চিত্র-সূচী

চিত্র-সূচী

চিত্র … পৃষ্ঠা

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

লেখক — পৃষ্ঠা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৬শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৪৩

১ম সংখ্যা

উদাসীন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফাল্গুনের রঙীন আবেশ
যেমন দিনে দিনে মিলিয়ে দেয় বনভূমি
নীরস বৈশাখের রিক্ততায়,
তেমনি ক'রেই সরিয়ে ফেলেছ তোমার মদির মায়া
অনাদরে অবহেলায়।
একদিন আপন হাতে আমার চোখে বিছিয়েছিলে বিহ্বলতা
রক্তে দিয়েছিলে দোল,
চিত্ত ভরেছিলে নেশায়, হে আমার সাকী,
পাত্র উজাড় ক'রে
জাদুরসধারা আজ ঢেলে দিয়েছ ধূলায়।
আজ উপেক্ষা করেছ আমার স্তুতিকে,
আমার দুই চক্ষুর বিস্ময়কে ডাক দিতে ভুলে গেলে;
আজ তোমার সাজের মধ্যে কোনো আকুতি নেই।
নেই সেই নীরব সুরের ঝঙ্কার
যা আমার নামকে দিয়েছিল রাগিণী।

শুনেছি একদিন চাঁদের দেহ ঘিরে
ছিল হাওয়ার আবর্ত।

তখন ছিল তার রঙের শিল্প,
ছিল সুরের মন্ত্র,
ছিল সে নিত্য নবীন।
দিনে দিনে উদাসী কেন ঘুচিয়ে দিল
আপন লীলার প্রবাহ?
কেন ক্লান্ত হ'ল সে আপনার মাধুর্য্যকে নিয়ে?
আজ শুধু তার মধ্যে আছে
আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন দ্বন্দ্ব,—
ফোটে না ফুল,
বহে না কলমুখরা নির্ঝরিণী।
সেই বাণীহারা চাঁদ তুমি আজ আমার কাছে।
দুঃখ এই যে, এতে দুঃখ নেই তোমার মনে।
একদিন নিজেকে নূতন নূতন ক'রে সৃষ্টি করেছিলে মায়ার ধ্বনি,
আমারি ভাললাগার রঙে রঙিয়ে।
আজ তারি উপর তুমি টেনে দিলে
যুগান্তের কালো যবনিকা
বর্ণহীন, ভাষাবিহীন।

ভুলে গেছ, যতই দিতে এসেছিলে আপনাকে
ততই পেয়েছিলে আপনাকে বিচিত্র ক'রে।
আজ আমাকে বঞ্চিত ক'রে
বঞ্চিত হয়েছ আপন সার্থকতায়।
তোমার মাধুর্য্যযুগের ভগ্নশেষ
রইল আমার মনের স্তরে স্তরে।
সেদিনকার তোরণের স্তূপ,
প্রাসাদের ভিত্তি,
গুল্মে ঢাকা বাগানের পথ।
আমি বাস করি
তোমার ভাঙা ঐশ্বর্য্যের ছড়ানো টুক্‌রোর মধ্যে।
আমি খুঁজে বেড়াই মাটির তলার অন্ধকার,
কুড়িয়ে রাখি যা ঠেকে হাতে।

আর তুমি আছ
আপন কৃপণতার পাণ্ডুর মরুদেশে,
পিপাসিতের জন্যে জল নেই সেখানে,
পিপাসাকে ছলনা করতে পারে
নেই এমন মরীচিকারও সম্বল ॥

১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬
শান্তিনিকেতন

মাঘোৎসব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

মানুষ সন্ধানী। আদিকাল হ'তে সে কেবল খুঁজে খুঁজেই বেড়িয়েছে। যখন তার সমস্ত চিত্তের উন্মেষ হয় নি, তখনও সে আপনার সন্ধান-প্রবৃত্তিকে ক্রমাগত জাগিয়েছে। এই চলার পথে পরিশ্রান্ত হ'য়ে সে কত বার তার চার দিকে একটা গণ্ডী টেনে দিয়ে বলেছে—এই হ'ল আমার গম্যস্থান, এখান থেকে আর এক পাও নড়ব না। অভ্যাস আর অনুষ্ঠানের বেড়া গ'ড়ে তুলে নিজেকে বন্দী ক'রে রেখেছে যাতে তাকে আর সাধনা করতে না হয়, সন্ধান ক'রে বেড়াতে না হয়। মস্তকে খুঁটির মতো তৈরি ক'রে সে তার চার দিকে কেবলই ঘানির বলদের মতো ঘুরেছে। পরিচিত কতকগুলো অভ্যাস অবলম্বন ক'রে মানুষ আরাম চেয়েছে।

কিন্তু মানুষ তো আরামের জীব নয়। স্থাণুর মতো স্থির হয়ে আপাত পরিতৃপ্তি নিয়ে সে যখন ব'সে থাকে, তখন তার সেই আরামলোভী সমাজের মধ্যেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব নিয়ে মহামানুষ জন্মায়। সে বলে—আমরা তো গহ্বরচর জীব নই, একটা নিত্যনিয়মিত গতিহারা রুদ্ধ জীবনের আহার বিহার ও আরাম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে আমাদের চলবে না তো! মহাপুরুষ সাধনার পথকে স্বীকার ক'রে নেন, সত্যকে সন্ধান ক'রে তিনি সেই গভীরকে সেই অসীমকে উপলব্ধি করতে চান। সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার সীমা অতিক্রম করার জন্যে তিনি তাঁর বেড়াভাঙার বাণী নিয়ে আসেন। মনে করিয়ে দেন যে, আরামের মধ্যে আনন্দ নেই, আনন্দকে মিলবে কেবল সেই অসীমের প্রাঙ্গণে। লোকে বলে এতদিনকার অভ্যাস আর অনুষ্ঠান দিয়ে বেড়া তৈরি করেছি, এখন সে গণ্ডী ভাঙবো কী ক'রে? এসেছি আমরা আমাদের গম্যস্থানে, আরামে আছি, আর খুঁজে বেড়াতে চাই না। তারা তাদের মিথ্যাকেই আঁকড়ে ধ'রে মহাপুরুষের সত্যবাণীকে অস্বীকার করে; তাঁকে গাল দেয়, অপমানও করে। বিজ্ঞানের দিক্ দিয়েও আমরা দেখি মানুষ আরাম পাবার জন্যে তার বুদ্ধিকে একদা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। প্রাচীনকালে লোক বলতো যে, আকাশ একটা কঠিন গোলকান্ধ, তাতে নড়চড় নেই, মাথার ওপর এই ফার্মামেণ্ট (firmament) কল্পনা ক'রে নিয়ে এবং জগৎ-সংসারের সমস্ত নিয়ম একেবারে বেঁধে ফেলে মানুষ আরাম পেলে—যেন বিভ্রমের পথে তার ভ্রাম্যমান বুদ্ধির একটা স্থিতি হ'ল। আমাদের দেশের জ্ঞানবৃদ্ধেরাও বলেছেন যে, সুমেরুশিখরের এক দিক্ দিয়ে সূর্য্য ওঠে, এবং আর এক দিকে

নামে ; কচ্ছপের খোলসের উপর আর বাসুকির মাথায় পৃথিবী অবস্থিত এই কল্পনা ক'রে ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের তাঁরা একটা ব্যাখ্যা ক'রে নিলেন। এতে ক'রে তাঁদের বুদ্ধি আরাম পেলে। কিন্তু সে বাঁধা-নিয়ম টিকল না তো! মানুষই তো শেষকালে বললে, পৃথিবীও চলছে। আরামপ্রিয় মানুষ এই সম্ভাবনায় হিংস্র হয়ে উঠল, সন্ধানের দুরূহ পথে পরিশ্রান্ত হবার ভয়ে সে বৈজ্ঞানিককে বললে, তার কথা প্রত্যাহার করতে। মানুষ কিন্তু অভ্যাসকে মানে নি, যদিও সে বাঁধামতওয়ালাদের কাছে অবমানিত হয়েছে; মার খেয়েছে। প্রাণ দিয়েও মানুষ সত্যকে দেখাবার প্রয়াস করেছে, ভয় পায় নি।

ধর্ম্মেও দেখি সেই রকম বাঁধা নিয়ম, কত শুচিতা, কত কৃত্রিম গণ্ডী। নিয়ম-পালন ক'রে আচার আবৃত্তি আর অভ্যাস রক্ষা ক'রে সে তার চিন্তাকে অবকাশ দিতে চেয়েছে, বহুবিধ জটিলতা থেকে। মানুষ বলেছে যে, আদিকাল থেকে ব্রহ্মা যে নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন, তার বাইরে যাবার জো নেই। ফলে নিত্য কৃত্রিমতার দরুন তার মন অসাড় হ'য়ে যায়, সে তখন নিত্যধর্ম্ম অর্থাৎ সত্যকে মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করে। আমাদের দেশে ধর্ম্মের যখন এই রকম নিঃসাড় অবস্থা, তখন রামমোহন এসেছিলেন। বাঁধা নিয়মের পথ পরিত্যাগ ক'রে তিনি দুর্গম পথের যাত্রী হ'য়েছিলেন। একথা বলা যাবে না যে শাস্ত্রজ্ঞ না হ'য়ে তিনি অন্য পথ বেছে নিয়েছিলেন। আচার আবৃত্তি ও অনুষ্ঠানের মধ্যে মন তাঁর তৃপ্তি মানে নি, অসীমের সন্ধান করতে গিয়ে তিনি উপনিষদের দ্বারে এসে পৌঁছেছিলেন। অন্যান্য মহাপুরুষের মতো তিনিও এসেছিলেন সন্ধানের পথে মানুষকে মুক্তি দিতে। তাঁদের মতোই কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা কত অবমাননা তাঁকে সইতে হয়েছে, কিন্তু বিপদ কোনও দিন তাকে সত্যপথ থেকে বিচলিত করতে পারে নি।

অতি বড় শোক ও বেদনার মধ্যে পিতামহীর মৃত্যুর পর পিতা আমার শান্তি চেয়েছিলেন। তাঁর সেই পীড়িত ও শোকাতুর চিত্ত আকাশের দিকে হাত বাড়িয়েছিল; তিনিও প্রচলিত ধর্ম্মের বাঁধন ছিঁড়ে এই উপনিষদের দ্বারে, সীমার ঊর্দ্ধে গিয়ে অসীমকে উপলব্ধি করার জন্যে এসেছিলেন। মুক্তির জন্যে তিনি রামমোহনের কাছে গিয়েছিলেন।

রামমোহন সম্পর্কে আজকের দিনটা একটা স্মরণীয় দিন। ছোট একটা মণ্ডলী গড়ে উঠেছিল তাঁর চার দিকে; তাঁদের কাছে তিনি ধর্ম্মপ্রচার করতে যান্ নি। তাঁদের সঙ্গে একসাথে সত্যের সাধনা ক'রেছিলেন। অভ্যাসের টান এবং শাসন থেকে বন্ধন-মোচন করতে তিনি এসেছিলেন মুক্তির দূত হ'য়ে। নিজের বন্ধন মোচন ক'রে অপরকে মুক্ত করার কর্ত্তব্য তিনি ক'রে গিয়েছেন। তিনি যদি ব্যর্থ হ'য়ে থাকেন, তবে সে আমাদের নিজেদেরই ব্যর্থতা; যদি তাঁর সাধনার বীজ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ ক'রে থাকে, তবে তা হ'ল সেই মহাপুরুষেরই কাজ।

১

মানুষের প্রথম ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আরম্ভ শক্তিকে পাবার জন্যে। রোগ, অন্নাভাব ও অন্যান্য অভাবের বিরুদ্ধে সে সংগ্রাম ক'রতে পারে না। সেই জন্যে সে কোনও শক্তিমানের সাধনা ক'রে শক্তিকে লাভ করার চেষ্টা ক'রেছে কেবল পার্থিব সুখের জন্যে নয়, মৃত্যুর পরেও ইহজীবনের সর্ব্বপ্রকার ব্যর্থতা অতিক্রম ক'রে একটা সুবিধে পাবার জন্য সে লালায়িত হয়েছে। এই শক্তির সাধনার পথে সে কত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন করেছে, কত মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপন করেছে। বিজ্ঞানের সাধনায় প্রবৃত্ত হ'য়ে মানুষ দেখলে যে, বিশ্বনিয়মের মধ্যেই শক্তি নিগূঢ় হ'য়ে আছে। প্রচণ্ড বেগ, প্রখর আলো,—সবই আছে এই জগতের মধ্যে। কিন্তু এই শক্তির রহস্যটা উদ্‌ঘাটিত হ'ল একে একে রূপকথার বিচিত্র স্বপ্ন সত্য হ'য়ে গেল, যখন বিজ্ঞান শক্তির ভাণ্ডার থেকে নতুন নতুন সব তথ্য এনে দিলে বুদ্ধির সঙ্গে ও শক্তির রহস্যের সঙ্গে যোগ সাধনে যারা কৃতী হয়েছে, তারা সব অভাব একে একে দূর করেছে। যারা অজ্ঞান, তারা দুর্ভিক্ষ ও মহামারীকে ভগবানের অভিশাপ বলেই স্বীকার ক'রে নেয়। যারা জ্ঞানযোগী তারা জানে যে, আরোগ্যের উপায় আছে পৃথিবীতে অন্তর্নিহিত শক্তির আকারে। অসীম শক্তির ক্ষেত্র এ বিশ্বসংসার। তার সঙ্গে যোগসাধন করতে পারলে

সার্থক হওয়া যায়। কিন্তু শক্তি যে আবার আত্মঘাতী, মারণ প্রবৃত্তি নিয়ে আসে! শক্তিই সব নয়, শক্তির উপরেও আর একটা জিনিষ আছে—সেটা আনন্দ! প্রেমের রূপে, সৌন্দর্য্যের আকারে, বীরের বীর্য্যে, ত্যাগীর ত্যাগে কঠোর ব্রতসাধনে সেই আনন্দ প্রচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে। আমাদের দেশে বলেছে যে, অসীমের আনন্দের সঙ্গে আত্মার যোগসাধনই প্রকৃত সন্ধানের জিনিষ, নিজেকে অনুভব করতে হবে এই বিশ্বসংসারের এবং সংসার-অতীতের মধ্যে। আমাদের প্রতিদিনকার মন্ত্রের আরম্ভ ভূর্ভুবঃস্বঃ,—সমগ্র বিশ্বের উপলব্ধি। নিজেকে বিরাট সৃষ্টির মধ্যে দেখা; সমস্তের সঙ্গে নিজের একান্ত যোগ অনুভব করা, এই হ'ল ব্যাহৃতি।

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

সৃষ্টিকর্তার বরণীয় তেজ ধ্যান করি—বাহিরের দিকে সৃষ্টিকর্তার প্রকাশ ভূর্ভুবস্বর্লোকে—সেই সৃষ্টি অন্তরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে চৈতন্যে। অসীম চৈতন্য সেই চৈতন্য প্রেরণ করছেন আমার অন্তরে। বাইরে এই বিশ্বসৃষ্টি এবং অন্তরে এই চৈতন্যধারা দুইকে একত্র মিলিয়ে ধ্যান করি তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গঃ। সৃষ্টিকর্তার এই বরণীয় তেজ নিজের চৈতন্যে উপলব্ধি দ্বারা অসীম চৈতন্যের মুক্তি অনুভব করি। আমাদের থাকতে হবে সেই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, সেই আলোতে—যে-আলো নিত্য বিচ্ছুরিত হয়ে আমাদের মনকে বিশুদ্ধ ক'রে দেয়। যে-বৃহতের মধ্যে ক্ষতি নেই, মরণ নেই, সেই অসীমে আমাদের আত্মাকে বিস্তীর্ণ ক'রে দেওয়ার সাধনা—বৃহতের সাধনা—আমাদের প্রতিদিনকার মন্ত্র!*

* শান্তিনিকেতনে মাঘোৎসবে আচার্য্যের উদ্বোধন ও উপদেশ। শ্রীক্ষিতীশ রায় কর্তৃক অনুলিখিত।

স্বপ্ন ও বাস্তব

শ্রীসুপ্রভা দেবী

জানি তাহা কিছু নয়। সেই মৃদু বাঁশরী-গুঞ্জনে
সেই পূর্ণ কৌমুদীর উচ্ছ্বসিত আলোক মায়ায়
বিধৌত প্রাসাদচূড়ে মধু নৃত্য ভবন-শিখীর।
সেই যে চামেলী-বনে পরিমল করিয়া লুণ্ঠন,
বায়ুভরে রহি রহি দীর্ঘশ্বাস উচ্ছলিয়া যায়,
যাহারে বাঁধিতে গেলে ক্ষণকাল নাহি রয় স্থির,
আঁখির পলক-পাতে স্বপ্নসম দিগন্তে মিলায়;
তবু কি প্রলয়-রাতে তারি লাগি চিত্ত কাঁদে হায়।
দুর্গম বন্ধুর পথে শঙ্কাকুল ত্রস্ত পদপাত,
অঞ্চলের আবরণে ঢাকি লয়ে ভীরু দীপখানি;
দুর্যোগের মত্ত বায়ে ভয়ে যদি কেঁপে যায় হাত,
নিমেষে নিবিয়া যাবে এই শিখা, সত্য এই জানি;
আঁধারে ঘিরিবে দিক, চারিধার মৃত্যুছায়াময়,
স্বপন-পূর্ণিমা স্মৃতি তবু হায় চিত্ত কেড়ে লয়।

পশ্চিমের যাত্রী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[৩] ভেনিস—ভিয়েনার পথে

জলপথের যাত্রা প্রথম কয় দিন একটু ভালো-ই লাগে। মহা-সাগরের হাওয়ায় যেন স্থলের কর্ম্মব্যস্ততাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, আমরা একটু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কিন্তু মাটীর সঙ্গে আমাদের নাড়ীর টান, দিন কতক একটু আরাম উপভোগ করবার পর আবার শুক্‌নো ডাঙ্গার জন্য প্রাণ আইটাই ক'রতে থাকে। রাত আটটার পরে জাহাজ পোর্ট-সাইদে পৌঁছুল। আমরা আশা ক'রছিলুম যে জাহাজ-ঘাটায় জাহাজ ভিড়বে, আমরা বিনা ঝঞ্ঝাটে ডাঙায় নামবো। তা হ'ল না, জাহাজ নঙ্গর ক'রলে শহর থেকে দূরে, জলের মধ্যেই। লাঞ্চে ক'রে শহরে যেতে হবে, অবশ্য জাহাজ কোম্পানীর নিখরচার লাঞ্চ। প্রথম বার যারা ইউরোপ যাচ্ছে, ছেলে-ছোকরার দল, তারা উৎসাহ ক'রে শহর দেখতে বেরুলো। পোর্ট-সাইদ আগে আমার দু-বার দেখা, কোনও বৈচিত্র্য নেই—তাই আমি আর রাত্রে নামলুম না। যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা কিছু খরচ ক'রে ফিরলেন—খামখা আধ-অন্ধকার রাস্তায় ট্যাক্সি বা ঘোড়ার গাড়ী ক'রে খানিক ঘুরে, আর আরব রেস্তোরাঁয় কিছু খেয়ে।

পোর্ট-সাইদ ছেড়ে ব্রিন্দিসি-মুখো হ'য়ে জাহাজ চ'লল। দু-দিন পরে ব্রিন্দিসি পৌঁছুবার কথা। জাহাজের একঘেয়ে জীবন পূর্ব্ববৎ চ'লেছে। একটা ছোটো ঘটনাতে হঠাৎ একদিন ইউরোপের লোকদের মজ্জাগত বর্ণ-বিদ্বেষ প্রকাশ পেলে। এই রকম একটা বর্ণ-বিদ্বেষ, বা বিদ্বেষাভাস, গৌরবর্ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বত্রই অল্প-বিস্তর বিদ্যমান। একটু কালো রঙের এক জন মাদ্রাজী ছোকরা, রীতা ব'লে যে ছোট্টো নরউইজীয়-রুশীয় খুকীটির কথা আগে বলেছি, তাকে একটু বেশী ক'রে কোলে নেয়, আদর করে। এটা রীতার মায়ের পছন্দ হয় না—যত দিন গোরা রঙের ভারতবর্ষীয়েরা কিংবা চীনারা খুকীকে আদর ক'রছিল, তত দিন কোনও কথা কেউ বলে নি। কিন্তু একটা কালো রঙের ভারতীয়কে তার শিশু মেয়েকে আদর ক'রতে দেখে সে নাকি শুনিয়ে শুনিয়ে একদিন বলে—"কালা আদমীরা আমার খুকীকে কোলে করে বা আদর করে সেটা আমি পছন্দ করি না।" এই কথা শোনার পর থেকে আমরা এদের একটু পাশ কাটিয়েই চ'লতুম। মাদ্রাজী ছেলেটা আমাদেরই মহলে খুব উষ্মা প্রকাশ ক'রলে একদিন, শ্বেতকায় জাতির সম্বন্ধে কতকগুলি সকারণ আর অকারণ গালিগালাজ ক'রলে, তবে তাদের শ্রুতিপথের বাইরে, এই সুবুদ্ধিটুকু তার ছিল।

গ্রীসের ধার দিয়ে আমাদের জাহাজ চ'ল্‌ল—ডান দিকে ক্রীট দ্বীপের অংশ, আর ইওনীয় দ্বীপপুঞ্জের কতকগুলির পাহাড়ে' তীরভূমি দেখা গেল। এইখানটায় আমার এক বন্ধুর খেয়াল-মতন তাঁর অনুরোধ পালন ক'রলুম,—গ্রীস আর ইটালীর মাঝে, তাঁর রচা একখানি বাঙলা কবিতার বই তাঁর হ'য়ে অর্ঘ্য-স্বরূপ জলে ফেলে দিয়ে, ভূমধ্য-সাগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কাছে নিবেদন ক'রলুম। বইখানিতে তিনি ইংরেজীতে লিখে দিয়েছিলেন—To the Mediterranean, Mother of Modern Civilization. গ্রীস আর রোমের অমর সংস্কৃতির কাছে, এবং গ্রীস আর রোমের ধাত্রী-স্বরূপ ভূমধ্য-সাগরকে হব্য-বাহন ক'রে, জন-গণ-মন-অধিনায়ক মানব-ভাগ্য-বিধাতার নিকটে তাঁর এই পূজোপায়ন প্রেরিত হ'ল; সমুদ্রের জলে বই ভেসে তলিয়ে গেল, দু-দিনেই লোনা জলের মধ্যে কাগজের বইয়ের পরিসমাপ্তি হবে,—কিন্তু বন্ধুবরের এই অভিনব অর্চ্চনার অন্তর্নিহিত ভাবটা আমার বেশ লাগ্‌ল।

২রা জুন সাড়ে আটটায় ব্রিন্দিসিতে আমাদের জাহাজ ধ'রলে। শহরে নেমে, তার পাথরে-মোড়া সড়কগুলি ধ'রে খানিক ঘুরে এলুম। একটা বাজারে দেখলুম, খুব ফল বিক্রী হ'চ্ছে, টকটকে' লাল চেরী ফলই বেশী। জাহাজে ফিরে এসে কতকগুলি চিঠি পেলুম—বাড়ীর চিঠি, ইউরোপের দু-চার

জন বন্ধুর চিঠি, ভেনিস থেকে জাহাজ কোম্পানী ব্রিন্দিসিতে পাঠিয়ে' দিয়েছে।

৩রা জুন সকালে আমরা ভেনিসে পৌঁছুলুম। সেই পরিচিত লিদো দ্বীপ—এখন এখানে বিস্তর বাড়ীঘর হ'য়েছে; তার পরে নীলাম্বু-চুম্বিতপদ প্রাসাদমালিনী সাগরবধূ ভেনিস-নগরী—সকালের মিষ্টি রোদ্দুরে উদ্ভাসিত হ'য়ে দেখা দিলে। পূর্ব্ব-পরিচিত সান-মার্কোর গির্জ্জার 'কাম্পানিলে' বা ঘড়ী-ঘর, প্রাচীন চুঙ্গী-দপ্তর, মাদোন্না-দেল্লা-সালুতে'র গির্জ্জার বৃহৎ গুম্বজ, এ সব দেখা গেল। ভেনিসের বন্দরে দেখা গেল—চার-পাঁচ খানা ফরাসী মানোয়ারী জাহাজ নঙ্গর ক'রে র'য়েছে; এদের সাদা রঙের বিরাট লোহার খোল, আর প্রভাতের বাতাসে উড়ছে তে-রঙা ফরাসী ঝাণ্ডার লাল-নীল-সাদা রঙ — সগৌরবে ফরাসী জাতির জয়জয়কার ঘোষণা ক'রছে। সবুজ-সাদা-লাল রঙের ঝাণ্ডা উড়িয়ে' খান তুই ইটালীয়ান যুদ্ধ-জাহাজও র'য়েছে দেখা গেল।

জাহাজ ক্রমে লয়েড ত্রিয়েস্তিনোর আপিসের লাগাও জাহাজ-ঘাটায় লাগ্‌ল। আমরা আগে থাক্‌তেই জিনিসপত্র গুছিয়ে' প্রাতরাশ সেরে তৈরী হ'য়ে আছি। আমার একটা বড়ো চামড়ার বাক্স সরাসরি লণ্ডনে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে জাহাজওয়ালাদের হাতে সেটা দিয়ে দিয়েছি। ছোটো তুটো লগেজ—একটা চামড়ার বাক্স, একটা থ'লে—জাহাজওয়ালারাই ডাঙায় নামিয়ে' দিয়ে ক্যাস্টম্‌স্‌-আপিস পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবে, এই আশ্বাস দিয়েছে। মাল নামিয়ে', প্রায় সকলেই মতলব ক'রেছেন, সরাসরি লণ্ডনের জন্য ট্রেন ধ'রবেন। জাহাজেই পাসপোর্ট দেখে ছাপ মেরে আমাদের ডাঙায় নামবার অনুমতি দিলে। আমরা তখন একে একে ক্যাস্টম্‌স্‌-আপিসের প্রশস্ত হলে এসে জমা হ'লুম—এই আপিস জাহাজ-ঘাটার সামনেই, পাশেই লয়েড ত্রিয়েস্তিনোর আপিস। একটা হলে যাত্রীদের অপেক্ষা করবার ব্যবস্থা হ'য়েছে—মার্বল পাথরের মেঝে, চেয়ার বেঞ্চি আছে, হলের এক দিকে মুসোলিনির এক ছবি, আর এক দিকে ইটালীর রাজার। পাশের হলে কাঠের সারি সারি মাচা—এগুলির উপরে যাত্রীদের বাক্স-পেটরা রাখা হয়, চুঙ্গীর কেরানীরা এসে বাক্স খুলে' দেখে, কোনও জিনিসে মাশুল আদায় করবার হ'লে, তা আদায় ক'রে ছাড়-স্বরূপ বাক্সের গায়ে খড়ী দিয়ে ঢেরা কেটে দেয়—যাত্রী তখন খালাস পায়, মালপত্র নিয়ে চুঙ্গীখানা থেকে বেরুতে পারে। আমাদের বাক্স-টাক্স ক্যাস্টম্‌স্‌ আপিসের হলে এসে জমা হবে, এই আশায় আমরা অপেক্ষা ক'রতে লাগলুম। জাহাজ থেকে মাল গড়িয়ে আসবার টানা সিঁড়ি ক'রে দিয়েছে তুটো—সিঁড়ির মতন ধাপ নেই, কাঠের পাটাতন দিয়ে বাক্স-পেটরা সব ঘষড়ে' ঘষড়ে' গড়িয়ে এসে নীচে জেটির উপরে প'ড়ছে, সেখানে সেগুলো মোটরে-চালানো ছোটো ছোটো গাড়ীতে বোঝাই ক'রে ক্যাস্টম্‌স্‌-আপিসে চালান ক'রে দিচ্ছে। আমার মাল তুটোর কোনও খোঁজ নেই। আধ ঘণ্টা আধ ঘণ্টা ক'রে প্রায় ঘণ্টা তুই অতীত হয় দেখে, আমি ত্যক্ত হ'য়ে জাহাজের উপরে উঠ্‌লুম, আমার মালের খোঁজে। দেখি, এক জায়গায় পাহাড়-প্রমাণ বাক্স ট্রাঙ্ক স্যুটকেস্ হোল্‌ড-অল টিনের পেটরা প্রভৃতির মধ্যে প'ড়ে র'য়েছে। অতি কষ্টে তুটিকে বা'র ক'রে নীচে চালান ক'রে দিলুম—মাল ক্যাস্টম্‌স্‌-আপিসে পরীক্ষার জন্য এসে গেল।

আমাদের সঙ্গে একটি মারহাট্টা ডাক্তার যাচ্ছিলেন—ডাক্তার শ্রীযুক্ত এন্ আর্ চোলকর; এঁর সঙ্গে খুব আলাপ হয়েছিল। পঞ্চাশের উপরে বয়স, টাক-মাথা, সদালাপী, প্রসন্ন হাসি মুখে লেগেই আছে, নাগপুরে ডাক্তারী করেন, ভিয়েনা যাচ্ছেন তু-একটা হাসপাতালের কাজ দেখবার জন্য; সারা পথ একখানি জর্ম্মান ব্যাকরণ নিয়ে জর্ম্মানের চর্চ্চা ক'রতে ক'রতে চ'লেছেন। ইনিও শুক্‌নো-মুখে নিজের মালের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, জাহাজে উঠে এঁকেও খোঁজাখুঁজি ক'রতে হয়,—পরে এঁরও জিনিস-পত্র এসে গেল। সঙ্গে ছিলেন অরুণ মিত্র ব'লে একটী বাঙালী ভদ্রলোক—বিলাতে অধ্যয়ন করেন, ইনি সোজাসুজি লণ্ডন যাবেন। আমরা তিন জনে একখানি গন্দোলা নৌকা ভাড়া ক'রে রেল-ষ্টেশনের দিকে রওনা হ'লুম। অরুণ বাবু সেখানে লণ্ডনের ট্রেন ধ'রে তুপুরের মধ্যেই যাত্রা ক'রবেন। আমরা লগেজ-আপিসে মালপত্র জমা ক'রে দিয়ে আসব—সন্ধ্যার দিকে আমাদের ভিয়েনা-গামী গাড়ী ছাড়বে, সারাদিন শহরটায় একটু ঘুরে, যথাসময়ে ষ্টেশনে এসে গাড়ী ধ'রবো।

জাহাজ থেকে মাল-নামানোর ব্যাপারে দেখা গেল,

ইটালীয়ানরা এ সব কাজে এখনো খুবই ঢিলে-ঢালা, ইংরেজদের মতন চটপটে' মোটেই হয় নি। বোম্বাইয়ে ইংরেজের শেখানো ভারতীয় কেরানী আর কুলিরা আরও দ্রুত যাত্রীদের মাল নামিয়ে খালাস ক'রে দেয়। যাত্রীদের মাল-পত্র বাক্স-পেটরার প্রতি ভারতীয় কুলিদের একটা মায়া মমতা আছে—মাথা থেকে নামানোর সময়ে, ঠেলে নিয়ে যাবার সময়ে, একটু বাঁচিয়ে' চলে; ইটালীয়ান কুলিরা, মালিক সামনে না থাকলে, লা-পরওয়া হ'য়ে লগেজগুলি দুম-দাম ক'রে কাঁধ থেকে মাটিতে ফেলে দেয়, জিনিস-পত্র জখম হ'ল কি না হ'ল, সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। এই যে ভারতীয় কুলিদের একটা কোমলতা,—এটা আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিরই একটা প্রকাশ মাত্র। অন্য অন্য ব্যাপারেও ভারত আর অন্য দেশের মধ্যে এই রকম একটা পার্থক্য আমি লক্ষ্য ক'রেছি।

মুসসোলিনির দাপটে ইটালীয়ানরা একটি বিষয়ে ভদ্র হ'চ্ছে দেখা গেল। আগে গন্দোলা ভাড়া করা ভেনিসে একটা বড়ই "ঘটা"র ব্যাপার ছিল—বিদেশী যাত্রী দেখ্‌লে গন্দোলার মাঝিরা অন্যায় ভাবে বেশী ভাড়া নিত, নানা রকমে যাত্রীদের "তঙ্গ" করত। এবার দেখলুম, ক্যস্টম্‌স্‌-আপিসের ঘাটে কাল-কোর্ত্তা-পরা এক ফাশিস্তী পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়ে' আছে, গন্দোলার ভীড়কে নিয়ন্ত্রিত ক'রে দিচ্ছে, আর গন্দোলাওয়ালাদের কত ভাড়া দিতে হবে তা যাত্রীদের ব'লে দিচ্ছে। আমাদের ব'লে দিলে, "ফেরোভিয়া" বা রেল-লাইন, অর্থাৎ রেল-ষ্টেশন পর্য্যন্ত "ত্রেই-দিয়েচি" অর্থাৎ তের' লিরা দিতে হবে; পাছে আমরা বুঝতে না পারি, তাই আঙুল দিয়ে ইশারা ক'রে জানালে, পাঁচ আর পাঁচে দশ আর তিনে তের'। যাঁরা আগে ইটালীতে ভ্রমণ করেছেন তাঁরা জানেন, এই 'এক দর'-এর ব্যবস্থা কতটা আরামপ্রদ।

কতকগুলি বুড়ো লোক লগী হাতে ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে'—এরা ঘাটে যাত্রী নেবার জন্য ভিড়্‌ছে এমন নৌকা লগী দিয়ে একটু টেনে নিয়ে' এল, আর যাত্রী চড়বার সময়ে হাত দিয়ে নৌকা ছুঁয়ে রইল, তার পরে মাথার টুপী ছুঁয়ে' সেলাম ক'রে দাঁড়াল,—কিঞ্চিৎ বখ্‌শীশ। এই রকম বুড়ো লোক গরীব লোক কিছু কাজের বা সেবার ভাব দেখিয়ে খামকা বখ্‌শীশের দাবী ক'রে বসে—ইটালীর এ রীতি এখনও বদলায় নি। এদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য দু-এক পয়সা দিতেই হয়।

গন্দোলায় ক'রে চ'ল্‌লুম—ভেনিস শহর তার প্রাসাদাবলীর সমৃদ্ধ শোভা নিয়ে পূর্ব্বেরই মত বিরাজমান। এতক্ষণ ধ'রে জাহাজ-ঘাটার রোদ্দুরে আর চুঙ্গীখানার হট্টগোলে লগেজ নিয়ে' যে বিব্রত হ'য়ে প'ড়েছিলুম, মেজাজ যে তিক্ত হ'য়ে গিয়েছিল, এখন গন্দোলায় চ'ড়ে, বেলা সাড়ে দশটার অপ্রখর রোদ্দুরে ভেনিসের প্রাচীন সব বাড়ীর রেখা-সুষম রৌদ্রোদ্ভাসিত সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে ভাবটা কেটে গেল, চিত্ত প্রসন্ন হ'য়ে উঠল। যেখানে যেখানে একটা খাল আর একটার সঙ্গে মিশেছে, মিশে' খালের মোড় বা চৌরাস্তার সৃষ্টি করেছে, সেখানে সেখানে একটু আগে থেকেই আমাদের গন্দোলার মাঝি হাঁক দিচ্ছে,—অন্য গন্দোলার মাঝি যাতে সাবধান হয়। ভেনিসের গন্দোলা প্রাচীন ভেনিসের এক অতি রোমান্স-ময় স্মৃতি-চিহ্ন। এক জন ক'রে দাঁড়ি পিছনে দাঁড়িয়ে' দাঁড়িয়ে' লগী দিয়ে এই নৌকা চালায়। আগে এদের খুব জমকালো পোষাক হ'ত, বিশেষতঃ অভিজাত-লোকের ঘরোয়া গন্দোলা হ'লে। আজকাল ভাড়াটে গন্দোলার মাঝিদের এক রকম উর্দ্দী হ'য়েছে, জাহাজের খালাসীদের মত পোষাক, সাদা ঢিলে ইজের, হাত-কাটা ব্লাউসের মত সাদা জামা, আর নীল রঙের স্কন্ধ ও পৃষ্ঠ বস্ত্র, মাথায় নীল খালাসী টুপী। গন্দোলার গলুইয়ে একটি ক'রে ইস্পাতে তৈরি ফলকের মতন থাকে, এগুলি গন্দোলার বিশিষ্ট অলঙ্করণ। অনেক সময়ে এই সব ইস্পাতের ফলক-অলঙ্কারে নানা রকম খোদাই কাজ থাকে; ভেনিসের ধাতু-শিল্পের খুব সুন্দর নিদর্শন এগুলি। আগে আমাদের দেশে বড়লোকের দরজায় বাহন হাতী ঘোড়া বাঁধা থাকত, গাড়ী হাজির থাকত, এখন মোটর তৈয়ারী থাকে; ভেনিসে খালের উপরে যে সব বড়ো বড়ো বাড়ী আছে, জলের উপরেই তাদের দরজায় গন্দোলা বাঁধা থাকে; গন্দোলা বাঁধবার জন্য লম্বা লম্বা কাঠের রঙ-করা খোঁটা বা থাম, বাড়ীর মালিকের coat of arms বা লাঞ্ছনের চিত্র দ্বারা অলঙ্কৃত,—ভেনিসের খাল-পথের ধারে ধারে খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে' শোভাবর্দ্ধন ক'রছে।

রেল-ষ্টেশনে পৌঁছে, ডাক্তার চোলকর আর আমি

আমাদের মালগুলি লগেজ-আপিসের হেপাজতে রেখে দিলুম, অরুণ বাবু তাঁর গাড়ী পেয়ে তাতে চ'ড়ে ব'সলেন।

সারাদিন পূর্ব্ব-পরিচিত ভেনিস শহরে সান-মার্কো অঞ্চলটায় ঘুরে' বেড়ালুম। চমৎকার লাগ্‌ল। তের বছরে বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হ'ল না। প্রথমেই আমরা টমাস্ কুকের আপিসে গিয়ে ভিয়েনা-পর্য্যন্ত টিকিট কিনলুম—তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটের জন্য নিলে ১৩০ লিরা, অর্থাৎ প্রায় ৩০ টাকা। শহর দেখার সঙ্গী হ'লেন আমাদের আসামী সহযাত্রী দু-জন—শ্রীযুক্ত কুলধর চলিহা ও শ্রীযুক্ত গুণগোবিন্দ দত্ত। ভেনিসের সান-মার্কোর চত্বর, সান-মার্কোর গির্জ্জা, অতীত কালের ভেনিসের শাসক "দোজে" উপাধিধারী রাজার বাড়ী, সান-মার্কোর চত্বরের ধারে সব দোকান, আর আশেপাশে কতকগুলি সরু সরু রাস্তায় দোকান-পাট, ঘোরা গেল। সান-মার্কোর গির্জ্জা আমার অতি প্রিয়। বিজান্তীয় রীতিতে তৈরি খ্রীষ্টান ধর্ম্মের এই মন্দিরটী রাস্‌কিন প্রমুখ অনেক শিল্প-রসিককে মুগ্ধ করেছে। এর ভিতরের মোসাইক্ কাজ এই রীতির চিত্রশিল্পের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই গির্জ্জাটীই ঘুরে-ফিরে খুব দেখা গেল।

১৯২২ সালে ভেনিসে এসে চার-পাঁচ দিন ধ'রে এই গির্জ্জাটী বেশ ক'রে দেখে নিয়েছিলুম। এরূপ সুন্দর পরিকল্পনার দেবমন্দির দেখে তৃপ্তি আমার হয় না। ভিতরটায় ছাতের নীচের দিকে যেন সোনা ঢালা—সোনালী জমির উপর লাল কালো নীল রঙের কাচের কুঁচি দিয়ে' বিজান্তীয় রীতিতে অঙ্কিত চিত্রের মোসাইক। মন্দিরের মধ্যকার নানা রঙীন পাথরের থাম, রঙীন পাথরের নক্সাদার মেঝে, আর উপরের দু-একটা কাচের জানালা দিয়ে সূর্য্যরশ্মি এসে ভিতরে গম্বুজ ক'টার নীচে জমাট আধো-আঁধারকে যেন বড়ো বড়ো টুকরো ক'রে কেটে দিয়েছে। এই মন্দির দর্শন-প্রসঙ্গে ১৯২২ সালের একটী ক্ষুদ্র ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। আগে ইটালী-ভ্রমণকালে দেখেছি, প্রায় সব গির্জ্জার ভিতরে, বেশ লক্ষণীয় স্থানে একটা ক'রে ইস্তাহার থাকৃত—La chiesa e la casa di Dio : vietato sputare—"গির্জ্জা হ'চ্ছে ভগবানের ঘর ; থুথু-ফেলা নিষিদ্ধ।" এই সান-মার্কো গির্জ্জাতে ব'সেই আমার অভিজ্ঞতা হয় যে এইরূপ ইস্তাহারের আবশ্যকতা ইটালীতে ছিল,—বোধ হয় এখনও আছে। সান্-মার্কো গির্জ্জায় একটা বিজান্তীয় যুগের icon বা মেরীর চিত্র আছে—যীশুকে কোলে ক'রে মা-মেরীর ছবি ; এটা এই মন্দিরের একটা বড়ো জাগ্রত দেবতা। এই চিত্রের সামনে ব'সে, ১৯২২ সালের দর্শনের সময়ে এক দিন দেখি, এক দল পাদরী ব'সে খুব ঘটা ক'রে litany বা মা-মেরীর শত নাম জপ ক'রছে। সামনা-সামনি চেয়ারে দু-সারিতে জন আষ্টেক পাদরী বসেছেন, সবুজ আর জরী দেওয়া খুব জমকালো পোষাক প'রেছেন, কালো পাদরীর পোষাকের উপরে। এক দল একটা ক'রে লাটিন মন্ত্র সুর ক'রে পাঠ করেন,—যেমন Mater Dei "মাতের্ দেই" অর্থাৎ "দেব-মাতা" বা "ঈশ্বর-মাতা," অন্য দল তেমনি সুরে জবাব-স্বরূপ ধুয়া পাঠ করেন—Ora pro nobis "ওরা প্রো নোবিস্" অর্থাৎ "আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন।" এই ভাবে মা মেরীর যত গুণবাচক নাম—যথা, Rosa Mystica বা "দৈব-রহস্যময়ী গোলাপ-পুষ্প", Mater Dolorosa "মাতের্ দোলোরোসা" বা "দুঃখময়ী বা বিষাদিনী জননী," Turres eburnea "তুরে'স এবুর্নেআ" বা "গজদন্তময়ী স্তম্ভস্বরূপিণী" প্রভৃতি—এক দল পাঠ করেন, আর অন্য দল "আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন" এই ধুয়া গান করেন। বেশ ভারিক্কে পুরুষের গলা, বিরাট মন্দির গমগম ক'রছে, সমবেত গীতধ্বনির প্রতিধ্বনি আসছে গির্জ্জাকে যেন কাঁপিয়ে দিয়ে। মূর্ত্তির সামনে বাতি জ্বলছে, ধূপ-ধূনার গন্ধে আর ধোঁয়ায় মন্দির পরিপূর্ণ, হাতজোড় ক'রে ভক্ত পূজারীর দল ব'সে আছে, হাঁটু গেড়ে আছে—ঠিক আমাদের পূজাবাড়ীর ভাব। আমি হিন্দু-সন্তান এই দৃশ্যটাকে বেশ উপভোগ ক'রছি, মন্দিরের দুটী থামের মাঝে একটু উঁচু স্তম্ভ-পাদপীঠে ব'সে ; সব ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ লাগছিল ; রোমান কাথলিক খ্রীষ্টান ধর্ম্মের নানা দেবতার মধ্যে কেমন ভাবে পিতা ঈশ্বর ও পুত্র যীশুর উপরেও মাতা মেরীর পূজার প্রসার লাভ ক'রেছে, তাই ভাব্‌ছি—কেমন ক'রে সেই জগজ্জননী যাঁকে আমরা ভারতবর্ষে উমা বা দুর্গা বা কালী ব'লে পূজা করি তিনি রোমান কাথলিক ধর্ম্মে মাতৃদেবী মেরীর বিগ্রহ ধারণ ক'রে ব'সেছেন তা দেখে পুলকিত হ'চ্ছি—এমন সময়ে দেখি, একটা ইটালীয়ান লোক, ময়লা কাপড়চোপড় পরা, হাতে টুপী, বাইরে থেকে এসে আমি যে

কোণে থামের তলায় ব'সেছিলুম সেখানে এসে দাঁড়াল'। আমার দিকে খানিক ক্ষণ তাকালে, তার পর দূরে যেখানে পূজা হ'চ্ছে সে দিকেও এক বার তাকালে, তার পরে খুব আওয়াজ ক'রে গলা খাঁখার দিয়ে খানিকটা থুথু আর কফ মন্দিরের ভিতরেই মেঝেতে ফেল্‌লে। তার এই বীভৎস বর্বরতা দেখে আমি তার দিকে একটা বিষাক্ত দৃষ্টি হান্‌লুম। তাতে সে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে তার চার্লি-চাপ্‌লিন-মার্কা বিরাট জুতো দিয়ে থুথুটা মেঝেয় লেপে দিলে। আমি আর সেখানে থাকৃতে পারলুম না, সেখান থেকে স'রে গিয়ে আর একটা কোণে গিয়ে ব'সলুম। লোকটা তখন কি ভেবে চ'লে গেল।

তের বছর আগে ইটালীর এই অবস্থা ছিল। দক্ষিণ ইটালীতে গির্জ্জার ইমারতে—বাইরে থেকে—আরও নোংরামি দেখেছি,—কাশীর অহল্যাবাঈ-ঘাট বা মুন্সীঘাট বা অন্য ঘাটের মত। (সুখের বিষয়, গঙ্গার তীরের ঘাটগুলি নোংরা করা বন্ধ ক'রতে কাশীর মিউনিসিপ্যালিটি সচেষ্ট হ'চ্ছেন, এ বার তা দেখে এলুম)। এ বার থুথু-ফেলা বিষয়ক ইস্তাহারটা সান্-মার্কো গির্জায় দেখ্‌লুম না। বোধ হয় মুসোলিনির হুকুমে ইটালীয়ানরা এ বিষয়ে এখন একটু পরিষ্কার, একটু ভদ্র, একটু শ্রদ্ধাশীল হ'তে শিখ্‌ছে। আমরা কবে তা হবো?

ভেনিস্ একটা ville d' art,—শিল্প ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ নগরী। এখানকার কাচের কাজ, চামড়ার কাজ, সুতোর লেস বা চিকন কাজ, পিতলের কাজ, আর অন্যান্য নানা মণিহারী জিনিস বিশ্ব-বিখ্যাত। দোকানের কাচের জানালায় যে-সব মনোমুগ্ধকর জিনিসের পসরা দিয়ে রেখেছে, সেগুলি থেকে চোখ ফিরানো যায় না, যেন শিল্পদ্রব্যের প্রদর্শনী খুলে দিয়েছে। শহরটীতে ঘুরলে কেবল আমাদের কাশীর কথা মনে হয়—সরু সরু গলি, উঁচু উঁচু বাড়ী, দু পা যেতে-না-যেতেই একটা ক'রে দেবালয়—কাশীতে শিবালয়, ভেনিসে গির্জ্জা—বিস্তর বাড়ীর দেওয়ালে কুলুঙ্গীতে দেবতার মূর্ত্তি—ভেনিসে যীশু বা মা-মেরীর মূর্ত্তি, আর কাশীতে শিবলিঙ্গ বা মহাবীরজীর মূর্ত্তি।

সঙ্গীদের নিয়ে বেড়াচ্ছি, মধ্যাহ্নাহার সমাপনের ব্যবস্থা ক'রতে হবে। ডাক্তার চোলকর মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, নিরামিষাশী, আর চলিহা ও দত্ত ডাক্তরিয়াদ্বয়ের হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস চলবে না। খুঁজে পেতে একটা ভেজিটেরিয়ান রেস্তোরাঁ বার করলুম। আহার বেশ হ'ল, তবে দামটা একটু বেশী নিলে ব'লে মনে হ'ল।

এইরূপে ঘুরে ফিরে, সন্ধ্যের দিকে ষ্টেশনে ফিরে আসা গেল। আমাদের গাড়ী রোম থেকে আসছে—রোম, ফ্লরেন্স, বোলঞা, পাদোবা বা পাদুয়া, ভেনিস, উদিনে, তার্বিসো, ভিল্লাখ, ভিয়েনা, তার পরে ক্রাকাউ, ভার্সোভা বা ওয়ার্স—এই হ'চ্ছে এর দৌড়; চারটে রাজ্যের ভিতর দিয়ে এই ট্রেন যাবে। ইটালীয়, জরমান, চেখ, আর পোলাণ্ড পর্য্যন্ত যে গাড়ীগুলি যাবে তাতে পোলিশ—এই চার ভাষাতে রেলের নোটিস লেখা। ষ্টেশনে আমরা গাড়ীর জন্য অপেক্ষা ক'রতে লাগলুম। ইটালীর রেল-ষ্টেশনে যাত্রীদের জন্য আট-দশ লিরায় কাগজের বড়ো বড়ো ঠোঙায় ক'রে আহার্য্য দ্রব্য বিক্রী করে; গাড়ীর রেস্তোরাঁ-কার-এ খেতে গেলে অনেক দর পড়ে, এই কাগজের ঠোঙায় যে colazione 'কোলাৎসিওনে' বা ভোজ্য পাওয়া যায়, তা খুবই ভাল—পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমি তা জানতুম; চলিহা ও দত্ত মশায়, আর আমি এই এক-একটা ক'রে কিনে নিলুম। এতে দিয়েছিল রুটি কয় টুকরা, পাতলা টিস্যু-পেপারে মোড়া খানিক ক'রে গরম-গরম কিছু আলু ভাজা, খানিকটা সরু সরু ফালি ক'রে কাটা পেঁয়াজ-রসুন দেওয়া ইটালীয়ান সসেজ, একটু রোস্ট-করা মুরগী, এক টুকরা পনীর আর একটা আপেল, এক টুকরো কেক, আর খড়ের আবরণে মোড়া এক বোতল ইটালীয়ান মদ—এটা লাল রঙের আঙুরের-রস ছাড়া আর কিছুই নয়। স্পেন ফ্রান্স, জাপান, ইটালী, গ্রীস—ইউরোপের দক্ষিণের এই কয়টি দেশে সকলেই এই মদ বা আঙুরের-রস খায়, কিন্তু এটি তাদের কাছে খাদ্য, মত্ততা আনবার সামগ্রী নয়। আমের রস জমিয়ে আমসত্ত্ব হয়, কিন্তু আঙুরের রসে "আঙুর-সত্ত্ব" হয় না, আঙুরের রস একটু টক হ'য়ে আল্‌কোহল-যুক্ত হ'য়ে যায়, এই যা। ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এই প্রকারের মদে শতকরা ৫ থেকে ৮ ক'রে আল্‌কোহল থাকে। হুইস্কি প্রভৃতি যব-পচিয়ে-তৈরী যে-সব মদ লোকে নেশা করবার জন্য খায় তাতে শতকরা ৬০ ক'রে আল্‌কোহল থাকে।

যাক্,—আমাদের ট্রেন সাড়ে ছটার একটু পরে ছেড়ে

দিলে। আমরা চার জন ভারতীয় তো যাচ্ছি—ডাক্তার চোলকর, চলিহা মহাশয়, দত্ত মহাশয়, আর আমি; এ ছাড়া প্লাটফর্মে দেখা হ'ল আর তিনটী ভিয়েনা-যাত্রী ভারতীয়ের সঙ্গে, এঁরা সেকেণ্ড ক্লাসে যাচ্ছেন। জাহাজে আমার ক্যাবিনে রমেশচন্দ্র ব'লে যে পাঞ্জাবী ছেলেটী ছিল, সে, আর তার বাপ মা চ'লেছেন। তার মা ষ্টেশনে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা ক'রছেন, বাপ আর ছেলে লগেজের তদ্‌বিরে গিয়েছে, ভদ্রমহিলার পরণে শাড়ী, তাই দেখবার জন্য প্লাটফর্মে বেশ একটা ভীড় জ'মে গেল। ইউরোপের কন্টিনেণ্টে এইটে প্রায়ই হয়। শাড়ী-পরা ভারতীয় মেয়েদের এরা কম দেখ্‌তে পায়—ইংলাণ্ডের লোকেদের এটা চোখ-সহা হ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু ইংলাণ্ডের বাইরে কন্টিনেণ্টে এখনও তা হয় নি। দেহলতাকে অবলম্বন ক'রে শাড়ীর রেখা-সুষমা এদের চোখে বড়ই সুন্দর লাগে। শুনছি হালে ইউরোপীয় মেয়েদের পোষাকেও শাড়ীর কিছু প্রভাব এসে যাচ্ছে—অনেক ফ্যাশন-রচক এখন মেয়েদের গাউনে *Sari* line অর্থাৎ শাড়ীর রেখা-সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা ক'রছেন।

ভেনিসের দ্বীপাবলী থেকে ইটালীর মাটী পর্য্যন্ত একটা বেশ চমৎকার জাঙ্গাল-সড়ক মুস্‌সোলিনির আদেশে তৈরী হ'য়েছে। মুস্‌সোলিনির রাজত্বে আর কিছু না হোক্, প্রাচীন রোমানদের অনুকরণে বড় বড় সড়ক, সাঁকো, স্মারক-মন্দির এই সব খুব হ'চ্ছে। মুস্‌সোলিনির বিপক্ষে যে সব প্রতিবাদ কচিৎ ইটালীর বাইরে উত্থিত হয়, তার মধ্যে শোনা যায়, গরীব দেশ ইটালীর রক্ত-শোষণ ক'রে মুস্‌সোলিনি তাঁর বাদশাহী চালে পাথরের আর ব্রঞ্জের ইমারতের পরে ইমারত, মূর্ত্তির পরে মূর্ত্তি, আর সড়কের পরে সড়ক বানিয়েই চ'লেছেন, যাতে প্রজার আয় হয় এমন পূর্ত্তকার্য্যের দিকে নজর ততটা নেই। যা হোক্, এই সড়কটা খুব চমৎকার, আর বোধ হয় এরূপ সড়কের দরকার ছিল। রেলের লাইনের পাশে-পাশে, সাগর-কূলের জলাভূমির উপর দিয়ে এই বিশাল রাস্তাটী গিয়েছে; এতে পদব্রজী, সাইকেল-আরোহী, মোটর-যাত্রী সব চ'লেছে, মোটর-ট্রাম অর্থাৎ লোহার লাইন নেই অথচ মাথায় তার আছে এমন মোটর-লরী চ'লেছে। আমরা ক্রমে-ক্রমে উত্তর ইটালীর সমতলভূমিতে প'ড়লুম। গ্রামের মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে তৈরী বাড়ীর চেয়ে মাঠে ক্ষেতের মধ্যে একতালা বা দোতালা চাষীর বাড়ী; সরু সরু খাল; গমের ক্ষেত, আঙুরের ক্ষেত। খুব চমৎকার সবুজের খেলা, কিন্তু খানিক পরেই বড্ড একঘেয়ে লাগ্‌ছিল।

ট্রেনের যাত্রীরা সব ইটালীয়—খালি একপাশে সামনা-সামনি দুটি জানালার ধারে ডাক্তার চোলকর আর আমি; চলিহা আর দত্ত মহাশয়রা অন্য কামরায়। এক জন সহযাত্রিণী ছিলেন, ইটালীয়ান একটি ছোকরার সঙ্গে আলাপ ক'রছিলেন, তাই প্রথমটায় তাঁকে ইটালীয়ান ব'লেই মনে হ'য়েছিল; পরিচয়ে পরে জানা গেল তিনি লাট্‌ভিয়া বা লেটোনিয়ার অধিবাসিনী, রিগা নগরে তাঁর বাড়ী, ভেনিসে তিনি অনেক কাল আছেন। ওয়ার্স হ'য়ে সোজা রিগা যাবেন। তাঁর মাতৃভাষা হচ্ছে রুষ; লেট্ ভাষা দেশভাষা ব'লে তিনি জানেন,—এ ছাড়া লিথুআনীয়, পোলিশ, জরমান, ফরাসী, ইটালীয় এ সব জানেন। আর কিছু পরিচয় দিলেন না। আমার সঙ্গে ফরাসীতে আর আমার ভাঙা-ভাঙা জরমানে আলাপ হ'ল। ইনি ভারতবর্ষের খবরও রাখেন দেখলুম, গান্ধীজী আর রবীন্দ্রনাথেরও নাম ক'রলেন। চলিহা মহাশয়দের গাড়ীতে কতকগুলি ইটালীয় ছাত্র যাচ্ছিল, তাদের সঙ্গে কথা কইবার জন্য আমায় চলিহা মহাশয় তাঁদের কামরায় ডেকে নিয়ে গেলেন। এরা পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-বিভাগের ছাত্র। ফরাসীতে এদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ১৯২২ সালে পাদুয়াতে আমি গিয়েছিলুম, পাঁচ-ছয় দিন ঐ শহরে ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম-শতকীয় উৎসব উপলক্ষে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল।

অস্‌ট্রিয়ার পথে একটী ষ্টেশন প'ড়ল, Udine "উদিনে"। এই উদিনে শহরে পরলোকগত ইতালীয় পণ্ডিত L. P. Tessitori এল্‌-পী-তেস্‌সিতোরি বাস ক'রতেন। আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষাগুলি নিয়ে যারা আলোচনা করেন, তেস্‌সিতোরি তাঁদের এক জন অগ্রণী ছিলেন। ইটালীতে থেকেই ইনি সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং গুজরাট ও রাজস্থানের ভাষাগুলিতে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেন। ১৯১৪-১৯১৫ সালে তিনি বোম্বাইয়ের "ইণ্ডিয়ান আণ্টিকোয়ারি" পত্রিকায় On the Grammar of Old

Western Rajasthani শীর্ষক একখানি অতি উপযোগী গ্রন্থ খণ্ডশঃ প্রকাশ করেন। এই পুস্তক ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের এক প্রামাণিক পুস্তক। তার পরে তেস্‌সিতোরি ভারতবর্ষে আসেন, গুজরাট ও রাজস্থান অঞ্চলে ভ্রমণ করেন, ঐ স্থানের নানা জৈন "ভাণ্ডার" অর্থাৎ দেবমন্দির-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থশালার পুঁথি আলোচনা করেন, এবং রাজস্থানী ভাষার সাহিত্য সম্বন্ধে অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকেন। কলকাতার এশিয়াটিক-সোসাইটি-অভ্‌-বেঙ্গলের তরফ থেকে ইনি দুখানি "ডিঙ্গল" বা রাজস্থানী ভাষার কাব্য সম্পাদন করেন; আর রাজস্থানী ভাষায় রচিত ভাট আর চারণদের সাহিত্যের হস্তলিখিত পুঁথির বিবরণী প্রকাশ করেন। গভীর পরিতাপের বিষয়, ভারতবর্ষে এসে কিছুকাল কাজ করবার পরে তেস্‌সিতোরি তরুণ বয়সেই হঠাৎ প্রাণত্যাগ করেন।

রাত্রি সাড়ে আটটা নয়টার দিকে আমরা উত্তর ইটালীর পার্ব্বত্য-অঞ্চলে পৌঁছুলুম। এবার বেশ শীত-শীত ক'রতে লাগ্‌ল। আমরা আলপ্‌স-পর্ব্বতের মধ্যে প'ড়লুম। ক্রমে ইটালীর সীমান্ত অতিক্রম ক'রে, অস্‌ট্রিয়ার সরহদ্দে প্রবেশ করা গেল। যথারীতি প্রথমটায় Tarvisio তার্‌বিসিও ষ্টেশনে ইটালীয় রাজপুরুষ এসে পাসপোর্ট দেখে তাতে ছাপ মেরে দিয়ে গেল। তার পরে এল Villach ভিলাখ্‌ ষ্টেশনে অস্‌ট্রিয়ান পাসপোর্ট-অফিসার—যাত্রীদের সঙ্গে বিশেষ ভদ্রতা প্রকাশ ক'রলে। রাত্রে ট্রেনে ভীড় ছিল না, একটা পুরো বেঞ্চি দখল ক'রে দিব্যি ঘুমোতে পারা গিয়েছিল।

৫ঠা জুন মঙ্গলবার। সকালে ঘুম ভাঙ্‌তে দেখি, চমৎকার দৃশ্য বাইরে—চারিদিকে সবুজ ঘাসে আর গাছপালায় ভরা পাহাড়, মাঝে মাঝে গ্রাম, কাছে আর দূরে ঘন-সবুজ পাইন বা সরল গাছের বন। আকাশটা বেশ মেঘলা—দু-এক পশলা বৃষ্টিও হ'য়ে গিয়েছে। একটা ছোটো ষ্টেশনে লোক উঠ্‌ল অনেকগুলি। এইবার জরমান ভাষার পালা। ভের্সাইয়ের সন্ধিতে যে ভাবে ইউরোপের রাজ্যগুলিকে ঢেলে সাজা হ'য়েছে, তাতে, মোটের উপরে, ভাষা-বিশেষের প্রসার-ভূমিকেই বিশেষ রাজ্য বা দেশ ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়া হ'য়েছে। অবশ্য, সব ক্ষেত্রে চুল-চেরা হিসাব ক'রে যে এই রীতি অনুবর্ত্তিত হ'য়েছে, তা নয়;—পোলাণ্ড, ইংলাণ্ড আর ফ্রান্সের খুব প্রিয়পাত্র ছিল ব'লে, পোলাণ্ডের উত্তরে লিথুআনীয়-জাতি দ্বারা অধ্যুষিত Wilna ভিল্‌না অঞ্চল, আর পোলাণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্বে রুষ-জাতির শাখা রুথেনীয় জাতির দ্বারা অধ্যুষিত Lwow ল্‌ভোভ্‌ বা Lemberg লেম্‌বের্গ অঞ্চল দখল ক'রে ব'সে আছে; স্বয়ং ফ্রান্স, জরমান-ভাষী Elsass-Lothringen, এলসাস-লোট্‌রিঙ্গেন বা Alsace-Lorraine আল্‌সাস্‌-লোরেন অঞ্চল অধিকার ক'রেছে; অস্‌ট্রিয়ান-সাম্রাজ্যের অংশীদার-বিধায় হঙ্গেরীয়ান্‌রা বিগত যুদ্ধের সময়ে সম্মিলিত শক্তি-সংঘের বিপক্ষে ছিল ব'লে, কতকটা হঙ্গেরীয়-অধ্যুষিত প্রদেশ চেকোশ্লোভাকিয়া আর রুমানিয়ার অধিকারে ফেলা হ'য়েছে। তবে মোটের উপরে, এখনকার অস্‌ট্রিয়াকে পুরাপুরি জরমান-ভাষী অস্‌ট্রিয়া বলা যায়। দক্ষিণে অস্‌ট্রিয়ার হাতা পার হ'লেই ইটালীয়-ভাষী আর স্লোভেন্‌ ও য়ুগোস্লাভ ভাষীদের দেশ পড়ে। ভেনিসের ইটালীয় স্বর-বহুল গুঞ্জনের পরে, এখন কানে ব্যঞ্জন-বহুল জরমানের ধ্বনি পৌঁছুতে লাগ্‌ল।

ভীড় বাড়ছে দেখে, ট্রেনের টয়লেট-কামরায় গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে ঠিক হ'য়ে নিলুম। এর পরে একটা ষ্টেশনে গাড়ীতে প্রাতরাশ বিক্রী ক'রতে এল—ষ্টেশনের রেস্তোর্‌াঁর একটি চট্‌পটে ছোকরা; কাগজের গেলাসে ক'রে খুব গরম-গরম কফী, আর পারিসের ধরণে অর্দ্ধচন্দ্রাকার মাখনের ময়ান দিয়ে তৈরী croissant ক্রোআসাঁ রুটি। আমার কাছে অস্‌ট্রিয়ান টাকা ছিল না, ইটালীয়ান টাকা নিলে, আড়াই লিরা দিয়ে এক গেলাস কফী আর দুখানা রুটি নিলুম। কি চমৎকার কফী—ভিয়েনায় পরে গিয়ে দেখলুম, অস্‌ট্রিয়ানরা কফী তৈরীতে সিদ্ধ-হস্ত, পারিসকেও হার মানায়। অস্‌ট্রিয়ান কফীর উৎকর্ষের একটা কারণ, এরা প্রচুর খাঁটি দুধের সর দিয়ে কফী খেতে দেয়।

এই অঞ্চলটার মধ্যে ইউরোপের আল্‌প্‌স্‌ পর্ব্বতের শাখা বিস্তৃত হ'য়ে আছে; বাস্তবিক পক্ষে, অস্‌ট্রিয়া ও সুইটজার-লাণ্ড, ভৌগোলিক সংস্থান হিসাবে আর দেশে অধ্যুষিত জাতির ভাষা ও ঐতিহ্য হিসাবে, একই দেশ। জরমানীর সঙ্গে সুইটজারলাণ্ড (ফরাসী ও ইটালীয় অংশ বাদ দিয়ে) আর অস্‌ট্রিয়া সংযুক্ত হ'য়ে গেলে, "ভাষাই হ'চ্ছে জাতীয়তা" এই

নীতির মর্য্যাদার রক্ষা হয়। বোধ হয়, কালে তা হবেও। পূর্ব্বে দু-বার সুইটজারলাণ্ডের মধ্য দিয়ে ট্রেনে ক'রে গিয়েছি, অস্‌ট্রিয়ার এই অংশ দেখে, খালি সুইট্‌জারলাণ্ডকেই মনে হ'তে লাগ্‌ল। সেই ঢালু পাহাড়ের গায়ে ঘাসের মধ্যে সাদা নীল হ'লদে ফুলের ঘটা, সেই ঢালু-ছাত দক্ষিণ জর্ম্মান ছাঁদের বাড়ী, সেই দূরে উঁচু পাহাড়ের শ্রেণী, সেই ছোটো ছোটো পাহাড়ে' নদীর ফেনিল সাদা জল তীর বেগে কুলু-কুলু রবে প্রবাহিত। দেশটাকে এরা এমন চমৎকার ক'রে রেখেছে, যে কথায় কি আর ব'লবো। এখানে বসতি বেশী, কিন্তু দেশের সম্বন্ধে, তার বাহ্য রূপ সম্বন্ধে, সাধারণ লোকেরও মমতাবোধ খুব। বসতি যে বেশী তা মাঝে মাঝে এই পাহাড়ে' পল্লীগ্রাম অঞ্চলে নানা জিনিসের যে-সব কারখানা স্থাপিত হ'য়েছে, তা থেকে বোঝা যায়।

যতই ভিয়েনার দিকে অগ্রসর হ'চ্ছি, ততই লোকের বাস বেশী ব'লে মনে হ'চ্ছে। লোকের বাস অর্থাৎ ঘরবাড়ী যত, তার চেয়ে বেশী যেন রকমারি কারখানা। বিঘার পর বিঘা জুড়ে বিরাট বিরাট এই-সব কারখানার ইমারত। লাল টালির ছাত, উঁচু উঁচু চিমনি। শহরতলী অংশের villa বা বাসবাটীর শ্রেণী—রাস্তায় ট্রাম—শেষে বেলা নটার পরে ভিয়েনা ষ্টেশনে আমাদের ট্রেন থাম্‌ল। ইউরোপের—ইউরোপের কেন পৃথিবীর—আধুনিক সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র, লণ্ডন পারিস বের্লিন রোমের সঙ্গে একত্র যার নাম ক'রতে হয় সেই শিল্প-বিজ্ঞান-সঙ্গীতের পীঠস্থান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আর সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী মূর্ত্তি ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অলঙ্করণে অতুলনীয়, বহুদিন ধ'রে দর্শনের জন্য আকাঙ্ক্ষিত ভিয়েনা নগরীতে অবশেষে উপস্থিত হওয়া গেল।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসুশীল জানা

বৃষ্টিটা বড় জোরেই নামিয়াছিল।

বৃষ্টি আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বেই উমেশ কবিরাজের বাড়ি গিয়াছে। তার পর বজ্রাঘাত ও ঝড়-ঝাপটার সহিত প্রবল বেগে বৃষ্টি নামায় বধূ মণিমালার উদ্বেগের অন্ত ছিল না। সাবিত্রীরও যে উদ্বেগ ছিল না, এমন নয় তবে তাহার উদ্বেগ ও ব্যাকুলতাটা একটু অন্য ধরণের। সে চঞ্চল মনে প্রতীক্ষা করিতেছিল, কতক্ষণে উমেশ ফিরিবে এবং অসুস্থ মেয়েটার মুখে ঔষধ পড়িবে। বৈকাল হইতেই যে মেয়েটা ঝিমাইয়া পড়িয়াছে!

সন্ধ্যার অল্প ক্ষণ পরেই উমেশ ফিরিল। বধূ অনুযোগ করিল—হ্যাগো—তোমার কি ভয়-ডর একটু নেই! এই ঝড়-জলে আজ না এলেই ত পারতে—ক'বরেজের বাড়িতে রয়ে গেলেই পারতে! কাল খুব সকাল সকাল উঠেই না-হয় আসতে। ধন্য সাহস বটে···চন্দ্র-নায়েবের কথা কি ভুলে গেলে, না গৌরার লাঠির ঘা ভুলে গেলে?···

উমেশ পেশল দেহ গামছা দিয়া মুছিয়া সেটা বধূর মুখের উপরে ছুঁড়িয়া দিয়া হাসিয়া বলিল—ভুলব কেন, গৌরাও ভোলে নি আর আমিও ভুলি নি। সে ব্যাটা এখন ঘানি টানছে তা জান? তার পর চন্দ্র-হালদার—ওকি বাঘ না ভালুক যে ওর ভয়ে ঘর থেকে বেরব না।

— ও আর কি বলেছিল সে তুমিই ভাল জান।

—জানি বইকি। গৌরাকে দিয়ে আমার মাথা ফাটিয়েছিল, কি হয়ত খুন করত—সে সব জানি। কিন্তু সেই গৌরচন্দ্র জেলে। আরে একি মগের মুল্লুক! রাজার আইন নেই? সে আর কেউ নয় আমার দাদা অধর মল্লিক; মুহুরীই হোক আর যাই হোক—প্রত্যেকটি আইন যার নখদর্পণে। এবার চন্দ্রকে যদি একবার জড়াতে পারি তাহ'লে বাচাধনকে একদম বারটি বছর···উমেশ দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, মধু যুগী—গরিব মানুষ, তার সর্ব্বস্ব মারবার ফন্দী! যেমনকে তেমন, জমিদারের কাছে আমার

এক সাক্ষীতেই নায়েবী খতম। সব বোঝে ত—জমিদার মানুষ, তায় আবার উকীল। আদালত হ'লে জেল হ'ত না!

বধূ বলিল—পরম আশে পাশে ক'দিন থেকে ঘোরাঘুরি করছে—তা জান?

উমেশ উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল, কে, পরমা, সাত চড়ে যার রা নেই। আর সেই বা আমার শক্রতা করতে আসবে কেন? সে আমাদের খেয়েই এক রকম মানুষ, আজও পর্য্যন্ত বৌদি তাদের কত সাহায্য করে আর তুমিও ত...

উমেশের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সাবিত্রী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। উমেশ ত্রস্ত হইয়া বলিল—চল চল বৌদি, ময়নাকে আগে ওষুধটা দিয়ে আসি। দাদাকে চিঠি দিলাম তার কোন উত্তর নেই—মহা বিপদে পড়লাম দেখছি। আজও পর্য্যন্ত এলেন না।

দুইবার ঔষধ দেওয়া হইল, ময়না কিন্তু তেমনই ঝিমাইয়া রহিল, মাঝে মাঝে ভুলও বকিতেছিল। হ্যারিকেনের দম কমাইয়া সাবিত্রী কন্যার শিয়রের কাছে জাগিয়া বসিয়া ছিল। ভাবিতেছিল, কত ক্ষণে সকাল হইবে আর উমেশ কাজলাগড় যাইবে টেলিগ্রাম করিতে।

যদিও উমেশ তখন বলিয়াছিল, এখন যদি বেরোই বৌদি—তা হ'লে ভোরে দাদাকে টেলিগ্রাম করতে পারব।

মণিমালা বাহিরের ধারাবর্ষণের দিকে চাহিয়া স্পষ্টই বলিয়াছিল—তুমি যদি ফের বেরোও তা হ'লে আমি এক্ষুনি আত্মঘাতী হব। তোমার প্রাণের মায়া কি একটুও নেই,—কপাল ভাঙলে যে আমারই ভাঙবে।

উমেশ তবুও বলিয়াছিল—হুঁ, আমি জোয়ান মরদ, প্রাণ হাতে ক'রে ব'সে থাকি আর ওদিকে মেয়েটা মরুক।

মণিমালা সাবিত্রীর হাত দুইটা ধরিয়া ফেলিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়াছিল—ওঁকে যেতে বারণ কর দিদি...একা গৌর ছাড়া কি চন্দ্র-নায়েবের আর লোক নেই। আবার কিছু একটা মন্দ কি ঘটতে পারে না!

সাবিত্রী ইহার উপরে আর কোন কথা বলিতে সাহস পায় নাই—সত্যই ত, সম্প্রতি গাঁয়ার উমেশের শত্রুর অভাব নাই। কিন্তু মনে তাহার দুঃখও হইয়াছিল, হিংসাও হইয়াছিল। কারণ এই উমেশকে সে নিতান্ত শিশুকাল হইতেই প্রতিপালন করিয়াছে আর আজ তাহার ভাল-মন্দ সে বুঝিল না—বুঝিল অন্য এক জন। লজ্জিতও হইয়াছিল এই জন্য যে মণিমালার কথাগুলা আগেই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না কেন!

এই প্রকৃতির একটা গোপন ঈর্ষার ভাব তাহার অন্তরে অন্তরে সম্প্রতি কয়েক মাস হইতে মণিমালার বিরুদ্ধে জাগিয়া উঠিতেছিল। সাবিত্রী ভাবে—উমেশের প্রকৃতি, তাহার ভাল-মন্দ সে-ই ত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী জানে ও বুঝে, সে-ই ত ভুক্তভোগী। আজ নূতন এক জন আসিয়া তাহার সে অধিকারটুকু ছিনাইয়া লইতেছে। তাই উমেশ যখন মণিমালার এমন কোন একটা মত চাহিয়া বসে, কি সামান্য কোন একটা জিনিষের প্রয়োজনের জন্য সাবিত্রীকে বাদ দিয়া মণিমালার অভিমতেই কাজ করিয়া ফেলে, তখন সাবিত্রী এই সংসারে নিজেকে নিষ্প্রয়োজন মনে করে।

মণিমালা ঠিক ইহার উল্টাটাই ভাবে। ভাবিয়া কাজ করিতে গিয়া পস্তাইতেও হয়। এই ত সেদিন সে এক রকম জোর করিয়াই উমেশকে গ্রামের আখড়াঘরে পাঠাইয়া দিল, কারণ উমেশ কিছুদিন পূর্ব্বে সাবিত্রীর পা ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে সে উক্ত জনৈক আখড়াঘরের ত্রিসীমানাতে আর কখনও যাইবে না। মণিমালা কেবল প্রতিজ্ঞাটাই জানিত—কারণটা জানিত না। তাই ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া বলিয়াছিল—গ্রামের পাঁচ জনের সঙ্গে মেলা-মেশা করবে না তাই কি হয়। বড়দি'র আর কি—তোমাকেই ত পাঁচ জনের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে হবে। তোমার ঘরে আগুন লাগলে কারা তখন নেবাতে আসবে শুনি?

উমেশ বলিয়াছিল, কিন্তু বড়দি'র পা ছুঁয়ে...

মণিমালা বলিয়াছিল, পা ছোঁয়াটাই বা কেন শুনি! প্রতিজ্ঞাই বা কিসের জন্যে।

উমেশ আর কথাটা ভাঙে নাই—তাহার ভয় হইয়াছিল, তাহাতে হয়ত মণিমালার নিকটে নীচু হইয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু উমেশ যখন আখড়া হইতে ফিরিল তখন সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে যে সঙ্গদোষে নেশা করে ইহা

মণিমালার জানা ছিল না। সাবিত্রী জানিত বলিয়াই প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিল।

উমেশ যখন মাতোয়ারা হইয়া ফিরিল তখন সাবিত্রী নিজের ঘরে দরজা দিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। এই অস্বাভাবিক ব্যবহারটা সে অত্যন্ত দুঃখে ও ক্রুদ্ধ হইয়াই করিয়াছিল। উমেশকে অনুসন্ধান করায় মণিমালা যখন হিংস্রতার আনন্দে বলিয়া ফেলিয়াছিল, আখড়ায় গেছে,—তখন সাবিত্রীর দুঃখের অন্ত ছিল না। মণিমালার সহিত কলহ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল বটে, কিন্তু কিছু না বলিয়াই সোজা সে নিজের ঘরে গিয়া খিল দিয়াছিল।

উমেশ আসিয়াই দাওয়ায় লম্বা হইয়া শুইল এবং উচ্চকণ্ঠে জানাইল, প্রথমে তাহাকে বৌদির পায়ের ধুলা না আনিয়া দিলে সেখান হইতে সে নড়িবে না—নড়েও নাই।

মণিমালা সাবিত্রীর নিকটে ক্ষমা চাহিয়া বলিয়াছিল, আমাকে ক্ষমা কর দিদি—আমি এসব জানতুম না।

উমেশকেও পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিতে হইয়াছিল।

ইহার পর হইতেই হয়ত সমস্ত বিসংবাদ মিটিয়া যাইত, কিন্তু মণিমালা মনে মনে একটা কথাই ভাবিতে লাগিল, কিছুতেই সে হটিয়া যাইবে না।

হটিলও না। অন্তরে অন্তরে দ্বন্দ্বটা রহিয়া গেল। উমেশ অত বুঝে না—বুঝিলে বা জানিতে পারিলে ইহাদের দুই জনকে সামলান হয়ত তাহার অসম্ভব হইয়া উঠিত। কারণ এক জন চায়,—সে 'বৌদি' 'বৌদি' বলিয়া তাহার সমস্ত অভাব-অভিযোগ ছেলেবেলার মত দস্যিপনা করিয়া ও আব্দারের সহিত কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া নিক এবং আর এক জন ভাবে—ভাল-মন্দ বুঝিবার ভার এখন ত তাহারই উপরে, সেখানে অপরের হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নাই। তাই একের সামান্য সার্থকতায় অপরে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরে।

মণিমালার মনের ভাব সাবিত্রী আজ সম্পূর্ণই বুঝিতে পারিয়াছে। ময়নাকে সে কেবল মৌখিক ভাবেই ভালবাসে, অন্তরে অন্তরে শত্রু ছাড়া আর কেহ নয়। ভালবাসিলে উমেশকে সে সহজভাবেই যাইতে দিত, এ পন্থা কেবল তাহাকে জব্দ করিবার জন্য। উমেশও যেন কি—সাবিত্রীর অভিমান হইল, উমেশ আজ পর হইয়া গিয়াছে। তাহার ভাগ্যটাই মন্দ।

যদিও উমেশ বলিয়াছিল, ত্রিশঙ্কুরও এমন হাল হয় নি। এখন যাই, না ঘরে ব'সে থাকি।

সাবিত্রীর মনে পড়িল, ঠিক এই কথাটাই উমেশ আর একদিন বলিয়াছিল। সেদিন উমেশের যেন সামান্য একটু শরীর খারাপ হইয়াছিল। মণিমালা সমস্ত দিনটা পাশে পাশেই ছিল। ইহা যেন সাবিত্রীর সহ্য হয় নাই—বলিয়াছিল, হ্যাঁরে, একটা বড় কিছু হ'লে কি করতিস্ বল ত? উমেশকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আজ কি খাবি উমা? ফল কিছু আনাই—কেমন?

মণিমালা প্রতিবাদ করিয়াছিল, উঁহু, শুধু একটু সাবু দিও বড়দি তৈরি ক'রে।

উমেশ বলিয়াছিল, না না বৌদি, ফল খাব। লেবু আনাও আর···ও সাবু আমি খাব না। উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিয়াছিল, আমার কি ভাল লাগে না-লাগে বৌদি সব জানে।

মণিমালার ইহাতেই অভিমান হইয়াছিল, কথায় কথায় সাবিত্রীকে যেন একটা কড়া কথাও শুনাইতে ছাড়ে নাই। ফলে উমেশ রহিল উপবাসী, সাবু লইয়া মণিমালাও আসিল না আর সাবিত্রীও মণিমালার কটু কথায় ফল আনিতে লোক পাঠায় নাই।

সেদিন ক্ষুধিত উমেশ চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল, ত্রিশঙ্কুর তবু মাথা গোঁজবার একটু ঠাঁই ছিল, কিন্তু আমার কপালে তাও নেই দেখছি। এমন ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

উমেশ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ মণিমালার চাপা কণ্ঠস্বরে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে উঠিয়া বসিল। বধূ বলিতেছিল, দেখ্‌বে এস, তোমার উপকারী পরম কি ভাবে দাঁড়িয়েছে দেখবে এস। সে এই ঝড়-জলে কি জন্যে লাঠি হাতে এসেছে শুনি? তোমার ঘর চৌকি দিতে বোধ হয়—না?

মণিমালার কথা সত্য বটে—

পরমই আসিয়াছে, কিন্তু তাহার বোধ করি দোষ নাই। বাঁচিয়া থাকিবার আশাই স্বার্থপর মানুষের মধ্যে প্রবল। সে যখন বলিয়াছিল, হুজুর যাদের খেয়ে মানুষ তাদের আমি এ অপকার করি কি ক'রে! মণি-ঠাকরুণ রাতে তোমাকে একা একা বাইরে আসতে দেয় না। লণ্ঠন হাতে পেছনে

পেছনে থাকে। তেনার সামনেই তেনার স্বামীকে আমি খুন ক'রতে পারব না হুজুর।

চন্দ্র হালদার উত্তরে গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়াছিল, বেশ। কাল-পরশুর ভেতরে তাহ'লে একবার নিতান্তই সদর আদালতে যেতে হয় দেখছি।

হুজুরের পায়ে মাথা ঠুকিয়া পরম বলিয়াছিল, ওইটি করবেন না হুজুর—ছেলেমেয়ে নিয়ে দাঁড়াই কোথা! জমিটুকু গেলে খাব কোথা থেকে!

অবশেষে হুজুরের ধমকানি ও আশ্বাসে আজই এই দুর্য্যোগের রাত্রে সুযোগ বুঝিয়া নিকাশ করিতে আসিয়াছিল। চন্দ্র হালদার যুক্তি দিয়াছিল, খলেয় পুরে একদম কালি নগরের গাঙে—বুঝলি?

উমেশ জানালার কাছে আসিয়া দেখিল—সত্যই কে যেন মাথায় কাপড় জড়াইয়া আঁকড় গাছটার তলে দাঁড়াইয়া। বুকটা তাহার একটু কাঁপিয়া উঠিল, গলাখাঁকারি দিয়া বলিল, ওখানে কে হে?

কোন উত্তর আসিল না—যে দাঁড়াইয়াছিল সে ধীরে ধীরে খানায় নামিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

পরম তখন দ্রুত পদে চলিয়া যাইতে যাইতে ভাবিতেছিল, যা হয় হোক—আশ্রয় না পাইলে এই মল্লিকদের আশ্রয়েই না-হয় আসিয়া উঠিবে—জীবনে সে খুন করে নাই, করিতেও পারিবে না। তাহার বার-বার মনে পড়িতেছিল, যেদিন সে ক্ষুধিত শিশুপুত্রদের লইয়া এই মল্লিক-বাড়িতেই আহার করিয়া গিয়াছিল সেদিনকার মণিমালার দয়ার্দ্র সুন্দর মুখখানি! ভাবিল, তাহারই সে সর্ব্বনাশ করিবে কি করিয়া!

পরম ঠিক এই রকম সব কথা ভাবিয়া আর মণিমালাকে দেখিয়া পূর্ব্বে বহু দিনই অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। আজ যাইতে যাইতে ভাবিল, দরকার নাই, একদিন মুখোমুখি গিয়া মণি-ঠাকরুণের পায়ের তলায় এই লাঠি দিয়া আসিব।

পরম যে-পথে অদৃশ্য হইয়া গেল সেই দিকে উমেশ একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। এমন সময় সাবিত্রী দরজায় ঘা দিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিল, ও উমা—উমা! বেরিয়ে আয় না ভাই একবার—ময়না যেন কেমন ক'রছে। কিছুতেই শুইয়ে রাখতে পারছি নে যে!···

উমেশ দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিল—বলিল, কি হ'ল, কই চল দেখি বৌদি?

ময়নাকে দেখিয়া আসিয়া উমেশ খাতা খুঁজিতে খুঁজিতে বলিল, আমি এখন শশী ডাক্তারের কাছে চললাম বৌদি—যত টাকা লাগে তাকে নিয়ে আস্‌ছি।

মণিমালা কোথায় ছিল ছুটিয়া আসিয়া উমেশের দুইটা পা জড়াইয়া ধরিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—না, কিছুতেই তুমি যেতে পাবে না। নিজের চোখে সব দেখেও কি তোমার বিশ্বাস হয় না কিছু! আমি সব জেনে-শুনে কোন মন্দ ঘটতে দেব না। কিছুতেই তুমি যেতে পাবে না।

সাবিত্রী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, ছেড়ে দে মণি—তোর পায়ে পড়ি, ওকে যেতে দে। ময়না যে আমার মরল রে! ওরে সে যেদিন ডুবে মরতে যাচ্ছিল সেদিন তুই-ই ত তাকে বাঁচিয়েছিলি—আজ তাকে তুই বাঁচা ভাই। তাকে যে তুই এত ভালবাসতিস, সে কি সব মিথ্যে রে!

মণিমালা কিন্তু তেমনই উমেশের পায়ের উপরে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। কিছুদিন পূর্ব্বের একটা ঘটনা তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছিল:

লোভী মেয়ে ময়না পুকুরের মাঝখানে একটা ডাব ভাসিতে দেখিয়া সেটাকে সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। গভীর জলে হাবুডুবু খাইতেছিল এমন সময়ে সে কলসীতে ভর দিয়া ভাসিয়া গিয়া তাহাকে টানিয়া আনিতেছে। সেদিন সে তাহাকে না উদ্ধার করিলেই ত পারিত! আজ সেই মেয়েটাই ত মরিতে বসিয়াছে, অথচ কেন সে উমেশকে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছে না! যাইতে দেওয়া উচিত, কিন্তু চন্দ্র-হালদারের মুখের কথা কয়টা—যাহা কানা-ঘুষা হইয়া তাহার কানে আসিয়াছিল তাহা যেন অন্তরে এখন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। স্পষ্টই সে দেখিতে পাইল, যেন কাহার ভীষণ লাঠির ঘায়ে মৃতপ্রায় উমেশকে কাহারা দাওয়ায় আনিয়া ফেলিল। বধূ শিহরিয়া উঠিয়া উমেশের পা দুইটা আরও নিবিড় ভাবে জড়াইয়া ধরিল। বিব্রত, বিমূঢ় উমেশ ছাতা-হাতে নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া।

এমন সময় বাহিরে অধরের উচ্চকণ্ঠস্বর শোনা গেল, ও উমেশ—উমা!···

উমেশ চমকিত হইয়া বলিল, দাদার গলা যেন শুনতে পাই—দাদা এল নাকি!

উমেশের দাদাই আসিয়াছে বটে। কণ্ঠস্বর শুনিয়া সাবিত্রীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার আতঙ্কিত মন নিজেকে প্রবোধ দিল, প্রধান লোকটিই যখন ফিরিয়াছে তখন ভয় করিবার বিশেষ আর কিছু নাই। বিপদের সমূহ ভার এখন যেন সেই সদ্য-আগত প্রধান লোকটির উপরে।

উমেশ দরজা খুলিতে গেল। মণিমালা উঠিয়া আসিয়া সাবিত্রীর দুইটা হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল ভাবে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিল, আমার অপ , ক্ষমা কর বড়দি। বড়ঠাকুরের কানে যেন একথা না উঠে—তাঁর শোনার আগে আমার যেন মরণ হয়। আমাকে ক্ষমা কর—ওঁর ভালমন্দ আমার চেয়ে তুমি-ই ত বেশী বোঝ বড়দি।

সাবিত্রী তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল—মৃদুকণ্ঠে বলিল, সে কি শুধু আজকেই রে! ওর ভাল-মন্দর ভার এ ঘরে যেদিন প্রথম ঢুকি সেদিন থেকেই যে আমার উপরে।

মণিমালা মৃদুকণ্ঠে বলিল, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর বড়দি—ময়না আমার শত্রু নয়। কিন্তু আমার কপাল-দোষে আজ আমি তোমার বিশ্বাস হারিয়েছি।

সাবিত্রী সস্নেহে বলিল, ছি—বিশ্বাস হারাতে যাবি কেন? কি যে বলিস···

—কেন হারাব না বড়দি! ময়নার আজ এই অবস্থায়···

মণিমালা আর বলিতে পারিল না। কিছু ক্ষণ পরে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, আমার মত স্বার্থপরের মরণ ভাল।

মণিমালা স্বার্থপর বটে! মুহূর্তে সাবিত্রীর চোখের সম্মুখে একটা ছবি ভাসিয়া উঠিল:

চন্দ্র হালদারের ষড়যন্ত্রে তাহাদের ঘরে আগুন লাগিয়াছে। সাবিত্রী বাক্স-পেঁটরা বাহির করিতে ব্যস্ত থাকায় কে কোথায় গেল তাহার খোঁজ রাখে নাই। সকলে বাহির হইয়া আসিবার অল্প ক্ষণ পরে মণি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, বড়দি, ময়না কোথায়? ধনরত্ন সর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হইয়া যাইবার ব্যথা অপেক্ষাও বড় যে একটা ব্যথা আছে তাহা যেন এত ক্ষণে সাবিত্রীকে শরাঘাত করিল। সাবিত্রী ময়নার নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। উমেশ চকিতে ছুটিয়া যাইতেছিল—মণিমালা তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিল,—না, তুমি নয়, আমি যাচ্ছি। মণিমালা মুহূর্তে ছুটিল সেই আগুন-লাগা ঘরের মধ্যে। মণিমালা যখন মূর্চ্ছিত ময়নাকে লইয়া ফিরিল তখন উমেশ বলিতেছিল, সর্ব্বনাশ! আরও একটা জিনিষ রয়ে গেল যে! ছোট বৌয়ের গয়নার বাক্সটা···উমেশ ছুটিয়া যাইতেছিল, মণিমালা তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিল, না—যেতে হবে না। সেটা আমার—তোমাদের নয়, যাক পুড়ে।

সাবিত্রীর স্নেহ, করুণা, সমস্ত কোমল অনুভূতি যেন একসঙ্গে উচ্ছল হইয়া উঠিল। কি যেন বলিতে যাইতেছিল কিন্তু বাধা পড়িল।

অধর তখন একহাঁটু কাদা লইয়া ঘরে ঢুকিয়াছে। হাতের জুতা জোড়াটা সশব্দে ফেলিয়া দিয়া বলিল, ময়না এখন কেমন আছে? উমেশের চিঠি পেয়েই বেরিয়েছি··· নরঘাটে আসতে সন্ধ্যে। তার পর যে ঝড়-জল, এগুতে কি পারা যায়। বাপ রে!···
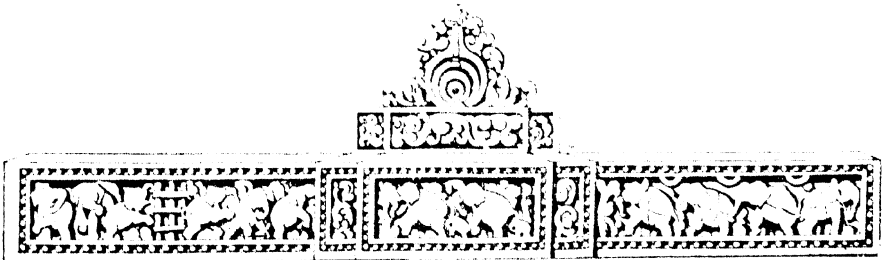
"চণ্ডীদাস-চরিত"

সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বাঁকুড়া নগর হইতে চারি ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে ছাতনা নামে স্থান আছে। সেখানে সামন্তভূমের রাজধানী ছিল। ১৫৭৫

চণ্ডীদাস-চরিত পুথীর লিপি

শকে, ইং ১৬৫৩ সালে, ছাতনার রাজা উত্তর-নারাণ তাঁহার কবিরাজ উদয়-সেনকে 'চণ্ডীদাস চরিত্র' বর্ণিতে আদেশ করেন। উদয়-সেন নানা স্থানে ঘুরিয়া তথ্য সংগ্রহ করিয়া সংস্কৃতে "চণ্ডিচরিতামৃতম্" নামে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহার মাত্র একখানি পাতা পাওয়া গিয়াছে। সে পাতার প্রথম পিঠের লিপি প্রদর্শিত হইল। তদনন্তর ছাতনার রাজা বলাইনারাণ তাঁহার প্রিয় পাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ-সেনকে "চণ্ডিচরিতামৃতম্" গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ করিতে বলেন। কৃষ্ণ-সেন উদয়-সেনের প্রপৌত্র ছিলেন। ১৭২৫ শকে, ইং ১৮০৩ সালে, বলাই-নারাণ রাজা হইয়াছিলেন। ইহার দশ-বার বৎসর পরে কৃষ্ণ-সেন উদয় সেনের পুথী আশ্রয় করিয়া বিবিধ ছন্দে "বাসলী ও চণ্ডীদাস," এই নামে পুথী লিখিয়াছিলেন।

যে পুথী মুদ্রিত হইতেছে, সে পুথী ছাতনার এক রাজার ছিল। রাজা বলাই-নারাণের পৌত্র এবং দ্বিতীয় লছমী নারাণের পুত্র রাজা আনন্দলাল সন ১২৬৮ সালে, ইং ১৮৬১ সালে, গুপ্তাঘাতে নিহত হয়েন। সে বিপৎকালে কিম্বা রাজার দ্বিতীয় রাণী আনন্দ-কুমারীর নিকট হইতে হামুল্যা গ্রামের শিবু-বাকতী (বাগ্‌দী) পুথীখানি নিজের ঘরে লইয়া যায়। শিবু রাজা আনন্দলালের দরোয়ান ছিল। সন ১৩১৮ সালে শিবুর মৃত্যু হইয়াছে। তদনন্তর সন ১৩২৫ কিম্বা ১৩২৮ সালে শিবুর পুত্র গিরি-বাকতী অন্য নানা পুথী ও কাগজ-পত্রের সহিত কাঠের একটা নূতন সিন্দুক লখ্যাশোল গ্রামের শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ-সেনকে বিক্রয় করে। ইনি কৃষ্ণ-সেনের প্রপৌত্র। এক্ষণে ইঁহার বয়স ৫৫ বৎসর। ছাতনার তিন ক্রোশ দক্ষিণে লখ্যাশোল। এই গ্রামের পাশে হামুল্যা গ্রাম। সন ১৩৪০ সালের বৈশাখ মাসে কেঞ্জাকুড়া গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুত রামানুজ-কর শ্রীযুত সেনের নিকট এই পুথীর ১১ ও ১২-র পাতা বাদে প্রথম ৪৪ পাতা পাইয়াছিলেন। আমি আশ্বিন মাসে ইঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি। পরে সিন্দুকের কাগজ-পত্র দেখিতে দেখিতে পুথীর ১১ ও ১২-র পাতা ও বাকি পাতা পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুত রামানুজ-কর

চণ্ডিদাসচরিতামৃতম্

আনিয়া দিয়াছেন। (পুথী-প্রাপ্তির বিস্তারিত বৃত্তান্ত ও পুথীর সংক্ষেপ সন ১৩৪২ সালের আষাঢ় ও ফাল্গুনের "প্রবাসী"তে দ্রষ্টব্য।)

পুথীখানি পুরু "বাঙ্গলা" কাগজের দুই পিঠে লিখিত। ১০০ পাতায় সম্পূর্ণ। পাতা ১৪৸০—১৫৸০ ইঞ্চি দীর্ঘ। শেষের তিন পাতা ছোট। এই তিন পাতায় উদয়-সেন হইতে কৃষ্ণ-সেনের বংশ-পরিচয় আছে। পুথীর পাতার বাম পার্শ্বে "বাসলী ও চণ্ডীদাস" এই নাম লেখা আছে। উদয়-সেনের পুথীর নাম "চণ্ডিচরিতামৃতম্।" চণ্ডী, বাসলী; আর চণ্ডী, চণ্ডীদাস। বোধ হয় এই হেতু কৃষ্ণ-সেন তাঁহার বঙ্গানুবাদের নাম "বাসলী ও চণ্ডীদাস" রাখিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস-চরিত-বর্ণন এই পুথীর মুখ্য বিষয়। এই হেতু এবং পাঠকের বোধের অভিপ্রায়ে মুদ্রিত গ্রন্থের নাম "চণ্ডীদাস-চরিত" রাখা গেল।

পুথীর অক্ষর গোটা গোটা, ছাঁদ পুরাতন। পুথী শুনিয়া গেলে অর্থবোধে কষ্ট হয় না, কিন্তু পড়িতে হইলে প্রথমে কয়েকটি অক্ষর পরিচয়, এবং বুঝিতে হইলে ছাতনা অঞ্চলের বাঙ্গলা-প্রাকৃত ভাষার বানান স্মরণ করিতে হইবে।

পুথীর তু স্থ পু অক্ষরের ু চিহ্ন র-ফলার মতন। ভু ও মু অক্ষরের ু চিহ্ন ভ ও ম অক্ষরে মিলিত হইয়াছে। হু, দেখিতে প্রায় হু। জ্ঞ বিচিত্র। ক্ত সেকেলে। "কৃষ্ণ" শব্দটি একটি অক্ষরে। ড় অক্ষরের তলে বিন্দু নাই। ৎ অক্ষর ৎ আকারে নাই। এখানে পুথীর দুই দূরবর্তী পাতার লিপি প্রদর্শিত হইল।

শব্দের বানানে উ স্থানে ঊ, ঐ স্থানে ওই, ঔ স্থানে ও ও কিম্বা ও, ণ স্থানে ন, য স্থানে জ, য় স্থানে অ কিম্বা এ, শ ষ স্থানে স লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ষু লিখিতে হু, এবং শু, স্থ স্থানে ষু হইয়াছে। শ অল্প কয়েক শব্দে আছে। ক্ষ আছে, নাইও। র-ফলা-যুক্ত ব্যঞ্জন দ্বিত্ব অথবা য-ফলা-যুক্ত, অথবা র-ফলা-শূন্য, এবং য-ফলা-যুক্ত ব্যঞ্জন র-ফলাযুক্ত হইয়াছে। ঋ-ও র-ফলার পরের ব্যঞ্জনে রেফ বসিয়াছে। পরে ব্যঞ্জন না থাকিলে র-ফলা-যুক্ত ব্যঞ্জনে রেফ আসিয়াছে। যেমন, বির্প্র। অক্ষরের মস্তকস্থিত ঙ, ম স্থানে অনুস্বর আছে। প্রথম খানকয়েক পাতায় যত বর্ণশুদ্ধি, পরে তত নাই।

উদয় সেনের চণ্ডিচরিতামৃতম্ পুথীর লিপি

আমরা শব্দের বানান দেখিয়া অর্থবোধ করি। পাঠকের সুবিধা হইবে ভাবিয়া এই মুদ্রণে শব্দের বানান বর্তমান প্রচলিত বানানের তুল্য করা গেল। যথা,

চণ্ডীদাসের পুথীর লিপি

পুথীতে

ওই দেখ সান্তিনদিঃ আঅ সাঁতারিবি জদিঃ আঅ সঙ্গে আঅ চলি আঅ।

মুদ্রণে

অই দেখ শান্তিনদী আয় সাঁতারিবি যদি
আয় সঙ্গে আয় চলি আয়।

পুথীতে

সোওদামিনী সমরুপে নবিন জোওবনা।

মুদ্রণে

সৌদামিনী সমরূপে নবীন যৌবনা।

পুথীতে 'ভোইরব' মুদ্রণে 'ভৈরব'। ছাতনার ও বাঁকুড়ার সাধারণ লোকে 'ভোউরব' বলে। তাহাদের মুখে স, এই একটি ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। বাঁকুড়া ও ছাতনায় অনেক শব্দের আদ্য ওকার স্থানে অকার হয়। যেমন, বোঝা, ধোবা, পোড়া, পোকা, পুথীতে বঝা, ধবা, পড়া, পকা।

য বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ ইঅ। ই ধ্বনি গ্রস্ত হইলে অ থাকে। এই হেতু য স্থানে অ হইয়াছে। যেমন, উদয়—উদঅ। য়ে স্থানে এ হইবার কারণও এই। যেমন, হৃদয়ে—রিদএ। বিষ্ণুপুরের পূর্ব-দক্ষিণাংশের কবিচন্দ্রের এক পুথীতে এ য়ে স্থানে অে, ও য়ো স্থানে অো আছে। পুথীতে এই রূপ নাই। কিন্তু য় স্থানে কোথাও কোথাও এ আছে। যেমন, ভয়—ভএ। কোথাও ই আছে। যেমন বিদায়—বিদাই, আয় আয়—আই আই। ইঅ প্রত্যয় প্রায়ই ইঞা, কোথাও ইআ হইয়াছে। এইরূপ, ইলে প্রত্যয় প্রায়ই ঞিলে, কোথাও ইলে আছে।

'ভাবিয়া' 'ডাকিয়াছে,' বর্তমান মৌখিক রূপে 'ভেবে' 'ডেকেছে'। পুথীতে 'ভাবে', ডাকেছে। 'হইতে', মৌখিক 'হতে'। পুথীতে 'হইতে', 'হতে' দুই রূপই আছে। 'হইতে' পড়িতে হইলে ই গ্রস্ত করিতে হইবে। গ্রস্ত ই বুঝাইবার নিমিত্ত বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার লিপিকরেরা য ফলা দিত। যেমন, হইল—হল্য, পাইল—পাল্য। এই পুথীর লিপিকর 'হইল' স্থানে 'হল' লিখিয়াছেন। "বল না বল না রাণী," পড়িতে হইবে "বল্য না বল্য না রাণী।" মুদ্রণে এই সকল রূপ অবিকল রাখা গেল।

পুথীতে পরিচ্ছেদ আছে। তিন তারা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সকল পরিচ্ছেদের নাম নাই। অনেক স্থানে একই ছন্দে দুই জনের উক্তি-প্রত্যুক্তি আছে। দুইবার না পড়িলে বুঝিতে পারা যায় না। এই অসুবিধা দূর করিতে পদ্যের বামে রেখা চিহ্ন দেওয়া গেল।

পুথী-প্রাপ্তির বৃত্তান্ত না জানিলেও ইহার কাগজ, কালী, অক্ষরের আকার, ছাঁদ, ভাষার শব্দ ও ব্যাকরণ, এবং রূপান্তর

দেখিয়া বলিতে পারা যায়, ষাট-সত্তর বর্ষ পূর্বে ছাতনার কোন রাজার মুন্সী পুথীখানি নকল করিয়াছিলেন। সমগ্র পুথী মুদ্রিত হইলে গ্রন্থ-বিচার করা যাইবে।

স্বস্তিক। বাঁকুড়া
সন ১৩৪২। চৈত্র

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

চণ্ডীদাস-চরিত।

বাসলী ও চণ্ডীদাস

উদয়-সেনের চণ্ডীচরিত হইতে বিবিধ ছন্দে লিখিতং।

পুথীর পত্রাঙ্ক ১/]

ওঁ শিবায় নমঃ।

বাসলী বিশ্বজননী কাল-ভয়-নিবারিণী
হামীর-উত্তর ভূপে ব্রাহ্মণের কন্যারূপে
অকস্মাৎ নিশিশেষে।
দেখা দিলা স্বপ্নাবেশে॥

বলেন রে নরপতি আমি হর-হৈমবতী
বারাণসী পরিহরি ভৈরবেরে সঙ্গে করি
শুভদিন শুভক্ষণে।
এসেছি ব্রহ্মণ্য ধামে॥

বণিক বলদ পিঠে আছি ব্যাপারীর মাঠে
শিলারূপ ধরি রহ আমি শ্যামা ব্রহ্মময়ী
বণিক না জানে তত্ত্ব।
পাষাণে পরম অর্থ॥

উঠ উঠ বাছাধন ত্বরায় কর গমন
বণিকের কাছে যাও বিনিময়ে শিলা নাও
হব তোর কুলদেবী।
নিত্য মোরে পূজা দিবি॥

বাসলী আমার নাম শুন বাছা গুণধাম
ত্যজ নিদ্রা চিন্তা ঘোর হের, কিবা রূপ মোর
নিশি অবসান প্রায়।
শয্যা ত্যজি উঠ রায়॥

বণিকের কাছে যাও বিনিময়ে শিলা লাও
মন্দির করহ বিরচন।
ঝটিতি রাখহ কীর্তি শিলামাঝে প্রতিমূর্তি
রাজপুরে করহ স্থাপন॥

কুশল হইবে তব যশোকীর্তি সুগৌরব
হব মুই তোর কুলদেবী।
জাগ্রত রহিব মুই দিগ্বিজয়ী হবি তুই
আমার যুগল পদ সেবি॥

ছাতনার বর্তমান মাপচিত্র

নিদ্রাভঙ্গে নর রায় সম্মুখে দেখিতে পায়
বিশ্বেশ্বরী হর-হৈমবতী।
ভীমাঙ্গিনী ভয়ঙ্করা এলাকেশী দিগম্বরা
সখণ্ডা* প্রচণ্ডা চণ্ডাবতী॥

উদ্ভ্রান্তা বিকটাননা লোলাক্ষী লোল-রসনা
ভীষণদশনা পলাদিনী†।
ভামিনী ভৈরবী ভীমা ভূতাত্মিকা ভ্রূভঙ্গিমা
নর-মুণ্ড-বিজয়-মালিনী॥

১) ছাতন নামে কোন গ্রাম নাই। রাজার নাম ছত্রিনা ছিল। অপভ্রংশে বর্তমান নাম ছাতন। রাজধানীর নামও ছাতনা। ব্রহ্মপুর, এখন বামুনকুলি। রাজধানীর একটা ছোট গ্রাম। ছাতনার বর্তমান মাপচিত্র পশ্য।

* খণ্ড, খড়্গ। সখণ্ডা, খড়্গিনী।

† সং পল, মাংস; সং পলাদন, মাংসাশী। বাং স্ত্রীং পলাদিনী।

হেরি চক্ষে নর রায় সঘন কম্পিত কায়
নমে চণ্ডা চণ্ডীর চরণে।
মুখে নাহি বাক্য সরে নয়নে প্রেমাশ্রু ঝরে
সর্ব্বাঙ্গ লুটায় ধরাসনে॥
কি ভয় কি ভয় তোর ভক্তপুত্র তুই মোর
বলি শ্যামা দিলেন অভয়।
উঠি তবে নরপতি করপুটে করে স্তুতি
মাতৃবাক্যে সানন্দ হৃদয়॥
জয়তি ভব-তারিণী জীব-অশিব-হারিণী
জগৎজননী পরাৎপরা।
ত্বং হি সদানন্দিনী অসুরারি-মর্দ্দিনী
হিম-গিরি-নন্দিনী তারা॥
কে জানে মা তব তত্ত্ব পাতাল ত্রিদিব মর্ত্ত্য
উন্মত্ত চিন্তনে তুমারি।
সাধে কি চরণে রণে পড়িলেন ধরাসনে
ত্রিপুরদলনে ত্রিপুরারি॥
জনক জনক যবে হরধনু-ভঙ্গ রবে
রাঘবে মানিলে নিজ কান্ত।
বনবাসে দিতে দণ্ড ঘটাঞিলে লঙ্কাকাণ্ড
রটাঞিলে অপযশ অনন্ত॥
অবতরি গোপকুলে ব্রজলীলা প্রকাশিলে
মান-ছলে রাখিলে মা কীর্ত্তি।
ললনা-ছলনা-ছলে পদে ধরি সমাকুলে
ভূতলে পড়েন বিশ্বমূর্ত্তি॥
প্রলয়-পয়োধি জলে যবে বিশ্ব ভাসাঞিলে
বিনাশিলে জগৎব্রহ্মাণ্ড।
পুন রচিতে সংসার নিজপতি সৃষ্টি কর
কিঙ্কর কি বুঝে তব কাণ্ড॥
অনন্ত-মহিমাবতী অচিন্ত্য-রূপ-শকতি
জ্যোতি-স্বরূপ-রূপ-ধরা।
সত্ত্ব রজ তমোময়ী দুরন্ত কৃতান্তজয়ী
ভবের ভবানী ভবহরা॥
কি জানি কি কব আর কি তত্ত্ব জানি তুমার
মাত্র পার করিবে সগুণে।
আমি অতি অভাজন না জানি ভকতি ভজন
হর ভয় অভয় চরণে॥

* | * | *

স্তবে তুষ্ট হঞে তবে মাভৈঃ মাভৈঃ রবে
অদৃশ্যা হইলা হৈমবতী।
প্রাতঃক্রিয়া সাঙ্গ করি চলিলেন ত্বরা করি
ব্যাপারীর মাঠে নরপতি॥
উপনীত হঞে তথা ডাক দেন বেন্যা কোথা
শুনি বেন্যা আইলা তখন।
ভূপে হেরি অকস্মাৎ আজি মোর সুপ্রভাত
বলি পদে করিলা বন্দন॥
পুনঃ জোড়-করে কয় অন্তরে হতেছে ভয়
কহ প্রভু কিবা প্রয়োজন।
কোন জন নাঞি সঙ্গে নাঞি অভরণ অঙ্গে
হেন বেশে কেন আগমন॥
আমি দীনহীন অতি তুমি হে ধরণী-পতি
যদি দোষ করে থাকি পায়।
১৮/] নিতান্ত অজ্ঞান জেনে ক্ষম প্রভু নিজ গুণে
বলি বেন্যা পড়িল ধরায়॥
তুলি তায় দ্রুতগতি কহিছেন নরপতি
শুন বাছা বণিক প্রধান।
কোন ভয় নাঞি তব যা চাহ তাহাই দিব
দেহ মোরে তব শিলাখান॥
করি পুনঃ অঙ্গীকার জাগাৎ* না লব আর
না দিব তোমারে কোন ক্লেশ।
মম রাজ্যে বেচা-কেনা করিবে খেরাজ† বিনা
কেহ কভু না করিবে দ্বেষ॥
যে আজ্ঞা বলিঞা বেন্যা শিলাখান দিলা এনে
হামীর-উত্তরে তদন্তর।
নৃপ শিলা ধরি শিরে আসি প্রবেশিলা পুরে
দেখি সাধু চিন্তিত অন্তর॥
ভাবে তুচ্ছ শিলাখান এতই কি মূল্যবান
সানন্দে নৃপতি ধরে মাথে।
এ শিলায় কে দেখিলা পরেশ মণির আলা
কে কহিলা রাজেন্দ্র সাক্ষাতে॥

* জাগাৎ শব্দটি ছাতনা অঞ্চলে অর্থ শুল্ক। অন্যত্র অপ্রচলিত। বোধ হয় সং জগৎ হইতে। জগৎ লোক; জাগাৎ লোকব্যবহার।

† খিরাজ, খেরাজ, রাজকর। আরবী শব্দ।

হবে কি অমূল্য ধন　　কিম্বা দেব দেবী কোন
　　শিলারূপে ছিলা মম পাশে।
সেবা অপরাধে আজি　আমারে গেলেন ত্যজি
　　এইরূপে নরেন্দ্র-সকাশে ॥
অজ্ঞান মানব আমি　　স্বর্গের দেবতা তুমি
　　হও যদি করি নিবেদন।
তিলেক স্বরূপ ধরি　　নিজগুণে কৃপা করি
　　অভাগারে দাও দরশন ॥

* | * | *

দেবীর আবির্ভাব ॥

উদিল সহসা　ঘোর ভীমভাগ　যোগিনী সঙ্গিনী সঙ্গে।
লো-লে লো-লো জিহ্ব　তাথিয়া তাথিয়া　নাচিয়া সমর রঙ্গে ॥
　হাসি হাহা হিহি　হিহি হিহি হিহি　রহি রহি রহি তুণ্ডে।
　চর্ব্বণ বিকট　　কট কট কট　　মট মট নরমুণ্ডে ॥
　শঙ্খ হাম হম　　তুম তুম তুম　　দনুজ-দলন দম্ভে।
　ঘন-রণ-নাদে　　পদে পদে পদে　　অটলা ধরণী কম্পে ॥
　অট্ট অট্ট হাসা　　ভীমা বিশ্ব-ত্রাসা　বিকট ভ্রুকুটি-ভঙ্গে।
　দীপ্ত এলকেশী　　রক্তবীজ নাশী　　রুধিরাশী রণরঙ্গে ॥
　করি খান খান　　হান হান হান　　খণ্ডান খর খণ্ডে।
　হাকি হুহুঙ্কারি　　ভীমা ভয়ঙ্করী　　দুর্মদ দানব দণ্ডে ॥
　সাধু পড়ি পাকে　ত্রাহি ত্রাহি ডাকে থর থর থর অঙ্গে।
　কহে দে মা ক্ষমা　হর মনোরমা　　ভীত চিত স্বরভঙ্গে ॥
শ্যামা চাহি না মা আর স্বরূপ দেখিতে　সম্বর রূপ তোর।
সদা　শয়নে স্বপনে　ও রাঙ্গা চরণে　থাকে যেন মতি মোর ॥
কত　সর্ষপ ঝাল　পেষণে প্রহার　করেছি মা তোর বুকে।*
বল　পরিণামে গতি　কি হবে আমার　মরি যে মা মনদুখে ॥
আমি কত অপরাধ　করেছি মা শ্যামা তোরে রাখি তরুতলে।
বুঝি　সেই অভিমানে　ত্যজিলি আমার হৃদয়ে আগুন জ্বেলে ॥
আমি　পাগল হইব　কেঁদে বেড়াইব　বলিব সবার কাছে।
আমার মা ছিল পাগলী　গেছে কুথা চলি
　　　　　　　　　　থৈই বুলি লাছে লাছে† ॥

* বণিক শিলাখণ্ডের এক পিঠে বাটনা বাটিত, অন্য পিঠে মাটি ছিল, বণিক সে পিঠে কোন মূর্ত্তি দেখে নাই।

† লাছ, স রণ্য, পথ।

আমি　অনলে পশিব　অগাধে ডুবিব　মরিব মরিব তারা।
তায়　দেখিব কেমন বহে　কিনা তোর বহে　সে নয়ানে ধারা ॥
তুই　দীনে দুর্গতি- হরা অসিধরা দীনের দুর্গতি নাশে।
তবে　দীনে দুঃখ দিয়া দীন দয়াময়ী কেন গেলি রাজবাসে ॥
আবার ডাকিলে ডাকিনী সাজিয়া আইলি নাচিয়া তাথিয়া থিয়া।
মাগো　হেরিয়া সে তোর　ভীষণ মূরতি　এখনো কাঁপিছে হিয়া ॥
চাস　ভয় দিয়া বুঝি　ফিরাইতে তোর　দাবি হতে দয়াময়ী।
মাগো　আমি যে কঠিন পাষাণীর ছেল্যা　ফিরিবার ছেল্যা নই ॥
ডাকি　আই আই আই　আই ব্রহ্মময়ী　আই সেই শিলারূপে।
আমি　সদাই পূজিব　নয়ানে হেরিব　রাখিব হৃদয়ে চেপে ॥

* | * | *

২/]

তখন　সহসা অদূরে মধুর শবদে　হইল আকাশবাণী।
আমার যেন গণপতি　কুমার যেমতি　তেমতি আমার তুমি।
মোরে　প্রেমপাশে আঁটি　বেঁধেছ যেরূপ কোথা থাকি তোমা বই।
বাছা　কেন কাঁদ মিছে　আছি তোর কাছে
　　　　　　　　　　তিল আধ ছাড়া নই ॥
আমি　শিলারূপে তোর　বলদের পিঠে
　　　　　　　　　　কেন ব্যাজে তোরে ছলি।
আজ　কাশী ত্যজি হেথা কেন যে আইনু
　　　　　　　　　　শুন তবে তোরে বলি ॥
কভু　সমাজ-পীড়নে　দ্বিজ দুই ভাই　ব্রাহ্মণনগর-বাসী।
পেয়ে　মনকষ্ট অতি　মাতার সংহতি　গিয়াছিল তারা কাশী ॥
জ্যেষ্ঠ　দেবীদাস　অনুজ চণ্ডীদাস　দ্বিজ নাম ধরে দুই জনে।
তারা　শান্ত শুদ্ধ-চিত　অতিমাতৃভক্ত　সদামত্ত হরিনামে ॥
মাতা　বিশ্বেশ্বরে স্মরি　ত্যজিলা জীবন　পঞ্চগঙ্গা ঘাটে২ যবে।
তারা　সেই হতে এই　শিলারূপে মোরে　পূজিত জননী ভাবে ॥
তার　কিছুদিন পর　জুড়ি দুই কর　বিষাদে কহিলা মোরে।
মাগো　তুমারি ইচ্ছায়　যাব দ্বারিকায়　কেমনে পূজিব তোরে ॥
তোরে　কেমনে পূজিব　বলে দে জননী　কিম্বা চাহি অনুমতি।
তোর　শিলারূপখানি　ধরি শিরোপরে　লয়ে যেতে দ্বারাবতী ॥
আমি　গগনের গায় মিশিয়া কহিনু　শুন দেবী চণ্ডীদাস।
এবে　দিনু অনুমতি　যাও দ্বারাবতী　পূর্ণ হবে অভিলাষ ॥

২) পঞ্চগঙ্গা ঘাট, কাশীর এক বিখ্যাত ঘাট। এই ঘাটের নিকটে অনেক বাঙ্গালীর বাস আছে।

বাছা শিলারূপ মোর না লইবি সাঁথে পথে পাইবা বহু ক্লেশ।
যবে রব দেশান্তরে পূজিবা অন্তরে শিলায় পূজিবা শেষ॥
হবে একদিন সাধ দেখিতে তোদের সাধের জনম-ভূমি।
বাছা যাবি তথা যবে যাব তার আগে এই শিলারূপা আমি॥
তখন এই শিলা হইতে ধরিব মূরতি ভক্তের পীরিতি লাগি।
তোরা গিঞে জন্মভূমে বংশ অনুক্রমে হইবি পূজার ভাগী॥
দিয়ে এহেন আদেশ এসেছি এদেশ তুমার বলদে চড়ি।
এই কহিলাম সার সব সমাচার আর কেন ভূমে পড়ি॥
এবার উঠহ অব্যাজে যাও নিজ কাজে গগনে উদিল ভানু।
সাধু মাতৃ আজ্ঞা শুনি চলিল অমনি আনন্দে আপ্লুত তনু॥*

* | * | *

মহানন্দে মহীপতি আসি অতি দ্রুতগতি
লঞে শিলা প্রবেশিলা পুরী।
ধরি তায় মঞ্চপরে ধৌত করে নিজ করে
সযতনে দিঞা গঙ্গাবারি।
আসিয়া মহিষী তথা হাসিয়া কহেন কথা
রাজন এ শিলায় কি হবে।
লক্ষ দাস দাসী যার একাজ কি হয় তার
বাতুল হইলে বুঝি তবে॥

বল না বল না রাণী কহিলেন নৃপমণি
ইনি শ্যামা গৌরী বিশ্বরূপা।
স্বইচ্ছায় হঞা রাজি হামীর-উত্তরে আজি
স্বপ্নছলে করিলেন কৃপা॥
মহিষী বলেন ওমা এ শিলা হইলে শ্যামা
শ্যামা ছাড়া শিলা কোথা তবে।
ভূপ কন ভক্তি করি দেখ চিন্তে নরেশ্বরী
গূঢ়তত্ত্ব তাহলে বুঝিবে।
নৃপতির বাক্য শুনি নয়ান মুদিয়া রাণী
মা মা বলি ডাকেন অন্তরে।

---

(৩) উদয়-সেনের পুথীর এক অশুদ্ধ নকল এক বহি হইতে উদ্ধৃত হইল। কৃষ্ণ-সেন-কৃত অনুবাদের সহিত মিলাইতে পারা যাইবে।

কৃপার্হবণিকং জ্ঞাত্বা দেব্যাঃ কৃপাসমুদ্ভবা।
অকস্মাত্তবতি চৈবমাকাশাদ্বাণিরীদৃশী॥
মম কার্তিকেয় গজাননশ্চ
উভয়োরিব ত্বমপি স্নেহযুতঃ।
তব প্রেম্না বিবদ্ধোহহমেধ্রুবং
বিহায়োপতে কুত্র মে নাস্তি সুখং॥
ন চ কদিহি বৎস ভৃশমনৃতং।
ক্ষণমপি ন ত্যাজ্য মম ত্বমেবং
ছলনামধিকৃত্য কিমর্থমহং।
বৃষারুহ্যেহ কাশ্যং এসি শৃণুত্বং।
তক্ষশ্যাপুরিক্ষানিবাসিনৌ তৌ।
বিপ্রস্তৌ ভ্রাতৃদ্বয়ঃ শুভৈব।
নাম্নৌ দেবীদাসচণ্ডিদাসৌ ব।
শুদ্ধচিত্তৌ মাতৃসেবানুরক্তৌ।
সদা হরেণ মামীয়ং পিবন্তৌ
প্রমত্তাবানন্দে নৃত্যগীতয়োঃ
সমাক্রপ্রপীড়্যমানৌ চ ভুক্ত্বা
মাত্রা সহ কাশ্যামগচ্ছতাঞ্চ।
তদধ্বরং তজ্জনী সা।
ভুক্ত্বা চাপি পঞ্চগঙ্গাতটস্থ
স্মরণেব বিশ্বেশ্বরাধারং মহেশং
দেহান্তরম্ব গত তৎস্থানেন॥
তদাভাবেবং জননী বিচিন্ত্য।
প্রাকুরুতাং শিলামূর্তি পূজায়ৈ।
কিয়দ্দাতেক্ষি পরিত্যুঃখনাপি
যুগ্মকরস্তৌ বদতে মামিদং।
গচ্ছাব আবাং দ্বারকানগর্যাং
কিঞ্চিদ্দিন সম্পূজয়িষ্যাবস্তুং
আজ্ঞাভবতে দ্বারকাপাপুর্যাং
শিলাং গৃহীত্বা সমস্থাপয়েবং।
তদা হি শৃণ্বাং কথয়ামীদম্ব।
যাতং ন বৎসৌ পাষাণেক্ষ ন ত্ব।
বহুক্লেশানি পথি প্রাপ্স্যেথ বাং।
সদৈবাথক্ষ বিদিশি যুবাভ্যং।
কুত্রাপ্যাবাপি মানস পূজাং মে।
লভিষ্যাথে সিদ্ধিমাপদ্বিহষ্টৌ॥
ততঃপরং শিলামূর্তিমিমাং মে
যথোপচারৈঃ পূজয়িষ্যাথোপি।
কস্মিনকালে জন্মভূমিক প্রষ্টুং
সমেষ্যিথাথে বা ন চাস্মবাতং।
যাস্যাতৎস্থপূর্বে যামাসি তত্র।
এবঞ্চ শিলায় মূর্তি প্রকাশং,
করিষ্যামাহশুদ্ধত্তাহিতাবং।
বংশানুক্রমতো যুবাং বিদিন।
সম্পূজয়িষ্যাথে ব মূর্তিমেতদ্ধি॥
বণিক তৌ তত্রানিশ্যাহমিদং।
শ্রবমাগতাঞ্চ তব বৃষারুহ্য॥
ব্রবীমীতি ত্বাঞ্চ নিগূঢ়তত্ত্বং।
ভূলুণ্ঠিত বৎস তু নকোত্তিষ্ঠ।
যাহি অতস্তুং স্বকার্যাকর্তুম্।
শুদিবাদৃষ্ট প্রাগগান চ ভানুঃ॥
মাতৃমুখাচ্চ তু বাক্যমেতদেবং।
আনন্দমগ্ন বণিক প্রযাতি॥

প্রকৃতি হইল স্তব্ধ অমনি উঠিল শব্দ
কেনে মা কেনে মা ডাক মোরে ॥
শুনি রাণী হেমাঙ্গিনী স্বর্গীয় সুধার বাণী
উদ্দেশে প্রণমি পুন কয় ।
জ্ঞান-হীনা এ অবলা কি বুঝিবে তব লীলা
নিজ গুণে দাও মা অভয় ॥
তুমি সর্ব্ব সিদ্ধীশ্বরী তুমি জীব-শুভঙ্করী
তুমারি কিঙ্করী মোরা সবে ।
তুমি না করিলে দৃষ্টি কে পারে পালিতে সৃষ্টি
কুবের অলকা কোথা পাবে ॥
বৈকুণ্ঠে তুমি কমলা স্বর্গে লক্ষ্মী সুবিমলা
চঞ্চলা-রূপিণী ভূমণ্ডলে ।
ঐশ্বর্য্য সুখ সম্পদ কীর্ত্তি খ্যাতি মানমদ
তুমারি সুখদ পদতলে ॥
পবন সতত বয় সাধু বৈদ্য সদাশয়
স্বার্থহীন মহাব্যাধি করি ।
পর-উপকারী যথা তুমার মহিমা তথা
কে বুঝিতে পারে সে চাতুরী ॥
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভকতি স্তুতি
জানি মাত্র তব শ্রীচরণ ।
২৮] যদি দোষ করি পদে যেন না পড়ি বিপদে
তব পদে এই আকিঞ্চন ।
বার্ত্তা পেয়ে এল দ্রুত রাজপুর-বাসী যত
দাস দাসী যে যেথায় ছিল ।
দিয়ে উচ্চে হুলাহুলি মহানন্দে বাহু তুলি
সবে মিলি নাচিতে লাগিল ॥
নাচ গো নাচ গো শ্যামা দিগম্বরী নাচ গো মা
বলে নেচে আয় মা শঙ্করী ।
মায়াবশে মোরা অন্ধ ঘুচা মা মনের সন্ধ
ধন্য হোক এ ব্রহ্মণ্য-পুরী ॥
যন্ত্র ধরি যন্ত্রদলে এল সবে দলে দলে
এক কালে যন্ত্রে দিল কাটি ।
ঢোল ঢক্কা দিল সাড়া নাদিয়া উঠিল কাড়া
সহস্র মৃদঙ্গে পড়ে চাটি ॥
নাদিল দামামা ডম্ফ তুরি ভেরি জগঝম্প
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘটারোলে ।
মালসাট মারি আঁটে মল্লগণ আইলা ছুটে
লম্ফ ঝম্ফ দিয়া সেই স্থলে ॥
ঘোর তুঙ্গ কলকলে অটল বাসুকী টলে
যেন উচ্চ সমুদ্রকল্লোল ।
শুনি হেন হুলুধ্বনি কি হইল কি হইল বলি
নগরে উঠিল কোলাহল ।

* | * | *

দেবীর স্বরূপ প্রকাশ ॥

গেল দিবা আইল রাতি নিদ্রা যান নরপতি
স্বপন প্রবন্ধে অতঃপর ।
আসি মাতা কন হেসে ভাষিয়ে ভৈরব ভাষে
উঠ পুত্র হাম্বীর উত্তর ॥
যাও শিলাখান লঞে দুগ্ধ পাত্রে ডুবাইঞে
রাখ গিঞা যাবত শর্ব্বরী ।
কর্ম্মকার ডাকি প্রাতে আজ্ঞা দিবা এই মতে
অস্ত্রাঘাত করে শিলাপরি ॥
শুন বাছা কহি তোরে আঘাত পাইলে পরে
দেখিতে না পাবি শিলাখান ।
স্বপনে দেখিলি যাহা প্রত্যক্ষ দেখিবি তাহা
বলি দেবী হন অন্তর্দ্ধান ।
নিদ্রা ত্যজি নরনাথ করি শত প্রণিপাত
পয় পাত্রে ধরিলেন শিলা ।
নিশাগতে শিলা হতে কর্ম্মকার অস্ত্রাঘাতে
বাহির হইল দক্ষবালা ॥
কি ছার চকোরে সুখ হেরি পূর্ণচন্দ্রমুখ
ভ্রমরে সে পদ্মিনী-পীরিতি ।
চাতকে জলদ-বিন্দু বিপন্নে হৃদয়-বন্ধু
অপুত্রার লভনে সন্ততি ॥
রোগী পেলে রোগে মুক্তি যোগী পেলে হরিভক্তি
ভোগী পেলে বৈভবে সম্ভোগ ।
যদি পায় ভিক্ষাশনে* সুররাজ সিংহাসনে
সাধু পেলে সাধুর সংযোগ ॥

* ভিক্ষা অশন ভোজ্য যার । অর্থাৎ ভিক্ষাজীবী ইন্দ্রতুল্য হয় ।

সে আনন্দ লাগে কিসে যে সুখে নৃপতি ভাসে
সে সুখের নাহিক অবধি।
দেবীর পদারবিন্দে করপুটে পুন বন্দে
প্রেমানন্দে নরেন্দ্র সুমতি ॥
প্রবল দম্ভে দীঘল লম্ফে ভূতল কম্পে কৈটভী।
যোগিনী সঙ্গে রণ তরঙ্গে ভীম ভ্রূভঙ্গে ভৈরবী ॥
কট কটাক্ষে কর্টদি কক্ষে বিকট চক্ষে শৌরিকে।
ভটেশ হস্তে নটেশ কাস্তে প্রবল বস্তে গৌরীকে ॥*

* | * | *

বল মা বল মা ফুটি ও রাঙ্গা চরণ দুটি
কি দিএে কেমনে পূজি এবে।
কি নৈবেদ্য কিবা ভোগ উৎসবের যোগাযোগ
সব তত্ত্ব বলে দে মা শিবে ॥
শুন তবে নৃপমণি হইল আকাশবাণী
সব তত্ত্ব কহি তব ঠাঁএি।
প্রত্যহ তণ্ডুল সবে অষ্ট সের ভোগ দিবে
সহ দুগ্ধ মৎস্যাদি কলাই[৪] ॥
আইলে শিশির কাল শুন বাছা মহীপাল
খিচুড়ীর ভোগ দিবে মোরে।
এইরূপে ভক্তিভাবে নিত্য মোর পূজা দিবে
বংশক্রমে অতি শুদ্ধাচারে ॥
নিত্য মোর সেবা পূজা নয়ানে দেখিবে রাজা
এই কথা মনে যেন রয়।
পিবে মোর স্নানোদকে প্রসাদ লইবে মুখে
পূর্ব্ব-কৃত পাপ হবে ক্ষয় ॥
যখন যে ভাবে রবে মাতৃ আজ্ঞা না ভুলিবে
হবে তাহে রাজ্যে উন্নতি।
সবংশে থাকিবে সুখে গৌরব গাহিবে লোকে
দানে পুণ্যে বাড়িবেক রতি ॥
৩/] জানি তুমি মহামতি আছে তব মাতৃভক্তি
তবু রাজা করি সাবধান।
সেবাগুণে যত চড়ে অন্যথায় তত পড়ে
ভুল না এ বেদের বিধান ॥
মধু শুক্ল সপ্তমীতে[৫] দেখা দিনু যে দিনেতে
সেই দিন [মনে রাখ] রাজা।
এই শুভক্ষণে মোরে প্রতি সন ভক্তিভরে
মহা মহোৎসবে দিবে পূজা ॥
প্রচার করহ দেশে আসে যেন বর্ষে বর্ষে
এই স্থানে যত নর নারী।
উৎসবের শুভযোগে এড়াইতে কর্মভোগে
তীর্থসম সমাদর করি ॥
অভ্যাগত জনগণে জানাইও জনে জনে
সবারে করিব আমি ধন্য।
কামনা যাহার যাহা আমি পুরাইব তাহা
দেয় যেন মুড়ি ও মিষ্টান্ন ॥
ইচ্ছা করি দেয় যদি হরিদ্রা আঁবাটা আদি
ভাজা পোড়া যার যা মনন।
যে যা দিবে শুদ্ধমতে তুষ্ট হএ্যা হাতে হাতে
আমি তাহা করিব গ্রহণ ॥
পতির মঙ্গল তরে কোন সতী শুদ্ধাচারে
সিন্দুর মানত করে যদি।
এই খর খড়্গাঘাতে আমি তার প্রাণনাথে
সঙ্কটে রক্ষিব নিরবধি ॥
আমার নির্ম্মাল্য তথি ধরে যেই গর্ভবতী
রহে গর্ভে অক্ষয় সন্তান।
স্নান জলে রোগে মুক্তি প্রসাদে অপূর্ব্ব ভক্তি
গাঁ মেলা কবচ প্রধান ॥
মঙ্গলেতে দিলে পূজা না রবে ঋণের বোঝা
সর্ব্ব ঠাঁএি উচ্চ রবে শির।
অতঃপর শুন বাণী পুত্র ভক্ত চূড়ামণি
কৌলিক পূজারী কর স্থির ॥

* | * | *

করপুটে কন রাজা কে করিবে তব পূজা
কোথায় সে কিবা নাম ধরে।

---

* যথা দৃষ্টং তথা মুদ্রিতং। এখানে এইরূপ স্তোত্রের টীকার স্থান নাই।

৪) এখানে সের অর্থে দেশ প্রচলিত 'পাই', পঞ্চসেরের পাদ। আট পাই = দশ সের। কলাই, মাষকলাই।

৫) এই তিথিতে বাসন্তী দুর্গার পূজা আরম্ভ হইয়া থাকে।

বল মা সে সব কথা　এই দণ্ডে গিঞা তথা
মাতৃ আজ্ঞা জানাইব তারে ॥
পুন কন হৈমবতী　শুন তবে নরপতি
আছিলা যে এ ব্রহ্মণ্য-ধামে।
কিছু পূর্ব্বে করি বাস　দেবীদাস চণ্ডীদাস
দেখ ভাবি পড়ে কি তা মনে ॥
রাজা কন পড়ে মনে　দেবী কন তবে কেনে
চিন্তা কর হামীর রাজন।
তুষ্ট মনে বৃত্তি দানে　সেই দুই দ্বিজে এনে
পূজা কর্ম্মে কর নিয়োজন ॥
রাজা কন কোথা তারা　তারা কন অতি ত্বরা
হবে দেখা তাহাদের সনে।
করি তীর্থ পর্য্যটন　আসে তারা দুই জন
মহাতীর্থ এ ব্রহ্মণ্য-ধামে ॥
জননী জনম-ভূমি　না জান কি নৃপ তুমি
স্বর্গাদপি হয় গরীয়সী।
তেঞি তারা এইবার　জন্মভূমি করি সার
কল্য প্রাতে দেখা দিবে আসি ॥
—এ কি কথা বল তারা　তারা যে মা জাতি-হারা
কেমনে করিবে তব পূজা।
রামী নামে রজকিনী　চণ্ডীর সর্ব্বস্ব তিনি
মনোদুঃখে কহিলেন রাজা ॥
যথা চণ্ডী তথা রামী　স্বচক্ষে দেখেছি আমি
৩৮]　শুন মাতঃ নুন্নুআর মাঠে[৬]।

একত্রে সে একাসনে　ছিল প্রেম আলাপনে
মোরে দেখি পলাইল ছুটে ॥
দেখিতাম কভু যেঞে　রজকিনী নিত্যালয়ে[৭]
সেবিছে চণ্ডীর পদদ্বয়ে।
কভু দেখিতাম তথা　আছে রামী নিদ্রাগতা
চণ্ডীবক্ষে পদ ছড়াইয়ে ॥
শুনিয়াছি চতুর্ম্মুখ　ধরিলেন বহুমুখ
পঞ্চমুখ শৈলজা-রমণ।
শূন্য পথে পাখা মেলি　উড়িত ভূধরাবলি
ভূমে না চলিত তুরঙ্গম ॥
কিন্তু কভু নাঞি শুনি　লক্ষ্মীর পূজারী শনি
শুনিলাম তোমারি কৃপায়।
আজ্ঞা যে লঙ্ঘিলে পাপ　না লঙ্ঘিলে মনস্তাপ
হরিষে বিষাদে প্রাণ যায় ॥
ত্বংহি মাতা আদ্যাশক্তি　সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্রী
পতিত পূজিবে তব পায়।
যদি মা সদয়া হলি　হেন আজ্ঞা কেন দিলি
বলে দে মা করি কি উপায় ॥
যথা যবে নিরজনে　রামী চণ্ডী একমনে
করে যেই প্রেম-আলাপন।
তার মর্ম্ম কিবা হয়　বলি মিটা মা সংশয়
সঠিক তা করি নিবেদন ॥

* | * | *

একদিন চণ্ডীদাস লইঞে বাড়শী।
মচ্ছ ধরিতেছিলা ধোবা-ঘাটে[৮] বসি ॥
হেনকালে আইল সেথা রামী রজকিনী।
চণ্ডীদাস পানে চাঞি কহে মৃদু বাণী ॥
ঘাটে বসি ধর মচ্ছ এ কি তব কাজ।
মেঞাছেল্যা আসে যায় নাঞি তব লাজ ॥

---

৬) নামটি নুন্নুর বা নান্নুর মাঠ। ইহার দক্ষিণে এই নামে হাট-তলা আছে। এখন সেখানে হাট বসে না। নান্নুর নামও অজ্ঞাত হইয়া পড়িতেছে। ছাতনার মাপচিত্রে 'চলহরি' পঞ্চ। যে পুষ্করিণী হইতে পানীয় আহৃত হয়, তাহার নাম জল-হরি। (শব্দটি কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে আছে।) এখন খোলা মাঠ পড়িয়া আছে। বোধ হয় পূর্ব্বকালে এই জল-হরির গায়ে বাসলীর আদি মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। এখন সে মন্দিরের কোন চিহ্ন নাই। সে মন্দির মাটিরও হইতে পারিত। রাজা হামীর-উত্তর শিলামূর্ত্তি পাইয়া নিশ্চয় কোনও মন্দিরে রাখিয়াছিলেন। পাষাণের মন্দির দুই এক বৎসরে নির্মিত হয় না। "নান্নুরের মাঠে, হাটের নিকটে, বাসলী বসয়ে যথা।" এই উক্তি উক্ত অনুমানের পোষক। নান্নুর গ্রামের নাম এখন যুবরাজপুর। পুথীতে পরে পাওয়া যাইবে। তখন ব্রহ্মণাপুর ও নান্নুর এই দুই গ্রাম ছিল। বর্ত্তমানের মান-দাস-পাড়া গ্রামের কিয়দংশ ব্রহ্মণাপুরে ও অপরাংশ নান্নুর মাঠে ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, মান নামক জাতি রাজাদের দাস ছিল। সে দাস-পাড়া

৭) নিত্যা দেবীর আলয়। আদিতে নিত্যা এক বৌদ্ধদেবী ছিলেন, পরে তিনি শিব-বনিতা মনসা হইয়াছেন। ছাতনার দিকে প্রায় গ্রামে গ্রামে মনসা-মেলা আছে। মেলা, একদিক-খোলা ঘর। মনসা-মেলা সাধারণের ঘর।

৮) ছাতনার বাসলীর আদি থানের দক্ষিণে সড়ক। সড়কের দক্ষিণে ধোবা-পোখর। এই পোখরের এক ঘাট ধোবা-ঘাট। কিন্তু এখানে বোধ হয় জল-হরির এক ঘাট।

কলসী লইঞা কাঁখে দাঁড়াতে যে নারি।
কোথায় লইব জল বল ত্বরা করি ॥
চণ্ডী কহে এই ঘাটে নাম যদি জলে।
চারের যতেক মাছ পলাবে তা হলে ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া মোরে এই কর দয়া।
দক্ষিণের ঘাটে তুমি জল লহ গিঞা ॥
পাগল আমি যে রাই লাজ কোথায় পাব।
না নামিহ এই ঘাটে কিছু মচ্ছ দিব ॥
হাসি কহে রাইমণি মচ্ছ নাঞি খাই।
দাও যদি বলি তবে আমি যেবা চাঞি ॥
চণ্ডীদাস বলে কিবা চাহ রাসমণি।
কহ তুমি থাকে যদি দিব তা এখনি ॥
চণ্ডীর এ হেন বাক্যে হাসি কহে রামী।
আগে অঙ্গ ছুঞি মোর দিব্য কর তুমি ॥
উঠি তবে কহে চণ্ডী করে কর ধরি।
বল তুমি কিবা চাহ রজক-ঝিয়ারী ॥
পরশিতে অঙ্গ তার শিহরি উঠিল।
সামালিয়ে রাসমণি কহিতে লাগিল ॥
উদার ব্রাহ্মণ তুমি আজু গেল জানা।
আমি চাঞি তব সাথে প্রেম বেচা কেনা ॥
লোক-নিন্দা রাজভয় সমাজ-পীড়ন।
সহিতে হইবা তায় করি প্রাণপণ ॥
আমার মনের কথা কহিলাম এবে।
কহ চণ্ডী এই ভিক্ষা দিবে কি না দিবে ॥
চণ্ডী বলে সে অভয় তোরে যদি দিবা।
ভাবে দেখ সে কর্ম্মের পরিণাম কিবা ॥
রামী কহে শুন সখা তার পরিণাম।
উভয়ে গাইব মোরা রাধাকৃষ্ণ নাম ॥
হবে অমরত্ব লাভ স্বর্গসুখভোগ।
না ছাড়িহ চণ্ডীদাস এহেন সুযোগ ॥

৪/] চণ্ডী কহে জানি না সে প্রেম কিবা হয়।
কেমনে কোথায় মিলে কহ তা নিশ্চয় ॥
রামী কহে জানি আমি তুমি শুষ্ক মরু।
আমিই শিখাব প্রেম হয়ে শিক্ষাগুরু ॥
হাসুক জগত তবু তুমি আর আমি।
এক প্রাণে পরস্পর হব অনুগামী ॥
যতদিন না মিলিবে প্রেমের সন্ধান।
পাষাণ বাঁধিয়া বুকে হও আগুয়ান ॥
যদি ভয়ে কদাচিত পশ্চাতে ফিরিবে।
তখনি তুমারে ভাই বাঘে ধরি খাবে ॥
সুপণ্ডিত তুমি সখা ভাবে দেখ মনে।
দুখ বই সুখ-লাভ হয় কি জীবনে ॥
ক্ষণকাল মৌন ভাবে থাকি চণ্ডীদাস।
কহিতে লাগিল পরে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস ॥
অবশ্য সহায় মম হইলা তুমি যবে।
মরুমাঝে তরুলতা এবে জন্মাইবে ॥
কিন্তু তবু রমণীরে না হয় প্রত্যয়।
ভাবি তোঞি পরিণামে কি জানি কি হয় ॥
আগে যদি মণি-লোভে হঞা মত্ত-মতি।
না বুঝিয়া ফণীর বিবরে কার গতি ॥
কি হবে তাহলে পরে কহ দেখি রাই।
লভ্য আসা দূরে থাক মূলে বা হারাই ॥
ছল করি রোষাবেশে কহে রাসমণি।
কাপুরুষ তুমি হেন আগে নাঞি জানি ॥
যেতে দাও কর তুমি যেবা মনোরথ।
চণ্ডী কহে পায়ে ধরি না ছাড়িব পথ ॥
শপথ করিয়া আগে কহ দেখি শুনি।
মোরে ছাড়ি কোনদিন না পলাবে তুমি ॥
রামী কহে রমণী বিকায় যার পদে।
না ছাড়ে তাহার সঙ্গ বিপদে সম্পদে ॥
নল গেল বনে দময়ন্তী গেল সাথে।
গেল সীতা বনবাসে রামের পশ্চাতে ॥
কিন্তু নল গেল ছাড়ি আপনার নারী।
রাম দিলা বনবাসে জনক-ঝিয়ারী ॥
পুরুষ প্রকৃতি মধ্যে কেবা ভাল ভবে।
কহ দেখি চণ্ডীদাস কিরূপ সম্ভবে ॥
প্রতিজ্ঞা করিঞা আমি তুমারে জানাই।
না ছাড়িব কোনদিন যদি প্রাণ যায় ॥

* | * | *

গদ গদ ভাষে	কহে চণ্ডীদাসে
কেমনে পরাণ জুড়াই।
প্রেম আলাপনে	প্রেমের বাঁধনে
পাগল করিলি রাই॥

প্রেমের ধরমে	প্রেমের করমে
প্রেমের মরম ভাষি।
দূর কর মোরে	সাগরের পারে
যেন না ফিরিয়া আসি॥

* | * | *	(ক্রমশঃ)

ঝাঁড়াঝাঁড়ির কোটাল

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

সন্ধ্যা হইবার পর হইতেই একবার যদি বাহিরে যাইতে হয় তো অমনি জীবনরামের গা ছম্ ছম্ করে।

ব্যাপারটা আমার পূর্ব্ব হইতে জানা ছিল; কিন্তু তবুও কি জানি কেন সময় সময় ভুলিয়া যাই। তাই সেদিন হঠাৎ ভুলিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলাম—জীবনরাম যাও তো, ছুটে গিয়ে পরেশের দোকান থেকে দু-পয়সার চিনি নিয়ে এস তো।

কয়েক মুহূর্ত্ত জীবনরামের অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই। আড়চোখে তাকাইয়া দেখি বারান্দার এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আমি তাকাইতেই সে আমার মুখের দিকে কাঁচুমাচু ভাবে তাকাইয়া বলিল—হালুয়া গুড়েরই করুন না বাবু! নতুন খেজুরে গুড়ের মন্দ হয় না।...

সত্যই হাসিয়া উঠিতে হইল। বলিলাম—আ[illegible] আচ্ছা, তোমাকে যেতে হবে না। তুমি এখানে বসে থাক, আমিই যাচ্ছি।

বাহির হইয়া পড়িলাম। পরেশ মুদীর দোকান আমার এখান হইতে বিশেষ দূর নয়। ঐ দূরে তাহার দোকানের আলো দেখা যাইতেছে। পথে 'হানার' ধারে বাঁশের সাঁকোটি একবার পার হইতে হয়। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিয়া সেটি নড়িয়া ওঠে। তলায় গভীরস্পর্শ কালো জল। সেই দিকে তাকাইয়া ভয় লাগিবারই কথা, তবুও গা-সহা হইয়া যাইতেছে। আজকাল আর অসুবিধা হয় না।

পরেশের দোকানে আসিয়া পৌঁছাইতে বেশী ক্ষণ লাগিল না। ত্রিশের কোঠা পার হইয়া যাইবার পর হইতে তার হরিনামের প্রতি এক প্রবল আকর্ষণ দেখা যাইতেছে। আজকাল সন্ধ্যার পর দোকানে বসিয়া সে একটি খোল লইয়া বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে বাজাইতে সুরু করিয়া দেয়, আর তাহারই একটি চেলা নিকটে বসিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া তাহার সহিত যোগ দেয়। খরিদ্দার আসিলে সে খোল ছাড়িয়া বিক্রয় করিতে বসে। আমাকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। খাতিরের একটু কারণও আছে; তাহার ছোট ছেলেটি আমার স্কুলের ছাত্র।

পরেশ বলিতে লাগিল—এ অসময়ে মাষ্টার-মশাই আপনি এলেন যে? জীবনে আসতে পারলে না? আপনাকে ভাল মানুষ পেয়ে ঠকিয়ে পয়সা নিচ্ছে।

আমি বলিলাম—না, আমিই এলুম। ছেলেমানুষ, রাতবিরেতে সাপের ভয়ও তো আছে?

পরেশ বলিল—তা ঠিক, তবে—

পরেশের দু-পয়সার চিনির মোড়াটি মুড়িয়া ফেলা হইয়া গিয়াছিল, সে আবার সেটি খুলিয়া ফেলিয়া তাতে অতিরিক্ত আর এক চামচ চিনি দিয়া এক গাল হাসিয়া বলিল—আজ্ঞে, ছেলেটা 'ফাষ্টো বুক' বেশ পড়তে পারে? মানুষ হবে তো?

পরেশের এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম—এই তো

সবে ফার্ষ্ট বুক ধরেছে। এখনও তো কিছু বলা যায় না। তবে তোমার ছেলেটি যে নেহাৎ বোকা, তা মনে হয় না। চেষ্টা ক'রে পড়লে কিছু শিখতেও পারে।

পরেশ এই সূত্রে হয়ত আর একটি গল্প ধরিতে যাইতেছিল, কিন্তু আমি আর দাঁড়াইলাম না। বলিলাম—আচ্ছা আসি।

...পরেশ দুই হাত তুলিয়া নমস্কার জানাইল।

মনে মনে কল্পনা করিয়া লইলাম, জীবনরাম নিশ্চয়ই এত ক্ষণ ভয়ে আধমরা হইয়া রহিয়াছে। এই ভীরু গ্রাম্য বালকটিকে লইয়া আর পারা গেল না। কিন্তু কি করিব, এই নূতন স্থানটিতে এই ছেলেটি ছাড়া আর কোন সঙ্গী আমার নাই যে!...জীবনসংগ্রামে শহর ছাড়িয়া এই দূর পল্লীগ্রামে আসিয়া ভিড়িয়াছি। ছোট্ট স্কুল। মাত্র দশটি ছেলে। মাষ্টার বলিতে আমি ছাড়া আর কেহ নাই। এই দুর্দ্দিনে ইহা মন্দ কি! যাহা পাই তাহাতেই কোন রকমে চালাইয়া লই। পল্লীর শান্ত সরল জীবনযাত্রা আমার অন্তরে এক বিচিত্র রেখাপাত করিয়াছে! এই কয় দিনের মধ্যে আমিও যেন ইহাদের এক জন হইয়া গিয়াছি।...

আমার অনুমান মিথ্যা নয়। জীবনরাম বারান্দার এক কোণ হইতে উঠিয়া গিয়া ঘরের দরজার সম্মুখে গিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে এবং অন্ধকারের দিকে এক-এক বার তাকাইয়া দেখিতেছে। আমাকে দেখিয়া তাহার বোধ হয় ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল।

আসিয়া রান্নার জোগাড় করিয়া লইলাম। নিজ হাতেই রাঁধিয়া লই। আমি আর জীবনরাম দুই জনে খাই। কাজ করিতে করিতে একবার জিজ্ঞাসা করি—জীবনরাম, তোমার অত ভয় কিসের?

এ প্রশ্নটি হয়ত জীবনরামের নিকট বড়ই বিচিত্র। পাড়াগাঁর ছেলে—বয়সও কম, এ দুর্ব্বলতাটুকু তো প্রায় সকলেরই আছে।

তবুও সে সাহস সঞ্চার করিয়া বলে—উই, উ দিকটে দিয়ে এখানকোর কেউ যায় না মাষ্টার-মশাই! উই 'হানা'টের ধার দিয়ে—

হানা। আমার স্কুলের চালাটির অত্যন্ত নিকটেই এই 'মাছদহে'র হানা। 'মাছদহে'র খালটি এদিক-ওদিক চারি দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই আবদ্ধ স্থানটিতে আসিয়া আটক হইয়া পড়িয়াছে। বিস্তীর্ণ একটি স্থান জুড়িয়া এই হানার সৃষ্টি। মাছের জন্য এটি এখানকার লোকের বড়ই প্রিয়। কত জেলের দল ইহারই আশেপাশে আসিয়া ঘর বাঁধিয়া কত দিন ধরিয়া বসবাস করিতেছে। মাছ ধরিয়া তারা নৌকা বোঝাই করিয়া খালের ভিতর দিয়া কত দেশ-বিদেশে চালান দেয়। খালটি দিয়াও কম দূর যাওয়া যায় তা নয়। এটি এদিক-ওদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়া উলুবেড়িয়ার গঙ্গায় পড়িয়াছে। গঙ্গা একবার ধরিতে পারিলে সুবিধা কম নয়। যেখানে ইচ্ছা যাওয়া যায়। হানার জল সবুজ—ঘন সবুজ। কখনও কখনও তার মধ্যে নৌকার হালের আঘাতে তরঙ্গের আলোড়ন উঠে। তাহা না হইলে মোটের উপর দেখিতে শান্ত। আমার স্কুলের চালার বারান্দায় বসিয়া গাছপাতার ব্যূহ ভেদ করিয়া হানার খানিকটা দেখা যায়। রাত্রেও এখানে বসিয়া দেখা যায় দূরে হানার জলরাশি কালো চাদরের মত পড়িয়া আছে।...

জীবনরাম আবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—মাষ্টার-মশাই চুপ মেরে রইলেন যে?

চুপ করিয়া গিয়াছিলাম বলিয়া বোধ হয় জীবনরাম আর একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিল। তাই আবার অন্য দিকে মন দিবার জন্য এই কথাগুলি বলিল।

আমি বলিলাম—কি বলছিলে জীবনরাম, ওদিক দিয়ে কেউ যায় না। কিন্তু কেন যায় না বলতে পার?

জীবনরাম আমার মুখের দিকে অল্প ক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিল—সেই যে গো! জানেন না মাষ্টার-মশাই, সেই নফর জেলের বউ—

'নফর জেলের বউ—' আমার এইবার মনে পড়িল। ঘটনাটি শুনিয়াছিলাম আমার পূর্ব্বে যে-মাষ্টার মহাশয় আমার স্থানে এই স্কুলে চাকুরি করিতেন তাঁর নিকট হইতে।...তিনি আমাকে এখানকার অনেক গল্প বলিয়া গিয়াছিলেন, তার মধ্যে এটিও একটি।...ঐ দূরে শ্যাওড়া গাছটির কোলে যে বাঁশ-ঝোপ তারই পশ্চিম দিকে এখনও একটি শূন্য জীর্ণ চালা পড়িয়া আছে। ঐ চালাটি ছিল নফর জেলের। নফর নিঃসন্তান ছিল। বউ মারা যাইবার পর আবার সে সংসার করিয়াছিল। দ্বিতীয় সংসারে আর একটি

পুত্রসন্তানলাভ হইয়াছিল। বউটির বয়স ছিল খুবই কম।... পাড়াগাঁয়ের নগণ্য একটি জেলের বউয়ের জীবনে আকাঙ্ক্ষার পরিধি আর কতটুকু হইতে পারে? ঐ যে একটি ছোট ছেলে—উহারই মধ্যে তাহাদের জীবনে যত কিছু আশা, আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ—সবকিছুই সঞ্চিত ছিল। ইহার বাহিরে পৃথিবীর সহিত প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ তাদের ছিল না। হয়ত এমনিই হয়।...কিন্তু বিধাতা তাহাতে বাধ সাধিলেন।...বর্ষাকাল। দিবারাত্র টুপটাপ বৃষ্টি পড়িতে থাকে। হানার জল একটু একটু করিয়া দিন দিন বাড়িয়াই চলে। শেষে পথঘাট, বাঁধ মাঠ সমস্তই জলে ডুবিয়া যায়। এবাড়ি হইতে ওবাড়ি যাইতে হইলে সাল্‌তি না হইলে যাওয়া যায় না। বাড়ির উঠানে পর্য্যন্ত জল-তরঙ্গ আসিয়া ভিড় করে,—ঘরের দাওয়ার পর হইতেই জল আর জল, মাঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত জল। ঠিক এমনি যখন অবস্থা তখন এক দিন নফরের বউ বুঝি কি একটা প্রয়োজনে সাল্‌তি চড়িয়া বাড়ির বাহির হইয়া যায়। ছোট ছেলেটিকে ঘরের ভিতর ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া যায়। ইচ্ছা ছিল খুব তাড়াতাড়িই ফিরিবার। কিন্তু হামাটানা দামাল ছেলেটি কখন ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া পড়ে। তার পর হামা টানিতে টানিতে দরজা ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া ঐ জলে—ঐ বানের তরঙ্গায়িত জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে...

ঘটনাটি ঐরূপ। কিন্তু আমার চমক ভাঙিয়া যায়। অনেক ক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলাম। আবার রান্নায় মন দিই। রাত তো বাড়িয়া চলিয়াছেই। জীবনরামের নাকডাকা শোনা যাইতেছে। রান্না হইয়া গেলেই তাহাকে ডাকিব। আহার না হইলে তার গাঢ় নিদ্রা হয় না। সজাগ থাকে। ডাকিলেই উঠিবে।...

২

দুপুর বেলা স্কুলে পড়াইতে বসি। ছোট এই চালাঘরটির ভিতর আমার শয়ন করিবার ঘর এবং স্কুল—দুই-ই। মাত্র দুখানি বেঞ্চ এবং একটি চেয়ার। রাত্রিবেলা বেঞ্চ দুইটি জুড়িয়া তাহার উপর বিছানা বিছাইয়া লই। লম্বা হইয়া শুইলে পায়ের দিকে একটু কম পড়ে, তখন চেয়ারটি টানিয়া আনিয়া তাহার উপর পা চাপাইয়া দিয়া নিদ্রা দিই। জীবনরাম মাটিতে চেটাই বিছাইয়া শুইয়া থাকে।

বেঞ্চদুটিতে ছেলেগুলি বসিয়া পড়ে। মাঝে মাঝে 'বড় গোল হচ্ছে' বলিয়া একটু ধমকানি দিই। তাহার পর বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকি।...

সর্ব্বাগ্রেই দৃষ্টি পড়ে হানা আর তার বিপুল জলরাশি। হানার পশ্চিম দিকটিতে জল তেমন নাই। খানিকটা ঘোলাটে জল, কাদা এবং পাঁক। সেইখানে মেছুনিরা কাপড় খাট করিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত পাঁকে ডুবাইয়া মাছের অনুসন্ধানে চুপড়ি-হাতে সমস্ত দিন রোদে পুড়িয়া গলদঘর্ম্ম হয়। পাড়ের উপর শ্বেতপুঙ্খের ঝাঁক বাঁধিয়া আছে। তার পর কয়েকটি বাকশ গাছ,—ছোট ছোট ফুল ধরিয়াছে সেগুলিতে।

পরেশের ছেলে পঞ্চানন্দ উঠিয়া আসিল। তার পড়া তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। পড়া দিয়া বাড়ি চলিয়া যাইবে এই উদ্দেশ্য।

জিজ্ঞাসা করিলাম—আটচল্লিশ কড়া? পঞ্চানন্দ একবার ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইল। তার পর বলিল—পাঁচ গণ্ডা দু-কড়া।

বলিলাম—পড়া তৈরি হয় নি। চেঁচিয়ে পড়গে যা।

ছেলেটি একান্ত বিরস মনে চলিয়া গেল।

জীবনরাম আসিয়া বলিল—মাষ্টার-মশাই রতনের বউ এয়েছে এই 'পোষ্টোকার্ড' খানা—

রতনের বউকে আমার এক ছাত্র এই পোষ্টকার্ডে চিঠি-খানি লিখিয়া দিয়াছে। সে আমাকে দিয়া একবার পড়াইয়া লইতে চায়। যদি কিছু ভুল থাকিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে চিঠি যাইবে না।

রতনের বউয়ের মুখের দিকে একবার তাকাইলাম: নিকষ-কালো চাষার বউ। কণ্ঠস্বরের মধ্যে কোন মাধুর্য্য নাই। ঠেঙা কাপড়। সুগঠিত কটিদেশ হইতে রূপার বিছাটি বস্ত্রান্তরাল ভেদ করিয়া আপনার অস্তিত্ব জানাইতেছে।

বুঝিলাম আমাকে কি করিতে হইবে। এইরূপ পূর্ব্বেও দু-এক বার করিতে হইয়াছে। চিঠিখানি পড়িয়া দেখিয়া দু-একটি ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়া বলিলাম—ঠিক আছে, আর কোন ভুল নেই—

জীবন বউটির হাতে চিঠিটি দিয়া দিল। সে চলিয়া গেল। চাষীর বউ—পৃথিবীর কোন খবরই রাখে না। ও ভাবে বুঝি আমি মস্ত বিদ্বান। আমার কিন্তু ইহাতে ভারী লজ্জাবোধ হয়। মুরুব্বিয়ানা এখনও আমার ধাতে সহ্য হয় না।

বউটি চিঠিখানি লইয়া চলিয়া যায়। উহার গতিপথের দিকে তাকাইয়া মনে হয় যেন উহাকে কোথাও দেখিয়াছি। ও না হউক অন্ততঃ অমনিটি।

মানসলোক দিয়া সাঁতরাইয়া যাই। মনে হইল দেখিয়াছি—চিনিয়াছি।…নফরের বউ—ঠিক এমনি একটি গ্রাম্য মেয়ে। তারও হৃদয়টি বোধ করি এরই মত। জীবনের ঐশ্বর্য্য তার ছোট একটি ছেলে। দামাল ছেলেটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া হামা টানিয়া বেড়ায়। বউটি গ্রাম্য স্বরে বলে—'আয় সোনা, আমার কাছ্ কে আয়!' তাহা শুনিয়া ছেলেটি গুটি গুটি করিয়া হামা টানিয়া পলাইবার চেষ্টা করে। বউ আসিয়া খপ্ করিয়া তাহাকে ধরিয়া বুকে চাপিয়া লয়। তার পর সে ভাবে তার মত ঐশ্বর্য্যশালিনী মেয়ে বুঝি আর কেহ নাই।

ঘড়ির দিকে তাকাইয়া টেবিলের উপর হইতে ঘণ্টাটি লইয়া বাজাইয়া দিয়া বলি—শনিবার আজ আগে ছুটি।

৩

সন্ধ্যার পরে কোন বিশেষ কাজ না থাকায় জীবনরামের সহিত গল্প ফাঁদিয়া বসি।

একথা-ওকথার পর জিজ্ঞাসা করিয়া বসি—আচ্ছা, ছেলেটি মারা যাবার পর নফরের বউ কি করলে?…

জীবনরাম উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিল—জানেন না বুঝি—সে এক কাণ্ড—বউ গেল পাগল হয়ে, ঘুরে ঘুরে সেও একদিন ঐ জলে ঝাঁপ দিলে। তার পরে কি হ'ল জানেন না মাষ্টার-মশাই? জানেন না আপনি? শোনেন নি একদিনও?…

তার পর জীবনরাম যাহা বলিল তাহা কোনদিন শুনি নাই। ঐ ঝাওড়া গাছটির পাশ দিয়া যাইতে যাইতে এখনও সন্ধ্যার পর শোনা যায় কাহার ছেলে কাঁদিতেছে। পরিত্যক্ত চালাটির মধ্যে আজও কাহার শাড়ীর খস্ খস্ শব্দ শোনা যাইতেছে।

জীবনরামের কথার মর্ম্মার্থ এইরূপ:

আজও নাকি গভীর রাত্রে ঐ হানার জলে কিসের আলোড়ন ওঠে। এখানকার সবাই একথা জানে। ও আর কিছু নয়। ঐ নফরের বউ জলের ভিতর এখনও হাত বাড়াইয়া বাড়াইয়া বেড়ায়। খুঁজিতে থাকে। যদি সেই হারানো ছেলেটিকে আবার হাতের মধ্যে পাইয়া যায়।… বউটির নাকি 'হানার' মাছগুলির উপর ভারী বিদ্বেষ! যে-বার বউ জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিল তাহার পর হানাতে মাছের মড়ক সুরু হইল। পর পর দুখানা গ্রামের জেলেরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। এমনি ভাবে যদি অল্প দিনেই সমস্ত মাছের বংশ শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলে সারা বছর মাছ-সরবরাহ কি করিয়া চলিবে। শুধু তাই নয়। হানার জলের ভিতর জেলেদের একটি প্রিয় মাছ ছিল। জীবনরামের ভাষায় বলিতে গেলে 'ঢেঁকির মত রুইমাছ'। সেই মাছটিকে দেবতার নিকট উৎসর্গ করিয়া তাহার নাসিকায় একটি নথ পরাইয়া দিয়া জলে ছাড়িয়া দিয়াছিল। কোন জেলে সেই মাছটিকে ধরিত না। যদি কাহারও জালে সেই মাছটি পড়িত তাহা হইলে সে তাহাকে আবার জলে ছাড়িয়া দিত। কিন্তু একদা বউয়ের কৃপায় এমন হইল যে সেই রুইমাছটি মরিয়া হানার জলে ভাসিয়া উঠিল। তার পর দিনের পর দিন ক্রমশঃ বহু মাছ মরিয়া জলে ভাসিয়া উঠিল। হানার আশেপাশে জলের ভিতর বহু কলসী, হাঁড়ি প্রভৃতি পোতা ছিল। সেগুলিতে কই, মাগুর মাছ আসিয়া বাসা বাঁধিয়া থাকিত; কিন্তু সেগুলিও তুলিয়া দেখিয়া জেলেরা অবাক হইয়া গেল। সেগুলির ভিতর আর মাছ কিলবিল করিতেছে না। যত মরা মাছে সেগুলি ভর্ত্তি হইয়া রহিয়াছে।…

লোকে বলে নফরের বউয়ের জন্য এই সমস্ত হয়। হানার জলের সহিত বউটির নাকি বেজায় বিরোধ।

• • •

রাত্রে শুইয়া শুইয়া জীবনরাম হঠাৎ বলিয়া ওঠে—ঐ শুনছেন, মাষ্টার-মশাই—ঐ যে শব্দ আসছে।

চাদরটি ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া কান পাতিয়া শব্দ শুনি।

আপত্তিগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া টাল্ সারি বাঁধিয়া সমান্তরালভাবে বীজ বপন করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাঁহার নিযুক্ত কৃষিকর্ম্মিগণ স্থিতিশীলতাবশতঃ তাহাদের পুরাতন পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিতে আপত্তি করিতে লাগিল। ইহাতে টাল্ নিজের অভিপ্রেত প্রণালীতে বীজবপন করিবার জন্য একটি উপযুক্ত যন্ত্রের আবিষ্কারে মনোনিবেশ করিলেন। অদম্য অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে একটি অর্গ্যানের পাটাতনের সাহায্যে তিনি এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিলেন যাহাতে সারি বাঁধিয়া নালী কাটার সঙ্গে সঙ্গে বীজগুলি মাটিতে সমান্তরালভাবে পড়িতে পারে। যন্ত্রটির পশ্চাতে সংলগ্ন আর একটি যন্ত্র দ্বারা পতিত বীজগুলিকে মাটি দিয়া ঢাকা দেওয়া খুব সহজসাধ্য। তাঁহার বপনযন্ত্র উদ্ভাবিত হইবার আগে অনেক সময় চাষারা হস্ত দ্বারা জমির মধ্যে নালী কাটিয়া বীজবপন করিত এবং এই প্রথাকে ড্রিলিং বা বপনপ্রথা বলিত। সেই পদ্ধতির অনুকরণে টাল্ উপরিউক্ত বীজবপন-যন্ত্রের নাম দিলেন ড্রিল বা বপন যন্ত্র।

টাল্ ক্রমান্বয়ে তের বৎসর ধরিয়া একই ক্ষেত্রে কোন প্রকার সার ব্যবহার না করিয়া গম উৎপন্ন করিয়াছিলেন এবং উহা তাঁহার প্রতিবেশী কৃষকদিগের ক্ষেত্রে উৎপন্ন গম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। তিনি দেখাইলেন যে তাঁহার প্রণালীতে বপন করিলে বীজের অপচয় খুব কম হয়। কারণ হস্তদ্বারা উপ্ত বীজ সকল সময়ে মাটি দিয়া ঢাকা পড়ে না এবং অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বেই অনেক সময়ে রৌদ্রবৃষ্টিতে পচিয়া যায় অথবা পক্ষীরা খুঁটিয়া খাইয়া ফেলে।

টাল্ আরও দেখাইলেন যে শস্যের চারাগুলি সারি বাঁধিয়া থাকিলে তাহাদের মধ্যস্থিত স্থানের তৃণ বা কোন আগাছা তুলিয়া দেওয়া সম্ভব এবং ইহাতে কেবল যে আগাছা নষ্ট হয় তাহা নয়, জমির বড় বড় ঢেলাগুলিও ভাঙিয়া খুব ছোট ছোট হইয়া যায়। টাল্ এই প্রসঙ্গে যে সকল পরীক্ষা করেন তাহাতে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে-মাটিকে যত বেশী চূর্ণবিচূর্ণ করা যায় ততই উদ্ভিদের মূল মাটি হইতে সহজে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে। অনেক প্রকার শাক-সবজী ও গম, যব ইত্যাদি শস্যদ্বারা পরীক্ষা করিয়া টাল্ প্রতিপন্ন করেন যে তাঁহার বপন এবং আগাছা উঠাইবার প্রণালী (Drilling and horse-hoeing) হস্ত দ্বারা বীজ ছিটাইয়া বপন-প্রণালী অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ।

১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধুবান্ধবের আগ্রহে টাল্ "The New Horse-hoeing Husbandry" নামক একটি প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর তের বৎসর পরে উপরিউক্ত প্রবন্ধকে তাঁহার অন্য দুইটি প্রবন্ধের সহিত একত্র করিয়া *Horse-hoeing Husbandry* নামক একখানি বৃহৎ গ্রন্থ মুদ্রিত করা হইয়াছিল।

সাইরাস্ হল্ ম্যাক্‌কর্মিক (১৮০৯—১৮৮৪)

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নবীন আমেরিকার আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। জনসাধারণ খুব গরিব-ভাবে থাকিত। অধিকাংশ লোক কাঠের গুঁড়িদ্বারা নির্ম্মিত ছোট ছোট কুটীরে বাস করিত এবং ঘরে বোনা পরিচ্ছদ পরিধান করিত। যে-সকল খাদ্য দ্বারা তাহারা জীবনধারণ করিত তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে আদৌ পুষ্টিকর নহে। তখনকার দিনে ভূমিকর্ষণ এবং শস্যকর্ত্তনের জন্য অতি সাধারণ যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইত। শস্যচ্ছেদনের জন্য তাহারা অতি পুরাকালের—মিশর এবং ব্যাবিলনে ব্যবহৃত—হস্তদ্বারা পরিচালিত ছোট ছোট কাস্তে ব্যবহার করিত এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগেও এই কাস্তের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেই সময়ে পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই কাস্তে এবং কৃষিকার্য্যের অন্যান্য সকল প্রকার যন্ত্রকে অধিকতর কার্য্যকরী করিবার বিশেষ চেষ্টা চলিতেছিল। আমেরিকার নবীন প্রজাতন্ত্র গভর্ণমেণ্ট কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। তখনকার দিনে আমেরিকার জনসাধারণেরও কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করা ভিন্ন অনাহারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার আর কোন উপায় ছিল না। ১৮১০ হইতে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ—এই সময়ের মধ্যে আমেরিকার অধিবাসিগণ দলে দলে কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিল এবং উহা আমেরিকার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তখনকার সরকারী রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে ঐ সময়ে আমেরিকার শতকরা নব্বই জন অধিবাসী উৎসাহ ও

অধ্যবসায়ের সহিত কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু কাষ্ঠ-নির্ম্মিত লাঙ্গল এবং হস্তদ্বারা পরিচালিত কাস্তে ও যষ্টি প্রভৃতি পুরাকালের উদ্ভাবিত যন্ত্রের তখনও বিশেষ উন্নতি হয় নাই। উপযুক্ত যন্ত্রের অভাবে কৃষক বিশেষ উৎসাহ সত্ত্বেও যথেষ্ট পরিমাণে শস্যোৎপাদন করিতে পারিত না। এই জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অধিকাংশ আমেরিকার অধিবাসী কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেও প্রথমে তাহারা উপযুক্ত শস্যোৎপাদনের প্রচেষ্টায় বিশেষ ফললাভ করে নাই। এই সময়ে, ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার অন্তর্গত নিভৃত ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশে এক কৃষকের ঘরে ভগবানের প্রেরিত দূতরূপে সাইরাস্ ম্যাক্‌কর্মিকের জন্ম হয়।

সাইরাসের পিতা রবার্ট ম্যাক্‌কর্মিক নিজের কারখানায় ছোটখাট যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইতেন এবং তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক অনেকগুলি নূতন প্রকারের কৃষিযন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছিল। তাঁহার নিজের গৃহে তিনি জুতা, মোজা, টুপী, কার্পেট, মোমবাতি, সাবান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন। ফলতঃ সাইরাস্ ম্যাককর্মিক এইরূপ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া যে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। পিতামাতার নিকট হইতে সাইরাস্ ম্যাক্‌কর্মিক কার্য্যসম্পাদনে দৃঢ়তা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং গৃহের চারি পার্শ্বে বিস্তীর্ণ গমের ক্ষেত তাঁহার মনকে শস্যচ্ছেদনের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রের উদ্ভাবনের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল।

শস্যচ্ছেদন এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তিত উদ্ভিদগুলিকে আটি বাঁধিয়া ফেলা—এইরূপ একটি যন্ত্রের উদ্ভাবনের জন্য রবার্ট ম্যাককর্মিক প্রচুর অধ্যবসায় সহকারে পনর বৎসর-কাল ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ ফললাভ করেন নাই। তিনি নিজের উদ্ভাবিত একটি ছেদন-যন্ত্র শস্যক্ষেত্রে চালনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আশানুরূপ কৃতকার্য্য হন নাই। হতাশ হইয়া তিনি অবশেষে প্রচেষ্টা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

রবার্ট ম্যাককর্মিক বিফলমনোরথ হইয়া শস্যচ্ছেদনযন্ত্রের আবিষ্কারের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিবার পরে তাঁহার পুত্র সাইরাস্ ম্যাক্‌কর্মিক পিতার পরিত্যক্ত গবেষণায় উৎসাহ সহকারে মনোনিবেশ করিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইল :—

(১) যে শস্যগুলিকে কর্ত্তন করা হইবে সেগুলিকে কাটিবার পূর্ব্বে চারি পার্শ্বের শস্যশ্রেণী হইতে পৃথক করা আবশ্যক। ধারাল ফলকের সহিত একটি বক্র হাতল সংযুক্ত করিয়া তিনি এই প্রশ্নের সমাধান করেন।

(২) শস্যক্ষেত্রের দণ্ডায়মান ও শায়িত উভয় প্রকার উদ্ভিদকে কাটিবার জন্য কর্ত্তন-ফলকের সম্মুখে ও পার্শ্বে গতি থাকা আবশ্যক। ম্যাক্‌কর্মিক প্রথমে ঘূর্ণায়মান চক্রাকার ফলকের দ্বারা এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে অপেক্ষাকৃত কম আয়াস-সাধ্য উপায়ে তিনি ইহার সমাধান করেন। তিনি একটি ধারাল সোজা ফলকের দুই পার্শ্বে গতিবিধির ব্যবস্থা করিলেন। অশ্বের সহিত সম্মুখের গতি এবং দুই-পার্শ্বের গতি একত্র হইয়া, দণ্ডায়মান ও শায়িত উভয়বিধ উদ্ভিদকেই ছেদন করা সহজসাধ্য হইল।

(৩) কাটিবার সময়ে শস্যগুলিকে ধরিয়া রাখা দরকার, যাহাতে শস্যগুলি কাটিবার সময়ে মাটিতে হেলিয়া না পড়ে। ম্যাক্‌কর্মিক ছেদন-ফলকের সহিত এক সারি অঙ্গুলির মত অংশ বসাইয়া এই প্রশ্নের সমাধান করেন। তিনি অঙ্গুলিগুলির গঠন এরূপ করিলেন, যাহাতে ভিজা শস্যগুলি দুইটি অঙ্গুলির মধ্যস্থিত স্থানে আটকাইয়া থাকিতে না পারে।

(৪) যে-সকল শস্য মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে সেগুলিকে কাটিবার পূর্ব্বে খাড়া করিয়া ধরিবার জন্য এক প্রকার লাটাইয়ের সাহায্য অবলম্বন করা হইয়াছিল।

(৫) কর্ত্তন-যন্ত্রের সহিত সংযোগ করিয়া একটি পাটাতন নির্ম্মাণ করা হইল, যাহাতে কর্ত্তিত উদ্ভিদগুলির বাণ্ডিল ধরা যাইতে পারে এবং যে লোক ছেদনযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে সে ঐ বাণ্ডিলগুলি সরাইয়া দিতে পারে।

(৬) অশ্বের সহিত যোগ করিবার জন্য দণ্ডটি ছেদন-যন্ত্রের একপার্শ্বে যোগ করা আবশ্যক হইয়াছিল—যাহাতে অশ্বের পায়ের চাপে শস্য নষ্ট না হয়।

(৭) ম্যাক্‌কর্মিক একটি বড় চাকার উপরে সমস্ত ছেদনযন্ত্রের ভার ন্যস্ত করিলেন এবং যাহাতে চাকাটি চলিবার

সময়ে লাটাইটি ও ছেদনফলকটি কাজ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থাও করা হইল।

১৮৩১ সালের জুলাই মাসে সাইরাস্ ম্যাককর্মিক শস্য কাটিবার জন্য নিজ হস্তদ্বারা নির্ম্মিত যন্ত্র নিজেদের গমের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। প্রথম ব্যবহারের পক্ষে যন্ত্রটি বিশেষ সুফল প্রদান করে। ইহার কিছু পরে ম্যাক্‌কর্মিক লাটাই ও বক্র হাতলটিকে কিছু উন্নত করেন এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে জনসাধারণের সম্মুখে তাঁহার যন্ত্রের ব্যবহার দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন। 'লেক্সিংটন ফিমেল একাডেমি'র জনৈক অধ্যাপক, ব্র্যাড্‌শ সেই সময়ে সকলকে বলিয়াছিলেন, "এই যন্ত্রের দাম এক লক্ষ ডলার"।

সাইরাস ম্যাক্‌কর্মিককে তাঁহার যন্ত্রের উপকারিতা বুঝাইবার জন্য প্রথমে অসংখ্য বাধা-বিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সত্য ও অধ্যবসায় অবশেষে জয়যুক্ত হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাক্‌কর্মিকের মৃত্যু হয়।

এখন পৃথিবীর অনেক জায়গায় ম্যাক্‌কর্মিক কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত শস্যচ্ছেদনযন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। প্রাথমিক অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইলেও আধুনিক সমস্ত ছেদনযন্ত্রই উপরিউক্ত সাতটি মূলতত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ম্যাক্‌কর্মিকের জীবনী লেখক এইচ. এন. ক্যাসন লিখিয়াছেন

"Cyrus Hall McCormick invented the Reaper. He did more—he invented the business of making Reapers and selling them to the farmers of America and foreign countries. He held pre-eminence in this line, with scarcely a break, until his death; and the manufacturing plant that he founded is today the biggest of its kind. Thus, it is no more than an exact statement of the truth to say that he did more than any other member of the human race to abolish the famine of the cities and the drudgery of the farm—to feed the hungry and straighten the bent backs of the world."*

২। কৃষিকার্য্যে বিদ্যুতের ব্যবহার

পৃথিবীর অনেক জায়গায়, বিশেষতঃ আমেরিকায়, কৃষিক্ষেত্রের খুব নিকটে অনেক ছোট ছোট নদী বা জলপ্রপাত বহিয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল জলধারার শক্তির সাহায্যে চাকা ঘুরাইবার ব্যবস্থা করা হয়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাইকেল ফ্যারাডে বহু পূর্ব্বেই দেখাইয়াছিলেন যে ঘূর্ণায়মান তারের চাকা এবং চুম্বকশক্তির সাহায্যে তাড়িতস্রোতের উৎপাদন অতি সহজ। এখনকার দিনে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত তাড়িতস্রোতজননকারী গতি-যন্ত্র উপরিউক্ত নিয়মে পরিচালিত হইতেছে।

বিদ্যুৎ কৃষিকার্য্যে দুইভাবে ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদের বর্দ্ধনশীলতা ও পুষ্টিসাধনের জন্য (electric-culture) এবং সাধারণ কৃষিকার্য্য ও কৃষিযন্ত্র পরিচালনার জন্য (electric-farming)। এই উভয়বিধ প্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক।

(১) উদ্ভিদের বর্দ্ধনশীলতা ও পুষ্টিসাধনের বৈদ্যুতিক পদ্ধতি দুই ভাবে কার্য্যকরী করা সম্ভব। উদ্ভিদের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন করিবার জন্য ক্ষেত্রে তাড়িতস্রোতবহনশক্তিহীন (insulated) দণ্ডের উপরে শস্যে তারের জাল বিছাইয়া সেই তারের মধ্য দিয়া তাড়িতস্রোত পরিচালনা করা হয়। নিম্নে যে-সকল কর্ম্মী কাজ করিবে তাহারা যাহাতে নিরাপদ থাকে তাহার সুব্যবস্থা করা দরকার। এই প্রণালীতে বৈদ্যুতিক জালের নিম্নস্থিত উদ্ভিদগুলির বর্দ্ধনশীলতা বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই প্রণালী বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ এবং ভারতবর্ষের দরিদ্র কৃষকদিগের পক্ষে আদৌ প্রযোজ্য নহে।

অন্য আর এক উপায়ে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে বৈদ্যুতিক শক্তিকে উদ্ভিদের বর্দ্ধনশীলতার সহায়তায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কয়েক মুহূর্ত্ত অথবা কয়েক মিনিট সময়ের জন্য বীজ, উৎপন্ন উদ্ভিদের মূল অথবা পারিপার্শ্বিক মৃত্তিকাকে বৈদ্যুতিকশক্তিসম্পন্ন তারের আবেষ্টনে রাখিয়া বৈদ্যুতিক শক্তির সংস্পর্শে আনিলে অনেক সময়ে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। বীজের মধ্যে অঙ্কুরিত হইবার শক্তি বর্ত্তমান আছে—বিদ্যুতের সাহায্যে বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হয় এবং উৎপন্ন উদ্ভিদ শীঘ্র পুষ্টিলাভ করে।

ভারতবর্ষের মত দরিদ্র কৃষকের দেশের পক্ষে যৌথভাবে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার আরম্ভ করা দরকার।

---

* Cyrus Hall McCormick—*His Life and Work* by H. N. Casson.—Ed. 1909, p. 17.

এই যৌথ-ব্যবসায়-সমিতি বীজগুলিকে বৈদ্যুতিক-শক্তির সাহায্যে বলশালী করিয়া তাড়িতস্রোতবহনশক্তিহীন (insulated) পাত্রের মধ্যে ভরিয়া কৃষকদিগের মধ্যে বিতরণ করিতে পারেন। অবশ্য ইহাতে কৃষকের মোটের উপরে আর্থিক লাভ কি লোকসান হইবে, কার্য্যতঃ না দেখিলে তাহা বলা শক্ত।

(২) সাধারণ কৃষিকার্য্য ও কৃষিযন্ত্র পরিচালনার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার :—ডাইনামোর সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রে গৃহগুলি বৈদ্যুতিক আলোকে সহজে আলোকিত করা, কৃষি-যন্ত্রগুলি ব্যবহার এবং প্রয়োজন হইলে সেগুলি মেরামত করিবার জন্য কারখানা স্থাপন করা সম্ভব। পাশ্চাত্য দেশের ও আমেরিকার যে-সকল স্থানে বিদ্যুতের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়সাপেক্ষ, সেই সকল স্থানে তাড়িতস্রোতের ব্যবহার কৃষিকার্য্যের প্রচুর সুবিধা করিয়া দিয়াছে।

সাগরতীরের রাজপুরী

উলাণ্ডের *Das Schloss am Meere* নামক জর্মান কবিতার অনুবাদ

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

"দেখিয়াছ তুমি সে রাজার পুরী,
উচ্চ পুরী সে সাগরতটে,
সোনালী গোলাপী মেঘ ফেরে ঘুরি
উপরে তাহার আকাশপটে?

মনে হয় যেন পড়িবে লুইয়া
মুকুর-স্বচ্ছ সাগরজলে,
মনে হয় যেন উঠিবে ছুঁইয়া
স্বর্ণসান্ধ্য মেঘের দলে।"

"দেখিয়াছি আমি রাজার প্রাসাদ
উচ্চ পুরী সে সাগরতীরে।
উপরে তাহার উঠেছিল চাঁদ,
ছিল চারিদিক কুয়াশা ঘিরে।"

"পবনের দোল লহরীর রাশি
জুড়ায়েছিল কি তোমার কান?
উপর হইতে এসেছিল ভাসি
বীণাঝঙ্কার প্রমোদগান?"

"ছিল সে বাতাস, ছিল বারিরাশ
শান্ত গভীর অচল থির।
বিষাদের সুর গৃহ হ'তে আসি
এনেছিল মোর নয়নে নীর।"

"রাজারে চলিতে দেখিয়াছ তুমি
মহিষীর সহ প্রাসাদ পরে,
লাল রাজবেশ চুমিয়াছে ভূমি,
সোনার মুকুটে আলোক ঝরে?

হরষে বিভোর রাজারাণী সাথে
ছিল না রূপসী তরুণী কেহ?
সোনার কিরণ কেশ শোভে মাথে,
ভানুসম রূপ উছলে দেহ?"

"পিতামাতা দোঁহে দেখেছি প্রাসাদে,
মুকুটের শোভা ছিল না শিরে,
কৃষ্ণবসন মলিন বিষাদে।
দেখি নাই আমি তরুণীটিরে।"

ঝড়

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

কালবৈশাখীর ধূলার হাত এড়াইতে পরেশের বাড়ি ঢুকিয়া পড়িয়াছিলাম।

একতলার ছোট ঘরখানায় বসিয়া বাহিরে প্রকৃতির তাণ্ডব দেখিতেছি। কালবৈশাখীর এমন মূর্তি কখনও দেখি নাই। জানালার সামনে ধূলি-আচ্ছন্ন আকাশ-বাতাসের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছি। দূরে মড়-মড় করিয়া কি যেন শব্দ হইল। বোধ হয় গাছের ডাল ভাঙিয়া পড়িল। হয়ত বা গোটা একটা গাছই।

এই কয় দিন ধরিয়া অসহ্য গরম পড়িয়াছিল। গাঢ় নীল আকাশের কোনও দিকে মেঘের কোন চিহ্ন ছিল না। আজ সহসা মেঘ দেখা দিল, নীল আকাশে কে যেন নীলকৃষ্ণ কালি লেপিয়া দিল। গরমে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলাম, একটু বৃষ্টিতে ভিজিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না। অবশ্য বৃষ্টিতে ভিজিবার বয়স বহু দিন পার হইয়া আসিয়াছি। কোন্ অতীতযুগে এমন একদিন ছিল যেদিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া আনন্দ পাইতাম, রোগভোগের আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু তাহার পর অনেক দিন কাটিয়াছে। যাহারা তখনও জন্মায় নাই, তাহারা প্রায় যৌবনে পা দিল। যাহারা ছিল শিশু তাহারা আজ যুবা। আর আমি যৌবনের শেষ সীমান্ত ছাড়াইয়া আসিয়াছি।

নব-বর্ষণের বিন্দুকয়টির মিষ্টত্ব আস্বাদ করা হইল না। কারণ বৃষ্টি আসিল না আসিল ঝড়। বাধ্য হইয়া পরেশের বাড়ী ঢুকিয়া পড়িলাম। আকাশ বাতাসের রং বদলাইয়া গেল—ধূসর ধূলিতে চারি দিক ঢাকিয়া গেল।

আশ্রয়লাভের প্রথম স্বস্তির ভাবটা কাটিলে পাশের অন্য লোকগুলির খোঁজ লওয়ার অবকাশ ঘটিল। শুধু পরেশ নহে, আরও তিন-চার জন রহিয়াছে, সকলেই বন্ধুস্থানীয়।

আমাদের বয়স চল্লিশের নীচে নহে। প্রায় সারাক্ষণই সে কথা অনুভব করিয়া থাকি। আমাদের কটিদেশের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু পরিধি আমাদের বয়সের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিয়াছে। প্রায় সকলেই আমরা মোটামুটি রোজগার ভালই করিয়া থাকি—তাই পলায়নোন্মুখ যৌবনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখার চেষ্টার কোনও ত্রুটি হয় নাই। বেশভূষা আহারবিহার যতদূর সম্ভব তরুণজনসুলভ করিয়াছি; পঁয়ত্রিশ পার হইয়া হঠাৎ একদিন আয়নায় পূর্ণ দেহের প্রতিবিম্ব দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়াছি, ফলে একটু-আধটু টেনিস খেলাও ধরিয়াছি, বৃথা। যেদিন কৈশোরের পরে যৌবন আসিয়াছিল, সেদিনও প্রায় হঠাৎ তাহাকে চিনিয়াছিলাম, পরে ঠিক তেমনই সহসা বুঝিলাম, যে আসিয়াছিল, সে বিদায় লইয়াছে। বিগত যৌবনের ছায়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া আর কোনও লাভ নাই।

এ ঘরের একজন শুধু আমাদের চেয়ে ছেলেমানুষ। সে নিশীথ মিত্র। নিশীথ! এ নাম ত্রিশ পর্যন্ত চলে, তাহার পরে কেমন যেন খাপছাড়া শুনায়। এ নাম শুনিলেই মনে হয়, যুবক, কবিত্বে ভরা মন, পৌরুষে ভরা দেহ— এ নাম প্রৌঢ়কে মানায় না।

অবশ্য প্রৌঢ় হইতে নিশীথের এখনও দেরি আছে। তাহার বয়স মোটে পঁয়ত্রিশ; দেহ-মন হইতে যৌবন এখনও নিঃশেষে বিদায় লয় নাই। তাই এখনও তাহার এ নামে চলে। কিন্তু চল্লিশের পরে কি করিয়া চলিবে, ভাবিয়া অকারণে অবাক হই।

নিশীথ মিত্র ঠিক এ দলের নয়। পঁয়ত্রিশ ও চল্লিশ এখনও এক সঙ্গে মিশিতে পারে না। আরও পাঁচ বছর পরে এ ব্যবধান বোধ হয় এতটা বেশী থাকিবে না। সেদিন প্রৌঢ় আমরা প্রৌঢ় নিশীথকে নিজেদের দলে টানিয়া লইব। কিন্তু আজ সে এ ঘরে আসিয়াছে দায়ে ঠেকিয়া, আমারই মত ধূলার হাত এড়াইতে।

বাহিরে ভীষণ বেগে ঝড় চলিয়াছে। আকাশ অদৃশ্য। তাহার পরে সহসা কখন বাতাস পড়িয়া গেল। ধূলি-আবরণ ভেদ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এই এ বৎসর

প্রথম বর্ষণ। বৃষ্টির বেগ বাড়িয়া বাহিরে জলের স্রোত বহিয়া চলিল। রাস্তায় এক হাঁটু জল জমিয়াছে। জনমানব নাই।

রাস্তার দিকে তাকাইয়া কহিলাম, "এমন ঝড়বৃষ্টি কখনও দেখেছি বলে ত মনে পড়ে না।" বন্ধুরা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন।

শুধু নিশীথ মিত্র বলিল, "তাহ'লে হয় আপনারা ভুলে গেছেন, না-হয় আপনারা সে বছর বৈশাখে কলকাতায় ছিলেন না। এ ঝড়টাকে যে এত বড় করে দেখছেন, তার কারণ এটা এ বছরের প্রথম ঝড় এবং প্রথম বৃষ্টি। গেল বছরেও প্রথম কালবৈশাখীতে বোধ হয় ঠিক এই কথাটাই বলেছিলেন, নয় কি?" বলিয়া নিশীথ হাসিল।

নিবারণ কহিল, "ঠিক! যে-বছরেই গরমকালে কাগজ উল্টোও, দেখবে, 'গত ত্রিশ বছরের মধ্যে এমন গরম পড়ে নাই।' শীতকালে দেখ, দেখবে, 'গত উনপঞ্চাশ বছরের মধ্যে মাত্র একবার এমন শীত পড়িয়াছে।' ওসব মনের ভ্রম।"

নিশীথ একটু ভাবিয়া কহিল, "তা ঠিক বল্‌তে পারি নে, কারণ আমি যে বছরের কথা বল্‌ছি, সে বছরেই বোধ হয় আমার জ্ঞানে ভীষণতম ঝড় দেখেছি। শুনবেন সে কথা?"

নিশীথ মিত্র কথা কহিতে জানিত। সিগারেটে খুব জোর একটা টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে কহিলাম, "বেশ ত। চলুক গল্প, বৃষ্টিটা কাটবে ভাল।" বন্ধুরা সোৎসাহে সম্মতি জানাইলেন।

নিশীথ এক-কথায় গল্প আরম্ভ করিতে পারিত না। হাতের আধপোড়া সিগারেট ফেলিয়া দিয়া সে একবার ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাইল। ক্যালেণ্ডারের উপরে একটি ফরাসী ললনার ছবি, হয়ত সেদিকে নয়। তাহার পরে পকেট হইতে সিগারেট-কেস্ বাহির করিয়া অতি ধীরতার সহিত একটি সিগারেট ধরাইল। তাহার পর আবার ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাইয়া গল্প আরম্ভ করিল।

কিন্তু গল্পের প্রথম কয় লাইন শুনিয়াই বুঝিলাম এ আমার জানা গল্প। অবশ্য নিশীথের কাছ হইতে কোনও দিন শুনি নাই, কিন্তু গল্পের পাত্রপাত্রীদের অধিকাংশকেই আমি বাস্তব জীবনে চিনিতাম। নিশীথ কি বলিতেছে সেদিকে খেয়াল রহিল না। এক হতভাগ্য পুরুষ আর তাহার দুর্ভাগিনী স্ত্রীর কথা মনে পড়িয়া মনটা আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

নিশীথের এক দূরসম্পর্কীয় মাসীর কথা। তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ। বড়জোর বছর-চোদ্দ বয়স, আমারই প্রায় সমবয়সী, আমার ঠিক খেলার সাথী ছিল না, কারণ চোদ্দ বছরের মেয়ে মনের বয়সের দিক দিয়া পনর বছরের কিশোরের চেয়ে অনেক বড়। তবে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি এক বাড়িতে তাহারা থাকিত, তাই বেশ পরিচয় ছিল।

মেয়েটির নাম মলিনা। এ নামের আরও দুই একজন দেখিয়াছি, দেখিয়া কেমন কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে যে এ নামের মেয়েরা সুখী হয় না। রং তাহার বেশ ময়লা, কালো বলিলে দোষ হয় না। মোটের উপর দেখিতে অত্যন্ত কুরূপা না হইলেও সুন্দরী নয় কিছুতেই। শিক্ষিতাও নয়। বাড়ির অবস্থাও বেশ খারাপ। কাজেই সুপাত্রের হাতে পড়িবে এ দুরাশা কেহ করে নাই। খুব বেশী আশা করিলে মনে হইত চলনসই দোজবরে পড়িলেও পড়িতে পারে। মেয়ে সুন্দরী না হোক, শিক্ষিতা না হোক, ঘরের কাজ ত জানে।

কিন্তু বিবাহের দিন বরের চেহারা দেখিয়া অনেকেরই চোখ টাটাইয়াছিল, যতক্ষণ না ভিতরের সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। বিবাহের আসরে বরকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। কন্দর্পের মত রূপবান বর, অত্যন্ত ফর্সা রং, গরিবের ঘরে রূপহীনা কিশোরীকে ঘরে লইতে এমন রূপকথার রাজপুত্রের আবির্ভাব হইল কি করিয়া? কিন্তু মলিনার চোখে আনন্দের ক্ষীণতম রেখাও দেখি নাই, তাহার মায়ের চোখেও না, তাহার কেরানী বাপের চোখেও না।

কেহ বলিল না, "মলিনা আমাদের শিবপূজার ফল পেয়েছে।" বাজনা বাজাইয়া বরপক্ষ বধূ লইয়া চলিয়া গেলে মলিনার মায়ের চাপা কান্নার মধ্যে যে বিষাদ অনুভব করিয়াছিলাম, সে শুধু মেয়ের আসন্ন বিচ্ছেদাশঙ্কায় নয়।

মলিনার স্বামীর পরিচয় পাইয়া আমার মত কিশোরের মনেও কেমন একটা নিরানন্দের ভাব আসিয়াছিল। মলিনার স্বামী পাগল। কৈশোরে মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয়, প্রথম যৌবনে ধনীর ছেলের শরীরের উপর

অত্যাচারেরও কোনও ত্রুটি ছিল না, ফলে প্রায় দুই বছর ধরিয়া তিনি পাগল। প্রায় দুরারোগ্য অবস্থা।

আইবুড়ো অবস্থার প্রায় সকল রকম রোগের ধন্বন্তরি বিবাহ। চরিত্রের দোষ ঘটিলে বিবাহ, পড়াশুনায় মন না বসিলে বিবাহ, এমন কি যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা দিলেও বিবাহ। কিন্তু পাগলের পাগলামি সারানোর পক্ষে এমন ঔষধ নাকি নাই।

পনর বছর বয়সে এসব কি রকম ভাবে গ্রহণ করিয়াছি ভাল করিয়া মনে পড়ে না, কিন্তু তাহার অনেক পরে আরও বহুবার মলিনাকে দেখার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তখন ভাবিয়াছিলাম, আমাকে যদি কেহ কোনও দিন বাংলা দেশের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা করিয়া দেয়, তাহা হইলে আমার জীবনের খুব বড় একটা অংশ কাটিয়া যাইবে পাগল ছেলের বিবাহ দেওয়ার মত পাপ যাহারা করে তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে। জগতের বর্ব্বরতম জাতির নিষ্ঠুরতম শাস্তিবিধানে হয়ত এই ধরণের পাপীদের শাস্তি মিলিতে পারে; আর কোথাও না। চোখের উপরে একটি নিরপরাধা মেয়ের জীবন দিন দিন ব্যর্থ হইতে দেখিয়াছি, তাহার মায়ের চোখে উচ্ছ্বসিত জলরাশি দেখিয়াছি—শুধু তাহার বাপের অপরাধ আমি কোনও দিন মার্জ্জনা করিতে পারি নাই, তাহার অশ্রু-সত্ত্বেও না। বনিয়াদ-ঘরের রূপবান ছেলের হাতে রূপহীনা মেয়ের জীবনটা সঁপিয়া দেওয়ার সুবর্ণসুযোগ তিনি ছাড়িতে পারেন নাই। মানি, এ সুযোগ ছাড়া গরিবের পক্ষে কঠিন। কিন্তু তাঁহাকে নিষেধ করার লোকের ত অভাব ছিল না। আমার মনে আছে আমার ছোটকাকা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এ বিবাহ বন্ধ করিতে। মলিনার বাবা চটিয়া কহিয়াছিলেন, "আরে মশায় মনতোষ আমাদের পাগল কোন্ জায়গাটায়? বলে কত বিপজ্জনক পাগল, শিকলে বাঁধা পাগল বিয়ে ক'রে সুস্থ হয়ে ঘর-সংসার করছে, আর এই সামান্য মাথা-গরম প্রায় সুস্থ লোকটি চিরকাল পাগল থাকবে? দাঁড়ান মশায়, বিয়েটা হয়ে যাক, দুদিনে দেখবেন, কোথায় পাগল, কোথায় কি!" ইত্যাদি আরও অনেক কথা।

ইহার পরেও তিনি যদি আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেন, তাহা আর যেই মানিয়া লউক আমি পারি নাই।

আরও একজন পারে নাই। সে মলিনার মা। মেয়ের বিবাহের বছরখানেকের মধ্যেই তিনি মারা যান; আমার মতে জন্মান্তরে অর্জ্জিত পুণ্যবলে।

কিন্তু বরের বাপ যদি ভাবিয়া থাকেন যে, যে-কোনও রকমের বধূ ঘরে আসিলেই মনতোষের পাগ্‌লামি সারিবে, তবে তিনি নেহাৎই ভুল করিয়াছিলেন। তাঁহার উচিত ছিল সুন্দরী মেয়ে খুঁজিয়া আনা। খুঁজিলে তিনি পাইতেনই। কিন্তু কুরূপা স্ত্রীর সংস্পর্শে আসিয়া মনতোষের খারাপ মাথা মোটেই ভালর দিকে গেল না, যাওয়া সম্ভবও নয়। পাগ্‌লামি দিন দিন বাড়িয়াই চলিল। মলিনাকে তাহার বাপের বাড়িতে মধ্যে মধ্যে দেখিতাম। বয়স তাহার বাড়িয়াই চলিল, কিন্তু রূপহীন দেহে যৌবনের প্রাবল্যেও রূপের আবির্ভাব হইল না। বরং পাগল স্বামী ও শুভাকাঙ্ক্ষী শাশুড়ীর শুভেচ্ছার কল্যাণে তাহার হাতে মুখে যে সব দাগ দেখিতাম, এবং বসনের অন্তরালে যে দাগ নিঃসন্দেহ আরও অনেক ছিল, তাহা রূপের দিক দিয়া অনুকূল নহে।

শীতের দিকে মনতোষের মাথা একটু ঠাণ্ডা থাকিত, প্রহারের মাত্রাও কমিত। কিন্তু ফাল্গুন-চৈত্র মাসে, গ্রীষ্মের আরম্ভে মনতোষ বদ্ধ পাগলে পরিণত হইত। সে সময়ে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন হইয়া পড়িত—মনতোষের জন্য নয়, মলিনার জন্য।

শাশুড়ী হয়ত ভাবিতেন ছেলের পাগ্‌লামি না সারার জন্য ষোল আনা দায়ী তাঁহার রূপহীনা পুত্রবধূ। তাই তাঁহার ব্যবহার শাশুড়ীজনোচিত হয়ত ছিল, কিন্তু মনুষ্যজনোচিত ছিল না।

পাগল স্বামী ও কুরূপা স্ত্রীরও ছেলেমেয়ে হয়। মলিনার যখন উনিশ বছর বয়স তখন সে দুইটি ছেলেমেয়ের মা। বাপের রূপ তাহারা পাইয়াছিল। কিন্তু মলিনার মনে আনন্দ ছিল না—তাহারা যে বাপের পাগ্‌লামি পাইবে না তাহার কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। তবু তার যন্ত্রণাভরা জীবনের মধ্যে ছেলেমেয়ে দুটি অনেকখানি সান্ত্বনার স্থল ছিল, শাশুড়ীর নির্যাতনও তাহাদের জন্মের পর একটু কমিয়াছিল।

এই অনবচ্ছিন্ন প্রহার ও অশ্রুর পালার মধ্যে বিরাম ছিল। গরম যখন অসহ্য হইয়া উঠিত, তখন পাগল মধ্যে

মধ্যে বাড়ির বাহির হইয়া পড়িত। দুই মাস, তিন মাস নানা দেশে নানাভাবে ঘুরিয়া কঙ্কালসার দেহে একদিন আপনিই বাড়ি ফিরিয়া আসিত। কিন্তু এই কয় দিন সারা শহর তোলপাড় করিয়া ফেলিলেও তাহাকে পাওয়া যাইত না, তার প্রধান কারণ সে কলিকাতায় থাকিতই না। এখানে থাকিলে যে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ হইবে তাহা সে বুঝিতে পারিত। পাগ্‌লামির ভিতরেও এ সহজ জ্ঞানটুকু তাহার থাকিত।

এই অজ্ঞাতবাসের আরম্ভ হইত এক অদ্ভুত নাটকীয় উপায়ে। যাওয়ার আগে সে চিঠি লিখিয়া রাখিয়া যাইত যে সে আর ফিরিয়া আসিবে না; মলিনার যন্ত্রণা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, এখন সে দেশে দেশে নানা তীর্থে ঘুরিয়া শরীর ও মন চাঙ্গা করিয়া তুলিতে চায়।

কিন্তু ফিরিয়া সে আসিত।

আমি জানি না, এরকম ভয়-দেখানো মলিনা প্রথম বারে কি ভাবে লইয়াছিল। কিছুতেই মনকে বুঝাইতে পারি না যে মলিনা আকুল হইয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিল বিচ্ছেদাশঙ্কায়। আমার মনে হয় সে গোপনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ভগবানকে ডাকিয়াছিল, "হে ঠাকুর, এই যেন সত্য হয়।"

আমি জানি না, প্রথমবার মনতোষ ফিরিয়া আসিলে মলিনা কি ভাবে সেই পুনর্মিলনকে গ্রহণ করিয়াছিল, হয়ত সে আবার ভগবানকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, "ঠাকুর, আমি ত ইহা চাই নাই, আমাকে স্বস্তিশান্তির আশা দিয়া কেন এমন করিয়া আবার সব ফিরাইয়া লইলে?"

কিংবা, কি জানি, হয় ত সে আর ভগবানকে ডাকে নাই, হয়ত চিরদিনের জন্য ভগবানের কাছে আর হাত জোড় করে নাই।

শেষ পর্য্যন্ত মনতোষের এই স্বেচ্ছানির্বাসন সকলেই অত্যন্ত সহজভাবে লইতে আরম্ভ করিল, বৈশাখ মাসের গোড়ায় কি চৈত্রের শেষাশেষি সে বাহির হইয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসে বর্ষণশীতল আষাঢ়ের কোন একটি দিনে। মলিনার এ লইয়া আর কোনরূপ অশান্তি বা উদ্বেগের কারণ রহিল না, আশারও না। শুধু যে কয় দিন সে বাহিরে থাকিত সেই কয় দিন ছিল মলিনার ছুটির দিন, তাহার দেহ-মনের নিষ্কৃতি। কি জানি, হয়ত প্রতিবারেই একটু ক্ষীণ আশা মলিনার মনে জাগিয়া রহিত, আর মনতোষ ফিরিবে না। কিন্তু সে ফিরিতই তাহার অস্থিচর্ম্মসার দেহ লইয়া। তখন আবার সুরু হইত স্বামীর পরিচর্য্যা, একটা অর্দ্ধমৃত কঙ্কালকে মানুষ করিয়া তোলা।

ইহার ভিতরেও মনতোষের মৌলিকতার অভাব ছিল না। সারা বছর সে মলিনার সহিত যেমন খারাপ ব্যবহারই করুক না কেন, অজ্ঞাতবাস হইতে ফিরিয়া কয়েকদিন পর্য্যন্ত সে মলিনার সহিত আশ্চর্য্য ভাল ব্যবহার করিত—ঠিক সাধারণ মানুষের মত নয়, কারণ সাধারণ মানুষ স্ত্রীর সহিত খুব ভাল ব্যবহার করে বলিয়া আমার জানা নাই। সে ব্যবহার যেন একটু অন্য ধরণের পাগলের মত। এই কয় দিন সে মলিনাকে তাহার অপরূপ পাগ্‌লামির আদরে স্নেহে অস্থির করিয়া তুলিত।

এই কয় দিনই ছিল মলিনার জীবনে সবচেয়ে বেশী যন্ত্রণাদায়ক। অত্যাচার, প্রহার, অপমান তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে আর তেমন তাপ ছিল না। মনতোষের প্রথম নিরুদ্দেশের পর প্রত্যাবর্ত্তনে যে আদরের দিনকয়টির আবির্ভাব হইয়াছিল, সে সময় হয়ত মলিনা ভাবিয়াছিল তাহার দুঃখের নিশা শেষ হইয়াছে। নিকষকালো অসীম রাত্রির মধ্যে তাহা যে শুধু বিদ্যুতের লীলা—বুঝিয়া তাহার কেমন লাগিয়াছিল, কোনদিন ভাবিয়া দেখি নাই, চেষ্টাও করি নাই। মানুষের হৃদয় লইয়া ভগবানের হৃদয়হীন ক্রীড়ার এ শুধু একটা উদাহরণ বই ত আর কিছুই নয়।

দিন পনরর মধ্যেই স্নেহ ও আদরের দিন শেষ হইত, আবার আরম্ভ হইত প্রহার, নির্য্যাতন, চিরদিনের ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি।

তাহার পর এক বৈশাখের অসহ্য গরমে মনতোষ বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। কাহারও এতটুকু ব্যস্ত হওয়ার কারণ ঘটিল না।

তার পর এক মাস দুই মাস করিয়া অনেক দিনই কাটিয়া গেল, কোন বৃষ্টিসজল আষাঢ়েই আর মনতোষ ফিরিল না।

কিন্তু স্বামী নিরুদ্দেশ হওয়ার বারো বৎসরের মধ্যে নাকি স্ত্রী বিধবা হয় না, মলিনাও সধবাই রহিয়া গেল।

মলিনার ছেলে মেয়ে দুইটি বড় হইয়াছে, লেখাপড়া

শিখিয়াছে, এখনও তাহাদের মাথাখারাপের কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। আর কখনও না পাইতেও পারে।

যে যাহাই বলুক, আমার মতে মলিনা সেই বৈশাখ হইতে সুখের সন্ধান পাইয়াছে।

* * *

কত ক্ষণ ধরিয়া এসব ভাবিতেছিলাম, কিছু খেয়াল ছিল না; ঘরের মধ্যে নিশীথের গল্পের একটি কথাও আমার কানে যায় নাই। যাওয়ার দরকারও ছিল না। কারণ সে কি বলিয়াছে আমি জানি।

সহসা নিশীথের গল্প থামিল, আমারও চিন্তাসূত্র ছিঁড়িয়া গেল। একটু অপ্রস্তুত ভাবে আলোচনায় যোগ দিতে চেষ্টা করিলাম।

নিশীথ গল্প শেষ করিয়া পকেট হইতে সিগারেট-কেস্ বাহির করিয়া সিগারেট ধরাইল।

খানিক ক্ষণ চুপচাপ কাটিল। তাহার পর নিখিল জিজ্ঞাসা করিল, "তার পরে আর তাকে পাওয়া যায় নি?"

"না।"

"আচ্ছা, সেদিন থেকে বারো বছর পর্যন্ত আপনার মাসী ত সধবা?"

"নিশ্চয়ই।"

বাহিরে রাত্রি হইয়াছে। কালো আকাশে একটিও তারা নাই। সকলে চুপ করিয়া বসিয়া আছি। মনে হইল সকলেই অন্ততঃ কিছু ক্ষণের জন্য এই দুর্ভাগিনী নারীর কথা না ভাবিয়া পারিবে না।

অন্ততঃ আমি পারিলাম না। মলিনার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথাই মনে পড়িয়া গেল। কলিকাতার এক জনবহুল পল্লীর একটি গলির মধ্যে একটি বাড়ি। দৈন্য চারি দিকে পরিস্ফুট। তবু একটি রাত্রিতে তাহাকে সাজাইবার জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছে। গুটি-কয়েক গ্যাসের আলোতে দৈন্য-দুর্দ্দশা আরও ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। দেওয়ালের চারিধারে ফাটল। বাড়ির লোকগুলিও বাড়ির মতনই নিরানন্দ।

তাহারই একটি ঘরে রোদনরতা কিশোরী।

তাহার পরে লোকজন লইয়া আলোয় চারিদিক ভরিয়া বাজনা বাজাইয়া কাহারা আসিয়া গলির বাহিরে বড় রাস্তায় থামিল।

কন্দর্পের মত রূপবান এক তরুণ।

এমনি আরও অনেক কথা মনে পড়ে। তাহার সহিত আরও একটা কথা মনে পড়ে, তাহা নিজের কৈশোর।

মনটা বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

বৃষ্টি ধরিয়া আসিতেছে। রাস্তার আলোর সামনে বৃষ্টির রেখা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। ভিজা মাটির গন্ধে মন আকুল হইয়া উঠিল। বিগতযৌবন দেহে বিগত-যৌবন মন লইয়া কোন্ বহু দূরবর্ত্তী দিবসের স্মৃতির স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম।

একটা ট্রাম রাস্তার মধ্যে ঘাসে-ঢাকা লাইন দিয়া বিশ্রী কর্কশ শব্দ করিয়া চলিয়া গেল, আমার অবান্তর অর্থহীন স্বপ্নকে চূর্ণ করিয়া। শুনিলাম, মনোরঞ্জন নিশীথকে বলিতেছে, "কিন্তু এর সঙ্গে ত ঝড়বৃষ্টির খুব বেশী সম্বন্ধ টের পাওয়া গেল না। আপনি ত ঝড় নিয়েই গল্প সুরু করেছিলেন!"

"সুরু করেছিলাম, শেষ ত এখনও করি নি।"

"আরও আছে নাকি?"

"আছে বইকি! বাকীটা এইবারে শুনুন।

"মেসোমশায় নিরুদ্দেশ হওয়ার বছরখানেক পরে আমি ট্রামে যাচ্ছিলাম এস্‌প্লানেডের দিকে। পথে এল ঝড়। ধুলোয় চারিদিক ভরে গেল। আমাদের প্রায় অন্ধ ক'রে দিয়ে তার পরে বৃষ্টি নামল। সে বৈশাখে সেই প্রথম ঝড়। প্রথম বৃষ্টি। ট্রামে থাকতে পারলাম না, নেমে পড়লাম।

"ময়দানের ধারে একটা গাছের ডাল ঝড়ে ভেঙে পড়েছে। কাছে এগিয়ে দেখি তলায় একটা মানুষের দেহ। জনকয়েক লোক ডাল সরিয়ে যখন লোকটাকে বার করল, ততক্ষণে তার হয়ে গেছে। একটা কঙ্কালসার দেহ, দাড়ি গোঁফে আচ্ছন্ন মুখ, পরণে অতিছিন্ন ন্যাকড়া। কিন্তু আমি তাকে দেখে চিনেছিলাম, সে আমার নিরুদ্দিষ্ট মেসোমশায়।"

ঠিক এটা কেহই প্রত্যাশা করি নাই, খানিক ক্ষণ কেহই কথা কহিতে পারিলাম না। তাহার পরে পরেশ

কহিল, "তার মানে আপনি এতদিন তার মৃত্যু লুকিয়ে রেখে আপনার মাসীকে সধবা সাজিয়ে রেখেছেন?"

"ঠিক। আমাদের দেশে সধবা আর বিধবার জীবন-যাত্রার আকাশ-পাতাল তফাৎ। এগারো বছর ঐ রকম একটা জীবের সঙ্গে ঘর ক'রে তার পরে বৈধব্য একটা মুক্তি হ'ত সন্দেহ নেই, কিন্তু হিন্দুসমাজে সধবার অবস্থা যেমনই হোক না কেন, বিধবার চেয়ে কোটিগুণে ভাল।"

মনোরঞ্জন বলিল, "কিন্তু আপনি যখন সৎকারের বন্দোবস্ত করলেন তখন জানাজানি হয় নি?"

"হয়ত হ'ত, যদি আমি সে বন্দোবস্ত করতাম। কিন্তু পাছে অমনি একটা গোলযোগ বাধে, সেই ভয়ে সে বন্দোবস্ত আমি করি নি; সে সব কর্পোরেশনের ডোমে করেছে।"

পরেশ এইবার যথার্থই চটিয়া কহিল, "আপনার একজন আত্মীয়ের দেহ আপনি অসঙ্কোচে ডোমের হাতে ছেড়ে দিয়ে এলেন, একটুও বাধল না?"

"উপায় কি? মৃত্যুর দাবির চেয়ে আমার কাছে জীবনের দাবির মূল্য অনেক বেশী। সেই জন্যেই এরকম তথাকথিত অন্যায় করতে মোটেই সঙ্কোচ বোধ করি নি, দরকার হ'লে ভবিষ্যতেও করব না।"

শুধু আমি নিশীথের 'পরে চটিতে পারিলাম না। মনে হইল, সে আর যাহাই করিয়া থাক্, মনতোষের মৃত্যুর দিন হইতে এগারো বছরের জন্য মলিনাকে বৈধব্যের কৃচ্ছ্র হইতে বাঁচাইয়াছে। ন্যায়-অন্যায় এসব দিক দিয়া বিচার করিতে আমি কোনদিনই পারি না, আজও পারিলাম না। কিন্তু আজ সহসা নিশীথ এত কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল কেন?

এই কথাটিই বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল একটু রূঢ় ভাবে। কহিল, "আপনার ফিলসফিকে ধন্যবাদ। কিন্তু এতদিন লুকিয়ে রেখে আজ হঠাৎ এতবড় গোপন কথাটা প্রকাশ করে ফেললেন, তার কারণ?"

নিশীথ ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাইয়া একবার হাসিল। পরে কহিল, "তার কারণ আজ ঠিক বারো বছর আগে মেসো শেষবারের মত নিরুদ্দেশ হন; সকালবেলা দেখে এসেছি মাসীকে শাড়ী ছাড়িয়ে থান পরানো হয়েছে।"

বলিয়া নিশীথ আর একবার হাসিল।

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে নারীর স্থান

শ্রীমনোরমা বসু, এম্-এ

১৯৩৫ সালের আইন

ভারতবর্ষে শীঘ্রই নূতন শাসন-ব্যবস্থার প্রচলন হইবে। এই শাসন-ব্যবস্থায় মেয়েদের অধিকার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। এই নূতন শাসনতন্ত্র প্রস্তুত হইতে সাত বৎসরেরও অধিক সময় লাগিয়াছে। ইংরেজী ১৯২৭ সালের শীতকালে সাইমন-কমিশন্ ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভারতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া পুরাতন শাসন-ব্যবস্থার কোন উন্নতি করা যায় কিনা, এ-বিষয়ে মতামত প্রকাশ করাই এই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর ভারতবর্ষে ও তাহার বাহিরে নানা স্থানে শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে অনেক আন্দোলন হইয়াছে। ভারতবাসী আজ রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে—নিজের অধিকার সে দাবি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে আরও অনেক কমিশন ও কন্‌ফারেন্স আহূত হয়। কমিশনগুলির কাজ শেষ হইয়াছে। ভারত-সংস্কার-বিল পাস হইয়া আইনে পরিণত হইয়াছে। আমাদের অধিকার ও শাসন-ব্যবস্থা এই আইন অনুসারেই নির্দ্দিষ্ট হইবে।

বর্ত্তমান আইনের পূর্ব্বে মেয়েদের কি অধিকার ছিল

নূতন আইনে আমাদের যে-সকল অধিকার প্রদত্ত

হইবে তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের পূর্ব্বের অবস্থার কথা জানা আবশ্যক।

১৯১৯ সালের শাসন-সংস্কার আইন অনুসারে ভারতবর্ষ শাসিত হইতেছিল। ভোটের সাহায্যে নির্ব্বাচনের প্রথা ১৮৯২ সালেই সর্ব্বপ্রথম ভারতে প্রচলিত হয়। সে সময়ে ভোট দিবার অধিকার অতি সামান্যই ছিল, কাজেই ভোটাধিকারীর সংখ্যা অতি অল্প ছিল। ১৯১৭ সালে যে-কমিশন বসিয়াছিল, ভোটদাতার সংখ্যা আরও অধিক হওয়া আবশ্যক ইহাই তাঁহারা বিশেষ ভাবে বলিয়াছিলেন। কিন্তু এ-বিষয়ে বিশেষ কিছুই করা হয় নাই। সেই জন্যই মোট লোকসংখ্যার শতকরা তিন জন মাত্র এত দিন ভোট দিতে পারিত। পুরুষই হউন বা মেয়েই হউন—এক নির্দ্দিষ্ট আয়ের সম্পত্তি যাঁহাদের আছে, তাঁহাদেরই ভোট দিবার অধিকার ছিল। এ বিষয়ে মেয়ে ও পুরুষে কোন অধিকার-ভেদ না থাকিলেও ভোটদাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। সমগ্র ভারতবর্ষে কেবলমাত্র তিন শত পনর হাজার মেয়ে ভোট দিতে পারিতেন। ভোট দিবার অধিকার প্রধানতঃ সম্পত্তি-গত বলিয়া এবং আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে ঐরূপ সম্পত্তির মালিক অতি অল্পসংখ্যক বলিয়াই এত কম মেয়ে ভোট দিতে পারিতেন।

নূতন শাসন-সংস্কার আইন অনুসারে মেয়েদের কি অধিকার

ভারতের নূতন শাসন-ব্যবস্থায় মেয়েদের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য রকম হইয়াছে। নূতন আইনে সম্পত্তির মালিক হওয়া ব্যতীত আরও অন্যান্য উপায়ে ভোট দিবার যোগ্যতা নিরূপিত হইবে। যে নির্দ্দিষ্ট আয়ের সম্পত্তির মালিক হইলে ভোটের অধিকার পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণও অনেক কমানো হইয়াছে। কোন পুরুষ বা মেয়ে অন্যূন ছয় আনার চৌকিদারী ট্যাক্স বা ইউনিয়ান বোর্ডের ট্যাক্স অথবা অন্যূন আট আনা সেস্ বা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স্ বা ইনকাম ট্যাক্স্ দিতে পারিলেই ভোটের অধিকার পাইবেন। ইহাতে গ্রামবাসী ও গরিব যাহারা তাহাদের অনেকেরই ভোট দিবার ক্ষমতা হইবে। সম্পত্তির মালিকের স্ত্রীও ভোটের অধিকার পাইবেন। সম্পত্তির মালিক মৃত হইলেও তাঁহার বিধবা স্ত্রীর ভোটের অধিকার থাকিবে। ভোট-দাত্রীর সংখ্যা বাড়ানোই এই সকল ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

শিক্ষিতা মেয়েদের অধিকার

বাংলা দেশে ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষা কিংবা গবর্ন্মেণ্টের অনুমোদিত অনুরূপ কোন পরীক্ষা পাস করিলে যে-কোন একুশ বছর বা তাহার অধিক বয়সের মেয়ে ভোটের অধিকার পাইবেন। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় পরীক্ষা পাস করিয়া যাঁহারা ভোটের অধিকার পাইবেন তাঁহাদের সংখ্যা নগণ্য না হইলেও খুবই অল্প হইবে। লিখিতে পড়িতে পারিলেই ভোট দিবার যাহাতে অধিকার হয় তাহার জন্য আন্দোলন করা হইয়াছিল। মেয়েদের নানা সংঘ ও সমিতি একত্র হইয়া গবর্ন্মেণ্টের নিকট এ-বিষয়ে আবেদন করিয়াছিলেন। ভারত-সচিবকেও তারযোগে মেয়েদের এই অভিপ্রায় জানান হইয়াছিল। ফলে নূতন আইনানুসারে দ্বিতীয় বার যখন ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইবে সেই সময়ে বাংলা দেশেও মেয়েরা লিখিতে পড়িতে জানিলেই ভোট দিতে পারিবেন।

মেয়ে-ভোটারের সংখ্যা বাড়াইবার উপায়

মেয়েদের মধ্যে ভোটারের সংখ্যা বাড়িলে, শাসন-ব্যবস্থায় মেয়েদের মতামত কার্য্যকরী হইবে সন্দেহ নাই। সুতরাং মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারই এখন আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। মেয়েদের মধ্যে ভোটারের সংখ্যা বাড়াইতে ও দেশের শাসন-ব্যবস্থায় মেয়েদের প্রভাব রাখিতে, মেয়েদের লেখা-পড়া শেখানোই একমাত্র উপায়। প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক মেয়েরই ভোটের অধিকার আমরা প্রথমে চাহিয়াছিলাম কিন্তু এই ব্যবস্থা করিতে অনেক অসুবিধা আছে—এই অজুহাতে প্রস্তাবটি অসম্ভব বলা হইয়াছে। প্রাপ্তবয়স্ক সকল মেয়ে ভোটের অধিকার পাইলে ভোটদাত্রীর সংখ্যা কয়েক হাজারের পরিবর্ত্তে বহু লক্ষ হইবে। এত অধিক-সংখ্যক ভোটার হইলে সুব্যবস্থা করা অসম্ভব হইবে, বলা হইয়াছে। অনেক যুক্তিতর্কের পরেও গবর্ন্মেণ্টের এই মত পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি যে সুবিধাটুকু আমরা পাইয়াছি তাহাতে কেবল লিখিতে পড়িতে শিখাইলে প্রাপ্তবয়স্ক সকল মেয়েই ভোট দিতে পারিবে। সুতরাং

প্রাপ্তবয়স্ক সকল মেয়ের ভোটের অধিকার থাকা বা না-থাকা আমাদের উপরই নির্ভর করিতেছে। আমাদের সঙ্কল্প করা উচিত যে আমাদের নিরক্ষর ভগিনীগণকে লেখাপড়া শিখাইতে আমরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে কিছু-না-কিছু করিব। শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা ও সেজন্য অর্থসংগ্রহ ইত্যাদি শিক্ষাবিস্তারের নানা কাজে সাহায্য করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। অন্তরে গভীর সঙ্কল্প লইয়া কাজ করিলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমাদের দেশের সকল মেয়েরই ভোটের অধিকার জন্মিবে ইহা নিশ্চিতভাবে আশা করিতে পারি।

নূতন শাসনতন্ত্রে ভোটারের সংখ্যা

যে-সকল উপায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছি তদনুসারে ভোট দিবার যোগ্যতা নির্দ্ধারিত হইলে ভোটারের সংখ্যা ৭০ লক্ষ হইতে বাড়িয়া সাড়ে তিন কোটি হইবে। এই সাড়ে তিন কোটির মধ্যে যাট লক্ষ মেয়ে। মেয়েদের মধ্যে ভোটারের সংখ্যা তিন শত পনর হাজার হইতে বাড়িয়া যাট লক্ষ হইবে। সমগ্র লোকসংখ্যা ধরিলে শতকরা তিন জনের পরিবর্ত্তে এখন শতকরা চোদ্দ জন ভোটের অধিকার পাইবে। এই সংখ্যাও অতি অল্প—ইহা বাড়াইবার জন্য আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। দেশের শাসন-ব্যবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর অধিকার না থাকিলে কোনও গবর্ন্মেণ্টই প্রতিনিধিমূলক হইতে পারে না।

মেয়েদের ভোটের আবশ্যকতা

মেয়েদের ভোট ও ভোট দিবার যোগ্যতা সম্বন্ধে এতক্ষণ আলোচনা করিলাম। কিন্তু কেন মেয়েদের ভোট দেওয়া উচিত এই গুরুতর বিষয়ের কোন উল্লেখই করি নাই। মেয়েদের ভোটের আবশ্যকতা সম্বন্ধে এখন সামান্য কিছু বলিব।

দেশের গবর্ন্মেণ্টে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিরই সাক্ষাৎভাবে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার আশা করা যায় না। সেকালে গ্রীসের নগরগুলিতে হয়ত ইহা সম্ভব ছিল, কিন্তু এখন ইহা অসম্ভব। দেশগুলি এখন বহুবিস্তৃত—তাহাদের লোকসংখ্যা এত অধিক যে কোন প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনার জন্য সকলের এক জায়গায় সমবেত হওয়া সম্ভব নহে। গ্রীসের নগরগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র ছিল, সুতরাং সকল নাগরিকেরই আলোচনায় যোগ দিবার কোন অসুবিধা ছিল না। বর্ত্তমান কালে দেশের সকল ভোটাধিকারীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে, এবং এই এক এক বিভাগের ভোটাধিকারীকে এক-একটি নির্ব্বাচক-মণ্ডল (constituency) বলে। প্রত্যেক নির্ব্বাচক-মণ্ডল হইতে কাউন্সিল অথবা ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক নির্ব্বাচক-মণ্ডলের লোকেরাই নিজেদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নিজের নির্ব্বাচকদিগের নিকট একটা দায়িত্ব আছে। যখনই কোন বিষয়ের আলোচনা হয়, নিজের নির্ব্বাচকদের সুবিধা-অসুবিধার কথা সর্ব্বদাই তাহার মনে জাগরূক থাকে। নিজের নির্ব্বাচকদের প্রতি কর্ত্তব্য অবহেলা করিলে ভবিষ্যতে তাহার পুনর্নির্ব্বাচিত না হইবার আশঙ্কা থাকে। এই জন্যই বলিতেছি মেয়েদের ভোট দেওয়া প্রয়োজন। ভোটদাত্রীর সংখ্যা যত বেশী হইবে প্রতিনিধিদিগের উপর মেয়েদের প্রভাব তত অধিক হইবে। এই প্রতিনিধিদিগের মধ্যস্থতায় দেশের শাসনতন্ত্রে মেয়েদের প্রভাব পরোক্ষভাবে থাকিবে।

ব্যবস্থাপক সভার কি কর্ত্তব্য

ব্যবস্থাপক সভা (Legislature) আইন প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যে-কোন দেশের গবর্ন্মেণ্টে ব্যবস্থাপক সভাই প্রধানতম প্রতিষ্ঠান। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ এই সভায় একত্র বসিয়া বর্ত্তমান সময়ের প্রধান প্রধান বিষয়গুলির আলোচনা ও মীমাংসা করিয়া থাকেন।

বাংলা দেশের ব্যবস্থাপক সভা

বাংলা দেশের আইন প্রণয়নের ভার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার উপর। বাংলা দেশকে কতকগুলি নির্ব্বাচকমণ্ডলীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

এ পর্য্যন্ত বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় কোন নারীই সভ্য নির্ব্বাচিত হন নাই। নির্ব্বাচিত না হইবার কারণ ইহা নহে

যে মেয়েদের সভ্য হইবার নিয়ম নাই বা যোগ্যতা নাই। প্রকৃতপক্ষে এরূপ কোন বাধা নাই। মেয়েদের মধ্যে ভোটারের সংখ্যা কম বলিয়াই এইরূপ সম্ভব হইয়াছে। বাংলার নূতন ব্যবস্থাপক সভায় অবস্থা অন্য রকম হইবে। নূতন আইন অনুসারে বঙ্গদেশে দুইটি ব্যবস্থাপক সভা থাকিবে—একটি উচ্চ কক্ষ (Upper House) ও একটি নিম্ন কক্ষ (Lower House বা বেঙ্গল লেজিসলেটিভ আসেম্বলী)। কোন বিল আইনে পরিণত করিতে হইলে এই দুই সভারই অনুমোদন প্রয়োজন। নিম্নকক্ষে মেয়েদের জন্য পাঁচটি সীট্ বা সভ্যপদ স্বতন্ত্র ভাবে রাখা হইয়াছে, কিন্তু মেয়েরা সাধারণ সীট্‌গুলির জন্য পুরুষদিগের সহিত সমানভাবে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবেন। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভায় মেয়ে-সভ্যের সংখ্যা কখনও পাঁচের কম হইবে না, বরঞ্চ বেশীই হইতে পারে।

মেয়েদের মধ্যে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচকসমষ্টি

দুর্ভাগ্যবশতঃ পুরুষদের মত মেয়েদের মধ্যেও বিভিন্ন সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে। মেয়েদের এই পাঁচটি সীটের মধ্যে হিন্দুর জন্য দুইটি, মুসলমানের জন্য দুইটি ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের জন্য একটি ধার্য্য হইয়াছে। এক সম্প্রদায়ের ভোটাধিকারিগণ কেবল নিজের সম্প্রদায় হইতেই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন—অর্থাৎ হিন্দুরা হিন্দুর জন্য, মুসলমানেরা মুসলমানের জন্য ইত্যাদি ভোট দিবেন।

ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে এই পৃথক ব্যবস্থা পূর্ব্বের মতই চলিবে। ইহার বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ করিয়াও কোন ফল হয় নাই। আমাদিগকে এরূপ ভাবে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে আমরা চাহি নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ-বিষয়ে আমাদের বাছিয়া লইবার কিছুই ছিল না। এই একটি বিষয় কখনও আলোচিত হয় নাই—এই একটি বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই মন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন—সুতরাং আমাদের অন্য উপায় আর কিছুই ছিল না। পুরুষদের জন্য যে ব্যবস্থা প্রচলিত রহিল, মেয়েদের জন্য তাহার আর পরিবর্ত্তন হইল না।

সকল সম্প্রদায় একত্র মিলিয়া প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের দাবি পুরুষ ও নারী সকলে সমবেত ভাবে একদিন করিবে—ইহাই আমরা আশা করিয়া আছি। যত দিন তাহা না হইবে তত দিন পর্য্যন্ত আমরা যাহা পাইয়াছি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

ব্যবস্থাপক সভায় মেয়েদের প্রভাব

ভারতের নূতন ব্যবস্থাপক সভায় অনেক গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হইবে—অনেক আবশ্যক আইন পাস হইবে। এই সময় ব্যবস্থাপক সভায় মেয়েদের অধিকার কার্য্যকর ভাবে থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। আড়াই শত জন সাধারণ সভ্যের ভিতর পাঁচ জন মেয়ে সভ্য কি করিতে পারেন? পরোক্ষভাবে মেয়েদের প্রভাব আরও অধিক কাজে লাগিবে। ভোটদাত্রীর সংখ্যা অধিক হইলে পুরুষ-ভোটপ্রার্থীদিগকে নির্ব্বাচিত হইবার জন্য মেয়েদের শরণাপন্ন হইতে হইবে এবং তাহাদের ভোটের উপর কতকটা নির্ভর করিতে হইবে। কাজেই ভোট পাইবার আশায় মেয়েদের সুখ-সুবিধা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে তাহাদের মনোযোগ থাকিবে। এই কারণেই মেয়েদের মধ্যে ভোটারের সংখ্যা যতটা সম্ভব বাড়ানো উচিত।

দিল্লী ও সিমলার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা

কেবল বাংলা দেশের ব্যবস্থাপক সভাই যে বাংলা দেশের জন্য আইন প্রণয়ন করেন তাহা নহে। বাংলা দেশের যে-সকল আইনের সহিত সমগ্র ভারতবর্ষের কোন-না-কোন যোগ থাকে, দিল্লী ও সিমলার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় সেই আইনগুলি বিধিবদ্ধ হইয়া থাকে। বাংলা দেশকে এই আইনগুলি মানিতে হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাতেও দুইটি 'হাউস' আছে—একটি নিম্ন কক্ষ (Lower House বা লেজিসলেটিভ আসেম্বলী), অন্যটি উচ্চ কক্ষ (Upper House অথবা কাউন্সিল অব স্টেট)। এই দুই সভাতেই এখন কোনও মেয়ে সভ্য নাই। ভারতের নূতন শাসন-ব্যবস্থাতেও এইরূপ দুইটি সভা থাকিবে। নিম্নকক্ষকে ফেডারাল আসেম্বলী বলা হইবে। ইহাতে মেয়েদের জন্য নয়টি স্বতন্ত্র সীট বা সভ্য-পদ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। এই নয়টির মধ্যে একটি বাংলা দেশের জন্য ধার্য্য হইয়াছে।

ভারতের নূতন শাসন-ব্যবস্থায় উচ্চ কক্ষের নাম পূর্ব্বের ন্যায় কাউন্সিল অব ষ্টেটই থাকিবে। প্রথমে কাউন্সিল অব ষ্টেটে মেয়েদের জন্য কোনও সীটই রাখা হয় নাই। ভারতশাসন-সংস্কার বিলটি যখন হাউস্ অব কমন্সে আলোচিত হইতেছিল সেই সময় মেয়েদের জন্য কাউন্সিল অব ষ্টেটে স্বতন্ত্রভাবে ছয়টি সীট নির্দ্দিষ্ট রাখিবার জন্য এক নূতন প্রস্তাব গৃহীত ও অনুমোদিত হয়।

নারীর কর্ত্তব্য

ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় এই বিশেষ পরিবর্ত্তনের সময় ভারতের ভবিষ্যৎ আমাদের উপর অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। আমাদের একতা রহিয়াছে—ইহা আমাদের একটি বিশেষত্ব। ক্ষুদ্র কলহ ও সম্প্রদায় ভেদের ঊর্দ্ধে আমরা উঠিতে পারিয়াছি। জাতি সম্প্রদায় ধর্ম্ম বা মত আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই। এমন কি সাইমন-কমিশনও ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

"মেয়েদের সকল প্রচেষ্টা ভারতবর্ষের উন্নতির পথ খুলিয়া দিবে—ইঁহাদের দ্বারা দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। যত দিন মেয়েরা শিক্ষিত হইয়া নিজেদের দায়িত্ব গ্রহণ না করেন তত দিন জগৎ-সভায় ভারতবাসী তাহার ঈপ্সিত স্থানে পৌছিতে পারিবে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

সাইমন-কমিশন মেয়েদের সম্বন্ধে এই সকল কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন নাই। এই কারণেই বলিতে চাই, ভারতের নূতন শাসন-ব্যবস্থায় মেয়েদের কার্য্যকরী শক্তি নিতান্ত তুচ্ছ নহে এবং এ-কথা আমাদের সকলের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

নূতন শাসন-ব্যবস্থা আইন আমাদের মনোমত না হইলেও নিতান্ত তুচ্ছ করা উচিত নহে। যতটুকু অধিকার পাইয়াছি ততটুকু গ্রহণ করিয়া আমাদের প্রভাব বাড়াইয়া তোলা উচিত। এই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে একতা সংস্থাপন আমাদের হাতে। আমরা যখন নিশ্চিতভাবে বলিতে পারিব—

"নানা ভাষ, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান"

তখনই বুঝিব আমাদের কাজ সফল হইয়াছে, তখনই আমরা স্বায়ত্তশাসনলাভের চেষ্টা করিতে পারিব এবং

"দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান
জগজন মানিবে বিস্ময়।"

বঙ্গীয় শব্দ-কোষ *

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দীর্ঘ আটাশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষার একখানি সুবৃহৎ অভিধান সঙ্কলন কার্য্যে আত্ম-নিয়োজিত হইয়া আছেন। এই বইয়ের সঙ্কলন-কার্য্য এবং ছাপাইতে দিবার জন্য 'প্রেস্-কাপি' আজ কয় বৎসর হইল প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছিল। বিগত আট নয় বৎসর ধরিয়া শ্রীযুক্ত হরিচরণ পণ্ডিত মহাশয়ের আরব্ধ এই বিশেষ শ্রমসাধ্য কার্য্যের সহিত আমি পরিচিত। তিনি একটা বিরাট ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছেন। সঙ্কলনকার্য্য যখন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পূর্ণ জোরে চলিতেছে, তখন শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারের একটী প্রকোষ্ঠে পণ্ডিত-মহাশয়ের অভিধান প্রণয়ন কার্য্য দেখিতাম। দিনের পর দিন, অধ্যাপনার কার্য্য হইতে যেটুকু ছুটী তিনি পাইয়াছেন, অমনিই তাঁহার অভিধানের ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। ছোট বড় নানা অভিধানে ভরা একখানি তক্তপোষ,—কেবল বাঙ্গালার নহে, সমস্ত সংস্কৃত অভিধান, এবং পালি প্রাকৃত ফার্সী উর্দু হিন্দী মারহাট্টী গুজরাটী উড়িয়া ইংরেজী প্রভৃতি নানা ভাষার অভিধান; এতদ্ভিন্ন প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান পুস্তক, ও সংস্কৃত সাহিত্যের যাবতীয় প্রধান পুস্তক, তাঁহার অভিধানের উপাদান স্বরূপ নানা আলমারী ও শেলফে মজুদ রহিয়াছে। এই পুস্তকস্তূপের মধ্যে, অক্লান্তকর্ম্মা জ্ঞান-তপস্বী, দীর্ঘ-দেহ শীর্ণকায় এই ব্রাহ্মণ, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, আপন মনে তাঁহার সঙ্কলন কার্য্য করিয়া যাইতেছেন, নানা অভিধান হইতে ও বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক হইতে শব্দচয়ন ও প্রয়োগ উদ্ধার করিয়া লিখিয়া যাইতেছেন। কেহ আসিলে তাঁহার সহিত আলাপ জমাইবার তাঁহার সময়ও নাই, প্রবৃত্তিও নাই—তাঁহার অমায়িক সরল হাস্যের সহিত কার্য্যের সঙ্গে-সঙ্গেই দুই-চারিটী বাক্য বিনিময় করিয়া লইতেছেন। এই দৃশ্য বাস্তবিকই আমার চিত্তকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিত। মাতৃ-ভাষা ও দেবভাষা, এই উভয়ের প্রতি গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা লইয়া, এবং উভয় ভাষার সাহিত্যের সহিত অনন্যসাধারণ প্রগাঢ় পরিচয়-মাত্রকে সম্বল করিয়া, তিনি এক সহায়-সম্বল-হীন অবস্থায় নিজের

* শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা ৯ নম্বর বিশ্বকোষ লেন বিশ্বকোষ মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত, ও বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত। আকার ১১½"×৯"। প্রথম হইতে দশম খণ্ড পর্য্যন্ত মুদ্রিত। প্রতি খণ্ড ৪ ফর্ম্মা — ৩২ পৃষ্ঠা, দশ খণ্ডে ৩১২ পৃষ্ঠা—"অ—আওয়াজ" পর্য্যন্ত। প্রতি খণ্ডের মূল্য ॥০, ডাকমাশুল /০, ত্রৈমাসিক মূল্য ১॥/০, ষাণ্মাসিক ৩।৶০, বার্ষিক ৬৶০। শান্তি-নিকেতন ডাকঘর, জিলা বীরভূম, সঙ্কলনকর্ত্তার নিকট প্রাপ্তব্য।

উদ্যম ও মাতৃভাষার সেবার আদর্শকে ভেলা রূপে গ্রহণ করিয়া দুস্তর শব্দসাগর পার হইবার জন্য অবতরণ করিয়াছিলেন। এত-দিনের পরিশ্রমে তাঁহার গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, তাঁহার সাধনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই বই সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইলে, ইহা বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টকলেবর অভিধান হইবে। পুস্তক যতই সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইতেছিল, ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশনের চিন্তাও পণ্ডিত-মহাশয়কে ততই উৎকণ্ঠিত করিতেছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই সময়ে এরূপ বিরাট্ কার্য্যের জন্য উপযুক্ত বিদ্যোৎসাহী দাতা পাওয়া গেল না। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বিশ্বভারতী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি তাবৎ শিক্ষা ও অনুশীলন পরিষদের নিতান্ত অর্থাভাব; প্রস্তুত অভিধানের মত গুরুতর কার্য্য গ্রহণ করা বাঙ্গালার কোনও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সম্ভব হইল না। এবং এই আর্থিক দুরবস্থার দিনে সরকারী সাহায্য লাভও দুরাশার কথা। এই অবস্থায় পণ্ডিত মহাশয়ের প্রায় সমগ্র জীবনের পরিশ্রমের ফল অমুদ্রিত ও অপ্রচারিত থাকিয়া নষ্ট হইয়া যাইবারই আশঙ্কা তাঁহাকে ও তাঁহার বন্ধুগণকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। কিন্তু যে উদ্যমের ফলে পণ্ডিত মহাশয় এই অভিধানখানি সঙ্কলন করেন, সে উদ্যম এখনও অটুট আছে। অতঃপর অনন্যোপায় হইয়া তিনি স্বয়ং এই পুস্তক ছাপাইবার কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার ধনবল নাই—তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মাত্র। জীবনে যাহা কিছু আর্থিক সংগ্রহ তিনি করিয়াছেন তাহা দিয়াই ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া তিনি মুদ্রণ-কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, যদি তাঁহার বইয়ে লোকের—বঙ্গভাষী জনগণের—উপকারের কিছু থাকে, তাহা হইলে এই পথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই, মুদ্রিত কিয়দংশ দেখিয়া "সুধী গ্রাহকগণের অনুকম্পা ও বিদ্যোৎসাহী ধনিজনের পৃষ্ঠপোষকতা" প্রাপ্তি পুস্তকের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে, এবং ধীরে ধীরে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইবে।

আমি এই গ্রন্থ দেখিয়াছি। কোনও কোনও অংশ বেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছি। এক সময়ে এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল যে বিশ্ব-ভারতী হইতে এই পুস্তক প্রকাশিত হইবে, এবং রবীন্দ্রনাথের অনুমোদিত একটী সম্পাদক-সঙ্ঘ শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সাহায্য করিবেন, এই সম্পাদক-সঙ্ঘে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম এবং বর্ত্তমান সমালোচকের নামও প্রস্তাবিত হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের নিজ নিজ কার্য্যভার নিবন্ধন এরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর হইল না। এই প্রস্তাব সম্পর্কে শাস্ত্রী মহাশয় ও পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত অভিধান সম্পর্কে আমার বহু আলাপ হয়, অভিধানের কতক অংশ আমার দেখিবারও সুযোগ ঘটে।

উপস্থিত বাঙ্গালা ভাষা যে ভাবে সংস্কৃতের আশ্রয়ে পুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে বলা চলে যে যে কোনও সংস্কৃত শব্দ সম্ভাব্য বা ভবিষ্যৎ বাঙ্গালা শব্দ—আবশ্যক হইলেই বাঙ্গালা ভাষা তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে, আত্মসাৎ করিতে পারে। সংস্কৃত শব্দ-ভাণ্ডারের দ্বার বাঙ্গালার জন্য সদা উন্মুক্ত রহিয়াছে, এবং সংস্কৃত ভাষা ধাতু ও প্রত্যয় দ্বারা নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালা ভাষার অভাব পূর্ণ করিবার জন্য সদা প্রস্তুত আছে। সংস্কৃত ও বাঙ্গালার এই সম্পর্ক বিচার করিয়া, সঙ্কলয়িতার ইচ্ছা ছিল—একাধারে তিনি এক খানি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষার সম্পূর্ণ অভিধান প্রস্তুত করিবেন। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ পরামর্শদাতার উপদেশে ও অনুরোধে সে সঙ্কল্প তিনি ত্যাগ করিয়া, বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ বর্জ্জন করিয়াছেন। শব্দ সংগ্রহ বিষয়ে তবে এই অভিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য—ইহাতে বাঙ্গালা ভাষায় আগত বোধ হয় তাবৎ সংস্কৃত শব্দ পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাই বলিয়া এই অভিধান একদেশদর্শী নহে—মাত্র বাঙ্গালা-ভাষায় আগত সংস্কৃত শব্দের সংগ্রহ নহে। খাঁটী বাঙ্গালা—প্রাকৃতজ ও অর্দ্ধতৎসম—শব্দ যতদূর সম্ভব ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালায় যে সমস্ত বিদেশী শব্দ গৃহীত হইয়াছে, সেগুলিও যথাযোগ্য সমাদরের সহিত এই অভিধানে স্থান লাভ করিয়াছে। অসংস্কৃত শব্দের সংখ্যা অন্য অভিধানের তুলনায় যথেষ্ট অধিক হইবে, কারণ এই অভিধান-খানি বাঙ্গালা ভাষার অন্তিম অভিধান বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভি-ধানের সাহায্য ইহা পাইয়াছে, এবং তদতিরিক্ত সঙ্কলয়িতার নিজের আহৃত নূতন অসংস্কৃত শব্দও ইহাতে আছে।

এই সম্পর্কে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিধান সমালোচনা করিয়া, "চলন্তিকা" অভিধানের সঙ্কলয়িতা, ব্যঙ্গ রচনায় সিদ্ধহস্ত "গড্ডলিকা" ও "কজ্জলী"র গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা খুবই সমীচীন, এবং পুনরুদ্ধার করিয়া দিবার যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—"কেহই শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় বিরাট কোষগ্রন্থ সঙ্কলনের প্রয়াস করেন নাই। 'বঙ্গীয় শব্দকোষে' প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃতের শব্দ (তদ্ভব দেশজ বৈদেশিক প্রভৃতি) প্রচুর আছে। কিন্তু সঙ্কলয়িতার পক্ষপাত নাই, তিনি বাংলা ভাষায় প্রচলিত ও প্রয়োগ-যোগ্য বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের সংগ্রহে ও বিবৃতিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নাই। যেমন সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন, তেমনি অ-সংস্কৃত শব্দের উৎপত্তি যথাসম্ভব দেখাইয়াছেন। এই সম-দর্শিতার ফলে তাঁহার গ্রন্থ যেমন মুখ্যতঃ বাংলা সাহিত্যের প্রয়োজনসাধক হইয়াছে, তেমনি গৌণতঃ সংস্কৃত সাহিত্য চর্চ্চারও সহায়ক হইয়াছে।...সংস্কৃত মৃতভাষা, কিন্তু গ্রীক লাটিনের তুল্য মৃত নয়।...ভাগ্যবতী বঙ্গভাষা সংস্কৃত শব্দের অক্ষয় ভাণ্ডারের উত্তরাধি-কারিণী, এবং এই বিপুল সম্পৎ ভোগ করিবার সামর্থ্যও বঙ্গভাষার প্রকৃতিগত। আমাদের ভাষা যতই স্বাধীন স্বচ্ছন্দ হউক, খাঁটি বাংলা শব্দের যতই বৈচিত্র্য ও ব্যঞ্জনা শক্তি থাকুক, বাংলা ভাষার লেখককে পদে পদে সংস্কৃত ভাষার শরণ লইতে হয়। কেবল নূতন শব্দের প্রয়োজনে নয়, সুপ্রচলিত শব্দের অর্থ প্রসার করি-বার নিমিত্তও। অতএব বাংলা অভিধানে যত বেশী সংস্কৃত শব্দের বিবৃতি পাওয়া যায় ততই বাংলা সাহিত্যের উপকার। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মহোপকার করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত শব্দের বাংলা প্রয়োগ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সংস্কৃত সাহিত্য হইতে রাশি রাশি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়াছেন। এই বিশাল কোষ-গ্রন্থে যে শব্দসম্ভার ও অর্থবৈচিত্র্য রহিয়াছে তাহাতে কেবল বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা সুগম হইবে এমন নয়, ভবিষ্যৎ সাহিত্যও সমৃদ্ধিলাভ করিবে।"

শব্দগুলি এইভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রথম, শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া বিশেষ গোল নাই—পূর্ব্বাচার্য্যগণের পথ অনুসরণ করিয়া শব্দসাধন প্রদর্শিত হইয়াছে। বিদেশী শব্দাবলীরও মূল বা ব্যুৎপত্তি সুপরিচিত, কিন্তু প্রাকৃতজ বহু শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় অনেক স্থলে বিশেষ কঠিন ব্যাপার। এ বিষয়ে অল্পবিস্তর মতভেদ উপস্থিত অবস্থায় থাকিবেই। তবে মোটের উপর, শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে ভাবে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সাধারণতঃ তাহা ভাষাতত্ত্বানুমোদিত রীতিতেই করিয়াছেন।

ব্যুৎপত্তি-নির্দ্দেশের পর অর্থ-নির্ণয়। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক ক্রম

অনুসৃত হইয়াছে। প্রথমে মৌলিক বা ধাতুগত অর্থ, তদনন্তর পর পর শব্দটীর অর্থঘটিত বিকাশ যেমন হইয়াছে, এক দুই তিন ইত্যাদি ক্রমে তদ্রূপ অর্থ-প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রত্যেক অর্থের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সর্ব্বত্র বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে এবং বহু স্থলে সংস্কৃত সাহিত্য হইতে প্রয়োগ উদ্ধার করিয়া দেখান হইয়াছে। এইখানেই সঙ্কলয়িতার কৃতিত্ব পদে পদে দেখা যায়। প্রয়োগের উপযোগিতা দেখিয়া তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়।

মূল শব্দের অর্থ ও প্রয়োগের পরে আছে, সেই শব্দকে আদি করিয়া সমস্ত পদ, এবং idiom বা বাক্য-ভঙ্গী। এখানেও প্রয়োগ-প্রদর্শন বিষয়ে কার্পণ্য করা হয় নাই।

মোটের উপরে, এরূপ অভিধান বাঙ্গালা ভাষায় ইতিপূর্ব্বে বাহির হয় নাই। এতাবৎ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধান বলিয়া পরিগণিত ছিল। এই অভিধানের শব্দসংখ্যা ৭৫,০০০। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিধানের শব্দ-সংখ্যা নিঃসন্দেহরূপে আরও অনেক অধিক হইবে। শব্দের অর্থ-বিচার ও প্রয়োগ-প্রদর্শনে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র বাবু বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োগ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, এবং সংস্কৃত শব্দাবলীর পূর্ণ আলোচনার জন্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিধান সাহিত্যিক ও শিক্ষার্থীর পক্ষে অপরিহার্য্য হইবে। দাস মহাশয়ের অভিধান এখন আর ছাপা নাই, তবে ইহার নূতন সংস্করণ প্রস্তুত হইতেছে। ইহার পুনঃ প্রকাশ হইলে, শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিধান, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের অভিধান এবং শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' বাঙ্গালা ভাষার যথাক্রমে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বৃহৎ, মধ্যম ও লঘু অভিধান বলিয়া পরিগণিত হইবে।

নানা কারণে, দেখা যাইতেছে আমাদের দেশে team work বা যৌথ-ভাবে চর্য্যা সম্ভবপর হইতেছে না। যে ভাবে ইংরেজ জাতির সমস্ত পণ্ডিতগণ মিলিয়া Oxford Dictionary তৈয়ারী করিয়া তুলিয়াছেন, সে ভাবে কোনও কাজ ইদানীং বঙ্গদেশে হয় নাই। বিশেষতঃ অভিধানের কাজ। কোনও প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী প্রতিষ্ঠান পিছনে না থাকিলে, এবং প্রচুর অর্থের ব্যবস্থা না হইলে সমবেত ভাবে পণ্ডিত-পরিষৎ কর্ত্তৃক এইরূপ কাজ সমাধা করা সম্ভবপর হয় না। আমাদের দেশে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বা বিশ্বভারতীর সমাদর আছে, কিন্তু শক্তি নাই—অর্থবল নাই। কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভার চেষ্টায় হিন্দী ভাষার যে বিরাট কোষগ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে, তদ্রূপ বিরাট কোষগ্রন্থের ভার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ লইতে পারিলেন না।

শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যে অদম্য সাহস ও শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় তাপসমনোবৃত্তিযুক্ত জ্ঞানের সাধকের উপযুক্ত। ইতিপূর্ব্বে আর এক জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এইরূপ বিরাট কার্য্যে হাত দিয়াছিলেন, এবং নিজ চেষ্টায় তাহা সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির বিরাট 'বাচস্পত্য অভিধান'-এর কথা স্বতঃ মনে হয়। আর এক জন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ সহ একটী নূতন সংস্করণ সম্পাদন ও প্রকাশের কার্য্যে একাকী নামিয়াছেন—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়, ইঁহার কৃতি সম্বন্ধে "প্রবাসী" পত্রে পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে (১৩৩৬, চৈত্র)। অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ পণ্ডিত ডাক্তার সামুয়েল জনসনও মাতৃভাষার অভিধান একা সম্পাদন ও মুদ্রণ করেন—ধনী লোকের পৃষ্ঠপোষকতা চেষ্টা করিয়া না পাইয়া, তিনি বীরের মত স্বয়ং এই কাজে অবতীর্ণ হন। পণ্ডিত মহাশয়ের উৎসাহ ও শ্রমশীলতা, এবং অনেক কার্য্যের পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে আশা ও আস্থা দেখিয়া তাঁহাকে সহস্র সাধুবাদ দিতে হয়—মনে হয়, দেশবাসিগণের সম্যক্ সম্পূর্ণরূপে পরিচিত না হইলেও, এই অলস ও নিরুৎসাহ, আরামপ্রিয় এবং অদৃষ্টবাদী জাতির মধ্যে তিনি একজন পুরুষসিংহ। ইঁহার সাহায্য করিতে পারা সৌভাগ্যের বিষয়।

এই সাহায্য প্রত্যেক বাঙ্গালীর যথাশক্তি করা উচিত। কেবল এই বৃহৎ বাঙ্গালা অভিধান প্রত্যেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে থাকা দরকার। বাঙ্গালা দেশে বারো শত ইস্কুল আছে; বছরে ছয় টাকা বা মাসে আট আনা—প্রতি মাসে নয় আনা—খরচ করিয়া এই বইয়ের এক গ্রাহক হওয়া প্রত্যেক ইস্কুলের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। তদ্ভিন্ন অনেকগুলি কলেজ আছে, সাধারণ পাঠাগার আছে, এবং বড়লোক ও মধ্যবিত্ত লোকের নিজ নিজ পুস্তকশালা আছে। এই আশা লইয়া এই জাতীয় অনুষ্ঠানে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নামিয়াছেন, সে আশা কি পূর্ণ হইবে না? বাঙ্গালী তাহার মাতৃভাষার বৃহত্তম অভিধানের জন্য এই সামান্য ব্যয়টুকু স্বীকার করিবে না? আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব যদি আমরা প্রত্যেকেই বুঝি, তাহা হইলে কাজটা সহজেই হইয়া যায়। যথাসম্ভব শীঘ্র সারা বাঙ্গালা দেশ হইতে "বঙ্গীয় শব্দকোষ"-এর এক হাজার গ্রাহক হউক, এই কামনা করিয়া, এই অভিধানের সঙ্কলয়িতাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা-নমস্কার জানাইয়া, অভিধানের পরিচয় প্রসঙ্গ উপস্থিত ক্ষেত্রে সমাপ্ত করিতেছি।

নদীশাসন ও সংস্কার

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

বাংলায় যুগের পর যুগ ধরিয়া নদনদীর উত্থান-পতনের সঙ্গে কত না রাজ্য, নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্রের উন্নতি অবনতি নিবিড় ভাবে জড়িত। বাংলার পাঁচ ভাগের দুই ভাগে নদনদীগুলি ব-প্রদেশ গড়িয়া তুলিয়া এখন ক্ষীণ, মৃতপ্রায়। ইহার সঙ্গে কৃষির অবনতি, জঙ্গলবৃদ্ধি ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ মিলিয়া এমন একটা পল্লীজীবনের দ্রুত অবনতির সূচনা করিয়াছে যাহা সমগ্র পৃথিবীতেও বিরল। এক শতাব্দীর মধ্যেই জনবহুল সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার কেন্দ্রগুলি বনজঙ্গলে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

বাংলার নদীর ইতিহাস কত বিধ্বস্ত, লুপ্তপ্রায় রাজধানী ও নগরীর ইতিহাস। তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম, গৌড়, রামপাল, সোনারগাঁ, সবই নদীর কীর্ত্তিনাশের সাক্ষ্য দিতেছে। দক্ষিণ, মধ্য ও পশ্চিম বাংলা মধ্যযুগের সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। বর্ত্তমান যুগে বাংলার এই কয়েকটি অংশই ক্ষয়িষ্ণু।

প্রাচীন যুগে রূপনারায়ণ ও রসুলপুর এবং মধ্যযুগে ভৈরব ও সরস্বতী বাংলার বিচিত্র শস্য ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি সামুদ্রিক বন্দরে বহন করিয়া আনিত। তাহার পর ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভাগীরথী সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই পদ্মার পূর্ব্ব প্রবাহ বৃদ্ধি ভাগীরথীর গতিহ্রাসের কারণ। পদ্মার এই পূর্ব্ব গতির মূলে কুশি নদীর পশ্চিম প্রবাহ ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের স্বাভাবিক জলসরবরাহের বিপর্যয় এবং ছোটনাগপুর অঞ্চলে অরণ্যবিনাশহেতু ভাগীরথীর পশ্চিম শাখানদীগুলির গতিহ্রাস ও গতিপরিবর্ত্তন। ভাগীরথী ইহাতে ক্ষীণতোয়া হওয়াতে পদ্মার পূর্ব্বপ্রবাহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যুক্ত ব-প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে একটা ভূমি অবরোহণের নানা প্রমাণ আছে, তাহাও পদ্মার পূর্ব্ব প্রবাহকে সাহায্য করিয়াছে। পদ্মার বিপুল পূর্ব্ব অভিযানের জন্যই প্রথমে ভাগীরথীর ও নদীয়ার অন্যান্য নদীগুলি ও পরে যশোহরের নদীগুলি ক্ষীণ বা মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ইহা মাত্র দেড় শত বৎসরের কথা। উত্তরে কুশির আগমন ও নদীর নিম্ন ব-প্রদেশে ব্রহ্মপুত্রের আবির্ভাবের জন্য কয়েকটি নূতন নদীও জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ত্রিশ বৎসরে বাংলার সমতল ভূমিতে অন্ততঃ ছয়টি বড় নূতন নদী আবির্ভূত হইয়াছিল,—তিস্তা, যমুনা, জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, কীর্ত্তিনাশা ও নয়া ভাঙ্গিনী। আশ্চর্য যে ভৌগোলিক, বৈষয়িক ও রাষ্ট্রিক পরিবর্ত্তনগুলি আধুনিক বাংলাকে নূতন সাজ দিয়াছে তাহারা সবই সমসাময়িক।

আগামী যুগে নদনদীর অবস্থান্তর বাংলার বিভিন্ন প্রদেশে যে কৃষি ও লোকসংখ্যার পরিবর্ত্তন আনিবে তাহা অবশ্যম্ভাবী। উত্তর-বঙ্গে তিস্তা যমুনা সংঘ পুরাতন ব-প্রদেশের উপর আর একটা নূতন ব-প্রদেশ গড়িতে, সাজাইতে থাকিবে। ফলে ঐ অঞ্চলের জলসরবরাহ বিপরীত দিকে হইবে, কতকগুলি নদী অন্য নদীর দ্বারা আক্রান্ত বা বন্দী হইবে এবং বন্যা বিপুলতর আকার গ্রহণ করিবে। রেলপথের জন্য ও তিস্তা যমুনার তীরে লোকবৃদ্ধিহেতু, বন্যা অধিকতর অনিষ্ট সাধন করিবে। বন্যাপীড়ন উত্তরবঙ্গে ক্রমশঃ একটা দুরূহ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে।

মধ্যবঙ্গে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র সংঘের নূতন দ্বন্দ্বের জন্য যশোহরের নদীগুলি নবজীবন লাভ করিতে পারে বলিয়া কিছু পূর্ব্বে যে আশার উদ্রেক হইয়াছিল, সে আশা এখন নির্ম্মূল হইয়াছে। বরং গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত-বিভাগের কমিটি ১৯৩০ সালে যে ভীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে মধ্যবঙ্গ ক্রমশঃ জলা ও জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, তাহা সত্য হইতে চলিয়াছে। শুধু মধ্যবঙ্গের নহে পশ্চিম-বঙ্গের অন্য অঞ্চলেরও এই দশা ঘটিতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর গত ত্রিশ বৎসরে বর্দ্ধমান জেলা, যাহাকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার উদ্যান বলিয়া বিদেশীরা বর্ণনা করিত, সেখানে কর্ষিত ভূমি ১১ লক্ষ একর হইতে কমিয়া ৭ লক্ষ একর হইয়াছে। যশোহর—যে প্রদেশে বহু নদীর

কঙ্কাল আজ চারি দিকে বিক্ষিপ্ত, সেখানেও কর্ষিত ভূমির পরিমাণ কমিয়াছে ১২ লক্ষ একর হইতে ৮ লক্ষ একর। যশোহরের বার্ষিক পতিত ভূমির পরিমাণ ফরিদপুরের চারগুণ।

পূর্ব্ববঙ্গে গঙ্গা ও মেঘনা সংঘের সংগ্রাম আরও ভীষণ হইতে থাকিবে। ইহার ফলে নদীতীরের বহু গ্রাম শহর বিধ্বস্ত হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের রাস্তা ও রেলপথ নির্ম্মাণ বাড়িতে দিলে স্বাভাবিক জলসরবরাহ ও খালগুলির প্রাকৃতিক শোধন বাধাপ্রাপ্ত হইবে। ইহার ফলে বন্যা ও ভাঙ্গন বাড়িবে বই কমিবে না। দক্ষিণ ও মধ্য বঙ্গে রেলপথ, রাস্তা বা সেতু নির্ম্মাণের বিষময় ফল দেখিয়াও পূর্ব্ববঙ্গ না ঠেকিয়া কি শিখিবে না?

বাংলার পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলে নদীর অধোগতি ও মৃত্যু ও অন্য অঞ্চলে যমুনা ও পদ্মার সাময়িক অতিবৃদ্ধি ও ভাঙ্গন প্রতিরোধ করাই বাংলার নদী-সংস্কার সমস্যা। তিস্তা, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, সুবর্ণরেখা, অজয় ও ময়ূরাক্ষীর উত্তর পথে পাহাড়ে বা উচ্চ ভূমিতে যেখানে জল সংগ্রহ সম্ভব, সেখানে পূর্ত্ত-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ দীর্ঘায়তন রিজারভয়ের নির্ম্মাণ অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, জলসংগ্রহের উপযুক্ত স্থানও পাওয়া গিয়াছে। তিস্তায় যেখানে এরূপ বাঁধ বাঁধিয়া সরোবর নির্ম্মাণ সম্ভব, সেখানে জলপ্রপাতের সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করাও কঠিন নহে। যুক্তপ্রদেশের উত্তর গাঙ্গেয় অঞ্চলে যেমন পূর্ত্ত নির্ম্মাণ ও বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন ও প্রচলন একটা নূতন শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছে, তেমনই উত্তর-বঙ্গেও তিস্তার বন্যারোধ, জলসংগ্রহ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন একই সঙ্গেই কৃষির উন্নতি, গৃহ-রক্ষা ও নূতন শিল্প উদ্ভাবন করিতে পারে।

নদীপরিত্যক্ত অঞ্চলে খরস্রোতা নদীর অতিরিক্ত প্লাবন মৃত বা ম্রিয়মান নদীগুলিতে বহাইয়া ইহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে এবং সমস্ত অঞ্চলে প্লাবন-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা জলসেচ, কৃষিরক্ষা ও ম্যালেরিয়া শাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইতালীর নানা অঞ্চলে এইরূপে ম্যালেরিয়া দূরীকরণ ও কৃষির উন্নতির সুব্যবস্থা হইয়াছে।

বিজয় ও গজনভী খাল বা করতোয়ার উন্নতিসাধন যে ভবিষ্যতের নদী-সংস্কার প্রণালী নির্দ্দেশ করিতেছে, ইহা সত্য। কিন্তু বাংলা দেশের এখন প্রয়োজন বিশ-ত্রিশ বৎসর ব্যাপী নদী সংস্কার, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতিসাধনের একটা সমগ্র পরিকল্পনাপ্রসূত কার্য্যপ্রণালী। এখানে-সেখানে অল্প দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র আয়োজনে হয়ত নদীরক্ষার জন্য ব্যয় ও পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে; তাহাতে হতাশা বাড়িবে বই কমিবে না। তাহা ছাড়া নদীপথগুলি অনেকটা দেশ জুড়িয়া অঙ্গাঙ্গী ভাবে আবদ্ধ, সম্মিলিত। পশ্চিমে ভাগীরথী এখন মৃত, ভগীরথের জীর্ণ কঙ্কাল। আবার আর একটি ভাগীরথী কঙ্কালাবশিষ্ট হইলে আর এক কীর্ত্তিনাশা পূর্ব্ব অঞ্চলে নামিয়া অন্য নূতন বিক্রমপুর ধ্বংস করিবে। নদীর অবস্থার দিক হইতে পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গের বিচ্ছেদ অসম্ভব। ব্যাপকতর দৃষ্টিতে সমগ্র গাঙ্গেয় সমতল ভূমি একই। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া বাংলা দেশে গঙ্গার জলরেখা গ্রীষ্ম বা শীতের সময় নামিয়া গিয়াছে দুই ফুট হইতে তিন ফুট। ইহাতে শাখাপ্রশাখাগুলির সহিত গঙ্গার যোগ কমিয়াছে, এমন কি বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আসামে পর্ব্বতের সানুদেশে বা ছোটনাগপুরের উপত্যকাভূমিতে অরণ্যের উচ্ছেদ বাংলা দেশে বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের কারণ, তাহাও বুঝাইতে হইবে না। যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও আসামের জলসেচ, কৃষিবিস্তার ও অরণ্যচ্ছেদ বাংলার নদীরক্ষা, স্বাভাবিক প্লাবন ও জল-বাণিজ্যের অন্তরায়। ভারত-গবর্ণমেণ্টের অধীনে, বিশেষজ্ঞ-সম্মিলিত একটা স্থায়ী গাঙ্গেয় কমিশন স্থাপন করিয়াই এই সব নদীর উচ্চ ও নিম্ন ভূমির সংঘর্ষের সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। প্রাদেশিক দৃষ্টিতে এই সকল সমস্যার সমাধান হইবে না, এমন কি ভবিষ্যতে এই সকল লইয়া প্রাদেশিক দ্বন্দ্ব খুবই বাড়িতে পারে। তাহা ছাড়া বাংলা দেশে নদী-নিয়ন্ত্রণ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য একটা জল-বিজ্ঞান ল্যাবরেটরী স্থাপনও অতি প্রয়োজনীয়। সকল প্রকার জলসেচ, বন্যানিবারণ, নদী-নিয়ন্ত্রণ, এমন কি জলাভূমি ও সমুদ্রতট হইতে কর্ষিত ভূমি উদ্ধার, সবই এই জল-বিজ্ঞান ল্যাবরেটরীর দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া লইতে হইবে।

এতকাল ধরিয়া ভুল ও অনিষ্টকারী নদীরক্ষা-প্রণালী অনুসরণের ফলে এখন বাংলার তিন ভাগের দুই ভাগ

ধ্বংসের মুখে। বৈজ্ঞানিক ও দীর্ঘ বৎসর ধরিয়া অনুসৃত রক্ষাপ্রণালী অবলম্বনে অচিরেই নদী-সংস্কার ও উন্নতিসাধন, জলসেচ, কৃষিরক্ষা ও ম্যালেরিয়া নিবারণ করিতে হইবে, তবেই রক্ষা।

অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে বাংলার ক্ষয়িষ্ণু ব-অঞ্চলের রক্ষা-প্রণালী উল্লিখিত হইল :

পশ্চিম ব-অঞ্চলে দামোদর ও অন্যান্য নদীতটে বাঁধ-নির্মাণ সহজ প্লাবন ও জল সরবরাহের প্রতিরোধ করিয়াছে। এই বাঁধগুলি নদীর খাতে পলি আবদ্ধ করিবার জন্য এখন উচ্চ হইতে উচ্চতর না করিলে যেমন বন্যানিবারণ অসম্ভব, তেমনই বাঁধগুলি রক্ষাও কঠিনতর ও বন্যার ভয়ও অধিকতর হইতেছে। এই বাঁধগুলিকে উইলকক্স সাহেব সয়তানী শৃঙ্খল আখ্যা দিয়াছিলেন, এগুলির বন্ধন মুক্ত করিয়া বাংলার পশ্চিম অংশে বাঁধগুলিতে জল-সরবরাহের দরজা লাগাইয়া নিয়ন্ত্রিত প্লাবনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উত্তর ব-অঞ্চলে তিস্তা নদীর অতিরিক্ত প্লাবন শীর্ণ আত্রেয়ী, করতোয়া ও পুনর্ভবা নদীতে প্রবেশ করাইয়া ইহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইবে। বরাল নদীকেও গঙ্গাপ্লাবনের দ্বারা সঞ্জীবিত করিতে হইবে।

মধ্যবঙ্গে জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি নদীগুলিতে গঙ্গার অতিরিক্ত প্লাবন পুরাতন বা নূতন খাতে বহাইতে পারিলে নদীগুলি অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

সুন্দরবন অঞ্চলে বাঁধ বাঁধিয়া, অকালে জলাভূমি কর্ষিত ভূমিতে রূপান্তরিত করিয়া যে-সকল নদীতে সমুদ্র হইতে জোয়ার-ভাঁটা খেলে সে-সকল নদীর অবনতি লক্ষিত হইয়াছে। মধ্যবঙ্গ হইতে গঙ্গাপ্লাবন নদীর উচ্চখাতে বহাইতে পারিলে নিম্ন অংশে জোয়ার-ভাঁটা আর নদীখাতে বালু বা পলি ঢালিতে পারিবে না। নদীগুলি বালুস্তূপ হইতে রক্ষা পাইবে, ও পূর্ব্ববঙ্গের মত ইহাতে বাঁধনির্ম্মাণ বিনাও লবণাক্ত জলের সীমানা সমুদ্রের দিকে আরও হটিয়া যাইবে।

চব্বিশ-পরগণা হইতে বাখরগঞ্জ পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরের অনতিদূরেই বিস্তৃত তৃণবহুল ভূমি বিদ্যমান। বাংলার গোজাতির অবস্থা ভারতবর্ষের মধ্যে নিকৃষ্ট। গোবংশের অধঃপতন নিবারণের একটি উপায় এই অঞ্চলে গোচারণ-মাঠ উদ্ধার করিয়া গো-সম্পদবৃদ্ধি।

জাপানীদের মত সুন্দরবনে বা সমুদ্রতটে সামুদ্রিক মৎস্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধরিয়া, সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া ও দূরদেশে পাঠাইয়া শিক্ষিত বাঙালীরা একটা নূতন অর্থোৎপাদনের পন্থা আবিষ্কার করিতে পারে। বাস্তবিক গোসাবা, পোর্ট-ক্যানিং ও ফ্রেজারগঞ্জের অলীক স্বপ্ন অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক মৎস্য চাষ ও ব্যবসায় অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে।

সমুদ্রতটে যেখানে ভীষণ বাত্যা বা বন্যা গ্রাম বা শহরের ক্ষতি করে, সেখানে বন রোপণ করিয়া সমুদ্রের মোহনার ঝড় বা জোয়ারের প্রকোপ হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যেখানে প্রয়োজন জলকচু পরিষ্কার; ড্রেজার দ্বারা নদীর খাত গভীরতর করা; যেখানে নদীর বাঁক অসুবিধাজনক, সহজ বা সোজা খাত খনন করা; উচ্চ খাত নির্ম্মাণ করিয়া বা পাম্প বা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে সতেজ নদী হইতে ক্ষীণ নদীতে জল আনয়ন করা,—সকল উপায়ই উদ্ভাবন করিতে হইবে যদি বাংলার পাঁচ ভাগের দুই ভাগে যে কৃষি ও স্বাস্থ্যের অবনতি ও লোকক্ষয় দেখা দিয়াছে তাহাকে প্রতিরোধ করিতে হয়।

বহু অর্থ ইহার জন্য প্রয়োজন। কিন্তু বাংলা দেশ লোকসংখ্যা, বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও শিল্প-বাণিজ্যের মালমসলা হিসাবে জর্ম্মানীর প্রায় সমতুল। বাংলা-উন্নতিবিষয়ক-আইন অনুসারে যে উন্নতি খাতে টাকা ধার্য্য হইতেছে তাহা এই সব পরিকল্পনার অনুপযোগী, তাহা অন্যায্যও বটে। বাংলার আধুনিক কৃষিসমস্যার সমাধান হইবে দূরদর্শী পরিকল্পনায় ও জলসেচ ও নদী-রক্ষা ব্যবস্থায়। সে ব্যবস্থা আগামী যুগে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যুক্তপ্রদেশ বা পঞ্জাবের মত উন্নতিবিধায়ক মোটা টাকার ঋণ বাংলার গবর্ণমেণ্টকে গ্রহণ করিতেই হইবে।

তবুও ষোড়শ শতাব্দী হইতে পদ্মার পূর্ব্বগতিজনিত যে বাংলার অধোগতি দেখা দিয়াছে তাহা প্রতিরোধ করা বড় সহজ নহে; যদিও তাহা অসম্ভবও নহে। বাংলার ব-প্রদেশের ভাঙ্গা-গড়া সব চেয়ে বেশী চলিয়াছে এখন মেঘনার মোহনায় ও চট্টগ্রামের তটে। আগামী যুগে সম্ভবতঃ সাহাবাজপুর নদীপথ বা শোণদ্বীপ খাত হুগলী নদীর স্থান অধিকার করিয়া লইবে। ভাগীরথীর শীর্ণতা ও কলিকাতার চারি পাশের অঞ্চলের অধঃপতনের জন্য কলিকাতার শিল্প ও

বাণিজ্যের প্রাধান্য হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাঞ্চলে চট্টগ্রাম বন্দর ও নারায়ণগঞ্জ, মুনসীগঞ্জ, চাঁদপুর ও ঝালকাটী প্রভৃতি বাণিজ্যের কেন্দ্র ক্রমশঃ আরও সমৃদ্ধি লাভ করিতে থাকিবে। পশ্চিম-বঙ্গের যে ক্ষতি তাহার পূরণ হইবে পূর্ব্ব নদী সমুদ্রে। এইরূপে বাংলার নদনদী বাংলার অধঃপতন আনিবে উত্তরে ও পশ্চিমে শুধু নূতন সোনার বাংলা গড়িবার জন্য দক্ষিণ ও পূর্ব্বকূলে। বাংলার চঞ্চলা ভাগ্যলক্ষ্মী তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম ও ধূমঘাটের লবণাক্ত জলে আপনার পদতল ধৌত করিয়া, নদীগর্ভে বহু ধন অলঙ্কার নিক্ষিপ্ত করিয়া, বিশাল রাজধানী কলিকাতার সৌধ অট্টালিকায় আপনার বেশবিন্যাস করিয়া, ললিতকলা নৃত্য দেখাইয়া আজ বালার্ককিরণস্নাত চট্টগ্রাম-নোয়াখালীকূলে তাহার সিংহাসন বসাইতেছেন। অন্য ধর্ম্ম, অন্য প্রকার কৃষ্টি, অন্য প্রকার সামাজিক আদর্শের তৈয়ারী এই বালুকা-প্রোথিত চপল সিংহাসন। বাংলার দেবতার মত পলি-মাটিতে গড়া এই শ্যামল নদীমাতৃকা দেশ আমাদের "নিত্যই নব।"

চিরকুট

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

মেয়েলি অক্ষরে ছোট চিরকুটে লেখা,—
"এসেছি, বসেছি, শেষে না পাইয়া দেখা
চলে গেনু।"—শুধু এই শব্দ গুটি কয়
টেবিলে পাথর-চাপা ; আর কিছু নয়।
চোখে প'ড়ে গেল তাই কক্ষে প্রবেশিতে,
কি যেন কাঁটার মত বিঁধিল চকিতে।—
এসে তবে চলে গেছে, নাই,—সত্যি নাই ?
—কিছু আগে ছিল ; তারে পাই কোথা পাই ?
কারে বা শুধাই, কেউ নাই আশে পাশে ;
আবার কে কোথা হতে হানে পরিহাসে
শুনে' তার কথা ! কে যে ফেলি' বাঁকা দিঠি
প্রচ্ছন্ন রহস্যচ্ছলে চায় মিটি-মিটি !
এদিকে তো এই ভয় ;—ঔৎসুক্য আবার
কিছুতে মনের দ্বার ছাড়ে নাকো আর।
কেবলি উঠিছে মনে,—এই কিছু আগে
এখানেই ছিল এই সমুখেরি ভাগে।
বেতের সোফাটি পেতে রয়েছিল ব'সে
যেন ওর শূন্য কোল সে-তনু-পরশে
সত্যই রয়েছে উষ্ণ ; ঘরের বাতাস
এখনো মদির বহি' কেশের সুবাস।
ঝুরঝুরে খাটো চুল, বাঁধেনি সে খোঁপা,
কাঁধে প'ড়ে হেলে দুলে আঙুরের থোপা ;
কাঁচা সোনাবরণের হাল্‌কা গড়ন
পড়ে-কি-পড়ে-না ভুঁয়ে চলিতে চরণ।
লতায়ে লতায়ে খেলে গায়ে সাদা চেলি,
শরতের ভোরে দেখা, শেফালি না বেলি !
অথবা কি লাজে-রাঙা অমলিন জুঁই ?
গন্ধভারে কাঁপে, ওরে ছুঁই-কি-না-ছুঁই !
সুগোল সুপুষ্ট দুটি বাহু কি নরম !
যে-রুলি জড়ানো তায়,—কাহার মরম
মায়া হয়ে গেছে যেন মুড়ে' বেঁকে বেঁকে।
আর ঐ করাঙ্গুলি ?—তা-ও থেকে থেকে
নড়ে চড়ে ; তুলে দেয় কাঁধেতে অঞ্চল,
কখনো চাবির গোছা নাচাতে চঞ্চল ;
ব্যস্ত কভু টেবিলের বইগুলি নিয়ে,
এটা ওটা, হেথা হোথা, কি করে কি দিয়ে !
দেখেছি দেখার মত চোখ দুটি কালো,
জানি না-যে কি বলিলে বলা হয় ভালো !
বনের হরিণী ওকি, না হয় খঞ্জন !
ওর চোখে চোখ দিয়ে পরেছি অঞ্জন ;

—আজিও সে-চোখে চাই,—তাই তো এমনি
শূন্যতাও রূপ ধরে, ধূলা হয় মণি !
দেখি,—সরু চটা প'রে এল হেঁটে হেঁটে,
ধারে ধারে পায়ে যেন রক্ত পড়ে ফেটে।
সে পদ-লালিমা লয়ে রাঙাইয়া হিয়া
মেঝে কিছু রাঙা ধূলি আছে কি পড়িয়া ?
ও যেন সবারই চির আদরেরই ধন
নয়নে পড়িলে আর না ফিরে নয়ন ;
কাছে পেলে মনে হয়, বলি দুটি কথা,
সেধে সেধে শুনে লই লুকানো বারতা।
আর কিছু না-ই হোক্, ফেলি ধীরে তুলি'
মুখের উপরে পড়া ওড়া চুলগুলি ;
মাঝে মাঝে ঘেমে থাকে কপোলের পাশ,—
বসনে মুছায়ে দিই,—জাগে বড় আশ !
এই তো দেখিনি কাল, লাগে কতদিন
সুদূর প্রবাসে প'ড়ে আছি জনহীন !—
—বিদেশ বিভূঁয়ে ;—কিন্তু আপনারি ঘর ;
এক এক মুহূর্ত যেন যুগ-যুগান্তর !
এর আগে আসিত সে প্রতি ভোরবেলা,
অকারণে ক'রে যেত মিছে হেলাফেলা।
টেবিলের দুই ধারে দোঁহে ব'সে মোরা
কত কি যে কহিতাম, নাই আগাগোড়া।
কোনোদিন কাছে কিছু রেখে দিল ফুল,
হঠাৎ একদা কানে প'রে এল দুল।
কখনো বা খুশীমত পড়া নিত বুঝে ;
আর সে কোথা যে এত খেলা পেত খুঁজে'—
থাকিতে দিত না মোরে কিছুতেই স্থির
মাঝে মাঝে দেখিতাম অতীব গম্ভীর,
বুঝিতাম টলানোর এ-ও এক ছল ;
দুজনেই চুপ, শেষে হাসি কলকল।
তার হাসি !—সে যেন কি হাসির ফোয়ারা,
নিজেরে হারায়, করে পরে আত্মহারা।
হাসিলে সে হাস ছাড়া নাই মনে কিছু ;
আবার দেখেছি এ-ও,—আঁখি ক'রে নীচু
নিস্তব্ধ বসিয়া আছে আপনার মনে,
নিরুদ্ধ অশ্রুর বাষ্প নয়নের কোণে।
হেমন্তের ম্রিয়মান গেরুয়া গোধূলি
চ'লে যেতে ধরা পানে যেমন ব্যাকুলি'
চেয়ে থাকে শেষ-চাওয়া হিমাচ্ছন্ন মাঠে,—
তারি রেখা কেঁপে যায় পাণ্ডুর ললাটে।
কারও 'পরে নাই কোনো অভিমান-গ্লানি,
না জানায় মনোব্যথা ;—সান্ত্বনা না জানি।
—এমনি কত যে দিন গেছে তারে ল'য়ে,
এসেছিল বুঝি তারি কোনো স্মৃতি ব'য়ে।
একবার চেয়েছিল ঐ দ্বার পানে
কান পেতে রেখেছিল,—বায়ু যদি আনে
ঈপ্সিত পায়ের ধ্বনি !—এই বুঝি মিলে !
—এমনি প্রতীক্ষা ক'রে গেছে তিলে তিলে !

কি জানি কি ছিল মনে, জানে একা সে-ই
মোর হাতে যা এল সে কাগজের খেই !

ইতালীর দ্রাক্ষা-উৎসব

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক

প্রাচীন কাল থেকে ইতালীতে যত রকম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে তার মধ্যে দ্রাক্ষা-উৎসবই আজ পর্যন্ত প্রাধান্য বজায় রেখেছে। ইতালীতেও আমাদের দেশের মত বার মাসে তের পার্ব্বণ। ধার্ম্মিকদের পূজা-আর্চ্চা লেগেই আছে; ক্যাথলিকদেরও দেবদেবীর অভাব নেই; কিন্তু বহু শতাব্দীর রাজনৈতিক নিষাতনে গীর্জার আচার-পালন আজ প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। গীর্জার পূজা-পার্ব্বণে আগে যে জাঁকজমক হ'ত আজ তার স্থান নিয়েছে জাতীয় উৎসব। আধুনিক ইতালীতে মুসোলিনীর অভ্যুদয়ের পর থেকে জাতীয় শ্লাঘা ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে দেশবাসীকে সচেতন করার দিকে রাষ্ট্রের নজর পড়েছে। ফাসিজ্‌মের আভ্যন্তরিক শক্তি এইখানে। জাতীয় উৎসবের মধ্যে বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত হয় এই কয়টি—২১শে এপ্রিল, জুলিয়স্ সিজারের স্মৃতি-বার্ষিকী—এই উপলক্ষে রোমে "নাতালে দি রোমা" (Natale di Roma) উৎসব হয়ে থাকে; ২৪শে মে, বিগত মহাযুদ্ধে ইতালী এই তারিখে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, তারই বার্ষিকী; ২৮শে অক্টোবর, মুসোলিনীর রোম-অভিযানের বার্ষিকী এবং ফাসিষ্ট বর্ষের সংক্রান্তি; ৪ঠা নবেম্বর, মহাযুদ্ধে ইতালীর জয়লাভের বার্ষিকী (ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের "আর্মিষ্টিস্ ডে"); এবং ১১ই নবেম্বর, বর্ত্তমান রাজার জন্মদিন। এ ছাড়া অন্যান্য ছোটখাট জাতীয় উৎসব ফাসিষ্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। জাতীয় উৎসবে সাধারণের যোগ দেবার সুবিধা নেই। একমাত্র সৈনিক বিভাগ ছাত্রদল, রাজকর্ম্মচারী এবং ফাসিষ্ট পার্টির কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারাই সবটা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ কেবল দর্শক হিসাবে জাতীয় উৎসবে যোগদান করতে পারে। তা ছাড়া গ্রাম্য অঞ্চলে জাতীয় উৎসবের অনুষ্ঠান তেমন জমে না, শহরগুলিতেই হৈচৈ হয়ে থাকে বেশী। উপরে যে কয়টা জাতীয় উৎসবের নাম করা হয়েছে তার প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই মুসোলিনী স্বয়ং যোগ দিয়ে থাকেন এবং কুচকাওয়াজ-অন্তে ভেনিস-প্রাসাদের বাতায়ন থেকে দেশবাসীকে উৎসাহবাণী দিয়ে থাকেন। এই তিথিগুলিতে সমস্ত শহরে রাত্রিতে দীপালি হয়ে থাকে এবং গীর্জায় প্রার্থনা করা হয়। এ-কথা এখানে ব'লে রাখা দরকার যে জাতীয় উৎসবে যত বাদ্যই বাজুক না কেন, তার প্রতিধ্বনি প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতে পৌঁছায় না। তারা যে উৎসবের অনুষ্ঠান করে, তাতে জাঁকজমক কম কিন্তু প্রাণের উল্লাস বেশী, তাতে যোগ দেবার অধিকার আছে সকলের—বালক যুবক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে। সাধারণের উৎসবের মধ্যে ফেব্রুয়ারি মাসের "কার্ণিভাল্" আর সেপ্টেম্বরের "ফেস্তা দেল্ উভা" (Festa dell' Uva) অর্থাৎ দ্রাক্ষা-উৎসবই প্রধান। ইতালী কৃষি-প্রধান দেশ। এদেশের জলপাই ও দ্রাক্ষা ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইতালী সমস্ত ইউরোপকে জলপাই-তৈল জোগান দিয়ে থাকে, আর ইতালীর দ্রাক্ষা-নিষ্পেষিত সুরা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আদৃত। ইতালীয়ান কৃষক জলপাই-উৎসব কেন করে না আমার জানা নেই, কিন্তু পাহাড়ের গায়ে গায়ে জলপাই-কুঞ্জের যে অপূর্ব্ব দৃশ্য অনেক কবি-চিত্তকে চঞ্চল করেছে তার জন্য একটা উৎসব করা নেহাৎ অমানান হ'ত না। মুসোলিনীর রাজত্বে দ্রাক্ষা-উৎপাদনের দিকে প্রজাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। "ত্যচের" হুকুমে ইতালী থেকে আঙুর রপ্তানি বন্ধ; তার কারণ সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ফাসিষ্ট্ গবর্ণমেণ্ট যত প্রকার প্রধান খাদ্য-সামগ্রীর মূল্য নির্দ্ধারণ ক'রে দিয়েছে তার মধ্যে আঙুরও একটি। ইতালীতে দুধ, রুটি, মাংস এবং আঙুরের মূল্য রাষ্ট্র দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে। শ্রমিক এবং চাষীদের দেহপুষ্টির জন্য এই কয়টি সামগ্রীর প্রয়োজন খুব বেশী, তাই এদের প্রাচুর্য্যের হানি না হয় সেজন্য ফাসিষ্ট-রাজ অত্যন্ত তৎপর।

ইতালীর দ্রাক্ষা-উৎসবের অর্থ অনেকটা পূর্ব্ববঙ্গের নবান্ন-উৎসবের মত। ক্ষেতের প্রথম ফসল যেমন দেবতাকে

নিবেদন না ক'রে গৃহী গ্রহণ করে না, ইতালীতেও তেমনই দ্রাক্ষাকুঞ্জের প্রথম ফসল ভূমিদেবতাকে নিবেদন না ক'রে চাষী নিজে ব্যবহার করে না বা বিক্রয়ার্থ বাজারে পাঠায় না। এই উপলক্ষে প্রত্যেক অঞ্চলে একটি ক'রে শোভাযাত্রা বাহির হয়। দিন-তিথি নির্দ্দিষ্ট কিছু নেই। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দিনে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ প্রত্যেক চাষীর ক্ষেত থেকে আঙুর সংগ্রহ ক'রে একটা বড় মোটর-লরাকে সাজান হয়। অন্য নানা রকম ভাবেও লরীগুলি সজ্জিত হয়। এই সুসজ্জিত বেদীর ঠিক মাঝখানে দ্রাক্ষারাণীর সিংহাসন স্থাপিত। অঞ্চলের সুন্দরী মহিলাদের মধ্য থেকে এই দ্রাক্ষাদেবী নির্ব্বাচিত হয়ে থাকেন। দেবীর চতুষ্পার্শ্বে কিঙ্কর-কিঙ্করীদের দল তাদের বিচিত্র বেশভূষা পরিধান ক'রে 'প্রসাদ' অর্থাৎ আঙুর বিতরণ করে। বড় বড় ভাঁড়ে আঙুর বোঝাই ক'রে দু-পাশের উল্লসিত জনতাকে বিতরণ করতে করতে শোভাযাত্রা অগ্রসর হয়। তার সঙ্গে ঢাক-ঢোল ত বাজেই। অপেক্ষাকৃত বড় শহরে তিন-চার খানা, এমন কি তারও বেশী দ্রাক্ষাসজ্জিত লরী শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। দ্রাক্ষা-উৎসবে যোগদান করতে হ'লে সকল মেয়েকেই তাদের বিশেষ বেশভূষা পরতে হয়। ইতালীর প্রত্যেক প্রদেশে এখনও স্বতন্ত্র বেশভূষার প্রচলন রয়েছে। আধুনিক ফ্যাশানের বিপুল প্রভাব উপেক্ষা ক'রে, ইতালীয়ান নরনারী আজও তাদের পিতৃপুরুষের বিশিষ্ট পোষাক-পরিচ্ছদ বজায় রেখেছে। তাই আজও কোন উৎসব উপলক্ষে তাদের ঐ সব পোষাক পরতে দেখা যায়।

ইতালীর এমনি এক দ্রাক্ষা-উৎসবে কেমন ক'রে একটি হেমন্তের অপরাহ্ণ কাটিয়েছিলাম তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েই প্রবন্ধ শেষ করব। রোডস থেকে ফিরছি। ব্রিন্দিসিতে জাহাজ থেকে নেমেছি সকালে। ট্রেনের পথ—ব্রিন্দিসি থেকে রোম। সকালে দশটার সময় ট্রেন ছাড়ল। সঙ্গী ছিল দুই জন ইতালীর ছাত্র-ছাত্রী। অনেকটা পথ কেবল সমুদ্রের তীর ঘেঁষে ট্রেন চলল। এক দিকে আড্রিয়াতিক সাগরের নীল জল আর এক দিকে কখনও দিগন্তপ্রসারী সমতলভূমি, কখনও পাহাড়ের গায়ে গায়ে জলপাই-বৃক্ষের

প্রকৃতির প্রাচুর্য্য ও মানবশক্তি ও শ্রমের বিজয়-প্রতীক

সারি। কিন্তু দক্ষিণ-ইতালীর এই মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার উপায় ছিল না। সঙ্গীরা তাদের রাজনৈতিক প্রসঙ্গে এক রকম জোর ক'রেই আমাকে যোগ দিতে বাধ্য করল। সেপ্টেম্বর মাস; তখন আবিসীনিয়ার গণ্ডগোল সবেমাত্র পাকিয়ে উঠছে; ভূমধ্য-সাগরে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর গতিবিধি বেড়ে চলেছে, তাই নিয়ে ফাসিষ্ট তরুণ-তরুণী ইংরেজের সমালোচনা করছিল। এমনি করে ক্রমশঃ রাজনীতি, অর্থনীতি থেকে আরম্ভ ক'রে দুনিয়ার যত রকম জ্ঞাতব্য এবং অজ্ঞাতব্য বিষয় আলোচনা করতে করতে মধ্যাহ্ন অতীত হয়ে গেল।

বেলা প্রায় চারটের সময় একটা বড় ষ্টেশনে গাড়ী এসে থামল। ষ্টেশনের বাইরে খানিকটা দূরে শহরের বড় রাস্তা; তার দু-ধারে দল বেঁধে অনেক লোক কিসের অপেক্ষা করছে মনে হ'ল। সঙ্গীদের সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে নেমে অনুসন্ধান করলাম কিসের জন্য এই চঞ্চলতা। উত্তর এল, দ্রাক্ষারাণীর শোভাযাত্রা আসছে। দ্রাক্ষা-উৎসবের কথা আগেই শুনেছিলাম, অসীম কৌতূহল হ'ল এই উৎসব দেখবার

জন্য। আটচল্লিশ ঘণ্টা সাগরের নাগরদোলার রেশ তখনও রয়েছে, তার পরে ছয়-সাত ঘণ্টা ট্রেনে আসতে হয়েছে। তাই তখন মাটিতে পা ফেলে বেশ দু-দশ কদম হেঁটে নেবার ইচ্ছা হচ্ছিল খুব, অধিকন্তু এল দ্রাক্ষারাণীর আহ্বান। সঙ্গীদের বললাম, আমি থেকে গেলাম এইখানে, রাত্রির ট্রেনে রোমে ফিরব। আমার বোঝাটাও দিলাম ওদের ঘাড়ে চাপিয়ে। ওদের নিয়ে ট্রেন চলে গেল। ষ্টেশন পেরিয়ে রাস্তায় যখন এসে দাঁড়িয়েছি তত ক্ষণে দ্রাক্ষারাণীর শোভাযাত্রা এসে গেছে, এদিক-ওদিক আঙুর ছড়িয়ে পড়ছে, আর তাই নিয়ে হল্লা হচ্ছিল প্রচুর। আমার নাকে-মুখেও কতকগুলি এসে পড়ল। ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম। এদের সঙ্গে হাঁটতে বেশ লাগছিল। দেশে রামকৃষ্ণ-মিশন, বন্যা-ভূমিকম্প, অসহযোগ-আন্দোলনের চাঁদা আদায় থেকে আরম্ভ ক'রে দেশবন্ধু, দেশপ্রিয় যতীন দাস প্রভৃতির শবদেহের শোভাযাত্রা কোনটাই বাদ যায় নি। কোথাও সঙ্গীত (?), কোথাও চীৎকারের চর্চ্চা করেছি, আর সঙ্গে সঙ্গে কেবল দেশের দুঃখ-দৈন্য অভাব-অভিযোগের কথা মনে হয়েছে। এদের এই শোভাযাত্রায় অভাব-অভিযোগের লেশ মাত্র স্পর্শ ছিল না। কেবল আনন্দ, জয়শ্লাঘা—প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যকে মানুষ যে পরিশ্রমের বিনিময়ে আহরণ ক'রে এনেছে তারই আগমনী, তারই জয়গানে শহর মুখরিত ক'রে চলেছিল দ্রাক্ষারাণীর শোভাযাত্রা। আমাদের দেশের নবান্ন-উৎসবের এই প্রাণ, এই চঞ্চলতা নেই কেন—এই সব ভাবতে ভাবতে আর আঙুর চিবোতে চিবোতে চলেছি, হঠাৎ পৃষ্ঠদেশে করস্পর্শ অনুভব করলাম। ফিরে দেখি আমারই ঠিক পিছনে চলেছে এক তরুণী, জিজ্ঞেস করল, "কৌতূহল মাপ ক'রো, তোমাকে বিদেশী ব'লে মনে হচ্ছে, তুমি কি সিসিলিয়ান?" জানিয়ে দিলাম যে আমি বিদেশী কিন্তু সিসিলিয়ান নই, ভারতীয়। এ মেয়েটি সম্ভবতঃ এর আগে ভারতবর্ষের লোক কখনও দেখে নি তাই আমাকে সিসিলিয়ান ব'লে ভুল করেছিল। পরে অনুসন্ধান করে জেনেছিলাম আমার ঐ ধারণা সত্য। ভারতবর্ষের নাম শুনতেই ওর কৌতূহল এবং উৎসাহ দুটোই বেড়ে গেল। কৌতূহল যথাসম্ভব নিবৃত্ত করা গেল। তার পর সে-ই আমাকে বোঝাতে লাগল সেদিনকার শোভাযাত্রার অর্থ এবং কর্ম্মকৌশল। শোভাযাত্রা এত ক্ষণে শহর ছাড়িয়ে মেঠো পথে এসে পড়েছে। নবপরিচিতাকে জিজ্ঞেস করলাম শোভাযাত্রা কত দূর অগ্রসর হবে, এবং শহরে ফিরে দশটার ট্রেন ধরা যাবে কিনা। সে বললে যে শোভাযাত্রা সেই রাস্তার শেষে এক উঁচু জমির উপর এসে থামবে; সেখানে সন্ধ্যার সময় আতসবাজীর উৎসব হবে, তার পরে শোভাযাত্রা শহরে ফিরবে। আমি জানালাম যে আমাকে তাহ'লে সেখান থেকেই বিদায় নিতে হচ্ছে। তরুণী বিস্ময় প্রকাশ করলে যে আতসবাজী না দেখে ফিরে যেতে চাইছি, এবং অভয় দিয়ে বললে যে আমাকে পথ দেখিয়ে দশটার আগে ষ্টেশনে পৌঁছে দেবে, আমি যদি আতস-বাজীর জন্য অপেক্ষা করি। এই আতিথ্যের আশ্বাসে খুশীই হলাম। তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়ার মত অন্য কোন আকর্ষণ ছিল না।

যেখানে এসে শোভাযাত্রা থাম্‌ল সেখান থেকে সমস্ত শহরটার এবং আশপাশের গ্রামগুলির দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মিটুকু পাহাড়ের চূড়া থেকে তখনও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি, নিম্নে উপত্যকায় প্রদোষান্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে। ইতালীর এই পার্ব্বত্য প্রদেশে দ্রাক্ষা-উৎসবের এই কোলাহলের মধ্যে সন্ধ্যার ছায়া স্বপ্নময় ব'লে মনে হ'ল। নূতন সঙ্গিনীর পরিচয় জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম। আতসবাজী দেখতে সত্যিই ভাল লেগেছিল। অতঃপর ঘড়ি দেখিয়ে ওকে বললাম যে এবারে আমাকে যেতে হচ্ছে। সে বললে, "এক মিনিট দাঁড়াও, আমি এখনই আসছি।" ওর কোন আত্মীয় কি বন্ধুকে হয়ত কি ব'লে আসতে গেল। মুহূর্ত্ত পরেই ফিরে এসে বললে, "চল।" পথ চল্‌তে চল্‌তে অনেক কথা হ'ল। আমি শুধু উৎসব দেখবার জন্য ওদের শহরে এসেছি এটা বিশ্বাস করতে চাইছিল না; বল্‌লে, এই দেখতে নাকি মানুষ আবার বাইরে থেকে আসে, এ ত সব অঞ্চলেই হয়ে থাকে। সময়-মত ষ্টেশনে এসে পৌঁছান গেল। অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বল্‌লাম, আমার সঙ্গে যদি কাফি সেবন কর তাহ'লে খুব খুশী হব। কাফিখানা থেকে বেরতেই ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াল। গাড়ীতে উঠে দরজায় দাঁড়িয়ে বিদায়-সম্ভাষণের পুনরুক্তি করলাম। উত্তরে সে শুধু বললে, "তোমাকে খুব ভাল

লেগেছে, আগামী বছরে এমনি দিনে দ্রাক্ষা-উৎসবে আবার এসো।" অনেক ক্ষণ গাড়ী চলেছে। দূরে পাহাড়ের উপরে কৃষ্ণাষ্টমীর ক্ষীণ চন্দ্র দেখা দিল, চারিদিকের সুপ্ত প্রান্তরে যেন স্বপ্নের মায়া। শুধু এক অপরিচিতা অজ্ঞাতকুলশীলা তরুণীর কথা আমার কানে বাজতে লাগ্ল "দ্রাক্ষা-উৎসবে আবার এসো।"

লিন্দৌ

কুকি উপকথ *

শ্রীলালতুদাই রায়

লিন্দৌ ও তাহার ছোট ভাই তোইসিয়ালের একমাত্র বিধবা মা ছাড়া সংসারে আর কেউ ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর কিছুকাল চলিয়া গেল। তার পর বিধবার মনে আবার স্বামী-গ্রহণের ইচ্ছা বলবতী হইল। ছেলে দুইটিকে সে কিরূপে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে তাহাই সে ভাবিতে লাগিল।

একদিন সে লিন্দৌ ও তোইসিয়ালকে ডাকিয়া জল আনিতে পাঠাইল। পাকা লাউয়ের খোল দিয়া কুকিরা জলপাত্র তৈয়ার করে। দুষ্টবুদ্ধি মাতা লাউয়ের তলদেশে একটি ছিদ্র করিয়া তাহা লিনদৌর হাতে দিল। লিন্দৌ ও তোইসিয়াল প্রত্যেক দিনের মত জল আনিতে গেল। দূরে পাহাড়ের গায়ে বাঁশের নল দিয়া ঝরণার জল অতি ক্ষুদ্র ধারে আসিতেছে। লিনদৌ লাউটিকে বাঁশের নলের নীচে বসাইয়া দিল। লাউয়ের মধ্যে জল পড়িতে লাগিল। অনেক ক্ষণ চলিয়া যায়, লাউ আজ আর জলে পূর্ণ হয় না। তোইসিয়াল বলে, 'দাদা, আজ কি হ'ল? লাউ কেন ভর্ত্তি হয় না? দেখ না কত সময় চলে গেল।'

গাছের ডালে একটি পাখী ডাকিয়া উঠিল, 'লিনদৌ লিন্দৌ উম্ পিন্ ভেরো।' (লিন্দৌ লিন্দৌ, লাউয়ের নীচে ছেঁদা।) পাখীর ডাক শুনিয়া দুই ভাইয়ের মনে কৌতূহল জন্মিল। তাহারা লাউ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল পাখী সত্য কথাই বলিয়াছে। লাউটিকে ফেলিয়া তাহারা শুধু-হাতে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

তাহারা বাড়ি ফিরিয়া দেখিল তাহাদের মা ঘরে নাই। মাকে না দেখিয়া তাহারা মা মা বলিয়া ডাকিতে লাগিল। শেষ কালে পাড়াপড়শীর মুখে তাহারা শুনিতে পাইল, তাহাদের মা অন্য গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের একটি ছোট ছাগলের বাচ্চা ছিল, তাহাও ঘরে বাঁধা রহিয়াছে। লিন্দৌ তোইসিয়ালকে পিঠে করিল, ছাগলের বাচ্চার দড়ি হাতে লইল; তার পর যে-পথে তাহাদের মা গিয়াছে সেই পথে চলিতে লাগিল।

অনেক দূর যাইতে যাইতে তাহারা চাংতুই নদীর পারে আসিয়া পড়িল। খরস্রোতা পাহাড়ী নদী তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহারা দেখিল তাহাদের মা নদীর ওপার দিয়া চলিয়া যাইতেছে। লিন্দৌ কিছুতেই নদী পার হইতে পারিল না। তখন সে তাহার মাকে চীৎকার করিয়া ডাকিল। তাহাদের মা তাহাদিগকে পূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়াছিল। সে বলিল, 'তোইসিয়ালকে রেখে ছাগলটিকে নিয়ে সাঁতরে চলে আয়।' ছোট ভাইকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে লিন্দৌর কিছুতেই মন সরিল না। অন্ততঃ দুঃখিত মনে সে তোইসিয়াল ও ছাগলটিকে লইয়া বাড়ির পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

কিছুদূর যাইতে যাইতে লিন্দৌ দেখিতে পাইল, কয় জন

* দেখা যায়, প্রত্যেক জাতির মধ্যেই উপকথা আছে। কুকিদের মধ্যেও বহু বহু উপকথা প্রচলিত আছে। যুগ যুগ ধরিয়া এগুলি মানুষের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। কোথায়, কি ভাবে, কাহার দ্বারা এগুলির উৎপত্তি তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে একথা সত্য যে একটি জাতির বহু কালের রীতিনীতি ও সংস্কৃতি লইয়া এগুলি রূপ লাভ করে।

দস্যু তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। ইহাদের হাতে পড়িলে আর রক্ষা নাই। ছাগলের বাচ্ছাটিকে ছাড়িয়া দিয়া, তোইসিয়ালকে পিঠে লইয়া লিন্‌দৌ প্রাণপণে বনের ভিতর দিয়া ছুটিতে লাগিল। কিছুদূর যাইতে-না-যাইতে একটি খড়ের স্তূপ সে দেখিতে পাইল এবং আত্মরক্ষার জন্য তাহাতে লুকাইয়া রহিল। ডাকাতরা তাহার অনুসরণ করিতেছিল। তাহারা বুঝিতে পারিল লিন্‌দৌ খড়ের ভিতর লুকাইয়াছে। অমনি তাহারা তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল। খড়গুলি ভিজা ছিল বলিয়া তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে ধূম বাহির হইতে লাগিল। লিন্‌দৌ তাড়াতাড়ি পশ্চাৎ দিকে বাহির হইয়া পলায়ন করিল। ধূমের জন্য ডাকাতরা তাহাকে দেখিতে পাইল না। ধীরে ধীরে খড়গুলি পুড়িয়া শেষ হইয়া গেল। দস্যুরা তাহাকে না পাইয়া, ছাগলের বাচ্ছাটি লইয়া চলিয়া গেল।

হতভাগ্য লিন্‌দৌ ও তোইসিয়াল! ছেলে বয়সেই তাহাদের পিতার মৃত্যু হইল। মা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। মায়ের অনুগমন করিতে গিয়া ডাকাতদের হাতে পড়িল। ছাগলের বাচ্ছাটি পরিত্যাগ করিয়া দস্যুদের কবল হইতে রক্ষা পাইলেও আত্মীয়-স্বজন, গ্রাম ও গৃহ হইতে বহুদূরে গভীর অরণ্যে আসিয়া পড়িল। পাহাড়ের পর পাহাড়, বনের পর বন। কোথাও লোকজনের চিহ্ন নাই। ক্ষুধার জ্বালায় তোইসিয়াল কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় লিন্‌দৌ দেখিতে পাইল মাটিতে একটি ভুট্টার দানা পড়িয়া আছে। তাহাই দুই জনে ভাগ করিয়া খাইয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করিল। তার পর আবার চলিতে লাগিল।

চলিতে চলিতে অনেক ক্ষণ পর তাহারা এক গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রামে অনেক লোক বাস করে। কিন্তু কেহই অপরিচিত বালককে ঘরে স্থান দিতে রাজী হইল না, এক মুঠা খাবারও দিল না। রাত্রির আর বেশী বিলম্ব নাই। লিন্‌দৌ তোইসিয়ালকে লইয়া বন হইতে অনেকগুলি খড় ও বাঁশ সংগ্রহ করিল। তাহারা সেগুলির দ্বারা অতি কষ্টে একটি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিল। তার পর গ্রামবাসীদের উচ্ছিষ্ট কুড়াইয়া নিজেদের ক্ষুধার শান্তি করিল। এই ভাবে তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল।

একদিন একটি চিল একটি সাপকে ছোঁ মারিয়া লইয়া আকাশে উড়িয়া যাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া লিন্‌দৌ চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চীৎকারে ভয় পাইয়া চিল সাপকে ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। সাপটি অর্দ্ধমৃতাবস্থায় মাটিতে পড়িয়া গেল। ইহার অবস্থা দেখিয়া লিনদৌর মনে বড় দয়া হইল। সে ইহাকে উঠাইয়া একটা গাছের কোটরে রাখিয়া দিল। চিল যাহাতে আর না দেখিতে পায়, সেই জন্য একটি পাতা দিয়া সাপকে ঢাকিয়া রাখিল। ধীরে ধীরে সাপটি সুস্থ হইয়া উঠিল এবং তাহার পিতামাতার নিকট পাতালে চলিয়া গেল। সাপের মা-বাপ তাহার মুখে সব কথা শুনিয়া আদেশ করিলেন, 'যাও, তোমার প্রাণ যে রক্ষা করেছে, তার কিছু উপকার ক'রে এস।'

এক বৃদ্ধার বেশ ধরিয়া সাপ লিন্‌দৌদের গ্রামে প্রবেশ করিল এবং ঘরে ঘরে গিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই তাহাকে আশ্রয় দিল না। অবশেষে সে লিন্‌দৌর কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। লিন্‌দৌ তাহাকে বলিল, 'দিদিমা, ঘরে স্থান দিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু আমার ঘরে একটি দানাও নাই যে তোমার সেবা করিয়া কৃতার্থ হই।' বৃদ্ধা উত্তর করিল, 'একটু থাকবার জায়গাই আমি চাই, খাবার জন্য কোন ভাবনা ক'রো না।' বৃদ্ধাকে নিজের ঘরে স্থান দিয়া দুই ভাই পাড়ায় আর এক জনের ঘরে শুইবার জন্য চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে তাহারা ঘরে আসিয়া দেখে, বৃদ্ধা তিন জনের উপযোগী অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাতে লিন্‌দৌর আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। এত দিনের পর লিনদৌ ও তোইসিয়াল তৃপ্তির সহিত পেট ভরিয়া আহার করিল। আহারের পর তাহারা কাজে চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরিয়াও তাহারা সকালের মত আহার প্রস্তুত পাইল। দুই-তিন দিন এইভাবে চলিয়া যাইবার পর, লিন্‌দৌর মনে ভয় হইল,—বৃদ্ধা কি শেষকালে প্রতিবেশীর ঘর হইতে চাউল তরকারী চুরি করিয়া লইয়া আসে? তাহা হইলে যে সকলের মাথা কাটা যাইবে। বুড়ীর কার্য্যকলাপ দেখিবার জন্য একদিন তাহারা কাজে না গিয়া কুটীরের কাছে লুকাইয়া রহিল এবং অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহার সবই লক্ষ্য করিতে লাগিল। বিকালবেলা বৃদ্ধা উরুর উপর

একখানা কুলা রাখিয়া, হাত দিয়া তাহার চোখ দুইটি মুছিতে লাগিল। তাহাতে দুই চোখ হইতে ঝর ঝর করিয়া চাউল পড়িতে লাগিল। এই চাউল দিয়া বৃদ্ধা রান্না করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তোইসিয়াল বলিল, 'দাদা, আমার বড় ঘেন্না করছে, আমি ও ভাত আর খেতে পারব না।' তোইসিয়াল বুড়ীর সামনে যাহাতে এইরূপ কথা না বলে এই জন্য লিনদৌ তাহাকে সাবধান করিয়া দিল।

একদিন সকল গ্রামবাসী চাষের জমি ভাগ করিতে চলিল।* তোইসিয়ালকে লইয়া লিন্দৌও সকলের সঙ্গে চলিল। তাহারা যে জায়গা চাষের জন্য ঠিক করে, অমনি আর এক জন আসিয়া বলে, 'এখানটায় আমি চাষ করব।' এই ভাবে কোথাও জায়গা না পাইয়া শেষকালে লিন্দৌ পথের ধারের একটি টিলা চাষের জন্য ঠিক করিল। তোইসিয়াল বলিল, 'দাদা, আজ সকালে ক্ষেতে আসবার সময় আমরা সকলে যে গাছটার উপর বসেছিলাম, আমি তার চোখ দেখেছি।' লিন্দৌ উত্তর করিল, 'চুপ কর, একথা শুনতে পেলে এরা আবার অনর্থ করবে।'

কিন্তু গ্রামবাসীদের এক জন কথাটা শুনিয়াই ফেলিল। সে সকলকে ডাকিয়া বলিল, 'তোমরা তোইসিয়ালের কথা শুনলে? সে নাকি আজ সকালে গাছের চোখ দেখে এসেছে। চল, আমরা সকলে গাছের চোখ দেখতে যাই। যদি গাছের চোখ দেখাতে না পারে তবে দু-ভায়ের মাথা আস্ত রাখবো না।' তোইসিয়াল ও লিন্দৌর পিছনে পিছনে গ্রামের সকল লোক চলিতে লাগিল। তাহারা সকালে যে গাছের নিকট বসিয়াছিল, তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া সকলেই দেখিতে পাইল, তাহা গাছ নহে, প্রকাণ্ড এক অজগর সাপ।

গ্রামবাসীরা সকলে মিলিয়া সাপটিকে মারিয়া ফেলিল। লিন্দৌকে জব্দ করিবার জন্য তাহারা সাপের নাড়ীভুঁড়ি তাহার হাতে দিয়া বলিল, 'এগুলো তোমরা নদীতে নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার কর।' লিন্দৌ আর কি করে! সাপের প্রকাণ্ড নাড়ীভুঁড়ি পিঠে করিয়া নদীর দিকে যাত্রা করিল। একটি পাখী গাছে বসিয়া ডাকিতে লাগিল, 'লিন্দৌ, লিনদৌ, ঠ্লাংদিকা (আরও নীচে)।' লিনদৌ আরও নীচের দিকে চলিতে লাগিল। অনেক দূর আসিয়া তাহার বড় পরিশ্রম বোধ হইতে লাগিল। পিঠ হইতে নাড়ী-ভুঁড়িগুলি নামাইয়া সে মাটিতে রাখিল। কিন্তু অবাক হইয়া লিন্দৌ দেখিতে পাইল—একটি পরশমণি, তিনটি ঘণ্টা এবং অনেক মণিমুক্তায় ইহা ভরিয়া রহিয়াছে। সেইগুলি কুড়াইয়া লইয়া লিনদৌ বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

একটি মুরগীর বাচ্চা কে এক জন পূজাতে উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। লিন্দৌ তাহা ধরিয়া বাড়ি লইয়া আসিল। মুরগীর ছানাটি পরশমণির সংস্পর্শে অল্পদিনের মধ্যেই মস্তবড় হইয়া উঠিল। একদিন গ্রামের এক জন লোক তাহার রুগ্ন শূকর ছানাটি রাখিয়া জোর করিয়া মুরগীটি লইয়া চলিয়া গেল। লিন্দৌ সকল অত্যাচারই চুপ করিয়া সহ্য করিয়া আসিতেছে। পরশমণির গুণে রোগা শূকরের বাচ্ছাটি অল্পদিনের মধ্যেই বৃহদাকার ধারণ করিল। ইহা দেখিয়া আর এক জন একটি রোগা ছাগলছানা রাখিয়া শূকরকে লইয়া চলিয়া গেল। ছাগলছানাটিও দেখিতে দেখিতে মস্তবড় ছাগল হইয়া উঠিল। আর একটি গ্রামবাসী তাহার একটি ছোট রোগা বাছুর রাখিয়া ছাগলটিকে লইয়া চলিয়া গেল। লিন্দৌ বাছুরটিকে সিসেত পাহাড়ে রাখিয়া আসিল। পরশমণির গুণে ঐ বাছুর অল্প দিনের মধ্যেই মস্তবড় হইয়া উঠিল এবং প্রতি মাসে একটি করিয়া বাচ্চা দিতে লাগিল।

লিন্দৌ ও তোইসিয়ালকে গ্রামের সকলেই হিংসা করিত। গ্রামের উৎসবাদিতে তাহাদের নিমন্ত্রণ হইত। কিন্তু অপমানিত করিবার জন্য তাহাদের পাতে ভাতের পরিবর্তে ছাই, মাংসের পরিবর্তে কাঠের টুকরা এবং মদের পরিবর্তে ছাইয়ের জল দেওয়া হইত। এইরূপ ব্যবহার পাইলেও লিন্দৌরা দুই ভাই গ্রামের প্রতি উৎসবে যোগদান করিত এবং ছাই, কাঠের টুকরা প্রভৃতি কাপড়ে বাঁধিয়া ঘরে লইয়া আসিত।

* কুকিদের চাষের কোন নির্দিষ্ট জমি থাকে না। বর্ষার আগে জঙ্গলের কতক অঞ্চলের গাছপালা কাটিয়া দেওয়া হয়। সেগুলি রোদে খুব শুকাইয়া গেলে, তাহাতে আগুন দেওয়া হয়। তাহাতে সব জঙ্গল পুড়িয়া পরিষ্কার হইয়া যায় এবং জমিতেও কিছু সার হয়। বৃষ্টি হইলে দা, কুঠার প্রভৃতির সাহায্যে কিছু কিছু মাটি কোপাইয়া তাহাতে ধান, তিল, কাপাস, কচু, শিম, কুমড়, কাঁকুড়, শশা প্রভৃতির বীজ লাগাইয়া দেওয়া হয়। ক্ষেতের মধ্যেই ঘর করিয়া ধান গোলাজাত করা হয়।

চাষের সময় উপস্থিত হইল। গ্রামের লোকেরা সকলেই আপন আপন জমিতে কাজ করিতে লাগিল। লিন্‌দৌদের কোন অস্ত্রপাতি ছিল না। তাহারা পথে বসিয়া থাকিত। পথিকদের কেহ ঐ স্থানে বিশ্রাম করিতে বসিলে লিন্‌দৌ তাহার দা ও কুঠার লইয়া গিয়া তাহার ক্ষেতের গাছের গোড়া অৰ্দ্ধেক অৰ্দ্ধেক কাটিয়া আসিত। রাত্রের ঝড়ে সেগুলি ভাঙিয়া মাটিতে পড়িত। এই ভাবে তাহাদের কিছু চাষের জমি হইল।

খুব রোদ উঠিয়াছে দেখিয়া একদিন গ্রামের লোক সব ক্ষেতে আগুন দিবার জন্য চলিয়া গেল। কিন্তু লিন্‌দৌর উপর আদেশ হইল সে সেদিন ক্ষেতে আগুন দিতে পারিবে না। সেই জন্য লিন্‌দৌ ক্ষেতে না গিয়া চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া রহিল। গ্রামবাসীদের জমিতে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে প্রবল ঝড় বৃষ্টি আসিয়া সেই আগুন একেবারে নিবাইয়া দিল। ক্ষেতের বনজঙ্গল মাঝে মাঝে আগুনে পুড়িল এবং মাঝে মাঝে রহিয়া গেল। ইহাতে গ্রামবাসীদের দুঃখের সীমা রহিল না। এ জঙ্গল আবার আগুন দিয়া পোড়ান যেমন অসম্ভব, হাত দিয়া পরিষ্কার করাও তেমনি কঠিন। ইহাতে চাষের মহা ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী।

আর একদিন সকালবেলা হইতে বৃষ্টি পড়িতেছিল। লিন্‌দৌকে ডাকিয়া সেদিন তাহার ক্ষেতে আগুন দিতে আদেশ হইল। লিন্‌দৌর এমন সাধ্য নাই যে, গ্রামবাসীদের হুকুম অমান্য করে। সে মহাদুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষেতের দিকে যাত্রা করিল। ক্ষেতে আগুন দিবার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গিয়া সমস্ত আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে এমন রৌদ্র উঠিল যেন শত সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে। অতি চমৎকার রূপে লিন্‌দৌর জমি পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। যেটুকু জমির গাছপালা সে কাটিয়াছিল, তাহা ছাড়া আরও বহু জায়গার জঙ্গলও পুড়িয়া পরিষ্কার হইয়া গেল।

ক্ষেতে বীজবপনের সময় আসিল। লিন্‌দৌ গ্রামের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইল। কেহ তাহাকে এক মুষ্টি ধান ত দিলই না, উল্টা আদেশ করিল, গ্রামবাসীদের রোদে দেওয়া ধান দুই ভাইকে সারাদিন পাহারা দিতে হইবে এবং মুরগী তাড়াইতে হইবে। লিন্‌দৌ ও তোইসিয়াল ধনুক লইয়া ধান পাহারা দিতে আরম্ভ করিল। তাহারা এক নূতন উপায় স্থির করিল। পাহারা দিবার সময় যখন তাহারা মাটি দিয়া ধনুকের গুলি তৈয়ার করিত, তখন প্রত্যেক গুলির ভিতর একটি দুইটি করিয়া ধান পুরিয়া দিতে লাগিল। গুলি রোদে শুকাইয়া গেলে তাহারা এগুলির একটি একটি ধনুক দিয়া তাহাদের ক্ষেতের উপর মারিতে লাগিল। পাথরে ও গাছের গোড়াতে লাগিয়া গুলি ভাঙিয়া গিয়া সারা ক্ষেতময় ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এই ভাবে লিনদৌ তাহার সমস্ত ক্ষেতে বীজ বপন করিল।

ভাল রকম পুড়িয়াছিল বলিয়া লিন্‌দৌর ক্ষেতে যেমন আগাছা জন্মিল না তেমনি ধান হইল প্রচুর পরিমাণে। সে রকম ধান গ্রামের আর কাহারও ক্ষেতে হয় নাই। তাহাতে সকলে একদিন হিংসা করিয়া লিন্‌দৌর ক্ষেতের সব ধান উপড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেল। লিন্‌দৌর সৌভাগ্য বশতঃ সেদিন রাত্রে খুব বৃষ্টি হইল। ইহাতে ধানগাছগুলি আবার মাটিতে বসিয়া গিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই বেশ বাড়িয়া উঠিল। সে বৎসর লিন্‌দৌ সাত ঘর ধান পাইয়াছিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে এক জনও সমস্ত বৎসরের খাওয়ার মত ধান পাইল না।

সেই গ্রামের এক রাজা ছিলেন। তাঁহার একমাত্র মেয়ের নাম ছিল মিয়াচং। একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে মিয়াচং লিন্‌দৌদের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। তোইসিয়াল তাহাকে আদর করিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল এবং তাহাদের সকল ধনরত্ন দেখাইয়া বলিল, 'দিদি, তুমি যদি আমার দাদাকে বিয়ে কর, তবে তুমিই এসবের মালিক হবে।' মণিরত্ন দেখিয়া রাজকন্যা মোহিত হইয়া গেল। সে লিন্‌দৌকে বিবাহ করিতে মনস্থ করিল। সেই জন্য সে বাড়ি গিয়া উপবাস-ব্রত আরম্ভ করিল। রাজা-রাণী মিয়াচঙের সখীকে দিয়া জানিতে পারিলেন যে মেয়ের স্বয়ম্বরা হইবার ইচ্ছা হইয়াছে। তাঁহারা পরম আহ্লাদিত মনে কন্যার স্বয়ম্বরের আয়োজন করিতে লাগিলেন। উৎসবের দিন গ্রামের গণ্যমান্য সকলেই স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হইলেন। নানা উপহারে বরের থালা প্রস্তুত হইল, মূল্যবান আসন পাতিয়া দেওয়া হইল। এই বার কন্যা যাহাকে

বরের আসন গ্রহণ করিতে আহ্বান করিবে, তিনিই কন্যা প্রাপ্ত হইবেন। মিয়াচং কাহাকেও আহ্বান করিল না। তখন রাজা গ্রামের আরও একটু নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে সভায় ডাকাইলেন। মিয়াচং তাহাদের কাহাকেও বরণ করিল না। তারপর আরও নিম্নস্তরের লোকের ডাক পড়িল। কিন্তু রাজ-জামাতা হইবার ভাগ্য কাহারও হইল না। অবশেষে লিন্‌দৌ ও তোইসিয়ালকে ডাকিয়া আনা হইল। লিন্‌দৌ সভাতে প্রবেশ করিবামাত্র মিয়াচং তাহাকে বরের আসন গ্রহণ করিতে আহ্বান করিল। ইহাতে সভার সকল লোক হিংসায় জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা উঠিয়া ঘৃণায় মিয়াচঙের গায়ে থুথু দিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে মিয়াচঙের সমস্ত শরীর ও কাপড় ভিজিয়া গেল। মিয়াচং ও তোইসিয়ালকে লইয়া লিন্‌দৌ আপন ঘরে ফিরিয়া আসিল।

মিয়াচঙের ব্যাপারে রাজা বড় দুঃখ ও অপমান বোধ করিলেন। তিনি আদেশ দিলেন, 'আমি যত ধনের দাবি করব, যদি লিন্‌দৌ তা দিতে না পারে, তাহ'লে তার মাথা কাটা যাবে।' লিনদৌ রাজার প্রার্থিত ধন অপেক্ষা অনেক বেশী ধন তাঁহাকে প্রদান করিল। তাহাতেও রাজার মন শান্ত হইল না। তিনি বলিলেন, 'যদি লিন্‌দৌ গরু দিয়ে আমার গোশালা ভর্তি ক'রে না দিতে পারে, তাহ'লে তার রক্ষে থাকবে না।' লিন্‌দৌ গরু দিতে সম্মত হইল। সে গ্রামবাসীদের ঘরে ঘরে গিয়া বলিল, 'কাল তোমরা কেউ ধান ও কাপড়চোপড় রোদে দিও না। আমরা কাল গরু আনতে যাব।'

গ্রামবাসীরা লিন্‌দৌর কথায় হাসিতে লাগিল। তাহারা আরও বেশী করিয়া ধান ও কাপড় রোদে দিল। লিনদৌ ও তোইসিয়াল যখন সিসেত পাহাড় হইতে তাহাদের সমস্ত গরু লইয়া আসিল, তখন গরুগুলি রোদে দেওয়া সকল ধান ও কাপড় নিমেষের মধ্যে খাইয়া ফেলিল। রাজার গোশালায় যত গরু ধরে তাহা রাজাকে দিয়া বাকী গরু তাহারা নিজেদের ঘরে লইয়া আসিল। দীন, ভিখারী, অনাথ লিনদৌ আজ রাজ-জামাতা। ধনে বিত্তে রাজার চেয়েও বড়। লিনদৌ গোযজ্ঞ করিতে মনস্থ করিল এবং দুই ভাই ও মিয়াচং মিলিয়া তাহার পরামর্শ ও আয়োজন করিতে লাগিল।

লিন্‌দৌর মা যেখানে চলিয়া গিয়াছিল, সেখানে সে বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইল। তাহার মা'র একখানা কুঠার ভিন্ন সংসারে কিছুই রহিল না। কুঠারখানার বিনিময়ে কিছু ধান লইবার জন্য লিনদৌর মা একদিন লিনদৌদের গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে গ্রামবাসীদের মুখে লিন্‌দৌর সৌভাগ্যের কথা শুনিল। পথে তোইসিয়ালকে পাইয়া সে লিনদৌর ঘর কোথায় তাহা জিজ্ঞাসা করিল। তোইসিয়াল বলিল, "এই বড় গাইটার পিছু পিছু চ'লে যাও। গাই যেখানে যাবে সেখানেই লিনদৌর ঘর।"

লিন্‌দৌ তাহার মাকে চিনিতে পারিল এবং আদর করিয়া ঘরে লইল। কোন অতিথি বাড়ি আসিলে, রাত্রিভোজনের পর এক কলসী মদের মধ্যে জল দিয়া সকলে মিলিয়া পান করা হয়। তাহাতে গ্রামের আরও দুই-চারি জনকেও আহ্বান করা হইয়া থাকে। লিন্‌দৌও মদ্যপানের ব্যবস্থা করিল। সকলে যখন আনন্দে মদ্যপানে মত্ত, সেই সময় লিন্‌দৌ গল্প বলিতে আরম্ভ করিল। যেন অতীতের অন্য কোন ব্যক্তির বিষয় বলিতেছে, এই ভাবে সে নিজের কাহিনীই বলিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া লিনদৌর মা মনঃকষ্টে ও অনুতাপে ক্রন্দন করিয়া সারারাত্রি যাপন করিল। পরদিন লিন্‌দৌ তাহার মা'র নিকট তাহাদের গোযজ্ঞের কথা বলিল এবং উৎসব পর্যান্ত থাকিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু যজ্ঞ পর্য্যন্ত এখানে থাকিলে তাহার নূতন স্বামী ও সন্তানেরা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে। আবার সে লিনদৌ ও তোইসিয়ালকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, এখন কোন্ মুখে তাহাদের নিকট মাতৃসম্মান দাবি করিবে। ইত্যাদি নানা কথা ভাবিয়া লিন্‌দৌর মা কিছুতেই রাজী হইল না। তোইসিয়াল তাহাকে সঙ্গে লইয়া ধান দিবার জন্য চলিল। সে প্রত্যেকটি গোলাঘরে প্রবেশ করিয়া মাকে দেখাইতে লাগিল। শেষ-কালে সর্ব্বশেষ ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, 'যত ধান তুমি নিতে পার, নিয়ে যাও।' ছেলেরা মায়ের কাছ হইতে তাহার শেষ-সম্বল কুঠারখানা লইল না। লিন্‌দৌর মা ধান লইয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

তাহার স্বামী অর্দ্ধপথে তাহার ভার লাঘব করিবার জন্য আসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। সে যখন দেখিল লিন্‌দৌর মা ধানের সঙ্গে সঙ্গে কুঠারখানাও লইয়া আসিয়াছে, তখন তাহার

মনে নানা খারাপ সন্দেহ উপস্থিত হইল। সে অতি অশ্লীল ভাবে তাহাকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে লিন্‌দৌর মায়ের মনে বড়ই দুঃখ হইল। সে মনোদুঃখে লাঠির উপরে চিবুক রাখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। হঠাৎ পদস্খলন হওয়াতে লাঠির অগ্রভাগ কণ্ঠে গিয়া বিদ্ধ হইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইল। তাহার স্বামী ধান লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল। এদিকে একটি পাখী লিন্‌দৌকে ডাকিয়া তাহার মা'র মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিল। লিন্‌দৌ ও তোইসিয়াল কালবিলম্ব না করিয়া মাতার মৃতদেহ লইয়া আসিল এবং যথোচিত সৎকার করিল।

ইহার কিছুদিন পর লিন্‌দৌ তাহার গোযজ্ঞ আরম্ভ করিল। সাত দিন সাত রাত্রি পানাহার, নৃত্য, গীতাদি চলিল। যজ্ঞের শেষভোজনের দিন, যাহারা লিন্‌দৌকে পূর্ব্বে ছাই ইত্যাদি ভোজনের জন্য দিয়াছিল, তাহাদের আহারের জন্য প্রচুর অন্ন, মদ্য ও মাংস প্রদান করিল এবং নিজের পাতে তাহাদের পূর্ব্ব প্রদত্ত ছাই, কাষ্ঠখণ্ড ও ছাইয়ের জল লইয়া বসিল। লিন্‌দৌ বলিল, 'আপনারা সকলে সন্তুষ্ট মনে আহার করুন, আমিও আমার উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করিতেছি।' লিন্‌দৌর পাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গ্রামবাসীদের মস্তক লজ্জায় অবনত হইয়া আসিল।

ইহার পর হইতে লিন্‌দৌ, মিয়াচং ও তোইসিয়াল পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। সর্পের কৃপায় লিন্‌দৌদের সৌভাগ্য আসিয়াছিল বলিয়া তখন হইতে কুকি-সমাজে সর্পের পূজা প্রচলিত হইয়াছে। সর্প অতিথির রূপে আসিয়াছিল। তাই আজ পর্য্যন্ত কুকিদের মধ্যে অতিথির এত আদর। লিন্‌দৌ ও তোইসিয়ালের ভ্রাতৃপ্রেম কুকি-সমাজে বড় প্রশংসিত।

অবসর

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রাবণ-শেষের দুপুরের মায়া
আধ রোদ আর আধ মেঘছায়া
ঢেলেছে আবেশ সকল অঙ্গে মনে;
কর্ম্মের বেগে নহে চঞ্চল,
ভরা অবসরে করে টলমল
কালের পেয়ালা আজি এই শুভলগনে।

কাননে সুপারি-নারিকেল-বনে
অলস বাতাস কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে
ঘুমন্ত রোদ সহসা শিহরি ওঠে,
চামর-দোলানো শ্যামল পাতায়
আলাপ-প্রলাপ এলোমেলো ধায়
নিমেষে আবার ভাষা মোটে নাহি জোটে।

নিতল দীঘির স্থির নীল জলে
গাঢ় নয়নের বেদনা উছলে
কানায় কানায় অশ্রুর কানাকানি;
প্রতিবেশীদের পোষা হাঁস দুটি
সেথা আনমনে ডানা খুঁটি খুঁটি
দু-চোখে নিমীল নিদ্রা এনেছে টানি।

দূরে কোথা কোন্ ছোট কারখানা,
লোহা পেটে কুলি, তারি একটানা
ক্লান্ত আঘাত শান্তি মোটে না জানে;
ডাঙা-গলা কাক, চিলের চিকন
কণ্ঠের স্বরে মিলি অনুখন
বিধুর বাতাসে ঘন অবসাদ হানে।

দুপুরের এই স্তব্ধ দূপুর
বুকে কাঁপে স্বর কাতর ঘুঘুর
পুকুর-পাড়ের ঘন বেণুবনছায়ে,
তারি পাশে বাঁকা অশথের শাখে,
পোড়ো বাড়িটার ফাটলের ফাঁকে
দুপুরের রোদ নেমেছে ক্লান্ত পায়ে।

ছায়া আলোকের এই রূপা সোনা
এরি সরু ডোরে মায়াজাল বোনা
মধ্যদিনের মায়ামরীচিকা খেলা,—
নাহি আলাপন মুখর ভাষণ,
একা উদাসীন মন উন্মন,
আলস-বিলাসে কাটাই বিজন বেলা।

হিন্দু-প্রভাবিত বাংলা-সাহিত্য

রেজাউল করীম, এম-এ, বি-এল

আজ বাংলা-সাহিত্য ও ভাষা যে মহিমান্বিত আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা হিন্দু-মুসলমানের যুগ্ম চেষ্টার ফলে কিংবা এক সম্প্রদায়ের অক্লান্ত চেষ্টায়, সে-বিষয়ে কোনও তর্ক না তুলিয়া অথবা বঙ্গভাষার সৌষ্ঠবরৃদ্ধিতে মুসলমানের দানের কথা অস্বীকার না করিয়াও, এ-কথা বিনা প্রতিবাদে বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে হিন্দুদের দান অসামান্য—হিন্দুদের এই দান না থাকিলে ইহা এরূপ উচ্চ আসন অধিকার করিতে পারিত না। প্রাগ্ ব্রিটিশ যুগে মুসলমান বাদশাহ, নবাব, আমীর, ওমরাহ এবং আরও বহু লোক বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য অনেক কিছু করিয়াছিলেন। যাঁহারা সাহিত্যিক ছিলেন না, তাঁহারা নানা প্রকার উৎসাহ ও অর্থসাহায্য দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের মহিমা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আর সাহিত্যিকগণ, বিশেষতঃ বৈষ্ণব কবি ও লেখকগণ, ইহার আভ্যন্তরীণ শ্রী ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্য বহু সাধনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের সময় বোধ হয় বৈদেশিক শাসনের প্রভাবে অথবা দেশের বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য অনেকেরই সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ অনুভবযোগ্য ভাবে কমিয়া আসিল। ফলে দীর্ঘকাল যাবৎ দেশে সাহিত্যিক দৈন্য ও অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। পাঠান-প্রভাবের সময় ইংরেজী সাহিত্যের যেরূপ দৈন্য উপস্থিত হয় কতকটা সেইরূপ। কিছু দিন পরে হিন্দুগণ অবসাদের কুজ্ঝটিকাজাল ভেদ করিয়া দাঁড়াইতে পারিল, কিন্তু বহুদিন যাবৎ মুসলমানদের মোহান্ধকার দূর হইল না। (আজিও হইয়াছে কি ?)। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হইবে না। মুসলমানরা না শিখিল ইংরেজী, না করিল বাংলার চর্চ্চা। কিন্তু অবসাদ কাটাইয়া উঠিয়া হিন্দুরা একদিকে ইংরেজী শিখিতে লাগিল, আর অপর দিকে বাংলার প্রতি তাহাদের আগ্রহ বাড়িতে লাগিল; সেই যুগে মহাত্মা রামমোহন রায়ের উদ্ভব দেশের সকল বিভাগেই এক নব-আলোকের সঞ্চার করিল। তাঁহার প্রচারকার্য্যের সহায়তা করিতে বাংলা ভাষা সজীব হইয়া উঠিল। এদিকে কেরী, মার্শমান প্রভৃতি স্বনামধন্য প্রচারকগণের অপরিসীম চেষ্টার ফলে নানা বিষয়ে বাংলা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির পথ পরিষ্কার হইয়া উঠিল। প্রেস হইল, পত্রিকা সংবাদপত্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইল—যাত্রা থিয়েটারের মধ্যবর্ত্তিতায় সাহিত্য একটা নূতন উদ্দীপনা পাইল। অভিনয়যোগ্য গল্প-নাটকের প্রতিও লেখকগণের সতর্ক দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। এই সব কারণে—বিশেষতঃ যুগের অভাব মিটাইবার জন্য সাহিত্য-পুস্তকের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। রাজা রামমোহনের পরেও তাঁহার প্রভাব একটুও কমিল না—নূতন নূতন সাহিত্যিক নব নব পরিকল্পনা, আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই ভাবে বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির যুগ আসিল। এ যুগের মনীষী সাহিত্যিকগণ বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য প্রাণমন ঢালিয়া দিলেন। ইঁহাদের প্রভাবে বিশৃঙ্খল ও অপূর্ণ সাহিত্য নবকলেবর প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বের বুকে সগৌরবে দাঁড়াইবার মত স্থান করিয়া লইল। তার পর দ্রুতভাবে ইহার গতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রতিভাবান লেখক, কবি, ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক উদ্ভূত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের আকার একেবারেই বদলাইয়া দিলেন। বর্ত্তমানে রবীন্দ্রনাথের যুগে বাংলা-সাহিত্য সমগ্র বিশ্বের আদরণীয় ও উপভোগ্য সম্পদ হইয়া উঠিয়াছে।

রাজা রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কাল বাংলার মুসলমানগণ কিন্তু এক প্রকার নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া ছিল। কেহই যে সাহিত্যচর্চ্চা করে নাই তাহা নহে—তবে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের মধ্যে সাহিত্যচর্চ্চা হয় নাই। খ্রীষ্টানভাবাপন্ন হইবার ভয়ে না হয় তাহারা ইংরেজী শিখিল না, কিন্তু বাংলা ভাষা চর্চ্চা করিতে তাহাদের কি বাধা ছিল ? আরবী-ফারসীরই বা কতটুকু চর্চ্চা হইয়াছিল ?

আরবী-ফারসী অভিজ্ঞ লোক হয়ত অনেকেই ছিলেন, কিন্তু যাহাকে বলে সাহিত্যচর্চ্চা সেরূপ কিছু ছিল না। মোটের উপর ব্যাপকভাবে সমাজে বিদ্যানুশীলনপ্রবৃত্তি ছিল না। সেই জন্য সাহিত্যিক দৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। দেশের মুসলমান-জনসাধারণের মাতৃভাষা বাংলাই ছিল। কিন্তু চর্চ্চার অভাবে, দলিললিখন, পত্রলিখন প্রভৃতির সীমা লঙ্ঘন করিয়া তাঁহারা উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে পারিলেন না। যদি কেহ করিয়া থাকেন তবে তাঁহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। এই সব কারণে যদি মুসলমান সমাজে মানসিক দেউলিয়া অবস্থা (intellectual bankruptcy) আসিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য সে-যুগের প্রধান প্রধান লোকেরাই দায়ী। ব্রিটিশ প্রভাব থাকা সত্ত্বেও হিন্দুরা যে-ভাবে সাহিত্য বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিয়াছিল, মুসলমানদেরও সেরূপ না হওয়াটা তাহাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে। ইহাতে সে-যুগের নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণের অদূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সুদীর্ঘ কালের অবহেলার ফলে মুসলমান সমাজে যে অবসাদ, তন্দ্রা ও দীনতার ভাব দেখা দিল তাহার মোহ কাটিয়া যাইতে বহু বিলম্ব হইল, বহু সাধনার প্রয়োজন হইল। যখন তাহাদের চৈতন্যোদয় হইল, তখন তাহারা অবাক হইয়া দেখিল, দেশের অবস্থা একেবারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে ইংরেজী সভ্যতায় দেশ ছাইয়া গিয়াছে, ইংরেজী বিদ্যাই হইয়া পড়িয়াছে শিক্ষার মানদণ্ড, তাহার অভাবে চাকরি-বাকরির পথ বন্ধ, রাজদ্বারে গমনাগমনের পথ রুদ্ধ। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেখিল তাহাদেরই মাতৃভাষা বাংলা আজ নব কলেবরে বিকশিত হইয়া সগৌরবে শোভা পাইতেছে, আর তাহারা অনাদৃত ভাবে তাহারই আশেপাশে পড়িয়া রহিয়াছে। যাঁহারা উর্দ্দু-ফার্সীর চর্চ্চা করিতেছিলেন তাঁহাদের কেহ কেহ দেখিলেন, নবযুগের এই প্রভাবের মধ্যে তাঁহাদের এ বিদ্যা চলিবে না। সুতরাং অনেকেই হিন্দুদের পন্থা অবলম্বন করিতে লাগিলেন, ইংরেজী ও বাংলাকে অবহেলা করা ভুল মনে করিলেন। বিগত কুড়ি-পঁচিশ বৎসর হইতেই সত্যকার ভাবে মুসলমানদের মধ্যে সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুরা এতাবৎকাল সাহিত্যচর্চ্চার দ্বারা নিজেদের সভ্যতা, আচার, সংস্কৃতি প্রভৃতিতে দেশে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন—আর সেই সময় মুসলমানরা ধর্ম্মরক্ষার নামে বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিল যুগের সঙ্গে চলিতে না পারিয়া একদা একদল হিন্দু ধর্ম্মরক্ষার নামে উন্নতিশীল নানা কার্য্যে বাধা দিয়াছিল। এমন কি সমুদ্র-যাত্রা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইল। সেই কারণেই সমগ্র মুসলমান সমাজ সাহিত্যকে অবহেলা করিল। ফলে সেই প্রাচীনপন্থী হিন্দুগণ আজ কোণঠাসা আর সেই-সব মুসলমানও আজ পতিত ও অবনত, সভ্যজগতের সীমা হইতে বহুদূরে নিক্ষিপ্ত।

সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহাদের এতটুকু জ্ঞান আছে তাঁহারাই জানেন যে কোনরূপ কৃত্রিমতার আওতায় সাহিত্য টিকিতে পারে না। সেইরূপ অবস্থায় রচিত বস্তুটিকে আর যে-কোন নামেই অভিহিত করা হউক না কেন, তাহা সাহিত্য নহে। তাহা বটতলার পুঁথি—"হজরত ইউসুফকে কুঁয়ায় ডালিবার বয়ান," "পাক পরওর দেগারের নাফারমানির লেগে তাঁহার তরফ থেকে আশাদ্দ আজাব" এই শ্রেণীর রচনা। প্রকৃত সাহিত্যের মানদণ্ড অনুসারে লেখকের ভাবধারা তাঁহার লেখনীমুখে স্বতঃউৎসারিত হইয়া প্রবাহিত হওয়া চাই—তাহা সত্য ও সুন্দর ত হইবেই, তাছাড়া তাহা স্বাভাবিকও হইবে। "আপনার মনে আপনার বেগে" তাহার গতি সকল বাধা ভেদ করিয়া চলিতে থাকিবে। কেহ তাহার সম্মান করিল কিনা সে-বিষয়ে সে একেবারেই বেপরওয়া। মুসলমানগণ যখন বাংলা-সাহিত্যকে পরিত্যাগ করিল, অথবা তাহার প্রতি উদাসীন রহিল, আর হিন্দুরা যখন উহাকে সাদরে গ্রহণ করিল ও উহার চর্চ্চা করিতে লাগিল, তখন তাহাতে যে হিন্দুদের মনের ভাব সহজে ও স্বাভাবিকভাবে প্রতিফলিত হইবে, এবং তাহা যে হিন্দু সভ্যতা প্রচারের বাহন হইয়া পড়িবে তাহা বিচিত্র নয়, বরং তাহাই স্বাভাবিক ও অপরিহার্য্য। স্বধর্ম্মভক্ত ও আপনাদের প্রাচীন সভ্যতায় আস্থাবান হিন্দুগণ যখন বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চা ও অনুশীলন করিতে লাগিল, তখন তাহাতে হিন্দুমনের অভিব্যক্তির ছাপ ত পড়িবেই। সেই যুগে যদি মুসলমানগণ সত্যকার ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন, তবে তাহাতে পরিস্ফুটভাবে ইসলামী সভ্যতারও ছাপ পড়িত। মুসলমানের অন্তরের ভাবধারা, তাহার সংস্কৃতি, আচার, সভ্যতা প্রভৃতি সব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিত। এ

দুই সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বাংলা-সাহিত্য আরও উন্নত ও সম্পদশালী হইয়া উঠিত। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই বাংলা-সাহিত্যকে উপেক্ষা করিয়া খুবই নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন। যাহারা সাধনার দ্বারা উহাকে সমৃদ্ধিশালী করিতে সাহায্য করিয়াছে তাহাদিগকে নিন্দা বা আক্রমণ করিলেই কি পূর্ব্বতনদের সব দোষ অপনোদিত হইবে? অথবা তাহাতেই কি আমাদের কর্ত্তব্যের ইতি হইয়া যাইবে?

যদি কেহ মনে করেন যে, হিন্দুরা একটি সভা আহ্বান করিয়া প্রস্তাব দ্বারা স্থির করিয়াছে যে, অতঃপর তাহারা বাংলা-সাহিত্যকে হিন্দুভাবান্বিত করিবে, ইস্‌লামী সভ্যতাকে পরিত্যাগ করিবে, আর সেই উদ্দেশ্যে গোপনে গোপনে সর্ব্বত্র প্রচারকার্য্য চালাইবে, তবে তাহা নিতান্ত ভুল ধারণা হইবে। এরূপ কিছুই হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহা এই—হিন্দুরা নিজেদের প্রাচীন সভ্যতার রসাস্বাদন পাইয়া আত্মসমাহিত হইয়াছে। তার পর তাহারা যাহা রচনা আরম্ভ করিল তাহাতেই তাহাদের স্বীয় ভাবসম্পদের ছাপ পড়িল। রেনেসাঁ যুগে ইউরোপেও তাহাই হইয়াছিল। প্রাচীনের মোহ মুসলমানের যেমন আছে, হিন্দুদেরও সেইরূপ আছে। প্রাচীনের মোহমুগ্ধ হিন্দু শুধু বেদ উপনিষদে নয়, সে যুগের কাব্য, নাটক, সাহিত্য প্রভৃতির মধ্যেও এ যুগের উপভোগ্য রসের সন্ধান পাইল। সেই রসে আপ্লুত হইয়া বহু সাহিত্যিক, লেখক ও কবি বাংলা-সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে লাগিলেন, এই জন্যই আজ বাংলা-সাহিত্য হিন্দু-প্রভাবিত, কিন্তু মুসলমানগণ সেরূপ কিছু করেন নাই বলিয়া আজ ইহাতে ইস্‌লামী প্রভাব নাই বলিলেও হয়। হিন্দুরা ইস্‌লামী সভ্যতা কেন পরিহার করিয়াছে, অথবা পরিহার করিয়া কতটা অন্যায় ও ভুল করিয়াছে তাহা বিচার করিবার ভার ঐতিহাসিকের,—সাহিত্য-সমালোচকের পক্ষে তাহা বিচার করিবার অবসরের অভাব।

নাটক, নভেল, যাত্রা, থিয়েটার, নৃত্য গীত প্রভৃতি আনন্দের বস্তুগুলি প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতি সভ্যতা ও সাহিত্যকে সজাগ ও সঞ্জীবিত রাখে এবং সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে এমন একটা অপার্থিব প্রেরণা দেয়, আর তাহার ফলে সাহিত্য এরূপ পুষ্টিলাভ করে যাহা কেবল ধর্ম্মনীতি ও দর্শনের নীরস তত্ত্বে সম্ভব হয় না। সাহিত্যকে সরস, সুমধুর করিতে—বিশেষতঃ সাধারণের চিত্তে প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে নাটক উপন্যাসের বিশেষ প্রয়োজন। রোম, গ্রীস, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে নাটক ও গল্প-গীতিকার প্রভাবে সাহিত্যের যে উন্নতি হইয়াছে তাহা অপূর্ব্ব। আবার এই নাটকাদি সাধারণের জন্য মঞ্চে অভিনীত হওয়াতে প্রকারান্তরে লোকসমাজে সাহিত্য-চর্চ্চার প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিয়াছে। প্রাচীন এথেন্সে থিয়েটারই ছিল লোকশিক্ষার প্রশস্ত বিদ্যালয়। বস্তুতঃ নাটক, গল্প ও যাত্রা থিয়েটারের মধ্যবর্ত্তিতায় সাধারণের মধ্যে যেরূপ সহজে সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ প্রচার হয়, যেরূপ ভাবে অতীতকে পরিস্ফুট করা সম্ভব হয়, অন্য কিছুতে তাহা হয় না। এদেশে হিন্দুরাও প্রাচীন সভ্যতাকে উপন্যাস ও নাট্যসাহিত্য দ্বারা অতি সহজেই প্রচার করিতে লাগিল। বহুকাল হইতে যাত্রার দল ও কীর্ত্তনওয়ালারা হিন্দু সংস্কৃতিকে সজীব রাখিয়াছিল, তার উপর নবযুগের থিয়েটারগুলি সভ্যতা প্রচারের ভার লইল। আর এই সব যাত্রা-থিয়েটারকে রসদ জোগাইবার জন্য কবি ও সাহিত্যিকগণ প্রাচীন গ্রন্থ অবলম্বনে নানা প্রকার গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। প্রাচীন যুগের ও হিন্দুগৌরবের আদর্শগুলি লোকলোচনের সম্মুখে অভিনীত হওয়াতে তাহারা বর্ত্তমানের প্রভাব সত্ত্বেও প্রাচীনকে একেবারে ভুলিতে পারিল না। আর এই শ্রেণীর লোক উত্তরকালে লেখাপড়া শিখিয়া হিন্দু কৃষ্টির দ্বারা এরূপ প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িল যে, তাহাদের রচনাতে তাহার ছাপ অনুভবযোগ্যভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। আজ পর্য্যন্ত তাহারা ইহার প্রভাব পরিহার করিতে পারে নাই। সেই জন্য হিন্দুর লেখনী হইতে স্বতঃউৎসারিত হইয়া যাহা বাহির হইয়া থাকে তাহার অনেকটাই হিন্দু সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত। হিন্দুরা যদি অপরের খাতির করিয়া স্বকীয় আজন্মপোষিত আদর্শ পরিহার করিয়া সাহিত্যচর্চ্চা করিত তবে হয়ত আমরা "মেঘনাদবধ" "বৃত্রসংহার" প্রভৃতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ পাইতাম না। ইহা বাংলা-সাহিত্যের পক্ষে ভালই হইয়াছে যে, মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রমুখ কবিগণ অন্তঃপ্রেরণাকে উপেক্ষা করিয়া অনুযোগ-অভিযোগের ভয়ে নত হইয়া পড়েন নাই।

কিন্তু মুসলমানগণ সাহিত্যপ্রচার ও লোকশিক্ষার জন্য এ পন্থা অবলম্বন করেন নাই, বরং ধর্ম্মের নামে নাটক-

নভেল যাত্রা-থিয়েটার প্রভৃতিকে ঘৃণা করিয়াছেন। আজিও গোপনে গোপনে এ সবে যোগদান করিলেও নীতির দিক দিয়া এগুলিকে তাঁহারা তাচ্ছিল্য করিয়া থাকেন। অভিনয়-ক্ষেত্রে ইস্‌লামের প্রথম যুগের মহাপুরুষগণকে মঞ্চোপরি কোনও ভূমিকায় নামানো ত দূরের কথা, সেই নামীয় কোনও ব্যক্তি কোন ভূমিকা গ্রহণ করিলে সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। শুনা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাস এক সময় এই কারণে অভিনীত হইতে পারে নাই। সুতরাং ইস্‌লামের আদর্শ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইতিহাস প্রভৃতি এই পন্থায় প্রচারিত হয় নাই, সেই জন্য এই সবকে উপলক্ষ্য করিয়া বিশেষ কোনও সাহিত্য রচিত হয় নাই। যদি তাঁহারা কারবালার ঘটনা, আরবের অন্ধযুগের কাহিনী, ইস্‌লামের প্রভাবে তাহার পরিবর্ত্তনের বিবরণ, ভারতে রাজ্যবিস্তারের কথা, ভারতে মোসলেম সভ্যতা প্রচারের বিবরণ প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া কাব্য, নাটক, উপন্যাস রচনা করিতেন ও তাহাকে মঞ্চোপরি অভিনীত হইতে দিতেন তাহা হইলে মুসলমানদের মধ্যে সাহিত্যচর্চ্চার প্রবৃত্তি খুবই বাড়িয়া যাইত, এবং ইসলামী সভ্যতার প্রভাব বঙ্গভাষায় পরিস্ফুট হইত। ঠিক হিন্দুদের মতই যাত্রা-থিয়েটারে ইসলামী কাহিনী উপকথা প্রভৃতি প্রচারিত হইত এবং এই দুই সভ্যতার প্রচারের ফলে দেশের উভয় সমাজই উপকৃত হইত, বঙ্গ-সাহিত্যে উভয়েরই প্রতিভার ছাপ পড়িত। এ যুগের সিনেমাকে বাহন করিয়া হিন্দুভারতের কত কাহিনী প্রচারিত হইতেছে, অথচ যাত্রা-থিয়েটারের মত সিনেমা-শিল্প আজ মুসলমানদের নিকট অবজ্ঞাত ও ঘৃণ্য। এই-সব বিষয়ে বাঙালী মুসলমানরা এত পশ্চাৎপদ যে পাল্লায় তুলিবার মত অধিক গ্রন্থ আমাদের মধ্যে নাই। এই ভাবে আমরা সভ্যতা প্রচারের সমুদয় পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছি—প্রথম যুগে বাংলাকে অবহেলা করিয়াছি, এবং এ-যুগে আদর্শ প্রচারের বাহনগুলিকে অবহেলা করিয়াছি। আর চোখের সম্মুখে দেখিতেছি অপরে এই-সব উপায় অবলম্বন করিয়া সাহিত্যের সর্ব্ব স্তরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতেছে, কিন্তু ইহাতেও আমাদের চৈতন্যোদয় হয় নাই। আমাদের সংস্কৃতি নষ্ট হইতেছে বলিয়া চীৎকার করিলেই কি সংস্কৃতি ফিরিয়া আসিবে? উহার মুরুব্বি ত ব্রিটিশ প্রভু নয় যে, চীৎকার করিয়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে দু-একটা কথা আওড়াইলে রাতারাতি বাঁটোয়ারার মত তাঁহাদের হাতে-গড়া 'রেডি-মেড' একটা সংস্কৃতি দিয়া অনুগ্রহপ্রার্থিগণকে থামাইয়া দিবেন! বুঝিয়া-সুঝিয়া সমঝিয়া চলিয়া, প্রেরণার আবেগে নয়, প্রয়োজনের তাগিদে কোন কিছু লিখিলেই তাহা সাহিত্য হয় না, তাহা সাহিত্যকে প্রভাবিত করিতে পারে না, তবে এই-সব চীৎকারের পরোক্ষভাবে এই ফল হইয়াছে—আজ আমরা বুঝিয়াছি যে বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব বেশী পড়ে নাই। কিন্তু সাহিত্য-সৃষ্টির চিরাচরিত পথ ব্যতীত অন্য পথে ও অন্য ভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে গেলে তাহা ব্যর্থ পরিশ্রম হইবে। অসাহিত্যিকের নির্দ্দেশে যে রচনা সৃষ্ট হইবে তাহা চিরকালই অচল হইয়া রহিবে। এজন্য সাহিত্যিক পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে—তাহা হইতেছে অনুপ্রাণিত হইয়া সৎসাহিত্য সৃষ্টি করা।

বঙ্গসাহিত্যকে যে পৌত্তলিকতার ভাবে ও আদর্শে পরিপূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা অসত্য নহে। কিন্তু পৌত্তলিকতায় আস্থাবান জাতির নিকট ইহা ব্যতীত অন্য কি আশা করা যাইতে পারে? পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যেরূপ অবস্থার মধ্যে হিন্দুরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাইল এবং যেভাবে তাহারা ইহার চর্চ্চা করিতে লাগিল, তাহাতে ইহার মধ্যে তাহাদের প্রভাবের ছাপ পড়া অধিকতর স্বাভাবিক। বঙ্গসাহিত্যে কোন্ সভ্যতার অধিক ছাপ পড়িয়াছে, অথবা পৌত্তলিকতার ছাপ এত বেশী কেন পড়িয়াছে, প্রতি পদবিক্ষেপে আমাদিগকে তাহা দেখিলে চলিবে না, আমরা শুধু দেখিব হিন্দুরা যাহা সৃষ্টি করিয়াছে তাহা প্রকৃত সাহিত্য হইয়াছে কিনা। যদি তাহা প্রকৃত সাহিত্য হয়, তবে তাহা আমাদের চিরবরণীয়। যীশুখ্রীষ্টকে খোদাতালার পুত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়া ইউরোপীয় ভাষায় যে-সব সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহা যদি আমাদের নিকট পরিত্যাজ্য না হয়, তবে রাম যুধিষ্ঠির ও সীতা সাবিত্রীকে আদর্শ করিয়া যে-সাহিত্য রচিত হইয়াছে পৌত্তলিকতার অজুহাতে তাহা পরিত্যাগ করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই।

কিছুদিন হইতে একটা কথা উঠিয়াছে, যেহেতু বাংলা-সাহিত্য

পৌত্তলিকতা ও হিন্দুসংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত সেই জন্য ইহা মুসলমানদের পাঠ করা অন্যায়। যদি মুসলমানদের পড়িতে হয় তবে তাহাদের প্রয়োজনমত সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে, প্রতিভাবান লেখকের ছাপ সাহিত্যে পড়িবেই পড়িবে। ইহা পরিহার করিবার উপায় নাই। নিজ ধর্ম্মের আদর্শ অনুরূপ নহে বলিয়া যদি মুসলমানকে কোন সাহিত্য পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে সারা বিশ্বে পড়িবার মত সাহিত্য তাহার জন্য একটাও পাওয়া যাইবে না। শুধু হিন্দু-প্রভাবিত বাংলা-সাহিত্য নহে, বিশ্বের বড় বড় সাহিত্য, রোম গ্রীস ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের অমূল্য সাহিত্য-সম্পদ মুসলমানদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়—অন্য পরে কা কথা, প্রাগ্‌ইসলামিক যুগের আরবী সাহিত্য, ইমরাল্ কায়েম প্রমুখ কবিগণের অমর কবিতা মুসলমানদের জন্য হারাম হইয়া পড়ে, অথচ এই সব আরবী সাহিত্য মুসলমানরা অতি সমাদরে পাঠ করিয়া থাকেন। আর অমুসলমান সম্প্রদায়গুলি যদি তাহাদের ধর্ম্মের আদর্শের বিপরীত বলিয়া ইসলামী সাহিত্যকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখে তবে সংস্কৃতির ও ভাবের আদান কেমন করিয়া হইবে? ইহার কুফল এই হইবে যে প্রত্যেক দেশের সাহিত্য কোণঠাসা হইয়া পড়িয়া রহিবে। সাহিত্যক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতা বলিয়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকিবে না। বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাহিত্যের মধ্যে আদান-প্রদান যতই বেশী হইতে থাকিবে, ততই তাহা প্রত্যেক সাহিত্যের পক্ষে লাভজনক ব্যাপার হইবে। ইহা বন্ধ করা উচিত হইবে না। পৌত্তলিক ও পরকীয়-প্রভাব আছে বলিয়া বাঙালী মুসলমানরা যদি অপরের সাহিত্য পরিহার করিতে চায়, আর বর্ত্তমানে তাহাদের যে যৎসামান্য সাহিত্য-সম্পদ আছে কেবল তাহারই উপর নির্ভর করে, তবে ভয় হয় তাহার সাহিত্য-প্রগতি বুঝি বা বন্ধ হইয়া যাইবে। এ বিষয়ে অসাহিত্যিক ব্যক্তি, বিশেষতঃ যাঁহাদের সাহিত্যে কোন দখল নাই, তাঁহারা যদি কথায় কথায় নির্দ্দেশ দিতে আসেন, আর সমাজের সংহতির নামে মুসলমানগণ যদি সেই নির্দ্দেশ মাথা পাতিয়া মানিয়া লন, তবে তাহা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইবে। বর্ত্তমানে মুসলমানগণ যে বাংলা-সাহিত্যে পশ্চাৎপদ তাহার জন্য উর্দ্দুওয়ালারা দায়ী। এতদিন উর্দ্দুকে মাতৃভাষা করিবার চেষ্টা হইতেছিল, এখন আবার কৃষ্টির নামে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইতে মুসলমানকে বঞ্চিত করিবার ষড়যন্ত্র হইতেছে—এই দোটানা স্রোতে পড়িয়া মুসলমানগণ কি চিরকালই অনির্দ্দিষ্ট ভাবে চলিতে থাকিবে?

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই, বাংলা-সাহিত্য আজ যে গৌরবান্বিত স্থানে উপনীত হইয়াছে তাহারই পার্শ্বে নিজেদের স্থান করিয়া লইবার জন্য মুসলমানদিগকে কঠোর সাধনা করিতে হইবে। বঙ্গসাহিত্যে হিন্দুদের দেবদেবীর নাম দেখিলেই যেমন আতঙ্কিত হওয়া ভুল ও অন্যায়, ঠিক সেইরূপ তাহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যথা-তথা আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করাও অন্যায় হইবে। সাহিত্যে দেবদেবীর নাম অথবা স্তুতি, অথবা দেবদেবীর উপমামূলক কোন রচনা পাঠ করিলেই কেহ পৌত্তলিক হইয়া পড়ে না। গৌরবের যুগে মুসলমানগণ রোমান ও গ্রীক সাহিত্য যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহারা পৌত্তলিক হইয়া পড়েন নাই। আর এই বিতর্ক উঠা সত্ত্বেও যে সব মুসলমান হিন্দুদের লিখিত বঙ্গসাহিত্য পাঠ করেন, তাঁহারা কি পৌত্তলিক হইয়া পড়িয়াছেন? যে-সব মুসলমান ইংরেজী সাহিত্য চর্চ্চা করেন, তাঁহারা Alma Mater, Temple of Learning, Pantheon প্রভৃতি এমন বহু শব্দ ব্যবহার করেন, যাহার মূলে আছে পৌত্তলিকতার স্পর্শ। কিন্তু কই সে-সময় ত কোনও কথা উঠে না। মুসলমানগণ বাংলা ভাষায় দেবদেবীর অনেক কাহিনী পড়িয়াছে, কিন্তু কোনও দিন তাহাদিগকে খোদাতালার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বিশ্বাস করে নাই। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির জন্য, উপযুক্ত উপমা অনুপ্রাস ও অলঙ্কারের জন্য যাহা লেখকের লেখনী হইতে স্বতঃউৎসারিত হইয়াছে তাহাকে আমরা কোনও কারণ দর্শাইয়া পরিত্যাগ করিতে পারি না। অনুপ্রেরণার সময় বহু শব্দকে বাদ দিয়া লেখক এক শুভ মুহূর্ত্তে যে যোগ্যতম শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, অথবা তাহার পরিবর্ত্তে অন্য শব্দ প্রযুক্ত করিলে সমগ্র লেখাটি ব্যর্থ হইয়া যাইবে। একটা উদাহরণ দিয়া ব্যাপারটি বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কবি মধুসূদন তাঁহার 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' নামক কবিতার এক স্থানে লিখিয়াছেন:

"আইলেন প্রভঞ্জন
সিংহনাদ করি ঘন
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব সমরে।'

এক জন সঙ্কলক মনে করিলেন মুসলমানের ছেলের পক্ষে ভীমের নাম জানা অত্যন্ত অন্যায়, তাই তিনি শেষ লাইনটি পরিবর্ত্তিত করিয়া নিম্নোক্ত কথা বসাইয়া দিলেন, "যথা আলি হায়দার বদর সমরে"—আর টেক্স্‌ট-বুক কমিটি তাহাই মঞ্জুর করিয়া দিলেন। কিন্তু মনোযোগ করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, পরিবর্ত্তিত লাইনটি মূল লাইনের সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য হইতে একেবারেই বঞ্চিত। এই ভাবে রসের দৃষ্টি না রাখিয়া সাহিত্যকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিলে মুসলমানদের বিশেষ উপকার হইবে না। মুসলমান সমাজকে হজরত আলির বিষয় জ্ঞাত করাইতে হইলে তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া রচনা লিখিতে হইবে। অথবা অন্য কোন কবিতায় উপযুক্ত উপমার সহিত তাঁহাকে জড়িত করিতে হইবে।

আমরা বঙ্গসাহিত্যে আরবী ফারসী শব্দ প্রয়োগের একেবারেই বিরোধী নহি। কিন্তু তাহা 'প্রয়োজন মত' অর্থাৎ গরজ অনুসারে ব্যবহৃত হইবে না। লিখিবার সময় স্বাভাবিক ভাবে আপনা হইতেই যাহা আসিবে কেবল তাহাই প্রয়োগ করিতে হইবে। আরবী ভাষার যে-সকল শব্দ সাধারণ মুসলমানগণ নিজেরাই বুঝে না, আরবী-অভিজ্ঞ পণ্ডিত যদি তাহাই বাংলায় ব্যবহার করিতে যান, তবে তাহাতে লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা বঙ্গভাষার সম্পদবৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিবে না। আরবী 'সালাত' 'সিয়াম' 'সাদকাত' 'রিয়াজাৎ' প্রভৃতি শব্দ সাধারণ মুসলমানগণ নিজেরাই বুঝে না, তাহারা ইহার পরিবর্ত্তে ফারসী নামাজ, রোজা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে। সুতরাং আমার বক্তব্য —নামাজ, রোজা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে 'সালাত' 'সিয়াম' শব্দ ব্যবহার করিবার কোনও কারণ নাই। অবশ্য নামাজ, রোজার পরিবর্ত্তে বাংলা উপাসনা ও উপবাস চলিবে না। কিন্তু উহার জন্য বঙ্গসাহিত্যে আরবী শব্দ ব্যবহার করিবার দরকার নাই। আমার মনে হয়, এই সব আরবী শব্দ লেখকের মনে আপনা হইতে উদিত হয় না। তিনি যখনই মনে করেন বঙ্গসাহিত্যকে জয় করিব, তখনই কতকটা কষ্টকল্পনার মত এই সব বাছাই বাছাই আরবী শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহা হউক, আশা করি, সাহিত্য জয় করিবার কথা উঠার পর যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা যেন আর অধিক দূর অগ্রসর না হয়, তাহা যেন মুসলমানদের দৃষ্টি বটতলার পুঁথির প্রতি পুনরায় লইয়া না যায়। এই বাদানুবাদের ফলস্বরূপ মুসলমানগণ যেন সত্যকার ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া সত্য ও সুন্দরের সাধনায় আত্মসমাহিত হয়।

অসময়ে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ হালদার

হাটের মাঝারে পাতিয়া দোকান
না করিতে বেচা-কেনা
শেষ হইবে কি পুঁজিপাটা সব
জীবনের লেনা-দেনা ?
রহিবে কি শুধু যত ক্ষতি ক্ষয়
ব্যথা ও বেদনা, চির-পরাজয়
বাঁধনের মাঝে জীবনের রথ
মুক্তির পথ চেয়ে ?
রয়েছে যে মিশে জীবনে মরণে
দিবসের শেষে গোধূলি-লগনে
আসিবে সে পুন খেয়াঘাটে এই
পারের তরণী বেয়ে ?

জীবনায়ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

(৩৪)

শিবপ্রসাদের মৃতদেহ দাহ করিয়া অরুণ যখন বাড়ি ফিরিল, তখন শীতসন্ধ্যার ধূম্রঘন অন্ধকার কলিকাতার পথে ঘনাইয়া আসিয়াছে। ঘোষ-বংশের বৃহৎ প্রাচীন বাড়িটি অরুণের চোখে বড় পুরাতন, ভগ্ন, মলিন মনে হইল।

ম্লানালোকিত স্তব্ধ বাড়িতে অরুণ নিঃশব্দে প্রবেশ করিল।

প্রতিমা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ছুটিয়া আসিল,—দাদা!

এতক্ষণ সে বারান্দার কোণে পথের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল।

প্রতিমার ম্লানমুখের দিকে চাহিয়া অরুণ বলিল, খেয়েছিস কিছু, টুলি?

—হ্যাঁ দাদা, আমি খেয়েছি, তুমি চল ওপরে—

প্রতিমা আর কিছু বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। অরুণের নগ্নপদ, শ্বেতবস্ত্র, উত্তরীয় দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল—দাদা! তাহার আর্তনাদ বৃহৎ অন্ধকার প্রাঙ্গণে মুখর হইয়া উঠিল।

অরুণ প্রতিমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।

—কাঁদিস্ নে টুলি, তুই কাঁদিস্ নে—তাহ'লে—

অরুণের চোখেও জল ভরিয়া আসিল। দুইজনে নীরবে হাত ধরাধরি করিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেল।

তাহারা পর্ব্বতের আড়ালে ছিল, সে পর্ব্বতের আশ্রয় ভাঙিয়া গিয়াছে, সংসারের ঝড়ের মধ্যে স্নেহের বোনটিকে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

শিবপ্রসাদের শূন্য ঘরে প্রদীপ জ্বালাইয়া আসিয়া, ঠাকুমা বলিলেন—অরুণ এলি বাবা!

ঠাকুমার চোখে জল নাই, কৃশ মুখ দৃঢ় হইয়া গিয়াছে। অরুণের মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া তাহার মনে পড়িল, তাহার প্রথম পুত্রের মৃত্যুর কথা। সেও যেন বেশী দিন নয়। বৎসরগুলি কি শীঘ্র কাটিয়া গিয়াছে। বুকটা অসহনীয় বেদনায় মোচড় দিয়া উঠিল। ঠোঁট দুইটি কাঁপিতে লাগিল। কান্নার বেগ দমন করিয়া ঠাকুমা যেন একটু তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন, আর দেরি করিস নে, খাবি আয়। টুলিও তোর জন্যে ভাল ক'রে কিছু খায় নি।

অশৌচের দিনগুলি একটির পর একটি কাটিয়া যাইতে লাগিল। সকলে ভাবিয়াছিল অরুণ বুঝি ভাঙিয়া পড়িবে, তাহার যেরূপ ভাবপ্রবণ স্বভাব।

কোথা হইতে যে অরুণের মনে দৃঢ় শক্তি আসিল অরুণ তাহা দেখিয়া নিজেই অবাক হইয়া গেল। এই ভাববিলাসী কল্পলোকবাসীর মধ্যে যে এমন শোকসহিষ্ণু দৃঢ়চেতা শান্ত মানুষটি লুকাইয়াছিল, তাহা কেহ ভাবিতে পারে নাই।

কাকাকে অরুণ গভীরভাবে ভালবাসিত, শ্রদ্ধা করিত। তাছাড়া গত দুই বৎসরে সাহিত্য, শিল্প, অক্সফোর্ডের জীবন, ইউরোপের সভ্যতা, নানা সমস্যা আলোচনা, গল্পের মধ্যে কাকার সহিত তাহার মানসিক যোগ স্থাপিত হইয়াছিল। বন্ধুরা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়া দেখিল, অরুণ যে কোন গভীর শোক পাইয়াছে, কথায় ব্যবহারে তাহার কোন চিহ্ন নাই। মাঝে মাঝে সে উচ্ছ্বসিত ভাবে হাসিয়া ওঠে, নানা রসিকতা করে, অশৌচ অবস্থার পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। কেহ ভাবিল, অরুণ হৃদয়হীন। কেহ বলিল, এটা তার পোজ্। প্রতিমাও অবাক হইয়া যাইত। সে বুঝিত, এ তাহার সরল স্বাভাবিক দাদা নয়। ভীতিকরুণ নয়নে সে অরুণের দিকে চাহিয়া বলিত, দাদা, অত প'ড়ো না।

—ঠিক বলেছিস্, কি হবে এত পড়ে, পাস হয়ে যাব কোন রকমে, তুই একটা গান গা'ত।

অরুণ প্রতিমাকে কোন হাল্কা সুরের হাল্কা গান গাহিতে বলিত। মৃত্যুশোকপীড়িত বাড়িতে সে ধরণের গান গাওয়া সামাজিকপ্রথাবিরুদ্ধ। প্রতিমা গুন-গুন করিয়া গাহিত, চেঁচাইয়া গাহিতে সাহস হইত না। অরুণকে দেখিয়া তাহার কেমন ভয় করিত। ভাবিত, দাদার কাঁদা দরকার;

তাহার মত দাদা যদি মাঝে মাঝে কাঁদে! মাঝে মাঝে সে দাদার সম্মুখে কাঁদিয়া ফেলিত। প্রথম প্রথম অরুণ তাহাকে কাঁদিতে দেখিলে আদর করিত, বলিত, কাঁদিস্‌নে টুলি; কিন্তু এখন একবার প্রতিমার দিকে করুণভাবে চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়। প্রতিমা এখন লুকাইয়া কাঁদে।

নিজ সত্তার এ পরিবর্ত্তন অরুণ অনুভব করিত। তাহার হৃদয় যেন বরফের মত জমিয়া গিয়াছে, বুকটা বেশ ঠাণ্ডা লাগে, এই ত শান্তি। অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে চিকিৎসক যেমন রোগীকে ক্লোরোফর্ম দ্বারা সংজ্ঞাহীন করিয়া দেন, তেমনই যেন তাহার হৃদয়কে অসাড় করিয়া দিয়াছে। কোন শোক, কোন বেদনা তাহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। শুধু হৃদয় নয়, তাহার মস্তিষ্কের রক্ত-চলাচলও ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। বি-এ পরীক্ষা সন্নিকট। অরুণ পাঠ্যপুস্তক-গুলি পাশে লইয়া ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়া বারান্দায় বসিয়া থাকে, পুস্তকগুলি পড়িতে চেষ্টা করে, কিন্তু মাথায় কিছু যেন ঢুকিতে চায় না। পাঠ বার বার ভুলিয়া যায়।

কেবলমাত্র হৃদয়ের অসাড়তা নয়, গভীর আলস্য। কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি ব্যতীত অরুণ আর কিছু করিতে চাহে না। কিন্তু কর্ত্তব্য-কর্ম্মগুলি অতি নিষ্ঠার সহিত করে।

উমা দুইখানি চিঠি দিয়াছে, উত্তর দিতে হইবে। চিঠি লিখিতে কুঁড়েমি লাগে। বস্তুতঃ কিছু লিখিতে ভাল লাগে না। কিন্তু বন্ধুরা আসিলে অনর্গল বাজে কথা কহিতে তাহার অত্যন্ত উৎসাহ। কলিকাতার নানা মুখরোচক সংবাদগুলি তাহার প্রতিদিন শোনা চাই। সে অবিশ্রান্ত কথা কহিয়া যায়, তাহার শ্রান্তি নাই।

বন্ধুরা বোঝে, এক অস্বাভাবিক উত্তেজনায় অরুণ কথা কহিয়া যাইতেছে, ইহাতে অরুণের শান্তি নাই। কিন্তু একা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে তাহার ভাল লাগে না, সে কিছু ভাবিতে চাহে না। বন্ধুরা যখন না থাকে, তখন সে প্রতিমাকে, ঠাকুমাকে বা সরকারমশাইকে বা মোটর চালককে ডাকিয়া গল্প করিতে বসে।

কিন্তু এত গল্প করিয়াও তাহার মন হাল্কা হয় না। কারণ, মন খুলিয়া সে কাহারও সঙ্গে কথা বলে না।

অরুণ ভাবে, যদি মামীমা কলিকাতায় থাকিতেন! মামীমা থাকিলে, এত লোক ডাকিয়া এত বাজে কথা কহিতে হইত না। এই বুদ্ধিমতী পরমস্নেহশীলা নারীর নিকট সে চিরদিন জীবনের সকল সুখ-দুঃখ, সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেদনার কথা বলিয়াছে; কত তর্ক করিয়াছে, আলোচনা করিয়াছে, মনে দুর্ব্বলতা আসিলে শক্তি পাইয়াছে। আজ এ দুঃখের দিনে তিনি দূরে। দিদির সঙ্গে অনেক কথা হয় বটে, কিন্তু দিদি তাহার মন ঠিক বুঝিতে পারেন না।

রাত্রে খাওয়ার পর দক্ষিণের বড় বারান্দায় বসিয়া অরুণ উমাকে চিঠি লিখিতে বসিল। উমা, কথাটি লিখিয়া সে উমার অনুপম সুন্দর মুখ কল্পনা করিতে চেষ্টা করিল। কল্পনার চক্ষে সে মুখ ভাসিয়া উঠিল না। অতি অস্পষ্ট আবছায়া, যেন কোন্ স্বপ্নে-দেখা ভুলিয়া যাওয়া মুখ। উমার মুখ সে ভুলিয়া গিয়াছে!

অরুণ একটি সিগারেট ধরাইল। এখন সে ভয়ঙ্কর সিগারেট খায়।

চিঠির কাগজটি সে ছিঁড়িয়া ফেলিল। বারান্দায় খানিক ক্ষণ পায়চারি করিল। অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটি ফেলিয়া আর একটি নূতন সিগারেট ধরাইল।

মাঘ মাসের শেষে বসন্তের মৃদু বাতাস বহিতেছে। নারিকেল বৃক্ষগুলির আড়ালে চতুর্দ্দশীর চন্দ্র।

হয়ত সে আর উমাকে ভালবাসে না। হয়ত তাহাদের প্রেম প্রথম যৌবনের রঙীন স্বপ্ন, যৌবনের অলীক স্বপ্ন, সে স্বপ্ন বুঝি টুটিয়া গিয়াছে।

শ্রান্ত হইয়া অরুণ চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সে ভাবিতে চায় না। কলেজের কোন পাঠ্যপুস্তক আনিয়া পড়িবে স্থির করিল। কিন্তু ঘরে গিয়া বই খুঁজিয়া আনিবার শক্তিও বুঝি তাহার নাই।

আর একটি সিগারেট ধরাইল। আর একটি চিঠির কাগজ লইয়া সে মামীমাকে চিঠি লিখিতে বসিল।

লিখিতে লিখিতে অরুণ ঘুমাইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। প্রস্ফুটিত জুঁইফুলের মত শুভ্র, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাধারায় বারান্দা ভরিয়া গিয়াছে। লিখিবার টেবিলে, চেয়ারে, চোখে চন্দ্রালোকের বন্যা। স্তব্ধ নিশীথিনী তরুমর্ম্মরে শিহরিয়া উঠিতেছে; স্বচ্ছ নীল-স্ফটিকের মত নীলাকাশে কয়েকটি লঘু শুভ্রমেঘ, তাহাদের

মধ্যে চন্দ্র স্বপ্নতরীর মত ভাসিয়া চলিয়াছে। জোয়ারের পদ্মার মত জ্যোৎস্না চারিদিকে থম্‌থম্ করিতেছে।

অরুণ শিহরিয়া জাগিয়া উঠিল। শুভ্র চন্দ্রের দিকে সে চাহিতে পারিল না। চাঁদের আলো গাছের সরু লম্বা কচি পাতাগুলিতে চিকিমিকি করিতেছে; গাছের পাতাগুলির দিকে সে মুগ্ধনয়নে চাহিল।

বুকে একটা ব্যথা খচ্ করিয়া বাজে। দেহের রক্তচলাচল আর মৃদু স্তিমিত নয়, বড় দ্রুত।

জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া অরুণের কান্না আসিল। ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল, মায়ের কোলে মুখ গুঁজিয়া ছোট শিশু যেমন করিয়া কাঁদে।

অরুণ বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। বরফের মত জমাট হৃদয় এবার গলিয়া আসিল। অশ্রুসিক্ত নয়নে সম্মুখে উমার মুখ ভাসিয়া উঠিল।

না, উমা তাহাকে ভোলে নাই। উমাকে সে ভালবাসে। তাহার হৃদয় বড় হাল্কা বোধ হইল। ইচ্ছা করিল গান গাহিয়া ওঠে। অথবা চীৎকার করিয়া সবাইকে জাগাইয়া তোলে, বলে, দেখ, দেখ, এ কি সুন্দরী রাত্রি, এ কি লাবণ্যে পরিপূর্ণ বিশ্বসংসার।

বহুক্ষণ সে বারান্দায় পায়চারি করিল, তার পর জ্যোৎস্নার আলোয় ইজি চেয়ার টানিয়া শুইয়া পড়িল।

বহু দিন পরে অরুণ শান্তিতে ঘুমাইল।

(৩৫)

শ্রাদ্ধ নির্বিঘ্নে চুকিয়া গেল। অরুণের ইচ্ছা ছিল বেশ জাঁকজমকের সহিত শ্রাদ্ধ করে। ঠাকুমা তাহা করিতে দিলেন না। সরকারমশাই জানাইলেন তহবিল অধিক নাই।

অর্থ সম্বন্ধে অরুণকে কোনদিন ভাবিতে হয় নাই। যখন যা টাকার দরকার হইয়াছে, সরকার-মহাশয়ের নিকট চাহিলেই পাইয়াছে। শিবপ্রসাদের যেমন খরচে হাত ছিল, অরুণকে অর্থ দিবার সম্বন্ধে তিনি কখনও কৃপণতা করেন নাই।

অর্থের যে অনটন হইতে পারে, খাটিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা দরকার হইতে পারে, এ-সব কথা অরুণ কোনদিন ভাবে নাই। ব্যারিষ্টার মিষ্টার এ-সি-সেনের সহিত দেখা করিতে গিয়া তাহার নূতন সাংসারিক অভিজ্ঞতা হইল।

মিষ্টার সেন শিবপ্রসাদের সহপাঠী ও বন্ধু। তাঁহারা এক সঙ্গে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িয়াছেন, এক সঙ্গে লিন্‌কন্‌স্ ইন্‌সে ডিনার খাইয়াছেন। হাইকোর্টে তাঁহার খুব ভাল প্র্যাকটিস্।

শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেলে, মিষ্টার সেন অরুণকে চিঠি লিখিলেন তাঁহার সহিত দেখা করিতে। কারণ তিনি শিবপ্রসাদের উইলের এগ্‌জিকিউটর।

বালীগঞ্জের নানা অজানা গলি ঘুরিয়া অরুণ যখন মিষ্টার সেনের বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দরোয়ান তাহাকে এক বৃহৎ ঘরে বসাইল। মোটা মোটা ল' রিপোর্টস ও আইনের বই ভরা সিলিং-উঁচু আলমারির সারিতে ঘরটি ভরা, কোথাও একটু দেওয়াল দেখা যায় না। অরুণ অবাক হইয়া চাহিল, পৃথিবীতে এত আইনের পুস্তক আছে! আইনকে যতদূর সম্ভব জটিল করিয়া তুলিবার আশ্চর্য্যকর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কিছু ক্ষণ পরে একটি মুসলমান বেহারা অরুণকে আর-একটি ঘরে লইয়া গেল। সে ঘরটিও লাল নীল নানা বর্ণের চামড়া-বাঁধানো মোটা মোটা পুস্তকে পূর্ণ। মধ্যে একটি বড় টেবিল। তাহার একদিকে রিভলভিং চেয়ারে মিষ্টার সেন বসিয়া আছেন, ঘরে প্রবেশ করিয়া অরুণ তাঁহাকে দেখিতেই পায় নাই।

—ঘোষ, তুমি আধঘণ্টা লেট।

গম্ভীর শব্দে একটু চমকিয়া অরুণ মিষ্টার সেনকে দেখিতে পাইল। শ্যামবর্ণ, দাড়ি-গোঁফ-কামানো মুখে যেমন বুদ্ধির দীপ্তি তেমনি ঔদ্ধত্য ও কর্তৃত্বের ভাব; খাঁড়ার মত উঁচু নাকে মোটা কাঁচকড়ার চশমা। চওড়া কপাল চক্ চক্ করিতেছে।

অরুণ নমস্কার করিতে ভুলিয়া গেল। লজ্জিত হইয়া বলিল, বাড়িটা খুঁজতে দেরি হয়ে গেল।

মিষ্টার সেন দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বসিয়া থাকিলে তাঁহাকে যত লম্বা মনে হইতেছিল, দাঁড়াইলে তত লম্বা মনে হয় না।

হ্যাণ্ড-শেক্ করিবার জন্য মিষ্টার সেন হাত বাড়াইয়া

দিলেন। অরুণ যন্ত্রচালিতের মত তাঁহার হাত ধরিল। ঠাণ্ডা হাত কিন্তু নরম।

—ব'স, ওই চেয়ারে।

দুই জনে মুখোমুখি বসিলে, মিষ্টার সেন বলিলেন, শিবু আমার বিশেষ বন্ধু ছিল, তার মৃত্যুতে আমি সত্যই বড় দুঃখিত হয়েছি। শ্রাদ্ধে যেতে পারি নি ব'লে আমায় ক্ষমা করবে, সেদিন একটা বড় কেসের কন্‌সাল্‌টেশ্যন্ পড়ে গেল।

—আপনার কথা আমি কাকার মুখে শুনেছি।

—কাজের কথাগুলি বলে নি। আমি তোমাকে বেশী সময় দিতে পারব না। তোমার কাকা তোমাদের বাড়িটা মর্টগেজ দিয়ে গেছেন, জান বোধ হয়।

অরুণ আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল, মর্টগেজ? মর্টগেজ মানে কি? আমাদের বাড়ি মর্টগেজ?

সে ধীরে বলিল—মর্টগেজ? না, আমরা কিছুই জানি না।

—মর্টগেজ মানে বোঝ নিশ্চয়।

—মর্টগেজ! হ্যাঁ, তবে আইনে যদি বিশেষ কোন অর্থ থাকে—

সেন ডানদিকের পুস্তকের র‍্যাক হইতে একটি মোটা বই টানিয়া লইলেন। সেটা না খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন, তুমি কি পড়?

—এ বৎসর বি-এ পরীক্ষা দেব।

—ও, ল পড় না।—আচ্ছা, বন্ধক বোঝ ত, লোকে সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে টাকা ধার করে।

ঠিক না বুঝিতে পারিলেও অরুণ বলিল, হাঁ।

—বেশ! তোমার কাকা তোমাদের বাড়ি বন্ধক দিয়ে টাকা ধার করেছেন, এক মাড়োয়ারীর কাছ থেকে।

—আমাদের বাড়ি? সমস্ত বাড়ি!

—না, সমস্ত বাড়ি নয়, বাড়িতে তাঁর অংশ বন্ধক দিয়েছেন; তোমার অংশ ঠিক আছে।

—এখন আমাদের কি করতে হবে?

—মাড়োয়ারী এবার টাকার তাগাদা করবে, বোধ হয় নালিশও করবে। তাছাড়া তোমার কাকার অনেক দেনা আছে।

—সে দেনা আমরা শোধ করব।

—আইনতঃ সব দেনা তোমাদের শুধতে হবে না।

—না, কাকা যদি কারুর কাছে ঋণ ক'রে গিয়ে থাকেন, সে টাকা আমাদের শোধ দেওয়া উচিত।

—আচ্ছা কি উচিত, সে আলোচনা পরে হবে, আমি এখন তোমাকে তোমাদের বিষয়-সম্পত্তির অবস্থা সম্বন্ধে জানাতে চাই। তুমি বোধ হয় কিছুই জান না।

—না আমি কিছুই জানি না।

—আজ দেরি করে এলে, আচ্ছা, আসছে রবিবার বিকেলে ঠিক সাড়ে চারটার সময় এস, আমার সঙ্গে চা খাবে, আমার স্ত্রীও তোমার সম্বন্ধে ইণ্টারেষ্টেড, তার সঙ্গেও আলাপ হবে। দেরি ক'রো না।

—না, দেরি হবে না। কিন্তু বাড়ি কি আমাদের বেচতে হবে?

—না, সমস্ত বাড়ি বোধ হয় বেচতে হবে না, তবে খানিকটা বেচতে হবে। তোমাদের ক্যাস টাকা কত আছে জান?

—আমি জানি না।

—আমার ধারণা, খুব বেশী নেই। বাড়ির পাশের খানিকটা জমি বেচলে বোধ হয় হবে। আচ্ছা, আজ গুড-নাইট্।

মিষ্টার সেনের সহিত হাণ্ড-শেক করিয়া আইন পুস্তক-ভরা ঘরগুলি পার হইয়া অরুণ যখন পথে আসিয়া পড়িল, তাহার মাথা টলিতে লাগিল।

তাহাদের এই প্রাচীন পিতৃপুরুষের প্রিয় বাড়ি বেচিতে হইবে? কাকা এ কি কাণ্ড করিয়া গিয়াছেন?

যদি বেচিতে হয়, ঠাকুমা তাহা হইলে বাঁচিবেন না। সরকার-মহাশয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে। ঠাকুমা বা টুলিকে এখন কোন কথা বলা হইবে না। আগামী রবিবার শীঘ্র আসিতে হইবে। মিষ্টার সেনকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে, বাড়ি বেচা হইবে না। তিনি এত বড় ব্যারিষ্টার, নিশ্চয় কোন উপায় করিয়া দিবেন।

নানা বৈষয়িক ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে অরুণ চলিল। একবার সে চমকিয়া চাহিল,—তিন বৎসর পূর্ব্বে সোনার স্বপ্ন-প্রাসাদ খুঁজিতে বোধ হয় সে এই পথগুলিতেই ঘুরিয়াছে। সে "স্বপ্ন-প্রাসাদ" সে কি কোনদিন খুঁজিয়া পাইবে না?

(৩৬)

বি-এ পরীক্ষা হইয়া গেল। অরুণের পরীক্ষা ভালই হইল। পরীক্ষার পূর্ব্বের মাস সে ভয়ঙ্কর পড়িয়াছে। ভাল করিয়া পরীক্ষা পাসের জন্য নয়, সংসারের নানা চিন্তা এড়াইবার জন্য, দুঃখ ভুলিয়া থাকিবার জন্য, পাঠ্য পুস্তক ছিল তাহার আশ্রয়।

পরীক্ষার পর অরুণের জীবন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। নানা চিন্তা মাথায় ভিড় করিয়া আসে। সব সময়ে কেমন ভয় করে। স্বাস্থ্যও ভাঙিয়া গিয়াছে। স্নায়বিক উত্তেজনায় সে সকল কাজ করিয়া যায়।

অরুণ বুঝিল, ফার্ষ্ট ইয়ারে তাহার যেরূপ ন্যারভাস ব্রেকডাউন হইয়াছিল, বর্ত্তমান দেহ-মনের এ ভাঙন তাহার চেয়ে গুরুতর। তখন অনন্ত নীল সমুদ্রের সঙ্গলাভ করিয়া সে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। আর ছিল মল্লিকা মল্লিক।

মল্লিকা! সে এখন কোথায়, কত বড় হইয়াছে, কে জানে, হয়ত তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ওইরূপ একটি প্রাণের খুশীভরা হাস্যকৌতুকময়ীর সঙ্গ পাইলে বাঁচিয়া থাকার উদ্দাম উল্লাসে আবার মাতিয়া উঠিতে পারে।

মামীমা সিমলা হইতে লিখিলেন, অরুণ তোমার চিঠি পড়ে মন বড্ড খারাপ হ'ল, তুমি ভয়ানক 'ক্রেড' করছ, তার পর পরীক্ষার খাটুনিতে তোমার শরীর খারাপ হয়েছে। তুমি কিছু দিনের জন্য সিমলায় এস, উমাকেও নিয়ে আসবে। তোমার একটা চেঞ্জ বিশেষ দরকার।

চন্দ্রা লিখিল, অরুণদা, সিমলা কি চমৎকার জায়গা! তুমি শিগ্‌গীর এস, উমাদিকে আনতে ভুল না। দাদার খুব ইচ্ছে। তুমি না এলে সত্যি ভয়ঙ্কর রাগ করব, আর এলে যে কি ভয়ঙ্কর খুশী হব, তা তোমায় জানাতে পাচ্ছি না। তোমার জন্যে আমার বড় মন খারাপ।

অরুণ মামীমাকে চিঠির উত্তরে লিখিল, ঠাকুমাকে ফেলে আমি এ সময় যেতে পারব না। কলকাতায় ভয়ানক গরম পড়েছে বলে আমার কেমন ক্লান্তি লাগে, আমার শরীর কিছু খারাপ নয়। বর্ষা আরম্ভ হ'লেই আর কষ্ট হবে না।

না যাইবার আসল কারণ অরুণ লিখিল না। অরুণের কেমন ভয় করে, তাহারা এ বাড়ি ছাড়িয়া গেলে, হয়ত পাওনাদারেরা এ বাড়ি আসিয়া দখল করিবে, হয়ত এ বাড়ি বিক্রী হইয়া যাইবে। এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে তাহার কেমন ভয় হয়।

শিবপ্রসাদের মৃত্যুর পর অশৌচাবস্থায় অরুণের দেহ-মন যেমন নিস্তেজ প্রাণহীন হইয়া গিয়াছিল, সেরূপ অবস্থা হইলে হয়ত ভাল হইত। কিন্তু পরীক্ষার জন্য অত্যধিক পাঠের ফলে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। মন স্থির, শান্ত থাকিতে চায় না, সে সর্ব্বক্ষণ ভাবিতেছে। নানা চিন্তার ছিন্নসূত্রের জালে মাথায় জট পাকাইয়া ওঠে। সমস্ত ক্ষণ একটা মানসিক চাঞ্চল্য, উদ্বেগ। স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না, বন্ধুদের সহিত গল্প করিতেও মন বসে না।

সকল বিষয়ে তাহার ভয় করে। একদিন প্রতিমার সামান্য একটু জ্বর হইল। অরুণ তিন জন ডাক্তার ডাকিয়া আনিল।

যদি প্রতিমার কোন ভারী অসুখ হয়, যদি প্রতিমা মরিয়া যায়! প্রতিমার মৃত্যুর কথা কল্পনা করিতে সে শিহরিয়া ওঠে। মাথা যেন ঘুরিতে থাকে।

কিন্তু অসম্ভব নয় ত। এই জ্বর টাইফয়েড হইতে পারে। মৃত্যু নির্ম্মম, মৃত্যু ত বিচার করে না, বিবেচনা করে না।

অরুণ স্তব্ধ হইয়া বসে। প্রতিমার মৃত্যুর কথা সে ভাবিতে পারে না।

অরুণ অনুভব করে, সে একা, বড় একা। জীবনের পথ একা-চলার পথ। প্রতি আত্মা সঙ্গীহীন, একাকী, আপন দুঃখের ভার বহন করিয়া চলিয়াছে। জীবনের মর্ম্মস্থলে যে বেদনা, সে বেদনা একাকী সহ্য করিতে হইবে, বন্ধুরা যেখানে সাহায্য করিতে পারে না, সান্ত্বনা দিতে পারে না।

কোন সকালে সে চাকরদের ডাকিয়া হৈ চৈ করিয়া বাড়ি পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। কাকার লাইব্রেরী, একতলার পুরাতন লাইব্রেরীর প্রাচীন বইগুলি ঝাড়িতে সাজাইতে আরম্ভ করে। দ্বিপ্রহরে গ্রীষ্মের তাপে সে শ্রান্ত হইয়া পড়ে। খাওয়ার পর বারান্দায় ইজি-চেয়ারে শুইয়া থাকে। বাহিরে রৌদ্র খাঁ খাঁ করে। গ্রীষ্মের মধ্যাকাশের এ প্রখর দীপ্তি বড় ভাল লাগে। গাছের পাতাগুলি ঝিক্‌মিক্ করিয়া বাতাসে দোলে: সমুদ্রের তরঙ্গগুলির উপর সূর্য্যালোক নাচিতেছে। বাগানের গাছগুলিকে দেখিয়া তাহার

মন খারাপ হইয়া যায়। হয়ত এ বাগান বেচিয়া দিতে হইবে। এই সুন্দর পুরাতন গাছগুলি কাটিয়া কোন মাড়োয়ারী বাড়ি করিবে। হয়ত এখানে চালের কল বা তেলের কল বসিবে। সারাক্ষণ ঘড়ঘড় শব্দ হইবে। সেই শব্দে ঘোষ-বংশের আদিপুরুষগণ চমকিয়া শিহরিয়া উঠিবেন।

ক্লান্ত হইয়া অরুণ ঘুমাইয়া পড়ে। দুপুরে অনেক সময় তাহার ঘুম হয় কিন্তু রাত্রে তাহার ঘুম হয় না।

তাহার ঘরে মায়ের বৃহৎ খাটে সে রাত্রে শুইতে পারে না। ঘরের ভেতর কেমন যেন দম আটকাইয়া আসে। পঙ্কের কাজ-করা পুরাতন বিবর্ণ দেওয়ালের উপর নিদ্রাহীন নয়নের সম্মুখে নানা ছায়ামূর্ত্তি নাচিয়া ভাসিয়া যায়। মনের যে গোপন গৃহে তাহার বিশ বৎসরের জীবনের নানা স্মৃতি সঞ্চিত হইয়াছে, সেই রহস্যময় অন্ধকার ঘরের দ্বার খুলিয়া যায়, লীলাচঞ্চলা কিশোরীদের মত কাহারা যেন নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া আসে। কত টুকরো হাসি, ছড়ানো কথা, অপরূপ ঘটনা, অসামান্য কণ্ঠস্বর। কোন শরৎ-প্রাতে উমার একটু চাউনি; মল্লিকা বলিয়াছিল, মল্লিকা মল্লিক যে হৃদয়হীনা নয়, সেই কথা তোমায় জানিয়ে গেলুম; এক গভীর রাতে কাকা অক্সফোর্ডে নৌকা-বাওয়ার কি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছিলেন; পদ্মার একটি শাখা-নদী দিয়া একবার তাহারা বজরা করিয়া সাত দিন চলিয়াছিল, মা কি সুন্দর ইলিশ মাছ রাঁধিয়াছিলেন, আশ্বিন-মাসের ভরানদীর দিগন্তব্যাপী শান্ত জলরাশিতে সূর্য্যের আলো চন্দ্রের আলো ঝলমল করিত, সে যেন এক মায়াপুরী। কিন্তু এই রঙীন মধুর নৃত্যময়ী মূর্ত্তিগুলি যে নিমেষে মিলাইয়া যায়, তাহাদের পিছনে আসে ঘন কাল ছায়ামূর্ত্তি, দুরন্ত দানব-বালকদের মত। নানা চিন্তা, ভয়, অর্থহীন ভাবনা।

অরুণ আর ঘরে থাকিতে পারে না। দক্ষিণের বারান্দায় ইজি-চেয়ারে শুইয়া পড়ে। তারাভরা স্নিগ্ধনীল আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে। বাগানের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করে। খোলা আকাশের দিকে চাহিয়া মন শান্ত হয়। মনের যে ভাবনাগুলি ঘরের দেওয়ালে মাথা ঠোকাঠুকি করিয়া মরিতেছিল, তাহারা মুক্তাকাশে ছাড়া পাইয়া নীল দিগন্তে ছুটিয়া চলিয়া যায়।

অরুণ সেজন্য আর ঘরে শোয় না, বারান্দায় একটি ছোট তক্তাপোষে শুইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। রাত্রির তারাভরা মুক্তাকাশ না দেখিলে তাহার চোখে ঘুম আসে না।

গভীর রাত্রে অরুণের ঘুম ভাঙিয়া গেল। পাণ্ডুর আকাশে ম্লান জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। জাগিয়া দেখিল, ঝড়ের মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে, রুদ্রের ডমরুধ্বনির মত জলভরা ঘনকৃষ্ণমেঘদলের গুরু গুরু শব্দ, প্রণয়চঞ্চলা রূপালী নাগিনীদের মত বিদ্যুতের ঝিলিক, কালো মেঘের পাশে নীলাকাশ জলজল করিতেছে; কালো মেঘস্তূপের মধ্যে চন্দ্র বার বার হারাইয়া যাইতেছে, পদ্মার তুফানে ছোট নৌকার মত।

শুভ্র গভীর রাত্রে ঝড় আসিতেছে! অরুণ লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। চারি দিক নিদ্রিত, নিঝুম; মাঝে মাঝে মেঘগর্জ্জন। বহুদিন পরে অরুণ অন্তরে জীবনের সহজ উল্লাস অনুভব করিল।

বড় বড় ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল, পথের ধুলা উড়াইয়া গাছগুলি দোলাইয়া নিদ্রিত নগর কাঁপাইয়া ঝড় আসিল।

বৃষ্টির অবিরাম আকুল ধারা! কি স্নিগ্ধ কি কল্লোলময় বারিবর্ষণ!

অরুণের দেহের শিরা-উপশিরায় রক্তস্রোতে উদ্দাম হইয়া উঠিল। বৃষ্টি-পড়ার সহিত তাহার দেহের রক্তচলাচলের কোন নিগূঢ় গভীর যোগ আছে। হৃদয় নাচিয়া উঠে। যেন যুগে যুগে জন্মে জন্মে এই মাটির পৃথিবীতে সে বার বার বর্ষার বারিধারা আকণ্ঠ পান করিয়াছে। আনন্দময় নব নব প্রাণের অভিব্যক্তি পথের বাঁকে বাঁকে, উদ্ভিদ্‌জন্ম জীবজন্মের স্তরে স্তরে পৃথিবীর নীলাকাশ হইতে জলধারায় স্নাত হইয়া পল্লবিত, মুঞ্জরিত, হিল্লোলিত, উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে।

সিঁড়ি দিয়া অরুণ বাগানে নামিয়া গেল। বাগানে ভিজিয়া সুখ হইল না। গেট খুলিয়া পথে বাহির হইয়া গেল।

পথ জনহীন, কিন্তু ঝঞ্চার আকুল বারিধারা সমস্ত পথ ভরিয়া তুলিয়াছে। অরুণ আপনাকে একাকী অনুভব করিল না, ঝড়কে তাহার একা পথ চলার সাথী পাইল। ঝঞ্চার সঙ্গলাভ করিয়া সে উল্লসিত অন্তরে পথের পর পথ অতিক্রম করিয়া চলিল।

ক্রমশঃ

আচার্য্য সর্ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্—ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার, এম-এ, পিএইচ-ডি, বার-এট-ল প্রণীত। প্রকাশক দি বুক কোম্পানী, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

ইহাতে অধ্যাপক সর্ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জীবন, চরিত্র, বিদ্যাবত্তা, অধ্যাপননিপুণতা ও বাগ্মিতা লেখকের মত অনুসারে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে বহু তথ্য জানিতে পারা যায়।

ঋষি প্রতাপচন্দ্র—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন নিয়োগী, এম-এ. প্রণীত। মূল্য বার আনা। আর্ট প্রেস, কলিকাতা।

এই সুলিখিত ও মনোজ্ঞ পুস্তকখানিতে লেখক স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের একটি বিশদ চিত্র অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মজুমদার মহাশয়ের ইংরেজী বক্তৃতা শোনা আমাদের ছাত্রজীবনের এবং কিছুকাল তৎপরবর্ত্তী কর্ম্মজীবনের একটি উচ্চ অধিকার ছিল। যেমন ছিল তাঁহার ভাব ও চিন্তা, তেমনি তাঁহার সুনির্ব্বাচিত শব্দসম্ভার, এবং তেমনি তাঁহার ধীর শান্ত বাগ্মিতা। তাঁহার রচিত পুস্তকাবলী পড়িবার সময় মন উচ্চতর লোকে বিচরণ করে। তাঁহার বাংলা উপাসনা ও উপদেশও আমরা শুনিয়াছিলাম। তাহা কবিত্বপূর্ণ এবং হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক করিত। তাঁহার যে দুটি ফোটোগ্রাফ পুস্তকখানিতে দেওয়া হইয়াছে, দেখিলেই তাঁহার বলিবার ধরণ চেনা যায় ও তাঁহাকে মনে পড়ে। আজকালকার যুবকেরা এবং অনেক প্রৌঢ় ব্যক্তিও হয়ত জানেন না এই ভক্ত সাধু পুরুষের দ্বারা বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের মত কত মনীষীও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। কলেজের ছাত্রদের অন্ততঃ এই তথ্যটি জানা উচিত যে, প্রতাপচন্দ্রই সোসাইটি ফর দি হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেন নাম দিয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট স্থাপন করেন।

ঋণবিধি—দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য ৵০। ৮৪ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই বহিটি কি সাধারণ গৃহস্থ, কি জমিদার, কি ব্যবসাদার, সকলেরই পড়া উচিত।

দানবিধি—দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য ৵০। No right reserved. ৮৪ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই সারগর্ভ পুস্তিকাটিতে পুণ্য, পরোপকার, দান, শিক্ষাদান ও সস্তায় বিক্রয়কার্য্যের তুলনা, দানবিচার, দানপ্রণালী, দানের উপায়, হিতসাধিনী সমিতি, ব্রাহ্মণকে দান, সাধুকে দান, তীর্থদান ও দানগ্রহণ—এই বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।

চাউলের কথা—শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রণীত; আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। মূল্য দুই পয়সা মাত্র। খাদি প্রতিষ্ঠান। ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বাঙালার তণ্ডুলভোজী। তাঁহারা এই পুস্তকটি পড়িয়া চাউল নির্ব্বাচন করিলে উপকৃত হইবেন।

বাংলা দশমিক বর্গীকরণ—বা Melvil প্রবর্ত্তিত Decimal classification অনুসারে বাংলা লাইব্রেরী-গ্রন্থ বর্গীকরণ পদ্ধতি। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য এক টাকা। শান্তিনিকেতনে লেখকের নিকট পাওয়া যায়।

বাংলা ভাষার বহি বাড়িতেছে, সঙ্গে লাইব্রেরীও বাড়িতেছে। গ্রন্থাগার কেমন করিয়া সাজাইলে তাহা পরিচালক ও পাঠকদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়, বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক প্রভাত বাবু এই পুস্তকে তাহা লিখিয়াছেন। ইহা পারিবারিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানিক ও সাধারণ পুস্তকালয়ের কর্ম্মকর্ত্তাদের কাজে লাগিবে। ইহার সমাদর ও ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

রামমোহন রায়ের বিরচিত "বেদান্তসার"—রামমোহন স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত।

রামমোহনের "ক্ষুদ্রপত্রী," "প্রার্থনাপত্র," "অনুষ্ঠান" ইত্যাদি। রামমোহন স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত—এই বহি দুখানি সুসম্পাদিত। মূল্য ও প্রাপ্তিস্থান লেখা নাই। শুনিয়াছি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক শ্রীদেবকুমার দত্তের দ্বারা এগুলি সম্পাদিত ও প্রকাশিত। "বেদান্তসার" গ্রন্থের রামমোহনের ভাষাকে কিছু আধুনিক রূপ দেওয়া হইয়াছে।

সাধুসমাগম—নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন বিবৃত। মূল্য, কাগজের মলাট ||০, কাপড়ে বাঁধান ৸০। নববিধান পাব্লিকেশন কমিটি, ৮৯ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ইহার প্রথমাংশে মুসা সক্রেটিস শাক্য ঋষিগণ খ্রীষ্ট মোহম্মদ চৈতন্য ও বিজ্ঞানবিৎ সমাগম বিষয়ক উপদেশ আছে। উত্তরাংশের উপদেশগুলির বিষয়—জগজ্জননী ও তাঁহার সাধুসন্তানগণ, মহাজনগণ, স্বর্গীয় সাধুদের জীবন, সাধু-সম্মান, সাধু মনীষিগণের সমাগম ও সাধুদর্শন। কেশবচন্দ্রের নববিধান বুঝিবার জন্য এই পুস্তকখানি পড়া আবশ্যক। পাঠকেরা উপকৃত হইবেন।

ব্রহ্মোপাসনায় শ্রুতিমন্ত্র—ঢাকা উয়ারী হইতে শ্রীমথুরানাথ গুহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা। ইহাতে ৮৪টি শ্রুতিমন্ত্র প্রামাণিক বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ সহ সঙ্কলিত হইয়াছে। তৎসমুদয় ১২ খানি প্রামাণিক উপনিষদ হইতে গৃহীত।

উপনিষদের মন্ত্রসমূহের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা অনাবশ্যক।

"অভ্যাসেন বৈরাগ্যেন." "ছেলেমেয়েদের ধর্ম্মশিক্ষা." "Religious Education of Children," এবং "ধর্ম্মসাধনে শ্রুতিস্মৃতি ও পুরাণ"।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত কর্ত্তৃক লিখিত এই সদুপদেশপূর্ণ পুস্তিকাগুলি কলিকাতার কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ ২১০-৬ সংখ্যক ভবন হইতে বিতরিত হয়।

র. চ.

গল্পগুচ্ছ—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। প্রতিখণ্ডের মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

বাংলা সাহিত্যে চিরপরিচিত গল্পগুচ্ছের এই সংস্করণটি বিশ্বভারতী সংস্করণ নামে পরিচিত। বাঙালীর কাছে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের নূতন পরিচয় কিংবা সমালোচনা উপস্থিত করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ২১০০ কপি করিয়া মুদ্রিত গল্পগুচ্ছের এই সংস্করণ একবার শেষ হইতে সাত বছর লাগিয়াছে দেখিয়া মনে হয় গল্পগুচ্ছের সহিত অপরিচিত বাঙালীর সংখ্যা বাংলা দেশে নিতান্ত কম নয়। প্রথম খণ্ডে পোষ্টমাষ্টার, খোকাবাবু, কঙ্কাল, একরাত্রি, মহামায়া, কাবুলি-ওয়ালা, জীবিত ও মৃত প্রভৃতি পঁচিশটি বিশ্ববিখ্যাত অমূল্য গল্প ছাড়া 'গল্প চারিটি' ও 'গল্প সপ্তকে'র সমস্ত গল্প আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে নিশীথে, মণিহারা প্রভৃতি আটাশটি গল্প। তিনটি খণ্ডে রয়াল সাইজের ১১১০ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া বাংলা গল্পভাণ্ডারের এই শ্রেষ্ঠ রত্নগুলি সজ্জিত। এত অল্পমূল্যেও তাহা বিক্রয় হইতে সাত বৎসর লাগে ইহা বাঙালী জাতির উন্নতির ইতিহাসে লিখিয়া রাখিবার কথা।

চতুরঙ্গ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

'সবুজপত্রে' প্রকাশিত 'জ্যাঠামশায়' 'শচীশ' 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস' এই চারিটি গল্পই চতুরঙ্গ উপন্যাসের চারি অংশ। সবুজপত্রের যুগে এই গল্পগুলি লইয়া বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে নাড়াচাড়া প্রবল হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া দামিনী, লীলানন্দ স্বামী ও জ্যাঠামহাশয়ের চরিত্রের রহস্য ও বৈশিষ্ট্য লইয়া অনেক সাহিত্যের আসর তর্কবিতর্কে সরগরম হইয়া উঠিত। কিন্তু আজকালকার নবীন পাঠকদের চতুরঙ্গ পড়িতে প্রায় দেখা যায় না। বইখানি কেমন যেন হঠাৎ চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। ইহা রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য-রচনায় যে একটা নূতন ধারা আনিয়াছিল সে-কথা আধুনিক পাঠকদের আর একবার মনে করাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে। অনেক আধুনিক লেখকও হয়ত ভুলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহাদের রচনার নূতনতর সুরের জন্যও তাঁহারা রবীন্দ্রনাথেরই নিকট ঋণী।

এই বিশ্বভারতী সংস্করণে প্রথম সংস্করণের অনেক বর্জিত অংশ পরিশিষ্ট রূপে দেওয়া হইয়াছে। বইখানির ছাপা বাঁধাই উপহার দিবার মত সুন্দর।

সঞ্চয়িতা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৪৲।

রবীন্দ্রনাথের বিরাট কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে শ্রেষ্ঠরত্নগুলি সংগ্রহ করিয়া একটি স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশ করিবার ইচ্ছা অনেকেরই ছিল। সর্ব্বপ্রথমে বোধ হয় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই উদ্দেশ্যে চয়নিকা প্রকাশ করেন। তাহার পর অনেকের মিলিত চেষ্টায় বহু বৎসর পরে আর একটি বৃহত্তর ও কিছু ভিন্ন রকম চয়নিকা প্রকাশিত হয়। তাহাই এখনও বাজারে চলিতেছে। সঞ্চয়িতা রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতের সঙ্কলন। ইহাতে ১২৮৮ সালে লিখিত সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩৩৯ সালে লিখিত পুনশ্চ পর্য্যন্ত কাব্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। ৫০ বৎসরের প্রায় তিন শত সুপরিচিত কবিতা ও গান রয়াল সাইজের ৮১৩ পৃষ্ঠাব্যাপী এই গ্রন্থখানিতে একত্রে গ্রথিত হইয়াছে। নিজের রচনার শ্রেষ্ঠ বিচারক তিনি নিজেই হইতে পারেন কিনা এ-বিষয়ে কবির মনে সন্দেহ আছে। কিন্তু তবুও তিনি নিজেই এ ভার গ্রহণ করিয়াছেন কেন তাহা তাঁহার কথাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

"যাঁরা আমার কবিতা প্রকাশ করেন অনেক দিন থেকে তাঁদের সম্বন্ধে এই অনুভব করছি যে, আমার অল্প বয়সের যে সকল রচনা স্খলিত পদে চল্‌তে আরম্ভ করেছে মাত্র, যারা ঠিক কবিতার সীমায় এসে পৌঁছয় নি, আমার গ্রন্থাবলীতে তাদের স্থান দেওয়া আমার প্রতি অবিচার।"

তাঁহার মতে সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত ও ছবি ও গানের লেখা-গুলি কবিতার রূপ পায় নাই। তাহাদের নিজ কাব্যগ্রন্থের অংশরূপে স্বীকার করিতে এবং তাহার অপরিণত অবস্থার ত্রুটির জন্য দায়ী হইতে তিনি চান না। এই অধিকার সাহিত্য-জগতকে জানাইয়া কেবল ইতিহাস রক্ষার খাতিরে এই যুগের সাতটি মাত্র কবিতাকে তিনি স্বীকার করিয়াছেন এবং ইতিহাস রক্ষার খাতিরেই তাহাদের সঞ্চয়িতাতে স্থান দিয়াছেন।

নিজ-রচনার শ্রেষ্ঠ বিচারক কাহারও পক্ষেই হওয়া সম্ভব নয় এ-কথা সর্ব্বক্ষেত্রে মানিয়া লওয়া যায় না। সঞ্চয়িতার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে সমস্ত কাব্যগ্রন্থ যেন একসঙ্গে চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতেছে। যদিও ইহা সঙ্কলন মাত্র তবু গ্রন্থানুক্রমিক ভাবে করা বলিয়া কবিতাগুলির প্রথম লাইনগুলি চোখে পড়িবামাত্র কাব্যগ্রন্থের উৎসমুখ হইতে প্রবহমান সমস্ত ধারাটি যেন স্মৃতিপটে ফুটিয়া উঠিতেছে।

স্থানাভাবে কিছু কিছু সঙ্কলনযোগ্য কবিতা বাদ পড়িয়াছে কবি নিজেই বলিয়াছেন।

আশা করা যাউক যে এই দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্র নিঃশেষ হইয়া যাইবে। এই সংস্করণে ৫ পৃষ্ঠা বই বাড়িয়াছে।

পুনশ্চ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৲। দ্বিতীয় সংস্করণ।

ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলাম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝঙ্কার না রেখে বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা।"

'লিপিকা'র কয়েকটি লেখায় এই গদ্যকাব্য রচনার প্রথম পরিচয় আছে। 'পুনশ্চ' আগাগোড়াই গদ্যকাব্য। ইহাতে গদ্যের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া, এমন কি কবিতায় ব্যবহৃত 'সনে' 'তরে' প্রভৃতি কথাগুলিকেও বর্জ্জন করিয়া গদ্য ভাষাকে অসঙ্কোচে কাব্যলক্ষ্মীর বাহন হইতে দেওয়া হইয়াছে। পুনশ্চের এই গদ্যকাব্যগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। 'সাধারণ মেয়ে' 'শেষ চিঠি' 'ক্যামেলিয়া' 'ছেলেটা' প্রভৃতি ছোট ছোট গল্প কবিতা হইয়া দেখা দিয়াছে, আবার 'শিশুতীর্থ' প্রভৃতি ছন্দের কবিতা গদ্য রূপ লইয়া আসরে নামিয়াছে। 'শিশু-তীর্থে'র ভাষার ঝঙ্কার ও রচনাভঙ্গী যদি ছন্দের বন্ধনে ধরা পড়িত তাহা হইলে ছন্দ অভ্যস্ত কাব্যামোদীরা ইহাকে আরও সাগ্রহে বরণ করিতে পারিতেন।

'প্রেমের সোনা' 'স্নান সমাপন' ইত্যাদি কবিতাগুলিতে বহুযুগ পূর্ব্বেকার ভক্তদের হরিজনপ্রীতির কাহিনী কবির ভাষায় অমর হইয়া আছে।

'পুনশ্চ' কবির স্বর্গগত একমাত্র দৌহিত্র নীতুর নামে উৎসর্গীকৃত।

শ্রীঅরবিন্দ—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম এ। বরদা এজেন্সী, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ ১৯০, মূল্য ।০।

শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে অপরিহার্য্য। এই গ্রন্থে অতি সুন্দর ভাবে সেই পরিচয় লাভের সুযোগ পাওয়া যাইবে। শ্রীঅরবিন্দের বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য—শিক্ষা, রাজনীতি, সাহিত্যচর্চ্চা এবং ধর্ম্মসাধনার স্তরগুলি এমন করিয়া ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে যাহাতে সহজেই লোকের মনে কৌতূহল জন্মে। নানা গ্রন্থের সাহায্য লওয়াতে এবং অংশবিশেষ উদ্ধৃত হওয়াতে এই পুস্তকের উপযোগিতা বাড়িয়াছে। পরিশিষ্টে পণ্ডিচেরী আশ্রম সম্বন্ধে আলোচনা আছে। বর্ত্তমান বঙ্গসমাজ এবং হিন্দুধর্ম্মের এক জন প্রধান নেতা শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি মোটামুটি এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দের একখানা চিত্র আছে। এইরূপ গ্রন্থের প্রচার বিশেষ বাঞ্ছনীয়। স্কুল-কলেজের পারিতোষিকরূপে এই গ্রন্থ আদৃত হইলে সমাজের মঙ্গল হইবে।

শ্রীরমেশ বসু

ধম্মপদ—শ্রীচারুচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত, অনূদিত ও প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান মহাবোধি সোসাইটি, ৪ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ১৮/০+২৭০। মূল্য ১৸০, বোর্ড বাঁধান ২৲।

ধম্মপদ বৌদ্ধ ধর্ম্মের এক হিসাবে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গীতার সহিত ইহার প্রভেদ হইল গীতার মধ্যে আমরা যে সু-উচ্চ দার্শনিক দৃষ্টির পরিচয় পাই, ইহার মধ্যে তাহার অনুরূপ একটি উচ্চ নৈতিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই জন্য ইহা যেন আমাদের হৃদয়কে আরও সহজে স্পর্শ করে, দুঃখ ও ভ্রান্তির মধ্যে আরও সহজে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

চারুবাবুর ধম্মপদের বর্ত্তমান অনুবাদ হরিনাথ দে, রমেশচন্দ্র মিত্র প্রমুখ সুধীগণ শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। বইখানির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা অতি আনন্দের বিষয়। ছাপা পূর্ব্বের মতই ভাল হইয়াছে।

আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

নারীর পথে (শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সহিত কথোপকথন)—প্রণেতা শ্রীপঞ্চানন সরকার, এম্ এ; সৎসঙ্গ পাব্লিশিং হাউস্ হইতে প্রকাশিত। পোঃ সৎসঙ্গ, পাবনা। ১৩৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ।৷০ টাকা।

বইখানিতে মূলের চেয়ে পাদটীকাই বোধ হয় বেশী। প্রথম কুড়ি পৃষ্ঠায় গণিয়া দেখা গেল, মূল আছে ২১৮ ছত্র, আর পাদটীকা আছে ২৯৬ ছত্র। দুই এক জায়গায় পাদটীকায়ই পৃষ্ঠা ভর্ত্তি হইয়াছে;—যেমন, ১১৭-১৮ পৃষ্ঠায় মূল মাত্র ৪ ছত্র, কিন্তু পাদটীকা ৫৪ ছত্র। আর সর্ব্বত্রই পাদটীকা ক্ষুদ্রতর অক্ষরে ছাপা হইয়াছে।

ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীর পরিপুষ্টির জন্য এই সব পাদটীকায় বিবিধ গ্রন্থ হইতে বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে আমরা একাধারে দক্ষ, কাত্যায়ন, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতা, কূর্ম্ম, কালিক প্রভৃতি পুরাণ, চরক সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ, বায়রণ (Byron) প্রভৃতি সাহিত্যিক, রাসেল্ (Russel) প্রভৃতি দার্শনিক, মুসোলিনী প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়ক এবং সর্ব্বোপরি মারী ষ্টোপস্ (Marie Stopes), হ্যাভলক্ এলিস্ (Havelock Ellis) প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে বহু উক্তি সংগৃহীত দেখিতে পাই।

গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়—(১) স্ত্রীগ্রহণ সত্ত্বেও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা সম্ভব কিনা? (৭ পৃ.), (২) বিবাহ কি না হ'লেই নয় (২০ পৃ.), (৩) কোন্ নারীর কোন পুরুষের সহিত মিলিত হওয়া উচিত (২৫ পৃ.), (৪) নারীর কত বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত (৬৬ পৃ.), (৫) স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ঠিক ঠিক ভালবাসা আছে কিনা তার অব্যর্থ test (পরখ) কি (৭৭ পৃ.), (৬) নারী অসতী হয় কেন? (১২৯ পৃ.) ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে বাজীকরণ সম্বন্ধে চরক, সুশ্রুত প্রভৃতির মতও আলোচিত হইয়াছে (১১৬ পৃ.)।

দুই একটি প্রশ্নোত্তর এত উচ্চ শ্রেণীর যে তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন। যেমন, ১৩১ পৃষ্ঠায়—প্রশ্ন।—রস কাহাকে বলে?

উত্তর। 'রস' মানে the sensation which occurs in contact of anything—may occur physically or mentally.

আশ্রমে হ্যাভলক্ এলিস, মারী ষ্টোপস্ প্রভৃতি পঠিত হয় এবং বাজীকরণ সম্বন্ধেও আলোচনা হয় জানিয়া আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি। এ-সব গ্রন্থ আশ্রমোচিত নূতন আরণ্যক শাস্ত্র, সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকার এক জন এম্ এ। সৎসঙ্গে যাওয়ার পূর্ব্বে এ-সব গ্রন্থ পড়িয়াও নারীর সম্বন্ধে তাঁর যে জ্ঞান না হইয়াছিল, শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত কথোপকথনে তাঁহার তাহা হইয়াছে এ-কথা তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন। অনেক গূঢ় তত্ত্বই যে গুরূপদেশগম্য, তাহা কে না জানে? "অজ্ঞান-তিমিরান্ধ ব্যক্তির চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা যিনি উন্মীলিত করিয়া দেন, সেই গুরুকে আমরা নমস্কার করি।"

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পল্লব—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীআশুতোষ সান্যাল প্রণীত। প্রকাশক এন. এম. রায় চৌধুরী এণ্ড কোং, ১১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বাইশটি কবিতায় এই বইখানির ক্ষুদ্র কলেবর সজ্জিত। কবিদ্বয়ের হাত পাকা। কবিতাগুলি পাকা হাতের গুণে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি ত্রুটি যে নাই তাহা বলা চলে না। প্রমাণস্বরূপ 'অনুরোধ' কবিতাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কবিতাটি বিশ্ববরেণ্যা সুন্দরী জাহাঙ্গীর-প্রিয়া নূরজাহানের সমাধি-লিপির দুই লাইন অমর শ্লোকের ভাবানুসৃতি। অমর কবি সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভার গুণে এই ভাবানুসৃতিই 'কবর ই-নূরজাহান' নামক কবিতায় বাংলা সাহিত্যে এক সম্পদ রচনা করিয়া গিয়াছে। উক্ত কবিতাটি পাঠের পরে এই 'অনুরোধ' কবিতা পাঠক-মনে বিন্দুমাত্র আনন্দসৃষ্টি করিবে না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অপরাপর কবিতাগুলি সুন্দর।

বঙ্গকাহিনী—শ্রীহেমচন্দ্র সেন, বি-এ, রচিত এবং গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বিকারি উপসি তারাপ্রসন্ন হাইস্কুল, ফরিদপুর, হইতে প্রকাশিত। দাম আট আনা।

এই বইখানি বারটি গাথার সমষ্টি। সাহিত্যক্ষেত্রে গ্রন্থকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ না হইলেও তাঁহার কবিতাগুলি ছন্দে ও ভাবসম্পদে কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির রচনা হইতে কোনও অংশে হীন নহে। অনেকগুলি কবিতা আবৃত্তির উপযোগী হইয়াছে। এই বই পাঠকের উপভোগ্য হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মানময়ী বয়েজ্ স্কুল—প্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রকাশক ডি. এম লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য ৸০ আনা।

নিউ দিল্লীতে চিত্রপ্রদর্শনী

শ্রী শান্তা দেবী

শ নিজস্ব সম্পদের দিকে
ল্পী ও রসগ্রাহীর চেষ্টায়
স ভারতের নানা স্থানে
ণ, ভাস্কর্য্য ইত্যাদির
। আগে এক
শিল্পপদ্ধতির
মান্দ্রাজ,
ভারতীয়
রে
া

"চন্দ্র ও ঊর্ম্মিমালা" ছবিখানি প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে পাটিয়ালা-মহারাজার ১৫০৲ টাকা পুরস্কার ও শ্রেষ্ঠ জলরং ছবি বলিয়া আর একটি পুরস্কারও পায়। ছবিখানির রেখাবিন্যাসের ছন্দোময় ভঙ্গী ফোটোগ্রাফের ভিতরও সুন্দর ফুটিয়াছে। রণদা উকীলের রেখা-ছন্দের আরও অনেকগুলি নিদর্শন প্রদর্শনীতে ছিল।

সারদা উকীলের "পার্ব্বতীর তপস্যা" প্রভৃতি গভীর ভাবব্যঞ্জক কতকগুলি ছবি উল্লেখযোগ্য। "মহানির্ব্বাণ" ছবিটি দেখিবামাত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছবিটি একটু নূতন ধরণের। সমরেন্দ্র গুপ্তের অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য চিত্রই ভূদৃশ্য, এন. কে. মজুমদারের "দানলীলা" ছবিটি শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক ছবি হিসাবে পুরস্কার পাইয়াছে।

সতীশ সিংহের "শারদ-প্রাতে" ছবিটি তৈলচিত্র-বিভাগে পুরস্কার পাইয়াছে। কুমারী অমৃত শের-গিলের চিত্রগুলিও উল্লেখযোগ্য। মহিলা-বিভাগে ইনি পাইয়াছেন। উকীল চিত্রবিদ্যালয়ের ছাত্র শিল্পী চৌধুরীর "পাহাড়ী মেয়ে" ছবিটিতে বিশেষত্ব পাহাড়ী মেয়ের ছবি আজকাল নকলের নকল তরুণ শিল্পীই আঁকেন। এটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র

দেখিয়া যত দূর বুঝা যায় সারদা উকীলের সত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শিশু ও জননী" কোন-না-কোন বিভাগে পুরস্কার পাওয়া ত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিটিতে বাংলা স্নিগ্ধ মধুর রসটি বেশ ফুটিয়াছে। চিত্র-খাপাত চক্ষুকে আরাম দেয়।

"পারস্য রাজকুমারী"কে প্রতিযোগিতার বিচার করিবেন না। শিল্পগুরুর সৃষ্টি নীগন্ধার মত ক্ষীণ পেলব তনু সংযত ও

না। শিশির-ধোয়া পদ্ম-ফুলটি!—হ্যাঁ, তেম্‌নিই বটে! মনে হয়, তারও বুঝি এমন কোমলতা নেই।

নিঃশ্বাস পড়ছে। ধীরে; অতি ধীরে,—খুব লক্ষ্য না করলে বোঝা যায় না। কপালের উপর অবাধ্য একটা চুলের গুচি, ক্রমাগতই এসে এসে পড়ছে। পাখার বাতাস দিয়ে নন্দ যত বার অন্য দিকে চালিয়ে দিচ্ছে, তত বারই আবার কপালের উপর এসে পড়ছে। ভাবলে "যাক্ গে সরিয়ে দি।" কণ্ঠার কাছ থেকে কাপড়টা নেমে পড়েছে। বুকে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে,—একে দুর্ব্বল শরীর, তাতে…। ভাবলে, "ভাল ক'রে ঢেকে দি। রুগী বইত না।" ছুঁতেই তার সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। নন্দলাল নিজের মনে অজ্ঞাতে বিড় বিড়্ ক'রে ব'লে উঠল "উঃ কি মারই মেরেছে পাষণ্ডটা। নেহাৎ একলা—নইলে বাড়ির মধ্যে পুরে ঘা-কতক দিয়ে দিতুম হারামজাদা বেটাকে।"

শেষরাত্রের দিকে জ্ঞান হ'ল; কিন্তু জর এল খুব। নন্দ ভেবেছিল রাত্রের মধ্যেই মাতালটা লোকজন নিয়ে হৈ চৈ ক'রে এসে পড়বে। কিন্তু কই? জনপ্রাণীর টুঁ শব্দটি নেই। সমস্ত রাত নন্দ কান পেতে আছে। বৌটা বার-বার নীচে আর উপর করছে—জল গরম, সেঁক এই সব নিয়ে। নন্দ ভাবছে, "ওর কি ভয়ডরও নেই?"

(৪)

পরদিন সকালে জর একটু যেন কম মনে হ'ল। মালতীকে ডেকে বললে, "ভাই ওকে বল আমার খোকাকে একটু এনে দিতে। সে উঠে আমাকে না দেখলে কেঁদে অনর্থ করবে।" গেল নন্দ আবার সেই মাতালটার বাড়ি। রোগীর অনুরোধ! তা ছাড়া না গেলে ছাড়ে কে?

সরু গলিটা থেকে বেরুতেই ধড়ে তার প্রাণ এল। সেই বুড়ী ঝিটা বক্ বক্ করতে করতে বাড়ি থেকে বেরচ্ছে। ভেবেই পাচ্ছিল না ব্যাটার বাড়িতে ঢুকবে কেমন ক'রে। বুড়ী কেবলই বক্ বক্ করছে, "চিরোটা কাল এমনি—হ্যাঃ মাগী বুঝি এবার পালাল। আক্কেল দেখ মাগীর, ঐ দুধের বাছা, তারেও ফেলে মানুষে যেতে পারে! ডাইনি মাগী।"

আর বেশী দেরি না ক'রে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে একটু খুশী ক'রে নন্দ বললে, 'ওগো অ বুড়ো মা, আরে শোনো গো, তোমার বৌমা কাল রাত্রে পালিয়ে আমাদের বাড়ি গিয়ে পড়েছে গো, ছেলে ফেলে পালায় নি। মারের চোটে বাছা গিয়ে পড়েছে, বড্ডই জর হয়েছে, বাঁচে কি না-বাঁচে। ছেলেকে একটু দেখতে চায় গো—আমাকে তাই নিতে পাঠিয়েছে।" এক মুহূর্ত্তে বুড়ী একেবারে জল; তার স্বর একেবারে দীপক থেকে সিন্ধু বারোয়াঁয় এসে নাম্‌ল, "আহা-হা, তাই বল বাছা। অমন সোনার পিত্তিমে, তার এমন দশাটা করলে। চিরোটা কাল এই দশা গো, চিরোটা কাল ঐ দশা। মদ খেলে আর জ্ঞান থাকে নি। আর তাই বা এত মারধোরের দরকার কি বাপু; ওপরে ত তালা দে রেখেছিস—আবার এত হাঙ্গাম হুজ্জুতে দরকার কি? আহা, মা আমার লক্ষ্মীর পিত্তিমে, মুখে রা'টি নেই…"

কথা শুনে ত নন্দর চক্ষুস্থির। "ওপরে তালা দিয়ে রাখে!" সে আবার কি রে বাবা! নন্দলালের মনে নানা রকম ভাবনা এসে জুটতে লাগল। ব্যাপার বড় সুবিধের ব'লে বোধ হ'ল না। একটা মুস্কিলে না পড়তে হয় শেষকালে!

"হ্যাঁ গা, বাবু কোথা?"

"হা কপাল; বাবু কি আর পাঁচ-ছ দিনের মধ্যে এ মুখো হবে গা? অম্‌নি ধারা তার চিরোটা কাল। একটা বাপ্পরাম শ্যয়রাম না নিয়ে আর ফিরবে নি বাপু। কমনে আড্ডায় আড্ডায় ফিরবে এখন। আমি যাই মানুষ, তাই এই সংসারে আগ্‌লে পড়ে আছি। হাতে ক'রে এত বড্ড ক'রে তুলেছি—ফেলেও ত যেতে পারি নি নইলে যেম্না ধারে গেছে বাবু, বেম্না ধারে গেছে…"

নন্দ খোকাকে নিয়ে ফিরে এল। কিন্তু মনের মধ্যে ভারি একটা অস্বস্তি, ভয়, কৌতূহলে মিলে তার মনটাকে নাড়া-চাড়া দিতে লাগ্‌ল। স্ত্রীকে গোপনে ডেকে বললে, "দেখ, এই রকম সব কাণ্ড; এরা কিন্তু সুবিধের লোক ব'লে বোধ হচ্ছে না।" মালতী হেসে উঠল, বললে, 'তুমি চুপ কর দিকি, কে ভাল লোক কে মন্দ লোক তা চিন্‌তে পারি। ও কখনই মন্দ লোক হ'তে পারে না।"

এক জন ভদ্রলোক দেখে কমলের ধড়ে যেন প্রাণ এল। সে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে, "দয়া ক'রে এর বাবার একটু খোঁজ ক'রে দিন। আর আমাদের বুড়ো চাকর, তার নাম ভোলা। খুব লম্বা-চওড়া লোক, কাঁচা-পাকা চুল—কপালে একটা কাটার দাগ। মাত্র দু-তিন দিন হ'ল এসেছি আমরা —কিছুই চিনি না এখানকার। বড় বিপদে পড়েছি, একটু দয়া করুন।"

সেই দুটি কাতর অশ্রু-সজল চোখ।

মন বলে—ছিঃ, অসহায়, তার সর্ব্বনাশ ক'রো না। ওকে বাঁচাও। অমন দুটি চোখের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন কর।

মতি বলে, "চুলোয় যাক্ কৃতজ্ঞতা।"

তার পরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত। সৎলোক সেজে অসহায়ের সর্ব্বনাশ করা শক্ত নয়। অতি সহজেই মেয়েটিকে সে ভুলিয়ে একেবারে কলকাতার খাঁচার মধ্যে এনে পুরে ফেললে।

প্রথম পর্ব্বে অনুনয়-বিনয়; দ্বিতীয় পর্ব্বে তর্জ্জন-গর্জ্জন; তৃতীয় পর্ব্বে নিঃসঙ্কোচে অত্যাচার এবং নির্দ্দয় প্রহার।

(৮)

সন্ধ্যার দিকে কমলের জ্বর খুব প্রবল হয়ে উঠল এবং বিকারের পূর্ব্বলক্ষণ সব দেখা যেতে লাগ্‌ল।

রাত আটটা। কিন্তু চারি দিক এত চুপচাপ যে দুপুর রাত ব'লে মনে হয়। রোগীর শিয়রে ব'সে আছে নন্দ। ডাক্তার দেখে সন্ধ্যাবেলা বলে গেছে যে আশা বিশেষ কিছুই নেই। ক্রমাগত বরফ চালাতে হচ্ছে। তাই হাতে একটা কাজ পেয়ে অকারণে ব'সে থাক্‌বার অস্বস্তিটা কেটেছে তার। বোধ হয় সেবার ভারটা ওর ভিতরে চাপা ছিল—অবসর ও সুযোগের অভাবে ফুট্‌তে পায় নি। নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছে নিজের সেবা করবার পটুতা দেখে। জ্বরের ধমকে সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠেছে—লাল টুক্‌টুকে ঠোঁট দুটি রসে টুল্‌টুল্ করছে। জ্বরের তাড়সে এত মারাত্মক সুন্দর দেখায় মানুষকে! নন্দ তার যন্ত্রণার কথা প্রায় ভুলেই বসেছিল। কত ক্ষণ এম্‌নি ভাবে ছিল তার হুঁস নেই। স্ত্রী এসে ফিসফিস্ ক'রে বললে, "কি গো, গিলে খাবে না কি?"—ব'লে একটু মুচকে হাসলে। নন্দ বলে—এত ছোট মন এই মেয়ে জাতটার। একটু ইয়ে হয়েছে কি ব্যস্, ওদের মনে সন্দেহ হবেই। হ'লই বা ঠাট্টা, অমন ঠাট্টা সব সময় ভাল না। অন্যমনস্ক ছিল বলেই বোধ করি ঠিক মুখের মত জবাবটা তার জোগাল না। একটু আম্‌তা-আম্‌তাই ক'রে ফেলেছিল প্রথমটা। তার পর সামলে নিয়ে প্রায় রেগেই বললে, "একটা আপদ ঘরে টেনে এনে, এখন ন্যাক্‌রা হচ্ছে, না?"

স্ত্রী কিছু না ব'লে একটু মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল—বললে, "ব'সো, আর একটু বরফ ভেঙে আনি।"

ওর এই হাসিটায় নন্দর পিত্তি জ্বলে যায়। খানিক ক্ষণ পরে মালতী বরফ নিয়ে ফিরে এল। রোগিণীর অবস্থা ভাল নয়। ক্রমাগত প্রলাপ বকে চলেছে, একটাও কথা বোঝা যায় না।

রাত্রি অনেক। পাখা নাড়তে নাড়তে একটু তন্দ্রা এসেছে মাত্র। এমন সময় হঠাৎ গলির মোড়ে কে যেন ডাক্‌ছে, "বাবুজী, এ বাবুজী।" কিছুই বুঝতে না পেরে সে চুপ হয়ে রইল। এত রাত্রে আবার কে ডাক্‌বে! স্ত্রী আগেই উঠে বসেছিল, বললে, "ও গো, কে ডাক্‌ছে যেন।"

নন্দর বুক তখন ধড়াস ধড়াস করছে। তবু মুখে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বললে, "হ্যাঃ, কে আবার আমায় ডাক্‌বে। অন্য কাউকে ডাক্‌ছে।"

তার কথা শেষ হবার আগেই বাড়ির দরজায় ঘা পড়ল, "বাবুজী, এ বাবুজী, কেওয়াড়া খোলিয়ে ত?"

বহু কষ্টে দায়ে পড়ে সাহসে ভর ক'রে সে বারান্দায় গিয়ে হাঁক দিলে, "কোন্ হায় রে বাপু এত্তো রাতমে। বাড়িমে ব্যায়রামী আদ্‌মি হায়। একটু নিন্দিন্দি হবার জো নেই।"

"খোলিয়ে বাবু। খবর হায়। হাম্ পুলুসকে আদ্‌মি হায়। মাটিয়া কালিজসে আয়া।"

ওরে বাবা, আবার পুলিস কেন! নন্দর পিলে ত চম্‌কে গেল। না গিয়েও উপায় নেই। ভারি রাগ হ'ল স্ত্রীর ওপর। যত হ্যাঙ্গামের গোড়া ত ওই। বক্‌-বক্ করতে করতে নন্দ উঠে পড়ল। তখন বললাম তা শুনলে না। এখন মরি গে আমি হাজতে পচে। দেখ্‌দিকি কি ফ্যাসাদে পড়া গেল! কি করি এখন? যত্ত সো হ্যাঙ্গাম।"

মালতী বললে, "এত ভয় পাচ্ছ কেন! কোন অন্যায় ত করো নি। দেখ না ব্যাপারটা কি!"

"আর দেখেছি। ক্যাঁক্ ক'রে হাতকড়ি দে নিয়ে যাবে'খন। পরের মেয়ে ঘরে পোরা সোজা কথা কি না!" আর বেশী তর্ক করবার সময় পেল না। দরজায় আবার ঘা পড়ল। স্ত্রীকে রেগে বললে, "নাও, এখন আলোটা ধর। মরতে ত হবেই। তার পথটা একটু দেখাও এখন।"

মালতী না হেসে থাকতে পারে না। নন্দ তাতে আরও চটে যায়।

"বাবুজী, খোলিয়ে না।"

"এই যে বাবা, এলুম ব'লে। রাগ ক'রো না সেপাই সাহেব। চটীসে ভক্তকে জলসে সেঁদোয় গিয়া—ঐ ঠো বের করনে মে যা দেরি।"

গেল নেমে, কাঁপতে কাঁপতে। পিছনে স্ত্রী লণ্ঠন-হাতে। যাহোক্ তবু একটা নিজের লোক, তাই একটু ভরসা।

সেপাই যা বললে তা শুনে নন্দলাল বেশ খানিকটা স্তম্ভিত হয়েই রইল। মানুষের মৃত্যুসংবাদে মানুষের কিছু আর খুশী হবার কথা নয়। তবু মনে হ'ল যেন একটা দুঃস্বপ্ন বুকে চেপে ছিল—তার থেকে ত্রাণ পেয়ে গেল। কিন্তু এর মানে কি? তার এতটা স্বস্তি পাবার কারণ ঠিক খুঁজে পাওয়াও শক্ত। বোধ করি কাল রাত্তিরে সেই যে মাতালের শাসানির পর থেকে একটা আসন্ন দুর্দ্দৈবের নিশ্চিত আতঙ্ক মনের ভিতর চেপে ছিল তার থেকে পরিত্রাণ পেল বলেই এই স্বস্তি। কিংবা অবলার উপর যে অত্যাচার করে, তার প্রতি বোধ করি সহজেই মানুষের একটা ঘৃণা জন্মে। ভগবান নিজেই পাষণ্ডের উপযুক্ত শাস্তি দিলেন ব'লে করুণাময়ের ন্যায়পরতায় এই প্রসন্নতা তার মনে। অথবা আরও কোন গূঢ়তম কারণ তার অন্তরের মধ্যেই ছিল হয়ত, কি জানি, কিন্তু মনটা যে সে অকস্মাৎ অত্যন্ত হাল্কা বোধ করলে এবং একটা গভীর তৃপ্তির নিঃশ্বাস নিজের অতর্কিতেই যে তার বুক থেকে বেরিয়ে এল তা ভেবে একটু যেন লজ্জাও হ'ল। বললে, "আহা সেপাই সাহেব। লোকটাকে চিনতুম না বটে—কিন্তু পড়শী কি না। ওরই বাড়িতে আজ ক'দিন হ'ল আমরা ভাড়াটে এসেছি। বুঝলে কিনা? তা মারাই গেল একেবারে; এঁা? আহা হা, সাহেব, এসব আর কিছু নয় মদে করেছে।"

সেপাই ঘাড় দোলাতে দোলাতে একটু ঘনিষ্ঠভাবে বললে, "বড্ডি মাতোয়ালা সিলো বাবু। কুচ্ছ খেয়াল সিলো না। নসীব বাবু, নসীব। উয়ার আপনে লোক কোই আসে?"

"না সেপাই-সায়েব, আপনার বলতে ওর কেউ নেই গো।" বুড়ো ঝিটাকে আর এই হাঙ্গামে ফেলতে তার ইচ্ছে হ'ল না।

মালতী এই বীভৎস মৃত্যুর কঢ়তায় স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিল। মাতাল হ'লেও তার কেমন মায়া করতে লাগল, সেপাই চ'লে গেলে সে ক্ষুণ্ণ স্বরে বললে, "আহা হা, লরীর তলায় পড়ে মারা গেল গা? উঃ—"

কথার ধরণে নন্দলাল ভারি চটে গিয়ে বললে, "মরবে না? ভগবান আছেন ত মাথার ওপর?"

মালতী তার ভগবদ্ভক্তিতে কিছুমাত্র অভিভূত না হয়ে একটু উষ্ণভাবেই বললে, "তাই ব'লে মোটর চাপা পড়ে মরবে? উঃ—শ!" এবং উক্ত উপায়ে মৃত্যুর দুঃসহ যন্ত্রণা কল্পনা ক'রে মনে মনে সে শিউরে উঠল।

নন্দলাল বিরক্ত হ'য়ে বলতে লাগল, "মরবে না? মেয়েটার কি করেছে দেখ ত? মরেছে না বেঁচেছে। নইলে জেলে পচে একদিন ফাঁসিতে ঝুলতে হ'ত।"

মালতী আর সে ব্যক্তির মৃত্যুর রকম নিয়ে কোন তুলনামূলক তর্ক তুললে না। সে চুপ করেই গেল। সম্ভবতঃ কথাটা তার ন্যায্যই মনে হয়ে থাকবে—অথবা স্বামীর বিরক্তিতে সে আর ইন্ধন জোগান এত রাত্রে পণ্ডশ্রম ব'লে মনে করলে। যাই হোক তার স্বামী বা ভগবান কারও বিচারের ওপর যে সে কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হ'ল তার মুখ দেখে এমন বোধ হ'ল না।

নন্দ তা লক্ষ্য ক'রে মনে মনে বললে, "মরুক গে, ওদের লজিকই আলাদা।"

জীবন-কমল

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

হৃদয়-মৃণাল ছুঁয়ে আছ কোন্ অতল তলে,
সেখানের খোঁজ পায় না কো কেউ পাই নি আমি,
সেখানে গিয়াছে পরিচিত সব শব্দ থামি,
ঢেউ থেমে গেছে সে কালো গহন গভীর জলে।

জীবন আমার পদ্মের মত ঊর্দ্ধ পানে
উঠেছে আলোয়, ফুটেছে বাতাসে, পল-বিপল
মেলিয়া দিয়াছে একেকটি করি হাজার দল,
আকাশের পানে, সুনীলের পানে, সূর্য্য পানে।

উপরে সলিল উতলা, অথির, তরঙ্গিত,
উথলিয়া ওঠে, উচ্ছসিয়া ওঠে বাতাস লেগে,
ফুলে ওঠে আর দুলে ওঠে দ্রুত ঝড়ের বেগে,
শিহরিয়া ওঠে মৃদু হিল্লোলে কণ্টকিত।

নিম্নে নিথর থম্ থম্ করে অগাধ বারি,
নিকষকৃষ্ণ রাত্রির মত অন্ধকার,
ধ্বনির সাড়ায় জাগে না সেখানে স্পন্দ তার,
প্রাণের তন্তু ছুঁয়ে আছে তল, আমি কি পারি ?

আমারে ঘিরিয়া ফুটে আছে শত কমলদল,
কেউ কাছে, কেউ দূরে, কেউ আছে ফিরায়ে মুখ,
গ্রীবাটি বাড়ায়ে কেউ চেয়ে থাকে কি উৎসুক,
কেউ বা স্বর্ণ, কেউ লাল, কেউ নীলোৎপল।

অনন্তলীন সেই আলোহীন অন্ধকারে
পথহারা এক রবিরশ্মির রেখার সম
মগ্ন গভীরে বন্দী মানস-মৃণাল মম ;
অতলের তলে ডুব দিতে বল কেই বা পারে ?

কালের সাগর অথৈ, গভীর, সুবিস্তার,
কোথা শতদল-ফুলের জনতা উপরিভাগে,
কোথাও শূন্য—গম্ভীর নীল সলিল জাগে,
কখনো শান্ত, কখনো ভীষণ ঊর্ম্মি তার।

সেথা চলে ছায়াচিত্রের খেলা রাত্রিদিন,
উতল মুকুরে ছায়া ভাঙে গড়ে, পড়ে না রেখা
নিমেষের ছবি নিমেষে বিলীন—রহে না লেখা,
আকাশের আঁখি চেয়ে থাকে শুধু নিমেষহীন।

অনাহতগতি ঊর্দ্ধে— শূন্যে মেলিয়া পাখা,
চলিয়াছে একা পারাবার-পারে যাত্রী পাখী,
মৃণাল-বাঁধনে কেন আমি চির-বন্দী থাকি ?
ছায়া চলে যায়, যায় না তাহারে ধরিয়া রাখা।

সে শ্যামসায়রে শতদল শত তুলেছে মুখ,
একটি কমল ফুটেছে আমার নিকটে অতি,
অধীর সমীরে সরে যায় দূরে বেপথুমতী,
দূরে গিয়ে ফের কাছে আসে আরো সে উন্মুখ।

ঝলমল করে লাবণ্য, মহা-মহোৎসব !
দিনের আলোক অপরূপ হয় সে রূপে লেগে,
গন্ধের ভারে মন্থর বায়ু বহে না বেগে,
সে যে প্রভাতের স্বপ্নের মত সুদুর্লভ।

তার সৌরভ-পরিমণ্ডল আমারে ঘিরি
বিরচিয়া চলে নিশিদিন ধরি নূতন মায়া,
কাঁপে হিল্লোলে, খেলা করে তার সলিলে ছায়া,
আমি তারে দেখি, মোর দিকে সে কি দেখে না ফিরি ?

চির-দিবসের পরশ-প্রয়াসী পরস্পর,
চৈত্রের মধু-মাধুরী-ঝরানো চাঁদিনী-তলে
নলিন-তনুর ছোঁয়া কি লাগিল এ দেহ-দলে ?
কমল-জীবন পূর্ণ কি এত দিনের পর ?

ভোরে জেগে দেখি, যেথায় যে ছিল সেথায় আছে,
অন্ধ কারায় বন্দী মৃণাল, সরিতে নারি,
মাঝে ব্যবধান, অথৈ গভীর অগাধ বারি,
অলঙ্ঘ্য বাধা, অসহ্য ব্যথা বুকের কাছে।

নিয়তি নিঠুর, রাঙা অন্তরে রক্ত ঝুরে ;
উভয়ের মাঝে অসীম বাসনা তুফান তোলে,
অপার আকুল অশ্রুসাগর নিয়ত দোলে,
আমরা দুজনে এত কাছাকাছি, তবু কি দূরে !

কম্যুনিজম বা সাম্যবাদ

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার, এম-এ, পিএইচ-ডি, বার-য়্যাট-ল

আমাদের দেশে শিক্ষিতদের মধ্যে দেখা যায় একদল লোক আছেন যাঁহাদের পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে উত্থিত নব নব ভাবধারা বা মতাদির উপর এক অজানা মোহ আছে। এই সকল নূতন নূতন মত বা ভাবের চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্য তাঁহাদিগকে এমনই মোহিত করিয়া ফেলে যে, আমাদের দেশের বা জাতির জীবনে কতদূর প্রযোজ্য বা উপযোগী তাহা না বুঝিয়াই এদেশে সেগুলির প্রচার ও প্রচলনে তাঁহারা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া যান।

এক্ষণে রাজনীতিক্ষেত্রে যে পাশ্চাত্য কম্যুনিজম প্রচলনের এক প্রবল চেষ্টা হইতেছে, দেশ ও জাতির পক্ষে তাহা প্রযোজ্য কিনা ও তাহা মঙ্গলপ্রদ হইবে কি না কেবল তাহার বিষয় এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

যে সোশ্যালিজম বা কম্যুনিজমের কথা আমরা এক্ষণে শুনিয়া থাকি তাহা প্রতীচ্যেরই এক বিশেষত্ব। অবশ্য সোশ্যালিজম ও কম্যুনিজম এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিলেও ও ইহার মতে মূলতঃ ঐক্য থাকিলেও উভয়ের পার্থক্য আছে। সোশ্যালিজম বা কম্যুনিজমের বাংলা প্রতিশব্দ সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্যবাদ। ইহার মূল মত বা তত্ত্বটি একবাক্যে এই বলিয়া প্রকাশ করা যায় যে, সম্পত্তিতে বা অর্থে ব্যক্তিগত অধিকার থাকা উচিত নহে, দেশের সমস্ত সম্পত্তিতে জনসাধারণের সমান অধিকার থাকা উচিত। এই মতানুসারে, সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকারই জনসাধারণের সকল দুঃখ-দুর্দশার কারণ ও ইহা ন্যায়বিরোধীও। ক্যাপিটালিজম বা যে মত সম্পত্তিতে বা অর্থে ব্যক্তিগত অধিকার মানে তাহার সহিত বিরোধিতা হইতেই সাম্যবাদের উদ্ভব।

সাম্যবাদ পাশ্চাত্য ইতিহাসে নূতন নহে, ইহা বহু প্রাচীন ; প্লেটো প্রভৃতির সময় হইতেই এই মতটি প্রচার হইয়া আসিতেছে। ইহা বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিলেও ইহার যে তত্ত্বকথাটি উপরে বলা হইয়াছে তাহা একই আছে। প্রাচীনকালে সাম্যবাদ প্রধানতঃ এক মতবাদেই নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহা এক মহা আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে। বর্তমান সাম্যবাদ আন্দোলনের গুরু—কার্ল মার্কস। মার্কসের সাম্যবাদ আন্দোলনটি হইতেছে ধনিকদের (Capitalists) সহিত শ্রমিকদের (Proletariat) সংগ্রাম, যাহাতে শ্রমিকরা ধনিকদের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া এক বর্ণহীন সমাজ বা রাষ্ট্র (classless society) স্থাপন করিতে পারে যাহা সমষ্টিভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে সর্বসাধারণের স্বার্থরক্ষা বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য। কিন্তু এই নূতন রাষ্ট্রের প্রকৃত রূপ কি হইবে বা কোন উপায় দ্বারা ইহা লাভ করা যাইবে, মার্কস সে কথা কোথাও পরিষ্কার করিয়া

বর্ণনা করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। তিনি এই কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের কাঠামোর কোনরূপ বর্ণনাকে আকাশ-কুসুম বলিয়াই মনে করেন, এবং এক্ষণে যাহারা মার্কসের শিষ্য, তাহারাও তাঁহাদের গুরুর ন্যায় মনে করেন যে, ধনিকদের সহিত শ্রমিকদের সংগ্রামই আসল, ইহার ফল কি হইবে তাহা লইয়া এক্ষণে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই।

সাম্যবাদীরা যে রাষ্ট্র স্থাপন করিতে চাহেন তাঁহারা মনে করেন তাহাই হইবে প্রকৃত গণতন্ত্র বা তাঁহারা যাহাকে সমাজতন্ত্র বলেন। প্রকৃত সমাজতন্ত্র স্থাপন করিতে হইলে বা ইহাকে কার্যকরী করিতে হইলে বর্তমান গণতন্ত্র-শাসনে বর্ণ ও অর্থের যে বিপজ্জনক অসাম্য রহিয়াছে তাহা দূর করা একান্ত প্রয়োজন। ইহাদের মতে বর্তমান গণতন্ত্র এক ভুয়া জিনিষ, ইহাতে ধনিকদেরই আধিপত্য। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এই গণতন্ত্রের উচ্ছেদ আবশ্যক এক বিপ্লবের দ্বারা, এবং ইহার জন্য একমাত্র শ্রমিকদের ডিক্টেটরত্ব বা প্রভুত্ব (dictatorship of the Proletariat) আবশ্যক। এই বিষয়েই সোশ্যালিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট দলের মতে প্রধান পার্থক্য। বর্তমান কম্যুনিষ্টরা মনে করেন যে, শ্রমিকদের এই ডিক্টেটরত্ব বা একনায়কত্বই সমাজতন্ত্র স্থাপনের একমাত্র উপায়। এই মতটি এক্ষণে প্রধানতঃ রুশীয় সাম্যবাদীদের দ্বারাই পোষিত, ইহারা কম্যুনিষ্ট বা বলশেভিক নামে অভিহিত। কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশে যে সকল সাম্যবাদী আছেন তাঁহারা মনে করেন যে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে বর্তমান পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের সাহায্যেই তাহা সম্ভব। এই জন্য রুশীয় কম্যুনিষ্টরা ইঁহাদিগকে প্রধানতম শত্রু বলিয়া মনে করেন।

উপরে বলা হইয়াছে কার্ল মার্কসই বর্তমান কম্যুনিষ্টদের গুরু। বাস্তবিক সর্বোপরি, সাম্যবাদে যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদের এক সমষ্টি তাহার এক বিশিষ্ট রূপ কার্ল মার্কসই দেন। ১৮৪৮ সালে মার্কস যে কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো বা কম্যুনিষ্টদের প্রতি নিবেদন প্রকাশ করেন ইহাতেই তাহার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় ও পরে ইহা তাঁহার অন্যান্য পুস্তক প্রভৃতিতেও বিবৃত হয়। আমরা দেখিয়াছি মার্কসের মতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদলের দ্বারাই হইবে। সেইজন্য সাম্যবাদীর প্রথম কর্তব্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক হইতে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করা ও ইহাদিগের মধ্যে যাহাতে দলবোধ (class consciousness) জাগ্রত হয় তাহার ও সমবেত-ভাবে কর্ম্ম করার বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া। প্রত্যেক স্থানেই সমাজতন্ত্র আন্দোলন শ্রমিকদের মধ্যেই নিবদ্ধ, ও ইহা শ্রমিকদের নানা সঙ্ঘের যোগেই চালিত হইয়া থাকে।

বর্তমান কম্যুনিজম বলিতে যে রুশীয় কম্যুনিজমকেই বুঝায় এ কথা উপরে বলা হইয়াছে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় যে মহা বিপ্লব হয়, সেই সময় হইতেই বর্তমান কম্যুনিজম এক বিশিষ্ট রূপ প্রাপ্ত হয়। সমাজতন্ত্রবাদ রাশিয়াতে বহুকাল যাবৎই বিদ্যমান ছিল, এবং সম্রাটের শাসনাধীনে ইহা যে ভাবে দমিত ও ইহার নেতারা যে ভাবে নিপীড়িত হইতে থাকেন তাহাতে ইহা বরাবরই বিদ্রোহমূলক ছিল। যাহা হউক, দেখা যায় রাশিয়াতে সাম্যবাদীরা দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। ইহার প্রধান দল, যাহাকে সোশ্যাল রিভলিউশনারী পার্টি বলা হইত, তাহার এজেণ্টরা প্রধানতঃ কৃষকদের মধ্যেই আন্দোলন চালাইতেন ও সন্ত্রাসবাদীদের উপদ্রব অনেক স্থলে অবলম্বন করিতেন। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের সাম্যবাদীদের সহিত ইঁহাদের কোনও যোগ ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রাশিয়ায় মার্কসের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত সাম্যবাদীদের যে দল সোস্যাল ডিমক্রাটিক পার্টি নামে অভিহিত ছিল তাহা ১৯০৬ সালে দুই বিরোধী দলে বিভক্ত হয়—এক দলকে বলা হইত মেনশেভিক ও অপর দলকে বলা হইত বলশেভিক। মেনশেভিকদের মত ছিল, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহিত যুক্ত হইয়া ও নিয়মতন্ত্র প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রথমে এরূপ এক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাহা হইবে সমাজতন্ত্রের পূর্ব্বাভাস স্বরূপ। কিন্তু বলশেভিকদের মত ছিল ইহার বিরোধী। ইঁহাদের মতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এক বিপ্লবের আবশ্যক যাহা শ্রমিকদের নিরঙ্কুশ প্রভুত্বাধীনে চালিত হইবে। উভয় দলই মার্কসকে গুরু বলিয়া মানিতেন সত্য, কিন্তু বলশেভিকরা মার্কস-প্রচারিত ১৮৪৮ সালের কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোর বিদ্রোহাত্মক বা বিপ্লবাত্মক ভাবের উপরই অধিক জোর বা আস্থা স্থাপন করাতেই এরূপ বিরোধিতা বা মতদ্বৈধ ঘটে।

১৯১৭ সালের প্রথম ভাগে রাশিয়ায় যে প্রথম বিপ্লব ঘটে, তাহাতে বলশেভিক, মেনশেভিক, উদারনৈতিক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই যোগদান করাতে তাহা সকল দেশের সাম্যবাদীদেরই অনুমোদন ও সহানুভূতি লাভ করে। কিন্তু ইহার অল্পকাল পরে রাশিয়ায় দ্বিতীয়বার যে বিপ্লব ঘটে তাহাতে প্রধানতঃ বলশেভিকরাই যোগদান করেন, এবং তাঁহারা ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়া শ্রমিকদের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব স্থাপন করেন। ইহাতে ইউরোপের সাম্যবাদীদের মধ্যে মতভেদ বা বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং এই বিরোধ আরও প্রকট হইয়া উঠে যখন বলশেভিকরা নিজেদের শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাদিগকে প্রকৃত কম্যুনিষ্ট সম্প্রদায় বলিয়া ঘোষণা করেন, এক আন্তর্জ্জাতিক সাম্যবাদী সঙ্ঘ (Communist International) স্থাপন করেন ও মার্কস প্রচারিত নীতি অনুসারে এক বিশ্ব-বিপ্লব উপস্থিত করিতে বদ্ধপরিকর হন। লেনিন ছিলেন এই দলের নেতা। ইঁহারা অপর দলকে "বিশ্বাসঘাতক" বলিয়া অভিহিত করেন, যেহেতু বলশেভিকরা মনে করেন যে, ইঁহারা ধনিকদের সহিত যোগদান করিয়া ধন-সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার প্রথাটি বহাল রাখিতে চাহেন, আবার অপর দলও এই বলশেভিকদের "স্বৈরতন্ত্রী" নামে অভিহিত করেন, যেহেতু ইঁহাদের মতে বলশেভিকরা রাশিয়াতে স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিকতার লোপ সাধন করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপর নিজেদের মত বা ইচ্ছা জোর করিয়া ও অতি অন্যায়ভাবেই আরোপ করিয়াছেন। এই বিরোধের ফলে য়ুরোপের সাম্যবাদীদের মধ্যেও মহা বিরোধ দেখা দেয়। যাহা হউক, বলশেভিকরা নিজেদের প্রধান কেন্দ্র করেন মস্কো সহর। ইঁহারা যে সঙ্ঘ স্থাপন করেন তাহা তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনাল বা আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ নামে অভিহিত। ইহার বৈঠক প্রতিবৎসর একবার করিয়া হইয়া থাকে। পৃথিবীর নানা জাতির সাম্যবাদী এই সঙ্ঘের শ্রেণীভুক্ত হইলেও রুশীয় কম্যুনিষ্টদেরই প্রভাব ও প্রতিপত্তি ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পৃথিবীর নানা দেশে ইহার শাখা আছে ও ইহাদের যাহা কিছু কার্য্য মস্কোস্থ এই সঙ্ঘের আদেশ ও নির্দ্দেশানুসারেই হইয়া থাকে। ইহার জন্য এই সঙ্ঘের বিস্তর অর্থও ব্যয় হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেশে এক বিপ্লব ঘটাইয়া বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পতন ঘটানই এই কম্যুনিষ্ট সঙ্ঘের এক্ষণে প্রধান উদ্দেশ্য ও কার্য্য।

আমরা দেখিয়াছি কম্যুনিষ্টরা ক্যাপিটালিজমের প্রধান ও ঘোর শত্রু। রাশিয়াতে ক্যাপিটালিজমের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলেও ইহার চতুর্দ্দিকস্থ দেশে ক্যাপিটালিজমের যেরূপ প্রভুত্ব তাহা বিনষ্ট করিতে না পারিলে তাহাদের হইতে ইঁহাদের যথেষ্ট ভয় আছে এই অজুহাতে কম্যুনিষ্টরা উঠিয়া পড়িয়া লাগেন যাহাতে সকল দেশে এক বিপ্লব ঘটাইয়া ক্যাপিটালিজমের পতন ঘটান সম্ভব হয়। যাঁহারাই পৃথিবীর কিছু খবর রাখেন তাঁহারাই অবগত আছেন কি ভাবে কম্যুনিষ্ট এজেণ্টরা নানা দেশে গিয়া ও গুপ্ত-ষড়যন্ত্রের দ্বারা এই বিপ্লব ঘটাইবার এক ব্যাপক চেষ্টা করেন।

যুদ্ধের পর জগতের সকল দেশেই এক অব্যবস্থিততার সুযোগ পাইয়া ইঁহাদের চেষ্টা অনেকটা সাফল্যমণ্ডিত হইলেও, শীঘ্রই ইহার বিরোধী পক্ষ মাথা তুলিয়া উঠেন। আমরা জানি ইউরোপে ইহার বিরোধীদলের দ্বারা ইহার প্রভাব কিরূপ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বলিতে হয় ইউরোপে ইহার প্রভাব অতি ক্ষীণ ও ইহার সাফল্যেরও আশা নাই। কম্যুনিষ্টরা নিজেদের ষড়যন্ত্রের জাল কেবল যে ইউরোপে বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা নহে, ইহা সুদূর প্রাচ্যেও বিস্তৃত হইয়াছিল। চীন, পারস্য, আফগানিস্থান, জাপান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি কোন স্থানই বাদ পড়ে নাই। এই সকল দেশে প্রথমে ইহার প্রভাব অনেকটা সাফল্য লাভ করিলেও ইহা এক্ষণে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, কেবল ভারতে ইহা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

ইউরোপে বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় রাশিয়ার দৃষ্টি পতিত হয় প্রাচ্যের দিকে, এবং এ বিষয়ে প্রথম চীনের অনুকূল অবস্থাই রাশিয়ার কম্যুনিষ্টদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ চীনে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে সমগ্র প্রাচ্যেই আগুন জ্বলিয়া উঠিবে ইহা তাহাদের আশা ছিল। চীনে বিপ্লব ঘটাইবার জন্য রাশিয়া এককালে লোক বা অর্থ কিছুই দান করিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু হইলে কি হয়, রাশিয়ার মতলব বা দুরভিসন্ধি শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়ায় তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। জাপানও এক্ষণে বলশেভিকদের

শক্র। কেবল যে নিজ দেশে ইঁহাদের প্রভাবকে নষ্ট করিয়াছে তাহা নহে, চীনেও ইঁহার প্রভাবকে নষ্ট করিতে জাপান বদ্ধপরিকর। এক্ষণে কেবল ভারতবর্ষই বাকী আছে দেখা যাইতেছে।

সরকারী খবর এই যে, ভারতবর্ষে এক বিপ্লব ঘটাইবার জন্য কম্যুনিষ্টদের চেষ্টা অনেক দিন হইতেই চলিতেছে। এ বিষয়ে কম্যুনিষ্টরা যে কেবল ভারতীয় বিদ্রোহী বা সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে, বিদেশ হইতে মধ্যে মধ্যে কম্যুনিজম প্রচারকার্য্যে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকও এদেশে পাঠান হইয়াছে উঁহাদের কার্য্যের অধিকতর শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্তের জন্য। ইঁহাদের চেষ্টায় বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকম্যুনিষ্টরা অধিকার করিয়াছে ও দেশের নানাস্থানে শ্রমিক ও কৃষাণ সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া নিজেদের কার্য্যসিদ্ধির বন্দোবস্ত করিয়াছে। ইহার ফলে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাই, বাংলা প্রভৃতি নানা স্থানে যে প্রবল ধর্ম্মঘট প্রভৃতি হয় তাহার পশ্চাতে কম্যুনিষ্টরাই ছিলেন এবং ইঁহার জন্য রাশিয়া হইতে বহু অর্থও আসিতে থাকে। এই সকল ধর্ম্মঘট প্রভৃতির দ্বারা সেই সময় এদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল ও বহু ভারতবাসীও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কম্যুনিষ্টরা বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য শ্রমিকদের উপরই নির্ভর করেন। সামান্য কোনরূপ ছুতা পাইলেই ধর্ম্মঘট করাইবার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সংগ্রাম করিবার শিক্ষা দেওয়া, গভর্ণমেণ্ট ও ধনিকদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষানল প্রজ্জলিত করা ও এই সংগ্রামের দ্বারা তাহাদিগকে প্রস্তুত করা যাহাতে তাহারা দিন আসিলে বিপ্লব করিতে পারে। ইহাই হইল বর্ত্তমান কম্যুনিষ্টদের কার্য্যসিদ্ধির এক প্রধান পন্থা বা উপায়। এইজন্য যত ব্যাপকভাবে ও যত বেশী ধর্ম্মঘট প্রভৃতি ঘটে তাহার জন্য ইঁহারা বহু অর্থ ও শক্তি নিয়োগ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের প্রচারের আর একটি উপায় হইতেছে কাগজপত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া ও পুস্তকাদি লিখিয়া অজ্ঞ শ্রমিকদের মধ্যে কম্যুনিষ্টদের মত ও ভাব ছড়ান। কেবল শ্রমিক ও কৃষাণদের উৎসাহিত করা নহে; যাহাতে দেশের যুবকবৃন্দও ইহার দলভুক্ত হয় তাহারও বিশেষ চেষ্টা করা। এইজন্য এদেশে যুবসঙ্ঘ স্থাপন করা ইঁহাদের আর এক কার্য্য। এক কথায় যাহারা অজ্ঞ বা অপরিপক্কবুদ্ধি তাহাদের সহজেই ক্ষেপাইয়া কার্য্যোদ্ধার করা। প্রসিদ্ধ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ইহার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। শ্রমিক আন্দোলন বে-আইনী বা বিপজ্জনক নহে, কিন্তু কম্যুনিষ্ট আন্দোলন বিপ্লবাত্মক হওয়ায় বে-আইনী ও বিপজ্জনক। কম্যুনিষ্টরা এ বিষয় সম্যক্ অবগত থাকায় তাঁহাদের প্রধান কার্য্য হইয়াছে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির অজুহাতে তাহাদের সঙ্ঘগুলি দখল করিয়া গুপ্তভাবে নিজেদের প্রচারকার্য্য চালান, এবং এ বিষয়ে তাঁহারা অনেকটা সফলও হইয়াছেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া এক্ষণে ইঁহাদের আর এক প্রবল উদ্যম হইয়াছে, ভারতীয় কংগ্রেসকে দখল করা ও ইহার নায়কত্ব করা। সরকারী খবর সংক্ষেপে এইরূপ।

কংগ্রেস এদেশের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও মাননীয় প্রতিষ্ঠান। ইহাকে অধিকার করিতে পারিলে যে সাম্যবাদের প্রচার ও কার্য্য এক অভূতপূর্ব শক্তিলাভ করিবে সে বিষয়ে অধিক বলাই বাহুল্য। কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ এক্ষণে ইহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়ায় ইহার সাফল্যের সম্ভাবনা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী কম্যুনিজমের বিরোধী সকলেই জানেন। তিনি ইহার হিংসামূলক নীতি কখনও অনুমোদন করেন না। তাঁহার জন্য ইহা কংগ্রেসকে এতদিন দখল করিতে পারে নাই এবং যত দিন তাঁহার প্রভাব থাকিবে ততদিন স্পষ্টতঃ পারিবেও না। চীনদেশেও কংগ্রেসকে দখল করিয়া কম্যুনিজম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

একটু ধীর ভাবে চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, কম্যুনিজমের মূলনীতিটিই কেমন ভারতের পক্ষে অস্বাভাবিক। ভারতীয়েরা স্বভাবতঃই ধর্ম্ম ও শান্তিপ্রিয়। তাদের যতই কেন দুঃখ দুর্দ্দশা হউক না তাহা দূর করিবার জন্য ভারতীয়েরা বিদ্রোহ করিতে কখনও উপদেশ পায় নাই, কিন্তু সহন ও প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাই তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের উপদেশ পাইয়াছে। ইহাই ভারতের বিশেষত্ব এবং ইহা জগতের সনাতন নিয়মেরও অনুকূল। জগতে সকল জিনিষেরই নিত্য নিয়ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কিন্তু তাহা ধীরে ধীরে। এই জন্য এই পরিবর্ত্তন বিপ্লবের (রিভলিউশনের) দ্বারা নহে বিবর্ত্তনের (ইভলিউশনের) দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ

হঠাৎ কোনও জিনিষের আমূল পরিবর্ত্তন নহে, কিন্তু ক্রমবিকাশের দ্বারা পরিবর্ত্তন। জগতের দিকে তাকাইলেও দেখা যায় রিভলিউশনের দ্বারা যাহা ঘটে তাহার ফল বিষময় হয়, কিন্তু ইভলিউশনে যাহা ঘটে তাহার ফল মঙ্গলপ্রসূ হয়। কম্যুনিষ্টদের অবস্থার পরিবর্ত্তন নীতিটিই এই বিদ্রোহের ব্যাপার, ক্রমবিকাশের ব্যাপার নহে, কাজেই ইহা মঙ্গলপ্রসূ হইতে পারে না। ইহার উপর কম্যুনিজমের যে ভাব, যে সর্ব্বসাধারণকে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়, তাহার জন্য যে ডিক্টেটরত্ব আবশ্যক তাহা ভ্রান্ত। মানুষকে জোর করিয়া স্বাধীনতা দেওয়ার ভাবটিই স্ববিরোধী। কম্যুনিজম যে মঙ্গলপ্রসূ নহে, ভারতের পক্ষে অনুপযোগী তাহার আর একটি বিশেষ কারণ আছে। কম্যুনিজম নিছক জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, মানুষের উন্নতি বা প্রগতিকে ইহা জড়ের দৃষ্টি হইতেই দেখে, কাজেই ইহার দৌড় যে অল্প দূর ও শেষ অবধি যে ইহা মানুষের দুখের কারণ হইতে পারে না একথা সকল ভারতবাসীকেই বলিতে হইবে। ধর্ম্ম ভারতবাসীর প্রাণ। এই দেশের বিশেষত্ব এই যে, ধর্ম্মের এক বিশেষ বিকাশ এদেশে হইয়াছিল, ধর্ম্মটি আপামর জনসাধারণের চিত্তে ওতপ্রোত। কাজেই কম্যুনিজমের ন্যায় এক ধর্ম্মবিরোধী মত এদেশের পক্ষে কখনও উপযোগী বা মঙ্গলপ্রসূ হইতে পারে না। ইহা রাশিয়ার ন্যায় এক পাশ্চাত্য জড়বাদী দেশের পক্ষেই শোভা পায়, ভারতে কখনও নহে। কাজেই ভারতে এরূপ এক ধর্ম্মবিরোধী মত কখনও গ্রহণীয় হইতে পারে না। তৃতীয় কথা এই, মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা জগতে চিরদিন ছিল, আছে এবং থাকিবেও। আমরা যতই কেন ভাবি না, ইহা জগত হইতে একেবারে তিরোহিত করা যাইবে না, তবে ইহার লাঘব করা সম্ভব। একথা ত কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, এ বিষয়ে কত সংস্কার সাধন হইয়াছে ও ধীরে ধীরে হইতেছেও। শ্রমিক, কৃষাণ প্রভৃতির উন্নতির জন্য দিন দিন কতরূপ উপায় অবলম্বিত হইতেছে ও তাহাদের দাবীও কতদূর স্বীকৃত হইয়াছে। কম্যুনিষ্টরা বলিবেন, এ গতি বড় মন্থর, ইহাকে ক্ষিপ্র করিতে হইবে, এখনই ইহাকে উৎপাটন করিতে হইবে। কিন্তু ইহা অযৌক্তিক বলিয়াই মনে হয়। কারণ তাঁহাদের উপায় অবলম্বন করিলে অচিরে ত কোন মঙ্গল ঘটিবেই না বরং সকল অনর্থের সৃষ্টি করিবে। অবশ্য তাঁহারা বলিবেন যে ইহা অল্পকাল স্থায়ী হইবে ও পরে যে পরিমাণ মঙ্গল প্রসব করিবে তাহাতে বর্ত্তমান অনর্থের সমর্থন করা যায়। কথাটা শুনিতে ভাল হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা ত তাহা দেখাইতে পারেন নাই! রাশিয়ায় লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নানারূপ উজ্জল ছবি লোকের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করা হয় বটে, কিন্তু রাশিয়া যাহা করিতে চাহিয়াছিল তাহার অনেক জিনিসই হয় নাই। ক্যাপিটালিজমকে তাহারা একেবারে উড়াইতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ঘটে নাই, তাহার অনেক কিছু ব্যবস্থাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। অধিকন্তু যে পার্লেমেণ্টারী গণতন্ত্র প্রণালীটিকে ইঁহারা ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলেন, ধনিকদের দ্বারা প্রভাবান্বিত বলিয়া, এক্ষণে তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। সুতরাং কেবল একটা মতের উপর নির্ভর করিয়াই ভারতবাসীর তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়া কখনই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ভারতবাসীকে কেবল ভাবের ঘোরে নহে, কিন্তু সকল দিক ভাল করিয়া বুঝিয়া-সুঝিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে।
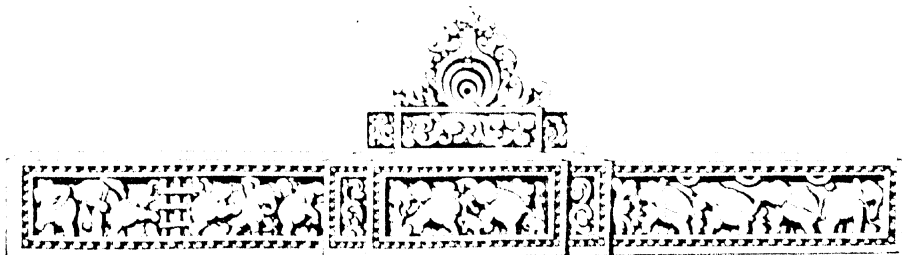
সন্তমত ও মানব-যোগ*

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

পুরাণে একটি চমৎকার গল্প আছে। সতী যখন দক্ষযজ্ঞে আসিয়া শিবনিন্দা শুনিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন তখন বিরহী শিব সেই শবদেহ লইয়া এমন মত্ত হইয়া উঠিলেন যে ধরিত্রী রসাতলে যাইতে উদ্যত হইল। নিরুপায় দেখিয়া দেবগণ নারায়ণের শরণ লইলেন। সতীর শবদেহ চক্রীর চক্রে ৫২ ভাগে বিভক্ত হইল।

প্রাণহীন শবদেহকে বিচ্ছিন্ন করা চলে কিন্তু জীবন্ত দেহকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টাকে কি নাম দিব? কোন্ উদ্দেশ্যে কোন্ চক্রীর চক্র এমন অমানুষিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে? আজ দেখিতেছি কোন্ চক্রে ভারতের ধর্ম্ম সংস্কৃতি সাহিত্য প্রভৃতিকে খণ্ড খণ্ড করিবার উৎসাহ চারিদিকে উঠিতেছে উগ্র হইয়া। কালচারের পক্ষে এত বড় অনাচার ও সর্ব্বনাশ কি আর কিছু হইতে পারে?

ধর্ম্ম লইয়া, ভগবানকে লইয়া দলে দলে কতদূর নীচ সঙ্ঘর্ষ! তাহাতে ব্যথিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন,

> তোমারে শতধা করি ক্ষুদ্র করি দিয়া
> মাটিতে লুটায় যারা তৃপ্ত সুপ্ত হিয়া
> সমস্ত ধরণী আজি অবহেলা ভরে
> পা রেখেছে তাহাদের মাথার উপরে।
>
> (নৈবেদ্য, ৫০ নং)

আবার বলিতেছেন,

> যে এক তরণী লক্ষ লোকের নির্ভর
> খণ্ড খণ্ড করি তারে তরিবে সাগর?
>
> (নৈবেদ্য, ৪৯ নং)

আজ বিংশ শতাব্দী। ষোড়শ শতাব্দীতে এই কথাই প্রাণের দুঃখে ভক্ত দাদূ বলিয়া গিয়াছেন,

> খণ্ড খণ্ড করি ব্রহ্মকো পখি পখি লিয়া বাঁটি।
> দাদূ পূরণ ব্রহ্ম তজি বঁধে ভরম কী গাঁঠি।

ব্রহ্মকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া দলে দলে লইল ভাগ করিয়া। হে দাদূ, পূরণ ব্রহ্মকে ত্যাগ করিয়া বদ্ধ হইল ভ্রমের গ্রন্থিতে।

যে সময় রবীন্দ্রনাথ এই কবিতা লেখেন (১৯০০-১৯০২খ্রীঃ) তখন তিনি কেন, বাংলার শিক্ষিত লোকের কেহই দাদূর বাণীর পরিচয়মাত্রও জানিতেন না। তবু দুই বিভিন্ন যুগের দুই মহাপুরুষের স্বতঃ উচ্ছ্বসিত বাণীতে একই বেদনার ব্যক্ত রূপ দেখিতে পাই।

সুলেমান বাদশার নিকট দুইটি নারী একটি শিশুসহ আসিয়া উভয়েই শিশুটির মাতৃত্বের দাবী করিল। উভয়েই চাহে বিচার। অন্য সাক্ষী-সাবুদ নাই। সুলেমান বলিলেন, তবে এই শিশুকে দুই টুকরা করিয়া উভয়কে এক এক ভাগ দেওয়া হউক। নকল মাতা অবিচল রহিল কিন্তু আসল মাতা বলিয়া উঠিল, আমার ভাগ আমি চাই না। না-হয় এই শিশুটি উহাকেই দেন। তখন কে যে আসল কে যে নকল মাতা তাহা বুঝিতে আর কাহারও বাকী রহিল না।

ভারতের ধর্ম্ম সংস্কৃতি প্রভৃতিরও এমন একটি জীবন্ত অখণ্ড সত্তা আছে যাহা খণ্ডিত হইতে বসিলে সকল যুগের সত্যদ্রষ্টার চিত্ত বিদীর্ণ হয়। এত শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও আধুনিক কালে শিক্ষিতাভিমানী আমরা যে-বেদনা অনুভব করি না, কত শতাব্দী আগে নিরক্ষর সব সাধকের দল সেই বেদনা তীব্র ভাবে করিয়াছেন অনুভব।

বহু দিনের কথা, তখন আমরা ছেলেমানুষ। গঙ্গার ঘাটে তর্ক হইতেছিল, এই গঙ্গা কোন প্রদেশের? হিন্দুস্থানী বলিলেন, ইহা উত্তর পশ্চিমের; বেহারী বলিলেন, ইহা বিহারের; বাঙ্গালী বলিলেন, ইহা বাংলার। একজন হিমাচলবাসী দাবী করিলেন—আমাদের দেশেই তো তার আদি উৎপত্তি, তাই গঙ্গা আমাদের। এক রসিক বৃদ্ধ বলিলেন—গঙ্গা যে আদিতে জনহীন তুষারশিলার মধ্য হইতেই বিগলিত, তাই গঙ্গার মালিক সেই সব শিলা ও তুষার। আর সবাই তাহাকে পরে ভোগ করিতেছে মাত্র। পতিতপাবনী সকল দেশের তৃষ্ণা মলিনতা দুঃখ-দুর্গতি দেখিয়া

---

* মধ্যযুগের সাম্প্রদায়িক বন্ধনের অতীত অব্যক্তলিঙ্গাচার সাধকদের সন্ত বলে। কবীর, নানক, নামদেব, দাদূ প্রভৃতি সাধকগণ সন্ত।

আপনি দ্রবময়ী হইয়া সহজ-ধারায় নামিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে যে বাঁধিয়া আপন সম্পত্তি করিতে গেল সে-ই তাঁহাকে হারাইল। পরশুরামের মত সে মাতৃঘাতী, তাহার মহাপাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই।

সত্য, ধর্ম্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতি মহাসম্পদ সেইরূপ সঙ্কীর্ণ স্থান ও কালের সীমা-বন্ধনের অতীত। যে ধরাতে আমাদের বাস, যে আকাশের নীচে আমাদের প্রাণ, যে সূর্য্য-চন্দ্র তারার সেবায় আমরা বাঁচিয়া আছি তাহাকে কোনও দল-বিশেষের সম্পত্তি বলা চলে কি? তাই দাদুকে যখন বলা হইল, তুমি যদি লোকের সেবা করিতে চাও তবে তোমাকেও কোন-না-কোন সম্প্রদায়ে বদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হইবে, তখন দাদূ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

> দাদূ এ সব কিসকে পন্থ মেঁ, ধরতী অরু অসমান।
> পানী পবন দিন রাত কা, চন্দ সূর রহিমান॥
> ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ কা, কৌন পন্থ গুরুদেব।
> সাঈ সিরজনহার তূ, কহিয়ে অলখ অভেব॥
> মহম্মদ কিসকে দীন মেঁ? জবরাঈল কিস রাহ?
> ইনকে মুরশিদ পীর কো, কহিয়ে এক অলাহ॥
> দাদূ এ সব কিসকে হ্বৈ রহে, যহ মেরে মন মাঁহি।
> অলখ ইলাহী জগতগুরু, দূজা কোঈ নাহিঁ॥ ১৩।১১৩।১১৪

হে দয়াময়, বল এই যে ধরিত্রী ও আকাশ, এই যে জল পবন ও দিন রাত্রি এবং যে চন্দ্র সূর্য্য নিরন্তর সেবাতে রত, ইহারা আছে কোন সম্প্রদায়ে? ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশের নামে যদি সব সম্প্রদায় স্থাপিত হইয়া থাকে তবে বল গুরুদেব এই ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরই বা ছিলেন কোন সম্প্রদায়ে? তুমি স্বামী, তুমি সৃজনকর্ত্তা, তুমি অলখ ভেদাতীত জ্ঞানাতীত, এই প্রশ্নের উত্তর তুমিই দিতে পার। হে এক আল্লা, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, তুমি বল, মহম্মদ ছিলেন কোন ধর্ম্মে, জবরাইল ছিলেন কোন পথে? ইহাদের মুর্শিদ ও পীর বা কে? দাদূ কহেন, যাঁহাদের নামে এই সম্প্রদায় তাঁহারা ছিলেন কাহার সম্প্রদায়ে কাহার সম্পত্তি হইয়া—এই প্রশ্নই তো জাগে নিরন্তর আমার মনে?

সেই অলখ ইলাহীই একমাত্র জগদ্গুরু। দ্বিতীয় আর তো কেহই নাই।

যাঁহাদের নাম লইয়া এত সম্প্রদায় ও মারামারি তাঁহারা ছিলেন কাহার সম্প্রদায়ে? বুদ্ধ তো আর বৌদ্ধ ছিলেন না। খ্রীষ্টও খ্রীষ্টান ছিলেন না। মহম্মদও মহম্মদীয় ছিলেন না। তাঁহারা একই ভগবানের সেবক। সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের মানব তাঁহারা।

সর্ব্বজগতের মানুষ বলিয়াই তাঁহারা সকলের প্রাণের ধন। মাত্র দল বিশেষের মানুষ যদি তাঁহাদের বলি তবে তাঁহাদের আর কে চাহিবে? বিশ্বের যাহা ধন তাহাকে বিশ্বের জন্য ছাড়িয়া দিতেই হইবে।

বৈষ্ণবরা গোষ্ঠ গান করেন। ব্রজের সকল বালক আসিয়া চাহে গোপালকে। মা যশোদা ছাড়িতে চান না। নিত্যই এই লীলা। বাউলরা এই লীলার মধ্যে একটি গভীর বিশ্ব-সত্য দেখিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, গোপাল বিশ্বের ধন। যাহার ঘরে সে আসিয়াছে সে তাহাকে আপন সাজে সাজাইয়া আবার বিশ্বকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য। ফাঁকি দিয়া তাহাকে আপনার জন্য বদ্ধ করিয়া রাখা চলিবে না। প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতির সাধনা, সাহিত্য, সঙ্গীত, কলা প্রভৃতি তাহার 'গোপাল'। সকল বিশ্ব তাহার দুয়ারে দাঁড়াইয়া চাহিতেছে; না দিয়া নিস্তার নাই। ফাঁকি চলিবে না। যত দুঃখই থাকুক, দিতেই হইবে।

> গোপালকে তোর দিতে হবে।......
> তোমার ঘরে এসে গোপাল হৈল অপরূপ।
> দিলে ঘর তোর ধন্য হবে, নৈলে অন্ধকূপ॥ তোর .....
> (তোমার) প্রাণসাগরের কমল গোলাপ ফুটলো যারে চেয়ে।
> তারেই যদি দিলাম্ মাগো, কি কল্লি তুই পেয়ে?॥ তোর...
> নিধি বলেই পেলি মাগো, এই তো নিধির নিধি।
> দুয়ার দিয়ে রাখিস্ যদি কেড়ে নিবে বিধি॥ তোর...
> জগতেরি নিধি বলে দুর্লভ এই ধন।
> তোর আপন ঘরের নিধি হৈলে, চাইতো বা কোন জন?॥ তোর...
> দেওয়া যে মরণ মাগো, (সেই) মরণ তোমায় মরতে হবে।
> ভয় যদি হয় { মনের মাঝে / দিতে গেলে } নেবার যে সে কেড়ে লবে। তোর......
> দিতে যদি পারিস মাগো দিবি হেসে হেসে।
> ধন্য হবি যদি পারিস দিতে ভালবেসে।
> { নৈলে / না হয় } তোরে দিতে হবে নয়ন জলে ভেসে॥ তবু দিতে হবে...

এই সব গোপালের উপর জগতের দাবী আছে। তাই তাঁদের ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিবার উপায় নাই। আপন ঘরের নিধি বলিয়া ধরিয়া রাখিবার জো নাই। বুদ্ধ জন্মিলেন মগধের উত্তরে এক শৈল-উপত্যকায়। সারা ভারত তাঁহাকে চাহিল, জগৎ তাঁহাকে দাবী করিল। উপায় নাই, দিতে হইল। আজ তাঁহার সাধনা প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র এশিয়ায়, এবং খ্রীষ্টীয় নামের মধ্য দিয়া রূপান্তরিত হইয়া তাহার অনেক কিছু আজ ইউরোপে আমেরিকায়—সর্ব্ব বিশ্বে ছড়াইয়া। তিব্বতের সাম্পোই ভারতে ব্রহ্মপুত্র নাম লইয়া চলিয়াছে। একই সত্য নানা নামে নানা দেশের উপর দিয়া চলে প্রবহমান হইয়া।

তেমন করিয়াই মগধের জৈনধর্ম্ম, পূর্ব্বতর দেশের যোগী ও নাথপন্থ আজ দূর-দূরান্তরে গেল বিস্তৃত হইয়া। অথচ তাঁহাদেরই নাম লইয়াই তাঁহাদের অনুবর্ত্তীর দল রচিয়াছেন সম্প্রদায় ও বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাহাদের বাণী ও সত্যকে। কিন্তু জগৎ আসিয়া যখন 'গোপাল'কে চাহে তখন বাধা দিতে পারে কে ?

ভক্ত কমাল বলেন,

মহাপুরুষের আসেন মানব সমাজে 'বরিয়াত' (শোভাযাত্রা—বরযাত্রা) চালাইয়া লইয়া যাইতে। তাঁহারা যদি দেখেন সবাই নিদ্রিত, তবে বজ্রের আঘাত দিয়া সকলকে জাগাইয়া তাঁহাদের হাতে দেন বজ্রাগ্নির মশাল। তাঁহাদের মন্ত্র ও বাণীই এই মশাল। সেই সব জ্বলন্ত মন্ত্র ও অগ্নিময়ী বাণী লইয়া দেহ তো সঞ্চয় করিয়া ভাণ্ডারে ভরিতে পারে না। কাজেই পরে যখন সঞ্চয়ব্রতী অনুবর্ত্তীর দল মঠ ও সম্প্রদায় করিতে উদ্যত হয় তখন তাঁহারা সেই সব জ্বলন্ত মশালকে নিবাইয়া নিরাপদ করিয়া লয়। ভাণ্ডারে নিরাপদে রাখিবার জন্য তাঁহারা আগুন বাদ দিয়া প্রাণহীন ছাইকড় ও কাষ্ঠদণ্ড সঞ্চিত করে।

সম্প্রদায় হইল সত্যভ্রষ্ট মহাপুরুষদের গোরস্থান, যেন চেলারা সেখানে গুরুর নামে চমৎকার মস্ত অট্টালিকা গড়িয়া তুলিতে পারে। গুরু যদি মরিতে না-ও চাহেন, তবু গুরুর পক্ষে এই গৌরবময় গোর-অট্টালিকা রচিবার জন্য চেলারা গুরুকে ও তাঁহার সত্যকে বধ করিয়া ও তাহার উপর সঙ্কীর্ণ-সাধনার কবর রচে। ইহারই নাম সম্প্রদায়।

জীবনে গুরুর অগ্নি বহন কর। নিবানো মশাল ও অগ্নির উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করিয়া অন্ধকার ভাণ্ডারের বোঝা বাড়াইও না। গুরুকে মারিয়া ফেলিয়া সম্প্রদায়ের অট্টালিকা গড়িয়া তুলিবার গৌরব লুব্ধতা ছাড়।

এই জন্যই কমাল কবীরের সম্প্রদায় রচনা করিতে উৎসাহ দিলেন না। তিনি বলিলেন,—আমার পিতা ছিলেন এই সব সঙ্কীর্ণতার বিরোধী। তাঁহার নামেই যদি এই সব সম্প্রদায় রচনা করি তবে আমার পিতারই আধ্যাত্মিক স্বরূপকে হত্যা করা হইবে। দৈহিক হত্যা অপেক্ষা তাহা শোচনীয়। তাই কমালের নামে মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে সব তীব্র ধিক্কার।

ডুবা বংশ কবীরকা উপজা পুত কমাল।

মহাপুরুষেরা বিশ্বের সর্ব্বদেশ হইতে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক খাদ্য সংগ্রহ করেন। বিরাট তাঁহাদের ক্ষুধা। সঙ্কীর্ণ ঘরের কোণে উপজাত ক্ষুদ্র খাদ্যে তাঁহাদের পেট ভরে না। গরুড় জন্মিয়াই এমন খাদ্য চাহিলেন যে বিনতার সামর্থ্যে কুলাইল না তাহা জোগাইবার। তখনই বুঝা গেল মহাসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যে খাদ্য খাইয়া শত শত বৎসর আমাদের দেশের সবাকার জীবনযাত্রা চলিল সেই খাদ্যে তো রামমোহনের কুলাইল না। হিন্দু-মুসলমান সব শাস্ত্র জীর্ণ করিয়া বালক রামমোহন জগতের সকল ধর্ম্ম লইয়া টান দিলেন। সব মহাপুরুষের পক্ষেই এই কথা খাটে। দাদূও বলিয়াছেন,

> পবন পানী সব পিয়া ধরতী অরু আকাশ
> চাঁদ সূর পাবক মিলে পাঁচে এক গরাস ॥
> চৌদহ তীনোঁ লোক সব ঠুঁগে সাসৈ সাস ॥ ৫,৩২-৩৩

পবন জল সব আমি করিলাম পান, ধরিত্রী আকাশ চন্দ্র সূর্য্য পাবক মিলিয়া পাঁচটায় হইল আমার একটি গ্রাস। চৌদ্দ লোক তিন ভুবন সকল লোক প্রতি শ্বাসে শ্বাসে আমি ভরিতেছি অন্তরের মধ্যে।

মহাপ্রভু চৈতন্য দক্ষিণ-দেশের ভক্তি-সাধনার সন্ধান পাইয়া তাঁহার অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান জলে ভাসাইয়া দিয়া বাহির হইলেন বুভুক্ষিত হইয়া ভারতের দেশে দেশে। সেই সাধনার ধারা শিষ্যদলের পর শিষ্যদলের দ্বারা সুদূর বৃন্দাবনে পাঠাইয়া স্বয়ং চলিলেন উড়িষ্যায়।

তাঁহারই সমসাময়িক পূর্ব্ববঙ্গ-শ্রীহট্টের সাধক জগমোহন ও তাঁহার শিষ্য রামকৃষ্ণের ভারত-ভ্রমণ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কবীর, নানক প্রভৃতির নানা দেশের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আমাদের ভাল করিয়া জানা উচিত। নানকের বগদাদ-ভ্রমণের এখন লিখিত প্রমাণ সব মিলিয়াছে।

তাঁহাদের এই পরিক্রমার মধ্যে কোন দম্ভ বা অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই। রাজা বা সম্রাটের মত তাঁহারা অপরকে পরাজিত ও অপমানিত করিয়া নিজ বিজয়-পতাকা উড়াইতে যান নাই। তাঁহারা উচ্চ-নীচ সকলের সঙ্গে মিশিয়া সত্য দিয়া ও সত্য নিয়া সাধনার "চাটাই বুনিয়াছেন।" "তানা-বানা" পরস্পর যুক্ত করিয়া তাঁহারা মানব-সাধনার লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন। জগতের অন্য বহুবিধ উৎপাতের মত তাঁহারা আপন Spiritual Imperialism বা আধ্যাত্মিক বাদশাহীর জুলুম দিয়া দুঃখ-জর্জ্জরিত মানব-জগৎকে আরও জর্জ্জরিত ও অপমানিত করিতে চাহেন নাই। যদি তাহাই হইত তবে তাঁহাদিগকে তৈমুরলঙ্গ চাঙ্গিজ খাঁ প্রভৃতি জগতের নানা উপদ্রবদের সঙ্গেই এক পর্য্যায়ভুক্ত করিতাম, তা তাঁহারা যত উচ্চ বুলিই মুখে আওড়ান না কেন। তাঁহাদের অনুবর্ত্তীরাও জগতের উপর যতই উপদ্রব করুন না কেন তাঁহারা কোনও সত্য-সাধনার উপযুক্ত নহেন।

সত্য ও ধর্ম্ম দিতে গিয়া এই সব মহাপুরুষেরা কাহারও সম্মানে আঘাত দেন নাই। আঘাত ও অসম্মান দিয়া তাঁহাদের লাভ তো কিছুই নাই। কারণ সত্যের সাধনায় পরাজিত আত্মসম্মানহীন সব ক্ষুদ্র নীচ প্রাণের স্থান নাই। ক্লীব শিখণ্ডীর দল লইয়া তাঁহারা কোন্ সাধন-সমর চালাইবেন?

হিন্দীভাষাকে যাঁহারা আজ জগৎ-সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন তাঁহারা গভীর সাধনার দ্বারা তাহার ভাব- ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য বদ্ধপরিকর হউন। আজ হিন্দীর যে-সব সুবিধা ও সৌভাগ্য আছে কাল তাহা না-ও থাকিতে পারে। কাজেই এমন সাধনা করুন, ভাষাকে এমন ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন করুন, যেন বাহিরের কোনও পরিবর্ত্তনে ইহার আসন কোথাও না টলে।

কেহ-কেহ মনে করেন যে বাংলা ভাষাতে দিনের পর দিন এমন সব আলোচনা, এমন সব রাষ্ট্রীয় মতবাদ জন্মিয়া উঠিয়াছিল যে তখন তাহা ভারতের ভাগ্যবিধাতাগণ পছন্দ করিতে পারিলেন না। কাজেই বাংলাকে তখনই পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগে বিভক্ত করিবার কথা হইল। লোকের প্রতিবাদে তাহা যখন অসম্ভব হইল তখন আর এক উপায়ে আসামে বিহারে উড়িষ্যায় নানা ভাগে বাংলার দেহ দেওয়া হইল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মধ্যেই মুসলমানী বাংলা বলিয়া আর একটি ভাষা-স্থাপনের দাবীও উঠিল।

বাংলাতে একটি প্রবাদ আছে "ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে।" বাংলার এই সব দুর্গতি দেখিয়া হিন্দীভাষীদেরও সাবধান হওয়া উচিত। হিন্দী-সাহিত্যেও রাজ্যচালকদের মতে যদি এইরূপ নানাবিধ অসুবিধাকর ভাবের আবির্ভাব হয় তখন দেখিবেন বিহার-মিথিলার জন্য আলাদা ভাষার প্রয়োজন হইবে, রাজপুত-ডিংগল ভিন্ন হইয়া থাকিবে, আবধী পূরবিয়া ও খড়ী বোলী সবাই পৃথগন্ন হইতে চাহিবে। কাজেই সময় থাকিতেই সচেতন হইয়া এই ভাষাকে হিন্দীভাষীরা এমন সমৃদ্ধ করুন যে কোন দিন ভাষার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইলেও যেন দিন-দিন তাহার প্রতিষ্ঠা এমন গভীর হয় যে তাহার সাধনার আসন না টলে।

আজ ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্যবোধ জাগিয়াছে, তাই এক ভাষার প্রয়োজন হইয়াছে। এই প্রয়োজনের দাবী হিন্দীই মিটাইতে পারে বলিয়া অনেকের মত, তাই তাহার ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন। কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে রাষ্ট্রীয় মতামত ও প্রয়োজন বারবার বদলায়। তাহার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মূঢ়তা। কাজেই হিন্দীভাষীরা অবহিত হইয়া সাহিত্যের জন্য সত্য সাধনায় প্রবৃত্ত হউন।

শুধু জনসংখ্যা গণিয়া যাঁহারা দাবী করিতে আসেন তাঁহাদের দাবীর মূলে সত্য অতিশয় কম। আজ চাকুরীতে কাউন্সিলে সর্ব্বত্র ইহার পরিচয় মিলিতেছে, কারণ সর্ব্বত্র যোগ্যতা অপেক্ষা সংখ্যারই দাবী প্রবল। সাহিত্যের ক্ষেত্রেই বা এই সংখ্যাগত দাবীর অন্তঃসারশূন্যতা কেন অনুভব না করিব? জনসংখ্যার দাবীতে যদি সাহিত্য চলিত তবে চীনভাষাই জগৎ-ভাষা হইত। গ্রীকরা আর সংখ্যায় কয়জন ছিল? আর তাহাদের স্বাধীনতার যুগই বা ছিল কতদিন স্থায়ী। তবু আজও সেই গ্রীক সাহিত্য অমর। ভবিষ্যতেও তাহার মৃত্যু নাই। সাহিত্যের সাধনায় এমন কীর্ত্তিই তাঁহারা রাখিয়া গিয়াছেন যে গ্রীক সাহিত্য চিরদিন জগৎকে অমৃত পরিবেশন করিবে। সমস্ত পৃথিবীতে একটি সাধারণ ভাষা চালাইবার জন্য Esperanto ভাষার জন্ম হইল। তাহার মধ্যে কি আজও কোন বড় সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে? অনেক সময় দেখা যায় এই ভাষাগত জয়যাত্রার পতাকাবাহী পদাতিকের দল ভুলিয়াই যায় যে, সাহিত্যকে সাধনা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা বৃথা বিড়ম্বনা। ঐ সব অযোগ্য সাধনাহীন লেখকদের বিপুল ভারেই সেই সব সাহিত্য দিন দিন আরও বেশী যায় তলাইয়া।

আমি যে-সব সন্তজনের বাণী লইয়া কাজ করিয়াছি তাঁহারা কোনও প্রদেশ-বিশেষের মানুষ নহেন। সারা ভারত জুড়িয়া তাঁহাদের জীবন ও সাধনা। প্রদেশ ও ভাষার সঙ্কীর্ণ বাধ তাঁহাদিগকে বাঁধিতে পারে নাই। আসলে গভীরতম পারমার্থিক ভাবের কোনও প্রদেশ বা ভাষা নাই। মৌনের অসীমতার দ্বারাই অনেক সময় সন্তজনেরা ভাবের অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাই ছাড়াও ভাষা তাঁহাদের কাছে গৌণ, ভাবই মুখ্য। ভাষা হইল ভাবস্থাপনের আধার মাত্র। তাই এক দেশের সন্তদের ভাব অন্য দেশের উপযোগী করিতে গেলে কোনও অসুবিধা নাই। শুধু অনুবাদ করিলেই অর্থাৎ এক আধার হইতে অন্য আধারে ঢালিলেই

হইল। ভিতরের যাহা ভাব তাহা যে তাঁহাদের সার্ব্বভৌম। বিশেষ বিশেষ কর্ম্মকাণ্ডে বা সাম্প্রদায়িক মতবাদেই যে-সব ধর্ম্মের মূল প্রতিষ্ঠা, তাহাদের এই সার্ব্বভৌমতা নাই। অর্থাৎ সেই সব ধর্ম্মের ভাবকে অনুবাদ করা অসম্ভব এবং করিলেও সে প্রয়াস নিষ্ফল। এসব কথা স্থানান্তরে বলা হইয়াছে।

যখন কোনও এক বিরাট ভাবধারা প্রদেশের পর প্রদেশ বাহিয়া চলে তখন সেই ভাবধারাই হয় সকল প্রদেশ-গত ভিন্নতার মধ্যে যোগ ও ঐক্যের মূল। তখন দেখা যায়,

একই আকাশ ঘটে ঘটে।
একই গঙ্গা ঘাটে ঘাটে॥ (বাউল)

এই গঙ্গাকে কেহ তো বদ্ধ করিয়া নিজস্ব করিয়া লইতে পারে না। কিন্তু যখন গঙ্গার ধারা মরিয়া যায় তখন গ্রামের নীচে নীচে অসংখ্য ডোবা-পুষ্করিণীতে তার খণ্ড খণ্ড অবশেষ মাত্র থাকে। তাহাদের কোনটার নাম "ঘোষের গঙ্গা", কোনটার নাম "বোসের গঙ্গা"। এই সঙ্কীর্ণ ভেদ-ভিন্ন পরিচয় তখনই হয় সম্ভব যখন সেই এক ভাবের মহাধারা গিয়াছে মরিয়া। আবার যদি কখনও ভাবের বন্যা আসে, সুদিনে ভাবের ধারা এক হইয়া উঠে, তখন কোথায় ভাসিয়া যায় সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেদ-বিভেদ!

তার পর হিন্দীর প্রসার যদি দিন দিন ঘটে তবে ভারতের সকল ভাষার সঙ্গে তাহার যোগ ও ঐক্য আরও করিতে হইবে দৃঢ় ও প্রাণবন্ত। সর্ব্বদাই আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে ইহার দ্বারা যেন আমরা অন্যসব প্রাদেশিক ভাষাকে বৃথা আঘাত না করি। কারণ, অন্য সব ভাষাকে মারিয়া ভারতে একটি মাত্র বিপুলায়তন ভাষা যদি প্রতিষ্ঠিত করা যায় তবে তাহার দ্বারা ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য-সম্পদের কোন লাভই হইবে না। বরং তাহাতে আমরাই বৃথা পরস্পর হানাহানি করিয়া শক্তিহীন হইব। মোগল-রাজত্বের অবসানে শিখ মহারাষ্ট্র প্রভৃতি ভারতীয় দল পরস্পরকে মারিয়া স্বীয় সঙ্কীর্ণ প্রাধান্য স্থাপন করার চেষ্টাতেই ভারত এমন করিয়া আপনাকে হারাইল।

ইউরোপে মধ্যযুগে যখন সকল প্রদেশের ভাষাকে চাপিয়া রাখিয়া এক লাটিনেরই রাজত্ব ছিল তখন ছিল ইউরোপের দারুণ দুর্গতি ও অন্ধকারের যুগ। যেই ইউরোপের দেশে-দেশে তাহাদের আপন-আপন ভাষা উঠিল জাগিয়া অমনি ইউরোপের জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-সাহিত্যে হইল এক নবযুগের অভ্যুদয়।

ভাষাগত এই সমস্যা জগতে নূতন নহে। যুগে-যুগে এই সমস্যা দেখা দিয়াছে। তখন মহাপ্রাণ সাধকের দল যে ভাবে তাহার সমাধান করিয়া গিয়াছেন তাহা যেন কখনও না ভুলি।

সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যে প্রভেদ এই যে সংস্কৃত ব্যাকরণাদি নিয়মের দ্বারা সুসংবদ্ধ। কাজেই তাহার স্থির একটি রূপ আছে। আর প্রাকৃত স্থান ও কাল ভেদে নিত্যই চলিয়াছে পরিবর্ত্তিত হইয়া। যখন বুদ্ধাদি মহাপুরুষেরা শাশ্বত কালের মহাসম্পদ তাঁহাদের সব অমূল্য উপদেশ দান করিলেন তখন সমস্যা হইল, এই সব বাণী রাখা যায় কোন্ আধারে? সংস্কৃতে না প্রাকৃতে? রত্ন মাত্রই লোকে রাখে লৌহ-মঞ্জুষায়। জলে ভাসমান কলার ভেলার উপর তো এমন সব রত্ন দিতে পারা যায় না ভাসাইয়া। তাই মনে হইতে পারে ঐ সব মহাপুরুষ সংস্কৃতের ধ্রুব আধারেই তাঁহাদের অমূল্য সব রত্ন রক্ষা করিবেন, প্রাকৃতের অস্থির অকূলে তাহা ভাসাইয়া দিবেন না।

কিন্তু মানুষই তাঁহাদের লক্ষ্য, উপদেশগুলির কাহিনী ও রক্ষা মাত্র তো নয়। তাঁহারা দেখিলেন, সংস্কৃতে যদি উপদেশ থাকে তবে মানুষ হইতে চিরদিন তাহা রহিবে দূরে দূরে। আর প্রাকৃতে যদি থাকে নিত্যই মানব পাইবে এই সব নিধি তাহার আপন বুকের কাছে। তাই বুদ্ধ মহাবীর প্রভৃতি সব মহাপুরুষ প্রাকৃত ভাষাতেই উপহার দিলেন তাঁহাদের সব অমূল্য ভাবসম্পদ।

বুদ্ধের প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে মহাত্মা কবীরও সেই কথাই বলিলেন,

সংস্কৃত কূপ জল কবীর ভাষা বহতা নীর।

কবীরকে না-হয় বলা যায় সংস্কৃত তাঁহার জানা ছিল না। তাই দায়ে পড়িয়া না-হয় তিনি এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধের ক্ষেত্রে তো এইরূপ বলা চলে না। তিনি যে ছিলেন সর্ব্ব ভাষায় সর্ব্বাগমে প্রবীণ, সর্ব্ব শাস্ত্রে নিষ্ণাত।

যমেলু তেকুল নামে দুই ভাই ভগবান বুদ্ধের কাছে গিয়া প্রশ্ন করিলেন, ভগবন্, আপন-আপন নাম-গোত্র জাতি-কুল পরিচয়ে বিভিন্ন যে সব লোক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আপন আপন কথ্য ভাষাতে বুদ্ধবাণীগুলি বিকৃত করিতেছেন। কাজেই সেই সব বাণী ছন্দে রূপান্তরিত করিয়া রাখা হউক।

ভগবান বুদ্ধ বলিলেন, তোমরা কি মূঢ় যে এমন কথা বলিতে পারিলে! এই উপায়েই কি লোকের বিশ্বাস নিষ্ঠা প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইবে?

দুই ভাইয়ের এই মূঢ়তার জন্য তিরস্কার করিয়া ভগবান তথাগত বলিলেন, বুদ্ধগণের বাণী তোমরা ছন্দে পরিবর্ত্তিত করিও না। এইরূপ করিলে তাহা হইবে দুষ্কৃত। তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কথিত ভাষাতেই বুদ্ধগণের বাণী শিক্ষা কর। (চুল্লবগ্গ, ৫, ৩৩)

বৈদিক ধর্ম্ম প্রধানতঃ কর্ম্মকাণ্ড লইয়া, তার পর এই দেশের নানা চিন্তার সঙ্গে বেদবাহ্য নানা মতবাদের সঙ্গে যোগে ও ঘাত-প্রতিঘাতে উপনিষদের যুগে ভারতীয় জ্ঞানের সম্পদ ক্রমে ক্রমে উঠিল বিকশিত হইয়া। যতদিন মানুষ কর্ম্মকাণ্ড ও সাম্প্রদায়িক জ্ঞান হইতে মুক্ত না হয় ততদিন সে সর্ব্বমানবের সঙ্গে যোগের উপযুক্তই নহে। তাই পরে যখন শৈব-ভাগবতাদি মতের দেখা পাওয়া গেল তখন ভক্তি ও ভাবের যোগসূত্রে মানবে মানবে মিলনের পথ প্রশস্ততর হইল। কর্ম্মকাণ্ড প্রভৃতি ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়-সীমাবদ্ধ। তাহা লইয়া বাহিরের কাহারও সঙ্গে মিলন হওয়া সম্ভব নহে। ভাব ও ভক্তি সার্ব্বভৌম বলিয়াই তাহাতে মিলন হইতে পারে। তাই এই সব ভাগবত ধর্ম্মের উদ্ভব ভারতের পক্ষে মহা সৌভাগ্যের কথা।

যতদিন এই সব ভাগবতেরা সহজ ছিলেন ততদিন মিলনটি কেমন সুচারুরূপে ঘটিতেছিল তাহা পরে দেখান হইয়াছে। তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও ভক্ত চণ্ডালের স্থান দিয়াছেন উচ্চে।

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্। ভাগবত ৭, ৯, ১০

কিন্তু যেই সেই ভাগবতেরা আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নানা মতবাদ ও আচার-বিচারের অর্থহীন জঞ্জালে ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, অমনি তাঁহারাও মানবে-মানবে যোগসাধনের মহাব্রত হইতে ভ্রষ্ট হইলেন।

সেই সঙ্কটময় কালেই ধর্ম্মে ধর্ম্মে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, মানুষে মানুষে যোগ-সাধনার জন্য সন্তদের হইল অভ্যুদয়। ইহারই নাম মধ্যযুগ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব সন্ত পূর্ব্বতন সব ভাগবতের হাতে তখন কম বাধা পান নাই। এই বিষয়েও পরে বলা যাইবে।

হিন্দু যখন রহিল তাহার আপন বেদ-শাস্ত্র আচার-বিচার প্রভৃতি লইয়া, মুসলমান যখন রহিল তাহার আপন কোরাণ ও হদিস-উপদিষ্ট ধর্ম্মাচরণ লইয়া, তখন কে এই উভয় দলকে যুক্ত করিবে? বিশ্বসত্যের খাতিরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কে তাহার আপনার দাবীটা সংযত করিবে? তখন রজ্জবজী (১৫৫০ খ্রীঃ) বলিলেন, যতদিন তোমরা আপন আপন শুষ্ক কাগজের দফ্‌তরকেই বিশ্ব মনে করিতেছ ততদিন তোমাদের মিলিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। বরং চাহিয়া দেখ, অখিল বসুধাই বেদ ও সারা সৃষ্টিই কোরাণ। এই বিশ্বকে যদি বেদ ও কোরাণ মনে করিয়া নিজ নিজ কাগজময় দফ্‌তরের মোহ ছাড় তবেই গোল মেটে। কিন্তু দুই দলেরই পণ্ডিত ও কাজীর দল তাহা দিবেন না ঘটিতে এবং অল্পবুদ্ধি সংকীর্ণমনোবৃত্তির নাসজ্ঞনোচিত লোক তো ঐ সব উত্তেজনাতেই নাচিবে, এবং তাহাদের ঐ ভাবে নাচাইলে যাহাদের নিজের সুবিধা তাহারা সর্ব্বপ্রকারে এই নাচাইবার পদ্ধতিটাও যাইবে চালাইয়া।

রজ্জব বসুধ বেদ সব কুল আলম কুরান
পংডিত কাজী বৈঠটে দফ্‌তর ভুলিয় জান।

বৈষ্ণব ও শৈব প্রভৃতি ভক্তিবাদের মূল প্রাচীন ভাগবত মতের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই ভাগবত মতের আদি উদ্ভব স্থাপনের খবর অল্পই আমাদের গোচরে আসিয়াছে। তবু পঞ্চরাত্র মতবাদ প্রভৃতির কথা সকলেই জানেন। ভাগবতে দাবী করেন, বেদ হইতে তাঁহাদের মত অর্ব্বাচীন নহে। অন্ততঃ বৈদিক ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভাগবত মতবাদেরও ধারা ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে দেখিতে পাই। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড যাঁহারা মানেন তাঁহাদের বলা হইত স্মার্ত্ত, আর ভক্তিবাদীদের বলা হইত ভাগবত। তখনকার সভাতে উৎসবে দেখিতে পাই স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদের ও ভক্তিবাদী

ভাগবতদের উভয়েরই সমান প্রতিষ্ঠা, সভাতে শুনা যাইত,

ইতো ব্রাহ্মণা ইতো ভাগবতাঃ।

ঐদিকে বসুন ব্রাহ্মণেরা আর ঐ দিকে বসুন ভাগবতের।

যতদিন এই ভাগবতরা হৃদয়ের জীবন্ত প্রেম-ভক্তির দ্বারা চালিত হইতেছিলেন ততদিন তাঁহারাও ছিলেন জীবন্ত। তখন তাঁহারা গ্রীক যবন প্রভৃতি বাহিরের কত ভক্তজনকে যে আত্মসাৎ করিয়াছেন তাহার পরিচয় পাই এখনও নানা শিলালেখে।

খ্রীষ্টের পূর্ব্বে দ্বিতীয় শতাব্দীতে (১৪০ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব) দেখা যায় বেশনগরের এক শিলালেখে যে তক্ষশিলাবাসী দিয়নের পুত্র ভাগবত হেলিয়োডোরের আজ্ঞাতে দেব-দেব বাসুদেবের গরুড়ধ্বজ রচিত হইয়াছিল,

"দেবদেবস বাসুদেবস গরুড়ধ্বজে অয়ম কারিতে...

হেলিউডোরেণ ভাগবতেন দিয়সপুত্রেণ তক্ষশিলাকেন"...

ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে হেলিয়োডোর গ্রীক-বংশীয় হইলেও তাঁহার ভাগবত হইবার পক্ষে কোন বাধা হয় নাই।

কাবুল ও পঞ্চনদের অধিপতি কাডফাইসাসের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তাহার পরিচয় দেখি—"মাহেশ্বরস" অর্থাৎ তিনি মহেশ্বরের পূজক শৈব। ইঁহার রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় ৮৫ অব্দ হইতে ১২০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি। গান্ধার-রাজ কণিষ্কও তো কুশান-বংশীয়। তাহার উত্তরাধিকারী হুবিষ্কও তাই। উভয়ের মুদ্রাতেই গ্রীকদেবতা ও দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত। ইহাদের পরের নৃপতির নামই একেবারে হইয়া গেল সংস্কৃত—"বাসুদেব কুশান।" তাহার সময় ১৮৫ খ্রীঃর কাছাকাছি। তাঁহার মুদ্রাতে দেখা যায় শিব ও নন্দীর মূর্ত্তি অঙ্কিত।

অর্থাৎ যতদিন ভারতের ভাগবতগণ ছিলেন জীবন্ত ততদিন অন্যকে গ্রহণ করিয়া আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লইবার শক্তিও তাহাদের ছিল। ক্রমে প্রাণশক্তি ক্ষীণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের এই পরিপাক-শক্তিও হইয়া আসিল মন্দা। ক্রমে এই বৈষ্ণবাদি ধর্ম্মও চিরসঞ্চিত আচারে বিচারে ও অর্থহীন মতবাদের, ট্রেডিশনের দ্বারা হইয়া উঠিল ভারাক্রান্ত। তার পর তাঁহারাও বেদের দোহাই পাড়িয়া অন্যদের দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন।

ভাগবত মতের রামপন্থী গোস্বামী তুলসীদাসও দেখি বেদের দোহাই পাড়িতেছেন, এবং সন্ত-মতকে বেদবাহ্য বলিয়া তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন—

নিরাচার যে শ্রুতিপথ ত্যাগী।

কলি জুগ সোই জ্ঞানী বৈরাগী॥ ইত্যাদি...

রামচরিত মানস, ন-প্র-সভ, উত্তর কাণ্ড, ৪৮৩ পৃঃ

বেদত্যাগী অনাচারীরাই কলিযুগে হন জ্ঞানী বৈরাগী।

তাই তখন তাঁহাকে বর্ণাশ্রমের মহিমাগান করিয়া বলিতে হইল,

পূজিয় বিপ্র সীল-গুণ-হীনা।

শূদ্র ন গুণগণ জ্ঞান প্রবীণা॥ ঐ, ১২৫ পৃঃ

শীল-গুণরহিত হইলেও বিপ্র পূজ্য। আর গুণময় জ্ঞান-প্রবীণ হইলেও শূদ্র পূজ্য নহে।

তুলসীদাস দুঃখ করিয়া বলিতেছেন,

শ্রুতিসম্মত হরিভক্তি পথ সংযুত বিরতি বিবেক।

তেহি ন চলহিঁ নর মোহবস কল্পহিঁ পংথ অনেক॥

(ঐ, উত্তরকাণ্ড, ১০০ দোহা)

বিরতি-বিবেকসংযুক্ত যে শ্রুতিসম্মত হরিভক্তি পথ, তাহাতে মানুষ মোহবশে চলে না চলিতে। মানুষ তাই অনেক পন্থ (সম্প্রদায়) করিয়াছে কল্পন।

কিন্তু এই সব রামপন্থ কৃষ্ণপন্থও এক সময় বেদাদি-উপনিষৎ পুরাতন মতের সঙ্গে কম লড়াই করিতে বাধ্য হইয়াছে? তার পর যেই সেই-সব মত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িল অমনি তাহারাও আবার পুরাতন সব শাস্ত্র আচার বর্ণাশ্রম প্রভৃতির যুগযুগান্তর-সঞ্চিত বোঝাতে উঠিল ভারাক্রান্ত হইয়া। তখন আর তাহাদের মধ্যে বাহিরের কাহারও প্রবেশের উপায় নাই। তখন এই সব পন্থই আবার নবভাবে জীবন্ত মতকে বার বার দিতে লাগিল বাধা।

এমন সময়ও গিয়াছে যখন দক্ষের বেদবিহিত যজ্ঞে শিবের স্থান হয় নাই। পুরাণে বার বার দেখিতে পাই, শূদ্রাদির পূজিত শিব মুনিদের দ্বারা গৃহীত হন নাই। শিবপূজা লিঙ্গপূজা প্রভৃতি মত বৈদিকগণ কিছুতেই স্বীকার করিতে পারেন নাই। বামন-পুরাণের ৪৩ অধ্যায়ে আছে, মুনিগণ শিবকে চাহেন না। মুনিপত্নীরা শিবকে চান, হয়ত তাঁহারা

শূদ্রাদি-কুলোৎপন্না। কিন্তু মুনিরা কাষ্ঠপাষাণ লইয়া শিবকে তাড়না করিতেই প্রবৃত্ত।

ক্রোড়ন্তং বিলোক্য মুনয় আশ্রমে তু স্বযোষিতান্।

হন্যতামিতি সম্ভাষ্য কাষ্ঠপাষাণপাণয়ঃ। বামন, পু, ৪৩,৭০

মুনিগণ আশ্রমে আপন স্ত্রীগণের ক্রোড় দেখিয়া কাষ্ঠপাষাণ হস্তে, (তাপসবেশী শিবকে) মার মার করিয়া উঠিলেন।

কিন্তু অবশেষে এই সব মুনিরাও শিবপূজা ও লিঙ্গপূজা গ্রহণে বাধ্য হইলেন। (বামন পুরাণ, ৪৪ অধ্যায়)

স্কন্দপুরাণের নাগর-খণ্ডে দেখি লিঙ্গধারী মহাদেব মুনিগণের আশ্রমে প্রবেশ করিলে মুনিগণ ক্রোধে বলিলেন,

যস্মাৎ পাপ ত্বয়াস্মাকমাশ্রমোঽয়ং বিড়ম্বিতঃ।

তস্মাল্লিঙ্গং পতত্বাশু তবৈব বসুধাতলে। স্কন্দ, নাগর ১,২০

"রে পাপ, যেহেতু তোমার দ্বারা আমাদের এই আশ্রম বিড়ম্বিত হইল, অতএব এখনই তোমার লিঙ্গ বসুধাতলে পতিত হউক।"

সমস্ত পুরাণের মধ্যে নানাভাবে দেখা যায় কেমন করিয়া শৈব ও বৈষ্ণব পন্থ বৈদিক মতবাদের দ্বারা প্রথমে ছিল তিরস্কৃত, ক্রমে কেমন করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহারা সমাজে একটু একটু করিয়া স্থান করিয়া লইল এবং অবশেষে তাহারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমে হইতে চলিল সনাতনী।

ভাগবতের ও মহাভারতের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, কেমন করিয়া ধীরে ধীরে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের স্থলে ভক্তিবাদ, দেবতাদের যজ্ঞের স্থলে অবতারবাদ, একটু একটু করিয়া আসিয়া বসিল। ইন্দ্রের পরে বিষ্ণু আসিলেন বলিয়াই তাহার নাম হইল উপেন্দ্র। অমরসিংহ তাঁহার প্রসিদ্ধ কোশগ্রন্থে বলিলেন,

উপেন্দ্র ইন্দ্রাবরজঃ।

মহাভারতে যখন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভীষ্মের উপদেশে সহদেব কৃষ্ণকে বিধিযুক্ত উত্তম অর্ঘ্য প্রদান করিলেন,

ততো ভীষ্মাভ্যনুজ্ঞাতঃ সহদেবঃ প্রতাপবান্।

উপজহ্রেঽথ বিধিবদ্বার্ষ্ণেয়ায়ার্ঘ্যমুত্তমম্।

(মহা, সভা, ৩৬,৩০)

তখন কৃষ্ণ তাহা গ্রহণ করিলেন,

প্রতিজগ্রাহ তৎ কৃষ্ণঃ। (ঐ, ৩৬, ৩১)

তখনই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এই অবৈধ আচরণকে শিশুপাল এমন আক্রমণ করিলেন যে, কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিলেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখি যখন গোপগণ ইন্দ্রযাগ করিতে উদ্যত তখন বলদেব ও কৃষ্ণ তাহা দেখিলেন,

ভগবানপি তত্রৈব বলদেবেন সংযুতঃ।

অপশ্যন্ নিবসন্ গোপানিন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্॥ ১০ম, ২৪, ১

শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইন্দ্রযাগের উদ্দেশ্য কি? নন্দ বলিলেন,

পর্জ্জন্যো ভগবানিন্দ্রো মেঘাস্তস্যাত্মমূর্ত্তয়ঃ।

তেঽভিবর্ষন্তি ভূতানাং প্রীণনং জীবনং পয়ঃ। (ঐ, ৮)

ভগবান ইন্দ্রই পর্জ্জন্য, মেঘ তাঁহার আত্মমূর্ত্তি, তাহারা জীবগণের প্রীতি সাধন প্রাণপ্রদ সলিল বর্ষণ করে—

নন্দ বলিলেন,

য এবং বিসৃজেদ্ধর্ম্মং পারম্পর্য্যাগতং নরঃ।

কামাল্লোভাদ্ভয়াদ্‌দ্বেষাৎ স বৈ নাপ্নোতি শোভনম্। (ঐ, ১১)

ইন্দ্রের পূজা পারম্পর্য্যাগত। যে এই পুরাতন ধর্ম্মকে কাম, লোভ, ভয় বা দ্বেষবশতঃ পরিত্যাগ করে, কখনই সে কল্যাণ লাভ করে না।

তখন শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইয়া বলিলেন,

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে।

সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে। (ঐ, ১৩)

কর্ম্মবশেই জীবের জন্ম ও বিলয়; সুখ দুঃখ ভয় ক্ষেম সবই হয় কর্ম্মবশে।

অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্ম্মণাম্।

কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি ন হ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ। (ঐ, ১৪)

আর যদি ঈশ্বর বলিয়া কেহ থাকেন তবে তিনিও কর্ম্মের কর্ত্তাকেই ভজন করেন, কর্ম্মহীনকে ফলদান করিতে তিনিও অক্ষম।

ঈশ্বর লইয়া বৃথা কেন টানাটানি?

স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে।

স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্। (ঐ, ১৬)

মানুষ স্বভাব-বশ, স্বভাবকেই সে অনুবর্ত্তন করে; দেবাসুর মানুষ সকলেই স্বভাবে অবস্থিত।

রজসোৎপাদিতং বিশ্বমন্যোন্যং বিবিধং জগৎ॥ (ঐ, ২২)

রজোগুণেই এই বিশ্ব ও সমস্ত বিবিধ জগৎ উৎপন্ন।

রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বূনি সর্ব্বতঃ।

প্রজাস্তৈরেব সিধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি। (ঐ, ২৩)

রজোগুণে প্রেরিত হইয়াই মেঘ সকল সর্ব্বত্র বারি বর্ষণ করে। তাহাতেই প্রজারা রক্ষা পায়, মহেন্দ্র আবার কি করিবেন?

ভাগবতে উদ্ধৃত শ্রীকৃষ্ণের যুক্তি ও বিচার শুনিয়া মনে হয় যেন তিনি আজিকার দিনের একজন নিরীশ্বর বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী। যুক্তি ও বিজ্ঞানের দ্বারাই প্রাচীন সব পরম্পরা-

গত আচারের অন্ধতা দূর করিতে যেন শ্রীকৃষ্ণ বদ্ধপরিকর। কত কষ্টে তিনি ভক্তিবাদ যুক্তিবাদ প্রভৃতি দিয়া অর্থহীন পরম্পরাগত সনাতন কর্ম্মকাণ্ড সরাইয়া ভারতীয় ধর্ম্মের জগতে নিজের একটু স্থান করিয়া লইলেন, তাহা তখনকার দিনের শাস্ত্রপুরাণাদি দেখিলেই বুঝা যায়। কিন্তু আজ?

আজ তাঁহাদেরই ভক্তের দল যুক্তিহীন সব আচার-পরম্পরাতে পিষ্ট নিপীড়িত। একটুও স্বাধীনভাবে দেখিবার শক্তি তাঁহাদের নাই। যে-সব প্রাচীনতর সঙ্কীর্ণ মতবাদকে বহুকষ্টে তাঁহাদের মহাগুরুরা সরাইয়াছিলেন আজ তাঁহারা সেই সঙ্কীর্ণতার গৌরবেই গর্ব্বিত। প্রাচীনকালে যে সব প্রাচীন অর্থহীন সব ভার ছিল, আজ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভারে তাঁহারা প্রপীড়িত।

সব নূতন মতবাদ স্থাপনের ইতিহাসেই দেখি আরম্ভে কত স্বাধীন বুদ্ধি, কত জোরালো সব আঘাত! প্রাচীনের অর্থ-হীন সঞ্চয়কে কত বেপরোয়া আক্রমণ! প্রাচীনতর সব মঠ ও মঠবাসী ধনসম্পদসৌভাগ্যশালী সাধুদের অলস জীবন-যাত্রার কি তীব্র সমালোচনা! কিন্তু যেই সেই-মতবাদ পরিণত হইল একটি সম্প্রদায়ে, যেই ধীরে ধীরে তাঁহাদের প্রতিপত্তি সম্পত্তি সব উঠিল জমিয়া তখন তাঁহাদেরই মধ্যে সেই সব আপদই ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিতে লাগিল। সেই মঠ, মহন্ত, অলস জীবন, স্বর্ণছত্র, স্বর্ণপাদুকা, হাতী ঘোড়া ঐশ্বর্য্য, ক্রমে বিপুল হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তাঁহারাই লক্ষ লক্ষ মুদ্রা মঠে ও সন্ন্যাসীদের বাসস্থান নির্ম্মাণে ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আদি আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া তাঁহারা সবই ভুলিয়া গেলেন। এবং তখন যদি নূতন কোনও সাধকমণ্ডল তাঁহাদেরই বিস্মৃত আদর্শগুলিকে নবপ্রাণে জীবন্ত করিয়া তুলিতে চায় তবে তাঁহারাই হইয়া উঠেন তাহার ভীষণতম শত্রু ও বাধা। অন্য দশজনে সেই নূতন প্রচেষ্টাকে একটু কৃপা করিলেও তাঁহারা নিরন্তর কৃপাণ লইয়াই তাহার বিরুদ্ধে থাকেন খাড়া হইয়া। তখন এই সব পন্থের মধ্যে যে-সব প্রচণ্ড শৌচ, আচার, পরম্পরাগত বিধিপরতন্ত্রতা ও নূতন যে-কোনও মতের অতি দারুণ বিদ্বেষ প্রচলিত দেখা যায় তাহাতে কখনও মনেই হয় না যে একদিন ইঁহাদেরও এই সব কারণে বহু দুঃখ পোহাইতে হইয়াছে। নির্য্যাতিতা বধূরাই কালক্রমে হয় দারুণ শাশুড়ী। মুসলমান-বংশীয় কবীরের অনুবর্ত্তী "উদা"-পন্থীদের বিষম আচারনিষ্ঠা দেখিলে আজ অবাক হইতে হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি পুরাতন কথা মনে আসিল। বহুদিনের কথা, রাজপুতানার মধ্য দিয়া সিন্ধুদেশে চলিয়াছি। পথে আজমীরের "উর্স" উৎসবের ভিড়, দারুণ জনতা। রেলে আর শ্রেণীবিচার নাই। একটু স্থানের জন্য সবার কি কাতর কাকুতি-মিনতি! যদি ট্রেনের লোকের দয়ায় কেহ একটু প্রবেশ পাইল তবেই দেখি কিছুক্ষণ পর সেই মানুষই আবার হইয়া বসিল এক সিংহ-অবতার! যে আসিতে চায় তাহাকেই ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেয়—"স্থান নাই, স্থান নাই, দূরে যাও।" এই মনোবৃত্তিটাই আমাদের দেশের ধর্ম্মের ইতিহাসের মধ্যে ঐরূপ ধারণ করিয়াছে। ক্রমে ইহারাই এইভাবে সব উদারতা বিসর্জ্জন দিয়াছে।

শৈব-বৈষ্ণবাদির এইরূপ দুর্গতি দেখিয়া আমাদের হাসিলে চলিবে না। হয়ত আমরা যে আজ উদারতার দাবী করি-তেছি আমাদেরও এই দুর্গতি আরম্ভ হইয়াছে। সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও দিনে দিনে মানবের সাধনা ও মহা-যোগের বাধাস্বরূপ হইয়া পড়িতেছি। লোকে অন্যের দুর্গতি বুঝিতে পারে, কিন্তু নিজেরটা ধরিতে পারে না। একবার এক পাগলা পরিধানের ধুতিখানি খুলিয়া মাথায় জড়াইয়া নগ্ন হইয়া চলিতেছিল। জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, "ও-পাড়ার মেয়ে নাকি ক্ষেপেছে, দেখতে যাচ্ছি।" হায়রে! ঘুঁটে পোড়ে আর গোবর হাসে! আমাদেরও হাসি সেইরূপ!

আচার অনুষ্ঠান ও কর্ম্মকাণ্ড মাত্রই বাহ্য। বাহ্য বস্তু মাত্রই ভৌতিক (material)। ভৌতিক জগতের ধর্ম্মই হইল স্থান-ব্যাপকতা, অর্থাৎ একটি বস্তু অন্য বস্তুকে দূরে রাখে ঠেকাইয়া। কালচারের ক্ষেত্রে ইহারই নাম Exclu-siveness। আকাশ এইরূপ বস্তুপুঞ্জ নয় বলিয়া আকাশ কাহাকেও বাধা দেয় না ও কোথাও বাধা পায় না। ভাবও এইরূপ আকাশধর্ম্মী। এক ভাব অন্য ভাবের বিরোধী নয়। যদি হয় তবে বুঝিব এই ভাবও হইয়া উঠিয়াছে ভার। তাই দাদূ ভাব-বস্তুকে শূন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। শূন্য ও সহজকে সর্ব্বদা এক করিয়া দেখিয়াছেন। [আমার লিখিত "দাদূ," উপক্রমণিকা, "শূন্য ও সহজ" ১৭৯-১৯৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য] এই ভাব, প্রেমই হইল সন্তদের "সহজ"। এই "সহজ"

জীবনে হইলে অনুদার হইবার কোনও হেতু থাকে না। কিন্তু ব্যক্ত বা অব্যক্ত ভাবে যতদিন আচারের ভার আমরা অন্তরে বা বাহিরে বহন করি ততদিন উদারতা-বুলির কোনও অর্থই নাই। তখন উদারতা অর্থ হইল, আমারটা সকলে গ্রহণ করুক, কিন্তু আমাকে যেন কাহারও মতবাদ গ্রহণ করিতে না হয়।

অনেক সময় বৃদ্ধা পুরস্ত্রীদের বলিতে শুনিয়াছি,—আমার মেয়ের ভাগ্য ভাল, জামাইটি চমৎকার। আমার কন্যার মতেই সে দিন-রাত চলে। আর আমার ছেলেটা একটা হতভাগা। একবারে আমার বৌয়ের গোলাম। বৌ যা বলে তা আর "না" বলিবার মত পৌরুষ তার নাই। একেবারে গোল্লায় গেছে, হতভাগা।

এরূপ তথাকথিত উদারতা হইল ঠিক এই ভাবের। কিন্তু ভাবের সহজ রাজ্যে যে সব সন্তজন বিরাজ করেন তাঁহাদের উদারতা একেবারে সাচ্চা, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটি নাই। বাংলার বাউল সিন্ধের সূফী ও উত্তর-ভারতের সন্তগণ এই সম্পদে অতুলনীয়। বিনা সাধনায় এই উদারতা-সম্পদ কেহ পায় না। উদারতা হইল একটা সাধনার ধন ও ভগবানের দেওয়া মহাসম্পদ্। শিক্ষিত লোকদের তথাকথিত উদারতার মধ্যে সেই সাচ্চা ভাব ও প্রাণের তাগিদ কই? সন্তগণই সাচ্চা সাধক। এই সব নিরক্ষর বহু প্রাণ সাধকদের উদারতার কাছে দাঁড়াইলে আমরা লজ্জায় মরিয়া যাই। এই উদারতাই হইল যথার্থ যোগ, অর্থাৎ সহজ ভাবে দেওয়া ও নেওয়া। আমাদের শিক্ষিত ভদ্রগণ তো ভারতের এত স্থানে গিয়াছেন ও বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ক'জন নানা প্রদেশের সাধনার সঙ্গে হৃদয়ে হৃদয়ে যুক্ত হইতে পারিয়াছেন?

এই তো বাংলা দেশে আর্য্যসমাজের পঞ্চাশত্তম উৎসব। বাংলার প্রাণবস্তু ও সাধনার পরিচয় কি তাঁহাদের সকলে সেই পরিবারে পাইতে পারিয়াছেন? বাংলা দেশের অতুলনীয় সাধনার সম্পদ যে বাউলদের বাণী, তাহার কতটুকু পরিচয় সকলে জানেন? শিক্ষিত বাঙ্গালীরাই বা কয়জনে জানেন? বাউলরা যে মূর্খ নিরক্ষর! তথাকথিত শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও আমরা কিরূপ সংকীর্ণ ও Exclusive! আমরা দেশে-দেশান্তরে যাই বটে, কিন্তু আচার-বিচার ও সংস্কারগত ক্ষুদ্র একখণ্ড দেশ আমরা কাঁধে বহন করিয়া লইয়া যাই। চিরাচরিত আচার-ব্যবহার সব আমরা সর্ব্বত্র রাখিতে চাই অব্যাহত।

এই বিষয়ে বোধ হয় ইউরোপীয়েরাই আমাদের গুরু। তাঁহারা যে দেশেই যান্ সেখানেই একটি কৃত্রিম 'হোম' (home) রচনা করিয়া তার মধ্যে করেন বাস। বোধ হয় তাঁহাদেরও গুরু হইল শম্বুক। শম্বুক যেখানেই যাক আপন বাসাটি স্কন্ধে বহিয়া চলে। অতল সাগরে যেমন কাচের ঘরে বসিয়া ডুবুরী সমুদ্রের ধন লুটিয়া আনে অথচ নিজেকে সাগরের সঙ্গে কোন মতেই যোগযুক্ত করে না, আমাদের তথাকথিত বর্ত্তমান সভ্যতার উচ্চতম আদর্শ হইল তাহাই। Exploit কর, কিন্তু যুক্ত হইও না।

সর্ব্বমানবের মধ্যে যোগশিক্ষা করিতে হইলে বসিতে হয় এই সন্ত সাধকদের চরণতলে। সাধনার এই যোগই হইল যথার্থ যোগ। বিরাট এই সন্তসাহিত্য—তার মধ্যে আজ কতটুকুরই বা পরিচয় দিতে পারি?

হিন্দীভাষীদের কাছে আমার বলা উচিত বাংলার বাউলদের কথা। আমি সাধারণতঃ বাংলা দেশে বলি বাংলার বাহিরের সাধুদের কথা, বাংলার বাহিরে বলি বাংলা প্রভৃতি প্রদেশান্তরের সাধকদের কথা।

"দাদূ" লিখিতে আমি পুঁথীর উপর নির্ভর না করিয়া নানা স্থানের সাধুভক্তদের মুখের বাণীর উপরই প্রধানতঃ করিয়াছি নির্ভর। বাংলা দেশে রাজস্থানের সাধকের দিলাম পরিচয়। রাজস্থানী সাধুর কথা কেন বাংলাতে লিখিলাম তাহার কৈফিয়ৎ তাই অনেকে চাহিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িতেছে। একবার একটি পরিবারের ছেলেদের সব বিবাহ হইয়া গেল। মেয়েদের বিবাহ আর হয় না। তখন একজন পাগলা-রকমের লোক দুঃখ করিয়া বলিলেন, ওরা কি মূর্খ! যদি ছেলেরা পরের কন্যাদায় দূর না করিয়া নিজের ঘরের মেয়েগুলিকে বিবাহ করিত তবে নিজেরাই হইতে পারিত দায়মুক্ত! সকলে বলিয়া উঠিল, লোকটা বদ্ধ পাগল না কি! অথচ আমাদের নিজেদের এইরূপ পাগলামি যে সাধনার ক্ষেত্রে আছে তাহা আমাদের চোখেই পড়ে না! জ্ঞান ও প্রথা আমাদের বাহির

হইতে সংগ্রহ যদি করি তবেই হয় স্বাভাবিক। নিজেকে খাইয়া মানুষ কয়দিন বাঁচে?

তাই আমাদের দেশে যদি এক প্রদেশের ভক্তের পরিচয় সেই দেশের ভাষাতে না লেখা কেহ দোষের বলেন তবে সবাই তাঁহাকে তারিফই করিবেন। আজ আমাদের দৃষ্টি ক্ষেত্র এতই সঙ্কীর্ণ!

এই সঙ্কীর্ণতা দূর করিতে হইলে এখনও আমাদিগের সকলকেই ঘরের বাহিরের বড় বড় সব সন্তের ও সাধকের পরিচয় লইতে হইবে। ক্রমাগত এইরূপ সাধনা করিতে করিতে যদি আমাদের মোহবন্ধন ঘোচে। এই সঙ্কীর্ণতা Exclusiveness দূর করিতেই হইবে। এই সব মহাপুরুষ ও সত্য যেই প্রদেশের সম্পদ সেই প্রদেশের মানুষেরা তো অনায়াসেই তাহা দেখিতে পারিবেন। যাঁহারা ভিন্ন প্রদেশবাসী, যাঁহাদের জানিবার সম্ভাবনা নাই, তাঁহাদের কাছে আমি চাই সেই সব সাধনাকে উপস্থিত করিতে। যাঁহারা মর্ম্মের ও সত্যের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন ভাষার জন্য তাঁহাদের তো মাথা-ব্যথা নাই। তাঁহাদের লক্ষ্য হইল মানুষ। মানুষ বন্ধনমুক্ত হইয়া দিনে দিনে হইয়া চলুক অগ্রসর, ইহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। গঙ্গা যদি তাঁহার আদিভূমি পর্ব্বতবন্ধনেই বদ্ধ হইয়া থাকিতেন তবে সারা জগৎ কেমন করিয়া হইত তৃপ্ত ও দাহমুক্ত? গঙ্গা যে তাঁহার সঙ্কীর্ণ পিতৃভূমির মোহ ত্যাগ করিয়া সব চরাচরকে তৃপ্ত করিতে এই জগতে নামিতে রাজী হইয়াছেন তাহাতেই জগৎ ধন্য। তাই প্রত্যেক দেশের ভাবগঙ্গাকে তাহার আপন সঙ্কীর্ণ ভাষা প্রভৃতির গণ্ডী হইতে বাহির করাইয়া তাপিত ধরণীর উপর বিস্তৃত না করিয়া দিতে পারিলে মানবের উপায় কই? এইখানে বাংলার বাউল মদনের একটি গান মনে পড়ে,

> তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে
> তোমার ডাক শুনি সাঞ্জ (কিন্তু) চলতে না পাই,
> রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে
> ডুইবা যাতে অঙ্গ জুড়ায়, তাতেই যদি জগৎ পুড়ায়,
> বলতে গুরু কোথায় দাঁড়ায়, তোমার অভেদ সাধন মরলো ভেদে।
> তোর দুয়ারেই নানান তালা, পুরাণ কোরাণ তসবী মালা
> ভেখ পথই তো প্রধান জ্বালা, কাইন্দে মদন মরে খেদে॥

ভাষার মধ্যে যে একটু সঙ্কীর্ণতা ও দোষ আছে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া আরও সহজ হইতে গিয়া সাধকেরা যুগে যুগে ভাষা অপেক্ষা অনেক সময় মৌনকেই বড় স্থান দিয়াছেন। ভগবান বুদ্ধকে একবার মহাসত্য সম্বন্ধে তিন বার প্রশ্ন করা হইল। তিন বারই বুদ্ধ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। যখন বুদ্ধদেবকে বলা হইল, উত্তর দেন না কেন? বুদ্ধ বলিলেন, উত্তর তো দিয়াছি। সেই মহাসত্য বচনাতীত মৌনস্বরূপ।

একবার কবীর যখন ভরুচে নর্ম্মদাতীরে শুক্লতীর্থে আছেন তখন তাঁহার খ্যাতি শুনিয়া এক পারস্যদেশীয় ভক্ত ফকীর তাঁহাকে দেখিতে ব্যাকুল হইলেন। একদিন তিনি দেখেন, একটি বোঝাই তরী পারস্য দেশের বন্দর হইতে ভরুচ যাত্রা করিতেছে। ফকীর একটু স্থান তাহাতে প্রার্থনা করিলেন। বণিকরা দয়া করিয়া তাঁহাকে জাহাজে লইল। ভরুচে পৌঁছিয়া ফকীর জানিলেন, জাহাজ আবার পরদিন পারস্য যাত্রা করিবে। তখন মধ্যাহ্নকাল। ফকীর ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া শুক্লতীর্থে কবীরের আশ্রমে সন্ধ্যাকালে পৌঁছিলেন। কবীর তখন ধ্যানমগ্ন। শিষ্যেরা তাঁহার সৎকার করিলেন। কবীর কিছু ক্ষণ পরে বাহিরে আসিলে উভয়ে উভয়ের হাত ধরিয়া চুপ করিয়া সারা রাত বসিয়া রহিলেন। পরদিন প্রভাতে ফকীর তৃপ্ত হইয়া চলিয়া গেলেন আপন জাহাজ ধরিতে। সবাই কবীরকে প্রশ্ন করিল, এত দূর হইতে আসিয়া তিনিই বা কেন চুপ করিয়া রহিলেন? আপনারও কেন একটি কথা হইল না? কবীর বলিলেন, এত কথা হইয়াছে যে তাহা ভাষাতে ধরে না। মনের ভাব আমি মুখের ভাষাতে অনুবাদ করিয়া বলিতে গেলে তাহার ঘটিত বিকৃতি। আবার তিনি যখন সেই সব কথা হইতে মনের ভাবে অনুবাদ করিতেন তখন আবার তাহাতে ঘটিত বিকৃতি। ইহাতে আসল ভাবের আর কিছু অবশেষ থাকিত না। কোনও একটি রূপকে আয়নায় উল্টা প্রতিফলিত করিয়া আবার আয়নাকে প্রতিফলিত করিয়া সোজা করার অপেক্ষা সোজা সহজ দৃষ্টিতে দেখাই তো ভাল। উভয় আয়নার আত্মগত দোষে এক হইয়া ওঠে আর।

তাই সহজবাদী সন্তরা ভাষা অপেক্ষা মৌনকেই করিয়াছেন বেশী সম্মান। এই মৌন একটি শূন্যতা মাত্র নহে। শূন্য ও সহজ তাঁহাদের দৃষ্টিতে একান্ত ভাবে

পরস্পরে যুক্ত। আমার "দাদূ" গ্রন্থে এই বিষয়ে আমি বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগের জন্যই ভাষা। আবার ভাষাই বিস্তৃততর ও গভীরতর যোগের পক্ষে মহা বাধা। সন্ত সাধকদের প্রধান লক্ষ্যই হইল মানবের সত্য ও সাধনার যোগ; কাজেই সত্য ও সাধনার ক্ষেত্রে সন্তজনেরা ভাষাকে কখনও মুখ্য স্থান দিতে পারেন নাই।

এই সাধনার জন্য সন্তগণ কি কম দুঃখই পাইয়াছেন? একটা গল্প আছে, তাহার ঐতিহাসিক ভিত্তি যাহাই থাকুক, তাহাতে বুঝা যায় সন্তদের অন্তরের ভাবটি। কথিত আছে, কাশীতে যখন হিন্দু-মুসলমানে সাধনার মিলন সম্বন্ধে কবীর সর্ব্বত্র চেষ্টা করিতেছেন তখন পণ্ডিতের দল গিয়া বাদশাহের কাছে নালিশ করিলেন, এই ব্যক্তি মুসলমান হইয়া আমাদের ধর্ম্মে বৃথা হস্তক্ষেপ করিতেছে। আর মুল্লার দল গিয়া নালিশ করিলেন, মুসলমানকুলে জন্মিয়াও রাম হরি প্রভৃতি বলিয়া এ ব্যক্তি মুসলমান-ধর্ম্মের অপমান করিতেছে। বাদশাহের দরবারে তাহার তলব হইল। কবীর দেখিলেন, সেখানে অতিশোভন কাঠগড়ায় পণ্ডিত ও মুল্লার দল একত্র দাঁড়াইয়া। কবীর উচ্চহাস্যে হাসিয়া উঠিলেন। সভাস্থ সকলে তাঁহার এইরূপ আচরণের কৈফিয়ৎ চাহিলেন। কবীর বলিলেন, এতদিন তো আমি চাহিয়াছিলাম। কিন্তু হায়, ঠিকানামে থোড়ী গলতী হো গঈ। চাহিয়াছিলাম হিন্দু-মুসলমানেরই মিলন। সবাই তখন বলিয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব। কিন্তু আজ তো দেখি তাহা হইয়াছে সম্ভব। জগদীশ্বরের সিংহাসনের তলে চাহিয়াছিলাম এই উভয় দলকে মিলাইতে। কিন্তু দেখিতেছি ইহারা মিলিয়াছেন জগতের রাজার সিংহাসনতলে! তাই বলিয়াছিলাম, ঠিকানামেঁ থোড়ী গলতী হো গঈ। জগতের রাজার সিংহাসনতলে তো স্থান সংকীর্ণ, ! জগদীশ্বরের সিংহাসনতলে স্থান অতি প্রশস্ত। এখানেই যদি মিলন সম্ভব হইয়া থাকে তবে সেখানে তো আরও সম্ভব। এখানে ইহাঁরা মিলিয়াছেন বিদ্বেষে ও সাম্প্রদায়িক লোভে। সেখানে তাঁহার সিংহাসনতলে প্রেমের স্থান তো আরও উদার। লোভে বিদ্বেষেই যদি আজ ইহাঁরা এখানে মিলিতে পারিয়া থাকেন তবে প্রেমের ও মৈত্রীর মহাক্ষেত্রে কেন ইহাঁরা আরও সহজে না মিলিবেন? হিন্দু-মুসলমান মিলনের যে কল্পনা করিয়াছিলাম তাহা আজ দেখিলাম সম্পূর্ণ সম্ভব, তাই হঠাৎ হাসি থামাইতে পারি নাই। দয়া করিয়া সকলে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলি। বিদ্বেষের ও কুটার স্থান যতটা অপ্রশস্ত কবীর মনে করিয়াছিলেন হয়ত ততটা অপ্রশস্ত নহে। এখন যদি কবীর বাঁচিয়া থাকিতেন তবে হয়ত দেখিয়া বিস্মিত হইতেন, ধর্ম্মে সাহিত্যে ভাষায় রাজনীতিতে কাউন্সিলে এই যে হিন্দু-মুসলমান কিছুতেই মিলিতে পারেন না, সেই হিন্দু মুসলমানকেই দেখি একই দলে একত্র হইয়া চুরি ডাকাতি জুয়াচুরি করিতে। এমন কি পকেট কাটিতেও এই দুই দলের সহকর্ম্মীদের মধ্যে কোথাও প্রেমের ও যোগের অভাব ঘটে না। অতি চমৎকার ভাবে এই সব ক্ষেত্রে তাহাদের যুক্ত সাধনা।

মহাপুরুষদের সাধনা ভিন্ন রূপ। মহাপুরুষেরা যে ঐক্য সাধন করিতে আসেন তাহার প্রধান লক্ষ্য হইল ভাব ও সত্য। আচার ও কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা তাহা সাধিত হয় না। কারণ আচার-অনুষ্ঠান প্রতি ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ। তাহাতে বিভেদ ও বিচ্ছেদই বড় হইয়া উঠে। ঐক্যের পথে অগ্রসর হইতে পারা যায় শুধু ভাব ও সত্যকে আশ্রয় করিয়া। তাই জগতের ইতিহাসে কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা কখনও বিভিন্ন মতের মধ্যে ঐক্য সাধিত হয় নাই। ঐক্যের গুরুরা এই কারণেই আচার-অনুষ্ঠান অতিক্রম করিয়া একান্তভাবে ভাব ও সত্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হন।

এই সত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়া রজ্জবজী বলিলেন,

> সব সাচ মিলে সো সাচ হৈ না মিলে সো ঝুট।
>
> বিশ্বের সকল সত্যের সঙ্গে যাহা মেলে তাহাই সত্য। না হইলে তাহা ঝুট।

জগতে সাম্প্রদায়িক সত্য, দলের সত্য, প্রভৃতি নানাবিধ সংকীর্ণ সত্য বলিয়া কোন সাচ্চা বস্তু নাই। জগতের সকল সত্যের একমাত্র পরখই হইল তাহার সার্ব্বভৌমিকতা।

কাজেই মহাগুরুরা ক্রমাগত বলিয়াছেন, সকল সংকীর্ণ আচার সংস্কার প্রভৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হও, 'সহজ' হও, তবেই ঐক্যের সকল বাধা দূর হইবে। শাস্ত্র, ভেখ, আচার বিগ্রহ, মন্দির, কর্ম্মকাণ্ড, সংস্কার প্রভৃতি সবই বাহ্য, সবই বাধা। তাই ভারতের মধ্যযুগের সন্ত-সাধকের দল উপদেশ দেন, এই সব বাধা হইতে মুক্ত হইয়া সহজ হও।

সন্তগণ অধিকাংশই তথাকথিত হীনকুলোৎপন্ন অর্থাৎ অনার্য্য। এক সময় ইহাঁদেরই পূর্ব্বপুরুষ অনার্য্যেরা যখন দেবদেবী লইয়া ধর্ম্মসাধন করিয়াছেন তখন অভিজাত আর্য্যগণ তাঁহাদের এই সব প্রাকৃত সাধনাকে বর্ব্বর মনে করিয়া কত দূরেই না রাখিতে চাহিয়াছেন! ক্রমে এই সব দেবদেবী আর্য্যদেরই এমন পাইয়া বসিল যে তাঁহারাই সেই সব দেবদেবীর মন্দিরের আদিম অধিকারীর সন্ততিদিগকে ক্রমে সেই সব মন্দির হইতেই দিলেন বাহির করিয়া। বলিলেন, ইহারা অনধিকারী, ইহাদের পক্ষে মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। ইহারাও সেই সব আদেশ নতশিরে মানিয়া লইলেন। কেবল নতশিরে এই আদেশ মানিয়া লইলেন না সন্তগণ, যদিও সেই সব আর্য্যেতর বংশেই তাঁহাদের অনেকের জন্ম।

বিদ্রোহী হইয়া সন্তগণ এই কথা বলিলেন না যে এই মন্দির তো আমাদেরই। তোমরা বাধা দিবার কে? আমাদের মন্দির আমরা তো প্রবেশ করিবই। বরং তাঁহারা বলিলেন, ঝুঁঠা এই সব মন্দির ও দেবতা, এখানে মাথা নত করাই হইল আত্মাবমানন। এই সব দেবতা ও মন্দিরের ভেদ-বিভেদের আর অন্ত নাই। সত্য দেবতা আছেন অন্তরে। মানবই হইল সেই সত্য দেবতার প্রত্যক্ষ মন্দির। সেখানে অপরূপ বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এক মহা ঐক্য নিত্য বিরাজমান। এখানেই সন্তগণের বিশেষত্ব।

সন্তগণ ঘোষণা করিলেন, এই সব আচার-অনুষ্ঠান সংস্কার দেবতা মন্দির প্রভৃতি যেন গায়ের কাঁটা। এই কণ্টকে কণ্টকিত হইয়া কাহারও সঙ্গে যোগ স্থাপন করা চলে না। এই কাঁটা খাড়া করিয়া আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে গেলে তাহা হইবে সজারুর আলিঙ্গনের মত। এই সব কণ্টক হইতে মুক্ত হইয়াই হইতে হইবে সহজ মানুষ।

সন্তগণ বুঝাইয়া বলিলেন, সহজ মানুষ হও। বাহিরের ভেদ-বিভেদ পরিত্যাগ করিয়া অন্তরের ঐক্যের সত্যের মধ্যে ফিরিয়া এস। সেখানে বৈচিত্র্য আছে কিন্তু বিরোধ নাই। এই অন্তরের মন্দিরে জ্বলিতেছে মানব-সাধনার নিত্যদীপ। সেই আলোকই আমাদের গুরু। সহজ হইলে এই গুরুর বাণী নিত্য পাইবে শুনিতে।

বুদ্ধদেব অন্তরের এই প্রদীপের সন্ধান জানিতেন বলিয়াই ঘোষণা করিলেন,

অপ্পদীপো ভব।
আত্মদীপ হও।

দাদূও বলিয়াছেন,

জী কা কা সংসা পড়্যা, কো কাকো তারৈ।
দাদূ সোই সূরিবাঁ জো আপ উবারৈ ॥২৪,২৫

কে যে কাহাকে তারে সেই সংশয়েই জীবকুল ব্যাকুল। দাদূ বলেন, সেই ত যথার্থ বীর যে আপনাকে পারে তরাইতে।

সন্তগণ বলিলেন, বাহিরের 'ঠাকুর-ঠোকোর' দেবতা বিগ্রহ শাস্ত্র সংস্কার প্রভৃতি ছাড়। অন্তরের মধ্যে এস, সহজ মানুষ হও। অর্থাৎ মানুষই হইল সাধনার চরম ও পরম কথা। তাই চণ্ডীদাস বলিলেন,

শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই॥

আমাদের 'মনের মধ্যে যে মানুষ' আছেন তিনিই আসল গুরু। তিনি সহজ। সহজ না হইলে তো তাঁহাকে পাওয়া যায় না। তাই বাউল বলেন,

যদি ভেটবি সে মানুষে।
সাধনে সহজ হবি, তোরে যাইতে হবে সহজ দেশে॥

এই সহজের সাধনাতে "ভেখ-ভাষা" সবই হওয়া চাই সহজ। বুদ্ধদেব ছিলেন সহজ পথের পথিক, তাই সংস্কৃত ছাড়িয়া তিনি ধরিলেন গণ-ভাষা পালি। কবীরও ভাষাতেই বলিলেন। তাঁর বাণী খাঁটি সত্য,

সংস্কৃত কূপ জল কবীর ভাষা বহতা নীর।

কিন্তু যখন দেখি যে-দেশে ও যে-যুগে পালি সংস্কৃতেরই মত দুর্বোধ্য, সেখানেও বুদ্ধশিষ্যগণ গুরুর বাণী বলিয়া পালিই চালাইতেছেন তখন বুঝিলাম বুদ্ধের শিষ্যেরাই বুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রধান বিদ্রোহী। যখন দেখি কবীরপন্থী আজ কোথাও কবীরের ভাষা ও আচরণ ছাড়িতেই অক্ষম, তখন বুঝি ইহাঁরাও সংস্কার ও আচারের ভারে গুরুকেই পিষিয়া মারিয়াছেন। Letter সর্ব্বত্রই এমন ভাবেই spiritকে মারিয়া খতম করে।

ভেখের দিকেও দেখি সন্তগণ কৃত্রিম কোনও সম্প্রদায়েরই সাজসজ্জাকে আমল দেন না। দাদূর বর্ণনা করিতে গিয়া রজ্জবজী বলিলেন,—

ভগ বাজী ভাবৈ নাহিঁ, বিভূতি লগাবৈ নাহিঁ,
পাখণ্ড সুহাবৈ নাহিঁ, ঐসো কছু চাল হৈ।

টীকা মালা মানৈ নাহি জৈন ম্যাগ জানৈ নাহি
প্রপংচ পররানে নাহি, ঐসা কছু জ্ঞান হৈ।
সীংগী মুদ্রা দেরে নাহি, বোধ বিধি লেরে নাহি,
ভরম দিল দেরে নাহি, ঐসা কছু খ্যাল হৈ।
তুরকী তো খোদিগাড়ী, হিন্দুন কী হদ্দ ছাড়ী,
অংতর অজব মাঁড়ী, ঐসো দাদূ লাল হৈ॥
"মিলে ন কাহূকে সংগ," "চালি সব হদ্দ আয়ে বেহদ,"
"পরচীন বিম্রান হৈ"॥ (রজ্জবজী, স্বামী দাদূ দয়ালজীকে ভেটক সবৈয়)

দাদূর কোনো ভেখ বা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার বালাই ছিল না। মালা, তিলক, গেরুয়া বসনের ধার তিনি ধারিতেন না। ভণ্ডামি ও বাঁধা বুলি তিনি কোন ক্রমেই স্বীকার করেন নাই। জৈন মত বা ভেখও মানেন নাই, ধর্ম লইয়া সাংসারিকতাও করেন নাই, সিংগা মুদ্রাও সেবা করেন নাই, বৌদ্ধ মতও নেন নাই, কোন প্রকার মিথ্যাও হৃদয়ে স্থান দেন নাই। মুসলমান সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিও তিনি ছাড়িয়াছিলেন, হিন্দুর সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাও তিনি স্বীকার করেন নাই। তিনি ছিলেন উদার ও প্রবীণবিজ্ঞান।

বেশভূষার মধ্যেও যে ভেদ প্রভেদ আছে তাহা দূর করিতে গিয়াই কি কেহ কেহ বলিলেন, দিগম্বর হও। কেশ লইয়াও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কি প্রচণ্ড মতভেদ! কেহ বা রাখেন দাড়ি, কেহ বা রাখেন শিখা। বাউলরা তাই বলেন, কাজ নাই বাপু এই সব হাঙ্গামায়, স্বাভাবিক হও, সর্বকেশ রক্ষা কর। তাই বাউলরা সর্ব কেশই রক্ষা করেন। শিখরাও দেখি তাহাই করেন।

বাহ্যলিঙ্গ ও আচার বর্জন করাতেই এই সব সহজ মতের সাধকদের নাম হইল অব্যক্তলিঙ্গাচার। তাঁহাদের বাহ্য আচার অনুষ্ঠান মন্দির 'ঠাকোর-ঠোকোর' কিছুই নাই। কেন্দুলীতে বাউল নিত্যানন্দ দাস বলিয়াছিলেন, বাবা, ঠাকোর-ঠোকোরের বালাই আমাদের নাই, বৈষ্ণবদের সঙ্গে ঐখানেই আমাদের তফাৎ।

এই 'সহজ' যে এত বড় সত্য, তাহাও মানুষ কামে লোভে ও মোহবশে করিয়াছে বিকৃত! তাই সহজ বলিতেই এখন অনেকে ধর্মের একটা বিকার ও দুর্গতিই বুঝেন। মানুষ একদিকে পশুর মত কামক্রোধাদি চালিত হইয়া নীচ ভোগে ও সুখে থাকে মত্ত, আর মানুষ অন্যদিকে ধর্মের জন্য কৃচ্ছ্রাচারের চরম সাধন করিয়া ছাড়ে। এই দুইই হইল কোটিদ্বয়। বুদ্ধ বলিলেন, এই উভয় কোটিই যথার্থ সত্য হইতে ভ্রষ্ট, সহজ মধ্যপন্থা গ্রহণই সমীচীন।

ক্ষুদ্রবুদ্ধি পশুভাবাপন্ন লোক ক্রমে এই সহজের দোহাই দিয়াই পশুর মত প্রবৃত্ত হইল কামাদি সম্ভোগ করিতে। এই কথা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিল না যে যাহা পশুর পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক তাহা মানবের পক্ষে সহজ নয়। কারণ কেবল ইন্দ্রিয়গুলি লইয়াই তো মানবের সত্তা নহে। 'সহজ' হইল উভয়কোটিবিনির্মুক্ত নির্মল সত্য। তাহা চিরন্তন, তাহা সার্বভৌম।

সন্তরা বলিলেন, সহজ হইবার জন্যই কামক্রোধাদি আকস্মিক উপদ্রব হইতে চিত্তকে নিত্য রাখিতে হইবে মুক্ত। যাহা সহজ তাহাতে বিক্ষোভ নাই, প্রয়াস নাই, শ্রান্তি নাই, তাহা 'পরম বিশ্রাম'। কামক্রোধাদি বাহ্য ভাব, তাহা সহজ নহে, কারণ তাহা বিক্ষোভে ও প্রয়াসে ভরা। কতক্ষণ আমরা সেই বিক্ষোভ সহিতে পারি? ঝড় ক্ষণিকের, তাহা কাটিয়া গেলে আবার দেখা যায় আকাশের চিরন্তন শাশ্বত শান্তি, যাহার মধ্যে নাই প্রয়াস, নাই বিক্ষোভ। চীনের মহাজ্ঞানী লাওৎসে বলেন, এত বড় যে প্রকৃতি সে-ই বা কতক্ষণ একটি বাহ্য ঝটিকার বেগকে ধারণ করিতে পারে? তার পরেই আসে ধীর শাশ্বত শান্তি। এই সব বিক্ষোভই ক্ষণিক ও বাহ্য। তাই তাহা স্থানে ও কালে সীমাবদ্ধ। সমাজে মানবের পক্ষে এই সব বিক্ষোভ একেবারে আত্মঘাতী। সহজের ধর্মই হইল নিত্যতা ও বিশ্বব্যাপ্তি। তাহাতেই শান্তি, তাহাতেই অমৃতত্ব।

কামক্রোধাদির বিক্ষোভে প্রত্যেক মানুষ অন্য মানুষ হইতে পৃথক্, এমন কি নিজেও শতধা খণ্ডবিখণ্ড। এই সবের মধ্য দিয়া মানবে মানবে মিলনের কি কোনও আশা আছে? সহজের মধ্যেই মানবের মিলন। শাশ্বত শান্ত সত্যের মধ্যেই সকল মানবের নিত্য ভরসা। তাই সন্তগণ এই সহজের মধ্য দিয়াই কামনা করিয়াছেন সকল মানবের যোগ।

সম্প্রদায়বিশেষ-পূজিত দারুপাষাণাদির প্রতীক ও তাহার পূজা বা আচার-সংস্কার মানুষ হইতে মানুষকে চিরদিন বিচ্ছিন্ন রাখে। কাজেই আপন অন্তরের মধ্যে সত্যস্বরূপ প্রেমস্বরূপ একেকে উপলব্ধি করা ছাড়া মিলনের আর কি উপায় হইতে পারে? সন্তমতের ইহাই সার কথা।

এক এক সম্প্রদায়ে দেবতার এক এক নাম। কোন সম্প্রদায়প্রথিত নাম লইলেই অন্য সম্প্রদায় উঠে ক্ষুব্ধ হইয়া। ইহার প্রতীকার কি? কবীর বলিলেন,

পূরব দিশা হরি কো বাসা পশ্চিম অলহ মুকামা ... ১, ২

হিন্দু মনে করেন পূর্ব্ব দিকে হরির বাস, মুসলমান মনে করেন পশ্চিমে আল্লার মোকাম।

এই উভয়ের নাম যে একেরই সেই কথাটা একেবারে চরম ভাবে বুঝাইবার জন্যই কবীর বলিলেন,

কবীর পোংগড়া অলহ রাম কা সো গুরু পীর হমারা॥ ৩,৩

কবীর এই আল্লা রামের পুত্র। তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পীর।

উভয়কে পিতা বলিয়া কবীর যে ঐক্যের সাক্ষ্য দিয়াছেন এত বড় জোরের সাক্ষ্য আর হয় না।

নাম করিতে গেলেই এই সব নানা ফ্যাসাদ। বাউলরা তাই ভগবানের উল্লেখ করিতে গিয়া নাম না লইয়া ব্যবহার করেন সর্ব্বনাম—যথা "তিনি" বা "তুমি"। ইহা তো সর্ব্বরই এক। স্ত্রী যেমন প্রেমবশতই স্বামীর নাম না লইয়া শুধু "তিনি", "তুমি" দিয়াই কাজ সারেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার ভগবৎপ্রেমের গীতগুলিতে ভগবানকে "তুমি", "তিনি" দিয়াই বুঝাইয়াছেন। তাই তাঁহার গানগুলি জগতের সকল সম্প্রদায়েরই ব্যবহারযোগ্য। বাউলরাও এই বিষয়ে বিশেষ সাবধান। না জানিয়াও রবীন্দ্রনাথ বাউলদের এই পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়াছেন।

সন্তরাও সহজে নাম ব্যবহার করিতে চাহেন নাই। "স্বামী," "প্রভু", "তুমি", "তিনি" প্রভৃতি দিয়া চাহিয়াছেন কাজ সারিতে। তাই দাদূ বলেন,

সুন্দরী কবহুঁ কান্তকা মুখ সৌঁ নাম ন লেই॥ ৩০, ২১

নারী কখনও তো তাঁহার কান্তের নাম মুখে আনেন না।

কবীর বলেন, আমার বাহিরেও তিনি, ও ভিতরেই তিনি, তিনি আমা হইতে একেবারে অন্তরে বাহিরে অভিন্ন। নাম লইব কেমন করিয়া? নাম লইলেই মনে হইবে তিনি বুঝি আমা হইতে ভিন্ন।

জল ভর কুম্ভ জলৈ বিচ ধরিয়া বাহর ভীতর সোই।
উনকা নাম কহন কো নাহী দুজা ধোখা হোই॥ ১, ৯৯

জলে ভরা কুম্ভ, জলের মধ্যেই স্থাপিত, বাহিরে ভিতরে তিনিই। তাঁহার নাম বলিতে নাই, পাছে দ্বৈতের সংশয় জন্মে। স্বামীর নাম লইলে মনে হইতে পারে যে তিনি বুঝি আমা হইতে ভিন্ন।

সহজের সাধনা করিতে করিতে সন্তগণের দৃষ্টিও হইয়া গিয়াছিল সহজ। শূন্য ও সহজ সম্বন্ধে মৎপ্রণীত "দাদূ" পুস্তকের উপক্রমণিকায় ১৭৭-১৯৮ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছি এখানে তাহার আর পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কত সব কঠিন কঠিন তত্ত্ব এই সব সন্তগণ জলের মত সহজ ভাষায় বুঝাইয়াছেন তাহা দাদূর এই বাণীগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

এই বিষয়ে কবীরের শক্তি অতুলনীয়। কত সহজ তাঁহার দৃষ্টি, অথচ সত্যের কোন দিকই বাদ দিয়া তিনি সাধনাকে সুলভ ও সস্তা করিতে চাহেন নাই। মহাসত্যকে তিনি কোনো প্রকার চালাকির দ্বারা এড়াইতে চাহেন নাই। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ঈশ্বর ভিতরে, কি বাহিরে, কোথায় তিনি বিরাজিত? কবীর বলিলেন,

ঐসা লো নহিঁ তৈসা লো,
মৈঁ কেহি বিধি কথৌঁ গম্ভীরা লো।
ভীতর কহুঁ তো জগময় লাজৈ,
বাহর কহুঁ তো ঝুঠ লো॥ ১, ১০৪

এমন নহেন তিনি তেমন, কেমন করিয়া সেই গভীর রহস্য পারি বলিতে? যদি বলি তিনি আছেন অন্তরে, তবে বাহিরের বিশ্বজগৎ মরিয়া যায় লজ্জায়; যদি বলি তিনি বাহিরে, তবে আবার সেই কথা হয় ঝুঠ।

দ্বৈত-অদ্বৈত তত্ত্ব লইয়া যুগ যুগান্তর ধরিয়া ভারতে কত তর্ক-বিচারই না হইল! ইহার কি আর শেষ আছে? বড় বড় জ্ঞানী পণ্ডিতের দল গেলেন হারিয়া! কাশীতে প্রশ্ন হইল, তিনি এক না দুই? সহজ মানুষ কবীর বলিলেন, রূপ গুণ সবারই যদি তিনি অতীত, তবে কেন সংখ্যার বা তিনি অতীত না হইবেন?

আগে বহুত বিচার থে, রূপ অরূপ ন তাহিঁ।
বহুত ধ্যান করি দেখিয়া, নহি তাহি সংখ্যা আহি॥ ৩, ৯০

আগে অনেক বিচারই ত হইয়াছে। রূপ অরূপ কিছুই ত তাঁহাতে নাই। বহুত ধ্যান করিয়া দেখিলাম, তাঁহাতে সংখ্যাও নাই।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, এত সম্পদ্ যেই সাধনায়, তাহা ভারতে কত দিনের? বাউলরা বলেন, বেদ তো কয়দিনের, আমাদের এই সহজ সত্য চিরদিনের। কারণ সত্যের আদি নাই। বেদ কিতাব শাস্ত্র সবই মানুষের রচা, কাজেই তার আদি আছে। সত্য অনাদি।

এইরূপ প্রাচীনতার দাবী শুনিয়া বাল্যকালে হাসিতাম। তার পর দেখি, বেদেও এই সব মরমী সহজবাদের আভাস পাই, যদিও সেই সব কথা বৈদিক ধর্ম্মমতের ঠিক অঙ্গীয় নহে। তার পর মোহেঞ্জোদরো প্রভৃতি দেখি যোগ প্রভৃতি মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কাজেই মনে হয়, ইহাদের দাবী নিতান্ত অযৌক্তিক নহে, এই সব মতবাদ আর্য্যপূর্ব্ব ও বেদপূর্ব্ব। ক্রমে ইহাদেরই সন্ততি হইলেন তৈর্থিকগণ—

হয়ত উপনিষদের সত্যদৃষ্টি তাঁহাদের সঙ্গে সংঘর্ষেরই ফল। বেদ-বাহ্য সব মতের মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধমতই পরে প্রখ্যাত হইয়াছে, যদিও এইরূপ আরও অনেক মত সেই যুগে বিদ্যমান ছিল। এই সব সহজবাদ, ভক্তিবাদ দিয়াই আমরা বাহিরের লোককে আপন করিতে পারি। কারণ সহজের পথ প্রেমের পথ হইল উদার, inclusive। আচারবদ্ধ ধর্ম্ম হইল সংকীর্ণ, exclusive।

মুসলমানেরা যখন ভারতে আসিলেন তখন হিন্দু-মুসলমানের যোগস্থাপনের জন্য ভগবান তাঁহার এই সব সহজভাবের সন্ত সন্তানদেরই একে একে ভারতের সাধনার ক্ষেত্রে দিলেন পাঠাইয়া। তাই উত্তর-ভারতে রামানন্দ হইতে সন্তদের একটি ধারা চলিল। দ্রাবিড় ভক্তি ও উত্তর-ভারতের যোগদৃষ্টি এই উভয়কে যুক্ত করিয়া কবীরের প্রেরণা।

ভক্তি দ্রাবিড় উপজী লায়ে রামানন্দ।

কিন্তু অনেকে প্রশ্ন করেন, তবে হিন্দী প্রভৃতি সাহিত্যে প্রথমে চারণ-কবিদের যুদ্ধগাথাই কেন দেখিতে পাই? তার পর তো দেখি এই সন্ত কবিদের যুগ। ইহার উত্তরে বলিতে হয়, আদিতে গ্রহগুলি ছিল সব অগ্নিময়। পৃথিবীও তাই অগ্নিময় বাষ্পময়; নানা যুগ অতিক্রম করিয়া ক্রমে সে হইয়া উঠিল জলস্থলোদ্ভিদ্‌শ্যামল জীবধাত্রী ধরিত্রী। সাহিত্য ও সাধনার ইতিহাসেও ঠিক সেই একই পদ্ধতি। হিন্দু-মুসলমানের সাক্ষাৎ হইতেই দেখা যায় প্রথমে মারামারি কাটাকাটি দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষেরই ইতিহাস। ক্রমে প্রেম মাধুর্য্য প্রভৃতি সুন্দর ভাব হয় আবির্ভূত। যখন এই সব মহাভাব ভারতের নানা প্রদেশে নানা ভাষায় আসিল, তখন ভারত অন্য নানা দুর্গতিতে আচ্ছন্ন হইলেও প্রাদেশিক সংকীর্ণতা তাহার সাধনার জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে নাই।

অযোধ্যার নিকট জায়সের তপস্বী মালিক মহম্মদের পদ্মাবতী দেখিতে দেখিতে আরাকানের রসিক মাগন ঠাকুরের চিত্ত হরণ করিল। তাঁহার অনুরোধে আলাওল করিলেন তাহা বাংলায় অনুবাদ।

চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের শেষ ভাগেই যে কবীরের পরিচয় ও প্রভাব বাংলার পূর্ব্বসীমা শ্রীহট্টে গিয়া পৌঁছিয়াছে তাহার সংবাদও আমরা পাই। তাহারও পূর্ব্বে দেখি বাংলার গোপীচাঁদের গান ছড়াইয়া গিয়াছে সারা ভারতে। বীরভূম-কেন্দুবিল্বের জয়দেবের পদ সাদরে গীত হয় না, ভারতে এমন প্রদেশ কোথায়? জয়দেবের সংস্কৃত, বাংলা সংস্কৃত। তবুও তো কোনও বাধা হয় নাই। রাজস্থানের দাদূর বন্দনা পাইলাম বাংলার বাউলের মুখে।

আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রেল-তার প্রভৃতির কৃপায় ভারতে সর্ব্বত্র যাওয়া-আসা ও পরিচয়ের সুবিধা কত সুখলভ্য হইয়াছে। অথচ আজই আমরা কি এতদূর হতভাগ্য যে কিছুতেই পরস্পর পরস্পরকে হৃদয়ের কাছে আনিতে পারিব না? ইহার অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে?

সাহিত্যে নব প্রাণ সঞ্চারের তপস্যা সারা ভারত জুড়িয়া প্রদেশে প্রদেশে ভাষায় ভাষায় নব প্রাণের সাধনাকে জাগাইয়া তুলুক। অথর্ব্বের একাদশ কাণ্ডে প্রাণের সম্বন্ধে একটি চমৎকার সূক্ত আছে,

যৎ প্রাণ ঋতাবাগতেঽভিক্রন্দত্যোষধীঃ।
সর্বং তদা প্রমোদতে যৎ কিং চ ভূম্যামধি। অথর্ব ১১, ৬, ৫

যখন ঋতু আসিলে ওষধিসকলের দিকে প্রাণ তাহার অভিক্রন্দন প্রেরণ করে তখন ভূমির উপর যাহা কিছু আছে সবই হয় প্রফুল্লিত হইয়া।

যদা প্রাণো অভ্যবর্ষীদ্ বর্ষেণ পৃথিবীং মহীম্। ১১, ৬, ৫
যখন প্রাণ এই মহী পৃথিবীর উপর বর্ষণ করে—
অভিবৃষ্টা ওষধয়ঃ প্রাণেন সমবাদিরন্। ১১, ৬, ৬
তখন অভিবৃষ্ট সকল ওষধি প্রাণের দ্বারাই দেয় তাহার প্রত্যুত্তর।

প্রাণের প্রত্যুত্তর হইল প্রতি ক্ষেত্রে বিচিত্র প্রকাশে। মৃত্যুর ধর্ম একরূপতা। জীবনের ধর্ম্মের প্রকাশ তাহার পদে পদে অভিনবত্বে ও জনে জনে বৈচিত্র্যে। তাই ভারতের ঋষি পিতামহগণ প্রাণপ্রদ পর্জ্জন্যকে স্তব করিয়া বলিয়াছেন,

তুমি আসিবার পূর্ব্বে সমস্ত পৃথিবী ছিল শুষ্ক শূন্য বৈচিত্র্যহীন একাকার। তুমি আসিলে আর সব হইয়া উঠিল নানারূপে নানা বর্ণে অনন্ত বৈচিত্র্যে ভরপুর।

ঋগ্বেদের ঋষিও বলিয়াছেন,

হসা রূপ ওষধী বিশ্বরূপা
স নঃ পর্জন্য মহি শর্ম যচ্ছ। ঋগ্বেদ, ৫, ৮৩, ৫

হে পর্জন্য, তোমার প্রসাদেই নানাবিধ ওষধি হইয়া উঠে বিশ্বসিচিত্ররূপা, আমাদের জীবনেও তুমি নিত্য বিচিত্র সুমহৎ কল্যাণ দান কর।*

*কলিকাতায় আগত সম্মেলনের পঞ্চদশতম বার্ষিক মহোৎসবে হিন্দীসাহিত্য-মহাসম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণের মূল বাংলা রূপ।

"বৈজ্ঞানিক পরিভাষা"*

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা ও সঙ্কলন করিতেছেন। ইঁহাদের সম্পাদিত গণিতের পরিভাষা সম্পূর্ণ হইয়া অভিমতের জন্য সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে। ইহার সম্যক্ এবং বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। সূচনায় প্রদত্ত নিয়মাবলী হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠিতেছে—বাঙলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা ও সঙ্কলনের প্রয়োজন কি? ইহার একমাত্র উত্তর—বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে গেলে—ইহা আবশ্যক। বাঙলা ভাষায় সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞান—এবং উচ্চ-বিজ্ঞান—শিক্ষা দেওয়া ও আলোচনা কেন অত্যাবশ্যক—তাহার বিচার বিস্তৃত ভাবে এখানে করা সম্ভব নয়। মোটামুটি ভাবে ইহাই বলিতে পারা যায় যে মাতৃভাষার সাহায্যে যে-কোনও বিষয়ই অত্যল্প সময়ে অল্পায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হয়। মাতৃভাষায় কথিত বা লিখিত যে কোনও ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে যেটুকু আয়াস প্রয়োজন হয়—তাহা প্রায় নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মতই স্বাভাবিক। বিদেশীয় ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার ফলে, উচ্চবিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন হইয়াও—ইহাকে পরিপাক করিয়া ঠিক নিজস্ব করিয়া লইবার পক্ষে যতটা সন্দেহের অবকাশ থাকে, মাতৃভাষার সাহায্যে ইহা আয়ত্ত করিলে ততটা থাকিবার কথা নহে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে—আমাদের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন জাতি হইয়া উঠিতে হইলে (যাহা আমাদের জাতীয় সাফল্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন) মাতৃভাষায়ই সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ আলোচনা হওয়া অপরিহার্য্য-রূপে আবশ্যক।

ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও প্রশ্ন উঠিতে পারে, বাঙলা ভাষায় সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞান আলোচনা হওয়া উচিত—ধরিয়া লইলেও পারিভাষিক শব্দের বাংলা অনুবাদ করিবার প্রয়োজন কি? ইংরেজী, জর্ম্মন, লাতিন, গ্রীক প্রভৃতি বিজ্ঞানসাহিত্যে প্রচলিত বিদেশীয় পরিভাষা ব্যবহার করিয়াই তো বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চ্চা চলিতে পারে। সাধারণ বাঙলাভাষীর নিকট হইতে এই প্রকার প্রশ্ন যতই অসঙ্গত মনে হউক,—ইহাকে একেবারে উড়াইয়া দিবার যো নাই। কারণ, বহু উচ্চশিক্ষিত বাঙালী বিজ্ঞানবিদ্, ইহাই সঙ্গত ও সম্ভব—এই ধারণা পোষণ করেন। বলা বাহুল্য—ইহা ভুল।

ভাষা সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে—পরিভাষা সম্বন্ধেও তাহা সম্পূর্ণরূপেই প্রযোজ্য। ইহা ব্যতীত পরিভাষার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রহিয়াছে। পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে দেখাইয়াছি† কোনও বস্তু বা বিষয় সম্পর্কিত পরিভাষার কার্য্য হইতেছে—সেই বস্তু বা ব্যাপারটির একটি চিত্র সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করা। ইহারই উপর বিজ্ঞান-সাহিত্যের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। বিদেশীয় পরিভাষায় এই সম্ভাবনা প্রায় নাই। Water শব্দটির সহিত আমরা আবাল্য পরিচিত হইলেও—'জল' শব্দটি যেরূপ শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে মনকে একটি তরলতায় সিক্ত করে, water শব্দটি তাহা করে কি? এই জন্যই জর্ম্মন প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় ভাষায় দীর্ঘকাল প্রচলিত লাতিন, গ্রীক প্রভৃতি পরিভাষাও ভাষান্তরিত করিয়া লওয়া হইতেছে। (অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, নব্য তুরস্ক তাহার ভাষা হইতে বহুদিনের আরবীক ও পারসীক শব্দ নির্বাসিত করিয়াছে এবং এই জন্য গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা নিজের নাম পর্য্যন্ত ভাষান্তরিত করিয়াছেন—ইহাও দ্রষ্টব্য। ইহা একটু বাড়াবাড়ি মনে হইতে পারে—কিন্তু ইহার অন্তরালে যে মনোবৃত্তি কার্য্য করিতেছে তাহা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক।) বিজ্ঞানের ভাষা ও পরিভাষা নিজস্ব না হইলে বিজ্ঞান কখনও সম্পূর্ণ নিজের হইবে না,—ইহা উপলব্ধি করিবার সময় হইয়াছে।

---

* বৈজ্ঞানিক পরিভাষা গণিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত। ১[illegible]৩৫।

† বিজ্ঞানের পরিভাষা—প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪২।

জন্যই এই হাস্যকর সম্ভাবনা (অসম্ভাবনা ?) তাঁহাদের আতঙ্কিত করিয়াছে। বাঙলা গাণিতিক সঙ্কেত ইংরেজী অক্ষরে লিখিবার এই নির্দ্দেশ কতটা সমীচীন হইয়াছে তাহা বিবেচ্য।

একথা ঠিক, যে যখন কোনও ইংরেজ ছাত্র দেখে যে—

The kinetic energy of a moving body of mass m and velocity v—is equal to half the product of the mass and square of the velocity. In short

$$K. E. = \frac{mv^2}{2}$$

তখন নিঃসন্দেহ এই সংক্ষিপ্ত গাণিতিক সঙ্কেতটি তাহার মনে সমস্ত ব্যাপারটির একটি চিত্র মুদ্রিত করিয়া দেয়; এবং বিষয়টির একটি পরিষ্কার ধারণা মনে রাখিবার সহায়তা করে, কিন্তু বাঙালী ছাত্রের পক্ষে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। সমিতির অনুমোদিত নিয়ম ও পরিভাষা অনুসারে লিখিত পুস্তকে বাঙালী ছাত্র পাঠ করিবে—

কোনও ভ্রাম্যমাণ বস্তুর চলশক্তি (?) তাহার ভর এবং বেগের বর্গের গুণফলের অর্দ্ধেক; এবং ইহাকে সংক্ষেপে এই ভাবে প্রকাশ করা চলে

$$\text{চলশক্তি} = \frac{mv^2}{2}$$

সহজেই বুঝিতে পারি এক্ষেত্রে এই সংক্ষিপ্ত সঙ্কেতটি বালকটির মনে কোনও চিত্রই মুদ্রিত করিবে না, এমন-কি ইহা সমস্ত ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করা এবং মনে রাখা সম্বন্ধেও কোনও সহায়তাই করিতেছে না। কারণ m এবং v অক্ষর দুইটি ইংরেজ বালকটির পক্ষে যেমন সহজেই mass এবং velocity-র প্রতীক হইয়া দাঁড়াইতেছে—বাঙালী বালকের পক্ষে তাহারা সেরূপ ভাবে 'ভর' (?) এবং বেগের প্রতীকস্বরূপ হইতেছে না। তাহাকেই সর্ব্বদাই মনে মনে এই অক্ষর দুইটিকে বাঙলায় অনুবাদ করিয়া লইতে হইতেছে। ফলে ইহা তাহার পক্ষে অযথা ভার মাত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই সামঞ্জস্য-হীন নির্দ্দেশ বিজ্ঞানসাহিত্যে গাণিতিক সঙ্কেতের (formula) উদ্দেশ্য একেবারে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে।

পক্ষান্তরে যদি দেখি,

কোনও বেগবান বস্তুর বেগশক্তি তাহার বস্তুমান ও গতিবেগের বর্গের গুণফলের অর্দ্ধেক অর্থাৎ—

$$\text{বেগশক্তি} = \frac{\text{ব} \times \text{গ}^2}{২}$$

তাহা হইলে এই সঙ্কেত তাহাকে সহজেই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিবার এবং মনে রাখিবার সহায়তা করিবে।

ইংরেজী অঙ্ক (figure) ব্যবহার করা সম্বন্ধেও অনুরূপ আপত্তির কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। অঙ্ক বলিব বাঙলায়, কিন্তু লিখিবার বেলায় লিখিব ইংরেজীতে—এই যুক্তিহীন অসামঞ্জস্য—কেবলমাত্র উত্তরকালে বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য একান্ত ভাবে বিদেশীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকের উপরে নির্ভর করিতে হইবে—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সমর্থিত হইতেছে। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি—ইহা কেবলমাত্র ভুল নহে; আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যেরও পরিপন্থী। বাঙালী ছাত্র যখন মুখে বলিবে 'ষোল' এবং পড়িবে 16 (sixteen) তখন এই উভয় সংখ্যার ভিতর সামঞ্জস্য বিধান করিতে তাহার কতকটা মানসিক আয়াস প্রয়োজন হইবে। ইহা হইতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

ইহা ব্যতীত দুইটি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বাস্তব-সংখ্যার (concrete number) ভিতর যে ভাষাতত্ত্ব-ঘটিত পার্থক্য আছে—তাহার কথাও মনে রাখা দরকার। 16 annas এবং ষোল আনা যে এক নহে তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এক্ষেত্রেও দেখিতে পাইতেছি বিজ্ঞান-সাহিত্যকে সম্পূর্ণরূপে সার্থক করিতে হইলে বাঙলা অঙ্ক ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত এবং উচিত।

অতঃপর বানান।

বানান-সংক্রান্ত দুই নম্বর নিয়মে দেখিতেছি, সমিতি u-এর short উচ্চারণ 'অ' কারের দ্বারা লিখিবার পক্ষপাতী। ইহা কি ঠিক হইয়াছে? ইংরেজ u-এর short উচ্চারণ যেমনই করুক, বাঙালী ইহা প্রায় 'আ' কারের ন্যায়ই উচ্চারণ করে। 'অ'কার অপেক্ষা 'আ'কারের দ্বারাই u-এর short উচ্চারণ অধিকতর নির্দ্দোষরূপে সূচিত হয়; এবং এইজন্য স্বভাবিক নিয়মে বাংলা সাহিত্যে সর্ব্বত্রই u যে 'আ' কার দ্বারা লিখিত হইয়াছে দেখিতে পাই। 'সোডিয়াম'কে বাঙালীর জিহ্বা যদি 'সোডিয়াম' (ইহাই sodiumএর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী উচ্চারণ) উচ্চারণ করে তাহা হইলেই বা এমন কি ক্ষতি? বিভিন্ন ভাষাতে একই শব্দ ভিন্ন-ভিন্নভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে; জর্ম্মন এই শব্দটিকে 'সডিয়ুম' উচ্চারণ করিয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, এবং ফরাসী ইহাকে সদিয়্ (ম) বলিয়া অভিহিত করে।

জর্মেনীর 'ৎসেপেলীন' ইংলণ্ডে আসিয়া 'জেপেলিন' হইয়াছে; এবং ফরাসীর 'পারি' নগরীকে ইংরেজ 'প্যারিস' বানাইয়াছে। বাঙলা ভাষায়ও এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ইংরেজ Doctor বাঙলায় ডাক্তার (-বাবু) হইয়া পাংক্তেয় হইয়াছেন, এবং engine ইঞ্জিন হইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। এ কথাও মনে রাখিতে হইবে short-u কে 'অ'কারের দ্বারা লিখিলে ভুল উচ্চারণ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যে সকল বালক বাংলা অর্থপুস্তক দেখিয়া (যাহাতে u এর short উচ্চারণ 'অ'কার বা 'ঃ' দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে) ইংরেজী উচ্চারণ করিতে শেখে—তাহাদের খারাপ উচ্চারণ লক্ষিতব্য।

Short-u কে 'অকার' দ্বারা লিখিলে, umbrella দেখিতে দেখিতে 'অমব্রেলায়' পরিণত হইবে, এবং আপার সার্কুলার রোড শীঘ্রই 'অপার' হইয়া দাঁড়াইবে যদিও আমরা এই 'অপার' অবস্থা বহুদিন হইল পার হইয়া আসিয়াছি। ইহাতে আমাদের বাজীর ঘোড়া রেসে 'অপসেট' হইয়া যাইবে। এই risk লইবার কোনও প্রয়োজন আছে কি?

তিন নম্বর নিয়মে দেখিতে পাই, u র short উচ্চারণ 'অ্য' (যাহাকে বক্র-অ বলা হইয়াছে) নির্দ্দেশ করিবার জন্য সমিতি একটি নূতন ও সম্পূর্ণ অনাবশ্যক অক্ষর ও চিহ্ন প্রচলন করিবার পক্ষপাতী। বক্র-অ বা 'অ্য' উচ্চারণ বাঙালীর নিকট নূতন বা বাঙলা ভাষায় অপ্রচুর নহে। লিখিত ভাষায় সচরাচর চারি প্রকার বানানের দ্বারা ইহা অভিব্যক্ত হয়। যেমন—

(১) 'অ্য' কারের দ্বারা, যথা—অ্যাকসারে, অজ্ঞান;

(২) 'এ' কারের দ্বারা, যথা—এক, দেখ, খেলা, এমন;

(৩) 'া' ফলা দ্বারা, যথা—ব্যাথ, ব্যর্থ ব্যবহার, ব্যস্ত;

(৪) য-কার, যথা—অভ্যাস, ব্যাবহারিক;

ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটি অক্ষর ও চিহ্নের বিকল্প উচ্চারণ আছে। কিন্তু 'য্য'-এর একটিই মাত্র (বক্র-অ্যা) উচ্চারণ। এই জন্য বিদেশীয় শব্দের 'অ্যা' উচ্চারণ নির্দ্দেশ করিতে এই বানান এতাবৎ কাল বহুল ভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। 'ক্যালসিয়াম' এবং 'আয়োডিন' ইতিপূর্ব্বেই বাঙলা ভাষায় ও সাহিত্যে পাংক্তেয় হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে আর একটি নূতন অক্ষরের উদ্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্যক। সমিতি ইহা কেন প্রচলিত করিয়া বাঙলার কেস অযথা ভারাক্রান্ত এবং বাঙালীর ছেলের অক্ষর পরিচয় অকারণে দুরূহ করিয়া তুলিতে চাহেন—তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

পাঁচ নম্বর নিয়মে সমিতি s স্থানে 'স' এবং sh স্থানে 'শ' ব্যবহার করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইহাই ঠিক—সন্দেহ নাই; কিন্তু st র জন্য 'স্‌ট' এই নূতন যুক্তাক্ষরের উদ্ভাবন অনাবশ্যক এবং বাহুল্য। 'স' এর সংস্কৃত বা হিন্দি উচ্চারণ যাহাই হউক না কেন, কোনও শিক্ষিত বাঙালীই ইহাকে s-রূপে উচ্চারণ করেন না;—করেন sh-রূপে। তথাপি সমিতি 'আরসেনিক' কে আর্সেনিক বানান দ্বারা (ইহাই ঠিক) লিখিতে আপত্তি বোধ করেন না। ঠিক এইরূপেই একই কারণে 'ষ্ট' (যে যুক্ত অক্ষরটি পূর্ব্ব হইতেই বাঙলা ভাষায় বিদ্যমান রহিয়াছে) অক্ষরটিও বাঙালী যেরূপ ভাবে উচ্চারণ করুক না কেন বৈদেশিক শব্দের st বানান করিতে ইহা নির্ভয়ে ব্যবহার করা চলিবে, এবং চলিয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই বাঙলা ভাষায় ইষ্টিশান, ষ্টাম্প, ষ্টুডেণ্ট প্রভৃতি st সম্বলিত শব্দ বহুল পরিমানে প্রচলিত এবং লিখিত হইতেছে। ইহাতে উচ্চারণে এ পর্য্যন্ত কোনও গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। ইহা সত্ত্বেও 'ষ্ট' সর্ব্বদাই ঠিক st নহে বলিয়া যদি কেহ আপত্তি করেন,—তাহা হইলে স্ট নূতন অক্ষর উদ্ভাবনা না করিয়া—স-এ হসন্ত দিয়া পরে বানান লেখা চলিতে পারে; যথা,—বেস্‌ট, লাস্‌ট, স্‌টেশন ইত্যাদি। এই প্রকার বানান বাঙলা সাহিত্যে এবং রেল-কোম্পানীর বিজ্ঞপ্তি পত্রে আজকাল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং যুক্তিসঙ্গত।

এইরূপ আরও একটি অযথা অক্ষরের উদ্ভাবনা ছয় নম্বর নিয়মে করা হইয়াছে। f এবং v এর স্থানে যথাক্রমে 'ফ' এবং 'ভ' চলিবে। ইতিপূর্ব্বেই চলিয়াছে। ইহা সমিতি স্বীকার করেন। কিন্তু z-এর জন্য একটি নূতন অক্ষর—অধোরেখা যুক্ত 'জ' এর অভাব এবং প্রয়োজন বোধ করিতেছেন। f ও v-এর উচ্চারণের সহিত বাঙলা 'ফ' ও 'ভ'-এর উচ্চারণের যে সম্পর্ক ও যতটুকু পার্থক্য,—z ও 'জ' এর পার্থক্য তাহার বেশী নহে। 'জ' অক্ষরটির উচ্চারণ সর্ব্বত্রই একমাত্র j-র মত নয়; পূর্ব্ব বঙ্গে ইহা প্রায় z-এর মতই উচ্চারিত হয়—তাহা সম্ভবতঃ অনেকেই জানেন। ইহা ব্যতীত বাঙলা ভাষায় সুপ্রচলিত দেশী ও বিদেশীয় অনেক শব্দে এই অক্ষরটি প্রায় z-এর ন্যায়

উচ্চারিত হয়; যথা—'মেজদা,* 'গজল', 'আওয়াজ' ইত্যাদি। z-ঘটিত শব্দ ইংরেজী ভাষাতেও অধিক নাই; এবং এরূপ বৈজ্ঞানিক শব্দের সংখ্যা কয়েকটি মাত্র। তথাপি ইহার জন্য একটি নূতন যুক্তাক্ষর (!) উদ্ভাবন করা (নিষ্প্রয়োজন) হইলেও বাঙালীর জিহ্বা 'বেনজিন'কে 'বেনঝিন' সহজে উচ্চারণ করিবে—তাহা মনে হয় না। আমাদের 'জু' গার্ডেনে জেব্রা আছে; এবং জাঞ্জিবার উপকূলে জুলুদের কথা কাগজে পড়িয়া থাকি। এই বাক্যের জ-এর পাঁচটি দৃষ্টান্ত প্রণিধানযোগ্য। ইহা ব্যতীত এই নূতন অক্ষরটির—আকার সাদৃশ্যের জন্য—'জ্ঞ'র সহিত ভুল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভবনা রহিয়াছে। মৌমাছির সুমধুর গুঞ্জনধ্বনি buzz—পরিভাষা সমিতির নির্দ্দেশ অনুযায়ী—'বঝ' লিখিতে হইলে উহা শীঘ্রই 'বজ্র' পরিণত হইবে। তখন ইহাকে 'বিনা মেঘে বজ্রপাত' বলা চলিবে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। কোনও জাতির বর্ণমালাতেই বিদেশীয় সর্ব্ব প্রকার ধ্বনিরই নির্দ্দোষ-উচ্চারণ-সূচক সমস্ত বর্ণ নাই (থাকা সম্ভব এবং বাঞ্ছনীয়ও নহে); কিন্তু এই ত্রুটির জন্য তাহারা লজ্জিত নয়; এবং বর্ণমালায় এজন্য নূতন অক্ষর ও টাইপ উদ্ভাবনা করিবার জন্যও তাহারা অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়ে নাই। বিদেশী ভাষার শব্দ যখন ইহারা নিজেদের ভাষায় গ্রহণ করে (তাহা ইহারা খুব প্রচুর পরিমাণেই করিয়া থাকে) তখন শব্দটিকে নিজেদের বর্ণমালা ও জিহ্বার বৈশিষ্ট্য অনুসারে অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত করিয়া লয়; ইহা শুধু অপরিহার্য্য নয়, শব্দের গোত্রান্তর ঘটাইবার জন্য ইহা প্রয়োজনও বটে। ইংরেজের জিহ্বা 'ত' উচ্চারণ করিতে পারে না বলিয়া—রাজনীতিজ্ঞ ইংরেজ জাতি তিব্বতকে 'টিবেট' করিতে ভয় পায় নাই; এবং ফরাসী ভাষায় 'চ'-এর প্রচলন নাই বলিয়া আমাদের সাধের 'চন্দননগর' 'সাঁর্ণগোর'-এ পরিণত হইয়াছে। শুনিয়াছি জাপানী ইতিহাসলেখক ট্রাফালগার দেখিতে গিয়া 'ত্রাফারুগারু' অপেক্ষা Trafalgar-এর অধিক নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন নাই। কিন্তু এজন্য তাঁহাদের বিশেষ অনুতপ্ত হইতে দেখা যায় নাই। অথচ আমরা জিহ্বার স্বাভাবিক জাতিগত প্রবণতা উপেক্ষা করিয়া বৈদেশিক শব্দের অতি সূক্ষ্ম ধ্বনিপার্থক্য মাতৃভাষাতেও বজায় রাখিবার জন্য নূতন অক্ষর উদ্ভাবনা করিতে অতিমাত্রায় ব্যগ্র! বলা বাহুল্য, ইহা সত্যই করিতে হইলে মাত্র তিনটি নূতন অক্ষর আবশ্যক নহে,—তিন শত (তিন সহস্র?) নূতন অক্ষরের প্রয়োজন হইবে। ইহাও দেখিতে পাইতেছি যে আমাদের জিহ্বা স্বাভাবিক নিয়মে master ও table কে 'মাষ্টার, ও টেবিল রূপে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে; bolt বল্টু হইয়াছে, এবং Doctor ডাক্তার হইয়াছেন। এ কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, যে, এইরূপে 'শুদ্ধি হওয়ার' ফলেই এই সকল বিদেশীয় শব্দ বাঙলা ভাষায় 'জাতে' উঠিয়াছে। এইরূপে Zebra-কে জেব্রা লিখিলে যদি উহা বাঙলার সম্পত্তি হইয়া পড়ে, তাহা হইলে দুঃখিত হইবার কিছুই নাই; ঠিক এই কারণে Sodium-কে 'সোডিয়াম' না লিখিয়া 'সোডিয়ম' লিখিলে ইংরেজী উচ্চারণের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হয় কিনা, এ বিচারও অনাবশ্যক [illegible]।

ইহা ব্যতীত একই শব্দ বা অক্ষর বিভিন্ন ভাষায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয়—ইহা পূর্ব্বে সোডিয়াম শব্দটির দৃষ্টান্তপ্রসঙ্গে দেখাইয়াছি। একই u অক্ষরটি (যাহার ইংরেজী short উচ্চারণ বাঙলায় ত্রুটিহীন রাখিবার জন্য সমিতি ব্যগ্র) তাহার ফরাসী, জর্মান ও ইংরেজী উচ্চারণ সম্পূর্ণ পৃথক্। এই সকল ধ্বনিই যথাযথ অবিকৃতভাবে বাঙলা ভাষায় আনয়ন করিতে হইলে অসংখ্য নূতন বর্ণের প্রয়োজন দেখা যাইবে; যদিও তাহাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কিনা সন্দেহ।

গত এক শতাব্দীর অধিক কাল হইতে বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান ও অপর নানা বিষয়ক রচনায় বৈদেশিক শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে; এবং বহু মনীষী বহু দুরূহ বৈজ্ঞানিক বিষয় বাঙলা ভাষায় লিখিয়াছেন; (যদিও বাঙালী পাঠক তাহার সংবাদ কমই রাখে)। বাঙলা পরিভাষার অভাবে অনেক সময়ে তাঁহারা অসুবিধা বোধ করিয়া বিদেশীয় পরিভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন,—কিন্তু সেজন্য বাঙলা বর্ণমালা এ যাবৎ কখনই অযথেষ্ট বিবেচিত হয় নাই।

* Z এর বাঙলা উচ্চারণের এই চমৎকার খাঁটি বাঙলা দৃষ্টান্তটি ১৫ই ভাদ্রের আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক ডাক্তার জ্যোতির্ম্ময় ঘোষের প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। পরিভাষা-সংকলয়িতাগণকে এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটি বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িতে অনুরোধ করিতেছি।

বর্ণ-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বাংলা টাইপ, কেস ও বাঙালী শিশুর মস্তিষ্ক অধিকতর ভারাক্রান্ত করিবার পূর্ব্বে—নূতন বর্ণের প্রকৃতই প্রয়োজন আছে কি না, এবং এই প্রয়োজন অপরিহার্য্য কিনা তাহা বিশেষরূপে বিচার করা আবশ্যক। মাতৃভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধ ব্যতীত এই বিচারের অপর কোনও মানদণ্ড নাই।

অতঃপর পরিভাষার তালিকাটি আলোচনা করা যাউক। এই প্রবন্ধের প্রথমেই পরিভাষা সম্পর্কে যে চারিটি সূত্র দেওয়া হইয়াছে তদনুসারে প্রত্যেকটি শব্দ বিচার করা প্রয়োজন। প্রথমেই বলিয়া রাখা যাইতে পারে—পাটিগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি প্রভৃতি কয়েকটি গণিত-পুস্তক (বিশেষ করিয়া প্রথম দুইটি) দীর্ঘ কাল হইতেই সম্পূর্ণ বাংলায় প্রচলিত আছে। ইহাদের পরিভাষার তালিকায় এই সকল প্রচলিত পরিভাষা যতদূর সম্ভব (কেবলমাত্র যে সকল পরিভাষা উপরিউক্ত চারিটি সূত্রের কষ্টিপাথরে অচল বলিয়া প্রমাণিত হইবে—সেগুলি ছাড়া) গৃহীত হওয়া উচিত।

পরিভাষা সমিতি যে তালিকা সঙ্কলিত করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই যথাযথ ও সুন্দর হইয়াছে; যদিও এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে। যে সকল পরিভাষা সম্বন্ধে আপত্তি আছে তাহার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হইল। ইহাতে এই সকল পরিভাষা কেন আপত্তিকর, এবং ইহা কিরূপ হওয়া উচিত তাহারও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সমিতি সমস্ত ত্রিকোণমিতি-ঘটিত পদগুলি ইংরেজীই রাখিয়াছেন। ইহা অবাঞ্ছনীয় মনে করি। কারণ ইহাতে আমাদের দেশে কোনও কালে ত্রিকোণমিতির কোনও রূপ চর্চা ছিল না—ছাত্রদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইবে। ইহা খুব সম্ভব যথার্থ নহে। পরবর্তী তালিকায় ত্রিকোণমিতির পরিভাষা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই তালিকায় ইংরেজী শব্দের পরে '—' দিয়া প্রথমেই সমিতির সঙ্কলিত পরিভাষা দেওয়া হইয়াছে। যেখানে সমিতির পরিভাষার সহিত অপর পরিভাষাও বাঞ্ছনীয় মনে হইয়াছে, সেখানে + চিহ্নের পরে নূতন পরিভাষা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; এবং যেখানে সমিতির সঙ্কলিত পরিভাষা আপত্তিকর এবং তাহার পরিবর্ত্তে নূতন পরিভাষা প্রস্তাবিত হইয়াছে, সেখানে সঙ্কলিত পরিভাষার পরে বন্ধনীর মধ্যে (?) চিহ্ন লিখিয়া পরে প্রস্তাবিত শব্দ দেওয়া হইয়াছে। যেখানে একাধিক নূতন পরিভাষা দেওয়া হইয়াছে সেখানে তাহাদের উপযুক্ততার ক্রমানুসারে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, যথা—approximate—আসন্ন, মোটামুটি। ইহার পরে sub-paraয় পরিভাষার প্রতিশব্দের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা সম্পর্কে টিপ্পনী ও আলোচনা রহিয়াছে।

Arithmetic—পাটিগণিত

Abstract Number—সংখ্যা }
Number—সংখ্যা } (?)

এই দুইটি পরিভাষাকে বাংলায় একই শব্দদ্বারা অনুবাদ করা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। Number-এর সংখ্যা শব্দটি বিশুদ্ধ (abstract) এবং প্রাকৃত (Concrete) উভয় প্রকার সংখ্যাকেই সমান ভাবে বুঝাইতে পারে। সুতরাং সংখ্যাদ্যোতক পরিভাষাগুলি এই প্রকার হওয়া উচিত:—

Abstract Number—বিশুদ্ধ সংখ্যা
Number—সংখ্যা (Concrete Number দ্রষ্টব্য)
Approximate—আসন্ন; + মোটামুটি
Approximate value—আসন্নমান; + মোটামুটি মূল্য
Capacity—ধারকত্ব (?) ধারণশক্তি; সামর্থ্য

'ধারকত্ব' শব্দটি qualitative; ইহা বস্তুর ধর্ম্মবাচক। কিন্তু গণিতে capacity শব্দটি quantitative ভাবে ব্যবহৃত হয়; ইহা ধারণশক্তির পরিমাণদ্যোতক। অতএব Capacity-র প্রতিশব্দ ধারণ-শক্তি বা সামর্থ্য করাই সঙ্গত।

Concrete Number—সংখ্যেয় (?) প্রাকৃতসংখ্যা, বস্তুর সংখ্যা

এই বিশেষ্য শব্দটি বাংলায় বিশেষণ হইয়া গেল কেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। যদি ইহাকে বিশেষ্য বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ইহার অর্থ কি—তাহা যাহাই হউক—concrete number বলিতে গণিত শাস্ত্রে যে বস্তু নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে—সংখ্যেয় শব্দ দ্বারা তাহা একেবারেই বুঝা যাইতেছে না।

Criterion—বিনির্ণায়ক (?) নির্ণায়ক

শেষোক্ত শব্দটির দ্বারাই যখন একই অর্থ সূচিত হয়, তখন অকারণে উপসর্গ জুড়িবার প্রয়োজন কি?

Difference—অন্তর }
Interval—অন্তর }

এই দুইটি পরিভাষাকেই একই শব্দদ্বারা অনুবাদ করা সমীচীন নহে। Difference ও Interval-এর পার্থক্য বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া কি সঙ্গত? অতএব

Difference—পার্থক্য
Interval—অন্তর
Duo-decimal—দ্বাদশীয়; (?) দ্বাদশিক অঙ্ক, (সংক্ষেপে) দ্বাদশিক;

বিশেষণের দ্বারা বিশেষ্যের ব্যঞ্জনা rhetoric-এ চলিতে পারে; কিন্তু পরিভাষার ক্ষেত্রে ইহা অচল। পাটিগণিতে duo-decimal শব্দটি বিশেষ্য রূপেই সমধিক প্রচলিত, এবং ইতিপূর্ব্বেই বাংলা পাটিগণিতে এই শব্দটির পরিভাষা বিদ্যমান রহিয়াছে।

Measure—সংখ্যামান; + পরিমাপ (ইহাই measure-এর প্রকৃত প্রতিশব্দ)

By (÷)—ভাজিত + 'ভাগ'

Into (×)—গুণিত : + 'গুণ'

Minus (–)—বিযুক্ত : + 'বিয়োগ'

Plus (+) যুক্ত : + 'যোগ'

সাধারণতঃ বাঙলা পাটিগণিতের ছাত্রগণ ÷ চিহ্নকে (যাহাকে ইংরেজীতে by রূপে পাঠ করা হয়) 'ভাগ' রূপে পাঠ করে : যথা three by two (3 ÷ 2)—তিন-ভাগ-দুই'। অপর চিহ্নগুলি সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। ইহাদের পঠিত রূপ বজায় রাখা আবশ্যক।

Power—ঘাত : (?) শক্তি।

প্রচলিত পাটিগণিতে শেষোক্ত প্রতিশব্দটিই চলিয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত দেখিতে পাইতেছি সমিতি logarithm শব্দটিকে ইংরেজীই রাখিয়াছেন। আমি ইহার প্রতিশব্দ 'ঘাত' করিবার পক্ষপাতী (logarithm দ্রষ্টব্য)। অতএব পাটিগণিতের power—শক্তি এই পরিভাষাই সমীচীন। Mechanics-এর power—ক্ষমতা।

Practice—চলিত নিয়ম : (?) সাঙ্কেতিক।

এই পূর্ব্ব প্রচলিত পরিভাষাটিই ত্যাগ করিয়া practice এর transliteration করিবার সার্থকতা বুঝা যাইতেছে না।

Reciprocal—বিপরীত : + অন্যোন্যক

এই পরিভাষা পূর্ব্ব হইতেই পাটিগণিতে প্রচলিত রহিয়াছে।

Rectangle—আয়তক্ষেত্র : + সমচতুষ্কোণ

Recurring—আবৃত্ত : + পৌনঃপুনিক

যদিও 'পৌনঃপুনিক' শব্দটি কিছু দুরুচ্চার্য্য, তথাপি ইহা দীর্ঘ কাল হইতেই পাটিগণিতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া এবং অর্থ হিসাবে ইহা আবৃত্ত (যাহার 'পঠিত' এই অর্থটির সহিতই ছাত্রগণ সমধিক পরিচিত) শব্দটি অপেক্ষা অধিকতর নির্দ্দোষ বলিয়া, ইহাকে একেবারে নির্ব্বাসন দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে।

Sum—যোগফল, সমষ্টি : + অঙ্ক'

Do a sum—'একটি যোগফল কর' নহে : 'একটি অঙ্ক কষ'।

Unit—একক : + মানদণ্ড, মাপকাঠি

Cf. Unit of calculation 'হিসাবের একক' নহে : 'গণনার মানদণ্ড' বা 'হিসাবের মাপকাঠি'।

Unitary Method—(তালিকায় নাই) ঐকিক নিয়ম।

Work—কার্য্য, কর্ম্ম :

'কর্ম্ম' রাখিবার প্রয়োজন নাই। এই দুইটি শব্দই সম্পূর্ণ একার্থক, এবং সেই জন্যই পরিভাষার ক্ষেত্রে সাধারণ সাহিত্যের মত যে-কোনওটিকে নির্ব্বিচারে ব্যবহার করা চলিবে না। ব্যাকরণে যাহাকে 'কর্ম্ম' বলা হয় তাহাকে 'কার্য্য'ও বলা চলে কি? একটিকে বাতিল করা প্রয়োজন (পূর্ব্বপ্রদত্ত পরিভাষা সংক্রান্ত ৩ তীয় সূত্র দ্রষ্টব্য)।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য—তাহাতে বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, যন্ত্রবিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতির পরিভাষার আলোচনা আছে।]

মহিলা সংবাদ

শ্রীমতী সি, মীনাক্ষী ভারতবর্ষের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বে গবেষণার জন্য মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি এইচ ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমতী সি, মীনাক্ষী
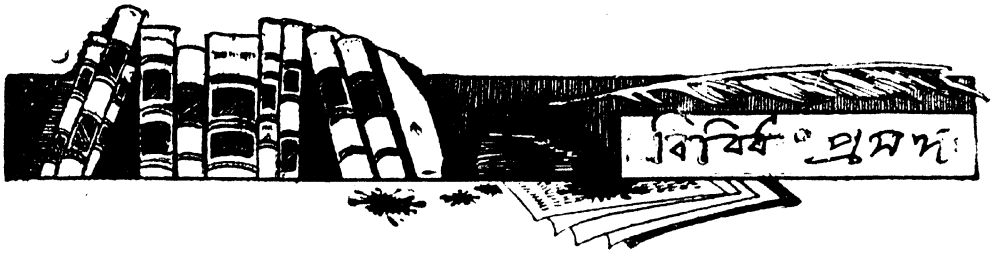
লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের অধিবেশন সম্বন্ধে জল্পনা

প্রবাসীর এই বৈশাখ সংখ্যা লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইবার পর বাহির হইবে। কিন্তু আমরা লিখিতে আরম্ভ করিতেছি ২৫শে চৈত্র, ৭ই এপ্রিল। এই জন্য এই অধিবেশনে কি হইয়াছে তাহার আলোচনা না করিয়া, কি হইবে বলিয়া আগে হইতে গুজব রটিয়াছে ও জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে, সেই বিষয়ে কিছু লিখিব।

—

কংগ্রেস ও মন্ত্রিত্বগ্রহণ

গুজব রটিয়াছে, যে, কংগ্রেসওয়ালারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন কিনা তাহার বিবেচনা লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে না হইয়া ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের নির্ব্বাচন হইয়া যাইবার পর হইবে। কিন্তু অধিবেশন না হওয়া পর্য্যন্ত নিশ্চিত কিছু বুঝা যাইতেছে না। এ বিষয়ে আমাদের মত প্রবাসীতে ও মডার্ন রিভিয়ুতে আগেই লিখিয়াছি। আবার লিখিতেছি।

কংগ্রেস বলিয়াছেন, নূতন মন্দ শাসনবিধি (Constitution) তাঁহারা গ্রহণীয় মনে করেন না, বর্জ্জনীয় মনে করেন বলিয়া উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। এইরূপ কথা বলিবার পর এখন মন্ত্রিত্বগ্রহণ ডিগবাজী খাওয়ার সমান হইবে। মন্ত্রিত্বগ্রহণের মানে হইবে গবন্মেণ্টের নীতির ও অনেক কাজের দায়িত্বগ্রহণ। কোন কংগ্রেসওয়ালা কি প্রকারে তাহা করিতে পারেন? কংগ্রেসের সম্মতি ও অনুমোদন অনুসারে অনেক কংগ্রেসওয়ালা যে ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে প্রবেশ করিয়াছেন তাহার সহিত এই অস্বীকৃতির অসামঞ্জস্য নাই। কারণ, তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে গিয়াছেন প্রধানতঃ গবন্মেণ্টের বিরোধিতা করিবার নিমিত্ত। ব্যবস্থাপক সভাসমূহে ও তৎসমুদয়ের বাহিরে উভয়ত্র গবন্মেণ্টের বিরোধিতা করা একই নীতির দুই অংশ। সুতরাং কৌন্সিল প্রবেশ দ্বারা কংগ্রেসওয়ালারা অসঙ্গতিদোষদুষ্ট হন নাই। অবশ্য, পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতা যাঁহাদের লক্ষ্য তাঁহারা ইংলণ্ডেশ্বরের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ কি প্রকারে করিতে পারিয়াছেন, কি প্রকারে নিজের নিজের মনকে মানাইয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু গবন্মেণ্টের নীতির বিরোধিতা করিবার নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্যের বিপরীত নহে।

যে-সব কংগ্রেসওয়ালা মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষপাতী, তাঁহারা এবং উদারনৈতিক বা মডারেটরা বলেন যে, কৌন্সিল-প্রবেশ ও মন্ত্রিত্বগ্রহণ একই পর্য্যায়ের জিনিষ, মন্ত্রিত্বগ্রহণ কৌন্সিলপ্রবেশের পরিণতি। আমরা তাহা মনে করি না। কংগ্রেসওয়ালারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছেন ও করিবেন, মুখ্যতঃ সরকারী নীতির প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধাচরণ করিবার নিমিত্ত। কিন্তু মন্ত্রিত্বগ্রহণ কেবলমাত্র বা মুখ্যতঃ বিরুদ্ধাচরণের জন্য হইতে পারে না। যাঁহারা মন্ত্রী হইবেন, তাঁহারা গবন্মেণ্টেরই একটি অংশ বা অঙ্গ হইবেন—গবন্মেণ্ট বলিতে তাঁহাদিগকেও বুঝাইবে। তাঁহাদের বেতন যত মোটা ও পদ যত উচ্চই হউক, তাঁহারা হইবেন সরকারী চাকর বা ভৃত্য। তাঁহারা মুখ্যতঃ বা কেবলমাত্র বিরোধিতা কেমন করিয়া করিতে পারেন? মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষপাতী কংগ্রেসওয়ালারা অবশ্য বলিতে পারেন, যে, কংগ্রেসওয়ালা মন্ত্রীরা তাহা করিবেন। এরূপ বলিলে অনেক প্রশ্ন উঠে। কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যাহাই হউক মন্ত্রিত্বের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গবন্মেণ্ট চালান। যে-কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য গবন্মেণ্ট চালান, সেই কাজ গ্রহণ করিয়া গবন্মেণ্ট অচল করিবার চেষ্টা করা কি সরল, অকপট, সঙ্গত ব্যবহার হইবে? জানি, রাজনীতিব্যবসায়ী লোকেরা চালিয়াৎ চক্রী ও অসরল

হইয়া থাকে। কিন্তু গান্ধীজী চান সত্যের অনুযায়ী সরল সঙ্গত আচরণ। এই জন্য এই প্রশ্ন করিতেছি। সরলতার কথা বাদ দিলেও বিবেচনা করিতে হইবে, বড়লাট বা গবর্ণর কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য জানিয়াও কোন কংগ্রেসওয়ালাকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে ডাকিবেন কি? যদি ডাকেন, তাহা হইলে কি প্রকারে জানা ও বুঝা যাইবে, যে, সেই ব্যক্তি মোটা বেতন ও উচ্চ পদের লোভে মন্ত্রিত্ব লইতেছেন না, কংগ্রেসের নীতির অনুসরণ করিবার জন্য লইতেছেন? মন্ত্রীদের পরস্পরের মধ্যে ও বড়লাট বা ছোটলাটের সহিত যে-সব আলোচনা হইবে, তাহা অপ্রকাশ্য। কেমন করিয়া জানা যাইবে, কংগ্রেসওয়ালা মন্ত্রী এই সব আলোচনায় খাঁটি কংগ্রেসী নীতি অনুসারে চলিতেছেন? ব্যবস্থাপক সভার কাজ প্রকাশ্য। সেখানে কে কি বলেন, না-বলেন, কোন্ পক্ষে ভোট দেন বা না-দেন সব জানা যায়। লাটসাহেবদের সঙ্গে ও মন্ত্রীদের পরস্পরের মধ্যে আলোচনায় কে কি বলিতেছেন করিতেছেন জানিবার উপায় নাই। তদ্ভিন্ন ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, নূতন ভারতশাসন আইন এরূপ আটঘাট বাঁধিয়া করা হইয়াছে, যে, কি ব্যবস্থাপক সভায়, কি মন্ত্রীদের ও লাটদের নিজেদের অন্তরঙ্গ বৈঠকে, কোথাও সফল বিরোধিতার কোন পথ রাখা হয় নাই। এক বিপ্লব ব্যতীত গবন্মেণ্টের নীতি ব্যর্থ করিবার কোন পথ ঐ আইনে নাই, ইহা উক্ত আইনপ্রণেতা ইংরেজরা জানে বলিয়া ঐ আইনেই বিপ্লবচেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত গবর্ণর-জেনার‍্যাল ও গবর্ণরদিগকে প্রয়োজনমত তাঁহাদের ইচ্ছা অনুসারে শাসনবিধি সম্পূর্ণরূপে বা অংশত স্থগিত রাখিয়া সমুদয় বা কোন কোন বিভাগের ক্ষমতা নিজে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা আছে। অতএব আমরা মনে করি, বিরোধিতা করিবার নিমিত্ত মন্ত্রিত্বগ্রহণ হইবে পণ্ডশ্রম মাত্র; কারণ সফল বিরোধিতা অসম্ভব, শাসনবিধির গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া গবন্মেণ্টকে অচল করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবেই।

কোন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী দল সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হইলে তবে গবর্ণর তাঁহাদের কোন কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রী হইতে বলিবেন। কিন্তু তাঁহারা দলে এত পুরু হইলে মন্ত্রিসভার বাহিরে থাকিয়াই ত বাধাদান নীতির যথেষ্ট অনুসরণ করিতে পারিবেন; মন্ত্রী হইবার কি আবশ্যক?

কোন কোন কংগ্রেস নেতা বলিতেছেন বলিয়া খবরের কাগজে প্রকাশ, যে, যে-যে প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী সভ্যেরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হইবে তথায় কোন কোন কংগ্রেসী সভ্যকে এই সর্ত্তে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে দেওয়া যাইতে পারে, যে, তাঁহারা কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট পন্থার অনুসরণ করিবেন।

আমরা ইহা ঠিক মনে করি না।

ব্রিটিশ পালেমেণ্ট ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলিকে যে ভুয়ো তথাকথিত আত্মকর্তৃত্ব দিতেছে, তাহার এই একটা উদ্দেশ্য অনুমিত হইয়াছে, যে, প্রত্যেক প্রদেশ নিজের নিজের পথে চলিবে, সমগ্র ভারতের একটা প্রধান লক্ষ্য ও পথ থাকিবে না, সমগ্র ভারতের একই অভিযোগ না-থাকিয়া প্রত্যেকের আলাদা আলাদা অভিযোগ থাকিবে,··· এই প্রকারে ভারতীয় একতা বাড়িতে না পাইয়া, বরং যতটা হইয়াছে তাহাও নষ্ট হইবে। কংগ্রেস যদি কোন কোন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ, কোথাও বা অগ্রহণ চালান, তাহা হইলে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের ভেদনীতিরই সহায়তা করা হইবে।

কংগ্রেসী মন্ত্রী যে কংগ্রেসের নীতির অনুসরণ করিতেছেন, তাহা কি প্রকারে বুঝা যাইবে? মন্ত্রীদের ও মন্ত্রীদের সভার অনেক কাজই এরূপ, যে, বাহিরের লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহা করিবার জো নাই। এমন ত হয় না, হইবেও না, যে, একটা ঘরে মন্ত্রীদের সভা হইতেছে এবং তাহার পাশেই আর একটা ঘরে কংগ্রেস কমিটির সভ্যেরা বসিয়া আছেন, এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীরা মধ্যে মধ্যে সভাগৃহ হইতে উঠিয়া আসিয়া কংগ্রেস কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের নির্দেশ অনুসারে চলিতেছেন। গবন্মেণ্টের সব মন্ত্রণা গোপনীয়। যথেষ্ট সময় পাইলেও কংগ্রেসী মন্ত্রীরা তৎসমুদয় কংগ্রেস কমিটিকে জানাইয়া তাহার পরামর্শ লইবেনই বা কি প্রকারে? গবন্মেণ্ট কি গোপনীয় মন্ত্রণার বিষয়ীভূত কিছু বেসরকারী লোকদিগকে জানাইতে দিবেন?

সমগ্রভারতীয় গবন্মেণ্টে ও কোন কোন প্রদেশের গবন্মেণ্টে কংগ্রেসওয়ালারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে, সমগ্রভারতীয় ও ঐ ঐ প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভাসমূহে অনেক সময়ই অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইবে, যে, জনকয়েক কংগ্রেসওয়ালা (অর্থাৎ কংগ্রেসী মন্ত্রীরা) গবন্মেণ্ট পক্ষে থাকিবেন এবং

ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সভ্যেরা গবর্মেণ্টের বিরোধী থাকিবেন। কংগ্রেসের মধ্যে এইরূপ গৃহবিবাদ কি বাঞ্ছনীয় হইবে ?

অনেকে মনে করেন, নূতন শাসনবিধিতে দেশহিতকর কাজ করিবার যতটুকু সুযোগ পাওয়া যায়, তাহার সুব্যবহার করা উচিত, এবং মন্ত্রীরা কংগ্রেসওয়ালা হইলে তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুব্যবহার করিতে পারিবেন। আমরা মনে করি, সুযোগ কিছু অবশ্যই আছে—কেন-না ব্রিটিশ রাজত্বকে ভাল বলিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্ত কিছু থাকা চাই। কিন্তু কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য পূর্ণ স্বরাজ। তদনুসারে দেশকে স্বশাসক করিবার সুযোগ কিংবা দেশকে সাক্ষাৎভাবে স্বরাজের দিকে অগ্রসর করিবার সুযোগ নূতন আইনে নাই। অন্য ছোটখাট দেশহিতকর কাজ করিবার যে সুযোগ আছে, যে-কেহ মন্ত্রী হইবেন তিনিই তাহার সাহায্যে কিছু করিতে পারিবেন। কংগ্রেসওয়ালা হইলে যে বেশী পারিবেন, এমন নয়। ভারতবর্ষকে অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘকালের জন্য ব্রিটিশ প্রভুত্বের অধীন রাখিবার যে নীতি অনুসারে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট নূতন আইনটা প্রণয়ন করিয়াছে, সেই নীতিকে ব্যর্থ করিতে কোন মন্ত্রীই পারিবেন না—তিনি যত বড় কংগ্রেসওয়ালাই হউন না কেন।

ব্রিটিশ জাতির অধিকাংশ লোকের ও পার্লেমেণ্টের ব্রিটিশ-প্রভুত্বরক্ষামূলক যে নীতি হইতে নূতন ভারতশাসন আইন উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাহা ব্যর্থ করিবার চেষ্টা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। এই চেষ্টা ব্যবস্থাপক সভাসমূহের বাহিরে এবং কতকটা ব্যবস্থাপক সভার মধ্যে থাকিয়া হইতে পারে, কিন্তু মন্ত্রিত্বগ্রহণ দ্বারা হইতে পারে না বলিয়া আমরা মনে করি। এই কথাই আমরা বলিলাম।

মন্ত্রিত্বগ্রহণ সম্বন্ধে এবং কংগ্রেসসংপৃক্ত অন্য যে-যে প্রশ্ন সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব, তাহার আলোচনা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি করিতেছেন দেখিতেছি। অতঃপর লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের বিষয়নির্ব্বাচক সমিতিও হয়ত তাহা করিবেন। এই উভয় সমিতিতে উপস্থাপিত তর্কবিতর্ক সম্বন্ধে আমরা কিছু লিখিবার চেষ্টা করিব না।

—

সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তনের চেষ্টা

ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের মন্ত্রিসভার অনুমোদিত এবং পরে নূতন ভারতশাসন আইনের অংশরূপে পরিণত সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা হইবে, কাগজে দেখিতেছি।

পঞ্জাবের কংগ্রেসওয়ালারা এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিবেন বলিয়া গুজব। বঙ্গের কংগ্রেস-চাঁইরা কি করিতেছেন ? সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত কি কোনও প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গের কম ক্ষতি করিয়াছে ও করিবে ?

ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে যে-যে সম্প্রদায়কে যতগুলি আসন দিয়াছে, তাহা বজায় রাখিয়া মিলিত নির্ব্বাচন হইবে—কেবল এই পরিবর্ত্তনই না-কি লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে করিবার চেষ্টা হইবে। আমরা মিলিত নির্ব্বাচন ভাল ও আবশ্যক মনে করি। কিন্তু কেবল তাহা দ্বারাই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তটার সাংঘাতিক দোষ দূরীভূত হইবে না—বঙ্গে ত দূরীভূত হইবেই না। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তটাকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া সমগ্রভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে কেবলমাত্র গণতান্ত্রিকতা, জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজ্‌মের ভিত্তিতে মিলিত নির্ব্বাচন চালাইলে তবেই ঐ সিদ্ধান্তটার প্রতিকার হইতে পারে। নতুবা শুধু মিলিত নির্ব্বাচন দ্বারা উহার বিষ নষ্ট হইবে না। বরং, এখন শুধু মিলিত নির্ব্বাচনের ভিত্তির উপর একটা রফা করিলে, ১৯১৬ সালের নামজাদা লক্ষ্ণৌ-চুক্তির মত ১৯৩৬ সালের প্রস্তাবিত এই লক্ষ্ণৌ-চুক্তিটাও ভবিষ্যতে সমস্যাটার উৎকৃষ্টতর সমাধানের পথে বাধা উপস্থিত করিয়া মহা অনর্থের কারণ হইবে।

মুসলমানেরা সমগ্র ভারতে, এবং যে-যে প্রদেশে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ, তথায় তাঁহাদের সংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্য অপেক্ষা অনেক অধিক আসন পাইয়াছেন। এই অন্যায়ের প্রতিকার কেবল মিলিত নির্ব্বাচন দ্বারা হইবে না। কে কোন সম্প্রদায়ের লোক তাহার বিচার না করিয়া, কোন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কত ও কোন সম্প্রদায় হইতে কত লোক ব্যবস্থাপক সভায় যাইবে, তাহা নির্দ্দেশ না করিয়া, সবাই ভারতীয়, সবাই অমুক প্রদেশের লোক, এইরূপ মনে

করিয়া, যোগ্যতমের মিলিত নির্ব্বাচন ইহার প্রকৃত প্রতিকার।

ইহার উত্তরে বলা হইবে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সকলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যে, তাহাদের জন্য কতকগুলি আসন সংরক্ষিত না থাকিলে এবং তাহাদের নিজেদের নির্ব্বাচকদের দ্বারা সেই আসনগুলিতে বসিবার তাহাদেরই সম্প্রদায়ের সদস্য নির্ব্বাচিত না হইলে, তাহাদের স্বার্থ রক্ষিত হইবে না; সুতরাং এখন তাহারা সম্পূর্ণ ও নিছক জাতীয়তার ভিত্তিতে নির্ব্বাচনে রাজী হইবে না। যদি তাহারা রাজী না হয়, তাহা হইলে তাহারা আলাদা নির্ব্বাচন চাহিতে পারে, নিজেদের জন্য কতকগুলি আসন চাহিতে পারে, কিন্তু লোকসংখ্যার অনুপাতে যত প্রাপ্য হয় তাহা অপেক্ষা বেশী আসন তাহারা কেন পাইবে? যাহারা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ তাহারা নিজেদের প্রাপ্য কতকগুলি আসন কেন ছাড়িয়া দিবে? যদি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা আলাদা আসন রাখাই আবশ্যক মনে হয়, তাহা হইলে সংখ্যাবহুল ও সংখ্যালঘু প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ লোকসংখ্যার অনুপাতে আসন পাউক—জাতীয়তার কপট দোহাই দিয়া সংখ্যাবহুল সম্প্রদায়কে কম আসন লইতে বলার বিদ্রূপ না করা হউক।

আর যদি সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে লোকসংখ্যার অনুপাতের অধিক আসনই দিতে হয়, তাহা হইলে বঙ্গের হিন্দুরা, পঞ্জাবের হিন্দুরা তাহাদের সংখ্যা অনুসারে প্রাপ্য আসন অপেক্ষা বেশী আসন কেন না পাইবে? বঙ্গের হিন্দুরা ত তাহাদের সংখ্যা অনুসারে প্রাপ্য আসনও পায় নাই। বঙ্গের সংস্কৃতি ও অন্য নানাবিধ উন্নতির জন্য এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়ে সমগ্র ভারতের প্রগতির নিমিত্ত বাঙালী হিন্দুরা অন্য কাহারও চেয়ে কম চেষ্টা করে নাই। নূতন ভারতশাসন আইনে তাহাদিগকে একেবারে ক্ষমতাহীন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাতে তাহাদিগকে কেবল যে আপনাদের স্বার্থরক্ষায় ও হিতসাধনে বহু পরিমাণে অসমর্থ করা হইয়াছে তাহা নহে, তাহাদিগকে দেশের প্রতি কর্ত্তব্য করিবার সুযোগ হইতেও বহু পরিমাণে, প্রায় সম্পূর্ণ রূপে, বঞ্চিত করা হইয়াছে। যে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের দ্বারা তাহাদিগকে এরূপ করা হইয়াছে, তাহা মানিয়া লওয়া বা তৎসম্বন্ধে একটা যে-কোন রকমের জোড়াতাড়া দেওয়া রফায় রাজী হওয়া তাহাদের পক্ষে আত্মঘাতের সমান হইবে। বঙ্গের কংগ্রেসওয়ালা কোন কোন লোক যদি-বা তাহাতে রাজী হন, অন্যেরা রাজী হইবেন না—এবং তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী।

—

কংগ্রেস ও দেশী রাজ্যসমূহের প্রজাবর্গ

কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ দেশী রাজ্যসমূহের ও তাহাদের প্রজাদিগের সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত প্রজারা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। সহানুভূতি তাঁহারা পাইয়াছেন, কিন্তু কংগ্রেস তাঁহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য দেশী রাজ্য-সমূহের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন নাই। প্রজারা এই মর্ম্মের কথা বলিতেছেন, যে, "যদি কংগ্রেস দেশী রাজ্যসমূহের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারসকলে হস্তক্ষেপ করিতে না-চান, আমরা কংগ্রেসের সহিত ঝগড়া করিব না, তাঁহাদের বাচনিক সহানুভূতিতেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। কিন্তু কংগ্রেস যখন সাক্ষাৎ ভাবে ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলির ও দেশী রাজ্যগুলির ফেডারেশুন মানিয়া লইয়াছেন, তখন কার্য্যতঃ ইহাই বলা হইয়াছে, যে, কংগ্রেসের সক্রিয়তা প্রদেশগুলিতেই আবদ্ধ থাকিবে না, দেশী রাজ্যেও কংগ্রেসকে কিছু করিতে হইবে। তাহা হইলে দেশী রাজ্যের প্রজাসমূহকে গান্ধীজী যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন কংগ্রেসকে তাহা পালন করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রজাদিগের পৌর ও জানপদ জীবনের ভিত্তিভূত অধিকারসমূহ ("Fundamental rights") গ্যারাণ্টি করিতে হইবে, ফেডার্যাল ব্যবস্থাপক সভায় সাক্ষাৎভাবে প্রতিনিধি পাঠাইবার ক্ষমতা তাহাদিগকে দিতে হইবে, এবং দেশী রাজ্যসমূহের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে ফেডার্যাল সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিবার ক্ষমতা তাহাদিগকে দিতে হইবে।"

আমরা দেশী রাজ্যসমূহের প্রজাদের যুক্তি ও দাবী ন্যায্য বলিয়া মনে করি। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে এই সব দাবীর ন্যায্যতা স্বীকৃত হইলে ভাল হয়। দেশী রাজ্যের নৃপতিরাও এই সব দাবী মানিয়া লইলে প্রজাদের এবং তাঁহাদের নিজেদেরও মঙ্গল হইবে। সময় থাকিতে ন্যায়ের পথ অবলম্বন শ্রেয়ঃ। বিপ্লব-নিবারণের তাহাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

—

কংগ্রেসের মূল বিধির পরিবর্ত্তন

কংগ্রেসের মূলবিধির কোন কোন দিকে পরিবর্ত্তনও লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে বিবেচিত হইবে, এইরূপ কথা উঠিয়াছে। এরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক বটে।

বর্ত্তমানে একটি নিয়ম আছে, যে, কংগ্রেসের সভ্য হইতে হইলে কিছু দৈহিক শ্রমের কাজ করিতে হইবে। যদি কেহ কিছু রচনা করিয়া লেখে বা মুদ্রিত বা লিখিত কিছু নকল করে, অথবা বক্তৃতা বা চীৎকার করে, মিছিলে যোগ দেয়, তাহাতেও শারীরিক পরিশ্রম হয় বটে; কিন্তু কংগ্রেসের নিয়মে তাহাকে দৈহিক শ্রম বলিয়া ধরা হয় না। চাষীরা, কারিকরেরা, মজুরেরা যেরূপ শ্রম করে, তাহাকেই দৈহিক শ্রম বলিয়া ধরা হয়। যদি কংগ্রেসের সকল সভ্য এই নিয়ম পালন করেন এবং দেশের লক্ষ লক্ষ লোক কংগ্রেসের সভ্য হন, তাহা হইলে দুটি সুফল ফলিতে পারে। দৈহিক শ্রমপ্রযুক্ত স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, এবং মজুর, চাষী ও কারিকর-শ্রেণীর লোকদের সহিত অন্য লোকদের আন্তরিক সহানুভূতি ও হৃদয়ের যোগ বর্দ্ধিত হয়—"আমি দৈহিক শ্রম করি না, অতএব আমি উচ্চতর জীব," এরূপ ভিত্তিহীন অহঙ্কার জন্মিবার বা বদ্ধমূল হইবার কারণ থাকে না।

কিন্তু যদি কংগ্রেসের সভ্যেরা "পিত্তিরক্ষা" নীতি অনুসারে কোন প্রকারে দু-এক গজ সুতা কাটিয়া বা অন্য প্রকারে দু-এক মিনিট হাত পা নাড়িয়া নিয়মের মর্য্যাদা রক্ষা করেন, বা করিতে চান, তাহা হইলে সুফলের সম্ভাবনা কম।

খদ্দর ব্যবহার

কংগ্রেসের আর একটি নিয়ম এই আছে, যে, সভ্যদিগকে সর্ব্বদা খদ্দর ব্যবহার করিতে হইবে। এই নিয়ম পালন করিলে পল্লীগ্রামের যে-সকল লোক চরখায় সুতা কাটিয়া দু-পয়সা উপার্জ্জন করে, এবং যাহারা তাহা হইতে হাতের তাঁতে কাপড় বোনে, তাহাদের কিছু আয় হয়। কিন্তু, যদি কোন ব্যবসাদার বা দোকানদার আর দশটা ব্যবসার মত লাভের জন্য খদ্দরের ব্যবসা করে, তাহা হইলে যাহারা সুতা কাটে ও কাপড় বোনে লাভের অধিক অংশটা তাহারা পায় না। তাহা বর্জনীয় নহে। সুতরাং খদ্দর কিনিতে হইলে এমন প্রতিষ্ঠান ও দোকান হইতে কেনা উচিত যাহা লাভের জন্যই চালান হইতেছে না। আর, খদ্দর ব্যবহারের নিয়মটি "পিত্তিরক্ষা"র হিসাবে রক্ষিত হইলে তাহাতে কপটতা প্রশ্রয় পায়—আফিসের পোষাকের মত কংগ্রেসের কোন প্রতিষ্ঠানের মীটিঙের জন্য খদ্দরের একখানা ধুতি, একটা চাদর ও একটা পিরান রাখিয়া দিলে তাহাতে লোকদেখান খদ্দর ব্যবহার মাত্র হয়, তাহাকে সর্ব্বদা খদ্দর ব্যবহার বলা যায় না।

এমন বিস্তর লোক আছেন যাঁহারা মিলের কাপড় ব্যবহার করেন, কেবলমাত্র দেশী মিলের কাপড়ই ব্যবহার করেন। কিন্তু তাঁহাদেরও মিল বাছিয়া কাপড় কেনা দরকার। আমরা শুনিয়াছি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোন কোন মিল জাপান হইতে খুব সস্তায় কাপড় আনাইয়া তাহাতে নিজেদের ছাপ লাগাইয়া দেশী কাপড় বলিয়া বিক্রী করে। ইহা সত্য কিনা, অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

কংগ্রেস ও সমাজতন্ত্রবাদী দল

এইরূপ সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রবাদীরা কংগ্রেস "দখল" করিবার চেষ্টা করিবে। তাহারা যে প্রবল হইয়াছে, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে সভাপতি করা তাহার একটি প্রমাণ। যে-প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তথাকার কাহাকেও সভাপতি করা হয় না, এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের এইরূপ একটি চিরাগত রীতি ছিল। এই রীতির ব্যতিক্রম কেন করা হইল, সম্প্রতি তাহার যে যে কারণ দেখান হইয়াছে, পণ্ডিতজীর সভাপতি নির্ব্বাচন দ্বারা সমাজতান্ত্রিকদিগকে হাতে রাখিয়া তাহাদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দল গঠন নিবারণ করা তন্মধ্যে একটি। বলা বাহুল্য, পণ্ডিত জবাহরলাল এক জন সমাজতান্ত্রিক—তাঁহাকে কম্যুনিষ্ট বা সাম্যবাদী বলিলেও বোধ হয় ভুল হয় না।

সভাপতি-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কংগ্রেসের চিরাগত রীতি কেন ভাঙা হইল, প্রবাসীতে ও মডার্ন রিভিয়ুতে আমরা তাহা জানিতে চাহিয়াছিলাম। এখন উত্তর পাওয়া গিয়াছে।

যে-যে দেশে দারিদ্র্য, রোগ, অকালমৃত্যু, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা অধিক, যেখানে ধনের বণ্টন ন্যায়সঙ্গত ভাবে হয় না, এবং যেখানে প্রধান সার্ব্বজনিক ভৃত্যের বেতন বার্ষিক কয়েক লক্ষ টাকা, কিন্তু নিম্নতম সার্ব্বজনিক ভৃত্যের বেতন এক শত

টাকাও নহে, সেখানে সাম্যবাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি বৃদ্ধি অস্বাভাবিক নহে।

—

কংগ্রেসে জনসাধারণের যোগদান

কংগ্রেসের সহিত যাহাতে সাধারণ জনগণের যোগ খুব বাড়ে ও ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকে, এরূপ একটি যোদ্ধ্ জনোচিত (militant) কার্য্যতালিকা ও কার্য্যপদ্ধতি প্রণয়ন লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে করা হইবে, এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী (anti-imperialist) সমুদয় দল ও শক্তিকে এক করিয়া সম্মিলিত ভাবে স্বরাজলাভের চেষ্টা করা হইবে, এই সংবাদও বাহির হইয়াছে।

অধিবেশন শেষ হইয়া গেলে, কি করা হইল জানা যাইবে। তখন আলোচনারও উপাদান ও সুযোগ মিলিবে।

—

লক্ষ্ণৌ শিল্পপ্রদর্শনী

গ্রামসমূহের কুটীরে পণ্যশিল্পজাত নানা সামগ্রী লক্ষ্ণৌ প্রদর্শনীতে দেখান হইতেছে। এইগুলি কেবল তাঁহারাই দেখিতেছেন যাঁহারা লক্ষ্ণৌবাসী কিংবা লক্ষ্ণৌ যাইতে সমর্থ। মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিবার সময় দর্শকদিগকে তাঁহাদের দৃষ্ট সব পণ্যদ্রব্যের সংবাদপ্রচারক ও গুণপ্রচারক হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহা কেহ কেহ করিলেও সন্তোষের বিষয় হইবে। কিন্তু সুশৃঙ্খল ভাবে এইরূপ প্রচার প্রদর্শনীটির উদ্যোক্তাদিগকেই করিতে হইবে, এবং নগরে নগরে গ্রামশিল্পজাত দ্রব্য দোকানে রাখিয়া তৎসমুদয় ক্রয়াভিলাষীদের সহজলভ্য করিতে হইবে।

এই প্রদর্শনীতে সুকুমারশিল্পোৎপন্ন চিত্রাদিও রক্ষিত হইয়াছে।

—

বঙ্গের ছয়টি জেলায় "অন্নকষ্ট"

বঙ্গের কয়েকটি জেলায় "অন্নকষ্ট" হইয়াছে। দেশে অর্থাভাব ও অন্নাভাব ত লাগিয়াই আছে। তাহার মাত্রা বাড়িলে তাহাকে সরকার বলিতে বাধ্য হন "অন্নকষ্ট", দেশের লোকেরা বলে "দুর্ভিক্ষ"। অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষের মধ্যে সীমারেখা টানা সুকঠিন। লোকেরা অন্নকষ্টকে দুর্ভিক্ষ বলিলে আগে কেবল সরকার পক্ষ হইতেই প্রতিবাদ হইত। কিছুদিন পূর্ব্বে গৈরিকধারী এক বেসরকারী পক্ষ হইতেও বলা হইয়াছিল, যে, আমি (অর্থাৎ প্রবাসীর সম্পাদক) অন্নকষ্টে বা দুর্ভিক্ষে বিপন্ন লোকদিগকে সাহায্যদানে অনভিজ্ঞ বলিয়া বাঁকুড়া জেলায় ঐরূপ বিপদ হইয়াছে লিখিয়াছিলাম—ঐ পক্ষের মতে অন্য কোন কোন জেলার অভাব আরও বেশী। তাহা সত্য কিনা আমি জানি না। কিন্তু অনভিজ্ঞ আমার নিবেদন কেবল এই, যে, সম্পূর্ণ উপবাসী এবং দুআনি-পেটা সিকি-পেটা আহারী সকলেরই খাদ্যের প্রয়োজন আছে।

সম্প্রতি এসোসিয়েটেড্ প্রেস জানিতে পারিয়াছেন অর্থাৎ সরকার এসোসিয়েটেড্ প্রেসের মারফতে জানাইয়াছেন :—

> বঙ্গীয় গবর্ন্মেণ্ট বাংলার ছয়টি জেলায় অন্নকষ্ট হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান এবং হুগলী ও খুলনা জেলার কোনও কোনও অংশ অন্নাভাবগ্রস্ত বলিয়া ঘোষিত হইবে। দুইটি ফসল সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হওয়ায় ঐ সকল জেলার কোনও কোনও অংশে সাময়িক অন্নকষ্ট উপস্থিত। কিন্তু ঐ জেলাসমূহ যদি সরকারী ভাবে অন্নকষ্ট ঘোষণা করা হয়, তাহা হইলে [illegible] যে সকল অংশও তাহার মধ্যে পড়িবে।
>
> অন্নকষ্ট ঘোষণা করিবার সাহায্য দিবার জন্য যেরূপ [illegible] হইবে। অন্নকষ্ট নিবারণের এবং সাময়িক বিষয়ে ব্যবস্থা সকল কার্য্যকরী করা হইতেছে।
>
> দুর্ভিক্ষের সাহায্য সম্বন্ধে রিলিফ কমিশনার মিঃ এ. কে. মার্টিন অন্নকষ্টপীড়িত স্থানসমূহ সফর ও পরিদর্শন করিতেছেন এবং সাহায্যদান-কার্য্য কতটা অগ্রসর হইতেছে, গবর্ন্মেণ্টের নিকট সে সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতেছেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের সহযোগিতায় মিঃ মার্টিন কার্য্য করিতেছেন।
>
> অতিরিক্ত সাহায্যের নিমিত্ত অর্থসংগ্রহের জন্য শীঘ্রই জনসাধারণের নিকট অনুরোধপত্র বাহির হইবে এবং ঐ বিষয়ে সকল রকম ব্যবস্থা হইয়াছে। ব্যবসায়ক এবং কমিশনারদিগকে ডাকিয়া এক সভা করা হইবে। সরকারী মহলের প্রচার, অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এবং অনশনক্লিষ্ট অঞ্চলের প্রতি সরকারের সজাগ দৃষ্টি রহিয়াছে। প্রত্যেক জেলায় অতিরিক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে। কৃষি এবং জমীর উন্নতির জন্য বহু টাকা অগ্রিম ঋণ দেওয়া হইতেছে। তাহা ছাড়া পারিশ্রমিক রূপে সাহায্যও প্রচুর দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে।

উপরে যাহা মুদ্রিত হইল তাহা ঠিক খবর হইলে সন্তোষের বিষয়। আমরা অনভিজ্ঞতা বশতঃ আগেই বাঁকুড়া জেলার নিরন্ন কতকগুলি কৃশ ও কঙ্কালসার লোকের (বাঁকুড়া সম্মিলনীর তোলা) প্রকৃত ছবি ছাপিয়া ফেলিয়াছিলাম, জেলাজজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি যাহার সদস্য এরূপ বাঁকুড়া রিলীফ কমিটির

আবেদন ছাপিয়াছিলাম, ইংরেজীতে ও বাংলায় তাঁহাদের এই উক্তির প্রচার করিয়াছিলাম যে তাঁহাদের মতে বাঁকুড়ায় পাঁচ লক্ষ লোকের সাহায্য পাওয়া আবশ্যক এবং তজ্জন্য ন্যূনকল্পে ১৫।১৬ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। বাঁকুড়া সম্মিলনী নিরন্ন লোকদের জন্য যাহা করিতেছেন, তাহাও লিখিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, আমরা "নেকড়ে বাঘ, নেকড়ে বাঘ" বলিয়া মিথ্যা চীৎকার করি নাই। কয়েক দিন পূর্ব্বে কাগজে দেখিয়াছিলাম, বাঁকুড়ার জেলা-বোর্ড জেলার বহু অংশে অন্নাভাব বা দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন এবং নানা প্রকারে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন—বিধবারা ধান ভানিয়া যাহাতে কিছু রোজগার করিতে পারেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে মাথাপিছু তিনটি করিয়া টাকা দিতেছেন। শেষ সংবাদ, বাংলা-গবন্মেণ্ট, দুর্ভিক্ষের না হউক, অন্ততঃ অন্নকষ্টের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন। অনেক ধনী লোক আছেন যাঁহারা গবন্মেণ্ট না চাহিলে টাকা দেন না। সরকারী আবেদনে তাঁহারা কিছু দিলে দরিদ্রেরা কিছু খাইতে পরিতে পাইবে।

বাংলা-গবন্মেণ্ট ঘোষণা করিবেন ছয়টি জেলার নানা অঞ্চলে অন্নকষ্ট উপস্থিত। ভারত-গবন্মেণ্টের অর্থসচিব সেদিন অহঙ্কার করিয়াছিলেন, যে, ব্রিটিশরাজ ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের বিলোপ সাধন করিয়াছেন।

—

বাঁকুড়ার লোকদের নিকট নিবেদন

আমার জন্ম ও গোড়াকার শিক্ষা বাঁকুড়ায় হইয়াছিল। আমি তথাকার অন্ন জলে বাতাসে বাড়িয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলাম। এই জন্য তথাকার অবস্থা কিছু জানি। কেবল সেখানকার জন্যও কিছু করিবার যথেষ্ট শক্তি সামর্থ্য আমার নাই। এই জন্য আমি সমগ্র মানবজাতি, সমগ্র ভারতবর্ষ, সমগ্র বঙ্গদেশ সম্বন্ধে কিছু আবেদন করিতে সঙ্কোচ বোধ করি। কিন্তু বাঁকুড়া সম্বন্ধে কিছু লিখিতে পারি। সে লেখায় কিছু ফল হইত, যদি আমি আমারই কর্ম্মবশে সেখান হইতে স্বয়ংনির্ব্বাসিতবৎ না হইতাম। তথাপি, ফল যাহাই হউক, বাঁকুড়ার লোকদিগকে কিছু অনুরোধ জানাইতেছি।

আমারই আধুনিক কর্ম্মজীবনে দেখিলাম, কয়েক বার আমাদের জেলায় দুর্ভিক্ষ হইল এবং নিরন্ন লোকদের নিমিত্ত ভিক্ষা করিতে হইল। কিন্তু এইরূপ বার-বার দুর্ভিক্ষ হওয়া এবং উদরপূর্ত্তির জন্য অপরের দ্বারস্থ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। "ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ।"

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।" বাঁকুড়ায় উৎপন্ন—বনজ স্বভাবজাত কৃষিজাত কুটীরশিল্প দ্বারা উৎপন্ন বা বৃহৎ কারখানায় উৎপন্ন—দ্রব্যের ব্যবসা দ্বারা বাঁকুড়ার লোকদের ধনাগম বাড়ান যায় কিনা, সকলকে, বিশেষতঃ সঙ্গতিপন্ন ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষিত লোকদিগকে বিবেচনা করিতে বলিতেছি। জেলায় নিশ্চয়ই কৃষিরও আরও উন্নতি আরও বিস্তৃতি হইতে পারে। এই সব বিষয়ের আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কৃষি বাণিজ্য কুটীরশিল্প পণ্যদ্রব্যের বৃহৎ কারখানা, সকলগুলিই কিন্তু যথাসম্ভব স্থানীয় লোকদের শ্রমে চালাইতে হইবে। বাহির হইতে সমুদয় বা অধিকাংশ শ্রমিক আমদানী করিয়া কাজ চালাইলে, যাঁহাদের মূলধন তাঁহাদের অর্থাগম হইতে পারে, কিন্তু জেলার সর্ব্বসাধারণের তাহাতে কি লাভ?

বাঁকুড়া জেলার লোকদের নিকট যে নিবেদন করিলাম, অন্য সব জেলার লোকদের নিকটও সেইরূপ নিবেদন করা যায়। তথাকার অধিবাসীরা সেই নিবেদন করুন। কোন কোন জেলার—বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন জেলার—বহু লোক অধিকতর উদ্যমশীল। তাঁহারা অপর সকলকে জাগাইয়া তুলুন।

—

কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দির

চন্দননগরের কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দিরটিকে বালিকাদের শিক্ষার একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার নিমিত্ত তথাকার বিখ্যাত অধিবাসী শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয় প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছেন, এখনও ব্যয় করিতেছেন এবং ইহার উন্নতির জন্য তাঁহার চেষ্টার বিরাম নাই। প্রতি বৎসর এই বিদ্যালয়টির পুরস্কার-বিতরণ উপলক্ষ্যে তিনি সাহিত্যে বা শিক্ষাদান কার্য্যে খ্যাতিমতী কোন-না-কোন বাঙালী মহিলাকে আহ্বান করেন। এ বৎসর তিনি শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা বসাক মহোদয়াকে পুরস্কার-বিতরণ সভায় নেত্রী করিতে পারিয়াছিলেন। সভানেত্রী তাঁহার অভিভাষণে বলেন :—

যায় না, তাহাতে আমাদের কখনও সন্দেহ ছিল না। অনুবাদের সাহায্যে কোন লেখককেই ভাল করিয়া জানা যায় না—বিশেষতঃ কোন কবিকে। মূলের ধ্বনির মোহিনী শক্তি অনুবাদে প্রায়ই থাকে না; অনুবাদ খুব ভাল হইলেও অন্যান্য খুঁৎও থাকে। অনেক সময় অনুবাদে চিন্তা, ভাব, অর্থ প্রকাশ পায়, কিন্তু অলঙ্কার বাদ পড়ে। তদ্ভিন্ন ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, রবীন্দ্রনাথের বিস্তর শ্রেষ্ঠ কবিতা অনুবাদিত হয় নাই। তাঁহার উৎকৃষ্ট অনেক গদ্য লেখারও অনুবাদ হয় নাই।

আমরা অনেক সময় শান্তিনিকেতনে কাহারও কাহারও কাছে বলিয়াছি, যে, যেমন ভিন্ন দেশ হইতে ছাত্রেরা জার্মেনীতে, ফ্রান্সে, ইটালীতে শিক্ষার জন্য গেলে সেই-সেই দেশের ভাষা শিখে, শিখিতে বাধ্য হন, সেইরূপ বঙ্গের বাহির হইতে ভিন্নভাষাভাষী যাঁহারা শিক্ষার জন্য বিশ্বভারতীতে আসেন, তাঁহাদের বাংলা শিক্ষা করা উচিত। নতুবা বিশ্বভারতীতে শিক্ষালাভের প্রধান যে উপকার ও আনন্দ রবীন্দ্রনাথকে জানা, তাহা হইতে তাঁহারা বহুপরিমাণে বঞ্চিত হন। আমরা যখন এইরূপ কথা বলিতাম, তখন শান্তিনিকেতন কলেজের অবাঙালী ছাত্রদের বাংলা শিখিবার আয়োজন ছিল না। শুনিয়াছি, পরে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আমরা আমাদের ইংরেজী মাসিক পত্রে রবীন্দ্রনাথের অনেক উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ও নাটোর অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছি। তাহা আমাদের কাগজটিকে মূল্যবান করিবার জন্য করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী মূলে পড়িবার আগ্রহও কতকগুলি অবাঙালীর মধ্যে উদ্ভূত হইয়া থাকিবে।

—

বিশ্বভারতীকে ষাট হাজার টাকা দান

দিল্লীতে কোন বা কতিপয় মহাশয় ব্যক্তি বিশ্বভারতীর ঋণশোধের জন্য রবীন্দ্রনাথকে ষাট হাজার টাকা দিয়া তাঁহাকে আপাততঃ আর অভিনয় দ্বারা অর্থসংগ্রহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নগরে যাইবার প্রয়োজন হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। তিনি বা তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ অবস্থায় কবিকে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইয়াছে, ইহাতে ভারতীয়দের—বিশেষতঃ বাঙালীদের, গৌরব নাই।

অতীতে ঋণ যে-কারণেই হইয়া থাকুক, ভবিষ্যতে আর যদি ঋণ না-হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মকর্তারা প্রশংসাভাজন হইবেন।

—

সিন্ধু ও উড়িষ্যা

গত ১লা এপ্রিল হইতে সিন্ধু ও উড়িষ্যা দুটি গবর্ণর-শাসিত স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্তনে ঐ দুই প্রদেশের লোকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধন, ও সর্বপ্রকার শ্রী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তাহারা আর্থিক বিষয়ে নিজ নিজ ব্যয় নির্বাহে সমর্থ হইলে, তাহাদের স্বাতন্ত্র্য সার্থক হইবে।

—

আসামে বাঙালীদের জন্য উচ্চবিদ্যালয়

আসামের গৌহাটী, তেজপুর ও ডিব্রুগড়ে বাঙালীদের জন্য তিনটি উচ্চবিদ্যালয়ের ব্যয়নির্বাহার্থ আসাম-গবন্মেণ্ট বাৎসরিক পনর হাজার টাকা দিবেন। আসাম বলিয়া পরিচিত প্রদেশে অসমিয়াভাষী অপেক্ষা বাংলাভাষীর সংখ্যা অধিক, এবং যে-সব বাঙালীর জন্য ঐ তিনটি বিদ্যালয় অভিপ্রেত তাহারা আসামের স্থায়ী বাসিন্দা, সুতরাং তাহাদের জন্য ব্যয়ও ন্যায্য বায়।

—

আসামে ও উড়িষ্যায় বাঙ্গালীবিদ্বেষ

গৃহবিবাদ ও জ্ঞাতিকলহ যেমন বিষদিগ্ধ হয়, অতি-নিকটভাষাভাষী বাঙালী, আসামী ও উৎকলীয়দের ঝগড়াও তদ্রূপ। ইহা সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়। রাজনৈতিক বাধা না ঘটিলে অসমিয়া, বাংলা ও ওড়িয়া এই তিন ভাষা ও সাহিত্য সম্মিলিত হইয়া একটি শ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারিত। কিন্তু যাহা ঘটে নাই, তাহার জন্য অনুশোচনা না করিয়া আসামী, ওড়িয়া ও বাঙালীদের পরস্পর সহযোগিতা দ্বারা সমাজের উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া একান্ত কর্তব্য।

—

উৎকলে বাংলা মাসিকপত্র

আমরা সাধারণতঃ মাসিকপত্রসমূহের সমালোচনা বা উল্লেখ করি না; বিশেষ স্থলে কদাচিৎ কখনও করিয়া থাকি।

যে-সকল দেশে বা প্রদেশে বাঙালীরা কিছু অধিক সংখ্যায় স্থায়ী ভাবে, ঘরবাড়ি বাঁধিয়া বাস করেন, সেখানে তাঁহাদের একখানি করিয়া বাংলা অন্ততঃ মাসিকপত্র থাকিলে ভাল হয়। এরূপ পত্র কোন কোন প্রদেশ হইতে বাহির হইয়াছে, কিন্তু স্থায়ী হয় নাই। আমরা যত দূর অবগত আছি, ব্রহ্মদেশের একাধিক বাংলা কাগজ লোপ পাইয়াছে; বোম্বাইয়ের একখানি কাগজ ছিল, লুপ্ত হইয়াছে; আগ্রা-অযোধ্যার কাগজখানি নিয়মিত রূপে বাহির হয় না। এ অবস্থায় উড়িষ্যার কটক হইতে "শ্রী" মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব আশা ও আশঙ্কার কারণ হইয়াছে। ইহার সম্পাদিকা ও সহকারী সম্পাদক স্থায়িত্বের ব্যবস্থা করিয়া কাগজখানি বাহির করিয়া থাকিলে প্রীত হইব। ইহার কয়েকটি লেখা ভাল হইয়াছে মনে হইল।

নিউ দিল্লীতে গত বৎসর পৌষে প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের গত অধিবেশনে স্থির হইয়াছিল, যে, উহার বাহক একখানি মাসিক কাগজ বাহির হইবে। তাহার উদ্যোগ আয়োজনও হইতেছে, পরে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু এখনও তাহা প্রকাশিত হয় নাই। বোধ হয় বর্ত্তমান বৈশাখ মাসে উহার প্রকাশ আরম্ভ হইবে।

—

সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের বজেট

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বজেটের আলোচনার সময় বেসরকারী সভ্যেরা ভোটের আধিক্যে অনেক ব্যয় ছাঁটিয়া ফেলিবার এবং কোন কোন ট্যাক্স ও মাশুল কমাইবার প্রস্তাব সভাকে গ্রহণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু সামান্য একটি পরিবর্ত্তন ছাড়া গবর্মেণ্ট কোন প্রস্তাবই গ্রহণ করেন নাই। গবর্ণর জেনারাল এইরূপ নিশ্চয়াত্মক মন্তব্য দ্বারা বজেটটি মঞ্জুর করিয়াছেন বা করাইয়াছেন, যে, উহাতে লিখিত সমুদয় ব্যয়, ট্যাক্স, মাশুল ভারতীয় রাষ্ট্রের কাজ চালাইবার জন্য একান্ত আবশ্যক। ইহা হইতে অনুমান করিতে হইবে, যে, বেসরকারী কোন ভারতীয় জনপ্রতিনিধি বা প্রতিনিধি-সমষ্টি ভারতবর্ষের কি প্রয়োজন তাহা ভারত-গবর্মেণ্টের মত বুঝেন না এবং তাঁহারা ভারত গবর্মেণ্টের মত ভারত-হিতৈষীও নহেন; স্ব-স্ব দেশের প্রয়োজন সম্বন্ধে জ্ঞান ও স্ব-স্ব দেশের হিতৈষণা কেবল স্বাধীন দেশের লোকদের একচেটিয়া সম্পত্তি, পরাধীন ভারতীয়দের তাহা থাকিতে পারে মনে করা আস্পর্দ্ধার কথা।

—

খবরের কাগজের ন্যূনতম ডাকমাশুল

ভারতীয় বজেটে সরকার যে পরিবর্ত্তনটি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা এই, যে, খবরের কাগজ আট তোলা ওজন পর্য্যন্ত এক পয়সা ডাকমাশুলে যাইত, অতঃপর দশ তোলা ওজন পর্য্যন্ত যাইবে। ডাক-বিভাগের বড়কর্তা মিঃ বেউর বলিয়াছেন, ইহাতে গবর্মেণ্টের ৭৫০০০ টাকা লোকসান হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন ইহা পৃথিবীতে খবরের কাগজের ন্যূনতম মাশুল। কিন্তু ইহা তাঁহার ভ্রম।

জাপানে খবরের কাগজের ন্যূনতম মাশুল আধ সেন। সেন ইয়েনের এক শত ভাগের এক ভাগ, এবং বর্ত্তমানে এক ইয়েন প্রায় সাড়ে বার আনার সমান, এক সেন আধ পয়সার ও আধ সেন সিকি পয়সার সমান। তাহা হইলে ভারতবর্ষে খবরের কাগজের ন্যূনতম মাশুল এক পয়সা, এবং জাপানে খবরের কাগজের ন্যূনতম মাশুল সিকি পয়সা। অথচ জাপানীদের মাথাপিছু আয় ও বাঁচিয়া থাকিবার ব্যয় ভারতীয়দের মাথাপিছু আয় ও বাঁচিয়া থাকিবার ব্যয় অপেক্ষা অধিক।

—

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণ

বর্ত্তমান বৎসরের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর অভিভাষণ খুব দীর্ঘ নহে, কিন্তু সংক্ষিপ্তও নহে। ইহা ডিমাই আট পেজী আকারের ৩৫ পৃষ্ঠা পরিমিত। এক একটি পৃষ্ঠা লম্বায় ৯ ইঞ্চি, চৌড়াই ৫ ইঞ্চি, এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৩২ পংক্তি লেখা আছে। সবগুলি অনুবাদ করিয়া প্রবাসীতে ছাপিলে প্রবাসীর ২৬।২৭ পৃষ্ঠা লাগিত।

অভিভাষণটি অল্প পড়িলেই ইহার ভাষা, ইহার শব্দ-নির্ব্বাচনপটুত্ব, ইহার লিখনভঙ্গী—এক কথায় ইহার সাহিত্যিক উৎকর্ষ পাঠককে আকৃষ্ট করে। এই গুণগুলি গোড়ার দিকেই বেশী স্পষ্ট। লেখক যে অকপট ভাবে, নিজের প্রাণের কথা বলিতেছেন, ইহার মধ্যে কোন চালবাজী ধাপ্পাবাজী নাই—ইহাও বেশ বুঝা যায়

সমস্ত অভিভাষণটি পড়িলে এই ধারণা জন্মে, যে, লেখক চান ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা, এবং চান ভারতবর্ষকে সমাজতান্ত্রিকতা ও সাম্যবাদের ছাচে ঢালিতে। সমস্ত দেশ ও মহাজাতিটিকে তিনি অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়া সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী করিতে চান। ইহা তাঁহার লক্ষ্য, এবং তাঁহার মতে ইহা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের উপায়ও বটে।

তিনি জানেন ও বলিয়াছেন, যে, সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ সম্বন্ধে তাঁহার যে মত, বহু কংগ্রেসওয়ালা ও অন্যবিধ ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিকদের মত তাহা হইতে ভিন্ন; কিন্তু তাঁহার কাহাকেও নিজের মতানুবর্ত্তী করিবার নির্ব্বন্ধাতিশয় নাই, কংগ্রেসকে এখনই সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের অনুমোদন করাইবার জিদ তাঁহার নাই, এবং যে-কেহ ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে চান, তাঁহার অন্যান্য মত যাহাই হউক তিনি তাঁহার সহিত ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছেন।

পণ্ডিত জবাহরলাল কংগ্রেস-কার্য্যক্ষেত্রের যে-সকল সহচর ও বন্ধু পরলোকে গিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে সহৃদয়তাপূর্ণ যথাযোগ্য প্রাণের কথা বলিয়া অভিভাষণটি আরম্ভ করিয়াছেন। তার পর সেই সকল সহচরদের সম্বন্ধে যথাযোগ্য কথা বলিয়াছেন, যাহারা জেলে বা আটকশিবিরে বন্দী আছেন। যাঁহারা পরলোকে, তাহারা শ্রমের পর বিশ্রাম করিবার ন্যায্য অধিকারী, বিশ্রাম করিতেছেন। অতঃপর জবাহরলাল বলিতেছেন, যাঁহারা ইহলোকে এখনও আছেন, বিশ্রাম তাঁহাদের জন্য নয়।

"আমরা বিশ্রাম করিতে পারি না। কারণ আমরা বিশ্রাম করিলে তাহা, যাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন ও যাইবার সময় আমাদিগকে স্বাধীনতার বর্ত্তিকা জ্বালাইয়া রাখিবার ভার দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হইবে, আমরা যে ব্রত লইয়াছি তাহা ভঙ্গ করা হইবে, যে কোটি কোটি জনগণ বিশ্রাম করিতে পায় না তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে।"

সমস্ত অভিভাষণটির সার সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিব না, কয়েকটি প্রধান কথার উল্লেখ করিব।

সমগ্র পৃথিবীতে যে রাষ্ট্রনৈতিক-সমাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, ভারতবর্ষের সমস্যাও যে তদ্বিধ ও তাহার অন্তর্গত, জবাহরলাল তাহা বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, "We *cannot* isolate India or the Indian problem from that of the rest of the world," "আমরা ভারতবর্ষকে ও ভারতীয় সমস্যাকে পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশের সমস্যা হইতে আলাদা করিয়া রাখিতে পারি না।"

সমস্ত পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের সহিত ধনিকতন্ত্রবাদের ও ফাসিজ্‌মের, এবং স্বাজাতিকতার (ন্যাশন্যালিজ্‌মের) সহিত সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। সাম্রাজ্যবাদ, ধনিকতন্ত্রবাদ ও ফাসিজ্‌মের চেষ্টা একবিধ, তাহাদের চেষ্টা ও লক্ষ্য অনেক স্থলে এক। স্বাজাতিকতা এবং সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের চেষ্টা অন্যবিধ। সাম্রাজ্যবাদ, ধনিকতন্ত্রবাদ ও ফাসিজ্‌ম্ পরস্পরের সহায়। জবাহরলাল স্বাজাতিকতাকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রাচ্য ও অন্য পরাধীন দেশসমূহের স্বাজাতিকতা স্বাধীনতা লাভের প্রেরণা হইতে উদ্ভূত; পাশ্চাত্য দেশসকলের ভীষণ সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর স্বাজাতিকতা সমাজতন্ত্রবাদের আবির্ভাব হইতে উৎপন্ন প্রতিক্রিয়ার শেষ ভরসাস্থল ফাসিজ্‌মের বেশধারী। পরাধীন জাতিসমূহের স্বাজাতিকতা স্বাধীনতা চায়। সমাজতন্ত্রবাদীরা এবং সাম্যবাদীরা সাম্রাজ্যবাদী ও ধনিকদের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিতে চায়। অতএব বক্তার মতে পরাধীন দেশসমূহের স্বাজাতিকতার এবং সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্য একই প্রকারের।

এই পৃথিবীব্যাপী দ্বন্দ্বে, জগৎজোড়া সমরে সমানসংগ্রামে, আমাদের স্থান কোথায়? জবাহরলাল এই প্রশ্ন ও তাহার উত্তর নিম্নমুদ্রিত বাক্যগুলিতে বিবৃত করিয়াছেন।

"Where do we stand then, we who labour for a free India? Inevitably we take our stand with the progressive forces of the world which are ranged against fascism and imperialism. We have to deal with one imperialism in particular, the oldest and the most far-reaching of the modern world, but powerful as it is, it is but one aspect of world imperialism. And that is the final argument for Indian independence and for the severance of our connection with the British Empire. Between Indian nationalism, Indian freedom and British imperialism there can be no common ground, and if we remain within the imperialist fold, whatever our name or status, whatever outward semblance of political power we might have, we remain cribbed and confined and allied to and dominated by the reactionary forces and the great financial vested interests of the capitalist world.

The exploitation of our masses will still continue and all the vital social problems that face us will remain unsolved. Even real political freedom will be out of our reach, much more so radical social changes."

ইহাতে জবাহরলাল বলিয়াছেন, যে, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকিলে তাহাকে ধনিক জগতের স্বার্থ-পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবে, প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা তাহার নাগালের বাহিরে থাকিবে, এবং ভারতীয় জনসাধারণের শ্রমে ধনিকদের সমৃদ্ধি হইবে। কিন্তু জনসাধারণের উন্নতি হইবে না—ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়নত্ব বা অন্য গালভরা রাষ্ট্রনৈতিক মর্যাদা যাহাই দেওয়া হউক।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধোগতি তাঁহার মতে নানা দিকে কিরূপ হইয়াছে, জবাহরলাল অতঃপর তাহা দেখাইয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি সুভাষচন্দ্রকে গবর্মেণ্ট যে, তিনি ভারতবর্ষে আসিলে স্বাধীনতা হারাইবেন বলিয়া ধমক দিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করেন, এবং বলেন যে তিনি বন্ধুগণের পরামর্শে ইউরোপে তাঁহার নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে রওনা হইয়াছিলেন।

জবাহরলালের মতে সন্ত্রাসনবাদ বা বিভীষিকা-পন্থা এখন কার্য্যতঃ বঙ্গে বা ভারতের অন্যত্র কোথাও নাই। তাঁহার মতে,

"Terrorism is always a sign of political immaturity in a people, just as so-called constitutionalism, where there is no democratic constitution, is a sign of political senility. Our national movement has long outgrown that immature stage, and even the odd individuals who have in the past indulged in terrorist acts have apparently given up that tragic and futile philosophy."

তাঁহার মতে গবর্মেণ্ট সন্ত্রাসনবাদ নির্মূল করিবার বাহানায় অশুবিধ রাষ্ট্রনৈতিক সমুদয় প্রচেষ্টা নিষ্পিষ্ট করিবার এবং বাংলাকে দেহে ও মনে খোঁড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

দেশের লোকদের মধ্যে অমিল ও কলহ, মধ্যবিত্তলোকদের দ্বারা জনসাধারণের নেতৃত্বের ক্রেটিগুলি সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা প্রয়োজন দেখা যায়। অতঃপর তিনি বলেন, যে, কংগ্রেসের যে কেবল সাধারণ লোকদের জন্য (for the masses) হওয়া চাই, তাহা নহে, ইহাকে সাধারণ লোকদেরই (of the masses) হওয়া চাই, এবং কেবল তাহা হইলেই ইহা বাস্তবিক সাধারণ লোকদের জন্য হইবে।

অন্য যে-সব বিষয়ের আলোচনা সভাপতি করিয়াছেন, তাহার কেবল উল্লেখ এখানে সম্ভব। আমরা কেবল তাঁহার মত দিতেছি, সমালোচনা করিতেছি না।

কংগ্রেসের মূল নিয়মাবলীর পরিবর্তন। দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সমুদয় শক্তিকে সম্মিলিত করিয়া কি প্রকারে সম্মিলিত চেষ্টা করা যায়, তাহাই আমাদের প্রকৃত সমস্যা। পৃথিবীর সব সমস্যার ও ভারতবর্ষের সব সমস্যার সমাধানের উপায় কেবল সমাজতন্ত্রবাদ। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য, বহুজনের বেকার অবস্থা, এবং ভারতীয় জনগণের পরাধীন ও অধঃপতিত অবস্থার প্রতিকার কেবল ইহার দ্বারাই হইতে পারে। নূতন ভারতশাসন আইন দাসত্বের চার্টার; ইহার প্রতি ভারতীয়দের মনোভাব হইতে পারে কেবল রফাহীন বিরোধিতা এবং ইহার উচ্ছেদের অবিরাম চেষ্টা; কি প্রকারে তাহা করিতে পারা যায়? কন্‌ষ্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্লীর আবশ্যকতা ও উপযোগিতা। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ বা অগ্রহণ (এ বিষয়ে তাঁহার মত ও যুক্তির সহিত দেখিতেছি প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় বিবিধ প্রসঙ্গে লিখিত মত ও যুক্তির সাদৃশ্য আছে)। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলার নির্ব্বাচনে অনেক বিলম্ব হইতে পারে, নির্ব্বাচন মোটেই না হইতে পারে; সমগ্রভারতব্যাপী ফেডারেশ্যনও না হইতে পারে। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত ও বাঁটোয়ারা; মুসলমান ও শিখদের সম্বন্ধে ব্যতিক্রম করিবার ইঙ্গিত; বঙ্গের প্রতি সহানুভূতি। অহিংস আইনলঙ্ঘনের কোন সম্ভাবনা বা সাধ্যায়ত্ততা দেখা যাইতেছে না। সমাজতন্ত্রবাদ দ্বারা দরিদ্র সমস্যার ও অস্পৃশ্যতার সমাধান। খদ্দর ও অন্যবিধ কুটীর-শিল্প আপাততঃ আবশ্যক হইলেও কারখানা-শিল্পই চরম সমাধান। জমীর বন্দোবস্ত ও খাজনা ভারতের বৃহৎ সমস্যা। আবিসীনিয়ানদের শৌর্য্যের প্রশংসা ও তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ। কোন সাম্রাজ্যবাদ-উদ্ভূত যুদ্ধে ভারত অংশী হইতে চায় না।

—

শিক্ষাসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রস্তাব

বঙ্গের "শিক্ষা সপ্তাহে" রবীন্দ্রনাথ "শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ" বিষয়ে যে প্রবন্ধ পড়েন, তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধটির শেষে পরপৃষ্ঠায় একটি "পুনশ্চ" আছে। তাহাতে "দ্বিতীয় প্রস্তাব" শীর্ষক একটি প্রস্তাব আছে এবং তাহার মাথায় লিখিত আছে যে, তাহা শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়কে প্রেরিত হইয়াছিল। প্রস্তাবটি এই:—

"...আমাদের দেশে একটি প্রস্তাব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমক্ষে আমি উপস্থিত করতে চাই। দেশের যে-সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মন কলেজে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের জন্যে [illegible] প্রাদেশিক [illegible] পরীক্ষাপ্রণালী স্থাপন করা যদি হয় তবে অনেকেই [illegible] নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবে। [illegible] পরীক্ষার্থীদের [illegible] নির্দিষ্ট [illegible] পাঠ্যপুস্তক [illegible] তাদের [illegible] শিক্ষা নির্দিষ্ট [illegible] পারে। এই পরীক্ষায় যোগ্য যে-সকল উপাধির অধিকার [illegible], সমাজের দিক থেকে তার সম্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার [illegible] মূল্য আছে। তাই আশা করা যায়, [illegible] পরীক্ষার্থীর দল ক্রমে [illegible] অনেক এর দ্বারা নির্দিষ্ট হবে। এই উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তক

রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে এবং এতে করে বিস্তর লেখকের জীবিকার উপায় নির্দ্ধারিত হবে। একদা বিশ্বভারতী থেকে এই কর্ত্তব্য গ্রহণ করবার সঙ্কল্প মনে উদয় হয়েছিল কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ মনের বাইরে অচল। তা ছাড়া রাজসরকারের উপাধিই জীবনযাত্রায় কর্ণধার।"

এই প্রস্তাবটি বঙ্গের শিক্ষা-বিভাগের নিকট উপস্থাপিত হওয়ায় শিক্ষা-বিভাগ এতদনুসারে কাজ করিবেন, এ-বিশ্বাস আমাদের নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা শিক্ষা-বিভাগের কাছে প্রেরণের এই সার্থকতা আছে, যে, উক্ত বিভাগ জানিতে পারিবেন, বঙ্গে শিক্ষাসম্বন্ধে সকলের চেয়ে প্রতিভাশালী যিনি, তিনিও রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনকারীদের মতই শিক্ষার বিস্তার চান, শিক্ষার উৎকর্ষসাধনের অছিলায় তাহার সঙ্কোচসাধনে সায় দেন না।

রবীন্দ্রনাথ যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, ঐরূপ একটি প্রস্তাব অনেক বৎসর পূর্ব্বে আমার মনেও দেখা দিয়াছিল। তাহা শিক্ষা-বিভাগকে জানাই নাই, রবীন্দ্রনাথকেই জানাইয়াছিলাম। তাহা বাঙালী বালিকা ও মহিলাদের সম্পর্কে বলিয়া আমার স্পষ্ট মনে আছে, বাঙালী পুরুষদেরও সম্বন্ধে ওরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়িতেছে না—বোধ হয় করি নাই। কবি পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমি স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে ঠিক্ তাহাই করিয়াছিলাম এবং তাঁহারই নেতৃত্ব চাহিয়াছিলাম। তাঁহার সম্মতি ও অনুমোদন পাইয়াছিলাম। তাহার পর কার্য্যতঃ কেন কিছু হইল না, সে বিষয়ে আমার পক্ষের কারণ আমি জানি; কবির পক্ষের কারণ আমি ইতিপূর্ব্বে এখনও জানিবার চেষ্টা করি নাই ও জানিতাম না।

রাজসরকার কর্ত্তৃক পরীক্ষা গৃহীত হওয়ার যে সুবিধা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সত্য। কিন্তু রাজসরকার কর্ত্তৃক পাঠ্যপুস্তক বাঁধিয়া দেওয়ার বিপদ আছে। একটা বিপদ সাম্প্রদায়িকতা। কোন কোন মুসলমান সাহিত্য-দিগ্‌গজের মতে রবীন্দ্রনাথের লেখা পর্য্যন্ত "পৌত্তলিকতা"-দোষে দুষ্ট! পাঠ্যপুস্তক রচনার ও নির্ব্বাচনের কার্য্যতঃ অন্যূনত একটা সরকারী নিয়ম এই, যে, হিন্দুদের সাহিত্য-পুস্তকে মুসলমানদের সম্বন্ধে কিছু লেখা থাকা চাই-ই, কিন্তু মুসলমানদের লেখা সাহিত্যপুস্তকে হিন্দুদের সম্বন্ধে কিছু থাকা আবশ্যক নহে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রস্তাবটিতে "পাঠ্যপুস্তক বেঁধে" দিবার কথা লিখিবার সময় সম্ভবতঃ সাম্প্রদায়িকতা-বিভীষিকা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হয় নাই।

এলাহাবাদে যে মহিলা বিদ্যাপীঠ আছে, তাহার বেসরকারী কর্ত্তৃপক্ষ হিন্দী ও বাংলা প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক স্বয়ং নির্দ্ধারণ করেন, এবং তাঁহাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণা মহিলারা কোন কোন দেশী রাজ্যে এবং অন্যত্র শিক্ষয়িত্রীর কাজ পান।

—

ক্ষত্রিয় কে?

সর্ যদুনাথ সরকার গত বৎসর ২৪শে ফাল্গুন তাঁহার দিব্য-স্মৃতি উৎসবের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন :

মহারাজ দিব্য এবং ভীম কৈবর্ত্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহারা যুদ্ধব্যবসায়ী। বর্ত্তমানে বরেন্দ্রভূমিতে তাঁহাদের স্বজাতিগণ মাহিষ্য বলিয়া অভিহিত হন। আমরা যদি ভগবদ্গীতায় বিশ্বাস করি এবং গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে চারি বর্ণের লোক সৃষ্ট হয় একথা মানি, তবে এই সব কৈবর্ত্তকে ক্ষত্রিয় বলিতে হইবে। যে দুইজন বীর প্রাণপণ করিয়া বরেন্দ্রী ভূমির অত্যাচারকারীকে দমন করেন, বিদেশী শত্রুকে তাড়াইয়া দেন, লক্ষ লক্ষ প্রজার, পুরুষ স্ত্রীর, প্রাণ মান রক্ষা করেন, তাঁহারা গুণে ও কর্ম্মে ক্ষত্রিয় ছিলেন; নামে যে জাতিই হউন না কেন, আসে যায় না।

সুতরাং আমরা যে আজকাল ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হিন্দুকে রেলওয়ের চারি শ্রেণীর গাড়ীর মত উচ্চ নীচ ভাগ করিয়া, প্রথম শ্রেণী [illegible], দ্বিতীয় শ্রেণী [illegible], [illegible] বর্ণ, আর [illegible] হইতে রেলের পৌছ দিয়া, মাথার উপর ভিন্ন ভিন্ন নাম লিখিয়া পৃথক করিয়া রাখিয়াছি, তাহা চিরন্তন নহে, ঐতিহাসিক সত্য নহে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। রাজপুতদের মত বীর জাতি ভারতে আর কেহ নাই, জগতেও বিরল। এই রাজপুতগণ নিজকে ক্ষত্রিয় বলিয়া গর্ব করে, অপর জাতিকে ঘৃণা করে। পশ্চিম অঞ্চলে কোন লোককে নীচ বা হীন বলিতে হইলে চলিত ভাষায় বলা হয় "সে কে? বানিয়া" অর্থাৎ দোকানদার, [illegible]। অথচ এই বানিয়া জাতীয় লোক রাজপুত রাজাদের সৈন্যদলের নেতা হইয়া যুদ্ধ জয় করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত রাজপুতানার ইতিহাসে অনেক পাইয়াছি।

সুতরাং আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতদের [illegible] পুরাণ [illegible] নহে। [illegible] যদি [illegible] করিতে হয়, তবে আজ আমরা বরেন্দ্রবাসী বরেন্দ্রপ্রবাসী সকলে মিলিয়া [illegible] দিব্য ও ভীমের আত্মার [illegible] করি। এই উদ্যোগ [illegible] হউক। [illegible] ইতিহাসের [illegible] নির্ণয় [illegible] করিতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান [illegible] হউক।

সুভাষচন্দ্র বসু আবার বন্দী

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু [illegible] এপ্রিল জাহাজে বোম্বাই পৌঁছেন। পুলিস তাঁহাকে সেখানে বন্দী করিয়া [illegible] জেলে রাখে। পরে তাঁহাকে অন্য [illegible] জেলে রাখা হইয়াছে।

গবর্মেণ্ট তাঁহাকে আগেই জানাইয়াছিলেন, যে, তিনি দেশে ফিরিলে স্বাধীন থাকিবার আশা করিতে পারেন না। তাহাতে তিনি ভীত না হইয়া দেশে ফিরিয়াছেন, এবং গবর্মেণ্টও নিজের পূর্ব্বকথা অনুসারে তাঁহাকে বন্দী করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে অসুস্থতা ও পীড়ার দরুণ জেলে দীর্ঘকাল ভুগিয়াছেন। মানসিক অশান্তির ত কথাই নাই। তাহা সত্ত্বেও এরূপ সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা অসাধারণ।

গবর্মেণ্ট কোন ব্যক্তির যত প্রকার দোষের যত প্রমাণ নিজের হাতে আছে বলুন না কেন, বিনা প্রকাশ্য বিচারালয়ে

ভারতের সিভিল সার্ভিস ও অন্য সব সার্ভিস দখল করিয়া ফেল, দেশ তোমাদেরই, তোমাদের মধ্যে এত বেশীসংখ্যক যোগ্য লোক আছে, যে, বিদেশ হইতে লোক আনিবার কোন প্রয়োজন নাই," তাহা হইলেই ঠিক্ কথা বলা হইত, এবং তাঁহাকে ভারতহিতৈষী ও ন্যায়বান লোক বলিয়া প্রশংসা করিতাম।

—

লর্ড উইলিংডনের বিদায়-ভর্ৎসনা

গত ৮ই এপ্রিল লর্ড উইলিংডন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ও রাষ্ট্রপরিষদের সদস্যদিগকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার শেষ বক্তৃতা করেন। তিনি তদুপলক্ষ্যে বলেন, যে, তিনি ব্যবস্থাপকসভাগৃহে বক্তৃতা করিতে আসিলে কিংবা তথায় পঠিত হইবার জন্য বাণী ("message") পাঠাইলে কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যেরা দলবলে অনুপস্থিত থাকেন; এই 'পূর্ব্ব হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া অসৌজন্য' ('calculated discourtesy') তাঁহাকে পীড়া দিয়াছে। লর্ড উইলিংডন সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয়ান। বাইবেলে লেখা আছে, "অপরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিও যেরূপ ব্যবহার তাহাদের নিকট হইতে পাইতে ইচ্ছা কর।" এই নিয়ম পালন বা লঙ্ঘন সরকার পক্ষ ও কংগ্রেসী সদস্যেরা উভয়েই করিয়াছেন কি না, উভয় পক্ষই দোষী বা নির্দোষ কিনা, কিংবা নির্দোষ বা দোষী পক্ষ কে, অসৌজন্য হইয়া থাকিলে কোন্ পক্ষ তাহার সূত্রপাত করিয়াছেন—এই সব প্রশ্নের আলোচনা লর্ড উইলিংডন হয়ত করেন নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মিস্ উইলকিন্সন এবং অপর একটি ইংরেজ মহিলা ও ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেননকে সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের অবস্থা জানিবার নিমিত্ত বড়লাট লর্ড উইলিংডন ও অন্যান্য অনেক সরকারী লোকের এবং বহু বেসরকারী লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এক খানি বিলাতী কাগজে পড়িয়াছি, যে, তাঁহারা দেশে ফিরিয়া গিয়া এক খানি বহিতে লিখিয়াছিলেন, লর্ড উইলিংডনের সহিত সাক্ষাৎকারের সময় তিনি পুনঃ পুনঃ মহাত্মা গান্ধীর উল্লেখ করিয়াছিলেন "ড্যাট্ লিটল্ ফেলো," "ঐ বেঁটে লোকটা," বলিয়া। ইহা সত্য হইলে তাঁহার সৌজন্যের একটি দৃষ্টান্ত বটে।

লর্ড উইলিংডনের বক্তৃতার সময় বা তাঁহার "বাণী" পঠিত হইবার সময় কংগ্রেসী সদস্যেরা উপস্থিত থাকিলে ব্রিটিশ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক মহলে তাহার এরূপ ব্যাখ্যা খুব সম্ভব হইতে পারিত ও হইত, যে, শেষ-নাগাদ উইলিংডনীয় নীতি ভারতে এত লোকপ্রিয় হইয়াছিল, যে, কংগ্রেসী সদস্যেরা পর্য্যন্ত সসম্মানে ও সানন্দে তাঁহার বক্তৃতা ও "বাণী" শুনিতেন।

—

অন্ধত্বের উপক্রমের প্রতিকার

গত মাসে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এক খানি বৃহৎ মোটরগাড়ী ঔষধ ও অস্ত্র এবং ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারী সহ বর্দ্ধমান যায়। জ্ঞানের অভাব বশতঃ যাহাতে লোকেরা অন্ধ না হয়, যাহাদের দৃষ্টিশক্তি কমিয়াছে যাহাতে তাহাদের দৃষ্টিশক্তি বাড়ে তাহা জানাইয়া দিবার জন্য এবং চক্ষুরোগের চিকিৎসার জন্য এই "ভ্রাম্যমান জুবিলি চক্ষুচিকিৎসালয়" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মোটরগাড়ীরূপ চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বঙ্গের গ্রামে গ্রামে গিয়া চক্ষু-চিকিৎসা করিবেন এবং চক্ষু-সম্বন্ধীয় উপদেশ দিবেন। এই ব্যবস্থা প্রশংসনীয়।

—

সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ

সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) ঠিক্ এক রকম নয়। পড়িয়াছি, প্রকার-ভেদে উহা প্রায় সাট রকম। সাম্যবাদ (Communism) চূড়ান্ত সমাজতন্ত্রবাদ। এই সকল মতের কিছু আলোচনা একাধিক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলে তবে হইতে পারে, ক্ষুদ্র একটা টিপ্পনীতে হইতে পারে না।

আমরা বর্ত্তমান সংখ্যারই আগের এক পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি, যে-দেশে দারিদ্র্য, রোগ, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, ধনবণ্টনে ন্যায্য-রীতির অভাব আছে, তথায় সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের প্রভাববৃদ্ধি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে-রূপ দুরবস্থার ও অন্যায়ের প্রতিকারের আশায় লোকদের সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ ভাল লাগে, সেরূপ দুরবস্থার প্রতিকার যে আবশ্যক তাহা বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল ও ন্যায়পরায়ণ কোন ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। অবশ্য সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ তাহার ঠিক প্রতিকার কি না, তাহার বিচার হইতে পারে, হওয়া চাই। এই মতগুলির মূলে যে সত্য আছে, তাহা আমরা স্বীকার করি। তবে, মানুষদের মধ্যে যখন বুদ্ধিশক্তির ও অন্যান্য শক্তির তারতম্য আছে, যখন প্রত্যেক মানুষ অপর প্রত্যেক মানুষের সমান ধন উৎপন্ন করিতে পারে না, তখন উৎপাদিত ধনের সমভাবে বণ্টন স্বাভাবিক নহে, উৎপাদনশক্তির তারতম্য অনুসারে বণ্টন ন্যায্য। শিক্ষালাভের পূর্ণ-সুযোগ এবং শ্রম দ্বারা ধন উৎপাদনের সুযোগ সকলেরই পাওয়া উচিত। ভূমি ও অন্য সব স্বাভাবিক সম্পত্তিতে একমাত্র রাষ্ট্রের অধিকার স্থাপনই শেষোক্ত সুযোগ দিবার একমাত্র বা প্রকৃষ্ট উপায় কি না, তাহা বিচার্য্য।

কোন রকম কাজের ন্যায্য পারিশ্রমিক কি প্রকার হওয়া উচিত, স্থির করা সহজ নয়। বহু সভ্য দেশে দেখা যায়, শিক্ষক ও অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইনজীবী, চিত্রকর, মূর্ত্তি-নির্ম্মাতা, পণ্যশিল্পের বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক প্রভৃতির পারিশ্রমিকে বিস্তর তারতম্য আছে। একটা প্রভেদ ন্যায্য নহে। অথচ সকলেরই প্রাপ্য বলপূর্ব্বক সমান করিয়া দিলে তাহাও ন্যায়সঙ্গত হইবে না।

রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট বা সাম্যবাদীরা হিংস্রনীতি অবলম্বন করিয়াছিল ও হয়ত এখনও স্থলবিশেষে তাহার পক্ষপাতী, এবং তাহারা ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতেছে, সত্য বটে; কিন্তু সাম্যবাদের সহিত হিংস্রতার ও ধর্ম্মবৈরিতার কোন স্বাভাবিক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নাই। যীশুর সমসাময়িক

এসেনী (Essenes) ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্পত্তি সম্বন্ধে সাম্যবাদী ছিলেন। ডক্টর ষ্টানলি জোন্স নামক নামজাদা মিশনরী খ্রীষ্টকে কম্যুনিষ্ট প্রমাণ করিবার জন্ম বহি লিখিয়াছেন। আমাদের ভারতবর্ষে বহু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে ও বৌদ্ধ সংঘে সম্পত্তিতে সমান অধিকার ছিল ও আছে শুনিয়াছি। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের যে ভারতাশ্রমে অনেক গৃহস্থ থাকিতেন, তাহার সম্পত্তিতে তাঁহাদের কাহারও ব্যক্তিগত অধিকার থাকিত না, শুনিয়াছি।

সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিবার প্রকৃষ্ট বা একমাত্র উপায় না হইতে পারে; কিন্তু মানুষকে মানুষ নামের যোগ্য হইতে ও থাকিতে হইলে সকলের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিবার অবিরাম চেষ্টা সর্ব্বপ্রযত্নে করিতে হইবে।

—

রামমোহন রায়ের কলিকাতা আগমনের বৎসর

রামমোহন রায় কোন্ বৎসর রংপুর হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করেন, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একখানি পুরাতন সংখ্যায় এ বিষয়ে কিছু প্রমাণ পাইয়াছেন। তাহাতে অন্য অনেক তথ্যও আছে। তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার একখানি মুদ্রিত বহিতে লিখিত হিসাব হইতেও কিছু তথ্য সংকলন করিয়াছেন। এই সমুদয় বিষয় সম্বলিত তাঁহার প্রবন্ধটি কিছু বিলম্বে প্রেসে আসায় এবার স্থানাভাবে মুদ্রিত হয় নাই, জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে মুদ্রিত হইবে।

—

সাহিত্য ও "পৌত্তলিকতা"

সাহিত্য শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইলে ধর্ম্মবিষয়ক তর্কবিতর্ক ও প্রশ্নোত্তর, পাটীগণিত, বীজগণিত, হিসাব-সম্বলিত রিপোর্টকেও সাহিত্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ সাহিত্য বলিতে নানাবিধ পদ্য ও গদ্য কাব্য গ্রন্থ প্রবন্ধ প্রভৃতি বুঝায়। মহাকাব্য, ছোট ছোট কবিতা, নানাবিধ নাট্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও প্রবন্ধসমষ্টি—এই সবই সাহিত্যের অন্তর্গত।

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মমতের সহিত সাহিত্যের কোনই সম্বন্ধ নাই, এমন নয়। কিন্তু যেহেতু অমুক জাতি বহুদেববাদী ও মূর্ত্তি-পূজক ছিল বা আছে, অতএব তাহাদের সাহিত্য নিকৃষ্ট ও অপাঠ্য, ইহা কেবল ধর্ম্মান্ধ অল্পবুদ্ধি সংস্কৃতিবিহীন লোকেরাই বলিতে পারে। প্রাচীন গ্রীক জাতি বহুদেববাদী ছিল, কিন্তু গ্রীক সাহিত্য অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আর কোন্ প্রাচীন জাতির ছিল? সভ্য জগতে খ্রীষ্টীয়েরা কি এখনও গ্রীক সাহিত্যকে উচ্চ স্থান দিয়া তাহা অধ্যয়ন করিতেছে না? "পৌত্তলিকতা" দোষে দুষ্ট হইবার ভয়ে কোন দেশের পুরাণ ও দেবদেবী-উপাখ্যানঘটিত কাব্য হইতে উপদেশ ও আনন্দলাভ [illegible]

হিন্দুধর্ম্মের সকল অংশই সাকারবাদ ও বহুদেববাদ নহে। সংস্কারক রামমোহন ও সংস্কারক দয়ানন্দ হিন্দুধর্ম্মের সেই রূপ-টিরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহা বহুদেব-বাদ ও সাকারবাদ নহে। আবার, সাকারবাদ ও বহুদেববাদ মাত্রকেই "পৌত্তলিকতা" বলাও যায় না। পরমাত্মার আরাধনায় যেমন কেহ রূপক ভাষার ব্যবহার করেন, তেমনই অন্য কেহ পরমাত্মার কোন স্বরূপকে মাটির, পাথরের, ধাতুর মূর্ত্তি দিতে পারেন। কিন্তু অর্থের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া শ্লোককে, মন্ত্রকে পূজা, ও মূর্ত্তিকে পূজা জ্ঞানী লোকেরা করেন না।

শয়তান মানা, স্বর্গদূত মানা, বিশেষ বিশেষ সাধু সাধ্বীর পূজা, বিশেষ বিশেষ স্থানের, সমাধির, প্রস্তরের, চিহ্নের পবিত্রতা মানা—এই সমস্তই এক প্রকার বহুদেববাদ ও "পৌত্তলিকতা"।

এবং সকলের চেয়ে অধম "পৌত্তলিকতা" ইন্দ্রিয়সুখের, বিলাসের, ধনমানের, ঐশ্বর্য্যের, ও পার্থিব শক্তির দাসত্ব।

—

নূতন বড়লাট ও সুভাষবাবুকে বন্দীকরণ

নূতন যে বড়লাট আসিতেছেন, তিনি উইলিংডনীয় নীতির পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ নূতন কোন নীতির অনুসরণ করিবেন, এরূপ আশা করি না। কিন্তু উইলিংডনীয় নীতির একটু পরিবর্ত্তনও তিনি করিবেন না, ইহাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না। তাঁহাকে নূতন ভারতশাসন আইনের গুণ লোককে বুঝাইতে হইবে। এই জন্য, কিছু পরিবর্ত্তন করিবার সুযোগ তাঁহাকে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু লর্ড উইলিংডন বড়লাট থাকিতে থাকিতেই সুভাষ বাবু পুনরায় স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হওয়ায় দমননীতির পরিবর্ত্তন করিবার সুযোগ সদ্য সদ্য লর্ড লিন-লিথগো ত পাইবেনই না, বরং তাঁহাকে প্রবল অসন্তোষ ও বিক্ষোভের মধ্যে রাজপ্রতিনিধিত্ব আরম্ভ করিতে হইবে। তাঁহাকে এইরূপ অসুবিধায় ফেলা কি উচিত হইল?

—

উড়িষ্যায় মন্ত্রীর অনিয়োগ ও বঙ্গে প্রাচুর্য্য

নূতনগঠিত উড়িষ্যা প্রদেশের আয়ের অল্পতা বশতঃ প্রথম বৎসর উহার গবর্ণর কোন মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন না। বঙ্গে কি বরাবর রাজকোষে প্রচুর টাকা ছিল বা এখনও আছে, যে, এত বেশীসংখ্যক মন্ত্রী ও শাসনপরিষদের সভ্য মোটা বেতনে পোষণ হইয়া আসিতেছে? বঙ্গদেশ কত দিকে পিছাইয়া রহিয়াছে ও পড়িতেছে, আর এই প্রকারে অনাবশ্যক কর্ম্মচারী পোষণে অপব্যয় করা হইতেছে। ডিভিজনাল কমিশনার পোষণও অনাবশ্যক। তাহাও অপব্যয়।

—

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীতে মহিলা কৌন্সিলর

বেগম সাকিনা ফারুক সুলতানা মুয়াইদজাদা, এম-এ, বি-এল, ব্যারিষ্টার, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কৌন্সিলর মনোনীত হইয়াছেন। তিনি

ইহার প্রথম মুসলমান মহিলা কৌন্সিলর। তাঁহার পিতা বহুপূর্ব্বে ইরান দেশে উৎপীড়িত হইয়া এদেশে আসেন এবং এখানে একটি সংবাদপত্র বাহির করিতেন। মহিলাটি সিবিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নূরন্নবীর পত্নী।

—

বঙ্গের তাঁতীদের উন্নতির চেষ্টা

বঙ্গে হাতের তাঁত আগে যত চলিত এখন তত চলে না, অনেক কম চলে। তথাপি এখনও বাঙালীরা বৎসরে যত কাপড় ব্যবহার করে তাহার এক-তৃতীয়াংশ বঙ্গের তাঁতীরা জোগায়। বাংলার তাঁতের ও তাঁতীদের উন্নতিকল্পে শ্রীযুক্ত ডাক্তার সর্ নীলরতন সরকার, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন, শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ প্রভৃতি একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। ঢাকেশ্বরী কটন মিল ও লক্ষ্মী কটন মিল হাতের তাঁতে ব্যবহার্য্য সূতা প্রস্তুত করে। বাঙালীদের অন্যান্য মিলও তাহা করিলে ও তাঁতীদিগকে জোগাইলে এবং বঙ্গে ভাল তুলা উৎপন্ন করিলে তাঁতীদের সুবিধা হয়, বঙ্গের অনেক টাকাও বঙ্গে থাকে। বঙ্গের অনেক স্থানে ভাল তুলা হইতে পারে।

—

আবিসীনিয়া, ইটালী ও প্রবল শক্তিপুঞ্জ

কংগ্রেসের সভাপতি ভারতবর্ষের লোকদের ও নিজের পক্ষ হইতে আবিসীনিয়ার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং আবিসীনীয় সম্রাটের ও জনগণের স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও শৌর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। সভাপতি মহাশয়ের কথায় ভারতীয়দের মনের ভাব ঠিক্ প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু আমাদের ত কোন ক্ষমতা নাই। পৃথিবীতে যে-সব জাতি প্রবলপরাক্রান্ত, তাহারা আবিসীনিয়ার সাহায্যার্থে কিছু করিল না—ফলে দেশটি উদ্ধত দস্যুজাতি ইটালীয়দের হস্তগত হইতেছে। তাহারা বিষাক্ত গ্যাসাদি ব্যবহার করিয়া হাবশীদিগকে ভীষণ যন্ত্রণা দিতেছে। বহু "সভ্য" জাতি কয়েক শতাব্দী ধরিয়া যে নৃশংস দস্যুতা করিয়া আসিতেছে, এখনও তাহার অবসান না হইয়া বরং বৃদ্ধি, মানবসমাজের শোচনীয় কলঙ্ক।

—

"মাতৃসদন"

যে-সকল প্রতিষ্ঠান অপহৃতা ও নিগৃহীতা নারীদের উদ্ধার-সাধনের ও তাহাদিগকে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার এবং দুর্বৃত্ত নারী-নির্য্যাতকদিগকে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করেন, "মাতৃসদন" তাহাদের অন্যতম। বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা-সমূহের মধ্যে মুদ্রিত ইহার একটি আবেদনপত্র পাঠকদিগকে পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। এই প্রতিষ্ঠান ভাল কাজ করেন। ইহার আরও বেশী সাহায্য পাওয়া উচিত।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসনীয় কার্য্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষার্থীদের ব্যবহারার্থ অনেক ভাষায় পুস্তক নির্ব্বাচন করিবেন, তজ্জন্য গ্রন্থকারদিগকে বাংলা হিন্দী উর্দু অসমিয়া প্রভৃতি ভাষায় ইতিহাস ভূগোল গণিত বিজ্ঞান সঙ্গীত চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি বিষয়ে বহি লিখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ব্বাচনার্থ পাঠাইতে আহ্বান করিয়াছেন। নিয়মাবলী এক টাকা ফীতে রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রাপ্তব্য।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের অধ্যক্ষতা ও পরিচালনায় চৈনিক ও তিব্বতীয় ভাষা ও সাহিত্যের কোন কোন বিভাগে অধ্যাপনা ও গবেষণার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় নূতন করিয়া করিয়াছেন।

—

ডাক্তার সর্ কেদারনাথ দাস

ডাক্তার সর্ কেদারনাথ দাস মহাশয়ের মৃত্যুতে দেশ একজন কৃতিপুরুষ, অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও প্রবীণ চিকিৎসক হারাইল। তিনি ভারতবর্ষে যেমন কৃতী ছিলেন, বিদেশেও সেইরূপ কৃতী হইয়াছিলেন। ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন, এবিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন,
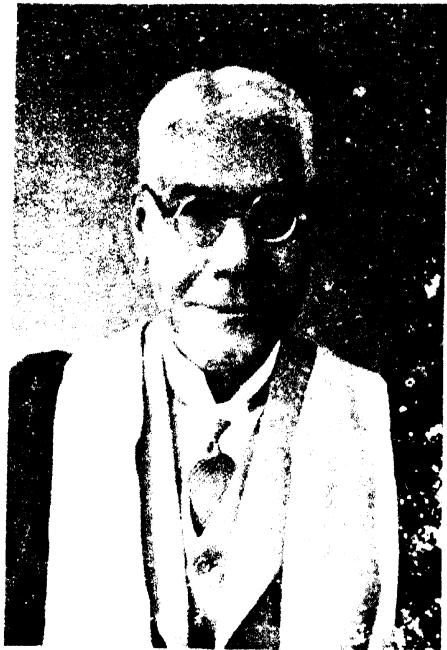
সর্ কেদারনাথ দাস

এবং প্রসূতিদের প্রসবকার্য্যে ব্যবহারের নিমিত্ত একটি [illegible] যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। বেলগাছিয়াস্থিত কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ রূপে তাঁহার নিপুণ শিক্ষকত্ব ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল।

ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস
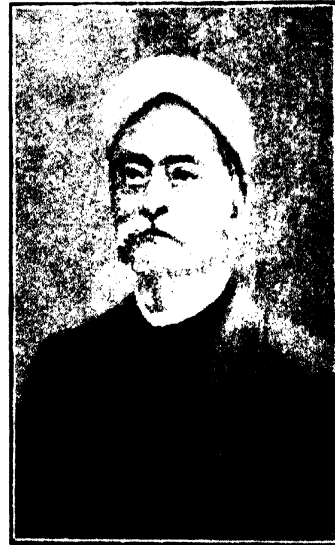
চণ্ডীচরণ লাহা

কল্পে "ললিতকুমারী দাতব্য চিকিৎসালয়" প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমস্ত চিকিৎসালয় সুদক্ষ পারদর্শী চিকিৎসকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে সুপরিচালিত হইয়া দৈনিক বহু রোগীর রোগযন্ত্রণা দূর করিতেছে। বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও তিনি প্রভূত দান করিয়া গিয়াছেন।"

ভারতবর্ষ

প্রবাসী বাঙালী যুবকের কৃতিত্ব

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এন কে ঘটক মহাশয় কয়েকটি গাছ-গাছড়ার ঔষধ হিসাবে মূল্য সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া রসায়নীবিদ্যায় ডি-এসসি উপাধি পাইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি কলিকাতা আলিপুরের সরকারী পরীক্ষণশালায় সহকারী গবেষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রী[illegible] নাগ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এসসি পরীক্ষায় পদার্থ-বিজ্ঞানে প্রথম হইয়া [illegible] পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ইনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী-সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক [illegible] উপেন্দ্রচন্দ্র নাগ মহাশয়ের পুত্র ও [illegible] চৌধুরী মহাশয়ের দৌহিত্র।

বিহারে প্রবাসী বাঙালী সাহিত্যিকদের জীবনী-সংগ্রহ

[illegible] বাঁকীপুর, (পাটনা) এই ঠিকানায় [illegible]

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৬শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

২য় সংখ্যা

"বসেছি অপরাহ্নে পারের খেয়াঘাটে"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বসেছি অপরাহ্নে পারের খেয়াঘাটে
শেষ ধাপের কাছটাতে।
কালো জল নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে পা ডুবিয়ে দিয়ে।
জীবনের পরিত্যক্ত ভোজের ক্ষেত্র পড়ে আছে পিছন দিকে
অনেক দিনের ছড়ানো উচ্ছিষ্ট নিয়ে।
মনে পড়ছে ভোগের আয়োজনে
ফাঁক পড়েছে বারম্বার।
কতদিন যখন মূল্য ছিল হাতে
হাট জমে নি তখনো,
বোঝাই নৌকো লাগল যখন ডাঙায়
তখন ঘণ্টা গিয়েছে বেজে,
ফুরিয়েছে বেচাকেনার প্রহর।

অকাল বসন্তে জেগেছিল ভোরের কোকিল;
সেদিন তার চড়িয়েছি সেতারে,
গানে বসিয়েছি সুর।
যাকে শোনাব তার চুল যখন হ'ল বাঁধা,

বুকে উঠল ফিরোজা রঙের আঁচল
তখন ঝিকিমিকি বেলা.
করুণ ক্লান্তি লেগেছে মূলতানে।
ক্রমে ধূসর আলোর উপরে কালো মর্‌চে পড়ে এল।
থেমে-যাওয়া গানখানি নিভে-যাওয়া প্রদীপের ভেলার মতো
ডুবল বুঝি কোন্ এক জনের মনের তলায়
উঠল বুঝি তার দীর্ঘনিশ্বাস,
কিন্তু জ্বালানো হ'ল না আলো ॥

এ নিয়ে আজ নালিশ নেই আমার।
বিরহের কালো গুহা ক্ষুধিত গহ্বর থেকে
ঢেলে দিয়েছে ক্ষুভিত সুরের ঝরণা রাত্রিদিন।
সাত রঙের ছটা খেলেছে তার নাচের উড়নিতে
সারাদিনের সূর্য্যালোকে,
নিশীথরাত্রের জপমন্ত্র ছন্দ পেয়েছে
তার তিমিরপুঞ্জ কলোচ্ছল ধারায়।
আমার তপ্ত মধ্যাহ্নের শূন্যতা থেকে উচ্ছ্বসিত
গৌড়-সারঙের আলাপ।
আজ বঞ্চিত জীবনকে বলি সার্থক
নিঃশেষ হয়ে এল তার দুঃখের সঞ্চয়
মৃত্যুর অর্ঘ্যপাত্রে
তার দক্ষিণা রয়ে গেল কালের বেদীপ্রান্তে।

জীবনের পথে মানুষ যাত্রা করে
নিজেকে খুঁজে পাবার জন্যে।
গান যে মানুষ গায়, দিয়েছে সে ধরা, আমার অন্তরে।
যে মানুষ দেয় প্রাণ, দেখা মেলে নি তার।
দেখেছি শুধু আপনার নিভৃত রূপ
ছায়ায় পরিকীর্ণ,
যেন পাহাড়তলীতে একখানা অস্তরঙ্গ সরোবর।

তীরের গাছ থেকে
সেখানে বসন্ত-শেষের ফুল পড়ে ঝরে,
ছেলেরা ভাসায় খেলার নৌকো
কলস ভরে নেয় তরুণীরা
বুদ্বুদ-ফেনিল গর্গরধ্বনিতে।

নববর্ষার গম্ভীর বিরাট শ্যামমহিমা
তার বক্ষতলে পায় লীলাচঞ্চল দোসরটিকে।

কালবৈশাখী হঠাৎ মারে পাখার ঝাপট,
স্থির জলে আনে অশান্তির উন্মন্থন,
অধৈর্যের আঘাত হানে তটবেষ্টনের স্থাবরতায়,
হঠাৎ বুঝি তার মনে হয় গিরিশিখরের পাগলাঝোরা পোষ মেনেছে
গিরিপদতলের বোবা জলরাশিতে।
বন্দী ভুলেছে আপনার উদ্বেলকে উদ্দামকে।

পাথর ডিঙিয়ে আপন সীমানা চূর্ণ করতে করতে নিরুদ্দেশের পথে
অজানার সংঘাতে বাঁকে বাঁকে
গর্জিত করল না আপন অবরুদ্ধ বাণী,
আবর্তে আবর্তে উৎক্ষিপ্ত করল না
অন্তর্গূঢ়কে।

মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।

দুর্গম ভাষণের ওপারে
অন্ধকারে অপেক্ষা করছে জ্ঞানের বরদাত্রী।
মানবের অভ্রভেদী বন্ধনশালা
তুলেছে কালো পাথরে গাঁথা উদ্ধত চূড়া
সূর্যোদয়ের পথে;

বহু শতাব্দীর বাথিত ক্ষত মুষ্টি
রক্তলাঞ্ছিত বিদ্রোহের ছাপ
লেপে দিয়ে যায় তার দ্বারফলকে;

ইতিহাস-বিধাতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ

দৈত্যের লৌহ-দুর্গে প্রচ্ছন্ন :

আকাশে দেবসেনাপতির কণ্ঠ শোনা যায়—

এস মৃত্যুবিজয়ী।

বাজল ভেরী,

তবু জাগল না রণদুর্ম্মদ

এই নিরাপদ নিশ্চেষ্ট জীবনে :

ব্যূহ ভেদ ক'রে

স্থান নিই নি যুধ্যমান দেবলোকের সংগ্রাম-সহকারিতায়।

কেবল স্বপ্নে শুনেছি ডমরুর গুরুগুরু,

কেবল সমর-যাত্রীর পদপাতকম্পন

মিলেছে হৃৎস্পন্দনে বাহিরের পথ থেকে।

যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে,

সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়জ্যোতি

ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায়।

শুধু রেখে গেলেম নত মস্তকের প্রণাম

মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে,

মর্ত্যের অমরাবতী যাঁর সৃষ্টি

মৃত্যুর মূল্যে দুঃখের দীপ্তিতে।

১লা বৈশাখ

১৩৪৩
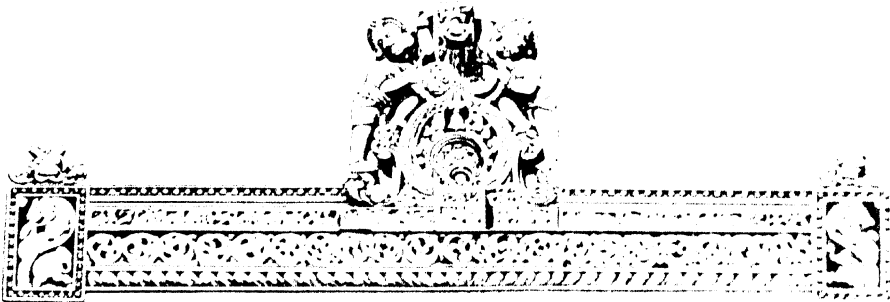
জন্মদিন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বয়স যখন অল্প ছিল তখন জন্মদিনের অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল অবিমিশ্র আনন্দের আস্বাদন। জন্মগ্রহণ ক'রে পৃথিবীতে এসেছি, সেদিন এইটুকু মাত্রই ছিল উৎসবের বিষয়। তখনকার দিনের অভিনন্দনে আমার প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির বিচার ছিল না। আত্মীয়-পরিজনেরা জন্মোৎসবে তেমনি করেই আমার অভ্যর্থনা করেছেন পৃথিবী যেমন তার ফুলফল, আলোবাতাস, নদীনির্ঝর নীলাকাশ সব নিয়ে নবজাত শিশুকে আমন্ত্রণ করেছিল। জীবনের প্রথম বিকাশের মূল্য সমস্ত জগৎ দিয়েছে নির্বিচারে। গাছে ফুল ফুটলে, আকাশে তারা উঠলে যে আনন্দ জন্মদিনের উৎসবে সেই আনন্দকে ঘোষণা করাই প্রকৃত অভিনন্দন। ধরণীর ধুলোর ঘরে যেমনি কেউ খেলতে আসে অমনি খেলাঘর সার্থক হয়। সেই হেতুই, তার কাছে বিশ্ব আর কোনো খাজনা দাবী করে না। অভ্যাগত অসঙ্কোচে আপন বরণের আসন দখল ক'রে বসে।

তাই বলছি সংসারে যখন অখ্যাত ছিলাম তখন বিশ্বে আগমনের অহেতুক মূল্য পেয়েছি। ক্রমে ক্রমে আত্মীয়-মণ্ডলীর সীমা অতিক্রম ক'রে এসে পড়েছি জনসাধারণের মধ্যে। সেই প্রশস্ত পরিধির মধ্যে আজ আমার জন্মদিন বহুকাল ধ'রে যথেষ্ট মূল্য দিয়ে তবে আপন আসন পেয়েছে। বহু লোকের হাত দিয়ে যাচাই হয়েছে তার অধিকার। কেননা আত্মীয়-ঘরের জন্মদিনে বিধাতার অযাচিত দান আলোর মত বাতাসের মত সকল জাতকের পক্ষেই সমান। কিন্তু সেখানকার আসনকে ঘরের সীমা পেরিয়ে বাইরে বিস্তার করতে গেলেই পাসপোর্ট দেখাতে হয়। এ নিয়ে গৌরব করতে গেলে মনে সংশয় জাগে যে এই পাসপোর্টের মেয়াদ কত দিনের তা কে বলতে পারে। আজকের দিনের সমর্থন যত সংখ্যক মানুষের শিলমোহরের ছাপ পাক না, কাল সেটা চলবে কি না কি ক'রে বলব? বহু দীর্ঘকালে জনসংখ্যার গণনা ব্যাপ্ত ক'রে নিয়ে তবে দলিল পাকা হয়।

যাঁরা আমার গান শুনেছেন, তাঁরা মনে করেছেন যে হয়তো আমি কিছু আলো জ্বালিয়ে যেতে পেরেছি এই অন্ধকারে, তাঁদের পক্ষে আজকের দিন প্রাপ্তি-স্বীকারের দিন। যিনি আমায় এই বিশ্বের মধ্যে স্থান দিয়েছেন তিনি প্রসন্ন হয়েছেন কি না জানি না, কিন্তু আমি প্রসাদ পেয়েছি।

আরও একটা কারণে আজকের দিনের জয়ন্তী উৎসবের সকল অংশই নির্বিচারে গ্রহণ করতে মন কুণ্ঠিত হয়। যে জিনিসটি সাজাবার জন্যে বহু লোক মিলে যোগ দেয় তার সাজানোর উৎসাহটা সাজানোর উপলক্ষ্যকে ছাপিয়ে যায়। রচনার সমারোহে রচনাকর্তা গৌরব বোধ করতে থাকে। সেই গৌরবের অনেকখানিই এই নাট্যের নায়কের প্রাপ্য নয়। বারোয়ারির সমারোহে আয়তনবৃদ্ধির অহঙ্কার বিস্তর অবান্তরের কাঠখড় আত্মসাৎ ক'রে স্ফীত হয় সবটাই তার মূল্যবান নয়। অহঙ্কারের মোহে একথা ভুলতে ইচ্ছা করে না। যদি ভুলি তবে আপন বুদ্ধির প্রতি অবিচার করা হয়। বহু জনের দত্ত সম্মানে যে অপরিমিতি থাকে তার প্রতি যেন অসাবধানে লোভ না থাকে এই আমি কামনা করি, যেন নিশ্চিত জানি যে, মাপজোখের বেহিসাবে উচ্চতার গৌরব নয় এবং আতিশয্যের দ্বারা বর্তমানের কণ্ঠধ্বনি সব ভাবী কালের কণ্ঠস্বর পরিমাপক না হ'তেও পারে।

কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য ক'রে জনসাধারণ আপন খেলা করবার বড় মাপের খেলনা পেলে খুশী হয়। তাকে প্রতিমার মত দালানে তুলে কখনো সাজায়, বর্জিত করে, কখনো ভাঙে, জলে ফেলে দেয়। যে কোনো কারণে লোক এই সার্বজনিক খেলায় যাকে ব্যবহার করার সুবিধে ঘটে তাকে কেউ ভালবাসে কেউ বাসে না তবু বহু লোকে মিলে কোমর বেঁধে গলা ভাঙাভাঙির মধ্যে যে মাদকতা আছে সেটা উপভোগ্য।

যত দিন কৃতকর্ম্মের হিসাবে জমাখরচের অঙ্ক সর্ব্বজনের চোখের সামনে বেড়ে চলেছিল, যত দিন এই যশের কারবারেই জীবন আপনার সব চেয়ে বড় মূল্য আদায় করতে উৎসুক ছিল, তত দিন সাধারণের পুতুলখেলার উপকরণ জুগিয়ে এসেছি। কিন্তু পূর্ব্বাহ্ণ এবং অপরাহ্ণে সংসারযাত্রা বিভক্ত। জীবনের পালা বদল হয়, দৃশ্য পরিবর্ত্তন ঘটে। গানে সুরের বিস্তার শেষে এসে স্তব্ধ হয়—সেই স্তব্ধতায় তার সমগ্র হয় কেন্দ্রীভূত। জীবনেও তাই। বাহিরের ব্যাপ্তিতে তার অভিব্যক্তি, অন্তরের পরিসমাপ্তিতে তার চরম ব্যঞ্জনা। দিনাবসানের বেলায় আপনার মধ্যে সেই প্রতিসংহরণকে বাধা দিয়ে আমরা জীবলীলাকে নিরর্থক করি। আজ আয়ুর অপরাহ্ণে এই কথা বার-বার মনে আসে।

কিন্তু জীবনের পূর্ব্বাভাসের একটা অহঙ্কার আছে। সেইদিনকার উদ্যমের গতি, লাভের সঞ্চয় যা তখনকার মধ্যেই সার্থক, এখনও তাকে টেনে নিয়ে চললে যে তার পূর্ণতায় বাধা দেওয়া হয় একথা মন মানতে চায় না। রাশ যথাসাধ্য ছেড়ে দেওয়া এবং যথাসম্ভব বাগিয়ে নেওয়াতেই লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়। এই লক্ষ্য বলতে বিশেষ কোনো একটা কর্ম্মের লক্ষ্য বোঝায় না, সমগ্র জীবনের লক্ষ্য বুঝতে হবে। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত রাজত্ব করাটাকেই রাজা মনে করতে পারে তার পরিপূর্ণতা, কিন্তু রাজত্ব মনুষ্যত্বের একটা অঙ্গমাত্র, সমগ্র মনুষ্যত্ব নয়। যথাসময় রাজ্য পরিত্যাগ করাতেই মনুষ্যত্বের পর্য্যাপ্তি। শেষ পর্য্যন্ত রাজ্য আঁকড়ে থাকাতেই আপনাকে খর্ব্ব করা হয়। রাজা যতটুকু, মানুষ তার চেয়ে অনেক বড়। গাছ ফল ফলায় কিন্তু ফল মোচন করাই তার সব শেষের কাজ। যদি না পারত তবে ফলের ভার তার ঐশ্বর্য্য হ'ত না, হ'ত তার বিষম বোঝা। গীতা এই জন্যেই বলেছেন, ফল সম্বন্ধে নির্ম্মম হওয়া চাই, কেননা ফলের শেষ সার্থকতা ত্যাগে।

খ্যাতির কলরবমুখর প্রাঙ্গণে আমার জন্মদিনের যে আসন পাতা হয়েছে সেখানে স্থান নিতে আমার মন যায় না। আজ আমার প্রয়োজন স্তব্ধতায় শান্তিতে। দীর্ঘকাল সংসারের সেবা আমি ক'রে এসেছি। সে সেবা জনতার মধ্যে। সব সময়ে তাতে সিদ্ধিলাভ করি নি, তা নাই হ'ল, যে মনিবের কাছে ফলের দামের চেয়ে ফলাবার চেষ্টার দাম কম নয় তিনি আমাকে কিছু পুরস্কার দেবেন লোকচক্ষুর অন্তরালে, তার বেশী আর আমি চাই নে। সংসারে যা পাওয়া যায় তা অনেক ফিরিয়ে দিতে হয়, কেননা সে পাওনা থাকে বাইরের থলিতে, কিন্তু যে পাওনা ভিতরে, সংসারের জরিমানা সেখানে পৌঁছয় না। আজ ফুলের ঋতু যাক, ফলের ঋতুও শেষ হোক, আজ নির্ব্বিশেষে আপনাকে আপনার মধ্যে পূর্ণ ক'রে তোলবার দিন। লোকমুখের বাক্যনিঃশ্বাসে আর যেন দোলা খেতে না হয় এই আমার জন্মদিনের শেষ কথা।

সকল মলিনতা ভেদ ক'রে, ফলের জীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে, অবান্তরের লোভ উত্তীর্ণ হয়ে যা প্রকাশ পায় তা ধন নয়, মান নয়, তা নবজীবনের প্রভাত-আলোক। আমার মধ্যে আমার সৃষ্টিকর্তার আনন্দ এই ব'লেই জেগে উঠুক যে জীবনের পরিসমাপ্তি হয়েছে উদয়-দিগন্তের নবালোকের ইঙ্গিতে। শেষ পর্য্যন্ত তা আঁকড়ে থাকে নি বস্তুভারপুঞ্জিত মাটির সম্বলকে।

এখন এই জনতার সম্বলকে অতিক্রম ক'রে জীবনকে নিয়ে যেতে হবে সেই পরিণতির দিকে যা হ'লে অন্তরে অন্তরে সেই আনন্দ জেগে উঠবে যা বিশ্বব্যাপী আনন্দের সঙ্গে যোগযুক্ত। আজকের বন্ধুদের কাছে আমার এই নিবেদন যে তাঁরা নূতন কিছু আমার কাছে দাবী করবেন না, মনে রাখবেন জীবনের পরিণত রূপ কেবল একটি দান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতার বাঙালী সমাজ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

কলিকাতা ভারতবর্ষে ইংরেজের রাজধানী ছিল, এখন আর নাই। তবু বর্ত্তমান ভারতের ইতিহাসে উহার নাম চিরকাল স্থায়ী হইয়া থাকিবে। কলিকাতা হইতে শুধু যে ইংরেজ-শাসনই ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহাই নয়,—এদেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রসারের কেন্দ্রও কলিকাতাই। কলিকাতা হইতে ও কলিকাতায় শিক্ষিত বাঙালীর দ্বারা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ইংরেজী শিক্ষা, আচার-ব্যবহার ও চিন্তাধারা প্রচারিত হইয়াছে। এখানেই নূতন যুগের প্রবর্ত্তক চাকুরী ও ব্যবসায়জীবী ইংরেজী-শিক্ষিত নূতন ভদ্রসম্প্রদায়েরও উদ্ভব হয়। সুতরাং ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে কলিকাতার নাম ও স্থান লোপ পাইবার সম্ভাবনা নাই।

১৬৯০ সনে জব চার্ণক কলিকাতা স্থাপন করেন। কিন্তু তখন হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত এক ইংরেজের কুঠি বলিয়াই এদেশে উহার পরিচয় ছিল। বাঙালী সমাজে কলিকাতার বিশিষ্টতা অনুভূত হইতে আরম্ভ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ইংরেজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে। তাহার পর হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে ও কলিকাতা একটি নূতন ধরণের সমাজ ও নূতন ধরণের আচার-ব্যবহারের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। এই সমাজ ও আচার-ব্যবহারের একটু পরিচয় দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এখানে একটি কথা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। ইংরেজ-সৃষ্ট কলিকাতা ও ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর কথা বলিলেই আমাদের হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের কথা মনে পড়ে। যাহাদের কথা মধুসূদন, রাজনারায়ণ বসু ও রামতনু লাহিড়ীর জীবন-কাহিনীতে অমর হইয়া রহিয়াছে, ডিরোজিও ও রিচার্ডসনের ইংরেজী কাব্য অধ্যাপনা, ও তাহাদের শিষ্যদের ইংরেজী ভাষা, শেক্সপীয়র ও মিল্টন, সঙ্গে সঙ্গে নাস্তিকতা, বিলাতী মদ্য ও নিষিদ্ধ মাংসের প্রতি প্রীতির কথা। কিন্তু এই প্রবন্ধে যে-কলিকাতার বর্ণনা দেওয়া হইবে তাহা এই যুগের পূর্ব্বেকার কলিকাতা। সে-যুগেও কলিকাতার বাঙালী সমাজে ইংরেজী রীতি-নীতির প্রভাব লক্ষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে সত্য, তবু তাহাতে হিন্দু-কলেজের যুগের উচ্চশিক্ষা, আদর্শপরায়ণতা ও রুচির সূক্ষ্মতা ছিল না। পরবর্ত্তী যুগের তুলনায় উহা স্থূল, অমার্জ্জিত, অশিক্ষিত ছিল। এ যেন বিলাতে শিক্ষিত ব্যারিষ্টার পুত্রের দোকানদার-পিতা। দোকানদার-পিতার অর্থের দ্বারাই ব্যারিষ্টার পুত্রের উন্নত জীবন, শিক্ষা ও কাল্‌চার সম্ভব হইলেও সে যেমন পিতৃ-পরিচয়ে একটু লজ্জা অনুভব না-করিয়া থাকিতে পারে না, আমাদের অনেকের নিকটও ইংরেজ-শাসন-সৃষ্ট কলিকাতার প্রথম বাঙালী সমাজ তেমনই একটু সঙ্কোচের বিষয় বলিয়া মনে হইতে পারে।

কিন্তু সে আজিকার কথা। তখনকার দিনের কলিকাতাবাসীর নিজেদের সম্বন্ধে অভিমান ও অহঙ্কার যথেষ্ট ছিল। কলিকাতার সমাজ যে শিক্ষায় দীক্ষায় ও আচার-ব্যবহারে বাংলা দেশের অন্য জায়গা হইতে স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ এ বিষয়ে তাহাদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। এজন্য সে-যুগের এক জন বিখ্যাত কলিকাতাবাসী পল্লীবাসী ও বাংলা দেশের অন্যান্য শহরবাসী লোকদিগকে কলিকাতার রীতিনীতি শিক্ষা দিবার জন্য একটি পুস্তক প্রণয়ন আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীচরণকে প্রথম বাংলা সংবাদপত্রসেবীদের প্রধান বলা চলে। তিনি ১৮২৩ সনে 'কলিকাতা কমলালয়' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন। এই বইখানির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি ভূমিকায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেই সে-যুগের কলিকাতাবাসীর আত্মাভিমান ও তাহার নিকট পল্লীবাসীর সঙ্কোচপূর্ণ নম্রতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। ভবানীচরণ লিখিয়াছেন—

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং

।। কলিকাতা কমলালয় ।।

কলিকাতার সাগরের সহিত সাদৃশ্য আছে তৎপ্রযুক্ত কলিকাতা কমলালয় নাম স্থির হইল, কমলা লক্ষ্মী তাঁহার আলয় এই অর্থ দ্বারা কমলালয় শব্দে যেমন সমুদ্রের উপস্থিতি হইতেছে তেমন কলিকাতার উপস্থিতি ও হইতে পারে অতএব কলিকাতা কমলালয় শব্দের যোগার্থ রহিল।

অথ সাগরের বিবরণ।

সাগরে অপেয় অগাধ জল, বর্ষাকালে তজ্জল নির্গত হইয়া দেশ বিদেশ যাইতেছে ও নানা নদীর সমাগম সাগরে হইতেছে এবং সাগর নানা বিধ রত্নের আরক হইয়াছেন ও দেবাসুর

[১২৩০ সনে মুদ্রিত 'কলিকাতা কমলালয়' পুস্তকের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি]

পল্লিগ্রাম নিবাসী ও অন্যান্য নগরবাসী লোক সকল এই কলিকাতায় আসিয়া এখানকার আচার বিচার ব্যবহার রীতি ও বাক্‌কৌশলাদি অবগত হইতে আশু অসমর্থ হয়েন তৎপ্রযুক্ত লজ্জাযুক্ত হইয়া এতন্নগরবাসি লোকেরদিগের নিকট গমনাগমন করেন এবং সভ্য ভব্য হইয়াও তাঁহারদিগের নিকটে অসভ্য ও অভব্যপ্রায় বসিয়া থাকেন কারণ যখন নগরবাসী বহুজন একত্র হইয়া প্রশ্নোত্তরভাবে পরস্পর কথোপকথন করেন তৎকালে পল্লিগ্রাম নিবাসি ব্যক্তি কোন সদুত্তর করিলেও নগরস্থ মহাশয়রা তাহা গ্রহণ না করিয়া কহেন তুমি পল্লিগ্রাম নিবাসী অর্থাৎ পাড়াগেঁয়ে মানুষ অত্যল্প দিবস কলিকাতায় আসিয়াছ এখানকার রীতিজ্ঞ নহ, তোমার একথায় প্রয়োজন নাস্তি এ উত্তরে নিরুত্তর হইয়া ঐ ব্যক্তি দুঃখিত হয়েন অতএব এই কলিকাতা মহানগরের বৃত্তান্ত বিবরণ করিয়া কলিকাতা কমলালয় নামক গ্রন্থকরণে প্রবর্ত্ত হইলাম এতদ্‌গ্রন্থ পাঠে ও শ্রবণে অনায়াসে এখানকার ব্যবহার ও রীতি ও বাক্‌চাতুরী ইত্যাদি প্রায় জ্ঞাত হইতে পারিবেন,...। (পৃ. ১২)

অবশ্য পল্লীবাসীরাও যে বিনাবাক্যব্যয়ে কলিকাতাবাসীদের এই অহঙ্কার মানিয়া লইত তাহা নহে। কিছু ঈর্ষার জন্য, কিছু রীতি-নীতির বৈষম্যের জন্যও বটে, তাহারাও কলিকাতার আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বহু নিন্দাবাদ প্রচার করিত। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অপবাদেরও কিছু কিছু আভাস দিয়াছেন। 'কলিকাতা কমলালয়' ও তাঁহার রচিত অন্য পুস্তক হইতে জানা যায়, পল্লীবাসীরা কলিকাতার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ এই ধরণের অভিযোগ করিত,—

(১) কলিকাতার ধনী ব্যক্তির কেহই [illegible] নিম্নখী বড়মানুষ নয়। "বস্তু ধন্য ধার্ম্মিক ধর্ম্মাবতার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দুষ্টনিবারক সৎ প্রজাপালক সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থ করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগরে...বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া [illegible] চৌকার পটকার মঠকার [illegible] হইয়া কিম্বা [illegible] কাঠের খাটের [illegible] মাটির ইটের [illegible] চৌকিদারী [illegible] পোদ্দারী করিয়া অথবা [illegible] মিথ্যাবচন পরকীয় [illegible] [illegible] তৎপর [illegible] কিম্বা পৌরোহিত্য [illegible] পুত্রপৌত্রাদি [illegible] কিঞ্চিৎ অর্থ [illegible] করিয়া কোম্পানির [illegible] কিম্বা [illegible] দিবসাবসানে অধিকতর ধনী হইয়াছেন...। (নববাবুবিলাস, পৃ. ৪)

(২) কলিকাতার লোকের আচারভ্রষ্ট হইয়াছে। এখানকার অধিক লোক কর্ম্মকাণ্ড ও সন্ধ্যাবন্দনাদি পরিত্যাগ করিয়াছে এবং [illegible] ও পরিচ্ছেদেরও বিবেচনা নাই [illegible] করেন।" যেমন "যখন পিতামাতার পরলোকপ্রাপ্তি হয় তখন অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াকে [illegible] কষ্ট বোধ করিয়া প্রতিনিধি [illegible] করিয়া তর্পণ করিয়া থাকেন সেই সময় এক অঞ্জলি জল [illegible] করিয়া প্রদান করেন অর্থাৎ একেবারেই [illegible] পুস্তক [illegible] উদ্‌যাপন করিয়া আইসেন এবং [illegible] কেবল [illegible] মাত্র করেন কেহ কেবল মস্তকের [illegible] রাখিয়া [illegible] অনুরোধে দাড়ির ক্ষৌর করান, আর [illegible] মহাশয়ের [illegible] শুদ্ধাচারের কেবল [illegible] করেন অন্য সময়ে কাহার বাজারের [illegible] মিঠাই মুসলমানের [illegible] ইত্যাদি [illegible] ভোজন করেন পরিচ্ছদ অর্থাৎ পোষাক ধুতি প্রভৃতি [illegible] করিয়া ইজার জামা জোড়া ইত্যাদি পরেন। (ক. ক., পৃ. [illegible]) এমন কি কলিকাতায় [illegible] বলিত "[illegible] ছাড়িলেন, [illegible] গীত গতন্য [illegible] যাহা।" (পৃ. [illegible])

(৩) কলিকাতাবাসীরা "শাস্ত্রের অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া কেবল পার্সী ও ইংরাজী পড়েন বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে জানেন না এবং বাঙ্গালা শাস্ত্র হেয় জ্ঞান করিয়া শিক্ষা করেন না" (পৃ ২০-২১)। তাহার উপর "স্বজাতীয় ভাষায় অন্য জাতীয় ভাষা মিশ্রিত করিয়া কহিয়া থাকেন যথা কম, কবুল, কমবেশ, কয়লা, কর্জ্জ, কষাকসি, কাজিয় ইত্যাদি ক কার অবধি ক্ষ কার পর্য্যন্ত, ইহাতে বোধ হয় সংস্কৃত শাস্ত্র ইঁহারা পড়েন নাই এবং পণ্ডিতের সহিত আলাপও করেন নাই তাহা হইলে এতাদৃশ বাক্য ব্যবহার করিতেন না" (পৃ. ২৪-২৫)।

৪) কলিকাতার লোকেরা সন্তানদের শিক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ও অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা ও ব্যয় করেন না। "কলিকাতার অনেক ভাগ্যবান লোক আপন সন্তানদিগের অপূর্ব্ব আভরণ ও বস্ত্রাদি দেন আর বিবাহাদি কর্ম্মে কেহ এক লক্ষ কেহ দুই তিন চারি পাঁচ লক্ষও হইবেক অত্যানন্দে ব্যয় করিয়া থাকেন কিন্তু শুনিতে পাই আপন সন্তানদিগের বিদ্যাবিষয়ে মনোযোগের অত্যন্ত অল্পতা যেহেতু স্বজাতীয় ভাষা ও অক্ষর শিক্ষার্থে একজন ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন লোককে কিঞ্চিৎ অধিক বেতন দিয়া না রাখিয়া হ্রস্ব দীর্ঘ ইত্যাদি বিবেচনাশূন্য কেবল অল্প শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্ন লোককে কিঞ্চিৎ বেতন প্রদানে রাখিয়া তাহারই শিক্ষা করান...।" (ক ক পৃ. ৬--৫৫)

শুধু তাই নয়, এই শিক্ষকেরাও আবার বালকদিগকে শাসন করিতে "কর্ত্তা মহাশয় রুষ্ট হইয়া কহেন শুন সরকার তুমি বাবুদিগের শরীরে কদাচ বেত্রাঘাতাদি করিবে না আর ভয়জনক উচ্চ ভাষাও কহিবে না সকল ক্ষুদ্র লোকের সন্তানদিগকে মারিয়া থাক, নম্র অনম্র বিনয় বাক্যেতে তুষ্ট রাখিয়া লেখাপড়া শিক্ষাইবা তুমি বড় বেল্লিক [illegible] কিছুই নীতিজ্ঞান নাই ভাগ্যবান লোকের সন্তানদিগকে বাবু বলিতে হয় সকল যেহ বাক্যে তুষ্টিতে হয় তবে তাহার স্বেচ্ছাতে লেখাপড়া অভ্যাস করে নতুবা মারপিট করিলে মেজাজ খারাপ হয়।" (নববাবুবিলাস, পৃ ৮।)

কলিকাতাবাসীর পক্ষ হইতে ভবানীচরণই এই সকল নিন্দার উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার আভাস কলিকাতার রীতি-নীতির আলোচনার সময়ে দিব। কিন্তু উহার পূর্ব্বে কলিকাতার বাঙালী সমাজের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

২

কলিকাতার মধ্যবিত্ত ও ধনী বাঙালী-সম্প্রদায় ইংরেজ-শাসনের সৃষ্টি। সেজন্য দেখিতে পাই উহার অধিকাংশই মুখ্য ও গৌণ ভাবে এবং উচ্চনীচ নানা পদে বিলাতী সওদাগরি কোম্পানী বা সরকারী আপিসের সহিত যুক্ত। তবে এখন যেমন ধনী বাঙালী মাত্রেরই জমিদার বনিয়া যাইবার একটা ধারা আছে, তখনও সেরূপ ধারা ছিল। তাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও শুধু জমিদারির উপস্বত্বভোগী বা ব্যাঙ্কে সঞ্চিত টাকার সুদভোগী কর্ম্মহীন বাবু কলিকাতায় অনেক ছিলেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অবশ্য ইংরেজী হৌস ও রাজপুরুষের ভৃত্য ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সন্তান-সন্ততিদের আর চাকুরী করিবার আবশ্যক ছিল না। কলিকাতার বাঙালী সমাজের শীর্ষস্থানীয় এই বাবুদের পরিচয় ভবানীচরণ এইরূপ দিয়াছেন :—

এক্ষণে অসাধারণ ভাগ্যবান্ লোকের রীতি শুনহ, ভগবানের কৃপাতে যাহারদিগের প্রচুরতর ধন আছে সেই ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইতে কাহার বা জমীদারির উপস্বত্ব হইতে আবশ্য ব্যয় হইয়াও উদ্বৃত্ত হয় তাঁহারা প্রায় আপন আলয়ে থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে সন্ধ্যা বন্দনাদিপূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে ভোজন করিয়া প্রায় অনেকেই নিদ্রা যান চারি বা ছয় দণ্ড বেলা সত্ত্বে আপন বিষয় দৃষ্টি করেন কেহবা পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া থাকেন। (ক. ক. পৃ. ১৭-১৮)

ইঁহাদের পরই "কর্ম্মকারী বিষয়ী" ভদ্রলোকের স্থান। ইঁহারা আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন—(১) "যাঁহারা প্রধান প্রধান কর্ম্ম অর্থাৎ দেওয়ানি বা মুৎসুদ্দিগিরি কর্ম্ম করিয়া থাকেন"; (২) "মধ্যবিত্ত লোক অর্থাৎ যাঁহারা ধনাঢ্য নহেন কেবল অন্নযোগে আছেন"; (৩) "দরিদ্র অথচ ভদ্র লোক।"

প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিরা "প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া মুখ প্রক্ষালনাদি পূর্ব্বক বহুবিধ লোকের সহিত আলাপ করিয়া পরে তৈল মর্দ্দন করিয়া থাকেন নানাপ্রকার তৈল যাহার যাহাতে সুখানুভব হয় তিনি তাহাই মর্দ্দন করিয়া স্নানাদি সমাপনানন্তর পূজাহোমাদি বলিবৈশ্ব প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া ভোজন করেন কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিয়া অপূর্ব্ব পোষাক জামাযোড়া ইত্যাদি পরিধান করিয়া পালকী বা অপূর্ব্ব শকটারোহণে কর্ম্মস্থানে গমন করেন কর্ম্মানুসারি কাল বিবেচনা পূর্ব্বক তৎস্থানে থাকিয়া গৃহে আগত হইয়া যেসকল বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালনানন্তর গঙ্গাজলস্পর্শে পবিত্র হইয়া সায়ংসন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া জলযোগানন্তর পুনর্ব্বার বৈঠক হয়, পরে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে, কেহ কোন কার্য্যোপলক্ষে কেহবা কেবল সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আইসেন অথবা তিনি কখন কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন ইত্যাদি।" (ক ক. পৃ. ১৫-১৬)

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের "প্রায় ঐ রীতি কেবল স্নান বৈঠকি আলাপের অল্পতা আর পরিশ্রমের বাহুল্য।" (পৃ. ১৬।)

তৃতীয় শ্রেণীর লোকদিগেরও অনেকের "ঐ ধারা কেবল আহার ও স্নানাদি কষ্টের লাঘব আছে আর শ্রমবিষয়ে প্রাবল্য বড় কারণ কেহ মুহুরি কেহ মেট কেহবা বাজার সরকার ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন [illegible] পথ হাঁটিতে হয় পরে প্রায় প্রতিদিন রাত্রে [illegible] দেওয়ানজীর নিকট আজ্ঞা যে আজ্ঞা মহাশয়ের করিতে হয়, না করিলেও নয় [illegible] উদরের জ্বালা।" (পৃ. ১৮)

এই স্থলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের চাকুরীজীবী বাঙালীর সহিত পূর্ব্ব যুগের চাকুরীজীবী বাঙালীর তুলনা

করিলে মন্দ হয় না। আজকাল যাঁহারা বাঙালীর চাকুরীপরায়ণতা সম্বন্ধে দুঃখ করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান চাকুরী করা বাঙালীর বহুদিনের অভ্যাস। পুরাতন বাংলা কাব্যে নারীগণের পতি নিন্দা বা প্রশংসা উপলক্ষে সাধারণ বাঙালীরা যে-সকল চাকুরী করিত তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই রেওয়াজ অনুযায়ী উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত 'দূতীবিলাস' নামক একটি ব্যঙ্গ-কাব্যেও নারীগণের পতি সম্বন্ধে আলোচনা নিবেশিত হইয়াছিল। এই আলোচনার সহিত 'বিদ্যাসুন্দরে'র আলোচনার তুলনা করিলে দুইয়ের মধ্যেই চাকুরী-পরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ও পরবর্ত্তী যুগের চাকুরীর মধ্যে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

'বিদ্যাসুন্দরে' পাই,

> কহে এক রসবতী গালভরা পাণ।
> পোদ্দার আমার পতি কৃপণ প্রধান।
> কোলে নিধি খরচ করিতে হয় খুন।
> চিনির বলদ সবে একখানি গুণ।...

পরবর্ত্তী যুগে,

> কেহ কহে পতি মোর ব্যাঙ্কের পোদ্দার।
> আর যত বেনে আছে তার তাঁবেদার।
> কালুস নোট তাঁরা মেকী চেনে সে চকিতে
> কেবা পারে তার ঘরে মেকী চালাইতে।
> টাকাই সে ভাল চেনে আর কিছু নয়।
> টাকা তার হাতে দিলে পরখিয়া লয়।
> (দূ. বিলাস, পৃ. ৭৮)

আগের যুগে,

> আর রামা বলে সই এ বুঝি উত্তম।
> খাজাঞ্চি আমার পতি সবার অধম।
> চাঁদমুখ টাকা দেই সোনামুখে লয়।
> গণি দিতে ছাইমুখে অধোমুখ হয়।
> পরধন পরে দিতে যার এই হাল।
> তার ঠাঁই পানিকৌটা পাইতে জঞ্জাল।

পরের যুগে,

> কহে কোন কামিনী করিয়া অহঙ্কার।
> মোর পতি অতিবড় ঘরে তহবিলদার।
> কত লোকে টাকা দেয় থোক থোক পায়।
> রেতে ঘরে এসে বৈসে মজুদ মিলায়।
> সে সময় কারো কথা নাহি শুনে কাণে।
> কাছে গিয়ে গেলে কেহ চায় না তা পানে।
> মজুদ মিলিয়ে গেলে হয় বড় খোস।
> কিছু যদি দেখে শুনে নাহি ধরে দোষ। (দূ. বি. পৃ. ৭৭)

আবার আগের যুগে,

> আর রামা বলে সই এ বড় সুধীর।
> অভাগীর পতি হিসাবের মুহুরির।
> শেষ রেতে এসে সারা রাতি লিখে পড়ে।
> খাওয়াইতে জাগাইতে হয় দিয়া কড়ে।

পরের যুগে,

> অন্য রসবতী কহে একি বড় গুণ।
> খাতার মুহুরি পতি কাগজে নিপুণ।
> ঠিকঠাক কাল বুকে হয় উপনীত।
> সব আশা পুরে মোর যাহা মনোনীত।
> ভুলভ্রমে যদি গৃহে আসে অসময়।
> কাগজ লইয়া বৈসে আনমনে রয়।" (দূ. বি. পৃ. ৭৭)

আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এই অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে একটি চাকুরীর মর্য্যাদা অনেকটা বাড়িয়াছে। ভারতচন্দ্রের যুগের কেরাণী "রাজার পাঁতি লেখা মুনসী" মাত্র, কিন্তু কোম্পানীর রাজত্বে

> ইংরেজী মেজাজ [illegible] করে [illegible]
> বিদ্যার [illegible] ভাই জানে কত [illegible]
> নকল করিতে পারে সাহিব না [illegible]।
> জল ছাড়া কথা নাহি করে [illegible]।
> বিস্কিট সদা থাকে রুটিখণ্ড খায়।
> মঙ্গল [illegible] কিছু দেখিতে না চায়।
> [illegible] সদাই থাকে ঘরে নাহি রয়।
> ঘরে যবে আসে সাজ [illegible] (দূ. বি. পৃ. ৭৮)

শুধু তাই নয়, নূতন যুগে কয়েকটি নূতন চাকুরীরও উদ্ভব হইয়াছে। যেমন,

> শুনে এক রসবতী কহে মৃদুস্বরে।
> দেওয়ান আমার পতি আমদানি ঘরে।
> ইংরাজী পারসী বিদ্যা কিছুই না জানে।
> দম্ভ করি কথা কহে কারে নাহি মানে।
> সাহেবের সনে কথা নাহি মুখে শুনে।
> তথাচ তাহারে [illegible] ভার গুণে।
> দুটি হাতে আসিছে টাকার [illegible] খায়।
> [illegible] (দূ. বি. পৃ. [illegible])

৩

ব্যবসা ও চাকুরীর দ্বারা ধনবৃদ্ধির ফলে কলিকাতার বাঙালী সমাজ ধর্ম্মচর্চ্চায় এক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছিল [illegible] এখন পূজাপার্ব্বণে ও বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে যে ধুমধা[illegible] ও ব্যয়বাহুল্য দেখা যায় উহার প্রবর্ত্তন ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা[illegible] পর হয়। উহার পূর্ব্বে মুসলমান সরকারের রাজস্ব-সংগ্রাহকদে[illegible] দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ভয়ে কেহই নিজেদের ঐশ্বর্য্যের ক[illegible]

সহজে প্রকাশ করিতে চাহিত না। কিন্তু ইংরেজদের দ্বারা রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়া যাইবার পর সে ভয় আর রহিল না, সঙ্গে সঙ্গে পূজাপার্ব্বণে, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে ধুমধামের মাত্রাও বাড়িয়া গেল। কলিকাতার ধনীসম্প্রদায় এ-বিষয়ে অগ্রণী হইলেন। এই জন্য কলিকাতায় ধর্ম্মানুষ্ঠান নাই এই অভিযোগে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কল্পিত নগরবাসী বিদেশীকে বলিতেছেন :—

> আপনি নিতান্ত ভ্রান্ত এমত কথাও কর্ণকুহরে প্রবেশ হইতে দেও যেহেতু এদেশে কেবল কর্ম্মকাণ্ডেরি বাহুল্য এবং মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা জাজ্বল্যমান বসিয়া আছেন তাঁহাদিগের ব্যবস্থানুসারে ভাগ্যবান লোকেরা সর্ব্বদাই দেব প্রতিষ্ঠা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা [illegible] [illegible] নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিতেছেন বিশেষতঃ পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে ধনী লোক সকল স্বজাতি [illegible] বন্ধুবান্ধব পুরোহিত অধ্যাপকাদি নিমন্ত্রণ করিয়া অনেক [illegible] লোক [illegible] করেন।

> ঐ সভামধ্যে কেহ সোনার কেহ রূপার দুই চারি [illegible] করিয়া থাকেন [illegible] [illegible] প্রভৃতি ব্যবহারোপযোগি দ্রব্য সকল [illegible] করিয়া পণ্ডিতদিগের বিবেচনাপূর্ব্বক দানাদি করেন আর অধ্যাপক বিদায়ের [illegible] ধার্য্য এমত কেহ শুনেন নাই, নৈয়ায়িক পণ্ডিতের বিদায় [illegible] স্মার্ত্ত পণ্ডিত বিদায় [illegible] ইত্যাদি।

> আর [illegible] কাঙ্গালি বিদায় প্রত্যেক কাঙ্গালি [illegible] কিন্তু [illegible] সকলকেই [illegible] থাকেন আপন বিভব বুঝিয়া [illegible] নিয়ম করিয়া [illegible] তোমাকে আর [illegible] কহিব। (ক. ক. পৃ. [illegible])

শুধু ইহাই নহে, অনুষ্ঠান ছাড়াও কলিকাতার বড়লোকেরা ব্রাহ্মণপণ্ডিতের যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন ও শাস্ত্রচর্চ্চায় উৎসাহ দিতেন।

> কলিকাতে নিবাসি ভাগ্যবান লোকেদিগের নিকটে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সর্ব্বদা গমনাগমন আছে এবং ভাগ্যবান ব্যক্তি সকল পণ্ডিতদিগের নানাপ্রকার [illegible] করিয়া নিয়ত প্রতিপালন করিতেছেন [illegible] [illegible] পল্লিগ্রাম হইতে কেহ [illegible] কেহ বুভুক্ষিত হইয়া কলিকাতায় আসিয়া থাকেন কোন যোগে কাহার [illegible] কোন ভদ্রের [illegible] লোকের সহিত আলাপ করেন পরে সর্ব্বদা যাতায়াতের দ্বারা আত্মীয়তা হয় যদি আপনার বিদ্যার প্রাচুর্য্য প্রকাশ করিতে পারেন তবেই তাঁহার প্রতিপত্তি হয় শেষে তাঁহার [illegible] চতুষ্পাঠী ঐ ভাগ্যবান ধার্ম্মিক বাবু করিয়া দেন এবং যাহাতে তিনি সর্ব্বদা থাকে হইয়া অধিক লাভ করিতে পারেন [illegible] চেষ্টা করেন এই প্রকারে অনেক টোল চৌপাড়ী হইয়াছে এবং এইক্ষণেও হইতেছে। (পৃ. [illegible])

ইহাতে আর একটা অসুবিধাও কিন্তু দাঁড়াইয়াছিল। [illegible]লিকাতায় গেলেই বড়লোকদের দয়ায় উদর ভরণ হইবে এই [illegible]শায় বহু ব্রাহ্মণ অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়া কলিকাতায় আসিয়া [illegible]টিতে আরম্ভ করিল ও বাবুদিগের নিকট দুই বেলা যাতায়াত শুরু করিয়া দিল। ইহাতে অন্য দিকে বাবুদের অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক পারিষদদের বিশেষ ক্রোধের কারণ হইল। তাহারা বাবুকে বুঝাইল, ভট্টাচার্য্যেরা

> "কেবল প্রতারক কতকগুলিন শ্লোক পড়ে তাহার ভাবার্থই বুঝা যায় না, না বুঝাইতেই পারে কেবল সর্ব্বদাই টাকা দাও এই কথা বই আর কোন কথা নাই—অধিকন্তু লজ্জাভঙ্গ মাত্র। আর যদি তিন ব্যক্তি একত্র হয় তবে এমত বিরোধ উপস্থিত করে যে সেস্থানে থাকা ভার হয়....। ('নববাবুবিলাস', পৃ. [illegible])

আরও,

> যত ভট্টাচার্য্য আছে ইহারা সকলেই পাষণ্ড অর্থাৎ পাপী ইহারদিগের পাপের ভোগ প্রতিদিন এই স্থান হইতে দেখেছ কি শীত, কি গ্রীষ্ম কি [illegible] কালেই প্রাতঃস্নান করিয়া থাকে এবং কম্পিত কলেবর পুরাণের সর্ব্বাঙ্গে মৃত্তিকা লেপন করে, আর কম্পিত [illegible] হইয়া স্তব কবচ পড়ে, [illegible] বিল্বিরাভিত্তিক পুষ্পাদি আহরণ করিয়া বেলা আড়াই প্রহর তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত পূজা করে আর সন্ধ্যাকালে নিরুপদ আতপ তণ্ডুলের অন্ন আহার ইহাতে হইয়াছে [illegible] বিবর্জ্জিত [illegible] হাই উঠিলে মুখের [illegible] কাহার সাধ্য [illegible] সেস্থানে থাকে সকলেই মনে করে এ পাপ এস্থান হইতে গমন করিলেই বাঁচি (ন. বা. বি. পৃ. [illegible])।

সুতরাং তাহারা বাবুকে পরামর্শ দিত,

> অধিক পণ্ডিতাভিমানি নিষ্ঠাধ ভট্টাচার্য্যের আগমন করিলে কদাচ আজ্ঞা হয় বসিতে আজ্ঞা হয় এমত বাক্য কহিবে না যদ্যপি কিঞ্চিৎ দিতে হয় তবে কহিবে সময়ানুসারে আসিবে এই রূপ মাসেক দুই মাস প্রত্যাখ্যান করিয়া কিঞ্চিৎ দিবা ইহাতেও তাহাদের আসায় [illegible] ভার হইবেক। (পৃ. [illegible])

সকলেই যে এই পরামর্শ গ্রহণ করিত তাহা নহে। তবে এই উপদেশ একেবারে নিষ্ফল হইত বলা চলে না।

৪

নূতন শাসনতন্ত্রের কেন্দ্র হওয়াতে কলিকাতায় ইংরেজী ও ফার্সী ভাষা চর্চ্চার খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল। ইহাতে পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা যে কলিকাতাবাসীদের উপর সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার প্রতি ঔদাসীন্য আরোপ করিত তাহার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহা কলিকাতাবাসীদের একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। কিন্তু তাহারা বলিত,

> অনেক ভদ্রলোকের সন্তানের অগ্রে সংস্কৃত [illegible] [illegible] ও [illegible] অভ্যাস করিয়া পশ্চাৎ অর্থকরী ইংরাজী ও পার্সি বিদ্যা শিক্ষা করেন অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, [illegible] অর্থাগমো নিত্যম্ অরোগিতা চ প্রিয়া চ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী চ। বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা ষড়্জীবলোকেষু সুখানি রাজন্‌

> অতএব অর্থকরী বিদ্যোপার্জ্জনের আবশ্যকতা আছে তাহা শাস্ত্রসিদ্ধ বটে এবং যখন যিনি দেশাধিপতি হয়েন তখন তাঁহাদিগের

বিদ্যাভ্যাস না করিলে কিপ্রকারে রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয় ইহাতে আমার মতে কোন দোষ দেখি না। (ক. ক. পৃ. ২৩-২৪)

দ্বিতীয়তঃ, ফার্সী-ইংরেজী-মিশ্রিত বাংলা ব্যবহার করিবার সপক্ষে তাহারা বলিত,—

যে সকল শব্দের অর্থ বাঙ্গলা ভাষায় হয় না অথবা সেই মত শব্দ তোমার সংস্কৃত বা তদনুযায়ী শব্দেও নাই তাহার কি কর্ত্তব্য (পৃ. ১৫-১৬)

এবং এইরূপ মিশ্র ভাষা ব্যবহারে—

বড় দোষ স্পর্শ হয় না যেহেতু সন্ধ্যাপূজা ও দৈবকর্ম্মে পিতৃকর্ম্মে ঐ সকল শব্দ ব্যবহার করিলেই দোষ হইতে পারে বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে কিম্বা হাস্য পরীহাসাদি সময়ে ব্যবহার করণে কি দোষ আর অন্য জাতীয় ভাষ না কহিলে পরে সংস্কৃতানুযায়ি ভাষ ব্যবহার করিলে অনেকে বুঝিতে পারে না তবে কিরূপে বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়....(পৃ. ৮০)

এই প্রসঙ্গে কলিকাতাবাসী বাংলা বা সংস্কৃত প্রতিশব্দ নাই এরূপ যে-সকল শব্দের তালিকা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে ইংরেজী শব্দের তালিকাটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

ইংরাজী শব্দ

ননসুট	ডিক্রি	জজ
সমন	ডিস্‌মিস্‌	সপিন
কামনেল	ডিউ	ওয়ারিন
কোম্পানি	প্রিমিয়ম	এজেন্ট
কোর্ট	সরিপ	রেজরি
		বিল
টচমেন্ট	কালেক্টর	সারবন
ডবল	কাপ্তান	ডিস্‌কোর্ট
		ইত্যাদি (পৃ. [illegible])

৫

এইবার কলিকাতার বাঙালী সমাজে বিদ্যাচর্চ্চার একটু পরিচয় দিব। ইংরেজী প্রথানুযায়ী তখন হইতেই আলমারি সাজাইয়া লাইব্রেরী-গঠনের ফ্যাশন এখানেও প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। নিন্দুকেরা ইহাতে বলিত,

বাবু সকল নানাজাতীয় ভাষার উত্তমঃ গ্রন্থ অর্থাৎ পার্সি ইংরাজী আরবি কেতাব ক্রয় করিয়া কেহ এক কেহ দুই দেওয়ালগিরি আলমারির মধ্যে সুন্দর শ্রেণী পূর্ব্বক এমত সাজাইয়া রাখেন যে দোকানদারের বাপেও এমত দোকানে তল করিয়া কেতাব সাজাইয়া রাখিতে পারে না আর তাহাতে এমন যত্ন করেন এক পত্র বৎসরেও কেহ বোধ করিতে পারেন না যে এই কেতাবে কাহার হস্তস্পর্শ হইয়াছে অন্য পরের হস্ত দেওয়া দূরে থাকুক কেতাব ভিন্ন বাবুও স্বয়ং কখন হস্ত দেন নাই এবং কোনকালেও দিবেন এমত কথাও শুনা যায় না, ভাল আমি জিজ্ঞাসা করি ঐ সকল কেতাব তাঁহারা রাখিয়াছেন ইহার কারণ কি আমি পাড়াগেঁয়ে ভূত কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নানা প্রকার তর্ক করিয়া মরিতেছি একপ্রকার এই বুঝা যায় বাবুরা বুঝি শুনিয়া থাকিবেন যে অধিক পুস্তক গৃহে রাখিলে সরস্বতী বদ্ধ থাকেন যেমন অধিক ধন আছে তাহার ব্যয় না করিলে লক্ষ্মী সুস্থিরা থাকেন ব্যয় করিলেই বিচলিতা হয়েন ইহাও বুঝি তেমনি কেতাব লইয়া আন্দোলন করিলে সরস্বতী বিরক্তা হয়েন তৎপ্রযুক্ত হস্তস্পর্শ তাহাতে করেন না।

দ্বিতীয় প্রকার এই বুঝি যেমন পুণ্যসঞ্চয় হেতুক ও কেহবা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হেতুক বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া থাকেন ঐ বিগ্রহের সেবার পরিপাটী ও সুরীতি এবং নানা প্রকার আভরণ ও অপূর্ব্ব মন্দির করিয়া দেন কিন্তু আপনাকে সে বাটীতে একবার প্রণাম করিতেও যাইতে হয় না এও বা সেইরূপ হয় বিদ্যা সংস্থান হেতুক এবং ঐশ্বর্য্য প্রকাশ কারণ কতকগুলিন পুস্তক প্রস্তুত করিয়া আশ্চর্য্য আলমারির মধ্যে রাখিয়াছেন এবং কেতাবগার ও মজুরি নিযুক্ত আছে তাহারাই সর্ব্বদা সেই সকল কেতাবের সেবা করিতেছে বাবুকে ঐ কেতাব কখন দেখিতে বা স্পর্শ করিতেও হয় না ....। (ক. ক. পৃ. [illegible])

ইহার উত্তরে কলিকাতাবাসীর পক্ষ হইতে যে উত্তর পাওয়া গেল তাহা প্রায় নিন্দুকের কথারই সমর্থক। নগরবাসী বলিতেছেন,

পুস্তক সংগ্রহের কারণ এই ভাগ্যবান লোকের সংসারে [illegible] সর্ব্বদাই থাকে অতএব যত্ন করিয়া রাখেন কিন্তু সকল সকল [illegible] ব্যবহার করিতে হয় না যখন যাহার আবশ্যক হয় তখনি তাহা ব্যবহার করেন তাঁহারদিগের সকল পুস্তক ব্যবহার করিবার [illegible] না তাঁহারা কি এমত বাতুল হইয়াছেন যে ঐ কেতাবগুলিন অর্থব্যয় করিয়া কিনিয়াছেন তাহা ব্যবহার না করিলে [illegible] এমত নহে আর তাঁহারদিগের কেতাব ব্যবহার না করিলে [illegible] না তাঁহারা তাহা করিয়াও থাকেন...। (পৃ. [illegible])

কলিকাতাবাসীদের বিদ্যানুরাগ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে তাঁহারা সংস্কৃত বা বাংলা গ্রন্থ না কিনিয়া শুধু ইংরেজী ফার্সী গ্রন্থ কিনিয়া থাকেন। বাংলা পুস্তক লইয়া গেলে তাঁহারা বলেন,

আমার বাঙ্গালা গ্রন্থে কিছু প্রয়োজন নাই কেহ বলেন এ সকল বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত হইয়াছে আমারদিগের ইহাতে আবশ্যক কি কেহ বলেন এই ছাপা গ্রন্থদিগের ভাষায় আর [illegible] [illegible] সকলই আইন মহাশয় [illegible] পুথি হইয়াছে [illegible] কেহ বলে [illegible] কেহ [illegible] নাম সহি করিয়া [illegible] কেহ বলেন কথা আইন কিন্তু [illegible] পারে অদ্যাবধি [illegible] নাই....। (পৃ. [illegible])

ইহার উত্তরে নগরবাসী বলিলেন,

তুমি ইহা বুঝিতে পার না যে এই কলিকাতায় যত ছাপাখানা আছে তাহাতে যে সকল পুস্তক প্রস্তুত হইতেছে তাহা কোথায় যায়, ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে এই নগরবাসী লোকেরা প্রায় তাবৎ লইয়া থাকেন তোমার পাড়াগেঁয়ে লোক কয়খান পুস্তক লয়, আমি মনে করি অনেক স্থানের লোক অদ্যাপি জানেন না যে ছাপাখানা কি প্রকার,...। (ক. ক. পৃ. ৭২-৭৩)

তবে কলিকাতায় নানা শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের সকলের পক্ষেই বাংলাই হউক বা ইংরেজীই হউক পুস্তকের মূল্য বোঝা সম্ভব নয়, যেমন—

একজন ছুতার কেবল ঢেঁকি পাঁড়ি খড়ম গড়িয়া থাকে ইদানী আলমারি ডেস্ক প্রভৃতি কাষ্ঠের কর্ম্ম করিয়া কিঞ্চিৎ সঙ্গতাপন্ন হইয়াছে দিনা ঢাকাই ধুতি জামদানের চেকলাই পরীধান করিয়া অসময়ের ইলিস মৎস্য ১ একটা ২ দুই টাকায় ক্রয় করিয়া হস্তে লইয়া যাইতেছে তাহাকে যদি বল, ইংরাজী বাঙ্গালা ডেক্সনরি হইতেছে লইবা সে তখন এরূপ অবশ্যই বলিবে যে মহাশয় কর্ম্মাতি পাওয়া যায় না কাষ্ঠের মুস্কিল হইয়াছে আমি কি করিব ইত্যাদি অতএব ধনী লোক মাত্রেই পুস্তকের মর্ম্ম বুঝে এবং গ্রাহক হয় এমত নহে। ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে যাঁহারদিগের বিদ্যাবিষয়ে অধিক আলোচনা আছে তাঁহারদিগের নিকট লইয়া গেলে অবশ্যই অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকেন। (ক. ক. পৃ. ৭৮)

৬

এইবারে বাঙালী সমাজের একটি প্রাচীন ও বৃহৎ ব্যাপারের পরিচয় দিব। আজকাল অনেকে দলাদলির নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই জিনিসটি আমাদের সামাজিক জীবনের একটি সনাতন ও অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল, এবং উহার ভালমন্দ দুই দিকই ছিল। দলের দ্বারা এক দিকে যেমন কলহের বা রেষারেষির সৃষ্টি হইত, আর এক দিকে তেমনই সংহত ভাবে কাজ করিবার অভ্যাসও হইত। তখনকার দিনে রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না, সামাজিক কর্ত্তব্য বলিতে লোকে ধর্ম্ম ও আচার রক্ষা, পরস্পরের সাহায্য প্রভৃতি বুঝিত। এ-সকলেরই নিয়ন্ত্রণ দলের মধ্য দিয়া হইত, কেবলমাত্র ব্যক্তি-বিশেষের ইচ্ছা বা অভিরুচির দ্বারা হইত না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতার বাঙালী সমাজেও চার-পাঁচটি দল ছিল। 'কলিকাতা কমলালয়ে' পল্লীবাসীর প্রশ্ন ও নগরবাসীর উত্তরের মধ্যে এই দলাদলির যে বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, তাহা অতি বিশদ ও বিস্তৃত। সেই জন্য উহা আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিতেছি,—

পল্লীবাসীর প্রথম প্রশ্ন।—"অনৈক্য না হইলে দল হয় না ইহাতে এত লোকের অনৈক্যতার কারণ কি?"

নগরবাসীর উত্তর।—"দলপতির সম্মান অদ্যাপি বিস্তর আছে তাহা প্রাপ্তি নিমিত্ত অনেকেরি বাঞ্ছা সুতরাং অনেকে এক পদাভিলাষি হইলেই পরস্পর অনৈক্য হইয়া উঠে।"

পল্লীবাসীর দ্বিতীয় প্রশ্ন। "দলপতি মহাশয়ের চেষ্টা করিয়া কি দল করেন?"

নগরবাসীর উত্তর।—"কেবল দলপতির চেষ্টায় দল হয় এমত নহে দলেরদিগের অনেক আকিঞ্চন হয় এবং ভদ্রতর লোকের যাঁহাকে পক্ষপাতশূন্য অথচ সর্ব্বত্র মান্য গুণিগণাগ্রগণ্য বিবেচনা করেন তাঁহাকেই দলপতি করিতে যত্ন পান।"

পল্লীবাসীর তৃতীয় প্রশ্ন।—"দলপতির ইহাতে লভ্য কি?"

নগরবাসীর উত্তর।—"দল করিতে দলপতির লভ্য এই আপন দলের মধ্যে কোন ব্যক্তির বাটীতে কোন বৃহৎ কর্ম্ম অর্থাৎ পুরাণ আরম্ভ সমাপন দিবসে এবং পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম উপস্থিত হইলে ঐ ব্যক্তি দলপতির নিকটে আসিয়া আপন বিষয় অবগত করান এবং আপন বিভবানুসারে ব্যয় করিবার ক্ষমতাও জানান তিনি সেই ব্যয়োপযুক্ত লোক নিমন্ত্রণ করিবার ফর্দ্দ করিয়া দেন আপন দলের সেকা ভাবাপন্ন কুলীন ব্রাহ্মণ এত ভঙ্গ কুলীন এত, অধ্যাপক এত, সেই ফর্দ্দ প্রমাণ নিমন্ত্রণ হয় পরে নিয়ম পত্র দেওয়ান তৎপরে কর্ম্ম দিবসে নির্ণয় সময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সকলে দলপতির অনুমতি লইয়া কর্ম্মকর্ত্তার বাটীতে আগমন করেন দলপতি প্রায় সর্ব্বত্রেই কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব করিয়া গমন করিয়া থাকেন। সকল লোক তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া সভায় বসিয়া কাল যাপন করেন অধ্যাপকেরা সভাস্থ হইয়া পরস্পর নানা শাস্ত্রের বিচার করিতেছেন কুলজ্ঞ কুলীন মহাশয় সকল এবং কুলাচার্য্য সকল কুলজীর ব্যাখ্যা করিতেছেন গোষ্ঠীপতিকে বেষ্টিত করিয়া কুলীন সকল বসিয়াছেন ভাট্টরা কর্ম্মকর্ত্তার বংশাবলি ও পূর্ব্বপুরুষের এবং তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছে ঐ সভাবাটীর দ্বারে দ্বারপালেরা হস্তপদাদি দ্বারা নিমন্ত্রিত ভিন্ন অন্য লোকের গমন বারণ করিতেছে এমত সময়ে অতি আড়ম্বরবহুবাদ্যধ্বনিসম্বলিতাড়ম্বরে দলপতি তুলা মহাশয় দলপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন তৎকালে সভাস্থ সকলে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আসিতে আজ্ঞা হউক ইত্যাদি পূজাদ্য বোধক সম্বোধন বাক্যোচ্চারণ পুরঃসর অভ্যর্থনা করেন তৎপরে দলপতি উপযুক্ত স্থানে পৃথক আসনে উপবিষ্ট হয়েন. কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে জিজ্ঞাসা করেন অমুক আসিয়াছেন ইত্যাদি, পরে কর্ম্মকর্ত্তা দলপতির নিকট আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটবদ্ধ হইয়া নিবেদন করেন যেন রাত্রি অধিক হইয়াছে অনুমতি হইলে সভাস্থ মহাশয়দিগকে মাল্য চন্দন অর্পণ করা যায় দলপতি অনুমতি করেন যে উপস্থিত অমুকের নিকট যাও, তাঁহার অনুমতি হয় পরে কুলীন ও অধ্যাপক মহাশয় সকলের অনুমতি করেন পরে পরিচারক ব্রাহ্মণের চন্দনের বাটী ও পুষ্পমালা আনিয়া কাহাকে আগে চন্দন করিবে কাহাকে পরে ইহাতে যে সময় অনেক স্থানে বিরোধ হইয়া থাকে যেহেতু চন্দনের পাত্র গোষ্ঠীপতি হয়েন যে সভায় দুই তিন জন থাকিলেই গোলযোগ বিরোধ হয় পরে দলপতি বিরোধ ভঞ্জন করিয়া দেন, কারণ গোষ্ঠীপতির চন্দন হইলে সভাস্থ ব্রাহ্মণের হয় তৎপরে দলপতির চন্দন হয়

তৎপরে অপ্রপক্ষপাতিবিবেচনা থাকে না একেবারে ক্রমেই মাল্যচন্দন হইয়া থাকে পরে সকলেই আপনার স্থানে প্রস্থান করেন অনন্তর যাঁহার সহিত যাঁহার অপ্রণয় ব্যবহার থাকে তাঁহার আহার করিয়া থাকেন পরে দলপতি মহাশয় উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া বিদায়ের অনুমতি করিয়া দেন কর্ম্মকর্ত্তা তদনুসারে সম্মানপূর্ব্বক সকলকে দানাদি প্রদান করেন ইহাতে দলপতির যে লভ্য হয় তাহা আমি আর অধিক কি কহিব...।"

পল্লীবাসীর চতুর্থ প্রশ্ন। "দলপতিরদিগের দলস্থ সকলকে বশীভূত রাখিতে কিছু ব্যয় হয় কি না?"

নগরবাসীর উত্তর।—"দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে আপন বাটীর

কর্ম্মোপলক্ষে বৎসরের মধ্যে প্রায় দুই একবার কিঞ্চিৎ২ দিতে হয় এবং দুর্গোৎসব সময়ে পাত্রবিশেষে পূজার পূর্ব্বে কোন কোন ব্যক্তিকেও পূজার সময়ে ভগবতীর প্রসাদি দ্রব্য নৈবেদ্য তৈজস বস্ত্র ইত্যাদি দিতে হয় অন্যং লোকের পূজাদিতে যে ব্যয় হয় তাহা হইতে দলপতির অধিক ব্যয় হইয়া থাকে আর দলপতিকে অধিক বাক্য ব্যয়ও করিতে হয় তাহার কারণ দলের ঘোঁট প্রায় সর্ব্বদাই আছে।"

পল্লীবাসীর পঞ্চম প্রশ্ন।—"দলস্থ সকলে দলপতির সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন?"

নগরবাসীর উত্তর।—"এক প্রকার ৩ ধারাতে কহিয়াছি যে দলপতির অনুমতি ব্যতিরেকে কোন স্থানে গমন করা যায় না এবং কাহাকেও বলা যায় না পুনশ্চ বলি, যখন যিনি দলভুক্ত হয়েন তখন দলপতির ফর্দ্দে তাঁহাকে নিজ নাম লেখাইতে হয় এবং যদি কোন ব্যক্তি দোষী বা অপবাদগ্রস্ত হয় তবে দলপতি দলস্থ সকলকে ডাকাইলে তাঁহার নিকট যাইতে হয় সকলের পরামর্শে যাহা স্থির হয় তাহা দলপতি আজ্ঞা করিলেই করিতে হয়।"

পল্লীবাসীর ষষ্ঠ প্রশ্ন।—"দল করিবার ফল কি?"

নগরবাসীর উত্তর।—"দলের ফল শুন দলে থাকিলে লোকের জাতি ও ধর্ম্ম থাকে যেহেতু কোন ব্যক্তি কুকর্ম্ম করিলে তাহার বাটীতে কেহ জল স্পর্শ করে না এবং পদার্পণও করে না তাহার সহিত কাহার নৈকট্যতা বা কুটুম্বতা কিম্বা আত্মীয়তা থাকিলেও দলস্থ লোকের ও দলপতির অনুমতি না হইলে যাইতে পারেন না ইহাতে শঙ্কান্বিত হইয়া লোক আহার ব্যবহার করেণ তাহাতে ধর্ম্ম রক্ষা পায় আর কেহ যদি মিথ্যাপবাদে পতিত হয় তবে দলপতি আপন গণকে বলেন তাহাকে উদ্ধার করেন ইহাতে তাহার জাতি রক্ষা পায়, অতএব দলা দলের ফল আপনি বিবেচনা কর।"

পল্লীবাসীর সপ্তম প্রশ্ন।—"কোন লোক যদি কাহার দলাক্রান্ত না হয় তাহাতে ক্ষতি কি?"

নগরবাসীর উত্তর।—"এই স্থানে বসতি করিয়া কেহ যদি দলভুক্ত না হয়েন তবে তাঁহার অনেক ক্ষতি হয় যেহেতু তিনি কোন কর্ম্ম করিলে তাঁহার বাটীতে কেহ যায় না এবং তিনিও কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে পারেন না যদ্যপি তাঁহার কর্ম্ম আটক হয় না যেহেতু নানা দেশনিবাসি অর্থাৎ বিক্রমপুর কাশীযোড় প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণ কলিকাতায় অনেক পাওয়া যায় তথাচ গ্রামস্থ লোক তাঁহার বাটীতে গমন না করিলে কেবল তাঁহাকে একাকী থাকিতে হয় তাহাতে লোকে যাহা বলিয়া থাকে তাহা বিবেচনা কর।"

পল্লীবাসীর অষ্টম প্রশ্ন।—"এক ব্যক্তি কোন দলভুক্ত আছে সে ব্যক্তি সেদল পরিত্যাগ করিয়া অন্য দলে যাইতে পারে কি না?"

নগরবাসীর উত্তর।—"দলপতি ত্যাগ করিতে পারে কি না, এ প্রশ্ন তুমি বালকের ন্যায় করিয়াছ যেহেতু দলপতির অধিকারে কেহ বাস করে না কেবল লৌকিক ব্যবহারানুরোধে এক ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ করিয়া সম্মান প্রদান করিয়াছেন মাত্র অতএব ঐ মানদাতা ব্যক্তি যদি দলপতির মান প্রদান না করেন তবে তাঁহার কে কি করিতে পারে সুতরাং সে ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে দলপতিকে অবজ্ঞা করিয়া আপন স্বেচ্ছায় দল পরিত্যাগ করিতে পারে।"

পল্লীবাসীর নবম প্রশ্ন।—"দলপতির আপন স্বেচ্ছায় কাহাকেও ত্যাগ করেন কি না?"

নগরবাসীর উত্তর।—"দলপতি আপন স্বেচ্ছায় কাহাকেও বিনা কারণে পরিত্যাগ করেন না করিলেও করিতে পারেন কিন্তু তাহার নিমিত্ত বহু বিরোধ উপস্থিত হয় তাহার কারণ দলস্থ লোকের জিজ্ঞাসা করেন যে মহাশয় আপনি অমুককে কি অপরাধে পরিত্যাগ করিলেন তাহার কারণ দর্শাইতে না পারিলে নবদল ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে ইহাতেই বোধ হয় যে দলপতি ত্যাগ করিলেই করিতে পারেন এমত নহে।"

পল্লীবাসীর দশম প্রশ্ন।—"এক জাতির কি একই দল?"

নগরবাসীর উত্তর।—"জাতি মাত্রেরি একং দল এমত নহে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ ইহারদিগেরি দলভুক্ত কামার কুমার তাঁতি মালি শাঁকারি কাঁসারি গন্ধবণিক নবশাখ প্রভৃতি জাতি আছেন কিন্তু ইহারদিগের পরস্পরের আহার ব্যবহার বিষয়ে ভিন্নং দল আছে এক জাতিতে দল কেবল সুবর্ণ বণিকেরদিগের দেখিতেছি।"

পল্লীবাসীর একাদশ প্রশ্ন।—"ব্রাহ্মণের কি দলপতি কি ধনী লোক, না রাজদত্ত সম্মানিত ব্যক্তি দলপতি হইয়া থাকেন?"

নগরবাসীর উত্তর।—"ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও নবশাক সম্বলিত যত দল দেখিতে পাই ইহার দলপতি ব্রাহ্মণ আর কায়স্থ ব্যতিরেকে অন্য জাতি নহে আর ধনবান ও রাজদত্ত মানে মান্যমান লোক দলপতি হয়েন এমত নহে ধনবান ক্রিয়াবান বিবেচক মর্য্যাদক লোক দলপতি হইয়া থাকেন।"

তাপস

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(১)

মন্টুকুমারের পড়িবার ঘর। দ্বারের সামনাসামনি ওদিকে মাঝারি সাইজের একটা টেবিলের প্রান্তে খোলা র‍্যাক্ একটা, বইয়ে ঠাসা—ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, আর দর্শনশাস্ত্রের পাস ও অনার্স মিলাইয়া রাশীকৃত বই। এক পাশে একটি চৌকি, হাত দু-একও চওড়া হয় কি না-হয়। উপরে একটা কালো রঙের কম্বল পাতা, মাথার দিকে একটি পাতলা বালিসের সঙ্গে একখানি চাদর গোটান।—মন্টুর বিছানা। টেবিলের সামনে একটি চেয়ার—বাহুহীন, শীর্ণকায়, পিঠটা এত সোজা এবং উঁচু যে যে-বসিবে তাহার মেরুদণ্ডটা সিধা রাখিবার জন্য যেন উদ্দণ্ড হইয়া আছে।

কাকা বলেন পড়াটা তপস্যা,—মন্টুর ওটা তপস্যাগার ক'রে দিলাম। মন্টু, কাকা ভিন্ন আর সবার কাছে বলে—জেলখানা।

ঘরে, সিলিঙে একটি বিজলী পাখার পয়েণ্ট আছে, পাখা নাই। এক দিকে দেওয়ালে একটা আলোর ব্র্যাকেট,—বাল্‌বটা না-থাকায় পুচ্ছহীন বৃন্তের মত একটা রুক্ষ রিক্ততা লইয়া ঘরটাকে যেন আরও কয়েক গুণ বিরস করিয়া রাখিয়াছে। এ-দুটি কাকা সম্প্রতি সরাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন—"পুরাণ কিংবা ইতিহাসে কাউকেও বিদ্যুতের আলো কিংবা পাখার নীচে তপস্যা ক'রতে শুনেছ ?"

মুখ ফুটিয়া উত্তর দেওয়ার উপায় নাই, অথচ উত্তর খুবই সোজা বলিয়া হাল্‌কা আগুনের মত দাউ দাউ করিয়া তাহার সমস্ত শরীরটাই যেন জ্বলাইয়া দেয়। ঝোঁকটা পড়ে কাকীমার উপর।—হয়ত কুটনা কুটিতেছেন, মন্টু শুষ্ক মুখে কাছে গিয়া বসিল; এটা ওটা নাড়িতে নাড়িতে হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল—আমার কুটনোও কুটছ নাকি ?"

"ওঃ, মস্তবড় খাইয়ে ছেলে আমার, ওর জন্যে আবার আলাদা ক'রে কুটনো!…কেন ?"

"আমার চাল নিও না আজ।"

"কেন শুনি, আজ আবার কি হ'ল ?"

"কিচ্ছু না।"

অনেক ক্ষণ চুপচাপ। কথাটা বাহির হইয়া পড়িবেই জানিয়া কাকীমা মনে মনে হাসিয়া নীরবে কুটনা কুটিতে লাগিলেন। মন্টু এক সময় চোখ মুখ অন্ধকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"আমার দ্বারা ওরকম 'তপস্যা' হবে না, এই ব'লে দিচ্ছি… ইস্, 'তপস্যা'!…"

কাকীমা হাসি চাপিবার জন্য একটা ছুতা করিয়া কাহাকেও কিছু ফরমাস করিয়া কুটনা কুটিয়া চলিলেন। এদিকে উত্তরের অভাবে রাগটা আত্মনিরুদ্ধ হইয়া ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। মন্টু আর একটু থামিয়া বলিল—"পুরাণ ইতিহাসের কথা যে ব'লছ—সে-সব সময়ে ইলেকট্রিসিটি ছিল যে লোকে পাখার হাওয়া খাবে, সুইচ টিপে আলো জ্বেলে পড়বে ? যত সব হা-ঘরে, একরত্তি ক'রে তেল জুটত না যে রাত্তিরে জ্বেলে পড়বে, তারা আবার…আর ফট্ ক'রে যে ব'লে বসলে পুরাণের কথা—আর আমি যদি উত্তর দিই যে রাবণরাজার ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনীরা নিশ্চয় বিদ্যুতের পাখার হাওয়া খেত, বিদ্যুতের আলোয় পড়াশুনা করত, তখন কি বলবে বল ? আমাদের দেশে যে এক সময় এ-সবই ছিল সে কথা তো ক্রমেই বেরিয়ে পড়বে…হট্ ক'রে যে ব'লে বসলে পাছে বিদ্যুতের পাখা চালিয়ে তপস্যা করত না,—ইতিহাসের সবচেয়ে আধুনিক থিওরিটা জান ? যে পৃথিবীতে নূতন কিছুই হ'চ্ছে না, যুগ যুগ পরে সেই একই জিনিষের পুনরাবর্ত্তন হ'চ্ছে মাত্র।…এসব যদি বলি তো বলবে ভাইপো-আমার মুখের ওপর চোপরা ক'রতে শিখেছে।…আচ্ছ সর্ব্বদাই যে বল…"

কাকীমা আর হাসি চাপিতে পারিলেন না; বলিলেন—"হ্যাঁরে, গব্ গব্ ক'রে মাথামুণ্ড কি সব ব'কে যাচ্ছিস্ ? বল', বল' যে ক'রছিস্—বলেছি কি আমিই, না, যে বলেছে সে আমার পরামর্শ নিয়ে ব'লেছে ?"

মনুজ অপ্রতিভ হইয়া একটু থামিল, কিন্তু দারুণ গায়ের জ্বালা আবার তখনই তাহাকে সব ভুলাইয়া দিল। অন্যমনস্ক-ভাবে একটা পটল হাতে কচলাইতে কচলাইতে বলিল—"তোমাদের কি?- ইজিচেয়ারে শুয়ে, ফ্যান্ খুলে দিব্বি তামাক পোড়াচ্ছ, হুকুম দিলে—মেনো তুই তপস্যা ক'র গে…"

"আমি তামাক পোড়াচ্ছি!…তোর হ'ল কি মনু?"

"তোমায় ব'ললাম!…বেশ, এইবার তুমি-সুদ্ধ লাগো আমার পেছনে, আমার কিচ্ছু ব'লে দরকার নেই বাপু, আমায় যদি তপস্যাই ক'রতে হয় তো বনে গিয়ে ক'রব,—পৌরাণিক যুগে তাই ক'রত, ঐতিহাসিক যুগে বুদ্ধও তাই ক'রেছিলেন,—রেড়ির তেলের আলোও জোগাতে হবে না; তোমাদের ঐ দেড় বিঘতের চৌকি—ওটুকুরও দরকার হবে না। দাও আমার বনে যাবার ব্যবস্থা ক'রে…"

"আচ্ছা, তোর কাকাকে ব'লে দোব'খন ব্যবস্থা করিয়ে, আপাতত কাল যে একবার বাড়ি যেতে হবে সে-খবর পেয়েছিস? বড়ঠাকুরের চিঠি দেখেছিস্?"

"আমার দেখেও কাজ নেই, গিয়েও কাজ নেই, তপস্যা ভঙ্গ হবে।"

হাতের পটলটা কুচি কুচি হইয়া গিয়াছে, একটা আলু তুলিয়া লইয়া কথার ঝোঁকের সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো আঙুলের নখটা তাহাতে বিঁধিয়া দিতে লাগিল। কাকী বলিলেন—"জানি নে বাপু, তোরা খুড়ো-ভাইপোতে বুঝগে যা।…আর কি যে ছাই তপস্যা তাও তো বুঝি নে। এই কি তপস্যার বয়েস? দিব্বি হেসে খেলে বেড়াবে তা নয়;…বুঝি নে বাপু সব কাণ্ড!"

মনুজ এক চোট জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—"বুঝবে কোথা থেকে,—পরের কষ্টের কথা কি একবার ভেবে দেখ তোমরা যে—?…আচ্ছা, ওদের আরতির ঘরের নীচে ম্যাটিং-করা, দুটো ভাল সোফা, বসবার চেয়ারে মখমলের গদি-আঁটা; হারমোনিয়াম, ব্যাঞ্জো, ফ্যান্, চমৎকার শেড্-দেওয়া আলো, পড়বার জন্যে একটা টেবিল-ল্যাম্প; দুটো ভাস্—যখন দেখ টাটকা ফুলে ভরা,—বল' তপস্যা ভঙ্গ হচ্ছে!.. এবারে টেষ্টে ফার্ষ্ট হ'য়েছে, ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ বাঁধা·· মেনো, তুই তপস্যা ক'রে মর্…"

কাকীমা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বলিলেন—"দিব্বি মেয়েটি, সত্যি; ইচ্ছে হয় ঘরে নিয়ে আসি।"

মনুজের একটু হুঁস হইল যেন; আলোচনাটিতে একটু লজ্জার কারণ আছে, অতটা খেয়াল হয় নাই। রাগটা তবু লাগিয়া আছে, জিহ্বা বশে আসিতেছে না; কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—"আমিও দেখিয়ে দোব কি ক'রে তপস্যা ক'রতে হয়,—হ্যাঁ, দেখিয়ে দোব। চুলোয় যাক্ বই, হাত-পা গুটিয়ে, চোখ বুজে বাল্মীকি ঋষি হ'য়ে···আচ্ছা, তপস্যাই যে ব'লছ, মিনিটে মিনিটে পিদ্দীপের বাতি ওস্কাব, না তপস্যা করব বল ত?—বল না, তার বেলা কথা কইছ না যে?…"

কাকীমা মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া বলিলেন—"ওই জিগ্যেস কর বাপু, যাকে জিগ্যেস করবার সত্যিই তো বাপু…"

পিছন ফিরিয়া ছিল, কাকা আসিলেন সেটা দেখিতে পায় নাই। ঘুরিয়া দেখিয়াই হাতের চটকান আলুটা ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। কাকা জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ, ভাল কথা মনে প'ড়ে গেল,—ফ্যানের অভাবে কোন রকম কষ্ট কি অসুবিধে হ'চ্ছে না তো?"

মনুজ কাকীমার পানে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া বলিল—"আজ্ঞে নাঃ।"

"দেখলে তো?—ওতে আরও মন বসে বরং, নয় কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

কাকীমা কি বলিতে যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া বলিল—"তুমি পিদ্দীপটা ঠিক ক'রে রেখো তো কাকীমা?—বড্ড নোংরা হ'য়ে গিয়েছিল।"

কাকীমা ঠোঁটের কোণে একটু হাসি মিলাইয়া লইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, রেখেছি···হ্যাঁ গো, ও যে ব'লছে কাল যাবে না বাড়ি, অথচ"

মনুজ একটু রাগিয়া বলিল—"তাই ব'ললাম?—ব'লছিলাম গেলেই পড়ার ক্ষতি তো, তাই"

কাকা মনুজের কাকীমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"দেখ, কেমন ঝোঁকটি আপনিই হ'য়ে আসছে। পড়াটা তো কিছু নয়, একটা সাধনা, তপস্যা, অবস্থাটা তপস্যার অনুকূল ক'রে দাও, দেখবে আপনিই মন কেন্দ্রীভূত হ'য়ে উঠছে।"

যাইতে যাইতে বলিলেন—"তা যাক্, হ'য়ে আসুক একবার বাড়ি থেকে, কি আর হবে তা'তে.."

মনুজ দু-এক বার আড়চোখে কাকার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিল; চলিয়া গেলে রাগে ঘাড় বাঁকাইয়া মুঠার ওপর মুঠা ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল—"আমি কখনও যাব না, দেখি আমায় কে যাওয়ায় তুমি যেন তাব'লে ব'লে দিতে যেও না, হ্যাঁঃ ···আর যদি যেতেই হয় তো আমি গরুর গাড়ীতে যাব, আগেকার তপস্বীদের মতন, দেখি আমায় কে মোটরে ক'রে পাঠাতে পারে। আর আমার যদি আজ চাল নাও তো···"

কাকীমার ক্রুদ্ধ চক্ষু দেখিয়া আর শেষ না করিয়া হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

(২)

মনুজের বি-এ-তে দর্শনশাস্ত্র লইবার কথা ছিল না। তাহার ঝোঁকটা ছিল ইতিহাসের দিকে। আই-এ পরীক্ষায় ইউনিভার্সিটি হইতে 'H' অক্ষরও পাইয়াছিল। ইতিহাসেই অনার্স লইবে ঠিক্‌ঠাক্ এমন সময় কাকার হাতে তাহার লেখা একটি প্রবন্ধ পড়িয়া গেল—"Feminine Beauty in the Making of History" (ইতিহাস-সৃষ্টিতে নারী-সৌন্দর্যের স্থান)। সংগ্রহের মধ্যে, তাহার বয়স ও শিক্ষার অনুপাতে বেশই মৌলিকতা ছিল; কিন্তু কাকা ভ্রাতুষ্পুত্রের মনের গতি লক্ষ্য করিয়া ভড়কাইয়া গেলেন। সাব্যস্ত হইল তাহাকে দর্শন লইতে হইবে,—অনার্সও দর্শনশাস্ত্রেই। মনুজ আড়ালে একটু গুঁইগাঁই করিল, কানে উঠিলে কাকা সামনা-সামনিই স্পষ্টস্বরে বলিলেন—"কেন?—যারা আসলে ইতিহাস গ'ড়ে তুললে—চন্দ্রগুপ্ত, বাবর, শেরশা, ক্রমওয়েল—এদের কথাই নেই, খোঁজ পড়ল গিয়ে কুইন্ মেরীর, নূরজাহানের!—এর অর্থটা কি শুনি?···ফেমিনিন্ বিউটি!···"

দর্শনশাস্ত্রটা বাড়িতে নিজেই পড়ান আরম্ভ করিয়াছেন। দুইটি কারণ আছে; প্রথমতঃ জিনিষটি তাঁহার প্রিয়, দ্বিতীয়তঃ ও শাস্ত্রে আবার মন যদি মিল্, হার্বার্ট স্পেন্সর প্রভৃতির জড়বাদের দিকে ঢলে তাহা হইলে বিপদ সমূহ, এমন কি ইতিহাসের চেয়েও ঢের বেশী, কারণ তাহার পরিণাম এপিকিউরিয়ানিজম্—অর্থাৎ যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ···। সুতরাং সেটিকে আবার আদর্শবাদের খাতে বহাইয়া লইয়া যাওয়া দরকার।

বন্ধুদের বলেন—"সঙ্গে সঙ্গে এথিক্সের কড়া ডিসিন্‌ফেক্‌টেন্ট-ও দিয়ে যাচ্ছি; দেখাই যাক্ না·"

তাঁহার বিশ্বাস ফল হইতেছে। তিনি যখন স্পেন্সার প্রভৃতির মতবাদগুলি সুতীক্ষ্ণ তর্কে এবং সুতীব্র মন্তব্যে ছিন্ন-ভিন্ন করিতেন, কিন্তু কান্ট হেগেলের আদর্শবাদ লইয়া বেদান্তের কোটায় গিয়া পড়িতেন সে-সময় ভাইপোর গভীর তদ্গত ভাব দেখিয়া নিজের ব্যবস্থায় বেশ আস্থাবান হইয়া উঠিতেছিলেন! মনুজ প্রথমে এক-আধটা তর্ক করিত, ক্রমে তন্ময়তার চোটে সেটাও বন্ধ হইয়া গেল, নীরবে তাঁহার যুক্তিস্রোতবর্ষী মুখের দিকে চাহিয়া থাকে মাত্র; ক্রমে দেখা গেল শুধু ধীরে ধীরে মাথা দোলাইতেছে, এবং ইহার পরে একদিন দেখা গেল কাকার উগ্র আলোচনার ঝোঁকে ঝোঁকে চৌকির ওপর ছোট্ট করিয়া এক-একটা ঘুসি পর্য্যন্ত বসাইয়া দিতে লাগিল। কাকা মনে মনে হাসিলেন—ভাইপো একেবারে মাতিয়া গিয়াছে; সুলক্ষণ।

সেদিন পড়ান শেষ করিয়া বাহিরে আসিতেই কিন্তু হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। কানে গেল—ছোট্ট পার্কটির ওধারে একটি দোতলা বাড়ি হইতে দ্রুত তালের নারীকণ্ঠ-সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে, পড়ানয় অতিরিক্ত মনোনিবেশের জন্য এতক্ষণ শুনিতে পান নাই। কাকা কপালে বাঁ-হাতের আঙুলের চারিটা ডগা চাপিয়া হেঁট-মুখে খানিক ক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন; একটু ঊর্দ্ধে নিম্নে মাথা দোলাইলেন, দু-একবার ডাইনে-বাঁয়ে,—কি একটা আকস্মিক সমস্যার ঠিকমত মীমাংসা হইতেছে না। শেষে নিজের মনেই বলিলেন—"নাঃ, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করাই ভাল।" আবার ঘরের দিকে ফিরিলেন।

ঘরের দিকে পা দিতে আরও স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল। মনুজ সাইকলজির ভারী বাঁধান বইটা বুকের কাছে চাপিয়া তড়বড় করিয়া বাঁয়া-তবলা বাজাইয়া যাইতেছে; মিঠে ভঙ্গিমায় মাথাটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুলিয়া যাইতেছে, চক্ষু গভীর তন্ময়তায় মুদ্রিত!—গান তখনও ওদিকে চলিতেছে।

কাকা নির্ব্বাক বিস্ময়ে একটু তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর উৎসাহভঙ্গ স্বরে ডাক দিলেন—"মনুজ ?"

মনুজ যেন আচমকা ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল। বাঁয়া-তবলাখানা আলগা হাত হইতে খসিয়া বিশৃঙ্খলভাবে নীচে গড়াইয়া পড়িল; বাদক কোন উত্তর না দিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। কাকা বলিলেন—"এখন তো বাঁয়াতবলাই বাজাচ্ছিলে স্পষ্টই দেখলাম, একটু আগের সম্বন্ধে আমার একটু খটকা রয়েছে, ঠিক বলবে তো ?"

মনুজ চক্ষু নামাইল।

"আমি যখন ভাবছিলাম—তুমি বেদান্তের বিচারে বিভোর হয়ে মাথা দোলাচ্ছ আর আমার সঙ্গে মেটিরিয়া-লিষ্টদের ওপর চ'টে চৌকিতে মাঝে মাঝে ঘা দিচ্ছ, তখন তুমি আসলে কোন একটা গানে তাল দিচ্ছিলে কিনা বল তো বাপু ? আরে ছ্যাঃ, এই তোমার তপস্যা !···আমি কানের কাছে অমন একটা ইন্‌টারেষ্টিং জিনিষ নিয়ে ব'কে ব'কে বেদম হচ্ছি, গ্রাহ্যই নেই, আর পার্কের একটেরেয় কে গানকে ভেংচি কাটছে তাই শুনে শুনে তুমি···ছিঃ—ছিঃ···?"

ফিরিয়া যাইতে যাইতে মনে হইল সব সন্দেহ মিটাইয়া লওয়াই ভাল। আবার ঘুরিলেন। ওভাবে কথা বাহির করা যাইবে না, সুর কিঞ্চিৎ বদলাইয়া বলিলেন—"অবশ্য তোমার অতটা অন্যমনস্ক হওয়া ভাল হয় নি; কিন্তু ছেলেটি গাইছে বেশ, তোমায় ততটা দোষও দেওয়া যায় না। তবে কথা হ'চ্ছে যতটা পারা যায় মনকে টেনে রাখাই ভাল। চেন নাকি ছেলেটিকে ?—এই পাড়াতেই থাকে ?"

কাকার এমন দরদ-মাখান কথায় মনুজের মনের কপাট যেন হঠাৎ খুলিয়া গেল। একটু সলজ্জ, অথচ উৎসাহদীপ্ত মুখে বলিল—"ছেলে নয় তো কাকা, আমাদের প্রফেসার কার্ত্তিকবাবুর মেয়ে আরতি সান্যাল, এবার মিউজিক কম্পিটিশনে সেকেণ্ড প্রাইজ পেয়েছেন। ওঁর বাবা নিজেও এক জন মস্তবড় গুণী লোক।"

কাকা মনে মনে বলিলেন—"বটে—বটে! অথচ ছেলেটা এদিকে 'হাঁ' 'না'র বেশী জবাব দেয় না কখন। একেবারে আত্মহারা হ'য়ে গেল যে!" মনুজকে বলিলেন—"হ্যাঁ, তাই ভাবছিলাম—ছেলের গলা এত মিষ্টি হয় কোত্থেকে! তা কদ্দিন ওঁরা এসেছেন এ-পাড়ায় ?—ছিলেন না তো···"

"ঠিক একুশ দিন হ'ল আজ নিয়ে; ফার্ষ্ট জুলাই উঠে এসেছেন কিনা।"

কাকার মনে হইল প্রায় ঐ আন্দাজ সময় হইতেই ভ্রাতুষ্পুত্রও পাঠের সময় মাথা দুলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, গানের তালে। বলিলেন—"বেশ, তেমন আলাপ-পরিচয় থাকলে ওঁদের সঙ্গে, একদিন নেমন্তন্ন ক'রে এলে হ'ত মেয়েটিকে। দেখছি, বেশ শোনবার মত গান।"

মনুজ একেবারে বর্ত্তাইয়া গেল। বলিল—"খুব জানাশোনা আছে; প্রফেসার সান্যাল আমায় খুব স্নেহ করেন কি না। তা ভিন্ন ওঁর ছেলে, আরতি দেবীর ভাই কিরণ সান্যাল আমার সঙ্গে এক ক্লাসেই পড়ে,—আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড। আর মিস্ সান্যাল যে শুধু গানই গাইতে পারেন তা নয়, ব্যাঞ্জোতেও এমন চমৎকার হাত!···"

কাকা মনে মনে একটি "হুঁ" বলিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন—"ছোট মেয়ে, যদি একলা না আসতে চায় তো তোমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড কিরণকেও সঙ্গে সঙ্গে ব'লে এলে হয়।"

মনুজ বোধ হয় আহ্লাদের চোটে স্থানকালপাত্র ভুলিয়া গেল। বলিল—"না, আরতি সান্যাল তত ছেলেমানুষ নয় তো; বয়েস পনর-ষো···মানে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়েন। তা কিরণকে ব'ললে আরও ভালই হয়। বলেন তো পরশুই না হয় ব'লে আসি—রবিবার আছে···"

সব বোঝা গেল, বয়সটি পর্য্যন্ত। কাকা যাইতে যাইতে বলিলেন—"দাঁড়াও দেখি, পরশু আমায় বোধ হয় একবার হুগলী যেতে হবে।...তুমি কিন্তু বাপু পড়াশুনার দিকেও একটু মন রেখে যেও, বইগুলোকে তবলা ক'রে ক'রে উচ্ছন্ন দিলে আর কি হবে ?

(৩)

অপর কেহ হইলে তপস্যার নমুনা দেখিয়াই হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিত; মনুজের কাকা অন্য ধাতের মানুষ।

রবিবার দিন নিমন্ত্রণের কথা না তুলিয়া বলিলেন—"তোমার দেখছি রাত্তিরটায় গানবাজনার অত্যাচারে খুবই ব্যাঘাত হয়। পাড়াটাও হ'য়ে উঠেছে বড্ড খারাপ; দেখছি কিনা—সকালবেলা সতের নম্বর বাড়িতে কর্ত্তার সা-রে-গা-মা··· দশটা পর্য্যন্ত সে যেই আঙুল ঘুরিয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে

আফিসে বেরুল, ছেলেটা কর্ণেট বের ক'রলে। বিকেল বেলা তো সমস্ত পাড়াটা গন্ধর্ব্বপুরী হ'য়ে দাঁড়ায়। রাত্রে একটু ক্ষান্ত দে সব,—এই নতুন অত্যাচার জুটেছেন—লোকের তাল দিয়েই ফুরসৎ নেই তো প'ড়বে কখন ?"

মনুজ কাপড়ের পাড়ের রংটা ঘষিয়া ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কাকা মন্তব্যটি মনে ভাল করিয়া বসিবার অবসর দিয়া বলিলেন—"বেশ ব্যাঘাত হচ্ছে। আমি তাই ঠিক ক'রেছি তুমি সুমুখ রাত্তিরে পড়া বন্ধ ক'রে, মাঝ রাত্রে উঠে তোমার সাধনা কর,—থাক ওরা গানবাজনা নিয়ে। তুমি এগারটার সময় না-শুয়ে সাড়ে আটটার সময়ই শুয়ে পড়, কেমন ?"

মনুজ মাথা কাৎ করিয়া সম্মতি দিল।

কাকা বলিলেন—"বাকী থাকে ঘুম ভাঙার কথা। একটা এলার্ম ঘড়ি কিনে আনছি। সে ধরণের এলার্ম নয় যে একেবারে আচমকা ঝন্‌ঝন্ ক'রে উঠে হুড়মুড়িয়ে তুলে দিলে, তা'তে ব্রেনে ভয়ানক শক্ লাগে। আমি যার কথা ব'লছি এ বেশ একটা নতুন ধরণের জিনিষ বেরিয়েছে জার্ম্মেনী থেকে, আস্তে আস্তে আরম্ভ হ'য়ে মিষ্টি খানিকটা গতের মত বেজে প্রথমে ঘুমের ঘোরটা ভেঙে দেবে, তার পরে জোরে খানিকটা জলদ, সেটা মিনিট-কয়েক পর্য্যন্ত চ'লবে—মানে, ঘড়ি নয়, পেয়াদা—ঘুম না ভাঙিয়ে ছাড়বে না, তবে ঐ রকম গায়ে হাত বুলিয়ে। ব'ললে দু-তিন দিনের মধ্যে জার্ম্মেনী থেকে কন্‌সাইন্‌মেণ্ট এসে প'ড়বে। ততদিন চালাও কোন রকমে, তবে ওরকম ক'রে তাল দিও না বাপু; বাঁয়াতবলাই বা তুমি শিখলে কোত্থেকে ?—কই, আমি তো ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতাম না!…"

ফিরিয়া যাইতে যাইতে অকস্মাৎ মুঠায় দাড়ি চাপিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। নিজের মনেই বলিলেন—"নিশুতি রাত…আর মেয়েটার নামই কত রকম ভাবে আওড়ালে সেদিন!—আরতি—আরতি দেবী—আরতি সান্যাল—মিস্ সান্যাল…"

ভিতরে গিয়া বলিলেন—"পদ্যটদ্য লেখার বাই নেই তো? …দেখো বাপু, নির্জ্জন রাতের ও-ও আবার একটা বিপদ আছে…"

কুটনা কোটা হইতেছিল; মনুজ গিয়া বসিল। মুখ অন্ধকার, জোরে জোরে নিশ্বাস পড়িতেছে। কাকীমার ঠোঁটের কোণটা একবার যেন একটু কুঞ্চিত হইল; কিন্তু কোন প্রশ্ন করিলেন না। খানিক ক্ষণ গেল।

মনুজ একবার আড়চোখে চাহিয়া আবার মুখ ফিরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমারও তরকারি কুটছ নাকি ?"

"হ্যাঁ, অদ্দেকগুলো তোর আর বাকী অদ্দেক আমাদের সব্বা'র।"

এইটুকুই যথেষ্ট ছিল। মনুজ একেবারে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।—"ঠাট্টা! কিন্তু দেখো, আমি যদি আর কিছু খাই তো…"

কাকীমা হঠাৎ কড়া চোখে চাহিয়া উঠিতে বলিল—"বেশ, দিব্যি না ক'রতে দাও তো ব'য়ে গেল, কিন্তু কে খাওয়াতে পারে আমায় একবার দেখব।…'রাত জেগে তপস্যা কর।'… বেশ, নিদ্রা যদি ছাড়তে হয় তো আহার নিদ্রে আমি দুই-ই ছাড়ব—ঘর ভেঙে ফেললেও দোর খুলব না, দেখি। মস্ত দোষ ক'রেছে সবাই গান গেয়ে…অত গানে ভয় তো চল না সবাই ফ্যারাওদের পিরামিডের ওপর গিয়ে ব'সে থাকি… আর অমনি খপ ক'রে যে ব'লে বসলে তাল দিচ্ছিলাম—মিছে অপবাদ—কানের কাছে ও-রকম কচ্‌কচ্ ক'রলে কখন অমন দ্রুত ঠুংরির তালে…মানে, ইয়ে…আচ্ছা বেশ, তুমি যে ব'ললে এলার্ম ঘড়ি কিনে আনবে—আমি যদি সেদিনকার কথা তুলে বলি যে সে-সব যুগে যেমন ইলেক্‌ট্রিক লাইট ফ্যানের নীচে ব'সে তপস্যা করত না, তেমনি যোগ-নিদ্রা ভাঙবার জন্যে এলার্ম ঘড়িরও বালাই ছিল না—তখন? তা হ'লেই তো হবে—মোনা হ'য়ে উঠেছে এক নম্বর বাচাল—তার্কিক! বেশ, আমি কোন তর্ক ক'রব না, কিন্তু দেখো, এই শপথ…শপথ না ক'রে বলছি…"

কাকীমা চটিয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু শপথ না করায় ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন—"আবার রাতজাগা, এলার্ম ঘড়ি—এ সবের হাঙ্গাম কেন বাপু?—একে তো দুধের দাঁত না ভাঙতে ভাঙতে চোখে চশমা—পড়ে পড়ে চোখের ওপর অত্যাচার ক'রেই তো?"

মনুজ আবার একবার জ্বলিয়া উঠিল, এবার সহানুভূতির বাতাসে। বলিল—"নাঃ, আমার আর ওসবের দরকার

আশেপাশে সমস্ত জায়গাটা ছাইয়া ফেলিয়াছে,—কুল্—ফুল্—ফুল্—ফুল্—কুল্···

আরতি নামিয়া নিজেই সুইচটা তুলিয়া দিল। অনেক দিনের নির্ব্বাসিত আলো যেন আচমকা ফিরিয়া আসিয়াছে, ঘরটি ভরিয়া গেল।

সামনেই আরতি দাঁড়াইয়া। দুষ্টামির হাসিতে-ভরা ঠোঁটের একটা কোণ মুঠা দিয়া চাপা। চুল, ভ্রূ, চোখের পাপড়ি আর সিক্ত বসন হইতে শীকরের মুক্তা ঝরিয়া পড়িতেছে।

এদিকে এত আলো, তবু কিন্তু ঘরটাতে কেমন একটা জড়তা, একটা অস্পষ্টতা। মনুজ ভাবিল—একি তাহার চোখের লজ্জার জন্য নাকি?···অসম্ভব নয়,—আরতি অলট্রা-মডার্ণ হইয়া তাহাকে যেন অনেক পেছনে ফেলিয়া দিয়াছে,—তাল রাখিয়া ওঠা যায় না। লজ্জা ঠেলিয়া, নেহাৎ কিছু একটা বলিবার জন্যই বলিল, "আলোটা বেশ খুলছে না যে, বাদলের জ'লো হাওয়ার জন্যেই না কি বল ত?"

চপল হাসিতে আরতির বৃষ্টিতে-ভেজা মুখখানি ঝিকমিক্ করিয়া উঠিল। প্রগল্‌ভার মত বলিল—"শোন কথা!—আরতির সামনে কখনও আলো খোলে নাকি?"

চোখের কোণে কোথায় যেন নিজের অতি-বেহায়াপনার একটু লজ্জা, মুক্তির পাশে পাশে সঙ্কোচ, আর সেই হাসির কুল্‌কুল্ শব্দ, বর্ষার সঙ্গে ওর গলায় যেন ধারা নামিয়াছে।

আরতির আবির্ভাবটা মনুজের যেন অদ্ভুত ভাবে কি এক রকম মনে হইতেছিল,—অত্যন্ত মিষ্ট, প্রায় অসম্ভবের কোটায়; অতিশয় আশ্চর্য্য; প্রায় অলৌকিক, তাহারই মধ্যে আবার নিতান্তই অন্তরঙ্গ একটা ঘটনা তাহার জীবনের সম্পর্কে সব চেয়ে সহজ সত্য;—এতই সহজ যে অপার্থিব হইয়া অনায়াসেই সম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, এমন একটি সত্যের আলোকে স্পষ্ট যে তাহার সামনে কাকা—তপস্যা—এলার্ম ঘড়ি—এ সবই যেন কুয়াশার মত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। মোটের উপর কি রকম একটা অনুভূতি—বাস্তবেও যেন স্বপ্ন, স্বপ্নেও যেন বাস্তব। এত পলকা একটা-কিছু যে সাহস করিয়া একটা প্রশ্ন করিয়া উঠিতে পারিতেছে না—মনে হইতেছে আসার কারণ সম্বন্ধে কোন জবাবদিহি করিতে গেলেই সমস্ত ব্যাপারটি কোন্ দিক দিয়া যেন মিলাইয়া যাইবে।

মনুজ একটু লজ্জিত হাসি হাসিয়া বলিল—"ব'সো আরু।"

বর্ষার জলের মতই আরতি যেন হাসির স্রোত বহাইবার পথ খুঁজিতেছে। হাসিয়া হাসিয়া বলিল—"কোথায়?—ঐ একফালি চৌকিতে? মাফ কর, আমার অত তপস্যার জোর নেই—প'ড়ে মরব, অত সূক্ষ্ম জিনিষ সহ্য হবে না। বরং তুমি ব'স ওটাতে, কিংবা শুয়ে পড়। আমি এই চেয়ারটাতে ব'সে যা করতে এসেছি তাই করি।"

ব্যাঞ্জোটা বাহির করিয়া কোলে রাখিল। মনুজ অতিমাত্র আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল—"ওটা কোথা থেকে বের করলে?—ভিজে যায় নি?"

পাতলা কি একটা আস্তরণ,—সেটা খুলিতে খুলিতে আরতি উত্তর করিল—"না, ওটা আমার অন্তরের জিনিষ, প্রাণের পাশাপাশি লুকান ছিল, ভিজলে তো প্রাণও ভিজে যেতে পারত?—নয় কি? বল না···ও, তুমি আবার দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র, ব'লবে—প্রাণ জলে ভেজে না, অনলে পোড়ে না।"

দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, "এক ধরণের অনলে কিন্তু পোড়ে প্রাণ, না গা?"

মনুজ হাসিয়া বলিল—"তুমি আজ হঠাৎ বড় বাচাল হ'য়ে উঠেছ আরু।"

"আজ বিকেল থেকে কেমন যেন হ'তে ইচ্ছে হয়েছে,—তুমি অনেক কথা বাকী থাকতেই তখন উঠে এলে কিনা; তার পর আবার এই চমৎকার বর্ষা রাত্তির···"

হঠাৎ সামনে একটু ঝুঁকিয়া বলিল, "আচ্ছা তুমিও হ'তে না বাচাল, কাকার কাছে যদি অমন দাবড়ানিটা না খেতে?—বল না?"

কৌতুকায়ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, চাঁদে জ্যোৎস্নার মত তাহাতে অফুরন্ত হাসি যেন জমান আছে।

মনুজ অনুভব করিল ক্রমশ তাহার জিহ্বাটাও বেশ সবল হইয়া আসিতেছে,—বোধ হয় কাকার দাবড়ানির জেরটা কাটিয়া আসিবার জন্যই। হাসিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল এমন সময় একটা দমকা হাওয়া আরতির কোলের ব্যাঞ্জোটার উপর দিয়া বহিয়া সমস্ত তারগুলা, একসঙ্গে সমস্ত পর্দায় চাপিয়া যেন ঝনঝনাইয়া দিল; একটা তীব্র মিঠা ঝঙ্কারে সমস্ত ঘরটা যেন ভরাট হইয়া গেল। মনুজ বলিল—

"তোমার সঙ্গিনীও বাচাল হ'য়ে উঠেছে আরু; তোমাদের দু-জনের প্রাণে প্রাণে একটু বিশ্রম্ভালাপ হোক্, আমি দুষ্যন্তের মত শুনি—চোখবোজার আড়াল থেকে।"

আরতির মুখের ভাবটি নিমেষে নরম হইয়া আসিল, কি একটা যেন সুখের বেদনায়। ব্যাঞ্জোটি কোলে রাখিয়া, বুকে চাপিয়া বলিল—"হ্যাঁ শোন ওর কথা শোনাতেই ও আমায় আজ এই বর্ষার মাঝরাতে ঘরছাড়া ক'রে টেনে এনেছে।"

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঞ্জো রণ্‌রণিয়া উঠিল। সে কি সঙ্গীত! মনুজের মনে হইল চাঁপার আধ ফুটন্ত কলি হইতে গন্ধের মত আরতির দুটি হাতের অঙ্গুলিগুচ্ছ হইতে সঙ্গীত ঝরিয়া পড়িতেছে। অবিশ্রান্ত বর্ষার ঝর্‌ঝর্ তালের সঙ্গে ড্রিম্—ড্রিম্—ড্রিম্—কখন মিলিয়া গলিয়া বেদনাতুর হইয়া এই অশ্রুময়ী রজনীর সঙ্গে এক হইয়া গেল—অতল অন্ধকারে, মিলনের সম্ভাবনার বাহিরে কি যেন একটা চিরবিরহের সুর; অন্ধ, নিষ্ফল অনুসন্ধানের ব্যথায় ভরা। অশ্রুতে মনুজের চোখের পাতা ভারী হইয়া আসিল। একটা তন্দ্রায় যেন ক্রমেই আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, কেমন একটা ভয় হইতেছে—এই আসন্ন নিদ্রার মধ্য দিয়া সে এমনই একটা অতলে গিয়া পড়িবে যে সেখান হইতে আর শত চেষ্টাতেও আরতির নাগাল পাওয়া যাইবে না।···তবু এই না-পাওয়ার আশঙ্কা—এও যে কত মধুর—কি যে অশ্রুতে-ভরা সুখ···

সুর বহিয়াই চলিয়াছে—রিম্ ঝিম্, রিম্ ঝিম্—কখন মৃদু,—যেন আর শোনাই যায় না; সহসা কখন ঝঙ্কৃত—নিজের পূর্ণতায়, নিজের গতির আবেগে আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া।···

মনুজ বলিল—"আরু, তুমি-আমি যেন হচ্ছি নদীর দুটি কূল; মাঝখান দিয়ে এমনি চিরবিরহের ধারা আমাদের দু-জনকে চিরকালের জন্যে এক ক'রে চলুক। মন্দ কি আরু?"

হঠাৎ একটা প্রবল ঝন্‌ঝনানির পর সঙ্গীত থামিয়া গেল। আরতি চেয়ার ছাড়িয়া, ব্যাঞ্জো রাখিয়া আসিয়া চৌকির নীচে মনুজের সামনেটিতে বসিল; দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, তোমার কাকা চিরকাল নদী হ'য়ে আমাদের তফাৎ ক'রে রাখুন, আর তুমি দিব্বি থাক তোমার তপস্যা নিয়ে··· তবে ঐ রইল তোমার ব্যাঞ্জো—কি যে সাধ!···"

মনুজ মুখটি কাছে আনিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "আমার যে কি তপস্যা—কি সাধ, তুমিও কি জান না আরু?"

হাসিতে আরতির কিছু অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছে, কিছু চোখেই টল্ টল্ করিতেছে,—সেটুকু আদর করিয়া মুছাইতে গিয়া মনুজের হাতটা খানিকটা শূন্যে গিয়া ভারী হইয়া গেল; পতন হইতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল।

ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালে দেখিল—একটা বাজিয়া দশ মিনিট হইয়াছে। মনে হইল যে এলার্মের শেষ ঝঙ্কারের সুর তখনও হাওয়ায় কোথায় একটু ভাসিয়া বেড়াইতেছে। খানিক ক্ষণ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ঘড়িটার দিকে চাহিয়া রহিল। বাহিরে বর্ষা, মাথার কাছের জানালাটা খুলিয়া গিয়া সজোরে আর্দ্র বাতাস আসিতেছে। চৌকির একধারে আসিয়া পড়িয়াছিল—আর একটু হইলেই হইয়াছিল আর কি!

বই লইয়া সাধনা করিবার আর প্রবৃত্তি হইল না; মনে হইল যেন এখনও আরতি নীচে, বুকের কাছটিতে বসিয়া আছে। আবার এমনই একটি স্বপ্নের মধ্যে একবার ভাল করিয়া তাহাকে যদি পাওয়া—এই আশায়, জড়িমা কাটিবার পূর্ব্বে, মনুজ আবার তাড়াতাড়ি—আরতির বিদ্রূপে সরসিত সেই সঙ্কীর্ণ চৌকিটায় শুইয়া পড়িয়া নিদ্রার সাধনায় লাগিয়া গেল। ব্যাঞ্জোর প্রত্যাশায় ঘড়িটাতে এলার্মের জন্য একটু দমও দিয়া দিল—অবশ্য বাঁ-দিকে চাবি দিয়াই।

* * *

পরের দিন কাকা বলিলেন—"নাঃ, রাত জেগে পড়াটা তোমার পক্ষে এখন ঠিক হবে কিনা সে-সম্বন্ধে মন স্থির করতে পারছি না—ভেবে ভেবে কাল আমারই ঘুম হয় নি, তাইতে শরীরটা এত খারাপ হয়েছে···থাক্ না-হয়, দু-এক জন ভাল ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি। ঘড়িটা আপাততঃ আমার ঘরেই রেখে এস।"

কাকীমা কুটনা কুটিতেছিলেন, মুখ অন্ধকার করিয়া মনুজ পাশে গিয়া বসিল। একবার আড়চোখে দেখিয়া

বলিল—"অত আলু কি হবে ?—আজ সাত জনের তো মোটে রান্না।"

"কেন আজ আবার অষ্টম জনটির কি হ'ল ?"

মনুজ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"নাঃ, কাজ কি কিছু হ'য়ে, মনা তো মানুষ নয়! এই এক রকম হুকুম, তক্ষুনি আবার অন্য রকম। কত ইয়ে ক'রে—কত রকম কত কি ক'রে যদি আরম্ভই ক'রলাম একটা সাধনা—দু-দিন দেখাই যাক্; না,—'ঘড়ি আজ আমার ঘরে দিয়ে আসিস্।'···কেন, সব থাকতে ঘড়িটার ওপরই এত আক্রোশ কেন ?—ও তো কারুর ব্যাঞ্জোও নয়, এস্রাজও নয়···আমি কক্ষণও রেখে আসব না। না হয় ব'লে বেড়াবে 'ভাইপো আমার অবাধ্য হ'য়েছে। বেশ, হ'য়েছে তো হয়েছে।···আমার তপস্যার, সাধনার ঘড়ি—ও আমি কোন মতেই ছাড়ব না।···একটা মায়া জন্মে যায় না ?···"

শালের বনে

শ্রীগোপাললাল দে, বি-এ

শেষ ফাগুনে শালের বনে কেউ কি গিয়েছ ?
নবীন আশার, নীরব ভাষার হরষ নিয়েছ !
নূতন লতায় নূতন পাতা,
তরল শ্যামলতায় গাঁথা,
দোদুল দোলে শিহর তোলে, পরশ দিয়েছ !
শেষ ফাগুনে শালের বনে কেউ কি গিয়েছ ?

গাঁয়ের পারে পথের ধারে যেমন দেবে পায়,
কেমন যেন গন্ধ আনি বইবে বন-বায়,
নূতন স্নেহের সাগর-সেঁচা,
একটু মিঠে একটু কাঁচা ;
বক্ষে তোমার চক্ষে তোমার ভরিয়ে নিয়েছ !
শেষ ফাগুনে শালের বনে কেউ কি গিয়েছ ?

শ্যাম যমুনায় বাজবে বাঁশী কোকিল কুহরায়,
বনের টানে ঘরের পানে ফেরাই হবে দায়,
মনের ভুলে চরণ চলে,
কোন্ স্বপনে অঙ্গ ঢলে,
এমন ক্ষণে দেখবে বনে কখন এয়েছ !
শেষ ফাগুনে শালের বনে কেউ কি গিয়েছ ?

প্রজাপতির হাজার পাখা নাচে শালের গায়,
আমলকীর পল্লবেতে দোলে ব্যাকুল বায়,
চামর দোলে সোঁদাল ফুলে,
কাঞ্চনেতে ভ্রমর বুলে,
পলাশ বুঝি ? বিপুল বনে গুলাল ছেয়েছ !
শেষ ফাগুনে শালের বনে কেউ কি গিয়েছ ?

ঝোপের আড়ে কি ফুল ফোটা দেখতে পাবে না,
গন্ধে তাহার আকুল ক'রে বইবে বন-বা',
অবাক হবে মিষ্ট বাসে,
ভাববে নাগরিকা আসে,
ক্ষণের মাঝে নগর সাঁঝে ফিরিয়ে পেয়েছ !
শেষ ফাগুনে শালের বনে কেউ কি গিয়েছ ?

মউল ফুলে অনেক মধু, ঝিন্টিমধু পিয়া',
পরীর পাখে প্রহর যাবে কোন্ সে পথ দিয়া,
চমক ভাঙি শুনবে কুহু,
কুরচিফুল শাখায় মুহু,
তখন তুমি স্বপন-লোকে প্রয়াণ দিয়েছ,
শেষ ফাগুনে শালের বনে কেউ কি গিয়েছ ?

"চণ্ডীদাস-চরিত"

(২)

এত কহি প্রেমমন্ত্র জপিতে জপিতে।
ধীরে ধীরে চলে চণ্ডী রামীর পশ্চাতে ॥
পাগল হইল হায় দ্বিজ চণ্ডীদাস।
যেই দেখে সেই বলে করি উপহাস ॥
সমাজের ভয় নাই লজ্জা নাই করে।
রামী সঙ্গে চণ্ডীদাস থাকে এক ঘরে ॥
দিবস রজনী তার রামী সঙ্গে খেলা।
রামী ধ্যান রামী জ্ঞান রামী জপ-মালা ॥
ছাপিত না রল কিছু সবে গেল জানা।
লজ্জা ভয় নাই তবু নাই শুনে মানা ॥
আর এক আশ্চর্য্য কথা শুন গো জননী ॥
রামিণীর আছে এক কনিষ্ঠা ভগিনী ॥
রোহিণী তাহার নাম দেখিতে স্নন্দরী।
বাপের আদুরে নাম হয় বিদ্যাধরী ॥
ব্রাহ্মণ-সমাজপতি বিজয়নারাণ।
তার পুত্র দয়ানন্দ গুণে অনুপাম ॥
ফুসলায়ে তার সাঁথে গোপনে রামিণী।
রোহিণীর বিভা দিলা অদ্ভুত কাহিনী ॥
পুরুত আছিলা তথা দ্বিজ চণ্ডীদাস।
ঘটিল সে ব্রাহ্মণের কিবা সর্ব্বনাশ ॥
জাতি কুল মান এবে সব গেল চলি।
ত্যজিল আহার নিদ্রা ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী ॥
ছুন্নুর গ্রামের নাম করিলে শ্রবণ।
পথ ভাঙ্গি চলি যায় বিদেশী ব্রাহ্মণ ॥
✓] মাঝে মাঝে আসে বটে কুটুম্ব সকল।
কিন্তু হায় কেহ নাহি খায় অন্নজল ॥
অগ্নিশর্ম্মা হয়ে তবে বিজয়-নারাণ।
বহুতর ব্রাহ্মণের করিলা আহ্বান ॥

সবে মিলি এল তারা মোর সন্নিকটে।
সব কথা খুলিয়া কহিল অকপটে ॥
বহু চিন্তা করি আমি কহিনু তখন।
আমার সুযুক্তি এক শুনহে ব্রাহ্মণ ॥
রামী চণ্ডীদাস আর ছুন্নুর আখ্যান।
যত দিন এ জগতে রবে বিদ্যমান ॥
ঘুচিবে না এ কলঙ্ক কহিলাম সার।
তাই বলি যুক্তি এক শুনহ আমার ॥
সঙ্গে সঙ্গে রামিণীরে করে দাও দূর।
রাখহ গ্রামের নাম যুবরাজপুর ॥
প্রায়শ্চিত্ত করি চণ্ডী উঠুক সম্প্রতি।
সবে মিলি ফিরাহ তাহার মতিগতি ॥
এই দণ্ডে রাজ্যমধ্যে করিব প্রচার।
এ গ্রামে ছুন্নুর কেহ নাহি কহে আর ॥
না বল ব্রহ্মণ্যপুর শুন সর্ব্বজনা।
এ গ্রামের নাম আমি থুইনু ছত্রিনা[১] ॥
মম আজ্ঞা ধরি শিরে ধন্য ধন্য রবে।
আশীর্ব্বাদ করি মোরে চলি গেলা সবে ॥
জোর করি রামিণীরে পাঠাইলা কাশী।
বুঝায় চণ্ডীরে তবে সবে অহনিশি ॥
চোরা না শুনয়ে কভু ধরম কাহিনী।
তবু কাঁদে চণ্ডীদাস বলি রামী রামী ॥
বহুমতে চণ্ডী তবে হইল সুধীর।
তার পর প্রায়শ্চিত্ত দিন হৈলা স্থির ॥
শুন মাগো রামী এথা বারাণসী পুরে।
রহয়ে ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ চন্দ্রচূড় ঘরে ॥
মা বলিঞা ডাকে চন্দ্র রামী কহে বাবা।
পিতার অধিক তার করে নিত্য সেবা ॥

---

১) রাজা হামীর-উত্তর উত্তর দেশ হইতে আগত ছত্রি ছিলেন। ছত্রি + নগর = ছত্রিনা।

রাইমণি দিন দিন করয়ে রন্ধন ॥
মহানন্দে চন্দ্রচূড় করেন ভোজন ॥
এত ভক্তি ভালবাসা কভু দেখি নাই।
তেঞি বৃদ্ধ গুপ্তধন দেখাইলা তায় ॥
কত রত্ন প্রবাল মাণিক্য টাকাকড়ি।
মৃত্তিকার তলে পুতা রহে হাড়ি হাড়ি ॥
চন্দ্রচূড় বলে রাই জীবনান্তে মোর।
এই গুপ্ত রত্ন ধন জানিবি যে তোর ॥
কে কুথাও নাঞি মম তুঁহা ছাড়া রাই।
গুপ্ত ধন তোরে আমি দেখাইনু তাই ॥
তুমারে দিলাম আমি এ সব সম্পত্তি।
তুমি নিলে হবে মোর পরলোকে গতি ॥
রামী কহে দেখ বাবা করিয়া স্মরণ।
আছে কি না আছে কোথা তুমার আপন ॥
চন্দ্র কহে ছিলা এক নিজের ভাগিনী।
ব্রহ্মণ্য-নগরে তার বিভা হয় জানি ॥
নাম তার পদ্মাবতী পুত্রবতী কি না।
মরেছে কি বাঁচে আছে কিছু নাঞি জানা।
জামাতার নাম হয় বিজয়-নারাণ।
বহুকাল নাঞি দেখা না জানি সন্ধান ॥
অকস্মাৎ আমি যদি তোর কোলে মরি।
যা পার করিবে তুমি এ ধন তুমারি ॥
হয়াছে অনেক বেলা পাত এবে পীঁড়ি।
ক্ষুধায় কাতর আমি অন্ন আন বাড়ি ॥
যেমন পশিবে রাই রন্ধন-শালায়।
চন্দ্রের চৌরাশী বন্ধু আইল তথায় ॥
পাতিলেন রাইমণি সবাকার পীঁড়ি।
সবাকার তরে অন্ন আনিলেন বাড়ি ॥
চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় খাওাইলা সবে।
অবাক হঞিয়া চন্দ্র মনে মনে ভাবে ॥
দেড় পুয়া তণ্ডুলের অন্নেতে কেমনে।
৫/] খাওাইলা রাসমণি চৌরাশী ব্রাহ্মণে ॥
দেবী কি মানবী কিছু বুঝিতে না পারি।
কেমনে চিনিব এবে কি উপায় করি ॥

গেল যবে বন্ধুগণ মাগিয়ে মেলানি।
গেল চলি চন্দ্রচূড় যথা রাসমণি ॥
কহিলেন কর ধরি কহ মা রামিণী।
কোথায় নিবাস তব কে বট আপুনি ॥
হাসিমুখে রাইমণি কহিতে লাগিলা।
সামান্যা মানবী আমি রজকের বালা ॥
কাঁপিয়া উঠিল বিপ্র তবু কহে পুন।
ব্রাহ্মণের জাতিনাশ তবে কর কেন ॥
সহাস্য বদনে রাই কহিল আবার।
সবে কয় গঙ্গাজলে না চলে বিচার ॥
গঙ্গাজলে আমি তব অন্ন রাঁধি তাই।
কোন দিকে দোষ তার দেখিতে না পাই ॥
শ্রীক্ষেত্রে এ কাশী-ধামে জাতির বিচার।
যে করে আছে কি বাবা নিস্তার তাহার ॥
মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে কহে চন্দ্রচূড়।
তা বলে কি বিষ্ঠা হবে মাথার ঠাকুর ॥
সত্য যদি সে বিশ্বাস আছয়ে তুমার।
বিশ্বেশ্বরে পূজ দেখি সাক্ষাতে আমার ॥
যদি তিনি পূজা তব লন শির পাতি।
তাহলে বুঝিব তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
প্রত্যয় না হয় কিন্তু তুমি রজকিনী।
তুমি যে মা অন্নপূর্ণা হরের ঘরণী ॥
কল্য প্রাতে পরীক্ষা করিবে তোর বাবা।
তখন পড়িবে ধরা হও তুমি যেবা ॥
এই কর্ম্মে আমি মাগো পাকায়েছি চুল।
মোরে যে ভুলাতে চাস সেটা তোর ভুল ॥
হাসিতে হাসিতে রাই গেল অপসরি।
উঠি বৈসে চন্দ্রচূড় স্মরিয়া শ্রীহরি ॥
প্রভাতে উঠিয়া রাই লঞে স্বর্ণঘটে।
উপনীত হইলা আসি পঞ্চগঙ্গা ঘাটে ॥
স্নান করি উঠি রাই পাঞিল দেখিতে।
আসে ভাসি পুষ্প এক জাহ্নবীর স্রোতে ॥
অপূর্ব্ব সোনার কান্তি পুষ্প মনোহর।
ঝাপ দিয়া ধরে রাই বাড়াইয়া কর ॥

যতনে আনিয়া তায় আপন গৃহেতে।
চন্দ্রচূড় সাথে যায় মহেশে পূজিতে॥
মন্দিরে পশিবে যবে চন্দ্রচূড় রামী।
চৌদিকে আসিয়া পাণ্ডা ঘেরিলা অমনি॥
শত মুখে হাঁক দেয় কোথা যাস তোরা।
রামী কহে শঙ্করে পূজিতে যাই মোরা॥
পাণ্ডাগণ কহে সঙ্গে পাণ্ডা না দেখি যে।
রামী কহে শঙ্করে পূজিব মোরা নিজে॥
হুঙ্কারি কহিলা সবে এ বড় কৌতুক।
নিজে তোরা দিবি পূজা এত বড় বুক॥
শঙ্করে পূজিতে কারো নাঞি অধিকার।
বিশ্বেশ্বর পূজা মাত্র মো সবার ভার॥
কুপিয়া কহিল রামী নির্ব্বোধ তুমারা।
ভক্তিপ্রিয় বিশ্বেশ্বর কারো নহে ধরা॥
অর্থলোভে কর সবে শঙ্কর-পূজন।
তাথে কিবা হয় জান নিরয়-গমন॥
ভক্ত-মনোরথ যদি পুরিতে না দিবে।
নিশ্চয় তাহলে সব নরকেতে যাবে॥
চন্দ্রচূড় কহে মাগো না কহ এমত।
শঙ্করের পাণ্ডা এঁরা সবার পূজিত॥
৫০। রামী কহে বাবা এরা অপূর্ব্ব শয়তান।
অর্থের পিশাচ ইথে না ভাবিহ আন॥
সভয়ে কহিলা এক পাণ্ডা স্বচতুর।
কে মা তুমি কহিয়া সংশয় কর দূর॥
সামান্যা রমণী তুমি নহ কদাচন।
তোর বাক্য শুনি মন হইল কেমন॥
রামী কহে আমি ছাড়া আর কিছু নই।
সত্য প্রাণ আমার না জানি সত্য বই॥
ব্রহ্মণ্যপুরেতে বাস জাতিতে রজক।
সনাতন নাম ধরে আমার জনক॥
লক্ষীপ্রিয়া নাম ধরে গুণময়ী মাতা।
চণ্ডীদাস হয় মোর আরাধ্য দেবতা॥
হাসিয়া কহিল পাণ্ডা বুঝিলাম এবে।
তা না হলে এত শক্তি তোঁহে কি সম্ভবে॥

সনাতন বিশ্বপতি জানি তাঁর লীলা।
সত্য বটে ধুয়ে থাকে জগতের মলা॥
রজকের কার্য্য তার জানি তা নিশ্চয়।
তাঁহার বনিতা লক্ষ্মী এত মিথ্যা নয়॥
তেঞি মা তুমার এত হৃদয়ের জোর।
না বুঝালে কে বুঝিবে মতিগতি তোর॥
কিন্তু না জানিতে দিলি কেবা চণ্ডীদাস।
ধরা দিঞে কেন পুন লুকাইতে চাস॥
ব্রহ্মণ্যপুরেতে মাগো নিত্য যার বাস।
আরাধ্য দেবতা তার কে সে চণ্ডীদাস॥
রামী কহে সব কথা কহিব পশ্চাতে।
এখন চলিনু আমি শঙ্করে পূজিতে॥
এত কহি পুরীমধ্যে পশিলা সত্বর।
দেখিলা শঙ্কর আছে পাতি দুই কর॥
বহিছে জটায় তার তরল তরঙ্গা।
ডমরুর সহ ভূমে পড়ি আছে শিঙ্গা॥
বাঘাম্বরে আঁটা কটি গলে হাড়মাল।
ধরণী চুম্বিয়া শিরে দুলে জটাজাল॥
সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া ফণী ফোঁস ফোঁস করে।
অবাক হইয়া সবে থাকে জোড় করে॥
দুই করে রাসমণি ধরি ফুলডালা।
প্রেম গদ-গদ-স্বরে কহিতে লাগিলা॥

আসিয়াছি আমি রজকিনী রামী
পূজিতে চরণ তব।
হঞে অনুকূল পদে ধর ফুল
নিজগুণে দেবদেব॥
তোমা বিনু আর কে আছে আমার
কর পার ভবসিন্ধু।
চরণে শরণ লইনু এখন
হে দীনজনার বন্ধু॥

এত কহি মহেশ্বরে স্মরি মনে মনে।
যেমন সে দিবে ফুল শঙ্কর-চরণে॥
হাঁ হাঁ করি ভোলানাথ ধরি দুই করে।
কহিতে লাগিলা ভাসি প্রেমানন্দ-নীরে॥

এই ফুলে শুন রাই তীর্থরাজে বসি।
পূজিলা প্রভুর পদ অনেক সন্ন্যাসী ॥
প্রভুর প্রসাদী ফুল দাও মোর করে।
তোর গুণে ধন্য হই ধরি শির পরে ॥
যাহ তুমি রাসমণি লঞে চণ্ডীদাসে।
প্রভুর সে গুণগান কর গিয়া দেশে।
বিলাও সকলে দোঁহে রাধাকৃষ্ণ নাম।
আমার আদেশে পূর্ণ হবে মনস্কাম ॥
এত কহি অন্তর্দ্ধান হন পশুপতি।
চৌদিকে উঠিল তবে রামীর খেআতি ॥
চন্দ্রচূড় কহে মোর সার্থক পরাণি।
কন্যা-রূপে তুমি মোর হরের ঘরণী ॥
তোর করে অন্ন খাই বহু ভাগ্য ফলে।
দেখিস মা মোরে তুই পিণ্ড দিস মলে ॥
যা ইচ্ছা করিস তুই মোর স্থাপ্য ধনে।
চল মা এবার তুমি আপন ভবনে ॥
কাশী-ধামে কিমতে কোথায় থাকে রাই।
জানিবারে গুপ্তচর পাঠাইনু তাই ॥
হরিহর নাম তার ফিরি আসি ঘরে।
সকল বৃত্তান্ত মাগো কহিলা বিস্তরে ॥
হেথায় রোহিণী কাঁদে গুমরি গুমরি।
শুদ্ধ হৈল দয়ানন্দ প্রায়শ্চিত্ত করি ॥
প্রায়শ্চিত্ত কৈল চণ্ডী ভোজনের কালে।
পাতা পাতি বসি গেলা ব্রাহ্মণ সকলে ॥
সুপরিচারক যত অন্ন দেয় পাতে।
চণ্ডী দেয় অন্নথালা বহিয়া পশ্চাতে ॥
বাহিরায় বহুজন ব্যঞ্জন লইঞা।
পাতে পাতে দেয় সবে পর পর গিয়া ॥
পুন বাহিরিল চণ্ডী অন্নথালা হাতে।
কোথা হতে আসি রামী কহিলা সাক্ষাতে ॥
চণ্ডী চণ্ডী চণ্ডীদাস পুরুষ-রতন।
প্রায়শ্চিত্ত কর তুমি একি বিড়ম্বন ॥
জেতে জাত দিলে তুমি আমি যাব কোথা।
কোন দিন চণ্ডী তুমি ভেবেছ সে কথা ॥

রমণীর জাতি গেলে জাতি নাঞি পায়।
ভাসাইলি শেষে চণ্ডী অকূলে আমায় ॥
আয় আয় করি তবে শেষ সম্ভাষণ।
বলি রামী চণ্ডীদাসে দিলা আলিঙ্গন ॥
চণ্ডীর দুহাতে ধরা ছিল অন্নথালা।
বার করি ভিন্ন হাত তারে আলিঙ্গিলা ॥
কেহ বলে একি হল আশ্চর্য্য ঘটনা।
চণ্ডীদাস মানুষ না আরো কোন জনা ॥
অন্নথালা রহে ধরা চণ্ডীর দুহাতে।
বাহিরিল দুটি হাত আবার কি মতে ॥
কেহ বলে কি যে বল পাগল সবাই।
আমিও ত আছি চেয়ে কিছু দেখি নাই ॥
কেহ বলে একি রামী এল কোথা হতে।
আলিঙ্গিলা চণ্ডীদাসে সবার সাক্ষাতে ॥
মার আজি দুই জনে ক্ষমা নাহি দাও।
একসঙ্গে বাঁধি দোঁহে অনলে পোড়াও ॥
হাঁকা-হাঁকি করি সবে উঠিয়া দাঁড়ায়।
ঝাঁকা-ঝাঁকি করে খাব নাই খাব নাই ॥
কেহ কহে থাম থাম কেহ কহে চল।
চণ্ডালের ঘরে কেবা খাবে অন্নজল ॥
অন্য জাতি হলে হত একেবারে ধোবা।
চল চল শীঘ্র চল জাতি দিবে কেবা ॥
নির্লজ্জ পামর ভেড়ুয়া মূর্খ অপকৃষ্ট।
ব্রাহ্মণের জাতিকুল সব কৈলি নষ্ট ॥
শ্রীমধুসূদন তুমি শীঘ্র কর পার।
ঠাপ ছাড়ি বৃদ্ধগণ হৈলা আগুসার ॥
লাঠি সোটা লঞা তবে যুবকের দল।
রামী পানে ছুটে যেন নদী-ভরা জল ॥
মার মার কাট কাট শব্দ মাত্র শুনি।
পলকেতে অন্তর্দ্ধান হৈল রাসমণি ॥
সবে চলি গেলা তবে হইঞা ফাঁপর।
নারীগণ গেল পরে যে যাহার ঘর ॥
দেবীদাস উঠি তবে চণ্ডীদাসে বলে।
তোর মত ভাই পাইনু বহু ভাগ্য ফলে ॥

মানুষ করেছি তোরে কাঁধে পিঠে ধরি।
আয়রে লক্ষণ ভাই আয় বক্ষে করি ॥
৬৮/] চণ্ডীদাসে বুকে ধরি নাচে দেবীদাস।
যে দেখে সে কতমতে করে উপহাস ॥
কহে দেবী ভাতৃপ্রেমে হয়ে মাতআরা।
শিবতুল্য ভাই মোর না চিনিলি তোরা ॥
কে যে চণ্ডী একদিন চিনিবি সবাই।
হাস একদিন আর বেশী দিন নাই ॥
আর এক কথা বলি শুন দিয়া মন।
মোর বাক্য মিথ্যা না হইবে কদাচন ॥
চণ্ডীর বিরহানলে পুড়ে যদি দেবী।
যথার্থ অনলে তোরা সর্ব্বস্ব হারাবি ॥
এই যে খালি না অন্ন অহঙ্কারে মাতি।
রাখিব এ অন্ন আমি গৃহমধ্যে পুতি ॥
জানে রাখ একদিন মৃত্তিকায় তুড়ি।
খাইবি এ অন্ন তোরা করি কাড়াকাড়ি ॥
এত কহি দেবীদাস গৃহমধ্যে পশি।
খনন করিল গর্ত্ত মনে মনে হাসি ॥
চণ্ডীদাস নকুল এ ভাই দুটি মিলে।
আনি যত অন্ন তায় ঢালে কুতুহলে।
বৃদ্ধা বিন্ধ্যবাসিনী সে জননী সবার।
নীরবে কাঁদিছে দেখি বসি একধার ॥
অন্ন ঢালা হৈল শেষ মাটি দিয়া ঢাকে।
দেখিলেও যেন না বুঝয়ে কোন লোকে ॥
হস্তপদ ধৌত করি বসি তিন জনে।
ভোজন করিল সবে প্রফুল্লিত মনে ॥

* | * | *

গেল যবে দিবাকর অস্তাচলে চলি।
সমাজ করিয়া বসে ব্রাহ্মণমণ্ডলী ॥
বহু তর্ক বিতর্ক চলিল বহুক্ষণ।
তদন্তরে একমত হইল সর্ব্বজন।
বিপ্র এক উঠিয়া কহিল উচ্চরবে।
ব্রাহ্মণের জাতিকুল চাহ যদি সবে ॥
কালকার মধ্যে তবে করহ সাধন।
চণ্ডীর জীবনদণ্ড রামী নির্ব্বাসন ॥

স্বস্তি স্বস্তি বলি সবে দিলা অনুমতি।
সভা ভঙ্গ করি গেল যে যার বসতি ॥
পরদিন প্রাতঃকালে হইল প্রকাশ।
নিশিযোগে পলাইল দেবী চণ্ডীদাস ॥
গিয়াছে তাদের সাথে বৃদ্ধা বিন্ধ্যা মাতা।
পথে ঘাটে রটে সবে এই মাত্র কথা ॥
হেনমতে গেল দিন আইল পুন রাতি।
ঘুমাইল যত জীব নিবে গেল বাতি ॥
অকস্মাৎ মহাউচ্চে উঠে কলরব।
রক্ষ রক্ষ অগ্নিদেব গেল গেল সব ॥
ছুটাছুটি গিঞা আমি প্রাসাদ উপরে।
দেখিলাম জলে অগ্নি যুবরাজপুরে ॥
যতই ঢালিছে জল আনি ক্ষিপ্রগতি।
ততই ধরিছে অগ্নি সংহার-মূরতি ॥
অবিশ্রান্ত চট চট ফট ফট রবে।
কর্ণে তালা লাগে তথা কার সাধ্য রবে ॥
প্রভাতে উঠিঞা আমি লইনু সংবাদ।
সব গেছে পুড়ি মাত্র দুটি ঘর বাদ ॥
সনা রজকের আর দেবীর যে বাড়ী।
এই দুটি বাদে হায় সব গেছে পুড়ি ॥
ঘরে নাই পুড়ি কেহ যা ছিল তা পরে।
কিছু নাঞি সব গেছে অনল-উদরে ॥
কেমনে বাঁচিবে সবে নাঞি কোন আশা।
আজ খাইতে কাল নাঞি হইল হেন দশা ॥
মাসাবধি দিনু আমি আহার সকলে।
বহু কষ্টে থাকে সবে ছামলার* তলে ॥
ভাঁড়ার হইল খালি দিতে কিছু নাঞি।
ভাবিয়া আকুল আমি কি করি উপায় ॥
হেনকালে রাসমণি আইল কোথা হতে।
৭/] সকলের দুখ দেখি দয়া হইল চিতে ॥
রামীকে দেখিয়া সবে কাঁদিঞা উঠিল।
তোরে মা পীড়ন করি এই দশা হল ॥
রামী কহে হয় যদি বিধাতা বিমুখ।
এই মত সবাই মা সয় বহু দুখ ॥

* ছায়া-মণ্ডপ, ছামলা। খুঁটির উপরে পত্রাদির আচ্ছাদন

যাহোক সময়মত যাবে মোর বাড়ী।
রোহিণীরে বল কিছু দিবে টাকাকড়ি॥
রোহিণীর কাছে তবে যখনি যে যায়।
শুধু হাতে নাঞি ফিরে যা চাহে তা পায়॥
ক্রমে ক্রমে সবাকার হৈল ঘরবাড়ী।
তিলার্দ্ধ না থাকে কেহ রামিণীরে ছাড়ি॥
কৈল বটে রোহিণী সবার দুখ দূর।
কিন্তু দুঃখ পায় তার শ্বশুরঠাকুর॥
লজ্জায় না যায় তারা রোহিণীর পাশে।
দেখি শুনি রাসমণি মনে মনে হাসে॥
গোপনে রোহিণী কিন্তু কাঁদে অবিরল।
দেখিয়া রামীর হইল পরাণ চঞ্চল॥
একদিন তরুতলে বিজয়-নারাণ।
বসি আছে অধোমুখে মলিন বয়ান।
হেনকালে আসি তথা কহে রাসমণি।
আমার সঞ্চিত কিছু আছে রত্নমণি॥
দেখিয়াছ প্রায় আমি হেথা সেথা যাই।
তুমার নিকটে তেঞি রাখিবারে চাই॥
বিজয়-নারাণ কহে শুন রাসমণি।
তুমার মনের ভাব বুঝিয়াছি আমি॥
রজকিনী নহ মাগো তুমি অন্নপূর্ণা।
কার্য্য দেখি এতদিনে সব গেছে জানা॥
কিন্তু না রাখিব আমি কারো রত্নধন।
এখন যে আমি মাগো দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
নিরাহারে যদি মরি তাহে নাঞি ক্ষোভ।
ঘটাস না তবু মাগো পরধনে লোভ॥
রামী কহে কিছু রত্ন লহ তবে কিনে।
বিজয়নারাণ কহে কিনিব কেমনে॥
অন্ন নাহি জুটে যার তরুতলে বাস।
সে কিনিবে রত্ন মাগো একি উপহাস॥
রামী কহে যদি তুমি রত্ন নাহি নিলে।
রমণী-বধের ভাগী হইবে তা হলে॥
তাই বলি লহ রত্ন বিজয়নারাণ।
রোহিণী বাঁচিবে মোর এই তার দাম॥

শুন দেব তাও বলি তুমারি এ অর্থ।
একদিন বুঝিতে পারিবে এর অর্থ॥
বহুক্ষণ চিন্তা করি কহিল বিজয়।
নারিনু বুঝিতে রত্ন মোর কিসে হয়॥
যাহোক লইব অর্থ কিন্তু কহ শুনি।
এত গুণ ধর যদি হয়ে রজকিনী॥
বল মা সে সব কথা করিয়া প্রকাশ।
কেনে কৈলি ব্রাহ্মণের জাতিকুল-নাশ॥
সহাস্য বদনে রামী কহিলা তখন।
ব্রাহ্মণেরে পূজা দেন দেব নারায়ণ॥
জাতিকুল নষ্ট তার পারি কি করিতে।
ব্রাহ্মণেরে দান দিনু ব্রাহ্মণ-দুহিতে॥
বিশুদ্ধ দ্বিজাতি কন্যা রোহিণী আমার।
ক্রমে ক্রমে সব কথা হইবে প্রচার॥
যেইদিন অগ্নিমুখে শুনিলা রোহিণী।
গৃহহীন অর্থশূন্য হইয়াছ তুমি॥
দিনান্তেও একবার অন্ন নাঞি জুটে।
তার জন্য পিতা পুত্রে বেড়াইছ ছুটে॥
৭৮| দিব্য করি হে ব্রাহ্মণ কহি অবিকল।
সেই হতে রোহিণী না ছোঁয় অন্নজল॥
আর দুই-চারি দিন যদি না খাইলা।
তাহলে ফুরাবে তার সব লীলা-খেলা॥
তুমারি এ অর্থ আমি দিতেছি তুমারে।
ধর লও হে ব্রাহ্মণ রক্ষা কর তারে॥
দাও তবে রাসমণি বলিয়া ব্রাহ্মণ।
কর পাতি লইলা যতেক রত্নধন॥
সত্বর চলিলা রাই মাগিয়া মেলানি।
ধুলায় পড়িয়া কাঁদে যথায় রোহিণী॥
বুকে তুলি কহে তায় সকল বৃত্তান্ত।
রোহিণী কহিলা ব্যস্তে দিদি এ কি সত্য॥
রামী কহে মোর বাক্যে না কর সংশয়।
সত্য যার সার ধর্ম্ম সে কি মিথ্যা কয়॥
মোর দিব্য খাও কিছু না ভাবিহ আর।
তুমার যতেক দুঃখ ঘুচাব এবার॥

রোহিণী করিলা তবে কিঞ্চিৎ ভোজন।
হেনকালে আইল তথা বিজয়-নন্দন॥
সনাতন নাঞি ঘরে নাঞি লক্ষীপ্রিয়া।
রাইমণি দাঁড়াইল অন্তরালে গিয়া॥
রোহিণী ঘোমটা টানি পলাইতে ছুটি।
দয়ানন্দ হাসি তার ধরে হাত দুটি॥
কহিলেন মনাগুনে পুড়ি দিবারাতি।
সত্য করি কহ তুমি কাহার সন্ততি॥
রোহিণী কহিল নাথ কহ তুমি আগে।
এ সন্দেহ তুমার হৃদয়ে কেন জাগে॥
দয়ানন্দ যা শুনিলা পিতার সকাশে।
কহিলা সে সব কথা রোহিণীর পাশে॥
চমকিয়া উঠে বালা এই কথা শুনে।
একদৃষ্টে চেয়ে থাকে তার মুখ পানে॥
ভয় পাইয়া দয়ানন্দ কহে গুণবতী।
সে কথায় শুনি কাজ নাহিক সম্প্রতি
রোহিণী কহিল এযে আশ্চর্য্য তাহ
রাইদিদি কহে মোর জন্ম বিপ্রকু
আমি জানি হঞি আমি রজক-
সনাতন পিতা মোর মাতা ল
দিদিরে ডাকিয়া তবে কর ভি
তার বাক্য মিথ্যা না হইবে
রাইমণি আসি তবে কহে
রোহিণীর জন্মকথা কহি
ব্রহ্মণ্যপুরের রাজা জানে
এর আগে ছিলা এক বি
ভবানী ঝোর‍্যাত[১০] না
তাঁর কন্যা হয় এই প্রা
কেমনে কিরূপে তারে
শুন দয়ানন্দ আমি কি

১০) ঝোর অর্থে জল। ঝো
ঝোর‍্যাৎ পশ্চিমা ব্রাহ্মণ, শিখরভূ
রাজা হইয়াছিলেন। সামন্তভূমের
প্রচলিত নাম পঞ্চকোট রাজা।

সত্য বলি চণ্ডীদাস করিলে স্বীকার।
তখন সন্দেহ কেহ না করিবে আর ॥
এখন এসব কথা রাখ মনে মনে।
অবশ্য ফলিবে ফল সময়ের গুণে ॥
সুধাই তুমারে এবে শুনি দেখি কহ।
তুমার মায়ের মামা আছিলা কি কেহ ॥
হাস্যমুখে দয়ানন্দ কহিলা তখন।
শুনেছি বাবার মুখে ছিলা এক জন ॥
বহুধন ছিল তার মার মুখে শুনি।
বহুদিন কাশীবাস করেছেন তিনি ॥
নাম তার চন্দ্রচূড় কহয়ে সবাই।
মরেছে কি বাঁচে আছে শুনিতে না পাই ॥
তার পর খুলি সব কহিলা রামিণী।
চন্দ্রচূড়-গৃহে বাস আদি সে কাহিনী ॥
ত্যুকালে সেহ মোরে যত রত্ন ধন।
া মাত্র তুমারে সে দিবার কারণ ॥
বছি সে ধন আমি বলদের পিঠে।
হ দক্ষিণ ঘরে পেটরায় আঁটে ॥
াহিবে তুমি পাইবা তখনি।
খরচ তার করেছে রোহিণী ॥
শ্রাদ্ধ তার কর বিধিমতে।
সের শুক্লপক্ষ পঞ্চমীতে ॥
ন তবে চলি গেলা রামী।
সব শুনিয়াছি আমি ॥

। * । *

(ক্রমশঃ)

দিল্লীর প্রাচীন মানমন্দির

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ, এম্-এ, পিএইচ্-ডি

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্গণ অতি সহজ প্রণালীতে গগনমণ্ডলস্থ পদার্থনিচয়ের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া যাহা সত্য বলিয়া অনুভব করিতেন, তাহাই সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিতেন এবং সৎপাত্র দেখিয়া সেই জ্যোতিষজ্ঞানের শিক্ষা দিতেন। এই প্রাকৃতিক গবেষণার মূলে তাঁহারা কোন্ মান-যন্ত্রের সাহায্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, অথবা কোন্ বেধালয়ের অত্যুন্নত শিখর হইতে গ্রহনক্ষত্রের গতি নিরীক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহার কোন নিদর্শন এখন আমরা পাই না। এমন কি, ভারত-জ্যোতিষের মুকুটমণি পূজ্যপাদ আর্য্যভট ও ভাস্করের সময়েও কোন সুপ্রতিষ্ঠিত মানমন্দির ছিল কিনা, তাহারও কোন উল্লেখ নাই। হয়ত কোন কালে ইহার অস্তিত্ব ছিল, এবং থাকিবার সম্ভাবনাই খুব বেশী; কিন্তু এক্ষণে বোধ হয় উহা অযত্নসঞ্জাত ধ্বংসপ্রভাবে বিস্মৃতির দর্পণতলে। বাস্তবিক যে ভারতীয় মানমন্দিরের বিষয় আমরা অবগত আছি এবং যাহার নিদর্শন আমরা এখনও পাইতেছি, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সৃষ্টি। সেই বিভিন্ন স্থানে নির্ম্মিত মানমন্দিরসমূহ অম্বরাধিপতি জয়পুর নগর প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ জয়সিংহের অক্ষয় কীর্ত্তি।

মহারাজ জয়সিংহ বিদ্যাবুদ্ধিতে ভারতের গৌরবস্থল ছিলেন। যে-বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্ন শোভা পাইত, যে-ভোজরাজের কীর্ত্তিকলাপ আপামর সাধারণের নিকট সুপরিচিত, জয়সিংহ তাঁহাদিগের ন্যায় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ইনি ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তখন মহম্মদ শাহ দিল্লীর সম্রাট্। জয়সিংহ গণিত-শাস্ত্রে—বিশেষতঃ জ্যোতির্ব্বিদ্যায় যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন,

অম্বরাধিপতি সওয়াই জয়সিংহ
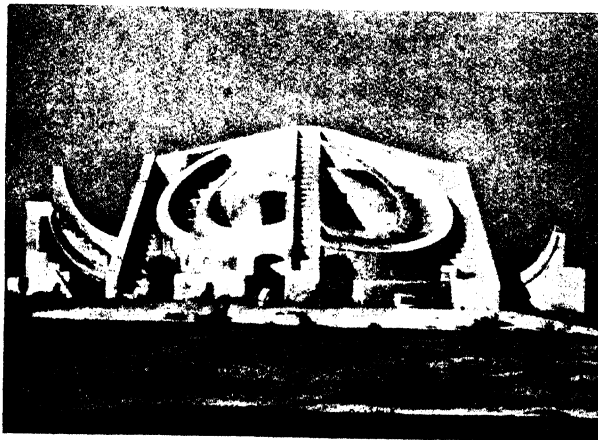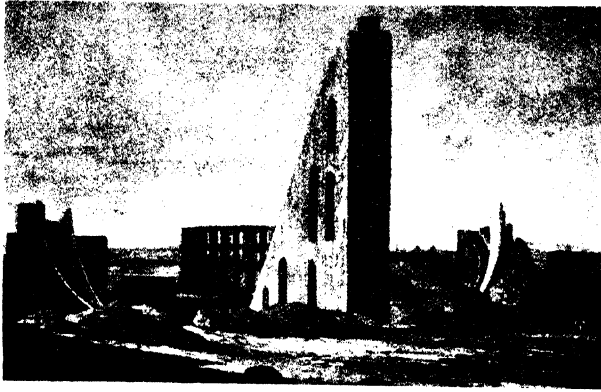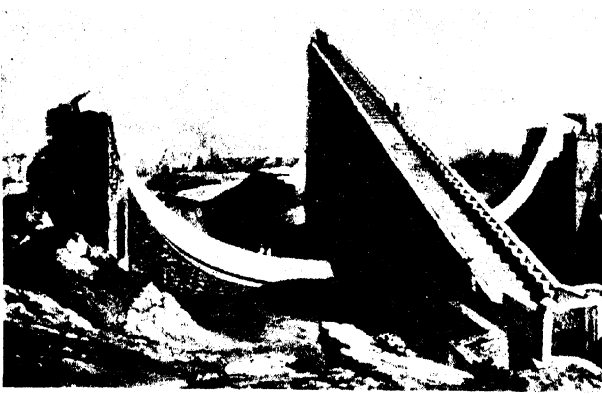
দিল্লী-মানমন্দির— ৮১৫ সালে অঙ্কিত চিত্র
দিল্লী-মানমন্দির—১৮১৫ সালে অঙ্কিত চিত্র
মিশ্রযন্ত্র, দিল্লী-মানমন্দির—দক্ষিণ দিকের দৃশ্য

তেমনই রাজনীতিকুশল, মন্ত্রণাদক্ষ নরপতি ছিলেন। কর্ণেল টড রাজস্থান-কাহিনী গ্রন্থে লিখিয়াছেন, এখনও রাজ-পুতানার মালব প্রদেশে জয়সিংহের নাম স্মরণ করিয়া লোকে জয়াশা করিয়া থাকে। জ্যোতির্ব্বিদ্যার সম্যক্ আলোচনার নিমিত্ত ইনি মানুয়েল নামক জনৈক পোর্ত্তুগীজ পাদরীর সহিত কতিপয় সুদক্ষ গণিতজ্ঞ লোক ইউরোপে প্রেরণ করেন; তিনি মহম্মদ শরিফকে দক্ষিণ মেরুর নিকটবর্ত্তী প্রদেশে এবং মহম্মদ মাহদিকে সুদূর দ্বীপসমূহে জ্যোতিষ শিক্ষা করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। বস্তুতঃ, ইউরোপে জ্যোতিষশাস্ত্রের অবস্থার অনুশীলন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। পোর্ত্তুগালের রাজা কয়েকটি যন্ত্রের সহিত এক জন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতকে এদেশে প্রেরণ করেন। ক্রমে ক্রমে নানাবিধ জ্যোতিষ-গ্রন্থ সংগৃহীত ও রচিত হইল। উহাদের মধ্যে 'সিদ্ধান্ত-সম্রাট' নামক পুস্তকখানিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জয়সিংহের প্রধান সভাপণ্ডিত জগন্নাথ ইহার রচয়িতা। ইনি তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি জয়সিংহের আদেশে আরবী 'মিজাস্তী' নামক সিদ্ধান্তগ্রন্থের সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া উহার নাম 'সিদ্ধান্ত-সম্রাট' রাখিয়াছিলেন। জগন্নাথ এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

> গ্রন্থং সিদ্ধান্তসম্রাজং সম্রাট্ রচয়তি স্ফুটং।
> তুষ্টৈ শ্রীজয়সিংহস্য জগন্নাথাভয়ঃ কৃতী।
> আরবী ভাষয়া গ্রন্থো মিজাস্তীনামকঃ স্থিতঃ।
> গণকানাং সুবোধায় গীর্ব্বাণ্যাপ্রকটীকৃতঃ॥

এই মিজাস্তী গ্রন্থ প্রাচীন যবন টলেমী কৃত গ্রন্থের আরবী অনুবাদ। সিদ্ধান্ত-সম্রাটে অনেক আরবী জ্যোতির্ব্বিদের গণনার ক্রম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই

গ্রন্থ গণকদিগের উপকারার্থ অতি যত্নের সহিত রচিত হয়। এতদ্ব্যতীত জয়সিংহ স্বয়ং জ্যোতিষ্ক-বেধোপযোগী গোলাদি যন্ত্রে নব নব কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারই আদেশে ও উদ্যোগে সিদ্ধান্তসম্রাট্ গ্রন্থানুসারে ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত অবলম্বনে জয়পুর, দিল্লী উজ্জয়িনী কাশী ও মথুরা-নগরীতে জ্যোতিষিক মানমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা দিল্লীর মানমন্দির সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিব।
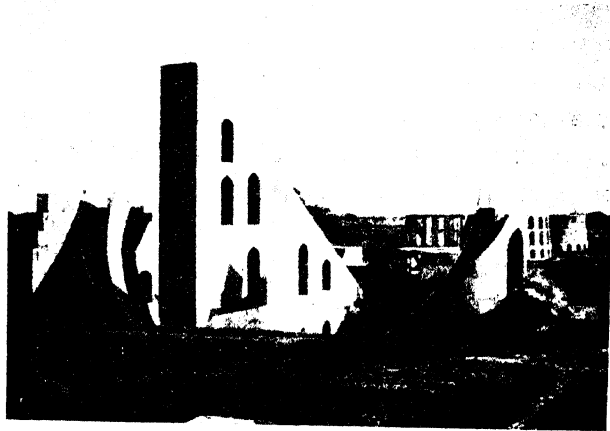
দিল্লীর মানমন্দির পুরাতন দিল্লী শহরের বাহিরে জামা মসজিদের প্রায় দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। বর্ত্তমান রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে 'মন্তর-মন্তর রোড' নামক রাজপথের বামপার্শ্বের এক প্রান্তে ইহা প্রতিষ্ঠিত। প্রায় ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে রাজা জয়সিংহ এই মানমন্দিরটি নির্ম্মাণ করেন বাহির হইতে বৃহৎশঙ্কুই প্রথমে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ইহার লম্বচ্ছেদ (vertical section) একটি সমকোণী ত্রিভুজের স্বরূপ। এই ত্রিভুজের কর্ণ ১১৮ ফুট লম্বা, ভুজ ১০৪ ফুট এবং কোটি (perpendicular height) প্রায় ৫৭ ফুট দীর্ঘ। পৃথিবীর অক্ষদণ্ডের সহিত (terrestrial axis) শঙ্কুর মুখ (the face of the gnomon) সমান্তরাল এবং এই ত্রিভুজের কোণ দিল্লীনগরীর অক্ষাংশের সমান। এই শঙ্কুর
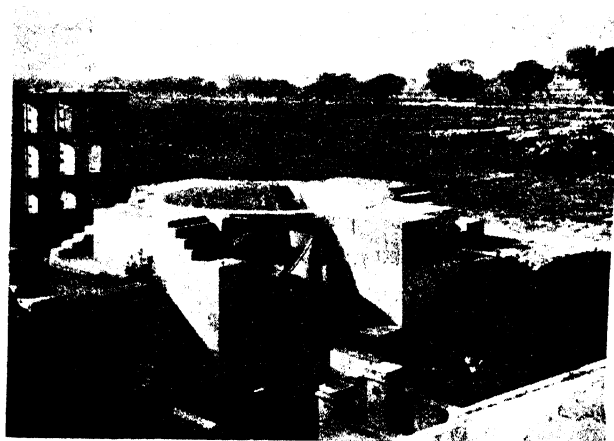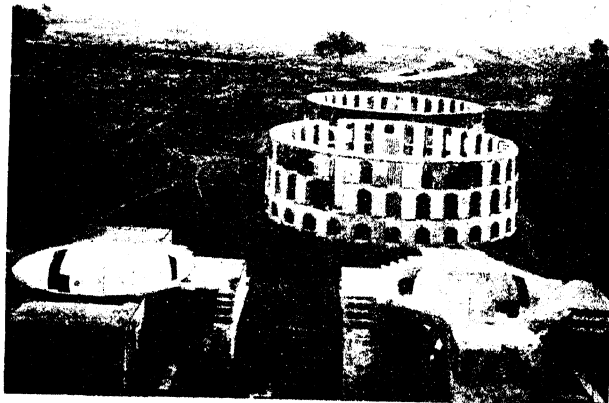
সম্রাট-যন্ত্র, দিল্লী-মানমন্দির

শঙ্কু হইতে দিল্লী-মানমন্দিরের দৃশ্য

জয়প্রকাশ, দিল্লী-মানমন্দির

মধ্যস্থল দিয়া একটি উচ্চ সোপানশ্রেণী উপরে উঠিয়াছে এবং ইহার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটি প্রকাণ্ড বৃত্তখণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার উপরেই শঙ্কুচ্ছায়া পতিত হইয়া থাকে। বৃত্তখণ্ডেও এক সোপান নির্ম্মিত আছে। ইহার উপর দিয়া ছায়ার এক অংশ অতিক্রম করিতে চার মিনিট সময় অতিবাহিত হয়। ইহার সন্নিকটে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আর একটি ভিত্তি সংস্থিত আছে। ইহার নির্ম্মাণপ্রণালী প্রথম যন্ত্রের ন্যায়, এবং মধ্যে একটি শঙ্কু স্থাপিত; আর উভয় পার্শ্বে দুইটি অর্দ্ধবৃত্ত গঠিত রহিয়াছে। এই ভিত্তির অবতরণ নিম্নের দিকে ক্ষিতিজ (horizon) পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। সৌর কাল নির্ণয় করাই এই শঙ্কু দুইটির প্রধান উদ্দেশ্য।

দিল্লীর মানমন্দিরের নির্ম্মাণপ্রণালী হইতে বর্ত্তমান সময়ে নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে :—

(১) সম্রাট্-যন্ত্র; ইহা একটি প্রকাণ্ড বিষুবযন্ত্র।

(২) জয়প্রকাশ; ইহার গঠন দুইটি অর্দ্ধবর্ত্তুলের ন্যায়, ইহা সম্রাট্-যন্ত্রের দক্ষিণে স্থাপিত।

(৩) রাম-যন্ত্র; ইহার গঠন দুইটি বৃত্তের ন্যায়, ইহা জয়প্রকাশের দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত।

(৪) মিশ্র-যন্ত্র; ইহা সম্রাট্-যন্ত্রের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

এতদ্ব্যতীত পুরাতন যন্ত্রের ভগ্নাবশেষ-স্বরূপ মিশ্র-যন্ত্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে দুইটি স্তম্ভ এবং মিশ্র-যন্ত্রের ঠিক দক্ষিণে একটি মৃত্তিকাস্তূপ লক্ষিত হয়।

১। সম্রাট্-যন্ত্র—ইহা মানমন্দিরের মধ্যস্থলে নির্ম্মিত। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য এবং ইহা একটি বৃহৎ যন্ত্র। ইহার নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে ইহার প্রয়োজনীয়তাও খুব বেশী বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহার অধিকাংশ ভাগ মৃত্তিকা-প্রোথিত। ইহা একটি ১৫ ফুট প্রশস্ত চতুষ্কোণ খাতের উপর অবস্থিত; ইহা ৬৮ ফুট উচ্চ, তাহার মধ্যে প্রায় ৮ ফুট ভূমিগর্ভে নিমজ্জিত। ইহার আয়তন পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম ১২৫ ফুট এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ ১১৩ ফুট। সম্রাট-যন্ত্রের চিত্রে ইহার অবয়বগুলি বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই যন্ত্রের প্রধান অংশ একটি বৃহৎ শঙ্কুর অবনত পার্শ্বদ্বয় এবং ইহার সহিত সংলগ্ন দুইটি বৃত্তপাদের ন্যায় গঠন। শঙ্কুর এক পার্শ্বভাগ উত্তর মেরু নির্দ্দেশ করিতেছে এবং ইহার মুখদেশ পৃথিবীর অক্ষদণ্ডের সহিত সমান্তরাল। বৃত্তপাদ দুইটি শঙ্কুর সহিত সমকোণ ভাবে অবস্থিত। সুতরাং ঐগুলি যে-বৃত্তের অংশ, সেই বৃত্তটি নিরক্ষবৃত্তের সমতলে (parallel to the plane of the equator) স্থাপিত। ঐ বৃত্তপাদ দুইটির ব্যাসার্দ্ধ প্রায় ৫০ ফুট এবং প্রত্যেকটির দুই পার্শ্বে ছয় ছয় অংশ করিয়া ঘটিকা চিহ্নিত করা রহিয়াছে। ইহাতে যথার্থ সময় নির্ণীত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রের যে-অংশে শঙ্কুচ্ছায়া পতিত হয়, উহার দ্বারা নতঘটি অর্থাৎ মধ্যাহ্ন হইতে কত সময় অতি-বাহিত হইয়াছে তাহাই জ্ঞাত হওয়া যায়। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে যদি শঙ্কুচ্ছায়া দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যে ঘটিকার সময় অবগত হওয়া যায়, তত সময় উত্তীর্ণ হইলে পর মধ্যাহ্ন হইবে; আর যদি মধ্যাহ্নের পর শঙ্কুচ্ছায়া দেখা যায়, তাহা হইলে যে ঘটিকার সময় অবগত হওয়া যায়, তত সময়ের পূর্ব্বেই মধ্যাহ্ন হইয়া গিয়াছে। শঙ্কুচ্ছায়া ভাল করিয়া দেখিবার জন্য প্রত্যেক দিকে প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপান প্রস্তুত হইয়াছে। সূর্য্যের শঙ্কুচ্ছায়া যেমন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, চন্দ্রের শঙ্কুচ্ছায়া সেইরূপ স্পষ্ট দেখা যায় না; এবং দূরবর্ত্তী গ্রহের বা নক্ষত্রের ছায়া আদৌ প্রতিবিম্বিত হয় না। সুতরাং চন্দ্র, গ্রহাদি ও নক্ষত্রের নত-ঘটি পর্য্যবেক্ষণ করিবার ভিন্ন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই যন্ত্রের উপরে একটি লৌহ তার অথবা একটি সরল নল স্থাপিত করিতে হয়, ইহার একটি প্রান্ত ধনুর পার্শ্বে থাকিবে এবং অপর প্রান্ত শঙ্কুর উপরে থাকিবে। পরে ধনুর পার্শ্বে যে প্রান্তটি অবস্থিত, তন্মধ্য দিয়া দ্রষ্টব্য গ্রহ বা তারকা লক্ষ্য করিতে হইবে। এমন ভাবে লৌহ নলটি স্থাপন করিতে হইবে যে, উহার ঠিক মধ্য দিয়া গ্রহ বা তারকা দৃষ্ট হয়। এই প্রকারে ধনুর যে পার্শ্বটি অন্য পার্শ্বটির অপেক্ষা নিম্নে অবস্থিত, তাহার যে চিহ্নটি নলের দ্বারা বিভক্ত হইবে, তাহাই গ্রহ বা তারকার মাধ্যাহ্নিক হইতে নতকাল হইবে (hour angle)। এখন শঙ্কুর পার্শ্বের যে অংশ ধনুর কেন্দ্র আর নলের প্রান্তের অন্তরে অবস্থিত, সেই অংশই গ্রহ বা নক্ষত্রের ক্রান্তির স্পর্শরেখা (the tangent of the declination of the planet or star) সুতরাং নতকাল ও ক্রান্তি এই যন্ত্রদ্বারা অবগত হওয়া যায়। কোন নক্ষত্রের ভুজাংশও এই যন্ত্রদ্বারা নিম্নলিখিত উপায়ে জ্ঞাত হওয়া অল্পায়াসসাধ্য। সূর্য্যের অস্তগমনের সময়ে মাধ্যাহ্নিক হইতে সূর্য্যের নতাংশ বাহির করিতে হইবে। এই

সময় হইতে যে-পর্য্যন্ত না ঐ নক্ষত্র (যাহার ভুজাংশ বাহির করিতে হইবে) আকাশে সুস্পষ্ট উদিত দৃষ্ট হয়, সেই পর্য্যন্ত যে সময় তাহা স্থির করিতে হইবে। পরে এই সময় মাধ্যাহ্নিক হইতে সূর্য্যের নতঘটিকাতে যোগ করিতে হইবে। এই রূপে প্রাপ্ত সময়ই সেই সময়ের মাধ্যাহ্নিক হইতে সূর্য্যের

ছেদাংশ, জয়প্রকাশ, দিল্লী-মানমন্দির

নতাংশ। তাহা হইলে মধ্যলগ্নের (culminating point of the ecliptic) বিষুবাংশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে যন্ত্রের সাহায্যে নক্ষত্রের নতঘটিকা বাহির করিয়া মধ্যলগ্নের বিষুবাংশে যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলে নক্ষত্রের আবশ্যক ভুজাংশ পাওয়া যাইবে। পূর্ব্ব গোলে নক্ষত্র থাকিলে যোগ করিতে হইবে, আর পশ্চিম গোলে নক্ষত্র থাকিলে বিয়োগ করিতে হইবে।

২। জয়প্রকাশ—ইহাকে জগন্নাথ সর্ব্বযন্ত্রশিরোমণি আখ্যা দিয়াছেন। ইহা দুইটি অর্দ্ধগোলক লইয়া গঠিত। অবশ্য একটি অর্দ্ধগোলকই যথেষ্ট হইত, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য একটি পূর্ণগোলক নির্ম্মিত করিয়া উহাকে অর্দ্ধভাবে কর্ত্তিত করা হইয়াছে। পূর্ব্বে অর্দ্ধগোলক দুইটির উপর সোজাসুজি দুইটি তার থাকিত। একটি উত্তর হইতে দক্ষিণে, আর একটি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, এইরূপ ভাবে বিস্তৃত থাকিত। এই তার দুইটির ছেদকবিন্দুর ছায়া সূর্য্যের অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিত। ঐ অর্দ্ধগোলকের উপরিভাগে কোটি অগ্রাবৃত্ত (azimuth circle), উন্নতাংশবৃত্ত (altitude circle), বিষুববৃত্ত, ক্রান্তিবৃত্ত প্রভৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে; সুতরাং সূর্য্যের অবস্থিতি অল্লায়াসেই জ্ঞাত হওয়া যায়। উহাতে ক্রান্তিবৃত্তের দ্বাদশ চিহ্ন খোদিত থাকায়, কোন বিশেষ সময়ে সূর্য্যের ছায়ার অবস্থানের দ্বারা মাধ্যাহ্নিকের উপর কোন্ চিহ্ন রহিয়াছে, তাহা অবগত হইতে পারা যায়। সূর্য্য ভিন্ন অপর জ্যোতিষ্কের অবস্থিতিও এই যন্ত্রের সাহায্যে অবগত হইবার উপায় আছে; কারণ উপরিলিখিত তার দুইটির ছেদকবিন্দু কখন জ্যোতিষ্কটি অতিক্রম করে, ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই উহার অবস্থান অবগত হওয়া গেল।

৩। রাম-যন্ত্র—এই যন্ত্র মহারাজ জয়সিংহের পূর্ব্বপুরুষ রাম-সিংহের নামে পরিচিত। ইহা জয়প্রকাশ-যন্ত্রের ঠিক দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। দুইটি বৃহৎ বৃত্তাকার ভিত্তি ইহার সহিত সংলগ্ন; প্রত্যেক ভিত্তির একটি বৃত্তাকার প্রাচীর গঠিত হইয়াছে এবং মধ্যস্থলে একটি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। অঙ্ক-চিহ্নিত ভূমিতল হইতে প্রাচীর ও স্তম্ভটির উচ্চতা ভিত্তির আভ্যন্তরিক ব্যাসার্দ্ধ অর্থাৎ স্তম্ভপরিধি হইতে প্রাচীরের ব্যবধান পর্য্যন্ত পরিমাণের সমান এবং মোট ২৪ ফুট ৬॥ ইঞ্চি, স্তম্ভের ব্যাস ৫ ফুট ৩॥ ইঞ্চি। কোটি-অগ্রা (azimuth) ও উন্নতাংশ (altitude) অবগত হইবার নিমিত্ত প্রাচীর ও ভিত্তিতলে অঙ্কচিহ্ন খোদিত রহিয়াছে। পর্য্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য ভিত্তিতল ৩০টি বৃত্তখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে; প্রত্যেকটির

ছেদাংশ, জয়প্রকাশ, দিল্লী-মানমন্দির

৬ ডিগ্রী ব্যবধান। ঐ অঙ্কচিহ্নিত বৃত্তখণ্ডগুলি তিন ফুট উচ্চ স্তম্ভের উপর সংস্থিত, ইহাতে পর্য্যবেক্ষণকারী যন্ত্রের যে-কোন স্থানে চক্ষু স্থাপন করিতে পারেন। এইরূপে অঙ্ক-চিহ্নিত প্রাচীরগুলির মধ্যে মধ্যে ছিদ্র করা রহিয়াছে, প্রত্যেকটির পার্শ্বে পর্য্যবেক্ষণ-দণ্ড রাখিবার জন্য অপ্রশস্ত পথ

নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে পর্য্যবেক্ষণের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে।

৪। মিশ্র যন্ত্র—ইহা সম্রাট-যন্ত্রের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় এক শত হস্ত দূরে অবস্থিত। একটি ভিত্তিতে চারিটি বিভিন্ন যন্ত্রের সমাবেশ হইয়াছে বলিয়া এই যন্ত্রের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। এই চারিটি যন্ত্রের মধ্যে নিয়তচক্র কেন্দ্রস্থলে স্থাপিত এবং প্রতিপার্শ্বে দুইটি অঙ্ক-চিহ্নিত বৃত্তার্দ্ধের সহিত একটি শঙ্কু নির্ম্মিত হইয়াছে। নিয়ত-যন্ত্রের প্রত্যেক দিকে এবং ইহার সহিত সংলগ্নভাবে একটি অর্দ্ধশঙ্কুপট্ট গঠিত রহিয়াছে। ইহার গঠন বৃহৎ সম্রাট-যন্ত্রের গঠনপ্রণালীর অনুরূপ। ভিত্তির পশ্চিম পার্শ্বে একটি বৃত্তপাদ (quadrant) স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মুখদেশ অক্ষদণ্ডের সহিত সমান্তরাল না হইয়া ক্ষিতিজের সহিত সমতলে স্থাপিত; ইহা অগ্রা-যন্ত্র নামে পরিচিত। ভিত্তির পূর্ব্ব প্রাচীরের একটি অঙ্ক-চিহ্নিত বৃত্তার্দ্ধ নির্ম্মিত রহিয়াছে, ইহার নাম দক্ষিণবৃত্তি যন্ত্র। ইহা উন্নতাংশ বাহির করিতে ব্যবহৃত হইত। মিশ্র-যন্ত্রের উত্তর প্রাচীর উল্লম্ব-রেখার (vertical) সহিত ৫ ডিগ্রী আনত (inclined), ইহাতে একটি বৃহৎ অঙ্কচিহ্নিত বৃত্ত সংলগ্ন রহিয়াছে। ইহা কর্কট রাশিবলয় বা কর্কটবৃত্ত (tropic of cancer) নামে অভিহিত।

পূর্ব্বোল্লিখিত যন্ত্রগুলি ব্যতীত আরও যে-কয়েকটি যন্ত্র এই মানমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন রহিয়াছে। দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেই সম্মুখে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে পুরাতন যন্ত্রের ভগ্নাবশেষ-স্বরূপ একটি ভিত্তি ও দুইটি স্তম্ভ দৃষ্ট হইয়া থাকে; মাঝে মাঝে বৃক্ষ জন্মিয়া দুই-একটি যন্ত্রকে ঈষৎ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। সমগ্র বেধালয়টি একটি বৃহৎ মৃন্ময়-প্রাচীরে বেষ্টিত। ইহার পশ্চিম দিকে প্রবেশ-দ্বার রহিয়াছে। মহারাজ জয়সিংহ সর্ব্বপ্রথম দিল্লীর মানমন্দিরটিই নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। এইখানেই মহারাজ জয়সিংহ তাঁহার প্রধান প্রধান পর্য্যবেক্ষণকার্য্য সমাধা করিয়া জীজ্ মহম্মদশাহী নামক নির্ঘণ্ট-পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। জয়সিংহ লিখিয়াছেন যে, প্রথমে তিনি দিল্লীতে পিত্তল-নির্ম্মিত যন্ত্র স্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে উহা তাঁহার মনোনীত না হওয়ায়, তিনি সম্রাট্-যন্ত্র, জয়প্রকাশ, রাম-যন্ত্র প্রভৃতি নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবিত করিয়া সুদৃঢ় সংলগ্ন করিবার জন্য প্রস্তর ও চূণ দিয়া ভিত্তি নির্ম্মাণ করেন। মিশ্র-যন্ত্রটি জয়সিংহের পুত্র মধুসিংহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনিও পিতৃতুল্য বিজ্ঞানোৎসাহী ছিলেন। দিল্লীর এই মানমন্দিরটি অতি সুন্দরভাবে নির্ম্মিত। বর্ত্তমান সময়ে ইহা ভারতের নূতন রাজধানীর শোভা-স্বরূপ হইয়াছে। বাহির হইতে ইহার রাম-যন্ত্রের বৃত্তাকার প্রাচীর ও তৎসংলগ্ন তুল্য ব্যবধানে অবস্থিত প্রাচীর-অংশের প্রশস্ততানুযায়ী ৩০টি করিয়া উপরি-উপরি তিন সারি বাঁধা বাতায়ন এক অপরূপ সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে। মনে হয়, যেন রোমনগরীর প্রাচীন কলোসীয়ম দৃষ্ট হইতেছে। ইহা একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকাবিশেষ।

রামযন্ত্র, দিল্লী-মানমন্দির—উত্তর দিকের গৃহ

ভারতের এই প্রাচীন মানমন্দিরটির বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহা এক ক্ষণজন্মা মনীষীর অদ্ভুত কীর্ত্তি এবং ভারতীয় জ্যোতিষালোচনার ধারাবাহিক ইতিহাসে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। জ্ঞানপ্রচারের দিক্ দিয়াও ইহার উপযোগিতা অল্প ছিল না; কারণ এতগুলি পর্য্যবেক্ষণোপযোগী উপযুক্ত যন্ত্র একসঙ্গে কোন বেধালয়ে ছিল কি না সন্দেহ। মহারাজ জয়সিংহের সময়ে দেশের অবস্থা

যেরূপ অবনত ছিল, রাজনীতিক বিপ্লবে ভারতভূমি তখন যেরূপ সংক্ষুব্ধ হইতেছিল, দেশবাসিগণ জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চ্চায় তখন যেরূপ বিগতস্পৃহ হইয়াছিল এবং জ্যোতিবিজ্ঞানের প্রচারকার্য্য তখন যেরূপ দুঃসাধ্য ছিল, তাহার বিচার করিলে এই মানমন্দিরটিকে ভারতের জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক অক্ষয়কীর্ত্তি বলিয়া মনে হয় এবং ইহা যে-বিজ্ঞানোৎসাহী নরপতির কল্পনা ও সাধনা-প্রসূত তাঁহার অসীম বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানস্পৃহার জলন্ত নিদর্শন দেখিয়া বিস্ময়মুগ্ধ হইতে হয়। *

*এই প্রবন্ধে মুদ্রিত চিত্রগুলি G. R. Kaye রচিত The Astronomical Observatories of Jai Singh গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

পাঠরতা

শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত স্কেচ

শ্রীসাগরময় ঘোষের সৌজন্যে

পশ্চিমের যাত্রী

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[৪] ভিয়েনা—ফ্রয়ড্-এর সঙ্গে দেখা

ভিয়েনার অশীতিবর্ষদেশীয় জ্ঞানবৃদ্ধ আচার্য্য ফ্রয়ড্ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত মনস্তত্ত্ববাদ আজকালকার চিন্তাধারায় একটা যুগান্তর এনে দিয়েছে। এই মনস্তত্ত্ববাদটা কি, তা বিশেষজ্ঞরা বাঙলায়-ও সাধারণের উপযোগী ক'রে জানাবার চেষ্টা ক'রেছেন। আমি ও বিষয়ে অব্যবসায়ী, তাই অনধিকারচর্চ্চা ক'রবো না। আমার বন্ধুদের মধ্যে ক'লকাতায় শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু আছেন, তিনি ক'লকাতার 'সাইকো-আনালিটিকাল সোসাইটি-র সভাপতি, আর ফ্রয়ড্-দর্শনের অন্যতম প্রধান ব্যাখ্যাতা; পাটনার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঙ্গীন হালদারও ফ্রয়ড্-এর মতবাদের আর একজন অভিজ্ঞ পরিপোষক। এবার ইউরোপ-ভ্রমণের কালে ভিয়েনায় আসবো শুনে, বিশেষ নির্ব্বন্ধ আর উৎসাহের সঙ্গে বন্ধুবর হালদার মহাশয় আমায় ধ'রলেন, নিশ্চয়ই যেন আমি ভিয়েনায় থাক্‌তে থাক্‌তে একবার ফ্রয়ড্-এর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি; আমার নিজের বিশেষ আলোচ্য বিদ্যার সঙ্গে ফ্রয়ড্-এর যোগ না থাক্‌লেও, অন্ততঃ পক্ষে ভারতবর্ষে ফ্রয়ড্-এর যে সমস্ত বন্ধু, অনুরাগী আর সম-দ্রষ্টা আছেন, তাঁদের হ'য়েও যেন তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ ক'রে আসি। আধুনিক কালের বিজ্ঞানময় দর্শনশাস্ত্রের দিগ্‌গজদের মধ্যে ফ্রয়ড্ হ'চ্ছেন অন্যতম; সুতরাং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আসাটা তো পরম আনন্দেরই কথা হবে; তাই ভিয়েনায় গেলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা নিশ্চয়ই ক'রবো,—এই কথা শুনে', হালদার মহাশয় বিলাত-যাত্রার দিনই গিরীন্দ্র বাবুর কাছ থেকে ফ্রয়ড্-এর কাছে লেখা আমার সম্বন্ধে এক পরিচয়-পত্র আমায় এনে দেন। বার বার ব'লে দেন, কথাপ্রসঙ্গে যেন ফ্রয়ড্‌কে আমি দুই-একটি গভীর তাত্ত্বিক বিষয়ে তাঁর অভিমত জিজ্ঞাসা করি।

ভিয়েনায় পৌঁছে হোটেলে উঠে দুই-এক দিন পরে ফ্রয়ড্-এর খোঁজ নিলুম। পোর্টিয়ের বা হোটেলের দ্বারীর কাছে জানলুম – ভিয়েনায় শহরের ভিতর ফ্রয়ড্ আর থাকেন না; আমাদের হোটেলের কাছেই Berggasse ব্যর্গ-গাস্‌সে নামের রাস্তায় একটা বাড়ীতে এখনও তাঁর চিঠিপত্র যায়-টায় বটে, কিন্তু ভিয়েনার উত্তরে Kobenzl কোবেন্‌ৎস্‌ল্ পাহাড়ের কাছে শহরতলীতে তিনি থাকেন। তিনি বৃদ্ধ, অসুস্থ, দুর্ব্বল; তাই আর কারো সঙ্গে দেখা করেন না। টেলিফোন ছোঁন না; টেলিফোন ক'রে কোনও ফল নেই, তাঁর সেক্রেটারীদের কেউ গোড়া থেকেই সাক্ষাতের বন্দোবস্ত ক'রতে অস্বীকার ক'রবে; বিশেষ কারণ না থাকলে তাঁর সঙ্গে দেখা করা একরকম অসম্ভব। তাঁকে চিঠি লিখলে পরে, যদি তিনি উচিত মনে করেন তা হ'লে দেখা ক'রতে রাজী হ'য়ে অনুকূল ভাবে লিখতে পারেন। আমি তখন গিরীন্দ্র বাবুর পরিচয়-পত্রের সঙ্গে আমার কার্ড, কার্ডে আমার ভিয়েনার ঠিকানা, আর আমি যে তাঁর ভারতীয় বন্ধুদের পক্ষ হ'তে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে আসছি সে কথা জানিয়ে, যবে যখন যেখানে তাঁর সুবিধা হবে, তদনুসারে দেখা ক'রতে প্রস্তুত তা উল্লেখ ক'রে, খামে সব পুরে' ডাকে ছেড়ে দিলুম, তাঁর ভিয়েনার শহরের বাড়ীর ঠিকানায়। তিন দিন পরে টেলিফোনে হোটেলে খবর এল'—আগামী কাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটায় ভিয়েনার উনিশের পল্লীতে Strassergasse ষ্ট্রাস্‌সর-গাস্‌সে রাস্তার ৪৭ সংখ্যক বাড়ীতে তিনি সাক্ষাতের সময় ঠিক ক'রে জানাচ্ছেন।

হোটেল থেকে সোজা আধ ঘণ্টা পথ ট্রামে গিয়ে ষ্ট্রাস্‌সর-গাস্‌সেতে পৌঁছানো যায়। মিনিট পনর আগেই ফ্রয়ড্-এর বাড়ীতে এসে প'ড়লুম। নির্দ্ধারিত সময়-মত হাজির হবার জন্য রাস্তায় একটু পায়চারী করা গেল। উঁচু পাহাড়ে' পথ, বাইসিকিল চ'ড়ে যাওয়া চলে না, দু'-চার জন ছোকরাকে দেখলুম বাইসিকিল থেকে নেমে বাইসিকিল হাতে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে, খাড়াই

এতটা। দিনটা ছিল চমৎকার,—ঝক্‌ঝকে রোদ্দুর, চারিদিকে বাগানে রকমারি গাছের সবুজ, আর বড় বড় ফুলের রঙের বাহার, নীল আকাশ, পাখীর ডাক। প্রত্যেক বাড়ীর চারি দিকে খানিকটা ক'রে বাগান, গাছপালা। এ অঞ্চলটায় নোতুন বসতি হ'চ্ছে—জমী মাঝে মাঝে খালি র'য়েছে, অনেক জায়গায় নোতুন বাড়ী উঠ্‌ছে। এই সুন্দর পাহাড়ে' রাস্তায় ঢালু জমীর উপরে ফ্রয়্‌ড্‌-এর বাড়ী। অনেকটা জমী নিয়ে একটা বাগান, তার মধ্যে। রাস্তা আর বাগানের মধ্যে লোহার রেলিং, রেলিং দিয়ে বাগানের শোভা দেখা যায়। বড় বড় গোলাপ ফুটে' র'য়েছে।

দশটা পঁচিশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফটকের গায়ে লাগানো বিজলী-ঘণ্টার বোতাম টিপলুম; ভিতর থেকে ঘণ্টা শুনে সুইচ্‌ টিপে ফটক খুলে দিলে। একজন ঝী বেরিয়ে এসে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল। বাড়ীর পিছন দিকের একটা প্রশস্ত দরজা দিয়ে, সরু হল্‌ পেরিয়ে, একটা বড় কামরায় আমায় আসতে ব'ল্‌লে।

কামরাটীতে বড় বড় জানালা—তা দিয়ে বাইরের সবুজ বাগান, আর রোদ্দুর দেখা যাচ্ছে। বাঁয়ে আর সামনে জানালা, এমন একটা কোণে এক টেবিলের পাশে চেয়ারে ফ্রয়্‌ড্‌ ব'সে আছেন। ছবিতে চেহারা জানা ছিল, চিনতে দেরী হ'ল না। অতি শীর্ণকায় জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, মুখখানাতে স্বাস্থ্যের জলুস নেই, ফেকাসে বা হ'লদে রঙের হ'য়ে গিয়েছে; মুখে পাকা দাড়ি-গোঁফ একটু আছে। তিনি আমাকে দেখেই একটু উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে ইংরেজীতেই ব'ললেন, "ব'সো, ঐ চেয়ারে ব'সো; ভারতবর্ষে আমার বন্ধুরা কেমন আছেন?" বসবার আগে ঘরের মধ্যে লক্ষ্য করলুম, ঘরের টেবিল কয়টী, বিশেষ ফ্রয়্‌ড্‌ যে চেয়ারে ব'সে আছেন তার সামনের টেবিলটা, যাতে তিনি লেখেন-টেখেন, আর তাঁর হাতের কাছে আশে-পাশে দু'-চারটা ছোটো টেবিল, আর তা ছাড়া ঘরের মধ্যে রাখা দুই একটা কাচের আলমারী—এ সব, নানা রকমের শিল্পময় মূর্ত্তিতে ভরা। লেখাপড়া করবার টেবিলে কাগজপত্র কিছু আছে, দু'চারখানা ছোটো বড়ো বইও আছে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী আছে মূর্ত্তি; টেবিলের উপরে কতকগুলি র‍্যাক্‌, থাকে থাকে সেগুলিও মূর্ত্তিতে ভরা। শিল্পের মধ্যে ছোটো আকারের কারুশিল্পের যেন একটা সংগ্রহশালা। এইরূপ মূর্ত্তিশিল্পের অল্পসল্প রসিক আমিও একজন, এই শিল্প-সম্ভারের মধ্যে শাকের ক্ষেতে কাঙালের বা বাঁশবনে ডোমের অবস্থা আমার হ'ল। নানা যুগের নানা জাতির শিল্প দ্রব্য; প্রাচীন মিসরের দেবতাদের ব্রঞ্জে ঢালা বা নরম মর্ম্মর পাথরের বা পোড়া মাটীর ছোটো ছোটো মূর্ত্তি—ওসিরিস্‌, ইসিস, হাথোর, বিড়ালমুখী সেখ্‌মেৎ প্রভৃতি দেবতা; গ্রীসের ছোটো ছোটো ব্রঞ্জমূর্ত্তি—হের্মেস্‌, আফ্রোদিতে, আথেনা, আর অন্য দেবতা; প্রাচীন গ্রীসের তানাগ্রা নগরে আর অন্যত্র প্রস্তুত পোড়ামাটীর মূর্ত্তি,—ক্রীড়ানিরতা বা দণ্ডায়মানা তরুণী, দেবতা, কতকগুলিকে সযত্নে কাচের আলমারীতে রাখা হ'য়েছে; গ্রীসের তানাগ্রার অনুরূপ চীনদেশের থাঙ্‌ যুগের পোড়ামাটীর মূর্ত্তি—বাদ্য-বাদন-নিরতা চীনা তরুণী, রাজপুরুষ, যোদ্ধা; চীনা ব্রঞ্জে ঢালা বুদ্ধ মূর্ত্তি, ওয়েই যুগের, মিঙ্‌ যুগের; গায়ে-ছবি-আঁকা প্রাচীন গ্রীসের কলসী, থালা, বাটী,—পোড়ামাটীর, কতকগুলিতে লাল জমীর উপর কালো রঙে আঁকা দেবতাদের লীলার বা মহাকাব্যের পাত্রপাত্রীদের চরিত্রের চিত্র, কতকগুলিতে সাদা জমীর উপর লাল রঙে আঁকা ছবি। জিনিসগুলির সব কয়টীই বাছা বাছা, খাঁটী প্রাচীন জিনিস। ব্রঞ্জের মূর্ত্তিগুলিতে সবুজ রঙের কলঙ্ক প'ড়ে তাদের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। ভারতবর্ষের দুই একটা পিতলের মূর্ত্তিও আছে, কিন্তু সেগুলি খুব লক্ষণীয় নয়। টেবিলের উপরে প্রাচীন মিসরীয়, গ্রীক ও চীনা মূর্ত্তিগুলির মাঝে আর একটা মূর্ত্তি দেখলুম, সেটা আমার পূর্ব্বপরিচিত। এটা একটা প্রায় এক বিঘত উঁচু, হাতীর দাঁতে তৈরী, কুণ্ডলী-পাকানো শেষ নাগের উপরে উপবিষ্ট মহাবিষ্ণু মূর্ত্তি—নাগের দেহ কুণ্ডলী পাকিয়ে সিংহাসনের সৃষ্টি ক'রেছে, নাগের ফণা রাজাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মাথার উপরে ছত্ররূপে বিস্তৃত হ'য়ে আছে; মূর্ত্তিটী ত্রিবাঙ্কুরের কারিগরের তৈরী। দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ কালে আমরা ত্রিবান্দ্রমে যাই, সেখানে এই রকমের একটী মূর্ত্তি তৈরী হ'চ্ছে দেখে, পরে অর্ডার দিয়ে এই মূর্ত্তিটীই ক'রে আনাই; এত বড় হাতীর দাঁতের মূর্ত্তি বাঙলাদেশে প্রায় করে না। ফ্রয়্‌ড্‌-এর ৭৫ বর্ষ-গ্রন্থি বা জন্মোৎসবের সময়ে ক'লকাতা থেকে গিরীন্দ্রবাবুরা তাঁকে উপহার স্বরূপ এটী

পাঠান, একটা ভাল জিনিস কিছু দিতে হবে ব'লে এটা আমার কাছ থেকে এঁরা কিনে নেন। মূল মূর্ত্তিটী একটু সাদাসিধে ছিল, মুর্শিদাবাদের এক ভাল কারিগর দিয়ে তার আরও একটু অলঙ্করণ করা হয়, একটী চন্দন কাঠের পীঠ তৈরী ক'রে তাতে এক সংস্কৃত লেখ খুঁদিয়ে দেওয়া হয়। জিনিসটা পেয়ে ফ্রয়্‌ড্‌ খুব খুশী হন, আর এটা যে তাঁর ভাল লেগেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল যে তিনি তাঁর বাছা বাছা গ্রীক মিসরী চীনা জিনিসের সঙ্গে সর্ব্বদা চোখের সামনে এটীকেও রেখেছেন।

যাক্‌, একবার চারদিক তাকিয়ে সব দেখে নিয়ে ফ্রয়্‌ড্‌-এর শিল্পগত-প্রাণতার পরিচয় পেলুম,—আমাদের ভাব-সম্মিলনের এক ক্ষেত্র পাওয়া গেল। ফ্রয়্‌ড্‌-এর কথা অনুসারে চেয়ারে ব'সে ব'ললুম, "ধন্যবাদ, বন্ধুরা ভাল আছেন, ডাক্তার বোস (গিরীন্দ্রবাবু) আপনাকে তাঁর শ্রদ্ধা নমস্কার জানিয়েছেন, আর একজন বন্ধু অধ্যাপক রঙ্গীন হালদার 'কাব্য ও নাটক সৃষ্টিতে নির্জ্ঞান ইচ্ছার প্রভাব' (The Working of an Unconscious Wish in the Creation of Poetry and Drama) সম্বন্ধে যাঁর এক প্রবন্ধ আপনাদের পত্রিকায় বেরিয়েছে, তিনিও বিশেষ ক'রে তাঁর নমস্কার জানিয়েছেন।" তারপরে তাঁকে ব'ললুম—"আপনি শিল্প-রাজ্যের কতকগুলি অপূর্ব্ব সুন্দর সৃষ্টির দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে আছেন,—মিসর, গ্রীস, চীন, ভারতবর্ষ—এইসব প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের মধ্যে বাস ক'রছেন; যদি অনুমতি করেন, আপনার সংগ্রহ একটু দেখি।" এই কথায় ফ্রয়্‌ড্‌ যেন একটু খুশী হ'লেন, হম-দরদী বা সহানুভূতির লোক পেলে বাতিকগ্রস্ত লোকেরা খুশীই হয়। তিনি ব'ললেন—"হাঁ, নিশ্চয়ই, আনন্দের কথা, ঘুরে ফিরে দ্যাখো।" আমি জিনিসগুলির সম্বন্ধে যথাজ্ঞান পরিচয় দিতে দিতে, কখনও কখনও তাঁকে কোনও জিনিসের প্রস্তুত-কাল জিজ্ঞাসা ক'রতে ক'রতে মিনিট পাঁচের মধ্যে ঘরের সংগ্রহগুলি একবার দেখে নিলুম। তিনি হাতীর দাঁতের বিষ্ণু মূর্ত্তিটীর দিকে আঙুল দেখিয়ে ব'ললেন, "ওটা তোমাদের দেশের।" আমি ব'ললুম—"ওটীকে আমি বেশ জানি—ভারতবর্ষ থেকে আপনার জন্মতিথিতে সামান্য উপহার-স্বরূপ ওটী এসেছে।"

তার পরে বসা গেল। ফ্রয়্‌ড্‌ দেখলুম কথা কইবার সময়ে ঠিক মত কথা কইতে পারেন না, ডান হাতের আঙুল মুখের ভিতরে দিয়ে দাঁতের মাড়ী টিপে টিপে কথা কইছেন, এতে ক'রে শুদ্ধ আর উচ্চারণ-দুরুস্ত হ'লেও তাঁর ইংরিজি উক্তিগুলি মাঝে মাঝে ধরা কঠিন হ'চ্ছিল। আমি ব'ললুম—"আপনার মনস্তত্ত্ববাদ বোধ হয় আমাদের দেশে—বাঙলায়—যতটা প্রচারিত হ'য়েছে, যতটা আলোচিত হ'য়েছে, ততটা খুব কম দেশেই হ'য়েছে। আপনি অবশ্য ডাক্তার গিরীন্দ্র-শেখর বসুর কৃতিত্ব, আর তাঁর 'সাইকো-আনালিটিকাল-সোসাইটি'-র কথা জানেন।" তিনি আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"তুমি এখন ইউরোপে কি উদ্দেশ্যে? ভ্রমণ?" আমি ব'ললুম—"আমি লণ্ডনে যাচ্ছি,—জুলাইয়ে লণ্ডনে আর সেপ্টেম্বরে রোমে পর পর দুইটা আন্তর্জাতিক সভা হবে, একটী ধ্বনি-তত্ত্ব সম্বন্ধে, আর একটা প্রাচ্য-বিদ্যা সম্বন্ধে, আমি ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-স্বরূপ সেই সভা দুটীতে যোগ দিতে যাচ্ছি। তের বছর আগে জারমানীতে ইটালীতে একটু ঘুরেছিলুম, কিন্তু ভিয়েনা, বুদাপেশ্‌ৎ, প্রাগ, এ তিনটা জায়গা দেখা হয় নি, তাই এদিকে এসেছি। আমার আলোচ্য বিদ্যা হ'চ্ছে ভাষা-তত্ত্ব, ব্যসন হ'চ্ছে শিল্পকলা; আপনার প্রচারিত তত্ত্ববাদ বা অন্য দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই—বন্ধুগোষ্ঠিতে চর্চ্চাকালে একটু আধটু যা ও বিষয়ে শুনেছি। শিল্প বা কলা-রস, আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রভৃতির সঙ্গে যে "স্মর-তা" বা কামানুভূতির বিশেষ যোগ আছে, যা নাকি আপনার প্রতিপাদ্য দর্শনের অন্যতম কথা, সে সম্বন্ধে বহু পূর্ব্বে আমাদের দেশের জ্ঞানী আর সাধকেরাও সচেতন হ'য়েছিলেন; যদি অনুমতি করেন, এ বিষয়ে একটা প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক পেয়েছি, তার অনুবাদ মূলের সঙ্গে লিখে এনেছি, সেটী প'ড়ে আপনাকে শোনাই।"

শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য থেকে "ব্রহ্মসংহিতা" ব'লে এক-খানি বৈষ্ণব স্তোত্রাত্মক পুঁথি বাঙলা দেশে নিয়ে আসেন, তাতে শ্রীকৃষ্ণ স্তবের কতকগুলি শ্লোক আছে। সেগুলি আমাকে দেখান আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও অধুনাতন সহকর্মী শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন; তার মধ্য থেকে এই শ্লোকটী একখানি খাতায় লেখা ছিল। ফ্রয়্‌ড্‌-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে, এই শ্লোকটী তাঁকে ভেট দেবো, ঠিক ক'রে এসেছিলুম; ফ্রয়্‌ড্‌-এর সঙ্গে সাক্ষাতের আগের রাত্রে এটা

দেবনাগরী আর রোমান অক্ষরে নকল করি, আর তার একটা ইংরেজী অনুবাদও ক'রে ফেলি; সবটা ভাল হাতে লিখে, তলায় নাম সই ক'রে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসি—"মধ্য-যুগের বৈষ্ণব আচার্য্যের উক্তিময় শ্লোক—আচার্য্য সিগমুণ্ড্ ফ্রয়্ড্-এর নিকটে ভেট।" শ্লোকটা প'ড়লুম, ইংরেজী অনুবাদ বা ব্যাখ্যাটীও শোনালুম—

আনন্দ-চিন্ময়-রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আনন্দ, চিৎ, ও রসের আত্মা-স্বরূপ বলিয়া যিনি 'স্মরতা' অর্থাৎ কাম-ভাব আশ্রয় পূর্ব্বক সমস্ত প্রাণিগণের চিত্তে আপনাকে প্রতিফলিত করিয়া, আপনার এই লীলা-দ্বারা অজস্র-ভাবে সমগ্র ভুবন সমূহে বিজয়ী হইয়া আছেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

শুনে, ফ্রয়্ড্ একটু গম্ভীর ভাবে ব'ল্‌লেন "হুঁ।" আমি ব'ল্‌লুম—"এই যে স্মরতা, তা আদি-পুরুষ গোবিন্দেরই লীলা। একথা ব'ল্‌ছেন আমাদের দেশের ভক্ত বৈষ্ণব সাধক। আপনি কি বলেন?—আপনাকে একটা সোজা কথা জিজ্ঞাসা করি: জগতের সার বস্তু অক্ষয় বস্তু কি? সেই সার বস্তুর সঙ্গে, অক্ষয় বস্তুর সঙ্গে মানবজীবনের কি সম্বন্ধ? আপনার বিচারে কি শেষ সিদ্ধান্ত আপনি ক'রেছেন?"

আমার কথা শুনে ফ্রয়্ড্ হাস্‌তে লাগলেন; ব'ল্‌লেন, "দ্যাখো, আমি যতটা বিচার ক'রে দেখেছি, তাতে কোনও অক্ষয়-বস্তুর সঙ্গে মানুষের জীবনের যোগ আমি পাই নি। এইখানেই, এই পৃথিবীতে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমস্ত শেষ।"

আমি ব'ললুম, "তা হ'লে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যখন পঞ্চভূতের বিলয় ঘটে, তখন মানুষের সব-কিছুরও অবসান ঘটে? নিত্য বস্তু কিছুই কি নেই? আপনি এই যে সমস্ত শিল্প-সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবে র'য়েছেন—তার থেকে কোনও কিছুর আভাস পান না কি?" তিনি ব'ল্‌লেন—"না; আমার শক্তির অবসান হ'য়ে আস্‌ছে; আস্তে আস্তে সব শেষ হবে।"—"তা হ'লে কবরের ওপারে কিছু থাকা সম্ভব মনে করেন না?"—"না—এইখানেই সব শেষ।"

আমি তখন ব'ল্‌লুম,—"দেখুন, আমরা, অর্থাৎ আধুনিক যুগের বেশীর ভাগ শিক্ষিত লোকে, যখন মাথা-ঘামিয়ে জীবনের অর্থ বা'র করবার চেষ্টা করি, তখন কিছু হদিস পাই না,—ভব-সাগর একেবারে অথই লাগে, কূল-কিনারাও পাওয়া যায় না; চিন্তা ক'রতে ব'সলে, প্রায়ই আমরা অজ্ঞেয়-বাদী হ'য়ে দাঁড়াই; আর যখন আমরা হৃদয় দিয়ে দেখি, অনুভূতির দিকে ঝুঁকি, তখন নানা রকমের ভাব-লহর চিত্তকে মথিত করে, আমরা তখন হই ভাবুক, মরমী, রসিক, বিশ্বাসী। আপনি এদিকে শিল্পরস-রসিক; ওদিকে আপনি অজ্ঞেয়-বাদী,—না নাস্তিক-বাদকেই ধ্রুব সত্য ব'লে মনে করেন?"

ফ্রয়্ড্ ব'ল্‌লেন—"শিল্প, রস, আনন্দ,—এ সমস্ত দেহকে আশ্রয় ক'রে; আমার স্থির সিদ্ধান্ত, দেহান্তে কিছুই থাকে না।"—"আচ্ছা, যাঁরা বড় গলায় বলেন, যে তাঁরা পরম-বস্তুর বা অক্ষয়-সত্যের সন্ধান পেয়েছেন; আমাদের দেশের ঋষিরা, সাধকেরা,—যেমন উপনিষদের ঋষিরা, রামকৃষ্ণ পরম-হংসদেবের মতন সাধকেরা—তাঁরা ব'লেছেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥—

যাঁরা স্পষ্ট ভাষায় ব'লেছেন—'আমি দেখেছি, আমি দেখেছি'—তাঁদের কথার মধ্যে এমন একটা নিষ্কপটতা আছে, যা শুনে তাঁদের বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছা হয়; অনেক সময়ে বিশ্বাস না ক'রে পারা যায় না; সে সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?"

ফ্রয়্ড্ ব'ল্‌লেন—"সব ঝুঠ হে; এ সমস্ত হ'চ্ছে ভাব-প্রবণ, কল্পনা-সর্ব্বস্ব লোকের আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র। তুমি একটু ভেবে দেখলেই বুঝ্‌তে পারবে যে এসব কিছু বিশ্বাস ক'রে নেবার মত কথা নয়।"

আমি ব'ললুম—"কিন্তু আমি আপনার কথায় নিঃসন্দেহ হ'তে পারছি না; আপনি দৃঢ়-মত হ'য়েছেন, কিছুই নেই, অথচ আপনি শিল্পের মধ্যে আনন্দ পাচ্ছেন,—আর a great peace, একটা বিরাট শান্তি-ভাব আপনার মনে এসেছে ব'লে মনে হয়—আপনি আপনার অজ্ঞাতসারে যেন একজন mystic হ'য়েই আছেন।—আচ্ছা, আইন্‌ষ্টাইন্ এ সম্বন্ধে যে মত পোষণ করেন তা জানেন? আমার মনে হয় আইন্‌ষ্টাইনও এক জন mystic।" ফ্রয়্ড্

ব'ল্লেন—"আইনষ্টাইন কি বলেন?" আমি ব'ললুম, "আইনষ্টাইনের কিছুই পড়ি নি, তাঁর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের চর্চ্চা করার মত বিদ্যা-বুদ্ধি আমার নেই; তবে রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসর বয়স হ'লে, তাঁর সংবর্দ্ধনার জন্য যে Golden Book of Tagore সঙ্কলিত হয়, তাতে আইনষ্টাইন যে টুকু লিখেছেন, তা থেকে মনে হয়, তিনি ব'লতে চান, মানুষ চন্দ্র-সূর্য্যের মত এক অ-দৃষ্ট নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়েই চ'লছে, তার নিজের ইচ্ছা ব'লে কিছু নেই; তাঁর কথার ভাবে মনে হয়, এই অ-দৃষ্ট শক্তি সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা, তা ঈশ্বর-বিশ্বাসী লোকের ধারণার-ই অনুরূপ। আমার মনে হয়, জীবনে এইরূপ একটা touch of mysticism—অ-দৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে অনুভূতি, বা অনুভূতির আভাস—এটা না হ'লে মানুষ বাঁচে না। শিল্প-কলা, সঙ্গীত—আমার মনে এই mystic বস্তুরই আভাস আনে।"

ফ্রয়্‌ড্‌ ব'ললেন্ "দ্যাখো, তুমি বোধ হয় তোমাদের দেশের লোকের মতই ভাবো, তাদের মতই কথা ব'লছ; কিন্তু আমি ওরূপ অনুভূতি মানি না; সমস্তই emotions-এর খেলা।—আর দ্যাখো, আমাদের দেশে জরমান ভাষায় একটা কথা আছে, gnaden-brod, অর্থাৎ 'দয়ার রুটী'; ঘোড়া বা কুকুর বুড়ো হ'য়ে গেলে, অনেক সময়ে তাদের মেরে ফেলে না, ঘরে রেখে দেয়, স্বাভাবিক মৃত্যু পর্য্যন্ত চারটী ক'রে খেতে দেয়; আমি আজ চোদ্দ-বছর ধ'রে যে বেঁচে আছি সব কাজের বা'র হ'য়ে, খালি ব'সে ব'সে এই gnaden-brod খাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা আমার মনে হয়; আমাদের মন স্থির ক'রে কাজ ক'রে যাওয়া উচিত; অনেক সময়ে ব্যারিষ্টার আর উকিল মোকদ্দমা হাতে নিয়েই বুঝতে পারে যে তার মামলা খারাপ, টি'কবে না, শেষটায় তার হার হবেই; কিন্তু তবুও সে ল'ড়তে কসুর করে না। আমাদেরও তাই; জীবনের সঙ্গেই সব শেষ—কিন্তু তবুও ল'ড়ে যেতে হবে, মামলা ছেড়ে দিলে চ'লবে না।"

আমি ব'ললুম—"তা হ'লে আপনি যথার্থ কর্ম্মযোগী; গীতায় যে বলেছে—

> 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে, মা ফলেষু কদাচন',

আর

> 'যতঃ প্রবৃত্তি র্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
> স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।'

(আমি সংস্কৃত বচন দুটী আউড়ে ইংরিজি ক'রে ব'ললুম)—আপনি তো তাই; অধিকন্তু বরং আপনার মনে কর্ম্ম-ফলের আকাঙ্ক্ষার কথা দূরে থাক্, নিজের কর্ম্ম-ফলের সঙ্গে কোনও রকম সংযোগের কথাই আপনার মনে স্থান পায় না, তবুও কর্ম্ম ক'রে যেতে চান। আপনার এই নিষ্কাম-কর্ম্ম, আর তার সঙ্গে সঙ্গে অনস্তিত্ব-বাদ, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য আমি ক'রতে পারছি না। নিশ্চয়ই এর মধ্যে অন্তর্নিহিত একটা সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু তা আমার বিচার-শক্তির অগোচর।"

আমার কথা শুনে ফ্রয়্‌ড্‌ কেবল হাস্‌তে লাগলেন।

এইরূপ নানা কথায় আধঘণ্টা কাল অতীত হ'ল, এগারোটা বাজতে মিনিট দু-চার দেরী। ফ্রয়্‌ড্‌ উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললেন, "তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে খুশীতে ছিলুম, কিন্তু দ্যাখো, একজন ডাক্তার আছেন, তিনি কোনও রকমে আমার এই ভাঙা শরীরখানাকে জুড়ে তালি-দিয়ে রেখে দিয়েছেন; এগারোটার সময়ে তাঁর আসবার কথা।"—আমি তখন উঠে বিদায় নিলুম। প্রশান্তচিত্ত বৃদ্ধ, তাঁর অমায়িক সরল হাসি আর সত্যকার বিনয় আর সৌজন্যের সঙ্গে উঠে আমার সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রলেন। আমি বিদায় নিয়ে চ'লে এলুম।

ভিয়েনা থেকে বুদাপেশ্‌ৎ-এ পৌঁছনোর পরে, এখানে 'মজর্' বা 'মাগ্যার' (অর্থাৎ হঙ্গেরীয়) ভাষার কবিদের থেকে ইংরিজী অনুবাদের একখানি বই সংগ্রহ করি। তাতে দেঝো কস্তোলান্যি Dezső Kosztolanyi নামে একজন আধুনিক কবির একটী ছোটো কবিতা পড়ি—

> I believe in nothing.
> If I die, I shall be nothing.
> Even as before I was born
> Upon this sun-lit earth. Monstrous!
> Soon I shall call you for the last time.
> Be my good mother, O eternal darkness.

কবিতাটী প'ড়ে, ফ্রয়্‌ড্‌-এর কথাই মনে হ'তে লাগ্‌ল।

ওগুরি-হাঙ্গওয়ান

(জাপানী গাথা হইতে)

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রসিদ্ধ তাকাকুরা দাইনাগোন, তাঁর অপর নাম কানে-ইয়ে অর্থাৎ ধনকুবের। চারিদিকে তাঁর দৌলতখানা।

কত দুষ্প্রাপ্য অসম্ভব বস্তু ছিল তাঁর ভাণ্ডারে তার ইয়ত্তা নাই।

এমন এক রত্ন ছিল আগুনকে যা দমন করিতে পারে, অপর এক রত্ন ছিল যা জলকে করে দমন। আর ছিল এক বাঘের নখ—জীবন্ত বাঘের থাবা থেকে কাটা। এমন কি অশ্বশাবকের শিং, কস্তুরীবিড়াল পর্য্যন্ত ছিল!

মানুষের কামনার ধন সমস্তই ছিল, ছিল না কেবল এক বংশধর। তা-ই ছিল তাঁর কষ্টের একমাত্র কারণ।

পুরাতন বিশ্বস্ত অনুচর ইকেনোসোজি একদিন তাহাকে বলিল—

"পবিত্র কুরামা-পাহাড়ের উপর বৌদ্ধ ঠাকুর তামোন্-তেনের মন্দির! ঠাকুরের কৃপার কথা দেশদেশান্তরের লোক জানে; আমার সবিনয় অনুরোধ, হুজুর সেই মন্দিরে গিয়ে তাঁর কাছে মানত করুন; তাহলে আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবেই!"

হুজুর সম্মত হইলেন। অবিলম্বে যাত্রার আয়োজন হইল সুরু।

অতি দ্রুত ভ্রমণের ফলে অচিরে তিনি মন্দিরে পৌঁছিলেন; তার পর দেহের উপর প্রচুর জল ঢালিয়া শুদ্ধশুচি হইয়া বংশধরের জন্য একমনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

সর্ব্ববিধ খাদ্য পরিহার করিয়া তিন দিন তিন রাত এইরূপে কাটাইলেন। কিন্তু সবই বুঝি বৃথা হয়!

দেবতা নিরুত্তর। হতাশ হইয়া ওমরাহ সঙ্কল্প করিলেন, মন্দিরের মাঝে 'হারাকিরি' করিয়া পবিত্র দেবায়তন কলুষিত করিবেন!

শুধু তাই নয়, মৃত্যুর পর বিদেহী অবস্থায় কুরামা-পাহাড়ে ভর করিয়া পাঁচক্রোশব্যাপী পার্ব্বত্য পথে তীর্থ-যাত্রীদের ভয় দেখাইয়া তাহাদের ধর্ম্মাচরণে বাধা দিবেন!

মুহূর্ত্তের বিলম্বে মারাত্মক কাণ্ড ঘটিতে পারিত; ভাগ্যে ইকেনোসোজি ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপস্থিত। 'হারা-কিরি'তে বাধা পড়িল।

"হুজুর!" অনুচর বলিল—"হুট্ করে' মরবার সঙ্কল্প করবেন না! আগে আমার ভাগ্য যাচাই করি, দেখি আপনার জন্যে মানত করে' আমি বেশী ফল পাই কি না!"

তখন সে একুশ বার দেহশুদ্ধি করিল—সাতবার দেহ ধুইল গরম জলে, সাতবার ধুইল শীতল জলে, আর সাতবার ধুইল একগোছা বাঁশপাতার সাহায্যে। তার পর দেবসকাশে নিবেদন করিল—

"ঠাকুরের কৃপায় আমার প্রভুর যদি বংশধর প্রাপ্তি হয়, তা'হ'লে প্রতিজ্ঞা করছি মন্দিরের উঠান ধাতু দিয়ে বাঁধিয়ে দেব! মন্দিরের বাহিরে বসাবো সারবন্দী ধাতুর লণ্ঠন, ভিতরের সমস্ত থাম খাঁটি সোনা আর রুপোর পাতে দেওয়াব মুড়িয়ে!"

দেবসকাশে দুই দিন দুই রাত ধ্যানধারণায় কাটার পর তৃতীয় রাত্রে তামোন্-তেন্ ভক্তের কাছে প্রকাশিত হইলেন। কহিলেন—

"তোমার প্রার্থনা পূরণ করার জন্যে উপযুক্ত বংশধরের সন্ধান করেছি নিকটে ও দূরে—এমন কি তেন্জিকু (ভারতবর্ষ) ও কারা (চীনদেশ) পর্য্যন্ত। কিন্তু যদিও মানুষ আকাশের নক্ষত্রের মত বা বেলাবালুকার মত অগণিত, তবুও তোমার প্রভুকে দেওয়ার মত মানুষের ঔরসজাত একটি বংশধরও খুঁজে পাই নি। অবশেষে, নিরুপায় হয়ে দান্দোকু পর্ব্বতের সুদূর প্রান্তে আরি-আরি শৃঙ্গে যাঁর নিবাস

সেই শি-তেন্‌নো দেবের আট সন্তানের একটিকে গোপনে সরিয়ে ফেলেছি। সেই শিশুকে তোমার প্রভুর বংশধর হতে পাঠাবো!"

এই কথা বলিয়া ঠাকুর মন্দিরের গর্ভগৃহে অন্তর্হিত হইলেন। তখন ইকেনোসোজি তার বাস্তব স্বপ্নভঙ্গে ঠাকুরের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে নয় বার প্রণত হইয়া প্রভুর গৃহাভিমুখে দ্রুত-গতি যাত্রা করিল।

অনতিকাল পরে তাকাকুরা-পত্নীর হইল গর্ভসঞ্চার। আশা আনন্দে দশ মাস কাটাইয়া বিনা যন্ত্রণায় তিনি এক পুত্র প্রসব করিলেন।

সকলে আশ্চর্য্য হইয়া লক্ষ্য করিল শিশুর ললাটে স্বাভাবিকভাবে 'অন্ন'-বোধক চীনা হরফটি অঙ্কিত!

আরও আশ্চর্য্য, তার চোখের মধ্যে চতুর্বুদ্ধের প্রতিবিম্ব!

ইকেনোসোজি ও শিশুর পিতামাতার আনন্দের আর অবধি নাই। জন্মের পর তৃতীয় দিনে শিশুর নামকরণ হইল আরি-ওয়াকা আরি-আরি পাহাড়ের নামের অনুকরণে।

২

শিশু দ্রুত বাড়িতে লাগিল। বয়স যখন হইল পনর তখন সম্রাট তাহাকে 'ওগুরি-হাঙ্গওয়ান কানেউজি' এই নাম ও উপাধি দান করিলেন।

যথাকালে যৌবনে পদার্পণ করিলে পিতা মনস্থ করিলেন পুত্রের বিবাহ দিবেন।

রাজসচিব ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের অনেক কন্যা দেখিলেন বটে, কিন্তু কাহাকেও কর্ত্তার পছন্দ হইল না।

ওদিকে যুবক হাঙ্গওয়ান যখন জানিতে পারিলেন যে তামোন্‌-তেন্ ঠাকুরের কৃপায় পিতামাতা তাঁহাকে লাভ করিয়াছেন, তখন তিনিও সঙ্কল্প করিলেন, সেই ঠাকুরের কাছেই পত্নী ভিক্ষা করিবেন। এইরূপ মনস্থ করিয়া ইকেনো-সোজিকে সঙ্গে লইয়া তিনি দ্রুতগতি দেবমন্দিরে যাত্রা করিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া শুচিশুদ্ধ হইয়া পূজার্চ্চনায় তিন রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করিলেন।

ক্রমে নিঃসঙ্গতা পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল, ওমরাহ্‌-পুত্র কি আর করেন, সময় কাটাইবার জন্য বাঁশের বাঁশিতে ফুঁ দিলেন।

সেই মন্দিরের সরোবরে বাস করিত এক অজগর—বাঁশির মধুর স্বরে মুগ্ধ হইয়া সে মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল রাজসভার রূপসী পরিচারিকার রূপ ধরিয়া। সে তন্ময় হইয়া বাঁশি শুনিতে লাগিল।

তাহাকে দেখিয়া যুবক কানেউজির মনে হইল তাহারই জন্য তিনি এত দূরে আসিয়াছিলেন—ঠাকুর তাহার প্রার্থনা শুনিয়া সেই কন্যাকেই তাহার বধূরূপে মনোনীত করিয়াছেন! সুতরাং সুন্দরীকে পাল্কীতে চাপাইয়া তিনি যথাকালে গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

উক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরেই রাজধানীতে উঠিল প্রচণ্ড ঝড়, তার পশ্চাতে আসিল প্রবল বন্যা। সাত দিন সাত রাত তার অবসান হইল না।

এইসব অশুভ লক্ষণ দেখিয়া সম্রাট বিষম উদ্বিগ্ন হইলেন; জ্যোতিষীর তলব হইল দুর্যোগের কারণ নির্দ্ধারণের জন্য।

পত্নীহারা অজগরের ক্রোধের ফলেই দুর্যোগের উৎপত্তি—অজগর প্রতিশোধ চাহে—কানেউজি যে-রূপসীকে সঙ্গে আনিয়াছে সে-ই সর্পিণী, সে মানবী নয়! ইহাই জ্যোতিষীর সিদ্ধান্ত।

শুনিয়া সম্রাট বলিলেন, বটে? তবে কানেউজিকে হিতাচি-প্রদেশে নির্ব্বাসিত করো আর মানবীর রূপে সর্পিনীকে তার সলিল-নিবাসে প্রত্যর্পণ করো!

রাজাদেশে দেশত্যাগে বাধ্য হইয়া কানেউজি হিতাচি-প্রদেশে যাত্রা করিল, সঙ্গে রহিল বিশ্বস্ত অনুচর ইকেনোসোজি।

৩

কানেউজির নির্ব্বাসনের অল্পকাল পরেই এক সওদাগর তার পণ্যসম্ভার লইয়া হিতাচিতে নির্ব্বাসিত ওমরাহ্‌-পুত্রের ভবনে আসিয়া উপস্থিত। হাঙ্গওয়ানের প্রশ্নের উত্তরে সে কহিল—

"আমার নিবাস কিওতো শহরে মুরোমাচি নামক রাস্তায়। আমার নাম গোতো সায়েমোন। আমার গুদামে আছে এক হাজার আটরকম মাল যা পাঠাই চীনদেশে; এক হাজার আটরকম মাল যা পাঠাই ভারতবর্ষে; আরও এক হাজার আটরকম মাল আছে যা কেবল জাপানে বিক্রি করি। তবেই

দেখুন আমার গুদামে আছে মোটমাট তিন হাজার চব্বিশ রকম মাল! কোথায় কোথায় গিয়েছি যদি জিজ্ঞাসা করেন ত বলতে পারি যে আমি এ পর্য্যন্ত তিন বার গিয়েছি ভারতবর্ষে, তিনবার গিয়েছি চীনদেশে আর জাপানের এদিকে আসছি এই সপ্তমবার!"

সমস্ত শুনিয়া হাঙ্গওয়ান সওদাগরকে প্রশ্ন করেন—"তুমি ত অনেক ঘুরেছ, বহু দেশ দেখেছ, আমার পত্নী হবার যোগ্য কোনো যুবতী কন্যার সন্ধান রাখো?"

সায়েমোন বলিল—"আমাদের পশ্চিমে সাগামী-প্রদেশ। সেখানে এক ধনী বাস করেন, তাঁর নাম য়োকোয়ামা চোজ্জা—তাঁর আট ছেলে। মেয়ে না থাকায় অনেকদিন ছিল তাঁর দুঃখ, একটি কন্যালাভের জন্য আদিত্যদেবের কাছে বহুকাল তিনি মানত করেন। তার ফলে একটি মেয়ে দেবতার কৃপায় তিনি লাভ করলেন। মেয়েটির জন্মের পর পিতামাতার মনে হ'ল তাকে নিজেদের চেয়ে উচ্চ মর্য্যাদা দেওয়া উচিত, কারণ তার জন্ম আদিত্যদেবের অনুগ্রহে; তাই তাঁরা মেয়ের জন্যে তৈরি করিয়ে দিলেন পৃথক বাসভবন। যথার্থই, মেয়েটির সঙ্গে অন্যান্য জাপানী স্ত্রীলোকের তুলনা চলে না। তিনি সর্ব্বাংশে আপনার উপযুক্ত, আর কোনো মেয়ের কথা ত আমার মনে পড়ে না!"

বিবরণ শুনিয়া কানেউজি আনন্দিত মনে সায়েমোনকে তার বিবাহের ঘটকালি করিতে অনুরোধ করিলেন। সায়েমোন যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিল।

তখন কানেউজি কালি-ঘষা পাথর ও লেখার তুলি চাহিলেন, তার পর একখানি প্রণয়লিপি রচনা করিয়া তাহা প্রেম-পত্রের মত ভাঁজ করিয়া দিলেন। লিপিখানি মহিলাটির হাতে দিবার জন্য সওদাগরকে অনুরোধ করিয়া পারিশ্রমিক হিসাবে তাহাকে দিলেন এক-শ সোনার মোহর।

বিস্মিত ও আনন্দিত সায়েমোন বার বার আভূমি প্রণত হইয়া ধন্যবাদ জানাইল। তার পর চিঠিখানি বাক্সের মধ্যে রাখিয়া পিঠের উপর বাক্স তুলিয়া লইয়া ওমরাহ-নন্দনের কাছে বিদায় লইল।

হিতাচি হইতে সাগামী সাত দিনের পথ, কিন্তু সওদাগর দিনরাত অবিরাম চলিয়া তৃতীয় দিন দুপুরে সেখানে পৌঁছিল।

তার পর সে গেল সেই ভবনে যার নাম ইনুই-নো-গোজ্জো। ধনী য়োকোয়ামা সেই ভবন তাঁর আদরিণী কন্যা তেরুতে-হিমের জন্য তৈরি করান সাগামী প্রদেশের সোবা জেলায়। ভবনে প্রবেশের অনুমতি সে চাহিল।

প্রহরীদল ভারি কড়া, তারা তাহাকে হাঁকাইয়া দিল। কহিল, প্রসিদ্ধ চোজ্জা য়োকোয়ামার কন্যা তেরুতে-হিমের সেই ভবন—পুরুষজাতীয় কোনো ব্যক্তির প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ! আরও জানাইল, প্রাসাদ রক্ষার সুব্যবস্থা আছে—দিনে দশ জন রাতে দশ জন প্রহরী, এবং তাহারা সতর্কতা ও কঠোরতার জন্য প্রখ্যাত।

কিন্তু সওদাগর দমিবার পাত্র নহে। সে কহিল, তার নাম গোতো সায়েমোন, নিবাস কিওতো শহরের মুরোমাচি রাস্তায়; সেখানকার সে একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, লোকে তাহাকে সেন্‌দান্যা বলিয়া ডাকে; সে করিয়াছে তিন বার ভারত ভ্রমণ, তিনবার চীন ভ্রমণ, আর আপাতত 'উদীয়মান সূর্য্যের' দেশে এই তার সপ্তম পরিক্রম!

সে আরও বলিল—"এই প্রাসাদ ছাড়া নিহোনের (জাপানের) আর সমস্ত প্রাসাদে আমার গতিবিধি অবাধ; এখানেও তোমরা আমাকে প্রবেশের অনুমতি দিলে বিশেষ বাধিত হব!"

অতঃপর সে থান থান রকমারি রঙীন রেশম বাহির করিয়া প্রহরীদের হাতে তুলিয়া দিল। এইরূপে লোভান্ধ প্রহরীদের আপত্তি খণ্ডন করিয়া সওদাগর সানন্দে প্রাসাদে প্রবেশ করিল। বাহিরের বিশাল তোরণ অতিক্রম করিয়া একটি পুল পার হইয়া সে গিয়া পৌঁছিল সখীমহলে। সমুচ্চ কণ্ঠে সে ডাকিয়া বলিল—"আসুন মহিলারা আসুন, আপনারা যা চান তাই পাবেন আমার কাছে! হরেক রকমের জিনিষ—চিরুণী আছে, ছুঁচ আছে, সন্না আছে! তাতেগামি পাবেন, রূপোর চিরুণী পাবেন, নাগাসাকির কামোজি পাবেন, আর পাবেন রকমারি চীনা আয়না!"

শুনিয়া মেয়েরা বিবিধ সৌখীন জিনিষ দেখার আগ্রহে ও আনন্দে সওদাগরকে কক্ষমধ্যে আহ্বান করিল। দেখিতে দেখিতে ঘরখানি নারীপ্রসাধনসম্ভার-বিপণিতে পরিণত হইল।

দরদস্তুর ও বিক্রির কথা অতি দ্রুত চলিতেছে, সায়েমোন

সেই সুযোগে বাক্স থেকে প্রেমপত্রখানি বাহির করিয়া মহিলাদের উদ্দেশে বলিল—

"এই চিঠিখানি, যতদূর মনে পড়ে, হিতাচির কোনো নগরে আমি কুড়িয়ে পাই, এখানি গ্রহণ করলে বড়ই আনন্দিত হব। লেখা যদি সুন্দর হয়, আদর্শরূপে ব্যবহার করতে পারেন; বিশ্রী হ'লে বিদ্রূপ করবেন!"

তখন প্রধানা সখী চিঠিখানি লইয়া খামের উপরের লেখা পড়ার চেষ্টা করিতে লাগিল—"ৎসুকি নি হোশি—আমে নি আরারে গা—কোরি কানা,"—

যার অর্থ—"শশী ও তারা—বৃষ্টি ও শিলা—বরফ করে!" কিন্তু সে এই রহস্যময় কথাগুলির হেঁয়ালি উদ্ধার করিতে পারিল না।

অপর মহিলারাও কথার অর্থ অনুমান করিতে অক্ষম হইয়া হাসিতে সুরু করিল। তীব্র হাসির শব্দ শুনিয়া ওমরাহ-নন্দিনী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সুসজ্জিতা কিন্তু তাঁর রাত্রির মত কালো চুল গুণ্ঠনাবৃত।

তেরুতে শুধাইলেন—"এত হাসি কেন? কি এমন মজার কথা? আমাকে বলবে না?"

সখীরা কহিল—"আমরা হাসছিলুম একখানা চিঠি পড়তে না পেরে। রাজধানী থেকে এই সদাগর এসেছে, বলে কি না চিঠিখানা পথে কুড়িয়ে পেয়েছে!"

বলিয়া চিঠিখানি লাল টকটকে একখানি খোলা পাখার উপর রাখিয়া যথারীতি ওমরাহ-নন্দিনীর দিকে আগাইয়া দিল। সেখানি লইয়া লেখার সৌন্দর্য্যের তারিফ করিয়া তিনি বলিলেন—

"কী সুন্দর! এমন খাসা লেখা কখনো দেখি নি! ঠিক যেন কোবোদাইশির বা মোঞ্জু বোসাৎসুর লেখা! হয়ত লেখক ইচিজো, নিজো বা সানজো পরিবারের কোনো ওমরাহ-পুত্র—তাঁরা সকলেই ওস্তাদ লিপিকার। কিম্বা, যদি আমার এই অনুমান ভ্রান্ত হয়, তাহ'লে আমার বিশ্বাস এই শব্দগুলি নিশ্চয়ই লিখেছেন ওগুরি-হাঙ্গওয়ান কানেউজি—যিনি হিতাচি-প্রদেশে এখন স্বনামধন্য। ···চিঠিখানা তোমাদের প'ড়ে শোনাই!"

খামখানি খোলা হইল। প্রথম বাক্যাংশ তিনি পড়িলেন—

ফুজি নো য়্যামা (ফুজি পর্ব্বত)···তিনি অর্থ করিলেন—উহা পদমর্য্যাদা বুঝায়। তারপর তিনি বাক্যাংশগুলি পড়িতে লাগিলেন—

কিয়োমিদজু কোসাকা (জায়গার নাম); আরারে নি ওজাসা (বাঁশপাতার উপর শিলাবৃষ্টি); ইতায়া নি আরারে (কাঠের ছাতের উপর শিলাবর্ষণ);

তামোতো নি কোরি (আস্তিনের মধ্যে বরফ); নোনাকা নি শিমিদজু (প্রান্তরের মাঝে প্রবাহিত নির্ম্মল জলধারা) কোইকে নি মাকোমো (ছোট পুকুরে উলুখড়);

ইনোবা নি ৎসুয় (তারো গাছের পাতায় শিশির); শাকুনাগা ওবি (অতি দীর্ঘ কটিবন্ধ); শিকা নি মোমিজি (মৃগ ও 'মেপল'-গাছ);

ফুতামাতা-গাওয়া (আঁকাবাঁকা নদী); হোসো তানিগাওয়ানি মারুকিবাশি (গোলাকার কাঠের কুঁদো ছোট স্রোতস্বতীর উপর পুলের মত স্থাপিত); ৎসুরুনাশি যুমি নি হাবুকে দোরি (জ্যাহীন ধনু ও পক্ষহীন পাখী)!

তখন তিনি শব্দগুলির তাৎপর্য্য বুঝিলেন—

'মাইরেবা আউ'—তাহাদের দেখা হইবে, কারণ সে তাঁর কাছে আসিবে! 'আরারে নাই'—তখন আর তাহাদের বিচ্ছেদ হইবে না! 'কোরোবি আউ'—তাহারা একত্রে শয়ন করিবে!

অবশিষ্ট অংশের অর্থ এইরূপ—

"এই পত্র আস্তিনের মধ্যে খোলা দরকার, যাহাতে অপরে ইহার সম্বন্ধে কিছুই না জানিতে পারে! নিজের বুকের মধ্যে গুপ্ত কথা রাখিয়া দিয়ো!

"বাতাসের মুখে উলুঘাস যেমন নত হয় তোমাকেও আমার কাছে তেমনি হইতে হইবে! সকল বিষয়ে আমি তোমার সেবা করিতে স্থিরসঙ্কল্প!

"যে-কোনো কারণে সুরুতে আমাদের মধ্যে ব্যবধান থাকিলেও শেষ পর্য্যন্ত আমরা মিলিত হইবই! আমি তোমাকে কামনা করি শরতে হরিণ যেরূপে হরিণীকে কামনা করে!

"দীর্ঘকাল দূরে দূরে থাকিলেও আমরা মিলিত হইব, যেমন করিয়া নদীর দুই-শাখায় বিভক্ত জলধারা অন্তে মিলিত হয়!

"দেবি, আমার মিনতি, এই লিপির অর্থ উদ্ধার করিয়া রাখিয়া দিয়ো! সদয় উত্তরের আশা রাখি! তেরুতে-হিমের কথা ভাবিতে ভাবিতে মনে হইতেছে যেন তার কাছে উড়িয়া যাইতে পারি!"

লিপিশেষে ওমরাহ-নন্দিনী তেরুতে লেখকের নাম দেখিতে পাইলেন—স্বয়ং ওগুরি-হাঙ্গওয়ান কানেউজি—তাঁর নিজের নামও দেখিলেন; চিঠিখানি তাঁহাকেই লিখিত!

তেরুতে মহা ফাঁপরে পড়িলেন, চিঠিখানি যে তাঁহাকেই লেখা সে-কথা গোড়ায় ভাবেন নাই, তাই সখীদের কাছে উচ্চকণ্ঠে উহা পড়িয়াছিলেন।

এখন উপায়? তিনি বেশ জানিতেন, কঠিনহৃদয় পিতা এসব কথা জানিতে পারিলে অচিরে তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিবেন। তাই, উয়ানোগাহারা প্রান্তরের মাটির সঙ্গে মেশার ভয়ে—সেস্থান ক্রোধোন্মত্ত পিতার পক্ষে কন্যাকে হত্যা করার উপযুক্ত—তিনি চিঠির প্রান্ত দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া সেখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু সওদাগর জানে পত্রের একটা কিছু উত্তর না নিয়া হিতাচিতে ফিরিতে পারে না, তাই চালাকি করিয়া জবাব আদায় করা মনস্থ করিল।

দ্রুতপদে তেরুতের পিছু পিছু গিয়া একেবারে অন্দরের কামরায় গিয়া হাজির হইল—চটিজোড়া পায়েই রহিল, খুলিয়া রাখারও তর সহিল না। চীৎকার করিয়া সে বলিল—

"দেখুন ওমরাহ-নন্দিনি! আমি শুনেছি লেখার হরফ ভারতবর্ষে আবিষ্কার করেন মোঞ্জু বোসাসু আর জাপানে করেন কোবোদাইশি! এমন ক'রে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলা সেই কোবোদাইশির হাত ছিঁড়ে ফেলারই মত নয় কি? স্ত্রীলোক কি পুরুষের সমান? তবে আপনি পুরুষের চিঠি ছেঁড়েন কোন্ অধিকারে? আপনি উত্তর লিখে দিতে অস্বীকার করলে এখনি ডাকবো সমস্ত ঠাকুর-দেবতাকে; তাঁদের কাছে জানিয়ে দেব আপনার স্ত্রীলোকের অযোগ্য আচরণের কথা; আপনার ওপর তাঁদের অভিসম্পাত ডেকে আনবো!"

এই কথা বলিয়া সে তার বাক্সর ভিতর থেকে জপমালা বাহির করিয়া বিষম ক্রোধের ভান করিয়া ঘুরাইতে শুরু করিল।

ত্রস্ত বিমূঢ় ওমরাহ-নন্দিনী ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার ভয়ে সওদাগরের মুখ বন্ধ করার জন্য তখনই পত্রের উত্তর লিখিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি করিলেন।

৪

অতি দ্রুত ভ্রমণের ফলে সওদাগর সত্বর হাঙ্গওয়ান-ভবনে আসিয়া পৌঁছিল। পত্রের উত্তর তাঁর হাতে দিল। আনন্দকম্পিত হস্তে চিঠির খাম খুলিয়া ফেলিয়া তিনি কেবল এই কথাকয়টি পড়িলেন—"ওকি নাকা বুনে" অর্থাৎ সম্মুখে ভাসমান নৌকা!

কানেউজি তার অর্থ অনুমান করিলেন এইরূপ—"সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য সকলেরই ভাগ্যে ঘটে, ভয় করিও না, অলক্ষ্যে আসার চেষ্টা করিবে!"

ইকেনোসোজিকে ডাকিয়া তিনি দ্রুত ভ্রমণের আয়োজন করার আদেশ দিলেন। সওদাগর পথ দেখাইতে রাজি হইল।

সোবা-জেলায় পৌঁছিয়া তারা যখন ওমরাহ-নন্দিনীর ভবনের দিকে চলিয়াছে তখন সে কুমারকে বলিল—

"ঐ যে সামনে কালো ফটকের বাড়ি দেখছেন, ঐটি হ'ল বিখ্যাত য়োকোয়ামা চোজার ভবন; আর উত্তরে ঐ যে আর একখানা বাড়ি দেখছেন, লাল ফটকের, ঐ হ'ল ফুলের মত সুন্দরী তেরুতের ভবন। সাবধানে বুঝেসুঝে চলবেন তাহলেই সফল হবেন"—

এই কথা বলিয়া পথ-প্রদর্শক বিদায় লইল।

বিশ্বস্ত অনুচরের সঙ্গে হাঙ্গওয়ান তখন লাল ফটকের দিকে অগ্রসর হইলেন।

ফটক পার হইতে উদ্যত দেখিয়া প্রহরীর দল হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল। কে হে তোমরা, যাও কোথা? তোমাদের সাহস ত কম নয়! ধনী য়োকোয়ামার নাম শোন নি? তাঁরই একমাত্র কন্যা তেরুতে-হিমের এই প্রাসাদ—সূর্যদেবের কৃপায় যাঁর জন্ম!

অনুচর উত্তর দিল—"তোমরা ঠিকই বলছো! কিন্তু তোমাদের জানা দরকার, আমরা রাজকর্মচারী, শহর থেকে

আসছি পলাতক আসামীর খোঁজে! এ বাড়িতে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ ব'লেই এখানে তল্লাস দরকার!"

রক্ষীরা অবাক হইয়া গেল, তাহাদিগকে আর বাধা দিতে পারিল না। তথাকথিত রাজকর্ম্মচারীরা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল, এবং ওমরাহ-নন্দিনীর সহচরীরা অনেকে তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনার জন্য বাহির হইয়া আসিল।

স্বয়ং কুমারী তেরুতে সেই প্রেমপত্রের লেখকের আগমনে যারপরনাই আনন্দিত হইয়া তাঁর পাণিপ্রার্থীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আনুষ্ঠানিক পরিচ্ছদে তিনি সজ্জিতা, তাঁর কাঁধের উপর একখানি আচ্ছাদনী।

কানে-উজিও সুন্দরী কুমারীর অভ্যর্থনায় মুগ্ধ হইলেন। অবিলম্বে উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল, তারপর সুরা-সহযোগে প্রকাণ্ড ভোজের সমারোহ। কুমারের অনুচর ও তেরুতের সহচরীবৃন্দ একত্রে নৃত্যগীতে মাতিয়া উঠিল। স্বয়ং ওগুরি হাঙ্গওয়ান তাঁর বাঁশের বাঁশি বাহির করিয়া মধুর স্বরে তান ধরিলেন।

অদূরবর্ত্তী ভবনে বসিয়া তেরুতের পিতা কন্যার আলয়ে আনন্দ-কলরোল শুনিয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল—কি হ'ল? ব্যাপার কি?

যখন শুনিল হাঙ্গওয়ান তার অনুমতি ব্যতিরেকেই তার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে তখন সে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া গোপনে প্রতিশোধের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

৫

পরদিন য়োকোয়ামা কুমার কানেউজিকে স্বীয় ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া পত্র দিল—উদ্দেশ্য, সুরাপান-অনুষ্ঠানের দ্বারা শ্বশুর-জামাতার সম্ভাষণ-বিনিময়।

তেরুতে স্বামীকে নিষেধ করিলেন, কারণ রাত্রে তিনি দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু হাঙ্গওয়ান তাঁর আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া নির্ভয়ে চোজার ভবনে চলিয়া গেলেন, পত্নীর ইচ্ছানুযায়ী কেবল কয়েক জন যুবক অনুচরকে সঙ্গে রাখিলেন।

য়োকোয়ামা চোজা তাঁর আগমনে উৎফুল্ল হইয়া গিরিসমুদ্রজাত বিবিধ সুখাদ্যে জামাতার পরিচর্য্যা করিল।

অবশেষে সুরাপানে অবসাদ আসিলে য়োকোয়ামা বলিল—এবার আমাদের মাননীয় অতিথি ওমরাহ কানেউজি সভার চিত্ত বিনোদন করুন!

বলুন কি করবো—হাঙ্গওয়ান বলিলেন।

চোজা বলিল—শুনেছি আপনার অশ্বারোহণ-পটুতা অসাধারণ!

বেশ, তাই দেখুন—কুমার উত্তর দিলেন।

অবিলম্বে 'ওনিকাগে' নামক অশ্ব আনীত হইল। ঘোড়াটা এমনি দুর্দ্দান্ত যে সেটাকে ঘোড়া বলিয়াই মনে হয় না, একটা অসুর কিম্বা ড্রাগন বলিয়াই মনে হয়। কেহ তার কাছে ঘেঁসিতে পর্য্যন্ত সাহস করিত না।

কানেউজি কিন্তু তখনি ঘোড়ার শিকলটা খুলিয়া দিয়া অবলীলাক্রমে তার পিঠে চাপিয়া বসিলেন;

দুর্দ্দান্ত 'ওনিকাগে' আরোহীর ইচ্ছানুযায়ী চলাফেরা করিতে বাধ্য হইল। দেখিয়া সমবেত সকলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল।

তখন চোজা ছয় ভাঁজ-করা একখানি কাঠের পরদা (screen) দাঁড় করাইয়া কুমারকে উহার উপরের কিনারা দিয়া ঘোড়া চালাইতে বলিল।

ওগুরি তাহাই করিলেন। তারপর একখানি দাবার পিঁড়ি রাখা হইল। তিনি তার উপর ঘোড়াকে ছকের ঘরে ঘরে পা ফেলাইয়া চালিত করিলেন।

অবশেষে তিনি আন্দন বা জাপানী লণ্ঠনের ফ্রেমের উপর ঘোড়াকে দাঁড় করাইলেন।

তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় য়োকোয়ামা কুমারের সম্মুখে আনত হইয়া কেবল বলিতে পারিল—যথেষ্ট আনন্দ দিলেন, যথার্থই বাধিত হলুম, বড় খুশী হয়েছি!

বাগানে একটা চেরিগাছে ঘোড়াটাকে বাঁধিয়া ওমরাহ ওগুরি আবার ঘরে ফিরিলেন।

ওদিকে কর্ত্তার তৃতীয় পুত্র সাবুরো বিষাক্ত মদ দিয়া কুমারকে হত্যা করিবে স্থির করিয়াছে—পিতাকেও রাজি করাইয়াছে। 'সাকে' পান করার জন্য সে কুমারকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। সেই সুরার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল নীল বিছা ও নীল গিরগিটির বিষ এবং ফাঁপরা বাঁশের গাঁটের মধ্যে দীর্ঘকাল আবদ্ধ দূষিত জল।

স-পারিষদ হাঙ্গওয়ান কোনো সন্দেহ না করিয়া সমস্তই নিঃশেষে পান করিলেন।

তখন সেই বিষ তাঁহাদের অন্ত্র ও নাড়িভুঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। বিষের দুর্ব্বার শক্তি তাঁহাদের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ করিয়া দিল। প্রভাতের শিশিরবিন্দু তৃণশীর্ষ হইতে যেরূপে লুপ্ত হয় তেমনি করিয়া তাঁহাদের প্রাণ দেহপিঞ্জর হইতে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সাবুরো ও তার পিতা শবগুলি উয়ানোগাহারা প্রান্তরে সমাহিত করিল।

৬

নিষ্ঠুর য়োকোয়ামা ভাবিয়া দেখিল, কন্যার পতিকে এরূপে হত্যা করার পর, কন্যাকে জীবিত রাখা চলে না। সুতরাং সে তাহার বিশ্বস্ত অনুচরদ্বয় ওনিয়ো ও ওনিজি নামক দুই ভাইকে আদেশ করিল, কন্যাকে সাগামী-সমুদ্রের দূরদেশে লইয়া গিয়া ডুবাইয়া মারিতে।

পাষাণহৃদয় প্রভুকে বুঝাইয়া নিরস্ত করা অসম্ভব, তাই সে-আদেশ মানিয়া লওয়া ছাড়া তাহাদের উপায় ছিল না। কি আর করে, দুই ভাই উদ্বেগকাতর মহিলাটির কাছে গিয়া তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানাইল।

পিতার নিষ্ঠুর সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া তেরুতে এতই অবাক হইলেন যে প্রথমে তাঁহার মনে হইল তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন! সেই স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইবার জন্য তিনি একান্তমনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে তিনি বলিলেন—"জীবনে সজ্ঞানে কখনো কোনো অপরাধ করি নি···আমার ভাগ্যে যাই থাক, আমার পিত্রালয়ে যাওয়ার পর আমার স্বামীর কি হ'ল জানবার জন্যে আমার ব্যাকুলতা কি ক'রে বোঝাবো!"

দুই ভাই উত্তর দিল—"প্রভুর অনুমতি না নিয়ে আপনারা বিয়ে করেছেন শুনে তিনি ভীষণ ক্রোধে আপনার ভাই সাবুরোর সাহায্যে কুমারকে বিষ খাইয়ে মেরেছেন!"

শুনিয়া শোকে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তেরুতে নিষ্ঠুর পিতাকে অভিসম্পাত দিতে লাগিলেন। কিন্তু নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য বিলাপ করার অবসরও তাঁহার নাই; ওনিয়ো ও তাহার ভাই অবিলম্বে তাঁহাকে বিবস্ত্র করিয়া খড়ের মাদুরে জড়াইয়া ফেলিল।

তেরুতে ও তাঁর সখীবৃন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে পরস্পরের কাছে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

নৌকা সমুদ্রে গিয়া পড়িল। দুই ভাই যখন দেখিল কেহ কোথাও নাই, তখন তাহারা পরামর্শ করিয়া প্রভু-কন্যার প্রাণ রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে সুরু করিল। এমন সময়ে স্রোতের মুখে একখানি খালি ডোঙা ভাসিতে ভাসিতে তাহাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। ভাইয়েরা বলিল—আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন! প্রভুকন্যাকে ডোঙার মধ্যে বসাইয়া বিদায়-নমস্কার করিয়া নৌকা বাহিয়া তাহারা প্রভুর কাছে ফিরিয়া গেল।

৭

সাত দিন সাত রাত দারুণ ঝড় ও বৃষ্টি। শালতিখানা অবিরাম ঢেউয়ের ঘায়ে বিপর্য্যস্ত হইয়া অবশেষে নাওয়ের নিকটে জনকয় জেলের চোখে পড়িল। জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরিতেছিল। শালতির মধ্যে সুন্দরীকে দেখিয়া তাহারা ভাবিল এ মানবী নয়, অপদেবতা—ঝড়-জল সে-ই আনিয়াছে! স্থানীয় এক ব্যক্তি তাঁহার ভার গ্রহণ না করিলে সম্ভবত দাঁড়ের ঘায়ে তাঁর প্রাণ যাইত।

উক্ত ব্যক্তির নাম মুরাকিমি দায়ু। লোকটির নিজের সন্তানাদি না থাকাতে সে সঙ্কল্প করিল তেরুতেকে কন্যারূপে গ্রহণ করিবে। এই ভাবিয়া সে তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেল এবং তাঁহার নাম দিল য়োরিহিমে। কিন্তু তাঁহার প্রতি সস্নেহ সদয় ব্যবহার করাতে লোকটির পত্নীর মনে ঈর্ষার সঞ্চার হইল। পতির অনুপস্থিতি কালে সে মেয়েটির প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে সুরু করিল।

তবুও য়োরিহিমে বিদায় হয় না দেখিয়া সেই দুঃশীলা স্ত্রীলোক চিরতরে তাঁহাকে সরাইবার দুরভিসন্ধি আঁটিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময়ে সমুদ্রকূলে মেয়েধরার এক জাহাজের আবির্ভাব। য়োরিহিমেকে গোপনে সেই নারীদেহের ব্যাপারীর কাছে বিক্রয় করা হইল।

৮

এই দুর্ঘটনার পর হতভাগিনা এক প্রভু হইতে অন্য প্রভুর কাছে পঁচাত্তর বার হস্তান্তরিত হইল। শেষ যাহার কাছে সে বিক্রীত হইল তার নাম য়োরোদ্‌জুয়া চোবেই—মিনোপ্রদেশের এক গণিকালয়ের সে মালিক।

নূতন প্রভুর নিকট তেরুতে বিনয়-নিবেদন করিলেন—শিক্ষাদীক্ষা তাঁহার নাই, কায়দাকানুন তাঁর অজ্ঞাত, তিনি যেন তাঁর মূঢ়তা মার্জ্জনা করেন! চোবেই তখন তাঁর নামধাম ও বংশপরিচয় জানিতে চাহিল।

তেরুতে ভাবিলেন, জন্মভূমির নামোল্লেখও সমীচীন নয়, কি জানি পিতার কুকীর্ত্তির কথাও হয়ত প্রকাশ হইয়া পড়িবে! ভাবিয়া চিন্তিয়া, হিতাচি-প্রদেশে তাঁহার জন্ম, কেবল এই উত্তর দিতে তিনি সঙ্কল্প করিলেন। যেথানে হাঙ্গওয়ানের ওমরাহ, তাঁর প্রেমাস্পদ, বাস করিতেন, সে স্থান তাঁরও জন্মভূমি, ইহা বলিতে তিনি একটা করুণ আনন্দ অনুভব করিলেন। তিনি বলিলেন—হিতাচি-প্রদেশে আমার জন্ম; কিন্তু বংশ অতি হীন, তাই পদবীর অভাব। দয়া ক'রে আপনিই আমার একটা নাম দিন না!

তখন তেরুতে-হিমের নামকরণ হইল—হিতাচির কোহাগী। প্রভুর ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করার আদেশ তিনি পাইলেন।

সে-আদেশ পালনে অসম্মত হইয়া তিনি কহিলেন, যে-কোন হীন বা কঠিন কাজ তিনি করিতে প্রস্তুত, কিন্তু গণিকা-বৃত্তি গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব!

দারুণ ক্রোধে চোবেই উত্তর দিল—তবে শোন তোমার দৈনিক কাজের ফিরিস্তি :—

"আস্তাবলে এক-শ ঘোড়া আছে, তাদের খাওয়াতে হবে! বাড়ির সকলে যখন খেতে বসবে তখন তাদের খাবার পরিবেশন করতে হবে!

"এ বাড়ির ছত্রিশ জন গণিকার চুল বেঁধে দিতে হবে, যাকে যেমন খোঁপা মানায় তার তেমনি খোঁপা চাই! তা ছাড়া শণের দড়ি পাকিয়ে রোজ সাতটি বাক্স ভরতে হবে!

"তা ছাড়া রোজ সাতটি চুলোয় আগুন দিতে হবে, আর এখান থেকে আধক্রোশ দূরে পাহাড়ে ঝরণা থেকে জল আনতে হবে!"

তেরুতে বুঝিলেন, নিষ্ঠুর প্রভুর নির্দ্দিষ্ট কাজ মানুষে করিতে পারে না। আপন দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া তিনি অশ্রু মোচন করিলেন। পরক্ষণেই তাঁর মনে হইল কাঁদিয়া লাভ নাই। অশ্রু মুছিয়া আস্তিন গুটাইয়া কোমরে ঝাড়ন জড়াইয়া তিনি ঘোড়াগুলিকে খাওয়াইতে সুরু করিলেন।

দেবতার করুণা মানুষের বুদ্ধির অগম্য; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে প্রথম ঘোড়াটিকে খাওয়াইতে সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে দৈবশক্তিতে সমস্ত ঘোড়ার পেট ভরিয়া গেল।

বাড়ির সকলকে খাদ্য পরিবেশনের সময়ও সেইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল; মেয়েদের চুল বাঁধার সময়, শণের দড়ি পাকাইবার সময়, উনানে আগুন দেওয়ার সময়ও সেই একই ব্যাপার!

কিন্তু দূরবর্ত্তী ঝরণা থেকে জল আনার জন্য জলের বাল্‌তি কাঁধে লইয়া তেরুতে-হিমে চলিয়াছেন, এই দৃশ্য সবচেয়ে করুণ!

জলে বালতি ভরিয়া তাহারই মধ্যে আপন মুখের ছায়া দেখিয়া তেরুতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। নিজের মুখ বলিয়া আর মনে হয় না!

সহসা নিষ্ঠুর প্রভুর কথা মনে পড়িল। সন্ত্রস্তচিত্তে বালতি তুলিয়া লইয়া তিনি তাঁর ভয়ঙ্কর বাসস্থানে ফিরিয়া চলিলেন।

অচিরে গণিকালয়ের অধিকারীর মনে সন্দেহ হইল যে তার নূতন দাসী সাধারণ স্ত্রীলোক নহে, ফলে সে তেরুতের প্রতি সদয় ব্যবহারের ভান করিতে লাগিল।

৯

এইবার কানেউজির কথা বলি। কাগামির ফুজিসাওয়া মন্দিরের বহুবিশ্রুত য়ুগ্যো-শোনিন্ জাপানের সর্ব্বত্র বুদ্ধের বাণী প্রচার করিয়া ফিরিতেন। একদা উয়ানোগাহারা প্রান্তর অতিক্রম করার সময় তিনি দেখিলেন একটি সমাধির আশপাশে ঝাঁকে ঝাঁকে কাক ও চিল ঘুরিয়া ফিরিতেছে। নিকটে অগ্রসর হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। খণ্ড-বিখণ্ড ভগ্ন সমাধিশিলার মাঝে একটা অনামা পদার্থ নড়িতেছে, মনে হইল সেটা হস্তপদবর্জ্জিত।

তখন তাঁর মনে পড়িল সেই প্রাচীন কিংবদন্তী—ইহ-

জগতে নির্দ্ধারিত পরমায়ু পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে যাহাদিগকে মারিয়া ফেলা হয়, তাহারা 'গাকি-আমি'র রূপে পুনঃপ্রকাশিত বা পুনরুজ্জীবিত হয়!

উক্ত আকৃতিটি হয় ত সেইরূপ কোনো অতৃপ্ত আত্মার ভাবিয়া তাঁহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। বিকটাকার পদার্থটিকে কুমানো-মন্দিরের উষ্ণ প্রস্রবণে পাঠাইয়া তাহাকে আবার পূর্ব্বের মানবাবস্থায় ফিরিতে সাহায্য করার সঙ্কল্প তিনি করিলেন। একখানি টানাগাড়ী তৈরি করাইয়া অনামা পদার্থটিকে তার মধ্যে রাখিলেন এবং তার বুকে একখানি কাঠের ফলক ঝুলাইয়া দিলেন। তার উপর বড় বড় হরফে লিখিলেন—

"এই হতভাগ্যকে দয়া করিয়ো, কুমানো-মন্দিরের উষ্ণ প্রস্রবণে যাইতে ইহাকে সাহায্য করিয়ো! গাড়ীর সংলগ্ন রজ্জু ধরিয়া যাহারা এই গাড়ী কিছুদূর টানিবে, তাহারা হইবে অশেষ মঙ্গলের অধিকারী! পদপরিমিত ভূমির উপর দিয়াও এই গাড়ী টানিলে সহস্র যতি ভোজন করানোর পুণ্য সঞ্চয় হইবে, দুই পা টানিলে দশ সহস্র যতি ভোজন করানোর পুণ্যার্জ্জন হইবে। আর ত্রিপদ-পরিমিত ভূমির উপর দিয়া ইহা টানিলে যে পুণ্য সঞ্চয় হইবে তদ্দ্বারা কোনো মৃত আত্মীয়ের—পিতা, মাতা বা পতি—মোক্ষলাভ হইবে!"

অচিরে পথিকেরা নিরাকার পদার্থটির প্রতি করুণা-পরবশ হইল। কেহ কেহ গাড়ীখানি কয়েক ক্রোশ টানিয়া দিল, কেহবা একাদিক্রমে কয়েক দিন ধরিয়া টানিতে লাগিল। এইরূপে, দীর্ঘকাল পরে, এক দিন শকটারূঢ় 'গাকি-আমি' চোবেইয়ের গণিকালয়ের সম্মুখে আসিয়া পৌছিল; হিতাচির কোহাগী তাহাকে দেখিয়া এবং তাহার উপরে ঝোলানো কাঠের ফলকে লেখা পড়িয়া বড়ই বিচলিত হইলেন। সহসা তাঁর ইচ্ছা হইল, অন্তত এক দিন গাড়ীখানি টানিয়া মৃত পতির জন্য পুণ্য অর্জ্জন করেন! অতঃপর তিনি গাড়ী টানার জন্য প্রভুর কাছে তিন দিনের ছুটি প্রার্থনা করিলেন। মুখে বলিলেন স্বর্গীয় পিতামাতার জন্য তাঁর প্রার্থনা—পতির কথা উল্লেখের সাহস হইল না।

চোবেই কিন্তু রাজি হয় না, কঠিন কণ্ঠে বলিল—"আমার পূর্ব্ব আদেশ মান্য কর নি, এক ঘণ্টার ছুটিও পাবে না!"

শুনিয়া কোহাগী বলিলেন—"প্রভু! শীত পড়িলে মুরগী যেমন তার বাসায় গিয়া ঢোকে, ছোট ছোট পাখী যেমন গভীর বনের দিকে দ্রুত ধাবিত হয়, মানুষও ঠিক তেমনি দুঃসময়ে বদান্যতার আশ্রয়ে ছুটিয়া পালায়! আপনার দয়ার কথা কে না জানে, নহিলে এই ভবন-প্রাচীরের পাশেই 'গাকি-আমি' বিশ্রাম করিতে আসিবে কেন? দয়া করিয়া আমায় কেবল তিন দিনের মুক্তি দিন! তার পরিবর্ত্তে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, প্রয়োজন হইলে প্রভু ও প্রভুপত্নীর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিব!"

অনেক সাধ্যসাধনার পর নির্দ্দয় চোবেই তাঁর আর্জ্জি মঞ্জুর করিল এবং সেই ছুটির সঙ্গে তার স্ত্রী আরও দু'দিন জুড়িয়া দিল। মোটমাট পাঁচ দিনের মুক্তি পাইয়া পরমানন্দে কোহাগী সেই ভয়ানক কাজে লিপ্ত হইলেন। বহু কষ্টে ফুহানোসেকি, মুসা, বাম্বা, সামেগায়ে, ওনো, সুয়েনাগা-তোগে অতিক্রম করিয়া তিন দিনের মধ্যে তিনি ওৎসু নামক প্রসিদ্ধ নগরে গিয়া পৌছিলেন। তিনি জানিতেন, সেইখানে তাঁহাকে গাড়ী ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ তথা হইতে মিনো-প্রদেশে ফিরিতে লাগিবে দুই দিন। ওৎসু পর্য্যন্ত পথ দীর্ঘ। পথপ্রান্তে প্রস্ফুটিত বনফুল, গাছে গাছে কলকণ্ঠ পাখী, ধানের ক্ষেতে কৃষাণীদের সঙ্গীত তাঁর নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিল। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী সে আনন্দ, সেই সব দৃশ্য ও শব্দ অতীত জীবনের কথা স্মরণে আনিয়া তাঁর বর্ত্তমান দুরবস্থার বেদনা আরও বাড়াইয়া তুলিল।

তিন দিন তিন রাত্রি দারুণ পরিশ্রমে কাতর হইলেও তিনি কোনো সরাইয়ে আশ্রয় লইলেন না। পরদিন যে অনামা পদার্থটিকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে তাহারই পাশে তিনি শেষ রাত্রি কাটাইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, শুনিয়াছি 'গাকি-আমি'র নিবাস প্রেতলোকে! সুতরাং আমার স্বর্গীয় স্বামীর কথা ইহার জানা সম্ভব! এই 'গাকি আমি'র দর্শন ও শ্রবণশক্তি থাকিলে বেশ হইত! তাহা হইলে ইহাকে কানেউজির সংবাদ শুধাইতে পারিতাম, হয় মুখের কথায়, নয় লিখিয়া!

কুয়াশায়-ঢাকা গিরিশিরে যখন ভোরের আলো ফুটিল,

কোহাগী তখন কালির শিলা ও লেখার তুলি সংগ্রহ করিতে গেলেন।

অনতিকাল পরে 'গাকি-আমি'র বুকে ঝোলানো কাষ্ঠফলকে যে লেখা ছিল তার তলায় তিনি লিখিলেন—

"পুনর্জীবন লাভ ক'রে যখন স্বদেশে ফিরতে পারবেন, তখন দয়া করে' একবার হিতাচির কোহাগীর সঙ্গে দেখা করবেন কি? কোহাগী মিনো-প্রদেশের ওবাকানগরের য়োরোদ্‌জুয়া চোবেই নামক ব্যক্তির পরিচারিকা! যাঁর জন্যে আমি বহুকষ্টে পাঁচ দিনের মুক্তি ভিক্ষা ক'রে নিই এবং সেই পাঁচ দিনের মধ্যে তিন দিনে যাঁর গাড়ী এখানে টেনে আনি, আবার তাঁর দর্শন পেলে খুব আনন্দিত হব।"

পরে গাকি-আমিকে বিদায়-সম্ভাষণ করিয়া তিনি দ্রুতগতি গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন, যদিও গাড়ীখানা নিঃসঙ্গ ফেলিয়া যাইতে তাঁর বড়ই ক্লেশ বোধ হইয়াছিল।

১০

অবশেষে, কুমানো-গোঙ্গেন নামক প্রখ্যাত মন্দিরের উষ্ণ-প্রস্রবণে একদিন 'গাকি-আমি' আনীত হইল এবং তাহার দুরবস্থায় যাঁরা অনুকম্পা বোধ করিতেন তাঁদের অনুগ্রহে সেই উষ্ণ-প্রস্রবণে তাহার স্নানের ব্যবস্থা হইল। মাত্র এক সপ্তাহ পরে, স্নানের ফলে নাক, চোখ, কান, এবং মুখ দেখা দিল; দুই সপ্তাহ পরে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণভাবে আবার গড়িয়া উঠিল; তারপর একুশ দিন পরে সেই অনামা জড়পিণ্ড আসল ওগুরি-হাঙ্গওয়ান কানেউজির পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিল—অতীতে তিনি যেমন নিখুঁত সুন্দর ছিলেন ঠিক তেমনি।

এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটার পর কানেউজি চারদিকে চাহিয়া চাহিয়া কখন ও কিরূপে সেই অচেনা স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন সে-কথা স্মরণ করার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত কুমানোর ঠাকুরের কৃপায় পুনর্জীবিত কুমার নিরাপদে কিওতোর নিজো অঞ্চলে পিতৃ-ভবনে ফিরিলেন। তাঁহাকে পাইয়া পিতামাতার আনন্দের অবধি রহিল না।

ওদিকে মহামহিম সম্রাট, সমস্ত শুনিয়া, তাঁহারই একজন প্রজা তিন বৎসর পূর্ব্বে মরিয়া পুনর্জীবন লাভ করিয়াছে ভাবিয়া চমৎকৃত হইলেন। যে-অপরাধের জন্য হাঙ্গওয়ান নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন শুধু তাহাই যে তিনি সানন্দে মার্জ্জনা করিলেন তা নয়, অধিকন্তু তিনি তাঁহাকে হিতাচি, সাগামী এবং মিনো এই তিন প্রদেশের শাসক ও সামন্তরাজ পদে অধিষ্ঠিত করিলেন।

১১

একদিন ওগুরি-হাঙ্গওয়ান রাজ্য পরিদর্শনে বাহির হইলেন। মিনো-প্রদেশে পৌঁছিয়া তিনি হিতাচির কোহাগীর সঙ্গে দেখা করার সঙ্কল্প করিলেন। উদ্দেশ্য, তাঁহার অতুলনীয় দয়ার জন্য নিজমুখে ধন্যবাদ জানাইবেন।

য়োরোদজুয়া-ভবনে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অতিথি-কক্ষে তিনি নীত হইলেন। সে-কক্ষ সোনার পর্দ্দায়, চীনা কার্পেটে ও অন্যান্য বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য আসবাবে সজ্জিত।

সামন্তরাজ হিতাচির কোহাগীকে আহ্বান করার আদেশ দিলেন। সকলের চক্ষুস্থির! তাহারা বলিতে লাগিল, সে একজন সামান্য দাসী, এমন অপরিচ্ছন্ন যে তাঁর সম্মুখে আসার উপযুক্ত নহে। সামন্তরাজ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। পুনরায় আদেশ করিলেন এখনি তাহাকে আসিতে হইবে, যে-অবস্থায় থাকুক না কেন!

সুতরাং, অনিচ্ছাসত্ত্বেও,কোহাগী রাজসকাশে আসিতে বাধ্য হইলেন। জালির মাঝ দিয়া রাজার উপর দৃষ্টি পড়িতেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। রাজার সঙ্গে হাঙ্গওয়ানের কী আশ্চর্য্য সাদৃশ্য!

ওগুরি তখন তার যথার্থ নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কোহাগী রাজি হইলেন না। বলিলেন—"আমার যথার্থ নাম না বল্‌লে যদি আপনাকে সুরা পরিবেশন করতে না পারি, তাহলে এখান থেকে বিদায় হওয়া ছাড়া আমার উপায় নাই!"

গমনোদ্যত হইলে হাঙ্গওয়ান তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"না, না, যেয়ো না, একটু থাম! তোমার নাম জিজ্ঞাসা করার বিশেষ কারণ আছে—গত বছর তুমি দয়া করে যাকে গাড়িতে ওৎসু পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিলে, যথার্থ আমিই সেই 'গাকি-আমি'!

এই বলিয়া কোহাগীর লিখিত কাঠের ফলকখানি তিনি বাহির করিলেন।

তখন কোহাগী অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। বলিলেন—"আপনাকে পুনর্জীবিত দেখে বড়ই আনন্দিত হলুম। এখন আমার সমস্ত কাহিনী সানন্দে বলবো। কিন্তু আমার এই আশা প্রভু, যেখান থেকে আপনি ফিরেছেন, সেই প্রেতলোকের কথা কিছু আমাকে বলবেন, কারণ সেখানেই আমার পতি এখন বাস করছেন। আমি জন্মাই (পূর্ব্ব কথা বলতে বুক ফেটে যায়!) য়োকোয়ামা-চোজার একমাত্র কন্যা হয়ে। তিনি সাগামী-প্রদেশ সোবা-জেলায় বাস করতেন। আমার নাম ছিল তেরুতে-হিমে! বেশ মনে পড়ে, তিন বছর আগে আমার বিবাহ হয় এক প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে। তাঁর নাম ছিল ওগুরি-হাঙ্গওয়ান কানেউজি, তিনি বাস করতেন হিতাচি-প্রদেশে। কিন্তু আমার পতিকে, আমার পিতা তাঁর তৃতীয় পুত্র সাবুরোর প্ররোচনায় বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন। তিনি আমাকেও সাগামী-সমুদ্রে ডুবিয়ে মারার আদেশ দেন। আমি যে এখনো সশরীরে বর্ত্তমান, তা কেবল পিতার বিশ্বস্ত ভৃত্যদ্বয় ওনিয়ো ও ওনিজির দয়ায়।"

সকলে চমৎকৃত হইয়া দেখিল সামন্তরাজ আসন ছাড়িয়া সেই অপরিচ্ছন্ন দাসীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন—

"তোমার সামনে এখানে যাকে দেখছ, তেরুতে, সে তোমারই পতি কানেউজি! আমার অনুচরদের সঙ্গে নিহত হ'লেও ইহজগতে আরও অনেক বছর আমার পরমায়ু। ফুজিসাওয়া-মন্দিরের শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিতের কৃপায় আমি রক্ষা পাই। তিনি একখানি টানাগাড়ীতে আমায় বসিয়ে দেন, অনেক সহৃদয় ব্যক্তি আমাকে কুমানোর উষ্ণ-প্রস্রবণ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যান। সেখানে আমি পূর্ব্বেকার স্বাস্থ্য ও আকৃতি ফিরে পাই। এখন আমি তিনটি প্রদেশের সামন্তরাজ ও শাসকের পদে অধিষ্ঠিত, এখন আমার অপ্রাপ্য কিছু নেই!"

তেরুতে ভাবিতেছিলেন, এ কি সত্য না স্বপ্ন! আনন্দের আতিশয্যে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি বলিলেন—"তোমাকে শেষ দেখার পর কত কষ্টই না সহ্য করেছি! সাত দিন সাত রাত একখানা ডিঙির মধ্যে সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়েছি, তার পর নাওয়ে-উপসাগরে বিষম বিপদে পড়ি, মুরাকামি-দায়ু নামে এক সহৃদয় ব্যক্তি আমায় রক্ষা করেন। তার পর পঁচাত্তর বার আমি বিক্রীত ও ক্রীত হই; শেষবার আমাকে এখানে নিয়ে আসে। গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করতে অস্বীকার করি ব'লে আমাকে সকল রকমের কষ্ট সহ্য করতে হয়! তাই আমার এমন দুর্দ্দশা!"

অমানুষ চোবেইয়ের নিষ্ঠুর আচরণের কথা শুনিয়া কানেউজি বিষম ক্রোধে তাহাকে তদ্দণ্ডে নিধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু তেরুতে পতির কাছে লোকটার প্রাণ ভিক্ষা করিয়া লইয়া চোবেইয়ের কাছে বহুদিন আগে যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিলেন।

প্রাণরক্ষা হওয়ায় চোবেই যে কৃতজ্ঞ হইল সেকথা বলাই বাহুল্য। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সে হাঙ্গওয়ানকে তার অশ্বশালার শত অশ্ব উপহার দিল আর তেরুতেকে দিল তার সংসারের ছত্রিশ জন ভৃত্যকে।

অতঃপর তেরুতে-হিমে রাজরাণীর মত বসনে ভূষণে সজ্জিত হইয়া আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে সামন্তরাজ কানেউজির সঙ্গে সাগামী অভিমুখে যাত্রা সুরু করিলেন।

১২

সাগামী-প্রদেশে এই সেই সোবা জেলা—তেরুতের জন্মভূমি। এই স্থানের সঙ্গে তাঁদের জীবনের কত তিক্তমধুর স্মৃতি জড়িত!

আর এখানেই বাস করে য়োকোয়ামা ও তার পুত্র, যে বিষপ্রয়োগে কুমার ওগুরিকে হত্যা করিয়াছিল।

য়োকোয়ামার সেই তৃতীয় পুত্র সাবুরোকে তোৎসুকা-নো-হারা নামক প্রান্তরে প্রাণ দিতে হইল!

কিন্তু য়োকোয়ামা-চোজা অপরাধী হইলেও নিষ্কৃতি পাইল। কারণ পিতামাতা, হাজার মন্দ হউক, সন্তানের কাছে সর্ব্বদাই সূর্য্যচন্দ্রের মতন! এই সদয় আদেশ শুনিয়া য়োকোয়ামা তার কৃতকর্ম্মের জন্য আন্তরিক অনুতপ্ত হইল।

দুই ভাই, ওনিয়ো এবং ওনিজি, সাগামী-সমুদ্রের উপকূলে তেরুতের প্রাণ রক্ষা করার জন্য প্রভূত পুরস্কার পাইল।

এইরূপে সাধুর হইল উন্নতি এবং অসাধুর হইল পতন!

প্রসন্নভাগ্য ওগুরি-সামা ও তেরুতে-হিমে একত্রে মিয়াকোতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তাঁদের মিলন হইল বসন্তের পুষ্পবিকাশের মত অপরূপ সুন্দর!

হারানো রতন

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কি যেন হারায়ে গেছে তাই খুঁজে ফিরি
এ-বিশ্বের আলো-অন্ধকারে।
কি যেন হারায়ে গেছে—কি যেন খুঁজিয়া ফিরি
উষা সন্ধ্যা বেলা—
রূপা নয়, সোনা নয়, নীলকান্ত মণি নয়,
চুনি পান্না পোখ্‌রাজ পরশ-পাথর নয়,
কিশোরী মেয়ের এক সচপল চলা নয়,
তরুণী চোখের দুটি তারকার আলো নয়,
দেহের বাঁশীতে বাজা জ্যোতির সঙ্গীত নয়,
মর্ম্মে তার উজলিত প্রেমের প্রদীপ নয়,—
কি যেন হারায়ে গেছে তাই খুঁজে ফিরি—
তাই খুঁজে খুঁজে ফিরি ধরার ধূলায়।

কি যেন হারায়ে গেছে!
কি যেন হারায়ে গেছে—
নিবে-যাওয়া প্রদীপের নিঃশেষ শিখার মত,
বরষা-রাতির শেষে মিলন-স্মৃতির মত,
বসন্তের ভুলে-যাওয়া সবুজ মায়ার মতো,
মনে আসে আসে যেন—নাহি মনে পড়ে
কি যেন হারায়ে গেছে।
বাতাসে করিয়া ভর ভেসে আসে কপোতের উদাস সঙ্গীত,
নীলিমা-সাগরে ভাসে স্বপনের ছায়া ওই দূর নভ-গায়,
কোথা হ'তে কেবা যেন বাঁশরী বাজায়—
মোর শুধু মনে আসে—আসে—আসে যেন
কি যেন হারায়ে গেছে—
কি যেন হারায়ে গেছে—নাহি পড়ে মনে।
উষা-বায়ে দূর্ব্বাদলে শিহরে শিশির,
সন্ধ্যারাতে দূর নভে জ্বলে এক তারা,
রূপালি জোছনা রাতে জোছনার সুর পড়ে ভেঙে ভেঙে
দিগন্তের গায়
ফাগুনী পূর্ণিমা সাথে আমের মুকুলরাশি সুবাস ছড়ায়,
মোর শুধু মনে জাগে—কি যেন হারায়ে গেছে—
কি যেন হারায়ে গেছে তাই খুঁজে ফিরি—
তাই খুঁজে খুঁজে ফিরি ধরার ধূলায়।

কি যেন হারায়ে গেছে!
কবে যে হারায়ে গেছে নাহি পড়ে মনে—
বুঝি গেছে শৈশবের বিদায়-বেলায়
নবীন আঁখির দুটি উজল তারায়
সঙ্গোপনে ছিল আঁকা সহজ সঙ্গীতে
অবলীলার ভঙ্গীতে।
কবে যে হারায়ে গেছে নাহি পড়ে মনে—
বুঝি গেছে কৈশরের ফেলে-আসা তীরে
ধমনী-শোণিতে ছিল কোন্ মন্ত্র ঘিরে, কোন্ যাদুকরী মায়া,
উষা হ'তে সন্ধ্যাবধি অজেয় কে চলিত সঞ্চরি'
প্রাণের গোপন পথে পুলক-মূর্চ্ছনা
মুঞ্জরিয়া হেলায় লীলায়;
বনে উপবনে ফোটা কুসুমের রাশে
তা'রি বর্ণে গন্ধে গীতে,
ভ্রমরের গুঞ্জরণে, বিহঙ্গম-স্বরে
আকাশের নীলিমায়, তারার সঙ্গীতে,
প্রজাপতির ইঙ্গিতে,
সাথীদের কলতানে, সখার প্রণয়ে আর হাসি-পরিহাসে
হারায়েছি তা'রে বুঝি কৈশোরের ফেলে-আসা তীরে
আজি আর নাহি পড়ে মনে—
কিম্বা বুঝি হারায়েছি যৌবনের ভিড়ে
ধন জন যশ মান খ্যাতির তিমিরে
সহস্র আকাঙ্ক্ষা যেথা বাঁধিয়াছে বাসা তা'র মত্ত লালসায়,
সহস্র লালসা তা'র দোলায় দোলায়
জীবনেরে করি' চলে গভীর বঞ্চনা
তা'রি তলে হারায়েছি—
কিন্তু কি যে হারায়েছি নাহি পড়ে মনে,
শুধু মনে পড়ে—কি যেন হারায়ে গেছে—
উষা সন্ধ্যা বেলা।

কি যেন হারায়ে গেছে—কি যেন খুঁজিয়া ফিরি
উষা সন্ধ্যা বেলা।
সোনা নয়, রূপা নয়, নীলকান্ত মণি নয়,
চুনি পান্না পোখ্‌রাজ পরশ-পাথর নয়,
কিশোরী মেয়ের কোন সচপল চলা নয়,
তরুণী চোখের দুটি তারকার আলো নয়,
দেহের বাঁশীতে বাজা জ্যোতির সঙ্গীত নয়,
মর্ম্মে তার উজলিত প্রেমের প্রদীপ নয়—
কি যেন হারায়ে গেছে তাই খুঁজে ফিরি—
তাই খুঁজে খুঁজে ফিরি এ-জীবনসিন্ধুর বেলায়।

কলিকাতায় রাজা রামমোহন রায়

ভূমিকা

বিষয়কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আসিয়া রাজা রামমোহন রায় ১৮১৪ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। এই যুগে তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত ছিল ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন এবং ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা। ১৭৬৯ শকের আশ্বিন মাসের (১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের) "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" (দ্বিতীয় কল্প, প্রথম ভাগ, ৫০ সংখ্যা) রামমোহন রায়ের এই যুগের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত-সম্বলিত "ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ" নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল (৮৯-৯২ পৃঃ)। এই প্রবন্ধটি নিম্নে অবিকল মুদ্রিত হইল। এই বিবরণ প্রকাশের ঠিক ১৭ বৎসর পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় দেশত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং ঠিক ১৪ বৎসর পূর্ব্বে ব্রিষ্টল নগরে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তৎকালে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" "তত্ত্ববোধিনী সভা"র মুখপত্র ছিল। ঐ সভার "১৭৬৮ শকের সাম্বৎসরিক আয় ব্যয় স্থিতির নিরূপণ পুস্তকে" অক্ষয়কুমার দত্তকে সভার গ্রন্থ-সম্পাদক উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং এই বিবরণ খুব সম্ভব সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমার দত্তের রচিত। এই নিরূপণ পুস্তকে দেখা যায়, তখন তত্ত্ববোধিনী সভার সভাপতি ছিলেন রমাপ্রসাদ রায়, একতম অধ্যক্ষ ছিলেন চন্দ্রশেখর দেব, এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন রাধাপ্রসাদ রায় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রাধাপ্রসাদ এবং রমাপ্রসাদ রায় রামমোহন রায়ের দুই পুত্র, চন্দ্রশেখর দেব তাঁহার শিষ্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বনামধন্য মহর্ষি। তত্ত্ববোধিনী সভা রাজা রামমোহন রায়ের প্রিয় শিষ্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই নিরূপণ পুস্তকের মুখবন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"মহাত্মা রাজার সমকালবর্ত্তী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপদিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি ১৭৬১ শকে (১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে) ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রদীপ্ত করিবার মানসে তত্ত্ববোধিনী নাম্নী এই সভা স্থাপন করিলেন।" (৵০ পৃঃ)

এই বিবরণ লেখার সময় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ জীবিত ছিলেন না। তিনি ১৮৪৪ সালে পরলোকগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এক সময় তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণের রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মুখে রামমোহন-কথা শুনিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। রাধাপ্রসাদ এবং রমাপ্রসাদও রামমোহন রায়ের জীবনের এই ভাগের অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই বিবরণ ঠিক সমসময়ে লিখিত না হইলেও নির্ভরযোগ্য। বলবত্তর বিরোধী প্রমাণ না পাইলে এই বিবরণের কোন অংশ অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

এই বিবরণে রামমোহন রায়ের রঙ্গপুর হইতে কলিকাতা আগমনের সময় দেওয়া হইয়াছে ১৭৩৫ শক (১৮১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দ)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্ঞাতসারেই বোধ হয় এই শক দেওয়া হইয়াছিল। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্ধৃত তাঁহার একটি বক্তৃতায় তিনি বলিতেছেন, "যখন কলিকাতায় তিনি (রামমোহন রায়) প্রথম বাস করেন, যখন তিনি ১৭৩৬ শকে একাকী বিদেশী উদাসীনের ন্যায় এখানে আইলেন, তখন কে তাঁহার সহযোগী হইয়া সাহায্য দিতে পারে?"* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কবে যে এই বক্তৃতা করিয়াছিলেন গ্রন্থকার তাহা বলেন নাই। খুব সম্ভব এই বক্তৃতা "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র বিবরণ প্রকাশিত হইবার অনেক পরে দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং এই ক্ষেত্রে তত্ত্ববোধিনীর লেখকের মতই বলবত্তর মনে করা কর্ত্তব্য।

১৭৩৭ শকে রামমোহন রায় কলিকাতায় "বেদান্ত গ্রন্থ" (বাদরায়ণের বেদান্ত সূত্রের শঙ্করভাষ্য-সম্মত বাঙ্গলা অনুবাদ) প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ রচনা করিতে এবং ছাপাইতে দুই বৎসর লাগা সম্ভব। সুতরাং যদি অনুমান করা যায় রামমোহন রায় কলিকাতা আসিয়া "বেদান্ত গ্রন্থ" রচনা করিয়াছিলেন তবে ১৭৩৫ শকে তাঁহার আগমন কাল স্বীকার

*নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,—"মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত," ৪র্থ সংস্করণ, ৩১৯ পৃঃ।

করিতে হয়। এই বিবরণের লেখক ইঙ্গিতে বলিয়াছেন, রঙ্গপুরে থাকিতে রাজা রামমোহন তাঁহার প্রিয়কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই।

এই বিবরণে অল্প কথায় রাজা রামমোহন রায়ের কলিকাতার জীবনের একটি জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়। তিনি ধর্ম্মসংস্থাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার না ছিল গুরু, না ছিল শিষ্য। ছায়াবৎ অনুগত অবধূত হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী বামাচারে রত ছিলেন, ব্রহ্মজ্ঞান-অনুশীলনে তাঁহার নিষ্ঠা মাত্র ছিল না। স্বামীজীর অনুজ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ লোকভয়ে হাতেকলমে সহমরণ সমর্থন করিয়া রামমোহন রায়ের মনে ব্যথা দিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী এই বিবরণে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে তান্ত্রিক বামাচারের নামগন্ধ নাই। রামমোহন রায় তর্কস্থলে বামাচারের এবং তান্ত্রিক শৈববিবাহের সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া অনেকে মনে করেন তিনি বামাচারী এবং শৈব-বিবাহকারী উভয়ই ছিলেন। কিন্তু এইরূপ মনে করিবার কোন সাক্ষাৎ-প্রমাণ এবং উপযুক্ত কারণ দেখা যায় না। রামমোহন রায় কলিকাতা আসিয়া বাস করিলে যে-সকল ধনী-মানী ব্যক্তি তাঁহার নিকট গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধ কথা শুনিয়া তাঁহার সংসর্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন। যাঁহারা তখন তাঁহার সংসর্গ ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারাও পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিয়া রীতিমত ব্রহ্মজ্ঞান অনুশীলন আরম্ভ করিতে পারেন নাই। তখন তাঁহার নামে অবিরত অসত্য অপবাদ প্রচারিত হইতেছিল। এই বিবরণ-লেখক জয়কৃষ্ণ সিংহ সম্বন্ধে যে ঘটনা লিখিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় অপবাদের মাত্রা কত দূর উঠিয়াছিল। উদাসীন মিত্রগণে এবং অসত্যবাদী শত্রুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রামমোহন রায় একাকীই তাঁহার মহাব্রত অনুষ্ঠানে রত ছিলেন। অথচ তিনি কখনও অমানুষী প্রেরণার দাবী করেন নাই। এইরূপ একান্ত বিচারনিষ্ঠ (rational) ধর্ম্মসংস্কারক প্রাচ্য জগতে আর দেখা যায় না।

ব্রাহ্মসমাজ রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত "আত্মীয় সভা"র রূপান্তর। এই বিবরণে "আত্মীয় সভা" প্রতিষ্ঠার সময়, ১৭৩৭ শক (১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ) পাওয়া যায়। ১৭৫০ শকের পৌষ মাসে যোড়াসাঁকোর কমল বসুর বাড়ির অধিবেশন উপলক্ষে প্রকৃতপ্রস্তাবে পুনরুজ্জীবিত আত্মীয় সভার নামকরণ হয় ব্রাহ্ম সমাজ, এবং ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ (১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি) নিজস্ব গৃহে সমাজের গৃহপ্রবেশ ঘটে।

রাজা রামমোহন রায়ের ইংলণ্ড-যাত্রা হইতে ১৭৫৬ শকের পৌষ মাস (ডিসেম্বর ১৮৩৪) পর্য্যন্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক ছিলেন। তার পর তিনি দিল্লী চলিয়া যায়েন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার *History of the Brahmo Samaj* পুস্তকে রাধাপ্রসাদ রায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, After his return from Delhi he ceased to take an active interest in the new church.* ইহার অর্থ, দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাধাপ্রসাদ রায় সমাজের কোন কার্য্যভার গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু "তত্ত্ববোধিনী সভা"র ১৭৬৮ হইতে ১৭৭২ শকের (১৮৪৬—১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের) "সাম্বৎসরিক আয় ব্যয় স্থিতির নিরূপণ পুস্তকে" দেখা যায় এই কয় বৎসর রাধাপ্রসাদ রায় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়ে "তত্ত্ববোধিনী সভা"র কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। তারপর ১৭৭৩ শকে সভার একমাত্র কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৭৭৩ শকের আয়ের হিসাবে রাধাপ্রসাদ রায়ের নামে ২২৲ জমা দেখা যায়। কিন্তু ১৭৭৪ এবং ১৭৭৫ শকের আয়ের হিসাবে রাধাপ্রসাদ রায়ের নামে কোনও টাকা জমা দেখা যায় না। ইহার কারণ কি বলা যায় না। ১৭৬৬ হইতে ১৭৭০ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর কাল রাধাপ্রসাদ রায়ের অনুজ রমাপ্রসাদ রায় "তত্ত্ববোধিনী সভা"র সভাপতি ছিলেন।† ১৭৭২ শক হইতে ১৭৭৫ শক পর্য্যন্ত সভার অধ্যক্ষগণের মধ্যে রমাপ্রসাদ রায়ের নাম প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে, এবং ১৭৭৫ শক পর্য্যন্ত তাঁহার নামে সভার চাঁদা (৩৬৲) জমা আছে। রাজা রামমোহন রায়ের পুত্রগণের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধের বিষয় ভাল করিয়া অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

* Sivanath Sastri, *History of the Brahmo Samaj*, Vol. I, Calcutta, 1911, p. 66.

† তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৭৭১ শক, ৩৪ পৃঃ।

"ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ।"

[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত]

বঙ্গভূমিতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে রাজা রামমোহন রায়েরই ধর্ম্মসংঘটিত বিবরণ প্রণীত করিতে হয়। পরম শাস্ত্র প্রতিপাদ্য সনাতন ব্রহ্মোপাসনা এদেশ মধ্যে এককালে বিস্মৃত হইয়াছিল। কেবল তিনিই তাহাকে বিনাশের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন, নানা শাস্ত্র সন্ধান দ্বারা তাঁহার চিত্ত সংস্কৃত হইয়া এই হৃদয়ঙ্গম হইল যে সর্ব্বকারণ পরব্রহ্মের উপাসনাই সত্য ধর্ম্ম এবং কেবল তাহাই পরম পুরুষার্থের একমাত্র কারণ। এই পরম ধর্ম্মকে তিনি একান্ত চিত্তে অবলম্বন করিলেন, ও স্বদেশীয় মনুষ্যকে আত্মজ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত করিবার জন্য যত্নবান্ হইলেন। কিন্তু অনেক কাল পর্য্যন্ত ধনসাধনাদি বিষয় ব্যাপারে আবৃত থাকাতে নানা স্থানে তাঁহার অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল; আপনার প্রিয় কার্য্যে বহুদিবস মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। পরন্তু ১৭৩৫ শকে রঙ্গপুর হইতে তিনি কলিকাতা নগরে আগমন পূর্ব্বক বিচার দ্বারা ও গ্রন্থাদি প্রকাশ দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা রূপ সত্য ধর্ম্ম স্থাপনে অত্যন্ত উদ্যোগী হইলেন। তৎকালে স্বদেশস্থ লোকদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত গোপীমোহন ঠাকুর, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ সিংহ, কাশীনাথ মল্লিক, রাজা পীতাম্বর মিত্রের পুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র, গোপীনাথ মুন্সী, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, রাজা বদনচন্দ্র রায়, দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁহার নিকট সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেন, এবং তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা করিতেন। কিন্তু রাজা পৌত্তলিক ধর্ম্মের অনাদর পূর্ব্বক যখন সর্ব্বত্র তত্ত্বজ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন অনেকেই তাঁহার সংসর্গে বিরক্ত হইয়া তাঁহার সহবাস ও আলাপাদি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। কেবল শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, জয়কৃষ্ণ সিংহ ও গোপীনাথ মুন্সীর সহিত তাঁহার হৃদ্যতা স্থিরতর রহিল। ১৭৩৭ শকে রাজা মানিকতলার উদ্যানগৃহে আত্মীয় সভা স্থাপন করিলেন, কিয়ৎকাল পরে সে স্থান পরিবর্ত্ত হইয়া তাঁহার ষষ্ঠীতলার বাটীতে সভা হইত, তদনন্তর কতক দিবস তাঁহার শিমুলিয়াস্থিত ভবনে সভা হইয়া পুনর্ব্বার মানিকতলার উদ্যানে আরম্ভ হইয়াছিল।

সায়াহ্নকালে আত্মীয় সভাতে বেদপাঠ ও ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইত, কিন্তু বেদ ব্যাখ্যার নিয়ম তৎকালে ছিল না। রাজার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদ পাঠ করিতেন ও গোবিন্দ মালা ব্রহ্ম সঙ্গীত গান করিত। শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর মহাশয় তথায় সময় সময় উপস্থিত হইতেন। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন মজুমদার, রাজনারায়ণ সেন, রামনৃসিংহ মুখোপাধ্যায়, দয়ালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হলধর বসু, নন্দকিশোর বসু এবং মদনমোহন মজুমদার ইঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা রূপ পরম ধর্ম্মকে অবলম্বন করিলেন। সেই কাল অবধি ভূরি আলোচনার পরেও যখন অদ্যাপি এ ধর্ম্মের প্রতি লোকের বিষম দ্বেষ অবসন্ন হয় নাই, তখন সেই অন্ধ কালে তাঁহারা যে লোকাপবাদ হইতে নিষ্কৃত থাকিবেন ইহা কদাপি সম্ভব নহে। তাঁহাদিগের প্রতি লোকে স্বেচ্ছাচারী ও নাস্তিক শব্দ পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিত। শ্রীযুক্ত জয়কৃষ্ণ সিংহ যিনি পূর্ব্বে রাজার প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন, তিনিও তাঁহার দ্বেষী হইয়া এমত অসত্য অপবাদ প্রচার করিতেন যে আত্মীয় সভাতে গোহত্যা হইয়া থাকে। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় স্বীয় প্রতিজ্ঞাত কার্য্যে কোন প্রকারেই পরাঙ্মুখ হইলেন না। স্পষ্ট শত্রু যাহারা তাহারা নানা মতে তাঁহার বিরোধি-আচরণে সচেষ্ট হইল, আর যাহারা তাঁহার মিত্ররূপে স্বীকার করিত তন্মধ্যেও অনেকে কেবল স্বার্থপর মাত্র ছিল। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি আত্মীয় সভার নির্ব্বাহক ছিলেন তাঁহার অতি কপট ব্যবহার ছিল, তিনি রাজার সম্মুখে ব্রাহ্মধর্ম্মে অচলা ভক্তি জানাইতেন, অথচ শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঠাকুরের নিকট প্রত্যহ গমন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দৃঢ় শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া দেবনিন্দা ও পৌত্তলিকদিগের প্রতি দ্বেষ উক্তি করিতেন, ও আপনারদিগকে অতি শুদ্ধচিত্ত আত্মজ্ঞাননিষ্ঠরূপে ব্যক্ত করিতেন, রাজা আশুতোষ স্বভাবে তাঁহারদিগকে অতি সুবোধ জ্ঞান করিয়া ধন দান করিতেন। কিন্তু তাঁহারা রাজার নিকেতন হইতে বহির্গত হইবা মাত্র আপনারদিগের প্রচ্ছন্ন বেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অতি কুশ্রাব্য কটূক্তি করিতে কিছু ক্রটি করিতেন না। শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নন্দকুমার-বিদ্যালঙ্কার যিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া হরিহরানন্দ

নাথ তীর্থস্বামী কুলাবধোত নামে খ্যাত হয়েন, তিনি যদিও রাজার সন্নিধানে ছায়াবৎ অনুগত ছিলেন, কিন্তু তিনি তন্ত্রোক্ত সাধন বামাচারে রত ছিলেন, বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান অনুশীলনে তাঁহার নিষ্ঠা মাত্র ছিল না। এদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহার সম্যক অনুবর্ত্তী ছিলেন কিন্তু লোকভয় প্রযুক্ত তিনিও সর্ব্বদা স্বমতানুগত ব্যবহার করিতে সমর্থ হইতেন না। সহমরণ নিবারণের ব্যবস্থা প্রচার হইলে তাহা রহিত করিবার জন্য প্রবর্ত্তক পক্ষরা রাজবিচারালয়ে যে আবেদন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে বিদ্যাবাগীশ লোকভয়ে স্বনাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, ইহাতে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে ১৭৩৯ শকে রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্ট বিচারালয়ে অভিযোগ করেন, ইহাতে তিনি প্রায় তিন বৎসর পর্য্যন্ত বিব্রত থাকাতে জ্ঞানচর্চ্চা জন্য তাঁহার তিল মাত্র অবকাশ ছিল না, আত্মীয় সভা পর্য্যন্ত আর হইত না। পরন্তু তিনি সেই অন্যায় অভিযোগ হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার সভা আরম্ভ করিলেন। রাজার কলিকাতাস্থ ভবনে সভারম্ভ হইলে পর প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্রের গৃহে এবং তদনন্তর ভূকৈলাসে শ্রীযুক্ত রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের বাটীতে এক একবার ব্রাহ্মসমাজ হয়। ১৭৪১ শকের পৌষ মাসে শ্রীযুক্ত বেহারীলাল চৌবে আপনার তুলাবাজারের বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ আহ্বান করেন তাহাতে শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ মিত্র, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা রামমোহন রায়, রঘুরাম শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ এবং সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেক ধনবান্ ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তথায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী এই বিচার উত্থাপন করেন যে বঙ্গদেশে বেদ পাঠ নাই ও ব্রাহ্মণও নাই, সভাস্থ তাবৎ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিরুত্তর রহিলেন, কেবল রাজা রামমোহন রায় একাকী বহু বিচারান্তে শাস্ত্রীকে নিরস্ত করিলেন। ইহার পরে রাজার যত্ন দ্বারা পৌত্তলিকদিগের বিরুদ্ধে গ্রন্থ সকল প্রকাশ হওয়াতে উত্তরোত্তর দেশস্থ লোকদিগের শত্রুতা বৃদ্ধিই হইতে লাগিল, এই সময়ে আত্মীয় সভাও ভঙ্গ হইয়াছিল, কিন্তু রাজার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রগাঢ় ব্রহ্মনিষ্ঠা কিঞ্চিন্মাত্র বিচল হয় নাই; তিনি নিয়ত সন্ধ্যাকালে বিশেষরূপে ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। অনন্তর ১৭৪৪ শকের ২০ মাঘে শ্রীযুক্ত উমানন্দন ঠাকুর তাঁহার বিরোধে পাষণ্ডপীড়ন নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহার উত্তর স্বরূপ পথ্য প্রদান গ্রন্থ তিনি ১৭৪৫ শকের ২৫ পৌষ প্রকাশ করিলেন। খ্রীষ্টানদিগের সহিত বিস্তর বাদানুবাদ হয়, তাহাতে তিনি খ্রীষ্টান শাস্ত্র হইতেই নিষ্পন্ন করেন যে এক অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনাই সত্য ধর্ম্ম, এবং তদনুসারে প্রোটেস্‌ট্যাণ্ট মিশনরী শ্রীযুক্ত উইলিয়েম এ্যাডাম সাহেবকে সেই ধর্ম্মাবলম্বনে প্রবৃত্ত করেন।

এই এ্যাডাম সাহেব ১৭৪৯ শকে বাঙ্গাল হরকরা নামক ইংরাজি সম্বাদ পত্রের কার্য্যালয়ের উপরিভাগে সপ্তাহ মধ্যে এক দিবস সায়ংকালে ধর্ম্মোপদেশ করিতেন, তাহাতে বাঙ্গালির মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়, তাঁহার ভাগিনেয় পুত্র ও অন্যান্য কেহ দূরস্থ কুটুম্ব এবং শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব গমন করিতেন। এক দিবস রাজা সেই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দেব ও তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে কহিলেন যে বিদেশীয় লোকের ধর্ম্ম যাজন গৃহে যাইয়া আমারদিগের উপদেশ শুনিতে হয়, আমারদিগের এমত কোন সাধারণ স্থান নাই যে তথায় বেদ অধ্যয়ন বা অন্য প্রকার পরমার্থ প্রসঙ্গ হয়, ইহা অতি অসুখের কারণ। এই মহৎ প্রস্তাবই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনের সূত্র হইল। রাজা ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং স্থির করিলেন যে শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও কালীনাথ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই এ বিষয় তাঁহারদিগের গোচর করিয়া ধার্য্য করিবেন। তদনন্তর এ বিষয়ে তাঁহারদিগের পরামর্শ সিদ্ধ হইল। শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায় ও মথুরানাথ মল্লিক এ বিষয়ে সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন। রাজা ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনের প্রতি অত্যন্ত সত্বর ছিলেন, এবং অবিলম্বে শিমুলিয়াস্থিত শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ সরকারের বাটীর দক্ষিণ যে এক খণ্ড ভূমি ছিল, তাহার মূল্য স্থির করিবার জন্য শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর দেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পরন্তু ঐ স্থান নির্দ্দিষ্ট না হওয়াতে ১৭৫০ শকে ভাদ্র মাসে যোড়াসাঁকোস্থিত শ্রীযুক্ত কমল বসুর বাটীতে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। তৎকালে প্রতি শনিবার সায়ংকালে সমাজ হইত, তাহাতে প্রথমতঃ দুই জন তৈলঙ্গি ব্রাহ্মণ বেদ উচ্চারণ

করিতেন, তদনন্তর শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদের মূল পাঠ করিতেন, অনন্তর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্যাখ্যান করিতেন, পরিশেষ ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সমাজের কার্য্য সম্পন্ন হইত; কলিকাতাস্থ অনেকেই তথায় আগমন করিতেন। তৎকালে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সমাজের নির্ব্বাহক ছিলেন। পরন্তু সমাজের আয় বৃদ্ধি হইলে কলিকাতাস্থ বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের গৃহ প্রস্তুত হইয়া ১৭৫১ শকের ১১ মাঘ দিবসে তথায় উপাসনা আরম্ভ হইল, এই স্থানে মধ্যে মধ্যে দিবাবসান কালে মোসলমান্ ও ফিরিঙ্গী বালকেরা পারসীক ও ইংরাজী ভাষাতে পরমেশ্বরের স্তবগান করিত, তৎকালে মেকিণ্টস্ কম্পানি সমাজের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন, প্রতিবৎসর ভাদ্র মাসে সমাজের জন্মদিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে দান বিতরণ করা যাইত, তাহাতে শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায় ও মথুরানাথ মল্লিক বিশেষ আনুকূল্য করিতেন; কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সমাজ হইতে অতি সংগোপনে দান প্রতিগ্রহ করিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার ও সহমরণ নিবারণ এই উভয় কারণে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি পৌত্তলিকদিগের দ্বেষানল জ্বলিত হইল, তাহারা তাঁহার প্রাণের উপর আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এপ্রযুক্ত তিনি অস্ত্র সমভিব্যাহার ব্যতীত গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন না। এই কালে কৌমুদী নামে ব্রাহ্মসমাজের অধীন এক প্রকাশ্য পত্র প্রচার হইত।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রাহ্মসমাজের তাবৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল। পরন্তু ১৭৫২ শকে রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ড দেশে যাত্রা করিতে মানস করিলেন তাহার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সমাজের নির্ব্বাহক পদ হইতে অবসর হইলেন ও তাঁহার পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর দাস তৎপদে নিযুক্ত হইলেন। রাজার ইংলণ্ড গমনের প্রাক্কালে ১৭৫১ শকের পৌষ মাসে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর, বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী এবং রাধাপ্রসাদ রায় সমাজ গৃহের বিশ্বস্ত হইলেন। ইহাতে সমাজের কোন কার্য্যের অন্যথা হয় নাই, কেবল শনিবারের পরিবর্ত্তে বুধবারে সমাজ হইবার নিয়ম তাঁহারা স্থির করিলেন। রাজার অনুপস্থিতি কালে শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর সমাজের প্রতি সম্যক্ আনুকূল্য করিতেন। ১৭৫৪ শকের পৌষ মাসে সমাজের কোষাধ্যক্ষ মেকিণ্টস্ কোম্পানির বাণিজ্য ব্যবসার পতন হয়, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তিনি সমাজের মূলধন ৬০৮০ ছয় সহস্র আশী টাকা তাঁহারদিগের নিকট হইতে গ্রহণপূর্ব্বক আপনার সন্নিধানে রাখিলেন; ঐ মূলধন তাঁহার পুত্রদিগের নিকট অদ্যাপি গচ্ছিত আছে। ঐ মূলধনের বৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের ব্যয়ের যা কিছু অসংস্থান থাকিত তৎসমুদয় শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্বয়ং আনুকূল্য করিতেন। তৎকালে শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ রায় নির্ব্বাহকের কর্ম্মও সাধন করিতেন।

১৭৫৫ শকের আশ্বিন মাসে ইংলণ্ড দেশে রাজা রামমোহন রায়ের পরলোকপ্রাপ্তি হয়, মাঘ মাসে তাহার সম্বাদ কলিকাতা নগরে প্রাপ্ত হইল। ১৭৫৬ শকের পৌষ মাসে শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ রায় পিতৃ প্রাপ্য ধন আনিবার জন্য দিল্লী নগরে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সকলেরই উপেক্ষা হইল। সমাজের জন্মদিবসে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতি ধন বিতরণ একাল পর্য্যন্ত নিয়মিত রূপে হইয়া আসিতেছিল, ১৭৫৫ শকে তাহা নিরস্ত হইল। এই সময়ে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নির্ব্বাহকের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের এই ম্লান অবস্থা প্রায় দশ বৎসর ক্রমাগত রহিল। পরন্তু ১৭৬১ শকের আশ্বিন মাসে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা প্রচারের আন্দোলন পুনর্ব্বার আরম্ভ হওয়াতে ১৭৬৫ শকের মধ্যেই পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির প্রতি অনেকেই যত্নবান হইলেন।

সর্পাঘাত

শ্রীমনোজ বসু

বাপ মারা গেলেন, কিন্তু বিষয় রইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক চুকিয়ে সুধানাথ অতঃপর নিশ্চিন্তে বৈঠকখানার ফরাসে জাঁকিয়ে বসবার উদ্যোগে আছে, এমন সময় গোমস্তা এসে আদালতের ছাপ-মারা স্তূপাকার কাগজপত্র সামনে হাজির করল।

সুধানাথ সভয়ে জিজ্ঞাসা করল—ব্যাপার কি?

—খাঁদাগাঁতির খামার নিলাম হয়ে গেছে। আট আনা পার্ব্বণী নিয়ে কর্ত্তা জমিদারের সঙ্গে গোলমাল করেছিলেন।··· এবার সদরে ছুটতে হবে।

সদরে আদালত বাড়িটা বাইরে থেকে দেখা আছে, কিন্তু সাহস ক'রে সুধানাথ কোন দিন ভিতরে ঢোকে নি। শোনা আছে, ওর টিকটিকিগুলোও বিনা ঘুষে হাঁ করে না। কেমন ক'রে কি ভাবে যে সেই আদালতের মুখ থেকে খামার জমি উদ্ধার ক'রে আনতে হবে, সুধানাথ ভাবতে গিয়ে কূলকিনারা পায় না।

গোমস্তা বলল—দেরি করলে হবে না, বাবু। একটা ভাল উকীল দাঁড় করিয়ে হাকিমকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত ক'রে দিন গে।

উকীলের কথায় আলো দেখা গেল। নীরদবিহারী উকীল ভাল, সুধার পিসতুত ভাই, তালেশ্বরে বাড়ি, সদর থেকে ক্রোশ-তিনেক পথ মাত্র। নীরদ বাড়ি থেকেই শেয়ারের নৌকায় আদালত যাতায়াত করে। দিনটা বৃহস্পতিবার, রথের ছুটি। সে হিসাবেও সুবিধা। আজ গিয়ে ধীরে-সুস্থে নীরদের সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করা যাবে; দরখাস্ত দাখিল হবে আগামী কাল প্রথম কাছারীতে।

নৌকায় যেতে হয়। তালেশ্বরের ঘাটে পৌছতে প্রায় সন্ধ্যা। জ্যোৎস্না রাত, কিন্তু মেঘের দৌরাত্ম্যে চাঁদ স্পষ্ট হয়ে ফুটতে পারে নি। নীরদের বিয়ের সময়—এই বছর পাঁচ-ছয় আগে—সুধানাথ একবার এ-বাড়ি এসেছিল। নূতন বৌদিদির সঙ্গে তখন যৎকিঞ্চিৎ আলাপও হয়েছিল। ইতিমধ্যে নীরদের এক খোকা হয়েছে। এবার সুধানাথের বাপের শ্রাদ্ধের সময় এঁরা সবসুদ্ধ তাদের বাড়ি গিয়ে দিন-কুড়িক ছিলেন। আসবার সময় লীলা নৌকায় উঠেও বার-বার মাথার দিব্য দিয়েছিলেন—যেও ঠাকুরপো, আমাদের ওখানে; যেও কিন্তু—। সুধানাথও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এত শীঘ্র সে প্রতিশ্রুতি পালন করবার আবশ্যক ঘটবে, তখন স্বপ্নেও ভাবা যায় নি।

নদীর ঘাট থেকে কয়েক পা গিয়েই বাইরের উঠান। কোন দিকে জনমানবের সাড়া নেই। আবছা অন্ধকারে বাড়িটা থমথম করছে। রোয়াক পেরিয়ে গোটা দুই তিন খালি ঘরের ভেতর দিয়ে সে এসে পড়ল ভিতর-উঠানে। তার পর আবার সুদীর্ঘ রোয়াক অতিক্রম ক'রে দালানে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল—যাক্, বাঁচোয়া—মানুষের চিহ্ন মিলেছে এবার, এবং যে-সে মানুষ নয়—স্বয়ং বৌদিদি ঠাকরুণ। এক পাশের টেবিলে উজ্জ্বল পাক্ আলো জ্বলছে। বৌদিদি পিছন ফিরে দেওয়ালে টাঙানো আয়নায় নিবিষ্টমনে চুল ঠিক করছেন।

সুধানাথ পায়ের জুতা খুলে রেখে টিপি-টিপি এগুতে লাগল। একেবারে পিছনটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, বৌদিদির হুঁশ নেই। খোঁপায় সোনার কাঁটা ঝিকমিক করছে, সুধানাথ সাফাই হাতে সেটা তুলে নিতে গেল। নিলও ঠিক, ঐ সঙ্গে ক'গাছি চুল উঠে এল। এক ঝটকায় দু-তিন হাত সরে গিয়ে মুখোমুখি তাকাল—সর্ব্বনাশ—বৌদিদি ত নয়, আর একটা মেয়ে। মেয়েটি হতভম্ব; সুধানাথও তাই; হাতে সোনার কাঁটা ঝকমক করছে। সেদিকে লক্ষ্য ক'রে মেয়েটি চেঁচাতে সুরু করল—চোর! চোর!

সর্ব্বনাশ! তম্বঙ্গী কিশোরী মেয়ে···চুরির বমাল হাতের উপর। পৃথিবী দ্বিধা হোক্, সেই ফাঁকের মধ্যে সুধানাথ

ঢুকে পড়তে রাজী। কিন্তু তা যখন হ'ল না,—যে পথে এসেছে সেই পথেই সে সোজা দৌড় দেবে কি না ভাবছে,—এমনি সময় দুই দরজা দিয়ে প্রায় যুগপৎ হাঁপাতে হাঁপাতে যুগলে এসে পড়লেন—নীরদ-দাদা ও লীলা-বৌদিদি।

বৌদিদি বলল—কি হয়েছে দুগ্‌গা ?

দুর্গা দু-চোখে আগুন ছড়াচ্ছে, দারুণ রাগে মুখ লাল। হাত দুখানা কোমরে দিয়ে কুস্তিগীরের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে বলল—চোর···চুরি করেছে, দিদি। আমি দাঁড়িয়ে আছি, পিছন থেকে এসেই—

নীরদ সুধানাথের অবস্থা দেখে খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। বলল—কি চুরি করেছে, বোন ? তোর হিয়া-মন-প্রাণ নাকি !

লীলাও হেসে তাড়াতাড়ি কলকণ্ঠে সুধানাথকে অভ্যর্থনা করল—কি ভাগ্যি,—মেঘলা রাতে চাঁদের উদয় ? জলকাদায় গা-হাত-পা সমস্ত যে চিতে বাঘের চামড়া হয়ে উঠেছে। ওরে কালীপদ, জল নিয়ে আয়। ঘটির কর্ম্ম নয়···কলসী···কলসী—

বেশ সুখী এরা। স্বামী-স্ত্রী দু-জনেই আমুদে। হাসি-খুশীর মধ্যে দিনগুলো পাখনা মেলে উড়ে যায়। সুধানাথ নিঃশ্বাস ফেলল। আর, এমনি তার কপাল—এই আনন্দের হাটে এসে পড়ে হঠাৎ এক বিপর্য্যয় ঘটিয়ে বসল, জের তার কিছুতে মিটছে না। অর্থাৎ সেই যে রণরঙ্গিণী বেশে দুর্গা অন্তরালবর্ত্তিনী হয়েছে, আর তার সাড়াশব্দ নেই।

ঘণ্টা-দুই পরে নীরদ আর সুধানাথ খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসেছে। খোকা ঘুমিয়েছে। বাইরে অবিশ্রান্ত বর্ষাধারা···ছড় ছড় ক'রে রোয়াকের উপর নলের জল পড়ছে। গল্প কেমন যেন জমেও জমছে না। অবশেষে নীরদ ডাকল—দুর্গা দেবি !

ডাকের পর ডাক ; দেবী প্রসন্না হ'লেন না। সুধানাথ বলল—ডাকাডাকি ক'রে মান আরও বাড়িয়ে তুলছ দাদা,···তার চেয়ে আমার মামলার কথাটা শোন দিকি এইবার।

নীরদ হেসে তাড়া দিয়ে উঠল—বুকের পাটা কম নয় দেখছি। চুড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে···চুপ, চুপ, ওরে ষ্টুপিড—

এমনি সময় দ্রুতপদে এসে দাঁড়াল লীলা।

—ডাকছ তোমরা ?

নীরদ বলল—ডাকছি, কিন্তু তোমাকে নয়। তোমায় ডাকলে লাউয়ের ঘণ্টে যে নূন পড়বে না। এমন অবস্থায় ডাকব—সত্যি সত্যি আমরা কি এমনি বোকা ?

লীলা বলল—তাই ত বলি। তোমার সকল রসজ্ঞান রসনায়। হঠাৎ পরমহংস হয়ে গিয়ে যে ক্ষীর ছেড়ে নীরে রুচি জন্মাবে···কিন্তু দুগ্‌গা ছুটে গিয়ে বলল—যাও দিদি, শিগ্‌গির—আমি তরকারি দেখছি···

সুধানাথ বলল—তিনি ! তা হ'লে আবার ডবল নূন পড়বে না ত ? যে রাগ ক'রে গেছেন !

নীরদ ঘাড় নেড়ে গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল—সেটি হবার জো নেই, ভাই। দুর্গাদেবী ভাল মেয়ে—লক্ষ্মীমেয়ে—কলেজে সায়ান্স কোর্স নিয়েছেন। একবার এক নজর ভিতর দিকে চেয়ে সে মুখ টিপে হাসল, বলতে লাগল—বোনটির আমার ল্যাবরেটারির জানালায় উঁকি দেওয়া অভ্যাস। চালাকি কথা নয়। নিক্তি মেপে আউন্স হিসাবে নূন দেন। তরকারি ধরে যেতে পারে, শুকিয়ে পুড়ে কয়লা হয়ে যেতে পারে, কিন্তু নূনের গোলমাল হবে না···

—জামাই বাবু ! আচম্বিতে দুর্গার আবির্ভাব। কণ্ঠ-ঝঙ্কারে পুরুষ দুটিকে সচকিত ক'রে বলতে লাগল—জামাই বাবু, আপনাদের পাড়াগাঁয়ের লোক এমন নিন্দুক ?

নীরদ বলল—এ কি বোন, রান্নাবান্না এরই মধ্যে সারা ক'রে এলে ?

—না, নামিয়ে রেখে এলাম। জবাবটা নিয়ে আবার গিয়ে চাপাবো। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কবে আপনাকে পোড়া তরকারি খাওয়ালাম ?

গলা হঠাৎ খাদে নেমে গেল। অর্থাৎ বজ্রবিপ্লবের পর বৃষ্টির সম্ভাবনা। এর জন্য নীরদ প্রস্তুত ছিল না। বারম্বার বলতে লাগল—নাঃ, তোমাদের নিয়ে চলে না। একটা ঠাট্টা করলাম···তাতেই একেবারে !···লোকে যে বলবে, একেবারে খুকী !—

এবং লোকটি যেন একেবারে তৈয়ারি ছিল। কথায় কথায় যে রাগ করে, তাকে রাগাতে ভারী মজা। ভালমানুষের মত সুধানাথ জিজ্ঞাসা করল—খুকীটি কে বৌদিদি ?

লীলা বলল—ঐ যে শুনলে ভাই, দুগ্‌গা—

—দুর্গা নয়, রাণী দুর্গাবতী বলুন। মিলিটারী রকম-সকম দেখে সেটা আন্দাজ হয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, এই খুকী দুর্গাবতীটি তোমার কে হন, বৌদিদি?

লীলা বলবার আগেই নীরদ জবাব দিল—উনি ওঁর বোন। কিন্তু তুমি হতভাগা কেবল ওঁর মিলিটারী হুলের ঘা খেয়েই গেলে···মধু পেলে না—

সুধানাথ বাধা দিয়ে বলল—সে কি কথা, দাদা,—খুবই পাচ্ছি। এ-বাড়িতে পা দেওয়া থেকেই। ওঁর কণ্ঠ সত্যিই মধুময়।

—ঠাট্টা? ওরে ইডিয়ট, জান না ত ক্ষমতা। গান-বাজনায় মেডেল পেয়েছে। কি গলা, কি রকম হাত মিষ্টি! যাও ত দিদি ঐ টুলের উপর। মুখ্যুটার মাথা ঘুরিয়ে দাও—

দেওয়াল ঘেঁষে দামী অর্গান। পাড়াগাঁ হ'লেও এ-ঘরে ও-ঘরে অনেক কিছু সৌখীন আসবাব সাজানো। আশ্চর্য্য! এত কথান্তরের পরও নিরাপত্তিতে গিয়ে দুর্গা বাজনার সামনে বসল। সুধানাথ মনে মনে হাসল—বাহাদুরী দেখাবার লোভ এদের এমনই বটে! তার পর দুর্গা প্রবলবেগে অর্গানের চাবি টিপে চলল—যেন ঝড় উঠেছে, কলোচ্ছ্বাসে বন্যা জেগেছে। লীলার বাঁচোয়া, সে ইতিমধ্যে কখন রান্নাঘরে ঢুকে দরজা দিয়েছে। এদিকে দুজন অভাগ্য শ্রোতার কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল; মহাপ্রলয়ের সময় মহামারী, প্লাবন, কল্কি-অবতার, বেগুনতলার হাট প্রভৃতি সকল উপদ্রবের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবতঃ এই রকম সুরবৃষ্টিও সুরু হবে। পুরো আধ ঘণ্টা ধ'রে চলল এই রকম তুমুল বাদ্যভাণ্ড। বাপ রে বাপ! মেয়েটার আঙুলেও ব্যথা ধরে না···

অবশেষে সুধানাথ নীরদের কানে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে প্রাণপণে শ্রুতিগম্য ক'রে বলল—দাদা, স্বীকার করছি—এক-শ বার স্বীকার করছি, ক্ষমতা আছেই। থামতে বলো। মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেনই সত্যি, ঘুরে পড়বার জোগাড়।···

নীরদ বলল—পরিত্রাহি দেবি, আপাততঃ স্থিরো ভব। যথেষ্ট হয়েছে।

বিশাল চোখ দুটো তাদের দিকে স্থাপন ক'রে ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই দুর্গা বাজনা বন্ধ করল। ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে বলল—এ রকম হবে আমারই অনুমান করা উচিত ছিল।

—কি?

—আমি স্বেচ্ছায় বাজাতে বসি নি, আপনারাই ডেকে বসিয়েছেন। পাড়াগাঁয়ের লোক আপনারা জামাইবাবু, কথায় কথায় লগুড় ধরা অভ্যাস। মেয়েদের মর্য্যাদা বুঝবেন কি? দুর্গা পুনশ্চ একবার চাবিগুলির উপর দিয়ে দ্রুত আঙুল বুলিয়ে গেল। বলল—এইবার গান হবে···ডেকে বসিয়েছেন, মনে থাকে যেন। শেষ না হ'লে উঠতে পারবেন না। গানও লাগবে ভাল—জানেন ত মেডেল পেয়েছি—

সুধানাথ বলল—আপনি ব'লে দিন দাদা, মেডেল পেলে থামেন যদি, তাতে রাজী আছি। গাইবার দরকার নেই—

কিন্তু নাছোড়বান্দা ভবী কিছুতেই ভোলবার নয়, গলা সাধা আরম্ভ হয়ে গেল। সহসা যেন ঐশী-প্রেরিত হয়ে লীলা এসে উদ্ধার করল। বলল—জায়গা হয়েছে, এস তোমরা—

ঘুম থেকে উঠতে সুধানাথের বড় বেলা হয়ে গেল। নীরদ তখন বৈঠকখানায়। সেখানে গিয়ে দেখে, মামলার কতকগুলো দলিলপত্র সামনে রেখে চেয়ারে বসে সে-ও ঘুমচ্ছে। কাঁধে হাত রাখতেই সচকিত হয়ে জেগে নীরদ হেসে ফেলল।

সুধানাথ বলল—দাদা, মক্কেলের টাকা খেয়ে এই রকম ভাবে কাজ করচ?

নীরদ বলল—আমার দোষ নেই ভাই, যত দোষ এই কান-ফোঁড়া নথিগুলোর। পড়তে গেলেই ঘুম পায়। এখন আমি ঘুমচ্ছি—আবার কাছারী গিয়ে যখন পড়তে আরম্ভ করব, হাকিমেরও ঘুম পাবে।

সুধানাথ বলল—যাই হোক, আমার কাগজগুলো আনি এইবার—

—হবে, হবে। চা হয়ে যাক আগে। ওগো দেবীযুগল, কৃপা ক'রে আবির্ভূতা হও।

আইন-নজীর-নথিপত্র—ভাব দেখলে মনে হয়, নীরদ বাঘের মত ভয় করে, পাশ কাটাতে পারলেই বেঁচে যায়। অথচ সে পশারওয়ালা ভাল উকীল। যেমন লোকে যাত্রা-থিয়েটার দেখে, তাস খেলে, গালগল্প করে—আদালতে গিয়ে মামলা-মোকদ্দমা চালানো তার বেশী সে মনে করে না কিছু।

পাহাড়ী মেয়ে

শ্রীকিরণময় ধর

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসুর সৌজন্যে

বলিদ্বীপে শিল্পকলা ও রসবোধ সাধারণের জীবন ও দৈনন্দিন কর্মের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ; শিল্পী বলিয়া সেখানে একটি স্বতন্ত্র জা'ত নাই, প্রায় সকলেই শিল্পকর্মে অল্পবিস্তর নিপুণ। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীই সাধারণত বলিদ্বীপের শিল্পকলার বিষয়বস্তু। তবে দৈনন্দিন ঘটনা ও দৃশ্যাবলী লইয়া আধুনিক কালে বহু শিল্পবস্তু রচিত হইয়াছে ; উপরের চিত্রখানি তাহার একটি নিদর্শন। বহির্জগতের সহিত যোগ স্থাপিত হইবার পর সম্প্রতি বলির শিল্পে বিদেশীয় প্রভাবও কোন কোন ক্ষেত্রে পড়িয়াছে। নীচের চিত্রখানি তাহার একটি নিদর্শন ; ইহার অঙ্কনরীতি বিখ্যাত শিল্পী অব্রে বিয়ার্ডসলির সহিত তুলনীয়।

দুই বোনে এসে ঘরে ঢুকল, সঙ্গে প্রাতরাশের আয়োজন। দুর্গা কোন দিকে না তাকিয়ে নিবিষ্টমনে চা ঢালছে, যেন সেখানে একটিও মানুষ নেই…ঠাকুরঘরে নিতান্তই সাত্ত্বিকভাবে লোকে যেমন নৈবেদ্য সাজিয়ে যায়, ঠিক তেমনি। গরম চা এক চুমুক খেয়ে সুধানাথ দিনের বেলা ভাল ক'রে মেয়েটির দিকে তাকাল। মুখখানা কচি কচি বয়স যা, মুখভাবে তার চেয়ে ঢের বেশী কোমল দেখায়,…বুদ্ধির অপূর্ব্ব দীপ্তিতে সমস্ত মুখ ঝকমক করছে। কাল রাত্রে কথাবার্ত্তার ধরণে এক-একবার মনে হয়েছিল শক্তিমান প্রতিপক্ষ; এখন সকালের আলোয় বোঝা গেল, এ ছেলেমানুষের সঙ্গে তর্ক করা হাস্যকর, একে কেবল ক্ষেপিয়ে মজা দেখতে হয়।

নীরদ বলল—চা রেখে দিলে যে—

হাসি চেপে মুখটা বাঁকিয়ে সুধানাথ বলল—খাওয়া যায় না।

কোন দোষ হয়ে গেছে ভেবে দুর্গা সত্য সত্য অপ্রতিভ হয়ে উঠেছে। নীরদ আবার টিপ্পনী কেটে বলল—চিনির বদলে ময়দা মিশিয়ে দাও নি ত, দিদি। যে শুভক্ষণে তোমার দেখা!

দুর্গা চোখ তুলে দেখে, দু-জনে মুখ টিপে হাসছে। বুঝল, সব মিথ্যা; দু-ভাই ষড়যন্ত্র ক'রে তাকে অপদস্থ করতে লেগেছে। রাগের বশে আর তার কাণ্ডজ্ঞান রইল না—সুধার অল্পখাওয়া চায়ের বাটি নিয়ে দিল এক চুমুক। বলল—এমন মিথ্যুক সব। দোহাই দিদি, দেখ—চেখে দেখ একটা বার—

নীরদ হো হো ক'রে হেসে হাততালি দিয়ে উঠল।—দুর্গাদেবী, তোমার পক্ষে ঐ চা মহাপ্রসাদ—অমৃত সমান। কিন্তু তোমার দিদি…বলি, তুমি খেতে পার ব'লে ও খায় কেমন ক'রে?

দুর্গা আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ঘাড় নেড়ে বলল—খেয়েছি, বেশ করেছি। এক-শ বার খাব। কাল থেকে লেগেছেন সব। মিথ্যে নিন্দে—মিথ্যে কথা—গালাগালি—

দ্রুতপদে সে ঘর ছেড়ে চলল। লীলা ডেকে বলল—আর এক কাপ চা নিয়ে আয়, লক্ষ্মী দিদি। ঠাকুরপোর খাওয়া হ'ল না।

দুর্গা ঝঙ্কার দিয়ে চলে গেল—ইঃ, আমার বয়ে গেছে। খাওয়া হ'ল না হ'ল…ভারি ত আমার!

একটু থমথমে ভাব ঘরের মধ্যে। তার পর সুধানাথ হেসে বলল—বৌদিদি মনে মনে চটে যাচ্ছেন।…কোথাকার উড়ো আপদ এসে বোনকে জ্বালাতন করছে—

লীলা বলল—বৌদিদির জ্বালাটাই বড্ড কম কিনা! ও তোমাদের পুরুষ মানুষের ধরণ। জিজ্ঞাসা কর তোমার ঐ দাদাটিকে। আমি ভাল মানুষ, তাই সয়ে যাই। বোন আমার বড্ড রাগী। তার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি বিয়ে করবে না?

সুধানাথ বলল—তার চেয়ে জরুরি দরকারে এসেছি, বৌদিদি। বিয়ের ঢোল দু-দিন পরে বাজলে চলবে; কিন্তু নিলামের ঢোল-সহরৎ সবুর মানবে না।

নীরদ অভয় দিয়ে বলল—কুছপরোয়া নেই। সে ভাবনা আমার। বুড়ো হাকিমটা বড্ড ভালমানুষ…বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তোমার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত ঠিক মঞ্জুর করিয়ে দেব।

সুধা বলল—এদিককার হাকিমও ভালমানুষ, কিন্তু বড্ড কড়া। তাহ'লে কাছারীর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে এদিকে সাধ্য-সাধনা সুরু ক'রে দিই—কি বল?

আনন্দের হাসিতে লীলা ও নীরদের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। লীলা বলল—সত্যি ঠাকুরপো, তুমি আমার বোনকে পায়ে নেবে? মা-বাবা নেই তাই বড্ড অভিমানী; নইলে—

সুধা কথাটা শেষ করতেই দিল না।—পায়ে? কি যে বল, বৌদিদি! শিবের মাথায় সাপ…তাই রক্ষে। পায়ে থাকলে—সর্ব্বনাশ! ভাবতেও ভয় লাগে—

হাস্যের তরঙ্গে সমস্ত ঘর ভাসিয়ে লীলা বেরিয়ে গেল।

মিনিট-দু'য়ের মধ্যে আবার চা এল। এবার নূতন ব্যবস্থা। কালীপদর হাতে সমস্ত সরঞ্জাম—সে-ই তৈরি করতে লাগল—দুর্গা আলগোছে পিছনে, নিতান্ত নিরপেক্ষ দর্শকের মত। হঠাৎ সে হাঁ হাঁ ক'রে উঠল—ওরে বেকুব, থাম্ থাম্—আগে জামাইবাবুকে দিয়ে পরখ করিয়ে নে। চিনি না ময়দা। দুধ না খড়ি-গোলা।—জানিস নে, পাড়াগাঁয়ের লোক—এঁরা দিনকে রাত করতে পারেন।

খোসামোদ করলে গোলমালটা যদি মেটে, সেই ভরসায় সুধানাথ বলল—দাদা, এইটুকু মেয়ে কলেজে পড়েন? খুব আশ্চর্য্য ত!

নীরদও বোধ হয় সন্ধির প্রত্যাশী। বলল– দুর্গা

দিদি আমাদের বড় ভাল মেয়ে। কলেজে যায়, ট্রিগোনমেট্রি কষে, কাগজে গল্প লেখে, ডিবেটিং ক্লাবে বক্তৃতা দেয়, আবার ফার্ষ্ট-এড্ ও পাস ক'রে ব'সে আছে।

প্রশংসমান চোখে সুধা মেয়েটির দিকে তাকাল। দুর্গা তখন অবিকল নীরদের স্বর নকল ক'রে বলতে লাগল—এবং চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শোনে, নাকে নিঃশ্বাস নেয়—কিন্তু অবাক হয়ে দেখবার কি আছে, জামাই বাবু?

—বিশ্বাস হয় না। এক মুহূর্ত্তে সুধানাথের মনের সয়তানটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সে ঘাড় নেড়ে বলল—কিছুতে বিশ্বাস হয় না। আচ্ছা, ট্রিগোনমেট্রি যে কষেন—বানান করুন দিকি ট্রিগোনমেট্রি!

সপ্রতিভ কণ্ঠে দুর্গা বলল—ডি-ও-এন্-কে-ই-ওয়াই—

পিছনে হাসির হুল্লোড়। দুর্গা ছুটে পালিয়ে গেল।

মামলার ইতিহাসটা মুখে মুখে ব'লে অতঃপর সুধানাথ দলিলপত্র নিতে ভিতরে এসেছে। তারই সম্বন্ধে কথা চলছে শুনে দালানের কোণে কৌতূহলী হয়ে দাঁড়াল। দুই বোনে আলোচনা···অবস্থা ইতিমধ্যেই সঙ্গীন হয়ে উঠেছে।

দুর্গা বলছে—এক ফোঁটা মেয়ে···এইটুকু মেয়ে···খুকী, খুকী···যেন আদ্যিকালের বদ্দি বুড়োরা এসেছেন সব। কথায় কথায় যারা ইন্সাল্ট করে তাদের সঙ্গে···দিদি, তোমার আর কাজকর্ম্ম নেই?

লীলা বলল—এই নাকে খৎ দিচ্ছি, আর বলব না। বুদ্ধিজ্ঞান হয়েছে, নিজের ভালমন্দ বুঝতে শিখেছ। বেশ ত, যা ভাল হয় কর। কিন্তু এ-ও বলে দিচ্ছি, অমন পাত্র তপস্যা ক'রে মেলে না।

ব্যঙ্গের সুরে দুর্গা জবাব দিল—পাত্রটা খুব ভাল। ঠংঠঙিয়ে বাজে। ঐ আওয়াজ শুনেই তোমাদের তাক লেগে গেছে, কিন্তু আসলে শূন্যকুম্ভ—

লীলার রাগের আর সীমা রইল না। বলল—অত দেমাক ভাল নয়। রূপ-গুণ, ধনদৌলত এমন ক'টা মেলে? নিজের দিকে চেয়ে কথা বলতে হয়, তবু যদি রংটা কটা হ'ত! এঁটো পাতের ধোঁয়া স্বর্গে যাবে না, জানি। আমরা করলে কি হবে?—

মেয়েটি শ্যামাঙ্গী। ব্যথার জায়গায় আঘাত পেয়ে সে একেবারে ক্ষেপে উঠল।—চাই নে রূপ, মাকাল ফলের কোন দরকার নেই। আর গুণের পরিচয় ত কাল আসা থেকে সুরু হয়েছে। খামকা এসেই ভদ্রমেয়ের গা-ঘেঁষে অপমান করতে পারে যে—চিরজন্ম আমি আঁস্তাকুড়ে পড়ে থাকব, ···অমন স্বর্গ আমি চাই নে কোন দিন—।

শেষদিকটায় স্বর অস্বাভাবিক বিকৃত। বোধ করি কান্না চাপতেই সে ছুটে বেরুচ্ছিল, হঠাৎ বজ্রাহতের মত থমকে দাঁড়াল,—সামনে সুধানাথ। তার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে লীলাও স্তম্ভিত হয়ে গেল। অপমানে সুধানাথের মুখ কালিবর্ণ হয়ে গেছে। লীলা তাড়াতাড়ি বলল—ঠাকুরপো, এখানে?

সুধানাথ বলল—হ্যাঁ বৌদিদি, দৈবাৎ এসেছি। আমার সম্বন্ধে সুখকর সমস্ত আলাপ কানে গেছে। জবাব দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

লীলা তাড়াতাড়ি বলল—কিচ্ছু মনে ক'রো না, ভাই। ও একটা পাগল।

সুধানাথ বলল—তবু সাফাই দেবার প্রয়োজন। কাল হঠাৎ ওর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু সেটা জেনে-শুনে নয়—

লীলা বলল—তার আবার বলবে কি ঠাকুরপো,—আমরা কি জানি নে?

সুধা বলল—তোমরা জানলেও, ওঁর নিজের একটু ভাল ক'রে জানা দরকার।···আমি আমার নিজের মুখই আয়নায় দেখতে গিয়েছিলাম। ওঁর মুখ উল্টো দিকে ফেরানো ছিল, সুমুখে থাকলে আপনা থেকেই এক-শ হাত তফাতে থাকতাম। নিজের সম্বন্ধে ওঁর বড় অনর্থক গর্ব্ব। সেটা ভাল কথা নয়। খোলাখুলি ব'লে ফেললাম। অপরাধ নেবেন না, বৌদি।

চোখ তুলে উভয়ের মুখে দুর্গা একবার তাকাল। ওষ্ঠ থর থর ক'রে কাঁপছে, কিছুই সে বলতে পারল না। টলতে টলতে খাটের উপর মুখ গুঁজে পড়ল। সুধানাথ নির্ব্বিকার গম্ভীর ভাবে বেরিয়ে গেল।

রাগ কমলে তখন সুধানাথের অনুতাপ হ'তে লাগল।

ছেলেমানুষ—এবং একটু রাগী স্বভাবের হ'লেও দোষ ত তাদেরই। সে-ই এসে অবধি ক্রমাগত বেচারীকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে। বাড়ির মধ্যে দুর্গার আর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দুই ভাই খেতে বসেছে, বৌদিদি দেওয়া-থোওয়া করছেন। তাঁরও গম্ভীর মুখ, বোনের ব্যথা তাঁরও মনে বিঁধেছে নিশ্চয়। লজ্জায় সুধানাথের মনে হ'তে লাগল, একছুটে এ-বাড়ির ত্রিসীমানা পেরিয়ে চলে যায়।

নীরদ পান চিবোতে চিবোতে তাড়াতাড়ি পোষাক পরছে, সুধানাথ বলল—দাদা, আমিও আসি?

নীরদ বলল—কোন দরকার নেই। লম্বা ঘুম দাও। আজ আমি কাছারী থেকে সব জেনে-শুনে আসি। দরকার হ'লে কাল যেও।

সুধানাথ বলল—তার চেয়ে ঘুরে আসি না কেন। একা একা—কাজকর্ম্ম নেই—সময় কাটে কি ক'রে?

—আর এক দফা ঝগড়া বাধিয়ে নিও, সময় উড়ে যাবে। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় তোমায় ষ্টুপিড,—। কৃত্রিম ক্রোধে নীরদ সুধানাথের দিকে চোখ পাকাল।—আমাদের কেউ একথা বললে ত আর ঘাড় ধ'রে ঠেলে না-দেওয়া পর্য্যন্ত নড়ি নে।

সুধানাথ আর প্রতিবাদ করল না। তার মনেও আশার আলো খেলে গেল। ঐ ত মেয়ে···ঝগড়া করতে না পেরে এতক্ষণ তার দম আটকে আসছে নিশ্চয়। এমন চুপচাপ কতক্ষণ থাকবে আর?···এটা সেটা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুম এসে গেছে। ঘুম ভাঙতে বেলা পড়ে এল। পাশেই মুখ ধোবার জল, ডিবেয় পান সাজানো। মানুষ নেই। সুধানাথ সোজা ভিতরে চলে এসে ডাকল—বৌদি?

লীলা দুর্গার চুল বাঁধছিল। উঠে এসে তাড়াতাড়ি আসন পেতে দিল। গম্ভীর আনতমুখে দুর্গা ঘর থেকে চলে গেল।

নিশ্বাস ফেলে সুধানাথ বলল—বৌদি, আমার দোষ হয়েছে মানি। কিন্তু দোষটা কি শুধু এক পক্ষের? বোনের পক্ষ নিয়ে রাগ ক'রে তুমিও চুপচাপ ব'সে আছ—কিন্তু আমি দেওর না হয়ে ভাই হ'তাম যদি, এমন মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারতে?

লীলা বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—না, না, ভাই—তোমার দোষ কি? অমন বললে কোন্ পুরুষমানুষের রাগ না-হয় বলো। আমাদের উনি যদি হতেন, চিরজন্মের মত আর মুখ দেখতেন না। ও দুগ্‌গা দুগ্‌গা, সত্যি বড্ড আদিখ্যেতা মেয়ের—

বিরক্ত মুখে অলক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগল—ঐ রকম করে। রাগ ক'রে এক বেলা দু-বেলা খায় না, কথা বলে না। উনি আসুন ওঁর কাছে মুখ গোমড়া ক'রে থাকবার জো নেই। পাঁচটা বেজেছে ত—উনি এই এলেন বলে—

অতএব তখন নীরদের আশায় সুধানাথ মিনিট গুণতে লাগল।

সন্ধ্যার পর আবার সেই দালানের খাটে দুই জনে বসেছে। সুধানাথ বলল—তার পর, কোর্টের খবর বল। কাজ যদি এমনি এমনি হয়ে যায়, কালই আমি চলে যাব, দাদা।

নীরদ বলল—কে তোকে এখানে জলবিছুটি দিচ্ছে, বল্ দিকি?

লীলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—আর কে? তোমার ঐ আহ্লাদী ঠাকরুণ। সেই সকাল থেকে আলাপ বন্ধ। এক দিনের জন্য এসেছে, ঝগড়াঝাঁটি ওর কাঁহাতক ভাল লাগে?

হো হো ক'রে ছাদফাটা হাসি হেসে নীরদ বলল—অবস্থা গাঢ় হয়ে উঠেছে, বল। একটা দিনে এত উন্নতি? আশ্চর্য্য ত! কিন্তু আসামী গেল কোথায়?···আরে, আরে,—পালাস নে বোন, কথা বলতে হবে না—তুই আয় এখানে—

ছুটে গিয়ে নীরদ দুর্গার হাত ধ'রে নিয়ে এল। মেজের উপর ঝুপ ক'রে দুর্গা ব'সে পড়ল। নীরদ বলল—আহা হা, ওখানে কেন? ঐ টুলের উপর গিয়ে বোস। কাল বাজনা হয়েছে, গান শুনিয়ে দাও আজকে। আরে কথা না বল না-ই বললে—গান গাইতে দোষ কি?

ঘাড় নীচু ক'রে দুর্গা সেই যে বসল, কিছুতে আর নড়ান গেল না। নীরদ পাশে এসে কত বোঝাতে লাগল—অত রাগ করে না। রাগরঙ্গগুলো সব আগেভাগে হয়ে গেলে শেষকালের জন্য থাকবে কি? শোন ভাই, কথা রাখ—

একবার এক ফাঁকে উঠে দুর্গা পালিয়ে গেল। একেবারে বিছানায় গিয়ে পড়ল। নীরদ বলতে লাগল—ধর্, ধর্,—।

তার পর হেসে বলল—না বড্ড রেগেছে, আজকে আর হবে না দেখছি—

সুধানাথ জিজ্ঞাসা করল—কোর্টের খবর কি ?

জিব কেটে নীরদ বলল—বিলকুল ভুলে গেছি, ভাই—

সুধানাথ বলল—যা-হয় হোক গে। আমার থাকবার জো নেই—আমি চলে যাব কাল—

বিপন্নস্বরে নীরদ বলল—এই নাও। এবার বুঝি তোমার পালা। সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে যাবে, একটা দিন ক্ষমা দে, ভাই।

পরের দিন নীরদ যত্ন ক'রে কাগজপত্র সব পড়ল, অনেক ক্ষণ ভাবল, তিন-চার ছিলিম তামাক পুড়ল, তার পর ধীরে ধীরে বাড়ির ভিতর চলে গেল। সুধানাথ বাইরের ঘরে একটি চেয়ারে স্থাণু হয়ে বসে আছে, এবং জানলা দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে স্বভাবের শোভা দেখছে। আরও অনেক পরে নীরদ এসে বলল—ব্যাপার সঙ্গীন। খুব ভরসা দিতে পারি নে ভাই।

অন্যমনস্ক সুধানাথ চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করল—সদরের কথা বলছ ?

—সদর, অন্দর দুই-ই। অবহেলা ক'রে বিষম জট পাকিয়ে ফেলেছ। হার হয় কি জিত হয়, কোর্ট থেকে না-আসা অবধি বলা যাচ্ছে না কিছু।

নীরদ বেরিয়ে যাবার কিছু পরেই সুধানাথের অস্বাভাবিক চীৎকার শোনা গেল—বৌদি! বৌদি!

যে যেখানে ছিল,—ছুটে এসে দেখে, দালানের বিছানায় সে এলিয়ে পড়ে আছে। পায়ের এক জায়গায় রুমাল দিয়ে বাঁধা। লীলার দিকে চেয়ে একটু ম্লান হেসে সুধানাথ বলল—দেখছ কি বৌদি, মা-মনসা ঠুকে দিয়েছেন। চললাম এবার।

ব্যাকুল হয়ে লীলা কেঁদেই ফেলল। দুর্গারও শুষ্ক শঙ্কাচ্ছন্ন মুখ। সে এগিয়ে ক্ষতস্থান দেখতে লাগল। কালীপদ ছুটল যোগীন-ওঝার বাড়ি। খানিক তীক্ষ্ণ চোখে দেখে দুর্গা একটু সরে এসে দাঁড়াল। মুখের মেঘ তখন কেটেছে, দু-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

লীলা প্রশ্ন করল—কি ?

দুর্গা বলল—বেশী কিছু নয়, আমি পারব, যোগীন-ওঝার দরকার হবে না।

রোগী একদৃষ্টে লক্ষ্য করছিল। সে বলল—আপনি পারবেন কি রকম ? ডাক্তারীও জানা আছে নাকি ?

লীলা বলল—কোথায় ? ফার্ষ্ট-এড্ শিখবার সময় বুঝি একটু-আধটু—। না, না—সে কোন কাজের কথা নয়। কালীপদ ফিরে এলে সদরে পাঠাচ্ছি···ভাল ডাক্তার নিয়ে উনি চলে আসুন। ভাল মানুষ বেড়াতে এসে কি যে হ'ল—আমার ত গা কাঁপছে···

দুর্গা এবার খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।—কিছু ভাবনা নেই দিদি, সদরে ছুটোছুটির দরকার নেই। আমার কথা শোন। যে সাপে কামড়েছে, দাগ দেখে বুঝছি, তার ফণা নেই।

সুধানাথও সমর্থন করল—না, না, সদরের ডাক্তার এসে কি করবে ? আমারও যেন মনে হচ্ছে, ও ঢোঁড়া সাপ। সেই রকমই দেখেছি।

ইতিমধ্যে কালীপদ যোগীন-ওঝাকে নিয়ে এসেছে। দুর্গা হুকুমের সুরে বলল—মন্তোর-তন্তোর তোমার পরে হবে, ওঝা-মশাই। বাঁধন মোটে একটা দেওয়া হয়েছে, ক'সে আরও দু-তিনটা দাও। আমি সাপের ডাক্তারী পাস ক'রে এসেছি—বুঝলে ?

ওঝা সসম্ভ্রমে দুর্গার দিকে একবার তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বাঁধন দিতে প্রবৃত্ত হ'ল। দুর্গা ঘাড় নাড়ে—ও ঠিক হয় নি। আরও—আরও জোরে—। যোগীন আর কালীপদ প্রাণপণ বলে দড়ি কষতে সুরু করে। আর্ত্তকণ্ঠে সুধানাথ বলল—বৌদি, সাপের বিষে প্রাণ না-ও যদি যেত, বাঁধনের চোটে যাবে নিশ্চয়।

লীলা কিন্তু এবার এদের দলে। বলল—বিষ ওপরে না ওঠে, সেটা আগে দেখতে হবে। হ্যাঁ রে দুগ্‌গা, এবার হয়েছে—না ? তুমি চোখ বুজে শুয়ে থাক, ভাই—

দুর্গা পরীক্ষা ক'রে খুশী মুখে ঘাড় নাড়ল। তার পর যোগীনকে বলল—এবার না-হয় তোমার চিকিৎসাই চলুক, ওঝা-মশাই। তার পর দরকার হ'লে আমি পরেই দেখব।

যোগীন অনেকক্ষণ মন্ত্র পড়লে, অনেকগুলো শিকড় এনে সুধার পায়ে বুলালে, শেষে ক্ষতের মুখে মুখ দিয়ে খানিকটা

রক্ত চুষে ফেলে বললে—ঠিক বলেছ ঠাকরুণ,…বিষ নেই। এবার খুলে দেওয়া হোক।…তবে নজর রেখো রোগী যেন ঘুমোন না।

বাঁধন খুলে আর একবার সকলকে সাবধান থাকতে ব'লে যোগীন বিদায় হ'ল। সুধানাথের পা যেন অসাড় হয়ে গেছে। এদিকে ছেলে কাঁদছে, লীলা যেতে যেতে বলল—তুই কোথাও যাস নে দুগ্‌গা…আর দেখবি, ঠাকুরপো ঘুমোয় না যেন।

দুর্গা হেসে ফেলে বলল—তা পারব। খুব—খু উ-ব পারব।

সুধানাথও বলল—আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যান বৌদি, তা উনি খুব পারবেন। এক্ষুনি এমন ঝগড়া সুরু করবেন যে ঘুম ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারবে না।—

বৌদিদি ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে।

দুর্গা বলল—ঝগড়া করতে যাব কোন্ দুঃখে? চিমটি কাটতে হয়—পচা আমানি খাওয়াতে হয়—দরকার হ'লে আরও গুরুতর অনেক কিছু প্রয়োগ করবার বিধান আছে—সাপের কামড়ের ঐ ব্যবস্থা।

—আজ্ঞে না। সুধানাথ মহাবেগে প্রতিবাদ ক'রে উঠল।—ওটা ভূতে-পাওয়ার ব্যবস্থা, সর্পাঘাতের নয়। আপনার ফার্ষ্ট-এডের যত বড় সার্টিফিকেটই থাকুক, এ-কথা আমি এক-শ বার বলব।

দুর্গা বলল—তা হ'লে খুলে বলি—আপনাকে ভূতেই পেয়েছে, সর্পাঘাত মিছে কথা!

—মিছে কথা?

—হ্যাঁ। এবং ইচ্ছে ক'রে লোক ঠকানো। তার মানে জুয়োচুরি। সাপের দাঁতের দাগ ও নয়—

—তাই যদিই হয়…সাপ অবশ্য আমি চোখে দেখি নি… ধরুন, শামুকে কাটতে পারে, কাঁটার খোঁচা লাগতে পারে …কত কি হ'তে পারে; কিন্তু ইচ্ছে ক'রে জুয়োচুরি এর প্রমাণ কি?

—ওটা ক্ষুরে কাটা—আপনারই দাড়ি কমানো ক্ষুর—

সুধানাথ তর্ক ছাড়ে না। তাই-ই যদি হয়…ক্ষুরে অজান্তেও কাটতে পারে। আমার দোষ কি?

—দোষ আপনার নয়, ঘাড়ের ভূতটার। দাড়ি কামাচ্ছিলেন, সেই সময় সে-ই সম্ভবত মতলব দিয়েছে, পায়ে ক্ষুর বসিয়ে দেবার। ভাবলেন, রক্তপাতের ফলে হয়ত সুরাহা হয়ে যাবে। কিন্তু এ ত ভাল কথা নয়।

সুধানাথ বলল—কি ভাল নয়? ভূত না ক্ষুর বসানো?

—দুই-ই। জানেন, কত সহজে সেপ্‌টিক্ হয়ে যেতে পারে। নিজের পায়ে নিজে ক্ষুর বসালেন,—আপনি ডাকাত।

—চোর, জুয়োচোর, ভূতগ্রস্ত এবং ডাকাত। ভূত তাড়াবার জন্য আপাততঃ চিমটি ও পচা আমানি…প্রয়োজন-মাফিক আরও গুরুতর ব্যবস্থা প্রয়োগ—। রোগ-নির্ণয় এবং চিকিৎসায় আপনার জুড়ি নেই, এ-কথা মানতে হবে।

যশ-গৌরব মেয়েটি অতি সহজে হজম ক'রে নিতে পারে। বড় বড় চোখ মেলে সে বলল—তা ঠিক। সবাই ওকথা ব'লে থাকে। নইলে ফার্ষ্টক্লাস সার্টিফিকেট পাওয়া যায় কখনও?

একটু চুপ ক'রে থেকে সুধানাথ নিঃশ্বাস ফেলে বলল—আচ্ছা, মানলাম ভূত। কিন্তু তাকে তাড়াতেই হবে, এই কি আপনার ইচ্ছা?

দুর্গা মৃদু হেসে বলল—তা ছাড়া উপায় কি বলুন। ভদ্র-লোকের ছেলে কুটুম্বের বাড়িতে এসে এই বিপদ। এঁদের কর্ত্তব্যই ত আপনাকে নিরাময় ক'রে তোলা।

—ওঁদের কথা জিজ্ঞাস্য নয়, জিজ্ঞাসা আপনার বিষয়ে। …আচ্ছা দুর্গারাণী, হোষ্টেলে থাকেন, ঝগড়া করেন কার সঙ্গে? মেয়েতে মেয়েতে সুবিধে হয় কি? সেখানে ত শুনেছি, সহজে জেতা যায় না।

দুর্গা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল—পুরুষেরই বা অভাবটা কি? ভ্যাবলা ব'লে চাকর আছে একটা—

—এমন ত হ'তে পারে, ভ্যাবলার চাকরি থাকল না। কিংবা ধরুন, সে ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেল।…চাকর বই ত নয়?

—তা হ'লেও ঠাকুর আছে। তার নাম হনুমানপ্রসাদ। চলে যায় এক রকম।…অসুবিধে যা-কিছু, কেমিষ্ট্রির টাস্‌ক্ নিয়ে…ফরমূলা দেখলেই কেমন মাথা গোলমাল হয়ে যায়—

—তবেই দেখুন, মুস্কিল কত। একদৃষ্টে ক্ষণকাল দুর্গার দিকে চেয়ে সুধানাথ কি দেখল, কে জানে। তার পর মৃদুভাবে একটু হেসে বলতে লাগল—আচ্ছা, বিবেচনা করা যাক্, যদি, কিছু উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করা যায়। অর্থাৎ ঝগড়া করবার

ফরাসী ভাষার কথা—রাসীন বা ভলতেয়ারের ফরাসী ভাষা। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে, আবহাওয়ায় পাই রোমান্টিকের চিত্তস্ফূর্তি—তাই তাঁর ভঙ্গির লক্ষণ ঋজুতা ততখানি নয় যতখানি কারুতা, স্বচ্ছতা ততখানি নয়, যতখানি বর্ণবিলাস, সারল্য নয় সালঙ্কারিতা। চিন্তার ভাবের অনুভাবের কত রকমারি গমক প্রতিধ্বনি তাঁর ভাষা স্ফুলিঙ্গের মত প্রতিপদে চারিদিকে ছড়িয়ে চলেছে। ব্যঞ্জনার সূক্ষ্মতা, বক্রোক্তির রেশ, চলনের লীলায়িত সৌকুমার্য্য আমাদিগকে আর এক জগতের দুয়ারে প্রতিনিয়ত নিয়ে চলে। প্রত্যক্ষের, বিচারবিতর্কের, যুক্তির যে ধারা ও ধরণ তাতে রবীন্দ্রনাথের রচনারীতি গঠিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় নি। স্পর্শালু চিত্তের, তীব্র বোধশক্তির, নিবিড় উন্মুখী আদর্শপ্রিয়তার যে সহজাত বিবেক বা আকর্ষণ বিকর্ষণ তা'ই দিয়েছে তাঁর ভাষার গড়ন ও গতি। তর্কবুদ্ধি বা যুক্তি এখানে তার পৃথক স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দাঁড়ায় নি—সে জিনিষ এক সরস প্রাণের অপরোক্ষ অনুভবের যেন পরোক্ষ স্ফুরণ। দৃঢ়গ্রন্থি, গাঢ়বন্ধ, প্রশান্ত প্রসন্ন হওয়ার অবকাশ বা প্রয়োজন এ ভাষার তেমন নেই—তার প্রয়োজন আবেগ, বেগ, ধার—এ যেন রবীন্দ্রনাথের নিজেরই সুরসভাতলে নৃত্য ক'রে চলে যে হিলোলবিলোল উর্ব্বশী তারই পায়ের ছন্দ।

কিন্তু তাই ব'লে উচ্ছ্বসিত, কেবলই ভাবাবেগফেনিল এ ভাষা নয়—এখানেও আছে বাঁধন, সংযম; বাঁধন সংযম ছাড়া ভাষার পারিপাট্য-সৌষ্ঠব কখনও আসতে পারে না। তবে সে বাঁধন এখানে নির্ভর করে লীলায়িত গতির আপন ছন্দের উপর—তার যতি, তার নিজস্ব পদক্ষেপের মাপের উপর। ক্লাসিক-রীতিতে প্রতিফলিত বুদ্ধির স্বচ্ছতা, মুক্তির বাঁধন ও দৃঢ়তা, প্রমাণ-ক্রমের নিরাভরণতা (যথা, ম্যাথ্যু আর্ণল্ড) কিন্তু কবির রচনায়, কবির গদ্য রচনাতেও দেখা দেয়, বুদ্ধির লজিক হয়ত নয়, কিন্তু অনুভবের লজিক—এ লজিক আরও জীবন্ত সচল।

বাংলার তৃতীয় যে ভাষা-শিল্পী—আমি বলছি শরৎচন্দ্রের কথা—তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বৈরূপ্য আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারি। শরৎচন্দ্রের ভাষা বঙ্কিমের মতই ঋজু স্বচ্ছ সরল—তবে বঙ্কিমে সব সময়ে মণ্ডন অলঙ্কার অপছন্দ করেন না—কিন্তু শরৎচন্দ্র একান্ত নিরাভরণ। কিন্তু এই নিরাভরণতার হেতু তাঁর যুক্তিতন্ত্রতা নয়—হেতু, তিনি দৈনন্দিন ভাষা, সাধারণের ভাষা, সকলের সহজ মুখের ভাষার ছাঁচে ঢেলে তাঁর ভাষা গড়েছেন, তবে তাকে মেজেঘষে পরিষ্কার ক'রে ঝরঝরে তকতকে ক'রে নিয়েছেন। স্পষ্টতা ঋজুতা সত্ত্বেও বঙ্কিমের হ'ল গুণীজনের ভাষা—নাগরিক বা পৌর ভাষা; শরৎচন্দ্রের বলা যেতে পারে "গ্রামিক" (গ্রাম্য বলা দোষ হবে) বা জানপদ ভাষা। তবে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য এইখানে যে উভয়ের ভাষাই গতিমান, এমন কি খর গতিমান, বেগময় এমন কি তীব্র বেগময়। যদিও গতির ভঙ্গীতে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা দ্রুত চলেছে বটে কিন্তু এঁকেবেঁকে, এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে, আশেপাশে দেখে শুনে, অফুরন্ত মন্তব্য বক্তব্য প্রকাশ করতে করতে, কৌতূহলের ঝলক ছড়াতে ছড়াতে—তাতে ফুটে উঠেছে আলপনার লীলায়িত রেখাবলী। শরৎচন্দ্র চলেন সোজা তাঁর লক্ষ্যে—জ্যামিতিক সরল রেখায় হয়ত নয়—তাঁর পথ ঈষৎ বক্র—বৃত্তাভাস—তীরমার্গের মত। এবং এ বক্রতা এসেছে আবেগের অন্তর্মুখী গাঢ়তা ও তীব্রতার চাপে। দামাস্কাস ইস্পাতের মত তা শাণিত ক্ষুরধার, নমনীয় অথচ সুদৃঢ়। বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের গতি হ'ল ঝরণার—বহুল ধ্বনিতে বিচিত্র বর্ণে তা সমৃদ্ধ। শরৎচন্দ্রের হ'ল নিঃশব্দে আকাশচারী লঘুপক্ষ পাখীর গতি। বঙ্কিমের মধ্যে আমরা পাই প্রশান্ত প্রসাদগুণ, পরিচ্ছিন্ন পারিপাট্য—রবীন্দ্রনাথে কারুকার্য্যবলয়িত বৈদগ্ধ্য—শরৎচন্দ্রে সবেগ সারল্য।

রবীন্দ্রনাথের অলঙ্কারিতার কথা আমি বলছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ অলঙ্কার স্থূল ভূষণ আদৌ নয়। দ্রাবিড়ী প্রসাধনের গুরুভার এখানে অণুমাত্র নেই—আধুনিক গয়নার মত তা হালকা পাতলা; সোনার তার পিটিয়ে অতি সরু ক'রে তবে তা দিয়ে যেন বহুভঙ্গ লতাপাতা কাটা হয়েছে—এ কারুতা হ'ল চারুতা। কারণ তার কাজ সূক্ষ্ম মিহি-চিক্কণ বাহ্য আড়ম্বর, স্থূল হস্তের অবলেপ নেই—অঙ্গে অঙ্গে তার রয়েছে সৌকুমার্য্য, বলয়িত লাস্য।

আজ বাংলা ভাষা নিত্য নূতন সৃষ্টির জন্য উন্মুখী উদ্যগ্র। অনেক নব সেবকের হাতে সে যে উন্মার্গগামী হয়ে পড়বে, তাও স্বাভাবিক। এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের উদাহরণটি

সম্মুখে ও স্মরণে রাখা একান্ত প্রয়োজন—তাঁর অনুকরণ বা অনুসরণ করবার প্রবৃত্তি যদি না-ই থাকে। রবীন্দ্রনাথও বহু নবসৃষ্টি করেছেন—এমন কি অতি-আধুনিক ধারাতেও নেমে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য ও শক্তি এইখানে যে তিনি কখন যথাযোগ্যের, সুন্দরের সীমানা অতিক্রম ক'রে যান নি—পরন্তু যেখানেই বা যত দূরই গিয়ে থাকুন সে সমস্ত সুন্দরেরই এলাকাভুক্ত ক'রে নিয়েছেন। শ্রীহীনতা নিরর্থকতা তাঁর কোন প্রয়াসে এসে দেখা দেয় নি। নূতনের অভিনবের ধারায় চলে তিনি সর্বত্র সুন্দরের সৌষ্ঠবের সার্থকতারই প্রতিষ্ঠা ক'রে গিয়েছেন। তাঁর অন্তরাত্মাকেই তিনি প্রকাশ ক'রে ধরেছেন।

তুমি আর আমি

শ্রীশান্তি পাল

তুমি সখী ওই পারে, আমি হেথা একা
তোমার আমার মাঝে চির-ব্যবধান
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, অশ্রু-পারাবার
নাহি জানি কোথা আদি, কোথা তার শেষ
ওঠে আর পড়ে ঢেউ, যুগ যুগ ধরি'
দিগন্তে লুটিয়া মরে বালু-বেলা-তটে।

সৃজনের আদি হ'তে সহস্র লীলায়
দেখা দিলে বারম্বার বিচিত্র বরণে
সায়াহ্ন-সন্ধ্যায় কত রং-ধরা মেঘে,
রাত্রির তমসামগ্ন শান্ত অবসরে,
দিবসের জ্বালাময় দৃপ্ত কোলাহলে
অবসন্ন সৌন্দর্য্যের নীরব উচ্ছ্বাসে।

তোমারে পারি নি কভু করিবারে জয়,
নারিনু বাঁধিতে তোরে ছন্দের নিগড়ে ;
ধবল তুষারাকীর্ণ উচ্চ শৈলচূড়ে,—
তরঙ্গিত সমুদ্রের জলকল্লোচ্ছ্বাসে
বজ্রের দিগন্তপ্লাবী গুরু মন্দ্রমাঝে
দক্ষিণ সমীর-স্পর্শ দেবদারু-শিরে।

তুমি সখী রহস্যের গুণ্ঠন-নমিতা,
দুঃখ শোক আনন্দের চির-সহচরী ;
তোমারে ঘিরিয়া ছুটে রবি শশী তারা,
গ্রহ উপগ্রহ কত অনন্ত আকাশে,
তৃণাকীর্ণ ছায়াময়ী সরস্বতী-কূলে
শত শিষ্য পরিবৃত গৌতমের মত।

নাহি জানি কার শাপে প্রেমের গৌরবে
বাঁধিলে আমারে সখী বিরহ-বন্ধনে ;
বিচিত্ররূপিণী অয়ি, জীবনসঙ্গিনী
অন্তরে পেয়েছি তব গূঢ় পরিচয় ;
তোমারে বেসেছি ভাল প্রথম উষায়
আজো তোরে ভালবাসি বিষন্ন সন্ধ্যায়।

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে কতিপয় বৌদ্ধ ধ্বংসাবশেষ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্‌-এ

ভগবান্ বুদ্ধ ৩৫ বৎসর বয়সে বোধি লাভ করিয়া বাকী জীবনের ৪৫ বৎসর ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রচার-জীবনের অধিকাংশ সময়ই উত্তর-বিহার ও আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে কাটিয়াছে। সেকালকার আগ্রা-অযোধ্যার বহু নগরের নাম পালিগ্রন্থে পাওয়া যায়; যথা, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী, বারাণসী, পাবা ও কুশীনারা। বুদ্ধদেব বহুবার এই সব

অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ

নগরে প্রচার উপলক্ষে আসিয়া বর্ষা ঋতু অতিবাহিত করিয়াছেন, এবং সেই উপলক্ষে নগরপ্রান্তে বৌদ্ধ বিহার ও আবাসাদির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সেই সব বিহার ও নগরের ধ্বংসাবশেষ আজও বর্ত্তমান। বুদ্ধদেব যে কেবল নগরে নগরেই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া গরিব, দুঃখী ও হীন জনকে সহজ সরল ভাষায় তাঁহার অমৃতবাণী শুনাইয়াছেন। ভগবান্ বুদ্ধের ঐ দীর্ঘ ৪৫ বৎসরের প্রচার-জীবনের বহু অধ্যায় আগ্রা-অযোধ্যার যুক্তপ্রদেশের বহু গ্রাম ও নগরের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে গাঁথা আছে। এই প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধেই কিছু লিখিব।

বারাণসী—সারনাথ

ভগবান্ বুদ্ধ গয়ার নিকটবর্ত্তী উরুবিল্ব নামক স্থানে বোধি লাভ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন কোথায় তিনি তাঁহার এই নবলব্ধ সত্যালোকের প্রচার করেন। তিনি জানিতে পারিলেন যে তাঁহার যে পঞ্চশিষ্য অনশনব্রতাদি কঠোর তপস্যা ভঙ্গ করিয়া খাদ্য গ্রহণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, এখন তাহারা বারাণসীর নিকটবর্ত্তী মনোরম বনভূমি ঋষিপতন মৃগদাবে তপস্যায় রত আছে। তাহাদিগকে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া তিনি মৃগদাবে উপস্থিত হইলেন। কথিত আছে যে, পঞ্চশিষ্য দূর হইতে বুদ্ধকে দেখিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "দেখ, দেখ, শ্রমণ গৌতম আসিতেছেন। ইনি পথভ্রান্ত হইয়া তপস্যাদি ধর্ম্মকার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমরা উঠিব না, বা ইঁহাকে আসন দান করিব না।" কিন্তু তথাগত তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহার জ্যোতিষ্মান্, গম্ভীর ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া শ্রদ্ধার সহিত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাহারা তাঁহাকে বসিবার জন্য আসন প্রদান করিল এবং ভক্তিসহকারে ভগবান্ বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইল।

ঋষিপতন মৃগদাবের আধুনিক নাম সারনাথ। এই স্থানে ভগবান্ বুদ্ধ এই পঞ্চঋষিকে প্রথম যে উপদেশ দেন তাহা "ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন" বলিয়া বৌদ্ধসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এবং এই জন্যই সারনাথ বৌদ্ধদের একটি মহা তীর্থস্থান। ভগবান বুদ্ধ এই বলিয়া তাঁহার প্রথম উপদেশ আরম্ভ করিলেন, "মানবজাতি মোহবশতঃ বিপথে পদার্পণ করে। এক দিকে বিষয়লালসা, ভোগাসক্তি, অন্য দিকে অনর্থক কঠোর তপস্যায় শরীর-শোষণ—দুই-ই ভ্রান্ত পথ। আমি সুন্দর

মধ্যপথের আবিষ্কার করিয়াছি সেই পথ আর্য্য অষ্টাঙ্গমার্গ। এই পথে চলিলে দুঃখের অবসান হইবে, এবং শান্তি ও নির্ব্বাণ লাভ হইবে।" বৌদ্ধধর্ম্মের এই মূলসূত্রে চারিটি গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে; বৌদ্ধেরা এইগুলিকে আর্য্য-চতুরঙ্গ সত্য বলিয়া অভিহিত করে, যথা—(১) দুঃখ, (২) দুঃখ-কারণ, (৩) দুঃখ-নিবৃত্তি, এবং (৪) দুঃখ-নিবৃত্তির পথ।

চতুরঙ্গ সত্যের তাৎপর্য্য

প্রথম, সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়, কারণ জন্ম দুঃখের চিরসঙ্গী। জন্ম হইলেই জরা ব্যাধি ও মরণ আসিবে। এই সকলই দুঃখময়। অতএব দুঃখ কি, তাহা জানিতে হইবে।

দ্বিতীয় জন্ম যদি দুঃখময় হয়, তবে যে-নিমিত্ত এই জন্ম হয় তাহাই দুঃখের কারণ। বিষয়তৃষ্ণা ও ভোগাসক্তি যত মিটাইতে চেষ্টা করিবে ততই বাড়িয়া যাইবে, এবং তাহার পরিতৃপ্তির জন্য পুনঃপুনঃ জন্ম লইতে হইবে। অতএব এই বিষয়তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ।

তৃতীয়, বিষয়তৃষ্ণা দুঃখের কারণ হইলে তাহা সমূলে উৎপাটন করিতে পারিলেই দুঃখনিবৃত্তি হইবে।

চতুর্থ, এই দুঃখনিবৃত্তির জন্য ভগবান্ বুদ্ধ আটটি পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন; যথা, সত্যদৃষ্টি, সত্যসঙ্কল্প, সত্য-বাচন, সদাচরণ, সাধুজীবিকা, আত্মসংযম, সত্যধারণা ও সত্যধ্যান। ইহাই আর্য্য অষ্টাঙ্গমার্গ এবং এই আটটি পথে চলিলেই দুঃখের নিবৃত্তি হইবে।

এই যে চারিটি সত্য ইহাই বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। এই সত্য চারিটির উপলব্ধি হইলেই পূর্ণবোধি বা নির্ব্বাণ লাভ হইবে।

সুন্দর সরল ভাষায় বিবৃত ভগবান্ বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া বারাণসীর ধনী-দরিদ্র সকলে দলে দলে তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সারনাথে এক বড় বৌদ্ধ সংঘ গড়িয়া উঠিল। দলে দলে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু, শ্রমণ ও শিষ্য আসিয়া সারনাথে বাস করিতে লাগিল। ভগবান বুদ্ধ যে কুটীরে বাস করিতেন তাহাকে 'গন্ধকুটি' বলা হইত। নির্ব্বাণ বা পূর্ণবোধি লাভের পর সারনাথে আসিয়া ভগবান্

ধামেক স্তূপ, সারনাথ

সর্ব্বপ্রথম যে কুটীরে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে 'মূল-গন্ধকুটি' বলা হয়। সেই মূলগন্ধকুটির সংলগ্ন যে বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা 'মূলগন্ধকুটিবিহার' নামে বৌদ্ধ সমাজে পরিচিত হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মরাজ অশোক সারনাথে ভগবান্ বুদ্ধের ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন স্মরণীয় করিয়া রাখেন। তিনি সারনাথে একটি শিলাস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার গাত্রে ঐ স্মরণীয় ঘটনা খোদিত করিয়া রাখিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইবার পর সারনাথেরও গৌরব নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সুখের বিষয় আজকাল ভারতের মহাবোধি সোসাইটির চেষ্টায় সারনাথ লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া পাইয়াছে। লক্ষাধিক টাকা খরচ করিয়া মূলগন্ধকুটিবিহার আবার নির্ম্মিত হইয়াছে। ভিক্ষু ও শ্রমণদের বাসের জন্য বহু আশ্রমগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বিদ্যালয়, পাঠাগার ও চিকিৎসালয়ের জন্য গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। সারনাথে মহাবোধি সোসাইটির প্রধান কার্য্যালয় হইয়াছে ও মহাবোধি সোসাইটির সম্পাদক দেবপ্রিয় বলিসিংহ বৎসরের বেশীর ভাগ সময়ই সেখানে বাস করেন। নবনির্ম্মিত মূলগন্ধকুটিবিহারের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য দেখিবার বিষয়। প্রকাণ্ড হলের দেওয়ালে দেওয়ালে জাপানী কলাশিল্পীর বহু সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কিত

রহিয়াছে। চিত্রগুলির বিষয় বুদ্ধের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী। দেখিলে অজণ্টা গুহার চিত্রের কথা মনে পড়ে, যদিও এগুলি অজণ্টা চিত্রের মত অত উচ্চাঙ্গের নহে।

মূলগন্ধকুটিবিহার, সারনাথ

সারনাথে আরও একটি দ্রষ্টব্য স্থান আছে, তাহা মিউজিয়ম। কয়েক বৎসর হইল ভারত-সরকারের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ সারনাথে খননকার্য্য চালাইয়াছিলেন। তাহাতে মৌর্য্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্তযুগ ও তৎপরবর্ত্তী যুগের যে-সকল প্রাচীন মূর্ত্তি, মৃন্ময় পাত্র, মুদ্রা ও অপরাপর প্রাচীন ইতিহাসের ধ্বংসচিহ্ন পাওয়া গিয়াছে তাহা ঐ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

কৌশাম্বী

কৌশাম্বীর ধ্বংসাবশেষ এলাহাবাদের ৩৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কোশম নামক গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। কৌশাম্বী অতি প্রাচীন নগরী। রামায়ণ, মহাভারত, ও বহু পুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ পিটকে কৌশাম্বী সম্বন্ধে বহু কথা লিখিত আছে। পালিগ্রন্থে ভগবান্ বুদ্ধের সমসাময়িক ভারতবর্ষের যে ছয়টি মহানগরীর নামের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে কৌশাম্বী একটি। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে যে ইহার অস্তিত্ব ছিল পুরাণে এ-সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায়। কথিত আছে যে পাণ্ডবরাজ পরীক্ষিতের পঞ্চমাধঃ বংশধর নিচক্ষুর রাজত্বকালে রাজধানী হস্তিনাপুর গঙ্গাগর্ভে লীন হইয়া গেলে তিনি কৌশাম্বীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কৌশাম্বীর আধুনিক আকৃতি দেখিলে মনে হয় ইহা রাজধানীর উপযুক্ত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। দক্ষিণ প্রান্তে যমুনা বহিতেছে। ইহার তিন দিক্ উচ্চ মৃত্তিকা-প্রাকার ও বুরুজ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল; তাহার চিহ্নগুলি এখনও বেশ স্পষ্ট রহিয়াছে। বুদ্ধদেবের সময় কৌশাম্বী বৎসরাজ উদয়নের রাজধানী ছিল। রাজা উদয়ন যে কৌশাম্বীকে এক সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পালিটীকা সুমঙ্গল-বিলাসিনীতে পাওয়া যায়। পালিগ্রন্থ-সমূহে লিখিত আছে যে কৌশাম্বী এক সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য-বন্দর ছিল। কোশল ও মগধ হইতে মালবোঝাই বড় বড় নৌকা গঙ্গা উজাইয়া সহযাতি* পর্য্যন্ত আসিয়া তথা হইতে যমুনা বহিয়া কৌশাম্বীতে

সারনাথে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত একটি স্থান

পৌঁছিত। কৌশাম্বী হইতে মাল স্থলপথে উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে চালান হইত। ঐ তিন দিক্ হইতে বড় বড় রাস্তা আসিয়া কৌশাম্বীতে মিলিত হইয়াছিল। কৌশাম্বীতে বহু ধনী বণিকের বাস ছিল, যথা,

* এলাহাবাদের ৯ মাইল দূরে ভিটা নামক স্থান সহযাতির ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে মৎকৃত *Early History of Kausambi* নামক গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছি।

ঘোসক, কুক্কুট ও পাবারিয় ইত্যাদি। তন্মধ্যে আমরা ধনী শ্রেষ্ঠী ঘোসকের নামের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত,

কৌশাম্বীতে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তি

[নিম্মাণকাল কণিষ্কের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসর]

কেন-না তিনি বৌদ্ধবিহারের সংলগ্ন এক বৃহৎ মনোরম আরাম ভিক্ষুদের বাসের জন্য নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন। বহু শতাব্দী পরে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও তৎপর হিউয়েনসাঙ্ যখন কৌশাম্বীতে উপস্থিত হন তখনও নগরের দক্ষিণ-পূর্ব্বে যমুনার তীরে ঐ 'ঘোসিকারামে'র ধ্বংসাবশেষ তাঁহারা দেখিয়াছেন।

ভগবান্ বুদ্ধ কৌশাম্বীতে একাধিক বার আসিয়া 'বর্ষাবাস' করিয়াছেন। পালিগ্রন্থে বিবৃত আছে যে, ভগবান্ বহু সূত্রাদেশ কৌশাম্বীতে করিয়াছিলেন, যথা— কোসম্বিয়সুত্ত, সন্দকসুত্ত ইত্যাদি। ভগবান বুদ্ধের কৌশাম্বীতে আগমনের এক শিলালেখ-প্রমাণও কিছুদিন হইল পাওয়া গিয়াছে। বুদ্ধদেবের এক সুন্দর প্রমাণ মূর্ত্তির পদতলে ব্রাহ্মী অক্ষরে এই শিলালেখ খোদিত আছে :—"মহারাজ কণিষ্কের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে ভগবান বুদ্ধের বহুবার কৌশাম্বীতে আগমনস্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য বুদ্ধমিত্রা নামক জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ (মহিলা) এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।"
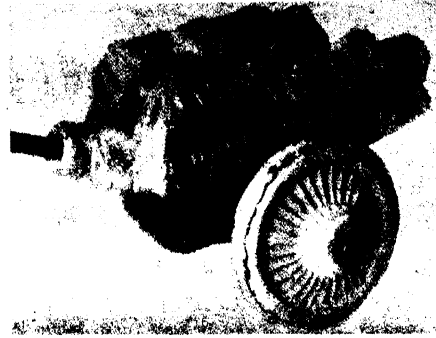
কৌশাম্বীতে প্রাপ্ত মৃৎ-শকটিকা

[খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী]

আমার কৌশাম্বীর প্রাচীন ইতিহাস নামক গ্রন্থে এই শিলালেখ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। কৌশাম্বীতে বুদ্ধের আগমনের যে উল্লেখ পালিগ্রন্থে আছে তাহার প্রমাণের নিমিত্ত এত দিন আমরা হিউয়েনসাঙের বৃত্তান্তের উপরই নির্ভর করিয়াছিলাম। এই শিলালেখ ইহার প্রাচীনতর প্রমাণ। স্থানীয় আর্কিয়লজিক্যাল সোসাইটির পরিচালক ব্রিজমোহন ব্যাস মহাশয় এই মূর্ত্তিটি আবিষ্কার করিয়া সুধীসমাজের মহা উপকার সাধন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া কৌশাম্বীতে প্রাপ্ত অন্যান্য বহু বৌদ্ধ ও জৈন মূর্ত্তি, স্তম্ভ,

কৌশাম্বীর বর্ত্তমান ধ্বংসস্তূপ
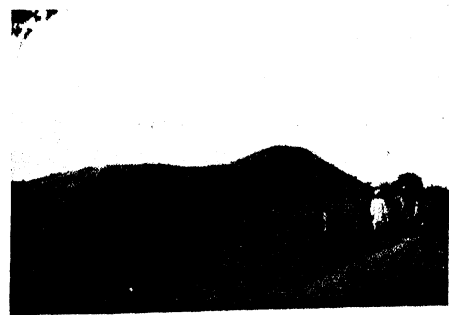
কুষাণ ও গুপ্তযুগের বহু মুদ্রা, মৃন্ময় মূর্ত্তি, ও খোদিত প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি এলাহাবাদ মিউনিসিপাল মিউজিয়মে সযত্নে রক্ষিত আছে। কৌশাম্বী দেখিতে যাইবার পূর্ব্বে এলাহাবাদ মিউজিয়মে সে সকল দেখিয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত। এলাহাবাদ হইতে কৌশাম্বীর ধ্বংসাবশেষ পর্য্যন্ত সুন্দর পাকা পথ আছে। মোটর গাড়ীতে দুই ঘণ্টার মধ্যেই পৌছান যায়। কেবল মাঝে পাঁচ-ছয় মাইল পথ বাঁকা ও বন্ধুর।

শ্রাবস্তী

ভগবান্ বুদ্ধের জীবনকালে মধ্যপ্রদেশের রাজ্যসমূহের মধ্যে কোশলরাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও পরাক্রমশালী ছিল। শ্রাবস্তী কোশলরাজ্যের রাজধানী ছিল। কোশল-রাজ প্রসেনজিৎ ভগবান বুদ্ধকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন।
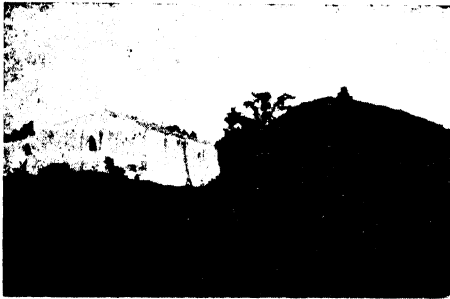
শ্রাবস্তী ধ্বংসস্তূপের দৃশ্য

রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধ বহুবার শ্রাবস্তীতে আসিয়া 'বর্ষাবাস' করিয়াছেন। অনাথপিণ্ডিক নামে শ্রাবস্তীর জনৈক ধর্ম্মপ্রাণ শ্রেষ্ঠী নগরপ্রান্তে এক বৃহৎ বিহার ও আরাম নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। যে বনভূমির উপর উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা রাজা প্রসেনজিতের কনিষ্ঠ পুত্র 'জেত'-এর অধিকারে ছিল। তিনি তাহা বিহার-নির্ম্মাণের জন্য দান করেন। এই জন্য বিহারের নাম হইয়াছে 'জেতবন-বিহার'। ভিক্ষুদের বাসের জন্য যে আরাম নির্ম্মিত হয় তাহার নাম রাখা হইল 'অনাথপিণ্ডিকারাম'। কথিত আছে, বিনয়পিটকের অধিকাংশ সূত্র ভগবান বুদ্ধ এই জেতবন-বিহারে অবস্থানকালে আদেশ করিয়াছিলেন।

আজকাল শ্রাবস্তীর ধ্বংসাবশেষ যুক্তপ্রদেশে গোণ্ডা ও বাহরাইচ জেলার প্রান্তে অবস্থিত সাহেৎ-মাহেত নামক স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাহেৎ-মাহেতের কিছু কিছু অংশ দুই জেলাতেই পড়িয়াছে। সেখানে প্রাচীন নগরীর বহু ধ্বংসস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বহু ইষ্টক ও প্রস্তরমূর্ত্তি এখনও পড়িয়া আছে। ১৯০৭ সালে ভারত-সরকারের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ সাহেৎ-মাহেতে কিছু খননকার্য্যও আরম্ভ করিয়াছিলেন। দুই বৎসর কার্য্যের পর তাহা বন্ধ হইয়া যায়। খননকালে দুইটি খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে যদ্দ্বারা সাহেৎ-মাহেতের ধ্বংসস্তূপ প্রাচীন শ্রাবস্তী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (*J. R. A. S.*, 1927)। ইহার পূর্ব্বে কানিংহাম সাহেৎ-মাহেৎই প্রাচীন শ্রাবস্তী বলিয়া অনুমান করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু কোন অকাট্য প্রমাণ দিতে পারেন নাই। ইহা উল্লেখযোগ্য যে পণ্ডিতপ্রবর কানিংহাম হিউয়েনসাঙের ভ্রমণবৃত্তান্তকে ভিত্তি করিয়া কেবল ভৌগোলিক প্রমাণ, প্রাচীন প্রবাদ ও পালি এবং সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লিখিত প্রমাণের সামঞ্জস্য করিয়া যে-সব প্রাচীন নগরের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, আজকাল প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের খননকার্য্যের ফলে শিলালেখ বা তাম্র-শাসনের দ্বারা তাহা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইতেছে। মহাবোধি সোসাইটির কৃপায় শ্রাবস্তীর লুপ্ত গৌরবের কিছু কিছু পুনরুদ্ধার হইয়াছে। জেতবন-বিহার কিছুকাল হইল পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। সেখানে এক জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও জন-কয়েক শ্রমণ বাস করেন। বি. এন. ডব্লু রেল লাইনে বলরামপুর পর্য্যন্ত গিয়া তথা হইতে মোটরবাসে অতি সহজেই সাহেৎ-মাহেতে যাওয়া যায়। ফৈজাবাদের রাস্তায় অযোধ্যাতে সরযূ পার হইয়া গোণ্ডা হইতেও সাহেৎ-মাহেৎ যাওয়া যায়।

সাকেত

সাকেত কোশলরাজ প্রসেনজিতের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল। পালিগ্রন্থে পাওয়া যায় প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তী হইতে সাকেতে প্রায়ই যাওয়া-আসা করিতেন এবং ইহাকে তাঁহার দ্বিতীয় রাজধানী রূপে ব্যবহার করিতেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে সাকেত রাজা দশরথের রাজধানী অযোধ্যার পরবর্ত্তী

নাম। আজকাল যে স্থানকে আমরা অযোধ্যা বলি তাহাই রাজা দশরথের অযোধ্যা কিনা আমাদের জানা নাই। কিন্তু বৌদ্ধ গ্রন্থে দুই শহরেরই নাম উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই সাকেত ও অযোধ্যা যে আলাদা শহর সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ ও রিজ ডেভিডসের মতও তাহাই। আমাদের মনে হয় বৌদ্ধ যুগের নূতন শহর সাকেত অযোধ্যার কাছাকাছি কোথাও নির্ম্মিত হয়। এই রূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে; যেমন মগধের প্রাচীন রাজধানী গিরিব্রজের নিকটেই বিম্বিসার রাজগৃহ নামক নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সাকেত ঠিক কোন্ সময়ে, কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হয় তাহা জানা নাই। তবে বুদ্ধদেবের সময়ে সাকেত যে একটা বড় শহর ছিল তৎসম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ পালি গ্রন্থে পাওয়া যায়। দীঘনিকায়ের মহাপরিনিব্বাণ-সুত্তে বর্ণিত আছে যে ভগবান বুদ্ধের সময়ে যে ছয়টি মহানগরী ছিল তন্মধ্যে সাকেত একটি। আধুনিক কোন স্থানটি সাকেত তাহা এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কানিংহাম অযোধ্যাকেই সাকেত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহার কোন নিঃসন্দেহ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। রিজ্ ডেভিডস্ অনুমান করেন যে সাকেত উনাও জেলায় সৈ নদীর তীরে সুজানকোটের ধ্বংসস্তূপ হইতে পারে। কিন্তু তাহা নিঃসন্দেহে মানিয়া লইবার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ তিনি দেন নাই। তবে পালি গ্রন্থের সঙ্কেতের উপর নির্ভর করিয়া আমরা ইহাই বলিতে পারি যে ফৈজাবাদ, গোণ্ডা বা উনাও জেলারই কোন স্থানে খুঁজিলে সাকেতের ধ্বংসস্তূপ পাওয়া যাইতে পারে।

পাবা

মহাপ্রস্থানের পথে চলিতে চলিতে ভগবান্ বুদ্ধ পাবাতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রিয়শিষ্য কর্ম্মকার চুন্দের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তথায় চুন্দের গৃহে ভোজন করিয়া কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। সেই রোগাক্রান্ত অবস্থায়ই বারো মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত কুশীনারার পথে চলিতে লাগিলেন। অতিকষ্টে সমস্ত দিনে এই পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে কুশীনারাতে পৌঁছিয়া সেই রাত্রেই পরিনির্ব্বাণ লাভ করিলেন। পাবাতে চুন্দের গৃহে যে আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহাই ভগবান্ বুদ্ধের মৃত্যুর কারণ। বৌদ্ধ যুগের এই একটি অতি
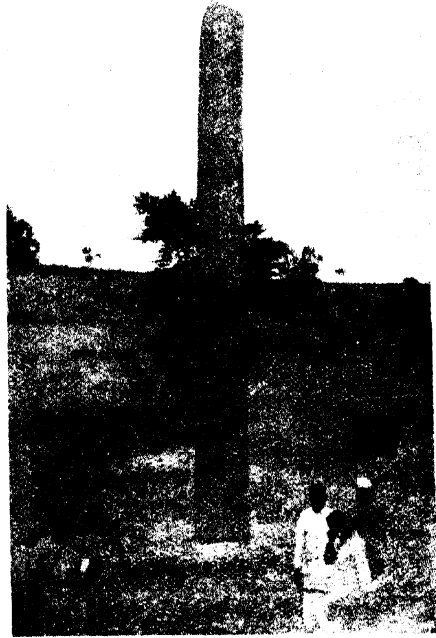
অশোকস্তম্ভ

বড় ঘটনার সহিত পাবার ইতিহাস জড়িত আছে। বুদ্ধদেবের সময়ে পাবা মল্লদের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল। অপর রাজধানী কুশীনারা। অঙ্গুত্তরনিকায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভগবান্ বুদ্ধের সময় যে ষোলটি মহা-জনপদ ছিল তন্মধ্যে মল্লদের প্রজাতন্ত্ররাষ্ট্র একটি। মল্লেরা পরাক্রমশালী যুদ্ধপ্রিয় ক্ষত্রিয় জাতি ছিল। তাহাদের রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল; এক ভাগের রাজধানী পাবা ও অপর ভাগের রাজধানী কুশীনারা। কানিংহামের মতে পাবার আধুনিক নাম পাড্রোনা। পাড্রোনা গোরখপুর জেলার কাসিয়া (প্রাচীন কুশীনারা) হইতে বারো মাইল

উত্তর-পশ্চিমে। গোরখপুর হইতে রেলযোগে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে পৌঁছান যায়। সেখানকার স্থানীয় জমিদার উত্তরাধিকারসূত্রে রাজা উপাধি লাভ করেন। সম্প্রতি সেখানে একটি চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাড্রোনাতে বৌদ্ধ যুগের ধ্বংসাবশেষ এখনও কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই।

কুশীনারা

বৈশাখী পূর্ণিমারাত্রির শেষ-যামে ভগবান্ বুদ্ধ কুশীনারাতে দেহত্যাগ করেন। ভগবান্ বুদ্ধ এই স্থানে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কুশীনারা বৌদ্ধদের একটি মহাতীর্থ। রোগাক্রান্ত হইয়া পাবা হইতে অতি কষ্টে চলিতে চলিতে বুদ্ধদেব অপরাহ্ণকালে হিরণ্যবতী নদী
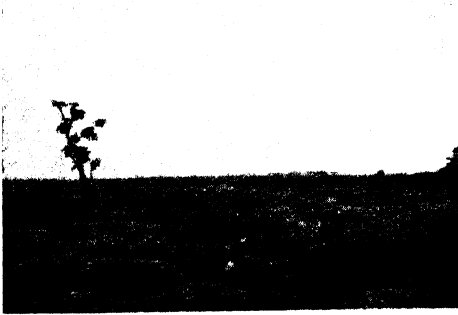
কুশীনারার প্রাচীন স্তূপের দৃশ্য

পার হইয়া কুশীনারার শালবনে এক যুগ্মশালতরুমূলে উপবেশন করিয়া প্রিয়শিষ্য আনন্দকে বলিলেন, "আনন্দ, তুমি কুশীনারাবাসী মল্লদের সংবাদ দাও যে আমি এখানে আসিয়াছি, এবং আজই রাত্রির চতুর্থ যামে দেহত্যাগ করিব।" আনন্দ কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী ও বারাণসী ইত্যাদি বড় বড় নগর থাকিতে, কুশীনারার মত এমন ক্ষুদ্র নগরীতে পরিনির্ব্বাণ লাভের ইচ্ছা কেন করিলেন ?" ভগবান্ বুদ্ধ বলিলেন, "বৎস আনন্দ, ইহা নহে। কুশীনারা অতি প্রাচীন নগর। পূর্ব্বে ইহা রাজচক্রবর্ত্তী ধর্ম্মপ্রাণ মহাসুদর্শনের রাজধানী ছিল। তখন ইহার নাম কুশবতী ছিল। কুশবতী অতি বিস্তীর্ণ, জনাকীর্ণ ও ধনশালী নগর ছিল। অশ্ব, হস্তী ও রথের চলাচলে এ স্থান সর্ব্বদা মুখর থাকিত। এখানে খাদ্য-পানীয়ের কোন অভাব ছিল না। এখানকার লোকেরা হাসিয়া খেলিয়া, নৃত্যগীত ও বাদ্য করিয়া আনন্দে দিন কাটাইত। তুমি কুশীনারাবাসীদের সংবাদ দাও। আমি তাহাদিগকে আমার শেষ উপদেশ প্রদান করিয়া এইখানেই দেহত্যাগ করিব।"

কুশীনারার ধ্বংসস্তূপ

এই সংবাদ নগরে প্রচারিত হইলে কুশীনারার আবাল-বৃদ্ধ নরনারী সকলে শোক করিতে করিতে সেই শালবনে উপস্থিত হইল, এবং আনন্দের নির্দ্দেশানুযায়ী ভগবানের দর্শন লাভ এবং তাঁহার শেষ বাণী শ্রবণ করিল। এই প্রকার উপদেশ দান করিতে করিতে রাত্রির তৃতীয় যাম শেষ হইলে চতুর্থ যামে ভগবান বুদ্ধ দক্ষিণ পার্শ্বে ভর দিয়া শয়ন করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন, এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে দেহত্যাগ করিলেন।

অতঃপর সাত দিন ধরিয়া কুশীনারার নরনারীরা ভগবান্ বুদ্ধের মৃত্যুতে শোক করিল, এবং অষ্টম দিবসে শবদেহ শুভ্র বস্ত্রে আবৃত করিয়া ও ঘৃতচন্দন ও অন্যান্য সুবাসে সিক্ত করিয়া তাহা উত্তর দ্বার দিয়া নগরে লইয়া আসিল। শবদেহ নগরের চারি দিক্ প্রদক্ষিণ করাইয়া পূর্ব্বদ্বার দিয়া বাহির করিয়া নগরের অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে হিরণ্যবতীর তীরে শ্মশানভূমিতে দাহক্রিয়া সম্পন্ন করিল। এই প্রকারে মহাসমারোহে বুদ্ধদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন

হইলে তাঁহার সেই পবিত্র দেহাবশিষ্ট অস্থিসমূহ আট ভাগে বিভক্ত হইল। যাঁহারা ঐ পবিত্র অস্থির অংশ পাইয়াছিলেন তাঁহারা স্ব স্ব দেশে তাহার উপর এক-একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিলেন। এই প্রকারে ভগবান্ বুদ্ধের দেহাবশিষ্টের উপর সর্ব্বপ্রথম আট জায়গায় স্তূপ নির্ম্মিত হয়। সেই আটটি স্থান রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অল্লকপ্প, রামগ্রাম, বেঠদীপ, পাবা ও কুশীনারা। অশোকাবদানে লিখিত আছে যে রাজা অশোক রামগ্রাম ব্যতীত বাকী সাত জায়গার স্তূপ খনন করিয়া সেই পবিত্র অস্থিসমূহ চুরাশি হাজার ভাগে বিভক্ত করিয়া হিন্দুকুশ হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাঁহার প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের নানা জায়গায় স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কিছু দিন হইল পেশাওয়ার ও তক্ষশিলাতে বুদ্ধদেবের অস্থি পাওয়া গিয়াছে; ভারত-সরকার তাহা মূলগন্ধকুটিবিহারে রাখিবার জন্য মহাবোধি সোসাইটিকে অর্পণ করিয়াছেন।

কুশীনারার আধুনিক নাম কাসিয়া। এই স্থান বি. এন. ডব্লু. আর-এর দেওরিয়া ষ্টেশন হইতে বারো মাইল ও গোরখপুর হইতে একুশ মাইল। দুই জায়গা হইতেই বাসে এখানে আসা যায়। কাসিয়াতে যে-স্থানে বুদ্ধদেব পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন সে-স্থানে রাজা অশোক একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই স্তূপ খননের ফলে এক তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছে যাহাতে "বুদ্ধ পরিনির্ব্বাণ চৈত্যম্ ইতি" কথাগুলি লিখিত আছে। এই প্রমাণের দ্বারা আধুনিক কাসিয়াই যে প্রাচীন কুশীনারা তাহা নিঃসন্দেহে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কুশীনারার অপর নাম 'মোত কোঁআর' অর্থাৎ রাজকুমারের মৃত্যুস্থান। ইহাও ঐ স্থাননির্দ্দেশের পক্ষে একটি প্রমাণ। পালিতে কুশীনারার পূর্ব্বে অবস্থিত হিরণ্যবতী নদীর উল্লেখ আছে, এবং বুদ্ধদেবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নগরের পূর্ব্বদিকে হইয়াছিল তাহাও লিখিত আছে। আমরা আধুনিক কাসিয়া হইতে প্রায় দেড় মাইল পথ মাঠের উপর দিয়া হাঁটিয়া একটি নদী দেখিতে পাইলাম, যাহার নাম 'সোনহারা', ও তাহার তীরেই একটি উচ্চ ভূমি দেখিতে পাইলাম যাহাকে 'অঙ্গার-স্তূপ' বলে। সেই অঙ্গার-স্তূপের উপর এক জন চীনা ভিক্ষু বাস করেন। পরিনির্ব্বাণ স্তূপের উপর একটি লম্বা পাকা গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেখানে বুদ্ধের প্রস্তরনির্ম্মিত এক অতিকায় মূর্ত্তি দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ান অবস্থায় রাখা আছে। সেই গৃহের ঠিক পশ্চাতেই এক উচ্চ ভূমির উপর একটি সুদৃশ্য বৃহৎ মন্দির এক ধর্ম্মপ্রাণ ব্রহ্মবাসী ধনী ১৯২৭ সালে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের উচ্চ চূড়া স্বর্ণপত্রে মণ্ডিত। ইহা পরিনির্ব্বাণ-মন্দির নামে পরিচিত। একটি বৌদ্ধ বিহারও এখানে আছে। ব্রহ্মবাসী ভিক্ষু চন্দ্রমণি গুটিকয়েক শ্রমণ লইয়া এই বিহারে বাস করেন। বিহার-গৃহটি বেশ বড়, কয়েকটি ঘর যাত্রীদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। ভিক্ষু চন্দ্রমণি পালি ও হিন্দী ভাষায় পণ্ডিত। তাঁহার সঙ্গে কথা বলিলে অনেক নূতন কথা জানা যায়।

মানুষের মন

শ্রীজীবনময় রায়

(৯)
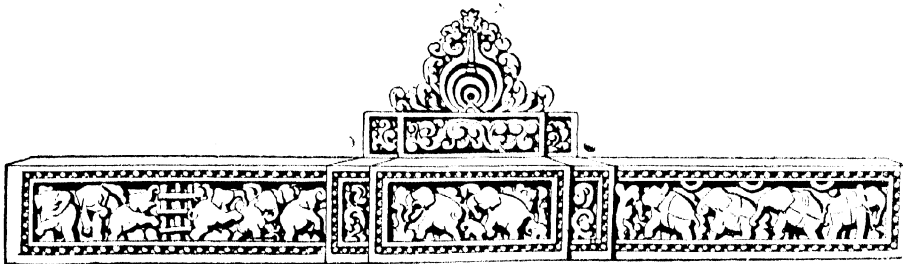
ফেনিসগঞ্জ একটা গ্রাম নয়।

ইমারতের মধ্যে রঙ্গিণী নদীর উত্তর পারে একটা পুরাতন নীলকুঠি, আর তার চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড একটা আমবাগান। তা আমবাগান কি সুন্দরবন এখন বোঝা শক্ত। এই অট্টালিকায় যাবার পথ ঐ বিরাট বনের মধ্যে একেবারে গা-ঢাকা দিয়েছে। দেউড়ির দরজার কতকটা অংশ নিজের বিপুল ভারে ভেঙে পড়েছে এবং চতুর্দ্দিকে বনকুল, নোনা, কাঁটাঝোপে জড়াজড়ি ক'রে নদী থেকে বাড়ি পর্য্যন্ত সমস্তটা একটা ভয়াবহ জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। বাড়ির পূব দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নীলের হাউজ। তার ভিতরেও জঙ্গল গভীর। এতদিনকার, তবু কি আশ্চর্য্য গাঁথুনি এই হাউজের—একখানি ইটও তার খ'সে যায় নি। জায়গায় জায়গায় জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে তার কতক অংশ চোখে পড়ে। চারি দিক এত নির্জ্জন যে খানিক ক্ষণ অপেক্ষা করলে নিজেকে জীবলোকের বাসিন্দা ব'লে মনে হয় না। মাঝে মাঝে বিশালকায় রবার, মেহগনি, সেগুন, শিশু প্রভৃতি গাছে সে বনের ছায়া নিবিড়তর ক'রে তুলেছে।

নদীর ঘাটের কাছে একটা ছোট মোটর-লঞ্চ বাঁধা। সেই লঞ্চে ব'সে ইংরেজবেশধারী একটি বাঙালী ভদ্রলোক, একটি বৃদ্ধা বিধবা ও একটি সুন্দরী কথাবার্ত্তা বলছিলেন।

বৃদ্ধা বল্‌ছেন, "তোর যেমন পছন্দ বাছা, এই বনালা জায়গায় কি মনিষ্যি আসে। বাঘে খেয়ে ফেল্‌বে যে।"

বৃদ্ধা বড় মিথ্যে বলেন নি। শচীন্দ্র ও পার্ব্বতী সকাল বেলা নদীর কিনারা তদারক করতে গিয়ে তার কিছু পরিচয় পেয়ে এসেছিল। নদীর পাড়ে কৃষ্ণচূড়ার গাছটা যেখানে জলের উপর নুয়ে পড়েছে, কোন কালে সেখানে হাউজ পর্য্যন্ত জলসরবরাহের জন্য একটা কাটা খাল ছিল। এখন তার অনেকটা বুজে এসেছে। বর্ষার দিন ছাড়া সে খালে এখন আর জলস্রোত প্রবেশ করে না। সেই খালের মুখে যে বাঘে জল খেতে আসে তার স্পষ্ট প্রমাণ কাদার উপর ছাপার অক্ষরে সে রেখে গেছে।

পার্ব্বতী দেখিয়ে বললে, "মিষ্টার সিংহ, দেখেছেন? এখানকার বাসিন্দা যাঁরা, আর বেশী দূর এগনো তাঁরা ট্রেসপাস ব'লে গণ্য করবেন। শেষে কি মেচিওর করবার আগেই আপনার নারী-কল্যাণের অতবড় আইডিয়াটা বেঘোরে বাঘের মুখে মারা পড়বে?"

শচীন বল্‌লে, "ভয় কি? আমি একলা হ'লেও বা বাঘে সিংহে একটা বোঝাপড়া হ'তে পারত। কিন্তু একেবারে সিংহবাহিনীর সাক্ষাতে এতটা বেয়াদবী করতে বাবাজীর ভরসায় কুলোবে না; কি বল?"

"ইস্ তাই বইকি! একেবারে ল্যাজটি মুখে পূরে গরুড়-পক্ষীটির মত হাতজোড় ক'রে এসে প্রথমে পদচুম্বন করবে এবং পরে বোধ হয় সবিনয়ে মুখচুম্বনের অনুমতি চাইবে? যাই বলুন, আপনার চয়েসের তারিফ করতে হয়। কি চমৎকার জায়গাই বেছেছেন, ভেবেচিন্তে। বাঘের পেটে সব ক'টা মেয়েকে একসঙ্গে যদি না-দিতে পারেন ত সাপের অভাব নেই বোধ হয়। তাও যদি পিতৃপুণ্যে কেউ রক্ষে পায় তো—" এই ব'লে সশব্দে একটা চাপড় মেরে "উঃ, সমস্ত হাত-পা একেবারে ফুলিয়ে দিয়েছে। বাব্‌বাঃ, ম্যালেরিয়ায় নির্ঘাত বাংলার নারীনির্যাতনের সব প্রবলেম—" আবার চপেটাঘাত।

"ইস্ তাই ত! কুইনিন খেয়েছিলে ত সকালে উঠে? ঐটি ভুলো না কিন্তু। আর যাই বল, এমন চমৎকার লোকালয়ের অন্তরালে, নদীর ধারে এমন উপযুক্ত জায়গা আর কোথাও পাবে না—"

"হ্যাঁ, এমন বড় বড় মশা, এমন শ্বাপদসঙ্কুল বিস্তৃত বন-ভূমি, এমন নিবিড় কাঁটাঝোপ,—"

শচীন্দ্র হেসে বল্‌লে, "কাঁটাঝোপই তো; সেই কণ্টক উদ্ধার করবার জন্যেই তো এই আয়োজন।"

"ও, তাই বুঝি কাঁটা তোলবার জন্যে আমাকে এই বাঘ-ভালুকের মুখে এনে—"

"বাঘ-ভালুকরা মানুষের চেয়ে খারাপ নয় গো—তাদের দেখলে চেনা যায়। না, না ঠাট্টা নয়; তুমি দেখে নিও এই জায়গা কি সুন্দর হয়ে ওঠে। কাঁটাঝোপ?—ও আর ক'দিন! জঙ্গল একবার সাফ ক'রতে সুরু হ'লে ক'দিনই বা লাগবে? তখন দেখো। তখন পেছুলে চল্‌বে না। তোমাকেই সব গড়ে তুলতে হবে। ইউরোপে যা-কিছু দেখে বেড়িয়েছ—সবার সেরা—। একেবারে সম্পূর্ণ নারীপ্রতিষ্ঠান—পুরুষের সম্পর্কশূন্য।"

"অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডটি আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে হাল্কা হ'য়ে স'রে পড়তে চান ত!"

"না, না স'রে পড়ার কোন কথাই হ'চ্ছে না। প্রথম দিকে আমরা তোমাদের সব বিষয়েই সাহায্য করব। বাইরের দিক থেকে তোমাদের যাতে কোন অসুবিধে না হয় তা দেখব। তবে সে দেখা দু-এক বছরের বেশী না দেখতে হয় তার চেষ্টা তোমরাও করবে।"

"সেটি হচ্ছে না। যতটুকু সুতো ছাড়ব ততটুকু উড়তে পাবেন। যেই সুতো গোটাব অমনি ফর্‌ফর্‌ ক'রে এসে উপস্থিত হবেন। তা নইলে 'কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মত' জোয়ালটি ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আপনি স'রে পড়বেন, আর আমি ঘানিগাছের চারিদিক বেওজর পাক খেতে থাকব, তা হচ্ছে না মশাই।"

আসলে এই নির্জ্জন বনবাসে আবদ্ধ হয়ে কতকগুলি নির্ব্বোধ অশিক্ষিত অবলার নিয়ত সঙ্গলাভের প্রসঙ্গ পার্ব্বতীর মনে বিশেষ উৎসাহ সঞ্চার করছিল না। শচীন্দ্রের এবং পার্ব্বতীর কর্ম্মপ্রেরণার উৎস এক নয়। শচীন্দ্রের বিরহ-বিধুর চিত্ত তার প্রিয়ার স্মৃতিকে সমুজ্জ্বল ক'রে রাখতে চায়; সুতরাং শচীন্দ্রের প্রেরণা তার অন্তরে। আর পার্ব্বতী? শচীন্দ্র আনন্দলাভ করবে এই জন্যেই তার উৎসাহ, সুতরাং যেখানে শচীন্দ্র অনুপস্থিত সেখানে তার পক্ষে কোন সরসতা নেই।

"আমি ত আছিই। যখনই দরকার সব কাজেই আমাকে পাবে। সব গুছিয়ে দেব। দেখবে তখন।"

গোছানোর কথায় পার্ব্বতী হো হো ক'রে হেসে উঠল। বল্‌লে, "হয়েছে। আপনাকে আর কাজের ফিরিস্তি দিতে হবে না। যা না মুরদ তো আর জান্‌তে আমার বাকী নেই। তবু আপনার অসুখের সময় লণ্ডনে আপনার ঘরে গিয়ে অবস্থাটা যদি না দেখতাম। উঃ, ঘর তো নয়, যেন মোষের বাথান। আমার মত পিট্‌পিটে লোক কেমন ক'রে যে সেই ঘর নিজে হাতে সাফ করেছিলাম তা ভাব্‌তে নিজেই অবাক হয়ে যাই। ভাগ্যিস জরে আপনি বেহুঁস ছিলেন। নইলে সেই দিনই সেই মুহূর্ত্তে বেরিয়ে গিয়ে টেমস্‌ নদীতে গঙ্গাস্নান ক'রে বিদায় নিতাম। আপনার ল্যাণ্ডলেডী বুড়ী বাঙালী ব'লে নেহাৎ কাকুতিমিনতি করেছিল তাই। আর বাবা মারা যাবার পর কত দিন যে ঘর আর অফিস ছাড়া কারুর সঙ্গে তখন মিশতাম না। বোধ হয় অনেক কাল কোন বাঙালীর সঙ্গে কথাই কই নি; তাই বোধ হয় একটু মায়া হয়ে থাকবে মনে মনে—"

শচীন্দ্র কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললে, "সত্যি, কি অসম্ভব কাজ করেছিলে! তুমি না থাকলে তো আমার বাঁচবারই কোন সম্ভাবনা ছিল না। সে রকম—"

পার্ব্বতী বাধা দিয়ে বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, যে দেশে পার্ব্বতী নেই সে দেশে তো বিদেশী ছেলে বাঁচে না?" ব'লে কথাটা উড়িয়ে দেবার অছিলায় সে প্রচুর হাস্‌তে লাগ্‌ল। এ হাসিতে তার লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং বোধ করি দুঃখও ছিল—সে দুঃখ নিজের প্রতি পরিহাসের দুঃখ।

শচীন হাসিতে যোগ না দিয়ে বল্‌তে লাগল—"সে রকম অবস্থায় একটি অসহায় মেয়ে বিদেশে যে কি দুঃসাহসে ভর ক'রে এত বড় একটা ভার মাথা পেতে নিতে পারে আমি ভেবেই পাই নে।"

"দুঃসাহস আবার কি? প্রথমত লণ্ডন আমার বিদেশ নয়। তার পর বাবার মৃত্যুর সময় রোগীচর্য্যা থেকে রোজগার পর্য্যন্ত সবই করতে হ'ত। তা ছাড়া মানুষ দরকারে পড়লে কি যে না পারে তা এখনও বুঝে উঠতে পারি নি। বাবা যখন মারা যান বয়স হিসাবে তখন আমাকে বালিকা বলাও চলে। মাত্র সতের বছর। পেরেছিলাম তো? কি নিদারুণ যন্ত্রণা ছিল তাঁর তা এখন মনে করলেও হৃৎকম্প হয়। তার তুলনায় আপনারটা তো সহজই বলতে হবে। বিশেষত আপনার জ্ঞান ছিল না এবং আমার হাতে অর্থও

ছিল তখন ; তার পর যখন জ্ঞান হ'তে সুরু হ'ল তখন কেমন ক'রে যেন সব সহজ হয়ে এসেছে।" ব'লে চুপ ক'রে লণ্ডনের তখনকার দিনগুলি তার মনের চিত্রপটে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠাতেই বোধ করি, সে মুখ ফিরিয়ে দূরে এক জায়গায় যেখানে নদীটি ঘন বনের অন্তরাল থেকে হঠাৎ বের হয়ে বাঁক ফিরেছে তারই সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল চিক্কণতার দিকে চেয়ে রইল। সেদিনকার কথা তার কাছে এখন স্বপ্নের মত, অথচ কত স্পষ্ট। তার স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নেওয়া গুরুভারের মধ্যে সে কি উন্মাদনা, কি তীব্র উদ্বেগ, তবু তার মধ্যে কত মাধুর্য্য, চিত্তের স্ফুটনোন্মুখ ভাবগুলির কি তীব্রমধুর মন্থন! আর আজ! জীবনের সেই রসবন্যায় আজ নৈরাশ্যের ভাটার টান ধরেছে। আজ তার জীবন সমস্ত আনন্দময় পরিণতির আশীর্ব্বাদ থেকে বঞ্চিত। অন্তরে অন্তরে অবসাদের ক্লেদ জমা হয়ে উঠেছে। নৌকায় আজ পালের বাতাসের দাক্ষিণ্য নেই, স্রোতের আনুকূল্য নেই ; যে তরণী সে বেয়ে চলেছে তার সঙ্গে তার যোগ বিচ্ছিন্ন ; সে তাকে ব'য়ে চলে না, টেনে নিয়ে তাকে জীবনপথে অগ্রসর হ'তে হয় শুধু গুণ দিয়ে। তবু তো এই যোগটুকুর মায়া সে কাটাতে পারে নি।

তাকে চুপ ক'রে গম্ভীর হ'য়ে থাক্‌তে দেখে শচীন্দ্র তার মনের চিন্তার গতি কল্পনা করবার চেষ্টা করতে লাগল। পার্ব্বতীর মনের কথা তার কাছে নিতান্ত অগোচর ছিল না এবং তার মনের এই মেঘটুকু কাটিয়ে দেবার জন্যে অত্যন্ত সহজ সুরে হালকা হাসির হাওয়ায় সেই প্রসঙ্গ উড়িয়ে দেবার জন্যে বললে, "করুণার তাড়নায় বুঝি আমার যা-কিছু কাগজ-পত্র, কাপড়, গেঞ্জি মায় নতুন পোষাকটা পর্য্যন্ত ঝেঁটিয়ে বের ক'রে দিলে? মনে আছে, যখন প্রথম জ্ঞান হ'ল তখন কি রকম অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম তোমায় দেখে?"

এ সব কথা শচীন্দ্র পূর্ব্বেও আলোচনা করেছে; তবু পার্ব্বতীর প্রতি তার স্নেহ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ অবনত চিত্ত এই আলোচনা-প্রসঙ্গে তার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যেন তৃপ্ত হ'ত না। এবং পার্ব্বতীর সঙ্গে তার যে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার একটি নিবিড় সম্পর্ক প্রকাশ পেত, এই সূত্রে বঞ্চিত-বিধুর-চিত্ত পার্ব্বতীও সেই পরম রমণীয় রসমাধুর্য্যটুকু থেকে আপনার প্রেমোন্মুখ ব্যথিত হৃদয়কে বঞ্চিত করতে পারত না। বিদেশে রোগশয্যায় শচীন্দ্রের কাছে সমস্ত জগতের মধ্যে যখন সে একমাত্র, তখনকার পরমানন্দময় দুঃখের বিচিত্র ছবি তার প্রেমাস্পদের চিত্তে প্রত্যক্ষ ক'রে তুলে তাদের জীবনে তাদের দু-জনের নিবিড় নিঃসঙ্গ আত্মীয়তাটুকু মনে মনে উপভোগ করায় সে যেন এক রকম নিরুপায়ের পরিতৃপ্তি এবং সুখ লাভ করত।

শচীন্দ্রের প্রচেষ্টাটুকু পার্ব্বতীর বুঝতে বাকী রইল না এবং সলজ্জ প্রয়াসে নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে একটু হেসে বললে—"আছে।"

শচীন্দ্র যে সর্ব্বপ্রথম কথাই বলেছিল 'খোকা কোথায়' একথা দু-জনেরই মনে পড়ল। কিন্তু শচীন্দ্রের জীবনে তার মর্ম্মান্তিক বেদনার কথাটিকে তারা দু-জনেই এড়িয়ে গেল।

শচীন বললে, "ভারি মুস্কিলে প'ড়ে গিয়েছিলে না?"

"মুস্কিল না? আপনি কত প্রশ্নই যে করেছিলেন। একটারও ত উত্তর দেবার পুঁজি ছিল না। কত বানান যায় বলুন ত?"

"তার পর?"

"তার পর দু-তিন দিন আবার একটু নির্ব্বিঘ্নে কাট্‌ল—বোধ হয় কথা বল্‌বার ক্ষমতা বেশী ছিল না ; কিংবা মাথাটাই পরিষ্কার হয় নি তখনও। তার পর একদিন সকাল বেলা মুখ ধোয়াতে গিয়ে দেখি আপনি ওঠবার চেষ্টা করছেন। তাড়াতাড়ি ধ'রে শুইয়ে দিলুম। অনেক ক্ষণ আমায় চেন্‌বার চেষ্টা ক'রে বল্‌লেন, "তুমি কে?" মহা ফ্যাসাদে পড়লুম। নতুন যে বাসাটাতে আপনাকে এম্বুলেন্স ডেকে উঠিয়ে এনেছিলুম, জানেন তো? সেখানে মিষ্টার এবং মিসেস্ সিনহা বলেই পরিচয় দিয়েছিলাম।"

"জানি, নইলে বোধ হয় সে ল্যাণ্ডলেডী জায়গাই দিত না।"

"হ্যাঁ; কারণ একদিন গল্প করতে করতে বল্‌ছিল যে বিয়ে করবে ব'লে বেশী ভাড়া আগাম দিয়ে একটা ছোকরা আর একটা মেয়ে এসে উঠেছিল। তার পরে তাদের নিয়ে পুলিসের হাঙ্গামে পড়তে হয়। বল্‌ছিল 'অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষকে আমরা সেই থেকে ভাড়া দেওয়া একেবারে বন্ধ ক'রে দিয়েছি'।"

"বটে? তাই নাকি? তার পর?"

"একবার ভাবলুম আমাদেরই সন্দেহ করছে বুঝি। তার পরে দেখলুম না, তা নয়। হিন্দুদের ওসব সন্দেহ তারা বড়-একটা করে না। বল্‌ছিল 'তোমাদের মত সকাল-সকাল বিয়ে হয়ে যাওয়াই ভাল। ওতে অন্ততঃ সামাজিক দুর্নীতি অতটা প্রশ্রয় পায় না'।"

"উঃ কি দুঃসাহস তোমার! যদি ধরা পড়তে? কি ভয়ানক উদ্বেগের মধ্যেই না তোমাকে দিন কাটাতে হয়েছে!"

"হ্যাঁ, উদ্বেগ ছিল বটে, তবে ধরা পড়ার নয়। ডাক্তার আপনার প্রাণের আশঙ্কা করছিল।" ব'লে সে চুপ ক'রে তার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে অতীতের স্মৃতির মধ্যে নিয়ে গেল এবং গভীর কৃতজ্ঞতায় শচীন্দ্রনাথ নিঃশব্দে পার্ব্বতীর একটা হাত নিজের দুটো হাতের মধ্যে সস্নেহে তুলে নিলে। এই সমাদরটুকুর স্নেহরসে পরিতৃপ্ত হয়ে পার্ব্বতী একটু হেসে বললে, "ধরা ত পড়ি নি। সে যাই হোক্‌, এদিকে বুড়ীকে এক রকম চোখঠার দিয়েছিলুম কিন্তু আপনাকে কি বলি? বললুম তোমার দিদি।" চোখ মুখ কুঁচকে আপনি গেঙিয়ে গেঙিয়ে বললেন, 'ননসেন্স, ইউ লুক্‌ ইয়ং এনাফ টু বি মাই ডটর' ভাবলুম, উঃ ছেলেগুলো কি জ্যাঠা, মরতে বসেও পাকামো ছাড়ে না। কিন্তু, ঐ দেখুন আপনার পেয়াদা এসে হাজির হয়েছে।"

বল্‌তে বল্‌তে একটি দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ বৃদ্ধ এসে উপস্থিত হ'ল।

শচীন্দ্র বললে, "কি ভোলাদা?"

"পিসীমা পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, বেলা হ'য়ে গেছে, রান্না জুড়িয়ে যাচ্ছে, চান-টান..."

"আচ্ছা আচ্ছা যাচ্ছি—যাও দশ মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি, পিসীমাকে গিয়ে বল।"

ভোলানাথ চ'লে যাওয়ার পর পার্ব্বতী বল্‌লে, "শচীন বাবু আপনার এই লোকটিকে কিন্তু আমি চাই। আপনার নারীকল্যাণকে আপনি যে রকম বনবাস দেবার ব্যবস্থা করছেন তাতে এমনি একটি 'লক্ষ্মণ-প্রহরী'র নিতান্তই প্রয়োজন। কি আশ্চর্য্য দেহের বাঁধন এই বয়সে; কোথাও যেন টোল খায় নি। পাকা চুল যেন ওর মাথায় পরচুলার মত মনে হয়। ভারী ভাল লেগেছে ওকে আমার।"

শচীন বললে, "সত্যিই চমৎকার শরীর। আমাদের ও তল্লাটে ওর চেয়ে ভাল লাঠিয়াল আর তীরন্দাজ এখনও নেই; কিন্তু সব চেয়ে চমৎকার ওর লয়্যালটি; কি ভালই বাসে। আমাকে মানুষ করেছিল ছেলেবেলায়, আমার বাবাকেও করেছিল বল্‌তে পারি। কিন্তু পুরনো চাকরবাকর যেমন বেয়াড়াপনা করে, মনিবদের উপর আবদার করে, এডভ্যানটেজ নেবার চেষ্টা করে, ও কখনও তা করে নি। এক বিলেতে যখন ছিলুম তখন ছাড়া ও কখনও আমার কাছ-ছাড়া হয়েছে ব'লেও আমার মনে পড়ে না।"

"সত্যি খুব আশ্চর্য্য। আপনার কপাল ভাল বল্‌তে হবে। ওকে পেলেন কোথায় বলুন তো?"

"ওর বাবা ছিল আমার ঠাকুরদার খাস খানসামা। খুব ছেলেবেলায় তাকে দেখেছি। এখনও মনে পড়ে, সোনার বোতাম দেওয়া ধবধবে সাদা চাপকান পরা, তকমা-আঁটা তার দীর্ঘ মূর্ত্তিখানা ছেলেবেলায় আমার খুব একটা আকর্ষণের বস্তু ছিল। মনে আছে চাকর ব'লে কখনও তাকে হেনস্থা করবার সাধ্য আমাদের ছিল না। ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে সেবকের চেয়েও বন্ধুর সম্পর্কই যেন বেশী ছিল। ভোলাদাই তার একমাত্র সন্তান। শুনেছি ছেলেবেলায় ভারী ডানপিটে ছিল ও। বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া ছেলেবেলায় ওর প্রায় একটা রোগের মত ছিল। বারো-তেরো বছর বয়সের সময় থেকে সে পালাতে সুরু করে। শিকারের ভীষণ নেশা ছিল ব'লে শিকারের দলে জুটে পড়বার সুযোগ পেলেই সে পালাত। শুনেছি ঐটুকু বয়সেই তার অসাধারণ সাহস আর ক্ষিপ্রতার জন্যে ঐসব দলে তার খাতিরও কম ছিল না। আশ্চর্য্য হাত ছিল ওর তীর-ছোঁড়ায়! বুড়ো বয়সে, যখন এক রকম সব ছেড়েই দিয়েছে,—তখনও দেখেছি পশ্চিমের বাগানে উঁচু বোম্বাইগাছের অগম্য শাখা থেকে আম পেড়ে দিতে।"

"এখনও পারে?"

পার্ব্বতী স্থান কাল ভুলে গিয়ে একেবারে শিশুর মত কৌতূহলে তার গল্প শুনছিল। বাংলা দেশটার লোক যে নিতান্ত ভীরু দুর্ব্বল এই ধারণাই তার বাবার কাছ থেকে তার মনে বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছিল। তাই আজ ভোলানাথের কৃতিত্বের কাহিনী তার কাছে রূপকথার মত চিত্তাকর্ষক

হ'য়ে উঠেছে। ছেলেমানুষের মত আগ্রহের সুরে সে জিজ্ঞেস করলে, "এখনও পারে তেম্‌নি তীর ছুঁড়তে ?"

তার এই শিশুর মত আগ্রহে শচীন্দ্র যেন গল্প-বলার পুরস্কার লাভ ক'রে মৃদু হেসে বল্‌লে, "অনেক দিন তো দেখি নি ওসব করতে। ওড়া পাখী পর্য্যন্ত অনায়াসে মারতে পারত শুনেছি। শুনেছি কেন, একবার দেখেওছি।"

"ওড়া পাখী তীর দিয়ে মারতে!"

"হ্যাঁ; বল্‌ছি। ভারি একটা করুণ ব্যাপার ঘটেছিল একদিন। ভোলাদার পাখী-শিকারের গল্প শুনে অবধি তার হাতের তাক দেখবার জন্যে মনে আর স্বস্তি ছিল না। গেলাম পিছনে লেগে ঘ্যান ঘ্যান ক'রে, 'ভোলাদা ওড়াপাখী মেরে দেখাও।' আমার মা ওসব ভালবাসতেন না। তাঁর কাছে ভোলাদা পাখী মারবে না ব'লে প্রতিজ্ঞাই করেছিল এক রকম। টের পেলেই তিনি আমাকে তিরস্কার করতেন, বোঝাতেন, অন্য শিশুলোভন বস্তু দিয়ে প্রলুব্ধ করতেন। তখনকার মত আমি ভুলে যেতাম বটে কিন্তু আবার ফাঁক পেলেই সেই 'ওড়া পাখী শিকারে'র গোপন তাড়নায় ভোলাদার জীবন বোধ হয় সে কয়দিন একেবারে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিলাম। মা আমাকে নানা উপায়ে এই দুষ্কার্য্য থেকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু সব পারা যায়, খেয়ালী শিশুর খেয়ালকে ভোলানোর চেষ্টা বৃথা। ভোলাদাকে একলা পেলেই ঐ আব্দার ছাড়া যেন আমার আর কোন কাজ ছিল না। কি যেন একটা কৌতুকময় রহস্য থেকে আমায় ভুলিয়ে রাখা হয়েছে; বিশেষ ক'রে নিষেধ করাতেই তার প্রতি আমার কৌতূহল বোধ হয় বেড়ে উঠেছিল। ভোলাদা অনেক ক'রে আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করত। প্রথমে বল্‌ত যে ওড়া পাখী সে মারতেই পারে না। কিন্তু বাবার কাছ থেকে যে ছেলে তার বিদ্যা সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করেছে তাকে এমন কথা বল্‌তে যাওয়া নির্ব্বুদ্ধিতা। তার পর সে বল্‌লে, পাখীকে মারলে তার দাদু কাঁদবে, বাবা কাঁদবে, মা কাঁদবে, তখন কি হবে ?"

"এই কথায় খোকাবাবু বুঝি একেবারে কাবু ?"

"না। কিছুদিন এ কথাটায় কিঞ্চিৎ ফল হ'ল বটে, কিন্তু সেও অল্পদিন। একদিন বিশেষ সন্দিহান হ'য়ে একেবারে বাবাকে গিয়ে সোজা প্রশ্ন করলাম, 'বাবা পাখীকে মারলে পাখীর দাদু কাঁদবে, বাবা কাঁদবে ?' বাবা নিজে ছিলেন শিকারী। সুকুমার মনোবৃত্তি তাঁর মনে বড়-একটা ঠাঁই পেত না। এই প্রশ্নে তিনি উচ্চরোলে হেসে উঠে বল্‌লেন, 'পাখীর শাশুড়ী বড্ড কান্নাকাটি করবে যে রে—কে বললে তোমাকে দাদু কাঁদবে, খোকা ?' ভারি লজ্জা পেলাম; ভারী রাগ হ'ল ভোলাদার উপর। এবার সে আমাকে আর ঠেকাতে পারল না। একদিন সকালবেলা একটা উড়ন্ত ঘুঘুর উপর তার বিদ্যার পরখ হ'ল। তার পরের ব্যাপারটি অতি করুণ। ঘুঘুনীর আর্ত্ত চীৎকারে সমস্ত আকাশ উতলা হ'য়ে উঠল। সে মৃত ঘুঘুটির চারিদিকে উড়ে উড়ে তার বুকের অসহ্য বেদনায় স্নিগ্ধ প্রভাতের অরুণালোককে যেন ব্যথায় পাণ্ডুর ক'রে তুল্‌লে। ভোলাদা ছুটে গিয়ে রক্তাক্ত পাখীটিকে দুই হাতে তুলে নিলে; সে যেন কেমন বিহ্বল হয়ে গেল। আমারও ভারী কান্না পেতে লাগল। এর পর বহুদিন ভোলাদা তীর ধনুক স্পর্শ করে নি। কিন্তু সে যাই হোক্, আমি ভাবি ভোলাদা সেদিন ইচ্ছে ক'রে কেন নিশানা ভুল করলে না ? কেন সে একটা ছোট ছেলের অন্যায় আবদারে কান দিলে ? কেন সে আমাকে ধমকে নিয়ে আমার মা'র দরবারে সমর্পণ করলে না ?' ব'লে সে খানিক ক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, "পাখীটা মুহূর্ত্তের মধ্যেই উড়ে চলে যাবে এই কথা মনে হ'লে শিকারী কি আর হাত সাম্‌লাতে পারে ? ও অবস্থায় ভেবেচিন্তে কিছু আর সংযত হওয়া চলে না।"

পার্ব্বতীর মনের মধ্যে একটা পরিহাস এবং বেদনায় মেশানো রহস্যময় সুরের যেন আবৃত্তি চল্‌তে লাগল, "উড়ে যেতে পারে না যে পাখী তার বেলায় শিকারীদের অন্য আচরণ, না ?" কিন্তু মুখ ফুটে সে কোন কথা বল্‌লে না।

এমন সময় ভোলানাথ দ্বিতীয় বার তাদের স্নানাহার করবার তাগিদ নিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল। শচীন্দ্র তার ডাকের উত্তরে "এই যে যাই ভোলাদা" ব'লে পার্ব্বতীকে বল্‌লে, "দেখেছ, গল্পে গল্পে খাবার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, চল শীগ্‌গির, নইলে পিসীমা আবার আমাদের না-খাইয়ে স্নান করবেন না, জান ত ?"

"হ্যাঁ, চলুন," ব'লে পার্ব্বতী চল্‌তে চল্‌তে নিজের মনটাকে ঝাড়া দিয়ে চাঙ্গা ক'রে নিল। এবং কতকটা

প্রতিক্রিয়া স্বরূপই বোধ হয় প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললে, "কি আশ্চর্য্য আপনার এই ভোলাদা। যতই ওকে দেখছি আর ওর কথা শুনছি, আমার মনে হ'চ্ছে যেন ও সেই নাইটদের যুগ থেকে এ যুগে হঠাৎ কেমন ক'রে খসে পড়েছে। আচ্ছা, সেদিনও তো ভোলাদাই আপনাদের সঙ্গে ছিল, না?"

"কোন দিন?"

পার্ব্বতী অনবধানে এলাহাবাদে কুম্ভমেলার ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হঠাৎ সচেতন হ'য়ে থেমে গেল এবং মনে মনে নিজের অন্যমনস্কতাকে প্রগল্‌ভতা মনে ক'রে একটু লজ্জিত হ'য়ে চুপ করলে। শচীন্দ্রও প্রশ্ন করেই বুঝেছিল পার্ব্বতী কোন্ দুর্দ্দিনের কথা নি'য়ে প্রশ্ন করতে গিয়ে চুপ ক'রে গেল। সেও আর দ্বিতীয় বার প্রশ্ন না ক'রে চুপ করেই রইল। তার মনের মধ্যে সেইদিনকার সব ছবি সুস্পষ্ট হ'য়ে ভেসে উঠল—এবং একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস তার বুক ভেঙে বেরিয়ে এল। কমলের স্মৃতি তার কাছে এখন একটা গভীর বিষাদপূর্ণ অভাবের দুঃখ, কিন্তু তার পুত্রের অভাব তার মনের মধ্যে তীব্র স্পর্শযোগ্য প্রত্যক্ষ বেদনার মত। এই জন্যই বোধ করি তার অবসর সময়ে কমলের চিন্তাকে যদিই বা সে মনের মধ্যে আলোচনা করত অনুপস্থিত কমলের সাহচর্য্যের মত; কিন্তু খোকার কথাকে সে মনের মধ্যে আমল দিতে প্রস্তুত ছিল না।

নিজের নিজের স্বপ্নে আচ্ছন্ন হ'য়ে নিঃশব্দে দু-জনে বোটে ফিরে গেল।

(১০)

দুপুরে খেয়েদেয়ে পার্ব্বতী বললে, "চলুন, শচীন বাবু জলি-বোটটা নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি। পিসীমাকে তো আর ডাঙায় নামানো যাবে না। এই লঞ্চের কোটরে ব'সে ব'সে তাঁর বোধ হয় কোমরে বাত ধ'রে গেল। চলুন একটু বেয়ে ঐ চড়াটায় যাওয়া যাক্। চষা ক্ষেতটেত দেখলে তিনিও একটু ধাতে আসবেন। ভারী চমৎকার লাগছে জায়গাটা আমার। সমস্ত দিন কিছুতেই এই ইঁদুরের গর্ত্তে ব'সে থাকতে পারব না।"

শচীন বললে, "আচ্ছা বেশ ত; মাল্লারা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিক্। আমি ততক্ষণ ভোলাদা আর বাহাদুর সিংকে নিয়ে বাড়ি আর জমিটা একটু তদারক ক'রে আসি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসব, তোমরা প্রস্তুত থেকো।"

"বেশ ত লোক। আমি হাঁ ক'রে ঘণ্টাখানেক এখানে ব'সে পানকৌড়িদের ডুবসাঁতার দেখব, না? সেটি হচ্ছে না। আমি হ'লাম নারী-প্রতিষ্ঠানের প্র-নেত্রী, আর আমি থাকব পিছনে পড়ে? যেতে হয় আমিও যাব। আমার ভবিষ্যৎ আস্তানা আমায় দেখে-শুনে নিতে হবে না?"

শচীন একটু মুস্কিলে পড়লো। নদীর ধারে ধারে সকালে তারা যেটুকু বেড়িয়ে এসেছিল তার মধ্যে বিপদের আশঙ্কা বড়-একটা ছিল না। কিন্তু এই নিশ্চিত অজ্ঞাত বিপদের মধ্যে বিশেষ আপত্তি ছিল। বাঘের পায়ের যে দাগ তারা খালের ধারে দেখেছিল, তা মোটেই পুরনো নয়। তা ছাড়া এই এত কালের পোড়ো বাড়ির মধ্যে কোন্ দিক দিয়ে যে কি বিপদ কখন হ'তে পারে তা বলা শক্ত। তারা নিজেরা ত পোষাক-টোষাক প'রে, চামড়ার পটি পায়ে বেঁধে, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এক রকম ক'রে নিজেদের রক্ষার উপায় করেই যাবে। কিন্তু এই শ্বাপদসঙ্কুল বনপথের ভিতর দিয়ে, অসংখ্য অজ্ঞাত বিপদের মধ্যে ঐ বাড়িতে একটি মেয়েকে সঙ্গে ক'রে যাওয়া হতেই পারে না। সে এক রকম বিব্রত হয়েই বলে উঠল, "না, না, তোমাকে নিয়ে ওখানে যাওয়া যাবে না। ভারি মুস্কিলে পড়া যাবে শেষকালে। কত রকম বিপদ হ'তে পারে কিছু বলা যায় না। তুমি থাক, আমরা খুব শীগ্‌গির ফিরে আসব।" তার পর পার্ব্বতীর মুখ ভার দেখে বললে, "লক্ষ্মীটি, অবুঝ হয়ো না; বুঝতেই ত পার—"

পার্ব্বতী কোন কথা না ব'লে নদীর অন্য পারের ধূ-ধূ-করা চরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইল। সে বুঝেই চুপ করলে, না, অভিমানে মন ভার ক'রে রইল, তা বোঝা গেল না।

মনিব এবং অনুচরদ্বয় রীতিমত পোষাক ক'রে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লঞ্চ থেকে নেমে গেল। যাবার সময় শচীন আবার পার্ব্বতীকে একটু অনুনয়ের সুরেই বললে, "রাগ ক'রো না লক্ষ্মীটি, ভারী বিশ্রী জায়গা। নইলে নিশ্চয়ই তোমায় সঙ্গে নিতাম।"

পার্ব্বতী বল্লে, "যান না, আমি ত আপনাকে বারণ করি নি।" ব'লে বোটের কামরায় চলে গেল। মিছে শুধু কথা-কাটাকাটি ক'রে ফল নেই দেখে শচীনও প্রস্তুত হ'য়ে অনুচর দু-জন নিয়ে বেরিয়ে প'ড়ল।

নদীর ঘাট থেকে একটা ঢালু জমি বেয়ে অনেকখানি উপরে উঠতে হয়। বর্ষার জল নিশ্চয় দুর্দ্দম স্রোতে সেই পথে নামে। কারণ স্রোতে ক্ষয়ে যাওয়ায় গভীর খাদে এব্ড়ো-খেবড়ো পথ প্রায় লোকচলাচলের অযোগ্য হ'য়ে ছিল। বহু কষ্টে সেইটুকু পার হ'য়ে তারা কুঠির সামনের বিস্তৃত জমিতে এসে উঠল একটা বিরাট বটগাছের তলায়। এই বটগাছের তলার জমিটুকুই যা একটু পরিষ্কার। তার পরই জঙ্গল, মনে হয় বাড়ির ভিতর পর্য্যন্ত।

গাছের পাতায় প্রচ্ছন্ন ছোট ছোট পাখীর কূজনে সমস্ত প্রদেশটির জনহীনতা যেন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। এই কালো পুরু মখমলের মত স্তব্ধ অন্ধকারে ছোট পাখীদের এই মৃদু কিচমিচ রূপালী শব্দে যেন ধ্বনির চুম্কি বসানো চলেছে। বাড়ির দোতলার প্রায় সমস্তটাই এখান থেকে চোখে পড়ে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দরজা, তাদের সমস্ত খড়খড়িগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ ক'রে কি যেন একটা গভীর রহস্যের ইতিহাসকে মানুষের কৌতূহলের প্রগল্‌ভতা থেকে গোপনে রক্ষা করছে।

শচীন্দ্র খানিক ক্ষণ এদিক-ওদিক দেখে বললে, "ভোলাদা, দেখ তো ঘাট-পর্য্যন্ত নিশ্চয় কোন বাঁধানো পথ ছিল, একটু খুঁজলেই পাওয়া যাবে।" এই ব'লে সে নিজেই প্রথম এগিয়ে গেল পথের সন্ধানে। বড় বড় বটের ঝুরি নেমে জায়গাটা প্রায় অন্ধকার ক'রে রেখেছে। উপর দিকে চাইলে চাপ চাপ অন্ধকারের অবকাশপথে সামান্য সামান্য আকাশের টুক্‌রো দেখা যায় মাত্র। সেই অবকাশপথ বেয়ে যে আলোটুকু নামে, তাতেই দুপুরবেলা গাছের তলার অন্ধকারটা অনেকখানি স্বচ্ছ দেখায়। তবু গাছের গুঁড়ির আশপাশের অন্ধকারগুলো যেন সব কিম্ভূত মূর্ত্তি ধ'রে গুঁড়ি মেরে সুযোগের প্রতীক্ষায় নির্ব্বাক নিশ্চল হ'য়ে আছে। নিঃশব্দে তারা চলেছে। শচীন্দ্র, ভোলানাথ, বাহাদুর সিং। ওর জুতোর আওয়াজটাও এই গাছের তলার ভিজে অন্ধকারে বেসুর কর্কশ শোনাচ্ছে। মনে হয় স্তব্ধতার ছানারা এই হঠকারীদের স্পর্দ্ধায় চকিত হ'য়ে অন্ধকার কোটর থেকে যেন উঁকি মেরে পরস্পর চোখঠারাঠারি করছে আর বিরূপ বিস্ময়ে একেবারে নির্ব্বাক হ'য়ে গেছে।

হঠাৎ ভোলানাথ বজ্রকণ্ঠে সমস্ত আতঙ্কের রাজ্যকে উচ্চকিত ক'রে ধম্‌কে উঠলো, "এই বেটা হনুমান!" শচীন্দ্র চমকে পিছন ফিরে যা দেখল তাতে সে হাসবে না কাঁদবে ঠাওর করতে পারল না। ভোলানাথের মত শিকারের অভিজ্ঞতা না থাকলে সেদিন যে একটা কাণ্ডই ঘটত একথা এক রকম জোর ক'রেই বলা যায়।

গাছের গুঁড়ির কাছে অন্ধকারটা যেখানে একটু গাঢ়, তার নীচে একটু লক্ষ্য করলে একটা লোহার বেঞ্চি দেখা যায়। কতকাল আগে কুঠির সাহেবরা নদীর হাওয়া খাবার জন্য বেঞ্চিটা গাছতলায় পেতেছিল তার ঠিক নেই। বটের জটগুলি তখনও এই লৌহাসনকে স্পর্শও ক'রে নি। তার পর এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে ধীরে ধীরে এই সর্পিল শিশুজটগুলি কখন অতবড় লোহার আসনটিকে প্রায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ক'রে এনেছে, তা কেউ দেখেও নি। অবশেষে বহুদিন পরে একটি বৃহৎ অজগর তার সন্তানসন্ততি নিয়ে সেই বটজটাচ্ছন্ন কোটরে পরম নিশ্চিন্তে বসবাস ক'রে বহু জটাজটিল সেই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষটিকে তার আহার ও বিহার ভূমিরূপে পরিণত ক'রে তুললে। এই লৌহ-কোটরের একটি ছিদ্রপথে অজগর-মাতার কোন একটি চঞ্চল শিশু তার লীলায়িত পুচ্ছটিকে বোধ করি বায়ু সেবনেরই উদ্দেশ্যে বাইরে প্রসারিত ক'রে দিয়ে থাক্‌বে। বাহাদুর সিংএর রেখামাত্র নয়নপথে এই দৃশ্যটি গোচর হবামাত্র তার চিত্তে রসিকতা-প্রবৃত্তি একটু প্রবল হ'য়ে উঠল। এবং কোমর থেকে কুক্‌রীটি বার ক'রে সে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেই বেঞ্চটির দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল। মৎলব, সেই শিশু অজগরের দুঃশাসিত পুচ্ছটিকে কিঞ্চিৎ সংযত করা।

রাহুল সাংকৃত্যায়নের ভ্রমণ-চিত্রাবলী

[২৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

কার্লে চৈত্য, পুনা : খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী

অজণ্টা, উনিশ নং গুহা

শিবের তাণ্ডব নৃত্য, এলোরা

কৈলাস, এলোরা

অজণ্টা, ১ নং গুহা
[সৈয়দ আহমদ কর্তৃক অনুকৃত চিত্র হইতে]

দৌলতাবাদ, দুর্গপ্রাকার ও চাঁদ মিনার
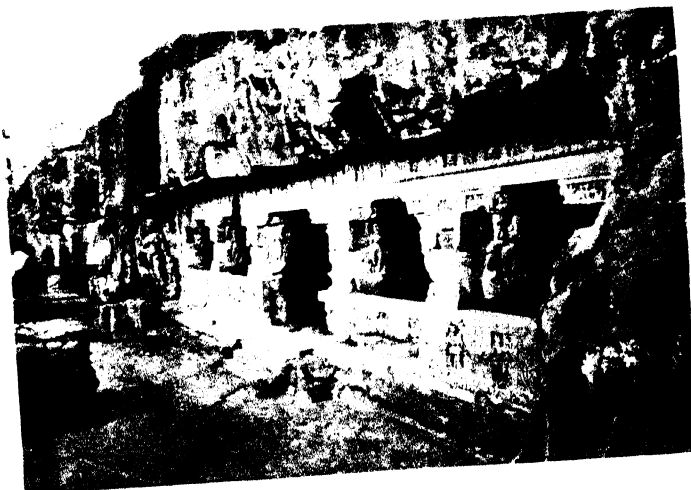
এলোরা, রামেশ্বর
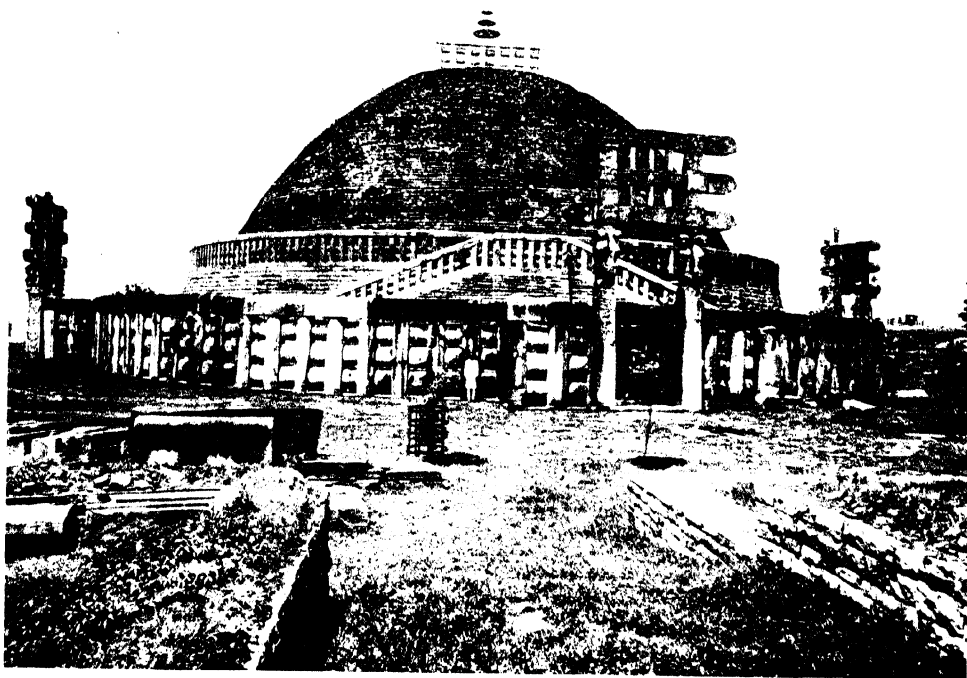
সাঁচী বৌদ্ধ স্তূপ

কৌশাম্বীর প্রাচীন স্তম্ভ

শিব-পার্ব্বতী, কৌশাম্বী
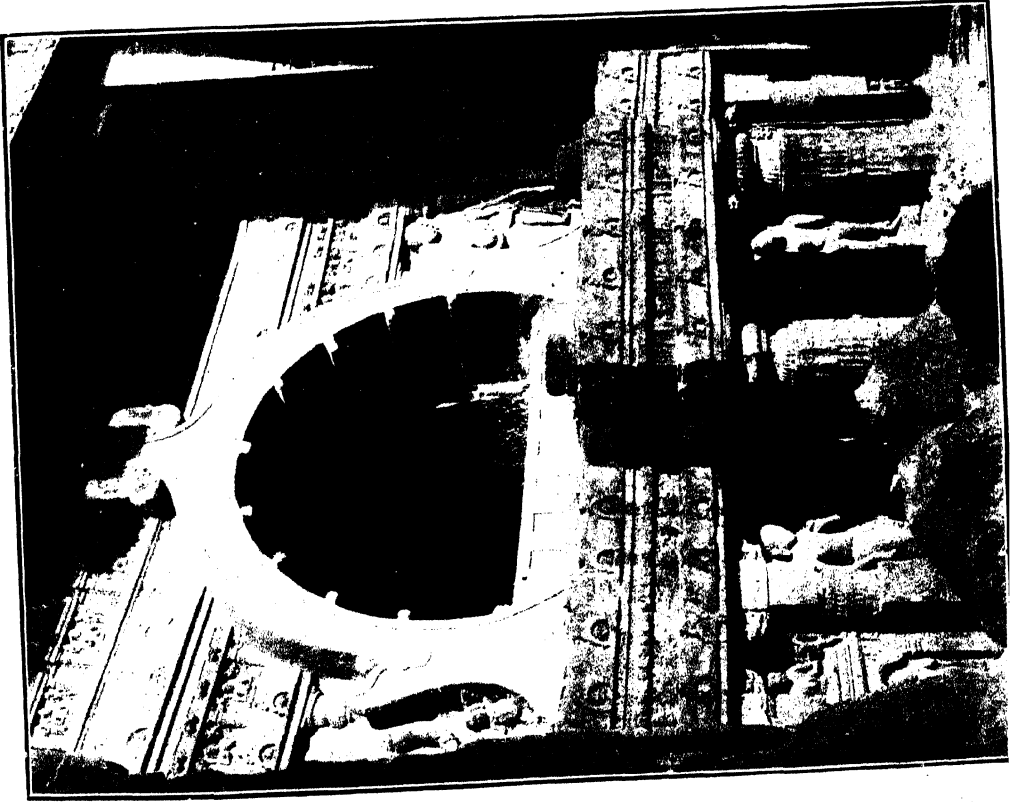
জাপানের আধুনিক ছায়াচিত্র

আধুনিক কালে জাপানে যে-সব লোকপ্রিয় ছায়াচিত্র প্রস্তুত হইতেছে তাহার অধিকাংশই জাপানের মধ্যযুগের বীরত্ব ও প্রেমকাহিনী লইয়া। এইরূপ একটি চিত্রের দুইটি দৃশ্য এখানে মুদ্রিত হইল। এইরূপ ছবি অনেক সময়ই জাপানের সৌন্দর্যময় প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে গৃহীত হয়; উপরের তরুণ সামুরাই ও কুমারীর চিত্রটি তাহার একটি নিদর্শন। নীচের ছবিটিতে জাপানের মধ্যযুগের জনৈক অভিজাতবংশীয় ব্যক্তি ও রাজকুমারীর প্রণয়কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

মজাটা যে কি অপরূপ হবে এই চিন্তা ক'রেই তার মণ্ডলাকার বদনপিণ্ড উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল।

পিছনে পায়ের শব্দ হঠাৎ থেমে যাওয়ায় ভোলানাথ পিছন ফিরতেই দৃশ্যটি তার চোখে পড়ল, এবং ব্যাপারটি বুঝে নিতে তার মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব হ'ল না। সর্ব্বনাশ ঘটতে আর বড় বেশী দেরি ছিল না। অজগরশিশু আহত হ'লে তার মায়ের দুঃসহ ক্রোধ যে কোন্ শাখাপত্রাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের গর্ভ হ'তে অকস্মাৎ আক্রমণে বজ্রের মত তাদের উপর এসে পড়বে তা বলা কারও সাধ্য নয়। সুতরাং ভোলানাথ আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করলে না। সাপের মত নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে গিয়ে বজ্রমুষ্টিতে একহাতে সিংজীর গ্রীবা এবং অন্য হাতে কুক্‌রীসুদ্ধ তার ডান হাতখানা চেপে ধরে প্রায় মাটি থেকে তাকে শূন্যে তুলে, ঝাঁকি দিয়ে গর্জ্জন ক'রে উঠল, "ব্যাটা হনুমান, নিজে মরবি, আর সকলকে মারবি? রসিকতার আর জায়গা পান্ নি? যমের বাড়ি যাবার আর পথ পায় নি! পাঠাচ্ছি একেবারে সিধে পথে। ব্যাটা মর্কট।"

ভোলানাথের ঝাঁকুনি খেয়ে তখন গুর্খাপুঙ্গবের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জো হয়েছে।

(১১)

শচীন্দ্রনাথ ব্যাপারখানা ঠিক ঠাহর করতে পারে নি। একটু অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস ক'রলে, "কি ভোলাদা, ব্যাপার কি?"

ভোলানাথ বললে, "ব্যাটাকে আজ যমে ধরেছে বাবু—"

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে শচীন্দ্র রহস্য ক'রে বললে, "তা তো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু হ'ল কি? ওর অপরাধটা কি হ'ল?"

"অপরাধ! ব্যাটা মরবার রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে। তা মরবি ত ব্যাটা নিজে মর; আমাদের সুদ্ধু শেষ ক'রেছিল আর কি। ঐ বেরৎ সাপের খপ্পরে পড়লে কি আর কারও রক্ষে ছিল? চল ব্যাটা তোকে বেঁধে রেখে আসি বেঞ্চিটার পায়ায়। সাপের ল্যাজে বাড়ি দেবার সাধ মিটবে'খন।" ব'লে আর এক ঝাঁকি দিল তার ঘাড় ধ'রে।

তখনও শচীন্দ্র ব্যাপারটা ঠিক আঁচ করতে না পেরে ব্যস্ত হ'য়ে বললে, "আরে, কর কি ভোলাদা, ছাড়, ছাড়; পাহাড়ে লোক; তায় নতুন মানুষ, ওর কি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান আছে? গোখরো সাপ বুঝি?"

"না বাবু, অজগরের ছাঁ। ঐ খেনে ঐ ঝোপে অজগরের বাসা আছে। সোঁদর বনে আমি অমন আরও দেখেছি। ভয়ানক জানোয়ার; বাঘে পার পায় না বাবু।"

শচীন্দ্রনাথের একটু ভয়ই হ'ল মনে মনে। বললে, "জন দুই লোক আর দুটো মশাল বেশী নিলে হ'ত।"

"না বাবু, সে ভয় নেই। না রাগলে, ওনারা মাটির মানুষ। তবে হ্যাঁ, ক্ষেপলে একেবারে সাক্ষেৎ যম।"

মনে মনে ভয় হ'লেও শচীন্দ্র আর বেশী বাক্যব্যয় না ক'রে চারি দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগল। ভাবলে এর চেয়ে নৌবিহারের প্রস্তাবটা নিতান্ত মন্দ ছিল না।

গুর্খাবীর ঝাঁকি খেয়ে মনে মনে বৃদ্ধের বাহুবলের তারিফ করতে করতে পিছনে পিছনে পোষা কুকুরটির মত চলতে লাগল। সম্প্রতি তার উপর দিয়ে যে কিছুমাত্র দুর্ঘটনা ঘটে গেছে তার চিহ্নমাত্র তার ল্যাপা পোঁছা মুখে খুঁজে পাবার জো নেই।

বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর তারা ইট দিয়ে বাঁধানো পথের মত একটা কিছু বার করতে পারলে। কিন্তু জঙ্গল না কাটলে সে পথ দিয়ে এক পাও এগনো চলে না। অনেক পরিশ্রমে দা ও ভোজালীর সাহায্যে একটু একটু ক'রে জঙ্গল সাফ ক'রে ক'রে তারা অগ্রসর হ'তে লাগল এবং গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'য়ে অবশেষে সেই অট্টালিকার নীচে সিঁড়ির কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। চারি দিকে ঘোরানো বারান্দা। সেই বারান্দা দিয়ে গিয়ে এক কোণে দোতলায় যাবার সিঁড়ির দরজা। দরজা খোলাই ছিল। সাবধানী ভোলানাথ বললে, "বাবু, এখানে মানুষের যাতায়াত আছে।" এই ব'লে দরজার কাছে এগিয়ে গেল এবং হঠাৎ কি দেখে থেমে বললে, "এই যে বাবু বেশীক্ষণ হয় নি এখানে দরজার শেকল ভেঙে লোক উপরে গেছে। এই দেখুন বাবু জুতোর দাগ।"

শচীন্দ্র একটু চিন্তিত এবং অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখলে সত্যিই জুতোর দাগ। বড় ভারি, কাদাজলমাখা জুতোর সদ্য চিহ্ন। শুধু তাই নয়। প্রকাণ্ড তালাটা না ভেঙে শিকলের হল্‌কাটা উপড়ে ফেলেছে। অদ্ভুত বটে! আর

অধিক অগ্রসর হওয়া সমীচীন কি না শচীন মনে মনে সেই আলোচনা করতে লাগল।

এমন সময় অকস্মাৎ সমস্ত বাড়িটার জনহীন স্তব্ধ পঞ্জরতল বিদীর্ণ ক'রে একটা তীব্র আর্ত্ত চীৎকার শব্দহীন জমাট আকাশটাকে ফেড়ে তাদের বুকের রক্তপ্রবাহকে আড়ষ্ট ক'রে দিয়ে গেল। শচীন্দ্র দু-তিন পা হটে এল। তার হাতে পায়ে যেন খাল ধরে গিয়েছে। গুর্খাপুঙ্গব তো 'দেও দেও' ব'লে কাঁপতে কাঁপতে সেইখানেই জমি নিলে। ভোলানাথও চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, "ডাকটা কি জানোয়ারের! না, আর কিছু?" আকাশপাতাল ভেবেও তার বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার কোন কুলুঙ্গীতে তার উত্তর খুঁজে পেল না। সকলেই স্তম্ভিত; মুখে কারও রা-টি নেই। আওয়াজটা এত অতিমানুষিক যে, যে-লোকটা জুতোসুদ্ধ উপরে গিয়েছে তার কথা শচীন্দ্রনাথ চমক খেয়ে একেবারে ভুলেই গিয়েছিল।

রহস্য সহ্য করা ভোলানাথের ধাতে পোষায় না। সে এক রকম বিরক্ত হয়েই উঠেছিল। তার উপর বাহাদুর সিংএর গোঙানী তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। তার ঘাড়ের কোটটা ধ'রে এক ঝটকায় তাকে সোজা দাঁড় করিয়ে দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললে, "চুপ ক'রে দাঁড়া উল্লুক, দাঁত ঠকঠকাবি ত এক চড়ে মুখ ভেঙে দেব।"

শচীন্দ্রও নিজের কাপুরুষতায় লজ্জিত হয়েছিল। কিন্তু কি করবে কিছুই ভেবে উঠতে পারছিল না।

এমন সময় আবার সেই চীৎকার। মনে হ'ল যেন পৃথিবীর বক্ষ নিদারুণ যন্ত্রণায় দীর্ণ ক'রে এই বিলাপধ্বনি উঠছে।

ভোলানাথ বললে, "এ মানুষের আওয়াজ বাবু, মেয়ে মানুষের। আমি দেখি।" ব'লে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে সে দু-তিনটে ক'রে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠে গেল। অগত্যা শচীন্দ্রও তার পিছু নিল।

উপরে উঠে দেখলে চারি দিকে চওড়া বারান্দা দিয়ে ঘেরা প্রকাণ্ড দালান। সামনের মাঠটা পেরিয়ে ঘন জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে নদীর জল দেখা যায়। ভোলানাথ জুতোর দাগ দেখে দেখে সাবধানে এগতে লাগল। পিছনে শচীন্দ্র—হাতের বন্দুকটা বাগিয়ে-ধরা। ভয়ে এবং বিস্ময়ে মনের মধ্যে তখন তার পরিণত বুদ্ধির পাকা মানুষটি প্রায় রূপকথার শিশুর পর্য্যায়ে এসে ঠেকেছে। সম্ভব এবং অসম্ভব উদ্ভট কল্পনায় তার মস্তিষ্কের মধ্যে চলচ্চিত্রের তাণ্ডব চলেছে যেন। একটা বারান্দার মোড় ফিরেই ভোলানাথ বললে, "ঐ যে বাবু।"

একটা অদ্ভুত পোষাক-পরা লোক একটা প্রকাণ্ড থামের প্রায় আড়ালে নদীর দিকে মুখ ক'রে রেলিঙের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার মধ্যে কল্পনার ফিল্ম কটাং ক'রে কেটে গেল, এবং ভয়ের ভোজবাজীটা অকস্মাৎ পরদা থেকে ছটকে এসে যেন গা ঘেঁষে নেমে পড়ল। সে প্রায় ভয়ার্ত্ত বিকৃত রূঢ় স্বরে হাঁক দিয়ে উঠ্‌ল, "কে? কে ওখানে? বল, নইলে—"

"নইলে"র অপেক্ষা না ক'রে হঠাৎ মাথার টুপিটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রকাণ্ড একটা লম্বা কোট খুলতে খুলতে পার্ব্বতী হি হি ক'রে হেসে উঠ্‌ল। "উঃ, কি জবরদস্ত বীরপুরুষ আপনারা। এই বীরপনা নিয়ে আবার আমাকে মেয়েমানুষ ব'লে ফেলে আসা হয়েছিল! বীরত্বের উত্তেজনায় আজ আমারই দফা শেষ করেছিলেন আর কি!"

নিরতিশয় বিস্ময়ে প্রায় নির্ব্বোধের মত মুখ ক'রে শচীন্দ্র তার দিকে চেয়ে বললে, "তুমি! পার্ব্বতী!"

"হ্যাঁ, পার্ব্বতীই তো! সারপ্রাইজটা নিতান্তই জোলো হ'য়ে গেল, যাঃ! হুরী না, পরী না, রাজকন্যে না, এমন কি বাঘ-ভাল্লুক পর্য্যন্ত নয়—"

"সত্যি এলে কেমন ক'রে বল তো? কি দুঃসাহস তোমার! এলে কোথা দিয়ে?"

পার্ব্বতী ঠাট্টা ক'রে বল্‌লে, "এলাম, উড়ে।"

শচীন্দ্র বিস্ময়বিস্ফারিত প্রশংসমান চোখে তার দিকে চেয়ে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে দেখ্‌তে লাগল। এই মেয়েটির সাহস, কর্ম্মপটুতা এবং স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দতায় তার মনোহর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় সে পূর্ব্বে প্রচুর লাভ করলেও এই অসম দুঃসাহসিকতা তার কাছে সে আশা করে নি। তার নিজের ভয়ের লজ্জা এবং পার্ব্বতীর এই নারী-দুর্লভ সাহসিকতা তাকে সত্যই অভিভূত করেছিল। বললে, "উড়ে এলে এত আশ্চর্য্য হ'তাম না। তবু আর যে কেমন ক'রে আস্‌তে পার তাও ত জানি নে।"

"বল্‌ব কেন? সত্যিই ত আর উড়ে আসি নি! লিভিংষ্টোন সাজতে গেলে বুদ্ধি আর নজরটাকে একটু পরিষ্কার রাখা চাই। একটু নজর করলেই দেখতে পেতেন যে পশ্চিমের আমবাগানটা নদীর উপর গিয়ে নেমেছে। তার তলাটা বেশ চলনসই পরিষ্কার। বোটটা নিয়ে একটু বেয়ে গিয়ে উঠে তার ভেতর দিয়ে বাড়ির দেউড়ির উল্টো দিকের কাঁঠালতলা দিয়ে এসে উঠলাম। উঃ, আর এক মিনিট দেরি হ'লেই আপনারা আমাকে নীচের তলায় ধ'রে ফেলেছিলেন আর কি! ভাগ্যিস্ সামনেই রেলিঙের একটা শিক পড়ে ছিল, তাই দিয়ে এক টানে শিকলের হুক্‌টা উপ্‌ড়ে ফেলে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এলাম। এসে মনে হ'ল মশায়দের সাহসটা একটু পরখ ক'রে দেখা যাক্। তা ভোলাদা না থাকলে বোধ হয় মশায় সিঁড়ির তলাতেই দাঁতকপাটি লেগে প'ড়ে থাক্‌তেন।"

ভোলানাথ এতক্ষণ একটাও কথা বল্‌তে পারে নি। এই মেয়েটির দুর্জ্জয় সাহস ও বুদ্ধিতে তার অশিক্ষিত সাদা বলিষ্ঠ মন প্রশংসায় ভরপূর হয়ে উঠেছিল। এখনও সে কোন কথা না ব'লে প্রাণ খুলে তার প্রকাণ্ড দরাজ গলায় 'হাঃ হাঃ' ক'রে হেসে উঠ্‌ল—যেন তার মনের সমস্ত প্রশংসার উচ্ছ্বাস একটা বিরাট হাসিতে তর্জ্জমা ক'রে দিলে।

শচীন্দ্রনাথের মনটাও প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু তার নিজের ভীরুতায় তার লজ্জাও কম হচ্ছিল না। সে একটু লজ্জিতভাবে হেসে বললে "উঃ, কি নিদারুণ চীৎকারই না ক'রেছিলে। কোন্ মানুষের গলায় যে এমন আওয়াজ বেরোয় তা ভাব্‌তেই পারি নি।" ব'লে নিজের ভয়ের কথা মনে ক'রে বোধ হয় সঙ্কোচে চুপ ক'রে গেল।

শচীন্দ্র লজ্জা পেয়েছে দেখে পার্ব্বতী বললে, "ভাবছেন কি চুপ ক'রে? ভাবছেন তো, যে মেয়েটা কি বেহায়া; বাংলা দেশে এমন মেয়ের স্থান হওয়া উচিত নয়—?"

শচীন বললে, "না, ভাবছি স্কটল্যাণ্ডয়িয়ার্ডের কৃতিত্ব নিতান্তই বাজে গল্প; কিংবা বাঙালীর মেয়ের জুড়িদার মাথা বিলেতে নেই। নইলে···মানে···" ব'লে হাস্‌তে লাগল।

"নইলে কি? নইলে এ মেয়েটা জেলের বাইরে এখনও ছাড়া আছে কেমন ক'রে, এই তো? তালাভাঙার কথা তো? তা, ধরা পড়বার ভয়ে ইনস্টিংক্‌ট্ অব সেল্‌ফ-প্রিজারভেশন্ মানুষের আপনিই জাগে।" এই ব'লে, কথাটাকে চাপা দেবার জন্যে বললে, "এই কোটটা ধর তো ভোলাদা, ওর পকেটে একটা কাগজে সন্দেশ আর ফ্লাস্কে সরবৎ আছে। একটু খেয়ে ঠাণ্ডা হোন্। অন্তত মুখটা বন্ধ হোক।"

এমন সময় দেখা গেল বারান্দার দেয়ালের কোণ থেকে বাহাদুর সিং উঁকি মেরে দেখছে। দেখছে হ'ল কি! এতক্ষণ নীচে ব'সে ব'সে সে নানা কাল্পনিক প্রেতিনীতত্ত্ব আলোচনা ক'রে ভয়ে এবং কল্পনায় বিভীষিকার জাল বুন্‌ছিল, এবং শচীন্দ্র ও ভোলানাথের অকস্মাৎ উধাও হওয়া সম্বন্ধে পিসীমাকে কি কি উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দিতে পারে তার একটা গল্প, ভৌতিক কল্পনা এবং তাদের উদ্ধারকল্পে নিজের বীরত্বের সঙ্গে মিলিয়ে সে এতক্ষণ ধ'রে মনে মনে প্রস্তুত ক'রে রাখছিল। অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন চেঁচামেচি, বন্দুক ছোড়াছুড়ি, হুড়হাঙ্গামের কোন লক্ষণ দেখতে পাওয়া গেল না বরং উপর থেকে হাসি এবং কথাবার্ত্তার শব্দই পাওয়া যেতে লাগল, তখন রীতিমত একটু নিরাশ এমন কি বিরক্ত হয়েই সাবধানে উপরে উঠে গেল। কথার শব্দ অনুসরণ ক'রে বারান্দার একটা মোড়ে গিয়ে উঁকি মেরে দেখছিল, যে, বাবু এবং অনুচর যে পেত্নীদের সঙ্গে এভাবে আড্ডা জমাতে পারে তাদের চেহারাটা কি রকম। সব চেয়ে আগে চোখ পড়ল পার্ব্বতীর। সে বললে, "এস এস বাহাদুর সিং। তোমার আশ্চর্য্য সাহসে সকলের তাক লেগে গেছে। সরকার বাহাদুর টের পেলে তোমাকে পল্টনে নিয়ে গিয়ে কাপ্তেন বানিয়ে দেবে।" বাহাদুর সিং খুব সপ্রতিভ ভাবে এগিয়ে এল এবং প্রথমে পার্ব্বতীকে ও পরে ভোলানাথকে ফৌজী কায়দায় সেলাম ঠুকে বন্দুকটাকে নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে কুৎকুৎ ক'রে চাইতে লাগল। শচীন্দ্র যে আদৎ মনিব, তা সে যেন গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্‌ল না। ভোলানাথ এই দেখে ভারি চটে গেল। তার বাবুকে এই নতুন-আমদানী পাহাড়ে-ভূতটা যে অগ্রাহ্য করবে তা সে সহ্য করতে পারবে কেন? রেগে বললে, "বেরো ব্যাটা হনুমান এখান থেকে; বাঁদর-নাচ দেখাতে এসেছে, বেরো।"

বাহাদুর আবার ফৌজী কায়দায় রীতিমত সেলাম ঠুকে, রাইট এবাউট টার্ণ ও কুইক মার্চ ক'রে বারান্দার অন্য দিকে চলে গেল। ভোলানাথ বললে, "বাবু, ঘরের দরজাগুলো খোল্‌বার চেষ্টা করি। আপনারা বরং এখানে একটু অপিক্ষে করুন।"

(ক্রমশঃ)

সহশিক্ষা সম্বন্ধে দু-চারটি কথা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহশিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করতে যদি যা বলবার তা "আমি, আমার" ভাবে বলি, তাতে আশা করি আপনারা অহমিকা-দোষ ধরবেন না, কেননা এ বৈঠকে বক্তাদের নিজের নিজের কথা শোনবার জন্যেই ডাকা হয়েছে।

শিক্ষা বলতে আমার মনে কি কি জিনিষ আসে, আগে তাই আপনাদের সামনে ধরি। শিক্ষা দেওয়ার মানে আমি বুঝি,—যে যা বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে জন্মেছে তাই জাগিয়ে বাড়িয়ে ফুটিয়ে তোলা। তা করতে হ'লে ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তি নানা উপায়ে খাটাবার অভ্যাস করাতে হয়; মনোহর ও হিতকারী তথ্য-তত্ত্বের পরিচয় দিতে হয়; ভাষা ও ললিতকলা দিয়ে ভাব ব্যক্ত ও আদান-প্রদান করার কৌশল যোগাতে হয়।

এই চুম্বক ফর্দ্দের মধ্যে এমন কিছুই দেখি না, যা ছেলে-মেয়েদের পক্ষে সমান দরকারী নয়, বা যার দরুন ছাত্রের জন্যে এক রকম, ছাত্রীর জন্যে অপর রকমের প্রণালী লাগে। এ কথা মানি যে, মেয়ে-পুরুষ স্বাভাবিক ক্ষমতায় যেটুকু তফাৎ সেই মত সংসারযাত্রায় তাদের কাজকর্ম্মও ভিন্ন, তাই বুঝে তাদের রকমারি শিক্ষাও লাগতে পারে; কিন্তু সে হ'ল দ্বিতীয় আশ্রমের বেলায়। এখন আমরা আজকাল-কার প্রথম আশ্রমের, অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষালয়ের, কথা ভাবছি। তাতে ত দেখা গেল, শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে জাতি-ভেদের কোন কথাই নেই; তা হ'লে, যা-কিছু গোল শিক্ষার পাত্র-পাত্রী নিয়ে।

কাজেই প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে এই—আমাদের ছেলেমেয়েরা যে কালটা শিক্ষালয়ে কাটায়, যে সময়ে তাদের চরিত্র তৈরি হ'তে থাকে, তখন তাদের মেলামেশা হওয়া, তাদের মধ্যে ভাবের বিনিময় চলা, তারা পরস্পরকে বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে সাহায্য করা,—এ ব্যবস্থার পক্ষে বিপক্ষে কি বলবার আছে?

মানবলীলাভূমিতে লীলাময় যে নর-নারী-ভেদ বিধান করেছেন তাতে কতই না আধ্যাত্মিক রস ও শক্তির সঞ্চার হয়েছে। তার কিছু ভাগ শিক্ষালয়ের মধ্যে এনে ফেললে আপত্তি কি? সেখানে কাজ বলুন, খেলা বলুন, বিদ্যাচর্চ্চা বলুন, রসসঞ্চয় বলুন, ছেলেমেয়েরা সে সব মিলে-মিশে করলে উৎসাহ, আনন্দ, সফলতা, কত বেড়ে যেতে পারে, তা কি লম্বা ক'রে বোঝাতে হবে? তা ছাড়া, এ কথাও সবাই জানেন যে, শিক্ষালয়ের মাটিতে বন্ধুত্বের ফুল বড় সরেশ ফোটে। একে ত ধরাধামের ফুলের মধ্যে এইটেই সেরা, তাতে আবার বন্ধুত্ব নরনারীর মধ্যে হ'লে তার বাহার বাড়ে বৈ কমে না। শেষে যদি বিবাহ পর্য্যন্ত পৌঁছয়, তবে সহ-শিক্ষিত দম্পতির পক্ষে সহ-ধর্ম্মের উপর গৃহস্থালী পত্তনের সম্ভাবনা বেশী, তা বলাই বাহুল্য; যার ফলে সমাজ উজ্জ্বল ও বংশ উন্নত হবার আশা করা যায়। আর, সেদিকে না গিয়ে, যদি নরনারীর বন্ধুত্ব ঘরের বাইরে ছড়িয়ে থাকে, তাতেও বিশ্বমৈত্রীর পথ খোলসা হ'য়ে স্বদেশ ধন্য হ'তে পারে।

আমার ত মন বলে, সকল দেশ সম্বন্ধে এ কথাগুলি সত্য, —আমাদের দেশেই কি খাটবে না? তবে কেন স্থাবরপন্থীর তরফ থেকে আপত্তির একটা সুর মানস-কানে আসছে—

"আচ্ছা লোক ত তুমি! ছেলেমেয়েরা শিক্ষালয়ে দিব্যি ভাব জমাচ্ছে, হয়ত নিজে নিজে বিয়ের ঠিক করছে, মা-বাপের অনুমতি বা পরামর্শের অপেক্ষা নেই, জাত-কুল বিচারের চেষ্টা নেই; প্রাচ্য নারীচরিত্রের, প্রাচীন সমাজ-বাঁধনের মূলে ঘা দেওয়ার এই ছবি অম্লান বদনে দেখিয়ে তুমি চটক লাগাবার ফিকিরে আছ!"

কথার ঝাঁজে মনে হচ্ছে যেন আপত্তিকারীতে আমাতে সতীত্বের ও জাতিত্বের আদর্শ নিয়ে একটা ঠোকাঠুকি বেধেছে। তা বেশ। ঠুকে আমি বাহাদুরী নিতে চাই না, তবে ঠোকা ঠেকাবার অনুমতি পেতে পারি ত?

সেকালের শাণ্ডিল্য ঋষি, আজও পর্য্যন্ত যাঁর গোষ্ঠী বজায় রয়েছে, আমি তাঁর গোত্রধর হ'য়ে সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম

না মেনে চলতেই পারি নে। আবার একালের যে মহর্ষি হিন্দুধর্ম্মকে জঙ্গম ক'রে গেছেন, তাঁর বংশধর হ'য়ে আমি আধুনিক জাতিভেদ প্রথা কেমন ক'রে বরদাস্ত করি?

বর্ণ বলতে ত গায়ের রং নয়, মনের রং, অর্থাৎ চরিত্র বোঝায়; যেখানে সমান মতি-গতির লোক একত্র থাকে, তাকে বলে আশ্রম; যা ধ'রে রাখে বা এক সঙ্গে বাঁধে, তারই নাম ধর্ম্ম। কাজেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানাতে আমি বুঝি—যে আদর্শ, রুচি, ব্যবহার প্রভৃতি নিয়ে জীবন-যাত্রা, সেগুলি যাদের মধ্যে এক-রকমের, তারা বড় সমাজের মধ্যে এক-একটা দল বেঁধে থাকা। এটাই যে স্বাভাবিক, সুবিধেজনক ও সমস্ত সমাজের পক্ষে বলকারক, তা কে অস্বীকার করবে? আর স্পষ্টই ত দেখা যায় যে, সহশিক্ষার দৌলতে এই রকমেরই দল-বাঁধার সুযোগ হবে।

কিন্তু যে জাতিভেদ প্রথা আমাদের স্থাবর সমাজে এখন দাঁড়িয়ে গেছে সেটা কি, না মন-প্রাণ-চরিত্রের যতই মিল থাক্ না কেন, দৈবাৎ কে কার ঘরে জন্মে ফেলেছে তাই ধ'রে মানুষকে যাবজ্জীবন আলাদা আলাদা গণ্ডীর মধ্যে আটক রাখা,—কেউ গণ্ডী পার হবার চেষ্টা করেছে কি স্থাবর দলের মধ্যে দে-মার দে-মার শব্দ! যে দিন-কাল পড়েছে, তাতে এ-ব্যাপার যেমন অশোভন তেমনি অনিষ্টকর,—হিন্দু-সমাজের সকল ক্ষেত্রে ছড়িভঙ্গী অবস্থা তার অকাট্য সাক্ষী দিচ্ছে। ভরসা এই যে, সহশিক্ষাই হোক্, আর যে-রকমেরই সৎ-শিক্ষা হোক্, তার চোটে এ পাপ আর টিঁকছে না।

ওদিকে স্থাবরপন্থী ভেবে সারা যে, পুরুষ-মানুষের সঙ্গে বুদ্ধি ঘষা-মাজা ক'রলে নারীর নারীত্ব, সতীর সতীত্ব খ'সে যাবে। বিদুষী গার্গী ত প্রশ্নের উপর প্রশ্ন তুলে উপনিষদের ঋষিকে ঝালাপালা ক'রে তুলেছিলেন; কিন্তু কৈ, তাঁর নারীত্ব বা সতীত্ব সম্বন্ধে নিন্দের কোন কথা পড়িও নি, শুনিও নি। তাতে ক'রে আমার সন্দেহ হয় যে, আমার সহ-যোদ্ধার উতলা হবার আসল কারণ আর কিছুই নয়, সহশিক্ষিতা পত্নী সকল অবস্থায় পতিকে দেবতা মানতে, তাঁর সেবাদাসীগিরি করতে, রাজি নাও হ'তে পারেন।

চৌপর দিন রাঁধ' আর বাড়', ছেলের পর ছেলে ঠেকাও; রসাল বই প'ড়ে সময় ও স্বভাব নষ্ট ক'র না; হাওয়া-খাওয়ার বা মেলা-মেশার ছুতোয় হৈ হৈ ক'রে বেড়িও না; যে "মা" বলতে স্থাবরপন্থী অজ্ঞান, তাই হ'য়ে থাক—তা, ছেলেপিলেকে মানুষের মত মানুষ করার উপযুক্ত হও না-হও, বাপে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারে তার চেয়ে বেশী ছেলে হ'তে হ'তে যদি মায়ের শরীর ভাঙে, প্রাণটা যায়, তাতেই বা কি? এ এক চমৎকার সতীত্বের আদর্শ বটে! এটাই যদি কায়েম রাখতে হয়, তাহ'লে আমি হার মেনে বলি, সহশিক্ষা মোটেই চলবে না, যাকে নহ-শিক্ষা বলা যায় এমন কোন হিক্মৎ বার করতে হবে।

তবে কি আমাদের মেয়েদের মেম-সাহেব বানিয়ে তুলতে চাই? আরে রাম! শাণ্ডিল্য-আসিত-দেবল-প্রবরস্থ যে আমি, আমার নামে শেষটা পাশ্চাত্য-পক্ষপাতিতার কলঙ্ক! তা হয় না। আমি ত বলি, পিতামহ ব্যাসদেব থাকতে আমরা আদর্শের খোঁজে বিদেশে-বিভুঁইয়ে ঘুরি কেন? যিনি মহাভারত-ভরা উপদেশ দিয়েছেন, তিনি কি আর সতীত্বের কথা ছেড়ে গেছেন? সে বিষয়ে গঙ্গাদেবীর জবানীতে শুনুন।

গঙ্গাদেবীর রূপ-লাবণ্যে বিমোহিত হ'য়ে যখন রাজা শান্তনু মৃদু-মধুর বচনে তাঁকে অনুনয় করতে লাগলেন, তখন গঙ্গাদেবী যা জবাব দিলেন তার বাংলা মর্ম্ম এই—

"মহারাজ! তুমি আমায় কামনা ক'রে সম্মানিত ক'রছ বটে, কিন্তু ভগবানের অভিপ্রায়ে কয়টি সন্তান উপযুক্তরূপে ভূমিষ্ঠ করার ভার আমার উপর পড়েছে; কাজেই আমাকে ভেবে-চিন্তে উত্তর দিতে হচ্ছে। তোমার শ্রেষ্ঠ কুলশীলের কারণে তোমাকে আমার সেই সন্তানদের পিতা হবার উপযুক্ত মনে করি, তাই আমি তোমার সহধর্ম্মিণী হ'য়ে তোমার সঙ্গে থাকব। কিন্তু কখনো যদি তোমার আচরণে সেই আসল উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত হ'তে দেখি, তবে আমি তোমায় পরিত্যাগ করব।"

এবং অবশেষে গঙ্গাদেবী সে কারণে রাজাকে ছেড়েও গিয়েছিলেন।

দেখুন দেখি! আমাদের সুরসিক পিতামহ কেমন ছোট্ট গল্পচ্ছলে সতীকে কত কি ভেবে পতি বরণ করতে হয়, কি ভাবে পতির সঙ্গে ঘর করতে হয়, কি হ'লে পতির সঙ্গ ছাড়তে হয়, সবই পরিষ্কার ব'লে দিলেন। সহশিক্ষার

সময়ে, বিয়ের আগে থাকতেই, পুরুষ-মানুষের বিদ্যের দৌড় কতকটা বুঝে না রাখতে পারলে, কোন আধুনিক সতী কি এ-রকম ক'রে ভাবতে পারবেন, না মাথা উঁচু রেখে মনের ভাব বলতে পারবেন ?

এতক্ষণ আমরা সংস্কৃত বা উৎকৃষ্ট মানুষ ও সমাজের কথা ভেবে চলেছি। এ কথাও ভুললে চলবে না যে, সমাজ যতই সংস্কৃত হোক্ না কেন, তার মধ্যে মানুষের আদিম প্রাকৃত ভাব মাঝে মাঝে ঠেলে উঠবার চেষ্টা করবে, আর যেখানেই উঠবে সেখানে উৎপাত বাধাবে। সমাজ বা নারী সম্বন্ধে যার যে আদর্শই থাক্, অস্থানে রিপু-রূপে কামের আবির্ভাব কেউই পছন্দ করেন না। তা ব'লে করাই বা কি ? বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতি ঋষিরাও ত সে রিপুর হাত এড়াতে পারেন নি। অস্থানকে যথাস্থানে, রিপুকে মিত্রে, পরিণত করাই নরোত্তমের কাজ, সে অভিপ্রায়ে এক-পক্ষে ব্যক্তিগত চিত্তশুদ্ধির, অপর পক্ষে সমাজে চলিত কু-প্রথা বদলের, কি উপায় করা যেতে পারে, তার আলোচনা আজকের বৈঠকে প্রাসঙ্গিক হবে না। তবে সহ-শিক্ষালয়ের পক্ষে এইটুকু বলা যায় যে, যে জায়গায় সারাক্ষণ সদ্ভাব সদালোচনা দিয়ে সংস্কৃতির চেষ্টা চলছে, সেখানে প্রাকৃত বদ্-ভাব উঁকি-ঝুঁকি মারতে পারে, কিন্তু তেড়ে ঢুকে শিং মারবার সুযোগ সহজে পাবে না।

বরং স্থাবরপন্থীর ঘরে-ঘরে যে-সব শিক্ষা চলে, তাতে কাম-রিপু বিলক্ষণ প্রশ্রয় পায়। সাত্ত্বিকতার ঠেলায় যেমন, কি খাব, কোথায় খাব, কার হাতে খাব, কি খাব-না, সারা দিনমান পেটেরই ভাবনা ; তেমনি সতীত্বের তাড়ায়, সময় নেই অসময় নেই, স্ত্রীলোকের স্ত্রীত্বের উপর যত ঝোঁক। একদিকেত মেয়েটাকে সকাল-সন্ধ্যে শশব্যস্ত রাখা হয়—"ওদিকে যাস্‌নি, সেদিকে তাকাস্ নি, মুখ ঢাক্, গা ঢাকা দে," ইত্যাদি —কিসের এত ভয় ? সোজা কথায় বলতে গেলে, পাছে হতভাগা পুরুষটার মনের বিকার হ'য়ে অনর্থ ঘটে! অন্য দিকে মেয়েকে সাজাও-গোজাও, আলতা লাগাও, রূপটান মাখাও, নইলে বিয়ের আগে পাত্রের মন টানতে পারবে না, বিয়ের পর স্বামীর মন রাখতে পারবে না। মনের গয়নার কথা কেউ কয় না,—ভাববার দরকারই বোঝে না। এ দলের মানসপটে আঁকা পুরুষ-মনের চেহারাখানা দেখে বলিহারি যাই!

সে যাই হোক্, ফলে দাঁড়ায় এই যে, মেয়ে বেচারীকে ছেলেবেলা থেকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া হয়—সে কামিনী, কামিনী ভাবে চলাফেরা ছাড়া তার গতি নেই। শেষে, পুরস্কারের বেলায়, তাকে কাঞ্চনের সঙ্গে এক কোঠায় ফেলে দিয়ে, ধর্ম্মচারীকে তাকে বিষের মত ডরাতে সাবধান করা হয়! আরও তাজ্জব এই যে, কোন কোন সন্ন্যাসী-মহারাজ, যাঁদের স্ত্রীপুরুষ-ভেদের উপর-তলায় বসবাস করার কথা, তাঁরাও এই উপদেশ দেন। প্রকৃতির আদ্যাশক্তিকে অপমান করলে অন্ধকার লোকে তলিয়ে যাবার যে ভয়ের কথা উপনিষদে বলা হয়েছে, তার খবর কি এঁরা রাখেন না, না সামাজিক বাঁধিগতের বিরুদ্ধে কথা কইতে কুণ্ঠিত হন ?

হায় রে আর্য্যাবর্ত্ত! অবশেষে তোমার এই দশা ? তোমার পবিত্র সীমানার মধ্যেও নর-নারীকে শেখান হয় না যে, পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ ভেদে তাদের জীবনের অর্থের এমন কিছু হেরফের করে না, যথাযথ বংশরক্ষা-কার্য্যেই তার অবসান, তাও অর্থনীতি স্বাস্থ্যনীতির নিয়মে সংযত না করলে বিপদ। মহামূল্য মানবজীবনের বাকী অধিকাংশ সম্বন্ধে তাদের মনে রাখা উচিত,—কিন্তু সে কথা কোন অভিভাবকে স্মরণ করিয়ে দেয় ? যে, তারা উভয়েই নারায়ণের তুল্য-অংশ, সুতরাং সম-শিক্ষা-দ্বারা সম-দক্ষতা ও সম-অধিকার অর্জ্জন ক'রে, নারায়ণ যে মহোৎসবের আয়োজন করেছেন সেটা সুসম্পন্ন করবার চেষ্টাতেই তাদের সার্থকতা ও পরমানন্দ। এই উদ্দেশ্য সাধনের একটা উপায় মনে ক'রেই আমি উপযুক্ত আদর্শ সামনে রেখে সহশিক্ষার পক্ষপাতী।

আজকের পালাটা সাঙ্গ করবার আগে আমার সেই কাল্পনিক স্থাবরপন্থীর সঙ্গে ঝগড়াটা মিটিয়ে নিতে চাই। ভেবে দেখছি, আদর্শ নিয়ে আমাদের মনান্তর আসলে হয় নি, আলাদা রকমে মানুষ হওয়ায় মতান্তর ঘটেছে মাত্র। বিগ্‌ড়ে-যাওয়া বা বিগড়ে-দেওয়াই স্ত্রী-স্বভাবের লক্ষণ, এ ধারণার মধ্যে যে জীবন কাটায়, সে মেয়েদের গুদামজাত ক'রে সাবধানে পাহারা দেবার ইচ্ছে না ক'রেই থাকতে পারে না। নারীজাতিকে নিজেদের মতই মানুষ-জ্ঞানে তাদের সঙ্গে কারবার না ক'রতে পেরে সে কি হারিয়েছে, নরনারীর সমকক্ষ মেলা-মেশায় কেমনতর শক্তি-লাভ আনন্দ-লাভ হয়, সে ব্যক্তি তার কি বা জানবে ?

তবে আক্ষেপের বিষয় এইটুকু যে, স্থাবরপন্থী মহাশয় যখন রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পাবার জন্যে আপ্‌সা-আপ্‌সি করেন, তখন তাঁর এ-খেয়াল হয় না যে, দেশের ছেলেদের কচি বেলায়, যখন তারা সব রকমের ভাব সহজে নিতে পারে, হজম করতে পারে, রক্ত-মাংসে মিশিয়ে ফেলতে পারে, তখন বদ্ধ-থাকা শরীর, খাটো-করা মন, চাপা-পড়া প্রাণ, নিয়ে তাদের সেই অভাগিনী মা স্বাধীনতার স্বরূপ কেমন ক'রে ঠিক মত চিনিয়ে দেবেন ? আসলে ঘটে উল্টোটাই। অন্দর-মহলের অন্ধকারে জন্মান' যতকিছু অকারণ ভয়-ভাবনার, অন্যায় বিদ্বেষ ভেদ-বুদ্ধির বীজ তাদের নরম মনে পুঁতে দেওয়া হয়, যেগুলি তাদের বড় বয়সে অবিচার, অসদ্ভাব, দলাদলি, ঝগড়াটে-পণা প্রভৃতি কাঁটাগাছ হ'য়ে দেখা দেয়, যার জ্বালায় আমাদের কোন স্বদেশী অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান মাথা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারে না,—জাতীয় একতা ত দূরের কথা।

এই সব বিঘ্নের পিঠে বিঘ্ন জুটে দেশে যে বিষ-চক্রের সৃষ্টি হয়েছে, সেটা ভেঙে দেবার পক্ষে আমি ত মনে করি সহশিক্ষা একটা মস্ত উপায়। আমরা জানি ব'লেই যাঁরা জানেন না তাঁদের জোর ক'রে আশ্বাস দিতে পারি যে, পরস্পরকে একই রকমের মানুষ ভাবে দেখার খোলা হাওয়ায় বেড়িয়ে যে-সকল নর-নারী একবার আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য উপভোগ ক'রেছেন, তাঁরা কোন প্রলোভনেই আর ভেদ-ঘেরা কোটর-কুঠরির বদ্ধ বাতাসের মধ্যে ফিরে ঢুকবেন না।

যতখানি বলা হ'ল তাতে আপনাদের সময় নষ্ট হ'য়ে থাকতে পারে ; আশা করি যা যা বলা গেল তাতে কারও মনে কষ্ট দেওয়া হয় নি।*

*বিশ্ববিদ্যালয়ে নব্য-শিক্ষা-সংক্রান্ত বিবিধ-প্রসঙ্গ আলোচনা-স্থলে ইহার ইংরেজী অনুবাদ পড়া হয়।

পাশাপাশি

"বনফুল"

১

বসিয়া, শুইয়া, কাগজ পড়িয়া, তাস খেলিয়া, আড্ডা দিয়া, পরচর্চ্চা ও পরনিন্দা করিয়া করিয়া হয়রান হইয়া গেলাম। শান্তি পাইতেছি না। আসল কারণ অর্থাভাব। আমার যাহা করিবার তাহা করিয়াছি। পরীক্ষা পাস করিয়াছি, বহুস্থানে চাকুরীর জন্য দরখাস্ত দিয়াছি—এমন কি কিছুদিন ইন্‌সিওরেন্সের দালালিও করিয়াছি—কিন্তু কিছু হয় নাই। অবশ্য এখনও অনেক কিছু করার বাকী আছে। ষ্টেশনারি দোকান বা মুদিখানা, অন্ততঃ পক্ষে একটা পান-বিড়ির দোকান খুলিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব ভাবি, কিন্তু—আঃ মাছির জ্বালায় অস্থির ! যেই একটু শুইব ঠিক চোখের কোণটিতে আসিয়া বসিবে। এত মাছি আর এত গরম। সুস্থির হইয়া যে একটু চিন্তা করিব তাহার উপায় নাই। উঠিয়া বসিলাম। এই দারুণ দ্বিপ্রহরে ঠায় বসিয়া চিন্তা করাও ত মুস্কিল ! শুইলেই মাছি ! হাতে পয়সা থাকিলে মাছি মারিবার আরক ছিটাইয়া খানিক ক্ষণ স্থির হইয়া চিন্তা করিতাম। আপনারা হয়ত হাসিতেছেন এবং ভাবিতেছেন "আচ্ছা চিন্তাশীল লোক ত !"

পেটের চিন্তার মত এত সহজ অথচ জটিল চিন্তা আর নাই। দিন-রাত সেই চিন্তাই করিতেছি। আমি চিন্তাশীল নই, চিন্তাগ্রস্ত।

......ঠিক করিয়া ফেলিলাম। কলিকাতা যাইব। কলিকাতায় গিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া দেখিব। এই পল্লীগ্রামে পড়িয়া থাকাটা কিছু নয়। দোকানই যদি করিতে হয় কলিকাতাই বেস্ট্ ফিল্ড ! চাকুরীও জুটিয়া যাইতে পারে। কিছুই বলা যায় না। এত কাল শুধু ঘরে বসিয়াই দরখাস্ত করিয়াছি। আপিসে আপিসে ঘুরিয়া বেড়াইলে একটা কিছু জুটিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।

কলিকাতা যাওয়াই ঠিক।

পরদিন সকালে বাবার রূপার গড়গড়াটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বাঁধা দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। অর্থ না লইয়া কলিকাতা যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। 'রূপার গড়গড়া' শুনিয়া আপনারা ভাবিবেন না যে

আমি কোন জমিদার-তনয়। মোটেই তাহা নয়। বাবা সৌখীন লোক ছিলেন এবং সেই জন্যই সম্ভবতঃ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। গড়গড়া বাঁধা দিয়া গোটা-দশেক টাকা মিলিল। হাতে আরও গোটা-দশেক ছিল। সুতরাং বাহির হইয়া পড়িলাম।

২

এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের বাসায় আসিয়া আশ্রয় লইলাম। সম্পর্কটা এতই জটিল যে বিকাশ বাবু আমার ঠিক কি তাহা নির্ণয় করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল। আমার মায়ের বোন-ঝির খুড়-শাশুড়ীর ভাইপোর পিস্‌তুতো শালার আপন ভায়রাভাই এই বিকাশ বাবু। রীতিমত অঙ্ক না কষিলে ঠিক সম্পর্কটি বাহির করা শক্ত। অত হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়া প্রথম-সাক্ষাতেই তাহাকে বলিয়া বসিলাম, "কি ভায়া, চিন্‌তে পারছ!" ভায়া নিশ্চয়ই আমাকে চিনিতে পারেন নাই। তথাপি বলিলেন, "অনেক দিন পরে কি না! তাই একটু—মানে—বাঁশবেড়ে থেকে আসছেন বুঝি?"

বুঝিলাম বংশবাটিকাতেও ইঁহাদের বংশের কেহ আছেন। বলিলাম, "নাঃ চিন্‌তে পার নি দেখছি। চেনবার কথাও নয়। আসছি আমি বাঁকুড়া থেকে। মানে বাঁকুড়ারও ইন্‌টিরিয়ারে থাকি আমরা। আমি হলাম গিয়ে তোমাদের" বলিয়া মায়ের নিকট হইতে সম্পর্কের যে ফরম্যুলাটা মুখস্থ করিয়া আসিয়াছিলাম তাহা বলিয়া গেলাম এবং শেষকালে বলিলাম, "তুমি হ'লে গিয়ে আমাদের হেমন্তের ভায়রাভাই। আপন লোক সব ক'লকাতার গলি-ঘুঁজিতে পড়ে আছ—দেখাশোনা আর হয়ে ওঠে না। এবার মনে করলাম যাই একটু বিকাশ-ভায়ার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।"

কুলীর মস্তকস্থিত আমার বিবর্ণ ট্রাঙ্ক এবং মলিন বিছানাপত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিকাশ বাবু বলিলেন, "থাকবেন নাকি এখানে?"

"বেশী দিন নয়—দু-চার দিন!"

"ও।"

কুলী বিছানাপত্র নামাইয়া পয়সা লইয়া চলিয়া গেল।

একটু পরে দেখিলাম বিকাশভায়াও খাওয়া-দাওয়া সারিয়া পোষাক পরিয়া বাহির হইয়া গেলেন। একা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। স্থৈর্য্য অবশ্য বেশী ক্ষণ টিকিল না। নানা আকৃতির একপাল ছেলে-মেয়ে আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। কেহ বলে, "লজেঞ্জুস্ দাও!" কেহ বলে, "ঘুড়ি চাই"! কেহ কিছু না বলিয়া পকেটে হাত ঢুকাইয়া দিল। আমার কর্ণমূলে একটি আঁচিল ছিল—তাহা লইয়া কেহ কেহ ভারি খুশী হইয়া উঠিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে ছেলেরাই শুধু জমাইতে পারে!

…বাহির হইয়া পড়িতে হইল।

৩

তিন দিন কাটিল। কলিকাতায় প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে আসিয়াছিলাম—অধ্যয়ন উপলক্ষে। এখন ঘুরিয়া দেখিলাম আমার পরিচিত এক জনও নাই। সহপাঠিগণ কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অধ্যাপকেরা সব নূতন লোক। যে মেসে পূর্ব্বে থাকিতাম তাহা এখন "ড্রাইং ক্লিনিং" হইয়াছে। আমাকে কেহ চিনিল না—আমিও কাহাকেও চিনিলাম না। ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় বিকাশভায়ার বাসায় ফিরিয়া আসিতে হইল। উপর্য্যুপরি তিন দিন এই রূপে কাটিল। বিকাশ বাবুর সহিত একটু দেখা হয় সকালে। সমস্ত সকালটা তিনি তাড়াহুড়া করিতে থাকেন, যেন 'লেট' না হইয়া যায়। নিজেই গামছা লইয়া সকালে বাহির হইয়া যান—বাজার করিয়া ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ফিরিয়া আসেন। বাজারটা রাখিয়াই তেল মাখিতে বসিয়া যান। কোন রকমে গায়ে মাথায় তেল চাপড়াইয়া কলতলায় স্নান করিতে করিতেই গৃহিণীকে হুকুম দেন, "ভাত বাড়। ওগো শুনছ—লেট হয়ে যাবে—পৌনে নটা হ'ল—যেতেও ত আবার খানিক ক্ষণ লাগবে—" তাহার পরই ঊর্দ্ধশ্বাসে নাকে-মুখে গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়েন। ফেরেন কোন দিন রাত্রি দশটা, কোন দিন এগারটা। সুতরাং বিকাশ বাবুর সহিত আলাপ বেশী ক্ষণ জমাইবার অবসরই পাই না। ভাবি—"কাজের মানুষ!" বিকাশভায়াকে দেখিয়া হিংসা হয়। কেমন সুন্দর রোজ আপিসে যায়, সারাদিন কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকে—রাত্রে আরামে ঘুমায়। বিকাশভায়ার

শরণাপন্ন হইলে কেমন হয়? চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই একটা চাকরি ও আমাকে জুটাইয়া দিতে পারে।

৪

পরদিন সঙ্গ লইলাম।

ঠিক যখন সে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতেছে তখন বলিলাম, "ভায়া, আমিও তোমার সঙ্গে একটু বেরুবো।"

"আমার সঙ্গে? কেন?"

"একটা কথা ছিল। মা...—"

"তাহ'লে আসুন। দেরি করবেন না—আমার 'লেট' হয়ে যাচ্ছে। দেরি হয়ে গেলে সে ব্যাটা এসে পড়বে—"

সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম।

পথে যাইতে যাইতে বিকাশ বাবু একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দরকারটা কি?"

"অর্থাৎ—" কি করিয়া কথাটা বলিব ভাবিতে লাগিলাম।

"টাকাকড়ি আমি ধার দিতে পারব না,—সেটা আগেই জানিয়ে রাখছি।"

"না—না, টাকাকড়ি চাই না। আচ্ছা, চল ট্রামেই বলব এখন!"

"ট্রামে ত আমি যাব না। আমি হেঁটে যাব।"

"বেশ ত! চল আমিও হেঁটে যাই। কত দূর?"

"ইডেন গার্ডেন!"

"ইডেন গার্ডেনে আপিস্? কিসের আপিস?"

"আপিস্ কে বল্লে আপনাকে!" বলিয়া বিকাশ বাবু সহাস্য দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন!

"তবে?"

"আরে রামঃ—আপনি বুঝি ভেবেছেন আমি রোজ আপিসে যাই?"

"কোথা যাও, তাহ'লে?" একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিকাশ বাবু বলিলেন, "পালিয়ে যাই!"

নির্ব্বাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম!

বিকাশ বাবু বলিয়া চলিলেন, "বাবা কিছু টাকা fixed deposit রেখে গিয়েছিলেন—তারই ৪০৲ সুদ থেকে গ্রাসাচ্ছাদন চলে। তিন বছর অবিরাম চেষ্টা ক'রেও চাকরি জোটাতে পারি নি। অথচ এম. এ-তে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছিলাম! চলুন—'লেট' হয়ে যাচ্ছে—সে ব্যাটা এসে পড়লে বেঞ্চটা আর পাব না!"

উভয়ে আবার খানিক ক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করিলাম। বিকাশবাবু আবার বলিলেন, "বাড়িতে কথাটা ফাঁস ক'রে দেবেন না যেন! বউ জানে আমি কোন বড় আপিসে বিনা-মাইনেতে 'অ্যাপ্রেন্টিসি' করছি। কিছুদিন পরে মাইনে হবে। তাই তাড়াতাড়ি রোজ ভাত রেঁধে দেয়!"

আবার কিছুক্ষণ নীরবে পাশাপাশি চলিয়াছি। আবার বিকাশ বাবু বলিলেন, "পালিয়ে আসি। বুঝলেন না? বাড়িতে ওই একপাল ছেলে নিয়ে সারাদিন ব'সে থাকা অসহ্য! সারা ক্ষণ ওদের বায়না লেগেই আছে! বাঁশী কিনে দাও, লজেন্‌স্ দাও—পুতুল দাও! পাশের বাড়ির ছেলের লাল জামা হয়েছে সেই রকম জামা ক'রে দাও! গিন্নীরও নানা রকম আবদার আছে!—সরে পড়ি! বুঝলেন না!"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আবার বিকাশবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "বাড়িতে থাক্‌লেই গোলমাল। বুঝলেন না! সেদিন রাত্রে গিয়ে শুনলাম ছোট ছেলেটার পড়ে গিয়ে মাথা ছেঁচে গেছে। নাক দিয়ে রক্তও পড়েছিল প্রচুর। বাড়িতে থাক্‌লে হৈ হৈ ক'রে একটা ডাক্তার-ফাক্তার ডাকতে হ'ত ধার ক'রেও! ছিলাম না—নিশ্চিন্ত!—চলুন একটু পা চালিয়ে—ইডেন গার্ডেনে গাছের ছায়ায় একটা বেঞ্চি আছে—সেইটেতে গিয়ে শুয়ে-ব'সে সারাদিনটা—বুঝলেন—'লেট' হয়ে গেলে আবার আর এক ব্যাটা এসে সেটা দখল করে—বুঝলেন!"

পাশাপাশি দুই জনে দ্রুতবেগে হাঁটিয়া চলিয়াছি।

ইডেন গার্ডেনের খালি বেঞ্চিটা না হাতছাড়া হইয়া যায়!

রাজহংস—শ্রীসজনীকান্ত দাস প্রণীত। প্রকাশক রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, মূল্য দেড় টাকা, পৃঃ ৮৫।

এই কবিতার বইখানি চারটি অংশে বিভক্ত। হিমালয় অংশে বারো, নির্ঝরিণীতে তিন, অরণ্যপ্রান্তরে তিন এবং আকাশ-সাগরে একটি মাত্র কবিতা মুদ্রিত হয়েছে। সংখ্যাহিসেবে না হ'লেও ভাব ও ভাষার দিক থেকে পূর্ব্বোক্ত বিভাগ সুষ্ঠু। এই উনিশটি ছাড়া উৎসর্গটিও কবিতা।

বিশ্লেষণের ফলে একাধিক কবির কবিতার রস শুকিয়ে গেলেও অন্যান্য অনেক কবির শক্তি ক্ষুণ্ণ হয় না, বিশেষতঃ যদি সে শক্তির প্রকাশে নূতনত্ব ও কৃতিত্বের দাবি থাকে। নূতনত্ব অর্থে অভিনবত্ব এবং কৃতিত্ব অর্থে মহত্ত্ব না ধরে সজনীকান্তের দাবি দুই দফায় পেশ করা যায়, ভাব এবং ভাষায়। ভাবকেই সমালোচক প্রাধান্য দিচ্ছেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস যে ভাবের বৈশিষ্ট্যই এই পুস্তকের ছন্দোবৈচিত্র্যকে রূপায়িত করেছে। যে ভাবটি পুস্তিকার প্রত্যেক কবিতার মধ্যে ওতপ্রোত রয়েছে তাকে পৌরুষ বলা চলে। সজনীকান্তের পৌরুষ প্রতিবাদের, তার সংস্থান প্রধানতঃ প্রতিক্রিয়ার। কৃত্রিমতা, অন্যায়, মিথ্যাচার, বিশেষতঃ কামবিভীষিকা এবং 'চঞ্চলগতি নবযুগব্যাধি'র উন্মাদ উত্তেজনার প্রকোপে সকল মানুষই আজ জর্জ্জরিত। তাঁদের মধ্যে কেহ বা ব্যাধির অস্তিত্ব স্বীকার করেই মুক্তি পেতে চান, আবার কেহ কেহ তাহার বিপক্ষে উচ্চকণ্ঠে তীব্র প্রতিবাদ জানান। মাত্র দু-এক জন প্রতিভাশালী কবি নতুন-পুরাতনের দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি করেন তাঁদের কারুকলার কুশলতায়। কবি সজনীকান্তের মনোভাব লক্ষ্য করলে মনে হয় যে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ। অন্যভাবে বলা চলে যে তাঁর প্রতিবাদ সদর্থক নয়, এবং তাঁর কবি-প্রতিভা এই চিরন্তন বিরোধকে সমন্বিত করতে সমর্থ হয় নি। তৎসত্ত্বেও সত্যের খাতিরে স্বীকার করতেই হবে যে সজনীকান্তের প্রতিবাদের মূলে রয়েছে সহজ ও স্বাভাবিক জীবনধর্ম্মের আশ্রিত গোটাকয়েক মূল্য। ঠিক এই কারণেই সজনীকান্তের বিদ্রূপাত্মক কবিতা জনপ্রিয়। কিন্তু রাজহংসে তিনি নিঃসংশয়ী নন—তাঁর বিশ্বাস আজ টলমল করছে। "রাজহংস" ও "দুই মেরু" নামক দুটি কবিতা পাঠে প্রতীতি জন্মায় যে সজনীকান্ত সনাতনী হয়েই বিরোধের সমাধান করতে পারছেন না, এবং তাঁর চিত্ত নিতান্ত আধুনিক রকমেই গঠিত। তাঁর সংশয় যে-পরিমাণে তাঁর বিদ্রূপের ক্ষমতা কমাচ্ছে ঠিক সেই পরিমাণেই তাঁর আধুনিকত্বকে প্রকট করছে। এই প্রকার মনোভাব নিয়ে তিনি কেমন করে চাবুক চালাবেন ভেবে পাওয়া যায় না। আজ তিনি দুই মেরুর অধিবাসী। তাই রাজহংসের কণ্ঠে দুটি ধ্বনির পরিচয় মেলে, যাদের সমন্বয়ে সুকুমারচিত্ত পাঠক-পাঠিকা তৃপ্তি পাবার বাসনা পোষণ করেন। সে যাই হোক, সজনীকান্তের প্রতিবাদে সংহতি না থাকলেও সংহারের ক্ষমতা আছে—তাতে দম্ভ আছে, তবু সেটি তেজীয়ানের, অতএব কবিতার ভাবে দোষ বর্ত্তায় না। রাজহংসের পুরুষালী চীৎকার মেয়েলী অভিমানের অপেক্ষা বেশী উপভোগ্য। সমালোচকের কাছে মর্দ্দানা কর্কশ আওয়াজের মূল্য নাকিসুরের চেয়ে বেশী।

অতএব সজনীকান্তের আঙ্গিক খানিকটা নূতন ধরণের হতে বাধ্য। অনেক অপাঙ্‌ক্তেয় শব্দ তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে এবং স্থানের শোভাবৃদ্ধি করেছে। ৮৭ পৃষ্ঠার মধ্যে ছন্দের তথাকথিত মিল নেই। তবু সবগুলি রচনাই কবিতা—অর্থাৎ গদ্য কবিতা নয়, ছন্দোময় গদ্যও নয়। তার প্রমাণ পাঠে। তার আঙ্গিক হ'ল প্রধানতঃ প্রত্যেক লাইনের অভ্যন্তরস্থ মিলে—সে লাইন আবার এক একটি সম্পূর্ণ বাক্য। বাক্যপ্রধান কবিতার স্বাভাবিক ঝোঁক গদ্যের দিকে—অতএব সেই ঝোঁক কাটাবার জন্য পাঠকের কানে আভ্যন্তরীণ মিলের খবর সর্ব্বদা পৌঁছে দিতে হবে, অবশ্য যদি অন্ত্যের মিলকে কোনো কারণে বাতিল করা হয়। বলা বাহুল্য, এই মিল সাঙ্গীতিক। সজনীকান্ত অক্ষর-বৃত্ত ছন্দে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে তাঁর রচনাকে গদ্য কবিতা এবং কাব্য-গদ্য থেকে বাঁচিয়েছেন এবং অভিনবত্ব না হ'লেও স্বকীয়ত্ব অর্জ্জন করেছেন। সমালোচকের মতে এই প্রকার মুক্তছন্দের নাটকায় গুণ আছে এবং কাব্য-নাট্যে তার যথেষ্ট সমাদর সম্ভব। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নমুনায় সমালোচক তৃপ্তি পান নি।

বিশ্লেষণবিমুখ পাঠক এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, উভয়েই সজনীকান্তের কবিত্বশক্তি স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। বিদ্রূপ ভিন্ন অন্য রসের অবতারণা করতেও যে তিনি সমর্থ এই সুসংবাদটি রাজহংসের পুরুষকণ্ঠে আজ প্রচারিত হ'ল।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পুরঞ্জন—(মহাকবি শেলীর অনুসরণে)। শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত, এম-এ, বি-এল্ প্রণীত। মূল্য এক টাকা চারি আনা মাত্র।

ইংরেজ কবি শেলির 'প্রমিথিয়ুস্ আনবাউণ্ড' নামক কাব্যের অনুবাদ। লেখক ভূমিকায় কাব্যাংশের ক্রম ও অর্থ বুঝাইতে চাহিয়াছেন। অনুবাদ সুষ্ঠু হয় নাই; অবশ্য শেলির ভাষান্তর সহজ নহে—কবির অনুবাদ কবির দ্বারাই সম্ভব, তথাপি এইরূপ অনুবাদের চেষ্টার মূল্য আছে, এবং লেখক যে এই দুঃসাধ্য কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন ইহা তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয়। বহু স্থানে ছন্দোবন্ধ গদ্য হইয়াছে। পুস্তকে বর্ণাশুদ্ধি প্রচুর; টীকাগুলি প্রয়োজনমত আরও সংক্ষিপ্ত করা যাইত বলিয়া মনে হয়।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

মানুষের গান—শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁকুড়া লক্ষ্মী প্রেস হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম পাঁচ আনা।

এখানি কবিতার বই। কোন কোন স্থানে ভাবাবেগ থাকিলেও ছন্দের তেজ না থাকায় প্রাণ আর নাই। এই ধরণের বই

পাকা হাত ছাড়া লেখা চলে না। সমগ্র কবিতার মধ্যেই কাজী নজরুলের ভাষা, চিন্তা ও ভঙ্গীর ছাপ আছে। অন্যের প্রতি ভক্তি থাকিলেও অনুকরণের দ্বারা নিজের শক্তি ক্ষুন্ন হয়। এই গ্রন্থ সেই শ্রেণীর।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

রক্তের টান—শ্রীঅরবিন্দ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক পি, সি, সরকার এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকরূপে পূর্ব্বপ্রকাশিত অত্যন্ত মামুলি ধরণের উপন্যাস। গ্রন্থটিতে বিশেষ কোন চরিত্র-বৈচিত্র্য, ক্রমবিকাশ, লিপিকুশলতা বা বর্ণনাভঙ্গী কিছুই নাই। লেখাও সর্ব্বত্র সমান নহে। মোটের উপর উপন্যাসটি পড়িয়া কোনরূপ তৃপ্তি পাই নাই।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

প্রেম ও প্রয়োজন—উপন্যাস। লেখক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৫৩ পৃষ্ঠা, মূল্য আড়াই টাকা।

তারাশঙ্কর বাবুর চিত্রের উপাদান বাস্তব জীবন। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি অনেক সময়েই এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত্ত যে মনে হয় যেন ইহাদিগকে চিত্রিত করিতে শিল্পীর লেশমাত্র বেগ পাইতে হয় নাই, যেন তাহারা আপন প্রয়োজনে আসিয়া ধরা দিয়াছে। বর্ত্তমানে বাংলা গল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এরূপ ক্ষমতাবান শিল্পী খুব বেশী নাই।

"প্রেম ও প্রয়োজনে"র অধিকাংশ চরিত্রই বাস্তবতার এই বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াছে। বলিবার ভঙ্গিও অত্যন্ত সহজ এবং সতেজ।

কড়ি গাঙ্গুলী এবং রমার চরিত্র-চিত্রণে লেখক অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এক জন বহু প্রকার অবস্থায় বহু প্রকার বাক্য দ্বারা, এবং অন্য জন প্রায় নীরবে শুধু চালচলনের মধ্য দিয়া নিজ নিজ চরিত্র পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সঞ্জীব এবং নলিনীর মধ্যে অসাধারণত্ব বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু সঞ্জীবের মাতা অসাধারণ। সংস্কারের সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ করিয়া ইঁহাকে গভীর দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছে। খ্রীষ্টান মেয়েকে সংসারের মধ্যে হঠাৎ স্থান দিতে তাঁহার সংস্কারে আঘাত লাগিয়াছিল, কিন্তু এই বুদ্ধিমতী নারী পুত্রের জন্য সংস্কার ভুলিয়া হৃদয়ের পথে তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংস্কারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তাঁহার আমরণ ছিল। পুত্রের অনুরোধে তিনি সংস্কার ত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু জীবন থাকিতে পারেন নাই। মৃত্যুকালে তাঁহার নির্দেশমত তাঁহার মৃতদেহ চণ্ডালের সাহায্যে দাহ করা হইয়াছিল। তিনি মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন, "জীবন থাকতে ত সংস্কার ত্যাগ করতে পারলাম না, ম'রে সেই অনুরোধ রাখব।"

বইখানির শেষের অধ্যায় মেলোড্রাম্যাটিক হইয়াছে এবং সেজন্য ভাষাও কবিত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীপরিমল গোস্বামী

রামকৃষ্ণের কথা ও গল্প—স্বামী প্রেমঘনানন্দ প্রণীত। উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১ নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

গ্রন্থকার সূচনায় বলিতেছেন—"রামকৃষ্ণ পরমহংস যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য, তাঁর অমূল্য উপদেশের কয়েকটি একত্রে প্রকাশিত হ'ল। আজকাল অনেকের মুখেই এসব গল্প শুনতে পাওয়া যায়। আমাদের ধর্ম্মপুস্তকে এবং প্রাচীনদের মুখে, রামকৃষ্ণের অনেক গল্প শুনতে পাওয়া যায়।" 'ধর্ম্মপুস্তকে' বর্ণিত এবং 'প্রাচীনদের মুখে' শোনা গল্প পরমহংসদেব উপদেশচ্ছলে ব্যবহার করিয়াছিলেন, অথবা গল্পগুলি তাঁহার মৌলিক রচনা, সে কথা ছেলে-মেয়েদের জন্য পুস্তকে বলিলে শোভন হইত না কি? তাঁহার জীবনকথা-আলোচনায় গ্রন্থকার বলিতেছেন—"সকল মেয়ের মধ্যেই রামকৃষ্ণ মা-কালীকে দেখতেন। ভাল মেয়ের মধ্যেও মা, খারাপ মেয়ের মধ্যেও মা। সারদামণিকেও তিনি মা-কালীর মত দেখতেন।"—সারদামণি ভাল মেয়ে কি খারাপ মেয়ে? শিশুসাহিত্য রচনায় সতর্কতা প্রয়োজন। এ সব সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও পুস্তকখানি উপভোগ্য।

শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত

বর্ষবাণী—জাহান-আরা চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও আলতাফ চৌধুরী কর্ত্তৃক কলিকাতা, ১ নং কুপার ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

প্রধানতঃ ছোটগল্প, নাটিকা, কবিতা প্রভৃতি রস-রচনাই এই বার্ষিক সংগ্রহ-গ্রন্থখানিতে স্থান পাইয়াছে। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কোনও রচনা না থাকিলেও মোটের উপর অধিকাংশই সুখপাঠ্য। কতকগুলি খেলো সস্তাদরের লেখাও অবশ্য আছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ বিশী ও জর্ম্মণ-বৌদ্ধ শিল্পী অনাগারিক গোবিন্দের অঙ্কিত বহুবর্ণ চিত্রাবলীতে বহিখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে।

"সম্পাদিকা ও প্রকাশকের নিবেদন" সময়োপযোগী ও প্রণিধান-যোগ্য।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

প্রেমডোর—শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, এম-বি, বি-এল প্রণীত এবং তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

এখানি কবিতার বই। মুখবন্ধে গ্রন্থকার জানাইয়া রাখিয়াছেন, ইহা উদভ্রান্ত প্রেমিকের প্রণয়কথা ও বিরহগাথা। রচয়িতা 'দারাহারা'। শ্লোক-রূপ ধারণ করিলেও শোক—বিশেষতঃ উদভ্রান্ত-শোক—সকল সময় সমালোচ্য নহে। কেবল পাঠকবর্গের অবগতির জন্য দুই-চারি ছত্র উদ্ধৃত হইল। যথা,

নাই যে অভিমান,
মিশিয়ে আছে পঞ্চভূতে 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ' জ্ঞান।

অথবা

থুয়ে গেছ মা'র কাছে ফণীপ্রেমহার···
ফণী আংটী, ফণী ফুল খুঁজে পাই না আমি।

শ্যালককে সম্বোধন করিয়া 'প্রেমডোর'-লেখক 'প্রেমজোয়ার' নামক কবিতায় বলিতেছেন,

হলই বা ভাই, তোমার সাথে নিত্য আড়াআড়ি,
তাই বলে কি প্রেম দিবে না?

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

চণ্ডীদাসের দেশ ও কালের লিখিত প্রমাণ

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

বড়ু চণ্ডীদাস কোথায় বাসলীচরণ বন্দিয়া কবে রাধাকৃষ্ণ-লীলাগীতি গাহিয়াছিলেন? সে দেশে নিশ্চয় বাসলী ছিলেন, তাঁহার গীতের রসজ্ঞ শ্রোতাও ছিলেন। কোন্ দেশের ভাষায় সে সব গীত রচিত হইয়াছিল? যে দেশে উৎকৃষ্ট গায়ক জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশে গীতবাদ্যের চর্চাও থাকে, তাঁহার অন্তে তাঁহার রচিত গীত বহুকাল প্রচারিত থাকে। সে দেশে যাতায়াতে অসুবিধা থাকিলে সে কবির গীত সে দেশেই প্রচারিত থাকে, দূরদেশে প্রচারিত হইতে বহুকাল লাগে, নূতন দেশে গীতের কিছু কিছু রূপান্তরও ঘটে। মল্লভূমের ইতিহাসে দেখিতেছি, চতুর্দশ খ্রিষ্ট-শতাব্দে বিষ্ণুপুরে গীতবাদ্যের রীতিমত চর্চা চলিয়াছিল। সে বিষ্ণুপুরেই বড়ু চণ্ডীদাসের গীতিকাব্যের পুথী আবিষ্কৃত হইয়াছে। দুইখানা খাতাদৃষ্টে আরও জানা গিয়াছে, সে বিষ্ণুপুরে শত বৎসর পূর্বেও বড়ুর কয়েকটা গীত কলাবতেরা শিষ্যদিগকে শিখাইতেন। ছাতনায় বাসলী, বিষ্ণুপুরে চণ্ডীদাসের গীতিকাব্যের আবিষ্কার, বিষ্ণুপুরে শত বৎসর পূর্বেও কয়েকটা গীতের প্রচলন, ছাতনায় চণ্ডী-চরিতাদি গ্রন্থপ্রণয়ন, এই সকল যোগ আকস্মিক হইতে পারে না। সুবর্ণরেখা নদীর বালিতে সোনা পাওয়া যায়, দামোদরের বালিতে পাওয়া যায় না।

চণ্ডীদাস যেমন-তেমন গায়ক ছিলেন না। সুদূর মিথিলায় তাঁহার খ্যাতি পঁহুছিয়াছিল। চৈতন্যদেবের সময় হইতে অনেক বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের বন্দনা করিয়াছেন। আর যে কত কবি গুরুর নামে আত্মবিসর্জন করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। লোকে এমন গুরুর চরিত সহজে বিস্মৃত হয় না। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, রামীর সহিত চণ্ডীদাসের মিলনের জল্পনা সোনায় সোহাগা হইয়াছিল।

তিনি কোন্ দেশ কবে ধন্য করিয়াছিলেন? ইহাই প্রশ্ন। ছাতনায় খানকয়েক পুথী পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এই প্রশ্নের উত্তর আছে, চণ্ডীদাস হামীর-উত্তর রায়ের রাজত্বকালে ছাতনায় বাসলীর সেবক ছিলেন। এখানে সে সকল পুথীর অল্পস্বল্প বিবরণ দিতেছি।

(১) পদ্মলোচন-শর্মার রচিত সংস্কৃত "বাসলীমাহাত্ম্য"। রচনা-শক ১৩৮৭, ইং ১৪৬৫ সাল। বাসলীর মহিমা-কীর্তন এই পুথীর উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গক্রমে চণ্ডীদাসের নাম ও পরিচয় আছে। (সন ১৩৩৩ সালের ফাল্গুনের "প্রবাসী" দ্রষ্টব্য।)

(২) উদয়-সেন-রচিত সংস্কৃত "চণ্ডিদাসচরিতামৃতম্"। রচনা-শক ১৫৭৫, ইং ১৬৫৩ সাল। এই পুথীর একখানি পাতা পাওয়া গিয়াছে। গত চৈত্র মাসে ছাতনার রামতারক-কবিরাজের বহি পাইয়াছি। তাহাতে আর এক পাতার নকল আছে। সে পাতায় একত্রে বাসলী, হামীর-উত্তর, দেবীদাস ও চণ্ডীদাসের উল্লেখ আছে। চণ্ডীদাসের চরিত-বর্ণন "চণ্ডিদাসচরিতামৃতম্" পুথীর উদ্দেশ্য। কবিরাজের বহির বৃত্তান্ত পরে লিখিতেছি।

(৩) কৃষ্ণ-সেন-রচিত "বাসলী ও চণ্ডীদাস"। উদয়-সেনের পুথীর বঙ্গানুবাদ। রচনা-শক ১৭৩৫, ইং ১৮১৩ সাল। এই পুথী "প্রবাসী"তে মুদ্রিত হইতেছে।

(৪) কৃষ্ণ-সেন-রচিত "ছাতনার রাজবংশপরিচয়।" রামতারক-কবিরাজের বহিতে উদ্ধৃত। রচনা-শক আনুমানিক ১৭৪০, ইং ১৮১৮ সাল। এই বংশ-পরিচয় আগামী মাসে আলোচিত হইবে। ইহাতে শক আছে।

(৫) রাধানাথ-দাস-রচিত "বাসলীর বন্দনা"। বাসলীর রূপাবর্ণন এই পুথীর উদ্দেশ্য। ইহাতে চণ্ডীদাসের নাম নাই। কিন্তু দেবীদাসের আছে। এ বিষয় পরে লিখিতেছি। রচনা-শক আনুমানিক ১৭৫০, ইং ১৮২৮ সাল।

১। রামতারক-কবিরাজের বহি

আমি উদয়-সেন-কৃত "চণ্ডিদাসচরিতামৃতম্" পুথীর মাত্র একখানি পাতা পাইয়াছি। কৃষ্ণ-সেন-কৃত বঙ্গানুবাদের

সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি। কৃষ্ণ-সেন উদয়-সেনকে ছাড়িয়া যান নাই। আর দুই এক পাতা পাইলে নিঃসংশয় হইতে পারা যায়। শ্রীযুত মহেন্দ্র-সেন বলিয়াছিলেন, তাঁহার জ্ঞাতি শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র-কবিরাজের ঔষধের একখানা বহি আছে। তাহাতে কিছু থাকিতে পারে। কিন্তু শ্রীযুত শ্রীশ-সেন মানভূম জেলায় এক গ্রামে কবিরাজি করেন। তিনি বাড়ী না আসিলে বই পাওয়া যাইবে না। গত বৎসর মাঘ মাসে এই কথা হইয়াছিল।

১৭ই ফাল্গুন শ্রীযুত মহেন্দ্র-সেন আমাকে লেখেন, তিনি বইখানি তাঁহার আর এক জ্ঞাতি শ্রীযুত সৃষ্টিধর কবিরাজের নিকট পাইয়াছেন। তিনি গত রাত্রে বাড়ী আসিয়াছেন। সে বইতে "চণ্ডীদাস-চরিতে"র কিয়দংশ আছে। আর, ছাতনার রাজবংশ-লতা আছে। তিনি বংশলতার নকল পাঠাইয়া দেন। পরে গত ৫ই চৈত্র শ্রীযুত রামানুজ-করের হাতে বইখানি পাঠাইয়া দিয়া ৮ই চৈত্র আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই কবিরাজী বহিতে উদয়-সেন-কৃত "চণ্ডিদাসচরিতামৃতম্" পুথীর এক পাতার নকল, কৃষ্ণ-সেন-রচিত পুথীর প্রথম কয়েক পাতার নকল এবং শক-সম্বলিত রাজবংশ-লতা আছে। আরও বহির অল্পস্বল্প নকল, ভারতী-স্তোত্র ও গীত আছে।

পুস্তকের বিবরণ

এটি পুথী নয়, চর্ম ও বস্ত্র-বদ্ধ বহি। পরিমাণ ৮ × ৫॥ × ১॥ ইঞ্চি। শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ৩৮৫। কাগজ আপীতনীল, ফুলিসকেপ। প্রথম পৃষ্ঠে লিখিত আছে,

শ্রীশ্রীহরি স্বহায়
কবিরাজী হাকিমী ডাকতরী
চিকিতসার ঔষধের বহী
কবিরাজ শ্রীরামতারক কবিরাজ
সাকিম ছাতনা
যুক্ত ৫ই বৈশাখ
১২৭৭ সাল

—

বহিখানিতে বাস্তবিক নানা রোগের ত্রিবিধ মতে ঔষধের যুক্তি কষ-কালিতে লেখা আছে। শেষের দিকে কতকগুলি রোগনিবারণের আঙ্কিক কবচ আছে। শেষে 'শ্রীমদুসুদন কবিরাজ' এই নাম লেখা আছে।

শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ-সেনের নিকট শুনিলাম ছাতনা গ্রামে কৃষ্ণদাস নামে এক কবিরাজ ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ মধুসূদন, কনিষ্ঠ রামতারক। উভয়েই চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু মধুসূদন হরিভক্ত ও সঙ্কীর্তন-গায়ক ছিলেন। অনেক সময় গানবাজনায় কাটাইতেন। রামতারক অনুমান সন ১২৮০ সালে, এবং মধুসূদন সন ১২৯৭ সালে, পরলোক গমন করিয়াছেন।

"চণ্ডীদাস-চরিতে"র কবি কৃষ্ণ-সেনের চারি পুত্র ছিলেন (১) গঙ্গানারায়ণ, (২) দর্পনারায়ণ (৩) রঘুনন্দন, (৪) কালাচরণ। দর্পনারায়ণ, মধুসূদন ও রামতারকের ভগ্নীপতি, এবং কালীচরণ ছাতনানিবাসী রাধানাথ-দাসের জামাতা ছিলেন। (এই রাধানাথ-দাস "বাসলীর বন্দনা" লিখিয়াছিলেন)। পিতৃবিয়োগের পর মধুসূদন ও রামতারক অনেক সময় লখ্যাশোলে ভগ্নীপতির বাড়ীতে থাকিতেন। সে সময় এই দুই কবিরাজ লখ্যাশোলের সেনদের বাড়ীর পুথীপত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং নিজেদের বহিতে কিছু কিছু লিখিয়া লইয়াছিলেন। তার পর সে বহি দুই হাত ঘুরিয়া এখন শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র কবিরাজের হাতে আসিয়াছে। ইহাঁর বয়স ৪৮ বৎসর। ইনি বলেন, বহির প্রায় প্রথমার্ধ রামতারকের, এবং দ্বিতীয়ার্ধ মধুসূদনের হাতের লেখা। মধ্যে মধ্যে অজ্ঞাত হাতের লেখা আছে। অতএব আমাদের প্রয়োজনীয় অংশ প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। অক্ষর ও বানান দৃষ্টেও এই কাল মনে হয়।

(১) উদয়-সেনের পুথীর নকল।

বহির ২২০ পৃষ্ঠে "ভারতীস্তোত্র" বাঙ্গালা দীর্ঘত্রিপদী। ছন্দ ও ভাব দেখিয়া মনে হয় এটি কৃষ্ণ-সেনের রচিত। এইরূপ স্তোত্র "চণ্ডীদাস-চরিতে"ও আছে। ২২৫, ২২৬, ২২৭ পৃষ্ঠে উদয়-সেনের পুথীর এক পাতার নকল। অশুদ্ধ সংস্কৃত। বৈশাখের "প্রবাসী"তে টীকায় মুদ্রিত হইয়াছে। দেখা যাইবে, সংস্কৃত শ্লোক ধরিয়া কৃষ্ণ-সেন লিখিয়াছেন। কিন্তু কিছুই ছাড়েন নাই, কিম্বা বাড়ান নাই।

(২) "চণ্ডীদাস-চরিতে"র নকল।

বহির ২৫৯ পৃষ্ঠে 'বাসলী বিশ্বজননী' হইতে ২৯০ পৃষ্ঠে 'কহিলেন হররাণী : বড় তুষ্ট হইনু আমি : যাও বৎস এবে

অন্তঃপুরে।' যে পুথী মুদ্রিত হইতেছে, সে পুথী রাজার ছিল। রামতারকের বহিতে সে পুথীর ৯ পাতা আছে। কিন্তু অতিরিক্ত আছে।

সন ১৩৩৪ সালের ১৫ই বৈশাখ শ্রীযুত মহেন্দ্র-সেন বাঁকুড়ার এক ডাক্তারকে এক পুথীর নকল দিয়াছিলেন। সে পুথী অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। আমি নকলটি পাইয়াছি। ইহাতে রাজার পুথীর দশ পাতা আছে। অতিরিক্তও আছে। দুই নকলের দুই অতিরিক্ত এক, কেবল একটা নামের ঐক্য নাই। পরে বলিতেছি।

বাসলীদেবী হামীর-উত্তরকে আদেশ করিলেন, তুমি দেবীদাস ও চণ্ডীদাসকে পূজাকর্মে নিযুক্ত কর। রাজা মুমুআর মাঠে ও নিত্যালয়ে চণ্ডীদাস ও রামীর প্রেম-আলাপন জানাইলেন। বাসলী সে কথায় কান দিলেন না। রাজা সংশয় মিটাইতে বলিলেন। ইহার পরে রাজার পুথীতে চণ্ডীদাসের মাছধরার কথার পর কি উপায়ে রামী চণ্ডীদাসকে ভুলাইয়াছিল, সে কথা আছে। দুই নকলে এই উপাখ্যান নাই। তৎপরিবর্তে প্রেম-আলাপনের ছয়টি গীত আছে। (১) রামীর প্রতি চণ্ডীদাসের উক্তি, (২) রাইমণির উক্তি, (৩) রামমণির প্রতি চণ্ডীদাসের উক্তি, (৪) চণ্ডীদাসের প্রতি রামমণির উক্তি, (৫) রোহিণীর প্রতি রামমণির উক্তি, (৬) রামমণির প্রতি রোহিণীর স্তব, এই ছয়টি গীত আছে। চারিটার ভাষা হিন্দী-মিশ্রিত ব্রজবুলি, দুইটার সংস্কৃত-মিশ্রিত, ছন্দে জয়দেবের অনুকরণ।* এই সকল গীতে রাসমণি নাম রামমণি হইয়াছে। রামতারকের বহিতে রোহিণী নাম মোহিনী হইয়াছে।

গীতের ছন্দে ও ভাবে পাণ্ডিত্য আছে। আমার মনে হয়, কৃষ্ণ-সেন উদয়-সেনের পুথীতে পালি-গানের সুবিধা না পাইয়া নিজের এক পুথীতে রসজ্ঞতা দেখাইয়াছেন। বড়ুশী-হাতে চণ্ডীদাস পালি-গানে আসিতে পারিতেন না।

আর দেখিতেছি, রামতারকের ও মহেন্দ্র-সেনের মাতৃকা পুথী এক সময়ের নয়। এক হইলে বক্তা ও শ্রোতার নাম একই থাকিত। অতএব মনে হয়, কৃষ্ণ-সেনের রচনার পর এক লেখক রাসমণির নাম রামমণি করিয়াছিলেন, তার পর আর এক লেখক রোহিণীর নাম মোহিনী করিয়াছিলেন। রামতারকের নকল প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বের। ইহার পূর্বে মহেন্দ্র-সেনের নকলের মাতৃকা, এবং তৎপূর্বে কৃষ্ণ-সেনের মূল পুথী রচিত হইয়াছিল।

২। রাধানাথ-দাসের "বাশুলীর বন্দনা"।

সন ১৩৩২ সালে আমি ছাতনা হইতে পাঠশালার এক গুরুমশায়ের লিখিত শুভঙ্করী পাটীগণিত ইত্যাদির একখান বড় বই আনিয়াছিলাম। গুরুমশায়ের নাম ক্ষেত্রনাথ-দাস-মজুমদার, বৈদ্য। পুস্তক-সমাপ্তি-কাল সন ১৩০০ ১ বৈশাখ। ইহার শেষে রাধানাথ-দাস-বিরচিত "বাশুলীর বন্দনা" আছে। এই বন্দনায় রাধানাথ-দাস একটু আধটু ভুল করিয়াছেন বটে, কিন্তু পদ্মলোচনের বিরোধী কিছু লেখেন নাই। কেহ কেহ রাধানাথ-দাসের "বাশুলী মাহাত্ম্য" ও "বাশুলীচরিত" নাম করিয়া ছাতনায় চণ্ডীদাসের নিবাসে সন্দেহ করিয়াছেন। আমি রাধানাথের এই এই নামের পুথী পাই নাই। গত চৈত্র মাসে ছাতনার পাঠশালার আর এক গুরুমশায়ের খাতা পাইয়াছি। এই খাতায় পৃষ্ঠাঙ্ক আছে। ইহার ১০০-১০৪ পৃষ্ঠায় "চৌত্রিশ অক্ষরে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-

---

* এখানে দুইটি গীতের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

রামীর প্রতি চণ্ডীদাসের উক্তি। [১ম উক্তি]

অয়ি রজককুঁবরী বর নারী।
অবহুঁ শুনু বিনয় বাত হঁমারি॥
যো দুঃখ দারুণ দেত বিধাতা।
জগমহ কে নহি সো দুখ-ত্রাতা॥
চারু বিমল মুখচন্দ্র তোঁহারি।
মমকর নয়ন চকোর পিয়ারী॥
নীল-সরোরুহ লোচন তেরা।
ঝপটি লেত হরি দিলহী মেরা॥

চণ্ডীদাসের প্রতি রামমণির উক্তি। [২য় উক্তি]

শ্রীমুখফুল্লশারদগগনেশ বিজাত বচনসুধাধারং।
চাতকীহৃদয়মসরমভিসিঞ্চতি নাথ সমোদমপারং॥
রসচয়-সিঞ্চিত গুণচয়মণ্ডিত সুরসিকরসপরিহাসং।
কামকুহুক মদমত্ত মনস্বিনী যাতি যুবতী সুবিলাসং॥

স্বয়মনুযাচতি কুমুদিনী চন্দ্রসুপ্রেমমনুপেয়ং।
স্বয়মনুযাচতি জলজিনী মধুপপতঙ্গসুপ্রেমং।
স্বয়মনুযাচতি চাতকী জলধর প্রেমসুধারং।
স্বয়মনুযাচতি চকোরিণী চন্দ্রসুধামতিসারং॥

অনেক কবি রামী চণ্ডীদাসের উক্তি-প্রত্যুক্তির গীত রচিয়াছিলেন। কতকগুলি "চণ্ডীদাসের পদাবলী"তে ছাপা হইয়াছে। কোন কোন পদাবলী-সম্পাদক কতকগুলি রাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি মনে করিয়া পদাবলীর অঙ্গীভূত করিয়াছেন।

বর্ণনা," ১৩০-১৩১ পৃষ্ঠায় "অথ কল্যাণী অষ্টক" (বরাকরের নিকটস্থ সেন পাহাড়ির কল্যাণ-গড়-বাসিনীর), ১৩২-১৩৪ পৃষ্ঠায় "অথ বাশুলীর বন্দনা"। আমরা বাল্যকালে পাঠশালায় গঙ্গার বন্দনা, গুরুদক্ষিণা, দাতাকর্ণ, ও চাণক্যশ্লোক পড়িয়াছি। দেখিতেছি, ছাতনার পাঠশালায় পড়ুয়ারা সে সব না পড়িয়া বাশুলীর বন্দনা পড়িত ও স্বদেশের ইতিহাস শুনিত। খাতাখানির আদি অন্ত ছিন্ন, লিপিকাল পাইলাম না। অক্ষর, শব্দের বানান, বিশেষতঃ শুভঙ্করী* দেখিয়া মনে হয় খাতাখানি ৬০।৭০ বৎসর পূর্বে লিখিত হইয়াছিল। দুই গুরুমশায়ের বন্দনায় একই কথা আছে পুরাতন খাতায় শেষ দিকের বাসলী-বন্দনা একটু অধিক আছে। শুনিয়া৷০, রাধানাথ-দাস আর কোন পুথী লেখেন নাই।

"বাশুলীর বন্দনায়" কি আছে দেখি। শুভদিনে শুভক্ষণে কাত্যায়নী হরের বাহনে [বলদের পিঠে] সামন্তভূমে আসিয়া রাজা হামীর-উত্তরকে স্বপ্নে দেখা দেন। ইত্যাদি। তার পর মহিমা প্রকাশ করেন।

(১) সামন্তভূমে 'বরগী' উপস্থিত, 'সভে' ভাবনা করিতে লাগিল। বাসলী যোগিনী-সঙ্গে লইয়া কারও মাথা, কারও হাত কাটিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। রণক্ষেত্রে তাহার বেসর পড়িয়া গিয়াছিল, রাজা খুজিয়া আনিয়া দেন। [এখানে বরগীকে মারাঠা বর্গী মনে করিলে রাধানাথ-দাসকে কাণ্ডজ্ঞানহীন বলিতে হইবে। কারণ, মারাঠা বর্গী ১৭৫২ সালে আসিয়াছিল। সে সময়ে হামীর-উত্তর ছিলেন না। এখানে পদ্মলোচন দস্যুসৈন্যদ্বারা নগর অবরোধ লিখিয়াছেন। বর্গীরা দস্যু-সৈন্য বটে। উদয়-সেন মল্লেশ্বর গোপালসিংহের সৈন্য বলিয়াছেন। সেও দস্যু-সৈন্য। রাধানাথ 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপাইয়াছেন।]

(২) কৌলিক 'পুজারু' পুত্রশোকে সন্ন্যাসী হইয়া দেশ-ত্যাগ করিলেন। বাসলীর পূজার বিঘ্ন হইল। 'সত্ত্বগুণান্বিত মহাঋষি বৃদ্ধ' দেবীদাস গোপাল লইয়া 'পশ্চিমালয়ে' যাইতেছিলেন। বাসলী তাহাকে কহিলেন, তুমি আমার পূজা কর। দেবীদাস সম্মত নহেন, প্রসাদ খাইতে পারিবেন না। বাসলী কহিলেন, তুমি আমাকে তোমার কন্যারূপে পূজা কর, প্রসাদ খাইবে না। [এখনও এই কথা প্রচলিত আছে। পদ্মলোচন লিখিয়াছেন, ঋত্বিক-বংশ বিলুপ্ত হইলে তীর্থ হইতে প্রত্যাবৃত্ত দেবীদাসকে বাসলী পিতা বলিয়া তাহাকে পূজারী হইতে সম্মত করাইয়াছিলেন। উদয়-সেনও সে কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু পূজারী-বংশলোপের কথা লেখেন নাই। রাধানাথের পুথীতে বাসলী চণ্ডীদাসকে পূজা করিতে বলেন নাই। তাহাঁর নামও আসে নাই।]

(৩) এক শাঁখারী সরোবর-তটে এক বালিকাকে শাঁখা পরাইয়া তাহার পিতা দেবীদাসের নিকট শাঁখার দাম চাহিয়াছিল। দেবীদাস বিশ্বাস করেন নাই। তখন বালিকা (বাসলী) জলমধ্য হইতে শাঁখা-পরা হাত দুখানি দেখাইয়াছিলেন। [এই কাহিনী এখনও প্রচলিত আছে। পদ্মলোচন ও উদয়-সেনও লিখিয়াছেন।]

(৪) অম্বিকাপতিকে রক্ষা করিতে বাসলী অশ্বারোহণে আগে আগে চলিয়াছিলেন। পথে এক গোয়ালিনীর নিকট দধি খাইয়া রাজা পিতার নিকট দাম লইতে বলিয়াছিলেন। রাজা চিহ্ন দেখিয়া বাসলীর কর্ম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। [রাধানাথের 'অম্বিকা-পতি' কে, বুঝিতে পারিলাম না। রাধানাথ ছাতনার নাম বাস্থলীয়া, (অপভ্রংশে) বাহুল্যা-নগর বলিয়াছেন। বাসলী, অম্বিকা; বাসলীনগরের রাজা অম্বিকা-পতি, এইরূপ অর্থ করিতে হইতেছে। ছাতনার তের ক্রোশ দক্ষিণে অম্বিকানগর। হামীর-উত্তরের রাজ্য এত দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল কি না, সন্দেহ। সে যাহা হউক, অম্বিকা-পতি কি বিপদে পড়িয়াছিলেন, কেমনে রক্ষা পাইলেন, রাধানাথ কিছুই লেখেন নাই। পদ্মলোচন লিখিয়াছেন। পরে বলিতেছি।]

(৫) কত দিন পরে বাসলী এক তাঁতীকে কৃপা করিয়াছিলেন। [পদ্মলোচন লিখিয়াছেন, তাঁতী অপুত্রক ছিল, বাসলীর কৃপায় তাহার পুত্র হইয়াছিল। উদয়-সেন লেখেন নাই।]

---

* একটা অঙ্ক আছে.

পণ শশী পঞ্চ সর গজবাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস বসু পরমাণ॥

ইহার দ্বিতীয়ার্ধের পাতন

৷/, ৷৷/, ।৶, ৷৷০। এইরূপ চণ্ডীদাস সম্বন্ধে

বিধুর নিকটে বসি নেত্রপক্ষ বাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস গীতপরিমাণ॥

১৩২৫ শকে ৯৯৬ গীত।

৬। কত দিনান্তরে সামন্তরাজ মেদিনীপুরে এক ম্লেচ্ছ ভূপতিকে 'ভেটিলেন,' বাসলী ম্লেচ্ছ ভূপতির বদনে বসিয়া রাজাকে 'খালাস' দেওয়াইলেন। ম্লেচ্ছ ভূপতি আরও অনেক রাজাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাহারাও মুক্তি পাইল। [পদ্মলোচন লিখিয়াছেন, এক ম্লেচ্ছ ভূপতি ছাতনার রাজা হামীর-উত্তরকে পাশ-বদ্ধ করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, বাসলী রাজাকে রক্ষা করিতে অশ্বারোহণে আগে আগে চলিয়াছিলেন। পথে এক গোয়ালিনীর নিকট দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন। বাসলী রাজাকে পাশমুক্ত করিয়া স্ব-রাজ্যে আনিয়াছিলেন। রাধানাথ এক ঘটনা ভাঙ্গিয়া দুইটা করিয়াছেন, কিন্তু মিলাইতে পারেন নাই। উদয়-সেন কিছু লেখেন নাই।]

রাধানাথ-দাস এই ছয়টি কথা লিখিয়াছেন। বাসলী যাহাকে যাহাকে কৃপা করিয়াছিলেন, রাধানাথ তাহাদের প্রতি বাসলীর কৃপা বর্ণনা করিয়াছেন। রাধানাথ কৃপার প্রমাণও পাইয়াছিলেন। বর্ষে বর্ষে শাঁখারীর বংশধর শাঁখা দিত, গোয়ালিনীর বংশধর দুধ দিয়া যাইত, তাঁতীর বংশধর বস্ত্র আনিত, দেবীদাসের বংশধর পূজা করিত। কবি দেবীদাসের বংশ-পরিচয় দিলে এবং তাহাতে চণ্ডীদাসের নাম না করিলে সন্দেহের কারণ হইত। কবির বর্ণনায় দেবীদাস গোপাল-ভক্ত বৃদ্ধ। বাসলীর কৃপায় দেবীদাস গৃহস্থ হইয়াছিলেন। তিনি বাসলীর প্রসাদ খাইবেন না, কিন্তু তাঁহার বংশধরেরা খাইবেন, ইহাও বাসলীর আদেশ। এই সব কথা এখনও প্রচলিত আছে। পদ্মলোচনও লিখিয়াছেন। এই ঐক্য এবং অন্যান্য বিষয়ে ঐক্য হইতে বলিতে পারা যায়, রাধানাথের অনুল্লিখিত বিষয়েও ঐক্য ছিল, চণ্ডীদাস দেবীদাসের ভ্রাতা ছিলেন। আর একটু বলিতে পারা যায়, রাধানাথের মতে বাসলী চণ্ডীদাসকে কৃপা করেন নাই।

আর এক বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। পদ্মলোচন, উদয়-সেন, কৃষ্ণ-সেন, রাধানাথ, এই চারি জনের কেহ কাহারও পুথী দেখিয়া লেখেন নাই। যিনি যেমন শুনিয়াছিলেন, তিনি তেমন লিখিয়াছিলেন। অতএব তিন কালের চারি সাক্ষীর তিন জন বাসলী হামীর-উত্তর দেবীদাস ও চণ্ডীদাসের, এবং এক জন বাসলী হামীর-উত্তর ও দেবীদাসের সমবস্থিতি শুনিয়াছিলেন। চতুর্থ সাক্ষী চণ্ডীদাসের নাম করেন নাই; ইহা হইতে এমন প্রমাণ হয় না, চণ্ডীদাস সেদেশে সেকালে ছিলেন না।

ভ্রম-সংশোধন

গত বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত "উদাসীন" কবিতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ত্রয়োদশ পংক্তি এইরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল :—

"একদিন নিজেকে নূতন নূতন করে সৃষ্টি করেছিলে মায়ার ধ্বনি,"

কিন্তু প্রকৃত পাঠ হইবে :—

"একদিন নিজেকে নূতন নূতন করে সৃষ্টি করেছিলে মায়াবিনী "

বৈশাখের প্রবাসীতে ১৩৯ পৃষ্ঠায় ভ্রমবশতঃ শ্রীমহেন্দ্রনাথ সেনের ছবির নাম শ্রীরামানুজ কর ও শ্রীরামানুজ করের ছবির নাম শ্রীমহেন্দ্রনাথ সেন বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে।

বৈশাখ সংখ্যার "পুস্তক-পরিচয়ে" "রামমোহন রায়ের বিরচিত বেদান্তসার ও রামমোহন রায়ের ক্ষুদ্রপত্রী, প্রার্থনাপত্র, অনুষ্ঠান ইত্যাদি' পুস্তক দুইখানির পরিচয় প্রসঙ্গে শ্রীদেবকুমার দত্ত বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, এই কথা লেখা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি ঢাকা ইণ্টারমীডিয়েট কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক।

বর্ত্তমান সংখ্যায় "চণ্ডীদাস-চরিতে" ১৮৩ পৃষ্ঠায় (১১) ফুটনোটে 'মেদিনীপুর জেলার ঘাটশিলা' মুদ্রিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ঘাটশিলা সিংভূম জেলায়।

জীবনায়ন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

(৩৭)

ভাদ্রের রাত্রির আকাশে ছিন্ন কৃষ্ণমেঘদলের আনাগোনার অন্ত নাই। নবমীর চন্দ্র এই চঞ্চল মেঘরাজ্যে ঝঞ্চার সমুদ্রে রূপালী তরীর মত বার-বার ডুবিতেছে, উঠিতেছে, পথ হারাইতেছে।

উর্দ্ধে আকাশে বায়ুস্রোত প্রবল কিন্তু নিম্নে ধরণীতে একটুও বাতাস নাই। গাছগুলি কালো ছায়ার মত স্থির দাঁড়াইয়া।

বিছানায় শুইয়া অরুণের ঘুম আসে না। চোখ জ্বালা করে, মাথা দপ্‌দপ্‌ করে। পঙ্কের কাজ-ওঠা প্রাচীন বিবর্ণ দেওয়ালে চাঁদের পাণ্ডুর আলো মাঝে মাঝে ঝিকিমিকি করিয়া ওঠে। কালো ছায়ামূর্ত্তির দল নাচিতে নাচিতে চলিয়া যায়।

ঘুম আসে না। মায়ের পুরাতন কারুকার্য্যময় কালো বৃহৎ খাটের এক পাশ হইতে অপর পাশে সে গড়াইয়া যায়, বার-বার পাশ বদল করে। ঘুম আসে না।

অরুণ ব্যথিত হৃদয়ে প্রার্থনা করে, ঘুম দাও, বিধাতা ঘুম দাও। মাতার বৃহৎ অয়েল-পেন্টিঙের দিকে করুণ নয়নে চাহিয়া থাকে। চোখ বুজিয়া স্থির হইয়া শোয়, ঘুম আসে না।

পুরাতন ফ্রেঞ্চ ঘড়িটি আবার বিকল, বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রাত বোধ হয় দুইটা হইবে। চারিদিক গভীর স্তব্ধ, প্রাণহীন।

তপ্ত শয্যা ত্যাগ করিয়া অরুণ ওঠে। কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া খায়। ইলেকট্রিক আলো জ্বালাইয়া কিছু ক্ষণ ইজিচেয়ারে চুপ করিয়া বসে। ঘড়িগুলি দেখে। সব ঘড়িই বন্ধ। তাহার মাথায় ঘড়ির চাকার মত চিন্তার ধারা কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুরিতেছে। এই চিন্তার ঘূর্ণাবর্ত্ত যে কিছুতেই থামে না। সে কিছু ভাবিতে চায় না। দম-দেওয়া কলের চাকার মত চিন্তাগুলি মাথায় এমন ঘোরে কেন?

আলো নিবাইয়া অরুণ ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। চেষ্টা করিলেই ঘুমান যায় না। ইচ্ছা করিলেই ভোলা যায় না; চিন্তার স্রোত ত নিজের ইচ্ছায় থামান যায় না। সে যেন কোন্ অদৃশ্য শক্তির হস্তের ক্রীড়নক। সে শক্তি তাহার দেহমনে এত বেদনা দিয়া কি অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে চায়?

অরুণ ঘর হইতে বাহির হইয়া চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। যেন একটা ভূতের বাড়ি। অন্ধকারময় প্রাঙ্গণ রহস্যময় নয়, ভীতিপ্রদও নয়, প্রাণহীন অন্ধ বিবরের মত।

ধীরে সে প্রতিমার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘর তালাবন্ধ, ভিতরে কি মৃদু শব্দ হইতেছে, বোধ হয় ইঁদুরের দল ঘুরিতেছে।

সে ভুলিয়া গিয়াছিল যে প্রতিমা এখন সিমলায়।

এক মাস হইল অজয়ের সহিত প্রতিমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে সিমলাতে।

কাকার মৃত্যুর ঠিক পরেই প্রতিমার বিবাহ দেওয়া অরুণের ইচ্ছা ছিল না। স্বর্ণময়ীও আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু হেমবাবু বিশেষ তাগাদা দিয়া চিঠি দিলেন। একদিন তিনি স্বর্ণময়ীকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন—তোমার ছেলের যদি এখন বিয়ে না দাও তাহলে —

স্বর্ণময়ী বাধা দিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, তোমায় আর বলতে হবে না, আমি যতশীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা করছি। হেমবাবুর প্রথম যৌবনের দু-একটি কীর্ত্তি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল।

প্রতিমাও বিবাহে বিশেষ উৎসাহিতা। এ বৎসর তাহাকে আর পরীক্ষা দিতে হয় না।

বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইতেই, অজয়ের বিবাহ

হইয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে তাহার একটি চাকরি পাইবার সম্ভাবনা দৃঢ় হইল।

অরুণ বি-এ পরীক্ষায় ইতিহাসে ফার্ষ্টক্লাস পাইল। সে কি করিয়া যে ফার্ষ্টক্লাস পাইল তাহা ভাবিয়া সে অবাক হইয়াছিল।

প্রতিমার কথা ভাবিতে গিয়া উমার কথা অরুণের মনে পড়ে। উমাকে যে ভুলিতে হইবে। তবু তাহার কথা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনে পড়ে।

প্রতিমার বিবাহের দিনগুলিতে নানা কাজের মধ্যে উমাকে সে বড় নিকটে পাইয়াছিল। বিবাহ-বাড়িতে নানা আভাসে, ইঙ্গিতে, এ বৎসরের শেষে যে আর একটি বিবাহ আসন্ন, এই কথা সবাই ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিত। উমার নিকট অরুণকে দেখিলেই রসিকা মহিলাগণ এক বিশেষ অর্থপূর্ণ হাস্য মুচকাইয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতেন। অরুণ লজ্জিত হইয়া উঠিত, উমা ভয়ঙ্কর রাগিয়া যাইত।

প্রতিমার ঘর পার হইয়া বারান্দা দিয়া অরুণ পূবের বড় বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

জীবনের এক-একটা ঘটনা স্মৃতির ফলকে যেন আগুনের রেখায় লেখা হইয়া যায়; কোন্ প্রিয়জন একদিন কি কথা বলিয়াছিল, বার-বার সে কথাগুলি কেন মনে আসে?

অজয়-প্রতিমার বিবাহ চুকিয়া গিয়াছে। বাড়ি নিঝুম। বাতাসে ভাজা লুচি ও নানা তরকারির গন্ধ।

অরুণ ও উমা বারান্দার এক কোণে নিভৃতে আসিয়া দাঁড়াইল। কোণে একখানি চেয়ার ছিল।

অরুণ বলিল—ব'স, তুমি ভয়ানক শ্রান্ত, খুব খেটেছ, আজ।

উমা হাসিয়া বলিল—তুমি ব'স, তুমি হচ্ছ এখন কুটুম-বাড়ির লোক, আমি বারান্দায় রেলিং ঠেস দিয়ে বেশ দাঁড়াচ্ছি।

দুই জনে পাশাপাশি দাঁড়াইল। সুশীতল রাত্রি। আকাশ তারায় ঝক্‌মক করিতেছে।

—তুমি তাহলে কাল যাচ্ছ?

—আর কি, বিয়ের হাঙ্গাম ত চুকে গেল।

—আর দু-চার দিন থেকে যাও, ভয়ানক পড়ার ক্ষতি হবে?

—সবেতেই তোমার ঠাট্টা। তুমি যদি বল থেকে যাই।

উমা চুপ করিয়া রহিল। অরুণ অনুভব করিল, উমা মুখে মৃদু হাসি খেলিয়া যাইতেছে।

অরুণ আবেগের সহিত উমার হাত ধরিয়া বলিল—শো উমা, তুমি জান, আমি তোমাকে—

উমা গম্ভীর মুখে হাত টানিয়া লইয়া একটু দূরে সরি দাঁড়াইল।

উমা একটু বিরক্তির স্বরে বলিল—আমি জানি, তুমি কি বলতে চাও; কিন্তু সেকথা ব'লে কোন লাভ আছে কি কেন তুমি নিজেকে এমন 'চীপ্' ক'রো?

অরুণ আপনাকে দমন করিতে পারিল না। সারাদি খাটিয়া তাহার দেহ যেমন শ্রান্ত তাহার মন তেমনি উত্তেজিত সে একটু রুক্ষ স্বরে বলিল—ভালবাসা সে কি এত সস্তা সেটা চীপ্ জিনিষ?

উমা গম্ভীর স্বরে বলিল—ভালবাসা কি আমি বুঝি ন তুমিও বোঝ না অরুণ,—তুমি যা ভালবাসা ভাবছ—

—আমি বুঝি কি বুঝি না সে বিচার তোমার করতে হবে না, তুমি চুপ ক'রো।

—কি সেণ্টিমেণ্টাল তুমি।

—হ্যাঁ, সেণ্টিমেণ্টাল! একটা কথার আশ্রয় নিয়ে কথার আড়াল দিয়ে হৃদয়টাকে তোমরা বাদ দিতে চাও, হৃদয় ব'লে কি কিছু নেই!

অরুণ আবেগের সহিত উমার দিকে অগ্রসর হইয়া তাহার হাত জড়াইয়া ধরিল।

উমা জোরে হাত টানিয়া লইয়া বলিল—কি যে ক'রো,—আমি মল্লিকা মল্লিক নই, বুঝলে।

অরুণ একটু শিহরিয়া কাঁপিতে লাগিল; তিক্তস্বরে বলিল—সে জানি, মল্লিকা মল্লিক তোমার মত হৃদয়হীনা নয়।

—বেশ! আমার হৃদয় নেই, তোমায় বলছি ত মাঝরাতে তুমি কি আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলে—যাও ঘুমোও গে যাও।

—আমায় ক্ষমা কর উমা। আমি কাল চ'লে যাব তোমার কাছ থেকে এমনভাবে বিদায় নিতে চাই না।

—দু-এক দিন থাকই না বাপু।

—না, কালই যাব।

—আচ্ছা, পূজোর ছুটিতে দিল্লীতে এস।

—না, আমি আর আসব না, আমি আর আসতে চাই না।

—কি পাগল ছেলে, কি সেন্টিমেণ্টাল তুমি।

উমা হাসিয়া উঠিল।

—বেশ, আমি সেন্টিমেণ্টাল, তা নিয়ে তুমি রঙ্গ করতে পার, তোমার ব্যঙ্গ আর আমি সইব না।

—অরুণ, লক্ষ্মীটি, কিছু মনে ক'রো না ভাই, আজ আমি বড় ক্লান্ত।

উমার দিকে চাহিয়া অরুণের চোখে জল আসিল। কেন সে উমাকে এমন গভীর ভাবে ভালবাসে। সে ভালবাসা আর সে সহিতে পারিতেছে না, সে ভালবাসার ভারে তাহার হৃদয় যে ভাঙিয়া পড়ে। বুঝি চলিয়া যাওয়াই ভাল।

না আমি কিছু মনে করি নি উমা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। যাও শুতে যাও, গুড্ নাইট্।

—তুমিও শুতে যাও। তুমি কি বারান্দায় হাঁ ক'রে ব'সে থাকবে—ঠাণ্ডা রাত।

ভাদ্ররাত্রির আকাশে কালো মেঘজালের আনাগোনার অন্ত নাই। অরুণের মাথায় বিদায়বেলায় উমার কথাগুলি সমুদ্রগামী পাখীর ঝাঁকের মত ঘুরিয়া বেড়ায়।

ভুলিতে হইবে উমার কথা, ভুলিতে হইবে। সিমলা ছাড়িবার সময় উমা বলিয়াছিল, au revoir, অরুণ বলিয়াছিল গুড্ বাই।

উমা বিবাহ করিবে না, উমা সেন্টিমেণ্টকে ঘৃণা করে। ভালবাসাকে উমা ব্যঙ্গ করে।

উমা বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখিতে চায়, কমরেড হইতে চায়।

কিন্তু অরুণ চায় প্রেম, অরুণ চায় প্রেমিকা, অরুণ খোঁজে লীলাসঙ্গিনী। যে-প্রেম দেহমনকে সুধারসে স্নিগ্ধ করিবে, যে-প্রেম সকল কামনা অন্তরের সকল তৃষা মিটাইয়া দিবে, সে-প্রেম যদি না মিলিল, কেন সে মরীচিকার মত আলেয়ার মত উমার সন্ধানে ফিরিবে?

সিমলা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া অরুণ স্থির করিল, উমার সহিত সে আর কোন সম্বন্ধ রাখিবে না।

অন্তরের গভীর প্রেম দিয়া উমার যে কনকপ্রতিমা গড়িয়া তুলিয়াছিল সে মানসী মূর্ত্তি সে ভাঙিয়া ফেলিল। প্রেম-প্রতিমা বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

বোধ হয় উমার কথাই সত্য। হয়ত সে শুধু যৌবন-বেদনায় কবি-মনের কল্পনায় রঙীন স্বপ্নজাল রচনা করিয়া ভাবিয়াছে, এই প্রেম, এই সত্য।

সে স্বপ্নজাল ছিন্ন হউক। প্রথম-যৌবন-স্বপ্ন টুটিয়া যাক্, রাত্রির সজল অন্ধকারের মত মিলাইয়া যাক্।

ষ্টেশনে বিদায়ের সময় সে উমাকে বলিতে চাহিয়াছিল, The play is finished রঙ্গ শেষ হইয়া গেল। বিদায়!

কিন্তু উমার মনে ব্যথা দিয়া সে কিছু বলিতে পারিল না। কেন বলিতে পারে না?

অন্ধকার গলির দিকে চাহিয়া অরুণ ভাবিতে লাগিল, উমা, তুমি যদি কোনদিন জীবনে কাউকে ভালবাস, তখন তুমি বুঝতে পারবে, তুমি আমার হৃদয়ে কি গভীর বেদনা দিয়েছ। সে বেদনার জন্য আমি কৃতজ্ঞ, সে বেদনায় আমি ধন্য, সে বেদনা আমাকে নবজীবনের দ্বারে পৌঁছে দিল।

অরুণ আপন মনে হাসিয়া উঠিল, সত্য সে বড় সেন্টি-মেণ্টাল।

বাড়ির পূর্ব্বাংশে চাহিয়া তাহার চোখ জ্বলিতে লাগিল। পূর্ব্বপুরুষদের প্রাচীন প্রিয় উদ্যান আর নাই। শিবপ্রসাদের সকল ঋণ শোধ করিবার জন্য বাগান ও পুকুর বেচিয়া দিতে হইয়াছে। ব্যারিষ্টার সেন বলিয়াছিলেন, কেবলমাত্র বাড়ির বাগানের অংশ বেচিলেই মর্টগেজের দেনা শোধ হইতে পারে। অরুণ কিন্তু মৃত কাকার সকল দেনাই শোধ দিতে চায়। সেজন্য পুকুরের অংশও বেচিতে হইল।

এখন বাগানে আর বৃহৎ প্রাচীন বৃক্ষগুলি নাই; নূতন বাড়ি তৈরি হইতেছে, ভারার বাঁশগুলি সঙ্গীনের মত আকাশের দিকে উঁচু হইয়া আছে।

ইটের স্তূপের দিকে চাহিয়া অরুণ আর বারান্দায় দাঁড়াইয়া

থাকিতে পারিল না। শিবপ্রসাদ যে-গৃহে শয়ন করিতেন সে-গৃহে আলো জ্বালাইয়া প্রবেশ করিল। তাহার গা কেমন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। নিঃশব্দে সে ঘরে পায়চারি করিতে লাগিল। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত শিবপ্রসাদ এইরূপ-ভাবে ঘরে বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

ধীরে অরুণ ড্রেসিং টেবিলের সংলগ্ন কাবার্ড খুলিল। দেখিল একটি বড় মদের বোতল ও গেলাস রহিয়াছে। একবার সে ঘরের চারিদিকে চাহিল। বাড়িখানি নিঝুম, ঘরের আলো দপ্ দপ করিতেছে।

দক্ষিণ-ফ্রান্সের দ্রাক্ষারসপূর্ণ রঙীন মদ কাচের গেলাসে কানায় কানায় ঢালিয়া অরুণ কয়েক চুমুকে মদ খাইতে লাগিল। গলা জ্বলিতে লাগিল বটে, কিন্তু বুকের ব্যথা যেন কিছু কমিয়া আসিল।

আর এক গেলাস মদ ঢালিবে ভাবিল। কোথায় যেন খস্খস্ শব্দ হইল। বুঝি কাকা চিরপরিচিত চেকের ড্রেসিংগাউন গায়ে জড়াইয়া বারান্দা হইতে ঘরে প্রবেশ করেন। অরুণ তাড়াতাড়ি কাবার্ড বন্ধ করিয়া দিল। ঘরের আলো নিবাইল না। অন্ধকারে যাইতে তাহার কেমন ভয় করিতেছে।

চঞ্চলপদে সে বিছানায় গিয়া শুইল। এইবার বোধ হয় চোখে ঘুম আসিবে।

এলার্ম ঘড়িটা সহসা বাজিয়া থামিয়া গেল। ভাদ্রে উষার আকাশ অন্ধকার করিয়া ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। অরুণের একবার ইচ্ছা হইল, বৃষ্টিতে গিয়া ভিজিয়া আসে। কিন্তু বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার মত শক্তি যেন তাহার মনে নাই।

ধীরে সে চোখ বুজিল। কোন সুখস্বপ্নের মায়া তাহার চোখে ভরিয়া আসিল না। চোখ দুইটি জ্বালা করিতেছে। প্রথম যৌবন-স্বপ্ন টুটিয়া গিয়াছে।

বারিবর্ষণের ঝরঝর সঙ্গীতে তাহার দেহমন শান্ত হইয়া আসিল। ধীরে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঠাকুমা তখন উঠিয়া সকল শূন্য ঘরের দরজায় দরজায় জল ছড়া দিতেছেন।

(সমাপ্ত)

প্রভাত-পদ্ম

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

ফুটিছে প্রভাত-পদ্ম চেতনার সাগর-সীমায়।
মৃত্যুঞ্জয়ী পদ্ম সেই—মুগ্ধ চোখে দেখিতেছি চেয়ে
প্রবাহিয়া চলিয়াছে জীবস্রোত বেলা-বালুকায়,
লঙ্ঘিয়া জীবন-মৃত্যু, দুনিবার ব্যবধান বেয়ে।
মরণ-রাত্রির পারে জ্যোতির্ম্ময়ী সুন্দরী উষায়
মনে হয় উড়ে যাই বিহগের মত গান গেয়ে,
পার হ'য়ে মেঘলোক, প্রাণ ভরি দিব্য কল্পনায়
মৃত্তিকার গন্ধ ল'য়ে পক্ষপুটে উড়ে যাই ধেয়ে।

আবর্ত্তিত সুখ-দুঃখ রচিতেছে মর্ত্ত্য-ইতিহাস,
আপন ভুবন রচে নির্বিরোধ ভাব-স্থির কবি,
সে ভুবনে রাত্রি শেষ,—হ'ল দূর দুঃসহ বিরহ।
কবিরে চিনেছে জানি গাঢ়-নীল নির্ম্মল আকাশ—
কবিরে চিনেছে জানি মূর্ত্তিমতী বেদনা-ভৈরবী
ফুটিছে প্রভাত-পদ্ম—প্রাণে তারি সুর অহরহ।

গ্রন্থাগার-আন্দোলনের প্রসার

কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়

এগার বৎসর পূর্ব্বে আমরা যখন প্রথম হুগলী জেলা পাঠাগার-সম্মেলন আহ্বান করি তখন ভাবিতে পারি নাই যে আমরা মাঝে মাঝে এই ভাবে সম্মিলিত হইতে পারিব। আমাদের দেশের জলবায়ুর দোষেই হউক, বা আর কোন কারণেই হউক, প্রথম উদ্যম ও উৎসাহ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসে। এ ক্ষেত্রে যে তাহা ঘটে নাই—ইহা নিঃসন্দেহে আশার ও আনন্দের কথা।

রাজবলহাটে গত ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত সপ্তম হুগলী জেলা পাঠাগার সম্মিলনের সভাপতি ও প্রতিনিধিবর্গ।

১৯২৫ সালের ৮ই ও ৯ই মে বাংলা দেশের মধ্যে বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে বাঁশবেড়িয়ায় প্রথম গ্রন্থাগার-আন্দোলন আরব্ধ হয়। সেই সময় হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সমিতি স্থাপিত হয়। হুগলী জেলাকে কেন্দ্র করিয়া কার্য্যের প্রথম সূত্রপাত হয়, ক্রমশঃ কার্য্যক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। হুগলী জেলার অধিকাংশ গ্রন্থাগার এই সমিতির সহিত সংযুক্ত

আছে। আমাদের দ্বিতীয় সম্মেলন ও প্রদর্শনী হয় উত্তর-পাড়ার সারস্বত-সম্মেলনের আহ্বানে। তৃতীয় সম্মেলন ও প্রদর্শনী হয় চন্দননগরে নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে—তৎপরবর্ত্তী অধিবেশন হয় আবার বাঁশবেড়িয়ায়; তাহার পরের সম্মেলন ও প্রদর্শনী হয় শ্রীরামপুর রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী হলে। এই সকল সম্মেলন ও প্রদর্শনী গ্রন্থাগার-সমিতির কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়। দেশে অর্থ-নৈতিক দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। এই দারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতার দিনে সমিতির কার্য্যপ্রসার আশানুরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। সরকার গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বহুদিন উদাসীন ছিলেন। আন্দোলনের ফলে সে ভাব কিছু কিছু কাটিতেছে। জেলা বোর্ড বা ইউনিয়ন বোর্ড পূর্ব্বে গ্রন্থাগারে অর্থসাহায্য করিতে পারিতেন না, আইনগত বাধা ছিল। সংশোধিত আইন দ্বারা সে-সব বাধা দূর হইয়াছে। এখন জেলাবোর্ড বা ইউনিয়ান বোর্ড তাঁহাদের এলাকাস্থিত গ্রন্থাগারে সাহায্য করিতে পারিতেছেন। হুগলী জেলা বোর্ডই তাহার প্রথম পথপ্রদর্শক। বাংলা দেশে হুগলী জেলার গোঘাট ইউনিয়ান বোর্ডই সর্ব্বপ্রথম তাঁহাদের এলাকাস্থিত গ্রন্থাগারে সাহায্য দান প্রবর্ত্তন করেন।

বাংলা দেশে লাইব্রেরী-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইত। মান্দ্রাজ, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে গ্রন্থাগারিকের কার্য্য শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে, বাংলা দেশে তাহার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। সরকারও একেবারেই উদাসীন ছিলেন। এই ঔদাসীন্য ঘুচাইবার প্রস্তাব করিলে তাঁহারা বলেন যে এখানে বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের চাহিদা নাই। চাহিদা আছে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য সন ১৯৩৪ সালে আমরা বাঁশবেড়িয়ায় নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক গ্রন্থাগারের কর্ম্মীদের লইয়া একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুলি। তাহাতে দেখা যায় শিক্ষার্থীর অভাব নাই। সে কেন্দ্রের শিক্ষার ভার লন শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। তিনি সেই সময় বড়োদা ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের কার্য্য শিক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসেন। এখন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক। যদিও অন্যান্য অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতী এই কেন্দ্রে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন ও ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক খাঁ-বাহাদুর আসাদুল্লা এই কেন্দ্রের ডিরেক্টর ছিলেন, তবু প্রমীল বাবুর সাহায্য না পাইলে আমরা এই শিক্ষাকেন্দ্র খুলিতে পারিতাম না। এই শিক্ষাকেন্দ্রের সাফল্যে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুলিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ইতিমধ্যে ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক খাঁ-বাহাদুর আসাদুল্লার চেষ্টায় সেখানে একটি শিক্ষাকেন্দ্র ছয় মাসের জন্য খোলা হয়। তাহার ফলও বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে।

আমরা প্রমীল বাবুকে দিয়া আরও একটা দরকারী কাজ করাইয়া লইয়াছি। আমাদের জেলার সদর শ্রীরামপুর ও আরামবাগ মহকুমায় যত লাইব্রেরী আছে—সাধারণ লাইব্রেরীই হউক আর স্কুল-কলেজ-সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীই হউক—তিনি স্বয়ং সেগুলি পরিদর্শন করিয়া তাদের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার উন্নতি বিধানের সহজ উপায় তাঁহার বিবরণে দিয়াছেন। আর তিনি যেখানে যেখানে গিয়াছেন সে সব স্থানে কর্ম্মীদিগকে লাইব্রেরী-পরিচালন সম্বন্ধে পরামর্শ ও উপদেশও দিয়াছেন। গ্রন্থাগারগুলিকে জনপ্রিয় করিতে হইলে পুস্তকের অবাধ ব্যবহারের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। অন্ততপক্ষে দরকারী বই যাহাতে বিনা চাঁদায় পাঠককে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের স্কুল-লাইব্রেরীকে চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে। যাহাতে ছাত্রেরা লাইব্রেরীতে আকৃষ্ট হয় ও তাহাদের পাঠের আগ্রহ বাড়ে তাহার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

বিলাতে কৌণ্টি লাইব্রেরী সার্ভিসেজের মত জেলাবোর্ডের মধ্যবর্ত্তিতায় লাইব্রেরীগুলির মধ্যে পরস্পর পুস্তক লেন-দেনের ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এই লেন-দেনের ফলে একই পুস্তক দোকর-তেকর খরিদ বন্ধ হইয়া সেই টাকায় নূতন নূতন বই কেনা চলিতে পারিবে। ইহাতে অন্য অনেক রকম সুবিধা আছে।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে এদেশে শিক্ষিত কারাবন্দীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। তাঁহারা কারাগারে পুস্তকের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতে থাকেন, কেবল হুগলীতে নয়, অন্য কারাগারেও পুস্তকের চাহিদা পূরণ করিবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। এ-সম্বন্ধে আমরা কয়েক বৎসর আন্দোলন করিয়া আসিতেছিলাম—এবার তাহার কিছু ফল

ফলিয়াছে। সরকার জেলখানায় গ্রন্থাগার স্থাপন করার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া সেজন্য কিছু টাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন ও আমাদের কাছেও পুস্তকের সাহায্য চাহিয়াছেন আশা করি যাঁহার যেরূপ সাধ্য পুরাতন পুস্তক বা পত্রিকা সংগ্রহ দ্বারা বন্দীদের পুস্তকপাঠে সাহায্য করিয়া তাহাদের কারাক্লেশ অনেকটা লাঘব করিতে চেষ্টা করিবেন।

আর এক কথা। আমাদের দেশে শিশু-পাঠাগারের বিশেষ অভাব দেখা যায়। স্কুলসংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীগুলিও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, আদৌ চিত্তাকর্ষক নয়। কয়েক বৎসর পূর্বে আমরা বাঁশবেড়িয়া সাধারণ লাইব্রেরীতে একটি শিশু-বিভাগ খুলিয়াছি—তাহার পরিচালনার ভার শিশুদের হাতে অনেকটা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফল অনেকটা সন্তোষজনক বলিয়া মনে হইতেছে। এই বিভাগ খুলিবার পর শিশুদের পুস্তকপাঠে অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছে। স্কুলে ধরাবাঁধা নিয়মে পাঠ্য পুস্তক পড়িতে হয়। পড়াশোনা কতকটা বাধ্য হইয়া করিতে হয় বলিয়া প্রকৃত পাঠানুরাগ জন্মে না।

স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে চিত্তাকর্ষক পুস্তক সহজেই পাঠানুরক্তি বাড়াইয়া দেয়। শিশুই দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা। তাহাদের গড়িয়া তোলা, তাহাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করাই শিশু-বিভাগের প্রধান লক্ষ্য। এখানে ছেলেদের গল্পের ক্লাসও অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার প্রসার বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইতেছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশে শিশু-সাহিত্য তেমন গড়িয়া উঠে নাই—সে বিষয়েও সচেষ্ট হইতে হইবে।

সরকার কবে কি করিবেন বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় আর নাই। আমাদেরও একটা কর্তব্য আছে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় গ্রন্থাগারের প্রত্যেক বিভাগের জন্য পৃথক ভাবে গ্রন্থাগারিকদিগকে শিক্ষিত করা হয়। যে-সকল লাইব্রেরীতে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বা ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত গ্রন্থ রক্ষিত হয় সেগুলির জন্যও বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। এমন কি হাসপাতালের লাইব্রেরীর জন্য পৃথক ভাবে বিশেষজ্ঞ প্রস্তুত ও নিয়োগ করা হয়। হাসপাতালের গ্রন্থাগারিক চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া প্রত্যেক রোগীর উপযোগী পুস্তক সরবরাহ করিয়া থাকেন—সব পুস্তক সকল রোগীর পক্ষে উপযোগী নহে। রোগীর মনের উপর পুস্তকের প্রভাব বিস্তৃত হয়। সেজন্য মানসিক অবস্থা বুঝিয়া পুস্তক নির্বাচন করিতে হয়। কোন পুস্তকে সাময়িক উত্তেজনা বর্দ্ধন করে, আবার কোন পুস্তক রোগীকে শক্তি দান করে, কোন পুস্তকপাঠে অবসাদ আনিয়া দেয়, কোনটি আবার মোহিনী শক্তিতে অভিভূত করিয়া ফেলে। কাজেই গ্রন্থাগারিককে পুস্তক-নির্বাচনে অতিরিক্ত পরিমাণে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।

আজকাল অনেক শিক্ষিত লোক চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য হাসপাতালে গিয়া থাকেন। তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য পুস্তক বা সাময়িক পত্রের অভাব পরিলক্ষিত হয়। রোগীদের দীর্ঘ অবসর কাটাইবার জন্য হাসপাতালে চিত্ত-বিনোদক সৎসাহিত্যের আমদানী করার আবশ্যক হইয়াছে। তাহাতে রোগীর শরীর ও মন দুই-ই ভাল থাকিবে এবং আরোগ্যের পথও সুগম হইতে পারে। আমরা সেই উদ্দেশ্যে হাসপাতালে রাখিবার জন্য পুস্তক ও সাময়িক পত্র সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছি। আশা করি হৃদয়বান লোকের সাহায্যে আমাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

আলোচনা

মণিপুরের বর্ত্তমান মহারাজা

শ্রীপরেশচন্দ্র ভৌমিক

গত চৈত্র মাসের "প্রবাসী"তে শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র-লিখিত "মণিপুর প্রবাসে" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার এক স্থানে বর্ত্তমান মহারাজা সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হইয়াছে তাহা পড়িয়া বিস্মিত হইলাম। মন্তব্যটি এইরূপ :—

মণিপুরের বর্ত্তমান মহারাজা

"রাজা ঘোর কৃষ্ণকায়, মোটা এবং বেঁটে। এমনতর মিশকালো রং মণিপুরীদের মধ্যে বড়-একটা দেখতে পাওয়া যায় না। এর চেহারায় বা পোষাক-পরিচ্ছদে রাজোচিত কোন লক্ষণই নেই। আসলে ইনি হচ্ছেন এক জন ভুঁইফোড় রাজা। এঁর পিতা চৌবী চৈম ছিলেন মণিপুরের নিতান্ত নগণ্য এক প্রজা।"

এইরূপ ব্যক্তিগত সমালোচনা সত্য হইলেও সুরুচি ও ভদ্রতা-বিগর্হিত হইত। কিন্তু সত্য নয় বলিয়া আরও আপত্তিকর ঠেকিতেছে। লেখক মণিপুরের মহারাজার বংশপরিচয় সম্বন্ধে তথ্য কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন জানি না, কিন্তু তিনি যদি 'ইম্পীরিয়াল গেজেটিয়ার' কিংবা "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা"র মত সুপরিচিত পুস্তক একবার উল্টাইয়াও দেখিতেন তাহা হইলেও জানিতে পারিতেন যে মহারাজা মণিপুরের নগণ্য প্রজার পুত্র হওয়া দূরে থাকুক রাজবংশেরই সন্তান এবং এক ভূতপূর্ব্ব মহারাজার প্রপৌত্র ও এক ভূতপূর্ব্ব যুবরাজ ও সেনাপতির পৌত্র।

গরীব নেওয়াজ অষ্টাদশ শতাব্দীতে মণিপুরের রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্রের দিকে দুই প্রপৌত্র ছিল। ইহাদের এক জনের নাম গম্ভীরসিংহ ও অপর জনের নাম নরসিংহ। গম্ভীরসিংহ মণিপুরের রাজা ও নরসিংহ যুবরাজ ও সেনাপতি ছিলেন। ১৮৩৪ সনে গম্ভীরসিংহের যখন মৃত্যু হয় তখন তাঁহার পুত্র চন্দ্রকীর্ত্তি মাত্র এক বৎসরের। সেজন্য নরসিংহ সেনাপতি ও অভিভাবক হিসাবে মণিপুর শাসন করিতে থাকেন। ১৮৪৪ সনে নরসিংহকে হত্যা করিবার একটা চেষ্টা হয়। এই চেষ্টার সহিত চন্দ্রকীর্ত্তির মাতা জড়িত ছিলেন। সুতরাং হত্যাচেষ্টা যখন বিফল হইল তখন নরসিংহের ভয়ে তিনি সপুত্র কাছাড়ে পলাইয়া গেলেন। তখন নরসিংহ মণিপুরের রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। ১৮৪৪ হইতে ১৮৫০ পর্য্যন্ত ছয় বৎসর নরসিংহের রাজত্বকাল। ১৮৫০ সনে নরসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা দেবেন্দ্রসিংহ মণিপুরের রাজা হন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই চন্দ্রকীর্ত্তি প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া মণিপুর রাজ্য অধিকার করেন ও ১৮৮৬ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে নরসিংহের দুই পুত্র—বড় চাউবা ও মেকাজিন সিংহ দুইবার সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করেন, কয়েক বৎসরের জন্য নবরাজ বলিয়াও স্বীকৃত হন। কিন্তু পরিশেষে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কয়েক বৎসর ঢাকায় বন্দী হিসাবে অবরুদ্ধ থাকেন। বর্ত্তমান মহারাজ ইঁহাদেরই আর এক ভ্রাতার পৌত্র ও রাজা নরসিংহের প্রপৌত্র। তাঁহার পিতা চাওবী য়াইমা মণিপুর রাজ্যের প্রজা ছিলেন সত্য, কারণ প্রিন্স অব ওয়েলস্‌ও ইংলণ্ডের রাজার প্রজা। কিন্তু তাঁহাকে মণিপুর রাজ্যের নগণ্য বা সাধারণ প্রজা বলা যে কিরূপ অসঙ্গত তাহা বোধ করি কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। *

* বাহুল্যভয়ে এখানে মহারাজার বংশতালিকা দেওয়া হইল না, কিন্তু ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার ও স্যর হেনরী কটনের আত্মজীবনী হইতে দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে :—"Chura Chand, a boy belonging to a collateral branch of the Royal

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

চুড়িওয়ালী

শ্রী অরুণ মুখোপাধ্যায়

মণিপুরের মহারাজার চেহারা সম্বন্ধে লেখক যে-সকল উক্তি করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিলাম। মহারাজার এতৎসহ মুদ্রিত চিত্রখানি দেখিলেই সকলে এ-বিষয়ে নিজেরাই বিচার করিতে পারিবেন।

house who was placed on the Gaddi" (*Imp. Gaz.*, Vol. XVII, p. 188.)

স্যর হেনরী কটন বলিতেছেন, "The Government of India declared that the Monipur State was forfeited to the Crown but decided in their clemency to regrant it to a scion of a Junior branch, who is the present Raja of Monipur" (*Indian and Home Memories*, p. 253.) তাহার ইতিহাস সকলেরই জানা আছে। যাঁহারা এ-সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ চান তাঁহারা উক্ত বৎসরের হাউস অব কমন্স ও হাউস অব লর্ডস্-এর মণিপুর-সংক্রান্ত আলোচনা ও এই বৎসরের প্রকাশিত মণিপুর-সংক্রান্ত ব্লুবুকগুলি দেখিতে পারেন।

'কম্যুনিজম্ বা সাম্যবাদ'

শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ চৌধুরী

বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়ের লিখিত 'কম্যুনিজম্ বা সাম্যবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধটির কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমতঃ, তিনি বলিয়াছেন, 'কম্যুনিজমের মূলনীতিটিই ভারতের পক্ষে অস্বাভাবিক।' কম্যুনিজমের মূলনীতি ভারতের পক্ষে অস্বাভাবিক ত নহেই, বরং খুবই স্বাভাবিক। কারণ, যৌথপরিবারপ্রথা কম্যুনিজমের মূলনীতিটিরই অনুসরণ করে। তাহা ছাড়া, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রেও কম্যুনিজমের উল্লেখ পাওয়া যায়।* কম্যুনিজমের মূলনীতি সমাজসাম্য। সমাজসাম্য ভারতবাসীর চিত্তে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই এ-সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিতে পারে না।

তবে বোধ হয়, তিনি কম্যুনিজমের বিপ্লবাত্মক দিকটার কথাই বলিতেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সমাজের সম্বন্ধ চিরকাল এতই কম ছিল যে, রাষ্ট্রের উত্থান-পতনে সমাজের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হইত না এবং সমাজের যাহা-কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইত, তাহা শান্তিজনকভাবেই সাধন করা হইত। তাহার বিরোধিতা কখনও রাষ্ট্র করে নাই, তা সে রাষ্ট্রের মালিক হিন্দুই হউক বা মুসলমানই হউক। অধিকন্তু সমাজের মধ্যে বিরুদ্ধশক্তির ঘাতপ্রতিঘাত কখনও ভীষণ ভাব ধরিতে পারিত না। কারণ, সামরিক তথা ধ্বংসমূলক শক্তি সমাজের হাতে চিরকাল অতি অল্পপরিমাণেই ছিল। সামাজিক সংস্কার সাধন করা হইত জনমতের সাহায্যে।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি লিখিয়াছেন, 'ভারতীয়েরা স্বভাবতঃই ধর্ম্ম ও শান্তিপ্রিয়। তাদের যতই কেন দুঃখদুর্দ্দশা হউক না, তাহা দূর করিবার জন্য ভারতীয়েরা বিদ্রোহ করিতে কখনও উপদেশ পায় নাই, কিন্তু সহন ও প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাই তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের উপদেশ পাইয়াছে। ইহাই ভারতের বিশেষত্ব এবং ইহা জগতের সনাতন নিয়মেরও অনুকূল।' সহনশীলতা ও ধর্ম্মভীরুতার নামে নিশ্চেষ্টতা ভারতবর্ষের পক্ষে চরমে উঠিয়াছে জানি, এবং তাহা যে আধুনিক ভারতের বিশেষত্ব তাহাও স্বীকার করি, কিন্তু ইহা যে কি রকম ভাবে জগতের সনাতন নিয়মের অনুকূল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে জগতের নিয়মের সিদ্ধান্ত করা যদি অসম্ভব না হয়, সংসারের সর্ব্বভোগে বঞ্চিত হইয়া পশুর অধম জীবন যাপন করা যদি মানুষের কাম্য না হয়, তাহা হইলে বলিব, সকল অবস্থাতেই শান্তিপ্রিয়তার মুখোস পরা নিশ্চেষ্টতা ও সহনশীলতা মানুষের ধর্ম্ম নহে, তাহা অ-মানুষেরই ধর্ম্ম।

তৃতীয়তঃ তিনি লিখিয়াছেন, 'রিভলিউশনের দ্বারা যাহা ঘটে, তাহার ফল বিষময় হয়, কিন্তু ইভলিউশনে যাহা ঘটে, তাহা মঙ্গলপ্রসূ হয়।' ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মেনী, ইতালী, রাশিয়া, এমন কি আমেরিকাতেও, অতীত কালে ও বর্ত্তমানে যে-সব উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাদের অধিকাংশই বিপ্লবের দ্বারা সম্ভবপর হইয়াছে। একে একে বহু বিদেশী শক্তি দেশ আক্রমণ করিল, অধিকার করিল, দেশের ঐশ্বর্য্য বিদেশে লইয়া গেল, কিন্তু ভারতবাসী নিজেদের দার্শনিক চিন্তায় বিভোর হইয়া ভাবিল, ইভলিউশন অর্থাৎ ক্রমবিবর্ত্তনের দ্বারাই তাহাদের দুঃখ ঘুচিবে—নিজেদের কিছুই করিতে হইবে না বা করা উচিত নহে। কেননা, নিজেদের চেষ্টা মানেই ইভলিউশনের গতি বাড়াইয়া দেওয়া এবং ইভলিউশনের গতি বাড়াইয়া দেওয়ার নামই রিভলিউশন। ইভলিউশনের ফল যে সকল সময় মঙ্গলপ্রসূ হয় না, ভারতের বিগত সহস্র বৎসরের বেদনাময় ইতিহাসই কি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ নয়?

প্রত্যেক জাতির জীবনে এক-একটি অবস্থা আসিয়া পড়ে যখন রিভলিউশন অবশ্যম্ভাবী। (রক্তপাতবিহীন রিভলিউশনই কাম্য এবং তাহা অসম্ভব ও অচিন্তনীয় নহে।) আবার কখনও কখনও এমন অবস্থা আসে, যখন ইভলিউশনের উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এখন সেই অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে। এই-সকল দেশে বর্ত্তমানে হয়ত কোন বিপ্লব ঘটিতে পারে না। ভারতবর্ষের অবস্থা তদ্রূপ নহে।

চতুর্থতঃ, তিনি লিখিয়াছেন, 'কম্যুনিজমের যে ভাব, যে সর্ব্বসাধারণকে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়, তাহার জন্য যে ডিক্টেটরত্ব আবশ্যক তাহা ভ্রান্ত। মানুষকে জোর করিয়া স্বাধীনতা দেওয়ার ভাবটিই স্ববিরোধী।' মানুষকে জোর করিয়া স্বাধীনতা দেওয়ার ভাবটি স্ববিরোধী স্বীকার করি, কিন্তু কখনও কখনও এমন অবস্থা আসিয়া পড়ে, যখন তাহা করিতেই হয়। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যে স্বাধীনতা আসিবে, তাহার জন্য ডিক্টেটরত্ব একান্তই আবশ্যক। কারণ, প্রথমাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রের বিপক্ষীয় ধনিকদের বিরুদ্ধে টিকিয়া থাকা চাই। তাহার উপর ডিক্টেটরত্ব সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য নহে, পরন্তু ইহা লক্ষ্যে পৌঁছিবার একটি উপায় মাত্র।

পঞ্চমতঃ, তিনি লিখিয়াছেন, 'কম্যুনিজমের ন্যায় ধর্ম্মবিরোধী মত এদেশের পক্ষে কখনও উপযোগী হইতে পারে না।' এখানে 'ধর্ম্ম' অর্থে লেখক মহাশয় কি বোঝেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ধর্ম্মের মূলমন্ত্র যদি গরিবদের শোষণ করা, উচ্চ-নীচের ব্যবধান রাখা, সকলকে মানবতার সুযোগ না দেওয়া হয়, তাহা হইলে কম্যুনিজম ধর্ম্মবিরোধী বটে। কিন্তু যদি ধর্ম্মের মূলমন্ত্র মানুষে মানুষে সমান অধিকার, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও মানবের দুঃখ দূর করা ইত্যাদি হয়, তাহা হইলে কম্যুনিজম ধর্ম্মবিরোধী ত নহেই, অধিকন্তু ইহা ধর্ম্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ধর্ম্মের মূলমন্ত্র মনে না রাখিয়া যাহারা ধর্ম্মের কঙ্কাল আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে কম্যুনিজম ধর্ম্মবিরোধী বটে, কারণ ইহা সমস্ত অসত্যকে নির্ম্মম

* বিনয়কুমার সরকারের হিন্দুরাষ্ট্রের গড়ন।

ভাবে নির্ম্মূল করিতে চায়। কম্যুনিজম্ এখন জড়বাদী বলিয়া প্রতীত হইলেও পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহা ধর্ম্মকে স্থান দিতে বাধ্য—কারণ দুইয়ের মধ্যে মূলগত কোন বিরোধ নাই।

ধর্ম্ম মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষ ধর্ম্ম করিবার জন্য জন্মে না, পরন্তু মানুষকে মানুষ নামে যোগ্য করিবার জন্যই ধর্ম্মের প্রয়োজন। কাজেই প্রথমে মানুষ, পরে ধর্ম্ম। বর্ত্তমানে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ধনিক ও উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গরিবদের শোষণ করিতেছে। ধর্ম্মপ্রচারকগণ তাহাদেরই চালিত যন্ত্র। কাজেই প্রথমাবস্থায় ধর্ম্মপ্রচারকগণ নিগৃহীত হইতে বাধ্য। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া সাময়িক ভাবে তাহা আমাদের সহ্য করিয়া চলিতেই হইবে।

সপ্তমতঃ, তিনি লিখিয়াছেন, 'মানুষের দুঃখদুর্দ্দশা চিরদিন ছিল, আছে এবং থাকিবেও,' ইত্যাদি। ইহাও আমাদের ভারতবর্ষীয় মনোবৃত্তিরই আর একটা পরিচয়। দুঃখদুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা যদি আমরা না করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা মানুষ নামের অযোগ্য।

শ্রমিক ও কৃষকদের উন্নতি আজকাল অল্পাধিক যাহা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের জন্যই। তাহা না হইলে, যাহা হইয়াছে ক্যাপিটালিষ্টগণ তাহাও হইতে দিত না।

কম্যুনিষ্টদের উপায় অবলম্বন করিলে যে বর্ত্তমানে অনর্থের সৃষ্টি হইবে, ইহা যেমন সত্য, তাহা যে অল্পকালমাত্র স্থায়ী হইবে, ইহাও তেমনই সত্য। রাশিয়ার দৃষ্টান্তই ইহার প্রমাণ। রাশিয়া অনেক কিছুই করিতে চাহিয়াছিল—তাহার অনেক কিছুই সম্ভব হয় নাই বটে, কিন্তু অনেক কিছুই সম্ভবপর হইয়াছেও। যাহা সে করিয়াছে, তাহার তুলনাই বা আর কোন্ দেশে পাওয়া যায়? রাশিয়ার আংশিক বিফলতার কারণ এই পৃথিবীর সর্ব্বদেশে ধনিকতন্ত্রবাদ এতই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, সামান্য দুই-দশ বৎসরের চেষ্টায় তাহাকে নির্ম্মূল করা সম্ভবপর নহে। এই জন্যই প্রথমাবস্থায় (রাশিয়ার অবস্থা এখনও এক্সপেরিমেণ্টাল) ক্যাপিটালিজমের কোন কোন ব্যবস্থাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, কারণ, দেশে বিদেশে বলশেভিকদের এত বিভিন্ন শক্তির বিরুদ্ধে একা যুদ্ধ করিতে হইয়াছে ও হইতেছে যে তাহাদের পক্ষে একক যুদ্ধ করা অসম্ভব।

ভারতবর্ষের সংস্কৃতির মূল সত্যটিকে না বুঝিয়া যাঁহারা তাহার জীর্ণ কঙ্কালটিকেই পরম সত্য বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা ভারতের মিত্র নহেন। ভারতবর্ষ চিরকালই মানবসেবাকে সর্ব্বোত্তম স্থান দিয়াছে। কম্যুনিজমও তাহাই দেয়। ইহার লক্ষ্য বিরাট ও মহৎ। কাজেই কম্যুনিজমের পক্ষে ভারতবাসীর চিত্ত অধিকার করা অস্বাভাবিক নয়।

সম্পাদকের মন্তব্য। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার মজুমদার আবশ্যক বোধ করিলে ও ইচ্ছা করিলে এই প্রতিবাদের উত্তর দিতে পারিবেন।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

Algebra—বীজগণিত

Coefficient—উপগুণক, + স্থিরাঙ্ক

এই শব্দটি রাখা প্রয়োজন; কারণ বিশুদ্ধ গণিত ব্যতীত বিজ্ঞানের অপর সকল শাখাতেই coefficient শব্দটি কোনও বস্তু বা বস্তুধর্ম্মের বিশিষ্টতা-সূচক অঙ্ক—এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা—coefficient of heat expansion—'তাপজনিত বৃদ্ধির স্থিরাঙ্ক'।

Ellipse—উপবৃত্ত (?); দীর্ঘবৃত্ত; বৃত্তাভাস (প)

'দীর্ঘবৃত্ত' শব্দটি সঙ্গে সঙ্গে ellipse-এর একটি চিত্র চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করে; 'বৃত্তাভাস' শব্দটিও এইরূপ ellipse-এর রূপ কল্পনা করিবার সহায়তা করে। ইহা ব্যতীত এই শব্দ দুইটি পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। ইহাদের ত্যাগ করিয়া 'উপবৃত্ত' শব্দটি (যাহা ellipse-এর আকৃতি সম্বন্ধে মনে কোনও ধারণাই জন্মায় না) সঙ্কলন করিবার সার্থকতা বুঝিতে পারা যায় না।

Expression—রাশিমালা (?); রাশি

পদসমষ্টি বা collection of terms এই অর্থে রাশি শব্দটি পূর্ব্ব হইতেই গণিতে প্রচলিত আছে; ইহার সহিত আর মালা গ্রথিত করা নিষ্প্রয়োজন।

Function—অপেক্ষক (?)

এই পরিভাষাটি একেবারেই যথাযথ হয় নাই। বীজগণিতে Function শব্দটি 'অপর একটি রাশিঘটিত কোনও রাশি' এই অর্থে প্রচলিত; এবং ইহা কখনই বিচ্ছিন্ন ভাবে স্বতন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। যথা—Function of x—স-ঘটিত রাশি; অর্থাৎ এমন একটি রাশি যাহার মূল্য 'স'-এর উপর নির্ভর করে। অতএব

Function (of x)—(স-) ঘটিত রাশি

Graph—লেখ (?): চিত্র; লিখন

'লেখ' অপেক্ষা লিখন শব্দটি Graph-এর অধিকতর যথাযথ প্রতিশব্দ। যথা—Graph traced by a recorder—লিপিযন্ত্রের লিখন। ইহা ব্যতীত 'লেখ' শব্দটি বাঙলা ভাষায় লিখ ধাতুর অনুজ্ঞা রূপে প্রচলিত রহিয়াছে (লেখ—Do write)। দেখিতে পাইতেছি Graph-এর প্রতিশব্দে 'লেখ' ব্যবহার না করাই শ্রেয়।

Harmonic series—বিপরীত শ্রেণী (?); হরাত্মক শ্রেণী।

বীজগণিতে যে-সকল সংখ্যার অন্যোন্যক সকল সমান্তর শ্রেণীতে অবস্থান করে (যথা—$\frac{৩}{৪}$, $\frac{১}{২}$, $\frac{৩}{৮}$) তাহাদের Harmonic series বলা হয় ইহাও সহজেই দেখান যায় যে, যে-সকল সংখ্যা Harmonic series-এর অন্তর্গত, তাহাদের হর সকল সমান্তর শ্রেণীর অন্তর্গত। অতএব

Harmonic series-এর প্রতিশব্দ—হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোষ যে হরাত্মক শ্রেণী করিয়াছেন, তাহা ঠিক হইয়াছে। অন্যথায় ইহাকে বিপরীত সমান্তর শ্রেণী বলা যাইতে পারে।

Hyperbola—পরাবৃত্ত (?) ; অতি পরবলয় (সূর্য্য-সিদ্ধান্ত)

Identity—অভেদ (?) ; একত্ব

অভেদ শব্দটি Identity-র যথার্থ প্রতিশব্দ কিনা বিবেচ্য। ইহার প্রতিশব্দ 'একত্ব' হওয়া উচিত।

Imaginary—কল্পিত (?) ; কাল্পনিক

Imaginary শব্দের অর্থ কখনই কল্পিত নহে। 'কল্পিত' শব্দটির অর্থ—যাহাকে কল্পনা করা হইয়াছে (অর্থাৎ যাহার বাস্তব হইবার পক্ষে কোনও বাধা নাই)। গণিতশাস্ত্রে Imaginary quantity বলিতে এমন রাশি বুঝায়—যাহা সম্পূর্ণ অবাস্তব ; অর্থাৎ যাহা বাস্তবিক কল্পনাও করা যায় না। ইহাকে 'কল্পিত' বলিলে ভুলই হইবে। ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

Index—সূচক ; + সূচাঙ্ক

Index কেবলমাত্র 'সূচক' করিলেই সব সময়ে চলিবে না ; অনেক ক্ষেত্রে ইহা সূচক অঙ্ক এই অর্থে প্রযুক্ত হয়। যথা—Logarithm is the index of power of the base. Logarithm base-এর শক্তির 'সূচাঙ্ক'।

Incommensurable—(তালিকায় নাই) অপরিমেয়

Inequality—অসমতা ; + বৈষম্য

Infinite : Infinity—অসীম ; অনন্ত (?)

এই দুইটিকে সম্পূর্ণ একার্থ-বোধক প্রতিশব্দরূপে নির্দ্দেশ না করিয়া, আমি ইহাদের নিম্নলিখিত রূপে রাখিবার পক্ষপাতী—

Infinite—অসীম (বিশেষণ)

Infinity—অনন্ত (বিশেষ্য)

Integer—(তালিকায় নাই) অখণ্ড সংখ্যা

Inverse variation—বিপরীত ভেদ (?) ; বিপরীত অনুবর্ত্তন।

Variation-এর গাণিতিক অর্থ 'ভেদ' নহে,—অনুবর্ত্তন। (Variation দ্রষ্টব্য)।

Irrational—অমূলদ (?) ; অমূলক ; করণীগত। অমূলদ শব্দটি irrational-এর অর্থ হিসাবে নির্দ্দোষ হইলেও শ্রুতিকটু, এবং কিছু পরিমাণে দুরুচ্চার্য্য। অমূলক বা করণীগত শব্দ দুইটি ত্রুটিহীন। (Rational দ্রষ্টব্য)।

Joint variation—সহভেদ (?) ; সমানুবর্ত্তন (Variation দ্রষ্টব্য)।

Like—সদৃশ ; + তুল্য

Limit—সীমা। কাষ্ঠা (?)

'কাষ্ঠা' রাখিবার প্রয়োজন কি ? এই শব্দটি বাংলা ভাষায় সুপ্রচলিত নহে।

Logarithm—লগারিদম্ (?) ; ঘাত ; লগ। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি—পরিভাষা যথাসম্ভব বাংলা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঘাত শব্দটি logarithm-এর প্রতিশব্দ হিসাবে চলিতে পারে। (Power) দ্রষ্টব্য।

Natural Number—অখণ্ড সংখ্যা (?) ; সাধারণ সংখ্যা ; একাদি সংখ্যা।

বীজগণিতে integral number ও natural number একই বস্তু নির্দ্দেশ করে না।

১ ২ ৩ ৪... প্রভৃতি সাধারণ ক্রমিক পূর্ণ সংখ্যাকেই natural numbers বলা হয়। Integral numbers ও natural numbers-এর পার্থক্য বজায় রাখা প্রয়োজন। বীজগণিতে a b c...x y z ক্ষেত্র-বিশেষে integer হইতে পারে ; কিন্তু ইহারা natural numbers নহে।

Parabola—অধিবৃত্ত (?) ; পরবলয়

হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোষ পরবলয় শব্দটি গ্রহণ করিয়াছেন ; ইহা বাংলা ভাষায়ও কিছু পরিমাণে প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন শব্দ সঙ্কলন করিবার প্রয়োজন কি ?

Plotting—অঙ্কন (?) ; বিন্দু-বিন্যাস, কারণ Algebra ও Co-ordinate Geometryতে এই শব্দটি plotting the points এই অর্থেই সংক্ষেপে ব্যবহৃত হয়।

Rational—মূলদ (?) ; সমূলক

মূলদ শব্দটি কিছু পরিমাণে শ্রুতিকটু ও দুরুচ্চার্য্য। যে কারণে 'বলদায়ক' এই অর্থে বলদকে টানিয়া আনা চলে না, সেই কারণেই মূলদও পরিত্যাজ্য। সমূলক হইলে আর কোনও ভয় থাকে না।

Term—রাশি (?) ; পদ

বাংলা গাণিতিক পরিভাষায় রাশি শব্দটি expression বা পদসমূহ অর্থে ব্যবহৃত হয়, যাহার প্রত্যেকটি পদকে ইংরেজীতে term বলে।

Variable—চল (?) ; পরিবর্ত্তনীয়

Variable শব্দটির অর্থ—যাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে ; ইহার প্রতিশব্দ হিসাবে—'চল' শব্দ অচল না হইলেও ইহা প্রচলিত বাংলায় চল্ ধাতুর অনুজ্ঞা রূপেই সমধিক পরিচিত। এরূপ ক্ষেত্রে variableকে 'চল' না করাই সঙ্গত।

Variation—ভেদ (?) ; অনুবর্ত্তন

যদিও variation শব্দটির অর্থ—পরিবর্ত্তন, বৈষম্য ইত্যাদি তথাপি গণিতশাস্ত্রে একটি সংখ্যার নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে অপর একটি সংখ্যার অনুবর্ত্তন বুঝাইতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যথা—Interest varies directly as principal—সুদ আসলের অনুপাতে বাড়ে বা কমে ; অর্থাৎ—সুদ আসলের অনুবর্ত্তী। Variation-এর গাণিতিক সংজ্ঞা এই,—One quantity A is said to vary as another B, when the two quantities depend upon each other in such a manner, that, if B is changed, A is *changed in the same ratio*. স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, Variation এর অর্থ ভেদ (যাহার অর্থ পার্থক্য, অনৈক্য ইত্যাদি) করিলে ভুল হইবে। গণিতশাস্ত্রের variation অনুবর্ত্তন।

Vary—(তালিকায় নাই) অনুবর্ত্তী হওয়া

Geometry—জ্যামিতি

Arc—চাপ (?) ; বৃত্তাংশ ; ধনু

যদিও প্রাচীন পৌরাণিক বাংলায় চাপ শব্দটির সংস্কৃতমূলক অর্থ ধনু—যথা "শরজাল বসাইল চাপে", কিন্তু প্রচলিত বাংলায় এই শব্দটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় ; এবং physics-এর পরিভাষায় pressure বুঝাইতে ইহা ইতিপূর্ব্বেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব ইহার পরিবর্ত্তে 'বৃত্তাংশ' বা 'ধনু' ব্যবহার করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

Circumference—পরিধি ; + নেমি

Circumscribed—পরিলিখিত ; + বৃত্তবেষ্টিত

Co-axial—সমাক্ষ (?) একাক্ষ ; একাক্ষিক

দুইটি জ্যামিতিক চিত্রের অক্ষ একই হইলে তাহাদের Co-axial বলা যায়। ইহার প্রতিশব্দ সমাক্ষ (সমান অক্ষবিশিষ্ট) না হইয়া—একাক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয়

Coincidence—সমাপতন ; + সম্মিলন

Complementary—পূরক (?) ; অনুপূরক

Supplementary—পরিপূরক, এবং complementary—অনুপূরক—এই দুইটি পরিভাষা বহুপূর্ব্ব হইতেই বাঙলা জ্যামিতি-পুস্তকে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা ব্যতীত supplementary angles-এর সমষ্টি দুই সমকোণ, এবং complementary angles-এর সমষ্টি তাহার অর্দ্ধেক—অর্থাৎ এক সমকোণ—উৎপন্ন করে, এই হিসাবে পরিপূরক ও অনুপূরক শব্দ দুইটি ব্যবহার করিবার সার্থকতা রহিয়াছে। Supplementary দ্রষ্টব্য।

Cyclic—বৃত্তস্থ (?) ; চক্রস্থ

'বৃত্ত' শব্দটি বিশেষ করিয়া circle অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং পার্থক্য বজায় রাখিবার জন্য cyclic-এর প্রতিশব্দ 'চক্রস্থ' হওয়া বাঞ্ছনীয়।

Cyclic order—(তালিকায় নাই) পর্য্যায়ক্রম ; চক্রানুক্রম পরম্পর

Data—উপাত্ত (?) ; অভিজ্ঞান ; (স্বীকৃত) সর্ত্ত

উপাত্ত শব্দটির অর্থ গৃহীত, স্বীকৃত—ইত্যাদি বটে ; কিন্তু data শব্দটি বাঙলায় বিশেষণে পরিবর্ত্তিত করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে কি? ইহা ব্যতীত পূর্ব্বে দেখাইয়াছি—পরিভাষা সরল এবং যতদূর সম্ভব সুপ্রচলিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। উপাত্ত শব্দটি বাঙলা ভাষায় তেমন প্রচলিত নহে।

Diagonal Scale—কর্ণ-মাপনী (!!) (?) ; তেরচা স্কেল Diagonal—কর্ণ, এবং scale-এর প্রতিশব্দ মাপনী ; অতএব এই সংস্কৃত এবং দেশজ শব্দ দুইটি সমাস করিয়া Diagonal scale—কর্ণমাপনী হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারা গেল। কিন্তু ইহা কি সমাস? (দ্বন্দ্ব সমাস নিশ্চয়ই নহে!) এবং ইহার অর্থ কি?—যে স্কেলের দ্বারা কর্ণ মাপন হয়? জ্যামিতির ছাত্র জানে, যে স্কেলের মাপিবার ছেদ রেখাগুলি diagonal রূপে (diagonal শব্দটির অর্থই—তির্য্যক বা কোণাকুণি) হেলিয়া আছে, এবং এই জন্য যাহার দ্বারা সরল রেখার অতি ক্ষুদ্রাংশও মাপিতে পারা যায়—তাহাই diagonal scale. ইহার প্রতিশব্দ তেরচা স্কেল রূপে ইতিপূর্ব্বেই প্রচলিত আছে। (Scale দ্রষ্টব্য)।

Harmonic—সমঞ্জস (?) ; হরাত্মক

Harmony সামঞ্জস্য ; অতএব Harmonic সমঞ্জস হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা সামঞ্জস্য আর কি হইতে পারে? গণিতে Harmonic শব্দটি বিভিন্ন সংখ্যা বা রাশির মধ্যের একটি বিশেষ সম্পর্ক সূচিত করে (Harmonic Progression দ্রষ্টব্য)। ইহার আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া মর্ম্মানুবাদ করাই বাঞ্ছনীয়।

Hypotenuse—অতিভুজ (?) ; কর্ণ

সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীতে বৃহত্তম যে বাহু তাহাই hypotenuse। এই অর্থে অতিভুজ শব্দটি নির্ভুল হইলেও বাঙলা জ্যামিতিতে ইহা কর্ণ শব্দ দ্বারাই এ যাবৎ সূচিত হইয়া আসিতেছে। আকৃতিগত তির্য্যক ভাবের জন্য চতুষ্কোণের diagonal এবং ত্রিভুজের hypotenuse উভয়কেই কর্ণ বলিলেও বিশেষ ভুল হয় না। এক্ষেত্রে প্রচলিত শব্দটিকে ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই।

Hypothesis—কল্পনা (!) (?) ; অনুমান

বিজ্ঞানে এবং বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে imagination এবং hypothesis-এ যে পার্থক্য বিদ্যমান, বাঙলা কল্পনা ও অনুমান শব্দ দুইটির মধ্যেও সেই পার্থক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে hypothesisকে কল্পনা না বলাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ hypothesis কল্পনা নহে ; —ইহা অনুমান মাত্র।

Included angle—অন্তর্ভূত কোণ (?) ; অন্তর্গত কোণ

Isosceles—সমদ্বিভুজ (?) ; সমদ্বিবাহু

Isosceles শব্দটি জ্যামিতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই triangle শব্দটির সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। Isosceles-এর অনুবাদ সমদ্বিভুজ করিলে isosceles triangle—'সমদ্বিভুজ-ত্রিভুজ' হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য ইহাকে সমদ্বিবাহু বলাই বাঞ্ছনীয়।

Major arc—অধিচাপ ; (?) অতিবৃত্তাংশ } (Arc দ্রষ্টব্য।)
Minor arc—উপচাপ ; (?) উপবৃত্তাংশ }

Median—মধ্যমা (?) ; মধ্য-রেখা

ত্রিভুজের শীর্ষ কোণ ও ভূমির মধ্যবিন্দুর যোজক-রেখাকে median বলা হয়। ইহা ত্রিভুজের ক্ষেত্রকেও সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে। অতএব ইহাকে কেবলমাত্র মধ্যমা না বলিয়া মধ্য রেখা বলাই যুক্তিযুক্ত। বিশেষতঃ মধ্যমা শব্দটির সাহিত্যিক ভাষায় অন্য অর্থও আছে।

Parallel—সমান্তরাল ; + সমান্তর

Perimeter—পরিধি (?) ; পরিসীমা ; আবেষ্টনী

ইংরেজী perimeter শব্দটি যে-কোনও জ্যামিতিক ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ বহিঃসীমা সূচিত করে। কিন্তু বাঙলা পরিধি শব্দটি কেবলমাত্র বৃত্তাকার ক্ষেত্রের বহিঃসীমা (circumference) নির্দ্দেশ করে। সমিতিও এই অর্থেই ইহা ইতিপূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। অতএব perimeterকে পরিধি বলিলে ভুল হইবে। ইহা পরিসীমা বা আবেষ্টনী।

Radius—অর (?) ; ব্যাসার্দ্ধ

জ্যামিতিশাস্ত্র অতি প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে বিদ্যমান আছে। কিন্তু প্রাচীন বা আধুনিক কোনও জ্যামিতিতেই radiusকে 'অর' বলা হয় নাই। আর্য্যভট্ট ইহাকে ব্যাসার্দ্ধ এবং বিষ্কম্ভার্দ্ধ বলিয়াছেন ; এবং সূর্য্য-সিদ্ধান্তে ইহাকে ত্রিজ্যা ও ত্রিজীবা বলা হইয়াছে। আধুনিক বাঙলা জ্যামিতি সর্ব্বত্রই ইহাকে ব্যাসার্দ্ধ বলিয়াছে। এরূপ স্থলে ইহার সুপ্রচলিত প্রতিশব্দ ত্যাগ করিয়া নূতন শব্দ 'অর' গ্রহণ করিবার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায় না। বিশেষতঃ 'অর' শব্দটি বৃত্তের ঠিক ব্যাসার্দ্ধ সূচিত করে না। ইহার অর্থ চক্রের দণ্ড বা spoke. ইহার পরিমাপ সব সময়ে বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধের ঠিক সমান নাও হইতে পারে।

Rectangle—আয়তক্ষেত্র ; + সমচতুষ্কোণ

Rhombus—রম্বস (?) ; সমচতুর্ভুজ

যে চতুর্ভুজের চারটি বাহুই পরস্পর সমান, কিন্তু কোণগুলি সমান নয়—তাহাকে rhombus বলা হয়। ইহার প্রতিশব্দ রচনা অসম্ভব বা কঠিন নহে। সুতরাং ৪ নং সূত্রানুসারে ইহার বাঙলা প্রতিশব্দ রচনা বা সঙ্কলন করা বাঞ্ছনীয়।

Scale, Ruler—মাপনী (?) ; স্কেল, রুল

স্কেল ও রুল শব্দ দুইটি বাঙলা ভাষায় প্রায় প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। দেশজ মাপনী শব্দটি ইহাদের (বিশেষতঃ রুলকে) হটাইতে পারিবে কিনা সন্দেহ। ইহাদের থাকিতে দেওয়াই সঙ্গত।

Solid—ঘন ; + ত্রিপার্শ ; ত্রিআয়তন (Three dimensional এই অর্থে)

Space—স্থান ; দেশ + আকাশ

Symmetrical—(তালিকায় নাই) প্রতিরূপক ; প্রতিসম

Symmetry—প্রতিসাম্য ; + প্রতিরূপ

Trapezium—ট্রাপিজিয়ম (?) ; অসম চতুর্ভুজ ; বিষমায়ত (ক্ষেত্র)

Rhombus-এর ন্যায় Trapezium-এরও বাঙলা প্রতিশব্দ থাকা বাঞ্ছনীয়। (Rhombus দ্রষ্টব্য)

Vertical angle—শিরঃকোণ (?) ; শীর্ষকোণ

নির্ভুল হইলেও শিরঃকোণ না রাখাই ভাল ; কারণ বাঙলায় বিসর্গের উচ্চারণ প্রায় নাই, এবং শব্দটি কিছু দুরুচ্চার্য।

Solid Geometry

Cone শঙ্কু ; + কোন

Cone-এর কোণাকৃতির জন্য ইহাকে কোনও বলা যাইতে পারে। ইহাতে একই শব্দ প্রতিশব্দ রূপেও পাওয়া যাইতেছে। কোণের (angle) সহিত কোন (Cone) এর পার্থক্য বানানের পার্থক্যের দ্বারা সহজেই নির্দ্দেশ করা চলিতে পারে।

Cube—ঘনক ; + ঘন

Cylinder—স্তম্ভক ; + স্তম্ভ

Face তল ; + পার্শ ; মুখ

Normal- (তালিকায় নাই) ভূলম্ব রেখা ; অভিলম্ব

Polyhedron—বহুতলক ; + বহুপার্শিক ; বহুমুখী

বহুতলক শব্দটি তেমন শ্রুতিসুখকর নহে ; ইহা পরিত্যাগ করিলে (তালাক দিলে) ক্ষতি কি ?

Prism—প্রিজম্ (?) ; ত্রিশির ; ঘন ত্রিকোণ

সমিতি skew-এর পর্যান্ত অনুবাদ করিতেছেন—নৈকতলীয় ; অথচ সাধারণতঃ বহু দৃষ্ট prism বাঙালীর নিকট বৈদেশিক থাকিয়া যাইতেছে। ইহা সঙ্গত নহে। ঝাড়লণ্ঠনের তে-শিরা কাঁচের সহিত বাঙালী ছাত্র আবাল্য পরিচিত।

Skew—নৈকতলীয় (?) ; বিষম তল

যে-সকল সরল রেখা এক সমতলে লীন নহে তাহাদের skew বলা যায়। নৈকতলীয় শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ইহা হইলেও, এই শব্দটি প্রায় বৈদেশিক শব্দের মতই দুরূহ ও অপরিচিত। বিষমতল শব্দই এই অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

Tetrahedron—চতুস্তলক (?) ; চতুষ্পার্শিক ; ঘন-ত্রিভুজ।

চতুস্তলক শব্দটি কিছু পরিমাণে শ্রুতিকটু। Tetrahedron চারিটি ত্রিভুজ দ্বারা সীমাবদ্ধ ঘনক্ষেত্র ; ইহাকে ঘন-ত্রিভুজ নাম দেওয়া যাইতে পারে।

Mechanics—বলবিদ্যা (?) ; যন্ত্রবিদ্যা

Mechanics-কে কেবলমাত্র বলসংক্রান্ত বিদ্যা বলিলে সবটা বলা হয় না। ইহা যন্ত্র-সংক্রান্ত বিদ্যাও বটে। ইহা ব্যতীত, আধুনিক বিজ্ঞান হইতে 'বল' শব্দটি বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে। অতএব mechanics-কে বল-বিদ্যা না বলিয়া যন্ত্র-বিদ্যা বলাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

Acceleration—ত্বরয়ণ (?) ; বেগবৃদ্ধি

ত্বরয়ণ শব্দটির অর্থ ত্বরা-যুক্ত করণ। কিন্তু Acceleration-এর গাণিতিক সংজ্ঞা—rate of change of velocity ; অর্থাৎ বেগ-বৃদ্ধির হার। ইহাকে সংক্ষেপে বেগবৃদ্ধি বলা যাইতে পারে।

Amplitude—মাত্রা ; + সীমা, বিস্তৃতি

Balance—তুলা (?) ; পাল্লা ; নিক্তি। বলসাম্য, সমতা

তুলা শব্দটি এত সুপরিচিত অন্য অর্থে বাঙলা ভাষায় প্রচলিত যে Balanceকে তুলা বাস্তবিক বলিলে বহু অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা। ওজন যন্ত্র এই অর্থে পাল্লা ও নিক্তি এবং Balance (of forces, etc.) অর্থে বল-সাম্য, সমতা শব্দগুলি ব্যবহার করাই সমীচীন।

Beam—ধরণ (?) ; কড়ি, দণ্ড

Beam শব্দটির অর্থ ধরণ কেন হইবে তাহা বুঝা কঠিন। ধরণ শব্দটি বাঙলা ভাষায় mood বা style অর্থে অত্যন্ত সুপ্রচলিত। Beam যে কড়ি তাহা যে-কোনও মিস্ত্রিই জানে। Balance-এর beam-এর প্রতি-ভাষা (তুলা) দণ্ড করা যাইতে পারে।

Capacity—সামর্থ্য ; ধারকত্ব (?) ; ধারণ-শক্তি

(Arithmetic-এ Capacity দ্রষ্টব্য)

Coefficient of elasticity—স্থিরাঙ্ক (?) ; স্থিতিস্থাপকতার স্থিরাঙ্ক ; স্থিতিস্থাপকত্ব

(Algebra-য় Coefficient দ্রষ্টব্য)

Component—উপাংশ (?) ; প্রত্যঙ্গ ; অঙ্গ

অংশ মাত্রেই 'উপ'—ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু উপাংশ শব্দটি গ্রহণ না করিলেই ভাল হয় ; ইহা তেমন শ্রুতিসুখকর নহে। Component forces—resultant forces-এর প্রত্যঙ্গ মাত্র।

Couple—দ্বন্দ্ব (?) ; যুগ্মবল

সংস্কৃত 'দ্বন্দ্ব' শব্দের অর্থ যুগ্ম হইলেও, বাঙলা ভাষায় ইহা সম্পূর্ণ পৃথক 'ঝগড়া' অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাঙলা প্রাচীন কাব্যে ইহার শিষ্ট প্রয়োগ আছে বটে ; কিন্তু পরিভাষায় ইহা অচল। দুইটি সমান্তর এবং বিপরীত-মুখী বলকে সম্মিলিত ভাবে couple বলা হয়। ইহাকে বাঙলায় যুগ্মবল বলা যাইতে পারে।

Density—ঘনাঙ্ক ; + ঘনত্ব

Differential (pulley)—বিভেদক (?) ব্যাসান্তরিক পুলি

Differential শব্দটির অর্থ পার্থক্য-জনিত বটে কিন্তু যে পুলির যান্ত্রিক সুবিধা (mechanical advantage) বিভিন্ন ব্যাসের এককেন্দ্রিক দুইটি পুলির ব্যাসের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে, তাহাই differential pulley. ইহাকে শুধু বিভেদক বলিলে শব্দানুবাদ করা হয় মাত্র।

Dynamics (kinetics) গতিবিদ্যা (?) ; গতিবিজ্ঞান

সাধারণতঃ বাঙলা ভাষায় বিদ্যা applied science এবং বিজ্ঞান pure science অর্থে প্রযুক্ত হয়। অতএব dynamics—গতিবিদ্যা নহে,—গতিবিজ্ঞান।*

Efficiency—কার্য্যক্ষমতা (?) ; কার্য্যকারিতা

কোনও যন্ত্র প্রতি একক সময়ে যে হারে শক্তি উৎপন্ন (অর্থাৎ

* এই প্রসঙ্গে "বিজ্ঞানের পরিভাষা"—প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২২ দ্রষ্টব্য।

রূপান্তরিত) করিতে পারে—তাহাই তাহার কার্য্যক্ষমতা বা সংক্ষেপে ক্ষমতা (power)। আর কোনও যন্ত্র তাহার উপর প্রযুক্ত শক্তির শতকরা যত অংশ রূপান্তরিত করিতে পারে, তাহা তাহার কার্য্যকারিতা efficiency সূচিত করে। সমান কার্য্যক্ষমতা-বিশিষ্ট দুইটি যন্ত্রের কার্য্যকারিতার যথেষ্ট পার্থক্য থাকিতে পারে। একটি ৫০-অশ্ব-ক্ষমতার মোটরের কার্য্যকারিতা শতকরা ৭০ ভাগ এবং অপর একটি ৫০-অশ্ব-ক্ষমতার মোটরের কার্য্যকারিতা শতকরা ৮০ ভাগ হইতে পারে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে efficiency কার্য্যক্ষমতা নহে—কার্য্যকারিতা।

Effort—চেষ্টন (?) ; চেষ্টা ; প্রচেষ্টা

শুধু চেষ্টাতেই যখন অভীষ্ট লাভ হইতেছে, তখন অনর্থক টন-age চাপাইবার প্রয়োজন কি ? ইহাতেও মন না উঠিলে প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। কিন্তু চেষ্টন-এর gerund রূপ অসহ্য।

Equilibrium—সাম্য। স্থিতি ; + বলসাম্য

Fulcrum—আলম্ব (?) ; কীলক ; সঙ্কু

Generalization—সামান্যীকরণ (?) ; সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত করা, সূত্রান্তর্গত করণ

সংস্কৃত সামান্য ও সাধারণ শব্দ দুইটি একার্থক হইলেও বাংলা ভাষায় সামান্য শব্দটি অল্প বা তুচ্ছ অর্থে ব্যবহৃত হয়। Generalizationকে সামান্যীকরণ বলিলে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

Horizontal—অনুভূম ; + ভূতল

যথা :—Horizontal line—ভূতল রেখা।

Kinetic—গতীয়, চল- (?), বেগ-

অ-কারান্ত চল শব্দটি সর্ব্বদা ঠিক উচ্চারিত হওয়া সম্বন্ধে আশঙ্কা আছে। ইহা ব্যতীত এই শব্দটি 'চল' ধাতুর অনুজ্ঞা-রূপেই বাংলায় সমধিক পরিচিত। এই জন্য ইহাকে 'বেগ'-রূপে অনুবাদ করাই সমীচীন। যথা :—

Kinetic Energy—(তালিকায় নাই) বেগশক্তি

Kinetics (Dynamics)—গতিবিদ্যা (?) ; গতিবিজ্ঞান (Dynamics দ্রষ্টব্য)।

Lever—লেভার (?) ; চাপদণ্ড, (সংক্ষেপে) দণ্ড

Lever-এর বাংলা প্রতিশব্দ নির্ব্বাচন করাই যুক্তিযুক্ত। যদি ইংরেজী শব্দটিই রাখিতে হয়, তবে ইহাকে লিভার করা উচিত ছিল। (Chambers's 20th Century Dictionary, New Oxford Dictionary ও Webster's Dictionary দ্রষ্টব্য)।

Mass—ভর (?) ; বস্তুমান

বাংলা ভাষায় ভর শব্দটি বস্তুর ওজন অর্থে প্রযুক্ত হয় ; যথা : "নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াও" "টেবিলে ভর দিও না" ইত্যাদি। গণিতে mass-এর সংজ্ঞা quantity of matter—অর্থাৎ বস্তুর পরিমাণ বা বস্তুমান। যদিও এই পরিমাণ বস্তুটির ওজনের আনুপাতিক বলিয়া ব্যবহারিক ভাবে ওজনের পরিমাণের দ্বারাই ইহা সূচিত হয়, তথাপি mass কখনই ভর বা weight নহে।

Moment—ভ্রামক (?) ; আবর্ত্তবেগ ; আবর্ত্তক

যন্ত্রবিদ্যায় moment-এর সংজ্ঞা এই—"The moment of a force about an axis on a body is its tendency to rotate it about that axis" অর্থাৎ কোনও অক্ষবিশিষ্ট বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের বস্তুটিকে অক্ষের চারিদিকে আবর্ত্তন করাইবার যে প্রবণতা আছে, তাহাই ইহার moment. ইহার অনুবাদ ভ্রম ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ভ্রামক (শৃগাল ?) কেন হইবে তাহা বুঝা কঠিন। আবর্ত্তবেগ ইহার যথার্থ অর্থদ্যোতক প্রতিশব্দ।

Neutral—উদাসীন (?) ; নিষ্ক্রিয়

জড়-জগতে অনেক সময়েই অনেক বস্তু অবস্থার ফেরে neutral থাকিতে বাধ্য হয় বটে ; তাই বলিয়া নিজেদের অভীষ্ট সাধন চেষ্টায় স্বার্থপর জড়-জগতের কোন বস্তুই উদাসীন নহে। সুযোগ পাইলেই তাহারা নিজেদের কার্য্য করিতে সর্ব্বদাই উন্মুখ। ইহারা কেবল সাময়িক ভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে মাত্র।

Neutralise—(তালিকায় নাই) নিষ্ক্রিয় করা

Normal acceleration—অভিলম্ব ত্বরণ (?) ; normal এবং acceleration দ্রষ্টব্য।

Phase—দশা (?) ; কলা ; অনুক্রম

দশা শব্দটি বাংলা ভাষায় ভিন্ন অর্থে এত সুপ্রচলিত, যে, Phase এর প্রতিশব্দ দশা না করিয়া কলা করাই যুক্তিযুক্ত ; যথা : phase of the moon—চন্দ্রের কলা। ইহা অধিকতর নির্দ্দোষ, এবং হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোষ ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অনুক্রম শব্দটিও প্রয়োজন, যথা—current in phase with voltage—বিদ্যুৎ চাপের অনুক্রমী প্রবাহ।

Potential (energy) স্থৈতিক (?) ; প্রচ্ছন্ন শক্যতা

কোনও গতিহীন বস্তুর মধ্যেও কার্য্য করিবার যে সাম্ভাব্যতা প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে তাহাকেই যন্ত্রবিদ্যায় Potential energy বলা হইয়াছে। দম দেওয়া ঘড়ির স্প্রিংয়ের ভিতরে যে শক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা potential energy'র দৃষ্টান্ত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইহা বস্তুটির বিশেষ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করিলেও ইহাকে স্থৈতিক শক্তি বলা সব সময়ে নিরাপদ নহে। ইংরেজী potentiality শব্দটির অর্থও সাম্ভাব্যতা—স্থিতি নয়। Potential (energy)কে প্রচ্ছন্ন (শক্তি) বলাই যুক্তিযুক্ত। ইহা ব্যতীত কোনও শক্তিক্ষেত্রের স্থানবিশেষে অবস্থিত বস্তুর কার্য্য পরিমাণের সাম্ভাব্যতা এই অর্থে শক্যতা শব্দটিও রাখা প্রয়োজন। যথা—In an electric field, a point nearer to the charge is at a higher potential than that at a distance—বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বিদ্যুতের নিকটবর্ত্তী স্থানের শক্যতা দূরবর্ত্তী স্থানের শক্যতা অপেক্ষা অধিক।

Retardation—মন্দয়ন ? ; বেগহ্রাস

বেগহ্রাসের হারকে (rate) গণিতে retardation বলা হইয়াছে। মন্দয়ন শব্দটি কবিত্বপূর্ণ ও শ্রুতিমধুর হইলেও প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে বিলম্ব ঘটে ; কারণ মন্দ শব্দটি বাংলায় মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহাকে সোজাসুজি বেগহ্রাস বলাই সঙ্গত।

Revolution—পরিক্রমণ (?) ; আবর্ত্ত

যন্ত্রবিদ্যায় revolution শব্দটি চক্র প্রভৃতির আবর্ত্তন বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। যথা—r. p. m. (revolution per minute) of the flywheel—এঞ্জিনচক্রের প্রতি মিনিটে আবর্ত্তন। ইহার প্রতিশব্দ পরিক্রমণ [পরি+ক্রমণ (পাদক্ষেপ, চলন)—অর্থ পর্য্যটন, পাদচারণ

ইত্যাদি। কেন হইল তাহা বুদ্ধির অগম্য। বাঙলা ভাষায়ও এই শব্দটি পর্য্যটন অর্থেই সুপ্রচলিত; যথা—'কেদার-বদরী-পরিক্রমণ'। Revolutionএর অর্থ পরিক্রমণ করা সম্পূর্ণ ভুল।

Rolling—গড়ানো, আবর্ত্তন (?)

কোনও বস্তু বলের বা বেলুনের মত আবর্ত্তিত হইতে হইতে অগ্রসর হইতে থাকিলে তাহাকে rolling বলা যায়। ইহা কেবল মাত্র আবর্ত্তন (revolution) নহে। ইহাকে শুধু গড়ানো বলাই সঙ্গত।

Sliding—বিসর্পণ; + পিছলান

Specific Gravity—বিশিষ্ট গুরুত্ব (?); আপেক্ষিক গুরুত্ব; তুলনীয় ওজন

বিজ্ঞানে কোনও বস্তুর specific gravity জলের তুলনায় তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্দেশ করে। ইহাকে বিশিষ্ট গুরুত্ব বলিলে আক্ষরিক অনুবাদ করা হয় মাত্র।

Statics—স্থিতি-বিদ্যা (?); স্থিতি: বিজ্ঞান
(Dynamics দ্রষ্টব্য)।

Thrust—ঘাত (?); ঠেলা, ঠেস

ইংরেজী ভাষায় বা বিজ্ঞানের পরিভাষায় কোনও স্থানেই thrust শব্দটি ঘাত (প্রহার, আঘাত) অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ইহা সর্ব্বত্রই ঠেলা বা ধাক্কা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার প্রতিশব্দ ঘাত নহে।

Transition—সরল গতি, ঋজুগতি (?); অপসরণ

কোনও বস্তুর transition ঘটিলে তাহার উপরিস্থিত প্রত্যেকটি বিন্দুরই সরলগতি হওয়া অপরিহার্য্য বটে; কিন্তু সমগ্র ভাবে বস্তুটির transitionকে অপসরণ বলিলে ব্যাপারটির যথার্থ স্বরূপ প্রকটিত হয়।

Trigonometry—ত্রিকোণমিতি

সমিতি গণিতের এই বিভাগের যাবতীয় পরিভাষা অপরিবর্ত্তিত রূপে ইংরেজীই রাখিবার পক্ষপাতী। বিজ্ঞানের কোনও একটি শাখারই সমস্ত পরিভাষার সম্পূর্ণ বিদেশীয় রূপ বাঙলায় গ্রহণ করা অবাঞ্ছনীয় মনে হয়। ইহাতে ছাত্রদের এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইবে, যে, ভারতীয় গণিতশাস্ত্রে—যাহাতে বীজগণিতের এবং জ্যামিতির উচ্চ আলোচনা রহিয়াছে—ত্রিকোণমিতি অজ্ঞাত ছিল। ইহা সম্পূর্ণ সত্য কখনই নহে। বিশেষতঃ সূর্য্য-সিদ্ধান্ত, সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকা, অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়, হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোষ, চলন্তিকা প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই আমাদের অধিকাংশ ত্রিকোণমিতিক সংজ্ঞাগুলির প্রতিশব্দ দিতেছেন। বাকী দুই একটি তৈয়ারী করিয়া লইলেই সম্পূর্ণ ত্রিকোণমিতিক পরিভাষা পাওয়া যাইবে।

বাঙলা ভাষায় ইংরেজীর পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত পরিভাষাগুলি গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

Circular measure—বৃত্তীয়মান; + বৃত্তীয় পরিমাপ

Co-secant—কোসেকাণ্ট (?); কোটি ছেদক; সংক্ষেপে কো-ছেদ

Co-sine—কোসাইন (?); কোটি-জ্যা: সংক্ষেপে 'কো-জ্যা' (সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকা)

Co-tangent—কোটাজেণ্ট (?); কোটি স্পর্শক; সংক্ষেপে 'কো-স্পর' (হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোষ)

Co-vers—ইহা পৃথক ভাবে রাখিবার প্রয়োজন নাই। কারণ ইহা (1-Sine A)। ইহাকে (১-জ্যা) দ্বারা প্রকাশ করা চলিবে। Trigonometryতেও co-versএর পৃথক ব্যবহার নাই বলিলেই চলে।

Degree—অংশ (?); ডিগ্রি

Grade—গ্রেড (?); অংশ, ধাপ

Radian—ব্যাসার্দ্ধ-কোণ; রেডিয়ান

Secant—সেকাণ্ট (?); ছেদক; সংক্ষেপে 'ছেদ' (হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোষ)

Sine—সাইন (?); জ্যা (সূর্য্য-সিদ্ধান্ত)

Tangent—ট্যাঞ্জেণ্ট (?); স্পর্শক; সংক্ষেপে 'স্পর' (আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়)

Trigonometrical ratios—কোণানুপাত (?); ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

Vers—ইহাও পৃথক ভাবে রাখিবার প্রয়োজন নাই। কারণ ইহা প্রকৃতপক্ষে (1-cosine)। ইহাকে (১-কো জ্যা) লিখিলেই চলিবে।

Conics—কনিক (?); কোণিক

Coneএর কোণাকৃতির জন্য conics কোনিক বলিলে বিশেষ ভুল হয় না; এবং conicsএর সহিত ধ্বনিসাদৃশ্যও থাকে।

Cone—শঙ্কু; + কোন

Ellipse—উপবৃত্ত; (দীর্ঘবৃত্ত) বৃত্তাভাস (?)

Ellipseকে উপবৃত্ত না বলিয়া দীর্ঘবৃত্তই বলা সঙ্গত। এই শব্দটির দ্বারা দীর্ঘাকৃতি-বৃত্ত বা ellipse-এর আকৃতি সম্বন্ধে সঙ্গে সঙ্গে ধারণা জন্মিবার সহায়তা হয়। হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোষ ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। বৃত্তাভাস শব্দটিও ইহার প্রকৃতি সূচিত করে; এবং বাঙলা বিজ্ঞান সাহিত্যে ইহা ইতিপূর্ব্বেই বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

Focal Distance—ফোকাস দূরত্ব (?): নাভি-দূরত্ব

এই পরিভাষা-তালিকায় focusকে নাভি বলা হইয়াছে। অতএব focal distance-এর প্রতিশব্দে focus-এর বাঙলা প্রতিশব্দ রাখাই বিধেয়।

Imaginary—কল্পিত; কাল্পনিক (পূর্ব্বে বীজগণিত প্রসঙ্গে Imaginary দ্রষ্টব্য)।

Parabola—অধিবৃত্ত (?); পরবলয় (পূর্ব্বে parabola দ্রষ্টব্য)।

Rectangular Hyperbola—সম-পরাবৃত্ত (?); সমাতিপরবলয় (পূর্ব্বে Hyperbola দ্রষ্টব্য)।

Astronomy—জ্যোতিষ + জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান

Aberration—অপেরণ (?): বিচলন

জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে পর্য্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে গ্রহনক্ষত্রাদির প্রকৃত স্থান হইতে অন্য স্থানে অবস্থিতি-বোধকে aberration বলা হয়।

অপেরণ শব্দটির অর্থ তাহা হইলেও ইহা বাঙালাভাষীর নিকট aberration অপেক্ষা কম দুর্ব্বোধ্য নহে ; (কোনও বাংলা অভিধানেই এই শব্দটি পাই না)। বিচলন aberration-এর সুন্দর এবং সরল প্রতিশব্দ।

Aphelion—অপদূর (?) ; অপ্রস্ফুট বিন্দু।

জ্যোতিষে গ্রহাদির বৃত্তাভাস-কক্ষের সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী বিন্দুকে aphelion বলে। ইহাকে অপ্রস্ফুট বিন্দু বলা যাইতে পারে। অপদূর শব্দটির অর্থ সাধারণ বাঙালীর নিকট aphelion অপেক্ষা প্রস্ফুট নহে। (Perihelion দ্রষ্টব্য)।

Apogee—অপভূ (?) ; ভূম্যুচ্চ-বিন্দু ; সর্ব্বোচ্চ-বিন্দু

পৃথিবী হইতে চন্দ্র বা অপর গ্রহকক্ষের সর্ব্বদূরবর্ত্তী বিন্দুকে apogee বলা হয়। ইহাকে অপভূ (অপ+ভূ) বলার সার্থকতা কি ? হিন্দী বৈজ্ঞানিক কোষ ইহাকে ভূম্যুচ্চ-বিন্দু বলিয়াছেন। আমরা ইহাকে সর্ব্বোচ্চ-বিন্দুও বলিতে পারি।

Apsidal—অপদূরক (?) ; নীচোচ্চক (Apsides দ্রষ্টব্য)।

Apside (sic)—অপদূরক (?) ; নীচোচ্চ

জ্যোতিষে সূর্য্য হইতে কোনও গ্রহ কক্ষের সর্ব্বনিকট ও সর্ব্বদূরবর্ত্তী বিন্দুদ্বয়, অথবা পৃথিবী হইতে চন্দ্র বা অপর কোনও গ্রহকক্ষের সর্ব্বনিকট ও সর্ব্বদূরবর্ত্তী বিন্দুদ্বয়কে যুক্তভাবে apsides বলা হয়। অপদূরক শব্দটি দ্বারা এই অর্থ যথাযথভাবে প্রকাশিত হয় কি না বিবেচ্য। নীচোচ্চ বলিলে কিছু পরিমাণে বুঝিবার সুবিধা হয়। সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা ইহাকে মন্দোচ্চ বলিয়াছেন। ইহাও চলিতে পারে।

Celestial bodies—(তালিকায় নাই) জ্যোতিষ্ক

Circuit—পরিক্রম ; + চক্র (ইহাই অধিকতর যথাযথ)

Constellation—নক্ষত্র (?) ; তারকামালা (?) ; নক্ষত্রমণ্ডল, রাশি

Constellation শব্দটি জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে a group of stars বা নক্ষত্রমণ্ডল বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়। বাঙলায় ইহা একবচনান্ত নক্ষত্র হইবে কেন—তাহা বুঝা কঠিন। বাঙলা জ্যোতিষে বিশেষতঃ পঞ্জিকায় ইহাকে রাশিও বলা হইয়াছে।

Double Star—তারকা যুগল (?) ; যুগ্মতারা

Elongation—প্রতান (?) ; আপাত-দূরত্ব

আপাতদৃষ্টিতে সূর্য্য হইতে অপর গ্রহাদির যে দূরত্ব (ইহা প্রকৃত দূরত্ব না হইতেও পারে) দর্শকের নিকট প্রতীয়মান হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাকে elongation বলা হয়। প্রতান শব্দটির অর্থও বিস্তৃতি বা elongation বটে, কিন্তু ইহা জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের elongation সূচিত করে না।

Gyroscope—জাইরোস্কোপ (?) ; ইহাকে বাংলা ভাষায় আবর্ত্ত দর্শক বলিলে ক্ষতি কি ? (বাংলা পরিভাষা যতদূর সম্ভব বাংলা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

Horizontal line—(তালিকায় নাই) দিগন্ত-রেখা ; ভূতল-রেখা

Meridian—মধ্যরেখা (?) ; মধ্যাকাশ-রেখা ; মধ্যাহ্ন-রেখা

পদার্থশাস্ত্র, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞানে median bisector, axis, diameter প্রভৃতি বহুতর মধ্য-রেখার সাক্ষাৎ পাই ইহা সত্য। কিন্তু meridian মধ্য-রেখা নহে। ইহা মধ্যাকাশ রেখা। সূর্য্যের কেন্দ্র এই রেখার উপর আসিলে মধ্যাহ্ন হয়, এজন্য ইহাকে মধ্যাহ্ন-রেখাও বলা যাইতে পারে।

Observer—দ্রষ্টা (?) ; দর্শক

বাঙলা দ্রষ্টা শব্দটি ইংরেজী seer শব্দটির ন্যায় metaphysical অর্থে বহু ব্যবহৃত হইয়া একটি বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে। Physics-এ ইহা observer অর্থে ব্যবহার না করাই ভাল। Observer সোজাসুজি দর্শক হইলেই যথেষ্ট ; তাহার দ্রষ্টা হইবার প্রয়োজন নাই।

Perihelion—অনুদূর (?) ; স্ফুট বিন্দু

গ্রহের বৃত্তাভাস কক্ষের যে বিন্দু সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে, তাহাকে perihelion বলা হয়। ইহাকে স্ফুটবিন্দু বলা যাইতে পারে। অনুদূর শব্দটি প্রচলিত বা সহজবোধ্য কোনটাই নহে।

Polar axis—ধ্রুবাক্ষ (?) ; মেরুরেখা

Pole যে ধ্রুব (নিশ্চল, অপরিবর্ত্তনীয়) নহে একথা বৈজ্ঞানিক জানেন। ইহা মেরু মাত্র। (End of the axis) ধ্রুব (স্থির) তারা সর্ব্বদাই প্রায় মেরুরেখার অতি সন্নিকটে অবস্থান করে বটে, তাই বলিয়া মেরুকে ধ্রুব বলা অনুচিত।

Progression—অগ্রগতি ; + প্রগতি (আজকাল প্রগতির যুগ কি না !)

Radius Vector—দূরক (?) ; কোণ-রেখা

কোনও সরল রেখা যখন ইহার প্রাথমিক অবস্থান হইতে একটি প্রান্তকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিয়া যায়, এবং এইরূপে কোণ উৎপন্ন করে, তখন [ঐ কোণ সম্পর্কে] ইহাকে radius vector বলা হয়। ইহা বাস্তবিক পক্ষে কোণ-উৎপাদক রেখা। ইহাকে দূরক [কেন ?] না বলিয়া কোণ-রেখা বলা অধিকতর সঙ্গত।

Star—তারা, ; তারকা; + নক্ষত্র

Tide—জলস্ফীতি ; + জোয়ার

Ebb-tide
Low-tide } ভাঁটা

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

[ত্রিপিটকাচার্য্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন বৌদ্ধধর্ম্ম ও শাস্ত্রে ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের অন্যতম। আগ্রা-অযোধ্যাপ্রদেশে আজমগড়ে ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ-পরিবারে ইঁহার জন্ম। কৈশোরেই গৃহত্যাগ করিয়া ইনি বারাণসী গমন করিয়া সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ইনি কিছুকাল বিহারে একজন মোহন্তের শিষ্যরূপে ছিলেন—এই সময় ইঁহার নাম ছিল বাবা রামোদারদাস। বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ইনি সিংহল গমন করেন ও তথা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভের নিমিত্ত তিব্বত যান। তাঁহার তিব্বত-ভ্রমণের বিপৎসঙ্কুল ও চিত্তাকর্ষক কাহিনী এই প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরাহুল সাংকৃত্যায়ন "তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম" "বুদ্ধচর্য্যা", "বিনয়পিটক", ও অন্যান্য হিন্দী পুস্তকের প্রণেতা। তিনি সম্প্রতি পুনরায় তিব্বতে গিয়াছেন।]

উদ্যোগ পর্ব্ব

১৯২৬ সালে আমি কাশ্মীর হইতে লদাখ্ যাত্রা করি। ফিরিবার পথে দলাই লামার ডংরী-খোর্সুম প্রদেশে কিছুদিন ছিলাম কিন্তু কয়েকটি কারণে বেশী দিন থাকা সম্ভব হয় নাই। ১৯২৭-২৮ সাল আমার সিংহলপ্রবাসে কাটে। সেই সময় আমি পুনর্ব্বার তিব্বত যাওয়ার আবশ্যকতা অনুভব করি। আমি দেখিলাম যে ভারতের অতীত যুগের দার্শনিকদের অনেক গ্রন্থের অনুবাদ এবং বৌদ্ধ ভারতের ধর্ম্ম ও ইতিহাসের অনেক বহুমূল্য সামগ্রী তিব্বতে গেলে আমি পাইতে পারি। ফলে আমি পালি বৌদ্ধগ্রন্থ অধ্যয়ন শেষ করিবার পর তিব্বত যাত্রা করা স্থির করিলাম।

সিংহলের কার্য্য শেষ হইলে ১৯২৮ সালের ১লা ডিসেম্বর আমার যাত্রারম্ভ হইল। বলা বাহুল্য, পূর্ব্ব হইতেই পথ ও উপায়ের কথা আমি ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম। জানা ছিল যে সোজাপথে ব্রিটিশ সীমানা পার হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। পাসপোর্টের ঝঞ্ঝাট ও কর্ত্তাদের কৃপার অপেক্ষায় বসিয়া থাকা আমার সহ্য হইবে না। ঐ কারণে কালিম্পং লাসার (লহাসা) সোজা পথ ছাড়িয়া—কেন-না ঐ পথে গ্যাংচী পর্য্যন্ত ইংরেজের প্রখর দৃষ্টির আড়াল হইবার উপায় নাই—নেপালের পথে যাওয়া স্থির করিলাম। নেপাল প্রবেশও সোজা নহে, কেন-না নেপাল রাজসরকার ব্রিটিশ প্রজা মাত্রকেই সন্দেহের চক্ষে দেখেন। ভোটিয়া-(তিব্বতী) দিগেরও ঐ অবস্থা। সুতরাং আমার কার্য্যোদ্ধারপথে তিনটি গবর্ণমেণ্টের চোখে ধূলা দেওয়া নিতান্তই দরকার হইয়া পড়িল। অস্তু। যাত্রা-প্রকরণ আয়ত্ত করার জন্য শ্রীযুত কাওয়াগুচি (জাপানী শ্রমণ) এবং মাদাম নীল—এই দুজনের পুস্তক পড়িয়াছিলাম। তাহাতে ভোটিয়াদিগের আচার-ব্যবহার বাদে পথের পরিচয় বিশেষ কিছু পাই নাই। শেষে নেপাল-কাঠমাণ্ডু হইতে তিব্বত যাইবার পথ ভারতীয় সরকারী সার্ভে ম্যাপ হইতে লিখিয়া লইলাম। ম্যাপ-নক্সা ইত্যাদি সন্দেহজনক বস্তু সঙ্গে রাখা বিপজ্জনক। ঠিক করিলাম, নেপালপ্রবেশের পক্ষে শিবরাত্রিই শ্রেষ্ঠ কাল। পূর্ব্বে, ১৯২৩ সালের শিবরাত্রিতে, আমি নেপাল গিয়াছিলাম এবং দেড়মাস সেখানে ছিলাম। আমি দেখিলাম এখনও শিবরাত্রির তিন মাস বাকী। সুতরাং স্থির করিলাম যে ঐ সময়ের মধ্যে পশ্চিম ও উত্তর ভারতের বৌদ্ধ তীর্থ এবং ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ দর্শন করিব।

কলম্বো হইতে ট্রেনে তলেমন্নার আসিলাম। এখানে ষ্টীমার-ঘাট। সিংহল হইতে ভারত মাত্র দুই ঘণ্টার পথ। তাহাও কয়েক মিনিট মাত্র 'অকূল পাথার', তাহার পরেই তট দৃষ্টিগোচর হয়। ধনুষ্কোডীতে নামিয়া কাষ্টম-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে আমার প্রায় পাঁচ মণ পুস্তক—অধিকাংশই ত্রিপিটক ও তাহার 'অট্‌ঠকথা', অর্থাৎ ভাষ্য—উদ্ধার করিয়া রেলযোগে পাটনা রওয়ানা করিলাম। তাহার পর মাদুরা, শ্রীরঙ্গম ও পুনা দেখিয়া কার্লে পৌঁছিলাম। কার্লে গিরিগুহা মলবাড়ী ষ্টেশন হইতে প্রায় আড়াই মাইল মোটরের পথ। পর্ব্বতদেহ কাটিয়া গুম্ফা নির্ম্মিত হইয়াছে। চৈত্যশালা বিশাল ও সুন্দর। শেষের দিকে প্রস্তর কাটিয়া

স্তূপ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। চৈত্যশালার বিশাল স্তম্ভ-গুলিতে কোথাও কোথাও নির্ম্মাণকারীদিগের নাম খোদিত আছে। চৈত্যাগারের পাশে ভিক্ষুদিগের থাকিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষও আছে। উপরে সুন্দর জলাশয়। এই সবই আধ মাইল চড়াইপথের মধ্যে।

কার্লে হইতে নাসিক গেলাম। এই স্থানের আশপাশে অনেক লেনি (গুম্ফা) আছে। সেগুলি দেখা সম্ভব নয়, এই ভাবিয়া ১২ই ডিসেম্বর পাঁচ মাইল দূরস্থিত পাণ্ডব গুম্ফা দেখিতে গেলাম। এখানে কার্লের মত অতটা চড়াই নাই। গুম্ফাপার্শ্বে অসংখ্য মহাযান দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। বড় চৈত্যশালায় বিশাল বুদ্ধ-প্রতিমা আছে। অন্য এক চৈত্যশালার চৈত্য কাটিয়া ব্রাহ্মণ্য দেবতার প্রতিমা রচনা করা হইয়াছে। শিলালিপিতে ব্রাহ্মণ ভক্ত শক রাজকুমার উষবদাত এবং তাঁহার কুটুম্বিনীর লেখও আছে। এই শকবংশই খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর কিছু পূর্ব্বে নিজ দেশ শকস্থান (সীস্তান) হইতে আসিয়া সিন্ধু-গুজরাত প্রদেশ এবং তথা হইতে উজ্জয়িনী ও মহারাষ্ট্র অধিকার করেন। উজ্জয়িনীর শকরাজ নহপান ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নৃপতি। উষবদাত ইঁহারই জামাতা। পৈঠনরাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি খ্রীঃ পূঃ ৫৩ সালে নহপান বা তাঁহার কোনও বংশজকে সংহার করিয়া উজ্জয়িনী উদ্ধার করেন। এই গৌতমীপুত্র সাত-কর্ণিই বিক্রমাদিত্য নামে প্রসিদ্ধ।

নাসিক হইতে আমার বেরুল যাইবার ইচ্ছা ছিল। বেরুল এখন "এলোরা" রূপ বিকৃত নামেই পরিচিত। ঔরঙ্গাবাদ ষ্টেশনে নামিবামাত্রই এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। প্লাটফর্ম্মের বাহিরে আসিবামাত্রই পুলিসের সামনে হাজির হইতে হইল। নাম বলিতে আমার কোনও আপত্তি ছিল না, কিন্তু সেখানে পুলিস সিপাই অপমানসূচক ভাষায় বাপ-আদির নাম জিজ্ঞাসা করায় আমি কিছু বলিতে অস্বীকার করিলাম। ফলে আমাকে টানিয়া প্রথমে থানায় পরে তহশীলদারের কাছে লইয়া হয়রান করা হইল। হায়দরাবাদের নবাবের উচিত বাহিরের লোকের জন্য পাসপোর্টের ব্যবস্থা করা। যাহা হউক, তহশীলদার মহাশয় ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি, মান্দ্রাজ-গভর্ণরের ঐদিনে বেরুল দর্শন এইরূপ ব্যবহারের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া আমায় ছুটি দিলেন। পরদিন মোটরযোগে নয়টার সময় বেরুলে পৌঁছিলাম। ঐ মোটর-বাসে এক আমেরিকান সঙ্গী হইলেন। পথে বুঝিলাম ইনিও আমারই অবস্থাপ্রাপ্ত। শ্রীযুক্ত স্মিথ (ইঁহার নাম) ওহায়ো ওয়েস্‌লীয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের (আমেরিকা) ধর্ম্মপ্রচার বিভাগের অধ্যক্ষ। ইনি অঙ্কোরবাট-আদির ভারতীয় ভব্য প্রাচীন বিভূতি সকল দর্শন করিয়া ভারতে আসিয়াছেন। ইঁহার হৃদয় মানবোচিত সহানুভূতিপূর্ণ।

আমরা কৈলাস মন্দির হইতে দর্শন আরম্ভ করিলাম। এক বিশাল শিবালয়—অঙ্গন, দ্বার, কক্ষ, আগার, হস্তিবাহন, নানা মূর্ত্তি চিত্র ইত্যাদি সমস্তই—মহাপর্ব্বতগাত্র ছেদন করিয়া নির্ম্মিত ও গঠিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া আমেরিকান মিত্র বলিলেন, "ইহার সম্মুখে অঙ্কোরবাট দাঁড়াইবার উপযুক্ত নহে। ইহা অতীত ভারতের সম্পত্তি; দৃঢ় মনোবল, হস্তকৌশল, সকলেরই সজীব স্বরূপ-পরিচায়ক।"

বেরুলে ডাকবাংলা বা দোকান-পাট কিছুই নাই। গুহার নিকটে পুলিস চৌকী আছে। পুলিস সিপাহীরা মুসলমান এবং অতি সৎলোক। বলিবামাত্র যথাসাধ্য যাত্রীদিগের সহায়তা করিতে প্রস্তুত। এই সজ্জনদিগের প্রদত্ত রুটি ও কৈলাস গুহার ঝরণার জলে, আমাদের প্রাতরাশ সম্পন্ন হইল। তাহার পর বৌদ্ধগুহার অংশ ধরিয়া সমস্ত দেখিতে আরম্ভ করিলাম। কৈলাসের বাম ভাগে বারোটি বৌদ্ধগুহা। পরে ব্রাহ্মণ-গুহাবলী আছে, তাহার মধ্যস্থলে কৈলাস। অন্তর্দেশে চারিটি জৈন গুহা আছে। বস্তুতঃ এই সকল গুহাকে পর্ব্বতে কর্ত্তিত প্রাসাদরাজি বলা উচিত। আমাদের সৌভাগ্য, পূর্ব্বদিন মান্দ্রাজের গবর্ণর আসায় গুহাবলী পরিষ্কার করা হইয়াছিল। সুতরাং চামচিকার দুর্গন্ধ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলাম।

সূর্য্য অস্ত গেল। আমরা তখন শেষ জৈনগুহা দর্শন সমাপ্ত করিয়াছি। ফিরিবার সময় আমার মনে কেবলই আমাদের সেই পূর্ব্বপুরুষদের কথা মনে আসিতেছিল যাঁহারা এইরূপে পর্ব্বত কাটিয়া নিজেদের শ্রদ্ধা ও কীর্ত্তির অক্ষয় নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের বিচিত্র রূপকলাকৌশল, বহুশতাব্দীব্যাপী অতুলনীয় সহিষ্ণুতা, কৃতি ও হৃদয়ের শক্তির পরিচায়ক এই নিদর্শন সত্যই কি অপূর্ব্ব নহে?

১৪ই ডিসেম্বরে আমরা দুই জনে ঐ পুলিসদের দেওয়া চারপায়ায় বিশ্রাম করিলাম। সত্যই এই সজ্জন সিপাহীরা না থাকিলে এইরূপ মনুষ্যবসতিবিহীন গহনে যাত্রীদিগের অশেষ কষ্ট হইত। রাত্রে ইহাদের গরম গরম রুটিতে আমাদের ক্ষুধা নিবারণ হইল। স্থথর মহাশয় ভাগ্যবান, তাঁহার জন্য গরম চাও জুটিয়া গেল।

১৫ই ডিসেম্বর আমরা পদব্রজে দৌলতাবাদ চলিলাম। পথে খুল্দাবাদে সম্রাট ঔরংজেবের সমাধি দেখিলাম। ইহার সম্মুখে পীর জৈনুদ্দিনের কবর রহিয়াছে। দেবগিরির (দৌলতাবাদ) সুদূরবিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, একান্তে দণ্ডায়মান শৈলসানুদেশে স্থিত বহু সরোবর, দ্বার, প্রাকার, গোলকধাঁধা, জলাশয়, মন্দিরধ্বংসাংশ, মিনার-গম্বুজ-বিশ্রামাগার যুক্ত বিকট দুর্গ এখনও মানুষের মনে বিস্ময় আনয়ন করে। এই দেবগিরিবাসীদিগের শ্রদ্ধা-বিভূতির অক্ষয় স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ উপরি-উক্ত কৈলাস ও অন্যান্য গুহামন্দির এখনও বর্ত্তমান। সে সকল দেখিলেও হৃদয় গর্ব্বে স্ফীত হয়। কি করিয়া ইহার অধিস্বামী পরাজিত হইতে পারিলেন তাহা চিন্তার অতীত; পরাজিত কিন্তু সত্যই যে হইয়াছিলেন তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই।

তৃতীয় প্রহরে আমরা ঔরঙ্গাবাদ অভিমুখে চলিলাম। স্থথর মহাশয় আগেই ডাকবাংলায় থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরদিন আমিও অজণ্টা যাইব, সুতরাং আমার জিনিষপত্রও ঐখানেই আনিলাম।

শুনিয়াছিলাম ফর্দ্দাপুরের বাস্ সকালেই ছাড়ে। কার্য্যকালে বেলা নয়টায় ছাড়িল। নিজাম-সরকার সমস্ত বাসের ঠিকা এক জনকে মাত্র দেওয়ায় যাত্রীদের সময় অর্থ ইত্যাদি সব দিকেই লোকসান হইতেছে। আমরা কোনপ্রকারে বেলা একটায় ফর্দ্দাপুরের ডাকবাংলায় পৌছিলাম। গভর্ণর-বাহাদুর তখন অজণ্টা দেখিয়া চলিয়া গিয়াছেন, শুধু তাঁবু ও অন্য লটবহর পড়িয়া আছে।

খাওয়ার পাট সাঙ্গ করিয়া আমরা অজণ্টার দিকে ছুটিলাম। প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বহু দিনের অভিলাষ পূর্ণ হইল। বিভিন্ন কালে নির্ম্মিত নানা গুহার অভ্যন্তরে অতি সুন্দর চিত্রপ্রতিমা, কক্ষশালাবিন্যাস ইত্যাদি অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিলাম। নির্জ্জন স্থানে জলের সান্নিধ্য, পর্ব্বতের শ্যামশোভা। অজণ্টার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও এইরূপ অনুপম। ভাল করিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই "বন্ধ হইবার সময় হইয়াছে" ঘোষণা শুনিলাম, কোন প্রকারে দেখা শেষ করিতে হইল।

ফিরিবার পথে স্থথর মহাশয় প্রাচীন কীর্ত্তির কথা প্রসঙ্গে বর্ত্তমান ভারতের অবস্থারও চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। তিনি বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতিগত অবসন্ন ভাবের উল্লেখ করিলেন। আমি বলিলাম, "উদ্দেশ্যের কথায় বলা যাইতে পারে, আমাদের উদ্দেশ্য তাহাই যাহা উদীয়মান জাতির হওয়া উচিত এবং ইহাও নিঃসন্দেহ যে বাধাবিঘ্ন ঘটিলেও জাতির উদ্দিষ্ট পথে অগ্রগতি অনিবার্য্য। চিত্তবিক্ষেপ ও মানসিক অবসাদ আমাদের বিশেষ দুর্ব্বলতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। জাতীয়তা ও ধর্ম্ম দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। একের স্থানে অন্যকে স্থাপন করা অসম্ভব। ইহা সত্য যে একের প্রভাব অন্যের উপর আসেই এবং তাহা অনুচিতও নহে। তথাপি যদি কোন ধর্ম্ম কোন জাতির সুদূর অতীত হইতে আবহমান জাতীয়তা ও সংস্কৃতির প্রবাহকে স্থানচ্যুত করিয়া সেই স্থানে অন্য কিছু স্থাপন করিতে চাহে, তবে বলিতে হইবেই যে উহা তাহার পক্ষে বিশেষ ধৃষ্টতা ও একান্ত অস্বাভাবিক কার্য্য। হিন্দুস্থানে ইস্লাম এই ভুল করিয়াছেন এবং খ্রীষ্টানদিগেরও অনেকেই করিতেছেন।" স্থথর মহাশয় বলিলেন, "আমরাও ইহা পছন্দ করি না।"

আমি বলিলাম, 'ছুৎমার্গ'ও আগের মত কোথায়? যাহা আছে তাহাই বা কয় দিনের জন্য? তবে কেন হিন্দুস্থানী নাম, হিন্দুস্থানী বেশ, হিন্দুস্থানী ভাষা ও সংস্কৃতি রাখিয়া সাচ্চা খ্রীষ্টান হওয়া যায় না? আমি অবশ্য স্বীকার করি যে অধিকাংশ আমেরিকান পাদরীও ঐরূপ জাতিভ্রষ্ট হওয়া পছন্দ করেন না।

তিনি বলিলেন, "এই বার আমাদের যাবতীয় ভারতীয় মিশনে সাক্ষাৎভাবে এই বিষয়ের আলোচনা অবশ্যই করিব।"

আমি বলিলাম, "যদি এই প্রকারে ভারতীয় মুসলমানেরাও ঐ পন্থা ধরিতেন তবে এই বিচ্ছেদ ঘটিত না। তবে সে

সময়ও দূর নহে যখন এ সকল ভুলভ্রান্তি তিরোহিত হইবে। ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, সন্দেহ নাই।

১৭ই ডিসেম্বর আমি গোযানে পরে মোটর বাসে ফর্দ্দাপুর হইতে জলগাঁও আসিয়া সেইদিনই সাঁচী রওয়ানা হইলাম। শ্রীযুক্ত স্থথর পরদিন আসিবেন স্থির করিলেন।

প্রত্যুষে সাঁচী পৌছিলাম। মনে হইল এই সেই স্থান যেখানে মহারাজ অশোকের পুত্র মহেন্দ্র সিংহলে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য চিরপ্রস্থান কারবার পূর্ব্বে কত দিন ছিলেন। এই সেই স্থান যেখানে বুদ্ধদেবের শুদ্ধতম ধর্ম্ম (স্থবিরবাদ) মগধ ছাড়িয়া বহু শতাব্দী বর্ত্তমান ছিল। সেই সময় মহান সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন—তথাগতের এই দুই প্রধান শিষ্যের দেহাস্থি বিশাল ও সুন্দর স্তূপের মধ্যে রাখা হইয়াছিল, ইহা এখন লণ্ডনের মিউজিয়মের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

সাঁচী স্তূপ মুগ্ধ হইয়া দেখিলাম। ভূপাল রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুন্দর ব্যবস্থা দেখিয়াও বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। ১৯ হইতে ২৬ তারিখ পর্য্যন্ত কোঁচ-এ এক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে থাকিলাম। "দশার্ণ" দেশ শুষ্ক হইলেও এখনও কত মধুর!

আমাকে শিবরাত্রির পূর্ব্বেই মধ্যদেশের (কুরুক্ষেত্র হইতে বিহার প্রান্ত অঞ্চলের প্রাচীন নাম) বুদ্ধচরণ পরিপূত বহুস্থান দর্শন করিতে হইবে। এই ভাবিয়া ২৭শে ডিসেম্বর আমি ফের বাবা রামউদারের "কালী কমলী" পরিলাম। সঙ্গে একটি ছোট ঝোলা এবং ভিক্ষু আনন্দের সিংহল ফেরৎ বাল্‌তি। ২৭শে তারিখেই কনোজ পৌছিলাম। 'বে-ঘর' কখনও ঘরের চিন্তা করে? একাওয়ালাকে বলিলাম, শহর হইতে বেশী দূর না হয় এমন কোনও বাগানে পৌছাইয়া দাও। ছোট বাগানও পাওয়া গেল, সেখানকার পূজারী মহাশয় অকিঞ্চন সাধুর উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। উন্মুক্ত আকাশের নীচে দুই বৎসর পরে* শীতের সহিত সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু সে সাক্ষাৎ মধুর লাগিল না।

কনোজ? নূতন কনোজ তো গোলাপজল না ছিটাইয়াই 'সুগন্ধে' ভরপূর! তবে আমি তো মৃতের ভক্ত† সুতরাং ইহাতে পশ্চাৎপদ হওয়া চলে না। ২৮শে অল্প কিছু জল পান করিয়াই স্তূপের ধূলারাশি ঘাঁটিতে চলিলাম। এমনই তো দেশব্যাপী দারিদ্র্যের পীড়ন, প্রাচীন নগরীগুলির ভাগ্য যেন ততোধিক ক্লিষ্ট। কত শতাব্দী ধরিয়া পতন আরম্ভ হইয়াছে, জানি না আরও কতদূর পড়িবে। বিশেষতঃ শ্রমজীবীদের দুর্দ্দশা বর্ণনাতীত। আমি চামার শ্রেণীর একজনকে পথ-প্রদর্শকরূপে সঙ্গী করিলাম। সারাদিন ঘুরিবার মজুরী চার আনা—সে তাহাই যথেষ্ট ভাবিল।

কনোজ কি একদিনে দেখা চলে, না তাহার বর্ণনা এই প্রবন্ধের মধ্যে লেখা সম্ভব? কনোজ বর্ণনার মুখবন্ধই এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধের উপযুক্ত। আমি অজয়পাল, রৌজা, টিলামুহল্লা, জামামস্‌জিদ (সীতা রসোই) বড়াপীর, ক্ষেমকলা-দেবী, মখদুমজহানিয়া, কালেশ্বর মহাদেব, ফুলমতী দেবী ও মকরন্দ নগর, এই পর্য্যন্ত কোনক্রমে দেখিলাম। সর্ব্বত্রই পুরাতন বস্তুর ভগ্নাবশেষের ছড়াছড়ি, অর্দ্ধ-সত্য কাহিনীর প্রচার, পুরাতন, সুন্দর কিন্তু খণ্ডিত-ছেদিত মূর্ত্তির প্রাচুর্য্য, এ সকলই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভব্য কান্যকুব্জের ক্ষীণ ছায়া দেখাইতেছিল। ফুলমতী দেবীর তো চারিধারে বুদ্ধ প্রতিমার আধিক্য দেখিলাম।

লোকটিকে চার আনা পয়সা দিলাম, সে আপনার প্রতিবেশী দিগের নিকট কিছু প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া দিল, তাহারও দাম দিলাম। ফিরিবার জন্য একা খুঁজিলাম, কিন্তু সেখানে ভাগ্য অপ্রসন্ন। কাছেই কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "আসুন শাহ্‌ সাহেব, * কোথা হইতে আগমন করিলেন?"

আমি বলিলাম, "ভাই, দুনিয়ার ধূলা ঘাঁটিয়া বেড়ায় যাহারা তাহাদের কি এ প্রশ্ন করা চলে?"

"জুমার নমাজ কি জামা মস্‌জিদে সম্পন্ন করিলেন? পান গ্রহণ করুন।"

"ধন্যবাদ। পান খাওয়া অভ্যাস নাই, ফরুখাবাদ যাইতে হইবে।"

ইহারা আমার লম্বা কালো আলখাল্লা দেখিয়াই এই ভ্রম করিলেন। ভ্রম কেন বলি, সনাতন হিন্দুও তো আমাকে

* সিংহলে দুই বৎসর শীতভোগ হয় নাই।

† অর্থাৎ অতীত স্মৃতির

* ভদ্র মুসলমান উচ্চশ্রেণীর ফকিরকে শাহ্‌ বলিয়া সম্বোধন করেন।

নাস্তিকই বলেন। যাহা হউক, অন্য প্রশ্ন এড়াইয়া চম্পট দিলাম। ষ্টেশনের কাছে লরীতে চড়িয়া কনৌজ হইতে পাঁচটার সময় বিদায় লইলাম।

পথে 'পুনিত পঞ্চালে'র সবুজ ক্ষেত, আমের বাগান, গ্রামের হাট, কৃশশরীর জীর্ণবস্ত্র ভবিষ্যতের আশারূপ গ্রাম্য ছাত্রদল, এমনই সব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ফরুরুখাবাদে গাড়ী বদল করিয়া ফতেহ্‌গড়ের গাড়ীতে ঐ দিনই মোটা ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। রাত্রে ষ্টেশনেই মুক্ত বাতাসের সঙ্গে প্রচণ্ড শীতের আনন্দে দেহমন পুলকিত হইল! অদ্য, সকালে সংকিসা-বসন্তপুরের পথ ধরিলাম।

২৯শে ডিসেম্বর প্রত্যুষেই কালী নদীর নৌকা আমাদের নামাইয়া দিল। ক্ষেতের মাঠে ঘুরিয়া-ফিরিয়া, ভুলভ্রান্তি করিয়া কোন প্রকারে তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বিসারী দেবীর কাছে পৌঁছিলাম। দেখিলাম অতীত-ভারত-গৌরব সম্রাট অশোকের অক্ষয় কীর্ত্তিরূপ স্তম্ভরাজির মধ্যে একটির শিখরহস্তীর পাশেই কয়েকটি মলিনবেশ ভারতসন্তান রৌদ্র সেবন করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে পুষ্করগিরি আমাকে পরিচিত বন্ধুর মত স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন। মুখ হাত ধুইবার পর প্রাচীন অশোকস্তূপ-অধিকারিণী অজ্ঞাত-নামা বিসারী দেবীকে দর্শন করিলাম। পুষ্করগিরি ভোজনের আয়োজন আরম্ভ করিলেন, আমি সংকিসা গড় দেখিতে চলিলাম। পাঞ্চালদিগের প্রাচীন মহানগর সাংকাশ্যের ধ্বংসাবশেষও মহান্। গ্রামের অধিকাংশ ঘরই পুরাতন ইটের তৈয়ারী। শুনিলাম অতিগভীর কূপ খনন কালে এখনও বহুদূর পর্য্যন্ত কাঠের বিশাল তক্তা পাওয়া যায়। পাওয়াই সম্ভব, কেননা এককালে দুর্গ, প্রাসাদ, চত্বর সবই কাষ্ঠময় হইত। সংকিসা ফরুরুখাবাদ জেলায়, নিকটেই এটায় সরাই-অহাগত আছে যেখানে এখনও বহু জৈন (সরাবগী) পরিবার বাস করে। সেখানে কিছুদিন পূর্ব্বের পুরাতন মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। সংকিসা প্রাচীন নগরের উচ্চ ভিটার উপর স্থাপিত বসতি।

ঐদিন সন্ধ্যায় পুষ্করগিরির প্রস্তুত সুমধুর ভোজন গ্রহণ করিয়া তিন জেলার প্রান্ত ঘুরিয়া মৈনপুরী জেলার অন্তর্গত মোটায় পৌঁছিলাম।

এখন আমার উদ্দেশ্য ছিল কুরুকুলদীপের অন্তিম শিখা বৎসরাজ উদয়নের রাজধানী কৌশাম্বী দর্শন। মোটা হইতে রাত্রে শিকোহাবাদের ট্রেনে রওয়ানা হইয়া সকালে ভরবারী পৌঁছিলাম। নামিবামাত্র মুখ হাত ধুইয়া উদর-পূজার ব্যবস্থা করিলাম। আমার পভোসা হইয়া কৌশাম্বী যাইবার ইচ্ছা ছিল। শুনিলাম করারী পর্য্যন্ত এক্কায় যাওয়া যায়, পরে পদব্রজেই উপায়। এক্কা জোগাড় করা হইল। পথ কাঁচা কিন্তু এক্কার ঘোড়া সতেজ, সুতরাং নয় মাইল পথ আর কতই বা সময় লাগে? করারীরও অধিকাংশ বাসিন্দা মুসলমান। অনেক চেষ্টার পর দুইটি মুসলমান বালক পথ দেখাইয়া যাইতে রাজী হইল। তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য কিছু পেয়ারা কিনিয়া দিলাম।

গ্রাম হইতে বাহির হইবামাত্র মধ্যবয়স্ক এক সজ্জনের সঙ্গে দেখা হইল। ছিপছিপে-গড়ন, প্রসন্নমুখ ভদ্রলোক যেন প্রেম ও বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি। ইনি গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশের লোক। দেখা হইবামাত্র বলিলেন,

"শাহ্ সাহেব এত বেলায় কোথায় চলিয়াছেন? আজ আমার গরিবখানায় বিরাজ করুন।"

"ভাই, আজ আমায় পভোসা পৌঁছাতে হবে।"

"ফকিরের কাছে আজ ও কালের মধ্যে প্রভেদ কি? আজ এ দীনের গৃহ পবিত্র করুন। আমাদের মত ভাগ্যহীনদের এরূপ সৌভাগ্য কতবার হয়?"

এরূপ প্রেমের বন্ধন এড়ানো মুস্কিল, কোন প্রকারে সেখান হইতে মুক্ত হইলাম। এদিকে সঙ্গী ছোকরা দুটিও ইতস্ততঃ করিতেছিল। অবস্থা বুঝিয়া কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করিলাম। তাহারা ফিরিয়া নিশ্চয়ই শাহ্ সাহেবের গুণকীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হইয়াছিল।

করারী হইতে পভোসা পাঁচ ক্রোশ পথ শুনিয়াছিলাম। বেলা একটা বাজিয়া গেল। ডিসেম্বরের দিনও ছোট। সুতরাং জোরে চলিতে লাগিলাম। চারি দিকের শ্যামল ক্ষেত্র সদ্যবর্ষণের ফলে আরও শ্যামল দেখাইতেছিল। অদূরে বাবুল গাছের সারির পাশে ভেড়া-ছাগল চরাইয়া কুমার-কুমারীর দল ফিরিতেছিল। আঙুলপ্রমাণ শস্যের ক্ষেতে ভেড়া চরাইবার যুগ চলিয়া গিয়াছে কিন্তু রাখালের দল আজও বহু শতাব্দীর পুরাতন সেই প্রাচীন গীতি গাহিতেছে। ক্ষেতের মধ্যে রাস্তা হারাইয়া উহাদের কাছে

খোঁজ করিতে গেলাম। সেখানে কিছু ক্ষণের জন্য পথের একজন সাথী জুটিল। তাহার ঘর গঙ্গার নহরের (সেচখালের) পাশের একটি বড় গ্রামে। ঐ গ্রামে আমার কোনই প্রয়োজন নাই, পভোসা আজই পৌঁছান দরকার—শুনিয়া বেচারা বলিল, মনিবের জন্য সে গাঁজা কিনিতে আসিয়াছে, যদি তিনি অনুমতি দেন তবে সে আমায় পভোসা পৌঁছাইয়া দিবে। সময় আসিলে অনেক ক্ষণ গ্রামের পাশে নহরের ধারে বৃথা অপেক্ষা করিয়া বুঝিলাম, মনিবের ইচ্ছা অনুকূল হয় নাই। যাহাই হউক রাস্তার নির্দ্দেশ এবং পথে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ঘর আছে কিনা সেই ঠিকানা লইয়া চলিলাম। নহরের গায়েই এক ব্রাহ্মণ-বাড়ির খোঁজ পাইয়া দ্রুত সেখানে পৌঁছিলাম। বেলা তখন প্রায় শেষ, যদিও পভোসা পৌঁছিবার ইচ্ছা তখনও মনে রহিয়াছে।

পণ্ডিতজীর খোঁজ করিলাম। তিনি বাড়ি ছিলেন। আমাকে বাহিরে দেখিতে পাইয়া তিনি আসিয়া আমায় দেখা দিলেন। ফলে, এ অভাগা দেশে সাধনসঙ্গতিহীন গৃহস্থের দ্বারে অপরিচিত সাধু দেখিলে যে মনোভাব হয়, তাহাই হইল। আরও আগাইয়া উত্তম বিশ্রামস্থান পাওয়া যাইবে এই নির্দ্দেশ পাইলাম। আমারও অন্তরাত্মা তো পভোসামুখী, সুতরাং আগেই চলিলাম। পথ কিছু দূরের পর নহর ছাড়িয়া ক্ষেতের মধ্যে চলিল। ক্ষেতের পাশে আখমাড়া কল। পথ ভুল হইলে সেখানে ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইতেছিল। সূর্য্যদেবের রক্তিম কিরণ আকাশপ্রান্তে প্রায় মিলাইয়া গিয়াছিল। রাস্তা পূর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট হইলেও বন্ধুর। হেথা-হোথা উঁচুনীচু নালার পাড়। আঁকাবাঁকা মেঠো পথের যেখানে-সেখানে চৌমাথা। সুতরাং সে পথের নিশ্চয়তা কিছুই ছিল না। মনে হইল, এ তো যমুনার উত্তরে বৎসদেশের সমতল ভূমি, তবে এখানকার জমি চেদি-দেশের ন্যায় এব্ড়ো-খাবড়ো খানাখন্দে পূর্ণ কেন। এখনও অগ্রসর হইতেছিলাম কিন্তু মনের মধ্যে আশার বাণী ক্রমেই ক্ষীণ হইতে লাগিল। চারিদিক অন্ধকার। কোন দীপের আলোও চোখে পড়িল না যে সেদিকে চাই। এমন সময় এক পুষ্করিণীর বাঁধ চোখে পড়িল। সেদিকে গিয়া প্রথমে এক বটগাছ, পরে ছোট একটি শূন্য দেবালয় দেখিলাম। ভাবিয়া স্থির করিলাম, এত রাত্রে এইভাবে অপরিচিত গ্রামে যাওয়া অপেক্ষা শূন্য দেবালয়ে আশ্রয় লওয়াই শ্রেয়। বাহিরের চবুতরা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বিজলী-মশালের সাহায্যে ছোট-বড় ভাঙা মূর্ত্তি ঘেরা ছোট দালান দেখা গেল। রাত্রিযাপন সেখানেই করিব স্থির করিয়াছি, এমন সময় নিকটেই মনুষ্যকণ্ঠস্বর শুনিলাম।

আগাইয়া গিয়া দেখিলাম, গাছের নীচে দুখানি গরুর গাড়ী। শুনিলাম কয়েকটি জৈন পরিবার তীর্থদর্শনের জন্য এই গাড়ীতে আসিয়া নিকটস্থ ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছে। পভোসা পৌঁছিয়াছি শুনিয়া মন প্রসন্ন হইল। ধর্ম্মশালার কূপ হইতে জল লইয়া আসিলাম এবং গাড়োয়ানদের পাশেই শয্যাসন বিছাইলাম। তাহারা ধুনীও জ্বালাইয়া দিল। গরিবের নিকট এরূপ সৌজন্য পাওয়া যায়। প্রাতে গ্রামের ভিতর দিয়া যমুনাস্নানে চলিলাম। গ্রামে কয়েকটি ব্রাহ্মণ্য দেবালয় দেখিলাম। স্নান করিয়া ফিরিবার পথে মনে হইল, যাহার জন্য এত পথের ধূলা উড়াইলাম, এবার সেই পাহাড় দেখা উচিত। পালিসূত্রে আনন্দের* ঘোষিতারাম† হইতে দেবকট সোব্‌ভ্‌ নামক স্থানের ছোট পাহাড়ে যাত্রার প্রসঙ্গ পড়িয়া সন্দেহ হইয়াছিল যে যমুনার উত্তরে পাহাড় কোথায়। কিন্তু আয়ুষ্মান্ আনন্দ‡ যখন এই সকল তীর্থ দর্শন করিয়া সিংহলে ফিরিলেন তখন সে প্রশ্নের সমাধান হইয়া গেল। এই একান্তে স্থিত পাহাড়টি দুই অংশে বিভক্ত। উত্তরের অংশের নাম বড়া পাহাড়। ইহার নীচে পদ্ম-প্রভুর মন্দির আছে। জৈন গৃহস্থ বলিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে গেলে দ্বার খোলাইয়া দর্শন করাইবেন। আমি কিছু আগেই চলিলাম।

পাহাড়ের উপরের মসৃণ গাত্রে বহুপ্রাচীন, ছোট ছোট মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে—অনেকগুলি দুর্গম স্থানে দেখিয়া মনে হইল বেশীর ভাগই জৈন মূর্ত্তি। বোধ হয় কৌশাম্বীর প্রাচীন সমৃদ্ধির কালে বহু শতাব্দী ধরিয়া এখানে জৈন সাধুজন থাকিতেন। সে সময় কৌশাম্বীর ধনকুবেরেরা না জানি কত শতবার এখানে ধর্ম্ম শ্রবণের জন্য আসিতেন।

কিছুক্ষণ পর জৈন গৃহস্থেরা আসিলেন। তাঁহারা নিজেরা

---

* ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য।

† বুদ্ধদেবের সময় কৌশাম্বীর এক বিহারের নাম ঘোষিতারাম।

‡ সিংহলে ভিক্ষু রাহুলের আচার্য্য।

দর্শন করিলেন এবং আমাকেও পরম সমাদরে দর্শন করাইলেন। বাহিরে সে সময় অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। দেবালয়ের প্রশস্ত বাঁধান অঙ্গনের স্থানে স্থানে হরিদ্রাভ বিন্দুর মত কোন পদার্থ দেখা যাইতেছিল। গৃহস্থ পরম শ্রদ্ধার সহিত নিবেদন করিলেন, "পূর্ব্বকালে এখানে কেশর-বৃষ্টি হইত, তখন লোকেরা সাধু ছিল। কালের প্রভাবে লোকে সত্যভ্রষ্ট হওয়ায় এখন আর কেশর-বৃষ্টি হয় না, কেশরের মত দ্রব্য মাটি হইতে ফুটিয়া বাহির হয়।"

আমি ভাবিলাম, অতীতের স্মৃতি কি মধুর। ইঁহাদের ধর্ম্মই এখন ভারতের জীবিত ধর্ম্মের মধ্যে প্রাচীনতম, ইহার ধারা অবিচ্ছিন্ন রূপে চলিয়া আসিতেছে। বৌদ্ধরাও এদেশে থাকিলে প্রাচীনত্বের দাবি রিতে পারিতেন। শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতির মতবাদ তো এই দুই ধর্ম্মের তুলনায় সেদিনের মাত্র। আড়াই হাজার বৎসর বিগত, কৌশাম্বী জনশূন্য গৃহশূন্য, ভূমির অধিকারী কত শত বার বদল হইয়াছে, কিন্তু এখনও ইঁহাদের কাছে কেশর-বৃষ্টি সম্পূর্ণ সত্য। গৃহস্থ ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া পাহাড় পরিক্রমা করিতে চলিলাম। পুনর্ব্বার উপরে গিয়া পুরাতন স্তূপের ধ্বংসাবশেষ এবং অপেক্ষাকৃত নূতন একটি ছোট স্তূপ দেখিলাম। উপর হইতে অদূরে এক পাশে কলিন্দ-নন্দিনীর মন্দগতি নীলধারা দেখা গেল। তাহার পরপারে অভিমানী শিশুপালের দেশ বিস্তৃত রহিয়াছে। ঐ দিকেই কোন দূরের জঙ্গলে হস্তী-বিলাসী উদয়ন প্রদ্যোতের কবলে বন্দী হইয়াছিলেন। মনে পড়িল, ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক কৌশাম্বীরাজ উদয়ন 'হাতী-খেদা' করিতে গিয়া কেমন করিয়া উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোতের লুক্কায়িত সেনার ফাঁদে পড়িলেন। বন্দী অবস্থায় প্রদ্যোত-দুহিতা বাসবদত্তার সহিত তাঁহার প্রণয় সঞ্চার এবং উভয়ের ষড়যন্ত্র ও পলায়নের কথা স্মৃতিপটে উদিত হইবা মাত্র মনে হইল, এই দেশই ঐ নাট্যের অভিনয়-মঞ্চ। বৎস তখনও স্বাধীন, কৌশাম্বীও স্বাধীন। কৌশাম্বী না জানি কতদিন উদ্‌গ্রীব হইয়া কুরুকুলের শেষ প্রদীপের প্রতীক্ষায় যমুনার পরপারে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছিল! শেষে দ্রুতগামিনী হস্তিনীর পৃষ্ঠে চড়িয়া প্রতাপশালী অবন্তীরাজের কন্যা ত্রিভুবনবিখ্যাত সুন্দরী বাসবদত্তার সঙ্গে বহু প্রতীক্ষিত উদয়নের প্রত্যাগমনে না জানি বৈভবসম্পন্ন কৌশাম্বীতে কি উৎসবের আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু আজ সে কৌশাম্বীর কি আশা ভরসা আছে! তাহার সন্তানগণের অন্তরে অতীত গৌরবের ক্ষীণতম স্মৃতিটিও আজ বর্ত্তমান নাই!

বড় পাহাড় হইতে নামিয়া দক্ষিণের শিখরে উঠিলাম। ইহার উপরিভাগ সমতল। সেখানে বড় বড় ইটের স্তূপাবশেষ রহিয়াছে। পর্ব্বতমূলে যমুনা প্রবাহিত। আজ এই পাহাড় শুষ্ক ও নীরস কিন্তু আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এখানকার কোন স্বাভাবিক জলাশয় দেব-কট সোব্‌ভ নামে খ্যাত ছিল।

ভোজনের বিলম্ব আছে শুনিয়া রাত্রের সেই দালানের দিকে চলিলাম। শুনিলাম, প্রভাসক্ষেত্রের * ব্রাহ্মণেরা পুষ্করিণীকে দেবকুণ্ড নামে অভিহিত এবং মন্দিরকে অনন্দী মহারাণী—এই পবিত্র নামে ভূষিত করিয়াছেন। মস্তক দেহের অনুপাতে বিপুল, দেহমধ্যভাগে ধ্যানী জৈন মূর্ত্তির অংশ এবং নীচে অন্য কোন মূর্ত্তির নিম্নাংশ, এই তিন খণ্ডের যোগে অনন্দীমাই আবির্ভূতা হইয়াছেন!

তরুণ ব্রাহ্মণ পূজারীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম সেও মলইয়াঁ পাঁড়ে †। এতদূরে আসিয়া পড়ার কারণ হিসাবে পুরাতন কাহিনীই শুনিলাম। বিবাহ-সম্বন্ধ দ্বারা কৌলীন্য-প্রার্থী কোন ব্রাহ্মণের পাল্লায় পড়িয়া তরুণ ব্রাহ্মণ চিরদিনের জন্য জন্মভূমি ছাড়িয়া আসিয়াছেন। পথে কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমার জৈন মন্দির দর্শন ও জৈনের হাতের রুটি ভোজন সম্বন্ধে টিপ্পনী করিলেন। রক্ষা এই যে সংকিসার মত এখানে সরৌকাদিগকে ‡ জল-অচল ভাবা হয় না।

প্রেম ও শ্রদ্ধার সহিত প্রস্তুত মধুর রন্ধন, সঙ্গে পূর্ব্বের চব্বিশ ঘণ্টার শ্রান্তি-ক্লান্তি, এরূপ ভোজন অমৃতের তুল্য। খাইবার পর একাকী কৌশাম্বীর পথে অগ্রসর হইলাম। জৈন গৃহস্থেরাও যাইবেন, কিন্তু নৌপথে। তাঁহাদের সঙ্গে যে-সব স্ত্রীলোক আছেন তাঁহারা আমার দৃষ্টিগোচর নহেন।

এক ক্রোশ পথ চলিবার পর সিংহবল গ্রাম, তাহার পর

* পভোসার পুরাতন নাম।

† লেখকও মলইয়াঁ পাঁড়ে বংশজ।

‡ সরাবাগী শ্রাবক জৈন।

পালী। পালীতে পুরানো ইটে প্রস্তুত ঘর দেখা যায়। পালীর অল্প দূরেই কোসম।* গ্রামের অধিকাংশ ঘরবাড়ী মুসলমানী আমলের ইটের প্রস্তুত। ইহাতে মনে হয় কৌশাম্বী মুসলমানের হাতে আসিবামাত্র বিধ্বস্ত হয় নাই; হইলে ধ্বংসস্তূপের ইটেই ঘরবাড়ি নির্ম্মিত হইত।

কোসম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে যমুনার তটে প্রাচীন কৌশাম্বীর গড়ের অবশেষ গঢ়বা নামে খ্যাত। দুর্গ-প্রাকার আজও দূর হইতে ছোট পাহাড়ের মত দেখা যায়। নিকটেই এক জৈন মন্দির। তাহার পাশেই অতি সুন্দর পদ্ম-প্রভুর ভগ্ন মূর্ত্তি আছে। জৈন মন্দিরের উত্তরে অল্পদূরে বিশাল অশোকস্তম্ভ। এই স্তম্ভ কোন্ স্থানের প্রসিদ্ধির জন্য স্থাপিত বলা যায় না। ঘোষিতারাম, বদরিকারাম আদি বৌদ্ধ-সংঘ প্রদত্ত তিনটি আরামই তো নগরী হইতে দূরে ছিল। বোধ হয় ইহা সেই স্থানের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে যেখানে ভগবান বুদ্ধের শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা উদয়ন-রাজমহিষী শ্যামাবতী তাঁহার সপত্নী মাগন্দীর চক্রান্তে সখীজনসহ অগ্নি-সমর্পিতা হইয়াছিলেন। শ্যামাবতী বুদ্ধের অশীতি জন প্রসিদ্ধ শিষ্য-শিষ্যার অন্যতমা। অগ্নিদগ্ধ হইবার সময় তাঁহার ধৈর্য্য অপূর্ব্ব ও অটুট ছিল বলিয়া কথিত। প্রাসাদমধ্যেই তিনি বহ্নি-নিক্ষিপ্তা হইয়াছিলেন। সুতরাং সম্ভবতঃ এইস্থানে রাজকুল-বাসস্থান ছিল।

কনৌজের মত এখানেও এক মুসলমান আমায় শাহ্ সাহেব সম্বোধন করিলেন। পরে সন্ধ্যার সময় সরায়-আকিলে আর একজন সেলামালেকুম্ নিবেদন করেন। সরায়-আকিলের ধর্ম্মশালা অপেক্ষা মন্দিরদালান পরিষ্কার দেখিয়া সেখানে রাত্রি যাপনের জন্য শয্যা বিছাইয়া দিলাম। আরতির পর দেবতাকে দণ্ডবৎ করি নাই, এই অপরাধে পূজারাজী ক্রুদ্ধ হইয়া নাস্তিক বলিলেন। তাতে আর দুঃখ কি? যাহা হোক আকিলের সরাইয়ে ১৯২৮ অব্দ সমাপ্ত হইল।

১লা জানুয়ারি, ১৯২৯, সকালেই বাস্‌যোগে মনৌরী ও এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম। বাসে সহযাত্রী সরকারী কর্ম্মচারী হিন্দু বাবুও আমায় মুসলমান ঠাওরাইলেন। আমি ভাবিয়া পাইলাম না যে পনর হইতে কুড়ি দিনের দীর্ঘ কেশ ভিন্ন আমাতে মুসলমানী বৈশিষ্ট্য কি আছে। যাহা হউক, এই সজ্জনেরা কেহই জানিতেন না, আমি রাম বা খুদাহ্ দুই হইতেই কত যোজন দূরে আছি।

ক্রমশঃ

* কৌশাম্বীর আধুনিক নাম।

পরলোকে ডাক্তার আন্সারী

দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ নাগরিক ডাক্তার আন্সারীর গত ৯ই মের শেষ রাত্রে রেলওয়ে ট্রেনে হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি এক চিকিৎসক-বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বয়ং বিচক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন। রাজচিকিৎসক রূপে তিনি রামপুর, আলোয়ার ও ভূপাল রাজ্য হইতে নিয়মিত বৃত্তি পাইতেন। চিকিৎসা বিষয়ে তিনি খুব বদান্য ছিলেন। অনেকের শুধু যে বিনা দক্ষিণায় চিকিৎসা করিতেন তাহা নহে, তাহাদিগকে নিজ ব্যয়ে ঔষধ-পথ্যও দিতেন। তাঁহার বাড়ি হাসপাতালের মত ছিল। তিনি অনেক ছাত্রের বাসস্থান ও আহারের ব্যয়নির্ব্বাহ করিতেন। জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে মুক্তহস্তে তিনি দান করিতেন। তাঁহার গৃহ সর্ব্বদা অতিথিপূর্ণ থাকিত।

তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া কংগ্রেস, মুস্লিম লীগ ও খিলাফৎ কন্‌ফারেন্সের সহিত যুক্ত ছিলেন, এবং প্রত্যেকটির অন্যতম নেতা ছিলেন। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার তিনি বিরোধী ছিলেন। মুসলমানেরা তাঁহার পরামর্শ অনুসারে চলিলে তাঁহাদের ও দেশের উপকার হইত। ১৯২৭ সালে তিনি মান্দ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতার সর্ব্বদল সম্মেলনের সভাপতিও তিনি ছিলেন। ১৯২০ হইতে ১৯২২ পর্য্যন্ত তিনি খিলাফৎ ও অসহযোগ প্রচেষ্টার সহিত অন্যতম কর্ম্মিষ্ঠ নেতারূপে যুক্ত ছিলেন, এবং ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালের অসহযোগ প্রচেষ্টার সংস্রবে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কংগ্রেস পার্লেমেণ্টারী দলের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ছিলেন। গত বৎসর এপ্রিল মাসে তিনি অসুস্থতা বশতঃ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যপদে ইস্তফা দেন, এবং তখন হইতে রাষ্ট্রনীতির সহিতও কোন সক্রিয় যোগ রাখেন নাই। অনেক বৎসর পূর্ব্বে যখন তুরস্কের সহিত ইটালীর যুদ্ধ হয়, তিনি তখন এক চিকিৎসক দলের নেতা রূপে যুদ্ধক্ষেত্রে তুরস্কের সাহায্য করিয়াছিলেন। চৈনিক যুদ্ধেও তিনি এইরূপ কাজ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পাসপোর্ট (ছাড়পত্র) পান নাই।

ডাক্তার আন্সারী

মহিলা-সংবাদ

নিউ দিল্লী মহিলা-সমিতির উদ্যোগে প্রতি বর্ষে একটি শিল্পপ্রদর্শনী বা 'আনন্দবাজার' হইয়া থাকে। গত ২৬শে ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী এই আনন্দবাজারের সপ্তম প্রদর্শনী হইয়াছে।

আগে শুধু বাঙালী মহিলাদেরই প্রদর্শনীতে আহ্বান করা হইত। এবার ভিন্ন প্রদেশীয় অনেক সম্রান্ত মহিলাও ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রদর্শনীতে নানা রকম জামা, গৃহনির্ম্মিত খাদ্যদ্রব্য, খেলনা ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ ছিল। প্রদর্শনীতে খেলনাগুলি অতি শীঘ্র বিক্রয় হইয়া যাওয়াতে আমাদের দেশে ঐ সমুদয়

নিউ দিল্লীতে মহিলাদের আনন্দবাজার

তৈয়ার করার প্রয়োজন বুঝা গেল। দেশী খেলনার অভাবে অপর্য্যাপ্ত জাপানী খেলনা বিক্রয় হয়।

ফারুক সুলতানা মুয়াঈদজাদা

বেগম সাকিনা ফারুক সুলতানা মুয়াঈদজাদা গবর্মেণ্ট কর্তৃক সম্প্রতি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটার কৌন্সিলর মনোনীত হইয়াছেন, এ সংবাদ পূর্ব্বেই প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে তাঁহার চিত্র মুদ্রিত হইল।

যে-সকল বালিকা বর্ত্তমান বাংলায় খেলোয়াড় হিসাবে যশ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন কুমারী বাণী ঘোষের নাম তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি উত্তর-কলিকাতার কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র ঘোষের কন্যা। দেবেশবাবু নিজে শরীর-সাধনাক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন এবং বিগত বেঙ্গল ফিজিক্যাল কালচার কনফারেন্সের সাঁতার-শাখার আহ্বানকারী ছিলেন। কংগ্রেসের অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়করূপেও ইহাকে সকলে জানেন। কুমারী বাণী ঘোষ শিশুকাল হইতেই লাঠিখেলা, ছুরিখেলা ও সাঁতারে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সাঁতারে তাঁহাকে ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক য়্যাসোসিয়েসন "অল-ইণ্ডিয়া লেডীজ চ্যাম্পিয়ানশিপ" দিয়াছেন এবং বর্ত্তমান অলিম্পিকে ভারত হইতে কোন মহিলা সাঁতারুকে পাঠানো হইলে কুমারী বাণীকেই

কুমারী বাণী ঘোষ

পাঠান হইত। গঙ্গায় সাত মাইল সাঁতার-প্রতিযোগিতায় বাণী চৌদ্দ জন পুরুষ-প্রতিযোগীকে পরাভূত করেন এবং পঞ্জাব ও বাংলার সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় একটি খেলায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। কুমারী বাণীর ন্যায় লাঠি ও ছুরি খেলোয়াড় পুরুষের মধ্যেও অধিক নাই। ইনি সঙ্গীতশিল্প, সাইকেল-চালান, অপরাপর দৌড়ঝাঁপ-জাতীয় খেলাতেও পারদর্শী। লেখাপড়ায়ও ইঁহার সুনাম আছে।

কুমারী তপতী ভট্টাচার্য্য দৌড়ঝাঁপ, বাস্কেটবল, সঙ্গীত ও মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদিতে অনেকগুলি পুরস্কার অর্জ্জন করিয়াছেন। লৌহগোলক নিক্ষেপে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ইনি

অনেক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বালিকাকে পরাজিত করিয়া সকলের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। হাইজাম্পেও ইনি যোগদান করেন। ইঁহার শিক্ষক শ্রীযুক্ত রবীন সরকার।

মধ্যবিত্ত ঘরের কুমারী সধবা ও বিধবাগণকে গৃহকর্ম্মের অবসরে স্বল্প সময়ে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য লইয়া ১৯৩৪ সালে বাণীপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ে ইংরেজী বাংলা অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অবৈতনিক শিক্ষা ও ফার্ষ্ট-এড্, হোমনার্সিং প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই বিদ্যালয় হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ১৯৩৪ সালে ৩০ জন ও ১৯৩৫ সালে ২৪ জন মহিলা শিক্ষয়িত্রী হইবার জন্য বিভিন্ন ট্রেনিং বিদ্যালয়ে জুনিয়র ট্রেনিং পড়িতেছেন। সিনিয়র ট্রেনিং পড়িবার জন্য ৬ জন মহিলা ১৯৩৬ সালে মাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই বিদ্যালয়ে অধিকাংশ মহিলাই বিনা বেতনে বা অর্দ্ধবেতনে পড়িতেছেন এবং বিদ্যালয়-সংলগ্ন ছাত্রীনিবাসে কয়েকটি অনাথা ছাত্রী বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া তিন-চারটি মহিলা ইতি-মধ্যেই শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে বহু অর্থসাহায্যের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে যিনি যাহা দান করিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে ও সংবাদপত্রে প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে অর্থাদি শ্রীযুক্ত শ্যামমোহিনী দেবী, জেনারেল সেক্রেটারী, ৬নং বাদুড় বাগান লেন, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কুমারী তপতী ভট্টাচার্য্য

বাণীপীঠের ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী ও কর্ম্মিবৃন্দ

বামদিক হইতে × চিহ্নযুক্ত : শ্রীমতী শ্যামমোহিনী দেবী, বাণীপীঠের সাধারণ সম্পাদিকা ; শ্রীরেবতীমোহন লাহিড়ী, অর্গানাইজিং সেক্রেটারী ; শ্রীনাতীশচন্দ্র বাগচী, নারীশিক্ষাপরিষদের সহ-সম্পাদক ; শ্রীননীগোপাল গুপ্ত, প্রচার-বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা।

স্বরলিপি

পলাশ-রাঙা বাসনাগুলি
মনের বনে বিছায়ে,
আজিকে সব করম ভুলি
আসীন তারি নিছায়ে।
সুদূরে কে যে বাজায় বাঁশী,
অলস বেলা মন উদাসী,
ভাবনা মোর নয়নজলে
দিয়েছি সিঁচায়ে।
বঁধুর বনে কুসুম ফোটে
গন্ধ আসে তার,
বরণ তার মানস পটে
আঁকি যে বার বার।
এমনি করে কাটাই বেলা,
সুরের বানে ভাসাই ভেলা,
ভুলে যে গেছি বিভল সুখে
মন যে কি চাহে॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

II হ্মা পা পণা | (ণ)দা -া | পা -া I হ্মা পা জ্ঞা | (জ্ঞ)ঋা -া | সা -া I
প লা শ রা ০ ঙা ০ বা স না গু ০ লি ০

I সা সজ্ঞা জ্ঞা | ঋা -া | সা -ন্া I সা -জ্ঞা (জ্ঞ)রা | জ্ঞা -া | -া -া I
ম নে র ব ০ নে ০ বি ০ ছা য়ে ০ ০ ০

I মা পা পা | হ্মপা -া | জ্ঞা -মা I পা না না | র্সা -া | র্সা -া I
আ জি কে স ০ ব ০ ক র ম ভু ০ লি ০

I ণা র্সা ণা | (ণ)দা -া | পা -া I হ্মা -দা (দ)পা | হ্মপা -জ্ঞা | -মা জ্ঞা II
আ সী ন তা ০ রি ০ নি ০ ছা য়ে ০ ০ ০

I র্সা -া র্জ্ঞা | জ্ঞা -র্রা | র্জ্ঞা -া I র্সর্জ্ঞা -া -া | র্ঋা -র্সা | র্সা -া I
সু ০ ০ দূ ০ রে ০ কে ০ ০ যে ০ বা ০

I না র্সা -ঋর্া । ঋর্া -র্সা । র্সা -ণা I [দ]পা দা ণা । ণা -দা । দা -পা I
জা o য়্ বাঁ o শী o অ ল স বে o লা o

I পা -ণা ণা । ণা -দা । -া -ণদা I পা -া -া । -া -া । -া -া I
ম ন্ উ দা o o oo সী o o o o o o

I পা পণা ধা । ণা -া । -া -া I [ণ]র্সা [র্স]ণা ণা । দা -া । পা -া I
ভা ব না মো o o র ন য় ন জ o লে o

I [প]ক্ষা পা দা । দা -া । পা -া I পক্ষা -পা -জ্ঞা । -মা -া । -জ্ঞা -া II
দি য়ে ছি সিঁ o চা o য়ে o o o o o o

II { সা জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা -রা । জ্ঞা -া I [জ্ঞ]মা জ্ঞা জ্ঞা । ঋা -া । সা -া I
বঁ ধু র ব o নে o কু সু ম ফো o টে o

I সা -ঋা ঋা । ঋা -া । সা -ন্া I সা -া -া । -া -া । -া -া I
গ o ন্ধ আ o সে o তা o o o o o র্

I সা জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা -া । জ্ঞা -মা I মা পা পা । পা -া । পা -া I
ব র ণ তা o র o মা ন স প o টে o

I ক্ষা পা জ্ঞা । জ্ঞা -মা । জ্ঞমা -পক্ষা I পা -া -া । -া -া । -া -া } I
আঁ কি যে বা o রo oo বা o o o o o র

I ক্ষা পা জ্ঞা । জ্ঞা -া । জ্ঞা -মা I পা না -া । র্সা -া । র্সা -া I
এ ম নি ক o রে o কা টা ই বে o লা o

I না র্সা জ্ঞা । ঋা -া । র্সা -া I [স]না -া -া । র্সা -া । -া ঋা I
সু রে র বা o নে o ভা o o সা o o ই

I ণা -র্সা -ণা । ণা -া । -া -র্সা I ণর্সা র্সা ণদা । দা -া । প -পা I
ভে o o লা o o o ভু লে ষে গে o ছি o

I [দ]ণা ণা ণদা । দা -া । পা -া I ক্ষা -পা দা । দা -া । পা -া I
বি ভ ল সু o খে o ম ন্ যে কি o চা o

I পক্ষা -পা -জ্ঞা । -মা -া । -জ্ঞা -া II II
হে o o o o o o

"সভ্যতার জয়, বর্ব্বতার পরাজয়"

ইটালী আবিসীনিয়ার রাজধানী আডিস আবাবা অধিকার করিবার পর মুসোলিনী যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে এই মর্ম্মের কথা আছে, যে, "সভ্যতা বর্ব্বরতার উপর জয়লাভ করিয়াছে।"

সভ্যতা বলিতে সচরাচর যাহা বুঝায়, তাহাতে ইটালী আবিসীনিয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বটে; কিন্তু ইটালী ও আবিসীনিয়ার মধ্যে যে যুদ্ধ সম্প্রতি শেষ হইল তাহাতে ইটালী জয়লাভ করিয়াছে যে যে উপায়ে তাহার মধ্যে আছে, বিষাক্ত গ্যাসের ব্যবহার, "তরল অগ্নি"র ব্যবহার, আকাশ হইতে বিস্ফোরক পদার্থপূর্ণ বোমা নিক্ষেপ ও তাহা নিক্ষেপ যোদ্ধা পুরুষ এবং অযোদ্ধা আবালবৃদ্ধবনিতানির্ব্বিশেষে সকলের উপর ও রেড্ক্রস যান ও হাসপাতালের উপর, এবং হাবসী সেনাপতি ও সৈন্যদিগকে স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক করিবার চেষ্টা। নৈতিক অর্থে এইরূপ আচরণ সভ্য আচরণ নহে, বর্ব্বর আচরণ। তদ্ভিন্ন, এক জাতি কর্ত্তৃক অন্য জাতিকে পদানত করা ও তাহাদের দেশ ও ধনসম্পত্তি দখল করা লীগ অব্ নেশ্যন্সের নীতির বিপরীত, তাহা সভ্যতা নহে। যুদ্ধ নিবারণ করা লীগ অব্ নেশ্যন্সের প্রধান উদ্দেশ্য, এবং পৃথিবীর প্রায় সব সভ্য দেশ এই লীগের সদস্য। সভ্য জাতির সমষ্টি যাহা নিবারণ করিতে চায়, তাহা নিশ্চয়ই সভ্য রীতি নহে। লীগ যুদ্ধ নিবারণ করিতে চায়, সুতরাং লীগের সকল সদস্য-দেশের ইহা স্বীকৃত কথা, যে, যুদ্ধ অসভ্য রীতি। ইটালীও এই লীগের সভ্য, এবং ইটালী যুদ্ধদ্বারা আবিসীনিয়া দখল ও তাহার স্বাধীনতালোপ করিয়াছে।

অতএব ইহা সত্য নহে, যে, ইটালী ও আবিসীনিয়ার যুদ্ধে সভ্যতা বর্ব্বরতাকে জয় করিয়াছে।

সকল যুদ্ধ একশ্রেণীভুক্ত নহে। যুদ্ধকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। পর-দেশ জয় ও অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধ এক শ্রেণীতে পড়ে, এবং স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার বা তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ অন্য এক শ্রেণীতে পড়ে। প্রথম শ্রেণীর যুদ্ধ গর্হিত ও নিন্দনীয়। দ্বিতীয় প্রকারের যুদ্ধ তাহা নহে; বরং, যত দিন না স্বাধীনতা রক্ষা বা পুনরুদ্ধারের কোন অসামরিক উপায়ের সাফল্য প্রমাণিত হইতেছে, তত দিন ইহা সম্ভবপর হইলে সমর্থনযোগ্য। কোন স্বাধীন জাতি যদি স্বাধীনতারক্ষার্থী বা স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারকামী অন্য কোন জাতির পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার আচরণও সমর্থনযোগ্য।

এইরূপ বিচারে ইটালীর যুদ্ধ গর্হিত ও অসভ্যতার ও দস্যুতার দৃষ্টান্তস্থল, এবং আবিসীনিয়ার যুদ্ধ সমর্থনযোগ্য। যদি কোন জাতি আবিসীনিয়াকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইত, তাহা হইলে তাহার আচরণও সমর্থনযোগ্য হইত।

হাবসীদের শৌর্য্য

হাবসীরা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একা একা যেরূপ অসাধারণ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে তাহা অতীব প্রশংসনীয়। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা অনতিক্রান্ত। তাহাদের সম্রাট ও সেনাপতিদের রণকৌশলও প্রশংসনীয়। হাবসীরা যে পরাজিত হইল, তাহা সাহস ও রণকৌশলে নিকৃষ্টতার জন্য নহে। যদি তাহারা যুদ্ধের নানা অস্ত্রে ও অন্যবিধ সরঞ্জামে ইটালীর সমকক্ষ হইত, তাহা হইলে তাহারা পরাজিত হইত না।

আমরা হাবসীদিগের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। এই প্রাচীন জাতিটির স্বাধীনতালোপ অতীব শোকাবহ ঘটনা।

ইটালীর সহিত আমাদের ব্যক্তিগত বা জাতিগত কোন বিবাদ নাই। ইটালীর অতীত ইতিহাসে ও সংস্কৃতিতে

যাহা কিছু ভাল আমরা তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্। লাটিন ও ইটালীয় সাহিত্য, ইটালীর সংগীত, চিত্রকলা, মূর্ত্তিশিল্প, স্থাপত্য, জ্ঞানে বিজ্ঞানে ও পণ্যশিল্পে ইটালীর আধুনিক প্রগতি, ইটালীকে এক ও স্বাধীন করিবার নিমিত্ত ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী, কৌণ্ট কাভূর প্রভৃতির সফল চেষ্টা—সমস্তই আমাদিগকে ইটালীর পক্ষপাতী করে। কিন্তু তাহার মুসোলিনীর দাসত্ব, তাহার ফাসিজ্‌ম্ ও সাম্রাজ্যবিস্তৃতিলোলুপতা, এবং তাহার দস্যুতার আমরা বিরোধী।

—

ইটালীয় পক্ষের কপট উক্তি

ইটালীর পক্ষ হইতে বলা হইতেছে, ইটালী আবিসীনিয়ায় সভ্যতা বিস্তার করিতে গিয়াছে, এবং দাসত্বের উচ্ছেদ করিতে গিয়াছে। ইহা মিথ্যা কথা। ইটালী তাহা করিতে যায় নাই—কোনও সাম্রাজ্যাধিকারী জাতির পরদেশ-

"বোমা ও বন্দুকের দ্বারা সভ্যতা বিস্তার"

আক্রমণ, অধিকার ও শাসনের উদ্দেশ্য তাহা নহে। ইটালী আবিসীনিয়া দখল করিতেছে তাহার প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হইয়া ধনী হইবার নিমিত্ত।

—

আবিসিনিয়ায় ও ইটালীতে দাসত্ব

ইটালী বলিতেছে, আবিসীনিয়ার দাসদিগকে মুক্তি দেওয়া তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য। আবিসীনিয়ার লোকদের গৃহস্থালীতে ভৃত্যদের পুরুষানুক্রমিক দাসত্ব প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল, কিন্তু কেহ দাস ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা করিলে পুরাতন ও নূতন আইনে তাহার মৃত্যুদণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে। গৃহস্থালীতে দাসত্ব-প্রথা লোপের জন্য বহু বৎসর হইতে নানা আইন প্রণীত হইয়াছে এবং তদনুসারে কাজ হইতেছে। এ বিষয়ে ম্যাকমিলান কোম্পানীর প্রকাশিত ১৯৩৫ সালের ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্স ইয়্যার-বুকে লিখিত হইয়াছে :—

"Domestic slavery is a recognized institution, but slave trading, by an ancient law renewed by a decree issued in June, 1923, is punishable by death. A comprehensive edict of 45 clauses was issued in March, 1924, providing for the gradual emancipation of slaves, beginning with the children born of slaves. In July, 1931, a further edict was published whereby *inter alia* slaves regain their freedom immediately on the death of their master. In August, 1932, a new Slavery Department, independent of the Ministry of the Interior, was constituted by decree." P. 652

আবিসীনিয়ার সম্রাট যথেচ্ছাচারী নৃপতি এরূপ ধারণাও ভুল। ইহার সম্বন্ধে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্স ইয়্যার-বুকে দেখিতে পাই :—

"On July 16, 1931, a constitution was proclaimed."

"All are equal before the law and succession to the Throne is reserved to the present dynasty. The first Parliament was opened on November 2, 1931."

তাৎপর্য্য। "১৯৩১ সালের ১৬ই জুলাই মূল শাসনবিধি ঘোষিত হয়।" "আইনের চক্ষে সবাই সমান, এবং সম্রাট হইবার অধিকার বর্ত্তমান রাজবংশের জন্য সংরক্ষিত। ১৯৩৪ সালের ২রা নবেম্বর প্রথম [আবিসীনিয়ার] পার্লেমেণ্টের অধিবেশন আরম্ভ হয়।"

এখন ইটালী নিজ আবিসীনিয়া অধিকার সমর্থনার্থ তাহার নানা সত্যমিথ্যা বদনাম করিতেছে। কিন্তু এই ইটালীই আবিসীনিয়ার লীগ অব নেশুন্সের সদস্য হওয়ার সমর্থন করিয়াছিল।

ব্রিটেন ফ্রান্স বেলজিয়াম প্রভৃতির অধিকৃত আফ্রিকার নানা দেশে নামতঃ না-হইলেও, কার্য্যতঃ দাসত্ব প্রচলিত আছে। সেই সব দেশের কৃষ্ণকায় লোকদিগকে দাসত্বমুক্ত করিবার চেষ্টা স্বাধীনতাদাতা ইটালী করুক না। ইটালী স্বয়ং ত মুসোলিনীর দাস। স্বয়ং মুক্ত হইবার চেষ্টা করুক না। জাপানে কন্যাদিগকে জঘন্য দাসীত্বে পিতামাতা বিক্রী করিতে পারে ও করে। জাপানের বিরুদ্ধে সে কারণে যুদ্ধ করিবার কল্পনা ত কেহ করে না। জাপানে বালিকা ও যুবতীদের এই ঘৃণ্য দাসীত্ব প্রাচীন ইতিহাসের কথা নহে। এই বৎসরেরই ১৬ই এপ্রিলের "জাপান উইক্লি ক্রনিক্‌ল্" কাগজে লিখিত হইয়াছে :—

"Parents can and do sell their daughters to the licensed quarters, and once in, it is with the greatest difficulty that the girl can escape so long as she retains the smallest measure of health and good looks."

পৃথিবীতে এমন কোন দেশ ও জাতি নাই যাহার কোন-না-কোন গুরুতর দোষ দেখান যায় না। তাই বলিয়া সেই অজুহাতে তাহার স্বাধীনতা লোপ করা ধর্ম্মনীতিসঙ্গত নহে। অনেক গৃহস্থের গৃহস্থালী সুশৃঙ্খল নহে, সুনীতিসঙ্গত ভাবে চালিত হয় না, কিন্তু তা বলিয়া অন্য কোন গৃহস্থ তাহার স্বাধীনতা লোপ করিতে অধিকারী নহে। এক এক গৃহস্থের যে ন্যায্য অধিকার আছে, এক একটি জাতির অধিকার তাহা অপেক্ষা কম নহে। কোন জাতির দোষ থাকিলে তাহার প্রতিকার যুদ্ধ ভিন্ন অন্য নানা উপায়ে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে, হইতে পারে। সেইরূপ উপায় অবলম্বন করাই উচিত।

—

আবিসীনিয়ার অতীত অবহেলা

আমরা ইটালীকে দোষ দিতেছি; সে বাস্তবিকই দোষী। তাহার সাম্রাজ্যবিস্তারের লালসা থাকায় অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল অথচ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ আবিসীনিয়াকে সে গ্রাস করিতে যাইতেছে। কিন্তু দুর্ব্বল থাকাটা কি শ্লাঘার বিষয়? মানব-সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা কি একটা ত্রুটি নয়? কেহ যত কেন দুর্ব্বল হউক না, তাহার উপর উপদ্রব করা ন্যায়সঙ্গত নহে সত্য; কিন্তু মানুষ এখনও ত এতটা ধার্ম্মিক হয় নাই যে দুর্ব্বলের উপর অন্যায় উপদ্রব হইতে বিরত থাকিবে। সুতরাং ধর্ম্মের দোহাই দিতে বিরত না-থাকিয়া শক্তিশালী হইবার চেষ্টাও করা উচিত। তাহাও ধর্ম্ম—বোধ হয় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। গল্প আছে, এক ছাগশিশু ব্রহ্মার কাছে নালিশ করে, যে, তাহাকে দুর্ব্বল দেখিয়া সবাই খাইতে চায়; তাহাতে প্রজাপতি বলেন, "তুমি এত দুর্ব্বল ও নিরীহ, যে, আমারও তোমাকে ভোজন করিতে লোভ হইতেছে।"

আবিসীনিয়ার আয়তন ৩,৫০,০০০ বর্গ-মাইল। ইহা নানা উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। অথচ ইহার লোকসংখ্যা আনুমানিক ৫৫ লক্ষ মাত্র। সত্য বটে, ইহার অনেক অংশ আরণ্য ও পার্ব্বত্য। কিন্তু তাহা হইলেও এত বড় দেশের পক্ষে ৫৫ লক্ষ লোক খুব কম। বর্ত্তমান বাংলা প্রদেশের আয়তন ৭৭,৫২১ বর্গ-মাইল, কিন্তু লোকসংখ্যা ৫ কোটির উপর। আবিসীনিয়ার নৃপতিগণ ও অধিবাসীরা যদি অতীত কাল হইতে শিক্ষা কৃষি পণ্যশিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তারে মন দিতেন, যদি দীর্ঘকাল ধরিয়া তথায় অধিবাসীদের রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকৃত হইয়া আসিত, তাহা হইলে দেশটি এখন শুধু যে বহুজনাকীর্ণ হইত তাহা নহে, প্রকৃত সভ্য, সমৃদ্ধ, শক্তিশালী ও আত্মরক্ষায় সমর্থও হইত। আমরা ঠিক্ জানি না, কিন্তু হইতে পারে, যে, বর্ত্তমান সম্রাট এই সব দিকে মন দিতেছিলেন। কিন্তু, যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলেও এই উন্নতিপ্রগতিচেষ্টা অত্যন্ত বিলম্বে আরব্ধ হইয়াছে। অতীতে অবহেলা ও বর্ত্তমানে উন্নতির মন্থরগতির শাস্তি আবিসীনিয়াকে পাইতে হইতেছে।

আবিসীনিয়ার এবং ভারতের ও বঙ্গের সমস্যা এক নহে। কিন্তু কিছু সাদৃশ্যও আছে। আবিসীনিয়া ও ভারতবর্ষ উভয়েই সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখীন; প্রভেদ এই, যে, ভারতবর্ষ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে তাহার সম্মুখীন, আবিসীনিয়া সম্প্রতি সম্মুখীন।

কোন দস্যুজাতি কোন দেশ আক্রমণ করিতে পারে বলিয়াই যে শেষোক্ত জাতির সকল দিক্ দিয়া শক্তিশালী হওয়া আবশ্যক তাহা নহে। পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের জন্য তাহা প্রয়োজনীয়। পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ যে যে উপায়ে যে-পথ দিয়া হয়, শক্তিলাভও সেই সেই উপায়ে সেই পথ দিয়া হয়।

ইটালীর সহিত তুলনা করিলে অতীত কালে আবিসীনিয়ার শক্তিশালী হইবার চেষ্টার অভাব বুঝা যাইবে।

আবিসীনিয়ার ইতিহাস ইটালীর ইতিহাস অপেক্ষা কম প্রাচীন নহে। ইহার রাজবংশ রাণী শেবা ও ইহুদীদের বিখ্যাত রাজা সুলেমান (Solomon) হইতে উদ্ভূত। এই রাজা সুলেমান বা সলোমান যীশুখ্রীষ্টের বহু পূর্ব্বেকার মানুষ। রাণী শেবার সময় হইতে আবিসীনিয়ার উন্নতি ও প্রগতি চলিতে থাকিলে ইহা এখন খুব শক্তিশালী দেশ হইতে পারিত। ইটালীর আয়তন ১,১৯,৭১৩ বর্গ-মাইল, আবিসীনিয়ার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। ইহাতে পর্ব্বত এবং অরণ্যও আছে, আগ্নেয়-গিরি আছে, ম্যালেরিয়াজনক বিস্তীর্ণ জলাভূমিও ছিল, অথচ ইটালীর লোকসংখ্যা চারি কোটির উপর, আবিসীনিয়ার লোকসংখ্যা পঞ্চান্ন লক্ষ মাত্র। মানবের সভ্যতার সংস্কৃতির কৃতিত্বের ইতিহাসে ইটালী অতীতে যে-স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং, মুসোলিনীর প্রভুত্ব ও দস্যুতা সত্ত্বেও, আধুনিক সময়েও করে, আবিসীনিয়া তাহার নিকট দিয়াও যায় না!

—

এখনও ইটালীকে নিবর্ত্তক শাস্তি দিবার কথা।

ইটালী নিজের কাজ হাসিল করিল, এখনও কিন্তু ইউরোপে আলোচনা চলিতেছে, যে, স্যাংশ্যানগুলা ("sanctions") অর্থাৎ তাহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগুলা ফলপ্রদ হইয়াছে কিনা এবং আরও ঐরূপ কি ব্যবস্থা হইতে পারে! কেবল হত্যাকাণ্ড ও ডাকাইতী হইয়া যাইবার পরও তাহা কেমন করিয়া নিবারণ করা যায়, ইহা তাহার আলোচনার মত।

"শান্তি নির্দ্ধারণের সময় কি আসে নাই ?"

আমেরিকার এই ব্যঙ্গচিত্রে এইরূপ মন্তব্যের ব্যঞ্জনা আছে।

—

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সরকারী সাহায্য হ্রাস

সর্ গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী সরকার পক্ষ হইতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে একটি বিবৃতি দেন, তাহাতে দেখা যায়, যে, প্রায় সমুদয় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্য কমান হইয়াছে। ইহা কি সরকারী একটা "নীতি" অনুসারে করা হইয়াছে ? তাহা হইলে, নূতন বড়লাট তাঁহার রেডিয়ো-যোগে প্রদত্ত বক্তৃতায় যে শিক্ষার উল্লেখ একেবারে করেন নাই, তাহা কি এই "নীতি"রই ফল ?

ভারতবর্ষ নামজাদা অশিক্ষিত দেশ। অন্য দিকে ব্রিটেন সুশিক্ষিত দেশ। সেই জন্য বোধ হয়, "যাহাদের আছে তাহাদিগকে আরও দেওয়া হইবে, এবং যাহাদের নাই (খুব কম আছে) তাহাদের নিকট হইতে সেই অল্পও কাড়িয়া লওয়া হইবে," বাইবেলের এই উক্তি অনুসারে ব্রিটেনে বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহে সরকারী সাহায্য পাঁচ বৎসরের জন্য বার্ষিক ১৮,৩০,০০০ পৌণ্ড হইতে বাড়াইয়া বার্ষিক ২১,০০,০০০ পৌণ্ড করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে এক পৌণ্ড ১৩½ টাকার সমান।

—

ইউরোপে যুদ্ধারম্ভের বিভীষিকা

ফ্রান্স ও জার্ম্মেনীতে মনকষাকষি দূরীভূত হয় নাই, অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মেনীর মধ্যে বিবাদ ও যুদ্ধ হইতে পারে, ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে ঝগড়া চলিতেছে, তুরস্ক যে ডার্ডানেলিস

"ইউরোপের চিমনী হইতে যুদ্ধবিভীষিকার ধূম"

প্রণালীকে সামরিক আশঙ্কা বশতঃ সুরক্ষিত করিতে চায় তাহাও যুদ্ধের একটা কারণ হইতে পারে, স্পেনে অশান্তি চলিতেছে—এই সকল সংবাদে মনে হয় ইউরোপে যে-কোন সময়ে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে।

এই অবস্থা আমেরিকার একটি ব্যঙ্গচিত্রে সূচিত হইয়াছে।

—

বঙ্গে দুর্ভিক্ষ

বঙ্গের শুধু বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী ডিবিজনে নহে, অন্য অনেক জায়গাতেও দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ইহাকে সরকারী সংজ্ঞা অনুসারে দুর্ভিক্ষ বলা হউক বা না-হউক, ইহা সত্য কথা, যে, বহু লক্ষ লোক খাইতে পাইতেছে না, অগণিত লোকের একখানা করিয়া গোটা কাপড় পর্য্যন্ত নাই, স্ত্রীলোকেরা অনেকেই বস্ত্রের অভাবে ভিক্ষাসংগ্রহের জন্যও বাহিরে যাইতে পারিতেছে না, এবং জলকষ্টও খুব হইয়াছে।

—

বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষ

যে-সকল সমিতি বঙ্গের নিরন্ন সব স্থানে সাহায্যদানের চেষ্টা করিতেছেন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের সেই প্রশংসনীয় কাজের সমর্থন করিতেছি এবং সঙ্গতিপন্ন প্রত্যেক লোককে তাঁহাদের সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি।

রতনপুরে বাঁকুড়াসম্মিলনীর সাহায্যকেন্দ্র।

বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর গ্রামের দুর্ভিক্ষপীড়িত কতকগুলি স্ত্রীলোক।

অগ্নিদগ্ধ কাঞ্চনপুর গ্রামের একটি দৃশ্য।

সমগ্র-বঙ্গের জন্য কাজ করিবার শক্তি সামর্থ্য আমাদের নাই। আমরা বাঁকুড়ার লোক, সেখানে যে-সকল সমিতি সাহায্যদানের কাজ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সাহায্য দিবার নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করিতেছি। বাঁকুড়ায় কিরূপ দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্ট হইয়াছে, খাদ্যের ও জলের অভাবে মনুষ্যেরা এবং গৃহস্থের পালিত গবাদি পশু কিরূপ অবর্ণনীয় কষ্ট পাইতেছে, তাহা আগে আমরা লিখিয়াছি। অন্নাভাবে বিপন্ন লোকদের ছবিও কিছু ছাপিয়াছি। প্রবাসীর সম্পাদক বাঁকুড়া-সম্মিলনীর সভাপতি। সম্মিলনীর কর্ম্মীদের নিকট হইতে আমরা সম্প্রতি আরও যে কয়েকখানি ছবি পাইয়াছি, তাহা এবার ছাপিতেছি। পাঠকেরা তাহা হইতে বিপন্ন লোকদের অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিবেন। সম্মিলনী অনেক জায়গায় অন্ন ব্যতীত বস্ত্রহীন গরিব লোকদিগকে কাপড়ও দিতেছেন। সম্মিলনীর অন্যতম বদান্য সভ্য রায় বাহাদুর হরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঁকুড়া শহরের নিকটবর্ত্তী এক্তেশ্বর গ্রামের এক শত জন নিরন্ন লোককে অন্ন দিতেছেন। বাঁকুড়া শহরে সম্মিলনীর যে মেডিক্যাল স্কুল আছে, তাহার পুষ্করিণীটির পঙ্কোদ্ধার ও বিস্তৃতি সাধন করান হইতেছে; তাহাতে অনেক শ্রমিকের অন্ন জুটিতেছে।

একটি ছবিতে পাঠকেরা দেখিবেন, একটি গ্রাম পুড়িয়া গিয়াছে। যে গ্রামটি পুড়িয়া গিয়াছে, তাহার নাম কাঞ্চনপুর।

ইহা সমৃদ্ধ গ্রাম। বিস্তর ঘরবাড়ি পুড়িয়া যাওয়ায় প্রায় দুই লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। গৃহহীন লোকদের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য টাকা চাই।

যে-সকল সহৃদয় দাতা চাউল দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাহা বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের বাঁকুড়া ষ্টেশন ঠিকানায় বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুলের ডাঃ রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে পাঠাইয়া দিলে কার্য্যের সুবিধা হইবে। নগদ টাকা এবং নূতন ও ধৌত পুরাতন কাপড় সম্মিলনীর সেক্রেটারী হাইকোর্টের য়্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত ঋষীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়কে কলিকাতার ২০ বী নং শাঁখারীটোলা ইষ্ট ঠিকানায় প্রেরিতব্য। যদি কেহ প্রবাসী কার্য্যালয়ে টাকা দেওয়া সুবিধাজনক মনে করেন, রসীদ লইয়া সেখানেও দিতে পারেন।

পক্কেশ্বরে বস্ত্রবিতরণ।

অগ্নিদগ্ধ কাঞ্চনপুর গ্রামে বস্ত্রবিতরণ।

—

স্বর্গীয় ওয়াজিদ আলি খাঁ পনি

চাঁদ মিঞা সাহেব নামে প্রসিদ্ধ ময়মনসিংহ জেলার করটিয়ার জমীদার স্বর্গীয় ওয়াজিদ আলি খাঁ পনি রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে ও শিক্ষাবিস্তারক্ষেত্রে যশস্বী হইয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি তাহাতে, শুধু মুখে নয়, কাজেও যোগ দেওয়ায়, কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার মত ধনশালী ও খ্যাতি প্রতিপত্তি বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে বঙ্গে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। শিক্ষাবিস্তারের নিমিত্ত তিনি কলেজ, উচ্চবিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা ও মক্তব স্থাপন করিয়া তাহার জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিতেন। তাহাতে অতি অল্পব্যয়ে বালক ও যুবকদিগের শিক্ষালাভের সুবিধা হইয়াছে। উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে বিদেশেও ছাত্র পাঠাইতেন। তিনি চিকিৎসালয়ও স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গে তাঁহার মত ও তাঁহার চেয়েও ধনশালী জমীদার ও অন্যবিধ সঙ্গতিপন্ন লোক অনেক আছেন। সকলে তাঁহার মত জনহিতব্রতী হইলে বঙ্গের চেহারা ফিরিয়া যাইতে পারে।

—

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ওকালতী ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং পরে বাংলা-গবর্মেণ্টের অন্যতম মন্ত্রী হন। সাবেক ব্যবস্থা অনুসারে তিনি কলিকাতা ম্যুনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের কাজ কিছু দিন করিয়াছিলেন। এই সমুদয় কাজেই তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কলিকাতা ম্যুনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান থাকার সময় তিনি ঘুষ দেওয়া

বাঁকুড়াসম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুলের যে পুকুর দুর্ভিক্ষপীড়িত শ্রমিকদের সাহায্যার্থ কাটান হইতেছে, তাহার তিনখানি চিত্র।

ও লওয়া নিবারণ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এক জনকে, যাহাকে পুলিসের ভাষায় 'বমালসহ গ্রেপ্তার' বলে, সেইরূপ ধরিয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল লণ্ডনে ভারত-সচিবের কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ভারতীয় সদস্যদের বিশেষ কোন ক্ষমতা ও প্রভাব না থাকায় এবং তাঁহাদের দ্বারা ভারতবর্ষের কোন উপকার হইবার সুযোগ না-থাকায় তিনি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই এই কাজে ইস্তফা দেন। ব্রিটিশ ভারতসচিবের কৌন্সিলের ভারতীয় সদস্যদের সহিত ভারতসচিবের ঘনিষ্ঠতা থাকা দূরে থাক, তাঁহার সহিত তাঁহাদের মুখচেনাচেনিও এত কম, যে, তদানীন্তন ভারতসচিব মল্লিক মহাশয়কে একদা ডক্টর পরাঞ্জপ্যে বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। এই কথা খবরের কাগজে মল্লিক মহাশয়ের জবানী বাহির হইয়াছিল।

ভারতসচিবের কৌন্সিলের সদস্যের পদ ত্যাগ করার পর তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া রাজনীতিক্ষেত্র হইতে প্রায় দূরেই ছিলেন, যদিও ভারতসভার সভাপতি হইয়াছিলেন এবং বঙ্গের সকল রাজনৈতিক দলের লোকদিগকে বঙ্গের

স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক

স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত ও বঙ্গের আর্থিক উন্নতিকল্পে সমবেত চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়া দুই একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি নিজগ্রাম সিঙ্গুরের শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল দিকে উন্নতিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য প্রভূত অর্থ-ব্যয়ও করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, সাধারণতঃ গ্রামসমূহের উন্নতি তাঁহার একটি প্রধান চিন্তার ও চেষ্টার বিষয় ছিল। তিনি স্পষ্টবাদী, দয়ালু, পরদুঃখকাতর, কোমলহৃদয় ও দানশীল ছিলেন।

—

লীগ অব নেশ্যন্সের অসামর্থ্য

অতীতে এবং বর্ত্তমান সময়েও কখন কখন দেশে দেশে যে-সকল বিবাদ হেতু যুদ্ধ হইয়াছিল ও হয়, সালিসীদ্বারা তৎসমুদয়ের নিষ্পত্তি করিয়া যুদ্ধ নিবারণ করা ও গৃধ্নুতা ও

পররাষ্ট্রলোলুপতা বশতঃ যে-সব যুদ্ধ হয় তাহাও নিবারণ করা এবং এই প্রকারে শান্তি স্থাপন ও রক্ষা করা লীগ অব নেশুন্সের প্রধান উদ্দেশ্য। চীনের বিরুদ্ধে বহুবর্ষব্যাপী জাপানী সামরিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করিতে না পারায় আগেই প্রমাণ হইয়া গিয়াছিল, যে, লীগ এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে অসমর্থ। আবিসীনিয়ার বিরুদ্ধে ইটালীর যুদ্ধেও তাহা প্রমাণ হইয়া গেল। লীগ তাঁহার সহায় হইবে এই ভরসায় আবিসীনিয়ার সম্রাট সাত মাস যুদ্ধ করিয়াছিলেন। লীগ তাহা না করায় বিশ্বাসঘাতক হইয়াছে।

একা একাই ইটালীর সমকক্ষ এবং ইটালী অপেক্ষা শক্তিশালী দেশ ইউরোপে আছে। সমষ্টিগত ভাবে ত লীগের সভ্যেরা নিশ্চয়ই ইটালীর চেয়ে শক্তিশালী। তথাপি ইটালীর দস্যুতায় কেহ একা বা লীগ কেন বাধা দিল না বা দিতে পারিল না, তদ্বিষয়ে কেবল অনুমান ও জল্পনা করা যাইতে পারে। কোন কোন দেশের সহিত ইটালীর প্রকাশ্য ও গোপনীয় সন্ধি ও চুক্তি আছে। তাহা প্রতিবন্ধক হইয়া থাকিবে। ইটালী এখন যাহা করিতেছে প্রত্যেক প্রবল দেশ তাহা করিয়াছে, সেটাও একটা বাধা। সকল প্রধান দেশ একমত হইতে না পারাতেও হয়ত ইটালী বাধা পায় নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নিজেদের স্বার্থে আঘাত পড়িতেছে বা পড়িবার সম্ভাবনা ঘটিতেছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নিজেদের দেশ বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা ঘটিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্য দেশের উপর—বিশেষতঃ অনিউরোপীয় কালা আদমীর দেশের উপর—কোন দস্যু জাতির আক্রমণে বাধা দেওয়া হয়ত কেহ কর্ত্তব্য মনে করে নাই।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, 'সভ্য' জাতিদের, খ্রীষ্টীয়ান জাতিদের, মুখে আন্তর্জাতিক আইন, আন্তর্জাতিক ন্যায়ান্যায় বিচার, মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি কথা কিরূপ অন্তঃসারশূন্য ও ভণ্ডামিপ্রসূত।

কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসংঘ যে আবিসীনিয়ার সাহায্য করিল না বা করিতে পারিল না, তাহার পূর্ব্বোল্লিখিত নানা কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু কেহই যে আবিসীনিয়ার রাজধানীর পতনে এবং কার্য্যতঃ আবিসীনিয়ার স্বাধীনতালোপে সহানুভূতি ও দুঃখ প্রকাশ করিল না, তাহার কারণ কি? এরূপ সহানুভূতি ও দুঃখ প্রকাশে ত আধ পয়সাও খরচ হইত না, কাহারও গায়ে আঁচড় লাগিত না। অথবা হয়ত ইহা ঠিকই হইয়াছে—যেখানে সহানুভূতি ও দুঃখ নাই সেখানে তাহার বাহ্য ভান দ্বারা কপটতার মাত্রা না-বাড়ানই ভাল।

—

আমেরিকার ব্যবহার

আমেরিকা লীগকে ও ব্রিটেনকে টিটকারী দিয়াছে; নিজেকেও বাদ না দিয়া বলিয়াছে, আবিসীনিয়ার পতনে সমুদয় পৃথিবীর লজ্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু আমেরিকাও আবিসীনিয়ার দুঃখ বিপদে দুঃখ প্রকাশ করে নাই!

—

জাপানের ব্যবহার

জাপান আবিসীনিয়াতে কাপাসের চাষের নিমিত্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ইজারা পাইয়াছিল এবং নানা বাণিজ্যিক সুবিধাও পাইয়াছিল। কিন্তু জাপানও চুপ করিয়া আছে!

—

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর হীনতা স্বীকার

ইটালীর দস্যুতায় বাধা দিতে না-পারায় যে ব্রিটেনের হিউমিলিয়েশুন অর্থাৎ হীনতা মর্য্যাদাহানি বা অবমাননা হইয়াছে, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ বল্ড্‌ইন যে তাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন, ইহা হইতে মনে হয়, তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি ন্যায়ান্যায়বোধ ও জাতীয় আত্মসম্মানবোধ সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই।

—

খোর্দ-গোবিন্দপুরের মোকদ্দমা

রাজশাহী জেলার খোর্দ-গোবিন্দপুর গ্রামে কতকগুলি লোক কতকগুলি পুরুষ ও নারীর উপর অত্যাচার করিয়াছে এই অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি হয়। তাহারা হাইকোর্টে আপীল করায় হাইকোর্ট মোকদ্দমার পুনর্বিচার জলপাইগুড়িতে হইবে, ইউরোপীয় ও খ্রীষ্টীয়ান জজের দ্বারা হইবে, এবং জুরীর সাহায্য না লইয়া আসেসরের সাহায্যে হইবে, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিচারাধীন মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা বে-আইনী। তাহা করিবার ইচ্ছা ও আইনসঙ্গত অধিকার আমাদের নাই। কেবল একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, তাহারই উল্লেখ করিতেছি। এই মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মুসলমান ও অভিযোক্তারা হিন্দু এবং জজ ও জুরী ছিলেন হিন্দু। ইহার প্রথম বিচারের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ হইতে অন্যধর্ম্মাবলম্বী জজ ও জুরীর নিকট বিচারের প্রার্থনা করা হয় নাই। এক পক্ষ এক-ধর্ম্মাবলম্বী, অন্য পক্ষ অন্যধর্ম্মাবলম্বী, এবং জজ ও জুরী উভয় পক্ষের কোন এক পক্ষের ধর্ম্মাবলম্বী, এরূপ মোকদ্দমা ও আপীল ইতিপূর্ব্বে হইয়াছিল কিনা, এবং তাহা হইয়া থাকিলে হাইকোর্ট বর্ত্তমান পুনর্বিচারের আদেশে জজ ও জুরী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিয়াছিলেন কিনা, উকীল ব্যারিষ্টারেরা তাহা বলিতে পারিবেন।

—

নূতন বড়লাটের প্রথম বক্তৃতানিচয়

নূতন বড়লাট লর্ড লিনলিথগো বোম্বাইয়ে পদার্পণ করিবার পর একাধিক অভিনন্দনপত্র পান। মুসলমানদের অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেন, যে, ধর্ম্মবিশ্বাস ও শ্রেণী নির্বিশেষে জাতীয় একতাতেই ভারতের ভবিষ্যৎ শক্তি নিহিত; সেই একতা যাহাতে জন্মে তাহার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং তদর্থে এই দেশের অধিবাসীদের প্রতি ধর্ম্মবিশ্বাস ও শ্রেণী নির্বিশেষে তিনি অপক্ষপাত ব্যবহার করিবেন।

তাহা তিনি যথাসাধ্য করিলে ভালই হইবে। কিন্তু নূতন ভারতশাসন আইন ও চাকরির বাঁটোয়ারা সম্বন্ধীয় ভারত-গবর্মেণ্টের রিজল্যুশন পক্ষপাতিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং সেইগুলি অনুসারে কাজ করিতে তিনি বাধ্য। সুতরাং অপক্ষপাত ব্যবহার করিতে তিনি ইচ্ছা করিলেও প্রধান প্রধান বিষয়ে তিনি তাহা করিতে পারিবেন না।

জাতীয় একতাতেই ভারতের ভবিষ্যৎ শক্তি নিহিত, ইহা খুব মামুলী সত্য কথা। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার উপর প্রতিষ্ঠিত নূতন ভারতশাসন আইন জাতীয় একতার মূলে প্রচণ্ডতম আঘাত করিয়াছে। এই আইনের উচ্ছেদ বা আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে ইহা জাতীয় একতার পথে প্রবল প্রতিবন্ধক হইয়া থাকিবে। অতএব লর্ড লিনলিথগো যাহা বলিয়াছেন তাহা ভারতশাসন আইনের অনভিপ্রেত বিরুদ্ধ সমালোচনা।

তিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমান ব্যবহার করিবেন, এই উক্তিতে মিঃ জিন্না কোপ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ভাবটা এইরূপ—"আমরা এত রাজভক্ত ও হিন্দুরা এত রাজদ্রোহী, অথচ বড়লাট কি না বলেন উভয়ের প্রতি সমান ব্যবহার!" অবশ্য এই কোপটাও অভিনয়মাত্র হইতে পারে; কারণ, মিঃ জিন্নার মত বুদ্ধিমান্ লোকে নিশ্চয়ই বুঝে, যে, ভারতশাসন আইন মানিয়া অপক্ষপাত ব্যবহার করা অসম্ভব।

বোম্বাই মিউনিসিপালিটীর অভিনন্দনের উত্তরে লাটসাহেব বলেন, ভূমিকর্ষণনিরত কৃষক চিরকাল যেমন এখনও তেমনই এই দেশের মেরুদণ্ড ও তাহার শ্রীসমৃদ্ধির ভিত্তিস্বরূপ। ইহা সত্য কথা, কিন্তু আংশিক সত্য। অতীতে ভারতবর্ষের শ্রীসমৃদ্ধির ভিত্তি যেমন ছিল কৃষি, তেমনই ছিল বাণিজ্য এবং পণ্যশিল্পও। ভারতে কৃষির উন্নতি খুবই আবশ্যক। কিন্তু শুধু কৃষির উপর নির্ভর করিয়া ভারত নিজের পূর্ব্বশ্রী ফিরিয়া পাইবে না। তদর্থে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি বিস্তৃতিও একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু নূতন ভারতশাসন আইন এই উভয় দিকে উন্নতি করা আগেকার চেয়েও কঠিন করিয়া দিয়াছে।

নিউ দিল্লীতে গিয়া লর্ড লিনলিথগো রেডিয়োর সাহায্যে দূরবর্ত্তী স্থানসমূহেও শ্রোতব্য একটি বক্তৃতা করেন। প্রধান এমন কোন বিষয় নাই এবং সরকারী চাকরিসমূহের এমন কোন বিভাগ (service) নাই যাহার বিষয়ে ঐ বক্তৃতাটিতে কিছু উল্লেখ নাই—কেবল একটি বিষয় ছাড়া।

তাহা শিক্ষা। সভ্য মানুষদের শাসনাধীন যত দেশ আছে তাহার মধ্যে ভারতবর্ষে নিরক্ষর লোক শতকরা যত জন আছে এমন আর কোথাও নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে যে-দেশের অবস্থা এরূপ লজ্জাকর, সে দেশের আর সব বিষয়েই বড়লাট উৎসাহ দিবার আশ্বাস দিয়াছেন অথচ সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য একান্ত আবশ্যক শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি সম্বন্ধে একটি কথাও বলিলেন না, ইহা কি বিস্মৃতি ও অনবধানতা-বশতঃ ঘটিয়াছে? তিনি চিকিৎসা-বিদ্যা, বিজ্ঞান, উচ্চ কারখানা-পণ্যশিল্প, ভারতীয় সুকুমার শিল্প ও সাহিত্য—সকল বিষয়েই কিছু-না-কিছু করিবার আশা দিয়াছেন, অথচ শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক! শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতি ব্যতিরেকে বিজ্ঞান ললিতকলা সাহিত্য কি প্রকারে উৎসাহলাভ করিতে পারে?

ভারতশাসন আইন তিনি ব্রিটেন ও ভারতের সম্মিলিত বিজ্ঞতা দ্বারা গঠিত বলিয়াছেন। ভারতবর্ষ এই আইনের জন্য মোটেই দায়ী নয়। ইহার জন্য প্রাপ্য সমুদয় প্রশংসাটা ব্রিটেন গ্রহণ করুন।

এই বক্তৃতায় তিনি বোম্বাইয়ের একটি বক্তৃতার মত নিজের সম্পূর্ণ অপক্ষপাতিত্বের উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আগেই বলিয়াছি।

ভারতীয় সিবিল সার্বিসের সুযশের উল্লেখ তিনি করেন। পৃথিবীতে সভ্য মানবের দ্বারা শাসিত দেশসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষ নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য ও রুগ্নতায় সকলের সেরা। সুতরাং সিবিল সার্বিসের সুযশ ভিত্তিহীন নহে।

—

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতে এবার এক জন বাঙালীকেও লওয়া হইয়াছে। তিনি শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসু। তিনি এই কমিটির সভ্য হইবার নিশ্চয়ই যোগ্য। কিন্তু তিনি কারাগারে; কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। কমিটিতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রতিনিধি লওয়া হইয়াছে খান্ আবদুল গফ্ফার খান্‌কে। কিন্তু তিনি কারাগারে আছেন বলিয়া অন্য এক জনকে তাঁহার স্থানে কাজ করিবার জন্য লওয়া হইয়াছে। বঙ্গের সুভাষ বাবুর বেলাতেও এই রীতি কেন অনুসৃত হইল না? বাঙালীদের রসবোধ আছে ও তাহারা তামাসা বুঝে বলিয়া কি?

—

স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ সেন

কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ সেন ৫৭ বৎসর বয়সে, অকালে, মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও পরে ইংলণ্ডের লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি প্রথমে শিবপুর এঞ্জিনিয়ারীং কলেজে রাসায়নিক শিল্প বিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তথায় রসায়ন বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সর্ব্বশেষ সরকারী চাকরি করেন কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষের পদে। পেন্সান লইয়া তিনি শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ দাস ও বীরেন্দ্রকুমার মৈত্রের সহযোগিতায় কলিকাতা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড স্থাপন করেন এবং অধুনা তাহার কারখানার কাজেই ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি ধীর প্রকৃতির সুশিক্ষক ছিলেন ও ছাত্রগণকে ভাল বাসিতেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বঙ্গের পণ্যশিল্প ক্ষেত্র হইতে এক সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক অন্তর্হিত হইলেন।

—

ডক্টর মেঘনাদ সাহা সম্বন্ধে গুজব

এইরূপ একটি গুজব রটিয়াছে যে ডক্টর মেঘনাদ সাহা পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পাইবেন। তিনি ইহার উপযুক্ত বটে। তাঁহার একটি গবেষণার ফল আরও কিছুদূর অগ্রসর করিয়া দু-জন বৈজ্ঞানিক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

—

আবিসীনিয়ার প্রতি সহানুভূতি

আবিসীনিয়ার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশার্থ ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে নানা স্থানে প্রকাশ্য সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

—

সুভাষ বসুর কারারোধের প্রতিবাদ

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে গবন্মেণ্ট ১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেশ্যান অনুসারে বন্দী করায় ভারতের সমুদয় প্রদেশে নানা স্থানে গবন্মেণ্টের এই কার্য্যের প্রতিবাদ হইয়া গিয়াছে।

—

পাটনায় বাঙালী কংগ্রেসওয়ালাদের বিবাদভঞ্জনচেষ্টা

অনেক বৎসর ধরিয়া বঙ্গের কংগ্রেস-চাঁইরা দলাদলি ও ঝগড়া করিতেছেন। তাঁহাদের ঝগড়া নিজেদের মধ্যেই মিটাইতে না-পারিয়া তাঁহারা পাটনায় বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের শরণাপন্ন হইয়াছেন। বঙ্গের পক্ষে ইহা লজ্জার কথা। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে দলাদলি আছে, গুজরাটে আছে, আরও কোন কোন জায়গায় আছে। তথাকার বিবদমান লোকেরা বিবাদভঞ্জনের জন্য নিজ নিজ প্রদেশের বাহিরে যান না, অথম বাঙালীকে বার-বার অবাঙালীর শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। ধিক্!

বাংলা দেশ স্বরাজ পাইলে কি তাহার কাজ চালাইবার নিমিত্ত বঙ্গের বাহির হইতে মনুষ্য আমদানী করিতে হইবে?

—

স্বাধীনতা হ্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন

রাষ্ট্রনৈতিক নানা বিষয়ে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু অনেক বিষয়ে মতের ঐক্য আছে। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ও প্রকাশ্য সভা করিয়া রাজনৈতিক বিষয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বহু পরিমাণে হ্রাস করা হইয়াছে, মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকদের নিকট হইতে টাকা জামিন লওয়া চলিতেছে, বিনা বিচারে বন্দী করিবার প্রথা আইনে পরিণত হইয়াছে, নানা বহি নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত হইয়াই চলিতেছে, বাড়ি খানাতল্লাস ও মানুষকে গ্রেপ্তার করা খুব বাড়িয়াছে—মানুষের যে স্বাধীনতা এই পরাধীন দেশেও ছিল তাহা কত দিকে যে কমান হইয়াছে তাহার পুরা তালিকা দেওয়া অনায়াসসাধ্য নহে। এমন কোন রাজনৈতিক দল নাই যাহার নেতৃবর্গ ও সভ্যেরা এই প্রকারে স্বাধীনতাহীন হইয়া থাকিতে চান।

এই স্বাধীনতাহরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার নিমিত্ত কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ধর্ম্মসম্প্রদায় ও রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে সভ্য লইয়া একটি ইণ্ডিয়ান সিবিল লিবার্টী য়ুনিয়ন গঠন করিতে চান এবং তজ্জন্য সকল প্রদেশে অনেকের মত জানিতে চাহিয়াছেন। আমরা ইহার সপক্ষে মত জ্ঞাপন করিয়াছি।

—

বঙ্গে ও বোম্বাইয়ে ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষার্থী

অনেকের এইরূপ একটা ধারণা আছে, যে, যেহেতু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশ্যন পরীক্ষায় প্রায় পঁচিশ

হাজার ছাত্রছাত্রী উপস্থিত হয়, অতএব বঙ্গে শিক্ষার বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়াছে। এই ধারণা যে ভ্রান্ত তাহা আমরা মধ্যে মধ্যে দেখাইয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান ১৯৩৬ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৩৮০০। সিন্ধুদেশ সমেত বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর লোক-সংখ্যা, দেশী রাজ্যগুলিও ধরিয়া, ২,৬৩,৯৮,৯৯৭। বঙ্গ ও আসামের ছাত্রছাত্রীরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেয়। এই দুই প্রদেশের মোট লোকসংখ্যা ৬,০৩,৩৫,১৯৫, অর্থাৎ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দ্বিগুণের অধিক। অতএব বঙ্গে ও আসামে ইংরেজী উচ্চ-বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিস্তার বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাছাকাছি পৌঁছাইতে গেলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ন্যূনকল্পে পঞ্চাশ হাজার হওয়া চাই।

ঢাকার ছেলেমেয়েরা তথাকার একটা বোর্ডের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয় বটে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুব কম।

—

ঢাকাই প্রশ্ন

এই বোর্ডের ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষার পরীক্ষার্থী-দিগকে "আক্কেল সেলামী" ও "বিস্মিল্লায় গলদ" এই দুটি শব্দসমষ্টি সম্বলিত বাক্য রচনা করিতে বলা হইয়াছে। এই শব্দসমষ্টি দুটি কথ্য ও কথিত বাংলায় প্রচলিত আছে বটে, প্রহসন আদিতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে; কিন্তু সাধারণতঃ উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায় তাহাতে এগুলির প্রয়োগ তেমন দৃষ্ট হয় না। তবে, খান বাহাদুর্ কাজী ইমদাদুল হকের "প্রবন্ধমালায়" থাকিতে পারে; পড়িয়া দেখিতে হইবে। উহা ঢাকার ম্যাট্রিকুলেশনের, উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের ও উচ্চ মাদ্রাসাসমূহের জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক। উহার চমৎকারিত্ব প্রবাসীতে একবার প্রদর্শিত হইয়াছিল আবার হইতে পারে। উহা যাহাদিগকে কিনিতে ও পড়িতে হইয়াছে, তাহাদের আক্কেল-সেলামী হইয়া গিয়াছে, এবং কিরূপ বাংলা লিখিলে ও শিখিলে "বিস্মিল্লায় গলদ" হয়, উহা তাহারও দৃষ্টান্ত স্থল।

ঢাকাই প্রবেশিকার প্রশ্নে ছাত্রছাত্রীদিগকে "বাদশাহ" ও "গোলাম" শব্দদুটি স্ত্রীলিঙ্গে কি রূপ ধারণ করে, তাহা লিখিতে বলা হইয়াছে। আমরা ত জানি না। খুব জোর কপাল বলিতে হইবে, যে এখন আর আমাদের ঢাকাই-পরীক্ষা দিবার বয়স নাই। বাঙালী ছেলেদের বাদশাহ হইবার সম্ভাবনা নাই, বাঙালী মেয়েদের ত নাই-ই। সুতরাং নারী-বাদশাহকে এক কথায় কি বলিতে হইবে, তাহা তাহারা নাই জানিল? তাহাতে ক্ষতি কি? গোলামীর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। আমাদের ছেলেমেয়েদিগকে পূর্ণমাত্রায় দাসভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে বটে। সুতরাং নারী-গোলাম এক কথায় কোন্ শব্দদ্বারা সূচিত হয়, তাহা জানা দরকার।

—

ধনোপার্জ্জনক্ষেত্রে প্রাদেশিকতা

কলিকাতাস্থ তালতলা পাব্লিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে গত কয়েক বৎসর একটি সাহিত্য-সম্মেলন হইতেছে। ইহাতে অনেক ভাল অভিভাষণ ও প্রবন্ধ পঠিত হয়। সমস্তই সাহিত্যসংক্রান্ত নহে। অন্যান্য বিষয়ের আলোচনাও হয়। এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতবর্ষে অর্থোপার্জ্জনক্ষেত্রে প্রাদেশিকতা সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ ও সুচিন্তিত একটি অভিভাষণ পাঠ করেন। নীচে তাহার প্রধান প্রধান তথ্য ও বক্তব্যগুলি দেওয়া হইল।

আজ "বিহার" "বিহারের" জন্য, "আসাম" "আসামের" জন্য, "বাঙ্গলা" "বাঙ্গালীদের" জন্য এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষেরা এই আন্তঃপ্রাদেশিক বিদ্বেষবহ্নিতে প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে ইন্ধন যোগাইয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এ রকম মনোভাব ভারতে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির পক্ষে মস্ত একটা অন্তরায়।

আমরা যদি ভারতবর্ষকে একটি অখণ্ড দেশ বলিয়া না মনে করি, তাহা হইলে আমাদের প্রকৃত দেশাত্মবোধ জাগিবে কি? আমি মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলি কতটা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরস্পরের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য। এই বিষয়টি হইতেছে Interprovincial migration। ১৯৩১ সালে আদমসুমারীর সময় যে-সমস্ত বিহারী ও উড়িয়া বিহার উড়িষ্যার বাহিরে ছিল তাহাদের সংখ্যা ছিল ১৭,০৮,১৩০। অন্য প্রদেশবাসী যাহারা ঐ সময় বিহার ও উড়িষ্যায় ছিল তাহাদের সংখ্যা ৪,৬৬,৫৬১। উক্ত বিহারী ও উড়িয়াগণের শতকরা ৯০ জনের উপর বাঙ্গলা ও আসামে বাস করিত। বাঙ্গলায় ছিল তাহাদের সংখ্যা ১১,৩৮,৮৫০। ঐ সময় কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে যে-সমস্ত বিহারী ও উড়িয়া ছিল তাহাদের সংখ্যা ২৩১১৫১। ১৯২১ ও ১৯৩১ এই দশ বৎসরের মধ্যে শেষ ছয় বৎসরের প্রতি বৎসর বিহার ও উড়িষ্যার পোষ্টাফিসসমূহে প্রায় ৮ কোটি টাকার মণিঅর্ডার হইয়াছে। এই অর্থের অধিকাংশই আসিয়াছিল বাঙ্গলা দেশ হইতে। ইহার তুলনায় কত টাকা বাঙ্গালীরা বাঙ্গলায় পাঠাইতেছে? যে-সমস্ত প্রবাসী বাঙ্গালী বিহার উড়িষ্যা অঞ্চলে আছেন তাঁহারা সেখানকার বাসিন্দা হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের সংখ্যাও মাত্র ১৫,৭৫২৪। ১৯৩১ সালে বাঙ্গলা দেশে যুক্তপ্রদেশ-প্রবাসীর সংখ্যা ছিল ৩৪০১৩১ কিন্তু যুক্তপ্রদেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০৫২১। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন তীর্থ-যাত্রী অর্থাৎ বাঙ্গলার টাকা তাঁহারা যুক্তপ্রদেশেই খরচই করিয়াছেন। মান্দ্রাজ সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। ১৯২১ সালে মান্দ্রাজ-প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল ৩১৪১। ১৯৩১ সালে তাহারা সংখ্যায় এত কম ছিল যে তাহাদের সেন্সস লইবার বোধ হয় প্রয়োজনই হয় নাই। এই সমস্ত উদাহরণ দ্বারা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি ভারতের প্রদেশগুলি

আর্থিক ব্যাপারে কতটা পরস্পর নির্ভরশীল। এক প্রদেশ হইতে কর্ম্মোপলক্ষে অন্য প্রদেশে গিয়া অধিবাস করিলে বেকার সমস্যার কতকটা সমাধান হয়। এই সব ক্ষেত্রে প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। ইহা ভারতের জাতীয়তা-বোধের বৃদ্ধির পথে একটি বাধা।

অধ্যাপক মহাশয় ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত কথাই বলিয়াছেন

—

জমীর ক্ষয়

কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, জমীর ক্ষয় (soil erosion) তাহার মধ্যে একটি। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি দেখান, বৃষ্টির জলে পশ্চিম বঙ্গে ভূমির উপরের অংশ ধৌত হইয়া নদীর বন্যায় জমী হইতে অন্যত্র নীত হয়। এই ধৌত মাটীর স্তরের কিছু অংশ নদী-গর্ভে পলি পড়িয়া তাহাকে ক্রমশঃ উঁচু করিতে থাকে এবং অনেক অংশ সাগরে গিয়া পড়ে। মাটীর এই উপরের স্তরের ক্ষয়ে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। অথচ ইহা নিবারণের কোন চেষ্টা হইতেছে না।

ইহা কেবলমাত্র পশ্চিম বঙ্গের সমস্যা নহে, বঙ্গের ও ভারতবর্ষের অন্যত্রও এইরূপ অনিষ্টকর ভূমিক্ষয় চলিতেছে। অন্য অনেক দেশেও এই সমস্যা বিদ্যমান।

এই সমস্যার সমাধান কি প্রকারে হয় তাহা জানিতে হইলে আমাদের যুবকদিগকে রাশিয়া ও আমেরিকা যাইতে হইবে, লেখক বলিয়াছেন।

এই অনিষ্টের প্রতিকারার্থ আমেরিকায়, আমাদের দৃষ্টিতে, প্রভূত চেষ্টা হইতেছে—যদিও আমেরিকার অনেক লোক তাহাতে সন্তুষ্ট নহে। তথায় একটি ভূমি সংরক্ষণ বিভাগ (The United States Soil Conservation Service) আছে। মিঃ হিউ বেনেট তাহার ডিরেক্টর। তাঁহার হিসাবে ভূমিক্ষয় দ্বারা য়ুনাইটেড ষ্টেট্‌সের বার্ষিক চল্লিশ কোটি ডলার অর্থাৎ মোটামুটি ১২০ কোটি টাকা ক্ষতি হইতেছে। ইহা নিবারণের জন্য তথাকার গবর্ন্মেণ্ট একটি আইন প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং ভূমি সংরক্ষণ বিভাগ ভূমিক্ষয়ের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাইতেছে। ক্ষয়নিয়ন্ত্রণমূলক পূর্ত্তকার্য্যের জন্য তথাকার পূর্ত্তবিভাগ চল্লিশটি প্রজেক্ট বা পরিকল্পনা স্থির করিয়াছে। তজ্জন্য বার্ষিক বরাদ্দ হইয়াছে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ ডলার অর্থাৎ মোটামুটি ৪,২০,০০,০০০ টাকা।

ভারতবর্ষের ইম্পীরিয়্যাল কৌন্সিল অব এগ্রিকাল্‌চ্যার্যাল রিসার্চ কিংবা বঙ্গের কৃষি-বিভাগ এই প্রকার বিষয়ে মাথা ঘামান কি?

বীরভূম বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় যে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হয় ভূমিক্ষয়ের সহিত তাহার সম্পর্ক আছে।

—

মহিলাদিগকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ

"সঞ্জীবনী" লিখিয়াছেন :—

তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে যে সাহিত্য সম্মেলন হইয়া গেল, তাহাতে এক দিন শ্রীমতী নীলিমা দেবী সভানেত্রী ছিলেন। কয়েকটি মহিলার প্রবন্ধ পঠিত হইবার পরে শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু 'নারীধর্ম্ম' নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধে তিনি নারীদের প্রতি যথেষ্ট বিদ্রূপ অসংযত ভাষায় বড় ঘরের ও গরিব মেয়েদের ও মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাত্রার কথা বর্ণনা করেন। সভায় উপস্থিত পুরুষগণ তাহা শ্রবণ করিয়া হাস্য ও করতালি দিয়া লেখককে সমর্থন করিতে থাকেন। সভাস্থলে বিখ্যাত অধ্যাপকগণ, হাইকোর্টের উকিল ও কর্পোরেশনের কাউন্সিলর প্রভৃতি ছিলেন। কোনও পুরুষ এই সকল হীন উক্তির প্রতিবাদ করেন নাই। মহিলাদের পক্ষে দুই জন মহিলা শ্রীযুক্তা বীণা রায় ও পুষ্প দে সভানেত্রীর অনুমতি লইয়া এরূপ প্রবন্ধ পাঠ করা উচিত কি না জিজ্ঞাসা করেন। সভানেত্রী প্রবন্ধ পাঠ করিতে, ও পরে আলোচনা হইবে বলেন। প্রবন্ধপাঠ হইলে সভানেত্রী বলেন, প্রবন্ধের স্থানে স্থানে ভাষা অসংযত হইলেও কবির অত্যুক্তি ও উচ্ছ্বাস নারীদের ক্ষমার যোগ্য।

সম্মেলনের মূল সভাপতি অধ্যাপক শ্রীজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা দিতে উঠিয়া মহিলাদিগকে বলেন, নারীগণ যখন পুরুষদের সহিত সমান অধিকারের দাবি করিতেছেন, তখন পুরুষদের সভায় আসিয়া বিচলিত হইলে চলিবে না। যাহাদের সাধনা নাই, সারবান্ পদার্থ নাই, যাহারা অশিক্ষিত ও নির্ব্বোধ তাহারাই বিচলিত হয়। তাঁহার এই শ্লেষপূর্ণ বাক্যে মহিলাদের মধ্যে ক্ষোভের উদয় হয়। কয়েক জন যুবক মহিলাদের মর্য্যাদাহানি হইয়াছে বলেন এবং আরও বলেন যে এরূপ স্থলে মহিলাদের আর থাকা উচিত নহে, তাঁহাদিগকে প্রচুর অপমান করা হইয়াছে। মহিলাগণ সভা হইতে বাহির হইতে আরম্ভ করিলে সভার উদ্যোক্তাগণ তাঁহাদিগকে বাধা দেন ও মহিলাদের সমর্থনকারী যুবকদিগকে প্রায় ধাক্কা দিয়া সভার বাহির করিয়া দেন। অবশেষে আমেরিকার দাসদের যখন স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যবস্থা হইল তখন তাহারা স্বাধীনতা চাহি না বলিয়া যেমন কলরব তুলিয়াছিল, সেইরূপ মহিলাগণই অধ্যাপক জয়গোপাল বানার্জ্জির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

"সঞ্জীবনী" যদি ঠিক্ সংবাদ পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে সাহিত্য-সম্মেলনের এই দিনের অধিবেশনে নিন্দনীয় কিছু হইয়াছিল বলিতে হইবে।

যেহেতু মহিলারা আজকাল পুরুষদের সহিত একই সভায় উপস্থিত থাকেন, অতএব পুরুষদের কথাবার্ত্তা বক্তৃতা তৎসত্ত্বেও অসংযত থাকিয়া গেলেও মহিলাদের তাহাতে বিচলিত হইবার কারণ ঘটে না এবং তাঁহারা বিচলিত হইলে অসার অশিক্ষিত সাধনাহীন ও নির্ব্বোধ বিবেচিত হইবার যোগ্য, আমরা এরূপ মনে করি না।

"সঞ্জীবনী" যদি ঠিক সংবাদ না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তদ্বিষয়ক প্রতিবাদ সেই কাগজেই হওয়া উচিত। তাহাতে প্রতিবাদ না করিয়া আমাদিগকে প্রতিবাদ পাঠাইলে আমরা ছাপিতে বাধ্য থাকিব না।

—

নেপালে বিদ্যাপতির গীতাবলীর পুথী

পাটনার বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়সবাল নেপালের রাজকীয় গ্রন্থাগারে একটি প্রায় ৫০০ বৎসরের পুরাতন বিদ্যাপতির গানের পুথী দেখিতে পাইয়াছেন। ইহা তালপাতার ১০৯টি পাতায় মৈথিলী অক্ষরে লেখা। মৈথিলী অক্ষর বাংলারই মত। বিদ্যাপতির পদাবলীর বঙ্গে একাধিক সংস্করণ আছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বহু পরিশ্রমে একটি সংস্করণ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাহার সহিত এই নবাবিষ্কৃত পুথী মিলাইয়া দেখা উচিত। নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে একাধিক শিক্ষিত বাঙালী আছেন। তাঁহাদের কাহারও পুথীটির নকল লওয়া কর্ত্তব্য। নেপাল সরকারের নিকট অনুমতি চাহিলেই অনুমতি পাওয়া যাইবে। এ বিষয়ে নেপাল সরকার খুব উদার।

—

ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্বিসে লোক লইবার নূতন নিয়ম

ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্বিসে লোক লইবার জন্য ইংলণ্ডে ও এদেশে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হইয়া থাকে। তাহার ফলে, ইংরেজদের বিবেচনায় যথেষ্ট ইংরেজ এই সার্বিসে চাকরি পায় না। এই জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছাড়া মনোনয়ন দ্বারাও কতকগুলি লোক লওয়া হইবে। এই পরিবর্ত্তনের অন্য কারণও দেখান হইয়াছে বটে, কিন্তু ইংরেজদের মতে যথেষ্টসংখ্যক নূতন সিবিলিয়ান না-পাওয়াটাকেই আমরা প্রকৃত কারণ মনে করি।

যে পরিবর্ত্তন করা হইতেছে, তাহার ভিত্তিস্বরূপ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, যে, সিবিল সার্বিসে ইংরেজ সিবিলিয়ান থাকা চাই-ই এবং তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৫০ জন হওয়া চাই। ব্রিটিশ প্রভুত্ব ও আর্থিক স্বার্থরক্ষার জন্য ইহা আবশ্যক বটে। কিন্তু ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য ইহা আবশ্যক নহে। ভারতবর্ষে দৈহিক মানসিক চারিত্রিক সকল দিক দিয়া যোগ্য এত শিক্ষিত লোক আছে, যে, সিবিল সার্বিসের জন্য এক জন মাত্র বিদেশীও অনাবশ্যক। ভারতবর্ষ স্বরাজ্য পাইবে, ইংলণ্ডের কয়েক নৃপতি ও বহু রাজপুরুষ একথা বলিয়াছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে হইলে সিবিল সার্বিসে ইংরেজ নিয়োগ এখনই কমাইয়া দেওয়া এবং পাঁচ বৎসরের মধ্যে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

—

উত্তর-চীনকে জাপানের আত্মকর্তৃত্বদানেচ্ছা !

মাঞ্চুরিয়া চীন সাধারণতন্ত্রের অন্তর্গত ছিল। জাপান তাহাকে চীন হইতে আলাদা করিয়া দিয়া এক জন সম্রাট্ দিয়াছে, তাঁহাকে স্বাধীন রাজার মত "হিজ্ ম্যাজেষ্টি" (His Majesty) বলে এবং মাঞ্চুরিয়াকে একটা স্বাধীন দেশ বলিয়া স্বীকার করিতে জগতের স্বাধীন জাতিদিগকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছে। অথচ বাস্তবিক মাঞ্চুরিয়ার কোন স্বাধীনতা নাই, সে জাপানের কথায় উঠিতে বসিতে বাধ্য, এবং জাপানী সাম্রাজ্যেরই একটা প্রদেশ মাত্র।

উত্তর-চীনকে চীনের অন্যান্য অংশসমূহ হইতে পৃথক করিয়া

উত্তর-চীনের নব সাজ

জাপান তাহাকেও মাঞ্চুরিয়ার মত অটনমি বা আত্মকর্তৃত্ব দিতে, অর্থাৎ তাহাকেও নিজের প্রভুত্বের অধীন করিতে চাহিতেছে—হয়ত এত দিনে করিয়া ফেলিয়াছে।

জাপানে প্রস্তুত পরিচ্ছদ বা উর্দি পরা চৈনিক এক জন মানুষের ছবির দ্বারা উত্তর-চীনের সম্ভাবিত এই অবস্থা একটি আমেরিকান ব্যঙ্গচিত্রে সূচিত হইয়াছে।

—

স্বর্গীয়া শ্রীমতী পূর্ণিমা দেবী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী পূর্ণিমা দেবীর সহিত মাজিষ্ট্রেট ও শাহজাহানপুরের জমীদার (পরলোকগত) পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ শঙ্খধরের বিবাহ হয়। বহুবৎসরব্যাপী বৈধব্যের পর শ্রীমতী পূর্ণিমা দেবীর সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ১৯২৪ সালে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের সমাজসংস্কার সমিতির সভানেত্রীর কাজ করিয়াছিলেন। ঐ প্রদেশের প্রধান দৈনিক পত্র "লীডার" লিখিয়াছেন, "শ্রীমতী পূর্ণিমা দেবী সুশিক্ষিত, চারিত্রিক সদ্গুণমণ্ডিত ও কার্য্যনির্ব্বাহশক্তিমতী ছিলেন, এবং তাঁহার

জমীদারীর উন্নতিসাধনে ও রায়তদিগের সহিত ব্যবহারে আদর্শ ভূম্যধিকারিণী ছিলেন; তাঁহাকে যাঁহারা জানিতেন সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন।"

—

বঙ্গের ছাত্রীদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা

বঙ্গের অল্পসংখ্যক ছাত্রেরই স্বাস্থ্য পরীক্ষিত হইয়াছে, এবং তাহাতে দেখা গিয়াছে অধিকাংশের স্বাস্থ্য ভাল নয়। স্বাস্থ্য ভাল করিতে ও রাখিতে হইলে যে-সব ব্যবস্থা ও অবস্থা আবশ্যক, তাহা ছাত্রদের পক্ষে যত টুকু বিদ্যমান, ছাত্রীদের পক্ষে তাহাও নাই। সুতরাং বলা বাহুল্য, ছাত্রীদের স্বাস্থ্য ছাত্রদের চেয়ে খারাপ। ছাত্রীদেরও স্বাস্থ্য পরীক্ষিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। মহিলা ডাক্তারেরা তাহা করিতে পারিবেন।

—

শিল্পের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা

কলিকাতা সাহিত্য সম্মেলনের চারুকলা শাখার সভাপতি রূপে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় শিল্পের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি শিল্প ও শিল্পীদের পক্ষ হইতে যে দাবি করেন, তাহা ভিত্তিহীন নহে; কিন্তু আমাদের মত অশিল্পী শিল্পানভিজ্ঞেরা এই দাবি ষোল আনা মানিবে না। তথাপি দাবিটি জানা চাই। তাহার একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

রূপের সাধনায়, অধ্যাত্মের আরাধনায়, তুলিকার ইন্দ্রজালে,—নিরক্ষর শিল্পীদের হাতে যে অলৌকিক ভাব রাজ্যের, যে অভিনব চিন্তা-জগতের—যে 'উদ্ঘাটন মন্ত্র' আছে, যে কল্পনা সৃষ্টির "সোনার চাবী-কাঠি" আছে, যাহার স্পর্শে রসের অমরাবতীর সিংহদ্বার তাহাদের চক্ষের সম্মুখে চিরদিন উন্মুক্ত রহিয়াছে,—তাহা কোনও কবিতা, কোনও মহাকাব্য, কোনও ইতিহাস, কোনও শব্দের অক্ষরে লিখিত সৃষ্টি হইতে হীন নহে, কোনও সাহিত্য-রচনা হইতে কম মূল্যবান্ নহে।

কারণ, শাব্দিক পণ্ডিত মহাশয়রা তাঁহাদের শব্দ-সমুদ্র মন্থন করে, কথা সাহিত্যিকরা তাঁহাদের "কথা-সরিৎ-সাগর" ছেঁচে, শব্দ সঙ্কলন করে, পাতার উপর পাতা এঁটে, কথার উপর কথা গেঁথে, যে 'কথা' প্রকাশ করেন,—আমরা এক তুলির আঁচড়ে তার শতগুণ বেশী বলিতে পারি। চীনের ভাষায় একটি প্রসিদ্ধ লোকোক্তি আছে, সেটি এই :—

"একখানি চিত্র পট কত শত সহস্র কথার তুল্য মূল্য।"

—

বেকার-সমস্যা ও বিপ্লববাদ

কলিকাতায় কিছুকাল পূর্ব্বে যে বিপ্লববাদ-বিরোধী কনফারেন্স (Anti-terrorist Conference) হইয়াছিল, তাহার একটা সিদ্ধান্ত এই ছিল, যে, বঙ্গের যুবকদের বেকার অবস্থাই তাহাদের বিপ্লববাদী বা সন্ত্রাসনবাদী হইবার একমাত্র বা প্রধান কারণ, অতএব বেকার-সমস্যার সমাধান হইলেই সন্ত্রাসনবাদ বা বিভীষিকাবাদ হইতে উদ্ভূত নরহত্যা আদি বন্ধ হইবে। বাংলা-গবন্মেণ্ট এই সিদ্ধান্তটি ইংরেজদের বণিকসমিতি বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সকে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা গবর্ন্মেণ্টকে জবাব দিয়াছেন, যে, তাঁহারা অনেক বাঙালী যুবককে কাজ দিয়া থাকেন, এবং বাঙালী যুবকেরা যে বেকার থাকে তাহা সুযোগের অভাবে নহে, তাহাদের শিল্পবাণিজ্য-সম্বন্ধীয় শিক্ষা নাই এবং শিল্পবাণিজ্যে কৃতিত্বলাভ করিতে হইলে যেরূপ ক্ষমতা ও চারিত্রিক গুণ আবশ্যক, তাহা তাহাদের নাই।

বেকার অবস্থা যে বিপ্লববাদের একমাত্র বা প্রধান কারণ, আমরা যে তাহা মনে করি না তাহা এবং সেরূপ মত পোষণ করিবার কারণ আমরা অনেক বার বলিয়াছি। বিপ্লববাদের উদ্ভব প্রধানতঃ রাষ্ট্রনৈতিক কারণ হইতে হইয়াছে। যাহা হউক, সে বিষয়ে পুনর্ব্বার তর্ক করা এখন অনাবশ্যক।

যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যে, বেকার-সমস্যাই বিপ্লববাদের একমাত্র বা প্রধান কারণ, তাহা হইলেও ইহা বলা অন্যায় হইবে না, যে, পণ্যশিল্পের কারখানার মালিক এবং সওদাগরী হৌসের মালিক ইংরেজরা বাঙালী যুবকদিগকে পণ্যশিল্প ও বাণিজ্য শিখিবার সুযোগ দেন না, যদি অগত্যা সামান্য কিছু দেন তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। তাঁহারা যে বাঙালীদিগকে কিছু কাজ দেন তাহা কেরানীগিরি; তাহাতে বাণিজ্য ও পণ্যশিল্প শিখিবার কোন সুযোগ মিলে না।

বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স যে বলিয়াছেন, যে, বাণিজ্যে ও পণ্যশিল্পে বাঙালী ছেলেদের শিক্ষা নাই এবং ঐ কার্য্যক্ষেত্রের উপযোগী চারিত্রিক গুণ নাই, ইহা একটা বাজে অছিলা মাত্র। আমরা বলিতেছি না, যে, বাঙালী যুবকদের সাধারণতঃ এই রকমের যোগ্যতা আছে। অধিকাংশ যুবকই এরূপ কার্য্য-ক্ষেত্রের উপযোগী পুথীগত ও কার্য্যলব্ধ শিক্ষা পায় না, এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল না হওয়ায় অনেকের হয়ত আবশ্যক চারিত্রিক গুণের বিকাশও যথোচিত হয় না। কিন্তু যাহাদের শিক্ষা ও অন্যবিধ যোগ্যতা আছে, যাহাদের যোগ্যতার প্রমাণ আছে, তাহাদিগকেই কি বঙ্গে অর্থোপার্জ্জনে ব্যাপৃত ইংরেজ ধনিকরা কাজ দিয়া উৎসাহ দেন? ডফারিন জাহাজে জাহাজ-পরিচালন বিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ও যোগ্যতার সরকারী সার্টিফিকেটধারী যুবকদিগকে ইংরেজ জাহাজ কোম্পানীগুলা কাজ দেয় না কেন? যে-সব যুবক ইউরোপে ও আমেরিকায় শিক্ষা পাইয়া এবং তথাকার কারখানায় কাজ ও উপার্জ্জন করিবার পর দেশে ফিরিয়াছে, এরূপ অভিজ্ঞ লোকেরা ভারতীয় ইংরেজাধিকৃত কারখানায় কিরূপ উৎসাহ পায়? যাহারা যোগ্যতার বলে বিদেশে কারখানায় বৈতনিক কাজ করিয়া সুখ্যাতি পাইয়াছে, এদেশে ইংরেজদের কারখানায় তাহারা কেন কাজ পাইবার যোগ্য বিবেচিত হয় না?

বিদেশে এইরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞতাশালী যতগুলি যুবক দেশী কারখানায় কাজ পাইয়াছে বা নিজেরাই মূলধন সংগ্রহ করিয়া কারখানা খুলিয়াছে, তাহারা সকলেই বা অধিকাংশ কি অকেজো বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে ?

আমরা বাঙালী যুবকদিগকে সর্ব্বগুণাধার মনে করি না, বলিও না। কিন্তু তাহাদের বেকার অবস্থার সব দোষটা তাহাদের ঘাড়ে চাপান অন্যায় মনে করি।

আর, তাহাদের যে শিক্ষার অভাব বলা হইয়াছে, সে দোষটা কাহার ? পণ্যশিল্প ও বাণিজ্য শিখাইবার প্রতিষ্ঠান এদেশে খুব কম এবং অল্পসংখ্যক এইরূপ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা পাইয়া যাহারা বাহির হয়, তাহাদের কার্য্যক্ষেত্রও অতি সঙ্কীর্ণ। শিক্ষার ব্যবস্থা প্রধানতঃ গবন্মেণ্টেরই করা উচিত এবং কার্য্যক্ষেত্রের ব্যবস্থাও গবন্মেণ্টের করা উচিত—যেমন জাপানের গবন্মেণ্ট জাপানীদের জন্য করিয়াছে। বঙ্গে সরকারী শিল্প-বিভাগ ছাতা, সাবান, ছুরী, কাঁচী প্রভৃতি তৈরি করিবার শিক্ষা কতকগুলি লোককে দিয়াছেন স্বীকার করি; কিন্তু এইরূপ অল্পসংখ্যক ও ছোট ছোট পণ্যশিল্পের দ্বারা বেকার-সমস্যার সমাধান বহু পরিমাণে হইতে পারে মনে করি না।

—

বিদ্যালয়ে সৈনিক আড্ডা

সন্ত্রাসনবাদ দমনের জন্য বঙ্গের অনেক জায়গায় স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাবে সৈনিক রাখা হইয়াছে। যেখানে স্থায়ী ভাবে তাহাদিগকে রাখা হয়, তথায় তাহাদের জন্য বাড়ি নির্ম্মিত হয়। কিন্তু যখন তাহারা সফরে বাহির হয়, তখন অনেক স্থলে তাহাদিগকে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে রাখা হয়। ইহাতে শিক্ষার ব্যাঘাত জন্মে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গবন্মেণ্টের কাছে এই অভিযোগ করেন। উত্তরে শিক্ষা-বিভাগ লিখিয়াছেন, বিশেষ বিবেচনা করিয়া সৈন্যদের বাসস্থান নির্দ্ধারিত হয়, এবং সৈন্যেরা বাস করায় কোন বিদ্যালয়ের কোন অসুবিধা হইয়াছে, গবন্মেণ্টের নিকট এরূপ কোন অভিযোগ কেহ করে নাই।

এক আধ দিন কোন ইস্কুলে সৈন্যেরা থাকিলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। কিন্তু দীর্ঘতর কাল থাকিলে শিক্ষার ব্যাঘাত নিশ্চয়ই হয়। অসুবিধা হইলেও কোন্ গ্রাম্য বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের বুকের পাটা এমন, যে, গবন্মেণ্টের কাছে তজ্জন্য অভিযোগ করিবেন ? কাহারও তাহা করিবার দুঃসাহস হইলে, যদি বিপ্লববাদের সহিত সহানুভূতির সন্দেহে তাঁহার পিছনে পুলিস না লাগে, তাহা তাঁহার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। অতএব কেহ অসুবিধার অভিযোগ না-করা হইতে ইহা প্রমাণ হয় না, যে, অসুবিধা হয় নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষা-বিভাগকে উত্তর দিয়াছেন, বিদ্যালয়ে সৈন্যদের বাসস্থান নির্দ্ধারিত হওয়ায় যে বিদ্যালয়ের অসুবিধা হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী ভাগ্যকুল ও সাভারের বিদ্যালয়ে সৈন্যদের আড্ডা স্থাপিত হওয়ায় উহা বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল; সুতরাং স্কুলগৃহে সৈন্যদিগকে থাকিতে দেওয়া উচিত নয়।

শিক্ষা-বিভাগ কি মনে করেন, বিদ্যালয়েই সন্ত্রাসনবাদ-রোগের উৎপত্তি হয়, অতএব তাহার ঔষধরূপী সৈন্যগণের আড্ডাও সেইখানেই হওয়া উচিত ? ভ্রমণকারী সৈন্যদের সঙ্গে তাঁবু দিলেই ভাল হয়।

—

ম্যাট্রিকুলেশ্যনের পাঠ্যপুস্তক

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ইংরেজী ছাড়া অন্য সব বিষয়ের পরীক্ষা ও অধ্যাপনা দেশী ভাষায় হইবে। এই জন্য পাঠ্যপুস্তকও দেশী ভাষায় রচিত হওয়া চাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, এইরূপ সব পুস্তক রচনা করিয়া ও ছাপাইয়া নির্ব্বাচনের নিমিত্ত আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে পাঠাইতে হইবে। পুস্তকপ্রকাশক সমিতি তাহাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়কে জানান, যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে ভাল বহি লিখিয়া ও ছাপাইয়া পাঠান অসম্ভব বা দুঃসাধ্য। বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্বিবেচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে বহি পাঠাইলেই চলিবে, কেবল গণিত ও প্রাথমিক বিজ্ঞানের বহি আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে পাঠাইতে হইবে। ইহা ঠিক হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বলিতে চাই, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বিষয়ক প্রবন্ধটি গ্রন্থকারদের কাজে লাগিতে পারে।

শুনিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয় কেবল বীজগণিতের বহি নিজেদের একচেটিয়া করিতে চান। কোন কিছু একচেটিয়া করিলে অন্য যোগ্য গ্রন্থকারদিগকে নিরুৎসাহ করা হয় এবং প্রতিযোগিতার অভাবে পুস্তকের ক্রমিক উৎকর্ষসাধনে বাধা পড়ে। অন্য দিকে, ইহাও বিবেচ্য, যে, গবন্মেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে যথেষ্ট অর্থসাহায্য না করায় বিশ্ববিদ্যালয়কে আয়ের অন্য নানা উপায় চিন্তা করিতে হয়।

আমাদের এই একটা মধ্য পন্থা মনে আসিয়াছে, যে, বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক লিখাইবার অবিরাম চেষ্টা করিতে থাকিলে, প্রতিযোগিতা বন্ধ হইবে না, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরই কাটতি সকলের চেয়ে বেশী হইতে পারিবে।

—

ত্রিবাঙ্কুড়ের শাসনবিবরণ

ত্রিবাঙ্কুড়ের ১৯৩৪-৩৫ সালের শাসনবিবরণে ঈর্ষ্যা ও আহ্লাদের সহিত দেখিতেছি, এই রাজ্যে রাজস্বের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অংশ, শতকরা ২৩·২ অংশ, শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়। কোন্ রাষ্ট্রীয় বিভাগে কত অংশ খরচ হয়, তাহা নীচের তালিকায় দ্রষ্টব্য।

শিক্ষা	২৩·২	পূর্ত্ত আদি	১৭·৩
"ধর্ম্মমন্দির"	৮·৬	পেন্সান	৭·৭
বিচার বিভাগ	৬·০	চিকিৎসা আদি	৫·৭
"সব্‌সিডি"	৪·০	পুলিস	৩·৫
সাধারণ শাসনবিভাগ	২·৬	বিবিধ	১৮·৪
সৈন্যদল	৩·০		

ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যে মাতার দিক্ দিয়া উত্তরাধিকার প্রচলিত, অর্থাৎ মহারাজার পুত্র মহারাজা হন না, ভাগিনেয় হন। নারীরা এদেশে স্বাধীন। এখানে শিক্ষার বিস্তার যে খুব বেশী হইয়াছে তাহার একটি কারণ এই স্ত্রীস্বাধীনতা।

কয়লা ব্যবসার দুরবস্থা

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশুনের সভাপতি, তিনি তাঁহার গত বার্ষিক অভিভাষণে কয়লা ব্যবসার দুরবস্থা বর্ণনা করেন ও তাহার কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করেন।

রেলওয়ে বোর্ড কয়লার সকলের চেয়ে বড় খরিদদার। কিন্তু এই বোর্ড তাঁহাদের নিজের খনিগুলি হইতে খুব বেশী কয়লা উত্তোলন করায় কয়লাখনির অন্য মালিকদের কয়লা যথেষ্ট বিক্রী হয় না, তাঁহারা লোকসান দিয়া কিছু কয়লা তুলিয়া কোন প্রকারে টিকিয়া আছেন। তা ছাড়া, কয়লার বদলে খনিজ তেলের ব্যবসায় বাড়িয়া চলিতেছে। ১৯১৩ হইতে ১৯৩৪ সালে তেলের ব্যবহার ১৫ গুণ বাড়িয়াছে। ১৯৩৪-৩৫ সালে রেলওয়ে বোর্ড ৯২ হাজার টন কয়লার পরিবর্ত্তে ৫১ হাজার টন তেল কিনিয়াছিলেন।

অল্প মাশুলে তেল আমদানী হওয়ায় বোম্বাইয়ের অনেক মিল দেশী কয়লা ব্যবহার না করিয়া বিদেশী তেল ব্যবহার করিতেছেন। তা ছাড়া, গবন্মেণ্ট বিদেশী কয়লার উপর যথোচিত আমদানী-শুল্ক ধার্য্য না করায় বিদেশী কয়লার আমদানী বাড়িতেছে ও জাপান ও দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা বাজার দখল করিতেছে।

ভারত-গবন্মেণ্ট যদি "জাতীয়" গবন্মেণ্টের মত নিজ কর্ত্তব্য করেন এবং দেশী মিলগুলি যে কারণ দেখাইয়া ভারতীয়দিগকে সস্তা বিদেশী মালের পরিবর্ত্তে বেশী দামের দেশী মাল কিনিতে বলেন, সেই কারণে যদি বিদেশী কয়লা ও তেলের পরিবর্ত্তে দাম বেশী হওয়া সত্ত্বেও দেশী কয়লা ব্যবহার করেন, তাহা হইলে কিছু প্রতিকার হইতে পারে।

বাণিজ্যিক মিউজিয়ামে নমুনা প্রদর্শনী

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর একটি বাণিজ্যিক মিউজিয়াম আছে। তাহা কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে অবস্থিত। সেখানে গত ২৬শে বৈশাখ নানাবিধ পণ্যশিল্পের নমুনার একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। তদুপলক্ষে যে সভা হয়, তাহার সভাপতিরূপে ডাক্তার সর্ নীলরতন সরকার প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন। তিনি বলেন :—

বাঙ্গলার জাতীয় শিল্পসমূহ আজ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ প্রদর্শনীর যে বিশেষ প্রয়োজন ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অবশ্য, বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির যে এইরূপ প্রদর্শনী হইতে খুব বেশী কিছু শিখিবার আছে বা থাকিতে পারে, তাহা বলা যায় না। কারণ, বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অনেক সমস্যা আছে। সেগুলি সম্বন্ধে এইরূপ প্রদর্শনী বিশেষ কিছুই সাহায্য করিতে পারে না। কিন্তু এই প্রদর্শনী হইতে কুটীর-শিল্পগুলির অনেক জানিবার এবং শিক্ষা করিবার আছে।

বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া তোলা আমাদের একান্ত প্রয়োজন এবং কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই সঙ্গে যাহাতে কুটীর-শিল্পের কোন ক্ষতি না হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখাও আমাদের একান্ত দরকার। এক দিকে যেমন আমরা বৃহৎ বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিব, অন্য দিকে আমরা কুটীরশিল্পের যাহাতে ক্ষতি না হয়, উহার যাহাতে উন্নতি হয়, তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখিব। তাহা না হইলে যত চেষ্টাই করি না কেন, বেকার সমস্যা আমরা কিছুতেই সমাধান করিতে পারিব না।

প্রদর্শনীটিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে গেঞ্জী ও মোজা, জুতা নির্ম্মাণ প্রণালী, চামড়া প্রস্তুত করিবার প্রণালী, ছাতা প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রভৃতি দেখান হয়। তদ্ভিন্ন বহুবিধ ঔষধ, চিকিৎসায় ব্যবহৃত নানা যন্ত্র, মিষ্টান্ন, টুপি, তালাচাবী, খাগড়াই বাসন, বাইসিকলের টায়ার, প্রভৃতির নমুনা দেখান হয়।

ময়ূরভঞ্জরাজ এবং মহীশূররাজ বস্ত্র এবং মোজা ও গেঞ্জীর নমুনা পাঠাইয়াছিলেন। বাংলা-গবন্মেণ্টের শিল্প-বিভাগ হইতে কোন কোন কুটীরশিল্পের প্রক্রিয়া দেখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর প্রচার-বিভাগ হইতে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের জনসংখ্যা, মৃত্যুহার, বাংলার স্বাস্থ্য, বাংলার নানা কুটীরশিল্পের সংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক চার্ট প্রদর্শনীতে রাখা হইয়াছে। যে-সকল কারখানা নিজ নিজ উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের নমুনা প্রদর্শনীতে রাখিয়াছেন, তাঁহাদের কতকগুলির নাম নীচে দেওয়া গেল।

ক্যালকাটা হোসিয়ারী, দি ক্যালকাটা সেলুলয়েড ওয়ার্কস্, বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস্, যশোহর কুম্বস এণ্ড সেলুলয়েড ওয়ার্কস্, সরোজ-নলিনী নারীশিল্প শিক্ষালয়, নারীকল্যাণ আশ্রম, বড়ুয়া বেকারী, ভারতী ওয়ার্কস, ইণ্ডিয়ান ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ, বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং, বেঙ্গল কেমিকাল ওয়ার্কস্ লিঃ, বেলেঘাটা ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্।

স্বর্গীয়া মনোরমা মজুমদার

ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব প্রধান আচার্য্য, ভক্ত প্রেমিক সাধক, জনসেবক গিরীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের যোগ্যা সহধর্ম্মিণী মনোরমা দেবী গত ১২ই বৈশাখ, শনিবার, ৮৬ বৎসর বয়সে কলিকাতা বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটস্থ ৪০ নম্বর বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই পুণ্যশীলা রমণীর পরলোকগমনে ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারযুগের জ্ঞানী, ভক্ত, কর্ম্মী, ত্যাগী প্রথম-প্রদর্শকদিগের এক জন প্রধানার তিরোধান হইল। বাংলার তথা ভারতের অভিনব যুগ-সন্ধিকালে যে-সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তি আত্মোৎসর্গের চরম পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মনোরমা দেবী এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

স্বীয় অধ্যবসায় ও একাগ্রতা বলে স্বামীসকাশে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিকা নিযুক্ত হন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে প্রকাশ্যে সর্ব্বসমক্ষে আচার্য্যাণীর কার্য্য যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করেন। আধুনিক সময়ে ইহার পূর্ব্বে কোন মহিলা তাহা করিয়াছেন বলিয়া আমি অবগত নহি।

ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে তিনি যখন খ্যাতিলাভ করেন, ঢাকা ঈডেন্ ফিমেল্ স্কুলে দ্বিতীয়া শিক্ষয়িত্রীর পদ সরকার তখন তাঁহাকে প্রদান করেন। মনোরম দেবীই প্রথম দেশীয় মহিলা শিক্ষয়িত্রী। তাঁহার অসাধারণ শিক্ষানৈপুণ্য ছিল।

১৮৮৮ সালে ডাক্তার (সর্) নীলরতন সরকারের সহিত প্রথমা কন্যার বিবাহে এবং বাবু সুরেশচন্দ্র সরকারের সহিত দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহে ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে তিনিই পৌরোহিত্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন মহিলা ধর্ম্মযাজকের আসন গ্রহণ করেন নাই। ১২০৭ সনে শিক্ষাকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কলিকাতায় আসেন এবং এখানে তাঁহার নীরব শান্ত জীবনে আধ্যাত্মিকতার ভিতর দিয়া ক্ষুদ্র হইতে ভূমার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। ১৯১৩ সনে জীবনের উজ্জ্বলতম আদর্শ দেবোপম স্বামীকে হারাইয়া এবং ১৯২৮ সনে অতি স্নেহের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিদায় দিয়া তিনি গৃহাভ্যন্তরে নীরবে তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিয়া আজ দিব্যালোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। ভ. ম.

—

"পত্রপুট"

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জীবনের ৭৫ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এই উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে, কলিকাতার কয়েক জায়গায় এবং অন্য অনেক স্থানে তাঁহার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার কৈশোর হইতে বঙ্গদেশকে ও পৃথিবীকে নানা উপহার দিয়া আসিতেছেন। গত ২৫শে বৈশাখের জন্মদিনেও কাব্যানুরাগীরা তাঁহার নিকট হইতে একটি উপহার পাইয়াছেন। তাহা "পত্রপুট"। এই গ্রন্থখানির ষোলটি কবিতা গদ্যে লিখিত, কেবল তাঁহার দৌহিত্রীর শুভপরিণয় উপলক্ষে লিখিত আশীর্ব্বাদটি পদ্যে লিখিত। এই ষোলটি কবিতার মধ্যে ১৪ সংখ্যক যেটি, তাহার রচনার দিন গত ১৯শে বৈশাখ। ষোলটির মধ্যে ইহাই সর্ব্বশেষে লিখিত। গ্রন্থখানির পরিচয় পরে দেওয়া হইবে।

—

"অন্নসমস্যায় বাঙালীর পরাজয় ও তাহার প্রতীকার"

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রণীত এই নূতন বহিখানি আমরা গত ২৮শে বৈশাখ পাইয়াছি। ইহার পরিচয় অবশ্য পরে দেওয়া হইবে। কিন্তু ইহা এত দরকারী বহি, যে, ইহার প্রকাশের সংবাদ অবিলম্বে লিখনপঠনক্ষম অন্ততঃ সব বেকার বাঙালীর পাওয়া আবশ্যক বোধে প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যাতেই দিলাম।

পরাজয়ের বৃত্তান্ত পড়িলে মনটা দমিয়া যায়, কিন্তু আচার্য্য মহাশয় প্রতিকারের পথও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং বহিখানি পড়িয়া ভগ্নোদ্যম হইবার কোন কারণ নাই।

—

জাতীয় ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি ভারতীয়দের অনুরাগ

ইউরোপের সকল দেশের লোকেরা স্বাধীনতাপ্রিয়। তাহারা অনেক বার নিজেদের দেশের ও জাতির স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব ও প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে ইটালী ও জার্মেনীতে যে তথাকার লোকেরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারাইয়া মুসোলিনী ও হিটলারের দাস হইয়া আছে, তাহাও অনেকটা তাহাদের জাতি ও দেশ মুসোলিনী ও হিটলারের নেতৃত্বে শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও গৌরবান্বিত হইবে, এই মোহজাত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া।

ইউরোপের লোকেরা নিজেদের বেলায় স্বাধীনতাপ্রিয়, স্বাধীনতার মূল্য বুঝে, কিন্তু ইউরোপের বাহিরের লোকদের স্বাধীনতাও যে তাহাদের কাছে তেমনই প্রিয়, ইউরোপের লোকেরা ইহা ভাবিয়া দেখে না, কল্পনা করে না, বিশ্বাস করে না। বিশেষতঃ ইউরোপের বাহিরের যে-যে দেশ কোন ইউরোপীয় জাতির অধীন, তাহাদের স্বাধীনতাও যে মূল্যবান

ও তাহাদের প্রিয় বস্তু, সেই ইউরোপীয় জাতি তাহা ভাবিয়া দেখে না, কল্পনা করে না, বিশ্বাস করে না। যেমন ইংরেজরা নিজেদের স্বাধীনতা খুব ভালবাসে, কিন্তু ভারতীয়দের স্বাধীনতা যে তাহাদের প্রাণের জিনিষ হইতে পারে, ইহা তাহাদের মনে স্থান পায় না। অশ্বেত জাতি যে কিরূপ স্বাধীনতাপ্রিয় হইতে পারে, হাবসীরা সাত মাস ধরিয়া অনতিক্রান্ত শৌর্য্যের সহিত অসম যুদ্ধ করিয়া তাহা প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু, ভারতীয়েরা এখন যেমন দীর্ঘকাল ইংরেজদের অধীন থাকায় ইংরেজরা মনে করে, অধীন থাকাটাই আমাদের প্রকৃতিগত, তেমনই হাবসীদিগকে যদি ইটালীয়ানরা দীর্ঘকাল অধীন রাখিতে পারে, তাহা হইলে তখন ইটালীয়ানরা দৃঢ় বিশ্বাস করিবে, যে, হাবসীরা স্বাধীনতাপ্রিয় নহে ও কোন কালে স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল না।

ভারতীয়েরা দীর্ঘকাল অধীন আছে বটে; কিন্তু তাহাতেও যে তাহাদের মনুষ্যপ্রকৃতিগত স্বাধীনতাপ্রিয়তা লুপ্ত হয় নাই, তাহা গত মাসে সর্ব্বপ্রদেশের নানা স্থানে অনুষ্ঠিত দুটি অনুষ্ঠান হইতে বুঝা যায়। সুভাষচন্দ্র বসুকে গবর্মেণ্ট প্রকাশ্য আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া বন্দী করায় যে বহু স্থানে প্রতিবাদ-সভা হইয়া গিয়াছে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যে ভারতীয়দের প্রিয়, তাহা তাহারই স্মারক। আর আবিসীনিয়ার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশার্থ যে বহুসংখ্যক সভা হইয়া গিয়াছে, তাহা প্রমাণ করে, যে, ভারতীয়েরা অন্ততঃ কিছু বুঝে পরাধীনতা কত বড় দুর্ভাগ্য।

—

বিলাতে রাষ্ট্রীয় গুপ্ত কথা প্রকাশ

এবারকার বিলাতী বজেটে যে ইনকম্ ট্যাক্স ও চায়ের উপর ট্যাক্স বাড়িবে, তাহা বজেট বাহির হইবার আগেই বাহির হইয়া পড়ায় তদন্ত হইতেছে। ভারতে এরূপ কিছু হইলে, ভারতীয়েরা যে কিরূপ বিশ্বাসের অযোগ্য, তাহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সমস্ত পৃথিবীতে রটাইয়া দিত। ভারতবর্ষের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব রাজস্বসচিব সর্ গাই ফ্লীটউড উইলসন অবসরগ্রহণের প্রাক্কালে ১৯১৩ সালে এক বক্তৃতায় বলেন, যে, তাঁহার একটি বজেটের একটি ট্যাক্সবৃদ্ধির সংবাদ প্রকাশ করিয়া দিলে প্রকাশকারী লক্ষ লক্ষ টাকা পাইতে পারিত, কিন্তু মোটা ও সামান্য বেতনের যে-সব ভারতীয় কর্ম্মচারী এই গোপনীয় সংবাদ জানিত, তাহারা কেহই উহা প্রকাশ করে নাই।

—

"হংস"

"হংস" নামক একটি হিন্দী সাময়িক পত্র আছে। তাহাতে ভারতীয় নানা ভাষার রচনা হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া ছাপা হয়। কিন্তু বাংলার অনুবাদ বড়-একটা দেখিতে পাই না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কি ভারতীয় সকল ভাষা ও সাহিত্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট বিবেচিত হইয়াছে?

—

কলিকাতা সাহিত্য-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ

কলিকাতা সাহিত্য-সম্মেলনের মূল সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিভাষণের একটি সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য দেখিয়াছি। তাহাতে তিনি বাংলা আধুনিক সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীদিগের সম্বন্ধে বলেন:—

> এ সাহিত্যের মধ্যে কোনও সত্য নাই, উহা কেবল পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণ। মহাযুদ্ধের পরে পাশ্চাত্য দেশে যে সাহিত্য সামাজিক, পারিবারিক ও যৌন সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া লিখিত, তাহা কেবল নগ্নরূপে যৌনতত্ত্বের নির্লজ্জ আলোচনা। এ-দেশের সাহিত্যিকগণ তাহার অনুকরণ করিতেছেন ও তরলমতি বালকবালিকাদের হাতে তাহা তুলিয়া দিতেছেন। এরূপে সাহিত্য নষ্ট হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও সর্ব্বনাশ হইবে।

—

"মুজাফ্ফর আহমদ" বাজেয়াপ্ত

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "মুজাফ্ফর আহমদ" নামক পুস্তিকা গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। তাহা হইলে এমন অ-রাজভক্ত মুসলমানও আছেন, যাঁহার বিষয়ে লিখিত বহি বাজেয়াপ্ত হয়!

—

বাঙালীর তৈরি নূতন তাঁত

কুমিল্লার শ্রীযুক্ত নিখিলবন্ধু ভট্টাচার্য্য এরূপ একটি তাঁত উদ্ভাবন ও প্রস্তুত করিয়াছেন যাহাতে একই সময়ে একাধিক বস্ত্র বয়ন করা যায়।

—

বিহারের স্বাস্থ্য

এমন এক সময় ছিল যখন বাংলা দেশের লোকেরা বিহার এবং আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশকে সাতিশয় স্বাস্থ্যকর বলিয়া জানিত, এবং তাহারা ছিলও খুব স্বাস্থ্যকর। কিন্তু ১৯৩৪-৩৫ সালের বিহারের স্বাস্থ্য-রিপোর্টে দেখা যায়, ঐ প্রদেশের স্বাস্থ্যের অবনতি হইতেছে। কেন এরূপ হইতেছে ?

—

বাংলা-গবর্মেণ্টের শিক্ষাব্যয়

আমরা আগে ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যের সরকারী শিক্ষাব্যয় যে তাহার অন্য সব সরকারী বিভাগের ব্যয় অপেক্ষা অধিক, তাহা দেখাইয়াছি। বাংলা-গবর্মেণ্ট ত্রিবাঙ্কুড়ের অনুপাতে শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলে বার্ষিক প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় করা তাহার উচিত ; কিন্তু এ বৎসর বঙ্গের শিক্ষাব্যয় ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা মাত্র।

—

বঙ্গে কয়লার ব্যবসায়ের উন্নতির উপায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়নের অধ্যাপক ডক্টর হেমেন্দ্রকুমার সেন কয়লা সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে,

> জাতির আর্থিক উন্নতিকল্পে কয়লা ব্যবসায়ে আমাদের অধিকতর মনোযোগ প্রদান ও সুব্যবস্থা আবশ্যক। কয়লা ব্যবসায়ে দুটি বিষয়ে মন দিতে হইবে। প্রথমতঃ খনি হইতে খনন ও উত্তোলন-কার্য্যে কয়লার অপচয় নিবারণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কয়লা হইতে জাত যাবতীয় শিল্পদ্রব্যের উন্নতি ও প্রচলন করিতে হইবে। ভারতে প্রতিবৎসর ২ কোটি ২০ লক্ষ টন কয়লা খনি হইতে তোলা হয়। উক্ত ব্যবসায়ে প্রায় ৫০ কোটি টাকা মূলধন খাটে এবং দুই লক্ষের উপর লোক খাটে। কয়লা হইতে আলকাতরা, নানাবিধ তৈল, বাষ্পীয় পদার্থ, নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়। সামান্য আলকাতরা হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপন্ন দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ভারতে আমদানী হইয়া থাকে। মূলধন খাটাইয়া উক্ত দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিলে প্রচুর লাভ হইবে।

—

চিটাগুড়ের ব্যবহার

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর নীলরতন ধর গবেষণার দ্বারা দেখাইয়াছেন, চিটাগুড় প্রয়োগে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। কলিকাতা সাহিত্য-সম্মেলনের গত অধিবেশনে

> যাদবপুর টেকনিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ বাণেশ্বর দাস রাস্তা তৈয়ার করিতে চিটাগুড়ের ব্যবহারে কিরূপ টেকসই রাস্তা প্রস্তুত করা যায় তাহা বলেন। ২৪-পরগণার কয়েকটি রাস্তায় চিটাগুড় ব্যবহার করিয়া কনক্রীট ও অন্যরূপে প্রস্তুত রাস্তার সহিত তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে, যে, চিটাগুড় দ্বারা প্রস্তুত রাস্তা অধিক টেকসই।

—

কলিকাতা সাহিত্য-সম্মেলনে শিশুসাহিত্য

কলিকাতা সাহিত্য-সম্মেলনে, শিশুসাহিত্য শাখার অধিবেশনে শ্রীমতী ঊষা বিশ্বাস, এম-এ, বি-টি, সভানেত্রী হন। ইহাতে প্রায় দুই শত বিশিষ্ট লোক যোগ দেন। তাঁহার অভিভাষণ উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। শ্রীমতী শোভনা নন্দী শিশু-সাহিত্য, শ্রীমতী বীণা সেন শিশুসাহিত্যের ধারা, শ্রীমতী সরলাবালা সরকার শিশুসাহিত্য ও শিশুর শিক্ষা বিষয়ে ও অপর কয়েক জন অন্যান্য প্রবন্ধ পাঠ করেন।

—

ভারতে যথেষ্টসংখ্যক নার্সের অভাব

যাহাতে শিক্ষিতা মহিলারা নার্সের অর্থাৎ শুশ্রূষাকারিণীর কার্য্য গ্রহণ করেন, তদ্বিষয়ে আলোচনার জন্য কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মেডিকেল কলেজ গৃহে মহিলাদের এক সম্মেলন হয়। উক্ত সভায় শ্রীমতী সরস্বতী দেবী তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, যে, ভারতে কোটি কোটি নারীর মধ্যে ২৫০০ শিক্ষিতা নার্স পাওয়া যায় না। নার্সের কার্য্য সেবাপরায়ণা নারীপ্রকৃতির উপযোগী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতে নার্সের কার্য্য শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হয় না। তিনি মনে করেন, যে, আহার, বাসস্থান ও জীবনের অন্যবিধ সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সুব্যবস্থা করিলে অনেক শিক্ষিতা মহিলা স্বেচ্ছায় নার্সের কার্য্য গ্রহণ করিবেন।

—

টৌকিয়োতে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হাঙ্গেরী দেশের একটি মহিলা ও তাঁহার কন্যা শান্তিনিকেতনে ছিলেন। মাতার নাম সাস্

হাঙ্গেরীয় শিল্পী শ্রীমতী এলিজাবেথ ব্রানার ও তৎকৃত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি

ব্রানার, কন্যার নাম এলিজাবেথ ব্রানার। তাঁহাদের পরিচ্ছদ অত্যন্ত সাদাসিধা ছিল। মাতা ও কন্যা জুতা পরিতেন না, সর্ব্বদা খালিপায়ে চলাফেরা করিতেন। তাঁহাদের আর এক বিশেষত্ব এই ছিল, যে, তাঁহারা কোন জিনিস রাঁধিয়া খাইতেন না। কন্যাটি রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার একটি ছবি আঁকিয়াছিলেন। অন্য অনেক ছবিও আঁকিয়াছিলেন। এই ছবি তাঁহারা কবির জন্মদিন উপলক্ষ্যে টোকিয়োতে দেখাইতেছেন।

তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের তৈলচিত্রটির এই ফোটোগ্রাফ টোকিয়ো হইতে এয়ার মেলে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তৈলচিত্রটির পার্শ্বে চিত্রশিল্পী শ্রীমতী এলিজাবেথ ব্রানার দণ্ডায়মানা।

—

লণ্ডনে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী

লণ্ডনে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে সর্ ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড সভাপতির কাজ করেন। ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড এবং মিঃ সী এফ্ এণ্ড্রুজ নিজ নিজ বক্তব্য লিখিয়া পাঠান। সভাপতি বলেন, যে, 'যত ধর্ম্মবিশ্বাস তত পথ,' ('As Many Faiths, So Many Paths') রামকৃষ্ণের এই বাণী প্রাচী হইতে গত শতাব্দীতে প্রাপ্ত সমুদয় বাণীর মধ্যে মহত্তম। সভা শেষ করিবার সময় তিনি বলেন, প্রতীচী এখন প্রাচী হইতে আধ্যাত্মিক বাণী গ্রহণ করিতে প্রস্তুত—বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী, যিনি ভারতবর্ষের বর্ত্তমান যুগের মহত্তম আধ্যাত্মিক প্রতিভাশালী ব্যক্তি এবং সর্ব্ব যুগের অন্যতম মহাপুরুষ।

—

ভারতবর্ষের খাদ্য ও আহারের সময়

ভারতবর্ষে বহুকোটি লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, যাহারা পায় তাহারাও পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে পায় না। এ অবস্থার প্রতিকার বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমরা এখন সে কথা বলিতেছি না। অন্য একটি বিষয়ে কিছু লিখিব।

ইউরোপে যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, খাদ্য সম্বন্ধীয় দুটি বিষয়ে ঐ মহাদেশের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সর্ব্বত্র মোটামুটি মিল আছে। একটি হইতেছে খাইবার সময়। প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও রাত্রে খাইবার সময় মোটামুটি সর্ব্বত্র এক, এবং লোকেরাও সেই সময় মানিয়া চলে। ইহাতে, যাহারা খাইতে দেয় ও যাহারা খায়, উভয় পক্ষেরই সুবিধা, কোন পক্ষেরই অসুবিধা ও স্বাস্থ্যহানি হয় না; এবং ভ্রমণকারীদেরও, প্রত্যেক দেশের আলাদা আলাদা নিয়ম থাকিলে যে অসুবিধা ও দৈহিক ক্ষতি হইত, তাহা হয় না। আমাদের দেশে সমগ্র ভারতবর্ষে খাইবার সময় ঠিক্ এক হওয়া দূরে থাকুক, এক-একটা অংশেই —যেমন বঙ্গে—সর্ব্বত্র এক নহে, এমন কি এক পরিবারেরই সব লোকেরা এক সময়ে খান না।

ভোজন সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় বিষয়টি ভোজ্যসামগ্রী-সম্পর্কীয়। ইউরোপের প্রত্যেক দেশেরই অবশ্য নিজস্ব কিছু মিষ্টান্ন, তরি-তরকারী ও রন্ধন-রীতি আছে। কিন্তু মোটের উপর সর্ব্বত্র প্রধান খাদ্যগুলি এক। আমাদের দেশে যেমন কলিকাতার লোকেরা মান্দ্রাজী রান্নার ঝাল সহ্য করিতে পারেন না, মান্দ্রাজীরা ও পূর্ব্ববঙ্গীয়েরা কলিকাতার আশ-পাশের রান্নাকে 'পান্‌সে' ভাবেন, ইত্যাদি, এবং তজ্জন্য এক অঞ্চলের লোকেরা অন্যত্র গেলে নানা অসুবিধায় পড়েন, ইউরোপে তাহা ঘটে না।

আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ছাত্রদের একটি কন্‌ফারেন্সের সভাপতি হইয়া যখন বিশাখপত্তন (ভিজাগাপাটাম) গিয়া-

ছিলাম, তখন তথাকার অন্ধ্র-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার রামমূর্ত্তির সহিত এ বিষয়ে কিছু কথা হয়। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের একটি ষ্টাণ্ডার্ড ডায়েট্, অর্থাৎ একটি সর্ব্বত্রপ্রচলনীয় আদর্শ পুষ্টিকর ভোজ্যাবলী, নির্দ্দিষ্ট ও প্রস্তুত হওয়া উচিত। আমাদের বোধ হয়, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ, সুপাচক-সুপাচিকা এবং হোটেলওয়ালা সকলে পরামর্শ করিয়া এরূপ একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহা সর্ব্বত্র প্রচার ও ব্যবহারের চেষ্টা করিলে সুফল ফলিতে পারে।

—

সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড

সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড

নব-মনোবিদ্যার প্রবর্ত্তক সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েডের অশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে সর্ব্ব দেশের বিদ্বজ্জনসমাজ তাঁহার প্রতি আজ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে। প্রাচীন মনোবিদ্যার কারবার ছিল সংজ্ঞান অর্থাৎ সচেতন মন লইয়া। ভিয়েনার ডাক্তার ফ্রয়েড হিষ্টীরিয়া রোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়া দেখিলেন, নিজেরই অগোচরে মানুষের মনে অনেক অজ্ঞাত ইচ্ছা লুকাইয়া থাকে। ইহাই হইল তাঁহার গবেষণার সূত্রপাত। তখন তাঁহার প্রথম যৌবন, চিকিৎসা-ব্যবসায় সবে সুরু করিয়াছেন বলিলেই হয়। তার পর বহু বৎসর ধরিয়া বহু অনুসন্ধান চলিল।

বহু মন পরীক্ষার পর ফ্রয়েড সিদ্ধান্ত করিলেন, মনের সবটা সংবিৎ বা সংজ্ঞান নহে, অজ্ঞাত মনই মানুষকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নির্জ্ঞান-তত্ত্বের উপর নব-মনোবিদ্যার প্রতিষ্ঠা। নির্জ্ঞান-তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া ফ্রয়েড মানবের চিন্তাধারাকে নূতন পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

—

বলি দ্বীপের ছবি

বলি দ্বীপের দুটি ছবির মধ্যে উপরেরটি এক জন হংস-চারকের চিত্র।

বিদেশ

মিশর

মিশরের রাজা ফুয়াদ সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র ফারুখের বয়স মাত্র ১৬ বৎসর ৩ মাস। সুতরাং একুশ মাস মিশর এক অভিভাবকমণ্ডলীদ্বারা শাসিত হইবে। বিধানানুযায়ী রাজা ফুয়াদ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে এই অভিভাবকমণ্ডলী মনোনীত করিয়াছিলেন। পার্লেমেণ্টে, নূতন নির্ব্বাচনের ফলে ওয়াফ্‌দ ন্যাশন্যালিষ্ট বা জাতীয়তাবাদী দল শতকরা ৮০টি আসন অধিকার করিয়াছে। এই নবগঠিত পার্লেমেণ্ট পরলোকগত রাজার মনোনয়ন অনুমোদন করেন নাই, তাঁহারা নূতন মণ্ডলী নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। ইহার পরই প্রধান মন্ত্রী আলি মেহের পাশা পদত্যাগ করিয়াছেন ও সংখ্যাগরিষ্ঠ ওয়াফ্‌দ দলের নেতা নাহাস্ পাশা নূতন মন্ত্রীদল গঠন করিয়াছেন। মিশর সমস্যা পুনরায় সঙ্গীন হইয়া উঠিল বলিতে হইবে।

কাগজপত্রে স্বাধীন দেশ বলিয়া বর্ণিত হইলেও প্রকৃত স্বাধীনতা মিশর উপভোগ করিতে পারিতেছে না। গত মহাযুদ্ধের আরম্ভকালে মিশর ছিল নামতঃ তুরস্কের সোলতানের অধীন, কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে তুরস্ক হাত দিত না, হয়ত দিবার ক্ষমতাও হারাইয়াছিল। ইংলণ্ডের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে মিশর শাসিত হইতেছিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অপরাপর ইউরোপীয় জাতির নিকট মিশরের ঋণ শোধের ব্যবস্থা করিতে ইংলণ্ড প্রথম মিশরের শাসন-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ পায়। ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডই মিশরের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পড়ে। যুদ্ধের প্রারম্ভে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড খেদিব আব্বাস হিল্‌মিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থলে হোসেন ইস্‌মাইলকে সোলতান ও মিশরকে ইংলণ্ডের আশ্রিত রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করেন। নবীন সোলতান হোসেন অতি অল্প কালই রাজমর্য্যাদা উপভোগ করেন। ১৯১৭ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর অনুজ আহ্মদ ফুয়াদ পাশা মিশরের সোলতান হইলেন।

সিংহাসনে বসিবার পূর্ব্বে মিশরের শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে ফুয়াদের

কার্য্যাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়, স্বাস্থ্য-যাদুঘর, ভৌগোলিক সমিতি ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা এবং ইংলণ্ডে মিশরীয় মহিলাদিগকে প্রেরণ করিয়া চিকিৎসা-বিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি মিশরে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন।

কিন্তু সিংহাসনে উপবেশন করিয়া সোলতান ফুয়াদ নিরুপদ্রবে রাজ্য শাসন করিতে পারেন নাই। দেশে একটি জাতীয়তাবাদী দলের উদ্ভব হইল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ জগলুল পাশার নেতৃত্বে তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হন। দেশে যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল তাহাতে নেতা জগলুল পাশা মাল্টাদ্বীপে বন্দীরূপে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু ইহাতে আন্দোলন থামিল না, বরং অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইল। তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইলে ১৯২১ সালে আন্দোলন প্রবলাকার ধারণ করিল।

পরলোকগত রাজা ফুয়াদ

তাহার ফলে মিশর স্বাধীন দেশ বলিয়া ঘোষিত হয় (১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ)। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ঘোষিত হয় যে অধিপতির উপাধি সোলতান না হইয়া ইংরেজী King হইবে এবং প্রাচীন ইসলামীয় প্রথা ত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎভাবে নিকটতম পুরুষের উত্তরাধিকারের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু ওয়াফ্‌দ-দল ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। কারণ ইংলণ্ড কয়েকটি অধিকার ত্যাগ করে নাই, যথা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গমনাগমনের পথ রক্ষা, বহিরাক্রমণ হইতে মিশরকে রক্ষা, মিশরে বৈদেশিকগণের রক্ষা ও সুদানের উপর কর্তৃত্ব। ওয়াফ্‌দ-দল দেশের স্বাধীনতার জন্য যে দাবি উপস্থিত করিয়াছিলেন এই ঘোষণায় তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেল। তখন তাঁহারা নূতন দাবি উপস্থিত করিলেন যে আধুনিক ইউরোপীয় দেশে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র প্রণালীতে দেশ শাসন করিতে হইবে। অর্থাৎ দেশে রাজা থাকিবেন সত্য কিন্তু ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ন্যায় গণ-প্রতিনিধি দ্বারা শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। ওয়াফ্‌দ-দলের বিশ্বাস যে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে ইংলণ্ডের প্রভাব হ্রাস পাইবে। রাজা ফুয়াদ তাঁহাদের দাবিতে সম্মত হইলেন না। যাহা হউক, রাজা এক কমিশন নিযুক্ত করিলেন ও তাহার সুপারিশমত পার্লেমেণ্ট-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল (১৯২৩)। প্রথম নির্ব্বাচনে ওয়াফ্‌দ-দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হইল। এই দলের বিশেষত্ব এই যে ধর্ম্ম বা বর্ণগত কোন বৈষম্যই ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধ জন্মাইতে পারে নাই। মুসলমান ও খ্রীষ্টান সকলেই মিশরের এই জাতীয় দাবিতে যোগ দিয়াছিল। কিন্তু এই পার্লেমেণ্টকে কোন কাজ করিতে দেওয়া হয় নাই। তাহার পর আরম্ভ হইল এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হয় ও ভাঙিয়া পড়ে, পার্লেমেণ্ট গঠিত হয় ও ভাঙিয়া দেওয়া হয়। এই অশান্তি ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় জগলুল পাশাকে পুনরায় বন্দী করিয়া দ্বীপান্তরে প্রেরণ করা হয়। কিছুকাল পরে মুক্তি পাইলে তিনি পুনরায় আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে যে মাসে যে নির্ব্বাচন হয় তাহাতে তাঁহার দলের প্রাধান্য ঘটে কিন্তু মন্ত্রীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার সুযোগ তাঁহাকে দেওয়া হইল না।

১৯২৭ সালে ওয়াফ্‌দ-নেতা জগলুল পাশা পরলোক গমন করেন। ঐ বৎসরই জুলাই মাসে রাজা ফুয়াদ ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডের সহিত মিশরের বন্ধুত্ব স্থাপিত হওয়ার কথা তখন উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছিল। ওয়াফ্‌দ-দলের নূতন নেতা নাহাস পাশা মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই (১৯২৮ সালের জুন মাসে) নাহাস পাশাকে পদচ্যুত করা হইল। তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে মিশরে যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করা ইংলণ্ডের প্রয়োজন হইয়াছিল। নূতন মন্ত্রী মহম্মদ পাশার পরামর্শে রাজা ফুয়াদ এক রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা পার্লেমেণ্ট ভাঙিয়া দিলেন ও মূল শাসনবিধি ও আইন সভা স্থগিত করিলেন। ইহার পর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ও মন্ত্রী ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডে তখন শ্রমিকদলের মন্ত্রী-সভা। এক ইংলণ্ড মিশর সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। ইহার প্রধান সর্ত্ত এই—কাইরো হইতে ইংলণ্ডের সৈন্য বাহিনী উঠাইয়া সুয়েজখালের নিকটে রাখা হইবে, বৈদেশিকগণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব ও অধিকার মিশরের উপর বর্ত্তিবে, ও জাতিসঙ্ঘে (লীগ-অব-নেশনস্) মিশরের যোগদান ইংলণ্ড সমর্থন করিবে ইত্যাদি। ইংলণ্ড দাবি করিল যে মিশরের সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমর্থিত মন্ত্রীমণ্ডলী দ্বারা এই সন্ধিপত্র অনুমোদন করাইতে হইবে।

১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে যে নির্ব্বাচন হয় তাহাতে ওয়াফ্‌দ-দল প্রায় শতকরা ৯০টি আসন অধিকার করিল। সুতরাং রাজা ফুয়াদকে নেতা মোস্তাফা নাহাস পাশাকেই মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিতে আহ্বান করিতে হইল। মন্ত্রী কিছুদিন পরেই ইংলণ্ডে গমন করেন। নূতন সন্ধি-পত্রের আলোচনা হইল কিন্তু ফলে কিছুই হইল না। তিনি এমন একটি প্রস্তাব করিলেন যাহাতে রাজার মূল শাসনবিধি মুলতুবী রাখিবার অধিকার লোপ পায়। যে সকল মন্ত্রী পূর্ব্বে এরূপ করিয়াছেন তাহাদিগের বিচার করিবার জন্যও এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। রাজা সম্মত হইলেন না, ফলে নাহাস পাশা পদত্যাগ করিলেন। রাজা তখন সিদ্কী পাশাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত ও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পার্লেমেণ্ট স্থগিত রাখিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই (১৯৩০, অক্টোবর) রাজা এক ঘোষণা প্রচার করিলেন যাহাতে পার্লেমেণ্টের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে চলিয়া গেল, প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীই মিশরের "ডিক্টেটর" হইলেন। কিছুদিন সিদকি পাশার শাসন চলিল। তাঁহার পর মন্ত্রী হইলেন ইয়াহ্‌য়া পাশা। কিন্তু দেশ এই প্রাসাদ-শাসনের বিরুদ্ধে উত্তাক্ত হইয়া উঠিল। তখন রাজা তৌফিক নেসিম পাশাকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। তিনি ওয়াফ্‌দ-দলভুক্ত না হইলেও ঐ দলের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন। ১৯৩০ সালে প্রবর্ত্তিত স্বেচ্ছাচার পদ্ধতির অবসান ঘটিল সত্য, কিন্তু গণপ্রতিনিধি পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল না—প্রধানতঃ ইংলণ্ডের বাধায়, কারণ তাহাতে ওয়াফ্‌দ-দলের প্রাধান্য ঘটিবার আশঙ্কা। এই কতিপয় বৎসরের স্বেচ্ছাচার বা প্রাসাদ-শাসনে ইংলণ্ডের প্রভাব মিশরে যথেষ্ট বাড়িয়াছে, ইহা ক্ষুণ্ণ করিতে ইংলণ্ড ইচ্ছুক নহে। মন্ত্রী নেসিম পাশা ইংলণ্ডের সহিত বন্ধুতা রক্ষা করিয়াই গণপ্রতিনিধি শাসনের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহার প্রধান অন্তরায় হইলেন জাকিয়েল ইব্রাশী পাশা। রাজার উপর তাঁহার অত্যন্ত প্রভাব, তিনি সম্মতি না দি-

মোস্তফা নাহাশ পাশা

জগলুল পাশা

হাফেজ আফিফি পাশা, লণ্ডনে মিশরের ভূতপূর্ব্ব বৈদেশিক মন্ত্রী

নেসিম পাশার কোন বিধানই রাজা অনুমোদন করেন না। ইব্রাসী পাশা ইংলণ্ডের বন্ধু নহেন। নেসিম পাশা ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। তখন রাজাকে বলা হইল, হয় এই ইব্রাসী পাশার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে হইবে নতুবা "রিজেন্সী"র হস্তে রাজ-ক্ষমতা অর্পণ করিতে হইবে। তখন বাধ্য হইয়া রাজা ইব্রাসী পাশাকে পদচ্যুত করেন (এপ্রিল ১৯৩৫)।

ইতালী-আবিসিনীয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে নূতন করিয়া বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ পাইল। মিশর এক্ষেত্রে আবিসিনীয়ার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সুতরাং বিদ্বেষ ইহাতে নহে। ইংলণ্ড আবিসিনীয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্যগ্র কিন্তু নিজে মিশরের প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের পরিপন্থী। বিদ্বেষের প্রথম ও প্রধান কারণ ইহাই। তদুপরি মিশরকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই দেশে সামরিক সজ্জা হইতেছে।

এদিকে ওয়াফ দ-দল রাজ্যশাসন-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ না পাইলেও ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। গত নবেম্বর মাসে সর্ সামুয়েল হোর (ইংলণ্ডের তৎকালীন পররাষ্ট্রসচিব) এক বক্তৃতায় বলেন যে মিশরে কোন্ শাসনপদ্ধতি উপযুক্ত তাহা ইংলণ্ডই বিচার করিবেন। ইহাতে মিশরে অসন্তোষ পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিল। ওয়াফ্‌দদের পতাকামূলে সকল দলই সমবেত হইল। এমন কি ইসমাইল সিদ্‌কী পাশা ও মোহম্মদ মামুদ পাশা প্রভৃতি বিরুদ্ধপক্ষীয়গণও নাহাস পাশার সহিত মিলিত হইলেন। ব্যাপার দেখিয়া ইংলণ্ড প্রচার করিলেন যে গণপ্রতিনিধি-শাসন পুনরায় প্রবর্ত্তন করিতে ইংলণ্ড বাধা উপস্থিত করিবেন না। ১৯৩০ সালের মে মাসে ওয়াফ দ-নেতা নাহাস পাশার সহিত যে সন্ধিপত্রের আলোচনা হইয়াছিল এবং নাহাশ পাশা যাহা গ্রহণ করেন নাই তাহাকে ভিত্তি করিয়া নূতন আলোচনা চালাইতেও ইংলণ্ড এখন প্রস্তুত। সম্প্রতি নির্ব্বাচনে ওয়াফ দ-দলই পুনরায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং মিশরে শান্তি ও প্রীতি স্থাপন করিতে হইলে এই দলের সঙ্গেই ইংলণ্ডকে সন্ধি করিতে হইবে। আবিসিনীয়ায় ইতালীর সামরিক অভিযানের সফলতায় সুয়েজখাল সম্পর্কে ইংলণ্ডের সামরিক ব্যবস্থার বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং সুয়েজখালে সৈন্যবল বৃদ্ধি করিয়া মিশরকে আত্মরক্ষার দায়িত্বেরও অধিকার দিতে এখন হয়ত ইংলণ্ডের প্রবল আপত্তি নাও থাকিতে পারে।

শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত

—

ভারতবর্ষ

বঙ্গের বাহিরে বাঙালী শিল্পী

শান্তিনিকেতন কলাভবনের প্রাক্তন ছাত্র শিল্পী শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর অধুনা-প্রতিষ্ঠিত দেরাদুন পাব্লিক স্কুলে শিল্পকলার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া স্কুলে অধ্যাপক ছিলেন। সিন্ধিয়া স্কুলের কলাবিভাগ-সংগঠনে খাস্তগীর মহাশয় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। গোয়ালিয়র পরিত্যাগের প্রাক্কালে খাস্তগীর মহাশয় ও তাঁহার ছাত্রগণের প্রস্তুত মূর্ত্তি ও চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী হয়; তাহার মধ্যে দুইটির ছবির প্রতিলিপি মুদ্রিত হইল।

খেলা—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

তুলসী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

বাংলা

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চসপ্ততিবর্ষপূর্ত্তি-উৎসব

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের পঞ্চসপ্ততিবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে নানা স্থানে আনন্দোৎসব হইয়া গিয়াছে। ২৫শে বৈশাখ প্রাতঃকালে কবির আত্মীয়-বন্ধুগণ তাঁহার জোড়াসাঁকোস্থ ভবনে সমবেত হইয়া

কবিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্ভাষণে তাঁহার জীবনের অনেক স্মৃতিকথা বিবৃত করেন। সেইদিন সায়ংকালে কলিকাতা শাখা পি ই-এন ক্লাব বরাহনগরে কবিকে সম্বর্দ্ধিত করেন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

গত ২৭শে বৈশাখ সায়ংকালে শান্তিনিকেতনের পূর্ব্বতন ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকগণ কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্ভাষণে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রারম্ভকালের স্মৃতি বিবৃত করেন। বিদ্যালয়-পরিচালনায় অভিজ্ঞতার অভাব ও ঋণভার সত্ত্বেও তিনি বালকদের জন্য একটি আনন্দময় পরিবেষ্টন রচনা করিবার উদ্দেশ্য লইয়া এই বিদ্যালয় আরম্ভ করেন। সভাপতি মহাশয় ও শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনের পূর্ব্বতন ছাত্র ও অধ্যাপক এবং দেশের পক্ষ হইতে কবিকে শ্রদ্ধানিবেদন করেন ও তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করেন।

রঙ্গপুরে রবীন্দ্রজন্মতিথি উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন হয়। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন দাদূ, মীরাবাঈ প্রভৃতির সহিত রবীন্দ্রনাথের ভাবের ঐক্য প্রদর্শন করিয়া একটি অভিভাষণ দেন। কালিম্পঙে নসীপুরের রাজা বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটি সভা হয় ও সভার পক্ষ হইতে কবির দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া একটি পত্র প্রেরিত হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক স্থানেও সভাসমিতি ও আনন্দোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ব্রডকাষ্টি এর কর্তৃপক্ষ ২৫শে বৈশাখ সায়ংকালে বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের রচিত সঙ্গীত, কবিতা পাঠ "বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনয় ও বক্তৃতাদির আয়োজন করিয়াছিলেন। বঙ্গের বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক এই শ্রদ্ধানিবেদনে যোগদান করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রজন্মোৎসব উপলক্ষ্যে "বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনয়
দণ্ডায়মান (বাম হইতে):—শ্রীমনোজ বসু (ঈশান), শ্রীসজনীকান্ত দাস (অবিনাশ), শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (কেদার), শ্রীপ্রমথ বিশী (তিনকড়ি)।
উপবিষ্ট (বাম হইতে):—শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র (বৈকুণ্ঠ), শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিপিন) ও শ্রীপরিমল গোস্বামী (ভৃত্য)।

সাময়িক প্রসঙ্গ

হাওড়া-সেতু কণ্ট্রাক্ট

কলিকাতায় গঙ্গার উপর নূতন করিয়া সেতু নির্ম্মিত হইবে। এই নির্ম্মাণ-কার্য্যের কণ্ট্রাক্ট কাহাকে দেওয়া হইবে ইহা লইয়া এতদিন জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল। সম্প্রতি পোর্টকমিশনারগণের সাবকমিটি ইংলণ্ডের কোন এক কোম্পানীকে এই কণ্ট্রাক্ট প্রদান করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। ইহাতে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। এত বৃহৎ ও লাভজনক কণ্ট্রাক্ট যে ইংলণ্ডের কোন কোম্পানী পাইবে ইহা বিচিত্র নহে, বরং অন্যরূপ সুপারিশ হইলেই আমরা বিস্মিত হইতাম। কিন্তু এইরূপ সুপারিশে কোন কোন মহলে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

একটি জার্ম্মান কোম্পানী—মেসার্স ক্রুপ্‌স্—সব চেয়ে কম টাকায়—২০৯ লক্ষ (মোটামুটি) এই নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পাদন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এইরূপ প্রকাশ যে এই কোম্পানী কণ্ট্রাক্ট-মূল্যের শতকরা ৪২ টাকা ভারতবর্ষে ও শতকরা ২৩ টাকা গ্রেট ব্রিটেনে ব্যয় করিতে এবং বাকী শতকরা ৩৫ টাকার মধ্যে ২৫ টাকায় জার্ম্মেণীতে ভারতের রপ্তানি দ্রব্য ক্রয় করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে যদি মূল্য অনুকূল হয় তবে তাঁহারা ভারতীয় চূণমাটি ও কিছু ভারতীয় ইস্পাত ক্রয় করিবেন। সাধারণ অবস্থায় নাকি সাবকমিটি ইঁহাদের জন্য সুপারিশ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। কিন্তু এই সেতু-নির্ম্মাণকার্য্য চারি বৎসর চলিবে এবং এই দীর্ঘ সময় জার্ম্মেণীতে শান্তি অব্যাহত না থাকিতেও পারে—অন্তর্বিরোধ ও আন্তর্জ্জাতিক বিরোধের আশঙ্কা আছে। অন্তর্বিরোধ সম্পর্কে ইঁহারা একটি ইংলণ্ডীয় কোম্পানীর (লয়েড) নিকট বীমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সাবকমিটির মতে একবার কাজ আরম্ভ করিয়া স্থগিত করিতে হইলে যে পরিমাণ ক্ষতি হইবে কোন বীমা কোম্পানীই তাহার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ করিতে পারে না।

পাঁচ লক্ষ বেশী টাকায় যে ক্লীভল্যাণ্ড ব্রিজ এণ্ড ইন্‌জিনীয়ারিং কোম্পানীর জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে তাঁহাদের দেশে—ইংলণ্ডে—অন্তর্বিরোধের আশঙ্কা হয়ত নাই কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক বিরোধের আশঙ্কা নাই এইরূপ বলা চলে না। আজ যদি ইউরোপে বিরোধ বাধে এবং জার্ম্মেণী তাহাতে লিপ্ত হয় তবে ইংলণ্ড যে নিরপেক্ষ দর্শক থাকিবে না ইহা নিশ্চিত। সে অবস্থায় সেতুনির্ম্মাণ-কার্য্য অব্যাহত ভাবে চলিবে, সাবকমিটি এরূপ আশ্বাস পাইয়াছেন কি?

জার্ম্মেণীর কোম্পানীর বেলায় যে ঝুঁকি ঘাড়ে পড়িবার আশঙ্কা ইংলণ্ডীয় কোম্পানীর বেলায় সেরূপ ঝুঁকির প্রশ্ন তুলিবার আগ্রহ সাবকমিটির ছিল না, থাকিতেও পারে না।

কিন্তু এই জার্ম্মান কোম্পানীর তুলনায় ইংলণ্ডীয় কোম্পানীর প্রতি পক্ষপাত দেখানো হইয়াছে—চাঞ্চল্য এই জন্য নহে; চাঞ্চল্য এই জন্য যে আরও ১৮ লক্ষ টাকা বেশী দরে একটি "ভারতীয়" ব্যবসায়ী সম্মেলনকে কেন এই কণ্ট্রাক্ট দিবার জন্য সুপারিশ করা হয় নাই। কতগুলি কারণে, যথা—ইংলণ্ডের উচ্চ আয়-কর হইতে অব্যাহতি ও ও ভারতীয় সংরক্ষণ-নীতির সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবার জন্য কতকগুলি অপূর্ব্ব 'ভারতীয়' কোম্পানীর সৃজন হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অংশ ভারতীয়গণের নিকট বিক্রয় করিয়া ও ডিরেক্টার বোর্ডে কতিপয় ভারতীয়কে স্থান দিয়া টাকায় মূলধন প্রচারিত করিয়া ভারতবর্ষে রেজেষ্টরী করিলে আইনের মাপকাঠিতে সরকারের চক্ষে এই কোম্পানী 'ভারতীয়' বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু ভারতবাসীর স্বার্থ এই কোম্পানীতে কতটুকু? বার্ণ, ব্রেথওয়েট কিংবা জেসপ কোনটিই খাঁটি ভারতীয় কোম্পানী নহে, সুতরাং তাহাদের সম্মেলন মণ্ডলী যদি এই কণ্ট্রাক্ট না পায় তবে ভারতবাসীর চাঞ্চল্যের কোনই কারণ নাই।

কিন্তু কলিকাতা কর্পোরেশন, ইণ্ডিয়ান মেটালার্জিকেল এসোসিয়েশন প্রভৃতি এই সুপারিশ উপেক্ষা করিয়া ভারতবর্ষে এই কণ্ট্রাক্ট রাখিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিতেছেন। ভারতীয় জাতীয় স্বার্থ বিসর্জ্জন দেওয়া হইতেছে এইরূপ রব উত্থাপন করা হইয়াছে। এই তথাকথিত ভারতীয় সম্মেলনের সভাপতি, ভারতীয়গণের সহানুভূতি উদ্রেক করিবার জন্য সংবাদপত্রে লিখিতেছেন: হাওড়া-সেতু নির্ম্মাণের কার্য্য যদি কোন ভারতীয় মণ্ডলীকে দেওয়া হয় তবে যে শুধু ইস্পাত-শিল্পের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের অবসানে সহায়তা করা হইবে তাহা নহে, কয়লা ও লৌহের খনি, রেলপথ, চূণমাটি ও প্রস্তরের ব্যবসায় এই নির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে কাজ যোগাইবে।

সভাপতির এই কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। প্রথমেই 'ষ্টাফ' বা কর্ম্মচারীর কথা ধরা যাউক। বার্ণ, ব্রেথওয়েট বা জেসপ কোম্পানীতে নিম্নশ্রেণীর কেরাণী ও মজুর ব্যতীত উচ্চ পদে ভারতীয়গণের সংখ্যা কত? দরে সস্তা বলিয়া অন্য দেশেও ভারতীয় মজুর নিযুক্ত করা হয়, বৈদেশিক কোম্পানী তাঁহাদের স্বদেশ হইতে মজুর ভারতবর্ষে আমদানী করিবে না, অন্ততঃ এ বিশ্বাস আমাদের আছে, এবং মজুরী ব্যতীত উচ্চতর কার্য্যে ভারতীয়ের নিয়োগের সম্ভাবনা যে নাই—যাঁহার হাতেই কণ্ট্রাক্ট পড়ুক না কেন—ইহা অনুমান করা কঠিন নহে। সভাপতি মহাশয় কয়লা ও লৌহের খনি, চূণমাটি ও পাথরের ব্যবসায় ও রেলওয়ের উল্লেখ করিয়াছেন—কেবল মাত্র তাঁহার সম্মেলনের ব্যাপারে নহে, যে কোন কোম্পানীর হাতেই হউক না কেন এই নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হইলে প্রত্যেকেরই কিছু ব্যবসায় বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু তাহাতে ভারতীয়গণের অংশ কতটুকু! তারপর ইস্পাতের কথা। এই প্রসঙ্গে "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" বলিতেছেন: ভারতীয় ইস্পাত শিল্প সম্পর্কে সংরক্ষণ-নীতির সার্থকতা মুখ্যতঃ সামরিক এই কথার উপর আমরা সময় সময় জোর দিয়াছি। গত যুদ্ধ ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে এইরূপ একটি শিল্প ব্যতীত ভারতবর্ষ থাকিতে পারে না অথবা থাকিতে সাহস করিতে পারে না। টাটা কোম্পানী যে শুধু ভারতবর্ষের প্রয়োজন মিটাইয়াছে তাহা নহে, মেসোপটেমিয়া, প্যালেষ্টাইন, ও পূর্ব্ব আফ্রিকায় রেল সরবরাহ করিয়াছে। সুয়েজের পূর্ব্ব দেশবাসী আমাদের এখন নিজেদের উপরই যুদ্ধকালে নির্ভর। নিজেদের রক্ষণের জন্য আমাদিগকে লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা ও বৃহৎ যান্ত্রিক শিল্প রাখিতেই হইবে। যদি শান্তির সময় ইহা ধ্বংস হইতে দিই তবে যুদ্ধকালে আমাদিগকে পরিতাপ করিতে হইবে।

ইহা ভারতবাসীর স্বার্থ-অস্বার্থের কথা নহে। ইহা বৃহত্তর ব্যাপার—সাম্রাজ্যরক্ষা ও বিস্তারের সামরিক প্রয়োজনীয়তা ও অপ্রয়োজনীয়তার কথা। এমন হইতে পারে যে শীঘ্রই এইরূপ কার্য্যে টাটা কোম্পানীর নিয়োগ পুনরায় প্রয়োজন হইতে পারে তাই এই ক্ষুদ্র সেতুনির্ম্মাণ-কার্য্যে তাহাদিগকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা উপেক্ষা নহে; সঙ্কটকালের জন্য মূলতুবী রাখা মাত্র।

খাঁটি ভারতীয় কোন প্রার্থী যখন নাই, তখন কণ্ট্রাক্ট কাহার হাতে পড়িল, ভারতবাসীর নিকট ইহাই বড় কথা নহে, দেশ বা কোম্পানী বিশেষের প্রতি পক্ষপাত দেখাইতে গিয়া যেন নির্ম্মাণ-ব্যয়ে বাহুল্য না ঘটে।

শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৬শ ভাগ ১ম খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৪৩ | ৩য় সংখ্যা

দ্বৈত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম দেখেছি তোমাকে,
বিশ্বরূপকারের ইঙ্গিতে,
তখন ছিলে তুমি আভাসে।
যেন দাঁড়িয়ে ছিলে বিধাতার মানসলোকের
সেই সীমানায়
সৃষ্টির আঙিনা যেখানে আরম্ভ।

যেমন অন্ধকারে ভোরের ব্যঞ্জনা
অরণ্যের অশ্রুতপ্রায় মর্ম্মরে
আকাশের অস্পষ্টপ্রায় রোমাঞ্চে—
ঊষা যখন পায়নি আপন নাম,
যখন জানেনি আপনাকে।
তার পরে সে নেমে আসে ধরাতলে ;
তার মুখ থেকে
অসীমের ছায়া-ঘোমটা পড়ে খসে
উদয় সমুদ্রতটে।

পৃথিবী তাকে আপন রঙে রাঙিয়ে তোলে,
পরায় তাকে আপন হাওয়ার উত্তরীয়।
তেমনি তুমি এসেছিলে ছবির প্রান্তরেখাটুকু
আমার হৃদয়ের দিগন্তপটে।
আমি তোমার চিত্রকরের সরিক,
কথা ছিল তোমার 'পরে মনের তুলি আমিও দেব বুলিয়ে,
তোমার রচনা সম্পূর্ণ করব আমি।—
দিনে দিনে তোমাকে রাঙিয়েছি
আমার ভাবের রঙে।
আমার প্রাণের হাওয়া
বইয়ে দিয়েছি তোমার চারিদিকে,
কখনো ঝড়ের বেগে,
কখনো মৃদুমন্দ বীজনে।

একদিন দ্যুলোকের দূরত্বে ছিলে তুমি অধরা,
ছিলে তুমি একলা বিধাতার :
একের নির্জ্জনে।
আমি বেঁধেছি তোমাকে দুইয়ের গ্রন্থিতে,
তোমার সৃষ্টি আজ তোমাতে আর আমাতে,
তোমার বেদনায় আমার বেদনায়।
আজ তুমি আপনাকে চিনেছ
আমার চেনা দিয়ে,
আমার সীমাবন্ধনে তুমি স্পষ্ট।
আমার বিস্মিত দৃষ্টির সোনার কাঠির স্পর্শে
জাগ্রত তোমার আনন্দরূপ
তোমার আপন চৈতন্যে।

৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩
বরানগর

আশ্রমের শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিষটার ঠিক বাস্তব রূপ কী তার ঐতিহাসিক ধারণা আজ সহজ নয়। তপোবনের যে প্রতিরূপ স্থায়ী ভাবে আঁকা পড়েছে ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে সে হচ্ছে একটি কল্যাণময় কল্পমূর্ত্তি, বিলাসমোহমুক্ত প্রাণবান্ আনন্দের মূর্ত্তি।

আধুনিক কালে জন্মেছি। কিন্তু এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। বর্ত্তমান যুগের বিদ্যায়তনে ভাবলোকের সেই তপোবনকে রূপলোকে প্রকাশ করবার জন্যে একদা কিছুকাল ধ'রে আমার মনে আগ্রহ জেগেছিল।

দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে। তিনি যন্ত্র নন তিনি মানুষ। নিষ্ক্রিয় ভাবে মানুষ নন সক্রিয় ভাবে, কেন-না মনুষ্যত্বের লক্ষ্য সাধনেই তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যের চিত্তকে গতিশীল ক'রে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্য জাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিযটি আশ্রমের শিক্ষায় সব চেয়ে মূল্যবান্ উপাদান। তার সেই মূল্য অধ্যাপনার বিষয়ে নয়, উপকরণে নয়, পদ্ধতিতে নয়। গুরুর মন প্রতি মুহূর্ত্তে আপনাকে পাচ্ছে ব'লেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ সপ্রমাণ করছে নিজের সত্যতা, দেওয়ার আনন্দেই।

একদা এক জন জাপানী ভদ্রলোকের বাড়ীতে ছিলাম, বাগানের কাজে ছিল তাঁর বিশেষ সখ। তিনি বৌদ্ধ, মৈত্রীর সাধক। তিনি বলতেন, আমি ভালবাসি গাছপালা, তরুলতায় সেই ভালবাসার শক্তি প্রবেশ করে, ওদের ফুলে ফলে জাগে সেই ভালবাসারই প্রতিক্রিয়া। বলা বাহুল্য মানব-চিত্তের মালীর সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। মনের সঙ্গে মন যথার্থভাবে মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশী। সেই খুশী সৃজনশক্তিশীল। আশ্রমের শিক্ষাদান এই খুশীর দান। যাদের মনে কর্ত্তব্যবোধ আছে কিন্তু সেই খুশী নেই, তাদের দোসরা পথ। গুরুশিষ্যের মধ্যে পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মাধ্যস্থ্য ব'লে জেনেছি।

আরও একটি কথা মনে ছিল। যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই। নইলে দেনা পাওনায় নাড়ির যোগ থাকে না। নদীর সঙ্গে যদি প্রকৃত শিক্ষকের তুলনা করি তবে বলব, কেবল ডাইনে বাঁয়ে কতকগুলো বুড়ো বুড়ো উপনদীর যোগেই নদী পূর্ণ নয় তার আদি ঝরণার ধারাটি মোটা মোটা পাথরগুলোর মধ্যে হারিয়ে যায় নি। যিনি জাতশিক্ষক ছেলেদের ডাক শুনলেই তাঁর ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি বেরিয়ে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণে ভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোন দিক থেকেই তাঁকে স্বশ্রেণীয় জীব ব'লে চিনতে না পারে, যদি মনে করে লোকটা যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী তবে নির্ভয়ে সে তাঁর কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না। সাধারণত আমাদের গুরুরা সর্ব্বদা নিজের প্রবীণতা অর্থাৎ নবীনের কাছ থেকে দূরবর্ত্তিতা সপ্রমাণ করতে ব্যগ্র, প্রায়ই ওটা সস্তায় কর্ত্তৃত্ব করবার প্রলোভনে। ছেলেদের পাড়ায় চোপদার না নিয়ে এগোলে পাছে সম্ভ্রম নষ্ট হয় এই ভয়ে তাঁরা সতর্ক। তাদের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি উঠছে চুপ, চুপ। তাই পাকা শাখায় কাঁচা শাখায় ফুল ফোটাবার ফল ফলাবার মর্ম্মগত সহযোগ রুদ্ধ হয়ে থাকে, চুপ ক'রে যায় ছেলেদের চিত্তে প্রাণের ক্রিয়া।

আর একটা কথা আছে। ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের। আরাম-কেদারায় তারা আরাম চায় না, সুযোগ পেলেই গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির নাড়িতে নাড়িতে প্রথম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল। শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চার করে। বয়স্কদের

শাসনে অভ্যাসের দ্বারা যে-পর্য্যন্ত তারা অভিভূত না হয়েছে সে-পর্য্যন্ত কৃত্রিমতার জাল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তারা ছটফট করে। আরণ্য ঋষিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের অমর ছেলে। তাই কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন— এই যা কিছু সমস্তই প্রাণ হ'তে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে। এ কি বার্গসঁ-এর বচন! এ মহান্ শিশুর বাণী। বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন লাগাতে দাও ছেলেদের দেহে মনে। শহরের বোবা কালা মরা দেয়ালগুলোর বাইরে।

তার পরে আশ্রমে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথা। মনে পড়ছে কাদম্বরীতে একটি বর্ণনা, "তপোবনে আসছে সন্ধ্যা, যেন গোষ্ঠে-ফিরে-আসা পাটল হোমধেনুটির মত।" শুনে মনে জাগে, সেখানে গোরু-চরানো, গো-দোহন, সমিধ্-কুশ আহরণ, অতিথি-পরিচর্য্যা, যজ্ঞবেদী রচনা, আশ্রম বালকবালিকাদের দিনকৃত্য। এই সব কর্ম্মপর্য্যায়ের দ্বারা তপোবনের সঙ্গে নিরন্তর মিলে যায় তাদের নিত্যপ্রবাহিত জীবনের ধারা। সহকারিতার সখ্যবিস্তারে আশ্রম হ'তে থাকে প্রতিক্ষণে আশ্রমবাসীদের নিজ হাতের রচনা। আমাদের আশ্রমে সতত উদ্যমশীল এই কর্ম্ম-সহযোগিতা কামনা করছি।

মানুষের প্রকৃতিতে যেখানে জড়তা আছে সেখানে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা কুশ্রী ও মলিন। স্বভাবের বর্ব্বরতা সেখানে প্রকাশে বাধা পায় না। ধনীসমাজে আন্তরিক শক্তির অভাব থাকলেও বাহ্যিক উপকরণ-প্রাচুর্য্যে কৃত্রিম উপায়ে এই দীনতাকে চাপা দিয়ে রাখা যায়। আমাদের দেশে প্রায় সর্ব্বত্রই ধনীগৃহে সদর অন্দরের প্রভেদ দেখলে এই প্রকৃতিগত তামসিকতা ধরা পড়ে।

নিজের চার দিককে নিজের চেষ্টায় সুন্দর সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর ক'রে তোলার দ্বারা একত্রবাসের সতর্ক দায়িত্বের অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই সহজ করা চাই। এক জনের শৈথিল্য অন্যের অসুবিধা অস্বাস্থ্য ও ক্ষতির কারণ হ'তে পারে এই বোধটি সভ্য জীবনযাত্রার ভিত্তিগত। সাধারণত আমাদের দেশের গার্হস্থ্যে এই বোধের ত্রুটি সর্ব্বদাই দেখা যায়।

সহযোগিতার সভ্য নীতিকে প্রত্যহ সচেতন ক'রে তোলা আশ্রমের শিক্ষার প্রধান সুযোগ। এই সুযোগটিকে সফল করবার জন্যে শিক্ষার প্রথম পর্ব্বে উপকরণ লাঘব অত্যাবশ্যক। একান্ত বস্তুপরায়ণ স্বভাবে প্রকাশ পায় চিত্তবৃত্তির স্থূলতা। সৌন্দর্য্য এবং সুব্যবস্থা মনের জিনিষ। সেই মনকে মুক্ত করা চাই কেবল আলস্য এবং অনৈপুণ্য থেকে নয় বস্তুলুব্ধতা থেকেও। রচনাশক্তির আনন্দ ততই সত্য হয় যতই তা জড়বাহুল্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হ'তে পারে। বাল্যকাল থেকেই ব্যবহারসামগ্রী সুনিয়ন্ত্রিত করবার আত্মশক্তিমূলক শিক্ষা আমাদের দেশে অত্যন্ত উপেক্ষিত হয়। সেই বয়সেই প্রতিদিন অল্প কিছু উপকরণ যা সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায় তাই দিয়েই সৃষ্টির আনন্দকে উদ্ভাবিত করবার চেষ্টা যেন নিরলস হ'তে পারে এবং সেই সঙ্গেই সাধারণের সুখ স্বাস্থ্য সুবিধাবিধানের কর্ত্তব্যে ছাত্রেরা যেন আনন্দ পেতে শেখে এই আমার কামনা।

আপন পরিবেষের প্রতি ছেলেদের আত্মকর্ত্তৃত্বচর্চ্চাকে আমাদের দেশে অসুবিধাজনক আপদজনক ও ঔদ্ধত্য মনে ক'রে সর্ব্বদা আমরা দমন করি। এতে ক'রে পরনির্ভরতার লজ্জা তাদের চলে যায়, পরের প্রতি আবদার বেড়ে ওঠে, এমন কি, ভিক্ষুকতার ক্ষেত্রেও তাদের অভিমান প্রবল হ'তে থাকে, তারা আত্মপ্রসাদ পায় পরের ত্রুটি নিয়ে কলহ ক'রে। এই লজ্জাকর দীনতা চার দিকে সর্ব্বদাই দেখা যাচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পাওয়াই চাই।

মনে আছে ছাত্রদের প্রাত্যহিক কাজে যখন আমার যোগ ছিল, তখন এক দল বয়স্ক ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমার কাছে নালিশ এল যে, অন্নভরা বড় বড় ধাতুপাত্র পরিবেষণের সময় মেজের উপর দিয়ে টানতে টানতে তার তলা ক্ষয়ে গিয়ে ঘরময় নোংরামি ছড়িয়ে পড়ে। আমি বললেম, তোমরা পাচ্ছ দুঃখ, অথচ তাকিয়ে আছ আমি এর প্রতিবিধান করব। এই সামান্য কথাটা তোমাদের বুদ্ধিতে আসছে না যে, ঐ পাত্রটার নীচে একটা বীড়ে বেঁধে দিলেই ঐ ঘর্ষণ থামে। চিন্তা করতে পারো না তার একমাত্র কারণ, তোমরা এইটাই স্থির ক'রে রেখেছ যে নিষ্ক্রিয়ভাবে ভোক্তৃত্বের অধিকারই তোমাদের, আর কর্ত্তৃত্বের অধিকার অন্যের। এতে আত্মসম্মান থাকে না।

শিক্ষার অবস্থায় উপকরণের কিছু বিরলতা আয়োজনের

কিছু অভাব থাকাই ভাল, অভ্যস্ত হওয়া চাই স্বল্পতায়। অনায়াসে প্রয়োজন জোগানোর দ্বারা ছেলেদের মনটাকে আদুরে ক'রে তোলা তাদের নষ্ট করা। সহজেই তারা যে এত কিছু চায় তা নয়। আমরাই বয়স্ক লোকের চাওয়াটা কেবলই তাদের উপর চাপিয়ে তাদেরকে বস্তুর নেশায় দীক্ষিত ক'রে তুলি। শরীর মনের শক্তির সম্যক চর্চা সেখানেই ভাল ক'রে সম্ভব, যেখানে বাইরের সহায়তা অনতিশয়। সেখানে মানুষের আপনার সৃষ্টিউদ্যম আপনি জাগে। যাদের না জাগে, প্রকৃতি তাদেরকে আবর্জ্জনার মত ঝেঁটিয়ে ফেলে দেয়। আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টিকর্তৃত্ব। সেই মানুষই যথার্থ স্বরাট, আপনার রাজ্য যে আপনি সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে অতিলালিত ছেলেরা সেই স্বচেষ্টতার চর্চা থেকে প্রথম হতেই বঞ্চিত। তাই আমরা অন্যদের শক্ত হাতের চাপে পরের নির্দ্দিষ্ট নমুনা মত রূপ নেবার জন্যে কর্দ্দমাক্ত ভাবে প্রস্তুত।

এই উপলক্ষ্যে আর একটা কথা বলবার আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শরীরতন্তুর শৈথিল্য বা অন্য যে কারণেই হোক আমাদের মানস প্রকৃতিতে ঔৎসুক্যের অত্যন্ত অভাব। একবার আমেরিকা থেকে জলতোলা বায়ুচক্র আনিয়েছিলুম। আশা ছিল, প্রকাণ্ড এই যন্ত্রটার ঘূর্ণিপাখার চালনা দেখতে ছেলেদের আগ্রহ হবে। কিন্তু দেখলুম অতি অল্প ছেলেই ভাল ক'রে ওটার দিকে তাকালে। ওরা নিতান্তই আল্‌গা ভাবে ধরে নিলে ওটা যা হোক একটা জিনিষ, জিজ্ঞাসার অযোগ্য।

নিরৌৎসুক্যই আন্তরিক নির্জ্জীবতা। আজকের দিনে যে-সব জাতি পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সমস্ত পৃথিবীর সব কিছুরই 'পরে তাদের অপ্রতিহত ঔৎসুক্য। এমন দেশ নেই, এমন কাল নেই, এমন বিষয় নেই, যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে। তাদের এই সজীব চিত্তশক্তি জয়ী হ'ল সর্ব্বজগতে।

পূর্ব্বেই আভাস দিয়েছি, আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকবার শিক্ষা। মরা মন নিয়েও পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর উর্দ্ধশিখরে ওঠা যায়, আমাদের দেশে প্রত্যহ তার পরিচয় পাই। দেখা যায় অতি ভাল কলেজি ছেলেরা পদবী অধিকার করে, বিশ্ব অধিকার করে না। প্রথম থেকেই আমার সঙ্কল্প ছিল, আশ্রমের ছেলেরা চার দিকের অব্যবহিত সম্পর্ক লাভে উৎসুক হয়ে থাকবে। সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। এখানে এমন সকল শিক্ষক সমবেত হবেন যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে; যাঁরা চক্ষুষ্মান্, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে।

সবশেষে বলব যেটাকে সব চেয়ে বড় মনে করি এবং যেটা সব চেয়ে দুর্লভ। তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্য্যবান। ছেলেদের প্রতি স্বভাবতই যাঁদের স্নেহ আছে এই ধৈর্য্য তাঁদেরই স্বাভাবিক। শিক্ষকদের নিজের চরিত্র সম্বন্ধে গুরুতর বিপদের কথা এই যে, যাদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার তারা ক্ষমতায় তাঁদের সমকক্ষ নয়। তাদের প্রতি সামান্য কারণে বা কাল্পনিক কারণে অসহিষ্ণু হওয়া, তাদের বিদ্রূপ করা, অপমান করা, শাস্তি দেওয়া অনায়াসেই সম্ভব। দুর্ব্বল পরজাতিকে শাসন করাই যাদের কাজ, তারা যেমন নিজের অগোচরেও সহজেই অন্যায়প্রবণ হয়ে ওঠে এও তেমনি। ক্ষমতাব্যবহারের স্বাভাবিক যোগ্যতা যাদের নেই, অক্ষমের প্রতি অবিচার করতে কেবল যে তাদের বাধা থাকে না তা নয় তাতে তাদের আনন্দ। ছেলেরা অবোধ হয়ে, দুর্ব্বল হয়েই মায়ের কোলে আসে, এই জন্যে তাদের রক্ষার প্রধান উপায় মায়ের মনে অপর্য্যাপ্ত স্নেহ। তৎসত্ত্বেও অসহিষ্ণুতা ও শক্তির অভিমান স্নেহকে অতিক্রম করেও ছেলেদের 'পরে অন্যায় অত্যাচারে প্রবৃত্ত করে, ঘরে ঘরে তার প্রমাণ পাই। ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত যেখানে দেখা যায়, প্রায়ই সেখানে মূলতঃ শিক্ষকেরাই দায়ী। তাঁরা দুর্ব্বলমনা ব'লেই কঠোরতা দ্বারা নিজের কর্ত্তব্যকে সহজ করতে চান।

রাষ্ট্রতন্ত্রেই হোক্ আর শিক্ষাতন্ত্রেই হোক, কঠোর শাসননীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ। শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমা যেখানে ক্ষীণ সেখানে শক্তিরই ক্ষীণতা।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতার বাঙালী সমাজ

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই প্রবন্ধের প্রথম পর্ব্বে কলিকাতার সমাজের বিভিন্ন স্তর ও আচার-ব্যবহারের কথা আলোচনা করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান পর্ব্বে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও অন্য কয়েকটি বিষয়ের কথা বলিব।

১

প্রত্যেক যুগেরই প্রতীক-স্বরূপ এক শ্রেণীর ব্যক্তি থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র 'লোকরহস্যে' "বাবু"-নামক জীবটিকে ইংরেজ-শাসিত বাংলা দেশের চূড়ান্ত বিশিষ্টতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে-"বাবু"কে লইয়া ব্যঙ্গ ও রহস্য করিয়াছেন, সে তাঁহার সমসাময়িক "বাবু"। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাবুদের সকল বিষয়ে পূর্ণ পরিণতি হয় নাই। যেমন, তখনও তাহারা পরভাষানুরাগী হইলেও পরভাষাপারদর্শী হয় নাই। সেই যুগের—অর্থাৎ এদেশে ইংরেজী শিক্ষা ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেকার যুগের—অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙালী বাবুর সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত চরিত্র-চিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল'। তবে এই পুস্তকই তাহার প্রথম চিত্র নয়। এই "নববাবু"রা উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে ইংরেজের শাসনতন্ত্র ও বাণিজ্যের ছায়ায় বর্দ্ধিত নূতন ধনী-সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে দেখা দেয়। সুতরাং সাহিত্যে উহাদের আবির্ভাবও সমসাময়িক। তাই প্রথম যুগের বাংলা সংবাদপত্রে এই বাবুদের প্রতি বহু ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এমন কি উহাদের আচার-ব্যবহার অবলম্বন করিয়া একখানি উপন্যাসও রচিত হয়। এই সকল রচনা প্রায়ই বিদ্রূপাত্মক, সুতরাং উহাদের মধ্যে "বাবু"-চরিত্রের দোষগুলিকে একটু অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। তবু সে-যুগের সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে এই সকল বিবরণের মূল্য আছে। এইগুলি ব্যবহার করিবার সময়ে অতিরঞ্জনের কথাটা ভুলিয়া না গেলে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ইহাদিগকে ব্যবহার করিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না।

১৮২১ সনে 'সমাচার দর্পণ' পত্রের দুইটি সংখ্যায় বাংলা-সাহিত্যে "বাবু"-চরিত্রের প্রথম অবতারণা হয়। এই বিবরণটির নাম দেওয়া হইয়াছিল "বাবুর উপাখ্যান"। এই রচনাটিই যে 'নববাবুবিলাস' ও 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর মত বিদ্রূপাত্মক সামাজিক চিত্রের মূল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতে শৈশব হইতে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্য্যন্ত তিলকচন্দ্র নামে এক ধনী দেওয়ান-পুত্রের জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। লেখক বলিতেছেন :—

> তিলকচন্দ্র বাবু ক্রোড়ে ব্যতীত মৃত্তিকাতে পদার্পণ করেন না, মহা আদর্য্য, কতং লোক তাহাকে ক্রোড়ে করিতে ইচ্ছা করে। দেওয়ানজী পুত্রের শরীরে যত ধরে তত স্বর্ণালঙ্কারে তাহাকে ভূষিত করিলেন। দেওয়ানজীর ইচ্ছা যে স্বর্ণের ইষ্টক পুত্রের গলে দোলায়মান করত আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন।
>
> এমতে পুত্র বড় হইতে লাগিলেন, বাক্য শক্তি হইল, তিলকচন্দ্র সকলকেই কটু বাক্য কহেন ও মারেন, তাহাতে দমন না করিয়া বরং সকলেই তাহাতে আহ্লাদ করেন। তিলকচন্দ্র বাবু কোন অকর্ম্ম করিলে তাহার দণ্ড না করিয়া চক্রবর্ত্তী দেওয়ান শিখাইয়া দেন যে তুমি কহ আমি করি নাই। এইরূপে বাবুকে লয়ে সর্ব্বদাই আমোদ হয়, তখন বাবু নামে খ্যাত হইলেন, তিলকচন্দ্র নাম কে উল্লেখ করে। দেওয়ান এত ঐশ্বর্য্য থাকিতে পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করাইলেন না, কহেন ব্রাহ্মণের ছেল্যা গায়িত্রী শিখিলেই হয়, কপালে থাকে বিদ্যা হবে, আমি যাহা রাখিয়া যাইব যদি রক্ষা করিয়া খাইতে পারেন কখন দুঃখ পাইবেন না, পুত্রের অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হবে আমি দেখিতে আসিব না। বাবু যেখানে যান সেইখানেই আদর্য্য ও মান্য, দেওয়ানজীর পুত্র অনেক আভরণ আছে। বাবু ঘুড়ী বুলবুলি প্রভৃতি খেলাতে সদা মগ্ন থাকেন, লেখা পড়ার দোকান আছে কিন্তু করেন না। অর্থী ও স্বার্থপর খোশামুদে মিষ্ট মুখো কতক গুলিন দেওয়ানজীর পারিষদ লোক বাবুর নানাবিধ গুণ ও বিদ্যাসূচক প্রশংসা করে।
>
> এমতে বাবুর ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইল সুতরাং বিষয় বোধ ও জ্ঞান যথেষ্ট। কেহ বাবুর স্থানে পরামর্শ লয়েন, কেহবা কোন বিষয়ের বিবেচনা বাবুকে লইয়া করেন, শাস্ত্রার্থ যাহা অন্য বিষয়ী ও পণ্ডিত লোকহইতে নিষ্পন্ন হয় না বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাহার শেষ

হয়। বৃত্তিভোগী অধ্যাপক মহাশয়েরা দর্শন শাস্ত্রাদির বিচার স্থলে বাবুকে মধ্যস্থ মানেন, বাবু তাহা বুঝেন এমত ক্ষমতা কি, কিন্তু শেষ করিয়া দেন। ইহাতে পণ্ডিত ঠাকুরেরা কহেন যে বাবুজী দেবানুগৃহীত মনুষ্য, এমত উত্তম বুদ্ধি বিবেচনা আর নাই ধন্য শুভক্ষণে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, বাবুর যেমত শিষ্টতা ও নম্রবারা ও ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি গুণ এমত কুত্রাপি দেখি না। কেহ২ আপনাআপনি ও পরস্পর অথচ বাবুর সম্মুখে কহেন যে দেখ ইহার অপেক্ষা বিজ্ঞ নাই, ইংরাজী পারশী আরবী নাগরী ফিরিঙ্গী আরমানি ইত্যাদি তাবৎ শাস্ত্রে তৎপর। ইংরাজী বাবু এক মাস দেখিয়াছিলেন ইহাতে চিঠী গুলান দেখিবামাত্রেই বুঝিতে পারেন ও তাহার উত্তর চড়২ করিয়া লিখিয়া দেন বিশেষতঃ সংস্কৃত শাস্ত্র কোন কালে দেখিলেন জ্ঞাত নহি কিন্তু তাহার যাদার্থ করিতে পারেন। যাহা হউক বাবু না পড়িয়া পণ্ডিত না হবেক কেন দেওয়ানজীর পুত্র প্রাকৃত মনুষ্য নহেন ক্ষণজন্মা ইত্যাদি কল্পিত স্তব ও প্রশংসাদ্বারা বাবু অন্তঃকরণে স্ফীত হইয়া মনে২ করেন যে আশ্চর্য্য আমি আপ্ত বিস্মৃত, সকলেই আমাকে বিজ্ঞ ও পণ্ডিত কহে আর আমার আপনাআপনিও বোধ হয় যে আমি পণ্ডিত বটি, তবে কি নিমিত্তে অন্য২ লোকের মত ক্লেশ লয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিব, আমি মুহরি কিম্বা মুনসী অথবা কেরাণী গিরি করিব না আমার দানাদি-দ্বারা যথেষ্ট পুণ্য হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত অনুপার্জিত বিদ্যাও হইয়াছে, অতএব এ অনিত্য সংসারে কেবল শারীরিক সুখ ভোগই সত্য। কোন দিন মরিয়া যাইব যত সুখ করিয়া লইতে পারি সেই কর্ত্তব্য। এই মতে পূর্ব্বোক্ত বাবুর নব গুণ অথবা ধর্ম্মপ্রতিপালনপূর্ব্বক আমোদে কালক্ষেপ করেন।

অনন্তর চক্রবর্ত্তী দেওয়ানের মৃত্যু হইল। বাবু স্বয়ং তাবৎ ধনাধিপতি হইয়া কর্ত্তা হইলেন। কেহ কর্ত্তা বলে কেহ২ বাবু, কহে কর্ত্তা বাবু বড় লোক, কতক গুলি নির্ধন দরিদ্র খোশামুদে যাতায়াত করে। কাহাকে ধন দেন, কাহাকেও চাকরি দেন, তখন বাবুর পূর্ব্বোক্ত নামের অর্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন অর্থাৎ যেমত মধুমক্ষিকা নানাবিধ পুষ্প-হইতে কণামাত্র মধু আহরণ করিয়া বহু কালে চাক বদ্ধ করিয়া অধিক মধু সংগ্রহ করেন পরে কোন ব্যক্তি ঐ চাকে অগ্নি নুড়া দিয়া পোড়াইয়া মধু ভাঙ্গিয়া লয়ে বিংশতি শের হিসাবে টাকায় বিক্রয় করে। সেই মত বাবুর পিতা বহুকালে বহু শ্রমে কিঞ্চিৎ২ করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন, বাবু সেই ধন হাজার২ টাকা নানা প্রকারে খরচ করিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে বাবু মনে ভাবিলেন যে আমার পিতা চাকরি করিয়া এত বিষয় করিয়াছিলেন তাহাতে আমি মান্য, অতএব আমার চাকরি কর্ত্তব্য. চাকরি না করিলে লোকে মানে না ও দশ জন প্রতিপালন হয় না। ইহা সর্ব্বদা ব্যক্ত করাতে ও কোন সাহেব কোন স্থানে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইল ইহার অনুসন্ধান করাতে অনেকের প্রতীতি হইল যে বাবু চাকরি করিবেন ইহাতে কতক গুলি বিদেশস্থ কর্ম্মচ্যুত বিষয়াকাঙ্ক্ষী উমেদওয়ার লোক বাবুর নিকটে যাতায়াত আরম্ভিল। ইহারা কতক সোপারিশদ্বারা কতক স্বয়ং পরিচিত হইয়া প্রাতে বৈকালে রাত্রিতে বাবুর নিকটে অনবরত হাজীর থাকে। বাবুর পূর্ব্বোক্ত বিদ্যায় কোন অংশেই গুণ নাই কেবল কতকগুলি অর্থ আছে কিন্তু আত্মাভিমানে পূর্ণ সুতরাং বিষয় কর্ম্ম হয় না হইবার সম্ভাবনাও নাই উমেদওয়ারেরদিগকে এমত আশ্বাসদ্বারা পরিতুষ্ট রাখেন যে বাবুর হস্তে নানা কর্ম্ম প্রস্তুত অত্যল্প দিনের মধ্যে তাবৎকে উত্তম২ কর্ম্ম দিবেন। ইহারা বাবুর কথায় প্রত্যয় করিয়া আপন২ স্বজন ও পরিবারকেও ঐ মত লব্ধ আশ্বাসানুসারে সমাচার লিখে। বাবু মনে জানেন যে তাহারো কর্ম্ম হইবে না সুতরাং অন্যেরো কর্ম্ম দিতে পারিবেন না এই রূপ প্রতারণা না করিলে কোন লোক আসিবেক না অতএব সভাবর্দ্ধক লোক সংগ্রহ আবশ্যক। উমেদওয়ার সকল প্রাতে ও সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই বৈঠকখানায় আসিয়া থাকেন বাবু আসিবামাত্রেই তাবতে অতিসমাদরপূর্ব্বক যথেষ্ট শিষ্টাচার করত অভ্যর্থনা করিয়া বাবুকে নিয়মিত সিংহাসনরূপ মছলন্দী মসনদে বসাইলে পরে বাবু প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেন যে অদ্যকার কি সমাচার। উমেদওয়ার মহাশয়েরা ক্রমে২ যে যাহা তাবৎ দিবসের মধ্যে উত্তম২ অথবা অসম্ভব কথা শুনিয়া থাকেন অনুসন্ধান করেন কেহ২ রচিয়া থাকেন তাহা কহেন, পরে ভূত ডাকাইত সর্প দুষ্কর্ম্ম দাতৃত্ব কৃপণতাদি বিষয়ে কথোপকথন হাস্য পরিহাসে অধিক রাত্রি হয় পরে বাবু গাত্রোত্থান করেন। উমেদওয়ারেরা স্ব২ বাসায় যান, তাহারা কেহ২ কহেন যে এবার আমার কর্ম্ম হওনের বাধা নাই আমার শনির শেষ হইয়াছে আমার প্রতি বাবুর বড় অনুগ্রহ। কেহবা দৈবজ্ঞের স্থানে গণনা করিয়া ভবিষ্যৎ শুভাশুভ দেখেন। কেহ বলেন যে বাবু গোলানগরের নবাব হইলেন, কেহ কহেন যে বাবুর এবার বড় কর্ম্ম হইল সুন্দরবন তাবৎ ইজারা করিলেন। কোন দিবস বাবু মজলিসে পদার্পণ করিবামাত্রেই চাকরকে হুকুম করেন যে আমার জামা জোড়া পাগ ইত্যাদি পোষাক তৈয়ার রাখ কল্য দরবার যাইব। ইহা শুনিতেই কর্ম্মের নিমিত্ত ব্যগ্র ব্যক্তিরা মনে করে যে যাহা অনুভব করিয়াছি তাহা বুঝি সত্য হইয়াছে, ইহা বলিয়া কেহ কালীঘাটে পূজা মানে, কেহ সত্য পীরের শীরণি দিতে চাহে, কেহবা আপন২ ইষ্টদেবতার স্থানে বাবুর মঙ্গল প্রার্থনা করে। সকলেই কর্ণে২ ফুস্‌ফুস করে ও পরস্পর জিজ্ঞাসা করে যে বাবু কল্য কোথা যাইবেন। কেহ কহে যে চুপ কর সে দিবস আমি যাহা কহিয়াছি সেই বটে বাবু সুন্দরবনের দেওয়ান হইবেন, দেখ মা জগদীশ্বরীর ইচ্ছা কিন্তু কেহ সহসা জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। তাহার মধ্যে এক জন আস্পর্দ্ধাধারী সোপর্দা লোক অধিক প্রস্তুত ছিল সে জিজ্ঞাসা করিল যে বাবুজী কল্য কোথা যাইবেন। বাবু ঈষদ্ হাসিয়া কহিলেন যে ঈশ্বর প্রতুল করুন পশ্চাৎ কহিব, দেবতার নিকট প্রার্থনা করহ। বাবু পর দিনে দরবার যাইবেন অতএব মজলিস অল্পরাত্রে বরখাস্ত হইল। বিদায় কালে বাবু কহিলেন যে তোমরা কল্য প্রাতে আসিও না।

পরদিনে বাটীর তাবৎ লোক ব্যস্ত কর্ম্মের ভিড়ের সীমা নাই বাবু কুঠী যাইবেন। বাবু প্রাতে স্নান করিলেন, কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া উত্তম জামা জোড়া বহুকালে পরিধান করিয়া বেশ বিন্যাস পূর্ব্বক অভুক্ত উত্তম গাড়ীতে আরোহণ করিলেন, সঙ্গে চারি জন ব্রজবাসী লাল পাগড়ী-ওয়ালা বাঁকা হামর চলিল, গাড়ী ঘর২ শব্দে ফুব্বিন বাজারে পঁহুছিল, সেখানে হাজী হাদী সাহেবের খেজুরের দোকানে উত্তীর্ণ হইলেন। হাদি সাহেব বড় লোক, বাবুর সহিত বড় প্রণয়, বাবুকে বসিতে চৌকি দিলেন, পরে উভয়ে অন্য ভাষায় আলাপ হইল বাবুর বাক্যশক্তি তাদৃক নাই তথাচ বড় লোক গাটমিট করিয়া কহিলেন। হাদী সাহেব বাবুর প্রতি কহিলেন যে অদ্য বড় গরমী, তুমি বড় মোটা হইয়াছ, তোমার কত টাকা আছে, টাকার কি দর, এক্ষণে সুদ, বাজারে টাকার অল্পতা কেন হইল বাণিয়ারা ইহার কি বলে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন যে সাহেব এ দেশে আর এক জন কাজী আসিতেন শুনি সত্য কি না, লড়াইয়ের কি খবর, এত জাহাজ আসিতেছে কেন ইত্যাদি আলাপ হইয়া বাবু ব্রজবাসীরদিগকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন যে এক জন দেখ মোল্লা ফিরোজ ঘরে আছেন কি না, আনতনি বত্রিগু সাহেব ঘরে হাজিরা খান কি না, দ্বিতীয় জনকে কহিলেন যে দেখ এয়াগু সাহেব নিশ্চিন্ত বসিয়া আছেন কি না জানিয়া আইস তবে আমি যাইব, ইহা কহিয়া গাড়ীতে সওয়ার হইলেন ও নিলাম ঘর হইয়া বাজার দিয়া বাবু বাটী আইলেন। বাটীর লোক সকলে শুষ্ক, বড় গরমি,

বাবু অভুক্ত কুঠী গিয়াছিলেন আহার হইলে হয়, সুতরাং সকলেই অতিব্যস্ত, পরিশ্রম হইয়াছে শিরঃপীড়াও হইল, আহার সুন্দররূপে করিতে পারিলেন না যৎকিঞ্চিৎ খাইয়া শয়ন করিলেন।

এখানে উম্মেদওয়ার মহাশয়েরা সূর্য্য দেখিতেছেন কতক ক্ষণে সন্ধ্যা হইবেক বাবুর নিকটে গিয়া মঙ্গল খবর শুনিব। সন্ধ্যাপরে বাবু উত্তম মছলন্দে আসিয়া বসিলেন ও প্রথমত আলাপ করিলেন যে অদ্য বড় ক্লেশ হইয়াছে দরবারহইতে আসিতে গৌণ হওয়াতে শিরঃপীড়া হইয়া শয়ন করিয়াছিলাম। বিষয় কর্ম্মের কথা বাবু কিছুই কহেন না। উম্মেদওয়ারেরা বাবুর মনঃসন্তোষজনক দিনফল যে যাহা২ শুনিয়াছিলেন দেখিয়াছিলেন অথবা রচনা করিয়াছিলেন ক্রমে২ নিবেদন করিলেন। পরে কোন ইংরাজ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইল অনুমান সিদ্ধ ব্যক্ত করিলেন কোন সাহেবের কে চাকর হইল। এই প্রকার প্রায় প্রতিদিন মজলিস হয়, অভাগা উম্মেদওয়ারেরা যে যত টাকা আনিয়াছিলেন তাহা খরচ করিলেন, পরে কর্জ্জ করিয়া বাসা খরচ চালাইলেন, যখন কর্জ্জ না পাইলেন তখন কুটুম্ব স্বজনের বাটীতে থাকিয়াও বাবুর উপাসনা করিলেন কিন্তু বাবুর অক্ষমতা প্রযুক্ত ইহাদের উপকার করিলেন না জবাবও দেন না, বরং যাতায়াতের অল্পতা হইলে কহেন যে অহো মহাশায় আপনি কোথায় গিয়াছিলেন এক কর্ম্ম উপস্থিত হইয়াছিল। তোমার কএক দিন না আইসাতে সে কর্ম্ম অন্যের হইয়াছে। এই প্রকারে বাবু কাল ক্ষেপ করেন। ('সমাচার দর্পণ', ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২১।)

এই "বাবুর উপাখ্যানে" ইংরেজী শিক্ষার প্রতি সামান্য ইঙ্গিত থাকিলেও এই সকল বাবুদের ইংরেজী আচার-ব্যবহারের দ্বারা প্রভাবান্বিত বলা চলে না। এখনও ইহারা কেবলমাত্র নবলক্ষণাক্রান্ত বাবু। কুলীনের নব লক্ষণের মত সেকালের বাবুদেরও নব লক্ষণ ছিল। যথা,—"ঘুড়ী তুড়ী জস দান আখড়া বুলবুলি মণিয়া গান। অষ্টাহে বন ভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ।"* কিন্তু ইহার পরই বাবুদের আচার-ব্যবহারে একটা পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়, তাঁহারা ইংরেজী ভাবাপন্ন হইয়া উঠিতে আরম্ভ করেন। এই ইংরেজী ধরণধারণ হিন্দুকলেজের ছাত্রদের আচার-ব্যবহারের মত নয়, শুধু বাহ্যিক ব্যবহারেই আবদ্ধ। মনে রাখিতে হইবে, হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে উন্নত ধরণের পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের সুযোগ কলিকাতায় একেবারেই ছিল না। ফিরিঙ্গি ও দু-এক জন বাঙালীর দ্বারা পরিচালিত কয়েকটি বিদ্যালয়ে নিতান্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য ও চাকুরী- সংক্রান্ত কাজ চালাইবার মত সামান্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু এই শিক্ষার ফলেই বাবুরা নিজদিগকে সময়ে সময়ে একেবারে আহেলী বিলাতী সাহেব বলিয়া মনে করিতেন। 'সমাচার দর্পণে'র "বাবু"-চরিত্রকার লিখিতেছেন:—

বাবু লেখা পড়া কিছু শিখিলেন না অথচ সর্ব্বত্র মান্য এবং পণ্ডিতেরা কহেন আপনি সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচার করিতে পারেন এবং সূক্ষ্ম বুঝিতে পারেন। এই সকল কথার দ্বারা বাবু মহাভিমানী হইয়া মনে করেন আমার বাঙ্গালির ধারা ব্যবহার বিদ্যা নিয়ম ইত্যাদি সকলি শিখা হইয়াছে এবং তদনুযায়ি কর্ম্মও সকল করা হইয়াছে। এই ক্ষণে সাহেব লোকের মত হইব এবং ধারা ব্যবহার পুরুষার্থ ধার্ম্মিকতা সৌজন্য বিচারবাক্য সেই প্রকার প্রকাশ করিব। ইহাতে কেবল বাবুর ছাতারের নৃত্য হইল। বিশেষ দেখ।

১। সাহেব লোকের ধারা একটা আছে সকালে বিকালে গাড়ীতে কিম্বা ঘোটকে আরোহণ করিয়া বেড়ান।

বাবু আপন চাকরকে হুকুম দিয়া রাখেন তোপের পূর্ব্বে নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিও প্রাতঃকালে ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া বেড়াইতে যাইব। বাবু প্রায় সমস্ত রাত্রি বেশ্যালয়ে ছিলেন, চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে বাটীতে আসিয়া শয়ন করিয়াছেন, তাহার পরে চাকর নিদ্রা ভাঙ্গাইলেক সুতরাং উঠিতেই হইল। সেই ঘুম চক্ষে ঘোড়ার উপরে সওয়ার হইয়া যাইতেছিলেন দেখেন রৌদ্র হইয়াছে এই ক্ষণে যে পথে সাহেব লোক গিয়াছে সে পথে গেলে লজ্জা পাইব। তাহাতে অন্য কোন পথে যাইতেছিলেন। ঘোড়ায় সওয়ার ভাল চিনিতে পারে বাবুর আসন বিবেচনা করিয়া পিঠহইতে ভূমিতে ফেলিয়া দিলেক, বাবু ছাইগাদায় পড়িয়া হাতে মুখে ছাই মাখিয়া সহীসের কান্ধে হাত দিয়া বাটী আইলেন। ঘোড়া দৌড়িয়া যাইতেছিল কোন সাহেব দেখিয়া আপন সহীসকে হুকুম দিয়া ঘোড়া ধরিয়া আড়গড়ায় পাঠাইয়া দিল।

২। সাহেব লোকের ব্যবহার এই যে যাহার সঙ্গে যে কথা কহেন তাহা অন্যথা হয় না অর্থাৎ মিথ্যা কহেন না।

বাবুর নিকটে অনেক লোক গমনাগমন করে তাহাতে ব্যবহার প্রায় প্রকাশ আছে। যদি কোন ভিক্ষুক বাবুর নিকটে যায় ও আপন পিতৃ মাতৃ বিয়োগাদি দুঃখ জানায় তাহাতে কহেন আমি কিছু দিব না, যাও আর দিক করিও না। ইহা শুনিয়া বাবুর কাছে মান্য কোন২ লোক সুপারিশ করে তাহাতে উত্তর করেন তোমরা কি আমাকে বাঙ্গালির মত করিতে কহ, একবার বলিয়াছি দিব না পুনরায় দিলে আমার কথা মিথ্যা হইবেক। আমার প্রাণ থাকিতেও ইহা হইবেক না, মানুষের একই কথা।

৩। সাহেব লোক যদি কাহারো সঙ্গে বিবাদ করেন তবে প্রায় যুদ্ধ করিয়া থাকেন ঘুসা কিম্বা পিস্তল ইত্যাদি মারিয়া থাকেন।

বাবুর অনুগত খুড়া কিম্বা অন্য প্রাচীন কুটুম্ব আর দাস দাসীর প্রতি যদি রাগ হয় তবে সেই প্রকার ইংরাজী ঘুশা মারেন এবং কহেন যে হামারা পিটল লেআও এই প্রকার ভয়ানক শব্দ করেন, তাহাতে ঐ দীন দুঃখিরা পলায়ন করে। বাবু সেই সময়ে আপন মনে২ পুরুষার্থ বিবেচনা করেন।

৪। সাহেব লোক রবিবার২ গ্রিজায় গিয়া থাকেন অন্য বারে বিষয় কর্ম্ম করেন।

বাবু এই বিবেচনা করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা দান তাবৎ পরিত্যাগ করিয়া রবিবারে বাগানে গিয়া কখন নেড়ীর গান, কখন শকের যাত্রা, খেঁউড় গীত শুনিয়া থাকেন।

৫। সাহেব লোক সৌজন্য প্রকাশ করেন যদি কোন লোক আপদ্-

* এই নব লক্ষণের একটি পাঠান্তর 'নববাবুবিলাসে' পাওয়া যায়। তাহা এইরূপ,—"মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান খোষ পোষাকী যশমী দান আড়িবুড়ি কানন ভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ।" (পৃ. ১৯)

গ্রস্ত হয় তবে তাহার বাটীতে গিয়া নানা প্রকারে তাহার আপদুদ্ধারের চেষ্টা করেন।

বাবুর নিকটে যদি কোন লোক আসিয়া কহে যে অমুক লোক এই প্রকার দায়গ্রস্ত। বাবু তৎক্ষণাৎ গাড়ী আরোহণ করিয়া তাহার বাটীতে গিয়া কহেন যে এ তোমার কোন দায় আমি সকল উদ্ধার করিব কিন্তু এইক্ষণে কিছু দিন অস্পষ্ট থাকহ আর বৈঠকখানায় কেন বসিয়াছ বাটীর ভিতর চল সেইখানেই পরামর্শ করিব। বাটীর ভিতর গিয়া মিথ্যা আশ্বাস বাক্যে আকাশের চন্দ্র হাতে দিয়া স্ত্রী লোক কোন দিকে থাকে তাহার অনুসন্ধান করেন, ঐ চেষ্টাতে প্রত্যহ যাতায়াত করেন।

৬। সাহেব লোকে অদালতহইতে শালিশী হুকুম দিয়া থাকেন।

বাবু শালিশ হইলেন প্রায় অদালত সকলি বুঝেন এবং ইংলিশ বুক দেখিয়া থাকেন। শালিশ হইয়া চারি মাসেও একবার বৈঠক করেন না, যদি অনেক উপাসনাতে দুই তিন বৎসরে বৈঠক হয় তবে যে পক্ষে বাবুর দয়া সেই পক্ষেই জয় হয় পরে রফানামা দেন।

৭। সাহেব লোক হিন্দী কথা কহেন তাহাতে ত কার দ কার স্থানে ট কার ড কার উচ্চারণ করেন।

বাবুকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমার নাম কি, ডাটারেম গোষ অর্থাৎ দাতারাম ঘোষ। এই সকল ছাতারের নৃত্য কি না বিবেচনা করিবেন। ('সমাচার দর্পণ', ৯ জুন ১৮২১।)

এই উপাখ্যান প্রকাশিত হইবার দুই-তিন মাস পরেই 'সমাচার দর্পণে'র এক জন পাঠক অর্দ্ধশিক্ষিত ধনী-পুত্রের রীতিনীতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পত্রটি 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত করেন :—

নীচের লিখিত কএক ধারা এ প্রদেশীয় কতকগুলি লোকের আছে, ইহাতে তাহারদিগের মন্দ হইতেছে এবং অনেক দীন দুঃখী ও বড় মানুষের বালকেরাও শিখিতেছে।...

এ প্রদেশীয় কতকগুলি বিশিষ্টানুশিষ্ট সন্তানেরদের অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই অভিমান আছে যে আমি কিম্বা আমরা বিশিষ্ট লোক অমুক ইতর লোক এই অভিমানে সর্ব্বদাই মুগ্ধ থাকেন, কিন্তু ব্যবহারে এবং বাক্যে কিছুই ইতর বিশেষ হয় না মনে করি তাঁহারা বুঝি ইতর ও বিশিষ্টের অর্থ বুঝেন না জাতি বিবেচনা করেন, কিন্তু তাঁহারদের উচিত হয় যে ব্যবহার ও বাক্য ও বিদ্যা বিবেচনা করেন, যদি জাত্যংশে বড় হও তাহার পূর্ব্বের রীতি মনে কর, আর যদি না জান কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর বড় জাতি ও বড় কুলীন ও গোষ্ঠীপতি কি নিমিত্ত হইয়াছিল সে সকল কেবল রাজদত্ত মর্য্যাদা কেবল ব্যবহার দেখিয়া রাজা দিয়াছিলেন অতএব এক্ষণকার ব্যবহার কি প্রকার তাহা একবার মনে কর না শুধু অভিমান। আমি কতক ব্যবহার স্মরণ করাই।

১। বিশিষ্ট লোকের সন্তান বটেন পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পিতা পিতামহপর্য্যন্ত নাম বলিতে পারেন পরে পিতৃ পক্ষ মাতৃ পক্ষের বংশাবলি আর কিছুই আইসে না, তাহাতে অপ্রতিভ না হইয়া জিজ্ঞাসকের উপরে রাগাশক্ত হইয়া কহেন আমি কি ঘটক।

২। সুপুরুষ হইতে মহাসাধ মনে ভাবেন বড় মানুষের ঘরে জন্মিয়াছি যদি সৌন্দর্য্য না দেখাই তবে লোকে ছোট লোক কহিবেক, ইহাতে করিয়া স্বর্ণ মুক্তা হীরা প্রভৃতির আভরণ অর্থাৎ দোনরি তেনরি পাঁচনরি হার বাজুবন্দ উপলক্ষে ইষ্ট কবচ গোট চাবির শিকলি ইত্যাদি গহনা। ও কালাপেড়ে রাঙ্গাপেড়ে শালপেড়ে কাঁকড়াপেড়ে লিখক কহে ইচ্ছা হয় ছাইপেড়ে ধুতি পরিধান করেন। এ সকল স্ত্রী লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে ইহাতে তোমাকে সুন্দর কোন প্রকারে দেখা যায় না ও বড় লোক কহা যায় না বরং ছোট লোক বিলক্ষণ সাবুদ হয়, আর ঐ নটবর বেশ বিন্যাস দেখিলে বোধ হয় না যে কোন সভায় কিম্বা সাহেব লোকের দরবার যাইতেছেন, স্পষ্ট বুঝা যায় যে বেশ্যালয়ে গমন হইতেছে।

৩। বাক্য বিন্যাস যেখানে বলিতে হইবেক অমুক বড় কৌতুক করিয়াছে সেখানে কহেন বা কি হদ্দ মজা করিয়াছে, নিয়ে যাও তাহার স্থানে লিএজা, চুচূঁড়া চুঁড়া, ফারাশডাঙ্গা ফড্ডাঙ্গা, কামড়িয়াছে কেমড়েছে, টাকার নাম ট্যাকা, মুখের নাম ব্যাঁৎ, করো নাম কড়ো। পরিহাস বাক্য আইস শাশুড়ে বৌও ইত্যাদি বাক্য যিনি অনেক কহিতে পারেন তিনি সুবক্তা, যাঁহাকে ঐ পরিহাস করে তাহারি বা কত মনোবিনোদন হয় তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র কহেন অমুকের পুত্র বড় সুজন বক্তা, সকলকে লইয়া আমোদ করেন।

৪। বিদ্যা গোটা কতক বিলাতী অক্ষর লিখিতে শিখেন আর ইংরেজী কথা প্রায় দুই তিন শত শিখেন। নোটের নাম লোট, বডিগার্ডের নাম বেনিগারদ, লোরি সাহেবকে বলেন নৌরি সাহেব এই প্রকার ইংরেজী শিখিয়া সর্ব্বদাই হুট গোটেহেল ডোনকের ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করা আছে আর বাঙ্গলাভাষা প্রায় বলেন না এবং বাঙ্গালি পত্রও লিখেন না, সকলকেই ইংরেজী চিঠী লিখেন তাহার অর্থ তাঁহারাই বুঝেন, কোন বিদ্বান্ বাঙ্গালি কিম্বা সাহেব লোকের সাধ্য নহে যে সে চিঠী বুঝিতে পারেন। ('সমাচার দর্পণ', ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮২১।)

বলা বাহুল্য এই বাবুদের নৈতিক চরিত্র অনেক সময়েই অনুকরণের যোগ্য হইত না। 'সমাচার দর্পণে'ই আর এক জন পত্রপ্রেরক বলিতেছেন :—

এই কলিকাতা মহানগরে অনেক২ ভাগ্যবান লোকেরা পুরুষানুক্রমে পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান বিদ্যাভ্যাস দেবতা ব্রাহ্মণ সেবা ইষ্টপূজা প্রভৃতি সৎকর্ম্মে নিয়ত কালক্ষেপণ করিতেছেন। কিন্তু এঁহারদিগের কাহারো২ যুবা সন্তানেরা কুজন সহবাসে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মে প্রায় বিরত হইয়া নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন যেহেতুক কুশীল লোকেরা বিদ্যা ও ধন রহিত আপন ক্ষামতায় উদর পালন হয় না ইহাতে নয়ক্রীড়া কিরূপ চলে, কেবল অনায়াসসাধ্য চুল কাটা পইতা মোটা লম্বা কাছা উড়ে কোঁচা করিয়া লম্পটাভিমানী হয়। তাহারা ইষ্টসিদ্ধির কারণ এক২ বাবুর সহিত বয়স্যতার আলাপদ্বারা সর্ব্বদা সহবাস করিয়া প্রীতি জন্মায় সুতরাং আহারাদি চিন্তা দূর হয়। বাবুরাও ঐ অসদালাপদ্বারা ক্রমে২ ঐ পথবর্ত্তী হন। যেহেতুক সংসর্গজাদোষ-গুণাভবন্তি ইত্যাদি।"

নববাবুদিগের চরিত্রদোষের ইহা ছাড়া আরও বহু ইঙ্গিত সমসাময়িক সাহিত্যে পাওয়া যায়। 'নববাবুবিলাস,' 'দূতী-বিলাস' ও 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি এই সকল অভ্যাসের কুফল দেখাইয়া বাবুদের চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে চরিত্রবান্ লোকও যে ছিল না, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। সমাজ-সংস্কারের

উদ্দেশ্যে লিখিত রচনায় প্রায়ই দোষের একটু বেশী উল্লেখ থাকে। সুতরাং এই সকল পুস্তকের বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া সে-যুগের নব্য কলিকাতা সমাজে লাম্পট্য ও নেশা-ভাঙে আসক্তি ভিন্ন আর কিছু ছিল না মনে করিলে অন্যায় হইবে।

২

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে-বাবুদের কথা বলা হইল, তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মীরা কি-ভাবে দিন কাটাইতেন তাহা জানিবার আগ্রহ অনেকেরই হইতে পারে। সুতরাং সে-যুগের সামাজিক চিত্র হইতে উঁহাদিগকে বাদ দিলে বলিবে না। মেয়েদের জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে তথ্য ও বিবরণ পুরুষদের অপেক্ষা পরিমাণে অনেক কম। তবে যেটুকু পাওয়া যায় তাহা হইতে বুঝা যায় যে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের জীবন অনেক সময়েই বেশভূষা, মজলিশ, যাত্রা, গানশোনা ও চিরপ্রচলিত ধর্ম্মকর্ম্মেই কাটিত। বড় ঘরের মেয়েদের মজলিশের একটি বিবরণ আমরা 'দূতী-বিলাসে' পাই। সেটি এইরূপ :—

ভোজনান্তে সকলে বসিল সভা করি।
তাকিয়া লাগায় তারা লজ্জা পরিহরি॥
গোপী দাসী সাজি আনি দিল পান দান।
কত মত ভুকুটি করিয়া পান খান॥
কাহারো আলবোলা এলো কার গুড়গুড়ি।
সকলে তামুক খায় নবীনা কি বুড়ি॥
এ সব হইলে পরে রাত্রি কিছু ছিল।
প্রেমিকারা প্রমারার খেলা আরম্ভিল॥
যাও থাক এই শব্দ কেহ কেহ কহে।
কেহ মৌরেস্ত ডাকে কেহ তাহা সহে।
সাবাসি কাগজ বলে কোন রসবতী।
শুনিয়া কাগজ ফেলে পেঁপুড়ি যুবতী॥ (পৃ. ৭৯)

এই যুবতীদের অঙ্গে প্রায়ই অলঙ্কারের বাহুল্য ও বস্ত্রের স্বল্পতা দেখা যাইত। যে-বাড়ির মেয়ে-মজলিশের বর্ণনা এইমাত্র দেওয়া হইল, তাহারই যুবতী-গৃহিণীর সাজসজ্জার নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা পাওয়া যায় :—

কুটিল কুন্তল কাল কপাল উপর।
সৌদামিনী জিনি সিঁতি অতি শোভাকর॥
কাণবালা কর্ণফুল কর্ণেতে পরেছে।
মনোহর মুক্তা লচ্ছা তাহাতে দিয়েছে॥
মুক্তায় মণ্ডিত নত নাসায় দুলিছে।
মঞ্জনে মার্জ্জিত দন্ত দামিনী খসিছে॥
মুক্তালচ্ছা গলদেশে সাজে সাতনরি।
হীরাপান্না ধুকধুকি আছে শোভা করি॥

বাহুতে পরেছে বাজু হীরাতে জড়াও।
পরেছে তাবিজ কোলে করিয়া মেলাও॥
খানি মুড়কি মরদানি পৈঁছে আছে হাতে
নবরত্ন অঙ্গুরীয় শোভা করে তাতে॥
হীরার ফুলেতে স্বর্ণবালা সুশোভিত।
কটীতে কনক চন্দ্রহার মনোনীত॥
চাবিশিকি তাহে পুন দিয়েছে ঝুলায়ে।
পদাঙ্গুলে আছে চুটকি ছাল্লাতে মিশায়ে॥
সুবর্ণের গোল মল পরিয়াছে পায়।
পরেছে ঢাকাই সাড়ী অঙ্গ দেখা যায়॥ (পৃ. ৪৯-৫০)

আবার,—

পরিয়াছে খাসা সাড়ী কাশা সাড়ী তার।
কুসুমে রঙ্গান ভাল বড় আঁচলাদার॥
মেতিতেল দিয়া মাথা আঁচড়িয়া বাঁধে।
দিয়েছে সিন্দুর ভালে যেন রবি চাঁদে॥
কালি দিয়ে উল্‌কি পরেছে ভুরুমাঝে।
তদুপরি সুবর্ণের টিকা ভাল সাজে॥
বিনা কর্ণফুলে কাণে ঝুমকা দোলায়।
সোণার ঠোঁসের নং আছে নাসিকায়॥
চাঁপকলি স্বর্ণমালা হাঁসলি রূপার।
গলায় দিয়াছে সব শোভা কত তার।
বাউটা পৈঁইছা লৌহ রূপাতে বান্ধান।
রূপার মাদুলি হাতে রেসমে গাঁথান॥
বড় মোটা বাঁকমল পরিয়াছে পায়।
আর অলঙ্কার ঢাকা নাহি দেখা যায়॥* (পৃ. ৭৫)

বলা বাহুল্য পল্লীগ্রামে কলিকাতার পুরুষদের মত কলিকাতার মেয়েদেরও বিশেষ দুর্নাম ছিল।† এই অপবাদ সম্ভবতঃ পল্লীগ্রামবাসীদের উত্তেজিত কল্পনাপ্রসূত। তবে কলিকাতার মেয়েরা যে কোন-কোন বিষয়ে একটু স্বাধীনতা দেখাইতেন তাহার আভাসও আমরা পাই। 'দূতীবিলাসে' দেখিতে পাই, কলিকাতার মেয়েরা পল্লীগ্রামের মেয়েদের পরাধীনতার সম্বন্ধে ধিক্কার দিতেছেন :—

তামাসা দেখিতে যদি কোন মেয়ে চায়।
ভাতারের মত নৈলে যেতে নাহি পায়॥
আপন খুসিতে কেহ দেখিবার তরে।
যে যায় তাহাকে স্বামী ঝাঁটাপিটা করে॥
শুনে নাকে হাত দিয়ে কহে নারীগণ।
হেন যারা সহে ধিক্ তাদের জীবন॥ (পৃ. ৭৬)

* 'নববাবুবিলাসে'ও অনেক রকমের গহনা ও শাড়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, "কাণবালা, চেঁড়ি ঝুমকো, বীরবৌলি" (পৃ. ৩৬) প্রভৃতি গহনা ও "শান্তিপুর অম্বিকা বাদাগাছি ঢাকা চন্দ্রকোণা খাস-বাগান বরাহনগর প্রভৃতি নানা স্থানের শাটী শালপেড়ে কাঁকড়াপেড়ে লালপেড়ে নীলপেড়ে তাবিজপেড়ে বরানগুরে ডুরে" (পৃ. ৩৭)।

† 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮২ দ্রষ্টব্য।

নিজেদের কিছু কিছু বা কোন-কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে তাঁহারা এইরূপ কথা নিশ্চয়ই বলিতেন না। মেয়েরা যে প্রচলিত আমোদ-প্রমোদে স্বাধীনভাবে যোগ দিতেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।—

কোন স্থানে চৈতন্যমঙ্গল গান হইতেছিল, সেই স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়া অনেক লোক শ্রবণ করিতে গিয়াছিল বিশেষতঃ স্ত্রী লোক অধিক। ইতোমধ্যে গায়ক আপন গুণ প্রকাশ অনেক করিতে লাগিল এবং অঙ্গভঙ্গী ও কটাক্ষ নৃত্য অনেক দেখাইল। তাহাতে কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রী অতিগুণগ্রাহিকা ও গুণবতী ঐ সকল দেখিয়া মুগ্ধা হইয়া আপন পুত্রের হস্তে গায়ককে পেলা দিবার নিমিত্ত আটটা টাকা দিলেন। সে বিশ বৎসরের বালক বাবু গায়ককে পেলা দিলে গায়ক আপন নায়ককর্তৃক যে পুষ্পমালা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা বাবুর গলে দোলায়মান করিলেক এবং কানে২ কি কহিয়া দিলেক। পরে ঐ শিশু প্রামাণিক বাবু ঐ মালা গলে দিয়া তাহার জননীর নিকটে যাইবামাত্র গুণবতী ঐ মালা সন্তানের গলহইতে আপন গলে দোলায়মান করত রূপ ঐশ্বর্য্য মাৎসর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে কোন সুরসিকা বিধবা স্ত্রী তিনিও মহাধনাঢ্য লোকের স্ত্রী তিনি বিবেচনা করিলেন যে আমি সত্বে এই মালার পাত্রী অন্য কেহ নহে, ইহাতে ঐ গুণবতীকে কহিলেক যে আমাকে মালা দেহ। গুণবতী উত্তর করিলেক যে কারণ কি। সুরসিকা কহিতে লাগিল যে বিবেচনা কর যদি ধনের সংখ্যা করিস তবে ধনাঢ্য বলিয়া আমার স্বামির নাম খ্যাত ছিল রাঢ়ে বঙ্গে কে না জানে, যদি সৌন্দর্য্য বিবেচনা করিস তবে আমার রূপ দেখ এবং এই সভার স্ত্রী পুরুষ সকলে দেখিতেছে আর ঐ গায়ককেও জিজ্ঞাসা কর, যদি ভাবিস তুই সধবা অনেক অলঙ্কার গায়ে দিয়াছিস্ আমার গলে যে মুক্তার মালা ও হস্তে যে হীরার আঙ্গুঠী আছে তোর সকল অলঙ্কারের মূল্য ইহার একের তুল্য হইবেক না। যদি বয়সের গরিমা করিস তবে দেখ তোর বয়স পঁচিশ বৎসরের অধিক নহে আমার বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়াছে যদি সন্তানের অভিমান করিস তোর চারি পুত্র বিনা নহে আমার পাঁচ পুত্র ও পৌত্র ও দৌহিত্র হইয়াছে। পরে গুণবতী কহিলেক যে গায়ক ঠাকুর এ মালা আমাকে দিয়াছেন আমার পুত্রের কানে২ কহিয়াছেন এবং আট টাকা পেলা দিয়াছি, চক্ষুখাগী তাহা কি দেখিস নাই। পরে সুরসিকা কহিলেক তুই আট টাকা পেলা বই দিস নাই, আমি বিলাতি ধুতি ঢাকাই একলাই চেলির জোড় সোনার হার বাজু দিয়াছি আর আমার সঙ্গে অনেক কালের জানা শুনা। এই প্রকার কথোপকথনদ্বারা বড় গোল হইলে গানভঙ্গ হইল, শেষে দুই জনে মারামারি করিয়া ঐ মালা ছিড়িয়া ফেলিলেক। সে উভয়ের সোনার অঙ্গে হায় কত নখাঘাতে ক্ষত হইয়া অঙ্গ ভঙ্গ শরীর চূর্ণ ও রক্তপাত হইল, যত লোক বাহিরে ছিল ঐ রাক্ষসীরদের মারা দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। শেষে দুই জনে প্রতিজ্ঞা করিলেক যে ভাল দেখা যাইবেক গায়ককে কে কত টাকা দিতে পারে আর গায়ক ঠাকুরকে আপন বাটীতে লইয়া যাইতে পারে।

তবে এই স্বাধীনতার ফলে মাঝে মাঝে যে বিভ্রাটও উপস্থিত হইত তাহার কথা এই কাহিনীতেও রহিয়াছে, অন্যত্রও পাই। যেমন,

...এই কলিকাতা রম্য নগরে কোন মহাশয়ের বণিতা কর্ত্তার অজ্ঞাতে এই সকল ক্রিয়া [বৈষ্ণবের পূজা, প্রসাদগ্রহণ ইত্যাদি] প্রতিদিন করিতেন। এক দিবস ঐ কর্ত্তা এই কথা শ্রবণান্তে রাগান্বিত হইয়া এ বিষয় জ্ঞানার্থে এক স্থানে লুক্কায়িত থাকিলেন। কিয়ৎ কালান্তরে ঐ অধিকারির প্রেরিত বৈষ্ণবহস্তস্থ রজতনির্ম্মিত পাত্র তদুপরি নানাবিধোপহারযুক্ত দিব্যান্ন ব্যঞ্জন চব্য চোষ্য লেহ্যপেয় পায়স পিষ্টক মিষ্টান্নসংযুক্ত ভূরি২ অন্তঃপুরে গৃহিণী সমীপে উপস্থিতমাত্রে ক্রোধাবিষ্ট তর্জন গর্জনযুক্ত ঐ লুক্কায়িত কর্ত্তা বিষ্ণু-পরায়ণ বাবাজীর মস্তকোপরি আর্কফলা সদৃশ কেশাকর্ষণপূর্ব্বক চপেটাঘাত মুষ্ট্যাঘাত পদাঘাত পাদুকাঘাত চতুর্বিধাঘাতে বাবাজী অঙ্গভঙ্গ গৌরাঙ্গ প্রাপ্ত প্রায় হইলেন। এই সময়ে গৃহিণী দেখিয়া সাশ্রুনয়নে গদগদস্বরে কহিতেছেন, আমারদিগের সুস্থিরা লক্ষ্মী অস্থিরা হইলেন। হে প্রভু কি করিলা বৈষ্ণব গোঁসাঞীর এত অপমান। যে হউক অত্যল্প কালেই প্রতিফল হইবেক। এই বাক্য বাবাজী শ্রবণ করিয়া কহিতেছেন আমার অপরাধ কি, অধিকারি মহাশয় আমাকে এ কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন এবং গৃহিণীর মতে আগমন করি ইহাতে আমার স্বার্থ কিছু নাই। এ মানী বাবাজী মানচ্যুতহইয়া অক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এই নারী-জীবনেও ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য প্রভাব অনুভূত হইতে আরম্ভ হইল। বাংলা দেশে স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা কি-ভাবে হয়, তাহার পরিচয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রচিত একটি পুস্তকে দুইটি গৃহস্থ-ঘরের মেয়ের কথোপকথনের মধ্যে আমরা পাই :—

প্র। ওলো। এখন যে অনেক মেয়্যা মানুষ লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিল এ কেমন ধারা। কালে২ কতই হবে ইহা তোমার মনে কেমন লাগে।

উ। তবে মন দিয়া শুন দিদি। সাহেবেরা এই যে ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতেই বুঝি এত কালের পর আমারদের কপাল ফিরিয়াছে, এমন জ্ঞান হয়।

প্র। কেন গো। সে সকল পুরুষের কায। তাহাতে আমারদের ভাল মন্দ কি।

উ। শুন লো। ইহাতে আমারদের ভাগ্য বড় ভাল বোধ হইতেছে; কেননা এ দেশের স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া করে না, ইহাতেই তাহারা প্রায় পশুর মত অজ্ঞান থাকে। কেবল ঘর দ্বারের কায কর্ম্ম করিয়া কাল কাটায়।

প্র। ভাল। লেখ পড়া শিখিলে কি ঘরের কায কর্ম্ম করিতে হয় না। স্ত্রীলোকের ঘর দ্বারের কায রাঁধা বাড়া ছেলাপিলা প্রতিপালন না করিলে চলিবে কেন। তাহা কি পুরুষে করিবে।

উ। না। পুরুষে করিবে কেন, স্ত্রীলোকেরই করিতে হয়, কিন্তু লেখা পড়াতে যদি কিছু জ্ঞান হয় তবে ঘরের কায কর্ম্ম সারিয়া অবকাশ মতে দুই দণ্ড লেখা পড়া নিয়া থাকিলে মন স্থির থাকে, এবং আপনার গণ্ডাও বুঝিয়া পড়িয়া নিতে পারে।

প্র। ভাল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কথায় বুঝিলাম যে লেখা পড়া আবশ্যক বটে। কিন্তু সে কালের স্ত্রীলোকেরা কহেন, যে লেখা পড়া যদি স্ত্রীলোকে করে তবে সে বিধবা হয় এ কি সত্য কথা, যদি এটা সত্য হয় তবে মেনে আমি পড়িব না, কি জানি ভাঙ্গা কপাল যদি ভাঙ্গে।

উ। না বইন, সে কেবল কথার কথা। কারণ আমি আমার ঠাকুরাণী দিদির ঠাঁই শুনিয়াছি যে কোন শাস্ত্রে এমত লেখা নাই, যে মেয়ামানুষ পড়িলে রাঁড় হয়। কেবল গতর শোগা মাগিরা এ কথার সৃষ্টি করিয়া তিলে তাল করিয়াছে। যদি তাহা হইত তবে কত স্ত্রীলোকের বিদ্যার কথা পুরাণে শুনিয়াছি, ও বড়২ মানুষের স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই লেখা পড়া করে এমত শুনিতে পাই। সংপ্রতি সাক্ষাতে দেখ না কেন, বিবিরা তো সাহেবের মত লেখা পড়া জানে, তাহারা কেন রাঁড় হয় না।

প্র। ভাল। যদি দোষ নাই তবে এত দিন এ দেশের মেয়্যা মানুষে কেন শিখে নাই।

উ। শুন লো। যখন স্ত্রীলোক মা বাপের বাড়ী থাকে, তখন তাহারা কেবল খেলাধুলা ও নাট রঙ্গ দেখিয়া বেড়ায়। বাপ মায়ও লেখা পড়ার কথা কহেন না। কেবল কহেন, যে ঘরের কায কর্ম্ম রাঁধা বাড়া না শিখিলে পরের ঘর কন্না কেমন করিয়া চালাইবি। সংসারের কর্ম্ম দেয়া থোয়া শিখিলেই শ্বশুর বাড়ী সুখ্যাতি হবে। নতুবা অখ্যাতির সীমা নাই। কিন্তু জ্ঞানের কথা কিছুই কহেন না।

প্র। হায়২ কেমন দুঃখের কথা দিদি। ভাল প্রায় সকল গাঁয়েই তো পাঠশাল আছে, তবে কন্যারা আপনারাই সেখানে গিয়া কেন শিখে না। তখন তো বালাকাল থাকে কোনস্থানে যাইবার বাধা নাই।

উ। হেদে দেখ দিদি। বাহির পানে তাকাইতে দেয় না। যদি ছোটং কন্যারা বাটীর বালকের লেখা পড়া দেখিয়া সাদ করিয়া কিছু শিখে ও পাততাড়ি হাতে করে তবে তাহার অখ্যাতি জগৎ বেড়ে হয়। সকলে কহে যে এই মদ্দা চেটি ছুঁড়ি বেটা ছেলের মত লেখা পড়া শিখে এ ছুঁড়ি বড় অসৎ হবে। এখনি এই শেষে না জানি কি হবে। যে গাছ বাড়ে তাহার অঙ্কুরে জানা যায়।

প্র। তবে আমারদের শিক্ষা বুঝি হবে না দিদি।

উ। হবে না কেন। আমরা তো ভালমানুষের কন্যা পাঠশালায় গেলে ভাই বাপ গালি দিবে। সাহেব লোকের পাঠশালার কোন শিক্ষিতা কন্যা আনিয়া ঘরের মধ্যেই শিখিব।*

৩

ইতিপূর্ব্বে চৈতন্যমঙ্গল গানের যে বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে উহা সে-যুগের আমোদ-প্রমোদের একটি দৃষ্টান্ত। তখনও থিয়েটার প্রভৃতি পাশ্চাত্য ধরণের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা হয় নাই। ধনী ব্যক্তিরাও যাত্রা, কবি, খেঁউড়, সং, বাইনাচ, কুস্তী, বুলবুলি পাখীর লড়াই প্রভৃতি প্রচলিত আমোদ-প্রমোদেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। বাইজীর নাচ তখন জনপ্রিয় আমোদ ছিল, এমন কি দুর্গোৎসবেও বাইজীর নাচ হইত। 'সমাচার দর্পণে' আমরা সে-যুগের আমোদ-প্রমোদের বহু বিবরণ পাই। উহাদের মধ্যে দুই-চারিটি উদ্ধৃত করিয়া সেকালের আমোদ-প্রমোদের একটু পরিচয় দিব। প্রথমেই কবির লড়াইয়ের কথা ধরা যাক্। ১৮২৯ সনের 'সমাচার দর্পণে' কলিকাতার এক বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়িতে কবির লড়াইয়ের এই বিবরণটি প্রকাশিত হয়:—

"এই নগর মধ্যে শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিকের দর্মেহাটার বাটীতে গত ৬ মাঘ [১২৩৫ সাল] শনিবার রাত্রিতে বাগবাজারনিবাসি ও যোড়াসাঁকোনিবাসিদিগের দুই দলে কবিতা সংগীতের ঘোরতর সমর হইয়াছিল। তদ্বিশেষ এই, বাগবাজারবাসি নানাকাব্যাভিলাষি রসিক রসজ্ঞ গান বাদ্যাদি বিদ্যায় বিজ্ঞবিশিষ্ট সন্তান কএক জন এক সম্প্রদায়, তন্মধ্যে শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র বসু অগ্রগণ্য অর্থাৎ দলপতি। আর যোড়াসাঁকোস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ তন্তুবায়প্রভৃতি কএক ব্যক্তির এক দল, এ দল বড় সবল যেহেতুক শ্রীযুত বৃন্দাবন ঘোষাল ও শ্রীযুত রামলোচন বসাক ইঁহারদিগের দুই জনের দুই দল ছিল এই উভয় দল মিলিত হইবায় সবল বলা যায়। দুই দলপতি অতি বিলম্বে অর্থাৎ দুই প্রহর রাত্রির পর প্রায় এক ঘণ্টার সময় স্বজনগণ সমভিব্যাহারে আসরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমতঃ বাগবাজারবাসিরা গানারম্ভ করিবেন তদুদযোগে যে সাজ বাজান কারণ যন্ত্রের মিলন করণে অধিক যত্ন মন্ত্রণাপূর্ব্বক সন্তাপ প্রায় সকলকেই দিলেন, ফলতঃ বিস্তর বিলম্ব হওয়াতে প্রায় তাবতে তিক্তবিরক্ত হইলেন, এমত সময়ে একেবারে যন্ত্রিবরে ঢোলক তাম্বুর মোচঙ্গ মন্দিরা পরিপাটী সিটি বাদ্যোদ্যম করিলেন। তাহা শ্রবণে বহুজনে ধন্যবাদ করিলেন, অনন্তর গানারম্ভ প্রথমতঃ ভবানীবিষয় পরে সখীসম্বাদ পরে খেঁউড় ইহাতে উভয় দলে কবিতা কৌশলে তান মান বাণস্বরূপ হইয়া ঘোরতর সমর হইয়াছিল। সে রণে রসিক বিচক্ষণসমূহের মনোরঞ্জন হইয়াছিল যেহেতুক গায়কগণের মৃদু মধুর মনোহর সুস্বর তালমান কবিতা রচনা বিবেচনা করত কে না সুখী হইয়াছিলেন। কবিতাযুদ্ধ যুদ্ধ এই দেখা গেল এমত নহে ইহার পূর্ব্বে অপূর্ব্ব গীত শুনা গিয়াছে কিন্তু সম্প্রতি এমত বোধ হইয়াছে যে কবিতা সংগ্রাম এ অবধি বিশ্রাম বা হয় বুঝি এমত আর হবে না। এই প্রকার গানে রাত্রি অবসানের পর দিনমানে ৮ দণ্ড বেলাপর্য্যন্ত হইয়াছিল। উভয় পক্ষের জয় পরাজয়হেতুক শ্রীযুত বাবু বীরনৃসিংহ মল্লিক বিবেচক স্থির হইয়াছিলেন। তিনি তাবতের সাক্ষাৎকার বাগবাজারবাসিদিগের জয় কহিয়া দিবায় তাঁহারা জয়পতাকা উড্ডীয়মান করত অর্থাৎ জয়ঢাকস্বরূপ জয়ঢোল বাদ্যিয়া রাজপথে পথিক লোককে সন্তুষ্ট করত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ('সমাচার দর্পণ,' ২৪ জানুয়ারি ১৮২৯)

বুলবুলির লড়াইয়ের একটি বর্ণনাও এখানে দেওয়া প্রয়োজন। 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় আমরা বুলবুলি পাখীর লড়াইয়ের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাটি পাই:—

বুলবুলাখ্য পক্ষির যুদ্ধ।—বহুকালাবধি এতন্নগরে একটা মহামোদের ব্যাপার আছে। বুলবুলাখ্য পক্ষিগণের যুদ্ধ ঈক্ষণে অনেকেই সুখি হইয়া থাকেন, এজন্য ধনবান্ এবং সুরসিক বিচক্ষণগণের মধ্যে কেহ২ ঐ সুখ বিলক্ষণসাধনকারণ সম্বৎসরাবধি উক্ত পক্ষি পালনকরণ বহু ধন ব্যয় করিয়া থাকেন শীতকালে এক দিবস যুদ্ধ হয়। সংপ্রতি গত ১৪ মাঘ রবিবার শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের বাটীতে ঐ যুদ্ধ হয় তাহাতে মহাসমারোহ হইয়াছিল

* জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার-রচিত 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক', ৩য় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত), ১৮২৪ সন, পৃ. ১৪।

যেহেতুক দেব বাবুর পক্ষিদলের বিপক্ষ হরিফ শ্রীযুত বাবু হরনাথ মল্লিকের এক দল পক্ষী, এতদুভয় পক্ষির পক্ষাধিপ মহাশয়েরা ঐ যুদ্ধদর্শনে আত্মীয় স্বজন সজ্জনগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। অপর অনেক লোক আছেন তাঁহারদিগকে তদ্বিষয়ে আহ্বান করিতেও হয় নাই যেহেতুক তাঁহারা সোয়াকীনরূপে খ্যাত অর্থাৎ তদ্বিষয়ঘটিত সুখে মহাসুখি হন, সুতরাং এই ত্রিবিধপ্রকার লোক সমারোহের সীমা কি। যাহারা ঐ যুদ্ধসেনার শিক্ষক অর্থাৎ খলীপা রণভূমিতে উপস্থিত হইলে শ্রীযুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর জয় পরাজয় বিবেচনানিমিত্ত শালিস হইলেন। পরে উভয় দলের পক্ষিরা ঘোরতর সমর করিল। দর্শকেরা মল্লিক বাবুর সেনাশিক্ষক খলীপাদিগকে বার২ ধন্যবাদ করিলেন কিন্তু সর্ব্বশেষে অর্থাৎ দুই প্রহর দুই ঘণ্টার পর মল্লিক বাবুর পক্ষ পক্ষি পরাজিত হইলে সভা ভঙ্গ হইল। (৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।)

সে-যুগের আর একটি আমোদের ব্যাপার ছিল মাহেশের রথযাত্রা। উহা খুব ধুমধামের সহিত হইত ও কলিকাতা হইতে বহু লোক মাহেশে আমোদ-প্রমোদ করিতে যাইতেন। এই স্নানযাত্রার বর্ণনা ও উহাতে যে অনেক রকমের অনাচার হইত তাহার আভাস আমরা কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় পাই। কিন্তু 'হুতোম' প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্বেও এক জন অজ্ঞাতনামা লেখক 'সমাচার দর্পণে' মাহেশের রথযাত্রার কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন। ১৮২১ সনের ২৩এ জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উপদেশাত্মক একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল।*

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভ হইতেই কলিকাতায় দুর্গোৎসব প্রভৃতি অতিশয়—এবং অনেক সময়ে অনাবশ্যক—আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইত। এই আড়ম্বর ও অর্থব্যয় সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে—বিশেষতঃ বিবাহ উপলক্ষেও দেখা যাইত। ইহার দৃষ্টান্ত হিসাবে সমসাময়িক দু-একটি বিবরণ উদ্ধৃত করিব।

বিবাহ।—মোং জনাইর শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু গোলোকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু হরদেব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু তারকনাথ মুখোপাধ্যায় পাঁচ সহোদর প্রত্যেকেই গুণবান্ ও ভাগ্যবান্ ও ধার্ম্মিক ও দাতা ও দয়ালু এবং পরস্পর পঞ্চ ভ্রাতা সংপ্রীতিপূর্ব্বক সুখ্যাত। এঁহারদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীযুত বাবু তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের শুভবিবাহ গত ৯ ফিব্রুআরি বাঙ্গলা ২৮ মাঘ শনিবারে মোং বরাহনগর শ্রীযুত গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীতে হইয়াছে। তাহাতে যেমত সমারোহ হইয়াছিল এরূপ গঙ্গার পশ্চিম পারে সংপ্রতি প্রায় হয় নাই। প্রথমতঃ মজলিসের ঘর ডাকের সাজ ও মোমের সাজ দ্বারা সুশোভিত এবং অপূর্ব্ব বিছানাতে মণ্ডিত ও শ্বেত নীল পীত রক্তবর্ণ ঝাড় ও লাণ্ঠন ও দেওয়ালগিরি-প্রভৃতি নানাবিধ রোশনাই হইয়া বিবাহের পূর্ব্ব চারি দিবস নাচ ও গান হইল। তাহাতে বড় মিয়া ও ছোট মিয়া ও নেকী ও কাশ্মীরিপ্রভৃতি প্রধান২ গায়ক আর২ অনেক তয়ফাও আসিয়াছিল এ সকল গায়কেরা যে মজলিসে আইসে সে মজলিস সুখদায়ক হয়। এবং সামাজিক ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপকেরদিগের নিমন্ত্রণপূর্ব্বক সমাদরে আনয়ন করিয়া নানাবিধ সম্মান করিয়াছেন এবং দেশ বিদেশীয় ঘটক ও কুলীন যত আসিয়াছিলেন তাহারদিগের বিবেচনা মত পুরস্কার করণে অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে। ('সমাচার দর্পণ', ৯ মার্চ ১৮২২।)

কাশীপুর মোকামের শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের শুভ বিবাহ ৯ বৈশাখ মঙ্গলবারে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্রীর সহিত সভাবাজারের মহারাজের পুরাতন বাটীতে হইয়াছে। কাশীপুরে বিবাহের পূর্ব্বে পাঁচ দিবস মজলিস হইয়াছিল তাহার প্রথম তিন দিবস কেবল ইঙ্গরাজের মজলিস হইয়াছিল ঐ মজলিসে শহরস্থ অনেক ভাগ্যবান সাহেব লোক ও বিবি লোক আগমন করিয়াছিলেন এবং শহরস্থ তাবৎ নর্ত্তক নর্ত্তকী আসিয়াছিল তাহারদিগের নৃত্য ও গীত দর্শন শ্রবণ করিয়া সকলে তুষ্ট হইয়াছেন এবং বাবুর শিষ্টতা সভ্যতাতে যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধিত হইয়া সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। শেষ দুই দিবস বাঙ্গালি মজলিস হইয়াছিল তাহাতে শহরস্থ অনেক২ ভাগ্যবান লোক ও দেশ ও বিদেশস্থ নিমন্ত্রিত ঘটক কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতপ্রভৃতির আগমন হইয়াছিল, ঐ দুই রাত্রিতে উত্তমরূপ নাচ গানেতে অতিশয় আমোদ হইয়াছিল। বিদেশস্থেরদিগের এমত সুন্দর বাসা ও সিধার পারিপাটা করিয়া দিয়াছিলেন যে তাহারা নিবাসাপেক্ষা সুখ বোধ করিয়াছিলেন। শহরস্থ ও চিতপুর ও কাশীপুর ও বরাহনগরের দলস্থ তাবৎ ব্রাহ্মণের বাটীতে বস্ত্রালঙ্কার ও শংখ তৈল হরিদ্রাদি পাঠাইয়া দিয়াছেন। আরো শুনা গেল যে নয় দণ্ড রাত্রির পর লগ্ন স্থির হইয়া সন্ধ্যা সময়ে বর ও বরযাত্র যাত্রা করিলে কৃত্রিম পাহাড় কৌটা বাগান নৌকাপ্রভৃতি নানাবিধ ছবি সঙ্গে গিয়াছিল ও ইস্তক কাশীপুর লাগাদ মহারাজের বাটী আন্দাজ দুই ক্রোশ পথ সমান রোশনাই হইয়াছিল। কিন্তু যখন মহারাজের বাটীর মধ্যে সকল লোক প্রবিষ্ট হইল তখন নীচে উপরে স্থানে২ এমত বিছানা ও রোশনাই ও মজলিস হইয়াছিল যে তাহা দেখিয়া অনেকে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। এবং মহারাজের বংশেরদিগের ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য বিদ্যা বিনয়াদি গুণে সমাগত তাবৎ লোক তৃপ্ত হইয়াছেন। ও নিরূপিত লগ্নে নির্বিঘ্নে শুভবিবাহ নির্ব্বাহ হইল। সভাতে কুলজ্ঞের কুলজ্ঞতার চন্দন ব্যবস্থাদি জন্য কোলাহল ধ্বনি ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বস্বাধীত শাস্ত্র প্রসঙ্গ কোলাহল ধ্বনিতে উদ্বেলমিবসাগরং। পরে সমাগত বরযাত্র কন্যাযাত্র মহাশয়েরদিগকে বাক্যামৃতদানে ও নানাবিধ জলপানীয় ভোজনে পরমাপ্যায়িত করিলেন। পর দিবস বৈকালে পূর্ব্বমত সমারোহপূর্ব্বক কাশীপুরের বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ঘটক কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায়ের বিষয় বিশেষ জানা যায় নাই অনুমান হয় যে তাহাও উত্তমরূপ হইয়া সুখ্যাতি হইবেক। ('সমাচার দর্পণ,' ১ মে ১৮২৪।)

কলিকাতার বড়লোকেরা শুধু গান, কবিতা, চিরপ্রচলিত উৎসব প্রভৃতিই নয়, শরীরচর্চ্চারও যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে তখন

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭-৩৮।

বালিকাদের মধ্যেও কুস্তী প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। ১৮২৭ সনের ৭ এপ্রিল তারিখের 'সমাচার দর্পণে' আমরা বালিকাদের কুস্তীর এই বর্ণনাটি পাই :—

সংপ্রতি মোং পাতরিয়াঘাটানিবাসি শ্রীলশ্রীযুত দেওয়ান নন্দলাল ঠাকুরের বাটীর সম্মুখে প্রত্যহ বৈকালে বালিকাপ্রভৃতির মল্লযুদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাতে তত্রস্থ বাঙ্গালির বালক প্রভৃতি দুই২ জন একং বার মল্লযুদ্ধ করিয়া থাকে। বিশেষতো বালিকার-দিগের যুদ্ধ সন্দর্শনে কে না আহ্লাদিত হন...।

দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়িতে এই সকল আমোদ-প্রমোদে সাহেবেরা যোগ দিতেন। 'সমাচার দর্পণে' পাই :—

গত সোমবার ৩ আগ্রহায়ণ [১২৩০] শ্রীযুত বাবু রূপলাল মল্লিকের বাটীতে রাস লীলা সময়ে নাচ হইয়াছিল তাহার বিবরণ। দিনেক দুই দিন পূর্ব্বে সাহেব লোকেরদিগের নিকটে টিকীট অর্থাৎ নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান গিয়াছিল তাহাতে নিমন্ত্রিত সাহেবেরা তদ্দিনে নয় ঘণ্টার কালে আসিতে আরম্ভ করিয়া এগার ঘণ্টা-পর্য্যন্ত সকলের আগমনেতে নাচঘর পরিপূর্ণ হইল এবং নাচঘরের সৌন্দর্য্য যে করিয়াছিলেন সে অনির্ব্বচনীয়। অনন্তর কএক তায়ফা নর্ত্তকীরা সেই সভাতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল ইহাতে তদ্বিষয়ে রসিকেরা অত্যন্ত তুষ্টি প্রকাশ করিলেন। এবং তাহার নীচের তালাতে চারি মেজ সাজাইয়া নানাবিধ খাদ্য সামিগ্রী প্রস্তুত করিয়া মেজ পরিপূর্ণ করিয়াছিল তাহাতে সাহেবেরা তৃপ্ত হইলেন ও মদিরা পানদ্বারা সকলেই আমোদিত হইলেন এবং বাদশাহী পল্টনের বাদ্যকরেরা অনুরাগে নানা রাগে বাদ্য করিল তাহাতে কোন শ্রোতা ব্যক্তি মনোহরণ না হইল। সকলে কহে যে এমত নাচ বাবুরদের ঘরে আর কোথাও হয় নাই।

সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুরের গৃহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহাতেও সাহেব-মেমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেদিন

সন্ধ্যার পরে শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্বীয় নবীনবাটীতে অনেক২ ভাগ্যবান্ সাহেব ও বিবীরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া চতুর্ব্বিধ ভোজনীয় দ্রব্য ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভোজনাবসানে ঐ ভবনে উত্তম গানে ও ইংগ্রণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণে অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে ভাঁড়েরা নানা শং করিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে এক জন গো বেশ ধারণপূর্ব্বক ঘাস চর্ব্বণাদি করিল। ('সমাচার দর্পণ,' ২০ ডিসেম্বর ১৮২৩।)

এই সকল আমোদ-প্রমোদ প্রসঙ্গে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তখনই দুর্গোৎসব প্রভৃতির ধুমধাম পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর হইতে কমিয়া যাইতেছে বলিয়া একটা ধুয়া উঠিয়াছিল। ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া 'সমাচার দর্পণে' যে আলোচনা প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে সাহেবরা দেশীয় আমোদ-প্রমোদের সহিত কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আলোচনাটি এইরূপ :—

শারদীয় পূজা।—এই দুর্গোৎসব এখন সমাপ্ত হইয়াছে এবং সমস্ত দেশে পুনর্ব্বার কর্ম্মকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সকলেই কহেন যে ইহার পূর্ব্বে এই দুর্গোৎসবে যেরূপ সমারোহপূর্ব্বক নৃত্যগীত-ইত্যাদি হইত এক্ষণে বৎসরং ক্রমে ঐ সমারোহ ইত্যাদির হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এই বৎসরে এই দুর্গোৎসবে নৃত্যগীতাদিতে যে প্রকার সমারোহ হইয়াছে ইহার পূর্ব্বে ইহার পাঁচ গুণ ঘটা হইত এমত আমারদের স্মরণে আইসে। কলিকাতাস্থ ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রে ইহার নানা কারণ দর্শান গিয়াছে বিশেষতঃ জানবুল সমাচার পত্রে প্রকাশ হয় যে কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরা আপনারাই কহেন যে এক্ষণে সাহেবলোকেরা বড় তামাসার বিষয়ে আমোদ করেন না। এপ্রযুক্ত যে হ্রাস হইয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ঐ পত্রপ্রকাশক আরো লেখেন হইতে পারে যে এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরদের আপনারদের টাকা এইরূপে সমারোহেতে মিথ্যা নষ্ট করা অনুচিত হইতে পারে যে কাহারো২ তাদৃক্ ধন এখন নাই। গত কতক বৎসর হইল নাচের বিষয়ে যে অখ্যাতি হইয়াছে ইহা সকলেই স্বীকার করেন ঐ নাচের সময়ে কএক বৎসরাবধি অতিশয় লজ্জাকর ব্যাপার হইত এবং যে ইংগ্রণ্ডীয়েরা সেস্থানে একত্রিত হইতেন তাঁহারা সাধারণ এবং মদ্যপানকরণে আপনারদের ইন্দ্রিয়দমনে অক্ষম।

অতএব এই উৎসবের যে শোভা হইত তাহা রাহুগ্রস্ত হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার অনেক কারণ দর্শান যায়। কলিকাতাস্থ অনেক বড়২ ঘর এখন দরিদ্র হইয়া গিয়াছে যাঁহারা ইহার পূর্ব্বে মহাবাবু এবং সকল লোকের মধ্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁহারদের মধ্যে অনেকেরি এখন সেই নামমাত্র আছে। কেহং সুপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণেতে নিঃস্ব হইয়াছেন কেহ২ আপনারদের অপরিমিত ব্যয়ে দরিদ্র হইয়াছেন কেহবা অধিকারের যে অংশকরণেতে বাঙ্গালিরা ক্রমেং হ্রাসপ্রাপ্ত হন তাহাকরণে নির্ধন হইয়া গিয়াছেন। এতদ্দেশে পূজা ও বিবাহ ও শ্রাদ্ধ এই তিন ব্যাপার টাকা ব্যয়ের প্রধান কারণ এবং ইহাতে অনেকে দরিদ্র হইয়া যান বিশেষতঃ এই তিন ব্যাপারে সুখ্যাতি প্রাপণার্থে এমত অপরিমিতরূপে ব্যয় করেন যে তাহাতে ঋণেতে একেবারে ডুবিয়া গিয়া পুনর্ব্বার ঐ সকল ব্যাপারকরণে অক্ষম হন। উৎসবের হ্রাসহওনের আরো এক কারণ এই যে জ্ঞানবৃদ্ধি। হিন্দুশাস্ত্রে লেখে যে যাঁহারা জ্ঞানকাণ্ডে আসক্ত তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডে অনাসক্ত। কলিকাতাস্থ মান্য লোকেরদের মধ্যে এখন বিদ্যার অতিশয় অনুশীলন হইতেছে এই প্রযুক্ত বহুব্যয়সাধ্য যে কর্ম্মেতে মানসিক সন্তোষ অল্প এবং বহুসম্পত্তির নাশ এমত কর্ম্মেতে লোকেরা প্রবৃত্ত হন না। ('সমাচার দর্পণ,' ১৭ অক্টোবর ১৮২৯।)

এই আলোচনাটি প্রকাশিত হয় ১৮২৯ সনে। ইহার তিন বৎসর পরে, 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রেও ঠিক এই ধরণের কথা বলা হয় :—

অবশ্য পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবে অনেক স্থলে যেমন এবৎসর মুসলমানেরা মহরম উঠাইয়াছেন তদ্রূপ হিন্দুরদের প্রধান কর্ম্ম যে দুর্গোৎসব তাহারও এবৎসরে অনেক ন্যূনতা শুনা যাইতেছে। পূর্ব্বে এতন্নগরে ও অন্যান্য স্থানে দুর্গোৎসবে নৃত্যগীতপ্রভৃতি নানারূপ সুখজনক ব্যাপার হইয়াছে, বাইনাচ ও ভাঁড়ের নাচ দেখিবার নিমিত্তে অনেক ইঙ্গরেজপর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া এমত জনতা করিতেন যে অন্যান্য লোকেরা সেই সকল বাড়ী প্রবিষ্ট হইতে

কঠিন জ্ঞান করিতেন। এবৎসরে সেই সকল বাড়ীতে ইতর লোকের স্ত্রীলোকেরাও স্বচ্ছন্দে প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া দেখিতে পায় এবং বাইজীরা গলী গলী বেড়াইয়াছেন তত্রাপি কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই। অনেকে এবৎসর পূজাই করেন নাই এবং যাহাঁরদের বাড়ীতে পাঁচ সাত তয়ফা বাই থাকিত এবৎসর কোন বাড়ীতে বৈঠকি গানের তালেই মান রহিয়াছে, কোনঃ স্থলে চণ্ডীর গান ও যাত্রার দ্বারাই রাত্রি কাটাইয়াছেন দুর্গোৎসবে প্রায় বাড়ীতে এমত আমোদ নাই যে লোকেরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে এবং যাহাঁরা আল করিয়া কাল বিনাশ করিতেন তাঁহারাও প্রায় এতদ্বর্ষে বাতীর আশ্রয় করিয়াছেন। অতএব দুর্গোৎসবে যে আমোদ প্রমোদ পূর্ব্বে ছিল এবৎসরে তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে। ইহাতে অনেকে কহেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ধন শূন্যহওয়াতেই এরূপ ঘটিয়াছে...। (১৩ অক্টোবর ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত)

এই সকল সংবাদ হইতে বাংলা দেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত ও সংস্পর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সংস্পর্শ ১৮১৭ সনে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর আরও নিবিড় হইয়া উঠে ও নূতন রূপ ধারণ করে। এই পরিবর্ত্তনের আলোচনা ভবিষ্যতে করিব।

সন্ধ্যাপ্রদীপ

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তুলে ধর সখী, সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখি আজ ভাল ক'রে
অবগুণ্ঠিত ও রূপ-মাধুরী কতখানি শোভা ধরে।
লজ্জিত আঁখি কেন মুদে আসে?—নামে সন্ধ্যার মায়া,
রূপ-শিখা কাঁপে, কাঁপে দীপশিখা, কাঁপিছে তাহার ছায়া।
অঞ্চল দিয়ে ঢেকো না প্রদীপ, স্নিগ্ধ আলোকে তার
আঁখির ঝালরে দেখি ঝলমল অশ্রুমুক্তা ধার!
মাটির প্রদীপ রচনা করিয়া জেলেছে সোনার হাতে,
যদি নিশিভোর জলিয়া জলিয়া সোনা হয়ে থাকে প্রাতে,
প্রভাতী-গানের প্রথম চরণে বন্দিবে তারে পাখী
লীলায়িত তব কর-পল্লবে পরাইব রাঙা রাখী!

প্রদীপ জালিলে আজি সন্ধ্যায় কাহারে স্মরণ করি
সন্ধ্যামালতী বরণ করিয়া নিলে অঞ্জলি ভরি
অনাগত কোন প্রিয়ের সকাশে পথচাওয়া বারে বারে,
আজি সন্ধ্যায় কাহার মায়ায় ফিরাইয়া দিবে কারে?
কাছে সরে এস তোমার আলোকে তোমারে দেখিব প্রিয়া
কোন্ রহস্যে রমণী হয়েছে বিশ্বের রমণীয়া।
তনুদেহখানি রেখেছ ঢাকিয়া রঙীন পট্টবাসে
অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠার মাঝে মনের মাধুরী হাসে।

ওগো সুন্দরী, সদ্য তবাসে তুমি সুন্দরী রমা
রমণীয় তুমি, কমনীয় তুমি কামিনী তিলোত্তমা,
নৃপতি-মুকুট চরণে লুটায় ধ্যানের অর্ঘ্যভার
মহাতপা মুনি উজাড় করিয়া ঢালিল পায়ে তোমার।
বিমোহিনী নারী দাঁড়াইয়া হাসে, কৌতুকে নাচে আঁখি,
নতজানু বীর ভুবনবিজয়ী, হাতে পরাইবে রাখী।
তব পায়ে পায়ে নূপুরের মত বাজে জীবনের গান
তব মালিকার ছিন্ন কুসুমে যৌবন লভে প্রাণ।
এত কাছে আছ তবু জানি আমি, জানি আমি ভাল ক'রে
মম জীবনের আয়ু ত তোমারে রাখিতে পারে না ধরে;
এই যে তোমারে নয়ন ভরিয়া দেখিতেছি সুন্দরী
দুইটি নয়নে অতখানি আলো কেমনে রাখিব ধরি—
তবু কাছে এস, ওগো জীবনের মূর্ত্ত অস্ফুট বাণী
সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাইয়া রাখ, এ মোর সন্ধ্যারাণী

অলখ-ঝোরা

শ্রীশান্তা দেবী

১

করুণা ঝির সঙ্গে আতা পাড়িয়া তাহার ছোট টুক্‌রীটি ভর্ত্তি করিয়া সুধা যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যদেব সবেমাত্র অস্তশিখরের অন্তরালে লুকাইলেও, তাহাদের মাঠের মধ্যের বাড়ী তাহারই মধ্যে একেবারে অন্ধকার হইয়া যায়। বাড়ীর পশ্চিম দিকে একটা পুকুর, তাহার পর প্রায় দুই শত বিঘা সুবিস্তৃত ধানের ক্ষেত। সুতরাং সূর্য্যদেব যখন ধরণীর নিকট বিদায় লন, তখন গাছপালা বাড়ীঘরের আড়ালে একটু একটু করিয়া নামেন না, একেবারেই দিগন্তরেখার অন্তরালে চলিয়া যান। সামান্য কিছুক্ষণ পশ্চিম আকাশের মেঘে কিম্বা ধূলিজালে বর্ণচ্ছটার খেলা দেখা যায়। তাহার পর অন্তহীন কালো অন্ধকারের স্তূপ মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

সুধা বাড়ী আসিয়া দেখিল তাহার ছোট ভাই শিবু বাহির বাড়ীর খোলা দাওয়ায় একটা মাদুর পাতিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া আছে। মাথার উপর ধূমলেশহীন বিরাট নীল আকাশের অসংখ্য নক্ষত্র জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে, দিগন্তের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত শুভ্র জলহীন বালুকাময় নদীগর্ভের মত ছায়াপথ আকাশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুধাও চিৎ হইয়া শিবুর পাশে শুইয়া পড়িল। শিবু আকাশের তারার দিকে তাহার ছোট তর্জ্জনীটি তুলিয়া বলিতেছিল, "এক তারা লারাপারা,* দুই তারা···"

সুধা তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "কি হিজিবিজি বকছিস্? ঐ দেখ্ একটা তারা খ'সে পড়ল।"

প্রকাণ্ড একটা উল্কাপিণ্ড আকাশের চারি পাশে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার দীপ্তি ছড়াইয়া পশ্চিম দিক্ হইতে ছুটিয়া পূর্ব্ব দিকের মাঠের পারে গিয়া পড়িল। শিবু বলিল, "তারা পড়লে কি বলতে হয় বল দেখি।"

সুধা মাদুরের উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আহা, তা যেন আর আমি জানি না! ছ'টি ব্রাহ্মণ, ছ'টি ফুল আর ছ'টি পুকুরের নাম করতে হয়। এই আমি বল্‌ছি, আমার সঙ্গে সঙ্গে তুইও বল্। হরিহর বিষ্ণুরাম বেণু, রতনকেষ্ট, গোপী, ছোটকালী, তারপর গে গোলাপ, দোপাটি, টগর, জবা, শালুক ··"

শিবু বলিল, "দিদি, তুই কিচ্ছু জানিস্ না। এগারটি ব্রাহ্মণের নাম করতে হয়।"

সুধা বলিল, "উনি মহা পণ্ডিত ভট্‌চায ঠাকুর এলেন আমার ভুল ধরতে! বল্ দেখি সাপের নাম করলে রাত্তিরে কি বল্‌তে হয়?"

শিবু বলিল, "নারায়ণং নমস্কৃত্য···"

সুধা গালে হাত দিয়া বলিল, "ওমা, কোথায় যাব আমি! ওই বুঝি বল্‌তে হয়? বল্‌তে হয় অস্তি কস্তি মুনিম্ মাতা, ভগিনী বাসুকী যথা, জরৎকারু মুনিঃ পত্নী মনসাদেবী নমস্তুতে।"

সুধার সংস্কৃতের ভুল বুঝিবার ক্ষমতা শিবুর ছিল না, সুতরাং শিবু হার মানিয়া বলিল, "আচ্ছা, তাই গো তাই। কিন্তু আমার যে বড্ড ঘুম পেয়েছে। চল্ রান্নাঘরে যাই। ভাত হয়েছে ত খেয়ে ঘুমোই গে।"

তাহারা এতক্ষণ বাহির বাড়ীর দাওয়ায় শুইয়াছিল। সুধা টুক্‌রীটা এবং শিবু মাদুরটা টানিতে টানিতে ভিতর বাড়ীতে আসিয়া ঢুকিল। শুইবার ঘরের কোলে ঢাকা বারান্দা, তাহার পর উঠান, উঠানের ওপারে রান্নাঘর। উঠানের মাঝখানে মস্ত একটা পেয়ারা গাছ, দুই দিকের বারান্দার পর্দ্দার কাজ করে। রান্নাঘরের খোড়ো বারান্দার তলায় উবু হইয়া বসিয়া মা ও পিসিমা ছেলেদের ভাত বাড়িতে-ছিলেন। পেয়ারা গাছের আড়ালে হ্যারিকেন লণ্ঠনের স্বল্প আলোয় তাঁহাদের মুখ ভাল করিয়া দেখা যায় না। মা'র মাথার কাপড়টা পড়িয়া গিয়াছে, মস্ত খোঁপাটা উঁচু হইয়া আছে,

* লারা = নারা, না-পারা।

পিসিমার স্বল্পকেশ মাথার উপর থান কাপড়ের ঘোমটা। বাতির আলোয় তাঁহাদের মাথার ও খোঁপার গঠনের বড় বড় কালো ছায়া সুধার চোখে ভারি সুন্দর ঠেকিতেছিল। সত্যকারের মায়ের সৌন্দর্য্যের চেয়ে এই ছায়াময়ী মা'র রূপই যেন তাহার মনের রূপতৃষ্ণাকে বেশী তৃপ্ত করিল। মা'র হাত-নাড়ার সঙ্গে ছায়ার হাত নড়িতেছে, মা হাতা হাতে উঠিতে বসিতে ছায়াও উঠিতেছে বসিতেছে, সুধা মুগ্ধ হইয়া তাহাই দেখিতেছিল। সুধা বায়োস্কোপ কখনও দেখে নাই কিন্তু দেখিলেও তাহাতে ইহার চেয়ে বেশী আনন্দ বোধ হয় সে পাইত না।

শিবু নাকিসুরে বলিয়া উঠিল, "দিদি, মাকে ডাক না। আঁর আমি বস্‌তে পা'চ্ছি না।"

সুধা চমকিয়া ডাকিল, "মা গো, শিবু যে ঘুমিয়ে পড়ল, ভাত কখন দেবে?"

মা মহামায়া মাটির হাঁড়ি হইতে হাতা করিয়া ভাত তুলিয়া শালপাতার উপর পরিবেশণ করিয়া কালো হাঁড়িটা রান্না ঘরের উঁচু তাকে বিঁড়ার উপর তুলিয়া রাখিলেন। তারপর এদিকে আসিয়া শিবুর চোখে জলহাত বুলাইয়া তাহাকে টানিতে টানিতে ভাত খাওয়াইতে লইয়া চলিলেন।

পিসিমা হৈমবতী মোটাসোটা ভারী মানুষ। তাঁহার চালচলন কিছুই মোলায়েম নয়। গলার আওয়াজটা পুরুষের মত মোটা, কথা বলেন ধমক দিয়া, হাঁটেন দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া, কিন্তু তাঁহার মনের ভিতরটা অন্য রকম। কর্ত্তব্যবোধের তাড়নায় তিনি মানুষের সেবা-যত্ন করেন, কি মমতার আধিক্যে করেন, তাহা তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়া কেহ বুঝিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার সেবার নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া সকলেই তাঁহার উপর খুশী থাকে।

শিবু ভাত খাইতে খাইতে সুধার গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িতেছিল, চোখ দুইটি তাহার তখন সন্ধ্যার পদ্মের মত মুদিত হইয়া আসিতেছিল। মহামায়া তাহার ডান হাতটা বাঁ হাত দিয়া নাড়া দিতে দিতে আদর করিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী সোনা আমার, একবারটি সোজা হয়ে ব'সে এই ক'টা গরাস খেয়ে ফেল, তার পরেই ঘরে গিয়ে শোবে।" কিন্তু কে বা শোনে তাঁহার কথা? শিবু সুধার কোলের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। হৈমবতী ঝোলের বাটি নামাইয়া রাখিয়া দুম্‌দাম্ করিয়া শিবুর সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া মোটা গলায় তাড়া দিয়া বলিলেন, "ও ছেলে! ভাত ভাত ক'রে অস্থির ক'রে শেষে এক কাঁড়ি ভাত নষ্ট করতে বসেছিস্? দাঁড়া আমি পরাণ মোড়লকে ডেকে দিচ্ছি এখ্‌খুনি; তার বাঁকা মুখটা নিয়ে তোকে এসে এক কামড় দেবে।"

শিবু তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বসিল। পরাণ মোড়লকে ভয় না করে এমন ছেলে এ তল্লাটে একটিও ছিল না। বিশেষতঃ রাত্রে তাহার নাম শুনিলে ত ছেলেদের বাবাদেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। মসীকৃষ্ণ পরাণ বয়সকালে মস্ত পালোয়ান ছিল, এখনও তাহার শৌর্য্য বীর্য্যের বিশেষ অভাব হয় নাই। কিন্তু শুধু এই কারণেই যে ছেলেরা তাহাকে ভয় করিত তাহা নয়। একবার মৌবনীর শালবনে শালগাছ কাটিতে কাটিতে সন্ধ্যা হইয়া পড়ায় পরাণ বুনো ভালুকের হাতে ধরা পড়িয়াছিল। যুদ্ধে সে ক্রুদ্ধ ভালুককে হার মানাইয়া নিজের প্রাণটি লইয়াই ফিরিয়াছিল, কিন্তু হিংস্র ভালুকের নখরাঘাতে তাহার নাক মুখ চোখ কোনটাই আর পূর্ব্ববৎ যথাযথ স্থানে ছিল না। ঘা সারিয়া উঠিবার পর তাহার যা কিম্ভূতকিমাকার চেহারা, হইল তাহাকে ভালুকের চেহারার চেয়েও অনেক বেশী ভয়াবহ বলা যাইতে পারে। সন্ধ্যাবেলায় এ অঞ্চলের ছেলেদের ভয় দেখাইবার জন্য তখন হইতে আর কাল্পনিক জুজুর আবাহনের প্রয়োজন হইত না। একবার পরাণ মোড়ল বলিলেই হইল। ছেলের মনে পিসির কথায় হয়ত আঘাত লাগিয়াছে ভাবিয়া মহামায়া তাড়াতাড়ি কথাটার সুর ফিরাইয়া বলিলেন, "ভাত ক'টা চট ক'রে আদায় ক'রে নে শিবু, আমি আজ তোর পাশে শুয়ে অমূল্যরতন শাড়ীর সমস্ত গল্পটা বল্‌ব।"

খোকা বলিল, "তুমি রোজ রোজ ভুল ক'রে অন্য অন্য রকম বল। ও আমি শুনতে চাই না।"

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, "তুই ভুল দেখলেই শুধরে দিবি, তাহলেই ত হবে?"

ভিতর বাড়ীর পাঁচিলের পিছন হইতে অগণ্য জোনাকীর আলোকে উজ্জ্বল ময়ূরের পেখমের মত একটি সুডৌল বন্য কুলগাছের মাথা সুধাদের ভাত খাইবার আসরের দিকে তাহার সহস্র চক্ষু মেলিয়া যেন তাকাইয়াছিল। সুধা মুখে

ভাত তুলিতে তুলিতে বলিল, "মা, জোছ্না রাতে এত জোনাক কোথায় চ'লে যায় ?"

হৈমবতী রাগিয়া বলিলেন, "মামার বাড়ী যায়! তোকে কবিয়ানা করতে হবে না, ভাত খা দিখি, হাবা মেয়ে।"

সুধা মুখ নামাইয়া ভাতে মন দিল। হৈমবতীর ছেলে মৃগাঙ্ক হাই স্কুলে পড়ে। সে নীরবে এক মনে স্তূপীকৃত অন্নরাশি শেষ করিবার চেষ্টায় লাগিয়াছিল, হৈমবতী তাহার পাতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "মুখে কি রা বেরোয় না ? শুক্‌নো ভাতের কাঁড়ি গিলছিস্—ডালটা কি ঝোলটা চাইতে পারিস না ?"

মৃগাঙ্ক বলিল, "একটু পোস্তর অম্বল দাও।"

"রাতে কে তোর জন্যে পোস্ত-আমড়া রাঁধতে বসেছিল ?" বলিয়া হৈমবতী পাতের উপর দুই হাতা কড়াইয়ের ডাল ঢালিয়া দিলেন। দিবার সময় এমন ভাবে হাত ও মুখ ঘুরাইলেন যেন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছেলেটাকে তাঁহাকে খাইতে দিতে হইতেছে। ডাল দিবার পর পরম অবজ্ঞাভরে হাতাটা বাটির ভিতর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ধপাস্ করিয়া খানিকটা কুমড়ার ঘণ্ট তাহার পাতে ফেলিয়া তিনি একেবারে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন।

মহামায়া পিছন হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ঠাকুরঝি, শীত ত পড়ব পড়ব করছে। আজ রাতেই কাঁথাখানা পেতে দিও, নইলে সেলাই করতে বড্ড দেরী হবে।"

ঠাকুরঝি ঘর হইতে বলিলেন, "না দিয়ে আর পার কই ? তোমাদের হাড়ে ত আর ওসব হয় না। খালি লিখি-পড়ি আর লিখিপড়ি।"

মহামায়া বলিলেন, "বিদ্যে বুদ্ধি ত তোমার মত নেই-ই ভাই, তার উপর কালই আবার রতনজোড়ে যেতে হবে, আর তোমাকে দিয়ে খাটিয়ে নেবার সময় কই ?"

হৈমবতী কথার জবাব দিবার আগেই সুধা চোখ বাহির করিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ও মা গো, কালই মামার বাড়ী যাব আমরা ? তবে ছোট পুঁটিকে যে বলেছিলাম তার সঙ্গে পুতুলের বিয়ে দেব, সে আর হবে না ?"

হৈমবতী ভারী গলায় বলিলেন, "আশ্বিন মাসে বিয়ের লগ্ন নেই। তুমি ফিরে এসে অঘ্রাণ মাসে মেয়ের বিয়ে দিও।"

মামাবাড়ী যাইবার আসন্ন সম্ভাবনায় সুধার মন এতই উত্তেজিত হইয়া উঠিল, যে, সে-রাত্রে তাহার চোখে ঘুমই আর আসিতে চাহে না। মামাবাড়ীতে ঠিক তাহার বয়সী খেলিবার সঙ্গী সব সময় থাকে না। কিন্তু মামাবাড়ীর আদর-যত্ন, সেখানকার নূতনত্ব, ইত্যাদির কথা ভাবিলে খেলার সাথীর অভাব একেবারেই মনে থাকে না। তাছাড়া বাড়ীতেও তাহার খেলার সাথী কালেভদ্রে জোটে। শিবুই প্রধান ও প্রায় একমাত্র সম্বল।

কালই সকালবেলা তাহাদের যাত্রা করিতে হইবে। না হইলে দশ-বারো ক্রোশ শালবন, পলাশবন ও ধানের ক্ষেত পার হইয়া পৌঁছাইতে তাহাদের সন্ধ্যা হইয়া যাইতে পারে। বছরে একবার এই মামাবাড়ী যাওয়ার সময়ই তাহাদের গরুর গাড়ী চড়া। বাকি সময় পাড়াগেঁয়ে দেশে এক জোড়া পা ছাড়া আর কোনও বাহন তাহাদের অদৃষ্টে জুটে না। গরুর গাড়ীর ছইয়ের তলায় পুরু করিয়া খড় ও তাহার উপর নীল ডোরাকাটা সতরঞ্চি পাতিয়া শুইয়া বসিয়া যাইতে ভারি মজা। কিন্তু অসুবিধাও কতকগুলা আছে। গাড়োয়ানটা কিছুতেই গাড়ীর পিছন দিকে বসিতে দিতে চাহে না। অথচ সেই দিক্ দিয়াই পার্ব্বত্য বনের পথ, বালুকাময় ক্ষুদ্র স্বচ্ছতোয়া নদী, নীল বাঁধের জলে শুভ্র কুমুদ ফুল, সাঁওতাল পথিক, কালো কালো পাথরের অতিকায় হস্তীর মত বিরাট ঢিপি, সবুজ ধানের ক্ষেত, ইত্যাদি সবই দেখিতে পাওয়া যায়। লোকটা কেবলই বলে, "ওদিকে গাড়ী ভারী হয়ে যাবে গো, সামনে এসে বস।" সামনে সব কয়টা মানুষ কি একসঙ্গে বসিতে পারে কখনও ? পারিলেও গাড়োয়ানের পিঠের আড়ালে বসিয়া কোনই সুখ নাই। পাশে যা একটু ফাঁক পাওয়া যায়, শিবু একলাই তাহা দখল করিয়া রাখে।

তাছাড়া গরুর গাড়ী চড়ারও বিপদ্ আছে। সুধার বেশ স্পষ্ট মনে আছে, গত বৎসর মামাবাড়ী যাইবার সময় গরুগুলার ভয়ে সে পিছন দিক্ দিয়া গাড়ীতে চড়িতে গিয়াছিল। দুই হাতে গোল ছইটা ধরিয়া যেই না গাড়ীতে পা দেওয়া অমনি সামনের ডাণ্ডাদুটা আকাশমুখী হইয়া সমস্ত গাড়ীটা সুধাকে লইয়া পিছন দিকে হুমড়ি খাইয়া পড়িল। কাজেই তাহার পর গরুর লাথির ভয় থাকা সত্ত্বেও সামনের দিক্ দিয়াই তাহাকে গাড়ী চড়িতে হইল।

সে যাহাই হউক না কেন, মামার বাড়ী একবার গিয়া পড়িলে ও-সব ছোটখাট দুঃখের কথা আর কিছুই মনে থাকিবে না। দাদামহাশয় ত তাহাদের দেখিয়াই কোলে করিয়া নামাইতে ছুটিয়া আসিবেন। যেন এখনও সুধার কোলে চড়িবার বয়স আছে। এই আসছে-পৌষে তাহার ত নয় বৎসর পূর্ণ হইয়া যাইবে। এ দিকে দাদামশায় ত বয়সে বাঁকিয়া পড়িয়াছেন। তবু তাঁহার সুধাকে দেখিলে কোলে লওয়াই চাই। হলুদে রং-করা একটি টাকা হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি আসিয়া বলিতেন, "কই রে আমার রাঙা দিদি এল? মোহর দিয়ে ত আর তোর মুখ দেখতে পারব না, তাই গরীব দাদা টাকাটি রাঙা করে এনেছে।" দাদামশায় যতই নিজেকে গরীব বলুন না কেন, এমন দিলদরিয়া মানুষ কিন্তু সুধা কখনও দেখে নাই। তাহারা গাড়ী হইতে নামিতে-না-নামিতে দাদামশায় তাঁহার খড়ম জোড়া পায়ে দিয়া শুধু গায়ে গলায় একটা চাদর ঝুলাইয়া ময়রাবাড়ী ছোটেন। ফিরেন যখন তখন দুটি হাঁড়ি সঙ্গে। একটি ভর্তি গুড়ের রসের রাঙা রসগোল্লায়, অন্যটি মোটা মোটা জিলাপীতে। সুধার মনে আছে, এই দুইটি হাঁড়ির খাবার তাহারা কখনও চাহিয়া খাইত না। যতবার ইচ্ছা হইত সুধা ও শিবু হাঁড়ির ভিতর হাত ভরিয়া যত ইচ্ছা বাহির করিয়া লইত। দিদিমা একটু হাতটান মানুষ। তিনি হাঁড়ি সিকায় তুলিতে আসিলেই দাদামশায় বলিতেন, 'দু-দিনের জন্যে ছেলেরা এসেছে, তুমি ওদের পেছন পেছন টিকটিক করবে না। ওরা যত খুশী খাক্।"

মহামায়া হাসিয়া বলিতেন, "কিন্তু পেট কামড়ে যে মরবে ভূতগুলো।"

দাদামশায় বলিতেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, তোরা আর ছোট ছিলি না, ছেলে কেমন ক'রে মানুষ করতে হয় তোদের কাছে এখন আমি শিখব। কামড়ালেই বা একদিন পেট, পরদিন উপোস দিলেই সেরে যাবে।"

দাদামশায়ের উৎপাতে এই কয়দিন বাড়ীতে শাক ভাত রাঁধিবার উপায় ছিল না। দু-বেলাই দিদিমার রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া তিনি বলিতেন, "বুটের ডাল, আলুর দম, বেগুন ভাজা, লুচি করবে, আমার দাদা দিদিকে ডিংলা* আর কড়াইয়ের ডাল খেতে খবরদার দেবে না।" বুনো পাতালফোঁড় ছাতুর তরকারি দিদিমা রাঁধিয়া দিলে সুধার অমৃতের মত খাইতে লাগিত, নটেশাকের ডাঁটা আর কুমড়ার ঝালও ছিল তাহার খুব মুখরোচক। কিন্তু দাদামশায়ের ভয়ে রসগোল্লা জিলাপী আর ছোলার ডাল ছাড়া তাহাদের বিশেষ কিছু খাইবার উপায় ছিল না। তাঁহার মতে এছাড়া আর সবই তাঁহার নাতিনাতনীর পক্ষে অখাদ্য।

মামীদের সাহায্যেও কোনও-কিছু যোগাড় করা শক্ত ব্যাপার। তাঁহারা তিন জনই তখন বৌমানুষ, দু-জনের ত পায়ে মল, নাকে নোলক আর মাথায় ঘোমটা। তাহার ভিতর ছোটমামী ত একেবারে কনে-বউ। কথা বলিলে ফিক্ করিয়া একটু হাসা ছাড়া আর কোনও জবাব দিবার সাহসও তখন তাঁহার হয় নাই। যাহাকে দেখিতেন, তাহারই সামনে একগলা ঘোমটা টানিয়া দিতেন। সবচেয়ে বেশী ঘোমটা টানিতেন ছোটমামাকে দেখিলে। কিন্তু তাহার ভিতরও একটা মজা ছিল বেশ। সুধা কতদিন দেখিয়াছে, তরকারি কুটিবার সময় হাত কাটিয়া ফেলিবার ভয়ে ছোট-মামী মাথার ঘোমটাটা খাট করিয়া লইতেন। কিন্তু যদি কোনও কারণে একবার ছোট মামার চটির শব্দ পাইলেন, ত দু-খানা হাত কাটা গেলেও বুক পর্য্যন্ত ঘোমটা না টানিয়া ছাড়িতেন না। সেই ছোটমামীকেই আবার রাত্রে অদ্ভুত বদ্‌লাইয়া যাইতে দেখিয়া সুধার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। মামাবাড়ীর দুতলায় ছাদের উপর একখানি মাত্র ঘর। সেটি ছোটমামীর ঘর। সুধা দুই-এক দিন রাত্রে তাঁহার সহিত উপরে গিয়া দেখিয়াছে, ঘরে ছোটমামী মামার কাছে ঘোমটা ত দূরের কথা মাথায় কাপড়ও দেন না। আবার হাসিয়া হাসিয়া কত গল্প করেন। সত্যই ছোটমামী অদ্ভুত। দিনের বেলা দেখিলে মনে হয় বোবা, আর রাত্রে এমন! সুধা এমন মেয়ে কখনও দেখে নাই। কিন্তু তবু ছোটমামীকে এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করিতে তাহার সাহস হইত না।

মামাবাড়ীর যে কথাটাই মনে পড়ে, সেইটাই মনের ভিতর দামী পাথরের মত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানা আলোক-পাতে দেখিতে সুধার বড় ভাল লাগিত। সারারাত্রি তাহার এমনই করিয়া পুরাতন স্মৃতির চিন্তায় কাটিয়া যাইতে

* ডিংলা—'বিলাতী' কুমড়া

পারিত, যদি না সারাদিনের দুরন্তপনার ফলে চোখ দুটি ক্লান্ত হইয়া কখন তাহার অজ্ঞাতসারেই বন্ধ হইয়া যাইত।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সুধা স্বপ্ন দেখিতেছিল, দাদামশায় সুধার জন্য চন্দ্রকোণার চৌখুপী শাড়ী আনিয়া দিয়াছেন, তাহার হল্‌দে রেশমের তাবিজপাড়টি সুধার বড় পছন্দ হইয়াছে। এমন সময় মা তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিলেন, "ওরে, কাক কোকিল উঠে গেল রে! এখুনি লখা-মাঝি* গরুর গাড়ী এনে হাজির করবে।"

২

সুধার বাবা চন্দ্রকান্ত মিশ্র চার মাইল দূরে সহরের স্কুলে সামান্য বেতনে হেডমাষ্টারী করিতেন। সেই স্বল্প আয়ে তাঁহার সংসার ত চলিতই না, অধিকন্তু স্কুলের এই প্রাত্যহিক পাখীপড়ার মধ্যে তাঁহার বহুমুখী মনের খোরাকও জুটিত না। তিনি মানুষটি ছিলেন একটু কবি-প্রকৃতির। সেকালের ব্রাহ্মণ-সন্তানদের মত চুল ছাঁটিয়া টিকি কোনও দিন তিনি রাখেন নাই, সর্ব্বদাই ঘাড় পর্য্যন্ত তাঁহার কোঁকড়া বাবরী চুল দুলিত। দাড়ি গোঁফের চিহ্ন মুখে থাকিতে দিতেন না। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজেই নিজের চুল দাড়ির পারিপাট্য সাধন করা তখনকার দিনে অতি সৌখীন লোকেও করিত না। কিন্তু চন্দ্রকান্ত ধোপানাপিতের ধার ধারিতেন না। নিজের কাপড় কাচিয়া ইস্ত্রী করা এবং নিজের চুল মাপিয়া ছাঁটা তাঁহার সখের কাজ ছিল। সকল কাজের মাঝেই তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে স্বরচিত ও রামপ্রসাদী মিঠা গান লাগিয়া থাকিত। গানেই ছিল তাঁহার প্রাণের মুক্তি।

নিজের একটি তানপুরা লইয়া অতি প্রত্যূষে একলা বসিয়া হিন্দী ভজন গান করা ছিল তাঁহার নিত্য কর্ম্ম। শহরের ছোট বাসা-বাড়ীতে তাঁহার ভজন-সাধন, তাঁহার কাব্যচর্চ্চা ঠিক খুলিত না। তাই তিনি গ্রামে এই দিগন্ত-জোড়া মাঠের মাঝখানে একটি নিজস্ব নীড় বাঁধিয়া তুলিয়াছিলেন। শহরের বাসা তুলিয়া দিয়া এখানেই যখন তিনি থাকা স্থির করিলেন তখন প্রত্যহ সকালে চার মাইল হাঁটিয়াই তিনি স্কুলে যাইতেন। বিকালেও তিনি অনায়াসে হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিতেন। তাঁহার প্রসন্ন হাস্য ও শ্রান্তিহীন মুখ দেখিলে মনে হইত যেন তিনি কেবল দুই দশ পা সখের ভ্রমণ করিয়া আসিলেন। এই গ্রাম্য জীবনযাত্রার সহিত এক ছন্দে চলিবার ইচ্ছায় ইস্কুল-মাষ্টারীর উপর ধানজমি চাষ করাও তিনি একটা আর্থিক আয়ের উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গোয়ালে গরু, মরাইয়ে ধান, উছলিয়া না পড়িলেও, কোনটারই একান্ত অভাব ছিল না।

সুধা যখন বিছানা হইতে উঠিয়া মুখ ধুইয়া বাসি খোঁপায় রূপার ফুল গুঁজিয়া মাথার সামনেটা আঁচড়াইয়া বাবার কাছে বিদায় লইতে গেল, চন্দ্রকান্ত তখন বাহিরের দাওয়ায় বড় পিঁড়ির উপর বসিয়া কাশীরাম দাসের মহাভারত সুর করিয়া পড়িতেছেন,

"দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর
ভুজযুগ নিন্দে নাগ আজানুলম্বিত
করিকর যুগবর জানু সুবলিত।"

এই বর্ণনাটা শুনিলেই সুধার মনে হইত যেন তাহার বাবাকে দেখিয়াই কাশীরাম দাস ইহা লিখিয়াছিলেন। তাহার বাবার মত এমন ধনুকের মত ভুরু আর বিস্তৃত কপাল সে কখনও দেখে নাই। তাহার উপর কবি হইলেও চন্দ্রকান্ত বীরের মত বলিষ্ঠ ও সুগঠিতদেহ ছিলেন। ভোরবেলার ভজন গানের পর একজোড়া মুগুর লইয়া মালকোচা মারিয়া ব্যায়াম করিয়া তবে তিনি স্নান করিতে যাইতেন। তাঁহাদের বাড়ীতে অনেক খরচ করিয়া তিনি একটি কূপ কাটাইয়াছিলেন, যাহাতে পুকুরের পঙ্কিল জলে স্নান করিয়া বাড়ীর লোকের খোস-পাঁচড়া না হয়। সেই কূপ হইতে নিজ হস্তে বাল্‌তি করিয়া জল টানিয়া প্রত্যহ প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বাল্‌তি জল মাথায় ঢালিয়া তিনি যখন স্নান করিতেন তখন তাঁহার সুবিস্তৃত কপাটবক্ষ, সিংহকটি ও পেশীবহুল বাহুদুটি দেখিয়া তাঁহাকে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন মনে করায় সুধার অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরব ছিল।

লখা মাঝির গরুর গাড়ী আসিয়া হাজির হইয়াছিল। মহামায়ার সবুজ টিনের তোরঙ্গ ও বড় বেতের ঝাঁপি দুইটাই চন্দ্রকান্ত গাড়ীর ভিতর তুলিয়া দিলেন। সুধার ছোট নীলাম্বরী শাড়ীতে হৈমবতী টানা লাড়ু ও বড় বড় চিনির

*সাঁওতাল পুরুষদিগকে মাঝি বলে। এ নৌকার মাঝি নয়।

কদমা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন দিদিমাকে দিবার জন্য। মিষ্টি না সঙ্গে দিয়া বধূকে বাপের বাড়ী ত পাঠানো যায় না। শিবু মিষ্টির পুঁটুলিটা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহামায়া আঁচলে সিঁদুরকৌটা বাঁধিয়া হৈমবতীকে প্রণাম করিয়া চন্দ্রকান্তের দিকে চাহিয়া শুধু একটু হাসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। শিবু ও সুধা বাবাকে পিসিমাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাকেও প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিবে কিনা ইতস্তত করিতেছিল। চন্দ্রকান্ত তাহাদের কোলে তুলিয়া গাড়ীর ভিতর বসাইয়া দিলেন। এই সামান্য কয়টা দিনের বিচ্ছেদ, তবু হৈমবতীর চোখে দুই বিন্দু অশ্রু ফুটিয়া উঠিল।

লখা মাঝি গরু দুইটার ল্যাজ মলিয়া লাঠির গুঁতা দিয়া 'হেট হেট্,' করিতেই গরু দুইটা ঢালু পথ দিয়া হড় হড় করিয়া গাড়ী লইয়া ছুটিল। চন্দ্রকান্ত তখন ঘরের ভিতর চলিয়া গিয়াছেন। হৈমবতী দুয়ারে দাঁড়াইয়া তাহাদের শেষ পর্য্যন্ত দেখিতেছিলেন।

দুই পাশে ঘন সবুজ শালবনের মাঝখান দিয়া এই রাঙা সিঁথির মত দীর্ঘ পথটি কি সুন্দর! বাড়ী ও পিসিমার মুখ চোখের আড়াল হইতেই সুধা ও শিবুর মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। পথটি সমুদ্রের বুকের ঢেউয়ের মত ক্রমাগত উঠিয়া নামিয়া চলিয়াছে। গরুর গাড়ীর চাকাও তাহারই তালে তালে উঠিতেছে পড়িতেছে।

লখা মাঝির পাশেই শিবু তাহার দোলাইটি পিঠে বাঁধিয়া বসিয়াছিল। এবার পূজা দেরীতে পড়িয়াছে, ইহার মধ্যেই ভোরের বেলা শীতের হাওয়া দেখা দেয়। শিবুর পিছন হইতে সুধা কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। তাহার মা মহামায়া মেয়ের অন্ধকার মুখ দেখিয়া বলিলেন, "সুধা, তুই আমার কাছে এসে বোস্ না, মা। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি. আয় আমার কোলে মাথা দিয়ে একটু ঘুমোবি।"

সুধা বলিল, "না মা, আমি ঘুমোব না। আমি সারা পথ দেখতে দেখতে যাব।" সে মা'র গায়ে পিঠ দিয়া শিবুর দিকে পিছন ফিরিয়া গাড়ীর পিছন দিক্ দিয়া রাস্তা দেখিতে লাগিল। ভোরবেলা জমিদার-বাড়ীর বৃদ্ধা হস্তিনী পিঠের দুই দিকে মোটা কাছিতে দুইটা ঘণ্টা দুলাইয়া শাল-বনে ডাল ভাঙিতে যাইতেছিল; কিছু সেখানেই প্রাতরাশ করিবে এবং কিছু পিঠে করিয়া লইয়া আসিবে পরের আহারের জন্য। বহুদূর হইতে তাহার জোড়া ঘণ্টার ঢং ঢং আওয়াজ শুনিয়া শিবু ও সুধার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এখন তাহার রাঙা মাটি ও চন্দন চর্চ্চিত কপালটুকু দেখিয়াই সুধা হাততালি দিয়া উঠিল, "লক্ষ্মী-পিয়ারী, লক্ষ্মী-পিয়ারী!"

গ্রামের দুই-চারিটি ছেলে অনেক কষ্টে ছুটিয়া হাতীর গজেন্দ্রগমনের সহিত তাল রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল; শিবু তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া তাহাদের সহিত সমস্বরে ছড়া কাটিয়া উঠিল,

"হাতীমামা দোল্ দোল্
পান খিলিটি—খোল্ গোল্।"

মহামায়া বলিলেন, "মামা কি রে? মাসি হয় যে!"

সুধা তাড়াতাড়ি মাহুতকে বলিল, "জগাদাদা, লক্ষ্মী-পিয়ারীকে নমস্কার করতে বল না!"

জগা হাসিয়া বলিল, "কিছু বকশিশ কর, তবে ত নমস্কার করবে? শুধু শুধু নমস্কার কেউ করে?"

সুধা মুখটি ম্লান করিয়া বলিল, "আমার ত পয়সা নেই।"

মহামায়া আঁচল হইতে দুইটি পয়সা মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। লক্ষ্মীপিয়ারী শুঁড় দিয়া পয়সা দুটি তুলিয়া লইয়া পিছনে শুঁড়টি বাঁকাইয়া জগাকে পয়সা দিল। তাহার পর দুইবার ঊর্দ্ধে শুণ্ড উৎক্ষিপ্ত করিয়া রাজোচিত ভঙ্গীতে নমস্কার করিয়া সমস্ত দেহ সজোরে দোলাইয়া ঢং ঢং করিতে করিতে শালবনের পথে চলিয়া গেল।

সেদিন হাটবার। পথে তখনই লোক-চলাচল বাড়িয়া উঠিতেছে। সাঁওতালদের মেয়েরা মাথায় তিন-চারিটা ঝুড়ি উপরি উপরি চাপাইয়া লালপেড়ে মোটা শাড়ীর চওড়া লাল আঁচল কোমরের পিছনে গুঁজিয়া ঋজুদেহ গতি-চ্ছন্দের সহিত অল্প দোলাইয়া সারি সারি পথে বাহির হইয়াছিল। তাহাদের নিটোল কালো হাতে চওড়া শুভ্র শাঁখা, ঘন তৈল-চিক্কণ চুলে জবা কি করবী ফুল। মেয়েদের ঝুড়িতে বেশীর ভাগই চাল কি চিঁড়া, নয়ত লাউ-কুমড়া। হাটের পথিকদের ভিতর মেয়ের ভিড়ই বেশী। পুরুষ অল্পস্বল্প যা আছে, তাহারা কেহ স্ত্রীর মাথায় গুরুভার বোঝাটি চাপাইয়া কোলের শিশুটিকে নিজে বুকে করিয়া চলিয়াছে, কেহ বা বাঁকের ভারে ঘাড় হেলাইয়া ক্ষেতের

বেগুন ঢেঁড়স লঙ্কা ইত্যাদি লইয়া দ্রুত তালে ছুটিয়াছে। তাহাদের কোমর জড়াইয়া পাঁচ-ছয় হাত একটা খাট ধুতি ছাড়া সর্ব্বাঙ্গে কোনও পোষাকের বালাই নাই, ঘর্ম্মাক্ত পেশীবহুল হাত-পাগুলি দ্রুত চলার তালে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। দুই-এক জনের মাথার বাব্‌রী চুলের উপর নূতন লাল গামছা বাঁধা।

মাইল দশেক আসিয়া পথটি হঠাৎ অনেকখানি নামিয়া গিয়াছে। সেখানে পথের দুই ধারে মস্ত মস্ত তেঁতুল গাছ। সমস্ত পথ ঝাঁপালো পাতার ছত্রে ছায়া করিয়া আছে। গাছ-তলায় মাঝে মাঝে গর্ত্ত কাটিয়া তিনখানা করিয়া পাথর কি ইট বসানো; ইটের গায়ের ও গর্ত্তের ভিতরের ঘন কালো রং ও পোড়া কাঠের টুকরা সদ্য রন্ধনের সাক্ষ্য দিতেছে। দুই পাশের বড় গ্রামগুলি হইতেই এই জায়গাটা একটু বেশী দূরে এবং এখানে নদীর জল ইচ্ছামত পাওয়া যায় বলিয়া হাটুরে ও দূর গ্রামের পথিকেরা এইখানেই রান্না-খাওয়া সারিয়া যায়।

লখা মাঝি বলিল, "মা এইখানে চানটা ক'রে আমি দুটো ডাল ভাত ফুটিয়ে নেব। ঘণ্টাখানিক লাগবে। তার পর ছ' ক্রোশ আর দাঁড়াব না।"

সুধা ও শিবু বলিল, "মা, আমরাও গাড়ী থেকে নাম্‌ব।"

মহামায়া বলিলেন, "বেশী দূরে যাস্‌ নে, একটু ঘুরে এসেই খেতে বস্‌বি, ঠাকুরঝি তোদের জন্যে লুচিমণ্ডা ক'রে দিয়েছেন।"

সুধা বলিল, "আমি বেশী দূরে যাব না মা; শুধু লখাদা যদি আমাদের একটু কাঁচা তেঁতুল আর কচি তেঁতুল-পাতা পেড়ে দেয়, তাহলেই হবে। কি চমৎকার খেতে মা!"

শিবু বলিল, "বাঃ, দিদির কি বুদ্ধি! নুড়ি নিতে হবে না বুঝি! বোকা না হ'লে আর আসল কথাটা ভুলে যাবে কেন? যতগুলো হাঁসের ডিমের মত আর সাবানের মত নুড়ি আছে, আমি সব ক'টাই নেব।"

লখা গরু দুইটাকে খুলিয়া গাড়ীটা তেঁতুলতলার সামনে হেলাইয়া দাঁড় করাইল। ঝুড়ি ও বাঁক নামাইয়া আরও দুই-চার জন মানুষ তখনই সেখানে উবু হইয়া বসিয়া বিশ্রাম সুরু করিয়াছিল, কেহ বা উঁচু হাঁটু দুটা দুই হাতে জড়াইয়া উপর দিকে মুখ করিয়া মাটিতেই বসিয়া পড়িয়াছিল। এক দল বৈরাগী, ছোটবড় নানা বয়সের, তাহাদের নাকে কপালে তিলক, গলায় ত্রিকণ্ঠি, হাতে আনন্দলহরী ও পিঠে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া চলিয়াছিল। রাস্তাটা যেখানে একেবারে নামিয়া প্রায় নদীগর্ভে পৌঁছিয়াছে, সেইখানে গেরুয়া ঝুলি-ঝোলা নামাইয়া সকলে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ছোট ছেলেগুলির উৎসাহ বেশী, তাহারা একেবারে নদীর মাঝখানে চলিয়া গেল। বড়রা পাড়ের কাছেই অল্প জলে দাঁড়াইয়া কেহ পৈতা মাজিতে ও কেহ টপ্‌ টপ্‌ করিয়া ডুব দিতে লাগিল। ক্রমে সাঁওতাল-সুন্দরীরাও তাহাদের চালের ঝুড়ি ও ফল-তরকারির ঝুড়ি তীরে রাখিয়া জলে নামিতে সুরু করিল। সকলেরই ইচ্ছা, তাড়াতাড়ি স্নানটা সারিয়া শরীরটা একটু ঠাণ্ডা করিয়া দ্রুত পা চালাইয়া আগে ভাগে হাটে গিয়া পৌঁছায়। গরম কাল না হইলেও এত পথ হাঁটিয়া তাহাদের শরীর গরম হইয়া উঠিয়াছে।

নদীর ধার হইতে বনের ভিতর দিকে কয়েক হাত দূরে দূরে চোরকাঁটায় আচ্ছন্ন সরু সরু সাপের মত বাঁকা বাঁকা পায়ে-চলা পথ। পথগুলি বনের ভিতর দিয়া লুকাইয়া ছোটবড় নানা গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। বনের ধারে এদিকে-ওদিকে রজত-বেদীর মত শুভ্র উজ্জ্বল মসৃণ বড় বড় পাথর নদীর বালির উপর পড়িয়া আছে, নদীগর্ভের ভিতরেও ছোটবড় এমন কত পাথরের মেলা। নদীতে যখন জল বেশী থাকে, তখন বর্ষার দিনে জলের উপর ইহাদের মাথার উজ্জ্বল চূড়াগুলি মাত্র দেখা যায়, জল মরিয়া গেলে মনে হয় যেন সারি সারি বিরাট শ্বেত হস্তী নদী পার হইবার সময় কোনও মহাতপা ঋষির নিদারুণ অভিশাপে প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে।

সেদিন নদীতে বেশী জল ছিল না, হাটের পথের মহিষ ও গরুর গাড়ীগুলিও অনায়াসে নদী পার হইয়া যাইতেছিল। জলের ভিতর পাছে গরু-মহিষগুলা ভয় পায় কিম্বা ভুল করিয়া অথৈ জলে চলিয়া যায়, তাই কিশোর চালকেরা সরু সরু গাছের ডাল হাতে করিয়া জলের ভিতর নামিয়া পড়িয়া অল্পবুদ্ধি বিরাটকায় পশুগুলিকে সাম্‌লাইয়া লইয়া যাইতেছিল। জলের ভিতর বৈরাগী বালকদের লাফালাফি দেখিয়া তাহাদের কিশোর মনও লুব্ধ হইয়া এবং উজ্জ্বল চক্ষু চঞ্চল হইয়া উঠিতে-ছিল। কিন্তু এক এক গাড়ী জিনিষের ভার তাহাদের উপর, ফেলিয়া যাইবার উপায় নাই।

গ্রামের মেয়েদের জল আনা তখনও শেষ হয় নাই। ঘন গাছের ভিতর হইতে সরু সরু পথে স্বচ্ছন্দগতি সাঁওতাল-কন্যারা মাথায় কলসী ও কোলে উলঙ্গ সুপুষ্ট কালো ছেলে লইয়া নদীর ঘাটে আসিতেছে। মাঝে মাঝে একটু মাজা রঙের শীর্ণকায় বাঙালীর মেয়েও দেখা দিতেছিল। একই গ্রামে বাস, একই পথে হাঁটা চলা, কিন্তু সাঁওতাল-মেয়েদের খোলা মাথা, নিটোল আঁট গড়ন, দৃপ্ত চলার ভঙ্গী, আর বাঙালীর মেয়ের মাথার ঘোমটা, ঢিলা শরীর, ঝুঁকিয়া সলজ্জ-ভঙ্গীতে চলা দেখিলে আকাশ-পাতাল প্রভেদ লাগে।

শিবু এত লোকের দেখাদেখি লখা-মাঝির সঙ্গে জলে নামিয়া পড়িল। স্বচ্ছ জলের তলায় নানা রঙের নুড়ি স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, খুশী হইয়া সে দুই হাতে তুলিতে লাগিল। সুধা একটি রজতশুভ্র পাথরের বেদীর উপর বসিয়া সাঁওতাল-মেয়েদের জলক্রীড়া দেখিতে লাগিল। কলসীর পিছন দিক দিয়া অপরিষ্কার জল দূরে ঠেলিয়া দিয়া তাহারা নদীর রুপালি জলে কষ্টিপাথরের মত কালো নিটোল সুচিক্কণ দেহ ভাসাইয়া তরল শুভ্র জল ও কঠিন কালো মূর্ত্তির বিপরীত শোভায় বনভূমি সলক্ষণের জন্য আলো করিয়া এক এক কলসী জল লইয়া ঘরে ফিরিয়া চলিল।

সুধাকে দেখিয়া সাঁওতাল-মেয়েদের কৌতূহল অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠিল, বার বার পিছন ফিরিয়া দেখিতে লাগিল।

বাঙালী বধূরাও ঘোমটা সরাইয়া সকৌতুক দৃষ্টিতে একটু মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেল। প্রৌঢ়া দুই-এক জন জিজ্ঞাসা করিল, "কুথা যাচ্ছ গো?"

সুধা বলিল, "মামাবাড়ী।"

"কুন গাঁ, কত দূর?"

সুধা বলিল, "রতনজোড়; সে অনেক দূর।"

হাটুরে মেয়েরা স্নান সারিয়া উঠিতেই সুধার মা মহামায়াকে দেখিয়া তরিতরকারির ঝুড়ি লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল, "বেগুন লিবি গো, সিম লিবি গো?"

পথের মাঝে মাঝে ক্রেতা দেখিলেই তাহারা ছোটখাট হাট বসাইয়া দিতেছে। সময়ের কোনও মূল্য নাই, যতক্ষণ খুশী, যতবার খুশী জিনিষ বাছাই কর, ওজন কর, কেহ কিছু আপত্তি করিতেছে না।

মহামায়া বলিলেন, "আমার ত এখানে ঘর নয় বাছা, তরবারি নিয়ে কি করব? ফল টল থাকে ত বরং দাও।"

একজন বলিল, "কলা আছে, লিবি?"

আর একজন বলিল, "আতা আছে।"

বৈরাগীর দলও হাটের সওদা দেখিয়া ছুটিয়া আসিল। তাহারা চিঁড়া কিনিতেই বেশী ব্যস্ত, দুই-এক জন মোটা মোটা শশাও কিনিল। মহামায়া ছেলেমেয়েদের জন্য কলা ও আতা কিনিলেন। একটা সিকি ফেলিয়া দিয়া দুইটা পয়সা চাহিতেই সকলে প্রায় সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "উ নাই লিব।"

শিবু ততক্ষণ উঠিয়া আসিয়াছে; সে সিকিটার উপর সাঁওতালদের সন্দিগ্ধদৃষ্টি দেখিয়া বলিল, "মা, সাঁওতালগুলো বড় বোকা, ওরা পয়সা ছাড়া আর সব-কিছুকেই ভয় পায়। রুপোর সিকিরই ত বেশী দাম, তা নেবে না।"

অনেক কষ্টে তাহাদের দাম চুকাইয়া বিদায় করা গেল। কিন্তু লখা-মাঝি কুড়ান পাথরের উনুন জ্বালিয়া রান্না সুরু করিতেই আবার ভীড় সুরু হইল। তখন চন্‌চনে রোদ উঠিয়াছে, লোকগুলার মাথায় ছাতা কি একটুকরা গামছাও হয়ত নাই, মাথার চুলই রোদ হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। এততেও অনেকের বিড়ি খাওয়ার সখ পুরা আছে। সবাই বলে, "মাঝি, একটু আগুন।"

বেচারী লখা কতবার যে উনানের কাঠ বাড়াইয়া ধরিল তাহার ঠিক নাই। শেষকালে একটা খড়ের নুড়িতে আগুন ধরাইয়া পাথরের পাশে ফেলিয়া রাখিয়া দিল, যাহার ইচ্ছা আপনি ধরাইবে।

মহামায়া বলিলেন, "বাছা, তাড়াতাড়ি রান্না খাওয়া সেরে নে, রোদ উঠেছে চড়চড়ে, তার উপর এই হাটের ভীড়, এখানে আর ব'সে থাকা যায় না।"

আবার যাত্রা সুরু হইল। নদী পার হইয়া মাঝে মাঝে উঁচু ডাঙ্গা জমির উপর ঝোপের মধ্যে কালো কালো হাতীর মত পাথর, মাঝে মাঝে ঘন সবুজ ধানের ক্ষেত। কোনও ক্ষেতে একটুখানি সোনার রং ধরিয়াছে, কোনটা একেবারে কাঁচা। দূরে দূরে বাঁধের জলে অসংখ্য শালুক ফুল ফুটিয়া লালে লাল হইয়া উঠিয়াছে। গ্রাম্য পথের এমন উজ্জ্বল রূপ দেখিয়া সুধার মনটা ভরিয়া উঠিতেছিল। দুই চোখে দেখিয়াও আশা মিটে না। পৃথিবীটা কি আশ্চর্য্য সুন্দর!

শিবু কিন্তু একটু পরেই কাৎ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। পথের ধারের একটা গ্রামের ছেলেরা বড় বড় লাঠি লইয়া রণপা করিয়া এক এক পায়ে চার পাঁচ হাত লাফাইয়া চলিতেছিল। তাহার সঙ্গে কি সানন্দ কলরব! সুধা বলিল, "শিবু, দেখ্ দেখ্, ছেলেগুলো কি মজা কচ্ছে।"

শিবু একবার "উঁ" বলিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। বেলা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। এদিক্‌কার হাটের পথ নির্জ্জন হইয়া আসিতেছে। অন্য হাটবারে সুধারা পথের ধারে দাঁড়াইয়া দেখে, দিনশেষে ভাঙা হাটের পর পথিকেরা মহা কোলাহল করিয়া ফিরিতেছে। তাড়ির মিষ্ট তীব্র গন্ধে সমস্ত পথটা ভরিয়া যায়। মেয়েরা হাত ভরিয়া শাঁখা পরিয়া ও পুরুষেরা নূতন জামা পরিয়া পয়সা গণিতে গণিতে চলে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর পথে যেখানেই ডোবা দেখে নামিয়া পড়িয়া নির্ব্বিচারে দল বাঁধিয়া আঁজলা ভরিয়া জল খায়। গরুর গাড়ীগুলা যথাসাধ্য জোরে হাঁকাইয়া বাড়ী ফিরিতে সবাই ব্যস্ত। আজ এদিকে হাট নাই, পথ জনশূন্য। শরতের নীল আকাশে টুকরা মেঘের মত এক-একটা বক মাঝে মাঝে উড়িয়া চলিয়াছে। উলঙ্গপ্রায় রাখাল-ছেলেরা দড়িতে ঢিল ঝুলাইয়া সজোরে তাহাদের লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িতেছে, যদি একটা বক মারা যায়। কোথাও বড় বড় মহুয়া, কি বট, কি আম গাছে শ্বেতপদ্মের মত ধপ্‌ধপে এক ঝাঁক শাদা বক ডালে ডালে বসিয়া আছে। দূর হইতে মুদিত শুভ্র পদ্ম ছাড়া কিছু মনে হয় না।

শিবুর দিবানিদ্রা শেষ হইলে সে সারা পথই খাইতে খাইতে চলিল। দিদির মত ধানক্ষেত আর বক দেখার সখ তাহার নাই। পিসিমা যত খাবার দিয়াছিলেন, সব একা খাইতে পাইলেই সে জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ পাইয়াছে বুঝিবে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আকাশে যখন মেঘের কোলে কে সাত রঙের তুলি টানিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন তাহারা মামাবাড়ীর গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

দূর হইতে সুধা দেখিল, সহাস্য মুখে দাদামশায় ঠিক পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার প্রশস্ত বক্ষের উপর শুধু একটি মাজা পৈতা, গায়ে জামা নাই। পায়ে কিন্তু তালতলার চটি একজোড়া আছে। গাড়ীটা দেখিয়াই "মায়া, এলি মা?" বলিয়া ছুটিয়া আসিলেন।

পারেন ত সব কয়জনকেই কোলে করিয়া নামান। লখা-মাঝির গরু খুলিয়া দেওয়া পর্য্যন্তও যেন তিনি অপেক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না।

মহামায়া কোনও রকমে নামিয়া পড়িয়া প্রণাম করিতে-না-করিতেই বৃদ্ধ লক্ষ্মণচন্দ্র তাঁহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। "চল্ চল্, নমস্কার করে না এখন, হাওয়ায় একটু বস্‌বি চল্। ছেলেগুলি এতদূর থেকে এল, দেখি জলটল কি রেখেছে সব। ও সব জামা জুতা খুলে ফেল, দাদা।"

লক্ষ্মণচন্দ্র নিজেই অপটু হস্তে শিবুর জামা জুতা ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিলেন।

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি বুড়োমানুষ, নবাবের জুতো জামা খুলে দেবে নাকি? ও থাক্, ঘরে গিয়ে আমি দেব এখন। মা কেমন আছেন, দাদারা কেমন?"

লক্ষ্মণচন্দ্র বলিলেন, "আছে সব একরকম। বেটাদের ত সাত দিনে একদিন চোখে দেখি না। বুড়ো বাপ মরল কি বাঁচল, কে খোঁজ নেয়! ভাগ্যে তোর দিদি আছে তাই জলের ঘটিটা এগিয়ে দেয়।"

বাড়ী আসিতেই সুধারও চোখে ঘুম ভরিয়া আসিল। মামাবাড়ী দেখার এত আগ্রহও তাহাকে জাগাইয়া রাখিতে পারিল না। সারা পথ একবার যে চোখ বোজে নাই।

(ক্রমশঃ)

"ছাতনার রাজবংশ-পরিচয়"ও চণ্ডীদাস

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

ছাতনায় প্রসিদ্ধি আছে, রাজা হামীর-উত্তর বর্তমান বাসলী-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা কালে দেবীদাস ও চণ্ডীদাস নামে দুই ভ্রাতাকে তাঁহার পূজায় নিযুক্ত করেন। দেবীদাস গৃহস্থ হইয়াছিলেন। বাসলীর বর্তমান পূজকেরা তাঁহারই বংশ। ১৩৮৭ শকে দেবীদাসের পৌত্র পদ্মলোচন "বাসলীমাহাত্ম্যে" হামীর-উত্তর, দেবীদাস, চণ্ডীদাস ও বাসলীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই শক হইতে রাজার ও চণ্ডীদাসের কাল জানিতে পারা যায়। কিন্তু হামীর-উত্তরের পৃথক লিখিত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। অন্য দিকে, আদি বাসলী-মন্দিরের প্রাচীরের ১৪৭৫ শকে নির্মিত ইটে 'হাবির উত্তর,' 'উত্তর রায়' এই দুই নাম পাওয়া যায়। ইটে চতুর্বিধ লেখ ছিল। ইং ১৮৭২ সালে বেগলার সাহেব দেখিয়াছিলেন। আমরা ত্রিবিধ লেখ দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি চতুর্বিধ লেখ পড়িতে পারেন নাই, আমরাও ত্রিবিধ লেখ পারি নাই। (সন ১৩৩৩ সালের চৈত্রের "প্রবাসী"।) যদি এই হাবির-উত্তর ও উত্তর-রায় চণ্ডীদাসের প্রতিপালক রাজা হন, তাহা হইলে সে চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের পরের লোক হইয়া পড়েন। ছাতনা-রাজবংশের ঐতিহ্যের সহিত এই হামীর-উত্তরের কিছুমাত্র সঙ্গতি থাকে না। এই কারণে ইটের শক ও রাজার নাম পৃথক কালের কল্পনা করিতে হইয়াছিল।

ছাতনার রাজ-পরম্পরা কোথায় পাই, এই চিন্তা চলিতেছিল। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র-সেনের পাঁচ পূর্বপুরুষ ছাতনার রাজার সেবক ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে রাজবংশলতা থাকিতে পারে, এই আশায় তাঁহাকে ধরিয়াছিলাম। তিনি অশুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত খণ্ডিত লতা দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কুত্রাপি শকের উল্লেখ নাই। শক না পাইলে সত্য মিথ্যা বিবেচনা করিতে পারা যায় না।

ভাগ্যক্রমে রামতারক-কবিরাজের বহিতে ১৮৮-১৯২ পৃষ্ঠায় শকসমন্বিত, আদিরাজা শঙ্খ-রায় হইতে কৃষ্ণ-সেনের রাজা বলাইনারাণ পর্যন্ত বংশলতা আছে। (গত মাসের "প্রবাসী"।) লিখিত আছে, ইহা কৃষ্ণ-সেনের রচিত। প্রথমে ছাতনা গ্রামের বর্ণনা, পরে রাজবংশ-পরিচয়, পরে টীকা আছে। "চণ্ডীদাস-চরিত" পুথীতে ছাতনা-বর্ণনা প্রায় এইরূপ আছে। এখানে উক্ত তিনটি বিষয় অবিকল দিতেছি।

"ছাতনার গ্রামের ও রাজবংশের পরিচয়।

ছত্রিনা-নগর : অতিমনোহর : ভূতলে অতুলশোভা।
চিত্ত চমৎকার : কি কহিব আর : সুরাসুর-মনোলোভা।
ধার্ম্মিক-প্রবর : হামীর-উত্তর : সেই দেশ অধিপতি।
প্রতাপে প্রবল : জিনি আখণ্ডল : দম্ভে কম্পে বসুমতি।
অভয়ার বরে : বিশ্ব চরাচরে : অমর-সমর-জয়ী।
ভূপে দয়া করি : হয়ে দিগম্বরী : রণে যান রণময়ী।
উত্তম পদাতি : সৈন্য সেনাপতি : গজবাজী অগণন।
সর্ব্বত্র অভয় : সমরে দুর্জ্জয় : গতি জিনি প্রভঞ্জন।
সমন সমান : দ্বারে দ্বারবান : সদা অসিচর্ম্ম হাতে।
মক্ষিকা বিহঙ্গ : কিটাদি পতঙ্গ : ক্ষণে খণ্ড ভীমাঘাতে।
কি ছার মানব : দেব কি দানব : মহামায়া প্রকাশনে।
প্রবেশ না পায় : সকম্পিত কায় : সদাগতি ভাবে মনে।
দীর্ঘ পরিসর : সোভে সরোবর : বিকচকমলসাজে।
করি গুন গুন : গায় তার গুণ : রসিক ভ্রমররাজে।
অতিসুসোভন : বন-উপবন : ফুল-ফল রস-ভরা।
অবিরাম শুনি : পিকবর-ধ্বনি : মুনীন্দ্র মানস-হরা।
বহে অতিধীর : মলয় সমির : নিশির শিশির সঙ্গে।
আসে উষারাণী : ভুবন-মোহিনী : রজনীর মনোভঙ্গে॥

"ছাতনার রাজবংশের পরিচয়।

কৃষ্ণপ্রসাদ গাতাইত বিরচিত।*

সামন্তের আদিরাজা সঙ্খরায় মহাতেজা
শিখরভুপেন্দ্র তায় জিনিল সমরে।
বসাইল অকপটে সামন্তের রাজপাটে
ভবানী ঝরাং নামে ব্রাহ্মণকুমারে।
ধর্ম্মনিষ্ঠ সদাচারী সুজনপালনকারী
দুর্জ্জনের পক্ষে তিনি সমন-সমান।
তাহারি রাজত্বকালে রূপনারায়ণ জলে
ভাসি আইল ধর্ম্মরাজ স্বরূপনারান।

---

* পড়িবার সুবিধানিমিত্ত ত্রিপদীর তিন পদ ছাড়াছাড়ি করিয়া দিলাম।

মৌলেশ্বর ভক্তাবেশে দ্বাদশ সামন্ত আইসে
বিনাশিল ব্রাহ্মণে সে খঞ্জরের ঘায়।
মাসে২ জনে২ বসে তারা সিংহাসনে
রাজ্যের সুসার কিন্তু নাহি ঘটে তায় ॥

মাসাব্ধিবিশিখ শকে হামির উত্তর লোকে
সামন্তের কন্যা দিয়া রাজ্য দিল দান।
তাহারি সৌভাগ্যক্রমে বাশুলী সামন্তভূমে
শিলামূর্ত্তি ধরিয়া হলেন অধিষ্ঠান।

পাসণ্ডদলন হেতু ভবাব্ধি-তরণে সেতু
রচে যবে চণ্ডিদাস রাধাকৃষ্ণলীলা।
বিদ্যাপতি তদুত্তরে গাইল মিথিলাপুরে
হরিপ্রেমরসগীতি নাহি যার তুলা ॥

ব্রহ্ম কাল কর্ম্ম অরি শকে সিংহাসনোপরি
বসে বীরহাম্বির সে হামিরনন্দন।
সংগ্রামে যবনে তাড়ি বঙ্গরাজ্য নিল কাড়ি
অভিসেক দিলে তার জনেক ব্রাহ্মণ ॥

নিশঙ্কু বীরাবরজ গোগুনেন্দুগ্রহব্রজ
শকে সিংহাসনে বসিলেন শুভক্ষণে।
যাহার রাজত্বশেষে দ্বিজাতি সে কীর্ত্তিবাসে
রচিল মনোজ্ঞ সপ্তকাণ্ড রামায়ণে।

রসাঙ্গবরস পরে বসে সিংহাসনোপরে
নিশঙ্কুকুমার সে নৃসিংনারায়ণ।
বর্ষেন্দ্রিয় হলে গত মোহান্ত নৃসিংহসুত
কৈশরে লভিলা তার পিতৃ-সিংহাসন।

বসিলেন সিংহাসনে ভুবনাস্তরীক্ষবর্ণে
শঙ্করনারাণ রায় মোহান্তকুমার
যেইকালে চারিধারে দিল্লীরাজ অত্যাচারে
ভারত যুড়িয়া উঠে ঘোর হাহাকার।

বিধুবর্ণগুণার্ণবে গৃহশূন্য হয়ে যবে
চৈতন্য মাতায় দেশ আনি হরিনামে।
যুক্তি করি প্রজাসবে রাজপট্ট দিলা তবে
শঙ্কর বৈমাত্রভ্রাতা বিরিঞ্চীনারাণে ॥

ব্রহ্মদ্বার বর্ষ গতে রাজদণ্ড লইল হাতে
হামীরউত্তরগর্ভে বিরিঞ্চীর জায়া।
চঞ্চলকুমারী নাম রূপে গুণে অনুপাম
রাজ্য করে অচলাঙ্গ বরষ ব্যাপিয়া।

ভূদিকজলধিবর্ণে হামির উত্তর নামে
বসে সিংহাসনে তবে বিরিঞ্চীনন্দন।
যবে রত্নসজ্যা ত্যজি চৈতন্যের পদ ভজি
সন্ন্যাসে বঞ্চেন কাল রূপসনাতন।

কবিরাজ কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে করি বাস
জীবগোস্বামীর পাশে করি অধ্যয়ন।
চৈতন্যে পূর্ণাংস ধরি ভক্তজনমনহারী
চৈতন্যচরিতামৃত করেন চয়ন।

পঞ্চদিনপঞ্চকালে বসিল উত্তর স্থলে
জটিলবিবেক রায় উত্তর তনয়।
যবে যথা বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণলীলা গীতি
গাইল গোবিন্দদাস প্রেমিকহৃদয়।

বিধুপ্রাণপিতৃদোষে স্বরূপ পর্য্যঙ্কে বসে
স্বরূপ সে কীর্ত্তিমান বিবেকনন্দন।
পঞ্চকাল দীপাম্বরে বসে সিংহাসনোপরে
স্বরূপের ভ্রাতা সে উত্তরনারায়ণ ॥

যে কালে উদয়সেন রাজ আজ্ঞায় লিখিলেন
বাশুলী ও চণ্ডীদাসলীলারসামৃত।
কাশীরামদাস নামে কবি এক শিঙ্গী গ্রামে
বিরচেন বঙ্গে মহাভারত কিঞ্চিৎ।

শশীকলাশূন্যরসে রাজসিংহাসনে বসে
উত্তরের পুত্র সে বিবেকনারায়ণ।
ভুতারাতি হলে গত বিবেকনারাণসুত
স্বরূপ লভিল তবে পিতৃসিংহাসন ॥

যবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সভায় ভারতচন্দ্র
রায়গুণাকর রচে অন্নদামঙ্গল।
বিদ্যাসুন্দরের খেলা রচি বঙ্গ ভাসাইলা
মধুরশৃঙ্গাররস আনন্দহিল্লোল।

ভুদর্শনার্ণববজ্র শকে সে স্বরূপাত্মজ
লছমীনারাণ বসে রাজমসনদে।
চক্রান্তের জালে পড়ি ইহমর্ত্ত গেল ছাড়ি
যবে সে সীরাজদ্দৌলা বিনা অপরাধে।

সোমাব্ধিপঙ্কশোধিশে স্বরূপ পর্য্যঙ্কে বসে
তৎপর কানাইলাল লছমীনন্দন।
ধরাসিন্ধুপক্ষশরে বসে সিংহাসনোপরে
তস্যানুজ ভ্রাতা বলরাম নারায়ণ ॥

যাঁহার আদেশ ধরি বাসলীচরণ স্মরি
হিরালাল সেনাত্মজ শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ।
উদয়সেনের কৃত চণ্ডির চরিতামৃত
বৎসরার্দ্ধে করিলেন বঙ্গে অনুবাদ ॥

	নাম	সম্পর্ক	রাজত্ব পাইবার শকাব্দ	
১।	শম্ভুরায়	সামন্তের আদি রাজা		
২।	ভবানী ঝোরাৎ	ব্রাহ্মণ রাজা	...	স্বরূপনারাণ ধর্ম্মরাজের সামন্তভূমে আগমন।
৩।	সামন্ত রায়াদি	১২ জন সামন্ত		
৪।	উত্তর হামীর	সামন্ত রায়ের জামাতা	১২৭৫	বাসলীর আবির্ভাব ও চণ্ডিদাসের লীলাকাল।
৫।	বীর হাম্বীর	উত্তর হামীরের পুত্র	১৩২৬	গণনায়ক বাঙ্গার রাজা হন।
৬।	নিশঙ্কু হামীর	ঐ	১৩৫৯	ইঁহার রাজত্বকালে কীর্ত্তিবাস সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করেন।
৭॥	নৃসিংহ দেব	নিশঙ্কুর পুত্র	১৩৭৭	
৮।	মোহান্ত রায়	নৃসিংহের পুত্র	১৩৮৮	
৯॥	শঙ্করনারাণ	মোহান্তের পুত্র	১৪০৪	হিন্দুদ্বেশী দিল্লীরাজ সিকন্দর বহু সাধু-সন্ন্যাসীকে হত্যা করিয়া হিন্দুর তীর্থযাত্রা নিবারণ করেন।

১০। বিরিঞ্চীনারাণ	ঐ	১৪৩৭	ইঁহার রাজত্বসময়ে চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন।
১১। চঞ্চলকুমারী	বিরিঞ্চীভার্য্যা	১৪৫৬	
১২। হাম্বীর-উত্তর রায়	বিরিঞ্চী পুত্র	১৪৭৪	ইঁহার রাজত্বকালে রূপ-সনাতন সন্ন্যাসাশ্রমী হন। কৃষ্ণদাস-কবিরাজ শ্রীজীব-গোস্বামীর নিকট বৃন্দাবনে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করেন।
১৩। জটিল বিবেক	উত্তর রায়ের পুত্র	১৫২৩	এই সময় কবিরাজ গোবিন্দদাস সুললিত ছন্দে রাধাকৃষ্ণলীলা-গীতি রচনা করেন।
১৪। স্বরূপনারায়ণ	বিবেকের পুত্র	১৫৫৩	
১৫। উত্তরনারায়ণ	স্বরূপভ্রাতা	১৫৭০	ইঁহার আমলে উদয়নারায়ণ সেন চণ্ডিচরিতামৃত রচনা করেন এবং সিঙ্গীগ্রামে কাশীরাম দাস আদি সভা বন ও বিরাট পর্ব্বের কতকদূর বাঙ্গালা পদ্যে মহাভারত রচনা করিয়া স্বর্গারোহণ করেন।
১৬। পঞ্চবিবেক	উত্তরপুত্র	১৬০৬	
১৭। স্বরূপনারাণ	বিবেকের পুত্র	১৬৬২	এই সময় নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় থাকিয়া ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন।
১৮। লছমীনারাণ	স্বরূপপুত্র	১৬৭৮	এই সময় দেশের কয়েক জন লোকের চক্রান্তের ফলে বিনা কারণে সিরাজদ্দৌলা নিহত হয়েন।
১৯। স্বরূপনারাণ	লছমীপুত্র	১৭০১	
২০। কানাইলাল	স্বরূপভ্রাতা		
২১। বলরামনারাণ	ঐ	১৭২৫	ইঁহার আমলে কৃষ্ণপ্রসাদ-সেন উদয়সেন-কৃত সংস্কৃত চণ্ডিচরিতামৃত বাঙ্গলা-পদ্যে অনুবাদ করেন।

এই শক-সম্বলিত বহুমূল্য বংশলতা অসম্ভাবিত রূপে পাওয়া গিয়াছে। রামতারকের বহির ১৭৮-১৮৬ পৃষ্ঠায় "কাম্য বনে দ্রৌপদীর সহিত কুরুরমণীগণের সাক্ষাৎ",* ১৮৮-১৯০ পৃষ্ঠায় "ছাতনার গ্রামের ও রাজবংশের পরিচয়" আছে।

এই বংশ-পরিচয় কৃষ্ণ-সেনের বিরচিত। ইহাতে তাঁহার রাজা বলাইনারাণ পর্যন্ত আছে। টীকাও তাঁহারই কৃত, কারণ, মূলে নাই, টীকায় আছে, এমন কথা আছে। মূলে শক যে যে শব্দে লিখিত হইয়াছে, সকল স্থলে সে সে শব্দ প্রচলিত অর্থে বুঝিতে পারা যায় না। লিপিকর-প্রমাদও ঘটিয়া থাকিবে। যেমন,

> ব্রহ্মকাল কর্ম্মঅরি শকে সিংহাসনোপরি
> বসে বীর হাম্বীর সে হামিরনন্দন।
> সংগ্রামে যবনে তাড়ি বঙ্গরাজ্য নিল কাড়ি
> অভিসেক দিলে তার জনেক ব্রাহ্মণ॥

এখানে ব্রহ্ম=১, কাল=৩, কর্ম্ম= , অরি=৬। টীকায় আছে ১৩২৬ শক। কর্ম্ম ২ মানিলে অবশ্য মিলাইয়া দিতে পারা যায়। যেমন নিষ্কাম ও সকাম কর্ম। অথবা সুকর্ম, কুকর্ম। কর্ম্ম স্থানে কর্ণ পড়িলে ২ সহজে আসে। তার পর, কে যবনকে পরাজিত করিয়া বঙ্গরাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন? টীকায় আছে, গণনায়ক। বোধ হয়, ইনি রাজা গণেশ। অবশ্য ১৩২৬ শকের পরে বুঝিতে হইবে।

সম্প্রতি রাজবংশ-লতায় আমাদের প্রয়োজন। সমসাময়িক ঘটনার কালের বিচার এখন থাক। অতএব কেবল রাজ্যগ্রহণ শকগুলি মিলাইয়া ছাতনার ইতিহাস সম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিতেছি।

১।২।৩। সামন্তভূমের উত্তরে ও পশ্চিমে শিখরভূম। এই ভূমের বর্তমান নাম পঞ্চকোট। এই ভূমে কূট, শিখর আছে। এই হেতু সে ভূমের নাম শিখরভূম। এখন মানভূম জেলার অন্তর্গত। ইং ১৮৭২ সালের পূর্বে সামন্তভূমও ঐ জেলার অন্তর্গত ছিল। শিখরভূমের রাজা সামন্তভূমের রাজা শঙ্খ-রায়কে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ভবানী-ঝোর্য্যাং নামে এক ব্রাহ্মণকুমারকে সমান্তভূমের রাজপাটে বসান। সামন্তেরা

---

* ইহার আরম্ভ,

> বিকচকমলবনে: পদ্ম যথা পদ্মাসনে:
> বিহরে বিকাশি কান্তিরাশি।

শেষ,

> পাণ্ডব প্রফুল্লমতি: সহকৃষ্ণা গুনবতী:
> ভাসিলেন আনন্দসাগরে॥

বশ্যতা স্বীকার করে নাই। ছাতনার দুই ক্রোশ দক্ষিণে মৌলবনা (মউল-বনা) গ্রামের মৌলেশ্বর শিবের গাজন হইয়া থাকে। নূতন রাজা ভবানী-ঝোর্‌য়াৎ গাজনের উৎসব দেখিতে গিয়াছিলেন। বিদ্রোহী বার জন সামন্ত শিবের ভক্ত্যা সাজিয়া সেই স্থযোগে খঙ্গর (অসি) আঘাতে ভবানীকে হত্যা করে, এবং পালাক্রমে এক এক সামন্ত এক এক মাস রাজা হইতে থাকে। ইহাতে রাজকার্যে বিশৃঙ্খলতা দেখিয়া এক সামন্তরাজা পশ্চিমদেশ হইতে আগত এক ছত্রিকে রাজ্য ও কন্যা দান করেন। ইনি হামীর-উত্তর নামে ছাতনার প্রথম ছত্রিরাজা ও বর্তমান বংশের আদি। এই ইতিহাস অদ্যাপি লোকমুখে প্রচারিত আছে। (সন ১৩৩৩ সালের ফাল্গুনের "প্রবাসী" দ্রষ্টব্য।) ছাতনার ২॥ ক্রোশ দক্ষিণে স্বরূপনারায়ণ ধর্মরাজ আছেন। কবি দ্বারকেশ্বর নদীর নাম রূপনারায়ণ করিয়াছেন। অর্থাৎ স্বরূপনারায়ণ ধর্মরাজ হইতে নদীর নাম। এই নাম ছাতনায় অজ্ঞাত। মেদিনী-পুর জেলায় ঘাটালের দক্ষিণে শিলাই নদী দ্বারকেশ্বরে পড়িবার পর নদীর নাম রূপনারাণ হইয়াছে। এই নামও ঘাটালের স্বরূপনারায়ণ ধর্মরাজের নাম হইতে হইয়াছে।

৪। মাস=১২, অগ্নি=৭, বিশিখ=৫। ১২৭৫ শকে হামীর-উত্তর রাজা হন। "চণ্ডীদাসচরিতে" পাই, চণ্ডীদাস ১২৪৬ শকের চৈত্র মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব ১২৭৫ শকে তাঁহার বয়স ৩০ বৎসর হইয়াছিল। হামীর-উত্তর রাজা হইবার পূর্বে রামী-চণ্ডীদাসের মিলন হইয়াছিল। চণ্ডীদাসের চৌত্রিশ বৎসর বয়সের সময় মিথিলার বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার মিলন হইয়াছিল।

৫। ব্রহ্ম=১, কাল=৩, কর্ম=২, অরি=৬। ১৩২৬ শকে হামীর-উত্তরের পুত্র বীর-হাম্বীর রাজা হন। এই শকের পরে গণনায়ক পূর্ববঙ্গে রাজা হন।

৬। গো=১, গুণ=৩, ইষু=৫, গ্রহ=৯। ১৩৫৯ শকে বীর-হাম্বীরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিশঙ্কনারায়ণ রাজা হন।

৭। ১৩৫৭ শকের 'রসাঙ্গ' বর্ষপরে নিশঙ্কর পুত্র নৃসিংহ রাজা হন। 'রসাঙ্গ' পাঠ ধরিলে ৬৮ বৎসর হয়। টীকায় ১৮ বৎসর আছে। বোধ হয় পাঠটি রূপাঙ্গ ছিল।

৮। ১৩৭৭ শকের 'ইন্দ্রিয়' বর্ষ গতে নৃসিংহপুত্র মোহান্ত কৈশোর বয়সে রাজা হন। কবি অন্তঃকরণ সহিত ইন্দ্রিয়= ১১ ধরিয়াছেন।

৯। ভুবন=১৪, অন্তরীক্ষ=০, বর্ণ=৪। ১৪০৪ শকে মোহান্তপুত্র শঙ্করনারায়ণ রাজা হন।

১০। বিধু=১, বর্ণ=৪, গুণ=৩, অর্ণব=৭। ১৪৩৭ শকে শঙ্করের বৈমাত্রভ্রাতা বিরিঞ্চিনারায়ণ রাজা হন।

১১। ১৪৩৭ শকের ব্রহ্ম=১, দ্বার=৯, ১৯ বর্ষ গতে অর্থাৎ ১৪২৬ শকে বিরিঞ্চির রাণী চঞ্চল-কুমারী রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। তিনি তখন সসত্বা ছিলেন। তিনি 'অচলাঙ্গ' অচলা=ভূ=১, অঙ্গ=৮, ১৮ বর্ষ রাজত্ব করেন।

১২। ভূ=১, দিক=৪, জলধি=৭, বর্ণ=৪। ১৪৭৪ শকে চঞ্চলকুমারীর পুত্র হামীর-উত্তর রাজা হন। ছাতনার ইটে ইঁহার নাম ও শক ১৪৭৫ আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, ইনি বেষ্টনপ্রাচীর করাইয়াছিলেন। টীকায় ইঁহাকে 'উত্তর রায়' বলা হইয়াছে। ইটেও এই নাম আছে। অতএব ইনি দ্বিতীয় হামীর-উত্তর।

১৩। পক্ষদিন=১৫, পক্ষ=২, কাল=৩। ১৫২৩ শকে উত্তর-রায়ের পুত্র জটিলবিবেকনারায়ণ রাজা হন।

১৪। বিধু=১, প্রাণ=৫, পিতৃ=৫, দোষ=৩। টীকায় পিতৃস্থানে ৫ আছে। চাণক্যনীতিতে পঞ্চপিতা প্রসিদ্ধ। ১৫৫৩ শকে (১ম) স্বরূপনারায়ণ রাজা হন।

১৫। পক্ষকাল=১৫, দ্বীপ=৭, অম্বর=০। ১৫৭০ শকে স্বরূপের ভ্রাতা উত্তরনারায়ণ রাজা হন। ইঁহারই আদেশে উদয়-সেন ১৫৭৫ শকে "চণ্ডিদাসচরিতামৃতম্" গ্রন্থ রচনা করেন।

১৬। শশীকলা=১৬, শূন্য=০, রস=৬। ১৬০৬ শকে উত্তরের পুত্র খঞ্জ বিবেকনারায়ণ রাজা হন। ইনি ১৬৫৫ শকে বাসলীর দ্বিতীয় মন্দির নির্মাণ করান। নাম ও শক মন্দিরগাত্রের পাথরে উৎকীর্ণ আছে।

১৭। ১৬০৬ শকের ভূত=৫, অরাতি=৬, ৫৬ বর্ষ গতে অর্থাৎ ১৬৬২ শকে (২য়) স্বরূপনারায়ণ রাজা হন।

১৮। ভূ=১, দর্শন=৬, অর্ণব=৭, বজ্র=৮। (দণ্ডী-পর্বে অষ্টবজ্র।) ১৬৭৮ শকে দ্বিতীয় স্বরূপের পুত্র লছমীনারাণ রাজা হন। "চণ্ডীদাস-চরিত" পুথীতে আছে, ইনি কবির পিতা হীরালাল গাঁতাইতকে ১৬৯৩ শকে লখ্যাশোল গ্রাম দেন।

১৯। সোম=১, অব্ধি=৭, খ=০, ওষধীশ=১। ১৭০১ শকে লছমীনারাণের পুত্র (৩য়) স্বরূপনারাণ রাজা হন।

২০। তৎপরে স্বরূপের ভ্রাতা কানাইলাল রাজা হন। এখানে কবি ইঁহার রাজ্যগ্রহণশক দেন নাই। লছমীনারাণের তিন পুত্র, স্বরূপ, বলাই, কানাই। স্বরূপের পর কানাই বলপূর্বক রাজা হইয়াছিলেন। রাজ্য বলাইনারাণের প্রাপ্য ছিল। "চণ্ডীদাসচরিতে" কবি দেশের দুর্গতি-বর্ণনাস্থলে লিখিয়াছেন, "কালর হস্তে খরকরবাল, লালের সিংহাসন।" বলাইনারাণ মকদ্দমা করিয়া রাজ্য পান।

২১। ধরা=১, সিন্ধু=৭, পক্ষ=২, শর=৫। ১৭২৫ শকে বলাইনারাণ রাজা হন। ইঁহারই আদেশে কৃষ্ণ-সেন উদয়-সেন-কৃত "চণ্ডিচরিতামৃত" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন।*

রাজা, রাণী, রাজার সহোদর, রাজার বৈমাত্রভ্রাতা রাজত্ব করিতেন। এই হেতু পুরুষগণনা দ্বারা কাল পরীক্ষা করিতে পারা যায় না। দেখা যাইতেছে, ১২৭৫ শকে হামীর-উত্তর হইতে ১৭২৫ শকে বলাইনারাণ পর্যন্ত ৪৫০ বৎসরে ১৭ রাজা হইয়াছিলেন। হারাহারি রাজ্য-শাসনকাল ২৬॥ বৎসর। ইহা অসম্ভব নহে। মল্লভূমের ইতিহাসে দেখা যায়, রাজা কানুমল্ল ১২৬৭ শকে রাজা হন। রাজা চৈতন্যসিংহ ১৭২৪ শক পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১২৬৭ হইতে ১৭২৪ শক ৪৫৭ বৎসরে ১৭ রাজা হইয়াছিলেন। অতএব হারাহারি রাজত্বকাল ২৭ বৎসর। প্রথম হামীর-উত্তর হইতে দ্বিতীয় হামির-উত্তর ২০০ বৎসর। এই কালে ৮ রাজা প্রত্যেকে হারাহারি ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব ছাতনা-রাজবংশলতায় অসম্ভব কিছু নাই। প্রথম হামীর-উত্তরের পূর্বে হামীর নামে রাজা নিশ্চয় ছিলেন। তাঁহাকে ধরিয়া তিন রাজায় ৫০ বৎসর ধরা যাইতে পারে। এইরূপে দেখা যায়, ১২২৫ শকে শঙ্খ-রায় রাজা হইয়াছিলেন। "বাঁকুড়া গেজেটিয়রে" ওমালি সাহেব ১৩২৫ শক শুনিয়াছিলেন।

ছাতনার এই রাজবংশ-পরিচয় হইতে জানিতেছি, ১২৭৫ শকে, ইং ১৩৫৩ সালে হামীর-উত্তর রাজা হইয়াছিলেন। এই সময়ে চণ্ডীদাস ছাতনায় রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গীতি গাহিয়াছিলেন। কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পূর্বে কৃষ্ণ-সেন এই বংশ-পরিচয় লিখিয়াছিলেন। তিনি বংশ-পরিচয়ের বৃত্তান্ত কোথায় পাইয়াছিলেন, রাজাদিগের সমকালিক ঘটনা কোথায় শুনিয়াছিলেন, কে জানে। সামন্তভূম ক্ষুদ্র রাজ্য বটে, প্রায় ৩০০ বর্গমাইল, ও রাজস্ব পনর হাজার টাকা, তথাপি স্বাধীন ছিল, রাজত্বের আনুষঙ্গিক সবই ছিল, রাজার জ্যোতিষী ও ভাটও ছিল। ১৭৭৭ শকে, মাত্র ৮১ বৎসর পূর্বে, ছাতনা-বাসী নিত্যানন্দপুত্র পরমানন্দ-দাস (বৈদ্য) "রসকদম্ব" পুথী সমাপ্তিতে লিখিয়াছেন,

> তাকো নিবাসহু ছাতনা সুন্দর নগর সুঠাম।
> চারুবর্ণলোগ নিবসতু হৈঁ সভে দয়া অঁক দান॥
> তাকো ভূপ প্রসিদ্ধ মহী লছমীনারায়ণ রাজ।
> জাকো ঘরমে বাশলী সদত করত বিরাজ॥
> রাজা সান্ত শূধীর হৈঁ ধার্ম্মিক গুণহী অনন্ত।
> সন্তগণে প্রতিপালন কিজে দুষ্টজনহি দুরন্ত॥

এই রাজা উত্তর লছমীনারাণ রাধাকৃষ্ণ-লীলাগীত ও শ্যামা-গীত রচিয়াছিলেন। সে রাধাকৃষ্ণ-লীলাগীত বিষ্ণুপুরে প্রচারিত হইয়াছিল। ইঁহার পুত্র রাজা আনন্দলাল সন ১২৬৪ সালে চোরা ঘাতে নিহত হন। ইহার পর রাজবংশ সর্বস্বান্ত ও ছাতনা হতশ্রী হইয়াছে। লোকে বলে মল্লরাজ্য যত কালের, সামন্তরাজ্যও তত কালের।

* কৃষ্ণ-সেন রাজা বলাইনারাণের সদস্য ছিলেন। তিনি শব্দে ও অঙ্কে ১৭২৫ শকে বলাইনারাণকে সিংহাসনে বসাইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বলাইনারাণের অগ্রজ ৩য় স্বরূপনারাণ ১৭৩২, ১৭৩৩, ১৭৩৪ শকেও সনন্দ দিয়াছিলেন। সে সে সনন্দ আছে। কৃত্রিম কিনা, বলিতে পারি না। ১৭৪০-১৭৬১ পর্যন্ত বলাইনারাণ-প্রদত্ত সনন্দ আছে। বলাইর পুত্র ২য় লছমীনারাণ ১৭৬২ শকে এক সনন্দ দিয়াছিলেন।

জটিল ব্যাপার

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা জটা জুটিয়াছিল।

পরচুলার ব্যবসা করি না; সখের থিয়েটার করাও অনেক দিন ছাড়িয়া দিয়াছি। তাই, আচম্বিতে যখন একটি পিঙ্গলবর্ণ জটার স্বত্বাধিকারী হইয়া পড়িলাম তখন ভাবনা হইল, এ অমূল্য নিধি লইয়া কি করিব।

কিন্তু কি করিয়া জটা লাভ করিলাম সে বিবরণ পাঠকের গোচর করা প্রয়োজন; নহিলে বলা-কহা নাই হঠাৎ একটি জটা বাহির করিয়া বসিলে পাঠক স্বভাবতই আমাকে বাজীকর বলিয়া সন্দেহ করিবেন। এরূপ সন্দেহভাজন হইয়া বাঁচিয়া থাকার চেয়ে উক্ত জটা মাথায় পরিয়া বিবাগী হইয়া যাওয়াও ভাল।

রবিবার প্রাতঃকালে বহির্দ্বারের সম্মুখে মোড়ায় বসিয়া রোদ পোহাইতেছিলাম—সাঁওতাল পরগণার মিঠে-কড়া ফাল্গুনী রৌদ্র মন্দ লাগিতেছিল না—এমন সময় এক গাঁট্টা-গোঁটা সন্ন্যাসী আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিলেন,—'বম্ মহাদেও, ভিখ্ লাও।'

বাবাজীর নাভি পর্য্যন্ত সর্পাকৃতি জটা দুলিতেছে, মুখ বিভূতিভূষিত। তবু ভক্তি হইল না, কহিলাম, 'কিছু হবে না।'

বাবাজী ঘৃণিত নেত্রে কহিলেন,—'কেঁও! তুম্ ম্লেচ্ছ্ হ্যায়? সাধু-সন্ত্ নহি মান্তা?'

বাবাজীর বচন শুনিয়া আপাদমস্তক জলিয়া গেল, বলিলাম, 'নহি মান্তা।'

সাধুবাবা অট্টহাস্যে পাড়া সচকিত করিয়া বলিলেন, 'তু বাংগালী হ্যায়—বাংগালীলোক ভ্রষ্ট্ হোতা হ্যায়!'

আর সহ্য হইল না, উঠিয়া সাধুবাবার জটা ধরিয়া মারিলাম এক টান।

কিছুক্ষণ দু-জনেই নির্ব্বাক। তার পর বাবাজী জটাটি আমার হস্তে রাখিয়া মুণ্ডিত শীর্ষ লইয়া দ্রুত পলায়ন করিলেন। রাস্তার কয়েক জন লোক হৈ হৈ করিয়া উঠিল, বাবাজী কিন্তু কোন দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না।

এক জন পথচারী সংবাদ দিয়া গেল,—লোকটা দাগী চোর, সম্প্রতি জেল হইতে বাহির হইয়া ভেক্ লইয়াছে। সে যা হোক, কিন্তু এখন এই জটা লইয়া কি করিব? সংবাদ-দাতাকে সেটি উপহার দিতে চাহিলাম, সে লইতে সম্মত হইল না।

হঠাৎ একটা প্ল্যান মাথায় খেলিয়া গেল—গৃহিণীকে ভয় দেখাইতে হইবে।

বাহিরে প্রকাশ না করিলেও আধুনিকা বলিয়া প্রমীলার মনে বেশ একটু গর্ব্ব আছে। গত তিন বৎসরের বিবাহিত জীবনে কখনও তাহাকে সেকেলে বলিবার সুযোগ পাই নাই। নিজেকে সে পুরুষের সমকক্ষ মনে করে, তাই তাহার লজ্জার বাড়াবাড়ি নাই; কোনও অবস্থাতেই লজ্জা বা ভয় পাওয়াকে সে নারীসুলভ লজ্জার ব্যতিক্রম মনে করে।

তার এই অসঙ্কোচ আত্মম্ভরিতা মাঝে মাঝে আমার পৌরুষকে পীড়া দিয়াছে, একটা অস্পষ্ট সংশয় কদাচিৎ মনের কোণে উঁকি মারিয়াছে—

ভাবিলাম, আজ পরীক্ষা হোক প্রমীলার মনের ভাব কতটা খাঁটি, কতটা আত্মপ্রতারণা।

জটা লুকাইয়া রাখিয়া বাড়ীর ভিতরটা একবার ঘুরিয়া আসিলাম। প্রমীলা বাড়ীর পশ্চাদ্দিকের ঘরে বসিয়া আছে। তাহার হাতে একখানা চিঠি। নিশ্চয় জটা-ঘটিত গণ্ডগোল শুনিতে পায় নাই।

আমাকে দেখিয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিল। মুখখানা গম্ভীর। জিজ্ঞাসা করিল, 'কিছু চাই?'

বলিলাম, 'না। কার চিঠি?'

'বাবার।'

'আজ এল?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়ীর সব ভাল ?'

প্রমীলা নীরবে ঘাড় নাড়িল। আমি ঘরময় একবার ঘুরিয়া বেড়াইয়া বলিলাম, 'আজ বিকেলে আমায় জংশনে যেতে হবে। রাত্রি এগারোটার গাড়ীতে ফিরব।'

'বেশ।'

'রাত্রে একলাটি বাড়ীতে থাকবে, ভয় করবে না ত ?'

'ভয়!' ঈষৎ ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'আমার ভয় করে না।'

'ভাল।' ঘর হইতে চলিয়া আসিলাম। হঠাৎ এত গাম্ভীর্য্য কেন ?

যা হোক, আজ রাত্রেই গাম্ভীর্য্যের পরীক্ষা হইবে।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় বন্ধুর গৃহে খানিকটা ছাই লইয়া মুখে মাখিয়া ফেলিলাম ; তার পর আলখাল্লা ও জটা পরিধান করিয়া আয়নায় নিজেকে পরিদর্শন করিলাম।

বন্ধু সপ্রশংসভাবে বলিলেন, 'খাসা হয়েছে, কার সাধ্যি ধরে তুমি দাগাবাজ ভণ্ডসন্ন্যাসী নও।—এক ছিলিম গাঁজা টেনে নিলে হ'ত না ?'

'না, অভ্যাস নেই—' বলিয়া বাহির হইলাম।

নিজের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দরজা বন্ধ। পিছনের পাঁচিল ডিঙাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

শয়নঘরে আলো জ্বলিতেছে। দরজার বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, প্রমীলা আলোর সম্মুখে ইজি-চেয়ারে বসিয়া নিবিষ্ট মনে পশমের গেঞ্জি বুনিতেছে।

হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিলাম, 'হর হর মহাদেও।'

প্রমীলার হাত হইতে শেলাই পড়িয়া গেল, সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া চমকিত কণ্ঠে বলিল, 'কে ?'

আমি খ্যাক্ খ্যাক্ করিয়া হাসিয়া বলিলাম, 'বম্ শঙ্কর। জয় চামুণ্ডে!'

প্রমীলা বিস্ফারিত স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ভয় পাইয়া পলাইবার কোনও চেষ্টা করিল না। তার পর সশব্দে নিশ্বাস টানিয়া বুকের উপর হাত রাখিল। 'সুরেশদা, তুমি এ বেশে কেন ?'

ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেলাম। সুরেশদা! আমি পাকা সন্ন্যাসী, আমাকে সুরেশদা বলে কেন ?

প্রমীলা স্খলিতস্বরে বলিল, 'সুরেশদা, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। কিন্তু তুমি কেন এলে ?—তোমাকে আমি বলেছিলুম আর আমার কাছে এস না, তবু কেন তুমি এখানে এলে ?'

মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সুরেশ প্রমীলার বাপের বাড়ীর বন্ধু, বোধ হয় একটু সম্পর্কও আছে। লোকটাকে আমি, গোড়া হইতেই অপছন্দ করিতাম ; প্রমীলার সঙ্গে বড় বেশী ঘনিষ্ঠতা করিত। কিন্তু সে ঘনিষ্ঠতা যে এত দূর—

ভাঙা গলায় বলিলাম, 'প্রমীলা—আমি—'

প্রমীলা দুই মুঠি শক্ত করিয়া তীক্ষ্ণ অনুচ্চ স্বরে বলিল, 'না না, তুমি যাও সুরেশদা, ইহজন্মে আমাদের মধ্যে সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে। আগেকার কথা ভুলে যাও। এখন আর আমি তোমার কাছে যেতে পারব না।'

দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিলাম, 'প্রমীলা, এক দিনের জন্যেও কি তুমি আমাকে ভাল—'

'বাসতুম। এখনও বাসি। কিন্তু তুমি যাও সুরেশদা, দোহাই তোমার—এখনই বাড়ীর মালিক এসে পড়বে—সর্ব্বনাশ হবে।'

আমি তাহার কাছে ঘেঁষিয়া গেলাম কিন্তু সে সরিয়া গেল না ; উত্তেজনা-অধীর স্বরে বলিল, 'যাবে না ? আমার গালে চূণকালি না মাখিয়ে তুমি যাবে না ? তোমার পায়ে পড়ি সুরেশদা, এখনই সে এসে পড়বে। তবু দাঁড়িয়ে রইলে ? আচ্ছা, এবার যাও—' সহসা সে আমার ভস্মলিপ্ত অধরে চুম্বন করিল—'এস'। আমার হাত ধরিয়া ঘরের বাহিরে টানিয়া লইয়া চলিল। আমি হতভম্বের মত চলিলাম।

খিড়কির দ্বার খুলিয়া দিয়া প্রমীলা বলিল, 'আর কখনও এমন পাগলামি ক'রো না। যদি থাকতে না পার, চিঠি দিও—ও আমার চিঠি পড়ে না। কিন্তু এমন ভাবে আর কখনও আমার কাছে এস না। মনে রেখ, যত দূরেই থাকি আমি তোমারই, আর কারুর নয়।'

অন্ধকারে তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু মনে হইল সে উচ্ছ্বসিত কান্না চাপিবার চেষ্টা করিতেছে।

নিজের খিড়কির দরজা দিয়া চুপি চুপি চোরের মত বাহির হইয়া গেলাম।

*　　*　　*

কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু তবু, চিরদিন অন্ধের মত প্রতারিত হওয়ার চেয়ে এ ভাল।

প্রমীলার চুম্বন আমার অধরে পোড়া ঘায়ের মত জ্বলিতেছিল, তাহার কথাগুলা বুকের মধ্যে কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া গিয়াছিল। 'ইহজন্মে আমাদের মধ্যে সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে—' কিরূপ সম্পর্কের ইঙ্গিত এই কথাগুলার মধ্যে রহিয়াছে? 'বাসতুম—এখনও ভালবাসি'—আমার সঙ্গে তবে এই তিন বৎসর ধরিয়া কেবল অভিনয় চলিয়াছে! 'আমি তোমারই, আর কারুর নয়'—হুঁ, স্বামী শুধু বিলাসের সামগ্রী জোগাইবার যন্ত্র! উঃ! এই নারী! আধুনিকা শিক্ষিতা নারী!

বন্ধুর গৃহে ফিরিলে বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হ'ল? বিদুষী বৌ সন্ন্যাসীঠাকুরকে কি রকম অভ্যর্থনা করলে?'

মুখের ছাই ধুইতে ধুইতে বলিলাম, 'ভাল।'

'দাঁতকপাটি লেগেছিল?'

মনে মনে বলিলাম, 'লেগেছিল আমার।'

স্থির করিলাম, নাটুকে কাণ্ড ছোরাছুরি আমার জন্য নয়। প্রমীলা কতখানি ছলনা করিতে পারে আজ দেখিব; তার পর তাহার সমস্ত প্রতারণা উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিব। ভদ্রলোক ইহার বেশী আর কি করিতে পারে? ইহার পরও যদি প্রমীলা তাহার আধুনিক কাল্‌চারের দর্প লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে ত পারুক। রোহিণী-গোবিন্দলালের থিয়েটারি অভিনয় করিয়া আমি নিজেকে কলঙ্কিত করিব না।

বাড়ী গিয়া দ্বারের কড়া নাড়িলাম। প্রমীলা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। দেখিলাম, তাহার মুখ প্রশান্ত, চোখের দৃষ্টিতে গোপন অপরাধের চিহ্ন মাত্র নাই।

সে বলিল, 'এরই মধ্যে ষ্টেশন থেকে এলে কি ক'রে? এই ত পাঁচ মিনিট হ'ল ট্রেন এল, আওয়াজ শুনতে পেলুম।'

জুতা জামা খুলিতে খুলিতে বলিলাম, 'তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এলুম—তুমি একলা আছ।' প্রথমটা আমাকেও ত অভিনয় করিতে হইবে!

'কিছু খাবে নাকি? দুধ মিষ্টি ঢাকা দিয়ে রেখেছি।'

'না—খেয়ে এসেছি।' টেবিলের উপর আলোটা বাড়াইয়া দিয়া চেয়ারে বসিলাম।

'শোবে না? আলো বাড়িয়ে দিলে যে।'

আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় তাহার কণ্ঠস্বরে, মুখের ভঙ্গিমায়, দেহের সঞ্চালনে, কোন একটা নির্দেশক চিহ্ন খুঁজিতেছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য তাহার অভিনয়, চক্ষের পলকপাতে তাহার মনের কথা ধরা গেল না।—এমনি করিয়াই এত দিন অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। উঃ—

বলিলাম, 'আলো বাড়িয়ে দিলুম তোমার মুখ ভাল করে দেখব বলে।'

সে গ্রীবাভঙ্গী সহকারে হাসিয়া বলিল, 'কেন, আমার মুখ এই প্রথম দেখছ নাকি?'

বলিলাম, 'না। কিন্তু মুখ কি ইচ্ছে করলেই দেখা যায়! আমার মুখ তুমি দেখতে পেয়েছ?'

'পেয়েছি। এত রাত্রে আর হেঁয়ালি করতে হবে না—শুয়ে পড়।—আমি আসছি।'

পাশের ঘরে গিয়া অতি শীঘ্র বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সে ফিরিয়া আসিল। 'এখনও শোও নি? শীতও করে না বুঝি! আমি বাপু ছেলেমানুষ, আর দাঁড়াতে পারব না।' একটু হাসিল।

তার পর আমার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, 'ওগো এস, শুয়ে পড়ি।'

এত ঘনিষ্ঠ, এত অন্তরঙ্গ এই কথা কয়টি, যে আমার হঠাৎ ধোঁকা লাগিল—আগাগোড়া একটা দুঃস্বপ্ন নয় ত?

'প্রমীলা!'

শঙ্কিত চক্ষে চাহিয়া সে বলিল, 'কি গা!'

আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলাম, 'না, কিছু নয়। শুয়ে পড়াই যাক, রাত হয়েছে।'

শয়ন করিবার পর কিয়ৎকাল দু-জনেই চুপ করিয়া রহিলাম। পাশাপাশি শুইয়া দুই জন মানুষের মধ্যে কতখানি লুকোচুরি চলিতে পারে ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

হঠাৎ প্রমীলা বলিল, 'আজ সন্ধ্যের পর কানন বেড়াতে এসেছিল।'

'কানন ?'

'হ্যাঁ গো—কাননবালা। যাকে বিয়ের আগে এত ভালবাসতে—এখন মনেই পড়ছে না ?'

গম্ভীরভাবে বলিলাম, 'ভালবাসতুম না, সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু।'

'ঐ হ'ল। সে দু-তিন দিন হ'ল বাপের বাড়ী এসেছে; আজ এ বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল। তার সঙ্গে অনেক গল্প হ'ল।'

'কি গল্প হ'ল ?'

'তুমি কবে একবার কালিঝুলি মেখে ভূত সেজে রাত্রে তার শোবার ঘরে ঢুকেছিলে, সেই গল্প বললে।'

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া বলিলাম, 'আর কি বললে ?'

'আরও অনেক গল্প। আচ্ছা, রাত দুপুরে ভূত সেজে তার ঘরে ঢুকেছিলে কেন বল ত ?'

'ভয় দেখাবার জন্যে।'

মাথায় রাগ বাড়িতেছিল। প্রমীলা আমার খুঁৎ ধরিতে চায় কোন্ স্পর্দ্ধায় ? অথবা ইহাও ছলনার একটা অঙ্গ ?

গলার স্বরটা একটু উগ্র হইয়া গেল—'তবে তুমি অন্য কিছু ভাবতে পার বটে !'

'কেন ?'

আমি বিছানার উপর উঠিয়া বসিলাম, 'প্রমীলা !'

'কি ?'

'তোমার সুরেশদা এখন কোথায় ?'

ক্ষীণস্বরে প্রমীলা বলিল, 'সুরেশদা !'

'হ্যাঁ—সুরেশদা। যাকে বিয়ের আগে এত ভালবাসতে—মনে পড়ছে না ?'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া প্রমীলা ধীরে ধীরে বলিল, 'পড়ছে। তাঁকে বিয়ের আগে ভালবাসতুম, এখনও বাসি।'

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমার মুখের উপর একথা বলিতে বাধিল না ?

দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিলাম, 'তোমার এই সুরেশদা এখন কোথায় আছেন বলতে পার ?'

'পারি। তুমি শুনতে চাও ?'

'বল। তোমার মুখেই শুনি।'

প্রমীলা ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিল, 'তিনি স্বর্গে।'

'স্বর্গে ?—মানে ?'

প্রমীলা ভারী গলায় বলিল, 'আজ সকালে বাবার চিঠি পেয়েছি, সুরেশদা মারা গেছেন। তুমি সুরেশদাকে পছন্দ করতে না তাই তোমাকে বলি নি।' হঠাৎ একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, 'সুরেশদা দেবতার মত লোক ছিলেন, আমাকে মা'র-পেটের-বোনের চেয়েও বেশী স্নেহ করতেন।'

মাথাটা পরিষ্কার হইতে একটু সময় লাগিল।

প্রমীলা আমার গায়ে হাত রাখিয়া মৃদু হাস্যে বলিল, 'এবার ঘুমোও।' তার পর নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিল, 'আর কখনও এমন পাগলামি ক'রো না। মনে রেখ আমি তোমারই, আর কারুর নয়—'
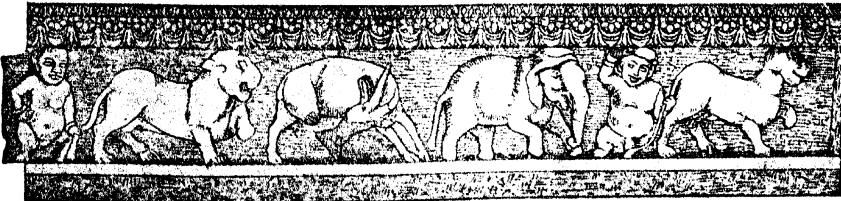
মহারাষ্ট্রে বর্ষা-উৎসব

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

সব দেশেই বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ আনন্দ-উৎসব আছে। মহারাষ্ট্র দেশের কোলাপুর রাজ্যে কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে তেমনই এক উৎসব আছে, তার নাম "টেম্বলাবাঈলা পানি।"

আষাঢ় মাসে এদেশে বর্ষা আরম্ভ হয়। আষাঢ়ের মনসুনের বাতাস সমুদ্র-গর্জ্জনের মত ভীষণ গর্জ্জন ক'রে বেগে বইতে থাকে, আর থম্‌কে থম্‌কে বৃষ্টি পড়তে থাকে, হ্রদ-নদী, খাল-বিল জলে ভরে যেতে থাকে; তখন এই কৃষকশ্রেণীর লোকেরা কল্পনায় তাদের শস্যক্ষেত্র-গুলির শ্যামল রূপ দেখতে পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। বর্ষার নবজলধারায় দেবীকে অভিষিক্ত ক'রে তারা দেবীর আশীর্ব্বাদ চাইতে যায়। সেই সময়ই তাদের বর্ষা-উৎসব।

কোলাপুর মহারাষ্ট্র অঞ্চলের একটি দেশী রাজ্য। এর প্রাকৃতিক শোভা বড়ই মনোহর। দুর্ভেদ্য শৈলরাজি পার হয়ে এই পার্ব্বত্য রাজ্যে পৌঁছতে হয়। বাংলা-মায়ের স্নিগ্ধ শ্যামল কোল ছেড়ে এসে মহারাষ্ট্রের এই বন্ধুর পার্ব্বত্য শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে মন বিস্ময়ে ভরে যায়।

আম্বাবাঈ ও টেম্বলাবাঈ, এঁরা দু-বোন কোলাপুরের নগর-দেবী। বড় বোন টেম্বলাবাঈ ও ছোট বোন আম্বাবাঈ প্রধান ও বিখ্যাত দেবী। ব্রাহ্মণরা বিশেষ ভক্তিভরে এঁদের পূজো ক'রে থাকে, নগরের মধ্যস্থলে আম্বাবাঈর মন্দির মাথা তুলে আছে।

মন্দিরের কারুকার্য্য ও গঠন-নৈপুণ্য পুরাকালের ভারতবাসীর ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যবিদ্যার পরিচয় দেয়। শুধু কোলাপুরে নয়, সমগ্র দাক্ষিণাত্যেই আম্বাবাঈর মন্দির ধর্ম্মের পীঠস্থান।

টেম্বলাবাঈ সেরূপ প্রসিদ্ধা না হ'লেও কৃষক-সম্প্রদায়ের আরাধ্যা দেবী। এক পাহাড়ের চূড়ায় টেম্বলাবাঈর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। স্থানটি বড় সুন্দর ও নির্জ্জন। হিন্দুদের দেবমন্দিরের স্থান-নির্ব্বাচন সর্ব্বত্রই তাদের রুচির পরিচয় দেয়। অধিকাংশ স্থলেই দেবমন্দিরগুলি পাহাড়ের চূড়ায়, নয়ত অতি নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও নীরবতা দর্শকের মনে গাম্ভীর্য্য এনে দেয়। তার পর মন্দিরের ভিতরের মৃদু আলোক, ধূপ-ধুনোর গন্ধ, ফুলের সৌরভ, আলো-আঁধারের মধ্যে কালো পাথরের দেবদেবীর মূর্ত্তি এক রহস্যলোকের সৃষ্টি করে। এখানে উত্তর-ভারতের মন্দিরগুলির মত পাণ্ডার উপদ্রব নেই; "টাকা দাও, পয়সা দাও, সুফল নাও" এসব ব'লে উৎপাত ক'রে দর্শকের অথবা পুণ্যকামী ভক্তদের মনে বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলবার লোক এখানে নেই। তাই এদেশের মন্দিরগুলি বেশ শান্তিময়।

এই টেম্বলাবাঈর মন্দির এত নির্জ্জন যে সন্ধ্যে হ'লেই সব জনপ্রাণী সে-আশ্রয় ছেড়ে চলে যায়। জনপ্রবাদ আছে যে, এই দেবী বড় জাগ্রত। রাত্রে জনহীন মন্দিরে কি হয়, সে-বিষয়ে সাধারণের কল্পনা বহু বিচিত্র প্রবাদের সৃষ্টি করেছে, যেমন, রাত্রে এখানে দেবীর লীলা হয়, ভূত, অপ্সরা প্রভৃতির আবির্ভাব হয়, দু-এক জন সেখানে লুকিয়ে থেকে দু-চোখ হারিয়েছে, নয়ত প্রাণে মারা গেছে, ইত্যাদি।

এদিকে আম্বাবাঈর মন্দিরের চার দিকে জনকোলাহল। ভোরে সাতটা থেকে রাত্রি দশটা অবধি মন্দিরের দ্বার অবারিত থাকে। সেখানে সারাদিন পূজো-অর্চ্চনা সব চলতে থাকে, ভক্তেরা মন্দির-চত্বরে ব'সে সারাদিন সাধন-ভজন, শাস্ত্রপাঠ করতে থাকে। আম্বাবাঈর মন্দির সম্বন্ধে এদের কোন ভীতিই নেই।

বৎসরে একবার এই দু-বোনের সাক্ষাৎ হয়। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার পঞ্চমী তিথি এই সাক্ষাতের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। সেদিন এ-রাজ্যে উৎসব। রাজবাড়ীতে স্থাপিত আম্বাবাঈ ও নগরের মধ্যে স্থাপিত আম্বাবাঈ দু-জনের জন্য দুটি রুপোর পাল্কী বের করা হয়।

তাতে লাল রেশমের গদী এঁটে দুই আম্বাবাঈকে সোনা মুক্তোর গয়না ও রেশমী শাড়ী দিয়ে সাজিয়ে বসানো হয়। উপরে কারুকার্য্যখচিত মস্ত ছাতা ধরা হয়। তার পর পূজারী ব্রাহ্মণেরা সেই দুই পাল্কী কাঁধে ক'রে টেম্বলাবাঈ-দর্শনে যাত্রা করে।

স্বয়ং মহারাজ তাঁর পাত্রমিত্রসভাসদবর্গসহ ঘোড়ায় চ'ড়ে দেবীর পাল্কীর অনুগমন করেন। রাজ্যে যত রকম বাদ্য আছে,—ইংরেজী ব্যাণ্ড, দেশী বাদ্য, সানাই, বাঁশী, তবলা, শিঙ্গা, সমস্ত বাজতে থাকে, চার দিকে বাজী পোড়ান হয়। হাতীগুলিকে নানা বর্ণে চিত্রিত ক'রে, বাঘ কুকুর প্রভৃতির গায়ে রেশমী জামা এঁটে তাদের শোভাযাত্রায় বের করা হয়। উটগুলির উপর ব'সে তবলাওয়ালারা তবলা বাজাতে থাকে। অশ্বারোহী সৈন্য, পদাতিক সৈন্য তালে তালে চলতে থাকে। এই অপূর্ব্ব শোভাযাত্রার পেছনে রাজ্যের জনতা ভেঙে পড়ে। মহাসমারোহে এই বিপুল শোভাযাত্রা টেম্বলাবাঈর মন্দিরে পৌঁছয়। তখন বহুদিন পর দুই ভগিনীর মিলন হয়।

পূজারী ব্রাহ্মণেরা দেবীদ্বয়ের পূজো ক'রে, একটি কুমড়ো এনে দেবীর সম্মুখে রাখে। একটি রজক-কুমারী রেশমী বস্ত্রে অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে এসে তলোয়ার নিয়ে সেই কুমড়োটিকে এক কোপে কেটে ফেলে। তখন খুব জোরে বাজনা বেজে ওঠে, পূজো শেষ হয়ে যায়। তার পর আবার আম্বাবাঈকে পাল্কীতে চড়িয়ে শহরে ফিরিয়ে আনা হয়। এইটে হ'ল রাজ্যের একটি প্রধান উৎসব, যাতে রাজা থেকে আরম্ভ ক'রে জনসাধারণ সবাই যোগদান করে।

"টেম্বলাবাঈলা পানি" শুধু কুলওয়াড়ী বা কৃষক-সম্প্রদায়ের উৎসব। কৃষকবধূরা, কৃষককন্যারা নূতন মাটির কলসী চিত্রিত ক'রে তাতে নদী থেকে জল ভরে নেয়, তার ওপর একটি ক'রে নারকেল রাখে, তার পর নূতন রঙীন শাড়ী প'রে রেশমী আঁচল উড়িয়ে এই কলসী মাথায় তুলে নেয়, ও সার বেঁধে হেলে দুলে চলতে থাকে। বলদের গাড়ীগুলি দেবদারুপাতা দিয়ে সাজিয়ে তার মধ্যে ছোট ছেলেমেয়েদের বসিয়ে দেওয়া হয়। বলদগুলির শিং লাল রং দিয়ে রাঙিয়ে দেয়, সমস্ত গায়ে হলুদ ও সিঁদুর দিয়ে চিত্র এঁকে দেয়, গলায় ঘুঙুর গেঁথে মালা পরিয়ে দেয়। এই অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হয়ে বলদগুলি মন্থর গতিতে চল্‌তে থাকে। শিশুদের কলরব, বলদগুলির ঘুঙুরের মৃদুমধুর আওয়াজ চার দিকে উৎসবের সূচনা করে। এক দল বাদ্যকর মাদলের মত এক রকম বাদ্য বাজাতে আরম্ভ করে। তাতে নাচের এক অদ্ভুত সুর বাজতে থাকে। আর এক রকম সানাইও সাপ-নাচের গানের মত বাজতে থাকে, আর সেই তালে তালে কখনও একটি মেয়ে কখনও বা একটি পুরুষ প্রবল বেগে নাচতে আরম্ভ করে। পুরুষ বা মেয়েটির সমস্ত কপালে হলুদ ও কুঙ্কুম দিয়ে চিত্রিত ক'রে দেওয়া হয়। সে দু-হাত জোড় ক'রে কখনও লাফিয়ে, কখনও বা কাৎ হয়ে বাজনার তালে তালে নাচতে থাকে। না থেমে সে এক মাইল দু-মাইল নেচে নেচে চলে; লোকেরা তখন বলতে থাকে, তার শরীরে দেবতার আবির্ভাব হয়েছে; সে সমস্ত লোকের সম্ভ্রমের পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। এই বিচিত্র শোভাযাত্রা রাস্তায় রাস্তায় থাম্‌তে থাকে এবং দেববিশ্বাসী ও ভূত-বিশ্বাসী লোকেরা এসে ঐ দেবাবিষ্ট লোকটিকে নিজেদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের শুভাশুভ জিজ্ঞেস করে, সেও তার উত্তর দেয়। লোকেরা গভীর বিশ্বাসে তাই গ্রহণ করে।

এই ভাবে তারা শহর ছাড়িয়ে যখন সেই নির্জ্জন পাহাড়ের চূড়ায় টেম্বলাবাঈর মন্দিরে উপস্থিত হয়, তখন বাজনা খুব জোরে বেজে ওঠে। দেবাবিষ্ট লোকের তাণ্ডবনৃত্য আরও ভীষণ বেগে চল্‌তে থাকে। মাঝে মাঝে এক এক দলের লোক এক রকম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নাচের ভঙ্গীতে সেই বাজনা বাজাতে থাকে।

এই কুলওয়াড়ী জাতির মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ, কাজেই তারা সেই কলসীর নূতন বর্ষার জল মন্দিরের সিঁড়িতে ঢাল্‌তে আরম্ভ করে, তাতেই দেবীকে জল দেওয়ার উদ্দেশ্য সার্থক হয়। পূজারী মন্দিরের ভিতরে পূজো ক'রে পাঁঠা বলি দেয়। সেই দেবাবিষ্ট লোকটির শরীর থেকে তখন দেবতার তিরোধান হয়ে যায়। ধীরে ধীরে বাজনা থেমে যায়। তখন কুলওয়াড়া নরনারী ও শিশুদের বিচিত্র ভাষায়, বিচিত্র কলরবে, সেই পাহাড়ের নির্জ্জন চূড়া মুখরিত হয়ে ওঠে। দলে দলে পুরুষ স্ত্রী তাদের খাদ্যদ্রব্য বের ক'রে বনভোজন কর্‌তে ব'সে যায়। চার দিকে মেয়েদের গায় লাল, নীল, হলুদ, সবুজ রঙের শাড়ী, আর পুরুষদের মাথায়

নানা বর্ণের পট্‌কা (পাগড়ী) শোভা পেতে থাকে। অবশ্য সেখানে রূপের হাট বসে না। কারণ এই কুলওয়াড়ী জাতের মধ্যে সে-রকম গৌরবর্ণ ও সুন্দর মুখশ্রী দেখা যায় না, যতটা দেখা যায় উচ্চশ্রেণীর লোকদের মধ্যে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার পূর্ব্বেই দলে দলে এরা ঘরে ফিরতে থাকে। তার পর নব উৎসাহে, নব উন্মাদনায় স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা ক্ষেতের কাজে লেগে যায়, দেবীর আশীর্ব্বাদে আর কুলওয়াড়ীদের অশ্রান্ত পরিশ্রমে শস্যক্ষেত্র-গুলি শ্যামল রূপ ধারণ করে, জনসাধারণের দৃষ্টিতে 'টেম্বলা-বাঈলা পানি' উৎসব সার্থক হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রবাণী

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১

বহু মাঠ, গাছ, ঘর, বাংলার বিচিত্র ভুবন
সমাজ সংস্কৃতি ধান্য—বন্দীর নয় তো জীবন।
বাংলার মন তবু স্বর্ণভূমে
ঘুরেছে দিনের ঘুমে, বিস্মরণে
কত কাল জানি
জীবন্ত অতীত হ'তে বাণী
পায় নি মাটির যোগে নবীন যুগের ধ্যানাসনে ;
মেশে নি জাগ্রত ধারা দু-হাতে, মননে, শক্তি হ'য়ে
চিত্তধারা গেছে ব'য়ে
পৌরাণিক আর্য্যস্বপ্নে ; একালে, পশ্চিমী ঝড়ে দুলে
আত্মগতি গেছে ভুলে—
বন্দীর জীবন সেই, গ্রামে ঘরে ঘোরে প্রাণচাকা
কভু শান্তি, কভু ক্লান্তি, আকস্মিকে বেঁচে-থাকা,
আশ্চর্য্য প্রাণেরে ঢালা দৈবাধীন, অবিদ্রোহে,
দুর্য্যোগেরে দোষী ক'রে দুঃখের সাধনা মোক্ষ-মোহে—
অভাবের কান্না ওঠে, সূর্য্যাকাশ নিরুত্তর
ধূসর অভ্যাসমরু, দিগন্তে মৃত্যুর গুপ্তচর।

২

এলে তুমি বাণী,
পত্রে পত্রে তব রুদ্রপাণি
রৌদ্রে নেয় ভ'রে,
বাংলার প্রাণ ফোটে বন্ধভাঙা পুষ্পের নির্ঝরে ;
শূন্যচেরা শ্যামল চেতন
তব মুক্ত শাখার স্পন্দন
মহান্ যুগের স্রোতে
বৃহৎ মানবসংঘ হ'তে
মর্ম্মরণি'
দিল জাগরণী।
চমকের নেশাচূর্ণ চোখে
আজ মাঠে শস্য নেই দেখে লোকে
দিন গেছে ; ঘরে ক্ষুধা ; শত শত্রু ফিরে
অশক্তির নাট্যমঞ্চ ঘিরে।
শক্তি এল সত্যের প্রত্যয়ে।
ভোরে উঠে জনে জনে পরম বিস্ময়ে
মহাবাণী, শুভ্র পটে জেনেছে তোমায়, মর্ম্মমাঝে
পেয়েছে সত্তার স্পর্শ ; দিনকাজে
বিদ্যালয়, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য সমাজে জাগে ভাষা।
প্রজ্জ্বলন্ত আশা
মধ্যাহ্নে তোমার ছন্দে গ্রামে গ্রামে নবীন সংগ্রাম
করিছে প্রণাম।

সায়াহ্নের আলো লাগে গভীর আকাশ হ'তে যবে
তরু, তব ধ্যানাবিষ্ট পল্লবে পল্লবে
মর্ত্ত্য-জ্যোতিষ্কের সুর মেশে,
বঙ্গদেশে
মানবেরে দিলে অঙ্গীকার,
অস্তিত্বের অধিকার
যেখানে সুন্দর দিনাকাশে
সত্তার সমগ্র তরু আপনা বিকাশে॥

মানুষের মন

শ্রীজীবনময় রায়

১২

ভোলানাথ চ'লে গেল। শচীন্দ্র আর পার্ব্বতী দু-জনে রেলিং ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে ফ্লাস্কটা খুলে একটু সরবৎ খাবার জোগাড় করতে লাগ্‌ল।

চারিদিকে চেয়ে পার্ব্বতী বললে "মাগো, পায়রার অত্যাচারে বারান্দাগুলো হয়েছে দেখুন না। একটু বস্‌বার জো নেই। এমন চমৎকার বারান্দা, কি নোংরাই করেছে, নইলে বোটে না থেকে এখানে থাকলে নেহাৎ মন্দ হ'ত না।"

"তোমার মৎলবখানা কি? আজ কি এইখানেই রাত কাটাতে চাও নাকি? বল তাহ'লে না হয় ঘর-দোর সাফ করাই, কাঁথা কম্বল আনাই।"

কথাগুলো ব'লে ফেলে তার বাঙালীর কানে একটু বাজ্‌ল এবং মনে মনে সে একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠ্‌ল। পার্ব্বতী কিন্তু কথাটা গায়েই মাখল না। বললে, "মন্দ কি, দুই প্রহর আমি ঘুমব আপনি পাহারা দেবেন আর বাকী দুই প্রহর আপনি পাহারা দেবেন, আমি ঘুমব। বেশ হবে, কেমন?"

কৃত্রিম ভয়ে, কম্পিত কণ্ঠে, নয়ন বিস্ফারিত ক'রে শচীন বললে, "তার পর, 'কে জাগে' ব'লে যখন অন্ধকার থেকে ঘ্যাঁগা গলায় হাঁক পাড়বে, ইস্পাতের তলোয়ারের মত জিবটা খড়খড়ির ভিতর থেকে ঝল্‌সে উঠবে, তখন? ওরে বাবা, সে আমার বড্ড ভয় করবে, সে আমি পারব না। তার চেয়ে এক কাজ করা যাবে, আমরা দু-জনেই দু-জনকে পাহারা দেব, কি বল, এ্যাঁ।"

"ঘুমিয়ে, না জেগে?"

"যা প্রাণ চায় তোমার।"

"আমার প্রাণ চায় যে আমি ঘুমব, আপনি জাগবেন।"

"না, সে ভারি অন্যায় হবে। বরং এক কাজ করা যাবে —তুমি ঘুমলে আমি জাগিয়ে দেব, আর আমি জেগে থাকলে তুমি ঘুম পাড়াবে; কেউ কাউকে খাতির করব না।"

"হুঁ! বুঝ্‌লুম। মানে, তলোয়ারের মত জিবটা আমার—"

"ক্ষুরের কাছে হার মান্‌বে—ঠিক।"

"হ্যাঁ, আমার জিব ক্ষুরের মত, আর মশায়ের একেবারে মিছ্‌রির ছুরি। নিন্, এখন চলুন, যাওয়া যাক। কেবল বাক্‌চাতুরী করলে ত কাজ হবে না? আর কোন কাজ নেই?"

শচীন বললে, "কাজ! আজও কাজ? আরম্ভটা এমন হয়েছে যে আজ কাজের দিন ব'লে মনেই নিচ্ছে না। মনে হচ্ছে আজ রূপকথার রূপকের রাজ্যে কল্পনার পক্ষিরাজে সওয়ার হ'য়ে কাটিয়ে দিই। তেপান্তরে মাঠের পারে ঘুমন্ত-পুরীতে ফুলের মালা হাতে রাজকুমারী যেখানে একলা ব'সে আমারই প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে সেখানে তার নিঃসঙ্গ জাগরণের দ্বারে গিয়ে অতিথি হই। বলি, হে কন্যা, তোমার প্রেমে তুমি আমার অন্তরের সুপ্ত দীপকে দীপ্ত কর। তোমার গোপন হৃদয়ের কমনীয় মণিদীপের মায়াস্পর্শে জেগে উঠুক আমার গভীর অন্ধকারের মধ্যে প্রাণের অনির্ব্বাণ জ্যোতি। মেঘমুক্ত প্রভাতের স্বর্ণরশ্মি পড়ুক তোমার সদ্য-সুপ্তোত্থিত আবিষ্ট চোখে। সেই আলোতে ঘুচে যাক আমার এই বিরহবিধুর চিত্তের তিমিরাবরণ। তোমার কণ্ঠের মুক্তার মালা..." শুনতে শুনতে পার্ব্বতীর সযত্নে গোপন-করা প্রাণের গভীর বেদনা তার মুখের উপর প্রকাশ পেয়ে তার চোখ দুটোকে ব্যথিত ক'রে তুললে। নিতান্ত লীলাচ্ছলে বলা শচীন্দ্রের কথাগুলো অন্তরের নিবিড় অনু-ভূতিকে যেন একটা নিষ্ঠুর অপমানের আঘাত করতে লাগল। তার পবিত্র গোপনতার রুদ্ধ দ্বার একটা রূঢ় উন্মোচনের দমকা বাতাসে ভেঙে গিয়ে তার চিত্তের শৃঙ্খলা যেন এলোমেলো হয়ে গেল। অকস্মাৎ অধৈর্য্য হয়ে সে বলে উঠ্‌ল, "থামুন শচীন-বাবু, থামুন। রূপকথার রূপকের রাজ্যে আপনার নিরাপদ অভিসারের কথা আমাকে না শোনালেও আপনার পৌরুষ

অক্ষুণ্ণ থাকবে। মানুষের অন্তরের যা নিতান্তই পবিত্র, একান্তই যা তার একলার বস্তু, তাকে অপমান করবার নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্তি দিলে আপনার বীরত্ব…” বলতে বলতে আর কথা খুঁজে না পেয়েই বোধ হয় তার উত্তেজিত কণ্ঠ সহসা নির্ব্বাক হ'ল। এক মুহূর্ত্তের জন্য নিজেকে তার অসহায় হৃতসর্ব্বস্ব ব'লে মনে হ'তে লাগল এবং মনে মনে সে সেই মুহূর্ত্তে শচীন্দ্রের প্রতি কঠিন নিষ্ঠুর হয়ে উঠ্‌ল। একটু থেমে আবার বললে, “পৌরুষ দেখাবার এমন সুযোগ আপনারা কিছুতেই ছাড়তে পারেন না, না?”

শচীন্দ্র এই কৌতুককরসমণ্ডিত দ্বিপ্রহরের নির্জ্জন ঔপন্যাসিক পরিবেশে উৎসাহিত হয়ে নিশ্চিন্ত লঘুচিত্তে আনন্দিত কলকণ্ঠে বাক্যের পর বাক্য রচনা ক'রে চলেছিল। পার্ব্বতীর এই অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনার কারণ অকস্মাৎ তার অপ্রস্তুত মস্তিষ্কের মধ্যে অনুমান করতে না পেরে প্রথমে সে অবাক হ'ল এবং এক সময় ক্রমশ কঠিন ক'রে তোলা তার শ্লেষের সুরে অত্যন্ত আহত হয়ে খানিক ক্ষণ চুপ ক'রে থেকে শচীন বললে, “পার্ব্বতী, তুমি জান ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমাকে কোনরূপ আঘাত করা আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। তোমাকে আমি অপমান করতে পারি, একথাও তোমার মনে আসা সম্ভব হ'ল কেমন ক'রে? তুমি ত জান…” বলতে বলতে থেমে, নিজেকে একটু শান্ত ক'রে নিয়ে গভীর ব্যথিত কণ্ঠে সে আবার বললে “তুমি নিশ্চয় জান, যে, সাধ্য-পক্ষে তোমার দান গ্রহণ করার আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে পারি এমন নির্ব্বোধ আমি নই। তবু যদি এমন হয়ে থাকে যে তোমার মত মেয়েকেও আমার জীবনে গ্রহণ করা ঘট্‌ল না, তবে সে দুর্ভাগ্যের চেয়ে বড় দুঃখ আমার কি আছে? তা নিয়ে তুমি যদি আমায় শ্লেষ করতে চাও, কর! কিন্তু—” ব'লে শচীন চুপ ক'রে গেল।

শচীন্দ্রের কথার সুরে যে হতাশার বেদনা ধ্বনিত হ'ল পার্ব্বতীর অভিমানে আত্মবিস্মৃত চিত্ত তার আঘাতে চেতনা লাভ করলে। সে যে তার অসংযত উক্তির দ্বারা শচীন্দ্রকে কঠিন আঘাত করবে, পূর্ব্বে একথা পার্ব্বতীর মনে হয় নি। কিন্তু তার প্রত্যাখ্যাত আত্মমর্য্যাদা বহুদিন অন্তরে অন্তরে তার ধৈর্য্যের বাঁধকে বোধ হয় ক্ষয় ক'রে এনেছিল—কিংবা শচীন্দ্রের কল্পনার মধ্যে তার প্রতীক্ষ্যমান প্রেমের এমন অবিকল রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল যে সহসা মালতীর মনে হল যেন তার হৃদয়ের রক্তে লালিত প্রিয়তম গোপন কামনাটিকে শচীন্দ্র ইচ্ছা ক'রেই নির্লজ্জ আঘাত করেছে।

শচীন্দ্রের বেদনার সুরে সে সচেতন হয়ে নিজের অসংযমের জন্যে মনে মনে দুঃখ ও লজ্জা বোধ করতে লাগল। শচীন্দ্রের মুখের দিকে সে আর চাইতে পারলে না। সময়োচিত কোন কথা পার্ব্বতী খুঁজে পেলে না এবং কোন প্রকার ক্ষমা প্রার্থনার কথা বলাকে তার প্রগল্‌ভতা বলেই মনে হ'ল। সে মাথা নীচু ক'রে, রোদবৃষ্টিতে ক্ষয়ে-যাওয়া রেলিঙের ধারগুলি নখ দিয়ে ক্রমাগত খুঁটতে খুঁটতে তার আকণ্ঠ উদ্বেলিত অশ্রু-রাশিকে প্রাণপণে ফেরাতে চেষ্টা করতে লাগল।

বহু দিনের বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে বিদেশে তাদের জীবন এমন একটি সমাজশাসনশূন্য অতীতের মাঝখানে কেটেছে যে সেকথা বাংলা দেশে প্রচারিত হ'লে সমস্ত বাংলা দেশের মধ্যে একদিনে তারা বিশ্রুত হয়ে উঠত। দুটি অভুক্ত নরনারী পরস্পরের নিকট নিজেদের অন্তরাত্মাকে সম্পূর্ণ নিরাবরণ ক'রে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেবার অজস্র অবসর পেয়েছে। কত নির্জ্জন বনচ্ছায়াকীর্ণ উপত্যকায়, কত নদীতটে, পর্ব্বতগুহায় তারা যে পরস্পরের নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গলাভে পরস্পরকে সহজ আনন্দে পরম সম্পদ রূপে অনুভব করেছে তার ইয়ত্তা নেই। শচীন তার হারানো-পত্নীর স্মৃতিভারে তখন অনন্যচিত্ত। তাকেই স্মরণ ক'রে বস্তুত তার এই নারীকল্যাণের উদ্যম। এবং সেই উদ্দেশ্যেই তারা দু-জনে ইউরোপের নানা নারীপ্রতিষ্ঠান দেখে বেড়িয়েছে। পার্ব্বতীর সঙ্গলাভে তার ক্ষুব্ধ উন্মনা চিত্ত যেন একটা পরমাশ্রয় লাভ করেছিল। তবু তখনও সে আশ্রয় পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মত চঞ্চল; বাতাসের লীলায় যখন খুশী সে খ'সে পড়তে পারে।

পরিণতযৌবনা পার্ব্বতীর চিত্ত তখন স্নেহের আদান-প্রদানের অপরিসীম তৃষ্ণায় মুখর। শচীন্দ্রের বিরহবিক্ষুব্ধ অন্তরকে সে তার স্নেহের সহস্রধারায় অভিষিক্ত ক'রে দিয়েছিল। শচীন্দ্রও সহজে শিশুটির মত আত্মসমর্পণ করেছিল তার এই সর্ব্বগ্রাসী স্নেহের কাছে। তবু পার্ব্বতী চিরদিনই অনুভব করেছে যেন শচীন্দ্রকে সে কিছুতেই নিজের প্রেমবিমূঢ় চিত্তের আয়ত্তের মধ্যে পায় নি। মায়ের মত সেবা,

বোনের ভালবাসা, বন্ধুর প্রীতি সে তাকে তার সমস্ত চিত্ত উজাড় ক'রে দান করেছে; প্রতিদানে সেও শচীন্দ্রের কাছ থেকে নির্ব্বিরোধ প্রীতি এবং বন্ধুত্বের অজস্র অকপট আত্মনিবেদন লাভ করেছে। কিন্তু তার এই দুরন্ত যৌবন-বিদাহী দীপ্যমান প্রেমের অজস্রতার কাছে সে কতটুকুই বা! যে ঘটনায় আজ এই হাস্যোজ্জ্বল দ্বিপ্রহরে অকস্মাৎ তাদের চিত্তে অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে এসেছিল তাকে সম্পূর্ণ বুঝতে হ'লে পার্ব্বতীর পূর্ব্বতন ইতিহাস একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

১৩

বাইরের দিক থেকে পার্ব্বতী নিজেকে অনেকখানি সংযত ক'রে এনেছিল; প্রথমত তার মজ্জাগত বিলাতী শিক্ষার শাসনগুণে, দ্বিতীয়ত তার স্বাভাবিক আত্মমর্য্যাদা প্রত্যাখ্যানকে উচ্ছ্বাসের নাটকীয়তায় পরিণত হ'তে দেয় নি ব'লে এবং তৃতীয়ত শচীন্দ্রের ইতিহাস এখন তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল না। অবশ্য একদিন ছিল যখন পার্ব্বতীর নবোৎসারিত দুর্জ্জয় প্রেম, প্রবল বন্যায় তার শিক্ষা, তার অভিমান সব ভাসিয়ে দেবার উপক্রম করেছিল। দোষও তার বড় ছিল না। শচীন্দ্রকে সে প্রথম দেখে প্রবল জ্বরে সংজ্ঞাশূন্য অসহায় অবস্থায়। সুতরাং লজ্জা, সঙ্কোচ এবং শিক্ষিত নরনারীর প্রথম পরিচয়ের স্বাভাবিক আত্মরক্ষণশীলতাকে তার দরজার বাইরেই ফেলে রেখে আসতে হয়েছিল। সে কথা বস্তুত তখন তার মনে রাখবার অবস্থাও ছিল না শচীন্দ্রের জীবনের মর্ম্মঘাতী দুঃখের ইতিহাস ছিল তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। সুতরাং তার নিজের নিরাশ্রয় তরুণ হৃদয়ের প্রথম প্রেমের কূলপ্লাবী উচ্ছ্বাসের আবেগে সে কোন কথা স্থিরভাবে চিন্তা করবার অবসর পায় নি। তাই আজ সে অবাক হয়ে ভাবে—কোথায় ছিল শচীন্দ্রনাথ—ভারতবর্ষ থেকে আগত, পত্নীবিরহবিধুর শান্তিসান্ত্বনাপ্রয়াসী এক যুবক, লণ্ডনে অপরিচিত বিদেশীর ঘরে এসে কেনই বা এমন অসুস্থ অসহায় হয়ে পড়ল? আর কোথায় ছিল পার্ব্বতী—বিদেশে বান্ধবহীনা চাকুরীজীবী একটি বাঙালীর মেয়ে! কি অভাবনীয় উপায়েই না পরস্পর পরস্পরের কাছে পরিচিত হ'ল! কি আবশ্যক ছিল এই পরিচয়ের, যদি না তার অন্তরাত্মা পূর্ণতা ও শান্তির আশ্রয় লাভ করতে পারল দৈবদেয় এই অপূর্ব্ব দানের দাক্ষিণ্যে!

লণ্ডনে সে-বার ভয়ানক শীত পড়েছে। আপিসের মধ্যে বসেও কাজ করা দুরূহ হয়ে উঠেছে। ইডিথ্ এসে পার্ব্বতীকে বললে, "দেখ, বড় মুস্কিলে পড়েছি আমরা। আজ কয়েক দিন হ'ল একটি ভারতবর্ষীয় যুবক এসে আমাদের বাড়িতে, নায়ডু যে-ঘরগুলোয় ছিল, সেই সুয়েটটা ভাড়া নিয়েছে। জাহাজ থেকেই অসুখ নিয়ে এসেছিল বোধ হয়। আজ দু-দিন হ'ল একেবারে জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়েছে। তার সঙ্গে আমাদের ভাল ক'রে আলাপই হয় নি। এমন কোন ঠিকানা তার কাছে পাচ্ছি না যাতে কাউকে 'তার' ক'রে একটা খবর দিতে পারি। মা ত খুবই ভয় পেয়েছে। তুমি কি গিয়ে একবার দেখবে? ভারতীয় ছেলে বলেই তোমাকে এই অনুরোধ করছি। কিছু যদি মনে না কর তবে মা'র অনুরোধ তুমি অনুগ্রহ ক'রে একবার আমাদের বাড়ী যেও।"

ইডিথ পার্ব্বতীদের আপিসেই কাজ করে। তার অমায়িক সরল ব্যবহারে সে পার্ব্বতীর বন্ধুতা অর্জ্জন করেছিল। এর পূর্ব্বেও ইডিথের মা'র কাছে পার্ব্বতী দু-এক বার গিয়েছে। তবে পার্ব্বতী নিজের অনন্যসাধারণ অদ্ভুত বিপর্য্যস্ত ভাগ্য নিয়ে নিজের মধ্যে আবৃত থাকতেই চাইত। তবু নিতান্ত দরিদ্র এই মেয়েটি এবং তার মা'র সঙ্গে তার পরিচয় অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। তা ছাড়া এই বিরাট লণ্ডনের জনসমুদ্রের কোলাহলময় নির্জ্জনতার অতলে সে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্নই রেখেছিল। পার্ব্বতী নিজে সহজে কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে পারত না। কারণও ছিল তার।

১৪

পার্ব্বতীর বাবা ভূপতিনাথ রায় ছিলেন একটু ফিরিঙ্গি-ভাবাপন্ন—ছেলেবেলা থেকেই। সেণ্টজেভিয়ার্সে পড়াশুনা করেছিলেন এবং তাঁর চিরদিনের বাসনা ছিল বিলাতে গিয়ে বসবাস করা। ভারতবর্ষের কিছুই তাঁর মতে মনুষ্যজনোচিত ছিল না। পিতার অনুমতিও পেলেন। এমন সময় বিলেত যাবার আগেই তাঁর বাবা গেলেন মারা। কিন্তু মারা যাবার

পূর্ব্বেই তিনি তাঁর পুত্রের বিদেশে চরিত্রবান্ থাকবার অব্যর্থ কবচ একটি পত্নীকে তার কণ্ঠলগ্ন ক'রে দিয়ে গেলেন। তথনকার মত তাঁর বিলাতযাত্রায় যবনিকা পড়ল। কিন্তু যাদৃশী ভাবনা যস্য,—কিছুদিন, অর্থাৎ বছর-পাঁচেক যেতে-না-যেতেই যমরাজের বিশেষ কৃপাদৃষ্টিতে, দুরন্ত কলেরা রোগে তাঁর দুই শ্যালক ইহলোকে, ভূপতি এবং তার শ্বশুর মহাশয়ের বিরাট লোহার সিন্দুকের মধ্যের ব্যবধানটুকু লুপ্ত ক'রে দিয়ে, বোধ করি ভগ্নীপতির আন্তরিক আশীর্ব্বাদের খেয়া-নৌকায় পরলোকের ঘাট সই ক'রে পাড়ি দিল। যে-ক'দিন এর পর বেঁচেছিলেন, ভূপতির শ্বশুরমহাশয় জামাইকে ও মেয়েকে তাঁর কাছছাড়া করেন নি। তার পর একদিন ভূপতি ও পার্ব্বতীর মাকে তাঁর ঘরসংসার, লোহার সিন্দুক এবং চাবির তাড়া সমর্পণ ক'রে দিয়ে তিনিও বিদায় নিলেন। পার্ব্বতীর বয়স তখন চার বছর মাত্র।

এর পর তার বাবা পড়লেন তার শিক্ষা নিয়ে। কখনও ভুলেও তার সঙ্গে বাংলায় কথা কইতেন না—একটু বড় হলেই লরেটোতে ভর্ত্তি ক'রে দিলেন এবং সর্ব্বপ্রকারে যাতে নেটিবগন্ধবিবর্জ্জিত শিক্ষা সে পায় তার জন্যে চারি দিকের শুচিতা বাঁচিয়ে তাকে খাঁটি ফিরিঙ্গি বানাবার অসাধ্য-সাধনে প্রাণপাত করতে লাগলেন।

পার্ব্বতীর মা ছিলেন অতি নিরীহ মানুষ, তাতে তাঁর বয়সও বেশী ছিল না। স্বামীর প্রভুত্বের কাছে বরাবরই তাঁকে হার মান্‌তে হয়েছে। তবু তিনি প্রাণপণে স্বামীর অগোচরে নিজের সাধ্যমত তাকে গৃহকর্ম্ম এবং বাংলা দেশ ও ভাষার প্রতি অনুরক্ত হ'তে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্ব্বল, তাঁর চেষ্টাও ছিল নিতান্ত সীমাবদ্ধ; তার উপর কোনদিন ভূপতি এ-সব জানতে পারলে অশেষ লাঞ্ছনা না দিয়ে তাঁকে নিষ্কৃতি দিতেন না। একটু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পার্ব্বতী মায়ের এই অসহায় ভাবখানা বেশ উপলব্ধি করতে পারল, এবং ধীরে ধীরে নিজের অজ্ঞাতেই সে ক্রমে মায়ের ইচ্ছাগুলিকে পিতার অগোচরে প্রাণপণে পালন ক'রে শেষের দু-এক বছর মা'র চিরনিস্তব্ধ ক্ষুব্ধ চিত্তে যে শান্তি ও তৃপ্তিদান সে করতে পেরেছিল উত্তরকালে মায়ের স্বল্পাবশিষ্ট স্মৃতিভাণ্ডারে ঐটুকুই ছিল তার সান্ত্বনার কথা।

পার্ব্বতীর মা যখন মারা যান পার্ব্বতী তখন নিতান্ত বালিকা। বয়স মাত্র তের বৎসর। কন্যার জুনিয়ার কেমব্রিজ পরীক্ষা পাসের সংবাদ জেনে যাবার অবসর আর তাঁর হ'ল না। তার পর ভূপতি বেশীদিন আর দেশে বাস করেন নি। টাকাকড়ি যা ছিল সব গুটিয়ে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর চিরবাঞ্ছিত স্বর্গধাম বিলেত অভিমুখে রওনা হ'লেন।

এখানে বছর-দুয়েক তাদের খুব আরামেই কেটেছিল। পড়াশুনা নিয়ে ও লাইব্রেরী, মিউজিয়ম এবং নানা দেশ দেখে বেড়িয়ে দুটো বছর যে কোথা দিয়ে বেরিয়ে গেল, নূতনত্বের আকর্ষণে পার্ব্বতীর তরুণ চিত্ত তার সন্ধানই করে নি।

এখানে এসেও ভূপতি যথারীতি তাঁর স্বদেশবাসীদের এড়িয়েই চলতেন। পার্ব্বতীর মন মাঝে মাঝে ক্ষুধাতুর হ'য়ে উঠ্‌ত। ভূপতিকে বল্‌ত, "বাবা, এখানে ত অনেক বাঙালী ভদ্রলোক আছেন। তোমার কি কারুর সঙ্গেই চেনা নেই? নেমন্তন্ন কর না দু-এক জনকে। নিজের হাতে ডাল-ভাত রেঁধে খাওয়াই—আমার ভারি ইচ্ছে করে।"

ভূপতি হেসে বলতেন, "আরে পাগ্‌লী, যদি এখানে এসেও বাঙালীদের খুঁজে-পেতে আলাপ করতে হয় তাহ'লে বাংলা দেশটা কি দোষ করেছিল? এত খরচপত্র ক'রে কি বাঙালীদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে সাতসমুদ্র পেরিয়ে এলুম? আর এই ঠাণ্ডা দেশে কি ভাত খায় রে পাগ্‌লী। নিউমোনিয়া ধরবে যে; ইচ্ছে হয় বরং একটু সাগুর পুডিং ক'রে আজ খাস্। জানিস্ ত ধান জলাভূমির শস্য, খেলে একেবারে প্লুরিসি, নিউমোনিয়া, হাইড্রোফোবিয়া—যা খুশী হ'তে পারে—সর্ব্বনাশ!" ব'লে কৃত্রিম ভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে তুলতেন।

তার বাবার বলার ভঙ্গীতে তার ভয়ানক হাসি পেয়ে যেত। হি হি ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে সে বলত, "তোমার যে রকম জলের আতঙ্ক দেখ্‌ছি, শীগ্‌গির ডাক্তারকে ডাক। বাংলা দেশে এতদিন কাটানোর দরুন তোমার ইতিমধ্যেই হাইড্রোফোবিয়ার বীজ শরীরে ঢুকেছে কি না পরীক্ষা করা দরকার।"

মোট কথা, পার্ব্বতীর পিছনের টান বড়-একটা ছিল না। ছেলেবেলা থেকে মা বাবা ছাড়া অন্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বেশী আলাপ করার তার সুযোগ হয় নি। আর চিরকাল সে

কলকাতায় মানুষ; সুতরাং বাংলা দেশের বিস্তীর্ণ নদনদী-জলাকীর্ণ বিরাট ব্যাপ্ত প্রকৃতি, ঘনচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন শান্তশ্রী গ্রাম্য-প্রকৃতি বা উচ্ছ্বসিত স্নেহব্যাকুল বাঙালীর মানবপ্রকৃতি তার চিত্তকে গভীরভাবে আকর্ষণ করবার কোন অবকাশ পায় নি। সেইজন্যে বিদেশে যাওয়া তার পক্ষে প্রবাসে যাওয়া ছিল না এবং দেশের মাটি পরিত্যাগ ক'রে সমুদ্রে যেদিন সে প্রথম ঢেউয়ের দোলায় তার চলমান রক্তপ্রবাহে জীবধাত্রী ধরণীর হৃৎস্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করেছিল, সেদিন অতিমাত্র বিরহ-ব্যাকুলতায় তার চিত্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে নি। তার দ্রুতধাবনরত কলহাস্যমুখরিত চঞ্চলতার মধ্যে পরিত্যক্ত পরিজনের সজলবেদনার ছায়াপাত হবার সম্ভাবনা ছিল না।

এমনি ক'রে পিতাপুত্রীতে নূতন নূতন দর্শনীয় ও আহরণীয়ের মাদকতায় মশ্‌গুল হয়ে বছর-দুয়েক বেশ এক রকম কাটিয়ে দিলে। তার পরই এল তাদের জীবনে বিপর্য্যয়ের দুরতিক্রম্য দুঃখের ইতিহাস।

সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে, ইদানীং ভূপতিনাথ একটি অনুচ্চ শ্রেণীর ইংরেজ রমণীর সঙ্গে এমনভাবে মিশতে আরম্ভ করেছিলেন, যাতে ঘরে কন্যা ও প্রতিষ্ঠিত গৃহব্যবস্থার মধ্যে বিরোধ ও বিপর্য্যয় না এনে তাঁর উপায় ছিল না। প্রথম প্রথম ব্যাপারটা তিনি যথেষ্ট গোপনে রেখেছিলেন। কিন্তু এ নেশায় যাকে ধরে, তাল সামলানো তার পক্ষে দুষ্কর হয়ে ওঠে। পরে ব্যাপারটা কিছু আর চাপা রইল না। মদখাওয়া তাঁর অত্যন্ত বেড়ে গেল। রাত্রে বাড়ী আসা প্রায় বন্ধ হয়ে এল এবং একদা গভীর নিশীথে সেই ইংরেজ-নন্দিনীকে নিয়ে তিনি এসে উঠলেন একেবারে তাঁর কন্যার নিরবলম্বপ্রায় ঘরকরণার অন্তঃপুরে। অতি শোচনীয় হ'য়ে উঠল জীবনযাত্রা। ক্লারা তার জীবনে অর্থের মুখ বড় একটা দেখে নি। একেবারে এতগুলি অর্থের অধিকারিণী হ'য়ে ব্যয় এবং অপব্যয়ের মাত্রা রক্ষা করা তার পক্ষে দুরূহ হ'য়ে উঠ্‌ল।

এমনি ক'রে তাদের সংসারে ক্রমে অর্থেরও অনটন ঘটে উঠতে লাগল। অত্যধিক অত্যাচারে ভূপতিনাথের শরীর ভেঙে আসছিল। উপরি কিছু আয় করবার ইচ্ছা বা শক্তিতে তখন তাঁর ভাটার টান লেগেছে। পার্ব্বতী গোপনে চেষ্টা ক'রে অল্প বেতনের একটি শিক্ষয়িত্রীর পদ সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু এই ভাঙনধরা সংসারে সে কতটুকুই বা!

এমনি দুর্দ্দশার অবস্থায় একদিন ডাক্তারে আবিষ্কার করলে যে তার পিতা ক্যান্‌সার রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। ক্লারা আর বেশী অপেক্ষা করে নি। একদিন সকলের অজ্ঞাতে সে তার গহনাপত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়ে উধাও হ'ল। দুর্দ্দিনে পার্ব্বতীর এই একটিমাত্র সান্ত্বনা। এর পরের ইতিহাস বেশী নয়। নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ ক'রে ভূপতি একদিন অনুতপ্ত চিত্তে তাঁর কন্যার কাছে ক্ষমাভিক্ষা ক'রে ইহসংসার থেকে মুক্তিলাভ করলেন। বিদেশে বন্ধুজনহীন কপর্দ্দকশূন্য হ'য়ে পার্ব্বতী সংসারসমুদ্রে পাড়ি দিল।

পিতার ইংরেজ-প্রীতির পরিণামে ইংরেজ জাতিটার উপরেই তার যেন একটা বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল। সে পারতপক্ষে কোন লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করত না। আপিসের কাজ সে মন দিয়ে করত এবং অবসর সময়ে লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশুনা ক'রত। বছরখানেক হ'ল সে একটা বড় ফার্মে ভাল কাজ পেয়েছিল। এইখানেই ইডিথ ছিল তার এক জন য়্যাসিষ্টাণ্ট্‌। ইডিথের অনুরোধে সে তাদের বাড়ি গিয়ে যা দেখ্‌লে তাতে আর সে স্থির থাক্‌তে পারলে না। অন্তরের অন্তস্তলে পিতার প্রতি তার বিদ্রোহান্বিত চিত্ত তার মায়ের প্রিয় বাংলা ভাষা ও বাঙালীর জন্য হয়ত তৃষিতই ছিল। লাইব্রেরীতে তার প্রধান পাঠ্য ছিল বাংলা। আর আজ সেই বাঙালী একটি চারুদর্শন অসহায় রোগবিমূঢ় যুবককে দেখে তার সেবাপরায়ণ হৃদয় মুহূর্ত্তে উদ্বেল হয়ে উঠ্‌ল। সে স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে তার সমস্ত ভার আপনার দুর্ব্বল স্কন্ধে তুলে নিলে এবং পরদিনই বিশেষ অনুসন্ধানে নূতন একটি স্যুট্ ভাড়া ক'রে তাকে স্বামী ব'লে পরিচয় দিয়ে এম্বুলেন্‌স্ ডেকে শচীনকে সেখানে নিয়ে গেল।

দিনের পর দিন সে প্রায় একাকী এই দুরন্ত রোগের পরিচর্য্যায় নিজের সমস্ত সঞ্চিত বিত্ত ও অনন্যসাধারণ স্বাস্থ্য ও নৈপুণ্য নিযুক্ত করেছে। তবু এই অসহায় সংগ্রামের

সে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ। মৃতদেহে নবতর প্রাণসৃষ্টির অপরিমেয় আত্মপ্রসাদ। শুধু কি তাই? তার এই বিধাতৃত্বের অন্তরালে তার চিত্ত কি অভূতপূর্ব্ব কোনও অভিনব চেতনায়, কোনও নবতর উষায় অরুণালোকের রসমাধুর্য্যধারায় প্লাবিত হয় নি? আপনার দেহমনের ক্ষুদ্র জগতের পরিমিত আবেষ্টনের মধ্যে নিজেকে যেন সে আর ধরে রাখ্‌তে পারে না। বৃহৎ একটা আনন্দময় সর্ব্বনাশের দুর্ম্মদ প্লাবনে, সমস্ত নিশ্চিন্ত সুনিয়ন্ত্রিত সংসারযাত্রার বিরুদ্ধে নিজেকে ভাসিয়ে না দিয়ে যেন তার তৃপ্তি নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের, পুরুষের সঙ্গে নারীর সর্ব্বপ্রকার বিচিত্র সম্পর্কের অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মধুর রসে তার চিত্ত বেদনাময় পরিপূর্ণতায় ওতপ্রোত হয়েছে। মানবপ্রেমের বিচিত্র রূপকে সে তার অন্তরের রসোপলব্ধির মধ্যে গভীরভাবে অনুভব করেছে—কখন রোগতাপক্লিষ্ট অসহায় শিশুর জননী রূপে, কখনও স্নেহপরায়ণা সেবানিরতা দিদির মত, কখনও বা দুঃসময়ের অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। কিন্তু ফল্গুপ্রবাহের ধারা যেমন সংগোপন অথচ সুনিশ্চিত তেমনই এই সমস্ত সম্পর্কের উপলব্ধির অন্তস্তলে, আরও কি এক অনির্ব্বচনীয় মধুরতর রসের আবেশে তার চিত্তলোক অমৃতময় হয়ে উঠেছে। তার সমস্ত প্রাণের বেদনায়িত আকুলতা দিয়ে সে রোগীর মৃতকল্প শরীরে নবপ্রাণ সঞ্চার করেছে। সে অনুভব করেছে—এই ত তার জীবনের চরম চরিতার্থতা। তার প্রিয়তমকে সে আপনার শরীর মন আত্মার সুনৃততম অংশ দিয়ে সৃষ্টি ক'রে নিয়েছে। সংসার-বিপণিতে বাছাই ও যাচাই করা পণ্যশ্রেণীর নির্ব্বাচন তার নয়। সে তার অন্তরলোকের রসোপলব্ধি, সে তার বহির্লোকের অভিনব আত্মোপলব্ধি, সে তার অন্তর-বাহিরের একান্ত সৃষ্টি।

এই সৃষ্টির অমৃতময় আনন্দে সে সম্পূর্ণ ভুলে বসেছিল নিজেকে। ভুলেছিল যে, যাকে সৃষ্টি করা সহজ তাকে ফিরে পাওয়া সহজ নয়। সৃষ্টির রহস্যই এই। সে এই ভেবেই পরম নিশ্চিন্তে নিরুদ্বিগ্ন ছিল যে যা একান্ত ক'রে তারই সৃষ্টি তাতে একান্ত ক'রে তারই অধিকার। রূঢ় আঘাতে একদিন তার এই মূঢ় বিশ্বাস চূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু সে কথা পরে হবে।

১৫

অনেক ক্ষণ দু-জনে চুপ করেই ছিল। কি ব'লে এর পর কথা আরম্ভ করবে, কি কথায় পরস্পরের মনের এই গুমোট্ কেটে গিয়ে চিত্ত আবার দক্ষিণ-সমীরণের স্নিগ্ধস্পর্শে আনন্দময় হয়ে উঠ্‌বে, দু-জনের মধ্যে কেউই তা নিজেদের অন্তরে ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারছিল না। শচীন্দ্র ভাবছিল যে, যে-সম্পর্ক তাদের মধ্যে কোনদিন সত্য হয়ে ওঠবার রূপ ও সম্ভাবনা সে কিছুতেই কল্পনা ক'রে উঠতে পারে না সেই সম্পর্কের সম্পদকে জীবনে যে পরমসম্পদ ব'লে গ্রহণ ক'রেছে, তার বঞ্চিত অভিশপ্ত জীবনের জন্যে শচীন্দ্রও কি দায়ী নয়? তবে এমন কোন্ অভিনব আত্মদান সে করতে পারে যাতে ক'রে পার্ব্বতীর এই অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যময় চিত্তে নির্ভরপূর্ণ শান্তি ও আনন্দের সঞ্চার হয়!

পার্ব্বতীর প্রতি স্নেহ ছিল তার অপরিসীম, বন্ধুতার নিরুচ্ছল রসমাধুর্য্যে সে-স্নেহ অমৃতময় করেছিল তার বিরহক্ষত অন্তরকে। এমন কোন পার্থিব সম্পদের কথা সে চিন্তা করতে পারে না, পার্ব্বতী সম্বন্ধে যা তার অদেয়। তবু যা তার নিতান্ত অন্তরতম, যে বেদনা তার নিভৃত হৃদয়ের গোপনে থেকে তার সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছে, তার জীবনের নিগূঢ়তম উদ্দেশ্যকে প্রেরণা দান করেছে সেই পবিত্রতম, কঠিনতম, মধুরতম বেদনার গোপন কক্ষে পার্ব্বতীকে সে কেমন ক'রে আহ্বান করবে? তবু ত সে তার দুঃসময়ের অতুলনীয় বন্ধু, তার প্রাণদাত্রী। দিনে দিনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অপরিচিত প্রবাসের একান্তে পার্ব্বতীরই অন্তরের সুমধুর পরিচয়ে শচীন্দ্র তার অপরিমেয় দুঃখের মধ্যে আনন্দলোকের পরিচয় লাভ করেছে। সেই পার্ব্বতীকে এমন দুঃখ সে কেমন ক'রে দেবে যার আঘাতে পার্ব্বতীর নিঃসঙ্গ সংগ্রামক্লিষ্ট জীবন সমূলে ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

পার্ব্বতীই প্রথম সেই দুর্ব্বিষহ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে। বললে, "দেখুন, আমাকে বুদ্ধিমতী ব'লে আপনারা অনেক প্রশংসা করেছেন, কিন্তু যদি আমার মনের মধ্যে একবার ঢুকতে পারতেন তবে আমার অমার্জ্জিত আদিম জড় মনের অপরিসীম নির্ব্বুদ্ধিতা এবং বিবেকহীন দুর্জ্জয় অন্ধ মূঢ়তা

দেখে অবাক হয়ে যেতেন। আমি জানি আমি অতর্কিতে আপনাকে অকারণে কঠিন আঘাত করেছি। আমার উপরে আপনার যে স্নেহ আছে তার মধ্যে ক্ষমাভিক্ষার অবসর আপনি রাখেন নি। তবু আমাকে...”

শচীন বললে, “পার্ব্বতী, আমি কি জানি না আমাকে আঘাত করলে আমার চেয়ে বেদনা তোমার অল্প লাগ্‌বে না? তবু যদি তোমার ক্ষুব্ধচিত্তে কোনদিন সামান্যমাত্র শান্তিদান করতে পারি তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।”

এমন সময় ভোলানাথ সশব্দে তাদের সাম্‌নের খড়খড়ির দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

পার্ব্বতী হাসিমুখেই জিজ্ঞাসা করলে, “কি ভোলাদা, লুকানো ধনরত্ন কি আবিষ্কার করলে? আশা করি কুঠির সায়েবরা যাবার সময় তাদের জমানো টাকাকড়ি কোথাও একটা পুঁতেটুতে রেখে গেছে, কি বল?”

কথাটা ভোলানাথের এতক্ষণ মনে হয় নি। সে এর পরিহাসটুকু বুঝতে না পেরে আগ্রহভরে বললে, “না দিদিমণি, তা ত দেখার কথা মনে হয় নি। নিশ্চয়ই আছে কোথাও,—দেখ্‌তে হবে খুঁজে।”

পার্ব্বতী তার ছেলেমানুষের মত বিশ্বাস ও সরলতায় সস্নেহে হেসে বললে, “আচ্ছা এখন থাক। চল বাড়ীটা ভাল ক’রে ঘুরে দেখে আসি।” ব’লে সে লঘুগতিতে ভোলানাথের সঙ্গে চলে গেল। যাবার সময় ফিরে বললে, “আসুন না, মিঃ সিংহ, বাড়ীটা দেখে আসি।”

পার্ব্বতী যত শীঘ্র নিজেকে সংহত ক’রে নিয়ে ভোলানাথের সঙ্গে নিতান্ত সহজভাবে কথা সুরু করলে, শচীন্দ্রের পুরুষ-মনের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। সে পার্ব্বতীর এই আচরণকে অল্প বয়সের লঘুচিত্ততা ব’লে মনে ক’রে কোন্ যুক্তিতে জানি না, নিজেকে যেন অল্প একটুখানি দায়িত্ব থেকে মুক্ত ব’লে অনুভব করলে।

১৬

আজ ক’দিন হ’ল কমলের জর ছেড়ে গিয়েছে। কিন্তু অসম্ভব দুর্ব্বলতায় উঠে বস্‌বার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তার নেই। দীর্ঘ তিন সপ্তাহের মধ্যে একদিনও তার এমন পরিষ্কার জ্ঞান হয় নি যে সে তার নিজের অবস্থার কথা কিছুমাত্র বুঝতে পারে। ভালই হয়েছিল। যে দুরন্ত তাণ্ডবের মধ্যে দিয়ে তাকে জীবনের সম্পূর্ণ নূতন এক অধ্যায়ে প্রবেশ করতে হ’ল, তার রোগক্লিষ্ট দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ও দুর্ব্বলতর হৃৎপিণ্ড সেই বিপ্লবকারী চিন্তার আবেগ সহ্য করতে পারত না। নেচার পাকা নার্স। ঠিক সময়েই সে তার সমস্ত দেহযন্ত্রের সম্পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা ক’রে তার রক্ষার উপায় করেছিল। নইলে রক্ষা পাওয়া সম্ভবই হ’ত না।

তবু এই জ্বরে একটা সর্ব্বনেশে ক্ষতি ক’রে দিয়ে গেল তার। তার মন থেকে নামের স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। কত চেষ্টা সে করেছে, তার বাড়ী, তার শ্বশুর-বাড়ীর নাম মনে করতে; তাতে পরিশ্রমে তার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক শ্রান্ত হয়েছে। ডাক্তার, নন্দ ও পত্নীকে কিছুকালের জন্য এই অনুসন্ধান-চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়ে বলে গেলেন যে স্মৃতি ফেরাবার চেষ্টা জোর ক’রে করতে গেলে হয়ত মস্তিষ্কের অধিকতর ক্ষতি হ’তে পারে। স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিলুপ্ত স্মৃতি বরং হয়ত ফিরে আসতেও পারে।

আজ সকালে শুয়ে শুয়ে জানলা দিয়ে পাশের বাড়ীর চূণবালি-খসে-যাওয়া দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে তার কেবলই দুই চোখ বেয়ে জল পড়ছিল। এই চোখের জলে তার বেদনার পরিমাণ যেটুকু ছিল তার কতকটা তার নিজের প্রতি অসহায় করুণায়। বাঙালী হিন্দুকন্যার স্বাভাবিক যে চিন্তা তারই আবেগে সে মনে মনে বলতে লাগল, “কোন দোষ ত আমি জেনে-শুনে করি নি ঠাকুর, তবে এই দুঃখিনীর দুঃখের উপরে কঠিনতর দুঃখ কেন দিলে। আর যে পারি না। উঃ, আজ কতদিন তাঁকে দেখি নি।” কিন্তু শান্তবিগলিত এই অশ্রুধারায় ভগবান্ এবং এই গৃহবাসী পরিবারের প্রতি তার হৃদয়ের পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতাও ছিল অনেকখানি। সেদিন রাত্রে এই বাড়ীতে এসে যে-আশ্রয় নিয়েছিল, সে-আশ্রয় যদি তার পূর্ব্ব আশ্রয়ের অনুরূপ অথবা তার চেয়েও সর্ব্বনাশের হ’ত! মনে করতেও তার সারা শরীর ঝিম্‌ঝিম্ ক’রে উঠল।

এমন সময় খোকাকে কোলে নিয়ে মালতী এক বাটি গরম দুধ হাতে ক’রে এসে উপস্থিত হ’ল। মেজের উপরে খোকাকে কোলে নিয়ে ব’সে বললে, “পারি নে বাপু তোমার

এই আহ্লাদে ছেলে নিয়ে। মিছরী দিয়েছে ব'লে দুধ আর মুখে করবে না—একটু সর মুখে ঠেকলে বাবুর খাওয়া মাথায় উঠ্‌ল। আর ঝিটাও হয়েছে বাহাত্তুরে। এত ক'রে ব'লে দি তা একটা কথা যদি মাথায় থাকে। খা বলছি মুখপোড়া ছেলে। এদিকে মাছ খুব চিনেছেন। মাছ একবার দেখ্‌লে হয়।"

দেখারও অবসর হ'ল না। শুনেই হৃদয় তাঁর উথলে উঠ্‌ল। "মাত্ দে" ব'লে তার টুকটুকে এক কোষ ছোট্ট হাতটি মালতীর দিকে উঁচু ক'রে ধরলে। মালতী হেসে বললে, "ওমা দেখেছ, কি দুষ্ট ছেলে। ঠিক বুঝতে পেরেছে।" ব'লে তার হাতটা মুখে চেপে ধরে চুমোয় ভরে দিলে।

"মাত্ দে।"

"হ্যাঁ, মাছ দেবে বইকি? তা হবে না; আগে দুদু খাও, তবে মাছ পাবে।" কমল বললে, "ওকে রোজ কাঁচা সদ্য-দোয়া গরম গরম ছাগলের দুধ খাওয়ানো হ'ত। তাই ও জ্বাল-দেওয়া কি মিষ্টি-দেওয়া দুধ খেতে পারে না। আমাদের এক জন পুরনো চাকর ছিল, সে-ই ওকে নিয়ে দিনরাত থাকৃত। এক মুহূর্ত্ত যেন ওকে চোখের আড় করতে পারত না। এখন কেমন ক'রে আছে কে জানে?"

বল্‌তে বল্‌তে আবার তার চোখ ভ'রে এল। মালতী ক্ষুণ্ণ স্বরে বললে, "এমন ক'রে রাতদিন কাঁদলে কি দেহ বইবে দিদি? উনি ত কত চেষ্টা করছেন। একটা সুরাহা ঠাকুর ক'রে দেবেনই।

"তোমরা আমার যা করছ বোন, ইহজন্মে তিল তিল ক'রে প্রাণপাত করলেও তা শোধ হবার নয়। চোখের জল বাধা মানে না, তাই ঝরে।" ব'লে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললে, "খুব ন্যাওটা হয়েছে তোমার, খোকন।"

"না হবে না আবার" ব'লে দুধের বাটিটা নামিয়ে খোকনকে কোলের মধ্যে চেপে ধ'রে মালতী বললে, "কেটে ফেলব না হাত দুটো বেইমানী করলে!" তার পর মস্ত একটা চুমো দিল।

১৭

দিন তাদের চলে যাচ্ছিল এক রকম। নন্দলাল প্রায় সমস্ত দিন বাইরে বাইরে কাটায়। তার পরিশ্রম অনেক বেড়ে গেছে। উপার্জ্জনের নূতন নূতন পন্থা তাকে অবলম্বন করতে হয়েছে অধিক অর্থাগমের চেষ্টায়। তবু এ পরিশ্রমে তার ক্লান্তি নেই। তার নূতন দায়িত্ব তার মধ্যে যেন নবীন উৎসাহের সঞ্চার করেছে। অর্থের অভাবে যাতে কোন রকমে কমল ও তার শিশুটির কোন কষ্ট না হয় তার জন্য সে নিজেকে কোন বিশ্রাম দিতে প্রস্তুত নয়। সন্ধ্যায় সে পরিশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে বাড়ী ফেরে, কিন্তু সে ক্লান্তিতে কোন অবসাদ নেই। খোকনের জন্যে সে নিত্যই কিছু-না-কিছু শিশুচিত্তহরণ উপহারদ্রব্য নিয়ে আসে এবং বাড়ীতে প্রবেশ ক'রেই সে ডাকে 'খোকন!' ডাক ঠিক জায়গায় পৌঁছতে দেরি হয় না। খোকনের উচ্ছ্বসিত আনন্দ যে অন্য একটি চিত্তে সহজেই সঞ্চারিত হয়, সেটি সে সুস্পষ্ট অনুভব করে। ঐটুকুতেই তার আত্মপ্রসাদ।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে ভগবান্ স্ত্রীলোককে স্বভাবতই আত্মরক্ষণশীল অর্থাৎ সন্দিহান স্বভাবের ক'রে সৃজন করেছেন। সমস্ত বহিঃপৃথিবীর অজস্র লোভনীয় আহ্বানের বিরুদ্ধে, অন্তঃপুরের অন্তরালে আবদ্ধ থেকে, এমন সকল লোভনতর ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিকর আয়োজনে নারীর নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে হয় যাতে ক'রে বহির্মুখীন প্রলুব্ধ পুরুষের বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে সংহত এবং গৃহানুগত করে। এ বিষয়ে মালতীর স্বাভাবিক অশিক্ষিত পটুত্ব অন্য অনেক রমণীর অপেক্ষা অল্প ছিল, এ কথা মানতেই হবে। যদিচ রসনার সরস পথে, দেহ-মনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে সে নন্দের তৃপ্তিসাধনের আয়োজনকে কখনও শিথিল হ'তে দেয় নি; তবু এক্ষেত্রে তার দৃষ্টিকে যথেষ্ট সতর্ক রাখা যে সম্ভব হয় নি তার গুরুতর কারণ মালতীর নিজের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল। কমল এবং তার সন্তানের প্রতি আন্তরিক করুণা ও নিবিড় স্নেহে মালতী আপনার অন্তরকে উন্মুখ ক'রে দিয়েছিল। বিশেষতঃ তার সন্তানহীন মাতৃহৃদয়ে কমলের শিশুপুত্রকে সে এমন গভীর মমতায়, এমন একটি পরম লোভনীয় আবেশময় আবরণে আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছিল যে এর থেকে কোন প্রকারে বিচ্ছেদ সম্ভাবনার আভাসও চিন্তার মধ্যে গ্রহণ করা মালতীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অতএব—চিত্তের আদিমতম সংস্কার আত্মরক্ষণশীলতা এবং তারই সহজাত স্ত্রীজাতিসুলভ সূক্ষ্ম সন্দেহতৎপরতা

এক্ষেত্রে মালতীর চিত্ত থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে তার নারীচিত্তের ভগবদ্দত্ত স্বাভাবিক মহিমাকে যে ক্ষুণ্ণ করেছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই তার গৃহের মধ্যে, তার চক্ষের সমক্ষে, এমন কি তারই বিস্তৃত আয়োজনের সহায়তায় তারই নিজের দুর্নিবার দুঃখের কারণ এমন ক'রে ঘনিয়ে উঠবে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

নন্দলালের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যে কোথাও কিছুমাত্র শৈথিল্য ঘটেছিল তা নয়, সে নিত্যনিয়মিত পূর্ব্বের মতই সকালে খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়ত এবং সমস্ত দিন নানা ধন্ধায় ঘুরে ক্লান্ত দেহে বাড়ী ফিরত। মালতী তাকে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করত, "কি গো, কোন কিনারা হ'ল?" নন্দলাল সংক্ষেপে বলত, "না"। সন্ধানের উৎসাহ তার চিত্তে প্রবল নয়। তা ছাড়া এক্ষেত্রে সন্ধান যে কি উপায়ে সুরু করবে তা সে ভেবে উঠতেও পারে না।

মালতী বলে, "কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দাও না গা।"

নন্দ হেসে বলে, "নইলে মেয়ে-বুদ্ধি কেন বল্‌বে! তাহ'লে ওর স্বামী বিজ্ঞাপন দিলে না কেন? বড়ঘরের বৌ, জানাজানি হ'লে আর ফেরবার পথ থাকবে?"

মালতী হতাশ হয়ে বলে, "তা যা হয় কর। বড্ড কান্নাকাটি করে যে!"

তার পর খোকনের ডাক পড়ত এবং এই শিশুটিকে উপলক্ষ্য ক'রে নন্দলাল তার হৃদয়ের বাষ্পাবেগ কতকটা মুক্ত ক'রে দেবার সুযোগ পেত। কখনও বা খোকনকে কোলে নিয়ে কমলার কাছে যেত এবং অত্যন্ত মামুলি দু-একটা কুশল প্রশ্ন করত।

এই ত গেল তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এ যেমন বৈচিত্র্যবিহীন তেমনই ক্লান্তিকর। কিন্তু মানুষের মন ত বাইরের গণিতের হিসাবের খাজনা দিয়ে চলে না। সে তার অন্তর্নিহিত গোপনতম অবচ্ছন্ন মনের নিগূঢ় প্রেরণায় নিয়ন্ত্রিত হয়। নন্দলালের পুরুষ-চিত্ত কর্ম্মপ্রবাহের এই নিরবচ্ছিন্ন অনসবরের মধ্যে জীবনের একটি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসের সন্ধান তার অন্তরের মধ্যে পেয়েছিল। তার জীবন, তার কর্ম্মচেষ্টা তার কাছে অকস্মাৎ অধিক অর্থপূর্ণ, অধিক আবশ্যক ব'লে মনে হ'তে লাগ্‌ল।

কলেজে পড়ার সময় যে-সব বই তার কাছে নিতান্ত পরীক্ষাপাসের যন্ত্রস্বরূপ ব'লে মনে হ'ত, এখন আবার তারা তাদের নূতনতর কাব্যরূপ নিয়ে তার মনের মধ্যে এসে সাড়া দিতে লাগল। আবার সে একটু একটু ক'রে পড়াশুনা আরম্ভ ক'রে দিলে। বৈষ্ণবপদাবলী এবং রবীন্দ্রনাথ সে নূতন ক'রে পড়তে সুরু করলে এবং মাঝে মাঝে মালতী ও কমলকে নিয়ে রাত্রে তার চিত্তের এই নূতন অনুভূতির আবেগে প'ড়ে শোনাতে চেষ্টা করতে লাগল।

মালতী তাকে বললে, "কি গো, আবার এগ্‌জামিন পাস দেবে না কি?"

নন্দলাল বললে, "দেখি না, মুখ্যু হয়ে থেকে লাভ কি?"

মালতীর কিন্তু সমস্ত দিন খাটুনির পর এ-সব ভাল লাগে না। সে বরং একটু গল্পগাছা করতে চায়। পড়া শুনতে শুনতে হঠাৎ বলে, "ঐ যাঃ, দইটা পেতে রাখতে ভুলে গেছি।" কমল কোন কথা বলে না, চুপ করেই ব'সে থাকে। নন্দলালের কিন্তু উৎসাহের বিরাম নাই। সে উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি ক'রে যায়

> "হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'
> জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি"

আর তার চিত্ত কবিতার সুরে সুরে নূতনতর পরিপূর্ণতর আনন্দময় জগতের মধ্যে সঞ্চরণ ক'রে ফেরে। মালতী আঁচল পেতে মেজের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে; কিংবা খানিক ক্ষণ পরে একটা কাজের নাম ক'রে উঠে পাশের ঘরে গিয়ে খোকাকে নিয়ে শুয়ে পড়ে। কমল দেয়ালে ঠেস দিয়ে জানালার অবকাশপথে খণ্ড আকাশের তারাময় নীরবতার দিকে চেয়ে ব'সে থাকে; কি শোনে তা সে-ই জানে। তার মনের পটে তার পূর্ব্বজীবনের ছবি ওঠে ভেসে। এমনি ক'রে আরও এক জন তাকে কবিতা গল্প উপন্যাস প'ড়ে শুনিয়েছে। কত মধুময় জাগরনিশীথ কেটেছে তাদের এই কাব্যচর্চ্চায়; কত মধুরতর অবসানে রাত্রি প্রভাত হয়ে গেছে। সে যেন জাতিস্মর; জন্মান্তরের স্মৃতি বহন ক'রে তাকে বেঁচে থাকতে হয়েছে।

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পাঠ চল্‌তে থাকে। দূরে রাস্তার

ক্ষীণ শব্দটুকুও ক্ষীণতর হয়ে আসে, ক্লান্ত মালতী গভীর সুষুপ্তির আশ্রয়ে আপনাকে সমর্পণ ক'রে মেঝের উপর নিশ্চিন্ত আরামে এলিয়ে প'ড়ে থাকে। কোন এক সময় পাঠের কোন একটা বিরতির অবসরে কমলের মুখের দিকে চেয়ে নন্দলাল তার পরিপূর্ণ অন্যমনস্ক দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে সন্দেহ করে যে সে মোটেই তার পাঠের প্রতি নিবিষ্টচিত্ত নেই। বলে, "বড় রাত হয়ে গেছে, না? বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমায়। শুয়ে পড়। আরও অনেক ক্ষণ আগে থামা উচিত ছিল, কিন্তু এত চমৎকার যে থামা যায় না। সত্যি ভারি অন্যায় হয়ে গেছে।"

নন্দলালকে অনুতপ্ত দেখে সে বলে, "না না, রাত্রে ত আমার ঘুম হয় না। তার চেয়ে আপনি কষ্ট ক'রে প'ড়ে শোনাচ্ছেন এ ত ভালই হচ্ছে।"

নন্দলাল পড়বে কি পড়বে না এই দ্বিধায় প'ড়ে একটু ইতস্ততঃ ক'রে উঠে পড়ে; বলে, "আজ থাক্। অনেক রাত হয়ে গেছে। একটু ঘুমতে চেষ্টা কর।" ব'লে, উঠে মালতীকে ডাকে, "ওগো ওঠো। মেঝেতেই পড়ে রাত কাটাবে না কি?" ডাক শুনে মালতী ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে—তার নিদ্রাজড়িত মস্তিস্কে একটা দুঃসংবাদের আশঙ্কা জেগে ওঠে—"খোকন!" "এই ত বিছানার উপর। তুমি উঠে শোও। আমি যাই। সিরাপটা দিও শোবার সময়। আর ঘুম না হ'লে একটা পুরিয়ার আধখানা। শুন্‌লে? না এখনও ঘুম ছাড়ে নি? উঃ, কি ঘুমুতেই পার, বাব্বা?"

মালতীর ঘুমজড়ানো চোখে মুখে স্মিত সলজ্জ আলস্য-জড়িত হাসি ফুটে ওঠে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলে, "এই দিচ্ছি ওষুধ।"

ক্রমশ

বঙ্গে মাৎস্যন্যায়

শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা। হূণ-প্লাবনে ও গৃহবিবাদে সমুদ্র-গুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্য বাত্যাবিক্ষুব্ধ ঊর্ম্মিরাশির সম্মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। ত্রিযামা রজনী কঠিন ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়াও সম্রাট্ স্কন্দগুপ্ত কেবলমাত্র কিয়ৎকালের জন্য চঞ্চলা রাজলক্ষ্মীকে স্বীয় আসনে স্থাপিত করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু যেদিন ভারতের কোন এক অজ্ঞাত স্থানে, প্রকৃত শেষ গুপ্ত-সম্রাট নিজের ক্লান্ত দেহভার বহনে অক্ষম হইয়া অন্তিম-শয্যা রচনা করিয়াছিলেন সেদিন আত্মকলহে বিব্রত মাগধগণ সাম্রাজ্যের তোরণ-রক্ষায় অপারগ হইয়াছিল। তখন গান্ধারের (বর্ত্তমান পেশাবর জেলা ও আফগানিস্থানের কিয়দংশ) দুর্গম গিরিবর্ত্ম হইতে বাহির হইয়া খর্ব্বাকার, বৃহৎশীর্ষ, ক্ষুদ্রনাসিক ও শ্বেতকায় হূণ অশ্বারোহিগণ আর্য্যাবর্ত্তে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। দেবতার মন্দির ধ্বংস করিয়া, অধিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি লাঞ্ছিত করিয়া, গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর ভস্মীভূত করিয়া, নিরস্ত্র নিরপরাধ অধিবাসীদিগকে হত্যা করিয়া হূণগণ বর্ব্বরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। রমণী ও শিশু, বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণের আর্ত্ত হাহাকারে উত্তরাপথের সুনীল আকাশ বিদীর্ণপ্রায় হইয়াছিল। বর্ব্বর হূণের বিজয়োল্লাস কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ভারতবর্ষের তখনও প্রাণ ছিল তাই বার-বার পরাজিত হইয়া আর্য্যাবর্ত্তের আধিপত্যের আশা চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়া, হূণগণ হিমমণ্ডিত উত্তরদেশীয় পার্ব্বত্য উপত্যকায়, কপিশায় এবং বাহ্লীকে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের গৌরবের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত উত্তর-ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল সৌরাষ্ট্রে বলভীর মৈত্রক রাজগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব আরম্ভ

করিয়াছিলেন। গুজরাটে চালুক্যগণ এবং রাজপুতানা ও মধ্যপ্রদেশে যশোধর্ম্মদেব নূতন রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। স্থাণ্বীশ্বরে (থানেশ্বর) পুষ্পভূতী-বংশীয় রাজগণ, কান্যকুব্জে মৌখরী-রাজগণ নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন। মগধে ও মালবে সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের হতভাগ্য বংশধরগণ লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের বৃথা চেষ্টায় প্রাচীন পাটলিপুত্রের জীর্ণ প্রাসাদে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বভারতের রাষ্ট্রীয় গগন ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। শক্তিশালী দণ্ডধরের অভাবে সমস্ত বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। তিব্বত-দেশীয় লামা তারানাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে তৎকালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য নিজ নিজ অধিকারে রাজা হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সমগ্র দেশে কেহ একাধিপত্য করিতে পারেন নাই। অরাজকতার প্রাচীন নাম মাৎস্যন্যায়। খালিমপুরে আবিষ্কৃত পাল-বংশের দ্বিতীয় সম্রাট্ ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বভারতের প্রজাপুঞ্জ অরাজকতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গোপালদেবকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন।

২

অরাজকতার সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদের খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস কিঞ্চিৎ অনুশীলন করিতে হইবে। এই সময়ে যশোধর্ম্মদেবের বিশাল সাম্রাজ্য অনস্তে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। রেবা-তীর হইতে লৌহিত্য পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধীশ্বর দৃঢ় ভিত্তির উপর রাজসিংহাসন স্থাপিত করিতে পারেন নাই। পঞ্চনদে পুষ্পভূতী-বংশীয় নৃপতিগণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কান্যকুব্জের মৌখরী-বংশের শেষ নরপতি গ্রহবর্ম্মণ মালবের দেবগুপ্ত কর্ত্তৃক নিহত হইলে, স্থাণ্বীশ্বর হইতে মগধ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ হর্ষবর্দ্ধনের করতলগত হইয়াছিল। মগধের সুপ্রাচীন রাজসিংহাসনে তখন কে যে উপবিষ্ট ছিলেন তাহা এখনও স্থির হয় নাই। বঙ্গদেশে শশাঙ্ক নামে এক জন ক্ষুদ্র ভূস্বামী কিয়ৎকালের জন্য বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার উপর একাধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। নিদাঘের প্রবল উত্তপ্ত বায়ুর সংঘাতে বালুকণার ন্যায় হর্ষের সাধের সাম্রাজ্য কোথায় যে উড়িয়া গেল তাহা কেহ বলিতে পারিল না। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তদীয় সচিব সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

ইহার পরে পূর্ব্বভারত বার-বার শত্রু-আক্রমণে পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ও স্বর্গত সিল্‌ভাঁ লেভি দেখাইয়াছেন যে ৫৮১ হইতে ৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গ বিহারের কতকাংশ তিব্বতদেশীয় নৃপতিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত 'গউড্‌বহো' নামক বাক্‌পতিরাজ কর্ত্তৃক প্রাকৃত ভাষায় রচিত একখানি কাব্যে কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মা কর্ত্তৃক সমগ্র পূর্ব্বভারত-জয়ের প্রচেষ্টা বর্ণিত আছে। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যশোবর্ম্মা বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিলে পর 'মগধনাথ' ভীত হইয়া রাজধানী হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু মগধনাথের সামন্তগণ তাহাতে বাধা দিয়া আক্রমণকারীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধান্তে যশোবর্ম্মা পরাজিত ও পলায়নপর মগধরাজকে হত্যা করিয়া নিজ শৌর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই মগধনাথ গৌড়েরও অধীশ্বর ছিলেন। রায়-বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ ও ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মগধনাথ, গুপ্ত-বংশীয় রাজা দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত ব্যতীত আর কেহই নহেন। মগধেশ্বরকে পরাজিত করিয়া যশোবর্ম্মদেব সমুদ্রতীরে বহু হস্তিযুক্ত বঙ্গাধিপতিকে স্বীয় অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন, প্রাচীনকালে বঙ্গ অর্থে সমগ্র বাংলা দেশকে বুঝাইত না—ইহা পূর্ব্ববঙ্গের নামমাত্র। কান্যকুব্জের গৌরবরবি অতি শীঘ্রই অস্তমিত হয়। কাশ্মীরের চিত্তমুগ্ধকর উপত্যকা হইতে বহির্গত হইয়া ললিতাদিত্য-মুক্তাপীড়ের বিজয়বাহিনী যশোবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়াছিল। যশোবর্ম্মণ যে এক জন ঐতিহাসিক ব্যক্তি সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। চীনদেশের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে যে ৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে যশোবর্ম্মণ চীন-সম্রাটের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নালন্দা মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যশোবর্ম্মদেবের একটি তাম্রশাসন বাহির হইয়াছে। কান্যকুব্জরাজ পরাজিত

হইলে গৌড়মণ্ডলের অধিপতি কতকগুলি হস্তী ললিতাদিত্যকে উপহার দিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি করিয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণীর অনুবাদক বিশ্ববিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ সর্ অরেল ষ্টাইন্ ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ-জয় ব্যতীত অন্য কোন ঘটনা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে রাজী নহেন; এবং স্বর্গত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে ইহাই বোধ হয় প্রকৃত ইতিহাস।

নেপালের পশুপতিনাথ-মন্দিরের পশ্চিম তোরণের পার্শ্বে লিচ্ছবী-বংশীয় নরপতি জয়দেবের একটি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভগদত্ত-বংশীয় কামরূপরাজ শ্রীহর্ষদেব বোধ হয় গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশল অধিকার করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কহ্লণমিশ্র ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড়ের বিজয়কাহিনীও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। জয়াপীড় কান্যকুব্জরাজ বজ্রায়ুধকে পরাজিত করিলে পর তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে, এবং তিনি ছদ্মবেশে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে গমন করেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর তখন জয়ন্ত নামক এক জন সামন্তরাজের অধীন ছিল। ক্রমে জয়াপীড়ের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িলে জয়ন্ত তাঁহার সহিত এক কন্যার বিবাহ দেন এবং জয়াপীড় জয়ন্তকে 'পঞ্চ গৌড়ে'র অধীশ্বর করিয়া কাশ্মীরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অদ্যাবধি কোন সমসাময়িক লিপিতে জয়ন্তের নাম পাওয়া যায় নাই; ষ্টাইন্ সাহেবের মতে জয়াপীড়ের গৌড়বিজয়-কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। তাঁহার এই অনুমান প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু ব্যতীত অন্য সকল ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। বিদেশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক বারংবার আক্রান্ত হইয়া সমস্ত দেশ প্রায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণ রাজ্যলোভে সতত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন, শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে কোন রাজাই বোধ হয় আর মগধ, বঙ্গ, উড়িষ্যায় স্বীয় অধিকার দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে পারেন নাই। পূর্ব্বভারতের প্রজাবৃন্দ এই সকল কারণে দুর্দ্দশার চরম সীমায় নীত হইয়া গোপালদেবকে রাজপদে বরণ করিয়াছিল। এত দিন বিভিন্ন রাজন্যবর্গের শিলালিপি ও তাম্রশাসনের বাক্যাংশ ও কবির কল্পনাপ্রসূত কাহিনী, বাংলায় মাৎস-ন্যায়ের ইতিহাসের একমাত্র উপাদান ছিল। অধুনা শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত বগুড়া জেলার পাহাড়পুর ও মহাস্থান-গড়ে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি নামক গ্রামে অবস্থিত ধ্বংসস্তূপগুলির মধ্যে যে খনন-কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে আমাদের বাংলার ইতিহাস সঙ্কলনের নূতন উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহারই কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৩

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে কলিকাতা হইতে ১৮৯ মাইল উত্তরে বগুড়া জেলায় পাহাড়পুর গ্রাম অবস্থিত। প্রায় ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ব্বে কুমার শরৎকুমার রায়ের অর্থসাহায্যে শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের তত্ত্বাবধানে এখানে প্রথম খনন-কার্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু প্রথম বার বিশেষ কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই; তাহার পর দুই-এক বৎসর কর্ম্ম স্থগিত থাকিবার পর ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের কতকাংশ বাহির করেন। তাঁহার কর্ম্মাবসানের পর দীর্ঘ আট বৎসর ধরিয়া শ্রীযুক্ত দীক্ষিত এই স্থানের খনন-কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়াছেন। ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের ইতিহাসে এই মন্দির চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে। পাহাড়পুরের প্রাচীন নাম সোমপুর; মন্দিরের পার্শ্বস্থিত বিহারের অবশেষ খনন করিবার সময় ১৯২৭-২৮ সনে একটি দগ্ধমৃত্তিকার মুদ্রিকা (seal) শ্রীযুক্ত দীক্ষিত বাহির করেন। মুদ্রিকার উপরি-ভাগে একটি চক্র আছে এবং তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি হরিণ অবস্থিত। এই ধরণের মুদ্রা পাল-সম্রাটগণের বহু 'শাসনে' পাওয়া গিয়াছে। ধর্ম্মচক্রের তলে প্রাচীন নাগরী অক্ষরে ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আছে—এই মুদ্রিকাটি 'সোমপুরের শ্রীধর্ম্মপালদেব মহাবিহারের আর্য্য ভিক্ষু সঙ্ঘের'।

ভগ্ন ইষ্টকরাশি ও মৃত্তিকা অপসারণের সময় এই মহা-বিহারের ইতিহাসের আরও দুই-একটি উপাদান পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে ১৫৯ গুপ্তাব্দে (খ্রীষ্টীয় ৪৭৮-৭৯ অব্দে) লিখিত একটি তাম্রশাসন বিশেষ মূল্যবান্। এই তাম্রপটে লিখিত হইয়াছে যে, বটগোহালী গ্রামস্থ গুহনন্দী ও তাহার নিগ্রন্থ শিষ্যদিগের অর্চ্চনার নিমিত্ত জনৈক ব্রাহ্মণ-দম্পতি একখণ্ড ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই বটগোহালী

উপর হইতে : মহাস্থানগড়ের বৈরাগীভিটা, খননের পূর্ব্বে। বৈরাগীভিটা, খননের পরে। মুনির ঘোঁন, খননের পূর্ব্বে। মুনির ঘোঁন খননে প্রাপ্ত পাল-যুগে নির্ম্মিত নগরপ্রাকারের ধ্বংসাবশেষ।

উপর হইতে ঃ বৈরাগীভিটায় প্রাপ্ত পাষাণস্তম্ভ, গুপ্ত-সম্রাটগণের সময়ে নির্ম্মিত ; পরবর্ত্তী কালে পয়ঃপ্রণালীরূপে ব্যবহৃত। মহাস্থানগড়ের গোবিন্দভিটা, খননের পূর্ব্বে। গোবিন্দভিটা, খননের পরে। বৈরাগীভিটায় ইষ্টকবেদিকা, পাল-যুগে নির্ম্মিত।

বর্ত্তমান গোয়ালভিটা গ্রাম এবং এই গ্রামের মধ্যে মন্দির-সীমার কতকাংশ অবস্থিত। মন্দির-খননের পর খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর ভাস্কর্য্য ও ইষ্টক ভিত্তিগাত্রে লক্ষিত হইয়াছে। অনুমান হয় যে ইহার পরে মাৎস্যন্যায়হেতু এই ধর্ম্মানুষ্ঠানটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে কিংবা নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে উত্তরাপথ-বিজয়ী পাল-বংশের দ্বিতীয় সম্রাট্ ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক পাহাড়পুরের মন্দির ও চতুষ্পার্শ্বস্থ বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। নালন্দায় আবিষ্কৃত খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে বিপুলশ্রীমিত্র নামক এক বৌদ্ধভিক্ষু সোমপুরের তারাদেবীর এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রধান মন্দিরের নিকট সত্যপীরের ভিটায় ক্ষুদ্রকায় এক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আবিষ্কৃত তারা-মূর্ত্তির এক মৃন্ময়-ফলক প্রমাণ করে যে এই মন্দিরটি বোধ হয় বিপুলশ্রীমিত্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার পর খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন তুর্কীপ্লাবনে বাঙালীর স্বাধীনতা, সভ্যতা ও কৃষ্টি তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া গেল তখনই বোধ হয় সোমপুরের মহাবিহার চিরদিনের মত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পরে কালক্রমে জনশূন্য ধর্ম্মপাল মহাবিহার গুল্মাচ্ছাদিত মাটির ইষ্টকরাশির টিলায় পরিণতি লাভ করে।

৪

বগুড়া জেলার অন্তর্গত মহাস্থান বা মহাস্থানগড়ের বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ এখন বঙ্গদেশের একটি শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ১৯৩১ সালে বারুফকির নামক এক জন মুসলমান কৃষক মহাস্থানগড়ে একটি ক্ষুদ্র লিপি-সমন্বিত ইষ্টকখণ্ড কুড়াইয়া পায়। এই লিপি হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে মৌর্য্য যুগের কোন নরপতি পুণ্ড্রনগরের মহামাত্রকে আজ্ঞা করিতেছেন যে দুর্ভিক্ষপীড়িত সংবঙ্গীয়দের যেন অর্থ ও ধান্যের দ্বারা সাহায্য করা হয় ইত্যাদি। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বর্ত্তমান মহাস্থানগড়টি প্রাচীন পুণ্ড্রনগর। ১৯২৮-২৯ সালে শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত মহাস্থানগড়ের অন্তর্গত বৈরাগীর ভিটা নামক একটি মৃন্ময়-স্তূপ খনন করিতে আরম্ভ করেন। খননের ফলে দুইটি বৃহৎ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। দুইটি মন্দির একই স্থানে দুই বিভিন্ন যুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গোপালদেব যে রাজ্যের সূচনা করিয়া-

প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা
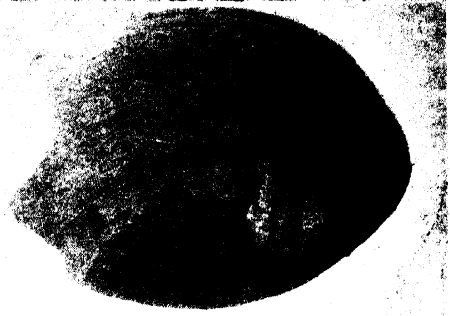
ছিলেন তাহা তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপালের সময় এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মপালদেবের বংশধরগণের অক্ষমতার জন্য ও অন্য নানা কারণে এই সাম্রাজ্য শীঘ্রই অধঃপতনের পিচ্ছিল পথে অগ্রসর হয়। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রথম মহীপালদেব কিয়ৎকালের জন্য পিতৃপুরুষের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই দুই বিভিন্ন সময়কে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণ প্রথম ও দ্বিতীয় পাল-যুগ আখ্যায় ভূষিত করিয়া থাকেন। বৈরাগীর ভিটায় প্রাচীনতর মন্দিরটি প্রথম পাল-যুগের এবং দৈর্ঘ্যে ৯৮ ফুট ও প্রস্থে ৪২ ফুট; ইহা ব্যতীত এই মন্দিরটির বিষয়ে আমাদের আর বিশেষ কিছু জানিবার নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে দ্বিতীয় পাল-যুগে ইহার ধ্বংসাবশেষের উপর আর একটি মন্দির নির্ম্মিত হওয়ায় ইহার অধিকাংশই চাপা পড়িয়া গিয়াছে। প্রথম পাল-যুগের মন্দিরের ভিত্তি খননের সময় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে মন্দির-নির্ম্মাণকারিগণ আরও একটি প্রাচীন দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষের উপর তাঁহাদের মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই অনুমানের কারণ এই যে, পূজার জল নিষ্কাশনের জন্য মন্দিরের গর্ভগৃহের তলদেশ হইতে একটি পয়ঃপ্রণালী প্রয়োজন হইয়াছিল। এই পয়ঃপ্রণালীর জন্য দুইটি পাষাণ-নির্ম্মিত স্তম্ভ ব্যবহৃত হইয়াছে। জল-নিষ্কাশনের জন্য স্তম্ভের মধ্যভাগে আট ইঞ্চি চওড়া

একটি প্রণালী খোদিত করা হইয়াছিল। এই স্তম্ভ দুইটির চারিদিকে যে সুচারু কারুকার্য্যের আভাস পাওয়া যায় তাহা খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর শিল্পীর কীর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে একটি দেবালয় বৈরাগীর ভিটায় অবস্থিত ছিল; কোন কারণে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে প্রথম পাল-যুগে তাহার উপরিভাগে ও তাহার অবশেষের দ্বারা আর একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন সময়ে সেই মন্দিরও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে দ্বিতীয় পাল-যুগে দৈর্ঘ্যে ১১১ ফুট ও প্রস্থে ৫৭ ফুট আর একটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত বৈরাগীর ভিটার ঐতিহাসিকতা নির্ণয় করিবার জন্য শ্রীযুক্ত দীক্ষিত সাতটি বিভিন্ন স্থানে পরিখা খনন করিয়াছিলেন এবং প্রায় প্রত্যেক স্থানেই প্রথম পাল-যুগের ধ্বংসাবশেষের নিম্নে গুপ্ত-সম্রাটগণের সমসাময়িক ও তাঁহাদের পরবর্ত্তী কালের হর্ম্ম্যরাজির ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বৈরাগীভিটার দক্ষিণ দিকে পরিখা-খননের ফলে খ্রীষ্টীয় দশম কিংবা একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও ইষ্টকনির্ম্মিত চতুষ্কোণ বেদিকা পাওয়া গিয়াছে। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফুট ৬ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৩৪ ফুট। মন্দিরের নিকটে একটি সড়কের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই রাস্তা হইতে মন্দিরের ভিত্তি প্রায় ৫ ফুট উচ্চে অবস্থিত। মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য পাঁচটি ধাপ-যুক্ত একটি সোপান প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল এবং প্রত্যেক ধাপ একটি প্রাচীন মন্দিরের পাষাণ-স্তম্ভ। এই স্তম্ভের গাত্রে খোদিত কীর্ত্তিমুখ ও অন্যান্য কারুকার্য্য দেখিয়া অনুমিত হয় যে পাষাণ-স্তম্ভগুলি ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

গোবিন্দভিটা নামক মহাস্থানগড়ের আর একটি মৃন্ময়-স্তূপ খনন করার ফলে আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। খননের সময় একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের দুইটি বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন যুগে নির্ম্মিত অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছে। বেষ্টনীর পশ্চিম ভাগে অবস্থিত গৃহগুলি দুইটি বিভিন্ন যুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। ইহার মধ্যে প্রাচীনতর গৃহটি (বোধ হয় দেবমন্দির) নির্ম্মাণের সময় ১৫ ইঞ্চি লম্বা ইষ্টক ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার নির্ম্মাণকৌশল ও ইষ্টক পাহাড়পুরের মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে পরিলক্ষিত হয়। ইহার ঠিক মধ্যস্থলে ৩০ ফুট লম্বা একটি মণ্ডপের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। মণ্ডপটি প্রাচীরের এত সন্নিকট যে তাহা দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মণ্ডপ ও তৎসংলগ্ন গৃহ ভূমিসাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত বেষ্টনীর প্রাচীর নির্ম্মাণ করা অসম্ভব ছিল। শ্রীযুক্ত দীক্ষিতের মতে এই মন্দির খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি আরও অনুমান করেন যে এই দেবালয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে প্রথম পাল-যুগের ধ্বংসস্তূপের উপর আর একটি মন্দির ও উপরিউক্ত প্রাচীর নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। কালক্রমে এই মন্দিরও ধ্বংস হয় এবং ইহার উপরে মুসলমান যুগে নির্ম্মিত একটি প্রাচীর এখনও দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রাচীরের পূর্ব্বদিকস্থ ধ্বংসাবশেষগুলি শ্রীযুত দীক্ষিতের মতে বাংলার ইতিহাসের চারিটি বিভিন্ন যুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সর্ব্বোচ্চ অবশেষটি খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বাংলার স্বাধীন সুলতান ইলিয়াস্ শাহের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটি মৃৎপাত্রে তাঁহার অষ্টাদশটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইহার ঠিক নিম্নে যে প্রাচীরগুলি দৃষ্টিগোচর হয় তাহার নির্ম্মাণকৌশল অতি হীন এবং অনুমান হয় যে ইহা প্রথম মুসলমান আক্রমণের পরে যখন বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, তখন নির্ম্মিত হয়। ইহার তলদেশে যে ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পশ্চিম দিকস্থ প্রথম পাল-যুগের মন্দিরের সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয়। ইহারও তলদেশে আর একটি দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। ইহার ইষ্টক ও নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়া প্রতীয়মান হয় যে ইহা খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

৫

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান মহাস্থানগড় একটি অতি সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। ১৯১৫ সালে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত দামোদরপুর গ্রামে গুপ্তরাজগণের যে পাঁচটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা হইতে

আমরা জানিতে পারি যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি নামক প্রদেশ গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধীন ছিল; সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন, অর্থাৎ বর্ত্তমান মহাস্থানগড় এই ভুক্তির প্রধান নগর ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পর কোন কারণে এই সুদৃশ্য সৌধরাজি ও জনপরিপূর্ণ নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহার প্রমাণও খননের সময় পাওয়া গিয়াছে। নগর-প্রাকারের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত দীক্ষিত মুনির ঘোঁন নামক একটি জঙ্গলাকীর্ণ মৃত্তিকাস্তূপ খনন করেন। খননের ফলে এই স্থানে প্রাকারের একটি অন্তরগ্র কোণের (re-entrant angle) একটি বুরুজের (bastion) ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। প্রাকারের নির্ম্মাণকৌশল অতীব সুন্দর। দুই দিকের বাহ্যাকার (surface) ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত করিয়া শূন্যগর্ভটি চূর্ণ ইষ্টক দ্বারা ভরাট করা হইয়াছিল। প্রাচীরটি প্রায় ১১ ফুট চওড়া। শ্রীযুক্ত দীক্ষিতের মতে প্রাকারের সর্ব্বোচ্চ অংশটি পাল-যুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল, কারণ ইহাতে দৈর্ঘ্যে ৮ হইতে ৯ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৫ হইতে ৬ ইঞ্চি এবং ২ ইঞ্চি স্থূল ইষ্টক ব্যবহৃত হইয়াছে; এইরূপ ইষ্টক পাল-যুগের বহু সৌধে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সপ্তম শতাব্দীর পরে কোন সময়ে কেবল নগরের হর্ম্ম্যরাজি নহে, নগর-প্রাকারও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার ফলে এই পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর প্রাচীন বাংলার নগর-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব হারায়। পাল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বাংলায় সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইলে এই সুপ্রাচীন নগরী পাল-বংশীয় নৃপতিদের কৃপালাভে বঞ্চিত না হইলেও আর তাহার হৃত গৌরবশ্রী ফিরিয়া পায় নাই। পাল-যুগ হইতে ইহা এক নগণ্য প্রাদেশিক শহরে পরিণতি লাভ করে এবং কালক্রমে বিস্মৃতির কুজ্ঝটিকায় আত্মগোপন করে।

এখন কোন্ সময়ে এই নগর সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহার বিচার করা যাক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে হর্ষের সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইবার পর বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশ অন্তত চারি বার বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল। কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মণের বিজয়কাহিনীর মধ্যে মগধ, গৌড় ও বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু বাংলা দেশের উত্তরাংশে অবস্থিত
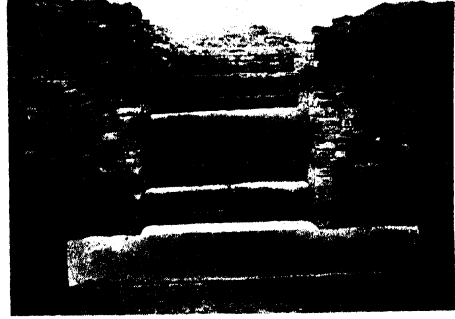
প্রাচীন কালের পাষাণস্তম্ভ পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত মন্দিরে সোপানশ্রেণীরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগর বা ভুক্তির নামগন্ধও নাই। ললিতাদিত্য-মুক্তাপীড়ের ইতিহাসেও পুণ্ড্রবর্দ্ধনের নাম নাই। কহ্লণ-মিশ্রের রাজতরঙ্গিণীতে জয়াপীড়ের এই নগরে বসবাসের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু এই স্থানে অবস্থান কালে তিনি যে নগরের কোন ক্ষতি করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। কামরূপরাজ শ্রীহর্ষদেবের গৌড় ওড্র ও কলিঙ্গ বিজয় অতি সাধারণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এই কাহিনী সত্যই ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা কবির কল্পনাপ্রসূত তাহার বিচার এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। কেবলমাত্র রাঘোলী-আবিষ্কৃত শৈলবংশীয় নরপতি দ্বিতীয় জয়বর্দ্ধনের তাম্রশাসনে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের উল্লেখ পাই। কেবল তাহাই নহে, ইহাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় জয়বর্দ্ধন 'বৈরী-বিদারণ-পটু' পৌণ্ড্রাধিপকে নিহত করিয়া সমস্ত পুণ্ড্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন।* সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে জয়োদ্দীপ্ত শৈলসেনাকটক প্রাচীন পুণ্ড্রনগর উদ্ঘৃষ্ট করিয়াছিল। দীর্ঘকাল এই অবস্থায় পড়িয়া থাকিবার পর প্রথম পাল-যুগে এই নগরে আবার বোধ হয় জনসমাগম হইয়াছিল।†

* *Epigraphia Indica*, vol. IX, p. 44.

† এই প্রবন্ধের ছবিগুলি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে প্রকাশিত হইল।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস শিল্পপ্রদর্শনী

শ্রীরামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

সে আজ বেশী দিনের কথা নয় যখন থেকে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ও হ্যাভেল সাহেবের চেষ্টায় ভারতবর্ষে চিত্রকলার নবযুগ আরম্ভ হয়েছে। অতঃপর অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার অন্যান্য কৃতী শিষ্য এবং অনুশিষ্যদের ঐকান্তিক সাধনায় চিত্রকলা আবার ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছে। আজকাল অনেকেই প্রাচ্য শিল্পকলার বিশেষত্বটুকু বুঝুন বা না-বুঝুন অন্ততঃ দেখবার আগেই মুখ বিকৃত করেন না এবং দেখে অনেক সময় সঠিক হৃদয়ঙ্গম না করতে পারলেও বোঝবার চেষ্টা করেন। অবশ্য এ-ই যথেষ্ট বললে চলবে না; ভারতীয় শিল্পকলাকে যথোচিত সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে এখনও সময় লাগবে। আজকাল প্রায় দেখা যায়, শিল্পকলাকে নেহাৎ স্থান না দিলে নয়, তাই সাধারণের মধ্যে কোন প্রকারে নিতান্ত অবহেলা সহকারে তাকে এক ধারে আসন দেওয়া হয়— যেন একটু করুণার ভাব দেখা যায়। যখন এই কৃপার ভাব লোপ পাবে, তার জায়গায় আসবে হৃদ্যতা—আসবে আগ্রহ, তখনই বুঝতে হবে যে শিল্পীদের চেষ্টা সার্থক হয়েছে এবং তাঁরা শিল্পকলাকে সাধারণের নিকট যথোচিত সম্মাননীয় করতে পেরেছেন।

এবার কিন্তু লক্ষ্ণৌয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনের সহিত যে প্রদর্শনীটি খোলা হয় তাতে শিল্পকলা-বিভাগকে সমুচিত সম্মানের স্থানই দেওয়া হয়েছে দেখে বড়ই আনন্দ হ'ল। শান্তিনিকেতনের কলাবিভাগের অধ্যক্ষ নন্দলাল বসুকে এই চিত্রকলা প্রদর্শনীটি গঠন করবার ভার অর্পণ করা হয়। ফিকে নীল রঙের খদ্দরে মোড়া পরিষ্কার এবং সুবৃহৎ মণ্ডপটি সকলেরই খুব ভাল লেগেছিল। এরূপ প্রদর্শনী দেখার সুযোগ পাওয়া স্থানীয় শিল্পানুরাগীদের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। এরূপ প্রদর্শনী শুধু লক্ষ্ণৌয়ে নয় সমগ্র ভারতবর্ষেও খুব কম দেখা যায় বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। এবং এত রকমের এত চিত্রকে বিভিন্ন কাল এবং বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী এত

প্রদর্শনী-দ্বার

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক পরিকল্পিত
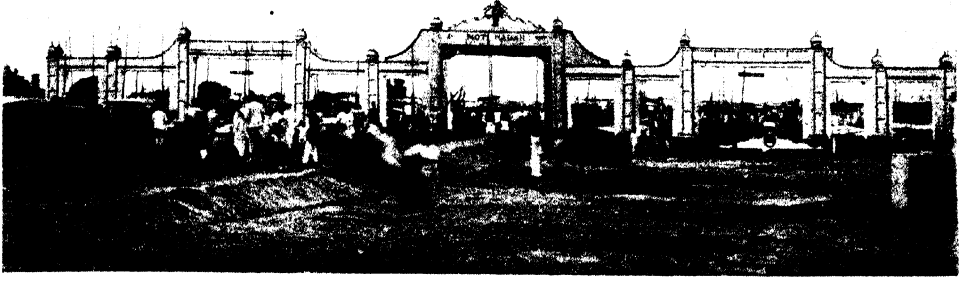
মোতিনগরের প্রধান প্রবেশ-দ্বার— কমলা-তোরণ

বামে কমল-বাজার দক্ষিণে কস্তুরী-বাজার

কষ্টসহকারে একত্রিত ক'রে এবং দক্ষতার সহিত লোক সমক্ষে ধ'রে নন্দলাল বসু সকলের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

এই প্রদর্শনীটিতে বৌদ্ধযুগ হতে আরম্ভ ক'রে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত যত প্রকার শিল্পধারা প্রবাহিত হয়েছে তার মধ্যে মুখ্য সব গুলিরই কিছু কিছু নিদর্শন ধারাবাহিক রূপে শ্রেণীবদ্ধ করা ছিল। বৌদ্ধ যুগের অজন্টা ও বাঘগুহার প্রাচীর চিত্রের নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত কয়েকখানি সুদক্ষ প্রতিলিপি ছিল। তিব্বতের কতকগুলি পতাকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার পরের ভাগে ছিল রাজপুত ও মোগল ধারার ছবি। এ বিভাগে খান-কয়েক খুবই সুন্দর প্রতীক ছিল যাতে এ দুটি ধারার বিশেষত্বগুলি স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছিল। তার পর ধীরে ধীরে মোগল স্কুলের কিরূপে অবনতি হয়, খান কয়েক চিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। গ্রাম্য শিল্পের কয়েকখানি খুবই সুন্দর নিদর্শন ছিল। নিবারণ ঘোষ অঙ্কিত খান কয়েক কালিঘাটের পটে যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। উড়িষ্যা এবং লক্ষ্ণৌয়ের গ্রাম্য শিল্পের কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন ছিল। তার পরের বিভাগে আসে আধুনিক চিত্রাবলি। এই চিত্রগুলির মধ্যে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের চিত্রগুলি সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ করা উচিত। তাঁর বার খানি চিত্র প্রদর্শিত হয়। কলিকাতার বাহিরে তাঁর এতগুলি চিত্র একত্রে দেখবার সুযোগ পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। তার পরেই উল্লেখযোগ্য গগনেন্দ্রনাথের চিত্রাবলি। ইহাঁর পাচখানি চিত্র ছিল। ইহাতে আমার মনে হয় তাঁর যথেষ্ট পরিচয় হয় না। তাঁর আরও খানকতক ছবি থাকলে ভাল হ'ত। গগনেন্দ্রনাথ বিলাতী চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি অবলম্বন ক'রেও কিরূপে সম্পূর্ণভাবে সেটিকে নিজস্ব করে ফুটিয়ে তুলেছেন, তা তাঁর এই কখানি চিত্রে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না। নন্দলাল বসুর আঠারখানি চিত্র ছিল। কিছু ছিল তাঁর আগেকার ধরণে আঁকা এবং কিছু ছিল তিনি আজকাল যেরূপ ছবি আঁকেন সেই সব ছবি। অসিতকুমারের তিন খানি চিত্র ছিল। তিন খানিই আগেকার আঁকা, আজকালকার কিছুই ছিল না। অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের তিন খানি, মুকুল দের দুইখানি, শৈলেন্দ্রনাথ দের এক খানি, ভেঙ্কাটাপ্পার তিন খানি, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের একখানি ও ললিত সেনের এক খানি চিত্র ছিল। আর ছিল রবীন্দ্রনাথের তের খানি ছবি যা বোঝবার সময় এখনও আসে নি। সব ক্ষেত্রেই সকলের ভাল ছবি ছিল ব'লে আমার মনে হয় না। এবং অনেক প্রসিদ্ধ শিল্পী বাদ পড়ে গিয়েছিলেন যাঁদের ছবি এরূপ প্রদর্শনীতে (যার উদ্দেশ্য সব প্রকার ভারতীয় শিল্পধারার নিদর্শন লোকসমক্ষে প্রকাশ করা) থাকা একান্ত প্রয়োজন, যথা—দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, বীরেশ্বর সেন, আবদুর রহমান চাঘতাই ইত্যাদি। সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তেরও কয়েকখানি এচিং ছিল, কিন্তু কোন অঙ্কিত চিত্র ছিল না। আধুনিক ইমপ্রেশ্যনিষ্ট ধারানুযায়ী আঁকবার চেষ্টাও অনেকেই করছেন দেখলুম। তার মধ্যে বিনোদবিহারী
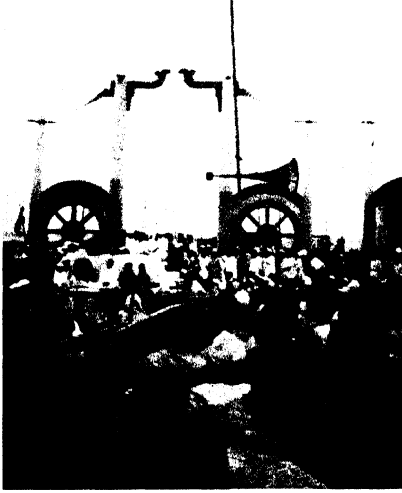
প্রদর্শনীর উদ্বোধনে সমবেত জনতা

মুখোপাধ্যায়ের কাজই বিশেষ চোখে পড়ে। মোটের ওপর আধুনিক চিত্রাবলির মধ্যে শান্তিনিকেতনের ছবিই ছিল বেশী; তা ছাড়া পুরাতন চিত্রাবলির খুব উৎকৃষ্ট নিদর্শন ছিল। রামকিঙ্কর বেইজ গঠিত কয়েকটি সুন্দর মূর্ত্তি ছিল। অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের তোলা কতকগুলি ফটোগ্রাফে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের ক্রমোন্নতি বিশদভাবে দেখান হয়েছিল। প্রদর্শনীর তালিকাখানিও খুব শিক্ষাপ্রদ হয়েছিল। সাধারণতঃ তালিকায় যা থাকে তা ত ছিলই, তা ছাড়াও ছিল ভারতীয় শিল্পকলার ক্রমবিকাশের ইতিহাস এবং আধুনিক শিল্পধারার কর্ণধারগণের নাম ইত্যাদি। কিন্তু জানি না অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য ও অনুশিষ্যগণের মধ্যে বীরেশ্বর সেনের নাম কেন বাদ প'ড়ে গেল। এরূপ বৃহৎকার্য্যে ভুলচুক অনেকই হয়ে থাকে, তা নিয়ে মাথা ঘামান অনুচিত। মোটের ওপর সরকার বাহাদুরের কোনরূপ সাহায্য না পেয়ে এবং শত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও এরূপ প্রদর্শনী সুচারুরূপে গঠিত করা খুবই প্রশংসনীয়।

প্রদর্শনীর গ্রামিক কুটীরশিল্প-বিভাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও বর্ণনীয়। কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু লেখা সম্ভব হ'ল না।

বাংলার লবণ-শিল্পের পুনর্বিকাশ

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

গত বর্ষের শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে "বাংলার লবণ-শিল্প" প্রবন্ধে এই প্রদেশে বহু দিন হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত কিরূপ বিস্তৃত ভাবে লবণ প্রস্তুত হইত তাহার উল্লেখ করিয়াছি। মুসলমান আমল হইতে ব্রিটিশ আমলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কি কুটীরশিল্পে, কি দেশীয় জমিদারদিগের সুবৃহৎ কারবারগুলিতে, প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হইয়া বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র এবং অন্যান্য প্রদেশেও চালান হইত। তৎকালীন হিজলী প্রদেশের নিমকমহাল বা সুনদ্বীপের খ্যাতি আজও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।

তৎকালের ন্যায় আজও বঙ্গপ্রদেশের দক্ষিণ-সীমানা বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ত জলে প্লাবিত হইয়া মানুষের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যবহার্য্য লবণের অফুরন্ত ভাণ্ডার ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে নিম্নবঙ্গের সেই সহস্র সহস্র মলঙ্গীদের অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে। শুধু তাই নয়, অতি প্রাচীনকাল হইতে জলেশ্বর হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত প্রায় সাত শত বর্গমাইল ধরিয়া সাগরকূলের অধিবাসীরা নিয়মিত ভাবে নিজ নিজ কুটীরে লবণ প্রস্তুত করিতে অভ্যস্ত ছিল।

বাংলার এই নষ্ট শিল্পের প্রতি আমরা এতদিন উদাসীন

বেঙ্গল সল্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের কারখানা,
কারখানার এক অংশ,
সমুদ্রের জল ঘন করিবার কনডেনসার

বর্ম্মা হইতে আনীত কাষ্ঠনির্ম্মিত জলনিকাশের যন্ত্র,
লোনা জল সংগ্রহ

মাটি-সংগ্রহ। মধ্যস্থলে শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী সাদা জল নোনামাটিতে ঢালিয়া নোনাজল বহিষ্করণ

ছিলাম। এক্ষণে তাহা পুনরায় কিরূপ ভাবে পুনর্বিকশিত হইতেছে তাহাই আলোচনা করিব। হিজলীপ্রদেশের পূর্ব্বেকার নিমকমহলে অর্থাৎ বর্ত্তমান কাঁথি মহকুমার লবণক্ষেত্রে কুটীরশিল্পে এবং কয়েকটি নূতন দেশীয় প্রতিষ্ঠানে লবণপ্রস্তুতির কিরূপ প্রসার বাড়িতেছে তাহা সম্প্রতি দেখিয়া আসিয়াছি।

পাঠকবর্গ সম্ভবতঃ জানেন যে ১৯৩০ সাল হইতে গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুসারে সমুদ্রতীরবাসীদের ব্যবহারোপযোগী লবণ প্রস্তুত করিতে এবং তাহা বিনা-শুল্কে ব্যবহার করিতে সরকার অনুমতি দিয়াছেন। নিকটস্থ গ্রামে বা হাটে এই লবণ বিনাশুল্কে বিক্রয় করিবার অধিকারও তাহাদের দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফলে আজ মেদিনীপুর, ২৪-পরগণা, সুন্দরবন, বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম—সর্ব্বত্রই এই কুটীরশিল্প কয়েক বৎসরে বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে। অবশ্য ইহার পরিমাণ এমন নয় যে তাহা কলিকাতা বা কোন বড় শহরে চালান দেওয়া যাইতে পারে। চালান দিলেও শুল্কযোগে বিদেশী লবণের তুলনায় অনেক বেশী দর পড়িয়া যায়। এই লবণ অতি পরিষ্কার, কিন্তু স্থানীয় বাজারে হাটে মাশুল না দিয়া ইহার মণকরা দর বারো আনা এক টাকার কম নহে। সেই জন্য স্থানীয় লোকেরা দুই-এক পয়সা সেরে প্রয়োজন-মত ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। সকলের পক্ষে—বিশেষতঃ যাহারা সমুদ্রকূল হইতে দূরে বাস করে তাহাদের লবণ প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। বেশীর ভাগ উপকূলবাসী কৃষকগণই যে-সময়ে ধান্যক্ষেত্রে কোন কাজ থাকে না, সেই সময় লবণ প্রস্তুত করে।

বঙ্গদেশে বৃহৎ পরিমাণে (কমার্শিয়াল স্কেলে) লবণ প্রস্তুত করা যায় কি-না তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য বাংলা সরকার পিট্ সাহেবকে নিযুক্ত করেন। পিট্ সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্য হইতে জানা যাইবে, কুটীরশিল্পে অতি সহজ উপায়ে কিরূপ পরিষ্কার লবণ প্রস্তুত হয়:—

বাউল

শ্রীনন্দলাল বসু

যে-সকল সাধারণ যন্ত্রপাতি বাহিরের সাহায্য ব্যতিরেকে সহজেই নির্ম্মাণ বা সংগ্রহ করা যায় তাহার সাহায্যে প্রতি পরিবারের লোকেরা স্ব স্ব গৃহে লবণ সহজেই প্রস্তুত করিতে পারে। (তাৎপর্য্য)

কাঁথিতে স্থানীয় গৃহস্থের বাটীতে কিরূপে লবণ প্রস্তুত হয় তাহা দেখিবার সুবিধা আমার ঘটিয়াছিল। এই লবণ-প্রস্তুত প্রণালীকে সংক্ষেপে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—১। নোনা মাটি সংগ্রহ; ২। সেই নোনা মাটি হইতে পরিস্রুত করিয়া তীব্র লবণাক্ত জল বহিষ্করণ; ৩। এই নোনা জলকে উনানে জ্বাল দিয়া বা ফুটাইয়া লবণের দানা নিষ্কাশণ।

কলিকাতার নিকটস্থ গ্রামবাসীরাও প্রায় এই ভাবেই লবণ প্রস্তুত করে।

মলঙ্গীরা সম্ভবতঃ এই ভাবেই লবণ প্রস্তুত করিত। চট্টগ্রাম বা সুন্দরবনের অধিবাসীরা এখনও নিকটস্থ বন হইতে কাঠ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছে, কিন্তু সর্ব্বত্র সে সুবিধা নাই। অনেক স্থানে ঘুঁটে, কয়লা, তুষ, খড় ব্যবহার করিতে হয় এবং সেই জন্য সে-সমস্ত স্থানে খরচ একটু বেশী পড়িয়া যায়। মলঙ্গীরা কাঁথি মহকুমায় সমুদ্রতীরবর্ত্তী যে "জলপাই" বনজঙ্গল হইতে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিত সেই জলপাই-বন অনেক দিন হইল লুপ্ত হইয়াছে। সেই জন্য গৃহস্থরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কয়লাই ব্যবহার করিয়া থাকে।

এইবার কিরূপে নোনা মাটি সংগৃহীত হয় তাহার কথা বলিব। সাগর-উপকূলের নিকটস্থ নিম্নভূমি জোয়ারের সময় সমুদ্রের নোনা জলে প্রায়ই কিছু ক্ষণের জন্য প্লাবিত হইয়া যায়। ইহার ফলে ঐ সমস্ত স্থানের মাটি অতিশয় লবণাক্ত হইয়া উঠে। কাঁথির উপকূলে বঙ্গোপসাগর অগভীর এবং অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এখানে জল বেশী নোনা—সেই জন্যই বোধ হয় হিজলীপ্রদেশে লবণ-প্রস্তুতির প্রসার বাড়িয়াছিল। সাধারণ জোয়ার অপেক্ষা কোটালের জোয়ার সমস্ত নিম্নভূমি-টিকে অধিক লবণাক্ত করিয়া দিয়া যায়। এই ভূমি শুষ্ক হইলে, উপরকার নোনা মাটি একটি লোহার ছোট পাত দ্বারা চাঁচিয়া স্থানে স্থানে ছোট ছোট পাহাড়ের আকারে জড়ো করিয়া রাখে।

পরিস্রুতীকরণ—নিকটেই সাধারণতঃ অল্প উচ্চ ভূমির উপর দুইটি গর্ত্ত খুঁড়িয়া এক-একটি ফিলটার-বেড্ নির্ম্মাণ করে। এগুলিকে 'গাড়ী' বলে। প্রথমে প্রায় দুই ফুট গভীর এবং তিন ফুট ব্যাস একটি বৃত্তাকার খাদ খনন করিয়া তাহার জমি পলিমাটি দিয়া সমতল ও মসৃণ করিয়া দেয়—তার পর উহার ভিতরে কতকগুলি সরু নালি কাটিয়া একটি ছিদ্রে সংযুক্ত করিয়া দেয় (চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই নালি-কাটা বেড্‌টির উপর চাঁচারী এবং কঞ্চি ও খড় চাপা দিয়া এমনভাবে মাচার মত নির্ম্মাণ করিয়া দেয় যাহাতে মাটি তলায় পড়িয়া নালিগুলিকে বন্ধ না করে। এইরূপ ভাবে প্রস্তুত ফিল্‌টার-বেডের উপর নোনা মাটি নিক্ষেপ করিলে সমতল ভাবে ইহা উপর হইতে একটি অতি অগভীর ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর মতই দেখায়—ভিতরে যে এত কারিগরি থাকে বুঝা যায় না। উপরিউক্ত ছিদ্রটির ঠিক নিম্নে নোনা জল পড়িবার জন্য একটি গর্ত্ত থাকে। গাড়ীগুলি বাহির হইতে অনেকটা মাটির উনানের মত দেখায়। বড় গর্ত্তটিতে নোনা-মাটি দিয়া তাহার উপর সাদা জল ঢালিলে এই জল চুঁইয়া মাটির লবণভাগকে গলাইয়া দেয় এবং সেই লবণ-মিশ্রিত জল নিম্নস্থিত গর্ত্তটি পূর্ণ করে। গ্রামবাসীরা এই নোনা জল কলসে পূর্ণ করিয়া নিজ নিজ গৃহে লইয়া যায়। এইরূপে মাটির লবণাংশ বহিষ্কৃত হইলে সেই মাটি তুলিয়া ফেলিয়া পুনরায় নূতন নোনা মাটি ভরিয়া দেওয়া হয়।

এই নোনা জলের লবণ-ভাগ সামুদ্রিক জল অপেক্ষা অনেক পরিমাণে বেশী। সামুদ্রিক জলে সাধারণতঃ শতকরা দুই-তিন ভাগের বেশী লবণ থাকে না। কিন্তু বোম্ (Beume) হাইড্রোমিটার দিয়া দেখা গিয়াছে যে এই নোনা জলে শতকরা কুড়ি হইতে বাইশ পর্য্যন্ত লবণভাগ থাকে। লবণের সেচুরেশন পয়েণ্ট (saturation point) ৩০।৩৫—শতকরা ৩০।৩৫ ভাগের বেশী হইলেই লবণ নিজ হইতে পড়িতে থাকে—সেই অবস্থায় আনিবার জন্যই আগুনে ফুটানোর প্রয়োজন। শীতকালে যখন রৌদ্রতেজ প্রখর থাকে এবং সাগর-কূলের প্রচণ্ড হাওয়ার আর্দ্রতা কমিয়া যায় তখন এই নোনা জল উন্মুক্ত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিলে দুই তিন দিনের মধ্যে লবণের দানা পাওয়া যাইতে পারে। ইহা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। স্থানীয় অধিবাসীরা এরূপ করে কি না জানি না।

উপরিউক্ত উপায়ে নোনা জল (ব্রাইন) সংগ্রহ করিয়া যে যার

"চণ্ডীদাস-চরিত"

(৩)

এই কথা নৃপমুখে শুনি মাতা মনসুখে
কহিলেন সহাস্য বদনে।
মোর বাক্যে যার সন্দ তাহার কপাল মন্দ
বিশেষত রাজা দেখে কানে॥
পরম বৈষ্ণব তুমি মোর ভক্ত জানি আমি
সুপণ্ডিত কিন্তু তুমি রাজা।
তেঁই স্বভাবের দোষে দুষ আজি চণ্ডীদাসে
লয়ে যত মিথ্যাবাদী প্রজা॥
শুন ওরে নরমণি যেই রামী সেই আমি
শিব-অংশে চণ্ডীর জনম।
তোর বহু ভাগ্যগুণে আইলেন ব্রহ্মণ্যধামে
কৃষ্ণলীলা করিতে কীর্ত্তন॥
এ মর্ত্ত মায়ার রাজ্য জান সে মায়ার কার্য্য
কর্ম্মকর্ত্তা যার কাম-রতি।
যথা রয় কাম-গন্ধ নয়ন থাকিতে অন্ধ
তথা বৃদ্ধ যুবক যুবতী॥
কাম-রতি নিত্য এসে ফুসলায় চণ্ডীদাসে
প্রেম-রত্ন করিতে হরণ।
তেঁই রামী-রূপে তার সঙ্গে থাকি অনিবার
রক্ষি রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধন॥
কায়া অনুগত ছায়া যথা কায়া তথা মায়া
পুন নিত্য ধাম পরিহরি।
প্রেমিক প্রেমিকা দুটি রক্ষিতে এসেছি ছুটি
আমি আর নিত্যা সহচরী[১২]॥
রামী চিনে চণ্ডীদাসে চণ্ডী জানে রামী কে সে
জানে তুচ্ছ দোঁহে সাধারণ।
পাত্র না থাকিলে চিনা কর্ম্মের কারণ জানা
বড় সুকঠিন হে রাজন॥

এক জন বঁধু গলে অন্যে দেবে, দিবে বলে
গাঁথে ফুল দুইটি সুন্দরী।
না দিতে না জানি শুনি বলিতে পার কি তুমি
কেবা সাধ্বী কেবা বারনারী॥
প্রেমের পাগল চণ্ডী না মানে সমাজগণ্ডী
ততোধিক রামী রজকিনী।
প্রাণে প্রাণে মিশি যায় কিন্তু কাম-গন্ধ নাঞি
দোঁহে দোঁহাকার চিন্তামণি॥
ভাবি দেখ নর-রায় রাজা কহে হায় হায়
পড়েছে মা সব কথা মনে।
একি হোলো একি হোলো জলে গেল জ্বলে গেল
হৃদয় প্রচণ্ড দাবাগুনে॥
-সহসা উন্মত্ত তুমি হইলে কি নৃপমণি
কহিলেন হাসি ভবদারা।
আবল তাবল বল অকস্মাৎ একি হইল
কেন বল কাঁদে হও সারা॥
রাজা কন কব আমি কি না জান শ্যামা তুমি
চণ্ডীদাস-শূন্যা যে ধরণী।
কব কি মা হায় হায় ঘাতকে বধিল তায়
সমাজের মন্ত্রণায় শুনি॥
মাতার অধিক তুমি বাসলী বিশ্ব-জননী
তুমিও বিমুখ সে বিপাকে।
না রক্ষিলে প্রাণ তার ভূমিতলে পড়ি যার
কাটামুণ্ড মা মা বলি ডাকে॥
ক্ষমা কর ক্ষেমাঙ্করী আর না বলিতে পারি
পাপী আমি গেল প্রাণ জ্বলে।
যার রাজ্যে ব্রহ্মহত্যা কর মা তাহারে হত্যা
বলি রাজা পড়িল ভূতলে॥
দিঞা মাতা আত্ম-শক্তি ডাকিলেন নরপতি
উত্তরে উত্তর কহে মাতা।
হাসি কন শৈলসুতা কে ব্রহ্মকে করে হত্যা
একথা শুনিলে তুমি কোথা॥

---

১২) বাসলা বৌদ্ধ বজ্রেশ্বরী। তাঁহার সহচরীর মধ্যে নিত্যা প্রধান। এই নিত্যা সামান্য মনসাদেবী নহেন। ইঁহাকে পরে পাওয়া যাইবে।

ই বলি নরমণি রাজা দেখে কানে শুনি
এইবার দেখ দেখি ভেবে।
৯/] রাজা কন ভাবি যদি নীচে বুঝি মিথ্যাবাদী
তার বাক্যে সত্য না সম্ভবে ॥
হাসিয়া কহেন মাতা শুনিলে চণ্ডীর কথা
ইতস্তত কেন কর তবে।
বিচার-বিহীন কর্ম্ম এ নহে রাজার ধর্ম্ম
কর্ম্ম দেখি মর্ম্ম বুঝি লবে ॥
প্রাণ যায় যাক্ তবু মিথ্যা না কহিবে কভু
নির্ভয়ে কহিবে সত্য কথা।
হবে সদা সদাশয় থাকে যেন ধর্ম্মে ভয়
তুমি রাজা মর্ত্তের বিধাতা ॥
যে যা বলে সব মিছে তোর চণ্ডী আছে বেঁচে
আমি তার রক্ষিয়াছি প্রাণ।
ঘাতকে করেছি নাশ ভ্রান্ত-সঙ্গে চণ্ডীদাস
কাশীধামে করিলা প্রয়াণ ॥
পদ্মরাগ মহামণি কাচসঙ্গে কাচমণি
অজসঙ্গে পশুরাজ অজ।
গোধন চরান বনে গোকুলে গোআলা সনে
ভবারাধ্য ইন্দ্র-অবরজ* ॥
কিন্তু কালে পদ্মরাগ কাচ নিন্দি ধরে রাগ
সিংহ ধরি খায় অজ অজা।
চূড়া ধড়া ফেলি দূরে সংহারি সে কংসাসুরে
কৃষ্ণচন্দ্র মথুরার রাজা ॥
অধমের সহবাসে নরাধম চণ্ডীদাসে
কহে তেঁই এ ব্রহ্মণ্য-পুর।
এবে সে আসিছে ফিরে দেখিবে দুদিন পরে
নর হতে চণ্ডী কত দূর ॥
শিলা-রূপে আমি রাজা লইতে তাদের পূজা
আসিয়াছি আমি তব পুরে।
তুষ্ট আমি কারে নই দেবী চণ্ডীদাস বই
সার বাক্য কহিলাম তোরে ॥

আর এক কথা বলি ইচ্ছা হলে দিবে বলি
ছাগ মেষ মহিষ গণ্ডার।
ইথে না হইবে পাপ না ঘটিবে মনস্তাপ
হয় যদি তব কুলাচার ॥
এতেক কহিলে মাতা রাজার ধরিল মাথা
কহে পুন কর-জোড় করি।
সকল শাস্ত্রের মর্ম্ম অহিংসা পরম ধর্ম্ম
তাহে পাপ নাহি মা শঙ্করী ॥[১৩]
দেশাচার কুলাচার সম শাস্ত্র নাহি আর
জগনমাতা কহিলেন হাসি।
তুমার উত্তর খণ্ডে সমীন মোরগ-অণ্ডে
তুষ্ট শিব পরম সন্ন্যাসী ॥[১৪]
ভক্ত করে নিবেদন কর পাতে নারায়ণ
মধু মাংস সমজ্ঞান করি।
সুরা সুমধুর সুধা না মিটে অনন্ত ক্ষুধা
যত পান তত চান হরি ॥
ভক্ত দেন বিশ্বরূপে যে জীবে নৈবেদ্য-রূপে
জীব-সংজ্ঞা নাহি থাকে তার।
নির্ম্মল না হয় কভু বিস্বাদ পঙ্কিল তবু
গঙ্গাজলে না চলে বিচার ॥
যেই শুদ্ধ সিদ্ধ শাক্ত সেই রাজা বিষ্ণুভক্ত
তার করে ধরা সে নির্ব্বাণ।
শক্তির সাধনে শক্তি মিলে তাহে পায় ভক্তি
ভক্তি হলে মিলে ব্রহ্মজ্ঞান ॥
অগ্রে কুলাচার মত হও নিত্য ধর্ম্মে রত
তাহে জ্ঞান যত যাবে বাড়ে।
বাঁশের খুসলী* প্রায় একে একে নররায়
কর্ম্মকাণ্ড সব যাবে ঝড়্যে ॥

১৩) সামন্তেরা বাসলী ও মনসা পূজা করিত, পশুবলি সে পূজার অঙ্গ ছিল। হামীর-উত্তর দেশাচার কুলাচার জানেন না, চণ্ডীর নিকট পশুবলি অধম নয়, তাহাও জানিতেন না। রাজবংশ-পরিচয়ে ও কিম্বদন্তীতে হামীর-উত্তর বিদেশী ছত্রি, বোধ হয় শৈব ছিলেন।

১৪) সমীন কুক্কুটাণ্ডে শিবের তুষ্টি কোথায়? রাঁচি অঞ্চলে নাকি এইরূপ শিব আছেন। বোধ হয় সে শিব কোন গ্রামদেবতা। কোন কোন গ্রামদেবতা ভৈরব ও শিব হইয়া গিয়াছেন।

* ইন্দ্র-অবরজ, ইন্দ্রের কনিষ্ঠ, উপেন্দ্র কৃষ্ণ।

* কোষ+লী=খুসলী, বাঁশের অঙ্কুরের খোল। শব্দটি বাঁকড়ী।

৯৩/] তখন দেখিবে ভূপ তুমি বিশ্ব একরূপ
শুদ্ধ ব্রহ্ম সমুখে তুমার।
আত্মবলি দিলে তবে আবার দেখিতে পাবে
তুমি ব্রহ্ম সব একাকার॥
-জীবে দয়া সমতুল আছে কি ধর্ম্মের মূল
হিংসা-সম পাপের পত্তন।
ডাকিলে মা তারা বলে যদি আসি লও কোলে
জীব-হিংসা তবে কি কারণ॥
এতেক কহিলা যদি নরাধিপ ব্রহ্মবাদী
ব্রহ্মময়ী কহিলা তখন।
কেন রাজা কি কারণে নাশে অজ ভুজঙ্গমে
পুণ্যতম বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
কি কারণে ম্লেচ্ছদেশে জনগণ জীব নাশে
ক্ষত্র ধায় মৃগয়ায় বনে।
নরমেধে অশ্বমেধে[১৫] কেন সে পুরাণে বেদে
লিখে রাজা সাধু সিদ্ধ জনে॥
ভাব তুমি নর-রায় তারা কি নরকে যায়
একি তব ধর্ম্ম আচরণ।
কেন ভ্রান্ত হেন ভ্রমে না লজ্জিবে কোন ক্রমে
ধ্রুব সত্য আমার বচন॥
গোঘ্ন[১৬] অতিথিরে কয় চর্ম্মণ্বতী কেন বয়[১৭]
জান সে ত হাম্বীর রাজন।
জ্ঞাত তুমি সব তত্ত্ব স্বভাবের দোষে মাত্র
মাতৃ-আজ্ঞা করিছ লঙ্ঘন॥

পুরাণ সে বেদ বিধি কেবল কর্ম্মেরি বিধি
সেই মত কর্ত্তব্য তুমার।
ফলাকাঙ্ক্ষা দাও ছাড়ি থাক নিত্য কর্ম্মে বেড়ি
একদিন হবে ব্রহ্মসার॥
তরু নাই ফল খাবে মরুভূমে জল পাবে
লাভ হবে ব্যবসায় বিনে।
একথা মানিলে সত্য তোর সম কে উন্মত্ত
আছে রাজা এই ধরাধামে॥
অত্র জল স্থল বই সজীব সকলি হয়
খাও দাও মাথ পর যেবা।
লক্ষ লক্ষ জীব-ক্ষয় নিত্য তুমা হতে হয়
তার প্রতিকার কর কিবা॥
-ব্রাহ্মণের জাতি যাবে রাজার কলঙ্ক হবে
ঘাতকের বংশ হবে ক্ষয়।
এ কর্ম্ম কেমনে করি রক্ষা দেমা ক্ষেমাঙ্করী
কাতর অন্তরে নৃপ কয়॥
-বিপ্র-বংশে শাক্ত যারা কুলে শ্রেষ্ঠ হয় তারা
ভূপ-শ্রেষ্ঠ যারা শক্তি পূজে।
যেবা জীবে দেয় বলি তারো রাজা বংশাবলি
দলে দলে ফিরিছে সমাজে॥
সত্য জাতি খ্যাতি যাবে কর্ম্ম শেষ হবে যবে
কেহ তোরে না কবে ভূপাল।
পঙ্গুতে মারিবে লাথি তরুতলে হবে স্থিতি
খাবে সঙ্গে কুকুর চণ্ডাল॥

---

১৫) নরমেধ অশ্বমেধ, মেধ যজ্ঞ। পশু আহুতি দিয়া যাজ্ঞিক ও যজমান তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেন। অশ্বমেধে দেখা যায়, অশ্বের কোন্ অঙ্গ কাহার প্রাপ্য, তাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। নর মেধেও অবশ্য নর-পশুমাংস ভক্ষিত হইত। বেদে ইহার নাম পুরুষ-মেধ। ঋগ্‌বেদে, শুক্লযজুর্বেদে, অথর্ববেদে, শতপথব্রাহ্মণ, ও দুই-একখানি শ্রৌতসূত্রে পুরুষমেধের কথা আছে। কালক্রমে এই বীভৎস যজ্ঞ উঠিয়া যায়, কিন্তু নর-বলি উঠিয়া যায় নাই। বৈষ্ণব ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে নর-পশুর নাম 'মায়াতি'। চণ্ডীর প্রীত্যর্থে নর-বলি হইত, কিন্তু পূজক ভক্ত প্রসাদ পাইতেন না। ইহা এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। কারণ এতদ্দ্বারা যজ্ঞের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, এবং নিজের অখাদ্য অপ্রীতিকর পশু আরাধ্যা দেবীকে অর্পিত হয়।

১৬) গোঘ্ন শব্দের মূলার্থ গোহত্যাকারী। বৈদিক কালে এবং বহু পরেও মান্য অতিথির ভোজনের নিমিত্ত গো-বধ করা হইত। এই কারণে গোঘ্ন শব্দের লাক্ষণিক অর্থ অতিথি হইয়াছিল। পরে গো-বধ নিষিদ্ধ হইলে মান্য অথিতিকে গো প্রদর্শিত হইত। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে এই বিধি আছে।

১৭) চর্মণ্বতী নদীর বর্ত্তমান নাম চম্বল। মধ্যভারতে বিন্ধ্য পর্বত হইতে নির্গত হইয়া যমুনায় পড়িয়াছে। প্রত্যেক বড় বড় নদীর উৎপত্তি-কাহিনী আছে। চর্মণ্বতী নদীরও আছে। চন্দ্রবংশে রন্তিদেব নামে এক বিখ্যাত ধর্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। তিনি প্রত্যহ ব্রাহ্মণভোজনের নিমিত্ত দুই সহস্র গো-বধ করিতেন। সে গো-সমূহের চর্মের ক্লেদে চর্মণ্বতীর উৎপত্তি। মহাভারতে বনপর্ব ২০৭ অঃ, শান্তিপর্ব ২৯ অঃ। মৎস্য ও ভাগবত পুরাণেও আছে। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে উদয়-সেনের মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কবিরাজ ছিলেন। চিকিৎসকের নিকট মেধ্যামেধ্য বিচার নাই। সুশ্রুত গো-মাংস পবিত্র বলিয়াছেন।

সেই দিন বড় ভাল　　চল রাজা চল চল
পথ দেখাইয়ে লঞা যাই।
অভয়া জননী যার　　কি ভয় কি ভয় তার
আয় সঙ্গে আয় চলি আয়॥
বলি মাতা নিরবিলা　　মা তুমার এ কি লীলা
বলি রাজা পড়িলা ধরায়।
অই দেখ শান্তি-নদী　　আয় সাঁতারিবি যদি
আয় সঙ্গে আয় চলি আয়॥
বলিতে বলিতে মাতা　　হইলেন অন্তরিতা
তবু কর্ণে শুনে নর-রায়।
অই দেখ শান্তি-নদী　　আয় সাঁতারিবি যদি
আয় সঙ্গে আয় চলি আয়॥
সচকিতে নর-রায়　　আকাশের পানে চায়
বক্ষ বেয়ে পড়ে প্রেম-বারি।
সুনীল গগন গায়　　সহসা দেখিতে পায়
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী॥
বিরিঞ্চি বাসব শিব　　সহ করিছেন স্তব
সম্মুখে সে প্রচণ্ডা বাসলী।
চতুর্ভিতে দেবদল　　রক্তজবা বিল্বদল
ঢালে পদে অঞ্জলি অঞ্জলি॥
গর্জ্জিছে জলদজাল　　তর্জ্জে দশদিকপাল
সপ্ত সিন্ধু সঘনে উথলে।
স্বনে ভীম ঝঞ্ঝাবাত　　হয় ঘন উল্কাপাত
বিশ্ব বুঝি যায় রসাতলে॥
ত্রাহি ত্রাহি পড়ে ডাক　　বাজে উচ্চ ঢোল ঢাক
দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ মিলি।
নাহি করি হিংসাদ্বেষ　　অসংখ্য মহিষ মেষ
মার পদে দিতেছেন বলি॥
দেখি শুনি নর-রায়　　সঘন কম্পিত কায়
মূরছি পড়িলা ভূমিতলে।
মায়াখেলা সাঙ্গ করি　　অমনি স্বরূপ ধরি
বাসলী করেন আসি কোলে॥
রাজার ভাঙ্গিল মোহ　　মা তুমার এত স্নেহ
আছে মা এ অধমের প্রতি।
শপথ করিয়া কই　　না ভজিব তুঁহা বই
না লঙ্ঘিব তুঁহার ভারতী॥
লঙ্ঘিবে যে মম বংশে　　তব বাক্য কোন অংশে
তোরে ভক্তি না করিবা যেই।
রাজ্য হবে ছারখার　　বংশ না থাকিবে তার
শেষ রাজা এ রাজ্যের সেই॥
এত কহি নরনাথ　　করি শত প্রণিপাত
বিদায় চাহিলা কর-জোড়ে।
কহিলেন হররাণী　　বড় তুষ্ট হইনু আমি
যাহ বৎস এবে অন্তঃপুরে॥

* | * | *

নগরপ্রান্তে দেবীদাস ও চণ্ডীদাস।

জন্মভূমির প্রতি।

এবার জাগ মা জনমভূমি
যাবে কি জনম কাঁদিয়ে।
জাগ জাগ মা জনমভূমি॥
চাঁদ জাগিছে নীল গগনে
কুসুম হাসিছে কুঞ্জ-কাননে
জাগাতে জগত মধুর তানে
জাগেন জগত-স্বামী।
জাগ জাগ মা জনমভূমি॥
সম কালানল সমাজ প্রবল
আমার বলিতে কে আছে মা বল
আমার বলিতে তোর কৃপাবল
তেঁই আসিয়াছি আমি।
জাগ জাগ মা জনমভূমি॥
ছিলাম যেদিন বারাণসী ধামে
বলেছিলা মাতা আসিবে এ ধামে
এসেছ কি তাই তুমারে সুধাই
দীনের সহায় যিনি।
জাগ জাগ মা জনমভূমি॥

কোথা সে আমার সাধনার ধন
জীবনে সে বেঁচে আছে কি এখন
বল মা সুধাই আছে কিবা নাই
সেই রজকিনী রামী।
জাগ জাগ মা জনমভূমি ॥
সারা নিশি জাগি নগরপ্রান্তে
পড়ে আছি তোর চরণপ্রান্তে
মরা জীয়ন্তে কাঁন্তে কাঁন্তে
পাগল চণ্ডে আমি।
জাগ জাগ মা জনমভূমি ॥
- পুত্র-হারা মাতা চির-উন্মাদিনী
ঘুমায় সে কিরে না পালে সে মণি
আয় কোলে আয় আয় দুটি ভাই
জনম-দুখিনী আমি।
তোদের জননী জনম-ভূমি[১৮] ॥

* | * | *

বাসলীর উক্তি।

বল আবার বল বল কি বলিলি
ছি ছি চণ্ডীদাস সব গেলি ভুলি
কে তুই কাহার ছেলে কারে তুই মা মা বলে
উঠি কার কোলে কহ মরমের ব্যথা।
আয় কোলে আয় মোর আমি যে জননী তোর
কার অঙ্গে এত জোর হয় তোর মাতা ॥
কে তব জনম-ভূমি বুঝেও না বুঝ তুমি
মা বলে ডাকেছ তাই কোলে করে আসি।
জনহীন বনাঞ্চলে ডাকিলেও মা মা বলে
স্তন টিপি ছুটে আসে ভীষণা রাক্ষসী ॥

জীব-প্রেম-আকর্ষণী মাত্র সে মা বোল বাণী
বংশ নাশে পুষে তেঁই গান্ধারী ভুজঙ্গ।*
সিংহিনী বাঘিনী তায় হিংসাবৃত্তি ভুলি যায়
বন্ধ্যানারী স্তনে ছুটে দুগ্ধের তরঙ্গ ॥
সবাই ত বলে শুনি সুখ-সিন্ধু এই ভূমি
মন্থনে উঠিল কিন্তু সর্ব্বত্র গরল।
এক বিন্দু সুধা তুমি উঠিলে কেবল ॥
লয়ে এই সুধা-বিন্দু রচিব অপার সিন্ধু
কাশীধামে চণ্ডীদাস যারে পূজা দিলি।
আমি শীলারূপা সেই তোর মা বাসলী ॥

* | * | *

এসেছ মা হর-রমা বলি দুটি ভাই।
দেবীর চরণতলে ধরণী লুটায় ॥
ধরি করে তুলি দোঁহে বাসলী সাদরে কহে
বাছা মোর চণ্ডীদাস চাহ কিবা বর।
যা চাহ তাহাই দিব কহ অতঃপর ॥
হাসি কহে চণ্ডীদাস কর কি মা পরিহাস
দুখের জীবন হতে যদি দুখ নিলি।
কি থাকে মা লোম-বস্ত্রে গেলে লোমাবলি ॥
মোরা যত দুখ পাই তাহে কিছু ক্ষতি নাই
দুঃখ হয় দেখি মা এ দেশের দুর্গতি।
সে দুঃখ করুণা করি হর হৈমবতী ॥

* | * | *

শূন্য-ভারতী।

এইবার তুমি বল দেখি সখা সত্য মরম কথা।
প্রাণের ভিতর পরাণ-মাণিক খুজতে গেছলে কোথা ॥
আলোক আঁধারে ঘুরি ফিরি সখা কোনটি দেখিলে ভাল।
কোনটি ধবল রক্তিম বল কোনটি দেখিলে কাল ॥†
১১/] ধরণীর গতি উজান বাহিয়া পলাএ্যে ছিলে তা জানি।
ধরিয়াছি চোর পড়িয়াছি ধরা কেমন চতুরা আমি ॥

---

১৮) পুথীর গীতগুলি কৃষ্ণ-সেনের রচিত। অনুরূপ ভাব উদয়-সেনের পুথীতে ছিল কি না, সন্দেহ। কারণ, কৃষ্ণ-সেন কোন কোন গীতে তাহার কাল লক্ষ্য করিয়াছেন। এই গীতে সমাজ-পীড়ন ব্যতীত দেশের দুর্গতিহেতু খেদ আছে। মল্লভূম ও সামন্তভূম স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। বারম্বার বর্গীর লোমহর্ষণ অত্যাচার, পরে দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস দেশকে উৎসন্ন করিয়াছিল। কবি দেখিয়াছিলেন।

* গান্ধারী দুর্য্যোধনের মাতা। এখানে ভুজঙ্গের সহিত উপমিত হইয়াছেন। প্রবাদ আছে, সর্প নিজের শাবক বধ করে।

† ধবল, রক্তিম, কাল—সত্ত্ব রজঃ তমঃ

আমায় চুরি করেছিলা তুমি তোমায় করেছি আমি।
আমি সে করিব তুমার বিচার আমার করিবা তুমি ॥
বলি দেয় সবে অটবী অনল কাষ্ঠে অনল রয় ।
বহুলোক মাঝে নামীর তত্ত্ব নামটি ধরিয়া হয় ॥
তরুলতা হতে বীজের জনম বীজ হতে তরুলতা।
বীজ কি বিটপী বল্লরী আগে কাজ কি সে সব কথা ॥
থাক বা না থাক ফলের কামনা তরুর যতন চাই।
ভেবে দেখ সখা তরুর যতনে আপনি সে ফল পাই ॥
ধন জন প্রাণ জাতি কুল মান সকলি চলিয়া যাক।
এক দুই তিন জুড়ি লহ সখা চারটি পড়িয়া থাক ॥*
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত আট নয় শূন্য।
এর চেয়ে আর বেশী কিছু নাঞি সকলি ইহাতে গণ্য ॥
বাঘও বলিতে মানুষ বুঝায় ছাগও বলিতে তাই।
আকাশ পাতাল সকলি মানুষ তাছাড়া কিছু ত নাই ॥
স্বর্গ মানুস নরক মানুষ মানুষ পরম প্রভু।
হচ্ছে মানুষ মর্চ্ছে মানুষ মানুষ নিত্য স্বভূ ॥
সে হেন মানুষ করি লও আপন তুমি কে বুঝিবা তবে।
কুকুর ঠাকুর বিচার বিধান সকলি চলিয়া যাবে ॥
মুঠা খুলি তুমি দেখিবে অপর কোন বাজিকর হতে।
এক দুই তিন উড়ি গেল সখা আইল সেই চারি হাতে ॥
এক হ'তে দশ অলস অবশ থাকেও দেখিবে নাই।†
তুমি আমি সখা সব চলি যাবে থাকিবা কেবল সেই ॥
সন্তাপ শশী যোগাবে তখন সূর্য্য হিমানী ধীর।
উরগ অতুল স্বরগের সুধা মরু সে মানস নীর ॥
ওঙ্কার রবে টলিবে বিশ্ব সেই সে শুনিবে কানে।
পরম হরষে কত কথা কবে সেই সে তাহার সনে ॥
পাগলীর কথা মনে রাখ ভাই না ভাবিও তায় দুষ্ট।
পাগলী তুমার পারাবার তরী কহয়ে পাগল কৃষ্ণ ॥‡

* ধর্ম্ম অর্থ কাম, ত্রিবর্গ—একদা আশ্রয় কর, চতুর্থ মোক্ষ চিন্তা
াক।

† দশটি অঙ্কদ্বারা যাবতীয় সংখ্যা ব্যক্ত হয়. দশটি ইন্দ্রিয় (পাঁচ
জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়) দ্বারা জগৎ উপলব্ধ হয়। কিন্তু জ্ঞাতা
া থাকিলে ইন্দ্রিয় বৃথা। এক পরম পুরুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত
াছেন, তিনি স্বয়ংভূ, তিনিই 'মানুষ'।

‡ সেই পরমপুরুষ ভাবনা করিলে ধর্ম অর্থ কাম উড়িয়া যাইবে, মোক্ষ
াসিবে। তখন বর্তমান ভেদ জ্ঞান থাকিবে না, সব এক ধর্ম দেখিবে।

চণ্ডীদাস উক্তি।

জানি আমি প্রিয় সখি আইলে কোন দেশ হতে
যে দেশে নাহিক দ্বেষ হিংসা জ্বালাতন।
সুধা খাইয়া করে লোক দুধে আচমন ॥
এদেশের রীতি ভাই মানুষে মানুষ খায়
মানুষ মারিতে জানে যে যত সন্ধান।
এ জগতে সেই ভাই তত বুদ্ধিমান ॥
ভারত ভ্রমিয়া যা দেখিনু সখা মোহে না আমার মন।
কালর হস্তে খর করবাল লালের সিংহাসন ॥
যদিও ধবল দেখিয়াছি কোথা পড়িআছে ঘাটে বাটে।
একটিও নয় তুমার মতন আমার গুরু বা বটে ॥
চুরির আসামী দোঁহে দোঁহাকার চুরির বমাল চোর।
পুলিশ প্রহরী সালিশ নালিশ তুমি মোর আমি তোর ॥
মুক্রিয়ার মম তুমি তোর আমি সফিনা দোঁহার দোঁহে।
দোঁহে দোঁহাকার ফৌজ সদিয়াল কাজী কি কোটাল তাহে ॥[১৯]

শশী সন্তাপ, সূর্য হিমানী, সংসার-ভুজঙ্গ স্বর্গের সুধা, মরু মানস-সরোবরের নীর যোগাইবে। কবি কৃষ্ণপ্রসাদ বলিতেছেন, তোমার 'পাগলী মা' তোমাকে সংসার পার করাইবেন। 'শূন্যভারতী' চণ্ডীদাসের বিবেক।

(১৯) কৃষ্ণ-সেন চণ্ডীদাসের উক্তি ফুলাইয়া বাড়াইয়া সার-শূন্য করিয়াছেন, চণ্ডীদাসের মুখ দিয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভব ব্যক্ত করিয়াছেন, যে আকাঙ্ক্ষা চণ্ডীদাসের মনে জাগে নাই, অসাবধানে তাহা আনিয়াছেন। বোধ হয় উদয়-সেন এত কথা লিখেন নাই। কৃষ্ণ-সেন রাজা বলাই-নারাণের প্রিয় সদস্য হইয়া রাজ্যে সর্বেসর্বা হইয়াছিলেন। এই কারণে যুবরাজ দ্বিতীয় লছমীনারাণের বিষ-দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার রাজাও সুখে রাজ্যভোগ করিতে পান নাই। 'কালর হস্তে খর করবাল লালের সিংহাসন।' এটি দ্ব্যর্থ। প্রথম লছমীনারাণের তিন পুত্র, স্বরূপ-নারাণ, বলাইনারাণ, কানাইনারাণ। স্বরূপ নিঃসন্তান অবস্থায় গত হইলে রাজসিংহাসন বলাইনারাণের প্রাপ্য হইয়াছিল। কিন্তু কানাই-নারাণ বলপূর্বক রাজা হইয়াছিলেন। পুরুলিয়ার আদালতে, এবং বোধ হয় কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টে মকদ্দমা করিয়া বলাইনারাণ হৃত রাজ্য উদ্ধার করেন, ঋণগ্রস্তও হইয়া পড়েন। কিঞ্চিদধিক শত বর্ষ পূর্বের কথা। তৎকালে সামন্তভুম মানভুম জেলার অন্তর্গত ছিল। কৃষ্ণ-সেন বলাই-নারাণের পক্ষে থাকিয়া পুরুলিয়া ও কলিকাতা ছুটাছুটি করিয়াছিলেন। তাঁহার পুথীতে পুলিস, সফিনা (আদালতে সমন), ও (পরে) কৌনহুলি, এই তিন ইংরেজী শব্দ আছে। সামন্তভুম তের 'ঘাটে' বিভক্ত ছিল। 'ঘাট', পুলিস আউটপোষ্ট। ঘাটোয়ালদের উপরে সদিয়াল ছিল। উভয়েই ভুমিবৃত্তি ভোগ করিত। সদিয়ালের অপর নাম দিগার (দিক্‌পাল)। সং সদস্ গৃহ, 'স্থান'। ঘাটি+আল= ঘাটিআল; সদি+আল=সদিআল, কৌটিল্যের 'স্থানিক', বর্তমানের থানাদার।

চুরি অপরাধে আমার বিচারে এই দণ্ড হইল তোর।
রুদ্ধ রও তুমি যাবত জীবন হৃদি কারাগারে মোর॥
আমা সহ তুমা কহিত যে হেরি ফেল দোঁহা মাথা কাটি।
আজ তুমা সহ মোরে করি দরশন জুড়াবে নয়ন দুটি॥
তোর গুণে আমি অমর হইব মোর গুণে হইবে তুমি।
১১০/] রাধাকৃষ্ণ নাম রইবে যতদিন রবে চণ্ডীদাস রামী॥
নির্গুণ পিতা সগুণ জননী তিনিই প্রথম গণ্য।
আদৌ অবোধ সন্তান কভু জানে না জননী ভিন্ন॥
কত যত্ন করি চিনাইলে মাতা তবে যায় তারে চেনা।
মাতৃহীন পুত্রের কত যে দুর্গতি কার বা না আছে জানা॥
উদ্গাতার মুখে শুনি সাম গান মনুর শাসন মানি।
আচারে বিচারে জীবনে মরণে সার মাত্র রজকিনী॥
আত্মতুষ্টি আমার রাধাকৃষ্ণ নামে শুন সখা তোরে বলি॥
অর্থ পরমার্থ তত্ত্ব-নিরূপণ কামনা ব্রজের ধুলি॥

যোগী যতি মুনি সবারি লক্ষ্য চাহি না সে মোক্ষধাম।
আমি আবার যাইব আবার আসিব গাইব হরির নাম॥
পরের দুঃখ শুনিলে পরে কেহ বা আহার ছাড়ে।
মরুক বাঁচুক খায় বা কেহ পরের আহার কাড়ে॥
এই মানুষের মানুষ কত মরেও অমর তারা।
এমন মানুষ দেখছি কত বাঁচে থেকেও মরা॥
এই মানুষের মানুষে কেহ যাচ্ছে পদে ঠেলি।
কতেক লোকের সবাই মিলে খাচ্ছে পদধূলি॥
কেহ বহায় রক্তগঙ্গা পরের রাজ্যে চড়ে।
কেহ পালায় নেংটি খিঁচে আপন রাজ্য ছেড়ে॥
স্বর্গ মানুষ নরক মানুষ মানুষ সকল ঘটে।
নিত্য স্বভূ পরম প্রভু মানুষ সত্য বটে॥
এমন মানুষ আপন করা আমার সাধ্য নয়।
তুমি যদি কর কৃপা তা হলে তা হয়।

* | * | * (ক্রমশঃ)

তুলনায়

শ্রীপারুল দেবী

বর্মার রেল-কোম্পানী মাসকতকের জন্য কুড়ি টাকা মাইনেতে কয়েক জন লোক নিচ্ছিল; ভাগ্যক্রমে ভবতোষ সেই অস্থায়ী চাকরি একটি পেয়ে গেল। এ রকম চাকরি ভবতোষ অনেক বারই করেছে, অনেক বারই ছেড়েছে। কিন্তু এবার অনেক দিন রোজগার নেই, তার পরে মাস-ছয়েক হ'ল বিয়েও করেছে—কাজেই সংসার চালান দুষ্কর।

বাল্যকাল তার বাংলা দেশেই কেটেছে। মা যত দিন বেঁচে ছিলেন, ভবতোষ কখন বাংলা দেশের বাইরে পা দেয় নি। মায়ের মৃত্যুর পর বন্ধনহীন ভবতোষ জাহাজের কুলির কাজ নিয়ে রেঙ্গুনে ভাগ্যপরীক্ষা করতে এসেছিল। সেখানে অনেক কষ্টে তার বছরের পর বছর কেটেছে। তার পর বর্মার চারি পাশে ইদানীং নূতন নূতন রেলওয়ে লাইন খোলায় সেই সংক্রান্ত ছোটখাট কাজ প্রায়ই তার ভাগ্যে জুটে যাচ্ছিল—এই করেই তার দিন কেটে চলেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে রেল-কোম্পানী অস্থায়ী লোক নেওয়া বন্ধ ক'রে দেয়, তখন ভবতোষের দিন কাটান দুরূহ হয়ে ওঠে; প্রতি মাসেই ধার করতে হয়। ইদানীং কয়েক মাস সেই ভাবেই চলছিল। ভবতোষ ভাবে এই একটা কিছু কাজকর্ম জোগাড় করতে পারলেই টাকা কয়টা শোধ ক'রে দেবে,—কিন্তু সেটা কিছুতেই হয়ে উঠছিল না। এমন সময়ে এই চাকরিটা বরাতে জুটে গেল। মাইনে ঐ কুড়ি—ভবতোষ ঠিক করেছে মাসে দশ টাকা ক'রে দিতে পারলে ক-মাসের মধ্যেই ওর ধারটা শোধ হয়ে যাবে। যদি কিছু বাকী থাকে ত সে তখন···।

পরের কথা ভবতোষ অত ভাবে না। সে জানে ওসব কোন-না-কোন উপায়ে ঠিক হয়ে যাবেই। অগতির গতি

ভগবান্ না হ'লে আছেন কি করতে? আপাততঃ সে রেল-কোম্পানীর যে বাড়ীখানি এই ক'টা মাস থাকবার জন্য পেয়েছে, সে-রকম বাড়ীতে নিজে বাস করবার কল্পনা ভবতোষ স্বপ্নেও কখনও করে নি; তাই মাইনে যতই সামান্য হোক এবং চাকরি যতই অল্পদিনের জন্য হোক, ভবতোষের বিশ্বাস সে খুবই সুখে আছে।

ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের অনাথা বিধবার পুত্র সে। ছেলেবেলায় সকালবেলা স্কুলে যাবার আগে মাসের অর্দ্ধেক দিন শুধু দুটি মুড়ি খেয়ে সে স্কুলে যেত—ভাত জুটত না। দীর্ঘপথ পদব্রজে অতিক্রম ক'রে শিশুপুত্র সারাদিনের জন্য বিদ্যালয়ে যাবে, তার আগে তাকে দুটি ভাত দিতে পারার অক্ষমতার দুঃখ দুঃখিনী মায়ের বুকে শেলের মত বিঁধত। কিন্তু তিনি মুখে হাসি এনে মুড়ি কয়টি জলে ভিজিয়ে ভিক্ষালব্ধ আখের গুড়টুকু তার সঙ্গে মেখে ছেলেকে কোলে টেনে নিয়ে বলতেন, "দেখ্ দিকিনি কেমন খাসা নরম ক'রে মিষ্টি ক'রে ফলার মেখেছি আজ। আয় আমি খাইয়ে দিই—তুই বাছা নিজে খেতে বসলে বড় কাপড়ে-চোপড়ে মাখিস। আয় বোস্ এখানে।" ছেলে আবদার ক'রে বলত, "না ও নরম মিষ্টি ফলার আমার ভাল লাগে না রোজ রোজ। কে তোমাকে মাখতে বললে জল দিয়ে? আমি ঘি দিয়ে গোলমরিচ দিয়ে শুকনো মুড়ি খাব। কাল নন্দ খাচ্ছিল ইস্কুলে—আমি দেখি নি বুঝি? সে-ই ভাল খেতে, এ বিচ্ছিরি।"

কিন্তু বলতে বলতে ভবতোষ মায়ের প্রসারিত বাহুর সস্নেহ আহ্বানে ধীরে ধীরে এসে মায়ের কোলে বসত, তার পর তার মুখে নরুণে রাক্ষুসীর নরুণ দিয়ে তুলে তুলে ভাত খাবার গল্প শুনতে শুনতে কখন যে সেই মুড়ি কয়টি শেষ ক'রে ফেলত তা জানতেও পারত না। থালা খালি হ'লে মা হেসে উঠতেন, "কি রে বিচ্ছিরি না ফলার? কোথা গেল তাহ'লে থালা থেকে। ওমা, শেয়ালে বুঝি খেয়ে গেল গো সব—আমাদের খোকন ত খায় নি। বিচ্ছিরি ফলার ত ও খায় না।"

তার পর ভবতোষের রাগের পালা। সে কোন দিন চেঁচাত, কোন দিন হাত পা ছুঁড়ত আর ক্রমাগত বলত, "তুমি ভারী দুষ্টু মা—রোজ আমাকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে ঐ জল-দেওয়া মুড়ি খাওয়াবে। খাব না ত—কাল থেকে আমি আর কখ্খনো খাব না। ছাই গল্প তোমার; ঐ পুরনো নরুণে রাক্ষসীর গল্প রোজ রোজ কেন বল আমাকে তুমি? কাল থেকে আমি মুড়িও খাব না, ও ছাই গল্পও শুনব না—কখ্খনো শুনব না, শুনব না—দেখো তুমি। রোজ ভুলিয়ে দেবে আমাকে—দুষ্টু মা তুমি, বিচ্ছিরি মা। কত দিন থেকে বলছি মাছের ঝোল ভাত না-রেঁধে দিলে কিছুতে খাব না আমি—কথা শোনা হয় না। খাব না ত—মাছের ঝোল ভাত না-রেঁধে দিলে কাল থেকে কিচ্ছু খাব না।"

কিন্তু সে-সব অনেক দিনের কথা। সে মা-ও আর নেই, সে ফলারও আর খেতে হয় না। এখন মাছের ঝোল ভাত ভবতোষ রোজই খেতে পায়—অন্তত মাস-দেড়েক থেকে ত পাচ্ছেই—কিন্তু সে খাওয়া আর ভবতোষের এখন পছন্দ হয় না। স্ত্রীকে বলে, "রোজ রোজ মাছের ঝোল রাঁধ কেন বল ত? বিচ্ছিরি লাগে আমার ঝোল খেতে। পেঁয়াজ দিয়ে লঙ্কা দিয়ে মাছের কালিয়া রাঁধতে পার না? একটুখানি ঘি দিও কিন্তু কালিয়ায়—না হ'লে ভাল হবে না।"

ভবতোষের স্ত্রী-ভাগ্য ভাল। মেয়েটির মুখখানি সুন্দর; বড় বড় কালো চোখ দুটি যখন তুলে সে তাকায়, মনে হয় ওর চোখ দুটি যেন আয়না। ওর মায়ামমতাভরা শান্ত, একান্ত পরিতৃপ্ত মনের ছায়া ওর চোখে এতই পরিষ্কার ভাবে পড়েছে যে মনটি না দেখে শুধু চোখ দুটি যেন ওর দেখবারই জো নেই। একপিঠ চুল অযত্নবিন্যস্ত—ক্রমাগত চোখে-মুখে এসে পড়ে। রং ফর্সা নয়, স্নিগ্ধ। অতি দরিদ্র পিতার অনাদৃতা সপ্তমা কন্যা সে; নাম আন্নাকালী। ছোটবেলায় আন্নাকালী কখনও একখানা আস্ত কাপড় পরেছে ব'লে তার মনে পড়ে না। বড়দির কাপড়ের আধখানা টুকরায় মেজদির বস্ত্রের ছিন্নাংশ জুড়ে সেলাই ক'রে মা তাকে কত সময়ে পরতে দিতেন এবং সে-কাপড় পরতে আন্না আপত্তি প্রকাশ করলে মুখনাড়া দিয়ে বলতেন, "নে, নে, আবদার করিস নে—লজ্জাও করে না আবদার করতে! এসেছেন ত ছ-জনের পরে—ছ-জনের জুটিয়ে তবে ত তোর জোটাব। আগে আসতিস ত আগে পেতিস।" ছ-জনের পরে আসাটা যে অত্যন্ত অপরাধ হয়ে গেছে তাতে আন্নাকালীর মনে সন্দেহমাত্র ছিল না, কিন্তু সে অপরাধটা কখন যে তার

অজ্ঞাতে হয়ে গেছে সেইটে ভেবে সে আকুল হয়ে উঠত এবং বার-বার ভাবত যে জন্মাবার সুযোগটা যদি এখন একবার হাতের কাছে পায় ত সে সকলকে ডিঙিয়ে তার উনিশ বছরের বড়দিদিরও উপরে এবার জন্মে নেয়।

তার পর বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারলে যে শুধু বাপ-মায়ের স্নেহ, ভাল কাপড়টি, ভাল খাবারটুকুই যে তার দিদিরা নিঃশেষে নিয়ে গেছে তাই নয়, বাপের টাকাও যা-কিছু ছিল তা-ও আর আন্নাকালীর জন্য তারা অবশিষ্ট কিছুই রেখে যায় নি। অতএব ভাল ঘরে ভাল বরে বিয়ে হওয়াও যে তার দুরাশা, মা থেকে থেকে সে-কথাটা তাকে জানিয়ে দিতেন। ভাল ঘরে, ভাল বরে আন্না'কালীর বিশেষ লোভ ছিল না, লোভ ছিল শুধু ভাল কাপড়খানিতে; তাই মা'র কথা শুনে তার ভয় হ'ত যে হয়ত তার বিয়ের সময়েও দিদিদের মত রাঙা শাড়ী, নতুন আনকোরা শাড়ী একখানিও জুটবে না—এবং হয়ত বা বিয়ের পরেও তার শাশুড়ী ও ননদের কাপড়ের ছিন্নাংশ জুড়েই তাকে পরতে হবে।

এমন সময়ে হঠাৎ আন্নাকালীর সুন্দর মুখখানি দেখে তাকে নিজে পছন্দ ক'রে বিয়ে ক'রে নিয়ে গেল।

স্বামী যে তার পিতাকে কন্যাদায় হ'তে বিনাপণে উদ্ধার করেছে এতে যে আন্নাকালী কত কৃতজ্ঞ তা সে কেমন ক'রে স্বামীকে জানাবে ভেবে পায় না। স্বামীর ঘরটি, স্বামীর শয্যাটি, জুতাটি, কাপড়খানি—সবই তার অসীম যত্নের। ভবতোষের নূতন চাকরি হওয়াতে তারা যে বাড়ীতে সম্প্রতি উঠে এসেছে সে বাড়ীতে দুটি ছোট ছোট ঘর এবং ভিতর দিকে একটি ছোট উঠান আছে, সেখানে একটি গন্ধরাজ ফুলের গাছ কে কবে সখ ক'রে পুঁতেছিল, সেটি এখন ফুলে ফুলে ভরে গেছে। ভবতোষের ঘর থেকে একটি কুটা বা এক টুকরা ছেঁড়া কাগজ বার করবার জো নেই, আন্নাকালীর যত্নে এখন ঝকঝক্ তকতক্ করছে ঘর দুখানি। পিতৃগৃহে আন্নাকালী এর চেয়ে অনেক দুঃখেই দিন কাটাত—স্বামীর গৃহে সে একলা গৃহিণী, তার নিজেরই সব—হোক না কেন সে মাত্র দুটি মাটির ঘর ও একটি গন্ধরাজ ফুলের গাছ—কিন্তু এখন অন্তত কিছুদিনের জন্যও তার সম্রাজ্ঞী ত সেই। বার-বার এইটে অনুভব ক'রে তার ক্ষুদ্র বুকটি গর্ব্বে ও আনন্দে ভরে যায় ও নিজের সেই ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যটুকুর নানারূপ অভিনব উন্নতির চেষ্টায় তার চিন্তা ও পরিশ্রমের অবধি থাকে না।

সেদিন দুপুরবেলা ভবতোষ ভাত খেতে ব'সে বললে, "কই, তোমার ভাত কই? কাল না বলেছি এবার থেকে একসঙ্গে না খেলে আমি খাব না?"

স্বামীর আহার শেষ হ'লে আন্না বরাবর সেই থালায় নিজের ভাগের অন্নব্যঞ্জন ঢেলে নিয়ে খেতে বসে। স্বামীর সহিত একসঙ্গে ব'সে ভাত খাওয়া সে চোখে দেখা দূরে থাকুক কখনও কানেও শোনে নি। সে সেই অশ্রুতপূর্ব্ব নির্লজ্জ ব্যাপারের প্রসঙ্গমাত্রেই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে বললে, "যাও—কি যে বল! রোজ রোজ এক কথা।"

ভবতোষ নিজের থালাখানা হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললে, "ও, কাল তবে বুঝি তুমি আমাকে ছেলে ভোলালে! বেশ ত রইল এই তোমার ভাত-তরকারী—খাব না ত আমি।"

ভবতোষ সত্যসত্যই ভাত ছেড়ে উঠে পড়ে দেখে আন্না-কালীর মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সে দু-হাত দিয়ে স্বামীর কাপড় চেপে ধরে বললে, "আমার মাথা খাও যদি ওঠ। বাড়া ভাত ফেলে উঠ্‌তে নেই—ব'সো ব'সো।"

টেনে স্বামীকে আসনে আবার বসিয়ে লজ্জায় রাঙা মুখে হেসে বললে, "আচ্ছা একি আবদার বল ত? এমন বেহায়া কাণ্ড বাপু আমি ত জন্মে কখনও শুনি নি। কেন, তুমি খেয়ে ওঠ না—ঐ পাতেই এখনই ত বসব আমি। আগে থেকে দুম ক'রে আমি খেতে ব'সে যাব তার পর তোমার যদি আর কিছু দরকার হয়?"

ভবতোস আবার উঠে পড়বার উপক্রম ক'রে বললে, "আজ আর ওসব শুনব না আমি- সত্যি, না খেয়ে উঠে যাব তাহ'লে। আচ্ছা, কেনই বা খাবে না শুনি? সেই দু-মিনিট পরে ত খাবেই—না-হয় দু-মিনিট আগেই খেলে। তুমি যা বেশী বেশী ক'রে ভাত-তরকারী দাও আমার থালায়—এটা শেষ ক'রে আবার আমার চাইবার দরকার হবে কেন, আমি কি একটা রাক্ষস? ওসব দরকার-টরকার তোমার একটা বাজে ওজর খালি, ওসব আমি শুনছি না। ওঠ, ওঠ—কই, উঠ্‌লে? যাও তোমার থালা আন, আনলে

তবে আমি ভাত মুখে তুলব। ওঠ না আন্না—খিদেতে পেট জ্বলে গেল যে, কতক্ষণ আর বসিয়ে রাখবে?”

আন্নাকালী নিরুপায় হয়ে মুখখানি ম্লান ক'রে ক্ষুণ্ণমনে রান্নাঘরে চলে গেল। একটু পরে একটি ছোট্ট কাঁসীতে ভাত ও অন্য একটি কাঁসীতে কি তরকারী এনে স্বামীর সামনে নামালে। ভবতোষ বললে, “ও কি রকম ভাতবাড়া? তোমার থালা কই?”

আন্না বললে, “থালা কি হবে? আমি এই কাঁসীতেই খাব।”

ভবতোষ গোলমাল ক'রে উঠল—“বা রে কাঁসীতে খাবে কেন? আর একটা থালা ক'রে আমায় যেমন দিয়েছ এমনি ক'রে ভাত বেড়ে নাও না। এ কি রকম ব্যবস্থা তোমার। কেন, আর একটা থালা নেই বুঝি?”

আন্নাকালী ছোট একটি ঘটিতে জল গড়িয়ে নিচ্ছিল। মুখ না তুলেই উত্তর দিলে, “বাড়ীতে মানুষ ত এই দুটি, একখানার বেশী থালা নিয়ে কি হবে? আমি ত তোমার পাতেই বরাবর খাই—দু-জনের জন্যে আবার আলাদা আলাদা দু-খানা থালা চাই নাকি? কবে বলবে একখানি ঘরে দু-জনে থাকব কি ক'রে—ঘরও দু-জনের দুখানা না হ'লে আর চলে না।”

জলের ঘটিটি রেখে একটু নুন সেই মেঝের উপরেই ঢেলে নিয়ে আন্নাকালী জীবনে এই প্রথমবার স্বামীর সঙ্গে খেতে বসল। লজ্জায় ভাল ক'রে খেতে পারলে না, কিন্তু স্বামীর জেদে খেতেই হ'ল।

বিকালে ভবতোষ কাগজে মোড়া কি একটা জিনিষ পিছনে লুকিয়ে নিয়ে হাসিমুখে বাড়ী ঢুকল। “আন্না, ও আন্না, কোথায় তুমি? শোন না এদিকে এস। আঃ কাপড় কাচতে ঢুকেছ বুঝি? বেরোও না শীগ্‌গির—কথা আছে, বড্ড দরকারী কথা। বাঃ, বলব কেন? এখানে না এলে বলব না। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এত বকতে পারব না দূর থেকে।”

আন্না কোনমতে তাড়াতাড়ি কাপড়-কাচা শেষ ক'রে স্বামীর ডাকাডাকিতে উৎসুক হয়ে ভিজা কাপড়েই বেরিয়ে এল। ডাগর চোখ দুটি তুলে বললে, “কি বলছ! এত ডাকাডাকি যে গা মুছতেও দিলে না।...ওঃ, বুঝেছি কি জিনিষ এনেছ, না? পেছনে হাত কেন লুকিয়েছ? হ্যাঁ, কিছু আন নি বইকি—নিশ্চয়ই কিছু এনেছ। আমায় অমনি বোকা পেয়েছ কিনা! কি এনেছ দেখাও শীগ্‌গির। আবার বুঝি গরম বেগুনী ভাজছিল ঐ দোকানটায় সেদিনের মত?”

ভবতোষ কাগজের মোড়ক খুলে বার করলে, বেগুনী নয়—বেগুনী রঙের একখানি শাড়ী, পাড়ের উপর কালো ও লাল রঙের সুতায় ফুল তোলা। আন্নার চোখ মুখ প্রথমে বিস্ময়ে তার পর আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শাড়ী, নূতন শাড়ী, কালোয় লালে ঝক্‌ঝক্ করছে পাড়। আন্না হাত বাড়িয়ে স্বামীর হাত থেকে শাড়ীটা নিলে। ভবতোষ অত্যন্ত তৃপ্ত হাসিমুখে স্ত্রীর দিকে দেখছিল। আন্না পাড়টায় হাত দিয়ে দিয়ে দেখতে লাগল কেমন উঁচু উঁচু ফুল তোলা—ঠিক যেন সত্যিকারের ফুল কেটে বসিয়ে দিয়েছে। তার পর স্বামীর দিকে তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে লজ্জিত আনন্দিত কুণ্ঠিত মুখে স্বামীর পায়ের গোড়ায় প্রণাম করলে।

ছোটবেলায় দুর্গাপূজার সময়েও আন্নাকালী কখনও একখানা নূতন আনকোরা শাড়ী পরেছে ব'লে মনে পড়ে না। আগের বৎসরের কেনা দিদিদের কোন একখানা শাড়ী তার ভাগ্যে পড়ত—কিন্তু তার আনন্দ আন্না এখনও ভোলে নি। কাপড় কাচতে তর সইত না—আন্না ছুটে গিয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছে নতুন শাড়ীটা প'রে ছোট্ট আরসীখানা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকত তাকে কেমন মানিয়েছে। মা দেখতে পেয়েই বলতেন, “নে নে, আইবুড় মেয়ের অত ভাবন ভাল নয়। গেলেন একেবারে আস্ত একখানা শাড়ী পেয়ে—মুখ দেখার ঘটা দেখ না। রাখ্ আরসী। নতুন কাপড় প'রে যে আগে গুরুজনকে পেন্নাম করতে হয়, বুড়ো ঢেঁকী মেয়ে তাও জানে না গো।”

আরসী রেখে আন্নাকালী তাড়াতাড়ি প্রথমে মাকে, তার পর বাবাকে, তার পর একে একে সব দিদিদের প্রণাম করত।

পূজা নয়, পার্ব্বণ নয়, কোন একটা উপলক্ষ্য নয়, স্বামী তাকে এমন শাড়ী এনে দিলে যা পরবার কথা আন্না কখনও ভাবতেও পারে নি। তাদের গাঁয়ে দুর্গাপূজার সময়ে পূজা-বাড়ীতে যে চাটুজ্জেদের বউরা আসত তাদের ছাড়া এই রকম শাড়ী পরতে আন্না কখনও কাউকে দেখে নি। ও জানে

এসব শাড়ী ওদের মত ঘরে মানায় না। আন্নার শাড়ীর স্বপ্ন আথ-পাতা ডুরের উর্দ্ধে কখনও ওঠে নি।

ভবতোষ স্ত্রীর প্রণাম আশা করে নি। থতমত খেয়ে আন্নার হাত ধ'রে তাকে তুলে নিলে। অপ্রস্তুত হয়ে হেসে বললে, "ওকি, ওকি, পেন্নাম কিসের।...ভারি ত শাড়ী! ঐ তেওয়ারীর বাড়ী গিয়েছিলাম কিনা, গিয়ে দেখি এক ফেরি-ওয়ালা শাড়ীর বোঁচকা খুলে বসেছে। রকম-বেরকমের কত শাড়ীই যে এনেছে—কিন্তু যা দাম হাঁকছে, আমাদের মত লোকের কেনবার জো কি? এইখানা সেই কাপড়ওয়ালা আমাকে দেখিয়ে বললে, 'বাবু কি বলব, এর দাম দশ টাকার কম নয়। তবে আপনাকে আদ্দেক দামেই দেব—এই দেখুন একটা জায়গায় একটু ইঁদুরে কেটে দিয়েছে বাবু, নষ্ট ক'রে দিয়েছে কাপড়খানা।' এই দেখ না, পাড়ের কাছটা একটু কাটা। কিন্তু ওটুকু কে বা দেখতে পাবে? আমি দাঁও বুঝে দর-কষাকষি ক'রে শেষে ৩৷৷৹ টাকায় কিনলাম। ভাল হয় নি? ঐ কাটাটুকু না থাকলে এ কাপড় আমাদের মত লোকের কেনবার সাধ্যি কি? তেওয়ারীকে বললাম, দাদা দিয়ে দাও দামটা—ও মাসের মাইনে পেলেই ফেলে দেব তোমাকে টাকাটা। তেওয়ারী মানুষ ভাল—তখুনি দিয়ে দিলে। তার পর এই আসছি।"

আন্না দামটামের কথা অত বোঝে না। কাটা পাড়টুকুর কাছে পরম স্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে বললে, "এ একটু-খানি কাটা—আমি সেলাই ক'রে নেব—বোঝাও যাবে না। বাঃ বেশ শাড়ীখানি, চমৎকার দেখতে। বিয়ের সময়ে মা বলেছিল ফুলশয্যেতে আমাকে একখানা এমনি ভাল শাড়ী দেবে—তা শেষটা আর হয়ে উঠল না। বেশ শাড়ীটা।"

সন্ধ্যাবেলা ষ্টেশন-মাষ্টারের স্ত্রী কুসুমলতার বাড়ী নূতন শাড়ীখানি প'রে আন্না বেড়াতে গেল। বললে, "কিছুতে ছাড়লে না দিদি—বললে পরো পরো, সখ ক'রে আমি কিনে আনলাম, পরবে না ত কি বাক্সে বন্ধ ক'রে রাখবে নাকি? কত বললাম যে এই ত আর একটা মাস বাদেই পুজো, একেবারে সেই গিয়ে ষষ্ঠীর দিনেই ত শাড়ীখানা পরব। তা কি রাগ, সে কথা শুনে। বললে, কেন পূজোর সময়ে না-হয় আর একখানা কেনাই হবে—এইটে না রাখলেই কি নয়? কি করি দিদি—নেমন্তন্ন-আমন্তন্ন না, নতুন দামী শাড়ীখানা শুধু শুধু আজই ভেঙে পরতে হ'ল। কেমন হয়েছে দিদি কাপড়খানা? এই দেখ না—একটুখানি কাটা শুধু—ও কি দেখা যাবে? আমি তোমায় দেখিয়ে দিলুম তাই—না হ'লে কি ধরতে পারতে? হ্যাঁ, তা আর ধরতে হয় না।"

তার পর হাতের মুঠোর ভিতর থেকে একটি সিকি বার করে কুসুমের হাতে দিয়ে আন্না আবার বললে, "দিদি, বাটি এনেছি—তুমি ত এই পরশু দিন দেড় সের ঘি কিনলে দেখলুম, আমায় তাই থেকে আজ ঐ চার আনার যুগ্যি ঘি দেবে? বাজার থেকে কা'কে দিয়ে আনাব ভাই? বললে ত ওকেই বলতে হবে—ধরা পড়ে যাব। লুকিয়ে তাই তোমার কাছে এসেছি—দেবে দিদি?"

কুসুমলতা হেসে বললে, "এত লুকোচুরি কেন রে? কি করবি ঘি নিয়ে?"

আন্না লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। হেসে একবার সখীর দিকে চোখ তুললে, আবার চোখ দুটি নামিয়ে বললে, "দাও না দিদি, একটা মজা হবে।"

কুসুমলতা নাছোড়বান্দা। মজাটা কিসের না বললে সে কিছুতেই ঘি দেবে না। আন্না নিরুপায় হয়ে বললে, "লুচি ভাজব দিদি রাত্তিরে। আমায় যেমন না-জানিয়ে শাড়ী দিলে ও—আমিও ওকে লুকিয়ে আজ লুচি ভেজে খাওয়াব। ডিম কিনেছি দুটো—কালিয়া রেঁধে এসেছি। কিন্তু লুচি ভাজবার ঘি ত নেই, তাই ভাবলুম যাই দিদির কাছে চেয়ে আনি। লুচি কি রকম যে ও ভালবাসে তুমি ত জানই দিদি। সেই যে খাওয়ানোর দিন—কি হয়েছিল মনে নেই? ক'খানা লুচি ও খেয়েছিল সেদিন?" আন্না হাসতে লাগল।

ঘি নিয়ে আন্না নিজের ঘরে এসে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে একখানা মালগাড়ী এসে থেমেছে সামনে। এটা ছোট্ট ষ্টেশন, ডাকগাড়ী এখানে থামে না। আন্নাকালী মাঝে মাঝে স্বামীকে বলে, "হ্যাগো কুসুমলতাদিদি বলে যে ওরা আগে যেখানে থাকত সেখানে নাকি ডাকগাড়ী থামত। সে গাড়ীতে কত লোক কত আলো—আবার নাকি এক রকমের হোটেলখানার মত গাড়ী থাকে, সে গাড়ীতে গিয়ে সাহেবমেমেরা খানা খেয়ে আসে। খানসামারা সব মেমেদের খানা খাওয়াত, কুসুমলতাদিদিরা নিজেদের বাড়ীর ভিতর ব'সে দেখতে পেত সব। সে নাকি চমৎকার দেখতে—

আমাকে বলছিল তাই। বলছিল এটা কি ছোট্ট একটা ছাই ইষ্টিশান—তুই প্যাসেঞ্জার ট্রেন এলেই হুড়মুড়িয়ে দেখতে ছুটিস, এ ত ভারি ট্রেন—ডাকগাড়ী আসত ত দেখতিস। তা একটা সে-রকম জায়গায় কি তোমার কাজ হয় না? একবার সাহেবকে ব'লে দেখ না।"

ভবতোষ সাহেবকে বলত কি না জানা নেই কিন্তু ডাকগাড়ী দেখা আন্নাকালীর ভাগ্যে এখনও হয়ে ওঠে নি। প্যাসেঞ্জার ট্রেন এলেই আন্নাকালী জানলার ধারে ব'সে ব'সে দেখে। ট্রেনে কত লোক, কত মেম, সাহেব, হিন্দুস্থানী, বাঙালী, কত দূরপথের যাত্রী সব; তারা ক্ষণকালের জন্য আন্নার ঘরটির সামনে এসে দাঁড়ায়—ক্ষণকালের জন্য লোকজন, গোলমালে, আলোয় ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে ঘুমন্ত স্থানটি যেন চকিত মুখরিত হয়ে ওঠে—আন্না চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে। যতক্ষণ না ট্রেনটি প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যায়, আবার আন্নার ঘরের সম্মুখের স্থানটি আগের মত অন্ধকার নিঝুম না হয়ে যায়, আন্না জানলা ছেড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু এই মালগাড়ীগুলোর উপরে আন্নার একটুও আকর্ষণ নেই। সে একবার মাত্র সেই ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে ঘিয়ের পাত্রটি উনুনের কাছে নামালে। উনুনে আগুন দিয়ে তবে আন্না কুসুমলতার কাছে ঘি আনতে গিয়েছিল—এতক্ষণে উনুন ধরে উঠেছে, গনগনে আগুনে ঘরটি গরম হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যাবেলা কোনদিন আন্না রান্নাঘরে রাঁধতে যায় না, তোলা-উনুনে আগুন দিয়ে ঘরের মধ্যে এনে জানলার ধারে ব'সে ব'সে রাঁধে আর ট্রেনের যাওয়া-আসা দেখে।

ঘিয়ের বাটিটি নামিয়ে রেখে আন্না প্রথমে নিজের নবলব্ধ অতি যত্নের শাড়ীখানি খুলে আলনায় রাখলে—পাছে রান্না করতে গিয়ে কাপড়খানি নষ্ট হয়ে যায়। আলনায় ঝুলিয়ে তার সেই পাড়ের কাটা জায়গাটুকু হাতে তুলে নিয়ে নিরীক্ষণ ক'রে দেখতে লাগল। একটু বেশীই কেটেছে কাপড়খানা—পোড়া ইঁদুর আর কাটবার কিছু জিনিষ পায় নি। এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে আন্না দেখতে লাগল কেমন ক'রে সেলাই ক'রে ওটুকু জুড়ে শাড়ীটি নিখুঁৎ করা যায়। কিন্তু সেলাই সম্বন্ধে আন্নার জ্ঞান গভীর ছিল না—দেখে দেখে বুঝতে না পেরে শেষে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কাপড়খানি সস্নেহে পাট ক'রে রেখে সকালবেলার পরিহিত ময়লা শাড়ীখানি গায়ে জড়িয়ে নিলে। উনুনের কাছে এসে ঘিয়ের বাটিটি দেখে এতক্ষণে আন্নার মুখখানি আবার প্রসন্ন হয়ে উঠল। সে আজ স্বামীকে আশ্চর্য্য ক'রে দেবে—খুশী ক'রে দেবে।

স্মিতহাসিমুখে জানলার ধারে ফিরে গিয়ে আন্না ভাবলে এখনই ভাজলে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে লুচিগুলো—একটু পরে তবে রান্না সুরু করবে। গরম লুচি ভবতোষ বড় ভালবাসে। খানকয়েক বেশী ক'রেই করতে হবে—কাল সকালে হরিপদকে ডেকে আন্না কখানা লুচি খাওয়াবে। আহা, বেচারী ছেলেমানুষ—আট-দশটি ভাইবোনের সংসার; বাপের মাইনে ত ঐ কুড়িটি টাকা—ভাল জিনিষ খাবে কোথা থেকে? বড় গরিব ওরা—আন্নাদের মত ত নয় যে যখন ইচ্ছে কাপড় কিনে পরলে, যখন ইচ্ছে লুচি ভেজে খেলে। হরিপদ ছেলেমানুষ—বাপমায়ের সংসারের অভাব ত বোঝে না—ভাল খাবে, ভাল পরবে ব'লে কত সময়ে আবদার করে আর মায়ের কাছে মার খায়। আন্না কাল তাকে ডেকে এনে কাছে বসিয়ে লুচি খাওয়াবে।...শাড়ীর ছেঁড়াটুকুও কাল সকালে মেরামত করতে হবে যেমন ক'রে হোক্। বেশ শাড়ীখানা—বেগুনী রংটা কি সুন্দরই মানিয়েছে ঐ পাড়ে! কুসুমলতারও একখানা এরকম শাড়ী বোধ হয় নেই।

মালগাড়ীর শেষে একখানা নূতন ধরণের গাড়ী লাগান—ঝকঝক করছে, নূতন সাদা রং—তারই জানলা দিয়ে মুখ বার ক'রে একটি ভদ্রমহিলা আন্নাকে দেখছিলেন; এতক্ষণে আন্নার চোখ তাঁর দিকে পড়ল। তাঁর সুন্দর মুখখানি ট্রেনের জানলার ধারে যেন ফুলের মত ফুটে রয়েছে আন্নার মনে হ'ল। বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে খানিক ক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে আন্না দেখলে, তিনি গাড়ীর দরজা খুলে নেমে এসে তার জানলার সম্মুখে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "এইটি বুঝি আপনাদের বাড়ী?"

তার পরনে কালো রেশমের উপরে চকচক্ করছে চওড়া জরির পাড়-দেওয়া শাড়ী—সোনার মত ঝলমল ক'রে উঠছে ট্রেনের আলো পড়ে। মহিলাটির হাতের চুড়ি, গলার হার, কানের দুল, শাড়ীর পাড়ের উজ্জ্বলতা আন্নার চোখে যেন অকস্মাৎ দৃষ্টিবিভ্রম এনে দিলে। অন্ধকার, দরিদ্র,

এই অতি অকিঞ্চিৎকর ছোট জায়গাটুকুতে অকস্মাৎ একি ঐশ্বর্য্যের আবির্ভাব—আন্না বিহ্বলের মত তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। তাঁর পায়ে মেমেদের মত জুতা—চললে পরে খুট্-খুট্ ক'রে শব্দ হয়—চকচক্ করছে সোনায় মোড়া জুতা। তাঁর পা থেকে মাথা অবধি দেখে আন্নার মুখে উত্তর জোগাল না। মহিলাটি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "এই বাড়ীতে আপনি থাকেন বুঝি ?"

এতক্ষণ পরে আন্না ঘাড় নেড়ে জানালে যে হাঁ্যা, সে এই বাড়ীতেই থাকে। মহিলাটি বললেন, "অনেক দিন ক্রমাগত এই ট্রেনে ট্রেনে ঘুরছি—আর ভাল লাগে না। আপনাকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি আপনি বাঙালী-ঘরের বৌ—তাই ত নেমে এলাম কথা কইতে। এই বার্ম্মিজদের কিচিমিচি শুনতে শুনতে কানে তালা ধরে গেছে ; ভাবলুম আপনার সঙ্গে দুটো বাংলা কথা ব'লে আসি। আসুন না, এই ত সামনেই আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে—আমার বাড়ীঘর বলতে এখন ও-ই আর কি। আসুন ওখানে গিয়ে ব'সে কথা বলা যাক্। আপনিও ত একা ব'সে রয়েছেন—কি বলেন ?"

মহিলাটি মৃদু হাসলেন। মন্ত্রমুগ্ধের মত আন্না আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে মহিলাটির অনুসরণ ক'রে সেই গাড়ীর কামরায় গিয়ে উঠ্ল। ভিতরে এত তীব্র আলো যে চোখে যেন ধাঁধা লেগে যায়। একটি বেঞ্চিতে নানা রঙের বিচিত্র একখানি কম্বল পাতা ; একদিকে কয়েকটি রঙীন তাকিয়া রয়েছে এবং তার নীচেই একটা সুন্দর ছবি-আঁকা বই উপুড় করা। ট্রেনের দেওয়ালের গায়ে মুখ দেখবার জন্য আরসী লাগান—ছেলেবেলায় নূতন কাপড় প'রে যে আরসীতে আন্না ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মুখ বার-বার ক'রে দেখত এ সে-রকম আরসী নয়, এ মস্তবড় আরসী ; হয়ত এতে মাথা থেকে পা অবধি সবটা একসঙ্গেই দেখতে পাওয়া যায়, এত বড় আয়না এ—এবং তার নীচে ছোট বড় শিশি, বোতল, চিরুণী, বুরুস, ছোটখাট বাক্স কৌটো কত কি রাখা রয়েছে, কোন্‌টা রূপার, কোনটা কাঁচের, কোনটা মখমলের—কোন্‌টা কিসের তা আন্না জানে না। আন্না একবার মহিলাটির দিকে তাকিয়ে চোখ দুটি তখনই নামিয়ে নিলে। তার বড় লজ্জা করতে লাগল। তিনি কম্বলটা একটু সরিয়ে নিয়ে ব'ললেন, "বসুন আপনি ; দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?"

তার অর্দ্ধমলিন কাপড়ে সেই দামী কম্বলের উপর বসতে আন্না অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করছিল। এখন মহিলাটি কম্বল গুটিয়ে নিয়ে ট্রেনের গদিমোড়া বেঞ্চিতে তার জন্যে বসবার স্থান ক'রে দিলেন দেখে আন্না মনে মনে স্বস্তি বোধ করলে, কিন্তু তবু বসল না। মহিলাটি নিজে কম্বলের উপর বসলেন, বললেন, "লজ্জা কি ? বসুন আপনি।" আন্না ব'সে নীরবে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। মহিলাটি তার পাশেই বসেছেন—মেজেতে তাঁর জুতা-পরা পা দুটি—তার ওপর কালো শাড়ীর জরির পাড় এসে পড়ে সব যেন সোনায় সোনা ক'রে দিয়েছে। আন্নার মনে হ'ল, এমন চকচকে জুতা প'রে ধূলা-মাটির ওপর দিয়ে হাঁটতে কষ্ট হয় না ? নষ্ট হয়ে যাবে যে। নিজের পা দুটির ওপরেও চোখ পড়ল। ধূলিমলিন পা দুখানি—অনেক দিন আগে কবে একদিন আলতা পরেছিল তারই মলিন দাগ এখনও রয়ে গেছে। নিজের কাপড়ের আঁচল নামিয়ে দিয়ে আন্না পা-দুখানি ঢাকবার চেষ্টা করলে।

তাদের গাড়ীর সামনেই নীচে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সেই খোঁড়া ভিখারীটা চেঁচামেচি সুরু করেছিল। আন্না একে রোজ দেখে। যখনই প্যাসেঞ্জার-গাড়ী থামে তখনই এই ভিখারীটা আরও বেশী খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে লাঠির উপর ভর ক'রে গাড়ীর দরজায় দরজায় ঘুরতে থাকে, তার পর ট্রেন চলে গেলে আন্নার ঘরের জানলার নীচেয় ব'সে ভিক্ষালব্ধ পয়সা ও কখনও কখনও ফল, রুটি, মিষ্টি ইত্যাদি ভাগ ক'রে গুছিয়ে নিজের গামছায় বেঁধে বেঁধে রাখে—আন্না কতদিন দেখেছে। মহিলাটি একবার তাকিয়ে বালিশগুলো একটু ঠেলে তার নীচে থেকে একটা ছোট্ট সাদা কুকুরছানা বার করলেন—সাদা ঘন লোমে তার গাটি ভরা, কালো দুটি চোখ জলজল করছে। আন্না সব ভুলে অবাক্ হয়ে সেই দিকে চেয়ে রইল। মহিলাটি সেই কুকুরের ঘাড়ের কাছে কি একটা ধরে টানলেন, অমনি কুকুরটি দু-ফাঁক হয়ে গেল। তখন আন্না বুঝলে এটা আস্ত কুকুর নয়—খেলনার কুকুর। কিন্তু কি চমৎকার খেলনাই তৈরি করেছে—ঠিক যেন মনে হয় সত্যিকারের কুকুর। সাহেব-বাড়ীর

তৈরি হবে বোধ হয়। মহিলাটি সেই খেলনা-কুকুরের পেট থেকে একটি রূপার জালে বোনা ছোট্ট ব্যাগ বার ক'রে নিলেন—কুকুর-ব্যাগটি আধখোলা অবস্থায় তাঁর কোলের উপর পড়ে রইল। আন্না দেখলে তার মধ্যে সোনার মত চকচকে গোল একটা কৌটা রয়েছে, এক থোলো চাবি, আর একটা সুন্দর রেশমী রুমালের আধখানা দেখা যাচ্ছে। ব্যাগ খুলতেই মৃদু একটা সুগন্ধ উঠে ট্রেনের কামরা যেন ভরে গেল। মহিলাটি সেই রূপার ব্যাগ খুলে একটা দু-আনি বার ক'রে ভিখারীর দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

আট পয়সা ভিক্ষা একটি মাত্র ভিখারীকে! না জানি ও কার মুখ দেখে উঠেছিল আজ। আন্না ভাবলে ঐ ছোট্ট ব্যাগটাতে না জানি কতগুলো দু-আনিই আছে—কিংবা হয়ত দু-আনি আর নেই, শুধু টাকাই আছে এবার।

এইবার মহিলাটি তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—এখানে বাড়ীতে আন্নার আর কে আছেন, স্বামী কি করেন, কত দিন হ'ল ওরা এ জায়গায় আছে, ছেলেমেয়ে আছে কিনা, জায়গাটা আন্নার কেমন লাগে ইত্যাদি।

এক জন সাদা ধবধবে পোষাক-পরা ও মাথায় পাগড়ী-বাঁধা খানসামা এসে সেই গাড়ীর কামরার মাঝখানে কোথা থেকে একটা ছোট টেবিল এনে রাখলে। তার পর সেই টেবিলের উপর একটা সাদা চাদর বিছিয়ে তার উপর সাদা সাদা বাসন, গেলাস, রূপার, কাঁচের কত কি সব জিনিষপত্র সাজাতে লাগল। আন্না সঙ্কুচিত ভাবে সেই দিকে আঙুল নির্দ্দেশ ক'রে মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করলে, "এতে কি হবে?"

মহিলাটি হেসে উত্তর দিলেন, "আমার স্বামী এই ষ্টেশনে কাজে নেমেছেন; তিনি ফিরে এলে আমরা দু-জনে খাব কি না, তাই চাকরটা টেবিল ঠিক করছে।"

আন্না বর্দ্ধিত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। দুটো মানুষ শুধু খাবে তারই এত আয়োজন! ছয়খানা বাসন লাগবে দু-জনের খেতে? আর ঐ সব রূপার জিনিষপত্র? ওগুলি দিয়ে খাবার সময়ে এঁদের কোন্ প্রয়োজন সাধিত হবে, সঙ্কোচে আন্না জিজ্ঞাসা করি-করি ক'রেও ক'রে উঠতে পারলে না।

একটু চুপ ক'রে থেকে আন্না জিজ্ঞাসা করলে, "তোমরা কি বাঙালী?"

মহিলাটি হেসে উঠলেন। "বাঙালী না হ'লে এতক্ষণ ধরে বাংলায় আপনার সঙ্গে কথা ব'লছি কি ক'রে? আমরা একেবারে বাঙালী! এই আপনি যেমন বাঙালী হিন্দুর মেয়ে, আমি ঠিক তেমনি বাঙালী হিন্দু ঘরেরই মেয়ে, একটুও তফাৎ নেই।"

ট্রেনের বাঁশী বেজে ওঠাতে মহিলাটি নিজের বাঁ-হাতের দিকে তাকালেন। আন্না দেখলে তাঁর কবজীতে সোনার ছোট্ট ঘড়ি চেন দিয়ে বাঁধা, তাইতে তিনি সময় দেখছেন। কি ছোট্ট ঘড়িটা! ওতে কি কাঁটা দেখা যায়? আন্নার ইচ্ছে হ'ল তাঁর হাতখানি ধরে ঘড়িটা একবার ভাল ক'রে দেখে নেয়। অতটুকু ঘড়ি টুং টুং ক'রে বাজে কিনা কে জানে।

মহিলাটি মুখ তুলে বললেন, "সাড়ে সাতটা হ'ল, আমাদের ট্রেন এইবার ছেড়ে দেবে। চলুন, আমি আপনাকে আপনার বাড়ী অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

আন্না তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী থেকে নেমে এল। বাড়ীর দরজায় তাকে পৌঁছে দিয়ে তিনি বললেন, "আচ্ছা, আসি তাহ'লে, নমস্কার। বেশ লাগল অনেক দিন পরে আপনার সঙ্গে দুটো বাংলা কথা কয়ে। হাজার হোক্ বাঙালী আমরা—বাঙালীর মুখ কিছুদিন না দেখতে পেলেই প্রাণ হাঁপায়। আমাকে মনে রাখবেন ত?"

আন্না প্রতিনমস্কার করলে না, কিন্তু ঘাড় নেড়ে জানাল যে মনে রাখবে।

মহিলাটি আবার খুটখুট ক'রে গিয়ে নিজের গাড়ীতে উঠলেন। গাড়ীর সেই আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে চিরুণী দিয়ে চুলে কি যেন করতে লাগলেন। তাঁর মাথার উপর থেকে ট্রেনের কামরার উজ্জ্বল আলো পড়ে তাঁর সেই প্রসাধনরত হাতের ঘড়ি ও চুড়িবালার গোছা ঝক্‌ঝক্ করতে লাগল। একটু পরেই আর একবার বাঁশী বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিলে—মহিলাটি আয়নার সামনে থেকে সরে এসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কি যেন দেখতে লাগলেন। প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে একটি সাহেব দাঁড়িয়ে ছিলেন—আন্না দেখলে সেই সাহেবটি ঐ চলন্ত ট্রেনে সেই কামরায় উঠে পড়লেন। দেখতে দেখতে ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে চলে গেল; আন্নার ঘরের সামনে আবার অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা

বিরাজ করতে লাগল, কিন্তু তার চোখের সম্মুখ থেকে সেই ঐশ্বর্য্যময়ী জ্যোতির্ময়ী মূর্ত্তি যেন সরে যেতে পারলে না। অন্ধকার জানলায় আন্না দুই চোখ বাইরের দিকে রেখে চেয়ে রইল—তার চোখে সেই শুভ্র রং, সেই কালো শাড়ী, তার জরির পাড়, সেই সোনার গহনা, সেই কানের দুল যেন মায়াজাল বিস্তার ক'রে ধরেছে। মেয়েটির পায়ের জুতা অবধি কি চক্‌চক্‌ করছে—জুতাও কি সোনায় মোড়া ?

অনেক ক্ষণ পরে স্বামীর পায়ের শব্দে চকিত হ'য়ে আন্না মুখ ফেরালে। কালো আলপাকার একমাত্র কোটটি খুলে আনলায় রাখতে রাখতে ভবতোষ বললে, "আজ এই গাড়ীতে আমাদের বড়সাহেব তাঁর মেমকে নিয়ে গেলেন। মালগাড়ীর পেছনে তাঁর সাদা গাড়ী ছিল, দেখেছিলে নাকি ? তাইতে মেমসাহেব ছিলেন।"

আন্না ভাবলে মেম কোথা—সে ত তারই মত বাঙালীর মেয়ে, বাঙালীর বৌ, বাংলা কথা বলে।

কিন্তু মুখে কিছু বললে না। উনুনের আগুন ম্লান হয়ে এসেছে—লুচির জোগাড় এখনও কিছু করা হয় নি। স্বামীকে আশ্চর্য্য ক'রে দেবার কথা এতক্ষণ মনে ছিল না আন্নার। থালাখানা এনে ময়দা মাখতে হবে, তার পর থালাটা আবার মেজে নিয়ে তাইতে স্বামীকে খেতে দেবে। আন্না ঘরের কোণ থেকে থালাখানা আনতে গেল। সেই বাঙালীর মেয়েটি হয়ত এতক্ষণে সেই ছ-খানা বাসন-সাজান টেবিলে স্বামীর সঙ্গে খেতে বসেছে। রূপোর অতগুলো অত রকমের জিনিষপত্র খাবার সময়ে কি কাজে লাগবে কে জানে !

আলনার উপর তার নূতন শাড়ীখানি দুলছে। প্রদীপের আলোয় তার বেগুনী রংটা যেন ম্লান বোধ হ'ল। পাড়ের কাটাটুকু উপরেই রয়েছে—ভবতোষ সেইটুকু হাতে তুলে দেখছে। বললে, "এটুকু কাল কিন্তু সেলাই ক'রে নিও—কিচ্ছু বোঝা যাবে না।"

আন্নার মনে হ'ল অনেকটা ছেঁড়া—সেলাইয়ে কি ঢাকবে ?

সেই মেয়েটির শাড়ীখানা ট্রেনের আলো পড়ে ঝকঝক্ করছিল, আন্নার চোখে তাই ভাসছে।

১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেশন

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার, এম্-এ, পিএইচ্-ডি, বার-এট্-ল

বিগত স্বদেশী-আন্দোলনের যুগ হইতে বিভিন্ন সময়ে ১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেশনে দেশের কয়েক জন লোকপ্রিয় নেতাকে আটক রাখায় ইহা লোকের যতটা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে ও সমালোচনার বিষয় হইয়াছে এরূপ আর পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। এই রেগুলেশনটা বহু প্রাচীন এবং ইহার দ্বারা মধ্যে মধ্যে যে দেশীয় লোককে আটক রাখা হইয়াছে তাহার অনেক দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় ; কিন্তু ইদানীং ইহা যেরূপ জনমত জাগ্রত করিয়াছে এরূপ আর পূর্ব্বে হয় নাই। বহুকাল পূর্ব্বে কেবলমাত্র একবার জনৈক ব্যক্তিকে এই রেগুলেশনে আটক রাখা হইলে তিনি ইহার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা উপস্থিত করিয়াছিলেন। ইহার বিবরণ পরে দিব। যাহা হউক, এই রেগুলেশনের ন্যায্যতা-অন্যায্যতা লইয়া এক্ষণে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে তাহার বিষয় কোনও আলোচনা করা আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, কেবল ইহার বিধি-ব্যবস্থার বিষয় লোকের ঠিক ধারণা না থাকায় তাহার বিষয় এখানে কিছু বলাই আমার উদ্দেশ্য।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী য়্যাক্টের (যাহা রেগুলেটিং য়্যাক্ট নামে খ্যাত) দ্বারা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রথম ভারতশাসন

ব্যবস্থার ভার প্রাপ্ত হন, তখন তাহার দ্বারা সপার্ষদ গবর্ণর-জেনারলও সময়ে সময়ে নিয়মকানুন, অর্ডিন্যান্স ও রেগুলেশন প্রণয়ন দ্বারা তাঁহাদের অধীনস্থ স্থানসমূহের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সুশাসন ব্যবস্থার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইহাতে ইহাও ব্যবস্থা করা হয় যে, সপার্ষদ গবর্ণর-জেনারল উক্ত ক্ষমতাবলে কোন রেগুলেশনাদি প্রণয়ন করিলে তাহা তখনই আইনে পরিণত হইতে পারিবে না। তাহা আইনে পরিণত করিতে হইলে তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টে তাহা রেজিষ্ট্রেশন করা ও ঐ কোর্ট-কর্তৃপক্ষের অনুমোদনলাভও প্রয়োজন ছিল। নিয়ম ছিল, এরূপ রেগুলেশনাদি সুপ্রীম কোর্টে প্রেরিত হইলে তাহা কুড়ি দিন উক্ত কোর্টের কোন প্রকাশ্য স্থানে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থ টাঙাইয়া রাখিতে হইত এবং ইহার বিধি-ব্যবস্থায় কোনও আপত্তি থাকিলে তাহা উক্ত কোর্টের কর্তৃপক্ষের গোচর করিয়া উহার রেজিষ্ট্রেশনে বাধা দিবার ও অকৃতকার্য্য হইলে তাহার বিরুদ্ধে বিলাতে সপার্ষদ সম্রাট্ বাহাদুরের নিকট আপীল করারও অধিকার জনসাধারণের ছিল। এরূপ ব্যবস্থা কেবল ভারতেই নহে, বিলাতেও ছিল। উক্ত রেগুলেশনাদি এখানে পাস হইলেই উহার এক প্রতিলিপি বিলাতে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে হইত এবং তাহা তথায় জনসাধারণের জ্ঞাতার্থ ইণ্ডিয়া হাউসের এক প্রকাশ্য স্থানে টাঙাইয়া রাখিবার নিয়ম ছিল। সেখানেও ইহার বিধি-ব্যবস্থায় কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে সপার্ষদ সম্রাটের নিকট তাহার আবেদন করিবার অধিকার ছিল। ইহার দ্বারা দেখা যায় যে, সপার্ষদ গবর্ণর-জেনারল কর্তৃক রচিত কোন নিয়ম-কানুনে অন্যায় বিধি-ব্যবস্থা থাকিলে তাহা পরিবর্তন বা নাকচ করিবার ক্ষমতা যে কেবল উচ্চ রাজকর্তৃপক্ষ বা সম্রাট্ বাহাদুরের নিজের ছিল তাহা নহে; পরন্তু উহার কোন অন্যায় বা আপত্তিজনক বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা কি ভারতীয়, কি ব্রিটিশ প্রজাবৃন্দের সকলেরই সমান ছিল।

১৭৮১ সালে যে আর একটি য়্যাক্ট জারি হয় তাহার ব্যবস্থা অনুসারে উপরে যে রেগুলেশনাদির সুপ্রীম কোর্টে রেজিষ্ট্রেশনের আবশ্যকতার কথা বলা হইয়াছে তাহা কোন কোন ক্ষেত্রে বাতিল হয়। এই জন্য অনেক সময় আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে যে, যে-রেগুলেশন উক্তরূপে রেজিষ্ট্রী হয় নাই তাহা আইন হইতে পারে না। আমরা যে রেগুলেশনটির বিষয় আলোচনা করিতেছি, নিম্নে ইহার বিরুদ্ধে যে মামলার কথা বলা যাইবে তাহাতেও অনুরূপ এক আপত্তি করা হইয়াছিল।

উক্ত ক্ষমতার বলে সপার্ষদ গবর্ণর-জেনারল সময়ে সময়ে প্রয়োজনানুসারে অনেক রেগুলেশনই বিধিবদ্ধ করেন। এই প্রদেশে যে রেগুলেশনগুলি বিধিবদ্ধ হয় তাহা Regulations of the Bengal Code নামে খ্যাত। ১৮১৮ সালের ৩ রেগুলেশনটিও ইহার অন্যতম। এই রেগুলেশনগুলির অধিকাংশই এক্ষণে বাতিল হইয়া গিয়াছে।

কেবল একবার জনৈক ভারতীয়কে এই রেগুলেশনে আটক করিলে কোর্টে ইহার বিরুদ্ধে যে মামলা হয় বলা হইয়াছে, তাহাই অতীত কালে এই রেগুলেশনের বিরুদ্ধে একমাত্র প্রতিবাদ বলিতে হইবে। সেই প্রসিদ্ধ মামলাটি হইতেছে আমির খাঁর। ইহা ১৮৭০ সালের কথা, এবং যখন এই মামলাটি হয় তখন দেশে এক মহা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। মামলাটির ব্যাপার এইরূপ।

যে সময়কার কথা বলা হইতেছে সেই সময় ওয়াহাবীদের ষড়যন্ত্রে দেশে এক সন্ত্রাসের হাওয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। এই ওয়াহাবী-দল ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী, ভারত হইতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদের জন্য ইহারা এক ব্যাপক ষড়যন্ত্র করে। ইহারা ভারতনিবাসী ছিল না। ভারতে আসিয়া ইহারা প্রথম সিতানায় বসবাস করিতে থাকে কিন্তু ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সেস্থান হইতে বিতাড়িত হইলে মালকায় আসিয়া বাস করিতে থাকে। ইহাদের চরেরা ফকিরবেশে ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিত ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করিত। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ইহাদের ষড়যন্ত্র সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে ও পরেও কিছুকাল বিদ্যমান ছিল। ইহারা অবশেষে পাটনায় তাহাদের ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র স্থাপন করে। এই সময় গবর্ণমেণ্ট এই ষড়যন্ত্রের উচ্ছেদসাধনের নিমিত্ত উঠিয়া-পড়িয়া লাগেন, এবং তাহার ফলে কয়েক জন ওয়াহাবী নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া পাটনাতে এক মামলা হয় ও তাহাতে তাহাদের সাজা হয়। ইহাতে এই ওয়াহাবী-ষড়যন্ত্র নির্ম্মূল হয়। এই সম্পর্কে যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয় আমির খাঁ ছিল তাহাদের অন্যতম।

আমির খাঁ ছিল কলিকাতা-নিবাসী এক জন ব্যবসায়ী। তাহাকে ১৮৬৯ সালের ১৮ই জুলাই ৩ নং রেগুলেশনে প্রথম গ্রেপ্তার করা হয় ও গয়াতে লইয়া গিয়া আটক রাখা হয়। ঐ সালের ২৫শে আগষ্ট তাহাকে আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। পরবর্ত্তী সালের ১লা আগষ্ট আমির খাঁর তরফ হইতে তাহাকে কোর্টে হাজির করিবার জন্য রিট্ অব্ হেবিয়স্ কর্পসের (Writ of Habeas Corpus) এক দরখাস্ত পেশ করা হয়। এই দরখাস্তানুযায়ী এক সমন আলিপুর জেলারের উপর জারি হইলে তিনি আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন যে, আমির খাঁকে ১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেশন অনুসারে আটক রাখা হইয়াছে সুতরাং কোর্টে আমির খাঁকে উপস্থিত করিতে হুকুম জারি করিবার ক্ষমতা কর্ত্তৃপক্ষের নাই। ইহাতে এই বিষয় লইয়া কোর্টে মামলা চলিতে থাকে। এই মামলাটি প্রথম বিচারপতি নরম্যান সাহেবের এজলাসে হয়, এবং তিনি ইহাতে বাদীর বিরুদ্ধে রায় প্রদান করিলে ইহার বিরুদ্ধে এক আপীল করা হয়। এই আপীলে আবেদনকারীর সপক্ষে যে-সকল আপত্তি উত্থাপিত হয় তাহার দুইটি ছিল এই যে, (১) ১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেশনে যে রাজকীয় বন্দীর কথা আছে তাহার দ্বারা বিদেশী রাজনৈতিক বন্দী-দিগকেই বুঝিতে হইবে, তাহা এদেশীয় ব্রিটিশ প্রজার পক্ষে প্রযোজ্য নহে ; ও (২) এদেশের কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ রেগুলেশন জারি করিবার ক্ষমতা বা যোগ্যতা নাই। আপীলেও এই মামলা টিকে না। যে দুই জন বিচারকের দ্বারা এই মামলার বিচার হয় তাঁহারা দুই জনেই একমত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করেন। উপরিউক্ত দুইটি যুক্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের মতের মর্ম্মার্থ এই যে,

উপরিউক্ত রেগুলেশনটি প্রথম পাস করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের যদি কোন গলদ থাকিয়াও থাকে তাহা হইলেও ইহা ১৮৫০ ও ১৮৫৮ সালের যথাক্রমে ৩৪ ও ৩ আইন দ্বারা সমর্থিত ও বহাল থাকায় তাহাতে ইহার সে দোষ থাকিলেও খণ্ডন হইয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী কালের এই দুইটি আইন দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষ যে কেবল ১৮১৮ সালের ৩ রেগুলেশনের বিধি-ব্যবস্থাগুলি মূলত বহালই রাখিয়াছিলেন তাহা নহে, এই বিধি-ব্যবস্থাগুলি যে কোম্পানীর অধীনস্থ সকল স্থানেই প্রযোজ্য একথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হয়। স্থানীয় আইন পরিষদ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী বা কোর্টগুলিকে এইরূপ সরাসরি গ্রেপ্তার ও আটকের ক্ষমতা বহু স্থানেই দিয়াছেন, এবং ইহা কোনরূপ অন্যায় ব্যবস্থা বা বিধি নহে ; এমন কি এই রেগুলেশন অনুসারে আসামীকে যে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক রাখিবার ব্যবস্থা আছে তাহাও অন্যায় বা কোনরূপ আইনবিরোধী নহে। তার পর আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে যে, ইহা ব্রিটিশ প্রজার উপর প্রযোজ্য নহে, তাহাও ঠিক নহে। যদিও এইরূপ মনে করা সমীচীন হইতে পারে যে, দেশে শান্তির সময় উক্ত রেগুলেশনের বিধি-ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য করা উচিত নহে, কিন্তু ইহাতে পরিষ্কারই ব্যবস্থা আছে যে, সপার্ষদ গবর্ণর-জেনারলের এরূপ ক্ষমতা থাকা আবশ্যক যাহাতে তাঁহারা অবস্থানুসারে সরাসরিভাবে লোককে গ্রেপ্তার করিতে ও আটক রাখিতে পারেন এবং ইহাতে বাধা দিবার ক্ষমতা কোর্টের থাকিবে না। এবং ইহাতে তাঁহারা কোনও দোষ বা অসামঞ্জস্য দেখেন না। যদি এই আইনের দ্বারা গবর্ণর-জেনারলকে এরূপ কোনও ক্ষমতা প্রদান করা ন্যায়সঙ্গত হয় তাহা হইলে ইহা স্পষ্ট যে ইহার দ্বারা কোনও অশান্তির সম্ভাবনা নিবারণ বা দমন করার ক্ষমতার ব্যবহার কর্ত্তব্য কর্ম্মই। এই আইন দ্বারা কেবল যে সপার্ষদ গবর্ণর জেনারলকে গ্রেপ্তার করিবার ও আটক রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে, ইহার দ্বারা তাঁহাদিগকে ইহা কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করিবার আবশ্যকতা আছে তাহার একমাত্র বিচারকও করা হইয়াছে।

জজদের এই মতের আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে ; ১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেশন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেশনটি রাজবন্দীদিগের আটক রাখা বিষয়ক। ইহার ভূমিকায় (preamble) ইহার উদ্দেশ্য বিষয়ে সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :

বিদেশী শক্তিগুলির সহিত ব্রিটিশ রাজ্যের মিত্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, ব্রিটিশের রক্ষণাধীন দেশীয় রাজ্যগুলিতে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য এবং বিদেশী শক্তির শত্রুতা হইতে ও দেশের বিদ্রোহ হইতে ব্রিটিশ রাজ্য রক্ষা বা নিরাপদ রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাকে আটক রাখিবার আবশ্যকতা হয় যাহা-দিগের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা উপস্থিত করার উপযুক্ত কারণ থাকে না, বা যখন তাহা করা সময়ের উপযোগী নহে, তখনই এই ব্যবস্থা করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কি কর্ত্তব্য তাহা সপার্ষদ গবর্ণর-জেনারলই ঠিক করিবেন। যে-সকল রাজবন্দী এই ভাবে বিনাবিচারে আটক থাকিবে তাহাদিগকে যে কারণে ঐরূপে আটক রাখা হইয়াছে তাহা মধ্যে মধ্যে পুনরালোচিত হইবে, এবং রাজবন্দীদিগেরও সকল সময় ঐ সকল কারণের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বা ইহা যে ভাবে প্রযুক্ত হইতেছে সে বিষয়ে সপরিষদ গবর্ণর জেনারলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার অধিকার থাকিবে। প্রত্যেক রাজবন্দীর স্বাস্থ্যের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং যাহাতে তাহারা তাহাদের পদ ও মর্য্যাদানুরূপ নিজেদের ও পরিবারের জন্য উপযুক্ত ভাতা পায় সেদিকেও গবর্ণমেণ্টকে অবহিত হইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ করা হয়।

সাম্প্রদায়িক সাহিত্য

শ্রীপরিমল গোস্বামী

সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা লইয়া সম্প্রতি খুব আন্দোলন হইতেছে, কিন্তু সাহিত্য সাম্প্রদায়িক হইতে পারে না। যদি হয় তবে তাহা সম্প্রদায়-বিশেষের সৃষ্টি বলিয়াই সাম্প্রদায়িক, সম্প্রদায়-বিশেষের বিজ্ঞাপন বলিয়া সাম্প্রদায়িক নহে। সাম্প্রদায়িক শব্দটি সদর্থে ব্যবহৃত হয় না, সুতরাং সাহিত্য যখন সাম্প্রদায়িক হয় তখন তাহা আর সাহিত্য থাকে না। কিন্তু মুসলমান-সম্প্রদায়ের এক অংশ বাংলা-সাহিত্যকেই সাম্প্রদায়িক সাহিত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।

যথার্থ সাম্প্রদায়িক সাহিত্য রচনা করা খুব সহজ। রেল কোম্পানির টাইম-টেবল সাম্প্রদায়িক সাহিত্য। জ্যামিতি পরিমিতি বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের রচিত সাহিত্যকে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য বলা যায়। এই সব সাহিত্য সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত নহে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া রচিত। সাহিত্য—যাহা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির আনন্দময় বা আবেগময় প্রকাশ, তাহা কখনও সাম্প্রদায়িক হইতে পারে না। সাহিত্য ব্যক্তিগত, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য নৈর্ব্যক্তিক। সাহিত্য-স্রষ্টা আপন অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি-লব্ধ সত্য অপরের মনে সঞ্চারিত করিতে চাহেন, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে লোকে তাহা পাঠ করিয়া ঠিক সময়ে ট্রেন ধরিতে পারুক বা কৃষিকার্য্য শিখুক বা কোনও ধর্ম্মমতে দীক্ষিত হউক। উদ্দেশ্য ইহাই যে লোকে তাহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হউক।

কিন্তু তথাপি সাহিত্য সাম্প্রদায়িক হইতে পারে এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের এক অংশ সাহিত্য হইতে আনন্দ পাইতেছেন না। ইহা সাহিত্যের দোষ নহে, দোষ এদেশের ভাগ্যের। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িতেছে। জনৈক স্কচ্ সিনেমা দেখা শেষ হইলে টিকিট ঘরের নিকট গিয়া বলিল, "এক টাকা দুই আনার টিকিট করিয়াছিলাম, আমাকে দুই আনা ফেরৎ দাও।" টিকিট-বিক্রেতা বলিল, "দুই আনা অ্যামুজমেণ্ট ট্যাক্স, ফেরৎ দেওয়া যায় না।" স্কচ্ তাহার উত্তরে বলিয়াছিল, "I wasna amused."। আমাদের মুসলমান ভ্রাতারাও বাংলা-সাহিত্য সম্পর্কে ঠিক এই ধরণের কথাই বলিতেছেন। অর্থাৎ amused হইতেছেন না।

যে-কোনও ভারতবাসী ভারতবর্ষে বসিয়া সাহিত্য রচনা করিতে গেলে ভারতবর্ষীয় ভাষায় তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। ভারতবর্ষের মানুষ, তাহার সমাজ, তাহার নদ-নদী, অরণ্য-পর্ব্বত—প্রত্যেকটির সহিত ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং সংস্কার ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া আছে। এদেশে বসিয়া চোখ খুলিলেই যাহা দেখা যায় তাহা যেমন এদেশের সাহিত্যের উপাদান, তেমনই এদেশে যাহা কিছু জন্মিয়াছে তাহাই এদেশের সাহিত্যের উপাদান হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। সুতরাং হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, খ্রীষ্টান হউন, এদেশের ভাষায় সাহিত্য রচনা করিতে গেলেই এদেশের চিন্তারীতি এবং ভাবধারার সহিত তাঁহাকে পরিচিত হইতে হইবে, না হইলে চলিবে না। এদেশে বাস করিয়া এদেশের মানুষকে, মানুষের সমাজকে, প্রকৃতিকে, তাহার যুগযুগান্তরের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে বাদ দিয়া এদেশের ভাষায় সাহিত্য রচনা করা সম্ভব নহে।

আমি হিন্দু, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনও দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। বিদ্যার জন্য সরস্বতী নামক দেবতার কাছে প্রার্থনা করিলে বিদ্যা হয় ইহাও বিশ্বাস করি না। কিন্তু সাহিত্য রচনার সময় অনায়াসে লিখি, "সরস্বতী আমাকে কৃপা করিলেন," বা "কৃপা হইতে বঞ্চিত করিলেন।" আমি "লেখাপড়া শিখিলাম" বা "শিখিতে পারিলাম না" ইহা আমি ঐ ভাষায় প্রকাশ করি মাত্র। কারণ ইহাই আমার দেশের ভাষা। ইহাতে আমি ধর্ম্মের ক্ষেত্রে কি মানি বা না-মানি তাহা কিছুই বুঝা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ পৌত্তলিক নহেন, কিন্তু তিনি বিশ্বের সর্ব্বত্র, মানুষের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে তাঁহার জীবনদেবতার প্রকাশ দেখিতে পান। তিনি যে ভাষায় চিন্তা করেন সে ভাষাও এই দেশেরই ভাষা। তিনি যখন বলেন, "আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে," কিংবা "সন্ধ্যা হ'ল গো ওমা—সন্ধ্যা হ'ল বুকে ধর" তখন তিনি যে পৌত্তলিক একথা কেহই বলিবে না। ব্যক্তিগতভাবে কে কি বিশ্বাস করেন বা মানেন, তাহার সহিত সাহিত্যের ভাষার কোনও সম্বন্ধ নাই। বাইবেল সাম্প্রদায়িক সাহিত্য নহে, কিন্তু মথি-লিখিত সুসমাচার সাম্প্রদায়িক সাহিত্য। কোরান সাম্প্রদায়িক সাহিত্য নহে, কিন্তু মুসলমানগণ তাহা যদি বিকৃত ভাষায় প্রচার করিতে থাকেন তবে তাহা সাম্প্রদায়িক সাহিত্যে পরিণত হইবে। তাঁহারা যদি সাম্প্রদায়িক না হইতে চাহেন তাহা হইলে বাংলা-সাহিত্য এবং বাংলা ভাষাকে চোখ বুজিয়া মানিয়া লউন, ইহা ছাড়া অন্য উপায় নাই।

সরস্বতী বা অন্য দেবতার পরিকল্পনা এই দেশের মাটিতেই হইয়াছে। সরস্বতীকে বাদ দিলেও 'বিদ্যা' থাকিবে, এবং বিদ্যাও দেবতারই নাম। ইহাকে স্বীকার করিয়া লইলেই তবে সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত হওয়া যাইবে; কারণ আরব দেশের ভাষা এবং চিন্তারীতি এবং আবহাওয়া এবং প্রকৃতি এদেশের সঙ্গে কোনকালেই মিলিবে না। যেমন, গঙ্গানদী বা আমগাছ এদেশের নদী বা গাছ বলিয়া মুসলমানগণ ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন না, তেমনই ভাষার ভিতর শত শত দেবতার নাম রহিয়াছে বলিয়া সে ভাষাও তাঁহারা ত্যাগ করিতে পারেন না। দুই-ই এদেশে জন্মিয়াছে। সাময়িক ভাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সাহিত্যে আরোপ করিয়া এমন কথা বলা চলে যে আরব দেশে গঙ্গানদী বা আমগাছ নাই বলিয়া মুসলমানগণ এদেশের প্রকৃতি-বর্ণনায় কেবল খেজুর গাছেরই উল্লেখ করিবেন। কিন্তু ইহাতে যে পরিতৃপ্তি তাঁহারা লাভ করিবেন তাহাও সাময়িক হইবে।

চিন্তা করিবার মত যদি মনের অবস্থা থাকে তাহা হইলে মুসলমানগণ একটু চিন্তা করিয়া দেখুন, তাঁহারা একটি উৎকট রূপে হাস্যকর আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। এদেশের সাহিত্যে যদি গঙ্গানদী এবং আমগাছের অস্তিত্ব রাখা সম্ভব হয় তাহা হইলে এদেশের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকেও রাখা সম্ভব হইবে। এদেশের প্রাচীন সম্পদ ত এদেশের হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেরই সম্পদ। মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টান হইয়াও তাঁহার ভারতীয়ত্বে গৌরব অনুভব করিয়াছেন। মুসলমানগণ পারিবেন না কেন? খ্রীষ্টান বা হিন্দুর যে ভয় নাই, মুসলমানের সে ভয় আসিল কোথা হইতে?

আমরা হিন্দু হইয়া আল্লার নাম করিতে পারি, গীর্জ্জায় গিয়া উপাসনা করিতে পারি; ইহাতে আমাদের হিন্দুত্বের কোনও ক্ষতি হয় না। এবং এক হিসাবে দেখিতে গেলে সাহিত্যে বা সমাজে, আমরা যে হিন্দু একথা প্রায় সর্ব্বদা বিস্মৃত হইয়াই থাকি। মুসলমানগণ নূতন করিয়া আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া না-দিলে ধর্ম্ম আমাদের সাহিত্যে, শিল্পে বা জীবনধারণ-বিষয়ে কোন বাধাই সৃষ্টি করিত না।

ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যকে 'মোহাম্মদী' "কেচ্ছা" বলিয়া গালি দিয়াছেন। স্বকর্ম্মের জন্য তাঁহারা সহজে লজ্জিত হন না। ইহা দ্বারা, ধর্ম্ম যে মুসলমানদের অতিশয় প্রিয় কেবল ইহাই প্রমাণিত হয়।

পৃথিবীতে যত জাতি আছে তাহাদের প্রত্যেকেরই নিজেদের একটা করিয়া বিশেষ আদর্শ আছে, এবং একথাও জোর করিয়া বলা যায় যে কোন জাতিই নিজেদের সেই আদর্শে অদ্যাবধি পৌঁছিতে পারেন নাই। মানুষের কত দুর্ব্বলতা, কত ভ্রান্তি, কত ত্রুটি। ইসলামীয় সভ্যতা যদি মুসলমানের আদর্শ হয় তাহা হইলেও একথা বলা চলে যে অধিকাংশ মুসলমান ব্যক্তিগত বা জাতিগত ভাবে সে আদর্শে পৌঁছিতে পারেন নাই। অন্যকে বিদ্বেষ করা বা অন্যের আদর্শ সম্বন্ধে কুৎসিত মন্তব্য করা বা অন্য ধর্ম্মের নিন্দা করা, ইহা নিশ্চিতই ইসলাম ধর্ম্মের আদর্শ হইতে পারে না, অথচ দেখা যাইতেছে 'মোহাম্মদী'র লেখকগণ ব্যক্তিগতভাবে এই সব দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন।

ধর্ম্মসাধনা বা ঈশ্বরকে পূজা করা ইহা নিতান্ত ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত ব্যাপার, ইহার রীতি লইয়া দাম্ভিকতা করা মানুষের পক্ষে শোভন নহে। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে মানুষের ধর্ম্মবিষয়ে যত বড় আদর্শই থাকুক, মানুষের কোথাও-না-কোথাও একটা সীমা আছেই। সে কাগজে-

কলমে সংস্কার মুক্ত হইলেও হাতেকলমে সংস্কারেরই দাস। পীর পূজা (পীরপরস্তী) বা গোরস্থানের পাথরকে চুম্বন করা বা দুলদুলের ঘোড়ার পায়ে জলদান বা পীর-মুরিদী প্রভৃতিও ফেটিশিজম্ (fetishism) বা জড়পূজারই একটা রূপ। আরবের নৃপতি ইব্‌ন্ সাউদের কার্য্যকলাপও আমাদের মত সমর্থন করে। তিনি এই সকল পূজাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই জড়পূজা ন্যায় বা অন্যায় নহে। যাহা আছে তাহার সহিত অন্যের বিরোধই অন্যায়। খ্রীষ্টানদের মধ্যেও এই-জাতীয় পৌত্তলিকতা আছে। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও মুসলমান বা খ্রীষ্টানকে কেহ পৌত্তলিক বলিবে না। হিন্দুও জড়পূজক বা পৌত্তলিক নহে। ঈশ্বরে বিশ্বাস বা ঈশ্বরের পূজা অন্তরের জিনিষ; মানুষ ঈশ্বর-উপাসনা বা পূজার আনুষঙ্গিক হিসাবে বাহিরে যাহাই করুক তাহাতে ইহা প্রমাণ হয় না যে সে ঈশ্বরকে ভুলিয়া বাহিরের জড়বস্তু লইয়াই মাতামাতি করিতেছে। হয়ত ব্যক্তিগত ভাবে তাহাও কেহ করিতে পারে, কারণ মানুষের আন্তরিকতা সকলের সমান নহে। সকল ধর্ম্মের লোকের মধ্যে সাধুর দেখা মিলিবে এবং শয়তানের দেখাও মিলিবে। যদি এমন হইত যে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে মানুষ মাত্রেই সাধু হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর যাবতীয় লোক ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইত। হিন্দু ধর্ম্ম এবং খ্রীষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধেও একথা সত্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে ধর্ম্মের আদর্শ যাহার যাহাই হউক, মানুষ সর্ব্বত্রই এক; সেই জন্য মনে হয় সামাজিকতার ক্ষেত্রে যেখানে মানুষে মানুষে সম্বন্ধ সেখানে ধর্ম্মের প্রশ্ন না তোলাই শ্রেয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাহাই। আমরা যখন আরবী বা ফারসী পড়ি তখন আরব বা পারস্য দেশের ধর্ম্ম সমাজ প্রভৃতি জানিবার জন্যই উহা পড়ি। আমরা যখন ইংরেজী পড়ি তখন ইংরেজদের সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইবার জন্যই তাহা পড়ি। এমন কি ইংরেজদের বাইবেল গ্রন্থ পাঠ যাহাতে হিন্দু ছাত্রদের পক্ষে আবশ্যিক হয় সেজন্য হিন্দুরাই উহা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাঠ্যরূপে মনোনীত করাইয়া লইয়াছে। আমরা যদি বিদেশীর সংস্কৃতিকে ভয় করিতাম তাহা হইলে অতি সহজেই বিদেশী ধর্ম্মের যাবতীয় সংশ্রব সাহিত্যের দিক হইতে অন্তত ত্যাগ করিতে পারিতাম।

ইংরেজীতে এইরূপ মনোবৃত্তিকে ফ্যানাটিসিজ্‌ম্ বলে। আমাদের ধর্ম্মবিষয়ে এই ফ্যানাটিসিজ্‌ম্ নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে ধর্ম্ম লইয়া গণ্ডগোল করা বড়ই লজ্জার বিষয়। কতকগুলি জিনিষ জানিলে ধর্ম্মে আঘাত লাগে, ধর্ম্ম এতখানি দুর্ব্বল বলিয়া ঘোষণা করাই কি লজ্জাকর নহে? জানা এবং পালন করা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ। নারায়ণ এবং লক্ষ্মীর সম্বন্ধ কি ইহা জানিলে ধর্ম্মে আঘাত লাগিবে কেন? কোরানে কি আছে তাহা জানিলে, হিন্দুধর্ম্মে ত আঘাত লাগে না! বরঞ্চ না জানিতে পারিলেই অজ্ঞতাজনিত দুঃখ পাই। যদি এমন হইত যে বাইবেল পড়িতে গেলে খ্রীষ্টান হইতে হইবে বা হিন্দু পুরাণ পড়িতে গেলে মন্দিরে দেবতাপূজা অভ্যাস করিতে হইবে তাহা হইলে অভিযোগের কারণ থাকত। কিন্তু এরূপ কিছুই হইতেছে না। জ্ঞান লাভ করিব না বলিয়া জেদ করা এ যুগের পক্ষে প্রকৃতই বাড়াবাড়ি।

প্রসঙ্গত আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। অন্য দেশের সাহিত্যের মত বাংলা-সাহিত্যের মধ্যেও কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য নাই। অন্য কোন ধর্ম্মের লোককে অকারণ পীড়া দিয়া তাহাকে হিন্দু-সংস্কৃতিতে দীক্ষা দিবার ষড়যন্ত্রও বাংলা সাহিত্য বা ভাষার মধ্যে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন জিনিষ জানা এবং তাহাতে দীক্ষিত হওয়ার মধ্যে গুরুতর পার্থক্য আছে। বাংলা-সাহিত্য পড়িতে গিয়া বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যকেই অস্বীকার করার কথা শুনিতে বড় খারাপ লাগে।
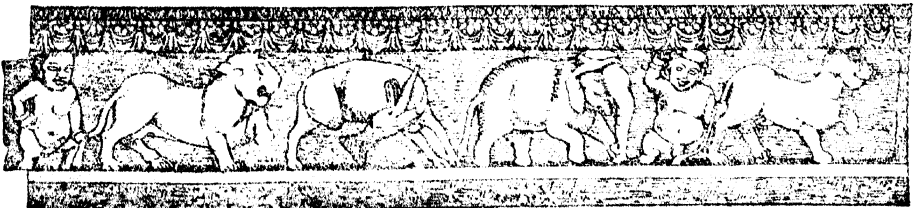
রাজার কুমারী

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

মগ্ন তখন নিশীথ-নগরী শ্রান্ত গভীর ঘুমে,
ঢুলু ঢুলু চাঁদ ঢুলিয়া পড়েছে প্রাসাদের চূড়া চুমে;
আমার নয়নে ঘুম নাই শুধু, দূরে দুটি তারা জ্বলে,
সিংহ-দুয়ারে সোনার ঘণ্টা—প্রহর বাজিয়া চলে।
বাহির হইনু সন্ধানে তব; রাজার কুমারী আজ
আমারে লইয়া তোমার রাজ্যে এসেছে পক্ষীরাজ।

দিবসের রাজপুরীর সে পথে ব্যস্ত জনেরা ছোটে
চারিদিকে শুধু উদ্দাম অতি কলকোলাহল ওঠে,
রথ-ঘর্ঘর, অশ্বের হ্রেষা, ধাতুর ঝনৎকার,
এর মাঝখানে জীবন আমার অর্থ হারায় তার।
রাতের জগতে ফিরিয়া পেলাম আমারি সে আপনারে,
তব সন্ধানে এসেছি আজিকে সপ্ত সাগর পারে।

তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে এসেছি তোমার কাছে,
কত অরণ্য, ঘন অরণ্য, মাঝপথে পাড়য়াছে,
কত নদী, কত গিরি দুর্গম—কে জানে ঠিকানা তার,
তোমার রাজ্যে এসেছি আজিকে সপ্ত সাগর পার।
জাগো জাগো জাগো রাজার কুমারী, দুয়ারে অতিথি এল,
যুগযুগান্ত কাটিয়া গিয়াছে, কন্যা নয়ন মেল।

জনহীন পথ, নড়ে নাকো পাতা, নির্জ্জন বনভূমি,
আসিয়া দেখিনু ঘুমের রাজ্যে ঘুমায়ে রয়েছ তুমি;
স্তব্ধ প্রাসাদ, নীরব কক্ষ, প্রহরীও নাই জেগে,
মহলের পর মহল চলেছি সাড়া পাই নাকো ডেকে।
জাগো জাগো জাগো রাজার কুমারী, কত-বা নিদ্রা যাও,
যুগযুগান্ত কাটিয়া গিয়াছে—নয়ন মেলিয়া চাও!

রাজার কুমারে পারে নি তাহার রাজ্য রাখিতে ধ'রে,
পারে নিকো কেহ কোন কারাগারে বন্দী করিতে জোরে;
কে ডাকে কোথায়? কে আছে কোথায়?
মন কিছু নাহি বোঝে,
নিশীথের পথে বাহির হইনু একেলা তোমার খোঁজে।
জাগো জাগো জাগো রাজার কন্যা, কন্যা নয়ন মেল,
রাজার কুমার অতিথি আজিকে, তোমার দুয়ারে এল।

শয্যাপ্রান্তে লুটায় তোমার অতুল কেশের রাশি,
আধো-প্রস্ফুট ওষ্ঠ-অধরে ঘুমায় মধুর হাসি,
বক্ষের বাসে ঘুমের ছন্দ তালে তালে ওঠে নামে।
অঙ্গের মৃদু গন্ধে বিভল বাতাস সেখানে থামে।
সেখানে আসিয়া থেমেছি আজিকে সুদূর সাগর পারে,
এখনো কি রবে নিদ্রা-নিলীন? অতিথি এসেছে দ্বারে।

লঘু সুকুমার শরীরের ভার, শুভ্র মরাল-গ্রীবা,
শয়ন-নিলীন তপ্ত তনুর কোমল গৌর বিভা;
প্রতীক্ষাতুর আলো ও ছায়ায় অপরূপ মায়া নামে।
দক্ষিণে বুঝি সোনার কাঠি ও, রূপার কাঠি সে বামে?
ঘুমের পিয়াস এখনো মেটে নি কত-বা নিদ্রা যাও,
শতেক বর্ষ কাটিয়া গিয়াছে, চক্ষু মেলিয়া চাও।

জীবন-কাঠির স্পর্শ লেগেছে, কত-বা ঘুমাবে আরো,
রাজার কুমার ডেকেছে তোমারে, তুমি কি ঘুমাতে পারো?
আকাশের পানে চাহিতে সহসা আকাশের মত নীল
তোমার নয়নে—মিলে গেল আজ মোর নয়নের মিল।
জাগো জাগো জাগো রাজার কুমারী, হৃদয়-দুয়ার খোল,
যুগান্তরের ভাঙিল কি ঘুম? কন্যা নয়ন তোল!

প্রতিধ্বনি

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার বাহিরে বেহারে পাটনায় আমার মামার বাড়ী। দিদিমা আম খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

পৌঁছিলাম বেলা সাড়ে দশটায়। সঙ্গে সঙ্গে বড়মামা সোরগোল তুলিলেন—আরে বংশীয়া, শিবুর জন্যে দোতলার সিঁড়ির পাশের ঘরটা সাফ়া ক'রে ফেল। ওর আবার একটু নিরিবিলি চাই।

সঙ্গে সঙ্গে নিজেও উঠিয়া পড়িলেন। দিদিমা আমার সর্ব্বাঙ্গে স্নেহ-কোমল হস্ত বুলাইয়া বলিলেন—বড্ড রোগা হ'য়ে গেছিস শিবু—রং তোর বড্ড ময়লা হয়েছে।

কি উত্তর দিতে গেলাম, কিন্তু বড়মামার কণ্ঠস্বরে বাধা পড়িল। তিনি বলিলেন—ওরে, তোর রসরাজ পাগল মারা গেছেন। আমাদের বাড়ীতেই মারা গেলেন।

দিদিমা বলিলেন—রসরাজ সামান্য লোক ছিলেন না; তিনি সিদ্ধ হয়েছিলেন। পাগল তিনি সেজে থাকতেন।

বড়মামা বলিলেন—শিবু রসরাজ পাগলকে বড় ভালবাসত মা।

আমি রসরাজ পাগলের কথাই ভাবিতেছিলাম। ভালবাসিতাম কি না জানি না, কিন্তু তাহার পাগলামি আমার বড় ভাল লাগিত। পাগল, সংসারে একান্তভাবে আপনার-জন-হীন পথচারী পাগল ছিল সে, অহরহ ফু-ফু করিয়া ফুৎকার দিয়া ফিরিত। কি যেন উড়াইয়া দিতে চাহিত। বহুবার বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি, বুঝিতে পারি নাই। আপনার অজ্ঞাতসারেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলাম।

বড়মামীমা জলখাবারের ডিস নামাইয়া দিতে আসিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—পাগলের মৃত্যু-সংবাদে দুঃখ হ'ল নাকি বাবা ?

ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলাম—দুঃখ একটু হ'ল বইকি মামীমা। মৃত্যুসংবাদ এমনি একটা সংবাদ যে, দুঃখ না ক'রে মানুষ পারে না!

আশ্চর্য্যের কথা—আমার কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত সকলেরই বুক হইতে এক একটি দীর্ঘনিশ্বাস সমবেত খেদের প্রকাশ করিয়া ঝরিয়া পড়িল। তার পর একটা বিষণ্ণ নিস্তব্ধতায় সকলেই কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

—বড়াবাবু, উ পাগলা বাবুকে চিজ্‌বিজের গাঁঠরীঠো কোথা রাখবে ?—বংশীয়া চাকর আসিয়া প্রশ্ন করিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল।

বড়মামা বলিলেন—ও, রসরাজদা'র পুঁটলীটা বুঝি ওই ঘরেই আছে। আঃ, আমারও মনে হয় নি, গঙ্গায় ওটা আর ফেলেও দেওয়া হয় নি!...আচ্ছা একপাশে রেখে দে, কাল ওটাকে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়ে আসব।

*　　*　　*

স্নান-আহার শেষ হইতেই বড়মামা বলিলেন—যাও একটু শুয়ে পড় শিবু। সমস্ত রাত্রি ট্রেনে এসেছ, একটু বিশ্রাম করা দরকার।

বিশ্রাম করিতেই গেলাম, আগে হইতেই বিছানা প্রস্তুত ছিল, হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া বেশ আরাম পাইলাম। আষাঢ় মাসের দ্বিপ্রহর, বেহারে এখনও বৃষ্টি নামে নাই। বাতাস প্রখর উত্তপ্ত। রাস্তার দিকের খোলা-জানালা দিয়া তপ্ত বায়ুপ্রবাহ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছিল। এ উত্তাপে গায়ে ঘাম হয় না, সর্ব্বাঙ্গে কেমন দাহ অনুভূত হয়। জানালাটা বন্ধ করিয়া দিলাম।

গরমে ঘুম কিছুতেই আসিল না। মনে পড়িয়া গেল রসরাজ পাগলকে।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়া সে-বার যখন এখানে আসি তখনই তাঁহাকে প্রথম দেখি। সে আজ বাইশ বৎসর হইয়া গেল। এই বাড়ীরই বাহিরে রাস্তার ধারের ফালি বারান্দাটায় দাঁড়াইয়াছিলাম। পথে তখনও গঙ্গাস্নান-যাত্রীদের ভিড় চলিতেছিল। ওদিক হইতে ষ্টেশন-ফেরৎ একাগুলি দ্রুতবেগে শহরের ভিতর ছুটিয়া চলিয়াছে।

—আরে হায়-হায়-হায়!

কতকগুলি পথিক আক্ষেপোক্তি করিয়া উঠিল। অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম ছোট একটি কুকুরের ছানা একা চাপা পড়িয়াছে। একাখানা দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেল। আহত জীবশিশুটার মরণার্ত্তনাদে স্থানটা অসহনীয় করুণ হইয়া উঠিল। তবুও ছুটিয়া সেইখানেই নামিয়া গেলাম। হতভাগ্য পশুটির ঠিক কোমরের উপর দিয়া একটা চাকা চলিয়া গিয়াছে। মরণ যন্ত্রণার আক্ষেপে সম্মুখের পা দুইটি ছুঁড়িয়া অবিরাম আর্ত্তনাদ করিতেছে। মুখ দিয়া রক্তও গড়াইয়া পড়িতেছিল। দেখিতে দেখিতে তাহাকে ঘেরিয়া ছোট একটি ভীড় জমিয়া

গেল। অতি কাতর সহানুভূতির সহিতই সকলে তাহার মৃত্যু-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। মধ্যে মধ্যে দুই-চারিটি কথা এখান-ওখান হইতে বুদ্বুদের মত উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছিল।

—কি হয়েছে—কেয়া হুয়া হ্যায় ?

কোন উচ্চ বলিষ্ঠ কণ্ঠের প্রশ্নে জনতা চকিত হইয়া উঠিল। আমিও মুখ তুলিয়া দেখিলাম আমার সম্মুখেই পশুটির ওপাশের জনতার পশ্চাতে সকলের মাথার উপর এক অস্বাভাবিক মূর্ত্তি। মাথায় তাহার বিশৃঙ্খল দীর্ঘ রুক্ষ চুল, দীর্ঘ শ্মশ্রু-গুম্ফে সমাচ্ছন্ন মুখ, চোখে প্রখর দৃষ্টি, সে মূর্ত্তি দেখিয়া ভয় হয়।

তাহার দিকের জনতা সরিতে আরম্ভ করিল। সে আবার প্রশ্ন করিল—কেয়া হুয়া হ্যায় ?

কে উত্তর দিল—একটা কুকুর মরেছে।

অকস্মাৎ সে চীৎকার করিয়া উঠিল—মরছে !

তাহার সম্মুখের জনতা তখন সম্পূর্ণরূপে সরিয়া গিয়াছে। তাহার সর্ব্ব অবয়ব দেখিতে পাইলাম। এক বিশালকায় পুরুষ, প্রায় নগ্নদেহ, কোমরে গামছার মত এক ফালি কাপড় মাত্র কোন রূপে জড়ান আছে, দেহের প্রত্যেক পেশীটি সবল এবং দৃঢ়। পিঠে একটা ছোট পুঁটুলীর মত কি বাঁধা রহিয়াছে আর হাতে এক প্রকাণ্ড লাঠি। লাঠিগাছটা ফেলিয়া দিয়া সে অবর্ণনীয় আকুলতার সহিত ওই মৃত্যুমুষ্টিনিপীড়িত জীবশিশুটির বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একাগ্র দৃষ্টিতে কুকুরটার মৃত্যুযন্ত্রণা দেখিতে লাগিল। কে মৃদুস্বরে বলিল—পাগলের খেয়াল !

কে এক জন পাগলকে রহস্য করিয়া বলিল—বাবুজী ডাগ্‌দার বোলাই ?

পাগল মুখ তুলিয়া বিপুল ব্যস্ততার সহিত বলিল হাঁ-হাঁ; জলদি জলদি। একঠো রাজ দে দেঙ্গে হাম ! জলদি !

আবার সে কুকুরটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। কুকুরটার আর্ত্তনাদ শুব্ধ হইয়া আসিয়াছে। দেহে তখন মৃত্যু-আক্ষেপ দেখা দিয়াছে, মধ্যে মধ্যে সমস্ত দেহটাকে টানিয়া টানিয়া সে হাঁ করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে একটা সুদীর্ঘ আক্ষেপে দেহটাকে টানিয়া পশুটা স্থির হইয়া গেল। কে এক জন বলিয়া উঠিল—ব্যস্ হো গিয়া !

পাগল চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিল—অঁ্যা—হো গিয়া ?

তার পর কুকুরটার দেহের উপর শূন্যমণ্ডলে দুই হাত প্রসারিত করিয়া কি যেন খুঁজিতে আরম্ভ করিল। ঐ ভঙ্গীতেই সে ধীরে ধীরে খাড়া হইয়া উঠিতেছিল। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সে জনতার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—কিধার গিয়া ? কিধার গিয়া—অঁ্যা ?

উচ্চরোলে জনতা এবার হাসিয়া উঠিল, পাগল তখন উর্দ্ধনেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া। অকস্মাৎ সে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া সবেগে মাথা নাড়িতে নাড়িতে চীৎকার করিয়া উঠিল—আরে ফুঃ—ফুঃ—আরে ফুঃ !

লাঠি তাহার পড়িয়া রহিল। দীর্ঘ পদক্ষেপে অতি দ্রুত সে চলিতে আরম্ভ করিল। চলিতে চলিতে সে সবেগে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বারবার তখনও প্রাণপণে ফুৎকার দিতেছিল—আরে ফুঃ—ফুঃ—আরে ফুঃ !

বাড়ীর মধ্যে আসিয়াই বড়মামাকে প্রশ্ন করিলাম—একটা পাগল দেখলাম বড়মামা, ফুঃ-ফুঃ করতে করতে চলে গেল।

বড়মামা বলিলেন—আরে উনিই হচ্ছেন রসরাজবাবু, আমাদের বাঙালী ব্রাহ্মণ রসরাজ ঘোষাল। পাগল হয়ে গেছেন।

দিদিমা এইসময় সেখানে আসিয়া পড়িলেন—তিনি বলিলেন—কে রে ?

—রসরাজ পাগলের কথা হচ্ছে মা।

দিদিমা বলিলেন—কালীসাধনা করতে গিয়ে উনি পাগল হয়ে গেছেন। মা আসবার আগে নানা বীভৎস ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আসে কিনা সাধককে ভয় দেখাতে। তাই এক মূর্ত্তি দেখে উনি ফুঃ-ফুঃ ক'রে আসন ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন। সেই অবধি অহরহ ফুঃ-ফুঃ ক'রেই বেড়ান।

বড়মামা বলিলেন—লোকে বলে ওই কথা, তবে ওদের বংশটাই যে পাগলের বংশ। ওর মা ছিলেন অল্প পাগল, এক বোন ছিল পাগল। এক ভাই ছিল, তারও মাথা খারাপ ছিল। তবে কেউ ওর মত উন্মাদ ছিল না।...রসিকবাবু শিক্ষিত লোক—বি-এ পড়তে পড়তে পাগল হয়ে গেলেন।

দিদিমার কথাটাই বিশ্বাস করিতে আমার ভাল লাগিল, মনে মনে নানা কল্পনা করিলাম সমস্ত দিন। সেদিন অপরাহ্নে ন-মামার সহিত বেড়াইতে বাহির হইলাম। আমরা দু-জনে প্রায় সমবয়সী। গঙ্গার কূলে কূলে অপ্রশস্ত একটি রাস্তা, সেই রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছিলাম। পাগলকে সেখানে আবার দেখিলাম, সে তাহার অভ্যস্ত দীর্ঘ সবল পদক্ষেপে দ্রুতবেগে বিপরীত দিক হইতে আমাদের দিকেই আসিতেছিল।

ন-মামা তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—কি রসদা, কোথায় যাবেন ? পাগল থমকিয়া দাঁড়াইল। কিছু ক্ষণ মামার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল—মর যায়েগা !

আমরা হতভম্ব হইয়া গেলাম। পাগল আমাদের মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল, সে আবার চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—সব কুছ—বিলকুল—তামাম দুনিয়া !

আমি ভাবিতেছিলাম ছুটিয়া পলাইব কি না ! ন-মামাও ভয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুই করিতে হইল না, পাগলই আমাদের নিষ্কৃতি দিল।

পরমুহূর্ত্তেই সে আরম্ভ করিল—আরে ফুঃ—আরে ফুঃ, ফুঃ-ফুঃ-ফুঃ ! সঙ্গে সঙ্গে সে দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। আমরা সুস্থ হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া দু-জনেই দু-জনের মুখের

দিকে চাহিয়া একটু হাসিলাম। তখনও দূরে গঙ্গার তীরভূমিতে প্রতিধ্বনি উঠিতেছিল—ফুঃ—ফুঃ—ফুঃ—আরে ফুঃ!

বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, পাগল প্রাণপণে ফুৎকার দিয়া কি যে উড়াইয়া দিতে চায় না-বুঝিয়া আবার একবার হাসিলাম।

সেদিন হইতে পাগল সম্বন্ধে সাবধান হইয়া গেলাম। তবে প্রায় দেখিতাম পাগল চলিত আর ফুৎকার দিয়া কি যেন উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় চীৎকার করিত—ফুঃ-ফুঃ—আরে ফুঃ!

* * *

ইহার পর অনেক দিন এখানে আসা ঘটিয়া উঠে নাই। চার-পাঁচ বৎসর পর পর কয়েকবার আসিয়াছি কিন্তু পাগলকে আর দেখি নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম, পাগল কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

গতবার, এই এক বৎসর পূর্ব্বে আবার পাগলের সহিত দেখা হইয়াছিল।

মনে পড়িল অপরাহ্নে বাহিরের বারান্দায় বসিয়া মামাদের সহিত গল্প করিতেছি, এমন সময় এক বৃদ্ধ ধীরে ধীরে আসিয়া নীরবে বারান্দার এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। বড়মামা বলিলেন—ওরে কে আছিস, মাকে বল রসরাজদা এসেছেন!

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুচ্চমকের মত আমার মনের মধ্যে রসরাজ পাগল জাগিয়া উঠিল। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে চাহিলাম। হ্যাঁ সেই; কিন্তু অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। দীর্ঘ সবল দেহ জরার ভারে যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে; সুদৃঢ় পেশীগুলি শিথিল-শীর্ণ, পাগলের ভাবও যেন অনেকটা শান্ত সুস্থ! দেখিলাম আজ আর সে প্রায়-উলঙ্গ নয়, খাটো হইলেও পরিধানে পুরা একখানি কাপড়ই রহিয়াছে। পাশে একটি ছোট পুঁটুলী দেখিলাম, একখানা কম্বলও বেশ ভাঁজ করিয়া অন্য পাশে রহিয়াছে দেখিলাম। পাগল অত্যন্ত মৃদুস্বরে আপন মনেই বিড় বিড় করিয়া কি বলিতেছিল। মনে হইল ইংরেজী, একটা লাইনও যেন বুঝিতে পারিলাম—"There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your Philosophy."

বড়মামা বলিলেন—চিন্‌তে পারছিস? উনি সেই পাগল রসরাজবাবু!

পাগলকে দেখিতে দেখিতেই বলিলাম—হ্যাঁ। এখন অনেক শান্ত হয়েছেন দেখছি!

বড়মামা বলিলেন—হ্যাঁ। লোকে বলে উনি সিদ্ধ হয়েছেন। জানি না, তবে এখন অনেক শান্ত। ওই, দিনে একবার কোন বাঙালী ব্রাহ্মণের বাড়ী যাবেন, বিছুক্ষণ অপেক্ষা করবেন, তাতে যদি গৃহস্থ খেতে দিল ত খেলেন, নইলে উঠে চলে যাবেন।

মেজমামা বলিলেন—বাঙালীরা সকলেই ওঁকে ভালবাসে। পরবার কাপড়, শীতে কম্বল অনেকে কিনে দেন। কিন্তু উনি সবচেয়ে কমদামী জিনিষ ভিন্ন কিছু নেন না।

বুঝিলাম পাগল অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, মর্য্যাদাবোধ সে কতক পরিমাণে ফিরিয়া পাইয়াছে। এই সময় খাবার হাতে করিয়া নিজে দিদিমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাগল খাবারের থালা সম্মুখে রাখিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। বড়মামা বলিলেন—খান রসরাজদা!

পাগল বলিয়া উঠিল—বিষ!

সকলে চকিত হইয়া উঠিল, দিদিমা বলিলেন—বিষ কি বলছেন?

পাগল বলিল—সংসারে সমস্ত খাদ্যের মধ্যে—।

অর্দ্ধপথে নীরব হইয়া যেন আরও খানিকটা ভাবিয়া লইয়া বলিল—সংসারের সমস্ত-কিছুর মধ্যে ক্ষয়শক্তি বিষ আছে। খাদ্যেও আছে, পুষ্টিও করে আবার ক্ষয়ও করে।

আমি বলিলাম—তা'হলে বিষামৃত বলুন, শুধু বিষ বলবেন কেন?

পাগল আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—হাঁ। আর একজন বলেছিল।···কিন্তু এ ভদ্রলোকটি কে রবি?

রবি আমার বড়মামার নাম। বড়মামা বলিলেন—আমার ভাগ্নে—মেজদিকে মনে আছে—তাঁরই ছেলে।

পাগল বলিল—মেজদি তোমার মরে গেছে?

দিদিমা শিহরিয়া উঠিলেন। বড়মামা বলিলেন—না, মরবেন কেন? এই ত সেদিন এসেছিলেন, আপনাকে খাবার দিলেন—মনে পড়ছে না?

পাগল আহারে মনোনিবেশ করিয়া বলিল—বেশ-বেশ-বেশ!···আচ্ছা, তোমার মেজদি কি অনেক দিন বেঁচে আছেন—এক-শ দু-শ বছর—হাজার বছর?

সকলে এবার হাসিয়া উঠিল। বড়মামা বলিলেন—হাজার বছর কি মানুষ বাঁচে রসরাজদা?

পাগল উত্তর দিল না। একটা গ্রাস মুখে পুরিয়া চোখ বুজিয়া চিবাইতে বসিল। মুখের গ্রাস শেষ হইয়া গেল, সে তেমনি ভাবে বসিয়া রহিল। ক্ষণকাল পর সহসা মাথা নাড়িয়া ফুৎকার দিয়া উঠিল—ফুঃ-ফুঃ—আরে ফুঃ!

কিন্তু পূর্ব্বের সে বলিষ্ঠতা বা তীক্ষ্ণতা নাই—এবার দেখিলাম ক্লান্ত ভঙ্গীতে শ্রান্ত কণ্ঠস্বর!

কিছুক্ষণ পর আবার সে শান্ত হইয়া খাইতে বসিল। আহার শেষ করিয়া হাত-মুখ ধুইয়া আপনার পুঁটুলীটি ও কম্বলখানি লইয়া বাহির দরজার পথ ধরিল। কিন্তু কি খেয়াল হইল, সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল কি কথাটি বললেন আপনি? কি বিষ—?

—বিষামৃত!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিষামৃত! কথাটা জানি কিন্তু মনে থাকে

না। বিষামৃত। বেশ, আপনার সঙ্গে একদিন কথা কইব।

পাগল চলিয়া গেল।

ইহার পর দু-তিন দিন আর পাগল আসিল না। সেদিন মামার এক বন্ধুর বাড়ীতে রাত্রে নিমন্ত্রণ খাইতে বসিয়াছি এমন সময় মামার ডাক আসিয়া উপস্থিত হইল। এক বাঙালী ভদ্রলোকের ছোট একটি মেয়ে দৈবদুর্ব্বিপাকে পুড়িয়া মারা গিয়াছে—তাহার সৎকারের ব্যবস্থা রবিবাবুকে করিয়া দিতে হইবে। মামা উঠিয়া পড়িলেন। আমাকে বলিয়া দিলেন, তুই বাড়ী চলে যা, শিবু।

রাত্রি তখন এগারটা। পথ প্রায় জনহীন, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। নগরীর মিউনিসিপ্যালিটির ব্যবস্থায় জ্যোৎস্না-লোকের জন্য পথ-প্রদীপগুলি নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নগরীর মাথার উপর সৌধশীর্ষে জ্যোৎস্না, পথের উপর সৌধমালার ছায়া। সেই ছায়ালোকের মধ্যে সন্তর্পণে চলিতে চলিতে ভাবিতেছিলাম—এখানকার পথ-প্রদীপ ও চন্দ্র যেন রাজপথসুন্দরীর প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বী—এক জগতে উভয়ের স্থান হয় না। কিন্তু চিন্তা ত্যাগ করিয়া চমকিয়া দাঁড়াইতে হইল।

একটা বাঁকের মোড়ে গাঢ়তর ছায়ালোকের মধ্যে কে কোথায় যেন মৃদু কণ্ঠে অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে। স্থির হইয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া দৃষ্টি হানিয়া দেখিলাম—সম্মুখেই একটা খোলার ঘরের বারান্দায় বসিয়া কে এক জন কি বলিতেছে। আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া নিকটে আসিয়া দেখিলাম, রসরাজ পাগল। আরও নিকটে গিয়া মনে হইল ভাষাটা ইংরেজী। বারান্দার উপরে উঠিতে উঠিতে প্রশ্ন করিলাম—কি বলছেন রসরাজ বাবু?

বলিতে বলিতেই আমি সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। রসরাজ পাগল নীরব হইয়া মুখ তুলিয়া আমার দিকে একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিল—কে, কে তুমি? পরমহংসদেব? এখন নয়, এখন নয়, পরে এস। এখন আমি নিউটনের সঙ্গে কথা কইছি।

পাগল বলে কি? চমকিয়া উঠিয়া উত্তর দিলাম—না, আমি রবিবাবুর ভাগ্নে। আমার সঙ্গে কথা কইবেন বলেছিলেন যে!

অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া যেন মনে করিয়া লইয়া পাগল বলিল—ও! তা বেশ। কিন্তু সে আজ ত হবে না। কাল, কাল কথা কইব।

আমি প্রশ্ন করিলাম—কিন্তু নিউটন কে?

—নিউটনকে জান না! মস্তবড় বৈজ্ঞানিক! সে এসেছিল, চলে গেল।

—কি বলছিলেন তাঁকে?

—বলছিলাম, গাছ থেকে ফল পড়ল আর তা থেকে তুমি আবিষ্কার করলে যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে ফলটা পড়ল। কিন্তু তাতে হ'ল কি? বুকের ভেতর থেকে প্রাণ কার আকর্ষণে কোথায় যায় বল্‌তে পার তুমি?

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—নিউটন কি বল্‌লেন?

—কিছু বলতে পারলে না। চুপ ক'রে ভাবছিল, এমন সময় তুমি এসে পড়লে। আজ পাগলের উপর কেমন শ্রদ্ধা হইল। সবিনয়ে বলিলাম—তবে ত বড় অন্যায় করলাম আমি, তিনি চলে গেলেন!

পাগল বলিল—তুমি গেলেই সে আবার হয়ত আসবে। এই যে থামটা দেখছ—এইটেই হয়ে উঠবে নিউটন। কোন দিন এটা নিউটন হয়, কোন দিন হয় পরমহংস, কোনদিন বা বেদব্যাস হয়—বুঝেছ!

বুঝিলাম বিকৃত কল্পনায় পাগল ঐ থামটার সহিতই বকিয়া যায়। আশ্চর্য্য মানুষের মন, মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বের শ্রদ্ধা এই মুহূর্ত্তে আর নাই! আমি চলিয়া আসিব মনে করিয়া ফিরিলাম। কিন্তু পাগল ডাকিয়া বলিল—সেদিন কি কথাটা তুমি বললে—বেশ একটা ভাল কথা?

—ও, বিষামৃত!

—হ্যাঁ, বিষামৃত। বেশ কথাটি। আচ্ছা এস তুমি। কাল, কাল কথা কইব।

পরদিন অপরাহ্ণে আর কোথাও বাহির হইলাম না, পাগলের প্রতীক্ষায় রহিলাম। তাহার সম্বন্ধে আমার একটা কৌতূহল জাগিয়াছে। কিন্তু সে দিন পাগল আসিল না। পরদিনও না। অবশেষে আমিই পাগলের খোঁজ করিলাম। কিন্তু কোথাও সন্ধান মিলিল না। পাগল কোথাও চলিয়া গিয়াছে। আর তাহার সহিত দেখা হয় নাই, এবার আসিয়া শুনিলাম—পাগল মরিয়াছে।

কল্পনাপ্রবণ মন পাগলের সমস্ত স্মৃতিটুকু স্মরণ করিয়া কত কাহিনী রচনা করিয়া চলিল। কিন্তু কোনটা সম্পূর্ণ হইল না। সহসা মনে পড়িল পাগলের পুঁটুলাটা এই ঘরেই আছে। কি আছে খুলিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল। জানালাটা খুলিয়া দিয়া খুঁজিয়া সেটাকে লইয়া বসিলাম। পাইলাম, দুইখানা ময়লা কাপড়, একটা শুকানো ফুল, একটা দেশলাই, টুকরা কয়েক দড়ি, একখানা মরিচা-ধরা ব্লেড, একটা সূচ, খানিকটা সুতা, একটা পেন্সিল, কয়টা পাথর, খানকয় খবরের কাগজ, মহাভারতের একখানা পাতা, একটা দেবনাগরী বইয়ের কয়খানা পাতা, সর্ব্বশেষে একখানা মোটা বাঁধান খাতা।

অনেক প্রত্যাশা করিয়া খাতাখানা খুলিলাম। প্রত্যাশা আমার সফল হইল—খাতাখানা ডায়েরীই বটে! মন আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। গোড়াকার পাতা উল্টাইয়া দেখিলাম, কিছুই বোঝা যায় না, লেখার উপরে আবার লেখা—একবার

নয়, তুইবার তিনবার—ইংরেজী বাংলা দেবনাগরী, নানা হরফের সংমিশ্রণে অপাঠ্য দুর্বোধ্য। পাতার পর পাতা উল্টাইয়া চলিলাম, কিন্তু সেই একই রূপ। একটা পাতায় লেখার উপরে খুব মোটা করিয়া লেখা—Who is She ?

আবার কিছুদূর গিয়া এক পাতায় খুব মোটা করিয়া লেখার উপরে লেখা—কি রূপ তার ?

শেষ পর্য্যন্ত হতাশ হইয়া খাতাখানা বন্ধ করিয়া দিলাম।

বসিয়া থাকিতেও ভাল লাগিল না। নীচে নামিয়া আসিলাম।

* * *

মনটা চিন্তাকুল হইয়াছিল, পাগলের অসম্পূর্ণ কাহিনীর সূত্র ধরিয়া মন তাহার জট ছাড়াইতে যেন ব্যস্ত! বড়মামা খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, খান-তুই পৃষ্ঠা আমাকে দিয়া বলিলেন—পড়।

কাগজের উপর চোখ রাখিয়াই বসিয়া রহিলাম। কিছু ক্ষণ পর বাহির দরজায় কে ডাকিল—রবিবাবু আছেন নাকি —রবিবাবু!

মামা তাড়াতাড়ি গিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া কাহাকে বলিলেন—আসুন, আসুন। কবে এলেন কাশী থেকে ?

মামার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন এক জন প্রৌঢ়, বৃদ্ধও বলা যায়। দেখিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াই মনে হইল। অন্ততঃ ব্যক্তিত্বে তাঁহার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলাম।

তক্তপোষের উপর বসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—আজই এগারটায় এসেই রসরাজের মৃত্যুসংবাদ শুনলাম। সে না কি আপনার বাড়ীতেই মারা গেছে। তাই এলাম একবার। কি হয়েছিল ?

বড়মামা বলিলেন—এ্যাপোপ্লেক্সি। খেয়ে উঠে হাত ধুতে ধুতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই মারা গেলেন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—রসরাজ আমার বাল্যবন্ধু ছিল। একসঙ্গে বি-এ পর্য্যন্ত পড়েছি। লোকে আমাদের ঠাট্টা করে বল্‌ত মাণিকজোড়। বি-এ পড়তে পড়তেই সে পাগল হয়ে গেল। রসরাজ ষ্টুডেণ্ট খুব ভাল ছিল। কিন্তু বেশী পড়তে পারত না সে। জানেন ত মস্তিষ্কবিকৃতি ওদের বংশের রোগ! ভদ্রলোক নীরব হইলেন। বড়মামা সহসা প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা লোকে বলে উনি শবসাধনা কি কালীসাধনা করতে গিয়ে পাগল হয়েছিলেন—কথাটা কি সত্যি ? আবার অনেকে বলে শেষ বয়সে না কি সিদ্ধও হয়েছিলেন।

ভদ্রলোক বলিলেন—কি বলব ? হ্যাঁ সাধনা বটে, তবে শবসাধনা কি কালীসাধনা নয়। অদ্ভুত সে কথা। কেউ হয়ত বিশ্বাস করবে না। একবার এক ডাক্তারকে বলেছিলাম—সে হেসে বলেছিল—ও সমস্তই তার বংশানুগত রোগের ক্রমপরিণতি।

বড়মামা বলিলেন—কি ব্যাপার একটু বলুন না। অবশ্য যদি বাধা না থাকে।

ভদ্রলোক বলিলেন—না, বাধা কিছুই নেই। বাধা আর কি ?

আমি আর কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না, বলিয়া ফেলিলাম—যদি বলতেন তাহ'লে— কথাটা শেষ করিতে পারিলাম না, ভদ্রতাবোধ মনের মধ্যে বড় হইয়া উঠিল।

বড়মামা বলিলেন—আমার ভাগ্নে এটি নীলমাধববাবু। রসরাজদা সম্বন্ধে ওর বড় কৌতূহল—তাঁকে ওর বড় ভাল লাগত। আর শিবু, ইনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত নীলমাধব ঘোষ, এখানকার কলেজের ফিলজফির প্রফেসার ছিলেন। এখন রিটায়ার ক'রে কাশীবাস করছেন।

আমি তাড়াতাড়ি নমস্কার করিলাম। প্রতিনমস্কার করিয়া নীলমাধববাবু বলিলেন, রসরাজকে আপনার ভাল লাগত ? শুনে আমার আনন্দ হ'ল। কিন্তু এখন ত আমার সময় হচ্ছে না, একটু কাজে বেরিয়েছি আমি। যাবেন দয়া ক'রে সন্ধ্যের সময় আমার বাড়ী—রবিবাবু, যাবেন ভাগ্নেকে সঙ্গে ক'রে। রসরাজের কথা শোনাব।

ভদ্রলোক বিদায়-নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন, যাইবার সময় আবার বলিয়া গেলেন—যাবেন সন্ধ্যেবেলা ভাগ্নেকে সঙ্গে করে।

* * *

সন্ধ্যায় নীলমাধববাবু বলিলেন—বহুক্ষণ থেকেই রসরাজের কথা ভাবছি। কিন্তু বৃদ্ধ হয়েছি—সব কথা ঠিক পর-পর মনে হচ্ছিল না। তাই ডায়েরীখানা বের করেছি, এ থেকেই বেছে বেছে শোনাই।···ওরে লছমন, চা নিয়ে আয়।

তাড়াতাড়ি বলিলাম—না, না, চায়ের প্রয়োজন নেই।

হাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—না, প্রয়োজন আছে—গৃহস্থের ধর্ম্ম এটা। সামান্য চা আর একটু মিষ্টিমুখ। 'না' বলবেন না, দুঃখিত হব।···আমার আজ বড় আনন্দ হচ্ছে রসরাজকে ভাল লাগত আপনার, তার কথা শুনতে চান আপনি।··· পাগল রসরাজকে দেখেছেন আপনি, সুস্থ সৌখীন যুবক রসরাজকে কল্পনা করতে পারবেন না। গৌর দেহবর্ণ, পেশী-সবল দেহ, মাথার চুলের পারিপাট্য, সৌখীন বেশভূষা—সে রূপ আমার চোখের সামনে আজও জল-জল করছে। আর পৃথিবীতে সে চলত অত্যন্ত লঘুভাবে—একটা আনন্দময় রহস্যপ্রিয়তার মধ্য দিয়ে। চিন্তাপ্রবণতার প্রতি একান্ত ভাবে বিমুখ ছিল সে, ব্যঙ্গ আর রহস্য করাই ছিল তার স্বভাব। এ নিয়ে একদিন তাকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম। সেইখান থেকেই আরম্ভ করি।

"১৯০৩ সালের ১২ই মার্চ্চ। আজ হরিসভায় এক পরিব্রাজক ভাগবৎধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। পরিব্রাজকটি নাকি পূর্ব্বে এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। সন্ধ্যায় বাহির হইব এমন সময় রসরাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। কথাটা বলিয়া বলিলাম—চল শুনে আসি।

রসরাজ মহা আপত্তি তুলিল, বলিল—তার চেয়ে গঙ্গার ধারে ব'সে চানাচুর খাই গে। বহুকষ্টে অবশেষে অভিমান করিয়া তাহাকে রাজী করিলাম। রসরাজের এই এক মহা-দোষ! চেষ্টা করিয়া সে লঘুচিত্ত হইতে চায়, Eat, drink and be merry—কথাটাকে যেন সার সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে!

হরিসভায় প্রবেশ-মুখে রসরাজ দাঁড়াইয়া বলিল, নাঃ—তুই যা, আমি যাব না।

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—কেন?

অদ্ভুত একটা ভঙ্গী করিয়া সে বলিল—আমার ঠোঁট নাক আর কাঁধের কাছগুলো কেমন সুড় সুড় করছে।

বিরক্ত হইয়া বলিলাম—তাতে কি হয়েছে?

মহাগম্ভীর ভাবে সে বলিল—ঠোঁট আর পালক গজাবার লক্ষণ পাচ্ছি। ওখানে গিয়ে জোড়হাত করে বসলেই আমি গরুড়পক্ষী হয়ে যাব।

বলিয়াই সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। আমিও আর ডাকিলাম না, দেখিলাম একছড়া বেলফুলের মালা কিনিয়া, একটা এক্কাতে সওয়ার হইয়া বলিল—চল ষ্টেশন। নীলমাধব বাবু সে পৃষ্ঠাটা উল্টাইয়া বলিলেন—তার পরের দিন—১৩ই মার্চ্চ।

"সকালেই রসরাজ আসিয়াছিল, তাহার সহিত কথা বলি নাই। সে-ই বলিল—রাগ ক'রেছিস?

কঠোরভাবেই বলিলাম—হ্যাঁ।

—কেন?

—সে প্রশ্ন করতে তোর লজ্জা হয় না? মানুষের জীবন কি হালকা পালক যে, বায়ুমণ্ডলে ভেসে ভেসে বেড়াবে?

অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল—দেখ, এটা এখন আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। কিন্তু চেষ্টা ক'রে আমি এটা আরও করেছি।

তিরস্কার করিয়া বলিলাম—জানি, কিন্তু কেন? তার যুক্তি কি?

সে তাহার অভ্যস্ত রহস্যের ভঙ্গীতে বলিল—মাফ্! তর্কে আমি হার মানছি। তর্ক হ'তে বিরক্তি, বিরক্তি হ'তে ক্রোধ, ক্রোধ হ'তে অনর্থ! মাফ্!

আমি বিরক্তিভরে চুপ করিয়া রহিলাম। সে বলিল হাস ভাই একটু! আমি তবুও চুপ করিয়া রহিলাম। এবার সে মৃদুস্বরে বলিল—আমাদের বংশের রোগের কথা তুই ভুলে গেলি? ভাবপ্রবণতাকে আমি বড় ভয় করি নীলু; সেই জন্যে বি-এ পরীক্ষাতে আমি ফিলজফি নিই নি। সে ত তুই জানিস।

সম্মুখে দর্পণ ছিল না, দেখি নাই আমার প্রতিবিম্বের কি রূপ হইয়াছিল, কিন্তু মনে মনে বড় ছোট হইয়া গেলাম, সকরুণ বেদনাও অনুভব করিলাম।"

এই সময় চাকরটা চা ও জলখাবার লইয়া আসিল।

* * *

কিছুক্ষণ পর নীলমাধববাবু আবার পড়িলেন—১৯০৩, ২৭শে নবেম্বর।

"আজ গঙ্গার ওপারের চরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমি ও রসরাজ। লোকে ঠাট্টা করিয়া আমাদের বলে মাণিকজোড়। গঙ্গা ও গণ্ডকের সঙ্গমস্থলে এক সাধুকে দেখিলাম। সাধুকে দেখিয়া আমার ভক্তি হইল। লোকটি প্রাচীন, ঈশ্বরকে না দেখিলেও বহুকে সে দর্শন করিয়াছে।

রসরাজকে বলিলাম—যাবি সাধুর সঙ্গে আলাপ করতে?

সে গান ধরিয়া দিল, 'যে যাবার যাক্ সই রে, আমি ত যাব না জলে।'

আমি বিরক্ত হইয়া তাহাকে ফেলিয়াই সাধুর কাছে চলিয়া গেলাম। আমি সাধুকে প্রণাম করিলাম, তিনি প্রতিনমস্কার করিলেন। সাধু পরিষ্কার বাংলায় বলিলেন—আসুন বাবা, বসুন। আমার ঘর নেই বাবা, আসন দিতে পারছি না!

আমি সবিনয়ে বলিলাম, না-না, কোন প্রয়োজন নেই বাবা। বেশ বসেছি আমি।

সাধু বলিলেন—এপারের চরে বুঝি বেড়াতে এসেছেন?

—হ্যাঁ বাবা, আমি আর আমার ঐ বন্ধুটি। অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে আমি রসরাজকে দেখাইয়া দিলাম। ছোট ছেলের মত এত ক্ষণ সে বালির ঘর তৈরি করিতেছিল। হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া আমাকে বলিল—আয় ফিরব।

সাধু বলিলেন—বসুন বাবা, বসুন।

রসরাজ উত্তর দিল—না বাবা, ধন্য হয়ে যাব।

সাধু হাসিয়া বলিলেন—ধন্য হওয়া ত সোজা নয় বাবা! ধন্য হতে পারা চাই, ধন্য করতে পারাও চাই। মণি এবং কাঞ্চন দুইই দুর্লভ বস্তু।

রসরাজ এবার চাপিয়া বসিল, বলিল—আপনি ধন্য হয়েছেন বাবা?

সাধু এ কথার কোন জবাব দিলেন না। কিছু ক্ষণ পর বলিলেন—আচ্ছা বাবা, আপনাকে একটি প্রশ্ন করব।

বাধা দিয়া রসরাজ বলিল—মাফ্! কলেজে মাইনে দিই তাই পরীক্ষা নেয়, উপরন্তু ফাউ নেয় ফি। আপনার কাছে পরীক্ষা দিতে হ'লে কিছু লাগবে না ত?

সন্ন্যাসী এক বিচিত্র হাসি হাসিলেন, বলিলেন—সংসারে

অমৃতের ভাগটুকুই আগে ছেঁকে খেয়ে শেষ করলে বাবা? বিষটাই ফেলে রাখলে?

আমি রসরাজকে আঙুল টিপিয়া নিষেধ করিলাম, কিন্তু তাহার ঘাড়ে যেন ভূত চাপিয়াছে, সে বলিল—ঈশ্বরকে আপনি দেখেছেন বাবা?

সাধু কোন উত্তর দিলেন না। আমি আবার রসরাজকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিলাম। কিন্তু সে গ্রাহ্য করিল না, আবার প্রশ্ন করিল—আচ্ছা ঈশ্বর কি ভূত?

সাধু এ কথারও কোন জবাব দিলেন না।

সে আবার প্রশ্ন করিল—আচ্ছা এত তপিস্যে ক'রে কি দেখলেন বলুন ত? ভূত না প্রেত?

সাধু এবার বলিলেন—বাবা, দেখলাম কি জান, দেখলাম এই যে সবুজ পৃথিবীর বুক, ওটাই পৃথিবী নয়। সবুজটা হ'ল আবরণ, পৃথিবীর মধ্যে দেখলাম কেবল অস্থি আর মেদ। মেদিনীই হ'ল ঠিক নাম।

রসরাজ চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলিল—ও। তা হ'লে মেদিনীপুরই হ'ল পৃথিবী।

আমি এবার তাহার দুইটি হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলাম—আয়, উঠে আয়।

রসরাজ উঠিতে উঠিতে বলিল—বললেন না বাবা, ঈশ্বর কেমন আপনার? ক'টা তার হাত, ক'টা তার পা?

সাধু এবার ঈষৎ কঠিন স্বরে বলিলেন—ঈশ্বরের ক'টা হাত ক'টা পা তা ত জানি না বাবা, তবে এটা জেনেছি যে, তার স্বভাব হ'ল প্রতিধ্বনির মত। যেমন সুরে তুমি কথা বলবে ঠিক সেই সুরে সে উত্তর দেবে। রহস্য কর সেও রহস্য করবে।

বাধা দিয়া রসরাজ বলিল—ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেব বাবা, ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেব।

সাধু এবার হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অদ্ভুত শক্তিশালী কণ্ঠ, কিন্তু তারও চেয়ে অদ্ভুত সে হাসির স্বর-বিন্যাস। শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। রসরাজ স্তব্ধ হইয়া সাধুর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, আমি তাহাকে টানিয়া লইয়া আসিলাম। এপারে নামিয়া রসিক বলিল—লোকটা কি বললে বল ত?"

* * *

একটু বিশ্রাম লইয়া নীলমাধববাবু বলিলেন—এর মাস-ছয়েক পরেই শহরে প্লেগ দেখা দিল। বিখ্যাত প্লেগের বৎসর। গ্রীষ্মকালের আগুনের মত দুর্দ্দান্ত প্রকোপে সমস্ত শহরটার মধ্যে রোগ ছড়িয়ে পড়ল।

তার পর আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—কল্পনা করতে পারবেন না সে যে কি ভীষণ! দলে দলে লোক শহর ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করলে। আমার যাওয়া হ'ল না। আমার বাবা ছিলেন পক্ষাঘাতে পঙ্গু, তাঁকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'ল না। তিন-চারটি পাগল নিয়ে রসরাজও কোথাও যেতে সাহস করলে না। শহরের সে এক ম্রিয়মাণ ভাব, পথে মানুষ নেই, পথ চলতে গা ছম-ছম করে; মনে হয় কোন গলি থেকে প্লেগ এসে হাসতে হাসতে সামনে দাঁড়াবে। ঘরে জোরে কথা কইতে সাহস হয় না, মনে হয় সাড়া পেয়ে প্লেগ এসে টুঁটি টিপে ধরবে। কাক চিল পর্য্যন্ত শহর ছাড়লে, শ্মশানের মাথায় হ'ল তাদের বসতি। শহরের মানুষের সাড়ার মধ্যে শুধু কান্না। বলব কি আপনাকে, ট্রেনে যারা যেত তারা ষ্টেশন থেকে কান্নার শব্দে শিউরে উঠত। ক্রমশ রসরাজের বাড়ীতে প্লেগ ঢুকল। তার মা গেল, বোন গেল, শেষ গেল তার ভাইটি।

তার পর ডায়েরী হইতে পড়িলেন,

"রসরাজের ভাই আজ মারা গেল। কিন্তু মানুষের স্বভাবের কি পরিবর্ত্তন হয় না! সৎকার-শেষে স্নান করিতে করিতে রসরাজ বলিয়া উঠিল, ফুরোলো বাগানের আম কি খাবি রে হনুমান!

জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, সে ব্যঙ্গভরে হাসিয়া বলিল—মৃত্যুকে বলছি।

রসিককে আজ আমাদের বাড়ীতে রাখিলাম।"

—এরই পরের দিনের ডায়েরী, শুনুন।

"ভোরে উঠিয়াই রসরাজের খোঁজ করিলাম, দেখিলাম সে নাই। বোধ হয় নিয়মমত বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। আমি ।"

নীলমাধববাবু বলিলেন—থাক রসরাজের কথা শোনাই। শুনুন।

"রসরাজ ফিরিয়া আসিল। তাহাকে বলিলাম—কোথায় গিয়েছিলি?

শ্রান্ত-ম্লান কণ্ঠে সে বলিল—বেড়াতে। উঃ, কি অদ্ভুত শহরের অবস্থা! এত কান্না আমি একসঙ্গে কখনও শুনি নি! আশ্চর্য্য এতদিন শুনতে পাইনি, আজ যেন হঠাৎ শুনলাম। উঃ, এত কান্না!

রসরাজের চোখে জল ছল ছল করিতেছিল।

বলিলাম—মন খারাপ করিস নে রসরাজ।

সে বলিল—আমি আরাম চলে যাই নীলু। এ আমি আর সহ্য করতে পারছি নে। এই সাড়ে ন'টার ট্রেনেই চলে যাই।

রসরাজকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আসিলাম।"

তার পর মুখ তুলিয়া নীলমাধববাবু বলিলেন—ঠিক তিন দিন পর। কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া তিনি পড়িলেন,

"ভোরে উঠিয়া বাহিরে আসিয়াই দেখিলাম বাহিরে

একখানা চেয়ারে রসরাজ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। আমি শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম,—রসরাজ তুই!

সে বলিল—হ্যাঁ। পারলাম না সেখানে থাকতে, পালিয়ে এলাম। সেখানেও এই।

চমকিয়া প্রশ্ন করিলাম—প্লেগ?

—না। মৃত্যু—কান্না।

আমি নীরব বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। রসরাজ বলিল—ষ্টেশনে নেমে শহরে ঢুকছি দেখলাম এক শব চলেছে। আবার কাল বিকেলে একদল ছেলে রাস্তায় খেলা করছিল। আমি দাঁড়িয়ে তাদেরই খেলা দেখছিলাম। হঠাৎ একখানা ঘুড়ি উড়ে এসে সুমুখের একখানা বাড়ীর ছাদের আল্‌সেতে আটকে গেল। একটা ছেলে ছুটল। ছাদে উঠে আল্‌সের ওপর ঝুঁকে ঘুড়িখানা ধরলে। কিন্তু আশ্চর্য্য ঘুড়িখানা হাত থেকে ফসকে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি ঝুঁকল—অমনি ঘাড় নীচু ক'রে একবারে নীচে একখানা পাথরের ওপর এসে পড়ল। উঃ, সে কি রক্ত আর তার মায়ের কি কান্না!

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। রসরাজ আবার বলিল—উঃ, পৃথিবীতে অহরহ মৃত্যু-তাণ্ডব চলেছে—তার বিশ্রাম নেই, সুপ্তি নাই, উঃ। আমি কানে শুধু শুনছি কান্না। অবিরাম অহরহ যেন অনেক লোক একসঙ্গে কাঁদছে।

বলিলাম—উপায় কি? ও নিয়ে মন খারাপ ক'রে হবে কি?

সে প্রশ্ন করিল—মৃত্যু কি?

চিন্তা না করিয়াই বলিলাম—ও একটা নিয়ম।

সে বলিল—না। আমি যে প্রত্যক্ষ দেখলাম তার একটা নিষ্ঠুর কৌতুকময় আকর্ষণে সে ছেলেটার হাত থেকে ঘুড়িটা কেড়ে নিলে, তাকে ব্যঙ্গ-কৌতুকভরে নীচে আকর্ষণ করলে।

এ কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, সত্যই আকস্মিক মৃত্যুর মধ্যে একটা নিষ্ঠুর কৌতুক প্রত্যক্ষ করা যায়।

রসরাজ হঠাৎ বলিল—আজ সেই সাধুর কথা আমার মনে পড়ছে। ঘাস পৃথিবী নয়—পৃথিবীর মধ্যে আছে শুধু অস্থি আর মেদ। পৃথিবীর নাম মেদিনী! আচ্ছা, লোকটা কি আমায় অভিশাপ দিয়ে গেছে? আমার ভয় হচ্ছে নীলু, বোধ হয় আমি পাগল হয়ে যাব। ওরে, এ যে আদি-অন্তহীন চিন্তা! সে কাঁদিয়া ফেলিল।

রসরাজকে যত্ন করিয়া স্নানাহার করাইলাম, জোর করিয়া শোয়াইলাম। রাত্রে চাকরটা ডাকিয়া বলিল—বাবুজী—ছাদ'পর আদমী উঠা হ্যায়। চোট্টা ডাকু মালুম হোতা! অনেক সাহস করিয়া ছাদে উঠিয়া দেখিলাম, রসরাজ দাঁড়াইয়া আছে। গভীর রাত্রি, মাঝে মাঝে এখান ওখান হইতে শ্রান্ত কান্নার স্বর শোনা যায় শুধু। রসরাজ তাহাই দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল।"

তার পর মুখ তুলিয়া নীলমাধব বাবু বলিলেন, ক্রমে ক্রমে প্লেগ কম প'ড়ে এল। রসরাজ কিন্তু কলেজ ছেড়ে দিলে। ক্রমশ তার দেখা পাওয়াও ভার হয়ে উঠল। আমার পরীক্ষার বৎসর, তবু তাকে ধরবার অনেক চেষ্টা করলাম। ইচ্ছা ছিল পরীক্ষাটা দেওয়াব ওকে। কিন্তু দেখা পেলাম না। কোথায় থাকে, কোথায় যায় কেউ বলতে পারলে না। ক্রমে শুনলাম, রাত্রে নাকি শ্মশানে ব'সে থাকে রসরাজ। তারপর চার মাস পর—দাঁড়ান পড়ি। চিহ্ন দেওয়াই ছিল, তিনি খুলিয়া পড়িলেন,

"আজ রসরাজকে ধরিয়াছিলাম। তাহার বাড়াতেই পাইলাম। দেখিলাম একগাদা বই লইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু কি চেহারা হইয়াছে তাহার! মুখে দাড়ি গোঁফ গজাইয়াছে, মাথায় বড় বড় চুল, সেগুলা রুক্ষ বিশৃঙ্খল। বলিলাম—এ কি চেহারা হয়েছে তোর?

সে উত্তর দিল—ও কিছু না!

আমি বলিলাম—কিন্তু ব্যাপার কি তোর? কলেজ ছাড়লি কেউ বলছে শ্মশানে যাস তুই কালী সাধনা করতে! কি হ'ল তোর?

রসরাজ বলিল—সেই কান্না! আশ্চর্য্য মন হয়েছে নীলু—আশ্চর্য্য দৃষ্টি, আশ্চর্য্য শ্রবণশক্তি আমার। মৃত্যু কি, কি তার রূপ, কোথা তার বাস—এ ভিন্ন চিন্তা নেই, মৃত্যু ভিন্ন চোখে কিছু দেখতে পাই না, কান্না ভিন্ন কিছু শুনতে পাই না। অহরহ যেন অনেক লোক একসঙ্গে কাঁদছে।

আমি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

সহসা সে করুণ নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি নীলু! সেই সাধু—! সে চুপ করিল। আবার বলিল—ডাক্তার বলে, এ চিন্তা আমার রোগের একটা সিম্পটম।

বলিলাম—চিকিৎসা করা।

—চেষ্টা করেছি। কিন্তু নিয়ম প্রতিপালন করতে পারি না।

অনেক ভাবিয়া বলিলাম—বিয়ে কর তুই রসরাজ!

তখন সে চিন্তাকুল, উত্তর দিল—মৃত্যুকে কে নিবারণ করবে?

এ কথার উত্তর নাই, চুপ করিয়া রহিলাম।

সে বিশৃঙ্খল চুলের মধ্যে হাত চালাইয়া বলিল জটিল রহস্য! যত পড়ছি তত দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠছে। সব ভ্রান্ত—সব কল্পনা। পড়ে কিছু পাচ্ছি না, রাত্রির পর রাত্রি শ্মশানে কাটিয়েও কিছু পেলাম না। কে সে মৃত্যু, কি তার রূপ, কোথা তার বাস? কল্পনাও করতে পারি না, বর্ণহীন, স্পর্শহীন, আস্বাদহীন, গন্ধহীন, শব্দহীন—সর্ব্বোপরি সে

স্থানহীন। পঞ্চভূতের যখন বিনাশ আছে তখন ত সে পঞ্চভূতাতীত, সুতরাং স্থানহীন, ব্যোমেরও অতীত সে। উঃ—।

রসরাজ পিঠ হইতে আঙ্গুলে টিপিয়া কি একটা ধরিয়া আনিয়া সেটাকে মানুষের অভ্যাসমত পিষিয়া মারিতে গিয়া নিরস্ত হইল। সেটাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল—আহা-হা—মরে যাবে!

একটা মৌমাছি সেটা। রসরাজের পিঠে দংশন করিয়াছিল।"

নীলমাধব বাবু ডায়েরী বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন—এর পরই আমি কলকাতা চ'লে যাই। মাস চারেক পর ফিরে এসে শুনলাম রসরাজ নাকি সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছে। গেলাম তার কাছে। আমায় দেখেই বল্‌লে—দাঁড়া। বলেই আমার চারিদিকে ফুঃ-ফঃ করে ফুঁ দিতে আরম্ভ করলে। চোখে জল এল, তবু বল্‌লাম—ও কি হচ্ছে? খুব গম্ভীরভাবে সে বললে—তোর চারি পাশে মৃত্যু, ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছি।

পাগলের দুর্বোধ্য ডায়েরীর পাতায় মোটা অক্ষরে লেখা কয়টি কথা আমার মনে পড়িল—কে সে? কি তার রূপ?

নীলমাধব বাবু বলিলেন—আমি ভাবি রসিক পাগল হ'য়ে হাসল না কেন? হাসির প্রতিধ্বনি কি কান্না?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলমান

রেজাউল করীম, এম-এ, বি-এল

কিছু দিন পূর্ব্বে মাননীয় ঢাকার নবাব-সাহেব যখন বঙ্গ-সাহিত্য বিজয় করিবার জন্য আস্ফালন করিয়াছিলেন, তখনই আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল, এই আন্দোলন এখানে শেষ হইবে না, ক্রমে ক্রমে ইহা সীমা লঙ্ঘন করিয়া অন্যত্র সংক্রামিত হইয়া পড়িবে। এখন দেখিতেছি, আমাদের এই সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নহে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একটা অভিযান আরম্ভ হইয়াছে। নবাব-সাহেবের সেই বিখ্যাত বক্তৃতার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত যে-সব ঘটনা ঘটিয়া গেল, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট অনুমিত হইবে যে, এ দেশের ভাষা, সাহিত্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একটা বিরাট্ ষড়যন্ত্র চলিতেছে। এই ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য মুসলমান-সমাজের গতি রাজনীতি হইতে ফিরাইয়া আনিয়া এই সব বিষয়ের দিকে পরিচালিত করা। যদি কোন-না-কোন প্রকার হিন্দু-বিরোধী আন্দোলনে মুসলমান-দের সমুদয় শক্তি নিয়োজিত হয়, তবে হয়ত মুসলমান-সমাজ সরকারের কার্য্যের প্রতিকূল সমালোচনা অথবা প্রগতিশীল রাজনীতি চর্চ্চা করিবার অবসর পাইবে না। আর সেই সুযোগে, এক রূপ বিনাবাধায়, সগৌরবে বাংলার বুকে সাম্রাজ্যবাদের বিজয়রথ চলিতে থাকিবে, তথাকথিত শাসনসংস্কারকে কার্য্যকরী করা সম্ভব হইবে।

হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকিলে তাহার প্রতিবাদ করিও না, অথবা কোনও রূপ প্রতিকারের চেষ্টা করিও না,—আমরা কোনও দিনই এ কথা বলিব না। বরং ইহাই বলিব যে তাহার প্রতিকারের জন্য সর্ব্বপ্রকার সঙ্গত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রতিবাদ ও প্রতিকারের কথাটা সম্মুখে রাখিয়া অন্য কোনও নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য যদি কোন আন্দোলন করা হয় তবে কোনও স্বদেশপ্রাণ মুসলমান তাহাতে যোগদান করিবে না। কারণ তাহাতে মূল অভিযোগ দূর হইবে না, কিন্তু যে নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আন্দোলন হইবে, তাহাই সিদ্ধ হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, আমরা তাহাকে এই শ্রেণীর বস্তু বলিয়া মনে করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ

আনয়ন করা হইয়াছে নিরপেক্ষভাবে তাহার বিচার করা দরকার। তৎপূর্ব্বে একটা কথা বলিয়া রাখিতেছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারে এখনও যে-সব ত্রুটিবিচ্যুতি আছে, এই আন্দোলনকারীরা সে-সব বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেন নাই। সেরূপ করিলে দেশ-বাসীর বিশেষ উপকার হইত, বিশ্ববিদ্যালয়ও দোষমুক্ত হইতে পারিত। তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশোধনের জন্য কোনও গঠনমূলক প্রস্তাব পেশ করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র অনুরোধ জানাইয়াছেন, সরকার বাহাদুর যেন বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্তক্ষেপ করেন। এই অনুরোধই তাঁহাদের গোপন উদ্দেশ্য নগ্নমূর্ত্তিতে প্রকটিত করিয়াছে। বলিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষমুক্ত করা তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য নহে, যেন-তেন-প্রকারে উহার বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন খাড়া করিয়া উহার স্বাতন্ত্র্যটুকু নষ্ট করাই হইল এই আন্দোলনের মূল অভিপ্রায়। বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত কোন বিষয়েই তাঁহাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই। চাকরি-সমস্যা অথবা ব্যবস্থাপক সভার জন্য আসন-সমস্যা এক বস্তু আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা একেবারে ভিন্ন বস্তু। এই দুই বস্তুকে একাসনে রাখিয়া একই দৃষ্টিতে দেখিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে, বাংলা-সাহিত্যের উপর হিন্দুদের যে এত প্রভাব তাহা হিন্দুদের পক্ষ হইতে কোনরূপ ষড়যন্ত্রের ফলে নহে। তাহা নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছে। ঠিক সেই কথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলায় প্রযোজ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর হিন্দুদের প্রভাব যে প্রবল তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তাহা কোনও ষড়যন্ত্র বা চক্রান্তের ফলে হয় নাই, তাহাও সাহিত্যের মত স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছে। প্রথম যুগ হইতেই মুসলমানদের অবহেলা, উদাসীনতা এবং প্রাচীন পন্থা ও গতানুগতিকতাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মুসলমানরা "নির্ব্বাসিত" হইয়াছে। সেই যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত মুসলমানদের মক্তব-মাদ্রাসা ও মধ্যযুগীয় শিক্ষার প্রতি আগ্রহ একটুও কমে নাই। ইংরেজী ভাবধারা প্রচারের একমাত্র প্রতীক বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁহারা কোনও দিন স্নেহের চক্ষে দেখেন নাই। সময়ের সহিত তাল রাখিতে না পারিয়া মুসলমানরা একটা মস্ত সুযোগ হারাইয়াছে। হিন্দুরা সে সুযোগ ত হারায় নাই, বরং তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া নিজেদের কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লইয়াছে, এটা কি তাহাদের মস্ত বড় অপরাধ? সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর হিন্দুদের যে প্রাধান্য হইয়াছে তাহাকে উহাদের "হীন ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত" ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করা নিতান্ত অন্যায়। তাহাদের এই প্রাধান্য কোন চক্রান্তের ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাহা সম্ভব হইয়াছে একেবারে স্বাভাবিক ভাবে ও স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে। যখন দেশের প্রত্যেক স্তরে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেই সময় আবার নূতন করিয়া সাম্প্রদায়িকতার অনলে ইন্ধন জোগাইয়া দেওয়া ঘোর অন্যায়। ইহাতে মুসলমানদের অগ্রগতির পথে অভিনব বাধা উপস্থিত হইবে।

রাজনীতির সাম্প্রদায়িকতাকে সাহিত্যে আমদানি করিলে সর্ব্বত্র যে কুফল হয়, মুসলমানদের বেলায়ও তাহাই হইবে। ইহাতে সত্যকারের সাহিত্যচর্চ্চায় ত ব্যাঘাত ঘটিবেই, তাছাড়া ধর্ম্মান্ধতা আসিয়া সমাজের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিকে কলুষিত করিয়া দিবে। সাহিত্য সমগ্র জগদ্বাসীর উপভোগের সামগ্রী। যদি কোথাও দেশ কাল ধর্ম্ম ও জাতির বিচার না থাকে তবে তাহা সাহিত্যজগতে। কোনও লেখক যখন স্বীয় রচনা প্রকাশিত করেন, তখন তাহা হইয়া পড়ে সারা বিশ্বের সম্পদ। বিশ্ববাসী তাহা হইতে রসাস্বাদন করিতে থাকে। তাহার ধর্ম্মভাব দ্বারা কেহই বিভ্রান্ত হয় না। রচনার নিজস্ব গুণ না থাকিলে তাহা বেশী দিন টিকে না, কিন্তু রচনার মধ্যে প্রকৃত সম্পদ থাকিলে তাহা কালজয়ী হয়। 'পিলগ্রীমস্ প্রোগ্রেস', 'প্যারাডাইজ লষ্ট্', 'প্যারাডাইজ রিগেণ্ড', 'ইমিটেশন অব ক্রাইষ্ট' প্রভৃতি ধর্ম্মভাবমূলক অমূল্য পুস্তক পড়িয়া ভারতের কোনও হিন্দু অথবা মুসলমান, খ্রীষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন অথবা তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন, এমন কথা কেহই বলিতে পারেন না। আবার কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণের অমর গ্রন্থ পড়িয়া কেহ "শুদ্ধি" হইয়া যান নাই, অথবা হিন্দুধর্ম্মের অন্ধপূজকও হন নাই। ঠিক সেইরূপ ফিরদৌসী, হাফেজ, রুমী, ওমর খৈয়াম পড়িয়া কোনও অমুসলমান ইসলামের শান্ত শীতল ছায়ার তলে আশ্রয় লইতে আসেন নাই। যদি কেহ ভক্ত হইয়া থাকেন,

তবে সেই কবিরই ; আর যদি কেহ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, তবে সেও সেই কবির অমর অবদানের প্রতি। হিন্দুর পক্ষে ওমর খৈয়াম বা মিলটনের প্রতি, অথবা খ্রীষ্টানের পক্ষে কালিদাসের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া যদি অন্যায় না হয়, তবে মুসলমানের পক্ষেও ভিন্নধর্মী কবি ও লেখকের প্রতি সেইরূপ আকৃষ্ট হওয়া কোন মতেই অন্যায় হইবে না। রসপিপাসু পাঠক আপন আপন রুচি ও শিক্ষা অনুসারে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কবির ভক্ত হইয়া থাকেন। কাহারও নিকট শেক্‌স্‌পীয়র আদর্শ কবি, কাহারও আদর্শ শেলী, কাহারও হাফেজ, কাহারও কালিদাস, ইত্যাদি। অপর দেশীয় ও অপর সম্প্রদায়ের কবিকে নিজের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলেই কি সে 'কাফের' হইয়া যাইবে? দাড়ি কামাইলে, গানবাজনা শুনিলে 'কাফের' হইবে এই ফতোয়া যাহারা দিয়া থাকেন তাঁহাদের নিকট সবই সম্ভব। কিন্তু আমরা ইংরেজী-শিক্ষিত মুসলমানদের নিকট নিবেদন জানাইতেছি, তোমাদেরও কি এই মত? এইরূপ ধর্ম্মান্ধতার দ্বারা তোমরাও কি চালিত হইবে? আমাদের মনে হয়, অন্য দেশের ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইলে, অথবা তাহার কোনও অংশ ভাল বলিয়া গ্রহণ করিলে ধর্ম্মনাশের কোনই ভয় থাকে না। সুতরাং বাংলা ভাষার বিভিন্ন লেখকের সহিত পরিচিত হইলে—এমন কি কাহারও ভক্ত হইয়া পড়িলেও—তাহাতে মুসলমানদের ভয়ের কোনই কারণ নাই। ইহাতে তাহাদের সংস্কৃতিও বিপন্ন হইবে না। বরং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাবধারার সংস্পর্শে আসিলে তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি পরিপূর্ণতা লাভ করিবে।

ইংরেজী সাহিত্য অথবা অন্য কোন ইউরোপীয় সাহিত্য ভালরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে বাইবেল ও রোম-গ্রীসের পৌরাণিক কাহিনী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। কারণ বড় বড় কবি ও সাহিত্যিকগণ এই সব কাহিনী হইতে বাছাই বাছাই উপমাগুলি নিজেদের রচনার মধ্যে এমন কৌশলে মিলাইয়া দিয়াছেন যে, সেই সব গল্প সম্বন্ধে ভালরূপ জ্ঞান না থাকিলে কেবল পাদটীকার উপর নির্ভর করিয়া সম্যক্‌রূপে রস আস্বাদন করা যায় না। অভিধানের সাহায্যে অর্থোদ্ধার করিতে গেলে একটা কিছু মানে পাওয়া যাইবে সত্য, কিন্তু তাহাতে কবির সহিত এক হইয়া রসাস্বাদন করা মোটেই সম্ভব হইবে না। শেক্‌স্‌পীয়র, মিল্টন, এ্যাডিসন, কীটস্‌, শেলী, কার্লাইল, রাসকিন, টেনিসন, ব্রাউনিং প্রভৃতি কবি ও লেখকগণ তাঁহাদের রচনার মধ্যে মুক্তহস্তে বাইবেল ও পৌরাণিক উপমা ছড়াইয়া দিয়াছেন—সেই সব ভালরূপে না জানিলে কেহই তাঁহাদের রচনা পড়িয়া প্রকৃত আনন্দ পাইবে না। উদাহরণ-স্বরূপ, মিল্টনের "To a Virtuous Lady" নামক একটি অমূল্য সনেটের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সনেটের প্রায় প্রতি পংক্তিতে কবিবর বাইবেলের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বহু বিষয় ভরিয়া দিয়াছেন। তিনি 'প্যারাডাইজ লষ্ট', 'প্যারাডাইজ রিগেণ্ড' এবং 'কোমাস'-এ রোম গ্রীসের কত উপকথা প্রয়োগ করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যের কবি কীট্‌সকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার 'Ode to Nightingale', এবং 'Ode on a Grecian Urn' ভালরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে বাইবেল ও পৌরাণিক কাহিনী সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা একান্ত দরকার। বোধ হয় এই কারণে বিদ্যালয়ে পূর্ব্বে Legends of Greece and Rome পড়ান হইত। এখন তাহা আর পড়ান হয় না। পদে পদে সংস্কৃতি-বিলোপের ভয় দেখাইলে উৎকৃষ্ট সাহিত্য হইতে জাতি চিরকালের তরে বঞ্চিত হইয়া থাকিবে।

বাংলা ভাষা ভালরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। কারণ বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ অধিকাংশ হিন্দু। তাঁহারা প্রাচীন সাহিত্য ও পৌরাণিক কাহিনী হইতে, ইউরোপীয় লেখকগণের মত, বহু উপমা নিজ নিজ রচনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই সব গল্প কাহিনী না জানিলে তাঁহাদের রচনা বুঝিতে কষ্ট হইবে। রামচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হইবার জন্য আমরা রামায়ণ না পড়িতে পারি, কিন্তু মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' পড়িবার জন্য আমাদের রামায়ণ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। সেইরূপ 'ব্রজাঙ্গনা,' 'তিলোত্তমা,' 'বৃত্রসংহার' প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থের সহিত পরিচিত হইতে হইলে হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানা আবশ্যক।

উপস্থিত বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্যিক উন্নতি এত কম যে, কেহ যদি মনে করে কেবলমাত্র মুসলিম-লেখকের উপর নির্ভর করিয়া বাংলা শিখিব, তবে তাহাকে হতাশ হইতে হইবে। অতীব লজ্জা ও দুঃখের সহিত ইহা আমাদিগকে

স্বীকার করিতে হইতেছে। সুতরাং হিন্দুসাহিত্যের উপর নির্ভর করা ব্যতীত বর্ত্তমানে অন্য পথ নাই। অতএব সেক্ষেত্রে হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনীর সহিতও পরিচিত হওয়া দরকার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলা সিলেক্‌শনে'র মধ্যে পৌরাণিক-কাহিনীপূর্ণ রচনা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, ইহা সত্য, কিন্তু তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে দোষ দেওয়া চলে না। কারণ সে-সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে আমরা এই অনুরোধ জানাইতেছি যে তাঁহারা যেন ভবিষ্যতে মুসলিম-সংস্কৃতির বিষয় পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবিষ্ট করেন। কারণ মুসলমানদের সম্বন্ধে হিন্দুদের কিছু কিছু জানা দরকার। পাঠ্যপুস্তক রচনা করিবার সময় আরও দেখিতে হইবে, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণাত্মক বিষয় যেন উহাতে কিছুতেই স্থান না পায়। উহাতে এমন সব বিষয় থাকা দরকার যাহাতে এক সম্প্রদায় অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবান, সহানুভূতিশীল ও প্রীতিভাবাপন্ন হইতে পারে। একে অপরকে যেন ঘৃণা করিতে না শিখে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একদেশদর্শী সমালোচকগণ উহার যে-সব দোষত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আংশিক সত্য কিছু থাকিলেও, তাহার অধিকাংশ বিদ্বেষমূলক, অসত্য ও প্রতিক্রিয়াশীল। বিদ্বেষ প্রচার করিয়া সমাজের কোনও অভিযোগের প্রতিকার হইবে না। যে উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনকে নিন্দা করা হয়, ইহাও তাহারই বহির্বিকাশ মাত্র। মুসলমান হইয়াও এই আন্দোলনে আমাদের যোগ না দিবার কারণ এই যে, আমরা মনে করি, ইহার দ্বারা মুসলমানদের লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক। ইহাতে সমাজের মধ্যে ধর্ম্মান্ধতা আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং ভ্রান্ত পথে মুসলিম-সংস্কৃতি রক্ষা করিতে গিয়া মুসলমানদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার প্রসার হইবে না। বাংলার এক শ্রেণীর মুসলমানের 'সুদৃঢ় ও সুচিন্তিত' বিশ্বাস সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সব কথা বলা সম্ভব হইবে না, তবে একান্ত কর্ত্তব্যবোধে দু-একটা কথা বলা দরকার মনে করিতেছি।

মুসলমানদের দেহ মন ও মস্তিষ্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু-প্রভাবিত সাহিত্য ও ইতিহাস পাঠ করিয়া আড়ষ্ট ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা মিথ্যা ও বিদ্বেষপ্রসূত ত বটেই; তাহা ছাড়া তদ্দ্বারা মুসলমানের বর্ত্তমান অধঃপতনের মূল কারণ উপলব্ধি করিবার যোগ্যতার অভাবই প্রতিপন্ন হইতেছে। হাজার হাজার মুসলমান যুবক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে লেখাপড়া শিখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব অনেক আছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন হিন্দু প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। এতদিন ধরিয়া হিন্দু সাহিত্য পড়িয়াও কোনও মুসলমান হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি ভক্তিমান হইয়া উঠে নাই। ভক্তি করা ত দূরের কথা, প্রত্যেক মুসলমানই মনে-প্রাণে পৌত্তলিকতাকে ঘৃণা করিয়া থাকে। হিন্দুদের পৌরাণিক দেবদেবীর কাহিনীর সহিত পরিচিত হইয়া তাহাদের সম্মুখে মাথা নত করিয়াছে এমন একটা মুসলমানও পাওয়া যাইবে না। রোমান, গ্রীক ও বাইবেলের কাহিনী পড়িয়াও কেহ সেগুলিকে আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করে না। এগুলিকে সকলেই সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া জানে, আর সেই ভাবেই পড়িয়া থাকে। ইহার মধ্যে প্রভাব বিস্তারের কথা আদৌ উঠিতে পারে না। আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্ত্তিত বাংলা-সাহিত্য পড়িয়া মুসলমান হিন্দুভাবাপন্ন হইবে বলিয়া যে ভয় করা হইতেছে তাহা অলীক—যুগযুগান্তর ধরিয়া পড়িলেও তাহা হইবে না। অপর ধর্ম্মের ত দূরের কথা, মুসলমানদের নিজ সমাজের মধ্যে যে-সব গালগল্প প্রচলিত আছে তাহাই তাহারা অবিশ্বাস করিতেছে; যথা, 'বাহিরা রাহেবের গল্প', 'বক্ষবিদারণকাহিনী', 'হজরত ঈসার বিনা বাপে জন্মের কথা, এবং তাঁহার এখনও জীবিত থাকিবার কথা', এই সব বিষয় তাহারা নানা যুক্তিতর্ক দ্বারা খণ্ডন করিতেছে, আর তাহারা অপরের পৌরাণিক কাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত হইবে! 'A thing of beauty is a joy for ever'—ইহাই যদি মানুষের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, তবে সে যেখানেই সৌন্দর্য্যের আস্বাদ পাইবে সেইখানেই যাইবে। সে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে সেই চিরবাঞ্ছিত সৌন্দর্য্যের জন্য প্রবেশ করিবে। বর্ত্তমান জগতের গতি কুসংস্কারের দিকে নয়,—সুতরাং পৌত্তলিকতা ও প্রকৃতিপূজার মোহে মানুষ অধিক দিন আকৃষ্ট থাকিবে না। কিন্তু উহার মধ্যে যদি সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায় তবে কেন তাহা গ্রহণ করিবে না?

নিজেদের সংস্কৃতি নাশের ভয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাহিত্য অবহেলা করিলে নিজেদেরই বঞ্চিত করা হইবে।

নিজেদের কালচার, সাহিত্য ও আদর্শ ব্যতীত অপর কাহারও কিছু জানিব না, শিখিব না ও বুঝিব না, এই নীতিতে যদি সকলেই চলিতে থাকে, তবে শুধু যে জ্ঞান ও সভ্যতার আদান-প্রদান হইবে না তাহা নহে, তাহাতে কাহারও সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্যক পরিপুষ্টও হইবে না। আজ মুসলিম কালচার বলিয়া যাহা প্রচলিত আছে তাহাতে মুসলমানদের নিজস্ব দান থাকিলেও, তাহাতে কি গ্রীসীয়, ইরাণীয় বা অন্যান্য কালচারের প্রভাব কিছুই নাই? মুসলমানদের নিজস্ব ভাবধারার সহিত নানা দেশের সভ্যতার সংমিশ্রণেই মুসলিম কালচার পরিপূর্ণ হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? আবার গ্রীক, রোমক ও আরব সভ্যতার সংস্পর্শে না আসিলে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি কখনই বর্ত্তমান আকার ধারণ করিতে পারিত না। তাহা হইলে পোপ-শাসিত মধ্য-যুগের মত সমগ্র ইউরোপে আজিও 'ডার্ক এজ'-এর প্রভাব থাকিত। হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতাও নানা ভাবধারার সংস্পর্শে আসিয়া আজ বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। যে সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তি থাকেন তাঁহারা অপরের ভাবধারাকে গ্রহণ করিয়াও নিজের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইতে দেন না। অনেকে তাহা পারে না, সুতরাং তাহারা পরের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। এই কারণে কত দেশের কত কালচার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ধ্বংস হইবার ভয়ে কূপমণ্ডুকতাও ভাল নহে। কাহারও কালচার যদি বাস্তবিকই ভাল হয়, কেন তাহা গ্রহণ করিব না? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে হিন্দু-কালচার ভরিয়া দিতেছে—তাহা না-হয় মানিলাম, কিন্তু বাস্তবিকই যদি হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে সার সত্য কিছু থাকে তবে তাহা গ্রহণ করিলে কি মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য, মর্য্যাদা ও আত্মসম্মান একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে? চুম্বকের মত তাহাদের ভাল অংশটুকু যদি আয়ত্ত করিতে পারি, তবে তাহাতে আমাদের লাভ ব্যতীত ক্ষতি হইবে না। তাহাতে মুসলমানদের **"শুদ্ধি"** হইয়া যাইবার কোনও ভয় নাই।

বাল্মীকি, হোমার, কালিদাস, শেক্‌সপীয়র, গ্যেটে, হাফেজ, রুমী, খৈয়াম প্রভৃতি মহাকবিগণ কোনও জাতি দেশ বা সম্প্রদায়-বিশেষের নহেন—ইহারা সমগ্র বিশ্বের সম্পদ। ইহাদের ভাবধারার সহিত পরিচিত হওয়া যে-কোন পাঠকের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়। কালচার ও ধর্ম্মনাশের ভয়ে যদি কেহ এই সকল মনীষীর জ্ঞানজগতের দ্বারদেশেও আসিতে না চায় তবে তাহার মানবজন্ম ব্যর্থ, তাহা তাহার পক্ষে অশেষ দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। আমাদের মনে হয় কোনও সংস্কারমুক্ত শিক্ষাব্রতী ধর্ম্মনাশের নামে এই সব মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিতে কুণ্ঠা বোধ করিবে না। মহাকবি গ্যেটে যে কালিদাসের গুণগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ শকুন্তলা সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি। অথচ তিনি হিন্দু সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, এমন অভিযোগ তাঁহার কোন শত্রুও করিতে পারেন নাই। মহামনীষী আল-বেরুণী দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতবর্ষে থাকিয়া ভারতীয় ভাষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সন্ধানে বহু গবেষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি হিন্দু হইয়া পড়িয়াছিল এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। বর্ত্তমান যুগের বাঙালী-মুসলমানই বা কেন বাংলা-সাহিত্য পড়িয়া হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে? বরং আমরা মনে করি দু-দশখানা "ছহি ছোনাভান" ও "গোলেবকাওলী" পড়ার চেয়ে একখানা 'শকুন্তলা', একখানা 'মেঘদূত', একখানা 'ফাউষ্ট', একখানা 'হামলেট', একখানা 'ইলিয়াড' পড়ার মূল্য অনেক বেশী। ইহাতে দেহ-মনের অবসাদ অনেকটা কাটিয়া যাইবে। একথা এই ধর্ম্মান্ধ সমাজকে কে বুঝাইবে? যাহারা এই সব অমূল্য সম্পদ হইতে সমাজের গতি ফিরাইয়া আনিয়া 'মধ্যযুগে'র আদর্শের দিকে লইয়া যাইতে চায়, তাহারা সমাজের যে কি সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহা চিন্তা করিলে দুঃখে অভিভূত হইতে হয়।

বিভিন্ন দেশের ভাবধারা ও সাহিত্যের সহিত পরিচিত হওয়ার মধ্যে যে সার্থকতা আছে, কূপমণ্ডুকতার মধ্যে তাহা নাই। মধ্যযুগের পোপ-প্রভাবিত খ্রীষ্টান ইউরোপ যেদিন রোম-গ্রীসের কালচারের সাক্ষাৎ স্পর্শ পাইল, সেই দিন হইতে তাহার সত্যকার জাগরণ আরম্ভ হইল। সেই সময় হইতে তাহার জ্ঞান প্রসারিত হইল, চিন্তাশক্তি অবারিত হইল। মানুষ শিখিল প্রত্যেক বিষয়ে সন্দেহ করিতে; এই সন্দেহ হইতে আসিল অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি—আর এই অনুসন্ধিৎসা হইতে

আসিল সৃষ্টির নব নব পরিকল্পনা, কাব্য, কলা, শিল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞান। ধর্ম্মান্ধতার জন্য মুসলমান যদি প্রতি পদে ভীত হইয়া পড়ে, সব কিছুকে পরিহার করে, নিজস্ব ব্যতীত অন্য কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করে, তবে তাহার অনুসন্ধিৎসার পথ একেবারেই রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এই সব বিভিন্ন দেশের জ্ঞান-রাশি আহরণ করিবার প্রকৃষ্ট সময় ছাত্রাবস্থায়—কেননা তৎপরে কর্ম্মজগতে প্রবেশ করিলে অবসর তাহার অল্পই থাকিবে।

সময় সময় দেখা যায়, কোন কোন জাতির এতদূর অধঃ-পতন হয়, মনোবৃত্তি এরূপ শোচনীয় হইয়া পড়ে যে তাহারা তাহাদের পতনের মূল কারণ নির্ণয় করিতে পারে না, তখন তাহারা যে-কোনও বিষয়ে একটু অসুবিধা ভোগ করে, মনে করে তাহাই বুঝি তাহাদের অধঃপতনের কারণ। কিন্তু কিছুকাল পরেই দেখা যায় যে, সে অসুবিধা দূর হইলেও তাহাদের অবস্থার একটুও উন্নতি হয় না। ব্যাধির মূল কারণ দূর না হইলে বাহ্যিক কতকগুলি লক্ষণ হ্রাস পাইলেই সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না। আমাদের বাঙালী-মুসলমানদের বেলায় এই কথাটা খুব খাটে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা একটু চিন্তাশীল, তাঁহারা চারি দিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এটুকু বুঝিয়াছেন যে, মুসলমানের মানবিকতা, তাহার দেহ মন ও মস্তিষ্ক আজ অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তাহাকে উদ্ধার করিতে হইবে। কিন্তু এই অধঃপতনের মূল কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া তাঁহারা মস্ত ভুল করিয়াছেন—সম্মুখে যাহাকে পাইয়াছেন তাহাকেই আক্রমণ করিয়া মনে করিতেছেন, ইহাতেই বুঝি আমাদের মুক্তি নিহিত আছে। যেখানে সিডিশ্যন আইনের ভয় নাই, প্রেস আইনের ভয় নাই, সেইখানে নিরাপদে তাঁহাদের সমস্ত আক্রমণ গিয়া পড়িল। তাঁহাদের এই আক্রমণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাটা "চিল-খাওয়া পাখী"র মত হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু যদি এই ভাবে যথা-তথা আক্রমণ চালাইয়া তাঁহারা মনে করেন সমাজের কল্যাণ-সাধন করিতেছি, আর সমাজ যদি মনে করে ইহাতেই তাহাদের কল্যাণ ও মুক্তি হইবে, তবে বলিব এ সমাজের উদ্ধার হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে।

মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ নির্ণয় করিবার জন্য এ প্রবন্ধ লিখিত হয় নাই। সুতরাং সে-বিষয়ে আমরা উপস্থিত কোনও কথা বলিব না, কিন্তু একথা দৃঢ়ভাবে বলিব, আজ যে মুসলমানদের দেহ-মন আড়ষ্ট ও অবসন্ন হইয়াছে তাহার জন্য দায়ী হিন্দু-প্রভাবিত বাংলা-সাহিত্য নয়, অথবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্পর্শে যাহারা কোনও দিনই আসে নাই, তাহারা কি এই আড়ষ্ট ভাব ও অবসাদ হইতে মুক্তি পাইয়াছে? আমাদের বিরাট্‌ 'আলেম' (পণ্ডিত) সমাজ, কোরআন আর হাদিস যাঁহাদের কণ্ঠস্থ, তাঁহাদের মানসিকতা কি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাস-করা ছেলেদের অপেক্ষা একটুও উন্নত? বরং পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, ইহারা মৌলবী মৌলানা অপেক্ষা চরিত্রবলে, উন্নত মানসিকতায় ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির প্রসারে অনেক বিষয়ে উন্নত। তাহা ছাড়া মুসলমান যুবকগণের সম্বন্ধে যে আড়ষ্টতা ও অবসাদের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে হিন্দু যুবকগণও কি মুক্তি পাইয়াছে? এদেশের শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে একটা সাধারণ অভিযোগ এই যে, ইহা 'মানুষ' তৈয়ার করে না—তৈয়ার করে কতকগুলি কেরাণী ও চাকরো। এই ত্রুটিবহুল শিক্ষাপদ্ধতি যুবকগণের মধ্যে অবসাদ ও আড়ষ্ট ভাবের জন্য কতকটা দায়ী তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু ইহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত বাংলা ভাষাকে দায়ী করা নিতান্ত ভুল। কিছু দিন পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষার জন্য কোনও পুস্তক অবশ্য-পঠিতব্য করেন নাই। তখন যে-সব মুসলমান সেখান হইতে পাস করিয়াছিলেন তাঁহারা কি এই অবসাদ ও পরমুখাপেক্ষিতার দারুণ অভিশাপ হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন? দেড় শত বৎসরের পরাধীনতায় দেশের সর্ব্বত্র ও সর্ব্বস্তরে যে একটা অবসাদ, তন্দ্রা ও পর-মুখাপেক্ষিতার ভাব লক্ষিত হইতেছে, মুসলমানদের মধ্যেও তাহাই দেখা যাইতেছে, আর সবগুলি একই কারণ-সম্ভূত। নিজ সম্প্রদায়ের অধঃপতন দেখিয়া অপর সম্প্রদায়কে তাহার জন্য দায়ী করিলে কেবলমাত্র সত্যের অপলাপ করা হইবে। বাংলার বাহিরে অন্যান্য দেশের মুসলমানগণ কি এই পরমুখা-পেক্ষিতা ও অবসাদের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছেন? বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের মুসলমান বুঝি একেবারে হজরত মহম্মদ যুগের আরববাসীদের মত? ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে তাহাদের মধ্যেও

সেই আড়ষ্টতা ও অবসাদ! আর যাঁহারা উচ্চশিক্ষিত তাঁহারাও মধ্যযুগকে বরণ করিয়া লইতে সম্মত নহেন। সেখানেও কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দু-সংস্কৃতি চড়াইতে গিয়াছে? সর্ব্বশেষে ভারতের বাহিরে গেলে কি দেখা যাইবে? খলিফা-প্রভাবাধীন তুরস্কের অবস্থার সহিত আজিকার তুরস্কের তুলনা করিলেই মুসলমানদের অধঃপতনের মূলীভূত কারণ স্পষ্ট বুঝা যাইবে। তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশ আজ তথাকথিত মুসলিম-সংস্কৃতি ও মুসলিম-সংহতির মোহে নিজেদের সর্ব্বনাশসাধন করিতে সম্মত নহে। তাহারা বিশ্বের যেখানে যাহা ভাল আছে তাহাই সংগ্রহ করিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে চায়। বাংলার মুসলমানদিগকেও আজ সেই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। মুসলমানদের অধঃপতনের ও শোচনীয় পরমুখাপেক্ষিতার মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে নিজেদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে—সমাজের অভ্যন্তরে গলদ থাকিলে, অপরকে তাহার জন্য দায়ী করিলে কোন দিনই নিজের সংশোধন হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া অথবা তাকে সরকারের করতলগত করিয়া দিতে সাহায্য করিয়া মুসলমানদের কোন লাভ হইবে না। আমরা ইহা বেশ জানি, সমাজের উপর অপ্রতিহতভাবে নেতৃত্ব চালাইতে গেলে এক-আধটু হিন্দুবিরোধী আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত না থাকিলে চলিবে না। কিন্তু তাহার জন্য ত রাজনীতির প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। বাঁটোয়ারা, চাকরি-সমস্যা, বাজনা-সমস্যা—এই সবই ত হিন্দুবিরোধী কার্য্যের বেশ উত্তম ও ভাইটামিন-যুক্ত খোরাক জোগাইতে থাকিবে। এসব ছাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর শ্যেনদৃষ্টিপাত করিবার কি দরকার? যাহাকে-তাহাকে দিয়া, কতকটা বেনামী ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে গরম-গরম ভাষায় দু-একটা প্রবন্ধ লিখাইয়া লইলেই সব কাজ ফরসা হইবে না। আমাদের অভাব মোচন করিতে হইলে তাহার অন্য উপায় আছে। শিক্ষা-সংস্কার করিতে হইলে, বর্ত্তমানে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু হইতেছে অজস্র টাকার। সমাজের নিকট হইতে এই অর্থ আদায় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করুন, মুসলিম-সংস্কৃতির উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন বিভাগ খুলিয়া দিন, কয়েক লক্ষ টাকা দিয়া উচ্চ আলোচনার (higher studies) জন্য কোরআন ক্লাস, হাদিস ক্লাস খুলিয়া দিন, ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন বিভাগ পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিন। আর এই সব ইসলামী বিভাগে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যে তাহাতে কোন অমুসলমান পড়িতে আসিলে সে যেন পড়ার সম্যক্ সুযোগ ও বৃত্তি পাইতে পারে। এই সব করিলে অল্পদিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র হইবে, অথচ তাহা মক্তব-মাদ্রাসার মত মধ্যযুগীয় আদর্শের প্রতীক হইবে না। বিশ্ববিদ্যালয়কে সংশোধন করিবার ইহাই হইল প্রকৃত পন্থা। কিন্তু তাহা না করিয়া পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া খাইতে গেলে সে কেন তাহা সহ্য করিবে? বাহিরের লোকের আক্রমণে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য ও অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আমাদের কিছুই কাজ হইবে না। কিন্তু উহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া অর্থসাহায্য দ্বারা উহাকে পুষ্ট করিলে উহার স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকিবে, অথচ প্রকৃত কাজ হইবে। আমরা এ-বিষয়ে প্রত্যেক মুসলমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।
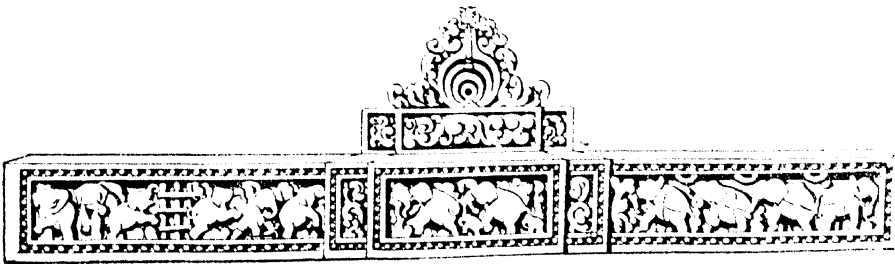
আলোচনা

"কলিকাতায় রাজা রামমোহন রায়"

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে "কলিকাতায় রাজা রামমোহন রায়" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ অন্যান্য বিষয়ের সহিত রামমোহন রায়ের কলিকাতা-আগমনের তারিখ সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। ১৭৬৯ শকের আশ্বিন (১৮৪৭, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত "ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ" নামে একটি সুপরিচিত প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিয়া এবং উহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি বলেন, এই ঘটনার তারিখ ১৭৩৫ শক বা ১৮১৩ সন এবং "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্ঞাত সারেই বোধ হয় এই শক দেওয়া হইয়াছিল।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁহার একটি বক্তৃতায় রামমোহনের কলিকাতা-আগমনের তারিখ দিয়াছেন ১৭৩৬ শক, অর্থাৎ ১৮১৪ সন। রমাপ্রসাদ বাবু এই তারিখ মানিতে চাহেন না, কারণ "খুব সম্ভব এই বক্তৃতা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র বিবরণ প্রকাশিত হইবার অনেক পরে দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং এই ক্ষেত্রে তত্ত্ববোধিনীর লেখকের মতই বলবত্তর মনে করা কর্তব্য।"* তাহা ছাড়া তিনি অন্য যুক্তিও দিয়াছেন। তিনি বলেন :—

"১৭৩৭ শকে রামমোহন রায় কলিকাতায় 'বেদান্ত গ্রন্থ'... প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ রচনা করিতে এবং ছাপাইতে দুই বৎসর লাগা সম্ভব। সুতরাং যদি অনুমান করা যায় রামমোহন রায় কলিকাতা আসিয়া 'বেদান্ত গ্রন্থ' রচনা করিয়াছিলেন তবে ১৭৩৫ শকে তাঁহার আগমন কাল স্বীকার করিতে হয়।"

কিন্তু এ-সম্বন্ধে সাক্ষাৎ সমসাময়িক প্রমাণ থাকাতে অনুমানের উপর নির্ভর করিবার আবশ্যক নাই। এই প্রমাণ হইতে দেখা যায়, রামমোহন ১৮১৪ সনেই রংপুর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন,—১৮১৩ সনে নহে।

গুরুদাস মুখোপাধ্যায় রামমোহন রায়ের ভাগিনেয়। তিনি মাতুলের সহিত চার বৎসর রংপুরে কাটাইয়াছিলেন। রামমোহনের সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের যে মোকদ্দমা হয় তাহাতে রামমোহনের পক্ষে সাক্ষী দিতে গিয়া গুরুদাস ১৮১৯ সনের এপ্রিল-মে মাসে বলেন :—

"........Saith that in the Bengal year 1221 [April 1814 to April 1815] the defendant Rammohun Roy returned to Calcutta where by the joint application of him the deponent and the said Rammohun Roy the said talooks were entered in the books of the [Burdwan] Collector in the name of him the said Rammohun Roy and the paper writing marked "E" [dated 7 September 1814] was issued by the said Collector."

গুরুদাস মুখোপাধ্যায় বাংলা ১২২০ (অর্থাৎ ইংরেজী ১৮১৩-১৪) সালে রংপুর ত্যাগ করিয়া বাটী প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি এ-সম্বন্ধে তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন :—

"......Saith that he this deponent returned to Langulpara in the Bengal year 1220 after an absence of four years."

গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের এই উক্তি যে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এ-বিষয়ে তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। ইহাও দেখা যাইতেছে যে তিনি নিজে বাং ১২২০, অর্থাৎ ইং ১৮১৩ সনে লাঙ্গুলপাড়া প্রত্যাবর্তন করেন। রামমোহনও সেই বৎসর কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকিলে গুরুদাসের পক্ষে ভুল করিয়া এই ঘটনার তারিখ ১২২১ সাল, অর্থাৎ ইং ১৮১৪ সন, বলিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং রামমোহনের রংপুর হইতে কলিকাতা আগমনের তারিখ যে ১৮১৪ সন তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে।

এ-সম্বন্ধে আরও একটি প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি। ১৮২৩ সনের ১৬ই জুন বর্দ্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্র কলিকাতার প্রভিন্শিয়াল আপীল কোর্টে মৃত রামকান্ত রায়ের উত্তরাধিকারী রূপে রামমোহন রায় ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের নামে দেনাপাওনার মোকদ্দমা করেন। এই মোকদ্দমায় রামমোহন নিজে আদালতে উপস্থিত থাকিয়া বর্দ্ধমানরাজের অভিযোগের উত্তরে জানাইয়াছিলেন :—

"As for his allegation that the defendant's place of abode could not be found, it was scarcely worthy of consideration, for the defendant was never out of the Company's territories; he alternately resided in the zilas of Ramgarh,

---

* রমাপ্রসাদ বাবু বোধ হয় জানেন না যে, ১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসে (অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৪৫ সনে) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় "মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জীবন বৃত্তান্ত" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উহাতে (পৃ. ১৬৫) রামমোহনের রংপুর হইতে কলিকাতা আগমনের তারিখ দেওয়া হয় ১৭৩৪ শক অর্থাৎ ইংরেজী ১৮১২। এই বিবরণটি রমাপ্রসাদ বাবু কর্তৃক ১৭৬৯ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' হইতে পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধ অপেক্ষা পুরাতন এবং যে-যে কারণের বলে রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহার উদ্ধৃত প্রবন্ধটিকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন ঠিক সেই কারণেই সমান নির্ভরযোগ্য। তবে কি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র উক্তির বলে ১৮১২ এবং ১৮১৩ এই দুই সনকেই রামমোহনের কলিকাতায় আগমনের তারিখ বলিয়া ধরিতে হইবে? বলা বাহুল্য, ঐতিহাসিক আলোচনার এইরূপ আত্মঘাতী পথ ধরিবার কোন প্রয়োজন নাই। রামমোহন সম্বন্ধে অজ্ঞাতনামা লেখক কর্তৃক ঘটনার ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে লিখিত তথ্যকে রামমোহনের জীবনের ঘটনার সহিত বাল্যকাল হইতে পরিচিত দেবেন্দ্রনাথের উক্তি অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য মনে করা ইতিহাস-রচনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-সম্মত নহে।

Bhagalpur, and Rangpur, and *for the last nine years lived in the town of Calcutta ;"*

রামমোহনের এই উক্তি হইতেও জানা যাইতেছে যে, তিনি ১৮১৪ সনের মাঝামাঝি হইতে কলিকাতায় বসবাস করিতেছিলেন। ১৮১৪ সনের ২০এ জুলাই তাঁহার পৃষ্ঠপোষক জন্ ডিগ্‌বী রংপুর-কলেক্টরীর ভার স্মেণ্ট নামে এক সিভিলিয়ানকে বুঝাইয়া দিয়া দীর্ঘকালের জন্য ছুটি লন। সেই সঙ্গে রামমোহনও নিশ্চয়ই রংপুর ত্যাগ করেন। এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহাকে কলিকাতায় বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত দেখিতে পাই, এবং তখন হইতেই তিনি স্থায়িভাবে কলিকাতা-বাসী হন।

(২)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার একটি বক্তৃতায় রামমোহনের কলিকাতা-আগমনের তারিখ ১৭৩৬ শক, অর্থাৎ ইং. ১৮১৪ সন, বলিয়াছেন। রমাপ্রসাদ বাবু মহর্ষির এই বক্তৃতার তারিখটি জ্ঞাত নহেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কবে যে এই বক্তৃতা করিয়াছিলেন গ্রন্থকার [নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়] তাহা বলেন নাই। খুব সম্ভব এই বক্তৃতা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র বিবরণ প্রকাশিত হইবার অনেক পরে দেওয়া হইয়াছিল।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতাটির তারিখ "১৭৮৬ শকের ২৬ বৈশাখ শনিবার"। এই বক্তৃতা "শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় কর্তৃক কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ব্রাহ্ম-বন্ধু সভাতে" প্রদত্ত হয়। ইহা "ব্রাহ্ম-সমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তিকার এক খণ্ড আমার নিকট আছে।

(৩)

অন্যান্য ব্যাপারেও রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহার রচনার দু-এক স্থলে অসাবধানতার পরিচয় দিয়াছেন।

(ক) তিনি লিখিয়াছেন, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ "১৮৪৪ সালে পরলোকগমন করিয়াছিলেন।" এই তারিখ ঠিক নহে। বিদ্যাবাগীশের মৃত্যু হয় ১৭৬৬ শকের ২০ ফাল্গুন, অর্থাৎ ১৮৪৫ সনের ২রা মার্চ, তারিখে। ("মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জীবনবৃত্তান্ত"—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' ১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক, পৃ. ১৬৭ দ্রষ্টব্য।)

(খ) ১৮৩৫ হইতে ১৮৪৫ সন পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের যোগসূত্রের কোন পরিচয় রমাপ্রসাদ বাবু দিতে পারেন নাই। ১৮৪৩ সনের জুন মাসে (আষাঢ়, ১৭৬৫ শক) স্থানসঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত যখন তত্ত্ববোধিনী সভাকে যোড়াসাঁকোস্থ ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ ত্যাগ করিতে হয়, তখন রাধাপ্রসাদ রায়ই অগ্রণী হইয়া কিছুদিনের জন্য "হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ অঞ্চলে এক প্রশস্থ গৃহে বিনা বেতনে" সভার কার্য্যালয়কে স্থান দান করেন। রাধাপ্রসাদই এই গৃহের অধিকারী ছিলেন; গৃহটি বিক্রয়কালে তত্ত্ববোধিনী সভার "কতক অঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং কতক তাহার উত্তরস্থ ৪৭ সংখ্যক ভবনে" স্থানান্তরিত হয়।*

(গ) তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত রাধাপ্রসাদ রায়ের সম্বন্ধ প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদ বাবু মন্তব্য করিয়াছেন :—

"১৭৭৩ শকের [তত্ত্ববোধিনী সভার] আয়ের হিসাবে রাধাপ্রসাদ রায়ের নামে ২২৲ জমা দেখা যায়। কিন্তু ১৭৭৪ এবং ১৭৭৫ শকের আয়ের হিসাবে রাধাপ্রসাদ রায়ের নামে কোনও টাকা জমা দেখা যায় না। ইহার কারণ কি বলা যায় না।"

কারণটি রমাপ্রসাদ বাবুর অজ্ঞাত হইলেও অজ্ঞেয় নহে। রাধা-প্রসাদ রায় ১৮৫২ সনের ৯ই মার্চ, মঙ্গলবার, অর্থাৎ ১৭৭৩ শকের শেষে, পরলোকগমন করেন।† উহার পর আর তাঁহার চাঁদা দেওয়া সম্ভব ছিল না।

* 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', ১ ফাল্গুন ১৭৬৭ শক, পৃ. ২৬২ দ্রষ্টব্য।

† রাধাপ্রসাদ রায়ের পরলোকগমনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার 'সংবাদ প্রভাকরে' ১৮৫২ সনের ১২ই মার্চ, শুক্রবার, লেখেন :—

"আমরা বিপুল শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া রোদনবদনে প্রকাশ করিতেছি ব্রহ্মলোকবাসি মৃত মহাত্মা ৺রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের প্রথম পুত্র বহুগুণান্বিত মহানুভব ৺রাধাপ্রসাদ রায় মহাশয় জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া গত মঙ্গলবাসরে এতন্মায়াময় সংসার পরিহার পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিয়াছেন,...। ঐ মহাশয় কিছুদিন দিল্লীশ্বরের সভাসদের পদে অভিষিক্ত থাকিয়া অতি উচ্চতর সম্মানের কার্য্য সুসম্পাদন করিয়াছেন, এবং সর্ব্বশেষে এক প্রধান রাজার প্রধান কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছিলেন,...।" (১৩৩৮ সালের ফাল্গুন মাসের 'প্রবাসী'র ৬৫৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।)

শ্রী —

রামকৃষ্ণ পরমহংস

স্বামী ভূমানন্দ-ফটিকচন্দ

শ্রীশ্রীগোবিন্দ গোস্বামী সরস্বতী মহাশয় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত গত ১৩৪২ সনের ফাল্গুনের প্রবাসীতে "শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা" প্রবন্ধের কয়েক লাইন—"তিনি যদিও জীবনের প্রথম ও মধ্য অবস্থায় এক জন হিন্দু সাধক ছিলেন, কিন্তু শেষ অবস্থায় তাঁহার বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল"—এই কথার সমালোচনা করিয়া গত ১৩৪২ সনের চৈত্রের প্রবাসীতে লিখিয়াছেন, "ইহা লেখকের নিজস্ব মনগড়া একটি ধারণা এবং এ ধারণা ভুল।" এই সমস্ত বলিয়া গোঁসাইজী গভীর আভিজাত্য বজায় রাখিবার জন্য "হিন্দুদের আচরিত প্রতিমাপূজা ইত্যাদি বাদ দিয়া কেবল ব্রহ্মজ্ঞান সাধনের তিনি (রামকৃষ্ণ) উপদেশ দিয়াছেন এমন প্রমাণ ত পাওয়া যায় না" এই রকম বচনের উপর এক দিকে প্রতিমাপূজা সমর্থন অন্য দিকে "হয়ত" "বেদে চরম ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান সাধন বর্ণিত আছে পরমহংসদেব তাহার সাধন করিতেন," অর্থাৎ কিনা শেষ অবস্থায় "তাঁহার বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল", ভাল করিয়া না বুঝাইয়া, বেদ ও প্রতিমাপূজাকে এক করিয়া রামকৃষ্ণের ধর্ম্মসমন্বয়ের পথে একটা বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছেন।

বাল্যকাল হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছি, রামকৃষ্ণ তাঁহার জীবনের ঘটনা, তাঁহার ধর্ম্মসাধনার বর্ণনা এবং তাঁহার পরিবর্ত্তিত ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কোনরকম আলোচনা লিখিয়া রাখিয়া যান নাই। তবুও তিনি তাঁহার ব্যক্তিত্বের ও বৈশিষ্ট্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যে চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, সেই বিষয় আলোচনা করিলে তাঁহার পরিবর্ত্তিত জীবনের সাধনার কয়েকটি পথ আমরা দেখিতে পাইব। যেমন 'যীশু' জগতের ত্রাণকর্ত্তা, তাঁহার পূজা করিয়া—ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা,

তাঁহার উপাসনা আরাধনা করিয়া—মাতৃপ্রেমে ভরপুর হিন্দুদেবদেবী প্রতিমা ইত্যাদির পূজা আরতি করিয়া—এবং পয়গম্বর মহম্মদের ছবি না পাওয়ার দরুন মসজিদকে নমস্কার করিয়া, যখন শুনি তিনি সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, তখনই সঙ্গে সঙ্গে এই কথা উপলব্ধি করা যায় যে, সনাতন হিন্দুর গণ্ডী ছাড়াইয়া হিন্দুসাধক হিসাবে তাঁহার প্রথম ও মধ্য অবস্থার সাধনার পথ কাটিয়া শেষ অবস্থায় তাঁহার বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ ব্রহ্মসংগীতের ভিতর দিয়া আসল বেদান্তের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং এই ব্রহ্মসংগীত শুনিবার জন্য পাগলের মত ছুটাছুটি করিতেন। শেষে এই ব্রহ্মসংগীত শুনিতে শুনিতে ও গাহিতে গাহিতে অচেতন হইয়া পড়িতেন, ইহা ব্রাহ্মদের দলে পড়িয়া এই ব্রহ্মসংগীতের ভিতর দিয়া তাঁহার পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিবার আর এক প্রমাণ। ইহাও ইতিহাসের সত্য কথা। কেন-না নূতন করিয়া ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিবার জন্য উপাসনা, আরাধনা ও উদ্বোধনের মধ্যে নানা নামের উচ্চারণ হওয়াতে ব্রহ্মসংগীতের ভিতর বেদ এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। যেমন—সত্য, শিব, সুন্দর, নাথ, বন্ধু, মধু, রাজা, মহারাজা, স্বামী, প্রভু, তুমি, ম, আনন্দময়ী, বিশ্বজননী, চিরনির্ভর, হৃদিরঞ্জন, পবিত্র, প্রাণ, সাথী, চিরসুন্দর, অনাদি, গতি, অগম্য, অপার, দয়াঘন, প্রেমময়, পরম, জ্যোতির্ম্ময়, আনন্দলোক, শান্তিনিলয়, অমৃতপাথার, জীবনবল্লভ, দয়ার ঠাকুর, দেবতা, সর্ব্বস্ব, স্রষ্টাপাতা, দেবাদিদেব, মহাদেব, জ্ঞানময়, স্বয়ম্ভু, স্বপ্রকাশ, দীননাথ, অনাথের নাথ, রসময়, মঙ্গলদাতা, ব্রহ্ম, পরাৎপর, পরমেশ্বর, ভগবান, ভূমা, সারথি, প্রধান, অনন্ত হইয়াও "কারু পিতা কারু মাতা কারু সুজন সখা হও—প্রেমে গ'লে যে যা বলে তাতেই তুমি প্রীত হও";—এই প্রেরণাই, রামকৃষ্ণের কেন, সমস্ত বঙ্গদেশের মৃত প্রাণে নূতন জীবন আনয়ন করিয়াছে। 'নরেন্দ্রনাথ' ও অন্যান্যেরা যেদিন ব্রহ্মমন্দিরে গান ধরিতেন, তিনি তাহা শুনিয়া অচেতন হইয়া পড়িতেন। এই ব্রহ্মসংগীতেরই কল্যাণে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সর্ব্বপ্রথম রামকৃষ্ণের সহিত অপরিচিত নরেন্দ্রনাথের (পরে বিবেকানন্দের) সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া দেন আর রামকৃষ্ণও এই ব্রহ্মসংগীত শুনিবার জন্য তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে নিমন্ত্রণ করেন। সুতরাং বিবেকানন্দও বিদেশে যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া বেদান্ত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও এই রামমোহন-প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মসংগীতের ফল; আর রামকৃষ্ণ যে ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া নিজের সাধনার পথ সুগম করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও এই ব্রহ্মসংগীতের ফল। কামাখ্যা বাবু যাহা লিখিয়াছেন "তিনি যদিও জীবনের প্রথম ও মধ্য অবস্থায় এক জন হিন্দুসাধক ছিলেন, কিন্তু শেষ অবস্থায় তাঁহার বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল" ইহা বেদবাক্যের মত সত্য কথা—"কোনো রকম মনগড়া নিজস্ব ধারণা" নয় বা এ ধারণা ভুলও নয়। শেষ জীবনে রামকৃষ্ণের বিশ্বাস ও মত যে কতখানি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ তিনি পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার সময় রাখিয়া গিয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি গুন্ গুন্ করিয়া ব্রহ্মসংগীতই গান করিয়াছেন এবং ব্রহ্মসংগীতই ভালবাসেন বলিয়া শুনিতে চাহিয়াছিলেন। নিজের আজীবনপূজিত কালীমাতার নাম, তাঁহার প্রিয় 'মা' নাম কি মধুর নাম", এমন কি দুর্গা, রাম, কৃষ্ণ, হরি, কাহারও নাম একেবারেই উচ্চারণ করেন নাই। মৃত্যুকালে রামমোহন রায় যেমন বিদেশে ওঁ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মারা গিয়াছিলেন, তেমনই রামকৃষ্ণ স্বদেশে কেবল ওঁ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে মারা যান। তাঁহার মৃত্যুকালের প্রমাণ অন্য সময়ের প্রমাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

[সম্পাদকের মন্তব্য।—এই আলোচনাটির লেখক ইহা গত ১৩ই এপ্রিল, ৩১শে চৈত্র (১৩৪২), প্রেরণ করেন ও আমরা বৈশাখ মাসে পাই। সুতরাং ইহা জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে মুদ্রিত হইতে পারিত। কিন্তু ইহা দীর্ঘ বলিয়া এবং তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হইতে পারে, ইহাতে এরূপ অনেক কথা থাকায়, রামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকীর মধ্যে তাহা বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া, আমরা জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে ইহা ছাপি নাই। তজ্জন্য, লেখক পুনর্ব্বার চিঠি লিখিয়াছেন। এই জন্য, তাঁহার তর্কবিতর্ক যথাসম্ভব পরিহার করিয়া, তাঁহার লেখার আনুমানিক এক-চতুর্থ অংশ উপরে মুদ্রিত হইল।

শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মূল প্রবন্ধটি লেখেন। তাঁহার লেখার প্রতিবাদের উত্তর দিবার অধিকার তাঁহার ছিল। তিনি উত্তর দেন নাই, কিন্তু অন্যে দিয়াছেন। অতএব, এতদ্বিষয়ক তর্কবিতর্ক শেষ হইল।

পিঠাপিঠি

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

মুখুজ্জে-গৃহিণীর পুত্রবধূ মলিনা আসন্নপ্রসবা। চার বছরের কোলের ছেলে বাপ্পু আজ মাসখানেক হইল তার ঠাকুরমার কাছে শোয়।

প্রথম প্রথম সে কিছুতেই মায়ের কাছ-ছাড়া হইতে চায় না। কত সাধ্য-সাধনা; বাপ্পু কিছুতেই কথা শোনে না। তার প্রধান আপত্তি না-কি—ঘুমের মধ্যে ঠাকুমার নাক ডাকে,—ভয় করে তার।

সন্ধ্যারাত্রে বিছানায় মার গলা জড়াইয়া সে কত আবোল-তাবোল বকিতে থাকে। কথায় কথায় মা হঠাৎ প্রশ্ন করে, "খোকন, আজ তুমি ঠাকুরমার কাছে শোবে, কেমন ?

"ন-না।"

"না কেন রে!—লক্ষ্মীটি, কথা শোন। ঠাকুরমা তোমায় কত ভালবাসেন।"

"ঠাকুরমার নাক ডাকে।"

মলিনা হাসিয়া বলে, "বলে দেব।—মা! শোন, বাপ্পু তোমায়—" খোকা তাহার ছোট হাত দুটি দিয়া মায়ের মুখ চাপা দিয়া কথা বন্ধ করে।

মলিনা হাসিয়া আবার সুধায়, "তবে বল, আজ তুমি ঠাকুরমার কাছে শোবে।"

"কাল শোব। আজ আমি তোমার কাছে থাকব মা।"

শিশু আবেগে মায়ের কণ্ঠলগ্ন হয়। মা-ও ছেলেকে বুকে

জড়াইয়া ধরে। মুখে তাহার কথা বন্ধ হয়। আর পীড়াপীড়ি করে না সে।

তার পর মা-ছেলেতে চলে অশ্রান্ত কথার বিনিময়। অবশেষে ভাষার উত্তাপ কমিতে থাকে; চোখের পাতা ভারী হয়; বাসু কখন ঘুমাইয়া পড়ে। মলিনা উঠিয়া খোকাকে শাশুড়ীর বিছানায় রাখিয়া আসে।

মাঝরাত্রে জাগিয়া বসিয়া মা-কে না দেখিয়া শিশু কাঁদিতে থাকে। ঠাকুরমার আদর-অনুনয় কানেও তোলে না।

বাসুর ক্রন্দনে মলিনাকে ঘুম হইতে উঠিয়া এ-ঘরে আসিতে হয়। কোন কোন দিন নিজের ঘরে লইয়া যায়, কোন দিন বা ঘুম পাড়াইয়া আবার শাশুড়ীর কাছেই রাখিয়া যায়।

এমনই করিয়া দিনে দিনে বহু চেষ্টায় বাসুর সুমতি হইয়াছে। এখন সে রাত্রে ঠাকুরমার কাছেই শোয়। তবে সন্ধ্যারাতে মায়ের কোলে ঘুমান তাহার না হইলে নয়!

শেষরাত্রে জাগিয়া সে এখন ঠাকুরমার কৃষ্ণের শতনাম শোনে। প্রশ্ন করে কত কি। কথায় কথায় ঠাকুরমা সুধায়, "বল ত দাদু আমার, তোমার ভাই হবে, না বোন্ হবে?"

বাসু জবাব দেয় না। ভাই হইবে অনেক দিন সে-কথা শুনিয়া আসিতেছে। কিন্তু চার বছরের শিশু-চিত্ত কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না, এই ভাই হওয়ার সঙ্গে মায়ের নিকট হইতে তাহার বিচ্ছেদের সম্বন্ধ কোথায়! ভাই হইবে ভাল কথা! কিন্তু বাড়ীর সকলে মিলিয়া কেন তাহাকে জননীর অধিকার হইতে তফাতে রাখিতে চায়! আর এই ষড়যন্ত্রে মায়েরও গোপন সম্মতি আছে বুঝিয়া শিশু কেমন যেন হইয়া যায়। তাহার মাতৃস্তন্যের একচেটে অধিকারে কিসের জন্য এত সতর্ক হস্তক্ষেপ! শিশুচিত্তে কি এক অননুমেয় সংশয়ের ছায়া ঘনায়।

বাসু তাই জবাব দেয় না। ঠাকুরমা আদর করিয়া কোলে টানিয়া বলেন, "বল দাদু, কাল তোমায় সন্দেশ দেব। বল ত একবার, তোমার ভাই হবে, না বোন হবে?"

বাসু খানিক ইতস্তত করিয়া জবাব দেয়, "বোন হবে।"

"তা হ'লে সন্দেশ পাবে না।" ঠাকুরমা হাসিয়া কোল হইতে তাহাকে একটু দূরে সরাইতে চান।

মধ্যবিত্ত বাঙালী-ঘরে ভাই না হইয়া বোন হওয়াটা যে কতখানি অপরাধের সে-কথা বুঝিবার বয়স না হইলেও বোন হইবে বলিলে যে সন্দেশ মিলিবে না এ-কথাটুকু ধরিতে বাসুর বিলম্ব হয় না। সে মৃদু হাসিয়া বলে, "ঠাকুমা, ভাই হবে আমার।"

"মুখে ফুলচন্দন পড়ুক," বলিতে বলিতে ঠাকুরমা সোহাগ করিয়া নাতিকে আবার কোলে টানিয়া নেন। ভাই-ই হোক, আর বোন-ই হোক, শিশু-মনের শঙ্কা ঘুচে না।

এক-এক দিন বাসু মা'র কোল ঘেঁষিয়া শুইয়া এ-কথা সে-কথা বলিতে বলিতে সহসা কখন জননীর বুকের আঁচল সরায়। মা বাধা দেয়, "ছি খোকন! তুমি না বড় হয়েছ।—সেদিন না বল্‌লে, আর খাবে না।"

"না মা, আমি খাব না মা—আমি খাওয়া-খাওয়া খেলা করব।"

শিশুর এই ছলনা মায়ের বুকে বিঁধে। মলিনার মনে পড়ে, স্তন্য ছাড়াইবার প্রতিদিনের ইতিহাস! কত অনুরোধ, কত উপদেশ, ধমক! মলিনা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া যায়।

এক এক দিন মলিনা নাছোড়বান্দা বাসুকে হয়ত খানিক ক্ষণের কড়ারে মাতৃস্তন্যে পুনরধিকার দেয়। শাশুড়ীর চোখে পড়িলেই তিনি মৃদু তিরস্কার করেন, "ওকি বৌমা! অমন কাজও ক'রো না। আবার ধরলে ছাড়ানো মুস্কিল হবে।"

মলিনা বাসুকে জোর করিয়া বুক-ছাড়া করে। যে আসিতেছে তাহার কথা ভুলিলে চলিবে কেন!

বাসু আজকাল আর কাঁদে না। অভিমানে চুপ করিয়া থাকে। মুখুজ্জে-গিন্নী আদর করিয়া বলেন, "নাতির আমার বুদ্ধি হয়েছে।"

যথাসময়ে মুখুজ্জে-পরিবারে আর একটি শিশুর আবির্ভাব হইল।

সকাল হইতে ঠাকুরমার ব্যস্তসমস্ত ভাব, ধাত্রীর আগমন, থাকিয়া-থাকিয়া ওঘর হইতে জননীর চাপা আর্তনাদ, পিতার ঘন ঘন ঘড়ি দেখা, পাড়ার সমাগত মেয়েদের সমস্বরে সাত ঝাঁক হুলুধ্বনি,—এ-সব দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত বাসু চুপ করিয়া বসিয়া আছে মেঝের উপর।

ভাই হইবে কি-না সেকথা জানিবার আগ্রহ তাহার আর নাই। মা যে কি এক বিপদের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে সে-

খবর কেহ বলিয়া না দিলেও সে অনুমানে বেশ বুঝিয়া লইয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া এক কোণে বসিয়া আছে। চার বছরের শিশুর মনে কেমন এক দুঃসহ শঙ্কা। ভগবান কি, সেকথা বুঝিবার বয়স তাহার নহে, নতুবা সে বুঝি আজ দুই হাত জোড় করিয়া আকুল প্রার্থনা জানাইত, তাহার মায়ের যেন বিপদ পার হইয়া যায়, তাহার যেন কোন অকল্যাণ না ঘটে। সে এখন কাঁদিতে পারিলে বাঁচে, কিন্তু কাঁদিবারও যেন কোন একটা কারণ খুঁজিয়া পায় না। কথা বলিতে চায়, ভাষায় কুলায় না।

মুখুজ্জে-গিন্নী ঘরে ঢুকিয়া পুত্রকে প্রশ্ন করিলেন, "ঘড়ি দেখেছিস্ বিনু ?"

"দেখেছি মা, দশটা পনের মিনিট তেইশ সেকেণ্ড।"

পুত্র বিনয়ভূষণ পঞ্জিকার পাতায় সময়টা লিখিয়া রাখিল।

"আমার দাদুমণি কোথায় রে ?" বলিয়া মুখুজ্জে-গিন্নী চারি দিক চাহিয়া বাসুর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই হাত বাড়াইয়া আগাইয়া গেলেন, "এস মাণিক, তোমার কথাই সত্য হ'ল। ভাই হয়েছে তোমার। দেখ্‌বে চল।"

বাসু তেমনই চুপ করিয়া আছে। বাবা ও ঠাকুরমার হর্ষ প্রকাশের সঙ্গে খানিক ক্ষণ আগে মার অস্ফুট ক্রন্দনের কোন সঙ্গতিই সে খুঁজিয়া পাইল না। মাতৃস্নেহে বঞ্চনা সত্ত্বেও ভাই হওয়ার সম্ভাবনায় সে যে উল্লাস প্রকাশ করিতে শিখিয়াছিল এখন তাহার লেশমাত্রও যেন আর অবশিষ্ট নাই।

"এস দাদু, চল, ভাই দেখবে চল।" ঠাকুরমা নাতিকে কোলে তুলিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

সদ্যোজাত শিশু-ভাইকে দেখিয়া সেই যে বাসু ঠাকুরমার কোলে মুখ লুকাইল আর মুখুজ্জে-গিন্নীর শত অনুনয়ে, পাড়ার বর্ষীয়সীদের বিস্তর সহাস্য সাধাসাধিতে একটি বারের জন্যও মুখ তুলিল না।

২

বাসু আঁতুড়ঘরের কাছ দিয়াও ঘেঁষে না। আজকাল সে ঠাকুরমার বেশী ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বাবার সঙ্গে স্নান করে, ঠাকুরমার কোলে বসিয়া খায়, কাঠের ঘোড়াটা লইয়া রাতদিন খেলা করে। মা'র কথা যেন সে ভুলিতে চায়।

সেদিন মলিনা অনেক চেষ্টায় ঝিকে দিয়া বাসুকে কাছে ডাকাইয়া আনিয়াছে। বাসু কিন্তু আঁতুড়ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। মা ডাকিল, "খোকন, বাপধন, ভেতরে এস না।"

বাসু কথার জবাব দেয় না। চৌকাঠের বাহিরেই চুপ করিয়া আছে।

বিস্তর সাধ্যসাধনার পর বাসু আঁতুড়ে ঢুকিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিল। মলিনা মৃদু হাসিয়া ডাকিল, "কাছে এসে ব'স না লক্ষ্মী আমার—ও কি! ছি!"

অগত্যা বাসু মায়ের দিকে মুখ করিয়া একটুখানি আগাইয়া বসিল। ঘরের এক পাশে একখানি বড় কাষ্ঠখণ্ড ধিকিধিকি জ্বলিতেছে। অদূরে বসিয়া আছে মা। রুক্ষ চুল, বিশুষ্ক অধর, মুখে চোখে কঠোর তপশ্চরণের করুণ সুন্দর রিক্ততা। জননীর এই তাপসী প্রসূতি-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বাসুর প্রাণ দুঃখ ও সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল। পার্শ্বস্থ সজীব মাংসপিণ্ডটাকেই মা'র এই কষ্টের কারণ মনে করিয়া পলকের জন্য শিশুর প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই বাসু চোখ ফিরাইয়া লইল।

অল্প সময়ের মধ্যেই মাতা-পুত্রে আলাপ জমিয়া গেল। মা কহিল, "তোমার খাওয়া হয়েছে ?

"হুঁ"

"কি-কি দিয়ে খেলে আজ ?"

"মাছ, ডাল, ভাজা—"

"কার সঙ্গে ব'সে খেয়েছ ?"

"বাবার সঙ্গে।—আজ আমি নিজের হাতে খেয়েছি মা।"

"তাই নাকি! এই ত খোকন আমার বড় হয়েছে।"

বাসু মায়ের প্রতি চাহিয়া গর্ব্বের হাসি হাসে। কথায় কথায় মলিনা হঠাৎ নবজাত শিশুকে কোলের কাছে সন্তর্পণে তুলিয়া বাসুর কাছে ধরিল, "দ্যাখ খোকন, কি সুন্দর ভাই তোমার—ওকি! উঠো না।"

বাসু উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইল। মা ডাকিল, "খোকন, একবার এদিকে তাকাও। ছি! অমন করতে নেই। তোমার ভাই হয় যে!" বাসু এক-পা দু-পা করিয়া দুয়ারের দিকে আগাইয়া গেল। মলিনা পিছু ডাকিল,

"কথা শোন লক্ষ্মী মাণিক আমার।—অমন ক'রে যেতে নেই।"

লক্ষ্মী মাণিক তত ক্ষণে ওঘরে গিয়া ঠাকুরমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল।

মুখুজ্জে-গিন্নী তাহাকে বুকে আঁকড়াইয়া কহিলেন, "কি হয়েছে দাদু! বাবা বকেছে?—আঃ বল না, কি হ'ল।"

বাসুর মুখে কথা নাই। ঠাকুরমার কোলে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

প্রসূতি এখন আঁতুড় ছাড়িয়া ঘরে আসিয়াছে। মা'র সঙ্গে বাসুর ভাব আবার একটু একটু করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু শিশু ছোট ভাই কাছে থাকিলে বাসু মা'র সংশ্রব এড়াইয়া চলে।

মাকে একলা পাইলেই খোকন তাহার কোল জুড়িয়া বসে। কখনও জননীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলে, "আজ তোমার কাছে শোব মা।"

"কেন, ঠাকুরমা কি তোকে ঘুমের মধ্যে চিম্‌টি কাটে?"

"নাক ডাকে।"

"বলে দেব।—মা!—"

"না-না, আর বলব না," হাসিতে হাসিতে বাসু মা'র মুখ চাপা দেয় কচি কচি হাত দুটি দিয়া।

মলিনা যদি কখনও মাতৃস্তন্যের লোভ দেখায় অমনই বাসু সপ্রতিভ হইয়া বলিয়া ওঠে, "আমার বুঝি খেতে আছে আর! ও যে ভাই খাবে।"

জননী হাসিয়া ওঠে, "এই যে খোকন আমার বড় হয়ে উঠেছে গো।—আর আমার চিন্তা কি! এবার চাকরি করতে বেরবে,—কি বল?"

খোকন ঘাড় নাড়িয়া সায় দেয়। মলিনা সুধায়, "বাসু, তুমি রোজগার ক'রে আমায় খাওয়াবে ত?"

"হুঁ।"

"আর কা'কে কা'কে খাওয়াবে?"

"বাবাকে।"

"ঠাকুরমাকে?"

"ঠাক্‌মাকেও।"

"ভাইটিকে?"

"উঁঃ!" বলিয়া বাসু ঘোর অসম্মতি জানায়। মা হাসিয়া বলে, "ওরে পাজি! এই তোর বুদ্ধি হয়েছে, এঁ্যা! পেটে তোর এত হিংসে।"

বাসু লজ্জায় মায়ের কোলটিতে মুখ গোঁজে, আর মাথা তুলিতে চায় না। মলিনা হাসিয়া বলে, "যা,—আমার কাছ থেকে যা। হিংসুটে কোথাকার!"

শুধু কি এই! বাসু তার দুধের বাটি ও ঝিনুক লুকাইয়া রাখিয়াছে। দু-দিন বাদে ছোট খোকা আর একটু বড় হইয়া উঠিলেই, বড় খোকার ঝিনুক-বাটিতেই কাজ চলিবে, বাসু স্বকর্ণে ঠাকুরমাকে সেদিন এ-কথা বলিতে শুনিয়াছে। চৌকির তলায় কাঠের সিন্ধুকটার পিছনে বাসু পরিত্যক্ত ছেঁড়া পা-পোষটা দিয়া ঢাকিয়া তাহার বাটি ও ঝিনুক লুকাইয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে গুপ্তধন বাহির করিয়া সেলুলয়েডের খোকা-পুতুলকে দুধ-খাওয়াইয়া আবার তাহা যথাস্থানে রাখিয়া দেয়। তবু ছোট ভাইকে তাহার সম্পত্তিতে ভাগ দিবে না সে।

মা সেদিন তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রশ্ন করিল, "তোমার ছোট পুতুলটা ভাইকে একবার দেবে?"

বাসু নিরুত্তর। মা তাহাকে ঠেলিয়া দিল, "আমার কাছে তোকে আসতে দেব না।—যা। বেহায়ার বেহদ্দ!"

জননীর সঙ্গে বার-কয়েক হাতাহাতি করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া বাসু ঠাকুরমার এজলাসে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল। সেখানে একতরফা ডিক্রি সে সব সময়ই পাইয়া থাকে।

মুখুজ্জে-গিন্নী ডাকিয়া কহিলেন, "বৌমা, ওকে শুধু শুধু কাঁদাচ্ছ কেন?"

"একটিবার ভাইকে ছোট পুতুলটা দিতে বলেছি, তা কাণ্ড দেখ না। ভাইয়ের কি তোর সত্যি সত্যি পুতুলখেলার বয়স হয়েছে না কি রে,—হিংসুটের হদ্দ!"

"তাই তো দাদু, ভাইকে পুতুল দাও নি কেন?" ঠাকুরমা প্রশ্ন করিল।

"আমার পুতুল আমি কেন দেব?"

"তাহ'লে কাল যে গোকুল-পিঠে করব, তা তোমায় খেতে দেব না।"

"দেবেই ত।"

"ঈস্—কুটুম্ আমার! খেতে দেবার আর লোক নেই কি না!"

ঠাকুরমার রসিকতায় খোকনও জবাব দিল, "আমি লুকিয়ে খাব।"

"আমি আলমারীতে তালা বন্ধ ক'রে রাখব।"

"আমি আমার বাবার সঙ্গে ব'সে খাব।"

মুখুজ্জে-গিন্নী হাসিয়া উঠিলেন, "তোর বাবা, আর আমার বুঝি কেউ নয়? আমার ছেলেকে আমি লুকিয়ে খাওয়াব। তুই কে রে মিন্‌সে?"

এবার নাতি ঠাকুরমার পিঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার আধপাকা চুলের গোছা টানিতে টানিতে কহিল, "আমায় না দিলে আমি তোমার চুল ছিড়ে দেব।"

নিরুপায় ঠাকুরমা তাহাকে কোলে টানিয়া কহিল, "আগে তবে বল, ভাইকে হিংসে করবে না? তাকে পুতুল দেবে।"

"দেব।"

"যাও, নিয়ে এস।"

"আজ নয় ঠাকুমা, কাল দেব।"

"ঠিক ত?"

"হ্যাঁ"।

৩

ছোট খোকার বয়স এখন কয়েক মাস। আজকাল সে উপুড় হইতে শিখিয়াছে। হাত-পা ছুঁড়িয়া তাহার ছোট ছোট পাশ-বালিশের বেড়া সরাইয়া দিতে পারে। কখনও কখনও নিজের অয়েল-ক্লথের বিছানা ছাড়িয়া বড় বিছানায়ও আসিয়া পড়িতে জানে।

বাসু ভাইকে আজকাল বাটি ও ঝিনুকে অধিকার দিয়াছে। তাহার খেলনাগুলি ভাইয়ের পাশে রাখিলে আপত্তি জানায় না আর। কিন্তু ভাইকে রোজগারের ভাগ দিবে কিনা সে-কথা জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব্বের মতই ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানায়,—তবে একটু মৃদুভাবে, মুচকি হাসির সঙ্গে।

ভাই কাছে থাকিলেও বাসু এখন মা'র কাছে যায়, মা'র কোলে শোয়। এক পাশে ভাই, আর এক দিকে বাসু। কখনও বা মাথা উঁচু করিয়া ওপাশে ছোট ভাইয়ের অশ্রান্ত হাত-পা নাড়া দেখে, হাসে, মা'র চোখে চোখ পড়িতে আবার মাথাটি এলাইয়া দেয় মায়ের কোলে। মলিনার মন খুশীতে ভরিয়া উঠে।

সুদিন আসিয়াছে মনে করিয়া মলিনা হয়ত কোন দিন বলে, "খোকন, পদ্মাসন করে ব'স না—হ্যাঁ, এই ঠিক্ হয়েছে।"

বাসু পদ্মাসন করিয়া জননীর দিকে চাহিয়া হাসে।

মলিনা ধীরে ধীরে শিশুকে তুলিয়া বাসুর কোলে দিতে যায়। বাসু অমনি তড়াক্ করিয়া আসন ভাঙিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

মলিনা কত সাধে। বাসুর সুমতির লক্ষণ দেখা যায় না।

মুখুজ্জে-গিন্নী দেখিয়া বলেন, "পীড়াপীড়ি ক'রো না বৌমা। শুতে উল্টো ফল হয়। দু-দিন বাদে আপনি ওর হিংসে মরে যাবে। বাছাকে আমার যে এঁড়েয় পায় নি তাই যথেষ্ট।"

কিন্তু মায়ের প্রাণ তাহা বোঝে না। ভাইয়ে-ভাইয়ে মিলন না দেখিলে তাহার মন যে প্রবোধ মানিতে চায় না।

ঘরে লোকজন থাকিলে বাসু কখনও ছোট ভাইয়ের কাছে যায় না। দূর দূর দিয়া চলে। কিন্তু ঘরে যখন কেহ নাই, বাসু এদিক-ওদিক চাহিয়া চৌকির নিকট আগাইয়া যায়। শিশু শুইয়া থাকিয়া অশ্রান্ত হাত-পা নাড়ে। তাহার পা-দুটি লইয়া বাসু দিব্য খেলা করে। কখনও বা শিশু ঘুমের মধ্যে হাসে, আবার পরক্ষণেই কাঁদে। খানিক বাদেই ঠোঁট-দুটিতে আবার হাসির রেখা ফোটে। দেখিয়া দেখিয়া বাসুও হাসিয়া কুটিকুটি। আবার জাগ্রত শিশু যখন অবোধ্য ভাষায় শব্দ রচনা করিতে থাকে, বাসুও তাহার কথার অনুকরণে 'অ-অ-অ' বলিয়া অর্থহীন জবাব দেয়।

কাহারও পায়ের শব্দ পাইলেই বাসু কিন্তু ভাইয়ের নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়ে।

একদিন বাসুর ইচ্ছা হইল পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, ছোট ভাইটির ক্রীড়াচঞ্চল কচি কচি পা-দুটি জোর করিয়া খানিক ক্ষণের জন্য আটকাইয়া রাখিলে সে কেমন করে। বাসু তাহার দুই হাতের মুঠিতে ভাইয়ের পা-দুটি বন্ধ করিতেই সে অমনি আপত্তিসূচক এক প্রকার ক্রন্দন তুলিল। বাসু ক্ষণেকের জন্য

ছাড়িয়া দিয়া আবার সেই নৃত্যশীল কোমল পা-দুখানি চাপিয়া ধরিল।

অবোলা ছোট ভাইটির অনুনাসিক অসম্মতি প্রকাশে বাসু মজা দেখিতেছে ঠিক এমনি সময়ে মলিনা ঘরে ঢুকিল। ক্রীড়ামত্ত বাসু তাহা টের পায় নাই।

মলিনার মুখে-চোখে আনন্দের চাপা হাসি। ডাকিল, "কি হচ্ছে রে চোর!"

বাসু মুখ তুলিয়া মাকে দেখিয়া ছুটিয়া আলমারীর আড়ালে গিয়া মুখ লুকাইল।

"এঁ্যা, তুই এমনি রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে চোরের মত ভাইয়ের সঙ্গে খেলা করিস। দাঁড়া, সবাইকে ব'লে দিচ্ছি।" মলিনা হাসিতে হাসিতে আলমারীর কাছে অগ্রসর হইল। দণ্ডায়মান বাসু বসিয়া পড়িয়া দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজিল। মা আদর করিয়া তাহার মাথাটি তুলিবার চেষ্টা করিতেই সে মেঝেতে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া হাতের কনুইয়ের ভাঁজে মুখ লুকাইল।

মলিনা গলা ছাড়িয়া ডাকিল, "মা, একবার এ-ঘরে এস, তোমার নাতির কীর্ত্তি দেখে যাও।"

বাসু সহসা উঠিয়া শক্ত করিয়া দুই হাতে জননীর হাঁটু জড়াইয়া তাহার শাড়ীর ভাঁজে সলজ্জ মুখখানিকে গোপন করিতে চাহিল। মা তাহার জানে জানুক, আর কেহ যেন এই অপযশের কথা না শুনিতে পায়।

"লুকিয়ে লুকিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে ভাব! মাগো, কি ঘেন্নার কথা!" মলিনা তাহাকে কোলে তুলিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

তবু বাসু সম্পূর্ণ ধরা দেয় না।

সমস্ত খেলনা সে ভাইকে দিয়াছে। রাত্রে আজকাল ভাইটির পাশেই মা'র বিছানায় শোয়।

ভাইয়ের জন্য যে মোটেই দরদ নাই এমন নহে। খোকাকে একলা ঘরে ফেলিয়া দৌড়িয়া রান্নাঘরে গিয়া জননীকে খবর পৌছায়, 'শিগ্‌গির এস মা, খোকন যে কাঁদছে।' তথাপি উপার্জ্জনের অংশ ভাইকে এখনও দিতে রাজী নয়।

গ্রামে খুব বানরের উপদ্রব। এই জীবগুলিকে বাসুর সবচেয়ে বেশী ভয়। ঘুমের চোখে যখন সে কিছুতেই খাইতে চায় না, ঐ 'এল রে' বলিলেই তাহার তন্দ্রা ভাঙে, সকল আপত্তি টুটিয়া যায়।

মলিনা ভয় দেখায়, 'এবার সেই যে বড় লালমুখো বাঁদরটা—মনে আছে ত?—সেটা আবার যখন আসবে, ভাইকে তোর দিয়ে দেব। নিয়ে যে চলে যাবে, আর ফিরিয়ে দেবে না। তুই রাতদিন কেবল হিংসে করিস্।"

বাসু হাসে। মা যথাসাধ্য গম্ভীর হইয়া বলে, "হাস্‌ছিস্ কি, সত্যি সত্যি দেব।"

খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া মলিনা জিজ্ঞাসা করে, "বাঁদরটাকে দিয়ে দেব—কি বলিস্?"

বাসু সম্মতি জানায়।

আর একদিন ডাইনীর মত কদাকার কালো বুড়ী পাগলীটা ভিক্ষা করিতে আসিলে ঠাকুরমা ছোট খোকাকে তাহার কাছে লইয়া গিয়া বাসুকে দেখাইয়া কহিলেন, "ওকে দিয়ে দিই। ওই ঝুলির মধ্যে ক'রে নিয়ে যাবে।—কি গো, আমাদের রাঙা টুক্‌টুকে ছেলেটি নেবে তুমি?"

বুড়ী রহস্য বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল, "নেব—দাও এই ঝুলির মধ্যে।"

বাসু পিছন হইতে ঠাকুরমার আঁচল টানিয়া তাহাকে ঘরের মধ্যে আনিতে চাহিল, অথচ মুখ ফুটিয়াও বলিবে না,—ভাইকে দিও না।

ও-ঘর হইতে মলিনা হাসিয়া কহিল, "দাও মা, দিয়ে দাও, ওর আপদ-বালাই চুকে যাক্।"

ঠাকুরমা নাতির দিকে মুখ ফিরান। নাতি অমনি লজ্জায় চৌকাঠের আড়ালে অদৃশ্য হয়।

সেদিন রবিবার। স্কুল নাই। বিনয়ভূষণ ঘরে চৌকির উপর বসিয়া ত্রৈমাসিক পরীক্ষার খাতা দেখিতেছে। মুখুজ্জে-গিন্নী তরকারী কুটিতে বসিয়াছেন। মলিনা রান্নাঘরে।

বাসু আজ সারা সকাল পুকুর-পাড়ে ও-বাড়ীর টুনি ও টেঁপীর সঙ্গে জলকাদা লইয়া 'ঘর-বাড়ী' খেলিয়া এইমাত্র ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে।

হঠাৎ তাহার ভাইয়ের কথা মনে জাগিল। কিন্তু খোকা তাহার বিছানায় নাই। ও-ঘরে গেল, সেখানেও নাই।

রান্নাঘর, ঢেঁকিঘর, গোয়াল, বাহিরের ঘর, সর্ব্বত্র সে পাতি-পাতি খুঁজিল, কোথাও বাসু ছোট ভ্রাতার দর্শন পাইল না।... ভাইটি গেল কোথায়! অথচ মা নিশ্চিন্তে রাঁধাবাড়ায় ব্যস্ত, বাবা একমনে কাগজ দেখিতেছেন, ঠাকুরমা রোজকার মত তেমনই তরকারি কুটিতেছেন। সব দিকে সবই ঠিক, অথচ ভাই গেল কোথায়?...

বাসু আবার বড় ঘরে ফিরিয়া আসিল। আর একবার চৌকির তলাটা দেখিয়া পিতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কি ভাবিয়া সকল লজ্জা ত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া পিতাকে প্রশ্ন করিল, "ভাই কোথায় বাবা?"

বিনয়ভূষণ খাতা হইতে মুখ তুলিয়া মনে মনে হাসিল। চাপা গলায় কহিল, "চুপ! তোর মা যেন এখন শোনে না। শুনলে এক্ষুণি কান্নাকাটি সুরু ক'রে দেবে। আমার স্কুলে যাওয়া আর হবে না। খাওয়ার আগে কাউকে বলিস্ নি যেন।" তার পর মুখে একটু কাঁদ-কাঁদ ভাব টানিয়া আনিয়া পুত্রকে জানাইল, "খোকাকে বড় বাঁদরটায় নিয়ে গেছে।"

বিনয় গম্ভীরভাবেই আবার নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। বাসু কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া রান্নাঘরে গিয়া মা'র কোলে কাঁদিয়া ফাটিয়া পড়িল।

"তোর আজ আবার হ'ল কি?"—মলিনা পুত্রকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

বাসু কিছুই বলিতে পারিল না। মলিনা কোলে টানিয়া কহিল, "বল লক্ষ্মীটি, তোমায় কে কি বলেছে?—আঃ বল্ না।"

বাসু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দনের কাটা-কাটা ভাষা হইতে মলিনা অবশেষে এইটুকু ধরিয়া লইল যে ভাইকে বড় বানরটা আসিয়া লইয়া গিয়াছে।

মলিনা বুঝিল, এ কাণ্ড কাহার। পুত্রকে কোলে লইয়া বড় ঘরে গিয়া স্বামীকে হাসিতে হাসিতে কপট রোষ প্রকাশ করিয়া কহিল, "তোমার আর খেয়ে-দেয়ে যত কাজ নেই। কি ফ্যাসাদ বাধিয়েছ বল দিকি? কাজের সময় এ ঝঞ্ঝাট ভাল লাগে? যাও, এখন খোকনকে নিয়ে এস গে।—আর পদি-পিসিমাই বা কেমনধারা লোক! সেই কোন্ সকালে নিয়ে গেছে, ওর দুধ খাওয়াবার সময়ও ত হয়েছে অনেক ক্ষণ।"

বিনয়ভূষণ ও-বাড়ী হইতে ছোট খোকাকে আনিতে গেল।

মলিনা বাসুকে প্রবোধ দিল, "কাঁদিস্ নে। বাবা তোকে ফাঁকি দিয়েছে। এক্ষুণি আসবে তোর ভাইটি।"

খোকার পৌঁছিবার আগেই বাসুর ক্রন্দনের বেগ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া মাঝে মাঝে একটু-আধটু ফোঁস-ফোঁসানিতে আসিয়া শেষ হইয়াছে।

"বোকা কোথাকার! ঠাট্টাও বোঝে না! ঐ দেখ্, তোর ভাই!—মাথা তোল্।"—মলিনা তাহার কাঁধ হইতে বাসুর মাথাটি তুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বাসু শক্ত করিয়া লাগিয়া আছে।

"মাথা তোল্ না, বোকারাম! ঐ যে তোর ভাই, দেখ্ না চেয়ে।"

বাসু এখন সবই বুঝিয়া লইয়াছে, মাথা তুলিতে চায় না মানের দায়ে। দুটি হাতে মা'র গলা জড়াইয়া সলজ্জ মুখখানি ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

মলিনা তাহার গলায় সুড়সুড়ি দিয়া মাথা জাগাইবার চেষ্টা করিল। এবার বাসু মুখ তুলিয়াছে।

পিতার কোলে চঞ্চল ছোট ভাইয়ের ঢল-ঢল মুখখানি দেখিয়া মায়ের কোলে বাসুর অশ্রুসজল মেঘল মুখে হি-হি হাসির এক ঝলক রৌদ্র ফুটিল; যেন সেদিন মুখুজ্জে-বাড়ীর উঠানের কোণে এক টুক্‌রা আলোক মুহূর্ত্তের জন্য ঠিক্‌রাইয়া পড়িয়া আবার মিলাইয়া গেল।

মা কহিল, "বাসু ত তার ভাইকে তার রোজগারের ভাগ দেবে না গো।"

"সত্যি না কি রে?"

"না বাবা।"

"মিথ্যাবাদী! বলিস্ নি?"

মলিনার প্রতিবাদে বারান্দা হইতে বিমুগ্ধা ঠাকুরমাও সায় দিয়া কহিলেন, "আমিও ত শুনেছি। মিথ্যা ব'লো না দাদু! তাহ'লে কিন্তু তোমার শাশুড়ীর নাকে-গোদ হবে।"

বাসু লজ্জা পাইয়া আবার মাথাটি এলাইয়া দিল মায়ের কাঁধে। তাহার দুষ্ট দুটি মিষ্টি চোখ ছোট ভাইয়ের দিকে চাহিয়া মিটিমিটি হাসিতে লাগিল।

অন্ধ্রদেশে দৃষ্টিনিক্ষেপ

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বাংলা দেশে আমাদের জন্ম, বাংলা দেশে জীবনের অধিকাংশ সময় বাস করিয়া আসিতেছি, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা; অথচ আমরা বাংলা দেশকে জানি, বলিতে পারি না। ইহার মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করা সহজ নহে। তাহা অপেক্ষা সহজ কাজ, কেবল সময় দিলেই এবং দৈহিক শ্রম ও কিছু ব্যয় করিলেই যাহা হইতে পারে, সেই বঙ্গদেশ-দর্শনের কাজই বা আমরা কয় জন করি? আমাদের নিকট বঙ্গের অধিকাংশ গ্রাম

নগর নদ নদী প.

বঙ্গদেশ অবস্থিত

সমস্ত জীবন

করিয়া বাংলা দেশকে

কোথাও গিয়া সেই দেশ জানিয়া চিনিয়া ফেলা অসম্ভব। ইউরোপ আমেরিকার লোকেরা এই অসাধ্য সাধন করেন বটে। তাঁহারা কেহ কেহ ভারতবর্ষে কয়েক দিন, সপ্তাহ বা মাস বেড়াইয়া ভারত সম্বন্ধে প্রকাণ্ড বহি লিখিয়া ফেলেন ও তাহা প্রামাণিকও বিবেচিত হয়। আমাদের সেরূপ কো দুরাকাঙ্ক্ষা নাই। আমরা দুইবার অন্ধ্রদেশে, নগরে, কয়েক দিন ছিলাম। তা

বিশেষ কোন জ্ঞান ল

কিছু দেখিয়া

…র সম্পাদক, প্রবাসীর সম্পাদক ও প্রার্থনা-সমাজের সম্পাদক।

থাও নামি নাই। আমরা বাল্যকালে অন্ধ্রদেশের নাম গালে পড়ি নাই। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীই জানিতাম, হার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন অংশ এক একটি দেশের নাম নিতাম না। এখন অন্ধ্রদেশ নামটি অন্তত কংগ্রেসওয়ালারা নেন। ইহা সেই দেশ যাহার মাতৃভাষা তেলুগু। বাংলা দেশে ার অধিবাসীদিগকে আমরা আগে তেলেঙ্গা বলিতাম। ই দেশের কলেজসমূহের ছাত্রদের একটি বার্ষিক কন্‌ফারেন্স , তাহারই একাদশ অধিবেশনের আমি সভাপতি মনোনীত

শ্রীমতী ভাগীরথী দেবী

ইয়া বিশাখপত্তন (ভিজাগাপটম্) যাই। এই ছাত্রেরা মামার পাথেয় বাবদে যাহা পাঠাইয়াছিলেন তাহা আমার য়োজন অপেক্ষা অনেক অধিক। তাঁহারা এরূপ কেন রিয়াছিলেন জানি না। হয়ত অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার ছাত্রেরাই অধিকাংশ স্থলে তথায় কলেজে পড়ে। পাথেয়ের মতিরিক্ত টাকা আমি ফেরত দিয়াছিলাম। তাঁহারা একটি চোলট্রির একটি পাকা বাড়ীতে আমাকে রাখিয়াছিলেন, এবং যত্নও খুব করিয়াছিলেন। খাদ্য বোধ হয় কোন বাঙালীর বাড়ীতে রান্না হইয়া আসিত; ঝাল বেশী ছিল না। এখানকার, এবং বোধ হয় মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সর্ব্বত্রই, শৌচাগার জঘন্য। চোলট্রি এক প্রকার পান্থনিবাস—যেমন পশ্চিমের ধর্ম্মশালা। ছাত্রেরা উৎসাহের সহিত কন্‌ফারেন্সের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কয়েক জনের বাগ্মিতা ও বিতর্কশক্তি বেশ আছে, লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কিছু দলাদলিও ছিল।

শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রক্ষিত

তাঁহাদের কন্‌ফারেন্স শহরের টাউনহলে হইয়াছিল, তাহা ঠিক সমুদ্রতটে রমণীয় স্থানে অবস্থিত। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় বিশাখপত্তনে অবস্থিত। ওয়ালটেয়ারকে বিশাখপত্তনেরই একটি অংশ বা উপকণ্ঠ বলা চলে। আমি যখন বিশাখপত্তন যাই, তখন ওয়ালটেয়ারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছিল, হয়ত এখন হইয়া গিয়াছে। সেগুলি স্থানীয় মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম অধ্যাপক ডাক্তার রামমূর্ত্তি আমাকে সৌজন্য সহকারে দেখাইয়াছিলেন। ওয়ালটেয়ার পার্ব্বত্য স্থান, যদিও উচ্চ কোন পর্ব্বত এখানে নাই। আবার ইহা সমুদ্রের তীরেও অবস্থিত। সমুদ্র ও শৈলরাজির একত্র সমাবেশে এখানকার দৃশ্য মনোরম। ওয়ালটেয়ার স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া এখানে অনেক রোগী গিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা কোন্ কোন্ রোগের পক্ষে ভাল, তাহা জানিয়া তবে যাওয়া উচিত। এবং যে বাড়ীতে রোগী থাকিবেন, তাহা সংক্রামক ক্ষয়রোগে আক্রান্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে

তাহার সংক্রামকত্ব সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হইয়াছে কিনা, তাহা জানিয়া তবে সেখানে যাওয়া উচিত। তথাকার মেডিক্যাল কলেজের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার তিরুমূর্ত্তি আমাকে কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, যে, কোন কোন অন্যরোগাক্রান্ত ব্যক্তি এখানে আসিয়া ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন।

আমি যখন বিশাখপত্তন গিয়াছিলাম, তখন তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে এক জন বাঙালী অধ্যাপক ছিলেন, এখনও

শ্রীমতী স্নেহশোভনা রক্ষিত

আছেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর সেন। মেডিক্যাল কলেজে অতি অল্পসংখ্যক বাঙালী ছাত্রও ছিলেন। তা ছাড়া, কেরানীগিরি প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত আরও সামান্য কয়েক জন বাঙালী ছিলেন। ইঁহাদের সকলের সহিত একদিন সন্ধ্যার সময় মিলিত ও পরিচিত হইয়াছিলাম। অল্প কয়েক জন বাঙালী মেডিক্যাল ছাত্র আসাতেই, তখন শুনিয়াছিলাম, কর্ত্তৃপক্ষ সাবধান হইয়াছেন ও আর বাঙালী ছাত্র যাহাতে না আসে তাহার উপায় অবলম্বন করিতেছেন। সম্প্রতি শুনিয়াছি, পরোক্ষভাবে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, এবং তাহার ফলে তথাকার মেডিক্যাল কলেজের ১ম ও ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে বাঙালী ছাত্র নাই। আগে সকল ছাত্রেরই বেতন বার্ষিক ২০০ টাকা লাগিত। এখানকার নিয়মে ভিন্নপ্রাদেশিক

শ্রীমতী কামেশ্বরাম্মা

ছাত্রদিগকে বার্ষিক ৪০০ টাকা বেতন দিতে হয়। লক্ষ্ণৌর আর্টস্কুলেও শুনিয়াছি ভিন্নপ্রাদেশিক ছাত্রদিগকে অনেক বেশী বেতন দিতে হয়। বাংলা দেশের কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের ছাত্রদের বেতনের পার্থক্য আছে বলিয়া আমি জানি না।

বাংলা দেশে যেমন, ভারতবর্ষের অন্যত্রও তেমনি, রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনিবার আগ্রহ খুব বেশী। সুতরাং আমাকে ছাত্রদের কন্‌ফারেন্সে তদুপযোগী বক্তৃতা ছাড়া শিক্ষিত সাধারণের জন্য রাজনৈতিক বিষয়েও বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। স্থানীয় প্রার্থনাসমাজের উদ্যোগে তাঁহাদের উপযোগী বিষয়েও কিছু বলিয়াছিলাম। তাহা আরম্ভ হইবার

পূর্ব্বে কয়েক জন স্থানীয় যুবক একটি বাংলা ভজন গান করিলেন। তাঁহাদের উচ্চারণ ঠিক বাঙালীর মত নহে—না হইবারই কথা।

বিশাখপত্তনে দেখিলাম, স্থানীয় লোকেরা যাতায়াতের জন্য গোযান ব্যবহার করেন। এগুলি ঘোড়ার গাড়ী অপেক্ষা সস্তা। ঘোড়ার গাড়ীর চেয়ে এগুলির চলন বেশী। গোযানগুলিতে যে গ্রাম্য লোকেরাই আরোহণ করেন, এমন নয়; শহরের পুরুষ ও মহিলারাও এগুলি ব্যবহার করেন।

আর. ভি. এম সূর্য্যরাও বাহাদুর সি. বি. ই. পীঠপুরমের মহারাজা

সম্প্রতি আমি অন্ধ্রদেশের আরও তিনটি স্থান দেখিয়াছি—পীঠপুরম্, কোকানাদা (স্থানীয় লোকেরা বলেন কাকিনাডা) ও রাজমহেন্দ্রী। অন্ধ্রদেশের প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-সংস্কারক, সমাজসংস্কারক ও লেখকাগ্রগণ্য স্বর্গীয় পণ্ডিত বীরেশলিঙ্গম্ পান্তলু মহাশয়ের প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে জনসভার সভাপতিত্ব করিবার জন্য আহূত হইয়া আমি রাজমহেন্দ্রী যাই। পথে পীঠপুরম্ ও কোকানাদা দেখিয়া যাই।

বীরেশলিঙ্গম্ পান্তলুর মর্ম্মর-মূর্ত্তি

পীঠপুরমে নামিবার একাধিক কারণ ছিল। তথাকার লোকহিতব্রত মহারাজা সূর্য্যরাও মহোদয়ের সহিত এবং তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা ব্রহ্মর্ষি ডক্টর সর্ রঘুপতি বেঙ্কটরত্নম্ নাইডু মহাশয়ের সহিত আগে হইতেই পরিচয় ছিল। তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা ছিল। মহারাজার লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিবার ইচ্ছাও ছিল। একটি প্রতিষ্ঠান আদি-অন্ধ্র অর্থাৎ অবনত শ্রেণীর অনাথ বালক-দিগের ভরণপোষণ ও শিক্ষার নিমিত্ত। নাম শান্তিকুটীর। তাহার তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত এ. চলমায়া। রবীন্দ্রনাথের শান্তি-

নিকেতনস্থ বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছিলেন এবং তথায় আমার কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমান প্রসাদের সহপাঠী ছিলেন। তিনি আমাকে পীঠপুরমে নামিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

তথায় মহারাজা সাহেবের অতিথিভবনে ছিলাম। অনাথ বালক ভিন্ন পীঠপুরমে অনাথ বালিকাদের জন্যও তাঁহার একটি আশ্রম আছে। তাহার তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ রাও। বালক ও বালিকাদের এই দুইটি আশ্রমে তাহাদের দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ উন্নতির ব্যবস্থা আছে। সমুদয় ব্যয় মহারাজা নির্ব্বাহ করেন। এই দুইটি ছাড়া তাঁহার ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। ইহা সহশিক্ষা রীতি অনুসারে পরিচালিত। ইহার ছাত্রের সংখ্যা ৬৪১ এবং ছাত্রীর ৯৭। ছাত্র ও ছাত্রীরা একত্র শিক্ষা লাভ করায় এখানে কোন সমস্যার উদ্ভব হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ, অন্ধ্রদেশে নারীদের অবরোধ-প্রথা নাই।

সর্ রঘুপতি বেঙ্কটরত্নম্ নাইডু

হয়ত সেই কারণেই এখানকার নারীরা যেরূপ অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে ও আত্মনির্ভরশীলভাবে চলাফেরা করেন, বাংলা দেশে নারীদের মধ্যে তাহা সচরাচর দেখা যায় না।

এখানে মহারাজা সাহেবের দেওয়ান মহাশয়ের বহু প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তাঁহার গৃহে পৌঁছিয়া শুনিলাম, তিনি স্বাস্থ্যলাভার্থ স্থানান্তরে গিয়াছেন। তাঁহার পত্নী কয়েকটি পুত্রকন্যাসহ বাহির হইয়া আসিলেন। কিছু কথাবার্ত্তা ও জলযোগের পর যখন বিদায় লইবার জন্য উঠিলাম, তখন আমাকে দুটি হাত পাতিতে বলা হইল। তিনি তাহা নানাবিধ ফলে পূর্ণ করিয়া দিলেন; যাহা হাতে ধরিল না, তাহা অন্য আধারে লইয়া আসিতে হইল। শুনিলাম, অতিথিদের সম্বর্দ্ধনার এই সুন্দর রীতিটি তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত।

ডাঃ ভি. ভি. কৃষ্ণায়া, কোকানাদ

দেওয়ান সাহেবের বাড়ীতে এবং অন্যত্রও আমি লক্ষ্য করিয়াছি, অন্ধ্রদেশে অনেক মহিলা সোনার, রূপার বা অন্য ধাতুর কটিবন্ধ ব্যবহার করেন। কুমারী ও সধবা স্ত্রীলোকেরা মাথায় কাপড় দেন না, বিধবারা মস্তক আবৃত করেন। এখানকার রীতি এইরূপ বলিয়া এখানকার প্রবাসিনী বাঙালী মহিলারাও সাধারণতঃ স্বামীর সাক্ষাতেও ঘোমটা দেন না। অন্ধ্রদেশে বাঙালী পুরুষের সংখ্যা খুব কম, বাঙালী নারীদের সংখ্যা আরও কম। একমাত্র কলিকাতা শহরেই যত অন্ধ্রদেশীয় আছেন, সমগ্র অন্ধ্রদেশে তত বাঙালী নাই। তাহার কারণ, বাঙালীরা দৈহিক শ্রমের জন্য অন্যত্র যাওয়া দূরে থাক, দৈহিক শ্রমের জন্য বাহির হইতেই বঙ্গে বহু লক্ষ লোক আসে, তা ছাড়া কিছু বা বেশী বিদ্যাসাপেক্ষ কাজের জন্য অবাঙালীরা বঙ্গে আসে। পক্ষান্তরে বাঙালীরা প্রধানতঃ বিদ্যাসাপেক্ষ কাজের জন্য

বঙ্গের বাহিরে যায়। পীঠপুরমে একমাত্র বাঙালী মহিলা শ্রীযুক্ত চলমায়্যার পত্নী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। চলমায়্যা বেশ বাংলা বলিতে পারেন। তাঁহার সহিত ও, অবশ্য, শ্রীমতী ইন্দিরার সহিত বাংলাতেই কথাবার্তা হইত। তদ্ভিন্ন,

মিঃ সুরবারাও পান্তলু

অনাথ বালিকাশ্রমের শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ রাও এবং শ্রীমতী সুন্দরাম্মার সহিতও বাংলায় কথাবার্তা হইয়াছিল। ইঁহারা এক সময়ে কলিকাতায় ছিলেন।

পীঠপুরমে মহারাজা সাহেবের সহিত এবং সর্ রঘুপতি বেঙ্কটরত্নম্ নাইডু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। নানা বিষয়ে তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা হয়। মনে পড়িতেছে, মহারাজা জানিতে চাহিয়াছিলেন, রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী কেন প্রকাশিত হইতেছে না। আমি ঠিক্ উত্তর দিতে পারি নাই। নাইডু মহাশয় সাধুতা, পাণ্ডিত্য, বাক্‌পটুতা ও শিক্ষাদানে পুণ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি

প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত রামস্বামী

কোকানাদা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এবং মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন। অন্যান্য অনেক কথার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা ভারতবর্ষের যে ক্ষতি হইতেছে, সে বিষয়ে কিছু কথা হয়। তিনি বলেন, বঙ্গের সাম্প্রদায়িকতা প্রধানত হিন্দু-মুসলমান লইয়া, কিন্তু মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে তা ছাড়া অন্য নানা রকমের দলও আছে। যেমন ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ, উচ্চবর্ণের হিন্দু ও তথাকথিত অস্পৃশ্য হিন্দু, ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবার নানাশ্রেণীর বামুন, তামিল তেলুগু কানাড়ী মলয়ালম ভাষাভাষীদের ভিন্ন ভিন্ন দল, ইত্যাদি। ইহারা প্রত্যেকেই সরকারী চাকরি প্রভৃতি সুবিধাগুলি একচেটিয়া করিতে চায়।

পীঠপুরম্ দেখিবার সুবিধার নিমিত্ত মহারাজা সাহেব একখানি মোটর দিয়াছিলেন। তাহাতে করিয়া একদিন কয়েক মাইল দূরবর্তী উপ্পাডা নামক গ্রামের সন্নিহিত সমুদ্রোপকূলে বেড়াইতে যাই। পথের দুই পাশে ফলের

পীঠপুরমের অনাথবালিকাশ্রম। ×শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ রাও

বাগান ও শস্যের ক্ষেত দেখিলেই বুঝা যায় এই অঞ্চলের জমী খুব উর্ব্বরা। পীঠপুরম্ হইতে যখন মোটরে কোকানাদা যাই, তখনও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। পরে অবগত হই, এই স্থানগুলি যে পূর্ব্ব-গোদাবরী জেলার অন্তর্গত, তাহা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অতি উর্ব্বর অন্যতম জেলা। স্বাভাবিক বারিপাত ব্যতীত এখানে কৃত্রিম খাল হইতে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের সুব্যবস্থা আছে।

উপ্পাডা গ্রামটি ছোট, কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গের অনেক গ্রামের মত ক্ষয়িষ্ণু ও শ্রীহীন নহে। অনেকগুলি পাকা বাড়ী চোখে পড়িল। যে-সব অধিবাসী দেখিলাম, তাহাদিগকে অনশন-ক্লিষ্ট বুভুক্ষিত মনে হইল না, সমুদ্রতীরে অনেকগুলি মানুষ দেখিলাম, তাহারা সমুদ্রে মাছ ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাহাদের প্রায়নগ্ন, সুগঠিত, প্রশস্তবক্ষ, ভুঁড়িবিহীন, ঋজু দেহ দেখিবার মত।

রাজমহেন্দ্রী যাইবার পূর্ব্বে কোকানাদা দেখিয়া যাইবার অনুরোধ ছিল। পীঠপুরমের মহারাজা সাহেবের মোটরে দশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সেখানে পৌঁছিলাম। তথাকার মহারাজার কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রক্ষিতের বাড়ীতে ছিলাম। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী স্নেহশোভনা দেবীও ঐ কলেজের শিক্ষয়িত্রী। অন্ধ্র-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূত কলেজসমূহের মধ্যে ইনিই কলেজ-বিভাগে একমাত্র শিক্ষয়িত্রী। কোকানাদাতে আর এক জন বাঙালী অধ্যাপক আছেন। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ পাল। তিনি রসায়নী বিদ্যার অধ্যাপক। ইনি বার বৎসর কোকানাদাতে আছেন। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী ভাগীরথী দেবীর সহিতও সাক্ষাৎ হইল। ইঁহার পিতা স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস মল্লিক সুবর্ণবণিক সমাজের এক জন সংস্কারক এবং "সুবর্ণ-বণিক সমাচার" পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। শুনিলাম শ্রীমতী ভাগীরথী দেবী এরূপ অনায়াসে তেলুগু বলিতে পারেন, যে, কেহ বলিয়া না-দিলে বুঝা যায় না, যে, তেলুগু তাঁহার মাতৃভাষা নহে।

কোকানাদাতে শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় অরণ্য-বিভাগে ডেপুটী কন্‌জার্ভেটরের কাজ করেন। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী অমিয়া দেবী কলিকাতার শ্যামবাজারের ডাক্তার

কোকানাদা পিট্টাপুর রাজার কলেজের অধ্যাপকবর্গ

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা। ইঁহাদের মোটরে আমি শহর দেখিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন ইঁহারা সৌজন্য সহকারে আমাকে দূরবর্ত্তী সামলকোট ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন।

মহারাজার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত রামস্বামীর সৌজন্যে আমি কলেজ ও স্কুল বিভাগ দেখিলাম। দুটিতেই সহশিক্ষা প্রচলিত। স্কুল-বিভাগে ১৭০০ ছাত্রছাত্রী এবং কলেজ-বিভাগে ৫০০ ছাত্রছাত্রী শিক্ষা পায়। উভয় বিভাগেই ছাত্রীরা বিনা বেতনে শিক্ষা পায়। অবনত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা কেবল যে বিনা বেতনে শিক্ষা পায় তাহা নহে, অধিকন্তু বৃত্তিও পায়। প্রিন্সিপ্যাল মহাশয় কলিকাতায় শিক্ষা লাভ করেন ও তথায় সস্ত্রীক থাকিতেন। তাঁহার পত্নী বাংলায় আমার সহিত কথা কহিলেন ও তাঁহাদের পুত্রকন্যার বিবাহে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। আমি যাইতে পারি নাই।

বাঙালী নহেন অথচ বাংলা বলেন এরূপ আর একটি ভদ্রলোকের সহিত কোকানাদায় পরিচয় হইল। ইনি ডাক্তার, কলিকাতায় শিক্ষা লাভ করেন, নাম শ্রীযুক্ত বেদাঙ্গম্ বেঙ্কট কৃষ্ণায়া। তাঁহার সেখানে বেশ পসার; তিনি কংগ্রেসের এক জন কৃতী কর্ম্মীও বটেন। তাঁহার স্ত্রীও কংগ্রেসের সেখানকার এক জন জানা কর্ম্মী। তিনিও বাংলা জানেন বলেন। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। ইঁহাদের একটি পুত্র কলিকাতায় বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসে শিক্ষানবীস আছেন।

কোকানাদার বন্ধুদের অনুরোধে সেখানে একটি বক্তৃতা করি। বিষয় ছিল, "সভ্যতার প্রগতি"। স্থানীয় ব্রাহ্মমন্দিরে বক্তৃতা হয়। মন্দিরটি বেশ বড়। দেখিতেও বেশ সুন্দর। পীঠপুরমের মহারাজার ব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রায় লক্ষ টাকা খরচ হইয়া থাকিবে। বক্তৃতার সময় ভিতরে ও বাহিরে বিস্তর শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

বিশাখপত্তন, কোকানাদা, রাজমহেন্দ্রী, কোনটিই বড় শহর নয়, কোনটিতেই দৈনিক কাগজ নাই। অথচ প্রত্যেক স্থানের আমার বক্তৃতাগুলির যেরূপ রিপোর্ট মান্দ্রাজী রিপোর্টারেরা দৈনিক "হিন্দু"তে পাঠাইয়াছিলেন, কলিকাতায় আমার কোন বক্তৃতার সেরূপ রিপোর্ট কলিকাতার কাগজে দেখি নাই।

কোকানাদায় মহারাজার যে অনাথালয় আছে, তাহার ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট। ছেলেমেয়েদের থাকিবার বাড়ী ও মন্দির সুদৃশ্য ও স্বাস্থ্যকর; বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর মহারাজার ব্যয়ে নির্ম্মিত। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে এখানে অনাথ বালক-বালিকাদিগকে রাখিয়া সাধারণ ও অর্থকর শিক্ষা দেওয়া হয়। বালকেরা যদি উচ্চতর শিক্ষা চায়, তাহা হইলে বিনা বেতনে মহারাজার

কোকানাদ পিট্টাপুর রাজার কলেজ

স্কুলে ও কলেজে পড়িতে পারে। নতুবা সাধারণত তাহারা উপার্জ্জনক্ষম হইলেই তাহাদিগকে কিছু পুঁজী দিয়া বিদায় দেওয়া হয়। বালিকারা প্রাপ্তবয়স্কা হইয়া বিবাহের পর আশ্রম ত্যাগ করে। বিবাহের সময় তাহাদের বিবাহের ব্যয় মহারাজা দেন এবং তদ্ভিন্ন প্রত্যেককে ৩৫০ টাকা ও অলঙ্কার দেন। এ-বিষয়ে স্বর্গীয়া মহারাণী বালিকাদের প্রতি মাতৃস্নেহের সহিত কর্ত্তব্য করিতেন। বিবাহিতা কেহ কেহ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে এখানে আসেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কেহ বিধবা হইলে আবার আশ্রমে আসেন। পুনর্ব্বার বিবাহে আপত্তি না থাকিলে তাঁহাদের বিবাহ দেওয়া হয়। নতুবা তাঁহারা কিছু শিখিয়া উপার্জ্জনক্ষম হইলে আশ্রম হইতে কর্ম্মক্ষেত্রে যান। অনাথালয়টির বাৎসরিক ব্যয় ১৫০০০ টাকা মহারাজা দেন।

এখান হইতে রাজমহেন্দ্রী যাই। সেখানে পৌঁছিতে মধ্যাহ্ন হয়। স্নানাহার করিয়া গিয়াছিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া দেখি, বীরেশলিঙ্গম্ পান্তলু মহাশয়ের বাগানে, যেখানে তাঁহার বাসগৃহ, সমাধি ও সাধনমণ্ডপ আছে, ভোজের আয়োজন হইয়াছে। পাত পাড়িয়া সকলে মাটিতে বসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার ক্ষুধা ছিল না, তাহার উপর খাদ্যে লঙ্কার আধিক্যবশত খাওয়াও সহজ ছিল না। কিন্তু "রসম্" পান করিলাম। কিছু পাপড় ও দৈ-ও খাইলাম।

একটি প্রকাণ্ড বাংলায় আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সেখানে বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে স্থানীয় টাউনহলে নূতন ভারত-শাসন আইন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গেলাম। টাউনহলটিতে বেশী লোক ধরে না বলিয়া উদ্যোক্তারা তাহারই সংলগ্ন ও এলাকাভুক্ত একটি খোলা জায়গায় সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। স্থানটিতে বোধ হয় তিন হাজারের কম লোক ধরে না। বক্তৃতার সময় উহার কোন অংশ খালি পড়িয়া ছিল না। সভাপতি হইয়াছিলেন ন্যায়পতি সুব্বারাও পান্তলু। ইঁহাকে রাজমহেন্দ্রীতে অন্ধ্রদেশের ভীষ্ম বলা হয়। তিনি প্রাচীন কংগ্রেসওয়ালা, এক সময়ে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। যেদিন আমি রাজমহেন্দ্রী পৌঁছি, সেই দিনই তিনি সৌজন্য সহকারে আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। বোধ হয় তিনিই প্রথমে আসেন। দেশী রীতি অনুসারে বাহিরের কক্ষে জুতা খুলিয়া আসিয়া বসিলেন। বলিলেন, "আমার অমুক সালের ইম্পীরিয়্যাল কৌন্সিলের একটি বক্তৃতার উপর আপনি মডার্ণ রিভিয়ুতে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন।" পরিচয়ের পর আমাকে সুধাইলেন,

"আপনার বয়স কত?" আমি বলিলাম, "সত্তর পার হয়েছে।" মৃদুস্বরে বলিলেন, "মাত্র সত্তর!" আমার মত জরাগ্রস্ত চেহারার মানুষের বয়স সত্তর কম মনে হয় বটে। তাছাড়া আর একটি কারণও ছিল। আমার বয়স তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন, সুতরাং আমিও তাঁর বয়স জানিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, "আশী"। তাঁহার কিন্তু অত বয়স দেখায় না। একটু বাঁকিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বার্দ্ধক্যের ইহাই প্রধান বাহ্য চিহ্ন।

পীঠপুরমের দেওয়ান সাহেবের পরিজনবর্গ

তাঁহার সহিত আমার প্রধানত বর্ত্তমানে আমাদের রাজনৈতিক
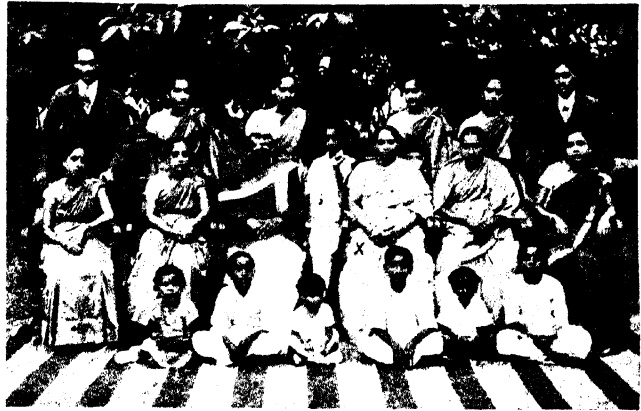
কোকানাদা অনাথ-আশ্রমের শিক্ষকবর্গ, মধ্যস্থলে—মিঃ জগন্নাথ রাও, সুপারিনটেনডেন্ট

কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কথা হয়। তিনি এই বলিয়া আরম্ভ করিলেন, "আপনি ত বক্তৃতায় নূতন আইনটাকে টুকরা টুকরা ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌লেন। কিন্তু স্বরাজলাভের জন্য করা যায় কি? সব সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন ক'রে সম্মিলিত চেষ্টা করা ত অসম্ভব ক'রে তুলেছে।" আমি বলিলাম, "তা মিথ্যা নয়; কিন্তু তাই ব'লে নিশ্চেষ্ট থাকাও উচিত নয়। আগে ঐক্য হবে, তার পর স্বরাজলাভ চেষ্টা করব, এ-রকম না ভেবে, প্রত্যেক সম্প্রদায়, শ্রেণী, দল, নিজ নিজ পন্থা অনুসারে স্বরাজলাভ-চেষ্টা করুন, সকলকে সহযোগিতা করতে ডাকুন, কিন্তু
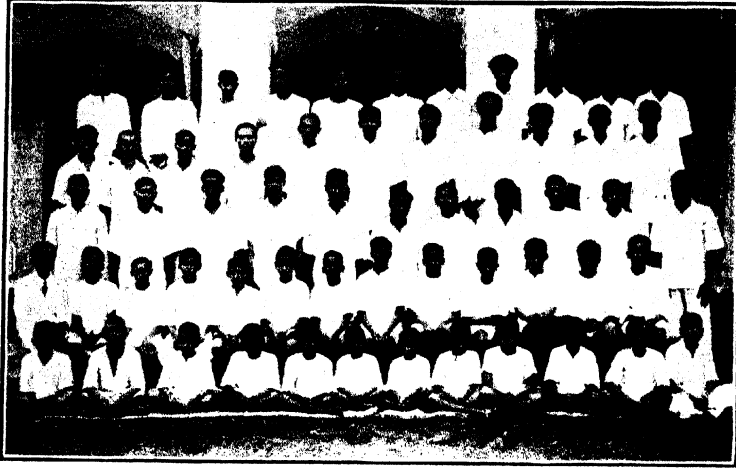
কোকানাদা অনাথ-আশ্রমের বালকবৃন্দ

সহযোগিতা পান বা না-পান, চেষ্টা অবিরত করতে থাকুন। এ ভিন্ন অন্য পথ ত আমি দেখতে পাচ্ছি না।" ইহাতে তিনি সায় দিলেন।

দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে দেখিলাম। সভাস্থলে লোকে লোকারণ্য। উচ্চ মঞ্চে সভাপতির আসন নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সেখান হইতে যত দূর চোখ যায় কেবল মানুষ আর মানুষ।

কোকানাদা অনাথ-আশ্রমের বালিকাবৃন্দ

পরদিন প্রার্থনা-মন্দিরে আমাকে উপাসনা করিতে হইল। অপরাহ্নে বীরেশলিঙ্গম্ পান্তলু মহাশয়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা। মূর্ত্তিটি শহরের একটি বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত স্থানে বসাইয়া ঘেরাটোপ

সভাপতি নির্ব্বাচনের পর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও স্থাপন কমিটির সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত সুন্দরশিব রাও রিপোর্ট পড়িলেন। তাহার পর আমি মূর্ত্তিটির আবরণ উন্মোচন করিলাম।

তাহার পর আমার বক্তৃতা ও অন্য অনেক বক্তৃতা হইল। অধিকাংশ বক্তৃতা তেলুগু ভাষায় হইল। আমি ঐ ভাষা জানি না। কিন্তু অনেক বক্তৃতা সুশ্রাব্য ও উদ্দীপনাপূর্ণ মনে হইল। কবিতায় পান্তলু মহাশয়ের কিছু প্রশস্তি পাঠও হইল। ইংরেজী বক্তৃতার মধ্যে ডক্টর ভি. রামকৃষ্ণ রাও মহাশয়ের এবং শ্রীমতী কামেশ্বরাম্মার বক্তৃতা প্রধান। ডক্টর রামকৃষ্ণ রাও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি., আগে কোকানাদা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সুপণ্ডিত, সুলেখক ও সুবক্তা, বেশ সারগর্ভ ও চিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা স্পষ্টবাদিতার সহিত করিলেন। শ্রীমতী কামেশ্বরাম্মা, বি-এ, শ্রীযুক্ত সুন্দরশিব রাওয়ের কন্যা; এখন মহীশূরে থাকেন। বাল্যে বিধবা হইয়াছিলেন। পরে বীরেশলিঙ্গম্ পান্তলু মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ-প্রচেষ্টার কল্যাণে বিবাহিত হইয়াছেন। তাঁহার বাগ্মিতা প্রশংসনীয়। তিনি বক্তৃতায় যেন পান্তলু মহাশয়ের একটি জীবন্ত ছবি শ্রোতাদের সম্মুখে ধরিলেন, এবং সকলকে প্রাণস্পর্শী ভাষায় নারীদের—বিশেষতঃ বিধবাদের—হিতসাধন ব্রত গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। তাঁহাকে গত করাচী কংগ্রেসে দেখিয়াছিলাম। তিনি কংগ্রেসের উৎসাহী কর্ম্মী।

আর. ভি. এম জি. রামরাও বাহাদুর অনাথ-আশ্রম, কোকানাদা

পান্তলু মহাশয় অল্প বেতনে তেলুগু পণ্ডিতের কাজ করিতেন। তিনি অন্ধ্র দেশের প্রধান ধর্ম্মসংস্কারক ও সমাজ-সংস্কারক এবং আধুনিক তেলুগু সাহিত্যের—বিশেষতঃ গদ্য সাহিত্যের—জন্মদাতা। বিবিধবিষয়ক প্রবন্ধ, নারীদের পাঠ্য নানা পুস্তিকা, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, আত্মচরিত—তাঁহার এবম্প্রকার নানা রচনায় বারটি ভল্যুম পূর্ণ। পণ্ডিতীর বেতন ও এই সব বহি বিক্রীর আয় হইতে তিনি যত কাজ করিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠানগুলি চালাইবার জন্য যত সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রার্থনা-মন্দির, টাউনহল, বৃহৎ একটি উচ্চবিদ্যালয়, সর্ব্বসাধারণের গ্রন্থাগার, বিধবাশ্রম—এই সব তাঁহার কীর্ত্তি। বাগান, ঘরবাড়ী, কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি এই সকলের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

রাজমহেন্দ্রীতে শুনিয়াছি এক জন মাত্র বাঙালী আছেন। তিনি এঞ্জিনীয়ার। তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।

রাত্রি প্রায় আটটার সময় সভাভঙ্গ হয়। তাহার পরই শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রক্ষিত, শ্রীমতী স্নেহশোভনা রক্ষিত ও অধ্যাপক সচ্চিদানন্দমের সহিত কোকানাদায় ফিরিয়া আসি। তাহার পরদিন প্রাতে সকাল সকাল আহার করিয়া
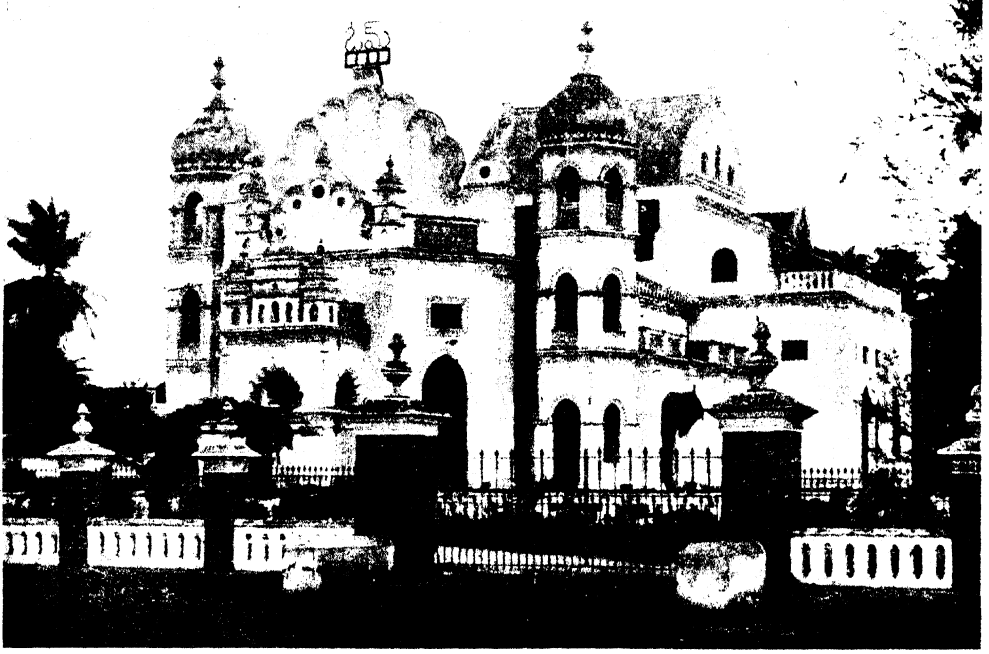
কোকানাদা ব্রাহ্মসমাজ মন্দির

সামলকোট ষ্টেশনে মেলট্রেন ধরি। শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার পত্নী পুত্রটি সহ তাঁহাদের মোটরে আমাকে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দেন। সামলকোট আরও অনেক জিনিষের জন্য প্রসিদ্ধ হইতে পারে। আমি কিন্তু সেখানে কতকগুলি সুন্দর কাঠের খেলনা কিনিয়াছিলাম। সন্ধ্যায় বহরমপুরে কিছু ভাত খাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু চেষ্টা খুব ফলবতী হয় নাই। লঙ্কার রাজত্ব। বিশাখপত্তনের মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ রামমূর্ত্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, ইউরোপের সর্ব্বত্র যেমন কতকগুলি পুষ্টিকর খাদ্য এবং একই প্রকার রন্ধন প্রচলিত, ভারতবর্ষেও তাহা হওয়া উচিত; তাহা হইলে দেশের যে-কোন স্থানের লোক অন্যত্র গেলে অসুবিধা হয় না। কথাটা খুব ঠিক্।

ফিরিবার পথে পীঠপুরম্ ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি, শ্রীযুক্ত চলমায়া আমাকে অন্ধ্রদেশের সুমিষ্ট বিস্তর লেবু পাঠাইয়া দিয়াছেন।
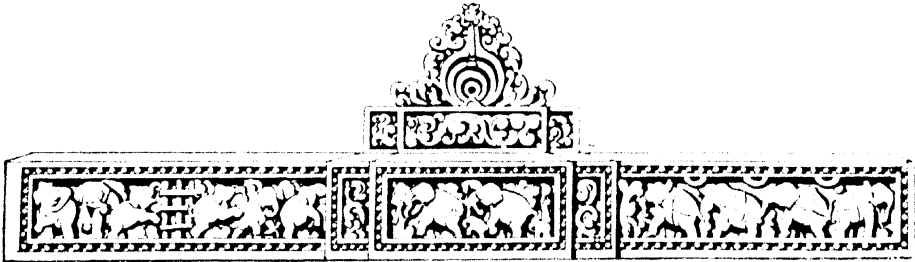
মহিলা-সংবাদ

কুমারী দীপ্তি সরকার এ-বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম ও ছাত্র-

কুমারী দীপ্তি সরকার

ছাত্রীদের মধ্যে ২৬শ স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি ছোট আদালতের অন্যতম বিচারক শ্রীযুক্ত এস. সি. সরকার মহাশয়ের কন্যা।

বেগম শামসুন নাহার

বেগম শামসুন নাহার বি-এ নিখিলবঙ্গ মুসলিম মহিলা-সমিতির সম্পাদিকা। অন্যান্য বহু নারীপ্রতিষ্ঠানের সহিতও তিনি সংযুক্ত আছেন। ইণ্ডিয়ান ডিলিমিটেশন (হ্যামণ্ড) কমিটির নিকট বাঙালী মহিলাদিগের পক্ষ হইতে তিনি সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। ইনি 'বুলবুল' মাসিক পত্রেরও সম্পাদনা করিয়া থাকেন।

শ্রীমতী ঊষা হালদার

মুজঃফর নগরের ডাঃ এস্ হালদারের কন্যা ডাঃ শ্রীমতী ঊষা হালদার গত বর্ষে দিল্লী হার্ডিং মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম বি, বি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। সম্প্রতি তিনি লাহোরে নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে হাসপাতালে মহিলা এসিষ্টাণ্ট সার্জন নিযুক্তা আছেন।

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

২

প্রয়াগে কাজ ত কিছু ছিলই না, যদি বন্ধুও বা কেহ থাকিতেন তবে না-হয় ডালরুটির ব্যবস্থাটা হইত। তাহাও এই হোটেলের যুগে ভাবিয়া লাভ নাই। সুতরাং সোজা ছোট লাইনের পথে বারাণসী যাত্রা করিলাম এবং সেখানে পৌঁছিয়াই সারনাথ রওয়ানা হইলাম। গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম ভিক্ষু শ্রীনিবাস ঘুমাইতেছেন। যাহা হউক, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, আমিও ঘুমাইবার স্থান পাইলাম।

জাপানী শ্রমণ কাবাগুচি শ্রীরাহুল সাংকৃত্যায়ন

কাশীতে আমার টীকাযুক্ত "অভিধর্মকোষ" ছাপাইবার, এবং যদি সম্ভব হয় তাহার বিনিময়ে তিব্বত-যাত্রার খরচের সংস্থান করিবার ইচ্ছা ছিল। পাণ্ডুলিপিখানি সে সময় সঙ্গে না থাকায় কিছুই করা সম্ভব হইবে না জানিয়া তথাগতের ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনের স্থান এই পুণ্যময় ঋষিপতন দর্শন করিতে লাগিলাম। বৌদ্ধ সাহিত্যে ঋষিপতন নামে খ্যাত এই সারনাথ-বারাণসীই বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচারের আরম্ভ দেখিয়াছিল। এখন তাহার সে গৌরবের কি আছে? যাহা হউক, মনে হয় ভবিষৎ প্রসন্ন এবং বর্ত্তমানেও কিছু প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

এবার শিবরাত্রি ১৬ই মার্চ্চ, সুতরাং হাতে দুই মাস সময় ছিল। দিন-কয়েক ছাপরায় বিশ্রাম করিয়া পাটনা-বক্তিয়ারপুর লাইনে রাজগিরিতে উপস্থিত হইলাম। সেখানে কৌণ্ডিন্য বাবার ধর্ম্মশালা ত আমার ঘর-বাড়ীরই মত।

সেই দিনই বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রথিত—বেণুবন, সপ্তপর্ণীগুহা, পিপ্পলীগুহা, তপোদা, বৈভার প্রভৃতি স্থানগুলি দেখিবার জন্য চলিলাম। তখন মনেও ভাবি নাই যে অতীতের খ্যাতি বর্ত্তমানে কতটুকুই বা আছে। যে-বেণুবন বুদ্ধদেবের সংঘ স্থাপনের জন্য প্রাপ্ত 'আরাম' সকলের মধ্যে প্রথম, যেখানে তথাগত বহুবার মাসাবধি থাকিয়া কত ধর্ম্মোপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহার এখন সন্ধান পাওয়াই দায়। যাহা হউক, কোন প্রকারে যদি বা বেণুবন খুঁজিয়া পাইলাম, সপ্তপর্ণীর খোঁজ পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। বেণুবনের
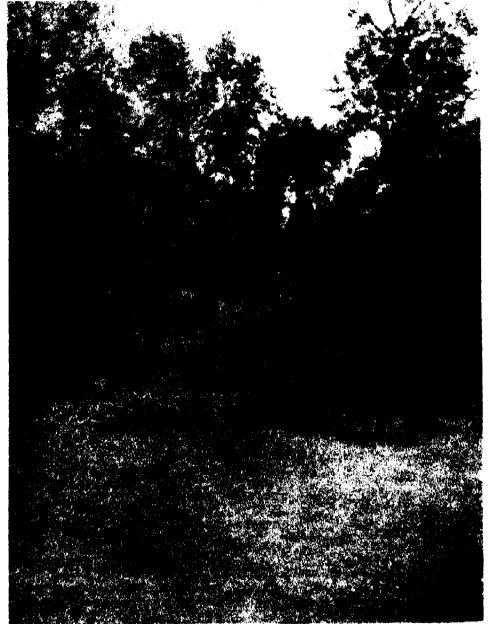
লুম্বিনী (রুম্মিনদেই)—বুদ্ধদেবের জন্মস্থল

রাজগৃহ। বৈভার ও বিপুল পর্ব্বতমধ্যে ঘাট

রাজগৃহ। গৃধ্রকূট

নালন্দায় প্রাপ্ত বোধিসত্ত্বের প্রস্তরমূর্ত্তি
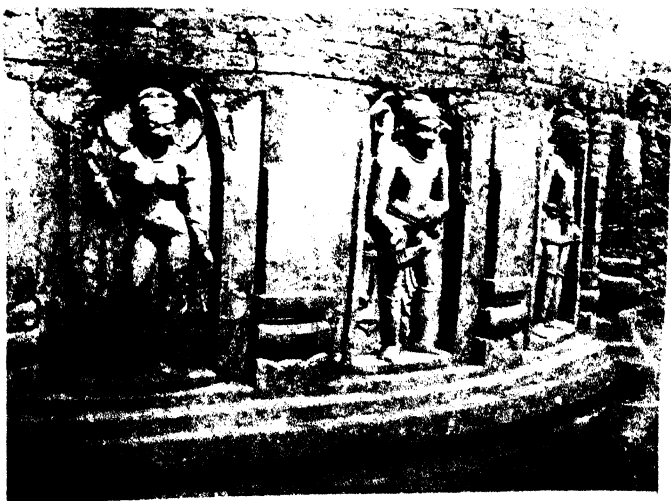
রাজগৃহ। মনিয়র মঠ—ভিতরের দেওয়ালের মূর্ত্তিসজ্জা

রাজগৃহ। গৃধ্রকূট ও গুহা

রাজগৃহ। বনগঙ্গা

রাজগৃহ। মণিয়ার মঠ ও আধুনিক জৈন মন্দির

রাজগৃহ। বৈভারের নীচে 'জরাসন্ধের বৈঠক' ও উষ্ণপ্রস্রবণ

পার্শ্বস্থ নদীর তীরে পূর্ব্বপরিচিত মোহন্তবাবার কুঠাতে গিয়া শুনিলাম, তিনি আর ইহলোকে নাই, স্থতরাং একাকীই বৈভারের চারি পাশে সপ্তপর্ণীর তল্লাসে ঘুরিলাম। বৈভারের উপর হইতে নামিবার সময় পিপ্পলীগুহা দেখিলাম। বিনা-মসলায়-জোড়া পাথরসাজানো এই গুহায় বুদ্ধের প্রিয় প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপ বহুদিন ছিলেন। আরও নীচে তপোদা—সপ্ত ঋষির তপ্তকুণ্ড দেখিলাম। সেদিনকার মত এই সব পুণ্যস্থান দর্শন স্থগিত করিলাম, গৃধ্রকূট পরদিনের জন্য রহিল।

পরদিন স্বামী প্রেমানন্দজী সাথী হইলেন। পাথেয় তাঁহারই প্রস্তুত তরকারী ও পরটা এবং পথপ্রদর্শক শ্রীকৌণ্ডিন্য স্থবিরের ভৃত্য। গৃধ্রকূটের দীর্ঘ চারি মাইল পথে, পুরানো নগরের পরে, জঙ্গলের মধ্যে "সুমাগধা"র শুষ্ক ঘাটে পৌঁছিলাম। এই সুমাগধার জলরাশি এক কালে রাজগৃহ ও আশপাশের বহু গ্রামকে তৃপ্ত করিত, আজ এমন বর্ষাতেও তাহা জলশূন্য। লক্ষ লোকের বসতি এই ভূমি এখন বন্যপশুর আবাসস্থল। কিন্তু তথাগতের সেবায় যাইবার জন্য, মগধসাম্রাজ্যস্থাপক নৃপতি বিম্বিসার নির্ম্মিত রাজপথ এখনও পথনামের যোগ্য আছে।

গৃধ্রকূট পৌঁছিলাম। মনুষ্যচিহ্ন সবই লুপ্তপ্রায় কিন্তু প্রস্তরময় চত্বর এখনও অটুট। যে-চত্বরের উপর পীতবস্ত্র-পরিহিত তথাগতের দর্শনে পুত্রের হস্তে বন্দী বিম্বিসারের হৃদয় আশা ও সন্তোষে পরিপূর্ণ হইত, সে-চত্বরের কাছে সহস্র বৎসর এক দণ্ড কাল মাত্র। আমরা দর্শনের পর পরটার 'সেবা' করিলাম। দ্বিপ্রহর কৌণ্ডিন্য বাবার ধর্ম্মশালায় কাটিল।

ঐদিনই (১০ই জানুয়ারি) সিলাব গ্রামে পৌঁছিলাম। যাঁহার উদ্দেশে গিয়াছিলাম, তাঁহার ত সাক্ষাৎ মিলিল না। তবে* মৌখরিদিগের গন্ধশালি-উৎপন্ন ভাত চিঁড়া বা খাজা তুচ্ছ করা চলে না। সিলাব গ্রাম, ব্রহ্মজাল-সুত্তের উপদেশ-স্থান অম্বলট্টিকা কিংবা মহাকাশ্যপের প্রব্রজ্যা-স্থান বহুপুত্রক চৈত্য, এই দুইয়ের কোন এক স্থান। এখানে বাবু ভগবান-দাস মৌখরির বাড়ীর এলাকার মধ্যে একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর এক শিলালেখ দেখিলাম। পরদিন ঐ লিপির নকল লইতে ও খাওয়া-দাওয়া শেষ করিতে দ্বিপ্রহর কাটিয়া গেল। সেইদিনই অপরাহ্নে নালন্দা রওয়ানা হইলাম।

দুই বৎসর পরে নালন্দার চিতা দর্শনে আসিলাম। এই নালন্দাই আমার স্বপ্নাবাসভূমি। ইহারই কৃতবিদ্য পণ্ডিত-মণ্ডলীর চরণপূত পথে আমায় তিব্বতযাত্রা করিতে হইবে। ইচ্ছা ছিল, ভবিষ্যতে এখানে আশ্রম করিবার জন্য কিছু জমি সংগ্রহ করি, কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে তাহা সম্ভব হইল না। এবারকার মত ভিতর-বাহির পরিক্রমা করিয়া, স্তূপ হইতে প্রাপ্ত মূর্ত্তি, মুদ্রা, তৈজসপত্র এবং বিহারের কুঠরী, দ্বার, স্তূপ, কূপ ইত্যাদি দেখিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলাম।

ইতিমধ্যে পাটনায় অভিধর্ম্মকোষের পার্শেল পৌঁছিয়া গিয়াছিল। তাহার উপরই পাথেয়-সংগ্রহের ভরসা। সুতরাং পাটনা হইয়া ১৩ই জানুয়ারি পুনর্ব্বার বারাণসী পৌঁছিলাম। প্রকাশক মহাশয় নিজে দেখিয়া পরে যাচাই করার জন্য পাণ্ডুলিপি অন্য বিদ্বানের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। তিনি ঐ বিষয়ক ফরাসী মূলগ্রন্থের সহিত মিলাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে সারনাথে গিয়া চীনা ভিক্ষু বোধিধর্ম্মের চিঠি পাইলাম। বোধিধর্ম্মের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় দুই বৎসর পূর্ব্বে রাজগৃহের জঙ্গলে, পরে সিংহলের বিদ্যালঙ্কার বিহারে আমরা কয়েক মাস একসঙ্গেই ছিলাম। অত্যধিক ধীর স্থির ছিলেন বলিয়া অপরিচিত লোকে ইঁহাকে পাগল বলিতে ছাড়িত না, এবং প্রথম-পরিচয়ে ঐ মলিন শীর্ণ নমিত দেহের ভিতর কতটা সংস্কৃতি আছে তাহা অনুমানও করা যাইত না। বোধিধর্ম্ম যে কেবলমাত্র চীনা ভাষায়, বৌদ্ধধর্ম্মে সুপণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক পদে ঐ মতের অনুসরণ করিয়া চলিবার চেষ্টা ছিল। তিনি আমার পত্রের উত্তরে তাঁহার নেপাল-যাত্রার সবিশেষ বিবরণ দিয়াছিলেন এবং আমাদের ভবিষ্যতের কার্য্য সম্বন্ধেও এই পত্রে অনেক কথা ছিল। আমি জানিতাম না যে ইহাই তাঁহার অন্তিম পত্র হইবে।

২০শে জানুয়ারি পাণ্ডুলিপি-সম্পর্কে পণ্ডিত মহোদয়ের—

---

* মধ্যদেশে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পর মৌখরি সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে। হর্ষবর্দ্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রীর বিবাহ-সম্পর্ক মৌখরি কুলেই হয়। মৌখরিদের এক শাখা বিহারে রাজত্ব করিত। সিলাব গ্রামে এখনও কয়েকটি "মোহরা" পরিবার আছে।

অনুকূল মত পাওয়া গেল, কিন্তু প্রকাশক বলিলেন তিনি কোনও আর্থিক পারিতোষিক দিতে অসমর্থ। এদিকে তিব্বতযাত্রার জন্য আমার কিছু টাকার বিশেষ প্রয়োজন, সুতরাং আমিও তাঁহাকে পুস্তক দিতে অসামর্থ্য জানাইলাম। প্রায় সবই নিষ্ফল হইয়া যায় এমন সময় আচার্য্য নরেন্দ্রদেব—তিনি পুস্তকের কোন কোন অংশ দেখিয়াছিলেন—কাশী বিদ্যাপীঠের তরফে ইহা প্রকাশের কথা বলিলেন। দুই দিন পরে বিদ্যাপীঠের কর্তৃপক্ষ উহা প্রকাশ করিতে এবং আমাকেও এক শত টাকা দিতে রাজী হইলেন।

* * *

আমি এখন অন্যান্য ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত, সুতরাং বুদ্ধগয়ায় গেলাম। সেখানে মঙ্গোলীয় ভিক্ষু লোব্-সঙ-শে-রবের সহিত আলাপ হইল। এই আলাপে পরে আমার কত উপকার হইবে তাহা তখন মনেও ভাবি নাই। আমি ভোটিয়া (তিব্বতী) ভাষার দুই-একখানি পুস্তক পড়িয়াছিলাম, সুতরাং দুই-চারিটি ভোটিয়া কথা বলিতে পারিতাম। ইনি তাহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া পরম আগ্রহের সহিত আমাকে চা খাওয়াইলেন, সঙ্গে সঙ্গে লাসায় ডেপুঙ্-মঠে নিজের প্রবাসের কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার মহাবোধিতে এক লক্ষ দণ্ডবৎ প্রণামের সংকল্প ছিল, সুতরাং এখানে আরও মাস দুই থাকিতে হইবে।

লিচ্ছবিদিগের প্রাচীন বৈশালী দেখিবার ইচ্ছা ছিল। প্রাচীন মিথিলার এই পরাক্রান্ত জাতির "পঞ্চায়তী" রাজধানী বৈশালী এখন মজঃফরপুর জেলার বসাঢ় গ্রামে পরিণত হইয়াছে।

মজঃফরপুরে শুনিলাম বসাঢ়ের কাছে বখরা পর্য্যন্ত বাস্ যায়। আমি পথে প্রথমে বখরায় অশোকস্তম্ভ দেখিতে গেলাম, তথায় তথাগত বহুবার বাস করিয়াছিলেন। এই স্তম্ভ সেই মহাবনের কূটাগারশালার স্থান নির্দ্দেশ করে। কত বিখ্যাত সূত্র এখানে রচিত হইয়াছে, এইখানেই তথাগতের পরিনির্ব্বাণের শত বর্ষ পরে আনন্দের শিষ্য সর্ব্বকামীর নেতৃত্বে সমস্ত ভিক্ষু-সংঘ একত্র হইয়া শঙ্কা-সমাধান করিয়া ভগবান বুদ্ধের সূক্ত গান করিয়াছিলেন। এখন ইহার এমন অবস্থা যে নিশ্চিত ভাবে ইহার স্থান নির্দ্দেশ করাও দুঃসাধ্য।

বখরার পথে বনিয়া পৌঁছিলাম। "বজ্জি"দিগের* রাজধানী বৈশালী এখন "বনিয়া-বসাঢ়" নামে পরিচিত; "বনিয়া"ই জৈনসূত্রের "বানিয় গাম নয়র" অর্থাৎ বৈশালীর ব্যাপারিক মহল্লা। বজ্জিদিগের মহাশক্তিশালী প্রজাতন্ত্রের রাজধানীর এই ব্যাপারিক কেন্দ্র সেকালে বিপুল ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ ছিল একথা বৌদ্ধ জৈন উভয় সাহিত্যেই স্পষ্ট লেখা আছে। ভগবান মহাবীরের প্রধান গৃহস্থ শিষ্য আনন্দ এইখানেই থাকিতেন এবং ভগবান বুদ্ধের প্রধান একাদশ গৃহস্থ শিষ্যের অন্যতম উগ্র গৃহপতির নিবাসও এইখানেই ছিল। এখন আছে ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র, তবে এখনও প্রাচীনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ মৃন্ময় মেখলা বাঁধা ক্ষুদ্র কূপ যেখানে সেখানে পাওয়া যায়।

বনিয়ার এক গৃহস্থ আগ্রহের সহিত অতিথি-সংকার করিলেন। তার পরে বসাঢ়ে আসিলাম। দাধির পাড়ের মন্দির—মন্দিরে বৌদ্ধ জৈন মূর্ত্তিরাজি হিন্দু দেবদেবীর নামে পূজা পায়—রৌজা, গড়, গ্রাম সবই ঘুরিয়া দেখিলাম। এইখানেই কোথাও পূর্ব্বকালের বজ্জিদিগের সংস্থাগার (প্রজাতন্ত্রভবন—পার্লেমেণ্ট) ছিল। সেখানে একদিন ৭৭০৭ জন রাজোপাধিধারী লিচ্ছবি পুরুষসিংহ একত্র হইয়া সপ্ত "অপরিহানিধর্ম" মতে বজ্জি দেশের প্রবল প্রজাতন্ত্র পরিচালন করিতেন। সেই প্রজাতন্ত্রের প্রতাপে একদা মগধ ও কোশলের হৃদয় কম্পিত হইত। মগধরাজ অজাতশত্রু এই প্রজাতন্ত্র আক্রমণে উদ্যত হইয়া জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মত জিজ্ঞাসা করেন। তিনি উত্তর দেন, (১) যত দিন বজ্জিগণ নিজদের পরিষদে বহুবার বহুলসংখ্যায় একত্র হইয়া পরামর্শ করিবেন, (২) যত দিন প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহাদের এই একতা থাকিবে, (৩) যত দিন বিনা-নিয়মে তাঁহারা কোন কার্য্য না করিবেন, এবং নিজেদের স্বীকৃত নিয়ম প্রতি অক্ষরে পালন করিবেন, (৪) যত দিন তাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ প্রধানগণের সমাদর এবং তাঁহাদের উচিত বাক্য শ্রবণ করিবেন, (৫) যত দিন তাঁহারা আপনাদের কুলস্ত্রী ও কুলকুমারীদিগের উপর অত্যাচার না করিবেন, (৬) যত দিন তাঁহারা নিজেদের চৈত্য-মন্দিরের সম্মান রক্ষা করিবেন, (৭) যত দিন তাঁহারা বিদ্বান অর্হৎগণের শ্রদ্ধা ও শুশ্রূষা করিবেন,

* বৃজি বা বজ্জি, লিচ্ছবিদিগের অন্য নাম।

শত্রুসেনা যতই প্রবল ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হউক না কেন, তত দিন উঁহাদের পরাজয় সম্ভব নয়। বুদ্ধদেবের এই সাতটি সর্ত্তই সপ্ত "অপরিহানিধর্ম্ম।"

বসাঢ় এবং আশপাশের গ্রামে জথরিয়া (ভূমিহার) জাতিই অধিকতর প্রভাবশালী। আজকাল ত ইঁহারা ষোল আনা ব্রাহ্মণ, যদিও একদিন 'জথরিয়া পুত্র' (জ্ঞাতি-পুত্র) বর্দ্ধমান মহাবীর এই ব্রাহ্মণদেরই ভিক্ষুক জাতি এবং তীর্থঙ্কর-উৎপাদনের অনুপযুক্ত বলিয়া হীনশ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। বসাঢ়ে একদিন এক বৃদ্ধ জথরিয়াকে বলিলাম, "আপনারা ব্রাহ্মণ নহেন, আপনারা ক্ষত্রিয়", তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ নিমসার হইতে আগত ভেখরংডিহের অধিবাসী তাঁহার ব্রাহ্মণ পূর্ব্বপুরুষের কাহিনী শুনাইলেন। তাঁহার নিকট সমৃদ্ধ, প্রতিভাশালী, স্বাধীন জ্ঞাতৃ-জাতির বীর-রক্তের সমাদর ততটা ছিল না, যতটা ছিল এক ধনহীন, বলহীন, মূর্খ, মিথ্যাভিমানী, কূপমণ্ডুক জাতির পর্য্যায়ভুক্ত হওয়ার! অথচ এখনও ঐ রক্তেরই প্রভাবে প্রতিবেশী জাতিদের মধ্যে ইহাদের সম্বন্ধে প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে,

সব জাত মেঁ বুর্বক জথরিয়া
মারৈ লাঠী ছিনৈ চদরিয়া।

এই নির্ব্বোধের কথা আর কেন বলি, জথরিয়া-বংশোদ্ভব সুশিক্ষিত মৌলানা শফী দাউদীই কি নিজকুলের মহত্ত্ব বুঝেন?

বৈশালী হইতে মজঃফরপুরে ফিরিলাম। সেখানকার কংগ্রেস-নায়ক জনকবাবু পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে ব্যাখ্যানের প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছিলেন, এক "জ্ঞাতৃ-পুত্রের" সভাপতিত্বে তাহা রক্ষা করিলাম। পরে দেবরিয়ার পথে কুশীনার (কসিয়া) যাত্রা করিলাম।

দুই-তিন বৎসর পরে পুনর্ব্বার কুশীনার দর্শন হইল। সৌভাগ্য এই যে, এত দিনে দেশের লোকে আত্মপরিচয় পাইতেছে, তাই আজ মহাপরিনির্বাণ-স্তূপ মেরামত হইয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে পদব্রজে এই পথে আসিবার সময় এক গৃহস্থ বলিয়াছিলেন, "কি হে বাপু, বর্ম্মা দেশের (!) দেবতার গন্ধ পেয়ে এসেছ?" বুদ্ধদেবের নাম বা কসিয়ার সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের কথা কেহই জানিত না, জানিত শুধু যে বর্ম্মা হইতে আগত স্থবির মহাবীর ঐস্থানে আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন।

স্থবির মহাবীরের আসল পরিচয় অল্প লোকেই জানে। যাঁহারা জানেন তাঁহারাও সকলে নিঃসন্দেহ নহেন। সিপাহী-বিদ্রোহে বিহারের প্রসিদ্ধ কুঁবরসিংহ বীরত্বের সহিত লড়িয়াছিলেন। তাঁহার পরাজয়ের পর তাঁহারই এক শ্যালক ইংরেজের প্রতিহিংসা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্রহ্মদেশে ছদ্মবেশে ছিলেন। সেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম অধ্যয়ন করিয়া ভিক্ষু ভাবে বহুকাল যাপন করিয়া স্থবির অবস্থায় কসিয়ায় আসেন। এই স্থবির মহাবীরের আশ্রম স্থাপনের ফলেই এত দিন পরে লোকে "বর্ম্মা দেশের দেবতা"র প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছে এবং হাজার হাজার নরনারী তথাগতের অন্তিম লীলা সংবরণ স্থানকে পরম শ্রদ্ধার সহিত ফুলমালায় সাজাইতেছে।

মূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া মনে হইল * ২৪১২ বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখী পূর্ণিমার প্রাতে এই স্থানেই যুগল শালবৃক্ষের মধ্যে এই ভাবেই উত্তরে শির দক্ষিণে পদ ও পশ্চিমে মুখ রাখিয়া শায়িত অবস্থায়, সহস্র সহস্র অশ্রুমুখ জনতার পরিবেষ্টনীর মধ্যে, "যাহা সৃষ্ট সবই নশ্বর" এই কথা বলিয়াই লোক-জ্যোতি চিরদিনের মত নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

কুশীনারায় দু-চার দিন বিশ্রাম করিলাম। পরে লুম্বিনী দর্শনের ইচ্ছায় গোরখপুর হইয়া নৌতনরা গেলাম। শুনিলাম লুম্বিনী এখান হইতে পাঁচ ক্রোশ। সেখানে টাট্টুতে চড়িয়া যাওয়াই প্রশস্ত। কিন্তু যাহাকে হিমালয়ের দুর্গম পথে বহু শত ক্রোশ পার হইতে হইবে তাহার টাট্টুর প্রয়োজন কিসে? সকালে মিঠাইয়ের দোকানে দেহের পাথেয় সংগ্রহ করিলাম এবং পথ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে শাক্য ও কোলিয় দিগের সীমানার রোহিণী† ইত্যাদি অনেক নদীনালা পার হইয়া চলিলাম।

দশ বৎসর পরে পুনর্ব্বার লুম্বিনীতে আসিয়া অনেক নূতন জিনিষ দেখিলাম। স্তূপ ও মন্দির মেরামত হইয়াছে, ছোট ধর্ম্মশালাও নির্ম্মিত হইয়াছে। কঁকরহবা পর্য্যন্ত পথও প্রায় তৈয়ারী শেষ। এ সকলই নেপাল-নরেশ চন্দ্রসমসের-জঙ্গের নির্দ্দেশে হইয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা ছিল "রুম্মিনদেই"কে পুনরায়

* ইং ১৯২৯ সালের হিসাবে লিখিত

† বুদ্ধ শাক্য-বংশোদ্ভব ছিলেন। উঁহার মাতা প্রতিবেশী কোলিয়-বংশের। এই দুই বংশের আদি দেশের মধ্যের সীমা রোহিণী নদী।

"লুম্বিনীবনে" পরিণত করা, কিন্তু সে সংকল্প মনে রাখিয়াই তিনি চিরপ্রস্থান করিয়াছেন। জানি না সে পুণ্যময় ইচ্ছা পূরণ করা কাহার সৌভাগ্যে ঘটিবে। তবে নেপাল-সরকারের কার্য্য চলিতেছে।

মনুষ্যজাতির এক-তৃতীয়াংশের একান্ত মনস্কামনা এই স্থান দর্শন। ২৪৯১ বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখী পূর্ণিমায় এইখানেই কুমার সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেন, ২১৮২ বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট্ অশোক এইখানেই পূজা দান করেন। যেখানে লোকগুরু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেইখানে এক নীচু কুঠরীতে এখনও জননী মহামায়ার বিনষ্টপ্রায় মূর্ত্তি, দক্ষিণ হস্তে শালবৃক্ষের শাখা ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কুশীনারার মহাস্থবির চন্দ্রমণির ইচ্ছানুসারে, তাঁহার প্রদত্ত ধূপকাঠি ও মোমবাতি আমি ঐ মূর্ত্তির সম্মুখেই জ্বালিয়া দিলাম।

রাত্রেও ঐ কুঠরীতেই বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পূজারী বলিলেন, ঐখানে রাত্রে চোরের উপদ্রব, সুতরাং থাকা নিরাপদ নহে। ইতস্তত করিতেছি এমন সময় থুনগাঁই গ্রামের চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র আসিয়া আমাকে তাঁহাদের বাড়ীতে বিশ্রাম ও ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। চৌধুরী মহাশয়ের দ্বার লুম্বিনী-যাত্রীদের জন্য অবারিত, এমন কি অ-হিন্দুদিগের ভোজনের জন্য চীনামাটির বাসন ইত্যাদিও তিনি রাখিয়াছেন। রাত্রে আমার ভোজনের প্রয়োজন না হওয়ায় সেইগুলি ব্যবহার করা হয় নাই।

পরদিন সহৃদয় চৌধুরী-সাহেবের ব্যবস্থায় তাঁহার গাড়ীতেই নৌগড় রোড ষ্টেশন রওয়ানা হওয়া গেল। থুনগাঁই হইতে কঁকরহবা দেড় কি দুই ক্রোশ মাত্র এবং ইহা নেপাল-সীমান্ত হইতে অল্পই দূর। এখন নৌগড় রোড হইতে এই পর্য্যন্ত মোটর বা গরুর গাড়ীতে আসা যায়, আর কিছুদিন পরে লুম্বিনী পর্য্যন্ত রাস্তা তৈয়ার হইলে যাত্রীরা মহাসুখে নৌগড় রোড হইতে বরাবর মোটরে যাইতে পারিবেন।

সেই দিনই রাত্রে ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। এখন কোশল-রাজধানী শ্রাবস্তীতে জেতবন দেখিবার পালা। কিন্তু ষ্টেশনে শুনিলাম সেদিন আর ট্রেন নাই, কাজেই হালুয়াইয়ের দোকানে আশ্রয় লইয়া ভোজনের চেষ্টা দেখিলাম। হালুয়াই পুরী তৈয়ারী আরম্ভ করিল। রোজার দিন, খানিক পরে তাহারই পাশের দোকানে ঐ গ্রামের এক মুসলমান গৃহস্থ আসিয়া বসিতে হালুয়াই তাঁহাকে পান খাওয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খাঁ-সাহেব, রোজায় বড় কষ্ট হচ্ছে, না?"

"না ভাই! এবার শীতের দিনে পড়েছে, রাত্রে খাওয়া ভালই হয়, গ্রীষ্মে রমজান পড়লেই কষ্ট হয়।"

দু-জনে দিব্য গল্প চলিল, হালুয়াই তাহার কাজও করিতে লাগিল। আমি ইহাদের সদালাপ শুনিতে শুনিতে ভাবিতে লাগিলাম যে, কোন্ শত্রুতে ইহাদের একক অপরের বিষম বৈরীতে পরিণত করিতেছে। এই দেশে কি এই দু-জনের নিজ নিজ আচার-ব্যবহার বজায় রাখিয়া গা ছড়াইবার মত ভূমির অভাব আছে? যদি কেহ বলে যে এই শত্রুতার কারণ ধর্ম্ম, তবে আমি বলি ধিক্ সেই ধর্ম্মে যাহাতে এইরূপ বন্ধু শত্রুতে পরিণত হয়!

* * *

পরদিন (১৯শে ফেব্রুয়ারি) নৌগড় হইতে বলরামপুর পৌঁছিলাম। ভিক্ষু আসয়ার ধর্ম্মশালায় আশ্রয় পাইলাম, ভিক্ষু মহাশয় ব্রহ্মদেশীয় ধনী পিতার শিক্ষিত সন্তান। দশ বৎসর পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিলাম, তখন বর-সম্বোধি নামক ভিক্ষু এই ধর্ম্মশালার সূচনা, এবং সবেমাত্র অল্প অংশ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এখন বিশ্রাম ভোজন ইত্যাদির স্থান ছাড়াও কূপ, মন্দির ও পুস্তকালয়ও প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে দেখিলাম।

২১শে ফেব্রুয়ারি আয়ুষ্মান্ আনন্দকে আমার জেতবন-ভ্রমণ সম্বন্ধে এই পত্র লিখিয়াছিলাম :—

"কাল সকালে পদব্রজে অবিরত আড়াই ঘণ্টা চলিয়া এখানে আসিয়া মহিন্দবাবার কুটীতে উঠিয়াছি। আমার হাঁটার অভ্যাস আরও বাড়ানো প্রয়োজন। মহিন্দবাবা এখন ব্রহ্মদেশে। আসিবার সময় ধনুষ্কোডিতে আমার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। কাল পূর্ব্বাহ্নে জেতবন ঘুরিয়া গন্ধকুটী, কোসম্বকুটী, কারেরী-কুটী, সললাগার দেখিলাম। এ সকলের অবস্থান-নির্ণয়ে সন্দেহের অবসর নাই। এই গন্ধকুটীর সম্মুখের নিম্নভূমিই "জেতবন-পোক্খরণী" সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। মহিন্দবাবার কুটী ফাহিয়ান-বর্ণিত তৈর্থির দেবালয়ের ভিটার উপর স্থাপিত।"

"অপরাহ্নে শ্রাবস্তী গেলাম। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়াও চারিদিক দেখা শেষ হয় নাই। শ্রাবস্তীর পূর্ব্বদ্বার গঙ্গাপুর দরওয়াজার (বড়কা দরবাজা) স্থানে ছিল বোধ হয়, কিন্তু

কুশীনার। বিহারের ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য

বসাঢ়। মৃন্ময় নারীমূর্তি

← নালন্দা অবলোকিতেশ্বর কাংস্য-মূর্তি।

নালন্দা পদ্মপাণি কাংস্যমূর্তি →

← রাজগৃহ। বৈভার পর্ব্বত
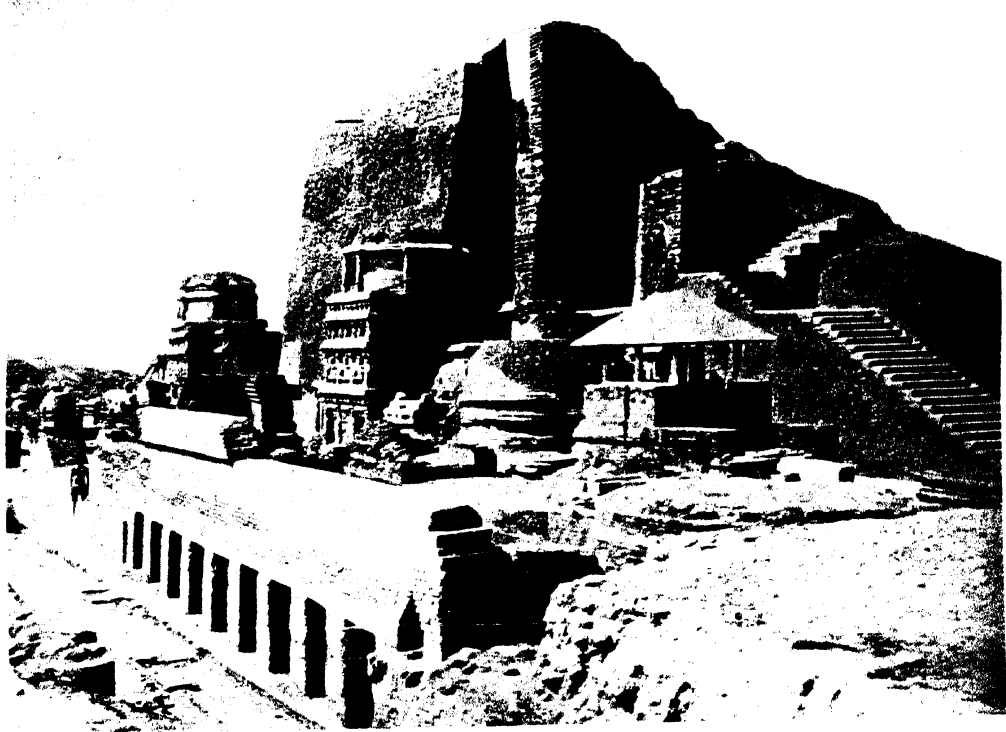
নালন্দায় আবিষ্কৃত বৌদ্ধস্তূপ

সারনাথ। ধামেক স্তূপ

← নালন্দা বজ্রপাণি কাংস্যমূর্ত্তি।

কুশীনার। বিহারের ধ্বংসাবশেষ

কুশীনার। বৃহৎ বিহারের ধ্বংসাবশেষ

লুম্বিনী-বন। অশোকের শিলালেখ

← বুদ্ধগয়া। মন্দির
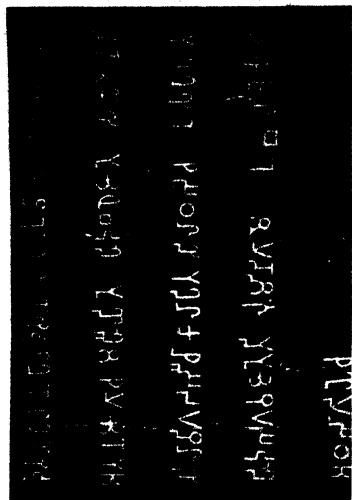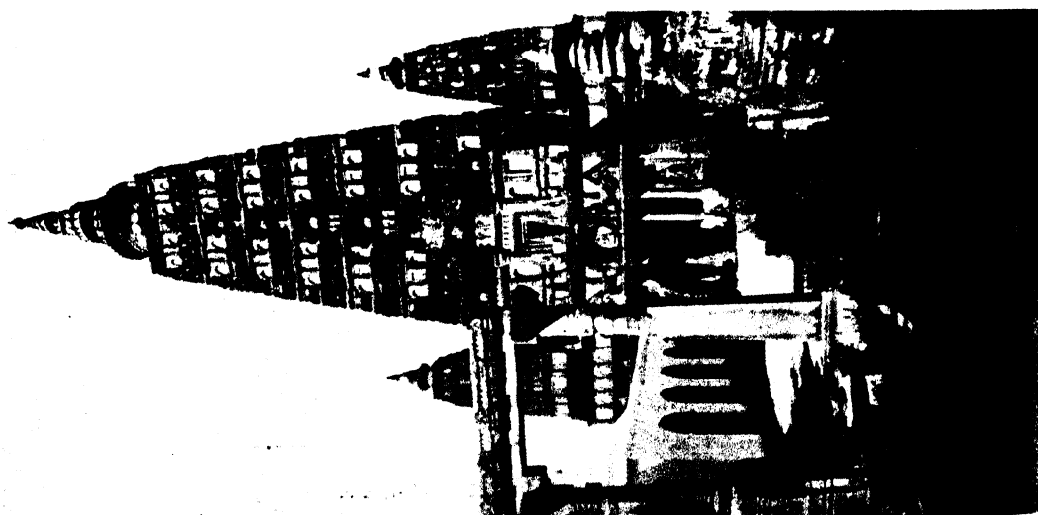
তাহার কাছে পূর্ব্বারামের কোনও চিহ্ন পাইলাম না। মনে হয় পূর্ব্বারামেরই ধ্বংসাবশেষ এখন হনুমনর্বা নামে পরিচিত।

"এবার গোঁডা-বাহরাইচ জেলায় দুর্ভিক্ষ। পুকুর সবই শুষ্ক, বর্ষার ফসল জন্মায় নাই, রবিশস্যের ও জলের অভাবে বিশেষ চাষ হয় নাই, সুতরাং আগামী বর্ষা পর্য্যন্ত ইহাদের কষ্টের অবস্থা চলিবে। এ অঞ্চলের লোক বিশেষ ক্লিষ্ট মনে হয়, সরকারের তরফে রাস্তা-মেরামতাদি কাজ আরম্ভ হইয়াছে, মজুরীর হার পুরুষের দশ পয়সা, অন্যদের দুই আনা, তাই লোকে দু-ক্রোশ-তিন ক্রোশ দূর হইতে আসা-যাওয়া করে। ভুট্টার দানা চার আনা সের। লুম্বিনীর পথে লোকের এইরূপ কষ্ট দেখি নাই।

"শেষ পত্র চম্পারণ জেলা হইতে লিখিব। নেপাল পর্য্যন্ত দু-এক জন সঙ্গী পাওয়া যাইবে, সুতরাং নেপাল হইতেও তাহাদের মারফৎ একটি চিঠি পাঠাইব। তাহাতে ভবিষ্যতের জন্য কি উপায় স্থির হইয়াছে তাহা জানিবে। নেপালে পৌঁছিবার পর হাতে দেড় শত টাকা থাকিবে বোধ হয়। যাত্রার জন্য বুদ্ধগয়ার মহাবোধিদ্রুমের ত্রিশ-চল্লিশটি পাতা, কুশীনারার কুশ ইত্যাদি লইয়াছি।

"আজ অন্ধবন দেখিবার ইচ্ছা আছে।"

* * *

২২শে ফেব্রুয়ারি রাত্রে চম্পারণ যাত্রা করিলাম। গোরখপুরে গাড়ী বদলের পর দশটার সময় ছিতৌনী ঘাটে পৌঁছিলাম। গণ্ডকের পুল ভাঙিয়া যাওয়ায় অনেক দূর পর্য্যন্ত নদীর বালির উপর চলিতে হইল। দেখিলাম পশুপতি-নাথের বহু যাত্রী এখনই নৌকা পথে চলিয়াছে, কিন্তু আমার হিসাবে এখনও যাত্রার আট দিন বাকী। নরকটিয়াগঞ্জের নিকট বিপিনবাবুর বাড়ীর কথা মনে পড়ায় স্থির করিলাম সেখানেই যাওয়া যাক। বিপিন-বাবু ছিলেন না, তবে তাঁর ছোট ভাইকে বাড়ীতেই পাওয়া গেল। বে-ঘরের পক্ষে ঘরের সন্ধান পাওয়া কতই সহজ! কিন্তু এখন প্রশ্ন হইল যে আট দিন কি করা যায়। কি করিলাম তাহা ২৮শে ফেব্রুয়ারি আনন্দকে লিখিত পত্রে আছে :—

"বলরামপুর হইতে চিঠি পাঠাইয়াছিলাম। এখানে আসা উচিত ছিল ৩রা মার্চ্চ, আসিয়াছি ২৩শে ফেব্রুয়ারি, সুতরাং এই প্রকারে সময় কাটাইতেছি।

"পিপরিয়া-গাঁওয়ের কাছে রমপুরবায় গিয়াছিলাম। সেখানে কাছাকাছি দুটি অশোক-স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে যাহার একটিতে শিলালিপি আছে। পুরাতত্ত্ব-বিভাগের খননে, একটি বৃষমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে যাহা একটি স্তম্ভের শীর্ষে ছিল, অন্যটির উপর কি ছিল তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই। লোক-পরম্পরায় এরূপ শোনা যায় যে ঐ স্তম্ভে ময়ূর ছিল। ময়ূর মৌর্য্যদের রাজচিহ্ন এবং পিপরিয়া গ্রাম কাছেই আছে, তবে কি মৌর্য্যদের প্রজাতন্ত্র রাজ্যের পিপ্পলীবনই এই পিপরিয়া-গাঁও? পিপ্পলীবন মৌর্য্যদের মূলস্থান, উহার অধিবাসিগণ বুদ্ধকে সম্মান করিত এবং কুশীনারায় পিপ্পলীবনস্থ মৌর্য্যগণ চিতাভস্মের অংশ পাইয়াছিলেন,—বিলম্বে আসায় অস্থি বা পুষ্প পান নাই। এখানে একই স্থানে দুইটি অশোক-স্তম্ভ স্থানের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে। মনে হয়, নিজের বুদ্ধভক্ত পূর্ব্বপুরুষদিগের আদিস্থান বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করিবার জন্যই সম্রাট্ অশোক এইখানে দুইটি স্তম্ভ প্রোথিত করেন।

"পিপ্পলীবনের মত ছোট গণতন্ত্রের রাজধানী বিশেষ বড় শহর হওয়া সম্ভব নহে। অজাতশত্রুর সময় ইহা নিশ্চয়ই মগধ-সাম্রাজ্যের সীমাভুক্ত ছিল। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর ক্ষুদ্র নগরের ধ্বংসাবশেষ বিশেষ স্পষ্ট না হইবারই কথা, বিশেষত যখন সে-সময়কার অধিকাংশ পুরীপ্রাসাদ কাষ্ঠময় ছিল। ইহার ধ্বংসাবশেষ এখন বিশ-বাইশ ফুট মাটির নীচে জলতলের সমীভূত।

"রমপুরবা হইতে সাত-আট মাইল উত্তরে ঠোরী গিয়াছিলাম। উহা নেপালের ভিতর এবং তিব্বতের অন্য এক পথের মুখে। ঠোরী হইতে তিন মাইল দক্ষিণে মহাযোগিনীর গড় আছে, নীচের ইটের গঠন দেখিয়া মনে হয় ইহা মুসলিম-আমলের পূর্ব্বেকার জিনিষ। পুরানো মন্দির সুদৃঢ়ভাবে প্রস্তরনির্ম্মিত ছিল, মুসলমানেরা নষ্ট করিবার পর এক-শ কি দেড়-শ বৎসর পূর্ব্বে নূতন মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহা এখন তরাইয়ের জঙ্গলের মধ্যে।"

"এখানে 'থারু' নামে এক বিচিত্র জাতির সঙ্গে পরিচয় হইল। বহু বিদ্বান ব্যক্তি ইহাদের সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন।

ইহাদের বৈশিষ্ট্য—(১) আকৃতি মঙ্গোলীয়, (২) এখানকার থারুদিগের ভাষার সহিত গয়া জেলার 'মগহী' ভাষা সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়, (৩) দক্ষিণের অ-থারু জাতিদিগকে ইহারা 'বাজী' (অর্থাৎ বৃজি=লিচ্ছবি) এবং তাহাদের দেশকে বজ্জিয়ান বলে, (৪) ইহারা মুরগী ও শূকর দুই-ই খায়, যদিও এখানকার হিন্দুরা মুরগী খাওয়া অত্যন্ত খারাপ মনে করে, (৫) চিতবনিয়া থারুরা বলে তাহারা চিতোরগড় হইতে আসিয়াছে, পশ্চিম ভাগের (লুম্বিনীর নিকটে) থারুদের কিংবদন্তী যে তাহারা বনবাসী অযোধ্যার রাজবংশের সন্তান।"

"কাল চানকী-গড় দেখিতে যাইব। সেখানে মৌর্য্য বা প্রাক্-মৌর্য্য কালের এক গড় আছে। পরশু রাত্রের গাড়ীতে এখান হইতে নরকটিয়াগঞ্জের পথে রক্সৌল যাত্রা করিব। নেপাল হইতে পত্র দিবার সুযোগ বোধ হয় হইবে না।"

"প্রিয় আনন্দ! শেষ নমস্কার করিয়া এখন বিদায় লই। 'কার্য্যং বা সাধয়েয়ং শরীরং বা পাতয়েয়ং'—জীবন বড়ই মূল্যবান, সময়ের মূল্য কিছুমাত্র নাই।"

* * *

তিন তারিখে শিকারপুর হইতে রক্সৌল, এবং সেইদিনই নেপালের সরকারী রেলে বীরগঞ্জ পৌঁছিলাম।

* * *

সূর্য্যোদয়ের সময় রক্সৌল পৌঁছিলাম। ছয় বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখন দেখিয়াছিলাম দলে দলে যাত্রী পদব্রজে বীরগঞ্জ চলিয়াছে। সেখানে কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া ডাক্তারকে নাড়ী দেখানো এবং সীমান্তের উচ্চ কর্ম্মচারীদের নিকট ছাড়পত্রের ব্যবস্থা ইত্যাদি চলিয়াছে। এখন বি-এন-ডবলু-রেলের রক্সৌল ষ্টেশনের পাশেই নেপাল রাজ্যের রেল-ষ্টেশন, যাত্রীদের সেখানে গিয়া ট্রেনে উঠিলেই হয়; ছাড়পত্রের জন্য বহু কর্ম্মচারী মোতায়েন থাকে, সুতরাং কোন ঝঞ্ঝাট নাই এবং ডাক্তারী "নাড়ীটেপানো"র কোন ব্যবস্থাই নাই। বাস্তবিক পক্ষে ঐ ডাক্তারী পরীক্ষা ছিল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, আসল পরীক্ষা হয় চীসাপানী-চন্দ্রাগঢ়ীর চড়াইয়ে যেখানে সুস্থ সবল লোকেরও হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়।

আমার এখানে পৌঁছিবার তারিখ বন্ধুবর্গের মধ্যে কেহ কেহ জানিতেন। তখনও আমার তিব্বত-প্রবাস আট-দশ বৎসর ব্যাপী হইবে বলিয়া ঠিক ছিল—চৌদ্দ মাস পরে যে ফিরিয়া আসিতে হইবে একথা ভাবিও নাই, সুতরাং বন্ধুদের অনেকেই বিদায়গ্রহণের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। রক্সৌল ষ্টেশনে নামিতেই দেখিলাম এক বন্ধু আসিয়াছেন, তাঁহার কাছে বিদায় লইয়া নেপালী ষ্টেশনে চলিলাম। ছাড়পত্র আগেই লইয়াছিলাম। কিন্তু সোজা অমলেখগঞ্জ যাইবার ইচ্ছা ছিল না, কেন-না জানিতাম বীরগঞ্জেও অনেক বন্ধু বিদায়ের জন্য প্রতীক্ষা করিবে, এবং ঐখানে যে নেপাল-যাত্রার সঙ্গীও কিছু মিলিবে, তাহাও জানিতাম।

ট্রেনে যাত্রীগাড়ীর অভাবে মালগাড়ী জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহারই একটিতে অতি কষ্টে ঢুকিলাম—এতই ভিড়। বস্তুত রেলযাত্রায় ভ্রমণের অনেক আনন্দ নষ্ট হয়। যখন ভারত-সীমানার ছোট নদীতে জল লইবার জন্য এঞ্জিন দাঁড়াইল, তখন ঐ নদীর কূলেই কিছু দূরে রাস্তার উপরের সেই ছোট কুটীর দেখিলাম, সেখানে দশ বৎসর পূর্ব্বে এক বৈশাখে ছাড়পত্রের অভাবে যাত্রা স্থগিত করিয়া আমায় কিছুদিন থাকিতে হইয়াছিল। সে-সময় সাধারণ লোকের পক্ষে, শিবরাত্রি ভিন্ন অন্য সময়ে, বীরগঞ্জে পৌঁছানও দুরূহ ব্যাপার ছিল। ঐখানে এক তরুণ সাধুর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা মনে পড়িল, তিনি রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এক জালামুখী তীর্থ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন বলিয়াছিলেন। সে সময় তাঁহার ভ্রমণকাহিনী শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু রুশদেশেও যে হিন্দুর "জালা-মাই" তীর্থ থাকিতে পারে বিশ্বাস হয় নাই। পরে জানিলাম যে রুশদেশের বাকু অঞ্চলে সত্য সত্যই ঐরূপ স্থান আছে।

রক্সৌল হইতে বীরগঞ্জ তিন-চার মাইল মাত্র। রেল বীরগঞ্জ বাজারের মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ রাস্তাকে আরও সঙ্কীর্ণ করিয়া চলিয়াছে। ষ্টেশনে নামিয়া অদূরে ধর্ম্মশালা দেখিয়া—আকৃতিতেই চিনিয়াছিলাম—অগ্রসর হইলাম। আগেকার দিনে এ-সময়ে এখানে স্থান পাওয়া দায় হইত, কিন্তু রেলের কৃপায় এখানে আর যাত্রীসমাগম বিশেষ নাই, সুতরাং সহজেই উপরের তলায় একলা থাকিবার মত এক কুঠরী পাইলাম। আজ ফাল্গুন সুদী অষ্টমী (৬ই মার্চ্চ ১৯২৯) মাত্র, সুতরাং নেপাল পৌঁছিবার পক্ষে যথেষ্ট সময় হাতে ছিল। ধর্ম্মশালাটি

ভাল, কোনও মাড়বাড়ী শেঠের দান—পাকা ঘরবাড়ী, কূপ, রন্ধনশালা, দ্বারের কাছে হালুয়াই, চালডালের দোকান, এমনি সব ব্যবস্থাই আছে, সুতরাং দু-এক দিন এখানে থাকা মনস্থ করিলাম। মুখ-হাত ধুইয়া পুরীভোজনে মনোনিবেশ করা গেল। ফিরিয়া দেখিলাম কুঠরীটি এক বরযাত্রী দলের ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে। কাজেই অন্য ঘর দেখিতে হইল।

একলা দিন কাটানো ভার। রাত্রি কোন প্রকারে কাটিয়া গেল। পরদিন মথুরাবাবুর সঙ্গে দেখা হইল। শুনিলাম তিনি রাত্রেই আসিয়াছেন। আমার অল্প জ্বর হইয়াছিল। এখানে ভাতের ব্যবস্থা নাই, মথুরাবাবু তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীতে প্রাত্যহিক ভাতের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা-গল্পের পর দশটার সময় মথুরাবাবু ফিরিয়া গেলেন। এখন আমাকে নেপালযাত্রার সঙ্গী বন্ধুদের প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

বিকালে এক জন আসিলেন, অন্য সঙ্গীদের সম্বন্ধে শুনিলাম এক জন অসুস্থ এবং আর এক জন যাত্রা স্থগিত করিয়াছেন। যিনি আসিয়াছেন তাঁহারও দৌড় এইখান পর্য্যন্তই। সুতরাং আর প্রতীক্ষা করায় কোন লাভ নাই, একাকীই অগ্রসর হইতে হইবে। যাহা হউক, ইহাতে নিরাশ হইবার কোনও কারণ দেখিলাম না, কেননা একাকী পথ চলাই ত আমার অভ্যাস। যে বন্ধু আসিয়াছেন তাঁহার এতটুকুর জন্য ছাপ্‌রা হইতে এতদূর আসার কষ্ট ভোগ করিতে হইল, কিন্তু উপায় ছিল না, কেননা আমার পাথেয় এবং যাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় সব জিনিষপত্রই তাঁহার কাছে ছিল।

বন্ধুবরের ইচ্ছা বিকালের গাড়ীতে রক্সৌল ফিরিয়া যাওয়া। আমিও এখানে অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার সঙ্গে রক্সৌল চলিলাম, কেননা তাঁহার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থাকাও হইবে এবং রক্সৌলে গাড়ি চড়াও সহজ হইবে, যাত্রীর যেরূপ ভিড় তাহাতে মাঝপথে বীরগঞ্জে ওঠা সম্ভব হইবে না। এই ভাবে বন্ধুর সঙ্গে পুনর্ব্বার ভারতসীমানার এপারে আসিলাম, এবং সেখানে তাঁহার নিকট দীর্ঘকালের বিদায় লইয়া অমলেখগঞ্জের গাড়ীতে উঠিলাম।

গাড়ীতে যাত্রা আরামেই হইল কিন্তু পদব্রজে যাওয়ার আনন্দ তাহাতে ছিল না। সন্ধ্যার সময় গাড়ী ঘোর জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিল এবং একটু বেশী রাত্রেই অমলেখগঞ্জ পৌঁছিলাম।

আমার কাব্যের গতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এক সময় বয়স যখন অল্প ছিল তখন নূতন কবিতা লিখে না-শুনিয়ে স্থির থাকতে পারতুম না, লোকের উপর অনেক অত্যাচার করেছি। মনে বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে প্রশংসা পাব। যৌবনের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত এই উৎসাহ ছিল; আমার বন্ধুমণ্ডলীতে যাঁরা তখন ছিলেন, তাঁদের আমি নূতন লেখা পড়িয়ে শোনাতুম; এমন কি গাড়ীভাড়া করেও শুনিয়ে এসেছি।

সে উৎসাহ অনেক দিন চলে গেছে। অনেক দিন ধরে, যেটা লিখি তা লোককে শোনাবার আগ্রহ জন্মায় না; এখন এই পরিবর্ত্তন হয়েছে, একলা লিখে সেটা রেখে দিই।

মনে হয় কবিতা যখন ছাপা হ'ত না তখনই তার স্বরূপ উজ্জ্বল ছিল; কারণ কণ্ঠে আবৃত্তিতেই ছন্দের বিশেষত্ব ভাল ক'রে প্রকাশ পায়। ছাপায় আমরা চোখ দিয়ে কবিতাকে দেখি, তার পংক্তি, গঠন লক্ষ্য করি। মনে মনে ধ্বনি উচ্চারণ ক'রে কবিতাকে সম্ভোগ করতে আমরা আজকাল শিখেছি। কিন্তু কবিতা নিঃশব্দে পড়বার বস্তু নয়, কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়েই তার রূপ ভাল ক'রে প্রকাশ পায়, স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাল্য-কালের সেই ইচ্ছাই ছিল স্বাভাবিক—শোনালেই কবিতার সম্পূর্ণ রস পাওয়া যায়, নইলে অভাব ঘটে।

ইদানীং পড়ে শোনাবার আগ্রহ যে কমে গেছে তার কারণ আছে। বহুকাল ধরে কবিতা লিখছি, আপনার মেজাজ অনুসারে শব্দ-নির্ব্বাচন করেছি, আপনার ভাবে

লিখেছি, কারু নকল করতে যাই নি। অল্প বয়সে প্রথমটা কিছুকাল অন্যের অনুকরণ অবশ্য করেছি—আমাদের বাড়িতে যে কবিদের সমাদর ছিল মনে করতুম তাঁদের মত কবিতা লিখ্‌তে পারলে ধন্য হব—তাই তখনকার প্রচলিত ছন্দ অনুকরণের চেষ্টা অল্পকাল কিছু করেছি। অকস্মাৎ এক সময় খাপছাড়া হয়ে কেমনভাবে নিজের ছন্দে পৌঁছলাম। শুধু এইটুকু মনে আছে, একদিন তেতলার ছাদে শ্লেট হাতে, মনটা বিষণ্ন—কাগজে পেন্সিলে নয়—শ্লেটে লিখ্‌তে অভ্যাসের পরিবর্ত্তনেই হয়ত ছন্দের একটা পরিবর্ত্তন এল যেটা তৎকাল-প্রচলিত নয়, আমি বুঝতে পারলুম এটা আমার নিজস্ব। তারই প্রবল আনন্দে সেই নূতন ধারাতে চললাম। ভয় করি নি। অনেক বিদ্রূপবাক্য শুন্‌তে হয়েছে, বলেছে এ ত কাব্য নয়, এ কাব্যি—কিন্তু তাতে আমাকে নিরস্ত করতে পারে নি। দুটি একটি লোক অবশ্য বললেন, এ ত আশ্চর্য্য, পূর্ব্বের লেখার সঙ্গে ত এর কোনোই মিল নেই দেখছি—এঁদেরই আমার মনে হ'ত একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। ভাগ্যক্রমে ক্রমশ লোকেও আমাকে সহ্য করলে। সন্ধ্যাসঙ্গীত ছেড়ে প্রভাতসঙ্গীতে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে যখন পৌঁছলুম তখন তৎকালীন অনেক ভাবুক লোক তার মধ্যে রস পেয়েছিলেন; ধীরে ধীরে পাঠকরাও সহ্য করলে।

আমার কাব্যজীবনে দেখছি ক্রমাগত এক পথ থেকে অন্য পথে চলবার প্রবণতা, নদী যেমন ক'রে বাঁক ফেরে। এক-একটা ছন্দ বা ভাবের পর্ব্ব যখন শেষ হয়ে এসেছে বোধ হয় তখন নূতন ছন্দ বা ভাব মনে না এলে আর লিখিই নে। সন্ধ্যাসঙ্গীতের পর এল প্রভাতসঙ্গীত, তার পর কড়ি ও কোমল, তিনের মাত্রার ছন্দে একটা নূতন প্রসার হয়েছিল, হৃদয়াবেগের তীব্রতাও প্রকাশ পেয়েছিল—কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে তখন গুরুতর পরিবর্ত্তন এনেছিল।

মানসীতে আবার নূতন ভাঙন লেগেছিল, অন্য পথে চলেছিলাম, ছন্দেরও কতকগুলি বিশেষ ভঙ্গী চেষ্টা করেছিলাম। একথা মনে রাখতে অনুরোধ করি যে কৌতূহলবশত বাহাদুরি নেবার জন্য আমি কখনও নূতন ছন্দ বানাবার চেষ্টা করি নি, সেটা আমার কাছে অদ্ভুত ব'লে মনে হয়। মানসীতে যে ছন্দের পরিবর্ত্তন এসেছিল সেটা ধ্বনির দিক্ থেকে। লক্ষ্য করেছিলাম, বাংলা কবিতায় জোর পাওয়া যায় না, তার মধ্যে ধ্বনির উচ্চনীচতা নেই, বাংলা কবিতা অতি দ্রুত গড়িয়ে চলে যায়। ইংরেজিতে য্যাকসেণ্ট, সংস্কৃতে তরঙ্গায়িততা আছে—বাংলায় তা নেই বলেই পূর্ব্বে পয়ারে সুর ক'রে পড়া হ'ত, টেনে টেনে অতি বিলম্বিত ক'রে পড়া হ'ত, তাই অর্থবোধে কষ্ট হ'ত না। লক্ষ্য করেছি, বাংলা কবিতা কানের ভিতর ধরে না, বোঝবার সম্ভাবনাও ঝাপসা হয়ে যায়। এর প্রতিকার চাই। বাংলায় দীর্ঘ-হ্রস্ব উচ্চারণ চালানোটা হাস্যকর, সেটা হাস্যরসেই প্রযুক্ত হ'তে পারে। যেমন আমার বড়দাদা চালিয়েছিলেন

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্যগৌড়ে।

কিন্তু সাধারণ ব্যবহারে সেটা অচল। এজন্য আমি যুক্তাক্ষরগুলিকে পূরো মাত্রার ওজন দিয়ে ছন্দ রচনা মানসীতে আরম্ভ করেছিলাম। এখন সেটা চলতি হয়ে গেছে; ছন্দের ধ্বনিগাম্ভীর্য্য তাতে বেড়েছে।

পরে পরে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে চলেছি। ক্ষণিকা যখন লিখলুম তখন লোকের ধাঁধা লেগে গেল, গাল দিতেও তাদের মন সরল না। তাতে যে হাস্যরসের ছিট ছিল লোকে মনে করলে, লেখক ভদ্রলোক কি পাঠকের সঙ্গে কৌতুক করছেন, না কি? আগে লোকে ভাল বলেছে মন্দ বলেছে—এমনতর নিস্তব্ধতা আমি আশা করি নি।

এমনি ক'রে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এসেছি। বলাকায় নূতন পর্ব্ব এসেছে, ভাব ভাষা ও ছন্দ নূতন পথে গেছে। দেখেছি, কাব্যের নূতন রূপ স্বীকার ক'রে নিতে সময় লাগে, অনভ্যস্ত ধ্বনি ও ভাবের রস গ্রহণে মন স্বভাবতই বিমুখ হয়। এইটে অনুভব করি বলেই রচনা পড়ে শোনবার যে স্বাভাবিক ইচ্ছা সেটা চলে গেছে। আমি জানি স্বীকার ক'রে নিতে সময় লাগবে। দীর্ঘকাল আমাকে লিখতে হয়েছে, কখনো একঘেয়ে ধরণে লিখি নি, বিচিত্রভাবে লিখ্‌তে চেষ্টা করেছি, কখনও একটা পথ অনুসরণ ক'রে নিরস্ত থাকি নি। অনেকে বলেন, উনি "সোনার তরী"র মতন আর কিছু লেখেন নি। অবশ্য সোনার তরী যখন লিখেছিলাম তখন সীমানাটা আরও পিছনে নির্দ্দিষ্ট ছিল। যদি এখনও সোনার তরীর মতই লিখতে থাকতাম, হয়ত তাঁরা বল্‌তেন, হাঁ, লিখ্‌তে পারে। এখন বলেন, এবার থামলে ভাল হয়। নূতনকে ক্ষমা করা সহজ নয়। বার-বার বিভিন্ন কাব্যে এই রকম

ভাবে আমার সীমানা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে শুনেছি—যখনি এ-কথা শুনি তখনি বুঝি, এ সীমানা যখন আপনি পেরবে তার পূর্ব্বে সবই বৃথা চেষ্টা। তাই দীর্ঘকাল কাউকে কবিতা পড়ে শোনাই নি।

বাংলায় নূতন ছন্দ অনেক আমিই প্রবর্ত্তিত করেছি—এক সময় যা রীতিবিরুদ্ধ ছিল আজ সেটাই orthodox, classical হয়ে গেছে। আমার এখনকার কবিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই, যা গদ্য তা কখনো কবিতা হ'তে পারে না—এ-কথাটা যে সত্য তা স্পষ্ট, এ কথার কোনো উত্তর নেই। গদ্য কথাবার্ত্তার ভাষা, কবিতার বক্তব্য তাতে বলবার জো নেই। ভাষার যে একটু ...নি আড়াল কাব্যে মাধুর্য্য জোগায় গদ্যে তার অভাব; গদ্য হচ্ছে কথার ভাষা, খবর দেবার ভাষা। যে ভাষা সর্ব্বদা প্রচলিত নয় তার মধ্যে যে একটা দূরত্ব আছে তারই প্রয়োগে কাব্যের রস জমে ওঠে। অধুনা "শেষ সপ্তক" প্রভৃতি গ্রন্থে আমি যে ভাষা, ছন্দ প্রয়োগ করেছি তাকে 'গদ্য' বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে। গদ্যের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে ব'লে কেউ কেউ তাকে বলেছেন গদ্যকাব্য, সোনার পাথরবাটি। আমি বলি, যাকে সচরাচর আমরা গদ্য ব'লে থাকি সেটা আর আমার আধুনিক কাব্যের ভাষা এক নয়, তার একটা বিশেষত্ব আছে যাতে সেটা কাব্যের বাহন হ'তে পারে; সে ভাষায় ও ভঙ্গীতে কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকা লিখিত হ'লে তার গ্রাহক-সংখ্যা কমবেই, বাড়বে না। এর একটা বিশেষত্ব আছে যাকে আমার মন কাব্যের ভাষা ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। এই ভঙ্গীতে আমি যা লিখেছি আমি জানি। তা অন্য কোনো ছন্দে বল্‌তে পারতুম না। অবশ্য উত্তর হ'তে পারে, নাই বলতেন। কিন্তু বলবার কথা আছে অথচ নিয়মের খাতিরে তা বলব না, এ বড় মিষ্টরের মত কথা। আমার পক্ষে এটা অনিবার্য্য অপরিহার্য্য বলেই করেছি; এ প্রচলিত স্বীকৃত হবে কি না তা আমি জানি নে। তর্কে অবশ্য এ জাতীয় বিচারের মীমাংসা হয় না; যদিচ আমার নিজের বিশ্বাস এটা অসঙ্গত হয় নি, এমন কুকীর্ত্তি করি নি যা দণ্ডনীয়, মহাকালের দরবারে আপীলে হারতেই হবে এমন মনে করি নে; কিন্তু রচয়িতার অভিমত এ ক্ষেত্রে অনেকে প্রামাণ্য ব'লে গ্রহণ না-ও করতে পারেন। আজকাল অনেক আধুনিক ইংরেজ কবি নানা রকম পরীক্ষা করছেন—এটা তারই অনুসরণ নয়। এক সময়ে আমাদের দেশে লেখকদের ইংরেজ রচয়িতাদের সঙ্গে তুলনা না-ক'রে আমরা শান্তি পেতুম না, নবীন সেন ছিলেন বাংলার বায়রণ, কালীপ্রসন্ন ঘোষ ছিলেন বাংলার কার্লাইল—আমাকে বলত বাংলার শেলি যদিও কোনোকালে আমি শেলি নই। এই রকম একটা শ্রেণীনির্ণয় না করতে পারলে অনেকে শান্ত হন না। আমাকে যদি বলেন বাংলার এলিয়ট তবে হয়ত অনেককে আমার দলে পাব; কিন্তু আমি তা নই, অনিবার্য্য পথে আমার কাব্যজীবন চলেছে, এখনো তার শেষ হয় নি, ক্রমশ লেখনী নৈপুণ্যে পরিণতি লাভ করছে।

অনেকে মনে করেন, কবিতা লেখা এতে সহজ হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, বাঁধা ছন্দেই তো রচনা হুহু ক'রে চলে, ছন্দই প্রবাহিত ক'রে নিয়ে যায়; কিন্তু যেখানে বন্ধন নেই অথচ ছন্দ আছে, সেখানে মনকে সর্ব্বদা সতর্ক ক'রে রাখতে হয়।

কলিকাতা বিশ্বভারতী সম্মিলনীতে বক্তার আধুনিক কাব্যপাঠের ভূমিকা। শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্ত্তৃক অনুলিখিত।
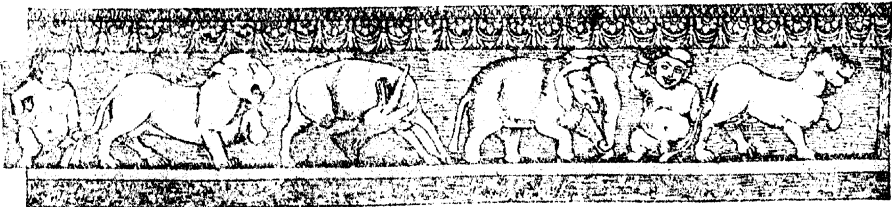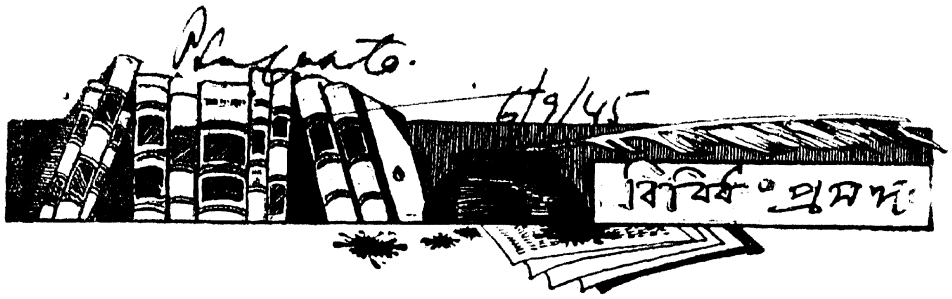
লর্ড লিনলিথগোর রাজকার্য্যনীতি

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে ২৯৪ পৃষ্ঠায় গবর্ন্‌র-জেনার‍্যাল লর্ড লিনলিথগোর প্রথম বক্তৃতানিচয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। এই সকল বক্তৃতায় তিনি যাহা যাহা করিবেন বলিয়াছেন, তাহা আবশ্যক ও প্রশংসনীয়; কিন্তু নূতন ভারতশাসন আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য বলিয়া তিনি এমন কোন কোন নীতি অবলম্বন ও কাজ করিবেন বলিয়াছেন, যাহা তিনি করিতে পারিবেন না। নিউদিল্লীতে পৌঁছিবার পর তিনি রেডিওর সাহায্যে অন্যত্রও শ্রোতব্য যে বক্তৃতা করেন, তাহা তাঁহার প্রথম বক্তৃতানিচয়ের মধ্যে প্রধান। এই বক্তৃতায় তিনি যে-সকল বিষয়ে মন দিবেন বলিয়াছেন, তাহার কোনটিই অনাবশ্যক বা তুচ্ছ নহে। কিন্তু একটি অত্যাবশ্যক বিষয়ের তিনি উল্লেখ করেন নাই। তাহা শিক্ষা। তাহা আমরা জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে লিখিয়াছি।

গো-বংশের উন্নতির জন্য তিনি কয়েকটি ষাঁড় কিনিয়াছেন। ভূস্বামীদিগকে তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। অন্যান্য উপায়েও তিনি কৃষির উন্নতি চেষ্টা করিবেন, তাহার আভাস দেখা যাইতেছে।

তিনি বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত ব্যক্তি, অন্য সমুদয় সভ্য দেশে গোবংশের ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি কি প্রকারে হইয়াছে, তাহা জানেন। সার্ব্বজনীন সাধারণ শিক্ষা, কৃষিশিক্ষার প্রভৃত আয়োজন, এবং গবাদি গৃহপালিত পশুর পালন ও চিকিৎসা বিষয়ক বিজ্ঞান ও বিদ্যা শিখাইবার যথেষ্ট ব্যবস্থা দ্বারা, জলসেচনের পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা, এবং দৃষ্টান্তদ্বারা যে অন্য সব সভ্য দেশে এই উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত থাকিবার কথা নয়। তিনি নিজে যে দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন ও অন্যকে দেখাইতে বলিতেছেন, তাহা ভাল, এবং তাহাতে কিছু সুফলও ফলিবে। কিন্তু ভারতবর্ষের মত বৃহৎ দেশে, আমরা যে-যে প্রকার শিক্ষার কথা বলিয়াছি তাহা ব্যতিরেকে যথেষ্ট ফললাভ হইবে না, ইহা নিশ্চিত। সিমলা মিউনিসিপালিটি বিদ্যালয়ের দরিদ্র কতকগুলি অপুষ্ট ছাত্রছাত্রীকে দুধ দিতেছেন। এই কাজটি ভাল। সর্ব্বত্র এই প্রকার চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। লর্ড লিনলিথগো এ প্রকার কাজের প্রশংসা করিয়া ভালই করিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ—সব বয়সের মানুষ—অপুষ্ট। তাহার কারণ দেশের দারিদ্র্য। দারিদ্র্য দূর না করিতে পারিলে, কি শিশুদের, কি বালক-বালিকাদের, কি প্রাপ্তবয়স্কদের, কাহারও অপুষ্টতার প্রতিকার হইতে পারে না। ভিক্ষা দিয়া একটা জাতির পেট ভরান যায় না। যদি তাহা সম্ভব হইত, তাহা হইলেও তাহা বাঞ্ছনীয় হইত না। মানুষের মনুষ্যত্ব এইখানে যে, সে নিজের চিন্তা ও চেষ্টার দ্বারা নিজের অভাব মোচন করিতে পারে, নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে। একটা সমগ্র জাতিকে কিংবা তাহার কোন অংশকে ভিক্ষাজীবীর জাতিতে বা সমষ্টিতে পরিণত করা তাহাকে উন্নত করিবার উপায় নহে।

যে জাতি আত্মপুষ্ট, কেবল সেই জাতিই সুপুষ্ট হইতে পারে। সেই জাতিই আত্মপুষ্ট হইতে পারে, যে জাতি আত্মশাসিত। পরশাসিত কোন জাতিকে আত্মশাসিত হইতে হইলে তাহার পক্ষে স্বাশ[illegible] উদ্বোধন আবশ্যক ও পথপ্রদর্শক সুশিক্ষালব্ধ জ্ঞানালোক আবশ্যক। অজ্ঞ, অশিক্ষিত, নিরক্ষর জাতিকে পরাধীন রাখা যত সহজ, জ্ঞানবান শিক্ষিত লিখনপঠনক্ষম জাতিকে পরাধীন রাখা তত সহজ নহে।

এবম্বিধ কারণে, লর্ড লিনলিথগো যে-যে দিকে যতটুকু ভাল কাজই করুন না, তাহার পরিমিত প্রশংসা করিলেও, সর্ব্ববিধ শিক্ষার যথেষ্ট আয়োজন না-করিলে তাঁহার সমুচিত প্রশংসা করা চলিবে না।

সিমলায় বিদ্যালয়ের কতকগুলি বালক-বালিকাকে দুধ দেওয়া উপলক্ষ্যে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহার শেষের দিকে বলেন :—

"What indeed is the use of spending public funds on objects such as education, welfare schemes and the like, if the people have not the health and vigour of mind and body to take full advantage of them and to enjoy them?"

তাৎপর্য। সরকারী টাকা শিক্ষা, শিশুমঙ্গল প্রভৃতিতে ব্যয় করিয়া বাস্তবিক লাভ কি, যদি লোকদের ঐ সকলের পুরা সুযোগ গ্রহণ ও উপভোগের নিমিত্ত আবশ্যক স্বাস্থ্য এবং মনের ও দেহের তেজ না থাকে?

এই কথাগুলির মধ্যে সত্য আছে। কিন্তু এগুলির দ্বারা ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব এবং অনিষ্ট হইতে পারে।

এগুলি পড়িয়া ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকদের এই ধারণা জন্মিতে পারে, যে, ভারতবর্ষে শিক্ষার ও শিশুমঙ্গলাদির জন্য সরকার বাহাদুর খুব ব্যয় করেন, কিন্তু সমস্তই প্রায় অপব্যয়ের সামিল হয় এই জন্য, যে, লোকদের স্বাস্থ্য ও দেহমনের স্ফূর্তি না-থাকায় তাহারা পরম-দয়ালু ও ন্যায়বান সরকারের শিক্ষা ও শিশুকল্যাণাদি ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু সত্য কথা এই, যে, সমগ্র ভারতে শিক্ষার জন্য সরকার যাহা ব্যয় করেন, ইংলণ্ডের একমাত্র লণ্ডন জেলা কৌন্সিল তাহার সমান বা তার চেয়ে বেশী শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন। আমরা যে সুস্থ, সুপুষ্ট এবং দৈহিক ও মানসিক স্ফূর্তি বিশিষ্ট জাতি নহি, তাহার একটা প্রধান কারণ, আমরা পরাধীন, অশিক্ষিত ও নিরক্ষর জাতি। প্রকারান্তরে অল্প আগে এই কথাই বলিয়াছি। লর্ড লিনলিথগো কিছু দুধ ভিক্ষা দেওয়ার প্রশংসা করিয়া সেই উপলক্ষ্যে যে শিক্ষার প্রতি পরোক্ষ ভাবে তাচ্ছিল্য দেখাইয়াছেন, তাহা নিন্দার্হ।

মনের তেজ, মনের স্ফূর্তি—সম্পূর্ণরূপে না হইলেও আংশিক ভাবে—মনোবৃত্তিসমূহের সম্যক পরিচালনার উপর নির্ভর করে। অশিক্ষিত মানুষ তাহার মনোবৃত্তিসমূহের সম্যক পরিচালনা করিতে পারে না। অতএব, এক দিকে যেমন ইহা সত্য যে, মনের তেজ না থাকিলে মানুষ শিক্ষার সুযোগের সুব্যবহার করিতে পারে না, অন্য দিকে তদ্রূপ ইহাও সত্য যে, শিক্ষা ব্যতিরেকে মনের তেজ যথেষ্ট বাড়ে না।

লর্ড লিনলিথগো জানেন, যে, নূতন ভারতশাসন আইন ভারতীয় মহাজাতিকে মানুষ হইবার চেষ্টায় সাহায্য করিতে গবর্নর-জেনার্যালকে অসমর্থ, ও তাহাদিগকে অমানুষ রাখিতে সমর্থ করিয়াছে। এবং এই আইন যে-আকারে পাস হইয়াছে তাহাকে সে আকার দেওয়াতেও পরোক্ষ ভাবে তাঁহার বেশ হাত ছিল। সুতরাং তিনি, যে, নানা রকম ছোটখাট বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন—যথা সেক্রেটরী ও কেরানীদের সহিত সাক্ষাৎ পরিচিত হইতে ও তাহাদের কাজ দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন—তাহার যথাযোগ্য প্রশংসা আমরা করিতে পারি; তজ্জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নাই। কিন্তু এই সকলের ফলে আমরা যেন এক মুহূর্তের জন্য ভুলিয়া না থাকি, যে, আমাদিগকে আমাদের প্রধান অধিকার, স্বশাসন অধিকার, হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। আশা করি, আমাদিগকে ভুলাইয়া রাখিবার অভিপ্রায় তাঁহার মত বুদ্ধিমান লোকের নাই—কেননা, তাহা সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব।

—

রবীন্দ্রনাথ ও 'মোহাম্মদী'

মাসিক 'মোহাম্মদী'তে (প্রধানত হিন্দু সাহিত্যিকদের চেষ্টায় পুষ্ট) বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালান হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের লেখাও রেহাই পায় নাই। তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় তাঁহার কোন কোন লেখার উপর আক্রমণের উত্তর দিয়া ঐ মাসিককে সম্মানিত করিয়াছেন। এইরূপ সম্মান পুনর্ব্বার প্রদর্শন করিতে তিনি বাধ্য না হইলে আশ্বস্ত হইব। তিনি লিখিয়াছেন—

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার "মোহাম্মদী" পত্রখানি আমার হাতে এল।

বাংলা প্রবেশিকা পাঠ্যপুস্তক যে অপাঠ্য লেখক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার বিস্তর প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। আমার রচনাও তার দৃষ্টান্ত জুগিয়েছে। নমুনাস্বরূপে সেই অংশটুকু নিয়েই আমি আলোচনা করব।

অতঃপর তিনি বলিতেছেন—

সাহিত্যের আসরে নেমে অবধি আমার বিরুদ্ধে অনেক অদ্ভুত অভিযোগ আমাকে শুনতে হয়েছে; তৎসত্ত্বেও আজ যা শোনা গেল, এতটা প্রত্যাশা করি নি। সমস্তটা উদ্ধৃত করতে হোলো, পাঠকদের কাছে ক্ষমা চাই।

তদনন্তর পঙ্কোদ্ধার-কার্য্য চলিয়াছে। যথা—

"পূজারিণী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৌত্তলিকতার একেবারে চূড়ান্ত।

'বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর কিছু নাই ভবে পূজা করিবার,'—বিশ্বের দরবারে বিশ্বকবির উপযুক্ত message ই বটে! আলোকের দুয়ারে এ যেন অন্ধকারের আহ্বান! ইহাও কি এ যুগে চলিবে?

"গান্ধারীর আবেদন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কুরুপাণ্ডবের কাহিনী। নারীত্বের প্রতি লাঞ্ছনা এবং ন্যায়ের প্রতি অবিচারই এই কবিতার অন্তরালে উঁকি মারিতেছে। মজার কথা এই, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা এবং পাণ্ডবদের প্রতি অন্যায় ও অবিচারকে ধৃতরাষ্ট্র এক অদ্ভুত যুক্তিবলে সমর্থন করিয়া যাইতেছেন। গান্ধারী যখন বলিতেছেন যে, পাপাচারী দুর্যোধনকে পরিত্যাগ কর, তখন ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন :—

'এককালে ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই তরী 'পরে পা দিয়ে বাঁচে না কেহ। বারেক যখন নেমেছে পাপের স্রোতে কুরুপাণ্ডুগণ, তখন ধর্ম্মের সাথে সন্ধি করা মিছে।'

"চমৎকার যুক্তি এ! তাহা হইলে একবার পাপ করিলে তাহার আর উদ্ধার নাই। সারা জীবন তাহাকে পাপ করিয়াই যাইতে হইবে? এ কথা শুনিলে নিরাশায় মানুষের চিত্ত ভরিয়া উঠিবে, পক্ষান্তরে পাপের স্রোত নিরুদ্ধগতিতে বহিয়া চলিবে। মানুষ পাপ করিতে পারে, তবু তাহার মুক্তির আশা আছে; কিন্তু যেদিন হইতে সে পাপের সহিত সংগ্রাম করিবার প্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলিবে, সেদিন তাহার ভবিষ্যৎ চিরঅন্ধকারময়। একবার পাপ করিলে আর ধর্ম্মের পথে ফিরিয়া আসায় কোন লাভ নাই—এই মারাত্মক ভ্রান্ত বিশ্বাস কিছুতেই মানুষের মনে বদ্ধমূল হইতে দেওয়া উচিত নয়।"

এই কথাগুলার উপর রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতে হইবে।

দেশের কোন পরিচিত লোককে যদি নিন্দা করতেই হয়, নিন্দার অহৈতুক আনন্দেই হোক্ অথবা কোনো উদ্দেশ্যমূলক কারণেই হোক, অন্তত সেটা বিশ্বাস্য হওয়া চাই। নইলে বুদ্ধির প্রতি দোষ আসে। কাব্যে আমি পৌত্তলিকতা প্রচার করেছি অথবা পাপ একবার সুরু করলে সেটা একেবারে চূড়ান্ত করাই কর্ত্তব্য, এই নীতিটাকে "মানুষের মনে বদ্ধমূল" করবার জন্যে আমি বদ্ধপরিকর, আমার সম্বন্ধে এমন অপবাদ বাংলার মতো দেশেও সম্ভবপর হোতে পারে—এ আমি কল্পনাও করি নি।

লেখক বলবেন, তাঁর স্বপক্ষের দলিলসুদ্ধ তিনি দাখিল করেছেন। অস্বীকার করবার জো নেই যে আমার কাব্যে অজাতশত্রু বৌদ্ধধর্ম্ম উচ্ছেদ করবার উপলক্ষ্যে বলেছেন, "বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর কিছু নাই ভবে পূজা করিবার," আর ধৃতরাষ্ট্রও বলেছেন বটে, "এককালে ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই তরী 'পরে পা দিয়ে বাঁচে না কেহ।"

এমনতরো অদ্ভুত যুক্তি নিয়ে বাদ প্রতিবাদ করতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হয়। যদি বলি লেখক যা বলছেন নিজেই তা বিশ্বাস করেন না, তা হোলে সেটা রূঢ় শোনায়; আর যদি বলি করেন, তবে সেটাও কম রূঢ় হয় না।

অর্থাৎ লেখককে হয় কপটাচারী নয় মূর্খ বলিতে হয়। অথচ এই দুটি শব্দের কোনটিই সম্মানব্যঞ্জক নয়।

লেখক পাপপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়ে আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন; আমি সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়ে তাঁকে এই উপদেশটুকু দেব যে, কাব্যে নাটকে পাত্রদের মুখে যে সব কথা বলানো হয়, সে কথাগুলিতে কবির কল্পনা প্রকাশ পায়, অধিকাংশ সময়েই কবির মত প্রকাশ পায় না। প্যারাডাইস লস্টে 'The Arch-Fiend' বলছেন :—

"To do aught good never will be our task,
but ever to do ill our sole delight."

সন্দেহ নেই, কথাগুলো উদ্ধতভাবে সুনীতিবিরুদ্ধ।

কিন্তু আজ পর্যান্ত কোনো ছাত্র বা অধ্যাপক, কোনো মাসিক পত্রের সম্পাদক বা পাঠক মিল্টনকে এ ব'লে অনুযোগ করে নি যে, পাঠকের মনে দুর্নীতি ও ঈশ্বর-বিদ্রোহ বদ্ধমূল করা কবির অভিপ্রেত ছিল। স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকের তালিকা থেকে প্যারাডাইস্ লস্টকে উচ্ছেদ করবার প্রস্তাব এখনো শোনা যায় নি; কিন্তু বাংলা দেশে কখনই শোনা সম্ভব হোতে পারে না, জোর ক'রে এমন কথা বলার মুখ আজ আর রইল না।

ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

আমি যে ধৃতরাষ্ট্র নই, সে কথা প্রমাণ করা এতই সহজ যে সে আমি চেষ্টাও করব না। স্বয়ং শেক্সপীয়রকেও প্রমাণের চেষ্টা করতে হয় নি যে, তিনি লেডি ম্যাকবেথ নন বা তাঁর পক্ষে ওকালৎনামা নেন নি। তাই রাজহত্যায় স্বামীকে উৎসাহিত করা উপলক্ষ্যে তাঁর নাটকের পাত্রীর মুখে এমন কথা নিশ্চিন্ত মনে বলাতে পেরেছেন :—

Infirm of purpose!
Give me the daggers:
the sleeping and the dead
are but as pictures.

শেক্সপীয়রকে এমন উপদেশ বিস্তারিত করেই দেওয়া যেতে পারে যে, একখানা ছবি মুছে ফেলা ও নিদ্রিত মানুষকে হত্যা করা একই, এমন কথা অত্যন্ত অশ্রাব্য অশ্রদ্ধেয়; বরঞ্চ নিদ্রিত মানুষকে বধ করার কেবল যে নরহিংসার পাপ আছে তা নয়, তার সঙ্গে কাপুরুষতা জড়িত। এই উপদেশকে আরো পল্লবিত করা যেতে পারে, কিন্তু নিরর্থক হবে। কেননা সম্পাদক নিশ্চয়ই বলতে পারেন শেক্সপীয়রের মুখে যা সাজে, রবীন্দ্রনাথের মত ক্ষুদ্র পাপীর মুখে তা শোভা পায় না। এমন কথা বলবার আশঙ্কা আছে, এই প্রবন্ধ থেকেই তার প্রমাণ পাই।

প্রমাণ তিনি নিম্নলিখিত প্রকারে দিয়াছেন।

লেখক অধ্যাপক খগেন্দ্র মিত্রের একটি গল্পের উল্লেখ করে বলেছেন :—

"এই গল্পে নরপূজার এক কুৎসিত চিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে। মানুষকে সাক্ষাৎ ভগবানের আসনে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই গল্প পাঠে মানুষের নৈতিক অধঃপতন অনিবার্য্য।"

ইহার উপর কবির মন্তব্যটুকু 'মোহাম্মদী'র লেখক গ্রহণ করিতে পারিবেন। অতএব তাহা উদ্ধৃত করায় কোন দোষ নাই।

আমার নৈতিক সৌভাগ্যবশতঃ গল্পটি পড়ি নি, কিন্তু হিজ হাইনেস আগা খাঁয়ের বিবরণ জানি এবং সকলেই জানে। নরপূজা হিন্দুর লেখা গল্পে থাকলে নৈতিক অধঃপতন অনিবার্য্য হয়, কিন্তু মুসলমান সমাজের সর্ব্বাগ্রগণ্য রাষ্ট্রনায়কের ব্যবহারে থাকলে দোষ স্পর্শে না, এই প্রসঙ্গে এ কথাটি চিন্তার বিষয় হয়েছে।

"হিজ হাইনেস আগা খাঁয়ের" ব্যবহারে নরপূজা কি

কি আকারে আছে, তাহা গত নবেম্বর ও ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ন রিভিয়ুতে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর প্রবন্ধ ও তাহার সমর্থক আগা খাঁয়ের সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের মন্তব্য পড়িলে পাঠকেরা জানিতে পারিবেন।

ইহার পর কবি কিছু অবান্তর অথচ সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা বলিয়াছেন।

এই উপলক্ষ্যে একটা বাহুল্য কথা বলে নিই, কেননা দুঃসময়ে বাহুল্য কথাও অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। জনশ্রুতি এই যে ভৈরব রাগ মহাদেবের তাণ্ডব গানের জন্যেই প্রবর্ত্তিত, আর শুনলেই বুঝা যায়, মিঞা মল্লার বাদশাহী আসরের ফরমাসেই রূপ নিয়েছে। কিন্তু তবুও ভৈরব বা ভৈরবী হিন্দু নয়, আর মুসলমান নয় মিঞা মল্লার। ওরা সম্প্রদায়ের অতীত। তেমনি হোমরের ইলিয়ড বা মিল্টনের প্যারাডাইস্ লস্ট স্বভাবতঃ পৌত্তলিকও নয় অপৌত্তলিকও নয়—ওরা সাহিত্য। ওদের গ্রহণ বর্জন সম্বন্ধে বিচার করবার সময় একমাত্র রসের দিক থেকেই বিচার কর্ত্তব্য, ধর্ম্মমতের দিক দিয়ে নয়। লজ্জা হয় এই সাদা কথাটারও ব্যাখ্যা করতে।

'মোহাম্মদী'র আক্রমণটা নূতন নয়। বাংলার সরকারী "পাঠ্যনির্ব্বাচন বিভাগের মুসলমান পক্ষ" পূর্ব্বেই ইহার নজীর সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন।

আমার 'কথা ও কাহিনী'তে "বিচারক" নামক কবিতার একস্থানে আছে, মরাঠ রঘুনাথ রাও মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাকালে বলছেন,—

"চলেছি করিতে যবন নিপাত
জোগাতে যমের খাদ্য।"

"যবন" শব্দটা কালক্রমে হয়তো শ্রুতিকটু হয়েছে। তাই সাধারণত নিজের রচনাতে মুসলমানদের সম্বন্ধে ঐ শব্দ কখনই ব্যবহার করি নে। কিছুকাল হোলো পাঠ্যনির্ব্বাচন বিভাগের মুসলমান পক্ষ থেকে আদেশ এল ঐ "যবন" শব্দটা তুলে দিতে হবে। বিস্মিত হলেম। দুর্ব্বল পক্ষ আমরা, ভাবলেম এই হতভাগ্য দেশ ছাড়া আর কোথাও এমন উৎপাত সম্ভব হোতে পারত না। মার্চেন্ট অব ভেনিসে খ্রীষ্টান বারেবারে ইহুদিকে কুকুর বলে গাল দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সমস্ত বইখানাতেই ইহুদির 'পরে অবজ্ঞা ফুটে উঠেছে, তা না হোলে ওর নাটকীয় বাস্তবতার অপলাপ হ'ত। তৎসত্ত্বেও [ইহুদি] লর্ড রেডিং যখন এখানে ভাইসরয় ছিলেন তখন ঐ বইটাকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যশ্রেণী থেকে সরাবার জন্যে পরোয়ানা জারি করেন নি। আর [ইহুদি] ডিজরেলির মত প্রখর বক্তা মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এ সম্বন্ধে নির্ব্বাক ছিলেন। অথচ কাব্যে মরাঠ পাত্রের মুখে উচ্চারিত সামান্য একটা "যবন" শব্দের জন্য বাংলা সাহিত্য যদি লাঞ্ছিত হ'তে পারে, তাহলে এই মাথাগণতির দিনে কার দরজায় দোহাই পাড়ব? সমস্ত কবিতাটিতে রঘুনাথ রাওকে আদর্শ পুরুষ বলেও খাড়া করা হয় নি। তার বিপরীত "যবন" শব্দ ব্যবহারের দ্বারা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি যদি অন্যায় সূচিত হয়ে থাকে, সে অন্যায় কবির মধ্যেও নেই, কাব্যের মধ্যেও নেই, বস্তুত সে অন্যায় সাহিত্যকে স্পর্শও করে নি। এই সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথ রাও যমের খাদ্য জোগাবার কথা বলেছে। ওটাও তো সাধুলোকের যোগ্য কথা নয়: ঐ পংক্তিটাও বর্ত্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে উদ্বেগের কারণ হয়ে রইল। ওথেলো নাটকে এক জন মুসলমান সেনাপতি অন্যায় সন্দেহে তার স্ত্রীকে খুন করেছে। খ্রীষ্টানে মুসলমানে বিবাহ হলে মুসলমান স্বামী কর্ত্তৃক এই রকম বীভৎস আচরণ স্বাভাবিক, শেকস্‌পিয়রের রচনার মধ্যে এমন একটা কুৎসিত ইসারা আছে, এই অভিযোগে পাঠ্যনির্ব্বাচন-সমিতির মুসলমান সদস্যেরা কি দণ্ড উত্তোলন করবেন? সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিয়ে ভাঙা কপাল আমরা পরস্পরের মাথা ভাঙাভাঙি করছি, অবশেষে কি সাহিত্যের ললাটে বাড়ি পড়তে শুরু হবে?

কবি "উপসংহারে ন্যায়ের অনুরোধে একটা কথা বলা উচিত" মনে করিয়াছেন।

সাহিত্যবিচার নিয়ে এই রকম অদ্ভুত বুদ্ধিবিকার আমার হিন্দু ভ্রাতাদের মধ্যেও উগ্র হয়ে উঠতে পারে, আমি হতভাগ্য তার প্রমাণ পেয়েছি। "ঘরে বাইরে" নামক একখানা উপন্যাস অশুভলগ্নে লিখেছিলেম। তার মধ্যে বর্ণিত সন্দীপ নামক এক দুর্ব্বৃত্তের মুখে সীতার প্রতি অসম্মান-জনক কিছু আলোচনা ছিল। বলা বাহুল্য, সন্দীপের চরিত্র-চিত্র পরিস্ফুট করা ছাড়া এই আলোচনার মধ্যে অন্য কোনো অসৎ অভিপ্রায় ছিল না। হঠাৎ আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কলরব উঠল, সীতাকে স্বয়ং আমিই অপমান করেছি। কবি বাল্মীকি অযোধ্যার প্রজাদের মুখের দুর্ব্বাক্যকে দুর্ম্মুখের মুখ দিয়ে ব্যক্ত করিয়ে নিরপরাধ সীতার নির্ব্বাসন সম্ভব করেছেন। কেউ তো ত্রেতা যুগের কবির প্রতি দোষারোপ করেন নি। আর এই কলি যুগের কবির মাথায় হিন্দু মুসলমান উভয় পক্ষই একই শ্রেণীর অপরাধ চাপিয়ে যদি তার অখ্যাতিকে দুর্ভর করে তোলেন, তবে কি এই বাংলা দেশের পঙ্কিল মাটিকেই দায়ী করব? প্রাকৃতিক কারণ ছাড়া কোনো রকম নৈতিক কারণ অনুমান করতেও সাহস করি নে।

কবির উল্লিখিত সাহিত্যিক দুর্ঘটনাটা মনে পড়িতেছে বোধ হয়। যিনি রবীন্দ্রনাথকে আসামী খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহারই পিতার কোন নাটক থেকে সীতাসম্বন্ধীয় কিছু দুর্বাক্য উদ্ধৃত করিয়া সমুচিত উত্তর দিয়াছিলেন।

'মোহাম্মদী'র লেখকের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা যে সমুদয় মুসলমানের প্রতি প্রযুক্ত ও প্রযোজ্য নহে, তিনি তাহা বলিয়া জবাবটি শেষ করিয়াছেন।

সবশেষে একটি কথা বলে বিদায় নেব। আমার কোনো কবিতায় ব্যক্তিগতভাবে আওরঙ্গজেবের সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ পেয়েছিল। বলেছিলেম, আওরঙ্গজেব ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করেছিলেন। পাঠ্য নির্ব্বাচনের মুসলমান সভা এটাকে সমস্ত মুসলমানের নিন্দা বলেই গণ্য করেছিলেন, নইলে এ লাইনটাকেও বর্জ্জন করতে আদেশ দিতেন না। তাই স্পষ্ট করে বলে রাখি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি মোহাম্মদীর প্রবন্ধ-লেখকের অদ্ভুত উক্তি নিয়ে যে আলোচনা করেছি সেটাও এক জনের সম্বন্ধেই। সেটাতে সমগ্র বা অধিকাংশ মুসলমানের বিচারবুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে, এ দুর্দ্দিনে এত বড়ো নিন্দার কথা কেউ যেন কল্পনা না করেন। আমি অনেক মুসলমানকে জানি, তাঁদের শ্রদ্ধা করি। অনেকেই তাঁরা বুদ্ধিমান, তাঁরা রসজ্ঞ, তাঁরা উদার, তাঁরা মননশীল, নানা ভাষার সাহিত্যে তাঁরা অভিজ্ঞ। অপক্ষপাত সদ্বিবেচনায় তাঁরা কোনো সম্প্রদায়ের কোনো সদাশয় ব্যক্তির চেয়ে

কোনো অংশেই ন্যূন নন। তাঁরা হিন্দু কি মুসলমান, এ তর্ক মনে ওঠেই না; জানি তাঁরা মানুষের মতো মানুষ।

—

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্তের অভিভাষণ

গত মাসে বরিশালে বঙ্গ ও আসামের ব্যবহারাজীবদিগের সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উহার সভাপতি শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অভিভাষণে বিচারকদের, শাসনকর্ত্তাদের, আইন-প্রণেতাদের ও আইনব্যবসায়ীদের চিন্তা করিবার অনেক সারগর্ভ কথা আছে। সেই সকল উদ্ধৃত করিয়া তাহার আলোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই। সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতব্য ও বিবেচ্য যে-সব কথা তিনি অভিভাষণের গোড়ার দিকে বলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

ব্যবহারাজীবগণ জনসাধারণের সেবক; তাঁহারাই জনসাধারণের স্বাভাবিক নেতা—যদিও তাঁহাদিগকে মুচিরও অধম বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। (মহাত্মা গান্ধী একবার বলিয়াছিলেন, আইন-ব্যবসায়ীরা মুচিরও অধম)। প্রবল অসহযোগ আন্দোলনের সময়ও তাঁহারা এই নেতৃত্বের আসন হইতে বিচ্যুত হন নাই। আইন-ব্যবসায়ীরা শুধু আইনের প্রয়োগকর্ত্তা বা ব্যাখ্যাতা নহেন। তাঁহারা আইন-প্রণেতাও বটেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র আইন-সভায় তাঁহাদেরই প্রাধান্য। আমাদের বর্ত্তমান ব্যবস্থা পরিষদের প্রেসিডেণ্ট, পরিষদের মুখ্য সদস্য (আইন-সচিব), কংগ্রেসী দলের নেতা, কংগ্রেস জাতীয় দলের নেতা, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পার্টির নেতা এবং পরিষদের অন্যান্য বহু সদস্য আইন-ব্যবসায়ী।

অতঃপর তিনি বলেন, ব্যবহারজীবী সরকারী কর্ম্মচারী-তুল্য; বিচারপতি যেমন কোর্টের কর্ম্মচারী, আইন-ব্যবসায়ীও ঠিক তদ্রূপ কোর্টের কর্ম্মচারী। তিনি বিচারপ্রার্থীর পক্ষ সমর্থন করেন। বিচারপ্রার্থী ভিক্ষুক নহে—বা সে কোর্টে গিয়া অনধিকারপ্রবেশের অপরাধও করে না; তথায় যাইবার অধিকার তাহার আছে। নগদ মূল্য দিয়া সে সেই অধিকার ক্রয় করে। বস্তুত বিচারপ্রার্থীদের প্রদত্ত অর্থেই কোর্টের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়; বিচারক তাহাদের বেতনভুক্। বিচারপ্রার্থীদের প্রয়োজনেই কোর্টের অস্তিত্ব। আবার আইন-ব্যবসায়ী বিচারপ্রার্থীদের পক্ষ হইতে কোর্টে উপস্থিত থাকেন, কৃপাবশে বা শিষ্টাচারবশত যে তাঁহাকে কোর্টে উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হয় তাহা নহে। তথায় উপস্থিত থাকিবার অধিকার তাঁহার আছে, সুতরাং শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম সর্ব্বাংশেই তাঁহার প্রাপ্য। ফৌজদারী বিচারকই হউন, আর দেওয়ানী বিচারকই হউন, তাঁহার বিচারপ্রার্থীর প্রতি ভদ্রতা এবং আইন-ব্যবসায়ীর প্রতি সম্ভ্রম প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের কোনও কোনও বিচারক আইন-ব্যবসায়ীর সহিত যারপরনাই অভদ্র আচরণ করেন। তাঁহারা দাম্ভিক ও বদমেজাজী এবং তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রেষ্ঠতার অভিমান পোষণ করিয়া থাকেন।

শেষের দিকে তিনি বলেন—

আজ আমরা বিপুল বিপ্লবের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছি। আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক, জীবনের এই তিন ক্ষেত্রেই আমূল পরিবর্ত্তন আসন্ন। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা সুদূর ভবিষ্যতের অবস্থা সম্বন্ধে একটা সাহিত্যিক বা কেতাবী আলোচনা নহে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে যে-কয়জন সোসিয়ালিস্ট (সমাজতন্ত্রবাদী) আছেন, তাঁহাদের বিদ্যমানতার একটা ফল ফলিবেই। আমাদের চারিদিকে যাহা ঘটিতেছে তাহা উপেক্ষা করিলে আমাদের চলিবে না। আজ সমাজতন্ত্রবাদ মাথা তুলিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতেই হয়ত পুঁজিবাদী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে উহাকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। গণতন্ত্র বনাম একনায়কত্ব, ইহা আর একটা আসন্ন সমস্যা। প্রথম অবস্থায় স্বেচ্ছাচার ও গণতন্ত্রের মধ্যেই সংগ্রাম চলে বটে; কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে উহা ভোল বদলাইয়া ফেলে ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে। ইটালী, স্পেন ও রাশিয়ায় তাহার দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। আজ অবস্থা অত্যন্ত জটিল। আজ শুধু যে মতবৈষম্য চলিয়াছে তাহা নহে, ইহা তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের পূর্ব্বাভাস, সংস্কৃতশাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পর এই সংগ্রাম প্রবল হইয়া উঠিবে।

এই শাসনতন্ত্রে আমাদের উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হইবে। সুতরাং ইহার বিরোধিতা করিতে হইবে; অর্থাৎ ইহা এমন ভাবে চালাইতে হইবে, যাহাতে ইহা ব্যর্থ হইয়া যায়। বিরোধীকে আক্রমণ করিবার অস্ত্রস্বরূপ এবং আত্মরক্ষার বর্ম্মস্বরূপ ইহা ব্যবহার করিতে হইবে।

অতঃপর তিনি বলেন—

এদেশের সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক জীবনে একটা পরিবর্ত্তন আসিতেছে। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রেই যুগপৎ এইরূপ ব্যাপক পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত বড় বেশী দেখা যায় না। জীবনের প্রতিক্ষেত্রের এই পরিবর্ত্তন পরস্পর ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। ভোটদ্বারা বা গুলিদ্বারা পরিবর্ত্তন সাধিত হইবার সম্ভাবনা। এস্থলে ভোটদ্বারা পরিবর্ত্তন সাধনের কথাই আমি বলিতেছি। পুরাপুরি বা আংশিক ভাবে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে দেশের আইনেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইবে। বিনারক্তপাতে ও শান্তিপূর্ণ ভাবে এই সব পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইলে একমাত্র আইন দ্বারাই তাহা করা সম্ভবপর। আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আমূল সংস্কার করিতে হইলে আইনেরও আমূল সংস্কার আবশ্যক। শ্রেণীগত অসাম্যের সমন্বয় আইন দ্বারাই অধিক করিতে হইবে। কাজেই এই পরিবর্ত্তনের দায়িত্ব আইন-ব্যবসায়ীদের উপরই পড়িবে। তাঁহাদিগকে কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন ও প্রবর্ত্তনই করিতে হইবে, এমন নহে, নূতন শাসন-ব্যবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া উহা সাধন করিতে হইবে। যথাসম্ভব বিনা বাধায় উহা করিতে ব্যবহারজীবীদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। এই হিসাবে আইন-ব্যবসায়ীদের অগ্নি-পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ভগবান করুন তাঁহারা যেন অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যথাযোগ্যভাবে কর্ত্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হন।

সর্ব্বশেষে দত্ত মহাশয় ব্যবহারাজীবদিগকে সাবধান করিয়া যাহা বলেন, সংক্ষেপে তাহা এই :—

শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি, দেশপ্রীতি প্রভৃতি বলেই তাঁহারা দেশের নেতৃত্বলাভে সমর্থ হইয়াছেন। যত দিন যোগ্যতা থাকিবে তত দিনই তাঁহারা ঐ নেতৃত্ব করিতে সমর্থ হইবেন। যোগ্যতাবলেই তাঁহারা নেতৃত্ব লাভ করিয়াছেন। কয়েক বৎসরের অসম্ভব অনটনে তাঁহাদের আয় হ্রাস পাইয়াছে। ইহার ফলে দেশহিতকর কার্য্য হইতে বিরত হওয়া উচিত হইবে না। অর্থই কর্ত্তৃত্ব করিবার মূলসূত্র নহে। অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে নেতৃত্ব ও কর্ত্তৃত্ব আয় অনুসারে হয় নাই। অনটন ও প্রয়োজনাতিরিক্ত সংখ্যাধিক্যের ফলে অনেকের

আচরণ যে ঘৃণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা তিনি দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য। আইন-ব্যবসায়ীদের মধ্যে কোন দোষ দেখা দেয় নাই ইহা মনে করা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। তবে অধঃপতনের মাত্রা যাহাতে হ্রাস পায় সে বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। ব্যবসায়ে এবং নাগরিক হিসাবে ব্যবহারজীবীরা নিষ্কণ্টক হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। তাহা হইলেই তাঁহারা তাঁহাদের উপর ন্যস্ত ভার বহনের যোগ্য হইবেন।

—

সোনা রপ্তানী

পৃথিবীর শক্তিশালী স্বাধীন জাতিরা যে যত পারে সোনা আমদানী করিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে ইংরেজ জাতির ব্যবস্থা সোনা রপ্তানী করা। আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে, ইহাই আমাদের পক্ষে ভাল! গত ৩০শে মে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে ২৭১ কোটি ৪৭ লক্ষ ২৪ হাজার ৪৪৯ টাকা মূল্যের সোনা রপ্তানী হইয়াছে। ইহার বদলে টাকা পাওয়া গিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু ঐ টাকার উপর হইতে রাজার মুখের ছাপ বাদ দিয়া শুধু রূপাটুকুর দাম ধরিলে মূল্য পাওয়া যায় আধাআধি।

—

সুভাষ বসু কার্সিয়ঙে

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে পুনা হইতে আনিয়া কার্সিয়ঙে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর বাড়ীতে আটক রাখা হইয়াছে। ভাইয়ের বাড়ীকে ভাইয়ের জেলে পরিণত করা প্রতিভাশালী পরিহাসরসিকের কাজ বটে। সরকার বাহাদুর শরৎবাবুকে বাড়ীভাড়া দিতেছেন কি?

সুভাষ বাবুর অপরাধ কি, সে-বিষয়ে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সর্ হেনরী ক্রেক প্রভৃতি সরকার-পক্ষ হইতে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে শ্রীযুত কৃষ্ণদাসের মহাত্মা গান্ধীকে লেখা চিঠি ছাড়া আরও কিছু চিঠিপত্রের উল্লেখ ছিল। তাহা আমরা এত দিন দেখি নাই। একখানি কাগজে সেদিন দেখিলাম, তাহা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সরকারী রিপোর্টে বাহির হইয়াছে। ঐ কাগজে একখানি চিঠি ও অন্য একটি রচনা উদ্ধৃত হইয়াছে।

আগে আমরা নিয়মিত রূপে বিনামূল্যে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ও কৌন্সিল অব্ ষ্টেটের বক্তৃতাদিসহ কার্য্যবিবরণ পাইতাম। কয়েক বৎসর হইল, তাহা আমাদিগকে দেওয়া হয় না। একবার বার্ষিক চাঁদা দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। তাহাও লওয়া হয় নাই। কখন কোন সংখ্যায় কি বাহির হয়, তাহা জানিতে না পারায় দরকার-মত কোন কোন সংখ্যা কিনিতেও পারি না।

পূর্ব্বোল্লিখিত কাগজে যে দুটি জিনিষ ছাপা হইয়াছে, তাহা যে সুভাষ বাবুর লেখা ও তাঁহার দ্বারা প্রচারিত, তাহা দস্তুরমত প্রমাণ করা আবশ্যক, এবং সেরূপ লেখা যে আইন-বিরুদ্ধ তাহাও প্রমাণ করা চাই। শুধু সর্ হেনরী ক্রেক বলিলেই তাহা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না। তাহা মানিয়া লইলে, গবর্ন্মেণ্টের নিজের অভিযোগেরই বিচারের জন্য এত বিচারক রাখিবার কোন সার্থকতা থাকে না।

রাজদ্রোহঘটিত মামলার সাক্ষীরা নিরাপদ নহে, সরকার-পক্ষের এই ওজুহাত সত্ত্বেও ত বহু বৎসর ধরিয়া এরূপ বিস্তর মোকদ্দমা হইয়া আসিতেছে ও এখনও চলিতেছে। যাহা হউক, এই অজুহাত যদি ভিত্তিহীন নাও হয়, তাহা হইলেও সুভাষ বাবুর বিরুদ্ধে সরকারী অভিযোগের প্রমাণ সমস্তই লিখিত বা মুদ্রিত জিনিষ। তাহাদের প্রাণ নাই, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই। তাহাদিগকে নির্ভয়ে আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারে।

—

পরলোকগত বিঠলভাই পটেলের উইল

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সভাপতি পরলোকগত বিঠলভাই পটেল মহাশয় তাঁহার উইলে বিদেশে ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় তথ্য প্রচার কার্য্যের জন্য এক লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন এবং এই নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন, যে, ঐ টাকা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের জন্য ব্যবহার করিবেন। পটেল মহাশয়ের ট্রষ্টীরা ঐ টাকা সুভাষবাবুকে দেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, ব্যবহারা-জীবদের মতে ঐ টাকা ঐ কাজের জন্য সুভাষ বাবুকে আইন অনুসারে দেওয়া যায় না। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিনয়জীবন ঘোষ পণ্ডিত জবাহরলালকে পত্রদ্বারা এই অনুরোধ করেন, যে, তিনি যেন এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া ঐ টাকাটির উইলানুযায়ী ব্যবহার করান। তাহাতে নেহরু মহাশয় উত্তর দিয়াছেন, তিনি এ বিষয়ে কিছু করিতে অক্ষম; কারণ, ব্যবহারাজীবদের মতে উইলের টাকা এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইতে পারে না। বোধ হয়, অন্য কোন রকম উত্তর নেহরু মহাশয় দিতে পারিতেন না।

কিন্তু ইহাও নিশ্চিত, যে, বঙ্গে বেসরকারী কম লোকই ঐ ব্যবহারাজীবদের কথা ঠিক্ বলিয়া মনে করেন। কেননা, বিঠলভাই পটেলও ব্যারিষ্টার ছিলেন এবং কম আইনজ্ঞ ছিলেন না।

—

বঙ্গে দুর্ভিক্ষ

বঙ্গের বহু জেলায় লোকে খাইতে পাইতেছে না, দৈহিক শ্রমের কাজে অনভ্যস্ত এবং দৈহিক শ্রমের কাজ করা অসম্মান-জনক মনে করে, এরূপ অনেক ভদ্রলোক শ্রেণীর পুরুষনারীও দৈনিক দু-আনা দেড় আনা মজুরীর আশায় 'টেষ্ট রিলিফ' কাজে যোগ দিতেছে। অন্য লক্ষ লক্ষ লোক ঐরূপ কাজ করিতেছে। তথাপি গবন্মেণ্ট বলিতেছেন, অন্নের দুষ্প্রাপ্যতা (scarcity) হইয়াছে, দুর্ভিক্ষ (famine) হয় নাই। আমাদের বাঁকুড়া জেলায় একটা কথা চলিত আছে, যার নাম চাল ভাজা তারই নাম মুড়ি। অন্নের দুষ্প্রাপ্যতা বলুন, আর দুর্ভিক্ষই বলুন, মানুষের খাইতে পাওয়া চাই। সরকারী সাহায্য যে দেওয়া হইতেছে, তাহা ভাল; কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। জনসাধারণ দুঃখের কথা শুনিয়া শুনিয়া এখন হয়ত আর আগেকার মত ব্যথিত ও দয়ার্দ্রচিত্ত হন না। কিন্তু এই দুর্ভাগা দেশে হৃদয়াবেগের দ্বারা চালিত হওয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না; কঠোর কর্ত্তব্যবুদ্ধির নির্দ্দেশে সর্ব্বদা কাজ করিতে হইবে ও নিরন্ন লোকদিগকে অন্ন দিতে হইবে।

—

কচুরী পানা ধ্বংস

কয়েকটি জেলার অনেকগুলি স্থানে সরকারী কর্ম্মচারী ও বহুসংখ্যক বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবকদের চেষ্টায় কচুরী পানা বিনষ্ট হওয়ার সংবাদ খবরের কাগজে দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। কচুরী পানা বিনষ্ট করিবার আইন হইবার পূর্ব্বে কেন এরূপ কাজ বেসরকারী লোকেরা ও সরকারী কর্ম্মচারীরা ব্যাপক ও দলবদ্ধ ভাবে করেন নাই, তাহাই ভাবিতেছি।

—

ভারতীয় মেডিক্যাল ডিগ্রী অনুমোদন

ব্রিটিশ মেডিক্যাল কৌন্সিলের মতে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, লক্ষ্ণৌ ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা সন্তোষজনক বলিয়া উক্ত কৌন্সিল কর্ত্তৃক তাহাদের মেডিক্যাল ডিগ্রী অনুমোদিত হইয়াছে। কলিকাতা ও ভারতীয় অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মেডিক্যাল ডিগ্রী এখনও ভারতীয় মেডিক্যাল কৌন্সিলের বিবেচনাধীন। কলিকাতায় শিক্ষা-প্রাপ্ত অথচ চিকিৎসাবিদ্যার কোন-না-কোন বিভাগে অতিশয় বিচক্ষণ ও দক্ষ চিকিৎসক আছেন। সুতরাং কলিকাতা আপাতত কেন অনুমোদন লাভ করে নাই, ঠিক্ জানি না।

—

পঞ্জাবে ও বঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষা

এ বৎসর পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল কুড়ি হাজারের উপর, বঙ্গ ও আসামে ছিল ২৫৬৬০। বঙ্গ ও আসামের লোকসংখ্যা ছয় কোটির উপর, পঞ্জাবের ২ কোটি তেইশ লক্ষ। অতএব, বঙ্গ ও আসামের প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষায় পঞ্জাবের সমান হইতে হইলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী ন্যূনকল্পে পঞ্চাশ হাজার হওয়া আবশ্যক।

—

বঙ্গে নারীদের কলেজী শিক্ষা

পুরুষ ও নারীদের শিক্ষা অনেক বিষয়ে একই হওয়া আবশ্যক; তাহাতে কোন ক্ষতিও নাই। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে নারীদের শিক্ষা আলাদা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা এখনও হয় নাই বলিয়া তাহাদিগকে মূর্খ করিয়া রাখিতে হইবে, আমরা এরূপ মনে করি না। এই জন্য, নারীরা যে ক্রমশ অধিকতর সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন, ইহা সন্তোষজনক।

বেথুন কলেজ বঙ্গে মেয়েদের প্রধান কলেজ। আই-এ ও আই-এসসি পরীক্ষায় এই কলেজের ফল এ বৎসর ভাল হইয়াছে। ইহা হইতে কুমারী দীপ্তি সরকার ও কুমারী রমা সরকার যথাক্রমে আই-এ ও আই-এসসি পরীক্ষায় ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। অধিকন্তু এই কলেজ হইতে ৩১টি ছাত্রী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

—

আসামীয়া শিক্ষক সম্মেলন

গত মে মাসের শেষ সপ্তাহে তেজপুরে যে আসামের শিক্ষক-সম্মেলনের নবম অধিবেশন হয়, তাহাতে ঐ প্রদেশে

সরকারী শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ মিঃ জি এ স্মল সভাপতির কাজ করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতার অন্যান্য কথার মধ্যে আসামে বাঙালী ছাত্রদের নিমিত্ত পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে কিছু আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ইহার বিরোধিতা করা নিতান্ত অশোভন। বাঙালী ছেলেরা যাহাতে তাহাদের মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভ করিতে পারে, তাহার সুযোগ তাহাদিগকে দেওয়া উচিত। আসামে যত জাতির ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক বাস করে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একতা ও সদ্ভাবের উপর উহার উন্নতি নির্ভর করে। অতএব সকল প্রতিবেশীর সহিত মৈত্রী ও প্রীতি স্থাপনের শিক্ষা দেওয়া শিক্ষকদের কর্ত্তব্য।

ইহা ঠিক বটে, যে, প্রত্যেক প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী ছোট ও বড় লোকসমষ্টিগুলির প্রত্যেকটির মাতৃভাষায় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সরকারী ব্যয়ে পৃথক পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন অসম্ভব। কিন্তু আসামে বাঙালীরা ক্ষুদ্র সমষ্টি নহে। তাহারা অসমীয়াদের চেয়েও সংখ্যায় অনেক বেশী, সুতরাং বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার সাহায্যে তাহাদের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা সুসাধ্য, ন্যায্য ও একান্ত আবশ্যক।

—

পণ্ডিত জবাহরলালের সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু সমাজতন্ত্রবাদে (সোশ্যালিজ্‌মে) এবং সাম্যবাদে (কম্যুনিজমে) বিশ্বাস করেন। কিন্তু তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, রাশিয়াতে যাহা কিছু করা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটি কর্ম্মধারার ও রীতির তিনি সমর্থন করেন না। ভারতবর্ষকে তিনি রাশিয়ার হুবহু নকল করিতে বলেন না, এদেশে এই দেশের উপযোগী ভাবে সমাজতন্ত্রবাদকে মূর্ত্তিদান তিনি চান।

যাঁহারা সমাজতন্ত্রবাদী নহেন এরূপ অনেক কংগ্রেসওয়ালা এবং অন্য অনেকে পণ্ডিতজীর সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারে এই বলিয়া আপত্তি করিতেছেন, যে, কংগ্রেস যখন সকল বা অধিকাংশ সভ্যের মতে সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ করেন নাই, তখন কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টের পক্ষে, তাঁহার কার্য্যকালের মধ্যে, উহা প্রচার করা উচিত নহে। ইহার উত্তরে নেহরু মহাশয়ের এই উক্তি উল্লিখিত হইতে পারে, যে, তিনি জবরদস্তি দ্বারা কংগ্রেসের ঘাড়ে নিজের মত চাপাইতে চান না, যে-সব কংগ্রেসওয়ালা সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাস করেন না তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া তিনি সমাজতন্ত্রবাদী করিতে চান। প্রত্যুত্তরে, বলা যাইতে পারে, যে, সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার কংগ্রেসের প্রধান কাজ নহে, সুতরাং কংগ্রেস সভাপতিরও উহা প্রধান কাজ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু তিনি যেখানে যাইতেছেন, সেখানেই উহার প্রচারে বেশী সময় দিতেছেন। কংগ্রেসের প্রধান কাজ স্বরাজলাভ অর্থাৎ দেশের রাষ্ট্রীয় শক্তি দেশের লোকদের হস্তগত করা। এবং পণ্ডিতজীও নিজে বলিয়াছেন, যে, রাষ্ট্রীয় শক্তি লব্ধ না হইলে সমাজতন্ত্রবাদকে দেশে মূর্ত্তি দিবার ক্ষমতা কাহারও হস্তগত হইবে না। সুতরাং রাষ্ট্রীয় শক্তি লাভের চেষ্টাটিকেই প্রধান স্থান দেওয়া উচিত। পণ্ডিতজীও তাহা কয়েক বার বলিয়াছেন। অতএব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভের জন্য ঐক্যবদ্ধ সম্মিলিত চেষ্টায় যাহাতে বাধা পড়ে, এমন কিছু করা উচিত নয়।

কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি কি বলিবেন ও কতক্ষণ তাহা বলিবেন, সে-বিষয়ে তাঁহার স্বাধীনতা লুপ্ত হইতে পারে না। তাঁহারই বিবেচনা করিয়া চলা উচিত। অবশ্য, তিনি সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়া সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করিলে এ আপত্তি ঘটিবে না। তাঁহার সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারের আর এক আপত্তি এই, যে, উহাতে দেশে আরও দলাদলি ও ভেদের সৃষ্টি হইতেছে ও হইবে, অথচ এখন রাষ্ট্রীয় শক্তি লাভার্থ সকল স্বরাজলিপ্সু লোকের সম্মিলিত চেষ্টা আবশ্যক। ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই মর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। আমরা এইরূপ কথা বহু পূর্ব্ব হইতে বলিয়া আসিতেছি। বলিয়া আসিতেছি, যে, আমাদের শক্তি পরস্পর বিরোধে ব্যয়িত না হইয়া পরাধীন ও শাসিত ভারতীয় এবং প্রভু ও শাসক বিদেশী জাতির মধ্যে বুঝাপড়াতে এখন ব্যয়িত হওয়া উচিত।

সমাজতন্ত্রবাদ ভাল কি মন্দ তাহার বিচার না করিয়া, কংগ্রেস সভাপতির উহা প্রচার করা উচিত কিনা, এবং দেশের বর্ত্তমান পরাধীন অবস্থায় যখন স্বরাজলাভের নিমিত্ত সকল দলের একতা ও সম্মিলিত চেষ্টা আবশ্যক, তখন উহা প্রচার করা উচিত কিনা, তাহাই বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত দু-রকমের আপত্তি উঠিয়াছে। আর এক রকমের আপত্তি অন্যবিধ। এই আপত্তি যাঁহারা করেন, তাঁহারা সমাজতন্ত্রবাদকে ও তাহার চরম পরিণতি সাম্যবাদকেই সমস্ত জাতির দুঃখদুর্গতি দূর করিবার আদর্শ উপায় মনে করেন না, বরং তাহাকে অনিষ্টকর ও বিপজ্জনক মনে করেন। এবম্বিধ আপত্তিকারীদের মধ্যে ধনিক, জমীদার প্রভৃতি আছেন যাঁহারা আপনাদের সম্পত্তিনাশের ভয়ে ভীত— যদিও সব প্রভূতসম্পত্তিশালী লোক এরূপ না হইতে পারেন।

কিন্তু তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্য আপত্তি, যুক্তিযুক্ত আপত্তি, হইতে পারে। তাহার বিস্তারিত আলোচনা এখানে হইতে পারে না। সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদীরা দেশে ও পৃথিবীতে আর সব শ্রেণী উঠাইয়া দিয়া কেবল এক শ্রেণী রাখিতে, অন্ততঃ কেবল সেই শ্রেণীর প্রভুত্ব রাখিতে চান। অন্যান্য শ্রেণীর

লোকেরা হয় আত্মবিলোপ করুক, নয় শ্রেণীতে শ্রেণীতে যুদ্ধ চলুক—তাহাতে যে থাকে থাক, যে যায় যাক। স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া কোন শ্রেণীর পক্ষে আত্মবিনাশ করা স্বাভাবিক নহে। সেই জন্য রাশিয়াতে প্রবলতম শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীর লোকদিগকে হত্যা করিয়াছে, তাড়াইয়া দিয়াছে, কিংবা খুব দয়া করিয়া থাকিলে তাহাদিগকে পদানত করিয়া তাহাদের দুর্গতি করিয়াছে। অন্য কোন কোন দেশে, শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর লোকেরা আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে নাই, অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের উপর প্রভুত্ব দৃঢ়তর করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং সে চেষ্টা আপাতত সফলও হইয়াছে। ইটালীতে ফাসিষ্টরা ইহা করিয়াছে। ইহাও যে ভাল, তাহা বলা যায় না।

সকল শ্রেণীর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া সকলের উন্নতি কেমন করিয়া হইতে পারে, হঠাৎ দু-কথায় তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা আমাদের মনে হয়, যে, পৃথিবীতে যেমন কেবল এক রকমের এক উচ্চতার গাছ নাই, নানা রকমের আছে, নানাবিধ পশুপক্ষীর মধ্যে এক এক জাতির পশু ও পক্ষীর মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে, তদ্রূপ মানুষের মধ্যেও কেবল একটা শ্রেণী না থাকিয়া নানা শ্রেণী থাকা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু সব মানুষেরই মানুষ হইবার ও থাকিবার সুবিধা ও সুযোগ থাকা চাই, কাজ চাই, স্ব স্ব শ্রমের ও উপার্জ্জনের ন্যায্য ফলভাগী হওয়া চাই এবং পরশ্রমজীবিতার বিলোপ চাই।

—

সমাজতন্ত্রবাদ ও অন্য পন্থা

সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের সমর্থন যাঁহারা করেন, তাঁহারা বলেন, যে, দেশের অধিকাংশ লোকের দরিদ্রতা—ও তজ্জাত স্বাস্থ্যকর গৃহাভাব, অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, রোগে চিকিৎসা ঔষধ পথ্যের অভাব—দূর করিবার একমাত্র ও শ্রেষ্ঠ উপায় ঐ মত অনুসারে রাষ্ট্রকে ও সমাজকে আমূল নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা। এমন কথা বলিলে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ দীনদুঃখী লোকদের হৃদয় স্বভাবতই আকৃষ্ট হয় ও আনন্দে নৃত্য করে—তাহারা সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষপাতী হয়। এবং ইহাও কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, যে, দেশের কোটি কোটি লোকের বেকার অবস্থার, দারিদ্র্যের, অজ্ঞতার ও রুগ্নতার উচ্ছেদ হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাহা ক্রমশ হইবে বলিলে তাহাদের মন প্রবোধ মানে না—মানুষ স্বয়ং বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে দুর্দশা হইতে মুক্ত হইতে চায়। ইংরেজরা যখন বলে, "আমরা শত শত বৎসরের সংগ্রাম ও চেষ্টায় প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী স্থাপন করিয়াছি, তোমরাও শত শত বৎসর ধরিয়া তাহা করিতে চেষ্টা কর," তখন আমরা তাহাতে খুশী হই না। সুতরাং কোন মজুর বা চাষীকে যদি বলা হয়, "তোমার নাতীর নাতী সুখের মুখ দেখিবে, তাই ভাবিয়া তুমি শান্ত হও," এবং যদি সে তাহাতে সন্তুষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহার উপর চটা উচিত নয়। প্রত্যেক মানুষেরই নিজের জীবিতকালে সুখী হইবার ইচ্ছা ও আশা করা স্বাভাবিক।

অতএব, যাঁহারা সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের বিরুদ্ধে লিখিতেছেন বলিতেছেন, তাঁহাদের শুধু পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে আক্রমণ করিলে চলিবে না। তিনি যেমন একটা উপায় বাৎলাইয়াছেন ও রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাঁহারাও একটা পন্থা নির্দ্দেশ করুন এবং সেই পথে চলিয়া যে সুফল পাওয়া গিয়াছে দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইয়া দিন। আমরা পণ্ডিতজীর মতাবলম্বী নহি, কিন্তু তাঁহাকে শুধু আক্রমণ করারও কোন সার্থকতা দেখিতেছি না। তাঁহার মতের সহিত আমাদের মত যেখানে মিলে না, সেখানে তাঁহার মতের সমালোচনা অবশ্যই যথাসাধ্য করি ও করিব। কিন্তু তিনি যেমন সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদকে ঋজু অব্যর্থ পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, আমরা তাঁহার জায়গায় ঋজু ও অব্যর্থ অন্য কোন উপায় নির্দ্দেশ করিতে আপাতত অসমর্থ।

আমাদের ধারণা এইরূপ, যে, এদেশে দারিদ্র্যের আশু প্রতিকার না হইলে, অন্য কোন কোন দেশে যেমন রক্তারক্তি ও বিপ্লব হইয়াছে, আমাদের দেশের দরিদ্র লোকেরা যতই দুর্ব্বল ও অসহায় হউক, তাহাদের দ্বারাও তেমনি রক্তারক্তি ও বিপ্লব হইতে পারে। দুর্ব্বল ও অসহায় লোকেরা শক্তিহীন বলিয়া অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য সহকারে তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। অন্য যে-যে দেশে রক্তারক্তি ও বিপ্লব হইয়াছে, তথাকার অভিজাত ও সঙ্গতিপন্ন লোকেরাও তথাকার দরিদ্র লোকদিগকে এই প্রকার দুর্ব্বল ও অসহায় মনে করিত। অতএব, ন্যায়পরায়ণতা, মানবিকতা ও দয়াদাক্ষিণ্যের দিক হইতে এবং অভিজাত ও সঙ্গতিপন্ন লোকদের নিজ নিজ নিরাপত্তার দিক হইতেও, এদেশের দরিদ্র লোকদের দুঃখদুর্দ্দশার উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে।

দারিদ্র্যই যে নিম্নশ্রেণীর লোকদের চরম দুর্গতি তাহা নহে। তাহারা যে মানুষের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, সর্ব্বদা ভয়ে সঙ্কোচে তাহাদের মাথাটা ঘাড়টা নীচু হইয়াই আছে, শিরদাঁড়াটা বাঁকিয়াই আছে, ইহা দারিদ্র্য অপেক্ষাও অধম অবস্থা। অতএব, আদর্শ গোয়ালের গোরুর মত তাহাদিগকে সুপুষ্ট করিলেই হইবে না, তাহাদিগকে মানুষ হইতে শিখাইতে হইবে, মানুষ হইতে দিতে হইবে।

—

শ্রেণীগত ও ধর্ম্মসম্প্রদায়গত বিরোধ

কয়েক বৎসর হইতেই পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বলিয়া

আসিতেছেন, যে, যদি ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিসংবাদ ও বিরোধ দূর করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার উপায়, মানুষকে ধর্ম্ম অনুসারে বিভক্ত ও দলবদ্ধ না করিয়া, তাহাদের বৃত্তি অনুসারে, তাহাদের উপার্জ্জনের উপায় অনুসারে তাহাদিগকে বিভক্ত ও দলবদ্ধ করা। তাহা হইলে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, এখানকার হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের পরিবর্ত্তে তখন বিরোধ হইবে শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে, কৃষক ও জমীদারের মধ্যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ও নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর মধ্যে। সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান শ্রমিক হিন্দু-মুসলমান ধনিকের বিরুদ্ধে, হিন্দু-মুসলমান খাতক হিন্দু-মুসলমান মহাজনের বিরুদ্ধে, হিন্দু-মুসলমান রায়ৎ হিন্দু-মুসলমান জমীদারের বিরুদ্ধে এদেশে সমভাবে দাঁড়াইবে কিনা সন্দেহ, যদিও মুসলমান খাতকেরা যে হিন্দু মহাজনের সম্পত্তি লুণ্ঠন ও তাহার প্রাণবধ করিয়াছে, মুসলমান রায়তেরা যে হিন্দু জমীদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত এদেশে আছে বটে; কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যে, হিন্দু-মুসলমান মজুর এক দিকে ও হিন্দু-মুসলমান ধনিক অন্য দিকে, হিন্দু-মুসলমান কৃষক এক দিকে ও হিন্দু-মুসলমান জমীদার অন্য দিকে, এইরূপ বিবাদ ও শ্রেণীসংগ্রাম হয়, তাহা হইলে যুযুৎসু ও যুদ্ধনিরত দলগুলিতে এক এক পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের লোক থাকিবে বটে; কিন্তু হিংসাদ্বেষ বিরোধ, সংগ্রাম, অশান্তি ত দূর হইবে না, সেগুলা চলিতেই থাকিবে। সুতরাং এখন আমাদের সাম্প্রদায়িক সংগ্রামের নরকে বাসের পরিবর্ত্তে তখন আমাদের শ্রেণীগত যুদ্ধের নরকে বাস ঘটিবে। এই শেষোক্ত নরককে স্বর্গ বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ আছে কি? সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ও সংগ্রামে পৃথিবীর নানা দেশে রক্তপাত হত্যা লুণ্ঠন ইত্যাদি হইয়াছে ও হইয়া থাকে বটে; কিন্তু শ্রেণীগত সংঘর্ষ ও সংগ্রামে তাহা হয় নাই ও হইতেছে না কি? সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে কোন দেশে—ধরুন ভারতবর্ষে—হিন্দু বা মুসলমান তাহাদের বিদ্বেষভাজন সম্প্রদায়কে নির্ম্মূল বা নির্বাসিত করে নাই; কিন্তু রাশিয়ায় শ্রেণীগত যুদ্ধে অভিজাতশ্রেণী নির্ম্মূল বা নির্বাসিত হইয়াছে, মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। অন্য কোন কোন দেশেও এইরূপ অবস্থার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রত্যেক ধর্ম্মেই পরধর্ম্মসহিষ্ণুতার উপদেশ আছে, এবং তাহা পালন করিবার লোক আছে। কিন্তু শ্রেণীযুদ্ধের (ক্লাস-ওয়ারের) উপদেষ্টারা এরূপ সহিষ্ণুতা ও শান্তি শিক্ষা দেন কি?

আগুনের দ্বারা আগুন নিবান যায় না—এক প্রকার যুদ্ধের পরিবর্ত্তে অন্য প্রকার যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে, কিন্তু যুদ্ধ জিনিষটার অস্তিত্ব যুদ্ধের দ্বারা বিলুপ্ত হইতে পারে না।

অতএব শ্রেণীযুদ্ধ সাম্প্রদায়িক যুদ্ধের প্রতিকার নহে।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও জবাহরলাল

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু অনেক বার বলিয়াছেন, তিনি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিপক্ষে, তাহার একটা কারণ উহা গণতন্ত্রের বিপরীত। তিনি ইহাও বলিয়াছেন, যে, কংগ্রেস যেরূপ কথাসমষ্টি দ্বারা উহার সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার উপর ঐ মত প্রকাশ করিবার ভার পড়িলে তিনি সেরূপ শব্দযোজনা দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতেন না—অন্য প্রকারে করিতেন, অথচ তিনি একথাও বলিয়াছেন, যে, ও বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত মত ও কংগ্রেসের মত এক। আমাদের তাহা মনে হয় না। কেন-না, তিনি পরিষ্কার ভাষায় উহার স্বীয় বিরোধিতা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু কংগ্রেস উহাকে না-গ্রহণ না-বর্জ্জন রূপ নিরপেক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন।

পণ্ডিত জবাহরলাল বলিয়াছেন, যাঁহারা বাঁটোয়ারাটা রহিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিরোধিতা করিতেছেন, তাঁহারা ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের বিদ্যমানতা ধরিয়া লইয়া চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু তিনি স্বাধীন ভারতের অবস্থা মনে রাখিয়া উহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। ইহা তাঁহার ভ্রম। আমরা যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাই না, এমন নয়। আমরা যে স্বাধীনতা চাই, তাহা তাঁহার সহিত তর্ক করিবার নিমিত্ত এখন বলিতেছি না, অনেক বৎসর হইতেই লিখিতেছি বলিতেছি, অথচ আমরা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটার সম্পূর্ণ বিরোধী ও তাহার উচ্ছেদ চাই। কেন চাই, তাহা বিস্তারিত ভাবে বহুবার বলিয়াছি। এখন কেবল একটা কারণের উল্লেখ করিব। স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে ভারতীয় মহাজাতির ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে একতা আবশ্যক —একান্ত আবশ্যক কি না সে তর্কে প্রবৃত্ত হইব না, কেবল ইহাই বলিব, যে, একতা থাকিলে স্বাধীনতালাভ যত কঠিন, একতা না-থাকিলে তাহা লাভ তদপেক্ষা অনেক বেশী কঠিন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটা থাকিতে ঐ একতা জন্মিতে পারে না। এবং ইহা বলিলেও অন্যায় হইবে না, যে, ব্রিটেনের মন্ত্রীদের অনুমোদিত এই বাঁটোয়ারার অনুযায়ী আইন একতা স্থাপনের প্রবল বাধা হইবে জানিয়া ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট ঐ আইন পাস করিয়াছে। বাঁটোয়ারাটা ভারতবর্ষে স্বরাজ স্থাপনে বাধা জন্মাইয়াছে এবং কায়েম থাকিলে ভবিষ্যতে আরও বেশী বাধা জন্মাইবে বলিয়া আমরা উহার বিরোধী।

পণ্ডিত জবাহরলাল বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে তখন বাঁটোয়ারাটা আপনা-আপনিই লোপ পাইবে। স্বাধীন হইলে ত! বাঁটোয়ারাটা যে স্বাধীনতালাভের অন্তরায়, ভারতবর্ষকে স্বাধীন হইতে দিবে না। তদ্ভিন্ন ইহাও বিবেচ্য, যে, বাঁটোয়ারাটার দ্বারা যাহাদের স্বার্থসিদ্ধি হইতেছে,

তাহারা বলিবে, যে, কোন-না কোন আকারে বাঁটোয়ারাটা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অবস্থাতেও বিদ্যমান থাকিলে তবে তাহারা দেশের স্বাধীনতা চায়।

আর পণ্ডিতজী যে বলিতেছেন, দেশ স্বাধীন হইলে বাঁটোয়ারাটা আপনা-আপনিই যাইবে—কি প্রকারে আপনা-আপনি যাইবে তাহা আমরা বুঝিতে না-পারিলেও, এই তর্কের উত্তরে বলি, দেশ স্বাধীন হইলে আরও অনেক অবাঞ্ছনীয় জিনিষ আপনা-আপনি যাইতে পারে; যেমন বিনা-বিচারে মানুষের স্বাধীনতা লোপ, বিনাবিচারে সংবাদপত্রের ও ছাপাখানার অস্তিত্ব লোপ ইত্যাদি। তাহা হইলে এই সব দমনমূলক ব্যবস্থা রহিত করিবার নিমিত্ত কংগ্রেসওয়ালা ও অন্য স্বাজাতিকদিগের একটি সমিতি গড়িবার চেষ্টা তিনি কেন করিতেছেন? স্বাধীনতা যখন আসিবে, তখন সব ঠিক্ হইয়া যাইবে, আমরা সবাই এই স্বপ্ন দেখিলেই ত চলে।

পণ্ডিতজী আরও বলিয়াছেন, বাঁটোয়ারাটার বিরোধিতা দ্বারা উহার উচ্ছেদ সাধন করা যাইবে না, উভয় পক্ষের মধ্যে বুঝাপড়া ও রফার দ্বারা করা যাইবে। কংগ্রেস এই উপায় অবলম্বন করিয়াছেন কি? করিয়া থাকিলে কবে করিয়াছেন ও কি ফল হইয়াছে? বাঁটোয়ারভক্ত এক জন মুসলমানকেও কংগ্রেস বাঁটোয়ারা বিরোধী করিতে পারিয়াছেন কি? যদি কংগ্রেস উক্ত উপায় অবলম্বন করেন নাই, তাহা হইলে কেন করেন নাই?

একটা রফার জন্য পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় যেরূপ ধৈর্য্যের সহিত অনেক দিন চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর কেহ তাহা করেন নাই—করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। এই পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ই নেতাদের মধ্যে বাঁটোয়ারাটার সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বিরোধী। রফার পথটা পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর নূতন আবিষ্কার নহে। উহা পরীক্ষিত হইয়াছে, সিদ্ধিলাভ হয় নাই। নিলামে ব্রিটিশ ডাকটা সর্ব্বোচ্চ হওয়ায় মালবীয় মহাশয় বিফলপ্রযত্ন হইয়াছেন।

আবিসীনিয়ায় ইটালীর জয়ের কারণ

মুসোলিনির দৃপ্ত দাম্ভিকতাপূর্ণ উক্তি, ইটালী তলোয়ারের দ্বারা আবিসীনিয়া জয় করিয়াছে। ইহা সত্য নহে। বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার না করিলে ইটালী জিতিতে পারিত না। আবিসীনিয়ার যোদ্ধারা সেকেলে বন্দুক তীরধনুক ও অন্যবিধ অস্ত্রশস্ত্র লইয়াও ইটালীর পক্ষের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রশালী সৈন্যদিগকে অনেক বার হটাইয়া দিয়াছিল। ইটালীর দ্বিতীয় প্রধান অস্ত্র ঘুষ। ঘুষ পাইয়া অনেক সোমালী ও আবিসীনিয় আবিসীনিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। ইটালীর জয়লাভের আর একটা কারণ, আবিসীনিয়দের মধ্যে গৃহবিবাদ।

ঘুষ দ্বারা জয়লাভ প্রসঙ্গে একটি আখ্যান মনে পড়িয়া গেল। পুনার বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ও প্রত্নতাত্ত্বিক সর্ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর (যাহার স্মৃতিরক্ষার্থ প্রতিষ্ঠিত ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইন্সটিটিউট হইতে মহাভারতের একটি প্রসিদ্ধ সংস্করণ বাহির হইতেছে) এবং প্রসিদ্ধ বিদ্বান, ঐতিহাসিক ও ঔষধার্থ ব্যবহৃত ভারতীয় উদ্ভিদসমূহের বৃত্তান্তপুস্তকের প্রধান প্রণেতা মেজর বামনদাস বসুর সহিত পুনায় একদিন কথোপকথন উপলক্ষে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে মহারাষ্ট্রীয়দের কোন একটা পরাজয় সম্বন্ধে বসু মহাশয় বলেন, যে, এই পরাজয়টা কোম্পানী ঘুষ দিয়া ঘটাইয়াছিল। তাহাতে বৃদ্ধ ভাণ্ডারকর মহাশয় চটিয়া বলিলেন, "তোমরা (অর্থাৎ ভারতীয়েরা) ত কোম্পানীর পক্ষীয় কোন সেনাপতিকে ঘুষ লওয়াইতে পার নাই?" তাঁহার ইহা বলিবার অভিপ্রায় এই ছিল, যে, যে-দেশের প্রধান লোকদিগকে শত্রুপক্ষের ঘুষ লওয়ান যায়, তাহারা ত হারিবেই, এবং যে-পক্ষের প্রধান লোকেরা শত্রুপক্ষের ঘুষ লয় না তাহাদের শক্তিমত্তার তাহা একটা কারণ।

ফ্রান্সে নারীর অধিকার

ফ্রান্সে সম্প্রতি নির্ব্বাচনে জয়ী যে সমাজতন্ত্রবাদী দলের মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হইয়াছে, তাহাতে তিনটি মহিলাকে লওয়া হইয়াছে, অথচ ফরাসী মহিলাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার নাই, এবং সেই জন্য তাঁহারা সম্প্রতি বিক্ষোভ প্রকাশও করিয়াছেন।

আমাদের দেশে, একপ্রকার বিনা সংগ্রামেই, মহিলারা ভোটাধিকার পাইয়াছেন। এ বিষয়ে ফ্রান্সের নারীদের দুঃখ তাঁহাদের নাই। তবে, কংগ্রেসে ওয়ার্কিং কমিটিতে এক জন মহিলাকেও লওয়া হয় নাই। তাঁহারা এখন নজীর দেখাইয়া বলিতে পারেন, ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিক নেতারা তিন জন মহিলাকে মন্ত্রী করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক নেতা পণ্ডিত জবাহরলাল এক জন মহিলাকেও কংগ্রেস মন্ত্রী-সভার সদস্য মনোনয়ন করেন নাই।

ভারত-গবন্মেণ্টের রাজনৈতিক বিভাগ

১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ভারত-গবন্মেণ্টের রাজনৈতিক বিভাগ ইংলণ্ডেশ্বরের খাস বিভাগ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহা ভারত-গবন্মেণ্টের হাত হইতে ভারতবর্ষে ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধিরূপী বড়লাটের হাতে যাইবে। এই পরিবর্ত্তনের অর্থ বুঝা আবশ্যক। যে বিভাগটি ভারত-গবন্মেণ্টের হাতে থাকে, তাহার সব কাজের আলোচনা স-পারিষদ গবর্ণর-জেনার‍্যাল করেন। সেই আলোচনা মন্ত্রণায় গবর্ণর-জেনার‍্যালের শাসন

পরিষদের (executive councilএর) সব সদস্যেরা (তাঁহারা নূতন আইন প্রবর্ত্তনের পর হইতে মন্ত্রী নামে অভিহিত হইবেন) যোগ দিতে ও ভোট দিতে পারেন ও দেন। সভ্যদের মধ্যে কয়েক জন ভারতীয় থাকেন ও পরেও থাকিবেন। রাজনৈতিক বিভাগটি অতঃপর এখন ইংলণ্ড-রাজপ্রতিনিধির খাস বিভাগ হইবে, তখন ভারতীয় সদস্য বা মন্ত্রীরা ঐ বিভাগের কিছুই জানিতে পারিবেন না। সুতরাং পরিবর্ত্তনটার দ্বারা ভারতীয়দের মর্য্যাদা ও ক্ষমতা না-বাড়িয়া কমিল।

—

কলিকাতার পানীয় জল সমস্যা

গঙ্গার জল সমুদ্র হইতে কতকটা দূর পর্য্যন্ত ফেব্রুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত কয়েক মা. নোনা হয়, এবং বর্ষা না-নামা পর্য্যন্ত উহার লবণাক্ততা দূর হয় না। ইহাতে একটি সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। লবণাক্ততা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। আগে সমুদ্র হইতে যত দূর পর্য্যন্ত জল নোনা হইত না, এখন তাহা হইতেছে। আগে যখন কলিকাতার জন্য জল তুলিবার স্থান পলতায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তখন সমুদ্রের নোনা জলের দ্বারা তথাকার গঙ্গার জল লবণাক্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল না, কিন্তু এখন আশঙ্কা হইয়াছে। তাহার কারণ, আগে গঙ্গার যত পরিমাণ জল আগ্রাপ্রদেশ ও বিহার অতিক্রম করিয়া বঙ্গের গঙ্গায় আসিয়া পড়িত, এখন উপরের দিকে কৃত্রিম খাল হওয়ায় তত জল আসে না, এবং গঙ্গাভাগীরথীর জলবাহী পথগুলি ক্রমশঃ ভরাট ও শুষ্ক হওয়ায় জলধারা ঠিকমত প্রবাহিত হয় না; সেই জন্য সাগরের জল আগেকার চেয়ে অনেক উপর পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসে।

এখন লবণাক্ততার অসুবিধা এড়াইবার নিমিত্ত জোয়ারের সময় জল পম্প না-করিয়া ভাঁটার সময় করা হয়। তাহার জন্য যন্ত্রপাতি বাড়াইতে হইবে। তাহাতেও যথেষ্ট ফললাভ না হইলে কঠিনতর উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর প্রধান এঞ্জিনীয়ার ডাক্তার বীরেন্দ্রনাথ দে এইরূপ বলিয়াছেন।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেতাবী ও কার্য্যগত সামরিক শিক্ষার প্রস্তাব সেনেট কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। আমরা যুদ্ধ পছন্দ করি না। পৃথিবী হইতে যুদ্ধ বিলুপ্ত হইলে সুখী হইব। কিন্তু কখন্ যে তাহা হইবে, কল্পনা করিতে পারিতেছি না। সমুদয় শক্তিশালী স্বাধীন জাতিই এখন যুদ্ধ করে, এবং সম্প্রতি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতও হইতেছে। ভারতবর্ষ শক্তিশালী নয়, স্বাধীনও নয়, অথচ ভারতবর্ষকে নিজের জন্য বা পরের জন্য, কিংবা আত্মপর উভয়েরই জন্য যুদ্ধ করিতে হইতে পারে। আত্মরক্ষার জন্যও মানবসভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় যুদ্ধ করিতে জানা আবশ্যক।

যুদ্ধ যদি কখনও পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে তৎপূর্ব্বে কোন বিশেষ শক্তিশালী জাতিকে, সাধারণত এ পর্য্যন্ত যেরূপ অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্যও যুদ্ধের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে, তেমন অবস্থাতেও যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিতে হইবে। তাহাতে বিপৎসম্ভাবনা আছে। কিন্তু পৃথিবীতে শান্তির প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সেই শক্তিশালী জাতিকে সেরূপ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে।

কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন শক্তিশালী দেশ নহে। সুতরাং সঙ্কট অবস্থায় আমাদের দেশ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলে ও যুদ্ধে বিরত থাকিলে, জগদ্বাসী আমাদের শান্তিপ্রিয়তা তাহার কারণ মনে না-করিয়া আমাদের অসামর্থ্য ও ভীরুতাই তাহার কারণ মনে করিবে। অন্য দিকে কোন বিশেষ শক্তিশালী স্বাধীন জাতি সঙ্কট অবস্থাতেও যুদ্ধ না করিলে, লোকে ভাবিবে তাহার সামর্থ্য ও সাহস থাকা সত্ত্বেও সে যুদ্ধ করিল না। তদ্দ্বারা জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার বলবিধান করা হইবে।

এবম্বিধ নানা কারণে, আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হউক বা না-হউক যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য আমাদিগকে লাভ করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন, কাহারও যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ও প্রয়োজন না-থাকিলেও সামরিক শিক্ষা দ্বারা স্বাস্থ্য ভাল হয়, দৈহিক বল বৃদ্ধি পায়, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও ক্ষিপ্রকারিতা জন্মে, এবং প্রয়োজনমত কোন একটা কাজ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে অবিলম্বে উপনীত হইবার অভ্যাস লাভ করিতে পারা যায়।

সেই জন্য মনে করি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামরিক শিক্ষা দিবার সঙ্কল্প সমর্থনযোগ্য।

—

বাংলা বানান

বাংলা ভাষায় প্রচলিত সংস্কৃত শব্দসমূহের বানান সংস্কৃতের মত। সুতরাং সে-বিষয়ে কিছু করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু সংস্কৃত ছাড়া বাংলা ভাষায় প্রচলিত অন্য যে-সব শব্দ প্রচলিত আছে—যেমন সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন 'তদ্ভব' শব্দ, 'দেশজ' শব্দ, বিদেশী নানা ভাষা হইতে গৃহীত বহু শব্দ- তাহাদের অনেকগুলির বানান নানা জনে নানা রকম করেন। কিন্তু সেগুলির প্রত্যেকটির বানান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এই কাজটি করিবার নিমিত্ত কলিকাতা বিশ্ববিদালয় একটি কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটি অনেক বাংলা-লেখকের মত চাহিয়াছিলেন ও পাইয়াছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথের সাহায্য পাইয়াছিলেন। কমিটির সভ্যেরা তাঁহাদের সিদ্ধান্তসমূহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা সকল বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। অন্যেরাও

প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহাদের অধিকাংশের মতে সায় দিতে অসমর্থ হইতে পারেন। কিন্তু একটি প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশংসার্হ।

ইংরেজী ভাষার কতকগুলি শব্দ আমেরিকানরা এক প্রকার ও ইংরেজরা অন্য প্রকার বানান করে, কিন্তু যাহাদের মাতৃভাষা ইংরেজী তাহারা সকলেই অধিকাংশ ইংরেজী শব্দের বানান একই রকম করে। সেইরূপ, বাংলায় শেষ পর্য্যন্ত কতকগুলি শব্দের বানানে মতভেদ থাকিয়া গেলেও অধিকাংশ শব্দের বানান একই রকম হওয়া উচিত ও তাহা হইবে।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পুনর্ব্বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মনোনীত হইয়াছেন। তাঁহার আমলে বিশ্ববিদ্যালয় যে-কয়টি কাজে হাত দিয়াছেন, তাহা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার জায়গায় আর কাহাকেও এবার ভাইস-চ্যান্সেলার করিলে কাজের সুবিধা হইত না। অতএব, গবর্নর-চ্যান্সেলার সাম্প্রদায়িক প্রভাবে অভিভূত না হইয়া ভাল করিয়াছেন।

—

রায়তদের অবস্থা

ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেরই রায়তদের আর্থিক অবস্থা যেমনটি হওয়া উচিত তেমন নয়। তাহারা ঋণমুক্ত ও উৎপীড়নমুক্ত নয়। বাংলা দেশে জমীদারী প্রথার উচ্ছেদ-সাধনার্থ আন্দোলন কয়েক বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশেও এই আন্দোলন নূতন নয়। ইহা কিষান (কৃষাণ) প্রচেষ্টা নামে পরিচিত। সম্প্রতি বাবু পুরুষোত্তমদাস টাণ্ডন ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু কংগ্রেস নেতাদ্বয়ের বক্তৃতাদি দ্বারা এই আন্দোলন প্রবলতর হইয়াছে।

জমীদারী প্রথা যে-যে প্রদেশে প্রচলিত, তথাকার প্রত্যেক জমীদার অত্যাচারী ও দুষ্কর্ম্মান্বিত না হইলেও, রায়তদের অবস্থা যে সাধারণতঃ ভাল নয়, তাহারা যে ঋণজালে জড়িত, এবং অনেক স্থলে তাহাদের উপর যে অত্যাচার হয়, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ইহাও স্বীকার করিতে হবে, যে, তাহারা অনেকে অনেক জমীদারের নিকট হইতে মানুষের মত ব্যবহার পাইতে ও আপনাদিগকে মানুষের মত মানুষ বলিয়া গণ্য করিতে অভ্যস্ত নহে। এই সমস্ত বিষয়েই তাহাদের অবস্থার শীঘ্র উন্নতি হওয়া আবশ্যক। কিন্তু প্রথম প্রশ্ন এই, সেরূপ উন্নতি কি জমীদারী প্রথা রাখিয়া করা অসম্ভব? এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন, যে-সব প্রদেশে জমীদারী প্রথা নাই, তথাকার রায়তদের অবস্থা মোটের উপর কি জমীদারদে[র] প্রজাদের চেয়ে ভাল? এই দুটি প্রশ্নের উত্তর দিবার ম[ত] জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমাদের নাই। এরূপ প্রশ্ন করিবার কা[রণ] এই, যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ নহে, ইহার গবন্মেণ্ট জাতি[য়] গবন্মেণ্ট নহে, এখানে জমীদারেরা ভূস্বামী না হ[ইয়া] গবন্মেণ্ট ভূস্বামী হইলে তাহার অর্থ ইহা হইবে না, [যে,] আমাদের জাতিটা ভূস্বামী হইল—বস্তুত তাহার অর্থ এ[ই] হইবে, যে, আমাদের জাতির কতকগুলি লোক জমীদার [না] হইয়া একটি বিদেশী জাতি এবং তাহাদের রাজা ও পার্লামেণ্ট ভূস্বামী হইবে। তাহাও আমরা, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়া[র] পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, মন্দের ভাল বলিব, যদি জমীদারের রায়তদে[র] চেয়ে গবর্ন্মেণ্টের রায়তদের অবস্থা মোটের উপর ভাল হ[য়]। কিন্তু জমীদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইলে যাহাদে[র] যেরূপ স্বত্ব লোপ পাইবে তাহাদের ক্ষতিপূরণার্থ যথাযোগ্য অ[র্থ] তাহাদিগকে দিতে হইবে।

—

প্যালেষ্টাইনে উপদ্রব

প্যালেষ্টাইনে আরবেরা অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে, দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং তাহাদের পক্ষের লোকদের, ইহুদী অধিবাসীদের, এবং তথাকার ইংরেজ গবন্মেণ্টের লোকদের মধ্যে অনেক হতাহত হইয়াছে। ইহাতে আমরা দুঃখিত। আরবে[রা] মুসলমান। ভারতবর্ষের মুসলমানেরা আরবদের উপর অন্যা[য়] ব্যবহারের ফলে এইরূপ অশান্তি ঘটিয়াছে বিশ্বাস করি[য়া] উত্তেজিত হইয়াছে। আরবদের উপর অন্যায় ব্যবহার হ[ইয়া] থাকিবে। তথাকার ইংরেজ গবন্মেণ্টের কোন স্বার্থসিদ্ধি[র] অভিপ্রায়ও এই অশান্তির মূলীভূত কারণ হইতে পারে। কি[ন্তু] সমস্ত খবর ঠিক না জানিয়া, ইহুদীরা অন্যায় করিয়াছে কি[না] না-জানিয়া, আমরা ইহুদীদিগকে দোষ দিতে ও তাহাদে[র] বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে পারি না। এই বিষয়ে কংগ্রেসের কোনও পক্ষ অবলম্বন করারও সমর্থন করি না। ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক নানা ব্যাপার লইয়া আমরা ব্যতিব্যস্ত। বাহিরের সাম্প্রদায়িক সমস্যায় হস্তক্ষেপ আমাদের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হইবে না। কংগ্রেস [য]দি ঠিক অবস্থা জানিয়া কিছু করিতে চান, তাহা হই[লে] সম্ভব হইলে প্যালেষ্টাইনে ধীরপ্রকৃতি নিরপেক্ষ বিদে[শী] লোক পাঠাইয়া আগে সত্য নির্দ্ধারণ করুন। এদেশে অনেক সময়েই সত্য সংবাদ পৌঁছে না—বিশেষতঃ যে-সব বিষয়ে[র] সহিত ইংরেজদের স্বার্থ জড়িত, সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে।

—

সংস্কার ও বিপ্লব

আমরা 'প্রবাসী'র আগেকার কোন কোন সংখ্যায়, এ[বং] বর্ত্তমান সংখ্যাতেও, লিখিয়াছি, যে, দেশের দীনদুঃ[খী]

[illegible]র অবস্থার উন্নতি যথাসম্ভব সত্বর না করিলে অন্য কোন [illegible] দেশের মত এদেশেও বিপ্লব ঘটিতে পারে। কিন্তু বিপ্লব আমরা চাই না, সংস্কারই চাই। যাহারা সংস্কার চায় আজকাল তাহাদিগকে রিফর্মিষ্ট বলিয়া স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ করিবার ফ্যাশন চলিত হইতেছে, তথাপি বলি, সংস্কার যথোপযুক্ত ও আমূল হইলে তাহা বিপ্লব হইতে শ্রেষ্ঠ। সংস্কার তর্কযুক্তির পথ অবলম্বন করিয়া ধীরতার সহিত করা হয়। বিপ্লবে যে উত্তেজনা, যে হিংসাদ্বেষ উস্কাইয়া তুলিয়া তাহা ঘটান হয়, সংস্কারে তাহা নাই। সংস্কারবাদী অতীতে ও বর্তমানে যাহা ভাল তাহা রক্ষা করিতে প্রয়াস পান, বিপ্লব অতীত ও বর্তমানের ভাল মন্দ দুই-ই বিনষ্ট করিতে পারে ও অনেক সময়েই করে।

কিন্তু বিপ্লব আমরা ভাল না বাসিলেও, আমরা সংস্কারপ্রয়াসী হইলেও, ইহা বিশ্বাস করি এবং আবার বলিতেছি, যে, যথাযোগ্য সংস্কার যথাসময়ে না হইলে বিপ্লব আসিবে—আমাদের ভাল লাগা না-লাগার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবে না।

চীন জাপানে আবার যুদ্ধ

চীন জাপানে আবার যুদ্ধ বলিলে মনে হইতে পারে, যে, আগে যুদ্ধ হইয়া থামিয়া গিয়াছিল, এখন আবার নূতন করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু বস্তুত বহু বৎসর ধরিয়া জাপান চীনকে হয় জাপানসাম্রাজ্যভুক্ত নয় সম্পূর্ণ নিজের ক্ষমতার অধীন করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, এবং তাহার জন্য চীনের সহিত যুদ্ধও মধ্যে মধ্যে করিয়াছে। এখন সেই সবিরাম যুদ্ধের আর এক পালা আরম্ভ হইবার উপক্রম হইয়াছে। আজ ২৭শে জ্যৈষ্ঠ কলিকাতার বাহির হইতে এই কথা লিখিতেছি। আষাঢ়ের প্রবাসী যখন পাঠকদের হাতে পড়িবে তখন তাঁহারা ঘটনাচক্র কোন্ দিকে কত দূর অগ্রসর হইয়াছে জানিতে পারিবেন।

প্রাচ্য মহাদেশের আসন্ন এই যুদ্ধে ভারতবর্ষ কোনও পক্ষে নাই, ভারতবর্ষের শাসনকর্তা ব্রিটেনও আপাতত কোন পক্ষে নাই। কিন্তু তথাপি ইহা ভারতীয়দের উদ্বেগ জন্মাইবে দুই কারণে। যদি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে ভারতবর্ষের ইহার সহিত জড়িত হইবার কোন সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলেও ভারতীয়েরা ও চৈনিকরা উভয়েই মানুষ বলিয়া চীনের দুঃখে ভারতবর্ষের দুঃখ বোধ করিবার কথা। কিন্তু ব্রিটেনের সাম্রাজ্য সব মহাদেশে বিস্তৃত বলিয়া তাহার এই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা আছে, এবং সেরূপ অবস্থা ঘটিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ভারতবর্ষকেও জড়াইয়া পড়িতে হইবে। কংগ্রেস বলিতে পারেন, জাতীয় উদারনৈতিক সংঘ বলিতে পারেন, কোন সম্প্রদায়ের মহাসভা ও সংঘগুলি বলিতে পারেন, ভারতবর্ষের সৈন্য যাহা তাহার নিজের যুদ্ধ নহে এরূপ যুদ্ধে দেশের বাহিরে পাঠান অনুচিত এবং তজ্জন্য ভারতবর্ষের টাকা খরচ করা অনুচিত। কিন্তু ব্রিটেনকে ভারতীয়দের কথা শুনিতে বাধ্য করিবার মত ক্ষমতা ভারতীয়দের নাই। সুতরাং ভারতীয়দের যাহা বলা উচিত তাহা তাহারা বলিবে। ইহার বেশী কিছু করিবার বা করাইবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। এই শক্তিহীনতার অবস্থা দুঃখকর ও লজ্জাকর।

ইটালীর যুদ্ধায়োজন

ইটালী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহার নানা প্রমাণ রয়টার টেলিগ্রাফ করিতেছে। হয়ত তাহা অষ্ট্রিয়ার আসন্ন কোন রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের সহিত—সাধারণতন্ত্রের পরিবর্ত্তে সেখানে আগেকার রাজবংশের কাহাকেও সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টার সহিত সংপৃক্ত, এরূপ আভাস পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ইটালীর অন্য প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে।

ব্রিটেনের যুদ্ধায়োজন

ব্রিটেন জলে স্থলে আকাশে যুদ্ধের আয়োজন বাড়াইতেছে। কোথায় কি জন্য এ যুদ্ধ হইবে? ইটালী আবিসীনিয়া দখল করায় ভূমধ্যসাগরে এবং মিশর ও সুদানের নিকটে তাহার শক্তি বাড়িয়াছে। ইটালীর এই শক্তি-বৃদ্ধিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন হইতে পারে। ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর ও সুয়েজ খাল অতিক্রম করিয়া ব্রিটেনকে তাহার সাম্রাজ্যভুক্ত ভারতে আসিতে হয় ও কোন কোন ব্রিটিশ উপনিবেশে যাইতে হয়। যাতায়াতের পথ নিষ্কণ্টক থাকা চাই। ইটালী তাহা কণ্টকিত করিতে পারে বা করিয়াছে বলিয়া ব্রিটেন কি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে? ইটালী যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে তাহা কি এই রূপ কোন সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া?

বাঘে ও মহিষে লড়াই হইলে উলুখড়ের যে অবস্থা হয় আমাদের অবস্থা তার চেয়ে দুঃখকর ও লজ্জাকর। কেন-না, আমরা, অন্তত বাহিরে, মনুষ্যাকৃতি ; উলু তাহা নহে।

আব্বাস তৈয়বজী

অশীতিপর বৃদ্ধ আব্বাস তৈয়বজী মহাশয়ের মৃত্যুর সংবাদ কাগজে বাহির হইয়াছে। সাবেক আমলের কংগ্রেসের সহিত তাঁহার যোগ ছিল, আবার একালের গান্ধীপ্রভাবিত কংগ্রেসের সহিতও তাঁহার যোগ ছিল। তিনি পূর্ব্বে বড়োদা রাজ্যের প্রধান জজ ছিলেন, এবং মনস্বী ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। বদরুদ্দিন তৈয়বজী ও তৈয়বজী নামধারী

আরও কাহারও কাহারও মত তাঁহার প্রকৃতি সংকীর্ণ ও উগ্র সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত ছিল।

—

অসবর্ণ বিবাহ বিল

ডক্টর সর্ হরি সিং গৌড় যে হিন্দু অসবর্ণ বিবাহ আইন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাস করাইয়াছেন, তদনুসারে হিন্দু যে-কোন বর্ণের ও উপবর্ণের পাত্রপাত্রীর সহিত অপর যে-কোন হিন্দু বর্ণের ও উপবর্ণের পাত্রীপাত্রের আইনসঙ্গত বিবাহ হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ বিবাহ যিনি করেন, তিনি আর একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত থাকিতে পারেন না। একান্নবর্ত্তিতা ভঙ্গ করিতে হইবে না, ইচ্ছা করিলে অসবর্ণ বিবাহ করিয়াও বিবাহিত পুরুষ যাহাতে একান্নবর্ত্তী থাকিতে পারিবে, এরূপ আইন করিবার নিমিত্ত পরলোকগত বিঠলভাই পটেল চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মুসাবিদা করা বিলটি কাশীর সুবিদ্বান শাস্ত্রজ্ঞ হিন্দু ডক্টর ভগবানদাস আবার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছেন। তাহার তিনটি ধারার মধ্যে প্রধান ধারাটি এই :—

"No marriage among Hindus shall be invalid by reason that the parties thereto do not belong to the same caste, any custom or any interpretation of Hindu Law to the contrary notwithstanding."

"হিন্দুদের মধ্যে কোন বিবাহ এই কারণে অসিদ্ধ হইবে না যে তাহার পাত্রপাত্রী এক বর্ণের (casteএর বা জাতির) নহে—তাহা কোন লোকাচার দেশাচার বা হিন্দু আইনের কোন ব্যাখ্যার বিপরীত হইলেও তৎসত্ত্বেও অসিদ্ধ হইবে না।"

হিন্দুদের মধ্যে যাহারা বিবাহ সম্বন্ধে লোকাচার ও দেশাচারের একান্ত অনুরাগী ও পক্ষপাতী এবং হিন্দু আইনের অসবর্ণবিবাহবিরোধী ব্যাখ্যার সমর্থক, তাহারা এই বিল পছন্দ করিবেন না। সমাজসংস্কারকদের ইহার বিরুদ্ধে কেবল একটি আপত্তি আছে। ইহা একপত্নীক বিবাহকে আবশ্যিক করে নাই। এক বা একাধিক স্ত্রী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেহ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের একাধিক নারীকে এরূপ আইন অনুসারে বিবাহ করিতে পারিবে। তাহা বাঞ্ছনীয় নহে।

—

অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে আদালতের রায়

বোম্বাই ও মান্দ্রাজ হাইকোর্টের মতে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহও হিন্দুআইনসম্মত। অর্থাৎ উচ্চ বর্ণের কোন পুরুষ নিম্ন বর্ণের কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিলেও তাহা আইনসঙ্গত। ডক্টর ভগবানদাসের বিল আইনে পরিণত হইলে প্রতিলোম বিবাহও আইনসঙ্গত হইবে।

—

হিন্দুবিবাহ সম্বন্ধে প্রিভি কৌন্সিলের এক [illegible]দের মত

গোরখপুরের বৈশ্যজাতীয় পরলোকগত নিকু[illegible]কারণ সম্পত্তি লইয়া তাহার দুই পুত্রের মধ্যে মোকদ্দমা[illegible] গোপীকৃষ্ণ নিকুলালের প্রথম বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত [illegible] শ্রীকৃষ্ণ তাহার 'সাগাই' প্রথা অনুসারে বিবাহিত স্ত্রী শ্রী[illegible] জগ্‌গোর গর্ভজাত। জগ্‌গোর তাহার সহিত বিবাহ [illegible] আইনসঙ্গত, হইয়াছিল কি না, প্রিভি কৌন্সিলের জজদিগ[illegible] তাহারই মীমাংসা করিতে হইয়াছিল। জগ্‌গোর ইতিহ[illegible] এইরূপ। তাহার সহিত, তাহার অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থ[illegible] বৈজনাথের বিবাহ হয়। বৈজনাথের মৃত্যুর পর [illegible] বৈজনাথের ছোট ভাই শিওনাথকে বিবাহ করে। তখ[illegible] শিওনাথের অন্য স্ত্রী জীবিত ছিল, দুই সতীনে ঝগড়া বিবা[illegible] হইত। এই অশান্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য শিওনা[illegible] জগ্‌গোকে পরিত্যাগ করে। পরিত্যক্তা জগ্‌গো বৈশ্যবর্ণে[illegible] যে উপবর্ণের অন্তর্গত, তাহা হইতে ভিন্ন অন্য উপবর্ণে[illegible] নিকুলালকে 'সাগাই' প্রথা অনুসারে বিবাহ করে[illegible] (বাঁকুড়া জেলার বাউরীদের মধ্যে এই 'সাগাই' প্রথা 'সাঙ্[illegible]' নামে প্রচলিত আছে।) তাহার পূর্ব্বস্বামী শিওনাথে[illegible] জীবিতকালে ভিন্ন উপবর্ণের অপর কাহারও সহিত জগ্‌গো[illegible] বিবাহ বৈধ হইয়াছিল কি না, ইহাই প্রিভি কৌন্সিলে[illegible] জজদিগকে স্থির করিতে হয়। তাহারা রায় দিয়াছে[illegible] স্থানীয় লোকাচার অনুসারে জগ্‌গো সত্যসত্যই পরিত্যা[illegible] হইয়াছিল, সুতরাং তাহার পূর্ব্ব স্বামী শিওনাথের জীবি[illegible] কালে তাহার আবার বিবাহ করিবার অধিকার জন্মিয়াছি[illegible] 'সাগাই' প্রথাও স্থানীয় লোকাচারসিদ্ধ, এবং ভিন্ন ভি[illegible] উপবর্ণের পাত্র পাত্রীর বিবাহ কোন হিন্দু শাস্ত্র দ্বারা নিষি[illegible] নহে।

এই রায় গত ২৮শে এপ্রিল প্রদত্ত হয়। যে তিন জন [illegible] আপীল শুনিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম লর্ড ব্লেন্সবরো, [illegible] শাদীলাল (লাহোর হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি[illegible]) এবং সর্ জর্জ র‍্যাঙ্কিন (কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূ[illegible] প্রধান বিচারপতি)।

—

ব্রিটিশ মন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় গোপনীয় কথা প্রকাশ

জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীর ৩০৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলাম, "এবারক[illegible] বিলাতী বজেটে যে ইনকম্ ট্যাক্স ও চায়ের উপর ট্যাক্স বাড়ি[illegible] তাহার বজেট বাহির হইবার আগেই বাহির হইয়া প[illegible] তদন্ত হইতেছে।" তদন্তের ফলে অন্যতম ব্রিটিশ ম[illegible] মিঃ টমাস দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন। তদন্তের রিপোর্ট বা[illegible] হইবার পূর্ব্বেই মিঃ টমাস মন্ত্রীপদ ত্যাগ করেন।

রাষ্ট্রীয় গোপনীয় কথা প্রকাশ হইয়া পড়া লজ্জা ও দুঃ[illegible]

...তবে, ব্রিটিশ জাতি যে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষেরও ... সন্দেহের প্রকাশ্য তদন্ত করিয়া তাহার রিপোর্ট ... করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের স্বদেশের গৌরবের কথা। ... কিন্তু ভারতবর্ষে স্বজাতীয় উচ্চপদস্থ লোকদের দোষ ... দিতেই অধিকতর ব্যস্ত ও অভ্যস্ত। তাহার দৃষ্টান্ত ... আছে। উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

—

হিন্দু নারীদের উত্তরাধিকার

হিন্দু নারীদের উত্তরাধিকার-সম্বন্ধীয় হিন্দু আইন ব্রিটিশ আদালতের ব্যাখ্যা অনুসারে যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের পূর্ব্বতন অধিকার সঙ্কুচিত হইয়াছে, ইহা রামমোহন রায় দেখাইয়া গিয়াছেন। নূতন আইন করিয়া তাঁহাদের অন্তত পূর্ব্ব অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তাহা যথেষ্ট না হইলে নূতন কিছু অধিকারও দেওয়া উচিত। এতদর্থে ডাক্তার দেশমুখ যে-বিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করিয়াছেন, তাহা সিলেক্ট কমিটির নিকট যাইবে। এরূপ ব্যবস্থা ভাল।

—

প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য

পাবনা জেলার একটি অতি দরিদ্র ভদ্র পরিবারে প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। গত মাসে ৭৬ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিছু দিন হইতে তিনি অতিরিক্ত রক্তের চাপে অসুস্থ ছিলেন। তাহারই ফলে সন্ন্যাস রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি মৃত্যুর সপ্তাহ দুই পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রকে বলিয়াছিলেন, যে, তাঁহার সময় আসিয়াছে, আর চৌদ্দ-পনর দিন মাত্র বাঁচিবেন, সেই জন্য বিশেষ কিছু কথা বলিবার নিমিত্ত তাঁহাকে ডাকাইয়াছেন।

আচার্য্য মহাশয় অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে সকল দিকে উচ্চ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। কেহ যদি দরিদ্র অবস্থায় জন্মিয়া কেবলমাত্র ধনী হয়, এবং সেই ধনশালিতা যদি আকস্মিক ঘটনার বা চৌর্য্য প্রবঞ্চনার ফলে না ঘটে, তাহা হইলে সে কৃতিত্বও সামান্য নহে, বরং প্রশংসনীয়। কিন্তু আচার্য্য মহাশয়ের কৃতিত্ব শুধু দারিদ্র্য হইতে সচ্ছল অবস্থায় উপনীত হওয়াতে নয়। তিনি সততা, বুদ্ধিমত্তা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারা মানুষের মত মানুষ হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জ্ঞানী সাধুপুরুষের যে-সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন—জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্ত্তব্যে নিষ্ঠা, ভগবদ্ভক্তি—সমস্তই তাঁহার ছিল।

ছাত্রাবস্থায় তিনি বুদ্ধিমান ও বিশেষ কৃতী ছাত্র ছিলেন। ছাত্ররূপে তাঁহার সাধারণ শিক্ষা এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত হইয়াছিল। চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিয়া তিনি এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং চিকিৎসকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। আমি যখন কলিকাতায় পড়িতে আসি তখনও প্রাণকৃষ্ণবাবু ছাত্র—যদিও আমার চেয়ে অনেক উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র। তিনি গণিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, একটি কলেজের ছাত্রকে তিনি গণিত শিখাইতেন আমার এই রূপ মনে পড়িতেছে।

প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য

সাধারণ কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন তখনও নানা বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানলাভে বিরত হন নাই। হিন্দু নানা শাস্ত্র তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টিয়ানদের শাস্ত্রও তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অন্যান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাঁহার পর্য্যাপ্ত জ্ঞান ছিল। দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্বে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল।

কলিকাতার ও বঙ্গের তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। বন্ধুবান্ধবদের চিকিৎসা ত প্রীতিবশত তিনি করিতেনই, কলিকাতার ও মফস্বলের বিস্তর গরীব লোকের চিকিৎসা তিনি সাগ্রহে বিনা পারিশ্রমিকে করিতেন। অন্য কাজ উপলক্ষ্যে তিনি মফস্বলে গেলেও গরীবের চিকিৎসা-রূপ

কর্ত্তব্যটি তিনি ভুলিতেন না। জীবনের শেষ কয় বৎসর উপার্জ্জনের জন্য চিকিৎসা প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন।

তিনি অর্থ উপার্জ্জন যেমন করিতেন, তাহার সদ্ব্যবহারও তেমনই করিতেন। দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্য করা জীবনের শেষ সজ্ঞান দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার একটি নিয়মিত কর্ম্ম ছিল। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বেও সিটি কলেজে ষোলটি দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষার সাহায্যের বিষয়ে চিন্তা ও সঙ্কল্প করিয়া পুত্রদ্বয়কে তদনুযায়ী উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। "দাসাশ্রম" নামে গত উনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতার অসহায় নিরাশ্রয় আতুরদের বাস গ্রাসাচ্ছাদন ও চিকিৎসাদির যে প্রতিষ্ঠান ছিল, আচার্য্য মহাশয় দীর্ঘকাল তাহার স্বেচ্ছাবৃত চিকিৎসক ছিলেন। বাণীবন বালিকা-বিদ্যালয়ের অট্টালিকানির্ম্মাণ প্রধানত তাঁহার ব্যয়েই নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। আরও কত প্রতিষ্ঠানে তিনি আরও কত দান করিয়াছেন, আমরা জানি না।

যে মহৎ ও বৃহৎ কাজটিতে তাঁহার জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি অনেক সময় দিতেন, তাহা আসাম ও বঙ্গের অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতি। তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন। জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে দরিদ্র গ্রামিক লোকদের পুত্রকন্যাদিগকে শিক্ষাদান ইহার প্রধান কাজ। ইহার তত্ত্বাবধানে নানা জেলায় প্রায় সাড়ে চারি শত বিদ্যালয় আছে। গ্রামিক লোকদিগকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিবার নিমিত্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনার্থ তিনি পদরজে, পা ক্ষতবিক্ষত করিয়া, বহুবার বহু দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। বস্তুত তিনি কলিকাতায় বসিয়া শুধু কাগজে নাম স্বাক্ষর করিয়া জনহিতকর কার্য্যের সহিত যোগ রক্ষায় তৃপ্ত হইতেন না; স্বয়ং মফস্বলে কার্য্যক্ষেত্রে গিয়া কাজ করিতে ভালবাসিতেন। আমার মনে পড়ে, কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে তিনি বাঁকুড়া জেলার দুর্ভিক্ষে বিপন্ন লোকদের সাহায্য করিতে গিয়া তথাকার একটি গ্রামে ছিলেন।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে ও স্বদেশীর পক্ষে বঙ্গে যে প্রবল আন্দোলন হয়, আচার্য্য মহাশয় তাহার অন্যতম নেতা, আন্তরিক সমর্থক, এবং বাগ্মী বক্তা ছিলেন। অন্য বহু দেশহিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহার যোগ ছিল।

তিনি বৈষয়িক ব্যাপারও বুঝিতেন ভাল। একাধিক জীবনবীমা কোম্পানীর প্রধান ডিরেক্টরের কাজ কোন-না-কোন সময়ে তিনি করিয়াছিলেন।

তিনি যৌবন কালে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মে পূর্ণ আস্থাবান্ ছিলেন। গ্রামিক অশিক্ষিত ও অধিকাংশ স্থলে দরিদ্র লোকদের সকল দিক দিয়া উন্নতি তাহাদের অন্তরের সহিত [illegible]

তিনি বিশ্বাস করিতেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন, এবং ইহার অন্যতম আচা- ছিলেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী উপাসনা ও সারগর্ভ উপ- যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা তাহা ভুলিতে পারিবেন উদ্বোধন, আরাধনা ও উপদেশের সময় তিনি যে-সব শা- বচন আবৃত্তি করিতেন, তাহা পুস্তক হইতে বা হস্তলিপি হ- পড়িতেন না, সমস্ত তাঁহার কণ্ঠস্থ থাকায় অনর্গল ব- যাইতেন এবং সেই জন্য শ্রোতাদের মনের উপর সেগু- প্রভাব অধিক হইত।

তিনি স্বাধীনচিত্ত পুরুষ ছিলেন। লোকে অনেক যে-সকল গুণকে পরস্পরবিরোধী মনে করে, সেগুলি তাঁহা- বিদ্যমান ছিল। এক দিকে তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, পূর্ণ স- অপ্রীতিকর হইলেও বলিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না; অন্য সাতিশয় স্নেহশীল এবং দয়ালুও ছিলেন। অন্যায়ের ক্রোধ তাঁহার প্রকৃতিতে ছিল, অথচ তিনি সাতিশয় হাস্য- ছিলেন—তাঁহার নির্ম্মল শুভ্র অট্টহাস্য ভুলিবার নহে।

আচার্য্য মহাশয় যদি আত্মচরিত লিখিয়া রাখিয়া থাকেন, কিংবা যদি তাঁহার ডায়েরী থাকে, তাহা হইলে দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। তাঁহার আবাল্য আযৌবন বন্ধুদের সাহায্যে তাঁহার একটি বিস্তারিত চরিত তাঁহার কৃতী কন্যাপুত্রেরা প্রকাশ করুন।

—

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিরাশী বৎসর বয়সে স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দে- ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যে প্রভূত সম্পত্তির অধিক- হইয়াছিলেন, তাহা তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পান নাই, আকস্মিক ঘটনাচক্রেও তাহা তাঁহার ভাগ্যে জুটে নাই; তিনি সততা, বুদ্ধিমত্তা, নিজের ব্যবসায়জ্ঞান, সু- কাজ করিবার ক্ষমতা ও অভ্যাস, ধীরতা ও পরিশ্রম- উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি অল্প বয়সে পিতৃহীন- শিক্ষার জন্য তিনি নিজ মাতৃদেবীর ও অপরের নিক- ছিলেন। তাঁহার আশী বৎসর বয়সের সময় যখন অ- হলে একটি অনুষ্ঠানে ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় মাতৃদেবীর সম্বন্ধে একটি কথা বলিতেছিলেন, তখ- রাজেন্দ্রনাথকে মাতৃহীন শিশুর মত অশ্রুমোচন করিতে- গিয়াছিল। তিনি ধনী হইয়াছিলেন, কিন্তু ধনগর্ব্ব- নাই, তাঁহার শৈশব, বাল্য ও যৌবনের অবস্থা ভুলি- নাই।

তিনি এঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু দিতে পারেন নাই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে যে উপাধি যায়, তাহা পান নাই। কিন্তু এই বিদ্যা এরূপ ভাল ছিলেন এবং ইহাতে তাঁহার এরূপ দক্ষতা ছিল যে তিনি

...লে কলিকাতার দুটি বড় কোম্পানীর প্রধান ব্যক্তি হইতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার জন্মগ্রাম ভ্যাবলার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির নিমিত্ত এবং তাহার অধিবাসীদের জীবনযাত্রানির্ব্বাহ সুখকর করিবার নিমিত্ত তিনি যথেষ্ট চিন্তা, শ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। জন্মস্থানের উন্নতিবিধান মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাতেই মানুষের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। রাজেন্দ্রনাথও কেবল যে ভ্যাবলারই হিত করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে। দেশের অন্য বহু প্রতিষ্ঠান তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে বঙ্গ ও আসামের অনুন্নত শ্রেণী-সমূহের উন্নতি-বিধায়িনী সমিতি বোধ হয় প্রধান। তিনি জীবনের শেষ কয় বৎসর ইহার সভাপতি ছিলেন এবং ইহার কাজে খুব মন ও সময় দিতেন। ইহার স্থায়ী ফণ্ডে টাকা দিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন নিয়মিত চাঁদা দিতেন এবং পরিচিত বিত্তশালী লোকদিগকে চিঠি দিয়া ইহার জন্য অর্থ সংগ্রহ করাইতেন। অল্প সময়ের মধ্যে ইহার সভাপতি সর্ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের পরলোকগমন উদ্বেগের কারণ হইয়াছে।

রাজেন্দ্রনাথ রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রের কর্ম্মী কখনও হন নাই। কিন্তু তিনি দেশের রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতির জন্য আত্মোৎসর্গের মূল্য বুঝিতেন। পরলোকগত গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লেকে তিনি নিয়মিত মাসিক দক্ষিণা দিতেন। যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্মৃতি-রক্ষার্থ অর্থসংগ্রহের চেষ্টা আরব্ধ হয়, তখন তিনি উহার কোষাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, এবং তিনি কোষাধ্যক্ষ হওয়াতে এমন অনেক লোকে টাকা দিয়াছিলেন যাঁহারা সম্ভবত তিনি কোষাধ্যক্ষ না হইলে টাকা দিতেন না।

তিনি যে রাজনীতি বুঝিতেন না, এমন নয়। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, গবর্ন্মেণ্ট তিনি (তথাকথিত) গোলটেবিল কন্‌ফারেন্সের (তথাকথিত) প্রতিনিধি হইতে রাজী হইবেন কিনা জানিতে চান। তিনি রাজী হন নাই। আমরা যাঁহার নিকট একথা শুনিয়াছি, তাঁহাকে রাজেন্দ্রনাথ

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বলিয়াছিলেন, গবর্ন্মেণ্ট স্বশাসনক্ষমতা কিছুই দিবে না; সুতরাং ওরূপ কন্‌ফারেন্সে তিনি যাইতে চান না। ওরূপ কাজে গিয়া বৃথা স্বদেশবাসীদের বিরাগভাজন হইতে তিনি রাজী ছিলেন না।

আমরা উপরে সামান্য যাহা কিছু লিখিলাম, তাহা হইতেও

বুঝা যাইবে, যে, তিনি নিজের চেষ্টায় ধনী হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার সম্বন্ধে একমাত্র জ্ঞাতব্য কথা নহে। তাঁহার সম্বন্ধে বলিবার ও শুনিবার অন্য অনেক কথা আছে। কিন্তু অধুনা অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে বাঙালীদের পরাজয় ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে বলিয়া ব্যবসাবাণিজ্যে রাজেন্দ্রনাথের কৃতিত্বের বিশেষ মূল্য আছে। তিনি কেমন করিয়া এরূপ কৃতী হইলেন, তাহা বিস্তারিত ভাবে বাংলায় লিখিয়া বা লিখাইয়া তাঁহার পুত্রেরা প্রকাশ করিলে বঙ্গদেশের উপকার হইবে।

পূরণচন্দ নাহার

পূরণচন্দ নাহার মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে বাংলা দেশ, এবং সমগ্র ভারতবর্ষের জৈন সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি জৈন সম্প্রদায়ের ভূষণ ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-এ, বি-এল ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় ইহা নহে। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ঐতিহাসিক জ্ঞান তাঁহাকে বিদ্বৎসমাজে সম্মানিত করিয়াছিল। ভারতীয় ঐতিহাসিক সাহিত্যে তাঁহার "জৈন অনুশাসন লিপি" প্রশংসিত স্থান লাভ করিয়াছে। ভারতীয় চিত্র ও মূর্ত্তিশিল্পের অনেক উৎকৃষ্ট নমুনা এবং বহু প্রাচীন মুদ্রা তিনি সংগ্রহ করিয়া নিজগৃহে রাখায় তাহা একটি মিউজিয়মের মত হইয়াছিল। এই সকল বিষয়ের ও নানা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ের অনেক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ তাঁহার লাইব্রেরীতে আছে। অনেক ঐতিহাসিক গবেষক তাঁহার ললিতকলাবিষয়ক ও প্রাচীন মুদ্রাবিষয়ক সংগ্রহের এবং লাইব্রেরীর সাহায্য পাইয়াছেন। আমরাও, গবেষক না-হইলেও, এইগুলি হইতে কখন কখন সাহায্য পাইয়াছি। নাহার মহাশয়ের পারিবারিক বাসভবনের অন্তর্গত কুমার সিংহ হলে তালতলা পাব্লিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতা সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া আসিতেছে।

পূরণচন্দ নাহার

নাহার মহাশয়কে তাঁহার সৌজন্য ও বিনয়নম্রতা লোকপ্রিয় করিয়াছিল। তাঁহার অসুস্থতার কথা তাঁহার মুখে মধ্যে মধ্যে শুনিতাম, কিন্তু এত শীঘ্র তাঁহার দেহান্ত হইবে কল্পনাও করি নাই।

বাংলা
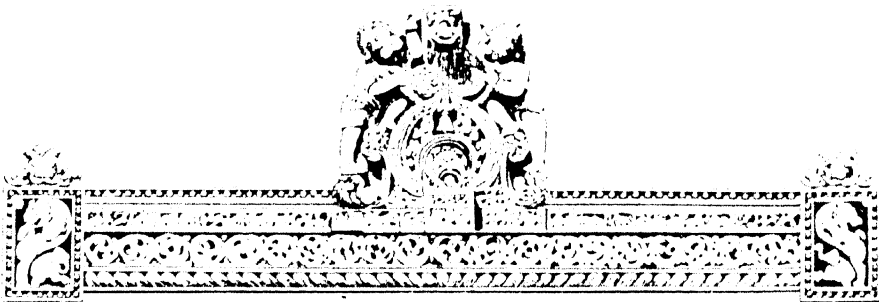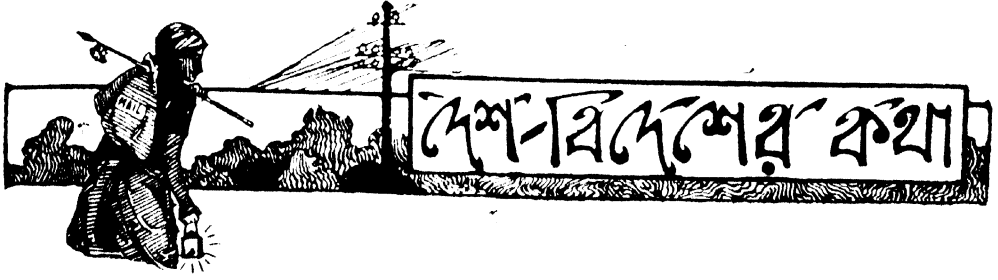
পুরন্দরপুর ও বিয়ারজুড়া গ্রামের কতিপয় দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তি।
ইহারা বাঁকুড়া-সম্মিলনী হইতে চাউল ও বস্ত্র সাহায্য পাইতেছে।

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে সাহায্যের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী জিলার নানা স্থানে সাহায্য-কেন্দ্র খুলিয়াছেন। তাহার দুইটি চিত্র মুদ্রিত হইল। সাহায্যদাতারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য পাঠাইবেন—সম্পাদক, বাঁকুড়া-সম্মিলনী, ২০-বি, শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

বিধবা-বিবাহ

ময়মনসিংহ জঙ্গলবাড়ী হিন্দুসভার সম্পাদক জানাইতেছেন যে উক্ত হিন্দুসভার উদ্যোগে গত ১৩৩৪ হইতে ১৩৪২ সাল পর্য্যন্ত মোট ৭৩ জন হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে গত বর্ষে মোট ১৩টি সম্পন্ন হয়।

ভূপর্যটক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৩৩৩ সনে আসামের তিনসুকিয়া হইতে পদব্রজে একাকী পৃথিবী-ভ্রমণে বহির্গত হন। সমগ্র উত্তর- ও মধ্য- ভারত ভ্রমণ করিয়া আকিয়াব ও বেসিনের পথে রেঙ্গুনে পৌঁছেন। তথা হইতে সাইকেলে ব্রহ্মদেশ, চীন, মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, বোর্ণিও, সেলিবিস্, বালি, জাভা, সুমাত্রা, মালয় ষ্টেটস্, ও ষ্ট্রেটস্ সেটল্‌মেণ্টস্ ভ্রমণ করিয়া গত ৭ই মার্চ্চ মান্দ্রাজে আসেন। বর্ত্তমানে তিনি তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণে ব্যাপৃত আছেন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রামপ্রাণ গুপ্ত-স্মৃতি পুরস্কার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ বাংলার সামাজিক ইতিহাস-সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের জন্য প্রতি দুই বৎসরে একটি পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা রামপ্রাণ গুপ্ত-স্মৃতি পুরস্কার বলিয়া অভিহিত। বর্তমান বর্ষে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" ও "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস" পুস্তকাবলীর জন্য এই পুরস্কার পাইয়াছেন। পুরস্কারলব্ধ অর্থ বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয় পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত

বাঙালী ছাত্রের কৃতিত্ব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তিধারী শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত, এম্-এস্‌সি, আড়াই বৎসর কাল ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। তিনি ম্যান্‌চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টার অব টেক্‌নলজিক্যাল সায়েন্সেস্ (এম-এস্‌সি টেক্) ডিগ্রী লাভ করিয়া লণ্ডনের ইন্‌ষ্টিটুট অব ফিজিক্স-এর এক জন সভ্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন। ১৯৩৪-৩৫ সনে শ্রীযুক্ত দত্ত ম্যানচেষ্টার মিউনিসিপ্যাল কলেজ অব টেক্‌নলজির ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে অস্থায়ী ডেমনষ্ট্রেটর নিযুক্ত হন। তিনি সেখানকার শ্রেষ্ঠ বৈদ্যুতিক কারখানা মেট্রোপলিটান্ ভিকার্স' ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানী ও ব্রিটিশ ইন্‌স্যুলেটেড কেব্‌ল্‌স্ লিমিটেড-এ হাতে-কলমে কাজ শিখিয়াছেন। বৈদ্যুতিক কেব্‌ল প্রস্তুত ও পরীক্ষা, বৈদ্যুতিক যন্ত্র সম্ভারাদি নির্ম্মাণ, হাই ভোল্টেজ টেক্‌নিক্ প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন

কৃতী বাঙালী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিচালিত কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্ক। দত্ত মহাশয় বাইশ বৎসর পূর্ব্বে সামান্য মূলধন লইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; ক্রমশ সুপরিচালনার ফলে ইহা বর্ত্তমান সমৃদ্ধিশালী অবস্থায় উপস্থিত

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

হইয়াছে ও ইহা দ্বারা বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের সহায়তা হইতেছে। এই ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সিডিউল ভুক্ত হইয়াছে। দেশের বহু স্থানে এই ব্যাঙ্কের শাখা রহিয়াছে। দত্তমহাশয় অন্যান্য বহু ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সহিতও যুক্ত আছেন।

ভারতবর্ষ

প্রবাসে কৃতী বাঙালী

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এত দিন আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের সরকারের রসায়নী-পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন; তাঁহার পূর্ব্বে কোনও ভারতীয় এই দায়িত্বপূর্ণ পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন নাই। সম্প্রতি ইঁহার কার্য্যকাল পূর্ণ হইয়াছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের ইনষ্টিট্যুট অব কেমিষ্ট্রিরও একজন সদস্য।

শ্রীসুধীর দাসগুপ্ত এই বৎসর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

শ্রীসুধীর দাশগুপ্ত

পরলোকে প্রবাসে কৃতী বাঙালী

পাটনা মিউজিয়মের কিউরেটার রায় সাহেব মনোরঞ্জন ঘোষ সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। তক্ষশীলায় খননকার্য্যের সময় তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পাটনার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি প্রভৃতি বহু বিদ্বৎসভার সহিত তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন।

রথযাত্রার মেলা

শ্রীবাসুদেব রায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৬শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৪৩

৪র্থ সংখ্যা

অকাল ঘুম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এসেছি অনাহূত।
কিছু কৌতুক করব ছিল মনে,
আচম্‌কা বাধা দেব অসময়ে
কোমরে-আঁচল-জড়ানো গৃহিণীপনায়।
দুয়ারে পা বাড়াতেই চোখে পড়ল
মেঝের 'পরে এলিয়ে-পড়া ওর
অকাল ঘুমের রূপখানি।

দূর পাড়ায় বিয়ে-বাড়িতে
বাজছে সানাই সারঙ্ সুরে।
প্রথম প্রহর পেরিয়ে গেছে
জ্যৈষ্ঠরৌদ্রে ঝাম্‌রে-পড়া
সকালবেলায়।
স্তরে স্তরে দু'খানি হাত গালের নিচে,
ঘুমিয়েছে শিথিল দেহে
উৎসব-রাতের অবসাদে
অসমাপ্ত ঘরকন্নার একধারে।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৬শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৪৩

৪র্থ সংখ্যা

অকাল ঘুম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এসেছি অনাহূত।
কিছু কৌতুক করব ছিল মনে,
আচম্‌কা বাধা দেব অসময়ে
কোমরে-আঁচল-জড়ানো গৃহিণীপনায়।
দুয়ারে পা বাড়াতেই চোখে পড়ল
মেঝের 'পরে এলিয়ে-পড়া ওর
অকাল ঘুমের রূপখানি।

দূর পাড়ায় বিয়ে-বাড়িতে
বাজছে সানাই সারঙ্ সুরে।
প্রথম প্রহর পেরিয়ে গেছে
জ্যৈষ্ঠরৌদ্রে ঝাম্‌রে-পড়া
সকালবেলায়।
স্তরে স্তরে দু'খানি হাত গালের নিচে,
ঘুমিয়েছে শিথিল দেহে
উৎসব-রাতের অবসাদে
অসমাপ্ত ঘরকন্নার একধারে।

কর্ম্মস্রোত নিস্তরঙ্গ ওর অঙ্গে অঙ্গে,
অনাবৃষ্টিতে অজয় নদের
প্রান্তশায়ী শ্রান্ত জলশেষের মতো।
ঈষৎ খোলা ঠোঁট দুটিতে মিলিয়ে আছে
মুদে-আসা-ফুলের
মধুর ঔদাসীনতা।
দুটি সুপ্ত চোখের কালো পক্ষ্মচ্ছায়া
পড়েছে পাণ্ডুর কপোলে।

ক্লান্ত জগৎ চলেছে পা টিপে'
ওর খোলা জানলার সামনে দিয়ে
ওর শান্ত নিঃশ্বাসের ছন্দে।
ঘড়ির ইসারা
বধির ঘরে টিক্‌টিক্‌ করছে কোণের টেবিলে,
বাতাসে দুলছে দিনপঞ্জী দেয়ালের গায়ে।

চল্‌তি মুহূর্ত্তগুলি গতি হারাল
ওর স্তব্ধ চেতনায়,
মিল্‌ল একটি অনিমেষ মুহূর্ত্তে;
ছড়িয়ে দিল তার অশরীরী ডানা
ওর নিবিড় নিদ্রার 'পরে।

ওর ক্লান্ত দেহের করুণ মাধুরী মাটিতে মেলা,
যেন পূর্ণিমা-রাতের ঘুমহারানো অলস চাঁদ
সকালবেলায় শূন্য মাঠের সীমানায়।

পোষা বিড়াল দুধের দাবী স্মরণ করিয়ে
ডাক দিল ওর কানের কাছে।
চম্‌কে জেগে উঠে দেখল আমাকে,
তাড়াতাড়ি বুকে কাপড় টেনে
অভিমানভরে বললে—"ছি, ছি,
কেন জাগালে না এতক্ষণ!"
কেন, আমি তার জবাব দিই নি ঠিকমতো।

যাকে খুব জানি তাকেও সব জানি নে
এই কথা ধরা পড়ে
কোনো একটা হঠাৎ সুযোগে।
হাসি আলাপ যখন আছে থেমে,
মনে যখন থম্‌কে আছে প্রাণের হাওয়া,
তখন সেই অচেতনের গভীরে
এ কী দেখা দিল আজ ?
সে কি অস্তিত্বের সেই বিষাদ
যার তল মেলে না ?
সে কি সেই বোবার প্রশ্ন
যার উত্তর লুকিয়ে বেড়ায় রক্তে ?
সে কি সেই বিরহ
যার ইতিহাস নেই ?
সে কি অজানা বাঁশির ডাকে
অচেনা পথে স্বপ্নে-চলা ?
ঘুমের স্বচ্ছ আকাশতলে
কোন্ নির্ব্বাক রহস্যের সামনে
ওকে নীরবে সুধিয়েছি,
"কে তুমি ?
তোমার শেষ পরিচয়
খুলে যাবে কোন্ লোকে ?"

সেদিন সকালে গলির ওপারে পাঠশালায়
ছেলেরা চেঁচিয়ে পড়ছিল নামতা ;
পাট-বোঝাই মোষের গাড়ি
চাকার ক্লিষ্টশব্দে পীড়ন করছিল বাতাসকে ;
ছাদ পিটচ্ছিল পাড়ার কোন্ বাড়িতে.
জানলার নিচে বাগানে
চালতা গাছের তলায়
উচ্ছিষ্ট আমের আঁঠি নিয়ে
টানাটানি করছিল একটা কাক

আজ এ সমস্তর উপরেই ছড়িয়ে পড়েছে
সেই দূর কালের মায়ারশ্মি।
ইতিহাসে বিলুপ্ত
তুচ্ছ এক মধ্যাহ্নের
আলস্যে আবিষ্ট রৌদ্রে
এরা অপরূপের রসে রইল ঘিরে
অকাল ঘুমের একখানি ছবি।

শান্তিনিকেতন
১০ জুন, ১৯৩৬

ঋগ্বেদে ইন্দ্র

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

বেদ।—ঋগ্বেদে যে-সকল আরাধ্য দেবতার উল্লেখ আছে তন্মধ্যে ইন্দ্র অন্যতম। ইন্দ্র যজ্ঞপুরুষরূপে পূজা পাইতেন। বিভিন্ন ঋষি বিভিন্ন ছন্দে যুগে যুগে তাঁহার স্তব রচনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের কতকগুলি ইন্দ্রস্তুতি বহু পুরাতন, কতক বা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। ঋগ্বেদে ইন্দ্রই সর্বপ্রধান দেব। বিভিন্ন কালের ইন্দ্রস্তুতি এবং অন্যান্য দেবতার উদ্দেশে স্তবসমূহ সূক্তাকারে ধৃত হইয়া ঋগ্বেদে স্থান পাইয়াছে। এই জন্যই ঋগ্বেদকে সংহিতা বলা হয়। ঋগ্বেদসংহিতার সূক্ত-সংগ্রহ বহুকাল যাবৎ চলিয়াছিল। ঋগ্বেদ ক্রমে বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। পুরাণে কথিত আছে, প্রথমে সমস্ত বেদ-সূক্তই সংহিতাকারে একত্র গ্রথিত ছিল। যজ্ঞ বা যজনকার্য্যের উদ্দেশ্যে স্তবগুলি রচিত হওয়ায় সংহিতার নাম ছিল যজুর্বেদ। তখন যজুর্বেদই একমাত্র বেদ ছিল। ঋত্বিকগণকে বেদোক্ত সূক্তগুলি মুখস্থ রাখিতে হইত। নূতন নূতন স্তব রচিত হওয়ার ফলে যজুর্বেদসংহিতার কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন সমগ্র যজুর্বেদ মুখস্থ রাখা কঠিন বোধ হওয়ায় তাহা তিন অংশে বিভক্ত হইল এবং ঋক্, সাম ও যজু এই তিন নামে পরিচিত হইল। বেদকলেবর ক্রমশ আরও বর্দ্ধিত হওয়ায় পুনরায় নূতন করিয়া বেদ-বিভাগের প্রয়োজন অনুভূত হয়। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসরূপে সমগ্র বেদসংহিতাকে নূতন করিয়া চারি ভাগ করেন।

> একং বেদং চতুষ্পাদং চতুর্দ্ধা পুনরীশ্বরঃ।
> যথা বিচ্ছেদ ভগবান ব্যাস সর্বান স্বপূজিতঃ। বায়ু।১।১৭৮।

এই চারি ভাগের নাম ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পরবর্তী কাল হইতে 'চতুর্বেদ' শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। তৎপূর্বে বেদ ত্রয়ী নামে অভিহিত ছিল। সম্ভবতঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কর্তৃক চতুর্বেদ সুনির্দিষ্ট হওয়ার পর আর কোন নূতন সূক্ত ঋগ্বেদে স্থান পায় নাই। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পরবর্তী কাল হইতে ক্রমে ক্রমে যজ্ঞানুষ্ঠান অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। যজ্ঞের লোকপ্রিয়তার লাঘব দেখা যাইলেও এখন পর্যন্ত শ্রৌত যজ্ঞকর্ম সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্বেও অনাবৃষ্টি হওয়ায় আমি দ্বারভাঙ্গায় এবং পুরীতে ইন্দ্রযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছি।

ইন্দ্র কোন্ দেব।—যে ইন্দ্র এতকাল যাবৎ সম্মান পাইয়া আসিতেছেন তিনি কোন্ দেবতা জানিতে স্বতঃই আমাদের কৌতূহল হয়। প্রাচীন হিন্দু প্রাকৃতিক নানা ব্যাপারের তৎ তৎ অধিষ্ঠাতৃদেবতা কল্পনা করিয়াছিলেন। বায়ু, অগ্নি, জল, আকাশ, পৃথিবী প্রভৃতি প্রত্যেকেরই এক এক অধিষ্ঠাতৃদেবতা আছে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডল দ্বিতীয় সূক্তের পাদটীকায় লিখিতেছেন,

প্রকৃতির মধ্যে কোন বস্তুকে 'ইন্দ্র' নাম দিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ উপাসনা করিতেন? ইন্দ্ ধাতু বর্ষণে, ইন্দ্র অর্থে বৃষ্টিদাতা আকাশ। প্রাচীন আর্য্যেরা আকাশকে 'দ্যু' 'বরুণ' প্রভৃতি নাম দিয়াও উপাসনা করিতেন আর্য্য জাতির যে শাখা ভারতবর্ষে আসিলেন তাঁহারাই বৃষ্টিদাতা আকাশের 'ইন্দ্র' বলিয়া একটী নূতন নাম দিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। 'দ্যু' আর্য্যদিগের প্রাচীন আকাশদেব, অতএব সেই আর্য্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখাজাতিদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে অর্থাৎ গ্রীকদিগের মধ্যে Zeus নামে, লাটিনদিগের মধ্যে Jovis বা Jupiter নামে, এংগ্লো সাক্সনদিগের মধ্যে Tiu নামে ও জার্ম্মানদিগের মধ্যে Zio নামে উপাসিত হইতেন। ঋগ্বেদেও 'দ্যু' ও পৃথিবীর উপাসনা আছে এবং তাঁহারা ইন্দ্রাদি সকল দেবতার পিতামাতা এরূপও বর্ণনা আছে। 'ইন্দ্র' কেবল হিন্দুদিগের নূতন আকাশদেব, সুতরাং কেবল ভারতবর্ষেই উপাসিত হইতেন। কিন্তু হিন্দুগণ যখন আকাশকে 'ইন্দ্র' বলিয়া নূতন নাম দিলেন, সেই অবধি ইন্দ্রে'র উপাসনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আকাশের পুরাতন দেব 'দ্যু'র তত গৌরব রহিল না। ইহার কারণ কতক অনুভব করা যায়। আর্য্যদিগের প্রথম বাসস্থান মধ্য আসিয়াতে আকাশের গৌরব অধিক; ভারতবর্ষে নদীর জল, ভূমির উর্ব্বরতা, ধান্য ও খাদ্যদ্রব্য, মানুষের সুখ ও জীবন, সমস্তই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে, অতএব বৃষ্টিদাতা আকাশের গৌরব অধিক। 'দ্যু' আর্য্যদিগের পুরাতন আকাশদেব সুতরাং বৃষ্টিদাতার উপাসনা ক্রমে বৃদ্ধি পাইল। যে কারণেই হউক ঋগ্বেদ রচনার সময় ইন্দ্রই সর্ব্বাগ্রগণ্য দেব ছিলেন। তাঁহার নাম যাস্ক হইতে উদ্ধৃত সূত্রে আছে, এবং তাঁহার সম্বন্ধে যত সূক্ত আছে, অন্য কোনও দেব সম্বন্ধে তত নাই।

বৈদিক দেবগণের প্রকারভেদ।—প্রাকৃতিক ঘটনাবলির অধিষ্ঠাতা দেবগণই যে প্রাচীন হিন্দুর উপাস্য ছিলেন সে-সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় পণ্ডিত একমত হইলেও কোন্ দেব কোন্ ব্যাপারের অধিষ্ঠাতা সে-সম্বন্ধে মতান্তর আছে। দেবতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কেহ বা দূর আকাশের জ্যোতিষিক ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কেহ বা মধ্য আকাশ বা অন্তরীক্ষের মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক লীলাকেই হিন্দুর পূজনীয় মনে করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এ-সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলর সাহেবের যে মত উদ্ধার করিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।—

I look upon the sunrise and sunset, on the daily return of day and night, on the battle between light and darkness, on the whole solar drama in all its details that is acted every day, every month, every year, in heaven and in earth as the principal subject of early mythology. I consider that the very idea of divine powers sprang from the wonderment with which the forefathers of the Aryan family stared at the bright (deva) powers that came and went, no one knew whence or whither; that never failed never faded, never died and were called immortal. Quite opposed to this, *the solar theory* is that proposed by Professor Kuhn, and adopted by the most eminent mythologians of Germany, which may be called the *meteorological theory.* This has been well sketched by Mr. Kelly in his Indo-European Tradition and Folklore. 'Clouds' he writes 'storms, rains, lightning, and thunder, were spectacles that above all others impressed the imagination of the early Aryans and busied it most in finding terrestrial objects to compare with their ever varying aspect'—MaxMuller's *Science of Language* (1882). Vol. ,II pp. 565, 566.

ম্যাকডোনেল সাহেব তাঁহার *Vedic Mythology* নামক গ্রন্থে বৈদিক দেবতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "They are almost without exception the deified representatives of the phenomena or agencies of nature." 1897, p 2. তিনি বৈদিক দেবগণকে প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা, ১। celestial বা আকাশ-দেব, ২। atmospheric বা আন্তরীক্ষ-দেব, ৩। terrestrial বা ভৌম-দেব এবং ৪। abstract বা গুণবাচক দেব। কীথ সাহেবও ম্যাকডোনেলের মতাবলম্বী। *Keith: The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads,* 1925.

ইন্দ্র প্রাকৃতিক দেব। তৎপক্ষে যুক্তি।—ইউরোপীয় বেদবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত এই যে, ইন্দ্র প্রাকৃতিক ব্যাপারের অধিষ্ঠাতা দেবতা মাত্র এবং এই জন্যই প্রাচীন হিন্দুর পূজার্হ হইয়াছিলেন। এই মতের পক্ষে স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের যে-সকল যুক্তি আছে সংক্ষেপে তাহা নির্দেশ করিতেছি।

১। সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক বস্তু বা ব্যাপারেই হিন্দু এক চৈতন্য সত্তার অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়াছেন। এই চৈতন্য সত্তা থাকার জন্যই জড় আমাদের চৈতন্যগ্রাহ্য হয়। যে-চৈতন্য সত্তা জড়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জড়কে উপলব্ধি করায় বা জড়ের দ্যোতক হয় তাহাই জড়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। পৃথিবীর ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় বস্তুতে তৎ তৎ অধিষ্ঠাতৃদেবতা আছে। বৈয়াকরণ বলেন, অচেতনস্য বৃক্ষস্য কথং সম্বোধনং

বিদুঃ। তদধিষ্ঠাতৃদেবানাং চেতনেত্তাভিধীয়তে॥ অর্থাৎ, অচেতন বৃক্ষকে, 'হে বৃক্ষ' এরূপ সম্বোধন কি করিয়া হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে তদধিষ্ঠাতৃদেবতার চেতনা সম্বোধনের বিষয়। ঘট পটাদি তুচ্ছ সামগ্রীর অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের কোন নামকরণ হয় নাই কিন্তু ঝড়, জল, আকাশ, পৃথিবী প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ প্রাকৃতিক সত্তার পৃথক পৃথক দেবতা কল্পিত হইয়াছে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণও বহির্জগতের দ্যোতক বলিয়া দেবতা নামে পরিচিত। দেবকল্পনা হিন্দু সমাজের সংস্কৃতির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শাস্ত্রে উল্লেখ না থাকিলেও সাধারণ লোকে ইচ্ছামত বিশেষ বিশেষ বস্তুতে দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়াছে। অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা কল্পনার ফলে প্রাচীন হিন্দু বিবরণে এক বিশেষত্ব দেখা যায়। যেখানে ইংরেজ বলিবেন 'it rains' সেখানে প্রাচীন হিন্দু বলেন 'পর্জন্যদেব জল বর্ষণ করিতেছেন।' যে-সকল প্রাকৃতিক ব্যাপার আমাদের মনে শ্রদ্ধা, ভয় বা বিস্ময়ের উদ্রেক করে বা যাহা আমাদের মঙ্গলামঙ্গলের সহিত সম্পৃক্ত প্রাচীন হিন্দু তাহাদের দেবতা কল্পনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই পরন্তু সেই সকল দেবতার পূজাও করিয়াছেন।

২। ঋগ্বেদের ইন্দ্র যে ঐ প্রকারই এক দেবতা তাহার প্রমাণ এই যে ঋগ্বেদের অন্যান্য দেবতাও নানাবিধ প্রাকৃতিক ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইন্দ্র যেমন বৃষ্টিদাতা আকাশদেব, 'দ্যু' সেইরূপ সমগ্র আকাশ, 'মিত্র' সূর্য, 'অশ্বিদ্বয়' প্রাতঃ এবং সায়ংসন্ধ্যা ইত্যাদি। অনেক সময় বিশেষ দেবতা কল্পনা না করিয়াও সরলভাবে প্রাকৃতিক ব্যাপার সম্বন্ধে ঋগ্বেদসূক্ত রচিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৪৬ সূক্তে ঋষি অরণ্যানীর স্তব করিয়াছেন; ঐরূপ উক্ত মণ্ডলের ১৬৮ সূক্তে 'কালবৈশাখী' ঝড়ের স্তুতি আছে। ঋগ্বেদের ঋষি যে বৃষ্টি-দেবতা ইন্দ্রের কল্পনা করিয়া তাঁহার স্তব করিবেন বিচিত্র কি?

৩। ভাষাতত্ত্ব এবং বিভিন্ন জাতির প্রাচীন কথা আলোচনা করিয়া দেখা যায়, যে-দেব ভারতের 'দ্যু' তিনিই গ্রীকদের মধ্যে Zeus, লাটিনদের মধ্যে Jovis ইত্যাদি। মরুৎ লাটিন Mars ও গ্রীক Aris একই দেবতা; উষা, গ্রীক Eos ও লাটিন Auroraও এক, ইত্যাদি। এই প্রকার আলোচনায় বুঝা যায় যে, বৈদিক দেবতাগুলি প্রাকৃতিক ব্যাপারেরই অধিষ্ঠাতৃদেবতা। দেবতাগণের নামের নিরুক্তিতেও এই প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা, 'ইন্দ' ধাতুর অর্থ 'বর্ষণ' অতএব বর্ষণের দেবতার নাম হইল ইন্দ্র।

৪। স্তবগুলি পাঠ করিলেও দেখা যায় যে, তাহা বাস্তবিক পক্ষে প্রাকৃতিক ব্যাপারেরই বর্ণনা। ইন্দ্রকে বহু স্থানে জলদাতা বলা হইয়াছে। সায়ণাদি হিন্দু বেদবিদ্‌গণও বহু সূক্তের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ইন্দ্র মাত্র প্রাকৃতিক দেব নহেন। পূর্ব যুক্তি খণ্ডন।—উপরিউক্ত যুক্তিগুলি আপাতঃ দৃষ্টিতে অখণ্ডনীয় মনে হইলেও বিচারে দেখা যাইবে যে তাহাদের ভিত্তি দৃঢ় নহে। প্রতিপক্ষের আপত্তি বিচার করিতেছি।

১। অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুই প্রকারের। এক জড়দ্যোতব সত্তা মাত্র। ইহাই যথার্থ প্রাকৃতিক অধিদেবতা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যে-সত্তা বৃক্ষের স্বরূপের দ্যোতক তাহাই বৃক্ষের প্রাকৃতিক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আর এক প্রকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। ইহাদের আগন্তুক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলা যাইতে পারে, যেমন, কোনও বৃক্ষে যক্ষ বাস করে কল্পনা করিলে যক্ষকে সেই বৃক্ষের আগন্তুক অধিদেবতা বলা যায়। এ প্রকার দেবতা জড়দ্যোতক নহেন। হিন্দুর জড়দ্যোতক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বহু বিষয়ের অধিদেবতা হইতে পারেন না। অপর পক্ষে বহু প্রাকৃতিক দেবও একই দ্রব্যের অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন না। কেবল পরম ব্রহ্মেই এরূপ বহুমুখ গুণ আরোপ সম্ভব। আমরা ঋক্‌সূক্তে দেখিতে পাই যে কখনও ইন্দ্রকে জলদেবতা, কখনও বা গোদাতা, কখন বা ধনদেবতা, কখন যুদ্ধবিজয়ী দেব, কখন বা অপর কিছু বলা হইতেছে। অপর পক্ষে সবিতা, বরুণ, অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবও বহু সূক্তে জলদাতা রূপে আহূত হইয়াছেন॥ ঋ। ২ম।৩৮।২,৭। ১ম।১২২।৬॥ ১ম। ১১৭। ২১॥ ইত্যাদি।

এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ইন্দ্র প্রথমে মাত্র বৃষ্টিপ্রদ প্রাকৃতিক দেব হিসাবেই পূজিত হইতেন, পরে তাঁহার মহিমা বিস্তৃত হইয়া তাঁহাকে নানা গুণাধিকারী করিয়াছিল। এই প্রকার উক্তির প্রমাণাভাব। ইন্দ্রের এমন কোন স্তব নাই যাহাতে তাঁহাকে মাত্র বৃষ্টিকারী বলা হইয়াছে। যে-ঋষি ইন্দ্রপূজা করিতেন তিনি যে অন্য দেবতা মানিতেন না তাহাও নহে, অতএব মাত্র বৃষ্টির অধিষ্ঠাতৃদেব হিসাবে কি করিয়া তিনি একাধিক দেবের স্তব করিতেন? ঋ। ১ম।২৩ সূক্তে জলকে জল হিসাবেই ঋষি আবাহন করিয়াছেন। তিনি সরল ভাবে ঝড়, অরণ্য প্রভৃতিরও স্তব করিয়াছেন, অতএব তাঁহার পক্ষে প্রাকৃতিক বস্তুর অধিদেব কল্পনা নিতান্ত আবশ্যক ছিল এমন বলা যায় না। তিনি জড়দ্যোতক চৈতন্য সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার ব্যতীত দেবকল্পনার অন্য প্রয়োজনও বোধ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন ঋষির মনোভাব বিভিন্ন ছিল বলিয়াই কেহ ঝড়কে ঝড় হিসাবেই আবাহন করিয়াছেন, কেহ বা তাহাতে বায়ুদেবের অধিষ্ঠান দেখিয়াছেন এমন কথাও বলা চলে না; কারণ ঋক্‌সকল একই আদর্শানুযায়ী রচিত বলিয়াই একত্র সংহিতাকারে গ্রথিত হইয়াছিল। ঋ। ১ম।২৩ সূক্তে কাণ্ব মেধাতিথি ঋষি বায়ু, মিত্র, বরুণ, প্রভৃতি দেবকেও স্তুতি করিতেছেন, আবার জলকেও জল বলিয়াই আবাহন করিতেছেন। তাঁহার মনে

যে দেবগণ মাত্র জড়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা রূপে প্রতিভাত হন নাই তাহা নিঃসন্দেহ। অতএব ঋষিগণ জড়প্রকৃতির উপাসক ছিলেন, এ-মত ভ্রান্ত। প্রাকৃতিক ব্যাপারের আগন্তুক দেবতা হিসাবেই ইন্দ্রাদি দেবগণকে তাঁহারা কল্পনা করিয়াছিলেন।

২। সবিতা, রুদ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবকেও মাত্র জড়দ্যোতক প্রাকৃতিক দেব বলা চলিবে না। যে-সকল যুক্তির বলে ইন্দ্রকে প্রাকৃতিক দেব বলা চলে না সে-সমস্ত যুক্তিই বৈদিক অন্যান্য দেব সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। অবশ্য যেখানে ঝড়, জল, অরণ্যকে সরলভাবে আবাহন করা হইয়াছে সেখানে মাত্র প্রাকৃতিক বস্তুই আহূত হইয়াছে বুঝিতে হইবে; এই সকল স্তবে কোনও অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত কথা নাই। ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র প্রভৃতি আগন্তুক দেবগণ যে একই আদর্শে কল্পিত হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

৩। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈদিক দেবগণ অন্যরূপ নামে পূজিত হইতেন সত্য, কিন্তু এই উক্তিতে তাঁহারা যে জড়দ্যোতক প্রাকৃতিক দেব মাত্র ছিলেন তাহা প্রমাণিত হয় না। ইহাতে এইমাত্র বুঝা যায় যে এই সকল জাতির ও হিন্দুর পূর্বপুরুষগণ পুরাকালে হয় একত্র ছিলেন বা তাঁহাদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান ছিল। কেন বা কি করিয়া দেবকল্পনা হইল এ-প্রকার বিচারে তাহা নির্ধারিত হয় না। 'ইন্দ' ধাতুর অর্থ 'বর্ষণ' অতএব বর্ষণের দেবতার নাম হইল 'ইন্দ্র', ইহাও সূক্তি নহে। প্রথমত ভারতীয় নিরুক্তিকারগণের মতে ইন্দ ধাতু মুখ্যতঃ ঐশ্বর্যবাচক। 'ইন্দতেবৈশ্বর্যকর্মনঃ।' ইন্দ্রের দেবত্ব নিষ্পন্ন হইবার পর ইন্দ ধাতুর নানা প্রকার অর্থ আসিয়াছে। ইন্দ্র শব্দের বিভিন্ন নিরুক্তির জন্য নিরুক্ত ১০।৮ এবং সায়ণ ১।৩।৪ দ্রষ্টব্য। ইন্দ ধাতুর মুখ্যার্থ বর্ষণ এ কথা নিরুক্তে নাই। নিরুক্তে দান, পোষণ, বিদারণ, দ্রবণ ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। ইন্দ ধাতুর অর্থ বর্ষণ মানিয়া লইলেও আপত্তি উঠিবে যে এই অর্থ ইন্দ্রকে বর্ষণের দেব বলিয়া কল্পনা করিবার পর নির্দিষ্ট হইয়াছে। আদিতে অপর কোন কারণে ইন্দ্র জলদাতা রূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, পরে ইন্দ ধাতুর অর্থ বর্ষণ হইয়াছে। ইংরেজীতেও এরূপ প্রয়োগ আছে, যথা, mesmerize, boycott, macadamize, galvanize ইত্যাদি। সূর্য বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তু কি করিয়া দেবরূপে পরিচিত হইল তাহা পরে নির্দেশ করিয়াছি। কি কারণে বজ্র ইন্দ্রের আয়ুধ হইল তাহাও পরে বিচার করিব।

৪। ইন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতা যে প্রাকৃতিক রূপক মাত্র ঋক্‌সূক্ত-পাঠে তাহা বুঝা যায়, অনেকে এ-কথা বলেন। ইঁহারা জ্যোতিষিক বা আন্তরীক্ষ ব্যাপার হিসাবেই সূক্তগুলির ব্যাখ্যা করেন। রূপক ব্যাখ্যার বিশেষ এই যে ইহার সাহায্যে সকল বস্তু বা ব্যাপারেরই স্বাভাবিক অর্থ উল্টাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। রূপকের অসাধ্য কিছুই নাই। রূপক ব্যাখ্যা সম্ভব বলিয়া বিষয় রূপক-হিসাবে লিখিত হইয়াছিল এ-যুক্তি অসার। ইন্দ্রস্তুতিতে সর্বত্র প্রাকৃতিক রূপকের সন্ধান করিতে যাইয়া বহু শব্দের কষ্টকল্পিত অর্থ করিতে হইয়াছে। যথা—বৃত্র অর্থে মেঘ, পর্বত অর্থেও মেঘ ইত্যাদি। যে-যে স্থলে ইন্দ্রকে সেনানায়ক, সম্রাট, শ্মশ্রুধারী, সুনাসিক প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে রূপক অর্থ করা অতি কষ্টসাধ্য। ইন্দ্রকে ঋষি গো-দাতাই বা কেন বলিতেছেন? ইন্দ্রের অশ্ব আছে এ-কথারই বা অর্থ কি? ঋক্‌সমূহ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে যে-কেহ দেখিতে পাইবেন, যে সর্বত্র রূপক ব্যাখ্যা সুসঙ্গত নহে। যদি অনুমান করা যায়, যে, প্রাকৃতিক দ্যোতক সত্তাকে দেব-রূপ দিতে যাইয়া তাহাকে দেহধারী কল্পনা করা হইয়াছিল, তাহা হইলেও ইন্দ্রে বিশেষ বিশেষ গুণগ্রাম কেন আরোপিত হইয়াছে, তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

ইন্দ্রের পঞ্চমূর্তি।—ইন্দ্র-সম্বন্ধীয় সূক্তগুলি পাঠ করিলে দেখা যায় যে ইন্দ্র

(ক) কখনও আকাশবাসী জ্যোতিষিক দেবরূপে উপাসিত হইতেছেন। যথা—

হে মনুষ্যগণ! (সূর্যারূপ ইন্দ্র) (নিদ্রায়) সংজ্ঞারহিতকে সংজ্ঞা দান করিয়া (অন্ধকারে) রূপরহিতকে রূপ দান করিয়া জ্বলন্ত রশ্মির সহিত উদিত হইতেছেন॥ ঋ। ১ম।৬।৩।

(খ) কখনও বা ইন্দ্রকে অন্তরীক্ষবাসী আবহ দেবতা বলা হইতেছে। যথা—

হে সর্বফলদাতঃ, হে বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্র! তুমি আমাদের জন্য ঐ মেঘ উদ্‌ঘাটন করিয়া দাও, তুমি আমাদের যাচ্ঞা কখনও অগ্রাহ্য কর নাই। ॥ঋ।১ম।৭।৬।

(গ) কখনও বা ইন্দ্রকে ইলাবৃতবাসী নররূপে আবাহন করা হইয়াছে। যথা—

হে বায়ু ও ইন্দ্র! অভিষবকারী যজমানের অভিষুত সোমরসের নিকট আইস; হে নরদ্বয়! এই কর্ম ত্বরায় সম্পন্ন হইবে। ॥ঋ।১ম।২।৬।

যুবা মেধাবী প্রভূতবলসম্পন্ন সকল কর্মের ধর্তা, বজ্রযুক্ত, ও বহু স্তুতিভাজন ইন্দ্র (অসুরদিগের) নগরবিদারকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ॥ঋ।১ম।১১।৪।

বাহুল্যভয়ে আরও উদ্ধৃতি দিলাম না। 'হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্র!' 'হে সোমপায়ী ইন্দ্র!' 'সম্রাট ইন্দ্র!' ইত্যাদি নরোচিত বর্ণনার প্রাচুর্য ঋক্‌সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঘ) নিরুক্তকার যাস্ক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দেবতা হিসাবে মন্ত্রের প্রকারভেদ নির্দেশ করিয়াছেন। ইন্দ্র কখনও বা মঙ্গলকারী অদৃশ্য দেব রূপেও পূজিত হইতেছেন। যথা—

...ন আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করুন, তিনি ধন প্রদান করুন, তিনি স্ত্রী প্রদান করুন, তিনি অন্ন লইয়া আমাদের সমীপে আগমন করুন। ।ঋ৷১ম৷৫৷৩॥

এই পৃথিবীতে অথবা আকাশ হইতে অথবা অন্তরীক্ষ হইতে ধন-দানের জন্য ইন্দ্রের নিকট যাচ্ঞা করি। ।ঋ৷১ম৷৬৷১০॥

এবং (৬) কখনও বা ইন্দ্র পরমদেবরূপে স্তুত হইয়াছেন। যথা—

ভিন্ন ভিন্ন ফলদাতা ভিন্ন ভিন্ন দেবতা সম্বন্ধে যে স্তুতিবাক্য প্রয়োগ উৎকৃষ্ট যে সমস্ত স্তোত্রই বজ্রধারী ইন্দ্রের তাঁহার যোগ্য স্তুতি আমি জানি না। ।ঋ৷১ম৷৭৷৭॥

ইন্দ্র (স্বীয় তেজের দ্বারা) পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পরিপূরিত করিয়াছেন; দ্যুলোকে উজ্জ্বল নক্ষত্রসকল স্থাপিত করিয়াছেন হে ইন্দ্র। তোমার ন্যায় কেহ উৎপন্ন হয় নাই, কেহ হইবে না তুমি বিশেষরূপে সমস্ত জগৎ ধারণ কর।

হে ইন্দ্র! তুমি সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি ॥ঋ৷১০ম৷১৪৪৷১॥

বেদ ও পুরাণ।— ইন্দ্রের এই পাঁচ মূর্তির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পাইলে বৈদিক দেবতত্ত্ব রহস্যাবৃত থাকিবে। বিদেশী পণ্ডিত বেদের তাৎপর্য না বুঝিয়া বেদের একদেশী অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেবল বিদেশী পণ্ডিতদের হস্তেই বেদ লাঞ্ছিত হইয়াছেন এমন নহে। এ-দেশেও যুগে যুগে বেদের অসদ্ব্যাখ্যা দেখা গিয়াছে। কোন্ সূত্র অবলম্বন করিলে বেদের যথার্থ তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইবে তাহা অনুসন্ধান-যোগ্য। বায়ুপুরাণে কথিত হইয়াছে,—

যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ।
ন চেৎ পুরাণং সংবিদ্যান্নৈব স স্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥১৷১৯৯,২০০॥

অর্থাৎ, যাঁহার পুরাণের জ্ঞান নাই অথচ যিনি সাঙ্গোপনিষদ চতুর্বেদ জানেন তিনি বিচক্ষণ নহেন। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদজ্ঞান সম্পূর্ণ বা বর্দ্ধিত করিতে হয় নচেৎ এরূপ অল্পজ্ঞ ব্যক্তি হইতে বেদ ভীত হন যে ইনি আমাকে প্রহার করিবেন।

পুরাণ ও ইতিহাসেই বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিবার সূত্র নিহিত আছে। পুরাণে সকল বৈদিক দেবেরই সন্ধান পাওয়া যাইবে। আমি প্রধানতঃ ইন্দ্রতত্ত্ব বিচার করিব। পুরাণে দেখা যায় যে 'ইন্দ্র' ইলাবৃতবর্ষ নামক ভূভাগের সম্রাটগণের সাধারণ নাম। এখনকার Kaiser বা Czar শব্দের অনুরূপ 'ইন্দ্র' শব্দ। ইন্দ্র এক জন নহে। ইলাবৃতবর্ষে পর পর যে-সকল ব্যক্তি সম্রাট হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই ইন্দ্র নামে পরিচিত। বিশেষ বিশেষ পরাক্রান্ত ইন্দ্রগণের নাম পুরাণে পাওয়া যায়। ইলাবৃতবর্ষের অপর নাম স্বর্গ। এই স্বর্গ ভৌম স্বর্গ। কি করিয়া ভৌম স্বর্গের রাজা ইন্দ্র পুণ্যাত্মা প্রেতগণের আবাসস্থান আকাশস্থিত স্বর্গের দেবরূপে কল্পিত হইলেন তাহা পরে বিচার করিতেছি। প্রথমে পুরাণে ইন্দ্রগণ সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে তাহা উদ্ধার করিয়া পরে ইন্দ্রের দেবত্ব আলোচনা করিব।

দেব ও অসুরদিগের বাসভূমি ইলাবৃতবর্ষ।— পুরাণান্তর্গত ভৌগোলিক বিবরণে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় হিমালয়। হিমালয়ের উত্তরে এবং হেমকূট পর্বতমালার দক্ষিণে কিম্পুরুষবর্ষ। হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ। হরিবর্ষের উত্তর সীমা নিষধ পর্বত। নিষধের উত্তরে ইলাবৃতবর্ষ। ইলাবৃতের উত্তর সীমা নীলাচল। এই সকল পর্বতের অবস্থান সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার না করিয়াও মোটামুটি বলা যায় যে ইলাবৃতবর্ষ মধ্য এসিয়ায় অবস্থিত। সম্ভবতঃ পূর্ব-তুর্কীস্থান ইলাবৃতবর্ষের অন্তর্গত। পুরাকালে এই ইলাবৃতবর্ষ অতি সমৃদ্ধ প্রদেশ ছিল। অনুমান হয় ক্রমে এই প্রদেশের নদনদী শুষ্ক হইয়া তথাকার সভ্যতা লুপ্ত হয়। জলাভাব আরম্ভ হওয়ার জন্যই হউক বা অপর কোন কারণেই হউক ইলাবৃতবর্ষ হইতে তত্রস্থ অধিবাসিগণ ভারতে আসিয়া রাজ্য বিস্তার করিতে থাকেন। ইলাবৃতবর্ষের অধিবাসিগণ আর্য-জাতীয় ছিলেন। কালবশে তাঁহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়েন। এক দল নিজেদের দেব ও অপর দল নিজেদের অসুর বলিতেন। অসুরগণ দেবগণের জ্ঞাতি ও বন্ধু ছিলেন একথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৩২।১১ শ্লোকে কথিত হইয়াছে। এই অসুরগণ এসিরিয়াবাসী অসুরগণ হইতে ভিন্ন। এসিরিয়া-বাসী জাতিতে সেমেটিক। ইলাবৃতবর্ষ যে দেববাসভূমি পুরাণে তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। ইলাবৃতবর্ষস্থিত মেরু-পর্বতের (এই মেরু পৃথিবীর অক্ষপ্রান্ত মেরু নহে) উপর ইন্দ্রাদি দেবগণের পুরী ছিল। "বেদ বেদাঙ্গবিদ্‌গণ নাকপৃষ্ঠ, দিব, স্বর্গ ইত্যাদি পর্যায়বাচক শব্দে মেরুমহিমা কীর্তন করেন।" "এই গিরিতেই দেবলোক বিরাজিত সমস্ত শ্রুতি বা বেদে কথিত আছে।" "দেবলোকো গিরৌ তস্মিন্ সর্বশ্রুতিষু গীয়তে॥" বায়ু।৩৪।৯৪—॥ মৎস্যপুরাণ বলিতেছেন, "যেখানে বলি যজ্ঞ করিয়াছিলেন সেই সুবিস্তৃত প্রদেশ ইলাবৃতবর্ষ নামে খ্যাত। এই স্থান দেবগণের জন্মভূমি বলিয়া তিন লোকে বিখ্যাত। দেবদিগের বিবাহ, যজ্ঞ, জাতকর্ম, কন্যাদান প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ এই প্রদেশেই অনুষ্ঠিত হয়।" ॥ মৎস্য।১৩১৷২,৩॥

ইলাবৃতবর্ষাধিপতি ইন্দ্রগণ।—যে-কেহ ইলাবৃতবর্ষ বা স্বর্গরাজ্যের অধিপতি হইতেন তিনিই ইন্দ্র বলিয়া পরিচিত হইতেন। বলি অসুর হইয়াও ইন্দ্র হইয়াছিলেন। অনুমান হয় ভারতে যে আর্য দেবজাতির শাখা প্রথমে আসেন তাঁহারা বহুদিন যাবৎ ইন্দ্রের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। সম্রাট ইন্দ্রের প্রতিভূগণ ভারত শাসন করিতেন। এই প্রতিভূগণের

সাধারণ নাম মনু। মনুর অধীন ভারতবাসী দেবগণ 'মানব' বা 'মনুষ্য' নামে পরিচিত হইলেন। এই প্রকারে দেব ও মানবের প্রভেদ উৎপন্ন হইয়াছিল। পুরাণে লিখিত আছে, হিরণ্যকশিপুর ইন্দ্রত্বকালে দেবগণ মানুষী তনু ধারণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহারা ভারতে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে মনুবংশীয়গণ ক্রমে পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন ও বেণ নিজেকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এ সমস্তই বহু প্রাচীন কালের ঘটনা। বেণের পর পৃথু ভারতে সম্রাট হইয়াছিলেন। পৃথু সম্বন্ধে পুরাণে আছে তিনি অরিচক্র বিদারণ করিয়া অব্যাহত ভাবে সমস্ত লোকে বিচরণ করিতেন। পৃথুর কালে ভারতে প্রকৃত রাজ্য স্থাপনা হয়। তিনি নগরাদি নির্মাণ করেন, কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতি করেন এবং রাজার উপযুক্ত সমস্ত কর্মভার গ্রহণ করেন।

পৃথুর পরবর্তী কাল হইতে ভারতীয় রাজগণের সহিত ইলাবৃতরাজ ইন্দ্রগণের কখন বন্ধুত্ব কখন বৈর দেখা গিয়াছে। দেবাসুর-সংগ্রামে ভারতীয় নৃপতিরা অনেক সময় দেবপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন। রজি নামক এক ভারতীয় রাজার নিকট একবার দেবাসুর উভয় পক্ষ সাহায্যার্থী হইয়া দূত প্রেরণ করিলেন। রজি অসুরদের বলিলেন, আমি দেবদিগকে পরাজিত করিব কিন্তু আমিই ইন্দ্র হইব। এই সর্তে তোমরা রাজী থাকিলে তোমাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। 'ইন্দ্রো ভবামি ধর্মাত্মা ততো যোৎস্যামি সংযুগে'। অসুরগণ বলিল, 'প্রহ্লাদ আমাদের ইন্দ্র, আমরা তাঁহার জন্যই যুদ্ধ করি'। তখন দেবপক্ষ বলিলেন, 'আপনি সকলকে জয় করিয়া ইন্দ্র হইবেন আমাদের আপত্তি নাই'। রজি যুদ্ধে অসুরদিগকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্র হইলেন। পরে দেবদিগের ইন্দ্র তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া রজির নিকট হইতে নিজ রাজ্য চাহিয়া লইলেন। রজির মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ রজির আশ্রিত ইন্দ্রকে তাড়াইয়া নিজেরা ইন্দ্র হইলেন। দেবরাজকে বহু কষ্টে নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে হইয়াছিল॥ বায়ু। ৯২।৭৫॥ ঋ। ৬ম।২৬।৬॥

ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা পরঞ্জয়ও ইন্দ্রপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রকে পরঞ্জয়ের প্রতি প্রভূর উপযুক্ত সম্মান দেখাইতে হইয়াছিল। রাজা নহুষ কিছুদিন ইন্দ্রত্ব করিয়াছিলেন। নহুষ, রজি প্রভৃতির বহুকাল পূর্বে শিবিরাজা ইন্দ্র হইয়াছিলেন। প্রধান প্রধান ইন্দ্রগণের নাম পুরাণে ধৃত হইয়াছে, যথা, বিপশ্চিত, সুশান্তি, শিবি, বিভু, মনোজব, পুরন্দর, বলি ইত্যাদি॥ বিষ্ণু।৩।১॥ ঋগ্বেদে এই পুরন্দর ইন্দ্রের উদ্দেশে বহু স্তব দেখা যায়।

ভারতে আর্যরাজ্য বিস্তার।—অনুমান হয় দেবগণ তুর্কীস্থান-কাশ্মীরের পথে প্রথমে ভারতে আসেন। তাঁহারা কাশ্মীর হইতে পঞ্জাব ও পঞ্জাব হইতে বিন্ধ্য প্রদেশ পর্যন্ত ক্রমে অধিকার করেন। তৎপরে বিন্ধ্য দক্ষিণেও আর্যগণ রাজ্যবিস্তার করেন। পরবর্তী পাঠান, মোগল ও ইংরেজ রাজত্ব যেরূপ দ্রুত বিস্তৃত হইয়া সমস্ত ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছে আর্যগণও তদ্রূপ দ্রুতই সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। পুরাণ আলোচনায় দেখা যায় যে দক্ষিণাপথে আর্যরাজ্য বহু প্রাচীন। ইলাবৃতবর্ষ, কাশ্মীর, বিন্ধ্যোত্তর, ভারত ও দক্ষিণাপথ পর্যায়ক্রমে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, মর্ত ও পাতাল নামে পুরাণে পরিচিত আছে। ভারতীয়গণের পূর্বপুরুষগণ প্রথমে কাশ্মীরে বা অন্তরীক্ষে আসিয়া বসবাস করেন বলিয়া অন্তরীক্ষের অপর নাম পিতৃলোক। অন্তরীক্ষ অর্থে মধ্যবর্তী দেশ। পরবর্তী কালে কোনও এক ইন্দ্র সামরিক উদ্দেশ্যে স্বর্গপথ অর্থাৎ কাশ্মীর-তুর্কীস্থান পথ পাহাড় ফেলিয়া বন্ধ করিয়া দেন। মৎস্য-পুরাণে আছে, যখন হইতে হীনচেতা ইন্দ্র বজ্রদ্বারা স্বর্গপথ রোধ করেন তখন হইতেই লোকসকলের স্বর্গমার্গ নিবারিত হইয়াছে। ১৯১।১০॥ এই পথ রুদ্ধ হইলে বদরীনারায়ণ ও মানস-সরোবরের পথে ভারতীয়গণ স্বর্গে যাইতেন। তখন স্বর্গ ও মর্তের মধ্যবর্তী এই সকল পার্বত্যপ্রদেশও অন্তরীক্ষ নাম পাইয়াছিল। দেবলোক, পিতৃলোক ও মর্তলোক অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষ, কাশ্মীর ও উত্তর-ভারত প্রাচীনকালে আরও তিন নামে পরিচিত ছিল, যথা—ইলা, সরস্বতী ও ভারতী। একাধিক ঋক্‌সূক্তে এই তিন নাম পাওয়া যায়। এই তিন প্রদেশেরই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাক্‌দেবতা নামে পরিচিত॥ ঋ। ৭ম। ২। ৮॥ ইত্যাদি

ইন্দ্রের সেনানায়ক, মরুদ্‌গণ।—ইন্দ্র সম্বন্ধে পুরাণে আরও জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের অনুচর ছিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় একোনপঞ্চাশৎ। "দেবা একোন-পঞ্চাশৎ সহায়া বজ্রপাণিনঃ॥ বি।১।১১।৪০॥ ঋ।৬ম।১৭।৮॥ ৮।২।৩৬॥ অনুমান হয় ইন্দ্রের যে মহতী সেনা ছিল তাহা আদিতে সপ্ত নায়কের অধীন ছিল। এই সেনানায়কগণের সাধারণ নাম মরুৎ। মরুদ্‌গণকে 'অতিবেগিণঃ' বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে। ইন্দ্র এবং মরুদ্‌গণ অশ্বারোহী, উষ্ণীষ ও বর্মধারী ছিলেন। এই বর্ম ধাতব। ঋ।৭ম।২৫।৩।৫॥ ৫৩।৪॥ ৫। ৫৪।১১॥৫।৫৪।৬॥ ৮।৭।২৫॥ ৮।২০।২২॥ জাম্বুনদ স্বর্ণ হইতে এই বর্ম প্রস্তুত হইত। পরে ইন্দ্রসেনার এক এক বিভাগ সপ্ত সপ্ত গণে পুনরায় বিভক্ত হইয়া মোট ৪৯ বিভাগ করা হয়। প্রত্যেক বিভাগের অধিনায়ক এক এক জন মরুৎ হওয়ায় মরুদ্‌গণের সংখ্যাও একোনপঞ্চাশ হয়। বায়ু-পুরাণ-পাঠে মনে হয় অসুরগণের দল হইতে ইন্দ্র তাঁহাদের সেনানায়কগণকে প্রলোভন দেখাইয়া নিজ দলে নিযুক্ত

করিয়াছিলেন। ইন্দ্র বলিয়াছিলেন, এই মরুদ্‌গণ অসুরদল-ভুক্ত হইলেও দেবসম্মত এবং দেবভূত হইয়া যজ্ঞভাগভোজী হইবেন ॥বা।৬৭।১৩২—॥ বেদে কথিত হইয়াছে ইন্দ্রের সৈন্য আকাশের ন্যায় প্রভূত ॥ ঋ।১ম।৮।৫॥ দেবগণের সংখ্যা তেত্রিশ কোটি এ-কথা পুরাণে প্রসিদ্ধ। এই সকল উক্তি হইতে বুঝা যায় যে ইলাবৃতবর্ষ পুরাকালে অতি জনাকীর্ণ প্রদেশ ছিল। ইন্দ্রগণ বৃত্রবধের পর আট যুগ যাবৎ রাজত্ব করিয়াছিলেন ॥ স্কন্দ। নাগর।৮।১১৯॥

বৃত্র।—ইন্দ্র বৃত্রহন্তা নামে পরিচিত। স্কন্দপুরাণ নাগরখণ্ড অষ্টম অধ্যায়ে বৃত্রের বর্ণনা আছে। বৃত্রকে হিরণ্যকশিপুর কন্যা রমা ও মহর্ষি ত্বষ্টার সুত বলা হইয়াছে। পুরাণে একাধিক ত্বষ্টার নাম আছে। বৃত্রপিতা ত্বষ্টা কোন্ ত্বষ্টা তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। ইন্দ্র ত্বষ্টাপুত্রকে নিহত করেন ঋগ্বেদেও এ-কথা আছে ॥ ঋ।১০ম।৮।৯॥ বৃত্র তদানীন্তন ইন্দ্রকে যুদ্ধে অষ্টাদশ বার পরাজিত করেন এবং স্বয়ং ইন্দ্র হন। ঋগ্বেদেও দেখা যায় ইন্দ্র বৃত্রের নিকট পরাজিত হইয়া নদনদী অতিক্রম করিয়া পলাইয়াছিলেন ॥ ঋ।১ম।৩২।১৪॥ পরে ত্বষ্টা (ইনি নিশ্চয় বৃত্রপিতা ত্বষ্টা নহেন) ইন্দ্রকে বজ্র নির্মাণ করিয়া দিলে ইন্দ্র তদ্বারা বৃত্রকে হনন করেন।

বজ্র।—বজ্র ইন্দ্রের আয়ুধ। এ অস্ত্র অপর কাহারও ছিল না। বজ্র কি প্রকার অস্ত্র ছিল সে-সম্বন্ধে পুরাণে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। বজ্র মোচন কালে তাহা হইতে শব্দ হইত এবং অগ্নি নির্গত হইত। ইন্দ্র যখন আন্তরীক্ষ দেবতা কল্পিত হইলেন, তখন ইন্দ্রের বজ্র গুণসাম্যে মেঘের বজ্রে পরিণত হইল। কি করিয়া এ পরিবর্তন ঘটিল পরে দিবি আরোহণ প্রসঙ্গে তাহা আলোচনা করিয়াছি। ইন্দ্রের বজ্র বন্দুকের ন্যায় কোন অস্ত্র ছিল বলিয়া মনে হয়। ঋগ্বেদে বজ্রকে সুদূরপাতী বলা হইয়াছে। বজ্র-সম্বন্ধীয় পৌরাণিক বৃত্তান্ত পাঠে অনুমান হয় কোন প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর দীর্ঘ অস্থি বজ্রাস্ত্রে বন্দুকের নলের ন্যায় ব্যবহৃত হইত। সম্ভবত ত্বষ্টা বারুদ করিতে জানিতেন। দীর্ঘ নালিক অস্থির মধ্যে ধাতুখণ্ড ও প্রস্তরাদি ভরিয়া বারুদ সাহায্যে তাহা ছোড়া হইত। এইরূপ অস্থিনির্মিত বজ্র মোচন আঘাতকারীর পক্ষেও বিপদজনক। স্কন্দপুরাণে আছে ইন্দ্র ভয়যুক্ত হইয়া কম্পিতকায়ে দূর হইতে বৃত্রকে বজ্রাঘাত করিয়াই পলাইয়াছিলেন। বৃত্র যে বজ্রাঘাতে মরিয়াছে তিনি তাহা জানিতে পর্যন্ত পারেন নাই। অপর দেবগণ তাঁহাকে সে সংবাদ দিয়াছিল। বজ্র যে অস্থিনির্মিত নালিক যন্ত্রবিশেষ ছিল তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে।

ইন্দ্র বৃত্রবধে হতাশ হইয়া বিষ্ণুর সহিত পরামর্শ করিতে গিয়াছেন। বিষ্ণু বলিলেন,

> অবধ্য সর্ব্ব শস্ত্রাণাং স কৃতঃ শূলপাণিনা।
> তস্মাদস্থিময়ং বজ্রং তদ্বধার্থ নিরূপয় ॥

ইন্দ্র উবাচ,

> অস্থিভিঃ কস্য জীবস্য বজ্রং দেব ভবিষ্যতি।
> গজস্য শরভস্যাথ কিং বান্যস্য বদস্ব মে ॥

বিষ্ণুরুবাচ,

> শতহস্ত প্রমাণং তৎ ষড়স্রি চ সুরাধিপ।
> মধ্যে ক্ষামন্তু পার্শ্বাভ্যাং স্থূলং রৌদ্রসমাকৃতি ॥

ইন্দ্র উবাচ,

> ন তাদৃগ্ দৃশ্যতে সত্ত্বং ত্রৈলোক্যেঽপি সুরেশ্বর।
> যস্যাস্থিভির্বিধিয়তে বজ্রমেবংবিধাকৃতি ॥"

স্কন্দ।নাগর।৮।৭২ ৭৫॥

অর্থাৎ,—সে (বৃত্র) শূলপাণি কর্তৃক সকল শস্ত্রের অবধ্য হইয়াছে সে জন্য অস্থিময় বজ্রের দ্বারা তাহার বধের ব্যবস্থা কর। ইন্দ্র বলিলেন, হে দেব, কোন্ জীবের অস্থির দ্বারা বজ্র প্রস্তুত হইবে? গজ, শরভ কিংবা অন্য কোন জন্তুর অস্থি আবশ্যক তাহা আমাকে বলুন। বিষ্ণু বলিলেন, হে সুরাধিপ তাহা শতহস্তপ্রমাণ, মধ্যে ক্ষীণ, দুই পার্শ্বে স্থূল এবং ছয় কোণ যুক্ত (ছয় পল যুক্ত) ও ভীষণাকৃতি হওয় চাই। ইন্দ্র বলিলেন, হে সুরেশ্বর, এই ত্রৈলোক্য মধ্যে এমন কোন প্রাণীই দেখি না যাহার অস্থিতে আপনার নির্দেশ মত বজ্র তৈয়ারি হইতে পারে।

বিষ্ণু বলিলেন, সরস্বতী-তীরে দধীচি নামে পরম তপোযুক্ত এক বিপ্র আছেন। তিনি ইহার দ্বিগুণ দীর্ঘ। তখন ইন্দ্র সন্ধান করিয়া দধীচিকে পাইলেন এবং তাঁহার নিকট অস্থি প্রার্থনা করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন, "বৃত্র শতহস্তপ্রমাণ কোন জীবের অস্থিনির্মিত বজ্রদ্বারা বধ্য হইবেন এবং হে ব্রাহ্মণ আপনি ভিন্ন তাদৃশ কোন জীব নাই।" পৌরাণিক অতিরঞ্জনের ধারা অবধান করিলে বুঝা যাইবে যে শতহস্ত-পরিমাণ জীবের অস্থি দধীচি মুনির অস্থি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যে জীবের অস্থির দ্বারা বজ্র নির্মিত হইয়াছিল তাহার মস্তকের কঙ্কাল অশ্ব-মস্তকের অস্থির ন্যায় দেখিতে ছিল। ঋ।১ম।৮৪।১৪ ঋকে আছে, পর্ব্বতে লুক্কায়িত (দধীচির) অশ্ব-মস্তক পাইবার ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্র সেই মস্তক শর্য্যণাবৎ (সরোবরে) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বেদে বজ্রকে প্রকাণ্ড, শতপর্ব, চারি পলযুক্ত বলা হইয়াছে ॥ঋ।৪ম।২২।২॥ ৮ম।৬।৬। ৫ম।৩২।২॥ ৮ম।৭৬।২॥ ৮।৮৯।৩॥ ইলাবৃতবর্ষে অর্থাৎ পূর্ব তুর্কীস্থান এবং তন্নিকটস্থ প্রদেশে এখন পর্যন্ত প্রাগৈতিহাসিক জীবের কঙ্কাল পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন যে চীনদেশে প্রথমে বারুদ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। চীনদেশের পৌরাণিক নাম ভদ্রাশ্ববর্ষ। ভদ্রাশ্ববর্ষ ইলাবৃতবর্ষসংলগ্ন। ইলাবৃতবাসী ত্বষ্টার বারুদের জ্ঞান অনুমান করা অসম্ভব কল্পনা নহে।

সমস্ত পুরাণগুলি উত্তমরূপে পর্যালোচনা করিলে বৈদিক দেবগণ সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে সন্দেহ নাই। এই প্রবন্ধে বৈদিক দেবগণের কাল নিরূপণের কোনও চেষ্টা করি নাই। পৌরাণিক কাল মাপনার সূত্র জানা

থাকিলে পুরাণসাহায্যে পুরন্দর প্রভৃতি ইন্দ্রের কাল নির্ণয় করা সম্ভব। যাঁহারা এ-বিষয়ে কৌতূহলী তাঁহাদিগকে 'পুরাণপ্রবেশ' দেখিতে অনুরোধ করি।

যজ্ঞ ও বেদসূক্ত।—ইলাবৃতবাসী নরগণ দেব বলিয়া পরিচিত ছিলেন সত্য কিন্তু ইহাতে ঋগ্বেদের ইন্দ্রের যে পঞ্চমূর্তি আমরা দেখিয়াছি তাহার সম্যক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কি করিয়া নরেন্দ্র ইন্দ্রের দেবত্ব হইল তাহার সূত্রও পুরাণে পাওয়া যায়। সম্রাট ইন্দ্র নরেন্দ্ররূপে সাধারণের সম্মান পাইতেন। এখন যেমন বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ রাজা বা রাজপ্রতিভূকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ করেন এবং তদুপলক্ষে নানা উৎসবের অনুষ্ঠান করেন এবং 'সম্মানার্হ অতিথি'কে (honoured guest) মানপত্র প্রদান করেন পূর্বেও লোকে ঠিক সেই ভাবে ইন্দ্রাদি নরপতিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া অভ্যর্থনা করিত। এই অভ্যর্থনার নাম ছিল 'যজ্ঞ'। সম্মানার্হ অতিথির নাম ছিল 'যজ্ঞপুরুষ'। তখন সোম পান করান বিশিষ্ট সম্মান-প্রদর্শনের নিদর্শন ছিল। সর্বাগ্রে যজ্ঞপুরুষকে সোম নিবেদন করিয়া অভ্যাগতগণের মধ্যে তাহা বিতরণ করা হইত। এই উদ্দেশ্যে কলস কলস সোমরস প্রস্তুত হইত। সোম বহুমূল্য ছিল। শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহু প্রমাণ বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন যে সোম ও 'সিদ্ধি' বা ভাঙ একই পদার্থ। আয়ুর্বেদের সোমলতা বৈদিক সোম নহে। যজ্ঞে মাংসাদি নানা প্রকার ভূরি ভোজনেরও ব্যবস্থা থাকিত। যজ্ঞোদ্দেশ্যে যজ্ঞকর্তাকে বিবিধ ভোজ্য বা অন্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইত। যজ্ঞ হইতেছে সন্ধান পাইয়া অনেক সময় দুর্বৃত্তগণ যজ্ঞদ্রব্য লুটপাট করিয়া লইত। এই সকল যজ্ঞবিঘ্নকারীকে রাক্ষস বলা হইত। আমরা এখন গুণ্ডা ডাকাত বলিলে যাহা বুঝি রাক্ষস তাহাই॥ পুরাণপ্রবেশ। ২৬০ পৃ. দ্রষ্টব্য॥ যজ্ঞকর্তাকে রাক্ষস-নিবারণের ব্যবস্থা করিতে হইত।

এখন যেমন মানপত্রে পূজ্য ব্যক্তির কীর্তিকলাপ বর্ণিত হয় তখনও ঐরূপ যজ্ঞপুরুষের উদ্দেশে রচিত স্তুতিতে তাহার বিশিষ্ট গুণাবলি ও কীর্তির উল্লেখ থাকিত। ইন্দ্রের স্তুতিতে ঋষি প্রায়ই বলিতেছেন, 'হে ইন্দ্র আমি তোমার কীর্তিসমূহ বর্ণন করিতেছি'। কোন গবর্নরের উদ্দেশে লিখিত বিভিন্ন মানপত্র দেখিয়া যেমন ইতিবৃত্তকার বলিতে পারেন তিনি কি কি কর্ম করিয়াছেন, তদ্রূপ ইন্দ্রসূক্তগুলি বিচার করিলেও ইলাবৃতবাসী ইন্দ্রগণের কীর্তিকলাপ জানিতে পারা যায়। ঋগ্বেদ ইতিবৃত্ত না হইলেও এজন্য ঋক্‌সূক্ত হইতে কিছু কিছু প্রাচীন ইতিবৃত্ত উদ্ধার করা সম্ভব। ইন্দ্রের বিশিষ্ট কীর্তি পরে আলোচনা করিয়াছি।

যজ্ঞের পরিণতি।—বৃত্রবধের পর অষ্টযুগ যাবৎ ... রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে ইন্দ্র লুপ্ত হইলেও ইন্দ্রযজ্ঞ লোপ পায় নাই। পরবর্তী কালে ইন্দ্র না থাকিলেও যজ্ঞাগ্নিতে ইন্দ্রের নামে আহুতি দেওয়া হইত; যজ্ঞ তখন আর অভ্যর্থনা-উৎসব নহে, ইন্দ্রও প্রত্যক্ষ-দেব নহেন। ইন্দ্র অদৃশ্য-দেব বা আকাশ-দেব বা আন্তরীক্ষ-দেবে পরিণত হইয়াছেন। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রই পঞ্চমূর্তির মধ্যে আদি দেব। পরে অন্য চারি প্রকার দেবত্ব তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে এবং যজ্ঞের আদিম অর্থও পরিবর্তিত হইয়াছে। যে ভাবে ইন্দ্রের দেবত্বের ক্রমিক পরিণতি ঘটিয়াছিল অন্য দেবগণ সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য। পুরাণ এই ক্রমপরিণতির সূত্রের আভাস দিয়াছেন। পৌরাণিক দিবি আরোহণ ও অবতারতত্ত্ব বুঝিলে বৈদিক দেবতত্ত্ব সুগম হইবে।

দিব-আরোহণ তত্ত্ব।—বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে দ্বাদশাধ্যায়ে ধ্রুবের আখ্যানে কথিত আছে, ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া ধ্রুবকে কহিলেন, "হে ধ্রুব, সূর্য সোম বৃহস্পতি ইত্যাদি সপ্তর্ষি প্রভৃতি যে-সকল বিমানচারী সুরগণ আছেন তাঁহাদের সকলের উপর তোমার স্থান দিলাম।" পৌরাণিকগণ উত্তর দিক্‌কে ঊর্ধ্ব দিক্ বলিতেন। বৈমানিক জ্যোতিশ্চক্রের উত্তর অক্ষপ্রান্তই সর্বোচ্চ বিন্দু। ধ্রুবের স্থান এইখানে॥ পুরাণপ্রবেশ। ২৪২ পৃ.॥ মনুষ্যধ্রুবের ধ্রুব নক্ষত্রে স্থান হইল অর্থে নক্ষত্রের নাম ধ্রুবের নামানুসারে রাখা হইল। এখনও আমরা এই প্রথায় মনুষ্যনামানুযায়ী প্রাকৃতিক বস্তুর নামকরণ করিয়া থাকি, যথা—চন্দ্রস্থিত পর্বতকে কোপারনিকস্ বলা হয়, হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গের নাম এভারেষ্ট, ইত্যাদি। বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই এইরূপ নামকরণ। পৌরাণিকগণ আরও এক কারণে এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের নাম যাহাতে চিরস্থায়ী হইতে পারে তাহাও তাঁহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ভগবান ধ্রুবকে উপরিউক্ত বর দান করিয়া বলিলেন, "কেহ চতুর্যুগ পর্যন্ত স্থায়ী হয়, কেহ বা মন্বন্তর পর্যন্ত কিন্তু তুমি আমার বরে কল্পকাল পর্যন্ত (অর্থাৎ বিশ্বসংসার ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত) স্থায়ী হইবে। যে-সকল মনুষ্য সুসমাহিত হইয়া সায়ংপ্রাতঃ তোমার কথা কীর্তন করিবে তাহাদের মহৎ পুণ্য হইবে।...যে ধ্রুবের দিবি-আরোহণ স্মরণ করে সে স্বর্গলোকে মহিমা প্রাপ্ত হয়।"

জ্যোতিষ্কগণের নামকরণ।—পুরাণে বহু ব্যক্তির এরূপ দিবি-আরোহণ বর্ণিত হইয়াছে। পুরাকালে বিবস্বান নামে অতিপরাক্রান্ত এক গন্ধর্ব রাজা ছিলেন। গন্ধর্বগণ

ন্তরীক্ষ অর্থাৎ ইলাবৃত ও ভারতের মধ্যস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী জাতি। বৈবস্বত মনু, যম, যমী, সাবর্ণি মনু ও অশ্বিদয় বিবস্বানের সন্তান। বিবস্বান চাক্ষুষ মন্বন্তরে জন্মগ্রহণ করেন। মন্বন্তর কালজ্ঞাপক পৌরাণিক সঙ্কেত॥ পুরাণ-প্রবেশ॥ পরবর্তী বৈবস্বত মন্বন্তরে বিবস্বানের নামানুযায়ী সূর্যের নামকরণ হইয়াছিল॥ বায়ু। ৫৩।৭৯,১০৪॥ ফলে লোকে সূর্যকে কখনও বিবস্বান বলিয়াছে এবং বিবস্বানকে সূর্য বলিয়াছে। ইক্ষ্বাকু বিবস্বানের বংশধর। ইক্ষ্বাকু-বংশের এই কারণেই সূর্য-বংশ নাম হইয়াছে। ধর্মপুত্র ত্বিষিমান বসুর নামে চন্দ্রের নামকরণ হইয়াছিল। তদ্রূপ অসুর-যাজক ভার্গবের নামে শুক্র গ্রহের নামকরণ হইল। বুধ, বৃহস্পতি, প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রহগণ এইরূপে নিজ নিজ নাম পাইয়াছিল। সপ্তর্ষিমণ্ডলের নক্ষত্রগণের নামও এই প্রকারে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এই নামকরণের ফলে পরবর্তী কালে ধ্রুব, বিবস্বান, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তৎ তৎ নামীয় জ্যোতিষ্কগণের আগন্তুক অধিষ্ঠাতৃ-দেবরূপে কল্পিত হইতে লাগিলেন। এই কল্পিত অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ও জড়দ্যোতক অধিষ্ঠাতৃদেবতা ভিন্ন। সূর্য প্রভৃতি দেবতার স্তুতিকালে জড় ও নর উভয়ের গুণাবলি মিশ্রিত হইয়া গেল। সূর্যস্তবে যখন বলা হয়, "হে সূর্য, তুমি সপ্তাশ্বযুক্ত রথে আকাশে বিচরণ কর" তখন পৌরাণিক বিবরণের সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি যে নর বিবস্বান সপ্তাশ্ব রথে যাইতেন বলিয়াই সূর্য-সম্বন্ধে এই কল্পনা আসিয়াছে। আরও পরে জ্যোতিষিক রূপকের প্রভাবে আদিত্যের দ্বাদশ অর-বিশিষ্ট রথচক্র কল্পিত হইয়াছে॥ ঋ। ১ম। ১৬৪।১১॥ ঋক্‌সূক্তে যখন ইন্দ্রকে এতশ নামক ব্যক্তির সাহায্যকারী এবং সূর্যশক্র বলা হইয়াছে তখন সূর্য অর্থে নরপতি বিবস্বান এবং ইন্দ্র অর্থে ইলাবৃতপতি॥ ঋ। ৫ম।৩১।১॥ ৮।১।১১॥ বিবস্বান অন্তরীক্ষ প্রদেশের রাজা বলিয়া তাঁহাকে গন্ধর্ব বলা হইয়াছে। আবার ঋ। ৮ম।৯৩।৪ সূক্তে ইন্দ্রকেই সূর্য বলা হইয়াছে। ইন্দ্র এখানে আকাশস্থিত সূর্যের অধিষ্ঠাতা অদৃশ্য পরম দেব।

প্রত্যক্ষ ও অদৃশ্য দেবতা।—দিবি-আরোহণ হইলে ভৌমদেবতা আকাশে প্রত্যক্ষ হন। বিবস্বানের তিরোধানের পরও সূর্যরূপে বিবস্বান প্রত্যক্ষগোচর রহিলেন। সূর্যের ন্যায় মহৎ প্রাকৃতিক বস্তু স্বতঃই মনুষ্যের বিস্ময়ের পাত্র, তদুপরি অতি তেজস্বী বিবস্বান নরপতির গুণাবলি তাহার সহিত জড়িত হওয়ায় সূর্য স্তবনীয় হইলেন। হিন্দু কখনও বিশুদ্ধ জড়োপাসক (animist মাত্র ছিলেন না। হিন্দু জড়োপাসনা ও প্রতিমা-উপাসনায় প্রভেদ করেন। সূর্য যে জড়, হিন্দু তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। তাঁহার সূর্যোপাসনা আদিতে সূর্যাধিষ্ঠিত বিবস্বানের উপাসনা ছিল। সূর্য নিজে প্রত্যক্ষ হইলেও তাহার আগন্তুক অধিদেবতা অদৃশ্য। ক্রমে ভৌম প্রত্যক্ষ দেবতার উপাসনা অদৃশ্য দেবতার উপাসনায় পরিণত হইয়াছে। ভৌম ইলাবৃত-বর্ষও অনির্দিষ্ট উচ্চ স্থানে আকাশে অদৃশ্য স্বর্গরূপে কল্পিত হইয়াছে। দেবতা অদৃশ্য হইলে তাহাতে নানা গুণারোপ সম্ভব হয়। অদৃশ্য দেবতা ক্রমে পরম দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছে। ইন্দ্রের অদৃশ্যদেব রূপে উপাসনার ইহাই রহস্য। ইন্দ্র যখন প্রত্যক্ষ দেব ছিলেন তখন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সম্মান দেখান হইত, সোম ও ভোজ্যাদি নিবেদন করা হইত। ইন্দ্রের তিরোধান ঘটিলে সমস্ত দ্রব্যাদি অগ্নিতে অর্পণ করা হইত। অগ্নি হব্যবাহন অর্থাৎ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ভোজ্যাদি ধূমরূপে ঊর্ধে অদৃশ্য হইয়া যায় বলিয়া 'অগ্নি অদৃশ্য দেবতার নিকট ভোজ্য বহন করিয়া লইয়া যান' বলা চলে। আরও এক কারণে অগ্নির দেবত্ব কল্পিত হইয়াছিল। দেবসেনাপতিগণের মধ্যে কেহ অগ্নি নামে পরিচিত ছিলেন মনে হয়। মরুৎ যেমন বায়ু বলিয়া স্তবনীয় হইয়াছিলেন নর অগ্নিও সেইরূপ বহ্নিরূপে পূজনীয় হইয়াছিলেন। ঋ।১ম।৩১।১১ ঋকে আছে, 'হে অগ্নি দেবগণ প্রথমে তোমাকে মনুষ্যরূপধারী নহুষের মনুষ্যরূপধারী সেনাপতি করিয়াছিলেন।' অনুমান হয়, যখন নহুষ কিছু দিনের জন্য ইন্দ্রত্ব করিয়াছিলেন তখন তাঁহার যিনি সেনানায়ক ছিলেন তাঁহার নাম ছিল অগ্নি বা তদ্বাচক কোন শব্দ।

আকাশ, আন্তরীক্ষ ও ভৌম দেবতা।—নর অগ্নির বহ্নি রূপে পরিণতি বা মরুদ্‌গণের বায়ু রূপ ধারণ ঠিক দিবি-আরোহণ না হইলেও অনুরূপ প্রক্রিয়ায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। দিবি-আরোহণের মূলতত্ত্ব এই যে সম্মানার্হ ব্যক্তির নাম কোন মহৎ প্রাকৃতিক বস্তুতে অর্পিত হয়। আমরা যাহাকে পূজনীয় মনে করি সাধারণতঃ উচ্চে তাহার স্থান নির্দেশ করি। নিজ্ঞানমনোবিৎ জানেন উচ্চের ধারণা শ্রেষ্ঠতার ধারণার সহিত সংশ্লিষ্ট এবং নীচের ধারণা অপকৃষ্টতার সহিত জড়িত। এই জন্যই 'উচ্চমনা', 'নীচমনা' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় নচেৎ মন-সম্বন্ধে দেশবাচক উচ্চ, নীচ শব্দ প্রযোজ্য নহে। সভায় পূজনীয় ব্যক্তিগণের স্থান উচ্চ-ভূমিতেই নির্দিষ্ট হয়; ইত্যাদি। সকল অদৃশ্য সত্তার স্থান এই কারণেই গুণানুসারে উচ্চে বা নীচে কল্পিত হয়। কেবল যে জ্যোতিষ্কাদির নামকরণোপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দিবি আরোহণ হয় তাহা নহে। প্রধান ব্যক্তিগণের তিরোধান ঘটিলে গণমন তাঁহাদের আত্মার অবস্থান কোনও নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট উচ্চস্থানে বা কোনও মহৎ প্রাকৃতিক বস্তুতে কল্পনা করিয়া লয়। এই জন্য প্রেতপুণ্যাত্মাগণের বাসস্থান ঊর্ধে স্বর্গলোকে; পাপীরা মৃত্যুর পর কোন অনির্দিষ্ট নিম্নপ্রদেশস্থিত নরকে যায়। অদৃশ্য দেবতার বা প্রেতপুণ্যাত্মার দৃশ্য বস্তুতে

অবস্থান বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিতে হইলে আকাশের জ্যোতিষ্ক, অন্তরীক্ষের বায়ু প্রভৃতি বা পৃথিবীর কোন উচ্চ-প্রদেশস্থিত বা মহৎ বস্তুর আশ্রয় অবলম্বন করিতে হয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলিতেছেন, পুণ্যবলে যাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাঁহারা পুণ্যাবসানে গ্রহ আশ্রয় করিয়া তারকারূপে বিরাজ করেন॥ ব্র।৫৮।৫২॥ ধ্রুবাদি এইরূপে জ্যোতিষ্ক হইয়াছেন, মরুদ্‌গণ বায়ু হইয়াছেন। প্রভঞ্জনের ন্যায় ক্ষিপ্রগামী ও প্রবল বলিয়া গুণসাম্যে মরুদ্‌গণ বায়ুর অধিষ্ঠাতৃদেবতা কল্পিত হইয়াছেন। অগ্নি এই প্রকারে হব্যবাহক হইয়াছেন। কৈলাসের নিকটবর্তী মান্ধাতা পর্বত রাজা মান্ধাতার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। রাজা বিবস্বানের নররূপী শত্রু স্বর্ভানু আকাশের সূর্যের শত্রু রাহু হইয়াছেন। আকাশের রাহু যে বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবীর ছায়া হিন্দু তাহা জানিতেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫৮।৩ শ্লোকে রাহুকে 'পার্থিবচ্ছায়াং নির্মিতো মণ্ডলাকৃতিঃ' বলা হইয়াছে।

নর ইন্দ্রের কীর্তি পরে আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে যে বৃত্র শত্রুপক্ষকে বিড়ম্বিত করিবার জন্য পর্বত ফেলিয়া নদীর জল অবরোধ করেন। ইন্দ্র বজ্রাঘাতে পর্বত বিদীর্ণ করিয়া জলনির্গমনের পথ করিয়া দিয়াছিলেন। ইন্দ্রকে এই কারণে ঋক্‌সূক্তে জলমোচনকারী বলা হইয়াছে এবং এই কারণেই ইন্দ্র দিবি আরোহণের পর জলবর্ষণকারী আন্তরীক্ষদেব হইয়াছেন। কেবল বৃষ্টিদাতা আকাশের প্রাকৃতিক দেবতা রূপে বৈদিক ইন্দ্রের কল্পনা হয় নাই। বৃষ্টির অধিষ্ঠাতা প্রাকৃতিক বৈদিক দেবতার নাম পর্জন্য। পর্জন্যের ইন্দ্রের অনুরূপ কোন নরোচিত কীর্তি বর্ণিত হয় নাই। বিবস্বান-শত্রু স্বর্ভানু যেমন সূর্যশত্রু রাহু হইয়াছেন তদ্রূপ ইন্দ্রশত্রু বৃত্র মেঘ ও পর্বত হইয়াছেন। দিবি-আরোহণ তত্ত্ব মনে না রাখিলে বৈদিক দেবতাগণের স্বরূপ বুঝা যাইবে না।

স্বর্গপ্রাপ্তি।—কেবল যে মনুষ্যাদির দিবি-আরোহণ ঘটিয়াছে তাহা নহে। ভৌম দেবগণের বাসস্থান ইলাবৃতবর্ষ অদৃশ্য দেবতার বাসস্থান স্বর্গ হইয়াছে। এখন যেমন ছাড়পত্র ব্যতীত এক রাজ্যের প্রজা অপর রাজ্যে প্রবেশ করিতে পায় না অনুমান হয় পূর্বেও তদ্রূপ বিশেষ অনুমতি ভিন্ন ভারতীয়গণ ইলাবৃতবর্ষে যাইতে পাইতেন না। সামরিক উদ্দেশ্যে এক ইন্দ্র যে ইলাবৃতবর্ষে যাইবার পথ পাহাড় ফেলিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন সে-কথা পূর্বেই বলিয়াছি। যে-সকল বিশিষ্ট ভাগ্যবান্ ব্যক্তি যজ্ঞ উপঢৌকনাদির দ্বারা ইন্দ্রের কৃপালাভ করিতেন কেবল তাঁহারাই ইলাবৃতবর্ষরূপ ভৌমস্বর্গে যাইবার অনুমতি পাইতেন। বায়ুপুরাণে কথিত আছে, "দেবলোক (ভৌম) সুমেরু গিরিতে অবস্থিত। বিবিধ যজ্ঞ নিয়ম ও অনেক জন্ম সঞ্চিত পুণ্যফলে দেবলোক বা স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে।" বা।৩৪।৯৬,৯৭॥ যাগযজ্ঞ করিলে যে স্বর্গলাভ হয় এবং স্বর্গভোগ শেষ হইলে যে সেখান হইতে পুনরাবর্তন ঘটে এই হিন্দু ধারণার মূলে ভৌম-স্বর্গপ্রাপ্তি ও তথা হইতে প্রত্যাগমনের প্রাচীন স্মৃতি আছে। ভৌম-ইলাবৃতবর্ষ যেরূপ স্বর্গ হইয়াছিল তদ্রূপ দিবি-আরোহণের ফলে ভৌম-দেবযানপথ (কাশ্মীর-তুর্কীস্থান রাস্তা) আকাশ-স্থিত নক্ষত্রবীথিতে পরিণত হইয়াছে। সোম আনন্দদায়ক বলিয়া চন্দ্র হইয়াছে। যজ্ঞের প্রাচীন উদ্দেশ্য ও অর্থ পরিবর্তিত হইয়াছে। মহিমাবিস্তারের ফলে অদৃশ্য দেবগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্রহ্মপদেও উন্নীত হইয়াছেন, এমন কি যজ্ঞের সমস্ত অঙ্গকে শাস্ত্র ব্রহ্মবুদ্ধিতে দেখিবার উপদেশ দিয়াছেন। ব্রহ্মরূপে পরিণতি দিবি-আরোহণের চরম অবস্থা। জন-সাধারণের দিবি-আরোহণ করাইবার প্রবৃত্তিকে কি করিয়া ক্রমে ব্রহ্মোপলব্ধির পথে লইয়া যাইতে পারা যায় হিন্দুর দেবতত্ত্বে তাহা পরিস্ফুট।

শক্তিদেবতা।—বৈদিক দেবগণের উপাসনা প্রাকৃতিক বস্তুর উপাসনা হইতে উদ্ভূত এ-ধারণা ভ্রমাত্মক। শূর, বীর, রাজা বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি মনুষ্যের যে স্বাভাবিক ভক্তি-শ্রদ্ধা অর্পিত হয় বৈদিক উপাসনার মূলে তাহাই আছে। এ-কারণে প্রায় অধিকাংশ বৈদিক দেবতাই শত্রুবিমর্দক পরাক্রান্ত যোদ্ধা। তাঁহারা সকলেই নানা অস্ত্রধারী। স্ত্রী-দেবতার কল্পনায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হয়। ইলা, সরস্বতী ও ভারতী প্রদেশত্রয় এবং উষা, নদী, অরণ্যানী প্রভৃতি স্ত্রীরূপে উপাসিত হইয়াছেন। স্ত্রীদেবতার উপাসনার মূলে বীরা রমণীর উপাসনা না থাকিলেও স্ত্রীদেবতাগুলিও তৎ তৎ অধিষ্ঠানের প্রতীক। নদী, বন প্রভৃতির উপাসনা জড়দ্যোতক অধিষ্ঠাতৃদেবতার উপাসনা মাত্র। এ-সকল সূক্তকে উপাসনা না-বলিয়া বর্ণনা বলিলেই অধিকতর সঙ্গত হয়। ইলা, সরস্বতী ও ভারতী এই তিন প্রদেশেরই সংস্কৃতি বাক্‌দেবীরূপে উপাসিত হইয়াছেন। ইহা এক প্রকার শক্তি-উপাসনা। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপাখ্যানে কথিত আছে, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের শক্তি একত্র হইয়া নারীরূপ ধারণ করিয়াছিল। এই নারী চণ্ডী। শ্রীশ্রীচণ্ডী।২।১২॥

যে রীতিতে ইন্দ্রাদি শূর, বীর, মহাত্মগণ দেবত্ব পাইয়াছেন হিন্দুধর্মের তাহা সনাতন প্রথা। ইন্দ্রের বহুপরবর্তী রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবরূপে পূজনীয় হইয়াছেন। আধুনিক কালেও চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, গান্ধী প্রভৃতি মহাত্মার দেবত্ব হইয়াছে বা হইতেছে। অর্বাচীন ভারতীয় দেবগণ বেদে স্থান পান নাই।

অবতার-তত্ত্ব।—হিন্দুর দেবত্ব কল্পনার আর এক সূত্র লক্ষণীয়। হিন্দু বিশ্বপ্রপঞ্চে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় অর্থাৎ

creation, continuance and destruction এই তিন রূপ দেখিয়াছেন। ব্রহ্মের এই তিন লীলার তিন বিভিন্ন শক্তি কল্পিত হইয়াছে। যে শক্তি সৃষ্টি করে তাহার নাম ব্রহ্মা, যে পালন করে বা যাহা হইতে স্থিতি তাহার নাম বিষ্ণু, যে ধ্বংস করে তাহার নাম রুদ্র। অনুমান হয় অনুরূপ তিন গুণ বিশিষ্ট বিভিন্ন নরের নাম হইতেই এই নামগুলির উৎপত্তি। বিষ্ণু ও রুদ্র যে নররূপী, পুরাণে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। ঋগ্বেদেও আছে যে বিষ্ণু উন্নত অর্থাৎ উত্তরদেশবাসী। তাঁহার রাজ্যে 'ভূরিশৃঙ্গাঃ গাবঃ' অর্থাৎ হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়॥ ঋ।১ম।১৫৪॥ পৌরাণিক নির্দেশ অনুসারে মনে হয় বিষ্ণুর রাজ্য ক্যাস্‌পিয়ন সাগরের উত্তরে ছিল। হিন্দু তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসী ক্যাসপিয়ন সাগরের তীরে যাইতেন তাহার প্রমাণ আছে॥ বাকুতে হিন্দু মন্দির। নূতন পত্রিকা। ৭ ফেব্রুয়ারি। ১৯৩৬॥

হিন্দুশাস্ত্র-মতে যে ব্যক্তি প্রজাবৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছেন বা যাঁহার রাজত্বকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তিনিই ব্রহ্মার অবতার। এই জন্য দক্ষ, অরণ্য, বৈরাজ, বীরণ, কর্দম, পর্জন্য ইত্যাদি নামধারী ব্যক্তিগণ পুরাণে প্রজাপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যিনি প্রজাপালক বা সমাজরক্ষক তিনি বিষ্ণুর অবতার, যথা শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি। যিনি প্রজাধ্বংসকারী প্রবল যোদ্ধা তিনি রুদ্রের অবতার, যথা, পরশুরাম, বলরাম প্রভৃতি। নামসাম্যে বা কীর্তিসাম্যেও পরবর্তী ব্যক্তি পূর্ববর্তী ব্যক্তির অবতার রূপে কল্পিত হইয়াছেন। মহাভারত আদিপর্বে ৬৭ অধ্যায়ে কে কাহার অবতার তাহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। অঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশের প্রাচীন রাজা বলি তাঁহার পূর্ববর্তী অসুর বলির অবতার বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। অবতার-কল্পনার ফলে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ব্যক্তিগণের কীর্তিকলাপ পরস্পরে আরোপিত হয়। বিভিন্ন ইন্দ্রের কীর্তি মিশ্রিত হওয়া বিচিত্র নহে, কারণ ইঁহারা সকলেই ইন্দ্রনামধারী। বৃত্র, অহি, শুষ্ণ প্রভৃতি অসুরের কীর্তিও পরস্পরে কিছু কিছু আরোপিত হইয়াছে সন্দেহ হয়। ইঁহারা সকলেই ইন্দ্রের শত্রু। দিবি-আরোহণ-তত্ত্ব এবং অবতার-তত্ত্ব স্মরণ রাখিলে বৈদিক দেবতত্ত্ব সুগম হইবে। ঋক্‌সূক্তগুলির যে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা হইতে পারে প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাহা জানিতেন। নিরুক্তকার যাস্ক অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "তৎ কৌ অশ্বিনৌ। দ্যাবা পৃথিব্যৌ ইতি একে। অহোরাত্রৌ ইতি একে। সূর্যাচন্দ্রমসৌ ইতি একে। রাজানৌ পুণ্যকৃতৌ ইতি ঐতিহাসিকাঃ॥ ১২।১॥ অর্থাৎ, অশ্বিদ্বয় কাঁহারা? কেহ বলেন দ্যাবা পৃথিবী, কেহ বলেন দিন রাত্রি, কেহ বলেন সূর্য চন্দ্র, ঐতিহাসিকগণ বলেন তাঁহারা দুই জন পুণ্যবান রাজা।

বেদের রহস্য।—প্রাচীন হিন্দু বেদসূক্তগুলি কেন এত যত্নসহকারে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা বিচার্য। বেদকে হিন্দুধর্মের ভিত্তি বলা হয়। বেদে দেবতার স্তব, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা, শত্রুর প্রতি অভিচারের মন্ত্র, দ্যূতক্রীড়ার নিন্দা, রোগশান্তির মন্ত্র, এখন আমরা কবিতা বলিলে যাহা বুঝি সেই প্রকার উচ্ছ্বাস, কুৎসিত কামবিষয়ক মন্ত্র এবং অতি উচ্চাঙ্গের ব্রহ্মজ্ঞানের কথা সমস্তই স্থান পাইয়াছে। এই প্রকার বিভিন্ন বিষয়ের সংমিশ্রণে কি করিয়া ধর্মপুস্তক গঠিত হইল তাহা বিস্ময়ের কথা। বেদ বলিলে মাত্র সংহিতা অংশ ধরিলে চলিবে না। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ এই লইয়া বেদ। উপনিষদ পরে লিখিত হইয়াছিল বলিলেও বেদের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে না। প্রথমতঃ বেদের সংহিতা-ভাগেও অনেক ঔপনিষদিক ভাবধারা বর্তমান, দ্বিতীয়তঃ কেনই বা উপনিষদ, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ ও সূক্ত একত্র বেদ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল পৌর্বাপর্য বিচারে তাহা বুঝা যায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেদবিৎ কীথ সাহেব লিখিতেছেন :—

> ...the efforts which have been made by Hillebrandt to prove that, in a stage earlier than that recorded, the Rigveda was a definitely practical collection of hymns, arranged according to their connection with the sacrificial ritual, must be pronounced to have failed.......The Rigveda is not a practical but a historical handbook. It must represent a collection of hymns made by unknown hands at a time when for some unrecorded reason it was felt desirable to preserve the religious poetry current among the Vedic tribes.—Keith: *The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads*. 1925 Vol. I. p. 1.

কীথ সাহেব বেদকে historical handbook এই অর্থে বলিয়াছেন যে হিন্দুদের মধ্যে religion সম্বন্ধীয় সমস্ত ভাবধারা পর-পর যেমন-যেমন বিকশিত হইয়াছে সেইরূপই বেদভুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ বেদে নির্বিচারে আদিম প্রাচীন ও অর্বাচীন religious ভাব ও চিন্তা ধৃত হইয়াছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি এরূপ পৌর্বাপর্য বিচারে বেদের রহস্য জানা যাইবে না। বেদে religious poetry কেন সংরক্ষিত হইয়াছিল কীথ সাহেব তাহা ধরিতে পারেন নাই। ধর্মসম্বন্ধীয় মন্ত্রাদি সংরক্ষণের চেষ্টা স্বাভাবিক সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রশ্ন এই যে বেদের সমস্ত সূক্তই ধর্মের ভিত্তি এ-ধারণা কি করিয়া আসিল?

হিন্দু 'ধর্ম' অর্থে বুঝেন যাহা কিছু সমাজকে ধারণ করিয়া রাখে। পাপ-পুণ্য এবং স্বর্গ নরকের ধারণা, নীতিজ্ঞান বা moral sense, আইনকানুন ইত্যাদি সমস্তই ধর্মের অন্তর্গত। এই সকলের মধ্যে পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, পুনর্জন্ম-দেবতা ইত্যাদি তত্ত্ব অলৌকিক অর্থাৎ এই সকলের ধারণা যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে। অলৌকিক বিশ্বাসের ভিত্তি

বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে। আপ্তবাক্য বা ঐতিহ্যের প্রভাবে অলৌকিক ধর্মবিশ্বাস উৎপন্ন হয়। ধর্মের অলৌকিক অংশের ইংরেজী প্রতিশব্দ religion। বেদ religion বলিয়া বিবেচিত হইলে সংরক্ষিত হইবে এ-কথা বিচিত্র নহে। অনেকে মনে করেন বুঝি এই কারণেই বেদসূক্ত রক্ষা পাইয়াছে। Barnett: *Antiquities of India*, p. 1; Fraser: *Literary History of India*, 3rd edition, 1915, p. 2; Macdonell: *History of Sanskrit Literature*, 1909, p. 1. ইত্যাদি বহু পুস্তকে এই প্রকার মতের আভাস পাওয়া যায়। আমি এই প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে আদিতে বৈদিক সূক্তগুলিতে অতিপ্রাকৃত religious কিছু ছিল না। শূর বীরগণের উদ্দেশ্যেই এই সকল সূক্ত রচিত হইয়াছিল। তবে কেন ঋক্‌সূক্ত সংরক্ষিত হইল? ধর্মের সহিত বীরগাথার সম্পর্ক কি?

অপৌরুষেয় বেদ ও ধর্ম।—হিন্দুধর্মের উদ্দেশ্য একাধারে সমাজরক্ষা ও আত্মোন্নতি। আত্মোন্নতির চরম উৎকর্ষ ব্রহ্মজ্ঞানলাভ। ধর্মের এই দুই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দু সচেতন ছিলেন। প্রাচান হিন্দু ঋষি জানিতেন প্রাকৃতিক সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে অস্বীকার করিয়া যে ধর্মশাস্ত্র প্রণীত হয় তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। প্রবৃত্তিসমূহ সৎপথে চালিত হইলে সমাজের উন্নতি হয়। অসংযত কাম-ইচ্ছা সমাজ ধ্বংস করে, অপরপক্ষে বিবাহরূপ সামাজিক অনুষ্ঠানে কামপ্রবৃত্তি স্থান পাইলে তদ্দ্বারা সমাজ রক্ষা হয়। অসংযত নিষ্ঠুরতা সমাজ-পরিপন্থী কিন্তু ধর্মযুদ্ধে সমাজরক্ষাও হয় এবং মনুষ্যের স্বভাবজ নিষ্ঠুর প্রবৃত্তিও চরিতার্থ হয়। ধর্মশাস্ত্রকারের সৎ অসৎ সকল প্রকার প্রবৃত্তির সাহত পরিচিত থাকা আবশ্যক। ঋষি-রচিত বেদসূক্তে সকল প্রকার আদিম মনোভাব স্থান পাইয়াছিল। ঋষি শত্রু-নিযাতন কামনা করিয়াছেন, হিরণ্য পশু অশ্ব ভৃত্য চাহিয়াছেন, ভেকের গানে মোহিত হইয়া স্তোত্র লিখিয়াছেন, মারণ উচাটন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, দ্যূতক্রীড়ার কুফল বর্ণনা করিয়াছেন, কুৎসিত কামজ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, দৃশ্য অদৃশ্য সকল প্রকার দেবতার আবাহন করিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানের বাণীর গভীর ঝঙ্কার শুনাইয়াছেন। মোট কথা, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসমূহের বশে চালিত সরলমনা ঋষির মনে যখন যে ভাব উঠিয়াছে তিনি তাহাই অকপটে সূক্তাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। বুদ্ধি, নীতি, ধর্মজ্ঞান, লজ্জা কিছুই তাঁহার ভাবপ্রকাশে বাধাস্বরূপ হয় নাই। পুরুষের শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন স্বতঃস্ফূর্ত হয় মানবের চিরন্তন কামনাসমূহ তদ্রূপ ঋষির মনে প্রতিফলিত হইয়াছে ও তিনি তাহা বিনা বিচারে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই জন্যই ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা, মন্ত্র-স্রষ্টা নহেন। এই জন্যই বেদ অপৌরুষেয়, অর্থাৎ বেদ কোনও ব্যক্তির স্বচিন্তিত, বুদ্ধিপ্রসূত লিখন নহে।

'পুরাণপ্রবেশ' গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি,—

মানবের চিরন্তন হিংসাদি প্রবৃত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া যে ধর্মশাস্ত্র রচিত হয় তাহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত নহে এবং স্থায়ী হইতে পারে না। যাহা বেদবহির্ভূত তাহা অগ্রাহ্য। পক্ষপাতশূন্য ঋষিগণ কর্তৃক উপলব্ধ হইয়া মানবের স্বাভাবিক কামনাসমূহ বেদরূপে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বেদপ্রমাণ হিন্দুশাস্ত্রকারগণের মতে অখণ্ডনীয়। বিজ্ঞানী যেরূপ পর্য্যবেক্ষণলব্ধ ঘটনাকে অগ্রাহ্য করিয়া বিজ্ঞানশাস্ত্র গড়িতে পারেন না, সেইরূপ ধর্মরক্ষক ও দর্শনকার অনুভবসিদ্ধ প্রবল মানবীয় আকাঙ্ক্ষাগুলিকে বাদ দিয়া স্থায়ী শাস্ত্র রচনা করিতে পারেন না। মানুষের মনে চিরন্তন হিংসাপ্রবৃত্তি আছে, এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সামাজিক ব্যবস্থা না থাকিলে সমাজ টিকিবে না। যুদ্ধ এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম্য ও স্বর্গপ্রদ। পশুবলিও এই কারণে শাস্ত্রসম্মত। মানুষ পশুমাংস খাইবেই। কসাইয়ের পশুবলি ও কালীঘাটে পশুবলি পশুর পক্ষে উভয়ই সমান। হিন্দুশাস্ত্রে মৃগয়ালব্ধ ও বলিমাংস ভিন্ন অপর প্রকারে প্রাপ্ত মাংস বৃথামাংস নামে পরিচিত। মৃগয়া যুদ্ধ প্রভৃতি কার্যে মানুষের অদম্য হিংসাপ্রবৃত্তিও চরিতার্থ হয় অথচ তাহা সমাজের পক্ষেও আবশ্যক। কোন ব্যক্তির মন কোমল প্রকৃতির হইলে অহিংসাই তাহার পক্ষে পরম ধর্ম। সমাজসম্মত ভাবে নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই স্বধর্ম। পুরাণাদি শাস্ত্রবর্ণিত স্বধর্মের ইহাই অর্থ। হিন্দুশাস্ত্রমতে ক্রূরকর্মী জল্লাদ ও শাস্ত্রপঠনরত ব্রাহ্মণ উভয়েই স্বধর্মনিরত বলিয়া মোক্ষযোগ্য। হিন্দু সমাজের মধ্যেই বিরুদ্ধধর্মী শাক্ত ও বৈষ্ণবের স্থান আছে॥ পুরাণপ্রবেশ। পৃ. ২৭৬-২৭৭॥

ঋগ্বেদের যম ও যমী সংক্রান্ত সূক্তে। ঋ৷১০ম৷১০॥ আছে যমী নিজভ্রাতা যমকে কামজ প্রেম নিবেদন করিতেছেন। ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যেও সময়-সময় যে কামভাব দেখা দিতে পারে হিন্দুশাস্ত্রকারের নিকট উক্ত সূক্ত তাহার প্রমাণ। এরূপ ঘটনা যাহাতে সমাজে না ঘটে তজ্জন্য মনুসংহিতায় উপদেশ আছে মাতা, ভগিনী ও দুহিতার সহিত নির্জনে একাসনে বসিবে না, কারণ ইন্দ্রিয়-গ্রাম বলবান বলিয়া বিদ্বান ব্যক্তিকেও কর্ষণ করে। হিন্দু-ঋষি বেদপ্রমাণানুযায়ী ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি জানিতেন সকল প্রকার শ্রদ্ধাভক্তি, বিস্ময়, রসানুভূতি প্রভৃতির উৎস একই। এই উৎস মানব-মনে। পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি, দেবতায় ভক্তি, ব্রহ্মে ভক্তি বিভিন্ন পদার্থ নহে। মূলতঃ ভক্তি একই কিন্তু ইহার প্রকাশ পৃথক পৃথক। বিস্ময়, রসানুভূতি প্রভৃতি অন্য ভাব সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। যে ভক্তিশ্রদ্ধা নরপতি ইন্দ্রে অর্পিত হইয়াছে উপযুক্ত ভাবে পরিচালিত হইলে তাহাই আন্তরীক্ষ দেব ইন্দ্রে, অদৃশ্য দেব ইন্দ্রে এবং পরিশেষে পরম দেব ইন্দ্রে অর্পিত হইবে। এই জন্যই নরপতি ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্র বেদে স্থান পাইয়াছে। এই ভাব ক্রমে পুষ্ট হওয়ায় বিভিন্ন প্রকারের ইন্দ্রস্তোত্র রচিত হইয়াছিল। যাগযজ্ঞের

দ্বারা স্বর্গলাভ হয় হিন্দু এ-কথা মানিতেন কিন্তু হিন্দুধর্মের ইহাই চরম কথা নহে। যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে মনুষ্যের মন পবিত্র হয় এবং তখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ সম্ভব হয় ইহাই শ্রেষ্ঠ উপদেশ। নিষ্কাম যজ্ঞের ইহাই উদ্দেশ্য।

বেদ-সংরক্ষণ।—বেদসূক্তে নানা ভাবধারা কি করিয়া স্থান পাইল তাহা বুঝা গেল। ঋষি এ-সম্বন্ধে সচেতন না থাকিলে নরপতি ইন্দ্রের উদ্দেশে রচিত বীরগাথা সংরক্ষণ করিতেন না; ভেকের গানকেও বেদে স্থান দিতেন না। কোন্ ঋষি প্রথমে এই সকল সূক্ত আহরণ করিয়া তাহাকে বেদ বলিলেন সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া যায় না। পুরাণে স্বায়ম্ভুব মনু এবং শ্বেত নামা মহামুনিকে আদি বেদব্যাস বলা হইয়াছে। হয়ত ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথম বেদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে, পরিব্রাজক ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ বেদাহরণ কার্যের জন্য পৃথিবী পর্য্যটন করেন॥ বি৷৩৷৯৷১২॥ বৈদিক দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ ইঁহার পূজাই সর্বাগ্রে প্রবর্তিত হয়॥ ঋ৷৭ম৷১০০৷৩॥ বিষ্ণুর পরে মিত্র ও বরুণ পূজা পান॥ ঋ৷৬ম৷৬৭৷১॥ বিষ্ণু, মিত্র এবং বরুণ ইলাবৃতবাসী দেবগণেরও স্তবনীয় ছিলেন। শতক্রতু ইন্দ্র সম্ভবত ইঁহাদেরই যজ্ঞপুরুষ মনন করিতেন। অগ্নি সর্বকনিষ্ঠ দেব॥ ঋ৷৫ম৷২৬৷২৭॥৬ম৷৪৮৷৭॥ বামন বিষ্ণু ইন্দ্রের সহায়ক ছিলেন বলিয়া কথিত আছে অতএব ইনি পূর্ববর্তী বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কল্পিত হইয়াছিলেন। বহু ইন্দ্রের ন্যায় বহু বিষ্ণুও ছিলেন। বামন বিষ্ণুর উদ্দেশে ঋক্‌সূক্ত আছে। ইন্দ্র যখন প্রত্যক্ষ তখন বৃদ্ধ বিষ্ণু, মিত্র এবং বরুণ অদৃশ্য দেব। অনুমান হয় ইন্দ্রগণের অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী কাল হইতেই ঋক্‌সূক্ত সংগৃহীত হইত এবং ভারতীয় ঋষিগণ ইলাবৃতবাসী ঋষিদের নিকট হইতে ঋক্-সংরক্ষণ শিখিয়াছিলেন। কোন ঋষির মন্ত্র দৃষ্ট এবং কাহারই বা সৃষ্ট কি প্রকারে নির্ণীত হইয়াছিল বলা যায় না। বোধ হয় ধার্মিক ও খ্যাতনামা বলিয়া পরিচিত না থাকিলে কোন ঋষির মন্ত্রই বেদমন্ত্র বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

বেদে ইতবৃত্ত। পুরন্দরের কীর্তি।—ঋগ্বেদ হিন্দুর আদি ধর্মগ্রন্থ হইলেও প্রাচীন বীরগণের সামরিক কীর্তিস্মৃতি ইহার মূল। ঋক্‌সূক্তের বিভিন্ন স্তর মনে রাখিলে দেবতাগণ সম্বন্ধে বহু ইতবৃত্তীয় তথ্য নির্ণয় করা যাইবে। ইন্দ্রগণের কাল ও কীর্তিকলাপ পুরাণ ও বেদ সাহায্যে উদ্ধার করা যাইবে। বিভিন্ন ইন্দ্রের কীর্তি পরস্পরে আরোপিত হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রের ইতবৃত্ত জানা সম্ভব। বৃত্রহন্তা, বজ্রধারী, পুরন্দর ইন্দ্র অতি পরাক্রান্ত যোদ্ধা ছিলেন। পুরন্দর উপনাম বলিয়া মনে হয়। পুরন্দর অর্থে যিনি পুরী ধ্বংস করেন। ইনি বহু অসুর-নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন। বৃত্র, তৎপুত্র অহি, শুষ্ম প্রভৃতি অসুরগণ ইঁহার হস্তে নিহত হন। পনি নামক কোনও জাতি বা দল ইন্দ্রের প্রজাদিগের গো হরণ করিয়া দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ইন্দ্র কুকুরী (জাতি-বিশেষের নাম) সরমার নিকট সন্ধান পাইয়া গোধন উদ্ধার করেন ও তাহা আশ্রিতগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন॥ ঋ৷১০ম৷১০৮॥ ইন্দ্র হৃষ্ট হইলে গো দান করেন এ-কথা ঋক্ সূক্তে প্রসিদ্ধ।

নদীর অবরোধ মোচন।—পুরন্দর ইন্দ্রের সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত কর্ম নদীর অবরোধ অপসারণ। যুদ্ধকালে বৃত্র ইন্দ্রকে বা তাঁহার প্রজাবর্গকে উৎপীড়ন করার উদ্দেশ্যে পাহাড় ফেলিয়া চারিটি নদীর পথ রুদ্ধ করেন। ইন্দ্র বৃত্রকে হনন করিয়া এই অবরোধ দূর করেন। বৃত্রের নদী অবরোধ এবং ইন্দ্র কর্তৃক তদপসারণ উভয়ই বিরাট সামরিক কীর্তি সন্দেহ নাই। বৃত্র কোন্ কোন্ নদী অবরোধ করিয়াছিলেন এবং সেই অবরোধ-স্থানই বা কোথায় জানিতে কৌতূহল হয়। ঋগ্বেদে আদিতে চারিটি নদী অবরোধের কথা দেখা যায়। পরবর্তী সূক্তে চারি নদীর স্থলে সাতটি নদীর উল্লেখ আছে। পুরাণ-পাঠে অনুমান হয় মানস-সরোবরের নিকটে বৃত্র কর্তৃক নদী অবরুদ্ধ হইয়াছিল। "কৈলাসের দক্ষিণ পার্শ্বে ক্রূর জন্তু ও ওষধি সমন্বিত বৃত্রকায় হইতে উৎপন্ন বিবিধ ধাতুমণ্ডিত বৈদ্যুত নামে এক পর্বত আছে" ব্রহ্মাণ্ড ৫১৷১৪॥ বায়ু। ৪৭৷১৩—॥ মানস-সরোবরের নিকট শতদ্রু প্রভৃতি নদীর উৎপত্তি-স্থান। পুরাকালে এই প্রদেশে নদীগুলির অবস্থান কিরূপ ছিল নিশ্চিত জানা যায় না। তিব্বতীয় নদীগুলির পথ পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত হইয়াছে।

গোতম নোধা ঋষি বলিতেছেন, "ইন্দ্র পৃথিবীর উপরে স্থাপিত মধুর উদকপূর্ণ যে চারিটি নদী জলপূর্ণ করিয়াছেন তাহা সেই দর্শনীয় ইন্দ্রের অতিশয় পূজ্য ও সুন্দর কর্ম।" ঋ৷১ম৷৬২৷৬॥

বিশ্বামিত্র বলিতেছেন, "জলপ্রবাহবতী বিপাশ ও শুতুদ্রী নদীদ্বয় পর্ব্বতের উৎসঙ্গ প্রদেশ হইতে সাগর সঙ্গমাভিলাষিণী হইয়া মন্দুরাবিমুক্ত ঘোটকীদ্বয়ের ন্যায় স্পর্দ্ধা করতঃ গোদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইয়া বৎস-লেহনাভিলাষিণী ধনুদ্বয়ের ন্যায় বেগে গমন করিতেছে।" ঋ৷৩ম৷৩৩৷১॥

হে নদীদ্বয়, ইন্দ্র তোমাদের প্রেরণ করিতেছেন, তোমরা তাঁহার প্রার্থনা রক্ষা করিতেছ, ও রথীদ্বয়ের ন্যায় সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতেছ॥ ঋ৷৩ম৷৩৩৷২॥

নদীদ্বয় বলিতেছেন, নদীগণের পরিবেষ্টক বৃত্রকে হনন করিয়া বজ্রবাহু ইন্দ্র আমাদিগকে খনন করিয়াছেন। জগৎ প্রেরক, শোভন, দ্যুতিমান ইন্দ্র আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞায় আমরা প্রভূত হইয়া গমন করিতেছি॥ ঋ৷৩ম৷৩৩৷৬॥

বিশ্বামিত্র,—ইন্দ্র যে অহিকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বীর কর্ম সর্বদা কীর্তন করা উচিত। ইন্দ্র চতুর্দিকে আসীন (অর্থাৎ অবরোধকারীদিগকে) বজ্রদ্বারা বধ করিয়াছিলেন। গমনাভিলাষী জল-সমূহ আগমন করিয়াছিল। ঋ৷৩ম৷৩৩৷৭॥

এই সকল বিবরণ হইতে মনে হয় বৃত্র কর্তৃক অবরুদ্ধ

নদীগণের মধ্যে বিপাশ ও শুতুদ্রী দুইটি। এই দুই নদীর আধুনিক নাম বিয়াস ও সটলেজ। সটলেজ মানস-সরোবরের নিকট হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।

পরবর্ত্তী ইন্দ্রগণ।—ঋগ্বেদ দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্তে গৃৎসমদ ঋষি বলিতেছেন, 'লোকে এখন ইন্দ্রকে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে।' জনগণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তিনি বলিতেছেন, 'যিনি মহতী সেনার নায়ক তিনিই ইন্দ্র; যিনি অহিকে বিনাশ করিয়া সপ্তসংখ্যক নদী প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যিনি গো উদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি শত্রু বিনাশ করেন, যিনি বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন তিনিই ইন্দ্র।' ইত্যাদি। ইন্দ্রগণ লুপ্ত হইবার পর ইন্দ্রের নরত্ব কি করিয়া অল্পে অল্পে অদৃশ্য দেবত্বে পরিণত হইয়াছিল এই সূক্ত তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দেবত্ব-কল্পনায় প্রাচীন নর ইন্দ্রের কীর্ত্তি কিছু অতিরঞ্জিত হইয়াছে। চারি নদীর স্থলে সাত নদী আসিয়াছে। হয়ত চারি নদীর কথাতেও কিছু অত্যুক্তি আছে। বিয়াস ও সটলেজের উৎপত্তি-স্থান পরস্পর হইতে দূরে। বৃত্রের পক্ষে বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে নদী অবরোধ করার সম্ভাবনা কম। পরবর্ত্তী ইন্দ্রগণের কীর্ত্তির সহিত প্রাচীন ইন্দ্রের কীর্ত্তি যে মিশিয়া গিয়াছে তাহার প্রমাণ আছে ॥ঋ।৫ম।৩১।৬॥ ঋ।৬ম।২৭॥ ঋ।৭ম। ২৬॥ ইত্যাদি সূক্ত দ্রষ্টব্য।

অনুমান হয় অস্থি-বজ্র-নির্ম্মাতা ত্বষ্টার মৃত্যুর পর বারুদ-প্রস্তুতের জ্ঞানও লোপ পাইয়াছিল। পুরন্দরের পরবর্ত্তী অপর কোন ব্যক্তির বজ্র বা তদনুরূপ কোন অস্ত্র ছিল, পুরাণে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। আগ্নেয়াস্ত্র, অগ্নিবাণ, নালিকাস্ত্র প্রভৃতি যে বন্দুক নহে আচার্য শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ঋক্‌সূক্তে অস্থি-নির্মিত বজ্রের স্থলে অয়োনির্ম্মিত বজ্র আসিয়াছে॥ ঋ ৮ম।৯৬।৩॥ ১০ম।৯৬।৩॥ সুবর্ণ-নির্ম্মিত বজ্রেরও উল্লেখ দেখা যায় ॥ঋ।১০ম।২৩।৩॥ পুরন্দরের পরবর্ত্তী ইন্দ্রগণ সাধারণ লৌহাস্ত্র সাহায্যে শত্রু হনন করিয়াছেন মনে হয়।

নর ইন্দ্রের শূরত্ব-প্রতিপাদক ঋকের উদাহরণ।—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের অনূদিত ঋগ্বেদসংহিতা হইতে উদাহরণ-স্বরূপ মাত্র কতিপয় ঋক্ উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এই সকল ঋকে পুরন্দর নামক ইন্দ্রের কীর্ত্তির কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। স্থানাভাবে ইন্দ্রের নরত্ব-প্রতিপাদক সব ঋক্ দেওয়া গেল না। ঋগ্বেদ অনুবাদ কালে দত্ত-মহাশয় স্থানে স্থানে যে টীকা দিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় রূপক ব্যাখ্যা কত কষ্টকল্পিত। দত্ত-মহাশয়ের মূল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধের সমস্ত ঋকের অনুবাদ দত্ত-মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

"হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্র, ত্বরান্বিত হইয়া স্তোত্র গ্রহণ করিতে আইস। এই সোম অভিষব যুক্ত যজ্ঞে আমাদিগের অন্ন ধারণ কর ॥ঋ।১ম।৩।৬॥

হে সোমপায়ী ইন্দ্র, আমাদিগের অভিষবের নিকট আইস, সোম পান কর; তুমি ধনবান, তুমি হৃষ্ট হইলে গাভী দান কর ॥ঋ।১ম।৪।২॥

হে শতক্রতু, এই সোম পান করিয়া তুমি বৃত্র প্রভৃতি শত্রুদিগকে হনন করিয়াছিলে, যুদ্ধে (তোমার ভক্ত) যোদ্ধাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলে ॥ঋ।১ম।৪।৮॥

হে ইন্দ্র, দৃঢ় স্থানের ভেদকারী এবং বহনশীল মরুৎদিগের সহিত তুমি গুহায় লুক্কায়িত গাভীসমুদয় অন্বেষণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে ॥ঋ।১ম।৬।৫॥

যুবা, মেধাবী, প্রভূত বল সম্পন্ন, সকল কর্ম্মের ধর্ত্তা, বজ্রযুক্ত ও বহুস্তুতিভাজন ইন্দ্র (অসুরদিগের) নগরবিদারকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ঋ।১ম।১১।৪॥

বজ্রধারী ইন্দ্র প্রথমে যে পরাক্রমের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন তাঁহার সেই কর্ম্মসমূহ বর্ণনা করি। তিনি অহিকে (মেঘকে)(১) হনন করিয়াছিলেন। পরে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলেন, বহনশীল পার্ব্বতীয় নদীসমূহের (পথ) ভেদ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ঋ।১ম।৩২।১॥

ইন্দ্র পর্ব্বতাশ্রিত অহিকে হনন করিয়াছিলেন; ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য সুদূরপাতী বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; (তৎপর) যেরূপ গাভী সবেগে বৎসের দিকে যায় ধারাবাহী জল সেইরূপ সবেগে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়াছিল ॥ঋ।১ম।৩২।২॥

জগতের আবরণকারী বৃত্রকে ইন্দ্র মহাধ্বংসকারী বজ্রদ্বারা ছিন্নবাহু করিয়া বিনাশ করিলেন, কুঠার ছিন্ন বৃক্ষস্কন্ধের ন্যায় অহি পৃথিবী স্পর্শ করিয়া পড়িয়া আছে ॥ঋ।১ম।৩২।৫॥

ভগ্ন (কূলকে) অতিক্রম করিয়া নদ যেরূপ বহিয়া যায় মনোহর জল সেইরূপ পতিত (বৃত্রদেহকে) অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। বৃত্র জীবদ্দশায় নিজ মহিমাদ্বারা যে জলকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, অহি এখন সেই জলের পদের নীচে শয়ন করিল ॥ঋ।১ম।৩২।৮॥

হে ইন্দ্র, অহিকে হনন করিবার সময় যখন তোমার হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হইয়াছিল তখন তুমি অহির অন্য কোন্ হন্তার জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিলে, যে ভীত হইয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় নবনবতি নদী ও জল পার হইয়া গিয়াছিলে ॥ঋ।১ম।৩২।১৪॥

যখন (জল) দিবালোক হইতে পৃথিবীর অন্ত প্রাপ্ত হইল না, এবং ধনপ্রদ ভূমিকে উপকারী দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ করিল না, তখন বর্ষণকারী ইন্দ্র হস্তে বজ্র ধারণ করিলেন, এবং (২) দ্যুতিমান (বজ্র) দ্বারা অন্ধকার রূপ (মেঘ) হইতে পতনশীল (জল) নিঃশেষিত রূপে দোহন করিলেন ॥ঋ।১ম।৩৩।১০॥

প্রকৃতি অনুসারে জল প্রবাহিত হইল; কিন্তু (বৃত্র) নৌকাগম্য নদীসমূহের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল; তখন ইন্দ্র স্থিরসঙ্কল্প অতিবলযুক্ত প্রাণসংহারক আয়ুধ দ্বারা কয়েক দিবসে হনন করিলেন ॥ঋ।১ম।৩৩।১১॥

তুমি শুষ্ণ (অসুরের) সহিত যুদ্ধে কুৎস ঋষিকে রক্ষা করিয়াছিলে, তুমি অতিথিবৎসল (দিবোদাসের রক্ষার্থে) শম্বর (নামক অসুরকে) হনন করিয়াছিলে। তুমি মহান অর্ব্বুদ (নামক অসুরকে) পদদ্বারা

(১) মূলে 'মেঘ' শব্দ নাই।

(২) মূল সূক্তের আক্ষরিক অনুবাদ,—জ্যোতির সাহায্যে অন্ধকার হইতে গো-দিগকে দোহন করিলেন।

আক্রমণ করিয়াছিলে। অতএব তুমি দস্যুহত্যার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছ ॥ঋ।১ম।৫১।৬॥

ত্বষ্টা তোমার যোগ্য বল বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং তাঁহার পরাভবকারী বল দ্বারা বজ্র তীক্ষ্ণ করিয়াছেন ॥ঋ।১ম।৫২।৭॥

সহায়রহিত সুশ্রব (নামক রাজার) সহিত (যুদ্ধ করিবার জন্য) যে বিংশ নরপতি ও ৬০,০৯৯ অনুচর আসিয়াছিল, হে প্রসিদ্ধ ইন্দ্র, তুমি শত্রুদিগের অলঙ্ঘ্য রথচক্রদ্বারা তাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছিলে ॥ ঋ।১ম।৫৩।৯॥

তুমি নর্য্য, তুর্বশ ও যদু (নামক রাজাদিগকে) রক্ষা করিয়াছ; হে শতক্রতু, তুমি বর্য্যকুলের তুর্বীতি (নামক রাজাকে) রক্ষা করিয়াছ; তুমি আবশ্যকীয় ধননিমিত্ত যুদ্ধে তাহাদের রথ ও অশ্ব রক্ষা করিয়াছ, তুমি শম্বরের নবনবতি নগর ধ্বংস করিয়াছ। ঋ।১ম। ৫৪।৬ ॥

হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র, তুমি সেই বিস্তীর্ণ মেঘকে (মূলে পর্ব্বতং আছে। অর্থ পর্ব্বতং মেঘং বৃত্রাসুরং বা। সায়ণ) বজ্রদ্বারা পর্ব্বে পর্ব্বে কাটিয়াছ; সেই মেঘে আবৃত জল বহিয়া যাইবার জন্য ভিন্ন দিকে ছাড়িয়া দিয়াছ; (৩) কেবল তুমিই বিশ্বব্যাপী বল ধারণ কর ॥ ঋ। ম। ৫৭।৬।

ইন্দ্র স্বকীয় বলদ্বারা জলশোষক বৃত্রকে বজ্রদ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন এবং (চৌরাপহৃত) গাভীসমূহের ন্যায় (বৃত্রদ্বারা) অবরুদ্ধ জগতের রক্ষণশীল জলসমুদয় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি হব্যদাতাকে তাঁহার অভিলাষানুসারে অন্নদান করেন। ঋ।১ম।৬১।১০।

ইন্দ্র পৃথিবীর উপরে স্থাপিত মধুর উদকপূর্ণ যে চারিটি নদী জলপূর্ণ করিয়াছেন তাহা সেই দর্শনীয় ইন্দ্রের অতিশয় পূজ্য ও সুন্দর কর্ম্ম॥ ঋ।১ম।৬২।৬।

তিনি বৃত্রকে বধ করিয়া তন্নিরুদ্ধ বারি নির্গত করাইয়াছিলেন। ঋ।১ম।৮০।১০।

ইন্দ্রের লৌহময় ও সহস্রধারাযুক্ত বজ্র বৃত্রকে আক্রমণ করিল। ঋ।১ম।৮০।১২।

তিনি সুদর্শন, সুন্দর নাসিকাযুক্ত ও হরি নামক অশ্বযুক্ত; তিনি আমাদিগের সম্পদের জন্য দৃঢ়বদ্ধ হস্তে লৌহময় বজ্র স্থাপন করিলেন॥ ঋ।১ম।৮১।৪॥

অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র দধীচি ঋষির (৪) অস্থিদ্বারা বৃত্রগণকে নবগুণ নবতিবার বধ করিয়াছিলেন॥ ঋ।১ম।৮৪।১৩।

পর্ব্বতে লুক্কায়িত দধীচির(৫) অশ্বমস্তক পাইবার ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্র সেই মস্তক শর্য্যণাবৎ (সরোবরে) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ঋ।১ম।৮৪।১৪।

নদীসমূহ যাঁহার নিয়মানুসারে বহিয়া যায়॥ ঋ।১ম।১০১।৩।

তিনি বজ্ররূপ অস্ত্র লইয়া, বীরকার্য্যে উৎসাহপূর্ণ হইয়া দস্যুদিগের নগর সমূহ বিনাশ করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন॥ঋ।১ম।১০৩।৩।

হে যুদ্ধকালে নৃত্যকারী ইন্দ্র, তুমি হবিঃপ্রদায়ী অভীষ্টপূরক দিবোদাস রাজার জন্য নবতিসংখ্যক নগরী নষ্ট করিয়াছিলে ।ঋ।১ম।১৩০।৭।

হে জলবর্ষণকারী, নগরবিদারক ইন্দ্র, ইত্যাদি। ঋ॥ ১ম।১৩০।

হে ইন্দ্র, মনুষ্যেরা তোমার বীর্য্য জানিত। তুমি যে শত্রুদিগের শারদীপুরীসমূহ নষ্ট করিয়াছিলে, উহাদিগকে পরাজিত করিয়া ন[illegible] করিয়াছিলে, সে কথা মনুষ্যেরা জানিত।...তুমি আনন্দ সহকারে [illegible] কাড়িয়া লইয়াছিলে ।ঋ।১ম।১৩১।৪॥

ইন্দ্র জলান্বেষণে তৎপর। তিনি স্বীয় বন্ধু যজমানদিগের জন্য [illegible] অন্বেষণ করেন ॥ঋ।১ম।১৩২।৩॥

হে ইন্দ্র তুমি যখন সাতটী শারদীপুরী ভেদ করিয়াছিলে ত[illegible] প্রজাগণকে সংযতবাক্য করিয়া সুখে দমন করিয়াছিলে। হে অনব[illegible] তুমি চলনশীল জল প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলে, তুমি তরুণবয়স্ক পুরুকুৎ[illegible] রাজার জন্য বৃত্রকে বধ করিয়াছিলে ।ঋ।১ম।১৭৪।২॥

হে শূর ইন্দ্র, তুমি যে জল বর্দ্ধিত করিয়াছ, অহি সেই প্র[illegible] জল আক্রমণ করিয়াছিল, তুমি সেই প্রভূত জল ছাড়িয়া দিয়াছ ।ঋ।২ম। ১১।২।

যিনি মহতী সেনার নায়ক, তিনিই ইন্দ্র ।ঋ।২ম।১২। ।

হে মনুষ্যগণ, যিনি অহিকে বিনাশ করিয়া সপ্তসংখ্যক নদী প্রবাহি[illegible] করিয়াছিলেন, যিনি বলকর্ত্তৃক নিরুদ্ধ গোসমূহকে উদ্ধার করিয়াছিলে[illegible] যিনি মেঘদ্বয়ের(৬) মধ্যে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং যুদ্ধকা[illegible] শত্রুগণকে বিনাশ করেন তিনিই ইন্দ্র। ঋ।২ম।১২।৩।

যিনি পর্ব্বতে লুক্কায়িত শম্বরকে ৪০ বৎসর অন্বেষণ করিয়া প্রা[illegible] হইয়াছিলেন, যিনি বলপ্রকাশকারী অহি নামক শয়ান দানবকে বিনা[illegible] করিয়াছিলেন তিনিই ইন্দ্র ।ঋ।২ম।১২।১১।

তুমি প্রবাহিত নদীসকলের পথ গমনযোগ্য করিয়াছ ।ঋ।২ম।[illegible]

তিনি বজ্রদ্বারা নদীর নির্গমন দ্বার সকল খুলিয়া দিয়াছেন ।ঋ।২ম। ১৫।৩।

ইন্দ্র নিজ মহিমায় সিন্ধুকে উত্তরবাহিনী করিয়াছেন ।ঋ।২ম।১৫।[illegible]

অঙ্গিরাগণ স্তব করিলে ইন্দ্র বলকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। পর্ব্বতে[illegible] দৃঢ়ীকৃত দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। ইহাদিগের কৃত্রিম (৭) [illegible] সকলও উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র সোমজনিত হর্ষ [illegible] হইলে এই সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন ।ঋ।২ম।১৫।৮।

ইন্দ্র গাভীর নির্গমনের জন্য পথ সুগম করিয়াছিলেন, [illegible] শব্দায়মান জল সকল, বহুলোকের আহূত ইন্দ্রের অভিমুখে আগম[illegible] করিয়াছিল ।ঋ।৩ম।৩০।১০।

বলাভিলাষী ইন্দ্র দৃঢ় (মেঘসকল)(৮) জয় করিয়াছিলে[illegible] পর্ব্বতসকলের কন্দ ভেদ করিয়াছিলেন ।ঋ।৪ম।[illegible]

তিনি নির্জ্জন প্রদেশসমূহ পরিপূর্ণ করিয়াছেন ।ঋ।৪ম।১৯।৭।

তুমি বদ্ধ সিন্ধুগণকে উন্মুক্ত করিয়াছ ।ঋ।৪ম।৪২।৭।

যেরূপ পরশু অরণ্য ছেদন করে, তদ্রূপ ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিলে[illegible] শত্রুর পুরী ধ্বংস করিলেন, পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া নদীর পথ [illegible] করিয়া দিলেন, অপক কলসের ন্যায় পর্ব্বতকে ভঙ্গ করিলেন। [illegible] সহায়দিগের সঙ্গে গাভীসমূহ নিষ্কাসিত করিলেন ।ঋ।১০ম।[illegible]

---

(৩) মূলের আক্ষরিক অনুবাদ—তুমি বজ্রের দ্বারা সেই বিশাল পর্ব্বতকে পর্ব্বে পর্ব্বে কাটিয়াছ, সেই নিবৃত (নিরুদ্ধ) জল মুক্ত করিয়াছ।

(৪) মূলে 'ঋষি' কথা নাই।

(৫) মূলে 'দধীচি' নাই।

(৬) মূলে অশ্মনোরন্তরগ্নিং শব্দ আছে। অশ্মন শব্দের [illegible] অর্থ প্রস্তর।

(৭) মূলেও 'কৃত্রিম' শব্দ আছে।

(৮) মূলে 'মেঘ' শব্দ নাই। 'দৃঢ়' কর্ম্মকের বিশেষণ

দোকানীর বউ

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সরলার পায়ে সব সময় মল থাকে। মল বাজাইয়া হাঁটে সরলা,—ঝমর ঝমর। চুপি চুপি নিঃশব্দে হাঁটিবার দরকার হইলেও মল সরলা খুলিয়া ফেলে না, উপরের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া শক্ত করিয়া পায়ের মাংসপেশীতে আটকাইয়া দেয়,—মল আর বাজে না। প্রথম প্রথম শম্ভু এ খবর রাখিত না, ভাবিত বউ আশেপাশে আসিয়া পৌছানোর আগে আসিবে মলের আওয়াজের সঙ্কেত—পিছন হইতে মোটর আসিবার আগে যেমন হর্ণের শব্দ আসে। ক'বার বিপদে পড়িয়া বউয়ের মলের উপর শম্ভুর নির্ভর টুটিয়া গিয়াছে।

ঘোষপাড়ার প্রধানতম পথটার ধারে একখানা বড় টিনের ঘরের সামনের খানিকটা অংশে বাঁশের মাচার উপর শম্ভুর দোকান। মাটির হাঁড়ি গামলা, কেরোসিন কাঠের তক্তার চৌকো চৌকো খোপ, ছোট বড় বারকোশ, চটের বস্তা ইত্যাদি আধারে রক্ষিত জিনিষপত্রের মাঝখানে শম্ভুর বসিবার ও পয়সা রাখিবার ছোট চৌকী; হাত ও লোহার হাতা বাড়াইয়া এখানে বসিয়াই শম্ভু অধিকাংশ জিনিষের নাগাল পায়। পিছনে প্রায় এক মানুষ উঁচু পাঁচ সারি কাঠের তাক। সাবু, বার্লি ও দানাদার চিনি রাখিবার জন্য এক পাশে কাঁচ-বসানো হলদে রঙের টিন, এলাচ লবঙ্গ প্রভৃতি দামী মসলার নানা আকারের পাত্র, লণ্ঠনের চিমনি, দেশলাইয়ের প্যাক, কাপড়-কাচা গায়ে মাখা সাবান, জুতার কালি, লজেঞ্জুস এবং মুদীখানা ও মণিহারী দোকানের আরও অনেক বিক্রেয় পদার্থের সমাবেশে তাকগুলি ঠাসা। তাকের তিন হাত পিছনে শম্ভুর শয়নঘরের মাটিলেপা চাঁচের বেড়ার দেওয়াল। তাক আর এই দেওয়ালের সমান্তরাল রক্ষণাবেক্ষণে যে সরু আবছা অন্ধকার গলিটুকুর সৃষ্টি হইয়াছে শম্ভুর সেটা অন্দরে যাতায়াত করার পথ। সরলা বৌ-মানুষ, অন্দরেই তার থাকার কথা, কিন্তু সরলা মাঝে মাঝে করে কি, পায়ের মল উপরে ঠেলিয়া দিয়া চুপি চুপি তাকের জিনিষের ফাঁকে চোখ পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, স্বামীর দোকানদারী দেখে এবং খদ্দেরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শোনে। বাড়ীতে শম্ভু খুব নিরীহ শান্ত প্রকৃতির চুপচাপ মানুষ কিন্তু দোকানে বসিয়া খদ্দেরের সঙ্গে তাকে কথা বলিতে ও হাসিতামাশা করিতে দেখিয়া সরলা অবাক মানে। মানুষ বুঝিয়া এমন সব হাসির কথা বলে শম্ভু যে তাকের আড়ালে সরলার হাসি চাপিতে প্রাণ বাহির হইয়া যায়। ক্রেতারা যদি পুরুষ হয় তবেই শম্ভুর ব্যবহারে এ-রকম মজা লাগে সরলার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শম্ভুর দোকানে শুধু তার স্বজাতিরাই জিনিষ কিনিতে আসে না।

বেচাকেনা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সরলা অপেক্ষা করে, তার পর পায়ের মলগুলি আলগা করিয়া দেয় এবং মাটিতে লাথিমারার মত জোরে জোরে পা ফেলিয়া ঝমর ঝমর মল বাজাইয়া অন্দরে যায়। শম্ভুও ভিতরে আসে একটু পরেই। দেখিতে পায় উনান নিবিয়া আছে, ভাত-ডালের হাঁড়ি গড়াগড়ি দিতেছে উঠানে, আর স্বয়ং সরলা গড়াইতেছে রোয়াকে। অন্য দুর্লক্ষণগুলি শম্ভু তেমন গুরুতর মনে করে না, ঘরে তিন পুরুষের পালঙ্কে প্রশস্ত সুখশয্যা থাকিতে রোয়াকে ছেঁড়া মাদুরে কালা, কানা, বোবা ও আগুন সরলাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াই সে কাবু হইয়া যায়। তার পর অনেক ক্ষণ তাকে ওজন করিয়া কথা বলিতে ও সোহাগ জানাইতে হয়, একটা মানুষের একটু হাসা ও একটা মানুষকে একটু হাসানোর মধ্যে যে দোষের কিছুই নাই আর একটা মানুষ যে কেন তা বুঝিতে পারে না বলিয়া অনেক আপশোষ করিতে হয়, আর অজস্র পরিমাণে খরচ করিতে হয় দোকানে বিক্রীর জন্য রাখা লজেঞ্জুস। সরলা একেবারে লজেঞ্জুস খাওয়ার রাক্ষসী। তাও যদি কমদামী লজেঞ্জুস খাইয়া তার সাধ মিটিত! পয়সায় যে লজেঞ্জুস শম্ভু দুটির বেশী বিক্রী করে না, কেউ চার পয়সার কিনিলেও একটি ফাউ দেয় না, সেইগুলি সরলার গোগ্রাসে গেলা চাই।

তার পর সরলার কানাত্ব কালাত্ব ও বোবাত্ব ঘোচে এবং

রাগের আগুন নিবিয়া যায়। তবে একটা উদাস-উদাস অবহেলার ভাব, কথায় কথায় অভিমান করিয়া কাঁদ-কাঁদ হওয়া এ সমস্তের ওষুধ হিসাবে দরকার হয় একখানা শাড়ী। দামী নয়, সাধারণ একখানা শাড়ী, ডুরে হইলেই ভাল।

এক বছর মোটে দোকান করিয়াছে শম্ভু, এর মধ্যে এমনিভাবে এবং এই ধরণের অন্য ভাবে সরলা সাতখানা শাড়ী আদায় করিয়াছে। সাধারণ কম দামী শাড়ী,—ডুরে হইলেই ভাল।

তবু, বছরের শেষাশেষি, চৈত্র মাসের কয়েক তারিখে, অকারণে শম্ভু তাকে আর একখানা ডুরে শাড়ী কিনিয়া দিল। বলিল অবশ্য যে ভালবাসিয়া দিয়াছে, একটু বাড়াবাড়ি রকমের ব্যগ্রতার সঙ্গে বাড়াবাড়ি রকম স্পষ্ট করিয়াই বলিল, কিন্তু বিনা দোষে সাত বার জরিমানা আদায়কারিণী বৌকে এরকম কেউ কি দেয়? যাই হোক, শাড়ী পাইয়া এত খুশী হইল সরলা যে আর এক দণ্ডও স্বামীর বাড়ীতে থাকিতে পারিল না, বেড়ার ওপাশে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া হাজির হইল। শম্ভুর বাড়ীটা আসলে আস্ত একটা বাড়ী নয়, বাড়ীর এক টুকরা অংশ মাত্র,—তিন ভাগের এক ভাগ। দোকানঘর ও শয়নঘরে ভাগ করা বড় ঘরখানা, উত্তরের ভিটায় আর একখানা খুব ছোট ঘর, তার পাশে রান্নার একটা চালা আর শয়নঘরের কোণ হইতে রান্নার চালাটার কোণ পর্য্যন্ত মোটা শক্ত ডবল চাঁচের বেড়া দিয়া ভাগ-করা তিনকোণা এক টুকরা উঠান। শম্ভুরা তিন ভাই কিনা তাই বছরখানেক আগে এই রকম ভাবে পৈতৃক বাড়ীটা ভাগ করা হইয়াছে, বেড়ার এ-পাশে শম্ভুর এক ভাগ এবং ওপাশে অন্য দু-ভায়ের বাকী দু-ভাগ। এ-পাশে শম্ভু আর সরলা থাকে, ওপাশে একত্র থাকে শম্ভুর দাদা দীননাথ ও ছোট ভাই বৈদ্যনাথ, তাদের বৌ আর ছেলেমেয়ে, শম্ভুর বিধবা মা ও মাসী, এবং শম্ভুর দু'টি বোন। এভাবে শুধু বৌটিকে লইয়া বাড়ীর উঠানে বেড়া দিয়া ভিন্ন হওয়ার জন্য শম্ভুকে ভয়ানক স্বার্থপর মনে হইলেও আসল কারণটা কিন্তু তা নয়। এক বছর আগে শম্ভু ছিল বেকার, সরলার দোকানদার বাবা বিষ্ণুচরণ তখন অবিকল এই রকম ভাবে ভিন্ন হওয়ার সর্ত্তে জামাইকে দোকান করার টাকা দেয়। সুতরাং বলিতে হয়, স্বামীকে ভেড়া বানাইয়া নয়, বর্ত্তমান সুখ ও স্বাধীনতাটুকু সরলা তার বাপের টাকায় কিনিয়াছে।

কি সুখ সরলার, কি স্বাধীনতা! বেড়ার ওপাশের যাদের কাছে সে ছিল একটা বেকার লোকের বৌ, বেড়ার এ-পাশে এখন তাদের শোনাইয়া শোনাইয়া ঝমর ঝমর মল বাজাইয়া হাঁটিবার কি গর্ব্ব, কি গৌরব! দোকানটা ভালই চলিতেছে শম্ভুর, ওদের টানাটানির সংসারের তুলনায় তার কি সচ্ছলতা! একটু মুখ ভার করিলে তার ডুরে শাড়ী আসে, না করিলেও আসে।

সরলার পরণে নূতন ডুরে শাড়ীখানা দেখিয়া বেড়ার ওপাশের অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করিল। তার মধ্যে সব চেয়ে কড়া হইল ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা বড়-জা কালীর মন্তব্য। শীর্ণ মুখে ঈর্ষা বিকীর্ণ করিয়া বলিল, নাচনেউলী সেজে গুরুজনদের সামনে আসতে তোর লজ্জা করে না মেজ-বৌ? যা যা নাচ দেখিয়ে ভোলা গে যা স্বামীকে।

ছোট-জা ক্ষেন্তির মাথায় একটু ছিট আছে কিন্তু ঈর্ষা নাই। সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, ঝম-ঝম মল বাজে সারাদিন, মেজদি নিশ্চয় দিনরাত্তির নাচে দিদি। পান খাবে মেজদি?

হঠাৎ ভাসুরের আবির্ভাব ঘটায় লম্বা ঘোমটা টানিয়া সরলা একটু মাথা নাড়িল। দীননাথ গম্ভীর গলায় বলিল, মেজবৌ কেন এসেছে পুঁটি?

বিবাহের তিন মাসের মধ্যে স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা কাঠির মত সরু পুঁটি বলিল, এমনি।

—এমনি আসবার দরকার!—বলিয়া দীননাথ সরিয়া গেল। সরলা ঘোমটা খুলিল এবং বৈদ্যনাথ আসিয়া পড়ায় ক্ষেন্তি টানিল ঘোমটা। বৈদ্যনাথ একটু রসিক মানুষ; শম্ভু কেবল দোকানে বসিয়া বাছা-বাছা খদ্দেরের সঙ্গে রসিকতা করে, বৈদ্যনাথ সময়-অসময় মানুষ-অমানুষ বাছে না। সম্ভবতঃ রাত্রে তার রসিকতায় চাপিয়া চাপিয়া হাসিতে হয় বলিয়া ক্ষেন্তির মাথায় যখন-তখন কারণে অকারণে খিল খিল করিয়া হাসিয়া ওঠার ছিট দেখা দিয়াছে। সে আসিয়াই বলিল, মেজো বৌঠান যে সেজেগুজে! কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! কার মুখ দেখে উঠেছিলাম!

এঁ্যা? ও পুঁটি, দে দে বসতে দে, ছুটে একটা দামী আসন নিয়ে আয় গে ছিনাথবাবুর বাড়ী থেকে।

এই রকম করে সকলে সরলার সঙ্গে। কেবল শম্ভুর মা বড় ঘরের দাওয়ার কোণে বসিয়া নিঃশব্দে নির্ব্বিকার চিত্তে মালা জপিয়া যায়, সরলা সামনে আসিয়া ঢিপ করিয়া প্রণাম করিলেও চাহিয়া দেখে না। সরলা পায়ে হাত দিতে গেলে শুধু বলে, নতুন কাপড় প'রে ছুঁয়ো না বাছা।

সরলার দাঁতগুলি একটু বড় বড়। সাধারণতঃ কোন সময়েই সেগুলি সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে না। কুড়ি মিনিট শ্বশুরবাড়ী কাটাইয়া বাড়ী ফেরার সময় দেখা গেল তার অধর ও ওষ্ঠে আজ নিবিড় মিলন হইয়াছে।

ভিন্ন হওয়ার আগে ওরা সরলাকে ভয়ানক যন্ত্রণা দিত। উঠানে বেড়া ওঠার আগে সরলা ছিল ভারি রোগা ও দুর্ব্বল, কাজ করিত বেশী খাইত কম, বকুনি শুনিয়া শুনিয়া ঝালাপালা কান দুটিতে শম্ভুও কখনও মিষ্টি কথা ঢালিত না। এক বছর একা থাকিয়া সরলার শরীরটি হইয়াছে নিটোল, মনটি ভরিয়া উঠিয়াছে সুখ ও শান্তিতে। রাণীর মত আছে সরলা, রান্না ছাড়া কোন কাজই এক রকম তাকে করিতে হয় না, পাড়ার একটি দুঃখী বিধবা কাজগুলি করিয়া দিয়া যায়। দোকান করার জন্য তার বাবা যত টাকা শম্ভুকে দিবে বলিয়াছিল, সব এখনও দেয় নাই, অল্পে অল্পে দিয়া দোকানের উন্নতি করার সাহায্য করিতেছে। মাসে একবার করিয়া আসিয়া দোকানের মজুত মালপত্র ও বেচাকেনার হিসাব দেখিয়া যায়। প্রত্যেক বার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে ইতিমধ্যে শম্ভুর পত্নীপ্রেমে সাময়িক ভাঁটাও কখনও পড়িয়াছিল কি-না। বড় সন্দেহপ্রবণ লোকটা, বড় অবিশ্বাসী,—নয় তো মেয়ের আহ্লাদে গদ-গদ ভাব আর ডুরে শাড়ীর বহর দেখিবার পর ও-কথাটা আর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার চেষ্টা করিত না।

দুঃখ যদি সরলার কিছু থাকে সেটা তার এই পরম কল্যাণকর একা থাকিবার দুঃখ। বেড়ার ওধারে অশান্তিভরা মস্ত সংসারটির কলরব দিনরাত্রি তার কানে আসে, ছোট বড় ঘটনাগুলির ঘটিয়া চলা এ বাড়ীতে বসিয়াই সে অনুসরণ করিতে পারে; ছেলেমেয়েগুলি কখনও কাঁদে ক্ষুধায় আর কখনও কাঁদে মার খাইয়া, বড়-জা কখনও কি জন্য চেঁচায়, ছোট-জা কখনও কি জন্য খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া ধমক শোনে, ছোট দেবর কখনও কাকে খোঁচা দিয়া ঠাট্টা করে, কবে কে আত্মীয়স্বজন আসে যায়। বেড়ার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সরলা স্থানে স্থানে কয়েক জোড়া ফুটা করিয়াছে, সরিয়া সরিয়া এই ফুটাগুলিতে চোখ পাতিয়া সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়। ওই আবর্ত্তের মধ্যে কিছুক্ষণ পাক খাইয়া আসিতে বড় ইচ্ছা হয় সরলার।

নিজের বাড়ী আসিয়া সে ডুরে শাড়ী ছাড়িল না, রান্নার আয়োজন করিল না, একবার শম্ভুর দোকানদারী দেখিয়া আসিয়া ছটফট করিতে লাগিল। বিকালে তার বাবা আসিবে, বাপের সঙ্গে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবে কিনা তাই ভাবিতে লাগিল সরলা। কত কথা মনে আসে আলস্যের প্রশ্রয়ে অবাধ্য মনে। শম্ভু বেকার ছিল তাই আগে সকলে তাকে দিত যন্ত্রণা, ভিন্ন হইয়া আছে বলিয়া এখন সকলে তার সঙ্গে ব্যবহার করে খারাপ। বেড়াটা ভাঙিয়া আবার ভাঙা বাড়ী দুটাকে এক করিয়া দিলে ওরা কি তাকে খাতির করিবে না? তার স্বামী এখন রোজগার করে, ভবিষ্যতে আরও অনেক বেশী করিবে, এই সমস্ত ভাবিয়া? তবে মুস্কিল এই, এখন যদি দোকানের আয়ে ওরা ভাগ বসায় দোকানের উন্নতি হইবে না, এমন একদিন কখনও আসিবে না যেদিন লোহার সিন্দুকে টাকা রাখিতে হইবে শম্ভুকে। যত ডুরে শাড়ী সে আদায় করুক আর লজেঞ্জুস খাক, দোকানের আয়ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব তো সরলা জানে। তিন পুরুষের পালঙ্কে গিয়া সে শুইয়া পড়ে। কত দিন পরে ও-বাড়ীর সকলের ভয় ভালবাসা ও সমীহ কিনিবার মত অবস্থা তার হইবে হিসাব করিয়া উঠিতে না পারিয়া বড় কষ্ট হয় সরলার।

অনেক ক্ষণ পরে উঠিয়া গিয়া অভ্যাস-মত সরলা একবার বেড়ার মাঝখানের ফুটায় চোখ পাতিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, ও-বাড়ীতে বড় ঘরের দাওয়ায় বসিয়া শম্ভু সকলের সঙ্গে কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে শম্ভুকে সে বেড়ার ওদিকে দেখিতে পায়। এতে সরলা আশ্চর্য্য হয় না, সে পরের মেয়ে সে যখন যায়, শম্ভুও মাঝে মাঝে যাইবে বইকি! সরলার কাছে বিস্ময়কর মনে হয় শম্ভুর সঙ্গে সকলের

ব্যবহার। ভিন্ন হওয়ার জন্য রাগ করা দূরে থাক কেউ যেন একটু বিরক্ত পর্য্যন্ত হয় নাই শম্ভুর উপর। বেড়া ডিঙানো মাত্র ওপাশের মানুষগুলির সঙ্গে শম্ভু যেন এক হইয়া মিশিয়া যায়, এতটুকু বাধা পায় না। পুঁটি এক গ্লাস জল আনিয়া দিল শম্ভুকে। সকলের সঙ্গে কি আলোচনা শম্ভু করিতেছে সরলা বুঝিতে পারিল না, মন দিয়া সকলে তার কথা শুনিতে লাগিল আর খুশী হইয়া কি যেন বলাবলি করিতে লাগিল নিজেদের মধ্যে। শম্ভু উঠিয়া আসিবার পরেও ওদের মধ্যে আলোচনা চলিতে লাগিল। সরলা অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল যে তার স্বামীর যোগ আছে অথচ তার জানা নাই এমন কি গুরুতর ব্যাপার থাকিতে পারে যে এত পরামর্শ দরকার হয়? জিজ্ঞাসা করিতে শম্ভু বলিল, ও কিছু না। জমিজমা ভাগ-বাঁটোয়ারার কথা হচ্ছিল। আমার ভাগটা বেচে ফেলব ভাবছি কি-না।

—কেন, বেচবে কেন?

শম্ভু মুখ ভার করিয়া বলিল, তুমি জান না, না? কবে থেকে বলছি তেল নুন বেচে লাভ নেই একদম, বাজারে একটা মণিহারী দোকান করব,—তাতে টাকা লাগবে না? কোথায় পাব টাকা জমি না বেচলে?

সরলা বলিল, জমির থেকেও আয় ত হচ্ছে?

—দোকানে বেশী হবে।

সরলা চিন্তিতা হইয়া বলিল, কবে খুলবে বাজারে দোকান?

—পয়লা বোশেখ খুলব ভাবছি, এখন আমার অদেষ্ট।

প্রকাণ্ড একটা হাই তুলিয়া হাঁ'র সামনে তুড়ি দিল শম্ভু, মাথা নাড়িল, বাঁকা হইয়া বসিল। বলিল, তোমার বাবা বলেছিল সবসুদ্ধ ছ-শ টাকা দেবে দোকান করতে, দোকান খোলার জন্যে এক-শ দিয়ে বাকী টাকা আটকে দিলে। এক বছরে আর মোটে দু-শ দিয়েছে তার পর,—এমনি করলে দোকান চালাতে পারে মানুষ? দোকান করতে একসঙ্গে টাকা চাই।

মনে মনে একটা জটিল হিসাব করিয়া সরলা বলিল, বাবা ত আসবে আজ, বাবাকে বলব?

শম্ভু বিষণ্ণ মুখে বলিল, ব'লে কি হবে? বিশ ত্রিশ টাকার বেশী একসঙ্গে দেবে না।

আমি বললে নিশ্চয় দেবে, বলিয়া সরলা একগাল হাসিল।

তার পর বউকে লজেঞ্চুস দিল শম্ভু, কালো গালে অদৃশ্য রং আনিল আর ফিস ফিস করিয়া নিজের গোপন মতলবের কথা বলিতে লাগিল। মা'র হাতে কিছু টাকা আছে শম্ভুর, সব ছেলের চেয়ে শম্ভুকেই তার মা বেশী ভালবাসে তা ত জানে সরলা। ওই টাকাটা বাগানোর ফিকিরে আছে শম্ভু, নয়ত এত বেশী ও-বাড়ীতে যাওয়ার তার কি দরকার! বাজারে মস্ত দোকান খুলিবে শম্ভু, এবার আর দোকানদারী নয়, রীতিমত ব্যবসাদারী,—বাপকে বাকী টাকাটা এক সঙ্গে দিবার কথা বলিতে সরলা যেন না ভোলে। দুর্গা দুর্গা। না, এবেলা আর রাঁধিবার দরকার নাই। ফলার-টলার করিলেই চলিবে। আহা, গরমে সরলার রাঁধিতে কষ্ট হইবে যে।

সরলা জানে হিসাবে ভুল হইতেছে, বাটখারা লাভের দিকে না-ঝুঁকিবার সম্ভাবনা আছে, তবু স্বামীর সঙ্গে আর বেশী দোকানদারী করা ভাল নয়। বাপের টাকায় স্বামীকে কিনিয়া রাখিয়াছে এক বছর, এবার তাকে মুক্তি দেওয়াই ভাল, তাতে যা হয় হইবে। একদিন ত নিজেকে কোন রকম রক্ষাকবচ ছাড়াই স্বামীর হাতে সমর্পণ করিতে হইবে তার। তা ছাড়া এক বছর ধরিয়া স্বামী তাহাকে যে-রকম ভালবাসিয়াছে সেটা শুধু নিজের মনের খুঁতখুঁতানির জন্য ফাঁকি মনে করা উচিত নয়। অবশ্য, পেটে যে সন্তানটা আসিয়াছে সেটা জন্মগ্রহণ করা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেই সব চেয়ে ভাল হইত, এতদিন একসঙ্গে বাস করিয়া সরলার কি আর জানিতে বাকী আছে নিজের ছেলের মুখ দেখিলে শম্ভুর পাকা শক্ত মনটা কি রকম কাঁচা আর নরম হইয়া যাইবে। তবে ছেলেটার জন্মিতে এখনও অনেক দেরি। তার আগে জমি বেচিয়া বাজারে মণিহারী দোকান খুলিয়া বসিলে শম্ভু ভাবিবে সব কীর্ত্তি তার একার, কারও কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার কিছু নাই। আগেকার কথা মনে করিয়া সরলা অবশ্য ভাবিয়া উঠিতে পারে না কৃতজ্ঞতার কতখানি দাম আছে শম্ভুর কাছে। বাজারে মণিহারী দোকান খুলিয়া দু-এক বছরের মধ্যে এমন অবস্থা যদি হয় শম্ভুর যে মাঝখানের বেড়াটা ভাঙিয়া সরলা নির্ভয়ে এবং সুখে শান্তিতে, এক রকম বাড়ীর কর্ত্রীর মতই সকলের

সঙ্গে বাস করিতে পারে, হয়ত অকৃতজ্ঞ পাষাণের মত শম্ভু নিজেই তাকে দাবাইয়া রাখিবে। তবু, ভবিষ্যতেও সে তার বশে থাকিতে পারে এ-রকম একটু সম্ভাবনা যখন দেখা গিয়াছে এবার হাল ছাড়িয়া দেখাই ভাল যে কি হয়।

সরলার সন্দেহপ্রবণ অবিশ্বাসী বাবা মেয়ের অনুরোধ শুনিয়া প্রথমটা একটু ভড়কাইয়া গেল। একসঙ্গে তিন-শ টাকা! জামাইকে আর একটি পয়সা না দিবার কথাই সে ভাবিতেছিল, দোকান যেমন চলিতেছে শম্ভুর, তাতে দু-জন মানুষের খাইয়া-পরিয়া থাকা চলে, বড়লোকের মত না হোক গরীবের মত চলে। জামাইকে বড়লোক করিয়া দিবার ভার ত সে গ্রহণ করে নাই। মোট ছ-শ টাকা অবশ্য সে দিবে বলিয়াছিল, তবে সংসারে কত সময় মানুষ অমন কত কথা বলে, সব কি আর চোখ-কান বুজিয়া অক্ষরে অক্ষরে পালন করা উচিত, না তাই মানুষে পারে? অবস্থা বুঝিয়া করিতে হয় ব্যবস্থা। তাছাড়া, বাজারে মণিহারী দোকান খোলার মত দুর্ব্বুদ্ধি যদি শম্ভু করিয়া থাকে—কাঁদিয়া-কাটিয়া সরলা অনর্থ করিতে থাকে, কত কষ্টে বাপের কাছ হইতে টাকাটা সে আদায় করিয়া দিতেছে, শম্ভুকে তা বোঝানোর জন্য যতটা দরকার ছিল তার চেয়ে বেশী কাঁদাকাটা করে। দেবে বলেছিলে এখন দেবে না বলছ বাবা?—বলিতে বলিতে দুঃখে অভিমানে বুকটাই যেন ফাটিয়া যাইবে সরলার। একসঙ্গে তিন-শ টাকা দেওয়া সরলার বাবার পক্ষে সহজ নয়, তবু একবেলা মেয়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া সে হার মানিল। ছেলে তার আছে তিনটা কিন্তু আর মেয়ে নাই। সরলা তার একমাত্র মা-মরা ছোট মেয়ে। কোথায় দোকান করিবে, কি রকম দোকান খুলিবে, কত টাকার জিনিষ রাখিবে দোকানে আর কত টাকা পুঁজি রাখিবে হাতে, শম্ভুকে এসব অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সরলার বাবা গম্ভীর চিন্তিত মুখে বিদায় হইয়া গেল।

সরলা বলিল—দেখলে?

শম্ভু যথোচিত ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইল। স্বামীদের যে-ভাবে স্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানান উচিত ঠিক সে ভাবে নয়, নম্র ভাবে, সবিনয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে। এই সময় বেড়ার ওপাশে হঠাৎ শোনা গেল ছোটবৌ ক্ষেন্তির খিলখিল হাসি। বেড়ার ফুটায় সে চোখ পাতিয়া ছিল নাকি এতক্ষণ, তাদের আলাপ শুনিতেছিল? রান্নার চালাটার পিছন দিয়া ঘুরিয়া সরলা চোখের নিমেষে ও-বাড়ীতে গিয়া হাজির হইল। বৈদ্যনাথ ক্ষেন্তি আর বাড়ীর কুকুরটা ছাড়া উঠান নির্জ্জন। উঠানের বেড়া আর ধানের মরাইটার মাঝখানে দাঁড়াইয়া রসিক বৈদ্যনাথ স্ত্রীর সঙ্গে রসিকতা করিতেছে।

—সবাই কোথা গেছে লো ছোটবৌ?

কাছে আসিয়া ক্ষেন্তি ফিস ফিস করিয়া বলিল, ঘরে।

সেটা সম্ভব। চৈত্রের দুপুরে ঘরের বাহিরে কড়া রোদ, গরম বাতাস। কিন্তু এদের কি ঘর নাই? এখানে এরা কি করিতেছে এ সময়? হাসাহাসি? নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া বারান্দা ছাড়িয়া এবার সরলা ও শম্ভু ঘরে গেল। তিন পুরুষের পুরানো পালঙ্কে (ভিন্ন হওয়ার সময় ভাইদের কবল হইতে শম্ভু সেটা কি কৌশলে বাগাইয়াছিল আজও সরলা তাহা বুঝিতে পারে না) শুইয়া সরলা চোখ বুজিল, শম্ভু বসিয়া বসিয়া টানিতে লাগিল তামাক। নিজেই তামাক সাজে কি না শম্ভু, এত বেশী তামাক দেয় যে তামাক শেষ হইতে হইতে দুপুরে এবং রাত্রে দু-বেলাই সরলার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। আজ দেখা গেল সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হয় বাপের সঙ্গে সমস্ত সকালবেলাটা লড়াই করিয়া না-হয় বৈদ্যনাথ ও ক্ষেন্তিকে ধানের মরাইয়ের আড়ালে রোদে দাঁড়াইয়া হাসাহাসি করিতে দেখিয়া সরলা বোধ হয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

দিন-সাতেক পরে শম্ভু সকাল বেলা সরলার বাবার কাছ হইতে টাকা আনিবার জন্য রওনা হইয়া গেল। গেল ও-বাড়ী হইয়া। দোকানে নূতন মাল আনা সে কিছুদিন আগেই বন্ধ করিয়াছিল, অনেক জিনিষ ফুরাইয়া গিয়াছে, অনেক খদ্দের ফিরিয়া যায়। মণিহারী দোকানে যে-সব জিনিষ রাখা চলিবে না,—চাল ডাল মশলাপাতি, সে সব শেষ হইয়া যাওয়াই ভাল। তাই আজ একটা দিনের জন্যও দোকানটা সে বন্ধ রাখিতে চায় না। বৈদ্যনাথ আসিয়া দোকানে বসিবে। বেকার রসিক বৈদ্যনাথ। শম্ভুর যে ছোট ভাই এবং যে দুপুর রোদে উঠানে ধানের মরাইয়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া বৌয়ের সঙ্গে হাসাহাসি করে। শম্ভুও একদিন বেকার ছিল, বউও ছিল শম্ভুর,—ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়ার মত

হাড্ডিসার হোক, বউ বউ। ক্ষেন্তিই বা কি রূপসী পরীর মত ? ওর মাথায় বরং ছিট আছে, এক বছর আগেকার সরলার মত কম খাইয়া বেশী খাটিতে খাটিতেও কারণের চেয়ে অকারণেই বেশী খিল খিল করিয়া হাসে। বেকার অবস্থায় একবারও নয়, দোকানদার হওয়ার পর শম্ভুকে কয়েক বার হাসাহাসি করিতে দেখিয়াছে সরলা, কিন্তু সে অন্য এক জনের সঙ্গে। তার পর শম্ভু বউকে কিনিয়া দিয়াছে ডুরে শাড়ী। অন্য অনেকের সঙ্গেই বৈদ্যনাথ হাসাহাসি করে, ক্ষেন্তিকে কিন্তু কখনও কিছু কিনিয়া দেয় না। কি করিয়া দিবে ? পয়সা নাই যে! দু-ভায়ের মধ্যে প্রভেদটা কি আশ্চর্য্যজনক ! নামে নামে পর্য্যন্ত শুধু 'নাথ'এর মিল, ওটা বাদ দিলে এক জন শম্ভু অন্য জন বৈদ্য !

মন না বাজাইয়া দোকানে তাকের আড়ালে দাঁড়াইয়া সরলা বৈদ্যনাথের অনভ্যস্ত দোকানদারী দেখে। মালপত্রের অভাবে কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লক্ষ্মী-ছাড়া মনে হয় দোকানটা।

ক'দিন হইতে মনটা ভাল ছিল না সরলার, উঁচু দাঁত দুটি অনেক সময় ঢাকা পড়িয়া যাইতেছিল। পাকা দোকানীর মেয়ে সে, কাঁচা দোকানীর বউ,—তার কেবল মনে হইতেছিল ভুল হইয়াছে, ভুল হইয়াছে, শুধু লোকসান নয়, একেবারে সে দেউলিয়া হইয়া যাইবে এবার। কিছুদিন হইতে কি রকম যেন হইয়া উঠিয়াছে পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা তার, সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তবু চোখ-কান বুজিয়া এই সব না-বোঝা অবস্থা ও ঘটনাগুলিকে পরিণতির দিকে চলিতে সাহায্য করিতেছে। আজকাল শম্ভু ঘন ঘন ও-বাড়ীতে যাওয়া-আসা সুরু করিয়াছে, ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছে, সেটা না-হয় জমিজমার ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্যই হইল, শম্ভুর সঙ্গে ও-বাড়ীর সকলের ব্যবহার ? ও-বাড়ীতে কি শুধু দেবদেবী বাস করে যে, এক বছর ধরিয়া এমন ভাবে ভিন্ন হইয়া থাকিয়া জমিজমার ভাগ-বাঁটোয়ারা করিতে গেলেও শম্ভুর সঙ্গে ওরা সকলে পরমাত্মীয়ের মত ব্যবহার করিবে ? তাছাড়া এখানকার দোকান তুলিয়া দিয়া বাজারে দোকান খুলিতেছে শম্ভু, সে জন্য ও-বাড়ীতে একটা উত্তেজনার প্রবাহ আসিবে কেন ? ওদের কি আসিয়া যায় ? বেড়ার ফুটায় চোখ রাখিয়া সরলা স্পষ্ট বুঝিতে পারে ও-বাড়ীর বয়স্ক মানুষগুলির কি যেন হইয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে বিবাহ উপনয়নের মত বড় রকম একটা ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলে বাড়ীর লোকগুলি যেমন করে, ওরাও করিতেছে অবিকল তেমনই। হইতে পারে শম্ভুর বাজারে দোকান খোলার একই সময়ে ওদের সংসারেও একটা বড় ব্যাপার ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে, তবে সেটা যে কি ব্যাপার সরলা তা জানিতে পারিতেছে না কেন ? বেড়ার ওপাশে যা ঘটিবে, সকলে গোপন না করিলে সরলার কাছে ত তা গোপন থাকার কথা নয়। আর, সরলার কাছে সকলে যা গোপন করিবে, তার পক্ষে সেটা কি কখনও শুভকর হইতে পারে ?

শুধু টাকা-আদায়ের চেষ্টা করার বদলে বাপের সঙ্গে এ-সব বিষয়ে পরামর্শ না-করার জন্য সরলার দুঃখ হয়। মেয়েমানুষ সে, এত লোকের ষড়যন্ত্র সে কি সামলাইয়া চলিতে পারে ? চক্রান্তটা বুঝিতে পারিলেও বরং আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া দেখিত, একটা বুদ্ধি খাটানো চলিত। সে যে অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরিতেছে, স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে। সে যে ঠিক করিয়াছে এবার হাল ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। মেয়েমানুষ সে, বৌমানুষ সে, তার কি উচিত এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়া রাখা যাহাতে তার বিরুদ্ধে সকলের চুপি চুপি চক্রান্ত করিতে হয় ?

দোকানে খদ্দের নাই দেখিয়া এক সময় সে বৈদ্যনাথকে ভিতরে ডাকিল।

—আচ্ছা ঠাকুরপো, ও তোমাদের বাড়ী গিয়ে কি সব বলত বল ত ?

রসিক বৈদ্যনাথ বলিল, তা জান না মেজো বৌঠান ? তোমার নিন্দে করত—তুমি নাকি দাদার এক কান ধরে ওঠাও, আর এক কান ধরে বসাও। কানের ব্যথায়—

সরলা রাগিয়া বলিল, চাষার মতন কথাবার্ত্তা হয়েছে তোমার বাপু, এদিকে এক পয়সা রোজগার নেই, কথা শুনলে গা জলে মানুষের। বিক্রীর পয়সা থেকে আজ কত গাপ করবে তুমিই জান !

ক'দিন আগে ধানের মরাইয়ের আড়ালে বৌ-এর সঙ্গে হাসাহাসি করার পুরস্কার পাইয়া বৈদ্যনাথ দোকানে গিয়া বসিল। সরলা গালে হাত দিয়া রোয়াকে বসিয়া ভাবিতে লাগিল ভবিষ্যতের কথা। বড় ভাই উকীলের মুহুরি, সে নিজে একটা পাস দিবার দু-ক্লাস নীচে পর্য্যন্ত পড়িয়া একটা

আড়তে হিসাব লেখার কাজ করে, এত সব দেখিয়া তার বাবা শম্ভুর সঙ্গে তার বিবাহ দিয়াছিল, তার দাঁত-উঁচু কালো মেয়েকে। না-ই বা দিত? পাশের গাঁয়ের জগৎ নামে যে লোকটি জমি চাষ করিয়া খায় তার সঙ্গে দিলেই হইত? সে লোকটা এমনিই বশে থাকিত সরলার, আর অদৃষ্টে থাকিলে তাহাকে দিয়া আস্তে আস্তে অবস্থার উন্নতি করিয়া এমন দিন হয়ত সে আনিতে পারিত যখন ডুরে শাড়ীটি পরিয়া মল বাজাইয়া সে ঘুরিয়া বেড়াইত, না করিত সংসারের কাজ, না শুনিত কারও বকুনি। দোকানদারের দাঁত-উঁচু কালো মেয়ের মুখ্য চাষা স্বামীই ভাল। লেখাপড়া শিখিয়া পরের আড়তে যে কাজ করে আর পরের টাকায় দোকানী হয় তার মত পাজী বজ্জাত নে...—

পরদিন অনেক বেলায় শম্ভু ফিরিয়া আসা মাত্র সরলা টের পাইল যে-লোকটা কাল বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছিল অবিকল সেই লোকটাই ফিরিয়া আসে নাই। গিয়াছিল দম-আটকানো অবস্থায়, ফিরিয়া আসিয়াছে হাঁফ ছাড়িয়া। শম্ভু একবার একটা মামলায় পড়িয়াছিল, রায় প্রকাশের দিন সে যেমন অবস্থায় কোর্টে গিয়াছিল আর স্বপক্ষে রায় শুনিয়া যেমন অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছিল এবার শ্বশুর-বাড়ী যাওয়া-আসা তার সঙ্গে মেলে।

—টাকা পেলে? সরলা জিজ্ঞাসা করিল।

শম্ভু একগাল হাসিয়া বলিল, হাঁ পেয়েছি।

—সব?

—সব। পাখাটা কই? বাতাস কর না একটু।

সরলা হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল, ওই যে পাখা বেড়ার গায়ে। হ্যাগো, দাদা কিছু বলল না এই টাকার ব্যাপার নিয়ে? বিয়ের সময় তোমাকে চার-শ টাকা পণ দেওয়া নিয়ে বাবার সঙ্গে যে কাণ্ডটা বেধেছিল দাদার!

শম্ভুর মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছিল, কড়া দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, ঘেমেটেমে এলাম এই রোদে, পাখাটা পর্য্যন্ত এনে দিতে পার না তুমি হাতে? অন্য কেউ হ'লে বাতাস করত নিজে থেকে, বলতেও হ'ত না।

সরলা হাসিয়া বলিল, ছোট বৌ করে, ঠাকুরপো ওকে খুব হাসায় কি-না সেই জন্যে।

পাখাটা আনিয়া সরলা স্বামীকে বাতাস করিতে লাগিল বটে, বাতাসে শম্ভু কিন্তু ঠাণ্ডা হইল না। ভিতরে ভিতরে সে যে গরম হইয়াই আছে সেটা বোঝা যাইতে লাগিল তার মুখের ভাবে ও তাকানোর রকমে। সরলা আনমনে বলিতে লাগিল, ষাট্, ষাট্! আমার মাথার যত চুল তত বচ্ছর পরমায়ু হোক ছোট বৌয়ের।

—কেন?

—কাল রাত্তিরে দুঃস্বপন দেখলাম যে। হাসতে হাসতে ছোটবৌটা যেন মরে গেছে বুক ফেটে! আগুন লাগুক আমার পোড়া স্বপন দেখায়!

শম্ভু রাগিয়া বলিল, ইয়ার্কি জুড়েছ নাকি আমার সঙ্গে, এঁ্যা? ভাল হবে না বলছি। ঘেমেটেমে এলাম আমি—

বকুনি শুনিয়া সরলা অভিমান করিয়া পাখা ফেলিয়া রোয়াকে গিয়া ছেঁড়া মাদুরে শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া তেল মাখিতে মাখিতে শম্ভু বলিল, রাগ হ'ল নাকি? রাগবার মত কি তোমাকে বলেছি শুনি?

সরলা জবাব না দেওয়ায় গামছা-কাঁধে সে স্নান করিতে চলিয়া গেল পুকুরে। চলন্ত স্বামীকে দেখিতে চৈত্রের রোদে চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল সরলার! ডুরে শাড়ী নয়, লজেঞ্চুস নয়, সোহাগ নয়, মিষ্টি কথা নয়, শুধু সে রাগ করিয়াছে নাকি জিজ্ঞাসা করিয়া স্নান করিতে চলিয়া যাওয়া! একদিনে এমন অধঃপতন হইয়াছে শম্ভুর? কে জানে, স্নান করিয়া আসিয়া খাইতে বসিয়া ডাল পোড়া-লাগার জন্য সরলাকে হয়ত আজ সে গালাগালি পর্য্যন্ত দিয়া বসিবে! সব কথা খুলিয়া বলিয়া বাবার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কি ভুলই সে করিয়াছে!

ডাল পোড়া-লাগার জন্য শম্ভু কিছু বলিল না, বরং মুখ ভার করিয়া না থাকার জন্য একবার অনুরোধই করিল সরলাকে। সরলা সজল সুরে বলিল, বকলে কেন? শম্ভু বলিল, না, বকি নি। ঘেমেটেমে এলাম কিনা—

খাওয়ার পর সরলাই আজ তাকে তামাক সাজিয়া দিল। সাজিয়া দিল, ফুঁ দিয়া তামাক ধরাইয়া দিল না। আয়নার সামনে সে অভিনয় করিয়া দেখিয়াছে যে ফুঁ দিবার সময় বড় বিশ্রী দেখায় তার মুখখানা। শম্ভু নিজেই তামাক ধরাইয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত টানিতে আরম্ভ করিল। সরলা বলিল, ঠাকুরপো যা বিক্রীসিক্রী করেছে, হিসাব নিও।

শম্ভু বলিল, নেব।

সরলা বলিল, রাখালবাবুর বাড়ী আধ মণ চাল নিয়েছে, ছিনাথ উকীলের বাড়ী আড়াই সের মুগের ডাল, আড়াই-পো মিছরি আর গায়ে মাখা একটা সাবান, তাছাড়া খুচরো জিনিষ অনেক বিক্রী হয়েছে। ভাঁড়ে ক'রে ঠাকুরপো অনেকটা তেল বাড়ী নিয়ে গেছে কাল, আর আজ নিয়ে গেছে কতকগুলো লেবেঞ্চুস, আর কিসের যেন একটা কৌটো, অত নামটাম জানি না বাপু আমি, জিজ্ঞেস ক'রো।

শম্ভু বলিল, আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে'খন।

তার পর এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়িল। সরলা একবার ও-বাড়ীতে গেল। কেহ তাহাকে আসিতেও বলে না, বসিতেও বলে না, তবে এতদিনে এটা তার সহ্য হইয়া গিয়াছে। বড়-জা কালী শুইয়া আছে, ক্ষেন্তি সেলাই করিতেছে কাঁথা, বৈদ্যনাথ ঘুমে অচেতন। শাশুড়ী উবু হইয়া বসিয়া মালা জপিয়া চলিয়াছে, কাছে চুপচাপ বসিয়া আছে পুঁটি। ভাসুর এ-সময় কাজে যায়, নাম মাত্র ঘোমটা দিয়া অনেকটা স্বাধীনভাবেই সরলা খানিক ক্ষণ এঘরে খানিক ক্ষণ ওঘরে বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিল। ক্ষেন্তির কাছেই সে বসিল বেশী ক্ষণ। ফিস্ ফিস্ করিয়া আবোল-তাবোল কতকগুলি কথা বলিল ক্ষেন্তি, একবার খিলখিল করিয়া হাসিল, আসল কথা একটিও আদায় করা গেল না তার কাছে। বাড়ী আসিয়া পালঙ্কে উঠিয়া সরলা বসিয়া রহিল। জোর বাতাসে টাঙানো বাঁশে সাজানো জামা-কাপড়গুলি দুলিতেছে, ওর মধ্যে সরলার ডুরে শাড়ী দুখানাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী। আর দৃষ্টি আকর্ষণ করে শম্ভুর ঘাড়ের কাছে লোমভরা মস্ত জন্মচিহ্নটি। কাৎ হইয়া শুইয়া আছে শম্ভু, চওড়া পিঠে শয্যায় বিছানো পাটির ছাপ। সরলা বিছানায় উঠিবার পর সে পাশ ফিরিয়াছে, সরলার দিকে নয়, ওদিকে। কে জানে এটা তার ভাগ্যেরই ইঙ্গিত কি না! এ-রকম কত ইঙ্গিত ভাগ্য মানুষকে আগে-ভাগে করিয়া রাখে। শম্ভুর সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে সোনারপুরে তার জন্য খুব ভাল একটি পাত্র দেখিতে বাহির হওয়ার সময় তার বাবা চৌকাটে হোঁচট খাইয়াছিল, আগের বারের ছেলেটা তার পেটের মধ্যেই যেদিন মরিয়া গিয়াছিল তার আগের রাত্রে একটা প্যাঁচা ঘরের পিছনে আমগাছটায় ডাকিয়া ডাকিয়া ভয়ে তাহাকে আধমরা করিয়া দিয়াছিল।—সরলা হঠাৎ শক্ত হইয়া যায়, লম্বাটে হইয়া যায় তার মুখখানা। বেড়ার গায়ে ঠিক এমনি সময় একটা টিকটিকিও যে ডাকিয়া উঠিল আজ? মাগো, না জানি কি আছে সরলার কপালে!

বিকালে ঘুম ভাঙিয়া মুখ-হাত ধুইয়া আগের বারের সাধ তামাক টানার সুখটা মনে করিয়া শম্ভু বলিল, দাও না, এক ছিলুম তামাক সেজে দাও না।

সরলা বলিল, তুমি সেজে নাও।

শম্ভু গভীর উদারতা বোধ করিতেছিল, জেলখানার কয়েদী যেন নিজের বাড়ীতে তিন পুরুষের পুরানো পালঙ্কে প্রথম ঘুম দিয়া উঠিয়াছে। নিজেই তামাক সাজিয়া গিয়া দোকান খুলিল, কাঠের ছোট চৌকীটিতে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল। পাড়ার দুঃখী মেয়েটি আসিয়া বাসন মাজিয়া রান্নাঘর লেপিয়া জল তুলিয়া দিয়া গেল। ও-বাড়ীর দুপুরের স্তব্ধতা ধীরে ধীরে ঘুচিয়া যাইতে লাগিল। বেলা পড়িয়া গেল, সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সরলা গা ধুইল না, রান্নার আয়োজন করিল না, খানিকক্ষণ ছটফট করিতে লাগিল অন্দরে আর খানিকক্ষণ ফাঁকে চোখ রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে লাগিল দোকানে তাকের আড়ালে। সন্ধ্যার পর দীননাথ কাজ হইতে ফিরিয়া বাড়ী ঢোকার আগে আসিল শম্ভুর দোকানে। উপস্থিত খদ্দেরটি চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিল, টাকা পেয়েছিস?

শম্ভু বলিল, হাঁ, বাড়ী যান, আমি যাচ্ছি।

দীননাথ বলিল, এখানেই বসি না, ব'সে কথাবার্ত্তা কই?

শম্ভু বলিল, না, না, এখানে নয়, আড়ালে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি সব শোনে।

দীননাথ এ-বগলের নথিপত্র ও-বগলে চালান করিয়া বলিল, বাড়ীতে ছেলেপিলেগুলো বড্ড জালায়। বৌমা এলে মলের আওয়াজে—?

সরলার মল যে সব সময় বাজে না এ-কথা বুঝাইয়া বলিতে সে যে কেমন লোকের মেয়ে এ-বিষয়ে একটা মন্তব্য করিয়া দীননাথ বাড়ী গেল। খানিক পরে দোকান বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া শম্ভু গেল অন্দরে। ত্রিকোণ উঠানের এক কোণে এক বছর আগে সরলার স্বহস্তে রোপিত তুলসী গাছটার তলায় শুধু একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে নিবু-নিবু

বস্থায়, আর কোথাও আলো নাই। বেড়া ডিঙাইয়া ও-বাড়ীর আলো খানিকটা শোবার ঘরের চালে আসিয়া পড়িয়াছে। ঘরে গিয়া একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়া ছেলা যে খাটে শুইয়া আছে শম্ভু তাহাও দেখিয়া লইল, একটা ঘড়িও ধরাইয়া লইল। তার পর সরলাকে একবার ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া গেল ও-বাড়ীতে।

তখন উঠিয়া বসিল সরলা। এ-বাড়ীতে এক বছর রাণীর মত যে মল বাজাইয়া সে হাঁটিয়া বেড়াইয়াছে আজ প্রথম সেই মলগুলি খুলিয়া ফেলিল। এমন হাল্কা মনে হইতে লাগিল পা দুটিকে সরলার! লঘুপদে সে নামিয়া গেল উঠানে। বেড়ার ফুটায় চোখ দিয়া বুঝিতে পারিল ও-বাড়ীর একমাত্র কালি-পড়া লণ্ঠনটি জ্বলিতেছে বড় ঘরে এবং ও-ঘরেই আসর বসিয়াছে তিন ভাইয়ের, দরজার কাছে বসিয়া আছে কালী আর ভিতরে তার শাশুড়ীর শরীরটা রহিয়াছে আড়ালে, শুধু দেখা যাইতেছে মালা-জপ-রত হাত। রান্নার চালাটার পিছন দিয়া ঘুরিয়াই বেড়ার ওপাশে ও-বাড়ীর উঠানের একটা প্রান্ত পাওয়া যায়। সরলা সেদিকে গেল না, একেবারে নামিয়া গেল ও-বাড়ীর রান্নঘর ও তার লাগাও ক্ষেন্তির ঘরের পিছনে ঝোপঝাড়ের মধ্যে। কি অন্ধকার চারি দিক। ভয়ে সরলার বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছিল। ছিটাল পার হওয়ার সময়ে পায়ে একটা মাছের কাঁটা ফুটিল। কিন্তু কি করিবে সরলা? ভয় করা আর মাছের কাঁটা ফোটাকে গ্রাহ্য করিলে তার চলিবে কেন? একা মেয়েমানুষ সে, এতগুলি লোক তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র জুড়িয়াছে, রচনা করিতেছে ফাঁদ। কিসের ভয় এখন, কিসের কাঁটা ফোটা! আর যা হয় হোক, অন্ধকারে এভাবে বনে জঙ্গলে আর ছিটালে হাঁটার জন্য কিছু যেন তার নাগাল না পায়, পেটের ছেলেটা এবারও যেন তার মরিয়া না যায় জন্ম নেওয়ার আগেই। এলোচুলে সে ঘরের বাহির হয় নাই, একটি চুল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বাঁ-হাতের কড়ে-আঙুলের নখে কামড় দিয়া তবে উঠানে নামিয়াছে, এই যা ভরসা সরলার।

বড় ঘরের পিছনে কয়েকটা কলাগাছ আছে, ঘরের দুটো জানালাও আছে এদিকে। উঁচু ভিটার ঘর, জানালাগুলিও বেড়ার অনেক উঁচুতে। এত কষ্টে এখানে আসিয়া জানালার নাগাল না পাইয়া সরলার কান্না আসিতে লাগিল। তবে জানালার পাশে পাতা চৌকীতেই বোধ হয় তিন ভাই বসিয়াছে, ওদের কথাগুলি বেশ শোনা যায়, শুধু বোঝা যায় না পুঁটি কালী শাশুড়ী ওদের মন্তব্য। কান্না এবং ঘরের ভিতরের দৃশ্যটা দেখিবার প্রবল ইচ্ছা দমন করিয়া সরলা কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল।

শম্ভুর গলা: কবার ত বললাম, এই সোজা হিসেবটা তোর মাথায় ঢোকে না বদ্যি? আমার দোকানে যা মণিহারী জিনিষ আছে তার দাম এক-শ'র বেশীই হবে,—ধরলাম এক-শ। মাল না কেনার জন্যে হাতে জমেছে এক-শ দু-পাঁচ টাকা,—ধরলাম এক-শ। আর শ্বশুর-মশায় দিয়েছে তিন-শ। এই হ'ল পাঁচ-শ,—আমার ভাগ। তুই আর দাদা পাঁচ-শ ক'রে দিলে হবে দেড় হাজার। হাজার টাকায় দোকান হবে; হাতে থাকবে পাঁচ-শ।

হাসি চাপিতে ক্ষেন্তির মুখে কাপড় গোঁজার আওয়াজ। দীননাথের গলা: বৌমা! বেহায়াপনা ক'রো না বৌমা।

—কি জানিস শম্ভু, বড় বৌয়ের সব গয়না বেচে আর কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আমি না-হয় পাঁচ-শ দিলাম, বদ্যি অত টাকা কোথা পাবে? ছোট বৌমার গয়না বেচলে ত অত টাকা হবে না।

বৈদ্যনাথের গলা: শ-তিনেক হয় ত ঢের। তবে আমার বিয়ের আংটি বেচলে—

শম্ভুর গলা: থাম্ বাপু তুই, সব সময় খালি ফাজলামি তোর।

দীননাথের গলা: যেমন স্বভাব হয়েছে তোর তেমনি স্বভাব হয়েছে ছোট বৌমার।

শম্ভুর গলা: যাক্, যাক্। কাজের কথা হোক। বদ্যি তবে আড়াই-শ দিক, লাভের আমরা যা ভাগ পাব ও পাবে তার অদ্দেক। ভাগাভাগির কথা বলছি এই জন্যে, আগে থেকে এসব কথা ঠিক ক'রে না রাখলে পরে আবার হয়ত গোল বাধবে। যে যত দেবে তার তত ভাগ, বাস্, সোজা কথা; সব গণ্ডগোল মিটে গেল।

একটু স্তব্ধতা। তার পর দীননাথের গলা: তবে আমিও

একটা পষ্ট কথা বলি তোকে শম্ভু। তুই যে পাঁচ-শ টাকা দিবি—

শম্ভুর গলা: পাঁচ-শ নগদ নয়, এক-শ টাকার জিনিষ, চার-শ নগদ।

দীননাথের গলা: বেশ। চার-শ'ই আমাদের একবার তুই দেখা। গয়নাগাঁটি সব বেচে ফেলবার পর শেষে যে তুই বলবি—

শম্ভুর গলা (ক্রুদ্ধ): আমাকে বুঝি বিশ্বাস হয় না আপনার? ভাবছেন আমি ভাঁওতা দিয়ে—চার-পাঁচটি গলার প্রতিবাদ। শম্ভুর গলা (আরও ক্রুদ্ধ): সকলকে সমান-সমান ভাগ দিতে চাচ্ছি কিনা তাই আমাকে অবিশ্বাস! আমি যেন একা গিয়ে দোকান করতে পারি না! পাঁচ-শ টাকা নিয়ে যদি দোকান খুলি আমি, এক বছরে হাজার টাকা লাভ করব, না আসতে চাও তোমরা না-ই আসবে! চাই না তোমাদের টাকা!

কোলাহল, কলহ, কড়া কথা, মধ্যস্থের গোলমাল থামানোর চেষ্টা। খানিকক্ষণ বাজে ব্যক্তিগত কথা। আবার ঝগড়া বাধিবার উপক্রম।

তারপর শম্ভুর গলা: বেশ, কাল সকালে টাকা দেখাব।

দীননাথের গলা: গজেন ঠাকুরার সঙ্গে কথা কয়ে এসেছি, সাড়ে উনত্রিশ দর দেবে বলেছে। কাল কাজে না গিয়ে গয়নাগুলোর ব্যবস্থা করব। যা লোকসানটাই হবে! এমনি সোনা হয় আলাদা কথা, তৈরি গয়না বেচার মত মহাপাপ আর নেই।—বৌমা বুঝি রাঁধে নি আজ? এখানেই তবে তুই খেয়ে যা শম্ভু। ও পুঁটি, ঠাঁই ক'রে দে ত আমাদের।

বাক্সে টাকাগুলি রাখিয়াছিল শম্ভু, কোথায় যে গেল সে টাকা! টাকার শোকে ও-বাড়ীর সকলের কাছে লজ্জায় শম্ভু পাগলের মত চুল ছিঁড়িতে লাগিল।

সরলা সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিল, কি আর করবে বল? অদেষ্টের ওপর ত হাত নেই মানুষের! আমি ঘুমচ্ছি, ঘরের দরজা খোলা, আর তুমি ও-বাড়ী গিয়ে ব'সে রইলে রাত দশটা পর্য্যন্ত! আর ওই ত বাস্কো! শাবলের এক চাড়েই হয় ত ভেঙে গেছে। আমারও কি ঘুম, একবার টের পেলাম না!

দু-চোখে সন্দেহ ভরিয়া চাহিয়া শম্ভু বলিল, টের পেয়েছ কি না-পেয়েছ—

সরলা তাড়াতাড়ি বলিল, এমন ক'রো না লক্ষ্মী। যেমন দোকান করছিলে তেমনি কর এখন, বাবাকে ব'লে আর কিছু টাকা—

—আর কি টাকা দেবে তোমার বাবা!

—সহজে কি দেবে? আমি কাঁদাকাটা করলে—

ঝমর ঝমর মল বাজাইয়া গিয়া সরলা স্বামীকে এক বাটি মুড়ি ও খানিকটা গুড় আনিয়া দিল। সস্নেহে বলিল, খাও, না খেলে কি টাকা ফিরে পাবে? বাবা টাকা যদি না-ই দেয়,—দেবে ঠিক, যদির কথা বলছি—আমি গয়না বেচে তোমায় টাকা দেব।
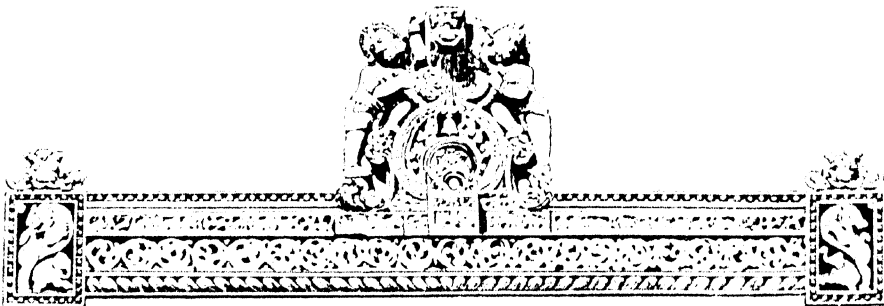
সমর্পণমন্ত্র

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

কোন্ অনাদি আনন্দেরি ছন্দ থেকে চঞ্চলিয়া
ঝরলে আদি সৃষ্টিতলে লক্ষকোটি মন ছলিয়া।
কোন্ খেয়ালে সৃষ্টিখেলার লীলার লাগি বন্দী তুমি,
মূর্ত্ত হ'লে দেহের গেহে এই ভুবনের গন্ধে চুমি।

বিশ্ব জুড়ে রূপখেয়ালী রচলে রূপের কুঞ্জবন,
তোমায় ঘিরে সৃষ্ট হ'ল তোমার লীলা গুঞ্জরণ।
জন্ম থেকে জন্ম বহি সেই যে সবার যাত্রা সুরু,
কর্ম্মদোলায় নর্ম্মমানব তোমায় ভুলে রইল গুরু।

সখের লীলায় বন্দী হয়ে এই ভুবনের অন্তরে গো,
মর্ম্মদলে করছ খেলা নর্ম্মলীলার কোন্ ঘরে গো?
বাজছে তব মোহন বেণু ঝরছে সদা তোমার মধু,
তোমার নাগাল পায় না তবু তোমায় হারা জীবন-বধূ।

প্রাণের মাঝে শক্তি তুমি অদৃষ্টেরি ছদ্মপথে,
সৃষ্টি-ফুলের পাপড়ি-ঢাকা মগ্ন আছ মর্ম্মরথে।
সূত্র হয়ে গাঁথলে তুমি সৃজন-লীলাপদ্মহার,
পদ্ম কবে পড়বে ঝরে ঘুচবে আড়াল ছদ্মতার।

পুষ্পমণির মালায় মোহি তোমায় হ'নু বিস্মরণ,
মর্ম্ম খুলি মানব কবে দেখবে তোমা চিরন্তন।
দেখবে কবে স্বরূপ তব অরূপ তোমা নির্ব্বিকার,
মিশবে কবে তোমার সনে মানব-মনের নীলবিথার।

তোমার রসের কেন্দ্র হ'তে ঝরলো যে সব ঝর্ণাজল,
সিন্ধু হ'তে ফিরাও তাদের বিন্দুবিরাট্ অচঞ্চল।
সিন্ধুহিয়ায় নদীর ধারায় হোক না তাদের চিহ্নময়,
জানাও তুমি—তাদের ধারা তোমার সাথে ভিন্ন নয়।

গঙ্গাধারা সাগর হয়েও তোমার সাথে যুক্ত হোক,
লীলায় জীবন বন্দী হয়েও তোমার দিকে মুক্ত রো'ক্।
ধরার বুকে ভিন্ন রেখেও—দুঃখে করি বিমুক্ত,
আবার প্রভু তোমার সনে মোদের কর শ্রীযুক্ত

মানবনারীর জীবনলীলায় লুকিয়ে নাচো ছন্দ তুমি,
তোমার যাদুর ইন্দ্রজাল এই তোমার লীলারঙ্গভূমি।
আজকে তুমি ভেদ্ করেছ আমার লীলা মর্ম্মদ্বার,
মর্ম্মদ্বারে সুপ্রভাতে হেরনু তোমায় সারাৎসার।

হেরনু তোমায় ব্যাপ্তচেতন রূপসাগরে কী কল্লোল,
তোমার লীলার হিন্দোলাতে আমায় দিলে দোদোলদোল্।
আমায় যেমন করলে দয়া এমনি দয়ার স্পর্শমণি,
সব মানবের জীবন কখন্ করবে হঠাৎ স্বর্ণখনি?

মাটির মোহ ভুলিয়ে সবার এক মিনিটের কর্ত্তা সাজা,
দাও খুলে দাও জীবনশ্লোকে তোমার গীতা দয়াল রাজা।
মানব-মনের তুলির লিখন তোমার রঙে হোক রঙীন্,
সব কবিদের ছন্দে আবার বাজুক তব ছন্দবীণ।

ধরার লেখা পূর্ণ করি তোমার লেখার গন্ধ দানে,
অহংলীলা হরণ কর তোমার লীলানন্দগানে।
কর্ম্মধরার যন্ত্র ছুটুক তোমার লীলাযন্ত্রে সেজে,
এই মনেরি মন্ত্র উঠুক তোমার পূজামন্ত্রে বেজে।

আজ থেকে সব কর্ম্ম তোমার নর্ম্মে মিশে ভাঙুক ভুল,
মাটির নিখিল তোমার লীলায় ফুটুক হয়ে পদ্মফুল।
ভিড়াও তব রসের ঘাটে এই জীবনের পণ্যতরী,
কামধরণীর তৃষ্ণা লহ তোমার ভোগে ধন্য করি।

তোমায় ছুঁয়ে মানবনারী করুক বিজয় দুঃখ শোক,
জীবন হউক নিত্য আবার চিত্ত হউক ব্রহ্মলোক।
তোমার কৃপা ধরতে আজি ব্যাকুল কর বিশ্বমন,
আমার সাথে মানব তোমায় করুক হৃদয় সমর্পণ।
চিত্ত লহ—বিত্ত লহ—সর্ব্ব লহ—গর্ব্ব-তমঃ,
আত্মা দেহ তোমার পদে সমর্পণমন্ত্র মম।

"চণ্ডীদাস-চরিত"

(৪)

বাসলী দেবীর উক্তি।

নাকার সাকার সাধন বাছা বুঝতে পার না কি।
নাকার-সাধন যেমন কুলা সাকার-সাধন ঢেঁকি॥
ব্রহ্মভাবের ভাবুক হলে উচ্চপদ পাবি।
ধ্যানভাবের ভাবুক হলে মাঝে থাকে যাবি॥
স্তুতি জপের কর্ম্মা হলে বলবে অধম সবে।
বাহ্য পূজক হলে তারা অধমাধম কবে॥
গুরুকরণ করগে আগে আমায় সাক্ষী রাখি।
সেই গুরু যার বাক্যগুলি বেদে মাখামাখি॥
আপ্ত ঋষি জানবি তারে শুনবি মুখে যার।
আপ্ত বাক্য আগম নিগম বেদ বেদান্ত সার॥
চাঁড়াল হলেও নিত্য সত্য তথায় দেখতে পাবি।
বুঝবি তখন পরমব্রহ্ম সত্য মিথ্যা সবি॥
হৃদয়ে তোর উদয় যবে হবে ব্রহ্মজ্ঞান।
মিথ্যা রূপে দিবেন দেখা নিজেও ভগবান॥
মায়া-শরণ ব্রহ্ম যেমন জলের তরঙ্গ।
ব্রহ্মেরি তা স্ফুরণ মাত্র নহে তার অঙ্গ॥
গুরুর কৃপায় চিনবি যখন ওঁ তৎসৎ যিনি।
উঠবে জাগে হৃদয়ে তোর কুলকুণ্ডলিনী॥
শুনবি যখন অলির মত মধুর গুঞ্জন।
তখন হবে চণ্ডীরে তোর ওঙ্কার দর্শন॥
মানুষের এই চরম লক্ষ্য যে যা করুক আগে।
যজ্ঞ কি তপস্যা যোগ আদি কর্ম্ম যোগে॥
সবাই আমার চন্দ্রশেখর সবাই আমার হরি।
সবাই আমার গণপতি সবাই শাকম্ভরী॥
সবাই আমার আমিই সবার আমিই আমার ধর্ম্ম।
আমিই তিনি তিনিই আমি আমিই কর্ত্তাকর্ম্ম॥
শৈব শাক্ত গাণপত্য বিষ্ণুপদাশ্রিত।
এমনি ভাবে ভাবতে পারলে সবাই ব্রহ্মবিত॥

কিন্তু বাছাধন সত্য কর পণ মিথ্যা ফেল পদে ঠেলি।
সত্যে সজাগ ব্রহ্ম মিথ্যা পথ পেলে আত্মানন্দে যান চলি॥
কর্ম্মকাণ্ডে দুখ জ্ঞানকাণ্ডে সুখ এ দুটি তুমারি তরে।
না ভুঞ্জিলে দুখ সুখের মাধুরী বুঝিবে কেমন করে॥
যেই আপ্ত বাক্যে নিত্য সত্য মিলে নাহি যাহে ভেদাভেদ।
সেই আপ্ত বাক্য শুন বাছাধন আগম নিগম বেদ॥
যে জানে পুরাণ স্মৃতি ইতিহাস সে বুঝে বেদের মর্ম্ম।
ঠেলি ফেলি সব জাতি বন্ধু দ্বিজের ভাব লুকাচুরি কর্ম্ম॥
ত্যজি ভাষ্যকার লুকাচুরি-খেলা শাস্ত্রকার-রূপকতা।
মুক্তিশাস্ত্র মত বিচার করিলে আর না কহিবে কথা॥
রূপকের বনে প্রণব ঝঙ্কার হৃদয়-রঞ্জন তরু।
ষড়রস মাঝে রসিক নাগর ওঁ তৎসৎ গুরু॥
সমর-প্রাঙ্গণে করে ধরি অসি তত্ত্বমসি করে খেলা।
কোথা কিছু নাই রূপহীন তায় হৃদয় করিছে আলা॥
মুণ্ডমালী কালী লোলো-রসনা মৌলি বন্ধ তার ওম।
রুদ্র হৃদে জাগে প্রণব ঝঙ্কার মুখে বোবো বোম্ বোম্॥
বেদবেদান্তে ব্রহ্ম ব্রহ্মোপনিষদে সাংখ্যে পুরুষ পুরাণ।
বৈশেষিকে আর মীমাংসা দর্শনে ধর্ম্মমাত্র প্রণিধান॥
ন্যায় পাতঞ্জলে ঈশ্বর-সাধন সাধুসঙ্গ অভিধানে।
দীপিকার মতে ক্রিয়া-সাধ্য গুণ সম্ভব যা নরগণে॥
অহিংসা পুরাণে মুক্তি শাস্ত্রে ন্যায় কর্ম্ম যেবা শুভকরী।
ইতিহাসে রামকৃষ্ণ নামগান ভবাব্ধিতরণে তরী॥
মূলে গায় গীত বেদ সমুদয় শ্রুতি সুললিত তানে।
দোবারি করিছে বেদান্ত তাহার উপনিষদের সনে॥
আর সবে মিলি করিছে সঙ্গত বাঁধি বাদ্য পরতেক।
মাঝে মাঝে রং পুরে তায় কত তালে কিন্তু সব এক॥
কত বাচস্পতি তর্ক-পঞ্চানন কত সে সর্ব্ববিদ্য বাগীশ।
হেন শাস্ত্র-সিন্ধু মথি সুধা-আশে তুলেছে কেবল বিষ॥
আত্মজ্ঞান-হীন পাণ্ডিত্যে কেবল বহুতর্ক তাহে তুলি।
দিলা রসাতল ভাবার্থ সকল টীকার বাজার খুলি॥

ব্রহ্ম অর্থে ব্রহ্ম এর চেঞে মানে আর তার কিছু নাই।
ধরার মত বলি বুঝাইতে গেলে সরার মত হঞে যায়॥
নাহি তার উপাধি লক্ষণ কি গুণ নাহি তার বিশেষণ।
নয় কি তাহলে পুঁথিগত ব্রহ্ম পটাঙ্কিত সমীরণ॥
সর্ব্বগুণোপাধি সর্ব্বসুলক্ষণ সর্ব্ববিশেষণ সার।
যা আছে যা হবে যা ছিল সে ব্রহ্ম সকলেরি সমাহার॥
তেঁই সবে কয় না পারি বর্ণিতে গুণাদির শেষাবধি।
অনন্ত অব্যক্ত বিশেষণাতীত গুণাতীত নিরুপাধি॥
শশমধ্যে এক সিংহের শাবক লালিত পালিত হয়ে।
শশকের মত পলাইত ছুটি শৃগাল দেখিলে ভয়ে॥
এক সিংহ তারে ধরি কোনদিন নদীতীরে লঞা যায়।
জলমধ্যে নিজ প্রতিবিম্ব হেরি গর্জ্জিয়া উঠিল তায়॥
হাসি সিংহ কয় স্বরূপ কেমন না বুঝিলে এতদিন।
তুমি আমি এক নহি ভিন্ন ভাব সঙ্গদোষে ছিলে হীন॥
তুমিও তেমনি হতেছ পালিত ষড়রিপু-সহবাসে।
তাদেরি মতন হয়েছ এখন ভুলে গেছ তুমি কে সে॥
স্বরূপ-সলিলে দেখ যদি আসি জ্ঞানতরঙ্গিণী তটে।
ব্রহ্ম-কৃপাগুণে বুঝিবে তখন কে তুমি তুমার ঘটে॥
একমাত্র তুমি আত্মারূপী ব্রহ্ম জড় তব ষড়রিপু।
অচৈতন্য প্রাণ জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চভূতে গড়া বপু॥
গুরুদত্ত বাক্যে আপনা চিনিবে মায়ায় জিনিবে তবে।
জরামৃত্যুভয় বন্ধন ব্যসন রোগ শোক চলি যাবে॥
অই হের বাছা শুশুনিয়া গিরি[২০] মুনি-মনোহর স্থান।
তথা রহে এক সিদ্ধ অবধূত আনন্দ তাহার নাম॥
দীক্ষা যদি চাও যাও তার পাশে সদা আজ্ঞাধীন রবে।
মায়ায় জিনিবে আপনা চিনিবে বাসনা পুরিবে তবে॥*
চণ্ডীদাস কয় এহেন আদেশ কেন মা দাসের প্রতি।
অমর করিতে গরলের বিধি দেন নিজে নিশাপতি॥
যায় যায় প্রাণ পিপাসায় যার সে জন কেমন করিয়া।
মরুভূমে মাগো করে ছুটাছুটি সুরলারা+ করে ধরিয়া॥

২০) ছাতনা হইতে শুশুনিয়া পাহাড় তিন কোশ উত্তরে।

* এখানে বাসলী ধর্ম্মশাস্ত্র ও ষড় দর্শন মন্থনপূর্ব্বক সংশয়াকুলচিত্ত চণ্ডীদাসকে গুরুদীক্ষিত হইয়া যোগসাধনাদ্বারা এক সত্য ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে বলিয়াছেন।

+ সং সুরলা, গঙ্গা।

দিবস রজনী ভ্রমি যবে আমি তুমার আঁচল ধরিয়া।
কে এমন শিবে মোরে দীক্ষা দিবে হৃদয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া॥
বাসলী কহিছে শাস্ত্রকার-বিধি অবশ্য চলিবে মানিয়া।
সরঃ-সিন্ধু-ঘেরা চাতক তথাপি মেঘপানে থাকে চাহিয়া॥

চণ্ডীদাসের দেশ

চণ্ডীদাস কহে কেনে তবে মাতা জাহ্নবীর জলে ভাসিয়া।
ভাবয়ে অসার লোক-লোকাচার শাস্ত্রকার-বিধি ভাঙ্গিয়া॥
বাসলী কহিছে সবিদ্যাবাগীশ পিতা স্ব-স্বজন ত্যজিয়া।
শিক্ষাদাতা পিতা করে নিরূপণ তবু সে সুতের লাগিয়া॥
চণ্ডী কহে শির নুয়াবে কেমনে চরণে সবার শঙ্করী।
শির পরে যার সতত বিরাজে জগন্মাতা জগদীশ্বরী॥
যে করে ধরিয়া জবা বিল্বদল পূজি মা তুমার চরণে।
সে করে করিয়া গুরুর শ্রীপদ সেবিব শিবানী কেমনে॥
মাতা কহে যার রহে বর্ত্তমান অভিমান হেন অন্তরে।
ফুল ফলে তার আরতি কেবল পূজিতে ঘুরিতে অন্তরে॥
লক্ষে লভে সেই আরাধয়ে যেই মানস-মন্দিরে বসিয়া।
না মিলে সে ধন ঢাকে ঢোলে কভু কিম্বা ধূপ দীপ জালিয়া।

চণ্ডীদাসের উক্তি।

মোদের পূরব জনম কথা মাগো জানে কি রজক-সুতা।
কি কাজ করিনু কেমনে পাইনু তোমারে জগন্মাতা
কহ মা সে সব কথা॥

১৩/] শুন তবে বাছাধন হাসিঞা বাসলী কন
যুবরাজপুরে হীরা নামে ছিলা নারী তপে নিমগন
কহি তার বিবরণ ॥

কভু হাসি কহে শিবা কহ মা কি বর নিবা
হাসি কহে হীরা এ দীন-হীনারে যদি তুমি বর দিবা
শুন মা সে বর কিবা ॥

নিত্য যেন ঘরে বসি ত্রিবেণীর নীরে ভাসি
পূজি মা তুমার চরণ-কমল চরণ-সেবার দাসী
আমি এই বর অভিলাষী ॥

হাসিয়া গিরিজা কন একি মা তুমার পণ
অঘট-ঘটনা ঘটাব কেমনে পূজ তবে নারায়ণ
যদি না ছাড়িবে পণ ॥

কহিলা ভূদেব-বালা জানি মা তুমার ছলা
ভাসিয়া ক্ষণেক ডুবিলে অগাধে তবে বাঁধ তার ভেলা
না বুঝি কি তোর খেলা ॥

যদি না এ বর দিবে যাহ চলি যথা যাবে
জানাবে এ দাসী মনের বেদনা যতদিন পারে শিবে
কেনে মা দাঁড়াঞে তবে ॥

যায় যায় শিবা যায় পুন পুন ফিরি চায়
আবার ফিরিয়া আবার কহিছে শুন মা কহি তুমায়
হাসি হীরা পুন চায় ॥

আছে তিন পুত্র তব মোর ভক্ত বীর।
বিচারে পণ্ডিত তারা রণে মহাবীর ॥
আদেশ করহ সবে যাহা চাহ তুমি।
ইচ্ছা পূর্ণ হবে তব কহিলাম আমি ॥
বল্লভ যোগাবে নিত্য জাহ্নবীর পয়ঃ।
যমুনার জল আনি দিবে জিতেন্দ্রিয় ॥
যোগাবে পরেশ নিত্য সরস্বতী নীর।
শুন হীরা এই কথা কহিলাম স্থির ॥
শুনিয়া দেবীর বাক্য হীরা তুষ্ট হইলা।
এই কথা পুত্রগণে ডাকিয়া কহিলা ॥
দেবীর প্রসাদে তবে পুত্র তিন জন।
তিনটি সরসী তারা করিল খনন ॥
কাটিয়া সুড়ঙ্গ তবে দেবীর কৃপায়।
তিন তরঙ্গিণী স্রোতে আনিয়া মিলায় ॥

বল্লভ স্বখাদ পূরে গঙ্গার সলিলে।
পূরিলা পরেশ বাপী যমুনার জলে ॥
ভরিলা জিতের সর সরস্বতী নীরে।
অবগাহে নিত্য হীরা তিন সরোবরে ॥
সেই ভক্ত বল্লভ আমার চণ্ডীদাস
দেবী রূপে জিতেন্দ্রিয় হঞেছে প্রকাশ ॥[২১]
পরেশ নকুল তব হীরা বিদ্ধ্যা মাতা।
এই হইল তোমাদের পূর্ব্ব জন্ম কথা ॥
নকুল তুমার ভাই ধার্ম্মিক সুজন।
রজ তম গুণে করে সমাজ-রক্ষণ ॥
দেবীদাস দিবানিশি পূজে কাত্যায়নী।
সত্ত্ব রজ গুণে মোর ভক্ত চূড়ামণি ॥
শক্তির সাধনে সিদ্ধ শক্তি-মন্ত্র পার।
সত্ত্বগুণাধার চণ্ডী তুমি রে আমার ॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলা গীতি করিয়া রচন।
করহ এবার তুমি পাষণ্ড-দলন ॥
উত্তর-সাধিকা হবে রামী রজকিনী।
যখন যা চাই তোরে যোগাবে সে আনি ॥
প্রাণ-প্রিয়া সহচরী মোর নিত্যা হয়।
মাঝে মাঝে যাবে তুমি নিত্যার আলয় ॥[২২]

---

২১) ছাতনার তিন প্রসিদ্ধ সরোবরের উৎপত্তি-কাহিনী। [illegible] খনিত 'বৌল পোখর' ছাতনার আধ ক্রোশ পূর্বে। পরেশের কৃত খনন বাঁধ নান্নুর হাটের দক্ষিণে। এটি 'বান্ধ' অর্থাৎ উচ্চভূমির পার্শ্বের নিম্ন ভূমি দুই কিম্বা তিন দিকে বাঁধ বাঁধিয়া নির্মিত সরোবর। জিতেন্দ্রিয় খনিত পয়ঃরাজ বান্দুনকুলি গ্রামের পশ্চিমে।

২২) ছাতনা হইতে চারি ক্রোশ পূর্বে সাল-তড়া গ্রাম। সন ১৩৩০ সালে বাঁকুড়ার প্রোফেসর শ্রীযুত রামশরণ ঘোষ নিত্যালয় দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি আমাকে লিখিয়াছেন,—"গঙ্গাজলঘাটী হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে সাল-তড়া গ্রাম। সে গ্রামের রামশরণ চক্রবর্তীর মেলায় মৃন্ময় হস্তী ও ঘোটক আছে। এক কোণে সিংহাসনের উপরে সিন্দূর-লিপ্ত তিনটি ঠাকুর আছে। চক্রবর্তী-মহাশয় বলেন, এই তিন ঠাকুর গ্রামপ্রান্তে এক তেঁতুলতলায় ছিল। দক্ষিণ পার্শ্বে পঞ্চানন-মূর্তি, বৃষোপরি স্থাপিত। বাম পার্শ্বে দ্বিভুজা নারীমূর্তি, নাম বাসলী। সম্মুখে এক মুড়া। ইনি ক্ষেত্রপাল। বন্ধ্যা নারী সন্তানকামনায় এখানে আসিয়া পূজা দেয়। সাল-তড়া গ্রামে অনেক রজকের বাস আছে, পদবী চৌধুরী। গ্রামের লোকে বলে রামী রজকী এই বংশোদ্ভূত ছিল। কেহ কেহ বলে, এখানে চণ্ডীদাসের আশ্রম ছিল।" দেখা যাইতেছে, নিত্যা ও বাসলী অভিন্ন হইয়াছেন এবং নিত্যা শিবের শক্তি। তিনি বিষহরি। বেহুলার উপাখ্যানে বিষহরি মনসার এক প্রিয়সখি নেতা ধোপানী দেবগণের কাপড় কাচিত। সাল-তড়া গ্রামেও নিত্যা দেবী রজক গ্রামে অবস্থিতি করিয়াছেন। নেতা নিত্যা নামের অপভ্রংশ মনে হয়।

গাইবা সে প্রেমগীতি নিত্যার সকাশে।
সে হেন সঙ্গীত সখি বড় ভালবাসে ॥
হতজ্ঞান ছিলা চণ্ডী হইঞা তন্ময়।
চাপড় মারিয়া পিঠে পুন দেবী কয় ॥
করিহ এ কাজ তুমি বাঁচ যতক্ষণ।
কথার অন্যথা না করিবা কদাচন ॥
আমি কন্যা দেবীদাস তুমি মোর বাবা।
করিহ আমার নিত্য নৈমিত্তিক সেবা ॥
প্রসাদ না খাবে মোর কন্যা হেন জ্ঞানে।
করিবা আমার পূজা বংশ-অনুক্রমে ॥
দেবীদাস কহে মাতা একি কথা কহ।
বংশ কিসে হবে মোর না হলে বিবাহ ॥
প্রায় আশী বৎসর বয়স মোর হইল।
কেবা দিবে কন্যা বলি হাসিতে লাগিল ॥
পরশু তুমার বিআ কহিলেন মাতা।
পাত্রী বেসড়ার[২৭] বিষ্ণুশর্ম্মার দুহিতা ॥
পয়রাজে করি স্নান যাহ দৌহে ঘরে।
চলিলাম আমি এবে আপন মন্দিরে ॥
স্নান করি আসি দৌহে দাণ্ডাইল দ্বারে।
নকুল নকুল বলি সঘনে ফুকারে ॥
নকুল আইল ছুটি দাদা দাদা বলি।
মহানন্দে লইল দৌহার পদধূলি ॥
ঘরে বসি তিন জনে কহে বহুকথা।
এতক্ষণে নকুল জিজ্ঞাসে মাতা কোথা ॥
বিষণ্ণ হইঞে দেবী কন মৃদুস্বরে।
রেখেছেন দেহ মাতা বারাণসী পুরে ॥
নকুল নীরবে বসি কাঁদিতে লাগিল।
কতমতে দেবীদাস তারে শান্তাইল ॥
ঘরে আইল চণ্ডীদাস এই কথা শুনি।
নগরে উঠিল তবে আনন্দের ধ্বনি ॥
কেহ দাদা কেহ খুড়া কেহ মামা বলি।
দলে দলে আসি সবে লয় পদধূলি ॥

সকলের শুভবার্ত্তা করি জিজ্ঞাসন।
কহিলেন দেবীদাস বিনম্র বচন ॥
কৃপা করি যদি সবে দেন অনুমতি।
ব্রাহ্মণ-ভোজন তবে করাই সম্প্রতি ॥
তথাস্তু বলিয়া সবে অনুমতি দিয়া।
নিজ নিজ ঘরে যান হরষিত হৈয়া ॥
পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সর্ব্বজন।
একত্র হইঞা বসে পাতিয়া আসন ॥
রোহিণী শ্বশুরালয়ে পাইয়াছে স্থান।
বড় ভালবাসে তারে বিজয়-নারাণ ॥
বহু ধনে ধনবান তাহে বহু মানী।
সবাকার উপকার করেছে রোহিণী ॥
কেহ না কহয়ে কিছু সব দেখি শুনি।
যথা তথা সকলে করয়ে কানাকানি ॥
সেই কথা হবে আজি কিন্তু সাধ্য কার।
সে কথা বলিয়া উঠে সম্মুখে তাহার ॥
দেবীদাস কহে একি সব যে নির্ব্বাক।
রোহিণীরে বিজয় না না না থাক থাক ॥
এইরূপে কহে সবে আধ আধ কথা।
কে কহিবা খুলি সব কার দুটি মাথা ॥
দেবী কন বুঝিয়াছি দয়ানন্দ পুন।
রোহিণীরে গ্রহণ করিল আজি কেন ॥ [১৪/]
ঠিক ঠিক অই কথা বলি উঠে সবে।
দেবীদাস কহিতে লাগিল পুন তবে ॥
অবশ্য ভিতরে কোন আছে সত্য কথা।
তা না হলে এত মূর্খ হয় কি বিধাতা ॥
জিজ্ঞাসহ সবে ভাই চণ্ডীরে আমার।
তাহলে এ গুপ্ততত্ত্ব হইবে প্রচার ॥
শতমুখে কহে তবে কহ চণ্ডীদাস।
তুমি যা কহিবে মোরা করিব বিশ্বাস ॥
চণ্ডী কহে যদি কৃষ্ণ আহীরের পুত।
ব্রাহ্মণ প্রণমে তায় এ যদি অদ্ভুত ॥
ধীবরের কন্যা যদি হয় মৎস্যগন্ধা।
হাতে ধরি শান্তনুর ঘটে থাকে নিন্দা ॥

২৭) বেসড়া গ্রাম ছাতনার দুই কোশ উত্তর-পশ্চিম। আশী বৎসর অত্যুক্তি। বিবাহের বয়স ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছিল। ইহা অভিপ্রায়।

রোহিণীর হাতে ধরি দয়ানন্দ তবে।
আপনার জাতি কুল কেন না হারাবে ॥
তর্কচঞ্চু কহে কৃষ্ণ দেবকীনন্দন।
সবার পূজিত তিনি দেব নারায়ণ ॥
ক্ষত্র-বালা মৎস্যগন্ধা হাতে ধরি তার।
ক্ষত্রিয় বহিবা কেন কলঙ্কের ভার ॥
হাসিয়া কহিলা চণ্ডী শুন সর্ব্বজন।
কহি তবে রোহিণীর জন্মবিবরণ ॥
ব্রহ্মণ্য-পুরের রাজা ভবানী-ঝোর্‌য়াত।
তাঁর অঙ্গে যেদিন হইল অস্ত্রাঘাত ॥
ছিল সেথা সনাতন সেই প্রাণাকুলে।
ছুটি গিঞা প্রবেশিলা অন্দর মহলে ॥
মহিষী কহেন কাঁদি শুন সনাতন।
করহ কন্যার মম জীবন রক্ষণ ॥
কন্যা লঞে সনাতন করে পলায়ন।
বহু যত্নে করে তার লালন পালন ॥
শুন সবে হে ব্রাহ্মণ কহি দিব্য করি।
সেই কন্যা হয় এই রোহিণী সুন্দরী ॥
তার বিভা দিনু আমি দয়ানন্দ সাঁথে।
ব্রাহ্মণের জাতি তবে গেল কোন পথে ॥
মাতা বলতে রামী মোর পিতা বলতে রামী।
প্রিয়া বলতে রামী আর প্রিয় বলতে আমি ॥
পুত্রকন্যা রামী মোর ভাইবন্ধু সব।
রামীই আমার প্রাণ রামী অবয়ব ॥
অন্তরে অম্বিকা মোর বাহিরে সে রামী।
কে বুঝিবা তার লীলা বিনা অন্তর্যামী ॥
সাধু সাধু চণ্ডীদাস সবে উচ্চে কয়।
বৃদ্ধ করে আশীষ যুবক প্রণময় ॥
দৃষ্টিহীন মোরা সবে তুমি চক্ষুষ্মান।
অতি ভাগ্যবান মোদের বিজয়-নারাণ ॥
কৃপাদৃষ্টি কর প্রভু সকলের প্রতি।
বহু অপরাধী মোরা চরণে সম্প্রতি ॥
ইষ্টমন্ত্র দিয়া কাণে পদে দাও স্থান।
এ ঘোর সঙ্কট হতে কর পরিত্রাণ ॥

চণ্ডী কহে সর্ব্বঘটে শ্রীকৃষ্ণ আমার।
তেঁই আমি করি সবে শত নমস্কার ॥
ভজহ গোবিন্দ-পদ মনে করি গুরু।
পাইবে অভয়পদ কামকল্পতরু ॥
এবার সকলে মিলি কর গাত্রোত্থান।
১৪৵] ভোজনের কাল প্রায় হল আগুয়ান ॥
হাসিয়া কহেন সবে ব্রাহ্মণভোজন।
কেমনে হইবে প্রভু কোথা আয়োজন ॥
চণ্ডী কহে প্রস্তুত হয়েছে সব জানি।
যখন লঞেছে ভার রাই রাসমণি ॥
রজকিনী বলি সবে চমকে থমকে।
সমুখে দেখিল হাসে রজক-বালিকে ॥
যেন শত সৌদামিনী একত্র হইয়া।
চমকে সর্ব্বত্র [illegible]াদি থাকিয়া থাকিয়া ॥
সঘনে কম্পিত সবে প্রণমে উদ্দেশে।
কহিলেন রাইমণি মৃদুমন্দ হেসে ॥
কালি-তক ছিনু আমি রামী রজকিনী।
সবার সিদ্ধান্তে আজি হয়েছি ব্রাহ্মণী ॥
সতাসৎ থাকে যদি একত্রে মিলন।
ঘটে থাকে কালে তায় মিত্রতা-বন্ধন ॥
দ্বিভাবে না থাকে তারা হয় একমত।
সৎ হয় অসৎ অথবা সতাসৎ ॥
চির-সহচরী মোর আছিলা রোহিণী।
এক প্রাণ এক মন এক আত্মা জানি ॥
বিচারে দাণ্ডায় যদি ব্রাহ্মণত্ব তার।
রজকত্ব রামীর কি করে থাকে আর ॥
করপুটে কহে তবে ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
তুমার সিদ্ধান্ত যদি থান মা বাসলী ॥
তাহলে বুঝিব তুমি ব্রাহ্মণীর পার।
অবাধে খাইব মোরা সিদ্ধান্ন তুমার ॥
এই কথা শুনি রামী মৃত্তিকা খুঁড়িয়া।
বাহির করিল অন্ন হরষিত হইয়া ॥
কাঞ্চন থালায় তবে অন্ন দিল বাড়ি।
তার পাশে দিলা পাতি এক স্বর্ণ পিঁড়ি ॥

ঘৃতের প্রদীপ জ্বালি বাহির হইল।
কপাট ভেজাএ রামী ধ্যানেতে বসিল ॥
ছিদ্রপথে দেখে চেএে ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
থাবা থাবা করি অন্ন খান মা বাসলী ॥
ধন্য ধন্য রবে সবে করি হুড়াহুড়ি।
পাতা পাতি বসিল সবে তাড়াতাড়ি ॥
রামিণী দিতেছে অন্ন রোহিণী ব্যঞ্জন।
অন্ন হতে উঠে ধুঁআ অপূর্ব্ব ঘটন ॥
সবে বসি পচা অন্ন সুধা-সম খান।
অধোমুখে সপাসপ ঊর্দ্ধে নাহি চান ॥
যত খান তত সবে আন আন ডাকে।
যে যা চায় দেয় দোঁহে চক্ষের পলকে ॥
পরিতৃপ্ত হন সবে করিএা ভোজন।
গণ্ডিণী-গমনে তবে করিলা গমন ॥
চণ্ডীদাস রামীর এ অপূর্ব্ব ঘটনা।
অল্পদিন মধ্যে হইল সর্ব্বত্র ঘোষণা ॥
পরদিন আইল এক ব্রাহ্মণ বিদেশী।
আছে এক সঙ্গে তার ষোড়শী রূপসী ॥
দেবী কহে কে তুমি কোথায় তব ধাম।
বেসড়ার হই আমি বিষ্ণুশর্ম্মা নাম ॥
কহিলা সে পুন দেবী তারে জিজ্ঞাসয়।
কে অই রমণী তব কহ মহাশয় ॥
বিষ্ণুশর্ম্মা কহে বাপু অই যে রমণী।
একমাত্র কন্যা মোর নাম সুরধুনী ॥
কন্যা-সম উপযুক্ত পাত্র নাহি পাই।
১৫০] এই হেতু দেশ দেশ ভ্রমিএা বেড়াই ॥
স্বপ্নে দেখি আজি তার হইবে বিবাহ।
ব্রহ্মণ্যপুরের এক দেবীদাস সহ ॥
নিত্যনিরঞ্জন-শর্ম্মা হয় তার পিতা।
পরম বৈষ্ণব চণ্ডীদাস তার ভ্রাতা ॥
তার সঙ্গে যদি তব থাকে পরিচয়।
কোথা সেই দেবীদাস কহ মহাশয় ॥
দেবী কহে স্বপ্নাদেশ সত্য নহে কভু।
দেশে দেশে ভ্রম বর না মিলিলা তবু ॥

দেখিয়া তুমায় করি পাগল সন্দেহ।
বলিয়াছে এই কথা ব্যজ্ঞ করি কেহ ॥
পলাহ এ সব তব বাতুলতা মাত্র।
আশী বৎসরের বুড়া হয় যোগ্য পাত্র ॥
দ্বিজ কহে একবার দেখিব তাহায়।
কোথায় তাহার বাড়ী তিনি বা কোথায় ॥
দেবী কহে মোর বাক্যে হবে কি বিশ্বাস।
আমিই সুযোগ্য পাত্র সেই দেবীদাস ॥
বিষ্ণুশর্ম্মা কহে একি সেই যদি তুমি।
তুমার সমান পাত্র না দেখি যে আমি ॥
বয়সে নবীন তুমি বাক্যে সুচতুর।
স্বভাব-চরিত্র তব অতি সুমধুর ॥
অনুগ্রহ করি তবে কন্যারে আমার।
দাও স্থান দ্বিজবর চরণে তুমার ॥
দেবীদাস স্থির চিত্তে ভাবে মনে মনে।
এতদিন ছিনু আমি মত্ত হরিনামে ॥
ঘটে কোন কর্ম্মদোষে সংসার-বন্ধন।
কেনে বা করিতে যাই শক্তির পূজন ॥
এই মত দেবীদাস করিছে চিন্তন।
হইল আকাশবাণী চিন্ত কি কারণ ॥
চণ্ডীদাস-সঙ্গগুণে বল হরি হরি।
না হও এখনও তুমি তার অধিকারী ॥
এ জন্মও যাবে তব শক্তির সাধনে।
কি ভয় তা হলে তব বিবাহ-বন্ধনে ॥
ধর্ম্মেরি এ অঙ্গ এক কহিলাম সার।
বিবাহ করহ তুমি কি চিন্তা তুমার ॥
এই মতে দেবীদাস করিল বিবাহ।
যথারীতি বাসলীরে পূজে অহরহ ॥
অতঃপর চণ্ডীদাস মাতৃ-আজ্ঞা স্মরি।
চলিলেন সঙ্গে রামী শুশুনিয়া গিরি ॥
সাত দিন থাকি তথা আনন্দ-আশ্রমে।
রামী সহ দীক্ষিত হইল তার স্থানে ॥
কিছুদিন পরে দোঁহে বিদায় লইএে।
উপনীত হইল আসি দোঁহে নিত্যালয়ে ॥

অমনি আকাশবাণী হইল আচম্বিত।
বড় ইচ্ছা তব মুখে শুনিতে সঙ্গীত ॥
কৃষ্ণ-প্রেম-রস-ভরা গাও চণ্ডীদাস।
পুরাও নিত্যার তুমি এই অভিলাষ ॥
দেবীর আদেশে তবে চণ্ডীদাস রামী।
শ্রীরাধার পূর্ব্ব-রাগ ধরিল অমনি ॥[24]
কামোদ সিন্ধুরা তুড়ি নটনারায়ণ।
নানা রাগে গায় গীত অতি সুশোভন ॥
ভাবেতে বিভোর হঞে ধৈর্য্য নাহি বাঁধে।
১০০ | মনুষ্যের কথা কিবা পশুপক্ষী কাঁদে ॥
উথলিয়া পড়ে পাড়ে তড়াগের জল।
পবন শুনয়ে গীত হইয়ে নিশ্চল ॥
বিস্মরি নিত্যার সুখের সীমা নাই।
হইল আকাশবাণী বলিহারি যাই ॥
ধন্য কবি চণ্ডীদাস ধন্য তোর রামী।
দোঁহু মুখে শুনে গীত ধন্য হইনু আমি ॥
যতদিন রবে এই চন্দ্র-সূর্য্য-তারা।
ততদিন সবার মস্তকে রবি তোরা ॥
পরদিন আইল ফিরি ছত্রিনা নগরে।
প্রবেশিলা আসি দোঁহে পর্ণের কুটীরে ॥
রাধাকৃষ্ণ চণ্ডীর সে নিত্য উপাসনা।
নিত্য কত লীলাগীতি করয়ে রচনা ॥
রামিণী আদৌ করে তার রসাস্বাদ।
পশ্চাতে সকলে পায় তার পরসাদ ॥
লোক-মুখে শুনি এই অপূর্ব্ব কথন।
বহু দেশ-দিক হইতে আইসে বহু জন ॥
মূলে গায় চণ্ডী রামী করিছে দুবারি ॥
ধরিতে না পারে কেহ নয়নের বারি ॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলাগীতি করিঞে শ্রবণ।

২৪) "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে" রাধার পূর্ব্বরাগ নাই, কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ আছে। উদয়-সেন শুধু 'গীত' লিখিয়া থাকিবেন, কৃষ্ণ সেন তাহার বাঙ্গলা করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, কৃষ্ণ সেন "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" পুথী দেখেন নাই। দ্বিজ-চণ্ডীদাস এই এই রাগিণীতে রাধিকার পূর্ব্বরাগ গাহিয়াছিলেন।

কেহ কহে এই বুঝি নব বৃন্দাবন ॥
কেহ ভাবে বুঝি এই শঙ্কর গোসাঞি।
মানুষে এ হেন শক্তি দেখিতে না পাই ॥
এইরূপে বহু লোকে করে বহু খ্যাতি।
শুনিলেন মিথিলায় থাকি বিদ্যাপতি ॥
লোক-মুখে তাহাদের হইল পরিচয়।
মাঝে মাঝে কবিতার হয় বিনিময় ॥

* | * | *

এল কোনদিন বাসলী বাঁধে।[25]
একটি বণিক ঝাঁপটি কাঁধে ॥
দেখিলা সে জন বসিয়া তটে।
একা কে বালিকা বসিয়া ঘাটে ॥
মাখিছে তেল আপন মনে।
বুঝিলা বালিকা এসেছে স্নানে ॥
যাক চলি আগে করিয়া স্নান।
তার পর জল করিব পান ॥
ভাবি সে এমত বসিঞা রয়।
মনে মনে তার কত কি হয় ॥
কে এ বালিকা অল্প-বয়সী।
কাল তবু আল করে সে সরসী ॥
কেহ কোথা নাঞি বালিকা একা।
কাহারে সুধাই কে এ বালিকা ॥

২৫) এটি বাঁধ নহে, পোখর। প্রচলিত নাম, শাঁখা পোখর [illegible] পোখর। বাসলীর আদি মন্দিরের পশ্চাৎ দ্বারের সন্নিকটে। [illegible] এদেশে শাঁখার মধ্যভাগ লাল রঙ্গে রঞ্জিত হইত। সন [illegible] দুর্ভিক্ষের সময় শাঁখ পোখরের পঙ্কোদ্ধার হইয়াছিল, ঝুড়ি ঝুড়ি [illegible] শাঁখা ও চুড়ি পাওয়া গিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, কেহ [illegible] ও অন্য প্রাপ্ত দ্রব্য রাখে নাই। দেবীর শঙ্খ-পরিহিত হস্ত [illegible] জনশ্রুতি অন্যত্রও আছে। হুগলী জেলার আরামবাগের দক্ষিণে [illegible] রণজিৎ রায়ের বিস্তীর্ণ দীঘি আছে। রাজা শাক্ত ছিলেন, [illegible] বিশালাক্ষী তাঁহার আরাধ্য ছিলেন। তিনি তাঁহার বালিকা [illegible] দেবীকে প্রত্যক্ষ করিতেন। এক বিপৎপাতের সময় কন্যা [illegible] জলে অন্তর্হিত হন। রাজা অশ্বারোহণে কন্যার অন্বেষণে ছুটিয়া যান। [illegible] জলমধ্য হইতে শঙ্খ-পরিহিত হাত দুখানি দেখান। উন্মত্তপ্রায় [illegible] রাজাও জলমধ্যে ঝাঁপাইয়া প্রাণ বিসর্জন করেন। সেই হইতে [illegible] লোকে সে দীঘিতে বারুণিস্নান করে। দেবী, বিক্রমপুরের [illegible] নামে খ্যাত। রাজা রণজিৎ রায় প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে [illegible] কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ও মাণিক গাঙ্গুলীর "ধর্ম্মমঙ্গলে" এই দেবী [illegible] আছে।

দেখিতে দেখিতে দেখিতে পায়।
ধ্যানেতে মগন দীঘল-কায় ॥
গিরিস্থ বসন কৌপীন-আঁটা।
মাথায় দু চারি দুলিছে জটা ॥
যোগী ভাবি তারে কিছু না কয়।
মনে মনে কত হতেছে ভয় ॥
কিছু কাল বেন্যা নীরবে থাকি।
ভাবিতে লাগিলা করিবা কি ॥
কহিলা তা পর করি সাহস।
কে মা তুমি নি[illegible]সরিয়া বল ॥
পিপাসায় মোর যেতেছে প্রাণ।
স্নান করি জল করিব পান ॥
বালিকা তখন কহিলা হাসি।
এতক্ষণ কেন ছিলা বা বসি ॥
বামুনের মেঞে হই যে আমি।
কি লঞা কোথায় যাতেছ তুমি ॥
বেন্যা কয় আমি শাঁখারী জাতে।
শাঁখা লঞে আমি যাই বেচিতে ॥
তাড়াতাড়ি তবে কহে বালিকা।
আমার হাতের আছে কি শাঁখা ॥
আছে বলি বেন্যা কহিল তায়।
১৬৴] বালা বলে তবে দেখাও আমায় ॥
বেন্যা কয় আগে চল মা ঘরে।
তার পর শাঁখা দেখাব তোরে ॥
বালা বলে না না এখনি চাই।
দেখি দেখি আগে আছে কি নাই ॥
ঝাঁপি খুলি বেন্যা লইঞা করে।
লাল লাল শাঁখা দেখায় তারে ॥
বালা কহে দেখি এটা কি ওকি।
ঝাঁপিতে সদাই মারিছে উঁকি ॥
বাছি বাছি তবে কহিলা তারে।
এই দুটি শাঁখা পরাও মোরে ॥
বেন্যা কয় রাগে থামরে থাম।
এখানে পরালে কে দিবে দাম ॥

বালা কহে দাম কত বা হবে।
দু টাকার চেঞে বেশী কি নিবে ॥
তিন টাকা দাম শাঁখারী বলে।
দিতে পার যদি দিব তাহলে ॥
যদি কর কম একটি কড়ি।
বাসলী হলেও না দিব ছাড়ি ॥
হাসি কহে বালা তুমি যা নিবে।
তাই দিব দাম পরাও তবে ॥
শাঁখারী তখন যতন করে্য।
পরাইল শাঁখা বালার করে ॥
বেন্যা কহে শাঁখা পরাই বহু।
এমন হাত ত দেখি না কভু ॥
অতি সুকোমল যেমন তুলা।
তুমি কি মা কোন দেবতা-বালা ॥
আমি যে মা আর আমাতে নাই।
আমাতে তুমায় দেখিতে পাই ॥
বালা কহে না না কিছু না হবে।
বেন্যা কহে দাম দাও মা তবে ॥
বালা কয় তুমি পাইবে টাকা।
চণ্ডীদাস মোর হয় যে কাকা ॥
তারে বল দাম দিবে অথবা।
দেবীদাস মোর হয় যে বাবা ॥
তারে বল দাম দিবেন তিনি।
স্নান করি ত্বরা যাতেছি আমি ॥
হাতে টাকা তার যদি না থাকে।
এই কথা তবে বলিও তাকে ॥
বড় ঘরে যেই কোরঙ্গ* ফাঁকা।
আছে মোর তাতে তিনটি টাকা ॥
এই কথা তুমি বলিবে তারে।
যাও এবে আমি যেতেছি পরে ॥
ওই দেখ চেঞে মোদের ঘর।
বলিয়া দেখায় বাড়াঞে কর ॥
বেন্যা গিয়া তবে ফুকারে দ্বারে।
দেবীদাস কেবা আছ কি ঘরে ॥

* কোরঙ্গ, কোলঙ্গ।

দেবীদাস তবে বাহির হল।
কহিলা কি চাও তুমি কে বল॥
বেন্থা কহে দাও তিনটি টাকা।
তুমার দুহিতা পরেছে শাঁখা॥
যদি টাকা তব না থাকে হাতে।
যা কহিলা শুন তুমার সুতে॥

বড় ঘরে যেই কোরঙ্গ ফাঁকা।
আছে তার তাতে তিনটি টাকা॥
দাও ত্বরা করি চলিয়া যাই।
দেরি কর্য়ো আর দিও না ভাই॥

* | * | *

ক্রমশঃ

বরষায়

শ্রীশান্তি পাল

একি উন্মাদ পারা,—
এসেছে বরষা, স্নিগ্ধ সরসা
আষাঢ়ের জলধারা!
ভয় নাই, ভয় নাই।
আজ আকাশে লেগেছে দোলা,—
শেষ ক'রে ফেল যত কিছু কাজ
যেখানে যা আছে তোলা।

আঁধার ঘনায়ে আসে,—
গরজে তটিনী, কানন-নটিনী
কল কল কল ভাসে!
ভয় নাই, ভয় নাই।
আজ সায়রে লেগেছে দোলা,—
শেষ ক'রে ফেল যত কিছু কাজ
যেখানে যা আছে তোলা।

কাজল মেঘের ভেলা—
গুরু গুরু রব, দেয়া-উৎসব
চল-চপলার খেলা!
ভয় নাই, ভয় নাই।
আজ নয়নে লেগেছে দোলা,—
শেষ ক'রে ফেল যত কিছু কাজ
যেখানে যা আছে তোলা।

কেয়ার কুঞ্জতলে,—
দাদুরী ডাকিছে, ঝিল্লী কাঁদিছে
জোনাকী-প্রদীপ জ্বলে!
ভয় নাই, ভয় নাই।
আজ কাননে লেগেছে দোলা,—
শেষ ক'রে ফেল যত কিছু কাজ
যেখানে যা আছে তোলা।

নীল অঞ্জন চোখে,—
প্রান্তর পারে, আঙিনার ধারে
দাঁড়ায়ে রয়েছে ও কে!
ভয় নাই, ভয় নাই।
আজ মরমে লেগেছে দোলা,—
শেষ ক'রে ফেল যত কিছু কাজ
যেখানে যা আছে তোলা।

এ কি বাদলের ধারা,—
এসেছে বরষা, স্নিগ্ধ সরসা
ব্যাকুল বিভোর পারা!
হবে জয়, হবে জয়।
ওরে এপার, ও-পার দুলে,—
শেষ ক'রে ফেল যত কিছু কাজ
সকল বাঁধন খুলে।

অলখ-ঝোরা

শ্রীশান্তা দেবী

৩

মামার বাড়ী সেকেলে ধরণের বাড়ী, রাস্তার উপরেই সারি সারি চারখানি ঘর, কিন্তু একখানি ছাড়া আর কোনওটির রাস্তার উপর দরজা নাই। বাড়ীর ভিতর দিকে চারখানি ঘরের দরজার কোলে লম্বা দালান, দালানের পর খোলা চাতাল, দালানেরই সমান উঁচু। চাতাল হইতে দুই ধাপ সিঁড়ি নামিয়া রান্নাঘরের খড়ো আটচালা। রান্নাঘরে আটচালার নিকস-কালো কাঠের খুঁটিগুলির গায়ে বিচিত্র কারুকার্য্য, চৌকাঠের মাথায় কাঠে খোদাই এক জোড়া মকরের মুখ, দরজাগুলিতে কাঠের চৌখুপি ঘরের ভিতর বড় বড় পিতলের ফুল বসানো।

বসতবাড়ীর দালানের এক কোণে চাল রাখিবার জন্য নীচু নীচু ছোট দুটি মরাই, আর এক কোণে কালো কাঠের প্রকাণ্ড একটা গাছ সিন্ধুক। সুধা এত বড় সিন্ধুক তাহার নয় বৎসরের জীবনে আর কোথাও দেখে নাই। এই জন্য এই জিনিষটি তাহার বিশেষ প্রিয় ও স্মরণীয় ছিল। সিন্ধুকের ভিতর থাকিত বাড়ীর পূজাপার্ব্বণ বিবাহাদির জন্য যত নক্সাকাটা বড় বড় তোলা বাসন; অধিকাংশই পিতলের, খানিক কাঁসাও ছিল। সিন্দুকের উপর কাঠের রেলিং-ঘেরা ছোট একটি খাটের মত জায়গা। সেই রেলিং ও সিন্ধুকের গায়ে কাঠ-খোদাইয়ের কি চমৎকার লতাপাতার বাহার। সুধা সেই লতা ও ফুলের গড়ন দেখিয়া দেখিয়া মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। ছবি আঁকিবার চেষ্টা সে কখনও করে নাই, না হইলে আঁকিয়া দেখাইতে পারিত। তাহার মনের পটে সিন্ধুকের ছবিটি চিরকাল আঁকা ছিল। বিধবা বড় মাসীমার দুটি বড় বড় ছেলে, বিশু আর সতু; তাহারা এই সিন্ধুকের উপরেই রাত্রে বিছানা পাতিয়া ঘুমায়। সিন্ধুকের উপর বিছানা পাতিয়া ঘুমানো শিবুর কাছে ছিল একটা পরম লোভনীয় ও রহস্যময় ব্যাপার। আগে আগে সে বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখিত মাত্র, এবার সে বিশুদাকে আসিয়াই বলিয়াছিল, "বিশুদা, তোমার সঙ্গে আমাকে একদিন শুতে দিতে হবে।"

বিশুদা বলিল, "হ্যাঁ, রাত্রে কি কাণ্ড কর তার ঠিক নেই। শেষে পূজোপার্ব্বণের বাসন নষ্ট হোক, আর বুড়ো বয়সে দিদিমার হাতে মার খেয়ে মরি।" শিবু অত্যন্ত অপমানিত হইয়া ইহার পর আর দ্বিতীয় বার অনুরোধ করে নাই।

বাড়ীর যত ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে অধিকাংশই ঘুমাইত সুধার দিদিমার কাছে। দালানের উল্টাকোণে একেবারে জানালার ধারে এক জোড়া খুব উঁচু পুরাতন পালঙ্ক পাতা। তাহার উচ্চতা এত বেশী যে চড়িবার একটা মই থাকিলেই ভাল হইত। মই না থাকিলেও খাটের তলায় একখানা ছোট চৌকি পাতা ছিল, তাহার উপর দাঁড়াইয়া ন্যাকড়ায় পা মুছিয়া দিদিমা খাটে উঠিতেন। খাটগুলি প্রশস্তও কম নয়, দুইখানাতে মিলিয়া বেশ একটা ঘরের সমান হইবে। খাটের মাথা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রায় এক মানুষ উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে ময়ূর-মিথুন দুই দিকে ঘাড় ঘুরাইয়া লতাকুঞ্জে নৃত্যে মাতিয়াছে।

প্রথম রাত্রেই দিদিমা সুধা ও শিবুকে বলিলেন, "আমার কাছে শুবি তোরা?"

শিবু মাকে ছাড়িয়া শুইতে একেবারেই রাজি নয়। সুধা যদিও কাহারও সঙ্গে শোওয়া মোটেই পছন্দ করিত না, তবু দিদিমা পাছে দুঃখিত হন বলিয়া বলিল, "হ্যাঁ দিদিমা, আমি শোব।"

খাট জুড়িয়া দিদিমার চারিধারে অর্থাৎ মাথার সিথানে, পায়ের নীচে, দুই পাশে তের-চোদ্দটি ছোট ছেলেমেয়ে তাহাদের পাড় বসানো কাঁথা ও ছোট ছোট বালিশ লইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমায়। কাহারও বা দুই পাশে দুইটা করিয়া পাশ-বালিশ। দিদিমা যেন ঠিক মা-ষষ্ঠী কি কাঁঠাল গাছ, আষ্টেপৃষ্ঠে ফল ঝুলিতেছে। ছেলেমেয়েগুলির বয়স সবই কাছাকাছি, কিন্তু

তাহাদের এক-এক জনের এক-এক ছাঁচের মুখ, এক-এক ধাঁচের গড়ন, কথা বলার ভঙ্গী, কাপড় পরা চুল বাঁধার রীতি আলাদা, দেখিতে শুনিতে সুধার ভারি মজার লাগে। তাহাদের পিতারা এই সংসারের ছেলে, কিন্তু মায়েরা ভিন্ন ভিন্ন সংসার হইতে ভিন্ন ভিন্ন ধরণ লইয়া আসিয়াছে, তাই একই ঝাড়ে বিভিন্ন রঙের ফুলের মত এক থাট আলো করিয়া এত নানা ছাঁচের শিশুমূর্ত্তি দেখিলে তাকাইয়া থাকিতে হয়। ঘুমাইবার আগে স্বল্প আলোয় দিদিমার ঘাড়ে পিঠে চড়িয়া তাহারা যখন গল্প ছড়া ও গানের আব্দার করিত, তখন সুধা একটু দূরে সরিয়া ইহাদের রকম-সকম দেখিত, ঐ সুরে সুর মিলাইয়া আব্দার করিতে তাহার কেমন যেন লজ্জা করিত।

দিদিমা কিন্তু অত জনের ধাক্কা সামলাইয়াও সুধাকে ভুলিতেন না, তাহার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "হ্যাঁরে সুধা, অত দূরে স'রে গেলি কেন রে, আমি কি তোর পর? এক বছরেই দিদিমাকে একেবারে ভুলে গেলি?"

এত ছেলেপিলে এক সঙ্গে দেখা সুধার কখনও অভ্যাস নাই, তাহারা দুটি ভাই-বোন নিজ্জনে পরস্পরের সঙ্গী হইয়াই মানুষ হইতেছে। এ যেন একেবারে ছেলের হাট।

গত বৎসর যখন সুধা আসিয়াছিল, তখন ত দিদিমার ঘরে এত ছেলেপিলে দেখে নাই। বড়মামীর পাঁচটি ছেলে-মেয়েই তখন বড়মামীর সঙ্গে তাঁহার বাপের বাড়ী গিয়াছিল, আর মেজমামীর খুকী তখন সবে তুই মাসের, সারা মুখে কাজল মাখিয়া মেজেয় কাঁথার উপর ঝুন্ ঝুন্ করিয়া মল-পরা পা ছুঁড়িত। মেজমামার প্রথম পক্ষের যে তিনটি ছেলে-মেয়ে আছে একথা সুধা ঠিক জানিত না, কারণ এ-জিনিসটা ঠিক সে বুঝিত না। এবার তাহারাও এখানে আসিয়াছে; সতুদা কাল সন্ধ্যাতেই সুধাকে বলিয়াছে, "জানিস, এরা হ'ল মেজমামার প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়ে, এই মেজমামী ওদের মা নন।"

সুধা তাহাদের খুব ছোটবেলা দেখিয়াছে, কিন্তু এবার চিনিতে পারে নাই। বড় ছেলেটি কিন্তু মহামায়াকে ঠিক চিনিয়াছে। সে গম্ভীর মুখ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে, "ছোটপিসি, ও মা তুমি যে!" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া মহামায়ার আঁচল চাপিয়া ধরিল। তাহার শ্যামবর্ণ কচি মুখখানি হাসিতে ভরিয়া উঠিল; মুক্তার মত দাঁতগুলি ঝলমল করিতে লাগিল। সুধার চেয়ে সে বছর তিনেকের বড় হইবে, কিন্তু সুধার তাহাকে দেখিয়া কেমন একটা বাৎসল্যের ভাব আসিতেছিল। সুধা মানুষটা চুপচাপ ধরণের, সকলের সঙ্গে বেশী কথা কয় না, তাই কিছুই বলিল না। কিন্তু তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, ছেলেটির হাতখানা একটু চাপিয়া ধরে। অন্য ছেলেমেয়ে দুইটি কিন্তু সুধাদের দেখিয়া সামান্য একটু কৌতূহল ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ করিল না।

রাত হইয়া গিয়াছিল, আজ আর গত বছরের দেখা মামার বাড়ীটা পুনরায় আগাগোড়া দেখিয়া ঝালাইয়া লইবার সময় নাই; শালপাতায় বাড়া ভাত, বিউলির ডাল ও পোস্তর বড়া খাইয়া সুধাদের সকাল সকাল ঘুমাইতে হইবে। দাদামশায় লুচি ভাজিতে বলিলেন, কিন্তু অতক্ষণ অপেক্ষা সুধা কিছু করিতে পারিবে না। মহামায়া তাহাদের জল খাইবার গেলাস আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এখানে সকলেই ঘটি করিয়া আলগোছে জল খায়, সুধা বড়ই অসুবিধায় পড়িয়াছে। কি করে? শেষে বড় মামীমার কাছে একটা বাটি চাহিয়া লইয়া তাহাতেই জল খাইল।

খুব ভোরে সুধার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। চোখ মেলিয়া দেখিল, দালানের পর মেজমামীর ঘরের জানালা খোলা রহিয়া গিয়াছে, একেবারে রোয়াক হইতে সদর রাস্তার লাল মাটি দেখা যাইতেছে, পথের ধারের অশথ গাছটার নূতন পাতায় আলো পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। গাছের ডালে কয়েকটা লম্বা-ল্যাজ বানর লাফালাফি সুরু করিয়াছে। সুধা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। মনে করিয়াছিল দেখিবে, আর সকলেই ঘুমাইতেছে। কিন্তু খাট হইতে নামিয়া দেখিল, দুই-একটি কচি ছেলে ছাড়া সকলেই তাহার আগে উঠিয়া পড়িয়াছে। ইহারা কি আশ্চর্য্য ভোরে উঠে!

মামীরা খোলা দালানের উপর দশ-বারোটা জল খাইবার ঘটি লইয়া শালপাতা ও সরিষার তেল দিয়া মাজিতে বসিয়াছেন। মাজিতে মাজিতে সমস্ত কালিটা শালপাতার গায়ে উঠিয়া আসিতেছে এবং ফুল কাঁসার সুগোল ঘটিগুলি রূপার মত ঝক্‌ঝকে হইয়া উঠিতেছে।

ছোটমামীকে কাল রাত্রে সুধা ভাল করিয়া দেখে নাই। আজ সকালে দেখিল, ছোটমামী গত বৎসরের চেয়ে অনেক সুন্দর হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার গলায় কালো একটা সুতায় একটা সোনার মাদুলী ফরসা রঙে এমন চমৎকার মানাইয়াছে যে বলা যায় না, গহনার চেয়ে অনেক বেশী ভাল। মামীদের মধ্যে ইনি সত্যই সুন্দরী। পাড়াগাঁয়ের বাঙালী মেয়ের এমন রং চোখে বড় পড়ে না।

সুধা এ বাড়ীর ভিতর বড় মাসীমার সঙ্গেই একটু বেশী কথাবার্ত্তা বলিত। তিনি কি করিতেছেন দেখিবার জন্য একবার ছুটিয়া রান্নাঘরে গেল, রাত্রে ত কথা বলা হয় নাই। দেখিল, রান্নাঘর হইতে এক কাঁড়ি কাঁসা পিতলের বাসন বাহির করিয়া তিনি মাজিবার জন্য বাগ্‌দী বৌকে দিতেছেন। সুধাকে দেখিয়া বলিলেন, "সুধা, চল না আমার সঙ্গে তামলী-বাঁধে নাইতে যাবে। তোমার জন্যে একটি ক্ষেতুরে বাটি এনে রেখেছি, চান ক'রে এসে দেব।"

বড় মাসীমা সুধাকে কখনও তুই বলিতেন না, সুধার ইহা বড় ভাল লাগিত। সুধা বলিল, "না মাসীমা, মা ত আমাকে পুকুরে চান করতে দেন না কখনও, আমি জলে দাঁড়াতে পারব না, ডুবে যাব।"

মাসীমা হাসিয়া বলিলেন, "ও মা, এত বড় মেয়ে জলে দাঁড়াতে পারবে না কি রকম! মায়ার সবই অদ্ভুত, এমনি ক'রেই ছেলেপিলে মানুষ করতে হয়? মেয়েকে চিরকাল ঝি রেখে তোলা জলে চান করাবে!"

মাসীমা ছোট ছোট দুটি বাটিতে তেল ও হলুদ লইয়া ও একখানা লাল রঙের চৌখুপি গামছা কাঁধে ফেলিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেলেন। এ তাঁহার বাপের বাড়ীর পাড়া, এখানে তিনি পথে বাহির হইলেও মাথায় কাপড় দিতেন না।

বাগ্‌দী বৌ বাসনগুলি ঝক্‌ঝকে ক'রিয়া মাজিয়া আনিয়া বড়মামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় বাসন রাখব গো, বড়-খুড়ী?"

বড়মামীমা বলিলেন, "রাখ না বাছা ঐ কুলুঙ্গিতলায়।" মেজমামী ঘটিতে করিয়া খানিকটা জল লইয়া বাসনের উপর ঢালিয়া ঢালিয়া সেগুলিকে আবার রান্নাঘরের দাওয়ায় তুলিতে লাগিলেন। বড় দালানে তাঁহার পেট-রোগা খুকীটা সকাল হইতে এক জায়গায় বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে, পা দুইটি সরু সরু, পেটটা মস্ত বড়। দেড় বৎসর বয়স হইতে চলিল, এখনও এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় নড়িয়া বসিতে পারে না। মামীর মাত্র ত দুইটি ছেলেমেয়ে। তবু ইহাকে একটু ভাল করিয়া যত্ন করিতে পারেন না, সারাদিনই এটা সেটা নানা কাজ। মেয়েটার গায়ে মুখে কেবলই মাছি উড়িয়া উড়িয়া বসিতেছে। সুধা কোথা হইতে একটা পাখা আনিয়া তাহাকে হাওয়া করিতে লাগিল। খুকী তবুও প্রাণপণে চেঁচাইতে লাগিল। খাওয়া, কাঁদা আর পেট ছাড়া, বেচারার জীবনে তিনটি মাত্র কাজ। বড়মামীমা পিতলের পাইয়ে করিয়া চাল মাপিয়া একটা ধামায় ঢালিতেছিলেন, রাগ করিয়া বলিলেন, "মেজবৌ, বাসন ক'খানা রেখে মেয়েটাকে ধর দিখি, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যে গলায় রক্ত উঠে যাবে। তোমার মেয়ের সঙ্গে ত ভাই, চিলেও পাল্লা দিতে পারে না।"

মেজমামী বিরক্ত মুখে আসিয়া মেয়ের পিঠে একটা কিল বসাইয়া বাঁ হাতে তাহার একটা হাত ধরিয়া ঝট্‌কা দিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

বড়মামী বলিলেন, "ও সুধা, যা না মা, বাকি বাসন ক'খানায় একটু জল ঢেলে তুলে নিয়ে আয়। আমি আজ আর ছোঁব না এখন ওগুলো।"

সুধা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরে মামীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল। মামী বলিলেন, "কি হ'ল রে? যা না চট্ ক'রে!"

সুধা একটু ইতস্তত: করিয়া বলিল, "তুমি যে কাজ করবে না তা আমাকে কেন করতে বলছ? তুমি যদি না ছোঁও ত আমি কেন ছোঁব?"

মামী বলিলেন, "বাপ্‌রে, মেয়ের বিচার দেখ! যা, ওই সাগরজল-মা'র সঙ্গে সই পাতা গে যা। সারা পথ গোবর ছড়া দিয়ে হাঁটবি।" মামী হাসিয়া উঠিলেন।

সুধা মামীর হাসির কারণ না বুঝিয়া অপমানিত হইয়া সেখান হইতে ঢেঁকিশালে চলিয়া গেল। এইখানে ঢেঁকির উপর বসিয়া গত বৎসর সে জ্ঞাতিদের মেয়ে বাসিনীর সহিত বেণে পুতুল লইয়া খেলা করিত।

আজ সেখানেও কাজের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। বাগ্‌দীদের বৌরা ঘরের চালে বাঁধা দড়ি ধরিয়া তালে তালে নাচিয়া

নাচিয়া ঢেঁকিতে পাড় দিতে সুরু করিয়াছে, বাসিনীর মা 'সোনামুখীর মামী' ঢেঁকির গড়ের ভিতর ধান নাড়িয়া দিতেছেন। দু সেকেণ্ড অন্তর ঢেঁকি পড়িতেছে, তবু তারই ভিতর মামীর হাত কেমন ক্ষিপ্র চলিতেছে, আবার গল্পেরও বিরাম নাই। সোনামুখীর মামী গ'প্পে মানুষ, কিন্তু বেচারীর কপাল ভাল নয়, বাসিনীকে কোলে লইয়া আঠারো বৎসরেই বিধবা হইয়াছেন। দাদামশায়ের পাশেই তাঁহার ভিটা তাই রক্ষা, ঘরের ধানচালে পেট ভরে, আর কাপড়চোপড় হাতখরচ চলে দাদামশায়ের ঘরে ধান ভানিয়া, নদী হইতে খাবার জল আনিয়া দিয়া। দিন য' কলসী খাবার জল তিনি আনেন, মাসে তত আধুলি তাঁহাকে দেওয়া হয়। তাছাড়া ধান ভানা, মুড়ি ভাজার মজুরি আলাদা। ধানের মজুরি ধান, মুড়ির মজুরি চাল, ইহার ভিতর পয়সার হিসাব নাই।

সুধাকে দেখিয়া সোনামুখীর মামী বলিলেন, "সুধা যে গো! কাল এসেছিস বাছা, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা ঘর ছেড়ে আর তোদের খোঁজ নিতে পারি নি। মা কেমন আছে তোর? শিবু ভাল ত? আর ভাই হয়েছে একটি?"

সুধা এতগুলা প্রশ্নের এক সঙ্গে উত্তর দিতে পারিল না, বলিল, "না, আর ভাই ত হয় নি।"

সোনামুখীর মামী কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন ভুলিয়া গিয়া আপন মনেই বলিতে লাগিলেন, "তা তোদের ঘরে হবে কেন? খেতে পরতে পাবে যে! যত সব কাঙালের দোরে দোরেই ছেলের পাল এসে জমা হয়।"

সুধা চুপ করিয়া রহিল, এ কথার কোনও জবাব দিবার প্রয়োজন যে নাই এবং মামী জবাব আশাও যে করেন না তাহা সুধা বুঝিয়াছিল। উঠানে বড় বড় ধানের মরাইয়ের উপর একপাল চড়ুই পাখী কিচির মিচির করিতেছিল, ঠিক যেন মানুষে মানুষে কথা কাটাকাটি হইতেছে, সুধা তাহাই দেখিতেছিল। এমন সময় দিদিমা ডাক দিলেন, "ওরে ও সতু, বিশু, সব ছেলেগুলোকে ডাক্ না রে। দুধ জ্বাল দিয়েছে, এই বেলা খেয়ে নিক, ভোর থেকে ত পেটে কিছু পড়ে নি।"

সুধা ডাক শুনিলে অগ্রাহ্য করিতে পারিত না, সে সকলের আগে গিয়া হাজির হইল। ক্রমে ধীরে ধীরে নানা জায়গা হইতে এক-একটি করিয়া ছেলেমেয়ের পাল জমা হইতে লাগিল। চৌদ্দ পনরটা কাঁসার বাটি সাজাইয়া মধ্যে এক কড়া দুধ লইয়া দিদিমা বসিয়াছেন। পিতলের হাতায় করিয়া সকলকে বাঁটিয়া দিতেছেন। তারপর মুড়ি ও গুড়, নয়ত তেলমাখা মুড়ির সঙ্গে কুচো পেঁয়াজ, সবাইকে এক কোঁচড় ভরিয়া। দাদামশায় আসিয়া বলিলেন, "কাল যে জিলাপী আনলাম তার কি হ'ল? মুড়ি দিচ্ছ কেন ছেলেদের? বছরে একবার আসে, তাও তুমি হাত তুলে দুটো দিতে পার না?"

দিদিমা বলিলেন, "দিতে আমার কি অসাধ? কিন্তু শুধু সুধা আর শিবুকে দিলেই কি হবে? এবার যে বলতে নেই—সব ক'টি একঠাঁই হয়েছে, তোমার ও জিলাপীর হাঁড়িতে কুলাবে? এখন ক্ষিদের মুখে সকালবেলা ওসব কাজ নেই, বিকেলবেলা সবাইকে একটা একটা ক'রে দেব।"

দাদামশায় রাগ করিয়া বৈঠকখানা ঘরে যাইতে যাইতে বলিলেন, "ও মায়া, তোর গরীব বাপের ঘরে আর ছেলেদের আনিস্ না; গুড় মুড়ি ছাড়া কিছু খাবার এখানে জোটে না।"

দিদিমা রাগিয়া বলিলেন, "গাই বিইয়েছে, বড় বড় দুধের বাটি বার করেছি, ভত্তি ক'রে দুধ দিলাম, তবু তোমার মন ওঠে না। গেরস্তর ঘরে ছেলেপিলে আবার কত খাবে?"

পাড়ার মেয়েরা পুকুরঘাটে যাইবার পথে আজ সবাই এ বাড়ী উঁকি মারিয়া যাইতেছে, কাল যে মহামায়া আসিয়াছেন। কেহ বলিতেছে, "ওলো মায়াদিদি, দেখি না লো কেমন আছিস, এক বছর যে দেখি নাই।" কেহ বলিতেছে, "ওলো ছোট মাসি, ছেলেপিলে ডাগর হয়েছে, এবার ওদের পিসির কাছে রেখে বেশীদিন থাক্ না এখানে।"

দূর হইতে শুনিয়াই সুধার চোখে জল আসিয়া গেল। মাকে ছাড়িয়া পৃথিবীতে একদিনও যে কোথাও থাকা যায় তাহা সুধা কল্পনা করিতে পারিত না। মা আর বাবা তাহার সমস্ত জগৎ আলো করিয়া আছেন, মা না থাকিলে অর্দ্ধেক জগৎ অন্ধকার হইয়া যাইবে যে!

মেয়েদের হাতে বেশীর ভাগেরই মোটা মোটা পালিশ-কর রূপার বালা, দুই-চার জনের হাতে এক গোছা করিয়া রূপার চুড়ি। সুধার মা সোনার চুড়ি পরিতেন বলিয়া সুধা এক কৌতূহলের সহিত মেয়েদের আভরণ দেখিতেছিল। একা

মহিলা হাসিয়া বলিলেন, "কি দেখছিস বাছা, তোর মা বড়লোকের পরিবার, সোনার গয়না পরে, সকলের কি তা জুটে ?"

সুধা হাবার মত হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। মহামায়া ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "বোকা মেয়েটাকে কি মাথামুণ্ডু শোনাচ্ছ ? ও ত বড়লোক গরীব লোক সব জানে।"

মহামায়াকে দেখিয়া সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল, এক বৎসরে তাঁহার সংসারে কি কি নূতন খবর জমিয়াছে জানিবার জন্য। মহামায়া গত বৎসরে সুধা ও শিবুকে লইয়া আসিয়াছিলেন, এ বৎসরও সেই দুইটিই ; নূতন আর একটি আনিতে পারেন নাই, ইহাতে সঙ্গিনীরা বড়ই নিরাশ হইয়া গেলেন। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, এই ত পৃথিবীর খবর, পৃথিবীর নূতনত্বও ইহাই লইয়া। মহামায়ার সংসারে বিবাহের বয়স এখন কাহারও নাই, মৃত্যু—সে যেন শত্রুরও না হয়, জন্মই একমাত্র সুখবর ছিল, তাহা হইতেও যেন মহামায়া সকলকে বঞ্চিত করিলেন।

লোকসমাগম দেখিয়া সোনামুখীর মামী কাজ সারিয়া আসিয়া জুটিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আ দ্যাখ, সনাতনের মায়ের গেল বছর এক খোকা হ'ল, আবার এ বছরেও একটি হয়েছে। সাতটি ছেলেমেয়ে ঘরে, কিন্তু খেতে দেবার পয়সা নেই।"

বড়মামী বলিলেন, "আর আমাদের উমিরও ত তাই। ফি বছরই একটি।"

মহামায়া বলিলেন, "সুধা, যা দেখি এখান থেকে। যত সব বাজে গল্পের মাঝখানে ব'সে থাকতে হবে না।" সুধা চলিয়া গেল।

একজন পড়সী বলিলেন, "ও ত কেবল মেয়েই বিয়োচ্ছে, এর মধ্যে পাঁচটা হয়ে গেল। শাশুড়ী বলে—ঘটা ক'রে ছেলের সকাল সকাল বিয়ে দিলাম। কাজ-কর্ম্ম কিছু নেই, বৌ এর মধ্যে পাঁচটা মেয়ে হইয়ে দিলেন।"

মহামায়া বলিলেন, "উমার মেয়েগুলিকে আমি দেখেছি, আহা, কি সুন্দর দেখতে, যেন ফুলের ডালি।"

সোনামুখীর মামী বলিলেন, "অমন সুন্দরের নাম কি ভাই ? কেবল মেয়ের পাল ; ওর মধ্যে দুটো বেটাছেলে মিশাল থাকত, তবে না সাজন্ত হত। শাশুড়ী মাগী বড় দজ্জাল, উঠতে বসতে গঞ্জনা দিচ্ছে—মেয়ে-বিয়ুনী ব'লে। উমি বলে—এবার মেয়ে হ'লে আমি গলায় দড়ি দেব।"

বিনোদা বলিল, "মায়া দিদি, ওঠ্ না লো, চান করতে করতে গল্প হবে, তেল গামছা নিয়ে আয়।"

মহামায়া বলিলেন, "চল্ যাচ্ছি, আমি ঘাটে ব'সে তেল মাখতে পারব না, শুধু গামছা হ'লেই চলবে।"

সোনামুখীর মামী বলিলেন, "ঠাকুরঝি, দিনে দিনে একেবারে মেম হয়ে উঠছিস, এবার একটি ঘাঘরা প'রে আসিস্।"

মহামায়া বলিলেন, "দোকানে কিনতে পাঠিয়েছিলাম, পাওয়া গেল না, নইলে এইবারেই প'রে আসতাম।"

বিনোদা বলিল, "মায়া দিদি, এত রঙ্গও জানিস্। তোর সঙ্গে পারা ভার। তবে তোর যা রং ভাই, এমনি সুন্দর চেহারাতেই ঘাঘরা মানায়। আমাদের প্রিয়বালার মা, ওই যে কাটিকেষ্ট বাবুর বৌ, পাড়ায় পাড়ায় বাইবেল নিয়ে বেড়ায় আর সেলাই করায়, ওর রং নয়ত হাঁড়ির কালি, রূপ যেন শ্যাওড়া গাছের পেত্নী, কিন্তু ঘাঘরাটি ঠিক পরা চাই।"

কুমুদা বলিল, "তা যা বলিস ভাই ছোটমাসি, ওরা আমাদের চেয়ে ভাল। এই আমাদের শৈবলিনী কালো মেয়ে, তবু বাপমার সখ হ'ল কুলীনে করতে হবে। জামাইও হয়েছে তেমনি, যেন ঠিক বাউরী কি কাওরা। গেল বছর দেখলি ত মেয়ে জামাইকে, এবার ছোঁড়া আবার দুটো বিয়ে করেছে। বললে বলে—কালো মেয়ে, ওকে নিয়ে যে আমি ঘর করব না, তা ত তোমরা জানই। টাকা দিতে পার, ফি বছর একবার আসব।"

বিনোদা বলিল, "লাভ ত বড় ! এখন মেয়ে পুষছে; এর পর নাতি-নাতনীও বছর বছর পুষবে। তার চেয়ে সত্যি খিষ্টান হলেই সুখ ছিল।"

৪

মহামায়া অল্পদিনের জন্য বাপের বাড়ী আসিতেন, আর তাঁহার স্বামী ছিলেন এ বাড়ীর অন্য সব জামাইদের চাইতে একটু পণ্ডিতধরণের মানুষ। এই বয়সেই লোকসমাজে তাঁহার নামডাক হইয়াছিল, তাছাড়া মহামায়া বাপমায়ের কোলের মেয়ে, এই জন্য বাপের বাড়ীতে তাঁহার আদর একটু বেশী

ছিল। পিতা লক্ষ্মণচন্দ্র তাঁহাকে দেখিবার জন্য দিনে দশবার ঘরবাহির করিতেন, মা মুখে কিছু না বলিলেও সমস্ত মনটা তাঁহার মায়ার কাছেই পড়িয়া থাকিত, ভাজেরাও শ্বশুর-শাশুড়ীর মন বুঝিয়া এবং কতকটা আপনা হইতেই মহামায়াকে একটু খাতির করিতেন, বিধবা দিদি ত তাঁহাকে এক মুহূর্ত্ত কাছ-ছাড়া করিতে চাহিতেন না।

মহামায়া বাপের বাড়ী আসিলে তাঁহার চারিপাশে অষ্ট প্রহরই যেন মজলিশ লাগিয়া থাকিত। খাইতে শুইতে বসিতে সাত জনের সাতশ গল্প লাগিয়াই আছে। সে যে কত রকমের গল্প তাহার ঠিক নাই।

ছোট ভাজ মৃণালিনী যতদিন নূতন বৌ ছিলেন কথা বলিতেন না, এখন তিন-চারি বৎসর বিবাহ হইয়াছে, একটি সন্তানেরও সম্ভাবনা, এখন সকলের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি ভাজেদের মধ্যে সকলের চেয়ে সুন্দরী, তাঁহার কাঁচা সোনার মত রং, মেঘের মত চুল, একটু কটা কটা চোখের রং, বেশ নরম সরম গোলগাল গড়ন; তাঁহার গল্পের বিষয়ও ছিল মানুষের রূপ। সকল গল্পেই শেষ পর্য্যন্ত বক্তব্য গিয়া দাঁড়াইত তাঁহার নিজের রূপের শ্রেষ্ঠতায় ও আর পাঁচ জনের রূপহীনতায়। সুধার চোখে তাঁহাকে দেখিতে খুব ভালই লাগিত; কিন্তু তিনি যে এবার প্রথম কথাই সুধার রূপ লইয়া পাড়িয়াছিলেন ইহাতে সুধা তাঁহার কাছে যাইতে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। তিনি সুধার সামনেই মহামায়াকে বলিলেন, "হাঁ, ছোট ঠাকুরঝি, তোমার ভাই এমন রূপ, ঠাকুরজামাই এত সুন্দর, মেয়ে এমন কি ক'রে হ'ল? বাপমায়ের রূপে ঘর আলো আর মেয়ের এই ছিরি, তোমার মেয়ে ব'লে যে লোকে স্বীকার করবে না।"

সুধার মনটা মুসড়াইয়া এতটুকু হইয়া গেল। কথাগুলা সুধার কানে যে অমৃত বর্ষণ করিতেছে না ইহা কাহারও খেয়ালই হইল না। মৃণালিনী বলিলেন, "ওকে মাগুর মাছের কানকো বেঁটে মাখিও। আমার ছোট বোনের রং কালো ছিল, তাই বিয়ের আগে মা তাকে এক বছর ধ'রে রোজ ছাদের চিলের ঘরে নিয়ে গিয়ে মাগুর মাছের কানকো বাঁটা সর্ব্বাঙ্গে মাখাতেন। সত্যি সত্যি মেয়েটার রং বদলে গেল।"

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ভাই সুন্দরী মানুষ, তোমার সারাক্ষণ রূপের ভাবনা। আমার মেয়ের এখন বিয়ের বয়স হয় নি, এখনই অত রং চেকনাই করবার দরকার নেই।"

মৃণালিনী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা ঠাকুরঝি, কাশ্মীরী কোন্ জাতকে বলে জান?"

মহামায়া বলিলেন, "জানি মানে চোখে হয়ত দেখিনি, তবে বইয়ে পড়েছি, লোকের মুখে শুনেছি; বোধ হচ্ছে কল্‌কাতায় একবার একটা কাশ্মীরী শালওয়ালা দে'খে থাকব।"

মৃণালিনী বলিলেন, "তাদের বুঝি খুব সুন্দর রং? আমার ছোটবেলায় পাড়ার লোকেরা বলত, 'এ মেয়ে ঠিক কাশ্মীরীর মতন।' বিনিকে যে দেখত সেই বলত 'এক মায়ের পেটে দুটি এমন দুরকম জন্মাল কি ক'রে?' বারো দশ বছর বয়স না-হতেই আমার কত জায়গা থেকে যে সম্বন্ধ এল তার ঠিক নেই।"

মহামায়া বলিলেন, "তা বেছে বেছে গরীবের ঘরটিতে তোমার বাপ মা দিলেন কেন?"

মৃণালিনী একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আহা, তা যেন আর জান না? তোমার ভাই যে [illegible] পণ করেছিলেন।"

বড় ভাজ দেখিতে চলনসই ছিলেন, রোগা, কালো শ্যাম বর্ণ রং; কিন্তু তাঁহার মুখে হাসি সর্ব্বদাই লাগিয়া থাকিত। তাঁহাকে শত কাজের ভিতরেও অপ্রসন্ন মুখে বড় দেখা যাইত না। তাঁহার কোলের ছেলে একেবারে কচি ছিল না বলিয়া কাজকর্ম্মের ভিতরেও লোকের সহিত রঙ্গ-রস করিতে তিনি ভালবাসিতেন। মৃণালিনী রূপের গল্প শুরু করিলে বড় জা পার্ব্বতী বলিতেন, "আমরা ভাই কালো কুচ্ছিত মানুষ, আমাদের সঙ্গে ছোটবৌয়ের গল্প জমে না। হাজার হোক, মেয়েমানুষের মন ত? এক জন কেবল রূপের দেমাক্ করলে মনে একটু খোঁচা লাগে বইকি! আমাদের বাপ মায়ে ধ'রে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে, কেউ দে'খে গলায় গড়াতে আসে নি; কিন্তু তবু ত ঘর চলছে, এখনও কেউ বার ক'রে দেয় নি।"

মৃণালিনী একটু লজ্জিত হইয়া বলিতেন, "বড় দিদির যেমন কথা! আমি নাকি দেমাক্ করছি, কথায় কথা উঠল তাই বললাম। ছেলেবেলা মা আমাকে মোটে আয়নায়

মুখ দেখতে দিত না, সিঁথি কেটে চুল বাঁধতে দিত না, পাছে রূপের গুমোর শিখি।"

বড় জা বলিতেন, "আচ্ছা, ঠাকুরপোকে বলব এবার আয়নায় ঘর মুড়ে দিতে। প্রাণে যত রকম সাধ আছে মিটিয়ে নিস; যুগল রূপের ছায়াও মন্দ দেখাবে না।"

সুধা সেইখানেই পিঠ ফিরাইয়া বসিয়া খেলিতে খেলিতে সকল কথা শুনিত আর ভাবিত, 'ভগবান্ আমাকে সুন্দর করেন নাই তাহাতে কাহার কি ক্ষতিটা হইল?' আবার ভাবিত, 'আমি সুন্দর হ'লে আমার মা বাবা যে এত সুন্দর তা বুঝতে পারতাম না। আমার মত সুন্দর বাপ মা কারুর নেই।'

মামার বাড়ীতে যখনই মেয়েদের জটলা হইত, তখনই দেখা যাইত, খানিকক্ষণ হাসি-তামাসা ও ঘর-সংসারের সুখ-দুঃখের গল্পের পর গল্পের ধারা অকস্মাৎ মোড় ফিরিত। মেয়েদের গলা নীচু হইয়া আসিত, দূরের সঙ্গিনীরা অনেকটা কাছে আগাইয়া বসিতেন, বোঝা যাইত, এইবার গল্পটা সব কয় জনেরই সমান চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সুধা-শিবুর কাছে এই বারেই তাহা দুর্বোধ্য হইয়া পড়িত। সুধা বুঝিতে পারিত, থাকিয়া থাকিয়া কোনও একজন পুরুষের কথা উঠিতেছে, যাহার নামটা বারংবার উচ্চারণ করিতে মেয়েদের একটু ভয় আছে। না-জানি কে শুনিয়া ফেলিবে। আকারে ইঙ্গিতে কিন্তু সব গল্পটাই হইয়া যাইত। মানুষটা কি একটা ঘোরতর অন্যায় কাজ করিয়াছে, নীচু গলায় চোখ বড় বড় করিয়া সকলে তাহারই গল্প ঘোরালো করিয়া তুলিত। কিন্তু এত বড় অন্যায়ের আলোচনায় সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রায় সকলেই থাকিয়া থাকিয়া মুচকিয়া হাসিয়া উঠিত। মানুষের অপরাধের ভিতর আনন্দরস কোথা হইতে আসে ভাবিয়া সুধা কত সময় অবাক্ হইয়া মাসী ও মামীদের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত কিন্তু তাহার উপস্থিতিটাকে বিশেষ কেহ গ্রাহ্য করিত না, কেহ ফিরিয়া তাহার দিকে তাকাইতও না। মাঝে মাঝে মহামায়া এক-একবার বলিয়া উঠিতেন, "সুধা, যা দিকি এখান থেকে, বুড়োদের কথা যত হাঁ ক'রে গিলতে হবে না। বিশ্বের ছাইভস্ম!"

মানুষের বয়স বাড়িলে এই জাতীয় বুড়োমি গল্প যে পৃথিবী জুড়িয়া অধিকাংশ লোকেই করে, তাহা সুধা তখনও বুঝিতে শিখে নাই। সে মনে করিত, জগতের যত সামাজিক অপরাধ তাহার মামার বাড়ীর পাড়ার বিশেষ কয়েকটি লোকই বোধ হয় করিয়া থাকিবে, তাই এই বাড়ীতে এই অপরাধের এত আলোচনা। তাহার ইতিপূর্ব্বে ধারণা ছিল, সামাজিক আইন সম্বন্ধে শিশুরাই অজ্ঞ, তাই তাহারা না জানিয়া কাহাকেও আঙুল দেখায়, কাহাকেও মুখ ভেঙায় কিংবা কাহাকেও বা পথে শোনা দুই-একটা গালাগালি উপহার দিয়া বসে। বয়স্ক লোকে জানিয়া শুনিয়া সমাজের কাছে এক সঙ্গে অপরাধী ও হাস্যাস্পদ কেন হইয়া বসে ভাবিয়া সে কূল-কিনারা পাইত না। বয়সে মানুষের বুদ্ধি তাহা হইলে বাড়ে না।

বড়মামী পার্ব্বতীর একটু বিশেষত্ব ছিল, সর্ব্বদা গল্প-গুলিকে এই পথে টানিয়া লইয়া যাইবার ক্ষমতায়। ছোট-মামীর যেমন রূপের অহঙ্কার ছিল, বড়মামীর তেমনই ছিল শালীনতার। যখন তখন তাঁহার মুখে পাড়ার মেয়েদের নামে শোনা যাইত, "মেয়ের ভাবন দেখে আর বাঁচি না।" "ভাবুনী"দের তিনি দু-চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তাই বোধ হয় নিজে কখনও একখানা ভাল কাপড় কি গহনা পরিতেন না। চুলটা মাথার উপর উবু ঝুঁটি করিয়া বাঁধিয়া মোটা একখানা শাড়ী জড়াইয়া সকাল সন্ধ্যা তাঁহার কাটিত। মুখে হাসির অভাব কখনও দেখা যাইত না, কিন্তু আর কোনও ভূষণের ধার তিনি ধারিতেন না।

পাড়ার নর্ম্মদাদিদির স্বামীর গল্প মহিলা-মজলিশে প্রায়ই হইত। সে যে ঠিক কি করিয়াছিল, সেটা ভাষায় কেহ ব্যক্ত করিত না বলিয়া সুধা অপরাধটা বুঝিতে পারিত না; তবে মানুষটার মত মন্দ লোক পৃথিবীর ভদ্রসমাজে আর যে নাই এ-বিষয়ে সুধা স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিল। কিন্তু লোকাচার সম্বন্ধে সুধার জ্ঞান সম্পূর্ণ পাল্টাইয়া গেল যেদিন সে দেখিল যে নর্ম্মদাদিদির স্বামী উপেনবাবু পূজা উপলক্ষ্যে শান্তিপুরে ধুতি চাদর পরিয়া ফুলবাবুটি সাজিয়া বাড়ী বাড়ী প্রণাম করিয়া বেড়াইতেছেন। বড়মামী সুদ্ধ তাঁহাকে কত ঘটা করিয়াই না অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। অন্য মামীরা জামাইয়ের সামনে মুখে ঘোমটা দিলেও সাতদিক্ হইতে সাতজন সন্দেশ জলপান যোগান দিতে লাগিলেন। যে

বড়মামী সেদিন হাত ঘুরাইয়া বলিতেছিলেন, 'ঝাঁটা মার ঐ উপেনটার মুখে,' তিনিই ত আসন পাতিয়া 'এস বাবা, বস বাবা' করিতে লাগিলেন সবার আগে।

বড় মাসীমা কিন্তু ভারি মজার ছিলেন। তিনি কখনও মেয়েদের এই নিন্দার মজলিশে বসিতেন না। যাহার উপর রাগ হইত তাহাকে ধরিয়া তখনই দশ কথা খুব শুনাইয়া দিতেন এবং যাহাকে ভাল চিনিতেন না তেমন লোককে ভাল না লাগিলে একেবারে মুখ ফিরাইয়া বসিতেন। নন্দাদিদির স্বামীকে দেখিয়া মাসীমা ত ঘর ছাড়িয়াই উঠিয়া চলিয়া গেলেন। বড়মামীমা ঘরে আসিয়া বলিলেন, "জামাই তোমায় প্রণাম করতে চাইছে, ঠাকুরঝি!"

মাসীমা বলিলেন, "প্রণামে কাজ নেই, এইখান থেকেই আশীর্ব্বাদ করছি, ভগবান্ ওকে শুভমতি দিন।"

বড়মামী কিন্তু উপেনবাবুর কাছে বলিলেন, "ঠাকুরঝির বড় গায়ে ব্যথা হয়েছে, আজ আর এদিকে আসছেন না। কিছু মনে ক'রো না।'

মহামায়ার দিদি সুরধুনী তাঁহাকে ছেলেবেলা হইতেই বড় ভালবাসিতেন। বাপের বাড়ী আসিলেই তিনি মহামায়াকে তাঁহার ঘরে শুইবার জন্য লইয়া যাইতেন। বিধবা মানুষ, একলা বারোমাস থাকেন, কাহারও সঙ্গে দুইটা মনের কথা বলিবার জো নাই। বাপের বাড়ীতে চিরকাল বাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বাপ-মায়ের কাজেও তিনিই সকলের চেয়ে বেশী লাগেন, কিন্তু তবু দুইটা ছেলে লইয়া বুড়ো বাপের গলায় পড়িয়াছেন বলিয়া বাপের বাড়ীতে অন্য মেয়েদের মত তাঁহার আদর নাই। বাপ-মা কাজের সময় ডাকেন, ফাইফরমাস করেন কিন্তু তাঁহার নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনার কথা শুনিবার বয়স কি অবসর তাঁহাদের নাই, বলিবার ইচ্ছাও সুরধুনীর হয় না। ভাজেদের চালচলন অন্য রকম, পরের বাড়ীর মেয়ে সব, তাহাদের সঙ্গে মিশিতে তিনি পারেন না। তাছাড়া বিধবা মানুষ সংসারের গলগ্রহ, যদি ভারিক্কি হইয়া না চলেন, নিজের রসহীন শুষ্ক জীবনের করুণ ক্রন্দন তাঁহাদের কানে ঢালেন, তবে বয়সে ছোট এই ভাজেরা তাঁহাকে মানিবে কেন? বাপেরই না-হয় তিনি খান পরেন, কিন্তু ভাজেরা এখনও তাঁহাকে গুরুজন বলিয়া সমীহ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাহাদের কাছে রুক্ষতার বর্ম্ম তাঁহাকে পরিয়া থাকিতেই হইবে। নিজের ছেলেরা একে বয়সে অনেক ছোট, তাহাতে পুরুষ মানুষ, সর্ব্বোপরি মা'র বৈধব্যটাকে মায়েরই একটা অপরাধ বলিয়া তাহারা ধরিয়া লইয়াছে, সুতরাং মনের যোগ তাহাদের সঙ্গে ত হইবার উপায় নাই।

কিন্তু বোনের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কই আলাদা, একই পিতৃ-মাতৃরক্তধারা ভাইবোন সকলের শরীরে প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু একটা বয়সের পর ভাইরা যেন সে প্রবাহের মাঝখানে কোথায় একটা বাঁধ তুলিয়া দেয়, তাহারা যেন হইয়া যায় সম্পূর্ণ নূতন মানুষ, কিন্তু বোনেরা দূরে চলিয়া গেলেও সেই অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনী একের অন্তর হইতে আর একজনের অন্তরে একই ভাবে বহিয়া চলে। বহুদিন পরে যখন বোনে বোনে মিলন হয় তখন যেন স্রোতস্বিনীতে বর্ষার বান ডাকিয়া যায়।

ক্রমশঃ
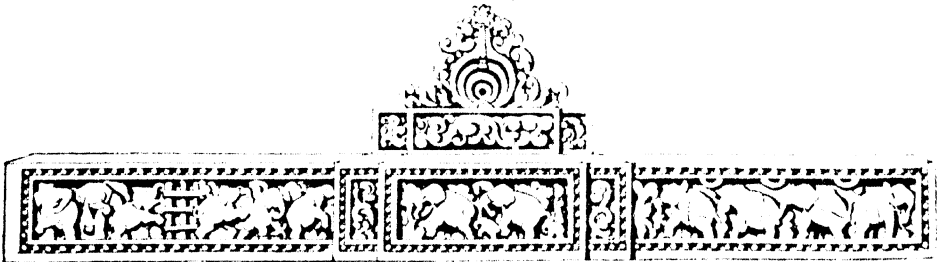
শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য শব্দতত্ত্বঘটিত তাঁর এক প্রবন্ধে "গান গা'ব" বাক্যের "গা'ব" শব্দটিকে অশুদ্ধ প্রয়োগের দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করেছেন। এই দৃষ্টান্তটি আমারই কোন রচনা থেকে উদ্ধৃত।

স্বীকার করি, এরূপ প্রয়োগ আমি ক'রে থাকি। এটা আমার ব্যক্তিগত বিশে..ষ কি না তারই সন্ধান করতে গিয়ে আমি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখরকে জিজ্ঞাসা করলেম যে যদি বলি, "আজ সভায় আমি গান গা'ব না গা'বেন বসন্তবাবু, এখানে গান গা'বার আরো অনেক লোক আ..ছে" তাতে কোন দোষ হবে কিনা—প্রশ্ন শুনে তিনি বিস্মিত হলেন, বললেন তাঁর কানে কোথাও ত্রুটি ঠেকৃছে না। বাংলা শব্দকোষকার পণ্ডিত হরিচরণকেও অনুরূপ প্রশ্ন করাতে তিনি বললেন তিনি স্বয়ং এই রকমই প্রয়োগ ক'রে থাকেন।

বিজনবিহারীর সঙ্গেও আলোচনা করেছি। তিনি বাংলা শব্দতত্ত্বের একটি নিয়মের উল্লেখ ক'রে বললেন, বাংলা গাওয়া শব্দটার মূলধাতু "গাহ্"—যে ইকার এই হ ধ্বনির সঙ্গে মিলিত, তার বৈধব্য ঘটলেও বিনাশ হয় না, হ লোপ হ'লেও ই টিঁকে থাকে। অতএব গাওয়া থেকে গাইব হয়, গা'ব হ'তে পারে না, সহমরণের প্রথা এস্থলে প্রচলিত নেই।

আমাকে চিন্তা করতে হ'ল। শব্দের ব্যবহারটা কী, আগে স্থির হ'লে তবে তার নিয়ম পরে স্থির হ'তে পারে। বলা বাহুল্য, বাংলার যে ভূভাগের ভাষা প্রাকৃত বাংলা ব'লে আজকালকার সাহিত্যে চলেছে সেইখানেই অনুসন্ধান করতে হবে।

এখানে হ ধ্বনিযুক্ত ক্রিয়াপদের তালিকা দেওয়া যাক্।—

কহ্, গাহ্, চাহ্, নাহ্, সহ্, বাহ্, রহ্, দোহ্।

দেখা যায় অধিকাংশ স্থলেই এই সকল ক্রিয়াপদে ভবিষ্যৎ কারকে বিকল্পে ই থাকে এবং লোপ পায়।

"কথা কইবে"ও হয় "কথা ক'বে"ও, যথা, "গেলে কথা ক'বে না সে নব ভূপতি।"

ভিক্ষে চা'ব না বললেও হয়, ভিক্ষে চাইব বললেও হয়। "তোমার কাছে শান্তি চা'ব না" গানের পদটি আমারই রচনা বটে, কিন্তু কারো কানে এ পর্য্যন্ত খটকা লাগে নি।

"এ অপমান স'বে না" কিম্বা "দুঃখের দিন র'বে না" বল্লে কেউ বিদেশী ব'লে সন্দেহ করে না।

যদি বলি "গঙ্গায় না'বে, না তোলা জলে" তা হ'লে ভাষার দোষ ধ'রে শ্রোতা আপত্তি করবে না।

কেবল বহা ও বাহা ক্রিয়াপদে "ব'বে" "বা'বে" ব্যবহার শোনা যায় না তার কারণ পাশাপাশি দুটো "ব"-কে ওষ্ঠ পরিত্যাগ করতে চায়।

হ ধ্বনি বর্জ্জিত এই জাতীয় ক্রিয়াপদে প্রাকৃত প্রয়োগে নিঃসংশয়ে ই স্বর লুপ্ত হয়। কথ্য ভাষায় কখনই বলি নে খাইব, যাইব, পাইব।

"দোহা" ক্রিয়াপদের আরম্ভে ওকার আছে, তারই জোরে ই থেকে যায়—বলি "গোরু দুইবে"। কিন্তু একেবারেই ই লোপ হ'তে পারে না ব'লে আশঙ্কা করি নে। "রুগ্ন গোরু কখনই দো'বে না" বাক্যটা অকথ্য নয়।

"পোহা" অর্থাৎ প্রভাত হওয়া ক্রিয়াপদের ধাতুরূপ "পোহা",—পোহাইবে বা পোহাইল শব্দে লিখিত ভাষায় ই চলে কিন্তু কথিত ভাষায় চলে না। সন্দেহ হচ্ছে "কখন রাত পুইবে" বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ "পোয়াবে" এবং "পুইবে" দুইই হয়।

বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা। দ্বিতীয় ভাগ। দশটি চিত্র সমন্বিত। শ্রীসুন্দরীমোহন দাস প্রণীত। প্রকাশক শ্রীপ্রেমানন্দ দাস, ৫৭।১।১।এ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ ৭৯। মূল্য ৸০ আনা।

গ্রন্থকার খ্যাতনামা চিকিৎসক। তিনি ধাত্রীবিদ্যাবিশেষজ্ঞ। ব্যবসায় উপলক্ষ্যে তাঁহাকে নানা চরিত্রের বহু নরনারীর সম্পর্কে আসিতে হইয়াছে। গ্রন্থকারের বিপুল অভিজ্ঞতা কেবল চিকিৎসা ব্যাপারেই পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি জীবনে রসের সন্ধান পাইয়াছেন এবং সেই রস পাঠককেও আস্বাদন করাইয়াছেন। পুস্তিকার অনাড়ম্বর কাহিনীগুলি সকল শ্রেণীর ব্যক্তিকে তৃপ্তি দান করিবে। গ্রন্থকারের বর্ণনভঙ্গী নিজস্ব। স্থানে স্থানে ক্রিয়াপদের অভাব অনুভূত হইলেও ভাষা ও ভাবের সুসঙ্গতি সর্ব্বত্র বিদ্যমান। গানগুলিও পরম উপভোগ্য হইয়াছে। বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচার প্রথম ভাগের ন্যায় দ্বিতীয় ভাগও আদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

বুদ্বুদ—শ্রীপরিমল গোস্বামী লিখিত। ডবল ক্রাউন, ১৬ পেজ, ১৭৪ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা চারি আনা। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

বইখানিতে পরিমলবাবুর লেখা কয়েকটি ছোট গল্প আছে। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক শ্রীপরিমল গোস্বামী স্বনামখ্যাত। তাঁহার লেখার মধ্যে সরলতা আছে কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রসবোধ ও অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ ক্ষমতার সমাবেশে সে সরলতার ধার স্থানে স্থানে খুবই ধারাল। পাঠক বাঙালীর ভাবপ্রবণতার পরিচয় সাহিত্যে সর্ব্বদাই পাইয়া থাকেন। কল্পনাও কখন কখন উগ্রভাবে সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাস্তবদৃষ্টিতে দেখা জীবনের ছবি সাহিত্যে প্রায় পাওয়া যায় না। এদেশের জীবন-যাত্রার বাহিরের মোটামুটি আকার যা, তা পাওয়া যায়। যায় না বিশেষ করিয়া ভিতরের খবর। পরিমলবাবুর লেখা ডাক্তারের ছুরী, অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, টেষ্টটিউব ও বকযন্ত্রের সমন্বয়। কাটিয়া, চিরিয়া, বাড়াইয়া, কমাইয়া, জমাইয়া, গলাইয়া যেমন করিয়া হউক ধরা পড়িতেই হইবে। রসের ক্ষেত্রে এ যেন শারলক্ হোমস্ এর ডিটেকটিভী। আমার মনে হয় পাঠক যদি সত্যকার রস আস্বাদন করিতে চান, তাহা হইলে এ বই তাঁহার ভাল লাগিবে। কারণ এই নারিকেলের দেশে অধিকাংশ রস-নারিকেল বিক্রেতাই খরিদ্দারকে ছোবড়া চুষিয়া রসাস্বাদন করিতে শিক্ষা দিয়া থাকেন। আসল যাহা উপভোগ্য তাহা স্বস্থানেই মজুত থাকিয়া যায়। শ্রীপরিমল গোস্বামী নারিকেলের অন্তরে ঢুকিয়াছেন। তাঁহার সাহায্যে আমরা কিছু নূতন রস পাইলাম।

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

কুটীরের গান—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পি সি সরকার এণ্ড কোং। দাম দেড় টাকা।

বইখানিতে সাতাশটি কবিতা আছে। শেষের তিনটি রুপার্ট ব্রুক, মনোমোহন ঘোষ ও রিচার্ড মিডলটন হইতে অনুবাদ। অনুবাদগুলি ভাল। লেখক পল্লীপ্রকৃতির ভক্ত। সেই আকর্ষণ তাঁহাকে সামান্য বাস্তবের খুঁটিনাটি বর্ণনায় টানিয়া লইয়া যায় নাই। তাঁহার মনে পল্লীস্মৃতি যে শান্তস্নিগ্ধ, মায়ামধুর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে কবিতাগুলির মধ্যে সেই রূপটি প্রকাশের জন্য উন্মুখ হইয়াছে।

স্বপ্নাকুল দুই নেত্র, হৃদয় অধীর
রণিয়া রণিয়া বাজে সুদূর মঞ্জীর।

শব্দ ও ছন্দ এমনি একটি স্বপ্নময় ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছে। 'ঘুম-নিঝুমি' কবিতাটি সুন্দর।

নিশীথ রাতের বুকের তলের স্বপনটুকুর ঘোরে
তারার সব কয় কি কথা সারা আকাশ জুড়ে?
আচমকা ডাক ডাকলো পাখী,
স্বপন দেখে জাগলে নাকি?
উড়ে পাখীর ডানার ধ্বনি মিলালো কোন দূরে।
বন-ঝাউয়ের বুকে বাতাস এলো আবার ঘুরে।

কবিতাগুলি কাব্যামোদী পাঠকের আনন্দ বিধান করিবে।

বনফুলের কবিতা—শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও ২৫।২ মোহনবাগান রো, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

বইখানি সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ, নানা-ধরণের কবিতার সমষ্টি। কয়েকটি গম্ভীর। বেশীর ভাগ বিদ্রূপাত্মক। কতকগুলি কবিতার কতকগুলি অংশ সেগুলির রঙ্গ রহস্যে অনুপ্রাণিত। 'পিপাসা' কবিতাটিতে 'বনফুল' মানস-মনের বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন।

তব আকুলিত স্বপ্ন — হে কবি কোরো না ভগ্ন,
হে বেদনা-বেদের উদ্গাতা,
সুখ-সখী তব ছন্দ — হে বন্ধু কোরো না বন্ধ,
বর্ণময় তব মধুবাণ।

একটি প্রবল অথচ সাবলীল ভঙ্গী 'বনফুলে'র কবিতাকে বেগবান করিয়াছে। অনেকগুলির মধ্যে ব্যঙ্গের তীব্রতা আছে। কোথাও ব্যক্তিগত আক্রমণে পর্য্যবসিত হয় নাই বলিয়া সে তীব্রতা কবিতাগুলিকে স্বাদু করিয়া তুলিয়াছে। এই যুগে 'শালা' কবিতাটি সকলের ভাল লাগিবে। 'বিদগ্ধ কবিতায় 'বনফুল' বলিতেছেন,

'অর্ণব হইয়া পার দেখিতেছি ধু ধু বালুরাশি।
শ্রমক্লিষ্ট দেহ হায় মাগিতেছে ক্ষুধায় খাবার,
শিরোপরি ভাবগুচ্ছ (কলেজে যা জুটেছিল আসি)
দ্বীপবাসী বৃক্ষসম তাড়না করিছে বারম্বার।

'প্রেমপত্রে'

অতীতে মিলন যাহা রেখেছিল বেশ
বর্ত্তমান প্রদর্শিছে অদৃষ্ট নীরবে।

উপভোগ্য বটে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

মিথ্যার জয়—শ্রীসত্যরঞ্জন সেন। প্রকাশক এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ; ১৫ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ক্রাউন অক্টেভ, ১৭৯ পৃ. মূল্য ১॥০।

'মিথ্যার জয়!' ও অন্যান্য আটটি—মোট নয়টি ছোট গল্পের সমষ্টি। এই গ্রন্থের মাত্র তিনটি গল্প—'মিথ্যার জয়!' 'প্রতীক্ষা' এবং 'দুই বন্ধু' সরস এবং সুখপাঠ্য হইয়াছে। অন্যান্য গল্পগুলি জমে নাই, ইহার বিশেষ কারণ এই যে প্লটের অংশগুলি পরস্পরের সহিত স্বাভাবিকভাবে মিলিতে পারে নাই।

শেষ দুইটি গল্প—'সন্ধিবিচ্ছেদ' ও 'কাবুলী অবলা' অত্যন্ত কাঁচা হাতের লেখা। 'সন্ধিবিচ্ছেদ' না'র কোন সার্থকতাই দেখিলাম না; 'কাবুলী অবলা' এই নামটির স্থলতাও রুচিসঙ্গত হয় নাই। এই গল্প দুইটি একই লেখকের লেখা বলিয়া বিশ্বাস করিতে কষ্ট হয়।

শ্রীপরিমল গোস্বামী

পঞ্চভূত ও বিচিত্র প্রবন্ধ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত. বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য যথাক্রমে ১।০ ও ১৷৷

১৩০৪ সালে "পঞ্চভূত" সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের জবানীতে তাঁহার নিজের ও তাঁহার পাঁচটি পারিপার্শ্বিকের 'মনুষ্য' 'নরনারী' 'গদ্য ও পদ্য' 'কৌতুক হাস্য' 'ভদ্রতার আদর্শ' প্রভৃতি নানা বিষয়ে তর্ক ও মতামত সরস ভাবধারার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাকে গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা বলিয়া গ্রহণ করিলে চলিবে না, আবার নিছক রসিকতা বলিয়া উড়াইয়া দিলেও চলিবে না। গুণীজন নীরটুকু ত্যাগ করিয়া ক্ষীরটুকু মাত্র গ্রহণ করিবেন এই আশা লইয়াই হয়ত গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছিল; অবশ্য ইহার নীর-অংশ ক্ষীর-অংশ অপেক্ষা কম উপভোগ্য এমন কথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। লেখক স্বয়ং নিশ্চয় তাহা বলেন না।

১৩১৪ সালে 'পঞ্চভূত' 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র মধ্যে পরিমার্জিত রূপে স্থান লাভ করে। ১৩৫২ সালে পঞ্চভূতের দ্বিতীয় সংস্করণ স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশিত হইল।

"বিচিত্র প্রবন্ধে" 'ভারতী' 'বালক' ও 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল প্রথম ১৩১৪ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্বের শৃঙ্খল ভাঙিয়া রচনাগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হইয়াছে। ইহাতে অন্য কিছু কিছু পরিবর্তনও আছে। 'নানা কথা' ও 'পথপ্রান্তে' প্রবন্ধ দুটি পঞ্চাশ বৎসর আগের 'ভারতী' 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, গ্রন্থাকারে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। 'য়ুরোপযাত্রী' 'পঞ্চভূত' প্রভৃতি প্রবন্ধকে এবার 'বিচিত্র প্রবন্ধ' হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। গত দশ বৎসরের পত্র-সংগ্রহ হইতে ২৫টি পত্র বাছিয়া গ্রন্থশেষে 'চিঠির টুকরি' নামে প্রকাশ করা হইয়াছে।

'বিচিত্র প্রবন্ধের' সরস রচনাভঙ্গীর ভিতর দিয়া এই কবি ও দার্শনিকের লেখনী কত সুমহৎ ও তুচ্ছ পদার্থকে অলৌকিক রূপে দেখিতে বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া বাঙালী জাতিকে সাহায্য করিয়াছে। বাঙালী কত উপমা, কত চিন্তাধারা, কত প্রকাশভঙ্গী, কত বাক্য-যোজনার জন্য যে রবীন্দ্রনাথের নিকট ঋণী বহুকাল পরে একত্রে এই প্রবন্ধগুলি পড়িলে তাহা চোখের উপর ভাসিয়া উঠে। বাঙালীর চিন্তার ধারা ও রচনা-কুশলতার উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই যে এখনও সকলের চেয়ে বেশী তাহা অতি-আধুনিকপন্থীরা বিদ্রোহ করিয়া অস্বীকার করিলেও রবীন্দ্রনাথের প্রাচীনতম হইতে আধুনিকতম রচনাসমষ্টি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ও 'পঞ্চভূত' ইত্যাদি পড়িলে গদ্যরচনা-পদ্ধতিতেও এই কবিই যে আমাদের গুরু তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। গদ্যের সুযুক্তি প্রাঞ্জলতা ও ভাবগরিমার সহিত কবিতার ছন্দ ও ভাষার ঝঙ্কারের হিসাব মত মশলা পড়িলে তাহা যে অনবদ্য হইয়া উঠে এ শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনা হইতেই বাঙালী পাইয়াছে।

বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস—শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। মূল্য ১৷০।

বইখানির শেষ পৃষ্ঠায় আছে—"বড়লাট রিপনের প্রাইভেট সেক্রেটারী লিখিয়াছেন, ভারতবাসী হাসে না, হাসিতে জানে না। স্যর মাইকেল স্যাডলার এদেশে আসিয়া বলিয়াছেন যে বিলাতের একটা খেলার মাঠে যে-পরিমাণ হাসি তামাসা কৌতুক দেখা যায়, সমগ্র ভারতবর্ষে তিনি তাহা দেখিতে পান নাই। অতএব নিরানন্দ বাঙালীদিগকে যাঁহারা হাসাইবার জন্য সরস সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা সমগ্র দেশবাসীর ধন্যবাদের ও কৃতজ্ঞতার পাত্র।"

বাঙালীর এবং ভারতবাসীর জীবনে আনন্দের অভাব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু যে পরিমাণ নিরানন্দের কারণের ভিতর তাহারা যতখানি হাসিতে ও মানুষকে হাসাইতে পারিয়াছে তাহাতে তাহাদের হাস্য-রসবোধকে উপেক্ষা করা চলে না।

লেখক বাঙালী গদ্য ও পদ্য রচয়িতাদের হাসির তুবড়িগুলি সংগ্রহ করিয়া সকল বাঙালীর গৃহে হাসির ফোয়ারা ছুটাইবার যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা প্রশংসার্হ।

প্রধানতঃ উনবিংশ শতাব্দীর এবং কিছু কিছু বিংশ শতাব্দীর লেখকদের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়াই বইখানি সঙ্কলিত। ইহাতে নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ও দুষ্প্রাপ্য উপকরণ একত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

ইহাতে ভারতচন্দ্র, আজু গোঁসাই, রমাপ্রসাদ, কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি, দাশু রায়, এণ্টনী ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা, ঈশ্বর গুপ্ত, হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, কাব্যবিশারদ, দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি বহু ছোট বড় কবি ও লেখকের রচনার নমুনা আছে।

হাস্যরসে অশ্লীলতা ও কুরুচির আবির্ভাব সহজেই ঘটে, সুতরাং সেকালের হাস্যরসের অনেক নমুনাই সুরুচিপূর্ণ হয় না। প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য কবিতাই ইহাতে বেশী, তবুও উদাহরণগুলিতে কুরুচির ছড়াছড়ি বিশেষ নাই, ইহা হাস্যরসপিপাসু সকমার বয়স্কদের পক্ষে সুসংবাদ। এমন একখানা বই দেখিলে অর্দ্ধেক না বুঝিলেও বালখিল্যদেরই তাহার প্রতি আকর্ষণ হয় বেশী।

বইখানি বাঙালীর ঘরে আদৃত হইলে আনন্দিত হইব।

শিশু রামায়ণ—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র। মূল্য চার আনা।
প্রাপ্তিস্থান শ্রীগুরু লাইব্রেরী।

এই ছোট বইখানি যুক্তাক্ষরবর্জিত, একেবারে শিশুদের জন্য লেখা। সুতরাং লেখা ইহাতে অতি সামান্যই আছে, বড় বড় ছবিতেই পাতা ভরা। যেটুকু লেখা আছে তাহা সুখপাঠ্য এবং তাহাতে রামায়ণের গল্পের সারাংশ জানা যায়। ছবিগুলি খ্যাতনামা চিত্রকরের আঁকা হইলে বড়দেরও সুন্দর লাগিত।

অন্নসমস্যায় বাঙালীর পরাজয় ও তাহার প্রতীকার—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়। চক্রবর্তী চাটার্জি এণ্ড কোং লিঃ। মূল্য বারো আনা মাত্র।

বাংলা দেশে ভদ্র অভদ্র সকল শ্রেণীর ভিতর দারিদ্র্যের দুর্দ্দম রাজত্ব চলিয়াছে। এই দারিদ্র্য-রাক্ষসীর হাত হইতে স্বজাতিকে মুক্ত না করিতে পারিলে বাঙালী পৃথিবীতে একটি লুপ্ত ও বিস্মৃত জাতি হইয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মাত্র শোভা পাইবে। বাংলা দেশে শত সহস্র যুবক জীবনোপায়ের পথ না খুঁজিয়া পাইয়া জীবন্মৃতের মত দিন কাটাইতেছে, কেহ বা আত্মহত্যা করিয়া সমস্যা পূরণ করিতেছে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতে বাঙালী 'স্বখাত সলিলে'ই ডুবিয়া মরিতেছে। তিনি বলেন "জগতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জীবিকা অর্জ্জনের পথ দেখিতে হয়। কেবল মানুষ নহে, পশুপক্ষীও এই নিয়মের অধীন। মাতা যেমন শিশুকে স্তন্যপানে পুষ্ট করেন পশুদেরও সেইরূপ।...পশুপক্ষী একটু বড় হইলেই চলিয়া বেড়াইতে শিখে, আর মা বাপের তোয়াক্কা রাখে না। কিন্তু মন্দভাগ্য বাঙালী সমাজে এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে। বাঙালী ছেলে আজ চিরশিশুভাবাপন্ন। এই প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য অভিভাবকগণই দায়ী। পুরুষানুক্রমে সন্তানের শিক্ষাদীক্ষা ও জীবনোপায় পদ্ধতি নিরূপণের যে চিরাগত প্রথা চলিয়া আসিতেছে তাহারই সংকীর্ণ খাতে সন্তানের জীবনধারা বহাইয়া দিয়া আমরা পিতামাতারা দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি।"

এই চিরাগত সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া বাঙালী যাহাতে ভাগ্য অন্ন সমস্যার একটা সমাধান করিতে পারে তাহার জন্য প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙালীকে নূতন পথ দেখাইয়া আসিতেছেন। কলিকাতা সহরেই মুটে, মজুর, কুলী, পাচক, ধোবা হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় ব্যবসাদারের পর্যন্ত অধিকাংশই বিদেশী। পশ্চিমা, বেহারী, উড়িয়া, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, কচ্ছি, পাঞ্জাবী সকলেই বাংলার অর্থ শোষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, বাঙালী নিরন্নেও তাহার চিরপুরাতন আসনে ধ্যানস্থ।

বাঙালীর এই দুর্দ্দশা মোচনের জন্যই এই বইখানি লিখিত। বাঙালীর শিক্ষাপদ্ধতির অসম্পূর্ণতা, শ্রমের মর্য্যাদা ও বাঙালীর পরাজয়, মাতৃভাষার অনাদর, ডিগ্রীর মোহ, বিলাসিতার প্রাবল্য, বাঙালীর শ্রমবিমুখতা প্রভৃতি বহু চিন্তনীয় বিষয়ে আচার্য্যদেবের বহুদর্শিতার ও অভিজ্ঞতার পরিচয় এই প্রবন্ধগুলিতে আছে। ইহা ভাবুকের উচ্ছ্বাস নহে, হাতে কলমে করা কাজের হিসাব ও অক্ষমতার পরিণাম দেখিয়া বৈজ্ঞানিকের নিক্তিতে তৌলকরা সিদ্ধান্ত।

এই বইখানির বহুল প্রচার হইলে এবং ইহাতে লিখিত গোকুল সিংহ প্রভৃতি নিরক্ষর ব্যবসায়ীর সদৃষ্টান্ত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙালী যুবকেরা গ্রহণ করিলে বাংলার অন্নসমস্যা ঘুচিতে সুদীর্ঘ কাল লাগিবে না। মিথ্যা সম্মানের মোহে কায়িক শ্রমকে এড়াইয়া চলিয়া এবং সুনির্দ্দিষ্ট পন্থার চক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাঙালী যেন এমন করিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আপন কলঙ্ক ঘোষণা না করেন।

শার্লক হোমসের বিচিত্র কীর্ত্তি-কথা—শ্রীকুলদারঞ্জন রায় অনূদিত। প্রকাশক এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স। মূল্য ২৲

স্যর আর্থার কোনান ডয়েল রচিত শার্লক হোমসের গল্পগুলি ইংরেজী সাহিত্যে সুপরিচিত। যাঁহারা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের বৈচিত্র্য ও আকস্মিক বিস্ময়রস উপভোগ করিতে ভালবাসেন সেই সব বাঙালী পাঠকেরাও শার্লক হোমসের ইংরেজী গল্পগুলি রাত্রি জাগিয়া সাগ্রহে পাঠ করেন। ইংরেজী না জানা পাঠক বিশেষতঃ পাঠিকার অভাব বাংলা দেশে মোটেই কম নয়। সুতরাং যাঁহারা এই জাতীয় বিভীষিকা ও বিস্ময়রসের ভক্ত তাঁহারা কুলদাবাবুকে এই নূতন উপহার বাঙালী সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দিবেন।

কুলদারঞ্জন রায় বহু শিশুপাঠ্য পুস্তক ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্য হইতে অনুবাদ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছেন। তিনি অনুবাদকার্য্যে নূতন ব্রতী নহেন। তাঁহার ভাষা শুদ্ধ মার্জ্জিত ও সত্যকার বাংলা। আজকাল বাংলার নামে অনেকে ইংরেজী ও ফারসী আরবী মিশ্রিত ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ এক রকম ভাষা সাহিত্যেও স্বচ্ছন্দে চালাইয়া যাইতেছেন। কুলদাবাবু প্রমুখ সাহিত্যিকরা সে ভাষাকে উৎসাহ দেন না। লেখক সংস্কৃতমূলক বাংলা শব্দের সাহায্যে সুখপাঠ্য অনুবাদই করিয়া থাকেন।

আশা করি ২৲ মাত্র মূল্যে এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি শার্লক হোমস ভক্তদের ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে।

বিদেশী গল্পসঞ্চয়ন—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা।

বিদেশের সৎসাহিত্য শ্রেণীর গ্রন্থগুলি বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে কোনো চেষ্টাই আমাদের দেশে হয় নাই বলা চলে না, তবে বিশেষ কিছু হয় নাই। গজেন্দ্রবাবু এই বিষয়ে উৎসাহী হইয়া বাঙালীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি আলেকজাণ্ডার ডুমা, ডিকেন্স, ভিক্টর হিউগো, বনিয়ান, কোনান ডয়েল, লুইস কেরল প্রভৃতি ইউরোপীয় সুবিখ্যাত সাহিত্যিকদের কতকগুলি জগৎবিখ্যাত উপন্যাস কিশোরবয়স্ক বালক-বালিকাদের উপযোগী করিয়া বাংলায় সংক্ষিপ্তসার করিয়াছেন। মণ্টিক্রিষ্টো, অলিভার টুইষ্ট, ট্রেজার আইল্যাণ্ড প্রভৃতির গল্প ইংরেজী উপন্যাস পড়িবার মত বিদ্যা হইলে অধিকাংশ বাঙালীর ছেলেই সাগ্রহে পড়িতে আরম্ভ করে। এই গল্পগুলি তাহাদের কল্পনাকে উদ্দীপিত করে, বিস্ময় ও অন্যান্য রস উপভোগের প্রচুর খোরাক যোগায়। বাংলায় এই গল্পগুলি পাইলে ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছেলেমেয়েদেরও আনন্দের খোরাক বাড়ে।

বাংলায় এই ১১টি গল্প সহজ ভাষাতেই লেখা। কিন্তু এগুলি এত সংক্ষেপে সমস্ত আভরণবর্জ্জিত করিয়া পরিবেশন করা হইয়াছে যে গল্পের মনোহারিণী শক্তির তাহাতে অনেকখানি ক্ষতি হইয়াছে। বিশদ বর্ণন, অবাধ কল্পনা, কিছু অতিশয়োক্তি ও অন্যান্য আভরণের প্রাচুর্য্যের সাহায্যেই না-দেখা ছবি মানুষের চোখের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উঠে। গল্পকে সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়া যদি এ সমস্তই সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দেওয়া যায় তাহা হইলে গল্পের কাঠামো মাত্রে তরুণ বয়স্ক পাঠকের বিশেষ আনন্দ পায় না।

তবু গল্পগুলির সহজ ভাষা ও আভিজাত্যের জন্য এবং নির্ব্বাচনের বৈচিত্র্যের জন্য এগুলি তরুণ সমাজে সমাদর পাইবে আশা করি। দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক বইখানিকে আর একটু বড় করিয়া যদি যথোচিত আভরণের সাহায্যে ইহাকে আরও সরস করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন ত খুব ভাল হয়।

সমসাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ—প্রাপ্তিস্থান শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ১।০।

ইহাতে সাত জন আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার বহুমুখী সাহিত্যের কয়েকটি বিভিন্ন দিক হইতে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথম প্রবন্ধ শ্রীবুদ্ধদেব বসু লিখিত। ইহাতে রবীন্দ্র-প্রতিভার কথা যত না আছে, বসু মহাশয়ের নিজ প্রতিভার কথা তাহা অপেক্ষা বোধ হয় বেশী আছে। যেন লেখকেরই আত্মচরিত। যাহাই হউক, ইহাতে লেখক রবীন্দ্রনাথকে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করিয়া তাঁহার কোনটা মেকি ও কোনটা খাঁটি বিচার করিবার চেষ্টা করিলেও বলিয়াছেন গীতাঞ্জলি

ও বলাকা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য, শেষের কবিতা, চতুরঙ্গ, যোগাযোগ, লিপিকা ইত্যাদি তাঁর শ্রেষ্ঠ গদ্য। এবং স্বীকার করিয়াছেন "রবীন্দ্রনাথ কেবল যে আমাদের ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি তা নয়, শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক বলতেও তাঁকেই বোঝায়।"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় বলেন, "রবীন্দ্রনাথের গানের কথা সুন্দরতর লিরিক হিসাবে, ভাবে শব্দবিন্যাসে কবিত্বে এবং মিলে আর ছন্দে নির্খুঁত ও চমৎকার। এই গান বাঙালীর সৌভাগ্যের নিধি।"

"রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা সাহিত্য" সম্বন্ধে শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী একটি প্রাঞ্জল সুযুক্তিপূর্ণ ও সুখপাঠ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, "তাঁহার সমালোচনা রচনাগুলিও স্বতন্ত্র রসসৃষ্টি। শকুন্তলার মত অত বড় দিব্য চিত্রও রবিকরসম্পাতে নূতন মহত্ত্বে মাধুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বলতর হইয়া অভিনব প্রাণ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে।"

শ্রীকালিদাস রায় "রবীন্দ্রকাব্যবিচারের ভূমিকা", শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত "উর্ব্বশী", শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত "সমালোচক রবীন্দ্রনাথ" লিখিয়াছেন। শ্রীমতী রাধারাণী দেবী "ঘরে বাইরে"র চরিত্রগুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধটির শেষার্দ্ধ মেজরাণীর চরিত্র লইয়া রচিত, এবং ইহাই প্রবন্ধটির বিশেষত্ব। মেজরাণীকে রাধারাণী দেবী যে প্রকার মমতা ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়া তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যটুকু প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সম্ভবতঃ আর কেহ করেন নাই।

বইখানি সাত জন লেখকের রচনার পক্ষে ছোট এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের বহু দিকই ইহাতে আলোচিত হয় নাই; তবু ইহা পাঠকে পড়িয়া দেখিলে ভাল হয়, নবীজনের মনে লিখিবার নূতন প্রেরণা আনিতে পারে।

শ্রীশান্তা দেবী

রহস্য-লহরী—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীব্রজমনোহর দাস গুপ্ত, বি এ. প্রণীত, মূল্য আট আনা।

পুস্তকখানি অতি সরল ও সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই পুস্তকে অধ্যাত্ম-জীবন সম্বন্ধে গল্পচ্ছলে নানারূপ জটিল সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। বালক-বালিকারা ইহা পড়িয়া উপকার ও আনন্দ লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

মৃত্যু-বিলাসী—শ্রীভবদত্ত উপাধ্যায় প্রণীত, শ্রীমিহিরকুমার সিংহ সম্পাদিত। সিদ্ধেশ্বরী প্রেস, ১২।৩ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, বিচিত্র রহস্য সিরিজের ২য় গ্রন্থ; মূল্য ৮০।

ইহা একটি ডিটেকটিভ উপন্যাস। কোটিপতি ব্যাঙ্কার রায় বাহাদুর বিনয়কৃষ্ণ দত্তের পুত্র রবি দত্ত পিতার তিরস্কারে ব্যথিত হইয়া রাইটার কনষ্টেবলের চাকুরী গ্রহণ করেন ও পাঁচ বৎসরের মধ্যে গোয়েন্দা-বিভাগের ইনস্‌পেকটার হন। 'মৃত্যু-বিলাসী' নামক জাল জুয়াচুরি ও খুন-খারাপিতে রত একটি দলের অনুসন্ধানে রবি দত্ত নিযুক্ত হইলেন। এই কার্য্যে কোটিপতি বৃদ্ধ রায় বাহাদুরও—অবশ্য পুত্রের অজ্ঞাতসারে—সহায়তা কম করেন নাই। মৃত্যু-বিলাসী দলের কেহ-বা প্রাণত্যাগ করিল, কেহ-বা ধরা পড়িল। অবশেষে দেখা গেল মৃত্যু-বিলাসীর দল রায় বাহাদুরেরই অগ্রজ রামপ্রসাদ, তাঁহার মাদ্রাজী পত্নী ও পুত্রকন্যা। রবি দত্ত পুলিসের চাকুরি ছাড়িয়া দিল। ভাষা, ছাপা, বাঁধাই চলনসই।

শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত

চোর-চূড়ামণি—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

এক রাজপুত্রের চুরিবিদ্যায় পারদর্শিতার বিবরণ এই গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। চুরিবিদ্যার উৎকর্ষ ও চোরের কৃতিত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন উপাখ্যান বা রূপকথা নানা স্থানে প্রচলিত আছে বা ছিল। তবে অন্যান্য উপাখ্যানের ন্যায় এই উপাখ্যানগুলিও দিন দিন অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছে। এগুলির যথাযথ সঙ্কলন দেশের সংস্কৃতির দিক হইতে বিশেষ মূল্যবান্‌। কোন স্থান বা কোন গ্রন্থ হইতে আলোচ্য উপাখ্যানের মূল সংগৃহীত হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। সেইরূপ নির্দ্দেশ থাকিলে উপকথার ইতিবৃত্ত ও ক্রমপরিণতি যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহাদের নিকট এই গ্রন্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইত। গল্পটির মাধুর্য্যবৃদ্ধির আশায় মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় নৈতিক, দার্শনিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান করিবার যে চেষ্টা এই গ্রন্থ-মধ্যে দেখা যায় তাহা ইহার স্বাভাবিক গতিকে অনেক ক্ষেত্রে খর্ব্ব করিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হয়। বস্তুতঃ গল্প বলিবার যে ধারা আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে তাহার মধ্যে আধুনিক রীতির বা ভাবের মিশ্রণ স্থানে স্থানে বিসদৃশ হইয়া উঠে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

নেপালের পথে—শ্রীরাজলক্ষ্মী দেবী প্রণীত। রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়। ১৪।১বি, ভুবনমোহন সরকার লেন, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ আনা, পৃ. ৩৯।

রক্সৌল হইতে পশুপতিনাথ পর্য্যন্ত লেখিকা কি ভাবে তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন, পুস্তকে তাহার বর্ণনা আছে। যাঁহারা নেপাল যাইতে ইচ্ছুক, পুস্তকখানি তাঁহাদের উপকারে লাগিতে পারে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

জর্ডন উপত্যকার একটি ইহুদীপল্লী

প্যালেষ্টাইনে ইহুদী

শ্রীসাগরময় ঘোষ

যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার অপরাধে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের অত্যাচার-নিপীড়িত ইহুদীরা নিজেদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র ইউরোপে। নিজেদের দেশ হারাল, কিন্তু নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি, উৎসাহ ও একনিষ্ঠতার জোরে ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই ধনসম্পদে ও জ্ঞানগরিমায় অনেকে সমাজে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রে বসল। যার স্বদেশ বলতে কিছু নেই, জাতীয়তাকে যে হারিয়েছে, সুখ-সম্মানের মধ্যে থেকেও সে সবচেয়ে রিক্ত। এই দুঃখই মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে জনকয়েক ইহুদী মহাপুরুষের মনে 'সুইট হোমে'র সুখকর কল্পনা জাগিয়ে তুলল—তাঁরা চাইলেন নিজেদের দেশে ফিরে যেতে, নিজেদের জাতিকে গড়ে তুলতে এবং এক হারানো সভ্যতাকে ফিরিয়ে আনতে।

প্যালেষ্টাইনে ফিরে যাবার জন্তে ইহুদীদের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন সুরু হ'ল এবং তার পুরোহিত হ'লেন ডেভিড জিওন। এই আন্দোলনের মূল কথা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

"ফিরে চল মাটির টানে,
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।"

দেশের আর্থিক উন্নতির প্রথম সোপান মাটিতেই নিহিত এবং কৃষিকার্য্যের যথার্থ উন্নতি বিধান না ক'রে কোন জাতিই স্থায়ী উন্নতি বা ঐশ্বর্য্যলাভে সমর্থ হয় নি। দেশপ্রত্যাবর্ত্তন-আন্দোলনকারী জিওনিষ্ট দল উপলব্ধি করল যে উপনিবেশ-স্থাপনের একমাত্র উপায় কৃষিকে অবলম্বন ক'রে।

ইহুদীরা প্যালেষ্টাইনে ফিরে আসবার আগে সে দেশের কৃষির অবস্থা ভারতবর্ষের মতই ছিল। আমাদের দেশের কৃষকদের মত ও-দেশের কৃষকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত, তাদের কৃষি-পদ্ধতিও ভারতের কৃষি-পদ্ধতির মতই অতি পুরাতন, কৃষি-যন্ত্রাদিও সাবেকী, নিতান্ত সাধারণ রকমের। পশুপালনের শিক্ষা তাদের নেই, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শস্যোৎপাদন, মান্ধাতার আমল থেকে যা চলে আসছে তার কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় নি। জমি থেকে যতটুকু পাচ্ছে ততটুকুতে পেট না ভরলেও তার বেশী আদায় করবার ইচ্ছাও নেই, চেষ্টাও নেই। অধিবাসীরা কেবল জমি থেকে শোষণ ক'রে নিয়েছে, প্রতিদানে দেয় নি কিছুই। যখন বছরের পর বছর মাটির অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং ক্ষুধার অন্ন উৎপাদনও যখন হ্রাসপ্রাপ্ত হ'ল, তখন অদৃষ্টবাদী ও নিরুৎসাহ চাষীরা ভাগ্যের কাছে ভিক্ষা চাওয়া ছাড়া নিজেদের অভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার আর কোন অস্ত্র খুঁজে পায় নি। আমাদের দেশের মত ও-দেশেও শ্রেণী-বিভাগ ছিল। যারা অশিক্ষিত

আরব ফেলাহীনের পুরাতন পদ্ধতিতে চাষ করিতেছে

দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন কৃষক তাদের বলা হয় 'ফেলাহীন' (Fellaheen) আর আছে এফেণ্ডী (Effendi), আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদের মত অল্পবিস্তর জায়গাজমি-ওয়ালা ধনী।

এই আন্দোলনের যারা অগ্রদূত তারা ভগ্নোদ্যম ও নিরুৎসাহ না হয়ে নূতন আশার আলোয় অনুপ্রাণিত হ'য়ে দেশের অবস্থা ও আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে নিজেদের তৈরি ক'রে তুলতে লাগল। তারা বুঝতে পারলে যে আবহমান কালের যে সংস্কারাচ্ছন্ন কৃষি-পদ্ধতি দেশের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে ব'সে তাকে ভারগ্রস্ত ক'রে নীচের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে তাকে জাগিয়ে তোলা সহজসাধ্য নয়। বাইরে তারা নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু ব্যবহার করা ছেড়ে দিল; কেবল যেটুকু না হ'লে চলে না সেটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট। মাটিকে সঙ্গী ক'রে নিয়ে নানা রকম দুঃখকষ্ট ও কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে তারা যে সে-দেশের নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভ ক'রে চলেছে, এর পিছনে আছে তাদের ভবিষ্যতকে গ'ড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা। বাইরে তারা মাঠে মাঠে মাটি কুপিয়ে লাঙ্গল চালিয়ে সাধারণ চাষাভূষোর মত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম ক'রে যেতে লাগল বটে, কিন্তু বাড়ীতে তারা তাদের বিদেশ-থেকে-আনা জীবনযাপনের ধারাকে কিছুমাত্র বদলাতে পারল না। তারা পাথর দিয়ে বড় বড় দালান কোঠা তৈরি ক'রে নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে সম্পূর্ণ বজায় রাখল; ছেলেমেয়েদের জন্যে স্কুলের প্রতিষ্ঠা হ'ল। প্রথম প্রথম যাদের কৃষিকেই একমাত্র অবলম্বন ক'রে নিতে হয়েছে তাদের কাছে জমি থেকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ভরণপোষণের উপকরণটুকুও পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠল। অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা ক'রে নেবার মত ত্যাগস্বীকার অল্প দু'চার জন ছাড়া জনসাধারণের মধ্যে দেখা গেল না, তাই পদে পদে ঘটল বিফলতা। জাতিকে গ'ড়ে তোলার যে আদর্শ নিয়ে তারা কাজে নেমেছিল এই প্রতিকূলতার মধ্যে পড়ে সে আদর্শ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। জায়গাজমি ক'রে নেবার সঙ্গে জমিদার হয়ে উঠল, কিন্তু জমিতে খেটে কাজ করার উৎসাহ আর রইল না।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত ধনী রথচাইল্ড এক জন ইহুদী। প্যালেস্টাইনে তিনি সর্ব্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করলেন,
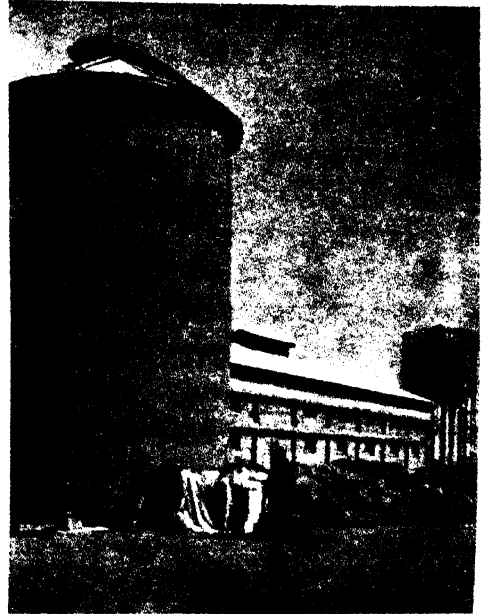
প্যালেস্টাইন ইহুদী উপনিবেশের ধানের গোলা

সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় টাকাও তাঁকে ঢালতে হয়েছে অজস্র। প্যালেস্টাইনের পাহাড়ভরা বালুঢাকা জমির মধ্যে

ফলিয়ে তুললেন ফরাসী দেশীয় শ্রেষ্ঠ দ্রাক্ষাক্ষেত্র। তুঁত গাছের চাষ হ'তে লাগল রেশম তৈরির জন্যে। দেশবিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞদের আনিয়ে চাষবাসের ধারাই বদলে দিলেন। দেখতে দেখতে জমির চেহারা গেল ফিরে, মাটিতে সোনা ফলতে লাগল। কিন্তু এত করেও রথচাইল্ডের এই বিপুল আয়োজনের গোড়াতে যে গলদ ছিল তা ক্রমশ বড় আকার ধারণ ক'রে এই প্রচেষ্টাকে ধূলিসাৎ ক'রে দিল। তিনি ইহুদীদের সামাজিক দিকটা উপেক্ষা ক'রে তখনকার দিনের প্রথানুযায়ী আরবদের মজুরীর কাজে লাগালেন। তাতে ফল হ'ল এই যে ইহুদীদের মজুরী পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, কারণ আরবদের মজুরীর হার এত কম যে সেই হারে ইহুদীদের পক্ষে পুষিয়ে ওঠা দুষ্কর। বাইরে থেকে বসবাস করতে যারা এল তাদের চেয়ে আরব মজুরদের সংখ্যা গেল বেড়ে। মাটির সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ বেশী তারাই মাটিকে চেনে; অতএব কৃষির কাজ আরবরাই শিখতে লাগল বেশী। রথচাইল্ডের এই উপনিবেশ স্থাপনে মদের ব্যবসার উন্নতি হ'ল কিন্তু সমগ্র ইহুদী জাতির সামাজিক অবস্থার কোন উন্নতি হ'তে পারল না।

জাকভের একটি সুরারক্ষণাগার

জিওনিষ্ট আন্দোলনকারীদের পিছনে রথচাইল্ডের মত টাকা ঢালবার লোক কেউ ছিল না। একতা ও সংঘবদ্ধ-ভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে তারা একে একে প্রতিকূলতাকে জয় ক'রে পুরনো প্রথাকে ভেঙে-চুরে সম্পূর্ণ নূতন ধরণে উপনিবেশ গ'ড়ে তাদের এত দিনের স্বপ্নকে সফল ক'রে তুলতে লাগল। কি ভাবে ও কি উপায়ে ইহুদী কৃষকরা এই 'ফেলাহীন্' কৃষকদের সনাতন কৃষিপ্রণালীর প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত ক'রে সম্পূর্ণ নূতন ধরণে বিভিন্ন কৃষি-পদ্ধতির সাহায্যে এই মরুভূমি ও নেড়া পাহাড়ের দেশকে এমন সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ক'রে তুলতে পারল তা দেখলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক প্রণালীতে কৃষিশিক্ষার জন্য নানা রকম পরীক্ষাক্ষেত্র স্থানে স্থানে খোলা হ'ল। জমির উর্ব্বরতা, বিদেশ থেকে আমদানী নূতন গাছ-গাছড়াকে প্যালেষ্টাইনের আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষবাস করার উপর তারা প্রথম দৃষ্টি দিল।

ইহুদী যুবকদল অনুভব করল যে বাইরের থেকে আরব কিংবা অন্যান্য ভাড়াখাটানো মজুরদের কাছ থেকে বেশী কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। পরের জমিতে ভাড়া খাটে ব'লে দায়সারা-গোছের কাজ ক'রে চলে যায়। মানুষ শিক্ষা ও অভ্যাসের জোরে সব কাজেই হাত লাগাতে পারে। ধন-দৌলতের মধ্যে লালিতপালিত, উচ্চশিক্ষিত ছেলেমেয়েরা নিজেদের দেশকে গ'ড়ে তুলবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সব আভিজাত্যকে ভুলে গিয়ে মনে প্রাণে কাজের মধ্যে জীবনকে ঢেলে দিল। দিনরাত্রি, বছরের পর বছর অসীম অধ্যবসায় নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে যেতে লাগল। ব্যক্তি-গত চেষ্টাকে পরিত্যাগ ক'রে রাশিয়ার মত সমবেত ভাবে কৃষির চেষ্টা অর্থাৎ collective farm গ'ড়ে তুলতে পেরেছে বলেই শস্যোৎপাদনের সঙ্গে পশুপালন ও মুরগীর চাষে এত উন্নতি করা সম্ভব হয়েছে। ইন্‌টেন্সিভ চাষের সাহায্যে দশ বছরের মধ্যে জিওনিষ্টরা তাদের কৃষিকার্য্যের প্রধান সমস্যাগুলির

সমাধান ক'রে ফেলল, অর্থাৎ অল্প জায়গায় অধিকসংখ্যক লোক বসবাস করতে লাগল, এবং এই অল্প জায়গা থেকে তারা যে ফসল পেতে লাগল তাতে জীবনযাত্রা বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে চ'লে যেতে লাগল। তারা পূর্ব্বের অবস্থার উন্নতি ক'রে ফেলল; আরব চাষীদের মত জীবনযাপনের দুঃখকষ্ট থেকে তারা মুক্তি পেল। এ যেন তাদের নবজন্মের আন্দোলন। নূতন ক'রে ঘর বেঁধে নূতন উৎসাহে জীবনকে তারা নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলল।

ইহুদী নারীদিগের কৃষিশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রকৃতির উপর হাল না ছেড়ে দিয়ে কি ভাবে তারা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল, তা দেখলে বিস্মিত হ'তে হয়। পাহাড় ও মরুভূমির দেশ এই প্যালেষ্টাইন, জলের অভাবে মাটি শুকিয়ে খাঁ খাঁ করছে। আমাদের দেশের চাষার মত আকাশের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থেকে যদি ওদের বৃষ্টির জন্যে দিন গুণতে হ'ত তা হ'লে ওরা বাঁচত না। জলের সমস্যা ওদের প্রধান সমস্যা। হিসেব ক'রে দেখা গেল যে সেচের ব্যবস্থা করলে আগের চেয়ে আটগুণ ফসল উৎপন্ন করা যায়। কারণ এক বিঘা সেচের জমিতে যে-পরিমাণ ফসল হয় তা আট বিঘা সেচবিহীন জমির ফসলের সমান। তাই ইহুদীরা তাদের সব শক্তি নিয়োগ করল সেচের উন্নতির জন্যে। পুণ্যতোয়া জর্ডন নদী প্যালেষ্টাইনের গঙ্গা; সেখান থেকে ছোট ছোট খাল কেটে পারিপার্শ্বিক জমিতে সেচের ব্যবস্থা হ'ল। তাছাড়া দেশের যেখানে-যেখানে জলা জায়গা ও হ্রদ আছে সেগুলিকে সেচের কাজে লাগিয়ে সে অঞ্চলের ক্ষেতের শস্যোৎপাদন-ক্ষমতা বাড়িয়ে দিল। এ ছাড়া নলকূপের সাহায্যে মাটির তলা থেকে শত শত ঘনমিটার জল উঠতে লাগল। দশ বছর আগে ইহুদীরা বছরে ৫০০,০০০ ঘন মিটার জল সরবরাহ করেছিল এবং বর্ত্তমানে তাদের বৎসরে সেচের জল ৬০,০০০,০০০ হ'তে ৭০,০০০,০০০ ঘনমিটার পর্য্যন্ত খরচ হয়। এর থেকেই বোঝা যায় সেদেশের কৃষকদের জলের উপর কতখানি নির্ভর করতে হয় এবং জল-সরবরাহের পদ্ধতি কত উন্নত।

যুদ্ধের আগে সেচের ফসলের মধ্যে কমলা লেবু ছাড়া আর কিছুই ইহুদী কৃষকরা জানত না। ফলের চাষের জন্য প্যালেষ্টাইন বিখ্যাত, তাই কমলা কলা ষ্ট্রবেরী আঙুর জাতীয় ফলের চাষে এই আবহাওয়া উপযুক্ত ব'লে তারা এগুলিকে প্রধান শস্য হিসাবে সমতল জমিতে উৎপন্ন করে। এছাড়া ফুলকপি, বিলিতী বেগুন ও আলু-জাতীয় শস্য সাহায্যকারী ফসল হিসাবে চাষ করে। পাহাড়ের গায়ের জমিতে জঙ্গল তৈরির জন্যে ওক পাইন ইত্যাদি গাছের চাষ চলছে; কারণ ইংলণ্ডের কাছে গাছের চারা বিক্রী ক'রে ওরা যথেষ্ট লাভ ক'রে থাকে। এ ছাড়া বৃষ্টির আবশ্যকতা ও কাঠের প্রয়োজনীয়তাও একটা উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশের কৃষকদের একমাত্র অবলম্বন ধান কিংবা পাট। অনাবৃষ্টির ফলে যেবার ধান হ'ল না অথবা পাটের দাম গেল কমে, সেবার দুর্ভিক্ষের বিভীষিকায় চাষীদের মধ্যে হাহাকার পড়ে যায়। ইহুদী

ইহুদীদিগের ব্যবহৃত একটি আধুনিক কৃষিযন্ত্র

অন্ধ ভাবে মাঠে কাজ করে না। যে-শস্য উৎপাদনের জন্য মাঠে মাটি কোপায় সেই শস্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও যথেষ্ট অর্জ্জন করে। বিজ্ঞানকে ভিত্তি ক'রেই এদের কাজের সুরু এবং বিজ্ঞানকে পিছনে রেখে এরা কাজ সমাধা করে। বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে চাষীদের এমন সহজ সুন্দর সহযোগিতা যদি না থাকত তাহলে এদেশ মরুভূমিই থেকে যেত। আমাদের সংস্কৃতের মত প্রাচীন ও মৃত ভাষা হিব্রুকে এরা মাতৃভাষা ক'রে তুলে এই ভাষায় কৃষি সম্বন্ধে বই লিখে, কাগজ বের ক'রে, পুস্তিকা ছাপিয়ে চাষীদের মধ্যে কৃষিশিক্ষাকে সহজ ক'রে দিতে পেরেছে। এদের জাতীয় সাহিত্যও গড়ে উঠেছে এই ভাষাকে অবলম্বন ক'রে।

কৃষকরা কোন-একটা বিশেষ শস্যের উপর নির্ভর ক'রে বসে থাকে না, তাছাড়া মিশ্র চাষের (mixed farmingএর) প্রচলনও দেশের সর্ব্বত্র। অর্থাৎ শুধু তরিতরকারীর উপর নির্ভর না ক'রে ওরা পশুপালন ও মুরগীর চাষেও যথেষ্ট উপায় ক'রে থাকে। অজন্মা হ'লেও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পড়বার সম্ভাবনা ও-দেশে একেবারেই নেই।

সেচের কাজের সঙ্গে সঙ্গে তারা গোপালন ও মুরগীর চাষেও খুব অল্প সময়ে উন্নতি ক'রে ফেলল। গরুর খাবারের জন্য হাজার হাজার মণ তৃণাদি (ফডার) ও খড়ের চাষে মাঠ সবুজ হয়ে উঠল এবং তারই ফলে গরুর দুধ বেড়ে গেল। গোশালা যখন প্রথম খোলা হ'ল তখন প্রতি গরু বছরে ২,০০০ লিটার দুধ দিত। ছ-বছর পরে হল্যাণ্ড দেশীয় উচ্চশ্রেণীর গরুর সংমিশ্রণের ফলে এক-একটা গরুর দুধ বছরে ৩,০০০ থেকে ৪,০০০ লিটার বেড়ে গেল। মুরগীর চাষেও এই ভাবে অনেক উন্নতি ক'রে ফেললে। আগে যেখানে একটা মুরগী বছরে ৭০টা ডিম দিত ৮ বৎসর ধরে পরীক্ষার পর একটা মুরগী বছরে ২৫০টা ডিম দিতে লাগল। বর্ত্তমানে প্যালেষ্টাইনের মুরগীর চাষ আমেরিকা ও জার্মানী থেকে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। দশ বছর আগে মুরগীর চাষ ক'রে প্রকৃতপক্ষে ইহুদীরা কিছুই লাভ করতে পারে নি। কিন্তু '৯৩০-৩১ সালে কেবল মাত্র একটি সমবায়-সমিতি থেকে ৫৬,৫০০ পাউণ্ড মূল্যের মুরগী ও ডিম বিক্রী হয়েছে।

ইহুদী চাষীদের আর একটি বিশেষত্ব এই যে এরা

প্রথমে ইহুদীরা ব্যক্তিগত ভাবে স্বতন্ত্র চেষ্টায়, স্বতন্ত্র অর্থে উপনিবেশ স্থাপন সুরু করেছিল। ছোট ছোট এক একটি জায়গা কিনে আলাদা ভাবে চাষ করতে তাদের যেমন আর্থিক ক্ষতি হ'ল, তেমনই আবার অনেকটা পরিশ্রম বৃথাই নষ্ট হ'তে লাগল। কারণ খরচ ও পরিশ্রমের অনুপাতে এই রকম খণ্ডবিচ্ছিন্ন জমি হ'তে আশানুরূপ আয় হওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াল। রাশিয়ার সমবায় কৃষিক্ষেত্রের (Collective farmএর) আদর্শানুসারে ইহুদীরা জাতীয় সমিতি গঠন ক'রে ইহুদী জাতীয় ধনভাণ্ডার (Jewish National Fund) খুলল। এই ফণ্ডের সাহায্যে ব্যক্তিগত জমিগুলিকে একত্রীভূত ক'রে লাভজনক ভাবে খাটাবার জন্য নানা রকম ব্যবস্থা হ'ল। সমবায় পদ্ধতিতে এই চাষবাস থেকে আরম্ভ ক'রে বেচাকেনার কাজও চলতে লাগল। জাতীয় সমিতির তত্ত্বাবধানে বহুসংখ্যক কৃষক সমবেত ভাবে জমি চাষ ক'রে মাসে ১৫০ ফ্রাঁ ক'রে রোজগার করার সঙ্গে লভ্যাংশের অর্দ্ধেক ফিরে পেতে লাগল। এই ভাবে মিলিত চেষ্টার দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রের সাহায্যে চাষবাস করার অনেক সুবিধা হ'ল এবং লাভের সম্ভাবনা বেড়ে গেল। বিক্রয়-ব্যবস্থার সুবিধার জন্য সমবায়-সমিতির সাহায্যে গ্রাম থেকে গাড়ী বোঝাই ক'রে কৃষিজাত পণ্যগুলি প্রধান প্রধান

প্যালেষ্টাইনে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী-প্রচলনে কৃষিকার্য্যের বহুল উন্নতি সাধিত হইয়াছে ; দেগানিয়ার এই সুশৃঙ্খল উপনিবেশটি তাহার একটি নিদর্শন।

১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত টেল আবিব-এর এই পল্লী বর্ত্তমানে একটি আধুনিক নগরীতে পরিণত হইয়াছে ; কিন্তু এই নগরীর গঠন-ব্যবস্থা অতিশয় বিশৃঙ্খল।
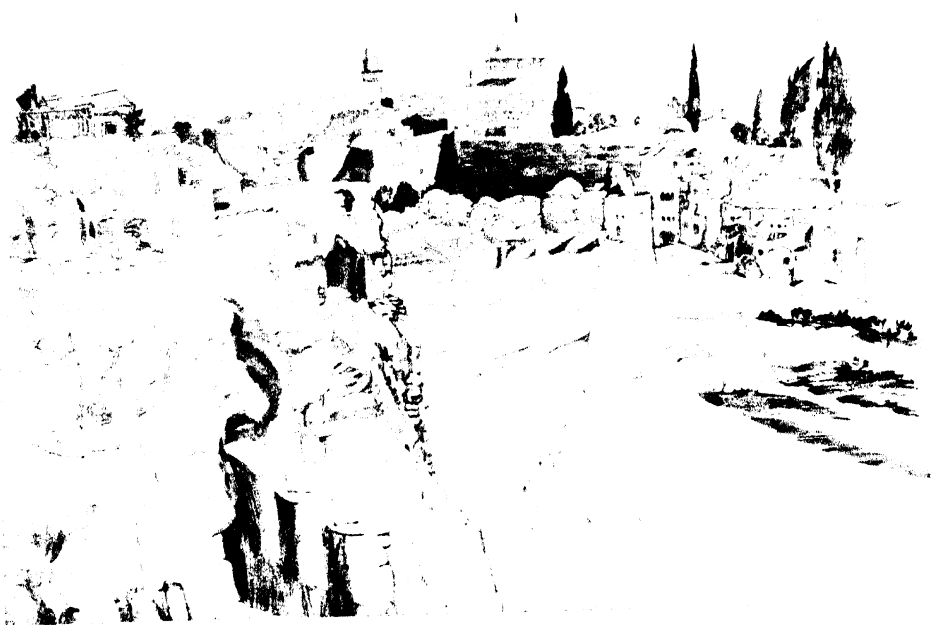
জেরুসালেমে ইহুদীদের বিলাপ-প্রাচীর (The Wailing Wall)। প্রতি বর্ষে বহু ইহুদী এই প্রাচীরগাত্রে সমবেত হইয়া অতীতের জন্য শোচনা ও ভবিষ্যতের জন্য প্রার্থনা করেন। এই প্রাচীর উপলক্ষ্য করিয়া প্যালেষ্টাইনে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে বহু দিন ধরিয়া কলহ চলিয়া আসিতেছে।

[illegible] একটি পবিত্র স্থান।

কৃষিকেন্দ্রে এসে জড়ো হয়। আবার কৃষিকার্য্যে ব্যবহারের জন্য যাবতীয় যন্ত্রপাতি এই সমিতিই সরবরাহ করে।

নিজেদের দেশ ও জাতিকে গড়ে তোলবার জন্যে ইহুদী যুবকরা অল্প সময়ে যে দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছে, তার সহায়তা করেছে ইহুদী নারীরা। নিজেদের দেশকে গ'ড়ে তোলার গৌরব থেকে তারা নিজেদের বঞ্চিত করে নি। মেয়েদের সেখানে ছেলেদের সমান অধিকার, কোন রকম পার্থক্য তারা রাখতে দেয় নি। দীপ্তশক্তিসম্পন্ন সুস্থসবলদেহ কত ধনীর মেয়ে জাতীয় আদর্শের প্রেরণায় ঘরবাড়ী বাপমাকে ছেড়ে দলে দলে চলে এসেছে প্যালেষ্টাইনে। ইহুদী কৃষকদের মত স্ত্রীলোকরাও কষ্টসহিষ্ণু, কৃষির কাজ শিখে মাঠে শস্য উৎপাদন ক'রে এরাও উপার্জ্জন করে। এদেশে মেয়েরা বিয়ে ক'রেও নিজেরা স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল থাকে। অর্থাভাবে ঘরবাড়ী তুলতে না পারলে ছোট ছোট তাঁবুর মধ্যে সুখে শান্তিতে দাম্পত্যজীবন যাপন করে, অথচ কৃষিকাজে মেয়েরা কখনও অবহেলা করে না।

আমাদের দেশে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্য যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দেশের স্বাধীনতা ও উন্নতির পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করেছে প্যালেষ্টাইনেও ইহুদী ও আরবদের মধ্যেও সেই একই সমস্যা দেখা যায়। আজকাল প্রায় প্রত্যহই খবরের কাগজে ইহুদীদের সহিত আরবদের সংঘর্ষের খবর পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এর পিছনে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্রিটিশ কূটনীতির চালবাজী যে নেই, তা কে বলতে পারে?

মানুষের মন

শ্রীজীবনময় রায়

১৮

এর পর প্রায় দু-বৎসর অতীত হয়েছে। নন্দলালের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার গৃহেরও নানা পরিবর্ত্তন ঘটেছে। সেই ছোট গলির মধ্যে ছোট বাড়ীতে সে আর নেই। একটা অপেক্ষাকৃত বড় বাড়ীতে তারা উঠে এসেছে। কমলের নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরেছে বটে, কিন্তু তার স্মৃতি ফিরে আসে নি। কোন নামই সে মনে আনতে পারে না, সুতরাং তার আত্মীয়স্বজনের অনুসন্ধান নন্দলালের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি।

এই অনুসন্ধান-কার্য্যে যে নন্দলালের অতিমাত্র আগ্রহ ছিল এবং সর্ব্বপ্রকার সাধ্য প্রয়াসে হতাশ হয়ে যে সে নিরস্ত হয়েছিল, এমন কথা বলা যায় না। নিতান্ত যতটুকু না করলে নিজের মনকেও স্তোক দেওয়া চলে না, ততটুকু করার উদ্যোগে অবশ্য তাকে সাড়ম্বর প্রয়াস করতে দেখা যেত। মৃত্যুযবনিকার মত দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্টের অমোঘতার বিরুদ্ধে কমল সম্পূর্ণ নিরাশ এবং অবসন্ন হয়ে অবশেষে তাকে মেনে নিলে। এখানে তার নূতন নাম হয়েছে জ্যোৎস্না।

কিন্তু এ সকলের চেয়েও একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটেছিল সংসারে। নন্দলালের কাজে-কর্ম্মে চলা-ফেরায় কোথাও যে কিছু অশোভনতা প্রকাশ পেয়েছিল তা নয়, তবু সমস্ত বাড়ীর মধ্যে একটা কি-যেন-কি ধরণের অস্বস্তিতে সকলের চিত্তকে ভারাতুর ক'রে রেখেছিল। এটুকু বোধগম্য করতে কমলের বিলম্ব হয় নি যে নন্দলালের হৃদয় তার প্রতি উন্মুখ ও প্রবণ। আতঙ্কে তার সমস্ত প্রাণ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। যথাসম্ভব সে নন্দলালের দৃষ্টিপথ এড়িয়ে চলত এবং গৃহকর্ম্মের তুচ্ছতম ব্যাপারেও সে নিতান্ত অনাবশ্যকে নিজেকে সর্ব্বদা ব্যাপৃত রাখতে চেষ্টা করত। মালতী বাধা দিতে গেলে বলত, "ভাই, একটা কিছু ত নিয়ে আমার থাকতে হবে। এতে আমার কোন কষ্ট নেই। কাজ থেকে অবসর দিলে আমি বাঁচব কি নিয়ে?"

নন্দলালের গৃহস্থ-মন তার নিজের অন্তর্নিহিত অস্বস্তিকে কোনো অশোভন অভিব্যক্তির উচ্ছ্বাসে সংসারে বাহ্যত কোনো অশান্তির কারণ ঘটতে দেয় নি বটে, কিন্তু তার অন্তরের সঙ্গে বাইরের এই নিয়ত বিরোধে তার চিত্ত ক্রমে অবসন্ন হয়ে পড়ছিল। তার কিছুদিন পূর্ব্বেকার প্রফুল্ল মনের উপর যে ছায়াপাত হ'তে সুরু হয়েছিল, তার মুখে, তার কাজে, তার প্রত্যেকটি বাক্যে সে তার উপচীয়মান ক্লান্তি ধীরে ধীরে বিস্তার করেছিল। খেতে ব'সে নন্দ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত, অনেক কাজে তার পূর্ব্বের মত স্থির অবধান আর ছিল না। ব্যবসায়ের গুরুতর বিষয়গুলির গুরুত্বও তার কাছে ক্রমে উপেক্ষণীয় হয়ে উঠছিল। তবু বিদ্রোহে ভীত, সমাজশাসনে অভ্যস্ত তার পোষমানা মন তার অন্তরের সংগ্রাম-চেষ্টাকে শিথিল না-হ'তে দিতে পণ করেছিল। কিন্তু সে যেন আর পেরে উঠছিল না।

মালতীর অবস্থা অন্য রকম। সে সহজেই সরল সাদাসিধা মানুষ। তাদের অবস্থার উন্নতি তার কাছে পরম উপভোগ্য। এখন আর তাকে একলাই রাঁধা, বাসন-মাজা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করতে হয় না। চাকর-দাসী নিয়ে সে দস্তুরমত গৃহিণীপনার আনন্দেই যেন সকলের প্রতি প্রসন্ন। তা ছাড়া কমলের ছেলে তার অনেকখানি সময় অধিকার ক'রে থাকত। তাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে, তেল মাখিয়ে, স্নান করিয়ে, খাইয়ে, গল্প ক'রে ঘুম পাড়িয়ে সে পরমানন্দে নিজেকে ব্যাপৃত রাখত। নন্দলাল বাড়ী ফিরলে তাকে খোকার গুণপনার গল্প ক'রে, তার জন্য প্রাত্যহিক ফরমায়েসের কৈফিয়ৎ নিয়ে, নন্দলালকে ব্যস্ত ক'রে তুলত। নন্দলাল হেসে বলত, "অত ক'রে ছেলেকে আদর দিও না। ওকে মানুষ হ'তে দাও।" মালতী অত্যন্ত রাগ ক'রে উত্তর দিত, "আহা! আদর আবার কি? ছেলেপিলেকে ভূত সাজিয়ে, না খেতে দিয়ে রাখলেই খুব মানুষ করা হবে, না? তোমার অত ভাববার দরকার নেই—কালকে ওর জন্যে দম-দেওয়া মোটর গাড়ী একটা বড় দেখে এনে দিও দিখি নি।" নন্দলাল ক্লান্তভাবে মৃদু হেসে চুপ ক'রে থাকত।

ক্রমে মালতীর কাছেও যেন একটু একটু ধরা পড়তে লাগল। কি একটা বিস্মরণ হওয়ায় মালতী একদিন রাত্রে অনুযোগ ক'রে বল্লে, "তুমি আজকাল বড্ড ভুলে যাও। সেদিন জ্যোতিদিকে চিঠি লিখে দিলাম তোমায় ঠিকানা লিখতে, তুমি জোছ্‌নার নাম দিয়ে এখানকার ঠিকানা লিখে দিয়েছ। জোছ্‌না চিঠিটা খুলে বল্লে, 'ও মা একি ভাই, এ যে তোমার লেখা।' ভাগ্যিস্ অন্য কোন ঠিকানায় পাঠাও নি। কি যে ভুল হয়েছে তোমার!"

নন্দলাল কৌতুকের প্রয়াসে উদ্বিগ্ন মুখ ক'রে বল্লে, "বুড়ো হয়েছি তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।"

মালতী ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল, "আর ন্যাকরা করতে হবে না. বুড়ো হয়েছেন! ভীমরতির বয়স হয়েছে, না?"

কথাটা চাপা পড়া সত্ত্বেও নন্দলাল নিজের অনবধানতা দেখে লজ্জায় আশঙ্কায় অন্তরে অন্তরে শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ল। নিজের প্রতি ক্রমে তার বিশ্বাস ক্ষীণ হয়ে আসছে। লোকালয়ে এই অবস্থায় থাকলে কোন দিন একটা হাস্যকর কিছু ক'রে ফেলাও অসম্ভব নয়।

কি ক'রে নিজেকে সংযত করতে পারে তার কথা ভাবতে ভাবতে সে উন্মনা হয়ে পড়ল। তার মুখের উপর তার চিন্তার বিহ্বলতার ছায়া ঘনিয়ে উঠল। কথা বলতে বলতে মালতী তার মুখের দিকে চেয়ে একটু শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার কি শরীর ভাল নেই?" লণ্ঠনের ছায়া-আলোয় সে দেখলে নন্দলালের মুখ অসম্ভব ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

মালতী তার কপালে হাত দিয়ে দেখলে, জামার ভিতর হাত গলিয়ে দেখলে—না, জ্বর নয়। বল্লে, "শোবে চল।" কেমন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তার বুকটা ভরে উঠল। হাসির চেষ্টায় মুখটা বিকৃত ক'রে নন্দ বল্লে, "পাগল, কিছু হয় নি। বাইরে আমার এখন ঢের কাজ।"

"হোক কাজ," ব'লে মালতী তাকে জোর ক'রে নিয়ে গিয়ে পীড়িত দুরন্ত ছেলেটিকে মা যেমন ক'রে শুইয়ে আরামের ব্যবস্থা ক'রে দেয়, তেমনি সযত্নে তাকে শুইয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে তার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। নন্দ যেন অগত্যা মালতীর হাতে নিজেকে সমর্পণ করলে এই ভাবে প'ড়ে রইল।

বুক ফেটে কান্না আর চেপে রাখা যায় না, নন্দলালের এমনি মনে হ'তে লাগল। সে মনে মনে বলতে লাগল "দয়াময় এই দুর্ব্বলতা থেকে, এই নিষ্ঠুর বঞ্চনা থেকে, এই সর্ব্বনাশ থেকে আমায় রক্ষা কর। তুমি দিও না এই শান্তিময়

আশ্রয়নীড় চূর্ণ হয়ে যেতে। রক্ষা কর, রক্ষা কর, প্রভু তুমি দয়াময়, দয়াময়, দয়াময়।" বল্‌তে বলতে তার দুই চোখের জলে নীরবে তার বালিস ভিজে যেতে লাগল। অনেক ক্ষণ পরে সে মাথাটাকে মালতীর কোলের কাছে আরও একটু ঘনিষ্ঠ ক'রে এনে দুই হাতে উপবিষ্ট মালতীকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন ক'রে ধরল। মালতীর একটু তন্দ্রা এসেছিল। এই আকস্মিক উচ্ছ্বাসের সুনিশ্চিত অর্থ সে হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারল না। মালতীর দ্বাদশবর্ষব্যাপী বিবাহিত জীবনের অনতিবিচিত্র অভিজ্ঞতায় প্রথম দু-এক বৎসর ব্যতীত উচ্ছ্বাসের অবসর তারা বড়-একটা পায় নি। নন্দলাল বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার পূর্ব্বেই তার পিতা ইহলোক থেকে অবসর গ্রহণ করেন। নন্দলাল গ্রামে তার বিধবা মাতা, অপোগণ্ড দুটি শিশু ভগ্নী এবং যুবতী স্ত্রীর অন্নবস্ত্র ও হিন্দু ভদ্র-পরিবারের অবশ্যকর্ত্তব্যের সংস্থান করতে কলকাতায় অনাহারে অনিদ্রায় অক্লান্ত পরিশ্রমে কাটাতে লাগল। তার নিষ্পেষিত চিত্তের কাব্যরস-প্রবৃত্তি অকালে শুষ্ক হয়ে এল। বহু বৎসর মালতীর প্রতি নন্দলাল এই শ্রেণীর সম্ভাষণ করে নি। গৃহকর্ম্মের অবকাশ-কালে স্নেহের যে-অভিব্যক্তি ইদানীং তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছ্বাসের উত্তুঙ্গতরঙ্গাভিঘাতের কোনো লক্ষণ ছিল না। নিতান্ত অতি-আধুনিক শিক্ষায় এবং আচারে দীক্ষিত না-হওয়ায় তাদের হৃদয়োচ্ছ্বাস অপেক্ষাকৃত সুসংযত, স্নিগ্ধ ও কাকলীবর্জ্জিত ছিল। তাতে উত্তেজনার বিলাস ছিল না। সম্প্রতি নন্দলালের শুষ্কচিত্ত-পাদপ যে মঞ্জরিত হ'তে সুরু করেছিল এবং তার হৃদয়ে যে রসোচ্ছ্বাসের সঞ্চার হচ্ছিল সে-খবর মালতীর সুখতৃপ্ত চিত্তে বিশেষ ক'রে পৌঁছয় নি। আজ এই আবেগের নিবিড় আবেষ্টনে আবদ্ধ হয়ে মালতী সত্যই বিস্মিত হ'ল এবং সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব ও জীবকোষঘটিত বিশ্লেষণ-বিদ্যা তার অপরিজ্ঞাত থাকায় সে একটু আশঙ্কান্বিত হয়েই জিজ্ঞেস করলে, "কি গো, অমন করছ কেন? কি হয়েছে? মিথ্যে ক'রে ব'লো না, আমার ভাল লাগছে না যে গো?"

মালতীর ভীতিবিহ্বল প্রায়োচ্চস্বর পাছে পাশের ঘরে গিয়ে পৌঁছয় এই ভয়ে নন্দলাল মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তার হৃদয়ের রসাপ্লুত অনুতাপ-প্রবৃত্তি অকস্মাৎ যেন একটা কাব্যরসহীন কঠিন চেতনা লাভ করলে এবং তার অন্তরের ভাবব্যাকুলতার এই বিকৃত সমাদরে তার চিত্ত অন্তরে অন্তরে তিক্ত হয়ে উঠল—মূঢ় এই আদিম নারীর অসংযত স্নেহের অভিব্যক্তির উচ্ছ্বাসে। তার ইচ্ছা হ'তে লাগল, রূঢ় হাতে মালতীর মুখটা চেপে ধ'রে তার এই নির্ব্বোধ উচ্ছ্বাসকে সংযত করে।

সে চোখ-নাক মুছে উঠে বসল এবং যথাসম্ভব স্বাভাবিক স্বরে বললে, "না, কারুর কিছু হয় নি। এক গ্লাস জল আন ত।" জলের যে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল তা নয় কিন্তু নিজেকে একাকী সংবৃত করে নেবার তার প্রয়োজন ছিল এবং মালতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে সে খাট থেকে মাটিতে নেমে একটু পায়চারি করলে, তার পর হঠাৎ এক সময়ে দাঁড়িয়ে মাথাটা ঝাঁকি দিয়ে অনুচ্চ স্বরে বললে, "না, এমন ক'রে চল্‌বে না।"

১৯

নন্দলালের ব্যবহারের যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে এ-কথা সকলের আগে ধরা পড়ল কমলার কাছে। নন্দলাল সাবধানে সাধ্যমত তার দৃষ্টিপথ এড়িয়ে চলতে লাগল। পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক অভিনিবেশের সঙ্গে তার বিষয়কর্ম্মে সে মনোযোগ দিলে এবং দিবসের অধিকাংশ সময় সে নিজেকে বাইরের কাজে এমন ক'রে নিযুক্ত রাখ্‌তে লাগ্‌ল যে সব দিন দুপুর-বেলা তার বাড়ীতে খেতে আসবার পর্য্যন্ত অবসর হ'ল না। মালতী বল্‌লে, "এমন ক'রে শরীর বইবে কেন?"

নন্দলাল বল্‌লে, "শরীরের নাম মহাশয়। আর ক'টা বৎসর খেটেখুটে একটু জুৎ ক'রে নিতে পারলে আর ভাবনা থাকবে না।"

কমলা মুখে কিছু বলতে পারে না। কিন্তু নন্দলালের এই আত্মনিগ্রহে মনে মনে নিজেকে দায়ী ক'রে সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে। এই পরিবার তাকে অযাচিত স্নেহদান ক'রে তার অচিন্তনীয় বিপদ থেকে তাকে তাদের পরিবারের নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত আশ্রয় ও আত্মীয়তার অধিকারের মধ্যে নির্ব্বিচারে গ্রহণ ক'রে তাকে যে কৃতজ্ঞতায় ও স্নেহে আবদ্ধ করেছে, তাতে তার দ্বারা ঘৃণাক্ষরেও এদের কোন অনিষ্ট-সম্ভাবনা ঘটলে তার পরিতাপের আর সীমা থাকবে

না। সে মনে মনে নিজের অভিশপ্ত অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে চিন্তা করতে লাগল যে কি উপায়ে নিজের এই দুরদৃষ্টের ছায়াপাত থেকে এদের শান্তিময় জীবনকে সে রক্ষা করতে পারে। আপনার দুর্গ্রহ নিয়ে এই বাড়ী থেকে সকলের অজ্ঞাতে নিজেকে অপসারিত ক'রে নিয়ে যাবার কথা তার মনে হয় নি যে তা নয়। কিন্তু প্রথমত নিতান্ত অপরিচিত বাইরের জগতের যে অল্প অভিজ্ঞতা সে তার জীবনে লাভ করেছিল তার কথা চিন্তা করতেও তার মন আতঙ্কে অবসন্ন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত তার পুত্র, যে তার স্বামীর একমাত্র প্রতীক, তার দুঃখের দিনে একমাত্র সান্ত্বনা, তাকে ছেড়ে সে কোন মতে দূরে চলে যেতে পারবে না। তবু তাকে ত একটা উপায় করতেই হবে যাতে তার উপস্থিতিতে এই পরিবারের অদৃষ্টাকাশে যে বিপ্লবের দুর্লক্ষণ ঘনিয়ে উঠছে তার প্রতীকার হ'তে পারে।

অনেক চিন্তার পর একদিন সে মালতীকে বললে, "দিদি, এমনি ক'রে শুয়ে-ব'সে ত সময় আর কাটে না। একটা কোন রকম কাজকর্ম্ম শেখার বন্দোবস্ত তোমার স্বামীকে ব'লে যদি ক'রে দাও ত আমার ভারী উপকার হয়।"

মালতী বললে, "কেন ভাই, চাকরি ক'রতে যাবে নাকি ছাতা হাতে ক'রে?" ব'লে ছাতা হাতে ক'রে চাকরি করতে যাবার ছবিটা মনে ক'রে সে হেসে উঠল।

কমলা কিন্তু এত সহজে কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দিতে দিল না। সে অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে তাকে বোঝাতে লাগল। বললে, "সমস্ত দিন নিজেকে নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে, নিজের এই পোড়া কপালের কথা ভাবতে ভাবতে শেষে পাগল হয়ে যাব। তবু যা হোক একটা কাজকর্ম্ম শেখার দিকে মন দিলে একটুখানি নিজের কাছ থেকে রেহাই পাব।"

অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর মালতী নন্দলালকে বলতে রাজী হ'ল। বললে, "উনি কিন্তু ভাই ভয়ানক রাগ করবেন আমার উপর।"

নন্দলালকে বলাতে সে গম্ভীরভাবে একটি "হুঁ" ব'লে চুপ ক'রে রইল। মালতী বললে, "আমি অনেক ক'রে বারণ করেছিলাম, তা ও কিছুতেই শুনতে চায় না। বলে এমন ক'রে ভেবে ভেবে শেষে পাগল হয়ে যাবে। তুমি বরং একটু বুঝিয়ে বল।"

নন্দলাল আবার ছোট্ট ক'রে বললে, "আচ্ছা"।

কয়েক দিন কেটে গেল। কোন দিকেই কোন সাড়াশব্দ নেই। নন্দলালের মনে মনে একবার একটু অভিমান হ'ল। এমন কোন দুর্ব্যবহার ত সে জ্যোৎস্নার উপর করে নি যার জন্যে তার গৃহ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা দরকার হ'তে পারে। দুনিয়ার অন্য সহস্র লোকের সঙ্গে তার যে চরিত্রের কত প্রভেদ তা সে বুঝতে পারল না! স্ত্রীলোক কি শুধুই স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারে না? একবার তার মনে এমন দুরাশাপূর্ণ সন্দেহও হ'ল যে জ্যোৎস্নার মনে হয়ত তার সম্বন্ধে কোন দুর্ব্বলতার সঞ্চার হয়ে থাকবে। কিন্তু কখনও কি তাহ'লে সে-কথার আভাস সে পেত না? ভাবলে, কি জানি স্ত্রীলোকের চরিত্র দুর্জ্ঞেয়। দেখা যাক্ ব্যাপারটা কি।

কয়েক দিন পরে কমলা আর থাকতে না পেরে মালতীকে জিজ্ঞেস করলে, "বলেছিলে দিদি আমার কথা।"

মালতী বললে, "হুঁ, বলেছিলাম।"

"কি বললেন?"

"কোন কথা বললে না।"

"রাগ করলেন?"

"কি জানি ভাই ওদের কিছু বোঝা যায় না।"

কমলা বললে, "না দিদি তোমায় আর একবার বলতে হবে। এমনি ক'রে চুপ ক'রে থাকতে আমার আর ভাল লাগে না। লক্ষ্মী দিদি, এইটুকু আমার হয়ে তুমি ব'লে দাও।"

মালতী আবার গিয়ে নন্দলালকে বললে।

নন্দলাল হেসে বললে, "ওকে তোমার বিদায় করবার ইচ্ছা হয়েছে বুঝি। বললেই হয় স্পষ্ট ক'রে। না হয়, অজয়কে আর ওকে দেশে মা'র কাছে রেখে আসি। কি বল?"

মালতী ভারি রাগ করলে। গোলমাল ক'রে বলতে লাগল, "কখ্‌খনো না, আমি কখনও ওকে যেতে বলি নি। আমি বরং মানাই করেছি। ও কিছুতেই ছাড়ে না। তোমার ভারি অন্যায় এ রকম ক'রে বলা। খোকনকে কখ্‌খনো আমি নিয়ে যেতে দেব না। যাও না তুমি নিজে গিয়ে জিজ্ঞেস কর দিখি নি, আমি কি বলেছি।" বলতে বলতে খোকনকে নিয়ে যাবার কথা মনে ক'রে সে কেঁদে ফেললে।

নন্দলাল বল্‌লে, "আচ্ছা, আচ্ছা, আমি জিজ্ঞেস করছি। তুমি চুপ কর।" ব'লে সেই বাইরে চ'লে গেল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে নন্দ মালতীকে বললে, "চল জ্যোৎস্নাকে জিজ্ঞেস করি কি হয়েছে তার।"

মালতী বললে, "আমি যাব না।"

নন্দলাল আবার একটু ক্ষীণ অনুরোধ করলে, "চল না। সুন্দরী নারীর গৃহে রাত্রে একা যেতে মনুর শাস্ত্রে নিষেধ আছে।"

মালতী একটু ঝাঁকি দিয়ে বললে, "আচ্ছা, আর ভশ্চাজ্জিগিরি ক'রে শাস্তর ফলাতে হবে না। খোকনকে তুলে এখন দুধ খাওয়াতে হবে। এখন আমি যেতে পারব না।" ব'লে সে চ'লে গেল।

অগত্যা অনেক কাল পরে রবীন্দ্রনাথের একখানা নৌকাডুবি হাতে ক'রে দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে সে ধীরে ধীরে কমলার ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। নন্দলাল গলা পরিষ্কার করার আওয়াজ দিয়ে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করল। ভিতরে নড়াচড়া, আলো-জালার একটা শব্দে সে অনুভব করলে যে জ্যোৎস্না উঠেছে। মনে হ'ল সে যেন দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। তার পর আর কোন শব্দ নেই, খানিক ক্ষণ অপেক্ষা ক'রে নন্দলাল ডাকলে, "জ্যোৎস্না"। স্বরটা কিছুতেই স্বাভাবিক করতে পারলে না। কমলা দরজা খুলে দিয়ে মাথা নীচু ক'রে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু ঢোক গিলে নন্দলাল বল্‌লে, "অনেক দিন পরে একটু পড়তে ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু ন'টা বেজে গেছে—তোমার ঘুমের সময় হ'ল। অল্পক্ষণ পড়লে কি তোমার অসুবিধা হবে?"

কমলা সে-কথার কোন উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "দিদি কোথায়? তিনি এলেন না?"

"বল্লুম ত তাকে। বললে, খোকাকে তুলে এখন দুধ খাওয়াতে হবে। আর এসে ত প'ড়ে প'ড়ে ঘুমবে।" ব'লে একটু হাসলে। এই হাসিটুকুতে যোগ না দিয়ে কমলা বল্‌লে, "আমি যাই তাঁকে ডেকে আনি।" ব'লে উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

নন্দলাল যেন একটু অপমানিত বোধ করলে। একটু রাগও হ'ল। ভাবলে, এত ভয় কিসের? এত দিন দেখেও কি একটা লোককে এইটুকু চেনা যায় না? আমি এত ক'রে তার সম্মান রক্ষা ক'রে চলি, আর আমাকে এতটুকু বিশ্বাসও করা যায় না। একবার ভাবলে, দূর হোক্ গে ছাই ফিরে যাই; কি এত? কিন্তু এত যে কি, তার সঠিক উত্তর না পেয়েও তার ফিরে-যাওয়া ঘটে উঠল না। নিতান্ত তিক্ত চিত্তেই ঘরে প্রবেশ ক'রে সে একটা মাদুরের উপর গুম হয়ে ব'সে রইল এবং অন্যমনস্ক ভাবে বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে কখন যে তার গল্পে মন ব'সে গেল তা সে টেরও পায় নি। ষ্টীমারে খুড়ো ও উপেনের কাহিনী পড়তে পড়তে তার মনের তিক্ততা কখন ঘুচে গেছে। পিড়ীং শাকের আহরণ-কাহিনী প'ড়ে সে যখন একটু হেসেই ফেলেছে এমন সময় মালতী ঘরে ঢুকল—পিছনে কমলা। মালতী ঢুকে নন্দলালকে হাসতে দেখে খিলখিল ক'রে হাসিতে ভেঙে পড়ে বললে, "ওমা, কি হবে গো! অমন একলা একলা ব'সে হাসছ কেন?" নন্দলাল বেশ গুছিয়ে ব'সে বললে, "হাসছি তোমার বোনের আতঙ্কের কথা মনে ক'রে। প'ড়ে শোনাতে এলাম, তা বোধ হয় ভয় হ'ল পাছে তুমি ক্ষেপে যাও, একলা ঘরে স্ত্রীর ভগ্নীকে নিয়ে কাব্য চর্চা করছি দেখে, তাই আর কথাটি না ব'লে তোমায় খুঁজে-পেতে নিয়ে আসতে গিয়েছিলেন।" নন্দলালের মনে মনে যে তিক্ততা তাকে পীড়িত করছিল, তার কতকটা উদ্গীরণ ক'রে সে যেন একটু সুস্থ বোধ করলে।

মালতী রাগ ক'রে বললে, "যাও, থাকব না আমি। তখনই জোছনাকে বললাম, আমার ঢের কাজ আছে, তা কিছুতেই শুনবে না।" ব'লে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই কমলা তার হাত চেপে ধরলে। মালতী বললে, "না ভাই, আমাকে ছেড়ে দাও। এখনও আমার খাওয়া হয় নি, তার পর চিট্টি গুটোতে হবে—আমার ব'সে থাকবার সময় নেই।"

কমলা করুণ অনুনয়ের সুরে মৃদু স্বরে বললে, "অল্প একটুক্ষণ বস না দিদি। তার পর আমিও তোমার সঙ্গে যাব। লক্ষীটি ব'স।"

নন্দলাল মনে মনে হতাশ হয়ে বললে, "ওগো একটা মানুষ উপরোধ করছে, একটু কষ্ট ক'রে বসই না। তাতে

তোমার সোনার সংসার একেবারে সবাই লুটপাট ক'রে নেবে না। না-হয় পড়া আজ থাক্। আজ সেই কথাটাই হয়ে যাক না।”

কমলা আর মালতী মাটির উপর বস্‌ল। মালতী বললে, “কই জিজ্ঞেস কর না, আমি ওকে যেতে বলেছি, না, ও আমাদের মায়া কাটাতে চাইছে।”

এই কথায়, কথাটা পাড়বার সুযোগ পেয়ে নন্দলাল কমলার দিকে চেয়ে বললে, “এখানে তোমার দিদি তোমাকে ঝিয়ের মত খাটায় ব'লে নাকি তুমি বলেছ যে গতর খাটিয়েই যদি খেতে হয় তবে এখানে কেন; একটা কাজটাজ শিখে চাকরি ক'রে খাবে?”

মালতী ব্যস্ত হয়ে রেগে বললে, “কখ্‌খনো আমি তা বলি নি। যত মিথ্যে কথা আমার নামে। ভারি অন্যায়। না জ্যোছনা, ওকে মোটেই সে কথা বলি নি।”

মালতীর রাগ দেখে কমলা হেসে ফেললে, ধীরে ধীরে বললে, “কথাটা একটু উল্টিয়ে নিলেই ঠিক কথাটা হবে। এখানে দিদি সমস্ত দিন ঝিয়ের মত নিজে খাটবেন—আমার হাত-পা নাড়ার পর্য্যন্ত জো নেই। এমন ক'রে মানুষ থাকতে পারে না। তা ছাড়া আমার ভয়ানক ইচ্ছা যে আমি কোন একটা কিছু শিখি যাতে আমার জীবনটা মানুষের কাজে লাগাতে পারি। ছেলেবেলা থেকে বাবার ইচ্ছা ছিল আমাকে ডাক্তারী পড়াবার। তার ত এখন আর উপায় নেই। অমনি আর একটা ছোটখাট আমার বিদ্যের উপযুক্ত কিছু কি শেখা যায় না। এই যেমন নার্সের কাজ?”

এত কথা একসঙ্গে এ বাড়ীতে এসে অবধি সে কখনও উচ্চারণ করে নি। নার্সের কথাটা বলতে তার নিজের মনেও সঙ্কোচ ছিল। তবু বলা হয়ে যাবার পর তার হঠাৎ মনে হ'ল ব'লে ফেলতে পেরে ভালই হয়েছে।

মালতী ত শুনেই ব'লে উঠ্‌ল, “মা গো, কি ঘেন্না। শেষকালে ধাইমাগীদের কাজ করবে নাকি? না না সে হবে না।” সে ভেবেছিল, ছাতা হাতে ক'রে বড়জোর মাষ্টারনীর জন্য জ্যোৎস্নার এই উমেদারী। ধাইবৃত্তির মত এত নিকৃষ্ট ঘৃণাজনক কাজে জ্যোৎস্নার রুচি হ'তে পারে এ-কথা স্বপ্নেও সে ভাবে নি। তার গা যেন ঘিন ঘিন ক'রে উঠ্‌ল।

স্ত্রীর উত্তেজনায় নন্দলালের সংস্কার-প্রবৃত্তি অকস্মাৎ প্রবল হয়ে উঠল। বললে, “ঘেন্না আবার কি? সব কাজই সম্মানের কাজ। যারা আমাদের পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ করায়, যারা আমাদের রোগের যন্ত্রণায় মায়ের মত শিয়রের পাশে ব'সে রাত জাগে, তারা আমাদের মা। তাদের কাজ সম্মান পাবার যোগ্য। সত্যেন দত্তর সেই কবিতাটা...।”

মালতী বললে, “থাক আর কবিতায় কাজ নেই। চিরকাল এই ধাইমাগীদের দেখলে আমার গা কেমন করে—দোক্তা ঠুসে একগাল পান চিবুতে চিবুতে—মা গো মনে করলেও ঘেন্না হয়। তা মেথরবাও তো আমাদের কত উপ্‌কার করে—পাঠাও তবে মেথরাণি হ'তে। না না, ওসব হবে না। চললুম, আমার ঢের কাজ আছে। যত বাজে কথা শোনবার আমার সময় নেই।” ব'লে সে কারুর জবাবের অপেক্ষা না ক'রে হন্ হন্ ক'রে বেরিয়ে চলে গেল।

২০

আজ প্রায় বৎসরখানেক হ'ল কমলা একটি দেশীয় হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে রোগচর্য্যাশিক্ষার কাজে ভর্ত্তি হয়েছে। সহজে এ-কার্য্য সিদ্ধ হয় নি। অনেক বাক্-বিতণ্ডা কান্নাকাটি মানঅভিমানের পালার পর সে মালতীর মতকে এবং নিজের মনকে আয়ত্তে আনতে পেরেছিল। তার নিজের মনেও দ্বিধা ছিল বিস্তর; তবে সে দ্বিধা আর মালতীর আপত্তি এক জাতের ছিল না। কমলা গাজীপুরে থাক্‌তে একটি প্রৌঢ়া ইংরেজ নার্সের সঙ্গে তাদের পরিবারের পরিচয় ছিল। তার চালচলন কাজকর্ম্ম পরিচ্ছন্নতা এবং মধ্যে মধ্যে তার নিকট থেকে কেক বিস্কুট লজেঞ্জুস প্রভৃতি আহার্য্য এবং জন্মদিনে লোভনীয় উপহারদ্রব্য লাভ ক'রে তার শিশু-চিত্তের কল্পনার রঙে নার্স জাতি সম্বন্ধে তার ধারণা উচ্চই ছিল। কিন্তু অপরিচিত বাইরের জগৎ এবং সাধারণতঃ অপরিচিত পুরুষ সম্বন্ধে তার মনে যে সঙ্কোচ এবং আতঙ্ক সঞ্চিত ছিল তার বাধাই মালতীর প্রবল মতের বিরুদ্ধে তার তর্কের শক্তিকে খর্ব্ব ক'রে রেখেছিল। মালতীর কোন যুক্তি ছিল না; বস্তুত যুক্তির জন্য তার বিশেষ আগ্রহও ছিল না। ধাই-বৃত্তি সম্পর্কে তার ধারণা খুব নীচ শ্রেণীর ছিল এবং এরূপ কার্য্য নির্ব্বাচন ও সমর্থনের জন্য সে তার স্বামী ও কমলাকে তীব্র তিরস্কারে সম্ভাষণ করতে

ত্রুটি করত না। অসহ্য ঘৃণার চেয়ে বড় যুক্তি তার ছিল না এবং তা তার আবশ্যকও ছিল না। তবু একদিন চোখের জলে তাকে টলতে হ'ল। নন্দলাল আর এ সব কান্না-কাটির মধ্যে নিজেকে জড়ায় নি। মালতী অবশেষে একদিন এই দেশীয় হাসপাতালে গিয়ে এখানকার শিক্ষার্থিনীদের নিজ চোখে দেখে এল। সৌভাগ্যক্রমে তাদের মধ্যে মালতীর সম্পর্কিতা একটি মেয়ে ছিল। তার কাছ থেকে এখানকার জীবনযাত্রার নানা তথ্য সম্বন্ধে অপরূপ প্রশ্নাদি করার পর সে আর প্রতিবাদ করে নি। বোধ করি নার্সদের সম্বন্ধে নিজের ধারণায় তার সন্দেহ জন্মেই থাকবে।

এখন কমলাকে আর পূর্ব্বের মানুষ ব'লে প্রায় চেনাই যায় না। গতিতে তার জড়তা নেই, কথায়বার্ত্তায় তার সে দ্বিধাকুণ্ঠিত বেপথু নেই, তার কাজকর্ম্মের মধ্যে তার সহজ আত্মবিশ্বাস পরিস্ফুট হয়েছে। অকস্মাৎ তাকে দেখলে মনে হয় যেন তার সমস্ত চেহারাটারই বিবর্ত্তন ঘটেছে। পূর্ব্বের চেয়েও সে যেন লম্বাও হয়েছে অনেকটা। তার কাপড়ের পাড়টুকুর সুবিন্যস্ত ভঙ্গীতে, তার প্রতি পদক্ষেপের সুদৃঢ় মর্য্যাদায়, তার স্মিতহাস্যের সুসংযত সুষমায়, সহজেই লোকের সম্ভ্রম আকর্ষণ করে। অবশ্য এই চিত্তাকর্ষণের মূলে তার রূপের দীপ্তিরও অল্প সম্মোহনী শক্তি ছিল না। তার স্বাভাবিক উজ্জ্বল বর্ণ উজ্জ্বলতর হয়েছে, তার দেহ হয়েছে দীর্ঘ ও ঋজু।

সাধারণত সে কারও সঙ্গে বেশী আলাপ করে না। নিজের পড়াশুনা কাজকর্ম্ম এবং অবসর সময়ে সেলাই নিয়েই তার বেশী সময় কাটে। তার কাছে দেখা করতে আসার লোকের মধ্যে নন্দলাল ও অজয়; আর মালতী কালেভদ্রে।

ইদানীং নন্দলালের সঙ্গে আলাপে কমলার সেই পূর্ব্বের সঙ্কোচ এবং সন্ত্রস্ত ভাব প্রকাশ পেত না। আপেক্ষিক স্বাধীনতার জড়তাবিহীন আনন্দের উপলব্ধি এবং অপরিচিত পরিবেষ্টনের সঙ্কোচের পরাধীনতা দুই-ই তার চিত্তকে নন্দলালের উপস্থিতি এবং আত্মীয়তা সম্বন্ধে অনুকূল করেছিল। যত দিন সে নন্দলালের গৃহপ্রাচীরের অন্তরালে কেবলমাত্র নন্দলাল-পরিবারের স্নেহজালে আবদ্ধ হয়েছিল, তত দিন নন্দলালকে সে আত্মীয়ের মত ক'রে দেখতে পারে নি। নন্দের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা ছিল অসীম, কিন্তু সেই জন্য তার ভার ছিল দুর্ব্বহ। তা ছাড়া নন্দলালের উন্মুখীনতার প্রতি তার কেমনতর একটা অস্বস্তিকর অসহায় ভাব ছিল যেটাকে সে তাদের সহস্র সহৃদয় ব্যবহারেও কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

জীবনের নানা দুর্ঘটনাময় অভিজ্ঞতায় সাধারণত পুরুষ জাতি সম্বন্ধেই তার চিত্তে অস্বচ্ছন্দ মনোভাব সঞ্চিত ছিল। সুতরাং নন্দলালের সম্বন্ধেও তার মনকে কিছুতেই সে অনুকূল ক'রে তুলতে পারত না; এবং নন্দের গৃহে নন্দলালের প্রত্যেকটি ব্যবহার সম্বন্ধে সে তার সতর্ক সন্দিগ্ধ চিত্তকে জাগ্রত রেখেছিল। কিন্তু অধুনা তার মনের সেই বিকার অনেকখানি কেটে গিয়েছিল। নন্দলাল তার মনের মধ্যে আত্মীয়শ্রেণীতে পরিগণিত হয়েছে। এই সহজ আত্মীয়তার পরম পরিতৃপ্তিকর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পুরুষের প্রতি তার অস্বস্তিকর বিরুদ্ধতার অবসান ঘটছিল এবং তার জীবনের এক নূতনতর আনন্দময় অধ্যায় তার অন্তরে আত্মপ্রকাশ করছিল। তার সহজ অথচ সুসংযত ব্যবহারে সে অল্প কালেই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। অর্থের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল না এবং সেই জন্যই তার কাছে তার কাজ কেবলমাত্র জীবিকানির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ হয়ে ওঠে নি। যে স্বাধীনতার আস্বাদন সে জীবনে এই প্রথম সম্ভোগ করলে, সেই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আত্মপ্রত্যয়ের মূল্য তার অন্তরকে তার কর্ম্মবেষ্টনের সমস্ত কর্ত্তব্যসাধনের প্রতি কৃতজ্ঞ ও পরিতুষ্ট রেখেছিল এবং তার কর্ম্মকে মাতৃপাণি-পরিবেশিত সেবার মত সৌন্দর্য্যে ও আনন্দে পূর্ণ করেছিল।

২১

ডাক্তার নিখিলনাথ এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তাদের অন্যতম। ইংলণ্ড ও জার্ম্মানী থেকে তিনি শিশুচিকিৎসা-বিদ্যায় বিশেষ শিক্ষালাভ ক'রে যখন ফিরলেন, ভারতবর্ষে তখন একদল যুবকযুবতীর চিত্ত বিজাতীয় হিংসাবৃত্তিতে অগ্নিময়।

এই দুর্গ্রহ দলের গুপ্ত চেষ্টার বিরুদ্ধে গবর্ন্মেণ্টের সুনিয়ন্ত্রিত অভিযান কঠোর এবং প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল। দোষী-নির্দ্দোষী-নির্ব্বিচারে সমস্ত যুবক দলের উপর পুলিসের কৃপাদৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল। তাতে বহু সহস্র যুবক বন্দী-শালার আতিথ্য গ্রহণে বাধ্য হয়।

নিখিলনাথ নিজে পাঠদ্দশায় এই দুর্ব্বার স্রোতের মধ্যে

পড়েছিলেন, এমন কি জেলও খাটতে হয়েছিল। সে প্রায় দশ বৎসর আগের কথা। ইউরোপ থেকে ফেরবার পর সরকারী চাকরি সম্বন্ধে যদিও এখন তাঁর মনে বিশেষ বিরুদ্ধতা স্পষ্ট ছিল না, তবু অর্থলোভ বা সরকারী উচ্চপদের প্রলোভন তাঁর চিত্তে বিশেষ ক'রে স্থান পায় নি। যে-কোন একটা মঙ্গল প্রতিষ্ঠানে নিজের অধিগত বিষয়ের চর্চ্চা নিশ্চিন্ত মনে করবার সুযোগ পেলেই সে খুশী হ'ত। এমন সময় নিখিলনাথকে এই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ সাগ্রহে তাঁদের কাজের মধ্যে ডেকে নিলেন। কাজ করবার এমন একটা সুযোগ সকলের ভাগ্যে যে সহজে ঘটে না একথা নিখিলনাথের অজানা ছিল না। তাঁর স্বদেশে ও বিদেশে অর্জ্জিত সমস্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি একেবারে কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। লোকটির স্বভাবের মধ্যে এই অনন্যতার প্রভাব একটু বেশী ক'রেই ছিল এবং দেখতে দেখতে এই হাসপাতালের এবং তাঁর শিশুচিকিৎসার যশ চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষীয় এক জন হ'য়ে উঠলেন। এই স্বল্পভাষী অনন্যকর্ম্মা পুরুষটি অধিকবয়স্ক না হলেও সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা ক'রে চলত। দায়টুকুমাত্র সাধন ক'রে এখানকার অধিকাংশ ডাক্তারই উদ্বৃত্ত সময়টা হাস্যামোদে, সিগারেট-সেবনে এবং নার্সদের সম্বন্ধে রসালোচনায় অতিবাহিত করত। তাদের এই অগাধ আলস্যভরা চপলতার প্রতি তাঁর যে একপ্রকার অশ্রদ্ধাপূর্ণ তীব্র কটাক্ষ ছিল, তাকে ভয় করত না এমন লোক এই হাসপাতালে কেউ ছিল না।

তিনি আসার পর থেকে এখানকার ডাক্তারদের নিয়ে একটা পাক্ষিক অধিবেশন এবং একটা মাসিক পত্রিকার আয়োজন ক'রে সকলকে ইচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় তাদের নিজ নিজ বিশেষ বিষয়ের চর্চ্চা ও পাঠে অনুপ্রেরিত ক'রে তুলেছিলেন। তাঁদের আলোচনা-সভায় প্রতিষ্ঠানের কারও যোগ দেবার বাধা ছিল না। আলোচনা বাংলায় চলার নিয়ম ছিল এবং তাঁদের এই আলোচনায় উপস্থিত থাকতে তিনি ধাত্রীদেরও উৎসাহিত করতেন।

কমলের শেখবার উৎসাহ এবং চেষ্টা ছিল প্রচুর এবং এই সভার আলোচনায় সে উপস্থিত থাকত। এতে শুধু তার জ্ঞানতৃষ্ণা যে মিটত তা নয়, তার সময় এতে কাটত অনেকখানি; কারণ এই আলোচনা যাতে সে বুঝতে অক্ষম না হয়, তার জন্যে সে অন্য সময় বই এবং ডাক্তারদের সাহায্য নিতে ত্রুটি করত না। এক জন সামান্য নার্সের এই চেষ্টায় অধিকাংশ ডাক্তারই কৌতূহল ও কৌতুক অনুভব করত, কিন্তু তার স্বভাবগুণেই হোক বা তার রূপের গুণেই হোক, সাহায্য সে সকলের কাছেই পেত।

সবচেয়ে বেশী উৎসাহ পেত সে নিখিলনাথের কাছ থেকে। শিশুচর্য্যার নানা রহস্যময় তথ্য সে নিখিলনাথের কাছে সংগ্রহ করত এবং নিজেও সে শিশুদের মধ্যে সেবার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করতে বেশী ভালবাসত। তার নিজের বুকের ধনটিকে তার বাধ্য হয়ে নিজের কোল থেকে দূরে রাখতে হয়েছিল—তাই তার মাতৃহৃদয়ের বেদনায়িত স্নেহক্ষুধায় তার চিত্ত ছিল ক্ষুধাতুর। এই রুগ্ন অসহায় প্রকৃতির শিশুগুলির পরিচর্য্যা তার চিত্তে কতক পরিমাণে সন্তানবিরহের দুঃখকে লঘু ক'রে আনত।

জ্ঞানার্জ্জন সম্পর্কে অন্যান্য লোকের মত নিখিলনাথের সাহায্যও সে মধ্যে মধ্যে গ্রহণ করত। তিনি তাঁর শত কাজের মধ্যে সপ্তাহে একদিন স্বেচ্ছায় মেয়েটিকে পাঠচর্চ্চায় সাহায্য করতেন। নার্স কোয়ার্টারের নীচের একটি ঘরে যেখানে নার্সদের আত্মীয়-পরিজনেরা তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসত, সেইখানেই তাদের পাঠচর্চ্চার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল।

অধিকাংশ নার্সই স্বচ্ছন্দে বাইরে গিয়ে তাদের অভীষ্ট জনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে পেত। সুতরাং এই ঘরে পাঠ প্রসঙ্গের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটত না। কেবল নন্দলাল যেদিন অজয়কে নিয়ে এসে উপস্থিত হ'ত সেদিন সব উলটপালট হয়ে যেত। এই যাতায়াতে নন্দলালের সঙ্গে এখানকার অনেকগুলি ডাক্তারের কতকটা পরিচয় ঘটেছিল। নিখিলনাথের সঙ্গেও নন্দর দু-এক দিন সাক্ষাৎকার ঘটেছে। এই সাক্ষাৎকারে নন্দের চিত্ত নিখিলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এ-কথা বলা চলে না। নিখিলনাথ স্বভাবত কিছু অসামাজিক মানুষ; অধিক আলাপ-পরিচয় করা তাঁর অভ্যাস ছিল না—সুতরাং সহসা লোকে তাঁকে অহংকৃত ব'লে মনে করতে পারত। নন্দের সঙ্গে পরিচয়েও তাঁর এই স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটে নি; এবং প্রথম আলাপেই স্বভাবতই তার চিত্ত নিখিলের প্রতি বিমুখ হ'য়ে উঠল।

ক্রমশঃ

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি

শ্রীশশিভূষণ বসু

অনেক দিন পূর্ব্বে যখন আমি শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের বাটীতে থাকিতাম, তখন একদিন মধ্যাহ্নকালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। উদ্দেশ্য, হেরম্বচন্দ্রের সহিত কোন বিষয়ে একটু কথা বলা। সে সময় হেরম্ববাবুর বৃদ্ধ পিতা তাঁহাদিগের হিজ্‌লাবট নামক গ্রাম হইতে আসিয়া পুত্রের সঙ্গে বাস করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় হঠাৎ উপস্থিত হইলে আমরা সকলেই ঐ মহাপুরুষের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে বসিবার আসন প্রদান করিলাম। হেরম্ববাবুর পিতা চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়ের সঙ্গে পূর্ব্বে তাঁহার বিশেষ আলাপ-পরিচয় ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বৃদ্ধ মৈত্র মহাশয়কে দেখিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন, মৈত্র মহাশয়ও এত বড় লোকের আগমনে হৃদয়ের বিশেষ আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন। যাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কখনও বসিয়া তাঁহার কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন তিনি এক জন খুব গল্পে লোক ছিলেন। তিনি সেদিন একটি উচ্চ আসনে বসিয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ মিষ্ট ভাষায় তাঁহার জীবনের নানারূপ অভিজ্ঞতার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা সকলেই নিম্নে বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলাম। ঈশ্বরচন্দ্র কিরূপ তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনী পাঠে সকলেই অবগত আছেন। সেদিন তাঁহার কাহিনীর মধ্যে তাঁহার নির্ভীকতার ও স্বাবলম্বন-শক্তিরই বিশেষ নিদর্শন যেন প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। কোন স্থানেই তিনি কাপুরুষের ন্যায় মস্তক অবনত করিবার লোক ছিলেন না। কি রাজা, কি ধনী, কি বা উচ্চ পদস্থ সাহেবদিগের নিকট।

সেদিন সূর্য্যদেব পাটে বসিবার অল্প পূর্ব্বেই বিদ্যাসাগর মহাশয় আসন পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা সকলে দণ্ডায়মান হইলাম। যাইবার সময় গৃহের বাহিরে গিয়া চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়কে একটু গোপনে কি যেন বলিলেন, তৎপরে আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন আমি ঘরের ভিতরেই ছিলাম। আসিয়া আমায় বলিলেন, "বাপু! তুমি এ বাড়ীতে থাক, শুনিলাম। আমি আগামী কল্য এ বাটীর সমস্ত লোককেই আমার বাড়ীতে মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছি। কিন্তু মৈত্র মহাশয় বলিলেন, তোমাকে এজন্য বিশেষভাবেই বলা উচিত। তা তুমি কাল ইঁহাদের সঙ্গে গিয়া আমার বাড়ীতে দুইটি ডাল ভাত খাইবে।" আমি বিনীতভাবে সহাস্যমুখে বলিলাম, "অবশ্য আপনি আমাকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ না করিলেও, আমি ইঁহাদের সঙ্গে গিয়া আপনার বাড়ী আহার করিতাম।" সে স্নেহের বচন এখনও স্মরণে বেশ জাগিয়া রহিয়াছে।

পরদিন মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইতে-না-হইতে আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য সকলেই যাত্রা করিলাম। আমাদের গাড়ী যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাদুড়বাগানস্থ সুন্দর ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন তিনি স্বয়ং ফটকের দ্বারে আসিয়া আমাদিগকে যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। মহিলারা গাড়ী হইতে নামিলে, তিনি দুই একটি শিশুকে নিজে কোলে করিয়া লইলেন। আমরা ভবনে প্রবেশ করিলাম। অল্পক্ষণ পরেই আহারে বসিলাম। মহিলাদিগের খাইবার স্থান অবশ্য অন্যত্রই হইয়াছিল। আমরা ভোজনে বসিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় একটি মোড়ার উপর আমাদিগের নিকট উপবেশন করিলেন, করিয়া বলিলেন, "আমি পীড়িত, অম্বলের পীড়ায় ভুগিতেছি, তাই আমি ১০টার সময় আহার করি, সেজন্য বাপু তোমরা কিছু মনে করিও না।" আহারের আয়োজন দেখিয়া আমরা অবাক হইলাম; সুখী হইলাম। প্রত্যেকেরই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থালার উপর সুন্দর চাউলের অন্ন ও থালাগুলি চারিদিকে ব্যঞ্জনপূর্ণ বহু বাটিতে বেষ্টিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বেশ সুরসিক পুরুষ ছিলেন। আমরা

যখন ভোজনে রত তখন তিনি হুঁকা হাতে করিয়া নানারূপ গল্প জুড়িয়া দিলেন। একটি সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া নিমন্ত্রণে ভোজনের বিষয়ে বলিলেন, জন্ম বার বার হইতে পারে, কিন্তু নিমন্ত্রণ সকল সময় ঘটিয়া উঠে না; সেজন্য, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের উচিত, ভোজনের সময় লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া উচিতমতই ভোজন করা, ইত্যাদি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ মিষ্ট গল্পের সঙ্গে আমরা মিষ্ট ব্যঞ্জনাদি দ্বারা রসনারও তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিলাম। এইরূপে আমাদের ভোজন শেষ হইয়া গেল।

আমরা উপরতলায় গেলাম। বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী রূপেই তাঁহার গৃহটি সাজান দেখিলাম। চারি দিকে পুস্তকের আলমারি—চক্‌চকে গ্রন্থাদিতে পূর্ণ। সে-সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয় ও আমি ছিলাম। গৃহস্বামী আমাদিগের সহিত বসিয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আমি কাচে আবৃত শেলফের পুস্তকগুলির প্রতি বার-বার তাকাইতে লাগিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, বলিলেন, "এস বই দেখাই," এই বলিয়া এক-একটি শেলফ খুলিয়া বই দেখাইতে লাগিলেন। ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি বিশেষ বিশেষ বিভাগে সজ্জিত করা হইয়াছে। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। সমস্ত পুস্তক একই রকমের বাঁধান। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, বিলাতের পুস্তক-বিক্রেতাদিগের নিকট এইরূপ বলা আছে, যে, নূতন ভাল পুস্তক বাহির হইলে, তাহারা একরূপ বাঁধাই করিয়া, আমার এখানে পাঠাইবেন। দেখিলাম, আরভিঙের স্কেচ-বুক, এই সামান্য দরের পুস্তকখানিও অন্যান্য দামী পুস্তকের মত বাঁধান হইয়াছে। বইখানি কিনিতে যে খরচ পড়িয়াছে তাহা অপেক্ষা বাঁধাইয়ের মূল্য অধিক। এই সকল উৎকৃষ্ট গ্রন্থরাজির মধ্যে বসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সময় যাপন করিতেন। এত বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের পাশ্চাত্য সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনের প্রতি কি প্রবল অনুরাগই তাঁহার প্রকাণ্ড লাইব্রেরী প্রকাশ করিতেছে, তখন এই কথাই মনে আসিতে লাগিল। বইগুলি তাঁহার এতই অনুরাগের ও ভালবাসার সামগ্রী ছিল যে, কোন ব্যক্তি ঐ লাইব্রেরীর বই পড়িতে চাহিলে তিনি তাহা কখনই দিতেন না; এই কথা বলিতেন, উহা দিলে তাঁহার প্রাণে লাগে। উহা না-দিয়া তিনি সে পুস্তক একখানি কিনিয়া দিতেও প্রস্তুত হইতেন।

এই দিনই বিদ্যাসাগর মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, এখানে দরিদ্র ব্যক্তিরা শীতকালে অনেকেই বস্ত্রাভাবে কষ্ট পায় বটে, কিন্তু বিলাতে কি নিদারুণ শীত, সেখানে শীতকালে দরিদ্র কৃষক প্রভৃতি কত কষ্টই না ভোগ করিয়া থাকে ইত্যাদি। এইরূপ কথা বলিবার সময়, লেখকের যত দূর স্মরণ হয়, দয়ার সাগর বিদ্যা-সাগরের দুইটি চক্ষু যেন অশ্রুসিক্ত হইয়া পড়িল। চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয় ও আমি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তাই আজ মনে হইতেছে, পণ্ডিতেরা তাঁহার সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি দর্শনে তাঁহাকে যে "বিদ্যাসাগর" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা উপযুক্ত পাত্রেই প্রদত্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাংলার অগণ্য জনসাধারণ তাঁহাকে যে "দয়ার সাগর" নামে অভিহিত করিয়াছিল, ইহা যেন তাঁহার জীবনের পক্ষে যোগ্যতর উজ্জ্বলতর উপাধি।

আর একদিন চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগর-ভবনে গমন করি। মৈত্র মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার সময় ঠিক সহজ পথে না গিয়া একটু ঘুরিয়া যাই। সেদিনও তিনি আমাদিগকে বেশ প্রীতির সহিতই অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু মৈত্র মহাশয় আমার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলেন, "ইনি আমাকে বড় ঘুরিয়ে এনেছেন।" বিদ্যাসাগর বৃদ্ধের এই কথা শুনিয়া আমায় বলিলেন, "সে কি গো, তুমি এই বুড়ো মানুষকে এত ঘুরিয়ে আনলে?" বলিয়াই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা বাপু! তুমি কি কর?" চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয় তদুত্তরে বলিলেন, "ইনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক জন প্রচারক।" শুনিয়াই বিদ্যাসাগর বলিলেন, "বাপু! এ সংসারের পথেই যদি মানুষকে এইরূপে ঘুরাইয়া আনিতে পার, তাহলে ধর্ম্মের পথে মানুষকে কত যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে, তা কে জানে?" ইত্যাদি। পরে ধর্ম্ম বিষয়ে দুই একটা কথা এই প্রসঙ্গে উত্থাপন করিলেন। বলিলেন, "ধর্ম্ম বড় জটিল জিনিষ, আমি এ-বিষয়ে বড় কিছু বুঝিতে পারি না।" পরে আত্মার কথা তুলিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে 'আত্মা' কি?

এ-বিষয়ে অনেকরূপ সংজ্ঞাদি প্রদত্ত হইয়াছে কিন্তু আমি সে-সকল বিষয়ের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারি না" ইত্যাদি। পরে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাপু, ধর্ম্মপ্রচার বড়ই কঠিন কাজ, প্রকৃত পথ দেখাইতে না পারিলে মানুষের অনিষ্টই সাধন করা হয়।" এইরূপ কিছু বলিয়া চুপ করিলেন।

মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, বিদ্যাসাগর মহাশয় ঠিক কথাই বলিতেছেন। ধর্ম্মের ভ্রান্ত মত প্রচারে মানব-সমাজে কতই না অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। ধর্ম্মের গোঁড়ামিতে কত দলাদলির সৃষ্টিই না হইয়াছে, কত রক্তপাতই না হইয়াছে! অতএব ধর্ম্মপ্রচার কঠিন কার্য্য, এবং ধর্ম্মপ্রচারকের কার্য্যও বড় গুরুতর কার্য্য।

যে-সময়ের কথা বলিতেছি, সে-সময় বঙ্গদেশে স্বর্গীয় পণ্ডিতবর শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের আন্দোলন সবেমাত্র সুরু করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিষয়ে বলিলেন, "পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। তিনি আমাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'আপনি হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের জন্য আসিয়াছেন আমি তাহা শুনিয়াছি। আপনি শাস্ত্রাদি কোথায় পাঠ করিয়াছিলেন?' উত্তরে তিনি বলিলেন, 'কাশীধামে।' জিজ্ঞাসা করিলাম,'কি পড়িয়াছিলেন?' বলিলেন, 'দর্শন শাস্ত্র,' এই কথা শুনিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মের, সাদা, রাঙা, নীল, কালো, এমন সকল রং কোথায় পেলেন? আমিও দর্শন পাঠ করিয়াছি, কিন্তু দুর্বোধ্য বিষয়, কিছুই ভাল বুঝা যায় না। পণ্ডিত মহাশয় পড়াইবার সময় যখন জিজ্ঞাসা করিতেন, "ঈশ্বর বুঝ ত?' আমি বলিতাম, 'আপনিও যেমন বুঝেন, আমিও তেমনি বুঝি, পড়িয়ে যাচ্ছেন পড়িয়ে যান।' পণ্ডিত মহাশয় আমার এই কথা শুনিয়া খুব হাসিতেন।'" তৎপরে বিদ্যাসাগর মহাশয় চূড়ামণি মহাশয়কে বলিলেন, "আপনাকে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের জন্য যাঁহারা আনিয়াছেন তাঁহারা যে কিরূপ দরের হিন্দু তাহা ত আমি বেশই জানি, তবে আপনি এসেছেন, বক্তৃতা করুন। লোকে বলিবে, বেশ বলেন ভাল। এইরূপ একটা প্রশংসা লাভ করিবেন, এই মাত্র।" বলিয়া বলিলেন, "আমার স্কুলের ছেলেরা যে মুরগীর মাংস খায়, আপনার বক্তৃতায় তাহারা যে মাংস ছাড়িবে আমি তাহা একেবারেই বিশ্বাস করি না।" তৎপরে একটু রসিকতাচ্ছলে তিনি চূড়ামণি মহাশয়কে বলিলেন, "দেখুন, হিন্দুধর্ম্ম অজর অমর ও অক্ষয়।" চূড়ামণি মহাশয় বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি উদারচেতা পুরুষ ছিলেন, ধর্ম্ম-বিষয়ে তাঁহার কোনই গোঁড়ামি ছিল না। তবে আমার বিশ্বাস, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অনেক উচ্চে তিনি বাস করিতেন। লোকের ধর্ম্ম-বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা বড় কঠিন বিষয়। তাই এখানে এ-বিষয়ে আর কিছু বলিলাম না।

আর একটি ঘটনার বিষয় বলি। যখন সিটি-স্কুল সংস্থাপিত হয়, তখন ঐ বিদ্যালয়-ভবনে আমি দুইটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করি। একটি 'রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়', অপরটি 'ছাত্র-সমাজ'। শেষোক্ত সমাজের সপ্তাহে একদিন করিয়া অধিবেশন হইত। উহাতে ছাত্রদিগের জন্য উপাসনা ও উপদেশ প্রদত্ত হইত। বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীস্থ ও কলেজের ছাত্রেরাই তথায় যোগদান করিত। বহুদিনই উহার কার্য্য সুচারুরূপে চলিয়া আসিয়াছিল। এই সমাজ হইতে অনেকেই রীতিমত ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিল। সেই সময় একটি কলেজের ছাত্র আপনাদের পরিবার-মধ্যে হিন্দু প্রথানুযায়ী অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দিতে অস্বীকৃত হইলে, তাহার পিতা কলেজের বেতন প্রভৃতি প্রদানে বিরতি প্রকাশ করিলেন। যুবকটি আমাকে এ-সকল কথা জানাইল এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এ-বিষয় জানাইবে বলিল। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গিয়া তাহার ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান এবং এজন্য তাহার কলেজের মাহিনা বন্ধ, ইত্যাদির কথা জানাইল। বিদ্যাসাগর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন কলেজে পড়?" সে বলিল, "আমি আপনারই মেট্রোপলিটান কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ করি।" বিদ্যাসাগর বলিলেন, "বাপু, আমি ত ব্রাহ্ম নই, আর ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আমার কোন যোগই নাই। যাহা হউক, তুমি ভাল বুঝিয়া যে ধর্ম্ম ধরিয়াছ তাহার উপর আমার কিছুই বলিবার নাই।" তৎপরে তিনি তাহাকে এজন্য মাসিক দশ টাকা করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দান করেন। সে যুবাপুরুষটি এই দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে মাসে মাসে ঐ টাকা লইয়া আসিত।

গলি, গরু ও গৌরী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

খোলা জানালা হইতে নীল আকাশের অনেকখানি দেখা যায়। এতখানি অনাবৃত আকাশ দেখা বিশেষ করিয়া অট্টালিকা-অটবীময়ী কলিকাতার মত শহরে দুর্লভ বস্তু ত বটেই, সৌভাগ্যও তাহাতে অনেকখানি। সে সৌভাগ্যের একমাত্র কারণ নীচের অধিবাসীরা; কাঠা-কতক জমিতে খোলার চালা বাঁধিয়া তাহারাই আলো, বায়ু এবং উন্মুক্ত আকাশ-সৌন্দর্য্যকে আমাদের এই নাতিউচ্চ দ্বিতল গৃহে প্রবেশ করিবার অবাধ অধিকার দিয়াছে। আমরা সৌন্দর্য্যই উপভোগ করি। খোলা জানালা দিয়া চাঁদের আলো আসিয়া বিছানায় পড়িলে অতি-পুরাতন কয়েকটি সরস কথা লইয়া হাস্য-পরিহাস করি কিংবা অন্ধকার রাত্রিতে তারাভরা আকাশের পানে চাহিয়া অনুচ্চারিত কবিতার কয়েকটি লাইন মনে করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি। এই সৌন্দর্য্যবোধের মধ্যে যে সৌকুমার্য্য, যে রসোচ্ছ্বাস সেই পরম ক্ষণটিতে উদ্বেল হইয়া মনকে কল্পলোকে উধাও করিয়া লইয়া যায়, মর্ত্ত্যবাসীর সে এক শ্রেষ্ঠতম বিলাস ছাড়া আর কি! কিন্তু বিলাসী মনও মাঝে মাঝে আকাশ ছাড়িয়া সঙ্কীর্ণ গলির উপর বিচরণ করিতে থাকে। সেখানে সৌন্দর্য্য উপভোগের লেশমাত্র নাই, তথাপি অতি রূঢ় বাস্তবকে সে চাহিয়া চাহিয়া খানিকক্ষণ দেখে। দেখে মিউনিসিপ্যালিটির কৃপাবর্জ্জিত অসমতল গলিটার উপর একটি গরু বাঁধা রহিয়াছে, জাব খাইবার গামলার চারি পাশে বহু মাছি মশা উড়িতেছে, গরু লেজ নাড়িতেছে এবং সর্ব্ব দেহ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে গলার ঘণ্টা বাজিতেছে ঠুং—ঠুং—ঠুং। গরু থাকিলেও গলিটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উপরে আমরা ব্রাহ্মণ আছি বলিয়া নহে—গরুরই স্বাস্থ্যের খাতিরে মলমূত্রাদি সেখানে জমিতে পায় না। কিন্তু আপাততঃ গো-দেবতার অনুসরণ করিয়া আমরা যেখানে পৌঁছিয়াছি সে একটি অতি সঙ্কীর্ণ গলি; গলির গায়ে নাতিউচ্চ খোলার চালা এবং চালায় যাহারা বাস করে তাহারাও সম্ভবত ভক্তিমান।

তাহার মানে প্রায়ই দেখি একটি অনতিক্রান্তযৌবনা নারী ছেঁড়া চটের পর্দ্দা ঘেরা দুয়ারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। গোমাতার গায়ে গোবরের একটি ফোঁটা লাগিলে আপন আঁচল দিয়া সযত্নে মুছিয়া লয়—এ-ধারে ও-ধারে খড়ের কুটা পড়িয়া থাকিলে সেটি কুড়াইয়া গামলায় রাখিয়া দেয়—খালি বা ঝালরওয়ালা গলায় হাত বুলাইয়া অ-বোলা দেবতাকে আদর করে। গরুর চেহারাটি বেশ নাদুসনুদুস; গামলায় যে বিচালী পরিপাটি করিয়া কুচানো থাকে নুন- ও খোল-গোলা জলের সঙ্গে ঐ মেয়েটি চুড়ি-পরা হাতে যখন জাব না মাখিয়া দেয় তখন মর্ত্ত্যের মানুষও সে-দিকে চাহিয়া যে লোভাতুর হইয়া উঠিবে—সে আর এমনই কি বিচিত্র!

গরুর যত্ন লইতে অনেকগুলি প্রাণীকেই তৎপর দেখিতে পাই। বছর চল্লিশের একটি পুরুষ যখন-তখন গলির প্রান্তে দাঁড়াইয়া গলি এবং গরুকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে থাকে। গামলা যদি অপরিষ্কার থাকিল, বিচালী যদি অপর্য্যাপ্ত দেওয়া হইয়া থাকে কিংবা গরুর গায়ে কাদা-গোবর লাগিয়া থাকে ত নেপথ্যচারিণীর উদ্দেশে আরম্ভ হয় তীক্ষ্ণ বাক্যবাণের বর্ষণ। ঝাঁটা হাতে লইয়া সে নিজেই একবার গলিটার এ-মুড়া হইতে ও-মুড়া পর্য্যন্ত ঝাঁট দিয়া গামলায় খানিকটা জল ঢালিয়া দেয় এবং মাথা হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত হাত বুলাইয়া গরুকে খানিক আদর করিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া ঢোকে।

তার পর অসতর্ক মুহূর্ত্তে গো-দেবতার কাছে যাহার আবির্ভাব হয়—সে একটি আট বছরের ফুটফুটে মেয়ে। খোলার ঘর হইতে বাহির হইতে না দেখিলে তাহাকে ও-পাশের সৌধবাসিনী কল্পনা করিলে কিছুমাত্র অশোভন হইবে না। অসূর্য্যম্পশ্যা সৌন্দর্য্যময়ীর মতই তাহার অতি কোমল দেহ, বর্ণে প্রভাত-সূর্য্যের আশীর্ব্বাদ এবং লালিত্যে বৈষ্ণব কবির পদাবলীর মতই সে তনু-সম্পদশালিনী। কোঁকড়া চুল কাঁধের উপর ফণীশিশুর মতই দৌরাত্ম্যশীল, ভাসা-ভাসা টানা চোখ গৌর মুখে উজ্জ্বল মণির মত শোভাময়।...কবে যে ক্ষুদ্র কোরক বৃন্ত-সংলগ্ন হইয়া অঙ্কুরিত হইয়াছে সে খবর আমাদের অগোচর এবং কবেই কুঁড়ির বন্ধন মুক্ত হইয়া পূর্ণ গৌরবে সে ফুল হইয়া ফুটিবে তাহাও হয়ত আমরা দেখিব না, কেবল এই মধ্যবর্ত্তী কাল বিকচোন্মুখ ক্রমবর্দ্ধমান কুঁড়িটির লাবণ্যে আমরা তার অনাগত গৌরবময় ভবিষ্যতের একটা সৌন্দর্য্য অনুমান করিয়া লইতেছি।...

মেয়েটির আসিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। সে প্রায়ই আসে। আসিয়া গরুর তৈলনিষিক্ত পিঠে ছোট হাতখানি রাখিয়া কত কি আদরের কথা বলে। গদগদ কণ্ঠের সেই অস্ফুট আবৃত্তির ধ্বনি অর্থময় না হইলেও আমাদের

কানে বড়ই মধুর হইয়া বাজে। খাওয়া ছাড়িয়া অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষে গরুও সে-আদর উপভোগ করে।

এই বদ্ধ বোবা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে প্রতিদিন একটি গরুকে লইয়া আদর, যত্ন, সেবা ও মমতার যে-কাহিনী রচিত হইতে থাকে উপরের খোলা জানালায় বসিয়া অবসর মুহূর্ত্তে সে-কাহিনী পড়িয়া সত্যই আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করি।

* * *

সে দিন অবসর ছিল। গলির পানে চাহিতেই দেখিলাম গরুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া মেয়েটি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গায়ে গা ঠেকাইয়া মৌন মুহূর্ত্তকে এই অ-বোলা প্রাণী ও বাঙ্‌ময়ী বালিকা যেমন গভীর ভাবে অনুভব করিতেছে এমনটি ত কোন দিন নজরে পড়ে নাই। বাক্যের ধ্বনিতে অনুভবের গাঢ়তা যে বহুলাংশে নষ্ট হয়, এই মুহূর্ত্তে সেকথা বার বার মনে হইল। হৃদয়ের মধ্যে যখন ভাবের আধিক্য থাকে না তখনই বাক্য দিয়া আমরা কোলাহল জমাই।

ওপারের খোলা দুয়ার হইতে উচ্চস্বর ভাসিয়া আসিল,—ও মা গো—দেখ গো দেখ। গরুর মুখে মুখ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গৌরী। আমি যাব কোথায় গো! ও লো, ও হিমি—হিমি—দেখ্‌ সে লো—দেখ্‌ সে তোর মেয়ের কাণ্ড।

হিমি মানে গরুর শুশ্রূষাকারিণী সেই অনতিক্রান্তযৌবনা মেয়েটি।

সে আসিল এবং তাহার পিছনে আরও অনেকে আসিয়া দাঁড়াইল। গোলমালে মেয়েটি গরুর কাঁধ হইতে মাথা তুলিয়াছে এবং গরুও গামলায় জাব্‌না খাইতে ঘাড় হেঁট করিয়াছে। যে-কথা চলিতেছিল তাহা যেন অকস্মাৎ শেষ হইয়া গেল।

মৌনভঙ্গকারিণীই গৌরীর হাত ধরিয়া এদিকে আনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, কাণ্ড দেখে ত অবাক! হ্যাঁ লো গৌরী,—কি কথা হচ্ছিল বুধির সঙ্গে। সই পাতিয়েছিস বুঝি ওর সঙ্গে? তা মানিয়েছে বেশ। তোর যেমন নধর-কান্তি গরু, হিমি—দুদণ্ড চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে,—তেমনি লক্ষ্মীর মত মেয়ে। ওদের দুটিতে মানিয়েছে বেশ।

—সকলেই হাসিল।

হিমি অর্থাৎ হেমাঙ্গিনী বলিল, আর দিদি, গরীবের ঘরে কি-ই বা আছে যে যত্ন করব। ওরও যেমন গরু-অন্ত প্রাণ, মেয়েটারও তাই।

প্রতিবেশিনী বলিল, এখন এত যত্ন আত্তি সার্থক হয় তবে ত! দুধ না দিলে সব ভস্মে ঘি ঢালা! আমাদের ওনারও একবার সাধ হয়েছিল গরু পুষতে। আনলেন দুধুলি গাইয়ের এক বকনা। সে কি যত্ন! খোল রে, ভূষি রে, কাঁঠালের ভুতুড়ি, আমের খোলা, লাউ সেদ্ধ, নুন—পহরে পহরে গেলানো। ওমা! বিইয়ে দিলে কিনা দেড় সের দুধ! খেয়ে খেয়ে গরুর গতর ফেটে পড়তে লাগল—দুধ আর বাড়ে না। বললাম, দাও ঝাঁটা মেরে বিদেয় ক'রে। তার পর দিনই—

হেমাঙ্গিনী বলিল, আহা! বিদেয় করে দিলে? এতদিন পুষে একটু মায়া হ'ল না।

প্রতিবেশিনী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, মায়া! পোড়া কপাল মায়ার। যে জন্যে পোষা তাই যখন হ'ল না—তখন মায়া কিসের? তাই কি দিলেন গোয়ালাকে! দুধ দেখে কেউ দাম দেয় না। শেষপরে কসাই ডেকে—

হেমাঙ্গিনী গরুর পানে সত্রাসে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, আমি কিন্তু তা পারব না, দিদি। দুধ দিক আর নাই দিক—বুধি আমাদেরই থাকবে।

প্রতিবেশিনী হাসিল, দেখা যাবে লো, দেখা যাবে। বলে সব মায়া টাকার সঙ্গে। তা যাই বল ভাই, তোর কপাল ভাল। লোকসান নেই। এমন ফুটফুটে মেয়ে—

হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিল, মেয়ে আমার খুবই সুন্দরী, না দিদি? আমার মায়ের চোখ, ওর খুঁত ত কোথাও দেখতে পাই না। দেখ দেখি একবার—নাক, মুখ, চোখ। বলিয়া গৌরীর হাসিমাখা মুখখানি তুলিয়া ধরিল।

প্রতিবেশিনী বলিল, কোথাও খুঁত নেই—যেন দুগ্‌গো পিরতিমে। 'গৌরী' নাম ওর সার্থক, হিমি। কি বলিস লো তোরা?—বলিয়া অন্য সকলের পানে চাহিল।

সকলেই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হিমির বরাত ভাল। ওই মেয়ে হ'তেই ও রাজার হালে থাকবে।

হেমাঙ্গিনী হাসিমুখে বলিল, তাই আশীর্ব্বাদ কর দিদি, ভগবান ওকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমার সুখ চাই নে—মেয়ে যেন সুখী হয়।

প্রতিবেশিনী বলিল, আশীর্ব্বাদ করতে হবে না, ভাই, তোর মেয়ের যা রূপ, কোন রাজারাজড়া ওকে লুফে নেবে। বলিয়া হাসির মাত্রাটা সে বাড়াইয়া দিল।

হেমাঙ্গিনী মেয়েকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, ষাট! ষাট! আমি ওর বিয়ে দেব। বেশ ভাল চরিত্রের একটি ছেলে, বিদ্বান, খাওয়াপরার কষ্ট নেই—কিন্তু হেমাঙ্গিনীর কথা শেষ হইল না। প্রতিবেশিনীরা এমনই হাসির রোল তুলিল যে বিরক্ত হইয়া গৌরীর হাত ধরিয়া হেমাঙ্গিনী বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

* * *

প্রতিবেশিনীদের হাসিটা কিছু মাত্র অন্যায় বা অশোভন হয় নাই। যে-দেশে তাহাদের বাড়ী, সূর্য্য সেখানে কোন দিনই উঠেন নাই, উঠিবার কল্পনাও কেহ করিতে পারে না। চারিদিকের বড় বড় অট্টালিকার খোলা দুয়ার ও জানালায় কত কালো বা সুন্দর ছেলেমেয়ে হাসি-খেলায় নক্ষত্রের মতই ইহাদের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে। বিদ্যুতের আলো পড়িয়া সে হাসি উজ্জ্বলতর হয়। কত দিন কত না মুহূর্ত্তে

সৌভাগ্যবতীদের সৌভাগ্য ঘোষণা করিয়া মাঙ্গলিক শঙ্খ বাজিয়া উঠে, বহুকণ্ঠের হুলুধ্বনি শোনা যায় এবং সানাইয়ের রাগিণী-আলাপ, হাসি-আনন্দের টুকরা সব-কিছুই এই নিরালোক দেশের অধিবাসিনীদের চোখে মরীচিকার মত ফুটিয়া উঠিয়া বিভ্রম জন্মায়। তাহারা জানে ও-জগৎ হইতে বহুদিন হইল তাহাদের নির্ব্বাসন ঘটিয়াছে। বৃথা ওদিকে চাহিয়া হৃদয়ের বারিধিতে ঢেউ তুলিয়া চোখের কোণ ভিজাইয়া লাভ কি? আলো যেখানে দুষ্প্রাপ্য সেখানে অন্ধকারকে মন-প্রাণ দিয়া না লইয়া উপায় কি!...আলোককে উপহাস করিয়া তাই তাহারা অন্ধকারকে ভালবাসিতে চেষ্টা করে। বিবাহের কথা শুনিয়া তাই প্রতিবেশিনীদের হাসি অত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

গৌরীর মা কিন্তু সে হাসি গায়ে মাখিল না, মেয়ের সৌন্দর্য্যসাধনে যত্নবতী হইল। একে ত এই অন্ধকার খোলার ঘর—পরিচয়-কৌলীন্যের গর্ব্ব করিবার কিছু নাই। সে জানে, ওপারের আলো আসিয়া এ-পারের অন্ধকারাবৃত অঙ্গন কোন দিনই উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে না, তবু আশা! এ শহর কলিকাতা, সমাজবন্ধনের মধ্যে কেহ সাধ করিয়া মাথা গলাইতে চাহে না, অসবর্ণ বিবাহের ঢেউ রীতিমত উত্তাল। কাগজে বা বইয়ে সে প্রায়ই পড়িতেছে, লোকের মুখেও শোনা যাইতেছে—কত বিদ্বান গুণবান কৃতী যুবক মাত্র রূপের নেশায় ভালবাসিয়া এমনই কুমারী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছে। যদি কোন শুভ মুহূর্ত্তে প্রজাপতির রঙীন পাখায় ভর করিয়া আলোর এক টুকরা—এই অন্ধকারের বুকে অতর্কিতে আসিয়া পড়ে...হেমাঙ্গিনীর কল্পনা দিনের পর দিন সেই সোনালী আলোর স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকে।...

গৌরীর বাপের নাম শম্ভু। লোকটা রোগা হইলেও স্বাস্থ্যবঞ্চিত নহে এবং সর্ব্বদা রুক্ষ মেজাজেও থাকে না। ফলের ঝুড়ি মাথায় করিয়া ফিরি করে বলিয়াই হয়ত অন্তর তার স্বাদুতায় ভরা। হেমাঙ্গিনীর খামখেয়ালে সে বাধা দেয় না, বরং খুশী হইয়া বাহিরের দুয়ারে বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে গরুর পানে চাহিয়া প্রশ্ন করে, হ্যাঁ রে হিমি, গরুটা আগের চেয়ে যেন চেকনাই দিয়েছে, না রে?—

ভিতর হইতে অনুযোগভরা কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসে, আজ মঙ্গলবার, অমন ক'রে চোখ দিয়ো না বলছি।

—না, তাই বলছি। বলিয়া প্রসন্ন মনে শম্ভু তামাক টানিতে থাকে।

গৌরী আসিয়া পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া আব্দার ধরে, কই, আমার পাউডার আনলে না, বাবা!

শম্ভু মেয়ের দিকে ফিরিয়া বলে, ছাই পাউডার। তোর এমন গোলাপ ফুলের মত রং—কি হবে ও ছাইভস্ম মেখে!

—না—আ—আ,—মেয়ে স্বর টানিবার উপক্রম করিতেই শম্ভু তাড়াতাড়ি হুঁকা নামাইয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া আদর করিয়া বলে, হবে রে হবে। ভাল একঝুড়ি ল্যাংড়া আম আছে, কাল বেচে যা লাভ হবে—আগে তোর পাউডার—তার পর—

গৌরী আনন্দে বাপের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, তুমি খুব—খুব ভাল, বাবা।

শম্ভু তামাক টানা বন্ধ করিয়া একবার গরু, একবার গৌরীর পানে চাহিয়া কত কি ভাবিতে থাকে।

* * *

এমনি করিয়া কিছু দিন যায়। ক্ষুদ্র কুটীরে অত্যাসন্ন শুভলগ্নের প্রতীক্ষায় শম্ভু ও হেমাঙ্গিনী রীতিমত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এই মাসেই গরুর বাছুর হইবে। দুধের একটা লাভজনক পরিমাণ এবং বিক্রয়ের পড়তা ধরিয়া মোটা টাকার অঙ্কটিকে লইয়া দুই জনেই মনে মনে কত কি ভাঙাগড়া করিতেছে। গরুর দু-পাশে দাঁড়াইয়া সকাল, সন্ধ্যা ও রাত্রিতে তাহাদের আকাশ-কুসুম চয়ন চলে।

শম্ভু বলে, লাউ খাওয়াতে পারলে নাকি গরুর দুধ ডবল হয়। হেমাঙ্গিনী বলে, ভাত ফেন দিলেও মন্দ বাড়ে না। তার চেয়ে এক কাজ করলে হয়—কলাই-সেদ্ধ দেওয়া যাবে ধর যদি আট সের দুধ হয়—তার এক সের রাখব ঘরে—আর সাত সের বিক্রী ক'রে—

দুধ বিক্রয় করিয়া কি হইবে—সে-সব অনতিরঞ্জিত দীর্ঘ কাহিনীর পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কখনও ধানের জমি কেনা হয়, কখনও চালার বদলে কোঠা উঠে, কখনও হেমাঙ্গিনীর অলঙ্কারের ফর্দ্দ তৈয়ারী হয়—কখনও বা গৌরীর বিবাহ লইয়া রঙে রেখায় সুদৃঢ় ভবিষ্যতের ছবি আঁকা চলে। চঞ্চলা মেয়েটি এ-সব সাংসারিক সুখ-সাধের তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও অপরিণত বুদ্ধি দিয়া অনুভব করে,—একটা কিছু শুভ আবির্ভাবে বাবা মা তাহার উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে এবং সন্দেশ খাওয়ার মত সেই লোভনীয় ব্যাপারটা যে কবে ঘটিবে তাহারই ব্যগ্র প্রতীক্ষায় চক্ষু দুইটিতে তাহার আনন্দ উপচিয়া পড়ে। গরুটিকে কেন্দ্র করিয়া ওই বাড়ীতে উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং সব কয়টি প্রাণীই ত্বরান্বিত হইয়া সেই দীর্ঘদিন-বাঞ্ছিত সুন্দরের প্রতীক্ষা করিতেছে।

* * *

এমনই শুভদিনের সূচনায় সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে দেবদূতের মত যে আসিল—তার আগমনের হেতুটা আগে বলি।

গলি হইতে মিনিট-খানেকের পথ বড় রাস্তা এবং তার পরেই গোলদীঘি।

সকালে বিকালে এই চতুষ্কোণ দীঘির চারি ধারে যে-সব স্বাস্থ্যকামী দ্রুত পায়চারি করিয়া বিশুদ্ধ (?) বায়ু সেবন করিয়া থাকেন ছেলেটি তাহাদেরই অন্যতম। গৌরী ত প্রত্যহ

সাজিয়া গুজিয়া রঙীন ফুলটির মত দীঘিতে গিয়া ফুটিয়া থাকে। অবশ্য জলে নহে, স্থলে—জড় নহে, রীতিমত সক্রিয় এবং চঞ্চল। গৌরীর আরও অনেক সাথী আছে। এ-পাড়া ও-পাড়া হইতে বেড়াইতে আসিয়া, লুকোচুরি খেলার সূত্রে আলাপ জমিয়াছে। সে দিন লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে জনাকীর্ণ গোলদীঘির চক্রপথ দিয়া ছুটিতে ছুটিতে গিয়া গৌরী নাকি এই ছেলেটির সাম্‌নে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। পড়িয়াই সে উঠিল, কিন্তু নিজের দেহের পানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অমন সুন্দর জামাটা কাদামাখা হইলে তত দুঃখ ছিল না, এমন ভাবে ছিঁড়িয়াছে যে রিপু করিলেও গায়ে দেওয়া চলিবে না। হাতের মায়াপুরী মেটালের চুড়ি ক-গাছা বাঁকিয়া গিয়াছে আর কপালের খানিকটা কাটিয়া বেশ রক্ত গড়াইতেছে। ছোট মেয়ে—কাঁদিবারই কথা।

ছেলেটি হয়ত থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কি সান্ত্বনাও দিতে গিয়াছিল কিন্তু এ-সব ক্ষেত্রে ক্ষতির কথাই মনে বদ্ধমূল হয়, সান্ত্বনার স্নিগ্ধ প্রলেপ অঙ্গারের মতই মনকে পোড়াইতে থাকে; ক্রন্দনের বেগ কমে না, বাড়িয়াই চলে।

তাই হয়ত ছেলেটি গৌরীর বাড়ীর ঠিকানা জানিয়া এবং বেশী দূর নহে বলিয়া ভদ্রতা করিয়া রোরুদ্যমানা গৌরীর হাত ধরিয়া গলির মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে।

গৌরীর ক্রন্দনের ইতিহাস গলির মুখেই শোনা গেল এবং গৌরীর মা সুন্দর সুবেশ ছেলেটিকে পলকহীন প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখা ছাড়া খোলার কুটীরে আহ্বান করিয়া বসাইতে পারিল না, পরিচয় জিজ্ঞাসা ত দূরের কথা!

গৌরী তখনও কাঁদিতেছে দেখিয়া ছেলেটি সান্ত্বনা দিয়া বলিল, কেঁদ না খুকী, তোমায় ওর চেয়ে ভাল জামা কাল আমি কিনে দেব।—বলিয়া গৌরীর মাকে উদ্দেশ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, ওকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যাও—কাল আমি আসব আবার।

ছেলেটি চলিয়া গেলে সেই প্রতিবেশিনী রহস্য করিয়া বলিল, তা যাই বল ভাই, গৌরী তোমার স্বয়ম্বরা হ'য়ে আপনি বর ধ'রে এনেছে। দিব্যি মহাদেবের মত বর।

হেমাঙ্গিনীও হাসিল, কিন্তু নামটি ওর জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলাম, দিদি।

প্রতিবেশিনী বলিল, নামে যাই হোক—তোদের কাছে ও গৌরীর বর—শিব। দেখে বোধ হয় অবস্থা ভাল। তোর কপাল ভাল। কাল আবার জামা না কি আনবে বললে?—

হেমাঙ্গিনী বলিল, দিক্ চাই না-দিক্—ওই রকম একটি ফুটফুটে ছেলের সঙ্গেই দিব্যি মানাবে।—বলিয়া গৌরীকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

* * *

পরদিন জামা লইয়া ছেলেটি সত্যসত্যই আসিল। দুয়ারে দাঁড়াইয়া কি বলিয়া ডাকিবে ভাবিতেছে, এমন সময় গৌরী ছুটিয়া আসিয়া জামার মোড়কটিতে হাত দিয়া বলিল, এটাতে কি আছে? কই, আমার জামা আনলে না?

ছেলেটি ডান হাতের আঙুলে তাহার দুটি গালে অল্প একটু চাপ দিয়া হাসিমুখে বলিল, ক-টা জামা তোমার চাই, খুকী?

গৌরী ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, বাঃ রে! আমি বুঝি খুকী? আমি ত গৌরী।—বলিয়া এ-দিক ও-দিক চাহিয়া সমর্থনযোগ্য কাহাকেও না পাইয়া গরুটাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, কি রে বুধি, আমি গৌরী নয়?—

গরু গামলা হইতে মুখ তুলিয়া গৌরীর পানে চাহিতেই গৌরী খিল-খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, দেখলে, বুধি কেমন আমার কথা বুঝতে পারে?

গৌরীর হাসির শব্দে হেমাঙ্গিনী বাহির হইয়া আসিল; ব্যস্ত হইয়া বলিল, ওমা, তুমি দাঁড়িয়ে আছ, বাবা। আ বলি কার সঙ্গে না কার সঙ্গে গল্প করছে। যা না গৌর টুলখানা এখানে এনে দে। যে ঘর, বসবার জায়গা ত নেই!

ছেলেটি ব্যস্ত হইয়া বলিল, থাক্, থাক্, দাঁড়িয়েই বেশ আছি। এই দেখ—গৌরীর জামা এনেছি—একবার গায়ে দাও ত দেখি।

হেমাঙ্গিনী হাসিমুখে জামার বাণ্ডিলটা হাতে লইয়া লজ্জিত স্বরে বলিল, এ আবার কেন, বাবা?—

ছেলেটি বলিল, আমি আসি, একটু কাজ আছে।

গৌরী টুল আনিয়া বলিল, ব'স।

ছেলেটি হাসিল, আজ ব'সব না, আর একদিন আসব।

হেমাঙ্গিনী আজও বসিবার অনুরোধ করিতে পারিল না। ছেলেটির বেশবাসে ও চেহারায় আভিজাত্য অতি মাত্রায় পরিস্ফুট ছিল বলিয়াই হয় ত দরিদ্র বস্তিবাসিনীর কণ্ঠে সহজ আত্মীয়তার সুরটুকু ফুটিতে পারিল না। ছোট একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে গৌরীকে বলিল, টুলখানা নিয়ে আয় ত, মা।

জামা গৌরীর পছন্দ হইয়াছে, গায়েও বেশ মানাইয়াছে। জামা গায়ে দিয়া আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে কতবার সে বুধির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, অকারণে কতবার গলির এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

পূর্ব্বোক্তা প্রতিবেশিনী বলিল, কি লো গৌরী, জামা কে দিলে? তোর বাপের দেখছি আজকাল পয়সা হয়েছে!

গৌরী হাত তুলিয়া বলিল, ইস্, বাবার আর দিতে হয় না! পরে দু-হাতে জামার প্রান্তভাগ তুলিয়া বলিল, দেখছ, এ সিল্কের—সুতোর নয়।

প্রতিবেশিনী ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল, ওঃ—তোর বর বুঝি ?

ধ্যেৎ—বলিয়া গৌরী ভ্রূকুটি করিয়া ছুটিয়া পলাইল।

ক্ষণপরে গৌরীর মা গরুকে জাব দিতে আসিলে প্রতিবেশিনী বলিল, কি লো, শিব নাকি জামা দিয়ে গেছে ? দিব্যি জামা দেখলুম। তাই বলছি বরাত তোর ভাল। মেয়ের দৌলতে সোনাদানার মুখ দেখবি, রাজরাণীর সুখে থাকবি।

গৌরীর মা বলিল, আমার সুখ চাই নে দিদি, গৌরী সুখী হলেই হ'ল।

প্রতিবেশিনী বক্র হাসি হাসিয়া বলিল, ওই হ'ল! পোর নামে পোয়াতি বর্ত্তায়। সুন্দরী মেয়ে—বুড়ো বয়সে তোদের ব্যাঙ্কের পুঁজি! তা কত টাকা বায়না দিলে ?

—বায়না কিসের, দিদি? বিস্মিতা হেমাঙ্গিনী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

—নেকী! কিছুই জানেন না! জিজ্ঞেস করিস্ শম্ভুকে—সে জানে।

—সত্যি দিদি, আমি কিছু বুঝতে পারছি নে।—

—মরণ দশা! এত ন্যাকা যারা তাদের আবার এ পথে আসা কেন ?—বলিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিতেই—'ছি' বলিয়া হেমাঙ্গিনী পিছন ফিরিল।

* * *

গলির গায়েই খোলার চালা। একটি মাত্র নাতি-প্রশস্ত জানালা দিবারাত্র খোলা থাকে। ছোট ঘর, মাটির দেওয়াল, মাটির মেঝে। জানালার ধারে তক্তপোষের উপর আড়ম্বরহীন বিছানা পাতা। গোটা দুই তাকিয়া ও ঝালর-দেওয়া মাথার বালিশ দু-টা; বালিশের পাশে একখানা তালের পাখা। তক্তপোষ বাদ দিলে যে-টুকু মেঝে দেখা যায় পরিষ্কার করিয়া নিকানো। হেমাঙ্গিনী দরিদ্র হইলেও পরিচ্ছন্নতার দিকে প্রখর দৃষ্টি আছে। উপরের জানালা হইতে গলি যেমন স্পষ্ট দেখা যায়—ঘরের মধ্যে তক্তপোষে আসিয়া বসিলেও ভিতরের দৃশ্য দেখিতে কিছু মাত্র অসুবিধা বোধ হয় না। কথা পর্য্যন্ত স্পষ্ট শোনা যায়।

গলি হইতে ফিরিয়া হেমাঙ্গিনী ঘরের মধ্যে ঢুকিল। গৌরী তক্তপোষের উপর পুতুল সাজাইয়া খেলা করিতেছিল—মাকে দেখিয়া বড় একটা পুতুল দেখাইয়া কি বলিতে যাইতেছিল—হেমাঙ্গিনী বাধা দিয়া বলিল, পুতুল রাখ্, জামাটা খোল্ দেখি।

গৌরী বলিল, বাঃ রে, এখন খুলব কেন—সেই নাইবার সময়।

শাসনের স্বরে হেমাঙ্গিনী বলিল, খোল্ বলছি। পরের জামা গায়ে দিয়ে আর আদিখ্যেতা করতে হবে না, খোল্।

গৌরী তথাপি প্রতিবাদ করিল, ইঃ, পরের বই কি ? আমাকেই ত দিয়েছে।

হেমাঙ্গিনী অসহিষ্ণু উচ্চ কণ্ঠে বলিল, আবার মুখের ওপর কথা, খোল্ হতভাগা মেয়ে! দিয়েছে ? তোর সাত পুরুষের কুটুম তোকে জামা দিয়েছে! খোল্, আজ এলে যার জামা তাকে ফিরিয়ে দেব।

গৌরী কাঁদিতে কাঁদিতে জামা খুলিয়া রাগ করিয়া তক্তপোষের এককোণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল, এই নে তোর জামা, দিস ফিরিয়ে—তার গায়ে ছাই হবে।

কথাটা হেমাঙ্গিনীর মনে লাগিল। ছোট মেয়ের জামা সে কি করিবে। ফিরাইয়া দিতে গেলে হয়ত রাগ করিবে। তা রাগ করিবে বইকি। যাহার আভিজাত্য স্মরণ করিয়া হেমাঙ্গিনী মাটির ঘরে বসিবার আহ্বান পর্য্যন্ত জানাইতে পারে নাই—জামা ফিরাইতে গেলে তাহাকে রীতিমত অপমান করা হইবে বইকি। সে যে অসৎ এই কথাটাই হেমাঙ্গিনী বার-বার ভাবিতেছে। কোথাকার কার কথা শুনিয়া হেমাঙ্গিনীর মন এমন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে এমন সুন্দর সকালবেলার যত কিছু সৌন্দর্য্য প্রতিদিনকার আনন্দ-ভরা কাজকর্ম্ম সকলই কেমন বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে। দরিদ্রের উপরে দয়া যাহারা করে, তাহাদের অন্তঃকরণের মহত্ত্বকে সন্দেহ করা হেমাঙ্গিনীর উচিত নহে।

মেয়ের রোরুদ্যমান মুখের পানে চাহিয়া হেমাঙ্গিনী খানিকক্ষণ ধরিয়া এই সব কথাই বোধ করি ভাবিল। তারপর জামাটা তুলিয়া লইয়া গৌরীর নিকটে আসিল ও তাহার মাথায় একখানি হাত রাখিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল, নে গায়ে দে জামা। বোকা মেয়ে, তোকে রাগাচ্ছিলাম বুঝতে পারলি নে।

* * *

সন্দেহের বীজ একবার উপ্ত হইলে অঙ্কুরিত না হইয়া পারে না। মেয়েকে সুন্দর করিয়া সাজাইতে হেমাঙ্গিনী দিবসের অনেকখানি সময়ই নষ্ট করে। কাপড় পরাইবার কোন্ ভঙ্গীটি মনোজ্ঞ, চুলের কোন্খানটা ফাঁপাইয়া রাখিলে মুখখানিকে পদ্মফুল বলিয়া ভ্রম হইবে, টিপটি কপালের মাঝখানে যুগ্মভ্রূর সমান্তরালবর্ত্তী করিয়া অতি সূক্ষ্ম ভাবে আঁকিয়া দিলে দেবীপ্রতিমার মত দেখাইবে—এ-সব বিষয়ে হেমাঙ্গিনীর প্রখর দৃষ্টি থাকিলেও মেয়েকে সে চোখে চোখে আগলাইয়া ফেরে। যেমন সে গলিতে গরুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে অমনই দেখা যায় হেমাঙ্গিনী কাজের অছিলায় দোরগোড়ায় উঁকি মারিতেছে; যেন গলিটার খবরদারী না করিলে তাহার প্রধান একটি কাজের অঙ্গহানি হইবে! ছেলেটি যখন আসে তখন ত হেমাঙ্গিনীর সব কাজই পড়িয়া থাকে। গৌরীকে গল্প করিতে দিয়া সে অন্তরালে দাঁড়াইয়া উঁহাদের ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করে। উঁহাদের গল্প শোনে—

হাসি শোনে আর মনে মনে ভাবে কতটুকু তার অশোভন। কোন্ কথাটির অন্তরালে কিসের ইঙ্গিত বা চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে কতটুকু মালিন্যের খাদ মিশানো। ছেলেটি দোর-গোড়ায় টুলে বসিয়া গল্প করে—এখনও তাহাকে বাড়ীর মধ্যে পূর্ণভাবে অভ্যর্থনা করিবার সাহস হেমাঙ্গিনীর হয় নাই—আর হেমাঙ্গিনী ঐ ক্ষুদ্র ঘরের তক্তপোষের উপর শুইয়া শুইয়া উহাদের কথা শোনে, মাঝে মাঝে খোলা জানালা দিয়া আড়চোখে চাহিয়া ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করে।···

আশ্চর্য্যের বিষয় ছেলেটি যখন আসে তখন শম্ভু থাকে না এবং শম্ভু থাকিলে ছেলেটিরও আসিবার সময় হয় না, অথচ ফলের ঝুড়ি নামাইয়া শম্ভু যে গল্প ফাঁদে তাহা ঐ ছেলেটিকেই কেন্দ্র করিয়া। যেন সে কতই পরিচিত—শম্ভুর সঙ্গে আলাপ তার নিবিড়। দুবেলা-দেখা লোকের কথা লইয়াও এমন ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ-আলোচনা কেহ করিতে পারে না। গরুটা তার পরমাত্মীয় সন্দেহ নাই, কেননা অদূর ভবিষ্যতে সে সম্পত্তি স্বর্ণ প্রসবই করিবে—আর ছেলেটি তার চেয়েও পরমাত্মীয়। শুধু গৌরীর প্রসাধনের জিনিষগুলি দিয়াই সে ক্ষান্ত হয় নাই—হেমাঙ্গিনীর চওড়া লাল-পাড় শাড়ী, পদ্মকাটা সেমিজ, শম্ভুর উড়ানী, নাগরা জুতা···কল্পতরুমূলে দাঁড়াইয়া শম্ভু যদি স্বপ্ন না দেখিবে ত কে দেখিবে?

ছেলেটি সেদিনও দুয়ারে বসিয়া আছে। কাছে বসিয়া গৌরী অনর্গল বকিয়া যাইতেছে—কত কি অসলংগ্ন কথা—তার নিজের কথা, বুদির কথা, গোলদীঘির খেলুড়েদের কথা, এ-বাড়ী ও-বাড়ীর কত তুচ্ছ কথা—আর পাশের ঘরে হেমাঙ্গিনী ঠায় শুইয়া শুইয়া সে-সব শুনিতেছে। ঘরে ঝাঁট পড়ে নাই, উঠানে বাসনের গাদা, বিছানা এলোমেলো—হেমাঙ্গিনীর সে-সব গ্রাহ্য নাই। এমন সময় সদর দরজায় ঝাঁকা মাথায় শম্ভুর আবির্ভাব। একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, কে তুমি? এই গিয়ে—আপনি কে?

ছেলেটি হাসিল, তোমারই নাম শম্ভু বুঝি?

ঝাঁকা নামাইয়া শম্ভুও হাসিল, আজ্ঞে হাঁ। তা দোর-গোড়ায় বসে কেন, ঘর ত রয়েছে। বলি—

চীৎকারের উপক্রম করিতেই ছেলেটি বলিল, বেশ ত ফাঁকা জায়গায় হাওয়ায় বসে গৌরীর সঙ্গে গল্প করছি।

শম্ভু কৃতার্থ হইয়া বলিল, গৌরীর সঙ্গে গল্প করছেন? ওর···জানেন ত গৌরী আমার মেয়ে। ভারী সুন্দরী মেয়ে, বেশ গল্প করে ও।—বলিয়া মস্ত একটা রসিকতা করিয়াছে ভাবিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

হাসিটা হেমাঙ্গিনীর ভাল লাগিল না। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দোর গোড়ায় আসিয়া বলিতে লাগিল, সে উনি জানেন। তোমার মেয়ে যে সুন্দরী সে কেবল আমরাই বলি, ওরা ত বস্তির মধ্যে পড়ে থাকে না—তোমার মেয়ের চেয়ে লাখ লাখ সুন্দরী মেয়ে ওদের বাড়ীতে আছে।

শম্ভু মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল, আছে? কক্ষনো না। গয়না গায়ে দিলে সোন্দর হয়? গাড়ী চড়লেই বুঝি সোন্দর হয়? বড় বাড়ীতে থাকলেই বুঝি—

হেমাঙ্গিনী ধমক দিল, মিছে বক্ বক্ ক'রো না, যাও হাত পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হও।

শম্ভু ধমক খাইয়া উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তাহার মনে হইল, ছেলেটি ভাবিবে ঐ রোগা মেয়েটাই বুঝি এ বাড়ীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা আর শম্ভু মানুষ না মানুষ! পৌরুষ-গর্ব্ব লইয়া সে সমান তেজে উত্তর দিল, তুই থাম্, বলি তুই এসব কথার কি বুঝিস? মেয়েমানুষ—মেয়েমানুষের মত থাক। খাও, দাও, কাজ কর, বাস্।—পরে ছেলেটির পানে ফিরিয়া বলিল, কি বলেন বাবু, এর মতন সুন্দরী আছে তোমাদের ঘরে?

ছেলেটি মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, না।

শম্ভু আনন্দে গলিয়া গিয়া বলিল, শুনলি, হিমি, শুনলি? হেমাঙ্গিনীর মুখে উল্লাসের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না। কষিয়া চাবুক মারিলে মুখের প্রত্যেকটি রেখা যেরূপ বেদনায় স্পষ্ট হইয়া উঠে কিন্তু আর্ত্তনাদ করিবার সামর্থ্য থাকে না—হেমাঙ্গিনী তেমনই নিরুপায় অসহায়ার মত চাহিয়া আছে। শম্ভু সে মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, কথাই ত। আচ্ছা, তোর কি আক্কেল বল্ দেখি, বাবুকে বসিয়ে রেখেছিস এই বাইরের গলিতে? ঘরে কি জায়গা নেই?

—তোর রস থাকে বসাগে। ঘর? ঘর আর বলিস নে—খোঁয়াড় বল্। হেমাঙ্গিনী মুখ খুলিল।

—কি, খোঁয়াড়? বলিয়া শম্ভু হুমকি দিয়া উঠিতেই হেমাঙ্গিনী নিঃশব্দে সরিয়া গেল।

তারপর শম্ভু একেবারে বদলাইয়া গেল। ছেলেটির পানে চাহিয়া আপ্যায়িতের হাসি হাসিয়া বলিল, একটু তামাক দেব কি?

ছেলেটি তাড়াতাড়ি বলিল, না তামাক আমি খাই নে। একটু থামিয়া বলিল, তোমাদের সংসার—মানে তোমরা কি করে চালাও!

শম্ভু বলিল, আর বাবু সকাল-বিকাল হাড়ভাঙা মেহন্নত ক'রে যা উপায় করি তাইতেই চলে।—বলিয়া হাসিল।

ছেলেটি আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু সে-সব কথা নিতান্তই সময় কাটাইবার জন্য। সে জিজ্ঞাসা-বাদের মধ্যে কৌতূহল ত ছিলই না, উপরন্তু প্রত্যেক প্রশ্নের পর শম্ভু যখন অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল ছেলেটি গৌরীর হাত লইয়া আঙুল-ধরাধরি খেলা করিতেছিল। ছেলেটি বুদ্ধিমান। জানে, কোন ধনী যদি দরিদ্রের কুটীরে বসিয়া সহানুভূতিহীন প্রশ্নে তার দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী শুনিতে চাহে—কৃতার্থমন্য দরিদ্র ধনীর প্রশ্নের অন্তরালে নিস্পৃহ মনকে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা মাত্র না করিয়া আপন আবেগেই

দুঃখ-দুর্দ্দশার ছবিতে রঙ ফলাইতে আরম্ভ করে। বিশেষ করিয়া শম্ভুর মত দরিদ্রেরা।

উঠিবার সময় ছেলেটি অভিভূত শম্ভুর হাতে একখানি দশ টাকার নোট দিয়া বলিল, নাও, কিছু ভাল খাবার আনিয়ে খেয়ো।

তীব্র আনন্দের বেগ ফেরিওয়ালা শম্ভু সহ্য করিতে পারিল না, চোখে তাহার জল আসিল এবং অঙ্গুলিধৃত নোটখানা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মুখ তুলিয়া কি বলিতে গিয়া দেখে ছেলেটি সেখানে নাই। শম্ভু চীৎকার করিয়া হেমাঙ্গিনীকে ডাকিল, সেদিক হইতে কোন উত্তর না পাইয়া বকিতে বকিতে শম্ভু বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল।

* * *

বাড়ীর মধ্যে মানে সেই ঘরে যেখানে হেমাঙ্গিনী বিছানা ঝাড়িতেছিল—শম্ভু নোটখানা সদ্যপাতা চাদরের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, দেখ্, হিমি, দেখ্—খুব ভাল লোকের ছেলে না হ'লে এমন হয়।

হেমাঙ্গিনী নোটখানার পানে চাহিয়াও দেখিল না,—আপন মনে কাজ করিতে লাগিল।

শম্ভুর রাগ হইবার কথা, কিন্তু আনন্দের চড়া সুরে মন বাঁধা ছিল বলিয়া সে সহজ ভাবেই রসিকতা করিল, মর্ মাগী কাজের গুমোরে চোখে দেখতে পায় না!

এইবার হেমাঙ্গিনী ঝাঁঝিয়া উঠিল, আমার কাজগুলো তুমি করে দেবে কিনা! ও-সব বড়মানুষী গল্প শোনবার আমার অবসর নেই। টাকা? যে টাকা দেখে নি সে-ই জুল্-জুল্ ক'রে চেয়ে দেখুক।

শম্ভু বুঝিল, হেমাঙ্গিনী তাহাকে তাচ্ছিল্য করিয়া ঐরূপ কড়া কথা বলিতেছে। সে আর সহ্য করিতে পারিল না—ঝাঁপাইয়া হেমাঙ্গিনীর উপর পড়িয়া তাহার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিয়া আনিল ও নির্ম্মম ভাবে প্রহার করিতে করিতে বলিল, তবে রে হারামজাদী—বড় টাকার গুমোর হয়েছে তোর? নবাবের বেটী……অভিধান-বহির্ভূত আরও অনেক সম্বোধন করিল। হেমাঙ্গিনী টুঁ শব্দটি করিল না।

প্রহার-শেষে শম্ভু হাঁপাইতে লাগিল—হেমাঙ্গিনী যেন কিছুই হয় নাই এমন ভাবে বিশৃঙ্খল চাদরখানা টান-টান করিয়া পাতিতে লাগিল।

পরের দিন গৌরী তাহার সিল্কের ডোরাকাটা জামা গায়ে দিতে গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শম্ভু ছুটিয়া আসিয়া বলিল, কি রে, কি হ'ল?—রোরুদ্যমানা বালিকা দু'টি হাত দিয়া সুন্দর জামাটি মেলিয়া ধরিয়া ভাঙা গলায় বলিল, দেখ না, বাবা, কে ছিঁড়ে দিয়েছে।

হাত দিয়া টানিয়া ফাঁসাইয়া দিলে যেমন হয় তেমনই বিশ্রী ভাবে জামাটা ছিঁড়িয়াছে। শম্ভু গৌরীর হাত হইতে জামাটি লইয়া উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া বহুক্ষণ দেখিল। দুঃখটা গৌরীর চেয়ে তাহাকে যেন বেশী বাজিয়াছে এমনই ভাবে জামার পানে চাহিয়া সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

গৌরী কাঁদিতে লাগিল, শম্ভু কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া বলিল, ও বেলা বাবু এলে চেয়ে নিস আর একটা।

হেমাঙ্গিনী কোথায় আছে বোঝা গেল না। কেন-না, এতবড় ক্ষতির বিরুদ্ধে সে কোন মন্তব্যই করিল না। দুপুরে গৌরী সেই ঘরে আসিয়া হেমাঙ্গিনীকে বলিল, আজ আমার চুল বেঁধে দিবি নে? বাঃ রে!

হেমাঙ্গিনী বলিল, রোজ-রোজ চুল বাঁধে না, যা।

গৌরী নাকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, বা রে,—আমি বুঝি বেড়াতে যাব না?

হেমাঙ্গিনী বিরক্ত হইয়া মেয়ের পিঠে দুম্ করিয়া এক কিল বসাইয়া দিয়া বলিল, চুলোয় যাবি, আয়।—বলিয়া টানিয়া বসাইয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই কবরী-রচনা শেষ করিয়া দিল।

গৌরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, উঃ, এমন টান-টান করে বেঁধেছ চুল যে মাথায় লাগছে।

দাঁতে দাঁত রাখিয়া হেমাঙ্গিনী বলিল, এখন থেকে বাহার না দিলে মেয়ের মন ওঠে না! পাতা কেটে চুল বাঁধব, টিপ পরব, সিল্কের জামা গায়ে দেব—ভাবন কত—

গৌরী বলিল, বা রে, নিজেই বকেন ধুলো মাখলে—আবার নিজেই—

—হাঁ বকি। তোমায় ত পেত্নী সেজে থাকতে বলি নে, যদিও পেত্নী সেজে থাকাই তোর উচিত। রূপ! রূপ! ও রূপের জন্যে তোর যদি শতেকখোয়ার না হয়—

টান-টান খোঁপা বাঁধা, গায়ে সামান্য সুতার আধ-ময়লা জামা, মুখখানি বিষণ্ণ, তবু গৌরীকে সুন্দরী না বলিয়া উপায় নাই। বুধি গরুর কাছে সে ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল।

ওদিকের দুয়ার হইতে সেই প্রতিবেশিনী বলিল, ও মা, ও কি ছিরি! যেমন খোঁপা বাঁধার ঢং তেমনই জামা পরানোর বাহার! হাজার হোক একটা বড়লোকের ছেলের নজরে—

হেমাঙ্গিনী উল্কার মত গলির মধ্যে আসিয়া তীব্র স্বরে বলিল, যখন-তখন ও-সব খারাপ কথা ব'লো না বলছি।

প্রতিবেশিনীও দমিবার পাত্রী নহে, মুখ বাঁকাইয়া বিঁধিয়া বিঁধিয়া বলিল, ওলো, তেজ দেখে যে আর বাঁচিনে। বলে জন্ম গেল ছেলে খেতে—আজ বলে ডান!

তার পর যে-সব তীব্র গালির স্রোত আরম্ভ হইল তাহার তোড়ে গৌরীর মা গৌরীকে লইয়া গলি হইতে পলাইল। আমরাও জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম।

জানালা বন্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কি এ রহস্য! যে-হেমাঙ্গিনী গৌরীর সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া সগর্ব্বে

বলিত, 'এমন সুন্দরী মেয়ে ক-টা আছে বার করুক না,' যে-হেমাঙ্গিনী গৌরীর সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনে নিজের শ্রেষ্ঠ রুচি দিয়া মনের মত করিয়া সাজাইয়া বার-বার তৃপ্তিভরে চাহিয়া দেখিত, চাহিয়া আর আশা মিটিত না—সে কেন গৌরী সুন্দরী শুনিলে মুখখানিতে আষাঢ়ের মেঘ নামায়? সে কেন অন্যের সঙ্গে কটু প্রতিবাদ করিয়া বুঝাইতে চাহে গৌরী নিতান্তই সাধারণ? সে কেন ত্রস্ত দৃষ্টি মেলিয়া ও সতর্ক কান পাতিয়া গৌরীর প্রত্যেক পদক্ষেপ ও কথার কদর্থ করিতে বসে? এই বয়সের মেয়েরা যে বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া সাজসজ্জা করে না—সে কথা অবুঝ হেমাঙ্গিনী কেন বোঝে না!

আলোক-বঞ্চিত বলিয়াই কি হেমাঙ্গিনীর এই ব্যর্থ বিদ্বেষ! ধনীর ধনে দরিদ্রের যেমন অকারণ ঈর্ষা হেমাঙ্গিনী বুঝি চারি পাশের গৃহের বাতায়ন দিয়া কুললক্ষ্মীদের তৃপ্তিভরা মুখের পানে চাহিয়া তেমনই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ভালবাসে। উহাদের অপরিমেয় সুখের ঢেউয়ে হেমাঙ্গিনার শুষ্ক বালুবেলা ক্ষণতরে পরিপ্লাবিত হইয়া দ্বিগুণ আর্ত্তিতে ফাটিয়া চৌচির হইয়া যায়! হেমাঙ্গিনী গৌরীর পানে চাহিয়া বুঝি ভাবে, বহুবল্লভা কুসুমের মত সে কি-দিন কি-রাত্রি বিভিন্ন ঋতুতে—আলোয় বা অন্ধকারে, ক্ষণে ও অক্ষণে কেন ফুটিবে? এই নিষ্কল নিষ্পাপ কোরক কেন সূর্য্যমুখী হইয়া ফুটিবে না? সূর্য্যকিরণের ঘায় মুদিত দলগুলি তার বিকশিত হইয়া উঠিবে এবং সূর্য্যের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে সৌন্দর্য্যে নিষ্ঠায় ও ভক্তিতে সে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। হয়ত মনে পড়ে রামায়ণের পুণ্য কাহিনী। বনবাসিনী চীরধারিণী অসূর্য্যম্পশ্যা রাজতনয়ার পতি-অনুগমনের কথা। মনে পড়ে সতীকুলরাণী সাবিত্রীর অকুতোভয়। কিংবা এ-সব হয়ত কিছুই মনে পড়ে নাই। একগামিনী নারীর মন লইয়া নিষ্ঠার পদতলে এই যে নিত্যপূজার আয়োজন, এ বুঝি নারী-চরিত্রের চিরন্তন রহস্য। অন্ধকারের যাত্রী—ধ্রুবতারার পানে চাহিয়া আছে নির্নিমেষে। ধূলায় যে-প্রেমের আসন পাতা, ধূলার গণ্ডী ঘিরিয়াই সে আসনে হৈম কিরণজ্যোতি ঝলসিয়া উঠিতেছে। সংসারের বাহিরে যে সংসার পাতিয়াছে এবং সেই একান্ততার কষ্টিপাথরে মেয়ের ভাবী সুখকে, পবিত্রতাকে, আনন্দকে ও নারীজীবনকে যাচাই করিয়া পাতিব্রত্যের নির্দ্দেশ দিতে প্রাণপণ করিতেছে। ফুলের সৌন্দর্য্য দেবতার পূজায় সার্থক হইবে বলিয়াই না হেমাঙ্গিনী গৌরীকে প্রাণ দিয়া সাজাইতে চাহিত, কিন্তু কুঁড়ির ভিতর কীটের আবির্ভাব যেইমাত্র বুঝিয়াছে—সমস্ত উৎসাহ তার স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে।

হেমাঙ্গিনীর চোখের কোলে স্পষ্ট কালির রেখা, চুল সে ভাল করিয়া বাঁধে না, মুখে হাসি নাই, দৃষ্টি ভয়-চকিত। গৌরীকে সে একবারও আদর করে না, সে কাছে আসিলে মুখ ফিরাইয়া কাজ করিতে থাকে, সাতবার ডাকিলে একবার উত্তর দেয় এবং সাজাইতে বসিয়া যদি-বা চুল বাঁধে—টিপ্ পরাইতে ভুলিয়া যায়। জামার সঙ্গে কাপড়টাও মানাইয়া পরাইতে পারে না।

গৌরী রাগ করিয়া বলে, মা কোন কর্ম্মের নয়, খালি ভাত রাঁধে আর বাসন মাজে।

* * *

দিন দুই পরে।

শম্ভু হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া ডাকিল, গৌরী,—গৌরী—কই রে?

হেমাঙ্গিনী বলিল, গৌরীকে কেন?

শম্ভু বলিল, শীগ্‌গির সাজিয়ে দে, বাবু মোটর নিয়ে—দাঁড়িয়ে আছে—ঐ বড় রাস্তার মোড়ে। ওরা বললে, ওকে নিয়ে বায়স্কোপে যাবে।

—না, সে বায়স্কোপে যাবে না।

শম্ভুও জিদ ধরিল, আলবৎ যাবে। আমি বলছি সে যাবে। গৌরী—গৌরী?

গৌরী ও-বাড়ী হইতে ছুটিয়া আসিল। বলিল, কেন বাবা?

—শীগ্‌গির জামা গায়ে দিয়ে নে—বায়স্কোপে যাবি। গৌরী ডাকিল, ওমা?—

মা উত্তর দিল, আমার হাত জোড়া।

অগত্যা শম্ভুই তাহাকে সাজাইতে বসিল। সে কি সজ্জা!

গৌরী অনবরত নাকে কাঁদিতে সুরু করিয়াছে—শম্ভুও ঘামিয়া উঠিয়াছে—অবশেষে বিরক্ত হইয়া একটা জামা চড়চড় করিয়া ছিঁড়িয়া শম্ভু বলিল, দুত্তোরি, একি আমাদের কর্ম্ম! যত কুঁড়ের কাজ। দেখ একবার মাগীর আক্কেল! হাসছে!

সত্যই কয়েকদিন পরে হেমাঙ্গিনীর মুখে হাসি ফুটিয়াছে। নিকটে আসিয়া সে কোমল স্বরে বলিল, নাচতে না জানলে দোষ হয় উঠোনের। সর।—বলিয়া গৌরীকে সাজাইয়া দিয়া তেমনই কোমল স্বরে অনুনয় করিয়া বলিল, একটা কথা রাখবে আমার? রাখ ত বলি।

কয়েক দিন অশান্তির পর শান্তির সুবাতাস বহিতে দেখিয়া যুদ্ধক্ষত শম্ভুও প্রফুল্ল হইল। কোমলস্বরে বলিল, তোর কোন্ কথাটা না রেখেছি হিমি? বল্।

—বলি, বলিয়া হেমাঙ্গিনী একমুহূর্ত্ত ভাবিয়া চাপা গলায় বলিল, মেয়েকে যেখানে-সেখানে অমন ক'রে পাঠিও না। বয়স ত বাড়ছে।

শম্ভু কোন কথা কহিল না দেখিয়া হেমাঙ্গিনী সাহস করিয়া বলিল, আর ও ছেলেটিকেও বারণ করে দিও আসতে। আমরা গরীব, বড়লোকের সঙ্গে অত মেশা-মিশিতে দরকার কি আমাদের?

শম্ভু অসহিষ্ণু কণ্ঠে প্রতিবাদ করিল, ঐ হিংসেতেই তুই মলি!

হেমাঙ্গিনীর চোখ জ্বলিয়া উঠিল, হিংসে? কিসের হিংসে? কার হিংসে?

শম্ভু চড়া গলায় বলিল, কার আবার, মেয়ের। ওর রূপ আছে—তোর নেই।

হেমাঙ্গিনী তীব্র গতিতে শম্ভুর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পাগলিনীর মত তাহাকে কিল চড় মারিতে মারিতে বলিল, বেশ করি হিংসে করি। আমার মেয়ে আমি যদি হিংসে করি, তাতে কার কি?

এমন সময়ে বহির্দ্বারে ছেলেটি আসিয়া ডাকিল, গৌরী! স্তম্ভিতা গৌরী মুহূর্ত্তে সচকিতা হইয়া ছুটিয়া আসিল। ছেলেটি তাহার হাত ধরিয়া হাসিয়া বলিল, চল।

* * *

রাত্রিতে গৌরী যখন ফিরিল—তখন তাহার পিছনে প্রকাণ্ড মোট লইয়া একটা মুটেও আসিল। কাপড়, জামা, স্নটকেশ, চায়ের টিন, ষ্টোভ, খাবার ইত্যাদিতে মোটটি বোঝাই হইয়াছিল।

ক্ষুদ্র ঘরের তক্তপোষে জিনিষগুলি নামাইয়া রাখিতেই সেখানে আর জায়গা রহিল না। গৌরী হাসিমুখে মাকে ডাকিল। কেহ কোন সাড়া দিল না। শম্ভু যদিও আসিল এবং জিনিষগুলি দেখিয়া জোর করিয়া হাসিলও, তথাপি বেশ বুঝা গেল উৎসাহের তারটি কে যেন জোর করিয়া ছিঁড়িয়া দিয়াছে। অপরাহ্নের বাহুযুদ্ধ প্রবলতর হইবার মুহূর্ত্তে জানালাটা উহারা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, স্নতরাং পরিণামফল জানিবার স্নযোগ আমাদের হয় নাই। এখন হয়ত বা যুদ্ধবিরতিতে শান্তি চলিতেছে, কিন্তু আসন্ন মুহূর্ত্তগুলির 'পরে কাহারও তেমন বিশ্বাস নাই। স্তব্ধ আকাশ; যে-কোন মুহূর্ত্তে ঝড় উঠিতে পারে।

সে যাহা হউক, জিনিষগুলি নাড়িতে নাড়িতে শম্ভুর উৎসাহ যেন ফিরিয়া আসিতেছিল। ষ্টোভটা হাতে লইয়া বলিল, এটা কি হবে রে, গৌরী?

গৌরী বলিল, কেন, চা হবে। এই দেখ না, চায়ের টিন—মেলাই চা আছে এতে। বাবু বললে, তোমরা চা খাও না, কেন?—আমরা দোকানে বসে কেমন চা খেলাম। তারপর এইটে কিনে দিয়ে বললে, কাল যখন তোমাদের বাড়ী যাব, তখন এতেই করে চা তৈরি করে দিও ত। —বলিয়া গৌরী ষ্টোভটা নাড়িতে লাগিল।

দ্বারের ও-পাশে হেমাঙ্গিনীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ভাত-টাত খাবি গৌরী, না হেঁসেলপাট নিয়ে সারারাত ব'সে থাকব?

গৌরীকে উদ্দেশ করিয়া কথাটা ঠিক জায়গায় গিয়া পৌঁছিল।

শম্ভু বলিল, হাঁ, ভাত বাড়—আমরা যাচ্ছি।

গৌরী তাড়াতাড়ি বলিল, আমি কিছু খাব না, মা। বলে পেট ফেটে যাচ্ছে!

—তা জানি। ভাল ভাল খাবার খেয়ে কি মুখে ভাত রোচে?

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গেল, সারারাত্রির মধ্যে কেহ কোন কথাই বলিল না।

সকালে উঠিয়া শম্ভু বাহির হইয়া গেল। হেমাঙ্গিনী ঝুড়িতে কাটা বিচালী লইয়া গরুকে জাবনা দিতে আসিল—পিছনে গৌরী।

গামলায় বিচালী ঢালিয়া 'শানি' মাখিতে যাইতেছে, গৌরী আঁচল ধরিয়া টানিল, মা?—

হেমাঙ্গিনী উত্তর দিল, কি?

গৌরী মিষ্ট গলায় বলিল, তুই নাকি আমার ওপর রাগ করেছিস? বল না, মা?

হেমাঙ্গিনী গামলার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কাজ করিতে করিতে অস্ফুটস্বরে কি বলিল। গৌরীর ছলছল চোখ দুটিতে মুক্তার মত বিন্দু ফুটিয়া উঠিল—মায়ের আঁচলের প্রান্ত টানিয়া লইয়া চোখে দিয়াই সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আঁচলে টান পড়িতেই হেমাঙ্গিনী ফিরিল এবং অনাদৃতা কন্যার গূঢ় অভিমানের হেতু বুঝিয়া মাতৃহৃদয়ে তাহার হাহাকার করিয়া উঠিল। পড়িয়া রহিল বিচালী মাখা, ভুলিয়া গেল সে স্থান-কালের কথা। গৌরীকে সবেগে বুকে চাপিয়া ধরিয়া হেমাঙ্গিনী কাঁদিয়া উঠিল। খানিক ক্ষণ কাঁদিয়া অন্তরের দহন-জ্বালা তাহার বোধ করি নিবিল। মেয়ের মুখে কয়েকটি সস্নেহ চুম্বন দিয়া গদ্‌গদ স্বরে বলিল, আয় গৌরী,—তোকে ভাল ক'রে সাজিয়ে দিই।

—তক্তপোষের উপর বসিয়া হেমাঙ্গিনী মেয়েকে সাজাইতে লাগিল। পরিপাটি করিয়া চুল বাঁধিয়া দিল, ঘন জ্রর সমান্তরালবর্ত্তী করিয়া তেমনই সুন্দর সূক্ষ্ম টিপ আঁকিল 'স্নো' দিয়া মুখখানিকে শিশিরস্নাত প্রভাতপদ্মের মত করিয়া তুলিল, ঠোঁট-দুখানিতে লাল রঙ মাখাইতে ভুলিল না। তারপর সব চেয়ে দামী ব্লাউজ শাড়ীর সঙ্গে মানাইয়া মান্দ্রাজী-ধরণে পরাইয়া দিল। কাল রাত্রিতে গৌরী যে বেল-ফুলের মালা গলায় দিয়া আসিয়াছিল সেই মালাটি জড়াইয়া দিল কবরীতে। প্রসাধন শেষ করিয়া হেমাঙ্গিনী একদৃষ্টে গৌরীর পানে চাহিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

গৌরী ধরা গলায় বলিল, কাঁদিস কেন মা?

হেমাঙ্গিনী কোন কথা না বলিয়া পাগলিনীর মত তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া উগ্র চুম্বনের দ্বারা এমন ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া দিল যে গৌরী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, উঃ, লাগে যে!

অতঃপর চক্ষু মুছিয়া হেমাঙ্গিনী গৌরীর পানে চাহিয়া বলিতে লাগিল, একটা কথা বলি শুনে রাখ্ মা। রূপ টাকা-কড়ির চেয়েও মূল্যবান, আবার মেয়েমানুষের এর চেয়ে বালাইও আর নাই। খুব সামলে চলা দরকার। বাইরের লোক হয়ত তোকে ভালবাসবে—কিন্তু ঠিক জানবি তোকে নয়, ভালবাসবে তোর রূপকে।

গৌরী এইসব উপদেশের কি-ই বা বোঝে? চঞ্চল হইয়া বলিল, ছেড়ে দে, ওদের দেখিয়ে আসি।

হেমাঙ্গিনী বলিল, ছি মা, একি দেখিয়ে বেড়াবার জিনিষ? ওতে অহঙ্কার বাড়ে। এই আছে এই নেই—এ নিয়ে কি দেমাক করা চলে? মনটাকে শক্ত করে না রাখলে—

চঞ্চলা গৌরী বলিল, আচ্ছা মা, ও-বেলা ওই ছেলেটি এলে এমনি ক'রে সাজিয়ে দিবি ত?

হেমাঙ্গিনী গাঢ়স্বরে বলিল, ও-বেলা ও এলে আমি ফিরিয়ে দেব।

—বাঃ রে! আজও যে ছবি দেখতে যাব! ছবি কেমন কথা কয়। তোমার আমার মত সত্যিকারের মানুষ।

—ছিঃ, ওর সঙ্গে যেতে নেই, ছবি দেখতে নেই।

—না নেই! তোমার মত ঘরের কোণে বসে আমি থাকতে পারব না।

হেমাঙ্গিনীর মুখ হইতে সমস্ত রক্ত নিমেষে চলিয়া গেল, পাংশু ঠোঁট দুখানি থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কোন কথাই সে বলিতে পারিল না—কেবল হাত দু-খানি তার কয়েক সেকেণ্ডের জন্য কাঁপিয়া উঠিয়া স্থির হইয়া গেল।

গৌরী ভয় পাইয়া ডাকিল,—মা?

প্রচণ্ড একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হেমাঙ্গিনী অস্ফুট শব্দ করিল,—উঃ!

তারপর অত্যুত্তেজিত বাহু দিয়া বুকের অত্যন্ত সন্নিকটে মেয়েকে টানিয়া আনিয়া নিরুত্তাপ চুম্বনে দুটি গালে তার সোহাগের চিহ্ন আঁকিয়া দিয়া প্রাণহীন স্বরে বলিল, চা খাবি গৌরী?

মায়ের মুখের নিকট হইতে মুখ সরাইয়া গৌরী বলিল, খাব।

—তোর ষ্টোভটাতেই চা তৈরি হোক, কি বলিস?

গৌরী উৎসাহিত হইয়া উঠিল, সেই ভাল। আমি ষ্টোভ জ্বালাব মা?

হেমাঙ্গিনী বলিল, বেশ ত। কিন্তু গৌরী, তুই যদি বায়োস্কোপে না যেতিস—।

গৌরী মুখ বাঁকাইয়া বলিল, ইঃ, তোমার খালি খালি ঐ কথা। সেখানে যা মজা। আচ্ছা মা, তুই না-হয় একদিন দেখে আসিস—দেখে এলে না গিয়ে থাকতে পারবি নে—রোজ রোজ যেতে চাইবি।

—হুঁ—বলিয়া হেমাঙ্গিনী যন্ত্রচালিতের মত ষ্টোভ হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

গৌরী উৎসাহিত হইয়া কহিল, দাঁড়াও, আগে এই বোতলের তেল ঢেলে জ্বালাতে হয়—কাল আমি দেখেছি। —বলিয়া স্পিরিটের বোতল হাতে করিয়া তক্তপোষের উপর হইতে নামিল।

হেমাঙ্গিনী আসিয়া এ-দিক কার জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল।

কয়েক মিনিট নিস্তব্ধতার পর ষ্টোভের গর্জ্জন শোনা গেল। গর্জ্জনটা অত্যধিক বলিয়াই বোধ হইল—সঙ্গে সঙ্গে বালিকা-কণ্ঠের পরিত্রাহি চীৎকার ধ্বনি! কি সে করুণ বুকফাটা চীৎকার! জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলাম, সারা বস্তির লোক সেই আর্ত্ত চীৎকারে ছুটিয়া আসিয়া গলিতে জড়ো হইয়াছে। অতি সাহসী জনকয়েক বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। বাকী সকলে পরস্পরকে প্রশ্ন করিতে লাগিল, কি হ'ল! ব্যাপার কি?

কে এক জন বলিল, সাংঘাতিক পুড়েছে, মেয়েটা বোধ হয় বাঁচবে না।

রমণীকণ্ঠের স্বরও শোনা গেল, ধন্যি মা, ধন্যি কাঠ প্রাণ! চোখে এক ফোঁটা জল নেই গা!—

* * *

তার পর! বোধ হয় মাসখানেক পরে।

সেই নিস্তব্ধ নির্জ্জন সঙ্কীর্ণ গলি; গরুটা সেইখানেই বাঁধা রহিয়াছে—পরিচর্য্যার অভাবে কিছু শীর্ণকায়। প্রহরে প্রহরে খোল বিচালী মাখিয়া কেহ গামলা ভর্ত্তি করিয়া দেয় না—গায়ে হাত বুলাইয়া তেমন ঘন ঘন আদরও কেহ করে না। শম্ভু আসিয়া দোরগোড়ায় টুল পাতিয়া বসিয়া

সংসারের কোন চিত্রই কথার দ্বারা আঁকিয়া আর উৎফুল্ল হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় সেই দিন হইতে ছেলেটিকেও এই গলিতে আর দেখি নাই। কেবল হেমাঙ্গিনীর গম্ভীর মুখের রেখায় সেই উদ্বেগব্যাকুল স্ফীতিগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, চোখে উৎসাহ বা উত্তেজনার লেশমাত্র নাই। কাজে অনুরাগ বাড়িয়াছে। সমস্ত কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়া সে যেন বহুদিন পরে নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

পুরা এক মাস পরে গৌরীকে দেখিলাম। কিন্তু না দেখিলেই বোধ হয় ভাল হইত। ধীরে ধীরে সে বিশীর্ণপ্রায় গরুটির পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখখানি কাঁধের উপর রাখিল এবং অনুচ্চারিত সমবেদনা দিয়া এক হাতে ধীরে ধীরে গরুর গলায় হাত বুলাইতে লাগিল।

সেই গৌরী! মাথায় এক গাছিও চুল নাই, ভ্রূ-হীন ঝলসানো মুখে চামড়া লোল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, শ্বেত কুষ্ঠের মত দগ্ধাবশিষ্ট সৌন্দর্য্য প্রেতলোকের কাহিনীই মনে জাগাইয়া তোলে। মেয়েটির গায়ে হাত দিতে গেলে একটা অদম্য ঘৃণাকে কোনক্রমে ঠেকাইয়া রাখা চলে না এবং একবার মাত্র উহার দিকে চাহিলে বিধাতার ব্যর্থ সৃষ্টিকে অভিসম্পাত না করিয়া উপায় নাই। কি বীভৎস! কি কুৎসিত!

পলক মাত্রই চাহিয়াছিলাম।—

গৌরীর স্পর্শে গরুটা মুখ তুলিয়া জিব বাহির করিল—এবং পরম আরামে সেই কঙ্কালময়ী কুৎসিত বালিকার দেহ অবলেহন করিতে লাগিল!

জানালাটা বন্ধ করিয়া দিলাম।

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

নেপাল রেলওয়ে শেষ হইয়াছে অমলেখগঞ্জে, কালে ভীমফেদী পর্য্যন্ত ইহা পৌঁছিতে পারে, এখন লরী মারফৎ মালপত্র ঐ পর্য্যন্ত যায়। অমলেখগঞ্জ শহরটি নূতন কিন্তু রেলের কৃপায় দিন দিন ইহার উন্নতি ও বিস্তৃতি ঘটিতেছে। ষ্টেশনে নামিয়া ঠিক করিলাম কোন লরী-ওয়ালার সঙ্গে ব্যবস্থা করিয়া তাহারই আড্ডায় রাত্রে শুইয়া থাকিব যাহাতে প্রত্যূষে ভীমফেদী রওয়ানা হইয়া ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় চীসাপাণী গঢ়ীর চড়াই অতিক্রম করিতে পারি। ইহা ভাবিয়া এক বাস্‌ওয়ালার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিলাম এবং সে খুব সকালে রওয়ানা হইবে কথা দেওয়ায় তাহার বাস্ গাড়ীতেই শয়ন করিলাম। সকালে দেখিলাম বিপরীত ব্যাপার, চারি দিকে একটির পর একটি লরী হু হু শব্দে চলিয়াছে, কিন্তু আমার বাস্ স্থির ও অচল! কারণ জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম যাত্রী বোঝাই না হইলে গাড়ী ছাড়িবে না। কথাটা ঠিক, কিন্তু আমার তাহাতে অসুবিধা। কাজেই মালবাহী এক লরীর শরণাপন্ন হইতে হইল, তাতে ভাড়া কম—মাত্র এক টাকা, সুতরাং যাত্রীও প্রচুর এবং সে কারণে গাড়ী ছাড়িতে দেরি হইল না।

আমার ধারণা ছিল যে এখন লরী হওয়ায় কেহই এই পথে পদব্রজে যাওয়ার নামও করিবে না, কিন্তু পথে দলে দলে যাত্রী দেখিয়া সে ভ্রম দূর হইল। ইহারা যে পুণ্যসঞ্চয়ের জন্যই হাঁটিয়া চলিয়াছে তাহা নয়, আসল কারণ ঘোর দারিদ্র্য, লরীতে পয়সা খরচ করা ইহাদের নিকট বিলাসিতা। পশুপতিনাথের যাত্রীদের মধ্যে যাহাদের পয়সা আছে এমন অনেকে দূর দেশ হইতে আসে, কিন্তু নিকটস্থ চম্পারণ-আদি জেলার বহু লোক ছাতু মাত্র সম্বল করিয়া রওয়ানা হয়।

লরী কখন চুরিয়াঘাটির চড়াই উঠিতে আরম্ভ করে তাহা প্রতীক্ষা করিতেছিলাম; কিন্তু অল্পক্ষণ পরে এক সুড়ঙ্গের মুখে পৌঁছিতে বুঝিলাম চুরিয়ার চড়াইপর্ব্ব এই সুড়ঙ্গে শেষ হইয়া গিয়াছে। সুড়ঙ্গের পর তরাইয়ের জঙ্গলের পারের

পর্ব্বতশ্রেণীর দিকে পথ চলিয়া গিয়াছে। দু-পাশে জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের সারি, তাহার মাঝে মাঝে কোথাও বা বন কাটিয়া নূতন বসতি নির্ম্মাণ চলিয়াছে, কোথাও বা নূতন স্থাপিত গ্রামের পাশে ছোট ছোট পাহাড়ী গাভী চরিয়া বেড়াইতেছে। পথিকের দল পশুপতিনাথ এবং ভৈরবের গান গাহিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে "একবার বোলো পস্‌পস্‌-নাথ বাবা কী জয়," "গুহ্মেশ্বরী (গুহ্যেশ্বরী) মাই কী জয়" শব্দে পথ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। দেখাদেখি আমার শরীর সহযাত্রীদের মধ্যেও ঐ ব্যারাম সংক্রামিত হইল। ফলে আমি কখন যে তিন ঘণ্টার পথ পার হইয়া ভীমফেদীতে উপস্থিত হইলাম তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।

ভীমফেদী বাজারের পাশেই "রোপলাইনে"র আড্ডা। মালপত্র অমলেখগঞ্জ হইতে এখানে লরীতে আসে এবং এখানকার রোপলাইনের তারযোগে বিজলীর জোরে কাঠমাণ্ডবে পৌঁছায়। ভীমফেদী প্রবেশ করার পূর্ব্বেই সিপাহীর দল ছাড়পত্র দেখিতে আসিল। কর্ম্মচারীর সংখ্যা অধিক ছিল বলিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই রেহাই পাওয়া গেল। এইবার পায়ে চলিবার পালা। যদিও সঙ্গে বোঝা বিশেষ কিছু ছিল না, তবু দেড় টাকায় এক "ভরিয়া" (ভারি=মুটে) ঠিক করা গেল, পথে রন্ধন-ভোজনের পাটও ইহারা পার করে। আমার জাতিবিচারের কোনই প্রয়োজন নাই, কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সে জাতিতে লামা। আমাদের দেশে যেমন বৈরাগী বা সন্ন্যাসী কোন কারণে গৃহী হইলে তাহার সন্তানেরাও নিজেদের বৈরাগী নামে চালায়, সেইরূপ এই দেশে বৌদ্ধ-ভিক্ষু গৃহস্থ হইলে তাহার সন্তানসন্ততি লামা পদবী গ্রহণ করে। লামা, গুরুঙ্গ, তমঙ্গ, আদি জাতিরা নেপাল দূন অঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশের লোক। ইহাদের ভাষা তিব্বতীয় ভাষারই শাখা, কিন্তু গোর্খা রাজভাষা হওয়ায় তাহারই ব্যবহার প্রচলিত।

চীসাপাণীর চড়াই সামনেই, ভীমফেদীতে ভোজন শেষ করিয়া রওয়ানা হইলাম। চড়াইয়ের আরম্ভের কাছে কুলিদের নাম-ধাম প্রভৃতি সরকারী বিভাগ হইতে লিখিয়া লওয়া হয়। ইহার কারণ অনভিজ্ঞ যাত্রীদের রক্ষা, যাহাতে তাহাদের ঠকাইয়া কুলিরা আশপাশের পাহাড়ে চম্পট না দিতে পারে। চীসাপাণীর চড়াই আর আগেকার মত ভীষণ নাই, নূতন সরকারী রাস্তা বেশ চওড়া আর চড়াইয়ের ঢালও ঢের কম। এইভাবে ক্রমশঃ অল্পে অল্পে চড়াইয়ের ঢাল ওঠায় এ পথের পূর্ব্ব গৌরবের অর্দ্ধেক লুপ্ত হইয়াছে এবং যদি কালে মোটর চলিতে থাকে তবে বাকী অংশও লুপ্ত হইবে। জিনিষপত্র ত এখনই রোপলাইনে বাহিত হইতেছে, পথে কত বার মাথার উপর লৌহরজ্জুযোগে মালপত্র বহন চলিতেছে দেখিলাম। চীসাপাণী গঢ়ীর উপর পৌঁছিতে দ্বিপ্রহর হইল, সেখানে মালপত্র তল্লাসী হয় কিন্তু আমার সামান্য জিনিষ যাহা ছিল তাহা তুচ্ছজ্ঞানে কর্ম্মচারী মহাশয় খুলিয়াও দেখিলেন না। একমাত্র দেখিলাম যে আমার বৌদ্ধ ভিক্ষুর পীত বস্ত্র পরিধান ভুল হইয়াছে, এই অঞ্চলে তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না, উপরন্তু উহা দেখিবামাত্র লোকের সন্দেহ হওয়া সম্ভব।

'ভরিয়া' বলিল, আজই চন্দ্রাগঢ়ী পার হওয়া ভাল, আমারও কথাটা ভাল লাগায় অগ্রসর হওয়া গেল। এই প্রদেশে পথের দু-পাশে অনেক গ্রাম জঙ্গল সে রকম নাই, দেখিতে দেখিতে বেলা তিনটা নাগাদ আগের বারে যে মহিষদহে রাত্রিবাস করিয়াছিলাম তাহাও ছাড়াইয়া গেলাম। কিন্তু আর ঘণ্টা-খানেক পরেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। কোন প্রকারে মনে জোর করিয়া চলিতে লাগিলাম, কুলি ত প্রতি পদেই আগাইয়া যাইতে লাগিল। পথে সারণ জেলার দুই-তিন জন পরিচিত ব্যক্তির দেখা পাইলাম, তাহাদের মধ্যে এক জনের অবস্থা আমার চেয়েও শোচনীয়। যাহা হউক, কোনক্রমে 'ম'রেপিটে' চিতলাং পৌঁছিলাম। এইরূপ যাত্রায় সন্ধ্যার আগে চটিতে পৌঁছান উচিত। আমাদের দেরি হওয়ায় স্থান পাওয়া দায় হইল, বহু কষ্টে ছোট একটি কুঠরি পাওয়া গেল, তাহাতেই আমরা পাঁচ জনে আশ্রয় লইলাম। দারুণ পথশ্রান্তির পর শয়নই চরম সুখ কিন্তু না খাইলে কলাকার চড়াই অতিক্রম করা যাইবে না, সুতরাং সঙ্গী পাণ্ডেজী ভাত রাঁধিলেন—আমরা ভোজন শেষ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। অতি প্রত্যূষেই যাত্রারম্ভ করিলাম। এখন আমার পূর্ব্ব দিনের সাথীদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে, কেননা যদিও তাঁহাদের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তবুও তাঁহারা জানিতেন না আমার এ যাত্রার আসল উদ্দেশ্য কি এবং সেই জন্য তাঁহাদের সঙ্গ বিপজ্জনক। যাহা হউক, চন্দ্রাগঢ়ীর চড়াইয়ে

তাঁহারা নিজেরাই বহু পিছনে পড়িলেন, সুতরাং সমস্যা সমাধান সহজেই হইল। চড়াইয়ের পর অতি কঠিন উৎরাই প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু কাছে আসিতে দেখিলাম এখানেও নূতন রাস্তায় উৎরাইয়ের কায়া পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সহজেই নীচে পৌঁছিলাম। পথের শেষে মহাপ্রাণীর পোষণের প্রশ্ন। সকলেই নীচের সদাব্রতের মালপোয়ার কথা বলায় আমিও তথাস্তু বলিয়া চলিলাম। দেখিলাম সেখানে অনেক মহাত্মাই আশ্রয় লইয়াছেন, গাঁজার কলিকায় দমের পর দম চলিয়াছে। আমারও সাদর আমন্ত্রণ হইল "আও সন্তজী"। কোন রকমে পাশ কাটাইয়া মালপোয়া লইয়া গন্তব্য পথে চলিলাম। থানকোটে দুধকলাও জুটিল, সুতরাং আজ ভোজনের ব্যবস্থা পরিপাটি। পথে দেখিলাম রোপলাইনের শেষে লরীর সার ষ্টেশন হইতে মাল লইয়া আগে চলিয়াছে। এই রোপলাইনের কথায় আমার ভরিয়া তাহাদের দুঃখের কথা বলিল, রোপলাইন হওয়ার পূর্ব্বে ভীমফেদী হইতে কাঠমাণ্ডব পর্য্যন্ত মাল বহিয়া তাহার মত হাজার হাজার কুলি-পরিবারের বৎসরকার অন্নসংস্থান হইত। এখন রোপলাইনে মণ-প্রতি ছয় আনা ভাড়া, কাহার দায় পড়িয়াছে আট গুণ বেশী দিয়া তাহাদের ভরণপোষণ করে! বস্তুতই এই বেচারাদের দিনগুজরাণের ব্যবস্থা না করিয়া রোপলাইন নির্ম্মাণ করা বড়ই অবিচার হইয়াছে।

কাঠমাণ্ডব শহর হইয়া দশটার সময় আমি থাপাথলীর বৈরাগীমঠে পৌঁছিলাম। যদিও পূর্ব্বের বারে সপ্তাহকাল থাকার দরুণ মহন্তজীর সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল, এবং তিনি তাঁহার জন্মস্থান ছাপরার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের কথাও অবগত হইয়াছিলেন, তবুও ভীড়ের মধ্যে পরিচিত লোকের কথা কত দিন আর মনে থাকে? যাহা হউক তিনি আমার থাকিবার জন্য পরিষ্কার জায়গা ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

* * *

৬ই মার্চ্চ নেপাল পৌঁছিলাম। সেদিন কোথাও যাওয়া হয় নাই। শিবরাত্রির কয়দিন নেপাল-মহারাজের তরফে থাপাথলীর সমস্ত মঠে যাবতীয় সাধুর জন্য আহার, গাঁজা, তামাক, ধুনীর কাঠ, সব জিনিষই দেওয়া হয়। সাধারণ দিনেও প্রতি মঠে কয়েক হাঁড়ি প্রসাদের—এক হাঁড়ি অর্থে এক জনের ভোজন—বাঁধা ব্যবস্থা আছে। এই দৈনিক হাঁড়ি ও বার্ষিক ভোজের খরচের পয়সা বাঁচাইয়া এখানে মহন্তের দল বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, যদিও বাহিরের চালচলনে তাঁহাদের অতি দরিদ্রই দেখায়। নেপাল দূনের মহন্ত কেন, রাজপরিবার ভিন্ন কেহই নিজ অবস্থানুযায়ী চালচলন রাখে না। এইরূপ আত্মগোপনের কারণ ছদ্ম শত্রুর ভয়, পাছে কেহ রাজকর্ণে প্রজার ঐশ্বর্য্যের কথা বলে—রাজা বা উচ্চকর্ম্মচারীরা সর্ব্বজ্ঞ নহেন, সুতরাং তাহাতে গুপ্তধন রক্ষা পায়। আমি নিজে দেখিয়াছি যে বহু নেপালী সাহুকার দেশে নিতান্ত সাধারণভাবে আছেন, তাঁহাদেরই লাসার বিরাট প্রাসাদতুল্য পুরী বহু লক্ষ টাকার দ্রব্যে পরিপূর্ণ। মহন্তদের অবস্থা আরও শঙ্কটাপন্ন, তাঁহারা ত নিজেদের বারুদের গাদায় অবস্থিত মনে করেন—কখন্ কাহার কথায় সর্ব্বনাশ হয়। যাহাদের ভয়ের কারণ ভাবেন তাহাদের পূজা-অর্ঘ্য দিতে হয়, আবার যে টাকা আত্মসাৎ করেন তাহাও লুকাইয়া নেপালের বাহিরে রাখিতে হয় যাহাতে পদচ্যুতি বা ততোধিক বিপদে প্রাণ বাঁচাইয়া আশ্রয়ের চেষ্টা দেখিতে পারেন। শিবরাত্রির ভোজের তদারকের জন্য রাজকর্ম্মচারীর দল থাকেন, তাঁহাদের দরুন আসল কাজের কিছুই হয় না, তবে তাঁহারা ঐ সময়ে কিছু গুছাইয়া লইতে পারেন বস্তুতঃ এই দোষ সে-সব শাসন-প্রথাতেই আছে যেখানে জনমতের কোনও মূল্য নাই এবং সেই সকল ক্ষেত্রেই শাসকবর্গ ক্রমেই পার্শ্বচর রক্ষক-ভক্ষকদিগের করতলগত হইয়া পড়েন।

পরদিন বিচার করিয়া দেখিলাম আমার পক্ষে বসিয়া কালক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। পথের ব্যবস্থা খোঁজ করায় জানিলাম তিব্বত-সীমান্তের নিকটস্থ মুক্তিনাথ ও গোসাঁইকুণ্ড এই দুই তীর্থ স্থানে যাওয়ার অনুমতি চাহিলেই পাওয়া যায় কিন্তু সরকারী খরচে এবং তদারকে সাধুদিগের যাওয়া-আসার সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। এই উপায়ে গেলে আমার কার্য্য-সিদ্ধির সম্ভাবনা কম, সুতরাং স্থির করিলাম সে কার্য্যের জন্য কোন ভোটীয় (তিব্বতী) সাথী সংগ্রহ করিতে হইবে। পশুপতিনাথ-মন্দিরের অল্প দূরেই বোধাস্থান। ইহাকে নেপালের অন্তর্গত তিব্বতের টুকরা বলিলেই চলে। ঠিক কাশীর বাঙালী, মারাঠী বা তৈলঙ্গ মহল্লার মতই ইহার জাতিবৈশিষ্ট্য আছে। সেখানে ভোটীয় সঙ্গীর সন্ধান পাওয়া

পশুপতিনাথের মন্দিরশ্রেণী

সম্ভব ভাবিয়া ৭ই মার্চ পশুপতি ও গুহেশ্বরী দর্শন করার পর নদী পার হইয়া বোধায় গেলাম।

বোধা-স্তূপের তিব্বতী নাম ছোর্তেন-রিম্পোছে (চৈত্যরত্ন) বা ব-য়ুন ছোর্তেন (নেপাল-চৈত্য)। শোনা যায়, প্রথমে ইহা সম্রাট্ অশোক নির্ম্মাণ করেন। এই বিশাল স্তূপের কেন্দ্রে স্বর্ণমণ্ডিত শিখর এবং ইহার পরিক্রমার চারি ধারে লোকের বসতি। বাসিন্দা প্রায় সবই ভোটীয় সে কারণে—বিশেষভাবে শীতকালে—ইহা একেবারে তিব্বতের সামিল বলিয়া বোধ হয়। ইতিপূর্ব্বে যখন এখানে আসিয়াছিলাম তখন এখানকার চীনা প্রধান-লামার সহিত আলাপ হইয়াছিল এবং সেই জন্য আশা করিয়াছিলাম এবার তাঁহার নিকট বিশেষ সাহায্য পাইব। কিন্তু এখানে গিয়া অতি দুঃখের সহিত শুনিলাম তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। স্তূপের ভিতর প্রদক্ষিণ করিবার সময় দেখিলাম বহু ভোটীয় ভিক্ষু পাতলা দেশী কাগজ একের উপর আর এক টুকরা জুড়িতে ব্যস্ত আছেন। আমার ভাঙা ভোটিয়ায় তাঁহাদের দেশে কথা জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম উঁহাদের মধ্যে তিব্বত, ভুটা[n] মায় কাংড়া-কুলু (পঞ্জাব) অঞ্চলের লোক আছে কুলুর দুই জন ভিক্ষুর মুখে হিন্দী কথা শুনিয়া আমার প্রসন্নতাপূর্ণ হইল। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা এক জন লামার শিষ্য, তিনি উচ্চশ্রেণীর সিদ্ধপুরুষ ও অবতারবিশে[ষ] এখানে প্রায় দুই মাস তিনি বিরাজ করিতেছেন এবং অ[ারও] এক মাস থাকিবেন। ইঁহার জন্ম ডুক্‌পা (ভুটান) প্র[দেশে] সেই জন্য লোকে ইঁহাকে ডুক্‌পা লামা বলে। নেপ[াল] সীমানার নিকট তিব্বতের কোরোং অঞ্চলে এবং অন্য স্থানে ইনি বড় বড় মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গুরুজী [দিন] রাত্র যোগাসনে থাকেন, আমরা ত্রিশ-চল্লিশ জন ভিক্ষু [তাঁহার] শিষ্যরূপে তাঁহার সেবায় আছি। উনি বজ্রচ্ছে[দিকা] প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তকের ধর্ম্মার্থ বিতরণের জন্য ছাপাইবে[ন] আমরা তাহারই ছাপা ও কাগজ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছি।

শেষ যেবার লদাখ গিয়াছিলাম, তখন এবং তাহার পরে লদাখের বড় বড় লামাগণ আমায় কতকগুলি পত্র দিয়াছিলেন সেগুলি আমার সঙ্গে ছিল। সেগুলিতে আমার সম্বন্ধে প্রশংসা ও আমার তিব্বত-যাত্রার উদ্দেশ্য বিচার ইত্যাদি অনেক কথা ত ছিলই উপরন্তু তাহাতে আমাকে সহায়তা করার অনুরোধও স্পষ্ট ভাষায় লিখিত ছিল। চিঠিগুলি দেখাইতে অনেক কাজ হইল, কেননা কুলুবাসী ভিক্ষু উহা পড়িয়া আমায় ডুকপা লামার নিকট লইয়া গেলেন এবং তিনি পড়িয়া বলিলেন যে পত্রলেখকদিগের মধ্যে এক জন তাঁহার বিশেষ পরিচিত এবং একই সম্প্রদায়ভুক্ত। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "বুদ্ধধর্ম্ম তাহার জন্মভূমিতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এমন কি ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকও নাই। সেই পুস্তকের জন্য সিংহল গিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানেও দেখিলাম অনেক বড় বড় আচার্য্য লিখিত পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায় না। তিব্বতে সে সবই রহিয়াছে, সেই জন্য আমি তিব্বতের কোন উচ্চশ্রেণীর গুম্বায় (বিহার) থাকিয়া সে-সকল পুস্তক অধ্যয়ন ও সংগ্রহ করিয়া ভারতে লইয়া গিয়া সংস্কৃত বা অন্য ভাষায় অনুবাদ করিতে চাই। এইরূপে ভারতবাসীদিগের মধ্যে পুনরায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার ও পরিচয় করান আমার বিশেষ ইচ্ছা, আপনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তিব্বতে লইয়া চলুন।"

ডুকপা লামা তৎক্ষণাৎ আমাকে সঙ্গে লইতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু এত শীঘ্র স্বীকার করায় আমি বুঝিলাম যে তিনি ভাবিতেছেন যে তিব্বতে কোন ভোটীয়কে লইয়া যাওয়া এবং আমাকে লইয়া যাওয়া উভয়ই সমান, বিশেষ কোন বাধা নাই। যাহা হউক, আমি জিনিষপত্র লইয়া আসি বলিয়া থাপাথলী ফিরিলাম—বুঝিলাম প্রথম অঙ্কে 'কেল্লাফতে' হইয়াছে।

৮ই মার্চ্চ আমার এক পূর্ব্বপরিচিত বৈদ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পাটন গিয়া শুনিলাম তিনিও এ সংসারে নাই। অন্য কয়েক জন সংস্কৃতজ্ঞ বৌদ্ধ সজ্জনের সঙ্গে আলাপ করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম এবং তাঁহারাও আমার ব্যাখ্যা বিচারে সন্তুষ্ট হইলেন। কোন ব্রাহ্মণের যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি এরূপ আকর্ষণ থাকিতে পারে, ইহা তাঁহাদের কাছে আশ্চর্য্য মনে হইতেছিল। তিব্বত যাওয়া সম্বন্ধে ডুকপা লামার আশ্রয় লওয়া ভিন্ন অন্য উপায় তাঁহারাও দেখাইতে পারিলেন না।

পাটন নেপালের প্রাচীন রাজধানী। ইহার অন্য নাম ললিত-পট্টন বা অশোক-পট্টন। অধিবাসী প্রায় সবই বৌদ্ধ এবং নেবার। শহরের চারি ধারে মন্দির-চৈত্যের ছড়াছড়ি, গলির পথে বিছানো ইট প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচায়ক, পুরান রাজপ্রাসাদ এখনও দর্শনীয় বস্তু। শহরে নূতন জলের কল বসান হইয়াছে কিন্তু রাস্তা ও গলির অবস্থা জঘন্য, চারি ধারে আবর্জ্জনার মধ্যে শূকরের পাল চরিয়া বেড়াইতেছে। পাটনের প্রাচীন বিহার এখনও পুরান নামেই প্রসিদ্ধ এবং এখনও সেখানে ভিক্ষুনামে পরিচিত বহু লোকের বাস, যদিও এই "গৃহস্থ ভিক্ষু" শ্রেণীর ভিক্ষুভাব, আমাদের গৃহস্থ গোঁসাইদের সন্ন্যাসের মত, নাম পর্য্যন্তই বজায় আছে, বিদ্যা বা ত্যাগের সহিত সম্বন্ধ নাই। ঐ দিন পাটনে এক বৌদ্ধ গৃহস্থের অতিথি হইলাম। আগের বারে এখানকার এক সাহুকারের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। সেবার আমার তিব্বত যাইবার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু তিনি আমাকে তিব্বত লইয়া যাইতে বিশেষ উৎসুক হইয়াছিলেন। এবার আমি স্বয়ং যাইতে উৎসুক, কিন্তু কেহই এক কথাও বলিলেন না।

পাটন হইতে থাপাথলী ফিরিলাম। ইচ্ছা ছিল সেই দিনই ঐ স্থান ত্যাগ করি—বিপদ হইল আমার সিংহলী চীবর বস্ত্রের মোট। সেটি না থাকিলে স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারিতাম, কিন্তু এ অবস্থায় উহা কেহ দেখিয়া ফেলিলে সন্দেহ করিবে, সেই জন্য উহা এক নেবার-সজ্জনের কাছে রাখার ব্যবস্থা করিলাম। তাহাকে দূরে দাঁড় করাইয়া জিনিষ আনিতে গিয়া দেখিলাম সেখানে অন্য লোক রহিয়াছে, সুতরাং মালপত্র সরান সন্দেহজনক হইবে। এই কারণে সেদিন কিছু করা গেল না এবং সেরাত্রি ওখানেই কাটাইতে হইল। এই চীবর আনা বিশেষ নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হইয়াছিল, আমার অবস্থায় যদি কেহ পড়েন তবে তাঁহাকে আমি উপদেশ দিই যে এই প্রকার কোন দ্রব্য যেন তিনি সঙ্গে না রাখেন।

৯ই মার্চ্চ শনিবার মহাশিবরাত্রি। সেদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সযত্নে কম্বল চীবর ইত্যাদির গাঁঠরি এমনভাবে বাঁধিলাম যাহাতে কেহ সন্দেহ না করে যে বিদায়ের পূর্ব্বেই কেন আমি শয্যাদ্রব্য উঠাইয়াছি। বাহির হইয়া প্রথমে বাগমতীর পুলের নীচে থেকে উপরের দিকে চলিলাম, পরে হঠাৎ ঘুরিয়া পশুপতিনাথের দিকে মোড় ফিরিলাম। পশুপতিনাথ পৌঁছিতে

সূর্য্যোদয় হইল। একে মাঘ-ফাল্গুন মাস, তার উপর নেপালের তীব্র শীত, তবুও হাজার হাজার শ্রদ্ধালু তীর্থকামী স্নান করিতেছে দেখিলাম। স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে ইহাদের অধিকাংশই উত্তর-বিহারের অধিবাসী, অপেক্ষাকৃত অল্লাংশ পূর্ব্ব-সংযুক্ত প্রান্তের, অবশিষ্টাংশে ভারতের প্রায় সকল অঞ্চলের লোকই আছে। আমার আজ স্নান কিংবা বাবা পশুপতিনাথ-দর্শন কোনটারই সময় ছিল না। পুল পার হইয়া গুহ্যেশ্বরী গেলাম ও সেখানে নদী পার হইলাম।

ভাতগাঁওয়ের একটি মন্দিরের প্রবেশ-পথ

সকাল থাকিতেই বোধায় পৌছিলাম। কুন্নর ভিক্ষু রিক্কেনের সঙ্গে ডুক্‌পা লামার কাছে গেলাম। তিনি আমার সিংহলী ভিক্ষু-বস্ত্র দেখিলেন, কি ভাবে পরিতে হয় জিজ্ঞাসা করায় তাহাও দেখাইলাম। পরে রিক্কেন ও তাহার সাথী এবং যে গৃহে ছিল সেখানে গিয়া ভাত খাইয়া প্রাতরাশ সমাপ্ত করিলাম। রিক্কেনকে বলিলাম অতঃপর আমার আহার বিহার বসন সমস্তই ভোটীয় আচারসঙ্গত করিতে হইবে, নহিলে পরে দুঃখ অনিবার্য্য। আমার পরনে এখনও সেই কালো চোগা ছিল, যাহা অন্যের সন্দেহ এবং আমার বিপদের কারণ হইতে পারে, তাহার বদলে ভোটীয় ছুপা (লম্বা কোট) ও তিব্বতী জুতা জোগাড় করার কথা রিক্কেনকে বলিলাম। ছুপা সাত-আট টাকা মূল্যে পাওয়া গেল কিন্তু জুতা তখনই পাইলাম না। যাহা হউক, ছুপা পরিবার পরে সহজে কেহ আমাকে "মদেসিয়া" (মধ্যদেশের লোক) বলিয়া চিনিতে পারিত না। রিক্কেনের ঘরেই থাকিলাম। তাহারা দুই জন সারাদিন ছাপার কাজে ব্যস্ত থাকিত কিন্তু মাঝে মাঝে আসিয়া আমার খবরাখবর লইত। পরদিন ছুপা পরিয়া ডুক্‌পা লামার কাছে গেলাম। ইঁহার আসল নাম গেশে শেব্‌র-দোর্জে (অধ্যাপক প্রজ্ঞাবজ্র)। তিব্বতে গেশে (অধ্যাপক) উপাধি বিদ্বান্ ভিক্ষুমাত্রেরই প্রাপ্য। ইঁহার বয়ঃক্রম এখন ষাট বৎসর। তিব্বতে উত্তর-পূর্ব্ব সীমা প্রান্তকে খাম বলে। ইঁহার বিদ্যাভ্যাস খা এবং তিব্বতের অন্যান্য নানা স্থানে হয়। তাহার মধ্যে তান্ত্রি ক্রিয়া শিক্ষা তিব্বতের প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক লামা শাব শ্রীর নিকট হইয়াছিল। শিক্ষা শেষ হওয়ার পর ই নিজ দেশে (ভুটানে) ফিরিয়া রাজসম্মান ও সমাদর প্র হন। কিন্তু সেখানে শান্তি না পাওয়ায় তিব্বতে ফিরিয়া নেপাল-সীমান্তের নিকট কে-রো ন স্থানে থাকিয়া বহুদিন পূজাপাঠ তন্ত্রমন্ত্রসাধন ইত্যা যাপন করেন। তিব্বতে ও নেপালে তন্ত্রমন্ত্র না জা সম্মান পাওয়া যায় না। ইঁনি বিদ্বান, উপরন্তু তন্ত্রমন্ত্র-ঝাড় ভূতপ্রেত বিতাড়ন ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত, সুতরাং শেব্‌র-দোর্জের চতুষ্পার্শ্বে ধীরে ধীরে বহু ভিক্ষু-ভি সমাবেশ হইল। ভক্ত ও শিষ্যবৃন্দের সহিত কি চলিতে হয় তাহা ইঁনি ভালই জানিতেন। ফলে কেরো পুরান অবলোকিতেশ্বরের মন্দির মেরামত ও সশিষ্য থাকিবার জন্য মঠ নির্ম্মাণও হইল এবং চতুর্দ্দিকে
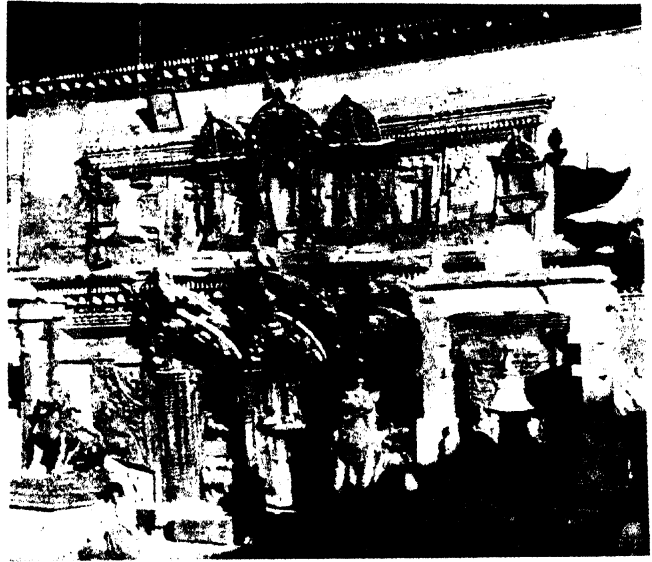
খ্যাতি-প্রতিপত্তিও যথেষ্ট বাড়িল। মন্দির ও মঠ নির্ম্মাণে নেপালের বৌদ্ধগণ অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। সে কারণে ডুক্‌পা লামা নামে ইনি দুই দেশেই খ্যাতি লাভ করেন।

কুলুর ভিক্ষুদ্বয় তাঁহাদের গুরুর অনেক অলৌকিক শক্তির কথা আমাকে বলেন। তাঁহার ধ্যানসমাধি প্রথম কয়দিন আমাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করিয়াছিল। দেখিতাম তিনি ধর্ম্মপাঠ বা শিষ্যভক্তবৃন্দের সহিত বাক্যালাপের মধ্যেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিছুকাল ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। আমি প্রথমে ভাবিতাম এই জীবন্মুক্ত পুরুষ বুঝিবা এইভাবে মাঝে মাঝে বাহিরের জগৎ ত্যাগ করিয়া অন্তর্লোকে প্রবেশ করেন। ভাবিলাম আমার অদৃষ্ট প্রসন্ন, কোথায় চলিয়াছি শুষ্ক মসীলিপ্ত কাগজের সন্ধানে, পথে এইরূপ রত্নাকর লাভ! কিন্তু আমার মত দুর্ভাগা তাকিকের শুষ্ক ন্যায়বিচারে এ ভক্তিভাব বেশী দিন টিকিল না। অল্পদিন সঙ্গে থাকিতেই বুঝিলাম ইহা সমাধি নহে—নিদ্রাবেশ মাত্র। ইঁহারা রাত্রে শয়ন ও নিদ্রায় অতি অল্প সময় যাপন করেন, সুতরাং এইরূপ বসিয়া বসিয়া ক্ষণিক তন্দ্রার অভ্যাস হইয়া যায়। পরে ভাবিয়া দেখিলাম যে আমার মত জ্ঞানমার্গব্রতীও যদি তিন চার দিনে এইরূপে ইঁহার প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া যায়, তবে সাধারণ ভক্ত না জানি কিরূপ বশ হয়। নেপালী ভক্তের ভিড় সর্ব্বদাই দেখিতাম, কেহ দণ্ডবৎ করিয়া সাধ্যমত মিছরি, ফল ও মুদ্রা নিবেদন করিত, কেহ-বা সুখ-দুঃখের কথা বলিত এবং ভবিষ্যতের বিষয় প্রশ্ন করিত। ইনি পাশাক্ষেপ করিয়া ভবিষ্যৎ ব্যক্ত করিতেন, কাহারও বিঘ্ন-নাশের জন্য মন্ত্রপূত যন্ত্র-কবচাদি দিতেন, কাহাকেও বা অল্প পূজাপাঠের ব্যবস্থা দিতেন।

তিব্বতী ভাষা অভ্যাসের জন্য অন্য শিষ্যবর্গের সঙ্গে এক জায়গায় থাকিবার ব্যবস্থা আমি দু-চার দিনের মধ্যেই করিয়াছিলাম, কিন্তু যতটা সুবিধা হইবে ভাবিয়াছিলাম কার্য্যতঃ ততটা হইল না। ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর দল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই উঠিয়া পুস্তক ছাপিবার স্থলে চলিয়া যাইতেন। ছাপিবার কোন প্রেস ছিল না, কাপড়ছাপা তক্তির মত কাষ্ঠফলকের দুই পৃষ্ঠে পুস্তকের অংশ খোদিত থাকে, সেই ফলকে মসী লেপন করিয়া কাগজ আঁটিয়া ছোট বেলন চালাইয়া মুদ্রণ-কার্য্য সম্পাদিত হইত। ইহাই এদেশের প্রথা। ডুক্‌পা লামা ঐভাবে মুদ্রিত সহস্রাধিক খণ্ড "বজ্রচ্ছেদিকা" বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন এবং এখন দশ হাজার খণ্ড বিতরণের জন্য ছাপাইতেছেন।

তিব্বতী পোষাক পরা বা অল্প-স্বল্প ভোটিয়া ভাষায় কথা বলা অভ্যাস হওয়া সত্ত্বেও আমার আত্মবিশ্বাস হইতে অনেক দিন লাগিল। তখন মনে হইত, এই বুঝি বা আমার চেহারার পার্থক্য দেখিয়া কেহ ধরিয়া ফেলে যে আমি ছদ্মবেশী ভারতীয়। বস্তুতঃ এরূপ ভয়ের কোনও কারণ ছিল না। আমার সঙ্গী কুলু অঞ্চলের ভিক্ষু রিগ্জেনের চেহারাও মোটেই ভোটিয়াসদৃশ ছিল না। কিন্তু আমার মত অবস্থায় লোকের মনে ভয় ও সন্দেহের আতিশয্য হইয়াই থাকে এবং সেই কারণে এই পথের বিপদ সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত শোনাকথা ধ্রুবসত্য বলিয়া মনে হয়। আসলে কিছু ভাষাজ্ঞান এবং তিব্বতী পোষাক-পরিচ্ছদ ও চালচলন মোটামুটি ঠিকমত হইলেই যথেষ্ট, কাহার এত দায় পড়িয়াছে যে সে অযথা সূক্ষ্মভাবে তোমার জাতি পরীক্ষা করিতে আসিবে? আমি কিন্তু ধরা পড়িবার ভয়ে সারা মাঘ মাস প্রায় কয়েদীর মতই ছিলাম, দিনে ত বাহির হইতামই না, রাত্রেও নিত্যকৃত্য ব্যাপার ভিন্ন এক-আধ বার মাত্র চৈত্য পরিক্রমায় যাইতাম। এই সময় হেণ্ডাসনের "তিবেতন্-ম্যানুয়েল" পড়িয়া তিব্বতী ভাষা অভ্যাস করিতেছিলাম, কিন্তু উচ্চারণ-শিক্ষায় টের পাইলাম যে এই পুস্তকে লাসার বিশুদ্ধ উচ্চারণ ব্যবহৃত হয় নাই, হইয়াছে টশীলুম্পোর নিকটস্থ চাং প্রদেশের। এই বিষয়ে সর্ চার্লস বেলের পুস্তক শ্রেষ্ঠ, কেন-না তাহাতে লাসার উচ্চারণ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

ডুক্‌পা লামা উপদেশ ও ব্যাখ্যানে যোগ-সমাধির কথা বাদ দিয়া কেবলই মন্ত্র-তন্ত্রের কথা বলিতেন। সুতরাং তাঁহার জ্ঞানের সীমা কত দূর তাহা অল্পদিনেই বুঝিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু আমাকে তিব্বতের সীমানার মধ্যে যাইতে হইলে কাহারও সঙ্গ লইতেই হইবে এবং সে হিসাবে ইঁহার আশ্রয় পাওয়া আমার সৌভাগ্য, সে-বিষয়ে সন্দেহ কি! কিছুকাল পরে যখন কাশীর পণ্ডিতের খোঁজে অনেক নেপালী আমার আশেপাশে ঘুরিতে লাগিল তখন আমি আবার চিন্তিত হইয়া উঠিলাম। আমার ইচ্ছা যতশীঘ্র সম্ভব ঐ স্থান ত্যাগ করা, কিন্তু লামার পুস্তক ছাপা শেষ হয় নাই

এবং গ্রীষ্মের আতিশয্যে শিষ্যবর্গ তখনও ক্লিষ্ট হয় নাই, সুতরাং তিনি যাইবার কথা ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করিলেন না। অন্য দিকে আমার উপর তাঁহার কৃপাদৃষ্টি ছিল। যেদিন তিনি আমাকে করুণাময়ের পূজাবিধি সম্পূর্ণভাবে দেখাইতে স্বীকার পাইলেন সেদিন রিক্কেন আমাকে বলিয়াছিল যে গুরুজী আমার উপর বিশেষ প্রসন্ন, নহিলে এত শীঘ্র আমাকে এ রহস্যের পরিচয় প্রদান করিতেন না। রিক্কেন জানিত না যে, যে-ব্যক্তি করুণাময় (অবলোকিতেশ্বর) নাম পর্য্যন্ত কল্পিত বলিয়াই জানে তাহার নিকট ঐ রত্নের মূল্য কি! নিজের বিশ্বাস সম্বন্ধে সম্যক্ পরিচয় দিতেও আমার ভয় ছিল। কিন্তু ঐরূপ ব্যাপারে এবং যখন পাটন ও কাঠমাণ্ডব হইতে লোকে আমার উপদেশ শুনিতে আসিত তখন আমি বিশেষ সঙ্কোচের মধ্যে পড়িতাম। কি করিয়া বলি যে আমি পুরুষোত্তম বুদ্ধের উপাসক, তোমাদের অলৌকিক বুদ্ধে আমার বিশ্বাস নাই।

২৭শে মার্চ্চ পুস্তক ছাপা শেষ হইয়া গেল। এদিকে চৈত্রের গরমে ভোটিয়াদিগের কয়েক জন কষ্ট পাইতে লাগিল। এই সকল কারণে গুরু স্থির করিলেন যে দু-চার দিন স্বয়ম্ভুতে থাকিয়া যল্মো যাত্রা করিবেন। যল্মোর পর তাঁহার শেষ-জীবন লব্ চীকী গুহায় যাপন করা স্থির ছিল। আমি নেপাল-সীমা পার না হইলেও ভোটিয়াদের বসতি যল্মোতে যাইতে পারিব এই খবরেই খুশী হইলাম, কেন-না সেখানে ধরাপড়ার ভয় কম। আমি বোধা পৌঁছানর পর হইতেই পাকা ভোটিয় হইবার চেষ্টায় ছিলাম, স্নান করা পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল যদিও তাহাতে প্রথমে পিসুর উৎপাতে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

৩১শে মার্চ্চ আমাদের দল বোধা ছাড়িয়া কিন্দু চলিল, এত দিন পরে আমি আবার পথে বাহির হইলাম। কাঠমাণ্ডব পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ভোটিয়া জুতায় পা কাটিয়া গেল, কিন্তু আমি ভয়ের চোটে তাহা খুলিতে পারিলাম না, পাছে আমার ভোটিয়ত্ব ঘুচিয়া যায়—যদিও সঙ্গী খাঁটি ভোটিয়দের অধিকাংশই নগ্নপদে ছিলেন—মনে পাপ থাকার এতই বিপদ। কাঠমাণ্ডবের লোকে তিব্বতী এতই দেখে যে তাহারা ভোটিয় দলের দিকে দৃক্পাতও করে কি না সন্দেহ, অথচ আমার প্রতি পদেই সন্দেহ হইতেছিল যে সকলেই আমার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইতেছে। জনৈক পরিচিত নেপালী গৃহস্থ কয়েক বার আমাকে আগ্রহ পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, ১লা ও ২রা এপ্রিল তাঁহার গৃহে কাটাইলাম। ইনি লোক বড়ই ভাল ছিলেন, যদিও ইনি জানিতেন যে তিনি ছদ্মবেশী ভারতীয়কে আশ্রয় দিয়াছেন

পশুপতিনাথের তীর্থযাত্রিণী পথিমধ্যে অসুস্থ হইয়া কুলির দ্বারা বাহিত হইতেছেন।

একথা নেপালরাজের কর্ণগোচর হইলে তাঁহার কঠোর অবার্থ—আমার উদ্দেশ্য সৎ বা তাঁহার আচরণ ধর্ম্মসঙ্গত হ বিচার হইবে না—তবুও আমাকে আমন্ত্রণ ও আশ্রয় দ্বিধা বোধ করেন নাই। চতুর্থ দিনে আমি কাঠমাণ্ডব হ স্বয়ম্ভু পৌঁছিলাম।

ভারতের সহিত প্রাচীন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ নেপালের উর্ব্বর উপত্যকায় কাঠমাণ্ডব, পাটন ও ভাতগাঁও—এই তিনটি শহর ও বহু গ্রাম আছে। কিম্বদন্তী আছে যে, পাটন—প্রাচীন ললিতপট্টন বা অশোকপট্টন—মহারাজ অশোক স্থাপিত এবং তাঁহার সময়ে ইহা মৌর্য্যসাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। নেপালের অর্দ্ধ-ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'স্বয়ম্ভু-পুরাণে' সম্রাট অশোকের নেপাল-যাত্রার বিবরণও আছে। উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভের পূর্ব্বে বীরগঞ্জের পথে নেপাল আসা প্রশস্ত ছিল না, ভারত হইতে ভিখ না টৌরী-পোখরা হইয়াই লোকে নেপাল আসিত।

ভারত ও নেপালের সম্বন্ধ প্রাচীন হইলেও নেপালের নেওয়ারী (নেবারী=নেপালী) ভাষা আর্য্যভাষা নয়, যদিও কালে ইহাতে বহু সংস্কৃত ও সংস্কৃত-অপভ্রংশ শব্দ গৃহীত হইয়াছে। ইহা বর্ম্মা ও তিব্বতী ভাষার বংশজ। প্রাচীন কাল হইতেই মধ্যদেশের সহিত এদেশের সংযোগ ছিল ও বিভিন্ন সময়ে বহু সহস্র মধ্যদেশীয় নিজ দেশ ছাড়িয়া এখানে বসতি করিয়াছে। কিন্তু মনে হয় না যে কখনও তাহারা একসঙ্গে অধিক সংখ্যায় আসিয়াছিল, কেন-না তাহা হইলে এদেশে তাহাদের ভাষার পৃথক অস্তিত্ব থাকিত। আজ যদিও নেবারদিগের মুখমণ্ডলে মঙ্গোল জাতির ছাপ বিশেষ ভাবে নাই, কিন্তু ইহাদের ভাষা দক্ষিণ অপেক্ষা উত্তর দেশের সহিত অধিক সম্পর্ক প্রকাশ করে। সপ্তম শতাব্দীতে, যখন উত্তর-ভারতে সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের শাসন ছিল, নেপাল তিব্বতীয় রাষ্ট্রপতি স্রোং-চেন-গেম্বোর আধিপত্য স্বীকার করিত। মুসলমান রাজত্বের সময় ভারত হইতে পলাতক রাজবংশধরগণ কখন কখন নেপাল শাসন করিয়াছেন।

নেপাল উপত্যকা সাধারণতঃ ক্ষুদ্র প্রদেশ। তাহার উপর সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তে রাজা যক্ষমল যখন তাঁহার রাজ্য নিজ পুত্রগণের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করিয়া দিলেন তখন নেপাল নিতান্তই হীনবল হইয়া পড়িল। ঐ সময় হইতে কাঠমাণ্ডব, পাটন ও ভাতগাঁও এই তিন নগরে তিন জন রাজা রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এদিকে পশ্চিম অঞ্চলে শিশোদীয়-বংশ নিজ দেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়া গোর্খা প্রদেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গোর্খাদের ঐ বংশের দশম রাজা পৃথ্বীনারায়ণ বিশেষ মনস্বী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নেপালের এই দুর্ব্বল অবস্থার সুযোগ লইয়া ২১শে ডিসেম্বর ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে কাঠমাণ্ডব দখল করেন এবং সেই সময় হইতে নেপাল গোর্খা-বংশের করতলগত হয়। আশ্চর্য্য এই যে, নেপাল যদিও প্রথমে বহু শতাব্দী যাবৎ বৌদ্ধ শাসকের হস্তেই ছিল এবং গোর্খা-রাজা ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মানুগত, তাহা হইলেও এদেশে কখনও ধর্ম্মের নামে কাহারও উপর অত্যাচার হয় নাই। মহারাজ পৃথ্বীনারায়ণ হইতে মহারাজ রাজেন্দ্রবিক্রমশাহের সময় পর্য্যন্ত নেপালের শাসনতন্ত্র গোর্খা ঠকুরী ক্ষত্রিয় রাজবংশের হস্তেই ছিল, কিন্তু ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বরের বিপ্লবে এক নূতন শাসনরীতি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা এখনও বর্ত্তমান। এই বিপ্লবের ফলে দেশের শাসনবল্গা মহারাজ জঙ্গবাহাদুর হস্তগত করেন। যদিও তিনি নিজেকে মহামন্ত্রী নামে অভিহিত করেন, তবুও ইহাতে সন্দেহ নাই যে ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পৃথ্বীনারায়ণের বংশ নামমাত্র নেপালের অধিরাজ (মহারাজাধিরাজ), বাস্তবপক্ষে মহারাজ জঙ্গবাহাদুরের রাণা-বংশই রাষ্ট্রপতি।

মহারাজ জঙ্গবাহাদুর নিজের ভায়েদের সাহায্যেই এই বিপ্লবে সাফল্য লাভ করেন, সুতরাং উত্তরাধিকার-বিষয়ে ভ্রাতাদিগের কথা তাঁহাকে ভাবিতে হয়। তিনি নিয়ম করেন যে মহামন্ত্রীর (যাঁহাকে "তিন সরকার"=শ্রী ৩, এবং মহারাজ আখ্যাও দেওয়া হয়) আসন শূন্য হইলে জীবিত ভ্রাতৃগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ সেই পদে আসীন হইবেন। ভায়েদের পালা শেষ হইলে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের (পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্র) মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ সেই পদ পাইবেন। মহারাজ জঙ্গবাহাদুরের পর তাঁহার ভ্রাতা উদীপসিংহ "তিন সরকার" পদ লাভ করেন (১৮৭৭-৮৫ খ্রীঃ), কিন্তু জঙ্গবাহাদুরের পুত্রগণের ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁহাকে ভারতে পলায়ন করিতে হয়। উদীপসিংহের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বীরশমশের পিতৃব্যকে গুলি করিয়া গদী দখল করেন (১৮৮৫-১৯০১ খ্রীঃ)। তাঁহার পর মহারাজ দেবশমশের কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করিয়া ভারতে পলায়ন করিলে মহারাজ চন্দ্রশমশের (১৯০১-১৯২৯) রাজত্ব করেন, তাহার পরের কথা ত আধুনিক ইতিহাস।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পৃথ্বীনারায়ণের বংশ এখন নেপালের অধিরাজ, কিন্তু রাজশক্তি সম্পূর্ণই প্রধান মন্ত্রীর আয়ত্তে, শাসন-তন্ত্র ভাঙা-গড়ার এক বিন্দু অধিকারও অধিরাজের হস্তে নাই।

মন্ত্রীপদ শূন্য হইলে রাণাবংশের পরবর্ত্তী জ্যেষ্ঠ পুরুষ স্বভাবতই সে পদে আসীন হয়েন। প্রধান মন্ত্রীর নীচে চীফ সাহেব (কমাণ্ডর-ইন-চীফ), পরে লাটসাহেব (ফৌজী লাট), তাহার নীচে রাজ্যের চারি জন জেনারেলের পদ এবং অন্যান্য উচ্চপদ সকলই ঐ বংশের অধিকারে আছে। মহারাজ জঙ্গবাহাদুরের ভ্রাতৃবংশে উৎপন্ন প্রত্যেক শিশুরই নেপালের প্রধান মন্ত্রী হইবার আশা আছে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা শতাধিক হওয়ায় সে আশা পূর্ণ হওয়া এখন কঠিন, এবং ইহাই ভবিষ্যতে এই পদ্ধতি বিনাশের কারণ হইবে।

নেপালের শাসনপ্রথাকে সামরিক শাসন বলিলেই চলে। রাণাবংশে পুত্র জন্মিবামাত্রই "জেনারেল" অর্থাৎ সেনাপতি হয় (যদিও মহারাজ চন্দ্রশমশের এই প্রথায় অনেক বাধা দিয়াছিলেন) এবং পরে বয়ঃক্রম অনুসারে ও বংশসম্পর্কের সুপারিশে উচ্চতম দায়িত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত হইতে পারে, যোগ্যতা থাকুক বা নাই থাকুক। যুদ্ধবিদ্যার ক-খ-জ্ঞানশূন্য হইয়াও এইরূপে সহস্র সৈনিকের অধ্যক্ষ "জর্নৈল" হইতে পারা যায়। এই জন্য উচ্চ আশা ও অভিলাষ পোষণ করায় ইহাদের চালচলন অবস্থা অনুসারে না হইয়া বংশগৌরব অনুযায়ী হয়, তাহাদের অধিকাংশেরই বুদ্ধি বা পরিশ্রম দ্বারা দেশের কোন উন্নতি করার যোগ্যতা না থাকিলেও রাজাকেও এই বিরাট পরিবারের সকল ব্যক্তিকেই পোষণ করিতে হয়। বহু বিবাহের কারণে এখনই এই বংশের পুরুষের সংখ্যা দুই শতের কাছাকাছি হইয়াছে এবং ঐ প্রথা থাকিলে কিছুদিনের মধ্যেই সহস্রের কোঠায় পৌঁছিবে। যদিও মহারাজ চন্দ্রশমশের নিজের পুত্রগণের শিক্ষার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন এবং যদিও তাঁহার অন্য কয়েকটি ভ্রাতাও অনুরূপ পথ অনুসরণ করিয়াছেন, তথাপি এই শত শত "জর্নৈল"দিগের কথা যখন ভাবি তখন মনে হয় অবস্থা বিশেষ সুবিধার নয়।

নেপালের আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতার মূল কারণ না জানায় অনেক হিন্দু উহার সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে নেপালে সাধারণ প্রজার অধিকার ভারতের অপকৃষ্টতম দেশী রাজ্যের প্রজার অপেক্ষা কম, এবং ঐ কারণে রাষ্ট্রশক্তির বা উন্নতির স্রোত তাহাদের নিকট রুদ্ধ। যে "তিন-সরকারের" শাসনের উপর তাহাদের আশা-ভরসা সেই পদের অধিকারীবৃন্দের অধিকাংশই শিক্ষাদীক্ষায় ঐরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদের অনুপযুক্ত এবং রাজসিক চালচলনের জন্য অমিতব্যয়ী হওয়ায় শোচনীয় রূপে আর্থিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত। আমি দুই-চার জনের কথা বলিতেছি না, বলিতেছি ঐ বংশের সমষ্টির কথা যাহার অন্তর্গত প্রত্যেক পুরুষেরই জীবিত থাকিলে একদিন ঐ উচ্চতম পদলাভের সম্ভাবনা আছে—সমষ্টির কথা বলার কারণ এই যে, এইরূপ ব্যাপারে গড়পড়তা যাচাই একমাত্র বিচারের পথ।

অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিগত শাসনে শাসকের জীবন সর্ব্বদাই বিপদসঙ্কুল হয়, নেপালে সেই অবস্থা। প্রবাদ আছে, 'নেপালের তিন-সরকারীর মূল্য এক গুলি, যাহাদ্বারা মহারাজ জঙ্গবাহাদুর উহা ক্রয় করেন।' গুলি হইতে রক্ষা পাইলেও সেইরূপ ষড়যন্ত্রের ভয় বরাবরই আছে যাহার ফলে দেবশমশের কয়েক মাসের মধ্যেই দেশ হইতে বিতাড়িত হন। এইরূপ অবস্থায় তিন-সরকার পদ লাভ করিলেও ক্ষণেকের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া সম্ভব নহে, সদাই কুচক্রীর ষড়যন্ত্রের ভয় থাকে এবং সেই জন্য নিজ সন্তানসন্ততির জন্য যত দূর সম্ভব ধন-সংগ্রহ এবং তাহা দেশের বাহিরে সুরক্ষার জন্য বিদেশী ব্যাঙ্কে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হয়, যাহাতে চক্রান্তের ফলে পদচ্যুতির সঙ্গে পরিবারের সমস্ত সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত না হয়। ইহার ফলে দেশের ধনবল ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় উন্নতির পথে বিষম বাধা জন্মায়।

ক্রমশঃ
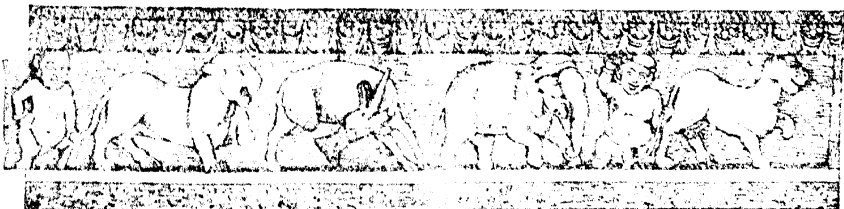
এই সেই ব্যথা-তীর্থ

শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

ভোরে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই তিমিরবরণ তাহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে আসিয়া দাঁড়ায়। এই বারান্দাটি ছোট—অতি ছোট একেবারে, এবং ঠিক তাহার একার পক্ষে কষ্টে বাসযোগ্য ঘরেরই মাপসই—একচুলও বড় হইবে না। বারান্দাটি বড় রাস্তারই ঠিক উপরে অবস্থিত—এখানে দাঁড়াইলে রাস্তার বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে। ত্রিতলের বারান্দা এটি—কাজেই বহু উচ্চে অবস্থিত হওয়ার ফলে রাস্তার একটা নূতন রূপ এখানে দাঁড়াইলে চোখে ধরা পড়ে। তিমিরবরণ সে রূপ আজ তিন বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছে; কখনও জনবিরল নিষ্প্রাণ, কখনও জনাধিক্যে অস্থির চঞ্চল, কখনও আবার একেবারে উন্মাদ...কখনও হয়ত এমন আবার যে, তিমিরবরণ তাহা প্রকাশের যোগ্য ভাষা খুঁজিয়া পায় না।

এখানে দাঁড়াইয়া নিত্য ভোরে তিমিরবরণ অনারব্ধ-কর্ম্ম শহরের মূর্ত্তিটা একবার দেখিয়া লয়, তার পর দৃষ্টি আরও প্রসারিত করিয়া দিয়া দেখে এই পৃথিবীর একটা মূর্ত্তি। আর ভাবে, এই সেই ব্যথা-তীর্থ! পৃথিবীর পানে চাহিয়া নির্জ্জন মুহূর্ত্তে তাহার এই একমাত্র কথাই মনে জাগে। আর এই পৃথিবীর মানুষের কথাটাও সেই সঙ্গে একবার সে না ভাবিয়া পারে না,—এই সেই ব্যথা-তীর্থের যাত্রীদল!

তার পর একে একে মনে জাগে বহু কথা।—সেই রাজার দুলাল বুদ্ধের কথা! এমন আরও কত কথা! গোটা ভারতবর্ষের একটা ব্যথা-কাতর রূপ জাগিয়া উঠে তাহার চোখের সম্মুখে।

তার পর নিজের কথা। এই তীর্থের সেও ত এক জন যাত্রী। সামান্য যাত্রী সে—আর তাহারই সম্মুখে বিস্তৃত পড়িয়া রহিয়াছে আদি অনন্ত কাল ধরিয়া সেই মহাতীর্থ—যুগে যুগে যেন সে ঐ একই নামে পরিচয় দিয়া আসিতেছে···ব্যথা-তীর্থ!

ভোরের পৃথিবীর রূপ নিবিষ্ট হইয়া দেখিবার মত সময় তিমিরবরণের নাই। সকালে তাহাকে দুইটি বাড়ীতে ছাত্র পড়াইতে যাইতে হয়; তার পর নিজের কলেজ আছে, সে বি-এস্‌সি পড়ে। তাড়াতাড়ি ছাত্র-পড়ানোর কাজটা তাহাকে সমাধা করিতে হয়। সে কোনও রকমে চোখ-মুখ ধোওয়ার কাজ শেষ করিয়া রাস্তার দিকের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া এবং ভিতরের দিকের দরজায় তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া পড়ে। তিমিরবরণের বাসাটি একটি হোটেল—নীচের তলায় হোটেল ও রেষ্টুরেণ্ট্‌ এবং উপরের দুই তলায় স্থায়ী ভাবে ভদ্রলোকদের থাকিবার ব্যবস্থাও আছে। দশ-বারো জন নানা বয়সের অধিবাসী প্রায় স্থায়ী ভাবেই আজ বহুদিন ধরিয়া এখানে বসবাস করিতেছে। তিমিরবরণও তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া দিল এই হোটেলের ত্রিতলের ঐ ছোট ঘরটিতে থাকিয়া। এখন এই ঘরটিই তবু তাহার কাছে আপনার হইয়া গিয়াছে, কারণ এত বড় পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় স্থান তাহার জানা নাই যেখানে জ্ঞানতঃ সে ইহার অধিক কাল একযোগে বসবাস করিয়াছে। তাহার নিকট-আত্মীয়ের মধ্যে একমাত্র তাহার মধ্যম মাতুল সপরিবারে বর্ত্তমান। তিনি ধনী, কাজেই তিমিরবরণ আত্মশ্লাঘার পক্ষে হানিকর মনে করিয়া তাঁহার সঙ্গে আত্মীয়তা বজায় রাখে নাই। অবশ্য সে-পক্ষও ইহার প্রতিবাদকল্পে এমন কিছু কোন দিন করে নাই যাহার জন্য তিমিরবরণের প্রতি কোন দোষারোপ করা যাইতে পারে। দুঃখ-দৈন্য-দারিদ্র্য ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়াই বহুবার জীবনে তাহাকে দেখা দিয়াছে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই সে ধনী মাতুলের কাছে প্রার্থীরূপে গিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই, এবং জীবনে হয়ত আর পারিবেও না—যদিও সে জানে যে আমরণ এই ব্যথা-তীর্থে তাহাকে দুঃখদৈন্য চরণে জড়াইয়া পথ চলিতে হইবে।

তিমিরবরণ নীচের রেষ্টরেন্ট হইতে এক কাপ চা একটু একটু করিয়া কণ্ঠে ঢালিয়া নিঃশেষ করিয়া ছাত্র পড়াইতে বাহির হইয়া গেল। ছাত্রের বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পা আর তাহার উঠিতেছিল না। দুই দিন সে পড়াইতে আসিতে পারে নাই। অবশ্য, না আসিতে পারার যথেষ্ট কারণই তাহার রহিয়াছে, কিন্তু সে-কথা যদি ছাত্রের পিতা বিশ্বাস না করেন? সুরেশ্বরবাবুর প্রতি তিমিরবরণের কেন জানি ধারণা অত্যন্ত বিরূপ ছিল। লোকটির কথাবার্ত্তা কেমন যেন রূঢ়। সত্যই সুরেশ্বরবাবু যদি এমন কিছু কঠিন কথাই তাহাকে বলিয়া বসেন ত কি তাহার যথাকর্ত্তব্য হইবে তখন? তিমিরবরণ একবার মাত্র সে-কথা ভাবিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। দুঃখ-দারিদ্র্য জীবনে তাহার এমন কিছু অপরিচিত নয়, তবে আর তাহার ভাবিবার কি আছে। পনর টাকার মায়া সে সহজেই কাটাইয়া উঠিতে পারিবে।

তিমিরবরণ গেটের ভিতর পা বাড়াইয়াই একেবারে সুরেশ্বরবাবুর সম্মুখে পড়িয়া গেল। সুরেশ্বরবাবু তাঁহার বাগানে পায়চারি করিতেছিলেন এবং একটা চাকরের প্রতি কি যেন উপদেশবাণী বর্ষণ করিতেছিলেন।

তিমিরবরণকে দেখিয়া সুরেশ্বরবাবু উপদেশ-বর্ষণ বন্ধ করিয়া তাহাকে বলিলেন—আজ একটু বেশী ভোরে এসে পড়া হয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে না কি?

তিমিরবরণ লজ্জিত হইয়া উঠিল।

সুরেশ্বরবাবু একটু যেন সময় লইয়াই আবার বলিলেন—দেখ তিমির, তোমার খুশীমত তুমি কামাই করগে তা'তে আমার আসবে যাবে না কিছুই, কিন্তু বিন্টুর পাশ করা চাই বছর বছর। ব্যস্, তা'হলেই হ'ল।

তিমিরবরণ অপ্রতিভ ভাবটা কোন রকমে কাটাইয়া উঠিতে না পারিয়া নিজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াই যেন বলিয়া ফেলিল—আমি ইচ্ছে ক'রে আর কামাই করি নি এ দু-দিন, বিশেষ কাজ ছিল তাই বাধ্য হয়েছি কামাই করতে।

সুরেশ্বরবাবু কেমন যেন একটু হাসিয়া বলিলেন—আমি কি তা অস্বীকার করছি বাপু। হুঁ, কাজ ত মানুষের থাকতেই পারে। মাসে অমন জরুরি কাজ বেশী থাকলেই একটু অসুবিধার কথা যে!

বলিয়া সুরেশ্বরবাবু আবার চাকরের প্রতি ফিরিয়া তাহারই সঙ্গে কথা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

তিমিরবরণ অস্বস্তিকর একটা উত্তেজনা লইয়া ক্ষণেক সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল এবং অশোভন কিছু করিয়া ওঠা তাহার দ্বারা সম্ভব নয় জানিয়াই যেন পড়াইবার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

দুই দিন সে পড়াইতে আসিতে পারে নাই এবং সেজন্য নিজের কাছেই সে যথেষ্ট লজ্জিত হইয়া ছিল, এ অবস্থায় তাহাকে তাহার দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় তিমিরবরণের মনের অবস্থা যে কত দূর খারাপ হইয়াছিল তাহা অবশ্য তাহার ছাত্র বিন্টু ধরিতে পারিল না, কিন্তু মাষ্টার-মশাই যে আজ সুস্থ মনে নাই তাহা সে বুঝিল। একবার তাই সে জিজ্ঞাসা করিয়াও বসিল—আপনার কি জ্বর হয়েছিল মাষ্টার-মশাই?

তিমিরবরণ এ প্রশ্নের উত্তরে সহজভাবেই বলিল—না বিন্টু, আমার এক বন্ধুর বোনের বিয়ে হ'ল—তাই এ দু-দিন আসতে পারি নি। তারা আমাকে কিছুতেই এ দু-দিন পড়াতে আসতে দিলে না। তোমার কি পড়ার খুব ক্ষতি হয়েছে তা'তে?

বিন্টু বলিল—না। কেন, বাবা কিছু বলেছেন নাকি?

তিমিরবরণ বলিল—না। এম্‌নিই জিজ্ঞেস করছি। ক্লাসে এ দু-দিনে যদি বেশী কিছু পড়ানো হয়ে গিয়ে থাকে ত রবিবার দিন এসে তা পড়িয়ে দিয়ে যাব'খন।

বিন্টু তাড়াতাড়ি বলিল—না মাষ্টার-মশাই, রবিবার আসবেন না। রবিবার আমি পড়ব না কিছুতেই। ছুটির দিনে আবার পড়া কিসের!

তিমিরবরণ অন্য দিনের তুলনায় আজ একটু বেশী সময় বিন্টুকে পড়াইয়াই বিদায় লইল। আবার অন্যত্র তাহাকে ছাত্র পড়াইতে যাইতে হইবে। সেখানেও আবার এই একই পর্ব্বের আশঙ্কা রহিয়াছে।

দ্বিতীয় বাড়ীতে তিমিরবরণ নিতান্ত ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করিল। কি জানি, অনন্তবাবুও যদি আবার সহসা সুরেশ্বরবাবুর মতই কোন নিদারুণ কিছু বলিয়া আঘাত করিয়া বসেন ত সে কেমন করিয়া যে এই ট্যুইশন্ বজায় রাখিবে তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। সুরেশ্বরবাবুর এক কথার পরেই সে যে কেন ঐ সামান্য পনর টাকা অবজ্ঞাভরে ছাড়িয়া দিয়া আসিতে পারিল না তাহাও সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। অনন্তবাবু সামান্য কোন কথা বলিলেই হয়ত সুরেশ্বরবাবুর প্রতি যে আচরণে ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে তাহার দিক হইতে তাহা সে চরম করিয়া জোড় মিটাইয়া সম্পন্ন করিবে।

কিন্তু অনন্তবাবু তিমিরবরণকে দেখিয়া একটা কথা বলিলেন না। তিমিরবরণ যে এই দুই দিন পড়াইতে আসে নাই তাহা যেন তিনি জানেন না এমন একটা আভাস তাঁহার নীরবতা হইতে অনুমান করিয়া লইলে কিছুমাত্র অন্যায় করা হয় না। তিমিরবরণ ইহাতে অধিকতর অস্বস্তি অনুভব করিল। কত কথাই তাহার মনে জাগিতেছিল। এমনও হইতে পারে যে অনন্তবাবু তাহার এই দুই দিন কামাই হওয়ায় এত দূর চটিয়াছেন যে একটি কথাও তিনি বলিতে পারিলেন না। এসব ক্ষেত্রে নীরবতা মানুষকে মুক্তি দেয় কোন দিনই, বরং অন্যায়টাকে আরও স্পষ্ট, আরও দৃ

করিয়া তোলে। তিমিরবরণের কাছেও ব্যাপারটা তেমনই দাঁড়াইয়া গেল। ইহা অপেক্ষা সুরেশ্বরবাবুর মন্তব্য সহজে সহ্য করা চলে। এ যেন কিছুতেই সে সহিতে পারিতেছিল না।

অনন্তবাবুর তৃতীয় পুত্র সুমন্ত তাহার ছাত্র। সুমন্ত আসিয়া যথাস্থানে বই খুলিয়া বসিল। তাহার বই খুলিয়া বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মা মায়া দেবী আসিয়া তাহাদের কাছে দাঁড়াইলেন।

তিমিরবরণের মনের অবস্থা তখন ভীষণ। না-জানি মায়া দেবী কি কথা বলিতে কি কথা বলিয়া বিপদ ঘনাইয়া তোলেন।

মায়া দেবী বলিলেন—বাবা তিমির, তোমার কি কোন অসুখ-বিসুখ করেছিল? দিনকাল যা পড়েছে—তাই বড় ভাবনা হয়। আজ না এলে কালই হয়ত সুমন্তকে তোমার মেসে পাঠাতে হ'ত। বড়ই ভাবনার কথা—যা দিন-কাল পড়েছে! একটু সাবধানে চলাফেরা ক'রো বাবা—আর শরীর যদি তোমার ভাল না থাকে ত পড়াতে এসে কাজ নেই—সবার আগে শরীরের যত্ন। তা আজকালকার ছেলে তোমরা, তোমরা কি কারও কথা শুনবে। এখন ভাবনা তাই যত আমাদের।

মায়া দেবী থামিলে তিমিরবরণ নিতান্ত অপরাধীর মত যেন বলিল—না মাসীমা, অসুখ-বিসুখ ত আমার হয় নি কিছু। আমার এক বিশেষ বন্ধুর বোনের পরশু বিয়ে গেছে, তাই এ দু-দিন তারা আমাকে আসতে দেয় নি কিছুতেই।

মায়া দেবী তখন বলিলেন—তবে আজ বাবা না এলেই ত ভাল করতে। এ দু-দিন সেখানে খাটা-খাটনি গেছে ত—মানুষের শরীরে কত আর দেয় বাবা! আজকের দিনটাও বিশ্রাম নিলেই ত ভাল করতে।

তিমিরবরণ নীরব হইয়াই রহিল। মায়া দেবী বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন। তিমিরবরণ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। মানুষের সহানুভূতি, দরদ, দয়াদাক্ষিণ্য, মায়া··· এ-সব আর তাহার ভাল লাগে না মানুষের দুঃখবোধকে ইহারা যেন আরও প্রখর করিয়া তোলে, বেদনাকে আরও বড় করিয়া চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরে যেন। মায়া দেবীর স্নেহাপ্লুত সহানুভূতির করুণ স্পর্শে সুরেশ্বর বাবুর ব্যবহারের রূঢ় অপমান আরও উগ্র দুঃসহ হইয়া উঠে।

ছাত্র-পড়ানো সকালের মত শেষ করিয়া তিমিরবরণ হোটেলে ফিরিয়া আসে। পথে সে মীনার কথাই ভাবিতে থাকে। এ দুই দিন সে মীনার কথা ভাবিবার অবসরই যেন পায় নাই বলিয়া তাহার মনে হয়। কিন্তু আসলে মীনার কথা এত গভীরভাবে তাহার জীবনকে এ দুই দিনে দোলা দিয়াছে যে সে-ভাবনার আর শেষ নাই জানিয়াই ভাবিতে সে চেষ্টা পায় নাই। মীনা তাহার বন্ধু সুব্রতর বোন এই মীনারই বিবাহ উপলক্ষে এ দুই দিন তাহার সমস্ত কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। এই মীনাকে তিমিরবরণ গভীর ভাবে ভালবাসিয়াছিল এবং এ-কথা সে উপলব্ধি করিয়াছিল সেই দিন যেদিন মীনার বিবাহের কথা পাকাপাকি রকমে ঠিক হইয়া গিয়াছিল। অবশ্য, তাহার পূর্ব্বে উপলব্ধি করিলেও মীনাকে জীবনে পাওয়ার কোন যোগ্যতাই তাহার ছিল না। মীনাও যে তাহাকে ভালবাসিয়াছিল তাহাও সে মীনার বহু দিনের আচরণের ভিতর দিয়া যেন বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের ভাব অপরের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িলেও কেহ তাহার মূল্য দেয় নাই। না দিবার কারণও যথেষ্ট বর্ত্তমান ছিল। মীনা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা, সুপ্রতিষ্ঠিত গৃহের বধূ হইবার মত যোগ্যতা তাহার আছে, কাজেই তিমিরবরণের যে কোন দাবি মীনার উপর থাকিতে পারে তাহা কেহ ভাবিয়া দেখা কোনদিন প্রয়োজন মনে করে নাই। তিমিরবরণ নিজেকে ভাল করিয়াই চিনিত—সে যে গৃহহীন, জীবনে অপ্রতিষ্ঠিত তাহা সে ভাল করিয়াই জানে। কাজেই অন্তরের ভীরু দাবি সে প্রকাশের যোগ্য বলিয়া মনে করে নাই, নীরব হইয়াই ছিল। তিমিরবরণের যা-কিছু সামান্য প্রতিষ্ঠা সে শুধু লেখক-হিসাবে। মীনা ছিল তাহার গল্পের প্রধান পাঠিকা এবং অপ্রশংসা ও বিদ্রূপের ভিতর দিয়া চিরদিন সে তিমিরবরণের লেখায় উৎসাহ জোগাইয়া আসিয়াছে। তিমিরবরণ কিন্তু তাহার মনের কথাটা ধরিতে পারিয়াছিল। আজ তাই তিমিরবরণের কেন জানি মনে হয়, মীনার প্রতি সে অবিচার করিয়াছে এবং দুনিয়া অবিচার করিয়াছে তাহার প্রতি। জীবনে মীনার সাক্ষাৎ না ঘটিলে হয়ত লেখক-হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য কোন আগ্রহই তাহার মধ্যে দেখা দিত না। কারণ, অজ্ঞাত অপরিচিত পাঠক-পাঠিকার জন্য তাহার হৃদয়ে কোন অনুভূতি ছিল না বলিলেই হয়। মীনার প্রেরণায় সে অজ্ঞাত পাঠক-পাঠিকার কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে, কিন্তু মীনার প্রেরণার অবর্ত্তমানেও তাহাদের চোখে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে।

তিমিরবরণ হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহারই পাশের ঘরে সুব্রত অনাদি বক্সীর সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। সুব্রত যে তাহারই কাছে আসিয়া ওখানে অপেক্ষা করিতেছে তাহা তিমিরবরণ সহজেই বুঝিল।

নিজের ঘরের দরজা খুলিয়া সুব্রতকে সেখানে আনিয়া বসাইয়া বলিল—কি রে, কলেজ যাবি না আজ?

সুব্রত বলিল—না, শরীরটা আজ ভাল না। ক'দিন

খাটুনি গেছে, বাড়ীটাও আজ একটু হাল্কা হয়েছে, আজকের দুপুরটা তাই শুয়ে কাটাবার মতলব করেছি।

তিমিরবরণ বলিল—সে মন্দ কথা না। আমার পার্সেন্টেজ শর্ট প'ড়ে যাবার ভয় না থাকলে আমিও শুয়ে কাটাতাম আজকের দুপুর।

সুব্রত বলিল—নে, রাখ্, বাপু! পার্সেন্টেজের ভাবনায় তা'বলে সুস্থিরে থাকতে পারব না! খুব হয়েছে! এখন চল্ আমার সঙ্গে, খাওয়া-দাওয়া চানটান্ আমাদের ওখানেই হবে'খন। রাখ্ তোর কলেজ আজ—ও ত আছেই।

সুব্রত যে তাহাকে সহজে ছাড়িয়া দিবে না তাহা তিমিরবরণ বুঝিল, কাজেই নির্ব্বিবাদে সে সুব্রতর প্রস্তাবেই রাজী হইল।

সুব্রত ভীষণ খেয়ালী—কখন যে তাহার মাথায় কি খেয়াল চাপিয়া বসে তাহার ঠিক নাই। পথে নামিয়াই সে বলিল—একটু ঘুরে যেতে হবে। বোস্-সাহেবের বাড়ীর কাছে আমার একটু দরকার আছে।

তিমিরবরণ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—বুঝেছি। সে এমন কিছু দরকার নয় যে না গেলেই নয়। আর তা'ছাড়া বোস-সাহেবের মেয়ে এতক্ষণে কলেজে চলে গেছে বোধ হয়।

সুব্রত তিমিরকে একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিল—যা, ও-ছাড়া আর যেন কোন দরকার মানুষের থাকতে নেই! আর সে কলেজে যাক ছাই না-যাক তা'তে আমার কি!

তিমিরবরণ বলিল—না, তোর যে কিছু তা কি আমি বলছি। আচ্ছা চল, ঘুরেই যাওয়া যাক। বোস্-সাহেবের মেয়েটির ব্যবহার কিন্তু চমৎকার! মীনার বিয়ের দিনে একলাই ত ও মেয়েদের তাল সামলেছে বলতে গেলে।

সুব্রত কেমন যেন একটু বিব্রত হইয়া বলিল—নে, প্রশংসায় আর শতমুখ হ'তে হবে না। অমন লোক-দেখানো কাজ সবাই করতে পারে।

—না, সবাই পারে না। আর, সবাই পারলে—অনুরূপের বোনও ত সেদিন এসেছিল—সেও তার নমুনা দেখিয়ে যেতে পারত। সে ত কই একটা মুখের কথা ব'লে পর্য্যন্ত কাউকে খুশী করতে পারলে না।—বলিয়া তিমিরবরণ মুখ টিপিয়া একটু হাসিল।

সুব্রত অমনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কাজ নেই ওদিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে। চল্, সোজা বাড়ীই যাই।

তিমিরবরণ জোরে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—নে, ন্যাকামো ঢের হয়েছে! তোর ইচ্ছেটা বুঝতে যেন লোকের আজও বাকী আছে। একটু তাড়াতাড়িই চল্, পথে বোস্-সাহেবের গাড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলেও ঘটতে পারে বা।

সুব্রত অভিমানভরে বলিল—না, কিছুতেই যাব না। সেদিন প্রীতি আমাকে ভয়ানক অপমান করেছে। ও যদি আর কারও মেয়ে হ'ত তা হ'লে—

তিমিরবরণ একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—সেকি! প্রীতি কাউকে অপমান করতে পারে ব'লে ত আমার ধারণা নেই। আরও বিশেষ ক'রে তোকে ও অপমান করবে কি!

সুব্রত গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—তা ও পারে। কিন্তু বোস্-সাহেবের মেয়ের মত কাজ সেটা ওর হয় নি। রাস্তায় হেঁটে আমার সঙ্গে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ নজরে পড়ল বাবুল রায়ের বেবী-অষ্টিন্, অমনি হাত তুলে গাড়ী থামালে। ভাবলাম, কি যেন কথা আছে, তা শেষ ক'রেই হয়ত দেবে বাবুল রায়কে বিদায়। কিন্তু তা নয়—চট্ ক'রে গিয়ে উঠে বসল ওর গাড়ীতে। উঠেই আমাকেও তুলতে চাইল সে গাড়ীতে, কিন্তু আমি রাজী না হওয়ায় দিব্যি সে বাবুল রায়ের সঙ্গেই গেল চ'লে। এর চেয়ে আবার মানুষকে অপমান করা যায় কেমন ক'রে শুনি?

শেষের কথাটায় সুব্রতর অভিমান যে কত গভীর তাহ[illegible] তিমিরবরণ বুঝিল। কাজেই চট্ করিয়া কিছু বলিতে[illegible] সে সাহস পাইতেছিল না। পাছে সুব্রতকে তাহা আঘা[illegible] করে।

সুব্রত তিমিরবরণকে নীরব দেখিয়া বলিল—না, ওদি[illegible] ঘুরে যাবার আমার কোনও প্রয়োজন নেই। সো[illegible] বাড়ীতেই চ'—খেয়ে-দেয়ে বহুদিন পরে আজ আবার কবি[illegible] পড়া যাবে'খন।

তিমিরবরণ আর কোনও কথা না বলিয়া সুব্রতর স[illegible] চলিতে লাগিল।

গলির মুখেই একেবারে বিজলীর সঙ্গে তাহাদের দে[illegible] ভালই হইল। বিজলী কলেজে চলিয়াছে, 'প্রক্সী'র ক[illegible] তাহাকে বলিয়া দিলেই হইবে। আর এসব ব্যাপারে বি[illegible] সুচতুরও বটে। কিন্তু তাহারা কিছু বলার পূর্ব্বেই বি[illegible] বলিল—রোল টোয়েন্টির খবর শুনেছিস?

—কে, বিশ্বজিতের কথা বলছিস্ ত? সেই ভাল ছে[illegible] কথা ত? আরে, সেই যে আমাদের বহরমপুর ক[illegible] স্কলার? কই না, কেন, হ'য়েছে কি?

বিজলী মহা বিস্ময়ের সঙ্গে বলিল—কিছুই শুনিস[illegible] সারা ক'লকাতা শহরটা জেনে গেল, আর তোরা[illegible] কিছুই জানিস্ না? বিশ্বজিৎ যে স্যুইসাইড্ করেছে!

—এ্যাঁ, স্যুইসাইড্? সত্যি?

বিজলী বিষণ্ণ কণ্ঠে বলিল—হুঁ। হতভাগা শে[illegible] কিনা পোটাসিয়াম্ সায়ানাইড খেয়ে—

তিমিরবরণ এক রকম আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিল—আ[illegible] বিশ্বজিৎ! বলিস্ কি বিজলী?

বিজলী বলিল—আর বলাবলি কি, কার ভেতরে যে কি আছে তা কি কেউ বলতে পারে? সকালবেলা কলেজ হোষ্টেলে গিয়ে দেখি এই ব্যাপার। একটা দুর্বোধ্য চিঠিও নাকি তার বালিশের নীচে পাওয়া গেছে। সে চিঠিতে আছে গুচ্ছের হেঁয়ালি—হয়ত বা প্রেমেই পড়েছিল। বিচিত্র কি!

সুব্রত বলিল—দূর! বিশ্বজিতের মত ভাল ছেলের পক্ষে তা কি সম্ভব কখনও!

তিমিরবরণ বলিল—বেশী ভালদের নিয়েই ত এই সব বিপদ যত।

বিজলী বলিল—রাখ্ তোর ভাল ছেলে! যত সব মুখ্খুর দল! আহা, কি সুদৃষ্টান্তই রেখে গেলেন পৃথিবীতে! একেই ত বাপু বিষ-ছড়ানো পৃথিবীতে কোন রকমে কায়ক্লেশে বেঁচে আছি, তার মধ্যে আবার এসব কেন?

বিজলী যেমন দুঃখিত হইয়াছিল তেমন আবার ক্ষুব্ধও হইয়াছিল বিশ্বজিতের এই আত্মহত্যায়। বিশ্বজিতের দুঃখ যত বড়ই হউক না কেন, বিজলী তাহাকে কোন দিনই ক্ষমা করিতে পারিবে না।

তিমিরবরণ কিন্তু সহজেই বিশ্বজিতকে ক্ষমা করিতে পারিল তাহার আত্মহত্যার কোন কারণ যথাযথভাবে না জানিয়াও। এমনও ত হইতে পারে যে প্রেম তাহার আত্মহত্যার কারণ একেবারেই নয়। আর তাহা যদি হয়ও তবুও তিমিরবরণ তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিবে। বিশ্বজিৎও ত এই ব্যথা-তীর্থেরই এক জন যাত্রী ছিল—তীর্থের ওপারে সে অনায়াসেই পৌঁছাইয়া গিয়াছে, বাঁচিয়াছে। বিশ্বজিতের প্রতি তাহার কোনও অভিযোগ নাই।

সুব্রতর অভিযোগ ছিল। কেননা সুব্রতকে সে সত্যই ভাবাইয়া তুলিয়াছে। প্রেমে পড়িয়া মানুষের আত্মহত্যার অবস্থাও কখনও আবার আসিতে পারে নাকি? বিচিত্র জগৎ—এখানে সকলই সম্ভব! সুব্রত কেমন হতাশ ও ব্যাকুল হইয়া উঠে।

তার পরে বিজলী দুই একটা কথার পরেই বিদায় লইয়া চলিয়া যায়। 'প্রজ্ঞী'র কথা বলিয়া দিতে তাহাদের আর মনে থাকে না। অবশ্য, কলেজ ছুটি হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী, কাজেই তাহারা সেজন্য ভাবনাগ্রস্তও হয় না।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই তাহারা শুনিতে পায় যে, সুব্রতর পাঁচ বৎসর বয়স্কা ছোট বোন লীনা কাঁদিয়া-কাটিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া তুলিয়াছে এবং বায়না ধরিয়াছে, তাহাকে তাহার দিদির কাছে অবিলম্বে পৌঁছাইয়া দেওয়া হউক। এ দুই দিন কিন্তু সে চুপ-চাপ ছিল। আজ কিন্তু তাহাকে সামলানো দায় হইয়া উঠিয়াছে।

সুব্রত এ সংবাদে চটিয়া গিয়া বলিল—তা মরুক গে, কাঁদছে ত কাঁদুক গে, আমরা তার কি করব শুনি?

সুব্রতর মা রমা দেবী আসিয়া তিমিরবরণকে বলিলেন—ভাল বিপদ হয়েছে আমার। তখনই ত আমি কর্তাকে বার-বার বলেছি যে, কাজ কি বাপু অচেনা অজানা ঘরে—তাও আবার দূরে—বিয়ে দিয়ে। কিন্তু আমার কথা কি কারও কানে গেল! এখন দুর্ভোগ ত ভুগতে হবে আমাকেই। মেয়েটাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে আমার যেন হয়েছে জ্বালা! একে-ওকে ডাকতে গিয়ে তারই নামটা বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে। আমারও যেমন! আহা, মনটা যেন কেমন হয়ে গেছে! কে জানে কেমন ঘরে পড়ল আবার—যে অভিমানী মেয়ে আমার! আবার ওটার জ্বালায় ত আমি আরও গেলুম।...লীনা, এখনও থাম্ বলছি বাপু, মেজাজ আমার বিগড়ে দিস্ নে। সেই তখন থেকে কান্না জুড়েছে, আমার হাড় না-জ্বালিয়ে যেন ওদের সোয়াস্তি নেই।

রমা দেবী আর দাঁড়াইলেন না। ক্রন্দনরতা লীনাকেই বোধ করি শাসন করিতে চলিয়া গেলেন।

তিমিরবরণের কেন জানি হাসি পাইল। চমৎকার মানুষের বেদনা, আর আরও চমৎকার তাহার অভিব্যক্তি!

সুব্রত মহা বিরক্ত হইয়া তিমিরবরণকে নিজের ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া লইয়া সশব্দে ঘরের দরজার খিলটা আঁটিয়া দিল।

কাব্যপাঠ করিয়া আনন্দ-আহরণের চেষ্টা তাহাদের ব্যর্থ হইয়া যায়। পৃথিবীর যাহা-কিছু সুন্দর তাহারই অন্তরে লুকায়িত আছে অব্যর্থ ব্যথা-শর—আঘাত তাহার অনিবার্য্য। সে আঘাত তাহাদের সহ্য করিতেই হয়।

তিমিরবরণ সুব্রতর নিকট বিদায় লইয়া রমা দেবীর সঙ্গে দেখা করিয়া বিকালের দিকে যখন তাহাদের বাড়ী হইতে যায় তখনই ঠিক সুব্রতদের বাড়ীর দুইখানা বাড়ীর পরের বাড়ী হইতে একটা শোকরোল শুনিতে পায়। সমস্ত অন্তর তাহার নিমেষে স্পর্শ করিয়া সে শোকরোল ঝঙ্কারিত হইয়া উঠে, মুহূর্ত্তে সে এই সহসা-সমুত্থিত শোকরোলের কারণ বুঝিতে পারে। সুব্রতর বোন মীনা এবং বাড়ীর আর সকলের কাছেও সে ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিল যে, কল্যাণীর স্বামীর টাইফয়েড, দিন-দিন খারাপের দিকেই চলিয়াছে। কল্যাণী মীনার চেয়ে বছর-পাঁচেকের বড় হইবে হয়ত। মীনা কল্যাণীর বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিল। তাহার কাছেই তিমিরবরণ কল্যাণীর সংসারের সুখ-দুঃখের অনেক কথা শুনিয়াছে এবং এতবেশী শুনিয়াছে যে, কল্যাণীর সহিত তাহার নিজের কোন পরিচয় না-থাকা সত্ত্বেও তাহাকে আর অপরিচিতা মনে হয় না। মীনার কাছে কল্যাণীকে একদিন সে আসিতেও দেখিয়াছিল। সেদিন কল্যাণীর মুখ সে ভাল করিয়া না

দেখিয়া থাকিলেও তাহার কেমন জানি একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ও মুখ সে আর কোথাও অপ্রত্যাশিতভাবে দেখিলেও চিনিয়া লইতে পারিবে। মীনার চোখে কল্যাণীর সমাদর ছিল, তিমিরবরণের কাছে তাই কল্যাণী ছিল অচেনা-আপন। সেই কল্যাণীরই বুঝি আজ কপাল পুড়িল।

তিমিরবরণ মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া সুব্রতদের বাড়ীর বাহিরের দরজার সামনে দাঁড়াইল। হঠাৎ তাহার কানে আসিল বাড়ীর ভিতর হইতে রমা দেবীর বিচলিত কণ্ঠের ডাক, সুব্রত! সুব্রত! একবার ছুটে যা—

তিমিরবরণ আর সেখানে দাঁড়াইল না। দিগন্ত বিধুর করিয়া তখন কান্নার রোল উঠিয়াছে···

রাস্তার মোড়ে আসিয়া তিমিরবরণ একটু চমকাইয়া দাঁড়াইয়া গেল। দক্ষিণ দিকের ফুটপাত ধরিয়া একটা লোক চলিয়াছিল ধীরমন্থর গতিতে। তিমিরবরণ সহজেই তাহাকে চিনিতে পারিল, যদিও চিনিবার মত চেহারা তাহার এখন আর নাই। দল-বাহারীর জমিদার-বাড়ীর ছেলে সে। তিমিরবরণ একটু পা চালাইয়া তাহারই কাছে আগাইয়া গিয়া বলিল—নন্তুবাবু যে!

নন্তুবাবু সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল। তার পরে ক্ষণিক বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া তিমিরবরণের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—তুমি সেই তিমিরবরণ ত? পাঁচ-ছ বছর আগে যেন তোমাকে দল-বাহারীতে একবার দেখেছিলাম ব'লে মনে হয়? তোমাদের বাড়ী ঘর-দোর কিছু আর সেখানে এখন নেই বুঝি? আর থাকবে কি—জমিদারের কবলে গেছে ত—তা ভালই হয়েছে। আর জমিদারেরই বা থাকল কি শুনি—সব গেছে। পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে গেছে। আর ও কিছু থাকবার জিনিষও নয়। জমিদারীর অবশিষ্ট যা আমার হাতে এসে পড়েছিল তা এই দু-বছরেই ফুঁকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছি। বাঁচা গেছে!

তিমিরবরণ একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—বলেন কি, অত বড় জমিদারী এরই মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেল!

নন্তুবাবু হাসিয়া বলিল—হুঁ, তা গেল ত দেখলাম চোখের সামনেই—আর নিজের হাত দিয়েই ত গেল! আর না যাওয়ার কারণও ত কিছু ভেবে পাই না।

তিমিরবরণ তাহারই সঙ্গে পথ চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল—এখন কি আপনাদের জমিদারীর কিছুই আর অবশিষ্ট নেই?

নন্তুবাবু বলিল—অবশিষ্ট এখন দেনা আর আমি।

তিমিরবরণ জিজ্ঞাসা করিল—এখন আপনি আছেন কোথায়? আর চলছেই বা আপনার কেমন ক'রে?

নন্তুবাবু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল—তা চলছে এক রকম কিছু না ক'রেই। এক কালে পয়সা ছড়িয়েছিলাম তারই সুদে। অপরের অনুকম্পায়ই দিন কাটছে এখন। আবার কোন্‌দিন হয় ত দেবে তাড়িয়ে—ভিক্ষের ঝুলি হাতে বেরিয়ে পড়ব পথে। জীবনে দেখা হ'ল সবই—এই যা লাভ! তবে দুঃখ আমি করি না তিমির, কারণ ও ক'রে কোন লাভ নেই। তবে মানুষ যখন আমাকে ঘৃণা করে তিমির, তখন কি জানি কেন দুঃখ পাই। জানি না, তুমিও এরই মধ্যে আমাকে ঘৃণা করতে সুরু করেছ কিনা।

তিমিরবরণ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে বলিল—আপনাকে ঘৃণা করবার মত কোন কারণ ত আমার ঘটে'নি নন্তুবাবু। খামকা একটা লোককে ঘৃণা করার কোন মানে হয় না যে! এক কালের দল-বাহারীর জমিদার আপনি—আপনার জন্যে বড়জোর দুঃখ বোধ করতে পারি, কিন্তু ঘৃণা করব কেন?

—না, অনেকে করে, তাই—বলিয়া নন্তুবাবু আসি একটি গলির দিকে বাঁকিয়া বলিল—আচ্ছা, তা'হলে তিমির। আমার এদিকেই যেতে হবে।

তিমিরবরণ হাত তুলিয়া নমস্কার জানাইয়া দল-বাহারীর ভূতপূর্ব্ব জমিদার নন্তুবাবুর কাছে বিদায় লইয়া নিজে হোটেলের দিকেই চলিল।

তিমিরবরণ নন্তুবাবুর কথা মনে মনে আলোচনা করিতে করিতেই পথ চলিতেছিল। সহসা রাস্তার একটা দোকানে সামনে বহুলোকের ভিড় হইয়াছে দেখিয়া সেও সেখা দাঁড়াইয়া গেল। ভিড়ের মধ্যে একটি লোক দাঁড়াইয়াছিল-তাহার কপালের উপর রক্তের দাগ এবং তাহা ঘিরিয়াই জনতা। দুই-এক কথায় তিমিরবরণ ব্যাপার কতকটা জানিয়া লইয়া আবার পথ চলিতে লাগি ব্যাপারটা এইরূপ,—এই আহত লোকটির সঙ্গে এক জ বহু কালের শত্রুতা ছিল। সে এত দিন কেবল সুযে খুঁজিয়াছে তাহাকে জব্দ করিবার। আজ সহসা তাহা রাস্তায় পাইয়া একটা মিথ্যা চুরির অপবাদ দিয়া দুই মারিতে-না-মারিতেই রাস্তার লোক ছুটিয়া আসিয়া তা সহায়তা করিয়াছে। চোরের উপযুক্ত সাজা হইয়া যাও পরে জানা গেল, চোর সে মোটেই নয় এবং দেখা চোরের আবিষ্কর্ত্তা নিরুদ্দেশ। সমাগত জনমণ্ডলী নিরপরাধ লোকটির জন্য অনুকম্পা জানাইতেছিল। সত্যকার অপরিচিত আসামীর উদ্দেশ্যে মনের ক্ষোভ মিটা যথেচ্ছ গালিগালাজ করিতেছিল।

তিমিরবরণ হোটেলে ফিরিয়া চিঠির বাক্স খুলিয়া নি নামে দুইখানি চিঠি আছে দেখিয়া তাহা লইয়া উপরে উ যাইতেছিল, এমন সময় হোটেলের ম্যানেজার অধর বলিলেন—তিমিরবাবু, আপনার কাছে দু-বার ক'রে আপ

সেই কবিবন্ধুটি এসেছিলেন এবং আর কিছু পরেই আবার আসবেন জানাতে ব'লে গেছেন। আপনাকে তার নাকি আজ পাওয়াই চাই, নইলে তাঁর ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে।

তিমিরবরণ উপরে উঠিয়া গেল।

ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া রাস্তার দিকের দরজাটা খুলিয়া দিয়া ক্ষণেক চল-চঞ্চল রাস্তার পানে অলস দৃষ্টি ফেলিয়া নিজের চৌকির উপর আসিয়া বসিয়া চিঠি দুইখান পড়িতে লাগিল।

একখানি একটি মাসিক পত্রের সম্পাদকের নিকট হইতে আসিয়াছে, অপরখানি লিখিয়াছে তাহারই এক বন্ধু শিলং হইতে।

সম্পাদক লিখিয়াছেন,—তিমিরবাবু, আমাদের কাগজের অবস্থা ত আপনার অজানা নাই, কাজেই আপনি আপনার গল্পের জন্য পারিশ্রমিক না-চাহিয়া কোনও ভাল গল্প যদি অবিলম্বে পাঠাইয়া দেন ত বিশেষ বাধিত হইব। ইত্যাদি।

শিলং হইতে বন্ধু লিখিয়াছে,—হঠাৎ সেদিন একখানি মাসিকপত্র আসিয়া হাতে পড়িল, তোমার 'অরণ্যের ব্যথা' গল্পটি তাহাতে বাহির হইয়াছে। পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম। তোমার সব গল্প পড়িতে পাই না বলিয়া দুঃখ হয়। তুমি যদি তোমার গল্প প্রতি মাসে যে যে কাগজে বাহির হয় তাহার একখানা করিয়া কাপি আমাকে পাঠাইয়া দাও ত আমার পড়া হইতে পারে। এটুকু কষ্ট আমার জন্য স্বীকার করিবে নিশ্চয়। ইত্যাদি।

তিমিরবরণ বিরক্ত হইয়া চিঠি দুইখানি দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পরে হোটেলের চাকর শঙ্কুকে ডাকিয়া এক কাপ চায়ের অর্ডার করিল এবং ফিরিয়া দেখিল, তাহার কবিবন্ধু পার্থ আসিয়া পড়িয়াছে। শঙ্কুকে আবার ডাকিয়া তিমিরবরণ দুই কাপ চায়ের কথাই জানাইয়া দিল।

পার্থকে ঘরে আনিয়া বসাইয়া তিমিরবরণ বলিল—তুই নাকি এরই মধ্যে দু-বার এসে আমায় খোঁজ ক'রে গেছিস্। কেন, আমাকে তোর এত দরকার কিসের?

পার্থ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—তোকে আমার দরকার নয়, দরকার আমার টাকার। আজ যদি টাকা কোথাও না পাই ত কাল থেকে সব উপোসী থাকতে হবে। তার পরে আবার ছোট বোনটার কাল থেকে জ্বর দেখা দিয়েছে, না জানি টাইফয়েডেই দাঁড়িয়ে যায়। একে একে সব সম্পাদকের দরজাতেই গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু আমার দশটা কবিতা কেউ দশ টাকা দিয়েও কিনতে রাজী হ'ল না। ইচ্ছে হ'ল, ঘরে ফিরে কবিতাগুলো সব ছিঁড়ে ফেলি। এর চেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইলেও যে এতক্ষণে দশটা টাকা রোজগার হ'তে পারত, অথচ পার্থ সেন নাকি আবার ভাল কবিতাও লেখে—তার নাম থাকলে নাকি আবার কাগজও বিকোয়,—আবার সম্পাদকের তাগিদেও তাকে অস্থির হ'তে হয়। চমৎকার কিন্তু!

তিমিরবরণ পার্থের হাতে সম্পাদকের ও তাহার শিলঙের বন্ধুর চিঠি দুইখানি ঘরের মেঝে হইতে তুলিয়া দিয়া বলিল—এ চিঠি দু-খানা প'ড়ে দেখ্। আর তোর কত টাকার দরকার এখন শুনি?

পার্থ বলিল—দুটো—চারটে—যা তুই দিতে পারিস্ তাই আমার দরকার।

তিমিরবরণ বলিল—চারটে পর্য্যন্ত দেবার মতই আমার আছে, তার বেশী আজ আর দিতে পারব না।

পার্থ বলিল—ঐ হ'লেই যথেষ্ট হবে।

শঙ্কু আসিয়া চা দিয়া গেল। পার্থ চা পান করিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কই, দে তবে, আজ আর বসব না। আর তুইও ত পড়াতে বেরুবি আর একটু পরেই। পারিস ত আসছে রবিবার একবার আমাদের বাড়ী যাস্। মা তোর কথা বলছিল আজও।

তিমিরবরণ টাকা বাহির করিয়া পার্থের হাতে দিয়া বলিল—কলেজ থেকে ফেরার পথে পারি ত কাল একবার যাব'খন।

—যাস্ কিন্তু। বলিয়া পার্থ চলিয়া গেল।

তিমিরবরণ তাড়াতাড়ি গিয়া রাস্তার দিকের বারান্দার রেলিঙের উপরে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল। পার্থের কথাই সে ভাবিতেছিল। পার্থ চমৎকার কবিতা লেখে। পার্থের কবি-প্রতিভা সাধারণ নয়। কিন্তু পার্থ কি বিপদেই পড়িয়াছে! অতবড় সংসার তাহার একার ঘাড়ে। সংসারে বিধবা মা আছেন, একটি বিধবা বোন, দুইটি অবিবাহিতা বোন ও তিনটি ছোট ভাই। পার্থ কবি, কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানহীন হইতে পারে নাই বলিয়াই তাহাকে এই সংসারের জন্য ছুটাছুটি করিয়া মরিতে হয়। হয়ত কবি-প্রতিভা তাহার একদিন এই দুঃখদৈন্যের মধ্যেই সমাধি লাভ করিবে। হয়ত সে কোনও এক সওদাগরী অফিসের এক কোণে অলক্ষিতে থাকিয়া কলম পিষিয়া যাইবে সারা জীবন।

তিমিরবরণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিল, পার্থ একটা বাস-এর পিছন দিয়া সাবধানে রাস্তা পার হইয়া ওপাশের ফুটপাত ধরিয়া বাড়ীর দিকে হাঁটিয়া চলিয়াছে। পার্থ কবি-হিসাবে এই স্বল্পকাল মধ্যেই বেশ নাম করিয়াছে, হয়ত রাস্তার লোক আঙুল তুলিয়া তাহাকে দেখাইয়া অপরের কাছে তাহার পরিচয়ও দিয়া থাকে।

একে একে রাস্তার আলোগুলি জ্বলিয়া ওঠে, রাস্তার রূপ বদলাইতে থাকে। তিমিরবরণ ঘরের দরজা বন্ধ

করিয়া দিয়া আবার পড়াইতে বাহির হইয়া যায়। রাত্রে সে দুই ঘণ্টার জন্ম একটি ছাত্রী পড়ায়। তাহার ছাত্রী অমিতা থার্ড ক্লাসে পড়ে।

তিমিরবরণের এবেলাও আবার সেই ভয় হয়। কি জানি, ছাত্রীর পিতা কি সে-বাড়ীর অন্ত কেহ যদি তাহার এই দুই দিন কামাইয়ের জন্ম কিছু বলিয়া বসে।

শঙ্কিতহৃদয়ে সে ছাত্রীর পড়ার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। অমিতা তখন নিজের চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপরকার একখানি খোলা বইয়ের পাতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ছিল, আর তাহারই অল্পদূরে তিমিরবরণের চেয়ারে কে এক জন অপরিচিত যুবক অমিতার বইয়ের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া ছিল।

তিমিরবরণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাই একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার আগমন অমিতা টের পায় নাই, সেই অপরিচিত যুবকটিই প্রথম টের পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনার কা'কে চাই ?

অমিতা চকিতে পিছন ফিরিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আঃ, উনিই ত আমার আগের মাষ্টার-মশাই। তার পরে তিমিরবরণকে বলিল—মাষ্টারমশাই, আপনি ওঘরে গিয়ে একটু বসুন, বাবাকে আমি ডেকে দিচ্ছি। বাবার সঙ্গে দেখা না ক'রে যাবেন না যেন।

তিমিরবরণ অমিতার পিতা জ্ঞানবাবুর সঙ্গে দেখা করার আর কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ করিল না। কিন্তু অমিতা কথা শেষ করিয়াই নিমেষে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল দেখিয়া তাহার পিতার সঙ্গে দেখা না করিয়া যাওয়াটাকে সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞানের বিরুদ্ধাচরণ হইবে বলিয়া মনে করিল। কাজেই পাশের ঘরের উদ্দেশ্যেই সে পা বাড়াইল।

অপরিচিত যুবকটি সহসা তিমিরবরণকে প্রশ্ন করিল—আপনারই নাম বুঝি তিমিরবরণ বাবু ? আপনি গল্পটল্পও লিখে থাকেন বুঝি ? অমিতাকে আপনি ক'বছর পড়িয়েছেন ? ও ত কিছুই জানে না দেখছি। এত দিন পাস করেছে যে কি ক'রে তাও ত ভেবে পাই না।

তিমিরবরণ তাহার প্রশ্নগুলির একটিরও উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বোধে ধীরে ধীরে পাশের ঘরে নীরবে চলিয়া গেল।

জ্ঞানবাবু কতকটা অপ্রতিভের মত আসিয়া তিমিরবরণের কাছে দাঁড়াইলেন। তিমিরবরণ যেন লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। ভাল করিয়া সে জ্ঞানবাবুর মুখের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া পর্য্যন্ত চাহিতে পারিল না।

জ্ঞানবাবু বলিলেন—তিমির, ব্যাপারটা বড় বিশ্রী দাঁড়িয়েছে, এতে আমার কিন্তু কোনই হাত নেই। তোমার দু-দিন কামাই হয়েছে ব'লে যে তোমাকে আর রাখছি নে তা যেন মনে ক'রো না। মানুষের শরীর যখন, তখন কামাই হওয়াটা আমি খুব দোষের মনে করি নে, আর তোমার মত কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন ছেলের পক্ষে। যাক্ সে কথা, এখন যা হয়েছে তাই বলি। এই যে অমিতার নূতন মাষ্টার—এটি আমার শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কে কি যেন লতায় পাতায় জড়িয়ে কি একটা হয়। গ্রাম থেকে এখানে এসেছে একটা চাকরির সন্ধানে—অবস্থা নাকি খুবই খারাপ। আমার স্ত্রীর অনুরোধে তাই এত বড় অপ্রিয় কাজও আমাকে করতে হ'চ্ছে। অকারণে এই যে তোমাকে ছাড়িয়ে দিতে হ'চ্ছে এর জন্তে আমার চেয়ে বোধ করি কেউ বেশী দুঃখিত বা লজ্জিত হয় নি। দু-দিন পরে একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো, তোমার মাইনে যা এ ক'দিনের হিসেবে পাওনা হয় তা আমি বুঝিয়ে দেব।

তিমিরবরণ বিদায় লইয়া রাস্তায় নামিয়া আসিল। জ্ঞানবাবুকে একটা কথাও সে বলিয়া উঠিতে পারিল না এবং বলার প্রয়োজন ছিল বলিয়াও সে অনুভব করিল না। পথে সে সমস্ত ব্যাপারটা একবার আদ্যোপান্ত ভাবিয়া দেখিতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। একটা সহজ অনুকম্পায় হৃদয় তাহার ভরিয়া উঠিল ;—সে যে নিজের জন্ত, না জ্ঞানবাবুর জন্ত তাহা সে ভাল করিয়া ধরিতে পারিল না। তার পরে জো[র] করিয়া একবার সে সমস্ত ভুলিতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু সহ[জ] নয় জানিয়া সে রাস্তার দুই পাশের সব জিনিষই একান্ত[ভা]বে দেখিতে লাগিল এবং চিন্তা সেই দিকেই চালিত করি[তে] প্রয়াসী হইল।

নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তিমিরবরণ আলো জা[লি]ল এবং আবার তাহা নিবাইয়া দিয়া শয্যায় শুইয়া পড়ি[ল]। একান্তে অন্ধকারে চিন্তা যেন তাহার আরও সর্ব্বগ্রাসী হ[ইয়া] উঠিল। চোখের পাতা আর তাহার বুজিতে পাইল [না]। নিখিল পৃথিবীর বেদনা যেন আজ তাহার কাছে মূর্ত্তি পাই[বার] জন্ত ব্যাকুলতা জানাইতেছে। রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র হ[ইতে] সামান্ত বনের বানর, মহাভারতের ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-যু[ধিষ্ঠির] হইতে তৃণাদপি যে তৃণ, সকলের ব্যথা-সমুদ্র তরঙ্গ-বি[ক্ষুব্ধ] পুরাণ-ইতিহাসময় ঘুরিয়া মরিতেছে কত মানুষের দী[র্ঘশ্বাস]। তার পরে আজিকার এই পৃথিবী—চিরদিনের ব্যথা-তীর্থ—আজও সেই ব্যথা-তীর্থই রহিয়া গিয়[াছে]। যুগে যুগে তাই শ্রীরামচন্দ্র হইতে শ্রীচৈতন্ত আসিয়[াছেন] এ মহাতীর্থে—নর-নারীর অশ্রু মুছাইতে নয়, কমণ্ডলু [পূর্ণ] করিয়া লইতে তাহাদের অশ্রুতে। কিন্তু সে ত পূর্ণ হ[য়] নয়—যুগে যুগে মানুষ অশ্রু ঢালি দিয়াই চলিয়াছে, চ[লিবে] অনন্তকাল ধরিয়া, তবু সে-কমণ্ডলু কোন দিন পূর্ণ হইবে ন[া]।

তিমিরবরণ আর শয্যায় পড়িয়া থাকিতে পারিল [না]। উঠিয়া বসিল। ঘরের আলোটা আবার জ্বালিল। সে [তাহার] অসমাপ্ত গল্পটা আবার চোখের সামনে মেলিয়া ধরিল।

করিল, আজ রাত্রের মধ্যেই এ গল্পটা শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে। গল্পটা যত দূর লেখা হইয়াছে—চমৎকার হইয়াছে। শেষটা সে ঠিক যেন মনের মত করিয়া আর শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু যদি একবার শেষটা কোন রকমে মনের মত হইয়া যায় ত এ গল্পটি তাহার সমস্ত গল্পের শ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইবে। পৃথিবীর ব্যথা-মূর্ত্তি এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার এই গল্পে—শুধু শেষের সেই সোনালী রেখাটা যথাস্থানে টানিয়া বসাইয়া দিতে পারিলেই যেন সৃষ্টির শেষকথা চরম করিয়া তাহার বলা হইয়া যায়। নিজের সামান্য ব্যথা ভুলিতে তাই সোনালী রেখার সন্ধানেই সে পৃথিবীর আদি-অনন্ত খুঁজিয়া ফেরে—কল্পনাকে দিক্-দিগন্তে ভুত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানে বিস্তৃত করিয়া দেয়। সোনালী রেখা আর ধরা না দিয়াই যেন পারে না।

রাত হইয়া যায় দেখিয়া হোটেলের চাকর শম্ভু আসিয়া দরজায় ধাক্কা দেয়। তিমিরবরণের চমক ভাঙে। উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া বলে—শম্ভু, ঠাকুরকে আমার রাত্রের খাবার এখানেই দিয়ে যেতে বল্, ওখানে আর যেতে পারি নে।

আহারাদির পর তিমিরবরণ আবার একবার রাস্তার দিকের বারান্দাটার রেলিঙে ভর দিয়া গিয়া দাঁড়ায়। ঘরে আলো জ্বলিতে থাকে, খাতাটাও বিছানার উপর খোলা পড়িয়া থাকে, আর কলমটাও খাতার 'পরেই খোলা থাকে। রাস্তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া ক্লান্তি ঘনাইয়া আসে, চিন্তায় চিন্তায় মস্তিষ্ক জড় হইয়া আসে, হঠাৎ গল্পের সে কি নাম দিবে তাহা ঠিক হইয়া যায়। রাত্রের পৃথিবীর পানে চাহিয়া বহু দিনের ভাবা সেই কথাই তাহার মনে হয়, এই সেই ব্যথা-তীর্থ! গল্পের নাম হইবে তাহাই। তিমিরবরণ অনেকটা স্বস্তি অনুভব করে, কিন্তু শেষের সেই রেখাটা যে আর কিছুতেই ধরা দিতে চাহে না। কত ভাবেই ত শেষ করা যাইতে পারে, কিন্তু যাহা না হইলেই নয় এমন যে শেষের টান সে টানটা ঠিক সে বসাইয়া দিতে পারিতেছে কোথায়?

দেহের ক্লান্তি শেষে জয়লাভ করিল। তিমিরবরণ আপনার অজ্ঞাতে কখন সুগভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া গেল। ঘরের আলো তেমনই জ্বলিতে লাগিল, খাতা ও কলম মাথার কাছে খোলাই পড়িয়া রহিল এবং রাস্তার দিকের দরজাটাও খোলা রহিল। এমন তাহার জীবনে বহু রাত্রিই ঘটিয়াছে।

তিমিরবরণ আপনাকে প্রকাশ করিতে না পারার যে-বেদনা লইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঘুমের মধ্যেও সে-ব্যথার মৃত্যু হয় নাই।

ভোরের দিকে সে তাই হয়ত স্বপ্ন দেখিল, এক বিরাট পুরুষ, অবর্ণনীয় তাঁহার মূর্ত্তি, কোটি কোটি মানবশিশুকে এক সিংহদ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিয়া সিংহদ্বারের প্রহরীকে ইঙ্গিতে দ্বার বন্ধের আদেশ দিয়া মানবশিশুদের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন, এই তোমাদের সেই কাম্যতীর্থ, এই সেই ব্যথা-তীর্থ! নির্ভয়ে তীর্থপথের পথিক হইয়া বাহির হইয়া পড়, পশ্চাতে ফিরিবার অধিকার হইতে তোমরা বঞ্চিত।

তিমিরবরণ সহসা অস্থির চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, এই কোটি কোটি মানবশিশুদের আবার যাহাতে ফিরিবার অধিকার দেওয়া হয় ঐ সিংহদ্বারের ভিতরে, বিরাট পুরুষের কাছে সেই আবেদন জানায়, কিন্তু সিংহদ্বার তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বিরাট পুরুষ শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছেন। তিমিরবরণ শুধু আন্তরিক বিক্ষোভ মিটাইতে যেন হতাশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, নিষ্ঠুর! জীবন লইয়া এ কি ছিনিমিনি খেলিতেছ! ব্যথা-গরল পান করিয়া নিজে ত নীলকণ্ঠ সাজিয়াছ, তবু কি তোমার লীলাকৌতুকের শেষ নাই!

তিমিরবরণ জাগিয়া উঠিল। তখনও ভোরের আলো দেখা দেয় নাই। রাস্তার দিকের বারান্দাটিতে সে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের পৃথিবী তখন নিষ্প্রাণ, নিষ্পন্দ। তিমিরবরণ স্বপ্নের কথাই ভাবিল। তাহার অসমাপ্ত গল্পের সে শেষ খুঁজিয়া পাইয়াছে। কোটি কোটি নবাগত মানবসন্তান ·· বিরাটপুরুষের সেই ব্যথা-তীর্থ চিনাইয়া দেওয়া···এই ত চমৎকার সমাপ্তি!···গল্প তাহার ব্যথা-তীর্থেরই মত চিরন্তন হইয়া থাকিবে। নিজে সে নীলকণ্ঠ সাজিবে—গরলে গরলে কণ্ঠ তাহার পুরিয়া যাক, নীল হইয়া উঠুক, নহিলে আর তৃপ্তি নাই।···

চিত্র-পরিচয়

সিদ্ধার্থের বিবাহ সম্বন্ধে নানারূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। তাহারই একটি অবলম্বনে "সিদ্ধার্থ ও যশোধরা" চিত্রখানি অঙ্কিত হইয়াছে। কথিত আছে, সিদ্ধার্থের বৈরাগ্যভাব-দর্শনে চিন্তিত হইয়া শুদ্ধোদন তাঁহার প্রাসাদে শাক্যরমণীদের একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। ইহাদের অলঙ্কার উপহার দিতে সিদ্ধার্থ শুদ্ধোদন কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন। সিদ্ধার্থ সর্ব্বোত্তম অলঙ্কারটি যশোধরাকে উপহার দিতেছেন, চিত্রে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

সিদ্ধার্থ ও যশোধরা
শ্রীমতী দেবী গুপ্তা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

আলোচনা

"ঢাকাই প্রশ্ন"

শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

ঢাকার শিক্ষা-পরিষদের ম্যাট্রিকুলেশন ও ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষার বাংলা প্রশ্নপত্র সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়া ঢাকার এক জন পত্রপ্রেরক ইংরেজী ও বাংলা সংবাদপত্রে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং প্রশ্নপত্র দুইটির অজ্ঞাতা প্রচার করিয়াছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন কে করিয়াছিলেন আমি ঠিক জানি না। কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন করিয়াছিলাম আমি। এক জন পত্রপ্রেরক এবং তিনি নিজেকে এক জন পরীক্ষার্থী বলিয়া পরিচয় দিয়া যে অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে প্রতিবাদ করা আমি আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীর বিবিধ-প্রসঙ্গের মধ্যে প্রবাসীর প্রবীণ ও পরমশ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় যখন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া 'ঢাকাই প্রশ্ন' সম্বন্ধে নিন্দা ঘোষণা করিয়াছেন, তখন আর চুপ করিয়া থাকা সমীচীন বোধ করিলাম না, আত্মসমর্থন করিতে বাধ্য হইতেছি।

যে-সমস্ত আরবী ফার্সি ইংরেজী ফরাসী পর্তুগীজ শব্দ বাংলায় সুপ্রচলিত হইয়া ভাষার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, সে-সমস্ত শব্দ যেমন বাংলা ভাষার অঙ্গ, যে সমস্ত বাক্যাংশ (phrase) এবং বাক্রীতি (idiom) বিদেশী হইলেও বাংলায় সুপ্রচলিত, তাহারাও বাংলা ভাষার অঙ্গ এবং সাহিত্যে ব্যবহার্য, সেগুলি বিদেশী ম্লেচ্ছ শব্দ বলিয়া অপাংক্তেয় বা বর্জনীয় মোটেই নয়। [তাহারা যে অপাংক্তেয় বা বর্জনীয়, ইহা আমি বলি নাই, মনেও করি না।—প্রবাসীর সম্পাদক।] আমার ধারণা ছিল যে অন্ততঃ ভাষায় জাতিভেদ অস্পৃশ্যতা সাম্প্রদায়িকতা নাই। কিন্তু সে ভ্রম এখন আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে। 'আক্কেল-সেলামী' এবং 'বিসমেল্লায় গলদ'* বাক্যাংশ দুটি যদি কথ্য বাংলায় ও প্রহসন আদিতে প্রচলিত থাকা স্বীকৃত হয় তবে তাহা সাহিত্যের অন্তর্ভূত হইয়া গিয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, কথ্য ভাষা ক্রমশঃ সাহিত্যের বাহন হইয়া উঠিতেছে এবং প্রহসন সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। [ইহা আমি অস্বীকার করি নাই।—প্রবাসীর সম্পাদক।] 'বাদশাহ' ও 'গোলাম' শব্দ দুইটির স্ত্রীলিঙ্গ পদ কি হইবে তাহা প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় জানেন না, ইহা অতীব বিস্ময়ের বিষয়। আকবর বাদশার যোধপুরী বেগম এবং আওরঙ্গজেব বাদশার উদিপুরী বেগম ইতিহাসে এবং বঙ্কিম-বাবুর রাজসিংহ উপন্যাসে সুপ্রসিদ্ধ। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নাটক আলিবাবার মধ্যে—

> আয় বাঁদী তুই বেগম হবি, খোয়াব দেখেছি,—
> আমি বাদশা বনেছি।
>
> *   *   *
>
> আমি বাদশা বনেছি,   আমি বেগম হয়েছি,
> বাদশা বেগম ঝমঝমাঝম বাজিয়ে চলেছি।

গানটি সুপ্রসিদ্ধ এবং অনেকের পরিচিত।

এই-সকল শব্দ এবং ইডিয়াম অনেক ব্যাকরণে এবং রচনা-পুস্তকে আছে। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর পশ্চিম-বাংলার লোক, কলিকাতার বাসিন্দা। তিনি ঢাকাই নহেন, ঢাকাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নকর্তা বটে। ইহাতে যদি তাঁহার জাত মারা গিয়া না থাকে, তবে ভয়ে কব না নির্ভয়ে কব জানি না, তাঁহার 'রচনাদর্শের' মধ্যে আমাদের কৃত প্রশ্নের আলোচনা ছাড়া বহু বিদেশী শব্দ ও বাক্যাংশ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত ও নমুনা আছে। বাদশার স্ত্রীলিঙ্গে বা গোলামের স্ত্রীলিঙ্গে কি হইবে না জানিলে ক্ষতি কি? ক্ষতি এই যে বিদ্যার্থীরা বাংলা ভাষা ও বাক্রীতির পূর্ণ পরিচয় না পাইয়া আংশিক অজ্ঞ হইয়া থাকিবে।

ইংরেজী কিং (king) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ কেন জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, বলিয়া ঢাকাই পত্রপ্রেরক সংবাদপত্রে ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। [আমি করি নাই, সুতরাং ইহার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে।—প্রবাসীর সম্পাদক।] ইহার কারণ, কিং বা উহার স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বাংলায় প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু লাট (লর্ড) প্রচলিত শব্দ, উহার স্ত্রীরূপ জিজ্ঞাসা করিলে অন্যায় হইবে না, এবং যে-সব বাংলা সংবাদপত্র ঢাকাই প্রশ্নের নিন্দা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে লাট-মহিষী হামেশাই লেখা হইয়া থাকে। [প্রবাসীর সম্পাদকের দ্বারা হামেশাই হয় না।—প্রবাসীর সম্পাদক।] অনেক প্রসিদ্ধ লেখকের লেখায় 'সুবর্ণ-সুযোগ' এবং 'চায়ের পেয়ালায় তুফান' তোলার উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু এগুলি ইংরেজী প্রবাদের বাংলা রূপ মাত্র। সুবিবেচক ও ধীর প্রাজ্ঞ প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলিয়া বাংলার সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ প্রবর্ধিত করিয়াছেন মনে করি এবং এই জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। [ইহা আমি করিয়া থাকিলে তাহার জন্য আমি অবশ্যই ক্ষমার অযোগ্য কিন্তু তাহা এখনও স্বীকার করি না।—প্রবাসীর সম্পাদক।] তাঁহার নিকট হইতে এইরূপ সঙ্কীর্ণতা আমরা কখনও আশা করি নাই।

রমণা, ঢাকা

সম্পাদকের মন্তব্য।—"চলন্তিকা" অভিধানে দেখিতেছি "বেগম" শব্দটি তুর্কী ভাষা হইতে গৃহীত। ঐ ভাষায় উহা দ্বারা কেবল মুসলমান বাদশাহদের পত্নী বুঝায় কি না, জানি না। কিন্তু বাংলায়, এবং ভারতবর্ষের অন্যত্রও, উহা এমন অনেক মুসলমান মহিলাকেও নিজেদের নামের সঙ্গে ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি যাঁহারা বাদশাহ-পত্নী নহেন। সুতরাং "বেগম" শব্দটির সহিত ও বাদশাহ-পত্নী অর্থে উহার প্রয়োগের সহিত আমার পরিচয় থাকিলেও, উহা যে বাংলায় কেবলমাত্র বাদশাহের স্ত্রীরূপ, ইহা আমি মনে করি নাই, এবং এখনও করি না। এম্পেরর ইংরেজী এম্পারারের এবং কুইন ইংরেজ কিংএর স্ত্রীরূপ, যেমন সম্রাজ্ঞী, মহারাণী ও রাণী সংস্কৃতে ও বাংলায় সম্রাট, মহারাজা ও রাজার স্ত্রীরূপ। কিন্তু ইংরেজ মহিলারা আপনাদিগের নামের সহিত এম্প্রেস বা কুইন লেখেন না, হিন্দুমহিলারাও আপনাদিগের নামের সহিত সম্রাজ্ঞী, মহারাণী ও রাণী ব্যবহার করেন না—যদিও অনেক রাজা মহারাজার এবং কোন কোন খেতাবী রাজা মহারাজার পত্নীরা রাণী বা মহারাণী বলিয়া উক্ত হয়েন। সম্রাজ্ঞীর ব্যবহার আসল সম্রাজ্ঞী ছাড়া কেবল সাহিত্য-সম্রাজ্ঞীদের নামের সহিত হইয়া থাকে। কেবলমাত্র বাদশাহের 'স্ত্রীরূপ' বেগম হইলে, বেগমের 'পুংরূপ' বাদশাহ হওয়া উচিত। কিন্তু বাংলা যাঁহারা নিজেদের নামের সঙ্গে বেগম লেখেন, তাঁহাদের স্বামীরা বাদশা নহেন এবং নিজেদের নামের সহিত বাদশাহ সংযুক্ত করেন না। অতীত কালেও বেগম বলিয়া অভিহিত জাহানারা, রোশনারা ও জেবুন্নিসা

* "বিসমিল্লায় গলদ"?—প্রবাসীর সম্পাদক।

বাদশাহজাদী ছিলেন, বাদশাহ-পত্নী ছিলেন না। ভূপালের ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ বেগম, নবাবপত্নী ছিলেন, বাদশাহ-পত্নী ছিলেন না।

ফারসী হইতে গৃহীত বাঁদী ফারসী হইতে গৃহীত বন্দা বা বান্দার 'স্ত্রীরূপ' ইহা আমি জানি। আরবী হইতে গৃহীত গোলাম শব্দ কোন পুরুষের প্রতি প্রযুক্ত হইলে তাহার ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবস্থা ও মর্য্যাদা যাহা বুঝায়, সেই অবস্থার ও মর্য্যাদার স্ত্রীলোক বুঝাইতে হইলে আরবী হইতে গৃহীত কোনও শব্দ বাংলায় প্রচলিত আছে কি না জানি না। গোলামের 'স্ত্রীরূপ' বাঁদী বলিলে বাংলায় ক্রীতদাসীও গোলামের 'স্ত্রীরূপ' বলা চলে। কিন্তু আরবী হইতে গোলামের কোন 'স্ত্রীরূপ' বাংলায় লওয়া হইয়াছে কি? হইয়া থাকিলে তাহা আমি জানি না, ইহাই আমার বক্তব্য ছিল। হইতে পারে, যে, তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয় নাই।]

—

"কলিকাতায় রাজা রামমোহন রায়"

(প্রত্যুত্তর)

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

(১) "সুপরিচিত"

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "প্রবাসী"তে ১৭৬৯ শকের আশ্বিন মাসের (১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের) "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" হইতে "ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ" ভূমিকাসহ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। গত আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিবরণকে "সুপরিচিত", অর্থাৎ, বোধ হয়, পুনর্মুদ্রণের অযোগ্য, বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, এই বিবরণ কাহার নিকট সুপরিচিত? কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমল হোম "Rammohun Roy, the Man and his Work, Centenary Publicity Booklet No. 1" সংকলিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন (জুন, ১৯৩৩)। শ্রীযুক্ত অমল হোম এই ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ। এই পুস্তকের মুখবন্ধে (Foreword এ) তিনি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়াছেন, তিনি আরও তিনজন বিশেষজ্ঞের নিকট হইতে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিয়াছেন। এই তিনজন,—স্বয়ং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এবং শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ। অমলবাবুর পুস্তকের ১৪৮-১৫১ পৃষ্ঠায় একটি Bibliography (Some books, pamphlets and magazine articles relating or having reference to Raja Rammohun Roy.) দেওয়া হইয়াছে। এই তালিকার শেষ ভাগে লিখিত হইয়াছে—

"A fuller bibliography will be published in a later issue of the Publicity Booklet—Editor." অর্থাৎ এই তালিকা অসম্পূর্ণ। এই সুদীর্ঘ তালিকায় ১৮৪৭ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত আমাদের পুনর্মুদ্রিত বিবরণের উল্লেখ না দেখিয়া মনে করা যাইতে পারে, প্রবন্ধটি এক সময় বিশেষজ্ঞগণের নিকট সুপরিচিত ছিল না। এই বিবরণ বোধ হয় বাংলা ভাষায় লিখিত ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্রে প্রকাশিত ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রামাণিক (authoritative) ঐতিহাসিক বিবরণ। ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত বাঙালী বিশেষজ্ঞের তালিকায় এই বিবরণের উল্লেখ না দেখিয়া যদি কোন অজ্ঞ লোক ইহা পুনর্মুদ্রণযোগ্য মনে করে তবে সে দোষী গণ্য হইতে পারে না।

আমার একজন বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু দেখাইয়াছেন, ১৩৩৬ সনের চৈত্র সংখ্যা "প্রবাসী"তে "রামমোহন রায় ও রাজারাম" শীর্ষক আলোচনায় ব্রজেন্দ্রবাবু ১৭৬৯ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ হইতে আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠার শক (১৭৩৭) এবং স্থান পরিবর্ত্তনের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন (৮৪৬ পৃঃ)। এই আলোচনায় ব্রজেন্দ্রবাবু "পানগুপাড়নে"র বচন বেদবাক্যের মত মানিয়া লইয়াছেন, অথচ এই বিবরণে সেই "অন্তকালে" লোকাপবাদ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহার উল্লেখমাত্রও করেন নাই। অতএব এই বিবরণের সহিত ব্রজেন্দ্র বাবু স্বয়ং যে ঠিক সুপরিচিত এমন কথা বলাও কঠিন।

(২) অকারণ বিবাদ

এই বিবরণসম্বলিত "কলিকাতায় রাজা রামমোহন রায়" নামক প্রবন্ধের ভূমিকা অংশ খুব নরম সুরে লিখিত হইয়াছে, কোনও কথা জোর করিয়া (dogmatically) বলা হয় নাই, কোনও তর্ক উপস্থাপিত হয় নাই। তথাপি ইহা পাঠ করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু যেন লেখকের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন, এবং সে যে কথা মোটেই লেখে নাই তাহা তাহার স্কন্ধে চাপাইয়া আড়ম্বরের সহিত প্রতিবাদ করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন "ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার বিবরণ" পুনর্মুদ্রিত করিয়া এবং উহার উপর নির্ভর করিয়া আমি নাকি লিখিয়াছি রামমোহন রায়ের কলিকাতা আগমনের তারিখ ১৭৩৫ শক বা ১৮১৩ সন। পুনরায় পাঠ করিয়া দেখিলাম আমার উপরে উক্ত ভূমিকায় কোথাও ১৮১৩ সন রামমোহন রায়ের কলিকাতা আগমন কাল বলিয়া লিখিত হয় নাই, সেখানে এইটুকু মাত্র লেখা হইয়াছে—

"এই বিবরণে রামমোহন রায়ের রঙ্গপুর হইতে কলিকাতা আগমনের সময় দেওয়া হইয়াছে ১৭৩৫ শক (১৮১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দ)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্ঞাতসারেই বোধ হয় এই শক দেওয়া হইয়াছিল।" (২০০ পৃঃ) যাঁহারা বাংলা ভাষার বাক্যরচনা রীতির সহিত পরিচিত তাঁহারা অবশ্য স্বীকার করিবেন "এই বিবরণে রামমোহন রায়ের রঙ্গপুর হইতে কলিকাতা আগমনের সময় দেওয়া হইয়াছে ১৭৩৫ শক" লিখিলে লেখকের নিজের মত প্রকাশিত হয় না, বিবরণলেখকের মত উদ্ধৃত করা হয়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এমন ইঙ্গিত মাত্রও আমার লেখায় নাই। আমি কেবল বন্ধনীর মধ্যে লিখিয়াছি, ১৭৩৫ শক ১৮১৩-১৪ খৃষ্টাব্দ। আমার নিজের মত আমি প্রবন্ধের গোড়ায় এইরূপে উল্লেখ করিয়াছি—"বিষয়-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আসিয়া রাজা রামমোহন রায় ১৮১৪ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন।" সুতরাং স্বয়ং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের পক্ষপাতী ব্রজেন্দ্রবাবু অকারণ আমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অবশ্য আমি বিবরণের ১৭৩৫ শক সমর্থন করিয়াছি। ১৭৩৫ শকের ভিতরে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম সাড়ে তিন মাস আছে। ব্রজেন্দ্রবাবু এই বিবরণ হইতে আত্মীয় সভার প্রতিষ্ঠার তারিখ (১৭৩৭) সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। ১৭৩৫ শক সম্বন্ধে এত অনাদর তাঁহার পক্ষে শোভা পায় না।

(৩) শকাব্দ ও খৃষ্টাব্দ

ব্রজেন্দ্রবাবু আমাকে স্বকপোলকল্পিত (১৮১৩ সালে রামমোহন রায়ের কলিকাতা আগমনের তারিখ নির্দ্ধারণের) অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া যে দণ্ডবিধান করিয়াছেন তাহা হাস্যোদ্দীপক। ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রবন্ধের প্রথম অংশের পাদটীকায় (৪১৮ পৃঃ) লিখিয়াছেন—

"রমাপ্রসাদবাবু বোধ হয় জানেন না যে, ১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসে (অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৪৫ সনে) "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"য় মহাত্মা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জীবনবৃত্তান্তশীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উহাতে (পৃঃ ১৬৫) রামমোহনের রংপুর হইতে কলিকাতা আগমনের তারিখ দেওয়া হয় ১৭৩৪ শক অর্থাৎ ইংরেজী ১৮১২।"

এই "অর্থাৎ"ই যত অনর্থের মূল। ৭৮ খৃষ্টাব্দে শকাব্দের গণনা আরম্ভ। সুতরাং শকাব্দের অঙ্কের সহিত ৭৮ যোগ দিলেও খৃষ্টাব্দের অঙ্ক পাওয়া যায়। এটি মোটা হিসাব। ব্রজেন্দ্রবাবু এই মোটা হিসাবে ১৭৩৪ শক + ৭৮ = ১৮১২ বাহির করিয়াছেন, এবং ১৭৩৫ শক + ৭৮ করিয়া আমার উপর ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ চাপাইয়াছেন। কিন্তু এই মোটা হিসাব ছাড়া শকাব্দের অঙ্ককে খৃষ্টাব্দে পরিণত করিবার একটি সূক্ষ্ম হিসাবও আছে। খৃষ্টাব্দের আরম্ভ ১লা জানুয়ারি, শকাব্দের আরম্ভ বৈশাখের (এপ্রিল-মের) ১লা। সুতরাং অগ্রহায়ণ-পৌষের (ডিসেম্বরের) পরের অংশকে খৃষ্টাব্দে পরিণত করিতে হইলে শকাব্দের অঙ্কের সহিত ৭৯ যোগ দেওয়া আবশ্যক। এই নিমিত্তই আমি ১৭৩৫ শককে ক্রমে ৭৮ এবং ৭৯ এই দুই অঙ্ক যোগ করিয়া ১৮১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে পরিণত করিয়াছিলাম। ব্রজেন্দ্রবাবু আমার প্রতিবাদ করিবার সময় এই সূক্ষ্ম হিসাব একেবারে উপেক্ষা করিলেও, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর তারিখের হিসাবের বেলা তাহা করেন নাই, কারণ সেখানে আমি মোটা হিসাব অনুসরণ করিয়াছিলাম।

এইরূপ মোটা হিসাবে শকাব্দকে খৃষ্টাব্দে পরিণত করিয়া, উপরিউক্ত ১৭৬৭ শকের বৈশাখ সংখ্যার "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"য় প্রদত্ত রামমোহন রায়ের কলিকাতা আগমনের তারিখ (১৭৩৪ = ১৮১২ খৃঃ অ) সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—

"এই বিবরণটি রমাপ্রসাদ বাবু কর্তৃক ১৭৬৯ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' হইতে পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধ অপেক্ষা পুরাতন এবং যে যে কারণের বলে রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহার উদ্ধৃত প্রবন্ধটিকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন ঠিক সেই কারণেই সমান নির্ভরযোগ্য। তবে কি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উক্তির বলে ১৮১২ এবং ১৮১৩ এই দুই সনকেই রামমোহনের কলিকাতায় আগমনের তারিখ বলিয়া ধরিতে হইবে? বলা বাহুল্য, ঐতিহাসিক আলোচনায় এইরূপ আত্মঘাতী পথ ধরিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

যে ব্যক্তি ১৮১২ (১৭৩৪ শক) এবং ১৮১৩ (১৭৩৫ শক) এই দুই সনই রামমোহন রায়ের কলিকাতায় আগমনের তারিখ ধরিতে চাহেন তাঁহার ঐতিহাসিক আলোচনার পথকে ব্রজেন্দ্রবাবু আত্মঘাতী পথ আখ্যা দিয়াছেন, কিন্তু নিজে সর্ব্বঘাতী পথ অবলম্বন করিয়াছেন, অর্থাৎ ১৭৩৪ এবং ১৭৩৫ শক এই দুইটি তারিখকেই উড়াইয়া দিয়াছেন। এই সর্ব্বঘাতী পথ ছাড়া পরস্পরবিরোধী প্রমাণ সমন্বয়ের আর কি কোনও পথ নাই? আমি ১৭৬৭ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দেখি নাই। তখনও বোধ হয় অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থ-সম্পাদক ছিলেন, এবং চন্দ্রশেখর দেব, রাধাপ্রসাদ রায়, রমাপ্রসাদ রায় সভার কর্তৃপক্ষের সামিল ছিলেন। ১৭৬৭ শকের বৈশাখ সংখ্যায় ১৭৩৪ শকে রামমোহন রায়ের কলিকাতা আগমনের তারিখ প্রকাশিত করিয়া, তাহার দুই বৎসর ছয় মাস পরে, ১৭৬৯ শকের আশ্বিন সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, যখন ঐ ঘটনার তারিখ ১৭৩৫ শক প্রকাশ করা হইয়াছে তখন মনে করিতে হইবে, হয় লেখক পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৭৩৪ শক ভুল মনে করিয়া ১৭৩৫ লিখিয়া সেই ভুল সংশোধন করিয়াছেন, আর না হয় রামমোহন রায় ১৭৩৪ শকে কলিকাতা আসিয়া কিছু দিন বাস করিয়া থাকিবেন, এবং আবার ১৭৩৫ শকে আসিয়া স্থায়ী হয়েন। এই ক্ষেত্রে আত্মহত্যার অবকাশ কোথায়?

এই সম্বন্ধে তৃতীয় মত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতায় উক্ত ১৭৩৬ শক। ব্রজেন্দ্র বাবু ১৭৩৬ শকের সমর্থনে লিখিয়াছেন—

"রামমোহন রায় সম্বন্ধে অজ্ঞাতনামা লেখক কর্তৃক ঘটনার ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে লিখিত তথ্যকে রামমোহনের জীবনের ঘটনার সহিত বাল্যকাল হইতে পরিচিত দেবেন্দ্রনাথের উক্তি অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য মনে করা ইতিহাস রচনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-সম্মত নহে।"

এখানে ব্রজেন্দ্রবাবু ১৭৬৯ শকের আশ্বিন সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণের লেখককে অজ্ঞাতনামা বলিয়া পাঠকের নিকট তাঁহাকে, এবং তাঁহার উক্তিকে উপেক্ষার বিষয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে এই অজ্ঞাতনামা লেখকের তথ্যনির্দ্ধারণের বিশেষ সুযোগ ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের কলিকাতা আগমনের সময় তাঁহার পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের ১৩।১৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই বিবরণের আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে দেখা যায়, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লেখক উপাদান আহরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই বিবরণে লেখকের স্বাক্ষর নাই বলিয়া ইহার কোনও অংশ অবিচারে উপেক্ষা করা যাইতে পারে না।

এই বিবরণ যে ১৭৬৯ শকের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল এই বিষয়ে তর্কের অবকাশ নাই, কেননা উক্ত সংখ্যার পত্রিকা এখনও দুর্লভ নহে। কিন্তু রামমোহন রায় এই বিবরণ প্রকাশের ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে, ১৭৩৫ শকে, অথবা ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে, ১৭৩৬ শকে, কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে। সুতরাং এই বিবরণ ঘটনার তেত্রিশ-চৌত্রিশ বৎসর পরে লিখিত বলা যাইতে পারে। ব্রজেন্দ্রবাবু আমাদিগকে ইতিহাস রচনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শিক্ষা দিতে ব্রতী হইয়া অকাতরে লিখিয়াছেন, বিবরণ "অজ্ঞাতনামা লেখক কর্তৃক ঘটনার ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে লিখিত তথ্য"। ৩৩।৩৪ বৎসরকে ৩০।৩৫ বৎসর বলিয়া উল্লেখ করা কি ঐতিহাসিক আলোচনা আত্মঘাতী পথ নহে? পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যখন রামমোহন রা কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন তখন দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহ করেন নাই। তখনকার ঘটনার সহিত পরিচিত থাকিবার বিশেষ সুযো ছিল রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের। এই নিমি বিরোধের স্থলে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রদত্ত তারিখ অপেক্ষা রাধাপ্রসা রায়ের অনুমোদিত তারিখ অধিকতর আদরণীয় মনে করা যাইতে পারে। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশি ডাক্তার কার্পেন্টারের লিখিত রামমোহন-চরিতে কলিকাতা আগমনে তারিখ দেওয়া হইয়াছে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে (in 1814 he retired Calcutta) এই তারিখের সহিত ১৭৩৫ শকের সমন্বয় যখন অসং নহে তখন তাহা একেবারে অগ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য নহে; অবশ্য অবিচা আসল প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া, তাহা গ্রহণ করাও কর্ত্তব্য নহে।

৪। সাক্ষাৎ সমসাময়িক প্রমাণ

ব্রজেন্দ্রবাবু, রামমোহন রায় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা আসিয়াছিলে এই মত সমর্থনের জন্য সাক্ষাৎ সমসাময়িক প্রমাণ উদ্ধৃ করিয়াছেন। এক সময় তিনি ১৮১৫ সালের পক্ষপাতী ছিলেন তার পর "অন্য প্রমাণের বলে" ১৮১৪ সালের মাঝামাঝি স্থির করেন ১৭৩৫ শকের চৈত্র-সংক্রান্তি হইতে ১৮১৪ সালের মাঝামাঝির মা

* বঙ্গশ্রী, ১৩৪০, অগ্রহায়ণ, ৫৭০ পৃঃ।

ব্যবধান আড়াই মাসের বেশী নয়। এবার গোবিন্দপ্রসাদ রায় বনাম রামমোহন রায় মোকদ্দমার নথীপত্র হইতে গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের জবানবন্দীর কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া ব্রজেন্দ্র বাবু দেখাইয়াছেন, রামমোহন ১২২১ বাংলা সনে (১৮১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতা আসিয়াছিলেন।

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার (বার-এট ল) মহাশয়ের অনুগ্রহে আমি উক্ত মোকদ্দমার নথীর নকল পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। আমার অনুমান হয়, ব্রজেন্দ্রবাবু এখনও এই নথীর সহিত সুপরিচিত হইবার অবকাশ পান নাই। কারণ এই নথীতে এই সম্বন্ধে আরও প্রমাণ আছে। রামমোহন রায়ের কলিকাতার কর্ম্মচারী গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন—

Rammohun hath lived and resided during the last 17 or 18 years past (1801-1819) sometimes in Calcutta and sometimes at Patna, Benares, Rungpur and Dacca and sometimes in Jessore.

ইহার তাৎপর্য্য, বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের পূর্ব্বেও রামমোহন রায়, ১৮০১ হইতে, কলিকাতা যাতায়াত করিতেন। রামমোহন রায়ের কলিকাতা আগমন সম্বন্ধে যত প্রমাণ আছে তাহা একত্র আলোচনা না করিলে এই সম্বন্ধে কোনও সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যাইতে পারে না।

বিষয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আসিয়া রাজা রামমোহন রায় ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। দীর্ঘ প্রতিবাদের উপলক্ষে আমার এই মত সমর্থন করিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু আমার আর দুইটি ভুল সংশোধন করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, আমি যে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর সাল (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ) দিয়াছি তাহা ঠিক নহে। বিদ্যাবাগীশের মৃত্যু হয় ১৭৬৬ শকের ২০শে ফাল্গুন, অর্থাৎ ১৮৪৫ সনের ২রা মার্চ্চ তারিখ। ১নং সেণ্টিনারী পাবলিসিটি বুকলেটের ১২৮ পৃষ্ঠায় বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর তারিখ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দই আছে। খৃষ্টাব্দ ১৮৪৫ হইলেও ২রা মার্চ্চ ঠিক নহে। ব্রজেন্দ্রবাবু বোধ হয় জানেন যে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চের বেঙ্গল হরকরা (*Bengal Harkaru*) পত্রে একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মুর্শিদাবাদে পরলোকগমন করিয়াছিলেন। বেঙ্গল হরকরার এই সংবাদের নকল ডক্টর যতীন্দ্রকুমার মজুমদার আমাকে দিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রবাবু রাধাপ্রসাদ রায় সম্বন্ধে যে কয়টি সংবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। রামমোহন রায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়কে ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম অছি (trustee) নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। প্রচলিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে রাধাপ্রসাদের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে (পিতার মৃত্যুর পর তিনি দিল্লী গিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ব্রাহ্মসমাজের কোন কার্য্যভার গ্রহণ করেন নাই) ইহাতে শুধু রাধাপ্রসাদের প্রতি অবিচার করা হয় নাই, যিনি তাঁহাকে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পিতা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিও বিশেষ অবিচার করা হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রকাশিত প্রমাণ হইতে জানা যায়, মৃত্যুর পূর্ব্ব বৎসর পর্য্যন্ত রাধাপ্রসাদ রায় তত্ত্ববোধিনী সভার একজন কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন।

নিঃসঙ্গ

শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

তুমি কাছে নাই রাণি, কেমনে আমার সন্ধ্যা কাটে ?
কোনদিন সিনেমায়, কোনদিন খেলিবার মাঠে
একা একা ঘুরি ফিরি, কিছুতেই নাহি বসে মন।
কারো বেণী, কারো গতি, কারো হাসি তোমার মতন—
তোমার মতন কেহ নয়। কত মেয়ে চোখে পড়ে ;
ডাগর পুতুল সব, স্প্রিঙের কৌশলে নড়েচড়ে,
কথা বলে তাও কলে, সৌজন্য সে রেকর্ডের গান,
সুরটুকু ঠিক আছে—কেবল হারায়ে গেছে প্রাণ।

জীবনের স্বাদ নাই, সময় হয়েছে গতিহীন
দুঃখের পসরাভারে। আরো কত দূরে সেই দিন
তুমি যবে দেখা দিবে ? কবে জাগিবে আবার
কবোষ্ণ নিঃশ্বাসে তব স্পন্দ দেহে শোণিত-জোয়ার ?
নিষ্প্রভ নয়নদীপে, হে আমার ধ্যানের মূরতি !
তব আবির্ভাবে কবে উদ্ভাসিবে আনন্দের জ্যোতি ?

সনতের সন্ন্যাস

শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত

সনৎ সন্ন্যাস লইয়াছে—

সংবাদ শুনিয়া সকলেই হইলেন উৎকণ্ঠিত, কিন্তু আমি ফেলিলাম স্বস্তির নিঃশ্বাস।

উঃ, কি দারুণ দুশ্চিন্তায়ই না তিন রাত্রি কাটাইয়াছি।

সন্ধ্যা হইতে-না-হইতে সনৎ মেসে ফিরিয়া আসে, হাঁক দেয় ভাত আন ঠাকুর।

আমরা বিদ্রূপের সুরে বলি, খোকাবাবুর খিদে পেয়েছে, তাড়াতাড়ি কর ঠাকুর।

দেবতার ভোগ, বৈষ্ণব-বাবাজীর সেবা, ব্রাহ্মণ-ভোজন—মেসে ত এর কোনটারই বন্দোবস্ত নেই দাদা; দু-বেলা চারটি চাল-ডালসিদ্ধ গেলা—গরম গরমই ভাল।—সনৎ হাসিয়া বলে।

সেই সনৎ, রাত বারোটা বাজিয়া গেল, তবু ফিরিল না। মেসে মৃদু আলোচনা আরম্ভ হইল।

নবীনচন্দ্র দাস মেসের মধ্যে প্রবীণ, আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর কলিকাতায় আছেন, তিনি বলিলেন, বড়লোকের পাল্‌কী, ছোটলোকের গরুর গাড়ী, এই ছিল বেশ। এখন হয়েছে ট্রাম, বাস্, লরী, ট্যাক্সী,—কখন কোন্‌টা ঘাড়ের উপর পড়ে। চল একবার হাসপাতালগুলো ঘুরে আসি।

প্রবোধচন্দ্র মিত্র রাইটার্স বিল্ডিংসের কেরাণী। বাপ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, শ্বশুর ম্যাজিষ্ট্রেটের পেশকার, তিনি বলিলেন—তখনই ছোকরাকে বলেছিলাম, খদ্দর প'রো না। হিন্দুর ছেলে, বয়স এই যাকে বলে ইন্ হিজ্ টীনস্, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী, কোমরে খদ্দরের ধুতি, ও-কি এমনই যায় ভাই! থাক দাদা দিন-কয় ইলিসিয়াম-রো'তে।

অনিলচন্দ্র দাস কলেজে পাঠ করেন, সনতের সঙ্গে একই কক্ষে বাস করেন। তিনি বলিলেন, এ সে ছেলেই নয় দাদা! সদ্য ম্যারেজ-মার্কেটে বিকিয়েছে, কেমিষ্ট্রীর খাতা খুলে গুন্ গুন্ গান করে, ডাকপিয়ন এলে শিস্ দিতে দিতে এগিয়ে যায়, স্ত্রীর চিঠিখানা বুকে ক'রে শুয়ে থাকে—এ ছেলে যাবে ইলিসিয়াম-রো'তে! ইলিসিয়াম-রো'র অপমান হবে।

পরেশচন্দ্র পাল, পাকা লোক বলিয়া তাঁর নাম, আজ চার বৎসর যাবৎ বি-এল পরীক্ষা দিতেছেন, তিনি বলিলেন, তবেই হয়েছে, হলিউডের ভায়রা-ভাই কলিউডের আনাচে-কানাচে ঘুরে এস দাদা—সন্ধান মিলবে'খন।

আমি সব শুনি, কিন্তু কিছুই বলি না, কোনটাই আমার মনে ধরে না।

আলোচনা আরও কিছুক্ষণ চলিল। মেসের ম্যানেজারবা[বু] বলিলেন, সনৎবাবু ত আর ছেলেমানুষ নন, কলকাত[া] নূতনও নন। হয়ত কোন আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ী গি[য়ে]ছেন—তাঁরা ছাড়েন নি। এতে এত চিন্তার কি আছে?

ম্যানেজারবাবু উঠিলেন—সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলেও।

বিছানায় গিয়া শুইলাম, চক্ষু মুদিতেই দেখি সনৎ হাও[ড়া] ব্রিজ হইতে লাফাইয়া পড়িল, একটা দ্রুতগামী ষ্টীমার তা[র] উপর দিয়া চলিয়া গেল!

পুনরায় চক্ষু মুদিতে আর সাহস হইল না, বারা[ন্দায়] পায়চারি আরম্ভ করিলাম।

পরদিন, এগারটা বাজিল, তবু সনতের দেখা নাই, নি[জের] মনে আর ত ঘরে বসিয়া থাকা চলে না।

ম্যানেজার বাবু বলিলেন, এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মে[স]বাবু, হয়ত সনৎ বাবু সোজা কলেজে চ'লে গেছেন—ফেরা দরকার মনে করেন নি।

তাও ত বটে, কলেজ কামাই সনৎ বড়-একটা কে[রে না], বলে, দুপুরবেলার গরমে মেসে ব'সে তাস পেটা চে[য়ে] এর চেয়ে কলেজে পাখার নীচে ব'সে চানাচুর খাওয়া ভাল।

ছুটিলাম কলেজে, কোথাও তাহাকে পাইলাম না।

করিয়াছেন। আমি যেন সেদিকে লক্ষ্য করিলাম না, বলিয়া চলিলাম, প্রাপ্য আদায়ের জন্য আপনার বিত্তে কেহ হস্তার্পণ করিলে আপনার স্ত্রী রাজদ্বারে অভিযোগ করিতে পারেন। তখন আমাদিগকে আলিপুর দণ্ডাশ্রমের অধিবাসী হইতে হইবে।

—বেশ, সামঞ্জস্য-বিধানের অধিকারপত্র আপনাকে দিতেছি। আপনার দ্বিতীয় কথা বলুন।

—আপনার বিবাহ গত ফাল্গুন মাসে সম্পাদিত হইয়াছে।

—ইহা আমি অবগত আছি।

—নববধূটির বয়স—

—আশ্রমে নারী-সম্পর্কে এরূপ আলোচনা—

—সম্পূর্ণ অন্যায়, ইহা অস্বীকার করিতেছি না।—সেই সরলা কিশোরী ইংরেজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা—

—এ সংবাদও আমার নিকট নূতন নহে।

—তাঁহার নিকট প্রেমলিপি প্রেরণ কালে আপনি আত্মনাম-সম্বলিত একটি খাম সঙ্গে দিতেন—

—এ আলোচনায় রত হইতে আমার প্রবৃত্তি নাই—

—কিন্তু বিবৃতিপ্রদানে আমার প্রয়োজন আছে। তার পর স্বামীজীর দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিলাম, আমি কি আপনার নিকট প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেছি?

স্বামীজীর কৌতূহল তখন উদ্দীপ্ত হইয়াছে। মৃদু হাস্য সহকারে তিনি বলিলেন—না।

পুনরায় শ্রীমদ্ সৎ-চৈতন্যকে বলিলাম, গত আঠারই জুন এরূপ একটি প্রেমলিপি ডাকে দিবার জন্য আপনি মেসের ভৃত্য শ্রীমান গদাধরের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন—

—হইতে পারে।

—ভৃত্যকে কার্য্যান্তরে প্রেরণের আদেশ দান করিয়া এই পত্রটি আমি হস্তগত করিয়াছিলাম।

—ইহা আপনার অন্যায় হইয়াছিল।

—হইতে পারে। কিন্তু ইহাতেই আমি নিবৃত্ত হই নাই। আপনার পত্র উন্মোচন পূর্ব্বক আপনার নাম সম্বলিত খামটি রাখিয়া আমার নাম সম্বলিত একটি খাম তাহাতে দিলাম।

স্বামীজী বলিলেন, সে কি!

—আপনার ধর্ম্মবুদ্ধিতে আঘাত লাগিতে পারে সত্য, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে সমবয়স্ক বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এরূপ পরিহাস বিরল নহে। যাহাই হউক, অনিবার্য্য ফল ফলিল—পতি-দেবতার উদ্দেশে লিখিত প্রেমলিপি পরপুরুষের নিকট উপস্থিত হইল।

স্বামীজী ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করিলেন—তার পর?

—তার পর শ্রীযুক্ত সনৎকুমার যাহাতে সে পত্র দেখিতে পান সেজন্য পত্রপাঠ করিবার ও লুকাইবার অভিনয়, অবিবাহিত মোহিতচন্দ্রের নিকট নারীহস্তলিখিত পত্র দর্শনে তাহার কৌতূহল, স্ত্রীর হস্তলিপি দর্শনে সন্দেহ, 'ইতি তোমারই প্রেমভিখারিণী সরযূ' পাঠে স্ত্রীর উপর অবিশ্বাস, সংসার বিষময় বোধ, মেসত্যাগ, আশ্রমে শান্তি অন্বেষণ—

—মোহিত! শ্রীমদ্ সৎ-চৈতন্য চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

—তুই যে একটা আস্ত গাধা তা আগে বুঝতে পারি নি। তোর স্ত্রীর সঙ্গে আমার দেখা নাই, আলাপ-পরিচয় নেই, একেবারে একটা প্রেমপত্র চলে এল, এ কি ক'রে তুই ভাবতে পারলি তাই আশ্চর্য্য!

তার পর স্বামীজীর সম্মুখে হাতজোড় করিয়া বলিলাম, এরূপ নিরেট বোকার উপর আজিকে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের গুরু-ভার ন্যস্ত করিয়া কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন?

স্বামীজী আমার প্রশ্নের কোন উত্তর করিলেন না, শ্রীমদ্ সৎ-চৈতন্যের স্কন্ধে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক সস্নেহে বলিলেন, সনৎকুমার, আশ্রম অপরাধীর আশ্রয় নহে, এক নিরপরাধা সরলা কিশোরীর উপর তুমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছ। তাহার মার্জ্জনা লাভের চেষ্টা কর। পবিত্র বেদমন্ত্র পাঠে যাহাকে জীবনের সঙ্গিনী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার ত্রুটিতে তাহার চরিত্রে সন্দেহ পোষণ করিয়াছ—গৃহস্থাশ্রমে ইহা অপেক্ষা হীন অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। অকপটে তাঁহার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া তাহার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবে। এই মুহূর্ত্তে বন্ধুর সহিত আশ্রম ত্যাগ কর, অধ্যক্ষ-মহারাজের নিকট যাহা বলিবার আমি বলিব।

নৃত্য

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

নৃত্যে মানুষ দৈহিক স্থিতি ও গতি বৈচিত্র্যের কল্পনার সাহায্যে বাস্তব জীবনে অতৃপ্ত বাসনার অনাস্বাদিত রসের সম্ভোগ চেষ্টা করে। উপস্থিত ক্ষেত্রে যে-আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির পথ অবরুদ্ধ দেখে, তাহা কল্পনার ক্ষেত্রে কৃত্রিম গতি ও ভঙ্গির সাহায্যে পূর্ণতা লাভের চেষ্টা করে। এই যে কল্পনার আবেগজনিত গতি ও ভঙ্গির ছন্দোবদ্ধ লীলা-কৌশল, ইহাই নৃত্য। আদিম মানব যুদ্ধ-সম্ভাবনা দেখিলে অন্তর্নিহিত শত্রুনিপাত-প্রবৃত্তির তাড়নায়, শত্রু আপাত অনুপস্থিত হইলেও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধের গতিবিধির উদ্দাম অনুকরণে রণনৃত্যে মাতিয়া উঠে। প্রকৃত যুদ্ধের ছন্দোবর্জ্জিত কদর্য্যতা রণনৃত্যে দেখা দেয় না; শুধু দেখা যায় বীরত্ব- ও হিংসা-ব্যঞ্জক উন্মত্ত আবেগের অপরূপ চলচ্চিত্র। শত্রু উপস্থিত থাকিলে তাহাদিগকে এমনই করিয়া বর্শার খোঁচায়, তলোয়ারের ঘায়ে বা ধনুর্বাণের সাহায্যে নিপাত করিতাম—এইরূপ একটা কল্পনার পথে আদিম মানব রণনৃত্যে অগ্রসর হয়। বসন্তের আগমনে গাছে গাছে নূতন পাতা দেখা দিবে, পুষ্পসৌরভে বনভূমি মাতিয়া উঠিবে, মেঘশূন্য আকাশের জ্যোৎস্নালোক নূতন সৌন্দর্য্যে চরাচর বিশ্বকে রাঙাইয়া তুলিবে; তৎকালে প্রিয়জনের সহিত সুখভ্রমণের ও মিলনের আনন্দ কল্পনা-প্রসূত নৃত্যভঙ্গির আনন্দে কতকটা উপলব্ধি করিবার জন্য সরলচিত্ত আদিম জাতিদিগের মধ্যে কোন কোন প্রকারের বসন্ত-নৃত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। অনাবৃষ্টির কষ্ট ভুলিবার জন্য অথবা বৃষ্টির আবাহন হেতু হয়ত বৃষ্টি হইলে কি কি উপায়ে তাহা সম্ভোগ করা যাইত তাহার প্রতিচ্ছবি নৃত্যে ফুটিয়া উঠে। এইরূপে দেখা যায়, যে, নৃত্য আরম্ভে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কৃত্রিম উপায়ে সত্য রসের অভাব দূরীকরণের চেষ্টা মাত্র। ক্রমশ মানব-কল্পনা ও চিন্তার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের ক্ষেত্রও প্রশস্ত হইয়াছে। নকলকে আসলের অধিক অনুরূপ করিবার জন্য নৃত্যের সহিত সঙ্গীত, বাদ্য, পোষাক, অলঙ্কার প্রভৃতির মিলন ঘটান হইয়াছে।

নৃত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে মানব-সৃষ্টির প্রথম হইতেই নৃত্য মানুষের জীবনযাত্রার অঙ্গস্বরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে, ভোজন-উৎসব উপলক্ষ্যে, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু, বীজবপন, মহামারী, জলকষ্ট, যুদ্ধজয়, বিদেশ-অভিযান, ঋতুপরিবর্ত্তন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে নৃত্য মানবসমাজে যুগে যুগে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে নব নব রূপে দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমান কালেও মনুষ্যজাতির সকল গোষ্ঠীর মধ্যেই নৃত্যের প্রচলন আছে। সভ্যতায় ছোট বড়, সমৃদ্ধ ও দরিদ্র, প্রবল পরাক্রমশালী ও হীনশক্তি, যেমনই হউক না, সকল জাতিরই নিজ নিজ নৃত্যকৌশল আছে। আফ্রিকার নিগ্রো ও ইউরোপের অতিসভ্য ইংরেজ উভয় জাতিই ভোজন-উৎসব উপলক্ষে নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে—দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কষ্টমলিন মুহূর্ত্তগুলির স্মৃতি ম[illegible] হইতে মুছিয়া ফেলা—অর্থ-উপার্জ্জন কি শত্রুনিপা[illegible] উত্তমর্ণের তাগিদ, কি ব্যাঘ্র ও ভল্লুকের তাড়না, শেয়া[illegible] বাজার মন্দা, কি অনাবৃষ্টি বা বন্যা, যে-প্রকার দুঃ[illegible] বিরক্তিকর ঘটনাই হউক না কেন, আনন্দ-ভোজনের পূ[illegible] কল্পনার আশ্রয়ে গতিচ্ছন্দে সে সকল ভুলিয়া মনকে [illegible] ও নিশ্চিন্ত আনন্দের সুরে বাঁধিয়া লওয়া। বাদ্য ও সঙ্গী[illegible] সুসজ্জিত নরনারীসঙ্গ, পুষ্প, পাউডার ও আতরের গন্ধ,-এ সকল আনুষঙ্গিক;—পূর্ণতার অলঙ্কার।

যে-কল্পনার অনুসরণে এই সকল অতি পুরাতন নৃত্যে বিভিন্ন রূপের আবির্ভাব হয়, তাহাই আবার জ্ঞান বা ভ[illegible] অথবা অপর কোন পথে অগ্রসর হইয়া যুগে যুগে মান[illegible] চিত্তের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নূতন রূপ ধারণ করি[illegible] ধর্ম্ম ও কলার ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়। যদি মানুষ সৃষ্টির

ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু অথবা সর্ব্বসংহারক মহাদেবের সাক্ষাৎ-দর্শন পাইত, তাহা হইলে যে অপরূপ ভক্তি, ভয়, বিস্ময় রসে সে আপ্লুত হইয়া উঠিত, তাহারই ঈষৎ পরিচয় হয়ত মানুষ নিজের ভক্তিরসসঞ্জীবিত মানসমুকুরে গতি ও ভঙ্গির আবেগ-ইঙ্গিতে ক্ষণিকের জন্য কখনও পায়, কখনও বা পায় না—দর্শককে পাওয়ায়। দেবদাসীদের নৃত্যের অভিব্যক্তি এই রূপেই আরম্ভ হয়। দেবতার স্বরূপ আরও পূর্ণতর করিয়া ভক্তের সম্মুখে প্রকট করিয়া তুলিবার জন্য মানুষ দেবতার কল্পনায় নিজের সাজসজ্জা গতি ও ভঙ্গির অনুষ্ঠান করে। এ যেন এক প্রকার রূপমতী আরাধনা!

এইরূপে কল্পনার শাখায় শাখায় নৃত্য মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কখনও পুরাণের কাহিনী, কখনও রাগরাগিণীর রূপের আলাপ, আবার কখনও বা শুধু নিছক রসের আলোচনা, যথা—নিরাশা কি হিংসা অথবা শোক, ভয় কিংবা মহানির্ব্বাণ। নৃত্যের যে ভাষা অর্থাৎ মুদ্রা বা ভঙ্গি, তাহা সহস্র বর্ষের চেষ্টার বাছাই-করা ফলসম্ভার মাত্র। সর্ব্বগুণীজন যে ভঙ্গি বা গতি সমন্বয় ভাববিশেষের অভিব্যক্তির প্রশস্ত পথ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আজ নৃত্যকলার ক্ষেত্রে চলিত ভাষারূপে ব্যবহৃত হইতেছে। অবশ্য কাব্যে যেমন কথার ভুল ব্যবহার বা ভুল উচ্চারণ ঘটিতে পারে, নৃত্যেও মুদ্রা ও ভঙ্গির সেইরূপ দুর্দ্দশা অসম্ভব নহে।

ইউরোপীয় নৃত্যে ধর্ম্ম, দর্শন, বা ভক্তির চর্চ্চা খ্রীষ্টীয় যুগে ক্রমশ লোপ পাইয়াছে। কিন্তু ভাবের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় নৃত্যকলা সম্পূর্ণ নিষ্ফল নহে, যদিও তাক লাগাইয়া দেওয়ার কিংবা গতিকৌশলে দর্শককে মুগ্ধ করিয়া ফেলার চেষ্টাই পাশ্চাত্যের নৃত্যে প্রবল।

রেনেসাঁসের যুগে ইউরোপের দূরদূরান্ত হইতে বিভিন্ন গ্রাম্য নৃত্যকৌশল যাচাই হইবার জন্য রাজদরবারগুলিতে উপস্থিত হইত। ফ্রান্সের রাজদরবার এই যাচাই-কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। স্পেনের দরবারও এ-কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করে। কত শত গ্রাম্য নৃত্যের এইরূপে দরবারী সংস্করণ হইয়া দেশে দেশে তাহাদের অভিজাত-মহলে প্রচার হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আধুনিক সময়ের পূর্ব্বে এই সকল নৃত্যের শুধু আনন্দের, সৌন্দর্য্যের, ছন্দের ও কৌশলের দিকই ছিল। উচ্চ অথবা জটিল কোন ভাবের অভিব্যক্তি এই সকল নৃত্যে বিশেষ দেখা যায় নাই। উদ্দেশ্য যেন শুধু বহির্মুখীই ছিল—অন্তরের ক্ষেত্র তখনও অননুসৃত।

লর্ড বাইরণ ও অন্যান্য বহু গুণী লোকের চেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ আবার নিজের খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব সভ্যতার নূতন করিয়া পাঠোদ্ধার সুরু করিল। ইহার মূল কারণ অবশ্য ছিল তুর্কীকে সায়েস্তা করা। গ্রীস, গ্রীস করিয়া ইউরোপ ক্ষেপিয়া উঠিল। যে গ্রীক সভ্যতা ধরণীর বক্ষ হইতে প্রায় মুছিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এই নূতন উদ্দীপনায় তাহার আদর অকস্মাৎ সতেজে বাড়িয়া উঠিল। বর্ত্তমান গ্রীসের বাসিন্দা বহু লোক, যাহারা প্রাচীন হেলেনিক জাতির গ্রামসম্পর্কেও কেহ হয় না, তাহারা এই সুযোগে পুরাকালের গ্রীক সভ্যতার কষ্ট-অভিনয় করিয়া ও নিজেদের তথাকথিত পিতৃপুরুষের নাম ভুল উচ্চারণ করিয়া তুর্কীর দাসত্ব কাটাইয়া উঠিল—ইউরোপের খরচে। যাহা হউক, এই ঘটনার প্রভাবে ইউরোপীয় শিল্পকলা এমন একটা নাড়া পাইল যাহার নিকট রেনেসাঁসও এক ভাবে দেখিলে হস্ব প্রতীয়মান হইবে। ইউরোপের মগজ এই ব্যাপারে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের নাগপাশ ছাড়াইয়া মুক্তিলাভ করিল। ইউরোপ বুঝিল যে তাহার "হিদেন" অখ্রীষ্টান পূর্ব্বপুরুষ পরলোকে সেন্টপিটারের এলাকায় স্থান না-পাইলেও ইহলোকে তাহার অবস্থা ততটা হীন ছিল না। ভাবে, রসে, সৌন্দর্য্যজ্ঞানে, শিল্পকলায়, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, দর্শনে, কাব্যে, নাট্যে, রাষ্ট্রনীতিতে সে গীর্জ্জাগতপ্রাণ খ্রীষ্টান ইয়োরোপীয় অপেক্ষা অনেক উচ্চে ছিল।

নৃত্যে এই নবজাগরণের পরিচয় ইউরোপে শীঘ্রই পাওয়া গেল। ভাব, ভঙ্গি ও গতির সমন্বয়ে ইউরোপীয় নৃত্য একটা নূতন পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। শুধু এক শত বর্ষে ইউরোপীয় নৃত্যকলা কৌশলের চটক ভুলিয়া যে সত্য ভাবরসের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা তৎপূর্ব্বে সহস্র বর্ষেও আমরা ইউরোপের নিকট পাই নাই। টেকনিক বা কেতাদুরস্ত কৌশল, এক্সপ্রেশন বা ভাবের প্রকাশকে দাবাইয়া নির্জ্জীব করিয়া রাখিয়াছিল। নূতন মুক্তির আনন্দে ইউরোপীয় কলাবিৎ দ্রুতগতি বহু পথ অতিক্রম করিয়া

এমন স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যেখানে তাহার মনের কথা তাহার গতির ও ভঙ্গির ভাষায় আমরা আজ বুঝিতে পারিতেছি। সে ভাষার হয়ত এখনও ব্যাকরণ ঠিকমত গড়িয়া উঠে নাই; কিন্তু উঠিবে এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইউরোপীয় নর্ত্তক-নর্ত্তকীদের মধ্যে অনেকে ভারতীয় আদর্শের অনুরূপ কোন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া একাকী অথবা অল্পসংখ্যক নর্ত্তক-নর্ত্তকী একত্র হইয়া নৃত্যের ভাষায় অন্তরের ভাব প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে বহু লোকের সমবেত চেষ্টায় কোন ভাববহুল বিষয়ের নৃত্যালোচনা করা হইয়াছে। আধুনিক ইউরোপের নৃত্যপ্রচেষ্টায় "রাশিয়ান ব্যালে"র স্থান অতি উচ্চে। এই ব্যালের নর্ত্তক-নর্ত্তকীসংঘের মধ্যে কোন কোন নৃত্যশিল্পী জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। আন্না পাব্‌লোভার নৃত্য আজও আমাদের অনেকের মনে জাগ্রত রহিয়াছে। তাঁহার গতি ও ভঙ্গির লীলা কথার কাব্যকে পরাস্ত করিয়া দর্শকের প্রাণে যে সাক্ষাৎ কাব্যরসের সৃষ্টি করিত, সে-অনুভূতি বাক্য-বিন্যাসে বর্ণনীয় নহে।

ইউরোপ একবার যখন আপনার ধর্ম্ম ও বর্ণগত কুসংস্কার ভুলিয়া বিগত যুগের অখ্রীষ্টান সভ্যতার আদর করিতে শিখিল, তখন ক্রমে বর্ত্তমান জগতের জীবন্ত সভ্যতাগুলির ও অন্যান্য দেশেরও পুরাতন সভ্যতার চর্চ্চা স্বভাবতই ইউরোপে আরম্ভ হইল। চীন, জাপান, জাভা ও বলি, ভারতবর্ষ, পারস্য, মিশর, এমন কি আফ্রিকা ও আমেরিকার মায়া ও আজ্‌টেক, কেহই বাদ রহিল না। ইউরোপের দেখাদেখি অপরাপর বহু দেশেও নিজ নিজ প্রাচীন শিল্পকলা প্রভৃতির পূর্ণ প্রচলন ও পুনরুদ্ধার চেষ্টা আরম্ভ হইল।

ভারতীয় নৃত্যকলায় কিছুকাল যাবৎ একটা নবজাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। আন্না পাব্‌লোভা প্রমুখ নৃত্যকলার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ কোন কোন শিল্পী এই জাগরণের সহায়তা করিয়াছেন —অপর দেশে ভারতীয় নৃত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া। শান্তিনিকেতনে নৃত্যকলার চর্চ্চা কবিবর রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে বিশেষ করিয়া করা হইতেছে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন নৃত্যপদ্ধতির আলোচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান ভারতীয় নৃত্যের সবিশেষ উপকার ও উন্নতি করিয়াছেন। উদয়শঙ্কর স্বয়ং ভারতীয় নৃত্যের প্রসিদ্ধ নিদর্শন। তাঁহার দ্বারা আমাদের শিল্পকলা দেশে দেশে প্রচারিত হওয়ায় আমাদের জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। নৃত্যের স্থান সৌন্দর্য্য ও রস অনুভূতির আসরে আজ পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। নৃত্যকলাকে অদূর ভবিষ্যতে নির্ব্বিচারে আর কোন শিক্ষিত লোকই তাচ্ছিল্য, অবহেলা ও ঘৃণার চক্ষে দেখিবেন না বলিয়া মনে হয়।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী নলিনী চক্রবর্ত্তী এই বৎসর কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স পাইয়া বি-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছেন। বি-এ ও বি-এসসি পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স লইয়া উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাইয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে ঈশান-বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে আর এক জন মাত্র মহিলা, শ্রীমতী শান্তিসুধা ঘোষ, এই বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী অনিলা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বৎসর বি-এ পরীক্ষায় ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে অনার্স লইয়া প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছেন।

বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী শান্তি ঘোষ গত বি-এ পরীক্ষায় সংস্কৃত অনার্স লইয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

জার্মেনীর ডয়টশে আকাডেমির অন্তর্গত ভারত-পরিষৎ প্রতি বর্ষে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের জার্মেনীতে অধ্যয়নের সুযোগ দিবার নিমিত্ত কতকগুলি বৃত্তি দিয়া থাকেন। এই বৎসর ডাঃ শ্রীমতী উষা হালদার, এম-বি, বি-এস (ইঁহার প্রতিকৃতি আমরা গত সংখ্যায় মুদ্রিত করিয়াছি) ও চিত্রশিল্পী শ্রীমতী শীলা বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহার দুইটি বৃত্তি পাইয়াছেন।

আণুবীক্ষণিক জলজ কীটাণু

কিছুদিন আগে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের নীচে ক্ষুদ্র একটি জীবন্ত চিংড়িমাছ রাখিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে কতগুলি অদ্ভুত কীটাণু নজরে পড়িয়াছিল। যেমন অদ্ভুত তাহাদের আকৃতি তেমনই অদ্ভুত তাহাদের জীবন-যাত্রা-প্রণালী। কৌতূহলী পাঠকেরা একটু চেষ্টা করিলেই সাধারণ একটি মাইক্রস্কোপের সাহায্যে এই অদ্ভুত কীটাণু সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন।

এক ফোঁটা জলের মধ্যে ঐরূপ অসংখ্য কীটাণু কিলবিল করিয়া বেড়ায়। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে খালি-চোখে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। চিংড়িটার গায়ে এপিষ্টাইলিস্ ও ভর্টিসেলা জাতীয় অসংখ্য প্রাণী আটকাইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। ইহাদিগকে দেখিতে কতকটা চায়ের পেয়ালার মত; প্রত্যেকেই এক-একটি লম্বা বোঁটার সহিত সংযুক্ত। ছবিতে ইহাদিগকে ৭৫ হইতে ২৫০ গুণ বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। তাহা হইতে ইহাদের স্বরূপ উপলব্ধি হইবে। যেন অসংখ্য ডালপালাসমন্বিত পত্রশূন্য এক-একটা গাছের প্রত্যেকটি শাখার ডগায় এক-একটি করিয়া চায়ের পেয়ালা ঝুলিতেছে। ইহাদিগকে এপিষ্টাইলিস বলে। এইরূপ অসংখ্য গাছ ঐ ক্ষুদ্র চিংড়িটার গায়ে আটকাইয়া ছিল। প্রত্যেকটি পেয়ালা এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী; দল বাঁধিয়া এক-সঙ্গে বাস করে। পেয়ালাগুলি অনবরত মুখ হাঁ করিয়া খাবার সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। মুখের চতুর্দ্দিকস্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শুঁয়া আন্দোলন করিয়া জলে স্রোত উৎপন্ন করে। স্রোতের বেগে কিছু মুখে আসিয়া পড়িলেই তৎক্ষণাৎ মুখ বন্ধ করিয়া সমস্ত ডালপালাসমেত সঙ্কুচিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়; আবার আস্তে আস্তে প্রসারিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় শিকার ধরিবার আশায় অপেক্ষা করিতে থাকে।

এই চিংড়িমাছগুলি যে-সকল জলজ উদ্ভিজ্জাদির মধ্যে বাস করে তাহার একটু ক্ষুদ্র পত্রাংশ মাইক্রস্কোপের নীচে রাখিয়া দেখিলাম—তাহার গায়ে ষ্টেণ্টর, রটিফার, প্যারামিসিয়াম ও এমিবা প্রভৃতি অনেক রকম কীটাণু আহার-সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যাপৃত রহিয়াছে। ষ্টেণ্টরগুলি জেলির মত একটু ডেলা পাকাইয়া পাতার তলায় লুকাইয়া থাকে। তার পর আস্তে আস্তে বড় হইয়া ঠিক গ্রামোফোনের হর্ণের আকৃতি ধারণ করে। হর্ণের মুখটা ছত্রাকারে ছড়াইয়া পড়ে। ঐ ছত্রের চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য শুঁয়া আছে। শুঁয়াগুলি পর পর অতি দ্রুতগতিতে আন্দোলন করিবার ফলে জলের মধ্যে একটা আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়। সেই আবর্ত্তে পড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু উহার মুখের মধ্যে আসিয়া পড়িলেই তৎক্ষণাৎ গিলিয়া ফেলে। এক স্থানের আহার্য্য বস্তু নিঃশেষ হইলে ষ্টেণ্টর অবলম্বন ছাড়িয়া দিয়া ঠিক একটি শশা বা কাঁকুড়ের মত আকার ধারণ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে শোঁ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। সুবিধা-মত স্থানে গিয়া মুখ মেলিয়া আবার আহার-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়।

রটিফারগুলি দেখিতে যেন ফুলের কুঁড়ির মত বোঁটায় আটকাইয়া আছে। লেজের দিকটা ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রান্তভাগে মুরগীর পায়ের মত চারটি নখর আছে। নখরের সাহায্যে ইহারা কোন কিছু আঁকড়াইয়া ধরিয়া আহার-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। আহার-সংগ্রহের সময় মুখের ভিতর হইতে দুইখানি চাকতি বাহির করিয়া দেয়। চাকতি দুইখানির ধারে ধারে অসংখ্য শুঁয়া আছে। শুঁয়াগুলি পর-পর দ্রুত-গতিতে আন্দোলন করিয়া জলের মধ্যে দুই দিকে দুইটি ঘূর্ণীর সৃষ্টি করে। ঐ ঘূর্ণীর মধ্যে পড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু প্রভৃতি মুখের মধ্যে প্রবেশ করে। শুঁয়াগুলি এত দ্রুত গতিতে আন্দোলিত হয় যে, দেখিয়া মনে হয় যেন দুইখানি দাঁতওয়ালা চক্র দ্রুতবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে। এই জন্য ইহাদিগকে চক্রকীটাণু নামেও অভিহিত করা হয়। ইহারা জোঁকের মত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করে, আবার সময়ে সময়ে ষ্টেণ্টরের মত সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়।

পাতার গায়ে আর একটা অদ্ভুত বস্তু দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। বস্তুটা না প্রাণী না উদ্ভিদ। ইহারা ডায়েটম নামে অভিহিত। বদ্ধ পুকুরে, নর্দ্দমায় ও ময়লা জলে বিভিন্ন জাতীয় অসংখ্য ডায়েটম পাওয়া যায়, বর্ত্তমান ডায়েটমটি দেখিয়া মনে হইল কেহ যেন এক মাপের দশ-পনরখানা কাঠি পাশাপাশি জুড়ে করিয়া রাখিয়াছে। তীব্র আলোক প্রয়োগ করিতেই দেখি—পাশাপাশি অবস্থিত নিশ্চল কাঠিগুলি, ফায়ার ব্রিগেডের ভাঁজ করা সিঁড়ির মত, একখানা আর একখানার গা বাহিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া লম্বা একখানা বৃহৎ কাঠির আকার ধারণ করিল। দুই-তিন সেকেণ্ড লম্বা হইয়া থাকিয়া আবার পূর্ব্বাবস্থায় গুটাইয়া গেল। খানিক ক্ষণ পরেই আবার উল্টাদিক হইতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রসারিত হইল। আলোর তীব্রতা ক্রমশঃ বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সঙ্কোচন-প্রসারণ অতি দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল। উভয়দিক হইতে পর পর এই গতিবেগের ফলে ডায়েটমটি স্থানভ্রষ্ট হইয়া বহুদূরে সরিয়া পড়িল। এই অদ্ভুত প্রকৃতির ডায়েটমটিকে ব্যাচিলারিয়া প্যারাডক্স নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

—

চোর মাকড়সা

আমাদের দেশে প্রায় সর্ব্বত্রই ঘরের মেঝে, দেওয়াল বা বেড়ার গায়ে আধ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা, পিঠের উভয় পাশে কালো ডোরাওয়ালা, ছোট ছোট এক প্রকার মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহারা দিনের বেলায় মাছি ধরিয়া খাইয়াই জীবন ধারণ করে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ইহারা নিজ নিজ বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করে অথবা কোন নিরাপদ স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ইহাদের শিকার ধরার কৌশল অতি অদ্ভুত। কিছু দূরে একটি মাছি বসিতে দেখিলেই মাকড়সা অতি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া অগ্রসর হয়। একটু কাছে আসিয়াই ঘুরিয়া মাছির পিছন দিকে উপস্থিত হয় এবং সেখান হইতে শিকারের ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়ে। এই মাকড়সারা একবারে প্রায় পনর-ষোলটি ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইবার পর সেগুলি কয়েক দিন পর্য্যন্ত বাসার মধ্যেই একত্র অবস্থান করিয়া থাকে। বাসা হইতে বাহির হইয়া গেলে ইহাদের পরস্পরের সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। অধিকাংশ বাচ্চারই প্রয়োজনানুরূপ শিকার ধরিবার সুযোগ বা যোগ্যতা থাকে না; কাজেই অনেকে অল্পাহারে বা অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ অবস্থায় বাধ্য হইয়াই ইহারা চুরি করিতে প্রবৃত্ত হয়।

(১) স্টেন্টর। বামদিকের স্টেন্টরটি মুখ বিস্তৃত করিয়া আহারান্বেষণ করিতেছে; ডানদিকেরটি সবে মুখ খুলিতেছে। (প্রায় ২০০ গুণ বর্দ্ধিতাকার চিত্র)। (২) পিঁপড়ের মুখ হইতে খাদ্য কাড়িবার জন্য চোর-মাকড়সা ওৎ পাতিয়া আছে। (৩) বিভিন্ন বয়সের মশকভুক্ ব্যাঙাচি। (৪) মাকড়সার নৃত্য: উপরেরটি স্ত্রী-মাকড়সা পুরুষ-মাকড়সাটি নৃত্য করিয়া পিছন হইতে অগ্রসর হইতেছে। (৫) ব্যাসিলারিয়া প্যারা[illegible] উভয় দিকেই প্রসারিত হইতেছে। নীচে ফুলের কুঁড়ির মত রটি[illegible] শেওলার গায়ে আটকাইয়া আছে। (৬) চিংড়ির শুঁড়ের [illegible] এপিষ্টাইলিস-উপনিবেশ। শুঁড়ের ডানদিকে কয়েকটি ভর্টিসেল[illegible] যাইতেছে।

[ফটোগ্রাফ লেখক-কর্তৃক গৃহী

আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই হলদে রঙের এক প্রকার ক্ষুদ্র পিপীলিকা দৃষ্টিগোচর হয়। ইহারা দলে দলে সার বাঁধিয়া আহার-সংগ্রহে ব্যাপৃত হয়, অথবা এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গমনাগমন করে। প্রায়ই দেখা যায়, হাজার হাজার পিপীলিক সার বাঁধিয়া খাদ্য-কণিকা অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম মুখে করিয়া এক স্থান হইতে অন্য দূরবর্ত্তী স্থানে যাতায়াত করিতেছে। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, এই পিঁপড়ের সারের আশেপাশে পূর্ব্বোক্ত বাচ্চা মাকড়সার দুই একটি অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পিপীলিকাদের গমনাগমন পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে অথবা উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করিতেছে। যেই একটি পিপীলিকা ডিম অথবা খাদ্য-কণিকা মুখে লইয়া তাহাদের কাহারও কাছ দিয়া চলিয়া যায় অমনি মাকড়সাটি চক্ষের নিমেষে ছুটিয়া গিয়া তাহার মুখের জিনিষ কাড়িয়া লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে চম্পট দেয়। পিঁপড়ের সারের মধ্যে তখন হুলুস্থূল পড়িয়া যায়। ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া তাহারা অপহরণকারীর পিছু তাড়া করে, কিন্তু মাকড়সার মত দ্রুত ছুটিতে পারে না বলিয়া কোন ফল হয় না। ইতিমধ্যে মাকড়সা ক্ষিপ্রগতিতে অপহৃত বস্তু লইয়া দূরে সরিয়া পড়ে এবং তাহা গলাধঃকরণ করিয়া কিছুক্ষণ পরে আবার আসিয়া খাবার ছিনাইয়া লইবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে।

—

মাকড়সার নৃত্য

ময়ূর, পায়রা ও চড়ুই পাখীর নৃত্য দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া যাই। বিশেষ করিয়া কবিরা ত ময়ূরের নৃত্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু কীটপতঙ্গ শ্রেণীর মধ্যে মাকড়সার নৃত্যভঙ্গী দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়। আমাদের দেশে খাল, বিল, পুকুরে জলজ ঘাস-পাতার ভিতরে, পায়ে ডোরা-কাটা ধূসর রঙের এক প্রকার ডুবুরি মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতের পুরুষ-মাকড়সারা স্ত্রী-মাকড়সা অপেক্ষা ছোট হয়। পুরুষ-মাকড়সার গায়ের রং কালো অথবা গাঢ় ধূসর, পা ছাড়া মুখের কাছে হাতের মত ছোট ছোট দুইটি উপাঙ্গ আছে। তাহাদের অগ্রভাগ মিশমিশে কালো কিন্তু গোড়ার দিক ধবধবে সাদা। ইহারা স্ত্রী-মাকড়সা দেখিতে পাইলেই ছুটাছুটি বন্ধ করিয়া অতি সন্তর্পণে পিছন দিক হইতে তাহার নিকট অগ্রসর হইতে থাকে। স্ত্রী-মাকড়সার নিকট হইতে চার-পাঁচ ইঞ্চি দূরে থাকিতেই শরীরটাকে একবার উঁচু একবার নীচু করিয়া নাচ সুরু করিয়া দেয়। সেই অদ্ভুত ভঙ্গীর নাচ প্রত্যক্ষ না করিলে লিখিয়া বুঝান অসম্ভব। এইরূপ ভাবে নাচিতে নাচিতে প্রায় দুই-তিন ইঞ্চি দূরত্ব রক্ষা করিয়া বার-বার স্ত্রী-মাকড়সাকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। স্ত্রী-মাকড়সাটা কিন্তু এক স্থানে চুপ করিয়া বসিয়াই এই নাচ দেখে। নাচিতে নাচিতে বৃত্তের পরিধি ক্রমশঃ কমাইতে থাকে। অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিয়া মুখের সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র উপাঙ্গ দুইটিকে ঠিক হাতজোড়ের মত জোড় করিয়া উপরে তোলে এবং পরক্ষণেই দুইটিকে দুই দিকে বিস্তৃত করিয়া নীচে নামাইয়া আনে। আগেকার দিনে নবাব-বাদশাদের দরবারে যেরূপ কুর্ণিশ করিবার প্রথা ছিল যেন হুবহু সেই কুর্ণিশের কায়দায় পুরুষ-মাকড়সা, মাকড়সারাণীকে তোয়াজ করে। এইরূপ কুর্ণিশ করিতে করিতে মাঝে মাঝে নৃত্যভঙ্গী বদলাইয়া পাগুলি কাঁপাইতে কাঁপাইতে একটু একটু করিয়া তাহার কাছে ঘেঁসিতে থাকে।

—

মশকভুক্ বেঙাচি

ডোবা, পুকুর অথবা বদ্ধজলে সচরাচর যে-সব কালো রঙের বেঙাচি দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা গলিত মাছ, মাংস বা অনুরূপ জিনিষ কুরিয়া কুরিয়া খাইয়া থাকে। বর্ষার সময় একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে অসংখ্য কালো রঙের বেঙাচি জলের ধারে ধারে দল বাঁধিয়া কোন পচা জিনিষ বা শেওলা প্রভৃতি কুরিয়া খাইতেছে। পচিয়া না গেলে কোন জীবন্ত প্রাণীকে ইহারা ভক্ষণ করিতে পারে না। ইহারা কুনো ব্যাঙের বাচ্চা। কিন্তু আমাদের দেশে আর এক রকমের বেঙাচি দেখিতে পাওয়া যায়—ইহাদের গায়ের রং কালো নহে ধূসর বর্ণ, পেটের দিক সম্পূর্ণরূপে সাদা। লম্বায় ইহারা এক ইঞ্চিরও বড় হয়। এই বেঙাচিরা বিভিন্ন অবস্থান্তরের পর কোলা ব্যাঙে পরিণত হয়। এই বেঙাচিরা কোন জিনিষ কুরিয়া খায় না, জীবন্ত মশার বাচ্চা ধরিয়া খায়। উপর হইতে বাতাস লইবার জন্য মশার কীড়াগুলি জলের নীচে হইতে অনবরত ওঠানামা করে। সেই সময় বেঙাচিরা দূর হইতে নড়ন-চড়ন লক্ষ্য করিয়া ইহাদিগকে ধরিয়া একেবারে গিলিয়া ফেলে। নড়াচড়া না করিলে বেঙাচিরা কাহাকেও আক্রমণ করে না। বর্ষাকালে নালা, ডোবায় জল জমিলেই সেখানে অসংখ্য মশার কীড়া কিলবিল করিতে দেখা যায়। সেখানে এই জাতীয় কয়েকটি বেঙাচি ছাড়িয়া দিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাহারা মশার কীড়াগুলিকে নিঃশেষে খাইয়া ফেলে। এই বেঙাচিরা কালো বেঙাচিও খাইয়া থাকে। যেখানে এই বেঙাচি থাকে সেখানে মশার কীড়া বা কালো বেঙাচি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

—

ধূলিকণা-নিবারক মুখোস

যাহারা খনি, কলকারখানা বা অন্যান্য ধূলিপরিপূর্ণ স্থানে কাজ করে তাহাদের মধ্যে সিলিকোসিস নামে এক প্রকার রোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ধোঁয়া, ধূলিকণা ও রোগবীজাণুবাহী নানা প্রকার গ্যাস শ্বাসযন্ত্রে প্রবেশ করিয়া সহজেই তাহাদিগকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া ফেলে। এই উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা নানা প্রকার গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। এই সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধানের জন্য আমেরিকার খনির মালিকদের সাহায্যপুষ্ট এক শক্তিশালী বিরাট প্রতিষ্ঠান আছে। নানা পরীক্ষার ফলে তাঁহারা কয়েক প্রকার ধূলি-নিবারক মুখোস উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নাক ও মুখ ঢাকিয়া এই মুখোস ঘাড়ের সঙ্গে আঁটিয়া

ইহারা সং নহে, মুখোসের দোষত্রুটি পরীক্ষার জন্য মুখোস পরাইয়া ইহাদের মুখে কয়লার গুঁড়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল

দেওয়া হয়। মুখোস পরিধান করিলে শ্বাসপ্রশ্বাস-প্রক্রিয়ার কোনই অসুবিধা অনুভূত হয় না, অথচ ধূলা, বালি, ধোঁয়া পরিপূর্ণ বাতাসের

মধ্যেও নির্ম্মল বায়ু সেবন করা যায়। মুখোস পরাইয়া সূক্ষ্ম কয়লার গুঁড়া যন্ত্রসহযোগে মুখের উপর উড়াইয়া দেওয়া হয়; তাহার ফলে মুখের যে-যে স্থানে কালি লাগিয়া যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া মুখোসের দোষকটি নির্ণয় করা হয়।
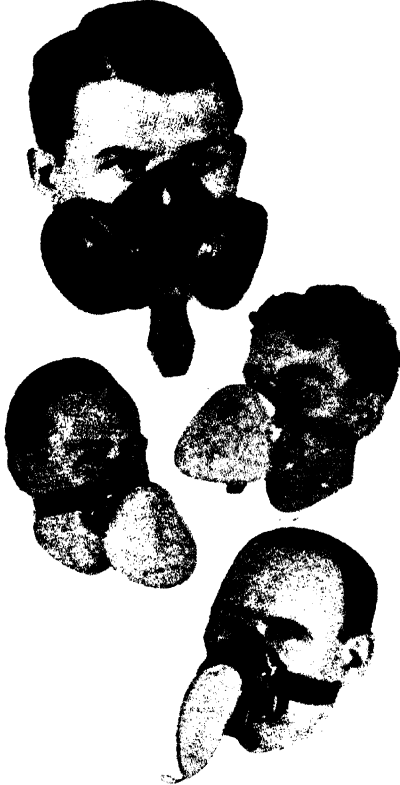
বিভিন্ন ধরণের ধূলিকণা-নিবারক মুখোস্

—

নূতন ধরণের গাছকাটা করাত

ভূমির সঙ্গে সমান করিয়া গাছ কাটিবার জন্য জার্ম্মেনীতে নূতন ধরণের এক প্রকার করাত আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যন্ত্র হাতে চালাইয়া একটি মাত্র লোক অতি অল্প সময়ের মধ্যে বড় একটি গাছকে অনায়াসে কাটিয়া ফেলিতে পারে। একখানি রেল-গাড়ীর উপর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একখানি করাত ভূমির সঙ্গে সমান্তরালে করিয়া এমনভাবে স্থাপিত করা হইয়াছে যে, গাড়ীর উপর দাড়াইয়া এক জন লোক একটি খাড় হাতলকে পাম্পের মত সামনে ও পিছনে ঠেলিলেই, কতগুলি চাকার সাহায্যে করাতখানি একবার এদিক একবার ওদিক দ্রুতগতিতে চলিতে থাকে। গাড়ীখানিকে শিকল দিয়া গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া দিতে হয়। একটি জোরালো স্প্রীং করাতখানিকে গাছের গায়ে চাপিয়া রাখে।

নূতন ধরণের গাছকাটা করাত

—

সূর্য্যগ্রহণের ছবি তুলিবার বিরাট ক্যামেরা

গত ১৯শে জুন যে সূর্য্যগ্রহণ হইয়া গেল, তাহা হইতে সূর্য্য-সম্বন্ধীয় বিবিধ তত্ত্ব উদ্ঘাটনের জন্য বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন হইতেই তোড়জোড় করিতেছিলেন। আমেরিকার জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা গ্রহণের সময় সূর্য্যের বিভিন্ন রকমের ফটো তুলিবার জন্য নূতন ধরণের এক বিরাট ক্যামেরা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ছবি হইতে এই ক্যামেরার বিশালায়তন ও নূতনত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা হইবে। ছবিতে ক্যামেরার বর্ণবিশ্লেষণী
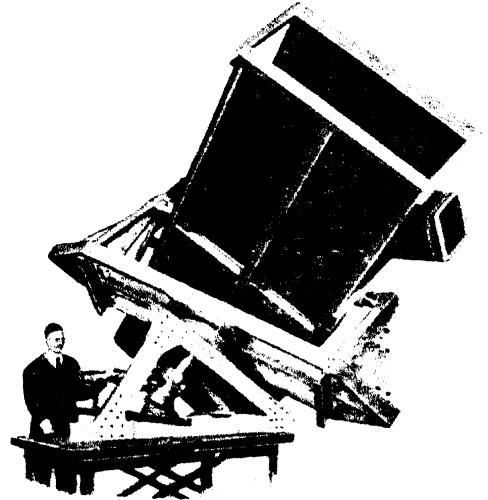
সূর্য্যগ্রহণের ফটো তুলিবার বিপুলাকৃতি ক্যামেরা

যন্ত্রের ব্যাটারী-সংস্থানের অংশবিশেষ দেখা যাইতেছে। অতি হাল্কা অথচ দৃঢ় মিশ্রধাতু হইতে যন্ত্রের কাঠামো ও বহিরাবরণগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। ক্যামেরাটি ভূমি হইতে পনর ফুট উঁচু। পূর্ণগ্রাসের সময় সূর্য্যকিরণ ক্যামেরার বর্ণবিশ্লেষণী যন্ত্রের মধ্য দিয়া ইন্দ্রধনুর মত বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়া যাইবে এবং প্রত্যেকটি বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সেকেণ্ডে এক-একবার করিয়া স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র সাহায্যে আলোকচিত্র গৃহীত হইবে। আর একটি বিরাট ফটোগ্রাফ যন্ত্রসাহায্যে ত্রিশ ইঞ্চি চওড়া ফিল্মের উপর বিশ্লেষিত বর্ণছত্রের চলচ্চিত্র গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সাইবিরিয়ার অন্তর্গত উড়াল পর্ব্বতের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত অ্যাক-বুলাক নামক স্থানে এই যন্ত্রসহযোগে গ্রহণের ছবি তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও মাসাচুসেটস্-এর টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট একযোগে এই অভিযান প্রেরণ করিয়াছেন।

—

মশক-নিবারক ঘোমটা

উত্তর মেরু সন্নিহিত প্রদেশসমূহে গ্রীষ্মঋতু যদিও স্বল্পকালস্থায়ী তথাপি উষ্ণমণ্ডলস্থিত প্রদেশসমূহের মত সেখানে মশকের উৎপাত বড় কম নহে। বৈজ্ঞানিক অভিযানকারীরা ঐ সমস্ত প্রদেশ পরিভ্রমণকালে অনেক

মশক নিবারক ঘোমটা

সময় মশক-দংশনে অতিষ্ঠ হইয়া পড়েন। এই উৎপাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকেরা ঘোমটার মত মুখঢাকা এক প্রকার মশক-নিবারক জাল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ছবিতে মশক-নিবারক ঘোমটা পরিহিত ডুনাইদ্বীপ অভিযানকারী এক দল যাত্রী দেখা যাইতেছে।

—

বিষাক্ত গ্যাস আক্রমণ হইতে সতর্কীকরণের ব্যবস্থা

বিষাক্ত গ্যাস আক্রমণের ভয়ে অধুনা ইউরোপের সকল জাতিই শঙ্কিত। যুদ্ধের সময় এরোপ্লেন হইতে বিষাক্ত গ্যাসপূর্ণ বোমা নিক্ষেপের ফলে যে কি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়, সে-সম্বন্ধে অনেকের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। ভবিষ্যৎ যুদ্ধে এই গ্যাস আক্রমণ হইতে নিরীহ নাগরিকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন জাতি কোন-না-কোন কার্য্যকরী উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করিয়াছে। বোমা বিদীর্ণ হইবার পর বিষাক্ত গ্যাস আস্তে আস্তে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে। বোমা ফাটিবার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটিয়া গিয়া দূরের লোককে বিষাক্ত গ্যাস আগমনের খবর জানাইতে পারিলে তাহারা নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে। জনসাধারণকে সময় থাকিতে গ্যাস আক্রমণ হইতে সাবধান করিয়া দিবার জন্য লণ্ডন শহরের রাস্তায় এক নূতন ব্যবস্থার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে। গ্যাস-

মুখোস-পরিহিত সাইক্লিষ্ট লাউড-স্পীকারযোগে গ্যাস-আক্রমণ হইতে লোকজনকে সতর্ক করিতেছে

নিরোধক মুখোস এবং শ্বাসপ্রশ্বাস-নিয়ামক যন্ত্রপরিহিত এক ব্যক্তি দ্রুতগতিসম্পন্ন দ্বিচক্রযানে আরোহণ করিয়া রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থিত নাগরিকগণকে সাইকেল-সংলগ্ন লাউড-স্পীকারের সাহায্যে সতর্ক করিয়া দিয়া যায়। মুখোসের মধ্যে মাইক্রোফোন স্থাপিত আছে। মাইক্রোফোনে শব্দ-কম্পন তারযোগে বৈদ্যুতিক ব্যাটারী পরিচালিত লাউড-স্পীকারে উপস্থিত হইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে বিপদবার্ত্তা ঘোষণা করে।

আরামে শুইয়া বই পড়িবার অভিনব চশমা

যাঁহারা বিছানায় শুইয়া আরামে বই পড়িতে চান তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ইহাতে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য এক জন ইংরেজ আবিষ্কারক এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। উপায়টি আর কিছুই নহে—সাধারণ

আরামে শুইয়া বই পড়িবার চশমা

একটি চশমার ফ্রেমের মধ্য হইতে কাচ দুইখানি খুলিয়া লইয়া সেস্থলে দুইখানি প্রিজম (ত্রি-শির কাচ) বসাইয়া লইলেই হইল। পুস্তকের পৃষ্ঠা হইতে আলোকরশ্মি সোজাভাবে আসিয়া প্রিজমের ভিতর দিয়া সমকোণে বাঁকিয়া চোখে পড়ে। কাজেই বইখানি হাতে উঁচু করিয়া চোখের সামনে না ধরিয়াও ছবিতে প্রদর্শিত ভাবে বুকের উপর খাড়া ভাবে রাখিলেই অক্ষরগুলি পরিষ্কার ভাবে দৃষ্টিগোচর হইবে।

—

বৃহত্তম অগ্নি-নির্ব্বাপক সিঁড়ি

অগ্নিপরিবেষ্টিত গৃহের মধ্য হইতে ধন-প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত ফায়ার ব্রিগেড এঞ্জিনের সঙ্গে এক প্রকার ভাঁজ-করা সিঁড়ি থাকে। আর্জ্জেন্টিনার বুয়েনস্-আয়ারেসের অগ্নি-নির্ব্বাপক সমিতি অগ্নি-নির্ব্বাপণের সুবিধার জন্য সম্প্রতি ঐরূপ একটি বিপুলকায় সিঁড়ি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এই ধরণের এত বড় সিঁড়ি নাকি এই নূতন। সম্পূর্ণরূপে ভাঁজ খুলিয়া দাঁড় করাইলে এই সিঁড়িটির উচ্চতা হয় ১০০ হাতের কিছু বেশী। ইহাকে পাঁচ ভাগে ভাঁজ করিয়া বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত বিরাট একখানি মোটর-ট্রাকের উপর স্থাপিত করা হইয়াছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রসাহায্যে টেলিস্কোপের নলের মত পর-পর ভাঁজ খুলিয়া সিঁড়িটি প্রসারিত হইয়া থাকে। আগুন নিবাইবার সময় প্রসারিত সিঁড়িটিকে যথাস্থানে স্থিরভাবে রাখিবার জন্য ট্রাকের কাঠামো সংলগ্ন চারিটি জ্যাকের সঙ্গে মাটি আঁকড়াইয়া ধরিবার যন্ত্রকে রাস্তার সঙ্গে প্যাঁচ কষিয়া দেওয়া হয়। অগ্নিপরিবেষ্টিত উঁচু বাড়ী
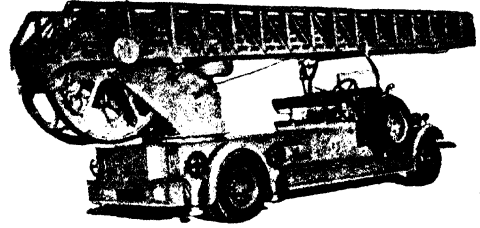
মোটর-ট্রাকের উপর সিঁড়িটি ভাঁজ করিয়া রাখা হইয়াছে

বৃহত্তম অগ্নি-নির্ব্বাপক সিঁড়ি পুরাপুরি প্রসারিত করা হইয়াছে

হইতে এই সিঁড়ির সাহায্যে অতি সহজেই লোকজন উদ্ধার করা সম্ভব হইবে এবং উপর হইতে জল দিয়া আগুন সহজে আয়ত্তে আনা যাইবে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বাঙালীর দ্বিতীয় পাটকল

শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

বাংলার ৯৪টি পাটকলের মধ্যে মাত্র একটি বাঙালীর ছিল। এইবার সৌভাগ্যক্রমে দুইটি হইতে চলিল। পাট বাংলার নিজস্ব সম্পত্তি বলিলেও চলে, কিন্তু ইহার লাভ বাঙালী পায় না। পাট যৎসামান্য মূল্যে বিক্রীত হয়, আর ইহার দুই গুণ, তিন গুণ মূল্যে পাট হইতে উৎপন্ন চট ও থলিয়া বিক্রীত হয়। বহু বৎসর ধরিয়া এইরূপ চলিতেছে, কোনও প্রতীকার হইতেছে না। সরকার যদি পাট-তদন্ত-কমিটির সম্মুখে উপস্থিত কৃষক ও মফস্বলের সাক্ষীদের একমাত্র মত মানিয়া লইয়া বাধ্যতামূলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতেন তাহা হইলে পাটের দর চড়িত, কিন্তু তাঁহারা স্বেচ্ছামূলক প্রচারের পথ অবলম্বন করিয়া সাধারণের কতকগুলি অর্থের অপব্যয় করিলেন। গত বৎসর সরকার যাহা স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার এক-তৃতীয়াংশ অধিক পাট জন্মিয়াছিল। এবার আবার তাহা অপেক্ষাও অধিক পাট জন্মিবে, কারণ অধিক জমিতে চাষ হইয়াছে। সুতরাং পাটের লাভ কলওয়ালাদের হাতেই রহিয়া যাইতেছে। কল যদি বাঙালীর বেশী থাকিত, তাহা হইলে এই প্রভূত লাভের একটা বড় অংশ বাঙালী পাইত। কলিকাতার বাঙালী ধনীদের হাতে অর্থ বড় কম নাই; কিন্তু তাঁহারা শিল্প-বাণিজ্যে টাকা লাগাইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া আছেন। এদিকে বেকার যুবকের আত্মহত্যার সংবাদ সংবাদপত্রে নিত্যপাঠ্য হইয়া উঠিল। যে-সকল বাঙালী সাহস করিয়া শিল্প-বাণিজ্যে অর্থনিয়োগ করিতেছেন, তাঁহারা জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন। যে কলটি চলিতেছে তাহা রাজা শ্রীজানকীনাথ রায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহা ইংরেজী ১৯৩১ সাল হইতে চলিতেছে। ইহার তিন হাজার শ্রমিকের মধ্যে অর্দ্ধেক বাঙালী। আর কোনও পাটকলে বাঙালী শ্রমিকের সংখ্যার অনুপাত এত নহে, যৎসামান্য মাত্র। বাঙালী পাটের দালালেরা এই কলে কাজ পায়, অন্য সব কলে না-পাওয়ার জন্য বাঙালী দালালের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া একটি লাভজনক পথ রুদ্ধ হইতেছে। রাজা শ্রীজানকীনাথের কলে পাঁচ শত তাঁত আছে। সম্প্রতি হাওড়া কদমতলার নিকট শানপুরে শ্রীআলামোহন দাস একটি পাটকল নির্ম্মাণ করিতেছেন। ইহাতে দুই শত তাঁত বসিবে ও চৌদ্দ শত লোক কাজ পাইবে। এই কলে যে-সকল

শ্রীআলামোহন দাস

যন্ত্রপাতি বসিতেছে, তাহার প্রধান অংশ শ্রীআলামোহনের নিজের এঞ্জিনীয়ারীং কারখানায় বাঙালী শ্রমিকের দ্বারা প্রস্তুত। শ্রীআলামোহন চৌদ্দ বৎসর বয়সে কলিকাতার রাস্তায় মাথায় করিয়া বৈ ফিরি করিয়াছেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম ওজন-কল তৈয়ারী করেন। তাঁহার ওজন-কলের কারখানা হইতে এখন ভারত-সরকার ও বিভিন্ন রেলওয়েকে ওজন-কল সরবরাহ করা হইতেছে। যে অতিকায় ওজন-কলের উপর রেলওয়ের মালগাড়ী মালসুদ্ধ ওজন হয়, তাহা এই বাঙালীর কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে। এই শিল্পপ্রতিষ্ঠার ফলে গত তিন বৎসরে ভারতের অন্ততঃ এক কোটি টাকার বিদেশী আমদানী বন্ধ হইয়াছে। শ্রীআলামোহনের পাটকলের বিশেষত্ব এই, যে, তিনি নিজের টাকা ও মধ্যবিত্ত লোকের টাকার মূলধনে ইহা প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। আমাদের ধনীরা যদি ব্যবসায়-বাণিজ্য না-ই করেন, তাহা হইলে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সম্প্রদায়কে বাঁচিবার পথ বাহির করিতে হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ
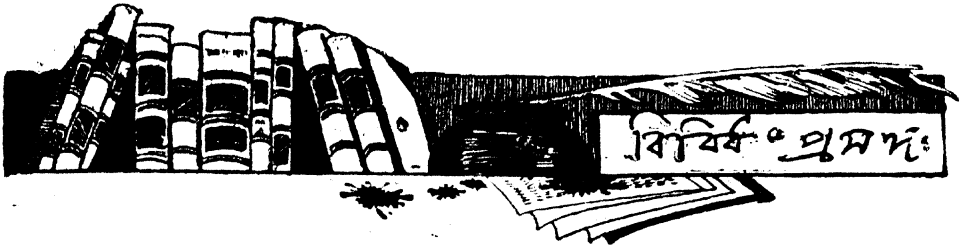
ভারতসচিবের নিকট বঙ্গের হিন্দুদের আবেদন

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ করিয়া বঙ্গের হিন্দুদের পক্ষ হইতে ভারতসচিবের নিকট একটি দরখাস্ত গিয়াছে। তাহাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, নীলরতন সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি মনীষী, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রায় সমুদয় হিন্দু সদস্য, বহু মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাপতি, বহু পেন্সানপ্রাপ্ত হিন্দু জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট, বঙ্গের প্রধান প্রধান হিন্দু পত্রিকা-সম্পাদক প্রভৃতির স্বাক্ষর আছে। আরও অনেকে স্বাক্ষর করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই দরখাস্তের সমর্থন করিয়া মফস্বলে অনেক স্থানে সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

এই দরখাস্তে প্রধানতঃ যাহা চাওয়া হইয়াছে, নীচে তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল।

(১) বাংলা দেশে হিন্দুরা একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়; অন্যান্য প্রদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার্থে যে-সকল বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, বাংলার হিন্দুদের জন্যও সেই সকল ব্যবস্থা করা হউক। যদি মাথা-গুনতি হিসাবেই প্রতিনিধির সংখ্যা নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা হয়, তবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রাপ্তবয়স্ক লোকের সংখ্যা বিবেচনা করিয়াই তাহা করা হউক; কেন-না প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারই (adult suffrageই) লক্ষ্য—শিশুদের ভোটাধিকার নহে। সংখ্যালঘু হইলেও বাংলার হিন্দুদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্থান শ্রেষ্ঠ। ট্যাক্সও তাহারাই বেশী দেয়। বাংলার লিখনপঠনক্ষমদের শতকরা ৬৪ জন হিন্দু; বাংলার যত ছাত্রছাত্রী ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিতেছে তাহার শতকরা ৮০ জনেরও অধিক হিন্দু; আইন-ব্যবসায়ীদের শতকরা ৮৭ জন হিন্দু, চিকিৎসকদের শতকরা ৮০ জন হিন্দু, ব্যাঙ্কিং, বীমা ও এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ীদের শতকরা ৮৩ জন হিন্দু। এ অবস্থায় তাহাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্তসংখ্যক সদস্যপদ দেওয়া হউক।

(২) হিন্দুরা যৌথ বা সম্মিলিত নির্ব্বাচনে বিশ্বাসী। পৃথক নির্ব্বাচনপ্রথা আত্মকর্তৃত্বশীল শাসনতন্ত্রের বিরোধী; গণতন্ত্র ও রাজনীতির ইতিহাসে পৃথক নির্ব্বাচনপ্রথার নজির নাই।

(৩) যত দিন পর্য্যন্ত না বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা নূতন চুক্তি হয়, তত দিন লক্ষ্ণৌ-চুক্তি অনুসারেই ব্যবস্থা করা হউক। সাইমন কমিশন এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

(৪) যাঁহারা আসন-সংরক্ষণের পক্ষপাতী, তাঁহারা সংখ্যালঘুদের জন্যই তাহার সমর্থন করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য আসন-সংরক্ষণ ব্যবস্থা অনাবশ্যক ও অন্যায়। যদি আসন-সংরক্ষণ করিতেই হয়, তবে সংখ্যালঘুদের জন্যই করা উচিত, সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য নহে।

(৫) হিন্দুদের দাবী সম্পর্কে যত দিন পর্য্যন্ত একটা সিদ্ধান্ত না হয়, তত দিন যেন বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভায় বাংলার হিন্দুদের সদস্যসংখ্যার অনুপাতেই ভবিষ্যতে তাহাদের আসন-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করা হয়।

এই আবেদনটির সমালোচনা করিতে হইলে প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে, যে, ইহা ঠিক স্বাজাতিক (ন্যাশন্যালিষ্ট) হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত ভারতসচিবের নিকট প্রেরিত হয় নাই, এবং ইহা হইতে হিন্দু স্বাজাতিকদের সম্পূর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শটি অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। হিন্দু স্বাজাতিকদের আদর্শ জানিবার নানা উপায় আছে। একটি সহজ উপায়, ১৯৩১ সালের মার্চ্চ মাসের শেষের দিকে নয়া দিল্লীতে হিন্দুমহাসভার কমিটি যে বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করেন, তাহা পাঠ করা। তাহাতে ধর্ম্মসম্প্রদায় বা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী অনুসারে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের আসনগুলি ভাগ করিবার নীতি ছিল না, সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত আলাদা নির্ব্বাচনের নীতি সমর্থিত

হয় নাই ; সকল সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর লোকদের ভোট দিবার যোগ্যতা একই প্রকার করিবার দাবী এবং সম্মিলিত নির্ব্বাচনের দাবী ছিল। অবশ্য সকল সম্প্রদায় ও শ্রেণীর ভাষা, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা ছিল। সংক্ষেপে, ঐ বিবৃতিতে ভারতবর্ষের জন্য সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও স্বাজাতিক রাষ্ট্রবিধির দাবী ছিল। এই প্রকার রাষ্ট্রবিধির দাবীর মূলে ছিল এই বিশ্বাস, যে, ধর্ম্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে সমুদয় ভারতীয়ের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ এক। ভারতবর্ষকে এইরূপ শাসনবিধি যদি দেওয়া হইত, এবং যদি তাহার ফলে বঙ্গের হিন্দুদের কিছু কিছু অসুবিধা হইত, তাহা হইলে তাহারা তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল।

কিন্তু আগামী বৎসর যে রাষ্ট্রবিধি অনুসারে দেশের সরকারী কাজ নির্ব্বাহিত হইতে আরম্ভ হইবে, তাহা গণতান্ত্রিক ও স্বাজাতিক নহে। এই বিধির প্রণেতারা ইহা ধরিয়া লইয়া আইনটা রচনা করিয়াছেন, যে, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ আলাদা। আইনপ্রণেতারা সেই সব বিভিন্ন স্বার্থ রক্ষার ওজুহাতে পৃথক নির্ব্বাচন, এক এক সম্প্রদায়ের জন্য নির্দ্দিষ্টসংখ্যক আসনরক্ষা, কোন কোন সম্প্রদায় ও শ্রেণীকে তাহাদের লোকসংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা অধিক আসন দান, কোন কোন প্রদেশকে তাহাদের লোকসংখ্যা অনুসারে প্রাপ্য অপেক্ষা অধিক আসন দান, কোন কোন সম্প্রদায়ের জন্য নূতন রকমের যোগ্যতা নির্দ্দেশ, ইত্যাদি ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এইরূপ নানা ব্যবস্থার ফলে কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও প্রদেশের সম্প্রদায়গত ও প্রাদেশিক সংকীর্ণ সুবিধা হইয়াছে—যদিও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের ও মহাজাতিগঠনের পথে কণ্টক রোপিত হইয়াছে। বঙ্গের হিন্দুদের বিন্দুমাত্রও সুবিধা হয় নাই, সম্পূর্ণ অসুবিধাই হইয়াছে। ভারতসচিবকে প্রেরিত দরখাস্তটির উদ্দেশ্য, নূতন ভারতশাসন আইনেই অনুসৃত নীতি অনুসারে এবং তাহারই একটি ধারা ও দুটি উপধারা অবলম্বনে বঙ্গের হিন্দুদের অসুবিধাগুলি কিঞ্চিৎ দূর করা। সুতরাং এই আবেদনে বঙ্গের হিন্দুরা স্বাজাতিকতা ও গণতান্ত্রিকতার অনুসরণ করেন নাই বলিলে ন্যায্য সমালোচনা করা হইবে না। স্বাজাতিকতা ও গণতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন ভারতশাসন-আইন-প্রণেতারা। তাহাতে বঙ্গের হিন্দুদের অসুবিধা হইয়াছে। আইনটাতেই নির্দ্দিষ্ট উপায়ে সেই অসুবিধা কিঞ্চিৎ দূরীকরণের চেষ্টা বঙ্গের হিন্দুরা করিতেছেন। সমগ্র-ভারতীয় শাসনবিধি স্বাজাতিকতাসম্মত ও গণতান্ত্রিকতাসম্মত হইলে তাঁহারা তজ্জনিত অসুবিধা সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন ও এখনও আছেন ; কিন্তু ভারতের বিদেশী শাসকেরা স্বাজাতিকতা ও গণতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া বঙ্গের হিন্দুদের যে-সব অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহাও নির্ব্বিবাদে সহ্য করিব, এরূপ আশা করা কাহারও উচিত নহে—বিশেষতঃ তাঁহাদের উচিত কোন ক্রমেই নহে, যাঁহারা আইনটার দ্বারা লাভবান হইবেন।

বঙ্গে ও অন্যত্র সংখ্যাগরিষ্ঠদের আসন-সংখ্যা

বঙ্গের হিন্দুরা ভারতসচিবের কাছে পূর্ব্ববর্ণিত দরখাস্ত করায় বঙ্গের মুসলমানপক্ষ হইতে কেহ কেহ বলিয়াছেন, বঙ্গে মুসলমানরাও ত তাঁহাদের সংখ্যার অনুপাতে আসন পান নাই, সুতরাং বঙ্গের হিন্দুরা তাঁহাদের সংখ্যার অনুপাতে আসন না-পাওয়ায় তাঁহাদিগকেই অসুবিধায় ফেলা হইয়াছে, কেন বলা হইতেছে ?

এরূপ প্রশ্ন দ্বারা একটি তথ্য ঢাকা পড়ে। তাহা বলিতেছি।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশে হিন্দুদের সংখ্যা বেশী, তাহারা তথায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু তাহারা তথাকার কোথাও তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে আসন পায় নাই। দৃষ্টান্ত দিতেছি। নীচের তালিকাটিতে হিন্দুরা কোন প্রদেশে মোট লোকসংখ্যার শতকরা কত জন, সমগ্র আসনসংখ্যার কয়টি তাহারা পাইয়াছে, এবং মোট আসনসংখ্যা হইতে বিশেষ আসনগুলি (যেমন বাণিজ্যের, শ্রমিকদের, প্রভৃতির জন্য রক্ষিত আসনগুলি) বাদ দিলে বাকী আসনগুলির শতকরা কয়টি পাইয়াছে, তাহা পরে পরে দেখাইতেছি। হিন্দুরা যে-সব প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সর্ব্বত্রই তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্য আসন অপেক্ষা কম আসন তাহারা পাইয়াছে। আমরা কেবল কয়েকটির দৃষ্টান্ত নীচে দিতেছি।

প্রদেশ।	হিন্দুরা শতকরা কয়জন	মোট আসনের শতকরা প্রাপ্ত	বিশেষ আসন বাদে শতকরা প্রাপ্ত
আগ্রা-অযোধ্যা	৮৪.৭	৬৩.২	৬৭
বিহার-উড়িষ্যা	৮২.৩	৬০.৬	৬৫.৮
মাদ্রাজ	৮৯.০	৭১.২	৭৮.১
বোম্বাই	৮৯.৫	৬৮.৬	৭৫.৯
মধ্যপ্রদেশ	৯৫.৬	৭৮.৬	৮৪.৬

উপরের তালিকায় প্রথম স্তম্ভে "হিন্দুরা" বলিতে প্রধানতঃ হিন্দুরা বুঝিতে হইবে। জৈন প্রভৃতি অত্যল্পসংখ্যক কোন কোন সম্প্রদায়কে হিন্দুদের সঙ্গে আসন দেওয়ায় তাহাদের সংখ্যাও হিন্দুদের সংখ্যায় যোগ করা হইয়াছে।

কোন প্রদেশেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে আসন পায় নাই; সুতরাং মুসলমানেরা বঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়াই সংখ্যার অনুপাতে আসন পাইতে পারে না।

যে আসনগুলি হিন্দুদের বলিয়া উদ্ধৃত দেখান হইল, তাহাতে জৈন, বৌদ্ধ, আদিম জাতি প্রভৃতির ভাগ আছে, এবং হিন্দুদের আসনগুলি হইতে অবনত হিন্দুদিগকে আলাদা করিয়া এক-একটা ভাগ দেওয়া হইয়াছে। মুসলমানদের আসনগুলিতে এরূপ কোন ভাগ নাই।

বঙ্গে মুসলমানের মোট লোকসংখ্যার শতকরা ৫৪.৮ জন। তাহাদিগকে মোট আসনসংখ্যার শতকরা ৪৭.৬টি এবং বিশেষ আসনগুলি বাদে মোট আসনের শতকরা ৫৫.২টি দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং অন্যান্য প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদিগকে যত আসন ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে, বঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদিগকে তাহা অপেক্ষা অনেক কম আসন ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। আরও মনে রাখিতে হইবে, যে, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে প্রধানতঃ মুসলমানদের সুবিধার জন্যই হিন্দুদিগকে বহু আসন ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে; কিন্তু বঙ্গে হিন্দুদের জন্য মুসলমানদিগকে একটিও আসন ছাড়িয়া দিতে হয় নাই। বস্তুতঃ, বিশেষ আসনগুলি বাদ দিলে বঙ্গে মুসলমানরা তাহাদের সংখ্যার অনুপাত অপেক্ষা বেশী আসন পাইয়াছে।

এই সমস্ত সংখ্যা ও হিসাব আমরা সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের বক্তৃতা ও রচনাবলীর ইংরেজী বহি হইতে লইয়াছি। আরও বিস্তারিত বৃত্তান্ত ও হিসাব তাহাতে আছে।

বঙ্গে ও অন্যত্র সংখ্যালঘুদের জন্য আসন

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ মোট লোকসংখ্যার শতকরা কত অংশ, মোট আসনসংখ্যার শতকরা কত তাহারা পাইয়াছে, এবং বিশেষ আসন বাদে শতকরা কয়টি আসন তাহারা পাইয়াছে নীচের তালিকায় তাহা দেখান হইল। সংখ্যাগুলি সর্ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের বহি হইতে গৃহীত।

সম্প্রদায় ও প্রদেশ	শতকরা সংখ্যা	মোট আসনের শতকরা	বিশেষ আসন বাদে শতকরা
বঙ্গে খ্রীষ্টিয়ান	.৩৬	৬.৮	৭.৯
আগ্রা-অযোধ্যায়			
খ্রীষ্টিয়ান	.৪২	২.২	২.৩
বিহার উড়িষ্যায়			
খ্রীষ্টিয়ান	[illegible]	৪.০	৪.৩
বোম্বাইয়ে			
খ্রীষ্টিয়ান	১.৩৭	[illegible]	[illegible]
পঞ্জাবে খ্রীষ্টিয়ান	[illegible]	২.৩	২.৪
মাদ্রাজে ,,	৩.৮	[illegible]	৭.১
মধ্যপ্রদেশে			
মুসলমান	৪.৪	১২.৪	১৩.৫
মাদ্রাজে ,,	৭.১	১৩.২	[illegible]
বোম্বাইয়ে ,,	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিহার উড়িষ্যায়			
মুসলমান	[illegible]	[illegible]	[illegible]
পঞ্জাবে শিখ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
আগ্রা-অযোধ্যায়			
মুসলমান	[illegible]	[illegible]	[illegible]
পঞ্জাবে হিন্দু	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বঙ্গে হিন্দু	[illegible]	[illegible]	[illegible]

সিন্ধুদেশে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা সংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্য অপেক্ষা অল্প অধিক আসন পাইয়াছে।

উপরের তালিকায় দেখা যাইতেছে, অহিন্দু সংখ্যালঘুরা সর্বত্র তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্য অপেক্ষা বেশী আসন পাইয়াছে। কিন্তু পঞ্জাবে ও বঙ্গে সংখ্যালঘু হিন্দুরা সংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্য অপেক্ষা কম আসন পাইয়াছে—বিশেষতঃ বঙ্গে। বঙ্গে হিন্দুদিগকে আরও দুর্বল করা হইয়াছে তাহাদের প্রাপ্য আসনগুলি হইতে ৩০টি আসন তপশীলভুক্ত জাতিদিগকে দিয়া, যাহারা এখনও স্বাধীনচিত্ততার সহিত সমগ্র দেশবাসীর, সমগ্র হিন্দুসমাজের বা সমগ্র তপশীলভুক্ত জাতিদের কল্যাণচেষ্টায় অভ্যস্ত নহে এবং যাহাদের তদনুরূপ শিক্ষাও হয় নাই।

বঙ্গের হিন্দুদের উপর যে ঘোরতর অবিচার ও অন্যায়-

বিরুদ্ধ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা বিস্তারিত ভাবে লেখা অনাবশ্যক।

কেহ কেহ এরূপ কথা বলিয়াছে, যে, তোমরা শতকরা ৪৪'৮ জন, তোমরা অন্য সংখ্যালঘুদের মত দুর্ব্বল নও, তোমরা কেন অনুপাত অনুযায়ী আসনের চেয়ে বেশী আসন চাও? আমরা বলি, সংখ্যালঘুরা কি পরিমাণ লঘু হইলে কিছু বেশী আসন পাইবে এবং কি হিসাবে পাইবে, তাহা আইনে কোথাও লেখা নাই; এবং কি পরিমাণে লঘু হইলে পাইবে না, তাহাও লেখা নাই। অহিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় মাত্রেই বেশী আসন পাইয়াছে, সুতরাং বঙ্গের হিন্দুরা কেন পাইবে না? আরও বলি, বেশী না-হয় নাই দিলে, কিন্তু সংখ্যার অনুপাতে যাহা প্রাপ্য তাহাও ত দাও নাই। এ কি রকম বিচার?

—

শিক্ষাসংস্কৃতি প্রভৃতির জন্য আসন দাবী

কোন কোন সমালোচক বলিতেছেন, বঙ্গের হিন্দুরা শিক্ষাসংস্কৃতি প্রভৃতিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আসন বেশী চাহিতেছেন, এ বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। মোটেই আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। সম্পূর্ণ স্বাজাতিকতা- ও গণতান্ত্রিকতা-সম্মতভাবে ব্যবস্থাপক সভা আদি গঠিত ও নির্ব্বাচনাদি নির্ব্বাহিত হউক, তাহা হইলে আমরা শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতিতে শ্রেষ্ঠতার জন্য কোন দাবীই করিব না। কিন্তু অন্যদের বেলায় কোন-না-কোন অনির্দ্দিষ্ট শ্রেষ্ঠতার অজুহাতে তাহাদিগকে বেশী আসন দেওয়া হইয়াছে, আর আমাদের বেলায় আসন বেশী না দিয়া প্রাপ্য আসন হইতে কিছু কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। ইহা কিরূপ বিচার?

বঙ্গে ইউরোপীয়েরা সংখ্যার অনুপাতে ১ (এক)টি মাত্র আসন পাইতে পারে, কিন্তু পাইয়াছে ২৫ (পঁচিশ)টি। তাহাদের শিক্ষা বাণিজ্যিক উদ্যম ইত্যাদির জন্য তাহাদিগকে এত বেশী দেওয়া হইয়াছে যদি বলা হয়, তাহা হইলে বাঙালী হিন্দুদিগকে ঐ ঐ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতার জন্য কেন বেশী আসন দেওয়া হইবে না, বরং কিছু কাড়িয়া লওয়া হইবে? বলিতে পারেন, ইংরেজরা বিজেতা বলিয়া তাহাদিগকে বেশী দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহারা ত অন্যান্য প্রদেশেও বিজেতা। সেখানে ত এত বেশী আসন তাহাদিগকে দেওয়া হয় নাই! যত দয়া ও যত সু(?)তর্ক কেবল বঙ্গের হিন্দুদের জন্যই কি রক্ষিত হইয়াছে?

ইংরেজদের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্। দেশী লোকদের মধ্যেও খ্রীষ্টিয়ানদিগকে সংখ্যার অনুপাতের অতিরিক্ত আসন দিবার একটি কারণ তাহাদের শিক্ষায় অগ্রসরতা। মুসলমানদিগকেও সম্ভবতঃ কোন প্রকার শ্রেষ্ঠতার ওজুহাতে কোথাও কোথাও সংখ্যার অনুপাতে প্রাপ্যের দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিকসংখ্যক আসন দেওয়া হইয়াছে। যেমন, বিহার, আগ্রা-অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশে।

এরূপ সমালোচনাও দেখিয়াছি, যে, বঙ্গের হিন্দুরা যদি জ্ঞানে ধনে উদ্যমে শ্রেষ্ঠ, তাহা হইলে তাহার দ্বারাই কেন নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারেন না। এরূপ প্রশ্ন নাগরিকদের, পৌর ও জানপদবর্গের অধিকার ও কর্ত্তব্য এবং ব্যবস্থাপক সভার উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করে। স্বার্থরক্ষাটাই পৌর ও জানপদ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, সমগ্র প্রদেশের ও জাতির প্রতি কর্ত্তব্যপালনের অধিকার সকলের চেয়ে বড় অধিকার। বঙ্গের হিন্দুরা তাহাদের সংখ্যা, শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুসারে সেই কর্ত্তব্য পালনের অধিকার হইতে বিন্দুমাত্রও কেন বঞ্চিত হইবে? অথচ বহু পরিমাণে বঞ্চিত হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে দেশের ও জাতির প্রতি কর্ত্তব্য করিতে এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিতে হইলে বুদ্ধি বিদ্যা জ্ঞান উদ্যম প্রভৃতি কিছুই কাজে লাগে না, এমন নয়; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ফলাফল নির্ভর করে সদস্যদের ভোটের উপর, মাথাগুনতির উপর। সে-গুনতিতে মহাপণ্ডিত ও মহামূর্খ, মহাদেশহিতৈষী ও অতি স্বার্থপর, সকলের ভোটের মূল্য ও শক্তি সমান। সুতরাং বঙ্গের হিন্দুরা তাহাদের প্রাপ্য আসন হইতে বঞ্চিত হইবার পর তাহাদিগকে শিক্ষাসংস্কৃতি ইত্যাদির দ্বারা নিজেদের স্বার্থরক্ষা ও কর্ত্তব্য-পালন করিতে বলা অজ্ঞের বা ক্রূরের উপহাস মাত্র।

—

হিন্দু মুসলমানকে বঞ্চিত করিতে চায় নাই

বঙ্গের মুসলমানরা সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা যত জন, ব্যবস্থাপক সভায় শতকরা ততটি আসন তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট

করিয়া দেওয়া হয় নাই সত্য—যদিও বিশেষ আসনগুলির কয়েকটি তাহারা সম্ভবতঃ পাইবে এবং তাহা হইলে ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের দল একাই অন্য সব দলের সমষ্টির চেয়ে বড় হইবে। সে কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা বঙ্গের মুসলমানদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, যে, এলাহাবাদে যে সাম্প্রদায়িক কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে কলিকাতায় বিড়লা পার্কে হিন্দুদের কন্‌ফারেন্সে স্থির হয়, যে, মুসলমানরা তাঁহাদের সংখ্যা অনুযায়ী আসন পাইবেন, হিন্দুরাও তাঁহাদের সংখ্যা অনুযায়ী আসন পাইবেন, এবং উভয় সম্প্রদায়কে তাহা পাইবার জন্য ইউরোপীয় ও অন্য খ্রীষ্টিয়ানদিগকে প্রদত্ত অত্যধিক আসনগুলি হইতে অতিরিক্ত কতকগুলি আসন লইবার জন্য সম্মিলিত চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ সম্মিলিত চেষ্টা করিতে মুসলমানরা রাজী হন নাই। অথচ মুসলমানদিগকে তাঁহাদের সংখ্যা অনুযায়ী আসন দিতে হইলে কেবল দুটি উপায় আছে। প্রথম, দেশী ও বিদেশী খ্রীষ্টিয়ানদিগকে প্রদত্ত অত্যধিক কতকগুলি আসন লওয়া; দ্বিতীয়, হিন্দুদিগকে তাহাদের প্রাপ্য আসন হইতে অত্যন্ত কম যত আসন দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেই, তাহাদিগকে আরও বঞ্চিত করিয়া, কতকগুলি আসন মুসলমানদিগকে দেওয়া।

লক্ষ্ণৌ-চুক্তি

লক্ষ্ণৌ-চুক্তিটাকে আমরা মোটেই নিখুঁত মনে করি না। কিন্তু তাহা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের তাৎকালিক নেতাদের পরামর্শসিদ্ধ হইয়াছিল। তাহার পরিবর্ত্তনও উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে আলোচনার দ্বারা হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাইমন কমিশনের রিপোর্টেও তাহা বলা হইয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট নিজেই চুক্তিটার বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া এমন একটা বন্দোবস্ত করিয়াছেন যাহাতে হিন্দুরা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন ও আপত্তি করিতেছেন এবং মুসলমানরাও অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন।

বঙ্গে দুর্ভিক্ষ

বঙ্গের এগার-বারটি জেলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। সম্প্রতি অনেক স্থানে বৃষ্টি হওয়ায় ধানের ক্ষেতে রোওয়া-পোঁতার কাজ করিবার নিমিত্ত শ্রমিকের আবশ্যক হওয়ায় শ্রমজীবী শ্রেণীর লোকদের কিছু সুবিধা হইয়াছে। তাহা কিন্তু অল্প সময়ের জন্য—ক্ষেতের বর্ত্তমান কাজ হইয়া গেলেই তাহারা আবার অন্নাভাবে কষ্ট পাইবে। ভদ্রলোকশ্রেণীর লোকদের এই সাময়িক সুবিধাও হয় নাই। তাহাদের অভাব ও কষ্ট সমানই চলিতেছে। খাদ্যের ও বস্ত্রের, এবং অনেকের চালের খড়েরও, অভাব অনুভূত হইতেছে।

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় কিছুদিন পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদের অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের বাড়ী বাঁকুড়া জেলায় হইলেও তাঁহাদের এই কাজ প্রশংসনীয় হইত। কিন্তু তাঁহাদের জন্মস্থান ও নিবাস বাঁকুড়ায় নহে বলিয়া তাঁহাদের পরিশ্রম আরও প্রশংসনীয়। তাঁহাদের পৃথক পৃথক রিপোর্টে বাঁকুড়ার আশু ও স্থায়ী উন্নতির জন্য তাঁহারা যে-সকল উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। এ-বিষয়ে গবর্ন্মেণ্টের এবং বাঁকুড়া জেলার অধিবাসীদের, উভয় পক্ষেরই কর্ত্তব্য আছে। কর্ত্তব্যগুলি সম্বন্ধে আন্দোলন জাগাইয়া রাখা আবশ্যক এবং উভয় পক্ষকে সমুদয় উপায় বার-বার স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। যাঁহারা তাহা করিতে চান, তাঁহাদিগকে জানাইতেছি, আমরাও এই বিষয়ের কিছু আলোচনা মধ্যে মধ্যে করিয়াছি—গত কয়েক মাসের মধ্যে করিয়াছি, এবং ১৩৩০ সালের চৈত্রের প্রবাসীতে "বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা" শীর্ষক প্রবন্ধে ও ১৩৩১ সালের বৈশাখের "ক্ষয়িষ্ণু জেলাগুলির উন্নতির উপায়" ও "বাঁকুড়ার উন্নতি" শীর্ষক প্রবন্ধ দুটিতে করিয়াছি। ১২।১৩ বৎসর পূর্বে কিছু বিস্তারিত আলোচনাই করিয়াছিলাম। সেই জন্য প্রথমোক্ত প্রবন্ধটি প্রায় আট-পৃষ্ঠা-ব্যাপী, শেষোক্তটি সচিত্র ও প্রায় ষোল-পৃষ্ঠা-ব্যাপী। কেহ সমগ্র বিষয়টির আলোচনা করিয়া উপায় নির্দ্ধারণ করিতে চাহিলে হয়ত এই প্রবন্ধগুলিও পড়া আবশ্যক হইতে পারে।

ম্যাক্সিম গর্কি

বিখ্যাত রাশিয়ান্ লেখক ম্যাক্সিম গর্কির মৃত্যু হইয়াছে তাঁহার আসল নাম ম্যাক্সিম গর্কি নয়, আসল নাম "আলেক্সে

রমাঁ রলাঁ   ম্যাক্সিম গর্কি

ম্যাক্সিমোভিচ্ পেস্কভ্"। তিনি টিফ্লিস শহরের রেলওয়ের কারখানায় অন্যতম মিস্ত্রীর কাজ করিবার সময় স্থানীয় একটি দৈনিক কাগজে ম্যাক্সিম গর্কি ছদ্ম নামে একটি গল্প প্রকাশ করেন। পরে তিনি ঐ নামেই বিখ্যাত হইয়া পড়েন। তাঁহার কতকগুলি গল্প পুস্তকাকারে প্রথম বাহির হয় ১৮৯৭ সালে। তাহাতে তিনি এরূপ যশস্বী হন যে লোকমত তাঁহাকে টলষ্টয়ের সমকক্ষ বলিয়া ঘোষণা করে।

গর্কি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন গালিচা, পরদা ইত্যাদির দ্বারা গৃহসজ্জাকারী। গর্কি ৫ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। তাহার পর তাঁহার মাতা আবার বিবাহ করেন ও তিনি মাতামহের বাড়ীতে মানুষ হন। মাতামহ ছিলেন রঞ্জক বা রংরেজ। তাঁহাকে ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। তিনি গর্কিকে ৯ বৎসর বয়স হইতেই অন্ন অর্জ্জনের কাজে নিযুক্ত করেন, এবং বালকটিকে পরবর্ত্তী ১৫ বৎসর এক পেশার পর আর এক পেশা অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণ রাশিয়ার সকল অঞ্চলে ও জর্জিয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। এই প্রকার পরিশ্রমের ও অনিশ্চিত আয়ের জীবন যাপন করিতে হওয়া সত্ত্বেও গর্কি নিজেই নিজেকে শিক্ষিত করিয়া তুলেন, জ্ঞানক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য বিস্তর বহি পড়েন, এবং অল্প বয়সেই লিপিতে আরম্ভ করেন।

সাহিত্যিক, সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যসমালোচকেরা গর্কির গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন ও তৎসমুদয়ের আলোচনা করিবেন। আমাদের সমাজ এবং আমাদের বালক ও যুবকেরা তাঁহার বংশ ও জীবন হইতে যাহা শিখিতে পারেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য।

কোন দেশেই বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভা সমাজের কোন একটা শ্রেণীতে, স্তরে ও জা'তে আবদ্ধ নহে। কিন্তু আমাদের দেশে নিম্নশ্রেণীর বালকেরা সুবিধা ও সুযোগের অভাবে এবং সামাজিক ব্যবস্থার দোষে প্রায়ই বুদ্ধির বিকাশ ও প্রতিভার স্ফুরণ হইতে বঞ্চিত থাকে। গর্কির পিতৃকুল ও মাতৃকুল যাহা ছিল, তাহার অনুরূপ কুলে জন্মিলে আমাদের দেশে বালকেরা প্রায়ই মাথা তুলিতে পারে না। অতএব, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা ও প্রথার এরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক

যাহার দ্বারা দেশ কোনও প্রতিভাশালী বালকের ভবিষ্যৎ কৃতিত্ব হইতে বঞ্চিত না হয়।

আমাদের বালক ও যুবকেরাও যেন আটপিটে, চিরআশাশীল ও চিরউদ্যমশীল হন। কোন প্রতিকূল অবস্থার সংঘাতেই যেন তাঁহারা পরাজয় স্বীকার না করেন। এক জন সপ্ততিপর বৃদ্ধ সংগ্রামাতীত অবস্থায় পৌছিয়া আমাদের উপর বক্তৃতা ঝাড়িতেছেন, তাঁহারা যেন এরূপ মনে না-করেন। বৃদ্ধদেরও সংগ্রাম আছে এবং বাহির হইতে লোকে যাহাকে নিশ্চিন্ত আরামের অবস্থা মনে করে তাহা বস্তুতঃ আরামের অবস্থা না-হইতে পারে। বৃদ্ধেরা অন্যকে যাহা করিতে বলে, অনেক সময় তাহা নিজেও যথাসাধ্য করিতে চেষ্টা করে।

বিখ্যাত ফ্রেঞ্চ মনীষী রম্যাঁ রল্যাঁর সহিত গর্কির বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। রল্যাঁর মত তিনিও পৃথিবীব্যাপী শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন।

—

শান্তিনিকেতন কলেজ

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় শতকরা যত জন ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়, তাহা হইতে সাধারণতঃ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষাদানবিষয়ক কৃতিত্বের বিচার হইয়া থাকে। ইহাতে ঠিক্ বিচার হয় না। কিন্তু বিচারের অন্য কোন সোজা উপায়ও নাই। সুতরাং ইহাকে অগ্রাহ্যও করা যায় না। সেই জন্য, যদিও শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম ও পরে বিশ্বভারতী ছেলেমেয়েদের পরীক্ষায় পাস করাইবার জন্যই মুখ্যতঃ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তথাপি যখন তথাকার বিদ্যালয় ও কলেজ হইতে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়া থাকে, তখন ঐসব পরীক্ষায় তাহাদের কৃতিত্বও বিবেচ্য। এ বৎসর কোন্ পরীক্ষা শান্তিনিকেতনের কত ছাত্রছাত্রী দিয়াছিল ও কত জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল, নীচের তালিকায় দেখান যাইতেছে।

পরীক্ষা।	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা।	উত্তীর্ণ।	১ম শ্রেণী।
ম্যাট্রিক্	১২	১০	৩
ইণ্টার আর্ট্স্	১৩	১১	৪
ইণ্টার সায়েন্স	৬	৪	৩
বি-এ	১৪	১৪	

বি-এ পরীক্ষায় ১ জন অনার্স ও ২ জন ডিস্টিংশন পাইয়াছে।

গত দুই বৎসরও পরীক্ষার ফল ভাল হইয়াছিল।

শান্তিনিকেতনের নিন্দা করিবার প্রয়োজন হইলে হয়, ওখানে কেবল নাচগান হয়। কিন্তু দেখা যাইবে যে, অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মত এখান হইতে ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হইয়া থাকে।

নৃত্য ও সংগীত সম্বন্ধে আমাদের মত প্রবাসীর পাঠক জানেন। আমরা সংগীত মাত্রেরই বিরোধী যেমন নৃত্যমাত্রেরই বিরোধীও তেমনি নহি। সংগীত স্বাভা[বিক] নৃত্যও স্বাভাবিক। ভাল সংগীত ও ভাল নৃত্য সং[স্কৃতির] অঙ্গ। উভয়েরই শিখিবার প্রকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান বিশ্বভার[তী]। উৎকৃষ্ট নাট্যের উৎকৃষ্ট অভিনয় শিক্ষার স্থানও বিশ্বভার[তী]। সাধারণতঃ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের কোন-না-কোন সম[য়] উৎসবে আজকাল সংগীত ও অভিনয় হয়, নৃত্যও বে[শ] কোথাও হয়। কিন্তু নিন্দা করিবার বেলায় [কেবল] বিশ্বভারতীর উল্লেখ কেহ কেহ করেন—যদিও সুরুচি উৎকৃষ্ট সংগীত, নৃত্য ও অভিনয়ই শান্তিনিকেতনে থাকে। এবং প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীই যে তাহা করে বা [শেখে] তাহাও নহে—যদিও প্রকৃত তথ্য সেরূপ হইলে তাহা [নিন্দা] বা অসন্তোষের বিষয় হইত না।

শান্তিনিকেতনে অল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রী লওয়া হয় অধ্যাপকেরা প্রত্যেকের প্রতি যতটা মন দিতে পারেন, তাহা দুঃসাধ্য। এখানকার লাইব্রেরী উৎকৃষ্ট। কা[রণ] প্রাচ্য এবং ইংরেজী ভিন্ন অন্য দুই একটি পাশ্চাত্য [ভাষার] পুস্তক ইহাতে যত আছে, আমাদের দেশের কলেজ লাই[ব্রেরী]গুলিতে সচরাচর তাহা দেখা যায় না। ইংরেজী গ্রন্থ[ও] বেশী আছে।

সহশিক্ষা এখন অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলিতে[ছে]। সুতরাং শান্তিনিকেতনে যে ইহা আগে হ[ইতে] চলিয়া আসিতেছে, সে বিষয়টির বিস্তারিত আ[লোচনা] অনাবশ্যক।

এখানে সংগীতাদি ব্যতীত চিত্রাঙ্কন শিখাইবার ব[্যবস্থা] খুব উৎকৃষ্ট। সুতরাং ছাত্রছাত্রীদের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা এ[খানে] হইতে পারে।

বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে প্রকৃতির সাক্ষাৎ সংস্পর্শে থাকিয়া শিক্ষালাভ উচ্চ অধিকার। স্বাস্থ্যের পক্ষেও ইহা ভাল।

বাংলা দেশে গ্রাম ও গ্রাম্য লোকই বেশী। বঙ্গের প্রকৃত উন্নতি গ্রামসমূহের উন্নতি ব্যতিরেকে হইতে পারে না। গ্রাম্য জীবনের সহিত সংস্পর্শ ও সম্পর্ক ব্যতিরেকে গ্রামসমূহের উন্নতি হইতে পারে না। শুধু সংস্পর্শ ও সম্পর্ক থাকিলেই হইবে না। উন্নতির উপায় ও প্রণালী জানা চাই; বিশেষ করিয়া কৃষির উন্নতির উপায় ও প্রণালী জানা আবশ্যক। বিশ্বভারতী অল্প দূরে দূরে গ্রামসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত। গ্রাম্য জীবনের সহিত সম্পর্ক এখানে বেশ রাখা যায়, এবং সুরুলে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর গ্রামোন্নতি-বিধায়ক বিভাগে গ্রাম্য জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির উপায় ও প্রণালী সম্বন্ধে পরীক্ষা হয় ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান বিদ্যার্থী-দিগকে দান করা হয়। এখানে নানা প্রকার তাঁতে শাড়ী ধুতি তোয়ালে সতরঞ্চ প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে শিখান হয়। তদ্ভিন্ন কাপড় রঙান, জাভার বাটিক কাজ, লাক্ষালেপন, উৎকৃষ্ট সূচিকর্ম্ম, উৎকৃষ্ট চামড়ার কাজ, জুতা প্রস্তুতি, পুস্তক বাঁধাই, খেলনা নির্ম্মাণ, অলঙ্কার নির্ম্মাণ, সূত্রধরের কাজ প্রভৃতি শিখান হয়। সুরুলে অবস্থিত যে প্রতিষ্ঠানে এই সকল শিল্প শিখান হয়, তাহার নাম শ্রীনিকেতন। ইহা শান্তিনিকেতন হইতে দেড় মাইল। যাহাতে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন উভয় প্রতিষ্ঠানেরই শিক্ষণীয় বিষয় ছাত্রছাত্রীরা শিখিতে পারে, তজ্জন্য উভয় স্থানের মধ্যে বিশ্বভারতীর মোটর-বাস্ চলে। ভাড়া জনপ্রতি এক আনা।

আমরা বালক ও যুবকদিগকে আর্টপিটে হইতে বলিয়াছি। বিশ্বভারতীতে আর্টপিটে হইবার সুযোগ আছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রত্যহ ঘণ্টা দুই নিয়মিত অধ্যয়ন যথেষ্ট। সুতরাং ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পাঠ্য পড়িয়াও ললিতকলা এবং কোন-না-কোন শিল্প শিখিতে পারেন। তাহাতে তাঁহাদের সংস্কৃতি ও উপার্জ্জনশক্তিলাভ দুই-ই হইবে।

দৈহিক অর্থেও আর্টপিটে হইবার সুযোগ এখানে আছে। এখানে গ্রামোন্নতির কাজ, ব্যায়াম ও খেলা, সবই হইতে পারে।

যাঁহারা সংস্কৃত ও অন্য দু-একটি ভাষার কোন-কোন বিদ্যায় গবেষণা শিখিতে ও করিতে চান, তাঁহারা সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন-শাস্ত্রী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বিদ্যাভবনে তাহা করিতে পারেন। মধ্যযুগে যে-সকল সাধু সন্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সম্বন্ধে ও বাউলদের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সান্নিধ্যে ও উপদেশে যেরূপ হইতে পারে, অন্য কোথাও তাহা অপেক্ষা ভাল বা তাহার মত হইতে পারে না।

—

বঙ্গের মুসলমানদের শিক্ষা

একখানি সাপ্তাহিক কাগজে "মোহাম্মদী" হইতে নীচের কথাগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে।

"নিম্ন ও মাধ্যমিক শিক্ষায় বাঙ্গালী মুসলমান ক্রমশ: অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু উচ্চ ও বিশেষ শিক্ষায় মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে, তাহা আমরা বহুবার হিসাব করিয়া দেখাইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এবারকার পরীক্ষার ফল দেখিয়াও সে অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।"

এ অবস্থার কারণ যদি "মোহাম্মদী" কিছু নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা তাহা অবগত নহি।

—

দু জন বাঙালী কর্ম্মচারীর প্রশংসা

সর্ ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র লণ্ডনে ভারতবর্ষের হাই কমিশনার ছিলেন। সম্প্রতি তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সেই উপলক্ষ্যে লণ্ডনের টাইম্‌স্ তাঁহার এবং তাঁহার আগেকার হাই কমিশনার সর্ অতুল চট্টোপাধ্যায়ের খুব প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই খুব যোগ্য লোক ও উভয়েই খুব বিশ্বস্ততার সহিত ইংরেজ গবর্মেণ্টের সেবা করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রাদেশিক গবর্ণর না-করার জন্য অবশ্য টাইম্‌স্ দুঃখ প্রকাশ করেন নাই, এবং তাহার কোন কারণও দেখান নাই।

—

ভারতশাসন আইনের একটি ধারার সার্থকতা

নূতন ভারতশাসন আইনের যে ধারা ও উপধারা অবলম্বন করিয়া সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত কতকটা পরিবর্ত্তন করিতে বঙ্গের হিন্দুরা ভারতসচিবকে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহা

৩০৮ ধারা এবং তাহার ৪ ও ২ উপধারা। এই ধারা ও উপধারাগুলি অনুসারে সকৌন্সিল ইংলণ্ডেশ্বরকে প্রার্থিত পরিবর্ত্তন করিতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

যখন উপধারাসমূহসমন্বিত এই ধারাটি আইনে সন্নিবিষ্ট হয়, তখন মুসলমানেরা ভয় ও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন। তাহাতে ভারতবর্ষের তৎকালীন বড়কর্ত্তারা মুসলমানদিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যদিও আইনে উক্তরূপ ব্যবস্থা রাখা হইল, তথাপি তদনুসারে কাজ করা হইবে না! শুনা যাইতেছে, ভারতবর্ষের এখনকার কর্ত্তারা না কি বঙ্গের হিন্দুদের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবার এই ওজুহাত দেখাইতে প্রস্তুত হইতেছেন, যে, তাঁহারা ঐ ধারা ও উপধারাগুলা অনুসারে কাজ না-করিতে প্রতিশ্রুত আছেন! যদি এই গুজব সত্য হয়, তাহা হইলে দুটি প্রশ্ন উঠে। প্রথম প্রশ্ন—আইনের কোন ধারা উপধারা অনুসারে কাজ না-করিবার ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা যদি ছিল, তাহা হইলে ঐ ধারা ও উপধারা আইনে নিবিষ্ট হইয়াছে কেন? উহা কি স্তোকবাক্য? উহা কি কোন লোক-সমষ্টিকে মিথ্যা প্রবোধ দিবার নিমিত্ত আইনে রাখা হইয়াছে?

ইহা সুবিদিত, যে, ভূতপূর্ব্ব ইংলণ্ডেশ্বর, ভূতপূর্ব্ব ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী, ভূতপূর্ব্ব দু-জন ভারতের বড়লাট ও অন্য অনেক উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞ ভারতবর্ষের অচিরে ডোমীনিয়নত্ব প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি ও আশা দিয়াছিলেন। ইহাও সুবিদিত, যে, নূতন ভারতশাসন আইনের খসড়া লইয়া যখন পার্লেমেণ্টে তর্কবিতর্ক চলিতেছিল, তখন এক জন পার্লেমেণ্ট-সদস্য বলেন, যে, পার্লেমেণ্ট নিজে যাহা আইনে নিবিষ্ট করেন নাই বা অন্য প্রকারে পার্লেমেণ্ট নিজে যে অঙ্গীকার না-করিয়াছেন, এরূপ কোন প্রতিশ্রুতি পার্লেমেণ্ট মানিতে বাধ্য নহেন। সদস্যটির এই উক্তির কোন প্রতিবাদ হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, পার্লেমেণ্ট স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরের ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করিতেও বাধ্য নহেন। সেই জন্য নূতন ভারতশাসন আইনে ডোমীনিয়নত্বের নামগন্ধও স্থান পায় নাই।

অতএব দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—

পার্লেমেণ্ট যখন মুসলমানদিগকে এইরূপ কোন কথা দেন নাই, যে, পূর্ব্বোক্ত ধারা ও উপধারা অনুসারে কাজ হইবে না, তখন, ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব বা ভূতপূর্ব্ব বড়লাট আইনে ব্যবস্থার বিপরীত কোন স্তোকবাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকি[লে] ইংলণ্ডেশ্বর ও বর্ত্তমান পার্লেমেণ্ট কি তদনুসারে চ[লিতে] বাধ্য?

—

হিন্দু আবেদনের বিরুদ্ধে একটা যুক্তি

বঙ্গের হিন্দুরা ভারতসচিবের নিকট যে দর[খাস্ত] করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে, যে, তাঁহারা বঙ্গের অন্[যতম] সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে তাঁহাদের সংখ্যার অনু[পাত] অনুযায়ী আসন অপেক্ষা অধিক আসন ত পানই নাই, সং[খ্যার] অনুপাত অনুযায়ী আসনও পান নাই। শুনা যাইতে[ছে] যে, সরকারী জবাব এই প্রকার হইবে, যে, বঙ্গের হি[ন্দুরা] তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট ৮০টা আসন ছাড়া বিশেষ অ[াসনের] (যেমন জমীদারদের আসন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন ইত্যা[দি]) অনেকগুলি দখল করিতে পারিবে, এবং তাহাতে তা[হারা] তাহাদের সংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী আসন পাইয়া যাই[বে।] এরূপ কথা পরীক্ষিত হওয়া আবশ্যক।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় (য়্যাসেম্বলীতে) ২৫০টি আসন আ[ছে।] জৈন প্রভৃতি সমেত হিন্দুরা বঙ্গের অধিবাসীদের শতকরা ৪[৪.৮] জন। সুতরাং সংখ্যার অনুপাতে তাহাদের ২৫০টি আ[সনের] শতকরা ৪৪.৮টি অর্থাৎ ১১২টি আসন পাওয়া উ[চিত।] তাহারা পাইয়াছে ৮০টি। আরও ৩২টি পাইলে তবে ১[১২টি] হয়। ২৫০টি আসনের মধ্যে বিশেষ আসন ৫১টি। ত[ন্মধ্যে] ইউরোপীয় (২৫), ফিরিঙ্গী (৪) ও দেশী খ্রীষ্টিয়ান ([...]দের জন্য ৩১টি রাখা হইয়াছে, বাকী থাকে ২০টি [...] আসন। এই কুড়িটি হিন্দু ও মুসলমানরা পাইবে। [যদি] হিন্দুরা ২০টিই পায় (যাহা তাহারা নিশ্চয়ই পাইবে [না]), তাহা হইলেও তাহারা তাহাদের সংখ্যার অনুপাতের অ[নুযায়ী] ১১২টি আসন অপেক্ষা ১২টি কম পাইবে। গুজব-অনু[যায়ী] সরকারী জবাবের প্রত্যুত্তর এই।

এ-বিষয়ে দ্বিতীয় মন্তব্য এই, যে, পঞ্জাব ও [...] ছাড়া অন্য সব প্রদেশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দিগকে এত [...] নির্দ্দিষ্টসংখ্যক আসন দেওয়া হইয়াছে, যাহা তাহাদের সং[খ্যার] অনুপাতে প্রাপ্য অপেক্ষা বেশী। এখানে, বঙ্গে, কিন্তু সং[খ্যা]লঘু হিন্দুদিগকে অতিরিক্ত আসন দেওয়া ত হয়ই [নাই]

অধিকন্তু তাহাদের সংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী আসন পাইবার নিমিত্তও তাহাদিগকে প্রতিযোগিতায় সিদ্ধকাম হইবার আশ্বাস দেওয়া হইতেছে।

সরকারী বা আধা-সরকারী তর্ক এইরূপও হইতে পারে, যে, ২৫০টি আসনের মধ্যে ৩১টি ইউরোপীয়, ফিরিঙ্গী ও দেশী খ্রীষ্টীয়ানদের জন্য, তাহারা (১) বাদশাহের জা'ত, (২) বাদশাহ জা'তের কুটুম্ব, এবং (৩) বাদশাহের গুরুভাই; বাদশাহের সহিত হিন্দু-মুসলমানদের ওরূপ কোন সম্পর্কের দাবী হইতে পারে না। অতএব, কেবল (২৫০—৩১) ২১৯টি আসনের শতকরা ৪৪·৮টি হিন্দুরা পাইতেছে কিনা দেখ। ভাল কথা; তাহাই দেখিতেছি।

২১৯এর শতকরা ৪৪.৮টি হয় ৯৮·১১২টি, হিন্দুরা পাইয়াছে ৮০টি। ২০টি হিন্দু-মুসলমানের প্রাপ্য বিশেষ আসনের মধ্যে ১৮·১১২ বা ১৯টি কি হিন্দুরা প্রতিযোগিতা দ্বারা পাইবে? কখনই পাইবে না। যদিই বা তাহা পাইত, তাহা হইলেও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অ-হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যার অনুপাতের অতিরিক্ত যত আসন পাইয়াছে, হিন্দুরা বঙ্গে সেরূপ কিছু পাইত না—এখন ত পায়ই নাই।

—

হিন্দুরা অবজ্ঞেয়—বিশেষতঃ বঙ্গের হিন্দুরা

নূতন ভারতশাসন আইনে সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুদের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। বঙ্গের হিন্দুদের প্রতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবিচার হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের হিন্দুদের প্রতি বিরক্তি ও ক্রোধ এবং তজ্জনিত অবিচারের কারণ, তাহারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চায় এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগ ও দুঃখবরণ (যথেষ্ট না হইলেও) তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে করিয়াছে। যখন দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ হয়, তখন প্রবলতর পক্ষ অন্য পক্ষের সহিত হয় রফা করে, কিংবা অন্য পক্ষকে শাস্তি দেয়। এই অন্য পক্ষ শক্তিশালী হইলে পরাজয় সত্ত্বেও রফার উপযুক্ত মনে হয়, যেমন দক্ষিণ-আফ্রিকার বুঅরেরা হইয়াছিল এবং তজ্জন্য আত্মকর্তৃত্ব ও ডোমীনিয়নত্ব পাইয়াছে। ভারতবর্ষের হিন্দুপ্রধান কংগ্রেস যথেষ্ট শক্তিশালী না-হওয়ায় রফার যোগ্য বিবেচিত হয় নাই, শাস্তির যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। কারণ, হিন্দুরা অবজ্ঞেয়, ও তাহারাই কংগ্রেস সভ্যদের মধ্যে সংখ্যায় বেশী।

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অবিচার ও শাস্তি বঙ্গের হিন্দুদের ভাগ্যে ঘটিবার কারণ, তাহারা কংগ্রেস নির্দ্দিষ্ট কাজ অন্যান্য প্রদেশের কংগ্রেস সভ্যদের মত (হয়ত বা তার চেয়ে বেশী) করিয়াছে, এবং তা ছাড়া বঙ্গে সন্ত্রাসনবাদী বা বিভীষিকা-পন্থীদের উপদ্রবও গবর্মেণ্টকে সহ্য করিতে হইয়াছে।

যাহারা কোন সময়ে, যথেষ্ট কারণে বা অযথেষ্ট কারণে, অবজ্ঞেয় বিবেচিত হয়, তাহারা চিরকাল, পুরুষানুক্রমে, অবজ্ঞেয় থাকে না—এবং বস্তুতঃ কোন ব্যক্তিই, কোন লোক-সমষ্টিই, কোন কালে সম্পূর্ণ অবজ্ঞেয় নহে; উপকার ও ক্ষতি করিবার ক্ষমতা সকলেরই আছে। সুতরাং যাহারা অবজ্ঞেয় বলিয়া বিবেচিত তাহারা ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ প্রতিকার চাহিলে তাহা করা বুদ্ধিমানের কাজ। তাহা না-করিলে অনভিপ্রেত ভাবে স্থায়ী ও পুরুষানুক্রমিক শত্রুতার ভিত্তি স্থাপন করা হইতে পারে।

—

ইংলণ্ডে ইহুদীদের উপর অত্যাচার

ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত ঝগড়াবিবাদ দাঙ্গা মারপিট রক্তপাত হয় বলিয়া ভারতবর্ষের লোকেরা স্বশাসনের অনুপযুক্ত বিবেচিত হইয়া থাকে। আমেরিকায় ও ইউরোপের অনেক দেশে—ব্রিটেনেও, ইহা যে হইয়া থাকে, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা আগে আগে দিতাম। অথচ এসব দেশ স্বশাসনের অনুপযুক্ত বিবেচিত হয় না। বস্তুতঃ, তর্ক করিয়া কেহ কখনও স্বশাসনের অধিকার লাভ করে নাই, কিংবা বাচনিক যথেষ্ট যুক্তির অভাবে কেহ স্বশাসন-অধিকার হইতে বঞ্চিতও হয় নাই। স্বশাসন-অধিকার রক্ষা করিবার বা হৃত অধিকার পুনর্লাভ করিবার শক্তি থাকা না-থাকার উপর জাতীয় ভাগ্য নির্ভর করে। তথাপি, যখন প্রবল পক্ষ তর্ক করে, তখন উত্তর দিতেও ইচ্ছা হয়।

২৮শে আষাঢ়ের কাগজে দেখিতেছি, সম্প্রতি ব্রিটেনে ইংরেজ ফাসিষ্টরা তথাকার ইহুদীদিগকে পুনঃ পুনঃ অপমান ও আক্রমণ করায় পার্লেমেণ্টে ব্যাপারটার আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অবশ্য, পার্লেমেণ্টের কোন সভ্য এ কথা বলেন নাই, যে, এরূপ আক্রমণ চলিতে থাকিলে ইংরেজরা স্বশাসন

অধিকারের অযোগ্য বিবেচিত হইবে। আর, ইউরোপে আজকাল এরূপ তর্ক বা আশঙ্কার উত্থাপনও দুঃসাহসের কাজ বিবেচিত হইতে পারে। কারণ, "আর্য্য" জার্ম্যানরা ইহুদীবিতাড়ন ও ইহুদীনির্যাতন দ্বারা আপনাদের স্বাধীনতা ও সভ্যতার প্রমাণ দিয়াছে।

—

আবিসীনিয়া ও জাতিসংঘ

আবিসীনিয়ার সম্রাট্ জেনিভায় জাতিসংঘের সভায় জাতিসংঘকে সুস্পষ্ট ভাষায় তাহার ভণ্ডামি, বিশ্বাসঘাতকতা ও বলহীনতার কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। জাতিসংঘ (লীগ অব নেশ্যন্স) তাহা হজম করিয়াছেন।

অধমতার লক্ষণ শক্তের ভক্ত ও নরমের যম হওয়া। জাতিসংঘ ইটালীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক (অকেজো) ব্যবস্থাগুলি (সাংশ্যন্স) প্রত্যাহার করিয়াছেন। আবিসীনিয়ার সম্রাট্ জাতিসংঘের কাছে স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধার ও তথায় শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ঋণ চাহিয়াছিলেন। সংঘ তাহা মঞ্জুর করেন নাই।

—

আবিসীনিয়ায় "ডাকাইত"

প্রবল পক্ষ কোন দেশ আক্রমণ বা জয় করিলে, যে-সব স্বদেশহিতৈষী লোক মরীয়া হইয়া শেষ পর্য্যন্ত লড়ে, "সভ্য" জগৎ তাহাদিগকে 'ডাকাইত' আখ্যা দিয়া থাকে। কোরিয়ায়, মাঞ্চুরিয়ায়, খাস চীনে, ও অন্যত্র এরূপ ঘটিয়াছে। এখন আবিসীনিয়ার যে-সব স্বদেশপ্রেমিক বীর নানা প্রকারে ইটালীয়দিগকে বিব্রত, ক্ষতিগ্রস্ত বা বধ করিতেছে রয়টার তাহাদের সম্বন্ধে সংবাদ দিতেছে তাহাদিগকে ডাকাইত (ব্যাণ্ডিট) বলিয়া উল্লেখ করিয়া।

—

আবিসীনিয়ার অংশ-বিশেষে দেশী গবন্মেণ্ট

আবিসীনিয়ার সম্রাট্ জগৎকে জানাইয়াছেন, যে, ইটালী এখনও তাঁহার দেশের সবখানি অধিকার করিতে পারে নাই, একটি অংশে হাবসী গবন্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এরূপ খবরও প্রকাশিত হইয়াছে, যে, স্বদেশভক্ত বীর হাবসীরা বর্ষার পূর্ব আবির্ভাবকালে ইটালীয়দিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবে।

—

ইউরোপে যুদ্ধের আশঙ্কা

খবরের কাগজে প্রায় প্রত্যহই ইউরোপের কোন-না-কোন দেশের সহিত অন্য কোন-না-কোন দেশের বিবাদ বিসম্বাদের ও তজ্জনিত যুদ্ধের আশঙ্কার সংবাদ প্রকাশিত হয়। ফ্রান্স, জার্ম্যানী, অষ্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড, ড্যান্জিগ, বেলজিয়ম, তুরস্ক, গ্রীস, স্পেন—এই সব ও অন্য কোন কোন অঞ্চলে গোলযোগ বাধিয়া যাইতে পারে। না বাধিলেই ভাল। গত মহাযুদ্ধে জেতা বিজিত কাহারও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়াছে মনে হয় না। জেতাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় সাম্রাজ্য ইংরেজদের। যুদ্ধের ফলে তাহাতে বহু লক্ষ বর্গমাইল স্থান সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু স্বদেশে ইংরেজদের অবস্থা এরূপ যে ২০।২২ লক্ষ বেকার থাকে, তাহাদিগকে খোরপোষ দিতে বৎসরে ৩,৮০,০০,০০০ পৌণ্ড খরচ হয়; এ বৎসর অতিরিক্ত আরও ৭,৭৫,০০০ পৌণ্ড ব্যয় হইবে।

গত মহাযুদ্ধের ফলে কাহারও আক্কেল হয় নাই মনে যায় না। ইংলণ্ডের হয়ত কিছু হইয়াছে। কারণ, ইংলণ্ড নিজের চেয়ে কম শক্তিশালী কোন কোন দেশের অপমানকর কথা ও ব্যবহার সহিয়া যাইতেছে।

—

ব্রিটেনের যুদ্ধায়োজন

তাহা সত্ত্বেও কিন্তু ইংলণ্ডে যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে। সম্প্রতি এ-বিষয়ে খুবই তাগিদ ও তৎপরতা দেখা যাইতেছে। ইহাতে ভারতবাসী আমাদের দুঃখ এই, যে, ব্রিটেন যে-কোন যাহার সহিতই যুদ্ধ করুন না কেন, ভারতবর্ষের মাথায় টাকার শ্রাদ্ধ তাহাতে হইতে পারে, যদিও ভারতের ভালমন্দের সহিত সে যুদ্ধের কোনই সম্পর্ক না-থাকিতে পারে।

—

ব্রিটেনে শান্তির ও ধর্ম্মের কথা

ব্যক্তি-বিশেষের এই অপবাদ আছে, যে, সে ধর্ম্মের কাহিনী শুনে না। ব্রিটেন এক দিকে যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত, তাহাতেই নাকি শান্তি রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা বাড়িতে হইতে পারে। ফলেন পরিচীয়তে। অন্য দিকে দেশ বিদেশ হইতে নানা জাতির লোক লণ্ডনে সমবেত হইয়াছেন,

ধর্ম্মমত সম্বন্ধে এবং চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত করিবার উপায়সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত। ইঁহাদের উপদেশ ও আলোচনা অনুসারে কাজ হইলে মঙ্গল হইতে পারে। কিন্তু বাহুবলদৃপ্ত ও লোভী জাতিরা কবে কখন উপদেশ শুনিয়াছে? নতুবা আমাদের দেশের ঈশোপনিষদের এই বহু পুরাতন উপদেশ ও তাহার অনুবাদ ত সুবিদিত—

ঈশাবাস্যমিদংসর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাংজগৎ।
তেন ত্যক্তেনভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্‌।

—

প্রাচ্যে যুদ্ধাশঙ্কা

ইউরোপে যুদ্ধের আশঙ্কার কথা উপরে বলিয়াছি। দক্ষিণ আমেরিকায় যুদ্ধ মধ্যে মধ্যে হইয়া আসিতেছে। আফ্রিকায় আবিসীনিয়া ও ইটালীর মধ্যে দস্তুরমত যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলেও এক প্রকার খণ্ডযুদ্ধ (যাহাকে ডাকাতদের কাজ বলা হইতেছে) এখনও মধ্যে মধ্যে হইতেছে। বড় রকমের যুদ্ধ যদি আফ্রিকায় হয়, তাহা হইলে তাহা তথাকার বহু দেশের মালিক ইউরোপীয় কোন কোন জাতির মধ্যেই হইবে। যাহারা আগে আফ্রিকার অংশ-বিশেষের মালিক ছিল, সেই জার্ম্যানরা আবার তাহা ফিরিয়া চাহিতেছে। ইটালীয়রা যাহা পাইয়াছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। অতএব, আর কাহারও জন্য না-হউক, ইহাদের জন্যই যুদ্ধ বাধিতে পারে। ইংরেজ ও ফ্রেঞ্চরা আপনাদের অধিকৃত অল্প জায়গাও সহজে ছাড়িয়া দিবে না।

প্রাচ্য মহাদেশ এশিয়ার পূর্ব্ব-পশ্চিম উভয় প্রান্তে যুদ্ধ হইতে পারে। 'হইতে পারে' কেন, প্যালেষ্টাইনে ইংরেজদের সঙ্গে আরবদের ত এক রকম যুদ্ধ চলিতেছেই। তথায় শান্তির লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না। ইংরেজ ও আরবদের মধ্যে সংঘর্ষের উপলক্ষ্য ইহুদী আগন্তুকদের তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রাচীন জন্মভূমিতে পুনরাগমন করিয়া বসবাস। তাহারা প্যালেষ্টাইনে কি করিতেছে, তাহা অন্যত্র লিখিত হইয়াছে। প্যালেষ্টাইনে ইটালীয়রা আরবদিগকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে উস্কাইতেছে মনে করিবারও কারণ আছে।

বড় রকম যুদ্ধ জাপানে ও চীনে এবং জাপানে ও রাশিয়ায় হইতে পারে। জাপানে ও চীনে যুদ্ধ ত এক রকম লাগিয়াই আছে বলিলেও চলে। জাপান ক্রমে ক্রমে চীনের একটি একটি অংশ গ্রাস করিতেছে। মাঞ্চুরিয়ায় যে চা'ল চালিয়া জাপান তাহাকে চীন সাধারণতন্ত্র হইতে পৃথক করিয়া কার্য্যতঃ জাপান সাম্রাজ্যের একটি অংশে পরিণত করিয়াছে, সেই চা'ল চীনের উত্তরাংশের কয়েকটি প্রদেশে চালিয়া আসিতেছে—বলিতেছে সেগুলিকে অটোনমাস্ অর্থাৎ স্বপ্রভু করিয়া দিবে। আসল উদ্দেশ্য, চীনের

এর পর?

অঙ্গচ্ছেদ দ্বারা তাহাকে আরও দুর্ব্বল করা এবং ছিন্ন অংশগুলিকে কার্য্যতঃ জাপান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত করা।

জাপান যেমন মাঞ্চুরিয়া লইয়াছে, সেইরূপ মোঙ্গোলিয়াও লইতে চায়। মোঙ্গোলিয়া দুই অংশে বিভক্ত—অন্তর্মোঙ্গোলিয়া ও বহির্মোঙ্গোলিয়া। জাপান প্রথমে অন্তর্মোঙ্গোলিয়া লইবে, পরে লইবে বহির্মোঙ্গোলিয়া, শাংঘাই হইতে প্রকাশিত 'ভয়েস্ অব চায়না' নামক চৈনিক সংবাদপত্রের একটি ব্যঙ্গচিত্রে এইরূপ ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বহির্মোঙ্গোলিয়া যেখানে শেষ রাশিয়ার বিশাল সাধারণতন্ত্র সেইখানেই আরম্ভ। সুতরাং মঙ্গোলিয়া লইয়া জাপানে রাশিয়ায় যুদ্ধ হইতে পারে।

এশিয়ার পূর্ব্বদিকের প্রশান্ত মহাসাগরের তটবর্ত্তী দেশ-সমূহ, প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থিত দ্বীপ-সাম্রাজ্য জাপান এবং দ্বীপ-সাধারণতন্ত্র (আপাততঃ আমেরিকার অভিভাবকত্বের অধীন) ফিলিপাইন্স আমেরিকার উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। সম্ভবতঃ সেই কারণে আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরে নিজের

রণতরীর ঘাঁটি ও আড্ডা এবং বিমান-ঘাঁটি ও বিমানের আড্ডা যথেষ্ট যাহাতে হয় সেই চেষ্টা করিতেছে। অনুমান হয়, সেই কারণে আমেরিকা প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত তিনটি ছোট দ্বীপে ৪ জন করিয়া নিজেদের ছাত্র নামাইয়াছে। তাহারা সেখানে আমেরিকার নিশান গাড়িয়াছে। সেগুলি প্রকৃতপ্রস্তাবে বা নামতঃ ব্রিটেনের। এই জন্য ব্রিটেনে ও আমেরিকায় এ-বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে।

—

লিনলিথগোর ষাঁড় ও ধর্ম্মের ষাঁড়

আধুনিক সভ্যতা আইনের দ্বারা কিংবা রাষ্ট্রীয় অন্য উপায়ে ও প্রভাব দ্বারা যাহা করে, হিন্দু ভারত তাহা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে করিয়া আসিতেছে। যেমন আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে রাষ্ট্র অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে, হিন্দু ভারত অধ্যাপকদিগকে দক্ষিণা ও "বিদায়" আদি দিয়া বিনা বেতনে ছাত্রদের ভরণপোষণে ও অধ্যাপনায় সমর্থ করিয়াছিল; পাশ্চাত্য নানা দেশে বেকারদিগকে রাষ্ট্র হইতে নির্দ্দিষ্ট ভাতা দেওয়া হয়, হিন্দু ভারত কতকটা একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা দ্বারা কতকটা অন্নসত্রাদি উপায়ে সেই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছে; পাশ্চাত্য মতে গোবংশ ও কৃষির উন্নতির নিমিত্ত ভাল জা'তের ষাঁড় স্থানে স্থানে রাখা আবশ্যক, হিন্দু ভারতে বৃষোৎসর্গের দ্বারা ধর্ম্মের ষাঁড় রক্ষার প্রথায় সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়; ইত্যাদি। হিন্দু প্রথা সবই নিখুঁত কিনা, কিংবা আগে ভাল থাকিলেও এখনও নিখুঁত আছে কিনা, তাহার আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের যাহা-কিছু ছিল ও এখনও আছে, সেকেলে বলিয়া বিনা বিচারে তাহার সবগুলি বা সবটাই বর্জ্জন করা উচিত নহে, ইহা বলিলে হয়ত অন্যায় বলা হইবে না।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান গবর্ণর-জেনারেল লর্ড লিনলিথগো গোবংশ ও কৃষির উন্নতির জন্য জমীদারদিগকে ও অন্য সঙ্গতিপন্ন লোকদিগকে ভাল জা'তের ষাঁড় রাখিতে ও পালন করিতে বলিতেছেন এবং নিজেও রাখিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসৃত হইলে তাহা হিতকর হইবে। এখানে ইহা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, যে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রামসমূহের উন্নতির একটি উপায় স্বরূপ শ্রীনিকেতন হইতে কয়েকটি কেন্দ্রে উৎকৃষ্ট বৃষ কয়েক বৎসর হইতে বিতরণ করিয়া আসিতেছেন, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ অগ্রজ ঋষিকল্প ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে একটি উৎকৃষ্ট বৃষ উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

এক দিকে লর্ড লিনলিথগো উৎকৃষ্ট বৃষের সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, অন্য দিকে ময়মনসিংহে এক (অ-হিন্দু) হাকিম হুকুম দিয়াছেন, যে, ধর্ম্মের ষাঁড়ের মালিকরা তাহাদের ভার না লইলে তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারা হইবে। ধর্ম্মের ষাঁড়ের মালিক কেহ নাই, যাঁহারা শ্রাদ্ধে বৃষ উৎসর্গ করেন, তাঁহাদের অধিকার সেইখানেই শেষ হয়। ধর্ম্মার্থে উৎসর্গীকৃত জীব বধ করিলে হিন্দুধর্ম্মে আঘাত করা হইবে, এবং অধিকন্তু গোবংশের আরও অবনতি হইবে, গবর্মেণ্টের ইহা বিবেচনা করিয়া এই হাকিমের হুকুম নাকচ করা কর্ত্তব্য।

—

"তাদের কি বাসী পোলাও-ও জুটে না?"

লর্ড লিনলিথগো উৎকৃষ্ট বৃষ রক্ষা ব্যতীত গ্রাম্য লোকেরা কত দুধ খায়, তাহার খোঁজ লওয়াইতেছেন, ইস্কুলের অপুষ্ট ছেলেমেয়েদিগকে দুধ ভিক্ষা দেওয়াইতেছেন। বৃষ রক্ষার মত এগুলিও ভাল কাজ। কিন্তু দেশের সাধারণ দারিদ্র্য দূরীভূত না হইলে শুধু এইগুলির দ্বারা যথেষ্ট ফললাভ হইবে না।

ভাল বৃষ থাকিতে পারে। কিন্তু যখন কোন গাভী আর দুধ দেয় না, আবার বাছুর হইলে তবে সে দুধ দিবে, তখন যত দিন তাহার বাছুর না-হয় তত দিন তাহাকে পালন করিবার শক্তি গোয়ালার বা গৃহস্থের না থাকিলে ভাল বাছুর কি প্রকারে হইবে? গাভী কসাইকে বিক্রী করা হইবে। তদ্ভিন্ন, যথেষ্ট গোচারণের মাঠ চাই, গবাদির খাদ্য খড় ঘাস প্রভৃতি যথেষ্ট উৎপন্ন হওয়া চাই, এবং তৈলবীজ দেশেই পেষণ করিয়া খইল অল্পমূল্যে দেশে যথেষ্ট প্রাপ্তব্য হওয়া চাই। তবে গোবংশের ও কৃষির উন্নতি হইবে, দুধের যোগানও বাড়িবে।

বাংলা দেশের বহু জেলায় এখন যেরূপ দুর্ভিক্ষ চলিতেছে, তাহাতে তথাকার গ্রাম্য লোকদিগকে তাহারা কত দুধ খায় প্রশ্ন করিলে তাহারা অবাক্ হইয়া হাঁ করিয়া থাকিবে। একমুঠা ভাত মুড়ি যাহারা পায় না, তাহারা

দুধ কোথায় পাইবে? যখন দুর্ভিক্ষ থাকে না, তখনই বা গরীব লোকেরা দুধ কতটুকু পাইতে পারে?

লর্ড লিনলিথগোর উদ্দেশ্যের বিচার করা আমাদের অভিপ্রেত নহে, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা স্বশাসন হইতে বঞ্চিত লোকদিগকে তাহার সমতুল্য কিছু দানের মত যে নহে, তাহাও আমরা বিস্তারিত ভাবে বলিতে চাই না। কিন্তু দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে দুধের দুষ্প্রাপ্যতা ও সুপ্রাপ্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ফ্রান্সের এক রাজকুমারীর ও ব্রিটিশ আমলের পূর্ব্বেকার অযোধ্যার এক নবাবজাদীর যে গল্প মনে পড়াইয়া দিয়াছে তাহা বলিতে হইতেছে।

ফ্রান্স চিরকালই সাধারণতন্ত্র ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে সেদেশে সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়। তাহার আগে রাজার দ্বারা দেশ শাসিত হইত। সেকালে দুর্ভিক্ষ হইত না, এমন দেশ ছিল না; ফ্রান্সেও দুর্ভিক্ষ হইত (এখন হয় না)। এইরূপ এক দুর্ভিক্ষের সময় এক দয়াময়ী রাজকুমারী শুনিলেন, রাজধানীর রাজপথ ভিক্ষুকে পূর্ণ হইতেছে, তাহারা রুটি পাইতেছে না। তিনি বিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "why don't they eat cakes?" "তারা রুটি পায় না ত কেক্ খায় না কেন"? কেক সুখাদ্য সুমিষ্ট পিষ্টক।

কথিত আছে, যে, এইরূপ অযোধ্যাতেও একবার দুর্ভিক্ষ হওয়ায় রাজধানী লক্ষ্ণৌ ভিক্ষুকসমাকীর্ণ হয়। তাহাতে এক মমতাময়ী নবাবজাদী দুঃখের সহিত সুধাইয়াছিলেন, "ওদের কি এক এক মুঠা বাসী ঠাণ্ডা পোলাও-ও জুটে না?"

—

হাবড়ার নূতন পুল

তিন কোটির উপর টাকা ব্যয়ে হাবড়ার যে নূতন পুল নির্ম্মিত হইবার প্রস্তাব কয়েক বৎসর হইতে বিবেচিত হইতেছিল এত দিনে তাহার ঠিকা বিলাতের এক ইংরেজ কোম্পানীকে দেওয়া হইয়াছে। ইহা অপ্রত্যাশিত ঘটনা নহে। এই কোম্পানীর টেণ্ডার সর্ব্বনিম্ন ছিল না। ইঁহারা দয়া করিয়া বলিয়াছেন, দর ও অন্যান্য সর্ত্ত যুক্তিসঙ্গত ("reasonable") হইলে তাঁহারা ইস্পাত ভারতবর্ষ হইতেই লইবেন। টাটা কোম্পানীর অদৃষ্টে কি জুটে, দেখা যাক্।

এ-বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে প্রবাসীতে অনেক কথা লেখা হইয়াছে। তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

—

বৃত্তি প্রদানের নূতন ব্যবস্থা স্থগিত

বাংলা-গবর্মেণ্টের শিক্ষা-বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল অনুযায়ী গুণ অনুসারে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা রহিত করিতে যাইতেছিলেন। এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংবাদপত্র-সমূহে তীব্র সমালোচনা হইতেছিল। তাহাতে সম্প্রতি বাংলা-গবর্মেণ্টের শিক্ষা-বিভাগ এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, বৃত্তিপ্রদানের নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব সম্পর্কে সমালোচনার প্রতি শিক্ষা-বিভাগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। নূতন নিয়মের রেগুলেশ্যন এই যে, যে-সকল ছাত্রছাত্রী বৃত্তি পাইবার যোগ্য স্থান অধিকার করিবে, তাহাদিগকে বৃত্তিযোগ্য (scholar) বলিয়া অভিহিত করা হইবে। বৃত্তির টাকার দরকার থাকিলে তাহাদিগকে দেওয়া হইবে। তবে যাহাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল, তাহারা তাহা না পাইয়া তাহাদের পরবর্ত্তী স্থানের অধিকারী দরিদ্র ছাত্রছাত্রী তাহা পাইবে। ১৯৩২ সালে বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগ এই নিয়ম করেন। এই বৎসর হইতেই এই নিয়ম কার্য্যকর করা অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু কতকগুলি অসুবিধা উপলব্ধি করা গিয়াছে। তজ্জন্য এই বিষয় আরও বিবেচনা করা প্রয়োজন। এমত অবস্থায় গবর্মেণ্ট এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৎসরে এবং যে-পর্য্যন্ত না এই বিষয় আরও পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়, সে-পর্য্যন্ত পুরাতন ব্যবস্থাই বলবৎ থাকিবে।

বৃত্তি সম্বন্ধে বরাবর যে নিয়মটি প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে, তাহার উৎকর্ষ এই, যে, তদনুসারে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ বুদ্ধি ও পরিশ্রম দ্বারা বৃত্তি পায়। তাহাতে গুণের পুরস্কার হয়, এবং বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর নিজের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস ও আত্মসম্মান বর্দ্ধিত হয়। পরিবর্ত্তিত নিয়মের দোষ এই, যে, কোন ছাত্রছাত্রী গুণ অনুসারে বৃত্তির যোগ্য হইলেও তাহার টাকাটা পাইতে হইলে তাহাকে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিজের দারিদ্র্য প্রমাণ করিতে হইবে। ইহা হীনতাজনক, এবং দারিদ্র্যে বা সচ্ছলতার কোন নির্দ্দিষ্ট মান না থাকায়—উভয়ই আপেক্ষিক হওয়ায়—নূতন নিয়মে সুপারিশ ও পক্ষপাতিত্বের খুব অবসর থাকিবে।

নূতন নিয়মটা সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট যে, জ্ঞাপকপত্র

(communiqué) প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বহু প্রশ্নের উদ্ভব হয়; যথা—

বৃত্তির টাকা গুণানুসারে বৃত্তিযোগ্য ছাত্রের আবশ্যক কিনা, তাহা কে স্থির করিবে? ছাত্র, তাহার অভিভাবক, তাহার শিক্ষক, বা শিক্ষা-বিভাগ, বা তাহার ডিরেক্টর? জ্ঞাপকপত্রে বলা হইয়াছে, কাহারও বৃত্তির টাকাটা আবশ্যক না হইলে সে উহা ত্যাগ করিতে পারে ("may give up")। তাহা যদি পারে, ত, সে ত্যাগটা স্বেচ্ছাকৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষা-বিভাগের তাহাতে হাত দেওয়া, অর্থাৎ প্রকারান্তরে হুকুম করা, জুলুমের নামান্তর হইবে। স্বেচ্ছায় ত্যাগের মূল্য আছে। যেমন বিহারে মন্ত্রী সর্ গণেশদত্ত সিং নিজে বেতনের বাৎসরিক ১২০০০ টাকা লইয়া বাকী ৫২০০০ টাকা দেশহিতার্থ দান করেন। ইহাতে তিনি প্রশংসাভাজন ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গের মন্ত্রী মাননীয় আজিজুল হক্ মহাশয়কে যদি গবর্ণর বলেন, "মন্ত্রী হইবার পূর্ব্বে আপনার যে আয় ছিল তাহাতেই আপনার চলা উচিত; অতএব আপনি সর্ গণেশদত্ত সিংয়ের মত দাতা হউন।" তাহাতে যদি বঙ্গমন্ত্রী মহাশয়কে প্রভূত অর্থ ত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা ত্যাগনামধেয় না হইয়া আর কিছু হইবে।

ম্যাট্রিক ও ইণ্টারমীডিয়েটের উচ্চতম বৃত্তি দু-বৎসরে ৬০০৲ টাকা। সচ্ছল অবস্থার কেহ বৃত্তি পাইলে যদি সেও এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা, হরিচরণ পণ্ডিত মহাশয়ের অভিধান এবং বঙ্গীয় মহাকোষ কিনিতে চায়, তাহাও ত এই টাকায় কুলাইবে না। অথচ এগুলি থাকিলে কলেজের সব ছাত্রেরই সুবিধা হয়। বৃত্তির টাকাটার দরকার নাই এমন ছাত্র ক'জন আছে?

বৃত্তিযোগ্য ছাত্রকে বঞ্চিত করা হউক, বা সে বৃত্তির টাকা স্বেচ্ছাতেই ত্যাগ করুক, তাহার পরবর্ত্তী কাহাকে টাকাটা দেওয়া হইবে, তাহা কি প্রকারে নির্দ্ধারিত হইবে? পরবর্ত্তী যে দরিদ্রতম ও গুণবত্তম তাহাকেই দেওয়া উচিত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের প্রাপ্ত মার্ক সরকারী গেজেটে বা বেসরকারী কোন খবরের কাগজে প্রকাশ করেন না। সুতরাং গুণানুসারে সর্ব্বোৎকৃষ্টকে দেওয়া হইয়াছে, এ বিশ্বাস সর্ব্বসাধারণের জন্মিবে কি প্রকারে? পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের আয় এবং পারিবারিক ব্যয়ের বজেট (family budgets) কখনও নির্দ্ধারিত ও প্রকাশিত হয় না। সুতরাং পারিবারিক আয় ও ব্যয় বিবেচনা করিয়া দরিদ্রতমকে বৃত্তির টাকা দেওয়া হইয়াছে, এ বিশ্বাসই বা জন্মিবে কেমন করিয়া? কোন দরিদ্র ছাত্র যত মার্ক পাইয়াছে, তার চেয়ে দরিদ্রতর ছাত্র মার্ক কিছু কম পাইয়া থাকিলে, কাহাকে বৃত্তির টাকা দেওয়া হইবে?

সরকারী জ্ঞাপকপত্রে বলা হইয়াছে, কোন কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগের বাঞ্ছিত প্রথা আছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নাম করা হয় নাই। ভারতবর্ষের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে কি? মনে রাখিতে হইবে, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী শিক্ষা-বিভাগ, এক জিনিষ নয়। বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার গঠন, মন্ত্রীমণ্ডল গঠন, শিক্ষা-বিভাগ গঠন, শিক্ষা-বিভাগের চাকরি বণ্টন শিক্ষা-বিভাগ কর্ত্তৃক প্রদত্ত নানাবিধ সাহায্য বণ্টন—সবের মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব ও লীলাখেলা এত বেশী, যে, কেবলমাত্র গুণানুসারে প্রদত্ত বৃত্তি কয়েকটিতে হস্তক্ষেপ করা সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়। সাধারণতঃ খুব ধনী বা খুব সচ্ছল অবস্থার ছেলেমেয়েরাই অধিকাংশ স্থলে বৃত্তি পায়, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। সুতরাং দরিদ্রের সাহায্যের জন্য চিরাগত প্রথায় হস্তক্ষেপের কারণ নাই। অধিকাংশ স্থলে হিন্দু ছাত্রেরাই বৃত্তি পায়। সুতরাং মুসলমান-শাসিত শিক্ষা-বিভাগ দ্বারা এরূপ হস্তক্ষেপ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজাত বলিয়া সন্দেহ জন্মিতে পারে। এই কারণেও তাহা অবাঞ্ছনীয়।

সরকারী জ্ঞাপকপত্রে বলা হইয়াছে, যে, বঙ্গীয় শিক্ষামন্ত্রী ১৯৩২ সালে পরিবর্ত্তিত প্রথার অনুমোদন করেন, এবং বর্ত্তমান বৎসর হইতে উহা প্রচলিত করিবার অভিপ্রায় ছিল। এই অভিপ্রায়টা আগেকার মন্ত্রীর, না বর্ত্তমান মন্ত্রীর? যদি আগেকার মন্ত্রীর হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান মন্ত্রীকে না জানাইয়া ও তাঁহার অনুমোদন না-লইয়া তাঁহার অধীনস্থ ডিরেক্টরের নূতন নিয়ম জারি করিবার অধিকার ছিল কি?

—

শিক্ষামন্ত্রীর মত পরিবর্ত্তন

বাংলা দেশের বিদ্যালয়সকলের—বিশেষ করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়সকলের—শিক্ষাদান প্রণালী, পরিচালনা প্রণালী,

সংখ্যাহ্রাস প্রভৃতি নানাবিষয়ক একটি দীর্ঘ মন্তব্য বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রী প্রচার করেন। সর্ব্বসাধারণের ও সংবাদপত্র-সমূহের সমালোচনার ফলে তিনি একাধিক বার ঐ মন্তব্য পরিবর্ত্তিত করেন। কার্য্যতঃ পরিবর্ত্তিত হইবে কিনা, তাহা বলা যায় না।

বৃত্তি সম্বন্ধে পরিবর্ত্তিত প্রথার প্রচলনও সমালোচনার প্রভাবে স্থগিত করা হইয়াছে।

মেদিনীপুর কলেজটি উঠাইয়া দিবার হুকুমও শিক্ষা-বিভাগ প্রথমতঃ দেন। পরে এই হুকুমও পারবর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানে ইণ্টামীডিয়েট ক্লাসের একটি বিভাগ উঠাইয়া দিবার হুকুম শিক্ষা-বিভাগ দেন। তাহাতে প্রায় ১০০ ছাত্রের প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞান শিখিবার সুযোগ লুপ্ত হইত। ঐ হুকুমও রদ হইয়াছে।

শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় যে শিক্ষিত লোকমত অগ্রাহ্য করেন না, ইহা প্রশংসার বিষয়। কিন্তু বার-বার মত পরিবর্ত্তন করিলে লোকে মতিস্থৈর্য্যের অভাব অনুমান করিতে পারে—যদিও এই অনুমান সত্য না হইতে পারে। এই জন্য মন্ত্রী মহাশয় নূতন কিছু করিবার পূর্ব্বে সরকারী কর্ম্মচারী ছাড়া তাঁহার বিশ্বাসভাজন স্বাধীনচেতা শিক্ষাভিজ্ঞ কোন কোন বেসরকারী লোকের সহিতও পরামর্শ যদি করেন, তাহা হইলে ভাল হয়। ইহাতে তাঁহার মানের ও পদগৌরবের লাঘব হইবে না, বরং প্রভাব ও কার্য্যকারিতা বাড়িবে।

—

কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভা অধিকার প্রয়াসী

সরদার বল্লভভাই পটেল এবং অন্য কোন কোন কংগ্রেস-নেতা জানাইয়াছেন, কংগ্রেস ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার দুই কক্ষের এবং সমুদয় প্রদেশের. এককাক্ষিক বা দ্বিকাক্ষিক, ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সমুদয় আসনে কংগ্রেস-সভ্যদিগকে বসাইতে চেষ্টা করিবেন। সমুদয় আসনের জন্যই তাঁহারা প্রতিনিধি-পদপ্রার্থী খাড়া করিয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত করাইবার চেষ্টা করিবেন।

ইহা আমরা দেশের পক্ষে ভাল মনে করি। কংগ্রেসের সমুদয় মত ও কার্য্যপ্রণালীর অনুমোদন ও অনুসরণ আমরা করিতে পারি নাই। কিন্তু স্বার্থত্যাগ করিয়া এবং দুঃখবরণ করিয়াও দেশে স্বরাজস্থাপনপ্রয়াসী যত লোক কংগ্রেস-সদস্যদের মধ্যে আছেন, অন্য কোন রাজনৈতিক দলের মধ্যে তত নাই। অন্য একটি বিষয়েও নবপর্য্যায়ের কংগ্রেসওয়ালাদের শ্রেষ্ঠতা আছে। তাঁহারা সাধারণতঃ আন্দোলক সাজিয়া গবন্মেণ্টের অনুগ্রহের বিনিময়ে আন্দোলন ত্যাগের পেশা অবলম্বন করেন না। তবে, এবার একটা ধুয়া উঠিয়াছে বটে, যে, কংগ্রেসওয়ালাদের মন্ত্রিত্বগ্রহণ দ্বারা গবন্মেণ্টকে অচল করিবার চেষ্টা করা উচিত। যাঁহারা এরূপ কথা বলিতেছেন, তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে এই ধুয়াটা চাপা দেওয়া ৬৪০০০এর মোহ আছে কি না, বলা যায় না। থাক বা না-থাক, কংগ্রেসওয়ালাদের মন্ত্রিত্বগ্রহণের পক্ষপাতী আমরা নই

—

কংগ্রেসের ইতিহাস

অন্ধ্রদেশের কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত পট্টাভি সীতারামায়্যা ইংরেজীতে কংগ্রেসের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহা যে যথাসম্ভব পক্ষপাতশূন্য নহে তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু সে বিষয়ে কিছু লিখি নাই। এ-বিষয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, যে, বহিখানির লেখক শ্রীযুক্ত পট্টাভি সীতারামায়া ও সংশোধক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাংলা দেশের সাবেক আমলের ও নূতন আমলের কংগ্রেস-নেতাদের প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই। বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সমালোচনা বিবেচনা করিয়া যদি পুস্তকটি সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে উহার উৎকর্ষ সাধিত হইবে, এবং উহা ভারতীয় মহাজাতির ঐক্যবিধায়ক হইবে।

—

বাঙালীর কাপড়ের কারখানা

বাঙালাদের কাপড়ের কারখানা ধীরে ধীরে বাড়িতেছে। যে-সকল কাপড়ের কলের এখনও কাজ আরম্ভ হয় নাই, তাঁহারা আশা করি একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগী আছেন—যে-সকল মিল চলিতেছে তাঁহাদেরও এদিকে দৃষ্টি আছে আশা করি। মিলগুলিতে কেবল হিসাবরক্ষক কেরানী প্রভৃতির কাজে বাঙালী নিযুক্ত করা যথেষ্ট নহে; সুতাগুটান, তাঁত চালান প্রভৃতি কাজেও বাঙালী শ্রমিক নিযুক্ত করা আবশ্যক।

আমরা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে পলতায় মহালক্ষ্মী কটন মিল্‌স্ দেখিয়াছিলাম। তখন তাহাতে ২৬টি তাঁত চলিত। গত মাসে গিয়া দেখিলাম, ১০২টি চলিতেছে এবং আরও ১০০টি বসাইবার জায়গা করা হইয়াছে। বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদক গৃহে যে আয়োজন আছে, অবগত হইলাম, তাহাতে ৩০০টি তাঁত পর্য্যন্ত চালান যাইবে। শুনিলাম এই কারখানায় মোটামুটি ৫০০ কর্ম্মীর মধ্যে প্রায় ৪৫০ জন বাঙালী। দেখিলাম, "ভদ্রলোক"শ্রেণীর বাঙালী যুবকেরাও তাঁত চালান প্রভৃতি কাজ করিতেছেন। দেখিয়া ধারণা জন্মিল, কাপড়ের মিল চালাইবার জন্য বাংলা দেশে শিক্ষণপঠনক্ষম শ্রমিকও পাওয়া যাইবে। মহালক্ষ্মী মিলসের কর্ত্তৃপক্ষ শ্রমিকদের থাকিবার জন্য দুতলা পাকা বাড়ী তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। এখানে প্রধানতঃ ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত হয়।

—

টিনে রক্ষিত ফল চালানের ব্যবসা

অনেক বৎসর পূর্ব্বে বিহারে ও বাংলা দেশে আম লিচু আনারস প্রভৃতি ফল টিনের মধ্যে রক্ষিত করিয়া দেশে ও বিদেশে বিক্রী করিবার ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনা ও আন্দোলন হয়। প্রবাসীতে এ-বিষয়ে সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। কারখানাও দু-একটি স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে কলিকাতার বেঙ্গল ক্যানিং এণ্ড্ কণ্ডিমেণ্ট ওয়ার্কস একটি। এখানে আম, লিচু ও আনারস রক্ষিত করিয়া টিনে পুরিয়া চালান দেওয়া হয়। দেশেও বিক্রী হয়। এই কারখানায় তরকারীও রক্ষিত করিয়া টিনে পুরিয়া চালান দেওয়া হয়—যেমন পটল। তদ্ভিন্ন এখানে চাটনি, জ্যাম প্রভৃতি প্রস্তুত হয় এবং রন্ধনের জন্য নানাবিধ মশলা গুঁড়া করিয়া চালান দেওয়া হয়। মহালক্ষ্মী মিলসের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত কয়েক মাস হইল এই কারখানাটির ভার লইয়াছেন। ইহার ক্রমোন্নতি হইলে সুখের বিষয় হইবে।

—

ছাত্রদের স্বাস্থ্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এ-পর্য্যন্ত কয়েকটি কলেজের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষিত হইয়াছে। তাহার পর সরকারী শিক্ষা-বিভাগ কলিকাতার কতকগুলি স্কুলের ছাত্রদের স্বাস্থ্যেরও পরীক্ষা করাইয়াছেন। উভয় পরীক্ষার ফলেই বিস্তর ছাত্রের স্বাস্থ্য ভাল নয় দেখা গিয়াছে। সমুদয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদেরই মধ্যে মধ্যে নিয়মিতরূপে স্বাস্থ্য পরীক্ষিত হওয়া আবশ্যক। যাহাদের স্বাস্থ্যে যে খুঁত পাওয়া যাইবে, তাহার প্রতীকার স্বাস্থ্যপরীক্ষক এবং অভিভাবকদের সহযোগিতায় হওয়া উচিত। কলেজ ও বিদ্যালয়সকলের কর্ত্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা-বিভাগও কেবল স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিলেই চলিবে না। ছাত্র-ছাত্রীদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ ভাবেও কিছু করিতে হইবে; যেমন মধ্যাহ্নে ছুটির সময় ছাত্রছাত্রীদের কিঞ্চিৎ পুষ্টিকর জলযোগের ব্যবস্থা।

—

দুর্ভিক্ষে বাঁকুড়াসম্মিলনীর সাহায্যকার্য্য

বাঁকুড়াসম্মিলনীর প্রত্যক্ষদর্শী কর্ম্মীরা আমাদিগকে লিখিয়াছেন—

বাঁকুড়ায় জেলাব্যাপী দুর্ভিক্ষ আজ ৬ মাস প্রবলভাবে চলিতেছে।

দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসমূহের যথাসম্ভব কষ্টনিবারণকল্পে বাঁকুড়া-সম্মিলনী সহৃদয় ব্যক্তিগণের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া সাহায্যকার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং পুরন্দরপুর ইঃ, কানেমার ইঃ, জামজুড়ি ইঃ তিলুড়ি ইঃ, ও বড়শাল ইঃ—এই পাঁচটি ইউনিয়নে ৫টি সাহায্যকেন্দ্র খুলিয়া প্রায় ষাটটি-গ্রামের দুঃস্থ অক্ষম ব্যক্তিগণকে চাউল ও বস্ত্র বিতরণ করিতেছেন। বাঁকুড়াসম্মিলনী নিজ মেডিক্যাল স্কুল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া বহু শ্রমিককে কার্য্য করিবার সুযোগ দিয়াছেন। উপরিউক্ত সাহায্যকেন্দ্র-গুলি গত ১৮ই জুলাই পরিদর্শন কালে সম্মিলনীর কোষাধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, সহকারী সম্পাদক শ্রীবৃন্দাবন্দ্র রায় ও সদস্য শ্রীহরিপদ নন্দী চাউল ও বস্ত্র ছাড়া গৃহস্থদিগের জন্য বাঁশ দড়ি খড় ইত্যাদি সামগ্রীর অভাব বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই বর্ষার সময়ে উক্ত প্রকারে সাহায্য না দিতে পারিলে অন্নহীন ও বস্ত্রহীন দুঃস্থ ব্যক্তিগণ গৃহহীন হইয়া একেবারে কষ্টের চরম সীমায় উপনীত হইবে। সম্মিলনী সানুনয় প্রার্থনা করিতেছেন, যে, যাঁহার যেরূপ সাহায্য করিবার ইচ্ছা, তাহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসী অফিস ১২০।২ অপার সাকুলার রোড; শ্রীঋষীন্দ্রনাথ সরকার, ২০-বি শাঁখারিটোলা ষ্ট্রীট; শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, ৩ নং ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা।

—

রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ-সভা

৩০শে আষাঢ়ের দৈনিক কাগজে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে,

"সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে গঠিত নূতন শাসনতন্ত্রের

আমলে আইনসভায় হিন্দু প্রতিনিধিবর্গ সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে পরিণত হইবে, বর্তমানে হিন্দুদের যে ক্ষমতা আছে তাহা ক্ষুণ্ণ হইবে, এবং দীর্ঘকালের সেবা, আত্মত্যাগ ও দেশহিতৈষণাদ্বারা তাহারা শাসনকার্য্য পরিচালনায় যে ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়াছিল তাহা হারাইবে—একথা আজ সমস্ত হিন্দুই উপলব্ধি করিতেছেন। এই অন্যায়, অবিচার ও জাতীয় অপমানের প্রতিবাদ কল্পে বুধবার ১৫ই জুলাই ৩১শে আষাঢ় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় কলিকাতা টাউনহলে হিন্দুগণের এক বিরাট সভা হইবে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। হিন্দু সাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

যাঁহারা এই সভা আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কংগ্রেসের সভ্য, উদারনৈতিক দলের সভ্য, হিন্দু মহাসভার সভ্য প্রভৃতি এবং কোন দলেরই সভ্য নহেন এরূপ লোকও আছেন। স্বয়ং সভাপতি কোন দলের লোক নহেন।

যে বিষয়টির আলোচনা সভায় হইবে, মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসীতে তাহার বিস্তারিত আলোচনা আমরা কয়েক বৎসর হইতে করিয়া আসিতেছি। প্রবাসীর বর্তমান সংখ্যাতেও করিয়াছি। সভার অধিবেশন যেদিনে হইবে, তাহাতে তাহার কার্য্যের বিবরণ বর্তমান সংখ্যায় দেওয়া সম্ভবপর নহে। কেবল এই মন্তব্যটুকু করা যাইতে পারে, যে, বঙ্গের হিন্দুদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বিষয়ের আলোচনার জন্য আহূত এরূপ সভা কলিকাতা টাউন হলে কচিৎ হয়।

—

জার্ম্যান পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি

ম্যুনিকের একটি জার্ম্যান পরিষদের ভারতীয় প্রতিষ্ঠান জার্মেনীতে উচ্চতম শিক্ষার নিমিত্ত প্রতি বৎসর ভারতীয় বিদ্যার্থীদিগকে কয়েকটি বৃত্তি দিয়া থাকেন ; এ বৎসর ১৭টি দিয়াছেন। তাহার মধ্যে ৮টি বাঙালী বিদ্যার্থীরা পাইয়াছেন ; তন্মধ্যে ২ জন মহিলা। —

লেডী টাটার স্মারক বৃত্তি

লেডী টাটার স্মৃতিরক্ষাকল্পে কোন কোন দুরারোগ্য রোগ সম্বন্ধীয় গবেষণার নিমিত্ত প্রতি বৎসর বিদেশী গবেষক ও ভারতীয় গবেষকদিগকে কয়েকটি বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে। এ বৎসর ছয়টি বৃত্তির মধ্যে পাঁচটি বাঙালী গবেষকেরা পাইয়াছেন। —

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রদের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সময়োপযোগী কাজ করিয়াছেন। ডাক্তার মুঞ্জে যে সামরিক বিদ্যালয় খুলিতেছেন, তাহাতে বাঙালী ছাত্রদের যাওয়া উচিত।

—

দৈহিক কারণে বর্জ্জিত ইংরেজ রংরুট

বিলাতের লোকদের অবস্থা আমাদের চেয়ে খুব ভাল। কিন্তু সেখানেও বহু লোকের যথেষ্ট দৈহিক পুষ্টি হয় না। তাহার একটি প্রমাণ, অধুনা যে ৬৮০০০ যুবক সৈন্যদলে রংরুট (recruit) রূপে ভর্ত্তি হইতে চায়, তাহার মধ্যে, স্বাস্থ্য সন্তোষজনক নহে বলিয়া, ৩০০০০কে লওয়া হয় নাই, কেবল ৩৮০০০কে লওয়া হইয়াছে।

—

"আবেদন নিবেদন"

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে ভারতসচিবের কাছে বঙ্গের হিন্দুদের যে দরখাস্ত গিয়াছে, তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ "আবেদন নিবেদন" নীতির বিরুদ্ধে মামুলী আপত্তি ও পরিহাসের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। তাঁহারা সিদ্ধিলাভার্থ ভিন্ন নীতি অবলম্বন করিতে পারেন। তজ্জন্য তাঁহারা অসম্মানভাজন হইবেন না।

খুব উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ, যেমন ভারতসচিব, সাধারণ কোন ভারতীয়কে "আপনার বাধ্যতম ভৃত্য" বলিয়া যখন স্বাক্ষর করেন, তখন সকলেই বুঝে যে ইহা একটি শিষ্ট রীতি মাত্র। তদ্রূপ বেসরকারী লোকেরা যখন রাজপুরুষদের কাছে "দীন দরখাস্ত" ("humble memorial") পাঠায়, তখন তাহা দাঁতে কুটা লইয়া মুষ্টিভিক্ষার প্রার্থনা না হইতেও পারে ;—তাহাও একটা কেতাদুরস্ত ব্যাপার।

গান্ধী-যুগের যে কংগ্রেসওয়ালারা ব্যবস্থাপক সভায় আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডেশ্বরের ভক্ত ও বাধ্য প্রজা বলিয়া শপথ করেন, অথচ পূর্ণ স্বরাজের জন্য অহিংস বিদ্রোহের জন্যও প্রস্তুত থাকেন, তাঁহাদের শপথের অর্থ কি ?

—

ব্যাষ্টীল-পতনের দিবস

১৪ই জুলাই (এবার ৩০শে আষাঢ়) ফ্রান্সের কু-খ্যাত কারাগারদুর্গ ব্যাষ্টীলের পতন হয়। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে যে রাষ্ট্রবিপ্লব আরব্ধ হয়, ব্যাষ্টীল-ধ্বংস তাহার একটি বিখ্যাত ঘটনা। এই ব্যাষ্টীলে অন্য সাধারণ বন্দী ছাড়া, বিনা-বিচারে বন্দী করিবার রাজাদেশের (lettres de cachetএর) বলে ধৃত ব্যক্তিদিগকেও অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক করিয়া রাখা হইত। প্রতি বৎসর এই ১৪ই জুলাই ফ্রান্সের সর্ব্বত্র ও ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগর প্রভৃতি স্থানে ব্যাষ্টীল-পতন উপলক্ষ্যে আমোদপ্রমোদ হয়। তাহাতে নিকটবর্ত্তী ব্রিটিশ রাজপুরুষেরাও যোগ দেন।

বিনাবিচারে বন্দী করার প্রথা যে-দিন ভারতবর্ষে উঠিয়া যাইবে, ভবিষ্যতে প্রতি বৎসর সেই দিবসেও ভারতে উৎসব হইবে।

—

নারীদের দাবী

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন আরও কার্য্যকর করিবার নিমিত্ত এবং নারীদের উত্তরাধিকার আইন আরও ন্যায়সঙ্গত করিবার নিমিত্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে দুটি বিল উপস্থাপিত হইয়াছে, নারীরা তাহার সমর্থন করিতেছেন। নারীদের এই জাগৃতি সুলক্ষণ।

হিটলারের জন্মোৎসবে বার্লিনে সৈন্য-সমারোহ
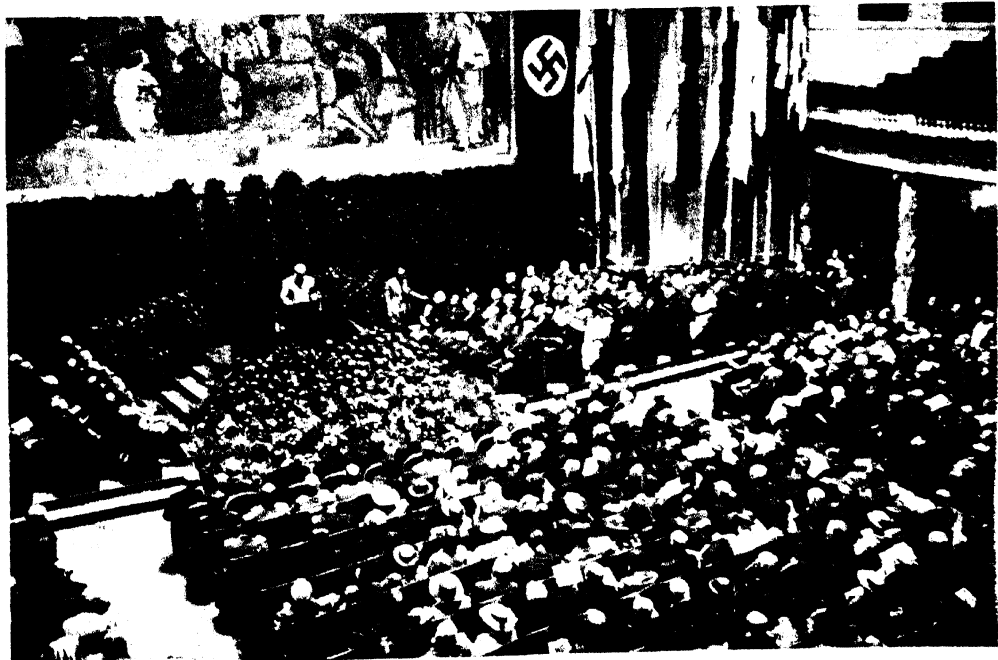
বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের আরম্ভ
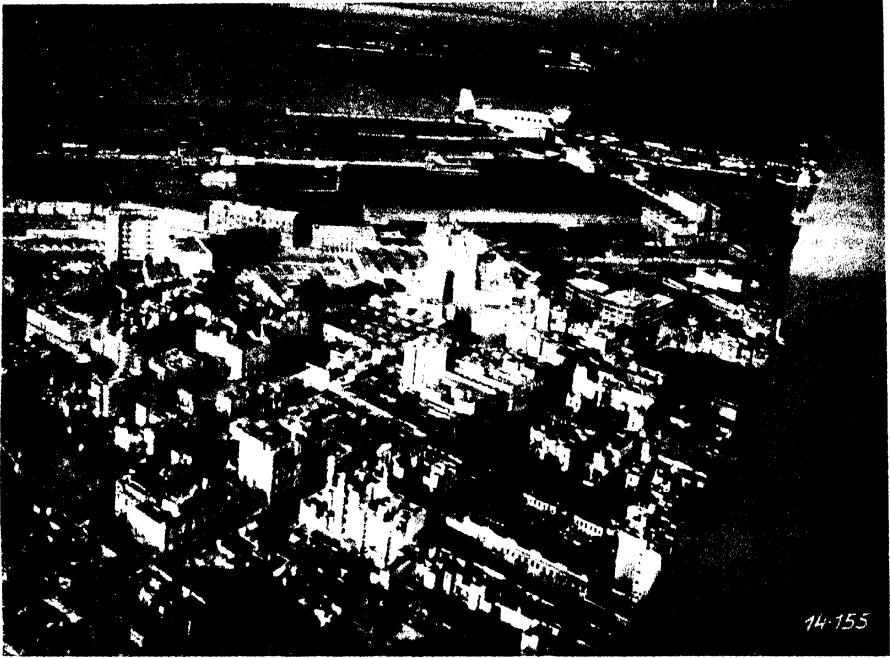
আটলান্টিক মহাসাগরের খেয়া : বুয়েনস এয়ারসের উপর ভ্রমণ খেয়াপারী 'জুবার' প্লেন
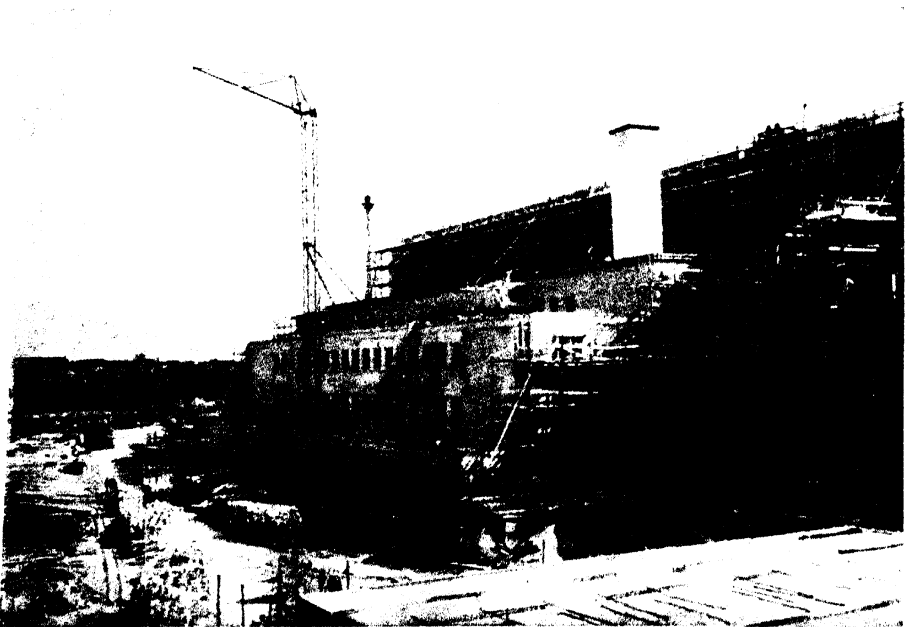
এই বৎসরের বার্লিনের ওলিম্পিক ক্রীড়াপ্রদর্শনী—ডয়েসল্যাণ্ড হল
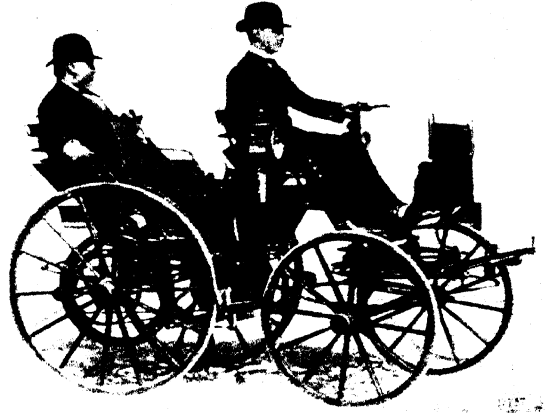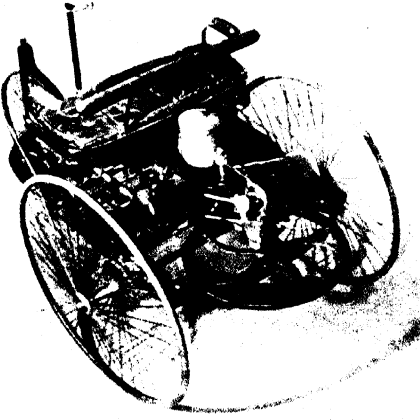
মোটর-জুবিলি : ১৮৮৬ সালে নির্ম্মিত সর্ব্বপ্রথম মোটরকারদ্বয়—দ্বিচক্র ও চতুশ্চক্র
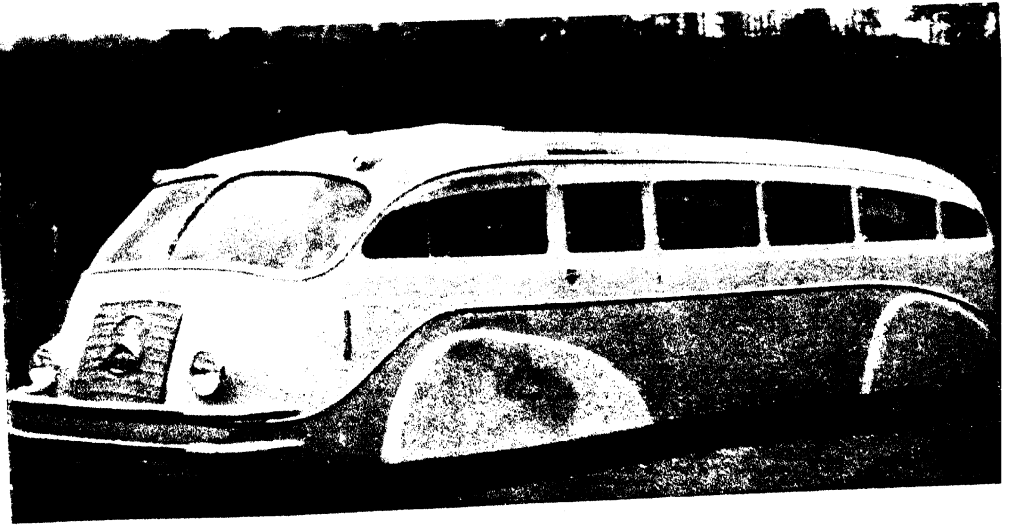
সর্ব্বপ্রথম ত্রিচক্র মোটরের অভিনবতম 'অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র'

রংবুক বিহার হইতে এভারেষ্টের দৃশ্য

১৯৩৩ সালের অভিযানের শেরপা "ব্যাঘ্র" কুলিদল

বিদেশ

হিটলারের জার্ম্মেনি

কয় বৎসর পূর্ব্বে যুদ্ধ অন্তর্বিপ্লব ইত্যাদির ফলে জার্ম্মেনির অবস্থা এতই শোচনীয় হইয়াছিল যে বিদেশী অভিজ্ঞ লোকেরা জার্ম্মেনির চরম পতনের দিন গুণিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হিটলারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদের চেষ্টায় দেশের আকৃতি-প্রকৃতি বদলাইয়া গিয়াছে। এখন জার্ম্মেনি আবার যুদ্ধ-পূর্ব্বকালের জার্ম্মেনির মত প্রগতির পথে অগ্রগামী।

এই সংখ্যার (পৃ ৮২৫-২৭) চিত্রের বিশেষ বর্ণনা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

মোটর-জুবিলি: ১৮৮৬ সালে কার্ল বেনজ্ পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম মোটর-কার (ত্রিচক্র) নির্ম্মাণ করেন। ঐ বৎসর গটলিয়েব ডেমলার প্রথম চার চাকার মোটর নির্ম্মাণ করেন। জার্ম্মেনিতে এ-বৎসর ঐ দুই জার্ম্মান আবিষ্কারের পঞ্চাশত্তম বৎসরের জুবিলি হইয়াছে; তাহাতে ঐ দুইটি মোটর-যান ও বহু নূতন মোটর প্রদর্শিত হয়। অভিনব গাড়িটি ডিজেল-মোটর চালিত ২২ যাত্রীবাহী 'বাস্'। ইহা ঘণ্টায় ৭২ মাইল বেগে চলিতে পারে।

অলিম্পিক ক্রীড়া: বার্লিনে এই ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার জন্য বিরাট আয়োজন চলিয়াছে। ক্রীড়াভূমিতে "ডয়ৎস্‌লাণ্ড" হলের নির্ম্মাণ প্রায় শেষ; ইহা এই শ্রেণীর প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে বৃহত্তম।

আকাশ-পথে আটলাণ্টিকের খেয়া: জার্ম্মেনি আটলাণ্টিক খেয়াপারের তিন রকম আয়োজন করিয়াছে। জলপথে বহুকাল হইতেই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে বৃহত্তম ও দ্রুততম জাহাজের জন্য জার্ম্মেনি প্রসিদ্ধ ছিল। যুদ্ধের পরও হিটলারের আমলে কিছুদিনের জন্য দ্রুততম জাহাজ জার্ম্মেনিই চালায়। অন্যদিকে আকাশপথে জার্ম্মান জেপেলিন মহাসাগর পারাপার চালাইয়াছে এবং ক্রমেই সেদিকে উন্নতি হইতেছে। এরোপ্লেনের ক্ষেত্রেও যুঙ্কার 'জি ২৪' শ্রেণীর যাত্রীবাহী 'প্লেন' ইয়োরোপ হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় খেয়াপার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

হিটলারের জন্মদিন: এ-বৎসর হিটলারের জন্মোৎসব মহা সমারোহের সহিত সারা জার্ম্মেনিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বার্লিনে ৩য় সামরিক বাহিনীর সমারোহ বিশেষ দ্রষ্টব্য হইয়াছিল।

আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেস: বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে জন-সংখ্যা সমস্যা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ ফ্রিক এই অধিবেশনের প্রারম্ভে আগত বৈজ্ঞানিকদিগকে সম্বর্দ্ধন করেন।

প্যালেষ্টাইন

মহাযুদ্ধের অবসানে জাতিসমূহের কূট রাজনীতি-কৌশলে কতিপয় দেশে পর-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল দেশকে পরাধীন বলিয়া ঘোষণা না করিলেও কার্য্যতঃ ইহাদের অবস্থা পরাধীন দেশ হইতে ভিন্ন নহে। ইউরোপের কতিপয় শক্তিশালী দেশ নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য লীগ অফ নেশ্যনস হইতে এই সকল দেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার ভার বা ম্যাণ্ডেট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শক্তিমানের দুর্ব্বলতা এই যে, কোনও প্রকারে একবার কোথাও সামান্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, স্বেচ্ছায় তাহা ত্যাগ বা সঙ্কোচ তাঁহারা করিতে পারেন না, বরং সে অধিকার, সে প্রভাব চিরস্থায়ী করিবারই প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এইরূপ স্বল্পকালব্যাপী পর-শাসনের পর ইরাক "স্বাধীন" বলিয়া ঘোষিত হইলেও তাহার রাজার ক্ষমতা—মর্য্যাদা যাহাই হউক—ভারতীয় দেশীয় নৃপতিদের অপেক্ষা বেশী নহে। তাই প্যালেষ্টাইনের অধিবাসিগণ বিদেশী শাসকগণের ব্যবস্থায় স্বাধিকারচ্যুতিতে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

প্যালেষ্টাইন অতি প্রাচীন দেশ, ইহার ঐতিহ্যসম্পদ সামান্য নহে। সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে আজ যে ধর্ম্ম প্রচলিত, তাহার প্রতিষ্ঠাতা যীশু-খ্রীষ্টের পিতৃভূমি এই প্যালেষ্টাইন। লীগ অব নেশ্যন্সের কৃপায় আজ ইংলণ্ড এই দেশ শাসন করিবার অধিকার পাইয়াছে। বাইবেলের যুগে যাহাই হউক বর্ত্তমান যুগের অধিবাসিগণের মধ্যে ইসলামধর্ম্মাবলম্বী আরবগণই এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসীর সংখ্যা অতি সামান্য।

শাসনভার গ্রহণ করিবার অল্পদিন পরেই ইংলণ্ড প্যালেষ্টাইনে আপনার প্রভাব চিরস্থায়ী করিবার পন্থা আবিষ্কারের প্রয়াস পাইল। প্যালেষ্টাইন ভূমধ্য-সাগরতীরস্থ দেশ, লোহিত-সাগরের সহিতও তাহার যোগ আছে। মিশর আজ জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভের প্রয়াসে উদ্‌গ্রীব; মিশরে অথবা সুয়েজ খালের উপর ইংলণ্ডের প্রভাব

সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত থাকিবে কি না, রাজনৈতিক মহলে সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং প্যালেষ্টাইনে ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ উপেক্ষা করা ইংলণ্ডের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। সুতরাং শাসনভার গ্রহণ করিবার অল্প দিন পরেই ইংলণ্ডের তৎকালীন অন্যতম মন্ত্রী ব্যালফুর ঘোষণা করিলেন যে প্যালেষ্টাইনকে ইহুদীদিগের জাতীয় বাসভূমি (National Home) করিতে হইবে। ইংলণ্ড প্যালেষ্টাইনের অধিপতি নহে, অভিভাবক-শাসক মাত্র; আরব-অধ্যুষিত এক দেশকে ইহুদী-নিবাস করিবার কোন আইনসঙ্গত অধিকার তাহার আছে কি?

ইহুদী এক অপূর্ব্ব জাতি। মানব-ইতিহাসের অতি প্রাচীন যুগ হইতেই নানা কর্ম্মক্ষেত্রে ইহাদের শক্তির বিকাশ দেখা যায়। ইহার সংখ্যায় খুব বেশী নহে। ভৌগোলিক সীমারেখায় ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডকেই আপনার বলিয়া যে দেশপ্রেম, তাহা ইহাদের কর্ম্মশক্তিকে খর্ব্ব করে নাই; বিশাল পৃথিবীতে বোধ হয় এমন একটি সভ্য দেশ নাই যেস্থলে এই ইহুদী জাতি নাই। কিন্তু যে-দেশে ইহারা অবস্থান করে সে দেশকে স্বদেশ গণ্য করিয়া ইহারা সেবা করিতে কুণ্ঠিত নয়। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান যুগে মন্ত্রী ডিজরেলি, লর্ড রেডিং, মণ্টেগু, সামুয়েল প্রভৃতি রাজনৈতিক মনীষীগণের কার্য্যাবলী সামান্য নহে।

ইংলণ্ড এই প্যালেষ্টাইনকে ইহুদীর দেশে পরিণত করিতেছে। সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া দেশ জয় করা চলে, হয়ত বা সাময়িক ভাবে শাসন করাও চলে, কিন্তু চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিবার জন্ত দেশের অধিবাসীদের উপর প্রভাব বিস্তার করা আবশ্যক। প্যালেষ্টাইনের আরব অধিবাসিগণের ধর্ম্ম ও রীতি-নীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠত্বাভিমানী প্রভাব বিস্তারের পক্ষে অনুকূল নহে, সুতরাং দেশের জনগণের মধ্যে ইংলণ্ডের প্রতি আস্থাবান ও নির্ভরশীল এক দল সৃষ্টি করাই সহজ ও নিরাপদ উপায়। তাই ইহুদী-দিগকে এই আহ্বান। ইহুদীগণ এ আহ্বানে সাড়া দিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। পূর্ব্ব ইউরোপ, রাশিয়া, পোলাণ্ড, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে বহু ইহুদী প্যালেষ্টাইনে আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে। জার্ম্মেনীতে হিট্‌লারের ইহুদী বিরোধী নীতির ফলে বহু ইহুদী ইংলণ্ডের রাজনৈতিক স্নেহচ্ছায়ায় প্যালেষ্টাইনে আশ্রয় পাইয়াছে। টেল-আবিব আজ আর জাফার ক্ষুদ্র উপকণ্ঠ নহে, লক্ষাধিক ইহুদীর সুবৃহৎ নগর। (পৃ. ৫৩৭ চিত্র দ্রষ্টব্য।)

পাশ্চাত্য ইংরেজের আগমনে প্যালেষ্টাইনের রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক যে-সকল পরিবর্ত্তন দ্রুত সাধিত হইতেছে, আরবগণ ইহাতে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে ইহুদীদের আমদানীতে তাহাদের আশঙ্কা হইয়াছে বুঝিবা তাহারা "নিজবাসভূমে পরবাসী" হইয়া পড়িতেছে। দেশে স্বায়ত্ত-শাসনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে—আইন পরিষদে ভারতবর্ষের মত স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে। হাই-কমিশনর সর এ ডি ওয়াচহোপ এক কমিউনিকে দ্বারা প্রচার করিয়াছেন, আইন-পরিষদের গঠন এইরূপ হইবে, যথা :—মুসলিম ১১, ইহুদী ৭, খ্রীষ্টান ৩, অন্যান্য জাতির বাণিজ্যিক প্রতিনিধি ২, ব্রিটিশ-কর্ম্মচারী ৫। এই প্রথায় বিচ্ছিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীস্থাপন যে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল কেবল তাহা নহে, পাঁচ জন ব্রিটিশ কর্ম্মচারীর মতানুসারেই পরিষদের সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রিত হইবে ; একা আরব মুসলমানগণ অথবা ইহুদীগণ এই ব্রিটিশ কর্ম্মচারিগণের ভোট স্বপক্ষে না পাইলে কিছুই করিতে পারিবে না। তদুপরি এই পরিষদের ক্ষমতা ও অধিকার অতীব সীমাবদ্ধ হইবে—দেশে 'ম্যাণ্ডেট' অথবা ইহুদী-আমদানী সম্পর্কে কোন আলোচনা এই পরিষদে হইতে পারিবে না। গবর্ণরের 'ভিটো' ও 'সার্টিফিকেট' দ্বারা আইন রোধ বা প্রবর্ত্তনের ক্ষমতা উভয়ই আছে। ১৯২২ সালে প্রথম এই ব্যবস্থায় আরবগণ প্রবল আপত্তি উত্থাপন করে, তাহাতে এ ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। এখন আরবগণ এ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে আর প্রবল বাধা দিতেছে না ; ইহারা যে সন্তুষ্ট চিত্তে 'ম্যাণ্ডেট' শাসন গ্রহণ করিতেছে তাহা নহে, তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্ত পরিষদকেই অস্ত্র-স্বরূপ গ্রহণ করিতে চাহে—যেমন ভারতীয় স্বরাজীদল করিয়াছে। এদিকে এখন ইহুদীগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে—আরবগণ পরিষদে যে সামান্ত ক্ষমতা লাভ করিবে তাহাতে ইহুদীগণের আগমনে বাধা দিতে তাহারা যথেষ্ট সুযোগ পাইবে। বহু শত বৎসর যাবৎ তাহারা যে ভূমিতে বাস করিতেছে আজ তাহাতে ইহুদীগণের আগমনে যে সত্যসত্যই তাহাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আরবেরা উপেক্ষা করিতে পারে না এবং ভবিষ্যতে আরও ইহুদী যেন আর না আসিতে পারে এ ব্যবস্থার জন্ত প্রাণপণ প্রয়াস পাইবে।

এদিকে প্যালেষ্টাইনে অবস্থা এরূপ সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কর্ত্তৃপক্ষ মিশর হইতে সৈন্ত আমদানি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এদিকে পার্লেমেণ্টে উপনিবেশ-সচিব ঘোষণা করিয়াছেন যে প্যালেষ্টাইনে আরব ও ইহুদীগণের অসন্তোষ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য একটি রয়্যাল কমিশন নিযুক্ত হইবে। তবে প্যালেষ্টাইনে ইংলণ্ডের "ম্যাণ্ডেট"-প্রশ্ন আলোচিত হইবে না। কিন্তু এই ঘোষণায় দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত

ফরাসী মন্ত্রীসভায় মহিলা

ফ্রান্সের গত নির্ব্বাচনে বিজয়ী সমাজতন্ত্রী দলের গবর্মেণ্টের মন্ত্রীসভায় তিনজন মহিলা নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে 'বিবিধ প্রসঙ্গে'

ইরেন কুরী-জোলিও

লিখিত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে ইরেন কুরী-জোলিও রসায়নশাস্ত্রে নোবেল-পুরস্কার পাইয়াছিলেন ; ইঁহার গবেষণার সম্বন্ধে প্রবাসীর গত বৎসরের মাঘ সংখ্যায় বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইরেন কুরী-জোলিও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিষয়ে আণ্ডার-সেক্রেটারি নিযুক্ত হইয়াছেন। অন্য দুইজন মহিলা যথাক্রমে শিশু-মঙ্গল এবং অনাথ- ও বিধবা- সহায় বিষয়ে আণ্ডার-সেক্রেটারি নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষ

এভারেষ্ট অভিযান

এভারেষ্ট এবারেও বিজয়ী। ১৯২১ হইতে এ-পর্য্যন্ত ছয় বার এই চূড়া জয়ের চেষ্টা হইয়াছে। ১৯২১ সালে কর্ণেল হাওয়ার্ড বরির দল পথ-ঘাট পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত হন। ১৯২২ সালে ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল ব্রুসের দল ২৭৩০০ ফুট পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন, তখন মানুষের পর্ব্বত-লঙ্ঘনের উচ্চতম সীমা উহাই ছিল। উহার পর, সাত জন লোকের প্রাণনাশের পর, তাঁহাদের বুদ্ধি ও চেষ্টার সীমা পার হইয়াছে জানিয়া তাঁহারা নিবৃত্ত হন। ১৯২৪ সালে কর্ণেল নর্টনের দল ২৮১০০ ফুট পর্য্যন্ত পৌছান। তাহার পর তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ "চড়িয়ে" ম্যালোরি ও আরভিন প্রাণ হারাইলে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হন। ১৯৩৩ ও ও ১৯৩৫ সালের দুই অভিযানে হিমালয়ের দুর্দ্ধর্ষ হিম-তুষার ও ঝঞ্ঝাবাত সম্বরণের উপায় আবিষ্কারের চেষ্টা ভিন্ন অন্য কিছু বিশেষ কাজ হয় নাই। এ বৎসর ঐ দুই অস্ত্রের প্রচণ্ড বেগ সামলাইতে না পারায় অভিযান ফিরিয়া আসিয়াছে।

১৯৩৩ সালে এক দল শেরপা ভারবাহী পিঠে বোঝা লইয়া ২৭৪০০ ফুট উঠিয়া সেখানে অভিযানকারীদের থাকিবার ব্যবস্থা করে। বলা বাহুল্য, ইহারা এই অদ্ভুত কার্য্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতলঙ্ঘী বীরদলের সমপর্য্যায়ে আসিয়াছে। অথচ ইহাদের কীর্ত্তি অল্প লোকেই জানে, নাম বাহিরের কেহ জানে কিনা সন্দেহ। (পৃ. ৬২৮ চিত্র দ্রষ্টব্য)

স্বর্গীয়া হেমনলিনী দেবী

স্বর্গীয়া হেমনলিনী দেবী

জয়পুর-প্রবাসী রামলাল সেন মহাশয়ের পত্নী হেমনলিনী দেবী সম্প্রতি ৬২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার সুমধুর ব্যবহারে ও আন্তরিক সদ্‌গুণাবলীর জন্য তিনি জয়পুর-প্রবাসী সকলের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ না করিলেও তিনি জ্ঞান ও সংস্কৃতিতে অগ্রসর ছিলেন। আত্মীয়-পরনির্ব্বিশেষে পীড়িতের সেবা ও জয়পুর-প্রবাসী বাঙালীদের নানাভাবে অভাব-মোচনে তিনি সর্ব্বদাই অগ্রণী ছিলেন। তিনি জয়পুর পর্দা ক্লাবের একজন প্রধান উদ্যোক্ত্রী ছিলেন।

প্রবাসে বাঙালী

সৈয়দ মুজতাবা আলি, পিএইচ-ডি, বড়োদা-রাজ্যে তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। ডক্টর আলি ১৯২৬ সালে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী-শিক্ষাভবনের পাঠক্রম সমাপ্ত করিয়া ১৯২৭ সালে কাবুল শিক্ষাবিভাগে ফরাসী ও ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া যান; এরূপ কার্য্যে ইনিই প্রথম বাঙালী। গত আফগান-বিদ্রোহের সময় ইনি ব্রিটিশ এয়ারোপ্লেনে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ডক্টর সৈয়দ মুজতাবা আলি

অতঃপর জার্মেনী হইতে হুমবোল্ড-বৃত্তি লাভ করিয়া ইনি তথায় গিয়া বার্লিন ও বন-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন ও তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্বে পিএইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ইনি ১৯৩৪ সালে পুনরায় বিদেশ-যাত্রা করেন ও সমগ্র ইউরোপ-ভ্রমণান্তে কায়রোতে এক বৎসর অধ্যয়ন করেন ও তৎপর জেরুসালেম দামস্কস প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। ডক্টর আলি ফরাসী জর্ম্মন প্রভৃতি ভাষায়ও সুপণ্ডিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৬শ ভাগ, ১ম খণ্ড | ভাদ্র, ১৩৪৩ | ৫ম সংখ্যা

চিরযাত্রী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অস্পষ্ট অতীত থেকে বেরিয়ে পড়েছে ওরা দলে দলে,
ওরা সন্ধানী, ওরা সাধক,
বেরিয়েছে পুরা-পৌরাণিক কালের
সিংহদ্বার দিয়ে।
তার তোরণের রেখা
আঁচড় কেটেছে অজানা আখরে
ভেঙে-পড়া ভাষায়।
যাত্রী ওরা, রণযাত্রী,
ওদের চিরযাত্রা অনাগত কালের দিকে।
যুদ্ধ হয় নি শেষ
বাজছে নিত্যকালের দুন্দুভি।
বহু শত যুগের পদপতন শব্দে
থরথর করে ধরিত্রী,
অন্ধকার রাত্রে দুরু দুরু করে বক্ষ,
চিত্ত হয় উদাস,
তুচ্ছ হয় ধনমান,
মৃত্যু হয় প্রিয়।

তেজ ছিল যাদের মজ্জায়,
যারা চলতে বেরিয়েছিল পথে
মৃত্যু পেরিয়ে আজো তারাই চলছে ;
যারা বাস্তু ছিল আঁকড়িয়ে
জীয়ন-মরা তারা,
তাদের নিঝুম বসতি
বোবা সমুদ্রের বালুর ডাঙায়।
তাদের জগৎজোড়া প্রেতস্থানে,
অশুচি হাওয়ায়
কে তুলবে ঘর,
কে রইবে চোখ উলটিয়ে কপালে,
কে জমাবে সঞ্চয়!

কোন্ আদিকালে মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে
বিশ্বপথের চৌমাথায়।
পাথেয় ছিল রক্তে, পাথেয় ছিল মজ্জায়,
পাথেয় ছিল পথেই।
সেই এঁকেছে নকশা,
ঘর বেঁধেছে পাকা গাঁথনির
ছাদ তুলেছে মেঘ ফুঁড়ে,
পরের দিন থেকে মাটির তলায়
ভিৎ হয়েছে ঝাঁঝরা ;
সে বাঁধ বেঁধেছে পাথরে পাথরে,
ভেঙে গেছে বন্যার ধাক্কায়।
সারারাত হিসেব করেছে স্থাবর সম্পদের,
রাতের শেষে হিসেবে বেরল সর্ব্বনাশ।
সে জমা করেছে ভোগের ধন সাতহাট থেকে,
ভোগে লেগেছে আগুন,
আপন তাপে গুমরে গুমরে
গেছে ভোগের জোগান অঙ্গার হয়ে।

তার রীতি তার নীতি তার শিকল তার খাঁচা
চাপা পড়েছে মাটির নিচে
পরযুগের কবরস্থানে।

কখনো বা ঘুমিয়েছে সে
ঝিমিয়ে-পড়া নেশার আসরে বাতিনেবা দালানে,
আরামের গদি পেতে।
অন্ধকারের ঝোপের থেকে
ঝাঁপিয়ে পড়েছে স্কন্ধকাটা দুঃস্বপ্ন
পাগলা জন্তুর মতো
গোঁ গোঁ করে,
ধরেছে তার টুঁটি চেপে,
বুকের পাঁজরগুলোয় ঝাঁকানি দিয়েছে নাড়া,
গুমরে উঠে জেগেছে সে মৃত্যুযন্ত্রণায়।
ক্ষোভের মাতুনিতে ভেঙে ফেলেছে মদের পাত্র,
ছিঁড়ে ফেলেছে ফুলের মালা।
বারে বারে বাঁকে পিছল দুর্গমে
ছুটে এসেছে শতচ্ছিদ্র কন্থার বাইরে
পথ-না-চেনা দিকসীমানার অলক্ষ্যে।
তার হৃৎপিণ্ডের রক্তের ধাক্কায় ধাক্কায়
ডমরুতে বেজেছে গুরুগুরু—
"পেরিয়ে চলো, পেরিয়ে চলো।"

ওরে চিরপথিক,
করিস্ নে নামের মায়া,
রাখিস্ নে ফলের আশা,
ওরে ঘরছাড়া মানুষের সন্তান।
কালের রথ-চলা রাস্তায়
বারে বারে কারা তুলেছিল জয়ের নিশান
বারে বারে পড়েছে চুরমার হয়ে
মানুষের কীর্তিনাশা সংসারে।

লড়াইয়ে জয়-করা রাজত্বের প্রাচীর
সে পাকা করতে গেছে ভুল সীমানায়।
সীমানা-ভাঙার দল ছুটে আসছে
বহু যুগ থেকে,
বেড়া ডিঙিয়ে, পাথর গুঁড়িয়ে
পার হয়ে পর্ব্বত;
আকাশে বেজে উঠছে
নিত্যকালের দুন্দুভি—
"পেরিয়ে চলো,
পেরিয়ে চলো।"

শান্তিনিকেতন
২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩।

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

৪

জনসংখ্যাবৃদ্ধির নিয়ম অনুসারে "তিন সরকারী" আসনের উমেদারের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, এবং এই কারণে সুদিনের আশাও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়াছে। যদি রাণা-বংশের সন্তানদিগকে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য দেশ-বিদেশে পাঠানো হইত, যদি নেপাল-সরকার বিদেশে বিভিন্ন স্থানে রাজদূত প্রেরণ করিত, * তবে হয়ত বেকার রাণা-বংশজদিগের শিক্ষা ও কার্য্য দুইয়েরই সংস্থান হওয়ায় দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যদিও ইঁহাদের অধিকাংশই বিদেশী বিলাস-ব্যসন গ্রহণে উৎসুক, কিন্তু বিদ্যার্থে বিদেশযাত্রায় কাহারও বিশেষ অনুরাগ নাই। তবে যে ইঁহাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ছাড়িয়া সুবুদ্ধি আসিবে জানি না—হয়ত আসিবে তখন যখন "চুনি নিতে দান ফেলেছে পাঞ্জা দিব কিসে" অবস্থা দাঁড়াইবে।

নেপালের বর্ত্তমান অবস্থা তাহার বিরোধী পক্ষে সন্তোষপ্রদ হইতে পারে, নিজ পক্ষের নহে। প্রজাগণ শক্তিহীন, সিংহাসনাধিপতি অধিরাজ রাজ্যাধিকারশূন্য এবং "তিন সরকার" আত্মীয়স্বজনের চক্রান্তে দুর্ব্বল, সুতরাং দেশ সমস্ত জনস্থানে পরিপূর্ণ হইলেও রাষ্ট্রের শক্তি কোথায়? দেশে যদিও মুড়িমুড়কির ন্যায় "কর্ণেল" "জর্ণেল"-এর ছড়াছড়ি দেশকে শক্তিমান করার শিক্ষাদীক্ষা ইঁহাদের কোথায়?

• • •

স্বয়ম্ভুর নিকটেই কিন্দুতে সম্প্রতি নূতন বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ডুকপা লামা এখানে কিছুদিন থাকিবেন। আমি ৩রা এপ্রিলের রাত্রে এখানে পৌঁছিলাম। লামা তাঁহার পাশেই আমার থাকিবার স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন

---

* এখন ইহার চেষ্টা চলিয়াছে।

কিন্তু আমি সেই রাত্রেই বুঝিলাম যে সেখানে যেরূপ সকল সময়েই শত শত লোকের যাতায়াত তাহাতে আমার স্থানান্তরে যাবাই শ্রেয়। ইহাও শুনিলাম যে, অন্য এক জন তিব্বতযাত্রী সন্ন্যাসীও এখানে আসিয়াছেন এবং তিনি লামার কাছে আসিলে পরে তাঁহাকে আমার কথা বলা হইয়াছে। পরে আরও জানিতে পারিলাম তিনি আমার খোঁজে ফিরিয়া গিয়াছেন। আমি শুনিয়া প্রমাদ গণিলাম, তিনি তো রাজার অনুমতিতে, রাজসাহায্যে আসিয়াছেন, তাঁহার ভয় কি, কিন্তু যদি তাঁহার মারফৎ আমার কথা বেশী দূর পৌছায় তবে এত চেষ্টা পরিশ্রম সবই ব্যর্থ হইয়া আমার আবার রক্সৌল-পারেই যাত্রা শেষ হইবে।

সেই রাত্রেই স্থির করিলাম, আমি অন্য কোথাও কোন নির্জন জায়গায় থাকিব। অদৃষ্ট প্রসন্ন, এক সজ্জনের সহায়তায় একটি খালি বাড়িতে থাকিবার ব্যবস্থা হইল। সারাদিন সেখানে এক কুঠরিতে থাকিতাম, রাত্রে নিত্য-কৃত্যের জন্য বাহিরে যাইতে হইত। হাজারিবাগে দুই বৎসর কারাবাসের ফলে কুঠরিতে আবদ্ধ থাকায় আমি অভ্যস্ত ছিলাম, কিন্তু এই নির্জনবাস যেন আরও কঠিন মনে হইত। উপরন্তু কেবলই ভয় হইত, এই অজ্ঞাতবাস প্রকাশ না হইয়া যায়।

এদিকে ডুকপা লামা যাইবার নামও করেন না। কথা ছিল দু-চার দিন মাত্র থাকার, কিন্তু পূজা-ভেট যথেষ্ট পরিমাণে পড়ায় তিনি যাইবার কথা স্থগিত রাখিয়াছেন। আবার আমার নির্জন আশ্রয়েও দু-চার জন লোক যাতায়াত আরম্ভ করায় আমার শঙ্কা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। ডুকপা লামার যল্মো গ্রামে গিয়া কিছুদিন থাকিবার কথা ছিল। স্থির করিলাম আমি আগে গিয়া সেখানেই অপেক্ষা করিব।

আমার নূতন বন্ধু অনেক চেষ্টা করিয়াও কোন যল্মোবাসী জোগাড় করিতে পারিলেন না। শেষে তিনি নিজেই আমায় লইয়া যাইবেন স্থির করিলেন এবং সেই-মত ৮ই এপ্রিল অন্ধকার থাকিতে আমাদের যাত্রারম্ভ হইল। স্বয়ম্ভূদর্শন পূর্ব্বেবার নেপাল-যাত্রাতেই হইয়াছিল। নেপালের ইহাই শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধতীর্থ, ইহার যুগল মন্দির চন্দ্রাগড়ী হইতেই দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা কাঠমাণ্ডুর বাহিরে ক্ষুদ্র টিলার উপর স্থিত। বর্তমান মন্দির [illegible] পুরাণের বর্ণনার ন্যায় প্রাচীন নহে। কি[illegible] এবং কিছুকাল পূর্ব্বে সম্পূর্ণ মেরামত হওয়ায় পরিষ্কার। আমি স্বয়ম্ভূ পরিক্রমা করিয়া নগরের বাহিরের পথেই যল্মো যাত্রা করিলাম। কিছু দূর পর্য্যন্ত রোপলাইনের স্তম্ভরাজি সঙ্গে চলিল, সেগুলি দেখিয়া হাজার হাজার বেবার কুলীর কথা মনে পড়িতে লাগিল। ইংরেজ রেসিডেন্সীর নীচের পথে আমরা চলিলাম, ইহা অনেক দিনের যত্নে বৃক্ষ-লতা উদ্যানের শোভায় পরিপূর্ণ।

আমার সঙ্গে ছোট একটি পোঁটরি ছিল, মিত্র-মহাশয় সেটি লইয়া চলিলেন, কিন্তু তাঁহারও ভার বহার অভ্যাস ছিল না। কিছু দূর যাইবার পর এক জন লোক পাওয়া গেল, তাহাকে সুন্দরীজল পর্য্যন্ত মোট-বহনের জন্য নিয়োগ করিতে চাহিলাম। ঘরে বলিয়া আসিবার ছুতায় গিয়া সে আর ফিরিল না, অনর্থক আমাদের চলার সময়ের অর্দ্ধঘণ্টাকাল নষ্ট হইল।

আমার পোষাকের কথা বলা হয় নাই। যল্মো-যাত্রার জন্য নেপালী পোষাক গ্রহণ করিয়াছিলাম। নেপালী "বগলবন্দী" জামা, উপরে কালো কোট, নীচে নেপালী পায়জামা, মাথায় নেপালী টুপী, পায়ে কাপড় ও রবারের "ফলাহারী" নেপালী জুতা, এই সকলে বাহিরের অংশ নেপালী হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু অন্তরে যে দুশ্চিন্তা সেই দুশ্চিন্তা! প্রকৃতপক্ষে নেপালে ভোটিয়া পোষাকই প্রশস্ত। এ পথে পুলিস-চৌকী আছে শুনিলাম, কিন্তু সেদিন সিপাহীর দল কাঠমাণ্ডুতে ঘোড়দৌড় দেখিতে যাওয়ায় আমি পরিত্রাণ পাইলাম।

নূতন জুতায় পা কাটিয়া গিয়াছিল এবং মাসাধিক কাল চলাফেরা না-করায় চলিবার শক্তিও কমিয়া গিয়াছিল, তবুও এত দিনে আসল যাত্রারম্ভ হইয়াছে এই উৎসাহে ভর দিয়া চলিতেছিলাম। কাঠমাণ্ডু হইতে সুন্দরীজল পর্য্যন্ত মোটরের যাতায়াত আছে, কিন্তু সম্প্রতি একটি পুল ভাঙিয়া যাওয়ায় মোটর-চলাচল বন্ধ। নদীর কাছে দেখিলাম পাথর-কয়লায় ইট পোড়ান হইতেছে, অথচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে এই পাথর-কয়লাই আমি জ্বালাইয়া দেখাইতে এক রাজবংশীয় অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। সে-সময়

এদেশে ঐ কয়লাকে লোকে দৈব ধাতুর খাদ বলিয়া জানিত এবং ক্ষেতে সার হিসাবে ব্যবহার ভিন্ন অন্য কোন কাজে লাগিত না। নেপালের ভূমি রত্নগর্ভা, নানা প্রকার ধাতু ও খনিজে পরিপূর্ণ এবং জমিও উৎকৃষ্ট ফলের উপযুক্ত, কিন্তু সেদিকে নজর দেয় কে?

চার-পাঁচটার সময় সুন্দরীজল পৌঁছিলাম। এখন এখান হইতে নলদ্বারা কাঠমাণ্ডুতে জল-সরবরাহ হয়। জেনারল মোহন শমসেরের প্রাসাদের নিকট হইতেই আমি ঐ নলের পথ ধরিয়া এখানে আসিয়াছিলাম।

মহারাজ চন্দ্রশমসের তাঁহার প্রত্যেক পুত্রের জন্য পৃথক পৃথক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। মহারাজের প্রাসাদ নির্ম্মাণের বিশেষ সখ ছিল, নিজের বিরাট প্রাসাদ অতি সুন্দর ভাবেই নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। লোকে বলে ইহাতে ক্রোরাধিক টাকা খরচ হইয়াছে। তিনি জীবিত কালেই তাঁহার প্রাসাদ "[illegible] সরকারী"তে দিয়া গিয়াছেন ও ছয় পুত্রের জন্য ছয়টি প্রাসাদ করিয়া দিয়াছেন। এই ব্যাপারে যে অর্থ ও ভূমি ব্যয় হইয়াছে ভবিষ্যতেও যদি তাই হয়, তবে বিংশ শতাব্দীর শেষে কাঠমাণ্ডুর ভূভাগের চতুর্দ্দিক প্রাসাদ ও অট্টালিকায় পূর্ণ হইবে এবং সমস্ত উপত্যকার উর্ব্বর ক্ষেত্র "পার্ক" ও উদ্যানে পরিণত হইবে। দেশের কোটি কোটি টাকা এইরূপে কারুকার্য্যবিহীন বিদেশী ঢঙের ইষ্টকস্তূপ-রচনায় খরচ হওয়ার ফল কি হইবে সে-কথা আলাদা।

সুন্দরীজলে চড়াই আরম্ভ হইল। এত দূর সমতল জমি ছিল। এবার বুঝিলাম পাহাড় পার হওয়া সহজ হইবে না। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় এক কাটখোট্টা জোয়ান "তমঙ্গ"-জাতীয় মজুর পাওয়া গেল। লোকটি দৈর্ঘ্য প্রস্থে সাধারণ গোর্খা অপেক্ষা বিশালতর ও বিশেষ বলিষ্ঠ ছিল। তাহাকে চার দিনের জন্য নেপালী আট মোহর (৬৲ টাকা) মজুরীতে নিযুক্ত করিলাম, স্থির হইল প্রয়োজন-মত সে আমাকেও বহন করিয়া লইয়া চলিবে।

সুন্দরীজলের পথে উপরের দিকে চলিলাম, অল্পদূর যাইতেই শ্যামল ক্ষেত্র-পরিবৃত বনের মধ্য দিয়া পথ চলিল। নীচের রাস্তা ছাড়িয়া উপরের পথেই চলিলাম, পাহাড়ের পাকদণ্ডির চড়াই দুরূহ কিন্তু আমার পক্ষে নিরাপদ---নীচের পথে চৌকী-পাহারার ব্যবস্থা আছে। ক্রমাগত চড়াইয়ের পর সন্ধ্যা নাগাদ উপরের একটি গ্রামে পৌঁছিলাম। গ্রাম অনেক উচ্চে অবস্থিত, সুতরাং শৈত্যের আধিক্য অনুভব করিলাম। নেপালের পথঘাটে মাঝে মাঝে দোকান-চটি আছে, সেখানে আহার্য্য পাওয়া যায়। সমস্ত দিনের পথশ্রমের পর শয়ন ও নিদ্রাই আমার সুখকর মনে হইতেছিল, কিন্তু সঙ্গী-মহাশয় পথের কষ্ট গ্রাহ্যই করিলেন না, তিনি ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন, তিন জনে তৃপ্তির সহিত আহার করিলাম।

এখনও চড়াইয়ের পথ অনেক বাকী, সুতরাং অতি প্রত্যুষেই আমরা রওনা হইলাম। পাহাড়ের এই উপরের অংশ স্থানে স্থানে আবাদী হইতেছে, লোকে কোন কোন জায়গায় জঙ্গল কাটিয়া সাফ করিতেছে এবং নিজেদের কুঁড়ে-ঘরও তৈয়ার করিতেছে। নেপালের জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে দার্জিলিং ও আসামে লক্ষ লক্ষ নেপালীর বসতি হওয়া সত্ত্বেও যাহারা দেশে আছে তাহাদের পক্ষে বর্তমানে ক্ষেত হইতে ভরণপোষণই অসম্ভব। [illegible] বড় বড় [illegible] ভাবে অরণ্য [illegible] নূতন ক্ষেত সৃষ্টি [illegible] হইতেছে এবং অনেক স্থানে পাহাড় [illegible] হইয়া গিয়াছে। [illegible] জঙ্গলের সঙ্গে [illegible] দেখা গিয়াছে বনভূমি-ধ্বংসের পর অনেক [illegible] জলস্রোতবিহীন অবস্থায় শুকাইয়া গিয়াছে। এখানে কি হয় বলা যায় না।

পথে, পাহাড়ের পথে চলিতে চলিতে, দ্বিপ্রহরে এক গ্রামে পৌঁছিলাম। সুন্দরীজলের উপরের অঞ্চল হইতে তমঙ্গদের দেশের আরম্ভ। ব্রিটিশ 'গোর্খা' পল্টনে তমঙ্গ-বীরদের চাহিদা আছে। ভোটিয়াদিগের সহিত ইহাদের চেহারার সাদৃশ্য আছে, ভাষার মিল ততোধিক। ইহাদের ধর্ম্ম এখনও বৌদ্ধ, কিন্তু বর্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয় তাহা অধিক দিন থাকে কিনা সন্দেহ। আমার সঙ্গী তমঙ্গ বলিল, তাহাদের মৃত্যুর পরে লামা ডাকিতে হয়, কিন্তু বিজয়া-দশমীর দিনে তাহারা ঘোর শাক্ত। এই গ্রামেও টিনে-ছাওয়া একখানি ছোট কুটীর ভগ্ন অবস্থায় আছে, শোনা গেল এক প্রসিদ্ধ সাধু বৌদ্ধ তমঙ্গদিগকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে দীক্ষা দিবার জন্য এখানে ছিলেন, তাহার জন্যই এই কুটীর নির্ম্মিত হয়।

পর্ব্বতমালার দ্বিতীয় স্কন্ধ পার হইয়া আমরা এখন অন্য পার দিয়া চলিতেছিলাম, এখন পথে স্থানে স্থানে 'মানী' অর্থাৎ 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' নামক তান্ত্রিক বৌদ্ধ মন্ত্র লিখিত প্রস্তরস্তূপ দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। দেখিলেই বুঝা যায় সেগুলি দীর্ঘকাল উপেক্ষিত।

রাত কাটিল এক কুঁড়েঘরে, প্রভাতে উৎরাইয়ের পালা আরম্ভ হইল। দু-দিন পথ-চলায় পায়ে জোর পাইয়াছিলাম, উপরন্তু এখন উৎরাই চলিয়াছে, সুতরাং এখন আমি পথ-চলায় কাহারও পিছনে পড়ি না। আটটার সময় আমরা নীচের নদীতটে আসিলাম এবং নদী পার হইয়া নীচে গিয়া কিছু দূরে নদীসঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইলাম। সেখানকার দোকানে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া আবার যাত্রা আরম্ভ করিলাম। দ্বিপ্রহরে একখানি ছোট গ্রামে পৌঁছিলাম। গ্রামের নীচে পূজার জন্য প্রাচীন অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষ রহিয়াছে, কিন্তু শীতের জন্য তাহাদের অবস্থা ভাল নহে। এখানে পাহাড়ের উপরের অংশে যল্মো জাতির বসতি। নীচের অংশ গরম এবং অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বলিয়া তাহাদের পছন্দ নহে, কেননা তাহাদের ভেড়া ও চমরীর পালের জন্য বনজঙ্গল অত্যাবশ্যক।

যে-গৃহে আমাদের রন্ধন-ভোজনের ব্যবস্থা হইল তাহার অধিস্বামী এক ক্ষেত্রী। নেপালে এখনও মনুসম্মত অনুলোম বিবাহের প্রচলন আছে। ক্ষত্রিয় পিতা ও নিম্ন-বর্ণের মাতা হইতে জাত সন্তান এদেশে ক্ষেত্রী নামে পরিচিত। বলা বাহুল্য, কয়েক পুরুষ পরে উপযুক্ত আদান-প্রদানের ফলে ইহারা পুরাদস্তুর ক্ষত্রিয় হইয়া যায়। এইরূপে অব্রাহ্মণ কন্যা জাত ব্রাহ্মণ পিতার সন্তান প্রথমে জোশী নামে পরিচিত এবং কয়েক পর্য্যায় পরে পুরা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়।

সেই দিনই সন্ধ্যায় আমরা যল্মোদিগের আদি বাসভূমিতে পৌঁছিলাম। ইহাদিগকে লোকে ভোটীয় বলিয়া মনে করে এবং ভোটীয় ভাষা ইহাদের বিশেষ পরিচিত। ইহাদের বর্ণ রক্তাভ গৌর এবং মুখকান্তিও সুন্দর, এই জন্য ইহাদের কন্যা রাজগৃহে উপপত্নীরূপে সমাদর পায়।

সেই রাত্রে পিশুর উৎপাতে ঘুম নষ্ট হইল, তবে পরদিন গন্তব্য স্থানে পৌঁছিব, সুতরাং সে কষ্ট সহ্য হইল। পরদিন অতি প্রত্যূষেই আবার চড়াইয়ের পথ ধরিলাম। তিন ঘণ্টা পথ-চলার পর ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এ-অঞ্চলে তখনও গমের শীষে দানা বাঁধে নাই, কোথাও কোথাও আলুর ক্ষেত তখনও রহিয়াছে। মধ্যাহ্নভোজনে আলুর সদ্ব্যবহার করিয়া আমরা আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম।

পর্ব্বতের এক বিস্তৃত বাহু লঙ্ঘন করিতেই যেন নাটকের এক নূতন দৃশ্যপটের প্রবর্ত্তন হইল। চারি দিকে গগনচুম্বী মনোহর দেবদারু বৃক্ষ, নীচে শ্যামল শস্যে ভরা ক্ষেত্র, যেন নীলবসনা প্রকৃতিদেবী দৃশ্যপটে সশরীরে অবতরণ করিয়াছেন। স্থানও অতি শীতল। ১১ই এপ্রিল তিনটা নাগাদ আমি আমার গন্তব্য স্থানে যল্মো গ্রামে পৌঁছিলাম। গ্রামের প্রবেশপথে জলস্রোতে-চালিত মন্ত্রচক্র ('মানী') ঘুরিতেছে দেখিলাম।

যে-গ্রামে আমি ছিলাম তাহা যল্মো জাতির বসতি। ইহারা যল্মো নদীর ধারের পাহাড়ে বাস করে। ইহাদের পুরুষদের বেশ নেপালী ধরনের, কিন্তু নারীরা ভোটীয়ানীদের ন্যায় বেশভূষা ব্যবহার করে। বস্তুতঃ ভাষা, বেশ, ভোজন ইত্যাদির হিসাবে ইহাদের ভোটীয় বলা উচিত, যদিও অন্য জাতির সদৃষ্টান্তে ইহারা ভোটীয়দিগের অপেক্ষা অনেক পরিষ্কার এবং এদেশে মুখ-হাত ধোওয়ার প্রচলন আছে।

এই বৃহৎ গ্রামখানিতে শতাধিক ঘর বাড়ী ছিল। পাশেই দেবদারুর বন থাকায় কাঠ পাওয়া সহজ এবং সেই জন্য গৃহনির্ম্মাণে কাঠের ব্যবহার খুবই বেশী। অধিকাংশ ঘরই দুতলা বা তেতলা, উপরের ছাদ কাষ্ঠনির্ম্মিত। নীচের অংশে (একতলায়) কাঠ রাখা, পশু রাখা এই সব চলে, উপরে বসবাস। শীতকালে এখানে বরফ পড়ে। এপ্রিলের অর্দ্ধেক পার হওয়ার পরেও আমি এখানে যথেষ্ট শীত ভোগ করিলাম। পাহাড়ের উপরের অংশে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে তুষারপাত দেখিয়াছি।

ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও জাগ্রত আছে। প্রতি ঘরের পাশে দেবদারুর স্তম্ভে মন্ত্রযুক্ত ছাপা কাপড়ের ধ্বজা ঝুলান আছে, গ্রামের 'মানী' স্তূপগুলিও সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। প্রতি গ্রামে দু-একটি "গুম্বা" (বৌদ্ধ বিহার বা

মঠ)। সেখানে দু-চার জন লামা থাকেন। গৃহ, লোকজন, ক্ষেত, পশু প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় এই যঙ্গোরা নেপালের অন্য জাতি অপেক্ষা সুখী। ইহাদের ক্ষেত অপেক্ষা মূল্যবান সম্পত্তি ভেড়া ছাগল ও চমরীর পাল। শীতের সময় ইহারা পশুর পাল ঘরে আনে, অন্য সময় যেখানে চরাইবার সুবিধা সেখানেই ইহাদের রাখালের দল কুকুর লইয়া যাযাবরের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। মাখনমিশ্রিত চা ও সত্তু (ছাতু) ইহাদের প্রধান খাদ্য।

আমি এক ভোটীয় (যঙ্গো) গৃহে স্থান লইলাম। এখানে আসিবামাত্রই আমি ভোটীয় চোগা ও জুতা পরিয়া লইয়াছিলাম। পরদিন আমার মিত্র ফিরিয়া গেলেন। শুনিলাম এই গ্রাম হইতে কুতী ও কেরোং চার দিনের পথ মাত্র, উভয় স্থানই তিব্বতের এলাকায়। এখানে ঘুরিয়া বেড়ানোর কোন বাধা ছিল না, সুতরাং দিন কাটাইতাম ঘুরিয়া এবং তিব্বতী পুস্তক পড়িয়া। মাঝে মাঝে ভাগ্য-গণনা করাইবার বা হাত দেখাইবার জন্য লোকে আমার কাছে আসিত। অধিকাংশকেই আমি নিরাশ করিতাম, যদিও ভাগ্যগণনা, মন্ত্রপ্রয়োগ ও ঔষধের ব্যবস্থা এই তিন কার্য্যই এদেশে বিশেষ সম্মানার্হ।

আমি আসিবার তিন দিন পরে ডুক্‌পা লামার শিষ্য ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর দল আসিয়া পড়িল। উহারা বলিল, বড় লামা শীঘ্রই আসিবেন এবং এ খবরও দিল যে এখনও কয়েক হাজার পুস্তক ছাপা বাকী আছে। শিষ্যের দল গ্রাম ছাড়িয়া নিকটস্থ এক গুহায় আস্তানা গাড়ায় আমিও সেইখানেই গেলাম, কেন-না ইহাদের সঙ্গে থাকিলে আমার তিব্বতী ভাষা শিক্ষা সহজ হইবে।

এখানে আসিয়া প্রথমে আমার জ্বর হয়, কিন্তু দুই-তিন দিনে ছাড়িয়া যায়। এখন গুহায় আমার কাজ ছিল সকালে প্রাতঃকৃত্যের পর যে-সময়ে অন্যেরা পুস্তক ছাপা বা কাগজ প্রস্তুত করার কাজে ব্যস্ত থাকিত—সে-সময় "তিবেতন্ মেন্ময়েল" পাঠ। বেলা আটটা নাগাদ "থুক্‌পা" (লেই) তৈয়ার হইত, সকলে তিন-চার পেয়ালা পান করিত, আমিও আমার কাঠের পেয়ালায় থুক্‌পা পান করিতাম। ফুটন্ত জলে ভুট্টা মেড়ুয়া বা জই (ওট্‌স) হইতে প্রস্তুত সত্তু ফেলিয়া পাক করিলেই থুক্‌পা হয়, কখনও কখনও তাহাতে শাকসব্জীও মিশাইয়া দেওয়া হয়, লবণ ত থাকেই। মধ্যাহ্ন-ভোজন—গাঢ়তর সত্তুর পাকের সহিত শাকসব্জী; সাতটার সময় সান্ধ্যভোজন ঐ থুক্‌পা। ভুট্টা ও মেড়ুয়ার সত্তুর ব্যবহারই অধিক প্রচলিত; মেড়ুয়ার সত্তু "গ্যাগর চম্পা" (ভারতীয় সত্তু) নামে পরিচিত; আমি ইহার নামের উপর খুবই টিপ্পনী করিতাম।

এখানে তিন্-জিন্ (সমাধি) নামের এক চার-পাঁচ বৎসর বয়স্ক বালক আমার ঘনিষ্ঠ মিত্র (ভোটীয় ভাষায় "রোক্‌পো") হইল। সে আমাকে ভাষা শিক্ষা ও ভাষা সম্বন্ধে ভুলভ্রান্তি দূর করা এই দুই কার্য্যে সাহায্য করিত। কিছু দিন পরে "গ্যাগর্ চম্পা" খাইয়া আমার 'পেটে চড়া পড়া' অবস্থা হওয়ায় আমি মাখন, চাউল ও যবের সত্তু কিনিয়া আনাইলাম। আমার মাষ্টার মহাশয় সানন্দে আমার একান্নবর্ত্তী হইলেন। জঙ্গলে তখন হিসালু (ষ্ট্রবেরী) পাকিয়াছে, আমি প্রত্যহ তাহারও ব্যবস্থা করায় তিন্-জিন্ মহা খুশী হইত। এই শিশু ডুক্‌পা লামার ধর্ম্মভ্রাতৃ-কন্যার পুত্র ছিল। এক মাস একত্র থাকায় সে আমার বিশেষ স্নেহভাজন হয় এবং যাইবার সময় তাহার জন্য আমায় বিচ্ছেদবাধাও পাইতে হয়।

এখান হইতে বড় কুকুরের উৎপাত আরম্ভ হইল। এই হেতু এখানে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বা রাখালদিগের বাসস্থানে যাওয়া-আসা দুরূহ ব্যাপার। তজ্জন্য আমি এত দিনের মধ্যে গ্রামে মাত্র দুই-তিন বার গিয়াছিলাম, যদিও প্রত্যহই পাহাড়ের উপর-নীচে বহুদূর "টহল" দিয়া ফিরিতাম। ক্ষেতে গম ও জইয়ের ঢেউ খেলিতেছিল, কিন্তু ফসল পাকিতে তখনও এক মাস দেরি। শীতের প্রকোপে এখানে ভুট্টা ও ধান হয় না, আলু যথেষ্ট পরিমাণে হয় কিন্তু তখন সবে বপন শেষ হইয়াছে মাত্র। কোন কোন দিন গত বৎসরের আলু ও মূলা তরকারির জন্য পাওয়া যাইত। ডুক্‌পা লামার শিষ্যদলও ভুট্টা মেড়ুয়ার সত্তু খাইয়া হয়রান হইয়া মাংসের খোঁজ আরম্ভ করিল। এক দিন চার-পাঁচ মাইল দূরের এক গ্রামে একটা বলদ মরিয়াছে খবর আসিল। ইহারা তৎক্ষণাৎ সেখানে চলিল, কিন্তু দাম ছয়-সাত টাকা এবং বলদটি অস্থিচর্ম্মসার দেখায় নিরাশ হইয়া ফিরিল—দলের লোকের পেট ভরিয়া মাংস খাওয়ার ইচ্ছা অপূর্ণই

বুদ্ধমূর্ত্তি-চতুষ্টয়। কাটমাণ্ডব

নেপালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-রমণী

নেপালের কৃষক

নেপালের রোপলাইনের ষ্টেশন

কাঠমাণ্ডুর পথে। কুলীর দল গুরুভার দ্রব্য লইয়া চলিয়াছে

নেপালের একটি ক্ষুদ্র নগরী →
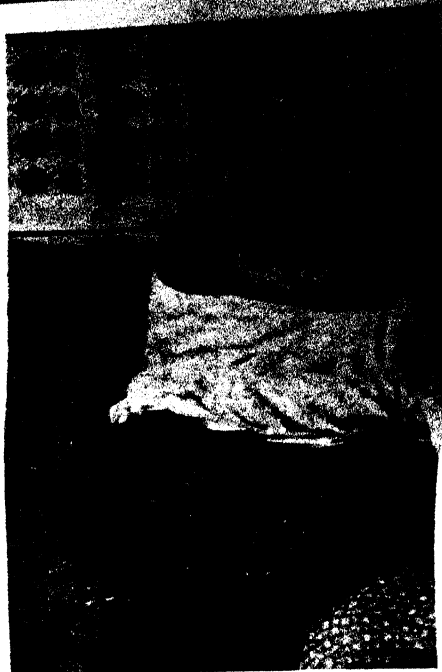
রহিল। শেষে ভুট্টা ভাজিয়া এবং চায়ে মাখন অভাবে সরিষার তৈল ঢালিয়া খাওয়া আরম্ভ হইল। মাখনের বদলে তৈলের ব্যবহার ইহারাই আবিষ্কার করে; শুনিতাম তাহাতে চা বেশ সুস্বাদু হইত। আমি দ্বিপ্রহরের পরে কিছুই খাইতাম না এবং পৃথক ব্যবস্থা করিবার পর আহারের সুখ ছিল।

আমাদের গুম্বা হইতে প্রায় এক মাইল উপরের দিকে, দেবদারুর ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি কুটীর ছিল, এক লামা

অধিরাজ রাজেন্দ্রসিংহ

সেখানে বত বৎ যাবৎ বাস করিতেছিলেন। লামারা এইরূপে প্রায়ই লোকালয়ের বাহিরেই থাকেন এবং ইঁহাদের নির্জন বাসের কাল বৎসর ও দিন হিসাবে নির্দ্দিষ্ট থাকে। শ্বেত বর্ণের কুটীরটি দেখিতে বড়ই সুন্দর ছিল, এক-একবার ইচ্ছা করিত ওখানে গিয়া কিছুদিন থাকি কিন্তু পরেই মনে হইত —"আইথি হরিভজন কো, ওটন লগী কাপাস"—আমার কার্য্যে কোনরূপ চিত্তবিক্ষেপের স্থান নাই।

এই গ্রামের ঠিক উপরে, একটু তফাতে, এক জন "খম্পা" নামা (চীনপ্রান্তস্থ তিব্বতের খম্ প্রদেশের) কয়েক বৎসর যাবৎ বাস করিতেছিলেন। এক দিন ইনি আমাদের গুম্বায় আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করেন এবং আমাকে তাঁহার আশ্রমে লইয়া যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এইখানে আমি আমাদের গুম্বার কিছু বর্ণনা করি:—আমি নীচের তলার প্রধান দেবালয়ে থাকিতাম। আমার সম্মুখেই রক্তপানরতা,

রাণা চন্দ্র বাহাদুর

অস্থিচর্ব্বণকারিণী, জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় রক্তবর্ণচক্ষুযুক্তা মৃন্ময়ী মূর্ত্তি। এই মন্দিরেই অন্য অনেক দেবতা ও লামার মূর্ত্তি ছিল। প্রধান মূর্ত্তি লোবন রিম্পো-ছের—অর্থাৎ গুরু পদ্মসম্ভব। ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে ঐ মূর্ত্তিতে কারুকৌশলের সৌন্দর্য্য এবং কলার লালিত্য ছিল। ছাদ হইতে বহু চিত্র লম্বমান। গুম্বার উপরতলে ছিল কয়েকটি মূর্ত্তি এবং শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার ভোটীয় ভাষায় হস্তলিখিত এক অতি সুন্দর পুঁথি। প্রথমে এখানে এক ভিক্ষু বাস করিতেন, পরে তাঁহার শিষ্য বিবাহ করেন এবং এখন তাঁহার সন্তানগণ এই গুম্বার

অধিকারী। গুম্বার পার্শ্বস্থ দেবোত্তর ক্ষেতের উপরই ইহাঁদের ভরণপোষণ নির্ভর করে। পূজাপাঠে হয়ত আরও কিছু আমদানী হয় কিন্তু তাহাতে বিশেষ ভরসা করা চলে কিনা জানি না।

১২ই মে খম্পা লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি পরম সমাদরে আমায় আপ্যায়িত করিলেন। তাঁহার স্বাগত-সম্ভাষণ "তুমিও বুদ্ধের ভক্ত আমিও বুদ্ধের অনুগত"—আমার কানে এখনও বাজিতেছে। লামা ন্যুমা (উপবাস-ব্রতে) ব্রতী

কাঠমাণ্ডবের পথে

অর্থাৎ প্রথম দিনে অনিয়মিত আহার ও পূজা, দ্বিতীয় দিন দ্বিপ্রহরের পরে না খাইয়া পূজা ও তৃতীয় দিনে নিরাহার অবস্থায় পূজা, উপরন্তু প্রতি দিন সহস্র দণ্ডবৎ—ইহাই তাঁহার নিয়ম। এই অবলোকিতেশ্বরের ব্রতের উপর লোকের বিশেষ আস্থা আছে, খম্পা লামার সঙ্গে অনেক শ্রদ্ধাশীল স্ত্রীপুরুষ এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে আসে। লামা ঝাড়ফুঁকও কিছু জানেন, সুতরাং এতাদৃশ লোকের কোন বিষয়ে অনটন থাকিতে পারে না। রাত্রে আমি খাই না কিন্তু উনি সাগ্রহে মাখনযুক্ত চা প্রস্তুত করিয়া আমায় পান করাইলেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ভোট-দেশ ও তথাকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হইল। লামা আমাকে খম্ দেশে যাইতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিলেন। সে রাত্রি ওখানেই থাকিলাম।

পরদিন তাঁহার উপবাস ছিল কিন্তু তিনি স্বহস্তে চাউল ও আলুর তরকারি রন্ধন করিয়া আমাকে পরম সন্তোষের সহিত খাওয়াইলেন। ভোজনান্তে মধ্যাহ্নের পর আমি নিজেদের গুম্বায় ফিরিলাম। সেই দিনই সন্ধ্যাকালে ডুক্‌পা লামার বাকী শিষ্যদল এখানে পৌঁছিলেন। তাঁহাদের নিকট শুনিলাম, ডুক্‌পা লামা কাঠমাণ্ডব হইতে সোজা কুতী রওয়ানা হইয়াছেন, এদিকে তাঁহার আসিবার সম্ভাবনা নাই। ডুক্‌পা লামা এখন জীবনের শেষভাগে ভোটীয় সিদ্ধপুরুষ ও কবি জেৎসুন-মিলা-রেপার সিদ্ধস্থান লপ্‌চীতে যাপন করিতে যাইতেছেন শুনিয়া শিষ্যমণ্ডলীর অনেকেই ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। আমার ত বিষম সমস্যা, দুই মাস তাঁহার আশায় থাকিবার পর এই দারুণ নৈরাশ্যজনক সংবাদ। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তিনি আমার সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। বস্তুতঃ এ-সংবাদে আমার মনে বিশেষ বিক্ষোভ হওয়ার কথা, তবে এত দিনে আমি ভোটীয় স্বভাবের কিছু পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমি তন্মুহূর্ত্তেই স্থির করিলাম পর-দিনই আমিও কুতী রওয়ানা হইব এবং পথে তাঁহাকে ধরিব। সঙ্গে যাইবার জন্য এক জন সাথী প্রয়োজন। শুনিলাম এই সময় বৎসরের জন্য লবণ সংগ্রহ করিতে বহু লোক কুতী যায় এবং দু-চার দিন অপেক্ষা করিলে সঙ্গী নিশ্চয় জুটিবে। কিন্তু আমাকে ডুক্‌পা লামার সঙ্গে সীমান্ত পার হইতে হইবে, সুতরাং অপেক্ষা করা বিপজ্জনক।

রাত্রি পর্য্যন্ত কোন লোকের ব্যবস্থা হইল না। এই গুম্বারই এক যুবক কুতী যাইবে শুনিলাম—কিন্তু তাহার ক্ষেতের ফসল কাটিবার পর। এই প্রকার অনিশ্চয়তার মধ্যেই আমাকে সে রাত্রির মত নিদ্রার চেষ্টা দেখিতে হইল।

(ক্রমশঃ)

ব্রতচারীর ব্রত

শ্রীসরলা দেবী চৌধুরাণী

রায়বেঁশে নৃত্যের লুপ্তোদ্ধার করেছেন দত্ত-মশায়, এই প্রথমে জানি। তার পরে ব্রতচারী নামে কতকগুলি প্রাচীন নৃত্য-প্রচারপ্রধান একটা অনুষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে, তা শুনি। তারও পরে শিক্ষক-সমিতির উৎসবে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়, সেই নৃত্যগুলি দেখি। নাচের সঙ্গে সঙ্গে যে-গান হচ্ছিল দূর থেকে তার কথাগুলো ভাল ধরতে পারি নি, কিন্তু বাঙালী যুবক ও প্রৌঢ়দের নৃত্যের ছাঁদে, আমোদের রসে মিশ্রিত সাবলীল ব্যায়ামভঙ্গিমা দেখতে খুব ভাল লেগেছিল।

বাঙালী সমাজে—কি উচ্চ কি নীচের স্তরে, নৃত্য জিনিষটা একেবারে উঠে গিয়েছিল। 'নৃত্য' কথাটা 'নেত্য' শব্দে পরিণত হয়ে একটা হাসির, ঠাটার, বিদ্রূপের, তাচ্ছিল্যের, ঘৃণার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ কয়েক বৎসর ধ'রে শিল্পজগতে নৃত্যকলাটির পুনরুদ্বোধনে নিবিষ্টচিত্ত হয়ে সার্থকতা লাভ ক'রে আসছিলেন। উদয়শঙ্কর রঙ্গমঞ্চে নেমে সেটা আরও ব্যাপ্ত করলেন। কিন্তু তখনও নৃত্যটি উচ্চ কলার ঘরে রইল, সাধারণের নিত্য ব্যবহারের বস্তু হ'ল না।

এই সময় এলেন গুরুসদয় দত্ত। এই মানুষটির ধাতে লোকহিতৈষণা ব'লে একটা জিনিষ নিহিত আছে। বাংলায় সিভিলিয়ান ত আরও কত বাঙালী হয়েছে। জেলায় জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেটি ক'রে জেলার গণ্যমান্য থেকে নগণ্য চাষাভূষা সকলের সংস্পর্শে আসার সুযোগ কত জনের হয়েছে। কিন্তু সে সুযোগকে বরণ ক'রে নেওয়া, নিয়ে সেটা তাদেরই উপকারে লাগান—এ রকম প্রবৃত্তি ক'টা লোকের দেখা যায় ?

স্ত্রীবিয়োগ হয় অনেক লোকের, কিন্তু সেই স্ত্রীবিয়োগ-জনিত শোকে দেশময় স্ত্রীজাতির কল্যাণসাধক প্রতিষ্ঠান খোলে ও খোলায় ক'টা লোকে ? এই রামোপম স্বামীর জীবনে প্রকৃতপক্ষেই হয়েছে—

> সঙ্গে সৈব তথৈকা বিরহে তন্ময়ং ত্রিভুবনম্।

একটা অফুরন্ত প্রাণের আবেগ এই লোকটির মধ্যে পাওয়া যায়। সেই প্রাণ প্রথমে তার নিকটতম প্রিয়তম আত্মীয়ের স্মৃতি অবলম্বন ক'রে আপনাকে ছড়ালে। তার পর সেই প্রাণ আরও ব্যাপকভূমি গ্রহণ করলে নিজের বিস্তৃতির জন্য। তাই রায়বেঁশে নৃত্যের আবিষ্কার শুধু নৃত্যপ্রচারেই তৃপ্ত থাকতে পারলে না। সেই নৃত্যকে কেন্দ্র ক'রে, একটা বৃহৎ আদর্শকে জীবন্ত ক'রে তুললে—সেটি বাঙালীকে মানুষ ক'রে তোলা।

রবীন্দ্রনাথ একদিন ক্ষোভভরা হৃদয়ে মাতৃভূমিকে বলেছিলেন—

> সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধা জননী,
> রেখেছ বাঙালী ক'রে, মানুষ কর নি।

আজ গুরুসদয় দত্ত কবির সেই ক্ষোভ মিটানর জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন, তাই তাঁর নৃত্যচর্চ্চা একটা ব্রতর ছাঁচে পড়ে গেল। আর 'রায়বেঁশে', 'রায়বেঁশে' শোনা গেল না, 'ব্রতচারী' 'ব্রতচারী' শোনা গেল।

'ব্রতচারী'-প্রগতির বাইরের শরীরটা হচ্ছে কতকগুলি নৃত্য, কিন্তু তার ভিতরের আত্মা হচ্ছে কতকগুলি ব্রত।

একটা ভাবের ক্ষ্যাপা, একটা ভাবের পাগল না জাগলে যে দেশের ধাত বদলাতে পারে না, দেশের মরা ও আধমরা যুবা বুড়োকে, ছেলেমেয়েকে জ্যান্ত ক'রে তুলতে পারে না, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এক অদৃশ্য গুরু যাঁর প্রেরয়িতা, সেই গুরুসদয় তাঁর প্রাণের আবেগে দ্বিধাসঙ্কোচ, বাধাবিপত্তি, লজ্জাসরম কিছু জানেন না, কিছু মানেন না।

তিনি মানুষ-গড়ার গুরু, তাই বাণীর কমলবন ছিঁড়ে-ছুঁড়ে যেখান থেকে দুটো কথা সংগ্রহ করা যায় তাই ক'রে তাঁর কাজ উদ্ধার করতে হবে। যখন ভদ্রলোকের ছেলের হাতে কোদাল ধরাতে হবে, তাদের দিয়ে কচুরিপানার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধন করতে হবে, বাপের অন্ন ধ্বংস করবে না, রোজগারের আগে বিয়ে করবে না প্রভৃতি নানা রকমের মনুষ্যোচিত পণ তাদের লওয়াতে হবে, তখন ছড়া-সাহিত্যের বেশী উর্দ্ধে উঠতে যাওয়ার চেষ্টা করা তাঁর নিষ্প্রয়োজন।

পণগুলি বা ব্রতগুলি অস্থিমজ্জাগত ক'রে দেবার জন্যে জপের মত সে ছড়াগুলি বারম্বার আওড়ান বিশেষ ফলপ্রদ। আবার প্রত্যেক প্রতিজ্ঞাটা দেখছি সূত্রাকারে তার আরম্ভের অক্ষরের দ্বারা স্মৃতিতে গেঁথে দেওয়া হচ্ছে। অনেকের কাছে ছেলেখেলা হ'লেও আমরা যারা মন্ত্রবাদী, একাক্ষর বীজ-মন্ত্রে বিশ্বাসী—তারা এর মর্ম্মগ্রাহী। যেখানে যেখানে বাঙালী ছেলেমেয়ে ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, সেখানে সেখানে এই মন্ত্রগুলি নিত্য জপ ও নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান যে দেশের মানসিক হাওয়া বদলে দেবে সে-বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই।

রাগ-সন্ধ্যা

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঘন লাল রঙে মগন সন্ধ্যা-গগন
অনুরাগ-বাণী বলার এই ত লগন,
হাতে কোন্ কাজ ?
রাখ তুলে আজ।
কাজ নেই নব সাজে
হের বিবশ সন্ধ্যা-গগন সূর্য্য-চুম্বনে রাঙা লাজে।

অন্তর তব এখনো ভাবনা মগন ?
গগনে জেগেছে দুঃসাহসের লগন !
ঘন নিঃশ্বাসে
মাটির সুবাসে
ভাসে ধরণীর ভাষা,—
তার দিবসের দূর আকাশেরে সাঁঝে কাছে লভিবার আশা।

সন্ধ্যা-প্রদীপ সন্ধ্যা-তারকা,—দু-জন
মনে মনে করে কোন্ প্রিয়তমে পূজন ?
দূরে কেন প্রিয়া ?—
হাতে হাত দিয়া
এস বসি কাছে ঘেঁসে
ওগো এখনো উদার গগনে হাজার তারকা ওঠে নি ভেসে।

দূরে কেন সখী ? এক হয়ে মিশে যাবার
অবসর কবে হবে এ-জীবনে আবার ?
দুটি হৃদয়ের
বাসনা ত ঢের
বাসি হ'ল পলে পলে
সখী ! আজি সন্ধ্যার কামনাটুকুরে ঘিরে রাখ অঞ্চলে।

আঁধারে ধরণী উদাসী নয়নে তাকায়
বাতাসের ভীরু পরাণে কাঁপন জাগায় ;
তোমার মনের
প্রতিবিম্বের
ছবি সেই ধরণীর,
হেথা আকাশের রাঙা শোণিতে আমার প্রতি শিরা ধমনীর।

হের দূরে গাছ কঙ্কালসার আকার,
ক্ষুধাতুর ক্রূর কালো কালো তারি শাখার
আঙুলের চাপে
থেকে থেকে কাঁপে
আকাশের রাঙা হিয়া,
হের অঞ্জলি ভরি দুঃসাহসী কে আগুন ধরেছে প্রিয়া !

তোমারে ভুলেছি ভিড়েতে হাজার কাজের—
—দিবা অবসানে শুভ অবসর সাঁঝের,
যেন এইবারে
ভুলি আপনারে
একেবারে নিঃশেষে,
সেই বিস্মরণের বুকে তুমি জাগো চির-স্মরণের বেশে।

সূর্য্য-গলানো গাঢ় লালে লাল গগন
অনুরাগ-বাণী বলার এই ত লগন।
স্তব্ধ ধরণী
উঠিবে এখনি
লক্ষ আলোকে জেগে,
সখী, পরাণের লাল পলকে মিলাবে রাত্রির কালো লেগে॥

নোংরা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

হাবুল মফস্বল কলেজ হইতে বি-এ পাস করিয়া কলিকাতায় এম-এ পড়িতে আসিতেছে। জোড়াসাঁকোয় তাহার কাকার বাড়ী, কয়েক দিন থেকে সেখানে একটু সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বউয়ে-ঝিয়ে, ছেলেমেয়েয় পরিবারটি একটু বড়, সতর্কতা সত্ত্বেও একটু অপরিচ্ছন্নতা আসিয়াই পড়ে। গৃহিণী বলিতেছেন, "আমি উদয়াস্ত খিট্ খিট্ ক'রে হার মানলাম, এইবার তোমরা জব্দ হবে।—সে তেমন-শুচিবেয়ে-ছেলে নয়, একটু কোথাও ময়লা দেখলে হুলস্থূল কাণ্ড বাধাবে!…"

বধূ, নিজের দুরন্ত ছেলেমেয়ে দুটি আর ছোট দেওর ননদগুলিকে খেলায়ধুলায়, সাজেগোজে পরিচ্ছন্নতায় অভ্যস্ত করিতেছে; একটু এদিক-ওদিক হইলেই শাসাইতেছে, "ঐ:, গাড়ীর শব্দ; দেখ্ ত র্যা,—বোধ হয় হাবুল ঠাকুরপো এল.." শিশুমহলে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ায় বেশ সুফলও পাওয়া যাইতেছে।

স্কুলগামী ছেলেমেয়ে পাঁচটি। তাহারা পড়ার ঘরদুয়ার ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া, বইয়ে শাদা কাগজের মলাট দিয়া, এক প্রকার সশঙ্ক আগ্রহের সহিত হাবুলের প্রতীক্ষা করিতেছে; ওদিকে তাহাদের স্কুলে পর্য্যন্ত হাবুলদাদার অলৌকিক পরিচ্ছন্নতার সংবাদ প্রচার করিয়া সেখানেও একটু বিস্ময়ের গুঞ্জন তুলিয়াছে। বড় মেয়েটি আবার একটু বেশী কল্পনা-প্রবণ,—চোখমুখ কুঞ্চিত করিয়া সহপাঠিনীদের বলিতেছে, "এত্তোটুকু ধুলো কি বালি একটু দেখুক্ দিকিন্ হাবুলদাদা তোমার গায়ে,—এই একরত্তি…হুঁ মশাই!…"—পরিণামটুকু তাহাদের কল্পনার উপর ছাড়িয়া দিয়া আরও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিতেছে।

ঠিক এতটা না হইলেও ছেলেটি এ-বিষয়ে একটু বাতিক-গ্রস্ত বটে। আসিল,—দিব্য ফিট্‌ফাট; ট্রেনে, জাহাজে যে এই বারোটি ঘণ্টা কাটাইয়া আসিল চেহারায় তাহার চিহ্ন খুবই কম, পরিচ্ছদে নাই বলিলেও চলে, জুতা জোড়াটি পর্য্যন্ত কখন এরই মধ্যে কেমন করিয়া ঝাড়িয়া ঝক্‌ঝকে করিয়া লইয়াছে।

ব্যাগটা রাখিয়া, কাকীমাকে প্রণাম করিতে ঝুঁকিয়া হঠাৎ একটু পাশে সরিয়া গেল। বলিল, "একটু স'রে এস এদিকে কাকীমা, একটু যেন নোংরা ওখানটা।"

ছেলেমেয়েরা সসম্ভ্রম কৌতূহলে এক স্থানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বড় মেয়েটি আগাইয়া গিয়া চারিটি আঙুল দিয়া জায়গাটা মুছিয়া দেখিল—একটু জলের সঙ্গে সামান্য একটু যেন ময়লা। সরিয়া আসিয়া, চোখ বড় করিয়া আর সবাইকে দেখাইয়া—সেটুকু কাগজে মুড়িয়া রাখিতে গেল, সহপাঠিনীদের দেখাইবে—হাবুলদার প্রমাণ!

হাবুল প্রশ্ন করিল, "বৌদি কোথায় কাকীমা? সেই দাদার বিয়ের সময় দেখেছিলাম। সামনে আসতে লজ্জা হচ্ছে না কি তাঁর?"

বৌদিদি সেভাবের উৎকট রকম লাজুক নয়। রান্না-ঘর থেকে হাত মুখ মুছিয়া আসিতেই ছিল, মাঝপথে ননদের সপ্রমাণ রিপোর্ট পাইয়া, ফিরিয়া গিয়া একবার আরশিটা দেখিয়া লইতেছিল। একটু দেরি যে হইয়া গেল তাহার কারণ সুন্দরী স্ত্রীলোকের আরশির সামনে দাঁড়াইলে একটু দেরি হইয়া যায়ই। শাশুড়ীর ডাকে আসিয়া হাজির হইল। একটি মিষ্ট হাসি দিয়া দেবরকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, "এস ভাই, ভাল আছ ত?"

"মন্দ নয়"—বলিয়া হাবুল পায়ের ধুলা লইল, এবং সত্যই ধুলা লাগিয়াছে কিনা একবার ত্বরিতে দেখিয়া লইয়া, হাতটা কপালে ঠেকাইয়া হাসিয়া বলিল, "ভাগ্যিস্ কাকীমা ডেকে দিলেন, নইলে মোটে আছি কিনা সে-খোঁজই নিতে বড়…অন্যায় ব'ললাম কাকীমা?"

কাকীমা হাসিয়া বলিলেন, "ঐ, আরম্ভ করলি। উনি ত এসেছিলেনই বাপু।"

বৌদিদি বলিল, "না ভাই, আমি এক টেরেয় ওদিকে

একটু কাজে ছিলাম; কেউ এলে-গেলে ওদিক থেকে টের পাওয়ার জো নেই…''

"কাজ, রন্ধন ত?"

"পেটুকের জাত তোমরা শুধু ঐটেকেই চেন বটে, কিন্তু তা ভিন্ন আমাদের আর কাজ নেই নাকি?"

"আঁচলের কোণে মসলার ছোপ লাগবে আর কোন্ কাজে?"

বধূ লজ্জিতভাবে আঁচলের দিকে চাহিয়া মুখ নীচু করিল; এত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও অপযশটুকু লাগিয়াই গেল।—আচ্ছা চোখ ত!

ননদ আসিয়া পাশ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গোপনে আঁচলটা তুলিয়া ধরিয়া বধূর দিকে চাহিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "ইস্, আমাদের ত চোখেই পড়ে না!

হাবুল বলিল, "তা হোক্, তোমার বউ কিন্তু কাকীমা ছেলেমেয়েগুলিকে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখেছে।"

কাকীমা বলিলেন, ''তা বলতে নেই বাপু, সেদিকে বেশ নজর আছে।"

স্বীয় প্রশংসায় একটু সঙ্কুচিত হইয়া বধূ বলিল, "দাঁড়াও যশ কত ক্ষণ টেকে দেখ।"

ছোটদের মধ্যে মৃদু একটু চাঞ্চল্য পড়িল,—তাহাদের প্রশংসা হইতেছে! ও-জিনিষটা তাহাদের বরাতে সচরাচর জোটে না। এক জন নিজের পরিষ্কার জামাটির উপর হাত বুলাইয়া নূতন করিয়া একটু ঝাড়িয়া লইল। দেখাদেখি পাশেরটিও তাহাই করিল এবং ক্রমে পদ্ধতিটা সংক্রামক হইয়া উঠিল। একটি ছোট মেয়ের হাতে একটি ধূলিমলিন পেয়ারা লুকান ছিল। সেটি সে তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দিল এবং দেহ ও পরিচ্ছদ দুইটিই পরিষ্কার রাখিবার উৎসাহে ফ্রকের মাঝ-বরাবর হাতটা বেশ ভাল করিয়া টানিয়া লইল। ইহাতে যখন সকলে হাসিয়া উঠিল মেয়েটি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়া বধূকে জড়াইয়া তাহার হাঁটুদুটির মাঝখানে মুখটা গুঁজিয় দিল।

"ছাড়্, আমার কাপড়ও খাবি এই সঙ্গে" বলিয়া বধূ মেয়েটিকে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য না-হওয়ায় দেবরের দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখলে ত—সোজা এই ভূতপেত্নীদের সঙ্গে পরিষ্কার হ'য়ে থাকা ঠাকুরপো?—বলছ ত…" অতি পরিচ্ছন্নতাটা যে এ-বাড়ীর স্বাভাবিক অবস্থা নয় হাবুল সেটা বুঝিতে পারিয়াছিল এবং এটাও আঁটিয়া লইয়াছিল যে তাহারই পরিচ্ছন্নতা-বাতিকের জন্য পরিবারটি একটু সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। মনে মনে একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "তা তোমার এত পরিষ্কার-বাই তা আমার জানা ছিল না বৌদি। দাদার ছোট মেয়ে বুঝি ওটি?…এস ত আমার কাছে, মা তোমার মেমসাহেব, নেবে না।"

ভাজ ব্যস্তভাবে মানা করা সত্ত্বেও মেয়েটিকে বুকে তুলিয়া লইল। ছেলেরা যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল—এত বড় অঘটন তাহারা জন্মে দেখে নাই!

কাকীমা বলিলেন, "ওরে ওর জুতোর ধুলোয় তোর জামাটা গেল হাবু, নামিয়ে দে। ওমা!—তোর সে অমন শুচিবাই গেল কোথায়?"

হাবুলের সমস্ত শরীরটা ঘিনঘিন করিতেছিল, মরিয়া হইয়া মেয়েটির পেয়ারা-চিবান মুখে একটা চুম্বন দিয়া বলিল, "সে-সব চিরকাল থাকবে নাকি কাকীমা?—সে ছিল একটা রোগ, যখন ছিল তখন ছিল।"

বড় মেয়েটি একটু নিরাশ হইয়া পড়িল,—হায়, তাহার পূজার প্রতিমার ভিতরে খড়!

২

হাবুল দিন-পাঁচেক কোন রকমে যথাসম্ভব আত্মগোপন করিল, তাহার পর নবাগমনের সঙ্কোচটা কাটিয়া গেলে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল।

কলেজ হইতে আসিয়াছে। হাত মুখ ধুইয়া, মাঝে মাঝে নাক উঁচু করিয়া, শরীরে, কাপড়ে, কিংবা ঘরে কোথায় অতিসূক্ষ্ম ময়লা আছে তাহাই উপলব্ধি করিতেছিল। খুড়তুত বোন শৈল—সেই স্কুলের ছাত্রী বড় মেয়েটি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ''চা আনব দাদা?''

"তোর নখ দেখি।"

শৈল হাত দুটি উপুড় করিয়া সামনে ধরিল। ঘটনাক্রমে নখ ছিল না, শৈল আজই ক্লাসে বসিয়া দাঁতে খুঁটিয়া শেষ করিয়াছে। হাবুল বলিল, "যাও; জেনে রেখ নখের ময়লা বিষ; পেটে গেলে…''

শৈল বলিল, "তা জানি,—মরে যায় লোকে।"

ভগ্নীর স্বাস্থ্য-জ্ঞানটা তাহার চেয়েও এত উৎকট রকম প্রবল দেখিয়া হাবুল হঠাৎ কিছু বলিতে পারিল না। একটু থামিয়া বলিল, "হুঁ...জার্ম্ কাকে বলে জান ?—রোগের বীজাণু !"

শৈল ভাবিতে লাগিল।

"কিসে এক জনের শরীর ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে, আর স্থবিধে পেলে তাকে মেরেও ফেলে অন্য জনের শরীরে রোগ নিয়ে যেতে পারে !"

শৈল আর একটু ভাবিল, তাহার [illegible] দেওয়া-গোছের করিয়া বলিয়া উঠিল—[illegible]পারে !"

হাবুল বিরক্ত হইয়া বলিল, "কো[illegible] তোমাদের হাইজিন্ পড়ান !...জার্ম্ এক রকম খুদে পোকা, এত ছোট যে একটা স্থচের ডগায় লক্ষ লক্ষ [illegible]তে পারে; তারা কত রকম রোগ ছড়িয়ে বেড়ায়, বুঝে ?...এখন, এদের থেকে বাঁচতে হ'লে আমাদের কি ক'রতে হবে ?"

"স্থচ কিনব না।"

"পরিষ্কার থাকতে হবে, কেন [illegible]লো কাদা, পচা জিনিষ এই সব নানান রকম ময়লাতে [illegible]র জন্ম আর বৃদ্ধি।... টিটেনাস্ কাকে বলে জান ?—ধনুষ্টঙ্কার !"

"অর্জ্জুনের...!"

"না, না; অর্জ্জুনের ধনুর নয়; সে এক রকম রোগ।...যা, চা-টা নিয়ে আয়..."

দেরি হইয়া যাইতেছে দেখি বৌদিদি নিজেই চা লইয়া আসিল। হাবুল বলিল, "এরা সাধারণ রোগের নাম পর্য্যন্ত জানে না, এরা পরিষ্কার থাকা মানে কি বুঝবে বল ত বৌদি ! কাজেই, তুমি সর্ব্বদা খড়্গহস্ত হয়ে থাকলেও কোন ফল হচ্ছে না। আমি ঠিক করেছি এদের সবাইকে একত্র ক'রে আমি রোজ বিকেলে খানিকটা ক'রে লেকচার দেব।...শৈল সবাইকে ডেকে আনবি।

বৌদিদি বলিল, "রোগের নাম মুখস্থ করবার জন্যে ?"

"শুধু রোগের নাম কেন ?—সৌন্দর্য্যের দিক থেকেও ত পরিষ্কার থাকার একটা মূল্য আছে ! ঐ, ঐ দেখ না, তোমার জ্যেষ্ঠ রত্নটি—এই একটু আগে কেমন ফুটফুটে দেখাচ্ছিল—ভূত সেজে এল দেখ না।...শৈল, যা, ওকে বাইরেই ঝেড়ে ঝুড়ে নিয়ে আয়; যা, যা; এক্ষুনি এসে ওর মাকে জড়িয়ে ধরবে।"...

"এদের রোগের কথা ব'ললে কি বুঝতে পারবে ?—এদের বলতে হবে বিশ্রী দেখায়।..."

"নাও, তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে লেকচার শুনিয়া বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল, এবং হাবুলকে কেন্দ্র করিয়াই ব্যাপারটা চলিতে লাগিল বলিয়া তাহার দুর্ভোগটা বাড়িল বই কমিল না। ছেলেদের মধ্যে, কোন্ রকম ময়লায় কি জার্ম্ বৃদ্ধি পায় সেই লইয়াই তর্ক হয়; ময়লার আধারটি—[illegible] ছাতা-ধরা কোন জিনিষ হাবুলের নিকট হাজির হয়। সময় কি নাই অসময় নাই প্রায়ই দুই-তিন জনে মিলিয়া এক জনকে ধরিয়া হাজির করিতেছে—কাপড়ে কি শরীরে কোথাও একটু ময়লা আছে—হাবুলের কাছে বামালসুদ্ধ নালিস। হাবুলের পড়ার ও ক্ষতি হইতেছে, তাহা ভিন্ন এই সব টানা-হিঁচড়ানিতে তার ঘরের পরিচ্ছন্নতাও কিছু বৃদ্ধি পায় না। সে আশা করিতেছে এদের অজ্ঞতাটা দূর হইলে এবং সৌন্দর্য্যের জ্ঞানটা একটু ফুটিলে সব ঠিক হইয়া যাইবে; ওদিকে আক্রোশের ভাবটা বাড়িয়া যাওয়ায় ওরা সব ক্রমাগতই পরস্পরের জামা-কাপড় নানা ফন্দীতে নোংরা করিয়া মোকদ্দমা-সাজানয় হাত রপ্ত করিতেছে।

একমাত্র শৈল সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। সে দাদাকে দেবতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, দেবতার মতই তাহাকে সুদূরে রাখিয়া সসম্ভ্রম পরিচ্ছন্নতার সহিত পূজা করিতেছে, যত রকম ময়লায় যত রকম রোগ হইতে পারে অবিচল নিষ্ঠার সহিত তাহাদের নাম মুখস্থ করিতেছে, এবং তাহার দেবতার প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটিগুলিকে কল্পনা এবং ভাষায় মণ্ডিত করিয়া তাহার কয়েকটি মুগ্ধ সহপাঠিনীদের মধ্যে ভাগবতরস বিতরণ করিতেছে।

এদিকে সংবাদ এই; ওদিকে কাকা এবং হাবুলের খুড়তুত বড় ভাই ভিতরে ভিতরে চিন্তান্বিত হইয়া উঠিতেছিলেন; অবসরমত দু-জনের মাঝে মাঝে এই সমস্যা লইয়া পরামর্শও হইতেছিল। অবশেষে একদিন কাকা বলিলেন, "হাবুল, তুই দেখতে পাচ্ছি পাড়ার স্যানিটারি ইন্‌স্পেক্টার দাঁড়িয়ে

গেছিস্, এ ত কাজের কথা নয়। একটা বছর বাদে তোকে অমন শক্ত এগ্জামিন দিতে হবে,—তুই লেখাপড়া করবি কখন? আমি বলি তুই তেতলার কোণের ছোট ঘরটা নে। দিব্যি নিরিবিলি ঘর; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভাল বাসিস্—সেখানে কোন রকম বালাই জুটবে না।"

হাবুল বলিল, "তা বেশ, কিন্তু এদের আমি অনেকটা ঠিক ক'রেও এনেছিলাম কাকা।"

বারান্দার ও-কোণে বড় নাতিটির আবির্ভাব।—বাঁ-হাতে একটা সাবান, ডান বগলে একটা ভিজা বিড়ালছানা ছটফট্ করিতেছে। কাকা সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তা দেখছি।...যাক, তুই [illegible] ...কে ব'লে [illegible] আলমারি, টেবিল সব দিয়ে আসুক্।"

৩

কাকার প্রতি একটু রাগ হইল, কিন্তু উপরে গিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটুকু কাটিয়া গেল। মাঝারি-গোছের ঘরটি, সামনে প্রশস্ত তেতলার ছাদ। সকালের ঝোঁকে হাবুল সমস্ত স্থানটি চাকর আর ভক্ত শৈলর সাহায্যে ঝক্‌ঝকে তকতকে করিয়া লইল, এবং কলেজ হইতে ফিরিয়া যখন দেখিল যেখানকার যেটি, অনাহত শ্রীতে ঠিক সেইখানেই বিরাজ করিতেছে, ঘরের কোণে যত্ন করিয়া সঞ্চিত ভিন্ন ভিন্ন জাতের আধার জড় করা নাই, এবং বিছানার উপরও কোনও শিশু হাবুলকে নিজের সৌন্দর্য্য এবং পরিচ্ছন্নতা দেখাইবার আগ্রহে জুতার ফিতা বাঁধিতেছে না, তখন সে সত্যই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

দু-দিন পরে আরও একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার চোখে পড়িল। ছেলেমেয়েগুলি প্রকৃতই যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। হাবুল যে উপরে আছে এবং যে-কোন মুহূর্ত্তেই নামিয়া আসিতে পারে এই ধারণাটিতে অনেক বেশী কাজ হইতেছে। মোট কথা, সে নাই বলিয়াই একটি অটল গাম্ভীর্য্যের কাল্পনিক মূর্ত্তিতে সবার সামনে বিরাজ করিতেছে। আহারের জন্য, কিংবা কলেজ হইতে আসা কি কলেজে যাওয়ার সময় যখন সবার প্রত্যক্ষ হয়, তখন সবাই সসম্ভ্রমে দৃষ্টি নত করিয়া তটস্থ হইয়া থাকে।

দেবতারা দূরে থাকিয়া বৎসরে এক-আধ বার আমাদের মধ্যে আনাগোনা করেন এই বন্দোবস্তই ভাল,—আমাদেরই এক জন হইয়া থাকিলে উভয় পক্ষেরই অনিষ্টের সম্ভাবনা।

বাড়ীর বাহিরেও হাবুলের যশ এই অনুপাতেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সর্ব্বদা দেখা যায় না বলিয়া ছেলেমেয়েদের কল্পনায় কিছু আটকাইতেছে না। শৈলকে কোন সখী প্রশ্ন করিলে শৈল অতিমাত্র গম্ভীর হইয়া বলে, "নীচেতেই তিনি ভারি থাকেন কি না আজকাল।..."

"তুই যাস না ওপরে?"

"রক্ষে কর ভাই; ত্রিসীমানার মধ্যে পা দেওয়ার জো আছে?"

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়।—তেতলার ছাদে, সিঁড়ির ঘরের সঙ্গে লা আর একটি ঘর আছে। আকারে ঠিক চতুষ্কোণ নয় কটা গিয়া একটা ফালি বাঁকিয়া গিয়াছে, ঘরটা দাঁড়াইয় উলটান ইংরেজী L-অক্ষরের মত। পূর্ব্বে কাঠকুটা থত; সম্প্রতি শৈল এটি দখল করিয়াছে। ছাদের এ কোণ তাহার ঘর, মাঝে পনর-ষোল হাত জায়গা, তাহার পর বুলের ঘরটি।

শৈলর সহসা উ উঠিয়া আসার কারণটা বুঝিয়া ওঠা যায় না;—হইতে প সে পরিচ্ছন্নতাসূত্রে হাবুলদাদার সহিত একটা সম-আত্মতা অনুভব করে বলিয়া একই স্তরে থাকিতে চায়; হত পারে তাহার পুতুলের সংসার বাড়িয়া গিয়াছে, এব নীচে দুইটি ভাইপো এবং ছোট বোনটির লোলুপ দৃষ্ট এড়ান ক্রমেই সুকঠিন হইয়া উঠিতেছে। মোট কথা, সদের নিকট যাহাই বলুক, শৈল সমস্ত দুপুরটা আজকাল পরেই—হাবুলের ত্রিসীমানার মধ্যেই কাটায়। তবে এটা হয় খুব লুকাইয়া,—হাবুলকে ব্যাপারটা জানান হয় নাই। তাহার কারণ বলিতে গেলে শৈলর খেলাঘরের সঙ্গিনী নৃত্যকালীর কথা পাড়িতে হয়।

প্রথমতঃ শৈলর সহিত নৃত্যকালীর সখিত্বটা সম্ভব হইল কি করিয়া সে-ই একটা সমস্যা সেটাকে নিতান্ত একটা আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া ধরিয়া লইলেও হাবুলের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্তির পরও সখিত্ব যে কি করিয়া বজায় আছে—সে ত একেবারেই দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয়।

মেয়েটি যৎপরোনাস্তি নোংরা। সমস্ত অবয়বটি

ধুলামাটিতে এতই প্রচ্ছন্ন যে তাহার আসল রংটি যে কি বলা একটু কঠিন। আত্মীয়েরা কুণ্ঠিত ভাবে বলে—শ্যামবর্ণ, যাহাদের নিন্দায় স্বার্থ আছে তাহারা প্রমাণ করিয়া দেয়——কালো। মাথাটা একটা আগাছার জঙ্গলের মত—চুল খুব ঘন, কিন্তু যত্নের অভাবে বাড় নাই। কোঁকড়ান কোঁকড়ান একরাশ স্তবক পরস্পরের সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া পিঠের অর্দ্ধেকটা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। খোঁপা হয় না, তবে কালেভদ্রে ঘাড়ের উপর অর্দ্ধচন্দ্রাকারের দুইটা টানা সুপুষ্ট বেড়াবেণী দেখা যায়। দু-এক দিন থাকে, তাহার পর কখন্ গ্রন্থি খুলিয়া গিয়া বিশৃঙ্খল ভাবে এলাইতে এলাইতে আবার আগেকার অবস্থায় ফিরিয়া আসে। দেখিলে মনে হয়, মাথার পিছনে কবে কি হইতেছে মেয়েটির সে লইয়া মোটেই মাথাব্যথা নাই।

সারাদিন খেলায় মত্ত থাকে, আর ফলপাকড়ের অত্যন্ত ভক্ত, এবং খেলা ও দুনিয়ার ফলপাকড় হইতে আহৃত ধুলা, কাদা, রসকষ প্রভৃতি শত রকমের নোংরা সব হাতে-মুখে, কাপড়ে-চোপড়ে জমা করিয়া বেড়ায়। সৌন্দর্য্যচর্চ্চার মধ্যে স্নানটা মাঝে মাঝে করে;—তাহাতে ময়লাগুলি গায়ে ভাল করিয়া বসিয়া যায়।

স্বভাব-নোংরা মেয়েদের মাঝে মাঝে একটু অসুখ-বিসুখ করা ভাল,—মা-বোনের যত্নআর্ত্তি পায় তাহা হইলে—একটু নজর পড়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে নৃত্যকালীর সে বালাই নাই; সে অটুট স্বাস্থ্য এবং অসংস্কৃত শরীর ও বেশভূষা লইয়া দূরে দূরেই কাটাইয়া দিতেছে।

গুণের মধ্যে মেয়েটির স্বভাব বড় নরম, অন্ততঃ তাহার চোখ দুটি এত নরম যে তাহাকে কাছে কাছে রাখিয়া নিশ্চিন্ত তৃপ্তির সঙ্গে বেশ একটি কর্ত্তৃত্বের ভাব উপভোগ করা যায়। খেলাঘরের জগতে এ একটা মস্তবড় লোভনীয় জিনিষ।... শৈল বলিল, "তোমার ছেলে ভাই হাবুলদাদার মত তিনটে পাস দিয়ে চারটে পাসের পড়া করছে বলে যে আমায় ন-হাজার টাকা তোমার ছিচরণে ঢালতে হবে সে আমি পারব না। আমার মেয়ে সুন্দর—তার একটা কদর নেই? আমি বরাভরণ-টরণ নিয়ে পাঁচটি হাজারের ওপর উঠছি নে; এইতেই তোমায় রাজী হ'তে হবে।"

অথচ এই কয়দিন আগে, এই নৃত্যকালীকেই শৈলর অপগণ্ড ছেলেটি নগদ সাত হাজার টাকা দিয়া লইতে হইয়াছে।

অন্য সঙ্গিনী হইলে বাঁকিয়া বসিত, অন্ততঃ ঠেস দিয়া দুটো কথা বলিত ত নিশ্চয়।...নৃত্যকালী সঙ্গে সঙ্গেই চুলের পুচ্ছ বাঁয়ে হেলাইয়া বলিল, "হব রাজী।"

অনুমান হয় এই সব কারণেই, হাজার নোংরা হইলেও নৃত্যকালী অপরিহার্য্যা।—নোড়ামুড়ি লইয়া খেলা চলে, তাহাতে পরিষ্কারও বেশ থাকা যায়, কিন্তু যতই অপরিষ্কার হোক্ না কেন কাদা লইয়া খেলায় একটা বিশেষ সুখ এবং সুবিধা আছে—যেমনটি ইচ্ছা ভাঙা-গড়া চলে।

নৃত্যকালীকে কিন্তু রাখা হয় খুব সঙ্গোপনে। ঘরের যে ফালিটুকু ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছে, নৃত্যকালী চুপি চুপি আসিয়া সেই দিকটায় বসিয়া থাকে। হাবুল যদি সিঁড়ি দিয়া উপরে যায় কিংবা নীচে আসে, ওর অস্তিত্বের খবরই পায় না। শৈলর কড়া হুকুম আছে—যেন ভুলিয়াও কখন হাবুলদাদার ঘরের দিকে না যায়, কি জোরে শব্দ না করে।

বলে, "তা যদি কর জলার পেত্নী, তো হাবুলদাদা টের পেলে সঙ্গে সঙ্গে আল্‌সে ডিঙিয়ে তোমায় নীচে ফেলে দেবে, আর তোমার সঙ্গে খেলার জন্যে আমার দশা সে কি করবে ভেবেই পাই না।'

হাবুল অশুচির ভয়ে ঘর ছাড়িয়া কম যাওয়া-আসা করার জন্যই হোক্, অথবা যেজন্যই হোক্, প্রায় মাসখানেক বেশ কাটিল, তাহার পর নৃত্যকালী এক দিন হঠাৎ ধরা পড়িয়া গেল।

যদি বলা যায় হাবুলই ধরা পড়িল, তাহা হইলেও বড়-একটা ভুল হয় না। ব্যাপারটা ঘটিল এই রকম।—

চৈত্র মাসের দুপুর বেলা। হাবুলদের কলেজ গরমের ছুটিতে বন্ধ হইয়াছে। হাবুল ঘরে বসিয়া একটা কবিতার বই পড়িতেছিল; হঠাৎ একটা ঘর-ছাড়ান ভাবে মনটা কেমন হইয়া গেল। সে বাহিরে আসিয়া, দুইটা নারিকেল গাছের মাথা একত্র হইয়া ঘরের আড়ালে যেখানে একটি নিবিড় ছায়া ফেলিয়াছে সেইখানটায় দাঁড়াইল।

শুব্ধতাটুকু বেশ লাগিল।—ঝিরঝিরে বাতাস দিতেছে, তাহাতে বিশ্রান্ত পল্লীর এখান-ওখান থেকে কতকগুলা চাপা

সুর মাঝে মাঝে কানে আসিতেছে। সামনাসামনি খানিকটা দূরে একটা দোতলা বাড়ীর খোলা জানালা দিয়া দেখা যায়—একটি মেয়ে মেঝেয় বসিয়া উবু হইয়া একান্ত মনে কি লিখিতেছে। চুলগুলা মুখের দুই পাশ ঢাকিয়া ভূমিতে লুটাইতেছে। ডান দিকে একটা একতলা বাড়ীর চিলে-কোঠার দেওয়ালে দুইটা পায়রার খোপ আঁটা; ভিতরের পায়রাগুলা ব্যস্ত, খোপের উপরে দুইটা পায়রা গায়ে গায়ে সাঁটিয়া চাপিয়া বসিয়া আছে। হাবুল মাঝে মাঝে এই দম্পতীটিকে দেখিতেছিল, মাঝে মাঝে মেয়েটির দিকে দেখিতেছিল; লিপিনিরতাকে লইয়া সে কি ভাঙাগড়া করিতেছিল সে-ই জানে।

সহসা দেখিল চিলেকোঠার পাশের ঘরটি হইতে বাহির হইয়া শৈল নীচে নামিয়া গেল।

তাহার বড় কৌতূহল হইল,—শৈলী আবার ওখানে করে কি?—খেলাঘরের বাই আছে নাকি?—সে যে একটা মস্ত নোংরামির ব্যাপার! কই, এত দিন ত জানিতে দেয় নাই,—বা রে শৈলী!

দেখিতে হয়।—হাবুল অগ্রসর হইয়া, দুইটা সিঁড়ি বাহিয়া ঘরটিতে প্রবেশ করিল; ভিতরে গিয়া দাঁড়াইতেই তাহার চক্ষুস্থির!

যত দূর নোংরা হইতে হয় একটি মেয়ে মেঝেয় পা ছড়াইয়া এবং বালিঝরা, নোনাধরা দেওয়ালে নিশ্চিন্তভাবে ঠেস দিয়া বসিয়া আছে। পাশে এক তাল কাদা; হাতের আঙুল-গুলা কাদা দিয়া কি একটা গড়িতে ব্যস্ত, তেলো দুইটা শুকনা কাদায় শাদা হইয়া গেছে; বাঁ গালে—কানের কাছটায় সেই রকম একটা বড় দাগ—বোধ হয় হাত দিয়া ঘাম মুছিয়া থাকিবে। আঁচল ভূমিতে বিছান, তাহার উপর কতকগুলা রাংচিত্রের পাতা আর ছোট ছোট আগাছার ফল—তাহাদের নীল, বেগুনে রসে আঁচলটায় ছোপ ধরিয়া গেছে; এক পাশে তেললঙ্কা মাখান, থেঁতো-করা খানিকটা কাঁচা আম।

হাবুলের ছায়ায় ঘরটা একটু অন্ধকার হইতেই মেয়েটি মুখ তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে যেন একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

হাবুল ফিরিয়া যাইতেছিল, ঘুরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"শৈল কোথায়?"

মেয়েটি উত্তর দিতে পারিল না, শুধু জিব দিয়া শুকনা ঠোঁট দুটি একটু ভিজাইয়া লইল এবং আঁচলটা একটু টানিয়া লইল। হাবুল প্রশ্ন করিল, "তোমার নাম কি?"

চুপচাপ। মুখের সেই শাদা দাগটা ঘামে ভিজিয়া একটি তরল কাদার রেখা গালের মাঝামাঝি গড়াইয়া আসিল। মুখখানা ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছিল, একটু একটু করিয়া রাঙিয়া উঠিতে লাগিল।

হাবুলের কৌতুক বোধ হইতেছিল, উত্তরের আশা না থাকিলেও প্রশ্ন করিল, "তুমি এত নোংরা কেন?"

ইহাতে মেয়েটি একটু গুটিসুটি মারিয়া গেল। বোধ হয় শৈলর সতর্কতার কথা মনে পড়িল,—এইবার বুঝি তাহা হইলে আলিসা ডিঙাইয়া ফেলিয়া দেয়।

হাবুল ঠায় নতদৃষ্টি এই জড়ভরতের মত মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল। কেন—বলা শক্ত, আরও বলা শক্ত এই জন্য যে অমন দারুণ নোংরামির মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাহার মুখে কোন বিকারের চিহ্ন লক্ষিত হইল না। একটু পরে হঠাৎ যেন কি মনে হইল, আর দাঁড়াইল না। দুয়ার পর্য্যন্ত গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল, বলিল, "হ্যাঁ, দেখ, আমি যে এসেছিলাম, কিংবা তোমাদের খেলাঘরের কথা জানি একথা শৈলকে ব'লো না—বলবে না ত?"

মেয়েটি বলিল, "না।"

উত্তর পাইয়া হাবুল আর একটু দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, "পুতুল খেলছিলে বুঝি?"

কোন উত্তর হইল না।

"শৈলর সঙ্গে পড় বুঝি?"

উত্তর নাই। এদিকে মনের মধ্যে কি রকম একটা গোল-যোগ সৃষ্টি হওয়ায় প্রশ্নও জোগাইতেছিল না। যাইবার জন্য ফিরিয়া আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তুমি রোজ এস, আসবে ত?"

মেয়েটি সাহস করিয়া ঘাড় পর্য্যন্ত নাড়িল না। বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াই হাবুল বলিল, "আমি কিছু বলব না··· আসবে ত?"

মেয়েটি ঘাড় নাড়িল। এমন সময় সিঁড়ির নীচের ধাপে পায়ের শব্দ হইল। হাবুল তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

তাহার পর দিন হাবুল জানালাটি অল্প খুলিয়া সিঁড়ির দিকে উৎকণ্ঠিত ভাবে চাহিয়া রহিল এবং শৈল এক সময়

পা টিপিয়া টিপিয়া নামিয়া গেলে নোংরা ঘরটিতে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেখিল মেয়েটি নাই। আরও দুই দিন নিরাশ হইয়া সে বুঝিল নিজের অপরিচ্ছন্নতার অপরাধে সে ভয় পাইয়াছে। তখন হাবুলের একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল এবং নিজের পরিচ্ছন্নতার অপরাধে মনটি বড়ই ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সিঁড়ির দিকে চাহিয়াই ছিল, অনেক ক্ষণ পরে শৈল আসিলে ডাক দিল। শৈল ক্ষণিক চোখের একটু আড়াল হইয়া মুঠার মধ্য হইতে কি গোটাকতক জিনিষ এক পাশে ফেলিয়া দিয়া হাতটা সেমিজে মুছিয়া লইল এবং সেমিজটা কাপড়ে ভাল করিয়া ঢাকিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। মুখটি শুকাইয়া গেছে।

হাবুল হাসিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল, "আমার ভয়ে খেলার জিনিষগুলো বুঝি ফেলে দেওয়া হ'ল? খেলা একটু চাই বইকি, তাতে রাগ করব কেন? শুধু অপরিষ্কার না হলেই হ'ল—বেশী রকম অপরিষ্কার।···মাটির পুতুল গড়তে জানিস?'

শৈল মাথা নাড়িয়া জানাইল—না।

"জানতে হয়; সে একটা শিল্প যে—চারুশিল্প। তোদের বন্ধুদের মধ্যে কেউ জানে না?"

শৈল একটু ভাবিল। যেন সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, "নেত্য বেশ জানে,—অনেক রকম।"

"তার কাছে শিখে নিলেই পার।···নেত্য আবার কে? নৃত্যধন?"

"না, নেত্যকালী, আমার সই—গঙ্গাজল।···বড্ড নোংরা সে, মিশতে ঘেন্না করে।"

হাবুল একটু হাসিয়া, কৃত্রিম রোষের সহিত চোখ দুটো বোনের মুখের উপর ফেলিয়া বলিল, "এই বুঝি শিক্ষা হচ্ছে তোমার? কাউকে ঘেন্না করতে আছে—তাও আবার নিজের সইকে! বরং তাকে পরিষ্কার হ'তে শেখাও না —সর্ব্বদা কাছে কাছে রেখে···"

শৈল একটু মাথা নীচু করিয়া রহিল, তাহার পর বাহির হইয়া গেল। হাবুল আবার তাহাকে ফিরাইয়া বলিল, "তা ব'লে যেন আমার ঘরের দিকে কাউকে এন না, খবরদার। নোংরা হ'লে আমার কাছে গঙ্গাজলেরও খাতির নেই—ব'লে দিলাম।"

পরের দিন জানালার অল্প ফাঁক দিয়া তাহার প্রায় ঘণ্টাখানেক একভাবে চাহিয়া থাকিবার পর শৈল ছাদে আসিল। একবার সিঁড়ির দিকে ঝুঁকিয়া চাহিয়া অদৃশ্য কাহাকে থামিবার জন্য ইসারা করিল এবং পা টিপিয়া টিপিয়া হাবুলের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। দেখিল—হাবুল নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। তাহার পর আবার তেমনই ভাবে ফিরিয়া গিয়া নৃত্যকালীকে সিঁড়ি হইতে ইসারায়ই ডাকিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিল।···উঠিয়া আবার ঘণ্টাখানেকের একটি দীর্ঘ যুগ জানালার ফাঁকে চাহিয়া থাকিবার পর হাবুল দেখিল—শৈল কি জন্য নীচে নামিয়া গেল। তখন হাবুল শৈলর চেয়েও নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে খেলাঘরটিতে গিয়া প্রবেশ করিল, কান দুটিকে যথাসম্ভব সিঁড়ির নিম্নতম ধাপের কাছে মোতায়েন করিয়া রাখিল।

নৃত্যকালী মাটির তাল হইতে খানিকটা কাটিয়া লইতেছিল, মুখ তুলিয়া চাহিল। কেন, তাহা ভগবান প্রজাপতিই জানেন, আজ তাহার চোখে ভয়ের বিশেষ কোন চিহ্ন ছিল না, শুধু একটা অবোধ কৌতূহলের ভাব। শাড়ীটা আজ একটু যেন ফরসা, তাহাতে ধুলা-কাদার ছোপ আরও স্পষ্ট করিয়া জাগিয়া আছে। কাঁধে বেড়াবেণী লতাইয়া আছে।

হাবুল বলিল, "শৈলকে খুঁজতে এসেছিলাম; কোথায় গেছে বলতে পার?"

"নীচে গেছে।"

উত্তরটা বোকার মত হইল।—উপরে যখন নাই তখন নীচে ত গেছেই। কিন্তু তাহাতে আবার প্রশ্ন করার সুযোগ থাকায় হাবুল খুশীই হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি করতে গেছে বলতে পার?"

"পারি।"

নিজের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়া হাবুল প্রশ্ন করিল, "কি ক'রতে?"

"আরও কাদা মেখে নিয়ে আসতে, আর খাংরা-কাঠি।"

হাবুলের মনে হইল স্বরটি বড় মিষ্ট।—'কাদা' 'খাংরাকাঠি'—এই রকম নোংরা কথাগুলাও এত মিষ্ট লাগিল!···বলিল, "কাদা সেই তোমাদের বাড়ী থেকে ত! —এ বাড়ীতে ত নেই?"

"হ্যাঁ।"

হাবুল খেবড়ি খাইয়া সামনেটিতে বসিয়া পড়িল। বলা বাহুল্য, স্থানটুকু বেশ পরিষ্কার ছিল না। বলিল, "তুমি বেশ পুতুল গড়তে পার, না ?"

নৃত্যকালী মাথাটা একটু নীচু করিয়া ঠোঁটের এক কোণে লজ্জিতভাবে একটু হাসিল।

হাবুল বলিল, "আমায় একটি গ'ড়ে দিতে হবে।"

অবশ্য শুধু বলিবার সুখটুকুর জন্যই বলিল, কেন না ভগ্নীকে মৃৎশিল্পে উৎসাহিত করিলেও, পুতুলের যা-সব নমুনা সামনে পড়িয়া ছিল সেগুলিকে চারুশিল্পের উৎকর্ষ বলিয়া মনে করে এতটা দুর্দ্দশা তাহার তখনও হয় নাই।

মেয়েটি মুখের উপর বাঁ-হাত চাপিয়া আর একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভাল ভাবেই হাসিয়া ফেলিল। যখন হাত সরাইয়া লইল, দেখা গেল ডান গালের নীচে আঙুলের ডগার কাদার তিনটি দাগ লাগিয়া গেছে। হাবুল বলিল, "ওকি হ'ল ?—ইয়েতে যে দাগ লেগে গেল !"

নৃত্যকালী বুঝিতে না পারিয়া মুখের দিকে চাহিতে বলিল, "ইয়েতে—মানে—ইয়ে—তোমার গালে আর কি।··· না; হয় নি, আর একটু মোছ ; আর একটু···ঐ পাশটায় এখনও রয়েছে—সমস্তটা টেনে মুছে দাও দিকিন···রয়েছে যে এখনও একটু···"

মোটেই আর কিছু ছিল না এবং অবর্ত্তমান কাদা মুছিতে সুকুমার গালটির যে অবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে হাবুল ভিন্ন আর যে-কেহই দয়া অনুভব করিত। হাবুল বলিল, "আমি না-হয় দোব ঠিক ক'রে ?"

বোধ হয় দিতও; কিন্তু নীচে যেন শৈলর স্বর শোনা গেল। হাবুল তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "সেদিন যে এসেছিলাম, বল নি ত শৈলকে ?"

নৃত্যকালী মাথা নাড়িল—না।

দুয়ারের নিকট হইতে ফিরিয়া হাবুল বলিল, "আর হ্যাঁ, আর এখন যে ওকে খুঁজতে এসেছিলাম সে কথাও ব'লে কাজ নেই, ভাববে—একটু খেলছি তাতেও হাবুলদাদার এসে বাগড়া দেওয়া···।"

৪

মাঝের চার-পাঁচ দিনের এদিককার ইতিহাস আর দিলাম না; আশা করি আন্দাজ করিয়া লইতে কাহারও বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না।

অপর দিকের খবর এই যে হাবুল আবার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে যেন আরও সতর্ক হইয়া উঠিয়াছে। বৌদিদিকে বলিল, "তোমরা গুরুজন, বলা ঠিক হয় না ; কিন্তু তোমরা যদি সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাক, ছেলেমেয়েরা একটা আদর্শ পায়। এই ধরা তুমি যদি সর্ব্বদা একটা স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে থাক···"

বৌদিদি বলিল, "রক্ষে কর ভাই ! বরং তুমিই একটি আদর্শ বিয়ে ক'রে নিয়ে এসে আলমারিতে সাজিয়ে রাখ না কেন।"

নিজের কথাটা ঠাট্টায় উড়াইয়া দিলেও দেবরের খুঁৎখুঁতানির চোটে বৌদিদিকে আবার কাচগুলার দিকে কড়া নজর দিতে হইল। তাহাদের সন্ত্রাসটা ছিলই, আবার একচোট উগ্রতর ভাবে জাগিয়া উঠিল। শৈল নিত্যকালীকে বারংবার সাবধান করিতে লাগিল, "তোকে ব'লে ব'লে হার মানছি পোড়ারমুখী, কিন্তু যদি এক দিন ঘুণাক্ষরেও হাবুলদাদার নজরে প'ড়ে যাস্ ত তোর যে কি দুর্গ্যাতি ক'রে ছাড়বে তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। আমি ত তোকে এনে ভয়ে যেন কাঁটা হয়ে থাকি।···মুয়ে আগুন, আবার ঠোঁট চেপে হাসি !—কোত্থেকে যে হাসি আসে পোড়ারমুখে তা ত বুঝি না···"

সেদিন দেখে নৃত্যকালী আগে হইতে আসিয়া বসিয়া আছে, ঘরে ঢুকিয়াই চাপা গলায় প্রশ্ন করে, "হাবুলদাদার ঘরের ওদিকে যাস্ নি ত ?"

নৃত্যকালী বলে—"নাঃ।"

শৈল বলে, "খবরদার !···আর দরকারই বা কি আমাদের ওদিকে যাবার ভাই ?···তুমি বাপু খুব পরিষ্কার আছ ত আছ ; আমরা দুটিতে না-হয় নোংরাই ; থাক এক কোণে তোমার ঘেন্না নিয়ে···কি বল ভাই গঙ্গাজল ?"—এই ভাবে নিশ্চিতকে সুনিশ্চিত করিবার জন্য যেমন এক দিকে শাসায়, অপর দিকে তেমনই আবার নৃত্যকালীর আত্মসম্মান জাগ্রত করিবারও চেষ্টা করে।

নৃত্যকালী বলে—"হুঁ।"

মেয়েটি আজকাল বেশ প্রতারণা শিখিয়াছে। কালই

প্রায় ঘণ্টাখানেক হাবুলের ঘরে গিয়া গল্পস্বল্প করিয়াছিল। শৈল বাহিরে কোথায় গিয়াছিল বলিয়া হাবুল ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল।

এর পরে আরও দুই দিন কাটিল। হাবুল অত্যন্ত কবিতা পড়িতেছে এবং বাকীটা সময় নীচে আসিয়া চারি দিকে অপরিচ্ছন্নতা আবিষ্কার করিয়া জর্জ্জরিত হইয়া উঠিতেছে। বলিতেছে, "তোমরা সব শেষ পর্য্যন্ত আমায় বাড়ীছাড়া না ক'রে ছাড়বে না দেখছি, আমার অদৃষ্টে লেখাই আছে হোষ্টেল..."

দুপুর বেলা। আজ শৈলদের স্কুলে প্রাইজ-বিতরণ। সাজিয়া-গুজিয়া বাহির হইতেছে, দুয়ারের সামনেই নৃত্য-কালীর দেখা। শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "যাবি না স্কুলে প্রাইজ দেখতে ?"

নৃত্যকালী নাসিকাটা কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ভাল্ লাগে না।"

শৈল বলিল, "মুয়ে আগুন ; কি ভাল লাগে তবে শুনি ?"

নৃত্যকালী তাহাকে কাটাইয়া গেলে, হঠাৎ ঘুরিয়া বলিল, "ওমা ! তুই যে আজ এসেন্স মেখেছিস্ লা ! পেত্নীর ভাবন দেখে বাঁচি না !"

"কই ধ্যাৎ"—বলিয়া নৃত্যকালী ভেতরে চলিয়া গেল।

বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া হাবুলের কাকীমা শুইয়াছিলেন, ভাড়াটেদের নূতন বৌটি পাকা চুল তুলিতেছিল, পুত্রবধূ উপুড় হইয়া শুইয়া একটা নাটক পড়িয়া শুনাইতেছিল। নৃত্য-কালীকে দেখিয়া বলিল, "নেত্য, একটু জল গাড়িয়ে দিয়ে যা ত দিদি...আর পারি নে উঠতে।"

নৃত্য জল দিয়া উপরের দিকে চলিয়া গেল। ভাড়াটেদের বউটি বলিল, "মেয়েটি নোংরা তাই, নইলে..."

কাকীমা বলিলেন, "হ্যাঁ, বেশ ছিরি আছে। আর নোংরাই কি থাকবে চিরদিনটা গা ?—বয়েস হয়ে আসছে...যা শুচিবেয়ে আমাদের হাবুলটা, নইলে ইচ্ছে ছিল "

পুত্রবধূ কিছু বলিল না ; ঠোঁটের কোণে একটি অতি-সূক্ষ্ম হাসি চাপিয়া অন্যমনস্কভাবে সিঁড়ির দিকে চাহিয়া ছিল ; বইয়ে চোখ ফিরাইয়া আনিয়া বলিল, "হুঁ, শোন "

হাবুল নিরাশ হইয়া খেলাঘর হইতে বাহির হইতেছিল ; দেখিল সিঁড়ির দরজায় নৃত্যকালী দাঁড়াইয়া ; প্রশ্ন করিল, "খেলবে না ?"

নৃত্যকালী প্রশ্ন করিল, "সই আছে ?"

হাবুলও যেন শৈলর স্কুলে যাওয়ার কথাটা মোটেই জানে না, এই ভাবে উত্তর করিল, "আছে বোধ হয় নীচে, আসবে'খন ; তুমি তত ক্ষণ চল না ওঘরে।...বাপ রে কি গরম এ ঘরটায় !"

ঘরে গিয়া হাবুল টেবিলের সামনে চেয়ারটিতে বসিল ; নৃত্যকালী একটু দূরে, পাশটিতে গিয়া দাঁড়াইল।

হাবুল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বুঝি ইস্কুলে যেতে ভাল লাগে না, নৃত্য ?"

নৃত্য হাসিল মাত্র।

"কি ভাল লাগে ?"

কথাটা বড় ব্যাপক, বোধ হয় মিলাইয়া দেখিয়া উত্তর হাতড়াইতেছিল ; হাবুল প্রশ্ন করিয়া বসিল, "আমার কাছে আসতে ?" নৃত্য একবার চোখ তুলিয়া লজ্জিতভাবে ঘাড় নাড়িল—হ্যাঁ।

হাবুল জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?...বলতে পার ?"

"সইয়ের দাদা ব'লে।"

হাবুল বলিল, "আমারও তোমার কাছে থাকতে ভাল লাগে নৃত্য।"

একটু থামিয়া প্রশ্ন করিল, "কেন, তা জিগ্যেস করলে না ?"

নৃত্যকালী চোখ তুলিয়া চাহিতে বলিল, "বোনের সই ব'লে।"

কথাটার মধ্যে কোথায় কি ছিল, নৃত্য খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতে মুখটা ঢাকিতে গিয়া আঁচলটা নীচে পড়িয়া গেল। তখন হাবুল যে-হাবুল এক দিন প্রণাম করিতে গিয়া সামান্য একটু ময়লার জন্য কাকীমাকে সরাইয়া লইয়াছিল, সেই শুচিবিলাসী হাবুল, পরম আগ্রহ সহকারে ভূলুণ্ঠিত অঞ্চলটি উঠাইয়া লইল এবং তাহাতে শুচিতার নিতান্ত অভাব থাকিলেও প্রায় বুকের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "বাঃ, চমৎকার পাড়টি ত !"

মেয়েটি আজ বেশী হাসিতেছে ; আবার খিল্ খিল্

করিয়া হাসিয়া বলিল, "ভাল কোথায়? কালো নাকি ভাল হয়?"

একরঙা, কোন রকম নক্সাবিহীন কালো পাড়। একে কালোই, ময়লা কাপড়ে আবার সত্যই তেমন ভাল দেখাইতেছিল না। হাবুল একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "ভাল মানে—ভাল অর্থাৎ—তোমার গায়ে বেশ ভাল দেখাচ্ছে।"

সাহস বাড়িয়া যাওয়ায় অঞ্চলটা মুঠায় ভরিয়া লইয়া নিজের নাকে চাপিয়া ধরিল, বোধ করি অধরেও একটু চাপিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল, "এসেন্স লাগিয়েছ বুঝি নৃত্য?…আমার বড্ড ভাল লাগে, বুঝেছ?"

নৃত্যকালী মুখ নীচু করিয়া একটু হাসিল, এবং একটু বোধ হয় বেশী করিয়া বুঝিয়াই বলিল, "এবার থেকে ফরসা কাপড়ও পরে আসব…আজ দিদি…"

হাবুল হঠাৎ এতটা সচকিত হইয়া গেল যে তাহার হাত হইতে আঁচলটা আবার মাটিতে পড়িয়া গেল। চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া বলিল, "না, না, অমন কাজ ক'রো না!…সবাই জানে আমি নোংরা দু-চক্ষে দেখতে পারি না—নিশ্চিন্দি আছি,—পরিষ্কার হ'তে গেলেই সর্ব্বনাশ! ভাববে মেয়েটা হঠাৎ… তুমি বরং কাপড়টা কেচে এসেন্সের গন্ধটাও ধুয়ে ফেলে দিও।"

ছেলেমানুষ, অবুঝ—তাহাকে এমনি বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। বোধ হয় সেই জন্য টেবিলের উপর হইতে নৃত্যর হাতটা—আলতার ছোপধরা হাতটা—তুলিয়া লইয়া নিজের গালে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "এই আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছ?—ফেলবে ধুয়ে?…আর, কখন পরিষ্কারও হ'তে যাবে না?"

ভারতীয় সাহিত্য-পরিষৎ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্য অনতিনবীন বিপুল রত্নসম্পদে সম্পন্ন। প্রতি প্রদেশই তাহার প্রাচীন কবি, কাব্য, কবিতা লইয়া গৌরব করিয়া থাকে—সংসারের নানা দুঃখদৈন্যের মধ্যে এই সাহিত্যই বিভিন্ন প্রদেশের জনসাধারণের তাপদগ্ধ হৃদয়কে শান্ত ও উৎসাহিত করে। তবে শুধু প্রাচীন সাহিত্যই যে বিভিন্ন প্রদেশের একমাত্র সম্বল তাহা নহে। বর্ত্তমান যুগেও নানা প্রদেশের সাহিত্যসৃষ্টির ইতিহাস উপেক্ষণীয় নহে। এক দিকে এক সম্প্রদায় দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়া দেশের প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন করিতেছেন এবং তাহারই উপকরণ হিসাবে নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত উপেক্ষিত বিনষ্টপ্রায় পুথিপত্র সংগ্রহ করিয়া অজ্ঞাত অপরিচিত পুরাতন সাহিত্যের বহুমূল্য রত্নসমূহ বহু আয়াসে উদ্ধার করিতেছেন—আর এক দিকে বহু উৎসাহী সাহিত্যরসিক কাব্য কবিতা গল্প উপন্যাস রচনা করিয়া জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিতেছেন এবং দেশের সাহিত্যসৌধকে সুসজ্জিত করিয়া তুলিতেছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত নানা সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় দেশের এই সাহিত্যপ্রচার ও সাহিত্যসৃষ্টি কার্যে নানা ভাবে সহায়তা করিতেছে—উৎসাহ যোগাইতেছে এবং দেশের লোকের মধ্যে সাহিত্যরসপিপাসার উদ্রেক করিতেছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এক প্রদেশের সাহিত্যপুষ্টি-বিষয়ক কর্ম্মসমূহ সম্বন্ধে আর এক প্রদেশের সাধারণ লোক ত দূরের কথা—শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গেরও বিশেষ কোনও ধারণা নাই। এক প্রদেশের লোক যে সাহিত্যের রস আস্বাদন করিয়া মুগ্ধ হয়—তৃপ্তি লাভ করে তাহার সহিত অন্য প্রদেশের লোকের পরিচয় নাই বা পরিচয় লাভ করিবার তেমন কোনও ব্যাপক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যবস্থা নাই।

অবশ্য, বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য নানা সময়ে নানা স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বহু চেষ্টা হইয়াছে। নানা প্রদেশের বিদ্বদ্‌বৃন্দ নিজ নিজ প্রদেশের সাহিত্যের দিকে সমগ্র জগতের মনীষিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বা করিতেছেন। ফলে ইংরেজী ভাষায় ভারতের একাধিক প্রদেশের সাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে—ভারতের প্রাচীন প্রাদেশিক সাহিত্যের অনেক অমূল্য রত্ন ইংরেজী অনুবাদের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রবর্তক বহু-ভাষাবিদ্ সার জর্জ গ্রীয়ার্‌সন্ প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলীর কৃত কার্য এই প্রসঙ্গে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। গ্রীয়ার্‌সন্ প্রবর্তিত পথে আজ বহু ভাষাতত্ত্বরসিক নানা প্রাদেশিক ভাষার বিচার, বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিয়া অনাদৃত অবজ্ঞাত এই সব ভাষার মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ভারতের যে অমূল্য সাহিত্যসম্পদের দিকে গ্রীয়ার্‌সন্ প্রমুখ সুধীগণ পৃথিবীর বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহার বিশেষ পরিচয় লাভ করিবার জন্য শিক্ষিত জনসাধারণ আজ উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন। সত্য বটে, হেরিটেজ অব ইণ্ডিয়া গ্রন্থাবলীতে (Heritage of India series) নানা প্রাদেশিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের উৎকণ্ঠা মিটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা, হিন্দী, অসমীয়া, গুজরাটী, উড়িয়া প্রভৃতিতে নিবদ্ধ প্রাচীন সাহিত্যের গৌরবময় নিদর্শনগুলিকে ইংরেজী ভূমিকাসহ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচার করিয়া বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের রস আস্বাদ করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানপিপাসা ইহাতে মিটে নাই—প্রাচীন প্রাদেশিক সাহিত্য সম্বন্ধে এই সকল গ্রন্থ হইতে যে জ্ঞানলাভ করা যায় তাহা এই সব সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা জানিবার জন্য লোকের মনে আগ্রহের সৃষ্টি করিয়া থাকে। অথচ প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির বর্তমান অবস্থা সাধারণকে জানাইবার চেষ্টা নিতান্ত নগণ্য।

বর্তমানে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় ইতিহাস ও ভাষা-তত্ত্বাদি বিষয়ে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইতেছে তাহার পরিচয় লাভ করিবার সুযোগ অবশ্য কিছু কিছু আছে। হল্যাণ্ড হইতে প্রতিবর্ষে প্রকাশিত 'অ্যানুঅল বিব্‌লিওগ্রাফি অব ইণ্ডিয়ন আর্কিঅলজি' (Annual Bibliography of Indian Archæology) গ্রন্থে ভারতের কোন কোন প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ-গুলিরও নাম ও বিবরণ অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, আজ কয়েক বৎসর যাবৎ ইণ্ডিয়ন ওরিয়েণ্টল কন্‌ফারেন্স (Indian Oriental Conference) নামে প্রতি দুই বৎসর অন্তর যে মহাসভার অধিবেশন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হয় তাহার সভাপতির অভিভাষণে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যে সমস্ত ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্ববিষয়ক আলোচনা হইয়া থাকে তাহার আভাস প্রদান করা হয় এবং ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এক বিশিষ্ট শাখায় করা হয়। বিশ বৎসর পূর্বে স্বর্গত অধ্যাপক রসিকলাল রায় ও তাঁহার অকাল পরলোকগমনের পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রলাল রায় মহাশয় কিছুদিন যাবৎ (১৩২২-২৪ সালে) ভারতবর্ষ পত্রিকায় 'বীণার তান' নাম দিয়া ভারতীয় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার পত্রিকায় প্রকাশিত মূল্যবান্ ঐতিহাসিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলির সার সঙ্কলন করিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে জাতীয় জিনিষ হয়ত চাহিদার অভাবে স্থায়ী হয় নাই।

যে জাতীয় সাহিত্যের চাহিদা থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা সেই লোকপ্রিয় লঘু সাহিত্য প্রচারের চেষ্টা অতি সামান্যই দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান যুগে সৃষ্ট নাটক, উপন্যাস, কবিতা, গল্প প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু দেশের লোকের নিত্য পরিতৃপ্তি সাধন করে তাহার পরিচয় প্রদান করিবার সাধারণ কোনও ব্যবস্থা নাই। অবশ্য বাংলা দেশের বিশেষ গৌরবের কথা এই যে, বাংলার বহু গল্প উপন্যাস ভারতের নানা ভাষায় অনূদিত হইয়া অসংখ্য লোকের তৃপ্তি সাধন করিতেছে। সকল প্রদেশের সাহিত্যের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু বাংলা দেশের সাহিত্য এ বিষয়ে অতি দরিদ্র তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। বিদেশের কোন কোন গ্রন্থের অনুবাদ বাংলায় পাওয়া যায় সত্য, তবে ভারতের অন্য কোন প্রদেশের কোন আধুনিক গল্প উপন্যাস বাংলায় অনূদিত হইয়াছে বলিয়া

আমার জানা নাই। অবশ্য, অনুবাদ করিবার মত জিনিষ অন্য প্রদেশের সাহিত্যে সৃষ্ট হইতেছে না এরূপ ধারণা করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ, এ বিষয়ে দেশের লোকের দৃষ্টি নাই।

সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে যাহাতে বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যের গতি প্রকৃতি, অভাব অভিযোগ প্রভৃতি বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে সেজন্য একটা সুশৃঙ্খল সঙ্ঘবদ্ধ ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা আজ কিছুদিন হইল ভারতের নানাস্থানে চলিয়া আসিতেছে। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্য লইয়াই বৎসর দুই পূর্বে বোম্বাই নগর হইতে ভারতীয় পি ই এন্ ক্লাবের মুখপত্ররূপে দি ইণ্ডিয়ন পি ই এন্ (The Indian P. E. N.) নামক ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প হয়। শ্রীযুক্তা সোফিয়া ওয়াদিয়ার সম্পাদকতায় ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে যথাক্রমে ইহার প্রথম দুই সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই দুই সংখ্যায় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের সাহিত্য বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। কিছুদিন হইল গুজরাটের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কহৈয়ালাল মুন্শী মহাশয় তাঁহার 'হংস' নামক মাসিক পত্রকে ভারতীয় সাহিত্যের মুখপত্ররূপে প্রকাশ করিতেছেন। এই পত্রিকায় যে সকল আলোচনা প্রকাশিত হয় তাহাদের মধ্যে নিম্ননির্দিষ্ট বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য—

(১) ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তের সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক কার্যাবলীর আলোচনা।

(২) বিভিন্ন প্রান্তীয় ভাষায় রচিত কবিতা ও তাহার হিন্দী অনুবাদ।

(৩) প্রান্তীয় লোকসাহিত্যের পরিচয়।

(৪) বিভিন্ন প্রান্তের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের পরিচয় ও সাহিত্যালোচনা।

(৫) বিভিন্ন প্রান্তের সাহিত্য ও সংস্কৃতির তুলনা।

(৬) ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তীয় ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের সমালোচনা।

(৭) বিভিন্ন প্রান্তীয় ভাষার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও আলোচনার অনুবাদ।

(৮) প্রান্তীয় ভাষায় প্রকাশিত আদর্শ উপন্যাসের মর্মানুবাদ।

জনসাধারণের মধ্যে প্রান্তীয় সাহিত্যের প্রচারের উদ্দেশ্যেই গত ১৯৩২ ও ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে 'ভারতীয় সাহিত্য-পরিষৎ' নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব হয়। হিন্দী, বাংলা, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় যে সমস্ত উত্তম গ্রন্থ আছে বা রচিত হইবে তাহাদের অনুবাদ করা বা করান এই প্রস্তাবিত পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল। বাংলা গ্রন্থের অনুবাদ হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায়, মারাঠী গ্রন্থের অনুবাদ হিন্দী, বাংলা, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় এইরূপে অনুবাদের সাহায্যে দেশের এক প্রান্তের সাহিত্য অন্য প্রান্তে প্রচারিত করিবার মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই এই পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প ছিল। কথা ছিল গত ডিসেম্বর মাসে ইন্দোরে এই সভার যে অধিবেশন হইয়াছে তাহাতে এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হইবে এবং প্রস্তাবিত সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই অধিবেশনে কার্য কত দূর অগ্রসর হইয়াছে পত্র লিখিয়াও তাহা জানিতে পারি নাই। হিন্দী সাহিত্যসম্মেলনেরও গত ১৯৩৫ সালে ইন্দোরের অধিবেশনে প্রান্তীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিকদিগের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং এই সম্মেলনের চেষ্টায় গত এপ্রিল মাসে নাগপুরে ভারতীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহার প্রথম অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সংবাদপত্রের বিবরণ হইতে জানা যায়, স্থির হইয়াছে— এই পরিষদের কার্য হিন্দীতে পরিচালিত হইবে। এখন পর্যন্ত ইহার পূর্ণ কার্যপদ্ধতি প্রকাশিত হয় নাই। তবে কর্মপদ্ধতি যেরূপই হউক না কেন তাহাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাহিত্য-পরিষদ্ ও সাহিত্যিকবৃন্দের সহযোগিতা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষগণ সেরূপ সহযোগিতা সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না; অন্ততঃ বিভিন্ন প্রান্তের পরিষদ্‌গুলির মধ্যে প্রাচীনতম বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মতামত এ বিষয়ে এখনও লওয়া হয় নাই। আশা করি, ক্রমশঃ তাহা করা হইবে।

এই অতিপ্রয়োজনীয় পরিষৎকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে যথেষ্ট পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন। হিন্দী

সাহিত্য-সম্মেলনের ধনবল ও জনবল দুইই আছে সত্য ; তথাপি এ-কাজের জন্য জনসাধারণের সাগ্রহ সহানুভূতি চাই। জনসাধারণের জ্ঞানপিপাসা জাগিয়া উঠিলে তবেই পরিষদের পক্ষে তাহার উদ্দেশ্যের অনুকূল কার্য করা সহজ ও সম্ভবপর হইবে। পরিষদের প্রারম্ভিক কার্য যদি সাধারণের হৃদয়ে উৎসাহ ও আগ্রহের সৃষ্টি করিতে না পারে তবে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া ইহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের সময় এই দিকে কর্তৃপক্ষকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হংস পত্রিকার মত হিন্দী ভাষার মধ্য দিয়া বিভিন্ন সাহিত্যের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলে হিন্দী ভাষাভাষী উপকৃত হইবে—হিন্দীসাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে কিন্তু সারা ভারতের লোক তাহাতে উৎসাহ বোধ করিবে বলিয়া মনে হয় না। ভাষার ব্যাপকতা যত বেশীই হউক না কেন, কোন এক ভাষার পক্ষে জনসাধারণের দ্বারে সমস্ত দেশের সাহিত্যের রস পরিবেষণ করা সম্ভবপর নহে। তাই মহারাষ্ট্র সাহিত্যসম্মিলনে প্রস্তাবিত পদ্ধতিই সমীচীনতর বলিয়া মনে হয়। এক প্রদেশের সাহিত্য যাহাতে বিভিন্ন প্রদেশের ভাষায় অনূদিত হইয়া সর্বসাধারণের মনোরঞ্জন করিতে পারে—এক প্রদেশের সাহিত্যিকের পরিচয় যাহাতে অন্যান্য প্রদেশের ভাষায় প্রকাশিত হইয়া সাধারণ্যে প্রচার লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই পরিষদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। অবশ্য এরূপ ব্যবস্থা করা সহজ নহে—তবে যে পথ আপাততঃ সহজ তাহাতে তেমন উপকার লাভের আশা করা যায় না। তাই কঠিন হইলেও পূর্বনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিবারই চেষ্টা করিতে হইবে। যদি এই উপায়ে বিভিন্ন প্রদেশে একটা অনুবাদের প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিতে পারা যায় তাহা হইলে সমগ্র দেশে জ্ঞানবিস্তারের সুবিধা হইবে—প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিও দিন দিন পুষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিবে। কেবল নিজ সৃষ্টি দ্বারাই কোন দেশের সাহিত্য সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে না—সাহিত্যের সম্পদ্‌বৃদ্ধির জন্য অন্য দেশের সাহিত্যকে অনুবাদের মধ্য দিয়া নিজস্ব করিয়া লইতে হইবে। বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যিকবর্গ ও সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় প্রাদেশিক ভাষাশিক্ষার সরল উপায় নির্ধারণ—প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির মধ্যে অনুবাদযোগ্য গ্রন্থ নির্বাচন ও তাহাদের দিকে সাহিত্যিকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ—বিশিষ্ট সাহিত্যিকবর্গের জীবনীসঙ্কলন প্রভৃতি উপায়ে প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির সহিত দেশের সাহিত্যিকগণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সম্পাদন এবং অনুবাদের সাহায্যে প্রাদেশিক সাহিত্যগুলিকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রদান করিয়া তাহাদের উন্নতি ও পরিপুষ্টি বিধানে সহায়তা করিতে পারিলে পরিষদের উদ্দেশ্য সফল হইবে—পরিষৎপ্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে। এই কার্যের জন্য পরিষৎকে দেশের সাহিত্যিকবৃন্দের মিলনস্থান করিয়া তুলিতে হইবে—দেশের সমগ্র সাহিত্যপ্রচেষ্টার কেন্দ্ররূপে পরিণত করিতে হইবে। সেজন্য, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন, হিন্দী সাহিত্যসম্মেলন প্রভৃতির ন্যায় প্রতি বর্ষে বা দুই বৎসর অন্তর ভারতীয় সাহিত্যসম্মেলন নামে একটী সম্মেলনের ব্যবস্থা ও তাহাতে বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যের নূতন সৃষ্ট গ্রন্থাদি ও সাময়িক বিবরণ আলোচনার বন্দোবস্ত করা বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া মনে হয়।
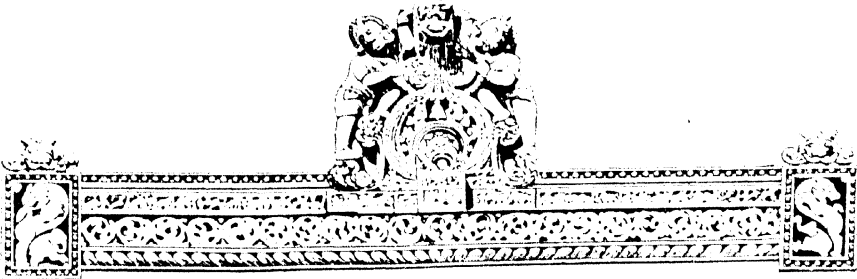
মানুষের মন

শ্রীজীবনময় রায়

২২

সেদিন নিখিলনাথ তাঁর খাসকামরায় বসে পড়াশুনা করছেন এমন সময় দরোয়ান একটি ছোট চিঠি তাঁর কাছে এনে দিলে। চিঠিতে লেখা, "দয়া করে আমাকে এক মিনিটের জন্যে দেখা করতে দিন।"

এই সময়টা বিশেষ ক'রে তাঁর পাঠচর্চ্চার সময় এবং কোন কারণে কেউ তাঁকে এ সময় যেন বিরক্ত না করে এমন হুকুম দরোয়ানের উপর দেওয়া আছে। সুতরাং দরোয়ানের দিকে চাইতেই সে বেচারা কৈফিয়ৎ দিতে সুরু করলে, "হজুর, হম্‌ শুনতি নহী। ময়্‌নে বহুৎ কহা; কিসী তরহ্‌সে উস্‌কো হটা নহী সকা। কহ্‌তি হয়্‌ আপকে সাথ মুলাকাৎ নহী করনেসে পিছে আপ গুস্‌সা হোবেঙ্গে। আওরৎ হয়্‌ সাব। হুকুম মিলে তো—।" হুকুম পেলে সে স্ত্রীলোকটির উপর কি জাতীয় বীরত্ব দেখাতে পারে, সে সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ না ক'রে নিখিলনাথ তাকে ডেকে আন্‌তে বললেন।

তাঁর নিজস্ব আস্তানায় স্ত্রীজনসমাগম প্রায় ঘটেই না— সুতরাং মনে মনে অবাক্ হয়ে যখন তিনি আকাশ-পাতাল ভেবে কিছু ঠিক করতে পারছেন না এমন সময় পর্দা সরিয়ে একটি অপরিচিত তরুণী এসে ঘরে প্রবেশ করলে। বিস্ময়ের উপর বিস্ময় অনুভব ক'রে তিনি তার দিকে জিজ্ঞাসু চোখ তুলে চাইতে সে এগিয়ে এসে ক্লান্ত ভাবে বিনা আহ্বানেই একখানা চেয়ার টেনে ব'সে পড়ল। নমস্কার বা কোন প্রকার বাহ্য ভদ্রতা প্রকাশের কোন চেষ্টাই সে করলে না। নিখিলনাথ এই তরুণীটির ব্যবহারে উত্তরোত্তর বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলেন। অপরিচিত তরুণীর সঙ্গে একান্তে কালক্ষেপ করা তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যে আর কখনও ঘটে নি। তা ছাড়া এই প্রকার অভিনব বাক্য-বিহীন পরিচয়ে তিনি মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। মেয়েটির পরিধানে একটি অনতিপরিচ্ছন্ন ছাইরঙের সিল্কের শাড়ী তার তনুদেহযষ্টি সযত্নে বেষ্টন ক'রে তার সহজ আত্মবিশ্বাস এবং কর্ম্মপটুতার ভাবখানিকে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছে। হাতে তার দুই গাছি হাতীর দাঁতের প্লেন শাঁখা ছাড়া দেহে অন্য অলঙ্কারের চিহ্ন মাত্র নাই। অনবগুণ্ঠিত মাথার স্বল্পতরঙ্গায়িত কেশ প্রায় অযত্ন-বিন্যস্ত; মধ্যে সরল দ্বিধা- ও ভঙ্গিমা -হীন সিঁথি সিন্দুরচিহ্ন-বিবর্জ্জিত। অবেণীবদ্ধ কেশরাজি মাথার পিছনে অভ্যস্ত হাতে আঁট ক'রে একটা পরিপুষ্ট খোঁপায় বাঁধা। মেয়েটির পায়ে এক জোড়া রবারের হীলশূন্য জুতো এবং তার অর্দ্ধেক হাতকাটা ব্লাউসের গ্রাস থেকে যে হাতখানি তার কোলের উপর এসে নেমেছে, তাতে লালিত্যের চেয়ে সতেজ সাবলীলতার আভাস সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেয়েটির চেহারা, পরিচ্ছদ, বসার ভঙ্গী প্রভৃতি সবশুদ্ধ নিয়ে তার মধ্যে যে একটি বৈশিষ্ট্য আছে এক মুহূর্ত্তে তা চোখে পড়ে। নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে নিখিলনাথ একদৃষ্টে বিস্ময়াবিষ্ট চোখে দেখছিল। সে সুন্দরী কিনা সে কথা মনেই আসে না, বিস্ময়ের সঙ্গে মনে হয় সে আশ্চর্য্য।

প্রায় আধ মিনিট নির্ব্বাক থেকে মেয়েটি বিনা ভূমিকায় বললে, "আপনাকে দয়া করে এখুনি আমার সঙ্গে একটু যেতে হবে। আপনার গাড়ী নিশ্চয় আছে, কিন্তু তাতে হবে না। কষ্ট ক'রে আমার সঙ্গে আপনাকে বাসেই যেতে হবে। দেরি করবার সময় নেই। বেশী দেরি করলে হয়ত আপনি তাঁকে বাঁচাতেই পারবেন না।" এ যেন অনুরোধ নয়,— হুকুম। নিখিলনাথ কি বলবেন ঠিক করতে না পেরে একটু ইতস্তত করতে লাগলেন। তার পর বললেন, "দাঁড়ান, ইন্‌চার্জ্জ যিনি আছেন তাঁকে একবার ব'লে আসি।" মেয়েটি এবার একটু হাস্‌ল। সে হাসিতে দাক্ষিণ্যের কোন ভাষা ছিল না, বললে, "কাউকে না ব'লে গেলেই আপনার পক্ষে বেশী নিরাপদ

হবে। তাই বলছি, যেমন আছেন তেমনি আমার সঙ্গে বেরিয়ে আসুন। প্রশ্ন করবার কৌতূহল থাকে, পরে করবেন। তা ছাড়া, যাঁকে দেখতে যাচ্ছেন তাঁকে দেখলে আপনার প্রশ্ন করবার আবশ্যকও হয়ত আর থাক্‌বে না। নিন্‌, এখন দেরি করবেন না, আপনার ষ্টেথিস্‌কোপ্‌ এবং দু-একটা শেষ সময়ের ইন্‌জেক্‌সন্‌-এর সরঞ্জাম পকেটে ক'রে আমার সঙ্গে বেরিয়ে আসুন। ডাক্তারী ব্যাগ নিয়ে বেরোবেন না, অন্যান্য আবশ্যক জিনিষ আশা করি সেখানেই পাবেন।" ব'লে মেয়েটি অত্যন্ত নিশ্চয়তার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। নিখিলনাথ আর যেন দ্বিরুক্তি করবার শক্তি সঞ্চয় ক'রে উঠ্‌তে পারলেন না। অত্যন্ত বাধ্য ছেলেটির মত দরকারী জিনিষগুলো পকেটস্থ ক'রে মেয়েটির পিছন পিছন বেরিয়ে পড়লেন। দরজার কাছে আস্‌তেই দরোয়ান টুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল এবং সসম্ভ্রমে মেয়েটিকে অবনত হয়ে সেলাম জানাল। নিখিলনাথ দরোয়ানের দিকে চেয়ে যেন প্রায় একটা কৈফিয়তের মতই বললেন, "ভগত্‌ সিং, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। কেউ আস্‌লে কাল আসতে ব'লো। আর 'বানার্জ্জি' বাবুকে ব'লো ৯টার সময় আমার 'বদলি' তিনি যেন একটু হাসপাতালে থাকেন।" এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত ভগত সিং এমন অদ্ভুত কথা এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোকটির মুখে কখনও শোনে নি। মুখে সে বললে, "বহুৎ আচ্ছা, হুজুর।" ব'লে একটা সেলাম ঠোকবার অবসরে একবার মেয়েটির আপাদমস্তক সন্দিগ্ধচোখে নিরীক্ষণ ক'রে নিলে।

মেয়েটির সঙ্গে বেরিয়ে নিখিলনাথ মনে মনে তাঁর পঠদ্দশার কথা স্মরণ করতে লাগলেন। কেমন ক'রে যেন তাঁর মনে হ'ল যে এর মধ্যে থেকে সেই দূর অতীতের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এই মেয়েটির ঋজু দেহ, দৃঢ় পদক্ষেপ, সতেজ কণ্ঠ নিখিলনাথের নারীপ্রভাবপরিশূন্য চিত্তে যে একটা মোহ এনেছিল হঠাৎ তাকে একটা রূঢ় আঘাতে ভেঙে দিয়ে মেয়েটি তাকে বললে, "আপনি অমন ক'রে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলবেন না। একটু অপরিচিতের মতই থাকবেন পথে। আপনি এখান থেকেই বাসে উঠবেন, দাঁড়ান।" তার পর লেশমাত্র ভদ্রতা না ক'রে কিংবা তার আদেশ এই পুরুষ-মানুষটি অমান্য করল কিনা সেদিকে দৃক্‌পাত মাত্র না ক'রে নিঃসংশয়ে সে পরের বাস-ষ্টপের দিকে এগিয়ে চ'লে গেল। স্ত্রীজাতির বিনয় বা রূঢ়তা তাকে যে এমন ভাবে বিচলিত করতে পারে, নিখিলনাথের এ অভিজ্ঞতা পূর্ব্বে ছিল না। সে যেন হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে তার স্বপ্নলোক থেকে জেগে উঠল এবং তার আলুথালু মনটাকে সংহত ক'রে নেবার জন্যে বাস্‌-ষ্টপে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে তার পাইপটা বের ক'রে ধরিয়ে নিলে।

হাওড়া ষ্টেশনে মেয়েটি তার পাশ ঘেঁষে যাবার সময় ব'লে গেল, "শ্রীরামপুর।" পূর্ব্বে এ সমস্ত ব্যাপারে যদিও সে একেবারে অনভ্যস্ত ছিল না, তবু একথা সে মনে না ক'রে থাকতে পারল না, যে, তাদের যুগে তাদের দুঃখকে এমন শ্রীমণ্ডিত করবার উপায় তাদের ভাগ্যে ঘটে নি। যাই হোক, একেবারে কলকাতা ছেড়ে যে তাকে বাইরে যেতে হবে একথা সে ভাবে নি। একবার তার মনে হ'ল যে হাস-পাতালের লোকেরা তার খোঁজ করবে; এবং বাইরে যাবার যে ক্ষীণ অজুহাৎ সে দরোয়ানের কাছে দিয়ে এসেছে এই মেয়েটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার রূপটা শ্রোতাদের কাছে বেশ একটু রোমাণ্টিক হয়েই দাঁড়াবে; ভেবে সে একটু মুচকে হাসলে।

শ্রীরামপুর ষ্টেশনে নেমে এদিক-ওদিক চেয়ে সে কোথাও মেয়েটিকে দেখতে পেলে না। হঠাৎ তার মনে হ'ল যে কোন চক্রান্তের কুহকে প'ড়ে কোন ব্যক্তিগত বিপদের মধ্যে পড়বে না ত! কিন্তু তখনই তার মনে তার ঘরের মধ্যেকার অসহায় ক্লান্ত অথচ আত্মসমাহিত সেই মেয়েটির ছবি জেগে উঠল। মন থেকে সমস্ত দ্বিধা দূর ক'রে দিয়ে সে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। এখানেও মেয়েটির সন্ধানে সে সাবধানে চার দিকে চেয়ে দেখলে, তখন সন্ধ্যা প্রায় সমাগত। গেট থেকে শহরের রাস্তায় বেরিয়ে সে কোন্‌ দিকে যাবে ঠিক করতে না পেরে সামনেই একটা খাবারের দোকান দেখে সেখানে গিয়ে কিছু খাবার কিন্‌লে। ইচ্ছা এই যে জল খাওয়ার ছলে এখানে অপেক্ষা ক'রে দেখবে যে মেয়েটির কোন হদিস্‌ করতে পারে কি-না।

নানা চিন্তায় অন্যমনস্ক ভাবে সে এদিক-ওদিক দেখছে। একটা হ্যাংলা কুকুর তার কাছে এসে দাঁড়াল; অল্প অল্প খাবার ভেঙে সে তাকে দিচ্ছে আর দেখছে। একটা ছাড়া-ক গরু শুনো শালপাতার ঠোঙা চিবিয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-

রস সম্ভোগ করছে। যেসব লোক যাতায়াত করছে তার অধিকাংশই ওড়িয়া কুলি। নিখিলনাথ ভাবলে, উঃ, এরা কি সমস্ত বাংলা দেশ ছেয়ে ফেলেছে! সাহেবের পোষাক-পরা একটা লোক এমন ক'রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাবার খাচ্ছে দেখে তারা মাঝে মাঝে তাদের কুতূহলী দৃষ্টি তার দিকে নিক্ষেপ করছে। একটি নিম্নজাতীয়া মেয়ে চলেছে, হাতে একটা ময়লা গামছার পুঁট্‌লী, বয়স হয়েছে, তবু পাড়াগাঁয়ের সাবলীলতা তার চলনে। নিখিলনাথ তার দিকে একবার চেয়ে মনে মনে শহরের কলেজের মেয়েদের সঙ্গে তুলনা ক'রে বিরক্ত হয়ে ভাবলে, ওরাই আবার দেশের মা হবে। আবার কুকুরটাকে খানিকটা খাবার দিয়ে শালপাতাটা গরুটার দিকে ফেলে দিলে। পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে মুখ মোছবার সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার দৃষ্টি মেয়েটির দিকে আপনা থেকেই ফিরল। মেয়েটি তখন একটু দূরে গিয়েছে। এমন সময় ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটি তার দিকে একবার চেয়ে আবার আপন মনে চল্‌তে লাগল।

এক মুহূর্ত্তে নিখিলনাথের চমক ভেঙে গেল। তার স্পষ্ট মনে হ'ল, মেয়েটি সে-ই। মেয়েটির এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে সে একেবারে অবাক্ হয়ে গেল এবং মনে মনে তারিফ না ক'রে থাকতে পারল না।

সাবধানে মেয়েটির উপর নজর রেখে সে ধীরেসুস্থে জল খেয়ে খাবারের দাম চুকিয়ে দিয়ে মেয়েটির অনুসরণ করলে। পথ তখন মোড় ফিরেছে, মেয়েটিকে আর দেখা যায় না, তবু সে প্রায় নিশ্চিন্ত হয়েই চল্‌তে লাগল। অনেক দূরে গিয়ে পথটা দু-ভাগে চলে গিয়েছে। তার একটা কাঁচা রাস্তা। কোন্ পথে যাবে যখন ভাবছে তখন দূরে সেই কাঁচা রাস্তা পার হয়ে মেয়েটিকে সে একটা আমবাগানের মধ্যে ঢুকতে দেখল। এমনি ক'রে নানা রাস্তা ঘুরে, আম বাগানের মধ্যে দিয়ে, এঁদো পুকুরের পাড় ভেঙে ঘণ্টাখানেক পরে মেয়েটির সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে একটা পোড়ো বাড়ীতে গিয়ে উঠল।

চারদিকে বড় বড় আমগাছ যেন প্রেতলোকের প্রহরী। দু-তিনটা ঘর পার হয়ে একটা বড় হল-ঘর। তার এক কোণে একটা মাদুরের উপর কে এক জন শুয়ে।

মেয়েটি এসেই একটা লণ্ঠন ধরালে। নিখিলনাথ দেখলে যে ঘরে কোন আসবাব নেই। কেবল রোগীর বিছানার পাশে একটা মাটির কলসী, গেলাস আর একটা মালসা। মেয়েটি রোগীর পাশে গিয়ে বসে আস্তে আস্তে তার কপালে হাত দিলে। "কে, সীমা?" ব'লে রোগী একটা কাতর ধ্বনি করলে।

"হ্যাঁ, দেখুন কে এসেছেন।"

নিখিলনাথ এগিয়ে এল। সীমা লণ্ঠনটা তুলে ধরলে। আলো-ছায়ায় মিশিয়ে মুমূর্ষুর মুখটা ভীষণ দেখাচ্ছে। চোখ দুটো কোটরে বসে গেছে; নাকটা খাড়া হ'য়ে উঠেছে; একটা ক্ষুধার্ত্ত শকুনি যেন! নিখিলনাথ ষ্টেথিস্‌কোপটা বের ক'রে ডাক্তারের কর্ত্তব্যসাধনের উদ্দেশ্যে মাদুরের কাছে গিয়ে উবু হ'য়ে বসল। উঃ, কি ভয়ানক চোখ লোকটার—কালো কাগজের জমির উপর যেন ভূতের চোখ আঁকা; তেমনি পাকানো, তেমনি নির্ম্মম। লোকটা একটা হাত বের করে ডাক্তারের হাত ধরলে। শিরদাঁড়াটা বেয়ে যেন একটা বরফের বিদ্যুৎ চম্‌কে গেল। মৃত্যুর অন্ধকার-কবরের ভিতর থেকে বাড়ানো সেই হাত। অনেক দিন পর্য্যন্ত নিখিলনাথ সে স্পর্শ ভোলে নি। রোগী যেন স্পষ্ট তার নাম ধ'রে ডাক্‌লে, "নিখিল!" নিখিল অবাক হয়ে গেল। এই ব্যক্তি কি তার পরিচিত? এ কে? এ মুখ সে কখনও দেখেছে বলে ত মনে করতে পারে না। আকাশ-পাতাল নানা চিন্তা করতে করতে সে রোগীর নাড়ী দেখতে লাগল। এই বার রোগী আবার সুস্পষ্ট-স্বরে বল্‌লে, "চিন্‌তে পারছিস্ না, নিখিল? আমার এই হাতখানা দেখ্‌লে কি কারুর ষ্টীমারঘাটে গোরা ঠ্যাঙাবার কথা মনে পড়বে?"

এক মুহূর্ত্তে নিখিলের চোখের উপর থেকে অতীতের বিরাট কালো পর্দ্দাটা উঠে গেল—সে চেঁচিয়ে উঠল, "সত্যদা!"

"চুপ, চেঁচাস্ নে ভাই। তুই ডাক্তার হয়েছিস্ নিখিল, বেশী যন্ত্রণা আর না পেতে হয় এমন একটা ব্যবস্থা কর। বাঁচবার আর ক্ষমতা নেই, ভাই। সাধ নেই তা বল্‌ছিনে। অনেক সাধই বাকী রয়ে গেল। পাগ্‌লীটা বোঝে না তাই ডাক্তার ডাক্তার ক'রে আমায় অস্থির করে। তোর কাছে পাঠিয়েছিলুম; বাঁচাবার জন্যে নয়, ওকে তোর জিম্মায় দিয়ে যাব বলে। তুই নিজে যদি কোন দিন ওর পরিচয় পাস্, ত দেখ্‌বি এমন রত্ন জগতে বেশী নেই।"

নিখিলনাথ অবাক হয়ে সত্যবানকে দেখ্‌ছিল। সেই সুদৃঢ়পেশী, ছ-ফুট লম্বা, বুক চওড়া, নির্ভীক দেশভক্ত সত্যদা; তাদের দলের নেতা, সে কি এই! তখনকার দিনে সত্যদাকে কি ভালই বাস্‌ত সকলে। সত্যদার একটা হুকুমে অনায়াসে প্রাণ তুচ্ছ করতে পারা ওদের পক্ষে কিছুই কঠিন ব্যাপার ছিল না।

নিখিলের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগ্‌ল। "সত্যদা কেমন ক'রে এ দশা তোমার হ'ল? তোমাকে ত ধরতে পারে নি?"

সত্য বললে, "ছিঃ ভাই নিখিল! তুই এমন দুর্ব্বল হয়ে গেছিস্‌! চোখের জল ফেলছিস্‌! ছিঃ!" ব'লে সে সস্নেহে নিখিলের হাতে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "ধরতে পারে নি বটে, কিন্তু যাদের ধরেছিল তারাই বুঝি বেঁচে গেছে রে। কি ক'রে যে আমাদের দিন কেটেছে পাঁচটা বছর তা বল্‌তে পারি নে। তারপর ভেলোয়ারের জঙ্গলে ভগবান মুখ তুলে চাইলে। পুলিসের সঙ্গে লড়াইয়ে আমাদের সব ক'জনই মারা গিয়েছিল, কেবল দু দুটো গুলির চোট খেয়েও এই প্রাণটা বের হয়নি।" বলে সত্যবান মোটামুটি সংক্ষেপে নিজেদের কথা বল্‌তে লাগ্‌ল। অল্প একটু বলে সে বারংবার শ্রান্ত হ'য়ে পড়ল। নিখিলের নিষেধে কিছুই ফল হ'ল না। অগত্যা নিখিল চুপ ক'রে শুনে গেল।

২৩

সেদিন বৃহস্পতিবার। নন্দ অজয়কে নিয়ে কমলার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে।

কমলা নন্দকে বললে, "দেখুন, এখন আমি অনায়াসে বাড়ী গিয়ে খোকাকে দেখে আসতে পারি, তাতে দিদির সঙ্গেও দেখা হয়; আর আপনাকেও কাজের ক্ষতি ক'রে ওকে নিয়ে ছুটোছুটি করতে হয় না।"

নন্দ বললে, "ভারি ত সপ্তাহে দু-এক দিন। এতে আর আমার কাজের কিই বা ক্ষতি হবে? আর তা ছাড়া সমস্ত সময়টা জুড়েই ত কাজ আমাকে ঘেরে থাকে; তার থেকে মুক্তি পেয়ে অল্প এই সময়টুকু তবু একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচবার অবসর পাই। আর বাড়ীতে গেলে তোমার দিদির আঁচলের তলায় তুমি এমনি গা-ঢাকা দাও যে তোমার ত ঠিকানাই পাওয়া যায় না।"

"তা কি করব। দিদি বেচারী একলা একলা চিরটা কাল দাসীবৃত্তি ক'রে মরল। তার উপর ত খোকার দৌরাত্ম্য আছেই।"

"আর আমাদের খাটুনিটা বুঝি দেখতে পাও না। সকাল থেকে জিন ক'ষে এই ব্যবসার বোঝা টেনে টেনে হয়রান হয়ে যাচ্ছি। লাগামটা খুলে দুটো সরস তৃণখণ্ড মুখে ক'রে মুখের তারটা বদলাব, তা বুঝি আর সহ্য হয় না। চিরটা কাল ঘরে ফিরে আমার সেই দানা ছাড়া বুঝি আর গতি নেই।"

কথায় এমন স্পষ্ট ইঙ্গিত নন্দলাল ইতিপূর্ব্বে কোন দিন করে নি। কথাটা বলে যেমন তার সঙ্কোচ হ'ল, কথাটা বলে ফেল্‌তে পেরে তার মনের অনেক দিনকার প্রচ্ছন্ন একটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর ভার যেন অনেকটা লঘু বোধ করতে লাগল। আসলে চিত্ত তার অন্তরে অন্তরে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। চিরকাল এমনি একটা মূক অভিব্যক্তিহীন জড়ভার অনিশ্চয়তার চাপে হৃদয়ের সমস্ত ক্ষুধাকে নিষ্পিষ্ট ক'রে মারতে হবে সংসারের এই বা কি নিয়ম! প্রকৃতির অপরাজেয় বুভুক্ষার নিরন্তর তাড়নার বিরুদ্ধে তার সামাজিক ভদ্রতায় অভ্যস্ত অন্তঃকরণ যুদ্ধ ক'রে ক'রে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। কত দিন সে আর সকলের মুখ চেয়ে নিজেকে এমন ক'রে বঞ্চিত করতে পারে! তাই সে আজ এই সামান্য ইঙ্গিতটুকু করেও যেন একটু স্বস্তি অনুভব করলে। রক্তমোক্ষণ ক'রে নিলে রক্তের চাপে ব্যথিত-মস্তিষ্ক রোগী যেমন আরাম পায়।

কমলার মুখের কোন পরিবর্ত্তন হ'ল না। নন্দলাল অনেক লক্ষ্য করেও বুঝতে পারলে না যে কথাগুলো জ্যোৎস্নার মনে কোন ভাবান্তর জন্মিয়েছে কিনা। কমলা সহজ করুণার স্বরেই বললে, "সত্যিই আপনাকে খুব খাটতে হয়। সেই সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি বিশ্রামের সময় ত পানই না, তার ওপর খোকনকে নিয়ে যদি দৌড়াদৌড়ি করতে হয়—। তাই বলছিলাম, যে এখন ত নিজেই আমি আপনার বাড়ী যেতে পারি; আপনার কষ্ট হয়, তাই ভেবেই বলেছিলাম। তা ছাড়া সত্যিই দিদির সঙ্গে দেখা ত হয়েই ওঠে না। সে

বেচারার সেই রান্না আর ভাঁড়ারের আবর্জ্জনা ঠেলেই প্রাণটা গেল। আপনারা তবু ইচ্ছে করলেই দশটা জায়গায় যেতে পারেন, দশ-খানা বই পড়ে মনের খোরাক বদ্‌লাতে পারেন। দিদির ত তাও নেই। তাই ইচ্ছে করে, গিয়ে তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে গল্পগাছা ক'রে তার মনটাকে একটু বিশ্রাম দিতে।"

"তবেই হয়েছে, তা আর দিতে হয় না। মনে নেই বই পড়ে শোনাতে গেলে হয় নাক ডাকিয়ে পড়ে ঘুম দিত, আর না হয় 'ঐ বাসনগুলো বুঝি ভগলু ফেলে দিলে' 'ঐ যাঃ, খোকনকে দুধ খাওয়ানো হয় নি' বলে সরে পড়ত। মাছটা জলের থেকে ডাঙায় ওঠালে তার বায়ুপরিবর্ত্তন হয় বটে, তবে কিছু উৎকট রকমই হয়। প্রকৃতি সকলের জন্যেই এক ব্যবস্থা করেন নি, বুঝলে? ব্যবস্থাটা হয় স্বভাব অনুসারে। স্বভাব কারুর স্থাবর, কারুর জঙ্গম। কাউকে টেনে বাড়ী থেকে বার করা যায় না, আবার কেউ বা একদণ্ড বাড়ীতে তিষ্ঠুতে পারে না।

"যেমন আপনি, না? বাড়ীতে তিষ্ঠোতে পারেন না!"

"বাপ, তোমার দিদির দাপটে তিষ্ঠোবার যো আছে? বাড়ীতে ঢুকেছ কি সংসারের এক কাহন ফর্দ্দ আর নালিশ আর কৈফিয়ৎ।"

"হ্যাঁ তা বই কি! দিনরাত কোথায় আপনার ত্রিফলার জল, কোথায় মিশ্রির জল, আপনি কি খাবার ভালবাসেন এই সব ক'রে ক'রে মরে কিনা। দিদি টিক টিক না করলে ত স্নানটা পর্য্যন্ত ভাল ক'রে করেন না, ময়লা কাপড়ের উপর ধোপজামা পরে বেরিয়ে যেতেও বাধে না। নখগুলো পর্য্যন্ত দিদি ধরে কেটে দিলে তবে কাটা হয়।

"শেষটা করে আত্মরক্ষার্থে, বুঝলে কিনা—।" কমলা হেসে বললে, "কেন দিদিকে কি খামচে দেবার ভয় দেখান নাকি?"

"না শ্বাপদসঙ্কুল জায়গায় বসবাস করতে হ'লে সশস্ত্র থাকতে হয়।"

"হ্যাঁ তাই ত, আমরা সব শ্বাপদ, আর আপনি?

"আপদ, মাঝে মাঝে আসি বলে বিদায় দেবার ফন্দী আঁটছিলে এক্ষুনি।"

এবারেও বাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল। কমলা কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না ক'রে উঠে বললে, "একটু বসুন, দিদির জন্যে একটা জিনিষ দেব, নিয়ে যাবেন।" এই বলে সে খোকনকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল।

নন্দলাল এবার মনে মনে একটু লজ্জিত এবং নিজের উপর এক রকম বিরক্তই হ'ল। সে চুপ ক'রে বসে ভাবতে লাগ্‌ল, এমন সময় ঘরে এসে ঢুক্‌ল নিখিলনাথ।

২৪

সতেজ সরল দেহ, উন্নত ললাটে প্রতিভার দীপ্তি। তার গঠনের মধ্যে, তার গতিভঙ্গীতে এবং তার অযত্নন্যস্ত ঈষৎ তরঙ্গিত কেশবিন্যাসে যে একটি স্বাতন্ত্র্যের একটি জ্ঞানী-জনসুলভ আভিজাত্যের প্রভাব পরিস্ফুট হয়েছে সেইটেই সকলের চোখে পড়ে। দেখলেই মনে হয় লোকটি জনতার মধ্যে থেকেও জনতা থেকে স্বতন্ত্র ও সুদূর। একে অবহেলা করবার মত ধৃষ্টতা সঞ্চয় করা চলে না, আবার এর সঙ্গে সহসা আত্মীয়তা করতে অগ্রসর হওয়াও যেন ধৃষ্টতা। ইংরেজী পোষাকটাও এর অঙ্গে একটি বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

নিখিলনাথ ঘরে ঢুক্‌তে নন্দলাল নিজের অজ্ঞাতসারেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল। কেন জানি না, সে একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌ল মনে মনে এবং এই লোকটির সামনে নিজেকে কেমন খেলো মনে হ'তে লাগল। নিজের এই চাঞ্চল্যে বিরক্ত হয়ে, নিজের আহত আত্মমর্য্যাদাটুকুকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যেই বোধ করি, সে উদ্ধতভাবে গিয়ে আবার চেয়ারে চেপে বস্‌ল। পূর্ব্বের সামান্য পরিচয় সত্ত্বেও কোন প্রকার সময়োচিত সম্ভাষণ তার মুখ থেকে বেরতে চাইল না, এবং অকারণেই অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে মনে হ'তে লাগল যে জ্যোৎস্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসার জন্যে এই লোকটার কাছে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হবে। মনটা তার বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইলে। নিখিলনাথের দিক থেকে জান্‌লার দিকে মুখ করে সে কাঠ হয়ে বসে রইল এবং একটা সঙ্গত কৈফিয়ৎ খাড়া ক'রে তুল্‌তে কেনই যে সে নিজের অগোচরে মাথা ঘামাতে লাগ্‌ল তা পরে নিজেই সে বুঝতে পারলে না।

নিখিলনাথ শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাকে এখানে আর এক দিন দেখেছি, না? আপনি ত জ্যোৎস্না দেবীর কাছে এসেছেন? দরোয়ানকে বলেছেন ত?"

নন্দলাল খানিকটা নড়ে চড়ে বসে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" বলে অকারণে এতক্ষণ পরে অকস্মাৎ একটা নমস্কার করলে। তার পর বিনা প্রশ্নেই বলে যেতে লাগল, "ওঁর ছেলেটিকে নিয়ে আসতে হয় কিনা; মানে ছেলেটি আমাদের কাছেই থাকে তাই তাকে নিয়ে—মাকে ছেড়ে থাকে নি—ছেলে মানুষ···তাকে নিয়েই উপরে গেছেন—আসবেন এখুনি। দরোয়ানকে বলব আপনি এসেছেন?"...কথাগুলো যেন নির্ব্বোধের মত শোনাচ্ছে সহসা এইরকম অনুভব ক'রে নন্দ নিজের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে থেমে গেল।

নন্দলালের অদ্ভুত কথাবার্ত্তায় একটু অবাক হ'লেও নিখিলনাথ আর কোন বাক্যব্যয় না ক'রে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে কমলের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

নন্দলাল মনে মনে তার নিজের কথাগুলো আলোচনা ক'রে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। রাগও হ'ল নিজের উপর। ভাবলে, লেখাপড়া শিখে এত মানুষ চরিয়ে এসে একটা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলতে শিখলাম না। সে একটু ভেবেচিন্তে নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করলে "জ্যোৎস্নাকে আর কত দিন থাকতে হবে? ওর কোর্স ত শেষ হয়ে এল, না?"

নিখিল বললেন "হ্যাঁ, আর মাস চারেক। তারপর অবশ্য ওঁর ইচ্ছা হ'লে এইখানেই কাজ পেতে পারবেন।"

নন্দ ভালমানুষের মত জিজ্ঞাসা করলে, "এখান থেকে যারা পাস করে তাদের সকলকেই আপনারা কাজ দেন বুঝি?"

"না, তা কেমন ক'রে দেব। যারা সব চেয়ে ভাল তাদের মধ্যে দু-জনকে প্রতিবছর আমরা এক বছরের জন্যে কাজ দি। ওঁর কাজে এবং ব্যবহারে সকলেই খুব খুশী—সুতরাং কাজ যদি উনি করেন ত আমরা সকলেই খুব খুশী হব।"

এত খুশী হওয়ার খবরে নন্দর মনটা আবার ভারী হ'য়ে উঠল। সে অত্যন্ত সংক্ষেপে একটি মাত্র "হুঁ" দিয়ে চুপ ক'রে রইল। সংসারে অনভিজ্ঞ নিখিলনাথ জ্যোৎস্নার আত্মীয়ের কাছে জ্যোৎস্নার গুণের কথা বললে তিনি আনন্দ পাবেন মনে ক'রে বললে, "কি আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ওঁর! এত অল্পদিনের মধ্যে উনি এত চমৎকার ক'রে সব আয়ত্ত ক'রে নিয়েছেন—দেখলে অবাক হ'তে হয়। শেখবার ইচ্ছাও ওঁর খুব।"

নন্দলাল অনাত্মীয় একজন পুরুষের এই প্রশংসায় মনে মনে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু আবার একটা "হুঁ" বলে সে চুপ ক'রে রইল। নিখিল নন্দের মনোভাব বুঝতে না পেরে ভাবলে যে আত্মীয়ের প্রশংসায় যোগ দিতে বোধ হয় নন্দের বিনয়ে বাধা লাগছে। তাই সে আরও উৎসাহিত হ'য়ে নন্দর কাছে জ্যোৎস্নার গুণবর্ণনা প্রসঙ্গে বললে, "আর সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে শুধু কাজের জন্য নয়, ওঁর চরিত্রের গুণে উনি সকলেরই শ্রদ্ধা লাভ করেছেন—যা এখানকার কোন নার্সের ভাগ্যেই প্রায় ঘটে না।"

এইবার নন্দর কৌতূহল উদ্দীপ্ত হ'ল, বললে "কেন?" এক নিমেষে তার বাঙালীর প্রাণ একটা কুৎসার আশায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠল।

নিখিল সেদিকে লক্ষ্য না ক'রে বলে গেল, "তার কারণ অধিকাংশ নার্সই ডাক্তারদের মন যুগিয়ে চলে,—অর্থাৎ তাদের চলতে হয়। তাদের চাকরি, তাদের সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ সবই সেই ডাক্তারদের কৃপার উপরই প্রায় নির্ভর করে। লেখাপড়া বা কালচার ব'লে কোন বস্তুর সংস্পর্শ এদের অধিকাংশই কখনও ত পায় না, কাজেই অন্য উপায়ে ডাক্তারদের মনস্তুষ্টি করতে তাদের বাধেও না—আর তা ছাড়া তাদের গতিই বা কি?"

নন্দ মনে মনে ভাবলে একবার জিজ্ঞেস করে, 'খুব বুঝি চলে?" এই রসাল সংবাদটা নেবার জন্যে তার মনটা লোভিয়ে উঠল। কিন্তু তার ভরসায় কুলোল না। নিরীহ ভাবে বললে, "তাই ত, নার্সদের ত তাহ'লে বিপদ কম না!"

"না, সেটা অবশ্য যার যার চরিত্রের বা মতিগতির উপর নির্ভর করে। জ্যোৎস্না দেবী সম্বন্ধে একথা একেবারেই খাটে না। দেখুন না, এখানকার একটা বদ রীতি আছে—ডাক্তারেরা নার্সদের 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করেন। কেবল ওঁরই বেলায় দেখি ব্যতিক্রম হয়েছে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে ওঁর বয়স বেশী নয়।"

জ্যোৎস্নার প্রসঙ্গ যে এই অল্পভাষী গুরুগম্ভীর লোকটিকে বাঙ্‌ময় করেছে এ কথা বুঝতে নন্দলালের বিলম্ব হয় নি।

কিন্তু কেন? এই প্রতিষ্ঠানের এত বড় এক জন ডাক্তারের একটি নার্স সম্বন্ধে এত উৎসাহ কেন? এটা ত ভাল কথা নয়! মানুষ কি কোথাও একটু নিশ্চিন্ত হবার জায়গা পাবে না? বয়স বেশী নয়; বয়স বেশী নয় ত তোমার কি? নার্স—নার্স। তার বয়স বেশী কি কম এসব কথা ওর মনে হবেই বা কেন? আর জ্যোৎস্নাই বা কেমন? পড়াশুনা করবে, কাজ শিখবে, ব্যস্ চুকে গেল। তা নয়, এই সব ডাক্তারকে বাড়ীতে ডেকে আড্ডা দেবার মানে কি?

ভাব্‌তে ভাব্‌তে নন্দর মনে আর শান্তি রইল না।

এমন সময় খোকাকে নিয়ে কমল এসে উপস্থিত হ'ল; এবং নিখিলনাথকে দেখে "ওমা, আপনি কত ক্ষণ এসেছেন?" ব'লে একটু অনুনয়ের স্বরে বললে, "আজ আমায় ছুটি দিতে হবে। ইনি আমার ভগ্নীপতি। সেদিন ত আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম, না, ডাক্তার রায়?"

"হ্যাঁ, এতক্ষণ ওঁর সঙ্গে আপনারই কথা হচ্ছিল। আজ তবে আমি যাই। কাল দুপুরবেলা তা হ'লে আপনাকে ক্যাম্বেলে নিয়ে যাব ওদের মিউজিয়মটা দেখাতে। আপনি প্রস্তুত থাকবেন।"

কমল বিনীত ভাবে মাথা হেলিয়ে বললে, "আচ্ছা।"

২৫

নিখিলনাথ নন্দকে নমস্কার ক'রে বেরিয়ে গেল। কমল নিতান্ত ভদ্রতা এবং সম্ভ্রম করেই দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল।

এক মিনিট নন্দ এবং কমল দু'জনেই নিস্তব্ধ হয়ে রইল। উঠে গিয়ে বিদায় দিয়ে আসবার মত আদিখ্যেতায় নন্দর গাত্রদাহ উপস্থিত হয়েছিল। বস্তুত নিখিলনাথের সম্বন্ধে কমলের কোন ব্যবহারকে বিকৃত ক'রে না-দেখার মত চরিত্র বা মেজাজ তার ছিল না। সে গুম হয়ে ব'সে রইল; এবং কমল তার এই আকস্মিক গাম্ভীর্য্যের কারণ বুঝে উঠ্‌তে না পেরে মনে মনে একটু অবাক হ'ল। অল্পক্ষণ পূর্ব্বেও ত নন্দ তার সঙ্গে লঘু আনন্দের সঙ্গে আলাপ করেছে!

কমল এই গুমটটাকে হাল্কা করবার জন্যে একটু হেসে বললে, "এইটে দিদিকে দেবেন। আমি ব'সে ব'সে নিজ হাতে এই ব্লাউসটা তৈরি করেছি। দেখুন ত কাজটা পছন্দ হয় কি না? দিদি নিশ্চয় খুব খুশী হবে।"

নন্দলালের মন থেকে নিখিলনাথ-ঘটিত উত্তাপ তখনও জুড়িয়ে যায় নি। বিশেষতঃ নিখিলনাথের সঙ্গে জ্যোৎস্নার ক্যাম্বেলে বেড়াতে যাওয়ার কথাটা (নন্দ ওটাকে বেড়াতে যাওয়ার অছিলা বলেই ধরে নিয়েছিল) তার মনে যে জ্বালা ধরিয়েছিল, একটু বিদ্রূপের সঙ্গেই তার ঝাঁজটুকু নন্দর মুখ থেকে বেরিয়ে এল। সে বললে, "পড়াশুনার নাম ক'রে ডাক্তারের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছ দেখছি। তোমাদের এখানে যত নার্স আছে সকলকেই কি তিনি পালা ক'রে অমনি বেড়াতে নিয়ে যান না কি? না, ওটা তোমার সম্বন্ধেই তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ?"

কমল প্রথম কথাটা ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারে নি। তার ঝাঁজটুকুতে যে অপমান লুকিয়েছিল তা রূঢ়ভাবেই তাকে আঘাত করলেও সে আত্মসম্বরণ করবার প্রয়াসে শুধু বললে, "মানে?"

"মানে অনুগ্রহটা কোন তরফের—আমি হতভাগাই শুধু বঞ্চিত হলাম।"

কমল নন্দলালের কাছ থেকে এই রকম কথা কখনও আশা করেনি। কখনও শোনেও নি।

এত দিন নন্দলালের সমাজশাসিত চিত্ত নিজের অশোভন চেষ্টার লজ্জায় নিজেকে প্রাণপণে সংযত ক'রে এসেছে—কমলকে তারই আশ্রয়ে একান্ত অসহায় এবং বঞ্চিত জেনে। কিন্তু আজ তাকে অন্যের সঙ্গসুখে সুখী কল্পনা ক'রে তার অনুকম্পা শুষ্ক হয়ে গেল এবং মুহূর্ত্তে তার লোভাতুর চিত্ত নিষ্ঠুর হয়ে উঠল।

যদিও নন্দলালের চিত্তের অস্বস্তিকর উন্মুখীনতার কথা কমলের অবিদিত ছিল না, তবু নন্দলালকে সে ভদ্র সংযত এবং তার প্রতি করুণার্দ্র বলেই জেনে এসেছে। অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে এমন রূঢ় কুরুচিপূর্ণ কথা নন্দলালের কাছ থেকে শুনে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। নন্দলালের কথাগুলো খানিকক্ষণ তার আহত মস্তিষ্কে যেন প্রবেশ করবার পথ না পেয়ে একটা কুৎসিত মানুষের মুখের মত প্রত্যক্ষগোচর হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে বিদ্রূপ

করতে লাগল। কি করবে, কি উত্তর দেবে, কেমন ক'রে এই ভদ্রবেশী দুর্বৃত্তকে এই অপমান করার অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত করবে, কিছুই যেন ভেবে উঠতে পারল না। এবং দিশাহারা অসহায় চিত্তের আকণ্ঠ উদ্বেলিত আবেগের তাড়নায় হঠাৎ এক সময়ে উঠে খোকনকে কোলে নিয়ে ছুটে চলে গেল; পাছে কারুর চোখে পড়ে এই ভয়ে সে স্নানের ঘরে ঢুকে প'ড়ে তার বড় আদরের দুলাল, তার সংসারের একমাত্র বন্ধন খোকাকে প্রাণপণে বুকে চেপে ধরে ঝরঝর করে কান্নায় যেন ভেঙে পড়ল। কী তার দুঃখ, তা তার কাছে স্পষ্ট রইল না, শুধু একটা অন্ধ, অসহায়, তীব্র বেদনা আকস্মিক কাল-বৈশাখীর মত তার বান্ধবহীন, আশ্রয়শূন্য চিত্তকে সমাচ্ছন্ন ক'রে ফেললে। খোকন মাকে এমন কখনও দেখে নি। সে ভয় পেয়ে তার কচি একটি হাত মার মুখের উপর দিয়ে "মা, মা রে" বলে কাঁদ-কাঁদ হয়ে ডাক্‌তে লাগল। এই আদরের একটুখানি কচি সুন্দর স্পর্শ পেয়ে সে যেন প্রকাণ্ড একটা আশ্রয় লাভ করলে। খোকনের কান্নায় তার সম্বিত ফিরে এল। চোখ মুছে সে নিঃশব্দে তার মুখের উপর মুখ রেখে নিবিড় ক'রে তাকে তার সমস্ত সত্তার চেতনার মধ্যে অনুভব করতে লাগল।

অল্পক্ষণ পরে সে খোকাকে কোলে ক'রে উপরে তার ঘরে গিয়ে বাক্স থেকে বিস্কুট, একটু প্লাম কেক্ বের ক'রে তাকে কোলের উপর বসিয়ে খাওয়াতে ব'সল। ইতিপূর্ব্বেই তার একদফা খাওয়া শেষ হয়েছিল। খাবার ইচ্ছা তার বড় একটা ছিলই না, তবু তার শিশুচিত্তে সে কেমন করে যেন বুঝতে পেরেছিল যে আজ এই স্নেহটুকু প্রত্যাখ্যান ক'রে মা'র মনে আঘাত করা চল্‌বে না। প্রায় চেষ্টা ক'রেই সে একটু একটু খেতে লাগল। কমল আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলে, "মাসীমা কেমন আছে রে খোকন?" মা'র এইটুকু প্রশ্নেই তার ছোট মন থেকে যেন মস্ত একটা বোঝা নেমে গেল এবং মাকে তার দুঃখের গভীর বেদনায় সান্ত্বনা দেবার সুযোগ পেয়ে খুশী হ'য়ে কলবল ক'রে কথা বলে মাকে ভুলিয়ে রাখবার প্রয়াসে নিযুক্ত হ'ল।

কমলা হঠাৎ উঠে চলে যাবার পর নন্দলাল নিজের নির্ব্বোধ অভদ্র আচরণ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। তার নিজের কথাগুলো মনে মনে আলোচনা ক'রে তার মন যেন তাকে চাবুক মারতে লাগল। অত্যন্ত অনুতাপ হ'ল তার এবং সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘনিঃশ্বাসে এ-কথাও তার মনে হ'ল যে নিজের চরম নির্ব্বুদ্ধিতায় তার আশার সামান্য অঙ্কুরটুকুকে সে নিজ হাতে উৎপাটন করেছে। ক্ষমা-প্রার্থনার সুযোগ সে মনে মনে আলোচনা করতে লাগল এবং পকেট-বুক বার ক'রে লিখলে, "আমি নির্ব্বোধ পশু; তাই তোমাকে অপমান করতে সাহস করেছি। ক্ষমা পাবার যোগ্য আমি নই—তবু তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আমার উপর রাগ ক'রে তোমার দিদিকে ত্যাগ ক'রো না। সে তোমাকে সত্যি ভালবাসে।" 'ভালবাসে' কথাটা লিখতে তার কলম যেন আড়ষ্ট হ'য়ে এল। তাড়াতাড়ি ওটা কেটে লিখলে "নিজের বোন ব'লেই মনে করে।" এইটুকু লিখে সে দরোয়ানের হাতে চিঠিটাকে উপরে পাঠিয়ে দিয়ে চঞ্চল চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগল।

খোকন তখন আপন উৎসাহে মাসীর নামে এক কাহন নালিশ সুরু ক'রে দিয়েছে 'মাসী তাকে কেবল কেবল দুধ খাওয়ায়, তাকে ভগলুর সঙ্গে রাস্তায় যেতে দেয় না, খালি খালি তেল মাখায়' ইত্যাদি। শুনতে শুনতে কমল তার মুখের দিকে চেয়ে নিজের দুঃখ ভুলে গেল। জিজ্ঞেস করলে, "মাসী তোকে ভালবাসে না, না রে? ভারি দুষ্টু।" মাসীকে দুষ্টু বলায় খোকার ভাল লাগল না। সে তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হ'য়ে উঠে আপত্তি জানালে, বললে "ধ্যেৎ, দুষ্টু বল্‌তে নেই।" এবং অবিলম্বে মাসীর গুণগান ক'রে তার প্রতি মাসীর ভালবাসা প্রমাণ করতে লেগে গেল। বললে, "তুমি বাঘের গপ্‌প বল্‌তে পারো! মাসী বাঘের গপ্‌প বলে।" এই বলে মাসীর কাছে বারংবার শোনা মনুষ্য-চরিত্রের আদর্শরূপী এক ধার্ম্মিক ব্যাঘ্রের উপাখ্যান সাড়ম্বরে বল্‌তে সুরু করলে। বালকের রজতধারার মত স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরে কমলের চিত্তের সন্তাপ ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল।

এমন সময় দরোয়ান নন্দলালের ছোট চিঠিখানি নিয়ে তার দরজায় এসে ডাকলে। চিঠির ভাষায় অনুতাপ প্রকাশের অভাব ছিল না, কিন্তু তবু তার মনে গিয়ে যেন ঠিক সুরে বাজল না। সে অনেকবার চিঠিটা পড়ল এবং

এই অনুতপ্ত আশ্রয়দাতৃসম্বন্ধে তার আহত চিত্তকে করুণার্দ্র করবার জন্যে নিজের মনকে বোঝাতে লাগল। কিন্তু সম্প্রতি তার মন তার এই আবেদনকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আন্‌লে না। দরোয়ানকে ডেকে বললে, "এই খোকাবাবুকে নিয়ে ঐ বাবুর কাছে দিয়ে এস। বল আমি এখন যেতে পারছি না।" তার পর খোকাকে কোলে ক'রে বারংবার চুমু দিয়ে সে দরোয়ানের কাছে দিয়ে দিল।

নন্দলাল যদিচ আশা করে নি যে পত্র প্রাপ্তি মাত্র জ্যোৎস্না তার সমস্ত দুর্ব্যবহার বিস্মৃত হয়ে তার কাছে এসে ধরা দেবে; তবু সে দরোয়ানকে একলা খোকাকে নিয়ে ফিরতে দেখে মনে মনে আহত হ'ল। তার অন্তর্নিহিত চিরন্তন পুরুষ মানুষটি যেন পৌরুষের অভিমানে আঘাত পেয়ে ভিতরে ভিতরে একটু উত্তপ্ত হয়েই উঠল। নিখিলনাথ সম্বন্ধে তার চিত্ত অধিকতর সন্দেহাকুল এবং এমন কি প্রায় ঈর্ষাপরায়ণ হ'য়ে তার মনকে তিক্ততায় ভ'রে তুল্‌লে। অজয়ের হাত ধ'রে সে অকারণেই অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে টেনে নিয়ে চল্‌ল তাকে। ভয়ে বেচারী একবার মেসোমশায়ের মুখের দিকে অসহায় ভাবে চেয়ে প্রাণপণে তার চলার সঙ্গে তাল রাখবার জন্যে দৌড়তে চেষ্টা ক'রে গেল প'ড়ে। তার উদ্দাম গতির এই আকস্মিক বাধায় নন্দলাল অত্যন্ত বিরক্ত এবং নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠল। হাত ধরে রূঢ় ভাবে একটা টান দিয়ে সে তাকে টেনে তুলতেই বালক ভয়ে কেঁদে ফেল্‌লে। অজয়ের সেই অসহায় কান্নায় নন্দলালের চমক ভাঙল। অজয়কে সে সত্যই ভালবাসত। তা ছাড়া সে কমলের দুলাল, তাকে দুঃখ দিয়ে কমলের বিরূপতা অর্জ্জন করতে সে পারে না। কিন্তু আজ বারংবার তার ক্ষতবিক্ষত অবমানিত হৃদয় বঞ্চিত ভিক্ষুকের মত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল; এবং কোন-একটা প্রতিশোধের ছিদ্রপথে হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বাষ্পকে মুক্তি দিতে না পারলে তার চিত্তকে কিছুতেই সে শান্ত করতে পারছিল না। এই সামান্য ঘটনার ধাক্কায় সে চেতনা লাভ করলে এবং অজয়কে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিয়ে বারংবার চুমো দিয়ে তাকে শান্ত করতে লাগল।

২৬

আবৃত লণ্ঠনের স্বচ্ছতিমিরালোকে জীর্ণ গৃহ-কঙ্কালের শ্মশানক্ষেত্রে স্তিমিতপ্রায় প্রাণশিখার শেষ বহ্নিজ্বালা উদ্গীরণ ক'রে সত্যবান তার জীবনলীলার অচিন্তনীয় অদ্ভুত কাহিনী ব'লে গেল। শুনতে শুনতে নিখিলনাথ তার চোখের জল সাম্‌লাতে পারে নি। সত্যবানের অসীম ধৈর্য্য, তার সঙ্গীদের অদম্য একনিষ্ঠতা, সীমার একাগ্র দেশভক্তি তাকে সম্পূর্ণ অভিভূত ক'রে ফেললে।

কথা মোটামুটি শেষ ক'রে সত্যবান বললে, "সব কথা শুনলে তোর মনে হবে সত্যদা তোকে একটা উপন্যাস শোনাচ্ছে। তাছাড়া সব কথা বলবার মত সময়ও বোধ হয় আর হবে না। আজ ক-দিন হ'ল ভিতর থেকে একটা কাঁপুনির মত ধরছে থেকে থেকে। তুই এসেছিস, বেশ হয়েছে। ক-টা কথা না ব'লে আমি মরতে পারছি না।"

নিখিল বাধা দিয়ে বললে, "মরার তোমার দেরী আছে সত্যদা। তোমার কাজ ত ফুরোয় নি এখনও। এখনই তোমার মুখ থেকে মরার কথা শুনতে আমরা রাজি নই। হাতটা একটু দেখি।"

এই বলে নিখিল তার চিকিৎসকের কর্ত্তব্যে প্রবৃত্ত হ'ল। সত্যবান একটু মৃদু হাসলে, কিন্তু বাধা দিলে না। বাধা দেবার ক্ষমতাও তার আর বেশী ছিল না। অনেক ক্ষণ ধরে খুব ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে আশার কোন অবলম্বন কিছু আছে ব'লে নিখিলনাথের মনে হ'ল না।

সত্যবানকে একদিন সে নিজে প্রাণ দিয়েই ভাল বেসেছে, গুরুর মত ভক্তি করেছে। দুর্জ্জয় জীবনবহ্নির সেই দীপ্তিশিখা আজ স্তিমিতপ্রায়। অজ্ঞাত, অখ্যাত, প্রতাড়িত সত্যবান :—তার ঐ কঙ্কালটুকুর মধ্যে কোথাও কি এতটুকু স্ফুলিঙ্গ জীবিত নেই যাকে তার সমস্ত চিকিৎসা-বিদ্যার মন্ত্রশক্তিতে আবার সেই প্রদীপ্ত শিখায় পরিণত করতে পারে! ব্যথিত ব্যাকুল চিত্তে সে চুপ ক'রে রইল।

নিঃসহায় নিরাশার ম্রিয়মান ছায়া সম্ভবত তার মুখে প্রকাশ পেয়ে থাক্‌বে। সত্যবান তার মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললে, "আমাকে কি ছেলেমানুষ পেয়েছিস্ রে? চিকিৎসার জন্যে আজ তোকে আমি ডাকি নি। সহজে আমার কথা বুঝবে এমন লোক আর আমার মনে পড়ল না। তাই তোকে এই বিপদের মধ্যে ডেকে এনেছি—নইলে

কাকে আর বিশ্বাস করতে পারি বল্? অথচ না ব'লেও তো আমার নিস্তার নেই। তাই তোকে বারণ করছি যে যে-কয়ঘণ্টা বেঁচে আছি তোর চিকিৎসার উৎপাত থেকে আমায় রেহাই দে।"

কিন্তু নিখিল ডাক্তার—তার কর্ত্তব্য তাকে করতেই হবে। সে তার পকেট-কেস্ বার ক'রে সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে করতে বললে, "দাদা, আমরা কি প্রাণ দেবার মালিক? কে বলতে পারে প্রাণশক্তি কখন কোন অবস্থায় কেমন ক'রে ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকাশ করে, কেমন ক'রে আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ বাণী ব্যর্থ ক'রে দিয়ে নিজের কাজটুকু ক'রে তোলে।" এই ব'লে সে একটা ইঞ্জেকসান দেবার পূর্ব্বে অস্থিচর্ম্মমাত্রসার একটা বাহুতে য়্যালকোহল ঘষতে লাগল। অনেকক্ষণ কথা বলার জন্যেই বোধ করি একরকম নিশ্চেষ্ট হয়ে সত্যবান চুপ ক'রে পড়ে রইল।

(ক্রমশঃ)

কীর্ত্তন

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ঘোষ

"কীর্ত্তন" বলিতে সাধারণতঃ বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলী অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা-বিষয়ক পালা-বন্দী গান বুঝায়। ইহার প্রচলিত নাম "মনোহরসাহী কীর্ত্তন"। ইহার প্রসিদ্ধ সুর—লোফা, খয়রা, দশকোশী, ছোট দশকোশী প্রভৃতি।

এই কীর্ত্তন-ভঙ্গিমার একটা অনন্যসাধারণ মাধুর্য্য ও চিত্তাকর্ষক গুণ আছে। প্রকৃতঃ, ইহার এমন একটা সহজ-মধুর শক্তি আছে যাহার গুণে গানের রস ও ভাব 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে'। শ্রীমদ্ভাগবতে একটি কথা আছে "হৃৎ-কর্ণ রসায়ন"। মনোহরসাহী-কীর্ত্তন বস্তুতই এইরূপ জিনিষ।

এই "কীর্ত্তন" বাংলার, তথা বাঙালীর, এক অমূল্য নিজস্ব সম্পত্তি, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বঙ্গসংস্কৃতির অংশবিশেষ। ইহাকে বজায় রাখা ও শুদ্ধ আদর্শে পরিচালিত করা বাঙালী মাত্রেরই ধর্ম্ম-ঋণ বলিয়া গণ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

ইহার আদি উদ্ভব ও প্রচলন-ক্ষেত্র হইল বীরভূম জেলার মনোহরসাহী পরগণা। বোলপুর শান্তিনিকেতন ও বর্দ্ধমানের শ্রীখণ্ড (কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী অঞ্চল) এই মনোহরসাহী পরগণার অন্তর্গত।

পূর্ব্বে "রেণেটী" এবং "গরাণহাটী" নামক দুই প্রকার কীর্ত্তনের রীতি প্রচলিত ছিল। অধুনা উভয় ধারাই লুপ্ত হইয়াছে। উড়িষ্যার রেণেটী এবং খেতুর-রাজসাহীর গরাণহাটী অঞ্চলের নামানুযায়ী ঐ দুইটি রীতির নামকরণ হইয়াছিল।

বর্ত্তমান কালের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রভাবে, আমাদের অনেক বিষয়ের মতই, কীর্ত্তনেরও অবনতি ঘটিয়াছে; ইহার মাহাত্ম্য ও মর্য্যাদা নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অংশবিশেষ লইয়া, মহাজনপদাবলী-সম্বলিত এক-একটা পালা নির্দ্দিষ্ট আছে। উহা 'মনোহরসাহী' সুরে ও পদ্ধতিতে গীত হইলে, উহার নামকরণ হয় "কীর্ত্তন"। "লীলা-কীর্ত্তন", "রস-কীর্ত্তন" নামেও ইহা প্রসিদ্ধ।

"সঙ্কীর্ত্তন" হইল বহু লোকের একসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্ত্তন। ইহা ব্রজলীলা-বিষয়ক পালা-বন্দী গান নহে এবং "কীর্ত্তনে" যেমন একটা সুরের বাঁধাবাঁধি পদ্ধতি ও গীত-পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট আছে, ইহাতে তাহার দরকার নাই। সঙ্কীর্ত্তন ও লীলাকীর্ত্তনের মধ্যে ইহাই প্রভেদ।

শ্রোতৃমণ্ডলী সম্বন্ধেও একটা তারতম্য নির্দ্দিষ্ট আছে। "কীর্ত্তন" আস্বাদনের জন্য একটু 'অন্তরঙ্গ' ভাবের, (reflective বা introspective moodএর) দরকার। যথা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের নির্দ্দেশ :—

বহিরঙ্গ সনে নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
অন্তরঙ্গ সনে রস-আস্বাদন॥

"অন্তরঙ্গ সনে রস-আস্বাদন"—অর্থাৎ রসকীর্ত্তনে গায়ান, বায়ান ও শ্রোতৃমণ্ডলী—সকলকেই সংযত ও শ্রদ্ধান্বিত হইতে হয়, সমস্ত আসরটাই যেন একটা ভজন-স্থলী, এইরূপ ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হয়।

শুদ্ধ বৈষ্ণব ও অনুরাগী ভক্তের নিকট "কীর্ত্তন" সত্য সত্যই এক শ্রেষ্ঠ ভজনাঙ্গ এবং উত্তম আধ্যাত্মিক খোরাক। ভজনমার্গের শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর—এই পঞ্চ রসের মধ্যে সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই তিনটি হইল ব্রজের মুখ্যরস এবং এই তিনকে আশ্রয় করিয়াই "কীর্ত্তন" হয়। কিন্তু, শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত কৃষ্ণ-ভজনের প্রাণ হইল 'মধুর'-রসাশ্রিত লীলা। ইহা "রাধার প্রেম সাধ্য-শিরোমণি"—এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রেম-সাধনার এক অপূর্ব্ব পরিপোষক কৌশল হইল "কীর্ত্তন"।

প্রসঙ্গতঃ, একটা কথা উল্লেখযোগ্য। শ্রীচৈতন্যের এই যে নবধর্ম্ম—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "পরোধর্ম্মঃ," "পরমোধর্ম্মঃ," যাহাকে বৈষ্ণব মহাজনেরা বলিয়াছেন "নব বৃন্দাবন"; যথা, চণ্ডীদাস :—

নব বৃন্দাবন নব নাম হয়
সকলই আনন্দময়
নব বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে
মিলিত হইয়া রয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহারই ভাষান্তর আছে। তাহা এই রূপ :—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নর-বপু তাহার স্বরূপ।
গোপ বেশ বেণুকর নব-কৈশোর নটবর
নর-লীলার হয় অনুরূপ।

বৃন্দাবনের এই "অপরিকল্পিতপূর্ব্বঃ" "চমৎকারকারী" লীলার মধ্য-মণি হইলেন শ্রীরাধা এবং "রাধার প্রেম" হইল "সাধ্য-শিরোমণি"। এই প্রেমই হইল জীবের 'পরম পুরুষার্থ', যাহার নামান্তর 'পঞ্চমপুরুষার্থ' বা 'পুরুষার্থ-শিরোমণি' (চৈতন্যচরিতামৃত)। এই প্রেমই হইল জগতের অজ্ঞাতপূর্ব্ব এক অভিনব সাধনা। এই সাধনার সঙ্কেত-গুরু হইলেন বিদ্যানগরের অধিকারী (রাজা) শ্রীল রায় রামানন্দ এবং ইহা প্রথম প্রকটিত হইয়াছিল গোদাবরী-তটের নিবিড় নিভৃত নিশীথ বিশ্রম্ভালাপে (চৈঃ চঃ মধ্য। ৮ম)।

শ্রীচৈতন্য নিজে হইলেন এই প্রেম-মন্ত্রের প্রকট মূর্ত্তি—দিব্য আদর্শ—জ্বলন্ত উদাহরণ। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে :—

রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা জ্ঞান।—অন্ত্য।১৪।১৪
রাধিকার ভাব-মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেই ভাবে সুখ দুঃখ উঠে নিরন্তর।—আদি।৪।১০৬
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি দিনে।—আদি।৪।১০৭

এই যে "রাধা ভাব-সুবলিত" দিব্য চিত্র—এই যে মহা-ভাবময়ী মূর্ত্তি—ইহাই হইলেন কীর্ত্তনের "শ্রীগৌরচন্দ্র" যাহার নামান্তর হইল কীর্ত্তনের "গৌরচন্দ্রিকা"।

'বৃন্দাবন-কেলিবার্ত্তা' লুপ্ত হইয়াছিল—রাধার প্রেম-মহিমা জগৎ ভুলিয়া গিয়াছিল।

শ্রীরায় রামানন্দ দিলেন ইঙ্গিত ও সঙ্কেত, শ্রীচৈতন্য করিলেন জীবন্ত সাধনা। রাধার প্রেম আবার প্রকট হইল শ্রীচৈতন্যের ভিতর দিয়া, জগত রাধাকে জানিল শ্রীচৈতন্যের ভিতর দিয়া এবং রাধাকে জানিয়াই কৃষ্ণকে জানিল। ইহার জন্যই শ্রীচৈতন্যের "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য" নাম সার্থক ও অন্বর্থ হইল। যথা, চরিতামৃতে :—

শেষ লীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।
কৃষ্ণ জানাইয়া বিশ্ব কৈল ধন্য।

ইহারই নাম (যেমন শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন) শ্রীচৈতন্যের "অনর্পিতচরী" অর্থাৎ জগতে অজ্ঞাত-পূর্ব্ব সাধনা।

ইহার অর্থ এই—শ্রীচৈতন্য যেন শ্রীরাধার প্রেমভাণ্ডারের চাবি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; তিনি উদ্ঘাটিত করিয়া, প্রকটিত করিয়া, দিলেই লোকে পাইবে;—যেন রাধা-ভাবের উজ্জ্বল আলেখ্য বা আদর্শ, যেন কৃষ্ণলীলার জীবন্ত ব্যাখ্যা।

প্রকৃতই, শ্রীচৈতন্য না হইলে কে বা রাধাকে চিনিত—রাধার প্রেম-মহিমা জানিত বা বুঝিত—কে-ই বা জানিতে বা বুঝিতে প্রলুব্ধ হইত!

বৈষ্ণব মহাজনের আস্বাদন ও অনুভব এইরূপ :—

যদি গৌরাঙ্গ না হইত।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে।

মধুর বৃন্দা- বিপিন মাধুরী
প্রবেশ-চাতুরী সার।
বরজ-যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার।

পুনশ্চ যথা,

প্রেম বলি নাম অতি অদভুত
শ্রুত হইত কার কানে।
বৃন্দা-বিপিনের মহা মধুরিমা
প্রবেশ হইত কার।
কেবা জানাইত রাধার মাধুর্য্য
রস যশ চমৎকার।
তার অনুভব সাত্ত্বিক বিকার
গোচর ছি বা কার।
কহে প্রেমানন্দ এমন গৌরাঙ্গ
অন্তরে ধরিয়া দোল।

"কীর্ত্তনের" মুখপাতে রহিয়াছেন এই শ্রীচৈতন্য। যে পালা কীর্ত্তন হইবে (রূপানুরাগ, মান, মাথুর ইত্যাদি), ঠিক তদনুরূপ রাধা-ভাব কিরূপ ফুটিত, তাহারই প্রকটনরূপী আদর্শ বা আলেখ্য রূপে কীর্ত্তনের মুখে বিরাজমান শ্রীগৌরচন্দ্র।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই অভিনব ভজনের নাম দিয়াছেন "কাচিৎ রম্যা উপাসনা যা ব্রজবধূবর্গেন কল্পিতা," ইহা এক "রম্যা উপাসনা" যাহা ব্রজ-গোপী কর্তৃক অনুষ্ঠিত।

শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা-কথা সংসার-তাপ-দগ্ধ জনগণের চির-তৃষাহরা পরম শান্তিদায়িনী "হরি-লীলা-শিখরিণী" (তৃষ্ণা-নিবারিণী পরম উপাদেয় সুপেয় সামগ্রী)।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে একটি বন্দনায় বিশুদ্ধ শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব এক কথায় অতি সুন্দর প্রকটন করিয়াছেন :—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং যঃ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেম-দীক্ষামশিক্ষয়ৎ॥

যিনি কৃষ্ণভাবামৃত [উন্নতোজ্জ্বল রস] আস্বাদন করিয়া এবং ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া, প্রেম-দীক্ষা অর্থাৎ শুদ্ধ-প্রীতি-মূল ভজনপ্রণালীবিষয়ক দীক্ষা বা দিব্য জ্ঞান দিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে বন্দনা করি।

শ্রীচৈতন্যের রাধা-ভাব-ভাবিত বিশুদ্ধ চিত্রটি হইল কীর্ত্তনের প্রাণ এবং 'শুদ্ধ গৌরচন্দ্র' ('গৌরচন্দ্রিকা') হইল কীর্ত্তনের প্রবেশিকা স্বরূপ এবং ইহার উপরেই কীর্ত্তনের ফলাফল নির্ভর করে।

"গৌরচন্দ্রিকা" ঠিক ভাবে না ধরিলে, কীর্ত্তন "রম্যা উপাসনা" না হইয়া, হয় কামকেলি-বিলাস; "হরিলীলা-শিখরিণী" না হইয়া হয় নাগরীপনা ও দূতিয়ালীর ছড়াছড়ি, অমৃতের বদলে কেবলই গরল, ইষ্টের বদলে কেবলই অনিষ্ট। সাধে কি, বঙ্কিমচন্দ্রের মনে খট্‌কা লাগিয়াছিল এবং তিনি নাম দিয়াছিলেন, "মদন-মহোৎসব"।

সাধনার পথ "শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায়," এই ঋষি-বাক্য কীর্ত্তন সম্বন্ধে যেমন খাটে, এমন বুঝি আর কোথায়ও নহে। সত্যই, এক দিকে প্রেমের মহনীয় স্বরূপ, অন্য দিকে আবার এক চুল এদিক-সেদিক হইলেই কাম-বিলাসের কদর্য্য আবিলতা! 'কাম,' 'মদন,' 'মন্মথ,' 'অভিসার,' 'নিকুঞ্জ-মিলন,' 'কেলি-বিলাস,' 'পরকীয়া রতি' প্রভৃতি নানা প্রাকৃত বর্ণনা ও লৌকিক ভাষার বহু প্রচলন আছে। অথচ, ইহার পশ্চাতে এবং মূলে একটা দিব্য অ-প্রাকৃত ভাব আছে, এবং এই দিব্য ভাব আছে বলিয়াই এই রসকে বলা হয় 'উন্নতোজ্জ্বল রস,' কৃষ্ণকে বলা হয় "অপ্রাকৃত নবীনমদন," আরও বেশী বলা হয় "সাক্ষাৎ মন্মথমথন" 'মদন-মোহন' অর্থাৎ, যেখানে মদনের মদনত্ব পরাভূত, কাম পরাস্ত, কামের কামত্ব লোপ পাইয়া প্রেমে পরিণত।

শ্রীচৈতন্য তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে 'স্বরূপতঃ, জীব হইতেছে নিত্য কৃষ্ণ-দাস—কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা ও সেব্য—জীব দাস, সেবক ইত্যাদি।'

শ্রীচৈতন্য নিজকে গণ্য করিতেন "গোপীভর্ত্তুঃ চরণ-কমলয়োঃ দাস-দাসানুদাসঃ" অর্থাৎ গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবকের দাসানুদাস। তিনি কৃষ্ণ সাজিতে আসেন নাই, কিংবা কখনও নাগরালীর অভিনয় করেন নাই বা ঐ শিক্ষা বা আচরণ প্রকটন বা সমর্থন করেন নাই। এমন কি, বৃন্দাবনদাস-রচিত 'চৈতন্য-ভাগবতে' স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে নদীয়া-নাগরালী আরোপণ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ ও দূষণীয়।

শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত নবধর্ম্ম (নব বৃন্দাবন), বাংলার প্রেম-ধর্ম্ম বা কৃষ্ণ-ভজন—এক জগদ্দুর্লভ দিব্য পবিত্র বস্তু, বিশ্বজগতে সর্ব্বসাধারণের গ্রহণীয় উদার সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব। মহাজন-পদাবলী, বৈষ্ণব শাস্ত্র (ফিলজফি) ও কীর্ত্তন—এই তিনটি হইল উহার প্রধান উপাদান, বাহন ও সাধন।

'কীর্ত্তন'—শুধু গান, কালোয়াতি কসরৎ নহে। ইহা নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ অনুশীলন, বিশেষতঃ ভগবৎকৃপাসাপেক্ষ। ইহা এক তপস্যা। সকলে ইহার অধিকারী হয় না।

ব্রজভজনের পথে, বিশেষতঃ, কীর্ত্তন বিষয়ে, মূল তত্ত্ব হইল (১) শ্রীগৌরচন্দ্র, (২) কৃষ্ণ, (৩) রাধা, (৪) সখী, (৫) বংশী। এই পঞ্চতত্ত্ব ঠিক্ ঠিক্ ভাবে যেখানে, সেইখানেই বৃন্দাবন। বৃন্দাবন অর্থ—"বৃন্দা" অর্থাৎ হ্লাদিনী বৃত্তির "অবন" অর্থাৎ সম্যক পরিপোষণ ও স্ফূর্ত্তি যেখানে। অতি সহজ, সুন্দর, অথচ নির্ম্মল তত্ত্ব।

পেশাদার কীর্ত্তনীয়াগণের মধ্যে এমন লোকও আছেন যাঁহারা এই পঞ্চতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। কিন্তু বিপদ আসিয়াছে অন্য দিক হইতে।

শিক্ষিত সমাজে কেহ কেহ, এমন কি সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা পর্য্যন্ত, প্রকাশ্য কীর্ত্তন-আসরে নামিয়াছেন। অথচ যে শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও সাধনা থাকিলে প্রকৃত কীর্ত্তনাধিকার জন্মে, তাহা তাঁহাদের সকলের নাই; অথচ, সুর-তাল সঙ্গতের জোরে "কীর্ত্তনে"র একটা বিকৃতি বাজারে চলিবার উপক্রম হইয়াছে।

কীর্ত্তনচ্ছলে—রাধাকৃষ্ণের প্রেমের নামে—এমন কি, প্রেমাবতার সোনার গৌরাঙ্গের নামে—কি কুৎসিত বিষয় ও ভাব সমাজে চলিতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত একখানি গ্রন্থ হইতে বুঝা যায়।

* * * *

[ইহার পর লেখক মহাশয় "শ্রীপদামৃতমাধুরী" নামক একখানি গ্রন্থ হইতে বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা তৎসমুদয় মুদ্রিত করা উচিত মনে করিলাম না। যাঁহারা এই সমুদয় বৈষ্ণব কবিতা আধ্যাত্মিক অর্থে বুঝেন, তাঁহাদের তাহা পাঠে কোন অনিষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উল্লিখিত গ্রন্থখানি বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের উপযোগী নহে।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

আগমনী

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

তুমি এসেছিলে যবে, রজনীর ঘন অন্ধকার
ক্ষণিকের তরে বুঝি ক্ষণপ্রভা স্পর্শেতে উজ্জ্বল
হইল সে শুভলগ্নে, তুমি যবে এসেছিলে সখি,
রজনীর অন্ধকারে উদ্ভাসিয়া আকুল আবেগে।

প্রথম কাকলি তব মিশেছিল পাখীদের গানে,
প্রথম ক্রন্দনটুকু—নীলাকাশে শুভ্র মেঘচ্ছায়া;
শৈশবের অশ্রুজল পবিত্র সে শিশিরের মত
জন্ম নহে তার কভু হৃদয়ের ঘন কালো মেঘে।

দুইটি কথার সুরে পরাজিত শত তানলয়,
আড়ষ্ট গতির লীলা, নটীদের সহস্র ইঙ্গিত
পারে না দেখাতে তার অপরূপ সৌন্দর্য্য-কৌশল;
স্রোতস্বিনী-কোলে যেন দুলে ওঠে চন্দ্রমার ছায়া।

রেশমী চুলের রাশি মৃদু মৃদু উঠিত কাঁপিয়া,
বসন্ত-পবন যেন মেতে ওঠে স্নিগ্ধ ঝাউ-বনে;
সরসীর কালো জলে ঝুঁকে-পড়া তরুশাখা সম
পেলব কোমল ঘন দীর্ঘ ছিল নয়ন-পল্লব।

হাসির হিল্লোলে অঙ্গ মেতে কভু উঠিত চঞ্চল,
অকারণ ক্রন্দনের তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ বক্ষ কভু—
অনাগত যৌবনের অনুভূতি দিত কভু দেখা,
লজ্জা, স্নেহ, অভিমান বেদনার স্নিগ্ধ অভিনয়ে।

কেহ বুঝিল না কবে বিস্মরিয়া তরুণ উষার
কুণ্ঠিত কোমল রশ্মি প্রখরিল সে যৌবন-রবি
উজ্জ্বল আকাশবক্ষে, পরাজিত তারকা চন্দ্রমা
বিস্ফারিত বিশ্ব-আঁখি হেরি প্রভা অর্দ্ধনিমীলিত।

শুখাইল কত ফুল, কত তরু বিদীর্ণ অন্তরে,
সবুজ প্রান্তর কত মরুসম হ'ল একেবারে;
শুধু এই এতটুকু মালঞ্চ সে লভিল আশ্রয়—
নয়নপল্লবছায়ে তাই তাহে আজও ফোটে ফুল।

আবার সন্ধ্যায় কবে ঘনায়িত আধ-অন্ধকারে
মরুবক্ষে লক্ষ ফুল ফুটিবে কি নবীন আবেগে!
শুষ্ক তরুশাখে পুনঃ দেখা দিবে নূতন পল্লব,
এ-মালঞ্চে ফুল আর ফুটিবে না সে অন্তিম কালে।

মৃত্যু-উৎসব

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

অমাবস্যার অন্ধকারভরা আষাঢ়ের সন্ধ্যা। আকাশে নক্ষত্র নাই—চারি দিকে মেঘের ভ্রূকুটি। শহর-ঘেঁষা পাড়াগাঁ নহে, সত্যকারের বনজঙ্গলে ভরা গ্রাম। পা-পিছলানো-কাদার মধ্যে এমন রাত্রিতে যে একবার এই গ্রাম্য পথে চলিয়াছে, সে কখনও জীবনে সেই অভিজ্ঞতা ভুলিবে না। কিন্তু যাহারা প্রত্যহ বর্ষাকালে ঝড়ে ও অন্ধকারে খদ্যোতিকার মশাল পাশে রাখিয়া ঝিঁঝিঁপোকার ডাক শুনিতে শুনিতে দিব্য নিশ্চিন্তে নরম কাদায় পা রাখিয়া গুনগুন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে এইরূপ গ্রাম্য পথে চলা-ফেরা করে তাহাদের কাছে এই অভিজ্ঞতার কি-ই বা মূল্য! ভূপতির বাস এমনই এক পল্লীগ্রামে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে ও পূরা অমাবস্যায় এই আবাল্যপরিচিত পথ চলিতে তাহার কিছুমাত্রও উদ্বেগ বা আশঙ্কা দেখা যায় না; শীতকালে অদূরে জঙ্গলের মধ্যে ফেউ ডাকিলে বুক তাহার দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠে না, ঝোপের আড়ালে জলন্ত অঙ্গারের মত দৃষ্টি দেখিয়া সে ভয়ে মূর্চ্ছা গিয়াছে বলিয়াও শুনা যায় নাই, বরং সুকৌশলে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। কত দিন গ্রীষ্মের অন্ধকার রাত্রিতে পাশে 'সর্-সর্' করিয়া সাপ চলিয়া গিয়াছে, হাতে তালি দিয়া সে নির্ভয়ে অগ্রসর হইয়াছে। সেই নির্ভীক ভূপতি আজও পথ চলিতেছে; আকাশে মেঘ—অমাবস্যার অন্ধকার—কিন্তু পা কাঁপে কেন? কেন পথিপার্শ্বের বৃক্ষলতার মৃদুধ্বনি অশরীরী আত্মার নিশ্বাসপতনের মত তাহার কানে আসিয়া বাজিতেছে? মেঘের ভ্রূকুটিতে মন কেন ভার-ভার?

ভূপতির দিদি সুভার বড় অসুখ। ভূপতির মা নাই, বাপ নাই, অন্য কোন আত্মীয় আত্মীয়া নাই—এই বিধবা দিদি একাধারে তার সব। সম্পর্কে বোন হইলেও মায়ের চেয়ে তিনি কম মহীয়সী নন। তিনি ভূপতির শৈশবকে আপন স্নেহের মহিমায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন এবং যৌবনের নদীতে একখানি রঙীন পালভরা নৌকা ভাসাইবার আয়োজন করিয়াও এ-যাবৎ কৃতকার্য্য হন নাই। কারণ ভূপতি অবুঝ। দিদির মনোদুঃখের চেয়ে সে নিজের বর্ত্তমান দুঃখকে বড় করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে। যিনি জীবন দিয়াছেন তিনি যে আহারও দেন—এই প্রবচনে তার প্রত্যয়ের অভাব। সাধ-আহ্লাদের কথা উঠিলে জীর্ণ চালা-ঘর দেখাইয়া সে দিদির চোখে জল টানিয়া আনে, আধভর্ত্তি গোলার পানে আর নিজের ছেঁড়া কাপড়ের পানে চাহিয়া হাসে, হয়ত বা দিদিকে রহস্য করিয়া বলে—পক্ষীরাজ ঘোড়া একটা পাইলে সাগরশায়িনী কন্যার মর্ম্মর-হর্ম্ম্যে গিয়া সোনার কাঠি দিয়া তার প্রিয়-প্রতীক্ষমান নিদ্রার পরিসমাপ্তি ঘটাইতে পারে। পরিহাসে দিদির কান্না শব্দমুখর হইলে সে ছুটিয়া অন্য কোথাও চলিয়া যায়।

এক তরফ হইতে এমনই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও অন্য তরফের ঔদাসীন্যের এক দিন সহসা শেষ হইল।—

দিদি অসুখে পড়িলেন।

যখন শয্যা আশ্রয় করিলেন তখনই অসুখের গুরুত্ব বোঝা গেল।

পাড়াগাঁর জ্বর এত দিন কাঁচা তেঁতুলের অম্বল আর কড়ায়ের ডালে ভিতরে ভিতরে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছিল; স্নানের পর শীতভাবটুকু ক্রমে কম্পে আসিয়া ঠেকিল—দিদি শয্যা লইলেন। শয্যাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে রোগের উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়া ভূপতি ভীত হইয়া পড়িল। প্রধান অভাব অর্থ, আনুষঙ্গিক শুশ্রূষার লোক। কে-ই বা রোগীকে ঔষধ খাওয়ায়—কে-ই বা সুস্থ ভূপতিকে ক্ষুধায় দু-মুঠা সিদ্ধ করিয়া দেয়!

কিন্তু নিজের জন্য ভূপতি ভাবে না। দিদিকে কিরূপে সুস্থ করিয়া তুলিবে এই চিন্তাই তার মনে প্রবল।

সুস্থ দিদি আর রুগ্ন দিদিতে কত না তফাৎ। রোগের প্রলাপে দিদির মুখে অন্য কথা নাই, শুধু ভূপতির কথা। তার খাওয়া, তার ঘুম বিশ্রাম, তার সুখ, তাকে সংসার পাতিবার অনুরোধ। রুগ্না বিধবার মুখে ভগবান নাই—আছে ভূপতির কথা। নিম্নগামী স্নেহের ধারায় ভূপতি রাত্রি দিন পরিপ্লাবিত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে তার কেবলই মনে হইতে লাগিল, দিদি যদি না-বাঁচে? ভাবনার কারণ আছে। এ কয় দিন চেষ্টা করিয়াও সে ভাল ডাক্তার জোগাড় করিতে পারে নাই। ছোট পাড়াগাঁ—ভাল ডাক্তার খুব বেশী না থাকিলেও সুবল ডাক্তারের মুখ চাহিয়া অনেকের বুকে অনেকখানি ভরসা জাগে। সেই সুবলকে আজ সাধিয়াও সে এ-দিক পানে আনিতে পারে নাই। গ্রামের জমিদারের অসুখ, অসুখটা শক্ত, তাই শহর হইতে বড় ডাক্তার আসিয়াছেন। সুবল এবং আরও অন্যান্য ক্ষুদে চিকিৎসকগুলি কয় দিন হইতেই জমিদারের বৈঠকখানায় কায়েমী ভাবে আশ্রয় লইয়াছে। পারিশ্রমিক মোটাই মিলিবে; না মিলিলেও গ্রামের জমিদার—সকলেরই ত দু-পাঁচ বিঘা জমিজমা আছে—সংসারী মানুষ, চক্ষু মুদিয়া গীতার শ্লোক অনুসরণ করিলে বানপ্রস্থ যে অবিলম্বে করতলগত হইবে সে-বিষয়েও নিঃসন্দেহ—সুতরাং জমিদারের বিপদে বুক দিয়া না পড়িলে চলিবে কেন?

সুবল-ডাক্তার ত স্পষ্টই বলিয়াছে, তোমার দিদির জন্য ভাবনা কি ভূপতি, বিধবা মানুষ, ওঁদের হাড় খুব টনকো। উপোস দিলে আপনিই সেরে উঠবে। দেখছ ত জমিদার বাবুর অবস্থা, ভোগের শরীর—রোগটাও শক্ত, এখান থেকে নড়ি কি ক'রে বল দেখি? ওঁর ভালমন্দ হ'লে সারা দেশের লোক অনাথ হবে যে!

ডাক্তারবাবুর গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া ভূপতি দ্বিতীয় কথাটি কহিতে সাহস করে নাই।

পথ চলিতে চলিতে নির্ভীক ভূপতি ঐ কথাটাই ভাবিতেছে। কুটীরবাসিনী দিদি আর গ্রামের জমিদারে কত না তফাৎ! বনপ্রান্তে ময়লা ও ছিন্ন শয্যায় দিদি তাহার শুইয়া অসহ রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে—পাশে সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই। না পড়িয়াছে এক ফোঁটা ঔষধ—বিধবা মানুষ ঔষধ খাইতেও চাহে নাই—শুধু সকাল সন্ধ্যায় তুলসীতলার মাটি আনিয়া সে দিদির কপালে ঠেকাইয়া দিয়াছে। তৃষ্ণার ক্ষণে দিয়াছে অল্প একটু জল। জল পান করিয়া দিদি অনেকটা সুস্থ বোধ করিয়াছে। ওদিকে জমিদারের অসুখে শহর হইতে বড় বড় ডাক্তার আসিতেছে—গ্রামের গুলি ত ফাউ—দিবারাত্র লোকজনে বাড়ী ভর্ত্তি। মন্দিরে চলিতেছে পূজা, পুরোহিত-বাড়ী শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, দুষ্প্রাপ্য মাদুলি ও দৈব ঔষধ চয়নের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিয়া দূর-দূরান্তরে লোক ছুটিতেছে। জমিদার যদিই দেহ রক্ষা করেন—নিতান্ত কপালের লেখা ছাড়া অন্য ত্রুটি হেতু কেহ ক্ষোভ প্রকাশ করিতে পারিবে না।...

যাহারা গরিব তাহাদের কেন ব্যাধি হয়? মৃত্যু আসিয়া একেবারে সব জ্বালা চুকাইয়া দিলেই ত পারে।

ভূপতি বাড়ী আসিয়া দেখিল দিদি ঘুমাইয়াছে। সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ও-বেলার জল দেওয়া পান্তাভাত বাড়িয়া খাইতে বসিল। খানিকটা নুন, কাঁচালঙ্কা ও একটু তেল দিয়া পান্তাভাত খাইতে বেশ লাগে। উপরন্তু রাত্রির রান্নার হাঙ্গামা বাঁচিয়া যায়।

ভাত খাওয়া তখনও শেষ হয় নাই—সহসা একটা মিশ্র ক্রন্দনধ্বনি শোনা গেল। কান পাতিয়া ভূপতি মিনিট-খানেক সেই ক্রমবর্দ্ধমান ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া বুঝিল, ধ্বনিটা জমিদার-বাড়ীর দিক হইতেই আসিতেছে। নিশ্চয়ই মানুষের মিলিত উদ্যমের পরাজয় ঘটিয়াছে। খাওয়া আর হইল না।

দিদির তন্দ্রাও সেই কোলাহলে টুটিয়া গিয়াছিল। ক্ষীণ-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হ'ল রে, ভূপি?

ভূপতি বলিল—জমিদার শশীকান্ত মারা গেলেন বোধ হয়।

দিদি ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করিলেন—কি হয়েছিল তাঁর?

কি জানি, অনেক ডাক্তার এসেছিল—অনেক কথাই ত বললে।

দিদি বলিলেন—আহা!

দিদির এই সহানুভূতিপ্রকাশ ভূপতির ভাল লাগিল না। যেখানে 'আহা' বলিবার অসংখ্য লোক রহিয়াছে সেখানে অপ্রচারিত এই সহানুভূতির কতটুকু মূল্য? কই দিদির অসুখে কেহ ত একবার 'আহা' বলে নাই। জমিদার মরিলেন—গ্রামে হয়ত ইন্দ্রপাত হইল—তাহার দিদি মরিলে কেহ একবার ভাল করিয়া হয়ত তাকাইয়াও দেখিবে না।

হয়ত বলিবে, আহা বিধবা বেশ গিয়াছে—থাকা মানে ত কষ্ট।

ভূপতির অন্তরের বিক্ষোভ কেহ সত্যকার অন্তর দিয়া অনুভব করিবে না।

—ভূপতি-দা, বাড়ী আছ?—ভূপতি-দা?

—কে?

—আমি হরেন। জমিদার বাবু এই মাত্র দেহ রাখলেন। তোমাকেও যে যেতে হবে?

—আমার বাড়ীতে অসুখ যে।

—বাঃ রে! আমরা মনে করেছি সংকীর্ত্তনের দল বার করব। তুমি না গেলে মূল গায়েন হবে কে?

—কেন, সন্তোষ পারবে না?

—রামঃ বল—ছাগল দিয়ে যব মাড়ানো! বেলেডাঙা থেকে নেড়া বৈরাগীর দল আসছে—তাদের ওপর টেক্কা দিতে হবে।

ভূপতি অল্প একটু ভাবিয়া বলিল—না-হয় তারাই গাইলে, আমাদের দল যদি না-ই বেরোয় তাতে ক্ষতিটা কি?

—কি যে বল ভূপতি-দা, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। আমাদের গাঁয়ের জমিদার আমরা গাইব না ত কি ওরা গাইবে? তা হ'লে এত দিন দল রাখার মানেটা কি? নাও, চল।

হাত ধরিয়া টানিতেই ভূপতি বলিল—দাঁড়া, দিদিকে বলি।

—কই, দিদি—বলিয়া হরেন নিজেই দাওয়ায় উঠিয়া ঘরের মধ্যে মুখ বাড়াইয়া বলিল—জমিদার বাবু এই মাত্র মারা গেলেন, দিদি। আমাদের ভূপতি-দাকে যে চাই—নইলে কেত্তন জমবে না।

ঘরের মধ্যে ম্লান প্রদীপশিখায় স্পষ্ট কিছু দেখা যাইতেছিল না। মলিন শয্যায় মিশাইয়া শীর্ণা সুভা পড়িয়া ছিল—বুক পর্য্যন্ত কাঁথা দিয়া ঢাকা। ক্ষীণস্বর শুধু সেই দিক হইতে ভাসিয়া আসিল, পর-পর ক-টা রাতই জেগেছে—একটু সকাল-সকাল ওকে পাঠিয়ে দিও ত, ভাই।

—আচ্ছা—বলিয়া ভূপতির দিকে ফিরিয়া হরেন বলিল—কদিন হ'ল দিদির অসুখ হয়েছে? বল নি ত আমাদের!

ভূপতি হাসিল, তোমাদের শোনবার ফুরসৎ ছিল কি?

হরেন আরও একটু উচ্চ হাসিয়া বলিল—তা বটে! রাজতুল্য জমিদার, আমাদের যে মরবার ফুরসৎ ছিল না।

ভূপতি দুয়ারে শিকল তুলিয়া তালা লাগাইবার উপক্রম করিতেই হরেন সবিস্ময়ে বলিল—কুলুপ দিচ্ছ যে? ওঁকে না-হয় বল না ভেতর থেকে—

—সে-ক্ষমতা থাকলে আমায় ও ব্যবস্থা করতে হয় কি? নাও, চল।

হরেন অল্প একটু চিন্তিত মুখে বলিল—তাই ত! ব্যায়রামটা শক্ত তা হ'লে।—তা আমাদের এত দিন···যাই হোক, কাল থেকে উঠে-প'ড়ে লাগব—দেখি ব্যাটা রোগ সারে কিনা!

ভূপতি অন্য প্রশ্ন পাড়িল—শ্মশানে কে কে যাবেন? হরেন দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল—শোন কথা! কে কে যাবেন না তাই বরং জিজ্ঞাসা কর। গ্রামের রাজা—! কি রকম প্রোসেশন হবে জান? প্রথমে এক দল কের্ত্তন, তার পর ধামায় ক'রে খই ছড়াতে ছড়াতে এক দল লোক যাবে; বাবুর ছেলে নিজের হাতে ছড়াবেন সিকি, দুয়ানি, আনি, পয়সা, আধুলি। তার পর খাট কাঁধে ক'রে আত্মীয়-স্বজন গাঁয়ের লোক, পেছনে থাকবে আর এক দল কের্ত্তন। কেমন, গ্র্যাণ্ড হবে না?

—বাজনা হবে না?

—দূর, মড়া নিয়ে বাজনা বাজায়?

ভূপতি হাসিল—ও, কীর্ত্তনের দল যাবে যে! তার পর হরেন, তোমাদের আর কি কি প্রোগ্রাম!

—প্রোগ্রাম! সে মেলাই। যে-খাটে জমিদার মরেছেন সেই খাটে ক'রেই নিয়ে যাওয়া হবে। কলকাতায় লোক ছুটেছে ফুল আনতে। আজ তিথিটা ভাল—অমাবস্যা—কি বল হে!

ভূপতি বলিল—সে পুরোহিত-মশায় ভাল বলতে পারেন। আমি ভাবছি তোমরা যে-রকম আয়োজন করছ—শ্মশানে পৌঁছতেই যে সকাল হয়ে যাবে!

হরেন হাসিল, ভারি ত সকাল। সারারাত সারাদিন ব'য়ে বেড়ালেও যায়-আসে না। কীর্ত্তনটা তাহ'লে অষ্টম প্রহর হয়। জমে ভাল।

—হরেন, কেবল জমার কথাই ভাবছ। এদিকে—

—হ্যাঁ—জমার কথা হরেনই ভাবছে শুধু। চল বাবুদের

একটানা ঝড়ের মত বহিয়া চলে—যেখানে আল্‌গা বালু বাতাসের বেগে ঘূর্ণীর সৃষ্টি করে—নদীজলের কুলুধ্বনিতে কান যেখানে পীড়িত হইয়া উঠে। ঝোপে ঝোপে যখন জোনাকি জ্বলিয়া নিবিয়া যায়, কিংবা শ্মশান-শকুন গভীর রাত্রিতে প্রেতশিশুর মত ককাইতে থাকে, অথবা মড়ার মাথার ভিতর দিয়া বায়ু প্রবাহিত হইয়া গোঙানির সৃষ্টি করে—তখন নিবন্ত চিতার পাশে বসিয়া অনতিদূরবর্ত্তী অন্ধকারমাখা নদী ও মাথার উপর পাংশু আকাশের পানে চাহিয়া কোন্ দেশের কথা মনে জাগে? চিতাধূম কুণ্ডলী পাকাইয়া উর্দ্ধস্তরে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে মনও তার সাথী হয় এবং তারার দেশের ওপারে যে অজানা জগৎ তারই সীমানায় লুব্ধ মধুকরের মত গুঞ্জরণ করিয়া ঘুরিয়া মরে। সেই অমৃতলোকে অমৃতসিন্ধুর তীরে মিলনের সেতু রচনায় তার ব্যস্ততা দেখা যায়। পার্থিব ক্ষণিক মিলনকে যুগব্যাপী ধ্বংসহীন আনন্দের মুখে তুলিয়া দিয়াই সে পরম তৃপ্ত। তাই তার স্বর্গ রচনার প্রয়াস—পরলোকের বার্ত্তা চয়ন করিয়া প্রিয়বিরহ নিবারণে তাই সে এত উৎসুক। শ্মশান-বৈরাগ্য ক্ষণিকের তরে আত্মবিলোপের যে ভাবটি মনে তীব্রতর ভাবে ফুটাইয়া তুলে উপরের ঐ নক্ষত্রজগৎ সামান্য স্নিগ্ধতর আলোকে ধীরে ধীরে সে ভাবটি বিলুপ্ত করিয়া মানুষের কানে সুদূর মিলনের আশ্বাসবাণী শুনাইতে থাকে। মানুষ ভস্মীভূত দেহের পানে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় ও নদীতে ডুব দিয়া আত্মহত্যা করে না—ধীরে ধীরে লোকালয়ে ফিরিয়া চলে।

এত ক্ষণে চিতা জ্বলিয়া উঠিল। চন্দনকাঠ ও গাওয়া ঘিয়ের সুগন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়াছে। ভাঙা কলসী, ছেঁড়া কাঁথা বালিশ ও বাঁশ দড়ির টুকুরার পাশে জমিদার-বাড়ীর বহুমূল্য খাট, বিছানা, বালিশ, ফুল ও পরিধেয় স্তূপীকৃত রহিয়াছে। বাবলা গাছে কাক আছে—রাত্রি বলিয়া সে নীরব, বহু লোকের কোলাহলে কুকুরের দল আত্মগোপন করিয়াছে। বনঝাউয়ের গর্ভে লোভার্ত্ত চোখগুলি জ্বলিবার ফুরসৎ পায় নাই—যে তীব্র আলো! উপরের আকাশও সময় বুঝিয়া পরিষ্কার নীলের থালায় নক্ষত্রের মণিমাণিক্য সাজাইয়া ধরিয়াছে, এখানকার নদী পর্য্যন্ত স্নানের ঘাটের ঊর্ম্মিবাহুবিক্ষেপভরা কিশোরী নদীর মতই চপলা। শ্মশানের ভয় ও গাম্ভীর্য্য মেশানো মহিমায় যেন অপমৃত্যু ঘটিয়াছে!

হায় রে মৃত্যু! তোমারই রাজত্বে আসিয়া এতগুলি মানুষ আজ তোমাকেই হত্যা করিয়া চলিল।

চারি দিকে গল্পের মিশ্রধ্বনি। যে যে-গল্পের রসিক বহুধা বিভক্ত হইয়া বালুতটে বৃত্তাকারে বসিয়া সেই কাহিনীর চিত্রে বর্ণ সম্পাত করিতেছে। চিতায় নিশ্চল তনু অগ্নির বর্ণে বর্ণ মিলাইয়া অঙ্গার হইয়া যাইতেছে—চিতার পাশে পার্থিব ভোগবিলাসের খোলস পরিত্যাগ করিয়া সে অগ্নিস্নাত হইতেছে, সে-দিকে কই, কেহ ত ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেছে না? নিশ্চিন্ত মনে মন্দীভূত তেজে ইন্ধন ঠেলিয়া দিয়া ঐ লোকগুলি পর্য্যন্ত হাত মুখ নাড়িয়া এত কিসের গল্প করিতেছে?

জীবন—জীবন—চারি দিকে অফুরন্ত জীবনস্রোত। সেই জীবনের কোলাহলে মৃত্যুও বুঝি তুচ্ছ হইয়া গেল।

কলিকাতার পথে দড়ির খাটে চাপিয়া জনস্রোতের মধ্য দিয়া যে-শব মুহূর্ত্তের তরে চলিয়া যায়—ক্ষুদ্র এক মুহূর্ত্ত-কণায়ও সে তার যাত্রাপথের অনুভূতি জাগাইয়া মনকে দোলা দেয় না। ঝড়ে নৌকাডুবি হইলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে পাগল নদ মগ্নস্থানটিকে অতি ক্ষিপ্রতায় নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। জীবনের স্রোত যেখানে প্রবল, মরণের তৃণখণ্ড সেখানে মুহূর্ত্তে শতধা বিভক্ত হইয়া এই ভাবেই বুঝি মিশিয়া যায়।

আজ যদি জমিদারের পরিবর্ত্তে ভূপতির দিদি এখানে আসিত? তাহা হইলে বাঁশের খাটিয়া বহিবার জন্য অতি কষ্টে চারি জন লোককে একত্র করিতে হইত। দীর্ঘ পথ হইত দীর্ঘতর। বন ঝোপের অন্ধকার, মাথার উপর রাত্রির প্রচণ্ড ভার ও বৃষ্টির ভয়াবহতা মনকে সর্ব্বক্ষণই বিমুখ করিয়া দিত। নদীর পটভূমিতে ঐ ঝাউয়ের বন—বাবলার সারি—ছেঁড়া কাঁথা মাদুর বাঁশ দড়ি ও ভাঙা কলসীর মাঝখানে মড়ার হাড় ও মাথার খুলি ডিঙাইয়া ক্ষণপূর্ব্বের নির্ব্বাপিত চিতার পাশে খাটিয়া নামাইয়া চাপা গলায় সকলে একবার 'হরিধ্বনি' দিয়া উঠিত। সেই হরিনাম মনকে আরও ভয়ত্রস্ত করিয়া তুলিত। ওদিকে হাড় চিবাইতে চিবাইতে কুকুরগুলা ক্ষণিকের তরে এধারে চাহিত, ঝোপের মধ্যে

গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য—শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন, গিরিশ লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত। রসচক্র সাহিত্য-সংসদ, দক্ষিণ কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেন কর্তৃক প্রকাশিত, ১৫ সংখ্যক রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠ-সংখ্যা ।৵০+২০৬। কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য দুই টাকা।

এই উপাদেয় পুস্তকখানি গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা তথা বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে একখানি source book বা প্রমাণ-পুস্তক স্বরূপ বঙ্গসাহিত্যে বিরাজ করিবে। লেখক গিরিশচন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ ও সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার সহিত কাব্য ও নাট্য সাহিত্য এবং ধর্ম্ম ও সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল প্রসঙ্গ হইয়াছিল, সেগুলির একটি বিশদ বিবরণ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের দেশের সাহিত্যের পক্ষে দুর্ভাগ্য যে যাঁহারা গত শতকের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই শতকের সমগ্র দ্বিতীয়ার্দ্ধ ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষার আধুনিক সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের সাহিত্যিক ও অন্য বিষয় সম্বন্ধীয় মতামত স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রূপে আমরা পাই না। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বঙ্কিম—ইঁহাদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া নানা বিষয়ে ইঁহাদের খোলাখুলি মত, ইঁহাদের সাহিত্যিক ও সামাজিক আদর্শ, আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি যদি কেহ আমাদের জন্য লিখিয়া রাখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আমাদের সাহিত্য ইতিহাসের পক্ষে তাহা কতই না উপযোগী হইত, বাঙ্গালীর মানসিক সংস্কৃতির ইতিহাসের জন্য তাহাতে কতই না উপাদান থাকিত! পরোক্ষভাবে ইঁহাদের রসদৃষ্টিতে এবং প্রত্যক্ষভাবে কিছু কিছু প্রবন্ধে ও পত্রাদিতে ইঁহারা নিজেদের যেটুকু ধরা দিয়েছেন, সেইটুকুতে, এবং তদতিরিক্ত অনুমান ও গবেষণায় আমাদের পূর্ণ কৌতূহল-নিবৃত্তি হয় না। সুখের বিষয়, গিরিশচন্দ্র শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেনের মত এক জন সাহিত্যবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত, সুশিক্ষিত ও শ্রদ্ধাশীল জিজ্ঞাসু পাইয়াছিলেন, যিনি দিনের পর দিন ধরিয়া নাট্যগুরুর নিকট উপস্থিত হইতেন, ও বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া তাঁহার স্পষ্ট মতামত গ্রহণ করিতেন, এবং পরে পরিশ্রম সহকারে সেগুলি যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে এই বইখানি বাঙ্গালার পাঠকসমাজকে উপকৃত করিবে। ব্যক্তিগত মতামতের প্রামাণিক ভাণ্ডারস্বরূপ বাঙ্গালা ভাষায় যে কয়খানি সুন্দর পুস্তক আছে সেগুলির মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া এই বইখানি বঙ্গসাহিত্যের জীবনী-কথা বিভাগকে অলঙ্কৃত করিয়াছে।

আলোচিত বিষয়ের যে সূচীপত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে ইঁহাদের আলাপের ব্যাপকত্ব বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালা দেশে তথা ভারতবর্ষে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রায় তাবৎ ব্যাপার; বুদ্ধদেব হইতে আরম্ভ করিয়া পরমহংসদেব ও বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বহু ধর্ম্মনেতা ও লোকনেতা; বাঙ্গালার কাব্যসাহিত্য; ইংরেজী ও অন্য ইউরোপীয় এবং সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য; বাঙ্গালা দেশের থিয়েটার ও নাটক; বাঙ্গালীর চরিত্র; গিরিশচন্দ্রের নিজ নাটকের ও নাটকের পাত্রপাত্রীদের চরিত্রের বিশ্লেষণ; প্রাণশক্তি, রস, বেশ, সমালোচনা, কল্পনা, "রূপ ও অরূপ", সতীধর্ম্ম, নারীর আদর্শ, অপেরা প্রভৃতি নানা প্রকীর্ণ বিষয়,—এই সবের আলোচনায়, ও সামসাময়িক বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিগত বা ভাবগত সংস্পর্শ ও সংঘাতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংবাদে বইখানি পূর্ণ। এই বইয়ে আমরা গিরিশচন্দ্রের জীবন্ত মনের পরিচয় পাই—তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও সমীক্ষাশক্তি, তাঁহার বৈদগ্ধ, তাঁহার জীবনে গভীর রসানুভূতি, এবং তাঁহার উদারতা তাঁহার রচিত নাটকের সীমাবদ্ধ আবেষ্টন হইতে মুক্ত হইয়া এই বইয়ে স্বচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। গিরিশের প্রতিভার কথা তাঁহার নাটকেই পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা, তাঁহার আধ্যাত্মিক গভীরতার কথা কুমুদবন্ধুর লেখায় স্বত উৎসারিত রূপে দেখা দিয়াছে। বইখানি পাঠ করিয়া মনে হয়, আরও দীর্ঘ হইলে ভাল হইত। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালী পাঠকসমাজে সুপরিজ্ঞাত; সমালোচক ও প্রযোজক গিরিশচন্দ্র এই বইয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

বাঙ্গালা সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাস আলোচনায় যাঁহাদের ঝোঁক আছে তাঁহারা এই বই বাদ দিতে পারিবেন না। বইখানির ভাষা সুখপাঠ্য, প্রাঞ্জল মুখের কথার সাবলীল গতিতে ইহাতে প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তর অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার সঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

ছাপা ও বাহ্যসৌষ্ঠব সুন্দর। এই বইয়ের বহুল প্রচার হইবে আশা করি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আবিসিনিয়া—শ্রীঅসিত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী প্রণীত। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশক—শ্রীযামিনীকান্ত দাস, বি-এ, বি-টি, প্রধান ভূগোল-শিক্ষক, রিপণ স্কুল, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। পৃ. ৯৬। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

ইটালী-আবিসিনিয়া-দ্বন্দ্ব আরম্ভ হওয়া অবধি সাময়িক পত্রে আবিসিনিয়া সম্পর্কে নানা দিক্ হইতে আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত পুস্তকাকারে মাত্র এই একখানিই প্রকাশিত হইয়াছে। এজন্য লেখকদ্বয় ও প্রকাশক ধন্যবাদার্হ। এই পুস্তকখানিতে পুরাকাল হইতে যুদ্ধের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত আবিসিনিয়ার ইতিহাস ও সমস্যার বিষয় আলোচনার চেষ্টা আছে। কিন্তু বিষয়টিতে গভীর প্রবেশ না থাকিবার চিহ্ন প্রতি পরিচ্ছেদে লক্ষ্য করা যায়। পুস্তকখানির ভাষা অসরল ও দুর্ব্বোধ্য; স্থানে স্থানে বহুজনের লেখা বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। সাময়িক পত্রে যে-সব প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে স্থানে স্থানে তাহার হুবহু অনুসরণ পরিদৃষ্ট হইবে। যথা—ভারত ও আবিসিনিয়া (পৃ ৯৩)। পুস্তকখানিতে ভ্রমপ্রমাদও যথেষ্ট। এরূপ পুস্তক প্রকাশে গ্রন্থকারদ্বয় ও প্রকাশক মহাশয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কয়েকখানি একবর্ণ চিত্রও ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। পুস্তকখানির মূল্যও অত্যধিক হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

"চণ্ডীদাস-চরিত"

(৫)

দেবী ভাবে কি আশ্চর্য্য কেবা সে বালিকা।
মোরে বাবা বলি মিছা কে পরিলা শাঁখা ॥
নিশ্চয় বাসলী হবে আর কেহ নয়।
ইহার পরীক্ষা তবে উচিত যে হয় ॥
কহিলা তখন দেবী শুন মহাশয়।
এতক আমার ভাগ্যে কন্যা না জন্ময় ॥
ঠকাল তুমায় কোন দুরন্ত বালিকা।
যাও তার কাছে আমি কেন দিব টাকা ॥
বেন্যা কহে তুমার সে না হলে বালিকা।
কি করে বলে যে কোরঙ্গে আছে টাকা ॥
যদি তথা টাকা তুমি না পাও ব্রাহ্মণ।
তবে সে বুঝিব কেহ করেছে বঞ্চন ॥
১৩/] দেবীদাস কহিলা কোরঙ্গে টাকা পাইলে।
অবশ্য শাঁখার দাম পাইবা তাহলে ॥
গিঞা সেই ঘরে দেবী দেখে তাড়াতাড়ি।
রঞেছে তিনটি টাকা কোরঙ্গেতে পড়ি ॥
রোমাঞ্চিত হইল তনু চক্ষে বহে জল।
হইল হৃদয় তার আনন্দে বিহ্বল ॥
আইলা ফিরিয়া তথা হাতে লঞা টাকা।
কহে কোথা কন্যা মোর পরিয়াছে শাঁখা ॥
চল যাই হে বণিক কন্যা মোর যথা।
তাহারে জিজ্ঞাসি দাম দিব আমি তথা ॥
বেন্যা কয় কন্যা তব বাসলীর বাঁধে।
আলা করি আছে যেন পূর্ণিমার চাঁদে ॥
এত কহি দুই জন চলিলা তথায়।
দেখে যাঞে কেহ নাঞি ইদি উদি চায় ॥
কাঁদিয়া কন্যারে ডাকে বেন্যা শ্রীনিবাস।
মিথ্যাবাদী বলি গালি দেন দেবীদাস ॥
বেন্যা কয় এইখানে বসি যে বালিকা।
সত্য কহি মোর কাছে পরিয়াছে শাঁখা ॥
দেবী কয় এই কার্য্য দেখেছে বা কে।
বেন্যা কয় এই সাধু যদি দেখে থাকে ॥
দূর হতে বার বার অঙ্গুলি হেলনে।
ধ্যান-মগ্ন চণ্ডীদাসে দেখাইল বেন্যে ॥
দেবী কয় চণ্ডী ভাই বল দেখি শুনি।
যে ঘটিলা এই স্থানে দেখেছ কি তুমি ॥
ধ্যান ভঙ্গে চণ্ডীদাস দেবীরে প্রণমি।
কহে দাদা কি ঘটিলা কহ আগে শুনি ॥
সকল বৃত্তান্ত তবে কহে দেবীদাস।
শুনিঞা চণ্ডীর মনে অসীম উল্লাস ॥
চণ্ডীদাস কহে দাদা করি নিবেদন।
বুঝিলাম যা ঘটিলা অপূর্ব্ব ঘটন ॥
দূর-দেশ-বাসী বেন্যে কথামত তার।
মিলিলা কোরঙ্গে টাকা সাক্ষাত তুমার ॥
তাহলে দুহিতা তব পরিয়াছে শাঁখা।
এ কথাটি কেমনে হইবা দাদা ফাঁকা ॥
তুমার যে কন্যা দাদা কে না জানে তায়।
যার গর্ভে পিতা মাতা সকলে জন্মায় ॥
পিতা নাঞি মাতা নাঞি ভ্রাতা নাঞি যার।
সেই শক্তি-স্বরূপিণী কন্যা যে তুমার ॥
আয় রে বণিক ভাই দেরে আলিঙ্গন।
পাঞেছ মায়ের তুমি সাক্ষাত দর্শন ॥
বহু পুণ্য ফলে ভাই হাতে ধরি তার।
পরাঞেছ শাঁখা তুমি এত ভাগ্য কার ॥
মা মা ব্রহ্মময়ী দুর্গে দুঃখ-হরা।
বলিতে বলিতে চণ্ডী হইল জ্ঞানহারা ॥
অকস্মাত দেবীদাস ছিন্নতরুপ্রায়।
মা মা বলি অচেতনে পড়িল ধরায় ॥

পাগল হইল বেন্যা নেত্রে ভরা জল।
জ্ঞানশূন্য হঞা পড়ে লুটি ধরাতল॥
কে কার সাহায্য করে সমান সকল।
বাসলী আসিয়া হাসি মুখে দেন জল॥
উঠি তবে কহে দেবী নাও বেন্যে টাকা।
বুঝিলাম মা আমার পরিয়াছে শাঁখা॥
বেন্যে কয় না হইলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
] না লইব টাকা আমি তেয়াগিব প্রাণ॥
আয় আয় কৃপাময়ী ডাকি মা তুমারে।
স্বকরে শাঁখার দাম দাও তুমি মোরে॥
দেখা দিঞা দে মা দাম দনুজ-দলনী।
নতুবা আমার কাছে রবে চির-ঋণী॥
হইল আকাশবাণী শুন বাছাধন।
লইঞে শাঁখার দাম করহ গমন॥
মানত করিঞে তুমি পূজা দিবে মোরে।
পাইবা আমার দেখা কহিনু তুমারে॥
বেন্যা কয় দেবীদাসে না দেখালে তুমি।
শাঁখা-পরা হাত দুটি শুন কাত্যায়নী॥
না লব শাঁখার দাম চলিলাম তবে।
পুনশ্চ আকাশবাণী হইলা ভীম রবে॥
দেখ রে বণিক অই পদ্মবনমাঝে।
তোর শাঁখা মোর করে সাজে কি না সাজে॥
দেখ বাবা দেবীদাস দেখ চণ্ডী কাকা।
কেমন সুন্দর দুটি পরিয়াছি শাঁখা॥
পদ্মবন মাঝে সবে ঘন ঘন চায়।
শাঁখা-পরা হাত দুটি দেখিবারে পায়॥
চারি পাশে শ্বেতপদ্ম রহিয়াছে ফুটি।
তার মাঝে শোভে যেন নীলপদ্ম দুটি॥
করতালু শঙ্খ তায় যেন কোকনদ।
গুন-গুন রবে উড়ি বইসে ষটপদ॥
ছিন্ন মেঘ মাঝে যথা রবির কিরণ।
ক্রমে ক্রমে মেঘতলে হয় নিমগন॥
সেই মত কর দুটি দেখিতে দেখিতে।
মিলাইঞা গেল হায় সবার সাক্ষাতে॥

দণ্ডবৎ হঞে সবে করে প্রণিপাত।
বেন্যা কয় আজি মোর হৈল সুপ্রভাত॥
জগন্মাতা বাসলীর সাক্ষাৎ পাইনু।
চণ্ডীদাস প্রভুর পাইনু পদরেণু॥
ধর্ম্মশীল দেবীদাস সঙ্গে পরিচয়।
হইল আজি অহো মোর কিবা ভাগ্যোদয়॥
হাসি-মুখে কহে চণ্ডী কহ শ্রীনিবাস।
কার উপাসক তুমি কোথায় নিবাস॥
বেন্যে কয় বিশ্বম্ভর আমার জনক।
বামাচারী ছিলা তিনি শক্তি-উপাসক॥
কিন্তু প্রভু এ অধম করঞে ভকতি।
পিতৃ-মাতৃ-পদে যথা সন্তান-সন্ততি॥
শ্যাম শ্যামা উভয়েরে দুই একাকার।
একের বিহনে মোর সব অন্ধকার॥
বিষ্ণুপুর-বাসী আমি বিষ্ণু-উপাসক।
আদ্যাশক্তি হন মম তাহার পোষক॥
শুন প্রভু কহি পুন আসি এই স্থানে।
দিব শাঁখা বর্ষে বর্ষে বংশ-অনুক্রমে॥
কহ দাসে চণ্ডীদাস কোথা রাসমণি।
দোঁহা মুখে সংকীর্ত্তন শুনিব যে আমি॥
চলি গেলা দেবীদাস আইলা রাসমণি।
অমনি উঠিল শূন্যে সঙ্গীতের ধ্বনি॥
মাঠে গোঠে ঘাটে বাটে যে যথায় ছিল।
ছুটাছুটি করি আসি চৌদিকে ঘেরিল॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গীতি করিঞে শ্রবণ।
প্রেমানন্দ রসে সবে হয় নিমগন॥
বেলা অবসান হইল শেষ হইল গীতি।
প্রশংসিয়া যায় তবে যে যার বসতি॥

।।*

১৭৮] হেন মতে কিছু দিন গেল সুখে চলি।
তদন্তরে যা ঘটিলা শুন সবে বলি॥
সভা করি বসিয়াছে হামীর রাজন।
চারি পাশে আছে ঘেরি পাত্রমিত্রগণ॥

বহু মতে ধীরে ধীরে হয় বহু কথা।
সমুখে ফুকারে ভাট রাজ-গুণ-গাথা॥
হেন কালে কোন জন আইল তথায়।
আজানুলম্বিত বাহু অতিদীর্ঘকায়॥
রক্ত-জবা-সম আঁখি গোউর বরণ।
রাজপদে যথোচিত করিলা বন্দন॥
নৃপ কহে কেবা তুমি কোথা নিবসন।
কি হেতু আইলা হেথা কিবা প্রয়োজন॥
ভীম রবে কহে সেই শুনহ রাজন।
কি হেতু আসেছি হেথা করি নিবেদন॥
মল্লেশ গোপাল-সিংহ সিংহ-পরাক্রম।
যার নামে কাঁপি উঠে দুরন্ত যবন॥
মাত্র যিনি হিন্দু-মধ্যে নৃপতি স্বাধীন।
তাহার প্রেরিত দূত আমি রামদীন॥২৬
কভু মল্লরাজে এক বেন্যা শ্রীনিবাস।
কহিলা কে আছে হেথা রামী চণ্ডীদাস॥
অপূর্ব্ব গায়ক দোঁহে অতি অনুপম।
দেবতাও আসে গীত করিতে শ্রবণ॥
এহেন সঙ্গীত রাজা শুনিবার তরে।
দোঁহে লঞা যাতে তেঁই পাঠালেন মোরে॥
ধরুন আদেশ-পত্র হে সামন্ত-রাজ।
আজ্ঞা দেহ দোঁহে লঞে ফিরি যাব আজ॥
দূত-মুখে শুনি এই গর্ব্বিত বচন।
কুপিলেন মনে মনে হামীর রাজন॥
তত্রাপি সহাস্য মুখে কন মৃদুবাণী।
সামান্য মানুষ নহে চণ্ডীদাস রামী॥
সবার সম্পূজ্য তারা অসাধ্য-সাধক।
নহে কভু হীন-বৃত্তি ভিক্ষুক গায়ক॥

রাজার বচন শুনি কহে রাজদূত।
সবার সম্পূজ্য তারা এ বড় অদ্ভুত॥
তেজিয়ান রাজা মোর তাঁর কিবা দোষ।
মূর্খ সেই তাঁর বাক্যে যেবা অসন্তোষ॥
ডিল্লিরাজ ফিরাজ-খাঁ মহাগর্ব্ব করি।
যেদিন ঘিরিল আসি মল্লরাজ-পুরী॥
কি দুর্গতি হইল তার সব জান শুনি।
নিজের বিপদ কেন আনিতেছ টানি॥
পাণ্ডুরাজ সমসুদী জিনিয়া ফিরাজে।
গর্ব্ব করি আক্রমিলা যবে মল্লরাজে॥
মরিল যবন-সৈন্য পিপীলিকা প্রায়।
অর্দ্ধমৃত হঞে সেহ যাঁর অস্ত্রঘায়॥
গত ভাদ্রে পাণ্ডুআয় ত্যজিল জীবন।*
কি করিতে পার তাঁর তুমি হে রাজন॥
রাজা কহে সত্য তিনি বীর-অবতার।
আরো শুনিয়াছি আমি মুখে সবাকার॥
গর্ভবতী উদরে কেমনে থাকে ভ্রূণ।
পেট চিরি দেখা তার এ অপূর্ব্ব গুণ॥
স্বল্প দোষে দোষীরে প্রাচীরে গাঁথা যার।
নিত্য কর্ম্ম কিবা সেই ধর্ম্ম-অবতার॥
শুনিয়া কহিল দূত জলন্ত আগুনি।
বুঝিলাম তুমারে দংশেছে কাল-ফণী॥
জানিলাম ভাল মতে এত দিন পরে।
কালে যারে ধরে তায় কে রাখিতে পারে॥
১৮/] চলিলাম হে রাজন হও সাবধান।
জানে থাক কাল তব হইল আগুয়ান॥
এত কহি আসি দূত মল্লরাজ-পুরে।
সকল বৃত্তান্ত কহে রাজার গোচরে॥
ক্রোধে কম্পবান রাজা যেন ছিন্ন তার।
থাকি থাকি ঘোর নাদে ছাড়ে হুহুঙ্কার॥
সেনাধ্যক্ষে ডাকি তবে কন নৃপমণি।
এখনি সাজাও সেনা এক অক্ষৌহিণী॥

২৬) এই মল্লেশ্বর গোপালসিংহের পুরা নাম কিসেন-গোপাল-মল্ল। পরে এই নাম পাওয়া যাইবে। ইহাঁর ডাকনাম কানু মল্ল ছিল। মল্লভূমের ইতিহাসে কানু-মল্ল ১২৬৭ শকে রাজা হইয়াছিলেন। পরে এই চণ্ডীদাস-চরিতে ইহাঁর মৃত্যুশক পাওয়া যাইবে। ইনি অতিশয় নিষ্ঠুর ছিলেন। পলাশী-যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মল্লভূম স্বাধীন ছিল। বঙ্গে আর কোনভূম ছিল না।

* ৩২ স্যা টীকা পশ্য।

অতি ক্ষুদ্র রাজ্য এক ছত্রিনা নগর।
সে রাজ্যের হয় রাজা হাম্মীর উত্তর ॥
আছে তথা চণ্ডীদাস রামী রজকিনী।
রাজারে বধিঞা দোঁহে দাও বাঁধে আনি ॥
সেনাপতি কহে দোঁহে চিনিব কেমনে।
রাজা কহে চিনে দোঁহে শ্রীনিবাস বেন্যে ॥
চলিলেন সেনাপতি লইঞে বিদায়।
শ্রীনিবাসে ডাকাইঞা আনিল ত্বরায় ॥
রাজার নিকটে দোঁহে ছুটাছুটি চলে।
করপুটে দাণ্ডাইল গিঞা সভাস্থলে ॥
সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিবাসে কহে নৃপবর।
যাহ সেনাপতি সাথে ছত্রিনা নগর ॥
দেখাইঞা দিও তারে রামী চণ্ডীদাসে।
আনিবে সে জোর করি দোঁহে মোর পাশে ॥
শুন সেনাপতি আগে দোঁহে করি হাত।
ছত্রিনা নগর পরে কর ভূমিসাৎ ॥
হাম্মীরের মুণ্ড কাটি আনিহ হেথায়।
আমি তার কাটা মুণ্ড দেখিবারে চাই ॥
শ্রীনিবাস কহে প্রভু করি নিবেদন।
কেমনে হইবা তব বাসনা পুরণ ॥
বরঞ্চ পাতিঞা ফাঁদ চাঁদ ধরা যাবে।
রামী চণ্ডীদাসে ধরা কভু না সম্ভবে ॥
কর তুমি ভূমিসাৎ বিশ্বচরাচর।
তথাপি অটল রবে ছত্রিনা নগর ॥
দ্বিতীয় রাবণ রাজা হাম্মীর নৃপতি।
তার মুণ্ড কাটি আনে কাহার শকতি ॥
যেই মত রক্ষ-কুল রক্ষিবার তরে।
ফিরিতেন উগ্রচণ্ডা স্বর্ণলঙ্কা পুরে ॥
সেই মত হে রাজন শুন সত্য বলি।
ছত্রিনা নগর রক্ষে প্রচণ্ডা বাসলী ॥
দন্ত কড়মড়ি রাজা কহে কাঁপি ঘন।
কার সঙ্গে কহ কথা মনে থাকে যেন ॥
নির্ব্বোধ পাপিষ্ঠ বেন্যা কর রে স্মরণ।
আমার যে রক্ষা-কর্ত্তা মদনমোহন ॥[২৭]
তার চেঞে বেশী হইল বাসলী কেমনে।
বল মূর্খ নইলে তোরে বধিব জীবনে ॥
বেন্যা কয় মহারাজ করি নিবেদন।
করেন শক্তির পূজা মদন-মোহন ॥
কিন্তু শক্তি পূজে কোথা দেব-নারায়ণে।
খুজিয়া না পায় কেহ বেদে কি পুরাণে ॥
গর্জ্জিয়া কহিল রাজা অতি ক্রোধভরে।
শুন রে দুর্ম্মুখ বেন্যে কহি দিব্য করে ॥
হাম্মীরের যুদ্ধে যদি পরাজয় মানি।
সব ছেড়ে শক্তি পূজা করিব রে আমি ॥
কিন্তু হয় পরাজিতা যদ্যপি বাসলী।
তার স্থানে আমি তোরে ধরি দিব বলি ॥
যাহ এবে বিলম্ব না কর কদাচন।
যাবেন এ যুদ্ধে মোর মদন-মোহন ॥
আমিও যাইব সঙ্গে শুন সেনাপতি।
সৈন্য সজ্জা কর এবে যাহ শীঘ্রগতি ॥
১৮৮] করিছে সমর-যাত্রা মল্ল-অধিকারী।
চলিছে সৈনিকবৃন্দ কোলাহল করি ॥
চতুর্দ্দিক অবিশ্রান্ত হয় সিংহনাদ।
ভূচর খেচর যত গণে পরমাদ ॥
বাজিছে বিবিধ বাদ্য ঘোর উচ্চরোলে।
বুঝিবা ডুবিবা বিশ্ব প্রলয়ের জলে ॥
গর্জ্জে ঘন গজরাজ তর্জ্জে ঘন বাজী।
না জানি কি সর্ব্বনাশ ঘটাইবা আজি ॥
ধীরে ধীরে গেল রবি অস্তাচলে চলি।
পরিয়া ধূসর বাস আইলা গোধূলি ॥
হাম্বা রবে আসি গাভী পশিলা গোশালে।
পাঠাগার হতে শিশু চলে দলে দলে ॥

---

২৭) বিষ্ণুপুরে কত কাল হইতে মদন-মোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা অজ্ঞাত। অন্ততঃ রাজা বীর হাম্বীরের সময় (১৫০৯ শক) হইতে ছিলেন। পুথীর ১১এর পাতায় মদনমোহনের ইতিহাস পাওয়া যাইবে।

গৃহমুখে সারি দিঞা যত কুলনারী।
কলসী লইঞা কাঁখে আসে ধীরি ধীরি ॥
নীলাকাশে নিরমল মাণিকের পারা।
একটি দুইটি করি উঠিতেছে তারা ॥
বাজিল ঝাঁঝরি শঙ্খ ঘণ্টা দেবালয়ে।
বাহিরিলা বামাকুল দেউটি জ্বালিয়ে ॥
এইরূপে আইল সন্ধ্যা গোধূলিরে জিনি।
সন্ধ্যারে জিনিয়া তবে আইলা রজনী ॥
ক্রমে ক্রমে অন্ন জল করিঞা গ্রহণ।
প্রদীপ নিবাঞে সবে করিলা শয়ন ॥
আইলেন নিদ্রাদেবী মোহমন্ত্র ঝাড়ি।
লইলেন সবার চৈতন্য তবে কাড়ি ॥
হেনকালে মল্ল সেনা লম্ফঝম্প দিঞা।
বোল পুখুরের তটে উত্তরিলা গিঞা ॥[২৮]
পরিসর ভূমি সেই অতি মনোরম।
তিন দিকে শোভে তার নিবিড় কানন ॥
পড়িল তথায় তবে সৈন্যের ছাউনী।
বিশ্রাম করিয়া কিছু কহেন নৃমণি ॥
লহ সঙ্গে শ্রীনিবাস এক শত সেনা।
কোথা থাকে চণ্ডীদাস আছে তব জানা ॥
যাহ তথা আন তারে রামিণীর সহ।
আরো যদি চাহ সেনা যত ইচ্ছা লহ ॥
বেন্যে কহে মহারাজ করি নিবেদন।
নিশ্চয় হইল মোর দুদিকে মরণ ॥
গেলে মারে চণ্ডীদাস না যাইলে তুমি।
মারীচের মত ফাঁদে পড়িয়াছি আমি ॥
যা হোক মরণে মোর তিলে নাহি গণি।
কিন্তু ভাবি পাছে প্রাণ হারান আপনি ॥

রাজা কহে আরে বেন্যে তুই কি পাগল।
ভিখারী চণ্ডীর অঙ্গে আছে এত বল ॥
এ হেন কটক সহ আমারে বধিবে।
পাগল না হলে তুই একথা কে কবে ॥
বেন্যে বলে যোগ-বল শ্রেষ্ঠ বলে মানি।
ভাবি তেঁই কি উপায়ে রক্ষা পাবে তুমি ॥
যোগ-বলে বলীয়ান চণ্ডী রাসমণি।
কি করিবা সেনা তব এক অক্ষৌহিণী ॥
কোটি অক্ষৌহিণী হলে নারিবে জিনিতে।
পদে পড়া বিনা নাই উপায় আনিতে ॥
রাজা কহে মূর্খ তুই অতীব চপল।
তেঁই তোর কাছে বড় হয় যোগ-বল ॥
জান না কি জমদগ্নি যোগীর প্রধান।
কেন কার্ত্তবীর্য্য করে হারাইলা প্রাণ ॥
তপঃশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের শতেক নন্দন।
কেন বিশ্বামিত্র করে ত্যজিল জীবন ॥
বেন্যা কহে মহারাজ কাজ কি কথাতে।
এখনি ত ফল তার পাবে হাতে হাতে ॥

* | * | *

১৯/] দাগহ কামান[২৯] এক বাজুক বাজনা।
তব আগমন-বার্ত্তা হউক ঘোষণা ॥
যাই আমি দেহ সঙ্গে সেনা এক শত।
ফিরি কিম্বা মরি কিন্তু এটা অনিশ্চিত ॥
দেখি শুনি যা হয় তা করিবা রাজন।
শত সেনা লঞা আমি চলিনু এখন ॥
এত কহি শ্রীনিবাস স্মরিয়া শ্রীহরি।
চলি গেলা সঙ্গে শত সেনা অস্ত্র-ধারী ॥
আচম্বিতে মল্লরাজ পাইলা দেখিতে।
কে দুজন যায় চলি তার বাম ভিতে ॥
কে যায় বলিয়া রাজা উচ্চে হাঁক দিলা।
সংসার-বিরাগী মোরা চণ্ডীদাস-চেলা ॥

২৮) বিষ্ণুপুর হইতে ১৪ ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে ছত্রিনা। মল্ল-সৈন্য রাত্রে পহুঁছিয়াছিল। ভাবে বুঝা যায়, তখন আশ্বিন মাস। বোল পুখুর হইতে ছত্রিনা আধ ক্রোশ দূরে। এই পুখুর সড়কের বাঁ দিকে। অপর তিন দিকে এখনও বন আছে। পুখুরটি বড়, জল নির্মল। কিন্তু কি অভিশাপ আছে, সে জল কেহ খায় না। ১৩৮৭ শকে দেবীদাসের পৌত্র "বাসলী-মাহাত্ম্য" লিপিয়াছিলেন, ছত্রিনা দস্যুসৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছিল। তার অর্থ এখানে পাওয়া যাইতেছে।

২৯) কামানের প্রকৃত দেশী নাম গাঁঠিআ বা গেঁঠ্যা। বিষ্ণুপুরের রাজাদের অসংখ্য গেঁঠ্যা ছিল। ছাতনার রাজাদেরও ছিল। সং 'স্বদেশী'। "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে" সংস্কৃত নাম 'নাল' আছে।

শুনি রাজা দূতে কয় পাকড়াও দোঁহে।
দূত গিঞা দুজনের করে ধরি কহে॥
রাজার হুকুম চলো রাজ-সন্নিধান।
জোর কি ওজর কর না রহিবা জান॥
সমস্বরে দোঁহে কয় কোথাকার রাজা।
না জানি না মানি তায় নহি তার প্রজা॥
তুমিও একটি কথা কহ যদি এবে।
নিশ্চয় তা হলে তুমি পরাণ হারাবে॥
শুনিঞা নৃপতি তবে নিকটেতে আইল।
দোঁহাকার রূপ হেরি মোহিত হইল॥
একটি পুরুষ আর একটি প্রকৃতি।
মদন-মোহন-রূপ দোঁহে দেবাকৃতি॥
মৃদুস্বরে মধুমাখা ধীরে ধীরে কয়।
কে তুমরা কৃপা করি দাও পরিচয়॥
মল্লভুম নামে দেশ তার অধিপতি।
গোপাল আমার নাম বিষ্ণুপুরে স্থিতি॥
শুনেছি ছত্রিনাপুরে চণ্ডীদাস নামে।
অপূর্ব্ব গায়ক এক আছেন তা শুনে॥
পাঠাইনু দূত আমি লঞা যেতে তাঁরে।
লাঞ্ছিত হইঞা দূত গিঞাছিলা ফিরে॥
তার প্রতিশোধ নিতে এসেছি সম্প্রতি।
কহ এবে কে তুমরা যুবক-যুবতী॥
হাসিয়া যুবক কয় শুন মহারাজ।
গৃহত্যাগী জনের নামেতে কিবা কাজ॥
চণ্ডীদাস গুরু আমি তাহারি কিঙ্কর।
গুরু-দত্ত নাম মোর হয় প্রিয়ঙ্কর॥
যুবতী কহেন হাসি শুন নরপতি।
রামিণীর দাসী আমি নাম ছায়ামতী॥
এই সহচর মোর আমি সহচরী।
একসঙ্গে থাকি মোরা একসঙ্গে ফিরি॥
আনন্দে হরির নাম গাহিঞে বেড়াই।
যথায় আনন্দ পাই তথাকারে যাই॥
রাজা কহে তুমরা যে পরিচয় দিলে।
শিখিয়াছ গীতিবাদ্য অবশ্য তাহলে॥

প্রিয়ঙ্কর কহে জানি রাজা কহে শুনি।
গাহত একটি গীতি কৃষ্ণ-বিষয়িণী॥
বাজাইয়া এসরাজ গায় প্রিয়ঙ্কর।
ছায়ামতী হাসি হাসি যোগাইছে স্বর॥

* | * | *

গীতি।

তোমার মদন-মোহন, বাঁকা মদন-মোহন।
মধুপুর বরজিয়া ব্রজপুর আওল
কঁহাওল শ্রীনন্দনন্দন।
তোমার মদন-মোহন॥
শৈশবে কোমল খিন কৈছনে কিসন গো
করিলেন পুতনা নিধন।
লম্বিত করে দোহি নবনীত লুঠই
কম্পিত সভয় চরণ।
[১৯৮] তোমার মদন-মোহন॥
ঝুরত দিবা-যামিনী ব্রজকি কুল-কামিনী
লম্পট নিলজ শ্যাম পেখি।
তপন-তনয়া-তটে রহসি রহি নীরবে
গোপিনীর হরিলা পিন্ধন।
তোমার মদন-মোহন॥
কুপিত অশনি-কর বরষে বারি নির্ঝরে
গোকুলোপরে কেবল দিবা যামিনী॥
ব্যাকুল গোপ আলোকি বাম করকি অঙ্গুলে
ধরতই গিরি গোবর্দ্ধন।
তোমার মদন-মোহন॥
তৃষিতাহীর-সন্ততি গতাসু গরলাশনে
ভাসতহি কালিয়দহ নীরে।
তরঙ্গি কানাঞা তহি তুরিত মগন ভেল
করিল সে কালিয় দমন।
তোমার মদন-মোহন॥
নিধু মধুর কাননে বাজাঞে মধু বাঁশরী
জপত কানু বৃষভানু কি নন্দিনী।
তপন-তনয়াতীরে আওত নিত কিশোরী
ভেটতঁহি রাধিকা-রমণ।
বাঁকা মদন-মোহন॥

বিষম বিরহানলে বরজি ব্রজসুন্দরী
মধুপুরে উপনীত ভেল।
হনই কংসাসুরে বসঁহি রাজ-আসনে
ভেল কালা কুবুজা-রমণ।
তোমার মদন-মোহন ॥
স্নেহ কি মোহ বন্ধনে ভোগ কি যোগ আসনে
ভকতি বিনু কানু না রহে কৈসে।
শুনহু নরাধিপ অব বসুদেবকি নন্দন
কারো ধরা নহে কদাচন।
তোমার মদন-মোহন ॥৩০

* | * | *

গীত শুনি প্রীত রাজা কহে করজুড়ি।
শুনাঞে সুধার গীতি মন নিলে কাড়ি ॥
কে তুমরা কি উদ্দেশ্যে হেথা আগমন।
কহ সত্য পারি যদি করিব পূরণ ॥
হাসি প্রিয়ঙ্কর কহে শুন মহারাজ।
উদ্দেশ্য-বিহীন মোরা নাহি কোন কাজ ॥
তুমার মঙ্গল হেতু আসিয়াছি হেথা।
চাহ যদি কহ তবে কহিব সে কথা ॥
রাজা কহে দীন হীন যারা এ জগতে।
রাজার কল্যাণ তারা করিবা কি মতে ॥
অবশ্য দিবার আছে হলে দেব দেবী।
কিবা দিবা হও যদি মানব মানবী ॥
কে বট তুমরা আগে দেহ পরিচয়।
তার পর বিবেচনা করিব যা হয় ॥
প্রিয়ঙ্কর কহে সে ত শুনেছ রাজন।
তা ছাড়া আমরা নহি অন্য কোন জন ॥

৩০) বহুকাল হইতে বিষ্ণুপুরে গীতবাদ্যের চর্চা চলিয়া আসিতেছে। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর-হাম্বীর (১৬০০ খ্রি-অ) গীত বাঁধিতেন। ছাতনার রাজা দ্বিতীয় লছমীনারাণ ব্রজবুলিতে গীত বাঁধিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কোন কোন গীত লোকমুখে প্রচারিত আছে। এই লছমীনারাণ, কৃষ্ণ-সেনের রাজা বলাইনারাণের পুত্র। তখন হিন্দী ভাষাও প্রচলিত ছিল। রাজা ও রাণীরা নাগরীতে স্বাক্ষর করিতেন। পুথীর গীতগুলির ভাব কবি কৃষ্ণ-সেনের।

রাজা কহে আমি রাজা এসেছি এখানে।
কত সেনা অস্ত্র লঞা দেখিছ নয়নে ॥
কেমনে আমার দূতে কহ তুমি তবে।
একটি না কহ কথা পরাণ হারাবে ॥
যদি হও মানব লইতে হবে শাস্তি।
দেবতা হইলে মোর কর যাহে স্বস্তি ॥
প্রিয়ঙ্কর কহে তবে পরিহাস-ছলে।
দেবতার জন্ম কোথা বুঝি গাছে ফলে ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ দেব কি দানব।
সবাই মানুষ রাজা সবাই মানব ॥
রাজ-আভরণ ঠুলি যতক্ষণ রবে।
জগতের কিছুমাত্র দেখিতে না পাবে ॥
কানে ঠুলি লও রাজা খুল চক্ষু দুটি।
সমুখে অক্ষয় সত্য উঠিবেক ফুটি ॥
মিথ্যার বাজার ছাড়ি যাও রাজা বনে।
পূজ গিঞা মনে তব মদন-মোহনে ॥
মিলিবে যে তাহে সুখ শান্তি গরীয়সী।
দেখিবে সে রাজ্য সুখ চেঞে কত বেশী ॥
২০/৷ রাজা কহে প্রিয়ঙ্কর বুঝিনু তাহলে।
তোমাদের পরিচয় গেল গোলমালে ॥
বুঝি সব যা কহিলা শাস্ত্রের কথন।
কিন্তু কে খণ্ডিতে পারে কর্ম্ম-নিবন্ধন ॥
নির্দ্দিষ্ট হঞাছে শাস্ত্রে যার যেই কর্ম্ম।
রীতিমত পালনো অবশ্য তার ধর্ম্ম ॥
রাজা আমি রাজকাজ না করিলে কভু।
মোর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবা কি বিভু ॥
থাকুক এসব কথা বুঝিলাম আমি।
এ বয়সে নানা শাস্ত্র ঘাঁটিয়াছ তুমি ॥
কহ দেখি তবে তুমি করিঞা গণনা।
যে কাজে এসেছি আমি পূর্ণ হবে কিনা ॥
প্রিয়ঙ্কর কহে রাজা দেখিয়াছি গণে।
পূর্ণ হবে আশা কিন্তু না জিনিবা রণে ॥
বড় বড় বীর তুমি জিনেছ সমরে।
কিন্তু আজ হবে বন্দী রমণীর করে ॥

যে শতেক সেনা তুমি পাঠালে নৃমণি।
বহুক্ষণ বন্দীশালে লুঠিছে ধরণী ॥
শীঘ্র করি পাঠাও পুনশ্চ শত সেনা।
দেখা যাবে আজি রাজা তোর বীরপনা ॥
ইচ্ছিলি শুনিতে গান তু[illegible]ার মুখে।
সেই রামী চণ্ডীদাস সাক্ষাৎ সম্মুখে ॥
সামাল সামাল রাজা খুব সাবধান।
বলি রামী চণ্ডীদাস হইল অন্তর্ধান ॥
চমকি উঠিল শুনি বিষ্ক্যার নন্দন।[৩১]
কহিলা কে প্রিয়ঙ্কর তুমি সেই জন ॥
শত সৈন্য বন্দী হইল রমণীর করে।
এস ফিরি সত্য করি বলে যাও মোরে ॥
এটা কি সে কামরূপ কিম্বা ভোজপুরী।*
কি হয় কি যায় কিছু বুঝিতে না পারি ॥
যাও আরো শত সৈন্য আন মোর পাশে।
ত্বরা করি বাঁধি এবে রামী চণ্ডীদাসে ॥
ছুটিল শতেক সেনা ধর ধর রবে।
অধোমুখে মল্লরাজ বসিলা নীরবে ॥
দেখিল যেতেছে তারা কিঞ্চিৎ অগ্রেতে।
ধরি ধরি করি সবে না পারে ধরিতে ॥
দেখিতে দেখিতে কোথা মিলাঞিয়া গেল।
সম্মুখে আলোক-ছটা দেখিতে পাইল ॥
বহুদূর আলোকিত হইয়াছে তায়।
সম্মুখে রমণী এক দেখিবারে পায় ॥
ভীমা ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি দীঘল শরীর।
বিকট-দশনা শ্যামা নাভি সুগভীর ॥
লক লক করে জিহ্বা হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করি।
গ্রাসিতে আইসে যেন ব্রহ্ম-অণ্ড ধরি ॥
এক হাতে তরআল এক হাতে ঢাল।
মুহুর্মুহু গর্জ্জে বামা যেন মহাকাল ॥

হুহুঙ্কার করি তবে কহিল কে যায়।
জান নাকি আমি শ্যামা আছি প্রহরায় ॥
বল ত্বরা কে তোরা কে আইলি মরিতে।
বলি বামা অট্টহাসি লাগিল নাচিতে ॥
তা দেখি শতেক সৈন্য যে যেখানে ছিল।
ছিন্ন-মূল তরুসম মূরছি পড়িল ॥
৵০২] ভৈরব ভৈরব বলি হাঁক দিলা দেবী।
আইলা ভৈরব তথা উল্লাসে তাণ্ডবী ॥
বিশ বিশ জনে ধরি আঁকাড়ি বাঁধিঞা।
রেখে আইল সেনা-দলে বন্দীশালে গিঞা ॥
নীরবে বসিঞে হেথা ভাবে নরমণি।
শুনিতে পাইল দূরে সঙ্গীতের ধ্বনি ॥

* | * | *

গীত।

হেদেরে নিঠুর কান।
সে দেশে জ্বালায়ে এদেশে আইলি
বধিতে রাধার প্রাণ ॥
তোর কপট মধুর হাসি কপট মধুর বাঁশী
তোর কপট শিধুর মধুর মূরতি নিঠুর মধুর নাম ॥
তোর কপট মধুর প্রীতি কপট মধুর রীতি
তোর কপট মধুর ময়ূর-চূড়ায় লিখিলি রাধার নাম ॥
তোর কপট বরজ লীলা কপট বরজ খেলা
তুই কপটে ধরিলি রাধার চরণে কপটে যাচিলি মান ॥
তুই কপটে চাঁদের অমিঅা কপটে আনিঞা ছানিঞা
তুই কপটে রাধার কোমল পরাণে ছুটালি পীরিতি বান ॥
ধিক্ ধিক্ তোরে কানাইঞা তুই ধরম করম জানিঞা
কপট পীরিতে কেমনে হরিলি অবলার কুল মান ॥
হেদেরে নিঠুর কালিঞা কেমনে আইলি চলিঞা
ফেলিঞা চাঁদের বিমল অমিঞা করিতে গরল পান ॥
হায় বঁধু এ কি করিলি কুবুজার সনে মজিলি
ছি ছি কোন লাজে তুই করিলি রাধার পিরীতের অপমান ॥

* | * | *

(ক্রমশঃ)

৩১) এখানে গোপালসিংহকে 'বিষ্কার নন্দন' বলা হইয়াছে। [illegible] বিষ্কা, ব্যাধ। গোপাল মল্ল ব্যাধের সন্তান, এই অপবাদ ছিল। [illegible] পুথীর শেষের দিকে আছে।

* কামরূপে মানুষ রূপান্তরিত হয়, ভোজপুরে দৃষ্ট বস্তু অদৃশ্য হয়।

চিত্রলেখা

শ্রীইলা দেবী

পূজোর বাজার। দোকানগুলো লোকে ভ'রে গেছে। কাপড়ের দোকানে সব থেকে বাহার, সব থেকে ভিড়, রকমারি রঙের রামধনু, জরি চুম্‌কির বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে।

বিক্রেতারা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। একটি অল্পবয়সী ছেলে, নতুন সে কাজে লেগেছে, কয়েক জন খদ্দেরকে বিদায় ক'রে সবেমাত্র সে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় ডাক পড়ল, "সুধীর, শিগ্‌গির এদিকে এস।"

সমস্ত দোকানে সাড়া প'ড়ে গেল, বাহাদুরপুরের মল্লিকবাবু এসেছেন। মস্ত বড় জমিদার, পুরনো খদ্দের। দোকানের অধিকারী স্বয়ং জোড়হস্তে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলেন। প্রকাণ্ড মোটরের ভেতর উগ্র লাল রঙের পর্দা দেওয়া, তার মাঝে মাঝে জরির থোপা ঝুলছে। ফুলদানিতে ফুলের তোড়া, বজ্র-আঁটনে গাঁথা বাঁধাকপির মত নিরেট তোড়া। লাল নীল রঙের জরি-লাগান পোষাকধারী দু-জন বরকন্দাজ নামল প্রথমে, তার পর মল্লিকবাবু তাঁর পর্ব্বতপ্রমাণ দেহ নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ধীরে ধীরে নেমে এলেন। তার পর নামল মোসাহেব, তার পর এল বিসর্পিত আলবোলা সহ গুড়গুড়ি নিয়ে খাস ভৃত্য। এক ধরণের লোক আছে জগতে যাদের সাজেসজ্জায় কাজেকথায় সমস্ত বিষয়ে অর্থের উগ্র ঝাঁজ আর রুচির শূন্যতা উৎকট ভাবে প্রকাশ পায়। বাহাদুরপুরের মল্লিকবাবু সেই দলের। তাঁর জন্যে মিঠে পান এল, পানীয় এল, সুধীর ছোট কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে বেনারসীর বস্তা নামালে। বহুক্ষণ বাছাবাছি ক'রে দোকানদারের বহু বিনয় বাক্যে পরিতুষ্ট হয়ে মল্লিকবাবু একখানা শাড়ী কিনলেন,—তীব্র ম্যাজেণ্টা রঙের জমি, আগাগোড়া ভ'রে রয়েছে সোনার গোলাপগুচ্ছ, গোলাপের ডালে ডালে ব'সে আছে দলে দলে ময়ূর,—অত ক্ষীণ ডালে এত বড় পাখী কি ক'রে বসেছে সে এক গবেষণার বিষয়। তবে শাড়ী যে রীতিমত জাঁকালো সে-বিষয়ে কারও সন্দেহ হবার অবকাশ নেই। দাম ছ-শ টাকা। মল্লিকবাবুর পারিষদ্ কিছু কমাতে অনুরোধ করলে। দোকানদার জোড়হস্তে বললে, "আজ্ঞে হেঁ হেঁ কি বলেন! আপনারা বাপ মা, আপনাদের খেয়েই ত বেঁচে আছি। ছ-শ টাকা আবার একটা দাম, ও ত বাবুর হাতের ময়লা।"

মল্লিকবাবু ঝাঁকড়া গোঁফের মাঝ দিয়ে অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন, "আরে যেতে দাও, যেতে দাও।"

কাপড় নিয়ে তাঁরা সদলবলে উঠে চলে গেলেন।

সুধীর গরীবের ঘরের ছেলে। সে হাঁ ক'রে শুনছিল—ছ-শ টাকা বাবুর হাতের ময়লা। এ সব জমিদারের কথা সে গল্পে পড়েছে, কল্পনায় দেখেছে নদীর পারে সাতমহলা বাড়ী, পঙ্খের কাজ করা মসৃণ, সুন্দর, শঙ্খশুভ্র কক্ষতল, কালো পাথরের ঘাটে কালো আবলুস কাঠের বিপুল বজরা বাঁধা, মুকুলে মুঞ্জরিত ছায়াঘন আম্রবন, বিস্তীর্ণ দীঘির কাকচক্ষু জলে সুপারির সারির ছায়া পড়েছে, পদ্ম ফুটেছে। বাড়ীতে নিত্য অতিথি অভ্যাগত, দুর্গোৎসব চলেছে, ব্রাহ্মণ-ভোজন হচ্ছে, কাঙালী বিদায় হচ্ছে, গ্রামের লোক ভেঙে পড়েছে। আর এ-পুরীর লক্ষ্মীস্বরূপা গৃহিণী যিনি,—যিনি ওই শাড়ী পরবেন,—প্রসন্ন তাঁর মুখ, করুণাভরা চোখ, তেজে সৌন্দর্য্যে রাণীর মত মহিমময়ী, সকলে তাঁর আজ্ঞায়, তাঁর অধীনে, সকলের সেবায় কল্যাণে যিনি নিবেদন করেছেন নিজেকে। আর রাজপুত্র যদি থাকে, অতীতের রাজপুত্রদের মত নির্ম্মল নির্ভীক, যুদ্ধ যাদের খেলা, বিপদ যাদের আনন্দ···

সুধীরের চিন্তায় বাধা দিয়া এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাকে ডাকলেন, "ওহে, দেখাও ত খানকতক শাড়ী।"

ক্লান্ত সুধীর অপ্রসন্ন মনে কয়েকখানা সাদা শাড়ী ফেলে দিলে বৃদ্ধের সামনে। এমন মলিন বেশধারী বৃদ্ধদের মূল্যবান শাড়ী দেখিয়ে সময় নষ্ট করার দরকার নেই, এ অভিজ্ঞতা তার দোকানে ঢুকেই হয়েছে। ভদ্রলোক জীর্ণ কোটের

ভিতর থেকে চশমা বার করতে করতে বললেন, "শুধু সাদা নয়, রঙীনও বের কর দেখি।"

সুধীর চটে গিয়ে ভাবলে, ওঃ বুড়োর সখ দেখ! অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে গিয়ে সে আরও কতকগুলো শাড়ী নিয়ে এল। ভদ্রলোকের পছন্দ আর হয় না। অনেক ক্ষণ ধ'রে অনেকগুলি শাড়ী নেড়েচেড়ে তাঁর পছন্দ হল একখানা নরম রেশমের স্নিগ্ধ সবুজ শাড়ী, ঘন লাল পাড়। দাম শুনে তাঁর শুষ্ক মুখ আর একটু শুকিয়ে গেল। অনেক ক্ষণ দরকষাকষির পরও কিছুতে সুবিধে হ'ল না, বৃদ্ধ অগত্যা একখানা কম দামের আলপাকা শাড়ী নিলেন। পুরনো চামড়ার থলিটি নিঃশেষ ক'রে দাম দিয়ে ম্লান মুখে চলে গেলেন।

এত চেঁচামেচির পর সুধীরের মেজাজ আরও বিগড়ে গেছে। অনর্থক বুড়োর সঙ্গে বকাবকি ক'রে সময় নষ্ট হ'ল, খুব ত এক শাড়ী কিনলেন তার জন্যে এতক্ষণ ধ'রে বাছাবাছি, —যেন দোকানটাই কিনতে চান। শেষকালে শাড়ী যদি বা পছন্দ হয় ত দাম পছন্দ হয় না! ঘরে আছে বোধ হয় চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী, কাপড় পছন্দ হ'লে তবেই ত ভাল ক'রে মিঠে পান ছেঁচে দেবে, পাকা চুল তুলে দেবে, তাই বুড়োর এত বাছাবাছি, অথচ পয়সাখরচটি সম্বন্ধে সাবধান। প্রণয়ও চাই এবং ব্যয়সঙ্কোচও চাই। হিসাবী প্রেমিক···

আর এক জন খদ্দের দোকানে ঢুকে ক্লান্তভাবে সতরঞ্চের ওপর ব'সে পড়ল, বললে, "দেখি কাপড়।" বয়স তার পঁয়ত্রিশও হ'তে পারে, পঞ্চান্নও হ'তে পারে, ময়লা শার্টের ওপর আধময়লা জিনের কোট, বেঁটে চেহারা, বুদ্ধিদীপ্তিহীন মুখ। কতকগুলো কাপড় দেখেশুনে একখানা চওড়া জরিপাড় ঢাকাই শাড়ী তুলে নিয়ে দাম জিজ্ঞেস করলে।

"আটাশ টাকা বারো আনা।"

লোকটির মুখ একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে গেল। সে বললে, "কিছু কম হবে না?"

সুধীরের মেজাজ বিগড়ে ছিল, সে বললে, "জিনিষ সরেশ হ'লে তার দাম এই রকম হয়। এই নিন না কম দামের কাপড়।"···সে কতকগুলো গামছার মত জ্যালজেলে কাপড় ফেলে দিলে।

লোকটি সেই চওড়া পাড় শাড়ীখানা আবার তুলে নিয়ে অনেক ক্ষণ ধ'রে নাড়াচাড়া ক'রে দেখলে। শার্টের হাতের বোতামগুলোর দিকে চেয়ে বহুক্ষণ সে অন্যমনস্ক হয়ে ব'সে রইল।

সুধীর ভাবলে, আচ্ছা জ্বালাতন ত! উঠবে না নাকি। লোকগুলো ঘরে গিয়ে যত পারে ভাবলেই ত পারে, তা নয়, ভাবনা যত দোকানে এলেই! স্ত্রী বোধ হয় মস্ত ফ্যাশানেবল্, দামী কাপড় না হ'লে মন উঠবে না, এদিকে লোকটিকে দেখে ত মনে হয় সুদখোর মহাজন, দেনদারের গলা টিপে টিপে সুদ আদায় ক'রে ক'রে অভ্যাস হয়ে গেছে সব জিনিষ টিপে টিপে দেখা। মহাজন যখন, তখন টাকার কুমীর নিশ্চয়। চশমখোর আর কা'কে বলে! মুখে বললে, "এখানাই নিয়ে নিন, এ-জিনিষ আর কারও অপছন্দ হবার জো নেই।"

লোকটি কি ভাবলে, তার পর উঠে প'ড়ে বললে, "আচ্ছা এখানা আলাদা ক'রে রাখ, আমি একটু পরে এসে নিয়ে যাব।"

সুধীর ভাবলে, আরও পাঁচ দোকানে দাম যাচাই করতে গেল নিশ্চয়!

ঘণ্টাদুয়েক বাদে সে যখন এসে শাড়ীখানা নিয়ে গেল, সুধীর যদি কাজের ভিড়ে লক্ষ্য করত তাহ'লে দেখত তার শার্টের হাতার সোনার বোতামগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সুধীর ভাবছিল এবার একটু ছুটি মিলবে, কিন্তু ছুটি তার ভাগ্যে নেই সেদিনে। এক জন যুবক রৌপ্যশুভ্র একখানা স্বচালিত মোটর হ'তে নেমে এল। মহীশূরী জর্জেট দেখাতে বললে দোকানে এসে। সুধীরের ব্যবহার তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রম হয়ে উঠল। এ নিশ্চয়ই বড়লোকের ছেলে, বাপ অনেক পয়সা রেখে মরেছে, ছেলে তার সদ্ব্যবহার করছে। এর স্ত্রী নিশ্চয় আজকালকার মেয়ে, মাসিক পত্রিকায় ভাল ভাল উপন্যাসে যাদের ওপর অনবরত গালি বর্ষিত হয়। আরাম-চেয়ারে ব'সে টেবিলের ওপর পা তুলে সিগারেট খেয়ে খেয়ে সে মেয়ের বোধ হয় বাত হবার উপক্রম হয়েছে, ভৃত্যপরিজন মক্ষিকার মত অনুক্ষণ তার চার পাশে ভন্ ভন্ করছে আর সেলাম করছে, সমস্ত সংসার তার অনিয়ন্ত্রিত, চারি দিকে কেবল অশুদ্ধাচার আর অপরিচ্ছন্নতা। আতিথেয়তার সে ধার ধারে না, সংসারের কাজে কুটাটি নাড়ে না, স্বামীভক্তি তার একেবারে নেই, কেবল অস্বাভাবিক সুরে কথা বলে, বাইরের লোক নিয়ে হৈ হৈ করে আর ককটেল্ পার্টিতে যায়। ককটেল্ পার্টিটা কি বস্তু সে সম্বন্ধে সুধীরের ধারণা ধূসর। দু-এক বার সে মাসিক পত্রের গল্পে কথাটা পড়েছে, কিন্তু লেখক-লেখিকাদের ও-সম্বন্ধে ব্যক্তিগত জ্ঞান না থাকাতেই বোধ হয় জিনিষটা রহস্যজড়িত হয়ে দেখা দিয়েছে। দু-চার জনকে জিজ্ঞেসও করেছে জিনিষটা কি। কিন্তু সকলেরই ধারণা তার মত ধূসর, তবে এটা যে ভয়ঙ্কর দোষাবহ একটা ভীষণ ব্যাপার এ-বিষয়ে সকলেই স্থির-নিশ্চয়।

অনেক কাপড়ের স্তূপ হ'তে যুবক একখানা বেছে নিলে। সোনালী সুন্দর রং। সুধীর কাগজ মুড়ে কাপড়খানা গাড়ীতে তুলে দিয়ে এল। সমস্ত কাজ সেরে যখন তার ছুটি হ'ল দোকানের ঘড়িতে তখন বারোটা প্রায় বাজে।

ছ-শ টাকা দামের বেনারসী শাড়ী ততক্ষণে যথাস্থানে পৌঁছেছে। বাহাদুরপুরের মল্লিকবাবু তাঁর দেহের অনুযায়ী

স্থূল তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে জাজিমে ব'সে আছেন। পাশে রয়েছে পীতপানীয়পূর্ণ পাত্র। কপি-পরিবৃত সুগ্রীবের মত ঘিরে আছে তাঁকে মোসাহেবের দল। সামনে ব'সে এক জন বাইজী তীক্ষ্ণসুরের ছোট হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান করছে। হারমোনিয়মের আওয়াজের সঙ্গে তার গলার তীক্ষ্ণতার প্রতিযোগিতা চলছে যেন, কে বেশী শ্রবণবিদারণ হ'তে পারে। তার বিশাল বপু গুরুভার গহনায় ভরা, পরনে সেই ময়ূর-দেওয়া ম্যাজেন্টা রঙের শাড়ী।

অন্তঃপুরে জমিদার-গৃহিণী তত ক্ষণ বধূদের উপর, দাসীদের উপর শাসন শেষ ক'রে শুতে গেছেন।

মোসাহেবের দল তাঁরও কিছু কম নয়। বেশীর ভাগ বিধবা, যারা বহু বাক্যবাণ সহ তাঁর অন্ন পরিপাক করে। সধবাও অনেকগুলি আছে, স্বামী যাদের গুলির আড্ডায় দিন কাটায়, পুত্রকন্যাদের সংখ্যা যাদের গণনাতীত। এ-সব আশ্রিতাদের মধ্যে একটা চাপা প্রতিযোগিতা আজীবন চলে, গৃহিণীর তোষামোদীতে কে অগ্রণী হ'তে পারে। গৃহিণীর অবহেলার অপমানে তারা অন্তরালে তাঁর নিত্য মৃত্যুকামনা করে, সামনে তাঁর কথায় দিনকে রাত বলে।

গৃহিণীর বপুখানি বিশালতায় কর্ত্তাকে অনুগমন করেছে। তাঁর আশ্রিতারা বলে, "রাণীমার সোনার অঙ্গ দিনে দিনে কাহিল হয়ে যাচ্ছে।" এমন ক্ষীয়মান দেহ পাছে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি নড়াচড়া করেন না। ডাক্তারে বলেছে বুক খারাপ, সেই জন্যে বধূ ও দাসীদের তিরস্কার ছাড়া সংসারের কাজে কুটোটি নাড়েন না। মার্বল্-পাথরের মেঝেতে মখমলের আসন বিছিয়ে বসেন তিনি, আশ্রিতার দল কেউ পায়ে হাত বুলোয়, কেউ কেশবিরল মস্তকে তেল মাখায়, কেউ পাখা করে, কেউ বা কানে সুড়সুড়ি দেয়, আর নবতর চাটুবাক্য উদ্ভাবনে তাঁকে পরিতুষ্ট করতে যায়। গৃহিণীর সারা অঙ্গ সেকালের নাইট্‌দের কোট অব্ আর্ম্‌স্-এর মত নিরেট অলঙ্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। পরনে তাঁর মূল্যবান একখানি মাত্র সূক্ষ্ম শান্তিপুরী শাড়ী।

গ্রামের ভদ্রাসন বহুকাল হ'ল তাঁরা পরিত্যাগ ক'রে এসেছেন। সেখানে কি মানুষ থাকতে পারে? কলকাতার বিশাল বদ্ধ বাড়ী, ধুলায় ধোঁয়ায় মলিন হয়ে আছে। দেউড়িতে দরোয়ানদের খাটিয়া, দুর্গন্ধ কম্বল, ময়লা মাদুর, খইনির চূণ, তামাকের ছাই ছড়িয়ে আছে সমস্ত জায়গায়। অন্তঃপুরের অঙ্গনে পঁচিশ বার গোবর-জলের ঝাঁট দেওয়া জঞ্জাল, তরকারির খোসা, মাছের আঁশ, গরুর বিচালির ডাবা। এক পাশে অযত্নপালিত বড় বড় গরু বাঁধা,—গোবরে মাছিতে সেখানটা একেবারে ছেয়ে আছে। দাসী-চাকররা প্রচণ্ড হট্টগোলে সর্ব্বদা হাট বসিয়ে রেখেছে। ঘরের নানা রকম নক্সাকাটা রঙীন দেওয়ালে আঙুলমোছা চূণের দাগ। মেঝেতে পানের পিচ্। পৈতৃক আমলের আসবাব ঘরে ঘরে দমবন্ধ ক'রে ঠাসা রয়েছে—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আলমারি, সিঁড়ি-লাগান খাট, সিন্ধুক। সদরে বসবার ঘরে গালিচার ওপর পুরুষানুক্রমে ধুলা জমে আছে, বড় বড় বাড়ির বেলোয়ারি ঝাড়ে মাকড়সার জাল নির্দ্বন্দ্বে ঘন হচ্ছে। ভিক্টোরিয়ান্ যুগের বিপুলায়তন সোফা চেয়ার, দেওয়ালে বৃহৎ ফ্রেমে বহুকাল-পরলোকগত রাজপুরুষদের ছবি, ধুলায় সব মলিন হয়ে আছে।

গৃহিণীর পরিচালনা এত দূর পৌঁছয় না। একে তিনি অন্তঃপুরিকা, তাতে তাঁর হার্ট খারাপ। তিনি যখন ন-বছরের ক'নে হয়ে এ সংসারে এসেছিলেন, তখন বধূদের নিজেদের কক্ষ ছেড়ে বাহিরে আসা প্রথা ছিল না। তাঁরা বসনভূষণ পেতেন, পুতুলের মত সাজতেন, ঘরের মধ্যে ওঠাবসা করতেন, দাসীরা সমস্ত কাজ হাতে হাতে ক'রে দিত। বিনা পরিশ্রমে তাঁদের দেহ ক্রমে স্থূল হ'তে স্থূলতর হ'ত। কোন পালপার্ব্বণে পাল্‌কি অন্তঃপুরে আসত, পাল্‌কিতে উঠে বসলে বাহকরা ঘেরাটোপ-ঘেরা পাল্‌কিসুদ্ধ তাঁদের গঙ্গায় ডুবিয়ে নিয়ে আসত। বাহিরের জগতের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক তাঁদের ছিল না।

কর্ত্তাদের নানা আপত্তিকর অনুল্লেখযোগ্য জায়গায় যাওয়ার কথা তাঁদের কানেও পৌঁছত। কর্ত্তাদের পূর্ব্বপুরুষের আমল হ'তে এসব চলেছে, এখনও চলছে। এর মধ্যে যে বীভৎসতা আছে সেটা তাঁদের অত মনে লাগত না। ওসব হ'ল পুরুষ-মানুষের খেলার জিনিষ, বড়মানুষীর অঙ্গ, ওতে কিছু আসে যায় না বলে নিজেদের সান্ত্বনা দিতেন। তাঁদের নিজেদের জীবনও খেলার পুতুলের চেয়ে কিছু উন্নত কি-না এসব চিন্তা তাঁদের ধারণার বাইরে ছিল, কেউ এসব কথা কোনদিন তাঁদের শোনায়ও নি।

এখনকার বধূরা কক্ষ দূরের কথা, গৃহ ছেড়ে সংসারের সীমানা পেরিয়ে বাইরের কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়ায়, পুরুষমানুষের সমালোচনা করতে বসে, নিজেদের মতামত জাহির করতে চায়। এসব নির্লজ্জ দুঃসাহসিকতায় গৃহিণী স্তম্ভিত হয়ে যান। তাঁর সংসারে অবশ্য এসব হবার জো-টি নেই, তাঁর 'হার্ট' নিয়ে তিনি যত দিন বেঁচে আছেন। একরাশ টাকা ঢেলে মেয়ের বাপ মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন বলেই দায় ফুরিয়েছে নাকি?—মেয়ের বিয়ে দিয়ে তিনি যে আজীবন চোরের দায়ে ধরা পড়েছেন, গৃহিণী যত দিন আছেন এ-কথাটি তাঁর বেহাইদের ভুলতে দেবেন না। তাঁর ছেলেরাও সে-বিষয়ে আদর্শ ছেলে, সেই যে মায়ের দাসী আনতে যাচ্ছি ব'লে বিয়ে করতে বেরিয়েছে তার প'র থেকে বধূদের দাসীর মতই শাসনে রেখেছে। তারা মায়ের আঁচলের নিধি, বড় আর হ'ল না। শিশুকাল হ'তে তারা বাক্সর আঙুর, মাটিতে পা দিলে পঁচিশটা লোক ছুটে আসবে হাঁ হাঁ ক'রে, একটা

পিঁপড়ে কামড়ালে চারি দিকে সমবেদনার ঢেউ উঠবে। ছেলে স্কুলে গেলে মা পলকে প্রলয় দেখবেন। ছেলেদের ভাগ্যিস স্কুলের গণ্ডী পেরতে হয় নি, তা না হ'লে গৃহিণী ভাবনায় আত্মঘাতী হতেন।

ছেলেরাও দেখেছে জগতে তাদের শুধু যেন-তেন-প্রকারেণ বেঁচে থাকলেই চলবে। মানুষ হবার কোন সাধনার দরকার নেই। তারা নিত্য দেখেছে পিতা-পিতামহর আচার-ব্যবহার। শুনেছে বটে পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তিকাহিনী, কিন্তু সে কাহিনী যত দিনে তাদের কাছে পৌচেছে তত দিনে তাদের সতেজ নির্ভীক জীবনধারা পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে, তারা পেয়েছে শুধু অলস পঙ্কিলতা।

বাইরে কোথায় পূজোর বাজনা বাজছে। গৃহিণী শুয়ে শুয়ে ভাবছেন ছোট বধূর বাপ এবারে পূজোর কি তত্ত্বই পাঠিয়েছেন, একখানা ভাল বেনারসীও জোটে নি। তেমনি তিনিও বধূকে বাপের বাড়ী যেতে দেন নি। ছোট্ট মেয়ে, পিতৃগৃহের জন্যে তার মন কেমন করে, ম্লানমুখে ছলছল-চোখে ভীত ত্রস্ত হয়ে থাকে। তা ব'লে বাপের অন্যায়কে ত প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।...

একটি অন্ধকার অপরিসর গলির একখানা অৰ্দ্ধভগ্ন বাড়ীতে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঢুকলেন। হাতে তাঁর কাগজ-মোড়া আলপাকার শাড়ী। বাড়ীর চুণ বালি অনেক কাল খ'সে গেছে, কালো আর সবুজ শ্যাওলার প্রলেপ লেগেছে দেওয়ালে, দু-চারটে বট-অশথের চারা আলিশার ধারে বেড়ে উঠেছে। দরজা-জানালার রং উঠে গেছে বহুকাল, জানালার একখানা পাল্লা কবে ভেঙে গেছে, আর একখানা অসহায় ভাবে ঝুলছে। বৃদ্ধ সাবধানে দরজা খুলে ভেতরে এলেন। দেওয়ালে একটা পুরাতন কেরাসিনের ধূমায়িত আলো ক্ষীণ ভাবে জ্বলছে। মেঝেগুলো ভেঙে গর্ত্ত হয়ে গেছে, পুরনো বাড়ীর ভ্যাপ্‌সা গন্ধে ভরা চারি দিক।

যে-ঘরে বাতি জ্বলছিল বৃদ্ধ সেই ঘরে প্রবেশ করলেন। জীর্ণ তক্তাপোষে শুয়ে একটি মেয়ে, অত্যন্ত রোগা, বিবর্ণ মুখে রক্তের চিহ্ন নেই, রুক্ষ চুল চারি পাশে ছড়িয়ে আছে। দারিদ্র্যমলিন কক্ষ, কোণে কোণে ঝুল ভ'রে রয়েছে, কুলুঙ্গীতে রাখা বাতি থেকে ধোঁয়া উঠছে, একটা পায়া-ভাঙা জল-চৌকিতে কয়েকটা ওষুধের শিশি রাখা রয়েছে।

বৃদ্ধ তক্তাপোষের এক পাশে বসতে সেটা আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল। জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছ দিদি?"

মেয়েটি চোখ খুললে না। রোগক্লান্ত স্বরে বিরক্ত ভাবে বললে, "তেমনি আছি, আবার কি রকম থাকব?"

বৃদ্ধ তার জরতপ্ত ললাট হ'তে চুলগুলো সস্নেহে সরিয়ে দিয়ে বললেন, "আগের চেয়ে একটু ভাল লাগছে না? পূজোটা হয়ে গেলেই তোমায় হাওয়া বদলাতে নিয়ে যাব দিদিমণি।"

"হ্যাঃ, তুমি রোজই হাওয়া বদলাতে নিয়ে যাচ্ছ।" মেয়েটি কষ্টে পাশ ফিরে শু'ল।

ব্যথিত বৃদ্ধ নীরব হয়ে রইলেন। সত্যি তিনি হাওয়া-বদলে যাবার প্রবোধ দিয়েছেন অনেক বার, কোন বারই তা কার্য্যে পরিণত হয় নি। জগতে তাঁর একমাত্র আপনার এই নাত্‌নীটি, তাঁর স্নেহের পুত্তলি, চোখের মণি, আদর ক'রে তার নাম দিয়েছিলেন মণিমালা।

কত কষ্টে কত যত্নে তাকে মানুষ করেছেন! এ ভাঙা বাড়ীর মলিন কুঠরির ধূমায়িত আলোয় তাঁর চোখে ভেসে উঠল প্রাসাদোপম অট্টালিকা, ভৃত্যপরিজনভরা তাঁর সংসার, তাঁর হাস্যময়ী পত্নী, একমাত্র মেয়ে। তখন তাঁর ব্যবসায়ে জোয়ার এসেছে, বাণিজ্যলক্ষ্মী সপ্তডিঙা পরিপূর্ণ ক'রে পাঠিয়েছেন। স্ত্রীর ইচ্ছা মেয়ের বিয়ে দিয়ে যাতে দূরে না পাঠাতে হয়। তাহ'লে তাঁদের গৃহ অন্ধকার হয়ে যাবে। কি নিয়ে থাকবেন তাঁরা? ভদ্রলোক নিজের অনিচ্ছাতেও ঘরজামাই ক'রে আনলেন।

তার পর যা সাধারণতঃ হয়ে থাকে, জামাই কুসংসর্গে প'ড়ে বিগড়ে গেল, দু-হাতে টাকা ওড়াতে লাগল। শেষে একদিন শ্বশুরের নাম জাল ক'রে চেক লিখে ধরা প'ড়ে জেলে গেল। শ্বশুর তাকে উদ্ধার ক'রে আনলেন। ওই ধরণের মেরুদণ্ড-বিহীন দুর্ব্বল লোক যা করে, সেও তেমনি আত্মহত্যা করল। সেই থেকে তাঁদের সংসারে শনি লাগল। মেয়ে মারা গেল, স্ত্রী গেলেন, এই সব আঘাতের পর আঘাতে ভদ্রলোক যখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁর ব্যবসাও তখন ডুবে গেল। বৃদ্ধ যখন সাংসারিক ঝঞ্ঝায় বিপর্য্যস্ত হচ্ছিলেন, অন্য অংশীদারেরা তখন গুছিয়ে নিয়েছে, তিনিই শুধু একেবারে পথে বসলেন। নাত্‌নীর হাত ধ'রে তিনি এ-বাড়ীতে এসেছিলেন। তার পর অতি কষ্টে বহু চেষ্টায় একটি বইয়ের দোকানে সামান্য একটা কাজ জুটিয়ে নিয়ে কোন মতে দিন চালাচ্ছেন। নাত্‌নী শিশুকাল হ'তে রুগ্ন, তখন তার সামান্য অসুখে বড় বড় ডাক্তার আসত, তার সঙ্গে সঙ্গে কত দাসদাসী থাকত। একে একটি মাত্র দৌহিত্রী, তার ওপর শরীর রুগ্ন ব'লে দাদামশায় দিদিমা তাকে পক্ষীশাবকের মত যত্নে ঢেকে রাখতেন।

এখন তার ওষুধটা জোটানও কষ্টসাধ্য। একটি ডাক্তারকে বহু সাধ্যসাধনা করায় তিনি বিনাপয়সায় সপ্তাহে একদিন দেখে যান, বৃদ্ধ হাসপাতাল থেকে জলে-গোলা ওষুধ নিয়ে আসেন। মণিমালা মানুষ হয়েছে ঐশ্বর্য্যের মাঝে, আদরে আবদারে। হঠাৎ অবস্থাবিপাকে নীড়চ্যুত হয়ে এ দারিদ্র্যসংঘাতের আবর্ত্তে প'ড়ে সে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ল। দুঃখকে উপেক্ষা করার মত মনের শক্তি তার

ছিল না, ভাগ্যসংগ্রামে যোগ দিয়ে জয়ী হবার চেষ্টা করার সামর্থ্য তার দুর্ব্বল দেহে ছিল না। অদৃষ্ট তাকে যে আঘাত দিলে, নির্দ্বন্দ্বে সে তাতেই ভেঙে পড়ল, তার রুগ্ন শরীরে শুধু প্রাণটা কোন মতে টিকে রইল। তার যত রাগ ক্ষোভ পড়ল গিয়ে বৃদ্ধ মাতামহর উপর, মণিমালার যত বিরক্তি অতৃপ্তি সব তারই উপর প্রকাশ পেত। তিনি তার অবুঝ ছেলেমানুষিতে রাগ করতে পারতেন না, গভীর স্নেহ তাঁকে নিবিড় ব্যথায় ভরিয়ে দিত।

বৃদ্ধ আস্তে আস্তে বললেন, "দিদি, এবার একটু সাবু খাও।"

মণিমালা ঝাঁজের সঙ্গে বললে, "না। তুমি জ্বালাতন ক'রো না।"

"ওষুধটা একবার খেয়ে নাও, লক্ষ্মী দিদি।"

মণিমালা ঝঙ্কার দিয়ে প্রায় কেঁদে ফেললে, "তুমি কি আমায় স্বস্তিতে মরতেও দেবে না?" দুর্ব্বল শরীরে সামান্য উত্তেজনাতেই সে একেবারে হাঁপিয়ে পড়ল।

বৃদ্ধ উদ্বিগ্ন হয়ে মাথায় বাতাস করতে লাগলেন। তার পর বললেন. "লক্ষ্মী দিদি, যদি ওষুধটা খেয়ে নাও, একটা জিনিষ এনেছি তোমার জন্যে দেব তাহলে।"

মণিমালার চোখটা একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তবু সে নিরুৎসাহে বললে, "কই কি এনেছ দেখি।"

বৃদ্ধ আজ অনেক দ্বারে ঘুরে অনেক অপমান বাক্যজ্বালা সয়ে অনেক কষ্টে কয়েকটি টাকা ধার ক'রে এ কাপড়খানি কিনে এনেছেন। দুর্ব্বল কম্পিত হস্তে মোড়কটা খুলে ফেলে বহু দুঃখে কেনা কাপড়খানা নাতনীর হাতে তুলে দিলেন।

বাড়ীর ম্লান আলোয় শাড়ীটা একবার দেখে নিয়েই মণিমালা চীৎকার ক'রে উঠল, "এই পচা কাপড় এনেছ আমার জন্যে। এই আমার পূজোর কাপড়!" কাপড়খানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে বালিসে মাথা ঠুকতে লাগল, "আমি চাই না, চাই না, কিছু আমায় দিতে হবে না, ওই কাপড়, ও ত ঝি-চাকরকে আমি দিয়েছি, ও আজকাল মেথরানীতেও পরে না, ওই কিনা আমার জন্যে আনা—"রোষে ক্ষোভে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

আহত বিমূঢ় বৃদ্ধ তাকে শান্ত করার বৃথা চেষ্টা করতে লাগলেন, "ছি ছি দিদু, চুপ কর, অমন করলে এখুনি অসুখ বাড়বে। আমি পরে তোমায় ভাল কাপড় এনে দেব—।"

মণিমালার কান্না দ্বিগুণ বেড়ে গেল। সে চীৎকার ক'রে বলতে লাগল, "সব তোমার মিথ্যে কথা। কেবল তুমি মিছে কথা ব'লে ভোলাও আমায়। তোমার একটি কথাও আমি আর বিশ্বাস করি না।" উত্তেজনায় দুর্বলতায় সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।...

...দমকা হাওয়ায় আলোকশিখা চমকে উঠল, ভাঙা জানালা আওয়াজ ক'রে উঠল, দেওয়ালের কালো ঝুলগুলো দুলতে লাগল। পাশের গলি হ'তে পূজোর বাজনা নিস্তব্ধ ঘরে রূঢ় কর্কশ শোনাতে লাগল।

জলে-ভেজা কলতলায় ব'সে একটি রমণী বাসন মাজছে। রান্নাঘর হ'তে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া বেরিয়ে অপরিসর অঙ্গনে জমাট হয়ে রয়েছে। ক্ষুদ্র বারান্দায় একরাশ ময়লা কাপড় ঝুলছে দড়িতে, একখানা মাদুর, খান-দুই পিঁড়ে, একটা ঘটি, জলের বালতি চারি দিকে ছড়িয়ে আছে। তার মাঝে নানা বয়সের একপাল ছেলেমেয়ে চেঁচামেচি মারামারি ক'রে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তুলেছে।

দরজার কড়া নড়তেই, "ওই রেঃ বাবা এসেছে" ব'লে ছেলের দঙ্গল হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। দশ-বার বছরের একটি মেয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলে। গৃহকর্ত্তা ভিতরে এসে কাপড়ের মোড়কটা ঘরে রাখলে। অতি ক্ষুদ্র ঘর, তক্তাপোষে স্তূপীকৃত বিছানা, বাক্স, পুঁটলি, বোতল, আয়না, ভাঙা পুতুল, ছেঁড়া বই, দেবদেবীর ছবি, সহস্র রকম জিনিষ ঠেসে আছে। গরাদ-দেওয়া একটুখানি জানলা দিয়ে পাশের বাড়ীর ইট-বের-করা দেওয়াল আর খানিকটা দুর্গন্ধ নর্দ্দমা দেখা যায়।

মেয়েটি মোড়কের দিকে আড়চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে, "আমাদের পূজোর কাপড় এনেছ?"

লোকটি বিরক্ত হয়ে বললে, "যা যা, বিরক্ত করিস নে। তোর মা কোথা?"

"মা বাসন মাজছে। ঝি আসে নি।"

"ঝিটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। রোজ কামাই।"

মেয়েটি পাকাবুড়ীর মত বললে, "ঝি বলেছে ভারি ত তিন টাকা মাইনে দেবে, তাও তিন মাস বাকী থাকবে, সে আর আসবে না।"

"যা তোর মাকে ডেকে দে বুঁচি।"

বুঁচি চলে গেল। লোকটি ক্লান্তভাবে তক্তাপোষের উপর ব'সে পড়ল। আজীবন ক্লান্তি, এ ক্লান্তির যেন শেষ নেই। সকালে উঠে কোনমতে কতকগুলো ভাত গিলে সেই সনাতন কলম পিষতে ছোটা,—দিনের আলো শেষ হয়ে এলে বাড়ীর অনন্ত অভাব-অনটনের মাঝে ফিরে আসা। দিনের পর দিন সেই একঘেয়ে জীবনের পুনরাবৃত্তি,—পরিশ্রমের ক্লান্তি এ নয়, এ হ'ল আশাহীনতার ক্লান্তি, আনন্দহীনতার ক্লান্তি, বৈচিত্র্যহীনতার ক্লান্তি, এ ক্লান্তি মানুষের জীবনরসকে প্রতিমুহূর্ত্তে শুষে নেয়, মানুষকে—সমস্ত জাতিকে নিরানন্দ, নির্জীব ক'রে তোলে।

বুঁচির মা বাসন ছেড়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এল। কালো রঙের শ্রীহীন চেহারা, দেহে শুধু হাড় কখানা বাকী

আছে। শিরাবহুল হাতের আঙুলগুলি ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে, শীর্ণ পায়ে চামড়া ফেটে গিয়ে কর্কশ হয়ে আছে।

"একি জুতোসুদ্ধ বিছানায় বসেছ কেন?" ব'লে সে স্বামীর পা হ'তে ধূলিমলিন জুতো খুলে খাটের তলায় রাখলে।

তার স্বামী বললে, "ওই কাপড় এনেছি, দেখ।"

বুঁচির মা হাতটা আর একবার আঁচলে মুছে নিয়ে মোড়ক খুললে, শাড়ীর জরির পাড়ের দিকে মুগ্ধ, একটু লুব্ধ চোখে চেয়ে বললে, "বাঃ, এ ত খুব দামী দেখছি।"

"কি করা যায় বল, সুরমার শাশুড়ী ত শাসিয়েছে পূজোর তত্ত্বে তাকে এবার ভাল কাপড় না দিলে ছেলের আবার বিয়ে দেবে।"

"ওদের ত অবস্থা ভাল, কাপড়ের কি অভাব? তবু কি চশমখোর, কি জায়গায় যে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি।"

"ও সবাই সমান। মেয়ের বিয়ে আমাদের জন্মগত অভিশাপ। যে বেটারা যত বেশী বক্তৃতা করে সে বেটারা তত বেশী চশমখোর।"—তার স্বরটা ঝাঁঝে উগ্র।

বুঁচির মা একটু কুণ্ঠিত ভাবে অনেক ইতস্ততঃ ক'রে বললে, "এ গুলোর জন্যে কিছু আনলে না, ওরা ত আমায় ছিঁড়ে খাচ্ছে পূজোর কাপড়, পূজোর কাপড় ক'রে।"

রুক্ষ কর্কশ স্বরে তার স্বামী বললে, "হ্যাঁ, আমার বড় টাকা দেখেছ কিনা তোমরা সকলে, এবার তোমাদের ছাপ্পান্ন কোটি যদুবংশের জন্যে দোকান উঠিয়ে আনব। হুকুম ত করা হচ্ছে লম্বা লম্বা, আসে কোত্থেকে টাকাটা? তোমরা আছ পঙ্গপাল, কেবল আমায় শুষে খাচ্ছ বারো মাস, একটি পয়সা রোজগারের মুরদ আছে?"

বুঁচির মা নিরুত্তরে জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অন্য দেশের মেয়ে হ'লে বলতে পারত, 'ছেলেমেয়েদের জগতে তুমিই এনেছ, তাদের ভার বইতে তুমি বাধ্য,' বলতে পারত, 'কৈশোর হ'তে তোমার সংসারে বেতনবিহীন বাঁদীর মতন বিরামবিহীন খেটেছি, তোমার সন্তান পালন ক'রে ক'রে অকালবৃদ্ধা হয়ে গেছি, এতেও কি আমার জীবিকা অর্জ্জন করা হচ্ছে না?' বলতে পারত, 'বাইরে উপার্জ্জনের শিক্ষা দেয় নি তাই ভিটে-মাটি বেচে তোমার বরপণ দিয়ে বাপ মা আমার বিয়ে দিয়েছিল।' কিন্তু সে বাংলা দেশের সহনশীলা মেয়ে, কোন কথাই বললে না, শুধু এই পূজোর দিনে এমন ভাবে বকুনি খেয়ে তার দু-চোখ উপচে জল গড়িয়ে পড়ল।

বুঁচির বাপ একটু নরম হয়ে বললে, 'কি ক'রে কাপড় আনি বল? বিয়ের পণের পাঁচ-শ টাকা আজও ওদের দিতে পারি নি, সত্যিই ওরা একটা কিছু ক'রে বসে যদি তাহ'লে সারাজন্ম মেয়ের ধাক্কা সামলাতে হবে। হাতের বোতামগুলো নিতাই স্যাকরার দোকানে বন্ধক রেখে ওই কাপড় আনলাম।"

'অ্যাঁ বল কি গো, সেই বোতামগুলো বেচলে?"

বুঁচির মা'র ব্যথিত বিস্মিত কণ্ঠে তার স্বামী দুঃখিত ভাবে বললে, "আর কোন উপায় থাকলে ওগুলো কি আমি দিতাম? তুমি তা বুঝবে না?"

আজকের এ অবসন্ন জীবনের পাতা উল্টে তার মন পৌঁছল একটি দিনে যখন বসন্তে মঞ্জরিত বৃক্ষের মত সতেজ স্নিগ্ধ ছিল মন, রৌদ্র-ঝলসিত শীত-মধ্যাহ্নের মত মধুর লাগত জীবন। তখন নববধূ বুঁচির-মা নতুন সংসার পেতেছে, তার স্বামী নতুন পেয়েছে কাজ। প্রত্যেকটি দিন এক-একটি পরিপূর্ণ রহস্য, সমস্ত সংসার একটি প্রোজ্জ্বল আশা। তখন একটিমাত্র সন্তান সুরমা, তার কথা-হাসি বাপ-মায়ের কৌতুকের উৎস। এখনকার এতগুলি ছেলেমেয়ের মত তার আগমন অবাঞ্ছিত হয় নি। ঐশ্বর্য্য ছিল না তাদের কোনদিন, কিন্তু তখনও অভাব এমন স্বভাবে দাঁড়ায় নি। একদিন খাবার খুব আয়োজন হয়েছে—মাছের মুড়োর কালিয়া, মাংস, পায়েস,—বুঁচির বাপ জিজ্ঞেস করলে, "আজ ব্যাপার কি, অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার খুলে গেছে যে!"

বুঁচির মা খুকীর হাসি হেসে বললে, "বা রে, নিজের জন্মতিথিও মনে থাকে না!"

"তাই নাকি! তাহ'লে ত শুধু খাওয়ালে হবে না, দক্ষিণাও চাই।"

স্ত্রীর চিন্তিত মুখ দেখে সে বললে, "এত ভাবছ যে, দক্ষিণার নামে ভয় পেয়ে গেলে নাকি?"

"না, কিছু ভাবছি না।" কিন্তু বুঁচির মা মনে মনে তখন ফন্দি আঁটছে। স্বামী ত তাকে প্রায়ই সাবান, গন্ধতেল, রঙীন সেমিজ এসব উপহার এনে দেন। পাওয়ার আনন্দ আছে অশেষ, কিন্তু দেওয়ার গৌরবে যে তৃপ্তি তারও তুলনা হয় না।—কিন্তু সে কি দেবে, তার ত নিজের একটি টাকাও নেই। স্বামী কাজে চলে যাবার পর অনেক ক্ষণ ভেবে ভেবে হঠাৎ তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কানের সোনার বড় বড় দুল-দুটি খুলে নিয়ে দাসীকে দিয়ে স্যাকরাকে ডেকে পাঠালে।

তার কয়েক দিন পরে বুঁচির মা ধোয়া পরিষ্কার শার্টে সোনার বোতামগুলি সযত্নে লাগিয়ে যখন স্বামীকে পরতে দিলে, সেদিনের বিস্ময়পুলকিত আনন্দস্মৃতি আজকেও বাদল-ব্যথিত দিনে রৌদ্রের স্বপ্নছবির মত দু-জনের মনের গোপনে ভ'রে আছে। অনেক অভাবেও তাই তারা এই ক'টি বোতামকে এত দিন বাঁচিয়ে রেখেছিল।...

বাইরে পূজোর বাজনা জোরে বাজছে। স্বামী স্ত্রী দু-জনের মনে হচ্ছিল জীবনের দেবতা জীবনের যাত্রারম্ভে যে শুদ্ধ আনন্দবেদ আবৃত্তি করেছিলেন তার শেষ ঝঙ্কার সংসারের কর্কশ কোলাহলে আজ নিমগ্ন হয়ে কোথায় হারিয়ে গেল।...

ঝরঝরে সুন্দর বাগান, তার মাঝে নতুন একখানা শুভ্র বাড়ী। বাড়ী আর বাগানে একটি পরিচ্ছন্নতার সুষ্ঠু সামঞ্জস্য।

মস্তবড় এক বোঝা ফুল আর পাতা নিয়ে সম্পা কয়েকটা বড় বড় পিতল আর রূপোর ফুলদানিতে ক্ষিপ্রহস্তে সাজিয়ে রাখছে। পিছন থেকে কে তার চোখ চেপে ধরলে।

"আঃ ছাড়, কাজের সময় বিরক্ত ক'রো না বাপু।" মোহন চোখ ছেড়ে বললে, "কি এমন কাজ যে এত ব্যস্ত?"

সম্পা রেগে বললে, "হ্যাঁ তা ত বলবেই। নিজে দিব্বি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে টো টো ক'রে ঘুরে বেড়ান হচ্ছে, এত-গুলি লোক খাবেন সে সব ধাক্কা সামলাই আমি। সকাল থেকে একবার দাঁড়াবার সময় পাই না।"

মোহন ব্যস্ত হয়ে বললে, "সত্যি, কেন এত খাটতে যাও? বিকেলে একবার টেনিসও ত খেললে না আজ। চাকরদের ছেড়ে দিলেই ত হয়।"

"হ্যাঁ, ওই এক কথা শিখে রেখেছ। সমস্ত হাতে হাতে পাও কিনা, ভাব সব আপনি হচ্ছে। ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকলেই হয়েছিল আর কি!"

সম্পার মেজাজ এখন বিশেষ স্নিগ্ধ নয় দেখে মোহন কাপড়ের মোড়কটা গোপন ক'রে আস্তে আস্তে সরে পড়বার উপক্রম করলে। সম্পা বললে, "এখন আবার পালানো হচ্ছে কোথায় শুনি? স্নানটান করতে হবে না?"

"তাই ত যাচ্ছি।"

"হ্যাঁ, আর ছাখো, আজ ডিনারে সেভারি আমার নতুন রেসিপি, একটু মন দিয়ে খেয়ে দেখো ত কেমন হয়েছে। তোমার ত কাণ্ড, সাপ ব্যাং কি খেলে কিছুই খেয়াল থাকে না।"

"ও, তোমার সেই গুড হাউস-কিপিঙের রেসিপি?" সম্পা চটে বললে, "হ্যাঁ, তাই, কি হয়েছে? এত ক'রে করি, সে বলা দূরে থাক্, সব তাতেই কেবল ঠাট্টা।"

মোহনের রসনার ওপর দিয়ে এই সব নবোদ্ভূত রান্নার পরীক্ষা এত ঘন ঘন চলে যে তার রীতিমত একটা আতঙ্ক দাঁড়িয়ে গেছে। সে চিন্তিত ভাবে বললে, "না ঠাট্টা কেন, তবে তুমি বড্ড বেশী খাওয়াও, অত খাওয়াটা কিছু নয়।"

"তোমারই শুধু খাওয়া যেন বাঘ। অন্য সকলে ত দেখি কত খেতে পারে। এই ত সেদিন লাঞ্চে সে রাশিয়ান্ ভদ্রলোকটি আমাদের পোলাও কি রকম ভালবেসে খেয়ে কত প্রশংসা করলে। আর তোমায় খেতে বললে মারতে আস।"

মোহন কবে আহারের অনুরোধে প্রহারে উদ্যত হয়েছে স্মরণ করতে পারলে না, বললে, "ও রাশিয়ানদের কথায় তুমি কান দিও না। পোলাও খেয়ে ওরা বর্তে গেছে, পোলাওকে বললে 'ভেরি নাইস্, ওই যে কি ওটার নাম, পিলাও-ভস্কি'—ওদের দেশে Piateletka—সেই পাঁচ বছরের প্ল্যান মানে পাঁচ বছর ওদের খাওয়া বন্ধ। ওরা হ'ল উপোসী ছারপোকা। আমাদের দেশে সে সুদিন কবে আসবে, তাহ'লে আমাদের জাতির দেহের মধ্যদেশটা একটু কমে।"

"উঃ নিজেদের 'ফিগার'-এর ভাবনাতেই গেলে, তবু কিনা বলা হয়, Vanity thy name is woman."

মোহন একটু বেকায়দায় প'ড়ে বললে, "এ সব কণ্টেজিয়স্ মেণ্টালিটি, তোমাদের সঙ্গে থেকে থেকে এসব একটু একটু পেয়েছি আমরা।"

"তাই নাকি! জান না আজকালকার সব থেকে বড় সাইকলজিষ্ট পুরুষমানুষদের ভ্যানিটি সম্বন্ধে কি বলেছেন—" মোহন বিপদ গণলে। একবার এসব তর্ক উঠলে সম্পা সহজে থামবে না। এক জন ভৃত্য এসে সম্পাকে কি বলায় সে নেমে গেল, বললে, "যাও যাও স্নান কর গে, আমি যাচ্ছি টেব্‌ল্‌টা অ্যারেঞ্জ করতে। আমার এখন ঢের কাজ, তোমার সঙ্গে বকতে পারি নে।"

সে বেরিয়ে যেতে যেতে ফিরে বললে, 'আর দেখ তুমি বেশী স্মোক ক'রো না লক্ষ্মীটি, রাত্রে তাহ'লে কাশবে, লোকের সামনে ত বেশী মানা করতে পারা যায় না।"

মোহন বললে, "ঐটি তোমার ভারি ভুল যে স্মোক করলে কাশি হয়। ঐ যে মাঠে মোষটা কাশছে, ঐ যে গয়লার গরুটা সকালে দুধ দিতে এসে কাশে, ওরা কি সিগারেট খেয়েছে?"

সম্পা ধমকে উঠল, "যাও যাও, চালাকি ক'রো না, যা বললাম তা যেন মনে থাকে।"

মোহন নিজেদের ঘরে এসে কাপড়ের মোড়কটা কোথায় গোপন ক'রে রাখবে ভাবতে লাগল। সব জায়গায় সম্পার সতর্ক দৃষ্টি, কোথাও কিছু নড়চড় হবার জো নেই। সোফা কোচ কি ফুলদানী যদি একচুল এদিক-ওদিক সরে, ও কি-রকম ইনষ্টিংটে তা টের পায়। কিছু ওর চোখ এড়ায় না। ভৃত্যেরা সব ঝেড়ে মুছে গেছে তবু সকালে তার ঝাড়ন নিয়ে ধুলোর সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে ঘোরা মনে প'ড়ে মোহনের ভারি হাসি পেল। মেয়েদের কি যে এসব বাজে কাজে সময় নষ্ট করা। আর সে যখন সম্পার চিত্রাঙ্কনের রং-তুলি গোপনে গ্রহণ ক'রে, বেঞ্চ টুল অথবা হাতের কাছে যা পায় রং করতে বসে, কিংবা রেডিওর যন্ত্রপাতি খোলাখুলি ক'রে তার উন্নতি সাধন করতে চায়, সম্পা বলে কিনা সময় নষ্ট করা হচ্ছে। এসব হাতের কাজে যে কত বড় ডিগনীটি অব লেবার রয়েছে, মেয়েদের তা মনে আসে না। হাক্সলি বলেছেন না, 'আসল শিক্ষা হচ্ছে তাই যা মানুষকে দরকার হ'লে হাতুড়ি পেটাতে পারে আর দরকার হ'লে সূক্ষ্ম মাকড়সার জাল বোনাতেও পারে!' রং করতে গিয়ে সেদিন তার নীলচে সিল্কের

শাড়ীটায় দাগ লেগে গেল ব'লে সম্পা রাগ করলে অথচ সে যে মিস্ত্রীর খরচটা বাঁচালে সেটা মোটেই ভাবলে না। রেডিওটা খোলাখুলি করার পর থেকে অবশ্য তার আওয়াজ একটু খারাপ হয়ে গেছে। মোটরের এঞ্জিন খুলে একটা পরীক্ষা করায় সেটায় মাঝে মাঝে বিকট আওয়াজ শোনা যায় দৈত্যের গর্জ্জনের মত, কিন্তু এই অত্যাবশ্যক খোলাখুলি না করলে ওগুলো যে আরও বেশী খারাপ হয়ে যেত এটা সে সম্পাকে কিছুতেই বোঝাতে পারে না। মেয়েদের মত অবুঝ জগতে আর নেই, ভাগ্যিস মেয়েরা এখনও এদেশে জুরি হয় নি -তাহলে তাদের বোঝাতে প্রাণান্ত হ'ত, আর আসামীর ঝাঁকড়া গোঁফ, দেখে কিংবা ঘাড়-ছাঁটা চুল দেখে সাব্যস্ত ক'রে নিত যে সে নিশ্চয় দোষি।

ভেবেচিন্তে এক তাড়া ব্রীফের তলায় শাড়ীখানা রেখে দিয়ে মোহন স্নানে গেল।

দেশী বিদেশী নানা জাতীয় অতিথিরা সকলে যখন বিদায় নিয়ে চলে গেছে, রাত তখন হয়েছে অনেক। পুষ্পাধারে ম্যাগনোলিয়ার বড় বড় শুভ্র পাপড়িগুলি গন্ধে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে এরই মধ্যে ঝরে পড়ছে।

সম্পা শয়নকক্ষে এসে দেখলে মোহন আগে এসে জানলার ধারে ব'সে ধূম পান করছে। সম্পা খোঁপাটা খুলতে খুলতে বললে, "উঃ, যা হৈ চৈ গেছে। কালকে ছুটি ভাগ্যিস, তা না হ'লে তোমার সেই সমস্ত দিন কোর্টে হাড়ভাঙা খাটুনি। ডিনার কেমন হয়েছিল বল।"

মোহন বললে, "খুব ভাল। সবাই বেশ খুশী হয়েছে, আদরে অভ্যর্থনায় বোঝা গেল। হবে না-ই বা কেন? তুমি যে রন্ধনে দ্রৌপদী।"

অনেক দিন থেকে সম্পার অভ্যাস ডিনার কেমন হয়েছে, সে অতিথিদের যথেষ্ট যত্ন করতে পেরেছে কিনা মোহনকে জিজ্ঞেস করা। মোহন খুশী হয়ে তাকে সার্টিফিকেট দিলে তবেই সে বুঝবে কিছুই বৃথায় যায় নি, তার সমস্ত কর্ত্তব্য যথাযথ করা হয়েছে।

মোহন বললে, "একটা জিনিষ দেখ সম্পা।" কাগজের মোড়কটা সে সম্পার হাতে তুলে দিলে। কাগজটা খুলতে আলোয় সোনালী শাড়ী ঝিল্‌মিল্‌ ক'রে যেন হেসে উঠল। সম্পা মুগ্ধ চোখে খানিক ক্ষণ চেয়ে রইল, তার পর উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, "কি সুন্দর, সত্যি চমৎকার! কি সুইট রংটা!" পরম আদরে সে দু-হাতে শাড়ীখানাকে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। তার পর মোহনের কাছে এগিয়ে এসে বললে, "আজ বিকেলে এই ক'রে বেড়ান হচ্ছিল বুঝি? কিন্তু কেন এত টাকা মিছিমিছি নষ্ট করলে, তোমার শালের ড্রেসিং-গাউন যেটা সেদিন দেখেছিলাম সেটা কিনলে ত হ'ত।"

মোহন বললে, "ও বুঝেছি, তাহ'লে পছন্দ হয় নি।"

"আহা তাই ত!"—শাড়ীখানাকে দুলিয়ে সম্পা বললে, "এটা বাপু বড্ড সুন্দর, আমার পরতে মায়া লাগবে। এত টাকা খরচ ক'রে কেনার কি দরকার ছিল বল ত।"

মোহন সম্পার হাত ধ'রে কাছে টেনে আনলে, তার কালো চোখের ওপর চোখ রেখে বললে, "তোমার জন্যে খরচ ক'রে কি ভাল লাগে সম্পা, তা বোঝ না? সে আনন্দ পাব বলেই এত পরিশ্রম করতে উৎসাহ হয়, খাটতে কষ্ট লাগে না, সে কি তুমি জান?"

সম্পার স্বপ্নসুন্দর চোখের ঘনচক্র পক্ষ্মগুলি কেঁপে উঠল একবার, মোহনের তাকে দেবার এই যে একান্ত ইচ্ছা, অনন্ত আগ্রহ, সম্পা ভাবে জীবনে তার এই হ'ল সবার বড় সম্পদ। কিন্তু সেকথা কি কথা দিয়ে বোঝান যায়? সে নীরব হয়ে রইল।

মোহন অনুচ্চ স্বরে বললে, "এমন ত দিন গেছে যখন হাজার ইচ্ছে হ'লেও একটা সামান্য জিনিষ তোমায় দেবার সামর্থ্য ছিল না। এখন ত কোন অভাব নেই, এখন সে-সব দিনগুলো মনে পড়ে আর মনে হয় যত কিছু উজাড় ক'রে দিয়ে তোমার সে-দিনের ক্ষোভ মেটাই।"

সম্পা মোহনের সংযুক্ত হাতে একবার চাপ দিয়ে একটা নিঃশ্বাস ধীরে ফেললে। এখন তাদের ঐশ্বর্য্যের অভাব নেই, কিন্তু কত কষ্টে কত যত্নে একে গ'ড়ে তুলতে হয়েছে। কয়েক বছর আগে তাদের প্রথম বিবাহিত জীবনের সংগ্রাম, সে-কথা মনে হ'লে আজও তার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। তখন মোহন সবে বিলেত থেকে ফিরে আইনব্যবসা আরম্ভ করেছে। সামান্য একটা ক্ষুদ্র গৃহ, উপার্জ্জন কিছুই নেই, অথচ ব্যবসায়ে ঠাট বজায় রাখতে ব্যয়ের ত্রুটি নেই। জীবনে তাদের চারি দিকে অসুবিধা অনটন, অথচ বাইরে সহজ হয়ে থাকা। সংসার তখন সঙ্কটময়; কর্কশ, কণ্টকাকীর্ণ লেগেছে জীবন। নিজেদের শিক্ষার গর্ব্ব আছে, আদর্শ তখন উচ্চ, অভাব যখন এসেছে অন্যের ওপর নির্ভর ক'রে থাকে নি কোনদিন তারা। দুঃখ যখন পেয়েছে তখন অনুযোগ করে নি কারোর কাছে। ভাগ্যের আঘাতের প্রতি তখন তাদের উদ্ধত অবহেলা, দুঃসহ দুর্দ্দিনে ছিল তাদের নির্ভীক ধৈর্য্য। অদৃষ্টের নির্ম্মম সংগ্রামে সমস্ত শক্তি সংহত ক'রে যুঝেছে দু-জনে, ক্লান্ত ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, কত রোগ-দুঃখ গেছে তার উপর, কত রাত কেটেছে নিদ্রাবিহীন দুর্ভাবনায়, তবু হার মানে নি তারা, অন্তরের নির্ভয় বিশ্বাসকে উদ্দীপ্ত রেখেছে শেষ পর্য্যন্ত।

* * *

গভীর রাত পর্য্যন্ত সম্পা জানলার ধারে ব'সে রইল। নিদ্রাস্তব্ধ রাত, সংহত-উচ্ছ্বাস সমুদ্রের মত স্তম্ভিত গম্ভীর আকাশ, লক্ষ জীবের বক্ষস্পন্দনের মত লক্ষ নক্ষত্রের দপ্‌দপানি। কক্ষ ভরেছে অন্ধকারে, শুধু তারার আলোয় মুকুরগুলি সরোবরের মত স্বচ্ছ হয়ে আছে। সম্পা

খাটের কাছে উঠে গিয়ে নিদ্রিত স্বামীর মুখের দিকে অনিমেষে চেয়ে রইল। মোহনের এলোমেলো চুলে অতি আদরে ধীরে এক বার হাত রাখলে। তার পর জানলার কাছে ফিরে এসে দাঁড়াল। রজনীগন্ধার গন্ধে মন্থর ঈষৎ বাতাস তার খোলা চুল দুলিয়ে দিয়ে গেল। জীবনের রুক্ষ দিনে সম্পা যে দুঃখ পেয়েছে তার জন্যে ক্ষোভ নেই তার, সহজলব্ধ যা তাতে শক্তির দৈন্য, প্রচেষ্টার পরাজয়। বেদনাকঠোর সাধনার পর যে সিদ্ধি সে-ই জীবনের পরম সত্য, তার মাঝে আছে অর্জ্জনের গৌরব, অধিকারে পরিতৃপ্তি।...

বহুদূর-হ'তে-আসা পূজোর বাজনা মৃদুগম্ভীর মে বাজছে। সম্পা তার ক্রমক্ষীণায়িত অগ্নিশিখার মত লীলায়ি দুটি হাত জোড় ক'রে ললাট স্পর্শ করলে -- যে-মন্ত্র ঝঙ্কারে জীবনে দেখা দেন তাঁর উদ্দেশে, যে-সত্য শক্তিরূপে সহা হন তাঁর উদ্দেশে, সমস্ত অন্তর তার প্রণামে অবনত হ রইল।

কম্যুনিষ্ট বা বলশেভিক দর্শন-তত্ত্ব

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার, এম-এ, পিএইচ ডি, বার-এট-ল

বর্ত্তমান কম্যুনিজম বা বলশেভিজম্ কেবল যে এক রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতবাদ তাহা নহে, ইহা এক দার্শনিক তত্ত্ব বা মতের উপরও প্রতিষ্ঠিত। কম্যুনিষ্টরা বা বলশেভিকরা সমাজ-সংস্কারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপনে কৃতকার্য্য হইলে তাঁহারা ইহাকে এক জ্ঞান বা বুদ্ধি-সম্মত বা অপর কথায় এক দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হন। তখন হইতে কম্যুনিষ্টদের ইহা অন্যতম প্রধান কার্য্য হয়।

আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, কম্যুনিজম্ এক নিছক জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জড়বাদ প্রচলিত পাশ্চাত্য জড়বাদের অনুরূপ হইলেও ইহার যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহা পরে দেখা যাইবে।

বর্ত্তমান কম্যুনিজম বা বলশেভিজমের প্রতিষ্ঠাতা বা উদ্বোদ্ধা লেনিন দেখিলেন যে দুইটি প্রধান দার্শনিক মত মানবের চিত্তকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে -- একটি হইতেছে চিদাত্মকবাদ (idealism) ও অপরটি হইতেছে জড়বাদ (materialism)। এই মতদ্বয়ের মধ্যে একটিতে অনুরক্ত হওয়া দার্শনিকদের ব্যক্তিগত কাজ অপেক্ষা ইহার প্রয়োজনীয়তা লেনিনের মতে আরও অধিক। তাঁহার মতে, যে দুইটি দল বা সম্প্রদায়ে সমাজ বিভক্ত তাঁহারা এই উভয় মতের একটি-না-একটিতে নিজেদের মত বা ভাবের ভিত্তি পাইয়াছেন। যাঁহারা চিদাত্মকবাদের অনুসরণকারী তাঁহাদিগকে ধনিক সম্প্রদায় বলা যায়, অর্থাৎ ইঁহারা ধন-উৎপাদনকারী সম্প্রদায় নহেন; আর যাঁহারা জড়বাদের অনুসরণকারী তাঁহাদিগকে শ্রমিক বা ধনোৎপাদনকারী সম্প্রদায় বলা যায়। কম্যুনিষ্ট বা বলশেভিকরা শ্রমি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হওয়ায় ইঁহারা জড়বাদকেই তাঁহাদে দার্শনিক মত বলিয়া গ্রহণ করেন ও ইহার উপরই তাঁহাদে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতবাদটিকে প্রতিষ্ঠিত করেন সুতরাং এই ভিত্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য কম্যুনিষ্ট ব বলশেভিক শাসনকর্ত্তাদের এক প্রধান কর্ম্ম হয়, চিদাত্মকবাদে বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। এক দার্শনিক ভিত্তির উপ কম্যুনিজমকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে ইহা যে কেব অধিকতর সম্মানার্হ হয় তাহা নহে, জনসাধারণ এই দার্শনি মতটি গ্রহণ করিলে কম্যুনিজমের স্থায়িত্ব বিষয়েও নিশ্চিন্তত আসে।

জড়বাদীর মতে জগতে বা জাগতিক ব্যাপারে কোনরূ উদ্দেশ্য বা ঈশ্বরের স্থান নাই; যাহা কিছু ঘ তাহা সকলই কার্য্য-কারণের এক লৌহশৃঙ্খলের দ্বার নিয়ন্ত্রিত। একটি জিনিষ ঘটে, কারণ আর একটি জিনি ইহার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল; সেইরূপ মানবসমাজে অবশ্যম্ভাবী গতি কম্যুনিজমের প্রতি, কারণ যে-ক্যাপিটালি সমাজ বর্ত্তমান ছিল তাহাই শ্রমিক সম্প্রদায় উৎপন্ন করিয়াছে। অধ্যাত্মবাদী ও জড়বাদীরা জাগতিক ব্যাপারকে দুই উল্ট দিক্ হইতে দেখেন। অধ্যাত্মবাদীরা জগতের চরম উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য লইয়াই ব্যস্ত, কিন্তু জড়বাদীরা সকল ব্যাপারের কারণানুসন্ধানেই রত। সকল ব্যাপারের এই প্রারম্ভের অনুসন্ধানই কম্যুনিষ্টদের মতে একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত বস্তু কারণ ইহাতে ভগবানের বা কোনও অতীন্দ্রিয় শক্তির স্থান নাই, এবং একমাত্র ইহার দ্বারাই মানবের সকল

জাগতিক ও সামাজিক শক্তির উপর প্রভুত্ব স্থাপনের পথ পরিষ্কৃত হয়। কার্য্য-কারণ নিয়মের লৌহশৃঙ্খলে জাগতিক সকল ব্যাপারই আবদ্ধ; আমরা ইহা ইচ্ছা করি বা না-করি, বা আমরা ইহার বিষয় জ্ঞাত থাকি বা না-থাকি তাহাতে কিছু আসে যায় না, ইহা তাহার অতীত। এই নিয়মেই জগতের সকল ব্যাপার ঘটিতেছে। সুতরাং সামাজিক ব্যাপারেও মানবের স্বাধীন ইচ্ছার স্থান নাই; ইহাও নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চালিত ও অবধারিত। স্বাধীন-ইচ্ছা মতটিতে ধর্ম্মের গন্ধই পাওয়া যায়, কাজেই ইহা সকল বৈজ্ঞানিক উন্নতির পরিপন্থী। জড়বাদী মতে মানবের স্বাধীন-ইচ্ছায় ভগবানের কোনও স্থান নাই, ইহা কতকগুলি বাহিরের কারণ বা মানব ও সমাজের অবস্থার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত; মানবেচ্ছা বা মানবাত্মার ব্যাপার বলিয়া যাহা মনে হয় তাহা বাস্তবিক দেহতত্ত্ববিজ্ঞানের দ্বারাই বুঝা যাইতে পারে।

এই ভাবে জড়বাদের অনুকূলে মত প্রচার করিয়া বলশেভিকদের কর্ম্ম হইল কেবল যে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাহা নহে, যে-মতই এই জড়দর্শনের বিরোধী, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করা ও তাহা সমূলে উৎপাটন করা, যেহেতু ইহা মানবের সকল উন্নতির পরিপন্থী। বলশেভিকরা বিশেষ করিয়া অধ্যাত্মবাদে এক প্রতি-বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখায় ইহার সমূল উৎপাটনে বদ্ধপরিকর হন।

ইহারা ইহাদের রচনাদির দ্বারা এই দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকেন যে, বলশেভিজমের বিরুদ্ধে সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিযান ব্যর্থ হওয়ায়, এই প্রতিঘাত বলসঞ্চয়ের জন্য অধ্যাত্মবাদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বলশেভিকদের মতে আত্মার স্বাধীনতা বা এক অতীত আধ্যাত্মিক জগতে বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। বিপ্লবীর পক্ষে জড়বাদই একমাত্র গ্রহণীয়। যাহা-কিছু এই জড়বাদের বিরোধী তাহাকেই নির্য্যাতিত ও সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে।

ইহারা সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটোর অধ্যাত্মবাদ আক্রমণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাহা ভ্রান্ত। বাস্তবিক গ্রীক্ দার্শনিক চিন্তাধারা প্লেটোর দর্শনে পরাকাষ্ঠা লাভ করে নাই, পরন্তু জড়বাদী ডিমক্রিটাসই প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ গ্রীক্ দার্শনিক। তাঁহারা জর্ম্মাণ অধ্যাত্মবাদকেও এই বলিয়া উড়াইয়া দেন যে, ইহা এক প্রকাণ্ড মিথ্যা। মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য ধনিকসম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিকদের ইহা কল্পনাপ্রসূত। অবশ্য লেনিন ইহাকে ঠিক মিথ্যা বলেন নাই; তবে তিনি ইহাকে এই অর্থে ভ্রান্ত বলিয়াছেন যে, ইহা বাস্তব বা সত্তার একাংশ মাত্র গ্রহণ করে। অধ্যাত্মবাদ জড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবল আত্মাকে মানেন ও ইহাকে ঈশ্বরস্থলাভিষিক্ত করেন। ইহা যে একেবারেই ভ্রান্ত তাহা বলা বাহুল্য। অধ্যাত্মবাদকে আক্রমণ করিবার জন্য বুখেরিন বলেন যে, মার্কস্-মতাবলম্বীদের মতে অধ্যাত্মবাদ এক অর্থহীন বস্তু। এমন কি হেগেলও যে জগতের নিয়ন্তা ঈশ্বরকে সকল মঙ্গলের আধার বলিয়াছেন তাহা অতি ভ্রান্ত, যেহেতু এই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের দ্বারাই জগতের যাহা-কিছু অমঙ্গল তাহা সৃষ্ট হইয়াছে, যাহার দ্বারা পাপীরা শাস্তি পাইয়া থাকে। এই পাপীদের ঈশ্বরই সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ইহারা যে পাপ করে তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই; তিনি এই প্রহেলিকার দ্বারা জগতকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই মত অতি অসম্ভব ও ভ্রান্ত। জাগতিক ব্যাপারের একমাত্র ব্যাখ্যা জড়বাদের দ্বারাই সম্ভব। তিনি আরও বলেন যে, অধ্যাত্মবাদের ভ্রান্ততা মানব-অভিজ্ঞতার প্রতি পদেই প্রমাণিত হয়।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বলশেভিকরা অধ্যাত্মবাদকে আক্রমণ করিবার জন্য বহু পুস্তক রচনা করেন। কেবল ইহার দ্বারাই নহে, যাহাতে ভবিষ্যৎবংশীয়েরা এই বিষের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিতে পারে তাহার জন্য রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে ইহাকে বিতাড়িত করিতে তাঁহারা ব্যস্ত হন। তাঁহাদের মতে ধর্ম্মের ন্যায় সকল প্রকার অধ্যাত্মবাদও ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক। রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে যে-সকল অধ্যাত্মবাদী অধ্যাপক ছিলেন তাঁহাদিগকে বলা হয়, হয় বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া যাইতে অথবা জড়বাদ গ্রহণ করিতে। ইহাতে অধিকাংশ বিখ্যাত দার্শনিকই রাশিয়া ত্যাগ করিয়া বিদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়েন। তাঁহাদের ন্যায় অনেক ঐতিহাসিক ও আইনজ্ঞকেও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। ইহার পর লেনিনের বিধবা পত্নীর নেতৃত্বাধীনে রাশিয়ার জাতীয় শিক্ষার প্রধান কমিটির দ্বারা এক সার্কুলার জারি করা হয় যাহার দ্বারা সমস্ত

লাইব্রেরী হইতে প্লেটো, ক্যাণ্ট, স্পেন্সার প্রভৃতির ন্যায় বিখ্যাত দার্শনিকদের পুস্তকাদি অপসারণের হুকুম দেওয়া হয়। জনৈক অধ্যাপক তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইতে অধ্যাত্মবাদসম্মত মত বা সিদ্ধান্ত করিবার উপক্রম করিলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ বিতাড়িত করা হয়।

এই স্থানে বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় এই যে, যে কম্যুনিষ্টরা এক্ষণে অধ্যাত্মবাদের এত বিরোধী তাঁহারাই কিছুকাল পূর্ব্বে অধ্যাত্মবাদের বিশেষ পরিপোষকরূপে তাঁহাদের বিপক্ষ দলের জড়বাদ মতের বিরুদ্ধে বিশেষ সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তখন ইঁহাদের বিপক্ষ মেনশেভিক দলই জড়বাদের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মতবাদ লইয়া বলশেভিক ও মেনশেভিক দলের বিরোধ অনেক দিন চলিয়া অবশেষে লেনিনের মধ্যস্থতায় দূর হয়। লেনিন তখন প্যারিসে বাস করিতেন, আইন খুব ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু দর্শনে তাঁহার কোনও অনুরাগ ছিল না। এই সময় হঠাৎ উপরিউক্ত বিরোধের মীমাংসার জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হন। তিনি অচিরে লণ্ডনে চলিয়া যান ও তথায় দুই বৎসর, কিন্তু বস্তুতঃ মাত্র ছয় সপ্তাহ, দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার পর তিনি যে পুস্তকখানি রচনা করেন তাহাতে জড়বাদের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। অধ্যাত্মবাদ লেনিনের নিকট দল-বিরোধের পক্ষে অনুপযুক্ত বোধ হওয়ায় ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশের ইহাই যথেষ্ট কারণ হয়। লেনিন জড়বাদের পক্ষে মত প্রকাশ করায় তাঁহার অনুচরেরাও নিজেদের পূর্ব্বভাব ভুলিয়া গিয়া যে অধ্যাত্মবাদের পক্ষে তাঁহারা ছিলেন তাহাকেই ভীষণ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে অনুভূত হইতে সময় লাগে। ১৯১৭ সালে অক্টোবর মাসে দ্বিতীয় বিদ্রোহ হইবার পর বলশেভিকরা যখন রুশীয় রাষ্ট্রের অধিনায়ক হন তখন ইহাই তাঁহাদের মত রূপে প্রচার করিবার সুযোগ হয়। লেনিনের উপরিউক্ত পুস্তকখানি এই সময় পুনঃপ্রকাশিত হয় এবং তাঁহার মতই মহাসমারোহে বলশেভিক রাষ্ট্রের ধর্ম্মমত বলিয়া ঘোষিত হয়।

এই সময় হইতে জীবন সম্বন্ধে বলশেভিক মতের দার্শনিক ভিত্তি হয় বিরোধসমন্বয়মূলক জড়বাদ (dialectical materialism)। এই জড়বাদ প্রাচীন পাশ্চাত্য জড়বাদ হইতে কোন কোন বিষয়ে পৃথক।

বলশেভিক বা কম্যুনিষ্টদের এই জড়বাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। বলশেভিকদের মতে জড়প্রকৃতিই মূল ও প্রাথমিক সত্তা, ইহা হইতে পরে প্রাণের, ও পরিশেষে চিন্তার উদয় হয়। সুতরাং মন জড়েরই এক নির্দ্দিষ্ট নিয়ন্ত্রিত রূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং মানসিক ব্যাপার ও চৈতন্য জড়েরই এক নির্দ্দিষ্ট উপায়ে নিয়ন্ত্রিত বা ব্যবস্থিত গুণ বা ক্রিয়া। এমন কি মনের সর্ব্বোচ্চ বিকাশও জড়ের দীর্ঘ উন্নতির ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে; জড় মনেতে শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে, বরং মনই জড়ের অন্তর্গত। এই মতে যুক্তি (reason) প্রকৃতির এক নগণ্য অংশ, ইহা প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত, ইহার ক্রিয়ারই প্রকাশ-বিশেষ। এই ব্রহ্মাণ্ডের আদিকালে কোনরূপ মনুষ্য বা জীবের অস্তিত্ব ছিল না, ইহা জড় হইতেই ক্রমবিকাশের ধারায় বহু পরে উদ্ভূত হয়। জড়বাদের মূল-সূত্র এই যে, এই বাহ্য জড়প্রকৃতি চৈতন্য-নিরপেক্ষ হইয়া বর্ত্তমান, এবং ইহা যাহা-কিছু আধ্যাত্মিক বলিয়া পরিচিত তাহারই উৎস।

বলশেভিকরা তাঁহাদের এই দার্শনিক জড়বাদের যৌক্তিকতা বা সমর্থন বিজ্ঞানের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। কিন্তু জড়বাদের নিরাকরণের চেষ্টা ইউরোপে বিগত শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ হইতেই আরম্ভ হয় এবং এখনও চলিতেছে। কিন্তু বলশেভিকরা ইহাতে দমিত না হইয়া জোর করিয়া প্রচার করেন যে, জাগতিক সকল ব্যাপারই যে কেবল কার্য্য-কারণের লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ তাহা নহে, মানবের মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তিটি তাহার দৈহিক বৃত্তি হইতে অভিন্ন, এবং বস্তুতঃ মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়া পৃথক বস্তু কিছু নাই। কেবল যে ব্যক্তির পক্ষে এই সিদ্ধান্ত সত্য তাহা নহে, ইহা সমাজের পক্ষেও সত্য। সমাজ বহু ব্যক্তির এক যান্ত্রিক সমষ্টি-বিশেষ, ইহাতে যন্ত্রের ন্যায়ই ব্যক্তিরা পরস্পরের উপর কার্য্য করিয়া থাকে, যেরূপ এক যন্ত্রে তাহার অংশগুলি পরস্পরের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। এই মতে সামাজিক জীবনের সকল ব্যাপার, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, কলা, দর্শন প্রভৃতি কৃষ্টি ও সভ্যতার সকল ব্যাপারই জড়ের নিয়ন্ত্রিত রূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি হইতে পৃথকভাবে মানবের কোনও কৃষ্টি বা বুদ্ধির ব্যাপার থাকিতে পারে না;

তরাং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি তাহার জড় অস্তিত্বের উপরই একমাত্র স্থিতিশীল, এবং সামাজিক ব্যবস্থা ইহার অর্থনৈতিক ব্যাপারের দ্বারাই নির্দ্ধারিত। বলশেভিক মতে "সমাজ" অর্থে ব্যক্তিবর্গের এক যান্ত্রিক সমষ্টিই বুঝিতে হইবে, যাহার উদ্দেশ্য সম্পদ উৎপাদন করা। সমাজের সকল রূপই এই অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর সৌধস্বরূপ। সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সকল ব্যাপারই কার্য্য-কারণের এক অনতিক্রমণীয় নিয়মে আবদ্ধ। এই মতটি মার্কসের নিকট হইতে গৃহীত। মার্কসের মতে সম্পদ-উৎপাদনের উপায়টিই প্রধানতঃ মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপারের নির্দ্ধারী কারণ। মানুষের চেতনা তাহার অস্তিত্বের নির্দ্ধারী কারণ নহে, পরন্তু তাহার সামাজিক অস্তিত্বই তাহার চেতনার নির্দ্ধারী কারণ। মানবের ধর্ম্ম ও নীতির ভাবটিও এই অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর সৌধস্বরূপ।

আমরা দেখিয়াছি যে বলশেভিকদের এই জড়বাদ বিরোধমূলক (dialectical)। জগতে যাহা-কিছু পরিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ ঘটিতেছে তাহা দুই বিরোধী ভাবের রূপ পরিবর্ত্তনের দ্বারাই সম্ভব হয় বা ঘটে। এই দুইটি বিরোধী ভাব একই বস্তুর মধ্যে নিবদ্ধ, এবং এই বস্তুর বিভাগ হইতেই তাহার উৎপত্তি হয়। ইহা দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই দৃষ্ট হয়। সমাজব্যবস্থায় এই বিরোধ দল-বিরোধে (class-war) দৃষ্ট হয়। এই বিরোধমূলক জড়বাদ যদি বিজ্ঞানসম্মত হয় তাহা হইলে জড়বিজ্ঞানে নিশ্চয়ই ইহার সমর্থন পাওয়া যাইবে। সেই জন্য লেনিন নব্য পদার্থবিজ্ঞানে তাহার উপরিউক্ত দার্শনিক মতের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। তাঁহার মতে এক্ষণে পদার্থ-বিজ্ঞানে যে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে বিরোধমূলক জড়বাদেরই সৃষ্টি হইবে। অবশ্য লেনিন বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন যে আইনষ্টাইন প্রভৃতির দ্বারা পদার্থবিজ্ঞানে যে আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক ভাব আনীত হইয়াছে তাহা তাঁহার মতের পরিপন্থী, কিন্তু তিনি ইহাকে এই বলিয়া উড়াইয়া দেন যে ইহা ভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক। ইঁহারা ডায়েলেকৃটিকের বিষয় অজ্ঞ বলিয়া এইরূপ ভ্রান্ত হইয়াছেন। এইরূপ ভ্রান্ত বলিয়া লেনিন যে-সকল বৈজ্ঞানিক মতে এইরূপ আধ্যাত্মিকতার গন্ধ আছে তাহার বিরুদ্ধে ঘোর যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই জন্য রাশিয়াতে সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা করায়ত্ত রাখিতে ও এইরূপ আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত হইতে বিজ্ঞানকে মুক্ত রাখিবার জন্য বিপ্লবের নামে অধিকার দাবী করা হয়। ইহা বিশেষ ভাবে আবশ্যক হয় এই কারণে যে তাঁহারা ধর্ম্মকে জড়বিজ্ঞানের দ্বারা দূরীভূত করিতে চাহিতে-ছিলেন, সুতরাং এই প্রকার বিজ্ঞানের দ্বারা যাহাতে কোনরূপ ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের ভাব জাগ্রত হইতে না-পারে সে-বিষয়ে দৃষ্টি রাখার আবশ্যক হয়।

উপরে সংক্ষেপে ও মোটামুটিভাবে কম্যুনিষ্ট বা বলশেভিক দর্শনতত্ত্বের বিষয় বলা হইল। এক্ষণে ইহার সমালোচনা-কল্পে দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যক। উপরে সংক্ষেপে কম্যুনিষ্ট দর্শনতত্ত্বের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, ইহা এক নিছক জড়বাদ, যদিও এই জড়বাদের বৈশিষ্ট্য আছে। সেই জন্য ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে dialectical materialism। যাহা হউক, বহুকাল প্রচলিত ইউরোপীয় জড়বাদের ন্যায় ইহার ভিত্তিটিও দুর্ব্বল। অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদের বিরোধ ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে বহু প্রাচীন। এই দুই মত পরস্পরবিরোধী। অধ্যাত্মবাদ বলেন আত্মাই একমাত্র সত্তা, জড় ইহার বিকাশ মাত্র; আর জড়বাদের মতে জড়ই প্রধান সত্তা, আত্মা বা প্রাণ ইহা হইতেই উদ্ভূত, কাজেই ইহা জড়রূপী। এই মতবাদের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ না করিয়া অধ্যাত্মবাদের পক্ষে যে প্রধান যুক্তিটি আছে তাহা নিরাস করা যায় না। সেটি হইতেছে এই যে, যদি কেহ বলেন যে জড়ই মূল সত্তা, আত্মা বা প্রাণ গৌণ সত্তা মাত্র; তাহা হইলে এই উক্তিটি করে কে, না আত্মাই। কাজেই আত্মাকে কখনও গৌণ বলা যায় না, পরন্তু আত্মাই মুখ্য বা সকলের আদি। এই যুক্তিটির দ্বারা জড়বাদের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যায়। মার্কস্‌ ও লেনিন যাঁহা-দিগকে কম্যুনিষ্ট জড়বাদের প্রবর্ত্তক বলিয়া মানা হয় তাঁহারা ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে বড় দার্শনিক বলিয়া স্থান পান নাই; কাজেই ইঁহারা জড়বাদের যে নূতন রূপ দিয়াছেন তাহা কত দূর গ্রহণযোগ্য তাহা পাঠকবর্গই বিবেচনা করিবেন। আমরা দেখিয়াছি যে লেনিনের মধ্যস্থতায় অধ্যাত্মবাদী বলশেভিকদের ও জড়বাদী মেনশেভিকদের বিরোধ মিটিয়া

যায়; তিনি দর্শনশাস্ত্র প্রকৃত ছয় সপ্তাহকাল মাত্র পাঠ করিয়াই জড়বাদের পক্ষে মত দেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে দর্শনের ন্যায় এক দুরূহ শাস্ত্র বুঝা ও তাহার বিচার করা যদি অসম্ভব বলা হয় তাহা হইলে বোধ হয় কিছুই অত্যুক্তি হয় না, এবং এরূপ মতের মূল্যও কতটুকু তাহা বুঝিতে বেশী কষ্ট পাইতে হয় না। অধিকন্তু এক জন সমালোচক এ-বিষয়ে বলিয়াছেন যে, লেনিনের দর্শনে অনুরাগ মানবের শক্রতে interested হইবারই অনুরূপ। অর্থাৎ তিনি দার্শনিক পুস্তকগুলি পড়িয়াছিলেন বা তাহাতে চোখ বুলাইয়াছিলেন মাত্র, বাস্তবিক তাহা বুঝিবার বা বিচার করিবার জন্য নহে, পরন্তু নিজের মতের সমর্থন লাভ করিবার জন্যই। ইঁহাদের মতটি যদি গভীর ও সুযুক্তিপূর্ণ হইত তাহা হইলে তাহা গায়ের জোরে প্রচার করিবার, অন্য সকল বিরুদ্ধ মতকে কেবল অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত বলিয়া ভৎ'সনা করিয়া উড়াইয়া দিবার, ও সর্ব্বোপরি ইহা জোর করিয়া লোকের উপর আরোপ করিবার যৌক্তিকতা থাকিত না। কম্যুনিষ্টরা এক্ষণে রাশিয়ায় যাহা করিতেছেন তাহা কেবল শক্তিলাভ করাতে গায়ের জোরে নিজেদের মত জনসাধারণের উপর চাপাইতেছেন। ইহা স্বেচ্ছাচারিতাই; লোককে বুঝাইবার চেষ্টা নহে। ইঁহাদের এই স্বেচ্ছাচারিতা বা ব্যভিচার নানা ক্ষেত্রেই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইঁহারা মানুষকে দেখেন যন্ত্রের অংশবিশেষরূপে। তাহার কোনরূপ স্বাধীন ইচ্ছা নাই; বা এই যন্ত্রের অংশস্বরূপ হইয়া ধনোৎপাদন ভিন্ন তাহার জীবনের অপর কোনও উদ্দেশ্য বা মূল্য নাই। মানুষ যদি ইচ্ছাশূন্য ও আত্মাবিহীন এক যন্ত্রবিশেষই হয় তাহা হইলে আবার তাহার সুখস্বাচ্ছন্দের জন্য এরূপ সমাজতন্ত্র-ব্যবস্থা কেন, আর ইহার যৌক্তিকতাই বা কোথায়? ইঁহারা মানুষকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা, ধর্ম্ম প্রভৃতি ভুলিতে শিক্ষা দেন, কেন-না তাহা হইলে তাঁহাদের নিরঙ্কুশ প্রভুত্বে জনসাধারণের চলিবার পথ বাধাহীন হয়! তাহা হইলে এই কথাই বুঝিতে হয় যে স্বাধীন ইচ্ছা বা বুদ্ধি কেবল এই ডিক্টেটরদেরই আছে আর কাহারও নাই! যাহা হউক, ইঁহাদের এত চেষ্টা ও সকল মতামতই ব্যর্থ হইয়া যায় কেবল একটি ব্যাপারের দ্বারাই; তাহা হইতেছে, ইঁহারা ধর্ম্ম প্রভৃতি ভুলিয়া মানুষকে যে যন্ত্রস্বরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে কি কৃতকার্য্য হইয়াছেন? কথিত হইয়াছে, বলশেভিকদের ব্যভিচারের ফলে ধর্ম্ম মানুষের চিত্ত হইতে রহিত হওয়া ত দূরের কথা, বরং আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক মানুষের যে মনুষ্যত্ব আধ্যাত্মিকতায়, তাহা কি উড়ান সম্ভব? এইখানেই ত সকল জড়বাদের খণ্ডন হইয়া যায়।

অলখ-ঝোরা

শ্রীশান্তা দেবী

(৫)

সুরধুনীর বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হইয়াছে, কিন্তু ভিতর ও বাহিরের আচরণে তাঁহার বয়স সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা। কুড়ি বৎসর বয়সেই দুইটি শিশুপুত্র কোলে লইয়া তিনি স্বামীকে হারাইয়াছেন, তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর প্রাচীনা গৃহিণীর মত পিতৃসংসারের সারথি হইয়া কঠিন হস্তে রশ্মি টানিয়া আছেন। পিছনে কত নাট্যের পর নাট্য ঘটিয়া চলিয়াছে, কত শিশু যৌবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার খেলায় দেহমন সঁপিয়া দিয়াছে, কত যৌবনের জয়গান থামিয়া গিয়া বার্দ্ধক্যের হতাশা ও অতৃপ্তি মাত্র শেষ দিনের প্রতীক্ষায় চাহিয়া আছে, সুরধুনী সেদিকে পিছন ফিরিয়া কখনও তাকান নাই, কখনও তাহাদের সেই জীবন-নাট্যলীলায় আপনাকে জড়াইয়া ফেলিতে চাহেন নাই; তিনি সম্মুখের দিকে চাহিয়া কেবল এই রথচক্রের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। সেখানে তিনি যেন অর্দ্ধ শতাব্দীর অভিজ্ঞতা লইয়াই জীবন আরম্ভ করিয়াছেন, তেমনই ভাবেই চলিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু আর এক জায়গায় তাঁহার সেই প্রথম যৌবনের

পঁচিশ বৎসরের কোঠা আজও তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। লক্ষ্মণচন্দ্র প্রথমা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন পিতৃমাতৃহীন এক কিশোর বালকের সঙ্গে। সংসারের মাথা কেহ ছিল না বলিয়া সুরধুনী পনের-ষোল বৎসর বয়সের আগে শ্বশুরবাড়ী যান নাই। তিনি হিন্দু ঘরের মেয়ে, ছেলেবেলা হইতেই শ্বশুরবাড়ীর বিভীষিকা সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা তাঁহার অভ্যাস, ভয়ে ভয়েই শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলেন, অবশ্য মনের কোণে অল্পদিনের দেখা কিশোর স্বামীটির সম্বন্ধে একটা কৌতূহল-মিশ্রিত অনুরাগের রশ্মি লইয়া যে যান নাই, তাহা নহে। গিয়া দেখিলেন, স্বামী তাঁহার জন্য একেবারে সতী-স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সে স্বর্গে মন্দার পারিজাত অপ্সরা কিন্নরী গন্ধর্ব্ব ছিল না, ছিল ছোট্ট একখানি গৃহ—উপরে নীচে আশেপাশে অতীতে বর্ত্তমানে ভবিষ্যতে স্বামীর অনুরাগ দিয়া মোড়া। নীলাম্বর তাঁহার জীবনের এই প্রথম আপন জনটিকে কেমন করিয়া কোথায় রাখিবেন, কি করিয়া তাঁহার কাছে আপনার মনের নিবিড় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন ভাবিয়া পাইতেন না। জীবনে কাহারও ভালবাসা পাওয়া কি কাহাকেও ভালবাসা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। এই সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতায় তিনি যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। শুধু সেবার ভিতর দিয়া ইহা প্রকাশ করিবেন বলিয়া, ছোট্ট মেয়েটিকে কোনও কষ্ট পাইতে দিবেন না বলিয়া, বিছানা পাতা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, উনুন ধরানো, সব কাজই নীলাম্বর সুরধুনীর আগে করিতে ছুটিতেন। সুরধুনীর মনে মনে অত্যন্ত হাসি পাইত, এ কি রকম পুরুষমানুষ, কর্ত্তা সাজিয়া দুটো ধমক চমক দিয়া কাজ আদায় করিবার চেষ্টা না করিয়া নিজেই স্ত্রীর পরিচর্য্যা করিতে বসিল! কিন্তু নববধূ লজ্জায় কিছু বলিতে পারিতেন না, ঘোমটার ভিতর হইতে হাসিতেন। নীলাম্বর তাঁহার মাথার কাপড়টা পিছন হইতে টানিয়া খুলিয়া দিয়া বলিতেন, "বেশ বউ ত তুমি, আমি এত ক'রে খেটেখুটে তোমার জন্যে সংসার সাজাচ্ছি আর তুমি একটু মুখ খুলে দেখবেও না?" সুরধুনী বলিতেন, "দেখব কি? ও দেখতেও লজ্জা করে। তুমি ব'সে দেখ, আমি করি, দেখবে কেমন মানায়।"

শেষকালে রফা হইত আধাআধি। দু-জনেই কাজ করিবে, কিন্তু কেহ নিজের কাজ করিতে পাইবে না। স্নানের আগে সুরধুনী যদি নীলাম্বরের মাথায় তেল দিয়া দিতেন ত স্নানের পর নীলাম্বর গামছা লইয়া আসিতেন সুরধুনীর এক মাথা ঘন কালো চুলের জল মুছিয়া দিতে। সুরধুনী ভাত বাড়িলে নীলাম্বর পিঁড়ি পাতিতে, জল গড়াইতে ছুটিতেন। সুরধুনী খুশী হইলেও লজ্জায় আকণ্ঠ লাল হইয়া উঠিতেন, বলিতেন, "তুমি অমন মেয়েমানুষের মত আমার সেবা করলে আমার যে পাপ হবে! ছেলেবেলা থেকে স্বামীকে ঠাকুরদেবতা ব'লে পূজো করতে শিখে এলাম আর তুমি শেষে আমার সব শিক্ষাদীক্ষা উল্টে দিতে চাও? আজ থেকে তোমায় কিছু করতে দেব না।"

নীলাম্বর দুষ্টামি করিয়া বলিতেন, "ঠাকুরদেবতার স্ত্রীরা কি সারাদিন উনুন নিকোয় আর ঘর ঝাঁট দেয়? তাঁরা কি করেন তোমার ওই হরগৌরীর পটে দেখ। গৌরী ত অষ্ট প্রহর মাথায় মুকুট প'রে বেচারী ভিখিরী শিবের কোলটি জুড়ে ব'সে আছেন, পতিসেবা ত কই করছেন না!" বলিয়া নীলাম্বর সুরধুনীকে দুই হাতে কোলের ভিতর জড়াইয়া ধরিতেন।

হাসিয়া সুরধুনী বলিতেন, "যাও, তোমার ঠাকুরদেবতা নিয়েও ফাজলামি!"

নীলাম্বর বলিতেন, "সত্যি কথা বললেই ফাজলামি হয়! শ্রীকৃষ্ণ রাধার পদ-সেবা পর্য্যন্ত করেছেন, পায়ে ধ'রে না সাধলে মানিনী ত সাড়াই দিতেন না। তোমরা আমাদের দর বাড়িয়ে এখন সব উল্টে দিয়েছ।"

পাঁচ বৎসর সুরধুনী স্বামীর ঘর করিয়াছিলেন, তাহার ভিতর দুইটি সন্তানের জন্মকালে দুইবার বাপের বাড়ী যাওয়া ছাড়া আর কখনও এক দিনের জন্যও তিনি স্বামীকে ছাড়িয়া থাকেন নাই। সেকালের বাঙালী গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, স্বামী-স্ত্রীর একাত্মতা বিষয়ে বক্তৃতা কখনও শোনেন নাই, নরনারীর সমান অধিকারের কথাও জানিতেন না, কিন্তু এমন করিয়া মনে-প্রাণে স্বামীর সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহাদের দুজনের ভাবনাচিন্তা কাজ সবই যেন একই উৎস হইতে উৎসারিত হইত। প্রেমকে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া বিরহ ও মিলনের নানা পর্য্যায়ের ভিতর দিয়া তাহারই রঙের চশমায়

নেই। ছেলে বয়সে কত পাগলামি যে করেছি ভাবলেও হাসি পায়।"

সুরধুনী বলিলেন, "জন্ম জন্ম অমনি পাগলামি কর্ এই আশীর্ব্বাদ করি। আমাকে যতই লুকোস্, তোকে চিনতে আমার বাকী নেই। হ্যাঁ রে, গয়না কাপড় এখনও সব ওর হুকুমমত করিস্? পুরুষ মানুষের পছন্দ তোর পছন্দ হয়? এই ত নূতন চুড়ি গড়িয়েছিস্ দেখছি, কার পছন্দ এটা?"

মহামায়া বলিলেন, "বিয়ের পর দু'চার বছর সব পুরুষ-মানুষই স্ত্রীর গয়না কাপড় বাছতে বসে, এটা পর সেটা পর ক'রে অস্থির করে, তা বলে চিরকালই কি আর সেই ধরণ বজায় থাকে? এখন আমি থাকি আমার ধান্দায়, তিনি থাকেন তাঁর ধান্দায়, সারাদিনে কে কার খোঁজ রাখে?"

সুরধুনী বলিলেন, "মন যাদের এক সুতোয় বাঁধা থাকে, তাদের মন-জানাজানি হতে এক লহমাও লাগে না। চোখের ভিতর একবার তাকালে কার মনের কি সাধ তা কি আর জানতে বাকি থাকে?"

মহামায়া মনে মনে ভাবিলেন রক্তমাংসে গড়া স্বামীটি কৈশোর-লীলা শেষ করিয়া সংসারের বৈচিত্র্যময় কর্ম্মক্ষেত্রে নামিবার পূর্ব্বেই বিদায় লইয়াছেন বলিয়া দিদি পুরুষমানুষের দৈনন্দিন জীবনে স্ত্রীর স্থান কোন্খানে তাহা এত বয়সেও ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। হাসিয়া তিনি বলিলেন, "সারাদিনের হ্যাঙ্গামে চোখ আছে কি নেই তাই তাদের মনে থাকে না, তার আবার চোখের ভিতর তাকাচ্ছে। সবাই বেঁচেবর্ত্তে কাজকর্ম্ম চালিয়ে যাচ্ছে, এইটুকু খবর ছাড়া আর বেশী খোঁজ নেবার সময় কি আর সদা সর্ব্বদা হয়?"

অবশ্য স্বামীকে যতখানি নীরস ও নিরাসক্ত করিয়া দিদির কাছে মহামায়া চিত্রিত করিলেন তাঁহার স্বামী ঠিক তাহা ছিলেন না। দিনান্তে স্ত্রীর নিকট একবার করিয়া প্রেমঅর্ঘ্য দিতে তিনি আসিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনযাত্রাপথে সঙ্গিনীর সান্নিধ্যটা তিনি সর্ব্বদাই অনুভব করিয়া চলিতেন। দিনশেষে তাঁহার এই পথচলার গান মহামায়াকে না শুনাইলে তাঁহার পথচলা সার্থক হইত না। কাব্যচর্চ্চাই হউক কি অধ্যয়ন অধ্যাপনাই হউক, সকল বিষয়েই তাঁহার চিন্তার ধারা যেদিকে প্রবাহিত হইত এবং কার্য্য-প্রণালী যে ভাবে চলিত তাহা তিনি মহামায়াকে বলিয়া যাইতেন, যেন আত্মচিন্তাকে ধ্বনিতে রূপ দিতেছেন এই ভাবে। সকল কথাই যে মহামায়া ঠিক স্বামীর মাপকাঠিতে মাপিয়া বুঝিতেন তাহা নয়, তবু মহামায়ার মুখের ভাবে প্রশংসা ও স্বামীগৌরবের দীপ্তি দেখিলেই চন্দ্রকান্ত তৃপ্ত হইতেন। কিন্তু এ সকল নিজেদের অন্তরঙ্গ জীবনের কথা দিদিকে বলিতে মহামায়ার লজ্জা করিত। তাছাড়া দিদি স্বামী বলিতে এখনও পুরুষমানুষের অপরিণত বয়সের একটা যে বিশেষ রূপকে চিনিতেন এবং তাহাকেই আপন মনের প্রেমঅর্ঘ্য দিয়া সাজাইতেন, মহামায়ার স্বামী পুরুষ-জীবনের সে অবস্থার পর অনেকখানি পরিণতি লাভ করিয়াছিলেন। বিস্মৃতপ্রায়, ছায়াময় এবং অনেকখানি সুরধুনীর স্বরচিত নীলাম্বরের পাশে এই পরিণতবুদ্ধি জীবন্ত ও সর্ব্বতোমুখীপ্রতিভাবান্ চন্দ্রকান্তকে দাঁড় করাইলে সুরধুনী ঠিক দুজনের ওজন বুঝিবেন কিনা মহামায়ার সন্দেহ হইত।

দিদিকে তিনি নিজের চেয়ে অনেকখানি ছেলেমানুষ এই দিকটায় ভাবিতেন। যদিও দিদি এত বড় একটা বিরাট সংসারের কর্ত্রী, এবং দুইটি বয়স্ক ছেলের মা, তবু দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা নবপরিণীতা কিম্বা অবিবাহিতা কিশোরীর মত।

সুরধুনী একটু নিরাশ হইয়া বলিলেন, "মায়া, তুই সেদিনের মেয়ে আর আমি বুড়ো বুড়ো ছেলের মা। কিন্তু তোরই বয়স বেড়েছে, আমার মনে এ জন্মে আর পাক ধরবে না। আগে বছরকার সময় তোর আশাতে থাকতাম, কিন্তু এখন দেখছি তুই আমার চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছিস্। পৃথিবীতে আমি এখন একেবারে একা।"

(৬)

সুরধুনীর সহিত গল্প করিতে করিতে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল, বাহিরে ঝিঁঝিঁর তীক্ষ্ণ ডাকও ক্রমে মৃদু হইয়া আসিতেছে, বহু দূরে দুই-একটা শিয়াল কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করিয়া এখন নীরব হইয়া গিয়াছে। মহামায়ার দুই চোখে ঘুম ভরিয়া আসিয়াছে, এমন সময় মায়ের ডাক শুনিতে পাইলেন, "ও মায়া, ও সুর, তোরা ঘুমোলি বাছা?"

সুরধুনী আগেই উঠিয়া বসিয়া ভীত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিলেন, "এত রাত্রে মা কেন ডাকাডাকি করছেন? পুরনো ফাটা বাড়ী, সাপখোপ বেরোল নাকি কে জানে? রাজ্যের ছেলে মেয়ে ত শুয়েছে চার পাশে।"

বলিতে বলিতেই ঘরের কোণের অর্দ্ধনির্ব্বাপিত হ্যারিকেন আলো এবং দেয়ালে-ঠেসানো একটা পেয়ারা গাছের ছড়ি লইয়া তিনি ছুটিলেন।

মহামায়াও দ্রুত দিদির পিছনে চলিলেন। ভুবনেশ্বরীর ছাপর খাটে বিচিত্র ভঙ্গীতে কুণ্ডলী পাকাইয়া এ উহার ঘাড়ে পা দিয়া ছেলেরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কেবল সুধা ও আর একটি মেয়ে অন্ধকারের মধ্যে বড় বড় চোখ বাহির করিয়া ভীত বিস্মিত মুখে উঠিয়া বসিয়াছে। দেয়ালের গায়ে প্রদীপের আলোতে বড় বড় ছায়া পড়িয়া ঘরটা রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। ভুবনেশ্বরীর মাথার কাছে কাঠের ময়ুর-মিথুনের গা স্বল্প আলোতেও চকচক করিতেছে। যেন শিশুদের ভীতি দেখিয়া তাহারাও সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। সুরধুনী মাতার মুখের কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, "কি হয়েছে মা? অমন ডাকাডাকি করছিলে যে? স্বপনটপন কিছু দেখেছ বুঝি? শোও শোও, এখনও অনেক রাত।"

মা শুইয়া রহিলেন, কোনও জবাব দিলেন না।

মহামায়া কোলের কাছে ঘেঁসিয়া মার মাথায় হাত দিয়া সস্নেহে বলিলেন, "কথা বল মা? কি হয়েছে তোমার, অসুখ করেছে?"

মা বলিলেন, "ছেলেপিলেগুলোকে সরিয়ে নিয়ে যা, আর তোর বাপকে একবার ডেকে দে।"

মহামায়া বলিলেন, "তা নয় ডাকলাম, কিন্তু কি হয়েছে আগে বল।"

মা বলিলেন, "শরীরটা ভাল লাগছে না, একটা পাশ অবশ হয়ে এসেছে। আমার বোধ হয় আর দেরী নেই।"

"কি যে বল মা, তার ঠিক নেই" বলিয়া সুরধুনী বৈঠকখানা ঘরে লক্ষ্মণচন্দ্রকে ডাকিয়া তুলিতে গেলেন। তাঁহার ডাকাডাকিতে পাশের ঘরে ভাই-ভাজদের ঘুম ভাঙিয়া গেল। বড় বৌ ও মেজ বৌ অর্দ্ধমুদিত চক্ষে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চোখের উপর হাত আড়াল করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বড় ভাই কোমরের কাপড়টা আঁটিতে আঁটিতে গর্জ্জাইতে গর্জ্জাইতে বাহির হইলেন, "দুপুর রাত্রে সব হৈ হৈ লাগিয়ে দিয়েছে, ডাকাত পড়েছে নাকি বাড়ীতে? আচ্ছা হ্যাঙ্গাম! খেটেখুটে এসে একটু ঘুমোবার জো নেই।"

সুরধুনী বলিলেন, "মা'র অসুখ করেছে দেখতে পাচ্ছ না? শুধু শুধু কি আর তোমাদের কাঁচা ঘুমে বাগড়া দিতে গিয়েছিলাম?"

মেজ ভাই বলিলেন, "কি হয়েছে মা? আবার বুঝি ঐ ছাইভস্ম গুগলিফুগলি খেয়ে পেট নামিয়েছে! যত বারণ করি যে বুড়ো বয়েসে ওসব জঞ্জালগুলো গিলো না, তত তোমার ওই দিকেই লোভ।"

মহামায়া বলিলেন, "না দাদা না, পেট নামায় নি, তার চেয়ে বেশী অসুখ। গায়ে হাত দিয়ে দেখ। একটা দিক যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। কবরেজ মশায়কে ডাকলে হত।"

বড় ভাই বলিলেন, "এই তিন পহর রাতে তাঁকে আনা কি সহজ? কাল সকালবেলা ডেকে আনব'খন। রাতটা চুপচাপ ক'রে কোনও রকমে কাটিয়ে দাও।"

লক্ষ্মণচন্দ্র ততক্ষণে শিয়রের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সুরধুনী ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, রাত কাটানো টাটানো কোনও কাজের কথা নয়। তুমি যেমন ক'রে হোক একবার খবর দাও।"

অগত্যা মেজ ছেলে গোপাল গায়ে একটা চাদর জড়াইয়া লণ্ঠন লইয়া জনহীন পথে অগ্রসর হইলেন। গৃহিণী ভুবনেশ্বরী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কবরেজের বড়িতে আমার কিছু হবে না গো। আমার ডাক এসেছে, আজকের তিথিটা দেখ আর তুমি একবার পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে দাও, তোমার কাছে জ্ঞানে অজ্ঞানে কত দোষ করেছি ক্ষমা ক'রো।"

লক্ষ্মণচন্দ্র ভুবনেশ্বরীর মাথার কাছে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টি ঘসাকাচের মত বর্ণহীন স্থির হইয়া গেল, লোলচর্ম্ম যেন মুহূর্ত্তে আরও ঝুলিয়া পড়িল। স্ত্রীর একখানা হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, "ক্ষমা করবার

মালিক কি আমি, ভুবন? তোমার কাছে আমি নিজেই কত অপরাধ করেছি তার লেখাজোখা নেই। শান্ত হও, ওসব কথা ভেবে মনকে অকারণ কষ্ট দিও না।"

গ্রামের বৃদ্ধ কবিরাজ আসিতে আসিতে ভোরের মুক্তাস্বচ্ছ আলো ফুটিবার উপক্রম করিল। নাড়ী দেখিয়া তিনি একটাও কথা বলিলেন না, ঘরের বাহিরে আসিয়া একটা বড়ির ব্যবস্থা করিয়া নিঃশব্দে তখনই চলিয়া গেলেন। সুরধুনী চোখে আঁচল দিয়া অশ্রুরোধ করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যে-মৃত্যু প্রথম যৌবনে তাঁহার সুখস্বর্গের নন্দনকানন দুই পায়ে বিদলিত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সেই মৃত্যু আজ আবার শিয়রের কাছে হানা দিয়াছে, যে-গৃহে প্রথম পৃথিবীর আলো চোখে পড়িয়াছিল, যে-গৃহে মৃতপ্রায় প্রাণ দ্বিতীয় জন্মলাভ করিয়াছিল, সে-গৃহের মূলও আজ যমরাজ উপাড়িয়া লইয়া যাইবেন। ভুবনেশ্বরীকে যাইতে হইবে, আর দেরী নাই। মহামায়ার প্রাণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল, ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "কিছু একটা কর। আর কিছুদিন, অন্ততঃ কিছুক্ষণ যাতে ধ'রে রাখা যায় তার উপায় করা যায় না? এই বড়ি ছাড়া আর কিছুই কি করবার নেই?"

অকস্মাৎ কালপ্রবাহের তুচ্ছ মুহূর্তমালার প্রত্যেকটি গ্রন্থি যেন অনন্ত ঐশ্বর্য্যের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। পলায়নপর প্রাণশক্তিকে তাহারাই যে ধরিয়া রাখিয়াছে। এই সুদীর্ঘ অতীতকাল ধরিয়া যে-জীবন এতবড় গোষ্ঠীর প্রত্যেক ছোট-বড়র কাছে মহাসত্য ছিল, এই কয়েকটি মুহূর্তের পর ভবিষ্যৎ কালপ্রবাহে সে চিরদিনের জন্য মিথ্যা হইয়া যাইবে। যত দিন যাইবে, ততই তাহার স্মৃতির কণা পর্য্যন্ত অতীতের অতল অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া যাইবে। এই যে কয়েকটি মুহূর্ত্ত মাত্র প্রাণময়ীকে চোখে সত্য বলিয়া দেখা যাইতেছে, স্পর্শে সত্য বলিয়া অনুভব করা যাইতেছে, কর্ণে সত্য বলিয়া শোনা যাইতেছে, ইহার পরেই সব মিথ্যা! এই কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে অতীত স্মৃতির ও বর্ত্তমানের সমস্ত সত্য পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মূল্যের কি তুলনা আছে?

ভুবনেশ্বরী স্বামীর কোলের উপর মাথা রাখিয়া হাসিতে হাসিতে পুত্রকন্যাদের মুখের দিকে সস্নেহ স্থিরদৃষ্টি তুলিয়া চলিয়া গেলেন। কন্যারা কাঁদিয়া মায়ের বুকের উপর শিশুর মত আছড়াইয়া পড়িল। মায়ের তুষারের মত কঠিন শীতল দেহ এই বুকফাটা বিলাপে কোনও সাড়া দিল না। ছেলেরা মাথার কাছে দাঁড়াইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। লক্ষ্মণচন্দ্র ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার জীবনের অবসান যেন তিনি চোখে দেখিতে লাগিলেন। জীবনের পঞ্চান্নটা বৎসর যে সূত্রে এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বর্ত্তমানের সহিত গাঁথা হইয়া ছিল তাহা ছিঁড়িয়া অতীতের গহ্বরে বিলীন হইয়া গেল কিন্তু কই, জীবনে যাহা-কিছু করিবেন মনে করিয়াছিলেন তাহার অনেক কিছুই ত করা হইল না। আর সময়ও ত নাই। ভবিষ্যতের তুচ্ছ কয়েকটা দিন মাত্র এখন জীবন বলিয়া চোখের সম্মুখে ঊর্ণনাভের জালের মত দুলিতেছে। কত সাবধানতা, কত যত্ন, কত হিসাব করিয়া যে-জীবনকে এতদিন ধরিয়া রাখা হইয়াছে, আজ এক মুহূর্ত্তে মনে হইতেছে এই সাবধানতা, এই আগলানো, এ কি অদ্ভুত হাস্যকর ছেলেমানুষী! এই ক্ষণভঙ্গুর কাচের মত জীবন-পাত্র দুই-চার মুহূর্ত্ত বেশী থাকিলেই বা কি, কম থাকিলেই বা কি! অনন্ত অতীতের সমাধিস্থলে সেই কমবেশীর মধ্যে তারতম্য কিছু আছে কি? কত সহজে কত অনায়াসে সকলের জাগ্রত দৃষ্টির পাহারার উপর দিয়া মৃত্যু তাহার পাওনা নিঃশব্দে অদৃশ্য হস্তে লইয়া গেল। কেহ ত বাধা দিতে পারিল না!

মেয়েরা ভুবনেশ্বরীর সীমন্তে সিঁদুর ঢালিয়া রাঙা করিয়া দিল, চরণে অলক্তক লেপিয়া দিল। ছোটবড় শিশু যুবা বৃদ্ধ সকলে পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া গৃহলক্ষ্মীকে মহাযাত্রার পথে অগ্রসর করিয়া দিল। বেদনায় সকলের মুখ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, বিস্ময়ে ভয়ে শিশুদের কচিমুখে ডাগর চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সুধা মায়ের আঁচল চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা গো, দিদিমাকে কোথায় নিয়ে গেল? আর দিদিমা ফিরে আসবে না?"

মহামায়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "না মা, আর কেউ আসে না; স্বর্গে চ'লে গেলেন যে!"

সুধা বিস্মিত চক্ষে পথের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল, "এই কি স্বর্গের পথ? এত সহজ! এই যাহারা দিদিমাকে স্বর্গে পৌঁছাইতে যাইতেছে, তাহারা ত আবার আসিবে, তবে কেন দিদিমা আসিবেন না?" কিন্তু

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কোনও প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না।

চন্দ্রকান্ত লিখিয়াছেন, "মাকেই বিশেষ ক'রে দেখতে গিয়েছিলে, মা ত তোমাদের ফে'লে চ'লে গেলেন। ওখানে তোমাদের মন টি'কছে না জানি। তবে বাবার আর দিদির মুখ চেয়ে কয়েকটা দিন থাকতেই হবে। তার পর তোমরা চ'লে এস।

"মায়ের সঙ্গে নাড়ীর প্রথম বন্ধন; তাঁর মৃত্যুতে পৃথিবী যে অন্ধকার লাগবে, জীবনটা অর্থহীন পরিহাস মনে হবে, এ ত বলাই বাহুল্য। কাছ থেকে মৃত্যুকে অনেক দিন দেখনি, কিন্তু জান ত, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই মানুষ দলে দলে যমযাত্রা করছে। অনাত্মীয়ের মৃত্যুর মধ্যে মৃত্যুর সর্ব্বনাশা রূপকে প্রত্যক্ষ ক'রে দেখতে হলে যতখানি মমতা নিয়ে দেখা দরকার, ততখানি ত আমাদের নেই। পরের শোক দুঃখ দেখবার সময় আমাদের চোখের উপর এমন একটা আবরণ টানা থাকে যে তার সমগ্র রূপটা আমরা কিছুতেই দেখতে পাই না। আজ যখন শিয়রের কাছে মৃত্যু হানা দিয়ে বলছে—যেতে হবে, এমনই ক'রে এই মায়া-মমতা-ভরা সংসার, শিশুর মধুর হাসি, প্রিয়জনের গভীর একাত্মতার বন্ধন, সমস্ত ফে'লে চ'লে যেতে হবে, তখন বুঝতে পারি, একটি মাত্র প্রাণ চ'লে যায় কত মানুষের অসংখ্য দিনের কত ছোট-বড় সংসার-রচনাকে একদিনে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে। দীর্ঘদিন ধ'রে শৈশব যৌবন কৈশোরের কত ঘটনা, কত চিন্তা, কত কার্য্যের মধ্যে দিয়ে পলে পলে আপনাকে এবং পারিপার্শ্বিক জগৎকে যে গ'ড়ে তুলছি, শত্রুমিত্র সকলের অন্তরে যে আপনাকে প্রতিদিন সৃষ্টি ক'রে চলছি, আবার আপনার মাঝখানে জগৎকে যে প্রতিদিন নানারূপে গ্রহণ ক'রে সঞ্চয় ক'রে ক'রে চলেছি, পার্থিব জগতের সঙ্গে এই আমার সুবিস্তীর্ণ সম্পর্ক কালের একটি ফুৎকারে শেষ হয়ে যাবে।

"তোমাকে বেশী কথা বলব না, আজ তুমি আমার চেয়ে বেশী স্পষ্ট ক'রে সত্য ক'রে পার্থিব জীবনের মূল্য বুঝতে পারছ। জগতের বিরাট প্রাণ-প্রবাহের কত ছোট ছোট এক-একটি প্রাণ-স্পন্দন মাত্র যে আমরা, তা ত সমগ্র মন দিয়ে আজ অনুভব করছ। যে মা আজ নেই, তিনি যেন কোনও দিনই ছিলেন না, পৃথিবীর নিয়মে অচিরে সেইটাই বড় সত্য হয়ে উঠবে। এর চেয়ে বড় দুঃখ সন্তানের পক্ষে কি আছে ?"

এবার পূজায় বাপের বাড়ী যাইবার সময় হইতেই মহামায়ার শরীরটা বিশেষ ভাল ছিল না। ননদ হৈমবতী বলিয়াইছিলেন, "বৌ, এবার তোমার ওখানে গিয়ে কাজ নেই। শরীরটার ভাবগতিক দিন কতক বুঝে নাও, তার পর এক সময় গেলেই হবে।"

কিন্তু মহামায়ার কেমন মনের ভিতরটা ছট্‌ফট্ করিতেছিল, তিনি না গিয়া থাকিতে পারিলেন না। যাইবার সময় হৈমবতী তাঁহার স্বাভাবিক ভারী গলায় বলিয়া দিলেন, "বৌ, তুমি ছেলেপুলের মা, তোমাকে ত সাত কথা ব'লে বোঝাবার দরকার নেই ? নিজের অবস্থা আন্দাজ ত করেছ খানিকটা, সাবধানে চলাফেরা করবে। যেন একটা কিছু বাধিয়ে ব'সো না।"

কিন্তু খুব সাবধানে চলাফেরা করা সম্ভব হইল না। মায়ের এরকম আকস্মিক মৃত্যুতে সংসার হঠাৎ যেন লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। একে বহুকালের নিয়মে বাঁধা সংসার, এবং তদুপরি দিন আসিলে দিন যাইতেই বাধ্য হয়, কাজেই একরকম করিয়া দিন কাটিতেছিল। কিন্তু সংসার-তরণীর হাল ধরিয়া ছিলেন ভুবনেশ্বরী এবং দাঁড় ছিল সুরধুনীর হাতে। ভুবনেশ্বরী ত চলিয়াই গেলেন, সুরধুনীর দৃষ্টিও এই আকস্মিক কঠিন আঘাতে তুচ্ছ বর্ত্তমান হইতে সরিয়া সুদূর অতীত ও অনাগত ভবিষ্যতে প্রসারিত হইয়া গেল। কর্ম্মের জগৎ হইতে এক নিমেষে চিন্তার জগতে তিনি চলিয়া যাওয়াতে সংসার কেবলই টাল খাইয়া চলিতে লাগিল। তাহার উপর অশৌচের নিয়ম পালন।

মহামায়া ও সুরধুনী বিবাহিতা কন্যা। তাঁহাদের নিয়ম-ভঙ্গ চার দিনেই করা যায়, কিন্তু সুরধুনী বলিলেন, "এক বাড়ীতে ব'সে ভাইয়ের এক রকম, বোনের এক রকম চলবে না। মা কি আমাদের কম মা ছিলেন ? আমাদের সব নিয়ম একসঙ্গেই ভঙ্গ হবে।"

চার দিনের দিন মৃণালিনী বলিলেন, "ছোট্ ঠাকুরঝি, তুমি এয়োস্ত্রী মানুষ, আজ দুটো মাছভাত মুখে দিতে হয়।"

মহামায়া বলিলেন, "না ভাই, তোমাদের সঙ্গে সব করলে আমার পাপ হবে না। আজ আমার ওসবে কাজ নেই।"

শীত অল্প অল্প পড়িয়াছিল, একতলার ঘরের মেঝে বেশ কন্‌কনে ঠাণ্ডা। মেজছেলে গোপাল বলিলেন, "এই সময় মাটিতে শুয়ে সবাইকার যে বাত ধ'রে যাবে। খাটের উপর একখানা ক'রে কম্বল পেতে শুলে ত হয়।"

শুনিয়া লক্ষ্মণচন্দ্র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "মা'র জন্যে এ জন্মে আর ত কিছু করবার রইল না, দশটা দিন মাটিতে শুতেও কুলপাবনরা পারবে না? আমি মরলে ঠ্যাঙে দড়ি দিয়ে ফে'লে দিস্‌। কিন্তু আমার চোখের উপর তাঁর কাজে কোনও ত্রুটি আমি ঘটতে দেব না।"

মাটিতে খড় পাতিয়া তাহার উপর কম্বল বিছাইয়া সকলের শুইবার ব্যবস্থা হইল। চিরকাল সুখশয্যায় অভ্যস্ত শরীর অত্যন্ত কাতর বোধ করিতে লাগিল। গায়েও কম্বল ছাড়া দিবার কিছু জো নাই, কিন্তু সকলের জন্য কম্বল ত জুটে নাই, কেহ পাতিবার কম্বলখানাই ঘুরাইয়া আধখানা গায়ে দিলেন, কেহ আঁচল মুড়ি দিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া আপনার শরীরের সাহায্যেই শরীরের তাপ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেন। সুরধুনী ও মহামায়া একখানা কম্বলের তলাতেই আশ্রয় লইলেন। ছোট ছেলেদের অত নিয়মের কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এমন একটা দুর্ঘটনার পর সুধা ও শিবু যে মাকে ছাড়িয়া থাকিতে চায় না। তাহারাও সেই-খানেই আসিয়া আশ্রয় লইল। সারারাতই শিবু 'শীত' 'শীত' করিয়া মায়ের গায়ের কাপড় ধরিয়া টানাটানি করে। পাছে সুরধুনীর গা আল্‌গা হইয়া যায় কি ঘুম ভাঙিয়া যায় এই ভয়ে মহামায়া নিজে প্রায় অনাবৃত থাকিয়া শিবুকে কম্বল চাপা দিয়া রাখিতেন।

শীতের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের চামড়া আপনি শুষ্ক হইয়া উঠে, তাহার উপর গায়ে মাথায় তেল নাই। পুকুর-ঘাট হইতে স্নান সারিয়া ভিজে কাপড়ে আসিতে আসিতে মুখ-হাত-পা যেন চড় চড় করিয়া ফাটিয়া উঠিত, এমন কি গা-টায় পর্য্যন্ত জ্বালা ধরিয়া যাইত। ফাটাগায়ে রাত্রে কম্বলের রোঁয়াগুলা কাঁটার মত খচ্‌ খচ্‌ করিয়া বিঁধিত। মহামায়ার গা-হাত পা ফাটার ধাত আর সকলের চেয়ে বেশী, তাহার মনে হইত সর্ব্বাঙ্গ যেন ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। ঘুম নয় ত নরকযন্ত্রণা! থাকিয়া থাকিয়া তিনি বিছানার উপর উঠিয়া বসিতেন। দুই হাতের তেলোয় মুখখানা রাখিয়া যতখানি ঘুমানো যায় অনেক সময় তাহার চেয়ে অধিক ঘুম অদৃষ্টে ঘটিত না। সেই অর্দ্ধ ঘুমের ভিতর থাকিয়া থাকিয়া মা'কে মনে পড়িয়া দুই চোখে অশ্রুর প্লাবন বহিয়া যাইত। মহামায়াকে কাঁদিতে দেখিয়া সুধা ও শিবু ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিত। মায়ের চোখে জল দেখা তাহাদের অভ্যাস নাই। অন্ধকার রাত্রে নীরবে সুধা ধীরে ধীরে মায়ের গায়ে হাত বুলাইত আর নিরুপায় হইয়া ভাবিত, "কেন মা'কে আমি দুঃখ ভোলাতে পারছি না। ভগবান এমন নিষ্ঠুর কেন যে দুঃখের প্রতিকারের কোনও উপায় রাখেন না?"

শিবু জাগিয়াই মা'কে সজোরে দুই হাতে চাপিয়া ধরিত, যেন বলিতে চাহিত, "আমি ত রয়েছি তোমার আশ্রয় ভুলে যাও আর সব দুঃখ।" কিন্তু ভাষায় এ-কথা ব্যক্ত করিবার শক্তি তাহার ছিল না। তবু ঘুমে জাগরণে সারারাত্রি সে এক হাত দিয়া মহামায়াকে ধরিয়া রাখিত।

(ক্রমশঃ)

আহ্বান

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র
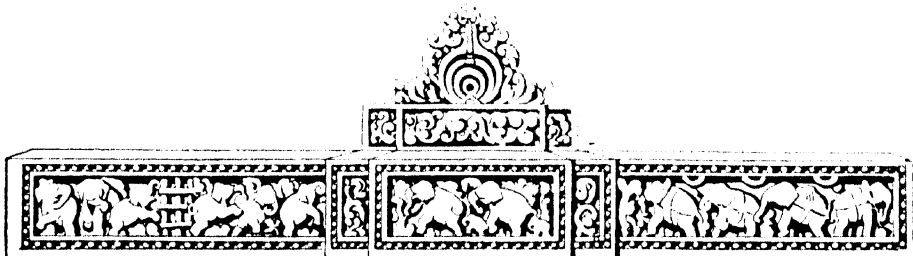
হে আবর্ত্ত, বলয়িত নর্ত্তন-হিল্লোলে
কলকল রোলে
উঠ জাগি' এ নিথর অন্তরে আমার।
হে দুর্ব্বার,
ঘূর্ণীবেগে সংগ্রহিয়া অন্তহীন পথের পাথেয়
শক্তি অপ্রমেয়
ছুটে যাই কক্ষপথে, নব-জীবনের সবিতারে
প্রদক্ষিণ করি বারে বারে।
শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন শঙ্কাহীন অব্যাহত গতি,
দৃক্ পাতে না আনি গ্লানি বিফলতা অপচয় ক্ষতি
নব আবর্ত্তন হ'তে নবতর বিবর্ত্তন পানে
নবশক্তি-উৎসের সন্ধানে
বাধাবন্ধহারা
ছুটে যাই উন্মাদের পারা।

ওগো ঘূর্ণী,
সহস্রধা দাও তুমি চূর্ণি'
প্রবল আঘাতভরে আলস্যের তুঙ্গ কারাগার,
জাগাও ধিক্কার
স্বপ্নাতুর এ নিশ্চেষ্ট জীবনের 'পরে।
পঙ্গুরে আপন পদভরে
দাঁড়াবার শক্তি দাও, শিরা স্নায়ু পেশী মাঝে তার
করিয়া সঞ্চার
তড়িৎ-স্পন্দিত উদ্দীপনা।
যে সহস্র ফণা
এই সুপ্ত বাসুকীর কুণ্ডলিত পাকের গহ্বরে
মূর্চ্ছাভরে আছে থরে থরে,
উল্লম্ফিয়া উঠুক্ তাহারা,
এড়াইয়া বিঘ্নাচল বন্ধহারা সে সহস্র ধারা
ছুটে যা'ক্ মুক্তাবেগে কুটিল গতিতে
ভুজঙ্গপ্রয়াতচ্ছন্দে দিকে দিকে থাক্ উথলিতে।

হে কালবৈশাখী,
ঝাপটি' ঝঞ্ঝার পাখা গরুড়ের সম রক্ত আঁখি
এস উড়ি' রুদ্র আলোড়নে
অশানি-স্তননে।
জালজঞ্জালের ভার জীর্ণতার শুষ্কপর্ণরাজি
উড়ায়ে ঝুরায়ে দাও আজি
ঘূর্ণীর ফুৎকারে
অজস্র আসারে।
ধুয়ে দাও বিকৃতির শীর্ণ পাণ্ডুরতা,
ফুটুক্ উষর বক্ষে শ্যামদ্যুতি-ঘন উর্ব্বরতা।
যত ঝরা মরা পাতা নিঃশেষে ধূলায় হোক লীন,
পশিয়া পরাণমূলে আরবার অম্লান নবীন
কিশলয় পুঞ্জে পুঞ্জে উঠুক ফুটিয়া
মরণের শাসন টুটিয়া।
ধ্বংসস্তূপ হ'তে
প্রাণের আবর্ত্তময় স্রোতে
জীর্ণতা গলিয়া গিয়া অঙ্কুরিয়া উঠুক্ আবার
নবোদ্ভিন্ন যৌবনশ্রী ফুল্লসুষমার।

ওগো বসুন্ধরে,
কে তোমারে ঘূর্ণীপাকে দিল ছাড়ি অসীম অম্বরে ?
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে মেরুদণ্ড 'পরে আপনার
ঘুরিয়া ঘুরিয়া তুমি শূন্য হ'তে আলো অন্ধকার
করিছ মন্থন।
উদয়াস্ত রক্তরাগে জাগে মঞ্জু বর্ণ গুঞ্জরণ
ফেনিল জলদপুঞ্জে, কুঞ্জে কুঞ্জে ফোটে ঝরে হাসি,
—কুসুম বুদ্বুদ রাশি রাশি।
স্বপ্নজাগরণে তব ঘূর্ণনের নাহিক বিরাম,
পরিধির চক্রপথে নিরবধি যাত্রা অবিশ্রাম।
ঋতুপরম্পরাক্রমে নব নবোন্মেষে
প্রদক্ষিণ করিছ দিনেশে,
আবর্ত্তে প্রবহমান দিবা বিভাবরী
কোটি কল্প ধরি'।
মোরা সেই সাথে
যুগ হ'তে যুগান্তর ঐতিহ্যের পাতে
উত্থান পতন কত, সাম্রাজ্যের, সভ্যতার কথা—
লিখিয়া চলেছি নিত্য, কত জন্ম মৃত্যু হর্ষ ব্যথা
বুদ্বুদি' উঠিছে ফেনোচ্ছ্বাসে,
আবর্ত্তে আবর্ত্তে ফিরে আসে।
মন্থনবিক্ষুব্ধ এই কালসিন্ধুনীরে,
উদ্বেলিত চিরন্তনে হেরি বসি' ক্ষণিকের তীরে।

উদ্ভিদের উপর উদ্ভিদের প্রভাব

শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ মিত্র, এম-এসসি

অনেক দিন হইতে জানা গিয়াছে যে এক জাতির বৃক্ষ অন্য জাতির বা শ্রেণীর বৃক্ষের নিকট জন্মিলে পরস্পরের উপর অপকারী বা হিতকর প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে কতকগুলি বিশেষ শস্য একসঙ্গে একই ক্ষেত্রে পাশাপাশি চাষ করিলে, উক্ত শস্যগুলিকে পৃথকভাবে চাষ করার অপেক্ষা অনেক বেশী ফসল পাওয়া যায়। এলম্ (Elm) বৃক্ষের নিকট দ্রাক্ষালতা রোপণ করিলে দ্রাক্ষালতাটি প্রচুর ফল দান করে ও বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়। উক্ত উদাহরণগুলি অত্যন্ত সাধারণ, কিন্তু সম্ভবতঃ অনেকের চক্ষে পড়ে না। ডানডেনো নামে এক জন বৈজ্ঞানিক ১৯০৮ সালে স্কোয়াশ-জাতীয় গাছের সহিত কয়েক রকম শস্যের চারা রোপণ করেন এবং তাহাতে যে শস্য পাওয়া যায় তাহা, পৃথকভাবে রোপণে প্রাপ্ত শস্য অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই যে এক জাতির বৃক্ষের উপর অন্য জাতির বৃক্ষের খুব প্রভাব আছে। জাবিজ নামক এক জন জার্ম্মানও যব, গম, মটর ইত্যাদি শস্য পৃথকভাবে ও একই ক্ষেত্রে মিশাইয়া রোপণ করিয়া ফসলের এইরূপ পার্থক্যই দেখিতে পান। প্রায় পনর বৎসর যাবৎ নানা জায়গায় পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, প্রতি একর জমিতে যদি চব্বিশ সের যব ও সতর সের জই রোপণ করা যায় তাহা হইলে যব ও জই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফসল প্রদান করে। একই জমিতে প্রতি বৎসর একই শস্য জন্মাইলে উক্ত জমির ফলোৎপাদনের ক্ষমতা কমিয়া যায়, কিন্তু যদি নানা প্রকারের শস্য উক্ত জমিতে পর-পর বৎসর জন্মান যায় তাহা হইলে উক্ত জমির উৎপাদনশক্তি হ্রাস হয় না বরং অনেক সময় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মটর-জাতীয় উদ্ভিদের অর্থাৎ ছোলা, মটর, প্রভৃতির শিকড়ে এক প্রকার জীবাণু বাসা বাঁধিয়া থাকে। এই সকল জীবাণু ঐ সকল উদ্ভিদকে বাতাস হইতে নাইট্রোজেন গ্যাস লইয়া প্রোটিন তৈয়ারী করিতে সাহায্য করে এবং উহা বৃক্ষের শরীরে খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কোন একটি শস্যের পর, বা উহার সহিত, মটরজাতীয় উদ্ভিদ রোপণ করিয়া উহার কেবল ফসল লইয়া, ডালপালা ইত্যাদি মাটির সহিত মিশিতে দিলে, উক্ত জমি ঐ সকল উদ্ভিদ হইতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী শস্যের সহায়তা করিতে পারে। আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের কৃষকগণ এই প্রণালীতে চাষ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইতেছেন। আমাদের দেশেও অনেক স্থানে এইরূপ প্রণালীতে চাষ হইতেছে।

এই ত গেল উপকারী প্রভাবের কথা। এক উদ্ভিদ অপর উদ্ভিদের উপর অপকারী প্রভাবও বিস্তার করিয়া থাকে। পিকারিং, বেডফোর্ড ও পিকারিং এক উদ্ভিদের উপর আর এক উদ্ভিদের অপকারিতা সম্বন্ধে অনেকগুলি পরীক্ষা করেন। তাঁহারা একটি পাত্রে দুইটি বৃক্ষ এরূপভাবে রোপণ করেন যে উপরের বৃক্ষটির জল নীচের বৃক্ষটির মাটিতে পড়িতে থাকে। ইহাতে দেখা যায় যে নীচের বৃক্ষটির বৃদ্ধির পরিমাণ হ্রাস হইয়াছে। তাঁহারা ডালিম, নাসপাতি, আপেল, কুল, সরিষা, তামাক, টমাটো, যব ও অনেক প্রকারের তৃণ-জাতীয় উদ্ভিদ লইয়া পরীক্ষা করেন এবং প্রত্যেক বারেই দেখেন যে এক শ্রেণীর উদ্ভিদ অপর শ্রেণীর উপর অপকারী প্রভাব বিস্তার করে। প্রায়ই দেখা যায় যে ফলের গাছের নিকট কোন তৃণ-জাতীয় উদ্ভিদ জন্মাইলে, উক্ত বৃক্ষের ফলোৎপাদনের শক্তি ক্ষয় হয় এবং ঐ বৃক্ষের ছালের রং, পাতার রং এবং এমন কি ফলের রং পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। এই সব ফলের আকার, রং ইত্যাদি এরূপ পরিবর্ত্তিত হয় যে বিচক্ষণ ফলোৎপাদনকারী অনেক সময় উক্ত ফলগুলিকে একেবারে নূতন জাতির ফল বলিয়া ভুল করেন। এইরূপ অনেক পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে, যে, একটি উদ্ভিদের উপর আর একটি উদ্ভিদের উপকারী ও অপকারী দুইরূপ প্রভাবই হইয়া থাকে।

এখন এরূপ প্রভাবের কারণ বিবেচনা করিয়া দেখা যাক।

যথাক্রমে তিনটি কারণ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, মাটিতে উদ্ভিদের পুষ্টিকর দ্রব্যের তারতম্য ঘটিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, উদ্ভিদের শিকড় ডাল পাতা পচিয়া মাটির সহিত অনেক প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্যে পরিণত হইতে পাবে যাহা অন্য উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর বা হিতকর। আর তৃতীয়তঃ উদ্ভিদের শিকড় হইতে কোনরূপ বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হইয়া মাটির সহিত মিশিয়া থাকে যাহা পরবর্ত্তী উদ্ভিদের পক্ষে অনিষ্টকর। হার্টেল এই বিষয় লইয়া কয়েকটি পরীক্ষা করেন। যোলটি শস্যকে যোলটি সমান্তরাল জমিতে আনুক্রমিক দুই বৎসর বপন করা হয় এবং তৃতীয় বৎসর উক্ত যোলটি সমান্তরাল জমিতে কেবলমাত্র একটি শস্য বপন করা হয়। উক্ত জমিগুলির পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অর্থাৎ জল, বাতাস, আলো, উত্তাপ ও খাদ্য একই রাখা হয়। পরে উক্ত যোলটি জমিতে পিঁয়াজ বপন করা হয়। বাঁধাকপি, বিট, গম ইত্যাদি শস্যের ক্ষেত্রে ১৭ মণ পিঁয়াজ হয়। যে-ক্ষেত্রে আলু দেওয়া হইয়াছিল, সেই ক্ষেত্রে ৪৭ মণ পিঁয়াজ হয়। জই, বজরা ইত্যাদির পর উহা ১৭৮ মণ হয় ও স্কোয়াশ গাছের ক্ষেত্রে ৩১৪ মণ হয়। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে একই শস্য পিঁয়াজের পরিমাণ, অন্যান্য শস্যের পরে চাষ করায়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

এখন দ্বিতীয় কারণটি দেখা যাক, অর্থাৎ উদ্ভিদের শিকড়, ডাল বা পাতা মাটির সহিত পচিয়া কিরূপে রাসায়নিক দ্রব্যের সৃষ্টি করে। লিভিংষ্টোন, ব্রিটন এবং রিড একটি জমি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে উক্ত জমিতে গম গাছের পক্ষে অনিষ্টকর কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য আছে। উক্ত মাটিতে যদি ফেরিক হাইড্রেট বা কারবন ব্ল্যাক দেওয়া হয় তাহা হইলে আর উক্ত রাসায়নিক দ্রব্যগুলি গম গাছের অনিষ্ট করিতে পারে না। ট্যানিক এসিডও উক্ত মাটিতে উপকার দিয়াছে। উক্ত পরীক্ষকগণ দেখান যে এই রাসায়নিক দ্রব্যগুলি উক্ত অনিষ্টকারী দ্রব্যের পক্ষে সংমিশ্রণে এরূপ কতকগুলি দ্রব্যের সৃষ্টি করে যাহা গম গাছের পক্ষে আর অনিষ্টকর থাকে না। ব্রিয়েজিয়েল্ কতকগুলি বিভিন্ন প্রকারের মাটি হইতে রস সংগ্রহ করেন এবং গমগাছকে, উক্ত রস ও জল সিঞ্চিত জমীতে বপন করেন। ইহাতে উক্ত গমগাছগুলির উপর উক্ত বিভিন্ন প্রকারের মাটির রসের ক্রিয়া লক্ষিত হয়। যখন উক্ত রসগুলির সহিত কারবন্ ব্ল্যাক্, ক্যালসিয়াম কারবনেট এবং ফেরিক হাইড্রেট মিশান হয়, তখন আর গমগাছগুলির অনিষ্ট হয় না।

শ্রিণার, স্কিনার, রীড এবং শোরি মাটির সহিত মিশ্রিত রাসায়নিক দ্রব্যগুলি পরীক্ষা করিয়াছেন এবং উক্ত দ্রব্যগুলির নানাবিধ প্রভাব উদ্ভিদের উপর লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু এমন অনেক রাসায়নিক দ্রব্য মাটির সহিত সংমিশ্রিত আছে যাহা এখনও ভালরূপে জানা যায় নাই। এই পরীক্ষকেরা দেখিয়াছেন যে যদি কতকগুলি সার ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে মাটির সহিত প্রাপ্ত রাসায়নিক দ্রব্যের ক্ষতিকর শক্তি হ্রাস হয়; সারের মধ্যে বিদ্যমান রাসায়নিক দ্রব্যগুলি ক্ষতিকর দ্রব্যগুলির সহিত মিশ্রিত হইয়া এমন কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্যের সৃষ্টি করে যাহা আর উদ্ভিদের ক্ষতিকর থাকে না। যেমন cumarin নামক রাসায়নিক দ্রব্যটির ক্ষতিকরতা নষ্ট করিতে হইলে ফস্ফেট সারের বিশেষ প্রয়োজন। ভ্যানিলিনের জন্য এবং কুইনোনের জন্য পটাসিয়াম সল্টস বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে রাসায়নিক দ্রব্যগুলি মাটি বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই, উদ্ভিদের শিকড়, ডাল ও পাতা পচাইয়া পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ পচাইয়া বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্য পাওয়া যায়, কারণ বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদের দেহে বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্য আছে।

এইবার তৃতীয় বিষয়টি আলোচনা করা যাক। পূর্ব্বে বলিয়াছি, গাছের শিকড় মাটিতে কতকগুলি বিষাক্ত পদার্থ নির্গমন করে যাহা অন্যান্য উদ্ভিদের পক্ষে অনিষ্টকর। ডি ক্যানডোলে এই বিষয়ে একটি মত প্রচার করেন যে প্রত্যেক উদ্ভিদ কতকগুলি দ্রব্য শিকড় দ্বারা নির্গমন করে যাহা অপর উদ্ভিদের পক্ষে অনিষ্টকর বা হিতকর হইতে পারে এবং সেই জন্য একটি শস্য পরবর্ত্তী শস্যটির পক্ষে হিতকর বা অনিষ্টকর হইবে কিনা পরীক্ষা করিয়া তবে রোপণ করা উচিত। তাঁহার মতটি অনেক দিন ভালরূপে পরীক্ষিত হয় নাই। ১৯০০ সালে ইংলণ্ডে পিকারিং নামক এক জন উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ ও আমেরিকায় কৃষিবিভাগ এ বিষয়ে পরীক্ষা

করেন। উক্ত বিভাগের পরীক্ষকগণ ডি ক্যানডোলের মত ঠিক বলিয়া প্রচার করেন, তবে পরবর্ত্তী পরীক্ষকগণ মনে করেন যে শিকড়, ডাল, পাতা এবং শিকড়ের এপিডামাল সেলের ভিতর বিদ্যমান পদার্থগুলি মাটির সহিত পচিয়া অন্যান্য উদ্ভিদের পক্ষে অনিষ্টকর বিষাক্ত দ্রব্যের সৃষ্টি করে। ধানের পরবর্ত্তী ফসল ধানই রোপণ করিলে, পরের ধান প্রথম ধানগুলির অপেক্ষা অনেক পরিমাণে ছোট হয় ও অল্প শস্য প্রদান করে। আমাদের দেশে মিঃ জে. এন. মুখার্জ্জি এই বিষয়ে পরীক্ষা করিয়াছেন। পেরালটা এবং এষ্টিকো পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে সাইপ্রাস ও পদ্মজাতীয় লতা ধানের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং জোকেট ধানের পক্ষে অনিষ্টকর। ডেভিস ওয়ালনাট বা বাদাম-জাতীয় বৃক্ষের শিকড় হইতে জাগলোন নামক একটি বিষাক্ত দ্রব্য বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া গিয়াছে; ইহা উক্ত বৃক্ষের পারিপার্শ্বিক উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। এই দ্রব্যটি পরিষ্কার ও স্ফটিকাকারে পরিণত করিবার পর টমাটো এবং এল্‌ফালফা উদ্ভিদের শরীরে প্রক্ষেপ করা হয়। তাহাতে উক্ত বিষাক্ত দ্রব্যটির ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া টমাটো ও এল্‌ফালফা গাছ দুটি বিশেষরূপে আহত হয়। উক্ত বিষাক্ত দ্রব্যটি ও বিভিন্ন উদ্ভিদের সহিত উহার সম্পর্ক ও প্রভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আমরা আরও জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

ধূলি ও ব্যাধি

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বি-এস্‌সি

ধূলি এ পার্থিব জগতে শাশ্বত পদার্থ। আজ যেমন ইহা সর্ব্বত্র সকল সময়েই বর্ত্তমান রহিয়াছে, সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বেও তেমনই ইহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান ছিল। তবে আজ হয়ত ধূলি উৎপাদনের কারণ কিছু বেশী হইতে পারে। কিন্তু উৎপাদনের হেতুর কথা উত্থাপন করিলেই প্রথমে সমস্যা উঠে ধূলি কি, বা ধূলির মৌলিক উপাদান কি?

ধূলির উপাদান যে কি, বা ধূলির বৈশিষ্ট্য অদ্বিতীয় কিনা, বা ধূলি বলিতে যথার্থতঃ কোন বিশেষ এক পদার্থই বুঝায় কিনা, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া বলা কঠিন। কিন্তু এ-কথা অনায়াসেই বলা চলে যে, সমস্ত পদার্থই অল্পবিস্তর ধূলিতে পরিণত হইতে পারে এবং হয়। পৃথিবীর সকল পদার্থই ক্রমশ ধ্বংসের দিকে চলিতেছে; এই ক্ষীয়মাণ বিভিন্ন পদার্থের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা-গুলি মিলিয়া ধূলির সৃষ্টি করে। বস্তুকণাগুলি কিন্তু পরস্পরের সহিত বড়-একটা অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত হয় না, মূল পদার্থ হইতে কণাসমূহ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের বস্তুস্বাতন্ত্র্য লইয়াই প্রায় ধূলির সঙ্গে মিশিয়া থাকে; তাই ধূলির স্বরূপ এক নহে, ধূলিকণাগুলিও সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সকল অবস্থায় এক প্রকার নহে। এই বিভিন্ন বস্তুকণার উৎপত্তি হয় কিরূপে?

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে ক্ষয়িত পদার্থের কণাগুলি মিলিয়া ধূলির সৃষ্টি করে। এইরূপ ক্ষয়ের কারণ দ্বিবিধ:—(ক) প্রকৃতির নিয়মে স্বাভাবিকভাবে কতকগুলি ক্ষয় সাধিত হয়, আর (খ) কতকগুলি মানুষের কৃত।

(ক) বাত্যা-ঝড়-ঝঞ্ঝায় ধূলির উৎপত্তি; প্রবল বাতাসে মরুভূমি ও নদীসৈকতের বালুকণা উড়াইয়া লয়, মাটির উপর হইতে মৃত্তিকা-কণা উত্থিত হইয়া বায়ুমণ্ডলের ধূলির সহিত মিলিত হয়; বৃষ্টিপাতে পাহাড়-পর্ব্বতের গা ধুইয়া নামিয়া আসে, মাটির বহু জায়গা প্লাবনে ধ্বসিয়া যায়। আবহের অবস্থান্তর ও তারতম্যের নিমিত্তও ধূলির উৎপাদন হয় যথেষ্ট। নদীর ভাঙন এবং ভূকম্পের প্রবল আলোড়নে উৎপন্ন ধূলির পরিমাণ নিতান্ত সামান্য নহে।

এতদ্ব্যতীত আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ, জাগতিক পদার্থসমূহের নিয়ত সংঘাত এবং নানা অবস্থায় বিভিন্ন কারণে পরস্পরের সংঘর্ষের ফলে ধূলির উৎপত্তি। বাত্যাতাড়িত বৃক্ষ-লতা-গুল্ম হইতেও কিয়ৎপরিমাণ ধূলির উৎপত্তি হয়।

(খ) মানুষের কৃত ধূলি: যান্ত্রিক যুগে মানবের অন্যতম প্রধান কর্মকেন্দ্র শ্রমশিল্পাগারসমূহে; কল-কবজাগুলি প্রতিনিয়ত প্রভূত ধূলির উৎপাদন করে। সভ্য জগতের রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও রসায়নাগারসমূহ ধূলি-সৃষ্টির অপর স্থান। চাষবাসের নিমিত্ত ভূমি-কর্ষণ প্রত্যেক ঋতুতেই পৃথিবীর কোন-না-কোন অংশে চলিতেছেই; ঘর-বাড়ী তৈয়ারি, করাত-ফাঁড়া, কাঠকাটা ইত্যাদি কত কারণে যে ধূলির উৎপত্তি হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

এইরূপ নানা প্রকার কার্য্য-কারণের ফলে পৃথিবীব্যাপী সর্ব্বত্র সকল সময়ে পুঞ্জীভূত ধূলিরাশি বিস্তৃত ও সঞ্চিত হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু ইহার নির্দ্দিষ্ট সংযোজনা নাই, নিশ্চিত বস্তুস্বাতন্ত্র্য নাই—সর্ব্ব প্রকারের সকল শ্রেণীর ধ্বংসমুখী প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম পদার্থসমূহের অধঃপতিত বা সংযোগবিচ্ছিন্ন বস্তুকণা-সমূহের সম্মিলনে স্তূপীকৃত ধূলিরাশি নিত্য সঞ্চিত হইতেছে; অসম বস্তুর মিলনে ইহার সৃষ্টি, সেই হেতু ইহা নিজেও অসমাবয়বী।

ধূলির বিভিন্ন বস্তুকণাগুলির রাসায়নিক সংযোজনা হয় না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া বিভিন্ন স্থানের ধূলির মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ করাও সহজ ব্যাপার নহে। ধূলিতে নাই কি, এ কথা যেমন সত্য, ধূলিতে আছে কি, তাহা নিরূপণ করাও ঠিক তেমনই কঠিন। স্বর্ণকার যেখানে বসিয়া সোনার কাজ করে সেই ঘরে মেঝের ধুলা-বালি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখে, ঝাড়িয়া ধুইয়া যত্নে তাহা হইতে স্বর্ণকণা সংগ্রহ করিয়া লয়। হাতের আংটী ক্রমশ ক্ষয় হইতে থাকে, এ ত আমরা নিত্যই দেখিতেছি। কিন্তু হাতের ঘষায় বা নিয়ত নানা কার্য্যব্যপদেশে বিভিন্ন বস্তুর সংঘাতে আংটীর স্বর্ণকণাগুলি যে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে, তাহা কোথায় যায়, কোন্ অবস্থায় থাকে, কি হয়? কর্ম্মকার ছুরি, কাঁচি, দা, প্রভৃতি লোহার জিনিষ প্রস্তুত করে; তপ্ত লৌহের উপরে হাতুড়ির অনবরত আঘাতের ফলে যে কত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র লৌহকণা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এমন কত ঘটনা প্রতিদিন প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমাদের চতুস্পার্শ্বে ঘটিতেছে তাহার সীমাসংখ্যা নাই। কিন্তু বিভিন্ন পদার্থের বস্তুকণাগুলি কোথায় যায়? তাই বলিতেছিলাম, ধূলির শ্রেণী নির্দ্ধারণ এবং স্থানবিশেষের ধূলির স্বরূপ নিরাকরণ সুকঠিন।

কিন্তু এই সকল লইয়া যুক্তি-তর্ক তুলিতে গেলে মাত্র একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্পূর্ণ করা সম্ভব নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য ধূলির সহিত ব্যাধির কি সম্বন্ধ তাহার আলোচনা।

ধূলি যে সময়ে সময়ে কিরূপ বিপদজনক এবং অপ্রীতিকর হইয়া উঠে তাহা সকলেই অল্প-বিস্তর অবগত আছেন। গ্রামাঞ্চলে ধূ-ধূ মাঠের মধ্য দিয়া পথ চলিতে দমকা বাতাসে যখন ধূলির ঝাপটা আসিয়া চোখে মুখে লাগিয়া অন্ধ করিয়া দেয়, তাহার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন হয়ত শহরবাসীর জীবনে অনেকেরই ঘটে নাই। কিন্তু পথ চলিতে চলিতে পিছন হইতে একখানা অতিকায় বাস্ আসিয়া তাহার ত্রস্ত সম্মুখগতির পশ্চাতে যখন ধূলি ও পেট্রোলের ধোঁয়ার পর্দা ছড়াইয়া দিয়া পথচারীর সম্মুখ-দৃষ্টিকে বিড়ম্বিত করিয়া তোলে, তাহা শহরবাসী প্রত্যেকেই নিত্য ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু এ ছাড়াও যে কি পরিমাণ ধূলি বায়ুমণ্ডলে নিয়ত ভাসিয়া বেড়াইতেছে, যাহা শুধু চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার কথা কেহ কোন দিন ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? ঘরের মধ্যে আলমারির বইয়ে, দেওয়ালের ছবির কাচে, আর্শিতে, বিছানা-পত্রে, চেয়ারে টেবিলে যে অনবরত ধূলি জমিতেছে, নিত্য ঝাড়িয়া মুছিয়াও কিছুতেই জিনিষপত্র-গুলি ধূলিমুক্ত করা যায় না—এত ধুলা কোথা হইতে আসে?

আজ অবশ্য বর্ত্তমান সভ্যতার বৈজ্ঞানিক যুগে শ্রমশিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি দুই চারিটি প্রয়োজন পরিপূরণে ধূলি নিয়োগ ও ব্যবহার সম্বন্ধে কেহ কেহ চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু লোকে প্রথমে অপ্রীতিকর দৃষ্টিতে ধূলিকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল; বস্তুতপক্ষে ধূলি যে ব্যাধির সৃষ্টি করে তৎপ্রতিই লোকের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হয় এবং তন্নিমিত্তই ধূলি সম্বন্ধে লোকে সর্ব্বপ্রথম বিশেষ অবহিত হইয়া উঠে।

জি. আগ্রিকোলাই সম্ভবতঃ প্রথম ধূলি ও ব্যাধির বৈজ্ঞানিক আলোচনা করেন। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম ভাগে এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে তিনি ধাতু বা ধাতব পদার্থসমূহ হইতে উৎপন্ন ধূলি মানবের স্বাস্থ্যের যে প্রভূত হানি করে তৎসম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করেন। তৎপরে খ্রীষ্টীয় ১৭২১ সালে জে. বুবে পাথর-ভাঙা ধূলি হইতে যে নানা প্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হয় তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া এক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। লেবলাঙ্ক ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধে বুবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। লেবলাঙ্কের উক্ত প্রবন্ধে চুণা-পাথর ইত্যাদি লইয়া যাহারা কাজ করে তাহাদের মধ্যে এক প্রকার অদ্ভুত ব্যাধির আক্রমণ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। অতঃপর জনষ্টোন আর এক শ্রেণীর শ্রমিক দলের মধ্যে এক ধরণের ব্যাধি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। তাঁহার অনুসন্ধানপ্রসূত আলোচনা ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এক সন্দর্ভে প্রকাশিত হয়। সূচ ইত্যাদির অগ্রভাগ যাহারা ছুঁচাল করে তাহাদের মধ্যে এক প্রকার ক্ষয়রোগের প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কার্য্যে প্রতিনিয়ত ধূলি নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং এই ধূলি ফুসফুসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্যাধির উৎপত্তি করে।

ইহার পর হইতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৮০ বৎসরে অন্যূন ৯১টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে—প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই বিভিন্ন প্রকার ধূলির জন্য যে বিশেষ ব্যাধির সৃষ্টি হয় তাহার বিশদ আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

কোন কোন ব্যক্তির ফুসফুসের অভ্যন্তরস্থ বর্ণবিশেষের যে বিকৃতি দেখা যায়, তাহা লইয়া উনবিংশ শতাব্দীতে যখন আলোচনা চলিতে থাকে, তখন বিশেষ করিয়া ধূলির প্রতি লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; উক্ত আলোচনাদির পরে চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হয় যে, সর্ব্ব শরীরময় যে এক প্রকার বর্ণহীন জলবৎ পদার্থ (বা lymph), পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে তাহারই প্রবাহের সহিত আসিয়া ধূলিকণাগুলি ফুসফুসের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে, ফলে ফুসফুসের ভিতরকার বর্ণক (pigment) এইরূপ বিকৃত হইয়া পড়ে।

আধুনিক সভ্যতার প্রসারের সহিত শ্রমশিল্পাগার তথা নানা প্রকার কলকব্জার প্রসারও বাড়িয়া চলিয়াছে; ফলে ধূলির উৎপাদনের কারণ এবং পরিমাণও দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে, আর লোকের স্বাস্থ্যও ক্ষয়-জাতীয় নানা প্রকার ফুসফুস ও হৃদয়ের ব্যাধিতে ক্রমেই পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কালের মধ্যেই ন্যূনাধিক ১২০০ শত প্রকাশিত প্রবন্ধের সন্ধান পাই, যাহাতে কেবল ধূলি এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ধূলির নিমিত্ত যে-সকল ব্যাধির সৃষ্টি হয় তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই সকল প্রবন্ধে কয়লা ও প্রস্তর খনি খনন, পাথর কাটা, ধাতু-খনি হইতে ধাতু উদ্ধার করা ইত্যাদির ফলে উৎপন্ন ব্যাধি এবং বিভিন্ন ধাতব পদার্থের কারখানার কর্ম্মীদের মধ্যে পরিদৃষ্ট এন্থ্রাকোসিস, মেলেনোসিস, যক্ষ্মা প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যাধি তৎসম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন ক্ষেত্রের রকমারি ধূলি ঐ সকল ব্যাধির আক্রমণের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কারখানার শ্রমিকগণের মধ্যে ক্ষয়রোগের প্রকোপ সম্বন্ধে বিংশ শতাব্দীতে প্রচুর আলোচনা হইয়াছে; তাহাতে প্রায় সকল বিশেষজ্ঞই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে ইহার মূল কারণ কলকারখানার অপরিমিত ধূলি। অবশ্য ধূলির সহিত যে ক্ষয়রোগের নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা বহু পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ প্রথম শেটুএনফ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; ইহার কিছু কাল পরে লম্বার্ডের আলোচনাতেও এইরূপ সমস্যার উল্লেখ দেখা যায়।

কিন্তু এ-স্থলে একটা কথার উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক। ধূলি নানা প্রকার ব্যাধির মূল বটে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির নিমিত্ত ধূলি মুখ্যত দায়ী নহে। কয়েক প্রকার ধূলি আছে যাহা পরোক্ষভাবে স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর, এই প্রকার ধূলি ব্যাধির জীবাণু বহন করিয়া থাকে। এই জীবাণুবাহী ধূলি দৈনন্দিন জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক সহচর; অপর দিকে যে ধূলি প্রত্যক্ষ-ভাবে বিপদজনক ও হানিকর তাহা প্রধানতঃ শ্রমশিল্পের ফলে উদ্ভূত। অপরন্তু সাধারণ অবস্থায় বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান সাধারণ ধূলি নিজেও সোজাসুজিভাবে ক্ষতি করিয়া থাকে এবং বায়ুমণ্ডলে নিয়ত ভাসমান জীবাণু বহন করিয়া লইয়া ক্ষয়রোগ-জাতীয় নানা প্রকার ব্যাধি

…রের সহায়তা করে (অবশ্য …রোগ-জাতীয় ব্যাধির জীবাণু …ত্যেকের দেহেই বর্ত্তমান)। আকাশের …ভিন্ন স্তরের ধূলি প্রত্যক্ষভাবে বা …ল্লিখিত বায়ুমণ্ডলস্থিত জীবাণুর …াহায্যে পরোক্ষভাবে দেহাবস্থিত …্যাধির পরিবৃদ্ধির সহায়তা করে মাত্র; …্রমশিল্পজাত ধূলিও সাধারণতঃ এই …ভাবেই মানব-স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রত্যেকের শরীরেই ক্ষয়রোগ-জাতীয় ব্যাধির যে জীবাণু বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা সাধারণ অবস্থায় সুপ্ত নির্লিপ্ত বা কর্ম্মশক্তিহীন থাকে। ধূলি-কণাসমূহ প্রশ্বাসের সহিত শরীরে প্রবেশ করিয়া মানুষের জীবনীশক্তি হ্রাস করিয়া ফেলে, ফলে এই সকল ব্যাধি ক্রমে শক্তিশালী ও সক্রিয় হইয়া উঠে। গত ১৯৩০ সালে সিলিকোসিস সম্বন্ধে আলোচনার নিমিত্ত জোহানিসবুর্গে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তাহাতে ধূলির নিমিত্ত যে-সকল ব্যাধি পরিপুষ্টি লাভ করে এবং ধূলিকণা অবলম্বনে নানা প্রকার জীবাণুর দেহমধ্যে প্রবেশে যে-সকল ব্যাধি জন্মে সাধারণ ভাবে তাহার আলোচনার আখ্যা দেওয়া হয় নিউমকোনিওসিস্। তবে এই আলোচনায় সিলিকা-উৎপন্ন ধূলির উপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য জগৎ ও আমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চলে এ সম্বন্ধে আলোচনা বহু দিন হইতে চলিতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে ইহার আলোচনা এক রকম হয়ই নাই বলা যাইতে পারে। এমন কি রন্ধনাদির নিমিত্ত যে অপরিমিত ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় তাহার প্রতিও আমাদের মনোযোগের অভাব। কল-কারখানার ধোঁয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও এই প্রকারে ঘরে ঘরে যে ধোঁয়া উৎপন্ন হয় তাহাও নাগরিক জীবনকে কম বিড়ম্বিত করে না, এবং ইহাতে বিপদের

পৃথিবীর বৃহত্তম ধূলি-মেঘ—গৌরীশৃঙ্গ-সংলগ্ন বহু মাইল ব্যাপী ধূলিকণায় গঠিত তুষার-কিরীট।
[রেকটিন প্রণীত 'ডাষ্ট' হইতে গৃহীত চিত্র]

আশঙ্কাও কম নহে। এই বিষয়ে দেশের স্বাস্থ্য-বিভাগগুলির বিশেষ যত্নবান হওয়া আবশ্যক। ক্ষয়রোগ এবং অন্যান্য যে সকল ব্যাধির মূল প্রধানতঃ ধূলি বলিয়া পাশ্চাত্যের মনীষিগণ নির্দ্দেশ দিয়াছেন, সেই সকল ব্যাধি এবং তন্নিমিত্ত মৃত্যুর হার এ দেশে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে।* কিন্তু আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে এখনও কোনরূপ যথাযথ গবেষণা হয় নাই এবং অন্যান্য দেশের ন্যায় ধূলি নিবারণ বা রোধের কোন প্রকার চেষ্টাও এ দেশে দেখা যায় না। তবে ধূলি যে ঐ প্রকার রোগের অন্যতম কারণ তাহা সহজেই

* বাংলা সরকারের ১৯৩১, ১৯৩২ ও ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের স্বাস্থ্য-বিবরণী অনুসারে দেখা যায় মৃত্যুসংখ্যার শতকরা ৫.৬, ৬.১ ও ৬.৯ জন লোক ফুসফুস্ অবরোধজনিত ব্যাধিতে মারা যায়; উক্ত সংখ্যা তিনটি হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে এইরূপ ব্যাধিতে মৃত্যুর হার ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে।

মেঘের উর্দ্ধে বায়ুমণ্ডলস্থিত ধূলিকণাসমূহ কেন্দ্র করিয়া যে তুষারকণাগুলি গঠিত হইয়াছে, তাহাতে অস্তায়মান সূর্য্যের রশ্মি প্রতিহত হইয়া এই দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে
[ব্রেক্টিন প্রণীত "ডাষ্ট" হইতে গৃহীত চিত্র]

লয় এবং যাহারা গলিত পিত্তলের [illegible] করে তাহাদের মধ্যে ক্ষয়রোগের প্রকোপ কিছু বেশী পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়; আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংসদের বিবরণী অনুসারে যাহারা পালিশের কাজ করে এরূপ কয়েক শ্রেণীর শ্রমিকগণকে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহারা ধূলিঘটিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। ময়দার কল, রুটির কারখানা, ব্রোন্জ্ প্রভৃতির কারখানা, দালান বালাখানা প্রস্তুতের কাজ, এস্‌বেস্টস কারখানা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ধূলিজনিত ব্যাধির আশঙ্কা অত্যন্ত বেশী।

অপর একটি অতীব বিপদজনক ও হানিকর ব্যবসায় হইল সুতা প্রস্তুত ও কাপড় বুনের কাজ। যাহারা সুতার কলে বা কাপড়ের কলে কাজ করে, তাহাদের মধ্যে ফিব্রোসিস নামে একটা বিশেষ ব্যাধির প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত নামটি হইতেই ইহার উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে—তুলার আঁশই শ্রমিকদের মধ্যে এইরূপ ব্যাধির উৎপত্তির কারণ। কাপড় ও সুতার কলের শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষয়রোগের প্রকোপও দেখিতে পাওয়া যায়। এই ফিব্রোসিস্ ও ক্ষয়রোগের পরস্পরের মধ্যে যে যোগাযোগ আছে তৎসম্বন্ধে ইংলণ্ডের প্রধান কারখানা পরিদর্শকের ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণীতে আলোচনা করা হইয়াছে (*Annual Report of the Chief Inspector of Factories of England & Wales for 1910*)। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কানাডাতে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাধি—বিশেষ করিয়া ক্ষয়রোগ—সম্পর্কে

অনুমেয়; ফুসফুস্-অবরোধজনিত ব্যাধির প্রকোপ শ্রমশিল্প-কেন্দ্র ও শহরে বন্দরেই খুব বেশী।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক আপিস হইতে শ্রমশিল্প ও শ্রমশিল্প-কেন্দ্রসমূহের শ্রমিকদের মধ্যে ও ধূলিজাত বিভিন্ন ব্যাধি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া এক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। (*Occupation and Health*, International Labour Office, Geneva, 1930); এই বিবরণীতে কি প্রকার কারখানায় কি ধরণের ব্যাধির প্রকোপ সাধারণতঃ বেশী তাহাও বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে উল্লেখ করা আবশ্যক যে ধূলির সহিত ধোঁয়ারও বিচার করা একান্ত প্রয়োজন, এবং মূলতঃ ধূলি বলিতে এ প্রবন্ধে যে সমস্যার অবতারণা করা হইয়াছে ধোঁয়াও তাহার অন্তর্ভুক্ত।

এই প্রকার হানিকর ধূলির অন্তর্গত কতগুলি বাষ্প সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া আবশ্যক। মেঙ্গানিজ ডাইঅক্‌সাইড এবং দস্তা, তাম্র, কেড্‌মিয়ম্, মেগ্‌নেসিয়ম্ ও পারদের অক্‌সাইড্ প্রভৃতির অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র (০·২ মাইক্রোন হইতে ১·০ মাইক্রোন† পর্য্যন্ত) কণাগুলি প্রশ্বাসের সহিত শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার সঙ্গর অবস্থার সৃষ্টি করে। গলিত পিত্তলের উপরিস্থিত সর যাহারা তুলিয়া

† ১ মাইক্রোন = ১ মিলিমিটারের সহস্রাংশের এক অংশ = ১ সেন্টিমিটারের দশ-সহস্রাংশের এক অংশ; ১ সেন্টিমিটার = ১ ইঞ্চির [illegible] ভাগের দুই ভাগ।

র্মূল না হইলেও কারখানা-গৃহে বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রিলে এই প্রকার ব্যাধির আক্রমণ হইতে বহুলাংশে রক্ষা াওয়া যায়।

সর্ব্বপ্রকার ধূলিজ শ্বাস-প্রশ্বাস-যন্ত্রের ব্যাধির সমস্যা বিপুল ও জটিলতাপূর্ণ। বহু অনুসন্ধান ও গবেষণার পরে বর্ত্তমানে ীমাংসিত হইয়াছে যে, ধূলিকণার আয়তনের উপরেই প্রকৃতপক্ষে ব্যাধির প্রকোপ ও প্রাবল্য নির্ভর করে। াই বলিয়া যে কেবল ধূলিকণার আয়তনের প্রতি দৃষ্টি নবদ্ধ করিয়া ব্যাধি নিবারণের চেষ্টায় নিরত হইতে হইবে তাহা নহে; ধূলিকণা যাহাতে প্রশ্বাসের সঙ্গে আদৌ শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার চেষ্টাই সর্ব্বাগ্রে করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ ২ মাইক্রোন আয়তনের ণা সমধিক হানিকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু (১) াছিয়া বাছিয়া ২ মাইক্রোনের মত অতি ক্ষুদ্র কণার গতি নিরোধের চেষ্টা কষ্টসাধ্য, এমন কি অসাধ্য বলিলেও হয়। বস্তুতঃ এই প্রকার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণার অস্তিত্ব নিরূপণই সাধারণভাবে দুঃসাধ্য। কাজেই (২) এমন উপায় সর্ব্বপ্রথমে অবলম্বন করা আবশ্যক, যাহাতে প্রশ্বাসের সঙ্গে লোকের দেহে ধূলি প্রবেশ করিতে না পারে। অবশ্য (৩) প্রশ্বাসের সঙ্গে ধূলিকণা টানিয়া লইবার পূর্ব্বে বাধা দেওয়া বা কণা সমূহ কোন উপায়ে অবরুদ্ধ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু তদপেক্ষাও সমস্যার কথা এই যে লোকে সহজে ধূলি-অবরোধক ব্যবহার করিতে চাহে না। কিন্তু ধূলির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতেই হইবে এবং ধূলি অপসরণের উপায় উদ্ভাবনে পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিষয়ে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এই সকল সমস্যার মীমাংসার নিমিত্ত স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করা প্রয়োজন; এইরূপ প্রতিষ্ঠানে বিশেষ গবেষণা করিতে হইবে। পূর্ব্বোল্লিখিত তৃতীয় সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে অনুসন্ধানের পরে বিশেষজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন যে, বিশেষ হানিকর ধূলির আক্রমণের আশঙ্কা না থাকিলে ধূলি-অব-রোধকের ব্যবহার অনাবশ্যক, এবং অত্যধিক প্রয়োজন বোধ করিলে তুলার প্যাড ব্যবহার করা যাইতে পারে। অধিকন্তু উক্ত বিশেষজ্ঞগণের অনুসন্ধান-সমিতি কারখানা বা শ্রম-শিল্পাগারসমূহ প্রচুর হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থার উপরে অধিক জোর দিয়াছেন। (Departmental Commission appointed to enquire into ventilation of factories and workshops : *Second Report.*)
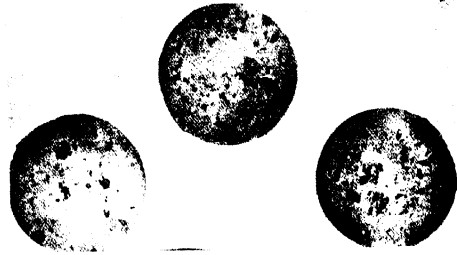
একটি কারখানার ধূলিকণাকার : ১৩৫ গুণ বৰ্দ্ধিত চিত্র

অবশ্য প্রধানতঃ ৫-৬ মাইক্রোন অপেক্ষা কম ব্যাসের ধূলিকণা যাহাতে ফুস্‌ফুসের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত; আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে কিছু পরিমাণ ধূলি শরীর-মধ্যে গ্রহণ করিয়াও ব্যাধির আক্রমণ হইতে লোকে আত্মরক্ষা করিতে পারে; কিছুটা ধূলিকণা ফুস্‌ফুসের অভ্যন্তরে চলিয়া গেলেও কোনরূপ ক্ষতি হয় না। কিন্তু কত দিন পর্য্যন্ত লোক এইরূপ ধূলি গ্রহণ করিয়াও নীরোগ থাকিতে পারে? ইহাই প্রধান সমস্যা। সমস্যাকে জটিল হইতে জটিলতর না করিয়া ধূলি যাহাতে আদৌ ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিতে না পারে তৎপ্রতি যত্নবান থাকাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সকল বিষয়েই বিশেষজ্ঞগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে এমন নহে। কতকগুলি সহজ উপায় প্রত্যেকেই অবলম্বন করিতে পারে, তাহাতে সম্পূর্ণ না হইলেও যথেষ্ট ফল লাভ হইবে আশা করা যায়। বাসস্থানে বাতাস চলাচল-ব্যবস্থার অল্পবিস্তর উন্নতি সকলেই করিতে পারে; অপরিমিত ধূম উৎপাদন না করিয়া উনান ধরান অনেকটা ইচ্ছা যত্ন চেষ্টা এবং মনোযোগের উপর নির্ভর করে। অন্ততঃ এই কয়টি ব্যাপারে ত বিশেষজ্ঞের অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই।

ঠুইঠ্‌লিঙ ও ভাম্‌বঙ

(কুকি উপকথা)

শ্রীলালতুদাই রায়

পাহাড়ের পর পাহাড়, তার পর পাহাড়। কালো পাহাড়ের কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। একটি ছোট পাহাড়ের মাথায় একখানি ছোট গ্রাম। গ্রামখানি ছোট হইলেও তাহাতে অনেক লোকের বাস।

দুইটি সখী গ্রামে বাস করিত। নিজের প্রাণের চেয়েও এক জন অপরকে বেশী ভালবাসিত। এক সখীর একটি ছোট ছেলে আছে, অপরের ছেলেমেয়ে কিছুই হয় নাই। নিঃসন্তান মেয়েটি তার সখীকে এক দিন বলিল, "ভাই, আমার যদি একটি মেয়ে হ'ত, তাহ'লে তোর ভাম্‌বঙের সাথে বিয়ে দিতাম। তোর ছেলেটি ভাই তোর চেয়েও সুন্দর।" ভাম্‌বঙের মা বলিল, "তাহ'লে বেশ হয় কিন্তু। তোর যদি মেয়ে হয়, আমার ছেলের সাথে বিয়ে দিবি। যখন কথা দিলি, কথা রাখিস্ ভাই।"

কিছু দিন পর সত্য সত্যই সখীর একটি মেয়ে হইল। মেয়ে নয়, যেন আকাশের চাঁদ। মেয়ের রূপ আর ধরে না। মাতাপিতা তাহার নাম রাখিল—'ঠুইঠ্‌লিঙ'। পাড়াপড়শী সকলেই মেয়েকে আদর করে, মেয়ের রূপের প্রশংসা করে, তাহাতে মা-বাপের আনন্দের সীমা থাকে না। ধীরে ধীরে ঠুইঠ্‌লিঙ বড় হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে ঠুইঠ্‌লিঙ ও ভাম্‌বঙের মধ্যে বড় ভাব হইয়া গেল। ভাম্‌বঙ ছাড়া আর কোন বালক-বালিকার সঙ্গে ঠুইঠ্‌লিঙ খেলা করে না, আর ঠুইঠ্‌লিঙকে ছাড়া ভাম্‌বঙও থাকিতে পারে না। ঠুইঠ্‌লিঙের মা তাহার সখীকে বলে, "দেখছিস্ ভাই, আমাদের ছেলেমেয়ে দুটি যেন মাণিকজোড়, আবার দুটিতে ভাব কেমন দেখছিস্? একটিকে ছেড়ে অপরটি থাকতে পারে না।" ভাম্‌বঙের মা উত্তর দেয়, "হাঁ ভাই, আমি রোজ বলি —পাথিয়ান (ঈশ্বর) তাদের রক্ষা করুন, তাদের দীর্ঘজীবী করুন, তাদের সংসার আনন্দময় হোক।"

এক দিন অতর্কিত ভাবে যৌবন আসিয়া বালক-বালিকা[illegible] দেহ আশ্রয় করিল। তাহারা কেহই তাহা জানিতে পারিল [illegible] কেবল ভাম্‌বঙ দেখিল,—তাহার জীবনের যত আনন্দ, [illegible] উৎসাহ কেমন করিয়া ঠুইঠ্‌লিঙ সব চুরি করিয়া ল[illegible] গিয়াছে, তাহাকে ছাড়া ভাম্‌বঙের জীবন বাঁচিতেই পারে [illegible] চলিতেই পারে না। ঠুইঠ্‌লিঙ দেখে তাহার অজ্ঞাতসা[illegible] ভাম্‌বঙ তাহার সারা মনপ্রাণ চুরি করিয়া লইয়াছে, তাহা[illegible] হৃদয় জুড়িয়া আসন পাতিয়া বসিয়া আছে। ভাম্‌বঙকে ছা[illegible] এক মুহূর্ত্তও সে বাঁচিবে না।

ভাম্‌বঙের সমস্ত শরীর দিয়া যেন বীরত্ব বাহির হইতে[illegible] এবং রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে—ঠুইঠ্‌লিঙের সারা [illegible] দিয়া। ভাম্‌বঙের মা এক দিন তাহার সখীকে বলিল, "ভা[illegible] আর দেরি কেন? এবার মেয়েটি আমায় দিয়ে তোমার ক[illegible] রক্ষা কর।" সখী বলিল, "হাঁ ভাই, আমি সব আয়ো[illegible] করছি।"

এই রকম একটা প্রবাদ উঠিয়াছিল—সর্পদেবতার ঔর[illegible] ভামবঙের জন্ম হইয়াছে। ইহা শুনিয়া ঠুইঠ্‌লিঙের [illegible] তাহার কাছে মেয়ে দিতে কিছুতেই রাজি হইল [illegible] ঠুইঠ্‌লিঙের মা কত কান্নাকাটি করিল, কিছুতেই ফল হই[illegible] না। ভিন্ন গ্রামের এক ছেলের সঙ্গে ঠুইঠ্‌লিঙের বিবাহ হই[illegible] গেল।

কুলপ্রথানুসারে এক মাস পর ঠুইঠ্‌লিঙ বাপের বা[illegible] আসিল। যখন শ্বশুরবাড়ী ফিরিবার সময় হইল, তখন [illegible] কিছুতেই যাইতে চাহিল না। অনেক অনুনয়বিনয় হই[illegible] অনেক লাঞ্ছনাগঞ্জনা চলিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শেষকালে ঠুইঠ্‌লিঙ বলিল, যদি ভাম্‌বঙ তাহাকে লইয়া শ্ব[illegible] বাড়ী দিয়া আসে তাহা হইলে সে যাইতে পারে। [illegible] কিছুতেই তাহাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠান যাইবে না। অ[illegible] তাহাই হইল।

যাহাকে জীবনের সঙ্গিনী করিবার মানসে ডাম্‌বঙ মনে মনে কত আশা কত কল্পনা করিয়া আসিতেছিল, যাহাকে ছাড়া তাহার জীবনের একটি দিনও কাটিবে একথা সে ভাবিতেও পারে নাই, সেই প্রাণের প্রতিমাকে অন্যের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য তাহাকে যাইতে হইবে! ডাম্‌বঙের অন্তরে দারুণ আঘাত লাগিল, কিন্তু ট্রুইট্‌লিঙের ভালবাসা শেষকালে তাহাকে যাইতেই বাধ্য করিল।

ট্রুইট্‌লিঙ যায়, তাহার পিছনে পিছনে ডাম্‌বঙ যায়। কত কথা, কত প্রাণের কথা, কত মনের কথা, কত অন্তরের কথা, কত সুখের কথা, কত দুঃখের কথা চলিতে লাগিল। পথ নিমেষেই যেন ফুরাইয়া গেল, কথার কিন্তু সবই যেন বাকী রহিল। তাহারা উভয়ে ট্রুইট্‌লিঙের শ্বশুরের গ্রামের কাছে উপস্থিত হইল। ডাম্‌বঙ বলিল, "ট্রুইট্‌লিঙ, ঐ তোমাদের গ্রাম দেখা যাচ্ছে, এবার আমায় বিদায় দাও।" ট্রুইট্‌লিঙ উত্তর করিল, "না, আমাদের বাড়ী চল।"

"আমাকে মেরে ফেললেও আমি তোমাদের বাড়ী যাব না; এত দূর যে এসেছি, সে কেবল তোমারই জন্য।"

"তা'হ'লে চল, ক্ষেতে যে কুঁড়ে দেখা যাচ্ছে, তাতে গিয়ে ব'সে দু-দণ্ড গল্প করি। এখনও সন্ধ্যার ঢের বাকী আছে।"

ক্ষেতের কুটীরে বসিয়া দুই জনে বিশ্রাম করিতে লাগিল। তাহাদের কথার আর শেষ হয় না। কুটীরের সামনে দুইটি বাঁশ একসঙ্গে জন্মিয়া বেশ বড় হইয়াছে। তাহারা মাঝে মাঝে বাতাসে বিচ্ছিন্ন হইতেছিল, আবার একত্র হইতেছিল। তাহা দেখিয়া ট্রুইট্‌লিঙ বলিল, "ডাম্‌বঙ দেখ দেখ, দুটি বাঁশ আমাদের মতই একত্রে জন্মেছিল। তারা মনে করেছিল সারা জীবনটাই তারা একত্রে কাটিয়ে দেবে। কিন্তু বাতাস এসে তাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে দিচ্ছে। তবুও আবার তারা আরও বেশী প্রেমাবদ্ধ হয়ে মিলিত হচ্ছে। আমাদেরও শেষকালে প্রেমেরই জয় হবে। তুমি দুটিকে কেটে নিয়ে এস আর গোড়া দিয়ে দুটি কোদালের বাঁট তৈরি কর।"

ডাম্‌বঙ বাঁশ দুইটি কাটিয়া আনিল এবং তাহা দিয়া সুন্দর দুইটি কোদালের বাঁট তৈরি করিল। একটি বাঁট ট্রুইট্‌লিঙ তুলিয়া লইল এবং তাহা ডাম্‌বঙের হাতে দিয়া বলিল, "এটি তুমি নাও, এটি আমার স্মৃতিচিহ্ন। যখন দেখবে বাঁশ ফাটতে আরম্ভ করেছে, তখন জানবে আমার অসুখ করেছে। যখন দেখবে বাঁট আগাগোড়া ফেটে গেছে তখনই জানবে আমার জীবন শেষ হয়েছে।" অপর বাঁটটি ডাম্‌বঙ তাহার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ ট্রুইট্‌লিঙের হাতে দিল।

এবার বিদায়ের পালা। যত বার ডাম্‌বঙ বিদায় লইতে চায় তত বারই ট্রুইট্‌লিঙ বলে, "আর একটু ব'স।" ডাম্‌বঙ দেখিল এভাবে ট্রুইট্‌লিঙের নিকট হইতে বিদায় লওয়া সম্ভব হইবে না। আবার, তাহার স্বামীর বাড়ীর কাছে বসিয়া এভাবে গল্প করাও নিরাপদ নয়। অনেক বুদ্ধি করিয়া ডাম্‌বঙ ট্রুইট্‌লিঙকে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া গেল। ট্রুইট্‌লিঙ কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী চলিয়া গেল।

ডাম্‌বঙকে ছাড়া ট্রুইট্‌লিঙ আর কিছু ভাবিতে পারে না, আর কিছু চিন্তা করিতে পারে না। সংসারের কাজকর্ম সে করে কিন্তু কিছুই তাহার ভাল লাগে না। দেখিতে দেখিতে কাল রোগ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। তাহার সেই রূপ আর নাই, সেই শরীর আর নাই। অল্পদিনের মধ্যেই ট্রুইট্‌লিঙকে বিছানার আশ্রয় লইতে হইল।

পলাইয়া আসিয়া ডাম্‌বঙের মনেও শান্তি নাই। অন্তরে তাহার সারাক্ষণই আগুন জ্বলিতেছে। ডাম্‌বঙ রোজ ট্রুইট্‌লিঙের দেওয়া কোদালের বাঁটটি দেখে। বাঁশের বাঁট তাহার সারা দেহে আগুন ছড়াইয়া দেয়, তবুও তাহা দেখিতে ভাল লাগে, না দেখিয়া উপায় নাই। এক দিন ডাম্‌বঙ দেখিল কোদালের বাঁট ফাটিতে আরম্ভ করিয়াছে। তার অন্তরে যেন শত শত রাক্ষস চীৎকার করিয়া উঠিল, 'তোমার প্রাণপ্রতিমার অসুখ করেছে, সে আর বাঁচবে না, সে আর বাঁচবে না।' ডাম্‌বঙ সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

এত বড় জোয়ান শরীর ডাম্‌বঙের যেন কালো হইয়া গেল, শুকাইয়া যেন কাঠ হইয়া গেল। খায় না, ঘুমায় না, সারাদিন বনে জঙ্গলে বসিয়া থাকে আর কি ভাবে। ডাম্‌বঙের বাবা চিন্তিত হইল, মা সমস্তই বুঝিতে পারিল। অবশেষে উভয়ে যুক্তি করিয়া ছেলের বিবাহ দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ছেলেকে কিছুতেই রাজি করান গেল না।

একদিন সকালে ডাম্‌বঙ দেখিল ঠুইঠ্‌লিঙের দেওয়া কোদালের বাঁট আগাগোড়া ফাটিয়া গিয়াছে। তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না তাহার প্রাণ-পাখী ঠুইঠ্‌লিঙ তাহার জন্যই শরীর ছাড়িয়া আকাশে উড়িয়া গিয়াছে। অন্তরে তাহার যতই ঝড় উঠুক, বাহিরে সে চুপ করিয়া রহিল।

ঠুইঠ্‌লিঙের ঘরে তাহার মৃত্যুসংবাদ লইয়া লোক আসিল। ঠুইঠ্‌লিঙের মা কাঁদিয়া বুক ভাসাইল। ঠুইঠ্‌লিঙকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য তাহার আত্মীয়েরা যাত্রা করিল। ডাম্‌বঙ সকলই দেখিতেছে, সকলই শুনিতেছে, তবুও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কুলপ্রথামত আত্মীয়-কুটুম্বেরা প্রত্যেকে গিয়া ঠুইঠ্‌লিঙের শবের উপর নূতন কাপড় দান করিল, কিন্তু কোন কাপড়েই ঠুইঠ্‌লিঙের শরীর সম্পূর্ণরূপে ঢাকা গেল না। একে একে ঠুইঠ্‌লিঙের বাবার ও স্বামীর গ্রামের প্রত্যেকে আসিয়া শবের উপর নূতন কাপড় দান করিল, কিন্তু কিছুতেই শব ঢাকা গেল না।

তখন কাহারও কাহারও মনে হইল,—ডাম্‌বঙ আসে নাই, হয়ত ডাম্‌বঙ কাপড় দিলে শব ঢাকা পড়িতে পারে। তখনই ডাম্‌বঙের জন্য লোক প্রেরিত হইল। ডামবঙ আসিল। আসিয়া সে শবের উপর হইতে সমস্ত নূতন কাপড় উঠাইয়া লইল, এবং নিজের চাদরখানি দিয়া অতি সহজে শবকে ঢাকিয়া দিল।

তাহার পর শবকে শবাধারে* রাখিতে হইবে। আত্মীয়কুটুম্ব সকলে চেষ্টা করিয়াও শবকে শবাধারে তুলিতে পারিল না। সকলের শেষে ডাম্‌বঙ শবকে তুলিয়া অতি সহজেই শবাধারে রাখিল। শবাধারকে ঘরে† লইয়া যাওয়াও আর কাহারও দ্বারা হইল না, ডাম্‌বঙ অতি সহজেই তাহা সম্পন্ন করিল।

ডাম্‌বঙ আর বাড়ী গেল না। সারাদিন পাহাড়ে জঙ্গলে কাঠ কাটিয়া বেড়াইল। তার পর সমস্ত কাঠ আনিয়া ঠুইঠ্‌লিঙের শবাধারে আগুনের তাপ দিতে লাগিল। এক মাস পর শবাধার খোলা হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য, শব গলে নাই, আগের মতই অবিকৃত আছে দেখা গেল। আবার শবাধার বন্ধ করা হইল, মোম দিয়া কাঠের মুখ জুড়িয়া দেওয়া হইল এবং আগের মতই ডাম্‌বঙ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শবাধারে আগুনের তাপ দিতে লাগিল। আরও এক মাস পর আবার শবাধার খোলা হইল এবং দেখা গেল,—আগের মতই শব অবিকৃত আছে। গ্রামের সকল লোক তখন ডাম্‌বঙের নামে নানা কুৎসা রচনা করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল। এমন কি কেহ কেহ তাহাকে মারিয়া ফেলিবে বলিয়াও ভয় দেখাইল।

শোকে দুঃখে অনাহারে অনিদ্রায় ডাম্‌বঙ বড় দুর্ব্বল ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এবার সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। একদিন শবের সামনে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, "ঠুইঠ্‌লিং, তোমার প্রেমে আমি আমার মান সম্ভ্রম লজ্জা সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়াছি, এখন বোধ হয় প্রাণও দিতে হইবে। ঠুইঠ্‌লিঙ, আমায় বিদায় দাও।" তখন আকাশবাণী হইল, "মাটিতে তোমার কাপড়খানা পাতিয়া দাও, কাপড়ে যাহা পাইবে, তাহা আমার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ তোমার মনোমত একটি স্থানে পুঁতিয়া রাখিবে।" ডাম্‌বঙ তাহার গায়ের কাপড়-খানা মাটিতে পাতিয়া দিল। তখনই উপর হইতে ঠুইঠ্‌লিঙের হৃৎপিণ্ডটি আসিয়া কাপড়ের উপর পড়িল। অতি যত্নের সহিত তাহা লইয়া ডাম্‌বঙ নিজের গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

ঠুইঠ্‌লিঙের বাবার জমিই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও সমতল। ডামবঙ তাহার ঠিক মাঝখানে হৃৎপিণ্ডটি পুঁতিয়া রাখিল। কিছু দিন পর সেখানে একটি বটগাছ জন্মিয়াছে

---

* এক টুকরা গাছের গোড়াকে মাঝখানে চিরিলে দুখানা হয়। তখন ঐ দুই খণ্ডের ভিতর হইতে সমস্ত কাঠ কাটিয়া ফেলিয়া নৌকার মত করা হয়। একখানার ভিতর শবকে রাখিয়া অপরখানা দিয়া ঢাকিয়া মোম দিয়া মুখ জুড়িয়া দেওয়া হয়। কেবলমাত্র বড়লোকদের জন্যই এই শবাধার ব্যবহৃত হয়।

† বাসগৃহের অল্প দূরে একটি ছোট ঘর তৈরি করা হয়। তাহার মধ্যে মাটি হইতে কিছু উপরে শবাধারটি রাখা হয়। তার পর কিছু দিন শবাধারে আগুনের তাপ দেওয়া হয়। তাহাতে শব শীঘ্রই পচিয়া যায়। শবাধারের নীচের দিকে একটি ছোট গর্ত্ত থাকে এবং তাহা হইতে একটি বাঁশের নল একেবারে মাটির ভিতর চলিয়া যায়। শবের গলিত অংশ ঐ ছিদ্রপথে নল দিয়া মাটির নীচে চলিয়া যায়। শবাধারের ভিতর তখন শুধু হাড়গুলি পড়িয়া থাকে। এক মাস পর শবাধার খুলিয়া মদ দিয়া ধুইয়া হাড়ের দুর্গন্ধ দূর করা হয়। তার পর হাড়গুলিকে একত্র করিয়া একটি পিতল, কাঁসা বা তামার পাত্রে রাখা হয়। একখানা কাঁসার থালায় পাত্রটির মুখ বন্ধ করিয়া পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় একটি গুহার মধ্যে পাত্রটি রাখিয়া আসা হয়। বিশিষ্ট লোকের শবের জন্যই এই ব্যবস্থা। কুকিদের সর্ব্বসাধারণ মাটিতে শবকে কবর দেয়, কুকি জাতির একটি শাখা হিন্দুদের মত শবদাহ করে।

দেখা গেল। দেখিতে দেখিতে এক বৎসরের মধ্যে বটগাছটি এত বড় হইয়া উঠিল যে সারা ক্ষেত একেবারে ঢাকিয়া ফেলিল। বটগাছটি কাটা ত দূরের কথা তাহার ডাল কাটিতে কাহারও সাহস হইল না, অথচ ডালপালা না কাটিয়া দিলে ক্ষেতে ফসল হইবারও কোন সম্ভাবনা রহিল না।

সকলেই বুঝিল যদি কেহ গাছের ডাল কাটিতে পারে, সে একমাত্র ডাম্বঙ। গাছের ডাল কাটিয়া দিতে ডাম্বঙকে অনুরোধ করা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই। কাজেই বাধ্য হইয়া ঠুইঠ্লিঙের বাবা এক দিন ডাম্বঙের কাছে গেল কিন্তু গাছের ডাল কাটিবার জন্য অনুরোধ করিতে তাহার বড়ই লজ্জা করিতে লাগিল। একথা-সেকথার পর সে ঘরে ফিরিয়া আসিল, আসল কথা আর বলা হইল না। তারপর ঠুইঠ্লিঙের মা ডাম্বঙকে অনুরোধ করিতে গেল, লজ্জায় সেও বলিতে পারিল না, অমনি ঘরে ফিরিয়া আসিল। ঠুইঠ্লিঙের একটি ছোট বোন ছিল। তাহার নাম তইনু। তখন ডাম্বঙকে ডাল কাটার কথা বলিবার জন্য তইনু গেল। ডাম্বঙের সঙ্গে বসিয়া সে অনেক গল্প করিল, কিন্তু ডাল কাটার কথাটি বলিতে পারিল না। ফিরিবার সময় তইনু দরজায় দাঁড়াইয়া "গাছের ডাল কাটতে—" মাত্র এই কথা কয়টি বলিয়াই দৌড়িয়া তাহার ঘরে চলিয়া গেল।

ডাম্বঙ সকল কথাই বুঝিতে পারিল। কিছুমাত্র রাগ না করিয়া সে ঠুইঠ্লিঙের বাবাকে জানাইয়া দিল,—পরের দিন গিয়া সে গাছের ডালপালা কাটিয়া আসিবে। ডাম্বঙের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ না দেওয়া যে কতবড় ভুল হইয়াছে, ঠুইঠ্লিঙের বাবা তাহা বুঝিতে পারিল। সে ভাবিল যদি তইনুকে ডাম্বঙের হাতে দেওয়া যাইতে পারে তবুও শেষ রক্ষা হয়। স্ত্রী স্বামী উভয়ে পরামর্শ করিল, কেহই ডাম্বঙের কাছে এই প্রস্তাব করিতে সাহস করিল না। তখন তাহারা মনে করিল,—তইনু যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, দেখিতেও সুন্দরী; যদি সে কোনও রকমে ডাম্বঙের মন হরণ করিতে পারে। তাহারা তইনুকে কৌশলে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিল।

পরদিন ডাম্বঙ গাছের ডালপালা কাটিবার জন্য ক্ষেতের দিকে যাত্রা করিল। তইনুও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেল। ডাম্বঙ খুব বুদ্ধিমান, সে পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল,—শীঘ্রই তাহাকে এই পরীক্ষায় পড়িতে হইবে। তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য তাহার সমবয়সী দুই-তিনটি বন্ধুকে সে বলিয়া গেল। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া গাছের ডাল কাটা শেষ হইল; গাছে থাকিয়াই ডাম্বঙ গান গাহিতে আরম্ভ করিল। তখন ডাম্বঙের বন্ধুরা দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "শত্রুরা তোমার গ্রাম আক্রমণ করিয়া লুঠ করিতেছে, মানুষ মারিতেছে, আর কাপুরুষ তুমি, গাছে উঠিয়া গান করিতেছ।" তাড়াতাড়ি ডাম্বঙ গাছ হইতে নামিয়া আসিল।

এদিকে গাছের নীচে তইনু নানা প্রকার খাবার তৈরি করিয়া ডাম্বঙের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ডাম্বঙ নামিয়া আসিতেই সে তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "এস, কত পরিশ্রমই না তোমার আজ হয়েছে। তোমার জন্য কিছু খাবার রেখেছি, এস খাবে। আজ আর তোমাকে বাড়ী যেতে দেব না, এখানেই আজ আমরা বিশ্রাম করব এবং রাতটা আনন্দে কাটিয়ে দেব।" ডাম্বঙ বলিল, "না, এখন আর খাবার বা বিশ্রাম করবার সময় নেই। শুনলে ত? শত্রুরা এসে আমাদের গ্রাম আক্রমণ করেছে। তুমি যদি আমার সঙ্গে না যাও, তবে আমিই চললাম।" তইনু তখন ডাম্বঙের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিল। ডাম্বঙ কিছুতেই রাজি হইল না; জোর করিয়া সে বাড়ী চলিয়া গেল।

ইহার পর ডাম্বঙ তাহার বাড়ীর উঠানে তাহার প্রিয়তমার নামে একটি ফুলগাছ রোপণ করিল। কিছু দিন পরেই তাহাতে ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিল। ঘুম হইতে উঠিয়া ডাম্বঙ রোজ সকালে দেখে,—গাছে একটা ফুলও নাই, কে সব চুরি করিয়া লইয়াছে। সন্দেহ করিয়া সে তাহার ছোট ভাইবোনদিগকে শাসন করিল ও সাবধান করিয়া দিল। পরদিনও ফুল নাই। ভাইবোনেরা আবার গালাগালি খাইল, প্রহারও লাভ করিল। তার পরদিনও দেখা গেল ফুল নাই। সেইদিন সারা রাত্রি জাগিয়া ডাম্বঙ ফুলগাছ পাহারা দিল। শেষরাত্রে দেখিল একটি বনবিড়াল আসিয়া ফুলগুলি তুলিয়া লইতেছে। আর যায় কোথায়! চুপি চুপি গিয়া ডাম্বঙ বনবিড়ালকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাহাকে মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল।

বনবিড়াল বলিল, 'আমায় মেরো না, যার জন্য তুমি

ফুলগাছ রোপণ করেছে, তার জন্যই আমি রোজ ফুল নিয়ে যাই।"

"সে কোথায় আছে?"

"সে স্বর্গে আছে।"

"তুমি আমাকে তার কাছে নিয়ে যাও।"

"মানুষ বেঁচে থাকতে সেখানে যেতে পারে না।"

"তুমি যেতে আসতে পার আর আমি পারব না? যদি তুমি আমাকে না নিয়ে যাও, তবে তোমাকে আমি মেরে ফেলব।"

"আচ্ছা বেশ, আমার লেজ ধর আর চোখ বোজ।"

ডাম্‌বঙ খুব শক্ত করিয়া বিড়ালের লেজ ধরিল ও চোখ বুজিল। বিড়াল তাহাকে লইয়া যাত্রা করিল। বনবিড়াল কোন্ পথে কি ভাবে তাহাকে লইয়া যাইতেছে ডাম্‌বঙ কিছুই বুঝিতে পারিল না। যাহা হউক, শীঘ্রই তাহারা ট্রইঠ্‌লিঙের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ট্রইঠ্‌লিঙ হঠাৎ ডাম্‌বঙকে দেখিয়া অবাক! উভয়ের আনন্দের সীমা নাই। মহা আনন্দে কিছু দিন কাটিয়া গেল। ডাম্‌বঙ স্বর্গে থাকিতে ক্রমশই কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল। এই কথা বুঝিতে ট্রইঠ্‌লিঙের দেরি হইল না। সে বলিল, "মানুষ মরলে স্বর্গে আসে। পৃথিবীর শরীর এখানে চলে না। তুমি যে এত দিন থাকতে পারলে, ইহাই আশ্চর্য্য। তুমি বাড়ী ফিরে যাও। তোমার মা-বাবাও তোমার জন্য বড় চিন্তিত আছেন।"

ডাম্‌বঙ উত্তর করিল, "ট্রইঠ্‌লিঙ, আমার দিন সেখানে কি ভাবে যে যাচ্ছে, তুমি কি বুঝতে পারছ না? আমায় ব'লে দাও, কি ক'রে আমি তোমার কাছে শীঘ্র শীঘ্র আসতে পারি।"

ট্রইঠ্‌লিঙ বলিল, "যদি শীঘ্র আমার কাছে চ'লে আসতে চাও তবে বাড়ী গিয়ে গোমেধ-যজ্ঞ ক'রো, যদি বিলম্বে আসতে চাও তাহ'লে পাখী দিয়ে যজ্ঞ ক'রো।"

চোখের জলে অভিষিক্ত করিয়া প্রেমিক-প্রেমিকা একে অন্যকে বিদায় দিল। বনবিড়াল ডাম্‌বঙকে তাহার বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল। ছেলেকে পাইয়া মাতাপিতা খুবই সুখী হইলেন। ডাম্‌বঙ গোমেধ-যজ্ঞের প্রস্তাব করিলে অতি আনন্দের সহিত তাঁহারা তাহাতে সম্মতি দিলেন। মহা ধুমধামে যজ্ঞ শেষ হইল। যজ্ঞশেষে ডাম্‌বঙ তাহার ঘরে গিয়া শুইয়া রহিল। একটি মুরগী উড়িয়া তখন ঘরের চালে বসিল। চাল হইতে একটি কাঠের টুকরা খসিয়া একেবারে ডাম্‌বঙের বুকে গিয়া বিঁধিয়া গেল এবং তখনই ডাম্‌বঙ প্রাণত্যাগ করিল।

ডাম্‌বঙের আত্মা তাহার প্রিয়তমা ট্রইঠ্‌লিঙের আত্মার সহিত মিলিত হইয়া চিরশান্তির আশ্রয় লাভ করিল।*

* কুকিদের কোন ধর্ম্মশাস্ত্র নাই। এই সব উপকথার উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের নানা ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মবিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে। কুকিরা পরলোক ও আত্মায় বিশ্বাসী। এই উপকথাটিই তাহার প্রমাণ। যদিও কুকিসমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, তবুও এই উপকথাটির আদর্শ গ্রহণ করিয়া আজ পর্য্যন্তও শত শত বিধবা পুনর্বিবাহ হইতে বিরত হইয়া সতী-নামের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছে।
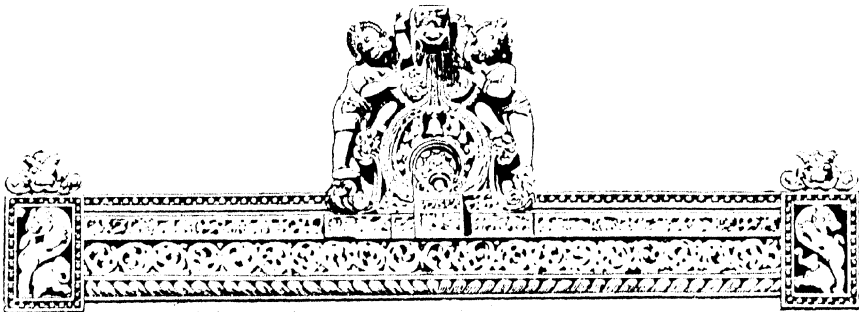
নব দিল্লীর উকীল-চিত্রবিদ্যালয়

শ্রীপরিমলচন্দ্র গুহ

[উকীল-ভ্রাতাদের নব দিল্লীর চিত্রবিদ্যালয়টি ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩২ সাল হইতে ইহার কাজ নিয়মিত ও উত্তম রূপে চলিতেছে। ছাত্রছাত্রীদের বেতন ছাড়া অন্য কোন সাহায্য এই বিদ্যালয় পায় না। উকীল-ভ্রাতারা এ পর্য্যন্ত গবর্ন্মেণ্টের বা মিউনিসিপালিটির কাছে সাহায্য চান নাই। তাঁহারা প্রধানতঃ এই অঞ্চলে শিল্প অনুশীলনের বিস্তার উদ্দেশ্যে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহাদের এই উদ্দেশ্য বহু পরিমাণে সফলও হইয়াছে। অ-বাঙালী ছাত্রছাত্রীও এখানে শিক্ষা পাইয়াছেন ও পাইতেছেন। সারদা বাবুর কয়েকটি ছাত্র ইতিমধ্যেই শিল্পক্ষেত্রে দিল্লী অঞ্চলে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

এই বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদিগকে জনপ্রতি ১০টাকা মাসিক বেতন ও প্রবেশিকা-ফী ৫টাকা দিতে হয়; মোট ২৪ জনের অধিক ছাত্রছাত্রী লওয়া হয় না। বিনা বেতনে এক জন ও অর্দ্ধ বেতনে এক জনকে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীর প্রতি মনোযোগ সুসাধ্য করিবার নিমিত্ত সংখ্যা ২৪ রাখা হইয়াছে।

সাধারণতঃ তিন বৎসরে সাধারণ চিত্রাঙ্কণ শিক্ষা সমাপ্ত হয়। প্রাচীরগাত্রে চিত্রাঙ্কণ (mural painting) শিখিতে আরও দুই বৎসর লাগে।

এই শিল্পবিদ্যালয়টির যাহাতে উত্তরোত্তর উন্নতি হয়, তাহার জন্য উকীল-ভ্রাতারা বিশেষ যত্নবান। ইহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং প্রতিবৎসর উৎকৃষ্ট শিল্প-প্রদর্শনীর দ্বারা তাঁহারা উত্তর-ভারতে বাঙালীর নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন। সর্ব্ব-সাধারণ, শিক্ষিত শ্রেণী, রাজা মহারাজা এবং ইংরেজ রাজপুরুষেরা তাঁহাদের শিল্পের অনুরাগী হইয়াছেন। সরকারী বা বেসরকারী কোন রকম সাহায্য না চাহিয়া ও না লইয়া তাঁহারা যাহা করিতে পারিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের বিদ্যানুরাগ ও পুরুষকারের পরিচায়ক।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

"প্রকৃতির যবনিকার অন্তরালে যে অনির্ব্বচনীয় অতীন্দ্রিয় লোক প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তারই আভাস কল্পনার ঐশ্বর্য্যে ও সুদক্ষ হস্তের তুলি-চালনার নৈপুণ্যে স্পষ্টতররূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মধ্যে নিয়ে আসার নামই চিত্রশিল্প।" চেন্নিনো চেন্নীনি (Cennino Cennini) তাঁর 'বুক অব আর্ট'-এ চিত্রশিল্পের সংজ্ঞা এই ভাবেই নিরূপণ করেছেন।

এই সংজ্ঞার অনুরূপ চিত্রকলাসম্পদের প্রাচুর্য্য দেখতে পাওয়া যায় উকীল-ভ্রাতাদের চিত্রশালা ও বিদ্যামন্দিরে। এই চিত্রশালা ও বিদ্যামন্দিরে প্রথিতযশা শিল্পী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল, শ্রীযুক্ত রণদাচরণ উকীল এবং তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের অঙ্কিত চিত্রসমূহের এক অপূর্ব্ব সমাবেশ ঘটেছে।

এই চিত্রবিদ্যালয়ের শিক্ষক উকীল-ভ্রাতৃদ্বয় চিত্রবিদ্যায় অনুবর্ত্তন করবার নির্দ্দেশ দেন না, এই তাঁদের বৈশিষ্ট্য। বস্তুত কোন যথার্থনামা শিক্ষকই সেরূপ শিক্ষা দিতে পারেন না। উকীল-ভ্রাতৃদ্বয়ও বিদ্যার্থীদের নিজের চিন্তা ও কল্পনাকেই শিল্পশিক্ষায় প্রধান স্থান দিয়ে উৎসাহিত করে থাকেন।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকীল প্রথমে তাঁর নিজের চিত্র-কক্ষে স্বল্পসংখ্যক ছাত্র নিয়ে এই বিদ্যালয়টি স্থাপনা করেছিলেন। বিলাত থেকে প্রত্যাগমনের পর শ্রীযুক্ত রণদাচরণ উকীলও এই বিদ্যালয়ের পরিচালনায় যোগ দিয়েছেন। লণ্ডনে রয়্যাল কলেজ অব আর্টে কয়েক বৎসর সুবিখ্যাত শিল্পী সর্ উইলিয়ম রোটেনষ্টাইনের শিক্ষাধীন থেকে চিত্রশিল্প সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। প্যারিস, বার্লিন, ভিনিস, মিলান এবং ইউরোপের আরও অনেক স্থানের প্রসিদ্ধ চিত্রশালা পরিদর্শন ক'রে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রে এসেছেন।

সুপরিচিত শিল্পী উকীল-ভ্রাতাদের শিল্পদক্ষতা সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা বাহুল্য। তাঁদের পরিচালনায় ছাত্রছাত্রীদের

তুলিকা অল্প সময়ের মধ্যেই ফলপ্রসূ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নব দিল্লীর চারু ও কারু শিল্প সমিতির উদ্যোগে ১৯৩৬ সালের মার্চ্চ মাসে যে পঞ্চম বার্ষিক শিল্প-প্রদর্শনী হয়ে গিয়েছে, তাতে এই বিদ্যালয়ের শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই পুরস্কৃত হয়েছেন।

এই বিদ্যালয়ের নবীন শিল্পীরা শিক্ষার্থী হ'লেও তাঁদের অনেক চিত্র দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; তারই কয়েকটির কিছু পরিচয় এখানে দিতে চাই।

শ্রীউমা যোশীর "অঞ্জলি" চিত্রে পুষ্পাঞ্জলিধৃত করপুটের কমনীয় ভঙ্গিমায় আত্মনিবেদন যেন রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই ছবিটির জন্য শ্রীমতী যোশী গত শিল্প-প্রদর্শনীতে ছাত্রী-বিভাগে 'বিড়লা পুরস্কার' পেয়েছেন।

শ্রীপ্রেমজা চৌধুরীর অঙ্কিত "জীবন-প্রদীপ" চিত্রটি ব্যঞ্জনা-মূলক। প্রাণ-প্রদীপের শিখার সাবলীল উর্দ্ধগতির বিভায় যুবতীর মুখমণ্ডল দীপ্ত, যৌবনলাবণ্য প্রতিভাত হয়েছে তার প্রদীপ্ত আননে। এ-প্রকার ছবির শিল্পরস উপভোগ্য। এই তরুণী শিল্পীর কল্পনাশক্তি ও নিপুণতা দুই-ই আছে।

শ্রীঅনিল রায় চৌধুরীর অঙ্কিত "পাহাড়ী মেয়ে" গত বৈশাখ সংখ্যার প্রবাসীতে প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়েছিল। সে ছবিটিতে পাহাড়ী মেয়ের সুগঠিত দেহলাবণ্য ও দৃষ্টি ভাবব্যঞ্জনা বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

শিল্পী শ্রীইন্দু ঘোষের "বাঁশীর সুরে" ছবিটিতে রাধার চিরনবীন কাহিনী অঙ্কিত হয়েছে। দূরাগত বাঁশীর সুরে বারিবাহিনীর হৃদয় উতলা, কলসী কক্ষচ্যুতপ্রায়।

শ্রীসুশীল সরকারের "মেলা হ'তে" চিত্রে আসন্ন সন্ধ্যার রূপ ও উৎসব-শেষের সকরুণতা প্রকাশ পেয়েছে।

শ্রীঅন্নদা সেন তাঁর 'আহারের সময়' ছবিটিতে পাখীর জীবনেও মাতৃত্বের মধুর রসটি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। শ্রীঅমর সেন, শ্রীসৌরেন সেন প্রভৃতিও এই বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র।

এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপরে প্রতিভাবান শিল্পী উকীল-ভ্রাতাদের শিল্পধারার যে প্রভাব পড়েছে সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু অনুকরণবৃত্তি এ-বিদ্যামন্দিরে কখনই শিক্ষা দেওয়া হয় না, শিল্পানুরাগীদের শিল্পপ্রতিভাও অঙ্কুরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

এই বিদ্যালয়ের জন্য বাঙালীর বিশেষ ক'রে আনন্দ করবার কারণ আছে। প্রধানতঃ এই স্বনামধন্য শিল্পীদের প্রচেষ্টাতেই উত্তর ভারতে বাংলার প্রবর্ত্তিত চিত্রকলার প্রচার সহজ ও সম্ভব হয়েছে। আরও সুখের বিষয় যে, প্রবাসী শিল্পোৎসাহীরা এঁদের সৌজন্যে ও শিক্ষাধীনে শিক্ষা লাভ করবার সুযোগ পাচ্ছেন এবং কেবল বাঙালীই নয়, সর্ব্বপ্রদেশের, সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীই এই শিল্পপীঠে শিক্ষা লাভ করছেন।

আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির গৌরব অ[illegible] রাখতে হ'লে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেদিকে [illegible]বাসীর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, [illegible]শবাসী এখনও এ-সম্বন্ধে একরূপ উদাসীন। এই ঔদাসীন্যের কারণ, সকলের মনে, এমন কি শিক্ষিত লোকদের মনেও, শিল্প-চেতনা এখনও জাগে নি। দেশের সর্ব্বত্র বার্ষিক প্রদর্শনী ও চিত্রশালা স্থাপন করলে সাধারণের মধ্যে শিল্প-চেতনা সহজে জাগতে পারে। এ-প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, অল্-ইণ্ডিয়া ফাইন আর্ট সোসাইটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বরদাচরণ উকীল দিল্লীতে একটি জাতীয় চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করছেন। অক্লান্ত পরিশ্রম, সবিশেষ চেষ্টা ও যত্নপ্রসূত বাঙালীর এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানটি দেশের একটি অমূল্য সম্পদ। এই শিল্প-প্রচেষ্টার জন্য এবং প্রতিষ্ঠাতা শিল্পীরা দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র।

ব্রহ্মদেশে বঙ্গ-সংস্কৃতি

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধদের এই গৌরবময় যুগ যখন ভারতসীমা অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল তখনও দেখা যায় এই বঙ্গ-মগধই ছিল তাহার প্রচারের প্রধান কেন্দ্রস্থল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গের বৌদ্ধ ভিক্ষু, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বণিক প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিয়া স্থাপত্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতিতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভারত প্রভাবান্বিত হয়। এই সময় হইতেই ব্রহ্মদেশ কিরূপ ভাবে বঙ্গ-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই দেখা যায় যে ব্রহ্মদের সহিত বাঙালীর একটি জাতিগত সাদৃশ্যও আছে। এই দুইটি জাতির ধমনীতেই মঙ্গলয়েড্ রক্ত প্রবাহিত এবং গঙ্গা-বিধৌত দেশ হইতেই একটি জাতি বঙ্গ ও আসামের মধ্য দিয়া প্রথম ব্রহ্মদেশে উপনীত হইয়া বসবাস করিতে থাকে। পরবর্ত্তী কালে বঙ্গ হইতে অভিরাজ দলবলসহ উত্তর ব্রহ্মে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তথায় সুপ্রাচীন তেগঙ্ নগর নির্ম্মাণ করেন।*

শকাব্দ (খ্রীষ্টীয় ৭৮ অব্দ) প্রবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর-ভারতের সহিত ব্রহ্মদেশের এইরূপ যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয় এবং এই সম্বন্ধে ট-সিন-কো 'আর্কিয়লজিক্যাল নোট্‌স্ অন্ পেগান' পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে শক-অব্দের প্রবর্ত্তন এবং হামাজাতে আবিষ্কৃত ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের বিশিষ্ট পদ্ধতিতে প্রমাণিত হয় যে উত্তর-ভারতের সহিত প্রোমের যোগাযোগ ছিল এবং খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে উত্তর- ও পূর্ব্ব-ভারত হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ঐ দেশে প্রবর্ত্তন করেন এবং ইহা গুপ্তাক্ষরে প্রথমে সংস্কৃতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল।

এমন কি হুয়েনসাংও সমতটে (গোমুখী) আসিয়াই শ্রীক্ষেত্র (প্রোম), দ্বারাবতী (শ্যাম), ঈশানপুর (কাম্বোজ) এবং মহাচম্পা দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত ইহা শুনিতে পান। তিনি বলিয়াছেন যে সুমাত্রা ছাড়িয়া এই দেশগুলি তাঁহার দেখা হয় নাই, কিন্তু সমতটে আসিয়া ইহাদের সম্বন্ধে সবিস্তার শুনিতে পাইয়াছিলেন (Watters, *Yuan Chwang*, Vol. II, p. 187)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে হুয়েনসাং-এর আগমনের পূর্ব্ব হইতেই সমতটের লোকদের সহিত এই সুদূর পূর্ব্বখণ্ডের একটি গভীর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং তন্ত্রযান-যুক্ত মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রহ্মদেশে, বিশেষতঃ পেগানে, উত্তর-পূর্ব্ব ভারত হইতেই আগমন করে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ-ব্রহ্মে অবস্থিত থাটনে প্রচলিত পালি বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বে উত্তর-ব্রহ্মে তন্ত্রযান-যুক্ত বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থিতি ছিল একথা প্রস্তর ও ব্রোঞ্জের মহাযান দেবদেবী অবলোকিতেশ্বর, তারা, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি মূর্ত্তি আবিষ্কারে প্রমাণিত হইয়াছে। এইস্থানে প্রচলিত উত্তর-ভারতের তান্ত্রিক-বৌদ্ধমতাবলম্বী অরি-সম্প্রদায়ও উহার সমর্থন করিতেছে। (C. Duroiselle, *The Aris of Burma and Tantric Buddhism*)

পেগানের খোদিত লিপি দেখিলেও ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে প্রকৃত ব্রহ্মে উত্তর দেশের মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মই প্রথমে প্রচারিত হয় এবং বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ প্রবর্ত্তিত হইলে উহাও উত্তর দেশের সংস্কৃত অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা হইত। সর্ আর্থার ফেয়ারির মতেও বৌদ্ধ ভিক্ষুকেরা বঙ্গ ও মণিপুরের মধ্য দিয়া উত্তর-ব্রহ্মে প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। ট-সিন-কো তাঁহার 'আর্কিয়লজিক্যাল নোট্‌স্ অন্ পেগান' পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় নিয়াঙ-উর

---

* *A Short History of Burma* by S. W. Cocks, pp. 6-9. *Burmese Sketches* by Taw Sein Ko, pp. 1-3.

(*Nyaung-u*) চৌককু ওন্ মিন্ গুহা-মন্দির সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন যে চৌককু মন্দির আরাকানের মহামুনি-বিহারের মত উত্তর-ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের স্মৃতি বহন করিতেছে এবং এই উত্তর-ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্ম সিংহল ও থাটন হইতে আগত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ার বহু পূর্ব্বেই ব্রহ্মদেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

এইরূপে দেখিতে পাই যে ব্রহ্মদেশ উত্তর-ভারতের মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা ধীরে ধীরে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। পেগানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গ-সংস্কৃতি স্থাপত্য, ধর্ম্মে, শিল্পে, সাহিত্যে ব্রহ্মদেশে কি অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তত্ত্বের সহিত, স্বচক্ষে যাহা দেখিয়া আসিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে তৎকালীন বঙ্গে বৌদ্ধদের অবস্থা সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরুত্থানে বঙ্গে বৌদ্ধদের প্রতি অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ হয়। সম্ভবতঃ এই উৎপীড়নে, ও তিব্বতীয়গণ কর্ত্তৃক অষ্টম শতাব্দীতে বঙ্গ-বিজয়ের ফলে, বৌদ্ধেরা দলে দলে এই দেশ হইতে সুদূর পূর্ব্বখণ্ডে চলিয়া যাইতে থাকেন। (*Bombay Gazetteer*, vol. 1, p. 493) মসিয় সেনার (M. Senart) ও শ্রী সান্তর (Srei Santhor) খোদিত লিপি বিচার-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে তারনাথ বহু বৌদ্ধের মগধদেশ হইতে অষ্টম শতাব্দীতে ইন্দোচীন আসিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হার্ভে সাহেবও তাঁহার 'হিষ্ট্রি অব বর্ম্মা' পুস্তকের ৪০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, যে সকল ধর্ম্মনিষ্ঠ বৌদ্ধ ভারতে উৎপীড়িত হইয়া শ্যামদেশ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পেগান তীর্থস্থানের প্রসিদ্ধিতে আকৃষ্ট হইয়া ঐ স্থানে আসিয়াছিলেন। রাজা চান্‌জিথ (Kyanzttha) এইরূপ আটজন ভিক্ষুককে স্বহস্তে ভোজনসামগ্রী দিয়া আপ্যায়িত করেন এবং গভীর মনোযোগ সহকারে তাহাদের নিকট হইতে উড়িষ্যার উদয়গিরি পর্ব্বতের অনন্ত-মন্দির সম্বন্ধে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে বল্লালসেনের রাজত্ব-কালেও বাংলায় বৌদ্ধেরা ভীষণ ভাবে নির্যাতিত হয় এবং সেই জন্য তাহারা দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। ইহারা নানা দিকে বৌদ্ধ মত প্রচার করিত এবং সুদূর পূর্ব্বখণ্ডে দক্ষিণ এশিয়ার সহিত বাণিজ্য করিত।*

বৌদ্ধদের অভিযানের ফলে ব্রহ্মদেশে প্রসারিত বঙ্গ-সংস্কৃতি জলপথ অপেক্ষা স্থলপথই অধিক অবলম্বন করিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বহুকাল হইতেই আসাম ও মণিপুরের মধ্য দিয়া ব্রহ্মদেশের এই পথ দেশবাসীর নিকট সুপরিচিত ছিল এবং ডক্টর কুমারস্বামীও তাঁহার 'হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইণ্ডোনেশিয়ান আর্ট' পুস্তকের ১৬৯ পৃষ্ঠায় ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, সম্ভবতঃ মৌর্য্য যুগেই ভারতের সহিত জলপথে ও স্থলপথে ব্রহ্মদেশের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল এবং উক্ত পুস্তকের ১৭২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে তেগঙ্ ব্রহ্মদেশের শাসনকর্ত্তাদের সুপ্রাচীন নগর ছিল এবং ইহার ভারতীয় সংস্কৃতি দক্ষিণ হইতে আসে নাই, মণিপুর এবং আসামের মধ্য দিয়াই আসিয়াছে। হার্ভে সাহেব তাঁহার 'হিষ্ট্রি অব বর্ম্মা' পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে উত্তর-ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব শুধু উপকূল দিয়াই আসে নাই, আসামের মধ্য দিয়া আগত মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চম শতাব্দীতে স্থাপত্য প্রভৃতিও পেগানে উপনীত হইয়াছিল। ফাগুসানও তাঁহার 'হিষ্ট্রি অব ঈষ্টার্ণ আর্কিটেক্‌চার' পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে উত্তরে তেগঙ্ ব্রহ্মদের সর্ব্বপ্রাচীন রাজধানী ছিল। উহার সহিত উত্তর-ভারতেরই প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং তাহারা তাহাদের ধর্ম্ম পশ্চিমাবর্ত্তন দিয়া বঙ্গদেশ হইতেই পাইয়াছিল।

ইহা হইতে দেখি যে বঙ্গ-সংস্কৃতির ধারা বহু প্রাচীন কাল হইতেই উত্তর-ব্রহ্মে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তেগঙ্-এর এই প্রাচীন সংস্কৃতি ভালভাবে আবিষ্কৃত হয় নাই, তাহার উপকরণও নাই। এ সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া আমরা দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে

* Introduction, *Modern Buddhism and its followers iu Orissa*: N. N. Vasu.
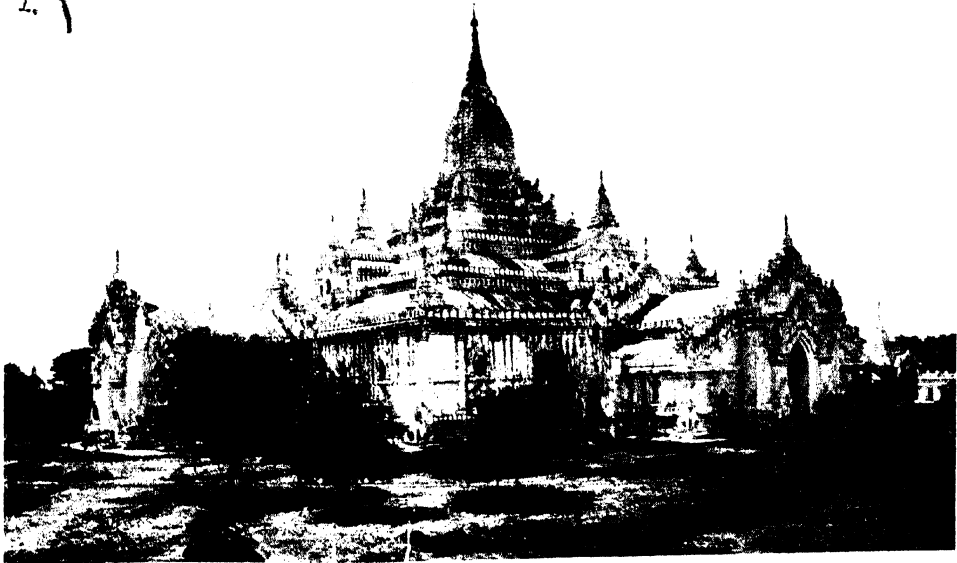
উপরে : মহাবোধি প্যাগোডা
নীচে : আনন্দ-মন্দির

আনন্দ-মন্দিরের দগ্ধমৃৎ-ফলক
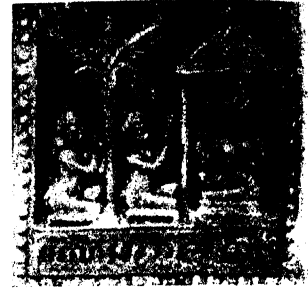
আনন্দ-মন্দিরের দগ্ধমৃৎ-ফলক
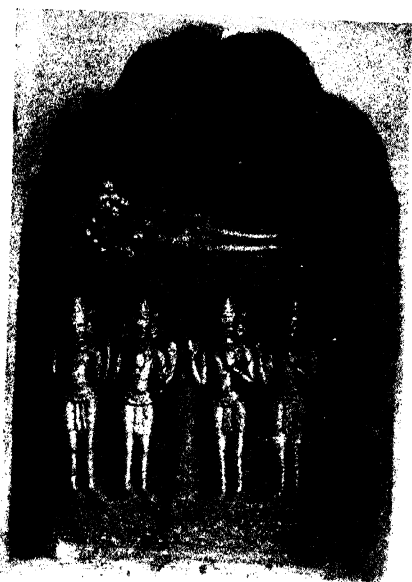
আনন্দ-মন্দিরের প্রস্তর-মূর্তিনিচয়

মহীশূরে অগ্নিক্রীড়া

উৎসবের প্রারম্ভে বাদ্যোদ্যম

অগ্নিক্রীড়কদিগের দলপতি কর্ত্তৃক তূর্য্যধ্বনি

বহ্নি-পরিক্রমা

[৭৫২ পৃ., 'অগ্নিপরীক্ষা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

পেগানে যে অপূর্ব্ব স্থাপত্য শিল্প রহিয়া গিয়াছে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

নদীতীরবর্ত্তী প্রায় দশ মাইল স্থান ব্যাপিয়া পেগানের ধ্বংসাবশেষ বিস্তৃত এবং ঐ স্থানে আট শত হইতে এক হাজারের অধিক মন্দির রহিয়াছে। নিয়াঙ্-উ, পেগান, মিন্‌পাগান, মিন্নান্ প্রভৃতি স্থানের মন্দিরগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়—(১) স্তূপাকৃতি মন্দির (২) চতুর্ম্মুখ বিহার (৩) বর্ত্তমান দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মত একতল ও দ্বিতল মন্দির। পেগানের ইতিহাস বহু পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইলেও রাজা অনরথের (১০৪৪-৭৭ খ্রীঃ) সময় হইতেই পেগান সর্ব্ব বিষয়ে একটি সমৃদ্ধশালী নগরে পরিণত হয়। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, এই সময় দলে দলে বৌদ্ধেরা বঙ্গ হইতে উত্তর-ব্রহ্মে গিয়া বঙ্গ-সংস্কৃতি বিস্তার করিতেছিল। অনরথও এই সময়ে বঙ্গদেশের সহিত সরাসরি ভাবে যোগসূত্র স্থাপন করেন। হার্ভের 'হিষ্ট্রি অব বর্ম্মা' পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে অনরথ সৈন্যদল সহ 'দি ইণ্ডিয়ান্ [illegible] অব বেঙ্গল' পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং অনন্তর চট্টগ্রামে মানুষের কুহক-মূর্ত্তি স্থাপিত করেন।

অনরথ যে কয়েকটি মন্দির প্রস্তুত করেন তাহার মধ্যে নিয়াঙ্-উতে অবস্থিত মোয়েজ্ঞিগন-প্যাগোডাই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহার গাঁথুনি নিরেট, দেখিতে স্ফীত ও গোলাকৃতি। অনরথ এই মন্দিরটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া যান; তাঁহার পুত্র রাজা চান্‌জিথ কর্ত্তৃক ইহা সম্পূর্ণ হয়। পেগানে এইরূপ স্ফীত ও সমগোলাকৃতি যে সকল স্তূপ আছে উহার সহিত আমাদের সারনাথ ও পালযুগের উৎসর্গীকৃত স্তূপের একটি বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অনরথের পুত্র রাজা চান্‌জিথের সময় হইতেই পেগানে বঙ্গের শিল্পী প্রতিভা-প্রদর্শনের সুযোগ পাইয়াছিলেন। চান্‌জিথের নিকট বঙ্গদেশ সুপরিচিত ছিল; তিনি আরাকান ও বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করিয়া ঐ স্থানের রাজকুমারীকে বিবাহ করেন, ইহা কক্‌স্ তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন।

চানজিথই পেগানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ-মন্দির ১০৯১ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করান। মন্দিরটি বর্গক্ষেত্রের আকৃতিতে নির্ম্মিত কিন্তু প্রত্যেক ধারেই কতকটা অংশ বর্দ্ধিত আছে। মন্দিরের প্রত্যেক দিকে চারিটি দীর্ঘ বাহু আছে এবং নিম্নাংশ ক্রুশের আকারে নির্ম্মিত। মন্দিরটিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নতলটি একটি নিরেট গাঁথা পোতার উপর নির্ম্মিত হইয়াছে এবং পোতার চতুর্দ্দিকে একটি সুবিস্তৃত প্রদক্ষিণ-পথ। মন্দিরের চতুর্দ্দিকের প্রাচারের বহির্ভাগ প্রায় ১৫০০ মৃত্তিকা-নির্ম্মিত মূর্ত্তি-ফলকদ্বারা শোভিত। মন্দিরের চতুর্দ্দিকের প্রাচীর, বেদী হইতে মাত্র এই প্রদক্ষিণ-পথ দ্বারাই বিচ্ছিন্ন, নহিলে একেবারে ভরাট গাঁথুনি। তবে মাঝে মাঝে মূর্ত্তি-স্থাপনার জন্য প্রায় আশিটি কুলুঙ্গি আছে। মন্দিরের মধ্যে চারিটি বেদী আছে; উহার প্রধান বেদীটি একটি খিলান-করা ছাদ-বিশিষ্ট কক্ষমধ্যে রক্ষিত। প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়া উপরের তলগুলিতে উঠা যায় কিন্তু ইহার সমস্ত কারুকার্য্য ও মূর্ত্তি-ফলকই বহির্ভাগে স্থাপিত। এরূপভাবে মোটামুটি তিনটি ক্রমহ্রস্বায়মান তলে মন্দিরটি সম্পূর্ণ।

ইহার মূর্ত্তি ও দগ্ধ-মৃত্তিকা-ফলক প্রভৃতি বিচার করিবার পূর্ব্বে, সম্প্রতি বঙ্গদেশে যে পাহাড়পুর মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে ঐ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের বার্ষিক বিবরণীতে পাহাড়পুরের চতুর্ম্মুখ বিহার সম্বন্ধে লিখিত আছে যে মন্দিরের গঠন নিতান্ত সরল। এই ত্রিতল মন্দিরটির নিম্নাংশ ক্রুশের আকারে নির্ম্মিত। এই ক্রুশের দীর্ঘতম বাহু ছিল উত্তর দিকে। নিম্নতলে কোনও গৃহাদি নাই, একেবারে ভরাট গাঁথুনি। তাহার উপরে দ্বিতলটি একটি নিরেট গাঁথা পোতার উপর নির্ম্মিত। দ্বিতলের পোতার চতুর্দ্দিকে একটি সুবিস্তৃত প্রদক্ষিণ-পথ। পথটি বাহিরের দিকে আবক্ষ উন্নত, নিম্ন প্রাচীরে ঘেরা। এই প্রাচীরের বহির্ভাগ মৃত্তিকানির্ম্মিত ও মূর্ত্তি-ফলক দ্বারা শোভিত। মন্দিরের প্রধান বেদীটি একটি খিলান-করা ছাদবিশিষ্ট কক্ষমধ্যে রক্ষিত। কক্ষটির উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে স্তম্ভ পরিবৃত এক একটি সুবৃহৎ মণ্ডপগৃহ। বর্গক্ষেত্রের আকৃতিতে মন্দিরটি নির্ম্মিত এবং প্রত্যেক ধারেই কতকটা অংশ বর্দ্ধিত আছে। এইরূপ ভাবে ক্রমহ্রস্বায়মান তলে মন্দিরটি সম্পূর্ণ। উত্তর দিকের প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়া উপরের

তলগুলিতে উঠা যায়। পঞ্চম শতাব্দীতে নির্ম্মিত পাহাড়পুরের ভিত্তিভূমি ও নক্সার সহিত আনন্দ মন্দিরের ভিত্তিভূমি ও নক্সার আশ্চর্য্য রকম মিল দেখা যাইতেছে। পাহাড়পুর আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে দ্বীপময় ভারতের ক্রুশাকৃতি ভিত্তির মূল ভারতে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই এবং সেই জন্য অনেক মনীষী ইহাও বলিয়াছেন যে উহা তাঁহাদের নিজস্ব স্থাপত্যধারা।
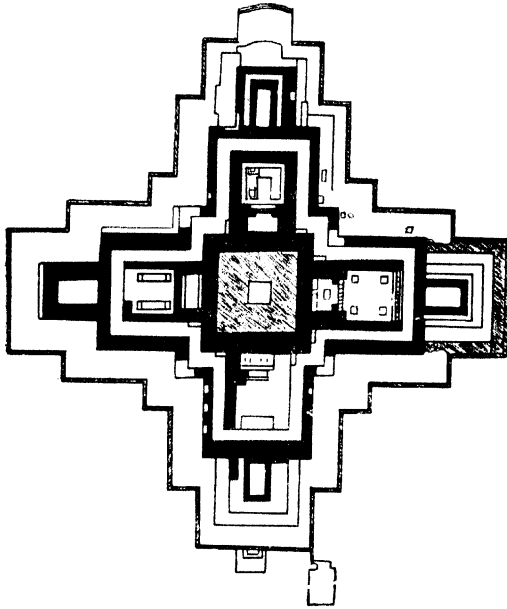
পাহাড়পুর মন্দিরের ভিত্তিভূমি

কিন্তু খোদিত লিপি, তাম্রশাসনপত্রের বিবৃতি এবং স্থলপথে ও জলপথে বঙ্গদেশের সহিত দ্বীপময় ভারতের যোগাযোগ এবং এই মন্দিরগুলি হইতে তিন-চারি শত বৎসরের পূর্ব্বের পাহাড়পুরের মন্দির প্রভৃতি বিচার করিয়া গত ১৩৪২ সনের অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে প্রকাশিত "বৃহত্তর ভারতে বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রভাব" প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে বঙ্গের এই চতুর্ম্মুখ বিহারই অন্যান্য দেশে আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছিল। দীক্ষিত-মহাশয়ও প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ১৯২৬-২৭ সালের বার্ষিক বিবরণীর ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, স্থাপত্য শিল্প-শাস্ত্রে ভারতীয় মন্দিরের প্রধান তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়; প্রথম নাগরী, দ্বিতীয়টি দ্রাবিড় এবং চালুক্য অর্থাৎ বেশর এবং তৃতীয়টি সর্ব্বতোভদ্র। এই সর্ব্বতোভদ্র ধারার অর্থাৎ যথানুপাতিক ত্রিতল অথবা চতুস্তল মন্দির পাহাড়পুর ভিন্ন ভারতের অন্য কোন প্রদেশে পাওয়া যায় নাই এবং উহার নির্ম্মাণপদ্ধতি বহু পূর্ব্বেই অন্যান্য প্রদেশবাসী ভুলিয়া গিয়াছিল। ভারতীয় এই বিশিষ্ট স্থাপত্য-পদ্ধতি সুদূর পূর্ব্বখণ্ডে বিশেষতঃ ব্রহ্মদেশ, জাভা এবং কাম্বোডিয়ার স্থাপত্যকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।
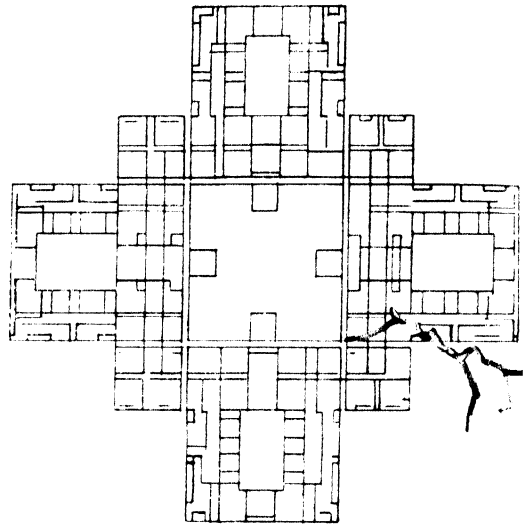
আনন্দ-মন্দিরের ভিত্তিভূমি

সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে পাহাড়পুর হইতে প্রায় পাঁচ শতাব্দী পরে নির্ম্মিত পেগানের আনন্দ-মন্দিরে পাহাড়পুরের এই বিশিষ্ট পদ্ধতি মূল আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছিল। আনন্দ-মন্দিরের দগ্ধ-মৃত্তিকা-ফলক ও মন্দিরাভ্যন্তরের প্রস্তর-মূর্ত্তিগুলি বিচার করিয়া দেখি যে মূর্ত্তিগুলির দেহের গঠন খুব দৃঢ়, অথচ সুন্দর ও কমনীয়। একটি নিটোল টানে তাহাদের হস্ত পদ ও বক্ষ হইতে ক্রমশঃ কৃশ কটিদেশ পুনরায় নিতম্ব অবধি উন্নত হইয়া একটি বিশেষ ভঙ্গীতে যে-রূপ পাইয়াছে তাহা আমাদের নবম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পাল- ও সেন- রাজদের নির্ম্মিত পূর্ব্ব-বিভাগের মূর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। মূর্ত্তিগুলির মুখাবয়ব

গোলাকৃতি কিন্তু চিবুকের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম এবং নিম্ন ওষ্ঠের ঈষৎ-বক্র ভঙ্গিমায় আত্মপ্রসাদজনিত একটি দিব্যভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। নাসিকা ও কপাল উন্নত; কমনীয় ভ্রূর নিম্নে অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষুর আত্মহারা ভাবে মূর্ত্তিগুলির মুখাবয়ব এক অনির্ব্বচনীয় শান্তশ্রীতে মণ্ডিত হইয়াছে। বঙ্গীয় শিল্পের অনুরূপ মূর্ত্তিগুলির বক্ষ সাধারণতঃ উন্মুক্ত এবং উন্নত, শুধু কটিদেশ বস্ত্রাবৃত এবং উহাও আবার মাত্র কয়েকটি রেখার সমাবেশে পূর্ণ। প্রায় সমস্ত মূর্ত্তিতেই মুকুট, সিঁথি, অঙ্গদ, বলয়, কণ্ঠহার, মুক্তাজাল, মেখলা, কাঞ্চী, বাজুবন্ধ, মণিবন্ধ, কটিবন্ধ, নূপুর প্রভৃতি অসংখ্য অলঙ্কার চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৩৩৪ সালের 'প্রবাসী'তে "গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাস" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে গান্ধারের শিল্প-নিদর্শন যেমন খোটানের মরুভূমি হইতে মথুরা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র আদর পাইয়াছিল, মথুরার শিল্পীর রক্ত-প্রস্তরে গঠিত মূর্ত্তি যেমন লোক পূর্ব্বে বুদ্ধগয়া, দক্ষিণে সাঞ্চী ও পশ্চিমে মুলতান-ভেরাগড় পর্য্যন্ত লইয়া যাইত, বারাণসীর চুনারের বুদ্ধ-মূর্ত্তি যেমন বরেন্দ্রভূমির বাঙালী নিজের দেশে লইয়া আসিয়া মন্দির-প্রতিষ্ঠা করিত, সেইরূপ গৌড়ীয় ভাস্করের মূর্ত্তি খ্রীষ্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত পশ্চিমে শ্রাবস্তী, দক্ষিণে পুরী বা পুরুষোত্তম, পূর্ব্বে ব্রহ্ম, শ্যাম ও মলয় উপদ্বীপ এবং উত্তরে তিব্বত পর্য্যন্ত সাদরে গৃহীত হইত।*

আনন্দ-মন্দিরের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, মন্দিরের অভ্যন্তর-ভাগ বাংলা দেশের মন্দিরের মত খিলান-করা এবং উহা হইতে শব্দ করিলে তৎক্ষণাৎ প্রতিধ্বনি হয়। ইহা অনেকে লক্ষ্য না করিলেও আমার মনে হয় বাংলা দেশের মন্দিরের ইহাও একটি বিশেষত্ব। এক কথায় বলা যাইতে পারে, যদি পাহাড়পুরের পরে বাঙালী নিজস্ব কোন স্থাপত্য-শিল্প লইয়া গর্ব্ব করিতে চায় তবে উহা পেগানের আনন্দ-মন্দির।

* "Possibly there was a regular manufacture of such images for the Burma market long after Buddhism had died in Upper India."—Harvey, *History of Burma*, p 11.

পরবর্ত্তীকালে অমরাপুরে চাউক্‌টজি (Kyauktaugyi) মন্দির (১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ), এবং পেগানের ধম্ময়নজি (Dhammayangyi) (১১৬০ খ্রীষ্টাব্দ) এবং অনরথের পৌত্র আলঙসিথু (ইনিও অর্ণবপোতে 'ইণ্ডিয়ান ল্যাণ্ড অব বেঙ্গল' পরিভ্রমণ করিতে আসিয়া পিতামহ অনরথ কর্ত্তৃক স্থাপিত মূর্ত্তিগুলি দেখিয়াছিলেন) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত থাট পিন্নু (১১৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) মন্দির প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছিল। এই মন্দিরাবলীর স্থাপত্যবিজ্ঞান ও মূর্ত্তিসমূহের সহিত বিশেষ ভাবে আরাকানের মহামুনি-প্যাগোডার নাগরাজ ও দেব মূর্ত্তি এবং পেগানের নাৎ হ্লাং গ্যাং (Nat-Hlaung Gyaung) মন্দিরের কল্কি, সূর্য্য, রামচন্দ্র, পরশুরাম প্রভৃতি মূর্ত্তিগুলির গঠন-পদ্ধতির একটি পরস্পর ঐক্য লক্ষিত হয়। ডক্টর কুমারস্বামীও তাঁহার 'হিষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইণ্ডোনেশিয়ান আর্ট' পুস্তকের ১৭০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে নান্‌-পায়া (Nan-paya) ফলকগুলি ও হ্লাং গ্যাং মন্দিরে উৎকীর্ণ দশ অবতারের প্রস্তরমূর্ত্তি খাঁটি ভারতীয়, এবং একাদশ শতাব্দীর ব্রোঞ্জ ও বিশেষতঃ প্রস্তর মূর্ত্তিগুলি বঙ্গ অথবা বিহার হইতে আমদানী হইয়াছিল। স্থাপত্য-শিল্পে মাত্র বুদ্ধগয়ার অনুকরণে পেগানে নন্‌দাঙ-মিয়া-মিন্ (Nan-daung Mia Min) কর্ত্তৃক ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত মহাবোধি প্যাগোডাই দেখিতে পাই। মন্দিরটি সমচতুর্ভুজাকার এবং ইহার দুই-তিনটি শ্রেণীবদ্ধ কুলুঙ্গি-বিশিষ্ট একতলের ভিত্তি খুব উচ্চ। মধ্যে গোলাকৃতি বেদী বাদ রাখিয়া ইহা পিরামিডাকৃতি সমতল মন্দির। এই মন্দিরটির সহিত বঙ্গদেশের বুদ্ধগয়া মন্দিরের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে।*

* রাজা আলঙসিথুর সময়েই বুদ্ধগয়া-মন্দির সংস্কৃত হয় এবং তাঁহার উৎসর্গীকৃত একখানি খোদিত লিপি বুদ্ধগয়া মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে।

[এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত চিত্রগুলি প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

ভারতবর্ষের ক্ষয়িষ্ণুতম প্রদেশ

শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত

স্বাভাবিক লোকবৃদ্ধি

যে-সকল কারণে দেশের লোকক্ষয় হয়, যুদ্ধ তাহার অন্যতম। আত্মরক্ষা অথবা পররাজ্যলালসায় মৃত্যুর সম্মুখীন হইবার প্রয়োজনীয়তা পরাধীন ভারতবাসীর বহুদিন যাবৎই নাই। ইংরেজ রাজসরকার সৈন্যদলে ভারতবাসীকে গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজন হইলে ভারত-সাম্রাজ্যের সীমার বাহিরেও প্রেরণ করেন সত্য কিন্তু এই সকল সৈন্যবাহিনীতে বাঙালীর কোন স্থান নাই। মৃত্যুর একটি দূতের হস্ত হইতে বাঙালী সম্পূর্ণরূপে "সুরক্ষিত"। লোক-বিধ্বংসী প্রবল জল-প্লাবন অথবা ভূ-কম্পন অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলার বক্ষে সচরাচর অধিক আলোড়ন তুলে না। তবু বাংলা ভারতবর্ষের ক্ষয়িষ্ণুতম প্রদেশ। ১৯৩৪ সালের বাংলার স্বাস্থ্য-সম্পর্কে সরকারী রিপোর্ট হইতে নিম্নোদ্ধৃত তালিকায় ঐ বৎসরের অবস্থা এইরূপ :

প্রদেশ	হাজার-করা জন্মের হার	হাজার-করা মৃত্যুর হার	স্বাভাবিক লোকবৃদ্ধি
বাংলা	২৯·৩	২৩·৬	৫·৭
মাদ্রাজ	৩৬·১৭	২০·৯৫	[illegible]·২
বোম্বাই	৩৫·৭৯	২৫·৪২	১০·৩৭
আগ্রা-অযোধ্যা	৩৬·৭৪	২৬·৭৫	৯·৯৯
পঞ্জাব	৪০·০১	২৭·৭০	২·৩১
মধ্যপ্রদেশ	৪৪·৮০	৩৭·২২	৭·৫৮
বিহার-উড়িষ্যা	৩৩·৭	২৬·০	৭·৭
উ-প-সীমান্ত	৩০·৮৩	২১·০৬	৯·৭৭
ব্রহ্ম	৩০·২২	২০·৬২	৯·৬০
আসাম	৩০·৬২	১৯·৬৪	[illegible]·৯৮

জন্মের হার বাংলায়ই সর্ব্বাপেক্ষা কম। মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নহে সত্য, কিন্তু প্রথমটি হইতে দ্বিতীয়টি বাদ দিয়া যে স্বাভাবিক লোকবৃদ্ধির হার নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, তাহা বাংলায়ই সর্ব্ব-নিম্ন।

একমাত্র ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দেই বাংলার এ শোচনীয় অবস্থা ছিল, তাহা নহে। বরং পূর্ব্ব বৎসর, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ, অপেক্ষা এ-বৎসর সামান্য উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে। সে-বৎসর অপেক্ষা এ-বৎসর জন্মের হার হাজার-করা ·২ বেশী ও মৃত্যুর হার হাজার-করা ·৪ কম অর্থাৎ স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার হাজার-করা ·২ বেশী।

সংখ্যা-হিসাবে বাংলায় লোকবৃদ্ধি এইরূপ :

বৎসর	জন্ম	মৃত্যু	বৃদ্ধি
১৯৩৪	১৪,৬১,৫২০	১১,৭৬,৮৮৬	২,৮৪,৬৩৪
১৯৩৩	১৪,৭৩,৯৪৪	১১,৯৭,৮৮৫	২,৭৬,০৫৯
১৯৩২	১৩,২৮,৩৩৪	১০,২২,২১৯	৩,০৬,১১৫

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সেন্সাস বা লোক-গণনানুসারে বাংলার জনসংখ্যা ৪,৯৯,০১,০৮০।

জিলাসমূহের ক্ষয়িষ্ণুতা

প্রাদেশিক ক্ষয়িষ্ণুতা জিলাসমূহের ক্ষয়িষ্ণুতার সমষ্টি মাত্র। জিলাসমূহের স্বাভাবিক লোকবৃদ্ধির হার আলোচনা করিলে বাংলার অবস্থা কি শোচনীয় হইয়াছে তাহা অনেকটা পরিষ্কার হইবে।

[বৃদ্ধি + হ্রাস —]

জিলা	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩৪
কলিকাতা	—[illegible]·৩	৭·৭	—৭·২
প্রেসিডেন্সী বিভাগ			
চব্বিশ পরগণা	+ ৭·৯	+ ৯·৮	+ ৯·১
যশোহর	— ৫·৯	— ৪·০	+ ৩·৩
নদীয়া	+ ১·৯	+ ৫·১	+ ৫·৯
মুর্শিদাবাদ	+ ১২·৯	+ ১৬·০	+ ৫·১
খুলনা	+ ৪·৫	+ ৪·৪	+ [illegible]·৬
বর্দ্ধমান বিভাগ			
হাওড়া	+ ৭·০	+ ৭·৪	+ ৭·[illegible]
হুগলী	+ ৩·১	+ ৫·২	+ [illegible]·৪
বীরভূম	+ ৪·৬	+ ৮·১	— ০·৮
বর্দ্ধমান	+ ৩·১	+ ৪·৮	+ [illegible]·৬
বাঁকুড়া	+ ৬·০	+ ৬·০	+ ৪·০
মেদিনীপুর	+ ৪·৭	+ ৭·২	+ ৫·৭
রাজসাহী বিভাগ			
রাজসাহী	+ [illegible]·৪	+ ৯·৬	+ ৩·৯
বগুড়া	+ ৫·৫	+ ১·৯	— ২·৪

মালদহ	+ ৮·১	+ ৯·১	+ ২·৮
দিনাজপুর	+ ৪·৬	+ ৩·৩	+ ৩·১
রংপুর	+ ৪·৫	+ ২·০	+ ০·৭
জলপাইগুড়ি	+ ৭·৪	+ ১·৪	+ ৫·১
দার্জিলিং	+ ৫·৫	+ ৯·৪	+ ৫·২
পাবনা	+ ৮·৩	+ ৮·০	+ ৪·৭

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা	+ ৮·৩	+ ৬·০	+ ৯·৩
ময়মনসিংহ	+ ৬·৯	+ ৩·৬	+ ৩·৫
ফরিদপুর	+ ৭·৩	+ ৩·৯	+ ৫·১
বাখরগঞ্জ	+ ৭·৪	+ ২·৭	+ ০·৭

চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম	+ ৭·৭	+ ৫·০	+ ৩·৭
নোয়াখালি	+ ১১·৫	+ ১০·৫	+ ১০·৩
ত্রিপুরা	+ ৯·৬	+ ৯·২	+ ১১·২

কলিকাতাকে একটি স্বতন্ত্র জেলা ধরিয়া বাংলার ২৭টি জেলার মধ্যে একমাত্র নদীয়া ও যশোহর এই দুইটি জেলাতেই স্বাভাবিক লোকবৃদ্ধির হার ক্রমবর্দ্ধমান। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ১৯৩২ ও ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হারই ছিল বেশী। অপর দিকে বাঁকুড়া, বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, পাবনা, নোয়াখালি এই ৭টি জেলায় স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। তন্মধ্যে বগুড়ায় মৃত্যুর হার জন্মের হারকেও ছাপাইয়া গিয়াছে। এই ক্রমক্ষয়িষ্ণু সাতটি জেলার পাঁচটিই উত্তর-বঙ্গে—রাজশাহী বিভাগে। হতভাগ্য প্রদেশের এই বিভাগই অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছে। বাংলার রাজধানী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী, কলিকাতায় জন্মের হার অপেক্ষা মৃত্যুর হার বেশী।

বাঙালী মরে কিসে?

সমরক্ষেত্রে শত্রুর অস্ত্রাঘাতে নয়, অতর্কিত দৈবদুর্ঘটনায় নয়, বাঙালী মরিতেছে তিলে তিলে, রোগের জ্বালায় বিছানায় অসহায় ভাবে শুইয়া। কোন্ রোগে বাংলায় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মানবজীবনযাপনের দুর্ব্বহ দায়িত্ব হইতে কত লোক মুক্তি পাইয়াছে, সরকারী বিবৃতিতে তাহার তালিকা আছে—

রোগ		মৃতের সংখ্যা
জ্বর		৭,৬৪,৯৯২
ম্যালেরিয়া	৩,৮৭,২৯১	
অতিসার জ্বর	৯,৭৫৪	
ঘামজ্বর	৩,৯৪৫	
পালাজ্বর	২,৭২০	
কালাজ্বর	১৪,৭৬৩	
অন্যবিধ জ্বর	৩,৪৬,১১৯	
শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রঘটিত		৮৫,১১৩
ইনফ্লুয়েঞ্জা	৪, ২৪	
নিউমোনিয়া	৪১,০০৩	
যক্ষ্মা	১৪,৮৬৫	
বিবিধ	২৫,.৩৮	
কলেরা		৫০,৭৪২
বসন্ত		৮,২৯৬
প্লেগ		১
আমাশয়		২৯,৬৭৪
উদরাময়		২৪,২৭৩
অপঘাত		২২, ৪৪
আত্মহত্যা	৩,২৮০	
দৈবাঘাত	১৩ ১৩৮	
সর্পাঘাত ইত্যাদি	৪,৭৯৬	
রেবিস্	৯৩০	
অন্যান্য		১,৯২.২ ২
	মোট	১১,৭৬,৮৮৬

বাংলা দেশে দৈনিক মৃত্যুর অঙ্কপাত ৩২২৪·৩৫। তন্মধ্যে নানাবিধ জ্বরে মৃত্যুর অঙ্কপাত ২০৯৬·৯২৮।

কোন রোগকেই উপেক্ষা করা সঙ্গত নহে, কিন্তু সকল রোগই সমান দুশ্চিকিৎস্য নহে। অর্থের অভাবে কেহ হয়ত সামান্য চিকিৎসার ব্যবস্থাও করিতে পারে না, রোগের সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তি অনেকের দেহেই আজকাল নাই। অতি সাধারণ রোগও বাঙালীর অদৃষ্টে সাংঘাতিক হইয়া উঠে। রোগ হইলে সুচিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করা অপেক্ষা রোগ হইতে না-দেওয়াই ভাল—একথা আমরা বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। এ উপদেশ পালন করিতে আমরা যত্ন করি, একথা বলা চলে না। স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ বিধিগুলি আমরা সর্ব্বথা পালন করি এমন নহে। বাংলায় যে-রোগে সবচেয়ে বেশী লোক মরে সেই ম্যালেরিয়ার কথাই ধরা যাক। দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করা সাধ্যাতীত নহে। কোন কোন দেশে ম্যালেরিয়া-বিতাড়ন-প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সমগ্র বাংলা দেশে

ব্যাপক ভাবে এরূপ কোন প্রয়াস হইয়াছে—সরকারী অথবা বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠান এরূপ দাবী করিতে পারেন না। অথচ জনসাধারণ এরূপ অভিযোগ করিতে পারেন যে শহর ও পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা যাঁহাদের অন্যতম কর্ত্তব্য সেই স্বায়ত্ত-শাসন-প্রতিষ্ঠানসমূহ—মিউনিসিপালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড—অনেক সময় পথ-ঘাট নির্ম্মাণ ও মেরামত ইত্যাদিতে যে অবৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহারা ম্যালেরিয়া বৃদ্ধির সহায়তাই করিয়া থাকেন।

শিশু-মৃত্যু

গাছে ফল ধরে, সে ফল কালে পাকিয়া ঝরিয়া পড়িবে—ইহাই স্বাভাবিক। মানবদেহ সম্পর্কেও সে-কথা প্রযোজ্য। মানবদেহ কালে বার্দ্ধক্যে চরম পরিণতি লাভ করিয়া ধ্বংস হইবে ইহাই স্বাভাবিক। ঝড়ে যেমন অপক্ক ফল বৃন্তচ্যুত হয়, রোগেও তেমনই মানবদেহ অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়—এরূপ মৃত্যু অস্বাভাবিক। অকালমৃত্যু অপমৃত্যুরই নামান্তর মাত্র। এই অকালমৃত্যুই বাংলার ঘরে ঘরে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর বার মাসের মধ্যে ১৯৩৪ সালে ২,৭৭,১৯৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১,৫৬,৯৮১ মরিয়াছে প্রথম মাসেই। ১৯৩৩ সালে এইরূপ মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ২,৯৪,৯৭৫ জন। ১৯৩৩ সনে ভারতবর্ষের প্রদেশসমূহের মধ্যে বাংলা দেশেই শিশুমৃত্যুর হার ছিল সবচেয়ে অধিক।

(প্রতি হাজার জন্মে)

প্রদেশ	১৯৩৩	১৯৩৪
বাংলা	২০০·১	১৮৯·২
মাদ্রাজ	১৮৪·৯৪	১৯২·৬৮
বোম্বাই	১৬০·৬৬	১৬৭·৩৭
আগ্রা-অযোধ্যা	১৩৭·৮৮	১৮৪·৬৪
পঞ্জাব	১৯২·৫৫	১৮৭·৪০
মধ্যপ্রদেশ	২০০·০৭	২৫৩·৪৭
বিহার-উড়িষ্যা	১৩৫·২	১৪৯·৯
উ-প-সীমান্ত	১৩৭·৩৬	১৩৪·২৯
ব্রহ্ম	১৯২·২৬	২১৯·৩৯
আসাম	১৬১·৫৬	১৬৫·৩৬

এই শিশুমৃত্যুর জন্য জনকজননীর স্বাস্থ্য, আঁতুর-ঘরের আবেষ্টন, প্রসবকালে সুচিকিৎসক ও সুশিক্ষিতা ধাত্রীর সহায়তা লাভের সুযোগের অভাব, সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদি কোন্‌টি কি পরিমাণে দায়ী এ সম্পর্কে ব্যাপক ভাবে কোন অনুসন্ধান হইয়াছে কি?

ভূমিষ্ঠ হইবার বার মাসের মধ্যে যদি হাজার জনের মধ্যে ২০০ জনকে বিদায় দেওয়া হয় তবে বাকী ৮০০ জনের মধ্যে কত জন বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিবে?

বাল-মৃত্যু

এই শোচনীয় শিশুমৃত্যুর পরই বাল-মৃত্যু। ১ বৎসর হইতে ৫ বৎসরের নীচে যাহাদের বয়স এমন বালকবালিকাদের মৃত্যুর সংখ্যা ১,৭১,৬৮২ ও পাঁচ বৎসর হইতে ১০ বৎসরের নীচে যাহাদের বয়স তাহাদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা ৮৬,৮০৯, অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইবার পর দ্বাদশ মাস যাহারা কোনক্রমে টিকিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ২,৫৮,৪৯১ জন দশম বর্ষে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত শিশুমৃত্যু ও এই বাল-মৃত্যুর সংখ্যা যোগ করিলে দাঁড়ায় ৫,৩৫,৬৮৫।

কিশোর মৃত্যু

দশম বর্ষে পদার্পণ করিবার সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ৭৫,৫৭৩ জন বিংশতি বর্ষে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুর কোলে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, অর্থাৎ দেহধারণের পর পূর্ণ গঠনের পূর্ব্বেই ৬,২১,২৫৮ জন দেহত্যাগ করিয়াছে।

পুরুষ ও নারী

পুরুষ ও নারী ভেদে মৃত্যুর সংখ্যা আলোচনা করিলে জাতির ক্ষয়িষ্ণুতার একটি কারণ সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

বয়স	পুরুষ	নারী
১ বৎসর মধ্যে	১,৪৮,৫৯২	১,২৮,০০২
২ হইতে ৫ বৎসরের নীচে	৮৬,২৯৩	৮৫,৩৮৮
৫—১০	৪৫,৫০২	৪১,৩০৭
১০—১৫	২৫,৫১২	২১,৫৪৭
১৫—২০	২৫,০৬৭	৩২,৩৯৭
২০—৩০	৫৩,৬৯১	৭০,০৩৮
৩০—৪০	৫৫,৩৭৩	৪৭,৮৬৮
৪০—৫০	৫৩,৩৫৫	৩৭,৬৬০
৫০—৬০	৪৭,৪০৯	৩৭,৪৪৪
৬০—ঊর্দ্ধে	৭০,৮৮৩	৬২,৯০৫
মোট	৬,১০,৭৩১	৫,৬৬,১৫৬

দেশে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অনেক কম। ১৯৩১ সালের লোকগণনায় তাহাদের সংখ্যা যথাক্রমে ২৫,৯২৭,৪৩৭

ও ২৩,৯৭৩,৬৫২ ছিল। প্রতি বৎসরই পুরুষ অপেক্ষা নারীর জন্মসংখ্যা কম।

	পুরুষ	নারী
১৯৩৩	৭,৬৪,২০৩	৭,০৬,৭৮১
১৯৩৪	৭,৫৯,৭২২	৭,০৪,৭৯৮

এ অবস্থায় সমবয়সী নারী অপেক্ষা পুরুষের মৃত্যুসংখ্যাই অধিক হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত তালিকায় দেখা যাইতেছে যে ১৫ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যাহারা মারা গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই অধিক। এই বয়সে নারীমৃত্যুর সংখ্যাধিক্যের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে যে নারীমৃত্যুর আতিশয্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। ঠিক এই কারণে কত নারী প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহা নির্ণয় করা হয় নাই। অবশ্য সরকারী রিপোর্টে প্রসবের দুই সপ্তাহ মধ্যে প্রসূতির মৃত্যুর সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে—মাত্র ১৩,৬৯২। কিন্তু এই সংকীর্ণ নির্দ্দিষ্ট কালমধ্যে মৃত্যু না হইলেই মৃত্যুর কারণের সহিত মাতৃত্বের কোনই সম্পর্ক নাই, এইরূপ মনে করা অত্যন্ত ভুল হইবে।

৩০ হইতে ৩৯ বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত পুরুষের মৃত্যুর সংখ্যা নারীমৃত্যু অপেক্ষা অধিক হইলেও সে বয়সেও নারীমৃত্যুর হার অধিক। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে নানা বয়সের হার এইরূপ :—

হাজার-করা হার

বয়স	পুরুষ	নারী	তারতম্য পুরুষ অধিক + নারী অধিক −
এক বৎসরের নীচে	১৯০·৬	১৮৭·৪	+১৩২
১ হইতে ৫	২১·৭	২৭·৬	+৪·০
৫—১০	১২·৮	১৩·১	−০·৩
১০—১৫	৮·২	৭·৮	+০·৪
১৫—২০	১১·০	১৩·৬	−২·৬
২০—৩০	১১·৩	১৪·৮	−৩·৫
৩০—৪০	১৪·৪	১৫·৬	−১·২
৪০—৫০	২১·৬	২০·০	+১·৬
৫০—৬০	৩৬·৬	৩৩·৮	+২·৮
৬০ ঊর্দ্ধে	৮২·০	৭৮·২	+৩৮

পাঁচ বৎসর হইতে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত নারী-মৃত্যুর হারের আধিক্য। কিন্তু সন্তোষের বিষয় এই যে কতিপয় বৎসর যাবৎ ৫ হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত নারীমৃত্যুর হার ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে, যথা—

বয়স	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩	১৯৩৪
১০—১৫	+০·৪	+০·৫	+০·৬	+০·৫	−০·২	−০·৪	−০·২	−০·২
১৫—২০	+৩·৮	+৪·৪	+৪·২	+৩·৩	+৩২	+২·৭	+২·৭	+২·৬
২০—৩০	+৪১	+৪·৪	+৪·৭	+৩·৭	+৪·২	+৩·৫	+৩·৬	+৩৬
৩০—৪০	+১৭	+১·৯	+২২	+১·৬	+১·৬	+১·৩	+১·৬	+১·২

রায়-বাহাদুর হরবিলাস শারদার বাল্যবিবাহনিরোধ আইন ১৯২৯ সালে প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার ফলে ১০—১৫ বৎসর বয়স্কা বালিকার মৃত্যুর হার সমবয়স্ক বালকদের অপেক্ষা কমিয়া আসিয়াছে, ৫—১০ বয়সের বালিকাদের হারও অদূর ভবিষ্যতে কমিবে সে আভাস পাওয়া যাইতেছে। শারদা-আইন প্রয়োগ সর্ব্বত্র সুন্দররূপে হইতেছে একথা বলা চলে না। শারদার প্রস্তাব আইন-সভায় পাস হইবার পর এবং দেশে প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে—এই সংকীর্ণ সময়ে আইনটি এড়াইবার জন্য অকস্মাৎ শিশুবিবাহের প্রাবল্য ঘটিয়াছিল। যদি তাহা না হইত তবে ফল যে আরও ভাল হইত সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সম্প্রদায় হিসাবে ক্ষয়িষ্ণুতা

দেশে যখনই একটা গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হয় তখনই এক দল লোক উহাতে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ কতটুকু জড়িত আছে তাহা বিশ্লেষণ না করিয়া তাহা সমাধানের চেষ্টায় অগ্রসর হইতে চাহেন না। সুতরাং সে হিসাবেও ইহার আলোচনা প্রয়োজন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সাম্প্রদায়িক জনসংখ্যার হাজার-করা অনুপাত এইরূপ :—

জাতি	জন্ম	মৃত্যু	স্বাভাবিক বৃদ্ধি
খ্রীষ্টিয়ান	২০.৪	১৪.৫	৫.৯
হিন্দু	২৮.৩	২২.৮	৫.৫
মুসলমান	২৯.৪	২৩.৭	৫.৭
বৌদ্ধ	২৬.৫	২০.৮	৫.৭
অন্যান্য	৭৪.৯	৫৫.৫	১৯.৪

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বাংলায় খ্রীষ্টিয়ান, হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ—এই চারি সম্প্রদায় প্রায় সমভাবেই ক্ষয়িষ্ণু—যেন একই গতিতে চারিটি যান ধ্বংসের পথে শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছে!

পূর্ব্ব বৎসরের (১৯৩৩) তালিকা এইরূপ :—

জাতি	জন্ম	মৃত্যু	স্বাভাবিক বৃদ্ধি
খ্রীষ্টিয়ান	২০.৪	১৪.০	[illegible]
হিন্দু	২৯.৭	২৩.১	৬.৬
মুসলমান	২৮.৫	২৪.৩	৪.২
বৌদ্ধ	২৫.৩	১৯.৬	৫.৭
অন্যান্য	৮১.৫	৫১.৪	৩০.১

উপসংহার

বিবরণীর প্রত্যেক সংখ্যাই নির্ভুল—সরকার এ দাবী করেন না, বরং জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে কোন কোন স্থানের সংখ্যা যুক্তিবিরোধী অথবা অবিশ্বাস্য বলিয়া

বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন মিউনিসিপালিটির জন্মমৃত্যুর সংবাদ তালিকাভুক্ত করিবার কার্য্য অসন্তোষজনক বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহ যে এই বিবরণী সর্ব্বথা নির্ভরযোগ্য নহে। এই সরকারী বিবরণী বাংলার যে নৈরাশ্যজনক, শোচনীয় অবস্থা প্রকাশ করিয়াছে তাহার এক ক্ষুদ্র অংশও যদি সত্য হয়—অসত্য বলিয়া মনে করিবার কোনই কারণ নাই—তাহা হইলেও বাংলার ভবিষ্যৎ যে শোচনীয়, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয়ান—বাংলার 'সভ্য' 'শিক্ষিত' ও [illegible] প্রত্যেক সম্প্রদায়ই যে অতি দ্রুত ধ্বংসের পথে যাইতেছে—সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

সমগ্র জাতিকে ক্ষয়রোগে ধরিয়াছে—রক্ষার উপায় কি? উপায় নির্দ্ধারণ ও অবলম্বন একান্ত আবশ্যক, এবং তাহা বাঙালীর সাধ্যাতীত নহে।

অগ্নিপরীক্ষা

অগ্নিপরীক্ষার কথা বলিলে স্বভাবতই আমাদের মনে যে-চিত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহা দুর্ভাগিনী রাজবধূ জানকীর অগ্নিপরীক্ষার চিত্র। লোকাপবাদকাতর রামচন্দ্রের দুর্বাক্যে বিহ্বলা সীতাদেবীর অগ্নিপ্রবেশের কাহিনী রামায়ণকারের রচনায় অবিস্মরণীয় রূপ লইয়া যুগে যুগে ভারতবাসীর চিত্তকে উদ্বোধিত করিয়াছে। এই পুণ্যকাহিনী কৃত্তিবাসে এইরূপে বর্ণিত আছে,

> কাষ্ঠ পুড়ি উঠিল জ্বলন্ত অগ্নিরাশি।
> প্রবেশ করেন তাহে শ্রীরাম মহিষী॥
> সাত বার রামের চরণে প্রদক্ষিণ।
> প্রদক্ষিণ অগ্নিকে করেন বার তিন॥
> কনক অঞ্জলি দিয়া অগ্নির উপরে।
> জোড়হাতে জানকী বলেন ধীরে ধীরে॥
> শুন বৈশ্বানর দেব তুমি সর্ব্ব আগে।
> পাপ পুণ্য লোকের জানহ যুগে যুগে॥
> কায়মনোবাক্যে যদি হই আমি সতী।
> তবে অগ্নি তব কাছে পাব অব্যাহতি॥
> শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে সবিশেষ।
> সীতা সতী অগ্নিমধ্যে করেন প্রবেশ॥

কিন্তু 'সকল পাপপুণ্যের সাক্ষী' বৈশ্বানর অপাপবিদ্ধা সীতার আত্মাহুতি গ্রহণ করিলেন না,

> আকাশ পাতাল জুড়ে অগ্নিশিখা জ্বলে।
> আপনি উঠিলা অগ্নি সীতা লয়ে কোলে॥

জানকীর কেশাগ্র পর্য্যন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হয় নাই—

> অগ্নি হৈতে উঠিলেন সীতা ঠাকুরাণী।
> যেমন তেমন আছে পরিধেয় খানি॥
> মস্তকেতে পুষ্পফুল সেহ না আররে।

ভক্ত প্রহ্লাদের সম্বন্ধেও এইরূপ কাহিনী আছে যে কৃষ্ণদ্বেষী পিতার আদেশে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই।

ধর্ম্মাশ্রিত পুণ্যাত্মা ব্যক্তির যে সর্ব্বভুক্ অগ্নির নিকটেও ধ্বংস নাই, এরূপ ধারণা যে শুধু আমাদের দেশেই প্রচলিত তাহা নহে। কথিত আছে, সেণ্ট পলিকার্প্‌কে দগ্ধ করিয়া মারিবার আদেশ হওয়ায় তাঁহার চারি দিকে আগুন জ্বালিয়া দেওয়া হইলে দেখা গেল সে-আগুন তাঁহাকে স্পর্শ করিল না, বরং তাঁহাকে চারি দিকে ঘিরিয়া রক্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু এই সকল কাহিনী কেবল রূপক বা কিংবদন্তী হিসাবেই চলিয়া আসিতেছে, এগুলিকে বাস্তব বা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া আমরা গ্রহণ করি না। আধুনিক কালেও ভারতবর্ষে, জাপানে, প্রশান্ত দ্বীপপুঞ্জে ও পৃথিবীর অন্যত্র অনুন্নত জাতির মধ্যে যে অগ্নি-উৎসবের প্রচলন অল্পবিস্তর রহিয়া গিয়াছে তাহার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পড়িলে, চিরাগত কাহিনীগুলিও হয়ত অংশতঃ বাস্তব হইতে পারে, এইরূপ একটা বিশ্বাস জন্মে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এইরূপ অগ্নি-উৎসবের প্রত্যক্ষদর্শীদের কয়েকটি বিবরণ নিম্নে সংকলিত হইল।

প্রশান্ত মহাসাগরে কুক দ্বীপের অধিবাসী অনুন্নত জাতির এইরূপ একটি উৎসবে এক জন ইউরোপীয় মহিলা উপস্থিত ছিলেন। উৎসবের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে একটি [illegible] চারি দিকে আগুন জ্বালাইয়া উত্তপ্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। দলপতি, যাদুদণ্ড হাতে, মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া এই [illegible] পাথরের উপর দিয়া হাঁটিয়া গেল, তার পর গেল [illegible] তিন জন চেলা, তাহার পর সর্ব্বসাধারণের পালা। মহিলাটি স্বয়ং এই পাথরের উপর দিয়া হাঁটিয়া দেখিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন, চলিবার সময় প্রবল উত্তাপ অনুভূত হই[illegible] পরে দেখিলেন যে তাঁহার পায়ে সে তাপের চিহ্নমাত্রও [illegible] নাই।

ফিজির কোন কোন জাতির মধ্যেও এইরূপ আগুনের উপর দিয়া চলার প্রচলন আছে। প্রত্যক্ষদর্শী লিখিতেছেন, তিন ফুট একটি গর্ত্ত করিয়া তাহাতে পাথর রাখিয়া [illegible]

মরিশাসে বহ্নিক্রীড়ায় রমণী

মরিশাসে বহ্নিক্রীড়ায় অগ্নিক্রীড়কদের দলপতি

উপরে জ্বালানী কাঠ স্তূপাকারে রাখা হয়। উৎসব আরম্ভ হইবার প্রায় যোল ঘণ্টা পূর্ব্বে এই কাষ্ঠস্তূপে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়, আগুনের তাপে তাহার কাছে যাওয়াই সাধারণের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। প্রথমে একদল লোক রঙীন পত্রপুষ্পে বিচিত্র বেশে সাজিয়া অগ্রসর হয়, দীর্ঘ দণ্ডের সাহায্যে দগ্ধ কাষ্ঠগুলি সরাইয়া পাথরগুলি সাজাইয়া রাখে। তার পর নগ্নপাদ অগ্নিক্রীড়কেরা এই তপ্ত পাথরের উপর হাঁটিয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারিণী ও লেখিকা শ্রীমতী রোজিটা ফর্বেস তাঁহার *Woman Called Wild* গ্রন্থে ডাচ গায়েনার একটি অগ্নি-নৃত্যের বিবরণ লিখিয়াছেন। গভীর অরণ্যে অনুষ্ঠিত এক অগ্নি-উৎসবে একটি বালিকাকে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, লেলিহান অগ্নিশিখা চারি দিক দিয়া তাহাকে ঘিরিয়াছে, মনে হইতেছে গ্রাস করিল বলিয়া—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহার সামান্য অঙ্গহানিও হয় নাই।

মরিশাসে রোজ হিলে একটি অন্ধবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও এই অগ্নিক্রীড়ার প্রচলন আছে; প্রতি বৎসর২রা জানুয়ারী ইহার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। দৈর্ঘ্যে ত্রিশ ফুট ও প্রস্থে ছয় ফুট একটি অঙ্গারস্থলী এই জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। অগ্নিক্রীড়কগণ অনেক সময় শরীরে ও মুখে দীর্ঘ সূচ বিঁধাইয়া লয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তৎসত্ত্বেও রক্তপাত হইতে দেখা যায় না। প্রথমে দলপতি নির্ভয়ে অঙ্গারস্তূপের উপর দিয়া অগ্রসর হইয়া গেলে আনন্দধ্বনি করিয়া তাহার অনুবর্ত্তীরাও অগ্রসর হয়।

মহীশূরে প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে এখনও এইরূপ অগ্নি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষদর্শী লিওনার্ড হাণ্ডলির বর্ণনায় আছে, প্রথম একটা খোলা মাঠের একধারে জ্বালানী কাঠ স্তূপাকারে রাখা হয়। উৎসবের পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যায় অগ্নিক্রীড়কদের গুরু এই স্তূপের চারি দিকে ঘুরিয়া পূজা-পাঠ ইত্যাদি করিয়া থাকে। পরদিন প্রাতঃকালে এই কাঠের জ্বলন্ত অঙ্গার একটি গর্ত্তে নিক্ষেপ করা হয়। অগ্নিক্রীড়কেরা উৎসবের পূর্ব্ব দিন সমস্ত রাত্রি নৃত্যাদি করিয়া কাটায়। পরদিন উৎসব-ক্ষেত্রে সহস্র সহস্র লোককে সাক্ষী করিয়া বাদ্যভাণ্ড সহযোগে উৎসব আরম্ভ হয়; পুনরায় পূজা ও নৃত্যাদি করিয়া প্রথমে গুরু, তাহার পরে অনুগামীগণ সেই জ্বলন্ত অঙ্গার-স্তূপের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়। এই অগ্নিক্রীড়কেরা উত্তেজনায় অনেক সময় অচৈতন্য হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু তাহাদের পায়ে আগুনের সামান্য চিহ্নও পাওয়া যায় নাই। মহীশূরের এই উৎসবের চিত্র ৭৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। সম্প্রতি লণ্ডনে কাশ্মীরী যুবক খুদা বক্স বহু চিকিৎসক ও গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে এইরূপ অগ্নিক্রীড়া দেখাইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন।

বৈজ্ঞানিকদের নিকট হইতে এখনও এই বিষয়টির সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নাই।

গুপ্ত

তীরন্দাজ মাছ

মানুষ যেমন দূর হইতে তীর ছুঁড়িয়া পশু-পাখী শিকার করিয়া থাকে কোন মাছের পক্ষে ঐরূপ কোন উপায়ে শিকার ধরা সম্ভব কি? বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ এক-জাতীয় তীরন্দাজ মাছ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মহলে যথেষ্ট আলোচনা হইতেছিল। ১৭৬১ খৃঃ অব্দে লণ্ডনের সুবিখ্যাত রয়েল সোসাইটির পত্রিকায় সর্ব্বপ্রথম তীরন্দাজ মাছ সম্বন্ধে এক চমৎকার বর্ণনা প্রকাশিত হয়। ব্যাটাভিয়া হাসপাতালের গভর্ণর মিঃ হোমেল বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেন—জ্যাকুলেটর নামে এক প্রকার মাছ নদী ও সমুদ্রের ধারে ধারে খাদ্য সংগ্রহের আশায় ঘুরিয়া বেড়ায়। পাড়ের কাছে অগভীর জলের উপর অনেক রকমের গাছপালা ঝুলিয়া থাকে। সেই সব লতাপাতার উপর কোন কীট-পতঙ্গ আসিয়া বসিলে, এই মাছ দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং প্রায় ৫।৬ ফিট দূর হইতে অতি দক্ষতার সহিত এক ফোঁটা জল পোকার উপর ছুঁড়িয়া মারে। ইহাদের লক্ষ্য অব্যর্থ, জলের ফোঁটা গায়ে লাগিয়া পোকাটা জলে পড়িবা মাত্রই মাছটা উহাকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলে। মাছের এই কৌশল সম্বন্ধে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত বড় বড় পাত্র জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে তিনি এই মাছ রাখিয়া দিয়াছিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই মাছগুলি ঐস্থানে থাকিতে অভ্যস্ত হইয়া গেলে তিনি কাঠির মাথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ আটকাইয়া জল হইতে উঁচুতে রাখিয়া দেখিয়াছেন—মাছগুলি অব্যর্থ সন্ধানে কীট-পতঙ্গগুলিকে জলের ফোঁটা ছুঁড়িয়া মারে। কোনরূপে লক্ষ্য ব্যর্থ হইলে পোকাটা পড়িয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত বার বার জলের ফোঁটা ছুঁড়িতে থাকে।

কিন্তু এরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন পর্য্যন্ত এ ব্যাপারটাকে কাল্পনিক বলিয়াই সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, কারণ এই বিবরণের পর তাহার সমর্থক আর কোন বিবরণ তখনও পাওয়া যায় নাই, এতদ্ব্যতীত প্রাচ্য-মৎস্যবিশেষজ্ঞ কয়েকজন বৈজ্ঞানিক জ্যাকুলেটর মাছের এইরূপ কোন অদ্ভুত ক্ষমতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইয়া এই ঘটনাকে দেখার ভুল অথবা কাল্পনিক বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ডাঃ পিটার ব্লিকার একজন মৎস্যবিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক। হোমেল যেস্থানে ছিলেন ডাঃ ব্লিকারও সেই ব্যাটাভিয়াতে ৩৫ বৎসর কাল মৎস্য-গবেষণা করিয়া কাটাইয়াছেন। তিনিও এই মাছের এই প্রকার অদ্ভুত শিকার-ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেন নাই এবং ইহাকে একটি ভ্রান্ত ধারণা বলিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

ডাঃ ফ্রান্সিস ডে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মাছ সম্বন্ধে প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া বহুবিধ গবেষণা করিয়াছেন। তিনি "ফনা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া"য় লিখিয়াছেন—শোনা যায় জলের ফোঁটা ছুঁড়িয়া এই মাছেরা কীট-পতঙ্গ শিকার করে কিন্তু ব্লিকার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের এই অদ্ভুত ক্ষমতার কথা অস্বীকার করেন। বিশেষতঃ এই মাছের মুখের আকৃতি ও আভ্যন্তরিক গঠনে এমন কিছু বিশেষত্ব নাই যাহার সহায়তায় ইহারা জল ছুঁড়িয়া মারিতে পারে।

এতদ্ব্যতীত প্রোফেসর কিংস্‌লি এই মাছ সম্বন্ধে আলোচনায় বলিয়াছেন—ইহাদের মুখের ভিতরে এমন কিছু অদ্ভুত যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নাই যাহা দ্বারা জল ছুঁড়িয়া উপর হইতে পোকামাকড় শিকার করিতে পারে।

কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীতে রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক জোলোনিস্কি এই মাছ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে ইহাদের এই অদ্ভুত শিকার-ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহের নিরসন হইয়াছে। তিনি সিঙ্গাপুর হইতে এই জাতীয় জীবন্ত মাছ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের কীটপতঙ্গ শিকারের কৌশল ও অন্যান্য স্বভাব প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন—যে-সব কীট-পতঙ্গ জলের উপর উড়িয়া বেড়ায় অথবা জলের উপরিস্থিত লতাপাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাদিগকে ধরিয়া পাইয়া ইহারা জীবন ধারণ করে। লতা-পাতার

কাঠ কই—বাংলা দেশের নদীতে প্রাপ্ত তীরন্দাজ মাছ

সিটোডোণ্ট—দক্ষিণ-সমুদ্রের তীরন্দাজ মাছ

উপর কোন কীট পতঙ্গ বসিতে দেখিলেই অতি সতর্কতার সহিত নিকটে আসিয়া ইহারা একদৃষ্টে শিকারের উপর লক্ষ্য করিতে থাকে এবং সুযোগ বুঝিলেই মুখখানিকে জলের উপর তুলিয়া এক ফোঁটা জল ছুঁড়িয়া মারে, একবার কৃতকার্য্য না হইলে বার বার জল ছুঁড়িয়া মারিতে থাকে। সময় সময় চার-পাঁচ ফুট দূর হইতে শিকারের উপর আক্রমণ করে। জল লাগিয়া পোকাটা পড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ গিলিয়া ফেলে। সময় সময় দেখা যায়, সুবিধামত স্থান হইতে জল ছুঁড়িবার জন্য সাঁতরাইয়া পিছু হটিয়া যায়। শিকার দেখিলেই ইহাদের চক্ষু যেন জ্বলিতে থাকে এবং উপরে নীচে, আশেপাশে চোখ ঘুরাইয়া সব দেখিয়া লয়।

মালয় দেশে জ্যাকুলেটর ও চেলুনো নামে দুই রকমের মাছ দেখা যায়। ঐ দেশীয় লোকেরা এই দুই জাতীয় মাছকেই সাম্‌পিট-সাম্‌পিট নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এই নামের গোলযোগের ফলেই হয়ত এতদিন এই মাছের শিকার-ক্ষমতা সম্বন্ধে এত বিতর্কের উৎপত্তি হইয়াছিল।

যাহা হউক, সম্প্রতি এই তীরন্দাজ মাছের শিকার ধরিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন। এইচ এম স্মিথ এই মাছ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া সম্প্রতি তাঁহার অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ আমেরিকার ন্যাচারেল হিষ্ট্রি ম্যাগাজিনে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের মুখের আভ্যন্তরিক গঠনে জল ছুঁড়িয়া মারিবার মত যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি এই মাছের জল ছুঁড়িয়া শিকার ধরিবার সিনেমা ছবি লইতেও সমর্থ হইয়াছেন। তিনি নাকি জ্যাকুলেটর মাছকে এই ভাবে একটি ছোট টিকটিকি শিকার করিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, তাঁহার এক বন্ধু এই মাছ-রক্ষিত জলের চৌবাচ্চার ধারে বারান্দায় বসিয়া প্রাতর্ভোজন শেষে চুরুট টানিতে টানিতে খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। এমন সময়ে একটা মাছ জল ছুঁড়িয়া দুই দুই বার তাঁহার চুরুট নিবাইয়া দিয়াছিল।

এই জাতীয় তীরন্দাজ মাছ (টক্সোটেস জ্যাকুলেটর) বঙ্গদেশের দক্ষিণাঞ্চলে সমুদ্র ও নদীর মোহনায় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে এই তীরন্দাজ মাছ কলিকাতার বাজারে বিক্রয়ার্থ আমদানী হইয়া থাকে। কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ নদী হইতে ধৃত তীরন্দাজ মাছের ছবি এস্থলে প্রদত্ত হইল। এ দেশে ইহাদিগকে নোচা বা কাঠ-কাই বলে। ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে তীরন্দাজ মাছের বিষয় আলোচিত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ সমুদ্রে সিটোডোন্ট নামে আমাদের দেশীয় চাঁদামাছের মত এক প্রকার তীরন্দাজ মাছ পাওয়া যায়। তাহারাও কাঠ-কইয়ের মত মুখ দিয়া জলের ফোঁটা ছুঁড়িয়া পোকামাকড় শিকার করিয়া থাকে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অগাষ্টা রোলিয়ার সৌর-বিদ্যালয়

প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় অন্যত্র বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু স্বাস্থ্য ও শিশু-মৃত্যু ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। এই সূত্রে শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে অন্যান্য দেশে যে সকল ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইতেছে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে ডাঃ অগাষ্টা রোলিয়া-প্রতিষ্ঠিত, সুইজারল্যাণ্ড-লেজ্যাঁর নিকটবর্ত্তী সৌর-বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। ডাঃ অগাষ্টা ও তাঁহার বিদ্যালয় সম্বন্ধে ডাঃ সুধীন্দ্রনাথ সিংহ গত ১৩৪১ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা প্রবাসী ও গত মে-সংখ্যা মডার্ণ রিভিউ পত্রে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। প্রধানতঃ সূর্য্যালোকের সাহায্যে দুর্ব্বল ও ক্ষয়রোগপ্রবণ শিশুদের স্বাস্থ্যোন্নতিসাধন এই বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব। সাধারণতঃ চার হইতে তের বৎসরের বালকবালিকাদের এই বিদ্যালয়ে লওয়া হয়; মহিলাগণ ইহাদের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। উন্মুক্ত স্থানে ইহারা পাঠচর্চ্চা করিয়া থাকে, এবং নিয়মিত ব্যায়ামসাধন ও সূর্য্যালোকসেবন ইহাদের অধ্যয়নের অঙ্গ। এই বিদ্যালয়ের অধীনে দুর্ব্বল শিশুদের স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। ইহাদের জীবন-যাত্রার চিত্রগুলির সাহায্যে বিষয়টি সম্যক পরিস্ফুট হইবে (পৃ. ৭৮৩-৮৪ দ্রষ্টব্য)। এইরূপ বিদ্যালয় চালনা খুব ব্যয়সাধ্য নহে—আমাদের দেশে এই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে বালকবালিকাদের স্বাস্থ্য শিশুকাল হইতেই দৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে।

যৎকিঞ্চিৎ, অতি সামান্য, ন্যায়সঙ্গত হইত। কিন্তু ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট যাহা করিয়াছেন, তাহাতে মন্দের ভালও বিন্দুমাত্রও নাই। সমগ্র ভারতের হিন্দুদের প্রতি পার্লেমেণ্টের ব্যবহার অতি গর্হিত হইয়াছে, বঙ্গের হিন্দুদের প্রতি ব্যবহার গর্হিততম হইয়াছে।

যাহারা এই ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক সুবিধা পাইয়াছে, এই গর্হিত ব্যবস্থার প্রতিকার তাহাদের সম্মতি ব্যতীত হইতে পারে না, এ প্রকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া ভারতসচিবের পক্ষে সাতিশয় গর্হিত কাজ হইয়াছে। "আমি প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, অতএব কিছু করিতে পারিব না, বা করিব না," ইহা একটা যুক্তিই নয়।

—

মুসলমানদের একটি ভ্রান্ত ধারণা

মুসলমানদের কাহারও কাহারও একটি ধারণার ভ্রম এখানেই দেখাইয়া দেওয়া ভাল। তাঁহাদের অভিযোগ এইরূপ, যে, তাঁহারা বঙ্গে কেবল যে তাঁহাদের সংখ্যার অনুপাতে আসন পান নাই তাহা নহে, তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদিগের জন্য অর্দ্ধেকেরও কম আসন সংরক্ষিত (reserved) রাখিয়া তাঁহাদিগকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করা হইয়াছে। তাঁহাদিগের মনে রাখা উচিত, যে, সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতে এবং কতকগুলি প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ; অথচ সমগ্রভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং এইসব প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দুরা তাঁহাদের সংখ্যার অনুপাতে আসন পান নাই। অধিকন্তু, ব্রিটিশ-ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও ব্যবস্থাপক সভায় ব্রিটিশ-ভারতের জন্য নির্দিষ্ট ২৫০টি আসনের মধ্যে কেবল ১০৫টি তাঁহাদের জন্য সংরক্ষিত হইয়াছে; এবং আসামে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদিগকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করা হইয়াছে। অতএব, কেবল বঙ্গীয় মুসলমানদের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে, এই ধারণা ভ্রান্ত।

—

ভারতশাসন আইনের ৩০৮ ধারা

ভারতশাসন আইনের যে ধারা ও উপধারা অনুসারে বঙ্গের হিন্দুরা ভারতসচিবকে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সর্ব্বসাধারণে তাহা অবগত নহেন। সেই জন্য, প্রবাসী বাংলা কাগজ হইলেও এবং উপধারাগুলি সমেত ধারাটি দীর্ঘ হইলেও, তাহা নীচে ছাপিতেছি।

308.—(1) Subject to the provisions of this section, if the Federal Legislature or any Provincial Legislature, on motions proposed in each Chamber by a minister on behalf of the council of ministers, pass a resolution recommending any such amendment of this Act or of an Order in Council made thereunder as is hereinafter mentioned, and on motions proposed in like manner, present to the Governor-General or, as the case may be, to the Governor an address for submission to His Majesty praying that His Majesty may be pleased to communicate the resolution to Parliament, the Secretary of State shall, within six months after the resolution is so communicated, cause to be laid before both Houses of Parliament a statement of any action which it may be proposed to take thereon.

The Governor-General or the Governor, as the case may be, when forwarding any such resolution and address to the Secretary of State shall transmit therewith a statement of his opinion as to the proposed amendment and, in particular, as to the effect which it would have on the interests of any minority, together with a report as to the views of any minority likely to be affected by the proposed amendment and as to whether a majority of the representatives of that minority in the Federal or, as the case may be, the Provincial Legislature support the proposal, and the Secretary of State shall cause such statement and report to be laid before Parliament.

In performing his duties under this subsection the Governor-General or the Governor, as the case may be, shall act in his discretion.

(2) The amendments referred to in the preceding subsection are—

(*a*) any amendments of the provisions relating to the size or composition of the Chambers of the Federal Legislature, or to the method of choosing or the qualifications of members of that Legislature, not being an amendment which would vary the proportion between the number of seats in the Council of State and the number of seats in the Federal Assembly, or would vary, either as regards the Council of State or the Federal Assembly, the proportion between the number of seats allotted to British India and the number of seats allotted to Indian States;

(*b*) any amendment of the provisions relating to the number of Chambers in a Provincial Legislature or the size or composition of the Chamber, or of either Chamber, of a Provincial Legislature, or to the method of choosing or the qualifications of members of a Provincial Legislature;

(*c*) any amendment providing that, in the case of women, literacy shall be substituted for any higher educational standard for the time being required as a qualification for the franchise, or providing that women, if duly qualified, shall be entered on electoral rolls

without any application being made for the purpose by them or on their behalf ; and

(*d*) any other amendment of the provisions relating to the qualifications entitling persons to be registered as voters for the purposes of elections.

(3) So far as regards any such amendment as is mentioned in paragraph (*c*) of the last preceding subsection, the provisions of subsection (1) of this section shall apply to a resolution of a Provincial Legislature whenever passed, but, save as aforesaid, those provisions shall not apply to any resolution passed before the expiration of ten years, in the case of a resolution of the Federal Legislature, from the establishment of the Federation, and, in the case of a resolution of a Provincial Legislature, from the commencement of Part III of this Act.

(4) His Majesty in Council may at any time before or after the commencement of Part III of this Act, whether the ten years referred to in the last preceding subsection have elapsed or not, and whether any such address as is mentioned in this section has been submitted to His Majesty or not, make in the provisions of this Act any such amendment as is referred to in subsection (2) of this section :

Provided that—

(i) if no such address has been submitted to His Majesty, then, before the draft of any Order which it is proposed to submit to His Majesty is laid before Parliament, the Secretary of State shall, unless it appears to him that the proposed amendment is of a minor or drafting nature, take such steps as His Majesty may direct for ascertaining the views of the Governments and Legislatures in India who would be affected by the proposed amendment and the views of any minority likely to be so affected, and whether a majority of the representatives of that minority in the Federal or, as the case may be, the Provincial Legislature support the proposal ;

(ii) the provisions of Part II of the First Schedule to this Act shall not be amended without the consent of the Ruler of any State which will be affected by the amendment.

—

৩০৮ ধারা ও উপধারায় কি আছে

৩০৮ ধারা ও উপধারাগুলি উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে কি আছে, তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। বঙ্গের হিন্দুরা (৪) উপধারা অনুসারে দরখাস্ত করিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা আছে, যে, দশ বৎসরের পূর্ব্বেও এবং ধারাটিতে উল্লিখিত "অনুরোধ" (Address) উপস্থাপিত না হইয়া থাকিলেও সকৌন্সিল মহিমান্বিত ইংলণ্ডেশ্বর পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। চতুর্থ উপধারার (i) অংশে পরিষ্কার করিয়া লেখা হইয়াছে, যে, যে-সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনটিতে জড়িত, প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তাহার মত জানিয়া লইতে হইবে। সকল সম্প্রদায়ের মত—সংখ্যাগরিষ্ঠদেরও মত—জানিয়া লইতে হইবে, আইনে তাহা নাই। আইনে যাহা নাই, সেরূপ প্রতিশ্রুতি দিবার অধিকার ভারতসচিবেরও নাই। কিন্তু "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম"; তর্কের দ্বারা কর্ত্তাকে তাঁহার অভীষ্ট পথ হইতে বিচলিত করা যাইবে না।

—

আইন ও গবর্ন্মেণ্টের অভিপ্রায়

আইনের ধারায় বলা হইয়াছে, যে, পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে—দশ বৎসরের আগেও হইতে পারিবে এবং ৩০৮ ধারার ৪র্থ উপধারার পূর্ব্ববর্ত্তী উপধারায় উল্লিখিত "অনুরোধ" উপস্থাপন সম্বন্ধীয় সর্ত্ত পালিত না হইয়া থাকিলেও, পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে।

ভারতসচিব বলিতেছেন, গবর্ন্মেণ্টের কোন পরিবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায় নাই, কিন্তু আইনের ৩০৮ ধারার চতুর্থ উপধারা বলিতেছে সকৌন্সিল ইংলণ্ডেশ্বর পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। যদি কোন পরিবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায় না থাকে, তাহা হইলে এই ধারাটি ও উপধারাগুলি আইনে কেন সন্নিবিষ্ট হইল? পার্লেমেণ্টের মাথা খারাপ হইয়াছিল, ইহা ত হইতে পারে না। কোন একটা উদ্দেশ্যে পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধীয় ধারা ও উপধারাগুলি আইনে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ইহা মনে করাই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত। সেই উদ্দেশ্যটি কি? ধারাটি ও উপধারাগুলি লোককে বলিতেছে, পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে; কিন্তু ভারতসচিব বলিতেছেন, পরিবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায় নাই। এই উভয়ের সামঞ্জস্য কি প্রকারে হইবে? না হইলে কাহাকে বিশ্বাস করিব? আইনকে না ভারত-সচিবকে? অবশ্য ভারতসচিব বলিয়াছেন বটে, যে, সম্প্রদায়-গুলির বাঞ্ছিত না হইলে পরিবর্ত্তন হইবে না, অর্থাৎ বাঞ্ছিত হইলে পরিবর্ত্তন হইবে। তাহার উপর আমাদের মন্তব্য এই, যে, আইনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিরই মত বা ইচ্ছা জানিবার আবশ্যকতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং বঙ্গের অন্যতম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিন্দুরা পরিবর্ত্তন চাহিতেছে। সুতরাং তাহাদের ইচ্ছা আইনসঙ্গত এবং ভারতসচিবের জবাব আইনবিরুদ্ধ।

—

সর্ব্ববিধ ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতির মূল্য

১৮৭৮ সালের ২রা মে তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিটন তৎকালীন ভারতসচিবকে লেখেন :—

"The Act of Parliament's undefined and indefinite obligations on the part of the Government of India towards its native subjects are so obviously dangerous that no sooner was the Act passed than the Government began to devise means for practically evading the fulfilment of it. Under the terms of the Act, which are studied and laid to heart by that increasing class of educated natives, whose development the Government encourages, without being able to satisfy the aspirations of its existing members, every such native, if once admitted to Government employment in posts previously reserved to the covenanted service, is entitled to expect and claim appointment in the fair course of promotion to the higher posts in that service. We all know that these expectations never can, or will, be fulfilled. We have had to choose between prohibiting them and cheating them; we have chosen the least straightforward course.... Since I am writing confidentially, I do not hesitate to say that both the Governments of England and of India appear to me, up to the present moment, unable to answer satisfactorily the charge of having taken every means in their power of breaking to the heart the words of promise they had uttered to the ear." *Labour's Way with the Commonwealth*, by George Lansbury, M. P., pp. 49-50.

ইহা ৫৮ বৎসর আগেকার কথা। তখনকার বড়লাট তখনকার ভারতসচিবকে লিখিয়াছিলেন, যে, তখনকার পার্লেমেণ্ট আইন পাস করিবার পরেই ভারতীয়দের প্রতি তদনুসারে ব্যবহার "বিপজ্জনক" ভাবিয়া তখনকার গবর্মেণ্ট আইনটি অনুসারে কার্য্যতঃ না-চলিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করেন ("no sooner was the Act passed than the Government began to devise means for practically evading the fulfilment of it")। এই মন্তব্যের সত্যতা বা অসত্যতার জন্য তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিটন দায়ী। অধুনা, ১৯৩৫ সালে ভারতশাসন আইন পাস হইবার আগেই, পার্লেমেণ্টে উহা আলোচিত হইবার সময়েই, ভারতসচিব বলিয়া রাখিয়াছেন, যে, উহার একটি ধারায় ও উপধারায় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার যেরূপ পরিবর্ত্তনের যে ব্যবস্থা আছে, সেরূপ কোন পরিবর্ত্তন করিবার গবর্মেণ্টের ইচ্ছা নাই। তখনকার বড়লাট তখনকার ভারতসচিবকে যেরূপ গোপনীয় ("confidential") চিঠি লিখিয়াছিলেন, এখনকার কোন লাট সেরূপ কিছু লিখিতেছেন কি না, জানিবার উপায় নাই।

৫৮ বৎসর আগেকার কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্। বর্ত্তমান শতাব্দীতে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ও অন্য কোন কোন রাজপুরুষ এবং কোন কোন ইংলণ্ডেশ্বর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন কোন প্রতিশ্রুতি (pledge) দিয়াছিলেন। সেগুলির বিস্তারিত বৃত্তান্ত দেওয়া এখানে অনাবশ্যক। ভারতবর্ষকে স্বশাসক ডোমীনিয়ন করা হইবে, এই প্রতিশ্রুতি সেগুলির মধ্যে প্রধান। অনেক প্রতিশ্রুতি যে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা তথাকথিত গোল টেবিল বৈঠক উপলক্ষ্যে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর কথাগুলি হইতে বুঝা যাইবে।

"The declarations made by British Sovereigns and statesmen from time to time that Great Britain's work in India was to prepare her for self-government have been plain ...... Pledge after pledge has been given to India that the British Raj was there not for perpetual domination... Why have our Queens and our Kings given you pledges? Why have our Viceroys given you pledges? I pray that by our labours together India will come to possess the only thing which she now lacks to give her the status of a Dominion amongst the British Commonwealth of Nations." *Labour's Way with the Commonwealth*, by George Lansbury, M. P., p. 66.

শেষ কথাগুলিতে ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়নত্বের মর্য্যাদা দিবার প্রতিশ্রুতি নিহিত আছে। এইরূপ অঙ্গীকার অন্য কোন কোন রাজপুরুষ এবং সম্রাটও করিয়াছিলেন। সেই সকল প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ হয় নাই—পার্লেমেণ্ট ১৯৩৫ সালে যে ভারতশাসন আইন প্রণয়ন ও পাস করেন, তাহাতে ডোমীনিয়নত্বের নামগন্ধও নাই। বস্তুতঃ এই আইনের খসড়া পার্লেমেণ্টে আলোচিত হইবার সময় তথায় বিনা প্রতিবাদে উক্ত হয়, যে, পার্লেমেণ্ট স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরের অঙ্গীকারের দ্বারাও বাধ্য নহে, কেবল নিজের প্রণীত আইন ও বিবেচনার দ্বারা বাধ্য। যথা—

রক্ষণশীল দলের পার্লেমেণ্ট-সদস্যদের ভারত-কমিটির চেয়ারম্যান (Chairman of the Conservative M. P.s India Committee) সর্ জন ওয়ার্ডল-মিল্‌ন্ (Sir John Wardlaw-Milne) ১৯৩৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর হাউস অব কমন্সে বলেন :—

"No pledge given by any Secretary of State or any Viceroy has any real legal bearing on the matter at all. The only thing that Parliament is really bound by is the Act of 1919."*

* *Hansard*, 10th December, 1934, Vol. 296, No. 15, p. 142.

অতএব, ভারতীয়েরাও কি বলিতে পারে না, যে, ভারতসচিব যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, বিষয়টির প্রতি তাহার কোন আইনানুসারী প্রযোজ্যতা নাই, এবং পার্লেমেণ্ট কেবল ১৯৩৫ সালের আইনের দ্বারাই বাধ্য, ভারতসচিবের কথা দ্বারা নহে ?

শুধু যে পার্লেমেণ্টের হাউস অব কমন্সেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় সমুদয় প্রতিশ্রুতিকে (pledgeকে) উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে, হাউস অব লর্ডসেও বিনা প্রতিবাদে এইরূপ মন্তব্য করা হইয়াছে। তথায়, বহু বৎসর হাউস অব কমন্সের কমিটির চেয়ারম্যান ও ডেপুটি-স্পীকার ("for many years Chairman of Committee and Deputy Speaker in the House of Commons)", লর্ড র‍্যাঙ্কীলার (Lord Rankeillour) ১৯৩৪ সালের ১৩ই ডিসেম্বর বলেন,

> "No statement by a Viceroy, no statement by any representative of the Sovereign, no statement by the Prime Minister, indeed, no statement by the Sovereign himself, can bind Parliament against its judgement."*

অতএব, যখন ইংলণ্ডাধিপতিরও কোন মন্তব্য বা বিবৃতি পর্য্যন্তকে প্রতিশ্রুতি বলিয়া পার্লেমেণ্ট নির্বিচারে মানিতে বাধ্য নহেন, তখন এক জন ভারতসচিবের কথাই যে চূড়ান্ত, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই।

আমরা এ বিশ্বাসে লিখিতেছি না, যে, এই যুক্তি-তর্কগুলার জোরে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমরা জানি, ভারতসচিবের কথা সহজে টলিবে না; জানি, ন্যায়সঙ্গত কিছু করিতে বাধ্য না হইলে ব্রিটিশ জাতি, ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট, ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডল, বা ব্রিটিশ ভারতসচিব তাহা করিবেন না। আমরা কেবল ইহাই অনুমান করিতেছি, যে, ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়ন করিবার প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হইলে তাহাতে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক ও অন্য স্বার্থে আঘাত লাগিত বলিয়া প্রতিশ্রুতিগুলারই কোন মূল্য নাই পার্লেমেণ্টে বিনা প্রতিবাদে এইরূপ কথা বলা হয়; আবার বর্ত্তমান ভারতসচিবের প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হইলে তদ্দ্বারা ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষিত হইবে বলিয়া তাহাকে অতি মূল্যবান, "পবিত্র", ও অলঙ্ঘনীয় মনে করা হইতেছে।

—

ভারতসচিবের প্রতিশ্রুতি ছাড়া তাঁহার অন্য কিছু কথা

হাউস অব লর্ডসে ১৯৩৫ সালের ৮ই জুলাই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে ভারতসচিবের যে উক্তি বঙ্গীয় দরখাস্তকারীদের উত্তরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন তিনি আরও কোন কোন কথা ঐ দিন বলিয়াছিলেন। তাহা হইতে শ্রোতা লর্ডরা বুঝিয়াছিলেন, যে, কোন কোন অবস্থায় দশ বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বেই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। সমুদয় কথা উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই। কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড বলেন :—

> "It is quite true that supposing before the ten years have expired some community, such as the Indian Christians, were really anxious to give up their special electorates and to take part in the joint electorate, it would then be possible, if they made that perfectly clear, for Parliament to take action under this clause ;......"*

তাৎপর্য্য। "ইহা সম্পূর্ণ সত্য, যে, যদি দশ বৎসর অতীত হইবার আগেই কোন সম্প্রদায়—যেমন ভারতীয় দেশী খ্রীষ্টিয়ানরা—তাহাদের বিশেষ আলাদা নির্ব্বাচকমণ্ডলী ছাড়িয়া দিয়া সম্মিলিত নির্ব্বাচক-মণ্ডলীতে যোগ দিতে ব্যগ্র হয় ও তাহাদের এই ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে, তাহা হইলে এই [৩০৮] ধারা অনুসারে পার্লেমেণ্ট পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।"

ভারতসচিব দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেশী খ্রীষ্টিয়ানদের নাম করিয়াছেন যেহেতু তাহারা সংখ্যালঘু। বঙ্গে হিন্দুরাও সংখ্যালঘু। যাহা দেশী খ্রীষ্টিয়ানদের বেলায় হইতে পারে বলিয়া ভারতসচিব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা বঙ্গের হিন্দুদের বেলায় কেন হইতে পারিবে না? তাহারা ত সম্মিলিত নির্ব্বাচনের পক্ষে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যগ্রতা সুস্পষ্ট করিয়াছে।

ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ডের ঐ কথাগুলি শুনিয়া লর্ড মিডলটন বলেন :—

> May I ask a specific question? Is there any intention of altering the Communal Award within ten years or not?†

* *Hansard*, House of Lords, December 13th, 1934, Vol. 95, No. 8, Col. 331.

* *Hansard*, Lords, 1934-35, Vol. 98, Column 25.

† *Ibid.*, Columns 27 & 28.

ইহার উত্তরে ভারতসচিব বলেন—

"There is no intention of altering the Communal Award within ten years, or after ten years, except with the agreement of the communities themselves."

এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া লর্ড মিডলটন বলেন :—

"That is not quite an answer to my question. In any circumstances can the Communal Award be upset within ten years or not ?

সুতরাং ভারতসচিবকে আবার বলিতে হয়—

"I gave an example of the sort of way in which an alteration might be made in the case of the Indian Christians. If they make it perfectly clear that they desire that alteration to be made, then it would be open to Parliament to make that alteration if they were satisfied."

তখন লর্ড মিডলটন ভারতসচিবের উত্তর আরও স্পষ্ট করাইয়া লইবার নিমিত্ত প্রশ্ন করেন—

"Have I understood the noble Marquess rightly that it is possible in certain circumstances to alter the Communal Award within ten years ? This is very important."

তাৎপর্য্য। মহানুভব লর্ড জেটল্যাণ্ডের উক্তির অর্থ আমি কি ঠিক্ বুঝিয়াছি যে, কোন কোন অবস্থায় দশ বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে ? ইহা খুব প্রয়োজনীয় কথা।

উত্তরে ভারতসচিব বলেন :—

"Yes, in the circumstances which I have explained."*

তাৎপর্য্য। হাঁ, আমি যেরূপ অবস্থার ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাতে পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

কিন্তু বঙ্গীয় হিন্দুদের আবেদনের উত্তরে ভারতসচিব তাঁহার যে কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ঐ প্রকার ধারণা না হইয়া বিপরীত ধারণাই হয়।

ভারতসচিব বলিয়াছেন, সম্প্রদায়সমূহের ইচ্ছা ব্যতিরেকে পরিবর্ত্তন হইতে পারে না ("unless it is desired by the communities themselves")। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের যে ৩০৮ ধারার ৪র্থ উপধারা আমরা আগে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে সংখ্যালঘু (minority) সম্প্রদায়ের মত অবগত হওয়ার ব্যবস্থা আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সম্মতি আবশ্যক, এরূপ কোন বিধি আইনে নাই। ভারতসচিব কিংবা আর যিনিই এরূপ কথা বলিবেন, যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়েরও সম্মতি হইলে তবে পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে, তাঁহার এই প্রকার কথার কোন সমর্থন আইনে পাওয়া যাইবে না। সুতরাং সেরূপ কথা আইনবিরুদ্ধ।

* এই এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ইংরেজী বাক্যগুলি হাউস্ অব লর্ডসের ১৯৩৪—৩৫ সালের হ্যানসার্ড রিপোর্টের ৯৮ ভল্যুমের ২৭,২৮ স্তম্ভ হইতে উদ্ধৃত।

ভারতসচিবের জবাব ও বঙ্গীয় হিন্দুদের কর্ত্তব্য

ভারতসচিব যে উত্তর দিয়াছেন, তাহাকে চূড়ান্ত ভাবিয়া সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটা উল্টাইয়া দিবার চেষ্টা হইতে আমরা বিরত হইতে পারি না। বাঁটোয়ারাটা মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতার প্রতিকূল, ন্যায়বিরুদ্ধ ও গর্হিত। উহা টিকিতে পারে না। কিন্তু কেবল খবরের কাগজে লিখিয়া এবং সভাতে বক্তৃতা ও প্রতিবাদ করিয়া উহা উল্টাইতে পারা যাইবে না, যদিও উভয়ই খুব আবশ্যক। বোধ হয়, ব্রিটিশ জাতি ও পার্লেমেণ্ট ভারতবর্ষের ও বঙ্গের হিন্দুদিগকে প্রধান স্বাধীনতাকামী সম্প্রদায় জানিয়া তাহাদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবিয়াছেন ও তাহাদিগকে হীনবল করিতে চাহিয়াছেন, এবং মনে করিয়াছেন তাহারা এরূপ অপদার্থ যে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিলেও তাহাদের সাহায্য পাওয়া যাইবে ও তাহাদের দ্বারা ব্রিটিশ জাতির কোন অসুবিধা হইতে পারে না। ভারতবর্ষের হিন্দুদিগকে এবং বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশের হিন্দুদিগকে ব্রিটিশ জাতির এই অনুমিত ধারণা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে বাঙালীদের আত্মনির্ভরশীলতা আবশ্যক। ইংরেজরা বণিক জাতি। আমরা স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন ও ক্রয়বিক্রয়ে পূর্ণ মনোযোগ দিলে এই বণিক জাতি আমাদিগকে অতি তুচ্ছ মনে না করিতেও পারে। অন্য অহিংস বৈধ উপায়ও আবিষ্কার ও অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা সমবেত ভাবে স্বাবলম্বী হইলে বিধাতা আমাদের সহায় হইবেন, কারণ আমাদের প্রচেষ্টা ন্যায্য ও ধর্ম্মানুমোদিত।

বঙ্গের হিন্দুদের অসন্তোষ, উত্তেজনা ও ক্রোধের যথেষ্ট কারণ থাকিলেও উত্তেজনা ও ক্রোধ প্রশমন, দমন ও বর্জ্জন করিয়া তাহাদিগকে দৃঢ়তার সহিত সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

—

পাঠিকা ও পাঠকদের প্রতি নিবেদন

আমরা নূতন ভারতশাসন আইন হইতে এবং অন্য কোন কোন বহি হইতে এই মাসের বিবিধ প্রসঙ্গে বহু ইংরেজী বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি। কারণ ভারতসচিবের উত্তরের পর আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত এইগুলি জানা আবশ্যক,

এবং যে-সব বহিতে এগুলি আছে, তাহার কোন কোনটি মফস্বলে—এমন কি কলিকাতাতেও—দুষ্প্রাপ্য। স্থানাভাবে উদ্ধৃত অধিকাংশ বাক্যেরই বাংলা দিতে পারি নাই। প্রয়োজন হইলে তৎসমুদয়ের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিবার লোক সর্ব্বত্র পাওয়া যাইবে।

—

"নারীধর্ষণকারীর চাকুরী লাভ"

এই শীর্ষনামের নীচে মুদ্রিত চিঠিটি আমরা গত ২২শে শ্রাবণ তারিখের "আনন্দ বাজার পত্রিকা" হইতে নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

কারাদণ্ড ভোগের পর দফাদার নিযুক্ত

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

সারিয়াকান্দী (বগুড়া), ৫ই আগষ্ট

সারিয়াকান্দী থানার অন্তর্গত হাটসেরপুর গ্রামের এক বিধবা ব্রাহ্মণ যুবতীর উপর পাশবিক অত্যাচার করায় আমান সর্দ্দার (৩৫) ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। সে পূর্ণ দণ্ড ভোগ করিয়া বাড়ীতে আসার পরই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী গোলাম ওয়াহেদ তাহাকে হামছপুর ইউনিয়নের দফাদার নিযুক্ত করিয়াছেন। দফাদারের পদে এক জন দণ্ডিত লম্পটকে নিযুক্ত করায় হিন্দুগণ বিশেষ শঙ্কিত হইয়াছে।

এইরূপ এক ব্যক্তিকে সরকারী কোন কাজে, বিশেষতঃ দফাদারের কাজে, নিযুক্ত করা গর্হিত। মুসলমান সমাজে লোকমত ও সামাজিক শাসন এরূপ হওয়া আবশ্যক যাহাতে কোন পদস্থ মুসলমান দ্বারা এরূপ নিয়োগ নিন্দনীয় বিবেচিত হয় এবং অসম্ভব হয়। ভদ্রশ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমানেরা চেষ্টা করিলে এইরূপ লোকমত, যদি না-থাকে বা দুর্ব্বল থাকে, তাহা হইলে তাহা জন্মিতে পারে বা প্রবল হইতে পারে।

এইরূপ জঘন্য ও গুরুতর অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিকে সরকারী কোন কাজে নিযুক্ত করা গবর্ন্মেণ্ট অনুমোদন করেন কি?

—

নারীর প্রতি আচরণ সম্বন্ধে মুসলমান জনমত

নারীর প্রতি আচরণ সম্বন্ধে মুসলমান জনমত ভালর দিকে সুস্পষ্ট ও যথেষ্ট প্রবল হওয়া যে আবশ্যক, তাহা ঢাকায় বঙ্গের গবর্ণরের একটি বক্তৃতা হইতে অনুভূত হইবে। হিন্দুদের মধ্যেও আরও প্রবল হওয়া চাই, কিন্তু সেকথা এই প্রসঙ্গে বলিতেছি না এই জন্য, যে, হিন্দুরা এ বিষয়ে আলোচনা ও আন্দোলন অনেক বৎসর ধরিয়া যতটা করিয়া আসিতেছেন মুসলমানরা ততটা করেন নাই।

বঙ্গের গবর্ণর ঢাকায় বলিয়াছিলেন, যে, [illegible] প্রকার নির্য্যাতন আইন অনুসারে দণ্ডনীয়, সেই প্রকারে নির্য্যাতিতা মুসলমান নারীর সংখ্যা সর্ব্বাধুনিক রিপোর্ট অনুসারে সেই প্রকারে নির্য্যাতিতা হিন্দুনারীর চেয়ে অধিক। ঠিক্ সংখ্যাগুলি আমাদের সম্মুখে নাই। এমন হইতে পারে, যে, বঙ্গে মুসলমান নারীর মোট সংখ্যা ও হিন্দুনারীর মোট সংখ্যা যত, নির্য্যাতিতাদের সংখ্যাও তাহার অনুরূপ; কিম্বা এমন হইতে পারে, যে, নির্য্যাতিতা মুসলমান নারীরা মোট নির্য্যাতিতা নারীদের শতকরা ৫৪।৫৫ জনের চেয়েও বেশী। যাহাই হউক, ইহা মোটের উপর সত্য, যে, হিন্দু নারীদের মধ্যে যেমন অনেকে নির্য্যাতিতা হন, মুসলমান নারীদের মধ্যেও তেমনি অনেকে নির্য্যাতিতা হন। এবং ইহাও গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃক সংগৃহীত সংখ্যা হইতে বুঝা যায়, যে, মুসলমান নারীদের নির্য্যাতন হিন্দু বদমায়েস দ্বারা যত হয় মুসলমান বদমায়েস দ্বারা তদপেক্ষা অনেক বেশী হয়। মুসলমান পুরুষদের দ্বারা মুসলমান নারীদের নির্য্যাতনের মোকদ্দমা হিন্দু ষড়যন্ত্রের ফলে হয়, মুসলমানরা এরূপ সন্দেহ করেন কিনা জানি না। কিন্তু সেরূপ সন্দেহের কোন কারণ আমরা অবগত নহি।

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া ভদ্রশ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমানরা বুঝিতে পারিবেন—সম্ভবতঃ তাঁহারা আগে হইতেই বিশ্বাস করেন, যে, নারীর প্রতি আচরণ সম্বন্ধে লোকমত স্পষ্টতর ও প্রবলতর হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে আন্দোলন করিতে হইলে তাঁহারা তাঁহাদের শাস্ত্রের যথেষ্ট সমর্থন পাইবেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমরা ভূপালের পরলোকগতা বেগম সাহিবার একখানি উর্দ্দু বহির ইংরেজী অনুবাদ পাইয়াছিলাম। তাহাতে মুসলমানধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মুহম্মদের এই একটি বাণীর ইংরেজী অনুবাদ ছিল বলিয়া মনে পড়িতেছে:

"Paradise lies at the feet of the mother"

"স্বর্গ জননীর পদতলে অবস্থিত।"

ইহাও শুনিয়াছি, যে, মুসলমানদের শাস্ত্রে ব্যভিচারীকে লোষ্ট্রনিক্ষেপ দ্বারা বধ করিবার বিধান আছে।

ঘটনাক্রমে আজ ২৭শে শ্রাবণ "স্বস্তিকা" নাম দিয়া

মুদ্রিত একটি হিন্দু বালিকার বিবাহ উপলক্ষ্যে প্রেরিত আশীর্ব্বাদগুলি পাইয়াছি। তাহার শেষে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মহাশয়ের লিখিত নিম্নমুদ্রিত কথাগুলি আছে।

'মহম্মদ'

"মান্ আক্‌রম যওজতহু আক্‌রমহু-ল্লাহ।"

যে স্ত্রীকে সম্মান করে, ঈশ্বর তাহাকে সম্মানিত করেন।

"আলা ইন্ন লকুম্ 'আলা নিসাইকুম্ হক্‌কান্ ওয়ালিনিসাইকুম্ 'আলয়কুম্ হক্‌কান্।"

সাবধান। স্ত্রীর উপর তোমাদের স্বত্ব আছে এবং তোমাদের উপর স্ত্রীর স্বত্ব আছে।

"আদ্‌দুন্‌য়া মাতা'উন ওয়া খয়্‌রু মতা'ই-দ্ দুন্‌য়া আল্ মর্‌ আতু-স্ স্বালিহ'তু।"

পৃথিবী সম্পদ, এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধার্ম্মিকা নারী।

ঢাকা আশীর্ব্বাদক

৩রা আষাঢ়, ১৩৪৩ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

—

বঙ্গে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা

কোন দেশে নারীর সংখ্যা ক্রমাগত কমিতে থাকিলে তথাকার অধিবাসী জাতির লোকসংখ্যা হ্রাস এবং পরিণামে লয়প্রাপ্তি অনিবার্য্য। এই জন্য বঙ্গে পুরুষদের তুলনায় নারীদের সংখ্যার অবিরাম হ্রাস সাতিশয় উদ্বেগজনক। এই হ্রাস কিরূপ, তাহা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত ভারতবর্ষের মহিলাদের ন্যাশন্যল কৌন্সিলের বুলেটিনের গত এপ্রিল সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন। তাহা হইতে কতকগুলি তথ্য বাঙালীদের বিবেচনার জন্য সংকলন করিয়া দিতেছি।

এ পর্য্যন্ত সরকারী সেন্সস অর্থাৎ লোকসংখ্যাগণনা সাত বার হইয়াছে। এই সাত বারে বঙ্গের সব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিহাজার পুরুষে মোট স্ত্রীলোক কত ছিল, এবং হিন্দুদের মধ্যে কত ও মুসলমানদের মধ্যে কত ছিল, তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার তালিকাটি নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

সেন্সসের বৎসর	সকল সম্প্রদায়	হিন্দু	মুসলমান
১৮৭২	৯৯২	১০০৩	৯৮৭
১৮৮১	৯৯৪	৯৯৯	৯৮৮
১৮৯১	৯৭৩	৯৬৯	৯৭৭
১৯০১	৯৬০	৯৫১	৯৬৮
১৯১১	৯৪৫	৯৩১	৯৪৯
১৯২১	৯৩২	৯১৬	৯৪৫
১৯৩১	৯২৪	৯০৮	৯৩০
হ্রাস	—৬৮	—৯৫	—৫৭

হাজারকরা এই হ্রাস বঙ্গের কোন একটা বা কয়েকটা অঞ্চলে আবদ্ধ নহে। সকল ডিবিজনেই যে হ্রাস হইয়াছে, তাহা যতীন্দ্রবাবু আর একটি তালিকায় দেখাইয়াছেন। তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

এরূপ মনে হইতে পারে, যে, বঙ্গে ক্রমশঃ কলকারখানা ও বাণিজ্য বাড়িতেছে এবং তদুপলক্ষ্যে বঙ্গের বাহির হইতে প্রধানতঃ পুরুষরাই আসিতেছে; এই জন্য বঙ্গে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা হাজারকরা ক্রমাগত কম দেখা যাইতেছে। নারীসংখ্যার হ্রাস কিয়ৎ পরিমাণে এই কারণে হইতেছে বটে। কিন্তু তাহা ঘটিতেছে কলিকাতা ও কলকারখানা-বহুল বাণিজ্যপ্রধান অন্য কয়েকটি নগরে। যদি আমরা বঙ্গের মোট লোকসংখ্যা হইতে নগরগুলির লোকসংখ্যা বাদ দি, তাহা হইলে গ্রামময় বঙ্গের লোকসংখ্যা পাওয়া যাইবে। সমগ্র বঙ্গে ও গ্রামময় বঙ্গে প্রতিহাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা নীচের তালিকায় দেখান হইতেছে।

সেন্সসের বৎসর	সমগ্র বঙ্গে	গ্রামময় বঙ্গে
১৮৭২	৯৯২	১০০৭
১৮৮১	৯৯৪	১০০৬
১৮৯১	৯৭৩	৯৯০
১৯০১	৯৬০	৯৮২
১৯১১	৯৪৫	৯৭১
১৯২১	৯৩২	৯৬১
১৯৩১	৯২৪	৯৫৫
মোট হ্রাস	—৬৮	—৫২

অতএব ইহা নিঃসন্দেহ, যে, বঙ্গে পুরুষদের তুলনায় স্ত্রীলোকদের সংখ্যার হ্রাস হইতেছে।

ইহা অবশ্য সত্য, যে, বঙ্গের লোকসংখ্যা—পুরুষদের ও স্ত্রীলোকদের সংখ্যা—ক্রমাগত বাড়িতেছে। কিন্তু পুরুষ যত বাড়িতেছে, স্ত্রীলোক তত বাড়িতেছে না। স্ত্রীলোকদের এই আপেক্ষিক হ্রাস উদ্বেগজনক। ইহার কারণ কি? সন্তানপ্রসব ছাড়া মৃত্যুর অন্য প্রধান কারণগুলি স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে লোকক্ষয়ের কারণ। সরকারী স্বাস্থ্য রিপোর্ট হইতে ১৯২১ হইতে ১৯৩০ পর্য্যন্ত কি কি কারণে গড়ে কত মৃত্যু হইয়াছে যতীন্দ্রবাবু তাহা নীচের তালিকায় দেখাইয়াছেন।

মৃত্যুর কারণ	মৃত পুরুষের সংখ্যা	মৃত স্ত্রীলোকের সংখ্যা
ওলাউঠা	৩৭,০২৭	৩৩,৬০৫
জ্বর (ম্যালেরিয়া সমেত)	৪,৪০,৫০১	৪,০২,৯৩৯
বসন্ত	৯,৭২৪	৮,৯৩১

মৃত্যুর কারণ	মৃত পুরুষের সংখ্যা	মৃত স্ত্রীলোকের সংখ্যা
আমাশয় ও উদরাময়	১৪,৮৪৭	১৩,০৩০
শ্বাসযন্ত্রঘটিত পীড়া	২১,৯৪৮	১৩,৪৫৫
আত্মহত্যা	১,৩১১	১,৮৫০
সন্তান প্রসব	—	৪,৪৩১

উপরের তালিকায় দৃষ্ট হইবে, যে, রোগে মৃত্যু পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকদের কম হয়। সন্তানপ্রসবঘটিত কারণে মৃত্যু অবশ্য কেবল স্ত্রীলোকদেরই হইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেরা আত্মহত্যা করে বেশী। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকেরাই বেশী আত্মহত্যা করে। তাহার কারণ, আমাদের দেশে, পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের জীবন দুঃখের হইলেও, নারীদের জীবন অধিকতর দুঃখময় ও দুর্বহ।

নারীদের আপেক্ষিক সংখ্যাহ্রাসের কারণ যতীন্দ্রবাবু সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার অনুবাদ দিবার স্থান নাই। কিন্তু তিনি, যে, সন্তানপ্রসবঘটিত পীড়াদিকে একটি প্রধান কারণ বলিয়াছেন, তাহার সম্পর্ক তালিকাটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। মোটামুটি ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নারীদের সন্তান প্রসবের বয়স। তালিকা হইতে দেখা যাইবে, এই বয়সে নারীদের মৃত্যুসংখ্যা পুরুষদের মৃত্যুসংখ্যা অপেক্ষা অধিক। তালিকাটিতে ভিন্ন ভিন্ন বয়সে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের হাজারকরা মৃত্যুসংখ্যা দেখান হইয়াছে। সংখ্যাগুলি ১৯২১ হইতে ১৯৩০ পর্য্যন্ত দশ বৎসরের গড়।

বয়স	পুরুষ	স্ত্রীলোক	পুরুষদের চেয়ে নারীদের মৃত্যুর আধিক্য (+) বা ন্যূনতা (−)
০—১	১৯১'৬	১৮০'৩	—১১'৩
১—৫	৩৬ ২	৩২'৬	—৩ ৬
৫—১০	১৩'৩	১১'৫	—১ ৮
১০—১৫	১০'০	৯'৭	—০ ৩
১৫—২০	১৩'৯	১৬'৬	+২'৭
২০—৩০	১৫'১	১৮'১	+৩'০
৩০—৪০	১৭'৯	১৮'৭	+০ ৮
৪০—৫০	২৩'১	২০'৮	—২'৫
৫০—৬০	৩৫ ৯	৩১ ৩	—৪'৮
৬০ ও তদধিক	৭২ ৭	৬১'৯	—১০'৮

নারীদের মৃত্যুসংখ্যা কমাইবার অন্যতম প্রধান উপায়, অল্প বয়সে তাঁহাদিগের জননীত্ব নিবারণ, ঘন ঘন জননীত্ব নিবারণ, সূতিকাগারসমূহের ও প্রসবকালীন রীতিনীতি প্রথা খাদ্য ও আচারের আবশ্যক-মত পরিবর্ত্তন, এবং সর্ব্বত্র যথেষ্টসংখ্যক শিক্ষিতা ধাত্রী পাইবার উপায় অবলম্বন।

হরবিলাস সারদা মহাশয়ের চেষ্টায় বিধিবদ্ধ বাল্যবিবাহ-নিরোধ আইনের ফলে যে জননী হইবার বয়সের নারীদের মৃত্যুর হার কমিয়াছে, যতীন্দ্র বাবু তাহা দুটি তালিকা দ্বারা দেখাইয়াছেন।

যতীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধটির নাম "নারীগণ এবং জাতীয় স্বাস্থ্য" ("Women and the Nation's Health")। বোধ হয় তিনি সেই জন্য পুরুষদের চেয়ে নারীদের সংখ্যা কম হইবার একটি কারণের উল্লেখ করেন নাই। বর্ত্তমান ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত ১৯৩৪ সালের সরকারী বঙ্গীয় স্বাস্থ্য-রিপোর্টে দেখিতেছি, ঐ বৎসর বঙ্গে পুরুষজাতীয় শিশু জন্মিয়াছিল ৭,৫৯,৭২২ এবং স্ত্রীজাতীয় শিশু জন্মিয়াছিল ৭,০৪,৭৯৮। অতএব, বঙ্গে নারীর জন্মও হয় কম। কোন কোন দেশে, কোন কোন জাতির মধ্যে, কোন কোন পরিবারে, কোন কোন সময়ে কেন ছেলে বা মেয়ে বেশী বা কম জন্মে, তাহার কারণ জানি না।

কিন্তু ইহা কি হইতে পারে না, যে, বঙ্গে বহু নারীর আদর অপেক্ষা অনাদর ও নিগ্রহ বেশী হয় বলিয়া বিধাতা বা প্রকৃতি এদেশে নারী কম পাঠাইতেছেন?

—

নারী রক্ষা একান্ত আবশ্যক

বাংলা দেশে "নারীরক্ষা" সাধারণতঃ দুর্বৃত্ত লোকদের হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা একান্ত আবশ্যক বটে। এবং নারীদের আত্মরক্ষার সামর্থ্য অর্জ্জন খুব বাঞ্ছনীয় হইলেও, যে-সকল পুরুষনামধারী জীব নারীদিগকে আত্মরক্ষার সামর্থ্যলাভের উপদেশ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে দিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে চায়, তাহারা অবজ্ঞার পাত্র।

"নারীরক্ষা" ব্যাপকতর অর্থে বুঝা উচিত। নারীদিগকে কেবল দুর্বৃত্ত লোকদের হাত হইতে নয়, অজ্ঞতা, রোগ ও অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করাও সমাজের একান্ত কর্ত্তব্য।

—

"ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা"

ডাক্তার শ্রীযুক্ত পশুপতি ভট্টাচার্য্য, ডি টি এম্, "ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা" নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়া তাহার প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার কাগজ ভাল, ছাপা ভাল, বাঁধাই ভাল। ইহার বেশী কিছু বলিবার অধিকার আমাদের নাই। যাঁহাদের আছে তাঁহারা ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। মুখপত্রে প্রশংসা করিয়াছেন ডাক্তার সর্ নীলরতন সরকার, এবং ভূমিকায় প্রশংসা করিয়াছেন "ডক্টর" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সকলে জানেন না, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের "ডক্টর" হইলেও কোন কোন রকমের চিকিৎসা সম্বন্ধেও পড়িয়াছেন বহু গ্রন্থ, অভিজ্ঞতাও অর্জ্জন করিয়াছেন সমধিক। ফী লইয়া ব্যবসা না করায় তাঁহার হাতযশ ও পসার সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ আছে। তাই তিনি লিখিয়াছেন, "ডাক্তারি বইয়ের ভূমিকা কবির চেয়ে কবিরাজকে মানায় ভালো", যদিও কবি-রাজ তিনি কবিরাজও হইতে পারিতেন। তাঁহাকে যে চিকিৎসা মধ্যে মধ্যে করিতে হইয়াছে, এবং এখনও হয়, তাহা তাঁহার ভূমিকার শেষ দুটি প্যারাগ্রাফ হইতে জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

"গ্রামে যদি কোথাও এক আধ জন জনহিতৈষী শিক্ষিত লোক থাকেন তাঁরাও এই রকম বইয়ের সাহায্যে উপস্থিত অনেক উপকার করতে পারবেন,—আর আমার মতো সাহিত্য-ডাক্তার যাকে দায়ে পড়ে হঠাৎ ভিষক্-ডাক্তার হ'তে হয় তার তো কথাই নাই। কিসের দায়? তার দৃষ্টান্ত দিই। সাঁওতাল পাড়ার মা এসে আমার দরজায় কেঁদে পড়ল, তার ছেলেকে ওষধ দিতে হবে। যতই বলি আমি ডাক্তার নই, তার জিদ ততই বেড়ে যায়। জানি, যদি তাকে নিতান্তই বিদায় করে দিই, সে তখনি যাবে ভূতের ওঝার কাছে,—তার ঝাড়ার চোটে রোগ ও রোগী দুইই দেবে দৌড়। বই খুলে বসতে হোলো,—বড়াই করতে চাইনে কেন না পসার বাড়াবার ইচ্ছে মোটেই নেই—সে রোগী আজও বেঁচে আছে;—আমার গুণে বা তার ভাগ্যের গুণে সে তর্কের শেষ মীমাংসা কোনো উপায়েই হ'তে পারে না। বহুকাল পূর্ব্বে রামগড় পাহাড়ে গিয়েছিলুম; সেখানেও রোগীরা আমাকে অসাধ্যরোগের মতোই পেয়ে বসেছিল,—ঝেড়ে ফেলবার অনেক চেষ্টা করেছিলুম, শেষকালে তাদেরই হোলো জিৎ। যাদের সাধ্যগোচরে কোথাও কোনো চিকিৎসার উপায় নেই তারা যখন কেঁদে এসে পায়ে ধরে পড়ে, তাদের তাড়া করে ফিরিয়ে দিতে পারি এতবড় নিষ্ঠুর শক্তি আমার নেই। এদের সম্বন্ধে পণ করে বসতে পারি নে যে পুরো চিকিৎসক নই বলে কোনো চেষ্টা করব না। আমাদের হতভাগ্য দেশে :আধা চিকিৎসকদেরকেও যমের সঙ্গে যুদ্ধে আড়কাঠি দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়।

"তা ছাড়া ঘরের লোক নির্ব্বুদ্ধিতা ও দুর্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ ডাক্তারের ব্যবস্থাকে প্রায়ই বিকৃত করে দিয়ে থাকে। এই কারণে, একে তো অভিজ্ঞ ডাক্তার বহুমূল্য, তার উপরে তাঁরা প্রায়ই অভিজ্ঞ শুশ্রূষার ব্যবস্থা দাবী করেন। ব্যয় সম্বন্ধে একে বলা যায় ডবল ব্যারেল বন্দুক। রোগীরা এই রাস্তা দিয়ে কখনো ধনে কখনো ধনে প্রাণে মরে। উপস্থিত বইখানি ঘরের কোনো লোক যদি পড়ে রাখেন তবে তাঁদের শুশ্রূষায় হৃদয়ের সঙ্গে জ্ঞানের যোগ হয়ে তার মূল্য অনেক বেড়ে যাবে। আ[illegible] যাই হোক, ডাক্তার পশুপতিকে আশীর্ব্বাদ করে, আমি মাঝে মাঝে এই বইখানি পড়ব এবং সেই পড়া নিশ্চয়ই কাজে লাগবে।"

ডাঃ সর্ নীলরতন সরকার লিখিয়াছেন—

"গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় নানা প্রকার ব্যাধির মধ্যে এখন ভারতব[illegible] যেগুলির প্রকোপ দেখা যায়, ঐসকল রোগের উৎপত্তি, নিদান ও নির্ণয়তত্ত্ব নিবারণ এবং প্রতিষেধক প্রণালী ও চিকিৎসাবিচার এই পুস্তকে বিশে[illegible] পারদর্শিতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর শ্রেণী রোগগুলির বর্ণনা লেখকের বিশেষ চিন্তা, গবেষণা ও পরিশ্রমের ফল। আমা[illegible] বিশেষ আশা ও দৃঢ়বিশ্বাস যে ছাত্র কিংবা শিক্ষক কিংবা ভিষক-চিকিৎসাজগতের সকল পাঠকই গ্রন্থকারের এই অক্লান্ত পরিশ্রমের সুফ[illegible] ভোগ করিবেন।

এখন বঙ্গের ব্যাধিরাজ ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে গ্রন্থকা[illegible] মহাশয়ের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করি—

"......স্বাস্থ্য ঠিক থাকিলে ম্যালেরিয়াকে ভয় নাই। খাদ্[illegible] সাধারণের স্বাস্থ্য বজায় রাখে। যাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় এ[illegible] অনিয়ম অত্যাচার করে না, তাহাদের ম্যালেরিয়া খুব কমই হয়,—ই[illegible] আমরা নিত্যই দেখি। এদেশে যাহাদের আহার জোটে, ম্যালেরিয়া তাহাদের কম,—যাহাদের জোটে না, তাহাদের মধ্যেই বেশী। যখন হইতে দেশের দারিদ্র্য বাড়িয়াছে তখন হইতে ম্যালেরিয়াও বাড়িয়াছে। দেশের অভাব দূর করিতে না পারিলে ম্যালেরিয়া দূর হইবে না। দারিদ্র্য ও ম্যালেরিয়া দুই যমজ ভাই, একটি থাকিতে অপরটিকে তাড়ানো দুঃসাধ্য।"

—

শ্রীযুক্ত এম্ সি রাজা ও ডাক্তার মুঞ্জে

তফসিলভুক্ত (scheduled) জাতিসমূহের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত এম্ সি রাজা ডাক্তার মুঞ্জের একটি অপ্রকাশ্য (confidential) চিঠি ছাপিয়া দিয়া খুব বাহবা পাইতেছেন এবং ডাঃ মুঞ্জের উপর বহু সংবাদপত্রের আক্রমণের কারণ হইয়াছেন। এই সব কাগজের সম্পাদকেরা জানেন কি না বলিতে পারি না, যে, চিঠিটি অপ্রকাশ্য ("confidential") ভাবে লিখিত হইয়াছিল। এরূপ চিঠি লেখকের অনুমতি না লইয়া প্রকাশ করা গর্হিত ও হেয় কাজ। কখন কখন এমন অবস্থা ঘটে বটে, যে, কোন কোন কন্‌ফিডেন্স্যাল চিঠি বা সংবাদ প্রকাশ না করিলে দেশের ও সমাজের বিশেষ ক্ষতি হয়। এক্ষেত্রে প্রকাশের সেরূপ কোন কারণ ছিল না। আমরা এই চিঠি অনেক আগে পাইয়াছিলাম। কিছু দিন পূর্ব্বে যখন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন ডাঃ মুঞ্জের সহিত পণ্ডিতজীর

এবিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনার সময় আমরা অন্য কাহারও কাহারও সহিত উপস্থিত ছিলাম। আলোচ্য প্রস্তাবটি পণ্ডিতজী অনুমোদন করেন নাই। সুতরাং এবিষয়ে ডাঃ মুঞ্জে আর কিছু করিতে ইচ্ছা করেন না—আমরা সকলে এই রূপ বুঝিয়াছিলাম। ঠিকই বুঝিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত রাজা চিঠিখানি প্রকাশ করিয়া দিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে পণ্ডিতজীর সহিত এই আলোচনা হয়।

শ্রীযুক্ত রাজা ডাঃ মুঞ্জের চিঠির এইরূপ অপব্যাখ্যা করিয়াছেন, যে, ডাঃ মুঞ্জে তফসিলভুক্ত জাতিদিগকে হিন্দু-সমাজ হইতে তাড়াইয়া দিয়া শিখ করিতে চান। কিন্তু ইহা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায়, যে, ডাঃ মুঞ্জের এরূপ কোন দুরভিসন্ধির লেশমাত্রও কখনও ছিল না ও নাই। তাঁহার মত কেবল এই ছিল, যে, যদি কোন তফসিলভুক্ত জাতির লোক একান্তই হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া জাতিভেদ-বিহীন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে চায়, তাহা হইলে তাহার শিখ হওয়াই ভাল। অনেক হিন্দুর মত এই রূপ। ডাঃ মুঞ্জের এই মত ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার কোন দুরভিসন্ধি ছিল না। তাঁহার নিন্দুকদের চেয়ে তিনি কম হিন্দু বা কম হিন্দুহিতৈষী নহেন। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি হিন্দুসমাজের জন্য অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। বঙ্গের হিন্দু সংবাদপত্রসেবীদের ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য, যে, ভারতীয় অবাঙালী নেতাদের মধ্যে বাঙালীর বন্ধু বেশী নাই এবং ডাঃ মুঞ্জের চেয়ে বড় বন্ধুও কেহ নাই। তিনি যে সামরিক বিদ্যালয় খুলিতেছেন, তাহাতে মোট ৩০০ ছাত্র শিক্ষা পাইবে। তাহার মধ্যে বাঙালী লইবেন ৫০ জন। তা ছাড়া, ঐ বিদ্যালয়ের দীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটির সময় আরও ১০০।২০০ বাঙালী ছাত্রকে প্রধান প্রধান বিষয়গুলি কার্য্যতঃ শিখাইয়া দিবার তাঁহার ইচ্ছা আছে।

—

মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের জয়

১৯১১ সালে মোহনবাগান দলের ফুটবল খেলোয়াড়রা অন্য সব ভারতীয় ও ইংরেজ দলকে পরাজিত করিয়া ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশ্যনের শীল্ড প্রাপ্ত হন। তাহার পর ২৫ বৎসর ধরিয়া আর কোন ভারতীয় দল শীল্ড পান নাই। সেই জন্য বর্ত্তমান বৎসরে আর সব দেশী ও বিদেশী দলকে হারাইয়া মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের শীল্ড লাভ বিশেষ সন্তোষের কারণ হইয়াছে। এই দল পুরুষোচিত ক্রীড়ার ক্ষেত্রে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন।

—

কলিকাতা নর্ম্যাল স্কুলের উচ্ছেদ ?

সংবাদপত্রে দেখিলাম, বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগ কলিকাতা নর্ম্যাল স্কুল উঠাইয়া দিতে সংকল্প করিয়াছেন। এই সংবাদ সত্য হইলে, এই সংকল্পের কারণ কি ? এই নর্ম্যাল স্কুলটি বহু বৎসর ধরিয়া মধ্য-বাংলা ও মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহের জন্য শিক্ষিত বহু হেড্ পণ্ডিত ও অন্যান্য পণ্ডিত জোগাইয়া আসিতেছেন। ইহার বিলোপ বাঞ্ছনীয় নহে। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় পুনর্ব্বিবেচনা করিয়া নর্ম্যাল স্কুলটি বজায় রাখিলে তাহা দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে।

—

ইউরোপে জন্মের হারের হ্রাস

ইউরোপের প্রায় সমুদয় দেশে জন্মের হার কমিয়া যাইতেছে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনের সুবন্দোবস্ত দ্বারা মৃত্যুর হারও কমান হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও, ইউরোপের বহু দেশে অধিবাসীদের বর্ত্তমান সংখ্যা রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে শ্বেত জাতিদের উদ্বর্ত্তন ("survival of the white races") সম্বন্ধে বহু পাশ্চাত্য মনীষী আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন। জন্মনিরোধের নানা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন জন্মের হার কমিবার একটি কারণ। পাশ্চাত্য বহু দেশে তাহার রাসায়নিক দ্রব্য ও যন্ত্রাদি অবাধে বিক্রয় করিতে দেওয়া হয় না ; কিন্তু ভারতবর্ষে তাহা হইতেছে। তাহাতে নৈতিক ও দৈহিক নানা অনিষ্ট হইতেছে।

অনেকে মনে করে, লোকসংখ্যা বাড়িতেছে, এত লোক খাইতে পাইবে কেমন করিয়া, অতএব লোকসংখ্যা কমাও। কিন্তু পৌরুষ, উদ্যোগিতা ও বুদ্ধি থাকিলে অধিকতর খাদ্য উৎপাদন করিয়া এবং পণ্যশিল্পজাত নানা দ্রব্যের বিনিময়ে নানা দেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া বর্দ্ধিত লোকসংখ্যার

অনুযায়ী খাদ্যের সংস্থান সমস্যার সমাধান হইতে পারে। এবং মানুষদের খাদ্যের সংস্থান ও সম্পদবৃদ্ধি সহকারে সংস্কৃতির উন্নতি হইলে স্বভাবতঃ লোকসংখ্যাবৃদ্ধির হার কমিয়া আসে, কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হয় না।

এই বহুজনাকীর্ণ বাংলা দেশেই এখনও কৃষিযোগ্য অনেক জমীতে চাষ হয় না—কৃষির বিস্তার হইতে পারে।

কৃষির উন্নতি ত খুব বেশী হইতে পারে। এক বিঘা জমী হইতে আমরা যত ধান, গম, যব, নানা তরকারী আদি পাই, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অন্য অনেক দেশের কৃষকেরা পায়। সম্প্রতি আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন দ্বারা বিস্ময়কর ফল পাওয়া গিয়াছে। দু-একটা দৃষ্টান্ত দি। কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর গেরিক (Dr. W. F. Gericke) ১৫ ফুট উঁচু টমাটোর বা বিলাতী বেগুনের গাছ জন্মাইতেন। তিনি এক এক একর (কিঞ্চিদধিক তিন বিঘা) জমীতে ২১৭ টন করিয়া বিলাতী বেগুন ও ২৪৬৫ বুশেল গোল আলু জন্মাইয়াছেন। আমেরিকায় সাধারণতঃ গড়ে এক একরে ১১৬ বুশেল জন্মে। এক বুশেল প্রায় সাড়ে নয় সের। অন্যান্য অনেক তরকারী ও ফুলের চাষেও তিনি আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছেন।

—

নূতন লাঙ্গল

বঙ্গে সাধারণতঃ ব্যবহৃত লাঙ্গলে মাটী গভীর ভাবে খনিত হয় না বলিয়া ফসল যে পরিমাণে হইতে পারে তাহা হয় না। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর নূতন এক রকম লাঙ্গলের খবর দিতেছেন যাহার দ্বারা মাটী গভীরতর ভাবে কর্ষিত হয়। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ সূত্রধর বা কর্ম্মকারের হাতিয়ার ভিন্নও জোড়া দেওয়া যায়। কিন্তু উহার দাম ৫৷৷০ টাকা। ইহার অর্দ্ধেক দামে বা তিন টাকা সাড়ে তিন টাকায় পাওয়া গেলে বঙ্গের গরীব চাষীদের সুবিধা হয়।

—

স্বাবলম্বন ও সাম্প্রদায়িক অনুগ্রহ

বোম্বাইয়ে মুসলমানদের একটি সভার অধিবেশনে তাহার সভাপতি সর্ রহিমতুল্লা সমবেত মুসলমান শ্রোতৃবর্গকে বলিয়াছেন:—

"নিজ সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করুন, সংরক্ষণের উপর নির্ভর করিবেন না। কোনও সম্প্রদায় বা শ্রেণীর পক্ষে চিরকাল অনুগ্রহের প্রয়োজন অনুভব করার মত অপমানজনক আর কিছু হইতে পারে না। অতএব নিজ সম্প্রদায়কে উপযুক্ত এরূপ শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের কর্ত্তব্য, যাহার দ্বারা তাহারা পৌর জীবনে যাহা আবশ্যক তাহা পাইবার যোগ্য হইতে পারে।"

—

চাকরির প্রতিযোগিতায় বাঙালী

সমগ্রভারতীয় সরকারী যে-সকল বিভাগের চাকুরীতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা লোক নিযুক্ত করা হয়, তাহাতে বাঙালী ছাত্রেরা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতে পারে না। এ অবস্থা সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়। এই সকল চাকরি জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় ত বটেই, অধিকন্তু দেশহিত করিবার ইচ্ছা থাকিলে এই সব চাকরির দ্বারাও কতকটা করা যায়, অবসর সময়েও করা যায়। সুতরাং এগুলি অবহেলা করা অনুচিত। আর একটা কথাও ভাবিবার বিষয়। বর্ত্তমানে বাংলা দেশের পরাধীনতা দু-রকমের। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের মত বাংলা দেশ ব্রিটেনের অধীন। আর এক রকম পরাধীনতাও বাঙালীদের আছে—তাহারা অবাঙালী কনষ্টেবল পাহারা-ওয়ালাদের অধীন। গবর্ন্মেণ্ট ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে এবং পুলিস অফিসাররা কনষ্টেবল ও পাহারাওয়ালাদের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিলে, এই সব কাজের জন্য যথেষ্ট বাঙালী পাওয়া যায়।

বাঙালী যুবকেরা সমগ্রভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাসমূহে অকৃতকার্য্য হইতে থাকিলে অচিরে বাংলা দেশের তৃতীয় আর এক রকম পরাধীনতা ঘটিবে—যাহার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; বঙ্গের অধিকাংশ জেলা জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য বড় কর্ম্মচারী অবাঙালী হইবে। তাহা বঙ্গের কল্যাণ ও সম্মানের দিক্ দিয়া অবাঞ্ছনীয়।

বাঙালী ছেলেরা যে কৃতকার্য্য হয় না, তাহা তাহাদের বুদ্ধির ন্যূনতার জন্য নহে। আমাদের স্কুলকলেজগুলির সাধারণ শিক্ষাদানপ্রণালীর উন্নতি আবশ্যক। তদ্ভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এবং অন্ততঃ কোন কোন উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ছাত্রদিগকে পারদর্শী করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা ও ব্যবস্থা করা উচিত। কয়েক দিন

পূর্ব্বে ভাইস্‌চ্যান্সেলার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কিছু চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু ছাত্রদের নিকট হইতে বিশেষ সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। ইহা দুঃখের বিষয়।

বাঙালী ছাত্রদের অধিকতর পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হওয়া আবশ্যক, এবং হুজুক ও সিনেমার "ভক্ত" কম হওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর অন্য নানা দেশের আধুনিক ঘটনা, সমস্যা, প্রশ্ন ও প্রচেষ্টা সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান বোধ হয় মান্দ্রাজ ও অন্য কোন কোন প্রদেশের ছাত্রদের চেয়ে কম, অথচ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে এরূপ জ্ঞানও পরীক্ষিত হয়। অবাঙালী বহু ছাত্র যত ভাল ভাল দেশী ও বিদেশী ইংরেজী মাসিক ও ত্রৈমাসিক কাগজ পড়িয়া এইরূপ জ্ঞান লাভ করে, বাঙালী ছাত্রেরা তত করে না। তাহারা, ইংরেজী সাময়িক পত্র কিছু পড়িলে, হয়ত প্রধানতঃ বিলাতী গল্পপ্রধান ম্যাগাজিন পড়িয়া কালক্ষেপ করে।

—

বন্যা

আসাম, বাংলা, বিহার, আগ্রা-অযোধ্যা—সমুদয় প্রদেশে ভীষণ বন্যা হইয়াছে। বিপন্ন লোকদের কষ্টের অবধি নাই। তাহাদের যত প্রকার সাহায্যের এখনই প্রয়োজন অবিলম্বে তাহা প্রদান গবর্ন্মেণ্টের ও জনসাধারণের কর্ত্তব্য। কিন্তু সেইখানেই থামিলে চলিবে না। জার্ম্মেনী, আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটস প্রভৃতি দেশে এঞ্জিনীয়ারেরা যে-সকল উপায়ে বন্যার অনিষ্টকারিতা অনেকটা নিবারণ করিয়াছেন, সেই সকল উপায় ভারতবর্ষেও অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক।

—

ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌স্

ঢাকেশ্বরী কটন মিল্‌সের কর্ত্তৃপক্ষীয় তিন জন ভদ্রলোককে হাইকোর্ট কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট কারাদণ্ডের পরিবর্ত্তে জরিমানার ব্যবস্থা করিয়া সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। দণ্ডিত ভদ্রলোকদের কোন অসৎ অভিপ্রায় ছিল না। তাঁহাদের ত্রুটি এই যে, তাঁহারা ভারতীয় কোম্পানী আইনের একটি ধারার ঠিক্ অনুসরণ করেন নাই।

আমরা কয়েক দিন পূর্ব্বে আসাম ও বঙ্গের অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়িনী সমিতির একটি কাজে ঢাকা গিয়াছিলাম। ঢাকেশ্বরী মিল্‌স্ দেখিয়া প্রীত ও উৎসাহিত হইয়া আসিয়াছি। পরে ইহার সম্বন্ধে ও ঢাকার অন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু লিখিব।

—

ভারতবর্ষে গবর্ন্মেণ্টের শিক্ষার ব্যয়

গত মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশ্যন উপলক্ষে তাহার ভাইস-চ্যান্সেলার মিঃ এ এফ রহমান বলেন, যে, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ গবর্ন্মেণ্টের আর্থিক টানাটানি উপলব্ধি করেন, কিন্তু তাঁহাদের নিবেদন এই, যে, এই প্রতিষ্ঠানটিকে কার্য্যকারিতার একটি যথেষ্ট উচ্চ স্তরে রাখিবার দায়িত্ব গবর্ন্মেণ্টেরও বটে। ইহা খুব যুক্তিসঙ্গত কথা। মিঃ রহমান আরও বলেন:

"The Government of Bengal is concerned as vitally as are the authorities of the University with the objects for which this institution was created and we appeal to the Government to give us financial assistance to ensure a reasonable chance of their fulfilment."

তাৎপর্য্য। এই প্রতিষ্ঠানটি যে সকল উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের সহিত ইহার কর্ত্তৃপক্ষের যেমন সম্পর্ক বাংলা গবর্ন্মেণ্টেরও তেমনি। তাই আমরা সেই সব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবন যাহাতে হয় তদ্রূপ আর্থিক সাহায্যের জন্য গবর্ন্মেণ্টের কাছে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

এই অনুরোধের ফল কি হইবে জানিনা।

ব্রিটেনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এত বেশী সাহায্য পায়, যে, ১৯৩৪-৩৫ সালে তথাকার ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অপর পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়কল্প প্রতিষ্ঠানের ৫০,৬৩৮ জন ছাত্রের মধ্যে ২০,৫১৮ জন ছিল সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্র। অর্থাৎ মোট ছাত্রসমষ্টির শতকরা ৪২ জন, বৃত্তি (scholarship), জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ভাতা (maintenance allowance), বা ভিক্ষাবৎ সাহায্য (eleemosynary grants) পাইয়া তবে শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে। ভারতবর্ষে বৃত্তির সংখ্যা ও পরিমাণ সামান্য, এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যয় ক্রমাগত বাড়ান হইতেছে।

আমাদের দেশে গবর্ন্মেণ্ট কেবল যে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিকে সাহায্য দিতেই কৃপণতা করেন, তাহা নহে, প্রাথমিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া সব রকম শিক্ষার জন্যই ব্যয় অতি সামান্য করেন। তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বিলাতী

শিক্ষাব্যয়ের ও ভারতীয় শিক্ষাব্যয়ের দুটি অঙ্ক পাঠকদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

ইংলণ্ডে লণ্ডন কৌণ্টি একটি জেলার মত। তাহার কৌন্সিল আমাদের দেশের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মত। তাহার লোকসংখ্যা ৪৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ৮২৫। এই ৪৪ লক্ষ লোকের বাসস্থান নগরটির শিক্ষার জন্য তাহার কৌন্সিলের ১৯৩৫-৩৬ সালের ব্যয় ১,২৪,০২,৯৪৩ পৌণ্ড, অর্থাৎ টাকায় বলিতে গেলে ষোল কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ বাহাত্তর হাজার পাঁচ শত তিয়াত্তর টাকা।

এখন ২৭,১৫,২৬,৯৩৩ (সাতাশ কোটি পনর লক্ষ ছাব্বিশ হাজার নয় শত তেত্রিশ) জন মানুষের বাসভূমি ব্রিটিশ ভারতের জন্য গবর্ন্মেণ্টের ব্যয় কত দেখা যাক্। যে ১৯৩৬ সালের হুইটেকার্স ম্যালমানাক (Whitaker's Almanack) হইতে লণ্ডনের শিক্ষাব্যয় দেখাইয়াছি, তাহাতেই লিখিত আছে, যে, ১৯৩৩-৩৪ সালে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেণ্টের ও সমুদয় প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের মোট শিক্ষাবিষয়ক **ও বিজ্ঞানবিষয়ক** ব্যয় হইয়াছিল ১২,৭৫,৪০,০০০ টাকা (বার কোটি পঁচাত্তর লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা)।

অর্থাৎ বিলাতে চুয়াল্লিশ লক্ষ লোকের বাসস্থানের শিক্ষাব্যয় ষোল কোটি টাকার উপর, কিন্তু ভারতে সাতাশ কোটির অধিক লোকের বাসভূমির শিক্ষাবিষয়ক **ও বিজ্ঞানবিষয়ক ব্যয়** মাত্র পৌনে তের কোটি!

তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে, বিলাতের লোকেরা ধনী, ভারতবর্ষের লোকেরা দরিদ্র বলিয়া তাহাদের গবর্ন্মেণ্টও দরিদ্র; সুতরাং বেশী শিক্ষাব্যয় কেমন করিয়া হইবে? উত্তরে বলা যাইতে পারে, যে, নানা দিকে ব্যয় কমাইয়া ভারতবর্ষেও শিক্ষার জন্য অনেক বেশী ব্যয় করা যাইতে পারে, যদিও তাহা শীঘ্র বিলাতের সমান হইবে না।

আর আমাদের দারিদ্র্য যে আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবে বা ধন উৎপাদনের জন্য আবশ্যক অধিবাসীদের বুদ্ধিমত্তা ও শ্রমশীলতার অভাবে ঘটে নাই, তাহাও বলা যাইতে পারে।

ইংরেজদের ইতিহাসেই দেখা যায়, মুর্শিদাবাদ ক্লাইবের সময়ে তখনকার লণ্ডনের মত বড় শহর ছিল। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই ছিল, যে, মুর্শিদাবাদে যেরূপ প্রভূতধনশালী যত জন মানুষ ছিল, লণ্ডনে তত ছিল না। ধনোৎপাদনের বৈজ্ঞানিক নানা উপায়ের বর্ত্তমান যুগে ভারতবর্ষের বা তাহার কোন প্রদেশের রাজধানী ধনশালিতায় কেন লণ্ডনের কাছাকাছিও যায় না, তাহা বিস্তৃত ভাবে বলিবার স্থান এ নয়।

—

হকি খেলায় ভারতের জয়, জাপানের পরাজয়

বার্লিনে যে পৃথিবীর প্রায় সমুদয় সভ্য দেশের খেলোয়াড়দের নানাবিধ খেলা দৌড় ও সাঁতার প্রভৃতির প্রতিযোগিতা হইতেছে তাহার কোন্ খেলা, দৌড় ও সাঁতারে কোন্ দেশের কে জিতিতেছে, রয়টার তাহার খবর তারে পাঠাইতেছেন। ১০ই আগষ্টের খবরে দেখা যায়, হকি খেলা তখনও শেষ হয় নাই; যত দূর হইয়াছিল, তাহাতে ভারতীয় দল দশটি গোল দিয়াছে, জাপানী দল একটি গোলও দিতে পারে নাই। ইহার আগে আগে ভারতীয় দল হকিতে সকল দেশকে পরাজিত করিয়াছিল। তাহাদের ম্যানেজার আশা করেন, এবারও তাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ থাকিবে।

—

জাপানের জয়

জাপান কিন্তু অন্য কয়েকটি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ওলিম্পিক মারাথন দৌড়ে জাপানের ধাবক সোন্ (Son) জিতিয়াছে। একটি সাঁতারে জাপানী য়ুসা দ্বিতীয় ও জাপানী আরাই তৃতীয় হইয়াছে। আর একটি সাঁতারে জাপানী উটো প্রথম হইয়াছে।

—

ব্রিটেনের জিৎ

কোন কোন প্রতিযোগিতায় ব্রিটেন প্রথম স্থান অধিকার করিতেছে।

—

স্পেনে বিদ্রোহ

আজ ২৯শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত যত তারের খবর আসিয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় না, স্পেনে সমাজতান্ত্রিক গবর্ন্মেণ্ট যুদ্ধে জয়লাভ করিবে, না ফাসিষ্ট বিদ্রোহীরা জিতিবে। স্পেনের যুদ্ধের ফলে ইউরোপের অন্য কোন কোন দেশও যুদ্ধে জড়িত হইতে পারে।

—

শ্রীহট্ট মহিলাসংঘ

শ্রীহট্ট মহিলাসংঘের তৃতীয় বর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। এই সংঘের কাজ শিক্ষাবিভাগ, স্বাস্থ্যবিভাগ, অর্থনৈতিক বিভাগ, এবং রাষ্ট্রসেবা এই চারিটি প্রধান বিভাগে বিভক্ত। ইহার ৩টি হরিজন ও ৫টি অন্য বিদ্যালয়ে ২৩৮ জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষা পায়। সংঘের তিনটি পাঠাগার আছে। ইহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিদ্যালয় ও ধাত্রী বিদ্যালয়ও চলিতেছে। স্বাস্থ্যবিভাগ দাতব্য চিকিৎসালয় চালান এবং রোগীর শুশ্রূষা ও সন্তান প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে প্রসূতির ও প্রসবের পর শিশুর শুশ্রূষা করেন। অর্থনৈতিক বিভাগ শিল্প, কৃষি, গোপালন, ও যৌথভাণ্ডার উপবিভাগ-গুলিতে বিভক্ত। শিল্প উপবিভাগ প্রায় ৪২ খানা নাগা তাঁত চালান, নানা প্রকার সেলাই শিখান ও নানাবিধ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া বিক্রী করেন, পুরাতন কাপড় দ্বারা নানা প্রকার কাঁথা, ন্যাপকিন ও শিশুদের নেংটি ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রী করেন, বাঁশ কুশ বেত আদি হইতে প্রস্তুত নানাবিধ শিল্পদ্রব্য বিক্রী করেন, জেলি চাটনি মোরব্বা আচার বড়ি ডাল চিঁড়া খই নারিকেল-সন্দেশ রস-গোল্লা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রী করেন, চরকার প্রচলন করেন, মাটির বাসন খেলনা সন্দেশের ছাঁচ প্রস্তুত ও বিক্রয় করেন, ইত্যাদি। গোপালন শিক্ষাদান ও দুগ্ধাদির ব্যবসাও সংঘ করেন। কৃষিবিভাগ কৃষি শিক্ষা দেন এবং উন্নত আধুনিক প্রণালীতে শস্য এবং নানাবিধ তরিতরকারি ও ফল উৎপন্ন করিয়া বিক্রী করেন। এতদ্ব্যতীত সংঘ যৌথভাণ্ডার স্থাপন এবং রাষ্ট্রসেবাও করিয়াছেন।

এইরূপ কর্মিষ্ঠ সংঘ সকল জেলায় প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে। শ্রীহট্ট মহিলাসংঘের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সরলা বালা দেব সামান্য ১৫৬৫॥৫ ব্যয়ে যে কাজ করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। বর্ত্তমান বৎসরে তিনি কাজ আরও বাড়াইতে চান এবং তাহার জন্য তাঁহার ৪৩৫৫ টাকা আবশ্যক। বদান্য দেশহিতৈষী ব্যক্তিরা এই টাকা দিলে ইহার সদ্ব্যয় হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

—

"ভারতীয়" সিভিল সার্ভিস

উদারচেতা ও ভারতীয়দিগের স্বশাসন অধিকার লাভের একান্ত পক্ষপাতী ব্রিটিশ রাজপুরুষদের মতে "ভারতীয়" সিভিল সার্ভিসে বড় বেশী ভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলে প্রবেশ করিতেছে, সুতরাং তাঁহারা নিছক প্রতি-যোগিতার জায়গায় কিছু প্রতিযোগিতা ও কিছু মনোনয়ন (অর্থাৎ অনেকটা মুরুব্বির জোর) দ্বারা "ভারতীয়" সিভিল সার্ভিসে চাকরি পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার ফলে বিস্তর ব্রিটিশ ছোকরা মনোনীত হইতে চাহিয়াছে; অবশ্য প্রতিযোগিতাও অনেকে করিবে। বলা বাহুল্য, মনোনয়নের দ্বারটা ব্রিটিশ ছোকরাদের নিমিত্ত—যদিও তাহার গায়ে ভারতীয় যুবকদের জন্য "প্রবেশ নিষিদ্ধ" প্রকাশ্য ভাবে লেখা না থাকিতে পারে। রয়টার খবর দিয়াছেন, ইতিমধ্যে পনর জন ব্রিটিশ ছোকরা মনোনয়নের পথে সিভিল সার্ভিসে ঢুকিয়াছে।

গত মহাযুদ্ধের সময় ইণ্ডিয়ান (অর্থাৎ "ভারতীয়") মেডিকাল সার্ভিস সম্বন্ধেও এই কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল—মনোনয়ন দ্বারা অনেক ডাক্তারকে এই বিভাগে লওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে ভারতীয় ডাক্তারও কিছু ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে স্থায়ী চাকরি কয় জনের হইয়াছে?

—

বীর কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষা

স্বর্গীয় ডাক্তার কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় প্রতিযোগিতার পথে ইণ্ডিয়ান মেডিকাল সার্ভিসে প্রবেশ করেন। তিনি গত মহাযুদ্ধের সময় মেসোপটেমিয়ায় কোন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি গোলাগুলি বৃষ্টির মধ্যে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া বিশেষ বীরত্ব সহকারে আহতদের প্রাণরক্ষা ও চিকিৎসা করেন। তজ্জন্য তিনি মিলিটারী ক্রস পদক পান। ভারতীয় না হইয়া তিনি ব্রিটন হইলে হয়ত ভিক্টোরিয়া ক্রস পাইতেন। তিনিই বাঙালীদের মধ্যে প্রথম মিলিটারী ক্রস পদক পান। তিনি কুট-এল-আমারার যুদ্ধে তুর্কদের হাতে বন্দী হন এবং ১৯১৭ সালে তুরস্কের এক ক্ষুদ্র শহরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বিধবা পত্নী শ্রীমতী বিভা দেবী তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তেইশ হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছেন। ঐ টাকার সুদ হইতে

দেশীয় উপাদান হইতে প্রস্তুত রাসায়নিক দ্রব্য ও খাদ্য-সামগ্রী সম্বন্ধে গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাডুয়েটদিগকে বৃত্তি দেওয়া হইবে। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যোগ্যতম ব্যক্তি ইহা পাইবেন। ইহা সাধারণতঃ এক বৎসরের জন্য দেওয়া হইবে।

—

ওলিম্পিক ক্রীড়ায় নিগ্রোর কৃতিত্ব

বার্লিনে যে নানাবিধ খেলা, দৌড়, সাঁতার ও বলিষ্ঠতার প্রতিযোগিতা হইতেছে, তাহাতে জেস্ আওয়েন্স্ (Jesse Owens) নামক এক জন আমেরিকান নিগ্রো ১০·৩ সেকণ্ডে ১০০ মীটার দৌড়িয়া প্রথম স্থানীয় হইয়াছেন। এক মীটার ৩৯·৩৭ ইঞ্চির সমান অর্থাৎ এক গজের কিছু অধিক।

—

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা সংঘ

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর প্রস্তাবে ও চেষ্টায় যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা সংঘ গঠিত হইতেছে, রবীন্দ্রনাথ তাহার সভাপতি হইতে রাজী হইয়াছেন। এই নির্ব্বাচন সাতিশয় সমীচীন হইয়াছে।

—

হিমাচল আরোহী জাপানী দল

চারি জন জাপানী হিমালয়ের নন্দকূট শৃঙ্গে আরোহণ করিবার নিমিত্ত আসিয়াছেন। তাঁহারা এই গিরিশিখরে উঠিতে পারিলে উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা করিবেন।

এ-পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য লোকেরাই হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিখর-গুলিতে আরোহণের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। এখন জাপানীরাও আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা হিমালয় আরোহণ করেন, তাঁহাদের সকলেই ভারতবর্ষীয় পথপ্রদর্শক ও ভারবাহী লোকদের সাহায্যে তাহা করিয়া থাকেন। অথচ ভারতীয় কোন দল এ-পর্য্যন্ত কোন উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণে রেকর্ড স্থাপনের চেষ্টা করেন নাই। তাহার কারণ, এদেশে শিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তা এবং দৈহিক শক্তি ও কষ্টসহিষ্ণুতার একত্র সমাবেশ নাই। যাহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি আছে তাহাদের যথেষ্ট দৈহিক শক্তি ও কষ্টসহিষ্ণুতা নাই, যাহাদের দৈহিক শক্তি ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা আছে তাহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি যথেষ্ট নাই—অবস্থাটা সাধারণতঃ এইরূপ। বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া দুঃসাহসের কাজ করিবার দুর্দমনীয় ইচ্ছা, কার্য্যবিশেষের দুরূহতার জন্যই তাহা করিবার দুর্নিবার অভিলাষ, এ-দেশের যথেষ্টসংখ্যক যুবকদের মধ্যেও সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্য নানাবিধ কারণে লক্ষিত হয় না।

—

চূড়ান্ত ক্ষমতা সংখ্যা অনুসারে প্রাপ্তব্য নহে

আমরা নানা সম্প্রদায়ের লোক বলিতেছি, আমাদের সংখ্যা এত, অতএব আমরা ব্যবস্থাপক সভায় তাহার অনুপাতে আসন পাইব না কেন? চতুর ব্রিটিশ জাতি নানা অছিলায় ও অজুহাতে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত কাহাকেও তদপেক্ষা কম, কাহাকেও তদপেক্ষা বেশী, কাহাকেও বা তদনুরূপ আসন দিতেছেন, কিন্তু চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাটা কোন বিষয়েই কাহাকেও দিতেছেন না। বস্তুতঃ, চূড়ান্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখিবার নিমিত্তই এই খেলা খেলিতেছেন।

চূড়ান্ত ক্ষমতা যদি সংখ্যার অনুগমন করিত, তাহা হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে শক্তিসামর্থ্যের বাটোয়ারাটা কিরূপ হইত দেখুন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীব্যাপী। কোথায় তাহার নাগরিক বা প্রজা কত তাহার তালিকা এই—

মহাদেশ বা দেশ	আনুমানিক লোকসংখ্যা
ইউরোপে	৪,৮০,০০,০০০
এশিয়ায়	৩৬,৫০,০০,০০০
আফ্রিকায়	৬,০০,০০,০০০
উত্তর আমেরিকায়	১০,০০,০০০
মধ্য আমেরিকায়	৫০,০০০
ওয়েষ্ট ইণ্ডীজে	২০,০০,০০০
দক্ষিণ আমেরিকায়	৩,২০,০০০
ওশিয়ানিয়ায়	১০,০০,০০০
মোট	৪৯,৩৩,৭০,০০০

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই ৪৯ কোটি অধিবাসীর মধ্যে শুধু ভারতবর্ষেই ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) কোটির উপর লোক বাস করে। যদি লোকসংখ্যা অনুসারে ক্ষমতার বণ্টন হয়, তাহা হইলে ব্রিটিশ জাতি ভারতীয়দিগকে বেশীর ভাগ ক্ষমতা দান করুন না? কিন্তু শক্তি দাতব্য নহে, অর্জ্জিতব্য।

ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লোকসমষ্টির বিভাগ মোটামুটি এইরূপ হইবে:—

ধর্ম্মসম্প্রদায়	লোকসংখ্যা
হিন্দু (কেবল ভারতবর্ষেই)	২৩,৯১,৯৫,১৪০
মুসলমান	১০,০০,০০,০০০
খ্রীষ্টিয়ান	৮,০০,০০,০০০
বৌদ্ধ	১,২০,০০,০০০

সুতরাং লোকসংখ্যা অনুসারে ক্ষমতার বণ্টন হইলে হিন্দুদের ভাগেই সকলের চেয়ে বেশী হয়। কিন্তু আগেই বলিয়াছি, প্রকৃত শক্তি বাঁটোয়ারার দ্বারা লভ্য নহে, ইহা সাধনা দ্বারা প্রাপ্য।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সব ধর্ম্মসম্প্রদায় দেহ মনে চরিত্রে সমান উন্নত হইলে অবশ্য হিন্দুরাই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান হইবে এবং সেই শক্তি "জগদ্ধিতায়", জগতের হিতসাধনকল্পে, নিয়োগ করিবে।

—

দেশীয় রাজ্য ও শিল্পের উন্নতি

মহীশূরে জলস্রোত ও জলপ্রপাত হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য বৃহৎ সরকারী আয়োজন আছে এবং বৃহৎ লোহা ইস্পাতের সরকারী কারখানা আছে, এবং রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য নানা প্রকার সরকারী ব্যবস্থা আছে। গোয়ালিয়রে মাটির বাসনের ও অন্যান্য শিল্পের সরকারী কারখানা আছে। এইরূপ সরকারী ব্যবস্থা ক্ষুদ্রবৃহৎ আরও অনেক দেশী রাজ্যে আছে। ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্য একটি মাটির বাসনের কারখানার জন্য তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বাংলা দেশে দেশী রাজ্য দুটি কেবল আছে—ত্রিপুরা ও কুচবিহার। এই দুটি রাজ্যে পণ্যশিল্পের উন্নতি দ্বারা প্রজাদিগকে সমৃদ্ধ করিবার কি আয়োজন আছে তাহা জ্ঞাতব্য।

—

নারীশিক্ষার উন্নতিকল্পে সরকারী প্রস্তাব

এইরূপ একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, যে, বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের শিক্ষাবিভাগ বঙ্গে নারীদের শিক্ষা সম্বন্ধে নানা বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া পরামর্শ দিবার নিমিত্ত একটি পরামর্শদাতা সমিতি (Advisory Board) গঠন করিবেন। নারীরা ইহার সদস্য হইবেন। এই সমিতির পরামর্শ অনুসারে কাজ করিবার মত টাকা দিতে যদি সরকার বাহাদুর রাজী থাকেন, তাহা হইলে সমিতি গঠিত হউক। নতুবা ইহার জন্য ২৲ টাকা খরচ হইলেও তাহা অপব্যয়।

অনেক বৎসর পূর্ব্বে বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট বালিকাদিগকে ১৪।১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে যত দূর ও যেরূপ জ্ঞান ও শিক্ষা দিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে একটি শিক্ষণীয়-বিষয়-তালিকা শিক্ষাদানপ্রণালী প্রভৃতি স্থির করিবার নিমিত্ত একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। কমিটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহা রাইটার্স বিল্ডিংসের কোন আলমারীর খুপ্‌রিতে থাকিতে পারে। আমাদের যত দূর মনে পড়ে ডাঃ সর্ নীলরতন সরকার, শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বসু ও পরলোকগতা শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দাস এই কমিটির সভ্যদের মধ্যে ছিলেন। ইহাঁদের রিপোর্ট গবর্ন্মেণ্ট কিরূপ কাজে লাগাইয়াছেন, জানি না।

—

প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি

বাংলা-গবর্ন্মেণ্ট প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া রিপোর্ট দিবার নিমিত্ত একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এ-পর্য্যন্ত তাহার একটি বৈঠকও হইয়াছে কিনা জানা যায় নাই। ইহার এক জন সদস্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ-বিভাগের অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু, নিজ কর্ত্তব্য ভাল করিয়া করিতে পারিবেন বলিয়া অনেকগুলি প্রশ্ন রচনা করিয়া শিক্ষাবিষয়ে অভিজ্ঞ কাহাকেও কাহাকেও দিয়াছেন। তাঁহারা এই প্রশ্নগুলির উত্তর তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলে কমিটিকেও সাহায্য করা হইবে।

সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রী যে-সব বিদ্যালয়ে পড়ে বা পড়িবার অধিকারী, তাহাতে ধর্ম্মশিক্ষা দান করা বিধেয় কিনা এবং বিধেয় হইলে তাহা কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণের কারণ কি প্রকারে না-হইতে পারে, কমিটিকে তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও সর্ব্বসাধারণের জন্য অভিপ্রেত বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্মশিক্ষাদানের আমরা বিরোধী। অসাম্প্রদায়িক ভাবে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া কি প্রকারে হইতে পারে তাহা নিরূপণ করা ও বলা বড় কঠিন। এই সব বিদ্যালয়ে যে-সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রী পড়ে, তাহাদের প্রত্যেকের

ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ে শিখাইতে গেলে নানা অনর্থ ঘটিতে পারে।

—

শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারিয়ারের কংগ্রেসের সম্পর্ক ত্যাগ

শ্রীযুক্ত সি রাজগোপালাচারিয়ার কংগ্রেসের এক জন প্রধান নেতা। কংগ্রেস মহলে তাঁহার এই খ্যাতি আছে, যে, তিনি মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগের দার্শনিক তত্ত্ব যেরূপ বুঝেন, তদপেক্ষা ভাল আর কেহ বুঝেন না। তিনি সমাজ-সংস্কারকও বটেন। তিনি হিন্দুসমাজভুক্ত ব্রাহ্মণবংশীয় হইলেও তাঁহার কন্যার সহিত গন্ধবণিকজাতীয় মহাত্মাজীর কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন। তিনি কয়েক দিন হইল কংগ্রেসের সহিত সমুদয় সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া মহাত্মা গান্ধী, সরদার বল্লভভাই পটেল ও পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে তাহা জানাইয়াছেন। অনেক কংগ্রেস-নেতা তাঁহাকে তাঁহার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিতেছেন।

তিনি কংগ্রেসের সম্পর্ক ছাড়িয়া দিলে বাস্তবিক উহার ক্ষতি হইবে।

—

ধন গোপাল মুখোপাধ্যায়

আমেরিকাপ্রবাসী প্রসিদ্ধ ইংরেজী গ্রন্থকার ধন গোপাল মুখোপাধ্যায় ৪৬ বৎসর বয়সে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই শোকাবহ ঘটনা আরও শোকাবহ হইয়াছে এই কারণে, যে, তিনি উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন এই রূপ অবস্থায় তাঁহার আমেরিকান পত্নী তাঁহাকে একটি কক্ষে দেখিতে পান, রয়টারের তারের খবর এই রূপ আসে। তাঁহার ভারতীয় বন্ধুরা তাঁহার কোন প্রকার মানসিক অসুস্থতার কথা ইতিপূর্ব্বে সন্দেহও করেন নাই। গত ১৮ই জুন তিনি তাঁহার গুরু স্বামী অখণ্ডানন্দকে আমেরিকা হইতে যে চিঠি লেখেন তাহা দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে তাঁহার মানসিক অশান্তির কিছু প্রমাণ নিহিত আছে বটে। কিন্তু এরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিবে, তাহা হইতে স্বামীজী এরূপ কল্পনাও করেন নাই।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ধন গোপাল কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং বর্ত্তমান ১৯৩৬ সালে জুলাই মাসে নিউইয়র্কে প্রাণ ত্যাগ করেন। তিনি কলিকাতার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া পিতামাতার অজ্ঞাতসারে জাপানে কোন শিল্প শিখিতে যান। তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তিনি ইয়োকোহামার কোন কোন ভারতীয় বণিকের সাহায্যে আমেরিকা যাত্রা করেন। সেখানে শস্যক্ষেত্রে ও ফলের বাগানে খাটিয়া,
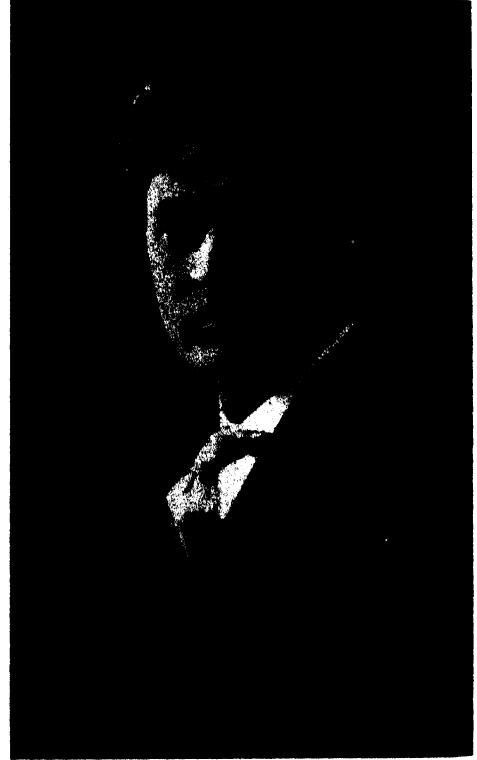
ধন গোপাল মুখোপাধ্যায়

হোটেলে ও গৃহস্থের বাড়ীতে বাসন ধুইয়া, এবং এই প্রকার অন্যান্য কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকেন, এবং আমেরিকার কালিফর্ণিয়া রাষ্ট্রের লেলাণ্ড ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া গ্রাডুয়েট হন। তখন হইতে তিনি ইংরেজীতে নানা পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন ও মধ্যে মধ্যে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের নানা নগরে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের ও অন্য কোন কোন

দেশের সাহিত্য, ধর্ম্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা করেন। উভয় কার্য্যক্ষেত্রেই তিনি কৃতিত্ব লাভ করেন ও বিশেষ যশস্বী হন। গদ্যে ও পদ্যে লিখিত তাঁহার ইংরেজী বহিগুলির সংখ্যা কুড়ির অধিক। তন্মধ্যে দশখানি বালকবালিকাদের জন্য লিখিত। তৎসমুদয় আমেরিকার শিশুদের বিশেষ প্রিয় বলিয়া বিদিত। এইগুলির মধ্যে গে নেক্ (Gay-Neck) বহিখানি ১৯২৭ সালের "সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্টতাসম্পন্ন বালক-বালিকাদের পাঠ্যপুস্তক" ("the most distinguished children's book") বলিয়া জন্ নিউবেরি পদক প্রাপ্ত হয়। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "চিত্রগ্রীব" নাম দিয়া ইহার একটি উৎকৃষ্ট বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ধন গোপালের কোন কোন বহি তাহাদের প্রকাশের বৎসরের সর্ব্বাধিক বিক্রীত পুস্তকসমূহের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্ম্মিণী সারদামণি দেবীর একটি জীবনচরিত লিখিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি আমেরিকায় ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম দূতস্বরূপ ছিলেন। তিনি বোধ হয় ভারতীয়দের মধ্যে আমেরিকানদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন।

ভারত-গবন্মেণ্ট আমেরিকার ব্রিটিশ কন্সালের দ্বারা ধন গোপালের মৃত্যু সম্বন্ধে তথ্য নিরূপণ করাইয়া প্রকাশ করিলে ভাল হয়।

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ

বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারী

বঙ্গের অনেকগুলি জেলায় যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, বৃষ্টি হওয়ায় কিছু দিন শ্রমিক শ্রেণীর লোক মাঠে কাজ করিয়া তাহার প্রকোপ হইতে কিছু অব্যাহতি পাইয়াছিল। কিন্তু মাঠের সে কাজ শেষ হওয়ায় এখন আবার তাহারা বিপন্ন হইয়াছে। যে-সকল শ্রেণীর লোক মাঠের কাজে অভ্যস্ত নহে, তাহাদের কষ্ট বরাবর সমান আছে। নিরন্ন সকল শ্রেণীর লোকদের কেবল যে অন্নকষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, কাপড়ের অভাব হইয়াছে এবং জীর্ণ কুটীরগুলির মেরামতও আবশ্যক। এই জন্য চাউল, বস্ত্র ও অর্থের প্রয়োজন। যাঁহারা এ-পর্য্যন্ত যত প্রকারে বাঁকুড়া সম্মিলনীকে সাহায্য করিয়াছেন, সম্মিলনী তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

মোহিনী মিলসের অধ্যক্ষ কিছু কাপড় পাঠাইয়া বাঁকুড়া সম্মিলনীকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। অন্যান্য মিলও কাপড় দিলে বাঁকুড়া সম্মিলনী সাতিশয় উপকৃত হইবেন। কাপড় ও চাউল বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ রামগতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের বাঁকুড়া (Bankura) ষ্টেশনে প্রেরিতব্য। টাকা পাঠাইবার ঠিকানা—

বাঁকুড়া সম্মিলনীর (১) সভাপতি শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১২০-২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা;

(২) সম্পাদক শ্রীঋষীন্দ্রনাথ সরকার, ২০ বি শাঁখারি-টোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

(৩) কোষাধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, ৩ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা।

ব্যোমযান

শোনা যায় প্রাচীন আর্য্যেরা—দেবতাদের ত কথাই নাই—আকাশপথে বিহার করার উপায় জানতেন। এ কথাও শুনেছি যে কোন কোন প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথিতে ঐ জাতীয় "ব্যোমযান" সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণও আছে এবং সেগুলি চালনার উপায় স্বরূপ "ঘূর্ণক যন্ত্র" "রেচক যন্ত্র" প্রভৃতির

অরভিল রাইট

কিছু কিছু বর্ণনা আছে। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিৎ বলেন যে বোধ হয় "পুষ্পকরথ" বড় গোছের ফানুস বা বেলুন জাতীয় কিছু ছিল। যা হোক, এখানে পুরাতত্ত্বের আলোচনা করা হবে না—অন্ততঃ পক্ষে অতটা পুরাতন তত্ত্বের।

ইতিহাসের—থুড়ি, পুরাণের—হিসাবে এই অল্প দিন আগে অর্থাৎ ১৯০২ খৃষ্টাব্দে, নিউ ইয়র্কের কোন প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রের এক রিপোর্টার এক অদ্ভুত গল্প শোনে। ফলে ক-দিন পরে সে এক অজ-পল্লীগ্রামের মাঠের মাঝখানে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে এক ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে সে এমন এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌তে পায় যে সে ছুটতে ছুটতে গিয়ে প্রথম টেলিগ্রাফ আফিস থেকে তার কাগজে এক লম্বা রিপোর্ট পাঠায়। কাগজের কর্ত্তারা রিপোর্টটিকে আজগুবি স্থির ক'রে পত্রপাঠ ছিঁড়ে ফেলেন এবং ঐ রিপোর্টারকে ছয় সপ্তাহের জন্য সস্‌পেণ্ড্ ক'রে এই ফাজলামির শাস্তি দেন। ঐ রিপোর্টটি ছিল অরভিল ও উইল্‌বর রাইট নামে দুই ভাইয়ের এরোপ্লেন-চালনা সম্পর্কে এবং রিপোর্টার রিপোর্টে জগতে সর্ব্বপ্রথম ইচ্ছাধীন ভাবে আকাশ-বিহারের পালার বর্ণনা দিয়েছিলেন। নিউ ইয়র্কের অতি সভ্য কর্ত্তারা ব্যাপারটা বিশ্বাসই করলেন না, কিন্তু যে-চাষার ক্ষেতের উপর এই রাইটেরা এরোপ্লেন-চালনা অভ্যাস করতেন সে তখন ঐ সব দেখে শুনে এতই অভ্যস্ত হয়েছিল যে আকাশে এরোপ্লেন দেখে সে রিপোর্টারকে বলেছিল, "ছোঁড়ারা আবার ঐ বাও করছে।"
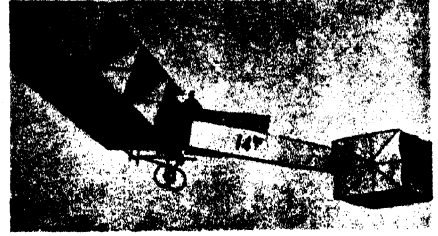
সাঁতো দ্যুমঁর "আগে লেজ" প্লেন (১৯০৬)

যাই হোক এ বিষয়ের সত্যাসত্য বেরোতে বেশী দিন লাগল না। ১৯০৩ সালে রাইট ভ্রাতাদের কুড়ি মিনিট ইচ্ছাধীনভাবে এরোপ্লেনে আকাশ-বিহারের খবরে জগৎ চমৎকৃত হ'ল। কিন্তু তখনও কেউ বিশ্বাস করে নি যে মানুষ কোন দিন ইচ্ছামত আকাশপথে দূরদেশে যেতে পারবে। ১৯০৬ সালে ফ্রান্সে সাঁতো দ্যুমঁ নামক ফরাসী বৈমানিকের উড়বার চেষ্টা দেখে লর্ড নর্থক্লিফের মনে বিশেষ ছাপ পড়েছিল তিনি দেশে ফিরে তাঁর প্রসিদ্ধ দৈনিক "ডেলি মেল" কাগজে ঘোষণা করেন যে, লণ্ডন থেকে ম্যাঞ্চেষ্টার (১৮০ মাইল পথ) বিমান চালনায় যে প্রথম হবে তাকে ১০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ দেড় লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এই ঘোষণার পরই লণ্ডনের এক প্রসিদ্ধ সান্ধ্য দৈনিকে এই টিপ্পনি ছাপা হয়,

"স্থানীয় এক প্রভাতী দৈনিকে লণ্ডন হইতে ম্যাঞ্চেষ্টার পর্য্যন্ত প্রথম এরোপ্লেন-যাত্রার জন্য সামান্য ১০,০০০ হাজার

সমুদ্রমধ্যে 'হিণ্ডেনবুর্গ' এয়ারশিপ ও 'ওসেনা' ষ্টিমারের সাক্ষাৎ

নূতন জেপেলিন তৈরি হইতেছে

'ডর্নিয়ের-ওয়াল' বিমান 'ওয়েষ্ট ফেলিনে'র ডেক হইতে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে

প্রশান্ত মহাসাগরের খেয়া। "চায়না ক্লিপার" সামুদ্রিক এরোপ্লেন
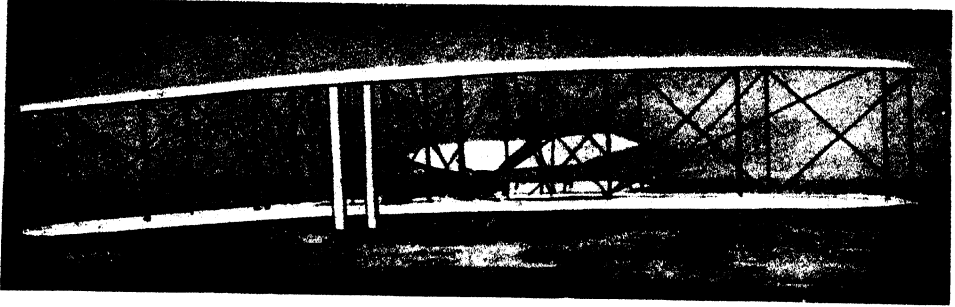
অরভিল রাইটের বাইপ্লেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ইহাতেই সর্ব্বপ্রথম ইচ্ছাধীন আকাশ-বিহার হয়
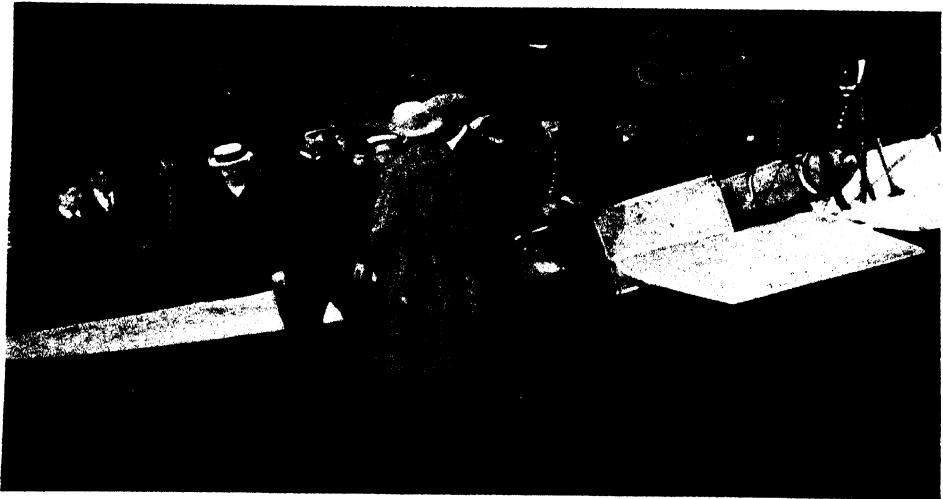
১৯০৯ সালের জগৎ-সংবাদ। ব্লেরিয়োর ইংলিশ চ্যানেল লঙ্ঘন

পাউণ্ড মাত্র পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। আমরা জানাইতেছি যে লণ্ডন হইতে পাঁচ মাইল মাত্র যাইয়া যাত্রাস্থলে ফিরিয়া আসিতে পারিবে তাহাকে ১০,০০০,০০০ পাউণ্ড (পনর কোটি টাকা) পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আমরা এখনও বলবৎ রাখিয়াছি। বলা বাহুল্য এই দুই পুরস্কার ঘোষণাই সমান নিরাপদ।"

সোয়ার্জ নির্ম্মিত সর্ব্বপ্রথম দৃঢ় কাঠাম বেলুন (সেন্টপিটার্সবার্গ ১৮৯৩)
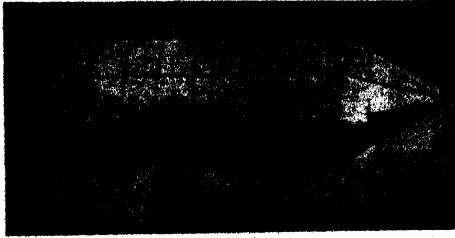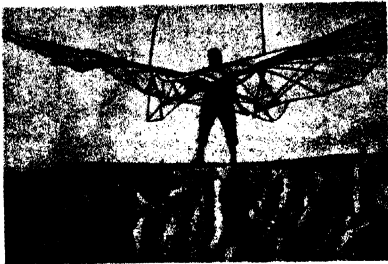
"পক্ষীমনুষ্য" লিলিয়েনটলের ওড়ার চেষ্টা

১৯০৬ সালেও এরোপ্লেনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লণ্ডনের খবরের কাগজওয়ালাদের মত সুসভ্য লোকেরাও এই রকম ধারণা পোষণ করতেন। অথচ বার বৎসরের মধ্যেই ১০,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার গ্রাহাম হোয়াইটের হস্তগত হয়—অন্য কাগজওয়ালা তখন কি বলেছিলেন জানি না।

মানুষের আকাশে ওড়বার চেষ্টা বোধ হয় আদিকাল থেকেই আছে। বেলুনে ওঠা ত অনেক দিন আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছিল, এমন কি ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দেই ফরাসী বৈমানিক ব্লঁশার বেলুন চালিয়ে সমুদ্র (ইংলিশ চ্যানেল) পার হয়েছিলেন। কিন্তু বেলুন এক জিনিষ আর পাখীর মত পাখার বশে উড়ে বেড়ান আর এক জিনিষ। এ পথেও চেষ্টা অনেক দিনের; লিলিয়েনটল, ডিগেন, বেস্নিয়ে এঁদের কথা ত ব্যোমযানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। বেলুনকে পবনদেবতার দাসত্ব থেকে উদ্ধার করে মানুষের আয়ত্তের মধ্যে আনার চেষ্টাও দিনের। এদিকে প্রথমে পথ দেখান ডেভিড সোয়ার্জ। তিনি ১৮৯৩ খৃঃ রুষদেশে সেন্ট-

সর্ব্বপ্রথম অটোজাইরোর ওড়া
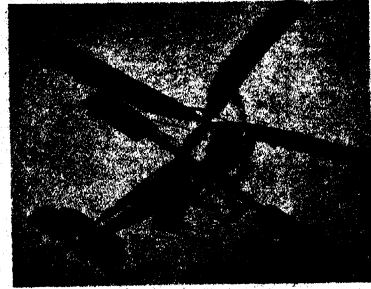
পিটার্সবার্গে প্রথম শক্ত-কাঠাম ব্যোমযান তৈয়ার করেন। জার্ম্মেনির কাউণ্ট জেপেলিন ঐরূপ বেলুনে মোটর লাগিয়ে ইচ্ছামত চালানর উপায় দেখান। এখনও ঐ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠতম হাওয়া-জাহাজ জেপেলিন নামেই খ্যাত এবং তাঁর কারখানাতেই প্রস্তুত হয়। জেপেলিন এখন মহাসমুদ্রের খেয়া পারাপার করে।

"সাগর-লঙ্ঘন" পৌরাণিক সময়ের পর প্রথম হয় ১৯০৯ সালে। ফরাসী বৈমানিক ব্লেরিয়ো ঐ বৎসর এক ছোট এরোপ্লেনে ক্যালে থেকে ডোভার ৩৭ মিনিটে এসে জগৎকে স্তম্ভিত করেন। তাঁর ছোট এরোপ্লেনের ২৫ অশ্বশক্তির ছোট মোটর ঘণ্টায় ৬০ মাইল পর্য্যন্ত প্লেন চালাতে পারত এবং কোন ক্রমে একজন লোকের ভার আকাশে তুলতে পারত।

১৯৩৫ সালে ঐ এরোপ্লেনের বংশধর, আমেরিকা প্রসিদ্ধ "চায়না ক্লিপার" অনায়াসে প্রশান্ত মহাসাগ[illegible] ৮৯০০ মাইল পাড়ি দিয়ে আমেরিকা থেকে চীন পর্য্যন্ত খে[illegible] পার করছে; জার্ম্মান এরোপ্লেন "ডর্নিয়ার ভাল" দক্ষি[illegible] আটলাণ্টিক পারাপার হয়ে ডাক-হরকরার কাজ করছে।

"আকাশের মোটরকার"—আধুনিক একটোয়াইরে প্লেন
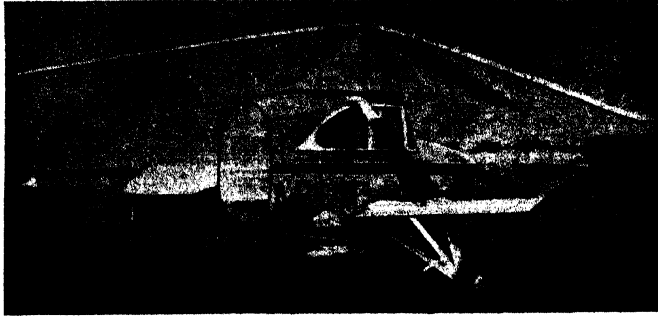
পথে ত বহুশত এরোপ্লেন প্রতি দিন প্রতি ঘটায় দেশ-বিদেশে ডাক ও যাত্রী নিয়ে চলেছে।

এত শত ব্যাপার, সবই সামান্য পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে। পৃথিবীতে আর কোনও দিকে মানুষের শক্তি এত অল্প সময়ে এত দূর প্রকাশ পেয়েছে কিনা সন্দেহ। কারণ কি? মানুষের সৃষ্টির শক্তি ও চেষ্টার বৃদ্ধি নিশ্চয় এই কারণের কিছু অংশ, কিন্তু তার চেয়ে মানুষের ধ্বংস-প্রবৃত্তি অথবা যুদ্ধস্পৃহা এ কারণের অধিকাংশ উপাদান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গত যুদ্ধে জার্মান সমর-বিভাগই প্রথম এরোপ্লেনের ভীষণ বিনাশশক্তির পরিচয় দেয়, তারপর জগতের সকল স্বাধীন জাতি ক্রমাগত ঐ শক্তি-বৃদ্ধির চেষ্টা করে চলেছে। সামরিক ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যপথে এর ব্যবহারে চেষ্টাও চলেছে—উদ্দেশ্য একই।

ক. চ.

আকাশপথে সর্ব্বপ্রথম সাগর (ইংলিশ চ্যানেল) লঙ্ঘন

সর্ব্বপ্রথম ইংলিশ চ্যানেল লঙ্ঘনকারী ব্লানচার্ড

বিদেশ

ভূমধ্য সাগরে স্বার্থ

ইটালীর শক্তি-সঞ্চয় ও আবিসীনিয়ায় তাহার সফল প্রয়োগে ভূমধ্য সাগর সমস্যা পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ভূমধ্য সাগর উদার মহাসাগর নহে, বিরাট হ্রদ মাত্র। পশ্চিম জিব্রালটারের সংকীর্ণ প্রণালীদ্বারা আটলান্টিক মহাসাগরের সহিত যোগরক্ষা হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে সুয়েজ যোজককে খালে পরিণত করিয়া লোহিত-সাগরের সহিত সংযোগ স্থাপিত করা হইয়াছে। এই দুই পথ ব্যতীত ভূমধ্য সাগর হইতে অর্ণবপোত বহির্গত হইবার তৃতীয় পথ নাই। সুতরাং ভূমধ্য সাগরে শক্তি-সাম্য বহু জাতিরই কাম্য।

ভূমধ্য সাগরের উত্তরে ইউরোপ, দক্ষিণে আফ্রিকা। অতি প্রাচীন যুগ—প্রাচীন গ্রীসীয় ও রোমীয় প্রতাপের যুগ—হইতেই ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র-শক্তি আফ্রিকায় রাজ্য বিস্তারের প্রয়াস পাইয়াছে, বর্ত্তমান যুগেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ভূমধ্য-সাগরতীরস্থিত আফ্রিকার সমগ্র অংশই কোন-না-কোন ইউরোপীয় শক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসনাধীন।

ভূমধ্য-সাগরের পশ্চিম উপকূলে স্পেন আফ্রিকার উত্তর তটভূমিতে তাহার অধীন অতি সামান্য অংশই আছে। স্পেনের নদী উপত্যকা ও পর্ব্বতপ্রাচীর দ্বারা বিভিন্ন অংশে কোন ঐক্য-বন্ধন নাই। কাটালোনিয়া গালিসিয়া প্রভৃতি প্রদেশগুলি স্বাতন্ত্র্য লাভের জন্য উৎসুক। তদুপরি রাজনৈতিক মতভেদে কলহও কম প্রবল নহে। রাজা আলফান্সোর সিংহাসনচ্যুতির পর হইতে এই সামান্য কয় বৎসরের মধ্যেই বিদ্রোহের বীভৎস মূর্ত্তিতে মতভেদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অন্তর্বিরোধপরায়ণ স্পেন হইতে কাহারও কোন আশঙ্কা অন্ততঃ বর্ত্তমানে নাই।

ফ্রান্স আফ্রিকার উপকূলে টিউনিস, আলজেরিয়া ও মরক্কোর অধিকারী। ফ্রান্স হইতে অতি সহজে সোজা দক্ষিণে এই সকল স্থানে যাওয়া যায়, সুতরাং ভূমধ্য সাগরের পশ্চিম অংশে অন্য কাহারও প্রভাব ফ্রান্স সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। নির্ব্যূঢ় ভাবে এ অধিকার ভোগ করিবার আশা ফ্রান্স করিতে পারে না। লীগ অব নেশনস্-এর কৃপায় পূর্ব্ব-উপকূলে সীরিয়ার অভিভাবক-শাসকের অধিকার প্রাপ্ত হওয়ায় সেই উপকূলে রণতরী রক্ষা করা তাহার অপরিহার্য্য প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

ইটালী আত্মপ্রত্যয়শীল; তাহার উপদ্বীপ-গঠন, আশু-সান্নিধ্যে সিসিলি ও সার্ডিনিয়ার অবস্থান ভূমধ্য সাগরে সর্ব্বত্র প্রভাব বিস্তার করিবার অপূর্ব্ব সুযোগ সর্ব্বদাই উপস্থিত করিতেছে। আফ্রিকার উপকূলে তাহার বিস্তীর্ণ রাজ্য। এতদ্ব্যতীত ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বাংশে রোডস ও ডোডেকানিস দ্বীপপুঞ্জও তাহার অধীন। ইটালী গর্ব্বভরে ভূমধ্য সাগরকে "রোমীয় সাগর" বলিয়া অভিহিত করে।

গ্রীস আজ পূর্ব্ব গৌরবহীন, ইউরোপীয় উপকূলেই রাজ্যের সীমারেখা আবদ্ধ নহে, ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বাংশে বহু ক্ষুদ্র-বৃহৎ দ্বীপে তাহার অধিকার। কিন্তু সাইপ্রাস, রোডস প্রভৃতি দ্বীপ পরহস্তগত, সে ক্ষোভ তাহার আছে। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তাহার রাজ্য-বিস্তার ঘটিলেও সে বর্দ্ধিত সীমারেখা রক্ষা করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তদুপরি অন্তর্বিপ্লবে তাহার শক্তিক্ষয়ও যথেষ্ট হইয়াছে। আশু-ভবিষ্যতে তাহার নিকট হইতে ভয়ের আশঙ্কা কাহারও নাই।

তুরস্ক ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। গত মহাযুদ্ধের পর প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ায় জাতিসঙ্ঘের পর-শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একটি বিস্তীর্ণ উপকূল খণ্ড তুরস্কের হস্তচ্যুত হইয়াছে। ভূমধ্য সাগরের উত্তরে উপসাগর এজিয়ান সাগর উপকূলে স্মার্ণা ও থ্রেসের অংশেও গ্রীসের প্রভুত্ব মিত্রশক্তিদের কৃপায় স্থাপিত হইলেও গ্রীস তাহা রক্ষা করিতে পারে নাই। এই উভয় দেশের মধ্যে এক মৈত্রী-চুক্তি (১৯৩৬) স্থাপিত হওয়ায় ও তাহার ফলে স্বজাতি-নাগরিক-বিনিময় প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় সংখ্যা-লঘিষ্ঠ-সমস্যার নামে আত্মকলহের সম্ভাবনা লোপ পাইতেছে, অপরদিকে দেশাত্মবোধের বৃদ্ধিতে ঐক্য ও শক্তি সঞ্চয় হইতেছে। ভূমধ্য সাগরে প্রভাববিস্তারে তুরস্কের সহিত মৈত্রীর মূল্য আজ অতি বেশী।

ইংলণ্ড ভূমধ্য সাগরতীরস্থ দেশ না হইলেও, তথায় প্রভাব রক্ষা করা তাহার একান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষ করতলগত করিয়াই ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যমর্য্যাদা। দ্বীপময় ইংলণ্ড হইতে জলপথে ভারতবর্ষে আগমন করিতে ভূমধ্য সাগর-পথই তাহার সহজ পথ—এই পথকে সর্ব্বদা নিরাপদ রাখিতে হইবে। পশ্চিমে জিব্রালটার ও পূর্ব্বে সুয়েজ খালে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংলণ্ড দুইটি চাবিকাঠি হস্তগত করিয়াছে। এতদুভয়ের মধ্যে ভূমধ্য সাগর-বক্ষে মল্টা ও সাইপ্রাস দ্বীপদ্বয়ে নৌবহর রক্ষার সুযোগ গ্রহণের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাহার পক্ষে সমুদ্রকূলবর্ত্তী কোন রাষ্ট্রের মৈত্রী একান্ত প্রয়োজন। পশ্চিমাংশে ফরাসীর উপর নির্ভর করা চলে কিন্তু পূর্ব্বে-অংশে?

ঈজিপ্ট বা মিশর ভূমধ্য সাগর তীরবর্ত্তী রাজ্য, পূর্ব্বে ইহা তুরস্ককে সার্ব্বভৌম বলিয়া স্বীকার করিত। এখন তাহা "স্বাধীন", যদিও স্বাধীন রাজ্যের সকল ক্ষমতা তাহাকে দেওয়া হয় নাই। দেশের জাতীয়তাবাদী ওয়াফ্‌দ্ দলের সকল দাবী এতকাল উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই ওয়াফ্‌দ দলের সহিত ইংলণ্ডের মৈত্রীবন্ধনের আলোচনা চলিতেছে, শীঘ্রই একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হইবে এইরূপ আশা করা যায়। যদি তাহা হয় তবে ভূমধ্য সাগরে ইংলণ্ড একজন কৃতজ্ঞ বন্ধু লাভ করিবে। কিন্তু তাহা হইলেও নব-স্বরাট-প্রাপ্ত ঈজিপ্টের যোগ্য নৌবহর গড়িয়া তুলিতে সময় প্রয়োজন—এত কাল কাহার বন্ধুত্ব উপর নির্ভর করা চলিবে?

সুতরাং ইংলণ্ড তুরস্কের বন্ধুতা কামনা করিল। ইংলণ্ড তুরস্কে

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৬শ ভাগ, ১ম খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৪৩ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বাঁশিওয়ালা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"ওগো বাঁশিওয়ালা,
বাজাও তোমার বাঁশি,
শুনি আমার নূতন নাম,"
—এই ব'লে তোমাকে প্রথম চিঠি লিখেছি,
মনে আছে তো ?

আমি তোমার বাংলা দেশের মেয়ে।
সৃষ্টিকর্ত্তা পুরো সময় দেন নি
আমাকে মানুষ ক'রে গড়তে—
রেখেছেন আধাআধি ক'রে।
অন্তরে বাহিরে মিল হয় নি
সেকালে আর আজকের কালে,
মিল হয় নি ব্যথায় আর বুদ্ধিতে,
মিল হয় নি শক্তিতে আর ইচ্ছায়।
আমাকে তুলে দেন নি এ যুগের পারানি নৌকোয়,
চলা আটক ক'রে ফেলে রেখেছেন
কালস্রোতের ওপারে বালু ডাঙায়।
সেখান থেকে দেখি
প্রখর আলোয় ঝাপ্সা দূরের জগৎ,

বিনা কারণে কাঙাল মন অধীর হয়ে ওঠে,
ছুই হাত বাড়িয়ে দিই,
নাগাল পাই নে কিছুই কোনোদিকে।

বেলা তো কাটে না,
বসে থাকি জোয়ারজলের দিকে চেয়ে,
ভেসে যায় মুক্তিপারের খেয়া,
ভেসে যায় ধনপতির ডিঙা,
ভেসে যায় চল্‌তি বেলার আলোছায়া।
এমন সময় বাজে তোমার বাঁশি
ভরা জীবনের সুরে।
মরা দিনের নাড়ীর মধ্যে
দব্‌দবিয়ে ফিরে আসে প্রাণের বেগ।

কী বাজাও তুমি,
জানি নে সে সুর জাগায় কার মনে কী ব্যথা।
বুঝি বাজাও পঞ্চম রাগে
দক্ষিণ হাওয়ার নব যৌবনের ভাটিয়ারি।
শুন্‌তে শুন্‌তে নিজেকে মনে হয়,
যে ছিল পাহাড়তলীর ঝিরঝিরে নদী,
তার বুকে হঠাৎ উঠেছে ঘনিয়ে
শ্রাবণের বাদল রাত্রি।
সকালে উঠে দেখা যায় পাড়ি গেছে ভেসে,
একগুঁয়ে পাথরগুলোকে ঠেলা দিচ্ছে
অসহ্য স্রোতের ঘূর্ণি-মাতন।

আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর
ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক,
আগুনের ডাক,—
পাঁজরের উপরে আছাড়-খাওয়া
মরণ-সাগরের ডাক,
ঘরের শিকলনাড়া উদাসী হাওয়ার ডাক।

যেন হাঁক দিয়ে আসে
অপূর্ণের সঙ্কীর্ণ খাদে
পূর্ণ স্রোতের ডাকাতি,
ছিনিয়ে নেবে, ভাসিয়ে দেবে বুঝি।
অঙ্গে অঙ্গে পাক দিয়ে ওঠে
কালবৈশাখীর ঘূর্ণি-মার-খাওয়া
অরণ্যের বকুনি।
ডানা দেয় নি বিধাতা,
তোমার গান দিয়েছে আমার স্বপ্নে
ঝোড়ো আকাশে উড়ো প্রাণের পাগলামি।

ঘরে কাজ করি শান্ত হয়ে
সবাই বলে ভালো।
তারা দেখে আমার ইচ্ছার নেই জোর,
সাড়া নেই লোভের,
ঝাপট লাগে মাথার উপর
ধুলোয় লুটোই মাথা।
দুরন্ত ঠেলায় নিষেধের পাহারা কাৎ ক'রে ফেলি
নেই এমন বুকের পাটা ;
কঠিন ক'রে জানি নে ভালোবাসতে,
কাঁদতে শুধু জানি,
জানি এলিয়ে পড়তে পায়ে

বাঁশিওয়ালা,
বেজে ওঠে তোমার বাঁশি,—
ডাক পড়ে অমর্ত্ত্যলোকে,
সেখানে আপন গরিমায়
উপরে উঠেছে আমার মাথা।
সেখানে কুয়াশার পর্দ্দা-ছেঁড়া
তরুণ সূর্য্য আমার জীবন।
সেখানে আগুনের ডানা মেলে দেয়
আমার বারণ-না-মানা আগ্রহ,

উড়ে চলে অজানা শূন্য পথে
প্রথম ক্ষুধায় অস্থির গরুড়ের মতো।
জেগে ওঠে বিদ্রোহিণী,
তীক্ষ্ণ চোখের আড়ে জানায় ঘৃণা
চারিদিকের ভীরুর ভীড়কে ;
কৃশ কুটিলের কাপুরুষতাকে।

বাঁশিওয়ালা,
হয়তো আমাকে দেখতে চেয়েছ তুমি।
জানি নে, ঠিক জায়গাটি কোথায়,
ঠিক সময় কখন,
চিনবে কেমন ক'রে ?
দোসরহারা আষাঢ়ের ঝিল্লি-ঝনক রাত্রে
সেই নারী তো ছায়ারূপে
গেছে তোমার অভিসারে
চোখ-এড়ানো পথে।
সেই অজানাকে কত বসন্তে
পরিয়েছ ছন্দের মালা,
শুকোবে না তার ফুল।
তোমার ডাক শুনে একদিন
ঘরপোষা নির্জ্জীব মেয়ে
অন্ধকার কোণ থেকে
বেরিয়ে এল ঘোমটাখসা নারী।
যেন সে হঠাৎ-গাওয়া নতুন ছন্দ বাল্মীকির,
চমক লাগালো তোমাকেই।
সে নাম্‌বে না গানের আসন থেকে ;
সে লিখবে তোমাকে চিঠি,
রাগিণীর আবছায়ায় ব'সে।
তুমি জান্‌বে না তার ঠিকানা।
ওগো বাঁশিওয়ালা,
সে থাক্ তোমার বাঁশির সুরের দূরত্বে।

১৬ জুন, ১৯৩৬

স্পেনের সন্ধানে

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

১

কাল শেষরাত্রে শেষ শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নার মধ্যে বোর্দো থেকে হিস্পানীদের গান শুনতে শুনতে পীরেনীজ পর্ব্বতমালার ইরুণ গিরিবর্ত্মে এসেছি। এই গান খুব পরিচিত মনে হ'ল; দু-মাস ইংলণ্ডের শীতের জড়তার মধ্যে এতটা সহৃদয়তা, এতটা আকর্ষণ পাই নি। লণ্ডনের কন্সার্ট হলের সুষ্ঠু শীলতা ও সুকঠিন আচারনিষ্ঠা প্রথম প্রথম বিদেশীকে অভয় দিতে পারে নি; কিন্তু কাল রাত্রে পার্ব্বত্য হিস্পানীদের গান আমাদের রাখালদের গানের মত জ্যোৎস্নার আভাসে ভরা আকাশে মিলিয়ে গিয়ে আমায় আশ্বাস দিচ্ছিল। তাই শেষরাত্রে সীমান্তের ষ্টেশনে অপরিচিত গ্রাম্য ও পার্ব্বত্য লোকগুলির দুর্ব্বোধ্য ভাষা সত্ত্বেও স্পেনকে বিশ্বাস ক'রে হৃদয়ে বরণ ক'রে নিলাম।

আলো, আলো! কত মাস পরে জীবনের সাড়া পেলাম ব'লে মনে হ'ল। ইংলণ্ডের ম্লান, মেঘাচ্ছন্ন, কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের একটা রূপ আছে। সে-রূপ উপভোগ করতে হ'লে বহু ধৈর্য্য ধ'রে ইংলণ্ডের অবগুণ্ঠন মোচন করতে হবে। কুয়াশায় পথ হারিয়ে ঘুরে ঘুরে অজানার সন্ধানের আনন্দ পেতে হবে; আণ্ডারগ্রাউণ্ডে সময়মত কলেজে না গিয়ে শীতের প্রভাতে 'বাসে' গিয়ে রক্তসূর্য্যের হরিদ্রাভ অপমান দেখতে দেখতে দেরি ক'রে ফেলে' এবং ক্লাস কামাই ক'রেও বিষণ্ণ ভাব দূর ক'রে ফেলতে হবে; রাত্রে বিজলী বাতি বা জ্যোৎস্নার আলোয় স্কেটিঙ করতে হবে দূর প্রান্তরে। সব মানি, মানি যে অন্ধকারের অন্তরালে আকাশ ও পৃথিবীর যুগল তপস্যার মধ্যে একটা স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য আছে; কিন্তু তার মধ্যে একটা ক্লান্তির চিহ্ন ধরা পড়ে ব'লে মনে হয়। তাই স্পেনের আলো আমার কাছে জীবন এনে দিল।

পীরেনীজ শৈলমালার কয়েকটা চূড়াতে একটা অপূর্ব্ব নীল আভা মূর্চ্ছিত হয়ে রয়েছে, যেন নিশান্তের সুখস্বপ্নের আব্‌ছায়া স্মৃতিখানি। কত যুগ এমন স্নিগ্ধ নীল আলোয় ভরা উষার মোহন রূপ দেখি নি। আজ প্রথম কৈশোরের আনন্দের মত একটা অকারণ আনন্দ মনকে মাতিয়ে তুলল। পরীক্ষার চিন্তাভারাক্রান্ত মন নয়, আকাশের পাখীর লঘু সরল অস্তিত্বের মত মন নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। উষা যে নিঃশ্বাসরুদ্ধ হৃদয়ে প্রভাতের জাগরণের ভাষা শুনতে শুনতে মৃদু চরণক্ষেপে এখনই চলে যাবে। পথে ঘাটে শীতকাতর হিস্পানী কম্বলে-মোড়া অবস্থায় জড়সড় হয়ে চলেছে; একটা গাধা রাস্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে; একটা ছোট ঘোড়ায়-টানা গাড়ী অনর্থক দাঁড়িয়ে আছে; একটা দোকানের সামনে খানিকটা কাদা, জল দিয়ে সে জায়গাটা পরিষ্কার করবার শ্লথ চেষ্টা হচ্ছে। লণ্ডনের প্রভাতের চাকরাণীর কর্ম্মব্যস্ততা, দুধওয়ালার ক্ষিপ্রপদে দ্বারে দ্বারে দুধ রেখে যাওয়া, কুলি-মজুরের আণ্ডারগ্রাউণ্ড বা ট্রামের পথে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ান, এ-সব পেলাম না, তাই পথগুলি বড় খালি মনে হ'তে লাগল। হঠাৎ দেশের কথা মনে পড়ল; আবার ইংলণ্ডে সদ্যোলব্ধ উল্লাসের প্রাচুর্য্যের কথাও ভাবলাম, বুঝলাম ইংলণ্ডের শিক্ষার ফল আমার উপর ফলছে, তাই সে দেশের কর্ম্মবহুল, চঞ্চল, সফল জীবনের স্পর্শ পেয়ে এত ভাল লাগে।

মনের মধ্যে রৌদ্রের উত্তাপ অনুভব করতে পারছি। ইংলণ্ডেও এই উত্তাপ দেখেছি। যেদিন একটু সূর্য্যের আলো অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা দেয় অমনি দলে দলে লোক শহরের বাইরে চলে যায়, ছেলেরা খেলতে যায়; লণ্ডনের মাঠগুলি সূর্য্যোপাসকের দলে ভরে যায়। লণ্ডন কলকাতা নয়, সেখানে প্রত্যেক পাড়ায় নিঃশ্বাস ফেলবার ও আরামে বেড়াবার বাগান আছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও প্রয়োজনীয়তার কথা অত বড় কর্ম্মচঞ্চল, গতিম শহরও ভোলে নি। শুধু ধনী লণ্ডনই বা কেন? ছোট শহ ও গ্রামগুলিতেও সেকথা সবাই মনে রাখে; গ্রামটিকে তার চারি পাশকে সাজিয়ে রাখবার কত ইচ্ছা ও চেষ্টা

আমার চোখ নিশ্চয়ই এখনও ইউরোপীয় হয়ে যায় নি; কিন্তু গ্রাম্য ইউরোপের পাশে গ্রাম্য বাংলাকে দাঁড় করিয়ে অনেক বার মনে হয়েছে যে আমাদের দেশের কবিরা নিছক সত্য কথা লেখেন নি; তাই বাংলার রূপ যতটা পাই কবিতায় ও কল্পনায় ততটা জীবনে পাই নে। মনে বাংলার রঙের পরশ যতটা বেশী থাকা উচিত ছিল ততটা হয়ত নেই। এ-কথা কি করে অস্বীকার করব যে মনের মধ্যে গ্রামের যে সুন্দর প্রাণময়, লীলায়িত, আনন্দরসাস্পদ চিত্র আঁকা ছিল তার সঙ্গে দেখলাম বাংলার গ্রামের চেয়ে ঔপন্যাসিক হার্ডির গ্রামগুলিই বেশী মিলে গেল।

২

ভারতবর্ষে ধারণা আছে স্পেন হচ্ছে ইউরোপের মধ্যে এক টুকরা ভারতবর্ষ। সে-কথাটা পরীক্ষা করবার ইচ্ছা বার-বার জেগে উঠেছে। পীরেনীজের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ও অন্যান্য ছোট শহরে উত্তর-ইউরোপের কর্ম্মচঞ্চলতা বা উৎসাহের প্রাচুর্য্য পেলাম না। এণ্ডোরা নামে স্পেন ও ফ্রান্সের মাঝখানে যে রাজ্যটুকু আছে সেখানেও এই অবস্থা। পথে ঘাটে গতির আরাম আছে আবেগ নেই; নগরবাসিনীর মৃদুমন্দ গমনে ছন্দ আছে, লীলা নেই। লণ্ডনের জনতাপূর্ণ পথে কিন্তু মনে হয়েছিল যে ইংলণ্ডে সবাই নিয়ম মেনে চলে, কারণ পথের শৃঙ্খলা সে দেশে কারও পায়ে শৃঙ্খল হয়ে বাজে না, সহস্র লোকের চলাচলের মধ্যে তা বন্ধমাত্র, বন্ধন নয়।

স্পেনের গ্রাম্য পোষাকও ঠিক ইউরোপীয় ছাঁদের নয়। ইউরোপীয় পোষাকের সুকঠিন সুষ্ঠু ভাব এখানে আশা করা যায় না। মেয়েদের পিঠে সুন্দর ঝালর-দেওয়া শাল,—রেশমী শালে জড়ান পোষাক ভারী সুন্দর দেখায়। পুরুষদের মাথার ক্যাপগুলিতে বিশেষত্ব আছে। এদেশে মূররা বহু শতাব্দী, পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব ক'রে গিয়েছে। তাদের ও ইহুদীদের রক্ত-সংমিশ্রণ দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্বকালের আগে বহু পরিমাণে হয়েছে; তার ফল আকৃতিতে, হাবভাবে ও জাতীয় চরিত্রেও যথেষ্ট দেখতে পাই। স্প্যানিশ লোকের গঠন কিছু স্থূল ও খর্ব্ব, বর্ণ অলিভ অর্থাৎ উত্তর-ইউরোপের লোকের মত অত শাদা নয়; চোখের কটাক্ষ গভীর ও কাজল; ভ্রূভঙ্গীতে একটা প্রাচ্য আভাস পাই। লোকগুলি সহজে পথের দেখায় বন্ধুত্ব পাতায়, মন খুলে গল্প করে, আবার হঠাৎ ধৈর্য্য ও শান্তি হারায়। অনেকটা সুয়েজের এ-পারের মত আবহাওয়া। একবার পথে বেরিয়ে একটি ঘণ্টার মধ্যে নূতন আলাপ ও নিবিড় বন্ধুত্ব এবং তীব্র বিদ্বেষ ও ভীষণ শত্রুতা পথেই অভিনীত হচ্ছে দেখে এলাম। প্রকৃতি মানুষ গঠন করে; রৌদ্র ও শীত চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তার উপর বিদেশী মূরের অধীনতায় বহুদিন বাস করায় জাতীয় চরিত্রও পরিবর্ত্তিত হয়েছে। ইতিহাস দেখিয়েছে যে স্বাধীন হবার পর বিদেশী প্রভাবের ফল দূর করার জন্য স্পেন প্রবল চেষ্টা করেছে। স্পেন মূর ও ইহুদীর বিরুদ্ধে শান্তিহীন ক্ষমাহীন মর্ম্মান্তিক যুদ্ধ চালিয়েছে; ইউরোপের ধর্ম্ম ও রাজনীতির নেতা ও বিধর্ম্মী তুরস্কের বিরুদ্ধে রক্ষাকর্ত্তা হয়েছে। সেই যুগে স্পেন একই কালে সমস্ত ইউরোপে ও বাহিরের জগতেও সৈন্য পাঠিয়েছে; ধর্ম্মের নামে অমানুষিক অত্যাচার করেছে বীরত্বের আবরণে। তবু স্পেন পূর্ণ মাত্রায় ইউরোপীয় হ'তে পারে নি এবং তার রাজনীতির অবনতি, অভিজাত সম্প্রদায়ের অধঃপতন ও পীড়নের ফলে অধীন প্রজার বিদ্রোহ ঠিক প্রাচ্য ভাবেই হয়েছে। ইউরোপ বলতে যা বুঝি স্পেন তার সবটা আমাদের দিতে পারে না।

তাই যখন এই প্রাচ্যভাবাপন্ন পোষাকে সজ্জিতা হিস্পানীদের মধ্যে একটি মেয়েকে নিখুঁত হাল-ফ্যাশানের পোষাকে দেখলাম তখন একটু বিস্ময়েই তার দিকে না তাকিয়ে পারলাম না। পাহাড়ের উপর তখন রৌদ্র ছায়া ও নীলাঞ্জন একটা অপূর্ব্ব মোহ বিস্তার করছে। অস্তরশ্মি-উদ্ভাসিত বেলাশেষের আকাশের সব ঐশ্বর্য্য তখন ইরুণ থেকে সান সিবাষ্টিয়ানের পথে একটি হ্রদের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে। সেই আসন্ন অন্ধকারের মোহিনী মায়ার মধ্যে বুঝলাম যে এই মেয়েটি জাতিতে হিস্পানী কিন্তু আমারই মত ভ্রমণপর। মেয়েটি সুন্দরী নয়, কিন্তু শোভনা। সে যা-কিছুতে হাত দেবে তারই মধ্যে অননুভবনীয় স্পর্শ জেগে উঠবে এমনই একটা সুকুমার কান্তি তার আঙুলের মধ্যে আছে। কালিদাস তার লীলাচঞ্চলতা দেখে তাকে

বনহরিণীর সঙ্গে তুলনা করতেন। অথচ প্রতি রক্তকণায় সে নগরবাসিনী। তার ভাল লাগা ব'লে কোন জিনিষ নেই; ভাল লাগলে হৃদয় থেকে সেই ভাব প্রকাশ কেমন ক'রে হ'তে পারে তা সে ভুলে গেছে। এই শ্রেণীর নারী নিজের বাহিরে আর কারও কথা সহজ ভাবে ভাবতে পারে না। আমার মনে হয়, ইউরোপের অবাধমিশ্রণের সমাজে, সকলের স্তুতিবাদক্লান্ত রূপকে এই মূল্য দিতেই হবে। যদিও মেয়েটি রঙীন আকাশের তলায় ধূসর পাহাড়ের একটা সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য দেখে ব'লে উঠছে, "কি সুন্দর, নয় কি", যদিও সে এই লোকগুলির অদ্ভুত পোষাক ও মনোহর চলনভঙ্গী দেখে মৃদুস্বরে বলছে "কি অদ্ভুত, চমৎকার", তবু আমি জানি যে সে সেই বিরাট ও শুষ্ক সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিজেকে একটু বাহিরের জগতের ব'লে মনে করছে। সে এই নিরুদ্দেশের আহ্বানময় দৃশ্যের সঙ্গে নিজেকে থাপ খাওয়াতে পারে নি, আর সে জন্য এই উদাস বৈরাগ্যের ধূসর চিত্রপটের সামনে তার উজ্জ্বল পোষাক, ফ্যাশনের চূড়ান্ত একটা স্কার্টের পাশের পকেটে হাত রেখে অঙ্গ হেলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, একটা প্রতিবাদের মত দেখাচ্ছে। সে যেন বুলভার-এ বেড়াতে এসেছে, সে পথিক নয়। তার চরিত্র হচ্ছে আত্ম-সচেতন, তার মনের জন্মভূমি প্যারিসের এক টুকরা, জীবনের মানদণ্ড ফ্যাশন।

যেখানেই যাই এই রকম টুরিষ্টের সন্ধান পাই। 'আমেরিকান টুরিষ্ট' কথাটা একটা অবজ্ঞেয় সংজ্ঞা পেয়েছে। কিন্তু শুধু আমেরিকানরাই বা দোষী কেন? বেশীর ভাগই বাহিরে বেড়াতে আসে ক্লাবে ও সমাজে নাম কিনবার জন্য, দলের মধ্যে দশ রকম কথা বলতে পারবার জন্য। সবাই 'টুরিষ্ট এজেন্সী'র বিজ্ঞাপন ও 'গাইডে'র হাতে আত্মসমর্পণ ক'রে বিনা প্রতিবাদে, চোখ না খুলেই, বিখ্যাত চিত্রশালা ও জন্তুশালা, রাজপ্রাসাদ ও ভুতুড়ে দুর্গ দেখে বড় হোটেলের বাঁধা ভোজ খেয়ে নিজের দলের বা সেই হোটেলের অন্যান্য ভ্রমণকারীর সঙ্গে থেকে নির্ভাবনায় সময় কাটিয়ে যায়। ইংরেজ ও আমেরিকান সব সময়ই ইংরেজী কথা বলা যায় এমন হোটেলে আস্তানা নেবে। এ-বিষয়ে বিদেশী সামান্যবিত্ত ছাত্র সৌভাগ্যবান্। সে থাকবে দেশীয় হোটেলে বা কোন লোকের বাড়ীতে কাঞ্চন-মূল্যে; ভোজন তার নিজে আবিষ্কার করা পথপার্শ্বের রেস্তোরাঁয়, পরিচয় অপরিচিতের সঙ্গে। আর সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য যে সে নিজেকে ভুলতে বা ভোলাতে দেশ-ভ্রমণে আসে না, আসে নিজেকে জাগাতে।

ইউরোপ ও আমেরিকার পথের লোক অন্য কোন কারণে না হ'লেও একটা বিশেষ মানসিক কারণে ভ্রমণকারী হ'তে বাধ্য। তারা নিজেদের ভুলতে চায়। সৌভাগ্যের অনিত্যতা, জীবনের লক্ষ্যহীনতা ও অনেক সময় উচ্চাকাঙ্ক্ষার নির্বুদ্ধিতা তাদের জীবনকে একটা উদ্দেশ্যহীন, নিরবচ্ছিন্ন গতি দেয়। সেই গতির আবেগে এরা মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়। স্পেনের শ্রেষ্ঠ সমুদ্র-বিলাসের স্থান সান্ সিবাষ্টিয়ানে বিস্কে উপসাগরের ব্রেকওয়াটারের পিছনের অচঞ্চল জলে সাগরস্নান করতে করতে এই কথাই মনে হ'ল। সামনে সমুদ্রের অসীম নীল নিদ্রাকরুণতা, দুই পাশে আসামের মত বিটপীশোভিত পর্ব্বতশ্রেণীর শ্যামশান্তি। এই দৃশ্যের মধ্যে ত ভ্রমণকারী দল নিজেদের মিলিয়ে দেয় না; কেহ হৈচৈ ক'রে সমুদ্রস্নান করে, কেহ স্পেনের চমৎকার মোটর-পথে বহুদূর চলে যায়, কেহ সন্ধ্যায় হোটেলের বিস্তীর্ণ বিলাসলীলাময় নাচঘরে আত্মবিস্মৃত থাকে। আত্মবিস্মরণের এই প্রাণপণ চেষ্টাই তাদের অনেকের উদ্দেশ্যহীন জীবনের উদ্দেশ্য। নিজেকে বিস্মৃত হবার, চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করবার প্রবল তৃষ্ণায় তারা আনন্দের পর আনন্দের সম্ভারে দিনরাত্রি পূর্ণ রাখতে চায়। আজকাল উল্লাস ও উত্তেজনা না হ'লে চলে না, কারণ সকলেই গত মহাযুদ্ধের পর থেকে নিজের অসহায় ক্ষুদ্রতার কথা ভাবতে ভয় পায়। যা অনন্ত ও চিরন্তন তা ইউরোপে সান্ত ক্ষণস্থায়ী জীবনে এ-যুগে কোন আশ্বাসের বাণী দিতে পারছে না। কিন্তু এ আনন্দের অন্বেষণও কাউকে বেশী দিন তৃপ্ত রাখতে পারছে না, কারণ তা লঘু অগভীর ও বিরামহীন। ইউরোপের সব আনন্দের পণ্যশালাতেই একটা অতৃপ্তির ভাব দেখি যাকে ফরাসী ভাষায় বলে 'blase', যাদের জীবনে এত গতি, এত উদ্দামতা তারাও নির্জ্জন মুহূর্ত্তে ব'লে উঠে—হাউ বোরিং!

৩

ডিসেম্বর মাসের প্রভাত বাহিরের তুষারের প্রতিফলি

আলোকে উজ্জ্বল, কিন্তু নানা রঙে আঁকা কাচের মধ্য দিয়ে অতি সামান্য একটু আলো সালামান্কার প্রাচীন বিরাট্ গীর্জ্জার মর্ম্মর-স্তম্ভের অন্তরালে ক্রুশের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে রয়েছে। এই গীর্জ্জায় মূরীয়, বাইজেণ্টাইন ও গথিক—তিন রকম শিল্পধারারই যে অতুলনীয় সমাবেশ ও ক্রমবিকাশের উদাহরণ রয়েছে তা থেকে আমার দৃষ্টি অন্য দিকে আসতে বাধ্য হ'ল। আমি বিস্ময়ান্বিত হয়ে আপাদমস্তক কালো পোষাকে আবৃত একটি স্থির, নতজানু, ধ্যানরত হিস্পানীকে দেখছিলাম ও মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করছিলাম যে খ্রীষ্টধর্ম্ম পাশ্চাত্যকে প্রাচ্যের দান। এই দৃশ্য ত এত দিনেও ইউরোপে ধর্ম্মমন্দির ছাড়া আর কোথাও দেখলাম না। এ যেন আমাদের অতি-চেনা, এর সঙ্গে অন্তরের পরিচয় আছে। যে ভূমিখণ্ডে এই পূজারী রয়েছে সে যেন ইউরোপের মধ্যে প্রাচ্যের এক টুকরা। প্রতীচ্যের অন্ধ গতিবেগ, সান্ত ও ক্ষণস্থায়ীর প্রতি অনুরাগকে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাবই প্রাচ্যের স্বভাবসুলভ ধ্যানের স্থিতিশীলতা দিয়ে সংহত ক'রে রেখেছে; চিত্তবিক্ষেপ থেকে সমাধি, বিষয় থেকে আদর্শ, আত্মবিস্মরণ থেকে মননে ফিরিয়ে এনেছে।

সালামান্কা প্রাচীন স্পেনের একটি অক্ষুণ্ণ পরিপূর্ণ চিত্র। সৌভাগ্যক্রমে বর্ত্তমানের কালোপযোগী ক'রে তুলবার প্রয়াস এই শহরটির মাধুর্য্য নষ্ট ক'রে দেবার চেষ্টা করে নি। যে-যুগে গ্যালিলিওর আবিষ্কার ইউরোপের আর কোথাও স্বীকৃত না হ'লেও এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে সে-বিষয়ে বক্তৃতা শুনতে বা কলম্বসের অদ্ভুত নূতন আবিষ্কারের কাহিনী শুনতে দশ হাজার ছাত্র আঁকাবাঁকা গলিপথ দিয়ে যাতায়াত করত, সে-যুগ এখনও এখান থেকে একেবারে চ'লে যায় নি।

শঙ্খগৃহের (Casa de las Conchas) বনিয়াদী ঘরোয়া প্রথার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কারুকার্য্যের উপর বিংশ শতাব্দীর কোন ছাপ এখনও পড়ে নি। মধ্যযুগের রঙীন চামড়ার সৌখীন হাতের কাজের শিল্পে সালামান্কা বর্ত্তমান ভেনিসের চেয়ে বড় ছিল। কলেজের ছাত্ররা এখনও তাদের বই এই চামড়ার সুদৃশ্য আবরণে ঢেকে রাখে। এখনও পঁচিশটি কলেজের ও বাটটি মঠের সম্পদ হচ্ছে তাদের যত্নরক্ষিত কারুকার্য্যখচিত পুস্তকাগারগুলি ও বিশেষতঃ ধর্ম্মপুস্তকের বিভাগ। একটির ভিতর থেকে যেদিকেই তাকাই, বিরাট গীর্জ্জাটিই শুধু চোখে পড়তে লাগল। সমস্ত শহর ছাড়িয়ে, তার সকল সাংসারিক কর্ম্ম ও কর্ত্তব্যকে ছাপিয়ে, তার সব আশা ও বিশ্বাস, প্রেরণা ও সাধনাকে মূর্ত্তি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই সালামান্কার গীর্জ্জা। যারা বলছে যে পাশ্চাত্য জাতির ধর্ম্মের প্রয়োজন নেই তারা ঠিক বলছে না। স্পেনে রাজা আলফন্সোর পলায়নের পর থেকেই গণতন্ত্র ক্যাথলিক ধর্ম্মকে রাজধর্ম্মের পদ থেকে চ্যুত করেছে, ক্যাথলিক-পরিচালিত স্কুলগুলি লোপ ক'রে দিয়েছে, দেবোত্তর ও ধর্ম্মোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়েছে। তার ফল আজ রাজনীতিক চাঞ্চল্য ও অশান্তির মধ্যে, নব্য স্পেনের সরকারী স্কুলে শিক্ষকের অভাবে, কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে প্রকাশ পাচ্ছে। স্পেনের গীর্জ্জায় অনেক দোষ ছিল, বৈষয়িকতা তার মধ্যে বহুপরিমাণে ছিল, যাজক হওয়া একটা লাভজনক ব্যবসায়ে পরিগণিত হয়েছিল। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম হিস্পানীদের অন্তরে অনেকখানি স্থান অধিকার করেছিল। ধর্ম্ম বলতে আমি কোন পারলৌকিক মঙ্গলের অনুষ্ঠানমাত্রকেই বলছি না।

ধারণাদ্ ধর্ম্ম ইত্যাহুঃ......যঃ স্যাৎ ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।

কুশাসিত, বিভক্ত-প্রদেশ, স্থিররাজনীতিহীন স্পেনের বিক্ষুব্ধ, বিক্ষিপ্ত জনসাধারণের চিত্তকে ধর্ম্মই একপথে চালিয়ে নিয়েছিল। যে বৃদ্ধকে আমার সামনে বিরাট আড়ম্বরময় প্রাচীন মন্দির উপাসনা করতে দেখেছি তার অন্তরের মধ্যে ধর্ম্ম একটি গোপন প্রকোষ্ঠ অধিকার ক'রে রেখেছিল। তার সেই বিরামগৃহ যখন লোপ পেয়ে যাবে, তার অন্তরের আশ্রয় আর থাকবে না, তখন সে খুব সহজেই বার্সিলোনার ছাত্র-বিপ্লবীদের পর্য্যায়ে চলে যাবে।

৪

মঠ ও মন্দির, প্রাসাদ ও স্মৃতিসৌধ সম্পন্ন 'এস্কোরিয়াল' গৃহটি স্পেন ও ক্যাথলিক ধর্ম্মকে যা-কিছু গঠন ক'রে রেখেছে কালের দ্বারা অস্পৃষ্ট তারই কয়েকটি স্মরণচিহ্ন বহন ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। এ-হিসাবে এস্কোরিয়ালের স্থান দিল্লী বা ফতেপুর সিক্রির উপরে। এই জায়গাটি দিল্লীর মতই একটি বিলুপ্ত যুগের মূক প্রহরী। তার প্রাসাদ আছে, প্রহরী

নেই, রাজপ্রেয়সী নেই। কিন্তু দিল্লীর কাছে নূতন দিল্লী হয়েছে; নূতন রাজপুরুষদের পদশব্দে রাজপথ মুখরিত হ'তে পারে যদিও ওমরাহদের সব চিহ্ন ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গেছে। এস্কোরিয়াল ফতেপুর সিক্রির মত অতীত যুগের চিহ্নগুলিকে সগৌরবে বহন ক'রে আসছে; সে-যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থারও বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নি। এ ধারণাটি সবচেয়ে বদ্ধমূল হয় এখানকার লোকদের সঙ্গে আলাপে। এদের চিন্তা ও স্বপ্ন এখনও মধ্যযুগ ছাড়িয়ে বর্ত্তমানে এসে পৌঁছয় নি। এখানে কার্ল'স্ কিন্তো (পঞ্চম চার্ল'স্) ও ফিলিপ সেগুন্দো (দ্বিতীয় ফিলিপ) সম্বন্ধে এমন ভাবে কথা কয় যেন তারা গতকালের বিদায়-নেওয়া বন্ধু; সিয়েরা গুয়াদারামা পর্ব্বতের নীলাঞ্জন ছায়ায় যেন এখনও তাদের অশ্বখুরের ধুলা মিলিয়ে যায় নি।

এস্কোরিয়ালের সঙ্গে বহির্জগতের কোন সম্বন্ধ নেই। মাদ্রিদ-প্যারিস এক্‌স্‌প্রেসে মাদ্রিদ থেকে মাত্র এক ঘণ্টার পাড়ি; কিন্তু মাদ্রিদের কোন অসন্তোষের বা চাঞ্চল্যের ঢেউ এখানে এসে পৌঁছয় না। দ্বিতীয় ফিলিপ চেয়েছিলেন যে তাঁর জীবনের ধর্ম্মময় শেষদিনগুলি শান্তিপূর্ণ ভাবে এখানে কাটবে; সেই বৃদ্ধ সম্রাটের জীবন বৃহৎ সাম্রাজ্যরক্ষা ও বিস্তৃতির টানা-পড়েনে অশান্তিতে ভ'রে উঠেছিল কিন্তু তাঁর সন্ন্যাসের প্রাসাদটি এখনও শান্তিতে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এখানে সেণ্টদের উৎসবগুলি এখনও ধূলিধূসরিত কিন্তু আড়ম্বরময় মঠের ভিতর নিয়মিতভাবে পালিত হয়। সেগুলিই এখানকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। সিয়েরা গুয়াদারামার নীল চিত্রপটের সামনে ধূসর, ধূপসুরভিত, উপাসনানন্দিত এই সৌধের চারি দিকে একটা অননুভবনীয় সৌন্দর্য্য আছে। শহরতলীও এমন চমৎকার মাধুর্য্যে ভরা যে-মাধুর্য্য মধ্যযুগের ইতিহাসের পাতা থেকে নেমে এসে এখানে রয়ে গিয়েছে। যুবরাজের প্রাসাদের উদ্যানপথে ছোট ছোট ছেলেরা পাথরে বাঁধান সিঁড়ির তৈরি রাস্তায় এমন ভাবে আধটি পেসেতা চায় যে তাকে ভিক্ষা বলা চলে না—এ যেন কামাখ্যার পাহাড়ে কুমারীদের পয়সা চাওয়া। ঐ বিশাল পর্ব্বতের তলায় জলপাইকুঞ্জে যখন ছায়া দীর্ঘতর হয়ে নেমে আসে, যখন রাখালবালক তার ছাগলগুলি নিয়ে ঘরের দিকে ফিরে যায়, গাধার গলায়-বাঁধা-ঘণ্টা শ্রান্ত সুরে বাজতে থাকে তখন মনে হয়, এই মধ্যযুগের শহরটি এখনও পদবী ও আভিজাত্যের মর্য্যাদায় গর্ব্বিত বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত স্প্যানিশ অভিজাতদের প্রতীক্ষা করছে—যারা সপ্তসমুদ্রের পারের দুর্গম অজ্ঞাত দেশের ভাগ্যান্বেষীদের দ্বারা আহৃত রত্ন গুয়াদিল কিভার নদীর তীরে সেভিলের বন্দর থেকে নিয়ে সম্রাটকে এই ভোগবিলাসহীন প্রাসাদে অভি-বাদন করতে আসবে। চারি দিকের পাথরের বাড়ীগুলির জানালা সকৌতুকে উন্মুক্ত ক'রে নাগরিকারা চেয়ে দেখবে; গীটার-বাদ্যরতা কোন তরুণী ব্যাকুলবক্ষে নীচে নেমে এসে তার প্রত্যাশিত বীরের সন্ধানে রক্ত কালো কাজল আঁখি একবার প্রকাশিত করেই সরে যাবে। মাণ্টার কথা মনে পড়ে। সেখানেও এমনি আঁকাবাঁকা রাস্তায় হরিণাক্ষী তরুণীরা চকিতে চেয়ে সরে পড়ে; আর স্থিরাক্ষী গৃহিণীরা কালো রেশমী শালে ঘাড় ঢেকে বিজয়গর্ব্বে চলে যায়, বিদেশী পথিককে তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না।

মঠের বিশাল দক্ষিণ তোরণ যেখানে সর্ব্বদা দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, রাজর্ষি ফিলিপের স্মৃতি যেখানে বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে বুঝি চপলতার কল্পনাই এরা করতে চাইবে না। প্যান্থিয়ন বা রাজকবর গৃহের শবাধারগুলির মর্ম্মরের অসম্ভব রকম ঔজ্জ্বল্য হয়ত আমাদের তাজমহলকেও হার মানায়। এখানকার অন্ধকারপ্রায় ভূগৃহে পঞ্চম চার্ল'স থেকে প্রায় সব রাজারই শেষভস্ম রক্ষিত আছে, শ্মশানের শূন্যতায় নয়, ঐশ্বর্য্যের পূর্ণতায়। এখানে একটি শবাধার দেখিয়ে গাইড বলল, "এটি রাজা আলফন্সোর জন্য ছিল; কিন্তু খাঁচায় পোরবার আগেই পাখী আমাদের কল্যাণে পালিয়ে গেছে।" এই রসিকতা করার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখদুটি চক্‌চক্ ক'রে উঠল ও মর্ম্মরদ্যুতিতে উজ্জ্বল-প্রায় সেই ভূগর্ভে সে নতজানু হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করল ও বুকে ক্রুশচিহ্ন আঙুল দিয়ে এঁকে দিল। মনে মনে বুঝলাম যে সোশ্যালিজ্‌মের উপরও রাজর্ষির জয় হয়েছে।

ইতিহাসের দিক দিয়েও এখানে চিত্তাকর্ষক বস্তুর অভাব নেই। যে-বিলাসহীন কক্ষে যে-টেবিলে, যে-ঘড়ির সামনে অক্লান্তকর্ম্মী ফিলিপ সাম্রাজ্যের কাজ করতেন তা সব তেমন ভাবে সাজান আছে। ফিলিপ ও ইংলণ্ডের রাণী মেরীর বাসরশয্যা ও শয়নকক্ষ এখনও সযত্নে সাজান আছে।

রাজদূতদের আসনগুলি এখনও তাদের প্রতীক্ষা করছে। দ্বিতীয় ফিলিপের পুস্তকাগার এক সময়ে ইউরোপে অদ্বিতীয় ছিল; তিনি এর উন্নতির জন্য কম চেষ্টা ও অর্থব্যয় করেন নি। শুধু তাই নয়, চিত্রশিল্পের জন্যও তিনি ও তাঁর বংশধররা এস্কোরিয়ালের প্রাসাদে অনেক ব্যয় ক'রে গিয়েছেন। তিৎশিয়ান, তিন্তোরেত্তো, ও ভেলাস্কেথ প্রভৃতির ছবিতে এই গৃহ পরিপূর্ণ ছিল। অবশ্য তার বহু অংশ অগ্নিকাণ্ডে ও নেপোলিয়নের ফরাসী সৈন্যদের দস্যুতায় পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে; কিছু মাদ্রিদে স্থানান্তরিত হয়েছে; কিন্তু যা বাকী আছে তার মূল্য কম নয়।

এখানকার তিৎশিয়ানের 'শেষ ভোজন' ছবিটি, ও লুভ্‌রে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির 'শেষ ভোজন' ছবি দুটির তুলনা করবার ইচ্ছা যে-কোন চিত্ররসিকের মনে স্বতই জেগে উঠবে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ এখানে আছে, তা হচ্ছে দেওয়ালে আঁকা সারি সারি ফ্রেস্কো ছবি—প্রেরেগ্রিন, লুই দ্য কার্বাথাল, কাবৃহুচ্চি ও লুকা জ্যোর্‌দানোর আঁকা যিশুখ্রীষ্টের সারাজীবনের কাহিনী। মনের মধ্যে কি করুণ ভাবে আঘাত করে ক্রশ থেকে খ্রীষ্টের দেহ-অবতরণের চিত্রটি। এই খ্রীষ্ট-জীবনীর ভাববস্তু স্পেনে কত জায়গায়, কত শিল্পীর কল্পনায়, কত বিভিন্ন ব্যঞ্জনায় দেখলাম।

যে-সব ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষী জাতি বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের আশায় মুসলমান রাজত্বকালে ভারতবর্ষে এসেছিল তাদের মধ্যে ইবেরিয়ান পেনিনসুলার অধিবাসীরাই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী খড়্‌গহস্ত হয়েছিল। যে ষাট বছর পোর্টুগীজরা স্পেনের অধীনে ছিল তখনও ভারতবর্ষে পৌত্তলিকদ্বেষ বিন্দুমাত্র কমে নি। আশ্চর্য্যের বিষয়, স্পেনে এসে দেখছি যে সে-যুগে এরাও কম পৌত্তলিক ছিল না। এবং এখনও এদের এ-বিষয়ে কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। সালামাঙ্কা, টোলেডো ও এস্কোরিয়ালের গীর্জ্জা দেখে বার-বার ভাবি যে সাকার পূজা ক্যাথলিকদের মধ্যেও হিন্দুদের মতই কত সুন্দর ও মধুর প্রথা এনে দিয়েছে; পূজার মন্দিরে কত ধূপগন্ধ, দীপমালা, কত চামরব্যজন, কত সন্ধ্যারতি। আমাদের মতই এদের তীর্থযাত্রা, পর্ব্ব-দিবস, আমাদের মতই প্রণতির বিচিত্র বিকাশ। খ্রীষ্ট, ত্রিমূর্ত্তি, পরমমাতা মেরী, এঁরা এদের দেবতা, এঁদের চিত্র বা মূর্ত্তি এদের কাছে হিন্দুর প্রতিমার মত, এঁদের জীবনকাহিনী হচ্ছে ক্যাথলিকের পুরাণ। এঁদের সামনে কত নতমস্তকে প্রার্থনা, পাপস্বীকার, অশ্রুপাত, দূর থেকে "কাটিড্রাল" দেখে কত বিনীত ভাব ধারণ। সবচেয়ে বেশী পৌত্তলিকতা দেখলাম এস্কোরিয়ালের গীর্জ্জায়। রেনেসাঁস যুগের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ উদাহরণগুলির অন্যতম এই গীর্জ্জাটিতে মাটি ও পাথরে গড়া মেরীর প্রতিমা আছে; তার পিছনে বন ও ঝরণার চিত্র তৈরি করা আছে, মোমবাতি ও ধূপকাঠিতে সেখানে হিন্দু মন্দিরের আবহাওয়া পরিপূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে বিরাজ করছে। তবে তেত্রিশ কোটি দেবতার স্থান অধিকার ক'রে আছেন একা যিশুখ্রীষ্ট।

সমস্ত স্পেন জুড়ে লোকের মন ভ'রে রেখেছিল এক খ্রীষ্টের জীবনী। ক্যাথলিক ধর্ম্ম, তার বাহন রাজতন্ত্র ও স্পেন যে অবিচ্ছেদ্য ছিল তা বার-বার বুঝতে পারছি ও বিভিন্ন ভাবে প্রমাণ পাচ্ছি। দেশটার কি দুর্ভাগ্য! বড় বড় সম্রাট্ পুরাতন ও নূতন পৃথিবীর আহৃত বিপুল ঐশ্বর্য্য দেশের লোককে দরিদ্র, অনুন্নত রেখে মন্দিরের পর মন্দির নির্ম্মাণে ব্যয় ক'রে গিয়েছেন; দেশের সাধারণ লোককে ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত রেখে উপাসনার অনুষ্ঠান ও উপকরণ-গুলিকে সোনায় মুড়ে দিয়েছেন। যাজককে যোদ্ধার উপরে সম্মান দিয়ে, ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার দাবিকে আভিজাত্যের চেয়ে বড় ক'রে দেখে, পরাক্রমশালী দেশকে নির্বীর্য্য অলস ক'রে জনশক্তির হানি ক'রে গিয়েছেন। ধর্ম্মের নামে দেশের শ্রেষ্ঠ বণিক ও কৃষক ইহুদী ও মূরকে বিতাড়িত ক'রে, স্বাধীন চিন্তাশীলতার কণ্ঠরোধ ক'রে, দেশকে ডুবিয়ে দিয়ে শান্তি লাভ করেছেন। এই এস্কোরিয়ালের গীর্জ্জায় যে সুকুমার বালকরা আজ প্রভাতে মধুর উদাত্ত কণ্ঠে উপাসনা ক'রে হরিদ্বারের পুরোহিত-বালকদের মন্দির-চত্বরে সামগানের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে, এদের জীবন সমাজ ও দেশের দিক্ থেকে কতখানি সফল হচ্ছে?

কিন্তু দেশের একটা সৌভাগ্য এই ক্যাথলিক খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ভিতর থেকেই এসেছে। এত মন্দিরশিল্পের ও চিত্রকলার

প্রসার ও উৎকর্ষ স্পেনে ক্যাথলিক ধর্ম্ম ছাড়া আর কোন প্রভাবই সম্ভব ক'রে তুলতে পারত কিনা সন্দেহ। এখানে শিল্পের একাধারে বাহন ও বিষয়বস্তু হয়েছে ক্যাথলিক ধর্ম্ম, বিশেষ ক'রে খ্রীষ্টের জীবনী। রাজা ও অভিজাতবর্গ বহু সম্পত্তি দেবোত্তর করেছেন, বহু শিল্পীর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, কারণ তাঁদের মনে হয়েছে যে শিল্পের প্রসারের মধ্য দিয়ে হবে ধর্ম্মের প্রচার। অবশ্য ইউরোপে সব দেশেই শিল্প ও রসসৃষ্টির দিক্ দিয়ে ক্যাথলিকের দান বিপুল এবং প্রটেষ্টাণ্টের চেয়ে অনেক বেশী। শিল্পের দিক্ দিয়ে প্রটেষ্টাণ্ট সৃষ্টির চেয়ে সংহারই করেছে বেশী; বাখ (Bach) ছাড়া আর কোন প্রটেষ্টাণ্ট মন্দির-সঙ্গীতকারের নাম হঠাৎ মনেই আসে না।

কিন্তু এজন্য স্পেনকে কম দাম দিতে হয় নি। অন্য কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্র দেশে ও বিদেশে ধর্ম্মের প্রচার ও বিস্তারের জন্য এমন ভাবে নিজের সর্ব্বনাশ করে নি। ফ্রান্সও ক্যাথলিক হয়েছিল, কিন্তু এমন ভাবে নিজেকে রিক্ত করে নি; এ যেন সর্ব্বাঙ্গকে ক্লিষ্ট অপুষ্ট রেখে মুখের প্রসাধন। ইটালীও ক্যাথলিক ছিল ও ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে শিল্পের উন্নতি স্পেনের চেয়ে বোধ হয় কম করে নি, কিন্তু স্পেনের মত নিজেকে ক্যাথলিক ধর্ম্মের জন্য সব কিছু থেকে বঞ্চিত করে নি। স্পেন করেছে চূড়ান্ত; তাই তার শিল্পের বিষয়বস্তুর মধ্যে পৌরাণিকতা নেই, পেগানিজম্ নেই।

কি আশ্চর্য্যের বিষয়, যে-সম্রাট ধর্ম্মপ্রাণতার আতিশয্যে ও ধর্ম্মপ্রচারের প্রাবল্যে তরবারির মুখে ও জ্বলন্ত ইন্ধনের প্রয়োগে (Inquisition) ক্যাথলিক ধর্ম্ম রক্ষা ও বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর নিজের শেষ জীবন ছিল একেবারে সন্ন্যাসীর মত আড়ম্বরহীন ও দুর্ব্বলের মত অসহায়। এস্কোরিয়ালের গীর্জ্জা প্রাসাদের চেয়ে বেশী সমৃদ্ধ ও সুন্দর। নিয়তির পরিহাস! শেষ বয়সের অসুস্থতার জন্য প্রাসাদের যে-কক্ষের দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে বিছানা থেকে তাঁকে 'ম্যাস' উপাসনা দেখেই তৃপ্ত থাকতে হ'ত, সেই দীনাতিদীন ঘরটিই আজ এখানে সব চেয়ে বেশী আকর্ষণের জিনিষ।

ফিলিপ ছিলেন স্পেনের ঔরঙ্গজেব।

৫

মাদ্রিদে আবার ভারতবর্ষকে মনে পড়ল। পথে পথে বেলিনের সুকঠিন সুষ্ঠু শৃঙ্খলা নেই, লণ্ডনের গতির স্রোতে ভেসে যাওয়া নেই। ৩১শে ডিসেম্বরের রাত্রে পুয়েস্তা দেল সল অর্থাৎ সূর্য্যতোরণে শহরের কেন্দ্রস্থলে সকলেই নববর্ষকে যেভাবে অভিনন্দিত ক'রে নিল তার মধ্যে শুধু যে আনন্দের উল্লাসই আছে তা নয়, তার মধ্যে আছে মথুরার পথে দোলের দিনের মত হল্লা ও হুল্লোড়। রাস্তায় চলতে চলতে হিস্পানীরা বন্ধুর দল পাকিয়ে এমন ভাবে পথ জুড়ে গল্প করবে যেন তাদের খাসদখল প্রমাণ হয়ে গেছে। এ যেন হট্টগোলের শহর; লোকের চীৎকার ছাপিয়ে ওঠে অটোম্যাটিক ট্রাফিক সিগন্যালের আলোর সঙ্গে ঠং ঠং ক'রে ঘণ্টাধ্বনি। স্পেনের সুন্দর রাজধানীটি ছোট, কিন্তু তার ঘোষণা বেশ বড়।

বিদেশী পর্য্যটকের কাছে স্পেনের যে সম্মানের আসন পাওয়া উচিত ছিল তা সে পায় নি। তার কারণ প্রধানতঃ দেশের অনুন্নত অবস্থা, বাহিরে বিজ্ঞাপনের অভাব ও ভিতরে রাজনীতিক বিপ্লব। নতুবা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রশালা হিসাবে 'প্রাদো'র অঙ্গনে আরও বেশী চিত্ররসিকের সমাগম হ'ত। গোইয়া, গ্রেকো, ম্যুরিলো, ভেলাস্‌কেথ প্রভৃতির যথাযোগ্য প্রকাশ এখনও হয় নি ব'লে মনে করি। গোইয়ার রাজবংশের চিত্রগুলিতে যে অনুসন্ধিৎসু এমন কি ক্ষমাহীন চরিত্রের বিশ্লেষণ আছে তার তুলনা কোথায়? অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর চিরকর গ্যার্দি ভেনিসের অধঃপতনের যুগের চিত্র অঙ্কনে যে সিদ্ধহস্ততা দেখিয়েছেন, বৃহত্তর ক্ষেত্রে গোইয়া তার চেয়ে বেশী কৃতিত্বের সঙ্গে একটি গৌরবময় যুগের শেষ সন্ধ্যায় একটি অস্তমান রাজসভার চিত্র এঁকে গিয়েছেন। জগৎটা তাঁর কাছে যেন একটা প্রহসন; কখনও গম্ভীর বিদ্রূপে, কখনও সাবলীল সরলতায় তিনি সমসাময়িক স্পেনের অন্তর উন্মুক্ত ক'রে দেখিয়েছেন। খ্রীষ্ট-জীবনী হচ্ছে ম্যুরিলোর প্রধান বিষয়বস্তু এবং ধর্ম্মমূলক। এই বিষয়টিতে তিনি যে প্রাণ ও মানবে অনুভবের সঞ্চার করেছেন তা ইটালীর শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের মধ্যেও দুর্লভ। 'যিশু ও সেণ্ট জন,' 'ক্রন্দনশীল সেণ্ট পিটার', 'শিশু পরিত্রাতা' 'দুঃখিনী মাতা' এদের তুল

কোথায়? প্রাদোতে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করে পাশাপাশি সাজানো ছুটি ইম্যাকুলেট কন্‌সেপশুনের চিত্র; একটি কৃষ্ণকেশিনী, অপরটি কনককেশিনী। এ ছুটি গভীর ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করলে ম্যুরিলোর শিল্পের বিবর্ত্তনের ধারা কিছু বুঝতে পারা যায়। দ্বিতীয়টিতে একাধারে রিবেরার বর্ণচাতুর্য্য, ভ্যান ডাইকের মাধুর্য্য ও ভেলাস্‌কেথের বাস্তব প্রাণময়তার সমাবেশ ও সমন্বয় দেখতে পাই। ত্রস্তা ব্যাকুলচিত্তা কুমারীর মধ্যে স্বর্গের পারিপার্শ্বিকতা সত্ত্বেও দেবীসুলভ রূপ নয়, আদর্শের প্রভাব নয়, মানবের অনুভবই বেশী আত্মপ্রকাশ করেছে। তা ছাড়া প্রাদোতে ম্যুরিলোর চিত্রগুলিতে জনতার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করার যে কৌশল দেখলাম তা পৃথিবীতে অতুলনীয় ব'লে আজকাল স্বীকৃত হয়েছে।

ক্রীটের সন্তান এল্ গ্রেকোর শুধু একটি মাত্র চিত্র—'কাউণ্ট অগার্থের কবর'—এতে হিস্পানী জাতীয় চরিত্রে মাধুরী ও চঞ্চলতা, ছলনশীলতা ও তীব্র অনুভূতির যে সবল প্রকাশ পাই তা কোন স্প্যানিশ চিত্রকরও দেখিয়েছেন কি না সন্দেহ।

আশ্চর্য্যের বিষয়, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী ভেলাস্‌কেথের (১৫৯৯-১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ) নাম উনবিংশ শতাব্দীর আগে খুব কম বিদেশীই জানত, অথচ তার ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের ছবিটি খ্রীষ্ট-সম্বন্ধীয় সব ছবির মধ্যে নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ। খ্রীষ্ট-জীবনীর চিত্রচয়নিকায় এটি না থাকলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তার পর, 'লাস মেনিনাস' অথবা 'দি ফ্যামিলি' নামক চিত্রটি স্বাভাবিক প্রতিকৃতির জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম চিত্র ব'লে স্বীকৃত হয়েছে। এতে যে সম্ভ্রম, শক্তি ও মাধুর্য্যের পরিচয় পাই তা শিল্পীর নিজের জীবনের চিন্তা-লেশহীন শান্তির আভাস দেয়। সার্ টমাস লরেন্সের কথা মনে পড়ে—যা আঁকতে চাওয়া হয়েছিল তার এমন নিখুঁত সাফল্য এতে আছে যে এই ছবিকে আর্ট অব ফিলজফি বলা যায়। লুকা জ্যোর্দ্দানো এর যে প্রশংসা করেছিলেন তার অনুবাদ করা চলে না—এই ছবিটি হচ্ছে থিওলজী অব পেন্টিং।

স্পেন অ-ক্যাথলিক ধর্ম্মের উপর যত অত্যাচার করেছে, সৌভাগ্যের বিষয় অ-ক্যাথলিক শিল্পের উপর তত করে নি। সেই জন্য সালামাঙ্কা ও সেভিলের গীর্জ্জার মিশ্র কারুকার্য্যের চমৎকার মনোহারিত্ব অক্ষুণ্ণ আছে—যার আবেদন শিল্পের ছাত্রের চেয়ে রসিকের কাছে বেশী। সেই জন্য সেভিলের 'আলকাথার' রাজপ্রাসাদও এত সুন্দর মনে হয়। কিন্তু স্পেনের খ্রীষ্টধর্ম্ম কর্দোভার 'মেথকিতা'কে অক্ষুণ্ণ সৌন্দর্য্যে থাকতে দেয় নি। আবদার রহমানের এই অনুপম মসজিদটি বিশালতায় রোমের সেন্ট পিটার্সের পরেই ও সেভিলের গীর্জ্জার সমান। অপরূপ শ্বেতলোহিত খিলানের এই মসজিদের ভিতরেই একটি উচ্চ বেদী ও অন্যান্য খ্রীষ্টান স্তম্ভ বসান হয়েছে। সেজন্য সম্রাট্ পঞ্চম চার্লস্ ভর্ৎসনা ক'রে বলেন, "তোমরা এখানে যা নির্ম্মাণ করেছ তা অন্য যে-কোন জায়গায় করতে পারতে; এবং পৃথিবীতে যা অতুলনীয় ছিল তা তোমরা ধ্বংস করেছ।" ৪৭০০ সুরভি তৈলের দীপে আলোকিত স্বর্ণ ও স্ফটিকের স্তম্ভময় মেহ্‌রাবের নিকটে উনিশটি তোরণ দিয়ে মূররা যখন উপাসনা করতে আসতেন, তখন সে দৃশ্য কি হ'ত তা আজ শুধু কল্পনাই করা যায়।

৬

স্পেন হচ্ছে উৎসবের দেশ। এর পথে ঘাটে বর্ণ-বৈচিত্র্য, মনোভাবের বিকাশ ও অন্তরের বহির্মুখী উল্লাস। সেভিলের রাজপথের প্রাণবান্ ও বৈচিত্র্যময় দৃশ্যের বহু চিত্র ও বর্ণনা আমরা পাই। এমন কি এই বিশেষত্ব গীতিনাট্যের সুরেও ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। মোৎসার্টের 'ফিগারো' ও 'ডন জোভান্নি', রস্‌সিনির 'বারবিয়ের দি সিভিল্যা' ও বিৎসের 'কারমেন' গীতিনাট্যের বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত নাগরিক ও গ্রামবাসীদের পৃথিবীর দ্বিতীয় বিশাল গীর্জ্জাটির চিত্রপটের সামনে এখনও দেখতে পাওয়া যাবে। মাদ্রিদের সমাজের সুকঠিন নিয়মনিষ্ঠা, বার্সিলোনা ও ভ্যালেন্সিয়ার অবসরহীন বণিক্‌সভ্যতা ও বিপ্লবের সূচনাকেও ছাপিয়ে ওঠে হিস্পানীদের উৎসব-প্রবণতা। বিশেষ ক'রে সেভিলে যে গ্রামবাসীরা ষাঁড়ের লড়াই বা মেলা বা তামাসা দেখতে আসে তারা বিচিত্র প্রাচীন প্রথা, উজ্জ্বল বর্ণসমৃদ্ধ পরিচ্ছদ ও রসিকতা এবং মার্জ্জিত ব্যবহারে সূর্য্যকরোজ্জ্বল ঐতিহাসিক আন্দালুসিয়াকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছে। সেভিলের মত এত উৎসব আর কোথাও হয় না; বিশেষতঃ ঈষ্টারের সময়। প্রাচীন সেভিলের আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ গলিপথে মূরীয় ছাপ এখনও দেখতে পাওয়া

যায় ; সাধারণ হোটেলের ভোজনশালাটিও মূরীয় কারুকার্য্যে সজ্জিত থাকবে। সে গলিপথের ভিতর দিয়েই যে-সব ট্রাম যাচ্ছে, তার পাশেই যে বিস্তৃত সুন্দর 'পাশিও দি লস্ দিলিথিয়াস্' নামে 'বুলভার' রয়েছে সেগুলি যেন অলীক। সেভিলের আরব বণিক্ কৃষ্ণ পোষাকাবৃত সন্ন্যাসী ও উৎফুল্ল প্রশংসাগর্ব্বিত 'মাতাদোর'দের সঙ্গে সেগুলি খাপ খায় না একটুও।

গ্রানাডার 'আলহাম্ব্রা'তেও ঠিক এমনি একটা আভাস পাই। ঐশ্বর্য্য ও কারুকার্য্যে আলহাম্ব্রা প্রাসাদ শাহ্‌জহানের আগ্রা-দুর্গের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এ আরও বেশী প্রাচীন ; কালের আঙুলের ছাপ একে আরও যেন বেশী অনস্বভূত আকর্ষণ দিয়েছে ; আর জেনারিলিফে উদ্যানের মত কোন উদ্যান আগ্রা-দুর্গে নেই। অনবদ্য মূরীশ কারুকার্য্য-খচিত এই প্রাসাদটি যে পাহাড়ের উপর তা যেন এই স্পেনের মধ্যে নয় ; এর চারি দিকের অলিন্দ থেকে যে ধূসর দৃশ্য দেখা যায়, "নিত্য তুষারা" যে সিয়েরা নেভাদা চিরকালের প্রহরীর মত সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে, আর পর্ব্বতগুহায় যে জিপ্সিরা বাস করে তারাই যেন এখানকার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সত্য ; আর বাকী সবই অলীক। সৌভাগ্যের বিষয়, স্বল্পালোকিত প্রস্তরবন্ধুর গিরিপথ দিয়ে এখানে উঠে আসতে হয় ; বিংশ শতাব্দীর মোটর গাড়ীর রূঢ় আত্মঘোষণা আলহাম্ব্রার সান্ধ্য তন্দ্রাটি ভঙ্গ করে না।

এদের প্রাত্যহিক জীবনে একটা চিন্তাহীন উল্লাস ও আন্তরিক উচ্ছ্বাস আছে যা দেখে স্পেনের বিপ্লববার্তা ও সংঘর্ষকে সত্য ব'লে মনে করা কঠিন। বার্সিলোনার 'রাম্ব্লা' রাজপথে 'প্লেন' গাছের ছায়ায় বন্ধু-বান্ধবীর দল হাস্যমুখে কৌতুক-পরিহাসের মধ্যে যেরূপে বেড়ায় তাতে দৈনিক খবরের কাগজের বার্সিলোনা বলে মনে হবে না। প্যারিসের শাজেলিজে রাজপথের সভ্যতার কৃত্রিমতা এখানে নেই। এরা এত সহজভাবে বিদেশীকে বন্ধু ক'রে নিল যেন এই রাজপথে ও ভ্যালেন্সিয়ার উৎসবের মেলা 'ফেরিয়া'তে কোন প্রভেদ নেই। পথে পথে রৌদ্রের আভায় সুন্দর কমলাকুঞ্জ অন্তরের দ্বার মুক্ত ক'রে দিল, আর স্পেনের আন্তরিকতা অভ্যর্থনায় পরকে আপন ক'রে নিল। এমনই আন্তরিকতার সঙ্গে প্রাদোতে একটি শিল্পী তার বহু যত্নের ইম্যাকুলেট কনসেপ্‌শনের প্রতিলিপির জন্য একটি অজ্ঞাত বিদেশীর কবিতা গ্রহণ করেছিল :—

তোমরা আঁকিয়া যাও ক্ষণিকের ভাবনা বিকাশ
অসীমের একটু কণিকা,
আমরা রাখিয়া যাই চিরদিন হৃদয়-উচ্ছ্বাস
প্রাণে পাই সুন্দরের লিখা ;
কত কথা কয়ে ওঠে তুলিকার নীরব ভাষায়
তোমাদের কল্পনার ছায়া,
আমরাও দেখি তাই বার-বার আনন্দে আশায়
যে স্বপ্ন লভেছে হেথা কায়া।

নারী ও পূর্ণতা

শ্রীমৃগাঙ্কমৌলি বসু

তোমার বারতা নারী,—নির্ঝরের মুক্তধারা সম
ধৌত করি ভাসাইল চিত্তের শূন্যতা গ্লানি মম,
চঞ্চল প্রবাহে তার টুটে রুদ্ধ সংশয়ের দ্বার
মিলাইল কি আবেগে আত্মারে বিশ্বেরে একাকার !

চলেছিনু রিক্তক্লিষ্ট দুর্গমের কি অজানা টানে
কণ্টক-আকীর্ণ পথে, শূন্যমনা, নিরুদ্দেশ পানে
উপেক্ষিয়া যত মোহ—জগতের নিত্য ছলনাতে
সুন্দরী এ মায়াময়ী ধরিত্রীরে ছাড়িয়া পশ্চাতে।

সুর থেমে গিয়েছিল জীবনের, কে জানিত কবে
চিরজনমের দ্বন্দ্ব মুহূর্ত্তের মাঝে শান্ত হবে,
বিশ্বেরে ভুলিতে গেনু—মায়াহীন চাহিনু নির্ব্বাণ,
সহসা কাহার বাণী শুনাইল ব্যথাতুরে গান !

সুধায় ভরিল বিশ্ব,—অমৃতের তৃপ্তি দিল আনি
সর্ব্বাঙ্গে শিহরে প্রাণ, জীবনেরে ধন্য বলি মানি,
উদিল কুয়াশাজাল ছিন্ন করি প্রভাতের রবি
নির্জ্জন প্রান্তরমাঝে দেখা দিল দীপ্ত স্বর্গচ্ছবি !

মায়ারে ঘেরিয়া প্রেম সুপ্তিমাঝে করে জাগরণ
অনিত্যের মাঝে নিত্য, সুন্দরের তাহে আগমন।
বিশ্বের নন্দিনী তুমি প্রিয়জনে কর আনন্দিত,
স্নেহের নিষেকে তব শ্রান্তি মোর অমৃত-পূরিত ॥

জলাতঙ্ক

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

ভিক্ষুর বউ বড়ই বিপদে পড়িল। সেই কবে স্বামীর জ্বর ধরিয়াছে আজও সারিবার নাম নাই! কি যে হইবে কে জানে! আজ দু-বছরের মধ্যে দুটি মাস একবার যা ভাল ছিল তার পর ঠিক একই ভাবে চলিতেছে। ভুগিয়া ভুগিয়া ভিক্ষুর শরীরে আর কিছুই নাই! কয়েক মুহূর্ত্ত তাকাইয়া থাকিলে কয়খানি হাড় তাহাও বুঝি গুণিয়া বলা যায়। ক্ষেত-খামার আর সে দুটি বছর দেখিতে পারে নাই। জমি-জমা তো যায়-যায়। কিছু আর ফলানো হয় না তাতে। মহাজন এবার হয়ত নিলাম ডাকিবে। ডাকুক, হয়ত তাহাই কপালে আছে!···কিন্তু একি আপদ হইল। এই জ্বরে জ্বরে সে শেষ হইয়া যাইবে নাকি?

ভিক্ষুর বউ কম বিপদে পড়ে নাই! জ্বর হইয়া অবধি তার এমনি ঘণ্টায় ঘণ্টায় জল খাইবার দাবি। জল না পাইলে চীৎকার করিয়া তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তোলে। বউ যত পারে জল আনিয়া দেয়, কিন্তু তাহা খাইয়া তাহার তৃপ্তি হয় না। অথচ সারা গ্রামে কোথাও আর ভাল জল পাইবার জো নাই! রৌদ্রদেবতা বৈশাখের খর রৌদ্রে সমস্তই শুষিয়া লইয়াছেন। যা দু-চারটি পানা-পচা ডোবা আছে সেখানে যা একটু জল পাওয়া যায়। কিন্তু এ-জল মুখে দিবার নয়! তাহার উপর ম্যালেরিয়ায়-ভোগা তিক্ত জিহ্বায় এ-জল তো বিষবৎ লাগিবারই কথা!

ভিক্ষুর বউ কিছুতেই স্বামীকে একথা বুঝাইয়া উঠিতে পারে না। গ্রাম হইতে দু-তিন ক্রোশ দূরে সেই যে একটি সরকারী টিউবওয়েল আছে সেটি ছাড়া আর গতি নাই। কিন্তু একলা ঘরে রুগী ফেলিয়া অত দূরে গিয়া কি রোজ জল আনা যায়?

কিন্তু তবুও ভিক্ষুর জ্বরের ঝোঁকে জল চাই! জল! মিঠে জল!

ভিক্ষুর বউ কি করিবে! পাড়াপড়শীর এক জনের বাড়ী গেল। কিন্তু কিছু সুবিধা হইল না। তাহাদেরও নিকট সেই পচা পুকুরের পাকগন্ধ জল আছে। তারা বলিল সরকারী পাতাল-জল লইয়া আসিতে। কিন্তু কি করিয়া হয়! সেই তো তিন ক্রোশ দূরে সরকারী টিউবওয়েল।

কি করিবে,—শেষকালে ভিক্ষুর বউ আর উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বামীর গায়ে কাঁথাটি ঢাকা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ছোট মেয়েটিকে রাখিয়া গেল বসিয়া থাকিবার জন্য।

বৈশাখের প্রখর রৌদ্র চারি দিকে খাঁ খাঁ করিতেছে। ভিক্ষুর বউ কলসীটি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। পথ আগুনের মত তাতিয়া উঠিয়াছে। পা পাতিয়া চলা কষ্টকর। তবুও ভিক্ষুর বউ চলিতে লাগিল। যত রাজ্যের ভাবনা আসিয়া তার মাথায় ভাঙিয়া পড়িল। এই ভিক্ষুর এক দিন কি না ছিল। জমিজমা লাঙ্গল বলদ কোন কিছুরই অভাব ছিল না। সেই সকালবেলা উঠিয়াই সে মাঠে চলিয়া যাইত। আর একবার দুপুরবেলা ফিরিয়া আসিয়া কিছু খাইয়াই বাহির হইত। সেই সন্ধ্যার সময় ফিরিত। কোন-কোন দিন আবার সে দুপুরবেলা ফিরিত না। বউ নিজেই মাঠে গিয়া তার আহার্য্য দিয়া আসিত। কি অসীম কার্য্য করিবার শক্তি ছিল তার। আর এখন কি হইয়াছে। অবশ্য মরসুমের সময়টা এইরূপ হইত। তাহা না হইলে অন্য সময়টা তার অবকাশ থাকিত। সেই সময় কোন রকমে চলিয়া যাইত। কিন্তু কয় বৎসর হইল এইরূপ হইয়াছে। নদীমাতৃক বাংলা দেশ, কিন্তু এখন আর নদী নাই। বহু দিনের পুরাতন শীর্ণ নদীটি আজ বৎসরের পর বৎসর পলি পড়িয়া পড়িয়া মজিয়া গিয়াছে। তাহাকে আর বাঁচাইবার উপায় নাই। তাই দেশের চাষ-বাসও গিয়াছে নষ্ট হইয়া। শুধু শুকনো মাটিতে লাঙ্গলের ফলার জোরে আর ফসল হয় না। তাই বছরের পর বছর আফলা জমির একটু একটু করিয়া মহাজনের হাতে পড়িয়া সবই প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে।

ভিক্ষুর বউ চলিতে লাগিল। অভিভূতের ন্যায় একান্ত ভাবে পথ চলিতে লাগিল। ক্ষেতের আলের উপর ঘাসগুলি সমস্ত জ্বলিয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে। এক পাশে যেখানে কাদাজলের উপর নলখাগড়াগুলি হাওয়ায় দুলিত, সেখানটি একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। কাঁচা খাগড়াগুলি রোদে পুড়িয়া লাল হইয়া গিয়াছে। কাটা ধানের শুক্না গোড়াগুলি ক্ষেতের উপর উঁচু হইয়া রহিয়াছে। কাহারা আবার তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়া গিয়াছে। মাঠ দিয়া বিশ্রী গন্ধ বাহির করিয়া বিসর্পিল ধোঁয়া উঠিতেছে।

ভিক্ষুর বউয়ের মনে হইল মেয়েটা থাকিতে পারিবে ত! অতটুকু মেয়ে অতবড় রুগী সামলাইবার কথা নয়! হয়ত জ্বরের ঝোঁকে ভিক্ষু চীৎকার করিয়া উঠিবে—জল চাহিয়া বসিবে! মেয়েটি ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিবে। কিন্তু কি করিবে, কোন উপায় নাই। আজ যেমন করিয়াই হউক তাহাকে জল আনিতে হইবে।

পথে চলিতে চলিতে নবদেব ব্যাপারীর সহিত দেখা।

নবদেব তাহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—কি গো ভিক্ষে কেমন আছে?

বউ সবিস্তারে তাহাকে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া সে বলিল—বলিস নি আর বলিস নি বউ, গেরামে থেকে লাভ ত ভারী! গত সনের ত এক পহাও আদায় লেই—এ সনহালটেই যে কিছু হবে তা ত মনে হয় না। গেরামে জল লেই, ডাক্তারখানা লেই। হাসপাতাল লেই। কি লিয়ে থাকবো? কিন্তু দেখ্ ত ঐ পাশে ইছেনপুর গ্রামটে? ইস্কুল, হাসপাতাল, নলকূপ কোন্‌টে লেই?

নবদেব ব্যাপারী কোন রকমে কথা কয়টি শেষ করিয়া আবার হন হন করিয়া চলিতে লাগিল। রৌদ্রে দাঁড়াইয়া কথা বলিবার অবকাশ থাকিলেও সহ্যগুণ কোথায়?

ভিক্ষুর বউ চলিতে লাগিল। না না, গ্রাম তাকে ছাড়িতেই হইবে। এ গ্রামে থাকিয়া আর কোন লাভ নাই। বহুদিন ধরিয়াই এমনি জলকষ্ট চলিতেছে। মাঝে দু-দিন বেশ জোরে একবার করিয়া বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল তাহাতে গ্রামের সকলের ভারি সুবিধা হইয়া গিয়াছিল। প্রথম এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলে টিনের চালাগুলি হইতে যে জল গড়াইয়া পড়ে সবাই তাহা একটি কাপড়ে ছাঁকিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখে, সেই জল পানীয় হিসাবে চলে। এমনি করিয়া সারা গ্রামে জল সংগ্রহ হয়।

ভিক্ষুর বউয়ের একটা কথা বড়ই মনে ধরিল—নবদেব ব্যাপারীর কথাটা। আচ্ছা সত্যই যদি তাহারা ইছেনপুর গ্রামে চলিয়া যায়? সেখানে ত সব রকম সুবিধা আছে যদি ভিক্ষু একটু সারিয়া উঠে তাহা হইলে তাহারা সেখানে চলিয়া যাইবে। সে সুখনের মা'র কাছে শুনিয়াছে সে ওখানকার চটকলে কাজ করে। যদি তাহাকে বলিয়া-কহিয়া একটা কাজ জোগাড় করিতে পারে ত তাহাদের বেশ চলিয়া যাইবে। সুখনের মা পাঁচ টাকা মাইনে পায়। সে কি কম কথা? হয়ত ভিক্ষু প্রথমে বউকে কলে কাজ করিতে পাঠাইবে না, আপত্তি করিবে। মিলের আবহাওয়া নাকি বড় খারাপ। কিন্তু তার বিশ্বাস আছে সে তাকে কোন রকমে বলিয়া-কহিয়া রাজী করাইবে। সে যে চিরকালই কলে কাজ করিতে চায়—তা নয়। মাত্র কিছু দিন কাজ করিবে। তার পর ভিক্ষু সারিয়া উঠিলে সে কাজ ছাড়িয়া দিবে। তা ছাড়া শুনিয়াছে কলে কাজ করিলে অনেক সময় থাকিবার স্থানও পাওয়া যায়। তাই যদি হয়? গ্রামে থাকিয়া ত আর কোন লাভ নাই। সকল চাষীর মুখেই এক কথা—চাষ ক'রে আর কারুর পড়তা পোষায় না। এই সুবিশাল, দিগন্তপ্রসারী জমিগুলিতে যদি দিনের পর দিন অজস্র শ্রম এবং অর্থব্যয় করিয়া কিছুই উসুল না-হয় ত কি হইবে?…

হঠাৎ ভিক্ষুর বউয়ের পায়ে কি একটা ফুটিয়া গেল। বাবলা-কাঁটা না কি? সে আবার মুখ বিকৃত করিয়া সেটি পা হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া চলিতে লাগিল।

ছেলেবেলাকার কথা তার মনে পড়িল। কত ছোট তখন তার বিবাহ হইয়াছিল। তার বাবা ছিল কর্ম্মকার। সে তার বাবার কামারশালায় বসিয়া থাকিত। তার বাপ জ্বলন্ত অঙ্গার হইতে লোহা বাহির করিয়া পিটিত আর তার সহিত গল্প করিত। তাদের কামারশালায় কত লোক আসিত যাইত। এক দিন হঠাৎ তার বাবার এক পুরাতন বন্ধু কোথা হইতে এক সম্বন্ধ আনিয়া হাজির

সেই লোকটি তার বাবাকে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল—তার পরিচিত একটি লোক অর্থাৎ ভিক্ষুর সহিত তার বিবাহ দিতে হইবে। এমনি ভাবে সত্য সত্যই এক দিন তার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল—তাহার পর বহু বৎসর ধরিয়া তাহাদের অবিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে।

দেখিতে দেখিতে মাঠের পথ ফুরাইয়া আসিল। কিছু দূরেই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের লাল রঙের বাড়ী দেখা যাইতে লাগিল। পথেই একটি মেয়ের সহিত দেখা—সেও একটি কলসী লইয়া আসিতেছে জল লইয়া যাইবার জন্য। আর একটু অগ্রসর হইতে দেখা গেল আরও দু-এক জন তাদেরই মত জল লইবার জন্য কলসী লইয়া আসিতেছে।

যখন বউ আপিসের ফটকের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল তখন সে দেখিল সেখানে রীতিমত এক মেলা বসিয়া গিয়াছে। কত যে নরনারী আসিয়া সেই উঠানটিতে ভিড় করিয়াছে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। ভিক্ষুর বউ অবাক হইয়া গেল।

উঠানের এক দিকে একটি উঁচু বাঁধান স্থানে নলকূপটি। নলকূপটির সহিত একটি প্রকাণ্ড চাকা লাগান। চাকাটিতে একটি চাবিতালা ঝোলান আছে। কেহ জল লইতেছে না। বউ একটু ভয় খাইয়া গেল। নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটিয়াছে !···

এক জনের নিকট সে ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিল—সরকার নলকূপ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। দারুণ গ্রীষ্মে নাকি নলকূপ দিয়া আর জল উঠিতেছে না। যা উঠিতেছে তা ঘোলা পাঁকগন্ধ জল—তা খাইলে গ্রামের সবার স্বাস্থ্যহানি হইবে, এই ভয়ে সরকার নলকূপ বন্ধ রাখিয়াছেন। আজ আর কাহাকেও জল দেওয়া হইবে না।

কথাটা ভিক্ষুর বউয়ের পক্ষে নিতান্ত মর্ম্মান্তিক। তাহা হইলে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া যে সে আসিল তাহা একদম বৃথা হইয়া যাইবে ? সে গিয়া স্বামীকে কি কৈফিয়ৎ দিবে ? সে যে জল আনিতে গিয়া জল পায় নাই একথা শুনিলেই তার স্বামী দুঃখে মরিয়া যাইবে।

ভিক্ষুর বউয়ের কান্না আসিতে লাগিল।

মনের তার যখন এই শোচনীয় অবস্থা এমন সময় এক জন গ্রামের চেনা লোকের সহিত তার দেখা হইয়া গেল। এ-লোকটি তাদের গ্রামের হরে খ্যাকরার ছেলে নন্দ। নন্দকে সে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। নন্দ কথাটা শুনিয়া একটু হাসিল, তার পর বলিল—ও-সব বাজে। দুটো পয়সা খয়রাৎ করতে পার ত আমি এখুনি ব্যবস্থা ক'রে দিই। নলকূপের জল যদিও এখন খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু তার আগে আমরা আপিসের ভেতর ভাল জল তুলে রেখে দিয়েছি। দুটি পয়সা মাশুল দিলে এনে দিতে পারি—সরকারের হুকুম যাদের বিশেষ দরকার তারা পাবে।

বউ তার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। সে অনেক কষ্টে বাক্স উজাড় করিয়া মাত্র দুটি পয়সা আঁচলে বাঁধিয়া আনিয়াছে তাহা দিয়া যাইতে হইবে ! কিন্তু কি করিবে সে, জল তার চাই ; জল না পাইলে তার স্বামী বাঁচিবে না। তাই একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বহুকষ্টে সে আঁচল হইতে পয়সা দুটি খুলিয়া তাহার হাতে দিল।

নন্দ পয়সা দুটি লইয়া তাকে সেইখানে এক জায়গায় বসিয়া থাকিতে বলিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—কিন্তু ব'লে দিচ্ছি দু-তিন ঘটীর বেশী হবে না—বড্ড জলের টান কিনা !

ভিক্ষুর বউ সেখানে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর নন্দ কলসী লইয়া আসিয়া তাহাকে দিল, বলিল—অনেক জল হয়েছে, এবার বেরিয়ে পড়—যেতেও ত হবে অনেকখানি।

ভিক্ষুর বউ কলসীটির দিকে তাকাইয়া দেখিল, প্রায় আধ কলসীটাক জল।—যাক, এই দুর্দিনে ইহাই যথেষ্ট মনে করিতে হইবে।

বউ আবার বাহির হইয়া পড়িল।—আবার সেই রুক্ষ বিবর্ণ পথরেখাটি তার দিকে ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। চারি দিকে আবার রৌদ্রের অসহ্য উত্তাপ—উষ্ণ বাতাসের দাপাদাপি। আকাশ, বাতাস, পথ, প্রান্তর সবাই যেন তার মুখের দিকে তৃষ্ণার্ত্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। সবাই যেন জিহ্বা বাড়াইয়া তাহার কলসী হইতে জল শুষিয়া লইতে চায়। এই অগ্নির রাজ্যে, তৃষ্ণার রাজ্যে, শোষণের

রাজ্যে কোন রকমে সে আপনাকে বাঁচাইয়া চলিতে লাগিল।

সম্মুখে সোজা পথ চলিয়া গিয়াছে। এমনি ভাবে চলিয়া গিয়াছে তার ভবিষ্যৎ—নিঃসীম নিরাশার ভিতর দিয়া। বউ ভাবিতে থাকে যদি তার স্বামী না বাঁচে। যদি এই জল লইয়া গিয়া পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই তাহার স্বামী মারা যায়! না না! এ-কথা ভাবিতে গিয়া তাহার মাথা যেন কেমন ঘুরিয়া গেল—পা ভার হইয়া পড়িল। এ-কথা ভাবিয়া লাভ নাই। যেমন করিয়াই হউক তাহাকে এ-জল লইয়া যাইতে হইবে। ক্ষেতের আলের উপর দিয়া বউ চলিতেছিল। আলগুলির মাঝে মাঝে এক এক স্থানে চেরা আছে। এক ক্ষেত হইতে আর এক ক্ষেতে জল সেচিয়া দিবার জন্য এইরূপ করা থাকে। বর্ষাকালে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া যাইবার পর উঁচু ক্ষেতগুলি হইতে নীচু ক্ষেতগুলিতে এই ফাটলগুলি দিয়া কেমন জল গিয়া থাকে, কেমন একটা ঝর ঝর করিয়া শব্দ হয়, তার শুনিতে ভারি ভাল লাগে। আর আজ এখানকার দগ্ধ বিবর্ণতা দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়—কিছুতেই মনে হয় না এই স্থানের এরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

কিছুক্ষণ যাইতে যাইতে মাঠের মাঝখানে ছায়া আসিয়া পড়িল। মাথার উপর দিয়া মস্তবড় একটা কাল মেঘ চলিয়া যাইতেছিল, তারই ছায়া পড়িয়াছে। ভিক্ষুর বউ আরও হাঁটিয়া চলিল। একটু যাইবার পর হঠাৎ যেন তাহার মাথা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল—জল জল করিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার চোখে যেন জলের স্বপ্ন লাগিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, মাঠ বাহিয়া জলের ধারা নামিয়াছে—আলের ফাঁকগুলি দিয়া জলের প্রবাহ সর্ সর্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সে উপলব্ধি করিতে পারিল জলকণা আসিয়া তাহার গায়ে পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহার গা ভিজিয়া গেল। জল—যে-জলের জন্য সমস্ত গ্রাম আজ ব্যাকুল, সেই জল আসিয়া তাহাকে ভিজাইয়া দিয়া গিয়াছে। বউ মাথার উপরে তাকাইয়া দেখিল, কাল-বৈশাখীর ঝড় সুরু হইয়াছে, তাহারই সহিত অঝোর ধারায় বৃষ্টি নামিয়াছে। যাক্, তাহা হইলে সত্যসত্যই ঈশ্বর মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন—এইবার অন্ততঃ দু-চার দিনের জন্যও আর জলের কথা ভাবিতে হইবে না। পরিতৃপ্তিতে তাহার দেহ-মন ভরিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পর বৃষ্টি থামিয়া গেল। আকাশের মেঘ কিন্তু কাটিল না। পাড়ার নিকটে আসিতে আসিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল।

পথের বাঁ-দিকে খেজুর গাছটির পাশ হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া হরি বোষ্টমের বউ তাহাকে বলিল—কে, ভিক্ষুর বউ? জল আনতে গিছলি? এত দেরি ক'রে বাড়ী ফেরে?

সত্যই! বউ বড় লজ্জায় পড়িল। সে কখন্ বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে। ঘরে অত বড় রুগী আছে তার খেয়ালই নাই। সে তাড়াতাড়ি পা ফেলিয়া চলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পড়িতে সে দেখিল কে কয় জন যেন তাহার দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তারা তাহাকে দেখিয়া আপনাদের মধ্যে কি বলিল; বউ দূর হইতে তাহা বুঝিতে পারিল না। কিন্তু ঘরের দরজার নিকটে আসিয়াই সে থামিয়া গেল। ভিক্ষু বিছানার উপর চক্ষু স্থির করিয়া পড়িয়া আছে, আর মেয়েটি তার বুকের উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

বউ থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল; কাঁখের কলসীটি পড়িয়া গিয়া ভাঙিয়া গেল, চারি দিকে জলে থৈ থৈ করিতে লাগিল—সে সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

* * *

সেই রাত্রে আকাশ ঘোর করিয়া বাদল নামিল।

ব্রহ্মদেশে ও আরাকানে বঙ্গ-সংস্কৃতি

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলার সহিত ব্রহ্মদেশের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য এবং ধর্ম্ম প্রভৃতিতে পরস্পর যোগাযোগের কথা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের অনুরূপ, পেগানের একতল ও দ্বিতল মন্দিরাবলী, তৎসমুদয়ের ফ্রেস্‌কো-চিত্রাঙ্কন এবং আরাকান-রাজসভায় প্রচলিত প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

পেগানে স্ফীত ও সমগোলাকার স্তূপ কিংবা আনন্দ-মন্দিরের মত চতুর্ভুজ মন্দিরগুলির পরে বর্ত্তমান দক্ষিণেশ্বরের মত একতল ও দ্বিতল মন্দিরগুলিই চোখে পড়িয়া থাকে। এই ধরণের মন্দিরগুলি সাধারণতঃ দ্বাদশ শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত এবং একটি বিশিষ্ট পদ্ধতির ফ্রেস্কো-চিত্র দ্বারা অলঙ্কৃত। মন্দিরগুলির বিশেষত্ব এই যে ইহার কোনটিই পেগানের চতুর্ভুজ মন্দিরের মত বৃহদাকার নহে, প্রায় বর্গক্ষেত্রের আকৃতিতে নির্ম্মিত এবং এই ধরণের প্রায় সব মন্দিরেই একই রূপ ফ্রেস্কো-চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্দিরগুলি যে দক্ষিণ-বঙ্গের স্থাপত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল তাহা উহাদের মাথার চূড়া, আকৃতি, আভ্যন্তরীণ খিলান-করা ছাদ এবং প্রবেশদ্বার প্রভৃতি দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়। বঙ্গদেশের এই ধরণের মন্দিরে প্রায়ই খিড়কীর দ্বার দিয়া ভোগ আনিবার জন্য মন্দিরের মধ্যে এক পার্শ্বে একটি কুঠরি থাকে। পেগানের অধিকাংশ মন্দিরেই ঐ ধরণের একটি করিয়া ক্ষুদ্র ভাঁড়ার-কুঠরি আছে। পশ্চিম- ও দক্ষিণ- বঙ্গে এই ধরণের মন্দিরগুলিই অনেক সময় দ্বিতল করা হইত। বিষ্ণুপুর এবং দক্ষিণ-বঙ্গে এইরূপ কয়েকটি মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। পেগানেও এইরূপ দশ-বারটি দ্বিতল মন্দির আছে। পেগানে অন্য ধরণের মন্দির থাকিলেও, আশ্চর্য্যের বিষয়, এই মন্দিরগুলিরই সংখ্যা বেশী এবং ইহাদের ভিতরের ফ্রেস্কো-চিত্র অন্যান্য মন্দিরের ফ্রেস্কো-চিত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মনে হয় যেন একই শিল্পীর তুলিকা-স্পর্শে প্রত্যেকটি মন্দির চিত্রিত হইয়াছিল। মন্দিরগুলির মাথার উপরে ব্রহ্মদেশীয় 'তি'গুলি চূড়ার উপরে উনানের মত তিনটি কোণের মধ্যে অবস্থিত। দেখিলে মনে হয় যে ইহা মন্দিরের মূল অংশের সহিত টানাভাবে গাঁথা হয় নাই নতুবা প্রায় অধিকাংশ মন্দিরের 'তি' সমানভাবে পড়িয়া যাইত না।

এই জাতীয় দুই-একটি মন্দির একটু বৃহদাকার ও অন্য ধরণের হইলেও সাধারণতঃ প্রায় সবগুলিই দক্ষিণ-বঙ্গের মন্দিরের মতই ক্ষুদ্র। এমন কি, ফার্গুসন তাঁহার 'ভারতীয় ও প্রাচ্য স্থাপত্যের ইতিহাস' পুস্তকের ৩৩৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বের দক্ষিণ-বঙ্গের স্থাপত্য-পদ্ধতিই পেগু ও প্রোমে উপনীত হইয়াছিল। উক্ত মন্দিরগুলির ফ্রেস্কো-চিত্রগুলি বিচার করিলেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে প্রথমে বঙ্গের পাল-শিল্পের সহিত পরিচয় প্রয়োজন।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে পাল-রাজাদের শেষ সময় পর্য্যন্ত মগধ-শিল্পের চরম উন্নতি সাধিত হয় এবং বঙ্গদেশই যে মগধের চিত্রাগার ছিল ইহা ক্রমশই প্রমাণিত হইতেছে। পাল-রাজত্বের পূর্ব্ব হইতেই গৌড় উত্তর-ভারতের সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ও বর্দ্ধিষ্ণু নগর বলিয়া বিদেশীয়দিগকে আকৃষ্ট করিত। এই সময় হইতেই বঙ্গদেশ চারুশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। দেবপালের রাজত্বকালে দুই জন প্রতিভাশালী শিল্পী ধীমান্ ও বীতপালের আমরা পরিচয় পাই। ভিক্ষু তারানাথ তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, দেবপালের রাজত্বকালে বরেন্দ্রভূমিতে দক্ষ শিল্পী ধীমান্ ও তৎপুত্র বীতপাল ধাতুশিল্পে, ভাস্কর্য্যে, চারু-কলায় বহু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। বীতপালের শিষ্য মগধেই বেশী ছিল এবং ধীমানের শিল্পপদ্ধতিকে 'পূর্ব্ব-

ভাগ' এবং বীতপালের পদ্ধতিকে 'মধ্যদেশ শিল্প-বিভাগ' লা হইত।

দশম শতাব্দীর শেষভাগে দ্বিতীয়-গোপাল সিংহাসন ধিকার করেন। সেই সময়ের একখানি সচিত্র পুঁথি াওয়া গিয়াছে এবং তাহা বর্ত্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়মে ক্ষিত আছে। ইহার পর একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হীপাল দেবের সময় বঙ্গ-শিল্পের পুনর্জাগরণের বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল এবং এই সময়েই অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথি লিখিত হয়। এই পুঁথির চিত্রগুলি ত্রিবর্ণে রঞ্জিত এবং ইহা এশিয়াটিক সোসাইটীর চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। এই সময়ের কতকগুলি চিত্র বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে (ক) বুদ্ধমূর্তির অবয়বে সামান্য রকম পরিমাণের অভাব; হস্তের তুলনায় পদদ্বয়ের হ্রস্বতা, (খ) দেহের উপরিভাগের তুলনায় নিম্নভাগের খর্ব্বতা, (গ) সাধারণতঃ কটিদেশ বস্ত্রাবৃত; অন্য কোন পরিচ্ছদের অভাব।

পেগানের কুব্যি অক্চি চান্‌জিথের ওন্‌মিন্ গুহা-মন্দিরে (একাদশ শতাব্দী) ফ্রেস্কো-চিত্রগুলি বিচার করিলেও দেখিতে পাই যে ইহার বিষয়বস্তু, বর্ণবিন্যাস ও মূর্ত্তিরচনা পূর্ব্বোক্ত বঙ্গীয় শিল্পধারার অনুবর্ত্তী।

মিন্ পেগানের কুব্যি অক্চি মন্দিরের ফ্রেস্কো-চিত্রগুলি, বিশেষতঃ এই চিত্রে বৃক্ষের পরিকল্পনার সহিত শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত কর্ত্তৃক অধুনা আবিষ্কৃত পটগুলিতে অঙ্কিত পত্রগুচ্ছের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। এই বৃক্ষগুলির* পত্রগুচ্ছ গাঢ় বর্ণে রঞ্জিত, আদর্শ প্রতিরূপে কেবলমাত্র উপরিভাগ গোলাকৃতি অথবা অর্দ্ধগোলাকৃতি অবস্থায় অঙ্কিত। এই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ও জর্ন্যাল অব দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটী অব ওরিয়াণ্টাল আর্টস্ পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে এই পদ্ধতিতে অঙ্কনপ্রথা প্রাক্-বৌদ্ধযুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

হার্ভে সাহেবও 'ব্রহ্মের ইতিহাসে' লিখিয়াছেন নিয়াং-উতে অবস্থিত চান্‌জিথ ওন্‌মিন্ মন্দিরের ফ্রেস্কো-চিত্রের অঙ্কন-রীতি নেপাল অথবা উত্তর-বঙ্গের শিল্পীর বলিয়া মনে হয়।

ইহার পরেই মিন্নান্থু গ্রামের পায়া-থোন্‌জু নন্দা-মানা প্রভৃতি মন্দির উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই মন্দিরগুলি দক্ষিণ-বঙ্গের স্থাপত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল এবং ইহার অধিকাংশ ফ্রেস্কো-চিত্রই জড়ানো পটের অনুরূপ। এই ধরণের ফ্রেস্কো-চিত্রই পেগানের অধিকাংশ মন্দিরে আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছিল। চিত্রগুলির সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তাই এই শিল্পের বিশেষত্ব। এই চিত্রগুলির মুখ, হাত, পা দুইটি দীর্ঘ রেখার দুই পার্শ্বে তুলি দিয়া নিটোল টানে অঙ্কিত এবং ইহার অঙ্কনভঙ্গীতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কমনীয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাধারণতঃ মূর্ত্তিগুলির বক্ষ উন্মুক্ত, শুধু কটিদেশ বস্ত্রাবৃত।

পায়া-থোন্‌জু মন্দিরের দেওয়ালের, জড়ানো-পটের অনুরূপ যে একটি চিত্র এখানে প্রকাশিত হইল, উহার শেষের এবং দ্বিতীয় চিত্রখানির উপরের কীর্ত্তিমুখ ও সিংহ দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূর্ত্তি দুইটির সহিত অধুনা শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত মথুরাপুর দেউলের কীর্ত্তিমুখ ও সিংহের পরিকল্পনার একটি বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরাপুর দেউলে অঙ্কিত সিংহের ন্যায় এই সিংহগুলিও এক-একটি পদ্মের কুঁড়ি দংশনে ছিন্ন করিতে উদ্যত; এ-ছাড়া, শ্রীগুরুসদয় দত্ত মহাশয় মথুরাপুরের দেউলের নারী-মূর্ত্তিগুলির যে বিশিষ্ট পদ্ধতির কথা ১৯৩৪ সালের মার্চ্চ সংখ্যা মডার্ণ রিভিউতে উল্লেখ করিয়াছেন উহার সহিত পেগানের এই মন্দিরগুলির চিত্রাঙ্কনপদ্ধতির একটি ঐক্য লক্ষিত হয়। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ জর্নাল অব দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টস্ পত্রে লিখিয়াছেন—কুমারস্বামী ও ক্রামরিশ নেপাল ও ব্রহ্মদেশের চিত্রে বঙ্গীয় শিল্পের সহিত যে-সাদৃশ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মথুরাপুরের দেউলে খোদিত এই ফলকগুলি তাহার সমর্থন করে।

উক্ত প্রবন্ধেই শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় দক্ষিণ-বঙ্গে প্রাপ্ত দ্বাদশ শতাব্দীর তাম্রশাসনে অঙ্কিত যে চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত করিয়াছেন, উহার চোখ এবং মুখের

* গত ১৩৪১ সনের ফাল্গুনের প্রবাসীতে "বঙ্গের পটচিত্র" প্রবন্ধে প্রকাশিত "বস্ত্রহরণ" নামে চিত্রখানিতে এইরূপ একটি বৃক্ষ অঙ্কিত আছে। এই চিত্রখানি শ্রীগুরুসদয় দত্ত কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত বস্ত্রহরণ চিত্র অনুসরণে আধুনিক পটুয়া কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

বিশেষ ভঙ্গিমা, দেহের সুঠাম গঠন এবং রেখাসমন্বয় বিশ্লেষণ করিলে, বঙ্গীয় শিল্পের এই পদ্ধতি এবং সমসাময়িক পেগান মন্দিরের এই চিত্রাঙ্কন-রীতিতে রেখার সুস্পষ্টতা ও অঙ্কন-নিপুণতা যে একই ধারায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

আনন্দ কুমারস্বামীও ত্রয়োদশ শতাব্দীর পেগানের পদ্মপাণি ও দেবতা ফ্রেস্কো-চিত্র আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার 'ভারতীয় ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আর্টের ইতিহাস' পুস্তকের ১৭২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, যে, এই ফ্রেস্কো-চিত্রাঙ্কন-রীতির সহিত বাংলা ও নেপালের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত রঞ্জিত পুঁথি, এশিয়াটিক সোসাইটীতে রক্ষিত পুঁথি, বোষ্টনে রক্ষিত বাংলার একাদশ শতাব্দীর পুঁথি প্রভৃতি বিচার করিলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উত্তর-ব্রহ্মে এখনও প্রায় পাঁচ-সাত শত ঘর বাঙালী পৌনাদের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহাদের বাড়ীতে চিত্রাঙ্কিত বাংলা পুঁথি দেখিয়াছি; ইহারা বর্ত্তমানে জ্যোতিষ প্রভৃতি আলোচনা করিয়া থাকেন কিন্তু চিত্রাঙ্কন-প্রথাই পূর্ব্বে ইহাদের পেশা ছিল। এই 'পৌনা' কথাটি 'বেম্‌না' (ব্রাহ্মণ) কথার অপভ্রংশ। বাংলা দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানে যে সমস্ত বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকেই তাচ্ছিল্যের সহিত 'বেম্‌না' বলা হইত। ব্রহ্মদেশে এই বাঙালীরা প্রায় তিন-চারি শত বৎসর বংশানুক্রমিক বসবাস করিয়া আসিতেছে।

যখন যে রাজা ইহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন তাঁহাদের রাজ্যেই ইহারা চলিয়া গিয়াছে। সেই জন্য বর্ত্তমানে এই বাঙালী পৌনাদের সংখ্যা অমরাপুর, মান্দালয় প্রভৃতি স্থানেই বেশী দেখা যায়।

এই সময় পুনঃ পুনঃ চীনাদের আক্রমণে পেগান পরিত্যক্ত হইতেছিল এবং এই কারণে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী কালে পেগানে কোন স্থাপত্য ও শিল্প আর গড়িয়া উঠিতে পারে নাই; যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাও ধ্বংসপ্রায় হইতে থাকে।

কিন্তু এই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই আরাকান রাজসভা অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে; এই সময় আরাকান-রাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরাকান-রাজসভায় কিরূপে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব। তৎপূর্ব্বে এই সময়ে আরাকানের সহিত বাংলার কিরূপ যোগাযোগ হইয়াছিল তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া নরমিখ্‌লা (Narmeikhla) বঙ্গদেশে গৌড়াধিপতি কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হন এবং তাঁহার অধীনে সামরিক কাজে সুনাম অর্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া যান। ইহার পরবর্ত্তী কাল হইতেই, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও আরাকানের নৃপতিদের মুসলমান উপাধি ধারণ করিতে দেখা যাইত এবং তাঁহাদের মুদ্রাও বঙ্গদেশ হইতে প্রস্তুত হইয়া যাইত।* এই সময় বঙ্গের নৃপতিগণের সহিত আরাকান-রাজদের যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে গঙ্গার মোহনায় উভয় রাজ্যের প্রায়ই জলযুদ্ধ ঘটিত। এই সব যুদ্ধে আরাকান-রাজগণ বঙ্গদেশ হইতে সহস্র সহস্র বন্দীকে দাসরূপে স্বদেশে লইয়া যাইতেন এবং ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে বহু সামাজিক প্রথাও ঐ দেশে প্রচলিত হইয়া যায়।

রামায়ণে কথিত আছে রাজা দশরথ একবার যুদ্ধে আহত হওয়ায় তাঁহার দ্বিতীয় মহিষী কৈকেয়ী বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করেন। ইহার পুরস্কার-স্বরূপ রাজা দশরথ কৈকেয়ীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে প্রথম পুত্রের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় পুত্রের হস্তে সমস্ত রাজ্যের ভার ন্যস্ত করিয়া যান। বাংলায় এই কাহিনীটি অন্যভাবে প্রচলিত কথিত আছে যে রাজা দশরথের আঙুলে একটি বিস্ফোটক হওয়ায় রাণী কৈকেয়ী উহা নিজের মুখ দিয়া চুষিয়া লইয়াছিলেন।

ব্রহ্মদেশের জাতকেও এইরূপ কথিত আছে যে রাজ ওক্কাকারিৎ-এর আঙুলে একটি বিস্ফোটক হওয়ায় তাঁহা ছোট রাণী উহা চুষিয়া খাইয়া ফেলিয়াছিলেন; এই জন্য রাজ রাণীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যের উত্তরাধিকার করিয়া যান। এই উপাখ্যানটি ব্রহ্মদেশীয় অভিনেতৃদে
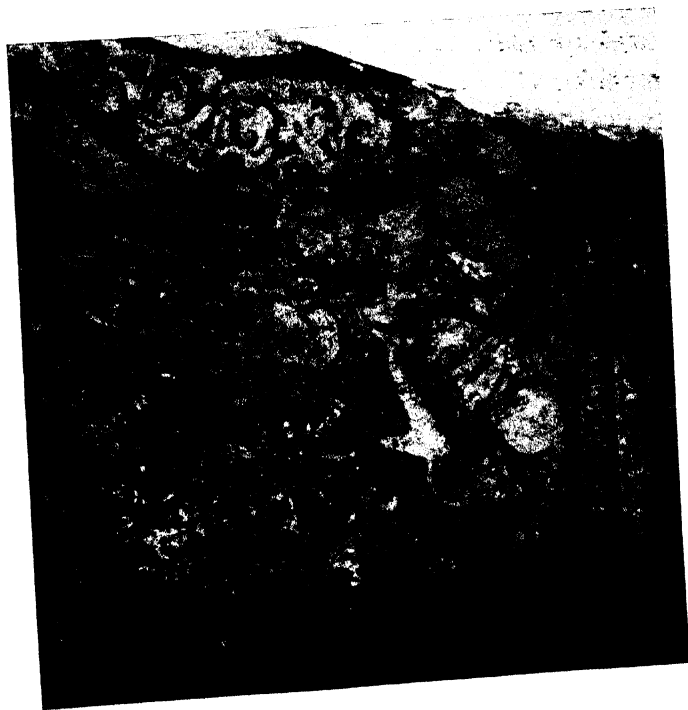
* Harvey: *History of Burma*, p. 140.
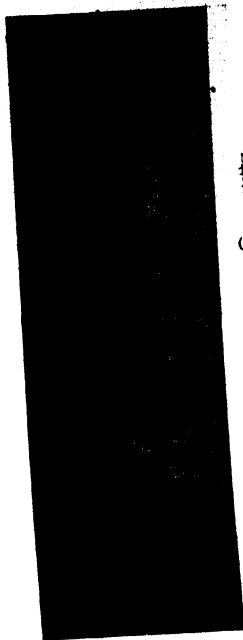
নন্দা-মান্না মন্দিরের ফ্রেস্কো-চিত্র

কুব্যি-অকচি মন্দিরের ফ্রেস্কো-চিত্র, মিন্-পেগান

পদ্মপাণি, পেগান-মন্দিরের ফ্রেস্কো-চিত্র

পেগান-মন্দিরের ফ্রেস্কো-চিত্র

[illegible]বীর তাম্র-চিত্র

পাথা-থোনজু মন্দিরের ফ্রেস্কো-চিত্র →

পাসা-শোনজু মন্দির
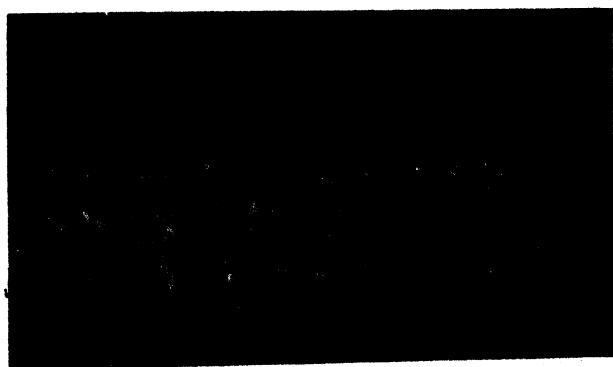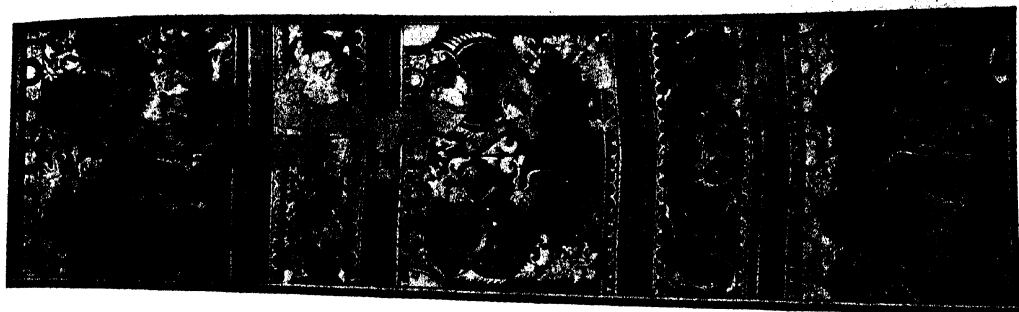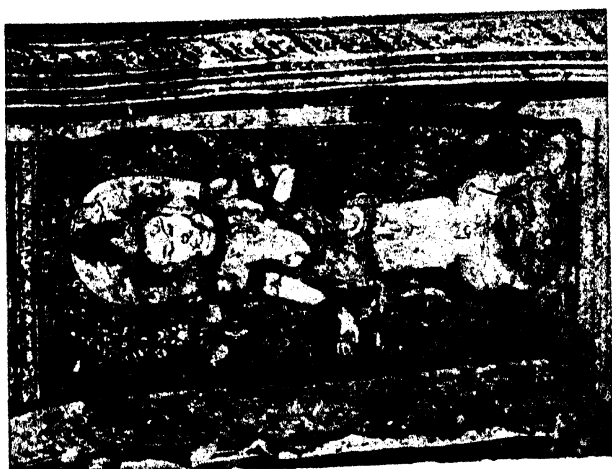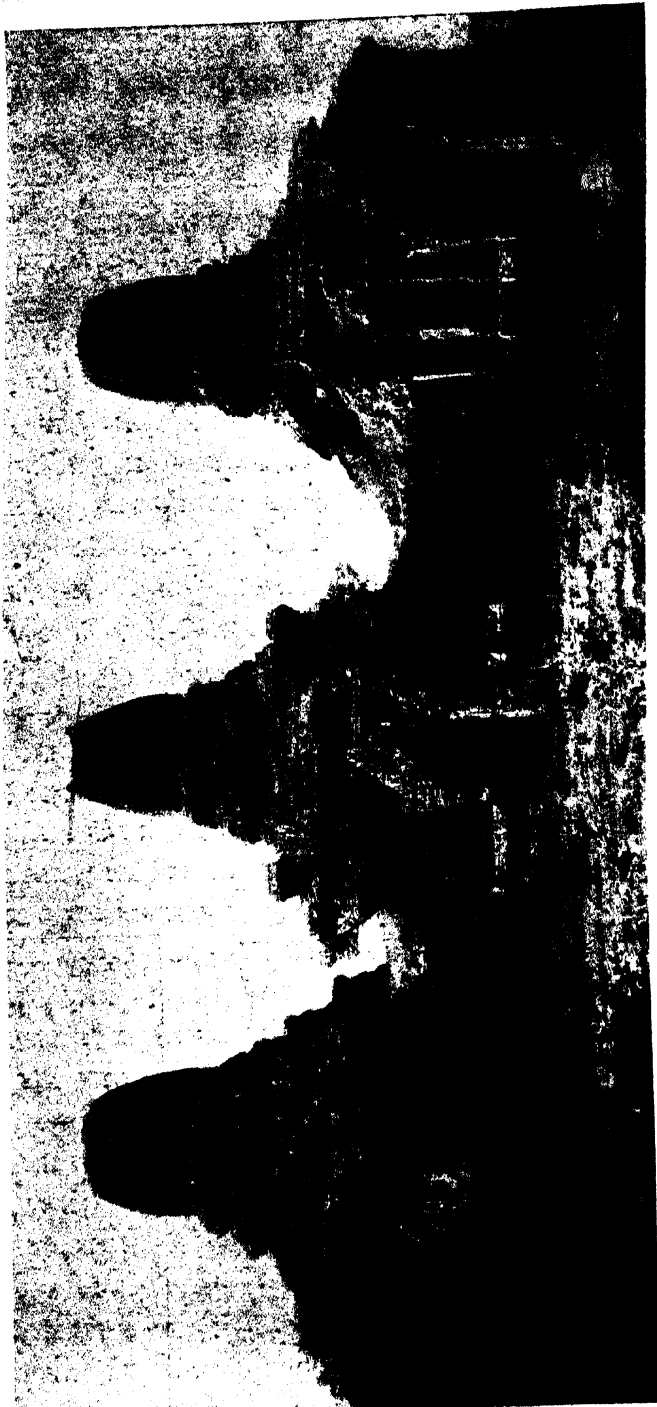
নিকট খুবই প্রিয় এবং বিভিন্ন রাজার নামে গ্রামবাসীরা প্রায়ই এই উপাখ্যানটি অভিনয় করিয়া থাকে।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায় মহাশয় তাঁহার "ব্রহ্মদেশে ব্রহ্মণ্য দেবতা" (*Brahminical Gods in Burma*) পুস্তকে লিখিয়াছেন যে এই সময়ে আরাকানকে ব্রহ্মদেশের একটি প্রদেশ বলার চেয়ে পূর্ব্ব ভারতের সীমান্ত-প্রদেশ বলাই অধিক সঙ্গত এবং আমরা মনে করি আরাকান ও বঙ্গদেশের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। পর্ত্তুগীজদের আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই এই মগদিগের সহিত বঙ্গদেশের রীতিমত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল (বর্ত্তমানে এনামুল হক্ প্রভৃতি মনে করেন যে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মগধ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া ইহারা "মগ" নামে খ্যাত)।

এই আরাকান-রাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় ষোড়শ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত আরাকান-রাজসভায় বাংলা ভাষা নানা দিক দিয়া যেরূপ পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল স্বদেশেও তখন সেরূপ হয় নাই।

সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সকল রোসাঙ্গ রাজের মুসলমান সভাসদ বাংলা ভাষার চর্চ্চায় স্বজাতীয় কবিদের নিয়োজিত করিয়া মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন সেই রোসাঙ্গ রাজাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

আরাকানী নাম	বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত নাম
(১) থিরী-থু-ধম্মা	শ্রীসুধর্ম্ম রাজা
(২) মিন্ সানি	ঐ
(৩) নরপদিগ্যি	নৃপতিগিরি ও নৃপগিরি
(৪) থাডো থাডো মিন্তার	চাদেহ
(৫) সান্দ থুধম্মা	চন্দ্র সুধর্ম্মা

রোসাঙ্গ-রাজ থিরী-থু-ধম্মার রাজ্য ঢাকা হইতে পেগু পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহারই রাজত্বকালে আশরফ্ খাঁর আদেশে রোসাঙ্গ-রাজসভায় থাকিয়া কবি দৌলত কাজী তাঁহার অসমাপ্ত কাব্য "সতী ময়না" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রোসাঙ্গ-রাজসভায় থাকিয়া যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন, কবি মাগন ঠাকুর তাঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি। "চন্দ্রাবতী" তাঁহার প্রসিদ্ধ কাব্য।

রাজা থাডো মিন্তার ১৬৪৫ হইতে ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইঁহার রাজত্বকালেই মহাকবি আলাওল তাঁহার সুবিখ্যাত "পদ্মাবতী" কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

এই আরাকান রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরও যে সকল কবির আবির্ভাব হয় তন্মধ্যে মরদন, সমশের আলী, মোহম্মদ খাঁ প্রভৃতি বারো জন প্রসিদ্ধ কবির নাম করা যাইতে পারে।

এইরূপে বহু প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম, স্থাপত্য, শিল্প ও কাব্যে বাংলা দেশের সহিত ব্রহ্মদেশের যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু ঘটনা-বিপর্য্যয়ে এবং নানারূপ রাজনৈতিক বিপ্লবে বাংলার এই বহিঃসংযোগ কমিয়া যাইতে থাকে এবং ইংরেজ-আগমনের পরবর্ত্তী কালে উহা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়।*

* এই প্রবন্ধের চিত্রগুলি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে মুদ্রিত।

'বিশেষ চিন্তিত আছি'

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

'প্রিয় নৃপেন,

বহুদিন হইল তোমার কোন সংবাদ না পাইয়া বিশেষ চিন্তিত আছি।'

এইটুকু লিখিয়াই মহিম অতঃপর ভাবিতে বসিল। ভাবনার কিছু কারণ আছে বটে, কেন না, মহিমের বয়স মাত্র আঠার বছর; ফার্ষ্ট ইয়ারের ছেলে—পাড়া-গাঁ হইতে সবে শহরে আসিয়াছে ভাল কলেজে পড়িতে। শহরের বৈচিত্র্য ও সমারোহ এই বয়সে মনকে প্রবল ভাবেই নাড়া দিয়া থাকে। কিন্তু প্রবাসী মহিমের মনে শহর এখনও বিশেষ ভাবে শিকড় গাড়িয়া বসে নাই, কাজেই প্রবাস-বাসের দশ দিনের মধ্যে এমন একখানি পত্র লিখিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

পত্রের প্রথম ছত্র দেখিলেই মনে হয়, নৃপেন মহিমেরই স্বগ্রামবাসী, আবাল্য সহপাঠী। মহিমের সঙ্গেই ম্যাট্রিক দিয়াছে; হয়ত পাস করিতে পারে নাই বলিয়া গ্রামে রহিয়া গিয়াছে অথবা পাস করিয়াও সামর্থ্যে কুলায় নাই তাই কলেজ-জীবন তাহার কাছে স্বপ্নের বিষয় হইয়া রহিল! ছেলেবেলা হইতে দু-জনের মধ্যে ভালবাসা আছে প্রচুর। চু-কপাটি খেলা শেষ করিয়া যখন নদীর ধারে বসিয়া (গ্রাম হইলে একটি নদীর কল্পনা স্বাভাবিক) শ্রান্ত ক্লান্ত ছেলের দল গান গাহিয়া, বাঁশী বাজাইয়া, গল্প করিয়া সময় কাটাইয়া দিত, আসন্ন সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে, দল হইতে একটু দূরে, জলের কিনারে শেষ পৈঠাটার উপর বসিয়া জলে পা ডুবাইয়া এই দুটি কিশোর তখন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিত। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে আমবাগানে আলাপ বা বর্ষা-সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়া চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া গল্প···দুটিতেই এক-মন আর এক-মনের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হয়।···

কিন্তু মহিমের চিন্তার কারণ এ-সব কিছুই নহে। অত্যন্ত পরিচিত নৃপেনের কাছে চিঠি লিখিতে হইলে এক ছত্র লিখিয়া পরের ছত্রের জন্য এত ভাবিতে হয় না। প্রবাসজীবনে দশ দিনে যে-সমস্ত বিস্ময় স্তূপীকৃত হইয়া উঠিয়াছে তাহার তলে রাশি রাশি ঘটনার সমাবেশ—লিখিতে বসিলে অনায়াসে লেখক-খ্যাতি অর্জ্জন করা যায়। বয়স আঠার, সাহিত্যের স্বাদে মন অল্পবিস্তর মাতাল হইয়া আছে, লিখিবার বিষয় পাইলে লেখনীর গতিকে ঠেকাইয়া রাখা যে কোন সাধনার চেয়ে কম আয়াসসাধ্য নহে! কিন্তু এক ছত্র লিখিয়াই মহিম চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। কোথা হইতে সুরু করিবে ও কোন্ কোন্ বিশেষণ প্রয়োগে ভাষাকে বলিষ্ঠ ও সুষ্ঠু করা যায়, কতটুকু বলা চলে, ইঙ্গিতে বা কতটুকু কৌতূহলের সৃষ্টি করা যায়; অস্পষ্ট ভাবের সঙ্গে অনন্ত পরিকল্পনার একটা বিরাট্ আভাস—লিপিরচনার এই সমস্ত কলা-কৌশলই কি মহিমের ভাবনার বিষয়?

শহরে আসিয়া জগতের চিন্তাধারার সূতাটি সে আবিষ্কার করিয়াছে, প্রবাসজীবনে প্রিয়বিরহব্যথার সঙ্গে বিস্মৃতির সন্ধান সে পাইয়াছে; বহু বিচিত্র রাগিণী মনের তারে লাগিয়া রহিয়াছে—কাহার দক্ষ অঙ্গুলির স্পর্শ পাইবামাত্র সুরের কায়া পরিগ্রহ করিবে। সে অজানার স্পর্শে মন ব্যাকুল, কিন্তু সে অজানাকে ভাষার মধ্যে আকার দেওয়া অসম্ভব। মহিমের কাছে নৃপেন অনেকটা সেইরূপ; পরিচিত অথচ অজানা। এগারো দিন আগে নৃপেন বলিয়া কোন যুবকের অস্তিত্ব তাহার কাছে ছিল না, অথচ এগারো দিন পরে লিখিতে হইতেছে, 'বহুদিন তোমার কোন সংবাদ না পাইয়া বিশেষ চিন্তিত আছি।' পত্রের পাঠ লিখিতে হইলে অথবা ভদ্রতার খাতিরে এগারো দিনকে বহুদিন বলিলে মিথ্যা ভাষণের অপরাধ হয় না, যদিও নৃপেনের অদর্শনে এ-কয় দিন বিশেষ চিন্তার কারণ তাহার হয় নাই! এ-কয় দিনে সে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়াছে বাড়ীর কথা অর্থাৎ গ্রামের কথা। সকালে বই খুলিয়া বসিলেই মনে পড়ে, রৌদ্রের তীব্র রেখা

পূবখোলা জানালা দিয়া যেমন মুখে আসিয়া পড়িত—অমনি ঘুম তাহার ভাঙিয়া যাইত। উঠান-নিকানো শেষ করিয়া মা তখন রান্নাঘরে হাঁড়ি-ন্যাতা লইয়া ঢুকিয়াছেন। কোমরে জড়ানো কাপড়ের পাড় কাজের ব্যস্ততায় অল্প অল্প দুলিতেছে, দেখিয়া সে হাঁকিত, মা, তোমায় বললাম খুব ভোরে উঠিয়ে দিয়ো, তা না—মা দূর হইতে কোন উত্তর দিতেন না, কাছে আসিলে মহিম যদি পুনরায় না-জাগাইবার অভিযোগ আনিত ত মৃদু হাস্যে বলিতেন, সারারাত জেগে পড়িস, ভোরে একটু না ঘুমুলে যে অসুখ করবে?

এখানে সারারাত ভাল ঘুম না হইলেও এই ত সূর্য্য উঠিবার বহু আগে সে জাগিয়াছে ও বই খুলিয়া বসিয়াছে। কিন্তু স্নিগ্ধ প্রভাতে পড়ায় তেমন মন দিতে পারিতেছে কই? সূর্য্যোদয়ের সে শোভাই বা কোথায় এখানে? এক দেখা যায় মধ্যাহ্নের দীপ্তিময় সূর্য্যকে,—অন্য সময়ে রৌদ্রের কোমলতায় প্রভাতের বা অপরাহ্ণের কল্পনা করিয়া লইতে হয়। নানা দেশ হইতে আগত হোষ্টেলের ছেলেগুলির আচরণেরও কূলকিনারা যেমন পাওয়া যায় না! দুপুর-বেলা ইহারই মধ্যে ক্লাসে 'প্রক্সি' সুরু হইয়াছে, বাজি রাখিয়া কে কোন্ প্রফেসারকে বেমালুম ফাঁকি দিতে পারে তাহার প্রতিযোগিতাও কম বীরত্বপূর্ণ নহে। মহিমের এ-সব করিতে সাহসে কুলায় নাই—তাই 'পাড়াগেঁয়ে' বলিয়া খ্যাতি রটিয়াছে। সবাক্ চিত্র বা শীল্ডের খেলা দেখায় তার আপত্তি আছে। বাড়ী হইতে আসিবার সময় অনেকগুলি টাকা অবশ্য সে আনিয়াছিল, কিন্তু বই কিনিতে, য়্যাডমিশন লইতে, হোষ্টেলে য়্যাডভান্স করিতে সে-গুলি প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে।

বাড়ীর অবস্থা এমন কিছু সচ্ছল নহে যাহাতে কলেজের পড়া ও বিলাসিতা একযোগে পূর্ণোদ্যমে চালানো যায়। ভাইবোনে ছয় জন; একটি বোনের বিবাহ দিতে বাপের স্বল্প পুঁজি প্রায় খালি হইয়া গিয়াছে—আর একটি বোনের বিবাহ দিতে হইবে। বাপ মুহুরিগিরি করেন, জমি সামান্য যা আছে সারা বছরের ভাতটা তাহা হইতে চলিয়া যায়। অন্যান্য গৃহস্থের তুলনায় তাহারা অবস্থাপন্ন বটে। না হইলে কলিকাতার হোষ্টেলে রাখিয়া ভাল কলেজে পড়াইবার সাধ মহিমের পিতার কেন হইল? এই সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া পড়ানোর মূলে কতখানি আশা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনা যে নিহিত, সে-কথা মহিমের মনে কষ্টিপাথরের সোনার কষের মত উজ্জ্বল হইয়া আছে। এক মাইল পথ সে অনায়াসে হাঁটিয়া যায়, ট্রামে বা বাসে চড়ে না। কলিকাতার মাইল আবার নাকি মাইল! একজিবিশনের মধ্যে নানা দ্রষ্টব্য জিনিষ দেখিয়া শুনিয়া যেমন আনন্দ হয়, দৈহিক শ্রমের কথা মনেই হয় না, কলিকাতায় পথ চলিবার ক্লান্তি—দুই ধারের বিচিত্র বিলাসপূর্ণ দ্রব্যসামগ্রীতে এমনই মিশিয়া গিয়াছে—বিশেষ ভাবে খুঁজিয়া বাহির না করিলে দর্শনই মিলে না। তার পর অপরাহ্ণে পার্কে বেড়াইবার সময় মন আসিয়া চক্ষু বা কর্ণে আশ্রয় লয়। দীঘির চক্রপথে পায়চারি করিতে করিতে কখনও উচ্চ মঞ্চ হইতে সাঁতারুদের উল্লম্ফন দেখে, কখনও বেঞ্চের উপর দণ্ডায়মান কোন অদ্ভুত পরিচ্ছদ-পরিহিত ব্যক্তির বক্তৃতা শোনে, ক্লান্তিবশত বেঞ্চে বসিলে পাশের বৃদ্ধদের রাজনীতি ও সমাজনীতির তথ্যপূর্ণ আলোচনা শুনিয়া দেশ ও সমাজের সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা করে, কখনও দীঘির ওপারে—ত্রিতল চারিতল অট্টালিকাগুলির উজ্জ্বল আলোকের পানে চাহিয়া ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখে!···সন্ধ্যায় পড়া ও খাওয়া শেষ করিয়া বিছানায় শুইলেই আবার বাড়ীর কথা মনে হয়। বর্ষাকালে বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছে, রান্নাঘরের দাওয়ায় এমন সময়ে তাহারা খাইতে বসিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে গল্প। দশ মিনিটের খাওয়া কলরবে কোলাহলে এক ঘণ্টায় শেষ হয়। অতঃপর বাড়ীর বৃদ্ধা পিসীমা দাওয়ায় বসিয়া আরম্ভ করেন সেকালের গল্প। সেকালের খাওয়ার সুখ, লোকের স্বাস্থ্য, বউদের বশ্যতা ও লজ্জা-শীলতা, ছেলেদের গুরুভক্তি ইত্যাদি মাঝে মাঝে রূপার কাঠির স্পর্শে সাগরশায়িনী রাজকন্যার নিবিড় নিদ্রা ও পক্ষীরাজ ঘোড়া চাপিয়া রাজপুত্রের দুঃসাহসিক অভিযানের রূপকথাও শোনা যায়। শুনিতে শুনিতে কাঁথামুড়ি-দেওয়া ছেলে-মেয়েগুলির চোখেও তন্দ্রা ঘনাইয়া আসে—রাজকন্যার মতই নিদ্রা তাহাদের নিবিড় হইয়া উঠে।

এতগুলি চিন্তা ঠেলিয়া নৃপেনের চিন্তা বড়-একটা মনে আসে না।

আজ হঠাৎ নৃপেনকে মনে পড়িবার কারণ, ক্লাসে নোট

লইবার সময় তার দেওয়া পেনসিলটি ব্যবহার করিতে হইয়াছে। একটি ফাউন্টেন পেন হইলে নোট লওয়ার সুবিধা হয় ; প্রত্যেক ছেলের বুকের পকেটেই ঐ জিনিষটি আছে। বাড়ীতে নৃপেনও তাহাকে ঐ কথা জানাইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে একটা বিখ্যাত দোকানের নাম করিয়া বলিয়াছিল—সেখান হইতে নৃপেনের নাম করিয়া লইলে কমিশন কিছু বেশী পাওয়া যাইবে। দোকানী নৃপেনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

বার-দুই দোকানের ধারে গিয়াও মহিম ভিতরে ঢুকিতে পারে নাই। কলম লইয়া দাম দিবার সময় নৃপেনের নাম উল্লেখ করিতে গেলেই প্রবল একটা লজ্জা তাহার কণ্ঠরোধ করিবে অনুমানে মহিম সে-কথা বুঝিতে পারিয়াছে। নৃপেনের নাম লওয়া ত নহে, দোকানীকে ঠকাইবার সে যেন একটা কৌশল। এক নৃপেন সঙ্গে থাকে—সে আলাদা কথা, কিংবা তার একখানা চিঠি পাইলেও মন্দ হয় না।...যদি দোকানী সন্দেহ করিয়া জিজ্ঞাসা করে—নৃপেনের সঙ্গে তোমার কত দিনের পরিচয়? তখন সে কি বলিবে,—গ্রীষ্মাবকাশের পর কলেজ খুলিবার মুখে গোয়ালন্দে অতিকষ্টে ট্রেনে উঠিয়া সে বসিবার জায়গার জন্য হতাশ নয়নে চারি দিকে চাহিতেছে—এমন সময় কুড়ি বছরের গৌরবর্ণের যে ছেলেটি তাহাকে টানিয়া পাশে বসাইয়া মৃদুহাস্যে বলিয়াছিল, এই ভিড়ে কি দাঁড়িয়ে থাকলে চলে, ভাই, ঠেলে-ঠুলে বসবার জায়গা ক'রে নিতে হয়। তারই নাম নৃপেন—সে পড়ে রাজশাহী কলেজে থার্ড ইয়ারে। অর্থাৎ মাত্র এগারো দিন পূর্ব্বে তার সঙ্গে পরিচয়। ট্রেনে যে আলাপ জমিয়াছিল তাহাতে মনে হয়—দশ বৎসর পূর্ব্বেও এই ছেলেটিকে যেন সে জানিত। সে পদ্মা পার হইয়া এই প্রথম এদিকের ট্রেনে চাপিয়াছে—নৃপেনের অভিজ্ঞতা বহু দিনের। ট্রেনের গল্প আর কলেজের গল্প, রাজশাহীর কথা আর কলিকাতার বর্ণনায় বন্ধুত্ব জমিয়াছিল। পোড়াদহে গাড়ী বদল করিয়া নৃপেন যখন নামিয়া গেল তখন মহিমের হাতখানি সে আপনার মুঠার মধ্যে নিবিড় ভাবে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, 'আমায় ভুলবে না ত, ভাই?'

নোট-বহিতে সে-ই নিজের হাতে ঠিকানা লিখিয়া দিয়াছিল, স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বুকের পকেটে সরু সুদৃশ্য পেন্‌সিলটিও দিয়াছিল গুঁজিয়া। তার পর বাঁশী বাজাইয়া দু-দিকের গাড়ী যখন বিপরীতমুখী লাইন ধরিয়া অগ্রসর হইল, তখন দুটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে দুখানি শাদা রুমাল বহুক্ষণ ধরিয়া আন্দোলিত হইয়াছিল।

পথের ধারে যে অমূল্য জিনিষ কুড়াইয়া পাওয়া গেল, পথের ধারেই সে রত্ন ফেলিয়া আসিতে হইল ;—তরুণ হৃদয়ে এ বিয়োগ-বেদনা খুব বেশী হইলেও পথের নেশাই তাহাকে আবার ক্ষণপূর্ব্বের ব্যথা ভুলাইয়া দেয়। উত্তর কালে যে অনন্ত পথ প্রসারিত হইয়া পথিককে চলিবার ইঙ্গিত জানায় সে যেন এই ক্ষণকালীন ট্রেনযাত্রারই প্রতীক।

কলিকাতায় আসিয়া নৃপেনকে ভুলিতে মহিমের তাই বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় নাই।...আজ পেনসিলের মধ্যে নৃপেনের ছবি ভাসিয়া উঠিল। গোয়ালন্দ হইতে পোড়াদহ ঘণ্টা-তিনেকের পথ—তিন ঘণ্টার স্মৃতি! মনে পড়িল, মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে নৃপেনের অল্প মাথা দোলাইয়া হাসা, হাত নাড়িয়া কথার ভঙ্গীকে উদ্দীপ্ত করা।

সে বলিয়াছিল, এক মাসের মধ্যে কলিকাতায় আসিবে। তখন যদি সে মহিমকে দেখে ও হাসিয়া বলে, 'কি বন্ধু, ট্রেনের প্রতিশ্রুতি এত শীঘ্র ভুলিয়া গিয়াছ? একখানা চিঠিও কি দিতে নাই?' তখন লজ্জিত মহিমের অবস্থাটা কল্পনাও করা যায় না! কিন্তু নৃপেন যে মহিমকে চিনিতে পারিবেই তারই বা নিশ্চয়তা কি? নৃপেনের মুখ স্পষ্ট তাহার মনে পড়ে না—কয়েকটি বিশেষ ভঙ্গির মধ্যে মাত্র চিহ্নটি জাগিয়া আছে। ঐ হাত-নাড়া বা মাথা-দোলানো হাসির মধ্যে বিকশিত সাদা ঝক্‌ঝকে দাঁত কয়টি, টিকলো নাকটিও যেন অস্পষ্ট মনে পড়ে। চোখের বিস্তৃতি, ভ্রূর ঘন কেশশ্রী, কপালের দীপ্তি বা গালের গঠন—কোনটাই না। অস্পষ্ট ভাবে মানুষটিকে ধরা যায়,—রং আর তুলি লইয়া ছবি আঁকা চলে না।

নৃপেন কেন—মা'র সম্পূর্ণ মূর্ত্তিটিই কি নিখুঁত ভাবে সে আঁকিতে পারে? প্রত্যেক ইন্দ্রিয় স্বতন্ত্র ভাবে এ-ক্ষেত্রে কোন কার্য্য করে না। মা বাঁচিয়া আছেন কতক চক্ষুতে, কতক কর্ণে, ঘ্রাণের মধ্যেও তিনি আছেন, মনে আছেন এবং স্পর্শেও আছেন। সম্পূর্ণ মা'কে পাইতে হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহযোগিতা আবশ্যক। দশ দিনের পরিচিত নৃপেনকে মহিম

যদি ঠিক মনে করিতে না-পারে কিংবা নৃপেন যদি কলিকাতায় আসিয়া মহিমকে চিনিতে না পারে সে-দোষ কাহারও নহে। বর্ষাকালের পুকুর আর নদী এক হইয়া গেলে কোন্‌টা নদীর জল আর কোন্‌টা বা পুকুরের, কেহ কি নির্দ্দেশ করিতে পারে? স্বল্প-পরিসর ট্রেনের কামরায় গায়ে গা ঠেকাইয়া যাহার সঙ্গে হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল, বিশাল বারিধির মত অকূল এই শহরে সেই পরিচয়ের বুদ্বুদ্ কোথায় ফুটিল, কোথায় বা মিলাইল, কে তাহার সন্ধান রাখে?

যাহা হউক, নৃপেনকে সে পত্র লিখিতে বসিয়াছে। সে যে ভোলে নাই, লিপির মধ্য দিয়া অন্তরঙ্গতাকে আবার এক দিন হয়ত নিবিড় করিয়া ফিরিয়া পাইবে, এই আশাতেই মহিম আজ উৎফুল্ল।

নূতন কলেজে পড়িতে আসিয়াছে—তৃতীয় বার্ষিকের ছাত্রকে পত্র লিখিতেছে, কিন্তু যে-ভাষায় লিখিলে বিদ্যার ও ষ্টাইলের পরিচয় দেওয়া যায় সে-ভাষায় না লিখিয়া বাংলায় চিঠি লেখে কেন? লিখিবার পূর্ব্বে মহিমও সে-কথা অনেক বার ভাবিয়াছে। ট্রেনের স্বল্প আলাপে সে বুঝিয়াছে নৃপেন মাতৃভাষার পক্ষপাতী—সাহিত্যের আলোচনাও কিছু কিছু হইয়াছে ঐটুকু সময়ের মধ্যে। কাজেই অনেক ভাবিয়া বাংলায় সে চিঠি লিখিতেছে। ভাষা ভাবের বাহন হইলেও মহিমের পক্ষে ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হইলে লিপিরচনা হয়ত সহজ হইয়া আসিবে—উপস্থিত মহিমের পক্ষে ত এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ভাব আর ভাষা এক নদীর দুটি তীর, এক দিক উঁচু আর এক দিক ঢালু। কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নাই। তাই নূতন পরিচিতকে লিখিতে বসিয়া এগারো দিনের ব্যবধানকে বলিতে হইতেছে 'বহুদিন' এবং চিন্তার কোন কারণ না-থাকিলেও 'বিশেষ' শব্দটি প্রয়োগ করিতে হইয়াছে!

শিল্পী ও কবি

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

লইলাম হস্তে ব্যগ্র রঙের তুলিটি
মিলাইনু সুকৌশলে বর্ণ রকমারি,
তোমার ও মুখচ্ছবি, চঞ্চল ও নয়নের খেলা
বর্ণে বর্ণে তুলিকা-পরশে আজ উঠিবে ফুটিয়া
শুভ্র এই রেশমের শুষ্ক বক্ষে।
কুণ্ঠিত হইল তুলি বর্ণ যে নিষ্প্রভ,
কেমনে জানাবে বিশ্বে আড়ষ্ট ভঙ্গীতে
কি দেখেছে অপলক নয়নেতে আজ!
ঘন কৃষ্ণ কেশ, পাহাড়ের কোলে
হাওয়ায় দোলান যেন অনন্ত বনানী;
ভ্রূযুগলে দেখি কোন তুষার আবৃত
মসৃণ পর্ব্বতশৃঙ্গে তীক্ষ্ণ মেঘচ্ছায়া;
সাগরের নীলজলে রোদের ঝলক—
তেমনি সে নয়নের দ্যুতি,
কোমল কপোল বাহি মিষ্ট হাসি
করে আসা-যাওয়া, ক্রীড়ারত
হরিণ-শিশুর মত দ্রুত ছন্দে;
সহসা বঙ্কিম গ্রীবা লীলায়িত নয়ন আগ্রহে
সরোবরে মৃণাল দুলিল লাস্যে কমলে ধরিয়া।
নিষ্পন্দ তুলিকা হায় কোন্ বর্ণে আঁকিবে সে ছবি,
পরাস্ত শিল্পীর হস্ত; লেখনী তুলিয়া লেখে কবি।

"চণ্ডীদাস-চরিত"

(৬)

সঙ্গীত শুনিঞা রাজা মনে মনে ভাবে।
এ হেন মধুর কণ্ঠ নরে না সম্ভবে ॥
যত রূপ তত গুণ দোঁহে অন্তর্যামী।
নিশ্চয় দেবতা হবে চণ্ডীদাস রামী ॥
এইরূপ মল্লরাজ করিঞা চিন্তন।
স্বর লক্ষি ধীরে ধীরে করিলা গমন ॥
বিল্বমূলে বসি দোঁহে কহে কত কথা।
দণ্ডবৎ করি রাজা দাণ্ডাইল তথা ॥
আশীর্ব্বাদ দিঞা চণ্ডী কহিলা তখন।
ইচ্ছা যদি হয় রাজা করহ বন্ধন ॥
রাজা কয় তুমাদের দেব আচরণে।
মনুষ্য হইঞা আমি বুঝিব কেমনে ॥
পলাইলে শত্রু বলি হয় অপমান।
সম্মুখে আইলে হয় মিত্র সম জ্ঞান ॥
আমার যা মনোরথ হঞেছে পুরণ।
কহ প্রভু চণ্ডীদাস কি করি এখন ॥
চণ্ডীদাস কহে তব দুই শত সেনা।
কিরূপে উদ্ধার পাবে কর বিবেচনা ॥
রাজা কহে আমি যদি না জিনিব রণ।
কেমনে হইবা মুক্ত তবে সৈন্যগণ ॥
চণ্ডী কহে ক্ষত্র তুমি মোর বাক্য শুনি।
যুদ্ধ ছাড়ি পলাবে কি বীর-চূড়ামণি ॥
কি চিন্তা তুমার রাজা করিবারে রণ।
যাহার পশ্চাতে আছে মদন-মোহন ॥
স্বয়ং এবার তুমি যুদ্ধে যাও রাজা।
ধার্ম্মিক সুজন তুমি ক্ষত্র মহাতেজা ॥
পরাস্ত হলেও তুমি পাবে বহু খ্যাতি।
২১/] পূর্ণ হবে মনস্কাম শুন নরপতি ॥

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া নরবর।
চণ্ডীদাসে চাহি কিছু কহে অতঃপর ॥
কেমনে লভিলে তুমি কহ মতিমান।
এ অল্প বয়সে হেন [বহু ?] শাস্ত্রজ্ঞান ॥
এখনো না হও তুমি অষ্টাদশ পার।
কেমনে লভিলা জ্ঞান এ হেন অপার ॥
একি কথা কহ রাজা চণ্ডীদাস বলে।
আমার বয়স প্রায় তেত্রিশের কোলে ॥
যেইদিন মহামুদী ঘোর অত্যাচারী।
বসিলেন সিংহাসনে পিতৃহত্যা করি ॥
তার পূর্ব্বদিনে মোর জন্ম মধুমাসে।
তুমি কিনা বল মোরে বালক বয়সে ॥
কহিতেন এই কথা প্রায় মোর পিতা।
যখনি উঠিত তার দৌরাত্ম্যের কথা ॥৩২

---

৩২) এখানে দিল্লীর ও গৌড়ের ইতবৃত্ত স্মরণ করিতে হইবে। ১৩২১ খ্রিষ্টাব্দে ঘিয়াসুদ্দিন-তুঘলক দিল্লীর বাদশাহ হন। ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র জুনা-খাঁ হস্তী-চালনা দ্বারা এক মণ্ডপ ধরাশায়ী করিয়া পিতাকে হত্যা করেন, এবং মুহম্মদ নাম লইয়া সিংহাসন অধিকার করেন। এই পিতৃহন্তা অতিশয় নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ছিলেন. ২৬ বৎসর ভারতকে উৎপীড়িত করিয়াছিলেন। আরবী সন ও মাসে ৭২৫ হিজরার রবি-অল-আওল মাসে ঘিয়াসুদ্দিন-তুঘলক অপহত হন। ইংরেজী সালে ১৩২৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই ফেবরুআরি হইতে ১৭ই মার্চের মধ্যে। সে বৎসর শক ১২৪৬। ২৪শে ফেবরুআরিতে মধু বা চৈত্র মাস পড়িয়াছিল। চণ্ডীদাসের জন্মশক ও মাস জানা গেল।

মল্লরাজদূতের বচন দেখা যাউক। জুনা-খাঁ-এর অন্তে ১৩৫১ খ্রিষ্টাব্দে ফিরোজ-শাহ দিল্লীর সুলতান হন। ১৩৪১ খ্রিষ্টাব্দে সমসুদ্দিন-ইলিয়াস-শাহ গৌড়ের বাদশাহ হন। ইনি ১৩৪৫ খ্রিষ্টাব্দে পাণ্ডুআ নগরে রাজধানী করেন। মালদহ হইতে ছয় ক্রোশ ঈশান কোণে পাণ্ডুআ নগর। এখানে শত বৎসর পাঠান সুলতানদিগের রাজধানী ছিল। ১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ফিরোজ-শাহ গৌড় আক্রমণ করেন কিন্তু জয়ী হইতে পারেন নাই। ৭৫৮ হিজরার জুলহিজ্জা মাসে শমসুদ্দিনের মৃত্যু হয় এবং তৎপুত্র সিকন্দর-শাহ বাদশাহ হন। ১৩৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর হইতে ১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে। তখন ১২৭৯ শকের অগ্রহায়ণ মাস। পুথীতে আছে, সে বৎসর ভাদ্র মাসে শমসুদ্দিনের মৃত্যু হইয়াছে। এই কয়েক মাসের অনৈক্য কাজের নয়। হয়ত ভাদ্র মাসে তাঁহার মৃত্যু আসন্ন হইয়াছিল,

রাজা কহে যেই জন তপঃসিদ্ধ হয়।
তাহার বয়স কভু না হয় নির্ণয় ॥
কিন্তু দেব দয়া করি কহ সত্য বাণী।
কে হয় সে আপনার রামী রজকিনী ॥
হাসিঞা কহিল চণ্ডী কি কব রাজন।
কারণ ব্যতীত কার্য্য নহে কদাচন ॥
একই সম্বন্ধ মোর রামিনী সহিতে।
যে সম্বন্ধ হয় তার জগতের সাঁথে ॥
অই দেখ মল্লরাজ কোথায় সে রামী।
কোথা হতে আইল এই হেরম্ব-জননী ॥
সাজ রাজা রণক্ষেত্রে চতুরঙ্গ দলে।
দেখা হবে এইবার সেই রণস্থলে ॥
এত বলি দ্রুতপদে চলি গেলা দোঁহে।
ভাসিতে লাগিল রাজা অপার সন্দেহে ॥
দূর হতে চণ্ডীদাস কহিলা রাজন।
করহ সংগ্রাম-স্থলে ত্বরিত গমন ॥
মহাবীর পরাক্রম ক্ষত্ররাজ তুমি।
বিনা যুদ্ধে বাহুড়িলে হবে অধোগামী ॥

করজোড় করি রাজা কহিলা তখন।
সঙ্গে মোর এস প্রভু মদন-মোহন ॥
ভোজ-রাজ পুরী এই ছত্রিনা নগর।
কি জানি কি হতে হয় সমর ভিতর ॥
হইল আকাশবাণী শুনরে গোপাল।
যে হিংসিবে তোরে আমি তার মহাকাল ॥
সকলি আমার হাতে রাখিয়াছি পুরি।
কে কারে রাখিতে পারে আমি যদি মারি ॥
তোমার বিপদ যদি ঘটে রণস্থলে।
পলকে প্রলয় আমি ঘটাব তাহলে।
আবার কে কহে উচ্চে পূরব আকাশে।
পলাও গোপাল-সিংহ আপনার দেশে ॥
এস না সংগ্রামে অই চাটুবাক্যে ভুলি।
ছত্রিনা-নগর রক্ষে প্রচণ্ডা বাসলী ॥
তাহারে জিনিবে রণে হেন সাধ্য কার।
বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর পূজা করে যার ॥
আমি যদি রণে তোর বধিরে জীবন।
কি করিতে পারে তোর মদন-মোহন ॥
রাজা কহে কে তুমি কি বলিছ আমারে।
প্রাণ-ভয়ে রণ ত্যজি পলাইব ঘরে ॥
যে হও সে হও রণে দেখাইব আজ।
ক্ষত্রিয়ের পুত্র আমি এই মল্লরাজ ॥
তুমিই ত ছিলে মাগো রাবণের ঘরে।
কেন সে মরিলা তবে শ্রীরামের শরে ॥
গো-সিংহ যে ছিলা তোর প্রাণের দোসর।
কেন তবে পার্থ-করে গেল যমঘর ॥৩৩

অথব বিষ্ণুপুরে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ আসিয়াছিল। এই বৎসর আশ্বিন মাসে মল্লেশ্বর ছাতনা আক্রমণ করিয়াছিলেন। তখন চণ্ডীদাসের বয়স তেত্রিশের কোলে। ১২৪৬ শকের চৈত্র মাসে চণ্ডীদাসের জন্ম হইয়া থাকিলে ১২৭৯ শকের আশ্বিন মাসে তাঁহার বয়স ৩২ বৎসর ৬ মাস হইয়াছিল, তেত্রিশ পূর্ণ হয় নাই।

পুথীতে আর এক কথা আছে। ফিরোজ-শাহ মল্লরাজ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেটি শমসুদ্দিনের মৃত্যুর পূর্বের ঘটনা। ১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ফিরোজ-শাহ বঙ্গদেশে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, সে সময়ে মল্লভূমেও আসিয়া থাকিতে পারেন। গৌড়ের ইতিহাসে ইহার উল্লেখ নাই। উদয়সেন মল্লরাজ-'পেতা' দেখিয়াছিলেন। পুথীতে পরে সে কথা আছে। অতএব ১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ ১২৭৫।১২৭৬ শকে মল্লভূমি-আক্রমণ সহসা অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না। ভারতের ইতিহাসে আছে ১২৮২ শকে, ১৩৬০ খ্রিষ্টাব্দে ফিরোজ-শাহ পাণ্ডুআ দ্বিতীয় বার আক্রমণ করিয়া সিকেন্দর-শাহের সহিত সন্ধি করেন। সে বৎসর ফিরোজ-শাহ ওড়িষ্যা জয় করিতে গিয়াছিলেন, প্রত্যাবর্ত্তন কালে মল্লভূম আক্রমণ করিয়া থাকিতে পারেন। এটিও সত্য মনে হয়। কারণ পদ্মলোচন শর্মা 'বাসলী মাহাত্ম্যে' লিখিয়াছেন, ছাতনার রাজা হামীর-উত্তর ম্লেচ্ছ-ভূপতির হস্তে পাশ-বদ্ধ হইয়াছিলেন। বাসলীর কৃপায় রাজা পাশ-মুক্ত হন। শত বৎসর পূর্বে ছাতনা-বাসী রাধানাথ-দাস লিখিয়াছিলেন, এক ম্লেচ্ছভূপতি রাজাকে মেদিনীপুরে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ফিরোজ-শাহ প্রত্যাগমন পথে বীরভূমের রাজাকে পরাজিত করেন। রাজা সন্ধি করেন। (শ্রীযুত নলিনীকান্ত-ভট্টশালী-কৃত Coins and Chronology of the early independent Sultans of Bengal পুস্তক দ্রষ্টব্য।)

৩৩) গো-সিংহ নামে এক দুর্দ্দান্ত অসুর পার্বতীর আশ্রিত ছিল, কিন্তু অর্জুনের হস্তে নিহত হয়। মহাভারতের বিরাট পর্বে শমীবৃক্ষতলে অর্জুন বিরাট-রাজপুত্র উত্তরের জিজ্ঞাসায় তাঁহার দশ নামের উৎপত্তি বলিয়াছিলেন। বিজয় এক নাম। সংস্কৃত মহাভারতে কিম্বা কাশীদাসী মহাভারতে সে উৎপত্তি বর্ণিত নাই। ওড়িয়া কবি সারলা দাস ওড়িয়া মহাভারতে গো-সিংহের যুদ্ধ লিখিয়াছেন। তাহার বঙ্গানুবাদ বিষ্ণুপুর অঞ্চলে প্রচারিত ছিল। তথাকার সন ১২৬০ সালে লিখিত পুথী হইতে যুদ্ধ-বৃত্তান্ত সংক্ষেপ করিতেছি। কৃষ্ণ যত যাদব যাদবী লইয়া রৈবতক পর্বতে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পৃথিবীর যত রাজা নিমন্ত্রণ পাইলেন। সাত্যকি দেবলোকে যাইয়া দেবগণসহ ইন্দ্রকে নিমন্ত্রণ দিলেন। ইন্দ্র চিন্তিত হইলেন, তিনি দেবগণসহ যজ্ঞ-স্থলে গেলে প্রবল-প্রতাপ গো-সিংহ সুরপুর লণ্ডভণ্ড করিবে। সুর-গুরু বৃহস্পতির যুক্তিতে

চলিনু এবার আমি রণযাত্রা করি।
তুমিও আইস মাগো নিজ রূপ ধরি ॥
এই কহি আগে রাজা সৈন্য পিছে চলে।
কেহ গজে কেহ অশ্বে কেহ চতুর্দ্দোলে।
উঠিল চৌদিকে ঘন [ ] ধ্বনি।
গর্জ্জিল কামান শত কাঁপায়ে মেদিনী ॥
ভাঙ্গিল সবার ঘুম দুম দুম নাদে।
কেহ দেখে দ্বার খুলি কেহ উঠি ছাদে ॥
ক্ষণে দ্বার রুদ্ধ করি ছাদ হতে নামি।
পশে গিঞা পুর-মধ্যে যুদ্ধ-যাত্রী জানি ॥
কতক্ষণ পরে রাজা চাহে চতুর্ভিতে।
সমুখে আলোক ছটা পাইল দেখিতে ॥
রবির সমান তার নি ··· ···।*
২১০/] পাশে তার রহে খাড়া একটি যুবতী ॥
ভুবন-মোহিনী রূপে তুলা নাহি তার।
নীল বাসে আঁটা কটি গলে চন্দ্রহার ॥
নাসায় বেসর ঝুলে কর্ণেতে কুণ্ডল।
কেয়ূর কঙ্কণ করে করে ঝলমল ॥
নড়িতে চড়িতে বাজে কটিতে কিঙ্কিণী।
চরণে সঘনে হয় নূপুরের ধ্বনি ॥
পৃষ্ঠে দুলে কেশ-পাশ যেন ঘন-ঘটা।
মাথায় মুকুট শোভে বিদ্যুতের ছটা ॥
দক্ষিণ করেতে ধরা খরতর অসি।
অগ্নি-ভরা আঁখি মুখে অট্ট অট্ট হাসি ॥
কহে রাজা করপুটে করিঞা প্রণাম।
কি রক্ষিছ হেথা মাগো ত্যজি বিশ্বধাম ॥
বিশ্বের জননী তুমি একি তব রীতি।
নয় কি গোপাল-সিংহ তুমার সন্ততি ॥
এক পুত্র হামীরের করিতে কল্যাণ।
আর পুত্র গোপালেরে দিবি বলিদান ॥
আকাশের চাঁদ পাড়ি দিবি এক পুতে।
আর সুতে দিবি বিষ মাখি দুধে ভাতে ॥
ক্ষত্র আমি বিনা যুদ্ধে কেমনে মা ফিরি।
ক্ষত্রিয়ের রীতি এই মারি কিম্বা মরি ॥
মা হঞে সন্তানে বধ অতি বড় সোজা।
কিন্তু বহা কঠিন সে কলঙ্কের বোঝা ॥
এই দণ্ডে ত্যজ মোর বন্দী সেনা-দলে।
ছাড় পথ যাই আমি সংগ্রামের স্থলে ॥
দেবী কহে জানি আমি শক্তির যে লীলা।
ভূতনাথ পতি তার ভূত সঙ্গে খেলা ॥
তেঞি তুমি নিজ রাজ্যে করিলে ঘোষণ।
কেহ যেন নাহি করে শক্তির পূজন ॥
মাতালের মাতা তিনি ডাকুর পূজিতা*।
মদিরা মহিষ ছাগ রক্তে হরষিতা ॥
নর-রক্ত হলে হয় আরো প্রীতি তার।
হেন রাক্ষসীর পূজা না করিহ আর ॥
এত শক্তি যদি তোর জন্মিয়াছে মনে।
আমারে আরতি তুই করিস কেমনে ॥
ক্ষত্র হয়ে মিথ্যা কথা ধিক্ দুরাশয়।
শক্র হঞে পুত্র বলি দিস পরিচয় ॥
বিধিমতে সাজা তার আজি তুমি পাবে।
ধর অস্ত্র কর রণ স্মরি ইষ্টদেবে ॥

সাত্যকি বিপদে পড়িয়া গো-সিংহকেও নিমন্ত্রণ দিলেন। মানুষ-ভক্ষণের লোভে অসুর যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইল, কৃষ্ণ চিন্তায় আকুল। গো-সিংহ তিন লক্ষ রাজাকে গিলিয়া ফেলিল, ছাপান্ন কোটি যদু-বংশকে সমুদ্রে ডুবাইল, কৃষ্ণ বলরামকে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিল। রৈবতক পর্বতে একটি মানুষ রহিল না। গো-সিংহ রূপবতী সত্যভামাকে রথে লইয়া স্বরাজ্যে যাত্রা করিল, সত্যভামা কৃষ্ণসখা অর্জুনকে ডাকিতে লাগিলেন। তখন অর্জুন প্রভাসতীর্থে তপস্যা করিতেছিলেন। অর্জুন জানিতে পারিয়া পাশ-ভেদী বাণ দ্বারা গো-সিংহের রথ আটকাইলেন। দুই জনের ভীষণ সংগ্রাম হইল। তেত্রিশ কোটি দেবতা থর্-থর কাঁপেন, সপ্তদ্বীপা পৃথিবী টল্-মল করেন, সপ্ত সাগরের জল উথলিয়া পড়ে। অর্জুনের ব্রহ্মাস্ত্রও নিষ্ফল হইল, অসুরের কাটা মুণ্ড যোড়া যাইতে লাগিল। অর্জুন শূন্য-বাণী শুনিলেন, গো-সিংহ পার্বতীর বর-পুত্র, তাহার মৃত্যু-শর পার্বতীর উদরে আছে। অর্জুন মন-ভেদী বাণ দ্বারা ত্রিলোচনের চরণে নিবেদন করিলেন। শিবের স্তবে তুষ্ট হইয়া পার্বতী মৃত্যু-শরটি দিলেন, মন-ভেদী অর্জুনের হাতে আনিয়া দিল। গো-সিংহ রাজাদিকে উদর হইতে বাহির করিল, যদু-বংশকে সমুদ্র হইতে তুলিল, কৃষ্ণ বলরামকে অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার করিল। পরে অর্জুনের হস্তে তাহার নিপাত হইল। সত্যভামা অর্জুনের নাম বিজয় রাখিলেন। "অর্জুনের বিজয় নাম এত দূরে সায়। সারদা সেবিয়া সে সারল কবি গায় ॥" সারলা-দাস। পঞ্চদশ খ্রিষ্টাব্দশতকে ছিলেন। তৎ-কৃত মহাভারত মধ্যপর্বে উপাখ্যানটি আছে, কিন্তু বঙ্গানুবাদের সহিত অবিকল ঐক্য নাই।

* পাতাখানির দক্ষিণ ধার স্থানে স্থানে ছিন্ন।

* ডাকু, ডাকাইৎ। ওড়িয়াতে ডাকু।

রাজা কহে কি যে বল মৃত্যু যার সখা।
যার সনে রণে বনে নিত্য হয় দেখা ॥
তার নাম করি মোরে কি দেখাও ভয়।
বার বার কত মাগো দিব পরিচয় ॥
মোরে কহ মিথ্যাবাদী বুঝিনু ভবানী।
সঙ্গদোষে সব গুণ হারাঞেছ তুমি ॥
পরম বৈষ্ণবী তুই তেঁই এক কালে।
ছিল চেষ্টা যাহে তোরে না পূজে মাতালে ॥
না পূজে দস্যুর দল ছাগ মেষ দিয়া।
নর-রক্তে না পূজে সে নর কপালিয়া* ॥
উল্টা বুঝি এলি তুই মল্লরাজ্য লাগি।
ধর্ম্ম করি হইনু আমি অধর্ম্মের ভাগী ॥
ক্ষত্র রয় পড়ি যদি মৃত্যুশয্যাপরে।
তার স্থানে রণ বাঞ্ছা যদি কেহ করে ॥
বিকার কাটিয়া সেই উঠে সেইক্ষণে।
২২৮] আমি তবে বিমুখিব তোরে বা কেমনে ॥
মরণ নিশ্চিত মোর তোর করে জানি।
তত্রাপি সতর্ক হও তুমি কাত্যায়নী ॥
যন্ত্রণার সীমা আছে আমার মরণে।
তোর কিন্তু নাহি সেই মৃত্যুহীন প্রাণে ॥
তেঁই বলি সাবধানে কর শ্যামা রণ।
সংগ্রামে নামিল ক্ষত্র করি প্রাণপণ ॥
অসিতে অসিতে যুদ্ধ হয় ঘোরতর।
স্বর্গে কাঁপে দেবগণ মর্ত্তে কাঁপে নর ॥
মুহুর্মুহু হুহুঙ্কার ছাড়ে দুই জন।
প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জ্জে ঘনে ঘন ॥
সামাল সামাল রাজা হাঁকে ক্যাত্যায়নী।
রাজা কহে আপনারে সামাল কল্যাণী ॥
হাঁক দিয়া হৈমবতী কহে অট্টহাসি।
মাথার মুকুট রাজা পড়িল যে খসি ॥
রাজা কহে বাতাঘাতে পড়িল তা জানি।
কিন্তু যে ছিঁড়িল তোর কটির কিঙ্কিণী ॥

এই মতে দুই জনে হয় ঘোর রণ।
বিষ্ণুপুরে জানিলা তা মদন-মোহন ॥
ভৈরব ভৈরব বলি হাঁকে হরপ্রিয়া।
গর্জ্জিঞা ভৈরব তথা উত্তরিল গিঞা ॥
আঁকড়ে বাঁধিঞা ভূপে তুলি শূন্য ভাগে।
লঞা যায় বন্দীশালে পবনের বেগে ॥
কৃতাঞ্জলি-পুটে রাজা কহিলা তখন।
রক্ষা কর আসি মোরে মদন-মোহন ॥
ভয় নাই ভয় নাই বলিতে বলিতে।
মদন-মোহন আসে গদা-চক্র হাতে ॥
শিরপরে কাঁপে ঘন শিখি-পুচ্ছ-চূড়া।
বনমালা সুশোভন গলে গুঞ্জ-বেড়া ॥
পীতাম্বর আঁটা কটি কমল-লোচন।
ভক্ত-মনোহর শ্যাম মদন-মোহন ॥
মুখে সদা হারেরেরে হারেরেরে রব।
মাভৈঃ মাভৈঃ হাঁকে ভৈরবী ভৈরব ॥
শ্যাম শ্যামা দোঁহে যবে হইল দেখাদেখি।
কি অপূর্ব্ব ভাবে তারা অশ্রুপূর্ণ আঁখি ॥
কিন্তু ক্ষণে ঘনশ্যাম মুছিঞা নয়ন।
বাসলীরে কহে কিছু কর্কশ বচন ॥
তমোগুণে পূর্ণ তুমি হঞা হৈমবতী।
একেবারে খোয়াঞিবি বিষ্ণুর শকতি ॥
জানি তোর ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু জ্ঞান নাঞি।
অসুর-দলনে তোরে জন্ম দিনু তাঞি ॥
মোর রণে তোর আজি দর্প হবে চুর।
দেবী কয় এস মোর মাথার ঠাকুর ॥
সত্য তুমি ধর্ম্মময় কিন্তু কোন কাজে।
কিঞ্চিদপি ধর্ম্ম তব নাহি পাই খুজে ॥
মাতৃ-বক্ষ হতে ছিনি পুত্রে কর নাশ।
এ কেমন ধর্ম্ম তব কহ শ্রীনিবাস ॥
লঙ্কার রাবণ হয় তাহার প্রমাণ।
আমি মাতা তুমি ঘাতা রঘুবর রাম ॥
চোরাঘাতে বধি তুমি বালীর জীবন।
কেমনে করিলা প্রভু ধর্ম্মের রক্ষণ ॥

---

* কপালিয়া, কাপালিক।

পতিব্রতা তুলসীর সতীত্ব হরণ।
কোন ধর্ম্মমতে কর কহ নারায়ণ॥
চন্দ্রচূড় সহ রণে জীবন হারায়।
তোমার পরম ভক্ত শঙ্খচূড় তায়॥[৩৪]
মনে আছে ভুলি নাঞি তুমি ভিক্ষা ছলে।
দান-বীর বলি রাজে দিলে রসাতলে॥
এইরূপ সর্ব্বনাশ যার যথা হয়।
সকলের কর্ত্তা তুমি জানি গুণময়॥
প্রভু কন মর্ম্ম কথা রাখিয়া গোপনে।
বাহিরে আমার নিন্দা করিস কেমনে॥
জীব-নাশে মহাপাপ সর্ব্বলোকে কয়।
একমাত্র তোর মতে ঘটায় সংশয়॥
তেঁই তোর নিত্য পূজা হয় তোর মতে।
ছাগ মেষ মহিষ গণ্ডার নরঘাতে॥
দুই সিংহ কখনও না রহে এক বনে।
হবে তার প্রতিকার আজিকার রণে॥
ধরিলাম এই আমি চক্র সুদর্শন।
খড়্গ ধরি হৈমবতী অট্টহাসি কন॥
যাক সৃষ্টি ডুবি তবে প্রলয়ের জলে।
পড়ুক খসিঞা চন্দ্র সূর্য্য এক কালে॥
ডুবে যাক তমোগর্ভে নিখিল ভুবন।
পূর্ণ হোক তব ইচ্ছা শ্রীমধুসূদন॥
বলি খড়্গ যেমন ক্ষেপিবে কাত্যায়নী।
উর্দ্ধশ্বাসে এল ছুটি চণ্ডীদাস রামী॥
করে করে দুই জনে করিয়া ধারণ।
বারংবার কহে কর ক্রোধ সংবরণ॥
ক্ষান্ত হও রাধাকান্ত ধরি শ্রীচরণে।
দানব-দলনী শ্যামা ক্ষমা দে মা রণে॥
এত কহি করপুটে করে বহু স্তব।
নীরবেতে রয় শ্যামা শ্রীরাধা-বল্লভ॥
স্তবে তুষ্ট হঞে তবে করি স্থির মতি।
সম্বরিলা দোঁহে এবে দোঁহার মূরতি॥

শ্যামা গেল রামী-হৃদি বারাণসীধামে।
শ্রীকান্ত পশিলা চণ্ডী-হৃদি বৃন্দাবনে॥
অতঃপর আনি সেথা হামীর-উত্তরে।
সমর্পিলা চণ্ডীদাস মল্লরাজ-করে॥
মহানন্দে কোলাকুলি করে দুই জন।
বহুমতে পরস্পর কৈল সম্ভাষণ॥
চণ্ডী কহে আজি হতে হামীর-উত্তর।
তোমার হে মল্লরাজ হইল দোসর॥
কহিলা গোপাল-সিংহ আমার এখন।
হইল লক্ষণ ভাই হামীর রাজন॥
সমভাগী হইনু তার বিপদে সম্পদে।
এই কথা বারম্বার নিবেদিনু পদে॥
হামীর-উত্তর কহে হে মল্ল-রাজন।
মম রাজ্য তব পদে কইনু সমর্পণ॥
আজ্ঞাকারী হঞে তব রব আজীবন।
কি আছে কি দিঞা পূজি তোমার চরণ॥
চণ্ডীদাস কহে পুন শুন নরমণি।
বারবার অঙ্গীকার করিতেছি আমি॥
রাস দোল পূর্ণিমার নিশি প্রতি সন।
আমি রামী বিষ্ণুপুরে করিব গমন॥
প্রভাত না হতে নিশি যাহ ত্বরা করি।
সৈন্যগণে লঞা রাজা নিজরাজ্যে ফিরি॥
লোকে জানাজানি জেন না হয় সম্প্রতি।
পহুঁছিবে রাজ্যে রাজা থাকে যেন রাতি॥
এত শুনি মল্লরাজ চলিলা তখন।
নিজ রাজ্য অভিমুখে লঞা সৈন্যগণ॥
এইরূপে টুটিল সবার গণ্ডগোল।
বল সবে একবার হরি হরি বোল॥
রাসমণি চণ্ডীদাস হইয়া সম্প্রীত।
মনের আনন্দে তবে ধরিলা সঙ্গীত॥

* | * | *

সঙ্গীত। চণ্ডীদাস

২৩/] প্রভাত হইল গভীর রাতি অই উষা জাগে ধীরে।
আর কেন রবে আঁধার প্রবাসে এস প্রিয়তম ফিরে॥

৩৪) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উপাখ্যানগুলি দ্রষ্টব্য।

আঁখি হতে যদি গেছে ঘুম ঘোর
রাখিব না বাঁধি করিব না জোর
প্রেমরণে আজি পরাজয় মোর মাগি লব নতশিরে ॥
রচেছি মিলন-বাসর তুমার স্বজন প্রলয় যেথা একাকার
মায়াময় ভব-পারাবার পার এ মম বক্ষ নীড়ে ॥

সঙ্গীত। রাসমণি।

রে মেরি চিত্ত-চোর।
নিঠুর নাগর দেহত ফিরায়ে প্রাণ।
কহা নাহি যায়রে দেয়ল কত দুখ
কটু কহল কত আন ॥
অবহু পড়ে মনে সুন্দর সেঁইঞা* তুহু
ভাসল কত ঘন রোদইরে।
সোহি চাঁদনি তলে কাল আঁখিয়া জলে
ভাসল কত স্নেহ চুম্বইরে ॥
হওল গত সব তুহু রহল নারে
হাম রহল আজু দূরে।
মাত্র রহল বঁধু মিলন-স্মৃতি-মধু
ডুবল প্রেম-ভুরি চিরতরে ॥
মিলন মেলাপর যাবত না জাহাঁ [ ]
করহু তুঁহারি ধ্যান।
তুহু ত দিনমণি হাম কমলিনী
দোঁহারি এক অবসান ॥

* | * | * (ক্রমশঃ)

* সেঁইঞা, সইঞা, স' স্বামী হইতে অর্থ বঁধু।

এলাহাবাদে ফলসংরক্ষণ-শিক্ষা

শ্রীমনোরমা চৌধুরী

গত মে মাসে এক দিন খবরের কাগজে দেখলাম যে যুক্ত-প্রদেশের ফল-উৎপাদকদের সমিতি ফলসংরক্ষণ-প্রণালী শিক্ষার একটি ক্লাস খুলবেন। দশ দিনের ভিতরে প্রাথমিক শিক্ষা যত দূর সম্ভব দেওয়া হবে। যা-যা শেখান হবে ও যাঁরা শেখাবেন, খবরের কাগজে তার তালিকা দেওয়া ছিল। আমাদের বাড়ীতে সকলেরই খুব লোভ হ'ল এলাহাবাদ গিয়ে ফলসংরক্ষণ-প্রণালী শিখে আসার। সে সময়ে গরমের ছুটি ব'লে স্কুল-কলেজও বন্ধ ছিল। সব রকম সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের যাওয়া হয়ে উঠল না; কারণ ক্লাস খুলবার মাত্র দু-দিন আগে আমরা জানতে পেরেছিলাম।

ফলসংরক্ষণ-প্রণালী শিক্ষার জন্য অনেক লোকের কাছ থেকে আবেদনপত্র ফল-উৎপাদকদের সমিতিতে এসেছিল। এলাহাবাদের ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া যুক্ত-প্রদেশের অন্যান্য ছোট-বড় শহর থেকে অনেক ছাত্র ও আচার-মোরব্বা-ব্যবসায়ীরা আসতে চাইছিলেন। সেজন্য দশ দিনে একবার 'কোর্স' শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার ক্লাস খোলা হ'ল। আবার দশ দিন পরে যখন তৃতীয় বার ক্লাস খোলা হ'বে আমরা জানতে পারলাম, তখন আমরা এলাহাবাদে যাবার ব্যবস্থা করতে লাগলাম। সময় অত্যন্ত অল্প থাকাতে 'যা থাকে কপালে' ব'লে আমরা সমিতির সভাপতি পণ্ডিত মূলচন্দ মালবীয় মহাশয়কে আমাদের যাবার খবর দিয়ে একটি টেলিগ্রাম ক'রে দিলাম ও উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে পরদিন ভোরবেলা এলাহাবাদ অভিমুখে যাত্রা করলাম। ঠিক যাবার মুখে আমার ভাই-বোনের উৎসাহ কমে এল, তাই কেবল মা আর আমি এলাম।

কাশী থেকে এলাহাবাদ প্রায় আশী মাইল দূরে। অত কাছে ব'লে আমরা সকাল সাড়ে আটটার মধ্যেই রামবাগ ষ্টেশনে পৌছলাম। আকাশে মেঘের গর্জ্জন ও বিদ্যুৎ চমকানোর অভাব ছিল না। আমরা ট্রেন

থেকে নামতেই বেশ এক পসলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। ভাগ্যক্রমে আমাদের আত্মীয়ের বাড়ী অনতিদূরেই ছিল, তাই বেশী ভিজতে হ'ল না।

বাড়ী পৌঁছে অল্প জিরিয়ে আমরা পণ্ডিত মালবীয়ের সঙ্গে দেখা করতে বেরলাম। অনেক দূরে চকের গলির মধ্যে তাঁর বাড়ী। মালবীয়-পরিবারের অনেক লোকের সেখানে বাড়ী। আমরা তাই ভুলক্রমে অন্য একটি মালবীয়ের ওখানে গিয়ে উঠলাম। তাঁরা আমাদের সঙ্গে লোক দিয়ে পণ্ডিত মূলচন্দ মালবীয়ের বাড়ী পৌঁছে দিলেন। পরে জানতে পেরেছিলাম যে আমরা প্রথমে যাঁর বাড়ী গিয়েছিলাম তিনি কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের বড় ছেলে।

পণ্ডিত মূলচন্দ মালবীয় আমাদের অনেক আদর-আপ্যায়ন ক'রে বসালেন। আমাদের থাকার ও খাবার-দাবার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমরা বারণ করলাম। তিনি আমাদের ব'লে দিলেন যে কোন্ জায়গায় ক্লাস হবে ও কখন আমাদের যেতে হবে। আমার মা গত বৎসর ফল-উৎপাদকদের সমিতির দ্বারা একটি কাপ, একটি মেডেল, একটি সার্টিফিকেট পুরস্কৃত হয়েছেন শুনে খুব খুশী হলেন—বললেন যদি প্রত্যেক বাড়ীতে মেয়েরা আচার, মোরব্বা ইত্যাদি তৈরি করে ও বাড়ীর ছেলেরা সেগুলি ফেরি ক'রে বিক্রী করে, তাহ'লে বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান আপনিই হয়ে যাবে। যে-সব ছাত্র এর পূর্ব্বে এখান থেকে পাস ক'রে বেরিয়েছে তাদের দিয়ে তিনি বাড়ী-বাড়ী পাঠিয়ে ক্লাসে প্রস্তুত অনেক জিনিষ বিক্রী করিয়েছেন। পণ্ডিতজী আমাদের বার-বার ব'লে দিলেন, যে, ফলসংরক্ষণ-প্রণালী কেবলমাত্র সখের জন্য যেন না শিখি। যদি আচার মোরব্বা বিক্রী করতে আমাদের বিশেষ আপত্তি থাকে তাহ'লে যেন অন্য গরিব লোকদের শেখাই।

আমরা পণ্ডিতজীর কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ী এলাম। একটা টংগা ঠিক করা হ'ল আমাদের রোজ সিটি এংলো-ভার্ণাকুলার স্কুলে পৌঁছে দেবার ও বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে আসবার জন্য। ঐ স্কুলেই আমাদের ক্লাস হওয়া স্থির হয়েছিল। পরদিন সকাল সাড়ে ছ'টার সময় সেখানে গিয়ে দেখি যে অনেক ছেলেমেয়ে এসেছে। অধিকাংশ মেয়ের সঙ্গে আমার আগে থেকে পরিচয় ছিল ব'লে বেশ সুবিধা হ'ল।

সাতটা বেজে যাবার পর আমাদের ক্লাস আরম্ভ হ'ল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন ফলরক্ষার উপযোগিতার বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন যে প্রতি বৎসর বিদেশ থেকে ক্রোরাধিক টাকার ফল ও ফল হ'তে প্রস্তুত নানাবিধ বস্তু চালান আসে, অথচ আমাদের দেশের ফল ঠিক করে রাখতে না জানার জন্য নষ্ট হয়। ভারতবর্ষে নানা প্রকার জমি ও ঋতুর সমাবেশ হওয়ায় ও এখানকার মাটি বিশেষ উর্ব্বরা ব'লে প্রচুর পরিমাণে নানা প্রকার ফল উৎপন্ন হয় ও হ'তে পারে। আমরা বিদেশকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিই, কিন্তু উপযুক্ত বিক্রয়-ব্যবস্থার অভাবে আমাদের দেশের ফল নষ্ট হচ্ছে এবং লোকেও অনাহারে মরছে। ফলরক্ষার ব্যবসায়ে লাভবান্ হওয়া সহজ, কিন্তু আমাদের দেশের বি-এ এম-এ পাস-করা ছেলেরা পনর টাকার একটি চাকরির জন্য লালায়িত হয়ে থাকে। ফলরক্ষা-ব্যবসায়ে প্রধান সুবিধা এই যে অল্প মূলধনে সুরু করা যায়, আবার পরে অল্প অল্প ক'রে বাড়িয়ে বড় কারবারে দাঁড় করানও যেতে পারে।

এই ব্যবসায়ে অসুবিধা যে নেই তাও নয়। আমাদের সবচেয়ে মুস্কিল এই যে, এখানে টিন বা বোতলের কোন কারখানা নেই। বিদেশ থেকে যে-টিন আসে সেগুলি কলকাতা থেকে এলাহাবাদে আনতে আট-দশ পয়সা প্রত্যেকটির দাম পড়ে যায়। এত বেশী দামে টিন ব্যবহার করলে আমরা বিদেশী পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে যাব। নিজেদের টিন-ফ্যাক্টরী থাকলে টিন সস্তা হবে, কারণ শুল্ক বসানর জন্যও বিদেশী টিনের দাম বেশী। কাছাকাছি টিনের কারখানা থাকলে আনাবার খরচ বেশী হবে না ও শুল্ক প্রভৃতি ত বেঁচেই যাবে।

আমাদের আর একটা অসুবিধা এই যে এদেশের বেশীর ভাগ লোক ফলের উপকারিতা সম্বন্ধে খুব সচেতন নন। এক মাত্র বড়লোকেরাই বিদেশী টিনে-বন্ধ ফল খেতে পারেন। মধ্যবিত্ত লোকেরা ফল খুব সস্তা হ'লে কেনেন, কিন্তু ফলকে খাদ্যদ্রব্য বলে ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনেন না। পেয়ারা, কুল, ও আম ইত্যাদি এদেশে প্রচুর

পরিমাণে হয়, ও দামও বেশী নয়। কিন্তু ফল যতটা ব্যবহার করা উচিত তা হয় না। বারমাস নিয়ম ক'রে ফল খাওয়ার রেওয়াজ আমাদের দেশে নেই। পাড়াগাঁয়ে কত সময় ফল মাটিতে পড়ে থাকে, নষ্ট হয়ে পচে গিয়ে রোগের বীজাণুর আড়ত হয়ে দাঁড়ায়। ক্ষীর রাবড়ি ও অন্যান্য মিষ্টান্নতে আমরা যত টাকা খরচ করি, তার অর্দ্ধেক বা সিকি ভাগ দিয়েও ফল কিনলে আমাদের স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি হবে।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহনের বক্তৃতা হয়ে যাবার পর শ্রীযুক্ত প্রেমবিহারী মাথুর ফলসংরক্ষণের কয়েকটি প্রধান প্রণালী আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। মিষ্টার মর্গানের ফলের চাষ সম্বন্ধে কিছু বলবার কথা ছিল, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ তিনি আসেন নি। মাথুর-মহাশয়ই তার পরিবর্ত্তে বক্তৃতা দিলেন। ফলের চাষের বিষয়ে তাঁর খুব ভাল জানা ছিল না, তাই তিনি অন্য বই থেকে পড়ে শোনালেন। তবে এটা তিনি বার-বার জোর দিয়ে বললেন যে আমাদের দেশে যদি ফলসংরক্ষণ একবার আরম্ভ হয় তাহলে ফলের বেশী চাহিদা হবার সঙ্গে সঙ্গে ফল-উৎপাদন করতে চাষীদের আপনা থেকেই উৎসাহ বেড়ে যাবে।

তার পর জ্যাম, জেলি, চাটনি, আচার মোরব্বা, কন্জার্ভ্স্, প্রিজার্ভ্স্, ক্যাণ্ডি, ফলের রস, সিরাপ, কর্ডিয়্যাল, ও সির্কার (vinegar) প্রভেদ আমাদের বলা হ'ল। আমাদের ক্লাসে একটি বৃদ্ধ লোক ছিলেন। তিনি জেলি কা'কে ব'লে জানতেন না। তাঁকে জেলি চাখতে দেওয়া হ'ল ও অন্যান্য জিনিষও অনেকে চেখে দেখতে লাগলেন।

আমাদের ব্যবহারের জন্য সামনে খুব বড় একটা টেবিলের উপর একটা চেম্বারল্যাণ্ড অটোক্লেভ বা প্রেস্যর কুকার, একটি ক্যান সীমিং মেশিন, হাইড্রোমিটার, থার্মো-মিটার (ফারেনহিট) ও স্প্রিং ব্যালান্স রাখা ছিল। সেগুলি কেমন ক'রে ব্যবহার করতে হয় আমাদের দেখান হ'ল। এই সব যন্ত্রের সাহায্য না নিয়েও কাজ চলতে পারে, কিন্তু থাকলে কাজের সুবিধা হয়। বাড়ীতে করতে হ'লে একটি ছোট স্প্রিং ব্যালান্স ও একটি থার্মোমিটারের সব সময়ে দরকার হ'তে পারে। এ জ্বর-দেখবার থার্মোমিটার নয়; দেখতে মোটা ও লম্বা; শুধু মুখের কাছে যেখানে পারা জমে থাকে, সেটি ফুটন্ত জল বা ফলের রস কিংবা জেলিতে ডুবিয়ে দিলে পারা গলে যায়। উপর থেকে দেখা যায় যে উত্তাপ কত হ'ল। একটু সাবধানে এই থার্মোমিটার ব্যবহার করা দরকার, কারণ তার পারা-অংশটা যদি পাত্রের গায়ে ঠেকে যায়, তাহলে ফেটে যাবার সম্ভাবনা। আমরা যেটা দিয়ে কাজ করতাম সেটাতে 400° F. পর্য্যন্ত উত্তাপ দেখবার দাগ করা ছিল।

সেদিনকার মত ক্লাস সাঙ্গ হ'লে পরদিন শ্রীযুক্ত মেহতা ক্লাস নিলেন। তিনি ফল পচে যাবার কারণ সম্বন্ধে নোট লেখালেন ও পচন কয় রকমের হয় তার নমুনা আমাদের দেখালেন। আচার, জেলি প্রভৃতি তৈরি করবার ও রাখবার জন্য আমরা কোন্ ধাতু ব্যবহার করব সে-বিষয়ে সাবধান ক'রে দিলেন। অম্লের সংস্পর্শে এসে প্রত্যেক ধাতুর একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া হয়। সাধারণ ভাষায় একে কলঙ্ক-পড়া বলে। আচার-মোরব্বা তৈরি করার সময়ে কাঁচের আস্তরণ-দেওয়া ধাতুপাত্র হ'লে সবচেয়ে ভাল, কিন্তু তাহা ব্যয়সাধ্য ব'লে সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্য বাধ্য হয়ে আমাদের এলুমিনিয়মের পাত্র ব্যবহার করতে হবে, তবে পুরনো হয়ে গেলে সে এলুমিনিয়ম পরিত্যাজ্য। বিদেশ থেকে যে-টিনে ক'রে ফল আসে, তার ভিতরেও কোন একটি বিশেষ ধাতুর আস্তরণ থাকে ব'লে নষ্ট হয়ে যায় না।

স্থায়ী রূপে ফল রাখতে হ'লে কেমন ক'রে বীজাণুরহিত (sterilize ও pasteurize) করা আবশ্যক সে-কথাও তিনি বললেন। এজন্য দুটি বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমতঃ যে বীজাণু ফলে আছে সেগুলি নির্ম্মূল করা ও দ্বিতীয়তঃ যাতে বাইরে থেকে বীজাণু আর প্রবেশ না করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। অনেক সময় সেজন্য প্রতিষেধকেরও ব্যবহার কর[া] হয়। অন্যান্য ঔষধ ছাড়া নুন, চিনি, রাইসর্ষে, সর্ষে[র] তেল ও হলুদ বীজাণু-নাশকের কাজ করে। অল্প পরিমা[ণে] বোরিক এসিড বা সোডিয়ম বেনজোয়েট ব্যবহার কর[লে] জিনিষ ঠিক থাকে, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্য দেশসমূহে খাদ্যদ্রব্যে[] কোন প্রকার ঔষধের ব্যবহার অবৈধ।

সাড়ে আটটার পর মেহ্তা-মশায় আমাদের জ্যাম প্রস্তু[ত]

করবার প্রণালী ব'লে দিতে লাগলেন ও আমাদেরই ক্লাসের কয়েকটি ছেলে তৈরি করতে লাগল। পাকা ল্যাংড়া আমের জ্যাম যখন তৈরি হ'ল তখন আমাদের লোভ সম্বরণ করা কঠিন হয়ে উঠেছিল।

পরদিন গ্রহণ-উপলক্ষে আমাদের ছুটি ছিল। কুড়ি তারিখে নৈনি এগ্রিকাল্‌চারাল স্কুলের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চাঁদ আমাদের দিয়ে জেলি তৈরি করালেন ও নোট লেখালেন। অম্ল, পেক্‌টিন্‌ ও চিনি এই তিনটি জিনিষ দিয়ে জেলি প্রস্তুত হয়। এর মধ্যে একটি বাদ দিলে জেলি জমবে না। পেয়ারার জেলি করবার সময়ে লেবুর রস দেওয়া হয় এ-কথা জানতাম, কিন্তু কেন দেওয়া হয় সে-বিষয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাই নি। উনি বলবার পর বুঝলাম যে পেয়ারাতে অম্ল অল্প থাকাতে লেবুর রস দিয়ে তার কমতি পূরণ করা হয়।

নূতন শিক্ষার্থীদের জেলি করবার জন্য একটা থার্মোমিটারের বিশেষ দরকার। যাদের অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা আছে তারা হাত দিয়ে রসের গাঢ়ত্ব বুঝতে পারে। থার্মোমিটার থাকলে চট ক'রে নিশ্চিত ভাবে জানা যায় জেলির রস নামাবার উপযুক্ত গাঢ় হয়েছে কিনা। সাধারণতঃ ২১৮ থেকে ২২১ ডিগ্রী ফারেনহিটের মধ্যে উত্তাপ হলেই বোঝা যাবে যে নামাবার সময় হয়েছে ও জেলিতে চিনির ভাগ শতকরা ৬৫। জেলির মধ্যে চিনি শতকরা ৬৫ ভাগের কম হ'লে ২১৮ ডিগ্রী ফা. পর্য্যন্ত উত্তাপ হবে না এবং জেলিও জমবে না। অম্ল কিংবা পেক্‌টিন্‌ কম থাকলে ২২৪ ডিগ্রী ফা. পর্য্যন্ত উত্তাপ হয়ে যাবার পর ও জেলি ঠাণ্ডা হবার পর থকথকে হয়ে জমে যাবে না। পাক বেশী হ'লে আবার চটচটে হয়ে যায়, সেটিও একটা দোষ।

সেদিন মারমালেডও তৈরি করা হ'ল। জেলি ও মারমালেডে প্রভেদ এই যে শেষোক্ত জিনিষে ফলের খোসা—বিশেষতঃ কাগজী, পাতি ও কমলালেবুর খোসা—সমান ভাবে কেটে দেওয়া হয়। মারমালেডেরও জেলির মত স্বচ্ছ পরিষ্কার ও থকথকে হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। মারমালেডে খোসার পরিমাণ অবশ্য ক্রেতাদের রুচির উপর নির্ভর করে।

২১শে তারিখে মাথুর-মশায় আমাদের প্রিজার্ভস্‌-এর প্রণালী বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। সেদিন ক্যান সীমিং মেশিনটা অন্য কোন জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ব'লে কাজটি সম্পূর্ণরূপে শিখতে পারলাম না। বিদেশী প্রিজার্ভস্‌ ও আমাদের দেশী মোরব্বা একই জিনিষ, কেবল মোরব্বাতে চিনির পরিমাণ অত্যধিক। তাতে বেশী মিষ্টি হবার দরুণ ফলের আসল স্বাদ বা গন্ধ পাওয়া যায় না। কিন্তু সিঙ্গাপুর থেকে যে আনারস টিনে ক'রে আসে, সে দেখতে ও খেতে প্রায় তাজা ফলেরই অনুরূপ। মোরব্বাতে বেশী চিনি বাধ্য হয়ে দিতে হয়, কারণ উহা বীজাণুরহিতও করা হয় না ও অনেক সময়ে হাওয়ায় খোলা প'ড়ে থাকে। শতকরা ৬৫ ভাগ বা তার বেশী চিনি থাকলে কোন খাবার জিনিষ সাধারণতঃ পচে যায় না।

আমাদের দিয়ে সেদিন পেঠার অর্থাৎ চালকুমড়ার মোরব্বা তৈরি করা হ'ল, ফলে বাড়ী ফিরতে বারটা বেজে গেল, কেননা চালকুমড়া সিদ্ধ হতে বড় দেরি লাগে।

পরদিন মেহ্‌তা-মশায় আমাদের আচার ও চাটনির দেশী ও বিলাতী প্রণালী বললেন। বিলেতে আমের চাটনি ও পিক্‌লের খুব চাহিদা। ইংরেজদের রুচি বুঝে আচার চাটনি ওদেশে চালান করলে প্রভূত লাভের আশা আছে। ভারতবর্ষে যেসব আচার বিক্রী হয় তা অনেক সময়ে গন্ধক দ্রাবক (sulphuric acid) দিয়ে তৈরি। এতে জিনিষ সস্তায় ও শীঘ্র তৈরি হয়ে যায়। আমাদের দেশেও কিন্তু নিয়ম হয়ে যাওয়া উচিত যে খাবার জিনিষে কেউ কোন ওষুধ ব্যবহার করতে পাবে না। মেহ্‌তা-মশায় কয়েকটি ব্যবস্থা (recipe) লিখিয়ে দিলেন ও নিজের তৈরি কাঁচা ফলসার আচার দেখালেন। আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল থেকে আচার তৈরি করা হ'ত। এখন পর্য্যন্ত পুরুষানুক্রমে তা চলে আসছে।

আমাদের ক্লাসে অনেকের হাতে-কলমে কাজ করবার খুব উৎসাহ ছিল। তাঁদের জন্য বিশেষ ক'রে রোজ দুপুরবেলা প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাস হ'ত। সে-সময়ে যার যা ইচ্ছা তৈরি করত। বর্ষার জন্য তখন আম ছাড়া অন্য কোন টাটকা ফল পাওয়া যেত না, কিন্তু পণ্ডিত মালবীয় অনেক চেষ্টা ক'রে পাহাড়ী ফল—যেমন আলুচা, পীচ ও আপেল ইত্যাদি—জোগাড় ক'রে রাখতেন। এলাহাবাদের সমিতি এই ক্লাসের জন্য অনেক খরচ করেছেন ও এখনও

করছেন। ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা প্রস্তুত জিনিষগুলি অবশ্য নামমাত্র মূল্যে বিক্রী করা হয়।

কয়েক দিনের মধ্যেই জাম উঠল। তাই জামের রস বীজাণুরহিত ক'রে বোতলে সীল ক'রে রাখা হ'ল। জামের আরকের রং ভারী সুন্দর দেখতে ও জিনিষটা উপকারীও বটে। আমার মা আবার বাড়ীতে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন যে জামের রসে যথেষ্ট পেক্‌টিন আছে। তাই তিনি বাড়ীতে জামের জেলি তৈরি করলেন সেদিনই। চমৎকার জমেছিল, কিন্তু খেতে পেয়ারার জেলির মত অত ভাল নয়। পরদিন পণ্ডিতজী দেখে খুব খুশী হলেন ও বললেন, "এ-সব আপনাদেরই কাজ। আমরা শুধু থিওরি শেখাচ্ছি।"

২১শে তারিখে মাথুর-মশায় সির্কা তৈরি করবার প্রণালী বুঝিয়ে দিলেন। সির্কা করবার পূর্ব্বে ফলের রসকে মদে পরিণত করা একান্ত প্রয়োজন। সরকার থেকে অনুমতি না পেলে মদ্যব্যবসায়ীরা খামির বিক্রী করে না। সেজন্য আমাদের হাতে-কলমে সির্কা তৈরি করা দেখা হ'ল না। অবশ্য সির্কা হ'তে ত্রিশ-চল্লিশ দিনের উপর সময় লাগে।

সির্কা নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ—বিশেষতঃ ফিরিঙ্গীদের মধ্যে। বিলেতের কারখানাতে ফলের খোসা, বিচি, তরকারী এমন কি বাসন-ধোওয়া জল পর্য্যন্ত কিছুই না ফেলে সির্কা ক'রে নেওয়া হয়। তবে আজকাল খাঁটি সির্কা পাওয়া এক রকম অসম্ভব। যত দূর জানা গেছে ব্ল্যাক্‌ওয়েল কোম্পানীর সির্কা যব থেকে তৈরি ও খাঁটি জিনিষ। ভারতবর্ষীয় কোন বিশ্বস্ত সির্কা-ব্যবসায়ীর কথা জানা নেই। বাজারে সির্কা ব'লে যা বিক্রী হয় তা জল-মিশানো অ্যাসেটিক এসিড। সস্তা সির্কায় অ্যাসেটিক এসিড এত বেশী পরিমাণে থাকে যে তা ব্যবহার করলে গলা অল্প খুসখুস করে ও পরে স্বাস্থ্যহানি হয়। খাঁটি সির্কা অল্পমূল্যে পাওয়া যাবে না ও তাতে শতকরা চার-পাঁচ ভাগের বেশী অ্যাসেটিক এসিড থাকা অসম্ভব।

পাড়াগাঁয়ে অনেকে সির্কা করবার জন্য ফলের রস রোদে রেখে দেয়, কিন্তু নিশ্চিত ভাবে আগে থেকে জানা যায় না যে ঐ ফলের রস সির্কাতে পরিণত হবে কি না। দৈবাৎ যদি খামিরের বীজাণু ফলের রসের মধ্যে যায়, তবেই সির্কা হ'তে পারে। তা না হ'লে ও-রসে ছাতা পড়বে ও পচে যাবে। অধিকাংশ ঐ রকম ফলের রসে সাদা সাদা মোটা মোটা পোকা জন্মায়। সেগুলি সন্তর্পণে ছেঁকে ফেলে বাজারে সির্কা ব'লে বিক্রী করে।

বাড়ীতে ভাল সির্কা খুব সহজে তৈরি করা যেতে পারে যদি উপযুক্ত শক্তির ইস্‌ট বা খামির পাওয়া যায়। পাউরুটি বা জিলিপি তৈরি করার জন্য যে খামির ব্যবহার হয়, তার বীজাণু অত্যন্ত দুর্ব্বল। সেই খামিরে প্রস্তুত সির্কাতেও সেজন্য ঝাঁজ বেশী থাকবে না। মদের জন্য যে খামির প্রয়োগ করা হয়, তা একবার জোগাড় করতে পারলে অনেক দিন পর্য্যন্ত অনায়াসে সির্কা বাড়ীতে করা যায়। আমরা রোজই ফল ও তরকারির খোসা ও বিচি ফেলে দিই। সেগুলির রস বার ক'রে নিলে খুব ভাল সির্কা হ'তে পারে। ইউরোপে, বিশেষ ক'রে জার্ম্মেনী ও ফ্রান্সে, এ-সব নষ্ট হ'তে পায় না। আমরা এত গরিব হয়েও এত জিনিষ কেমন ক'রে অপচয় করি, সেটাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

আমাদের ক্লাসে সবারই আসল সির্কার চাইতে কৃত্রিম সির্কা প্রস্তুত শিখতে বেশী ঝোঁক ছিল। মাথুর-মশায় হেসে বললেন যে বেশী লাভের প্রত্যাশায় অ্যাসেটিক এসিড দিয়ে সির্কা যেন না তৈরি করি। ফল-উৎপাদকদের সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্য ফলের ব্যবসায় দ্বারা দেশের আর্থিক উন্নতি। যারা এখান থেকে পাস ক'রে বেরবে ব্যবসায়ে সততা যেন তাদের মূলমন্ত্র হয়।

পরদিন তিনি আমাদের ফল ও তরকারি শুকিয়ে রাখার রীতি শেখালেন। যুক্ত-প্রদেশে কপি ও শালগম শুকিয়ে রেখে খাবার প্রথা আছে। যদি কড়াইশুঁটিও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শুকিয়ে রাখা হয়, তাহ'লে বিদেশী টিনে-ভরা শুষ্ক মটরের চেয়ে সস্তায় জিনিষ বাজারে পাঠাতে পারা যায়। ব্যবহার করবার ঘণ্টা-দুই আগে এই মটর ভিজিয়ে রাখলে দেখতে ও খেতে খুব তাজা হয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে তরকারি শুকিয়ে রাখলে বর্ষাকালেও তাতে ছাতা পড়বে না অথচ বার মাস ইচ্ছামত সব তরকারি হাতের কাছে পাওয়া যাবে।

সেদিনই আমরা 'ক্যাণ্ডি' করা শিখলাম। এর আগের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা লেবুর খোসার ক্যাণ্ডি করেছিল। আমরা চালকুমড়ার করলাম। এদেশে একেই পেঠার মেঠাই বলে ও এটা খুব বিক্রী হয়। আগ্রার পেঠা প্রসিদ্ধ, কিন্তু আমাদের তৈরি পেঠা আমাদের কাছে তার চেয়েও উৎকৃষ্ট মনে হ'ল।

আমরা কিছু লেবুর রসের সিরাপ এবং কর্ডিয়্যালও করেছিলাম, তবে অনভিজ্ঞতার দোষে একটু তেতো হয়ে গেল।

২৬শে তারিখে শ্রীযুক্ত ভার্গব বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। ইনি রোজ সকালে অল্পক্ষণ দুধের বিষয়ে বলতেন যদিও সেটা আমাদের কোর্সে ঠিক ছিল না। আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ তিনি কোন কাজে সে-সময়ে এলাহাবাদে এসেছিলেন তাই আমরা দুধের মত অমূল্য আহার্য্যের বিষয়ে অনেক দরকারী কথা জানতে পারলাম। লেমন ড্রপ্‌স তৈরি করার থিওরিও আমরা জানতে পারলাম, অনেকের ওবিষয়ে জানবার উৎসাহ ছিল বলে। ফ্যাক্টরী ভিন্ন লেমনড্রপ্‌স করা যায় না। যারা ফলসংরক্ষণ-ব্যবসায়ে ব্রতী হবে তাদের উপলক্ষ্য ক'রে মাথুর-মশায় আমাদের বললেন, ক্যানিঙে কি কি দোষ হয়।

সেদিনই বিকালে পরীক্ষা হ'ল। যা যা শেখান হয়েছিল তারই মধ্য থেকে মুখে মুখে প্রত্যেককে আলাদা ডেকে প্রশ্ন করা হ'ল। কিছু প্র্যাকটিক্যাল কাজও দেখা হ'ল। অনেককে কয়েক রকম জেলির নমুনা দেখিয়ে তাদের দোষ-গুণ বিচার করতে বললেন, কাউকে প্রেস্যর কুকারের ব্যবহার পরীক্ষকেরা দেখাতে বললেন। কয়েকটি রঙীন পোষ্টার দেখিয়ে অনেককে তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন যে এর মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ। কেননা বিজ্ঞাপনাদি বিক্রীর বন্দোবস্তের মধ্যে এসে যায়। দুটি ছাত্র ছাড়া আমরা সবাই পাস হয়ে গেলাম।

পরদিন এলাহাবাদের কালেক্টর মিঃ বিশপ আমাদের সার্টিফিকেট দিলেন। মা ও আমি সেদিনই কাশী ফিরে এলাম।

আট-দশ দিন পরে পণ্ডিতজীর বিশেষ অনুরোধে চাপরাসী দিয়ে আমরা বাড়ীতে তৈরি আচার জ্যাম জেলি প্রভৃতি সবসুদ্ধ একান্ন রকম জিনিষ এলাহাবাদে পাঠালাম প্রদর্শনীর জন্য। পণ্ডিতজীর চেষ্টায় যুক্ত-প্রদেশের ফলোৎপাদক-সমিতি একটি আম্র-প্রদর্শনী খুলেছিলেন। তাতে আচার-মোরব্বার জন্য একটি বিশেষ শাখা খোলা হয়েছিল। যারা যারা এখান থেকে শিখে গিয়েছে, তারাও অনেকে জিনিষ পাঠিয়েছিল; পণ্ডিতজীই সবাইকে চিঠি লিখেছিলেন পাঠাবার জন্য। এই আম্র-প্রদর্শনীটি নাকি কাশী ও লক্ষ্ণৌর প্রদর্শনীর অপেক্ষা অনেক উঁচু দরের হয়েছিল। এর থেকেই বোঝা যায় যে ফলসংরক্ষণ-শিক্ষা ক্লাসের উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে।

অলখ-ঝোরা

শ্রীশান্তা দেবী

পূর্ব্ব পরিচয়
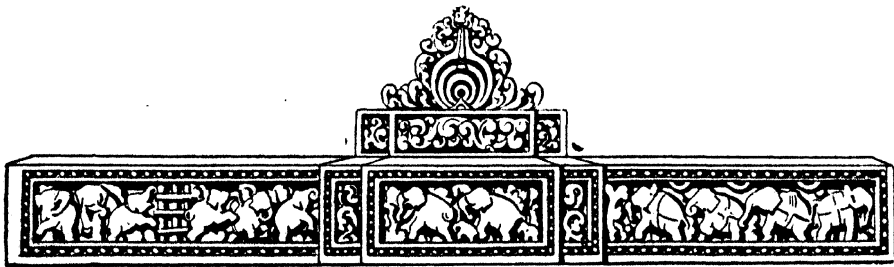
[চন্দ্রকান্ত মিশ্র নন্দানজোড় গ্রামে স্ত্রী মহামায়া, ভগিনী হৈমবতী ও পুত্রকন্যা শিবু ও সুধাকে লইয়া থাকেন। সুধা শিবু পূজার সময় মহামায়ার সঙ্গে মামার বাড়ী যায়। শালবনের ভিতর দিয়া লখা মাঝির গরুর গাড়ী চড়িয়া এবারেও তাহারা রতনজোড়ে দাদামহাশয় লক্ষ্মণচন্দ্র ও দিদিমা ভুবনেশ্বরীর নিকট গিয়াছিল। সেখানে মহামায়ার সহিত তাঁহার বিধবা দিদি সুরধুনীর খুব ভাব। সুরধুনী সংসারের কর্ত্রী কিন্তু অন্তরে বিরহিণী তরুণী। বাপের বাড়ীতে মহামায়ার খুব আদর, অনেক আত্মীয়বন্ধু। পূজার পূর্ব্বেই সেখানকার আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে সুধার দিদিমা ভুবনেশ্বরীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে মহামায়া ও সুরধুনী চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। মহামায়া তখন অন্তঃসত্ত্বা, কিন্তু শোকের ঔদাসীন্যে ও অশৌচের নিয়ম পালনে তিনি আপনার অবস্থার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল। তিনি আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।]

৭

ভুবনেশ্বরীর শ্রাদ্ধের পর মহামায়া যখন ছেলেমেয়ে লইয়া উদাস মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, তখন দরজার কাছে ছুটিয়া আসিয়া হৈমবতী তাঁহাকে দেখিয়া ত অবাক্। মহামায়া মুখ নীচু করিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন, মুখ নীচু করিয়াই ঘরে ঢুকিলেন, কাহারও দিকে এই শোককাতর ম্লান দৃষ্টি তুলিয়া ধরিতে তিনি পারিতেছিলেন না। যে-ভাষায় তিনি স্বীয় ঘরসংসারের নিকট বিদায় লইয়া গিয়াছিলেন, সেই ভাষা আজ ত মুখ হইতে বাহির হইবে না।

হৈমবতী বিনাইয়া বিনাইয়া কথা বলিতে পারিতেন না, সোজা গিয়া মহামায়ার হাত ধরিয়া বলিলেন, "এ কি বৌ, এ কি হয়ে গিয়েছ কি ? এই রকম চেহারা মানুষের হয় ?"

মহামায়ার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। তাঁহার চোখের জল দেখিয়া বিব্রত হইয়া আপনার দুর্ব্বলতাকে চাপা দিবার জন্য আরও শক্ত করিয়া হৈমবতী বলিলেন, "মা ত সকলেরই যায়; আমাদেরই কি যায় নি ? তাই ব'লে তোমার মত দশা ত কারুর হতে দেখি নি। এস, এস, ঘরে এসে ব'সে জিরিয়ে নিয়ে মুখে দুটো দাও, ঘরসংসারের দিকে তাকাও। মা সতীলক্ষ্মী তোমাদের সকলকে রেখে, বাবাকে রেখে, তাঁর কোলে মাথা দিয়ে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে চ'লে গিয়েছেন, তাঁর জন্যে মুখ কালি ক'রে চোখের জল ফেলছ কেন ? এর চেয়ে ভাল ক'রে কি কেউ যেতে পারে ? এই দেখ না আমার দশা, ঠেঁটি প'রে ভাতে ভাত গিলছি; এই বাঁচা কি বড় সুখের বাঁচা হ'ল ? কত মরণ দেখেছি, কত আরও দেখব, তিনি কিছুই দেখলেন না, তাঁর মত পুণ্যের জোর কার আছে ? যমের মুখের কাছে কলা দেখিয়ে গিয়েছেন।"

মহামায়া হৈমবতীকে চিনিতেন, তাঁহার এই রুক্ষ ভাষাই যে অনেক অশ্রুসজল সান্ত্বনার বাণী অপেক্ষা বেশী স্নেহকোমল উৎস হইতে উৎসারিত হইতেছে তাহা তিনি জানিতেন। মনে একবার তবুও খোঁচা লাগিল, মা যতই ভাগ্যবতীর মত যান, তবু তিনি যে চিরদিনের মত চোখের আড়াল হইয়া গেলেন, মরজগতে তাঁহার কোনও চিহ্ন রহিল না, ইহা কি কম দুঃখ !

হৈমবতী কিন্তু মহামায়াকে সহজ না করিয়া ছাড়িতে চাহেন না। জিনিষপত্রগুলা অর্দ্ধেক নিজেই টানিয়া ঘরে তুলিয়া বলিলেন, "নাও, গাড়ীর কাপড়খানা ছাড় দেখি ! যা বলেছিলাম তাই ত ঘটেছে দেখছি। আমার চোখে কিছু এড়ায় না; এমনি অবস্থায় না খেয়ে না ঘুমিয়ে শরীরের যা হাল করেছ তাতে পেটের কাঁটাটা বাঁচলে হয়। এত অসাবধান কেন ? টের পাও নি কিছু ?"

মহামায়া এতক্ষণে কথা বলিলেন, "পেয়েছি, কিন্তু অমন সময় কি মানুষের হুঁস থাকে ?"

হৈমবতী বলিলেন, "হুঁস যে পেয়াদায় থাকাবে শেষ-কালে ? শরীর কেমন আছে বল দেখি সত্যি ক'রে ?"

মহামায়া অগত্যা বলিলেন, "ভাল আর কই আছে ?

সমস্ত বাঁ দিক্‌টা একটানা ব্যথা হয়ে রয়েছে, একবারও ছাড়ে না।”

হৈমবতী গালে হাত দিয়া বলিলেন, “তবেই হয়েছে! ও-ব্যথা কি আর আজ ছাড়বে? ও এখন রইল সাত মাসের মত শরীর জুড়ে। সব ব্যথা এক সঙ্গে শেষ হবে।”

পুরাতন আবেষ্টনে ফিরিয়া আসিয়া মহামায়া অনেকখানি প্রকৃতিস্থ বোধ করিতেছিলেন, সংসারের যত কাজকর্ম্ম তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল, সকলে যেন ভীড় করিয়া আসিয়া বলিতেছে, “মৃত্যুর চেয়ে জীবনের দাবী বেশী। অবসর কালে রাত্রির অন্ধকারে তুমি মৃত্যুর মুখ চাহিয়া কাঁদিতে পার, কিন্তু এখন জীবনকে প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার পাওনা মিটাইয়া দিতে হইবে। মৃত্যু দস্যুর মত এক মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত লুণ্ঠন শেষ করিয়া লইয়াছে, কিন্তু জীবন সুদখোর মহাজনের মত পলে পলে তাহার সুদের হিসাব মিটাইয়া মিটাইয়া অগ্রসর হয়। তাহাকে এতটুকু ফাঁকি দিবার উপায় নাই। যেখানে দুই দিনের দেনা জমিয়াছে সেখানে সুদের হারে তাহা দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে।

চন্দ্রকান্ত বলিতেন, “তোমার মন ক্লান্ত, শরীর অসুস্থ, তুমি এত কাজের বাঁধনে নিজেকে জড়াচ্ছ কেন?”

মহামায়া ভাবিতেন, “কাজে আমি কি সাধ ক’রে জড়াই? এ বয়সে কাজের সহস্র বাহু হয়, সে আপনি আমাকে জড়িয়ে তার গহ্বরে পুরে নিচ্ছে, আমার মুক্তি কোথায়? জীবনে যে-কাজের বীজ বপন করেছি, তার ফসল কাটা পর্য্যন্ত কাজ আমায় ছাড়বে কেন?”

গৃহিণীর ক্লান্ত শরীরমন দেখিয়া চন্দ্রকান্তের মন দুশ্চিন্তায় চঞ্চল হইত; কিন্তু আবার তিনিই হয়ত আসিয়া বলিতেন, “ছেলেটার বড় সর্দ্দির ধাত হচ্ছে, ওকে স্নানের সময় ভাল ক’রে রোদে ব’সে তেল মাখিও। সুধা বড় হয়ে উঠল, এখন একটু লেখাপড়া ত শিখতে হবে। যখন আমি বাড়ী থাকব আমিই দেখব, অন্য সময় তুমি রোজ যদি ওকে একবার বইখাতা নিয়ে না বসাও ত সব ভুলে যাবে।”

মহামায়া হাসিতেন, বলিতেন, “আমার বিশ্রামের ভাল ব্যবস্থা ক’রে দিচ্ছ। এইবার শরীর ঠিক সারবে।”

চন্দ্রকান্ত নিজে একহাতে সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য করিতে পারেন না বলিয়া মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়া নীরবে চলিয়া যাইতেন।

মহামায়ার কাজ কমিবার বদলে প্রত্যহই বাড়িয়া চলিত। সংসার আছে, স্বামী আছেন, দুইটি পুত্রকন্যার শরীরমনের সকল অভাব মোচন আছে, তাহার উপর তৃতীয়টির অভ্যর্থনার জন্যও ত কিছু আয়োজন করা প্রয়োজন আছে!

সমস্ত দিনের কাজের শেষে বাক্স আলমারী ঘাঁটিয়া কোথায় কত ছোট ছোট বিস্মৃতপ্রায় জামা-কাপড় আছে, সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া মেরামত করিয়া আলাদা একটি ছোট বাক্সে জমা করা চলিত। একটার ছেঁড়া হাত কাটিয়া, আর একটার হাত জুড়িয়া, লাল কালো সাদা কাপড়ের তালি দিয়া কত বিচিত্র পোষাকই তৈরি হইত, অবশেষে সবগুলি সেই ক্ষুদ্র বাক্সে গিয়া আশ্রয় লইত।

এত বয়সেও মহামায়া ভাবী সন্তানের জন্য আয়োজন ননদের চোখের সম্মুখে করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। আপনার ঘরের কোণে লুকাইয়া একান্ত একলার তাঁহার ছিল এ সমস্ত কাজ। হৈমবতী মাঝে মাঝে অকস্মাৎ আসিয়া পড়িলে তিনি বাক্সের ডালা ফেলিয়া দিয়া যেন অন্য কাজে মাতিয়া যাইতেন।

তাঁহার সঙ্কোচকে অগ্রাহ্য করিয়া হৈমবতী বলিতেন, “বৌ, এই শরীরে রাত জেগে জেগে কি ফকিরের আলখাল্লা সব সেলাই হচ্ছে? ওসব কেন মিছে করছ? ছেঁড়া ন্যাকড়ায় ছেলে জন্মালে কোনও দুঃখ নেই, তার উপর সব করা যায়। কিন্তু ভগবান্ না করুন, যদি বিপদ্ আপদ্ কিছু হয় তখন ত ব’সে ব’সে ঐ সব পোষাক কোলে ক’রে কাঁদতে হবে! ও দূর ক’রে ফে’লে একটু গা মে’লে শোও দিখি।”

মহামায়া ননদের মুখের উপর জবাব দিতে পারিতেন না, কিন্তু রাত্রির নীরবতার আড়ালে প্রত্যহই তাঁহার নূতন ও পুরাতন কাপড়ের ভাণ্ডার বাড়িয়া চলিতে লাগিল। ছোট ছোট কাঁথা, ছেঁড়া শালের টুকরায় শাড়ীর পাড় বসাইয়া ঢাকা, মোজা, টুপি, জামা, কোনওটাই একেবারে বাদ পড়িল না।

সুধা কত রাত্রে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিয়াছে, মা ছোট ছোট পুরানো জামার পিঠগুলা চিরিয়া দুই ফাঁক করিয়া

পাশ মুড়িয়া রাখিতেছেন। কি একটা আসন্ন সুখ কি দুঃখের চিন্তায় মা যেন অন্যমনস্ক হইয়া থাকেন। তাহা যে কি, ভাল না মন্দ, ভয়ের না আনন্দের, তাহা মা'কে কিংবা আর কাউকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হয় না। এই বয়সেই সুধা বুঝিতে পারে, মায়ের এই একান্ত একলার নীরব কর্ম্মক্ষেত্রের মাঝখানে তাহার শিশুসুলভ কৌতূহলকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়ত শোভন নয়।

একদিন ভোর বেলা উঠিয়া সুধা ও শিবু দেখিল, বাড়ীতে অকস্মাৎ রাতারাতি কিসের যেন একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। উৎসবের আয়োজন বলিয়া ত মনে হয় না। সকলেরই যেন কেমন চিন্তিত মুখ, সশঙ্ক দৃষ্টি, অতি-ব্যস্ততার ভাব। সব কথায় সকলে তাহাদের দুই ভাইবোনকে বেশী করিয়া বাদ দিয়া দূরে ঠেলিয়া চলিতেছে। কতকটা যেন দিদিমার মহাযাত্রার দিনের মত।

সুধা তবু অনেক ভয়ে ভয়ে একবার পিসিমার কাছে গিয়া বলিল, "পিসিমা, মা কোথায় গেল? কি হয়েছে বল না?"

হৈমবতী অত্যন্ত বিরক্ত মুখ করিয়া বলিলেন, "মায়ের শরীর একটু খারাপ, ওঘরে আছে, তোমরা তার হাড় জ্বালাতে যেও না, খেলা কর গিয়ে।"

সুধার বেশী করিয়া দিদিমার কথা মনে পড়িয়া গেল। মায়ের শরীর খারাপ? মা তাহাদের ফাঁকি দিয়া অমনি করিয়া পালাইবে না ত? সকলের এমন অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখ দেখিয়া তাহাই ত মনে হয়। দিদিমা যেদিন চলিয়া যান, এমনি মুখই ত সকলের সেদিন হইয়াছিল। সুধা পিসিমার বকুনির ভয় সত্ত্বেও বলিল, "খুব কি অসুখ? একবারটি দে'খেই চ'লে আসব। আমি একটু যাই।"

পিসিমা এক তাড়া দিয়া বলিলেন, "ছেলেমানুষের গিন্নিগিরি না করলেই নয়? তুমি দে'খে কি অসুখ সারিয়ে দেবে? যাও এখান থেকে বলছি, কথার অবাধ্য হবে না।"

সুধা চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার সমস্ত মনটা মা'কে ঘিরিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল। সকালে উঠিয়া একবারটি মাকে দেখিতে পাইল না, এমন কি অসুখ মায়ের করিয়া থাকিতে পারে? দূর হইতে লুকাইয়া দেখিতে লাগিল, ছোট ঘরের জিনিষপত্র টানিয়া পিসিমা বড় ঘরে আনিয়া জড় করিতেছেন। পেয়ারা-তলার কাছে একটা কাঠের উনান জ্বালিয়া মস্ত এক হাঁড়ি গরম জল চড়িয়াছে। বাবাও রাত থাকিতে কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছিলেন, বেলা করিয়া এক বোঝা ওষুধ বিষুধ লইয়া ফিরিতেছেন। তিনিও আজ সুধার সঙ্গে কথা বলিলেন না। তাহাকে সামনে দেখিয়া এমন করিয়া অগ্রাহ্য করিয়া বাবা ত কখনও চলিয়া যান না। আজ যেন সকলের কি হইয়াছে, সকলেই সব কথা তাহাদের লুকাইতেছে।

সমস্ত দিন মনের অস্থিরতায় সুধা বাহিরে খেলিতে পারিল না। বাড়ীরই আশেপাশে মুখ চুণ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, যদি কোথাও দিয়া কোনও প্রকারে মা'কে দেখা যায়! একবার অনেক কষ্টে জানালা দিয়া দেখিল, মা অস্থির ভাবে ঘরের ভিতর পায়চারি করিতেছেন, আবার যেন অসহ্য যন্ত্রণায় বাঁকিয়া পড়িয়া জানালার গরাদে ধরিয়া কোন প্রকারে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইতেছেন। মায়ের মুখ দেখিয়া বিস্ময়ে ভয়ে সুধার মুখ সাদা হইয়া গেল। সুধাকে দূর হইতে দেখিয়া মা ক্ষীণ হাসির চেষ্টা করিয়া হাত নাড়িয়া তাহাকে দূরে চলিয়া যাইতে বলিলেন। সুধা সরিয়া গিয়া বাহিরের বারান্দায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাড়ীর ঝি করুণা সুধাকে কাঁদিতে দেখিয়া কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিল, "ভয় কি সুধা-দিদি, কাঁদছ কেন? মায়ের অসুখ ওসব কিছু না, তোমার নতুন ভাই হবে দে'খো এখন।"

সুধা বিশ্বাস করিতে পারিল না; জন্ম, সে ত নূতন আনন্দের আবির্ভাব, তাহা কি এমন করিয়া ভয়-ব্যাকুলতায় বিভীষিকায় সমস্ত সংসারকে অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিতে পারে? মা'র হাস্যচঞ্চল সুকুমার মুখে ওই যে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার কঠিন ছায়া, ওই কি নূতনের আগমনের সূচনা? মানুষ কি এমনই মিথ্যা দিয়া মানুষকে ভুলায়, না সৃষ্টি এমনই বেদনার ফল?

করুণা সুধা ও শিবুকে কোনও রকমে স্নান আহার করাইয়া বাহিরে বেড়াইতে লইয়া গেল। চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "দিদি, ছেলেমেয়েগুলো মুখ চুণ ক'রে আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ দেখলে কি রকম লাগে। এখন থেকে

জীবনের এমন পরিচয় ওদের পাবার দরকার নেই। ওদের কোথাও পাঠিয়ে দাও।"

হৈমবতী তাহাই করিলেন। বাড়ীতে করুণার অনেক প্রয়োজন ছিল, তবু তিনি ভাইয়ের কথাই রাখিলেন।

সন্ধ্যায় শ্রান্ত হইয়া ছেলেমেয়েরা যখন ফিরিয়াছে, তখন নানা খেলাধূলার গল্পে মা'র কথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল। ভাত খাইয়া দুই ভাইবোনে পাশাপাশি বিছানায় শুইয়া কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, নিজেরাই জানিতে পারে নাই।

অকস্মাৎ অতি পরিচিত কণ্ঠের তীব্র করুণ আর্ত্তনাদে সুধার স্বপ্নমধুর সুখনিদ্রা আছড়িয়া-পড়া কাচের বাসনের মত যেন সরবে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গেল। এ কি হইল? পৃথিবীতে এমন জিনিষের কল্পনা ত সে কখনও করে নাই। তাহার ক্ষুদ্র জীবনে মা'কেই সে সর্ব্বদুঃখহারিণী বলিয়া জানিত; মা'ই ত ছিলেন সকল শোকের সান্ত্বনা, সকল বেদনার প্রলেপ! সেই মা তাঁহার সকল শক্তি হারাইয়া সকল সংযম ভুলিয়া এমন করিয়া অসহায়ের মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া যন্ত্রণা হইতে মুক্তিভিক্ষা করিতেছেন কাহার কাছে? কি সে অমানুষিক ব্যথা যাহা তাহার সর্ব্বংসহা আনন্দরূপিণী মাকেও কাঁদাইতে পারে, কে সে এমন শক্তিশালী মানুষ যে এমন বেদনা হইতেও মানুষকে মুক্তি দিতে পারে? সে কি বিধাতার চেয়ে শক্তিমান্?

বিস্ময়ে বেদনায় সুধার ফুলের মত পেলব নধর শরীর যেন লোহার মত কঠিন হইয়া উঠিল। সে ক্ষুদ্র দুই মুঠি শক্ত করিয়া চোখ বড় করিয়া বিছানার উপর খাড়া হইয়া বসিল। মায়ের যন্ত্রণা যেন তাহার বুকে তীক্ষ্ণ বিষ-বাণের মত আসিয়া বিঁধিল। সুধা আর সহ্য করিতে পারে না। মৃত্যুবেদনা ত মা'কে এমন পাগল করে নাই! শিশুকাল হইতে চোখের জল পরের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখা তাহার অভ্যাস। কিন্তু আজ সে সে-কথা ভুলিয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। পিসিমা কোমরে কাপড় বাঁধিয়া সিপাহীর মত শক্ত হইয়া কঠিন মুখে কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন, সুধার ব্যাকুল কান্নার সুরে এ ঘরে ছুটিয়া আসিলেন। দুই ঘরের মাঝের দরজাটা একটু ফাঁক হইয়া গেল। ওঘরের অতি উজ্জ্বল আলো এত রাত্রে পল্লীগ্রামের অন্ধকার ঘরে শাণিত ছুরির ফলার মত চোখের সম্মুখে ঝলকিয়া উঠিল। পরদা ও দরজার ফাঁক দিয়া অপরিচিত মানুষদের জুতা-পরা পায়ের ব্যস্ত চলাচল দেখা যাইতেছে। সুধা বুঝিল এক জোড়া পুরুষের পা, এক জোড়া স্ত্রীলোকের। পুরুষটি ত ডাক্তার, কিন্তু স্ত্রীলোকটি কে? এত জনে মিলিয়া মা'কে কি কাটাকুটি করিতেছে? মা তাহার বাঁচিবেন ত? সুধার ভাবনাকে বাধা দিয়া হৈমবতী গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "সুধা, এত রাত্রে কান্নাকাটি করছ কেন? মায়ের অসুখ, তুমি তার মধ্যে কেঁদে মা'কে ব্যস্ত করছ! ছিঃ, এত বড় মেয়ে, তোমার লজ্জা করে না?"

সুধা চুপ হইয়া গেল। হৈমবতী মাঝের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। আর কিছুই দেখা গেল না। কেবল থাকিয়া থাকিয়া মায়ের গলার একটা গোঙানির শব্দ এখনও কানে আসিয়া সুধার বুকে একটা অস্বাভাবিক দোলা দিতে লাগিল। দুঃস্বপ্নময় নিদ্রা ও অস্বস্তিকর জাগরণের মধ্য দিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল।

ভোরবেলা কিন্তু সুধা নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সকালের রৌদ্র যখন বিছানার চাদরের উপর পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে, তখন করুণা আসিয়া সুধাকে ডাকিয়া জাগাইল। ঘুম ভাঙিতেই কি একটা বেদনার স্মৃতি বুকের ভিতর ভারের মত চাপিয়া ধরিল, কিন্তু তাহা ঠিক যে কি সুধা মনে আনিতে পারিল না। শিবু পাশে নাই, অনেকক্ষণ উঠিয়া গিয়াছে, বাবার বিছানায় কেহ শুইয়াছিল বলিয়াই মনে হইতেছে না। সুধা বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাইল। করুণা হাসিয়া বলিল, "ওঠ ওঠ সুধা দিদি, ছোট খোকাকে দেখবে চল।"

ছোট খোকা? সুধা বিস্ময়ে চোখ আরও বড় করিয়া করুণার দিকে তাকাইল। করুণা বলিল, "তোমার ভাই হয়েছে জান না?" সত্য? তবে ত করুণার কথাই সত্য। সুধার কাল রাত্রের সমস্ত কথা মনে পড়িয়া গেল। মায়ের কথা মনে পড়িয়া ভাইকে তাহার আর দেখিতে ইচ্ছা করিল না। কিন্তু করুণা তাহাকে প্রায় টানিয়াই লইয়া গেল।

মা খাটের উপর সাদা চাদর ঢাকা দিয়া শুইয়া আছেন। সমস্ত ঘর ঔষধের তীব্র ঝাঁজালো গন্ধে ভরপুর। গন্ধ শুধু নয়, ঘরের ব্যবস্থা, জিনিষপত্র, সবই যেন কেমন নূতন ও

অচেনা বলিয়া বোধ হয়। একটা নূতন বিছানায় মা'র ডানদিকে ছোট ছোট বালিশের মধ্যে ছোট্ট লেপ গায়ে দিয়া ন্যাড়া মাথা পুতুলের মত ছোট্ট একটি মানুষ দুই মুঠা বন্ধ করিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া ঘুমাইতেছে। যে-কর্ম্মময়ী মাকে চিরদিন ভোর হইতে গৃহকার্য্যে ব্যস্ত দেখা অভ্যাস, দিনের আলোয় যাহাকে সে কোনও দিন শুইতে দেখে নাই, বিছানায় এমন ভাবে তাঁহাকে পড়িয়া থাকিতে দেখাও ত নূতন। সুধা শিশুর দিকে তাকাইবে না মনে করিয়াছিল; কিন্তু অতটুকু মানুষ ইতিপূর্ব্বে সে কখনও দেখে নাই। তাহার কেমন যেন কৌতূহল হইল। মাও হাসিয়া বলিলেন, "আয় না রে, দেখ্ কেমন ভাই হয়েছে।"

সুধা মায়ের হাসি দেখিবে আশা করে নাই। মায়ের মুখ একদিনে শীর্ণ ও সাদা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু তাহাতে কি মিষ্ট হাসি! যে এত যন্ত্রণা মা'কে দিয়াছে তাহার উপর মা'র ত কোনও রাগ নাই। মা পরম স্নেহভরে হাসিয়া ছোট লেপখানা একটু সরাইয়া দিলেন। মুখে আলো ও গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিতেই চোখ মুখ আরও সঙ্কুচিত করিয়া শিশুটি কুণ্ডলী পাকাইয়া গেল। দেখিলেই সমস্ত মনটা আনন্দে ও মমতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। সুধা ছুটিয়া গিয়া দুই হাতে তাহার দুইটি স্বচ্ছ নরম কচি রাঙা মুঠি ধরিয়া ফেলিল। মা বলিলেন, "থাক্, থাক্, অত জোরে নয়, লাগবে যে ওর!" মা সুধার হাত দুইটা সরাইয়া দিলেন। সুধার কেমন একটা অভিমান হইল, মাগো মা, এরই মধ্যে ওর উপর মা'র এত টান! আমি যে মা'র এত-কালের মেয়ে, সারা রাত্রি একলা শুয়ে কাঁদলাম, তার খোঁজ ত মা কই একবারও করলেন না; আর রাক্ষুসে ছেলেটাকে একটু ছুঁয়েছি ব'লেই এত সাবধানতা!

মহামায়া সুধার অভিমান বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন, "তুই আমার কাছে আয় এদিকে; শিবু কোথায় গেল? কাল থেকে তোদের দুটিকে দেখি নি, বনে বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াস্ নে। পিসির কথা শুনে চলবি, বাবার কাছে শুবি।"

সুধা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মহামায়া বুঝিলেন, বলিলেন, "মাও যা বাবাও তাই; ছোট ভাই মা'র কাছে থাকল, তোমরা না-হয় বাবার কাছে রইলে।" সুধা মুখে কিছু বলিল না, কিন্তু দুই হাত কঠিন করিয়া মায়ের বাহু চাপিয়া ধরিল, যেন নীরবে মাকে ভর্ৎসনা করিতেছে, "তুমি আমাদের ভালবাস না, তাই মিথ্যে বোঝাচ্ছ।" সুধার দুই চোখে জল আসিয়া পড়িল।

দরজার পরদাটা ঠেলিয়া শিবু ঘরে ঢুকিয়া একেবারে এক লাফে মায়ের খাটে উঠিয়া পড়িল। মহামায়া "কি করিস্, কি করিস্" বলিতে না বলিতে সে খোকাকে ঠেলিয়া দুই হাতে মা'র গলা জড়াইয়া চুম্বনে মুখ ভরিয়া দিয়া বলিল, "তুমি ত আমার মা।" মহামায়া হাসিয়া বলিলেন, "সত্যিই ত।" শিবু বলিল, "ও পিসিমার কাছে শোবে। ওকে নামিয়ে দাও খাট থেকে।"

৮

শীতের দিনে একটা বেতের দোলার ভিতর অয়েল ক্লথ ও কাঁথা পাতিয়া নূতন খোকাকে বারাণ্ডার রৌদ্রে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সকালবেলা বারাণ্ডার থামের মাঝে মাঝে খিলানের ভিতর দিয়া কিউবিষ্ট চিত্রকরের ছবির মত বাঁকা বাঁকা রোদের টুকরা আসিয়া পড়িয়াছে। একটা টুকরাতে খোকার দোলা, আর একটা টুকরাতে দড়ির খাটিয়ায় মহামায়া শুইয়া, পাশে একটা ছোট বেতের মোড়া লইয়া চন্দ্রকান্ত বসিয়া আছেন। হৈমবতী কাছে নাই দেখিয়া মহামায়া স্বামীর একখানা হাত নিজের হাতের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিলেন, "পাঁচ মাস ত কবে হয়ে গেল, আমি কি আর উঠব না? তোমার ডাক্তারের কথা কই ফল্‌ল?"

চন্দ্রকান্ত স্ত্রীর শীর্ণ হাতের উপর হাত বুলাইয়া বলিলেন, "সব সময় কি মানুষের কথা মত শরীর চলে? এবার তোমার শরীর দুর্ব্বল ছিল, তাই সারতে দেরি হচ্ছে। কিন্তু তার জন্যে অকারণ দুর্ভাবনা না ক'রে মনে করছি একজন বড় ডাক্তারকে একবার এখানে নিয়ে আসব।"

মহামায়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না, না, অমন ক'রে টাকার শ্রাদ্ধ করতে হবে না। একটা ডাক্তারকে এখানে আনতে যা খরচ হবে তাতে আমাদের সকলের কলকাতা যাওয়া হয়ে যাবে। অনেক ভাল চিকিৎসাও হ'তে পারবে।"

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "কলকাতা গেলে টাকার সাশ্রয় কিছু হবে না, বাড়ীভাড়া চাকর-বাকর সবই বেশী

খরচের ব্যাপার, কিন্তু চিকিৎসা ভাল হবার সম্ভাবনা আছে, সেটা ঠিক। আচ্ছা, খোকা আর একটু বড় হোক, তাই যাওয়া যাবে। টাকার অভাবের জন্য কখনও জীবনে কোনও কাজে পিছপা হই নি, সামান্য টাকা হ'লেও কাজের সময় টাকা সর্ব্বদাই কুলিয়ে গিয়েছে।"

দোলার ভিতর খোকার মাথাটা নড়িয়া উঠিল, কদম-ফুলের কেশরের মত সোজা সোজা নূতন চুল গজাইয়া মাথাটি ভারি চমৎকার দেখিতে হইয়াছিল। খোকা মুখভঙ্গী করিবার সূচনা করিতেই মহামায়া বলিয়া উঠিলেন, "এইবার ত সিংহ গর্জ্জন করবে? ওরে ও সুধা, খোকার কাঁথাটা বদ্‌লে দিয়ে যা না মা; নইলে মহারাজের মেজাজ ঠাণ্ডা করতে সারাদিন লাগবে।"

সুধা ঘরের ভিতর হণ্টলি পামারের একটা বিস্কুটের টিনে তাহার কাচের ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, মায়ের ডাকে ছুটিয়া আসিয়া খোকার ভিজা কাঁথা বদ্‌লাইয়া নূতন কাঁথা পাতিয়া দিল। মহামায়া স্বামীকে ঠেলিয়া নীচু গলায় বলিলেন, "সুধার হাত নাড়বার ভঙ্গী দেখেছ! দশ বছরের মেয়ে কাপড়চোপড় পাতছে যেন কত কালের পাকা গিন্নী!"

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "ভগবানের রাজ্যে মানুষ যেমন ক'রে হোক আপনার পাওনা কিছু আদায় ক'রে নেয়। তোমার কাছে পাওনা নিয়ে খোকা এসেছে, তুমি ত অর্দ্ধেক ফাঁকি দিচ্ছ বেচারীকে। তাই মায়ের হাতের সেবাটা দিদিই মিটিয়ে দিচ্ছে।"

মহামায়া একটু বেদনাহত স্বরে বলিলেন, "ঐ হাত চেনাই ভাল, ভগবান্ হয়ত ঐ কচি হাতেই সব ভার তুলে দেবেন। আমি কি আর এ যাত্রা উঠব?"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "যা ঘটবার তা ত ঘটবেই। তাই বলে অমঙ্গলকে ডেকে আগে থেকে দুঃখ পাবার কি কিছু দরকার আছে?"

সুধা দোলার ভিতর খোকাকে পাশ ফিরাইয়া শোয়াইয়া চাপড়াইয়া তাহার গায়ে একটা কাঁথা চাপা দিয়া আস্তে আস্তে দোলাটা নাড়িতে লাগিল। খোকাকে লইয়া তাহার নাড়া-চাড়া পুতুল-খেলারই মত আনন্দদায়ক ছিল। সে ইহারই ভিতর যেন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। হাওয়াভরা বেলুনের মত খোকার মসৃণ চকচকে গাল দুটি কি পরিষ্কার! একটা মাছিও উড়িয়া বসিতে ভয় পায়। হাত-পায়ের তেলোগুলি গোলাপ ফুলের মত রঙীন, নরম যেন রেশমে তুলায় গড়া, মুঠি দুটির ভিতর আঙুল চালাইয়া যতবারই খুলিয়া দিতে চেষ্টা করে, ততবারই আঙুলের উপরেই মুঠি বন্ধ হইয়া যায়। লোভী ছেলের দুধ খাইবার লোভ দেখিলে হাসি পায় সব চেয়ে বেশী! মা কোথায় তার ঠিক নাই, চোখ বুজিয়া আপন মনেই গোলাপী ঠোঁট দুটি নাড়িয়া দুধ টানিয়া যাইতেছে। আবার স্বপ্ন দেখিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদে! ওমা! এক মুহূর্ত্ত পরেই আবার হাসি!

মহামায়া ডাকিয়া বলিলেন, "সুধা যা রে, এবার খেল্‌গে যা, সারাক্ষণ ওকে আঁকড়ে প'ড়ে থাকতে হবে না। তোর খেলাধুলা পড়াশুনো সব জলে গেল, তুই শেষে কি ছেলের ধাই হবি?"

চন্দ্রকান্ত ও মহামায়ার ইচ্ছা ছিল ছেলেমেয়েকে এমন করিয়া মানুষ করেন যে তাহারা যেন বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারে। বিবাহিত জীবনে কায়মনঃপ্রাণ দিয়া স্বামী ও সন্তানের সেবাই ছিল মহামায়ার ব্রত। তাঁহার ভবিষ্যৎ আশা ও আনন্দের স্বপ্ন ছিল ছেলেমেয়ের গৌরব লইয়া। ছেলেমেয়েরা আর একটু বড় হইলে নিজেদের সামান্য সম্বল দিয়া কলিকাতায় গিয়া কেমন করিয়া তাহাদের সকল বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিবেন ইহা ছিল তাঁহাদের স্বামীস্ত্রীর অতি প্রিয় গল্পের বিষয়।

কিন্তু ছোটখোকা হইবার কয়েক মাস পরেও যখন মহামায়ার শরীরের কোনও উন্নতি দেখা গেল না, বাঁদিকটা কেমন যখন-তখন ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া অবশ বোধ হইতে লাগিল, তখন তাঁহার মনও অচিরাগত একটা ভয় ও নৈরাশ্যে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। শরীরের অবসাদ কি গ্লানি একটু বাড়িলেই সমস্ত মন দুশ্চিন্তায় ছাইয়া যাইত। অবোধ সন্তানদের ফেলিয়া হয়ত তাঁহাকে অকালে সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, নয় চিররুগ্ন ভগ্ন পঙ্গু দেহ লইয়া তাহাদের অযত্নবর্দ্ধিত দেহমনের দুর্গতি প্রতিনিয়ত দেখিয়া বেদনা পাইতে হইবে। যাহাদের এখনও সকল দিক দিয়া চারা গাছের মত সংসারের ঝড়ঝাপটার আড়ালে বাড়িতে দিবার কথা, তাহারাই সমস্ত ঝঞ্ঝাট

মাথায় করিয়া দুর্ব্বল হস্তে তাঁহার খঞ্জের যষ্টি ধরিয়া বেড়াইবে। অবশ্য তাঁহার দেবতুল্য হৃদয়বান্ স্বামী আছেন, ইহা একটা মস্ত সান্ত্বনার কথা। কিন্তু স্বামী তাঁহার জীবনে শ্রেষ্ঠ সহায় ও গুরু হইলেও অনেক ক্ষেত্রে স্বামীকে তিনি শিশুর মতই অসহায় মনে করিতেন। তাঁহার বলিষ্ঠ দেহ ও মন থাকা সত্ত্বেও সংসারের কাজে তিনি কোনও দিন মহামায়ার সাহায্য করেন নাই, করিতে ভয় পাইতেন বলিয়া। ছোট শিশুকে কোলে করিতে গেলে তাঁহার দুই হাত আড়ষ্ট হইয়া যাইত, ঝি-চাকরের ঝগড়া নালিশ শুনিলেই তিনি বলিতেন, "ওদের মাহনে চুকিয়ে দাও, ওরা বাড়ী যাক, আমি ঝগড়ার বিচার করতে পারব না।" রন্ধনে তাঁহার এত ভয় ছিল যে স্ত্রী কি ভগিনীর অসুখ করিলে তিনি শুধু দুধ মুড়ি খাইয়া কাটাইয়া দিতেন। তাই মহামায়া শরীর অসুস্থ বোধ করিলেই আজকাল জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ছেলেমেয়েরা কেহ ছাদ হইতে পড়িয়া মাথা ভাঙিতেছে, কেহ না খাইয়া শুকাইয়া যাইতেছে, কেহ মাসি-পিসির দরজায় ক্ষুধাশীর্ণ দেহ ও স্নেহবঞ্চিত হৃদয় লইয়া কাঙালের মত পড়িয়া রহিয়াছে।

চন্দ্রকান্ত মহামায়ার ভাবনা বুঝিতে পারিতেন। তিনি চিন্তার ভারটা হাল্কা করিয়া দিবার জন্য প্রায়ই বলিতেন, "এত ভাবছ কেন? তোমার সুধা শিবু ত মস্ত বড় হয়ে গিয়েছে, ওরা খোকাকে ঠিক মানুষ করতে পারবে। বুড়ো হয়ে আমরা অথর্ব্ব হব, ওরা শক্তিমান্ হবে, এই ত পৃথিবীর ধর্ম্ম।"

মহামায়া বলিতেন, "আমাকে কেন ছেলে ভোলাচ্ছ, আমি সবই ত বুঝছি।"

চন্দ্রকান্ত একদিন বলিলেন, "মানুষের কোনও দুর্ভাগ্য নিয়েই বেশী কাতর হওয়া ভাল নয়; যদিও আমার নিজেরই যখন ও দুর্ব্বলতাটা আছে তখন তোমাকে উপদেশ দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু পৃথিবীতে কোনও জিনিষই ত স্থিরনিশ্চয় নয়, তোমার এই সাময়িক অসুখ যে সারবে না, একথাই বা কেন তুমি ভাবছ? আমাদের পক্ষে যতখানি করা সম্ভব আমরা ক'রে দেখি না, হয়ত সেরে যেতে পারে।"

মহামায়া বলিলেন, "আমরা গরীব মানুষ, অবস্থার অতিরিক্ত করতে তোমায় আমি দিতে পারি না। তাহলে ভবিষ্যতে ছেলেপিলের দশা কি হবে? তুমি কাজ-কর্ম্ম ফে'লে ত কলকাতা যেতে পার না।"

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, "আমি কলকাতাতেই একটা কাজ পেতে পারি, এটুকু যোগ্যতা আছে আমার। আজ থেকে সেই চেষ্টাই করব। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার জন্যে আমাদের একবার কলকাতায় ত কিছুদিন থাকতেই হবে, কতকালের থেকে কথা ছিল। দেখি সে চেষ্টা ও ইচ্ছা-গুলো সফল হয় কি না। তবে হয়ত কিছু দেরী হয়ে যেতে পারে।"

মহামায়া অভিমান করিয়া বলিলেন, "তোমার চেষ্টা সফল হতে হতে আমি যাব ম'রে। তারপর 'মা ম'লে বাপ তালুই, ছেলে হবে বনের বাবুই,' ওই আমার কপালে লেখা আছে।" (ক্রমশঃ)
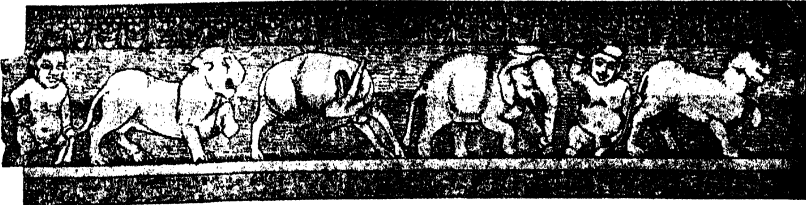
সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ

টুপিওয়ালা বিনা ফরমাইসে যে-সব টুপি তৈয়ার করে তার কোনটা কারও মাথার মাপ লইয়া নয়; অথচ সব টুপিই কারও-না-কারও মাথায় লাগেই। যার মাথায় যে টুপি লাগে, সে যদি মনে করে যে ঐ টুপি তারই উদ্দেশ্যে তৈয়ার হইয়াছিল, তবে সেটা কি সত্য হইবে?

১৩৪২ সনের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে আমি 'মঠ ও আশ্রম' নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে কোন মঠবিশেষ বা আশ্রমবিশেষ ঠিক আমার আলোচ্য বিষয় ছিল না। কিন্তু আমার বর্ণনার কোন-না-কোন অংশ কোন-না-কোন মঠ ও আশ্রমের সম্বন্ধে নিশ্চয়ই প্রযোজ্য হইয়া থাকিবে। টুপিধারীর মত কোন-কোন আশ্রমবাসীও মনে করিয়া বসিয়াছিলেন যে ঐ সব বর্ণনা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিত হইয়াছে, এবং তাহাই মনে করিয়া তাঁহাদের কেহ কেহ আমার উপর এত রোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সংসারে আসক্তি যাহার কমিয়াছে তাহাকেই আমরা বলি সন্ন্যাসী। যাহারা সমালোচনায় অসহিষ্ণু ঠুনকো মানের দায়ে যাহারা সহজেই উত্তেজিত হইয়া পড়ে যাহারা যশের কাঙ্গাল এবং অর্থের লোভী, তাহারাও সন্ন্যাসের ভেক বহন করে কোন্ লজ্জায় ভাবিয়া পাই না। ধনীরা অনেক সময় অর্থের গর্ব্ব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বিনয়ের ভান করিয়া চার-তলা বাড়ীর নাম দেন 'কুটীর'। তেমনই ষড়রিপুর লীলাক্ষেত্র যাঁদের মন তাঁহারা তাঁহাদের বিলাসের আবাস-ভূমি গৃহের নাম দেন 'আশ্রম'। ইহার ভিতর একটা প্রচণ্ড প্রতারণা আছে; কে প্রতারক এবং কে প্রতারিত তাহা অনেক সময় ঠিক করা কঠিন। নীতিশাস্ত্রের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে পরকে প্রতারণা করা সব সময়ই শেষ পর্য্যন্ত আত্ম-প্রতারণায়ই পর্য্যবসিত হয়। আর যেখানেই অনাবশ্যক এবং অন্যান্য ভান রহিয়াছে সেইখানেই প্রতারণা রহিয়াছে, এ কথাও বলা চলে।

আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে একটা কথা আমি বলিয়াছিলাম যে, বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে ব্যাঙের ছাতার মত এত যে সব মঠ ও আশ্রম গজাইয়া উঠিতেছে, সেগুলি হিন্দুর শাস্ত্র শ্রুতি-স্মৃতি ঠিক অনুমোদন করে না। আর যে-কোন ব্যক্তি যখন খুশী সন্ন্যাসী সাজিয়া বসেন ইহাও ঠিক শাস্ত্রানুমোদিত নহে। হিন্দুর শাস্ত্র সকলেরই শাস্ত্র নহে, এ-কথা আমি জানি; আর, সকল হিন্দুই যে সকল শাস্ত্র মানেন না, এবং মানিতে বাধ্যও নন, ইহাও আমি জানি। তথাপি শাস্ত্রের কথা তুলিয়াছিলাম এই জন্য যে, অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, সকল সাধু-বাবারাই শাস্ত্রীয় পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকেন। শাস্ত্র না-মানিয়া এই সকল সাধুদিগকে মানিবার স্বাধীনতা সকলেরই আছে। কিন্তু আমার বক্তব্য শুধু এই যে, শাস্ত্র এবং এরূপ সাধু, দুইকেই মানা অযৌক্তিক।

এই সম্পর্কে আমার দুই-এক জন সমালোচক শাস্ত্রের তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। যে-কোন সময় সন্ন্যাস গ্রহণের পক্ষে একমাত্র শ্রুতি জাবাল-উপনিষদের একটি বচন। ইহার বিরুদ্ধে এত শ্রুতি-স্মৃতি রহিয়াছে যে, ইহাকে ইতিহাসের দিক্ দিয়া দেখিলে একটা বিরুদ্ধ মত প্রতিষ্ঠার ক্ষীণ চেষ্টা বলিয়াই মনে হয়। প্রচলিত সাধারণ রীতি উহা অনুমোদন করে নাই। আমার এই মন্তব্যে বিচলিত হইয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন আমি শ্রুতি মানি না, উহাকে ভ্রান্ত মনে করিয়াছি, ইত্যাদি। আমি কি মানি কিংবা মানি না, তাহা আমাদের আলোচ্য নয়। সন্ন্যাস সম্বন্ধে হিন্দুর শাস্ত্রবিধি কি, তাহাই আমাদের বিবেচ্য।

শুধু ভারতের নয়, সমগ্র সভ্য-জগতের ইতিহাসেই সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের ইতিহাস একটি চিত্তাকর্ষক অধ্যায়। আর সর্ব্বত্রই আমরা এই একটি সত্য উপলব্ধি করি যে, সন্ন্যাসীদের ভিতর নানা প্রকার সম্প্রদায়ভেদ ঘটিয়া যায়; কাজেই তাহাদের শাস্ত্রও এক থাকে না। আমার সমালোচকেরা শ্রুতিতে অগাধ বিশ্বাসের ভান না করিয়া যদি একটু ইতিহাস চর্চ্চা করিতেন, তাহা হইলে হয়ত আমার প্রতি এতটা রুষ্ট হইতেন না এবং নিজেরাও উপকৃত হইতেন।

বিশেষণের প্রতিবাদে বিশেষণ প্রয়োগ তর্কযুদ্ধের একটা রীতি হইলেও ওটা ঠিক আমাদের অভ্যাস নয়। কাজেই আমার প্রতি প্রকাশ্যে এবং ইঙ্গিতে যে-সব বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহার কোন প্রতিবাদ আমি করিব না। কেবল যে-সব পণ্ডিতম্মন্য সমালোচক জাবাল-শ্রুতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য কয়েকটি কথা এখানে নিবেদন করিব।

হিন্দুরা শ্রদ্ধা করে, শাস্ত্র বলিয়া মানে এই রকম সকল গ্রন্থই

কি একই কথা বলে—একই প্রকার বিধি দেয়? যাহাদের শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় নিজের পারিবারিক আচারের গণ্ডী অতিক্রম করে নাই, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাহা ছাড়া, সকলেরই জানা উচিত যে, নানা মুনির নানা মত হিন্দু-শাস্ত্রে পাওয়া যায়। মহাভারতের প্রসিদ্ধ উক্তিটি এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে যে,—

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ,
নাসৌ মুনি র্যস্য মতং ন ভিন্নং।"

মহাভারত প্রামাণ্য স্মৃতি-গ্রন্থ; আর এই উক্তিটি শাস্ত্র-নিষ্ণাত যুধিষ্ঠিরের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল। শ্রুতিতে শ্রুতিতে, স্মৃতিতে স্মৃতিতে এবং শ্রুতি ও স্মৃতিতে এত বিরোধ রহিয়াছে যে, তাহার প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করিলেও অপর পক্ষকে অপমান করা হয়। এই ভেদকে অধিকারী-ভেদে প্রস্থান-ভেদ মনে করিয়া শাস্ত্রের ঐক্য দেখাইবার একটা চেষ্টা যে হইয়াছিল, তাহা জানি; এমন কি, সাংখ্য-বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রকেও একই শাস্ত্রের সোপান-ভেদ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু সে-চেষ্টা কি সফল হইয়াছে? ধর্ম্মবিশ্বাসে বিবাহাদি অনুষ্ঠানে, আহারাদি কর্ম্মে সকল হিন্দুই কি এক? বাঙালী ও মৈথিলী, শাক্ত ও বৈষ্ণব, কর্ম্মী ও জ্ঞানী গৃহী ও সন্ন্যাসী,—সকলেই হিন্দু হইয়াও বিভিন্ন হইতে পারে। এ ত অতি সোজা কথা। সব শ্রুতি যদি একই কথা বলিত আর সব শ্রুতির অর্থও যদি স্পষ্ট হইত ইহাদের ভিতর কোথাও যদি বিচার-তর্কের অবকাশ না থাকিত তবে মীমাংসা-দ্বয়ের কি প্রয়োজন ছিল? আর এই মীমাংসারই বা এত টীকা-ভাষ্য হইয়াছিল কেন? স্মৃতি যদি সব একই মত প্রকাশ করিয়াছিল তবে এতগুলি স্মৃতি হইল কেন, আর দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার মধ্যে অত পার্থক্য আসিল কোথা হইতে?

আমার এক জন বৈষ্ণব সমালোচক দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে আমি শ্রুতিবাক্যের 'অবিরোধ অনুসন্ধান না করিয়া' উহার বিরোধই দেখিয়াছি। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে অবিরোধ স্পষ্ট হইলে উহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয় না; আর চেষ্টা করিয়া বিরুদ্ধ বাক্যে ঐকমত্য কল্পনা করা ইতিহাস-বিরুদ্ধ সুতরাং সত্যের অপলাপ। শাস্ত্রকারদের ভিতর অবিরোধই কি প্রধান? বৈষ্ণব লেখক ত জানেন এবং স্বীকারও করিয়াছেন যে ভাগবত ও মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের ভিতর অনেক বিষয়েই মতের ঐক্য নাই। যিনি বৈষ্ণব, ভাগবতকে তিনি বড় প্রমাণ মনে করেন; কিন্তু ভাগবত শ্রুতি নয় স্মৃতি মাত্র; স্মার্ত্ত ও তান্ত্রিক প্রভৃতি ইহাকে কি বৈষ্ণবদের মত শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন? 'গোপ-বধূটি-দুকূলচৌর' শ্রীকৃষ্ণ সকল হিন্দুর নিকটই সমান দেবতা নন; মহাভারতের যুগে শিশুপাল যেমন তাঁর অর্ঘ্য প্রাপ্তির যোগ্যতা অস্বীকার করিয়াছিল, তেমনই এখনও অনেক হিন্দু তাঁহার দেবত্ব মানিতে অসম্মত। অথচ, বৈষ্ণবদের নিকট "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"! এসব কথা এত স্পষ্ট, যে ইহা বলার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়াই মনে হয় না।

তার পর সেই জাবাল-শ্রুতির কথাই ধরা যাক্। বেদান্ত-সূত্রের ৩।৪।২০ সূত্রে সন্ন্যাস আশ্রম সম্বন্ধে একটা বিচার আছে। সেখানে সূত্রকার যদি এই জাবাল-শ্রুতি উদ্ধৃত করিতে পারিতেন, তবে তাঁহার মীমাংসা সুকর হইত। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই; শ্রুত্যন্তর এবং যুক্তির সাহায্যে তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ভাষ্যকারদের চক্ষে ইহা ঠেকিয়াছে। শঙ্কর সাফাই গাহিয়া বলিতেছেন—

"অনপেক্ষ্যৈব জাবাল-শ্রুতিমাশ্রমান্তর-বিধায়িনীময়মাচার্য্যেণ বিচারঃ প্রবর্ত্তিতঃ।"

রামানুজও এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

"জাবালানামাশ্রমবিধিমসন্তমিব কৃত্বা"—ইত্যাদি।

জাবাল-শ্রুতির অপেক্ষা না করিয়া—অর্থাৎ উহা যেন নাই এরূপ মনে করিয়া সূত্রকার এই বিচার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সোজা কথায় জাবাল-উপনিষদের বচনটি সূত্রকার ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু কেন? শ্রুতিটি মানিলে তাঁহার এই বিচার নিষ্প্রয়োজন ছিল। শ্রুতিটি আছে, উহা প্রামাণ্য এবং সূত্রকার উহা জানেন—এমন যদি হইত তাহা হইলে এই বিরাট্ গবেষণার কোন সার্থকতা দেখা যায় না! তাহা হইলেই মনে করিতে হয় যে, হয় সূত্রকার উহার অস্তিত্ব জানিতেন না নয়ত তিনি উহা মানিতেন না; অথবা তাঁহার সময়ে এই শ্রুতি আদৌ বর্ত্তমানই ছিল না। একটা প্রামাণ্য শ্রুতি সূত্রকার জানিতেন না এতটা অজ্ঞ তাঁহাকে মনে করিবার কোন হেতুই নাই। সুতরাং হয় তাঁহার সময়ে এই শ্রুতির আবির্ভাব হয় নাই, নয়ত তিনি উহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন। 'অনপেক্ষা' আর 'উপেক্ষা'র ভিতর তফাৎটা খুব বেশী নয়।

সূত্রকার উপেক্ষা করিয়াছেন এমন শ্রুতি বর্ত্তমান থাকিলেও তাহার প্রামাণ্য খুব বেশী হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, এ-শ্রুতি তখন ছিল না, এরূপ মনে করিলে কি পাপ হইবে? শ্রুতির অপৌরুষেয়ত্ব-বাদী হয়ত চমকিয়া উঠিবেন সে কি কথা! শ্রুতি যে অনাদি! ঠিক কিন্তু 'আল্লা' এবং 'ছাগলে'র নামেও উপনিষদ হইয়াছে, এবং সেগুলিও শ্রুতির পদবী দাবী করে। কাজেই এমন হইতে পারে যে 'জাবাল-শ্রুতি বাদরায়ণের সময় আবির্ভূত হয় নাই।

অথবা এই কথাটাই অন্য ভঙ্গিতে বলা যায় যে, যে-ঋষি এই শ্রুতি দর্শন করিয়াছিলেন তিনি তখনও উহা সাধারণ্যে প্রকাশ করেন নাই। আমার সমালোচক জাবাল-উপনিষদ্‌কে যত বড় মনে করিয়াছেন, উহা প্রকৃতপক্ষে তত বড় হইলে বেদান্তসূত্রের বিচারে উহা উপেক্ষিত হইত না।

যে-কোন বর্ণের লোক যে-কোন বয়সে নাম ভাঁড়াইয়া এবং বেশ বদলাইয়া যে আজকাল সন্ন্যাসী হইয়া যায়, ইহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে। আশা করি, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি অতঃপর উহা স্বীকার করিবেন। যে-সব বর্ণের সন্ন্যাসে অধিকার আছে, তাহাদের সম্বন্ধেও কোন-কোন স্মৃতি কলিতে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ বলিয়াছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার উদ্বাহতত্ত্বের গোড়ায় কলিতে নিষিদ্ধ কতকগুলি কর্ম্মের তালিকা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে 'কমণ্ডলু-বিধারণ' অর্থাৎ সন্ন্যাসও একটি। অবশ্য রঘুনন্দনের স্মৃতি সকলে মানেন না। কিন্তু কোন স্মৃতি যাঁহারা মানেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন, যে, যে-কোন ব্যক্তির সন্ন্যাসে শাস্ত্রানুযায়ী অধিকার নাই।

দুনিয়ার সব লোকের সব কাজই হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্রানুসারেই হইবে, এমন কথা আমি কল্পনাও করিতে পারি না। তবে, ভান যত কম হয়, সত্য ততই স্পষ্ট হয়। যাঁহারা শাস্ত্র না জানিয়া সন্ন্যাসী হন, তাঁহাদের অজ্ঞতা দূর করা দরকার। আর, যাঁহারা শাস্ত্র না মানিয়া সন্ন্যাসী হন, তাঁহাদের সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার; তাহা না হইলে প্রতারণা করা হয়।

জগতের ইতিহাসে সন্ন্যাসীকে সর্ব্বত্রই কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী দেখিতে পাই। কিন্তু আধুনিক অনেক মঠ ও আশ্রম কামিনীও বর্জ্জন করেন না, কাঞ্চনেও বিগতস্পৃহ নহেন। অনেক আশ্রমের মালিককে জানি, প্রচুর টাকা ব্যাঙ্কে মজুত রাখিয়াছেন; এক জনের কোম্পানীর কাগজের মাসিক সুদ প্রায় হাজার টাকা হয়, এ-কথা আমি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি। তাহা ছাড়া, কেহ কেহ বিরাট্ জমিদারীও ভোগ করিয়া থাকেন। আর কোঠাবাড়ী ইমারত ত প্রায় সকলেরই আছে। আমি অভিযোগ করিয়াছি, যে, ইহাও ঠিক সন্ন্যাসের আদর্শের অনুযায়ী নহে। পাচক চাকর দ্বারা যে গৃহস্থালী চালান হয়, তাহাও গৃহস্থালীই, সন্ন্যাস নয়। উত্তরে আমায় এক জন স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, কোঠাবাড়ীতে শহরে কত লোক বাস করে, আমি তাহাদের বিরুদ্ধে ত কিছু বলি না। ধনী তাহার স্বোপার্জ্জিত কিংবা পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করিবে ইহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, কেন না, উহাতে কোন ভান নাই। কিন্তু গেরুয়াধারী প্রকাশ্যে সকালে বিকালে শিষ্যদের সম্মুখে প্রণব জপিবেন আর নিভৃতে খাজাঞ্চির সঙ্গে ক্যাশ গণিবেন, ইহা ত সরল জীবনধারা নয়। ইহাতে সমাজের অনিষ্ট হয়। সেই জন্যই আমার আপত্তি।

এটা যে সন্ন্যাসের আদর্শ নয় তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ আমি দিয়াছি। তাহার উত্তর শুনিয়াছি এই যে, শাস্ত্রের নির্দ্দেশ সব সময় মানিতে হইবে এমন কি কথা? যুগধর্ম্ম কালধর্ম্ম ইত্যাদিও ত আছে। নিশ্চয়ই; কিন্তু সাধারণের, বিশেষতঃ ভক্তদের জানা উচিত যে, উহা যুগধর্ম্ম অনুসারে অনুষ্ঠিত হইতেছে শাস্ত্রানুসারে নয়।

এই সব মঠ ও আশ্রমের অধিকারে যে প্রচুর বিত্ত সঞ্চিত হইয়াছে এবং হইতেছে আমি মনে করি, রাষ্ট্রের এবং সমাজের কল্যাণের জন্য সে-সব রাষ্ট্রের শাসনে আসা উচিত। এই কথা বলাতে কোন কোন আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ জোর গলায় বলিয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহাদের কিছুই বিত্ত নাই, তাঁহারা বড় গরীব! কোন্ আশ্রমের কি আছে, প্রয়োজন-মত সে অনুসন্ধান রাষ্ট্র করিবে; কিন্তু এই অনুসন্ধান যে সমাজের কল্যাণের জন্য করা উচিত ইহাই কি সকলে স্বীকার করেন?

এখানে একটা কথা বলা দরকার। মঠ ও আশ্রম কিংবা সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসীর আলোচনায় শুধু আধুনিক ধরণের—অর্থাৎ ইংরেজী-ওয়ালা আমেরিকা-ফেরত সন্ন্যাসীরাই উদ্দিষ্ট নহেন। আমি একসঙ্গে তীর্থের পাণ্ডা ও মোহন্তদের কথাও ভাবিতে চাই। তাঁহারাও কামিনীত্যাগী, কাঞ্চন-লোভী অশাস্ত্রীয় সন্ন্যাসী। অনেকে আবার কামিনীত্যাগও করেন নাই। অপব্যয়িত এবং ভোগে ব্যয়িত হইবার মত প্রচুর বিত্ত ইঁহাদেরও থাকে। তারকেশ্বরের মোহন্তের বিত্ত লইয়া মোকদ্দমা এখনও শেষ হয় নাই। সেদিন দেখিলাম বৈদ্যনাথের এক পাণ্ডার নামেও মোকদ্দমা দায়ের হইয়াছে।

বিলাতে যেমন মঠের উচ্ছেদ (Dissolution of monasteries) এক সময় রাষ্ট্রকে করিতে হইয়াছিল, তেমনটি এদেশেও করার প্রয়োজন হইয়াছে এবং সময়ও আসিয়াছে বলিয়া আমার আশঙ্কা হয়। মঠাদির সম্পত্তির রক্ষণ ও শাসনের ভার রাষ্ট্র যদি কখনও গ্রহণ করে, তবে তখন তীর্থ-পতিদের বিত্তের কথাও রাষ্ট্র বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

আধুনিক মঠাদিতে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের সন্ন্যাসের ভেক দেখিয়া তাঁহাদিগকে যতটা সংসার-বিরাগী মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে ততটা বিরাগী তাঁহারা নন; বরং কোন-কোন বিষয়ে তাঁহাদের জীবনধারা সংসারীদের চেয়ে ঢের নিকৃষ্ট। ইঁহাদের মনোবৃত্তি অনেক ক্ষেত্রেই একেবারে আধ্যাত্মিকতা-বর্জ্জিত।

আমার 'মঠ ও আশ্রম' নামক প্রবন্ধের প্রকাশ্য প্রতিবাদ যাঁহারা

করিয়াছেন, তাঁহারা ভদ্র পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু অনেক প্রতিবাদকই সে পন্থা অনুসরণ করেন নাই। এক জন আমাকে চিঠি লিখিয়া শাসাইয়াছিলেন, "আপনি ভারতের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের অপমান করিয়াছেন; আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি আমাদিগকে সীমা অতিক্রম করিতে উত্তেজিত করিবেন না!" কিসের 'সীমা' এবং সে সীমা অতিক্রান্ত হইলে আমার অদৃষ্টে কি ঘটিতে পারিত স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই। অনুমান পাঠকেরাও করিতে পারিবেন। দুই-এক জন মঠবাসী আমাকে আদালতের ভয়ও দেখাইয়াছিলেন। এই সব সংসার-বিরাগী সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের এবম্বিধ উষ্মা-প্রকাশ ঘোর সংসারাসক্ত গৃহীকেও লজ্জা দেয়! ইহারই নাম কি বৈরাগ্য? ইহাই কি তিতিক্ষা?

দুই-এক জন মঠবাসী আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াও তাঁহাদের ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়াছি। কারণ আমার ক্ষুদ্র আলোচনা এতটা চিত্তবিক্ষোভ এত জায়গায় কি করিয়া ঘটাইল তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। এত জন যে আমার উপর রুষ্ট হইয়াছেন তাহাতে মনে হয় চল্‌তি কথায় যাহাকে বলে, 'আঁতে ঘা লাগা', তাহাই ঘটিয়াছে। ভদ্রবেশী পাপিষ্ঠ আস্তিনের ভিতর শাণিত ছোরা লুক্কায়িত রাখিয়া পথিকের পকেট মারিতে চেষ্টা করে; হঠাৎ যদি কেহ দেখিয়া ফেলে তবে তাহার প্রতি আর সে ভদ্রতা রক্ষা করিতে পারে না; এ দৃষ্টান্ত বড় শহরে আমরা অনেক সময় পাই। যাঁহারা নিরীহ গৈরিকের অন্তরালে থাকিয়া উদভ্রান্ত ধর্ম্মপিপাসুদের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থে সুখভোগ করেন, তাঁহারা বিরুদ্ধ সমালোচনায় রুষ্ট হইবেন ইহা আশ্চর্য্যের কথা নয়। কিন্তু ক্রোধ সন্ন্যাসীদেরও রিপু; আর অহমিকা জয় না করিয়া যোগমার্গে উন্নতিলাভ করা যায় না।

'সন্ন্যাসী' কথাটার কোন সংজ্ঞা আমি দিই নাই; দেওয়া দুষ্কর অথচ নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা অগৃহী অর্থাৎ অকৃতদার অথবা বিপত্নীক এবং কাঞ্চনত্যাগী অর্থাৎ নিজে উপার্জ্জন করেন না, তাঁহারাই সাধারণতঃ এদেশে সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচিত হন। এই নিয়ম অনুসারে রাস্তার ধারে কিংবা দেব-মন্দিরের সম্মুখে ধুনা জ্বালিয়া উলঙ্গ বা ল্যাঙ্গট-পরিধারী যে-ব্যক্তি গাঁজা টানে সে-ও সন্ন্যাসী; আর বার্লিনে কিংবা লস্-এঞ্জেলেসে ইউরোপীয় পরিচ্ছদ-ধারী লম্বকেশ ও দীর্ঘশ্মশ্রু যে-সব ব্যক্তি ভারতীয় ধর্ম্ম ও দর্শন ব্যাখ্যা করিয়া বেড়ান, তাঁহারাও সন্ন্যাসী। ইহার মধ্যে ভালমন্দ দুই-ই আছে। মন্দরা বিশ্বাসপ্রবণ নরনারীকে প্রতারিত করিয়া সমাজের অমঙ্গল করে, এটা ত নূতন কথা মোটেই নয়। ইহা শুনিয়া কাহারও তেমন উত্তেজিত হইবারও কোন কারণ নাই।

সন্ন্যাসীরা যে সব সময়েই সংসার-বিরাগী নয়, তার কি প্রমাণ দেওয়া দরকার? সংবাদপত্রে ইহাদের কুকর্ম্মের কাহিনী এত প্রকাশিত হয় যে চক্ষু বুজিয়া কথাটা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সেদিন যুক্ত-প্রদেশের সীতাপুর জিলার এক গ্রামে কয়েক শত সংসার-বিরাগী সাধু সংসারাসক্ত গ্রামবাসীদের আতিথ্য ইচ্ছা করেন; কিন্তু সেই আতিথ্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা বেচারাদের গ্রামখানা আগুন দিয়া পুড়াইয়া দেন, এবং গীতার বচন অনুসারে লাভালাভ ও সুখ-দুঃখ সমান মনে করিয়া পাপিষ্ঠ গৃহস্থদের শস্য ইত্যাদিও লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু নিকটেই পুলিস ছিল বলিয়া ইঁহাদের আত্মিক শক্তির বিকাশ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। (অমৃত বাজার পত্রিকা, মার্চ্চ ৮, ১৯৩৬ সন)। ইহার কয়েক দিন পূর্ব্বেই কাগজে বাহির হয় যে, চব্বিশ-পরগণার বেহালা থানার অধীনে এক আশ্রমের অধীশ্বরের বিরুদ্ধে এক রমণী আদালতে এক কুৎসিত অভিযোগ আনিয়াছে। ইঁহার আশ্রম আছে এবং ইনিও এক জন সন্ন্যাসী!

হয়ত শুনিতে পাইব, পালে কালো মেষ আছে বলিয়া কি সব মেষই কালো? তা নিশ্চয়ই নয়; কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, সংখ্যা কোন্‌টির বেশী? সন্ন্যাসের ভেক লইয়া কত লক্ষ লোক হিন্দু সমাজে চরিয়া খাইতেছে, আর তাহার মধ্যে প্রকৃত সাধু কয় জন? যে জিনিষটার অপব্যবহার হয় অতি সহজে তাহাকে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা কি সমাজের কর্ত্তব্য নয়?

অনেক দিন আগে মুন্সীগঞ্জেই বোধ হয় একবার কল্কি-অবতারের আবির্ভাব হইয়াছিল; আর ফরিদপুরে এক নিঃসন্তান দম্পতীর সন্তানের আকাঙ্ক্ষা যাগ-যজ্ঞের সাহায্যে চরিতার্থ করিয়া দিতে লোভ দেখাইয়া এক সন্ন্যাসী রমণীটির সর্ব্বনাশ করিয়াছিল! ইহারাও যে সন্ন্যাসী! ইহারাও যে ধরা না-পড়া পর্য্যন্ত সমাজে পূজা পাইয়া থাকে! এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলে ইহারাও যে সহজেই শিষ্যসঙ্ঘ সংগ্রহ করিতে পারে! যে ধর্ম্মোন্মাদ এ জিনিষের প্রশ্রয় দেয় সমাজ-হিতার্থীর কি তাহার কথা চিন্তা করা উচিত নয়? পালের একটি কৃষ্ণ মেষ পালকে কৃষ্ণ করে না সত্য; কিন্তু তেমনই দুই-একটি শুভ্র মেষও সকল মেষকেই শুভ্র করিয়া দেয় না।

আধুনিক আশ্রমাদিতে জীবনধারা কি রকম তাহার একটু নমুনা দিলে আশা করি ভক্তেরা রুষ্ট হইবেন না। এক আশ্রম-বাসীদের একবার দুর্গোৎসব করিতে আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। ইঁহারা স্থির করিলেন মাটির মূর্ত্তিতে পূজা কিছুই নয়; "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা" তাঁহার পূজা মাতৃজাতিতেই হওয়া উচিত। আশ্রমবাসিনী কয়েকটি নারী পূজ্যা বিবেচিত হইলেন, আর কয়েক জন পুরুষ কার্ত্তিক, গণেশ অসুর ও সিংহ হইতে সম্মত হইলেন। দুর্গা যিনি হইলেন তাঁহার এক পা সিংহের পিঠে, আর এক পা অসুরের স্কন্ধে দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে নিশ্চয়ই কষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু ভক্তদের মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি সে কষ্ট গ্রাহ্য করেন নাই। তিন দিন ব্যাপিয়া সকাল হইতে সন্ধ্যারতি পর্য্যন্ত জীবন্ত মানুষ দ্বারা পূর্ণ কাঠামোতে এই ভাবে পূজা চলিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এ পূজায় আশ্রমের বিশিষ্ট ভক্তেরাই শুধু যোগ দিবার অধিকার পাইয়াছিল। বাহিরের লোক সংবাদটা জানিয়াছে মাত্র।

আর এক আশ্রমে একবার শাস্ত্রালাপ শুনিতে গিয়া দেখি, রামায়ণ-পাঠ হইতেছে। গুরুদেব কিংখাবে-মোড়া ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন; এক জন ভক্ত পাঠ করিতেছেন, আর অন্যেরা ভক্তিপ্লুত চিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছেন। পাঠ আরম্ভ হইল—'জাম্ববান্ কহিলেন—'! শ্রোতাদের চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল। আর ঠিক সেই সময়েই বাহিরের এক জন ভক্ত গুরুর জন্য কতকগুলি ডাব ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য ফলের ভেট লইয়া

উপস্থিত হইল! অমনি সেগুলি কুঠীতে লইয়া যাইবার জন্য এক জন শিষ্যকে গুরুদেব উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। পাঠ ক্ষণকালের জন্য স্থগিত রহিল। আমরাও সংসারে অনাসক্তির অপূর্ব্ব আস্বাদ পাইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম!

একবার এক সাধুকে দেখিতে গিয়া দেখি, বহু সরকারী পেনসন-ভোগী সেখানে জড়ো হইয়াছেন। শাস্ত্রালাপ চলিতেছে। এক জন জিজ্ঞাসু ভগবদ্দর্শন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন। আর গুরু তাঁহার জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিতেছেন। আলোচনায় সিদ্ধান্ত হইল যে কিছুই গুরুর উপদেশ ছাড়া জানিবার উপায় নাই; সুতরাং গুরু-করণ একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যে-কোন গুরুই শিষ্যের উপকার করিতে পারে না সদ্‌গুরুর প্রয়োজন। অর্থাৎ—। এদিকে এক জন আমার সঙ্গে আলাপ জুড়িয়া দিলেন এবং আমার নাম ধাম ইত্যাদিও জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহার কিছু কাল পরে এক ছাপানো চিঠিতে জানিতে পারিলাম যে, কোনও এক স্থানে এক মহোৎসব হইবে; ভক্তদের সাহায্য প্রয়োজন; যৎকিঞ্চিৎ পাঠাইয়া দিলে বাবা সন্তুষ্ট হইবেন। চিঠিতে আমার ঠিকানা নির্ভুল দেখিয়া প্রথমটায় নিজেকে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ মনে হইতেছিল; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল যে, আমার উপস্থিতির সময় সেখানে আমার নাম ঠিকানা জানিয়া রাখার মত লোক বর্ত্তমান ছিল! ইহারা সব পালের শুভ্র মেষ, না কৃষ্ণ মেষ?

বর্ত্তমানে ভারতে সন্ন্যাসীদের সংখ্যা কত তাহা কোথাও নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া জানি না, কিন্তু যে-কোন মেলায়, বিশেষতঃ কুম্ভমেলায় লক্ষ লক্ষ সংসারবিরাগী সাধু জমায়েৎ হন বলিয়া জানি। সমাজে ইহাদের অস্তিত্ব একটা ভাবনার কথা। নীতি, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতির দিক্ দিয়া এই প্রশ্ন বিবেচিত হইতে পারে। নীতির দিকে ইহাদের অস্তিত্ব সমাজের কতখানি হিত সাধন করে, তাহা কতকটা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির দিক্ দিয়াও বিষয়টির গুরুত্ব কম নয়। পঁয়ত্রিশ কোটি লোকের ভিতর এক কোটি লোক যদি কর্ম্মক্ষম হইয়াও অন্যের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করে তবে সেটা কি সমাজের স্বাস্থ্যের লক্ষণ? এ ছাড়া অন্ধ, আতুর, দুঃস্থ প্রভৃতি ত রহিয়াছেই। বড় বড় শহরে অত্যধিক ভিক্ষুকের উপস্থিতি একটা বিবেচ্য সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই বর্ত্তমানে বেকার-সমস্যাও একটা সমস্যা। বেকারেরা কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক কিন্তু কর্ম্মহীন। ভিক্ষুকেরা প্রায়ই কর্ম্মাক্ষম সুতরাং আয়হীন। ইহাদের কথা যদি সমাজ ভাবিতে পারে, তবে কর্ম্মক্ষম অথচ কর্ম্মে অনিচ্ছু সাধুদের কথাই বা সমাজ ভাবিবে না কেন? যে-কোন শ্রেণীর লোকের অস্তিত্ব সমাজের পক্ষে কল্যাণকর কি না, সে-কথা আজ সাহস করিয়া সব দেশের লোকেই ভাবে। ধনী-মজুরের কিংবা জমীদার-প্রজার সমস্যা আজ পৃথিবী বিচার করিতে বাধ্য হইয়াছে; এবং কোন কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব-বিলোপ আজকাল অনেক দেশেই ঈপ্সিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু অপরিগণনীয় সাধুদের দ্বারা হিন্দুসমাজের উপকার হইতেছে কি না এ-কথাটা ভাবাই কি দোষ? জমীদারদের অস্তিত্ব-বিলোপের কথা আজ বাংলা দেশে স্পষ্টভাবে উঠিয়াছে। তাহাতে জমীদারেরা রুষ্ট হইয়াছেন, বিচলিতও হইয়াছেন; কিন্তু আলোচনা বন্ধ করার শক্তি আর তাঁহাদের নাই। অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিলে সাধুরাও রুষ্ট হইবেন, ইহাও স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁহাদের রোষই ত তাঁহাদের উপকারিতা প্রমাণ করে না!

যে ভ্রান্ত ধর্ম্ম-প্রেপ্সা ইহাদের অস্তিত্বের মূল, তাহারও আমূল সংস্কার আবশ্যক। এ ধরণের ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে ফ্রয়েড প্রভৃতি মনস্তত্ত্ববিৎ যাহা বলিয়াছেন, এখানে আর সে-কথা তুলিব না। কিন্তু কিছু দিন আগে লক্ষ্ণৌ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর ডাক্তার পরাঞ্জপে এক বক্তৃতায় এ-বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"ভারতে, বিশেষতঃ পশ্চিম-ভারতে, আজকাল গুরুকরণের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। লোকে নিজের বিচারশক্তিতে আর বিশ্বাস করে না। বহু শিক্ষিত ব্যক্তিও এই ধূয়ায় মাতিয়া উঠিয়াছেন। নির্লজ্জ এবং বেহায়া না-হইতে পারিলে গুরু হওয়া যায় না।…দুই এক বার সমাধি বা মূর্চ্ছা ঘটাইতে পারিলে গুরুর ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের কাহিনী দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। অনেক সময় এইরূপ সমাধি গাঁজা, আফিম কিংবা মদের সাহায্যেও আনয়ন করা চলে।…একবার আমেরিকা ঘুরিয়া আসিতে পারিলে অভাবনীয় ফল পাওয়া যাইবে। আমেরিকাতেও মাথা-খারাপ লোক আছে; তাহারা এই নূতন চীজটিকে 'অবতার' বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠাবোধ করিবে না। শিষ্য-শিষ্যাণী জুটিবে, কাগজেও নাম জাহির হইবে। তার পর আর ঠেকায় কে?"

ডাক্তার পরাঞ্জপের নিজের কথাতেই পরিসমাপ্ত করি—

"আমি বলিতে চাই না যে এই (গুরুকরণ) ব্যাপারটা সমস্তই জ্ঞানতঃ কৃত যূথ-বদ্ধ কার্য্য। কতকগুলি সজ্ঞান ভণ্ড অবশ্যই আছে, আর কতকগুলি আত্মপ্রতারিত, আর বাকী বেশীর ভাগই যাহা কিছু বিচার-বিরুদ্ধ এবং রহস্যময় তাহার মোহে মোহিত এবং যে-কোন উপায়ে এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে উৎসুক। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও কোন গুরু উদ্দেশ্যও থাকে, এবং শেষ পর্য্যন্ত এই উদ্দেশ্য রাজনৈতিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও তাহাদের আশ্চর্য্য হওয়া উচিত হইবে না। কিন্তু আমি আমার দেশবাসীর বিচার-বুদ্ধির প্রতি নিবেদন করিতে চাই,—যাহাদিগকে খুব সদয়ভাবে বিচার করিলেও আত্ম-প্রতারিত নিরেট মূর্খ ছাড়া আর কিছু বলা চলে না, সেই সব ব্যক্তিকে সাধারণের অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে শ্রদ্ধা করা এবং প্রশংসা করা কি দেশের পক্ষে কল্যাণপ্রদ?"*

আমরাও দেশের কাছে এই কথাই জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

---

* "I do not mean to imply that the whole business is a tissue of organized conscious deceit. A few are conscious hypocrites, a few others are self-deceived, while the vast majority consists of people who have a vague fascination for all that is occult and against reason and satisfy this bent in the way that offers itself. A few of these people have ulterior motives and should not be surprised if some of these were found to be political. But I appeal to the better nature of my countrymen whether it is in the best interests of the country to laud up such men—who, to judge them mildly, are self-deceived idiots—as model for the ordinary man to follow." (*Amrita Bazar Patrika*, October 9, 1934).

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতের উপাদান

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

জনসঙ্ঘের জীবনচরিতের নাম ইতিহাস, এবং ব্যক্তি-বিশেষের ইতিহাসের নাম জীবনচরিত। ঘটনার সমসময়ে কার্য্যানুরোধে যে চিঠি-পত্র লিখিত হয় তাহাই ইতিহাসের উৎকৃষ্ট উপাদান। কিন্তু এরূপ চিঠি-পত্রও অবিচারে সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। এইরূপ পত্রের বিবরণ অসম্পূর্ণ হইতে পারে। লেখকের রুচি অনুসারে বা প্রয়োজন অনুসারে এইরূপ বিবরণে সত্য বিকৃত হইয়া থাকিতে পারে। যেখানে একই ঘটনায় দুইটি পরস্পরবিরোধী পক্ষের যোগ থাকে, সেখানে উভয় পক্ষের চিঠি-পত্র তুলনা করিয়া দেখিতে না পারিলে সত্য উদ্ধার সম্ভব নহে। সাবধানে প্রমাণ-পরীক্ষা (critical sifting of evidence) ঐতিহাসিক গবেষণার ভিত্তি।

তার পরের শ্রেণীর উপাদান, ঘটনার সমসময়ে লিখিত বিবরণ। যেমন ডায়েরী বা রোজনামচা, বা বার্ষিক বিবরণ (report) ইত্যাদি যাহা কতক পরিমাণে পাঠকগণের সন্তুষ্টির জন্য লিখিত হয়। এইরূপ বিবরণে সত্য বিকৃত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা।

তৃতীয় শ্রেণীর উপাদান, ঘটনার অল্পাধিক কাল পরে প্রত্যক্ষকারীর স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করিয়া লিখিত বিবরণ। ডায়েরীতে যে দোষ ঢুকিতে পারে এইরূপ বিবরণেও সেই দোষ থাকিতে পারে। তাহা ছাড়া মানুষের স্মরণশক্তি অনেক সময় তাহাকে বঞ্চনা করিতে পারে।

চতুর্থ শ্রেণীর উপাদান, গল্প-গুজব মূলক বিবরণ। খবরের কাগজের সংবাদ এই শ্রেণীভুক্ত। এইরূপ সংবাদে ভুল-চুকের অবকাশ অনেক বেশী।

পঞ্চম শ্রেণীর উপাদান, পরবর্ত্তী কালে সংগৃহীত বিবরণ। এই রূপ বিবরণ সমসময়ের লিখিত কাগজপত্রমূলক হইতে পারে, অথবা জনশ্রুতিমূলক হইতে পারে। পরবর্ত্তী কালে সংগৃহীত যে বিবরণ সমসময়ের লিখন মূলক বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে, তাহাই ইতিহাসের উপাদানরূপে বিচার যোগ্য। যে জনশ্রুতির এই প্রকার মূল নির্দ্ধারণ করা যায় না, তাহা প্রকৃত ঘটনার (fact এর) বিবরণের আকর হইতে পারে না। লোকে কথায় বলে, "নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" "জনশ্রুতি অমূলক হইতে পারে না।" কিন্তু যেখানে সেই মূল অজ্ঞাত, সেখানে তাহা কল্পনা করিয়া লওয়ার কাহারও অধিকার নাই। অজ্ঞাতমূল জনশ্রুতি হইতে সত্য উদ্ধার করা অসম্ভব। সুতরাং তাহা ইতিহাসের বা জীবনচরিতের উপাদানের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না।

রাজা রামমোহন রায় সম্ভবতঃ ১৭৭২ সালের ২২শে মে হুগলী (সেকালে বর্দ্ধমান) জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ১৮৩৩ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টল নগরে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজার এই ৬১ বৎসরকাল ব্যাপী জীবন চারিভাগে বা যুগে বিভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম যুগ, জন্ম হইতে ১৭৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে, রামমোহনের সাড়ে চব্বিশ বৎসর বয়সে, তাঁহার পিতা রামকান্ত রায় কর্ত্তৃক নিজের সম্পত্তি বাঁটোয়ারা করিয়া তিন পুত্রকে দান পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় যুগ, ১৭৯৭ সালে স্বাধীন ভাবে বিষয়কর্ম্ম আরম্ভ হইতে ১৮১৪ সালে চাকরী হইতে অবসর লইয়া স্থায়ীভাবে কলিকাতা আসিয়া বাস করা পর্য্যন্ত। তৃতীয় যুগ, ১৮১৪ সালে কলিকাতা আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ হইতে ১৮৩০ সালে ইংলণ্ড যাত্রা পর্য্যন্ত। চতুর্থ বা শেষ যুগ, ১৮৩১ সাল হইতে ১৮৩৩ সাল পর্য্যন্ত ইউরোপ প্রবাস। বর্ত্তমান প্রস্তাবে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের বিভিন্ন যুগের বৃত্তান্তের আকর উপাদান সকল সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

প্রথম যুগ (১৭২২-১৭৯৬)

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের প্রথম যুগ সম্বন্ধে সমসময়ের কোনও চিঠিপত্র এবং সমসময়ের লোকের দ্বারা

পরবর্ত্তী কালে লিখিত কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। এই যুগের চরিতের আকরের মধ্যে রাজার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত ডাক্তার কার্পেণ্টারের লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনীর প্রথম অংশ প্রথম উল্লেখযোগ্য। মিস মেরী কার্পেণ্টার এই সংক্ষিপ্ত জীবনীর এই সকল উপাদান উল্লেখ করিয়াছেন,—Monthly Repository of Theology and General Literature, vols.XIII-XX, Precepts of Jesus নামক পুস্তকের ভূমিকায় ডাক্তার রিস (Dr. T. Rees) লিখিত জীবন বৃত্তান্ত, এবং যে পরিবারের সহিত রাজা লণ্ডনে বাস করিতেন তাঁহাদের কথিত এবং রাজার নিজের কথিত বিবরণ (from communications received from the family with whom the Rajah resided in London, and from the Rajah personally)।* রাজার জীবনের প্রথম ভাগ সম্বন্ধে ডাক্তার কার্পেণ্টারের বৃত্তান্তে যাহা-কিছু লিখিত হইয়াছে তাহা অবশ্য আদৌ মুখের কথার এবং স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করিয়া লিখিত। ডাক্তার কার্পেণ্টার রাজার নিজেরমুখে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহার মধ্যে যদি ভুলচুক থাকে তাহার জন্য তাঁহার নিজের স্মরণশক্তি দায়ী, কিন্তু অন্যের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাতে ভুলচুক থাকিবার সম্ভাবনা বেশী। ডাক্তার কার্পেণ্টারের লিখিত রাজার জীবনের প্রথম ভাগের শেষ ঘটনার বিবরণ এখন মূল দলীলের সহায়তায় পরীক্ষা করা যাইতে পারে। ডাক্তার কার্পেণ্টার লিখিয়াছেন—

The father, Ram Kanta Roy, died about 1804 or 1805, having two years previously divided his property among his three sons.†

অর্থাৎ রামমোহন রায়ের পিতা রামকান্ত রায় ১৮০৪ কিম্বা ১৮০৫ সালে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে, ১৮০২ বা ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার সম্পত্তি তিনি তিন পুত্রের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন।

১৮১৭ সালের ২৩শে জুন রামমোহন রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায় কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের একুইটী বিভাগে যে মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন তাহার আর্জ্জির সঙ্গে রামকান্ত রায়ের মূল বণ্টনপত্রের ইংরেজী অনুবাদ দাখিল করা হইয়াছিল। এই অনুবাদে দেখা যায়, বণ্টন-পত্র সম্পাদনের তারিখ ১২০৩ সনের ১৯শে অগ্রহায়ণ বা ১৭৯৬ সালের ১লা ডিসেম্বর। গোবিন্দপ্রসাদের আর্জ্জিতে রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর তারিখ দেওয়া হইয়াছে, ১২১০ সনের বা ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ (মে-জুন) মাস, অর্থাৎ বণ্টন-পত্র সম্পাদনের প্রায় সাড়ে ছয় বৎসর পরে। গোবিন্দ-প্রসাদের আর্জ্জির জবাবে রামমোহন রায় পিতার মৃত্যুর এই তারিখ মানিয়া লইয়াছেন। সুতরাং এই দৃষ্টান্তে দেখা যায়, মুখে মুখে যে সংবাদ প্রচারিত হয় তাহাতে ভুলচুক ঢুকিবার সম্ভাবনা কত বেশী। ১৮৪৫ সালের কলিকাতা রিভিউ পত্রে (কিশোরী চাঁদ মিত্র লিখিত)* রামমোহন রায়ের যে জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর সাল (১২১০ সন=১৮০৩ খৃষ্টাব্দ) ঠিকই দেওয়া হইয়াছে। এই জীবনচরিতের আকর, কলিকাতা হইতে ১৮৩৪ সালে প্রকাশিত রাজার ইংরেজী জীবনচরিত (Biographical memoir of the late Rajah Rammohan Roy with a series of illustrative extracts from his writings, Calcutta, 1834) আমরা এখনও দেখি নাই।

আর একটি দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইবে কিশোরীচাঁদ মিত্র ১৮৩৪ সালে কলিকাতায় প্রকাশিত যে মূল জীবন চরিত হইতে উপাদান সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা ডাক্তার কার্পেণ্টারের বিবরণ অধিকতর নির্ভরযোগ্য। কিশোরীচাঁদ মিত্র রামকান্ত রায় কর্ত্তৃক নিজের স্থাবর সম্পত্তি বাঁটোয়ারা করিয়া তিন পুত্রকে দানের কথা উল্লেখও করেন নাই। কিন্তু মূল গ্রন্থের দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন—

"It has been roundly asserted by the writer of the memoir placed at the head of this article that Rammohun Roy had been disinherited by his father."

---

* Mary Carpenter, *The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy*, Calcutta, 1915, p. 1.

† Mary Carpenter, *op. cit.* p. 5.

* কলিকাতার (বর্ত্তমানে রয়েল) আসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে Calcutta Reviewতে প্রকাশিত এই জীবনচরিতের এক খানি স্বতন্ত্র খণ্ড (reprint) আছে। এই খণ্ডের উপহারদাতারূপে কিশোরীচাঁদ মিত্রের স্বাক্ষর আছে।

"এই প্রবন্ধের শিরোভাগে উল্লিখিত জীবনচরিতের রচয়িতা সোজাসুজি বলিয়াছেন যে রামমোহন রায়ের পিতা তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র (উত্তরাধিকারী রূপে পৈত্রিক সম্পত্তি লাভের অনধিকারী) ঘোষণা করিয়াছিলেন।"

কিশোরী চাঁদ মিত্র অবশ্য এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের হাতে যে সকল কাগজ-পত্র আছে তাহা হইতে দেখা যায় মিত্রমহাশয়ের কথাও একেবারে ঠিক নহে।

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের প্রথম ভাগের বিবরণের আর একটি প্রসিদ্ধ আকর, পত্রাকারে লিখিত আত্মজীবনী (autobiographical sketch)। এই পত্রের প্রকাশক ষ্টেণ্ডফোর্ড আর্ণট (Standford Arnot) বিশ্বাসযোগ্য লোক ছিলেন না এবং এই পত্রের বিবরণের সহিত ডাক্তার কার্পেণ্টারের বিবরণের সম্পূর্ণ ঐক্য নাই বলিয়া মিস্ কলেট (Miss Collet) এই চিঠী খানিকে জাল (spurious) বলিয়াছেন।* এই পত্র জাল হইলেও ইহাতে কতকগুলি শোনা সংবাদ আছে। রামমোহন রায়ের জীবনের প্রথম ভাগ সম্বন্ধে আদাম (Adam) সাহেবের চিঠিপত্রে এবং লেখায় এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য লেখায় যে সকল সংবাদ পাওয়া যায় তাহাও এই শ্রেণীর প্রমাণ। এই সকল সংবাদকে এক দিকে ভুলচুকশূন্য সত্য ঘটনা বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য নহে, আর এক দিকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও যায় না। রামমোহন রায়ের জীবনের প্রথম সারে চব্বিশ বৎসরের বিবরণ কতক পরিমাণে সংশয়াচ্ছন্ন।

দ্বিতীয় যুগ (১৭৯৭—১৮১৪)

১৭৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সাম্পাদিত বাঁটোয়ারার পর হইতে রামমোহন রায়ের জীবনচরিত সম্বন্ধে অধিকতর নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এ সকল প্রমাণের মধ্যে রেভিনিউ বোর্ডের চিঠিপত্র হইতে রামমোহন রায়ের চাকরী সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়, এবং সুপ্রিম কোর্টের একুইটি বিভাগের গোবিন্দপ্রসাদ বনাম রামমোহন রায় মোকদ্দমার নথীপত্রে † ১৭৯৭ হইতে ১৮১৭ সাল পর্য্যন্ত সময়ের রামমোহন রায়ের বৈষয়িক জীবনের অনেক সংবাদ পাওয়া যায়।

মোকদ্দমার নথীতে জীবনচরিতের উপাদান থাকিলেও সেই উপাদান ব্যবহারের অন্তরায় আছে। মোকদ্দমার কাগজের মধ্যে প্রধান, বাদীর আর্জ্জি এবং বিবাদীর জবাব। বাদী আর্জ্জিতে যে দাবী করেন, বিবাদী জবাবে সেই দাবীকে অনেক সময়ই অমূলক বা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেন। বাদীর পক্ষের সাক্ষীরা এবং তাহার দলীলপত্র বাদীর দাবী সমর্থন করে, বিবাদীর সাক্ষীরা এবং তাহার দলীলপত্র তাহার জবাব সমর্থন করে। বিচারক অনেকটা এক পক্ষের কথা বিশ্বাস এবং আর এক পক্ষের কথা অবিশ্বাস করিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন। গোবিন্দপ্রসাদ বনাম রামমোহন রায় মোকদ্দমায় সুপ্রিম কোর্টের তিন জন জজ বাদীর আর্জ্জি ডিসমিস করিয়াছিলেন, এবং বাদীর উপরে বিবাদীর খরচ ডিক্রী দিয়াছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদের দাবী ডিসমিস হইবার কারণ, সে সেই দাবী কোর্টে সপ্রমাণ করিতে পারে নাই। কিন্তু বিচারালয়ে দাবী সপ্রমাণ হয় নাই বলিয়া ইতিহাসের বিচারালয়ে সেই দাবীকে সকল সময় অমূলক সাব্যস্ত করা সঙ্গত নহে। গোবিন্দ-প্রসাদের দাবী নামঞ্জুর হইয়াছিল বলিয়াই যে তাঁহার কথা একেবারে মিথ্যা এবং রামমোহন রায়ের সকল কথা সত্য সহজে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচারকের সন্তোষজনক প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারিলে সত্য দাবীও নামঞ্জুর হইতে পারে। রামমোহন রায় গোবিন্দপ্রসাদের আর্জ্জির জবাবে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য কি মিথ্যা এই তর্কের চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে হইলে ইতিহাসের বিচারালয়ে হাকিমের হুকুম ছাড়া স্বতন্ত্র প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিলে ভাল হয়। লোকে কথায় বলে "একহাতে তালি বাজে না," এক পক্ষের দোষে মোকদ্দমা হয় না। কিন্তু রামমোহন রায়

* S. D. Collet, *Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, Calcutta, 1913, pp. 6-7.

† হাইকোর্টের এটর্নি শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই নথী আবিষ্কার করিয়াছেন। ডাক্তার যতীন্দ্রকুমার মজুমদারের সৌজন্যে আমরা এই নথীর নকল পাইয়াছি এবং তাহা মূল নথীর সহিত মিলাইয়া লইয়াছি।

গোবিন্দপ্রসাদের দাবীর জবাবে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, অর্থাৎ এই মোকদ্দমার সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের নিজের যে কোন দোষ ছিল না, এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে মোকদ্দমার নথীর বহির্ভূত স্বতন্ত্র প্রমাণও বর্ত্তমান আছে। এই প্রস্তাবে আমরা সেই প্রমাণের উল্লেখ করিয়া রামমোহন রায়ের সহজ সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিব।

১৭৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সম্পাদিত দান এবং বণ্টন-পত্র অনুসারে রামকান্ত রায়—

জ্যেষ্ঠ পুত্র জগমোহনকে দিয়াছিলেন লাঙ্গুড়পাড়ার বসত বাড়ীর অর্দ্ধাংশ, মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হরিরামপুর তালুক এবং আরও জমীজমা।

মধ্যম পুত্র, জগমোহনের সহোদর, রামমোহনকে দিয়াছিলেন লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ীর অর্দ্ধাংশ, কলিকাতার জোড়াসাঁকোর একখানি বাড়ী এবং জমীজমা।

কনিষ্ঠ পুত্র (কনিষ্ঠা পত্নী রামমণি দেবীর পুত্র) রামলোচন রায়কে দিয়াছিলেন রঘুনাথপুরের পৈত্রিক বাড়ীর নিজ অংশ এবং জমীজমা।

রামকান্ত রায় নিজে রাখিয়াছিলেন বর্দ্ধমানের বাসা-বাড়ী, কিছু ব্রহ্মোত্তর জমী, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত খাসমহাল ভুরসুট পরগণার ইজারা সত্ব, এবং বর্দ্ধমানরাজের জমীদারীর দুইটি পরগণার ইজারা সত্ব।

বাঁটোয়ারার অল্প দিন পরেই রামলোচন রায় তাঁহার মাতার সহিত রাধানগরের বাড়ীর নিজ অংশে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের আর্জ্জির মূল কথা, রামলোচন লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ী ত্যাগ করিবার পর রামকান্ত রায় এবং তাঁহার অপর দুই পুত্র, জগমোহন এবং রামমোহন, এই তিন জন মিলিত হইয়া বাঁটোয়ারা রদ করিয়া পুনরায় আপনাদের বিভক্ত সম্পত্তি একত্রিত করিয়াছিলেন। সুতরাং রামকান্ত রায়ের জীবদ্দশায় রামমোহন রায়ের নিজ নামে যে-সম্পত্তি খরিদ করা হইয়াছিল তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে বিনামীতে খরিদ-করা রামকান্ত রায়, জগমোহন রায়, রামমোহন রায় এই তিন জনের এজমালী সম্পত্তি। রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর পরও জগমোহন রায়ের এবং রামমোহন রায়ের সম্পত্তি বিভক্ত হইয়াছিল না, একত্র ছিল। তখন একক রামমোহন রায়ের নামে যে সম্পত্তি খরিদ করা হইয়াছে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে দুই ভাইয়ের সম্পত্তি। সুতরাং গোবিন্দপ্রসাদ রায় সুপ্রিম কোর্টের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন যে, রামমোহন রায়ের নিজ নামে এবং দখলে স্থাবর অস্থাবর যত কিছু সম্পত্তি আছে তাঁহাকে তাহার অর্দ্ধাংশ ভাগ করিয়া দিতে আজ্ঞা হয়।

এই আর্জ্জির জবাবে রামমোহন রায় লিখিয়াছেন, কৃষ্ণনগরের কাজির আফিসে রেজেষ্টারীকৃত বণ্টন পত্রের দ্বারা রামকান্ত রায় তাঁহার অধিকাংশ স্থাবর সম্পত্তি তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। এই বণ্টন পত্র কখনও তিনি রদ করেন নাই; তাঁহার এবং তাঁহার দুই পুত্র, জগমোহন এবং রামমোহন, এই তিন জনের সম্পত্তি কখনও পুনরায় একত্রিত করা হয় নাই; রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর পর এই দুই ভাইয়ের সম্পত্তি বরাবরই পৃথক ছিল। রামমোহন রায় বাঁটোয়ারার পর স্বনামে এবং বিনামে যখন যে সকল সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন তাহা তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থে খরিদকরা স্বীয় স্বতন্ত্র সম্পত্তি। রেভিনিউ বোর্ডের কাগজপত্র রামমোহন রায়ের এই উক্তি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে।

রামকান্ত রায়ের ইজারা খাসমহাল, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভুরসুট পরগণার, এবং জগমোহন রায়ের নিজ অংশের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হরিরামপুর তালুকের, সম্বন্ধে রেভিনিউ বোর্ডে অনেক কাগজপত্র আছে।* এই সকল কাগজপত্রে দেখা যায় ভুরসুটের ইজারা স্বত্ব রামকান্ত রায়ের নিজস্ব ছিল এবং হরিরামপুর তালুক জগমোহন রায়ের নিজস্ব ছিল। এই দুই তালুকের বাকী সদর জমার জন্য রামকান্ত রায় এবং জগমোহন রায় উভয়ে যথাক্রমে দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং বাকী শোধের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে কিস্তিবন্দী করিয়াছিলেন। ১১৯৬ সনে (১৭৮৯-৯০ সালে) ভুরসুট পরগণা ১১৯৩৮৯৮৶৫ এক লক্ষ উনিশ

---

* ডাক্তার যতীন্দ্রকুমার মজুমদার আমাকে বোর্ডের অনেক কাগজের নকল দিয়াছেন এবং আমি নিজেও এই সকল কাগজ দেখিতেছি। বাংলা গবর্ণমেণ্টের রেকর্ড বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত এবং তাঁহার সহযোগিগণ এ-বিষয়ে আমাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন।

হাজার তিন শত উননব্বই টাকা পনর আনা সওয়া পাঁচ গণ্ডা জমায় এক জনের নিকট ইজারা ছিল। রামকান্ত রায় ১০১৩৮৯ এক লক্ষ এক হাজার তিন শত উননব্বই টাকা বার্ষিক জমায় ১১৯৮ সন (১৭৯১—৯২ সাল) হইতে ১২০৬ সন (১৭৯৯-১৮০০ সাল) পর্য্যন্ত নয় বৎসরের মিয়াদে এই পরগণা ইজারা লইয়াছিলেন। রামকান্ত রায়ের জামীন হইয়াছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জগমোহন রায়।* এই ইজারার ষষ্ঠ বৎসরে, ১২০৩ সনের ১৯শে অগ্রহায়ণ (১৭৯৬ সালের ১লা ডিসেম্বর) তারিখে রামকান্ত রায় তাঁহার অধিকাংশ স্থাবর সম্পত্তি তিন পুত্রের মধ্যে বাঁটোয়ারা করিয়া দিয়াছিলেন। ইজারার মিয়াদের প্রথম আট বৎসর রামকান্ত রায় ভুরসুটের লক্ষাধিক টাকা জমা নিয়মমত সরকারে দাখিল করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ১২০৬ সনের চৈত্র মাসে (১৮০০ সনের এপ্রিল মাসে) ভুরসুটের ইজারার মিয়াদ শেষ হইবার সময় এই সনের জমার মধ্যে ২৮৫১।৶০ রামকান্ত রায়ের নিকট বাকী ছিল।† এই টাকার জন্য রামকান্ত রায়কে বর্দ্ধমানের দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। পরে এই দেনার কতক টাকা জামীন জগমোহন রায়ের জমী বিক্রয় করিয়া আদায় করা হইয়াছিল। অবশিষ্ট টাকা রামকান্ত রায় স্বয়ং পরিশোধ করায় ১৮০১ সালের অক্টোবর মাসে তিনি জেল হইতে খালাস পাইয়াছিলেন।

রামকান্ত রায় বর্দ্ধমানরাজের কয়েকখানি মহাল প্রায় লক্ষ টাকা বার্ষিক জমায় ইজারা রাখিতেন। এই সকল মহালের জমার ৭৫০১৲ বাকী পড়িয়াছিল‡ এবং তজ্জন্য তাহাকে প্রথমতঃ হুগলীতে এবং পরে বর্দ্ধমানে দেওয়ানী জেল ভোগ করিতে হইয়াছিল। শেষে কিস্তিবন্দী করিয়া দেনা দিতে অঙ্গীকার করায় তিনি খালাস পাইয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায় রামকান্ত রায় বাঁটোয়ারা

* Board of Revenue O.C. 2 May 1791, No. 30

† Board of Revenue O.C. 15 July 1800 No. 14

‡ বর্দ্ধমানের মহারাজ তেজচাঁদ রামকান্ত রায়ের ওয়ারিশান রামমোহন রায় এবং গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের নামে ১৮২৩ সালের ১৬ জুলাই রামকান্ত রায়ের নিকট প্রাপ্য কিস্তিবন্দীর টাকার জন্য কলিকাতা প্রোভিন্সিয়েল কোর্টে যে নালিশ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ (*Asiatic Journal, December*, 1833)।

রদ করিয়া কখনও পুত্রগণের সম্পত্তির সহিত নিজ সম্পত্তি একত্রিত করেন নাই। রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর পর বর্দ্ধমানের রাজা পাওনা টাকার জন্য তাঁহার বর্দ্ধমান শহরের বাসাবাড়ী দখল করিয়াছিলেন।

জগমোহন রায় ভুরসুটের ইজারা সম্পর্কে রামকান্ত রায়ের জামীন ছিলেন। ১২০৬ সনের চৈত্র (১৮০০ সালের এপ্রিল) মাসে ইজারার মিয়াদ ফুরাইলে যখন বর্দ্ধমানের কালেক্টর বাকী টাকা আদায় করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে সংশয় হইয়াছিল, হরিরামপুর তালুকের প্রকৃত মালিক জগমোহন রায় না রামকান্ত রায়, এবং তিনি বোর্ডকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন রামকান্ত রায়ের নিকট এই টাকা পাওনা থাকিতে জগমোহন রায়কে ১২০৭ সনে (১৮০০—১৮০১ সালে) হরিরামপুর তালুকের খাজনা আদায় ওয়াশীল করিতে দেওয়া হইবে কি না ? ১৮০০ সালের ১১ই জুলাই বর্দ্ধমানের কালেক্টর রেভিনিউ বোর্ডকে লিখিতেছেন—

Para 2d. I have also to acquaint you that Jugmohun Roy Talookdar of Hurrirampore has discharged the Balance of Sa. Rs. 203.14.1.2. account the past year, but a balance of Sa. Rs. 2851.6 being due from his father Ramcaunt Roy the late farmer of Bursoo & for whom he was security and *who is generally understood to be the actual proprieter of Hurrirampore, although it is registered in the name of his son*, I have therefore to request your orders whether he is to be permitted to commence the collections of the current year, or what measures are to be adopted for realizing the heavy balance due for the lands formerly let in farm to Ramcaunt Roy."*

বোর্ড বর্দ্ধমানের কালেক্টরের কথা শুনিয়াছিলেন না। জগমোহন রায়কে হরিরামপুরের প্রকৃত মালিক স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাকে ১২০৭ সনের (১৮০০—১৮০১ সালের) খাজনা আদায় ওয়াশীল করিতে দিয়াছিলেন। এই অনুগ্রহ জগমোহনের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল। হরিরামপুরের মোট সদর জমা ছিল ২৫,৮৮৩৷৶১॥, এবং মুনাফা ছিল বোধ হয় চার-পাঁচ হাজার টাকা মাত্র। ১২০৮ সনের গোড়ায় দেখা গেল, ১২০৭ সনের হরিরামপুরের সদর খাজনার ৯৬০০॥১॥ বাকী আছে।† এই বাকী

* Board of Revenue O.C. 15 July, 1800, No. 14

† Board of Revenue 28 April, 1801 No. 65

খাজনার জন্য ১৮০১ সালের জুন মাসে জগমোহন রায়কে দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করা হইল। তালুকখানি নীলামে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইল। তথাপি দেনা শোধ হইল না; শেষ পর্য্যন্ত ৪৪৫৮৮৶১০ বাকী রহিয়া গেল। দুই বৎসরের অধিককাল কারাভোগের পর জগমোহন রায় মেদিনীপুরের কালেক্টরের সহিত রফা করিলেন যে তাঁহাকে খালাস দিলে তিনি ১০০০৲ টাকা নগদ দিবেন, এবং বাকী ৩৪৫৮৲ মাসিক ১৫০৲ টাকা হারে শোধ দিবেন।‡ জেল হইতে বাহির হইয়া জগমোহন রায় মেদিনীপুরে এই ১০০০৲ টাকা জোগাড় করিলেন কি উপায়ে? সুপ্রিম কোর্টের স্থলবর্ত্তী কলিকাতার বর্ত্তমান হাই কোর্টের ওরিজিন্যাল সাইডের মহাফেজ খানায় গোবিন্দপ্রসাদ রায় বনাম রামমোহন রায় মোকদ্দমার নথীপত্রে রামমোহন রায়ের দাখিল-করা যে সকল মূল দলীল আছে তাহারই মধ্যে রামমোহন রায়ের বরাবরে জগমোহন রায়ের লিখিত এক খানি ১০০০৲ এক হাজার টাকার হাওলাত রসিদ পত্র আছে। হাই কোর্টের কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত ডাক্তার যতীন্দ্রকুমার মজুমদারকে আবশ্যকমত উক্ত মোকদ্দমার কাগজপত্রের ফটোগ্রাফ লইবার অনুমতি দিয়াছেন। আমরা ডাক্তার মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্যে এই হাওলাত রসিদ পত্রের (১নং চিত্র), রামমোহন রায়ের স্বহস্ত লিখিত এবং স্বাক্ষরযুক্ত একখানি এটর্ণি নিয়োগ পত্রের (২ নং চিত্র) এবং আরও কয়েকখানি মূল দলীলের ফটোগ্রাফ পাইয়াছি। এই হাওলাত রসিদপত্রে লিখিত হইয়াছে

প্রাণাধিক লিখিতং

শ্রীজুত রামমোহন রায় শ্রীজগমোহন রায়

(সাং) শ্রীজগমোহন রায়

ভাইজীউ পরম কল্যাণবরেষু

হাওলাত রসিদ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি তোমার স্থানে মবলগে সিক্কা ১০০০ এক হাজার টাকা কর্জ্জ লইলাম মবলক মজকুর ফিসও ১টাকা হিসাবে সুদ সমেত সন ১২১২ সাল দিব মবলক মজকুর মোকাম মেদনীপুরে শ্রীমোহন পোত্দারের তহবিল হইতে পাইয়া হাওলাত রশীদ লিখিয়া দিলাম ইতি—

সন ১২১১ সাল—তারিখ ৩রা ফাল্গুন

১২১১ সনের ৩রা ফাল্গুন অর্থাৎ ১৮০৪ সালের ১৫ই কি ১৬ই ফেব্রুয়ারী জেল হইতে বাহির হইয়া মেদিনীপুরের এই শ্রীমোহন পোদ্দারের মারফতে রামমোহন রায়ের নিকট হাজার টাকা কর্জ্জ পাইয়া জগমোহন রায় পূর্ণ স্বাধীনতালাভ করিয়া বাড়ী ফিরিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই রসিদপত্রের স্বাক্ষর যে জগমোহন রায়ের স্বাক্ষর ইহা আদালতে যথাবিধি প্রমাণিত হইয়াছিল। যদি কেহ এই প্রমাণ যথেষ্ট মনে না করেন, তবে তিনি জগমোহন রায়ের কারামুক্তি সম্বন্ধে সমস্ত সরকারী চিঠিপত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে এই সকল চিঠিপত্রের সহিত জগমোহন রায়ের এই হাওলাত রসিদ পত্র বেশ খাপ খাইয়া যায়। সুতরাং সরকারী চিঠিপত্র এবং এই রসিদপত্র সপ্রমাণ করে, বাঁটোয়ারার পরে জগমোহন রায় এবং রামমোহন রায় এই দুই জনের সম্পত্তি এবং হিসাব সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। অর্থাৎ রামমোহন রায় গোবিন্দপ্রসাদের আর্জ্জির জবাবে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই সত্য।

গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের আর্জ্জিতে বাঁটোয়ারার পর রাম কান্ত, জগমোহন, রামমোহন এই তিন জনের সম্পত্তি পুনরায় একত্রিত হওয়ার কথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা এই সম্বন্ধে রেভিনিউ বোর্ডের চিঠি-পত্র ছাড়া অন্য স্বতন্ত্র প্রমাণও আছে। ১২০৬ সনে রামমোহন রায় নিজ নামে গোবিন্দপুর এবং রামেশ্বরপুর নামক দুইখানি তালুক খরিদ করিয়াছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ তাঁহার আর্জ্জিতে লিখিয়াছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে এই দুইখানি তালুক এজমালী তহবীলের টাকায় রামকান্ত রায় রামমোহন রায়ের বিনামায় খরিদ করিয়াছিলেন। জগমোহন রায়ের স্ত্রী এবং গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের মাতা দুর্গাদেবী কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের একুইটী বিভাগে ১৮২১ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে আর একটি মোকদ্দমা রুজু করিয়াছিলেন। ডাক্তার যতীন্দ্রকুমার মজুমদার এই মোকদ্দমার নথী আবিষ্কার করিয়াছেন। এই মোকদ্দমার আর্জ্জিতে বাদিনী বলিয়াছেন, রামমোহন রায় বাদিনীর নিকট হইতে টাকা লইয়া নিজ নামে গোবিন্দপুর এবং রামেশ্বরপুর তালুক খরিদ করিয়াছিলেন। তারপর ১২০৬ সালের ৫ই শ্রাবণ (১৭৯৯ সালের ১৯শে জুন) রামমোহন রায় একখানি বাংলা কবালা সম্পাদন করিয়া এই দুই খানি তালুক দুর্গাদেবীর নিকট সাফ

‡ Board of Revenue Mis. 30 September, 1803 No 23

বিক্রয় করিয়াছিলেন, এবং ঐ তারিখে বাংলা ভাষায় একখানি কবুলিয়ত সম্পাদন করিয়া দিয়া এই দুইখানি তালুক ছয় বৎসরের মিয়াদে ইজারা লইয়াছিলেন। দুর্গাদেবীর আর্জ্জিতে রামমোহন রায়ের সম্পাদিত এই দুইখানি বাংলা দলীলের এবং আরও একখানি বাংলা দলীলের ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। গোবিন্দপ্রসাদ রায় স্বয়ং তাঁহার মাতার নামে আনীত এই মোকদ্দমার তদ্বিরকারক ছিলেন। তাহার প্রমাণ, দুর্গাদেবীর স্বাক্ষরিত এটর্ণী নিয়োগ পত্রে গোবিন্দপ্রসাদ রায় সাক্ষী স্বরূপ নাম সহি করিয়াছেন। অবশ্য দুর্গাদেবীর এই মোকদ্দমা তিনি চালাইতে পারেন নাই, এবং পরিচালনের অভাবে মোকদ্দমা ডিসমিস হইয়াছিল। গোবিন্দপুর এবং রামেশ্বরপুর খরিদ সম্বন্ধে পুত্রের এবং মাতার আর্জ্জিতে এইরূপ পরস্পর বিরোধী কথা থাকায় সিদ্ধান্ত হয়, ইহার কোন কথাই সত্য নহে, রামমোহন রায়ের কথাই সত্য।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিতে"র অষ্টম অধ্যায়ে (চতুর্থ সংস্করণ, ৩০১—৩০২ পৃঃ) রামমোহন রায়ের বরাবরে ১২২৬ সনের ১৪ই কার্ত্তিক (১৮১৯ সনের অক্টোবরে) লিখিত গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের একখানি চিঠি ছাপাইয়াছেন। এই চিঠিতে গোবিন্দপ্রসাদ স্বীকার করিতেছেন যে তিনি "শুপরেম কোর্টে একুইটিতে অজথার্থ নালিশ" করিয়াছিলেন। চিঠিখানি আমার নিকট সন্দেহজনক মনে হয়। এই চিঠি অনুসারে কোন কাজই হইয়াছিল না; গোবিন্দপ্রসাদ তাঁহার মোকদ্দমা তুলিয়া লইয়াছিলেন না; মোকদ্দমা ডিসমিস হইয়াছিল; এই চিঠি লেখার দেড় বৎসর পরে গোবিন্দপ্রসাদের মাতা রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে আবার মোকদ্দমাও করিয়াছিলেন।

তার পর প্রশ্ন হইতে পারে, জীবনচরিতকার কি রামমোহন রায়ের সকল কথাই বিশ্বাস করিতে পারেন? জীবনচরিতকার বিনা বিচারে কাহারও কোন কথাই বিশ্বাস করেতে পারেন না। কিন্তু যেখানে কোন ব্যক্তির কোন কথার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া না যায়, অথবা সেই কথা যে মিথ্যা এরূপ সন্দেহেরও কোন কারণ না থাকে, অথচ সেই কথার সমর্থনে স্বতন্ত্র কোন প্রমাণও না থাকে, তবে সেই কথা অবিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। রামমোহন রায়ের অনেক কথার সত্যতার সমর্থনে আমরা যখন স্বতন্ত্র নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ পাইতেছি, তখন তাঁহার কোন কোন উক্তির সমর্থনে এইরূপ প্রমাণ না থাকিলেও সেই উক্তি অগ্রাহ্য করা অসঙ্গত হইবে। পাশ্চাত্য জগতে কোনও লেখক কাহারও জীবনচরিত লিখিতে বসিলে ঐ ব্যক্তির নিজের চিঠির এবং তাঁহার ডায়েরীর উপর অধিকতর আস্থা স্থাপন করিয়া থাকেন। যাঁহারা মনুষ্যচরিত্র অভিজ্ঞ তাঁহারা জানেন মানব সমাজে দুই প্রকার লোকই দেখা যায়। এক প্রকার লোক সত্য-মিথ্যার প্রভেদ লক্ষ্য করে না, অথবা সহজে মিথ্যা কথা বলে। আর এক প্রকার লোক স্বভাবতঃ সত্যবাদী। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ খুব দায়ে না পড়িলে মিথ্যা কথা বলে না; আবার কেহ কেহ দায়ে পড়িলেও মিথ্যা কথা বলে না, বরং ক্ষতি স্বীকার করে। গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের আর্জ্জির উত্তরে দেখা যায়, রামমোহন রায় দায়ে পড়িয়াও সত্য ক্ষুণ্ণ করেন নাই। গোবিন্দপ্রসাদ আর্জ্জিতে বলিয়াছিলেন, রামকান্ত রায়ের সম্পত্তির বাঁটোয়ারার পর, রামলোচন রায় পৃথক হইয়া রাধানগর চলিয়া গেলে, রামকান্ত, জগমোহন এবং রামমোহন একান্নবর্ত্তী এবং সকল বিষয়ে একত্রিত হইয়াছিলেন (became again and were joint and undivided in food property and in all respects) হিন্দু পরিবারে একান্নবর্ত্তিতা অন্যান্য বিষয়েও ঐক্য সূচিত করে, এবং যে ব্যক্তি নিজেকে একান্নবর্ত্তী স্বীকার করিয়া সম্পত্তির পার্থক্যের দাবী করে, সেই পার্থক্যের প্রমাণের ভার তাহার নিজের উপর পড়ে। লাঙ্গুড়পাড়ার বাড়ীতে মাতা তারিণীদেবীর অধীনে জগমোহন এবং রামমোহন উভয়ের পরিবার একান্নবর্ত্তী ছিল জবাবে এই কথা স্বীকার করিয়া, রামমোহন রায়, তাঁহার সম্পত্তি যে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল এই কথা প্রমাণ করিবার গুরুভার নিজের স্কন্ধে লইয়াছিলেন। জীবন চরিত সঙ্কলন কালে এইরূপ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির উক্তি বিশেষ আদরণীয়।

তৃতীয় যুগ (১৮১৪—১৮৩০)

১৮১৪ সালে ৪২ বৎসর বয়সে চাকরী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং ক্রমশঃ দেশহিতকর সকল প্রকার

সদনুষ্ঠানেরই সহায়তায় ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই যুগের জীবনচরিতের সকল প্রকার উপাদানই কিছু কিছু আছে, এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ মোটের উপর যথেষ্ট আছে। এই সকল উপাদান অবলম্বন করিয়া ইংরেজী এবং বাংলা ভাষায় রামমোহন রায়ের কয়েকখানি জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই যুগে রামমোহন রায়ের জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে আরও কতক বিবরণ আছে যাহা চরিতকারের নিকট আদর পাইবার যোগ্য নহে। কলিকাতায় প্রথম প্রকাশিত "বেদান্ত গ্রন্থে"র ভূমিকায় এবং অনুষ্ঠানে রামমোহন রায় সাকারোপসনা এবং সাকারোপাসনার পোষক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের উপর দোষারোপ করিয়াছেন, এবং পরবর্ত্তী পুস্তক পুস্তিকায় তাহার মাত্রা বাড়াইয়াছেন। উপনিষৎ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র এই সকল শ্রেণীর হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি রামমোহন রায় গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্রীগণের সাকারোপাসনার সমর্থনের মূলে তিনি স্বার্থপরতা ভিন্ন কোন সদুদ্দেশ্য স্বীকার করেন নাই। সুতরাং "বেদান্ত গ্রন্থ" প্রকাশিত হইবা মাত্রই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ যে রামমোহন রায়ের ঘোরতর শত্রুতা আচরণ করিতে আরম্ভ করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছু নাই। এই শত্রুতা প্রথম অবস্থায় মৌখিক প্রতিবাদ এবং মৌখিক নিন্দায় প্রকাশ পাইয়াছিল। রামমোহন রায়ের কলিকাতা আসিয়া কার্য্যারম্ভের তৃতীয় বৎসর এই মৌখিক প্রতিবাদ এবং শত্রুতা কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল ইংরেজ মিশনারীগণের লেখায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮১৬ সনের ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটির কার্য্য বিবরণে (Periodical Accounts of the Baptist Missionary Society, vol. vi pp. 106—109) লিখিত হইয়াছে—

"He is said to be very moral; but is pronounced to be a most wicked man by the strict Hindus"*

"তিনি (রামমোহন রায়) অতি সচ্চরিত্র লোক বলিয়া কথিত হয়েন। কিন্তু গোঁড়া হিন্দুরা বলেন, তিনি অতি দুষ্ট লোক।"

১৮১৬ সালের মিশনারী রেজিষ্টারে লিখিত হইয়াছে, "The Brahmins had twice attempted his life but he was fully on his guard"। "ব্রাহ্মণগণ দুইবার তাঁহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সতর্ক ছিলেন।"†

মৌখিক নিন্দাবাদের এবং হাতে মারার বৃথা চেষ্টার পর লিখিত প্রতিবাদের প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম পুস্তক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "বেদান্তচন্দ্রিকা" (১৮১৭)। "বেদান্ত চন্দ্রিকা"য় বিদ্যালঙ্কার রামমোহন রায়কে "বকধূর্ত্ত" বলিয়াছিলেন। "ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার" নামক উত্তরে রামমোহন রায়ও বিদ্যালঙ্কারকে আক্রমণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "তিনি গোপনে নানাবিধ আচরণ করেন" অর্থাৎ তিনিও "বকধূর্ত্ত" বা ভণ্ড।

এই রূপ বাদ প্রতিবাদ যেমন চলিতে লাগিল, তেমন ব্যক্তিগত চরিত্রে দোষারোপের মাত্রা বাড়িতে লাগিল। এই মাত্রা খুব চড়িয়াছে "পাষণ্ড পীড়নে"। এই পুস্তকে রামমোহন রায়কে "নগরান্ত বাসী" বা অন্ত্যজ চণ্ডাল বলা হইয়াছে এবং লিখিত হইয়াছে (১৬৩ পৃঃ)—

"কিন্তু নগরান্তবাসীর অদ্যাপি জবনী গমনের চিহ্ন, প্রকাশ হইতেছে যেহেতু, নিজবাস স্থানের প্রান্তেই জবনী গমনের ধ্বজপতাকা রোপণ করিয়াছেন।"†

এই ধ্বজপতাকা আর কেহ কখন দেখেন নাই। সুতরাং অন্যের ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই।‡ আমাদের দেশে কথা আছে, "জ্বরের মাথা ব্যথা, বিবাদের তেড়া কথা।" "বেদান্ত চন্দ্রিকা", "পথ্য প্রদান" শ্রেণীর পুস্তকে প্রতিবাদ এবং বিবাদ (গালাগালি) দুই আছে। বিবাদের তেড়া কথা প্রকৃত ঘটনার বিবরণ সম্বলিত জীবনচরিতের উপাদান রূপে গৃহীত হইতে পারে না, সেকালের রুচির পরিচায়ক বিবাদের ইতিহাসে উল্লিখিত হইতে পারে।

১৮২৯ সালের ২৯শে ডিসেম্বর সহমরণ রহিত বিষয়ক সরকারী আদেশ প্রচারিত হইলে রামমোহন রায়ের প্রতি গোঁড়া হিন্দুগণের আক্রোশ চরম সীমায় পৌছিয়াছিল। সহমরণ প্রথা পুনঃপ্রবর্ত্তনের আন্দোলনের জন্য তাঁহারা ধর্ম্ম সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সভা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, যে হিন্দু সহমরণ-প্রথার বিরোধী পক্ষ সমর্থন করিবেন তাহাকে জাতিচ্যুত করা হইবে। "সমাচার চন্দ্রিকার" সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় "ধর্ম্ম সভার" সম্পাদক হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার পত্রিকা সভার মুখপত্র হইয়াছিল। ইহার পর "সমাচার চন্দ্রিকা"য় রামমোহন রায়ের যে সকল অপবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহা জীবনচরিতের উপাদান রূপে বিচারযোগ্য বিবেচনা করিলে তাঁহার স্মৃতির প্রতি অবিচার করা হয়। রামমোহন রায় শৈবমতে ভিন্নজাতীয়া স্ত্রীর বিবাহ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন বলিয়া অনেকে মনে করেন "পাষণ্ড পীড়ন"-কারের প্রচারিত অপবাদ একেবারে অমূলক নহে। কিন্তু রামমোহন রায়ের মত নির্ভীক পুরুষ যদি কোন অহিন্দু স্ত্রীলোককে শৈবমতে বিবাহ করিয়া থাকিতেন, তবে তিনি যে এইরূপ স্ত্রীকে "পাষণ্ড পীড়ন"কার এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন আর সকলের চক্ষুর অন্তরালে রাখিবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

* কুমারী কার্পেণ্টার উদ্ধৃত Last Days of Rajah Rammohun Roy, Calcutta 1915 pp. 29 and 32.

† Mary Carpenter, *op. cit.* pp. 29 and 32.

† শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্ধৃত। "প্রবাসী" চৈত্র, ১৩৩৪, ৮৪৪ পৃঃ।

‡ সমসাময়িক ও নিরপেক্ষ "সমাচার দর্পণ" যে এই সব কুৎসা বিশ্বাসের অযোগ্য ও মিথ্যা মনে করিতেন, তাহা আমি গত বৎসর ফাল্গুন সংখ্যায় ৭০৪ পৃষ্ঠায় দেখাইয়াছি।—প্রবাসীর সম্পাদক।

১। জগমোহন রায়ের হাওলাত রসিদ-পত্র

[হাইকোর্টের অনুমত্যনুসারে ও ডক্টর যতীন্দ্রকুমার মজুমদারের সৌজন্যে]

In the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal

In Equity

Gowindpersaud Roy only son heir and legal Personal representative of Juggomohun Roy deceased Complainant

against

Rammohun Roy Defendant

Fort William in Bengal — I Rammohun Roy the defendant in this cause do put in my place John Turner as my attorney in the room of the late Mr. Benjamin Turner my former Attorney to appear and defend the above suit Witness my hand this twelfth day of July 1819 — Rammohun Roy

Witness —
[illegible]
[illegible]

২। রাজা রামমোহন রায়ের এটর্ণি নিয়োগ-পত্র

[হাইকোর্টের অনুমত্যানুসারে ও ডক্টর যতীন্দ্রকুমার মজুমদারের সৌজন্যে]

মানুষের মন

শ্রীজীবনময় রায়

পূর্ব্ব পরিচয়

শচীন্দ্রনাথ—শিক্ষিত যুবক ও ধনী জমিদার। প্রয়াগে কুম্ভমেলায় স্ত্রী ও শিশুপুত্র হারিয়ে পুরাতন ভৃত্য ভোলানাথের সাহায্যে বহু অন্বেষণেও তাদের কোনও সন্ধান না পাওয়ায় উদভ্রান্ত চিত্তে ইউরোপে বেড়াতে যায়। লণ্ডনে অত্যন্ত অসুস্থ ও সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পার্ব্বতীর সেবায় প্রাণ পায় ও পার্ব্বতীর গুণগ্রাহী ও তার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়। ভারতবর্ষে ফিরে পার্ব্বতীর সাহায্যে একটি নারীকল্যাণ-প্রতিষ্ঠানে যত্নবান।

কমলা—শচীন্দ্রের পত্নী দরিদ্র পিতার সন্তান। গোরখপুরে মিশনরী স্কুলে পড়া সুন্দরী। কুম্ভমেলায় হারিয়ে গিয়ে উপেন্দ্রনাথের কৌশলে তার কলকাতার বাড়ীতে বন্দী হয়। পরে মাতাল উপেন্দ্রনাথের প্রহারে জর্জ্জরিত অবস্থায় একদা রাত্রে পাশের বাড়ীতে গিয়ে পড়ে ও নন্দলাল ও তার পত্নী মালতীর অক্লান্ত সেবায় প্রাণ পায় বটে, কিন্তু তার নামের স্মৃতি লোপ পাওয়ায় তার নূতন নাম হয়েছে জ্যোৎস্না এবং শিশুর নাম অজয়। নন্দলালের কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে এক দেশীয় হাসপাতালে ধাত্রীবিদ্যাশিক্ষার্থী। এখানে চরিত্রগুণে প্রধান ডাক্তার নিখিলনাথের ও অন্যান্য সকলের শ্রদ্ধা সে পেয়েছে।

নন্দলাল—সাধারণ গৃহস্থ। বি-এ ফেল, ব্যবসায়ী, ভীরু-স্বভাব। কমলের রূপে আকৃষ্ট। নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা ক'রে বিফলকাম এবং তার প্রতি প্রেমনিবেদন করতে লোলুপ অথচ প্রকাশ্যে অগ্রসর হবার শক্তি সঞ্চয় করতে পারে না। নিখিলের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। নিখিল সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিত ক'রে কমলকে অপমান করেছে।

মালতী—মামুলী গৃহস্থবধূ। নিঃসন্তান, সরল, স্নেহশীল, স্বামী নন্দলালের উত্তরোত্তর অবস্থার উন্নতিতে পরিতুষ্ট, এবং কমলা ও সর্ব্বোপরি অজয়ের প্রতি অসামান্য স্নেহাসক্ত।

নিখিলনাথ—বিদ্বান, চরিত্রবান, হৃদয়বান যুবক। বিলাত-ফেরৎ ডাক্তার। পাঠদ্দশায় বিপ্লবীদের দলে প'ড়ে জেলে গিয়েছিল। অধুনা মানবের হিতসাধনই ব্রত। সীমার সঙ্গে শ্রীরামপুরের অদূরে একটি আমবাগানে, পরিত্যক্ত ভগ্ন অট্টালিকায় গিয়ে তার পূর্ব্বনেতা সত্যবানকে মরণাপন্ন অবস্থায় দেখে এবং তার কাছে তাদের দলের লোকের মৃত্যু ও সীমার অসীম দেশভক্তি ও দুঃখকাহিনী শুনে সীমার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

সীমা—তার দাদার সঙ্গে সত্যবানের দলে এসে পড়ে এবং ভেলোয়ারের জঙ্গলে পুলিসের গুলিতে সকলের মৃত্যু হ'লে আহত সত্যবানকে নিয়ে গ্রামে জঙ্গলে, পরিত্যক্ত কুটীরে পলায়ন করতে করতে শ্রীরামপুরের প্রান্তে এক ভগ্ন অট্টালিকায় মৃত্যুমুখী সত্যবানকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। 'দেশ' ছাড়া সে কিছুজানে না। অত্যন্ত ঋজু, ক্ষিপ্র, একাগ্র, অনন্যচিত্ত।

সত্যবান—মরণোন্মুখ বৈপ্লবিক নেতা। এতগুলি মূল্যবান প্রাণ এই পথে টেনে এনে বলি দেওয়ায় অনুতপ্ত। সীমাকে এই পথ থেকে ফেরাবার জন্যে নিখিলকে অনুরোধ করতে মৃত্যুকালে তাকে স্মরণ করেছে।

পার্ব্বতী—লণ্ডনপ্রবাসী বাঙালীর মেয়ে। তার পিতার ইংরেজ-প্রীতি ও বাঙালীবিদ্বেষে তাদের পরিবারে যে সর্ব্বনাশ ঘটেছিল তারই ফলে ইংরেজ-বিমুখ এবং বাংলা ভাষা ও বাঙালীর জন্য তৃষিতচিত্ত। সর্ব্বস্বান্ত পিতার মৃত্যুর পর লণ্ডনে চাকুরিজীবী। সুদর্শন, সংজ্ঞাশূন্য, পীড়িত, নিঃসহায় শচীন্দ্রের প্রতি করুণায় তার শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করে এবং তাকে বিবাহিত না-জেনে তার প্রতি আসক্ত হয়। সুস্থ হ'য়ে শচীন্দ্রনাথ এ কথা জানতে পারে এবং পার্ব্বতীকে তার দুঃখের ইতিহাস ব'লে তার প্রেম-গ্রহণে নিজের অক্ষমতা জানায়। স্থিরচিত্ত সংযতভাব পার্ব্বতী শচীন্দ্রের অনুরোধে তার সঙ্গে ভারতবর্ষে এসে এক পরিত্যক্ত নীলকুঠি দু-জনে পরিদর্শন করতে যায়—নারী-প্রতিষ্ঠান সেখানে স্থাপন করবার উদ্দেশ্যে। শচীন্দ্রের প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলতে পার্ব্বতী নিজেকে উৎসর্গ করে।

তারপর চার বৎসর অতীত হ'য়েছে।

২৭

গ্রামের নাম দেওয়া হয়েছে কমলাপুরী। প্রমীলার রাজ্য যেন বিস্মৃত ইতিহাসের কল্পনার আশ্রয় থেকে সজীব হ'য়ে উঠেছে। নদীর ধারের এই ছোট গ্রামখানি পুরুষের সম্পর্কশূন্য। গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করলে মনে হয় আলাদিনের প্রদীপের মন্ত্রে হঠাৎ জেগে উঠেছে পাতালপুরীর ঘুমের রাজ্য থেকে। লাল সুরকির রাস্তাগুলি সরলরেখায় সমকোণে বিভক্ত করেছে পরস্পরকে। ছোট ছোট কুটীরগুলি পরিচ্ছন্ন, সুরুচিসঙ্গত। নদীটির ক্রোড় থেকে একটা চওড়া রাস্তা গেছে সোজা একটা দোতলা অট্টালিকার দরজা পর্য্যন্ত। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত এই অট্টালিকাটি এই গ্রামের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যনিবাস। নদীর ঘাটের কাছে একটি ছোট বাড়ীতে নেত্রীর বাসস্থান। কিছু দূরে একটি প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক বেষ্টন ক'রে বড় বড় ঘর—কোনটাতে অনেকগুলি তাঁত, কোনটাতে বই বাঁধাবার ব্যবস্থা, কোনটায় শেলাইয়ের কল চলছে, কোনটায় চিত্রকলা শেখাবার ব্যবস্থা আছে—ইত্যাদি অনেক। সমস্ত গৃহ যেন কর্ম্মের চঞ্চলতায় সজীব। গ্রামের বাইরে ক্ষেতগুলিকে বেষ্টন ক'রে একটি চওড়া বাঁধানো রাস্তা দুই দিকে দুটি ঘাটে গিয়ে নেমেছে। এইখান থেকে গ্রামের শিল্পদ্রব্য বাইরে রপ্তানি হয়। নারীরাজ্যের

এই খানেই অবসান। গ্রামটি ছোট কিন্তু অত্যন্ত সুসজ্জিত, একেবারে ছবির মত। পাঠকের বুঝতে বাকী নেই যে এইটিই শচীন্দ্রের পরিকল্পিত সেই নারী-প্রতিষ্ঠান।

আয়তন হিসাবে এখানকার জনসংখ্যা অল্পই। দরিদ্র ভদ্রগৃহস্থের কর্ম্মক্ষম বিধবাদের জন্য এই আয়োজন। 'কোর্স' পাঁচ বৎসরের এবং এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে এদের বাইরে যাবার নিয়ম নেই। প্রায় এক-শ ছাত্রীর এখানে থাকবার ব্যবস্থা আছে। দুটি ক'রে ঘরওয়ালা পঞ্চাশটি কুটীরের স্থান এখানে নির্দ্দিষ্ট।

শচীন্দ্রের বিপুল অর্থ এবং পার্ব্বতীর অক্লান্ত পরিশ্রমে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠতে পেরেছিল।

২৮

তিন বৎসর অতীত হ'য়ে গেছে। পার্ব্বতীর নাম এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলাদেশময় ছড়িয়ে পড়েছে অথচ প্রতিষ্ঠাতার নাম প্রায় কেউই জানে না। সমস্ত কাজই পার্ব্বতীর নামে চলে।

একদা পার্ব্বতী প্রতিষ্ঠানের অফিস ঘরে ব'সে কাজ করছে এমন সময় একটি মেয়ে এসে একটি নূতন ছাত্রীর আগমন-বার্ত্তা জানাল। পার্ব্বতী উঠে ঘাটের দিকে গেল এবং লঞ্চে গিয়ে তার অভিভাবকের সঙ্গে দেখা করলে।

ভদ্রলোকটি বৃদ্ধ। পার্ব্বতী নমস্কার ক'রে ভদ্রলোক ও মেয়েটিকে নিয়ে নেমে এল। এই রকম লোক এসে কয়েক ঘণ্টা নেত্রীর বাড়ীতে অতিথি হ'ত। আহারের পর পার্ব্বতী বললে, "আপনাকে বিকেলের লঞ্চে ফিরে যেতে হবে। আপনি ইচ্ছে ক'রলে আমাদের গ্রাম দেখে যেতে পারেন।"

"বেশ, আমিও ভাবছিলাম আপনাকে বলব। তা, চলুন।"

"ছুতোর ঘর" "তাঁত ঘর", "শেলাই ঘর", "ছবি ঘর" প্রভৃতি নানা শিল্পের ব্যবস্থা দেখতে দেখতে তাঁরা পাঠগৃহে এসে পৌছলেন। তাঁদের আগমনে গৃহে কাজের কোন বিরতি বা শৈথিল্য দেখা গেল না।

ভদ্রলোক একটু অবাক্ হ'য়ে বললেন, "কই, আপনাকে দেখে এরা দাঁড়ালো না ত?"

"দাঁড়াবে কেন?"

"সম্মান করবে না আপনাকে?"

"সম্মানই ত করছে। আমি যে কাজ দিয়েছি সেটা তারা মন দিয়ে করছে এইটাই ত সম্মান।"

ভদ্রলোক একটু অবাক্ হ'য়ে চুপ করলেন। প্রত্যেক ঘরে শিক্ষক তাদের কোন-না-কোন বিষয়ে কিছু বলছেন। মেয়েদের কারুর কাছে বই নেই—কেউ পড়া দিচ্ছে না, কেউ পড়া নিচ্ছে না—শুধু শুনছে আর মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছে। ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "এদের বই নেই?"

"না।"

"তবে ওরা কি পড়ে?"

"ওরা ত পড়ে না, ওরা শোনে—বার-বার ক'রে বলা হয় আর ওরা বার-বার ক'রে শোনে। তারপর রাত্রিতে গিয়ে সেগুলি নিজেদের মত ক'রে লিখে রাখে।

"পরীক্ষা কবে হয়?"

"পরীক্ষা ত হয় না।"

"হয় না?—তবে শেখে কি করে বোঝেন?"

"শেখেই। না বুঝলে আবার জিজ্ঞেস করে আবার শোনে। নইলে লিখে রাখবে কি ক'রে? লিখতেই হয়। সেইটাই ওদের নিজেদের পরখ।"

বৃদ্ধের মনে বোধ হয় একটু খটকা বোধ হ'ল। পার্ব্বতী সেইটুকু অনুভব ক'রে তিন বৎসর আছে এমন গুটি দুই মেয়েকে ডেকে বললে, "এই ভদ্র লোকটিকে তোমাদের গ্রাম দেখিয়ে আন"—বলে অন্যত্র চলে গেল।

মেয়ে দুটি তাদের হাতের তাঁতের কাজ, আসবাব, সতরঞ্চি প্রভৃতি দেখানোতে তিনি খুব খুশী হলেন এবং পার্ব্বতীর অনুপস্থিতিতে চক্ষুলজ্জার হাত থেকে রেহাই পেয়ে তাদের নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। দেশের এবং বিদেশের তাঁর নিজের জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত বহু বিষয়ে তারা অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে তাঁকে ব'লে যেতে লাগল। কোন বই না পড়িয়ে কোন পরীক্ষা না নিয়ে যে সত্যি এত সহজে এত জ্ঞাতব্য বিষয় শেখানো যায় তা' দেখে তিনি আশ্চর্য্য হলেন। বস্তুত আর বেশী প্রশ্ন করতে তিনি দ্বিধা বোধ করছিলেন পাছে নিজের অজ্ঞতা ধরা পড়ে যায়।

এদের পরিচ্ছন্নতা দেখেও তিনি কম আশ্চর্য্য হন নি।

গোয়ালঘরও যে এত পরিষ্কার হ'তে পারে বাংলা দেশে তা' আশ্চর্য্যের বিষয় বইকি ?

যাবার পূর্ব্বে বৃদ্ধ পার্ব্বতীকে তার প্রতিষ্ঠান এবং আতিথেয়তার জন্য বহু ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, "এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানকে নিয়মানুবর্ত্তী রাখেন কি করে ? ধরুন কেউ যদি রীতিমত নিয়ম না মানে !"

পার্ব্বতী হেসে বললে, "না মানবার উপায় নেই। প্রতিজ্ঞা-পত্র আপনি দেখছি ভাল ক'রে পড়েন নি। অবাধ্যতার এখানে কোন শাস্তি নেই। একেবারেই আশ্রম হ'তে নির্ব্বাসন। সেই নির্ব্বাসন এরা চায় না। তার দুটি কারণ আছে। প্রথম, এত সস্তায় নিজেকে মানুষ ক'রে তোলবার জায়গা আর নেই। দ্বিতীয়ত এখানে হাতের কাজ বেশী শেখানো হয় ব'লে ভর্ত্তি হবার অল্প কিছুদিন পর থেকেই এরা প্রত্যেকেই নিজের এবং প্রতিষ্ঠানের আয়ের দিকে কিছু-না-কিছু সাহায্য করতে পারে। নিয়ম আছে যে প্রত্যেকটি উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের মূল্যের কিয়দংশ শিল্পীর নামে ব্যাঙ্কে জমা হয়। পাঁচ বৎসর এমনি ক'রে তার কিছু কিছু অর্থ সঞ্চিত হতে থাকে এবং এই প্রতিষ্ঠানটি পরিত্যাগ ক'রে যাবার সময় সুদসমেত তাকে তার অর্জ্জিত অর্থ দিয়ে দেওয়া হয়—যাতে সে বেরিয়ে কোন রকম ছোটখাট ব্যবসা নিজেই অবলম্বন করতে পারে। চরিত্রে, ব্যবহারে বা নিয়ম-পালনে কোন ব্যতিক্রম ঘটলে এই অর্থ সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত হ'তে পারবে। এই নিয়ম থাকায় এখানকার কাজে ছাত্রীদের যেমন উৎসাহ, সুচারুরূপে নিয়মাধীন থাকার দিকে তেমনি তাদের দৃষ্টি।"

২৯

বৎসরের পর বৎসর আসে এবং যায়। অক্লান্ত পরিশ্রমে পার্ব্বতী তার কাজ ক'রে চলে। তার কোথাও বিরাম নাই, কোন ব্যতিক্রম নাই। বিলেতী শিক্ষায় তার কর্ম্মপটুতা এবং কর্ম্মশৃঙ্খলা ছিল প্রচুর এবং কাজ করবার শক্তিও ছিল তার অদম্য। তবু সমস্ত কর্ম্মের অবসানে গভীর রাত্রে নদীর দিকের বারান্দার উপর সে যখন একখানি ডেক্-চেয়ারে তার কর্ম্মক্লান্ত দেহটি এলিয়ে দিয়ে তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে পড়ে থাকে তখন হঠাৎ এক-এক দিন তার মনটা আবার সেই সুদূর ইউরোপের পর্ব্বতমালাবেষ্টিত বন-উপবন-চিত্রিত ছায়া আলোর ঝালরকাটা স্নিগ্ধোজ্জ্বল দিনগুলির জন্য আকুল হয়ে ওঠে। মনে মনে নিজেকে শ্রান্ত এমন কি বয়োবৃদ্ধ বলে মনে হয়; সমস্ত জীবন থেকে অমৃতের আস্বাদ যেন লুপ্ত হয়ে যায়; অকারণে তার চোখ থেকে জল ঝরতে থাকে এবং পরমাকাঙ্ক্ষিত অনাস্বাদিত রস-সম্পূরিত এক অনাগত জীবনের বিরহে তার সমস্ত প্রাণ ব্যর্থতার অভিমানে ভ'রে ওঠে। হঠাৎ মনে হয় সে যেন বন্দিনী। এই বৃহৎ অনুষ্ঠানের কর্ম্মবহুলতার শত পাকে তার সমস্ত চিত্ত, সমগ্র স্বাধীনতা, সমস্ত জীবন যেন বাঁধা পড়েছে; এর থেকে উদ্ধার পাবার কোন রাস্তা নেই। পাথরের দেবতার পূজায় সে তার সমস্ত অন্তরাত্মাকে বলি দিয়েছে। মাথা কুটে মরলেও যেন তাঁর কাছ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যাবে না।

তবু সে তার এই পূজা-মন্দির ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না। এরই দুয়ারে সে তার শ্রান্ত মাথা ঠেকিয়ে বলে, "বাঁচাও, ওগো নিয়ে যাও আমাকে এই কর্ম্মের কারাগার থেকে, তোমার স্নেহবন্ধনের অবাধ মুক্তির মধ্যে। দিও না আমাকে এমনি করে বিপুল আড়ম্বরপূর্ণ ব্যর্থতার মধ্যে অবসান পেতে। কর্ম্মের দুর্নিবার মত্ততার অবসাদে আমার দেহমন অবসন্ন। এস ওগো আমার রাজপুত্র, আমার সুপ্ত আত্মাকে জাগাও তোমার সোনার কাঠির অমৃতস্পর্শে। তোমার উত্তপ্ত বেদনাতুর আহত মাথাটাকে আমার স্নেহব্যাকুল ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়ে শীতল, শান্ত করবার অধিকার দাও আমাকে। ওগো নিয়ে যাও উদ্ধার ক'রে যেখানে সকল কর্ম্মের অবসানে তোমার সুপ্ত-দীপ অন্ধকারকক্ষে তুমি তোমার সমস্ত পৃথিবী থেকে স্বতন্ত্র, মুক্ত অবিমিশ্র সেই সম্পূর্ণ তোমার নিবিড় অস্তিত্বের অব্যাহত আলিঙ্গনের মধ্যে।"

রাত্রির অন্ধকার তার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের উপর কুহকজাল বিস্তার করে। সে তার কর্ম্মপরিবেষ্টনের কোলাহলময় বাস্তব থেকে কোন সুপ্তিমগ্ন দিগন্তরেখাহীন কল্পনারাজ্যের মধ্যে নীত হয়; যেখানে এই দুরতিক্রম্য পৃথিবীর অসংখ্য নরনারী একটিমাত্র সংখ্যাতীত পরমেপ্সিত অনধিগম্য মানুষে এসে ঠেকে—প্রদোষান্ধকার পরিপূর্ণ ক'রে যার আভাস

ওতপ্রোত হয়ে থাকে অথচ সমস্ত বিদীর্ণবক্ষের আকুল আহ্বান যার কানে পৌঁছায় না। এমনি করে তার কত রাত্রির অবসান হয়ে গেছে শয্যাহীন ডেক্‌-চেয়ারের কোলে তা কেউ জানে না

শচীন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শক হিসাবে পরিচিত। মাসে একদিন আশ্রমের কাজকর্ম্ম পরিদর্শন এবং আশ্রমের সংবাদ নেবার জন্য শচীন্দ্রকে কমল-পুরীতে আস্‌তে হয়। এই দিনটির অপেক্ষায় পার্ব্বতীর মাসের বাকী উনত্রিশদিন কর্ম্মশৃঙ্খলার আয়োজনে কেটে যায়। বিশেষ উৎসাহে এই দিনটিকে সে এক প্রকার উৎসবের দিনে পরিণত করবার চেষ্টা করে। সমস্ত গ্রাম সেদিন বিশেষভাবে মার্জ্জিত হয়, ছাত্রীরা বিশেষ ভাবে শুভ্র বসনে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, ব্যায়াম-ক্রীড়ার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় এবং আশ্রমের আহারে বিশেষ রসনা-পরিতৃপ্তিকর আয়োজনের প্রাচুর্য্য থাকে। আহারের স্থানে কোন পুরুষের আহার নিষিদ্ধ থাকায় পার্ব্বতীর গৃহেই শচীন্দ্রের আহারের ব্যবস্থার নিয়ম আছে ; এবং এই একদিন পরম যত্নে স্বহস্তে শচীন্দ্রের জন্যে রান্না করে তাকে খাইয়ে তার সামান্য সেবাযত্ন করে যে তৃপ্তিটুকু সে লাভ করে, শচীন্দ্রের অনুপস্থিতিতে মাসের অন্য দিনগুলিতে সেইটুকুই তার সম্বল।

সমস্ত মাসের অন্তে আজ্‌কাল শচীন্দ্রও এই দিনটির জন্য যেন অপেক্ষা ক'রে থাকে। কমলের প্রতীক্ষায়, কমলের অনুসন্ধানের নিরন্তর ব্যর্থতায় তার স্নেহাতুর চিত্ত ক্রমে যেন নিরাশ্রয় হয়ে পড়ছিল। তার সেই ভাগ্যবিড়ম্বিত পত্নীর ঐকান্তিক প্রেমের পরমনির্ভরশীলতা যে নিবিড় বেদনায় তার বিরহাতুর চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে রেখেছিল তার কোন বৃহৎ মূল্যদান না ক'রে সে শান্ত হ'তে পারছিল না। তাই তার বিপুল অর্থ এবং প্রেমের রচনা এই কমলাপুরী বাংলার অসহায় নারীদের সেবার সূত্রে তার চিত্তকে একটি পরম সান্ত্বনার আশ্রয় দান করেছিল। নারী-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মের জনতায় এবং নব নব কল্পনার আবেশে তার চিত্ত যখন বিভোর তখন ধীরে ধীরে বৎসরে বৎসরে কখন তার নিজেরই অজ্ঞাতে কমলের বিরহবেদনার তীব্রতা যে ম্লান হয়ে এল তা সে লক্ষ্যও করে নি। কমলের স্মৃতি তার কাছে ক্রমে একটি স্নেহপূর্ণ করুণ ইতিহাসের সামগ্রী হয়ে উঠ্‌ল ; এবং এই পরিপূর্ণ পরিব্যাপ্ত স্মৃতির প্রদোষান্ধকারে পার্ব্বতীর কর্ম্মনিরত স্নেহপ্রভাব তার তমসাচ্ছন্ন চিত্তাকাশে শুভ্র ছায়াপথের স্নিগ্ধতা বিকীর্ণ ক'রে বিরাজ করতে লাগ্‌ল।

৩০

সেদিন সমস্ত কাজকর্ম্মের অবসানে সন্ধ্যাবেলা শচীন্দ্র পার্ব্বতীর বাসগৃহের বারান্দায় অর্দ্ধমুদিত নেত্রে আরামকেদারায় শুয়ে আছে নদীর বাতাসে তার ক্লান্ত দেহ মেলে দিয়ে। সন্ধ্যার গাঢ় ছায়াপাতে জলস্থল যেন দিনের মুখরতার উপর নৈঃশব্দ্যের যবনিকা টেনে দিয়েছে। তারার আলোকে আকাশের অন্ধকার তখনও স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠে নি। অনতি-দূরে নদীর পরপারে, চষা-ক্ষেতের মাঝখানে চাষীর কুটির থেকে একটি ক্ষীণ প্রদীপের আলোকরেখা সেই অন্ধকার যবনিকা ভেদ ক'রে শচীন্দ্রের মনের উপর একটি অপরূপ মোহ বিস্তার করছে। তার মনে হচ্ছে ঐ কালো পর্দ্দাটার অন্তরালে মানবজীবনের সব সুখশান্তি আনন্দ আরামের নিরবচ্ছিন্ন প্রাণধারা বয়ে চলেছে। সেখানে কৃষক-বধূ তার নিপুণহাতে পরিষ্কার ক'রে উঠানটি নিকিয়ে রেখেছে, পিতলের বাসনগুলি পরম যত্নে মেজেঘসে উজ্জ্বল ক'রে রেখেছে, সন্ধ্যাবেলায় নদীর ঘাট থেকে গা'টি ধুয়ে তা'র মাটির ঘটটি পূর্ণ ক'রে নিয়ে গেছে। সেখানে নিজের মধ্যে সমস্ত সম্পূর্ণ, সমস্ত পরিতৃপ্ত, সমস্তই পর্য্যাপ্ত। ঐ সূক্ষ্ম ক্ষীণ আলোকধারাসূত্র যেন তারই নিশ্চিন্ত শান্তিপূর্ণ সহজ সুন্দর স্বর্গচ্যুত অনা-বিষ্কৃত জীবনধারার শান্ত মধুর ইতিহাস বহন ক'রে আনছে।

গৃহাভ্যন্তরে পার্ব্বতী গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত। ক্ষণে ক্ষণে তার মৃদুপদধ্বনি, তার কাজের ছোটখাট শব্দের পরিচয় শচীন্দ্রের অবচ্ছন্ন চেতনার উপর, পরপারের চাষীর কুটীর থেকে প্রক্ষিপ্ত আলোকপাতে, তার অন্তরের প্রেক্ষাগৃহে এক অনির্ব্বচনীয় রূপকথাকে চলচ্চিত্রে প্রভাসিত ক'রে তুলেছে। নিজের অজ্ঞাতেই গৃহকর্ম্মনিরত পার্ব্বতীর এক অপরূপ কল্যাণী মূর্ত্তি কখন এক সময় সেই প্রচ্ছদপটের উপর প্রতি-ফলিত হ'য়ে তার বহুদিনবিস্মৃত শান্তিময় গৃহ-নীড়ের একটি মনোরম প্রতিচ্ছবি তার বুভুক্ষু অন্তরাত্মাকে অমৃতের

আস্বাদনে পূর্ণ ক'রে তুল্‌ল। এই স্বপ্নালোকের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে কতক্ষণ কেটেছে সে জানতেও পারে নি।

হঠাৎ সে চমকে উঠল পার্ব্বতীর কণ্ঠস্বরে। "এবারকার অঙ্কের হিসাবটা আপনাকে নিতান্তই ভাবিয়ে তুললে দেখছি। অন্ধকার হাৎড়ে তার বিশেষ কিছু সুরাহা হবে বলে ত বোধ হয় না। তার চেয়ে বরঞ্চ বিলেতী হাতের দেশী রান্না খাবার সাহস থাকে ত আমার সঙ্গে উঠে আসুন।"

এই কৌতুকের সমস্তটা তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নি, এমনি ক'রে শচীন্দ্র পার্ব্বতীর দিকে চেয়ে রইল।

পার্ব্বতী আবার বললে, "খিদেতেষ্টা কি ভুলে গেছেন না কি? রাতদিন ভাবলে যেটুকু বুদ্ধি বাকী আছে তাও ক্ষয়ে ফুরিয়ে যাবে।"

এতক্ষণে শচীন্দ্র প্রকৃতিস্থ হ'য়ে সময়োচিত কৌতুকের হাসি মুখে টেনে এনে বললে, "আমাকে আধমুনে কৈলেস ঠাউরেছ না! নইলে বিকেলে তোমার ছাত্রীদের রস-রচনা যে পরিমাণ...।"

"তা লোভে পড়ে অত না খেলেই হ'ত। মেয়েদের খুশী করবার জন্যে? ও হবে না; কিছু না খেলে ভাল হবে না ব'লে দিচ্ছি।"

'বেশ ত! আমি কি বলেছি খাব না? তবে ভুক্ত-দ্রব্য পরিপাক করতে একটা যে সময়ের আবশ্যক তাকে অযথা সংক্ষেপ করতে গেলে—"

"কে বলছে সংক্ষেপ করতে? এই আমি বসলাম—দেখি কতক্ষণে আপনার সময় হয়।" বলে পার্ব্বতী একটা চেয়ার টেনে এনে তার পাশে বস্‌ল।

অন্ধকার ঘনতর হয়ে সমস্ত আকাশ এবং পৃথিবীর সম্পর্ক নিবিড়তর ক'রে তুলেছে। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে এই পরম নিবিড়তার মোহময় অনুভূতি দুজনে ভোগ করছিল।

শচীন্দ্রের মনের মধ্যে যে চিন্তাগুলি তার চিত্তকোষের চতুর্দ্দিকে অন্ধ মৌমাছির মত গুঞ্জন ক'রে ফিরছিল তারা এক সময় সহসা যেন চঞ্চল হ'য়ে উঠল। শচীন্দ্র আরাম-কেদারার উপর সোজা হয়ে উঠে বসতেই পার্ব্বতী একটু অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসু চোখ তুলে চাইল; এবং সেই মুহূর্ত্তেই শচীন্দ্রের কাছে অস্পষ্ট রইল না যে, যে-কথা প্রকাশের ব্যাকুলতায় আজ এই মোহময় রহস্যময় নিবিড় নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় তার চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, সে-কথা তার কাছে কিছুমাত্র সত্য নয়। সে যেন স্পষ্ট ক'রে তীব্র ক'রে অনুভব করলে যে কমলের বিলীয়মান স্মৃতি কালের প্রভাবে তার প্রত্যক্ষগোচর নয় এইমাত্র। তাই যখনই সে নিজের বিরহবিধুরচিত্তকে পার্ব্বতীর অচঞ্চল প্রত্যক্ষপ্রেমের অভিমুখে অগ্রসর ক'রে দেবার চেষ্টা করেছে—শুকতারার পানে নিশীথরাত্রির অভিসারের মত—তখনই তার মানসসরোবরের গভীর অদৃশ্য গোপনতল ভেদ ক'রে কমলের স্মৃতি কখন উষার আলোকে তার সহস্র দল মেলে ফুটে উঠেছে। তবে এ কি! বারংবার কেন তার এই মোহ!

যে-নারী তারই প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমে তার প্রেয়সীর স্মৃতিসমাধির পরিচর্য্যায় নিজেকে একান্তভাবে উৎসর্গ করেছে, যার নিবেদিত প্রেমের অর্ঘ্যকে সে বারম্বার প্রত্যাখ্যান করতে কুণ্ঠিত হয় নি—এ কি তার প্রতি করুণায়? এর মধ্যে কি শুধু তার জীবনদায়িনীর প্রতি, তার অনন্যতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কোন বস্তু নেই? এ কি সহজলভ্যের প্রতি তার বাসনার বিলাস? তা হ'লে তার চেয়ে অবমানকর পার্ব্বতীর সম্বন্ধে আর কি হতে পারে! সে কি জেনেশুনে পার্ব্বতীকে এই অবমাননার মধ্যে আহ্বান করতে অগ্রসর হয়েছে? নিজের মনে মনে নিজেকে সে ধিক্কার দিলে।

সে প্রতিজ্ঞা করলে যে পার্ব্বতীকে সে তার নিজের স্বার্থপূর্ণ কর্ম্মবন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেবে। পার্ব্বতীর অভিভূত চিত্তকে কোনমতেই আর এই তার আত্মবিলোপের অন্ধকূপে প'ড়ে থাকতে দেবে না। এতে তার নারী-প্রতিষ্ঠান যদি লোপ পায় তাতেও তার দুঃখ নেই। পত্নীর যে-স্মৃতিকে সে বাইরে রূপ দিতে চেয়েছে চিরদিন অপরূপ হয়ে সে তার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত রইল। এই বলে মনের মধ্যে কমলার স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টায় নিজের অনন্য প্রেমের আত্মপ্রসাদ মনে মনে সে অনুভব করতে লাগল।

৩১

সীমা এসেই চলে গিয়েছিল রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা এবং অতিথি-সৎকারের অবস্থানুকূল আয়োজন করতে। ঘণ্টাখানেক

পরে সে ফিরে এল। একটা এলুমিনিয়মের পাত্রে একটু জলসাগু আর কয়েকটা বিস্কুট নিয়ে এসে সত্যবানকে বল্‌লে, "প্রায় সমস্ত দিন তো আপনি না খেয়ে শুকিয়ে আছেন; এইটুকু কোনরকম ক'রে খেয়ে নিন্ ত। আজ আবার দুর্ঘটনা এঁকের উপর থেকে কিসে যেন ফেলে দিয়েছে—কি যে একটু খেতে দি তা বুঝতে পারি নে।" তার পর নিখিলের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "ফল কিছু খেতে চান না, দেখুন ত এখন আমি কি করি?" বল্‌তে বল্‌তে তার চোখ ছলছল ক'রে উঠল। যে-প্রাণটাকে বাঁচাবার জন্যে সে তার সর্ব্বস্ব ছেড়ে এই নির্জ্জন পরিত্যক্ত ভগ্ন মন্দিরটিতে আশ্রয় নিয়েছে, তার মৃত্যুযন্ত্রণাক্লিষ্ট দেহকে সে যে কিছুমাত্র শান্তি দিতে পারছে না, এর চেয়ে মর্ম্মান্তিক দুঃখ অধুনা তার কাছে কিছুই ছিল না।

সীমার কথা শুনে সত্যবান হেসে বললে, "পাগলী, খাবার কি ক্ষমতা আর আছে রে? খিদে পেলে ত খাব? তা' ছাড়া তোর হাতের সাগুর সরবৎটা বড় সরেশ হয়। দেখ্ না বরং একটু নিখিলকে খাইয়ে, ও কি বলে!"

সীমা হেসে ফেলে বললে, "জলসাগু আবার সরবৎ কি? থাক্, ওঁকে আর সাগু খাইয়ে কাজ নেই। অম্‌নিতেই ওঁকে যা জব্দটা করা হয়েছে! এখন ঘরের ছেলে ভালয় ভালয় ঘরে ফিরতে পারলে হয়!"

খাওয়ার চেষ্টায় সত্যবানের পরিশ্রম যা হ'ল খাওয়া তার কিছুই হ'ল না। নিখিল সীমাকে ইঙ্গিতে খাওয়াবার চেষ্টা থেকে বিরত হ'তে বল্‌লে, এবং পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে মুখটা মুছিয়ে দিলে। সীমা ধীরে ধীরে বাতাস করতে করতে সত্যবান একটু ঘুমিয়েই পড়ল বোধ হয়। নিখিল তার পকেট-কেসের সরঞ্জাম গুছিয়ে নিলে। সত্যবানকে নিদ্রিত দেখে সীমা এক সময় আস্তে উঠে নিখিলকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেল। বাইরে এলে সে নিখিলকে জিজ্ঞাসা করলে, "কেমন দেখলেন?" নিখিল একটু চুপ ক'রে রইল। এই নিঃসহায় মেয়েটির কাছে নিষ্ঠুর সত্যকে কি ভাবে সহনীয় ক'রে বলা যায় মনে মনে তারই মোহড়া দিতে দিতে বললে, "ভাল যে নয়, তা' ত দেখতেই পাচ্ছেন। তবে এসব কেস্ ত জোর ক'রে বলা যায় না। আমাদের সর্ব্বদাই মন্দটার জন্যে প্রস্তুত থাক্‌তে হবে। এখনি একটা ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছি, তাতে সাময়িক কিছু উপকার হ'তে পারে।"

সীমা বল্‌লে, "প্রস্তুত ত আছিই। যন্ত্রণার যদি কিছু উপশম করা যায়—তাই বল্‌ছি। মুখে একটুও শব্দ করেন না বটে, কিন্তু যন্ত্রণায় এক এক সময় নীল হয়ে যান। সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকে। মৃত্যু কি ওঁদের অকাম্য?" এই ব'লে অন্ধকার বনের দিকে চেয়ে সে যেন কোন দূর দিনের দৃশ্যকে প্রত্যক্ষ ক'রতে লাগল।

খানিক পরে নিজের এই আত্মবিস্মৃতিতে লজ্জিত হ'য়ে নিজেকে সম্বৃত ক'রে নিলে। এবং একটু অতিরিক্ত সহজ-কণ্ঠেই বল্‌লে, "চলুন নিখিলবাবু, আজ আপনার কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে। তার মধ্যে সব চেয়ে কঠিন দুর্দ্দৈব যেটা সেটা সেরে নিন। রাত বারোটার আগে আজ আর আপনার নিজের আস্তানায় ফেরা হবে না। সত্যদা একটু একলা থাকুন, আমরা বেশী দেরী করব না।" এই ব'লে নিখিলনাথকে নিয়ে সে একটা ছোট কুঠরিতে গেল।

নিখিলনাথ ঘরটির আয়োজন দেখে অবাক হ'ল। ঘরটির এক পাশে কয়েকখানি ইটের সাহায্যে একটা উনুন মত করা হয়েছে। গুটি তিন-চার মাটির পাত্র এ-ঘরের আস্‌বাব। একদিকে একটি আধ-ময়লা কাপড় চার ভাঁজ ক'রে একটি আসন পাতা; আর তারই সামনে একটি সদ্যছিন্ন ধোয়া কলার পাতা, পাশে একটি মাটির ভাঁড়ে এক ভাঁড় জল। নিখিলনাথ অবাক হ'য়ে মেয়েটির এই কৃচ্ছ্রসাধনের ছবি মনে মনে আলোচনা করতে লাগ্‌ল। কিসের প্রেরণায় সে আজ তার গৃহের শান্তি আরাম সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ ক'রে আনন্দে এই বিপদ এই দুঃখ এই নিদারুণ আত্মনিগ্রহকে বরণ করেছে। এইমাত্র সে শুনেছে যে তাদের দলে সে বেশী দিন ভর্ত্তি হয় নি। ওর দাদা প্রফুল্লর উপর ওর অসাধারণ ভালবাসা ও ভক্তির জোরে তারই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে মাস কয়েক আগে এদের দলের একেবারে মাঝখানে এসে পড়েছিল। অনন্যসাধারণ বুদ্ধি ও সাহসের জোরে দলের সকলেরই শ্রদ্ধা এবং স্নেহ সে পেয়েছে। আজ তারা কোথাও নেই। ভেলোয়ারের জঙ্গলে তাদের হারিয়ে আহত সত্যবানকে নিয়ে কেমন ক'রে যে সে গ্রামে জঙ্গলে উন্মুক্ত প্রান্তরে পরিত্যক্ত কুটীরে দিনের

পর দিন অতিবাহিত করেছে, শুন্‌তে শুন্‌তে নিখিলনাথের প্রাণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে প'ড়েছিল। কিন্তু কোথায় পেলে? একটুকু একটুখানি তনুদেহে অত বড় একটা আত্মদান করবা'র তড়িৎ-প্রেরণা সে পেলে কোথায়? নিখিলনাথের কাছে তার হাঁসপাতালের কাজকর্ম্ম, আত্মপ্রতিষ্ঠা, লোকের মঙ্গল-চেষ্টা এর কাছে তুচ্ছ, উপহাসকর বোধ হ'তে লাগ্‌ল। নিখিলকে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে সীমা বললে, "ভাব্‌ছেন কি দাঁড়িয়ে? খাওয়ার মত কিছু আয়োজন করা এখানে সম্ভব নয়। তবু উপোস করতে হবে ভেবেই এইটুকু ক'রেছি। ভাঁড়টা নিয়ে তাড়াতাড়ি একটু মুখ হাত ধুয়ে বসে পড়ুন। এই পোড়া ভাতে সেদ্ধটুকু যদি গরম-গরম না খান তবে আজ আপনার অদৃষ্টে হরিবাসরই হবে।"

নিখিল একটু অপ্রতিভ হয়ে হেসে বল্‌লে, "তা বটে; এমন হরিবাসর আমার কপালে সহজে জোটে না। যে উৎকলরত্নটি আমার পাকতন্ত্রের পর্য্যালোচনা করেন, পাকের চেয়ে দুর্ব্বিপাকেই তিনি সিদ্ধহস্ত; সুতরাং অধিকাংশ দিনই আমাকে রুটিমাখনের উপর নির্ভর ক'রে কাটাতে হয়। আজ কপালটা নিতান্তই সুপ্রসন্ন বল্‌তে হবে। পেটুক লোকের রুচিটা আপনাদের কাছে ধরা পড়তে দেরী হয় না।"

নিখিলনাথের এই সহজ কৌতুকে দীন আয়োজনের লজ্জা সীমার মন থেকে দূর হ'ল। সে মৃদু হেসে বললে, "আচ্ছা, এখন হাতমুখটা ধুয়ে আসুন ত, তারপর দেখা যাবে আপনি কত বড় বীর।"

নিখিলনাথ আর বাক্যব্যয় না করে, মুখ হাত ধুয়ে এল এবং বাঁ হাতের উপর ভর দিয়ে পা ছড়িয়ে খেতে বসে গেল। খিদে খুব যে তার পেয়েছিল তা নয়, কিন্তু এই নিরাড়ম্বর মেয়েটিকে তার সাগ্রহ আতিথেয়তা থেকে বঞ্চিত করতে তার ইচ্ছে হ'ল না। আয়োজন কিছুই ছিল না প্রায়। অল্প একটু ডাল ও আলু-ভাতে, খানিকটা ঘি ও একটা পোড়া লঙ্কা। কিন্তু সীমার আগ্রহ এবং যত্ন এই সামান্য আহার্য্যের মধ্যে যে রসসঞ্চার করেছিল তার গৌরবে নিখিলনাথের অন্তরে সমস্ত আয়োজনটি যেন একটি উৎসবের উদ্বোধন ব'লে প্রতিভাত হ'ল। এই আত্মসমাহিত কঠোর ব্রতচারিণী মেয়েটি তার মনশ্চক্ষের সমক্ষে একটি বিশেষ মহিমায় প্রকাশিত হ'ল। খেতে ব'সে একবার জিজ্ঞাসা করলে "কই, আপনি খাবেন না?" ব'লে তখনি তার প্রশ্নের বিসদৃশতা তার কানে বাজ্‌ল।

সীমা বললে, "আপনি খেয়ে গিয়ে সত্যদার কাছে বসুন, আমি এ-দিকটা একটু গুছিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। দেখুন তো ক-টা বেজেছে। বারোটার আগে আপনার ট্রেন নেই। তবে অনেকটা পথ আপনাকে ঘুরে যেতে হবে। এ ষ্টেশন থেকে আপনার গাড়ী ধরা হবে না।"

"এখন সাতটা পঞ্চাশ হয়েছে। কিন্তু এ করছেন কি? আর একটুও দেবেন না। তা'হলে আজ এখানেই রাত কাটাতে হবে কিন্তু।"

খাওয়া শেষ হ'লে নিখিলনাথ রোগীর ঘরে গেল। ঠোঙায় ঢাকা একটি ছোট লণ্ঠনের ঘোলাটে আলোয় ঘরটি অন্ধকার-প্রায়। রোগীর চোখে আলো লাগার ভয়ে তত নয়, বাইরের দৃষ্টির দূরতম সম্ভাবনাকে লুপ্ত করবার জন্যে যত।

সত্যবানের একটু তন্দ্রা এসেছিল কিনা কে জানে, প্রথমটা তাঁর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। খানিকক্ষণ পরে, একটু গভীর নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে যেন জেগে উঠ্‌লেন বললেন, "নিখিল অনেক দিন পরে তোকে পেয়েছি। আমার অনেক আশা ছিল, কিছুই পূর্ণ হ'ল না।—"

নিখিল বাধা দিয়ে বললে, "এ কথা কেন বলছ? ভাল হয়ে উঠে আবার নতুন ক'রে কাযে লেগে যাও। কালই আমি তোমাকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি।"

একটা অতিমৃদু পরিহাসের হাসি সত্যবানের মুখে ফুটে উঠ্‌ল। বললেন, "তুই ঠিক তেমনিই ছেলেমানুষটি আছিস এখনও। এখান থেকে ফিরে গিয়ে এখানকার প্রসঙ্গ একেবারে ভুলে যাবি, বুঝলি? নইলে তোর ত মঙ্গল নেই-ই, আমাদেরও বে-হেপাজতে আর বেশী দিন কাটাতে হবে না।

"গিরিডির বাইরে একটা পোড়ো বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলাম। ঘাগুলোর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছিল ব'লে সীমা একটি বাঙালী ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল—কিছুতেই শুন্‌লে না। ডাক্তারটি লোক খারাপ নয়; তা ছাড়া এসব ক্ষেত্রে প্রাণের ভয়ও থাকে লোকের। কিন্তু একটু খোসগল্প করবার লোভ বোধ হয় সামলাতে পারে নি। তারপর বুঝ্‌তে

পারলুম যে ওখানকার পাট ওঠাতে হবে। সীমা কোথার থেকে একটা আধপাগল কুষ্ঠরোগীকে ধ'রে এনেছিল। তাকেই দিন দশেকের মত খাবারদাবার ব্যবস্থা ক'রে, হাতে পাঁচটা টাকা গুঁজে দিয়ে আমাদের 'প্রক্সি' দেবার জন্যে রেখে দিয়ে এলুম।

"সাহায্য করবার লোক ছিল। রাত্রে সাড়ে তিন মাইল হেঁটে ষ্টেশনে এসে গাড়ী ধরতে হ'ল। তখন যেমন জ্বর তেম্‌নি যন্ত্রণা। কোন রকম ক'রে শুধু কপাল-জোরেই পালিয়ে এসেছি। কিন্তু আর বেশী দিন এ ভোগ যে ভুগ্‌তে হবে না, তা তোর ত অন্তত বুঝতে বাকী নেই। আমার শুধু ভাবনা ঐ মেয়েটার জন্যে। ওর বিশ্বাস যে ওর সত্যদা একটা দিক্‌পাল। সে সেরে উঠলেই শুধু তার হুমকির জোরেই ইংরেজ-বাহাদুরকে দেশ ছাড়া করবে। ভারতবর্ষে দেশ বলতে যে কোথাও কিছু নেই তা ওর ধারণাতেই আসে না—"

নিখিল বাধা দিয়ে বললে,"তোমার কথাটা হেঁয়ালির মত শোনাচ্ছে, দাদা। আমারও ত ধারণায় আস্‌ছে না ভারতবর্ষে দেশ নেই মানে কি ?"

"বেশী তর্ক করবার ক্ষমতা আমার নেই রে, শোন্। শুধু এইটুকুই তোকে জিজ্ঞেস করি, যে, দেশ কি এই ভারতবর্ষের মাটি, যে বরাবরই ছিল আর বরাবরই আছে ? দেশটা মানুষের দেশাত্মবোধের মধ্যে ; তাছাড়া দেশ বলতে আর যে কি বোঝাতে পারে আমি ত জানিনে। ভেবে দেখ ত, হাজার বছর ধরে প্রবঞ্চিত, আত্মজ্ঞানের অধিকারে বঞ্চিত এই লক্ষ-কোটি মূর্খ মূক শূদ্র ভারতবাসীর প্রাণে, আর্য্য, হিন্দু, শক, হুন, মোগল, পাঠান, ইংরেজ, কেউ কোনদিন দেশের বোধ জাগতে দিয়েছে ? তারা জানে শুধু রাজা আর প্রজা। সিংহাসনে তোর হিন্দু বসুক কি পাঠান বসুক কি খ্রীষ্টান বসুক, 'তারা যে তিমিরে তারা সে তিমিরে।' অথচ এরাই যুগে যুগে আমাদের খাওয়া জোগাবে, বিলাস জোগাবে এবং দরকার হ'লে প্রভুকে সিংহাসনে বহাল রাখবার জন্যে দল বেঁধে তার শত্রুর সঙ্গে লড়াই ক'রে মরবে। সেইটেই হবে তাদের দেশভক্তির পরাকাষ্ঠা। তার পর আবার কাজ ফুরোলেই যে তিমিরে সেই তিমিরে।"

ব'লে সে নিতান্ত শ্রান্ত হয়েই বোধকরি চোখ বুজে প'ড়ে রইল ; এবং এই অতিরিক্ত কথা বলানোর জন্যে নিখিলনাথের মনে মনে অনুতাপ হতে লাগল।

খানিক পরে চোখ খুলে ধীরে ধীরে বললে, "তুই বুদ্ধিমান, নিখিল, কথাটা ভেবে দেখিস্। কিন্তু সীমা! তোকেই যে ওকে বোঝাবার ভার নিতে হবে। ওর ঐ পাগলের মত ভালবাসা এই দেশটার জন্যে—সে কি আশ্চর্য্য ! ওর কাছে এইটুকু শিখেছি, যে মানুষ আর কিছু পারুক আর নাই পারুক, শুধু প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারলে তার অনেক সমস্যা আপনিই সমাধান হ'য়ে যায়। নইলে ঐটুকু মেয়ে, ওর কিসের এত তেজ বল্ তো! ওর লোক নেই, সমাজ নেই, ব্যক্তিগত সুখ শান্তি নেই, আছে শুধু ওর সীমাহীন দুর্জ্জয় দেশভক্তি, আর তার জন্যে অকুণ্ঠিত অক্লান্ত সেবা।

"কিন্তু তুই আমার কথা শুনিস্। তুই এর মধ্যে আর জড়াস নে। যে আগুনটা ছড়ানো গেছে, জানি না তা নেবাতে ওদের আর কতদিন লাগবে। কিন্তু ওকে বাঁচাবার ভার তোরই উপরে রইল। অন্য কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না বলেই আজ আমার শেষমুহূর্ত্তে তোকে অনেক কাল পরে স্মরণ করেছি। এর জন্যে তোকে হয়ত অনেক দুঃখ অনেক লাঞ্ছনা পেতে হবে। কিন্তু আমার শেষ সময়ে অন্য কোন উপায় আমি ভেবে উঠতে পারছি নে। তুই আমায় কথা দে, তাহলে এত যন্ত্রণার মধ্যেও আমি একটু নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি।"

নিখিল বললে, "দাদা, যার জন্যে এত ভাবনা, আমার ত বোধ হয় না সে তুমি ছাড়া আর কোন ভাবনাকেই মনে স্থান দেয়। তা ছাড়া তাকে আমি যতটুকু দেখেছি তাতে—"

সত্যবান হেসেই উঠল। বললে, "পাগল, তুই ওকে কিছুই বুঝিস্ নি। ওর ভালবাসা কি কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে ? ব্যক্তিটা নিতান্তই উপলক্ষ্য। দেশই ওর সব। দেশের জন্য এক মুহূর্ত্তে আমাকেও বিসর্জ্জন দিতে ও একটুও কুণ্ঠিত হবে না। ওর সত্য ওর কাছে এত বড় এত প্রত্যক্ষ ব'লেই ওর জন্যে আমার এত চিন্তা। কোন ফাঁকিতে ওকে ভোলানো যাবে না।

"আজ মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে এইটুকু বেশ বুঝতে পারছি,

যে, ভাল করি নি। এতগুলো খাঁটি সোনা মৃত্যুর অপচয়ের গহ্বরে টেনে এনে ফেলে দিয়েছি। স্পষ্ট দেখছি, মানুষ খুন ক'রে মানুষের কোন মহৎ উপকার সাধন করা যায় না—তাতে খুনের সংখ্যাই বাড়ে। কিন্তু দাবানলকে জ্বালানো সোজা রে, নেবানো সোজা নয়। আজ সীমাকে আর একথা বোঝানোর আমার সময় নেই—বোঝাবার শক্তিও নেই। তাই ওর ভার তোর উপর দিয়ে যাচ্ছি। তুই ওকে আগুন থেকে বাঁচা।"

নিখিলনাথ স্তব্ধ হ'য়ে সত্যবানের কথা শুনছিল। তার মনের সামনে সীমার তরুণ সতেজ মূর্ত্তিখানি অপরূপ মহিমায় ভেসে উঠল। সে যেন মানসচক্ষে দেখলে, যে, সীমা সঞ্চারিণী অগ্নিশিখার মত, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি সুপ্ত প্রাণের দীপে দীপে আপনার প্রজ্জ্বলন্ত বহ্নিশিখাস্পর্শে অগ্নিময় ক'রে তুলছে। এই নারীর অপরূপ দীপ্তিময় অস্তিত্বের কাছে নিজের ক্ষুদ্র জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিণতিকে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর, এমন কি হেয়, বলে মনে হ'তে লাগল। এমন স্পর্দ্ধার কথা সুস্পষ্ট ক'রে মনে আনতে যেন সে সাহস করলে না, যে এই বিদ্যুদ্বহ্নিকে কোন দিন সংহত করে সে গৃহসংসারের কল্যাণ-দীপে পরিণত করবে। তবু তার মনের তারে এমন একটি মধুর আনন্দময় আবেশময় সঙ্গীত ধ্বনিত হতে লাগল যাকে সে কোনমতেই এই মৃত্যু-আহুতিপূর্ণ স্বাধীনতা-সংগ্রামের রুদ্র ডমরুনাদের ঐকতান ব'লে মনে করতে পারলে না।

নিখিলকে চুপ করে ভাবতে দেখে সত্যবান বুঝতে পারলে যে তার কথার ঠিক সুরটি নিখিলের প্রাণে গিয়ে পৌঁছয় নি। সে বললে, "জানি কত কঠিন এ-কাজ, তবু এ তোকে করতে হবে। এমনি ক'রে সর্ব্বনাশের প্লাবনে ওকে ভেসে যেতে দিতে পারব না। সমস্ত দেশের অসহায় অবমানের উত্তেজনায় যে-দিন এ-কাজে প্রথম নেমেছিলুম, ওজন-করা বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করবার অবসর ছিল না সে-দিন। কিন্তু এই ক-মাস গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পালিয়ে বেড়ানোর অবসরে স্পষ্ট বুঝেছি যে, যে-ভীরুতা আমার রুগ্ন ভগ্ন ভাইদের মধ্যে কল্পনা করেছিলাম, তার চেয়েও ওদের আতঙ্ক আরও কত ভয়ঙ্কর, কত গভীরতর। হাজার বছরের চাপে শিরদাঁড়া যার বেঁকে গেছে তার মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি আসবে কোথা থেকে?

"হবে না, খুনোখুনি ক'রে কারও মঙ্গল হবে না। আজ এ-কথা আমার বিশ্বাস করিস। ভয়ে আতঙ্কে লোভের আশ্রয় যারা বেছে নিয়েছে, এ-কথা তাদের মুখের ওজন-করা কথা নয় রে, যে চটে উঠবি। তিল তিল মৃত্যুর মূল্য দিয়ে এ-কথা আজ আমি বুঝেছি যে, মৃত্যু দিয়ে মৃত্যুর থেকে বাঁচানো যায় না। জীবন চাই, জীবনীশক্তি চাই—ঐ বাঁকা শিরদাঁড়াটার চিকিৎসা চাই আগে। তারপর কালচক্রের অমোঘ নিয়মে সব আসবে আপনা থেকে একে একে—অন্ন, শ্রী, শক্তি, জয়, মুক্তি। প্রাণ দিলে প্রাণ পাওয়া যায়, প্রাণ নিলে নয়, এই মন্ত্রটা তোকে আজ দিয়ে গেলাম। সীমাকে তুই এই মন্ত্রে দিক্ষা দে। তোকে আমার বড় দরকার ছিল এরই জন্যে।"

ক্রমশঃ
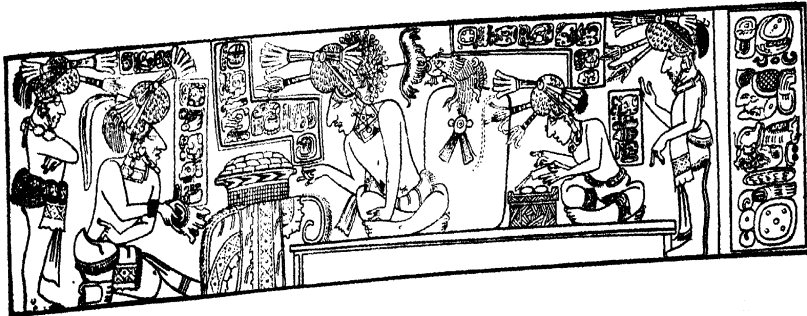
অমৃত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদায় নিয়ে চলে আসবার বেলা
বললেম তাকে,
"ভারতে এক জন নারী বলেছিলেন একদিন,—
উপকরণ চান না তিনি,
তিনি চান অমৃত।
এই তো নারীর পণ।
তুমি কি বলো ?"
অমিয়া হাসল একটু বিরস হাসি,
বললে, "এ কি উপদেশ ?"
আমি বললেম, তার হাত চেপে ধ'রে
"ভালোবাসাই সেই অমৃত,
উপকরণ তার কাছে তুচ্ছ
বুঝবে একদিন।"
বিরক্ত হ'ল অমিয়া
বললে, "তুমি কেন নিয়ে গেলে না আমাকে এই মিথ্যে থেকে ?
জোর নেই কেন তোমার ?"
আমি বললেম, "বাধে আত্মগৌরবে।
যত দিন না ধনে হব সমান
আসব না তোমার কাছে।"
অমিয়া মাথা ঝাঁকানি দিয়ে উঠে দাঁড়াল
চল্‌ল ঘরের বাইরে।
আমি বললেম, "শুনে রাখো,
তোমার ভালোবাসার বদলে
দেব না তোমাকে অকিঞ্চনের অসম্মান।
এই আমার পুরুষের পণ।"
দিন যায় রাত যায়,
মাথায় চ'ড়ে ওঠে সোনার মদের নেশা।

সঞ্চয়ের ধাক্কা যতই বাড়ে
ততই আমাকে চলে ঠেলে।
থামতে পারি নে, থামাতে পারি নে তার তাড়না।
বিত্ত বাড়ে, খ্যাতি বাড়ে,
বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলে আত্মশ্লাঘা।
শেষে ডাক্তার বললে বিশ্রাম চাই নিতান্তই,
দেহের কল অচল হয়ে এল ব'লে।

গেলেম দূরদেশে নির্জ্জনে।
সেখানে সমুদ্রের একটা খাড়ি এসে মিলেছে
পাহাড়তলীর অরণ্যে।
ভিড় জমেছে গাছে গাছে
মাছধরা পাখীদের পাড়ায়।
ক্ষীণ নদীটি ঝরে পড়ছে পাহাড় থেকে
পাথরের ধাপে ধাপে।
নুড়ি ডিঙিয়ে বেঁকে-চলা
তার ফটিক জলের কলকলানি
ধরিয়ে রেখেছে একটি মূল স্থুর
নির্জ্জনতার।
নিত্য-স্নান-করা সেখানকার হাওয়া
চলেছে মন্ত্র গুনগুনিয়ে বনের থেকে বনে।
দল বেঁধেছে নারকেল গাছ
কেউ খাড়া, কেউ হেলে-পড়া,
দিনরাত তার ঝালরঝোলা অস্থিরপনা।
ফিরে ফিরে আছাড় খেয়ে ফেনিয়ে উঠছে ঢেউ
মোটা মোটা কালো.পাথরে।
ডাঙায় ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে
ঝিনুক শামুক শ্যাওলা।
ক্লান্ত শরীর ব্যস্ত মনকে ফিরিয়েছে
শান্ত রক্তধারার স্নিগ্ধতায়।
কর্ম্মের নেশার ঝাঁজ এল ম'রে।

এত কালের খাটুনি মনে হ'ল যেন স্বপ্ন,
প্রাণ উঠল দু-হাত বাড়িয়ে
জীবনের সাঁচ্চা সোনার জন্যে।

সেদিন ঢেউ ছিল না জলে।
আশ্বিনের রোদ্দুর কাঁপছে
সমুদ্রের শিহর-লাগা গায়ে।
বাসার ধারে পুরোনো ঝাউগাছে
ধেয়ে আসছে খাপছাড়া হাওয়া,
ঝর্ ঝর্ ক'রে উঠছে তার পাতা।
বেগ্‌নি রঙের পাখী, বুকের কাছে সাদা,
টেলিগ্রাফের তারে ব'সে ল্যাজ দুলিয়ে
ডাক্‌ছে মিষ্টি মৃদু চাপা সুরে।
শরৎ আকাশের নির্ম্মলনীলে ছড়িয়ে আছে
কোন্ অনাদি নির্ব্বাসনের গভীর বিষাদ।
মনের মধ্যে হুহু ক'রে উঠছে—
"ফিরে যেতে হবে।"
থেকে থেকে মনে পড়ছে
সেদিনকার সেই জল-মুছে-ফেলা চোখে
ঝ'লে উঠেছিল যে আলো।

৩

সেইদিনই চড়লুম জাহাজে।
বন্দরে নেমেই এসেছি চলে।
রাস্তার বাঁকে এসে চাইলেম বাড়ির দিকে
মনে হ'ল সেখানে বাস নেই কারো।
এলেম সদর দরজার সামনে,
দেখি তালা বন্ধ।
ধক্ ক'রে উঠল বুকের মধ্যে;
বাড়ির ভিতর থেকে শূন্যতার দীর্ঘনিঃশ্বাস এসে
লাগল আমার অন্তরে।

অনেক সন্ধানের পর
দেখা হ'ল শেষে।
কোন্ বারো ভুঁইঞাদের আমলের
একখানা তিনকাল-পেরোনো গ্রাম,
একটি পুরোনো দীঘির ধারে।
দীঘির নামেই নাম তার লোচনদীঘি।
সেখানে ভুলে-যাওয়া তারিখের
ঝাপ্‌সা অক্ষরপটওয়ালা
ভাঙা দেবালয়।
পূর্ব্বখ্যাতির কোনো সাক্ষী রাখে নি,
আছে সে অশ্বত্থের পাঁজরভাঙা
আলিঙ্গনে জড়িয়ে-পড়া।
পাড়ির উপরে বুড়ো বটের তলায়
একটি নূতন আটচালা ঘর,
সেইখানে গ্রামের বালিকা-বিদ্যালয়।

দেখলুম অমিয়াকে,
ছাই রঙের মোটা শাড়ীপরা,
দুই হাতে দুই গাছি শাঁখা,
পায়ে নেই জুতো ;
ঢিলে খোঁপা অযত্নে পড়েছে ঝুলে'।
পাড়াগাঁয়ের শ্যামল রং লেগেছে মুখে।
ছোটো ঝারি-হাতে পাঠশালার বাগানে
জল দিচ্ছে সব্‌জি ক্ষেতে।
ভেবে পেলেম না কী বলি।
তারো মুখে এল না
প্রথম দেখার কোনো সম্ভাষণ,
কোনো প্রশ্ন।
চোখের আড়ে
আমার দামী জুতোজোড়াটার দিকে তাকিয়ে
বললে অনায়াসে,
"বেশি বর্ষায় আগাছায় চাপা পড়েছে
বিলিতি বেগুনের চারা,
এসো না, নিড়িয়ে দেবে।"

বোঝা গেল না, ঠাট্টা কি সত্যি।
জামার আস্তিনে ছিল মুক্তোর বোতাম,
লুকিয়ে আস্তিনটা দিলেম উল্‌টিয়ে,
অমিয়ার জন্যে একটা ব্রোচ্ ছিল পকেটে,
বুঝলেম দিতে গেলে
হীরেটাতে লাগ্‌বে প্রহসনের হাসি।

একটু কেশে' সুধালেম
"এখানে থাকো কোথায় ?"
ঝারি রেখে দিয়ে বললে, "দেখবে ?"
নিয়ে গেল স্কুলের মধ্যে,
দালানের পূব দিক্‌টাতে
সতরঞ্চের পর্দ্দা দিয়ে ভাগ-করা ঘরে।
একটা তক্তপোষের উপর
বিছানা রয়েছে গোটানো।

টুলের উপর সেলাইয়ের কল ;
ছিটের খাপে-ঢাকা সেতার
দেয়ালে ঠেসান দেওয়া।

দক্ষিণের দরজার সামনে মাদুর পাতা,
তার উপরে ছড়িয়ে আছে
ছাঁটা কাপড়, নানা রঙের ফিতে,
রেশমের মোড়ক।
উত্তর কোণের দেয়ালে
ছোটো টিপায়ে হাত-আয়না,
চিরুণি, তেলের শিশি,
বেতের ঝুড়িতে টুকিটাকি।
দক্ষিণ কোণের দেয়ালের গায়ে
ছোটো টেবিলে লেখবার সামগ্রী
আর রং-করা মাটির ভাঁড়ে
একটি স্থলপদ্ম।

অমিয়া বললে, "এই আমার বাসা,
একটু বোসো, আসছি আমি।"

বাইরে জটা-ঝোলা বটের ডালে
ডাকছে কোকিল।
মানকচুর ঝোপের পাশে
বিষম ক্ষেপে উঠেছে একদল ঝগড়াটে শালিক।
দেখা যায় ঝিলমিল করছে
ঢালুপাড়ির তলায়
দীঘির উত্তর ধারের এক টুক্‌রো জল,
কল্‌মি শাকের পাড়-দেওয়া।
চোখে পড়ল, লেখবার টেবিলে একটি ছবি,
অল্প বয়সের যুবা, চিনি নে তাকে,—
কয়লায় আঁকা, কাঁচকড়ার ফ্রেমে বাঁধানো,—
ফলাও তার কপাল, চুল আলুথালু,
চোখে যেন দূর ভবিষ্যের আলো,
ঠোঁটে যেন কঠিন পণ তালা আঁটা।—
এমন সময় অমিয়া নিয়ে এল,
থালায় ক'রে জলখাবার,—
চিঁড়ে, কলা, নারকেল নাড়ু,
কালো পাথরবাটিতে দুধ,
এক গেলাস ডাবের জল।
মেঝের উপর থালা রেখে
পশমে বোনা একটা আসন দিল পেতে।
ক্ষিদে নেই বললে মিথ্যে হ'ত না,
রুচি নেই বললে সত্য হ'ত,
কিন্তু খেতেই হ'ল।

তার পরে শোনা গেল খবর।

আমার ব্যবসায়ে আমদানি যখন জমে উঠ্‌ছে ব্যাঙ্কে
যখন হুঁস ছিল না আর কোনো জমাখরচে,
তখন অমিয়ার বাবা কুঞ্জকিশোর বাবু
মাঝে মাঝে লক্ষপতির ঘরের
দুর্লভ দুই একটি ছেলেকে
এনেছিলেন চায়ের টেবিলে।

সব সুযোগই ব্যর্থ করেছে বারেবারে
তাঁর একগুঁয়ে মেয়ে।
কপাল চাপ্‌ড়ে, হাল ছেড়েছেন যখন তিনি,
এমন সময় পারিবারিক দিগন্তে
হঠাৎ দেখা দিল কক্ষছাড়া পাগলা জ্যোতিষ্ক,
মাধপাড়ার রায় বাহাদুরের একমাত্র ছেলে
মহীভূষণ।
রায় বাহাদুর জমা টাকা আর জমাট বুদ্ধিতে
দেশবিখ্যাত।
তাঁর ছেলেকে কোনো কন্যার পিতা
পারে না হেলা করতে
যতই সে হোক্ লাগাম-ছেঁড়া।
আট বছর য়ুরোপে কাটিয়ে
মহীভূষণ ফিরেছেন দেশে।
বাবা বললেন, "বিষয়কর্ম্ম দেখো।"
ছেলে বললে, "কী হবে!"
লোকে বললে, ওর বুদ্ধির কাঁচা ফলে
ঠোকর দিয়েছে রাশিয়ার লক্ষ্মীখেদানো বাদুড়টা।
অমিয়ার বাবা বললেন, "ভয় নেই,
নরম হয়ে এল ব'লে দেশের ভিজে হাওয়ায়।"
দুদিনে অমিয়া হ'ল তার চেলা।
যখন তখন আসত মহীভূষণ,
আশপাশের হাসাহাসি কানাকানি
গায়ে লাগত না কিছুই।
দিনের পর দিন যায়।
অধীর হয়ে অমিয়ার বাবা তুললেন বিয়ের কথা।
মহী বললে—"কী হবে!"
বাবা রেগে বললেন—
"তবে তুমি আস কেন রোজ?"
অনায়াসে বললে মহীভূষণ,
"অমিয়াকে নিয়ে যেতে চাই
যেখানে ওর কাজ।"
অমিয়ার শেষ কথা এই—
"এসেছি তাঁরি কাজে।
উপকরণের দুর্গ থেকে
তিনি করেছেন আমাকে উদ্ধার।"
আমি সুধালেম, "কোথায় আছেন তিনি?"
অমিয়া বললে—"জেলখানায়।"

৩ জুলাই, ১৯৩৬

চন্দন-মূর্ত্তি

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

১

বৌদ্ধ ভিক্ষু বলিতে যে চিত্রটি আমাদের মনে উদয় হয়, একালের সাধারণ বাঙালীর চেহারার সঙ্গে সে-চিত্রের মোটেই মিল নাই। অথচ, যাঁহার কথা আজ লিখিতে বসিয়াছি সেই ভিক্ষু অভিরাম যে কেবল জাতিতে বাঙালী ছিলেন তাহাই নয়, তাঁহার চেহারাও ছিল নিতান্তই বাঙালীর মত।

গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল যে ভিক্ষু অভিরামের আগাগোড়া জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা আমার অভিপ্রায় নয়, থাকিলেও তাহা সম্ভব হইত না। তাঁহার বংশ- বা জাতি-পরিচয় কখনও শুনি নাই, তিনি বাঙালী হইয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে কি করিয়া গিয়া পড়িলেন সে ইতিহাসও আমার কাছে অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। কেবল এক বৎসরের আলাপে তাঁহার চরিত্রের যে-পরিচয়টি আমি পাইয়াছিলাম এবং একদিন অচিন্তনীয় অবস্থার মধ্যে পড়িয়া কিরূপে সেই পরিচয়ের বন্ধন চিরদিনের জন্য ছিন্ন হইয়া গেল, তাহাই সংক্ষেপে বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া পাঠকের সম্মুখে স্থাপন করিব। আমাদের দেশ ধর্ম্মোন্মত্ততার মল্লভূমি, ধর্ম্মের নামে মাথা কাটাকাটি অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু ভিক্ষু অভিরামের হৃদয়ে এই ধর্ম্মানুরাগ যে বিচিত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, এবং পরে যে আর দেখিব সে সম্ভাবনাও অল্প।

ভিক্ষু অভিরামের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে। বছর-চারেক আগেকার কথা, তখন আমি সবেমাত্র বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস লইয়া নাড়াচাড়া আরম্ভ করিয়াছি। একখানা দুষ্প্রাপ্য বৌদ্ধ পুস্তক খুঁজিতে গিয়া দেখিলাম তিনি পূর্ব্ব হইতে সেখানা দখল করিয়া বসিয়া আছেন।

ক্রমে তাঁহার সহিত আলাপ হইল। শীর্ণকায় মুণ্ডিত-শির লোকটি, দেহের বস্ত্রাদি ঈষৎ পীতবর্ণ, বয়স বোধ করি চল্লিশের নীচেই। কথাবার্ত্তা খুব মিষ্ট, হাসিটি শীর্ণ মুখে লাগিয়াই আছে; আমাদের দেশের সাধারণ উদাসী সম্প্রদায়ের মত একটি নির্লিপ্ত অনাসক্ত ভাব। তবু তাঁহাকে সাধারণ বলিয়া অবহেলা করা যায় না। চোখের মধ্যে ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়, একটা প্রবল দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা যজ্ঞাগ্নির মত সর্ব্বদা সেখানে জ্বলিতেছে। জটা কৌপীন কিছুই নাই, তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথের 'পরশ-পাথরে'র সেই ক্ষ্যাপাকে মনে পড়িয়া যায়—

> ওষ্ঠে অধরেতে চাপি অন্তরের দ্বার ঝাঁপি
> রাত্রিদিন তীব্র জ্বালা জ্বেলে রাখে চোখে
> দুটা চক্ষু সদা যেন নিশার খদ্যোত হেন
> উড়ে উড়ে খোঁজে কারে নিজের আলোকে।

বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষু বর্ত্তমান কালে থাকিতে পারে এ কল্পনা পূর্ব্বে মনে স্থান পায় নাই, তাই প্রথম দর্শনেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। ক্রমশঃ আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল। তিনি সময়ে অসময়ে আমার বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করিলেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান যেরূপ গভীর ছিল, বৌদ্ধ ইতিহাসে ততটা ছিল না। তাই বুদ্ধের জীবন সম্বন্ধে কোন নূতন কথা জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ আমাকে আসিয়া জানাইতেন। আমার ঐতিহাসিক গবেষণা সম্বন্ধেও তাঁহার ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না; ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থির হইয়া বসিয়া আমার বক্তৃতা শুনিয়া যাইতেন, আর তাঁহার চোখে সেই খদ্যোত-আলোক জ্বলিতে থাকিত।

খাদ্যাদি বিষয়ে তাঁহার কোন বিচার ছিল না। আমার বাড়ীতে আসিলে গৃহিণী প্রায়ই ভক্তিভরে তাঁহাকে খাওয়াইতেন; তিনি নির্ব্বিবাদে মাছ মাংস সবই গ্রহণ করিতেন। আমি একদিন প্রশ্ন করায় তিনি ক্ষীণ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি ভিক্ষু, ভিক্ষাপাত্রে যে যা দেবে তাই আমাকে খেতে হবে, বাছবিচার করবার ত আমার

অধিকার নেই। তথাগতের পাতে একদিন তাঁর এক শিষ্য শূকর-মাংস দিয়েছিল, তিনি তাও খেয়েছিলেন।' ভিক্ষুর দুই চক্ষু সহসা জলে ভরিয়া গিয়াছিল।

প্রায় ছয়-সাত মাস কাটিয়া যাইবার পর একদিন তাঁহার প্রাণের অন্তরতম কথাটি জানিতে পারিলাম। আমার বাড়ীতে বসিয়া বৌদ্ধ শিল্প লইয়া আলোচনা হইতেছিল। ভিক্ষু অভিরাম বলিতেছিলেন, 'ভারতে এবং ভারতের বাইরে কোটি কোটি বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে। কিন্তু সবগুলিই তাঁর ভাব-মূর্ত্তি। ভক্ত-শিল্পী যে ভাবে ভগবান তথাগতকে কল্পনা করেছে, পাথর কেটে তাঁর সেই মূর্ত্তিই গড়েছে। বুদ্ধের সত্যিকার আকৃতির সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল না।'

আমি বলিলাম, 'আমার ত মনে হয়, ছিল। আপনি লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়, যে, সব বুদ্ধ-মূর্ত্তিরই ছাঁচ প্রায় এক রকম। অবশ্য অল্পবিস্তর তফাৎ আছে, কিন্তু মোটের উপর একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়,—কান বড়, মাথায় কোঁকড়া চুল, ভারী গড়ন—এগুলো সব মূর্ত্তিতেই আছে। এর কারণ কি? নিশ্চয় তাঁর প্রকৃত চেহারা সম্বন্ধে শিল্পীদের জ্ঞান ছিল, নইলে কেবল কাল্পনিক মূর্ত্তি হ'লে এতটা সাদৃশ্য আসতে পারত না। একটা বাস্তব মডেল তাদের ছিলই।'

গভীর মনঃসংযোগে আমার কথা শুনিয়া ভিক্ষু অভিরাম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, 'কি জানি। বুদ্ধদেবের জীবিতকালে তাঁর মূর্ত্তি গঠিত হয় নি, তখন ভাস্কর্য্যের প্রচলন ছিল না। বুদ্ধ-মূর্ত্তির বহুল প্রচলন হয়েছে গুপ্ত-যুগ থেকে, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে, অর্থাৎ বুদ্ধ-নির্ব্বাণের প্রায় সাত-শ বছর পরে। এই সাত-শ বছর ধরে তাঁর আকৃতির স্মৃতি মানুষ কি ক'রে সঞ্জীবিত রেখেছিল? বৌদ্ধ-শাস্ত্রেও তাঁর চেহারার এমন কোন বর্ণনা নেই যা থেকে তাঁর একটা স্পষ্ট চিত্র আঁকা যেতে পারে। আপনি যে সাদৃশ্যের কথা বলছেন, সেটা সম্ভবতঃ শিল্পের একটা কনভেনশ্যন—প্রথমে এক জন প্রতিভাবান্ শিল্পী তাঁর ভাব-মূর্ত্তি গড়েছিলেন, তার পর যুগপরম্পরায় সেই মূর্ত্তিরই অনুকরণ হয়ে আসছে।' ভিক্ষু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, 'না—তাঁর সত্যিকার চেহারা মানুষ ভুলে গেছে।—টুটেনখামেন আমেন-হোটেপের শিলা-মূর্ত্তি আছে, কিন্তু বোধিসত্ত্বের দিব্য দেহের প্রতিমূর্ত্তি নেই।'

আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ, মানুষের স্মৃতির ওপর যাদের কোন দাবি নেই তারাই পাথরে নিজেদের প্রতিমূর্ত্তি খোদাই করিয়ে রেখে গেছে, আর যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা কেবল মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমর হয়ে আছেন। এই দেখুন না, যীশুখ্রীষ্টের প্রকৃত চেহারা যে কি রকম ছিল তা কেউ জানে না।'

তিনি বলিলেন, 'ঠিক। অথচ কত হাজার হাজার লোক তাঁর গায়ের একটা জামা দেখবার জন্য প্রতি বৎসর তীর্থযাত্রা করছে। তারা যদি তাঁর প্রকৃত প্রতিমূর্ত্তির সন্ধান পেত, কি করত বলুন দেখি। বোধ হয় আনন্দে পাগল হয়ে যেত।'

এই সময় তাঁহার চোখের দিকে আমার নজর পড়িল। ইংরেজীতে যাহাকে ফ্যানাটিক বলে, এ সেই তাহারই দৃষ্টি। যে উগ্র একাগ্রতা মানুষকে শহীদ করিয়া তোলে, তাঁহার চোখে সেই সর্ব্বগ্রাসী তন্ময়তার আগুন জ্বলিতেছে। চক্ষু-দুটা আমার পানে চাহিয়া আছে বটে, কিন্তু তাঁহার মন যেন আড়াই হাজার বৎসরের ঘন কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া এক দিব্য পুরুষের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে।

তিনি হঠাৎ বলিতে লাগিলেন, 'ভগবান বুদ্ধের দন্ত কেশ নখ দেখেছি; কিছু দিনের জন্য এক অপরূপ আনন্দের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলুম। কিন্তু তবু তাতে মন ভরল না। কেমন ছিল তাঁর পূর্ণাবয়ব দেহ? কেমন ছিল তাঁর চোখের দৃষ্টি? তাঁর কণ্ঠের বাণী—যা শুনে একদিন রাজা সিংহাসন ছেড়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছিল, গৃহস্থ-বধূ স্বামী-পুত্র ছেড়ে ভিক্ষুণী হয়েছিল—সেই কণ্ঠের অমৃতময় বাণী যদি একবার শুনতে পেতুম—'

দুর্দ্দম আবেগে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। দেখিলাম তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, অজ্ঞাতে দুই শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম; এত অল্প কারণে এতখানি ভাবাবেশ কখনও সম্ভব মনে করি নাই। শুনিয়াছিলাম বটে, কৃষ্ণনাম শুনিবামাত্র কোন কোন বৈষ্ণবের দশা উপস্থিত হয়, বিশ্বাস করিতাম না; কিন্তু ভিক্ষুর এই

অপূর্ব্ব ভাবোন্মাদনা দেখিয়া আর তাহা অসম্ভব বোধ হইল না। ধর্ম্মের এ-দিকটা কোন দিন প্রত্যক্ষ করি নাই; আজ যেন হঠাৎ চোখ খুলিয়া গেল।

ভিক্ষু বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভাবে বলিতে লাগিলেন, 'গোতম! তথাগত! আমি অর্হত্ত চাই না, নির্ব্বাণ চাই না,—একবার তোমার স্বরূপ আমাকে দেখাও। যে-দেহে তুমি এই পৃথিবীতে বিচরণ করতে সেই দেব-দেহ আমাকে দেখাও। বুদ্ধ, তথাগত—'

বুঝিলাম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম নয়, স্বয়ং সেই কালজয়ী মহাপুরুষ ভিক্ষু অভিরামকে উন্মাদ করিয়াছেন।

পা টিপিয়া টিপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। এই আত্মহারা ব্যাকুলতা বসিয়া দেখিতে পারিলাম না, মনে হইতে লাগিল যেন অপরাধ করিতেছি।

২

ধর্ম্মোন্মত্ততা বস্তুটা সংক্রামক। আমার মধ্যেও বোধ হয় অজ্ঞাতসারে সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাই, উল্লিখিত ঘটনার কয়েক দিন পরে এক দিন ফা-হিয়ানের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ এক জায়গায় আসিয়া দৃষ্টি আটকাইয়া গেল; আনন্দ ও উত্তেজনায় এক-বারে লাফাইয়া উঠিলাম। ফা-হিয়ান পূর্ব্বেও পড়িয়াছি, কিন্তু এ-জিনিষ চোখে ঠেকে নাই কেন?

সেইদিন অপরাহ্নে ভিক্ষু অভিরাম আসিলেন। উত্তেজনা দমন করিয়া বইখানা তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি উৎসুক ভাবে বলিলেন, 'কি এ?'

'পড়ে দেখুন' বলিয়া একটা পাতা নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম। ভিক্ষু পড়িতে লাগিলেন, আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

"বৈশালী হইতে দ্বাদশ শত পদ দক্ষিণে বৈশ্যাধিপতি সুদত্ত দক্ষিণাভিমুখী একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিহারের বামে ও দক্ষিণে স্বচ্ছ বারিপূর্ণ পুষ্করিণী বহু বৃক্ষ ও নানাবর্ণ পুষ্পে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। ইহাই জেতবন-বিহার।

"বুদ্ধদেব যখন ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গমন করিয়া তাঁহার মাতৃদেবীর হিতার্থে নব্বই দিবস ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তখন প্রসেনজিৎ তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া গোশীর্ষ চন্দন-কাষ্ঠে তাঁহার এক মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া যে-স্থানে তিনি সাধারণত উপবেশন করিতেন তথায় স্থাপন করিলেন। বুদ্ধদেব স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমন করিলে এই মূর্ত্তি বুদ্ধদেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য স্বস্থান পরিত্যাগ করিল। বুদ্ধদেব তখন মূর্ত্তিকে কহিলেন, 'তুমি স্বস্থানে প্রতিগমন কর; আমার নির্ব্বাণ লাভ হইলে তুমি আমার চতুর্ব্বর্গ শিষ্যের নিকটে আদর্শ হইবে।' এই বলিলে মূর্ত্তি প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই মূর্ত্তিই বুদ্ধদেবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম মূর্ত্তি এবং ইহা দৃষ্টেই পরে অন্যান্য মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে।

"বুদ্ধ-নির্ব্বাণের পরে এক সময় আগুন লাগিয়া জেতবন-বিহার ভস্মীভূত হয়। নরপতিগণ ও তাঁহাদের প্রজাবর্গ চন্দন-মূর্ত্তি ধ্বংস হইয়াছে মনে করিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হন; কিন্তু চারি-পাঁচ দিন পরে পূর্ব্বপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র বিহারের দ্বার উন্মুক্ত হইলে চন্দন-মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। সকলে উৎফুল্ল হৃদয়ে একত্র হইয়া বিহার পুনর্নির্ম্মাণে ব্রতী হইল। দ্বিতল নির্ম্মিত হইলে তাহারা প্রতিমূর্ত্তিকে পূর্ব্বস্থানে স্থাপন করিল।..."

তন্দ্রামূঢ়ের ন্যায় চক্ষু পুস্তক হইতে তুলিয়া ভিক্ষু আমার পানে চাহিলেন, অস্পষ্ট স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'কোথায় সে মূর্ত্তি?'

আমি বলিলাম, 'জানি না। চন্দন-মূর্ত্তির উল্লেখ আর কোথাও দেখেছি ব'লে ত স্মরণ হয় না।'

অতঃপর দীর্ঘকাল আবার দুই জনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। এই ক্ষুদ্র তথ্যটি ভিক্ষুর অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত নাড়া দিয়া আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে তাহা অনুমানে বুঝিতে পারিলাম। আমি বোধ হয় মনে মনে তাঁহার নিকট হইতে আনন্দের একটা প্রবল উচ্ছ্বাস প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, এই ভাবে অভাবিতের সম্মুখীন হইয়া তিনি কি বলিবেন কি করিবেন তাহা প্রত্যক্ষ করিবার কৌতূহলও ছিল। কিন্তু তিনি কিছুই করিলেন না; প্রায় আধ ঘণ্টা নিশ্চল ভাবে বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চক্ষে সেই সদ্যনিদ্রোত্থিতের অভিভূত দৃষ্টি,—কোন দিকে দৃক্‌পাত করিলেন না, নিশির ডাক শুনিয়া ঘুমন্ত মানুষ

যেমন শয্যা ছাড়িয়া একান্ত অবশে চলিয়া যায়, তেমনি ভাবে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

তার পর তিন মাস আর তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম না।

হঠাৎ পৌষের মাঝামাঝি একদিন তিনি মূর্ত্তিমান ভূমিকম্পের মত আসিয়া আমার স্থাবরতার পাকা ভিত এমনভাবে নাড়া দিয়া আলগা করিয়া দিলেন যে তাহা পূর্ব্বাহ্নে অনুমান করাও কঠিন। অন্ততঃ আমি যে কোন দিন এমন একটা দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হইয়া পড়িব তাহা সন্দেহ করিতেও আমার কুণ্ঠা বোধ হয়।

তিনি বলিলেন, 'সন্ধান পেয়েছি।'

আমি সানন্দে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম, 'আসুন—বসুন!'

তিনি বসিলেন না, উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'পেয়েছি বিভূতি বাবু, সে মূর্ত্তি হারায় নি, এখনও আছে।'

'সে কি, কোথায় পেলেন?'

'পাই নি এখনও। প্রাচীন বৈশালীর ভগ্নাবশেষ যেখানে পড়ে আছে সেই 'বেসাড়ে' গিয়েছিলুম। জেতবন-বিহারের কিছুই নেই, কেবল ইট আর পাথরের স্তূপ। তবু তারই ভেতর থেকে আমি সন্ধান পেয়েছি—সে মূর্ত্তি আছে।'

'কি ক'রে সন্ধান পেলেন?'

'এক শিলালিপি থেকে। একটা ভাঙা মন্দির থেকে একটা পাথর খ'সে পড়েছিল—তারই উল্টো পিঠে এই লিপি খোদাই করা ছিল।' এক খণ্ড কাগজ আমাকে দিয়া উত্তেজনা-অবরুদ্ধ স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'জেতবন-বিহার ধ্বংস হয়ে যাবার পর বোধ হয় তারই পাথর দিয়ে ঐ মন্দির তৈরি হয়েছিল; মন্দিরটাও পাঁচ-ছ-শ বছরের পুরনো, এখন তাতে কোন বিগ্রহ নেই।—একটা বিরাট অশথ্ গাছ তাকে অজগরের মত জড়িয়ে তার হাড়-পাঁজর গুঁড়ো ক'রে দিচ্ছে—পাথরগুলো খ'সে খ'সে পড়ছে। তারই একটা পাথরে এই লিপি খোদাই করা ছিল।'

কাগজখানা তাঁর হাত হইতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম; অনুমান দশম কি একাদশ শতাব্দীর প্রাকৃত ভাষায় লিখিত লিপি, ভিক্ষু অবিকল নকল করিয়া আনিয়াছেন। পাঠোদ্ধার করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না শিলালেখের অর্থ এইরূপ—

"হায় তথাগত! সদ্ধর্ম্মের আজ মহা দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। যে জেতবন-বিহারে তুমি পঞ্চবিংশ বর্ষ যাপন করিয়াছ তাহার আজ কি শোচনীয় দুর্দ্দশা। গৃহিগণ আর তোমার শ্রমণদিগকে ভিক্ষা দান করে না; রাজগণ বিহারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। পৃথিবীর প্রান্ত হইতে শিক্ষার্থিগণ আর বিনয়-ধম্ম-সুত্ত অধ্যয়নের জন্য বিহারে আগমন করে না। তথাগতের ধর্ম্মের গৌরব-মহিমা অস্তমিত হইয়াছে।

"তদুপরি সম্প্রতি দারুণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। কিছুকাল যাবৎ চারি দিক হইতে জনশ্রুতি আসিতেছে যে, তুরুষ্ক নামক এক অতি বর্ব্বর জাতি রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহারা বিধর্ম্মী ও অতিশয় নিষ্ঠুর; ভিক্ষু-শ্রমণ দেখিলেই নৃশংসভাবে হত্যা করিতেছে এবং বিহার-সঙ্ঘাদি লুণ্ঠন করিতেছে।

"এই সকল জনরব শুনিয়া ও তুরুষ্কগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত কয়েক জন মুমূর্ষু পলাতক শ্রমণকে দেখিয়া জেতবন-বিহারের মহাথের বুদ্ধরক্ষিত মহাশয় অতিশয় বিচলিত হইয়াছেন। তুরুষ্কগণ এই দিকেই আসিতেছে, অবশ্যই বিহার আক্রমণ করিবে। বিহারের অধিবাসিগণ অহিংসধর্ম্মী, অস্ত্রচালনায় অপারক। বিহারে বহু অমূল্য রত্নাদি সঞ্চিত আছে; সর্ব্বাপেক্ষা অমূল্য রত্ন আছে, গোশীর্ষ চন্দনকাষ্ঠে নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি—যাহা ভগবান তথাগতের জীবিতকালে প্রসেনজিৎ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তুরুষ্কের আক্রমণ হইতে এ সকল কে রক্ষা করিবে?

"মহাথের বুদ্ধরক্ষিত তিন দিবস অহোরাত্র চিন্তা করিয়া উপায় স্থির করিয়াছেন। আগামী অমাবস্যার মধ্যযামে দশ জন শ্রমণ বিহারস্থ মণি-রত্ন ও অমূল্য গ্রন্থ সকল সহ ভগবানের চন্দন-মূর্ত্তি লইয়া প্রস্থান করিবে। বিহার হইতে বিংশ যোজন উত্তরে হিমালয়ের সানু-নিষ্ঠ্যূত উপলা নদীর প্রস্রবণমুখে এক দৈত্যনির্ম্মিত পাষাণ-স্তম্ভ আছে; এই গগনলেহী স্তম্ভের শীর্ষদেশে এক গোপন ভাণ্ডার আছে। কথিত আছে যে অসুর-দেশীয় দৈত্যগণ দেবপ্রিয় ধর্ম্মাশোকের কালে হিমালয়ের স্পন্দনশীল জঙ্ঘাপ্রদেশে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। শ্রমণগণ চন্দন-মূর্ত্তি ও অন্যান্য মহার্ঘ বস্তু এই

গুপ্ত স্থানে লইয়া গিয়া রক্ষা করিবে। পরে তুরুষ্কের উৎপাত দূর হইলে তাহারা আবার উহা ফিরাইয়া আনিবে।

যদি তুরুষ্কের আক্রমণে বিহার ধ্বংস হয়, বিহারবাসী সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় মহাথের মহাশয়ের আজ্ঞাক্রমে পরবর্ত্তীদিগের অবগতির জন্য অদ্য কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীর দিবসে এই লিপি উৎকীর্ণ হইল। ভগবান বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

এইখানে লিপি শেষ হইয়াছে। লিপি পড়িতে পড়িতে আমার মনটাও অতীতের আবর্ত্তে গিয়া পড়িয়াছিল; আট শত বৎসর পূর্ব্বে জেতবন-বিহারের নিরীহ ভিক্ষুদের বিপদ-ছায়াচ্ছন্ন ত্রস্ত চঞ্চলতা যেন অস্পষ্ট ভাবে চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছিলাম; বিচক্ষণ প্রবীণ মহাস্থবির বুদ্ধরক্ষিতের গম্ভীর বিষণ্ণ মুখচ্ছবিও চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতেছিল। ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের একটা ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ যেন ঐ লিপির সাহায্যে আমি কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য চলচ্ছায়ার মত প্রত্যক্ষ করিয়া লইলাম। দেশব্যাপী সন্ত্রাস! শান্তিপ্রিয় নির্বীর্য্য জাতির উপর সহসা দুরন্ত দুর্ম্মদ বিদেশীর অভিযান! 'তুরুষ্ক! তুরুষ্ক! ঐ তুরুষ্ক আসিতেছে!' ভীত কণ্ঠের সহস্র সমবেত আর্ত্তনাদ আমার কণ্ঠে বাজিতে লাগিল।

তার পর চমক ভাঙিয়া গেল। দেখিলাম ভিক্ষু অভিরামের চোখে ক্ষুধিত উল্লাস! গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, 'মহাস্থবির বুদ্ধরক্ষিতের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে—কিন্তু কত বিলম্বে!'

তিনি প্রদীপ্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'হোক বিলম্ব। তবু এখনও সময় অতীত হয় নি। আমি যাব বিভূতি বাবু। সেই অসুরনির্ম্মিত পাষাণ-স্তম্ভ খুঁজে বার করব। কিছু সন্ধানও পেয়েছি—উপলা নদীর বর্ত্তমান নাম জানতে পেরেছি।—বিভূতি বাবু, দেড় হাজার বছর আগে চৈনিক পরিব্রাজক কোরিয়া থেকে যাত্রা সুরু ক'রে গোবি মরুভূমি পার হয়ে দুস্তর হিমালয় লঙ্ঘন ক'রে পদব্রজে ভারতভূমিতে আসতেন। কি জন্যে? কেবল বুদ্ধ তথাগতের জন্মভূমি দেখবার জন্যে! আর, আমাদের বিশ যোজনের মধ্যে ভগবান বুদ্ধের স্বরূপ-মূর্ত্তি রয়েছে, জানতে পেরেও আমরা তা খুঁজে বার করতে পারব না?'

আমি বলিলাম, 'নিশ্চয় পারবেন।'

ভিক্ষু তাঁহার বিদ্যুদ্বহ্নিপূর্ণ চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া এক প্রচণ্ড প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, 'বিভূতি বাবু, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন না?'

ক্ষণকালের জন্য হতবাক্ হইয়া গেলাম। আমি যাইব! কাজকর্ম্ম ফেলিয়া পাহাড়ে-জঙ্গলে এই মায়ামৃগের অন্বেষণে আমি কোথায় যাইব!

ভিক্ষু স্পন্দিতস্বরে বলিলেন, 'আট-শ বছরের মধ্যে সে দিব্যমূর্ত্তি কেউ দেখে নি। ভগবান শাক্যসিংহ আট শতাব্দী ধ'রে সেই স্তম্ভশীর্ষে আমাদেরই প্রতীক্ষা করছেন।—আপনি যাবেন না?'

ভিক্ষুর কথার মধ্যে কি ছিল জানি না, কিন্তু মজ্জাগত বহির্বিমুখতা ও বাঙালীসুলভ ঘরের টান যেন সঙ্গীত-যন্ত্রের উচ্চ সপ্তকের তারের মত সুরের অসহ্য স্পন্দনে ছিঁড়িয়া গেল। আমি উঠিয়া ভিক্ষুর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, 'আমি যাব।'

৩

এই আখ্যায়িকা যদি আমাদের হিমাচল-অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী হইত তাহা হইলে বোধ করি নানা বিচিত্র ঘটনার বর্ণনা করিয়া পাঠককে চমৎকৃত করিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু এ-গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে তাহার স্থান নাই। দৈত্য-নির্ম্মিত স্তম্ভ অন্বেষণের পরিসমাপ্তিটুকু বর্ণনা করিয়াই আমাকে নিবৃত্ত হইতে হইবে।

কলিকাতা হইতে যাত্রা সুরু করিবার দুই সপ্তাহ পরে একদিন অপরাহ্ণে যে ক্ষুদ্র জনপদটিতে পৌঁছিলাম তাহা মনুষ্য-লোকালয় হইতে এত ঊর্দ্ধে ও বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত যে হিমালয়-কুক্ষিস্থিত ঈগল পাখীর বাসা বলিয়া ভ্রম হয়। তখনও বরফের এলাকায় আসিয়া পৌঁছাই নাই; কিন্তু সম্মুখেই হিমাদ্রির তুষারশুভ্র দেহ আকাশের একটা দিক্ আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। আশেপাশে পিছনে চারি দিকেই নগ্ন পাহাড়, পায়ের তলায় পাহাড়ী কাঁকর ও উপলখণ্ড। এই উপলাকীর্ণ কঠিন ভূমি চিরিয়া তন্বী উপলা নদী ক্ষুরধারে নিম্নাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। আকাশে বাতাসে একটা জমাট শীতলতা।

আমরা তিন জন—আমি, ভিক্ষু অভিরাম ও এক জন ভুটিয়া পথপ্রদর্শক—গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইতেই গ্রামের সমস্ত স্ত্রীপুরুষ বালক-বালিকা আসিয়া আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বহির্জ্জগতের মানুষ এখানে কখনও আসে না; ইহারা সুবর্ত্তুল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া আমাদের নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

চেহারা দেখিয়া মনে হইল ইহারা লেপ্‌চা কিংবা ভুটানী। আর্য্য রক্তের সংমিশ্রণও সামান্য আছে; দুই-একটা খড়্গের মত তীক্ষ্ণ নাক চোখে পড়িল।

এইরূপ খড়্গ-নাসিকা এক জন প্রৌঢ়গোছের লোক আমাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া নিজ ভাষায় কি বলিল। বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের ভুটানী সহচর বুঝাইয়া দিল, ইনি গ্রামের মোড়ল, আমরা কি জন্য আসিয়াছি জানিতে চাহেন।

আমরা সরলভাবে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলাম। শুনিয়া লোকটির চোখে মুখে প্রথমে বিস্ময়, তার পর প্রবল কৌতূহল ফুটিয়া উঠিল। সে আমাদের আহ্বান করিয়া গ্রামে লইয়া চলিল।

মিছিল করিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। অগ্রে মোড়ল, তাহার পিছনে আমরা তিন জন ও সর্ব্বশেষে গ্রামের আবালবৃদ্ধ নরনারী।

একটি কুটীরের মধ্যে লইয়া গিয়া মোড়ল আমাদের বসাইল, আমরা ক্লান্ত ও ক্ষুৎপীড়িত দেখিয়া আহার্য্য দ্রব্য আনিয়া অতিথিসৎকার করিল। অতঃপর তৃপ্ত ও বিশ্রান্ত হইয়া আমরা দোভাষী ভুটিয়া মারফৎ বাক্যালাপ আরম্ভ করিলাম। সূর্য্য তখন পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে; হিমালয়ের সুদীর্ঘ সন্ধ্যা যেন স্বচ্ছ বাতাসে অলক্ষিত কুঙ্কুমবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছে।

মোড়ল বলিল—গ্রাম হইতে চার ক্রোশ উত্তরে উপলা নদীর প্রপ্রাত—ঐ প্রপাত হইতেই নদী আরম্ভ। ঐ স্থান অতিশয় দুর্গম ও দুরারোহ; উপলার অপর পারে প্রপাতের ঠিক মুখের উপর একটি স্তম্ভের মত পর্ব্বতশৃঙ্গ আছে, উহাই বুদ্ধস্তম্ভ নামে খ্যাত। গ্রামবাসীরা প্রতি পূর্ণিমার রাত্রে বুদ্ধ-স্তম্ভকে উদ্দেশ করিয়া পূজা দিয়া থাকে। কিন্তু সে স্থান দুরধিগম্য বলিয়া সেখানে কেহ যায় না, গ্রামের নিকটে উপলা নদীর স্রোতে পূজা ভাসাইয়া দেয়।

ভিক্ষু জিজ্ঞাসা করিলেন, উপলা পার হইয়া স্তম্ভের নিকটবর্ত্তী হইবার পথ কোথায়? মোড়ল মাথা নাড়িয়া জানাইল, পথ আছে বটে, কিন্তু তাহা এত বিপজ্জনক যে সে-পথে কেহ পার হইতে সাহস করে না। উপলার প্রপাতের নীচে একটি প্রাচীন লৌহ শৃঙ্খলের ঝোলা বা দোদুল্যমান সেতু দুই তীরকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাহা কালক্রমে এত জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার উপর দিয়া মানুষ যাইতে পারে না। অথচ উহাই একমাত্র পথ।

আমাদের গন্তব্যস্থানে যে পৌঁছিয়াছি তাহাতে সন্দেহ ছিল না। তবু নিঃসংশয় হইবার অভিপ্রায়ে মোড়লকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওই স্তম্ভে কি আছে তাহা কেহ বলিতে পারে কি না। মোড়ল বলিল—কি আছে তাহা কেহ চোখে দেখে নাই, কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে একটা প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে বুদ্ধদেব স্বয়ং সশরীরে এই স্তম্ভে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার দেহ হইতে নিরন্তর চন্দনের গন্ধ নির্গত হয়;—পাঁচ হাজার বৎসর পরে আবার মৈত্রেয়-রূপ ধারণ করিয়া তিনি এই স্থান হইতে বাহির হইবেন।

ভিক্ষু আমার পানে প্রোজ্জ্বল চক্ষে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বুদ্ধদেব সশরীরে এই স্তম্ভে আছেন, তাঁর দেহ থেকে চন্দনের গন্ধ নির্গত হয়—প্রবাদের মানে বুঝতে পারছেন, যে-শ্রমণরা বুদ্ধমূর্ত্তি এনেছিল, তারা সম্ভবতঃ ফিরে যেতে পারে নি—এই গ্রামেই হয়ত থেকে গিয়েছিল—'

ভিক্ষুর কথা শেষ হইতে পারিল না। এই সময় আমাদের কুটীর হঠাৎ একটা প্রবল ঝাঁকানি খাইয়া মড়্‌-মড়্‌ করিয়া উঠিল। আমরা মেঝের উপর বসিয়া ছিলাম, আমাদের নিম্নে মাটির ভিতর দিয়াও একটা কম্পন শিহরিয়া উঠিল। আমিও ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম—'ভূমিকম্প!'

আমরা উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে ভূমিকম্পের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছিল। মোড়ল নিশ্চিন্তমনে মেঝেয় বসিয়া ছিল, আমাদের ত্রাস দেখিয়া সে মৃদুহাস্যে জানাইল যে ভয়ের কোন কারণ নাই; এরূপ ভূমিকম্প এখানে প্রত্যহ চার-পাঁচ বার হইয়া থাকে, এ দেশের নামই ভূমিকম্পের জন্মভূমি।

আমরা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। ভূমিকম্পের জন্মভূমি! এমন কথা ত কখনও শুনি নাই।—তখনও জানিতাম না কি ভীষণ দুর্দ্দান্ত সন্তান প্রসব করিবার জন্য সে উদ্যত হইয়া আছে।

ভিক্ষু অভিরাম কিন্তু উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'ঠিক'! ঠিক! শিলালিপিতে যে এ-কথার উল্লেখ আছে—মনে নেই ?'

শিলালিপিতে ভূমিকম্পের উল্লেখ কোথায় আছে স্মরণ করিতে পারিলাম না। ভিক্ষু তখন ঝোলা হইতে শিলালেখের অনুলিপি বাহির করিয়া উল্লসিত স্বরে কহিলেন, 'আর সন্দেহ নেই বিভূতি বাবু, আমরা ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছি।—এই শুনুন।' বলিয়া তিনি মূল প্রাকৃতে লিপির সেই অংশ পড়িয়া শুনাইলেন—কথিত আছে যে, অসুর-দেশীয় দৈত্যগণ দেবপ্রিয় ধর্ম্মাশোকের কালে হিমালয়ের স্পন্দনশীল জঙ্ঘাপ্রদেশে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

মনে পড়িয়া গেল। 'স্পন্দনশীল জঙ্ঘাপ্রদেশ' কথাটাকে আমি নিরর্থক বাগাড়ম্বর মনে করিয়াছিলাম, উহার মধ্যে যে ভূমিকম্পের ইঙ্গিত নিহিত আছে তাহা ভাবি নাই। বলিলাম, 'হ্যাঁ, আপনি ঠিক ধরেছেন, ও-কথাগুলো আমি ভাল ক'রে লক্ষ্য করি নি। এ-জায়গাটাও বোধ হয় শিলঙের মত ভূমিকম্পের রাজ্য—'

এই সময় মোড়লের দিকে নজর পড়িল। সে হঠাৎ ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, ক্ষুদ্র তির্য্যক চক্ষু জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে, ঠোঁট দুটা যেন কি একটা বলিবার জন্য বিভক্ত হইয়া আছে। তার পর সে আমাদের ধাঁধাঁ লাগাইয়া পরিষ্কার প্রাকৃত ভাষায় বলিয়া উঠিল, 'শ্রবণ কর। সূর্য্য যে-সময় উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের দ্বিতীয় পাদে পদার্পণ করিবেন সেই সময় বুদ্ধস্তম্ভের রন্ধ্রপথে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিয়া তথাগতের দিব্যদেহ আলোকিত করিবে, মন্ত্রবলে স্তম্ভের দ্বার খুলিয়া যাইবে। উপর্য্যুপরি তিন দিন এইরূপ হইবে, তার পর এক বৎসরের জন্য দ্বার বন্ধ হইয়া যাইবে। হে ভক্ত শ্রমণ, যদি বুদ্ধের অলৌকিক মুখচ্ছবি দেখিয়া নির্ব্বাণের পথ সুগম করিতে চাও, এ কথা স্মরণ রাখিও।' এক নিশ্বাসে এতখানি বলিয়া মোড়ল হাঁপাইতে লাগিল।

তীব্র বিস্ময়ে ভিক্ষু বলিলেন, 'তুমি—তুমি প্রাকৃত ভাষা জান ?'

মোড়ল বুঝিতে না পারিয়া মাথা নাড়িল।

তখন ভুটানী সহচরের সাহায্য লইতে হইল। দোভাষী-প্রমুখাৎ মোড়ল জানাইল, ইহা তাহাদের কৌলিক মন্ত্র; পুরুষপরম্পরায় ইহা তাহাদের কণ্ঠস্থ করিতে হয়, কিন্তু এই মন্ত্রের অর্থ কি তাহা সে জানে না। আজ ভিক্ষুকে ঐ ভাষায় কথা কহিতে শুনিয়া সে উত্তেজিত হইয়া উহা উচ্চারণ করিয়াছে।

আমরা পরস্পর মুখের পানে তাকাইলাম।

ভিক্ষু মোড়লকে বলিলেন, 'তোমার মন্ত্র আর একবার বল।'

মোড়ল দ্বিতীয় বার ধীরে ধীরে মন্ত্র আবৃত্তি করিল। ব্যাপারটা সমস্ত বুঝিতে পারিলাম। এ মন্ত্র নয়—বুদ্ধ-স্তম্ভে প্রবেশ করিবার নির্দ্দেশ। বৎসরের মধ্যে তিন দিন সূর্য্যালোকের উত্তাপ রন্ধ্রপথে স্তম্ভের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সম্ভবতঃ কোন যন্ত্রকে উত্তপ্ত করে, ফলে যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত দ্বার খুলিয়া যায়। প্রাচীন মিশর ও আসীরিয়ায় এইরূপ কলকব্জার সাহায্যে মন্দিরদ্বার খুলিয়া মন্দিরের ভণ্ড পূজারি-গণ অনেক বুজরুকি দেখাইত—পুস্তকে পড়িয়াছি স্মরণ হইল। এই স্তম্ভের নির্ম্মাতাও অসুর—অর্থাৎ আসীরীয় শিল্পী; সুতরাং অনুরূপ কলকব্জার দ্বারা উহার প্রবেশ-দ্বারের নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব নয়। যে-শ্রমণগণ বুদ্ধ-মূর্ত্তি লইয়া এখানে আসিয়াছিল তাহারা নিশ্চয় এ রহস্য জানিত; পাছে ভবিষ্য বংশ ইহা ভুলিয়া যায় তাই এই মন্ত্র রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

কিন্তু মোড়ল এ মন্ত্র জানিল কিরূপে ?

তাহার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিলাম। মুখের আদল প্রধানতঃ মঙ্গোলীয় ছাঁচের হইলেও নাসিকা ভ্রূ ও চিবুকের গঠন আর্য্য-লক্ষণযুক্ত। শ্রমণগণ ফিরিয়া যাইতে পারে নাই; তাহাদের দশ জনের মধ্যে কাহারও হয়ত পদস্খলন হইয়াছিল। এই মোড়ল সেই ধর্ম্মচ্যুত শ্রমণের অধস্তন পুরুষ—পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাস সব ভুলিয়া গিয়াছে, কেবল শূন্যগর্ভ কবচের মত কৌলিক মন্ত্রটি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে।

চমক ভাঙিয়া স্মরণ হইল বৎসরের মধ্যে মাত্র তিনটি দিন স্তম্ভের দ্বার খোলা থাকে, তার পর বন্ধ হইয়া যায়। সে তিন দিন কবে ? কতদিন দ্বার খোলার প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিতে হইবে ?

ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের দ্বিতীয় পাদে সূর্য্য কবে পদার্পণ করবেন ?'

ভিক্ষু ঝোলা হইতে পাজি বাহির করিলেন। প্রায় পনর মিনিট গভীর তন্ময়তার সহিত পাজি দেখিয়া মুখ তুলিলেন। দেখিলাম, তাঁহার অধরোষ্ঠ কাঁপিতেছে, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। তিনি বলিলেন, 'কাল পয়লা মাঘ; সূর্য্য উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের দ্বিতীয় পাদে পদার্পণ করিবেন।—কি অলৌকিক সংঘটন! যদি তিন দিন পরে এসে পৌঁছতুম—' তাঁহার কণ্ঠস্বর থরথর করিয়া কাঁপিয়া গেল, অস্ফুট বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, 'তথাগত'!

কি সর্ব্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণতার উপান্তে আসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে, ভাবিয়া আমার দেহও কাঁটা দিয়া উঠিল। মনে মনে বলিলাম, 'তথাগত, তোমার ভিক্ষুর মনস্কাম যেন ব্যর্থ না হয়।'

৪

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা স্তম্ভ-অভিমুখে যাত্রা করিলাম, মোড়ল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের সঙ্গে চলিল।

গ্রামের সীমানা পার হইয়াই পাহাড় ধাপে ধাপে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্থানে স্থানে চড়াই এত দুরূহ যে হস্তপদের সাহায্যে অতি কষ্টে আরোহণ করিতে হয়। পদে পদে পা ফস্কাইয়া নিম্নে গড়াইয়া পড়িবার ভয়।

ভিক্ষুর মুখে কথা নাই; তাঁহার ক্ষীণ শরীরে শক্তিরও যেন সীমা নাই। সর্ব্বাগ্রে তিনি চলিয়াছেন, আমরা তাঁহার পশ্চাতে কোনক্রমে উঠিতেছি। তিনি যেন তাঁহার অদম্য উৎসাহের রজ্জু দিয়া আমাদের টানিয়া লইয়া চলিয়াছেন।

তবু পথে দু-বার বিশ্রাম করিতে হইল। আমার সঙ্গে একটা বাইনকুলার ছিল, তাহারই সাহায্যে চারি দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। বহু নিম্নে ক্ষুদ্র গ্রামটি খেলাঘরের মত দেখা যাইতেছে, আর চারি দিকে প্রাণহীন নিঃসঙ্গ পাহাড়।

অবশেষে পাঁচ ঘণ্টারও অধিক কাল হাড়ভাঙা চড়াই উত্তীর্ণ হইয়া আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। কিছু পূর্ব্ব হইতেই একটা চাপা গম্ গম্ শব্দ কানে আসিতেছিল—যেন বহুদূরে দুন্দুভি বাজিতেছে। মোড়ল বলিল, 'উহাই উপলা নদীর প্রপাতের শব্দ।'

প্রপাতের কিনারায় গিয়া যখন দাঁড়াইলাম তখন সম্মুখের অপরূপ দৃশ্য যেন ক্ষণকালের জন্য আমাদের নিস্পন্দ করিয়া দিল। আমরা যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম তাহার প্রায় পঞ্চাশ হাত ঊর্দ্ধে সংকীর্ণ প্রণালীপথে উপলার ফেনকেশর জলরাশি উগ্র আবেগভরে শূন্যে লাফাইয়া পড়িয়াছে; তার পর রামধনুর মত বঙ্কিম রেখায় দুই শত হাত নীচে পতিত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনায় তীব্র একটা আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া বহিয়া গিয়াছে। ফুটন্ত কটাহ হইতে যেমন বাষ্প উত্থিত হয়, তেমনই তাহার শিলাহত চূর্ণ শীকরকণা উঠিয়া আসিয়া আমাদের মুখে লাগিতেছে।

এখানে দুই তীরের মধ্যস্থিত খাদ প্রায় পঞ্চাশ গজ চওড়া—মনে হয় যেন পাহাড় এই স্থানে বিদীর্ণ হইয়া অবরুদ্ধা উপলার বহির্গমনের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছে। এই দুর্লঙ্ঘ্য খাদ পার হইবার জন্য বহুযুগ পূর্ব্বে দুর্ব্বল মানুষ যে ক্ষীণ সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহা দেখিলে ভয় হয়। দুইটি লোহার শিকল—একটি উপরে, অন্যটি নীচে—সমান্তরাল ভাবে এ-তীর হইতে ও-তীরে চলিয়া গিয়াছে। ইহাই সেতু। গর্জ্জমান-প্রপাতের পট-ভূমিকার সম্মুখে এই শীর্ণ মরিচা-ধরা শিকল দুটি দেখিয়া মনে হয় যেন মাকড়সার তন্তুর চেয়েও ইহারা ভঙ্গুর, একটু জোরে বাতাস লাগিলেই ছিঁড়িয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইবে।

কিন্তু ওপারের কথা এখনও বলি নাই। ওপারের দৃশ্যের প্রকৃতি এ-পার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক—এবং এই ধাতুগত বিভিন্নতার জন্যই বোধ করি প্রকৃতিদেবী ইহাদের পৃথক করিয়া দিয়াছেন। ওপারে দৃষ্টি পড়িলে সহসা মনে হয় যেন অসংখ্য মর্ম্মরনির্ম্মিত গম্বুজে স্থানটা পরিপূর্ণ। ছোট-বড়-মাঝারি বর্ত্তুলাকৃতি শ্বেতপাথরের ঢিবি যত দূর দৃষ্টি যায় ইতস্ততঃ ছড়ানো রহিয়াছে; যাঁহারা সারনাথের ধামেক স্তূপ দেখিয়াছেন তাঁহারা ইহাদের আকৃতি কতকটা অনুমান করিতে পারিবেন। এই প্রকৃতি-নির্ম্মিত স্তূপগুলিকে পশ্চাতে রাখিয়া, গভীর খাদের ঠিক কিনারায় একটি নিটোল সুন্দর স্তম্ভ মিনারের মত ঋজুরেখায় ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে। দ্বিপ্রহরের সূর্য্যকিরণে তাহার পাষাণ গাত্র ঝকমক

করিতেছে। দেখিয়া সন্দেহ হয়, ময়দানবের মত কোন মায়া-শিল্পীই বুঝি অতি যত্নে এই অভ্রভেদী দেব-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

পৃথিবীর শৈশবকালে প্রকৃতি যখন আপন মনে খেলাঘর তৈয়ার করিত, ইহা সেই সময়ের সৃষ্টি। হয়ত মানুষ-শিল্পীর হাতও ইহাতে কিছু আছে। বাইনকুলার চোখে দিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম, কিন্তু ইহার বহিরঙ্গে মানুষের হাতের চিহ্ন কিছু চোখে পড়িল না। স্তম্ভটা যে ফাঁপা তাহাও বাহির হইতে দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই; কেবল স্তম্ভের শীর্ষদেশে একটি ক্ষুদ্র রন্ধ্র চোখে পড়িল—রন্ধ্রটি চতুষ্কোণ, বোধ করি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এক হাতের বেশী হইবে না। সূর্য্যকিরণ সেই পথে ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। ইহাই নিশ্চয় মন্ত্রোক্ত রন্ধ্র।

মগ্ন হইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিলাম। এতক্ষণে পাশে দৃষ্টি পড়িতে দেখিলাম, ভিক্ষু ভূমির উপর সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া বুদ্ধস্তম্ভকে প্রণাম করিতেছেন।

* * *

অন্তিম ঘটনাগুলি বিস্তারিত ভাবে টানিয়া টানিয়া লিখিতে ক্লেশ বোধ হইতেছে। সংক্ষেপে শেষ করিয়া ফেলিব।

ভিক্ষু অভিরাম আমাদের নিষেধ শুনিলেন না, একাকী সেই শিকলের সেতু ধরিয়া ও-পারে গেলেন। আমরা তিন জন এ-পারে রহিলাম। পদে পদে ভয় হইতে লাগিল, এবার বুঝি শিকল ছিঁড়িয়া গেল, কিন্তু ভিক্ষুর শরীর কৃশ ও লঘু, শিকল ছিঁড়িল না।

ওপারে পৌঁছিয়া ভিক্ষু হাত নাড়িয়া আমাদের আশ্বাস জানাইলেন, তার পর স্তম্ভের দিকে চলিলেন। স্তম্ভ একবার পরিক্রমণ করিয়া আবার হাত তুলিয়া চীৎকার করিয়া কি বলিলেন, প্রপাতের গর্জ্জনে শুনিতে পাইলাম না। মনে হইল তিনি স্তম্ভের দ্বার খোলা পাইয়াছেন।

তার পর তিনি স্তম্ভের অন্তরালে চলিয়া গেলেন, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। চোখে বাইনকুলার লাগাইয়া বসিয়া রহিলাম। মানস চক্ষে দেখিতে লাগিলাম, ভিক্ষু চক্রাকৃতি অন্ধকার সোপান বাহিয়া ধীরে ধীরে উঠিতেছেন; কম্পিত অধর হইতে হয়ত অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারিত হইতেছে—তথাগত, তমসো মা জ্যোতির্গময়—

সেই গোশীর্ষ চন্দনকাষ্ঠের মূর্ত্তি কি এখনও আছে? ভিক্ষু তাহা দেখিতে পাইবেন? আমি দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু সেজন্য ক্ষোভ নাই। যদি সে-মূর্ত্তি থাকে, পরে লোকজন আনিয়া উহা উদ্ধার করিতে পারিব। দেশময় একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া যাইবে।

এইরূপ চিন্তায় দশ মিনিট কাটিল।

তার পর সব ওলট-পালট হইয়া গেল। হিমালয় যেন সহসা পাগল হইয়া গেল। মাটি টলিতে লাগিল; ভূগর্ভ হইতে একটা অবরুদ্ধ গোঙানি যেন মরণাহত দৈত্যের আর্ত্তনাদের মত বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। শিকলের সেতু ছিঁড়িয়া গিয়া চাবুকের মত দুই তীরে আছড়াইয়া পড়িল।

১লা মাঘের ভূমিকম্পের বর্ণনা আর দিব না। কেবল এইটুকুই জানাইব যে ভারতবর্ষের সমতলভূমিতে যাঁহারা এই ভূমিকম্প প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই ভূমিকম্পের জন্মকেন্দ্রের অবস্থা কল্পনা করিতেও পারিবেন না।

আমরা মরি নাই কেন জানি না। বোধ করি পরমায়ু ছিল বলিয়াই মরি নাই। নৃত্যোন্মাদ মাটি—তাহারই উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিলাম। চোখের সম্মুখে বুদ্ধস্তম্ভ বাত্যাবিপন্ন জাহাজের মাস্তলের মত দুলিতেছিল। চিন্তাহীন জড়বৎ মন লইয়া সেই দিকে তাকাইয়া ছিলাম।

ভিক্ষু! ভিক্ষুর কি হইবে?

ভূমিকম্পের বেগ একটু মন্দীভূত হইল। বোধ হইল যেন থামিয়া আসিতেছে। বাইনকুলারটা হাতেই মুষ্টিবদ্ধ ছিল, তুলিয়া চোখে দিলাম। পলায়নের চেষ্টা বৃথা, তাই সে-চেষ্টা করিলাম না।

আবার দ্বিগুণ বেগে ভূমিকম্প আরম্ভ হইল; যেন ক্ষণিক শিথিলতার জন্য অনুতপ্ত হইয়া শতগুণ হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে, এবার পৃথিবী ধ্বংস না করিয়া ছাড়িবে না।

কিন্তু ভিক্ষু?

স্তম্ভ এতক্ষণ মাস্তলের মত দুলিতেছিল, আর সহ্য করিতে পারিল না; হঠাৎ মূলের নিকট হইতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। অতল খাদের প্রান্তে ক্ষণকালের জন্য টলমল করিল, তার পর মরণোন্মত্তের মত খাদের মধ্যে ঝাঁপ দিল। গভীর নিম্নে একটা প্রকাণ্ড বাষ্পোচ্ছ্বাস উঠিয়া স্তম্ভকে আমার চক্ষু হইতে আড়াল করিয়া দিল।

স্তূপ যখন খাদের কিনারায় দ্বিধাভরে টল্‌মল্ করিতেছিল, সেই সময় চকিতের ন্যায় ভিক্ষুকে দেখিতে পাইলাম। বাইনকুলারটা অবশে চোখের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। দেখিলাম, ভিক্ষু রন্ধ্রপথে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার মুখে রৌদ্র পড়িয়াছে। অনির্ব্বচনীয় আনন্দে সে মুখ উদ্ভাসিত। চারি দিকে যে প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার চলিয়াছে সেদিকে তাঁহার চেতনা নাই।

আর তাঁহাকে দেখিলাম না; মরণোন্মত্ত স্তূপ খাদে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

*　　*　　*

একাকী গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি।

তার পর কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু এ-কাহিনী কাহাকেও বলিতে পারি নাই। ভিক্ষুর কথা স্মরণ হইলেই মনটা অপরিসীম বেদনায় পীড়িত হইয়া উঠে।

তবু এই ভাবিয়া মনে সান্ত্বনা পাই যে তাঁহার জীবনের চরম অভীপ্সা অপূর্ণ নাই। সেই স্তূপশীর্ষে তিনি তথাগতের কিরূপ নয়নাভিরাম মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী অনুসন্ধান সফল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মৃত্যুমুহূর্ত্তে তাঁহার মুখের উদ্ভাসিত আনন্দ আজও আমার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে।

তুমি-আমি

শ্রীসুধীরচন্দ্র কর

সংসারটা কি প্রকাণ্ড!—বলাই সে বাহুল্য,
তুমি-আমি তার মাঝে কে?—কিই বা মোদের মূল্য!
　　তবুও লোকে কিছু কিছু
　　ভাবে ত নিজ আগু-পিছু,
কোন্‌দিকে কে উঁচু-নীচু, কার সাথে কে তুল্য,
—কেমন ক'রে মন দেখো সে মূল কথাটাই ভুল্‌ল!

যাই হই না, বেঁচে থাকতে একটুকু চাই স্থান তো,
চার দিকে এর দায় পোহাতে এমনি জীবনান্ত!
　　তার মাঝেও ক্ষণে ক্ষণে
　　না চাইলেও পড়বে মনে
একখানি প্রাণ একটি কোণে চায় কারে একান্ত।
প্রজাপতির পরিহাসটা এখানেই কি ক্ষান্ত!

যেমন-তেমন একটি কথা, তাও যেন নয় তুচ্ছ!
যেমন ধরো তুমি বল্‌লে—"ওগো, ও কি খুঁজছ!"
　　বললেম,—"এই, নয় কিছু আর
　　সময় হ'ল আপিস যাবার,
কি ফেলে যাই ভাব্‌ব আবার!"—হাসলে একটু উচ্চ;
এগিয়ে দিতে পানের ডিবে, বাজল চাবির গুচ্ছ।

তুমি-আমি এই ত ব্যাপার!—যা হোক্, এ সম্বন্ধে
বাইরে কিছু বলতে গেলেই পড়ব মতের দ্বন্দ্বে।
　　অনুভবের অভিমানে
　　কারুর কথা কেউ কি মানে!
যাদের যেমন তারাই জানে;—জানুক তা স্বচ্ছন্দে;
দিন আমাদের গেলেই হ'ল এমনি ভালমন্দে॥

পাল-সাম্রাজ্যের শাসন-প্রণালী

ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, এম-এ, পিএইচ-ডি

পাল-বংশের প্রথম নরপাল গোপালদেব প্রকৃতিপুঞ্জকে মাৎস্য-ন্যায় বা অরাজকতার সর্ব্বনাশকারী উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার সামর্থ্য ধারণ করিতেন বলিয়া তাঁহাদের দ্বারা রাজপদে নির্ব্বাচিত হইয়া সমগ্র উত্তরাপথের পূর্ব্বাঞ্চলে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপত্তন করিতে পারিয়াছিলেন। এই সাম্রাজ্য অপ্রতিহতভাবে অনেক বৎসর চলিতে থাকিয়া মধ্যে মধ্যে ভাগ্যপরিবর্ত্তন দর্শন করিয়াছিল। পুনরায় ইহা পূর্ব্ব-সমৃদ্ধি লাভ করিয়া প্রায় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত একরূপ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছিল। এই পাল-বংশের রাজত্ব-সময়ে নরপালেরা কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া রাজ্যশাসন করিতেন, তাঁহাদের এ-যাবৎ আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে সংগৃহীত উপাদান অবলম্বন করিয়াই আমি তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। অতি সংক্ষেপে এই স্থানেই পাল-রাজগণের পৌর্ব্বাপর্য্য একটু জানিয়া লওয়া উচিত। পাল-সাম্রাজ্যের যুগকে নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত মনে করা যাইতে পারে। এই বংশের প্রথম রাজা প্রথম-গোপাল, তৎপুত্র প্রবলপরাক্রান্ত ধর্ম্মপাল ও তৎপুত্র দেবপাল ও তৎপুত্র প্রথম-বিগ্রহপাল এবং তাঁহার পুত্র নারায়ণপাল—এই পঞ্চ ভূপালের যুগকে এই সাম্রাজ্যের প্রথম সমৃদ্ধির যুগ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তৎপর নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপাল, তৎপুত্র দ্বিতীয়-গোপাল ও তৎপুত্র দ্বিতীয়-বিগ্রহপালের যুগকে একটি বিপ্লবের যুগ বলিয়া মনে করা যায়—কারণ, এই সময়েই অনধিকারী কাম্বোজ-বংশীয় কোন নরপতি পাল-রাজগণের রাজ্য আক্রমণ করিয়া গৌড়দেশে অনেক অনর্থ উৎপাদন করেন। ইহার পরযুগেই দ্বিতীয়-বিগ্রহপালের উপযুক্ত পুত্র ইতিহাস-বিখ্যাত প্রথম-মহীপাল পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া তৎপুত্র নয়পাল ও তৎপুত্র তৃতীয়-বিগ্রহপাল-দেবকে রাজত্ব-সুখরূপ ফল ভোগ করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। তার পরে যে-যুগ উপস্থিত হয় তাহা বৈদেশিক কোন বংশ বা রাজার উৎপাত হইতে সম্ভূত বিপ্লবের যুগ নহে, কিন্তু তৃতীয়-বিগ্রহপালের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয়-মহীপাল অনীতিপরায়ণ হইয়া রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলে পর, গৌড়ের প্রজাপুঞ্জ লোকনায়ক কৈবর্ত্তপতি দিব্য বা দিব্বোকের অধিনায়কত্বে বিদ্রোহী হইয়া মহীপালকে বধ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহাকে প্রজাবিদ্রোহের যুগ বলা যাইতে পারে। একাদশ শতাব্দীর এই সময়ে পুনরায় বরেন্দ্রীমণ্ডলে মাৎস্য-ন্যায় প্রবর্ত্তিত হইতে দেখা গেল। এই বিদ্রোহের সময়ে অত্যাচারী রাজা দ্বিতীয়-মহীপাল তদীয় উপযুক্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা শূরপাল ও রামপালকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ক্রমে রামপাল কোনও প্রকারে কারামুক্ত হইয়া বিশাল গৌড়রাজ্যের নানা প্রদেশ হইতে সামন্তচক্র সম্মিলিত করিয়া প্রথমতঃ দিব্যের অধিকৃত, পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রুদোকের পুত্র রাজা ভীমের দ্বারা কিয়ৎকালের জন্য শাসিত, রাজ্য পুনরায় স্বহস্তগত করেন। 'জনকভূ' বরেন্দ্রীর পুনরুদ্ধার সাধন করিতে গিয়া রামপালকে যে কিরূপ ক্লেশ-স্বীকার ও কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল তাহা, যাঁহারা সন্ধ্যাকর-নন্দীর 'রামচরিত' পাঠ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন। প্রকৃতি-পুঞ্জের নির্ব্বাচনে যে রাজবংশের প্রথম প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল—এবং এখন আবার প্রজাপুঞ্জের অসন্তোষে যাহার ভিত্তিকম্পন উপস্থিত হইল, সেই বংশের ভবিষ্যৎ আর বড় উজ্জ্বল থাকিতে পারে নাই। তথাপি পরবর্ত্তী বা শেষ যুগের তিন নরপতি, অর্থাৎ রামপালের উপযুক্ত পুত্র কুমারপাল ও তৎপুত্র শিশু-নরপতি তৃতীয়-গোপাল ও রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপাল সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি পুনরায় বাড়াইয়া লইতে পারিলেও, মোটের উপর এই সপ্তদশ পাল-নরপালের রাজ্যভোগের পরেই পাল-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের যুগ আপতিত হইয়াছিল। কি প্রকারে তাঁহাদের শাসন-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া গেল তাহা এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য নহে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষ বহুসংখ্যক খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন যুগে প্রদেশ-ভেদে বিভিন্ন প্রকারের রাজতন্ত্রও প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া জানা যায়। কোথাও রাজতন্ত্র রাজ্য, কোথাও বা গণতন্ত্র, আবার কোথাও অল্পজনতন্ত্র অবলম্বিত হইত। কিন্তু উত্তরাপথের প্রদেশসমূহে রাজতন্ত্র রাজ্যেরই (monarchical form of Government) সমধিক প্রচলনের কথা ইতিহাস-পাঠে অবগত হওয়া যায়।

রাজতন্ত্র রাজ্যের নরপতি যখনই নিজের বাহুবল, মন্ত্রিগণের সূক্ষ্মবুদ্ধি ও প্রজাপুঞ্জের অনুরাগ,—এই তিন বস্তুর উপর যথাযথ ভাবে নির্ভর করিয়া প্রকৃত দণ্ডধর রূপে খণ্ডরাজ্যগুলিকে ঐক্য-সূত্রে বন্ধনপূর্ব্বক নিজের সার্ব্বভৌম রাজত্বের শাসনাধীন করিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন, তখনই তিনি সাম্রাজ্য গঠন করিয়া লইতে পারিয়াছেন। মৌর্য্য-বংশীয় চন্দ্রগুপ্ত, গুপ্ত-বংশীয় সমুদ্রগুপ্ত ও বর্দ্ধন-বংশীয় হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতি মহাশক্তিশালী নরপালগণ মিত্ররাজগণকে নিজ শক্তির অধীন রাখিয়া তাঁহাদিগকে সামন্তরাজরূপে স্ব-স্ব রাজ্য শাসন করিতে দিয়াছিলেন, এবং শত্রু নরপতিগণের উচ্ছেদ সাধন করিয়া তাঁহাদের রাজ্যগুলিকে আপন শাসনগণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই ভাবে তাঁহারা এক-একবার উত্তর-ভারতে বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরে নানা কারণে যখনই তৎ-তৎ সাম্রাজ্যের শেষ নরপতি নিজ সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে অসমর্থ হইয়াছেন, তখনই শাসন-শৃঙ্খল শিথিল হইয়া দেশকে পুনরায় স্ব-স্ব-প্রধান অসংখ্য ক্ষুদ্রায়তন রাজতন্ত্র-পদ্ধতিতে শাসিত খণ্ড খণ্ড রাজ্যে পরিণত করিতে সহায়তা করিয়াছে। তখন দেশে সর্ব্বতোভাবে বিপ্লব, বিগ্রহ ও অরাজকতা উপস্থিত হইয়া সমাজকে মাৎস্য ন্যায়ের বশবর্ত্তী করিয়া তুলিয়াছে। তখন সমাজে দুর্ব্বলেরা সবলের কবলে পতিত হইয়া নানারূপ কষ্ট পাইয়াছে—তখন প্রভাব-উৎসাহ-মন্ত্রণা-শক্তিসম্পন্ন সার্ব্বভৌম নরপতির পদমর্য্যাদা লাভের উপযুক্ত পাত্র দেশে না থাকায় দণ্ডনীতি-শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য 'দণ্ড' বা শাসন অপ্রণীত থাকিয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হর্ষবর্দ্ধনের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে যখন 'অর্ব্বাচীন' গুপ্ত-বংশীয় নরপতিগণের রাজ্যও ক্রমশঃ মগধ দেশে বিলুপ্ত হইয়া পড়ে, তখনই গৌড়দেশে প্রায় সর্ব্বত্র মাৎস্যন্যায়-যুগ দেখা দেয়। সেই কালের বিপ্লব-যুগের অন্ধকার ভেদ করিয়া পাল-কুল-রবি গোপালদেব 'প্রকৃতি'পুঞ্জের নির্ব্বাচনে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পাল-সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের হেতু-স্বরূপ ভারতের পূর্ব্বদিকে উদিত হন।

সকলেই জানেন যে প্রাচীন নীতিশাস্ত্রবিদ্‌গণের মতে রাজতন্ত্র রাজ্য 'সপ্তাঙ্গ' বা 'সপ্তপ্রকৃতিক' বলিয়া অভিহিত। এই সাতটি অঙ্গ বা প্রকৃতির নাম, যথা (১) স্বামী (বা রাজা), (২) অমাত্য (অর্থাৎ মন্ত্রী, সচিববর্গ, অধ্যক্ষবৃন্দ ও অন্যান্য রাজপাদোপজীবী কর্ম্মচারিগণ), (৩) সুহৃৎ (বা মিত্ররাজগণ), (৪) কোষ (রাজার কোষগৃহে সঞ্চিত ধনরত্নাদি ও নানারূপ আয়), (৫) রাষ্ট্র (বা জনপদস্থিত প্রজাসম্পৎ), (৬) দুর্গ (নগর ও দুর্গনিবাসী পৌরবর্গ), ও (৭) বল (বা দণ্ড অর্থাৎ চতুরঙ্গ সৈন্যবিভাগ)। রাজ্যের এই সাতটি অঙ্গের প্রত্যেকটি সুস্থ বা অবিকল না থাকিলে দেশের কল্যাণ নাই, কিন্তু তন্মধ্যে স্বামী বা রাজাকেই অন্যান্য অঙ্গ বা প্রকৃতির মূল স্বরূপ মনে করা হইত; অন্যান্য ছয়টি অঙ্গ বা প্রকৃতি সুসমৃদ্ধ থাকিলেও যদি ইহারা অস্বামিক থাকে, তাহা হইলে ইহাদের কার্য্যনিস্তার অসম্ভব হইয়া উঠে। বর্ত্তমান কালের আমলাতন্ত্র রাজ্যশাসনের ন্যায় অতি প্রাচীন কালেও নানা শ্রেণীর উচ্চ নীচ রাজকর্ম্মচারী দ্বারা নানাবিধ রাজকার্য্যের সম্পাদনবিধি প্রবর্ত্তিত ছিল। রাজতন্ত্র রাজ্যের কেন্দ্র হইলেন রাজা, কিন্তু তাহা হইলেও কৌটিল্য প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রবিশারদগণ মনে করিতেন যে 'রাজত্ব সহায়সাধ্য'। রাজার পক্ষে একাকী রাজ্যপরিচালন কোন প্রকারেই সম্ভাবিত নহে। কারণ, চক্রান্তর-সহায়-নিরপক্ষ কোন শকটাদি এক চক্রের বলে চলে না। কাজেই রাজাকে কর্ম্মসচিব ও মতিসচিবাদি নিযুক্ত করিতে হয়। মন্ত্রীদের মন্ত্রণা যে নরপতি শ্রবণ না করিয়া স্বমতেই অবস্থিত থাকেন, তাঁহাকে ভিন্নরাষ্ট্র হইতে হয়—তাই, কৌটিল্য লিখিয়াছেন—"সহায়সাধ্যং রাজত্বং চক্রমেকং ন বর্ত্ততে। কুর্ব্বীত সচিবাংস্তস্মাৎ তেষাং চ শৃণুয়ান্মতম্।" রাজার পক্ষে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলে রাজ্যে অনর্থ উপস্থিত হয়—"প্রভুঃ স্বাতন্ত্র্যমাপন্নো হ্যনর্থায়ৈব

কল্পতে”—শুক্রাচার্য্যের এই মহানীতিবাক্য পাল-রাজারা যেন সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিয়া চলিয়াছিলেন, বিশেষতঃ তাঁহাদের রাজ্যের প্রথম পঞ্চনরপালের যুগে। কারণ, তাঁহারা নিজেরা সৌগত বা বৌদ্ধ হইলেও কুলক্রমাগত ব্রাহ্মণ-বংশীয় মন্ত্রিগণের মন্ত্রণাবলেই রাজ্য শাসন করিতেন, এই ঐতিহাসিক তথ্য আমরা ভট্টগুরব মিশ্রের বাদলস্তম্ভলিপি হইতে বিশেষ ভাবে জানিতে পারি। যদিও রাজতন্ত্র রাজ্যে প্রায় সর্ব্বপ্রকার শাসন সম্বন্ধে রাজাই একরূপ সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তথাপি তিনি এই গুরুতর কার্য্যে স্বাতন্ত্র্য-বশে কখনই স্বমতাবলম্বী হইয়া চলিতেন না। প্রাচীন ভারতে মন্ত্রী ও অন্যান্য সচিবেরাই যেন রাজার মন্ত্রীপরিষদে প্রজাপক্ষের অনির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হইয়া রাজকার্য্য করিতেন। রাজারা তাই প্রজাশক্তি স্মরণ রাখিয়া মন্ত্রীদিগকে সম্মানের চক্ষুতে দেখিতেন। মন্ত্রী ও অন্যান্য অমাত্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে পাল-রাজারা জাতিকুল গণনা না করিয়া গুণগণনার উপরই নির্ভর করিতেন। তাই ধর্ম্মপাল প্রভৃতি প্রথম যুগের নরপাল-পঞ্চক শাণ্ডিল্য-বংশের কুলক্রমাগত মন্ত্রী গর্গ, দর্ভপাণি, কেদারমিশ্র ও ভট্টগুরবকে প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রীরা নীতিশাস্ত্রজ্ঞ অমাত্য-গুণ-সম্পদে আঢ্য ছিলেন বলিয়া ধর্ম্মপাল ও দেবপালের মত রাজগুণসম্পন্ন নরপতিদিগেরও অতি শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন। দেবমন্ত্রী বৃহস্পতি ইন্দ্রকে কেবল পূর্ব্বদিকের অধিপতি করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু গর্গের বুদ্ধি এতখানি তীক্ষ্ণ ছিল যে তিনি ধর্ম্মপালকে অখিল-দিগের ‘স্বামী’ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া বৃহস্পতিকে উপহাস করিতে পারিতেন। কান্যকুব্জাধিপতি ইন্দ্রায়ুধকে পরাভূত করিয়া ধর্ম্মপাল চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন এবং তাঁহার এই বিজয়বার্ত্তায় ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গন্ধার এবং কীর প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের রাজগণ প্রণতি-পরায়ণ মস্তকে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত গৌরবময় ক্রিয়ার জন্য ধর্ম্মপাল নিশ্চিতই মন্ত্রী গর্গের মন্ত্রণা-কৌশলের উপর নির্ভর করিতেন। যাঁহার নীতির বলে দেবপাল প্রায় সমগ্র উত্তরাপথকে ‘করদ’ ভূমিতে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (“নীত্যা যস্য ভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালো নৃপঃ”), যাঁহার দ্বারদেশে রাজা স্বয়ং অবসরের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিতেন এবং যাঁহাকে অগ্রে আসন প্রদান করিয়া পরে তিনি নিজে সচকিতভাবে সিংহাসনে উপবেশন করিতেন—সেই নীতিবিৎ মন্ত্রীর নাম দর্ভপাণি। চতুর্বিদ্যাবিশারদ মন্ত্রী কেদারমিশ্রের বুদ্ধির উপাসনা করিয়াই গৌড়েশ্বর উৎকলে, হূণ-রাজ্যে এবং দ্রাবিড় ও গুর্জ্জর প্রদেশে স্বশক্তি জ্ঞাপিত করিতে পারিয়াছিলেন। এই বৃহস্পতি-প্রতিকৃতি কেদারমিশ্রের যজ্ঞস্থলে, রাজা শূরপাল বৌদ্ধ হইয়াও স্বয়ং উপস্থিত হইয়া রাজ্যের কল্যাণ-কামনায় মন্ত্রীর যজ্ঞীয় শান্তি-জল সশ্রদ্ধভাবে স্বমস্তকে গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। আবার নারায়ণপালের বহুমানের আস্পদ ছিলেন তদীয় নীতি-পরায়ণ মন্ত্রী গুরবমিশ্র—এই মন্ত্রীতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী যেন নিজ নিজ নৈসর্গিক বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া একত্র বাস করিতেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই মন্ত্রী যেমন বিদ্বানদিগের সভাতে নিজের বিদ্যাবলে প্রতিপক্ষবাদীর মদগর্ব্ব খর্ব্ব করিতে পারিতেন, তেমনই আবার যুদ্ধক্ষেত্রে স্বপরাক্রমে প্রতিপক্ষ ভটগণের অভিমানও দূর করিতে পারিতেন। ব্রাহ্মণমন্ত্রীর যুদ্ধক্ষেত্রে পরাক্রম-প্রদর্শনের কথা অসত্য বলিয়া গৃহীত হওয়ার যোগ্য নহে, কারণ এই পাল-বংশের পঞ্চদশ নরপতি কুমারপালদেবের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী বৈদ্যদেব যে রাজার পক্ষ হইতে অগ্রসর হইয়া কামরূপের বিকৃতিপরায়ণ নরপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পাল-নৃপতি কর্ত্তৃক তত্রত্য রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, ইহা বৈদ্য-দেবের কমৌলিতে প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে লব্ধ একটি ঐতিহাসিক তথ্য। সেই লিপিতে বর্ণিত হইয়াছে যে গৌড়াধিপ কুমারপালের ‘সপ্তাঙ্গ ক্ষিতিপাধিপত্ব’-সম্বন্ধে সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন বলিয়া গুণিগণাগ্রণী ‘উগ্রধী’ তদীয় সচিব বৈদ্যদেব রাজার নিকট তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর বন্ধু ছিলেন (“সপ্তাঙ্গক্ষিতিপাধিপত্বমভিতঃ সংচিন্তয়ন্নুগ্রধীঃ প্রাণেভ্যোপ্যতিবন্ধুরস্য সচিবঃ সোঽভূদ্‌গুণিগ্রামনীঃ”)। পাল-রাজ্য শাসনে মন্ত্রীদের স্থান অত্যন্ত গৌরবময় ও উচ্চ ছিল বলিয়া এস্থানে তাঁহাদের সম্বন্ধে এতখানি বলা হইল। রাজতন্ত্র রাজ্যের অমাত্য ও কর্ম্মচারী বা আমলাগণ যুগে যুগে নাম ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কি প্রকার পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে

তাহা এখানে বলা সম্ভব নহে। সুতরাং আমি এখন শাসনকার্য্যের বিভিন্নতা অনুসরণ করিয়া পাল-সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন রাজপাদোপজীবিগণের নাম ও তাহাদের রাজ্যশাসনকার্য্যে করণীয় সম্বন্ধে কিছু কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। কর বা রাজস্ব বিভাগ, সৈন্য বিভাগ, পুলিস ও দেওয়ানী বিভাগ ও সঙ্কীর্ণ বিভাগেই আমরা পাল-রাজগণের তাম্রশাসনাদি হইতে প্রাপ্ত রাজপাদোপজীবীদিগকে সম্প্রতি অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহাদের কার্য্য বা ব্যাপার বর্ণনা করিব।

গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ন্যায় পাল-সাম্রাজ্যের জনপদসমূহ শাসন-সৌকর্য্যার্থে নানা প্রকার বিভাগে বিভক্ত ছিল। রাজ্যের বড় বিভাগের নাম ছিল 'ভুক্তি'—যথা, শ্রীনগরভুক্তি, তীরভুক্তি, পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি ইত্যাদি। একটা ভুক্তিতে অনেকগুলি 'মণ্ডল' থাকিত, যথা ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল, গোকলিকা, আম্রষণ্ডিকা, হলাবর্ত্ত প্রভৃতি। একটি মণ্ডলে অনেকগুলি 'বিষয়' (বা district) অন্তর্ভুক্ত থাকিত, যথা কোটিবর্ষ, মহান্তাপ্রকাশ, স্থালীক্কট, ক্রিমিলাবিষয়, কক্ষবিষয় ইত্যাদি। আবার একটি বিষয়ে বহু 'গ্রাম' সন্নিবিষ্ট থাকিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভুক্তি, মণ্ডল, বিষয় ও গ্রাম—এই সংজ্ঞাগুলি পাল-যুগের জনপদাংশবাচী। গুপ্ত-যুগে ভুক্তিপতিগণ সম্রাট্‌কর্ত্তৃক রাজধানী হইতে নিযুক্ত হইয়া শাসকরূপে তৎ-তৎ ভুক্তিতে গিয়া রাজ্যশাসন করিতেন। তাঁহাদের উপাধি থাকিত 'উপরিক-মহারাজ'। তাঁহারা আবার 'কুমারামাত্য'-উপাধিসমন্বিত বিষয়পতিদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিতেন। দেবপালদেবের সময়ে ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলের অধিপতি ছিলেন রাজার দক্ষিণভুজরূপী শ্রীবলবর্ম্মা। তিনিই নালন্দা তাম্রশাসন-সম্পাদন সময়ে দূত্যবিধান বা দূতকের কাজ করিয়াছিলেন।

কর বা রাজস্ব বিভাগ

ভোগপতি—যাহার নাম ভোগপতি তিনি কি ভুক্তিপতি? তাহা হইলে তিনি বিষয়পতি হইতে অধিকতর উচ্চস্থ রাজকর্ম্মচারী—আর যদি তিনি 'ভোগ'-নাম রাজাদেয় করবিশেষের সংগ্রহকারী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি রাজস্ব-বিভাগের কর্ম্মচারী। অর্থশাস্ত্রের গণিকাধ্যক্ষপ্রচারেও 'ভোগ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়—গণিকাদের অর্জ্জিত অর্থের নাম 'ভোগ'—যিনি 'ভোগ-কর' সংগ্রহকারী তিনিই কি ভোগপতি?

বিষয়পতি—ভুক্তিপতি ও মণ্ডলপতির নীচের কর্ম্মচারী হইলেন বিষয়পতি। তিনি এখনকার দিনের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে কতকাংশে তুলিত হওয়ার যোগ্য। গুপ্ত-যুগে বিষয়পতিগণের নিজ নিজ অধিষ্ঠান (head-quarters town) থাকিত ইহা জানা গিয়াছে। তাহার নাম হইত বিষয়াধিকরণাধিষ্ঠান। তখন তাঁহারা নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম-সার্থবাহ, প্রথম-কুলিক ও প্রথম-কায়স্থ—এই চারি জন তৎ তৎ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া রচিত বিষয়-শাসন পরিষদের সাহায্যে বিষয় শাসন করিতেন। মনে হয়, পরবর্ত্তীকালে পাল-রাজগণের শাসন-সময়েও সেই প্রকার শাসনপদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছিল।

গ্রামপতি—গ্রামপতি, 'গ্রামপ' বা 'গ্রামনেতা' নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি বিষয়পতির তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কার্য্য করিতেন। প্রজারা যাহাতে দস্যুচৌরাদি ও রাজার অন্যান্য অধিকারিবর্গের অত্যাচার হইতে রক্ষা লাভ করে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখাই তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। শুক্রাচার্য্যের মতে প্রত্যেক গ্রামে 'সাহসাধিপতি', 'ভাগহার', 'লেখক', 'শুল্কগ্রাহ' ও 'প্রতিহার'—এই পাঁচ প্রকার রাজকর্ম্মচারী গ্রামপতির অধীন থাকিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন।

দাশগ্রামিক—কৌটিল্যের মতে শাসনের সুবিধার জন্য অষ্ট শত গ্রামের মধ্যে যে (district townএর মত) নগর সংস্থাপিত ছিল তাহার নাম ছিল 'স্থানীয়'। চারি শত গ্রামের মধ্যে (sub-divisional townএর মত) যে ছোট নগর সংস্থাপিত হইত, তাহার নাম ছিল 'দ্রোণমুখ', দুই শত গ্রামের মধ্যে (থানা-সদৃশ) ছোট স্থানের নাম ছিল 'কার্বটিক' বা 'খার্ব্বটিক' এবং দশ গ্রামের সমষ্টি দ্বারা গ্রামের যে স্থানকে লক্ষিত করা হইত, তাহার নাম ছিল 'সংগ্রহণ'। মনে হয় এই 'দশগ্রামী'র উপর যিনি শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেন তিনিই 'দাশগ্রামিক' বলিয়া অভিহিত। মনুসংহিতাতেও 'গ্রামাধিপতি', 'দশগ্রামপতি', 'বিংশতিশ', 'শতেশ' ও 'সহস্রপতি' নামে পরিচিত, যথাক্রমে এক, দশ, বিংশতি, শত ও সহস্র সংখ্যক গ্রামের অধিপগণের নাম ও ব্যাপার বর্ণিত আছে। গ্রামপতি প্রতিদিন গ্রামবাসিগণ হইতে রাজার প্রাপ্য অন্ন, পান ও ইন্ধনাদি স্ববৃত্তির জন্য নিজে ভোগ করিতে পাইতেন।

ষষ্ঠাধিকৃত—যাঁহারা রাজপ্রাপ্য ধান্যাদির ষষ্ঠ ভাগের আহরণ বা আদায় করিতেন সেই 'ভাগহার'দিগের নায়ক যিনি, তিনি ষষ্ঠাধিকৃত পুরুষ।

জ্যেষ্ঠকায়স্থ—মনে হয় রাজাধিকরণে যিনি লেখকশ্রেষ্ঠ তিনিই 'জ্যেষ্ঠকায়স্থ' বা 'প্রথম কায়স্থ' বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ বর্ত্তমান চীফ সেক্রেটারীর মত পদধারী ছিলেন।

মহত্তর ও মহামহত্তর—গ্রামে যাহারা সমৃদ্ধ অবস্থার লোক ও সমাজে যাহাদের বেশ প্রতিপত্তি এবং গ্রামের ও নগরের লোকজন যাহার কথার বাধ্য—সম্ভবতঃ তাহারাই 'মহত্তর' (মাতব্বর) বলিয়া খ্যাত। তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যিনি তিনিই 'মহামত্তর' ও 'মহত্তমোত্তম'। শেষোক্ত লোকদিগের সাহায্য লইয়া বিষয়পতিগণ বিষয়ের শাসনকার্য্য সম্পাদন করিতেন এই জন্য তাঁহারা 'বিষয়-ব্যবহারী' বলিয়াও তাম্রশাসনে উল্লিখিত হইয়াছেন।

ক্ষেত্রপ—রাষ্ট্রে যাহারা ক্ষেত্রকর—তাহাদের মধ্যে কাহার কিয়ৎ-পরিমাণ ক্ষেত্রভূমি রহিয়াছে সে-বিষয়ে যিনি রাজাধিকরণে হিসাব-রক্ষক, তিনি 'ক্ষেত্রপ' রাজপুরুষ।

খণ্ডরক্ষ—রাজনিকেতন ও অন্যান্য রাজকীয় প্রাসাদ ও কর্ম্মান্ত-প্রদেশের এবং রাজ্যস্থিত মন্দির ও বিহারাদির খণ্ডস্ফুটিত-সমাধানে ও জীর্ণোদ্ধারকার্য্যে যিনি ব্যাপৃত থাকিতেন, সেই রাজপুরুষের নাম 'খণ্ডরক্ষ' হইয়া থাকিবে। তিনি আজকালকার P. W. D. engineer প্রভৃতির সহিত তুলিত হইতে পারেন বলিয়া মনে হয়।

দাশাপরাধিক—গ্রামবাসিগণের মধ্যে যাহারা শাস্ত্রোক্ত দশ প্রকার উৎকট দোষ বা অপরাধ করিত তাহাদের সেই অপরাধের শাস্তির জন্য রাজার যে 'দণ্ড' বা জরিমানারূপ অর্থ প্রাপ্য হইত, তাহার নামই 'দশাপরাধ' দশাপচার' দণ্ড। এই 'দণ্ড' বিধান, অথবা, এই টাকা-সংগ্রহ-কার্য্য যে রাজপুরুষের উপর ন্যস্ত থাকিত তিনিই ছিলেন 'দাশাপরাধিক'।

শৌল্কিক—শৌল্কিক বা শুল্কাধ্যক্ষ প্রাচীন রাজনীতি-শাস্ত্রে বর্ণিত এক জন প্রধান রাজপুরুষ। রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র যাহারা পণ্যবাহী বণিক্‌গণ হইতে রাজার প্রাপ্য শুল্ক (customs ও tolls) আদায় করে—তাহাদের উপর অধ্যক্ষতার কাজ যিনি করেন, তিনিই শৌল্কিক। কোন্ পণ্য সশুল্ক রাজ্যসীমান্ত পার হয়—কোন্ পণ্য উচ্ছুল্ক হইয়া চলে—তদ্বিষয়ে সব বিধান তিনিই করিতেন। কোন্ দ্রব্যের উপর কত হারে শুল্ক বসিবে তাহাও নির্দ্ধারণ করিবার ভার থাকিত এই রাজকর্ম্মচারীর উপর। ইঁহার তত্ত্বাবধানেই রাষ্ট্রের পীড়াকর ভাণ্ড কখনই রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে দেওয়া হইত না এবং মহোপকারী দ্রব্য উচ্ছুল্ক হইয়া প্রবেশলাভ করিতে পারিত। নিষ্ক্রাম্য শুল্ক (export duty) ও প্রবেশ্য শুল্ক (import duty) ও অন্যান্য বাহ্য, আভ্যন্তর ও আতিথ্য নামক শুল্ক প্রভৃতির ব্যবহার এই রাজপুরুষের আয়ত্ত ছিল। শুল্কদানে ত্রুটি হইলে যে 'অত্যয়' বা জরিমানা হইত ইহার প্রত্যবেক্ষণও এই কর্ম্মচারীই করিতেন।

চৌরোদ্ধরণিক—'চোররজ্জু' বা "চৌরদ্ধরণ' নামে যে চৌকীদারী কর তৎকালে প্রচলিত ছিল, তৎসংগ্রহকারীদিগের ঊর্দ্ধতন রাজপুরুষের নাম 'চৌরোদ্ধরণিক'। কেহ কেহ এই কর্ম্মচারীকে পুলিস বিভাগের রাজপুরুষ-বিশেষ মনে করেন, কিন্তু ইহা সঙ্গত মনে হয় না।

মহাক্ষপটলিক—রাজকীয় 'অক্ষপটল' বা মহাপেজখানার যিনি অধ্যক্ষ পূর্ব্বে তাঁহার নাম ছিল 'অক্ষপটলাধ্যক্ষ'। এই রাজ-কর্ম্মচারীর কার্য্যসদনে সর্ব্বপ্রকার নিবদ্ধ পুস্তক (ledgers) থাকিত। গণনকার্য্যে নিযুক্ত 'গাণনিক' নামে আখ্যাত কর্ম্মচারীরা এই প্রধান রাজপুরুষের অধীন হইয়া কার্য্য করিত। গুপ্ত-যুগে যাহাদিগকে 'পুস্তপাল' নামে পরিচিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারাও এই শ্রেণীর কর্ম্মচারী। রাজার সর্ব্বপ্রকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব এই ব্যক্তির কার্য্যাগারে বা আপিসে রক্ষিত হইত। এখানে যাঁহারা ছোট ছোট কাজ করিতেন তাঁহাদের কাহারও নাম ছিল 'কার্ম্মিক' ও কাহারও নাম ছিল 'কারণিক'। এই রাজপুরুষের ব্যাপার বর্ত্তমান সময়ের একাউনটেণ্ট-জেনার‍্যালের কর্ত্তব্যের সহিত তুলনীয়।

সৈন্য বিভাগ

সেনাপতি—তিনি চতুরঙ্গ সেনার, অর্থাৎ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির নায়করূপে কার্য্য করেন। হস্ত্যধ্যক্ষ বা হস্তিব্যাপৃতক, অশ্বব্যাপৃতক, পত্তিব্যাপৃতক প্রভৃতির অবেক্ষণ কার্য্যের ভার এই মহামাত্যের বা মহামাত্রের উপর ন্যস্ত থাকিত। এই সেনাপতিকে সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধবিদ্যা ও প্রহরণবিদ্যায় শিক্ষিত হইতে হইত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে লিখিত আছে যে পত্তির অধ্যক্ষকে নিম্নযুদ্ধ, স্থলযুদ্ধ, প্রকাশযুদ্ধ, কূটযুদ্ধ, খনকযুদ্ধ (ট্রেঞ্চ কাটিয়া যুদ্ধ), আকাশযুদ্ধ, দিবাযুদ্ধ, রাত্রিযুদ্ধ প্রভৃতির জন্য ব্যায়াম (বা manœuvres) শিক্ষা করিতে হইত। সেনার ব্যায়ামের ভূমি, যুদ্ধের উপযুক্ত কাল, শত্রুসেনা অভিন্ন থাকিলে ভিন্ন করা, ভিন্ন স্বসৈন্যকে সংহত করা, সংহত সেনাকে ভিন্ন করা, বিঘটিত সেনার বধ, দুর্গ ধ্বংস, সেনার যাত্রাকাল প্রভৃতি বিষয়ে এই অমাত্যের সম্যক্ জ্ঞান থাকা চাই। সেনা-বিভাগের অত্যুচ্চ রাজপুরুষকেই সেনাপতি বা মহাসেনাপতি বলা হইত

প্রান্তপাল—রাজ্যের প্রান্ত বা অন্ত (Frontier) প্রদেশ যাহার অবেক্ষণে থাকিত, সেই রাজপুরুষের নাম প্রান্তপাল।

প্রাচীন কালে এই কর্ম্মচারীও অষ্টাদশ মহামাত্র বা তীর্থের অন্ততম বলিয়া গৃহীত হইত। তাঁহার করণীয়ের মধ্যে প্রধান এক কার্য্য এই ছিল যে, প্রান্তপ্রদেশ পার হইয়া সার্থবাহগণ যে যে দ্রব্য বাণিজ্যার্থ রাজার দেশে লইয়া আসিত তজ্জন্ত 'বর্ত্তনী' নামক শুল্ক গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগের মালপত্রে অভিজ্ঞান বা চিহ্ন (স্বহস্তলেখ) ও মালের মুদ্রা বা পাস দিয়া শুল্কাধ্যক্ষ বা শৌল্কিকের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া। শত্রুদিগের কার্য্যাবলীর সংবাদ গুপ্তচর দ্বারা সংগ্রহ করাও তদীয় অন্ত কর্ত্তব্য ছিল।

কোট্টপাল—যিনি কোট্টপাল নামে অভিহিত, তিনি পূর্ব্বে দুর্গপাল নামেও পরিজ্ঞাত ছিলেন। কি প্রকারে দুর্গনিবেশ ও দুর্গরক্ষাপ্রভৃতি কার্য্য করিতে হয় তদ্বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ।

গৌল্মিক—'গুল্ম' নামক পুলিস আউটপোষ্টের রক্ষিবর্গের প্রধান কর্ম্মচারী। মহাভারতে উক্ত আছে (শান্তিপর্ব্ব ৬৯ অধ্যায়ের ৭।৮ শ্লোকে) রাজাকে দুর্গে, সীমান্তে, নগরোপবনে, পুরোদ্যানে, কোষ্ঠপালাদির উপবেশস্থানে, এবং রাজনিবেশনে 'গুল্ম' নিবেশ করিতে হইবে। কিন্তু অমরকোষের মতে ৯টি হস্তী, ৯টি রথ, ২৭টি অশ্ব ও ৪৫টি পদাতি লইয়া একটি 'গুল্ম' সংগঠিত হয়। তবে কি তিনি এই প্রকার সেনামণ্ডলীর অধিনায়ক ?

বলাধ্যক্ষ—বলাধ্যক্ষ সম্ভবতঃ কৌটিল্যের 'পত্তধক্ষে'র পর্য্যায়-ভুক্ত শব্দ। সেনা-বিভাগের যে প্রধান কর্ম্মচারীকে মৌল ভৃত, শ্রেণী, মিত্র অমিত্র ও আটবিক—এই ছয় প্রকার বল বা সৈন্তের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে হইত, তিনিই বলাধ্যক্ষ।

মহাসান্ধিবিগ্রহিক বা মহাসন্ধিবিগ্রহিক—ষাড়্গুণ্যবিৎ যে প্রধান অমাত্য কোন্ রাজার সহিত সন্ধি এবং কোন্ রাজার সহিত বিগ্রহ বা যুদ্ধ করিতে হইবে বিশেষতঃ এই ব্যাপারে অধিকৃত থাকিয়া রাজাকে সর্ব্বদা উপদেশ প্রদান করেন এবং প্রয়োজনবোধে রাজার আদেশে যুদ্ধাদি ঘোষণা করেন, তিনিই এই আখ্যাধারী রাজপুরুষ। হর্ষবর্দ্ধনের অবন্তি নামক অমাত্যই সন্ধিবিগ্রহাধিকৃত ছিলেন বলিয়া আমরা হর্ষচরিতে (ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে) উল্লিখিত দেখিতে পাই। পাল-বংশের সপ্তদশ নরপাল মদনপালদেবের সন্ধিবিগ্রহিকের নাম ছিল ভীমদেব। সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা প্রজাপতি নন্দীও পাল-রাজের এক জন সন্ধিবিগ্রহিক ছিলেন বলিয়া 'রামচরিতে' আভাস পাওয়া যায়।

নাবাধ্যক্ষ—"নৌসাধনোদ্যত" বাঙালীদিগের রাজ্যশাসনে নাবাধ্যক্ষ বা 'নৌবল-ব্যাপৃতক' কর্ম্মচারী থাকিবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পাল-রাজগণের জয়স্কন্ধাবারে হস্তী, অশ্ব, পদাতির ন্তায় নৌবল বা নৌবাট (নৌবাহিনী) শব্দ ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান আমলে এই নৌবাটই 'নওয়ারা' নামে পরিচিত ছিল যে রাজকর্ম্মচারী নৌসেনার ঊর্দ্ধতম কর্ম্মচারী, তিনিই 'নৌবল-ব্যাপৃতক'। কমৌলি লিপিতে পালশাসন-যুগের এক নৌযুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়। সুবর্ণভূমি ও যবদ্বীপ প্রভৃতিতে অবস্থিত রাজ্যের সহিত গৌড়রাজ্যের রাজকর্ম্মচারীদিগের যে নৌ-যোগে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল, তাহা দেবপালদেবের নালন্দা-লিপি হইতে বেশ বুঝা যায়। কিন্তু যিনি 'নাবাধ্যক্ষ' বলিয়া পরিচিত তাঁহার করণীয়সমূহের মধ্যে প্রধান কার্য্য ছিল এই যে, তিনি সমুদ্রযায়ী নৌসমূহের যাতায়াত এবং নদীমুখে ও নদীর অন্যান্ত তরণ স্থানে বণিকেরা রাজাদেয় শুল্কাদি দেয় কি না, সেই কার্য্যের অবেক্ষণ করা।

তরপতি বা তরিক—রাজার নৌকা বিভাগ হইতে সাধারণে নৌকাভাড়া লইয়া কার্য্য করিতে পারিতেন। আমার মনে হয় 'তরপতি' বা 'তরিক' বলিয়া যাহাদের আখ্যা ছিল, তাহারা নাবাধ্যক্ষের নিম্নতম কর্ম্মচারী—তাহারা নদীপ্রভৃতির তরণস্থানে 'তর'-শুল্ক (ferry) সম্বন্ধীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। প্রাচীনকালে পোর্ট কমিশনারদিগের কর্ত্তার ন্তায় 'পত্তনাধ্যক্ষ'-নামে এক রাজকর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

হস্তিব্যাপৃতক—প্রাচীন ভারতে রাজার সৈন্ত-বিভাগে হস্তীর ব্যবহার বড় আদরণীয় ও প্রয়োজনীয় ছিল। ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই হস্তিযুদ্ধের প্রবর্ত্তন বেশী ছিল। রাজাদিগের বিজয় নির্ভর করিত হস্তিসেনার উপর। ["জয়ো ধ্রুবং নাগবতাং বলানাম্"—কামন্দকীয়] কামন্দক এমনও বলিয়াছেন যে "গজেষু নীলাভ্রসম-প্রভেষু রাজ্যং নিবদ্ধং পৃথিবী-পতীনাম্"—কালো হাতীর উপর নরপতিগণের রাজ্যস্থিতি নির্ভর করে। সংক্ষেপে এই বলা যায় যে, 'হস্তিব্যাপৃতক' বা 'হস্ত্যধ্যক্ষকে' রাজার হস্তিশালার সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের অবেক্ষণ করিতে হইত। হস্তীবলরক্ষার ব্যবস্থা তদীয় প্রধান কার্য্য। রাজার হস্তিশালাতে অবস্থিত হস্তীর জন্য 'বিধা' বা আহার, শয়ন, খাদ্যশস্যাদির প্রমাণ, কার্য্যে নিয়োগ, বন্ধনের উপকরণ এবং বর্ম্মাদি সাংগ্রামিক অলঙ্কারাদির ব্যবস্থা সম্বন্ধেও অবেক্ষণ তদীয় করণীয়ের মধ্যে ছিল। হর্ষচরিতে পাঠ করা যায় যে স্কন্দগুপ্ত নামক রাজপুরুষ হর্ষের অশেষ গজ-সাধনাধিকৃত ছিলেন।

অশ্বব্যাপৃতক—এই কর্ম্মচারীর অন্ত নাম ছিল অশ্বাধ্যক্ষ। রাজমন্দুরায় অশ্বসমৃদ্ধি রাজার প্রধান বল। হস্ত্যধ্যক্ষের ন্তায় অশ্বব্যাপৃতকের কার্য্যও বহুল প্রকারের ছিল। অশ্বশালার

অশ্বসমূহের বর্গীকরণ (classification) অশ্বের কুল, বয়স, বর্ণ, চিহ্ন ও কর্ম্মবিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান এই কর্ম্মচারীর থাকা চাই। পাল-রাজগণ নিজ নিজ অশ্বশালার জন্য পারসীক, কাম্বোজ প্রভৃতি দেশে উৎপন্ন অশ্বসমূহের আমদানী করিতেন বলিয়া জানা যায়।

উষ্ট্রব্যাপৃতক—পাল-রাজগণের পশুশালাতে উষ্ট্রেরও স্থান ছিল। যে কর্ম্মচারী উষ্ট্ররক্ষাদির অবেক্ষণ কার্য্য করিতেন, তাহাকেই উষ্ট্রব্যাপৃতক বলা হইত। সেনার রসদ-বহনে উষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধ হইত।

শরভঙ্গ—এই নাম যে কোন্ রাজপুরুষকে বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত, তাহা জানা যায় না। তিনি সম্ভবতঃ যুদ্ধ-বিভাগের কোন কর্ম্মচারী হইয়া থাকিবেন। তীর ধনু লইয়া যাহারা যুদ্ধাদি করিত তাহাদের কোন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী হইবেন কি?

কিশোর-বড়বা—গো-মহিষাধিকৃত, গো-মহিষাজাবিকাধ্যক্ষ—যাঁহারা 'কিশোর' অশ্ব (অর্থাৎ ৬ মাস হইতে ২। বৎসর বয়স্ক অশ্ব) সমূহের ও 'বড়বা' ঘোটকী প্রভৃতির প্রত্যবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিতেন তাঁহারাই 'কিশোরাধিকৃত' ও 'বড়বাধিকৃত' বলিয়া অভিহিত হইতেন। সেকালে বার্ত্তা-বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত 'পাশুপাল্য' বা পশুপালন যে সমাজে কত দূর আদরের বস্তু ছিল, রাজসরকারে গবাধ্যক্ষ, মহিষাধ্যক্ষ, অজাধ্যক্ষ (ছাগাধ্যক্ষ), অবিকাধ্যক্ষ (মেষাধ্যক্ষ) প্রভৃতি নানা প্রকার পশুর অধ্যক্ষ নিয়োগ হইতেই তাহা প্রতীয়মান হয়। রাজপশুশালায় প্রত্যেক জাতীয় বহুসংখ্যক গৃহপশু রক্ষিত হইত এবং তাহাদের ক্রয়বিক্রয় এবং তজ্জাত দ্রব্যাদিদ্বারা বাণিজ্য করা হইত।

পুলিস বিভাগ

মহাপ্রতীহার—রাজসদনে যত দ্বাররক্ষকগণ বা যামিকগণ (প্রহরিগণ) রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া পুলিসের কার্য্য করিয়া থাকে তাহাদের উর্দ্ধতন রাজপুরুষের নাম 'মহাপ্রতীহার'। তিনি প্রাচীনকালে উচ্চশ্রেণীর অমাত্যবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

দাণ্ডিক—দণ্ডধারী রক্ষি-পুরুষ-শ্রেষ্ঠ পুলিস বিভাগের কোন কর্ম্মচারী (দারোগা) অথবা অপরাধীর দণ্ডবিধানকারী বিচার বিভাগের কোন কর্ম্মচারী তিনি হইয়া থাকিবেন। তিনি পরবর্ত্তী-কালে 'দাণ্ডপাশিক' বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছেন।

দাণ্ডপাশিক বা দণ্ডপাশিক—বিচারে যে-সকল অপরাধীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে তাহাদের বধাধিকৃত রাজপুরুষই 'দাণ্ডপাশিক' নামে অভিহিত হইত বলিয়া মনে হয়।

দণ্ডশক্তি—কেবল ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনেই এই রাজপাদোপজীবীর নাম পাওয়া যায়। উহার করণীয় কিরূপ ছিল তাহা জানা যায় নাই। তবে মনে হয়, তিনিও পুলিস বিভাগের কোন রাজপুরুষ হইয়া থাকিবেন।

দেওয়ানী বিভাগ

মহাদণ্ডনায়ক—অর্থশাস্ত্রে যাঁহাকে 'দণ্ডপাল' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তিনিই পরবর্ত্তী সময়ে 'মহাদণ্ডনায়ক' নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন। গুপ্ত-যুগে এক জন প্রধান অমাত্যকে (হরিষেণের পিতা তিলভট্টককে) সান্ধিবিগ্রহিক ও কুমারামাত্য—এই দুইটি উপাধিসহ মহাদণ্ডনায়ক উপাধি ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে। মনে হয় যাঁহারা ফৌজদারী বিভাগের আসামীদিগকে শাস্তি বিধান করিতেন, তাঁহাদেরই উর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারীর নাম ছিল মহাদণ্ডনায়ক। অনেকে এই শব্দটিকে 'সেনাপতি'—সমানার্থক মনে করিয়া থাকেন। তাহা হইলে দুইটি শব্দ পৃথগ্‌ভাবে একই তাম্রশাসনের রাজপাদোপজীবিগণের মধ্যে ব্যবহৃত পাওয়া যায় কেন?

প্রমাতা—এই রাজপুরুষের ব্যাপার অপরিজ্ঞাত। তিনি কি কোন প্রকার বিচারক শ্রেণীর অধিপতি? অথবা ভূমি প্রভৃতির জরীপ বা মাপ সম্বন্ধে কার্য্যকর্ত্তা? তিনি অর্থশাস্ত্রে পৌতবাধ্যক্ষ ও মানাধ্যক্ষ বলিয়া উল্লিখিত কর্ম্মচারীদ্বয়ের শেষোক্ত জন হইবেন কি? মানাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য ছিল তুলা (balance) ও নানা প্রকারের মাপের দ্রব্যাদির পরীক্ষা করা (weights and measures-দর্শক)।

ধর্ম্মাধিকারার্পিত—এই ব্যক্তিই সম্ভবতঃ পূর্ব্বকালে 'পৌর-ব্যবহারিক' ও পরবর্ত্তী কালে ধর্ম্মাধ্যক্ষ বা 'মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ' নামে অভিহিত হইতেন। দেওয়ানী-বিচারে তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক। কুমার-পালদেবের মহামন্ত্রী বৈদ্যদেব যখন কামরূপাধিপতি নিযুক্ত ছিলেন, তখন তদীয় 'ধর্ম্মাধিকারার্পিত' এক রাজপুরুষের নাম ছিল শ্রীগোনন্দন (কমৌলি-লিপি)। পরবর্ত্তী সময়ে বিখ্যাত পণ্ডিত হলায়ুধ ছিলেন লক্ষ্মণসেনের রাজ্যে প্রধান বিচারপতি বা 'মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ'।

সঙ্কীর্ণ বিভাগ (Miscellaneous)

দূতক—তিনি দূত-নামক বার্ত্তাহর হইতে ভিন্ন প্রকারের কার্য্যকারী। প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণাদিকে তাম্রশাসনদ্বারা ভূমি প্রভৃতি দান বা তাহা বিক্রয় করিবার সময়ে, অমাত্য-শ্রেণীভুক্ত যে রাজ-পাদোপজীবী, প্রতিগ্রহীতা বা ক্রয়কারী ব্যক্তির আবেদন রাজাদের

নিকট অনুনয়-সহকারে নিবেদন করিতেন—তাহাকে তাম্রশাসনের 'দূতক' বলা হইত। রাজপুত্র বা সান্ধিবিগ্রহিক বা অন্য কোন প্রধান অমাত্য এই কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিতেন। যুবরাজ ত্রিভুবনপাল ধর্ম্মপালদেবের নিকট, যুবরাজ রাজ্যপাল ও মহামন্ত্রী ভট্টগুরব দেবপালের নিকট, মন্ত্রী ভট্টবামন প্রথম-মহীপালের নিকট এবং সন্ধিবিগ্রহিক ভীমদেব মদনপালদেবের নিকট কোন কোন তাম্রশাসন সম্পাদনকালে দূতকের কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাস-পাঠে অবগত হওয়া যায়।

রাণক, রাজন্যক, রাজরাজনক, রাজরাজন্যক—তাম্রশাসনে যাঁহাদের উপাধি 'রাজন্যক', 'রাণক' কিংবা 'রাজরাজনক' অথবা 'রাজরাজন্যক'—তাঁহারা সামন্তরাজ-শ্রেণীভুক্ত নরপতি বলিয়া প্রতিভাত হয়।

মহাসামন্ত, মহাসামন্তাধিপতি—আমার মনে হয় যে, এই ব্যক্তিকে সামন্তরাজগণের মধ্যে প্রধান নরপতি মনে করা সঙ্গত হইবে না। সামন্তরাজগণ সম্বন্ধে রাজকুলে যে অমাত্য রাজগণকে নানাপ্রকার রাজনীতিবিষয়ক উপদেশাদি দিতে পারিতেন এবং সামন্তগণ সম্বন্ধে যত প্রকার সংবাদ জানিয়া রাখা দরকার, তাহা যিনি রাখিতেন তিনিই এই নামে অভিহিত হইতেন। তিনি এক জন বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী।

রাজামাত্য—রাষ্ট্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগে রাজাকে উপদেশ ও পরামর্শ যাঁহারা দিতেন সেই সকল কর্ম্মসচিব ও বুদ্ধিসচিব এই শব্দদ্বারা সূচিত হইতেন। তন্মধ্যে পঞ্চাঙ্গমন্ত্রে যিনি সম্যক্ অভিজ্ঞ থাকিয়া রাজার প্রধান মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন তিনি ছিলেন মহামন্ত্রী।

রাজস্থানীয়োপরিক—গুপ্ত-যুগে যাঁহারা বড় বড় ভুক্তিতে 'মহারাজ' উপাধি-সহকারে সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া রাজার স্থানভুক্ত বা রাজপ্রতিনিধি (viceroy) ভাবে (বর্ত্তমান গভর্ণরগণের ন্যায়) রাজ্যশাসন করিতেন তাঁহাদের আখ্যা ছিল 'উপরিক'। মনে হয় পাল-সাম্রাজ্যে সেই প্রকার ভুক্তিশাসকগণই 'রাজস্থানীয়োপরিক' বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

মহাকুমারামাত্য—গুপ্ত-যুগে 'কুমারামাত্য' শব্দটিকে কখনও কখনও সান্ধিবিগ্রহিক, দণ্ডনায়ক, মহামন্ত্রী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষগণও উপাধিরূপে ব্যবহার করিতেন। তখন পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে অবস্থিত 'বিষয়পতি'গণও এই উপাধি ব্যবহার করিতেন। মনে হয়, যাহারা বংশানুক্রমে (নিজদিগের কুমার-অবস্থা হইতে) অমাত্যপদলাঞ্ছিত ছিলেন তাঁহারাই 'কুমারামাত্য'। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন, যে যাঁহারা রাজকুমারদিগের অমাত্য-কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এই শব্দদ্বারা সূচিত হইয়া থাকেন।

মহাকার্ত্তাকৃতিক—এই রাজপুরুষের নিয়োগ সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় না। এই শব্দটি 'কর্ত্তৃকৃৎ', অর্থাৎ যিনি কোন কার্য্যবিভাগের কর্ত্তাকে নিযুক্ত করিতে অধিকারী তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত কি? যে রাজপুরুষ 'কর্ত্তৃকৃৎ' (officer-makers) সমূহের নিয়োগে শ্রেষ্ঠ অধিকারী, তিনি কি এই পদবাচ্য হইয়া থাকিবেন? প্রধান প্রধান আরব্ধ রাজকার্য্যের কতখানি পরিমাণ 'কৃত' হইল, বা 'অকৃত' রহিল তিনি কি তাহার তত্ত্বাবধানকারী কোন কর্ম্মচারীও হইতে পারেন?

রাজপুত্র—রাজকুলের যাঁহারা যুবরাজ, বা রাজার অন্যান্য পুত্র কিংবা রাজসম্পর্কীয় অন্যান্য স্ববংশীয়গণ, তাঁহারাই এই শব্দদ্বারা সূচিত হইয়া থাকেন। যুবরাজ যে প্রাচীন রাজনীতিশাস্ত্রে অষ্টাদশ তীর্থের অন্যতম বলিয়া গৃহীত তাহা সুবিদিত। যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তিনি পিতার সাহায্যার্থে অনেক রাজকীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। পাল-সাম্রাজ্যে যুবরাজের প্রভাব প্রবল ছিল। কামন্দকনীতিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে ["অমাত্যো যুবরাজশ্চ ভুজাবেতৌ মহীপতেঃ" (১৮—২৮)] অমাত্য ও যুবরাজ রাজার দুই বাহুসদৃশ।

মহাদৌঃসাধ-সাধনিক, (পরবর্ত্তী কালে) দৌঃসাধনিক বা দৌঃসাধ্যসাধনিক বা দৌঃসাধিক—যে রাজপুরুষের উপর দ্বারপালগণের অবেক্ষণ কার্য্য অর্পিত, তিনিই কি এই পদবাচ্য? কাহারও মতে তিনি গ্রামপরিদর্শকরূপে রাজকার্য্য করিতেন। আমার মনে হয়—যাহারা রাজাকে 'বিষ্টি' বা শ্রমদ্বারা সহায়তা করিত, অর্থাৎ রাজকর নগদ বা দ্রব্যদ্বারা দিতে না পারিয়া হাতে খাটিয়া শোধ দিত সেই সমস্ত শ্রমজীবী কর্ম্মকরগণের উপর তত্ত্বাবধান কার্য্যে এই কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন।

দূতপ্রৈষণিক (দূতপ্রেষণিক)—যে রাজপুরুষ অন্যান্য রাষ্ট্রে দূতপ্রেরণ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহার নাম 'দূত-প্রৈষণিক' ছিল। দূত বিভাগ যে কত বড় প্রয়োজনীয় বিভাগ তাহা প্রাচীন অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র হইতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। পালশাসন-যুগে সুদূর সুবর্ণদ্বীপ (সুমাত্রা) ও যবদ্বীপ প্রভৃতি প্রশান্ত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত রাজগণের সহিত ভারতের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের গৌড়াধিপগণের সহিত দূতযোগে নানা কার্য্যের সম্পাদন হইত। দেবপালের নালন্দালিপি হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে শৈলেন্দ্র বংশতিলক যবভূমিপাল সমরাগ্রবীরের পুত্র, সুবর্ণদ্বীপাধিপতি মহারাজ বলপুত্র-দেব দূতকমুখে দেবপালের নিকট হইতে পাঁচটি গ্রাম তাম্রশাসনদ্বারা চাহিয়া লইয়া তাহা, নালন্দাতে তিনি যে বুদ্ধভট্টারকের বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহাতে, সর্ব্বপ্রকার পূজাদি বিধানের জন্য প্রতিপাদন করিয়াছিলেন।

গমাগমিক ও অভিত্বরমাণ বা অভিত্বরমাণক—মনে হয়, যাহাদিগকে স্বরাষ্ট্রে ও পররাষ্ট্রে সংবাদাদি সংগ্রহ করার জন্য বা কোন দ্রব্যাদি আনা নেওয়ার জন্য পাঠাইতে হইত—তাহাদের কার্য্য প্রত্যবেক্ষণের ভার যে কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকিত তিনিই গমাগমিক। এবং 'অভিত্বরমাণ' শব্দটিও যাহারা রাজকার্য্য সম্পাদনে শীঘ্রগ, তাহাদিগের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে।

তদাযুক্তক ও বিনিযুক্তক — পাল-রাজগণের তাম্রশাসনে এই প্রকার নামধারী রাজপুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু, তাঁহাদের নিয়োগ সম্বন্ধে আমরা কোন সুস্পষ্ট পরিচয় কোথাও বড় একটা পাইতেছি না। তবে, মনে হয় যে রাজাদিগের কোন প্রয়োজন-বিশেষ উপস্থিত হইলে যদি হঠাৎ নানাশ্রেণীর কর্ম্মচারীর নিয়োগ আবশ্যক হয়, তখন যে কর্ম্মচারীর উপর সেই প্রকার সেবক নিয়োগের প্রধান ভার ন্যস্ত থাকিত, তিনিই সম্ভবতঃ 'তদাযুক্তক' নামে আখ্যাত হইতেন। আর বিশেষ বিশেষ কার্য্যে লোক নিযুক্ত করার ভার যাহার উপর অর্পিত থাকিত, তিনিই 'বিনিযুক্তক' নামে পরিজ্ঞাত রাজপুরুষ হইয়া থাকিবেন।

উপরি বর্ণিত নানা প্রকার রাজপাদোপজীবিগণের নাম ও তাঁহাদের কার্য্যকলাপ হইতে এই অনুমান সর্ব্বথা সঙ্গত বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে যে, পাল-সাম্রাজ্যে যে শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহা রাজতন্ত্র-শাসন হইলেও পাল-নরপালগণ তাঁহাদের বিশাল রাজ্যে শাসনের সৌকর্য্যার্থে বর্ত্তমান সময়ের প্রাদেশিক আমলাবর্গের (bureaucracy) ন্যায় নানা বিভাগের অধ্যক্ষাদির সহায়তা লইতেন। মৌর্য্যযুগে, গুপ্তযুগে কিংবা মধ্যযুগে, নরপতিগণ যে প্রায় একই প্রকার শাসন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ভারতের সর্ব্বপ্রদেশে রাজ্য-শাসন সম্পাদন করিতেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই। তবে যুগে-যুগে রাজপুরুষগণের নাম অনেক সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে এবং নূতন নূতন নিয়োগাদিরও যে সৃষ্টি করা হইয়াছে —ইহা ইতিহাস, প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্য ও তাম্রশাসনাদিরূপ প্রত্ননিদর্শনের আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

পরের বোঝা

শ্রীসরযূ সেন

বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য ভলান্টিয়ার সাজিয়া প্রথম যখন পরমোৎসাহে সদলবলে রওয়ানা হইলাম তখন কল্পনাটা ছিল বেশ জাঁকালোগোছের। গন্তব্যস্থলে পৌছিবার বহু পূর্ব্বেই বিষয়টার পৌনে-ষোল আনা মনে মনে উপভোগ করিতে করিতে দুর্গত-জনের কৃতজ্ঞ-সজল দৃষ্টিতে পুণ্যস্নান করিয়া মহত্ত্বের নরলোক ডিঙাইয়া একেবারে দেবত্বের অমরলোকে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে লাগিলাম এবং বেশ একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলাম।

তার পর, ভাবলোক হইতে অভাব-লোকে পদার্পণ করিতেই নেশা ছুটিয়া যাইবার জো হইল। দেখিলাম বাহিরের বিপর্য্যস্ত প্রকৃতির যে কবিত্বময় চিত্র মনে মনে আঁকিয়াছি, তাহা নিতান্তই আমার কাঁচা হাতের কাজ। কোথায় আমার কল্পিত বিশ্বপ্রকৃতির সেই বিরাটব্যাপ্ত জলরাশির তরঙ্গায়িত লীলাবিলাস, আর কোথায় বা সেই বিপর্য্যস্ত গ্রাম্যশ্রীর উদ্‌ভ্রান্ত সৌন্দর্য্য। চমক ভাঙিয়া দেখিলাম, পীড়িতস্কন্ধে দুর্ব্বহ বন্যা, জানুপ্রমাণ কাদা ভাঙিতে ভাঙিতে মৃত জন্তু ও গলিত বৃক্ষলতার দুর্গন্ধে আমার শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং যাহাদের সাহায্যের জন্য আসিয়াছি তাহাদের মধ্যে আমার প্রতি কল্পিত কৃতজ্ঞতার সজল স্নিগ্ধদৃষ্টি, বুভুক্ষা এবং প্রকৃতির অকথ্য অত্যাচারে শকুনির মত ক্রুর হইয়া উঠিয়াছে।

ব্যাপার এই, তাহারা জানে যে সরকার-বাহাদুরই এ-সব সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন; এবং যে-সকল পিতৃমাতৃ গৃহতাড়িত হতভাগ্য এই সকল সাহায্য বিতরণ করিয়া

বেড়ায় তাহারা সরকারেরই অধমশ্রেণীর বেতনভুক্ জীব, সুতরাং এক প্রকার তাহাদেরও ভৃত্য। অতএব তাহাদের ইচ্ছামত সাহায্য দিতে ইহারা বাধ্য। কিছু অমনই নয়; চিরটা কাল তাহারা সবেগে সরকারের খাজনা যোগাইয়া আসিয়াছে; দায়ে ঘায়ে মালেক না বুঝিলে চলিবে কেন?

এ-সাহায্য যে সরকারী নয় এই সামান্য কথাটা অনেক করিয়া বুঝাইলেও বিশ্বাস করিবার মত মনোভাব কাহারও বড় দেখিলাম না। বরং এই সকল কথায় তাহারা বেশ একটু সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল এবং জলজ্যান্ত সরকার-বাহাদুরকে অস্বীকার করিতে দেখিয়া আমাদের গূঢ় দুরভিসন্ধি আন্দাজ করিয়া লইতে তাহাদের বিলম্ব হইল না। স্পষ্টই অনেকের অসন্তোষ টের পাইলাম এবং উদ্বৃত্ত জিনিষগুলা যে কোথায় যায় এ-বিষয়ে তাহাদের অনুমান এবং সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট বাক্যে প্রচার করিতে তাহারা দ্বিধামাত্র প্রকাশ করিল না।

দেবতার আসন হইতে অপদেবতার আসনে উপস্থাপিত হইয়াও মনে মনে তাহাদিগকে বিশেষ দোষারোপ করিতে পারি নাই। আমার সহকর্ম্মীদের খাওয়া-দাওয়া আমোদ-প্রমোদের ধুম দেখিলে হঠাৎ তাহাদিগকে বরযাত্র বলিয়া ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়।

ইতিমধ্যে জোয়ানগোছের একটি পাথুরে মূর্ত্তি—অবশ্য বর্ত্তমানে আর তেমন জোয়ান নাই—এক দিন আসিয়া বেশ একটু শাসাইয়া গিয়াছে।

সময়টা নিতান্তই অসময়। সন্ধ্যা হয়-হয়। সকালের সাহায্য বিতরণ, দ্বিপ্রহরের ভূরিভোজন, বৈকালিক চায়ের আড্ডায় বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামের স্বকপোলকল্পিত দুর্দ্দশার অভিনব অভিজ্ঞতার বাহুল্যবর্ণনা সহকারে বাহ্বাস্ফোট ইত্যাদি অবশ্য কর্ত্তব্যগুলি সমাপন করিয়া সঙ্গীরা তখন দ্বিতীয় কিস্তি চায়ের পেয়ালা হাতে উচ্চণ্ড তাসের আসর জমকাইয়া বসিয়াছে। ছেলেবেলা হইতেই এ-সকল লঘুতা আমার ধাতে সহিত না। শ্রান্তচিত্তে উদ্বেল দামোদরের জনহীন তীরে, আমাদের ডেরার কিছুদূরে বসিয়া, নাবাল জলের কর্দ্দমাক্ত তটভূমির কদর্য্যতায় বিলুপ্ত অপগত শ্যামশস্পশ্রীর অভিনব চিত্র কল্পনায় আঁকিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছি; এমন সময় এই নির্জ্জন প্রায়ান্ধকার বন্যাপ্লাবিত নদীতটে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা চমকাইয়া দিয়া অতিশয় রুক্ষ চেহারার একটি দীর্ঘকায় যুবক অত্যন্ত অকস্মাৎ এবং সম্পূর্ণ বিনাভূমিকায় আমার নিকট আসিয়া কিছু সাহায্য দাবি করিল। বলিল—কিছু দুধ তাহার এখনই বিশেষ আবশ্যক। বুঝিলাম লোকটি অহিফেনসেবী এবং সুরসিক।

প্রার্থী দেখিয়া বুকে ভরসা আসিল। যথাসাধ্য শান্ত স্বরে জানাইয়া দিলাম যে দুগ্ধ সরবরাহ করা আমার কার্য্য নয়। তা ছাড়া, এখন অসময়; কাল সকালে আসিলে আবশ্যক বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আমার গাম্ভীর্য্যে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বেশ একটু উদ্ধতভাবে যুবক বলিল, "যখন চাইব তখনই দিতে হবে; সরকারের নিমক খাও না?" বার-বার 'সরকার সরকার' শুনিয়া মনটা পূর্ব্ব হইতেই বেশ উত্তপ্ত ছিল, ফস্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলাম। বলিলাম, "সরকার ত এক নৌকা চাল পাঠাইয়াই খালাস, তার অর্দ্ধেক ত আবার যায় তার কর্ম্মচারীদের পেটে। এই যে দেশদেশান্তরের স্বেচ্ছাসেবকেরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া অন্নবস্ত্র আনিয়া বারে বারে এদের শূন্য গহ্বরে ঢালিয়া দিতেছে, তার সব ধন্যবাদ সব কৃতজ্ঞতা সরকারই ভোগ করিবে নাকি?"—মাথায় কেমন ভূত চাপিল, লোকটাকে জোর করিয়া বুঝাইতে বসিলাম। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক বহু তথ্য তাহাকে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সবিস্তারে এবং সোৎসাহে বুঝাইলাম। সে কি বুঝিল সে-ই জানে। কহিল, "বাবু, এতই দয়া যদি তোমাদের, তা আগে এলে না কেন?—আগে এলে আমার এমন সর্ব্বনাশটা হ'তে পারত না।"

তাহার স্বরে কোথায় যেন একটা শ্লেষের আভাস ছিল—অথবা সেটা হয়ত আমারই দুর্ব্বল চিত্তের একটা সন্দেহমাত্র—এবং অনেকখানি হতাশা ছিল। একটি শিশুর ক্রন্দনে চমকিত হইয়া দেখি, ফুটফুটে ছেলেটি বানে-ভাঙা রাস্তার ধারটিতে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। আমার দৃষ্টির অনুসরণে চাহিয়া যুবকটি কহিল,—যাক্, মরুক্ গে, পরের বোঝা, আমার কি? যত শত্তুর তাই—

—তোমার সব বুঝি গেছে?

—আমার সব? কিই বা ছিল? এক বুড়ো মা—তা সে কবে মরে গেছে। আমি একাই।

—বউ?

—বউ কোথা পাব?—মতিগতি তেমন সুবিধার নয়

কিনা, মেয়ে দিতে সাহস করে না কেউ। জামাই যদি রোজ রোজ ১০ ধারায় পড়ে, সেটা ত কারুরই সুবিধে লাগে না বাবু। যাক্, কুছ পরোয়া নেই। বিয়ে না হ'ল ত বয়ে গেল। তা বাবু, দুনিয়াতে অভাব কিছুরই হয় না। মেয়েগুলো—

আমার নীতিবাগীশ মনটা ঝাঁজাইয়া উঠিল। লোকটার কি লজ্জা বলিয়া কোন বস্তু নাই? বেশ একটু ঝাঁজ দিয়া কহিলাম—চমৎকার লোক ত তুমি হে? বেশ তোফা ফুর্ত্তিতেই ত দিন কাটাচ্ছ; এই বন্যায় যা-কিছু মুস্কিল ঘটালে, না?

আমার অভদ্র শ্লেষোক্তির প্রতি ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করিয়া সে নিজের কথা বলিতে লাগিল,

—বন্যায় সর্ব্বনাশ করেছে বাবু, মুস্কিল আসান যদি বা কোন কালে হ'তে পারত, তা হ'তে দিলে না! সে দেমাকে-মেয়েটা যেমন রূপগুণের অহঙ্কারে ধরাকে সরা দেখত, সে-সব অহঙ্কার সে বজায় রেখেই গেছে—নোয়াতে পারলুম না! নিঃশ্বাস ফেলিয়া লোকটা বসিয়া পড়িল।

একটা রোমান্টিক কাণ্ডের আমেজ পাইয়া মনটা কান খাড়া করিয়া বসিল। একটু নড়িয়া-চড়িয়া জমিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসার সুরে একটু করুণা মাখাইয়া বলিলাম—তাকে পাও নি বুঝি?

—কই আর পেলুম বাবু, সময় দিলে কই? হাতের মুঠোয় এসেই যে ফস্‌কে গেল। আগে যদি আসতে বাবু, তাহলে সে বাঁচত। আমি কি খেয়ে বেঁচেছি? আমার কথা বলছ? সেই ত মূল, আমার সাহায্য যদি নিতই তাহলে আর কথা কি ছিল? যখন তার স্বামী মরে গেল—লোকে বলে বটে আমি মেরেছি, দেবতা জানেন, বাবু, ওকাজ আমায় দিয়ে কখনও হ'ত না। তার পরিবারের ওপর নজর দেখে সে-ই আমায় ধাওয়া করেছিল। আর নজরেরই বা দোষ কি? ছোট-বেলা এক গাঁয়ে বাস, নেহাৎ বাউড়ে বলেই ত, নইলে তার বাপ কি আমাকে রেখে হানিফ মাঝিকে মেয়ে দেয়? না, মেয়েই তাতে মত দেয়? মেয়ে নয় ত, তেউড়ে বাঁশ! কত তোষামোদ, কত পায়ে পড়া, সেই যে বেঁকে বসল—। চণ্ডীর কিরা, বাবু, তাকে বিপদে ফেলতে আমার ইচ্ছা ছিল না। মরদের কাছে নানান্ থানা ক'রে লাগালো, হাজার হোক্, পুরুষ বাচ্ছা ত, কত সয়?...সেদিন আমার সঙ্গে সন্ধ্যের পর মনসাসিজের বেড়ার পাশে মাঝির পোর মূলাকাৎ হ'ল। হঠাৎ দেখি বাঁ-কাঁধটা প্রায় নেমে গেছে।

নত হইয়া যুবক একটা শুষ্ক গভীর ক্ষত দেখাইল। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় লোকটার মুখ বড় ভীষণ দেখাইতেছিল। রাত্রি প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছে, চারি দিক চুপচাপ। বাঙালীর ছেলে; মনটা কেমন একটু ছ্যাঁৎ-ছ্যাঁৎ করিতে লাগিল। ছেলেটার স্বর ক্রমে উচ্চে উঠিবার উপক্রম করিতেই এক প্রচণ্ড ধমক দিয়া রাঙা রাঙা চোখ দুটি ফিরাইয়া সে আবার সুরু করিল,

—আমার হাতে ত অস্তর ছিল না বাবু, একটা লাথি মেরে দিলাম ফেলে। মাথায় খুন চেপেছে ব'লে ওই প্যাকাটির মত মানুষটার তাকৎই বা আর কত? বুড়ো আঙুলে টিপে মারা যায়; কিন্তু সে রকম ইচ্ছে করি নি, এই যা! দেখি, পড়ে গিয়ে নিঃসাড়! বাঃ, এ আবার কি ঢং? রক্তে পা ভিজে যেতে দেখি, উবু হয়ে পড়েছে, ধারালো দাখানা বেশ ভাল করেই কলজে একেবারে ফারফোর ক'রে দিয়েছে!

লোকটার জলন্ত চোখের পানে চাহিয়া আছি দেখিয়া সে ঈষৎ হাসিয়া কহিল—আমায় দেখে অবাক হচ্ছ বাবু। অবাক হ'তে তাকে দেখলে। আমি যে-আমি, আমিই একেবারে থ বনে গিয়েছিলাম চার দণ্ড। বেড়ার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে তীর-বেঁধা পাখীর ছা-টির মত স্বামীকে কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল, আমায় নজর অবধি করলে না। লোকটা দু-দিন বেঁচেছিল। ও কোল থেকে নামায় নি। হাতের পাতের বেচে ডাক্তার-কবরেজ করলে। আরও বেশী অবাক করলে সে। সেই খুনের দায় থেকে আদালতে তারই সাক্ষীতে আমি বেঁচে গেলাম। বাবু, বাবু, অমন দেখি নি, অমন হয় না! তার পর তার পায়ে পড়েছি—দয়া হয় নি, টেনে এনেছি—ভয় হয় নি। শেষকালে যখন বন্যের জলে ঘরবাড়ী সব গেল, তার হাল গরু ধানী জমি—আখেরের পথ আর রইল না, তখন পাজি মন আমার বাবু, ভাবলাম,—এইবারে পথে এস চাঁদ! ওরে বাস রে, আমার অন্ন হারাম, কিছুতে যদি

খাওয়াতে পারি! চিঁড়ে-মুড়কি কত কি জোগাড় ক'রে এই বন্যায় তার পায়ে আছড়ে পড়লাম মড়ার মত, একটা কুটো যদি দাঁতে কাট্‌লে। কে আবার সাহায্য করবে বাবু, যার যার নিজের নিজের ঘর সামলানোরই ধুম। তিল তিল ক'রে মরতে দেখ্‌লে মানুষের মাথা কি ঠিক্ থাকে? শেষকালে বললাম—'মরবি যদি মর মর, চোখের ওপর শুকিয়ে না মরে ঐ সোঁতে ডুবে মর।' হেসে—শুকনো মুখের সে কি হাসি! যেন টিটকারি দিতে লাগ্‌ল। বল্‌লে—ছেলেটাকে নিয়ো, বাপ হওয়ার বড় সখ কিনা তোমার, বলতে বলতে ভাঙা ঘরের আড়া থেকে সোঁতের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ল।···তার পর আর কি! ওই ঘণ্টা গলায় বেঁধে ফিরছি, মরুক, ওর জন্যে—।"

আমি হঠাৎ ত্রস্ত স্বরে, গেল গেল, এই,—ধর, গর্ত্তের মধ্যে পড়ে গেল যে, জলের মধ্যে ছেলেটা—বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিয়া পড়িলাম।

আমি উঠিতে-না-উঠিতে লোকটা লাফ দিয়া খাদের মধ্যে নামিয়া পড়িয়া কাদামাখা ছেলেটাকে তুলিয়া আনিয়া বুকের মধ্যে সবলে চাপিয়া ধরিল।

—ওরে বাপধন, এই যে আমি, ভয় কি; ভয় কি মাণিক! বলিতে বলিতে চুমায় চুমায় রোরুদ্যমান ছেলেটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। আমার চোখে কেন জানি না জল আসিয়া পড়িল। পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া বলিলাম—এই নাও, এই টাকা দুটো নিয়ে যাও!

ঘাড় ঘুরাইয়া বাব্‌রী দুলাইয়া তাচ্ছিল্যের সহিত সে কহিল—অমন কত টাকা আমার আছে। বলিয়া ছেলেটাকে বুকে চাপিয়া সে নির্নিমেষ শূন্যদৃষ্টিতে সেই ধাবমান মৃত্যুময় খরস্রোতের দিকে চাহিয়া রহিল। স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া দেখিলাম—জ্যোৎস্নায় তাহার কোলে ছেলেটিকে দেখাইতেছিল ঠিক কষ্টিপাথরের বাটিতে এক দলা মাখনের মত। যেন তাহার সমস্ত কালিমাপূর্ণ জীবনের গরল মন্থন-করা একবিন্দু অমৃত।

প্রত্যাশা

শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

আরেকটি দিন এল, আঁখি মেলি প্রভাত আলোকে
মনে মনে ভাবিলাম কতদিন দেখি নাই চোখে
সে আনন্দ-প্রতিমারে। একে একে মরেছে পিপাসা—
নয়ন ছাড়ে নি আজো শেষবার দেখিবার আশা।
স্মৃতির নিকুঞ্জে মোর ছায়া যার ফেরে অহরহ
সে ত কভু কায়া ধরি' আসিল না ঘুচাতে বিরহ;
কত স্বপনের ফুলে সাজাইনু মালঞ্চ আমার,
এলে না মালিনী মোর—এল খরা ফুল ঝরাবার!

আশাহত হিয়ামাঝে আজিকার প্রভাতের আলো
জানি না কেমন ক'রে আরবার ভরসা জাগাল।

তব আবির্ভাব-বার্ত্তা ঝলকিল অরুণ-আলোকে;
ফুল হেসে কহে তাই, পাখী তাই গাহিছে পুলকে।

এল জ্যোতির্ম্ময়ী আশা অন্ধকার-যবনিকা ঠেলি;
আজ রবো পথ চেয়ে অনিমিখ আঁখি দুটি মেলি'।

পুস্তক পরিচয়

পত্রপুট—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

এই গদ্য কবিতার বইটিতে পনরটি গদ্যকবিতা ও দুইটি প্রাচীনপন্থী সমিল কবিতা আছে। কবিতাগুলি কবির পরিণত বয়সের ভাব-ঐশ্বর্য্যে এমন নিরেট করিয়া ঠাসা, যে কোন এক জায়গা হইতে দুই লাইন খাপছাড়া তুলিয়া দিতে গেলে তাহার অখণ্ড সৌন্দর্য্যে আঘাত করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করা যায় না। তা ছাড়া মিলযুক্ত কবিতার প্রত্যেক মিলের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি স্বতন্ত্র রূপ গড়িয়া উঠে মুক্তাহারের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র মুক্তার মত। এই গদ্যকবিতাগুলি যেন পেটানো সোনার হাঁসুলি। ইহাতে স্বতন্ত্র মুক্তাবীজ নাই, একটুখানি দেখাইতে গেলে ভাঙিয়া দেখাইতে হইবে। তাহার উপর আবার কোন কবিতারই নাম নাই। নাম করিয়া যে কোন একটির বিশেষ সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করিতে যাইব, তাহার উপায় নাই। আমাদের দেশের নজরবন্দী আসামীদের মত ইহারা এক, দুই, তিন, চার, মার্কায় অভিহিত।

যাই হোক, 'তিন কবিতায় কবি পৃথিবীকে যেখানে তাঁহার শেষ নমস্কার নিবেদন করিতেছেন, সেখানে 'স্নিগ্ধ, হিংস্র, পুরাতনী, নিত্যনবীনা, অন্নপূর্ণা, অন্নরিক্তা' ধরিত্রীর সহস্ররূপ শিল্পীর তুলিতে অপূর্ব্ব হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; 'বলাকা'র বিরাট নদী আবার নবসৌন্দর্য্যে কবির লেখনীর মুখে ধরা দিয়াছে।

দুই নম্বর কবিতায় কবির ছুটি ঋতুতে ঋতুতে কালে কালে লোক হইতে লোকাতীতে নি-খরচায় অনন্ত রূপসাগরে উজান বাহিয়া চলিয়াছে।

৮ নম্বরে ছোট একটি নাম-না-জানা ফুল অনন্ত কাল-স্রোতে আপনার ছবি লিখিয়া দিয়া গিয়াছে, জগতের বৃহৎ ইতিহাস-মালার সহিত একই লিপিতে।

চৌদ্দ কবিতায় মনে পড়ে "আজি হতে শত-বর্ষ পরে"।

পনর বাত্য মন্ত্রহীনের কবিতা। সাধক কবি সকল বেড়ার বাইরে সহজ ভক্তির আলোকে নক্ষত্রখচিত আকাশে, পুষ্পখচিত বনস্থলীতে, দোসর-জনার মিলন-বিরহের গহন বেদনায়, খুঁজেছেন তাঁর দেবতাকে। "সকল মন্দিরের বাহিরে তাঁর পূজা সমাপ্ত হয়েছে দেবলোক থেকে মানবলোকে আকাশে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষে আর মনের মানুষে তাঁর অন্তরতম আনন্দে।"

বইখানির বাঁধাই ও বহিরাবরণ ভাল। নালির আকার উপহারের যোগ্য।

সোনার হরিণ—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু। মডার্ণ পাবলিশিং সিণ্ডিকেট, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত, মূল্য ১৷০। দ্বিতীয় সংস্করণ।

মণীন্দ্র বাবু বাংলা ছোটগল্পের জগতে নূতন মানুষ নন। তাঁহার গল্প বাঙালীর বহুদিনের পরিচিত জিনিষ। দার্জ্জিলিঙে, বেনামী প্রভৃতি যৌবন-স্বপ্ন ও যৌবন-বেদনার গল্পগুলি যখন প্রথম বাহির হইয়াছিল, বাঙালী পাঠক-সমাজ সেগুলিকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখনকার বাংলা ছোট-গল্পে এই ধরণের আবহাওয়া খুব নূতন ছিল এবং এই রকম কবিতার মত ভাষা মানুষকে রোমাঞ্চে মাতাইয়া তোলে বলিয়া তরুণমহলে এগুলির খুব নাম ছিল। আধুনিক অনেক লেখক এই সব গল্পের নকলে আধুনিক রোমান্স লিখিতে হাত মক্স করিতেন।

বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়াতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ইহার বহিরাবরণ সুন্দর, কাগজ ছাপাও ভাল। 'অলকা', 'সুধা', 'সুরেশের মায়া,' সব গল্পই হাল্কা সুন্দর ভাষায় লেখা। বইটি উপহার দিবার মত।

শ্রীশান্তা দেবী।

মোগল যুগে স্ত্রীশিক্ষা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সার্ যদুনাথ সরকার লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। পৃ. ৩৯, মূল্য ।৷০ আনা।

বাংলা-সাহিত্যে ব্রজেন্দ্র বাবু ও তাঁহার একাধিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ সুপরিচিত। গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় এদেশে ঐতিহাসিক রচনার দ্বিতীয় সংস্করণের সৌভাগ্য কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। কাজেই এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাঙালী পাঠকের সুরুচি ও গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। সার্ যদুনাথের নির্ম্মম কষ্টিপাথরে যাহা খাঁটি সোনা বলিয়া যাচাই হইয়া গিয়াছে তাহার ঐতিহাসিকতায় পাঠক নিঃসন্দেহ থাকিতে পারেন। ইহা শুধু সঠিক ইতিহাস নহে, সুসাহিত্যও বটে।

ভূমিকায় সার্ যদুনাথ লিখিয়াছেন,—"গ্রন্থখানি ছোট হইলেও অতি মনোরম, শিক্ষাপ্রদ এবং ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।...কাজেই এই ছোট পুস্তক জ্ঞানবৃদ্ধির উপাদান হইয়া রহিবে।" আমাদের মতে এই শ্রেণীর পুস্তক বিনা তদ্বিরে—যাহা অবশ্য বর্ত্তমানে দুর্ঘট—বালিকাদের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত। বালিকারা ইহাতে ইতিহাসের শিক্ষা ও আদর্শ এবং গল্পের চমৎকারিতা একাধারে পাইতে পারে।

স্ত্রীশিক্ষা শুধু ভারতে মুসলমান যুগে নয়, ইস্‌লামের প্রারম্ভ হইতে হজরত মহম্মদ ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া গিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে ভগবান্ মনু ও মহম্মদের একই নির্দ্দেশ—"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।" যাঁহারা পর্দ্দা ও শিক্ষা পরস্পর-বিরোধী মনে করেন, তাঁহাদের ধারণা ব্রজেন্দ্র বাবুর এই পুস্তক পাঠে, আশা করি, দূর হইবে। সেকালে পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া স্ত্রীলোকেরা একসঙ্গে সাহিত্য ধর্ম্ম ও রাজনীতি আলোচনা করিতেন, কেহ কেহ অখণ্ড প্রতাপে সম্রাট্ ও সাম্রাজ্য দুই-ই শাসন করিতেন।

গ্রন্থোক্ত চরিত্রাবলী সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। তবে মনে হয় ইচ্ছা করিলে গ্রন্থকার নূরজাহান-চরিত্র আরও সরস করিয়া আঁকিতে পারিতেন। নূরজাহান শুধু স্বামীর অভিভাবিকা ছিলেন না, ধর্ম্মকর্ম্মেও অর্দ্ধাঙ্গিনী ছিলেন। আজমীর-শরিফের দরগাহর্ বড় ডেগটি—যাহাতে নাকি ১২০ মণ জিনিষের খিচুড়ি পাক হয়—জাহাঙ্গীর বাদশা দান করিয়াছিলেন। যেদিন এটি উৎসর্গ করা হয় সেদিন সর্ব্বপ্রথম নূরজাহান বেগম উহার পাক-চুল্লীতে নুড়ি জ্বালিয়াছিলেন। খিচুড়ি পাক হওয়ার পর বাদশা নিজহাতে এক থালা উঠাইয়া ফকিরদের পরিবেশন করেন। নূরজাহান সম্বন্ধে জাহাঙ্গীরের খেয়ালের অন্ত ছিল না। একদিন

তাঁহার খেয়াল হইল, যে-গো-শকট নুরের রূপরাশি বক্ষে ধরিয়া চলিয়াছে তাহার চালক হইবেন স্বয়ং দিল্লীশ্বর। বাদশাহী হেরেম হইতে রাত্রির অন্ধকারে শহরের বাহিরে পৌঁছান মাত্র এক মুহূর্ত্তে সারা শহরের আলো নিবিয়া গেল; জাহাঙ্গীর গাড়ী হাঁকাইয়া প্রিয়তমাকে আগ্রা-দুর্গে লইয়া আসিলেন।

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

জাগরণ—শ্রীসত্যহরি দাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক শ্রীকুমার-কৃষ্ণ মিত্র, ১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০, কাপড়ে বাঁধান ১৷৷০ টাকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন শাস্ত্রী ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "হিন্দিতে কথা আছে, 'গাগরমে সাগর' এই পুস্তকখানিও তাই, ইহাতে নাই এমন বিষয় নাই,…।" সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বেদে রেলগাড়ীর বিবরণ, বেদে ইলেক্‌ট্রিকের বিবরণ, ব্রাহ্মণগণের আধিপত্যলোপ, কায়স্থগণের যজ্ঞোপবীত ত্যাগের কারণ, দেবতাদিগের মধ্যে চতুর্ব্বর্ণ, সত্যধর্ম্ম, বিবাহে নিষিদ্ধকন্যা, পারা জমাইবার কৌশল, দীর্ঘায়ু পুত্রকন্যা লাভের উপায়, বশীকরণোপায়, সুখপ্রসব, ঈশ্বর, কুণ্ডলিনী, পরলোক, পুনর্জ্জন্মবাদ, পঞ্চকোষের ভোগ মুক্তি ইত্যাদি বহু তথ্যই নিষ্ঠাবান শাস্ত্রানুধ্যায়ী গৃহস্থ যোগজীবন ও তাঁহার সতীসাধ্বী স্ত্রী সুনীতির কথোপকথনচ্ছলে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের নিবেদনে আছে, "…একাধারে ইহা একখানি সুন্দর উপহারের গ্রন্থ হইয়াছে।…—বর্ত্তমানে এরূপ মহাগ্রন্থ বিরল।"

পুস্তকখানি সচিত্র; প্রকাশক, গ্রন্থকার, গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া ও বুদ্ধগয়ার মন্দিরের চিত্র ইহাতে আছে।

আফিমের ফুল—অনিরুদ্ধ রায় প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

'অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মত' আফিম, কোকেন ইত্যাদি নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যের ও সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল, পিস্তল, রিভলভার প্রভৃতি নিষিদ্ধ অস্ত্রাদির চোরাই ব্যবসা চলে। পুলিস ইহা দমন করিতে যত্নবান। কংগ্রেসের অন্যতম নায়িকা, গৃহস্থ ঘরের মহিলা কলেজ-পড়া প্রফুল্ল-নলিনী ক্রমে নারীসঙ্গবর্জ্জিত উগ্র বিপ্লবীদলে জড়িত হইয়া পড়িলেন, 'সর্পের ক্রূর চক্ষের সম্মোহনে শশক যেমন মুগ্ধ ও নির্জীব হইয়া পড়ে'। ক্রমে তিনি ঐ চোরাই ব্যবসায়ের বড় বড় কারবারীর সহিত পরিচিত হন এবং এক চৈনিক নারী কারবারীর সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে আরম্ভ করেন। অবৈধ কার্য্যে ব্রতী উভয় দলের রহস্য ভেদ করিতে পুলিস সচেষ্ট। বিপ্লববাদীদের কেহ কেহ আত্মহত্যা করিল। প্রফুল্লনলিনীর সহকর্ম্মী কারাগারে গেল, প্রফুল্লনলিনী বা অন্য কাহাকেও জড়াইল না। কারবারীদের অনেকেই দণ্ড পাইল। প্রফুল্লনলিনী নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া "শ্রীহীন অতীত ভুলিয়া" পুনরায় স্বামীর পাশে দাঁড়াইল।

লেখক চরিত্র-চিত্রণ অপেক্ষা ঘটনার সমাবেশ বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন বেশী। তাঁহার বর্ণনাভঙ্গী সহজ ও অনাড়ম্বর। ঘটনাবাহুল্যেও বিরক্তি জন্মে না, পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন সিনেমায় ছবি দেখিতেছি।

পুস্তকের ছাপা বাঁধাই ভাল।

শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত

পঙ্কপ্রদীপ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বি-এ, বিদ্যাভূষণ প্রণীত। বিজলী পাবলিশিং হাউস, ৩৬।১ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৭, মূল্য আট আনা।

বইখানি পাঁচটি ছোট ছোট গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলির বিষয়বস্তু একেবারে মামুলি। ইহাতে না আছে ঘটনার বৈচিত্র্য, না আছে ভাবের সমাবেশ। গল্পগুলিতে চরিত্র-প্রস্ফুটনের প্রচেষ্টাও নাই।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

বিদেশী ফুল—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত এবং কলিকাতা ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে বরেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

বইখানি কয়েকটি শ্রেষ্ঠ বিদেশী গল্পের চয়নিকা। প্রথম তিনটি এবং পঞ্চমটি যথাক্রমে লিও টলষ্টয়, গী দ্য মোপাসাঁ, লেডিসলাস রেমন্ট এবং ম্যাক্সিম গোর্কি রচিত চারিটি বিখ্যাত ছোট গল্পের অনুবাদ। অনুবাদের ভাষা স্বচ্ছন্দ। অবশিষ্ট দুইটি রচনা ঠিক অনুবাদ নয়, দুখানি ফরাসী ও রুষীয় উপন্যাসের গল্পবিবৃতি। কাহিনী-সাহিত্যে বাস্তবতার প্রথম প্রবর্ত্তন 'মাদাম বোভারী' হইতে। পূর্ব্বোল্লিখিত চারিটি ছোট গল্পের সহিত ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারী' ও টুর্গেনিভের 'স্মোক'—এই দুখানি প্রসিদ্ধ উপন্যাসের গল্পাংশের সন্নিবেশে এই সুখপাঠ্য চয়ন-পুস্তক সুসম্পূর্ণ হইয়াছে।

পথচারী—শ্রীশান্তি পাল প্রণীত এবং কলিকাতা, ২৫।২ মোহনবাগান রো হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

'পথচারী'তে যোলটি নাতিক্ষুদ্র নাতিবৃহৎ কবিতা আছে। কয়েকটি কবিতায় আবেগ আছে। ছন্দ সাবলীল। 'মিলনে' রচয়িতা বলিতেছেন,

ঘাসে ঘাসে কহিতেছে গোপন কথা—
খোল দ্বার, খোল দ্বার মৌন-রতা!
সুরভির আলিপনা এঁকে দে পথে
রাজ অধিরাজ আসে কনক রথে।

'পল্লী-বৈশাখে' নিদাঘ-পল্লীর একটি শান্ত রৌদ্রোজ্জ্বল ছবি আঁকা হইয়াছে।

আজ বৈশাখে যতেক গৃহিণী বামুন-বাড়ীতে গিয়ে,
পাদুটি ছড়ায়ে ঘরের মেঝেতে ঝুড়ি ঝুড়ি আম নিয়ে—
সাতটি গাঁয়ের কাহিনী কহিয়া কাসুন্দ কুটিয়া সারা
পল্লী-কবিও বাজাইছে তার কবিতার একতারা।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শুকতারা—শ্রীসুনীলরঞ্জন ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ, ১৪।১ এ, জগদানন্দ মুখার্জ্জি লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা। দাম ৷৷০ আনা।

এই বইয়ের কবিতাগুলি ছন্দে ও ভাবে অনবদ্য। প্রকৃত কাব্যা-মোদীর নিকটে 'শুকতারা' যে উপযুক্ত আদর পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যথার দেয়ালা—শ্রীঅতুলানন্দ রায় প্রণীত। কলিকাতা ২ এক, নলিন সরকার ষ্ট্রীট, প্রচারক কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। দাম ৷৷০ আনা।

শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই ক্ষুদ্র বইখানির পরিচিতি লিখিয়া দিয়াছেন। এই বইয়ের কবিতাগুলির অপেক্ষা বইখানির নাম এবং 'পরিচিতি' উপভোগ্য বলিয়া মনে হইল।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মাকড়সার লড়াই

আমাদের দেশে ঘরের দেওয়ালে অথবা পরিত্যক্ত নির্জন স্থানে ধূসর রঙের বড় বড় এক প্রকার মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়। দিনের বেলায় ইহারা প্রায়ই এক স্থানে পা ছড়াইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ রাত্রিচর; রাত্রিকালে আরসোলা, উইচিংড়ি প্রভৃতি শিকার করিয়া বেড়ায়। অনেক সময় দেখা যায়—মাদী মাকড়সা সাদা সাদা গোল বিস্কুটের মত চেপ্টা ডিম বুকে লইয়া একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। বুকে আটকানো বিস্কুটের মত গোলাকার জিনিসটি ডিম রাখিবার থলে। এই থলের মধ্যে ১৫০ হইতে ২০০।২৫০ হলদে রঙের ডিম থাকে। ডিম হইতে বাচ্চা বাহির না হওয়া পর্যন্ত ইহারা থলে বুকে করিয়া ঘোরাফেরা করে। কিছুদিন আগে একটা অপরিষ্কার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেওয়ালের দিকে তাকাইতে দেখি—দুইটা মাকড়সা প্রায় ৬।৭ ইঞ্চি ব্যবধানে অবস্থান করিয়া মুখোমুখি চাহিয়া রহিয়াছে। দুইটার বুকেই ডিম আটকানো ছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দুই জনে একইভাবে আছে, কেহই নড়ে না। তারপর হঠাৎ একটা মাকড়সা

তিন মিনিট যাইতে-না-যাইতেই দুই জনের মধ্যে আবার ভীষণ লড়াই বাধিয়া গেল। ডিম কিন্তু কেহই ছাড়ে না। মুখের সম্মুখস্থ হাড়ের মত উপাঙ্গ দুইটি দিয়া হুকের মত ডিম আঁকড়াইয়া আছে। নীচে দেওয়ালের গা ঘেঁষিয়া একটা বড় এনামেলের গামলা ছিল, এই অবস্থায় উভয়ে জড়াজড়ি করিয়া নিম্নে রক্ষিত সেই গামলাটার মধ্যে পড়িয়া গেল। গামলার মধ্যে পড়িয়াও সেই জড়াজড়ি অবস্থায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত কামড়াকামড়ি চলিল। কামড়াকামড়ির ফলে একটা মাকড়সার একটা ঠ্যাং ছিঁড়িয়া গেল, কিন্তু তথাপিও পরাজয়-স্বীকারের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। কিছুক্ষণ পরে উভয়ে উভয়কে ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় নূতন ভাবে আক্রমণ করিবার জন্য একটু দূরে গিয়া মুখোমুখি হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। প্রায় সাত-আট মিনিট এই ভাবে কাটিবার পর আবার লড়াই সুরু হইল। ছিন্নপদ মাকড়সাটা বড়ই কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। অপর মাকড়সাটা সেটাকে চিৎ করিয়া-ফেলিয়া বুকের কাছে দাঁত ফুটাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কামড়াইয়া রহিল। পরাজিত মাকড়সার পাগুলি থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। কতক্ষণ পরে

মাকড়সার লড়াই — পরাজিত মাকড়সার বুকের উপর উঠিয়া বিজেতা ডিম ছিনাইয়া লইয়াছে — বিজেতা মাকড়সা পিছনের পা দিয়া অপহৃত ডিম ধরিয়া পলায়ন করিতেছে
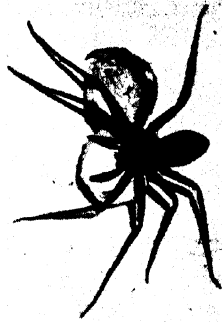
সামনের পা উঁচু করিয়া অপরটার দিকে অগ্রসর হইতেই সেটা একটু এদিক-ওদিক ঘুরিয়া যেন পলাইবার উদ্যোগই করিতেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পলাইল না। সেস্থানে থাকিয়াই সম্মুখের পা দুইটাকে উঁচু করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। সেই অবস্থায় উভয়েই আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পর প্রথম অগ্রগামী মাকড়সাটি হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া অপর মাকড়সার উপর পড়িল। প্রায় দুই তিন সেকেণ্ড ব্যাপিয়া উভয়ের মধ্যে খুব কামড়া-কামড়ি হইল। তার পর আবার দুই জনে সরিয়া দাঁড়াইল। দুই-

সে পাগুলিকে কাঁপাইতে কাঁপাইতে একবার সঙ্কুচিত ও একবার প্রসারিত করিতে লাগিল। তখনও কিন্তু ডিমটি তাহার বুকের উপর ধরা ছিল। কিছুক্ষণ পর বিজেতা, পরাজিত মাকড়সার বুক হইতে ডিমটি কাড়িয়া লইয়া পিছনের একটি ঠ্যাং দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া পলায়নের উপক্রম করিতে লাগিল; কিন্তু গামলার খাড়া পাড় বাহিয়া উঠিতে না পারায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে সেখানেই বন্দী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

ব্যাঙের ছাতা

আজকাল পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেই ব্যাঙের ছাতা বা 'মাশরুম' উপাদেয় খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ইউরোপ আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি দেশে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রচুর পরিমাণে সুখাদ্য ব্যাঙের ছাতার চাষ হইয়া থাকে এবং শুষ্ক অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে এক দেশ হইতে অন্য দেশে বিক্রয়ার্থ রপ্তানী হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও অনেকে ব্যাঙের ছাতা অতি উপাদেয় বোধে আহার করিয়া থাকেন, চীনা হোটেলের 'মাশরুম চাউ' অনেকের নিকটেই সুপরিচিত। এই দেশীয় হোটেল রেস্তোরাঁতে সাধারণতঃ বিদেশ হইতে আনীত শুষ্ক ব্যাঙের ছাতাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের লোকেরা অযত্নবর্দ্ধিত ব্যাঙের ছাতাই তরকারি কিংবা মাংসের মত রান্না করিয়া খাইয়া থাকে; কেহ কেহ ভাজিয়াও খায়।

এদেশে বহু প্রকারের ব্যাঙের ছাতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের অধিকাংশই অখাদ্য বা বিষাক্ত। কাজেই অনেকের ইচ্ছা থাকিলেও বিষাক্ত অবিষাক্ত নির্দ্ধারণ করিতে না-পারায়, ভয়প্রযুক্ত হোটেল-রেস্তোরাঁ ছাড়া অযত্নবর্দ্ধিত ছাতা খাইতে ভরসা পায় না। যে-সব ছাতার গায়ে বিভিন্ন রকমের রং দেখিতে পাওয়া যায় অথবা যাহাদের গলার কাছে বাটির মত বেষ্টনী থাকে, অথবা যাহাদের ছাতা জালের মত ছিদ্রযুক্ত এবং দুর্গন্ধময় তাহারাই বিষাক্ত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বিষাক্ত ছাতাগুলি সাধারণতঃ অপলকা-গোছের হয় এবং কাহারও ডাঁটার ভিতরটা ফাঁপা হইয়া থাকে, সামান্য একটু আঘাতেই ভাঙিয়া যায়। আমাদের দেশীয় অধিকাংশ সুখাদ্য ছাতাগুলির রং দুধের মত সাদা হয়। ডাঁটা ও ছাতা কতকটা রবারের মত স্থিতিস্থাপক। ডাঁটার ভিতরটা সম্পূর্ণ নিরেট। অনেক ক্ষেত্রেই আঁশ দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য কোন কোন জাতীয় সুখাদ্য ছাতার আঁশ সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। আঁশশূন্য ছাতাই খাইতে অধিকতর সুস্বাদু। আমাদের দেশে খড়ের গাদায়, গাছের গুঁড়ি, উইয়ের ঢিবি এবং স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার স্থানের মাটিতে বিভিন্ন জাতীয় সুখাদ্য ব্যাঙের ছাতা জন্মিয়া থাকে। বিভিন্ন জাতীয় সুখাদ্য ব্যাঙের ছাতাকে এদেশের লোকে ছাতু, কোঁড়, কোঁড়ক, পাতাল-ফোঁড়, ভুঁই-ফোড়, ভুঁই-চম্পা, ওল আঁধার-মাণিক বা আদার-মাণিক, ভুঁই-পদ্ম, দুর্গা-ছাতু, কাঠ-ছাতু প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া থাকে। সাধারণ নাম ব্যাঙের ছাতা বা ছাতু। (ব্যাঙের ছাতা নাম কেন হইল তাহা বলা দুষ্কর। সাধারণতঃ একটা প্রচলিত ধারণা এই যে, ব্যাং ইহার তলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু ইহার মূলে কোন সত্য নাই।) ইহাদের মধ্যে ভুঁই-পদ্ম ও ভুঁই-চম্পা নামক ছাতা দেখিতে যেমন সুন্দর, খাইতেও তেমনি সুস্বাদু।

আমাদের দেশীয় সুখাদ্য ব্যাঙের ছাতার মধ্যে ভুঁই-পদ্ম নামক ছাতাই আকারে সর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়। ইহাদের ছাতার ব্যাস ৬ ইঞ্চি হইতে ৮।৯ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। উপরের দিকে ছাতার মধ্য দেশ সামান্য একটু নীচু ও রং দুধের মত সাদা, ডাঁটা দুই ইঞ্চি,

চিত্র-পরিচয়ঃ

৪। কাঠ-ছাতু, ৫। কাঠচম্পা বা পইরি, ৬। ভুঁই-পদ্ম, ৭। খড়-ছাতু
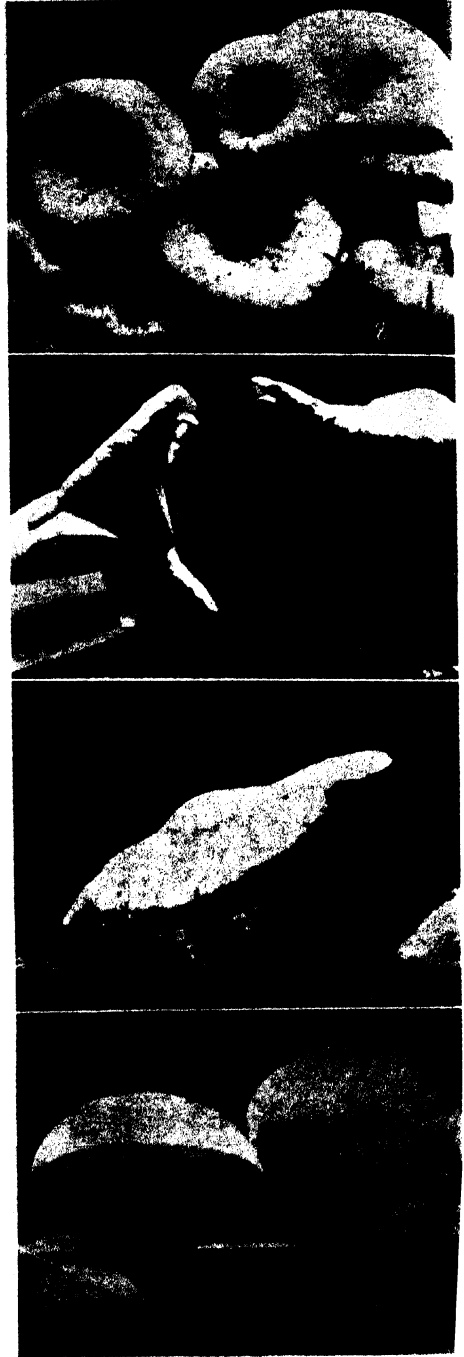
৮। ছুর্গা-ছাতু, ৯। ভুঁই-পদ্মের নিম্নভাগ,
১০। ভুঁইফোড়, ১১। ভুঁই-চম্পা,

আড়াই ইঞ্চির বেশী লম্বা হয় না। প্রত্যেক ব্যাঙের ছাতারই নিম্ন ভাগে ডাঁটা হইতে ছাতার প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত বইয়ের পাতার মত ভাঁজে ভাঁজে কতকগুলি পাতলা পর্দ্দা থাকে। ভুঁই-পদ্মের নিম্ন দেশের এই পর্দ্দাগুলি বাহিরের দিকে বাঁকানো। ইহারা প্রায়ই মাটির উপর আলাদা আলাদা ভাবে কাছাকাছি ফুটিয়া থাকে।

ভুঁই-চম্পা নামক ছাতাও দেখিতে দুগ্ধ-ধবল এবং খাইতে সুস্বাদু। ইহারা পুরাতন গাছের গুঁড়ির কাছে মাটিতে একসঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া ফুটিয়া থাকে। ছাতার উপরিভাগ ডিমের ন্যায় গোলাকার, ডাঁটাগুলি দেড় ইঞ্চি হইতে আড়াই ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ছাতার ব্যাস দুই ইঞ্চি হইতে আড়াই ইঞ্চির বেশী হয় না। খড়ের গাদার পাশেও এই জাতীয় অপেক্ষাকৃত বড় এক প্রকার ছাতা মাঝে মাঝে জন্মিতে দেখা যায়। ইহাদিগকে সাধারণতঃ খড়-ছাতু বলে।

দুর্গা-ছাতুর ডাঁটা আড়াই ইঞ্চি হইতে তিন-চার ইঞ্চি লম্বা হয়। ছাতা থালার মত প্রায় সমতল। গোলাকার প্রান্তদেশ প্রায়ই ছিঁড়িয়া যায় এবং বিভিন্ন আকারের তারকা-চিহ্নের মত দেখায়। ইহাদের রং একটু লালচে সাদা। ছাতার ব্যাস এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চির বেশী হয় না। আর এক জাতীয় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গা-ছাতু দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের ছাতা আধ ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। ইহারা যখন মাটির উপর দলে দলে ফুটিয়া থাকে তখন ভারি সুন্দর দেখায়। পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা ইহাদিগকে ওল, ভুঁই-তারা বা আঁধার-মাণিক বলিয়া থাকে। আর এক রকম ছোট ছোট দুর্গা-ছাতু প্রায়ই খড়ের গাদার আশে-পাশে ফুটিয়া থাকে। ইহাদের ডাঁটাগুলি সরল হয় না, আঁকিয়া-বাঁকিয়া উঠিয়া থাকে। এই ছাতুও খাইতে মন্দ নহে।

গাছপালায় আবৃত বনজঙ্গলের অন্ধকার স্থানে দুধের মত সাদা, কোণাকার টুপিওয়ালা এক প্রকার ছাতা জন্মিতে দেখা যায়। ইহাদের ডাঁটাগুলিও সম্পূর্ণ সরল নহে, ছাতার গলার কাছে খুব পাতলা একটি বেষ্টনী থাকে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ ভুঁই-ফোঁড় বলে। অনেকে ইহাদিগকে কলাপাতায় করিয়া ভাজিয়া খাইয়া থাকে।

উইয়ের ঢিবির মধ্যে সরু বোঁটাওয়ালা, ঈষৎ ধূসর রঙের এক প্রকার ছাতা জন্মে। ইহাদের টুপিও কোণাকার, ঠিক আধখানা কুলের মত দেখিতে। ইহাদের ডাঁটা ৫।৭ ইঞ্চিরও বেশী লম্বা হইয়া থাকে। ইহাদিগকে পাতাল-ফোঁড় বলা হয়। পাতাল-ফোঁড় একটু শক্ত লাগিলেও খাইতে মন্দ নহে।

পচা কাঠের গায়ে অনেক সময় একসঙ্গে অনেকগুলি করিয়া সাদা সাদা গোলাকার ফুল ফুটিতে দেখা যায়। ফুলগুলির বেড় দুই ইঞ্চি আড়াই ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়, ফুলের মধ্যস্থলে গভীর গর্ত্ত বোঁটা ছোট ও বাঁকানো। ইহাদের আঁশ খুব শক্ত, কাজেই সহজে ভাঙিয়া বা ছিঁড়িয়া যায় না। ইহাদিগকে কাঠ-ছাতু বলে। এদেশে কয়েক রকমের কাঠ-ছাতু দেখিতে পাওয়া যায়। যে-সব কাঠ মাটিতে পড়িয়া পচে, তাহার গায়ে কল্‌কে ফুলের মত প্রায় তিন-চার ইঞ্চি গোলাকার, বেশ বড় বড় এক প্রকার ছাতা ফুটিতে দেখা যায়। ইহাদের ডাঁটাগুলি প্রায়ই ধনুকের আকারে বাঁকিয়া থাকে। ইহাদিগকে অনেকে কাঠ-চম্পা, আবার কেহ কেহ

কাঠ-ছাতু নামেও অভিহিত করিয়া থাকে। কাঠ-ছাতুও বিষাক্ত নহে। তবে উপরিউক্ত ছাতুর মত তত সুস্বাদু নহে। সমস্ত রকমের ছাতাই কুঁড়ি অবস্থায় অথবা ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই খাওয়া উচিত। নচেৎ ফুটিয়া এক দিন দুই দিন থাকিলেই ছাতার নীচের দিকে পর্দার ভাঁজে ভাঁজে অতি সূক্ষ্ম পোকা জন্মায়। বিভিন্ন ছাতার গায়ে লাল, কালো, সাদা প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের পোকা দেখিতে পাওয়া যায়।

১২। ভূঁইচম্পা, লম্বালম্বি চিরিয়া দেখান হইয়াছে

১৩। এক জাতীয় ক্ষুদ্রকার কাঠ-ছাতু

সাধারণ ভোজ্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়া আমাদের দেশে আজও ব্যাঙের ছাতার প্রচলন হয় নাই। অবশ্য কেহ কেহ সখ করিয়া অল্পবিস্তর চাষ করিয়া থাকেন। ব্যাঙের ছাতা সাধারণতঃ অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে স্থানেই জন্মিয়া থাকে। চাষ করিতে হইবে হাওয়া খেলিতে পারে এরূপ কোন স্যাঁৎসেঁতে স্থান নির্বাচন করা প্রয়োজন। যদিও ইহারা অযত্নে যেখানে-সেখানে জন্মিয়া থাকে তথাপি চাষ করিতে হইলে বিশেষ যত্ন দরকার, নচেৎ কোন ফসলই উৎপন্ন হইবে না। প্রায় দুই হাত চওড়া, আট-দশ ইঞ্চি খাড়াই পুরাতন কাষ্ঠনির্মিত 'ট্রে'র মধ্যে গোবর বা ঘোড়ার নাদ-মিশ্রিত শুষ্ক সার মাটি চাপিয়া বসাইয়া সামান্য জল দিয়া ভিজাইয়া দিতে হয়। প্রায় সাত-আট ইঞ্চি পুরু করিয়া মাটি বসাইতে হইবে। মাটি কম হইলে উত্তাপের সমতা রক্ষিত হইবে না, আবার বেশী মাটি দিলেও উত্তাপ প্রয়োজনাতিরিক্ত হইয়া পড়িবে। এইরূপে ক্ষেত্র তৈরি হইলে, তাহাতে ছত্র-সূত্র বা ব্যাঙের ছাতার বীজ বসাইয়া দিতে হয়। যেখানে ব্যাঙের ছাতা গজায় সেখান হইতে সূত্রসমন্বিত খানিকটা অংশ অতি সাবধানে তুলিয়া আনিয়া বসাইয়া দিলেও চলিতে পারে, অথবা বিদেশ হইতে আনীত বীজ-সূত্র-সমন্বিত ঘাসের 'কেক্' ব্যবহৃত হইতে পারে। বীজ প্রোথিত করিবার পর প্রথম ফসল জন্মিতে প্রায় তিন-চার মাস সময় লাগিয়া থাকে। বীজ পুঁতিবার কিছু দিন পরে যখন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সাদা সূতার মত পদার্থ সমস্ত মাটির উপর ছড়াইয়া পড়িতে দেখা যাইবে তখন তাহার উপর প্রায় এক ইঞ্চি পুরু করিয়া খুব মিহি সার-মাটি ছড়াইয়া দিতে হয়। এখন হইতে নজর রাখিতে হইবে যেন মাটি একেবারে শুষ্ক হইয়া না-যায়। মাটি একটু স্যাঁৎসেঁতে রাখিবার জন্য ঘরের মধ্যে বড় পাত্রে করিয়া জল রাখিয়া দিলেও চলিতে পারে। ষ্টোভ বা অল্প আলো জ্বালিয়া ঘরের উত্তাপ প্রায় ৬০ ডিগ্রি পর্যন্ত রাখিতে পারিলে ভাল হয়। চাষ করিলেও ব্যাঙের ছাতা সবগুলিই একযোগে জন্মায় না; পর পর দফায় দফায় জন্মিয়া থাকে। ছাতা দেখা দিলেই সামান্য জল দিয়া মাটি ভিজাইয়া দেওয়া দরকার। প্রথম বারের ফসল উঠিয়া গেলে সেই জমির উপরই আবার কিছু সার-মাটি বসাইয়া দিলে, দুই-তিন মাস পরে আবার নূতন ফসল পাওয়া যাইবে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

[এই প্রবন্ধে মুদ্রিত ফটোগ্রাফগুলি লেখক-কর্তৃক গৃহীত]
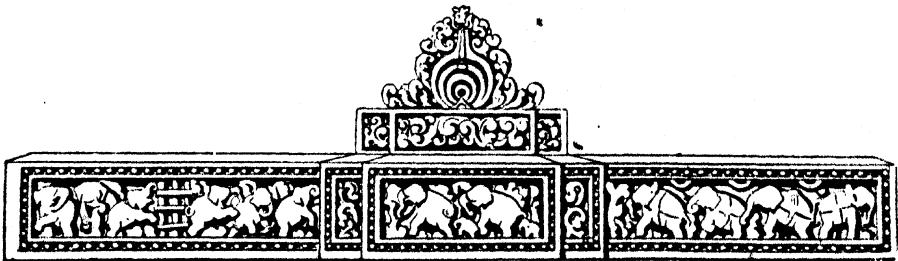
নব্য জার্ম্মেনীর নারী-সংগঠন

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন, ডক্টর-ফিল্ (হামবুর্গ), এম-এ,বি-এল

ন্যাশনাল সোশালিষ্ট জার্ম্মেনী ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমাজে তাহার নষ্ট গৌরব প্রায় পুনরধিকার করিয়াছে। ইহার পিছনে আছে নাট্‌সি-দলের উদ্যম ও প্রচেষ্টা। শুধু যে পুরুষদেরই সঙ্ঘবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা নয়, সমুদয় সমাজের উন্নতিপ্রয়াসে নারীশক্তিও প্রযুক্ত হইয়াছে। এই নারী-সংগঠনের কিছু পরিচয় দিব।

সরকারী জার্ম্মান নারী-সংঘের নাম "নাট্‌সিওনাল-সোট্‌সিয়ালিস্‌টিশের ফ্রাউয়েনশাফ্‌ট্" (National Sozialistischer Frauenschaft), অর্থাৎ "ন্যাশনাল সোশালিষ্ট নারীসংঘ," সংক্ষেপে ইহাকে NSF বলা হয়। যে-কোন প্রাপ্তবয়স্কা নারী ইহাতে যোগ দিতে পারে। নূতন সভ্যাকে প্রথম তিন মাস শিক্ষানবিস থাকিতে হয় এবং তাহার পর "নায়ক" (অর্থাৎ হিট্‌লার) ও পার্টি-মতবাদের বশ্যতা-জ্ঞাপক প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হয়। এক-একটি পাড়ার জন্য সংঘের এক-একটি "সমিতি" আছে, কয়েকটি সমিতি মিলিয়া একটি "শাখা" গঠিত হয়, কয়েকটি শাখা মিলিয়া একটি "চক্র" ও কয়েকটি চক্র মিলিয়া একটি "কেন্দ্র" হয়।

একটি ছাত্রী এক জন দুঃস্থা বৃদ্ধাকে বই পড়িয়া শুনাইতেছে

সমিতির সভ্যরা সপ্তাহে এক দিন মিলিত হইয়া সেলাই, বুনন ও গান করেন এবং বই পড়েন। প্রতি দুই সপ্তাহে "শাখা" মিলিত হইয়া বক্তৃতা, নাট্য, পাঠ ও গীত-বাদ্যের আয়োজন করেন। মাসান্তে একবার "চক্র" মিলিত হইয়া শাখার অনুরূপ কার্য্যাবলী অনুসরণ করেন, কিন্তু ইহার আসল কাজ পরিচালনা ও বন্দোবস্ত। সভ্যাদের যে-বিষয়ে আগ্রহ ও উৎসাহ তাহার অনুশীলনের জন্য তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ছোট "দলে" ভাগ করা চক্রের একটি কাজ। রান্না, গান, সেলাই, ব্যায়াম, আলোচনা, রাজনৈতিক মতবাদ, সাহিত্য, সংস্কৃতি—যাহার যেদিকে আগ্রহ অন্যের সহিত একত্র মিলিত হইয়া একযোগে যাহাতে তিনি সেই বিষয়ের সাধনা করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা চক্রের কাজ। বৎসরে দু-চার বার মিলিত হইয়া "কেন্দ্র" সকল কাজের ব্যবস্থা করেন। এই হইল সভ্যের নিজের ব্যক্তিগত ও সংস্কৃতিগত উন্নতির জন্য সংঘের কাজ। ইহা ছাড়া প্রত্যেক সভ্যাকে সমাজ-সেবার কাজ করিতে হয়। সমাজসেবার অর্থ নর-নারায়ণ, বিশেষতঃ দরিদ্র-নারায়ণের সেবা। সভ্যাদের দরিদ্র পরিবারের ভার গ্রহণ করিতে হয়, কেহ অসুস্থ হইলে তাহার সেবা করিতে হয়, মাতা পীড়িত হইলে দরিদ্র সন্তানদের তত্ত্বাবধানের ভার লইতে হয়, যে-গৃহের গৃহিণী অক্ষমা তাঁহাকে পাক্ষিক কাপড়কাচা ও সংসার-পরিচালনায় সহায়তা করিতে হয়, শীতকালে দরিদ্রদের বস্ত্রকষ্ট অন্নকষ্ট ও শীতকষ্ট নিবারণে সাহায্য করিতে হয়, রুগ্ন বা অসমর্থ

মাতাদের সন্তানপালনের সাহায্য ও শিক্ষা দিতে হয়—ইহাই সমাজসেবা। সভ্যেরা নিজ নিজ রুচি বা অভিজ্ঞতা অনুসারে এই সব কাজের ভার গ্রহণ করেন।

ছাত্রীর দরিদ্র বালক-বালিকাদের জন্য বড়দিনের খেলনা তৈরি করিতেছে

উপরিউক্ত কাজগুলি যাহাতে অপ্রাপ্তবয়স্ক নারীরাও নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী শিখিতে ও করিতে পারে তাহার জন্য যে সরকারী সংঘ আছে তাহার নাম "বুণ্ড ডয়েট্‌শের মেড্‌শেন" (Bund Deutscher Madchen) অর্থাৎ জার্ম্মান-যুবতী-দল, সংক্ষেপে BDM। চৌদ্দ হইতে একুশ বৎসরের মেয়েরা ইহাতে যোগ দেয়। দশ হইতে চৌদ্দ বৎসরের মেয়েদের জন্য যে সরকারী সংঘ আছে, তাহার নাম "ইউংমেডেলশাফ্‌ট্‌" (Jungmadelschaft) অর্থাৎ তরুণী-সংঘ। এইরূপে বালিকা হইতে বর্ষীয়সী পর্য্যন্ত সকলকেই সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিজের উন্নতি ও সমাজসেবার কাজে নিযুক্ত করা হইতেছে।

এ ছাড়া ইউনিভার্সিটির মেয়েদের জন্য একটা স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার নাম "আর্বাইটস্‌গেমাইশাফ্‌ট্‌ নাটসিওনাল সোটসিয়ালিস্‌টিশের ষ্টুডেন্টিনেন্‌" (Arbeits-gemeinschaft National-Sozialistischer Student-innen) অর্থাৎ, ন্যাশনাল সোশালিষ্ট ছাত্রীকর্ম্মসমিতি, সংক্ষেপে ANST। ইহা ইউনিভার্সিটির বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান National-Sozialistischer Deutscher Studenten-Bund (NSDSTB.)*-এর একটি শাখা। ANST-এর সভ্যেরা তিন দলে বিভক্ত, (১) চাষী স্ত্রীলোকদের সাহায্য—শারদীয় ছুটির সময় ছাত্রীরা সীমান্ত-প্রদেশের চাষী স্ত্রীলোকদের শস্য কাটায় সহায়তা করে, কারণ এখানে মজুরের অভাব। গ্রাম্য নাচ-গানের ব্যবস্থা ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করিয়া ছাত্রীরা গ্রাম্য স্ত্রীলোকদের একঘেয়ে জীবনে আনন্দ-সঞ্চারের চেষ্টা করেন। (২) NSF-এর অনুরূপ দরিদ্রসেবা—ছাত্রীদের সময় সংক্ষিপ্ত বলিয়া ইহারা এ-বিষয়ে ছোটখাট কাজের ভার গ্রহণ করেন, ছেলেপিলেকে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া, মেয়েদের কিছু পড়িয়া শোনান বা গল্পগুজব করা প্রভৃতি। (৩) কারখানার মজুরণীদের জীবন আনন্দপ্রদ করা—নাট্য, গীত, গ্রাম্যনাচ প্রভৃতি মজুরণীদের শিখান হয় যাহাতে তাহারা পরে নিজেরাই স্বীয় আনন্দ-বিধানের ব্যবস্থা করিতে পারে।

ইউনিভার্সিটির একটি ছাত্রীর সঙ্গে এক দরিদ্র পরিবারের বাসায় গিয়াছিলাম। অতি পুরাতন দরিদ্র পাড়ায় অতি পুরাতন বাড়ী, সিঁড়িতে উঠিতে দুর্গন্ধ নাকে আসে। স্বামীটি মধ্যবয়সী, বেকার ও রুগ্ন; দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রীর চারটি সন্তান, বড়টির পাঁচ বৎসর ও ছোটটির তিন মাস বয়স। সংকীর্ণ গৃহের ছোট ঘরে আসবাবপত্র অতি সামান্য ও নিকৃষ্ট। বাড়ীতে বিদ্যুতের আলো, রাঁধিবার গ্যাস ও রেডিও অবশ্য আছে। দরিদ্র-গৃহে চিনিহীন কফি খাইলাম। গৃহিণী সংসারের বহু দুরবস্থার কথা বলিলেন। কর্ত্তাটি লড়াইয়ে ছিলেন ও পরে হামবুর্গ বন্দরে ভাল কাজ করিতেন, সেই সব গল্প করিলেন। লোকটি হিটলার-বিরোধী; ছাত্রীটি এজন্য আমার কাছে একটু সংকোচ বোধ করিলেন, কিন্তু তাহাতে সেবা আটকায় না। ছেলেমেয়েগুলি একটু আদর পাইয়া ক্রমাগত পালা করিয়া আমার কোলে উঠিয়া বসিতে লাগিল; একটি কিছুতেই নামিবে না, কোলেই ঘুমাইয়া পড়িল, বিদায়ের সময় 'আর একবার' 'আর একবার' করিয়া বহুবার কোলে উঠিল। ছাত্রীটি যেদিন এ-পরিবারে দেখা করিতে আসেন সেদিন ছেলেগুলির জন্য কিছু ফল বা মিষ্ট কিনিয়া লইয়া আসেন। তাঁহার সাপ্তাহিক আগমন বাপ-মা ছেলেমেয়েদের একটা মহা আনন্দের দিন।

* ইহার কথা আগষ্ট ১৯৩৫ সালের মডার্ন রিভিয়ুর ১৫২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি।

মহিলা-সংবাদ

স্বর্গীয় আচার্য্য হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের কন্যা, "মুকুল" পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকা, শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী দুইটি বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর তিনি শাস্ত্রাধ্যয়নপূর্ব্বক "বেদতীর্থ" এবং

শ্রীমতী শকুন্তলা শাস্ত্রী

সংস্কৃত কলেজ হইতে "শাস্ত্রী" উপাধি লাভ করেন। তদনন্তর তিনি বৃত্তি পাইয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। সেখানে গবেষণামূলক প্রবন্ধ কর্তৃপক্ষের বিবেচনার্থ দিয়া বি. লিট্. (B. Litt.) উপাধি লাভানন্তর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

বিলাতে থাকিতে তিনি সকল ধর্মসম্প্রদায়ের কংগ্রেসে (World Congress of Faithsএ) যোগ দিয়াছিলেন। ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে ঐ কংগ্রেসের তৃতীয় আন্তর্জাতিক অধিবেশন (Third International Assembly of the World Congress of Faiths) হইবে। শ্রীমতী শকুন্তলা শাস্ত্রী এই অধিবেশনের অবৈতনিক ব্যবস্থাপিকা (Honorary Organizer) নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীমতী অণিমা চক্রবর্ত্তী

শ্রীমতী অণিমা চক্রবর্ত্তী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরীক্ষার্থিনীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন।
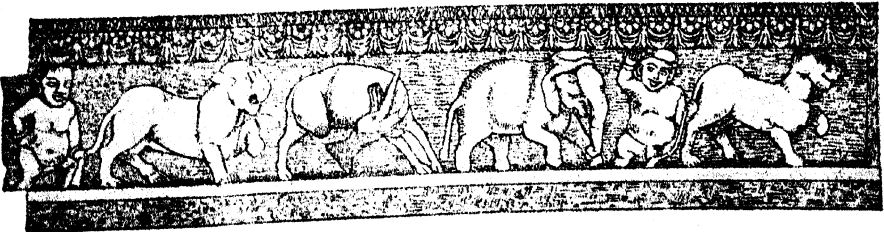
রামমোহন রায়ের প্রথম স্মৃতি-সভা

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার, এম্-এ, পিএইচ-ডি, বার-এট্-ল

সকলেই অবগত আছেন ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরে ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। পাঁচ মাস পরে সেই সংবাদ ভারতে পৌছায়। রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ যে প্রথম স্মৃতি-সভা এদেশে হয়, তাহার বিষয় অল্প লোকই অবগত আছেন। এই স্মৃতি-সভা ১৮৩৪ সালের ৫ই এপ্রেল তারিখে কলিকাতার টাউন হলে হয় ও ইহাতে বহু গণ্যমান্য ইংরাজ ও ভারতীয়ের সমাগম হয়। ইহাতে যে বক্তৃতাদি হয় তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এই সভায় তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার জন গ্রাণ্ট সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম কিছু বলেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন,

যে মহৎ ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ তাঁহারা সমবেত হইয়াছেন, তাঁহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই। কাজেই সভাপতির আসন গ্রহণ করা অন্য লোকের পক্ষেই উপযুক্ত হইত। কিন্তু যেহেতু ভারতে যে কোনও উচ্চপদস্থ ইংরাজের দেশীয় যোগ্য ব্যক্তির প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সময় উপস্থিত হইলে তাহাতে যোগদান করা উচিত ও তাঁহারাও তাহা করিতে প্রস্তুত, কেবল সেই জন্যই তিনি এই আসন গ্রহণ করিয়াছেন। এবং এরূপ এক মহৎ ব্যক্তির স্মৃতি-তর্পণে অংশ গ্রহণ করার কার্য্যটি তাঁহার ন্যায় একজন ইংরাজ বিচারকের পক্ষে অতি উপযুক্তই। যিনি শিক্ষার সকল কুসংস্কার অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন, যিনি দেশের ভ্রান্ত ও গোঁড়া মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিয়াছিলেন, এবং যিনি জ্ঞানপিপাসা নিবারণার্থ ও কিরূপে উন্নত জ্ঞানালোক মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে পারে তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য ও নিজ দেশের কল্যাণার্থ তাহা এদেশে প্রবর্ত্তিত করিবার মানস করিয়া সকল অপবাদ ও বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া সেই সুদূর দেশে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহার গুণের আলোচনা করা অপেক্ষা উত্তম কাজ আর কি হইতে পারে ? তিনি তাঁহার এই উদ্যমে বিদেশে প্রাণত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার নিকট বিদেশ ছিল না, কারণ তিনি তথায় বন্ধু ও অনুরাগী ব্যক্তি দ্বারাই বেষ্টিত ছিলেন। এক্ষণে এরূপ এক মহৎ ব্যক্তির কিরূপ উপযুক্তভাবে স্মৃতিরক্ষা করা যায় তাহা স্থির করিবার জন্যই এই সভা আহূত হইয়াছে।

ইহার পর মিঃ প্যাট্‌ল (Mr. Pattle) বক্তৃতা করিতে উঠেন। তিনি এক জন সিবিলিয়ন, গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি বলেন—

আমরা কেবল রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে এই সভায় আসি নাই, আমরা ইহার দ্বারা নিজদিগকেও সম্মানিত করিতে আসিয়াছি। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে রামমোহন একজন মহামানব ছিলেন না। একথা সত্য যে তিনি এক জন বিখ্যাত যোদ্ধা বা রাজনীতিবিদ্ বা কবি বা বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, কিন্তু তিনি ভরসা করিয়া বলিতে পারেন যে রামমোহন প্রকৃতপক্ষে একজন মহামানবই ছিলেন। তাঁহার ধৈর্য্য বা কষ্টসহিষ্ণুতা ও উন্নত মন সভ্যজগতের সমাদর বা প্রশংসা অবশ্যই লাভ করিবে। যিনিই তাঁহার গুণের বিষয় অবগত তিনিই তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। জ্ঞানোন্মেষের প্রথমাবধিই তিনি সকল কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং আর কখনও পৌরোহিত্যের গোঁড়ামি বা বন্ধুবান্ধবের অনুনয় তাঁহাকে এই জ্ঞানের পথ হইতে বিচলিত বা ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই, যদিও তাঁহাকে কত ভয় দেখান হইয়াছিল যে ইহার দ্বারা তাঁহার নরক প্রাপ্তি ঘটিবে ও জাতিচ্যুত হইতে হইবে। কোনওরূপ ভীতিপ্রদর্শন বা পিতামাতার অনুনয় তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, কারণ তাঁহার মন তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, জীবনে তাঁহাকে এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে— জাতিকে জ্ঞানান্বিত করিতে হইবে ও যে সকল কুসংস্কারাদির তাহারা বশীভূত তাহা দূর করিতে হইবে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় অকালেই তাঁহার ইহলীলা শেষ হইল। এরূপ এক মহৎ লোকের প্রশংসা না করিয়া কি কেহ থাকিতে পারেন ? যদি প্রাচীন রোম বা গ্রীস্ দেশে রামমোহনের জন্ম হইত, তাহা হইলে তিনি বলিতে পারেন যে, সে দেশের ঐতিহাসিক, কবি, চিত্রকর প্রভৃতির মধ্যে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবার জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়া যাইত। এক্ষণে আমাদিগকে স্থির করিতে হইবে, কিভাবে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষা করা যায়। এখানে এ বিষয়ে পরামর্শ দিবার যোগ্যতর ব্যক্তি আছেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় তাঁহার স্মৃতি উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিতে হইলে জাতির বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানোন্নতির জন্য কিছু করা উচিত, কারণ বাঁচিয়া থাকিলে তিনি এ বিষয়ে ব্যয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া নিজেই সব করিতেন।

দেশীয় লোকের পক্ষ হইতে রসিককৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় বলেন যে,

রামমোহনের ন্যায় ব্যক্তি আর আমরা দেখিতে পাইব না। যদিও ব্যক্তিগত ভাবে রামমোহনের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটে নাই, কিন্তু তিনি শুনিয়াছেন যে যখন রামমোহন খুব অল্পবয়স্ক তখন তাঁহাদের বাটিতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার পিতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় রামমোহনের মত অন্যান্য গোঁড়া হিন্দুর ন্যায়ই ছিল। তাঁহার পিতা এই সন্ন্যাসীর নিকট তাঁহাকে প্রথম শিক্ষালাভার্থ নিযুক্ত করেন, এবং ইহাঁর নিকটই রামমোহনের প্রথম বেদ পড়িবার সুযোগ ঘটে। এই বেদ পাঠ করিয়াই তাঁহার প্রথম জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, তিনি সকল কুসংস্কার বর্জ্জন করেন, ও জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির কল্পনাও তাঁহার মনে জাগ্রত হয়। এই ভাবই তাঁহাকে বহুদূর অগ্রসর হইতে ও তিনি জীবনে যে সকল অদ্ভুত কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাতে উদ্বুদ্ধ করে। অবশ্য আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই সতীদাহ নিবারণে তিনি যে

প্রধান অংশ গ্রহণ করেন তাহার জন্য তাঁহার উপর বিরূপ, কারণ তাঁহারা মনে করেন যে ইহার দ্বারা তাঁহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করা হইয়াছে ; কিন্তু দেশের লোক এ বিষয়ে যাহাই ভাবুন না কেন, রামমোহন যে কেবল একজন বড় লোক ছিলেন তাহা নয়, তিনি ছিলেন একজন সৎ লোক, দেশের ও মনুষ্যত্বের সুহৃৎ, ও বহু লোকের মুক্তিদাতা পুরুষ। দেশের লোককে শিক্ষাদানের ভাবটি তাঁহার মনে বিশেষভাবে বলবৎ ছিল। দেশের লোকের শিক্ষার জন্য রামমোহন যাহা করিয়াছেন সকলেই তাহা অবগত আছেন। তিনি স্কুল স্থাপন ও শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া হিন্দু বালকদের শিক্ষাদান করিতেন, এবং তিনি নিজে যে জ্ঞান পাইয়া এত লাভবান হইয়াছিলেন সেই জ্ঞানালোক অপরকেও দিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রবল ছিল। তাঁহার কুসংস্কারাপন্ন দেশবাসী তাঁহার উপর বীতরাগ হওয়ায় তিনি যতটা দেশের মঙ্গল সাধন করিতে পারিতেন তাহা ঘটে নাই। বক্তা হিন্দু কলেজকেই লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, যে বিদ্যালয়ের পরিচালনায় রামমোহনকে যোগদান করিতে দিলে বিশেষ সুফল ফলিত সেই বিদ্যালয়ের সংস্রবে তাঁহাকে থাকিতে দেওয়া হয় নাই। তাঁহাকে ইহার কার্য্যে যোগদান করিতে দিলে অধিকতর মঙ্গলেরই সম্ভাবনা ছিল। রামমোহন কেবল এই একটি কার্য্য করেন নাই ; তিনি আরও অনেক কিছু করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে দেশে বাংলা গদ্য এক প্রকার ছিল না। ইহার প্রতিষ্ঠা তাঁহার দ্বারাই হয়, এবং এ বিষয়ে তিনি নিজে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ প্রাঞ্জল বাংলা লিখিতে পারিতেন সেরূপ আর একজনও নাই। তিনি আরও কিছু করিয়াছিলেন। তিনি বিলাত গিয়াছিলেন, এবং ইহার দ্বারাও তিনি দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। কোম্পানীর নূতন সনন্দ যতই নিন্দনীয় হউক না কেন, ইহাতে যাহা কিছু ভাল বিধি আছে তাহা রামমোহনের চেষ্টারই ফল।

অতঃপর কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মিঃ টার্টন বক্তৃতা করেন। প্রেস অর্ডিন্যান্স পাস হইলে তাহার বিরুদ্ধে রামমোহন কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে যে মামলা দায়ের করেন তাহাতে এই টার্টন সাহেব তাঁহার পক্ষে একজন কৌন্সলী ছিলেন। টার্টন সাহেব বলেন যে,

যদিও রামমোহনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই, তথাপি তিনি বলিতে পারেন যে, তিনি এমন একজন লোক দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যিনি শত বাধাবিঘ্ন সত্বেও নিজের সকল স্বার্থ ভুলিয়া স্বদেশের কল্যাণ সাধনের জন্য ব্যগ্র ছিলেন। তিনি ভারতে আসিবার অল্পকাল পরেই গভর্ণমেণ্ট এমন এক আইন পাস করেন যাহার বিরুদ্ধে সাধারণের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু রামমোহন ব্যতীত আর কাহারও এই অন্যায় আইনের বিরোধিতা করিবার মনুষ্যত্ব ও সাহস ছিল না। একমাত্র রামমোহনই ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে অগ্রসর হয়েন। এই সময় (১৮২৩ সালে) রাজা রামমোহন রায় স্বদেশের স্বার্থরক্ষার জন্য যেরূপ আন্তরিকতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন স্বদেশে জাত ও লালিতপালিত কোন ইংরাজের পক্ষেও উহা অপেক্ষা অধিক করা সম্ভব ছিল না। এই সময়েই প্রথম রামমোহনের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, এবং তিনি এরূপ পরাধীনতার মধ্যে জাত ও লালিতপালিত এক ব্যক্তির মধ্যে এরূপ অদম্য স্বাধীনতা-প্রীতি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও পরম প্রীত হইয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি এই সভার কার্য্যে সামান্য ভাবেও সহায়তা করিতে উপস্থিত। বক্তা বলেন যে তাঁহার বাক্যের দ্বারা যদি একজন লোকও এরূপ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে ইহাকে তিনি তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব ও আনন্দের দিন বলিয়া মনে করিবেন। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন যে রামমোহন জাতীয় জীবনে ধ্রুবতারা হইয়া থাকিবেন ও জাতি তাঁহার নিকট হইতে এই শিক্ষাই লাভ করিবেন যে, দেশের হিতসাধন করিতে হইলে ধন বা পদের আবশ্যকতা করে না। দেশের ও দশের সুখ ও স্বার্থ বৃদ্ধি করাই চিরদিন তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল, এবং তিনি কখনও তোষামোদ বা নিপীড়নের দ্বারা এই লক্ষ্য হইতে চ্যুত হয়েন নাই। তিনি নিজের সৎবুদ্ধি ও মনোবলের দ্বারাই নিজ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন ও সকল কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা বলিয়াছেন যে, রামমোহনের চেষ্টাতেই নূতন চার্টারের যাহা কিছু ভাল বিধি তাহা আমরা লাভ করিয়াছি। তিনি উক্ত বক্তার সহিত একমত হইয়া বলেন যে, রামমোহন বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহার চেষ্টার দ্বারা দেশ আরও লাভবান হইত। জাতি যদি নিজ কল্যাণ চাহেন তাহা হইলে রামমোহনের ন্যায় নিজ মনোভাব তাঁহাদিগকে ব্যক্ত করিতে হইবে। বিলাতের মন্ত্রীসভা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞ বলিয়াই নূতন চার্টারে এত দোষ-ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে, এবং এ-দেশের লোকেরা নিজ কল্যাণ সাধনের জন্য যদি তৎপর না হন তাহা হইলে কিছুই হইবে না। এই জন্যই বক্তা মনে করেন যে রামমোহনের মৃত্যু দেশের পক্ষে মহা দুর্ভাগ্যের বিষয়। দেশীয় লোকের অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করিবার তিনিই একমাত্র মুখপাত্র ছিলেন। নিজদেশের উন্নতি করিতে চাহিলে দেশীয় লোককে রামমোহনের ন্যায়ই নির্ভীকচিত্তে ও অপরের অপেক্ষা না রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে ও অপরের দৃষ্টান্তস্থলও হইতে হইবে। এইজন্যই তিনি রামমোহনের এত প্রশংসা করেন। বলা হইয়াছে রামমোহন একজন বড় কবি বা রাজনীতিবিদ্ ছিলেন না ; কিন্তু তাঁহার মতে রামমোহন এই সকল অপেক্ষাও বড ছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন স্বদেশের প্রকৃত হিতকামী ব্যক্তি। তিনি নিজে কখনও মস্ত লোক হইতে চাহেন নাই, তিনি চাহিয়াছিলেন সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও দেশ-হিতকারী হইতে। রামমোহনের মহত্ত্ব তাঁহার দেশোপকারে। তাঁহার ন্যায় কোন একজন ব্যক্তি নিজের এত সময় ও সামর্থ্য দেশের মঙ্গলসাধনে নিয়োজিত করেন নাই। এই কারণেই কি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ এই সভায় সকলের সমবেত হওয়া অতি উপযুক্ত কর্ম্মই হয় নাই? বিনয় ও নিরহঙ্কারিতার জন্য রামমোহন অধিকতর প্রশংসা লাভের যোগ্য। তিনি যাহা-কিছু কার্য্য করিয়াছেন তাহা গোপনেই করিয়াছেন। এরূপ লোকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা নিজেদেরই সম্মানিত করা।

অবশেষে তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র "বেঙ্গল হরকরা"র সম্পাদক জেমস্ সাদারলণ্ড সাহেব বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে,

বিলাতে এক জাহাজে উভয়ে যাওয়ার পাঁচ মাস কাল রামমোহনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার এক অপূর্ব্ব সুযোগ তাঁহার ঘটিয়াছিল, এবং তিনি এই দীর্ঘকালের মধ্যে এমন একটি ভাবও রামমোহনের মধ্যে দেখেন নাই যাহা তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির অনুপযুক্ত। তিনি সর্ব্বদাই দেশের মঙ্গল-সাধনের এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেন, এবং তিনি ইহার জন্য সর্ব্বদাই নিজের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার বিলাত গমনের দ্বারা যাহাতে ভারতের কল্যাণ হয় তিনি সেই দিকেই তাকাইয়া থাকিতেন, এবং পথে কোনরূপ বিলম্ব ঘটিলে তাঁহার মন ব্যস্ত হইয়া উঠিত পাছে এই বিলম্বের দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। তাঁহার গুণাদির বিষয় এত বলা হইয়াছে যে তিনি আর সে বিষয়ে অধিক

কিছু বলিতে চাহেন না। তবে তিনি এই সভায় সমাগত ভারতীয় বন্ধুদের কয়েকটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন না। রামমোহনের সহিত তাঁহার দেশের লোকের কোন কোন বিষয়ে যতই মতদ্বৈধ থাকুক না কেন, কিন্তু একটি বিষয়ে কেহই দ্বিমত হইতে পারিবেন না। একথা স্বীকৃত হইয়াছে যে, তিনি ভারতীয়দের রাজনৈতিক অবস্থার এরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছেন যাহা তাঁহার চেষ্টা ব্যতীত বহুকাল অবধিও সম্ভব হইত না। তিনি ইহা কোন সম্প্রদায়বিশেষের জন্য করেন নাই, তিনি ইহা সকলের জন্যই করিয়া গিয়াছেন; এই জন্য তিনি আজ সকলেরই প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতাভাজন। এই জন্য তিনি বিশ্বাস করেন যে কেবল প্রস্তাব সমর্থন করিয়াই সকলে ক্ষান্ত হইবেন না, যাহাতে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষা হয় তাহাতেও সাহায্য করিবেন। আর একটি কথা। অনেক বৎসর পূর্ব্বে একবার রামমোহনের উপর এক অযথা ও মিথ্যা দোষারোপ করা হয়। সেই সময় সেই ব্যাপার সম্বন্ধে সকল বিষয় পাঠ করিবার সুযোগ বক্তার ঘটে, এবং ঐ ব্যাপার ঘটিবার পর তিনি এক সিভিলিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করেন, যিনি ঐ ব্যাপার সম্বন্ধে সকল বিষয় অবগত ছিলেন। তিনি আজ এই সভায় উপস্থিত ও তিনি তাঁহাকে এই বলিবার ক্ষমতা দিয়াছেন যে, রামমোহনের উপর যে দোষারোপ করা হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই বিষয়ে তিনি আর বেশী কিছু বলিতে চাহেন না, এবং বলা উচিতও মনে করেন না। যেদিন রামমোহন প্রেস আইনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, সেই দিন হইতে তাঁহার বিলাতযাত্রার সময় পর্য্যন্ত ও সেই দেশে পৌঁছিবার পর অবধিও বক্তা তাঁহার কার্য্যাবলী নিরীক্ষণ করিয়াছেন, এবং আজ একথা তিনি জোরের সহিত বলিতে পারেন যে, রামমোহনের সমগ্র আত্মা একমাত্র দেশের কল্যাণ কামনাতেই নিমজ্জিত ছিল। কাজেই তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষা করা দেশবাসী সকলেরই উচিত, তাঁহার সহিত ধর্ম্মমত লইয়া তাঁহাদের যতই মতদ্বৈধ বা বিরোধ থাকুক না কেন।

অতঃপর রামমোহনের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার জন্য যে কমিটি এই সভায় নিযুক্ত হয়, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাহার সভ্য হন।

Sir J. P. Grant, John Palmer, James Pattle, T. Plowden, H. M. Parker, D. Mcfarlan, T. E. M. Turton, L. Clarke, Col. Young, G. J. Gordon, A. Rogers, James Kyd, W. H. Smoult, David Hare, Col. Becher, Dwarkanath Tagore, Rustomjee Cowasjee, Russick Lall(?) Mullick, Mothoornath Mullick, Bissonath Motee Lall, James Sutherland.

এই সভায় প্রায় ছয় সহস্র মুদ্রাও সংগৃহীত হয়।

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

৫

আজ ১৪ই মে, সকালে অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অতি প্রত্যুষেই প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া পূর্ব্বোক্ত তমঙ্গ যুবককে সঙ্গী করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। শস্য-কাটা বাকী থাকায় তাহার পক্ষে যাওয়া মুস্কিল, শেষে তাতপানি পর্য্যন্ত মাত্র যাইতে বলায় সে কি ভাবিয়া রাজী হইল।

বেলা আটটা বাজিল, বৃষ্টিও কিছু কমিয়াছে মনে হইল, এবার বিদায়ের পালা। গ্রাম হইতে পাথেয়রূপে কিছু সত্তু পাওয়া গেল, তাহাই লইয়া পথ ধরিলাম। পথ এইবার পাহাড়ের উপরের দিকে চলিয়াছে, গ্রামের লোকের চেষ্টায় তাহা ভালরূপ মেরামত হইয়াছে; রাস্তাও চওড়া।

ছয় ঘণ্টা চলিবার পর রাখালদের পশুচারণের আড্ডায় পৌঁছিলাম। মোটা শিকলে বাঁধা কুকুরের দলের চীৎকারে কানের পর্দ্দা ছিঁড়িবার উপক্রম, রাখাল-গৃহিণী তাহাদের থামাইলে গৃহে প্রবেশ করা সম্ভব হইল। গৃহ আর কি, চাটাই মাদুরে ছাওয়া কুটীর, ভিতরে খাওয়া-পরার সরঞ্জাম, বিছানা, আসন ইত্যাদি সাজান আছে; পাশেই গোয়াল, সেখানে জামোর (চমরী ও গরুর সঙ্কর) দুধ দোহান হইতেছিল। গৃহস্বামী ছোট ছোট কাঠের বাসনে দুধ দুহিয়া আনিতেছিল, গৃহিণী আহার্য্য-রন্ধনে ব্যস্ত। এখানকার রীতি অনুসারে দোহনের সময়ে পশুর সম্মুখে কিছু আহার্য্য রাখিতে হয়। ঘরের এক কোণে এক বৃহৎ পাত্রে ঘোল ছিল, গৃহস্বামী আমাকে দুগ্ধপান করিতে বলায় আমি তাহা গ্রহণ করিলাম। কিছুক্ষণ পরে খাইবার জন্য সাদর অনুরোধ আসিল, অন্ন ও তরকারি প্রস্তুত; পথে আর খাইবার কিছু পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, সুতরাং নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। যাইবার সময় কিছু মাখন উপহার পাওয়া গেল; বেলা এগারটায় আবার পথে বাহির হইলাম।

পথের দুই পাশে বিশাল বৃক্ষশ্রেণী বনের পাখীর কূজনে মুখরিত, আশেপাশে আরণ্য ষ্ট্রবেরী ফলিয়া আছে, আমি ও আমার সাথী ভোটীয় ভাষায় গল্প করিতে করিতে ও ষ্ট্রবেরী খাইতে খাইতে চলিতে লাগিলাম, পথের শ্রান্তি যেন অনুভবই করিতেছিলাম না। উপরে কোথাও কোথাও যল্মোদের শ্বেতপতাকাপূর্ণ ছোট গ্রাম দেখা যাইতেছিল। এই সকল গ্রামের নিকটস্থ পথে মানী (বৌদ্ধমন্ত্রযুক্ত স্তূপ) অতি অবশ্য থাকে, এবং পথের সেই অংশ সর্ব্বদাই সুসংস্কৃত থাকে। বৌদ্ধ যাত্রী এই মানী দক্ষিণে রাখিয়া চলে, যাহাতে যাইবার সময় এক দিক ও ফিরিবার সময় অন্য দিক ঘুরিয়া পরিক্রমা পূর্ণ হইয়া বহু পুণ্যলাভ হয়। এক গ্রামের নিকটস্থ মানীর দেওয়ালের প্রস্তরে খোদিত চিত্র নূতনভাবে বর্ণ-রঞ্জিত করা হইয়াছে দেখিলাম। আগেই বলিয়াছি যল্মোদের মধ্যে লামাধর্ম্ম এখনও জাগ্রত আছে এবং তাহাদের সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যও বর্ত্তমান।

দ্বিপ্রহরে একটার সময় পর্ব্বত-স্কন্ধের উপর পৌছিলাম। সেখান হইতে আমার পথ পাহাড়ের ঘাট (তিব্বতী "লা") ধরিয়া অন্য পারে গিয়াছে। ঘাটের মুখেই বৃহৎ মানী এবং তাহার পর হইতেই সোজা উৎরাইয়ের আরম্ভ। কিছু নীচে নামিতেই বনজঙ্গল অদৃশ্য হইয়া গেল, পথের দু-পাশেই সুপক্ক গম ও জউয়ের ক্ষেত। আর কিছুক্ষণ চলিবার পর ঐ সকল ক্ষেতও উপরে রহিয়া গেল। নীচে নামিবার সঙ্গে তাপবৃদ্ধিও বেশ অনুভব করিলাম, তবে আমার সঙ্গীর ফসল কাটিবার জন্য ফিরিতে হইবে এবং আমারও পথচলা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমরা দ্রুতই চলিতে লাগিলাম।

পথে তমঙ্গদিগের বহু গ্রাম ছাড়িয়া নীচে গোর্খাদিগের বসতিতে পৌছিলাম, সেখানে ভুট্টার চারা এক বিঘৎ আন্দাজ বাড়িয়াছে। বেলা তিন-চারিটার সময় পাহাড়ের নীচে নদীর পুলে পৌছান গেল। সেখানেও এক জন সরকারী সিপাহী প্রহরী ছিল বটে, তবে ভোটিয়া লামার সঙ্গে তাহার কি প্রসঙ্গ থাকিতে পারে? নির্ব্বিবাদে পার হইয়া চড়াই-পথ ধরিলাম। চড়াইয়ে আগের মত দ্রুত চলা সম্ভব ছিল না, এবং পাঁচটার পর পথশ্রান্তিও অনুভব করিতে লাগিলাম সুতরাং সময় থাকিতেই আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিলাম। নিকটের এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণের ঘরে স্থান পাওয়া গেল, গৃহস্থ লামার জন্য শয়নের ব্যবস্থা করিলেন, সঙ্গী রন্ধনের ভার লইলেন।

রাত্রিযাপনের পর সকালে আবার চড়াই আরম্ভ করিলাম। কত গ্রাম, কত নদীনালা পার হইবার পর অন্য পর্ব্বতমালার স্কন্ধে পৌছিলাম; এবার বৃক্ষশূন্য পাহাড়ের মধ্যে পথ চলিয়াছে। দ্বিপ্রহর-শেষে আর এক চড়াই পার হইবার পরে, কাঠমাণ্ডব হইতে কুতীর পথে উপস্থিত হইলাম। এই পথ পর্ব্বতস্কন্ধের উপর দিয়া গিয়াছে, নীচেও আর একটি রাস্তা ঐ গন্তব্যমুখেই চলিয়াছে; কিন্তু অসহ্য গরমের জন্য সে পথে চলা মুস্কিল।

আবার পথ ঘন বনানীর মধ্য দিয়া চলিল। এখন কুতী হইতে তিব্বতী-লবণ আনিবার মরসুম, সুতরাং পথে দলে দলে লোক চলিয়াছে, কেহবা ভুট্টা চাউল ইত্যাদি লইয়া কুতীর বাজারে চলিয়াছে, কেহবা লবণের বোঝা কাঁধে ঘরের দিকে ফিরিতেছে। বেলা দুইটা নাগাদ আবার উৎরাই আরম্ভ হইল। এখন আমি শর্বা ভোটিয়াদের বসতিস্থলে আসিয়া পৌছিয়াছি। শর্বা নামের অর্থ "পূর্ব্ব-অঞ্চলের লোক," এই জাতি দার্জ্জিলিং-অঞ্চল পর্য্যন্ত বসতি স্থাপন করিয়াছে, যল্মোরা এই জাতিরই এক শাখা।*

এক জন শর্বাকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম, ডুক্‌পা লামা এখনও এ-পথ পার হইয়া যান নাই। মনে হইল, হয়ত এখনও তিনি পিছনে আছেন। ঘণ্টাখানেক চলিবার পর খবর পাইলাম, তিনি সম্মুখের গ্রামে বিশ্রাম করিতেছেন। এই সংবাদে মন প্রসন্নতাপরিপূর্ণ হইল। বেলা তিনটার সময় আমি তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম।

লামার সহিত আমার কোনও ঝগড়া ছিল না, তিনি কেবল তাঁহার জাতীয় স্বভাবের বশে আমায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, পুনর্মিলনের পর সকলেই 'পংডিতা' কে দেখিয়া খুশী হইলেন মনে হইল। সে রাত্রি ঐ গ্রামেই কাটাইতে হইল। গ্রামটি লামাধর্ম্মাবলম্বী তমঙ্গ জাতির ছিল, কিন্তু ডুক্‌পা লামার মত বিশিষ্ট লোকের প্রতিও তাহাদের শ্রদ্ধার কোন চিহ্ন দেখা গেল না, কেননা

*এভারেষ্ট অভিযানের প্রসিদ্ধ "টাইগার কুলি", যাহারা ভার লইয়া ২৭,৪০০ ফুট উঠিয়াছিল, তাহারাও এই শ্রেণীর লোক।

প্রয়োজন হইলে দাম দিয়াও কোন জিনিষ পাওয়া কঠিন ছিল; তবুও এতদিনে আমার মন শান্তিপূর্ণ হইল।

আমাদের দলে চার জন লামা ও চার জন গৃহস্থ ছিল, তাঁহার মধ্যে আমার বন্ধু কুলু-অঞ্চলের রিঞ্জেনও ছিলেন। ডুক্‌পা লামার শরীর মোটা, তাঁহার চলিবার শক্তিও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকে বহিয়া লইবার জন্য সঙ্গে লোক রাখিতে হইত।

সকালে আবার উৎরাই আরম্ভ হইল, উৎরাইয়ের শেষে নদীর উপর লোহার শিকলে ঝুলানো পুল পাওয়া গেল। সাধারণের চলিবার পথ এইটিই, সেই জন্য ঐখানে চটি এবং দোকান ছিল বটে, কিন্তু অগ্নিপক্ক মৎস্য ভিন্ন অন্য আহার্য্যের বিশেষ সন্ধান পাওয়া গেল না। আবার চড়াই আরম্ভ হইল, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিবার পর তমঙ্গদের একটি বড় গ্রামে পৌছিলাম। সেখানে রাত্রি কাটাইবার পর সকালে গুরুকে বহিবার জন্য দুই জন লোক লইয়া আবার যাত্রা সুরু হইল। এক পর্ব্বত-স্কন্ধ পার হইয়া অনেকখানি উৎরাইয়ের পর আমরা কালী নদীর তীরে পৌছিলাম। লবণ-সংগ্রহকারীদের ভীড়ে মনে হইল যেন পথে মেলা বসিয়াছে। এইরূপে ১৮ই মে আমরা কালী নদীর উপরের অংশে শর্বাদিগের এক বড় গ্রামে পৌছিলাম। সঙ্গীদের নিকট শুনিলাম আগামী কাল আমরা নেপালের সীমান্তের চৌকী পার হইব।

এই যাত্রায় অন্য সকলে সত্তু থুক্‌পা দিয়াই দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার শেষ করিত, কেবল ডুক্‌পা লামা ও আমার জন্য ভাতের ব্যবস্থা ছিল। ভাতের সঙ্গে কোন দিন জংলী শাক, কোন দিন মাছের ঝোল জুটিত। এই গ্রামে মুরগীর ডিমের প্রাচুর্য্য দেখা গেল। আমি চল্লিশ-পঞ্চাশটি ডিম কিনিলাম; সঙ্গীরা একরাত্রেই সে-সব সাবাড় করিয়া ফেলিলেন! ভারতে এই সকল পদার্থের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক ছিলনা, কিন্তু আমি এ-যাত্রা মাংসের উপর নিষেধাজ্ঞা অপসারণ করিয়াছিলাম। বাল্যাবস্থায় মাংসাহার চলিত, সুতরাং ঘৃণার কথা কিছু ছিল না।

এখন আমরা কাঠমাণ্ডব-তিব্বতের এক বড় রাস্তায় আসিয়াছি। রাত্রে সীমান্ত পার হইবার তোড়জোড়ের মধ্যে যস্মোভাষায় লিখিত কাগজপত্রাদি পুড়াইয়া শেষ করিলাম, পাছে তাতপানীতে কেহ তল্লাসী করিয়া ঐগুলি দেখিয়া সন্দিগ্ধ হয়।

আমরা কালী নদীর উপরের অংশে ছিলাম। নদীর পাড়ে পাড়ে আমাদের ক্রমেই উপরে উঠিতে হইতেছিল। নদীর দুই ধারই শ্যামল, যদিও সমস্ত দেশ যে জঙ্গলে ভরা তাহা নয়। বেলা দুইটা নাগাদ আমরা তাতপানী পৌছিলাম; গরম জলের প্রস্রবণ আছে বলিয়া এখানকার নাম "তাত (তপ্ত) পানী"। এখানে নেপালী ডাকঘর ও চুঙ্গী আদায়ের দপ্তর ছিল।

আমার ত বুক ধড়ফড় করিতেছিল, কখন কে বলে "তুমি 'মধেসিয়া' (ভারতীয়), এখানে কি করিয়া আসিলে?" লামা-মহাশয় পিছনে ছিলেন, চুঙ্গীর লোক আমাকেই প্রশ্ন করিল "লামা, কোথা হইতে আসিতেছ?" আমি উত্তর দিলাম "তীর্থ হইতে," (অর্থাৎ ভারতীয় বৌদ্ধ-তীর্থ দর্শনের পর) এবং তাহাতেই চুঙ্গীর হাতে রেহাই পাওয়া গেল। সঙ্গী রিঞ্জেন বলিলেন "যাক্, তোমার কার্য্যোদ্ধার হয়ে গেল ত?" সেই সময়েই আমি খোঁজ পাইলাম যে ফৌজী-চৌকী (সেনানিবাস) এখনও সম্মুখে আছে, সুতরাং বলিলাম "ভাই, আসল ঘাঁটী এখনও পার হই নাই।"

কিছুক্ষণ পর লামা আসিয়া পৌছিলেন। বৃষ্টি পড়িতে-ছিল, সুতরাং কিছু ক্ষণ একটি কুটীরে অপেক্ষা করিবার পর আমরা আবার চলিলাম। সম্মুখে এক উচ্চ পর্ব্বতবাহু যেন আমাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এমন কি, নদীর স্রোতও কোন্ পথে আসিতেছে তাহা দেখা যাইতেছিল না। এত ক্ষণে বুঝিলাম তাতপানীর ফৌজী-চৌকী তাতপানী ছাড়িয়া এতদূরে কেন। বাস্তবিকই এই বিরাট পর্ব্বত-প্রাকার সৈনিকের দৃষ্টিতে অতি মহত্বপূর্ণ, কেননা উহার সাহায্যে সামান্য সৈন্যের দলও শত্রুর বিশাল বাহিনীর পথরোধ করিতে পারে।

কিছু পথ চড়াইয়ের পর রাস্তার উপর সশস্ত্র সান্ত্রী দেখা দিল। সান্ত্রী আমাদের আটক করিয়া পথের পাশে বসিতে বলিয়া হওয়ল্দার সাহেবকে ডাকিয়া আনিল। এই সেই স্থান, যাহার ভয়ে আমার মন এত দিন অস্থির ছিল। আমার মনে হইল যেন আমি সাক্ষাৎ যমরাজের সম্মুখে উপস্থিত। আমার এক সঙ্গীকে প্রশ্ন করায় সে বলিল,

'আমরা কেরোঙের অবতারী-লামার শিষ্যদল।" বলিতে বলিতে স্বয়ং লামা-মহাশয় উপস্থিত হওয়ায় হওয়ল্‌দার কাপ্তান সাহেবকে খবর দিলেন।

কাপ্তান সুবেদারকে পাঠাইলেন, তিনি আসিতেই একে একে সকলের নাম, গ্রাম ইত্যাদি লেখান আরম্ভ হইল। সে সময় আমাকে দেখিলে নিশ্চয়ই মনে হইত আমি বহুদিন কঠিন রোগে ক্লিষ্ট। পারতপক্ষে আমার মুখ সুবেদারের নজরে যাহাতে না পড়ে আমি তাহারই চেষ্টা দেখিতেছিলাম। শেষে আমার পালা আসিল। রিঞ্চেন বলিল, "ইহার নাম খুনু ছবং।" আমার পরীক্ষা শেষ হইল, এত ক্ষণে আমি নিশ্বাস ফেলিতে পারিলাম, ধড়ে প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়, নিকটের গ্রামেই রাত্রিযাপন করিতে হইবে। সুবেদার-মহাশয় গ্রামের লোক ডাকাইয়া অবতারী-লামার থাকিবার সুব্যবস্থা করিতে হুকুম দিলেন। আমরা ঐ লোকের সঙ্গে গ্রামের দিকে চলিলাম। সম্মুখের পাহাড়ের বাঁকের পরেই গ্রাম দেখা গেল এবং সেখানে পৌছিতেই থাকিবার জন্য ভাল ঘরও পাওয়া গেল।

আজ ১৯শে মে, ডুক্‌পা লামা দেবতাপূজা আরম্ভ করিলেন। সত্তুপিণ্ড রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া 'মাংস' প্রস্তুত হইল, গ্রাম হইতে উৎকৃষ্ট 'কারণ' আসিল, বিংশাধিক ঘৃতদীপ জ্বলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ মন্ত্র-জপের পর ডমরু-নিনাদে পূজাস্থল মুখরিত হইয়া উঠিল। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত পূজা চলিবার পর প্রসাদ-বিতরণ আরম্ভ হইল। আমার কাছে প্রসাদী মদ্য আসিলে আমি ফিরাইয়া দিলাম। তাহাতে দেবতা রুষ্ট হইবেন ইত্যাদি অনেক কথা শুনিতে হইল, কিন্তু ঐ দেবতার ক্রোধের ভয় রাখে কে? যাহা হউক, লাল সত্তুর প্রসাদ আমি প্রত্যাখ্যান করিলাম না। পরদিন প্রাতে রওয়ানা হইয়া দুইঘণ্টা পথ চলিবার পর আমরা এক নদীর সেতুর কাছে পৌছিলাম। এই সেতুই নেপাল ও তিব্বতের সীমান্ত নির্দ্দেশ করিতেছে। তিব্বতের সীমায় পদার্পণ করিবামাত্রই দেহমন হর্ষোৎফুল্ল হইল; এতদিনে আমার অভিযান জয়যুক্ত হইল!

* * *

২০শে মে সকালে দশটার আগেই আমরা ভোট রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিলাম। এখানে ভোটিয়া-কোসী নদীর উপর কাঠের সেতু আছে, সেই সেতুই ভোট ও নেপালের সীমা নির্দ্দেশ করে। নদী পার হইতেই চড়াই আরম্ভ হইল, রাস্তা লবণপ্রার্থী গোর্খা পথিকের ভীড়ে ভর্ত্তি। মাঝে মাঝে এক-আধটি ভোটিয়ের বাড়ী, তাহাতে যাত্রীদিগের থাকিবার ব্যবস্থা আছে, কেননা ভোটীয় গৃহস্থের এই সময়ই যাত্রীদিগের নিকট পয়সা আদায়ের মরসুম। চারিদিকের জঙ্গলে কাঠের প্রাচুর্য্য, সুতরাং দিবারাত্র ঘরে ঘরে ধূনি জ্বলিতেছে এবং পথিকের তৃপ্তির জন্য ভুট্টার মদ্যও প্রচুর চলিতেছে। পথের দু-পাশ, এমন কি চৈত্য মানী ইত্যাদির পরিক্রমাও পথিকদলের 'উৎসর্গে' দুর্গন্ধ নরকে পরিণত হইয়াছে। সেই দিনের মধ্যাহ্ন-ভোজন আমি পথের মাঝে এক যল্মোর ঘরে সম্পন্ন করিলাম। এই দম্পতি যল্মো হইতে আসিয়া এখানে বাস করিতেছে।

এখন আমরা অতি মনোরম স্থানের মধ্য দিয়া চলিয়াছি চারি দিকে শ্যামলগাত্র উত্তুঙ্গশিখর পর্ব্বতমালা, মাঝে মাঝে পার্ব্বত্য ঝরণার কলনিনাদ, নীচে হইতে কোসী নদীর ফেনপুঞ্জে আচ্ছাদিত বেগবতী ধারার অস্ফুট গর্জ্জন এবং নানা প্রকার মনোহর পক্ষীর কাকলিকূজনে সমস্ত উপত্যকা মুখরিত। মনে হইতেছিল যেন কোন মায়াবীর দেশে আসিয়াছি। এ সমস্ত আনন্দের মধ্যে ভয় ছিল একমাত্র পাহাড়ী কাঁকড়া-বিছার। এইখানে ডুক্‌পা লামাকে বহন করিবার কোন লোক পাওয়া যায় নাই, সেই জন্য তিনি ক্রমাগত পথের মধ্যে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, আমাদেরও যখন-তখন অপেক্ষা করিতে হইতেছিল। আমার সেই বুদ্ধগয়ায় পরিচিত মঙ্গোলীয় লামা লোব্‌-সঙ্‌-শে-রব্‌ (সুমতি প্রজ্ঞ) কাল একাকীই কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তিনিও এখন আমার সঙ্গী। যদিও এখন স্থানে স্থানে চড়াই বহুদূর বিস্তৃত তবুও কোন ভারবোঝা না-থাকায় আমি বিনা কষ্টে পথ চলিতেছিলাম। দ্বিপ্রহরের পরে পথ ছোট ছোট বাঁশঝাড়ের জঙ্গলে প্রবেশ করিল।

বেলা চারিটার সময় ডাম্‌-গ্রামের নিকটবর্ত্তী এক চটিতে উপস্থিত হইলাম। লোক জানিত ডুক্‌পা লামা আসিতেছেন; সুতরাং সকলেই প্রস্তুত ছিল। লামা আসিতেই গ্রামের সকল স্ত্রী-পুরুষ লামার সম্মুখে মাথা নোয়াইতে ছুটিল।

তিনিও তাহাদের মাথায় ডান হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

লামাকে লইয়া শোভাযাত্রা হইল, আগে আগে ধূপধুনা জ্বালাইয়া কয়েক জন চলিল। রাস্তা হইতে কিছু দূরে এক জায়গায় গালিচা বিছান ছিল এবং পেয়ালা রাখিবার ছোট ছোট চৌকিও ছিল। বসিবামাত্র চা আসিল—যদিও আমি ঘোল সেবা করিলাম এবং ডুক্‌পা লামার সম্মুখে চাউল ও নেপালী মুহরের (রৌপ্য মুদ্রা) ভেট পড়িতে লাগিল, তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে মন্ত্রপূত লাল ও হরিদ্রা বর্ণের কাপড়ের টুকরা বিতরণ করিতে লাগিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে এই ব্যাপার সাঙ্গ হইল এবং আমরাও পথে অগ্রসর হইলাম। ধীরে ধীরে আমরা কোসী নদীর এক ছোট শাখার সম্মুখে আসিলাম ; উহার ধারা এইখানে ঘোর নিনাদে বহু উচ্চ হইতে প্রপতিত হইতেছিল। নদীপারের উপরে লোহার শিকলে ঝুলান সুদীর্ঘ সেতু, কিন্তু উহার মাঝামাঝি পৌঁছিলেই উহা এমন দুলিতে আরম্ভ করে যে অনেকে ভীত হইয়া পড়ে। আমাদের সঙ্গের নেপালী বালক গুমা-জু অতি কষ্টে পার হইল। সেতুরক্ষার জন্য নানাবর্ণের পতাকাযুক্ত দেবতা স্থাপিত আছে।

পুলের পাশেই উচুনীচু ক্ষেতের মধ্যে ডাম্‌গ্রাম। গ্রামে বিশ-পঁচিশটি ঘর, প্রায় সবই প্রস্তরের দেওয়াল ও কাঠের ছাউনি দিয়া নির্ম্মিত। একটু উপরেই দেবদারুর জঙ্গল, সুতরাং ঘর-ছাওয়া ইত্যাদি সকল কার্য্যেই দেবদারু কাঠের প্রচুর ব্যবহার হয়। একটি বড় ঘরে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যদিও এসময়ে লবণ সংগ্রহ-কারীদের ঘর ভাড়া দিলে লাভ হইত, তথাপি লামার সম্মান ও ভয় বড় কম ব্যাপার নহে। গ্রামে প্রবেশ করিতেই নরনারীর দল লামার আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য দৌড়াইল, ঘরে প্রবেশ করিবার পরই সেখানেও ভীড়ে ঘর ভরিয়া গেল। দোতলায় আমাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ডুক্‌পা লামাকে মাখনমিশ্রিত মদ্য নিবেদন করা হইল। আমাদেরও মাখনযুক্ত উত্তম চা জুটিল।

রাত্রেই রিঙ্কেনের কাছে শুনিলাম, কাল হইতে অবলোকিতেশ্বরের মহাব্রত আরম্ভ হইবে। অনেকেই ব্রতধারণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল ; আমিও বলিলাম ব্রত পালন করিব। এই ব্রত তিন দিন ব্যাপী হয়, প্রথম দিনে দ্বিপ্রহরের পর ভোজন নিষেধ, দ্বিতীয় দিন নিরাহারে মৌন-ব্রত ধারণ করিতে হয়, তৃতীয় দিনে কেবল পূজা করিতে হয়। ব্রতের সঙ্গে মন্ত্রজপ, পাঠ, পঞ্চাশাধিক ঘৃতদীপ প্রজ্জ্বালন, সত্তু ও মাখনের 'তোর্মা' (বলি) সাজাইয়া নিবেদন ইত্যাদি চলে, উপরন্তু বহু শত সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎও করিতে হয়। অবলোকিতেশ্বরের এই ব্রতে (ঘ্যামা) মদ্য ও মাংস সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। পরদিন দ্বিপ্রহরে সকলে অন্নভোজন করিলাম তাহার পর পূজাপাঠ আরম্ভ। অন্যদের সঙ্গে আমিও কয়েক শত দণ্ডবৎ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। অনর্থক কেন পরিশ্রম করিয়া হয়রাণ হই, এই ভাবিয়া দ্বিতীয় দিন প্রাতেই ব্রতভঙ্গ করিয়া চা ও সত্তু ভক্ষণ করিলাম। সেই দিন দ্বিপ্রহরে এক ভোটীয় সজ্জন আমাকে তাঁহার গৃহে লইয়া পরম তৃপ্তির সহিত মুরগীর ডিমে প্রস্তুত 'সেওয়ই' ইত্যাদি ভোজন করাইলেন। ভোজনের পর নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। এই ভদ্রলোক লাসা, চীন-সীমান্তের খাম্ অঞ্চল ইত্যাদি নানা স্থলে অধ্যয়ন করিয়াছেন, গোর্খা ভাষাও উত্তমরূপ জানেন।

তৃতীয় দিন বৈশাখী পূর্ণিমা ছিল ; উপরোক্ত সজ্জন আজ বুদ্ধোৎসব মানত করিলেন। বৌদ্ধদের এই পবিত্রতম তিথিতে বুদ্ধদেবের জন্ম, বোধ ও নির্ব্বাণ তিনটিই হয়, শুনিলাম এই দিনে সমস্ত ভোট দেশে বুদ্ধোৎসব হয়।

এই তিন দিনে লোকের ভেট-পূজা ইত্যাদি শেষ হইলে, ২৪শে মে প্রাতরাশের পর আমরা পুনর্ব্বার পথে বাহির হইলাম। কিছুদূর যাইতেই পর্ব্বতের দেবদারু কটিবন্ধে প্রবেশ করিলাম, নদীর দুই পাশেই দেবদারু-বৃক্ষরাজি দেখা দিল। বেলা দুইটার মধ্যে চিনা গ্রামে পৌঁছিলাম। এখানেও আমাদের খবর আগেই পৌঁছিয়াছিল, সুতরাং খুব বাদ্যভাণ্ডের সহিত ডুক্‌পা লামাকে স্বাগত করা হইল। ডুক্‌পা লামা আসনে বসিতেই দুই-তিন ডজন থালায় চাউল, মুহর ও 'খাতা' (চীনদেশে প্রস্তুত শ্বেত রেশমী বস্ত্র, যাহা মাল্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়) ইত্যাদি উপস্থিত হইল। সন্ধ্যার সময় রিঙ্কেন বলিল, "গুরু এখানে তিন দিন পূজাপাঠ করিবেন।" এইরূপে মাঝে মাঝে নিশ্চলভাবে থাকা আমার নিকট

অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হইত, কিন্তু উপায় কি? সৌভাগ্যক্রমে গ্রামের লোকে লামাকে রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিল না, বোধ হয় যাহার যাহা দেয় তাহা প্রথম-মুখেই দেওয়া হইয়া গিয়াছিল। রাত্রি এক প্রহর যাইতেই রিঙ্কেন বলিল, কালই রওনা হইতে হইবে। বলা বাহুল্য, এ-সংবাদ আমার নিকট অতি মধুর শুনাইল।

পরদিন বেলা আটটায় যাত্রা করিলাম। খালি-হাত হওয়ায় আমি অন্যদের আগেই চলিয়া যাইতাম। এখনও আমরা দেবদারুর অঞ্চলে, জঙ্গলের মাঝে মাঝে ছোট ছোট গরু চরিতেছে দেখিলাম। কিছুদূরে নবনির্ম্মিত ঘর দেখা গেল। আমি ঘর ছাড়াইয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া কিছু ক্ষণ সঙ্গীদের প্রতীক্ষা করিলাম, শেষে তাহাদের দেরি দেখিয়া ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামীকে বলিলাম ডুকপা লামা রেন্‌পোছে আসিতেছেন। ব্যস্, আর কথা কি, তৎক্ষণাৎ চায়ের পাত্র উনানে চড়ান হইল। লামা আসিতেই বলিলাম যে চা প্রস্তুত-প্রায়। গৃহস্বামী শশব্যস্তে লামাকে প্রণাম করিয়া নূতন গৃহে তাঁহার পদধূলি দান করাইল। গৃহের এক কোণে ছোট জলের প্রস্রবণ ছিল, লামা তাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন। কিছু পরে মাখনযুক্ত গাঢ় চা এবং সঙ্গে এক থালা চাউল ও মুহর ভেট উপস্থিত হইল। সকলের চা পাওয়া শেষ হইলে আবার আমরা অগ্রসর হইলাম।

দ্বিপ্রহরের পর দেবদারুবৃক্ষ ক্রমেই ছোট হইতেছে মনে হইল, কচিৎ একটি বনস্পতি দেখা যায়। শেষে নদীর ধার-রোধকারী বিশাল পর্ব্বতভুজ দেখা দিল, তাহা পার হইতেই বৃক্ষগুল্মের শ্যামল রাজ্য শেষ-প্রায় মনে হইল। এখন দু-চারটি মাত্র অতি ছোট দেবদারু দেখা যাইতেছিল ঘাসও প্রায় দেখাই যায় না। বিকালে চক্-সুম্ গ্রামে পৌঁছিলাম। সুমতি প্রজ্ঞ প্রথমে গ্রামে পৌঁছাইয়া মাখন চা প্রস্তুত করিয়া আগাইয়া অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। আমার কিছু পরে অন্যেরা পৌঁছিলেন এবং প্রত্যেকেই দু-এক পেয়ালা চা খাইয়া গ্রামের দিকে চলিলেন। গ্রামের পথের উপরে নীচে বহু চমরী গাই (য়াক্) চরিতেছে দেখিলাম। পাহাড়ের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম, এইখানেই বৃক্ষ-বনস্পতির শেষ দর্শন হইল। আবার বৎসরাধিক কাল পরে বৃক্ষবনরাজির শ্যামল শোভা দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়াছিল।

চক্-সুম্ বেশ বড় গ্রাম। গ্রামের নীচে নদী আছে দুইটি তপ্তজলের কুণ্ড থাকায় এ-গ্রামের অন্য নাম ছু-র্ছম্ (তপ্তজল)। এখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৃহে লামার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। রাত্রে মশাল জ্বালাইয়া তপ্ত জলে স্নান করিতে গেলাম, সঙ্গীরা সম্পূর্ণ নগ্ন হইয়া স্নান করিতে লাগিল। যাহা হউক, তখন তবু রাত্রের অন্ধকার ছিল, পরদিন দিনের বেলা স্নান করিতে গিয়া দেখিলাম ভোটিয় পুরুষেরা স্ত্রীলোকের সম্মুখেই অম্লানবদনে নগ্ন হইয়া স্নান করিতেছে। বস্তুতঃ আমার মনে হয় শীতের ভয় না থাকিলে ইহারা কঙ্গো দেশের কাফ্রীদের ন্যায় উলঙ্গ হইয়া ঘুরিত!

গ্রাম বড় ছিল কিন্তু যথেষ্ট ভেট আসে নাই, সেইজন্য ডাম্ হইতে আগত ভদ্র পুরুষ যদিও লামাকে বহন করার লোকের ব্যবস্থা করিয়া অগ্রে পৌঁছিবার জন্য অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই রওয়ানা হইয়াছিলেন, তথাপি লামা সমস্ত বিচার করিয়া আরও এক দিন থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। সেই দিন লামা গরম জলে স্নান, গরম গরম মদ্যপান, ভক্তদের ভাগ্য-বিচার ও মন্ত্রতন্ত্র উচ্চারণে কাটাইলেন।

২৬শে মে আমরা চক্-সুম্ হইতে রওয়ানা হইলাম। এখানে আসিবার পরই আমি রিঙ্কেনের প্রদত্ত ভোটিয় ভিক্ষুর বস্ত্র পরিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে শীত-বায়ুর প্রকোপে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। ভয় হইতেছিল, এখান হইতেই ফিরিতে না হয়।

চক্সুম ছাড়াইয়া কিছু দূর যাইতেই বৃক্ষলতার চিহ্নও পাওয়া গেল না, দূরে দূরে পর্ব্বতগাত্রে ঘাসের অন্বেষণে বিশালকায় চমরী চরিয়া বেড়াইতেছে দেখিলাম। পথে দুই বার তুষারের উপর দিয়া চলিতে হইল। এখানে কাঠ দুষ্প্রাপ্য, দ্বিপ্রহরে যেখানে চা খাইলাম সেখানে ঘুঁটে দ্বারা আগুন জ্বালান হইয়াছিল। এখন পথ অতটা দুর্গম ছিল না। দূরে তুষারাবৃত গৌরীশঙ্করের রূপালী শিখর দেখা যাইতেছিল।

কুতী হইতে এক মাইল আগেই লামার জন্য ঘোড়া আসিয়াছিল, কিন্তু বহনকারী কুলি থাকায় তিনি সওয়ার

হইলেন না। তিনি কয়েক জন অনুচরকে আগে যাইতে বলিলেন এবং আমাকেও তাহাদের সঙ্গে যাইতে বলিলেন। কিন্তু আমার মনে মনে অন্য ভয় আছে, সুতরাং আমি লামার সঙ্গেই চলিবার জন্য আগ্রহ দেখাইলাম। শেষে পাঁচটার সময় কুতী পৌঁছিলাম। নূতন মানী প্রতিষ্ঠার জন্য লামার নিকট চাউল আনা হইল, তিনি "সুপ্রতিষ্ঠ বজ্র স্বাহা" উচ্চারণ করিয়া মানীর চতুর্দ্দিকে ঐ চাউল নিক্ষেপ করিলেন।

আমাদের জন্য উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল। পৌঁছিবামাত্রই আমাদের জন্য গরম চা ও লামার জন্য গরম ঘীয়ে ছোকা উৎকৃষ্ট মদ্য আসিল। আমার স্থান লামার কক্ষেই নির্দ্দিষ্ট হইল। (ক্রমশঃ)

[এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত চিত্রগুলি লেখক-কর্তৃক গৃহীত]

সুন্দর

শ্রীশান্তি পাল

পরম-সুন্দর তুমি প্রেমের মূরতি,
কম্পিত পল্লব ঢাকা লাবণ্য-মুকুল,
উতলসমীরস্পর্শে মুঞ্জরিয়া উঠি
মধুরসৌরভ-ভার দিগন্তে ছড়ায়ে
জ্বালিয়া বাসনা-বহ্নি, লুণ্ঠিয়া হৃদয়,
মুহূর্ত্তে মিলায়ে যাও কোথায় কে জানে!

জানি সখি, দিবাশেষে ধূসর সন্ধ্যায়
ছল ছল জলধ্বনি, বিহঙ্গ কূজন,
পাষাণ-সোপান 'পরে রণিত মঞ্জীর,
ব্যাকুল মিনতি-ভরা কঙ্কণ-গীতিকা,
শ্যামল অঞ্চল লীন গোধূলি-আলোক—
তারাও মিলায়ে যায় সায়াহ্ন-অন্তরে।

জানি সখি, নিশা-নভে বিষণ্ণ তারকা,
শিশির-পাণ্ডুর বাঁকা দ্বিতীয়ার চাঁদ,
কুণ্ঠিত মাধবীলতা দেউল-প্রাঙ্গণে,
তরঙ্গচুম্বিত কালো তমসার নীর,
কালের প্রবাহে পড়ি অনাগতে খুঁজি—
তারাও মিলিয়া যায় রহস্যতিমিরে।

জানি সখি, একদিন নীলাভ আকাশে
মেঘের অঞ্চলতলে লভিয়া আসন,
বন্ধুর পিচ্ছিল পথে দু-বাহু পসারি
অলক্ত-লাঞ্ছিত পায়ে সুমুখে আসিয়া
আমারে টানিয়া লবে নয়ননিমেষে,
উন্মাদ কল্পনা-ঘেরা উষার আলোকে।

জানি সখি, জানি আমি কালের মহিমা,
একটি ইঙ্গিতে যায় লুটিয়া টুটিয়া,
কবরী খসিয়া পড়ে, উচ্ছিন্ন যৌবন,
দশন মুক্তার পাঁতি, তনু দেহখানি
শাশ্বত সত্যের কাছে মাগে পরাজয়।
—সেই ত সুন্দর সখি, বিকাশ বিলয়।

সুন্দর তোমার প্রেম অতল গভীর,
উপলমুখর গতি মঞ্জীর-নিক্কণ,
সুন্দর তোমার তনু প্রসন্ন সতত
মধুপ গুঞ্জন গানে চঞ্চল অধীর,
সুন্দর তোমার মূর্ত্তি ধ্যানের অতীত,
বিশ্বের হৃদয়মাঝে বিস্ময় পরম।

তিব্বতের পথে

চক্তুম গ্রামের সম্মুখে

পথের একটি চটি

কোসী নদীর উপর শিকলে ঝোলান সেতু

তিব্বতের পথে

উপরে : চকুস্থম গ্রামের প্রবেশ-পথ নীচে : পথ ঘন বনানীর মধ্যে

ভারতবন্ধু ডাঃ জে. টি. সাণ্ডার্ল্যাণ্ড

শ্রীতারকনাথ দাস, পিএইচ-ডি

ভক্তিভাজন ডাঃ জে. টি সাণ্ডার্ল্যাণ্ড অ্যান আর্বরে তাঁহার পুত্র অধ্যাপক সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের গৃহে ৯৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন, আজ প্রাতঃকালে এই সংবাদ জানিতে পারিলাম। তাঁহার মৃত্যুতে আমেরিকা এক জন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মনায়ককে হারাইল, স্বাধীনতা, ন্যায় ও শান্তির সেবক উদারমনা এক পুরুষ পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলেন।

যৌবনে ডাঃ সাণ্ডার্ল্যাণ্ড সর্ব্বদেশে মানবের মুক্তি-সংগ্রামে সহায়স্বরূপ ছিলেন; সেজন্য তাঁহাকে অনেক যুঝিতে হইয়াছে। নিগ্রো দাসদের স্বাধীনতা চাহিতেন বলিয়া আমেরিকার অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি লড়াই করিয়াছিলেন। জারের আমলের রাশিয়ার অত্যাচরিত ইহুদীদের তিনি ছিলেন সমর্থক; মিশর, আরব, ভারতবর্ষ—সর্ব্বত্রই তিনি স্বাধীনতার পোষক ছিলেন, প্যালেষ্টাইনে ইহুদী-উপনিবেশ স্থাপনেরও তিনি সমর্থন করিতেন। মানব-ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী ডাঃ সাণ্ডার্ল্যাণ্ড প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতিদের পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বহু শ্রম স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রাচ্য জাতিদের সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জাতিরা যাহাতে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করে, প্রাচ্য সংস্কৃতির গুণগ্রহণ যেন সহজে তাহারা করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি পাশ্চাত্য দেশে প্রাচ্য ভূখণ্ডের ধর্ম্ম ও সভ্যতার আলোচনা প্রচারে সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন। প্রাচ্য জাতিদের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের কথা তিনি সর্ব্বদাই স্বীয় রচনায় ও বক্তৃতায় পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে চেষ্টিত থাকিতেন।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল ধরিয়া আর কোনও বিদেশী এমন নিঃস্বার্থ- ও একাগ্রভাবে ভারতবর্ষের সেবা করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না। বহু বৎসর পূর্ব্বে (১৮৯৫ খ্রীঃ) ভারতবর্ষে আসিয়া ও তথাকার অবস্থা স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; খাদ্য বা বৃষ্টির অভাবে যে ভারতে দুর্ভিক্ষ হয় তাহা নয়, জনসাধারণের অচিন্তনীয় দারিদ্র্য ও শোষণই এই সকল দুর্ভিক্ষের কারণ, ইহাই ছিল তাঁহার সিদ্ধান্ত। ডাঃ সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের মন্তব্যে উদ্বোধিত হইয়াই 'প্রসপারাস ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া'র গ্রন্থকার উইলিয়ম ডিগবী, 'ভারতে দারিদ্র্য ও অ-ব্রিটিশোচিত শাসন' গ্রন্থের লেখক দাদাভাই নওরোজী, ভিক্টোরিয় যুগের ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস-প্রণেতা রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ভারতের দারিদ্র্য-সমস্যার আলোচনায় ব্রতী হন। ডাঃ সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের প্রেরণায়ই ইউনিয়ন থিয়লজিকাল সেমিনারির সভাপতি পরলোকগত ডাঃ হল প্রভৃতি খ্রীষ্টিয়ান নেতৃগণ ভারতের প্রতি অনুরক্ত হন। তাঁহারই চেষ্টায় মার্কিন-প্রধানদিগের অনেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমস্যার আলোচনায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য লর্ড কার্জ্জন-জাতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণ গোপনে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ডাঃ সাণ্ডার্ল্যাণ্ড যে ব্রিটিশ-বিদ্বেষী ছিলেন তাহা নয়; বরং ব্রিটিশ ঐতিহ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বদাই তিনি তাহার পরিপোষক ছিলেন। আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে বার্ক প্রভৃতি মার্কিন জাতির সহায় হইয়াছিলেন। বহু ব্রিটিশ বণিক আমেরিকায় অন্তর্যুদ্ধে দাসত্বপ্রথার সমর্থন করিলেও ব্রিটিশ শ্রমিকগণ ঐ প্রথা রদ করিবার পক্ষে ছিল। ডাঃ সাণ্ডার্ল্যাণ্ড আশা করিতেন, যে, ব্রিটিশ জাতির শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম অংশ ভারতবর্ষে স্বাধীনতার উদ্যমকেও সেইরূপ সমর্থন করিবেন। ভারতের মুক্তির জন্য লড়িতে গিয়া তিনি 'ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ এণ্ড হার রাইট টু ফ্রীডম' (পরাধীন ভারত ও তাহার স্বাধীনতার অধিকার) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ব্রিটিশ সরকারের আদেশে ভারতে বহিখানি বাজেয়াপ্ত হয়! কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে এ-যাবৎ ইহাই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তিনি সত্যই বলিতেন, যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে তবেই পৃথিবীতে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুতরাং ভারতবর্ষের কথা গ্রেট ব্রিটেন তাহার ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া

সরাইয়া রাখিতে পারে না। ভারতবর্ষের ৩৫ কোটী লোকের সুখদুঃখের উপর গৌণভাবে সমস্ত পৃথিবীরই মঙ্গল নির্ভর করে; ইহাকে একটি প্রধান আন্তর্জাতিক প্রশ্ন বলিয়াই বিবেচনা করা উচিত।

ডাঃ সাণ্ডার্ল্যাণ্ড ভারতীয় সমস্যার মীমাংসা এত দূর আবশ্যক বলিয়া বোধ করিতেন, যে, মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে একখানি চিঠিতে তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি আর একখানি ছোট বহি লিখিবেন ও ভারতবর্ষে বিনা-বিচারে বা রাজদ্রোহের অভিযোগে যাহারা বন্দীশালায় আবদ্ধ হইয়া আছে, তাহাদের মুক্তির জন্য রাজা অষ্টম এডোয়ার্ড ও ব্রিটিশ রাষ্ট্রনেতাদিগের নিকট আবেদন জানাইবেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ব্রিটিশ রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ ভারতবর্ষকে প্রকৃত স্বাধীনতা, অন্তত ডোমীনিয়নত্ব না দিলে ভারতে বিপ্লব উপস্থিত হইবে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হউক—বিপ্লবের পথে নয়, ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল।

ভারতের মুক্তিকল্পে নিঃস্বার্থ সেবায় সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ; রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার ঋষিকল্প জীবন ও মুক্তিপ্রিয়তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

ডাঃ সাণ্ডার্ল্যাণ্ড কেবল ভারতের সেবাই করেন নাই, আমেরিকার সত্য আদর্শের কথা ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করিয়া আমেরিকার সেবাও করিয়া গিয়াছেন। মার্কিনী জীবনযাত্রার মধ্যে যে-সকল মলিনতা আছে কেবল তাহারই প্রচারে ভারতবর্ষে যে-সকল ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার নিরসনের জন্য তিনি ১৯৩৪ সালে 'এমিনেন্ট আমেরিকানস' নামে একখানি গ্রন্থ ভারতবর্ষে প্রকাশ করেন।

পঁচিশ বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া ডাঃ সাণ্ডার্ল্যাণ্ডকে জানিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল; বহু বার তাঁহার নিকট হইতে আমি সহায়তা পাইয়াছি, এ-কথা কৃতজ্ঞ-অন্তরে আমি স্বীকার করি। লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি অন্যান্য অনেক ভারতীয়, যিনি যখন তাঁহার সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছেন, সর্ব্বদাই তাঁহার সহায়তা পাইয়াছেন। অনেক দুঃখ-দুর্দ্দিনে তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে; তাঁহার জীবন চিরদিন আমার উৎসাহের প্রস্রবণ হইয়া থাকিবে। আমার পরিচিত শ্রেষ্ঠ আমেরিকানদের অন্যতম ডাঃ সাণ্ডার্ল্যাণ্ড, বহু ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিকের অপেক্ষা ভারতের অধিকতর সেবা করিয়া গিয়াছেন; পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতবাসিগণ, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের স্বদেশকর্ম্মিগণ, আজ ভক্তিভাজন ডাঃ সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছে। [অনুবাদ।]

নিউ ইয়র্ক
আগষ্ট ১৫, ১৯৩৬

মরণসাগর পারে তোমরা অমর
তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারি ঘর
তোমাদের স্মরি।
সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক
জয় হোক জয় হোক তারি জয় হোক,
তোমাদের স্মরি।

বন্দীরে দিয়ে গেছ মুক্তির সুধা
তোমাদের স্মরি।
সত্যের বরমালে সাজালে বসুধা,
তোমাদের স্মরি।
রেখে গেলে বাণী সে যে অভয় অশোক
জয় হোক জয় হোক তারি জয় হোক
তোমাদের স্মরি।

—রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান।৩

দিবা ও রাত্রি

শ্রীআর্য্যকুমার সেন

প্রকাণ্ড বাড়ী। পূজার দিনে গোটা বাড়ীটাই লোকে ভর্ত্তি। লাল রঙের মোটা মোটা থাম, লাল সিমেন্টের সুদৃশ্য বারান্দা—তাহার উপর প্রকাণ্ড দুইখানা খাটে সতরঞ্চির উপর ফরাস পাতা এবং তাহার উপরে সারাক্ষণ নানা বয়সের এবং নানা বেশের লোকের অবিশ্রান্ত জটলা।

বাড়ীতে অনেকগুলি বড় বড় ঘর, উৎসবের দিনে সব কয়খানি অধিকৃত। বাড়ীর সকল লোক একত্র হইলে এত বড় বাড়ীতেও কুলায় না; কাছে প্রায় এত বড়ই একটা জনশূন্য বাড়ীর একখানি ঘরে এ-বাড়ীর স্থায়ী বাসিন্দারা পূজার উৎসবের কয়টি দিন কোনরূপে কাটাইয়া দেয়। অবশ্য অন্য সময় এক-এক জনে দুইখানি করিয়া ঘর নিজের অধিকারে রাখিলেও অকুলান হয় না।

স্থায়ী বাসিন্দা এ-বাড়ীর অল্পই। অস্থায়ী যাঁহারা তাঁহারা সারা বছর বাংলা বিহার প্রভৃতি স্থানের এদিক-ওদিক থাকেন; সহসা কোন উৎসবে আসিয়া পড়িলে বাড়ী সরগরম হইয়া উঠে, একটি বাড়ীর লোক সমস্ত গ্রামের লোক-সংখ্যাকে ছাড়াইয়া উঠে। গ্রামখানি নিতান্তই ছোট।

বাড়ীর ভিতরে ও বাহিরে মস্ত বড় দুই উঠান। মাঠ বলিলেও চলে। বাহিরের উঠানে, সদর দরজা দিয়া ভিতরে পা দিলেই ডান দিকে ছোট দুইটি ঘর চোখে পড়ে। পাশাপাশি এক মাটির ভিত্তির উপর কাঠের তক্তা দিয়া তৈরি, জীর্ণ চেহারা দেখিলে মনেও হয় না যে আর বেশী দিন এই উঠান অলঙ্কৃত করিয়া ইহারা টিকিয়া রহিবে।

তিন বছর আগে বাড়ীর চেহারা ছিল অন্য রকম। চারি দিক দিয়া বাড়ী ভাঙিয়া পড়িতেছে, দেওয়ালে চুণবালির আবরণ খুলিয়া কোথাও ইট সম্পূর্ণ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা অর্দ্ধাবৃত থাকিয়া আরও কুৎসিত হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কার না হইলে হয়ত আর কিছুদিন পরে চিহ্নও দেখা যাইত না।

কিন্তু এ তিন বছর আগের

আরও পনর বছর আগে এ-বাড়ী আরও অন্য রকম ছিল। বাড়ীর বাহিরের রূপ মোটামুটি ১৩৩৯ সালেরই মত, কিন্তু মজবুত।

এখন যেখানে বাঁদিকে মূলা ও পালংশাকের একটি অনাবশ্যক অতি-ক্ষুদ্র খেত, এবং প্রয়োজন হইলে যেখানে খাট ফেলিয়া সখের থিয়েটারের ষ্টেজ তৈরি হয়, সেখানে ছিল প্রকাণ্ড আটচালা-ঘর। ঘর জুড়িয়া সতরঞ্চির উপর ফরাস, তাহার মধ্যে মধ্যে বড় বড় তাকিয়া মহাসাগরের বুকে দ্বীপের মত ছড়ানো। বাড়ীর যত রাশভারী প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের দল এখানে আড্ডা বসাইতেন। সে আটচালা ঘর আজ নিশ্চিহ্ন, যেমন নিশ্চিহ্ন সে-সময়ের অধিকাংশ প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের দল।

তাহারও আগে হয়ত আরও অন্য রকম ছিল। বহুকাল আগে এক নগ্নগাত্র, বিরলকেশ বৃদ্ধ খড়ম পায়ে দিয়া সারা বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং অবসর সময় বেগুনের ক্ষেতের তদারক করিতেন। লোকে বলিত, "বেগুন-বেচা বুড়ো।" অবশ্য তিনি এখন অন্য জগতে।

শুধু বাহিরের উঠানে যে জীর্ণ দুইখানি কাঠের ঘর মাটির ভিত্তির উপর অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলিয়াছে, তাহারা হয়ত তখনও এই রকমই ছিল। নায়েব-মশায়ের ঘর। আলকাৎরা দিয়া লেপা দরজার চৌকাঠে খুদিয়া লেখা "নায়েব—শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।" সে নায়েবের কথা বাড়ীর অল্পবয়সীদের কাহারও মনে নাই। কিন্তু তাহা… নীচে আর এক জনের নাম।—"নায়েব, সেই মুখোপাধ্যায়।" বাড়ীর নেহাৎ বাল… ছাড়া এ নায়েব-মশায়… বড়জোর… ঘরখানিতে নিজের অধিকার বজায় রাখার অভিপ্রায়ে … ছেলেটা … …য়া রহিল।

এমনি করিয়া সাবধানতা লওয়া হইয়াছিল, ভয় পাছে কেহ কাড়িয়া লয়। অধিকার তাঁহার ঠিক বজায় আছে, এ-ঘরকে কেহ কোনদিন "নায়েব-মশায়ের ঘর" ভিন্ন অন্য কিছু বলিবে না।

এই নায়েব-মহাশয়ের ঘরে বাড়ীর যুবক ও প্রায়-প্রৌঢ়দের তাসের আড্ডা বসে। একখানি ছোট্ট তক্তাপোষ, তাহার মাত্র তিনখানি পায়া, অপরটির পরিবর্ত্তে একটি কেরোসিনের বাক্স। তাহার উপরে চার জনে বসিয়া অনবচ্ছিন্ন মনোযোগের সহিত ব্রিজ খেলেন, এবং আরও জনকয়েক আশেপাশে ছিন্ন মোড়া ও ভাঙা টুলের উপর বসিয়া সেই খেলা নিবিষ্টচিত্তে দেখে। হয়ত প্রচুর আনন্দ পায়।

তক্তাপোষের পিছনে কাঠের দেওয়ালে পেরেক পুঁতিয়া দুইখানি মারাত্মক অস্ত্র টাঙাইয়া রাখা হইয়াছে—একটি বিপুলকায় মরিচা-ধরা মহিষ-বলির খড়্গ, আর একখানি রামদা। বলি এ-বাড়ীতে আগে নিয়মিত হইত—একবার পাঁঠা বলিতে খড়্গ বাধিয়া যায়—তাহার পরে বৎসর না-ঘুরিতেই তিনটি শিশু এবং একটি কিশোরের অকালমৃত্যু ঘটে। তাহার পর হইতে জীববলি বন্ধ।

রামদাখানি কিন্তু পূজার সময় এখনও কাজে লাগে; তবে কতকগুলি নিরীহ ছাগশিশুকে স্বর্গে পাঠাইবার কাজে নহে; নবমীর দিনে একটি পাকা শশা, একটি চালকুমড়া ও একটি আখ বলি হয়। অবশ্য তাই বলিয়া বাড়ীর কেহ বৈষ্ণব নহেন।

পূজাবাড়ীর অবিশ্রান্ত কোলাহল, ঢাক-ঢোলের আওয়াজ, সমস্ত উপেক্ষা করিয়া নায়েব-মশায়ের ঘরের তাসখেলা চলে।

শুধু একজনের এসব তেমন ভাল লাগে না। সে মণীশ। তেইশ-চব্বিশ বছরের যুবক, শ্যামবর্ণ, দীর্ঘ একহারা সবল সপ্রতিভ চেহারা। সুপুরুষ ঠিক নয়, চেহারায় খুঁতের অভাব নাই। ছোট থুৎনী চরিত্রের দৃঢ়তার অভাব ধরাইয়া দেয়। কিন্তু গভীর কালো টানা দুইটি চোখের দিকে চাহিলে সে-সব কথা মনে থাকে না। স্বীকার করিতে হয়, রূপবান না হইলেও সুশ্রী।

তাসখেলা দেখিয়া লোকে কি সুখ পায় তাহা সে বুঝিতে পারে না—খেলা ত ভাল লাগেই না। যত ক্ষণ পুরাদমে তাসখেলা চলে, তত ক্ষণ সে বড় দালানের ভিতরে ঘুরিয়া এর-ওর-তার সহিত গল্প করিয়া সময় কাটাইয়া দেয়। তবে তাসখেলার ফাঁকে নায়েব-মশায়ের ঘরে গল্পগুজবও মন্দ চলে না, সে-সময়টা মণীশের মন্দ লাগে না। মজলিসে রসিক লোকের অভাব নাই, তাঁহাদের গালগল্প শুনিয়া সময় ভালই কাটে।

চারি দিকে পূজাবাড়ীর আমোদ-প্রমোদ হৈচৈ। সারা বাড়ীর নরনারী বালক-বালিকার মনে কোথাও দুঃখের লেশ আছে বলিয়া মনে হয় না। এত আনন্দ, এত হাসি, এত কোলাহলের মধ্যে বাড়ীর ভিতরে একটি অতি-ক্ষুদ্র নিভৃত কক্ষে ছিন্ন শয্যার উপর মলিন বালিশে মুখ লুকাইয়া একটি সদ্যবিধবা কান্নার আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। তিন মাস আগে স্বামী মারা গিয়াছেন, বাইশ বৎসরের বধূ ও দুই বৎসরের একটি শিশু রাখিয়া।

বারান্দার এক কোণে একখানি চেয়ারে একটি অতিবৃদ্ধ হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া আছেন। বয়স ছিয়াশি। মৃত্যুর প্রতীক্ষা তিনি করিতেছেন সত্য, কিন্তু বাহির হইতে লোকে যেমন করিয়া ভাবে তেমন করিয়া নহে। ছিয়াশি বৎসর ধরিয়া এই পৃথিবীর সমস্ত সম্ভোগ্য আকণ্ঠ ভোগ করিয়া জীবনসায়াহ্নে তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে করিতে ভগবানের নাম করেন না—যে-পৃথিবীকে আর কয়টি দিন বাদে চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহারই কথা ভাবেন।

জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মহিমারঞ্জনের সহিত যুবক মণীশের এক অদ্ভুত বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহিমারঞ্জন মাত্র বছরখানেক এ-বাড়ীতে আসিয়া স্থায়ী আসন পাতিয়াছিলেন। ছেষট্টি বছর আগে, যখন তাঁহার বয়স মাত্র কুড়ি, সেই সময় তিনি এই গ্রাম ছাড়িয়াছিলেন, জীবনের পশ্চিম-সীমান্তে পৌছিয়া এ-গ্রামে ফিরিয়াছিলেন।

মহিমারঞ্জন নামে এ-বাড়ীতে যে কোন দিন কেহ ছিল, কিছু দিন আগে বাড়ীর নেহাৎ বয়োবৃদ্ধগণ ছাড়া সে-খবর আর কেহ রাখিত না। এ-বাড়ীতে তাহার বিশেষ সুনাম ছিল না। ... পশ্চিমে পলায়ন করিয়া তিনি জীবনে

মোটামুটি সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নৈতিক জীবন নাকি মোটেই নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারেন নাই।

তাঁহার জীবনের কোন কোন ঘটনা মণীশ তাঁহার মুখেই শুনিয়াছিল। ষোল বছর বয়সে একটি ফুটফুটে সুন্দরী ত্রয়োদশী ঘরে আনিয়াছিলেন, তখনকার হিসাবে নিতান্তই অরক্ষণীয়া। তার পর বছর-চারেক ধরিয়া শ্বশুর-শাশুড়ীকে অশেষ আনন্দ দিয়া তাঁহাদের পৌত্রমুখ দেখাইবার লোভ দিয়া বধূ একদিন অতর্কিতে বিদায় লইল।

বছরখানেক পরে বাপ-মা আর একটি বধূ ঘরে আনিয়া শূন্য সংসার ভরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মহিমারঞ্জনের খোঁজ আর পাওয়া গেল না। যখন খোঁজ মিলিল, তখন বাপ-মা দু-জনেই পরলোকে, এবং বাড়ীর লোকদের মতে মহিমারঞ্জন উৎসন্নে। তাঁহাকে সৎপথে আনিবার চেষ্টাও কেহ করিল না। কিন্তু সে আজকের কথা নয়, ছেষট্টি বছর আগের কথা।

এমনি এক গল্পের মধ্যে মণীশ একদিন সহসা প্রশ্ন করিয়াছিল, "আচ্ছা, আপনার তাঁকে মনে পড়ে?"

বৃদ্ধ ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। পরে হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "অত্যন্ত অল্প অল্প মনে পড়ে, পড়ে না বললেই হয়। শুধু মনে পড়ে সে নাকে নোলক পরত, আর পায়ে মল। সে-সব ত এ-যুগের কথা নয়, তোমাদের পছন্দসই হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।"

মণীশ বুঝিত, বৃদ্ধ কথা এড়ানোর চেষ্টা করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে তাহার মনে হইত মহিমারঞ্জনের জীবনের শেষ আর কত দূরে! মৃত্যু মানুষের জীবনে কখন আসিবে আমরা জানি না, কিন্তু সময়ভেদে আমাদের শোকেরও তারতম্য ঘটে। যুবকের মৃত্যুতে আমরা দীর্ঘশ্বাস ফেলি, ভাবি, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়ার আগেই মৃত্যু তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া গেল। আর বৃদ্ধের মৃত্যু আমাদের কাছে উৎসব। জীবনটাকে যত দূর সম্ভব নিঃশেষে যে ভোগ করিয়াছে, আয়ুশেষে তাহার মৃত্যুতে আমাদের দুঃখের কি রহিয়াছে? হয়ত কিছুই নাই।

কিন্তু মণীশের মনে হয়, বার্দ্ধক্যে মৃত্যুর আক্রমণের চেয়ে করুণতর আর কিছু নাই। ছিয়াশি পার হইয়া যে-বৃদ্ধ বাঁচিয়া রহিয়াছেন, প্রতি হৃৎস্পন্দনে মৃত্যুর পদধ্বনি যাঁহার কানে পৌঁছাইতেছে, তাঁহার সে জীবনের মত করুণ, অশ্রুসজল আর কিছু আছে একথা মণীশ ভাবিতে পারে না। এই পৃথিবীতে রহিয়াছি, পরমুহূর্ত্তেই আর থাকিব না—বৃদ্ধের মৃত্যু বলিয়া কেহ দু-ফোঁটা অশ্রুও ফেলিবে না।

এ যে আনন্দের মৃত্যু! জীবনের কাজ যাহার ফুরাইয়াছে, যথাকালে যাহার ওপারের ডাক আসিয়াছে, তাহার জন্য ব্যর্থ অশ্রুপাত করিলে চলিবে কেন? কিন্তু মণীশ ভাবে, মৃত্যুর সার্থকতা ঐ অশ্রুটুকুর ভিতরে।

পূজার গোলমাল মিটিয়া গিয়াছে। দ্বাদশীর সন্ধ্যা। সারা আকাশ পৃথিবী সাদা করিয়া চাঁদ উঠিয়াছে।

বাহিরে ভাল লাগে না, মণীশ ভিতর-বাড়ীতে গেল। অধিকাংশ ঘরই অন্ধকার। ভিতরের উঠানের সামনে রোয়াক জুড়িয়া বসিয়া তিনটি বধূ রাশীকৃত মাছ কুটিতেছে। কেরোসিনের ডিবের ধূমে ও গন্ধে চারি দিক আচ্ছন্ন।

মণীশ বাহিরে ফিরিয়া আসিল। উঠানের উপর সমস্ত সাদা। ঘাসের উপরের শিশিরে জ্যোৎস্না পড়িয়া চিক্‌চিক করিতেছে। দরজার বাহিরে পুকুরধারের পত্রাবরণ চাঁদের আলো কতক ভেদ করিয়াছে, কতক করে নাই। আলো-আঁধারে অপরূপ মায়াজালের সৃষ্টি করিয়াছে।

বাহিরের বারান্দায় যোল-সতের বছরের কয়েকটি মেয়ে হাসি গল্প জুড়িয়াছে।

একটি প্রৌঢ়া বিধবা অতি-সন্তর্পণে একটি মাটির প্রদীপ লইয়া উঠান পার হইয়া ভিতর-বাড়ীতে ঢুকিল। খানিক পরে এদিক-ওদিক তাকাইতে তাকাইতে বাহির হইয়া আসিল। খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল।

পাশের একটি মেয়েকে মণীশ জিজ্ঞাসা করিল, "কে রে হাসি?"

হাসি অবাক হইয়া কহিল, "ওকে চেন না? ও কুমোর-বাড়ীর মতি-কুমোরের বৌ। ওর আট-নয় বছরের বোবা কালা পাগল ছেলেটা মধ্যে মধ্যে হারিয়ে যায়, ও খুঁজে বেড়ায়। হাতে পিদিম না থাকলে পাগল ছেলেটা মাকে চিন্‌তে পারে না।"

মণীশ চুপ করিয়া রহিল।

মনের মধ্যে কত স্বপ্ন ভাসিয়া আসে। প্রায় সত্তর বৎসর আগেকার কথা।

এখন চোখে দেখেন না, গ্রামের অবস্থা কি রকম দাঁড়াইয়াছে তাহা বৃদ্ধের চোখে পড়ে না। অবশ্য পরিবর্ত্তন নিশ্চয়ই অনেক হইয়াছে। কিন্তু এখন তিনি মনের চোখ দিয়া যে-গ্রাম, যে-বাড়ী দেখিতেছেন সে সত্তর বৎসর আগেকার গ্রাম।

পাকাবাড়ী নহে, বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থের চালাঘর। বাড়ীতে লোক খুব বেশী নয়, কিন্তু গ্রামে অনেক লোক। উঠানের চার পাশ দিয়া মজবুত বাঁশের বেড়া, তাহার ধারে ধারে নানা রকমের গাছ উঠিয়া দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছে। বাহিরে ও ভিতরে দুইটি পুকুর। বাহিরের পুকুরটিই বড়। পুকুরপাড়ে বিস্তীর্ণ জমি লইয়া ফুলের বাগান, দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। সাদা, লাল, গোলাপী, বেগুনী নানা রঙের ফুল, তাহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী চোখে পড়ে বড় বড় স্থলপদ্ম। স্থলপদ্মের গাছ আগে এই বাড়ীর সকল স্থান ভরিয়া ছিল। ফিকে লাল ফুলগুলি উৎসবের বাড়ী আনন্দের রঙে রাঙাইয়া তুলিত। এখন কি আর স্থলপদ্মের গাছ আছে? ভিতরের উঠানে শিউলি গাছগুলিই কি আর আছে? তকতকে করিয়া নিকানো গাছের তলা, তাহার উপরে ভোরবেলায় রাশীকৃত শিউলি ফুল লাল রঙের বোঁটা লইয়া স্তূপীকৃত হইয়া জমিয়া থাকিত। ছয়-সাতটি ছোট ছোট মেয়ে সেই ফুল কুড়াইয়া সাজি বোঝাই করিত, পূজার জন্য তত নয়, কাপড় ছোপাইবার লোভে। এখনকার মেয়েরা কি শিউলি গাছের তলায় তেমনি করিয়া ভিড় জমায়?

এই বাড়ীর সামনের মেঠো রাস্তা নানা বাড়ীর পাশ দিয়া, উঠানের ভিতর দিয়া, জঙ্গল ভেদ করিয়া নদী অবধি গিয়াছে। ভৈরবের বুকে ডিঙী লইয়া বৈঠা ঠেলিয়া ঘুরিয়া বেড়ান যে কত আমোদ ছিল, সে-কথা কি আজকালকার ছেলেরা জানে।

বাহাত্তর বৎসর আগের এক পূজার কথা মনে পড়িয়া যায়। ছয় জনের ডিঙীতে নয় জনে বসিয়া ভৈরবের উপর দিয়া তাঁহারা পাড়ি দিয়াছিলেন এক বৈকালে, নদীর পাশে যেখানে বড় খাল বাহির হইয়া গিয়াছে সেইখানে। বড় খালের মধ্য দিয়া পাড়ি দিয়া ছোট খাল, সেখান দিয়া আরও আধ ক্রোশ বৈঠা ঠেলিয়া বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত। সেখানে ডিঙীতে বসিয়া নদীর ধারের একটি জিওল গাছে ডাব রাখিয়া ডাব কাটিতে গিয়া কেমন করিয়া এক জন জলে পড়িয়া গেল, কেমন করিয়া সে সেই ভিজা কাপড়ে সমস্ত পথ নৌকায় বসিয়া বাড়ী ফিরিল, কাহারও সহিত কথা কহিল না, সে-সব স্পষ্ট মনে পড়ে।

আশ্চর্য্য! অত দিন আগের কথা এখন সহসা মনে পড়িল কেমন করিয়া? ঠিক যেন কাল্‌কের কথা!

আরও একটা ঘটনা মনে পড়ে। ষোল বছর বয়সে এক রাত্রে বাজনা, কোলাহল, লোকের হৈচৈয়ের মধ্যে কাহারা যেন একটি ত্রয়োদশী রূপসীকে তাঁহার জীবনের সহিত গাঁথিয়া দিয়াছিল। ফুট্‌ফুটে সুন্দর একটি মেয়ে। নাকে একটি মুক্তার নোলক, সারা গায়ে গহনা। ঘরের কাজ যখন করিত, মল ও চুড়ির সম্মিলিত আওয়াজে সঙ্গীত বাজিয়া উঠিত। তাহার নাম সরযূ। এত দিন তাহার স্মৃতির কণামাত্রও তাঁহার মনে অবশিষ্ট ছিল কিনা সন্দেহ, কিন্তু আজ সব মনে পড়িতেছে। মুখখানি পরিষ্কার মনে আছে। হরেকৃষ্ণ পালের গড়া লক্ষ্মীপ্রতিমার মত মুখ; বধূ বাড়ী আসা মাত্র কেহ কেহ বলিয়াছিল।

চার বছর পরে সরযূ কোন্ দূরলোকে প্রস্থান করিল?

বৃদ্ধ অস্থির হইয়া উঠিলেন। কতটুকুই বা ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল যাহার জন্য ঘরের সব কয়টি জানালা বন্ধ করিয়া তাঁহাকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছে! উঃ, যদি কেহ সব কয়টা জানালা টান করিয়া খুলিয়া দিত! এই মশারিটা ছিন্নভিন্ন করিয়া দূরে ফেলিয়া দিত!

হাতে কি একটুও জোর নাই? বৃদ্ধ হাত তুলিয়া মশারি সরাইতে চেষ্টা করিলেন, হাত একটুও নড়িল না। উঠিয়া বসিতে চাহিলেন, শায়িত অবস্থা হইতে এক চুলও সরিতে পারিলেন না। এতখানি অসামর্থ্য ত কোন দিনও হয় নাই।

তবে হয়ত এ-ই মৃত্যুর আগমনের পূর্ব্বাভাস।

মহিমারঞ্জনের সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভরিয়া উঠিল। না, না, মরিতে তিনি চান না, ছিয়াশি বছর ধরিয়া যে-ধরাকে আপনার সুখ-দুঃখ সব দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, তাহাকে এক কথায় তিনি ছাড়িতে পারেন না, কিছুতেই না।

মৃত্যু অন্ধকার, মৃত্যু কুৎসিত। মৃত্যুর ওপারে কিছু নাই, শুধু আছে অপার বিস্মৃতি। এই শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধপূর্ণ ধরণীকে ছাড়িয়া কোন্ প্রাণে তিনি সে বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত হইবেন? যদি এই অন্তিম মুহূর্ত্তে তাঁহার সমস্ত জীবনের বিশ্বাস ভুলিয়া পরকাল সম্বন্ধে নূতন করিয়া ধারণা গড়িয়া লইতে পারিতেন! মৃত্যু যদি এক জীবন হইতে অন্য জীবনের মধ্যে বিরাম-স্বরূপ হইত! যদি আবার তিনি এই ধরণীতে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন, নূতন দেহ, নূতন জীবন লইয়া!

ধীরে ধীরে এ-চিন্তাটুকুও তাঁহার আচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। হয়ত এই নিদ্রা। বৃদ্ধ ঘুমাইয়া পড়িলেন।

শেষ রাত্রি। বাহিরে বৃষ্টি থামিয়া আকাশের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। চাঁদ উঠিয়াছে। একটি প্রাণীও জাগিয়া নাই। শুধু মণীশ দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে।

সে যুবক, সম্মুখে তাহার নব নব দিন পড়িয়া রহিয়াছে। ভবিষ্যৎ তাহার গোপনমঞ্জুষায় তাহার জন্য কি রত্ন রাখিয়াছে কে বলিতে পারে? জীবনের জয়যাত্রায় সে অগ্রসর হইবে, একটি তরুণীর প্রত্যাখ্যানের স্মৃতি পদদলিত করিয়া। সাফল্য সে পাইবে; হয়ত তাহার লুপ্তপ্রায় প্রেমও আবার নূতন করিয়া খুঁজিয়া পাইবে এই বাংলা দেশেরই কোন তন্বী মেয়ের বুকে। অথবা কি জানি, হয়ত সাফল্যের তৃপ্তিতে প্রেম অপ্রয়োজনীয় সামগ্রীতে পরিণত হইবে। সেই কি হইবে তাহার শুভদিন? মল্লিকার স্মৃতি কালের গতিতে ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে একেবারে মিলাইয়া যাইবে, প্রথম যৌবনের সে নিবিড় প্রেমের একটি কণাও হয়ত আর অবশিষ্ট রহিবে না। সে জানে জীবনের সোপানশ্রেণীর কয়েকটি মাত্র ধাপ সে পার হইয়াছে, এখনও অগণিত সোপান তাহার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। সাফল্যের উচ্চতম শিখরে সে উঠিবে। হয়ত তত দূর সে উঠিবে না, কিন্তু তাহার যৌবনের আশা ত তাহার সহায়!

সেই গভীর রাত্রিতে সে-বাড়ীতে যে আরও একটি প্রাণী জাগিয়া রহিয়াছে, অন্ধকার ঘরে স্বামীবিয়োগের ব্যাথায় যে অবিরল চোখের জল ফেলিতেছে, তাহার কথা তাহার মনে পড়িল না।

দীপান্বিতা এক প্রৌঢ়ার অসহায় শিশু বাড়ীতে মায়ের কাছে ফিরিয়াছে কিনা সে-কথা মনে আসিল না।

পাশের ঘরেই এক বৃদ্ধের ক্লান্ত নিদ্রা কখন শেষ নিদ্রায় পরিণত হইল সে খোঁজ সে রাখিল না।

তাহার মনে শুধু সবল যৌবনের অগণিত আশার আলোক। তাহার মধ্যে এখন অন্ধকার, নিরাশা, মৃত্যুর কোনও স্থান নাই।

তাহার জীবনে এখন প্রাতঃসূর্য্যের অরুণ আভা।
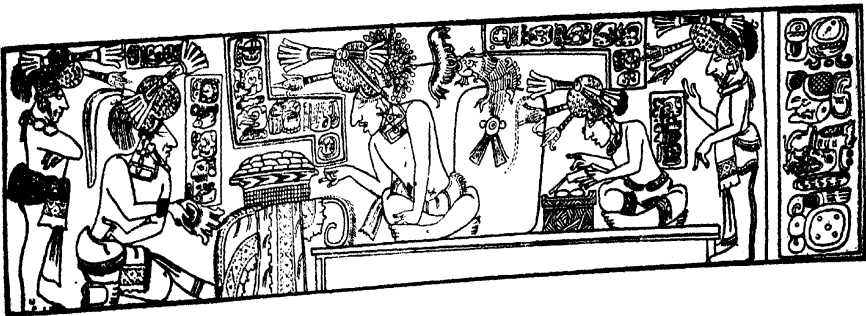
হাজার দর্শকের সম্মুখে দেখাইয়া সকলের তাক লাগাইয়া দিয়াছেন। নানাবিধ ব্যায়ামে তাঁহাদের ছন্দোবদ্ধ অঙ্গসঞ্চালন সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছে। তথায় দেশী এই সকল ক্রীড়া ও ব্যায়ামের বর্ণনা-পুস্তিকার চাহিদা হইয়াছে। তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের "যদি তোর ডাক শুনে কেও না আসে, তবে একলা চলরে", দল বাঁধিয়া গাইয়াও হাজার হাজার শ্রোতার আনন্দ ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের গান বঙ্গের নিরক্ষর সাধারণ লোকেও গায়, তাঁহার "জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা" ভারতবর্ষে সিন্ধু প্রভৃতি দেশে ও সিংহলে গীত হয়, কিন্তু "একলা চলরে" গানটি যে পৌরুষসম্পন্ন বহু মহারাষ্ট্রীয়ের হৃদয় জয় করিয়াছে, তাহা জানিতাম না।

আমাদের দেশী দৈহিক শক্তিবর্দ্ধক খেলাগুলির ও অধিকাংশ তদ্রূপ ব্যায়ামের একটি গুণ এই, যে, তাহাদের অনেকগুলির জন্য একটি পয়সারও সাজসরঞ্জাম কিনিতে হয় না, এবং যেগুলির জন্য সাজসরঞ্জাম আবশ্যক, তাহাদের উপকরণের মূল্যও সামান্য। সুতরাং ধনী নির্ধন সকলেরই এগুলি উপযোগী। বঙ্গে নিরক্ষর গ্রাম্য লোকদের মধ্যে এই রকম সব খেলা ও কুস্তি বরাবর প্রচলিত ছিল, এবং এখনও কিয়ৎপরিমাণে আছে—যদিও ফুটবল প্রভৃতিও তাহাদের মধ্যে ঢুকিয়াছে। আমরা বাল্যকালে ইস্কুলে পড়িবার সময় এই সকল খেলা খেলিতাম ও কুস্তি করিতাম। এখন কলিকাতায় ও অন্য কোথাও কোথাও এই সব খেলার আবার প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে। কিছু প্রচলন হইয়াছেও। ইহা শুভ লক্ষণ।

—

রামমোহন রায়ের ইংলণ্ডসহযাত্রী ব্যক্তিবর্গ

য্যালবিয়ন নামক জাহাজে রামমোহন রায় বিলাত গিয়াছিলেন। সেই জাহাজে আর কে কে গিয়াছিলেন, তাহার পূরা তালিকা এদেশের সরকারী দপ্তরে পাওয়া যায় নাই। অপর একটি, সম্ভবতঃ অসম্পূর্ণ, তালিকা ১৮৩১ সালের ২১শে জানুয়ারী তারিখের দক্ষিণ-আফ্রিকার "The Cape of Good Hope Government Gazette"এ ("দি কেপ অব্ গুড্‌হোপ গবর্মেণ্ট গেজেটে") পাওয়া গিয়াছে। ঐ সরকারী গেজেটটি তথাকার কর্ত্তৃপক্ষের প্রদত্ত ক্ষমতা ও অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত ("Published by Authority") হইত। ঐ সংখ্যার জাহাজী খবরের ("Shipping Intelligence"এর) মধ্যে এই সংবাদটি আছে :—

17th January, *Albion*, ship, Capt. M'Leod, from Calcutta 21st Nov., bound to Liverpool. Cargo sundries.—Passengers, Mesdames Gordon, Kemp and Sutherland; Capts. Thomson and Campbell; Misses Marshall and Kemp; Lieut. Campbell; Messrs Gordon, Cumming, Davison, Sutherland, Rammohun Roy, Rajah Baboo, Tebbs, Rollo, and Kemp; Master Kemp, and six servants. Sailed from Table Bay, January 23rd.

এই তথ্যটি শ্রীযুক্ত ডক্টর যতীন্দ্রকুমার মজুমদারের নিকট হইতে পাইয়াছি। তিনি উহা সম্প্রতি পাইয়াছেন। সংবাদটির মধ্যে 'রাজা বাবু' নামে রাজারামের উল্লেখ রহিয়াছে মনে করি।

—

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন

এত দিন কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন নাই, কংগ্রেসওয়ালাদিগকে উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে অনুমতি দেন নাই। কেন-না কংগ্রেস উহা মানিয়া লয়েন নাই, বর্জ্জনও করেন নাই। নূতন ব্যবস্থাপক সভাসমূহের যে সদস্য নির্ব্বাচন হইবে, কংগ্রেস তাহার জন্য সর্ব্বত্র নির্ব্বাচনপ্রার্থী খাড়া করিবেন। তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইলে ব্যবস্থাপক সভাসমূহে কিরূপ কাজ ও ব্যবহার করিবেন, কি কি উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টা করিবেন, তদ্বিষয়ে কংগ্রেস সম্প্রতি প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র বাহির করিয়াছেন। তাহাতে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, যে, বাঁটোয়ারাটা স্বাজাতিকতার বিরোধী, গণতান্ত্রিকতার বিরোধী, ও অনিষ্টকর, সুতরাং বর্জ্জনীয়। কংগ্রেস নূতন ভারতশাসন আইনটার দ্বারা বিধিবদ্ধ ভারতের মূল রাষ্ট্রবিধি (constitution)টাকেই বিনষ্ট করিতে চান; তাহা বিনষ্ট হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার অঙ্গীভূত বাঁটোয়ারাটাও যাইবে। কিন্তু কন্‌স্টিটিউশনটা না-গেলেও কংগ্রেস বাঁটোয়ারার উচ্ছেদ চান, ঘোষণাপত্রে তাহা বলা হইয়াছে।

বাঁটোয়ারাটার বিরুদ্ধে আন্দোলন সম্বন্ধে কংগ্রেস বলিয়াছেন, যে, কংগ্রেসওয়ালারা একা একা ব্যক্তিগত ভাবে উহার বিরোধিতা করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা সমষ্টিগত

ভাবে এমন আন্দোলন করিবেন না যাহা একপেশে ("one-sided") এবং যাহাতে এক সমষ্টি অপর সমষ্টিকে বঞ্চিত করিয়া লাভবান হইতে চাহিতেছে এরূপ মনে হয়। অর্থাৎ, সোজা কথায়, হিন্দুদের সমষ্টি মুসলমানদের সমষ্টির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবেন না।

কংগ্রেসের নির্দেশ মোটাম ঐ প্রকার। এ-বিষয়ে আমরা মডার্ণ রিভিয়ুতে লিখিয়াছিলাম, যে, কংগ্রেস যখন বাঁটোয়ারাটার উচ্ছেদ চান এবং কংগ্রেস এরূপ একটি বৃহৎ সমষ্টি যাহার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, শিখ, শ্রমিক, ধনিক, জমিদার, রায়ৎ, সকল দলেরই লোক আছেন বা থাকিতে পারেন, তখন কংগ্রেস স্বয়ংই তো বাঁটোয়ারাটার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে পারেন বা পারিতেন। তাহা 'একপেশে' আন্দোলন না হইয়া 'সব-পেশে' হইবে বা হইত।

সম্ভবতঃ এইরূপ কোন যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবেন স্থির করিয়াছে। তাঁহারা যে যুক্তিমার্গই অবলম্বন করিয়া থাকুন না কেন, তাঁহাদের সংকল্প ঠিকই হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয়ই আছেন। সুতরাং তাঁহাদের আন্দোলন "একপেশে" বলা চলিবে না।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি তাঁহাদের সংকল্প অনুসারে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইলে বঙ্গে কংগ্রেস স্বাজাতিক দলের ("Congress Nationalist Party"র) অস্তিত্বের প্রয়োজন থাকিবে না।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বঙ্গের এই সংকল্প সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত (৭ই সেপ্টেম্বর, ২২শে ভাদ্র পর্য্যন্ত) কিছু বলেন নাই।

—

রামমোহন রায় স্মৃতিমন্দির

প্রতিবৎসর ২৭শে সেপ্টেম্বর, রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিবসে, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ভারতবর্ষের নানা স্থানে সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের—সমগ্র মানবজাতির—সম্মানার্হ হইলেও, তিনি বাঙালী বলিয়া বাঙালীদেরই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হওয়া উচিত। অবশ্য, অন্য সকল কীর্ত্তিমান পুরুষদের মত তাঁহার কাজই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তথাপি, যেমন অন্য সব পুরুষশ্রেষ্ঠের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা তাঁহাদের স্বদেশবাসীরা করিয়া থাকেন ও করিয়াছেন, রামমোহনের জন্যও আমাদের তাহা করা উচিত। এই কর্ত্তব্য কিয়ৎ পরিমাণে সাধন করিবার নিমিত্ত কয়েক বৎসর হইল একটি কমিটি গঠিত হয়। তাহার চেষ্টায় রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগরে একটি স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই কমিটির সভাপতি মহারাজা প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর, কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অর্থসংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, এবং নিজেরাও যথেষ্ট টাকা দিয়াছেন। হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় এই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। ফলে স্মৃতিমন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু কণ্ট্র্যাক্টারের নিকট ৫০০০৲ (পাঁচ হাজার টাকা) ঋণ রহিয়াছে। তিনি ঐ টাকার জন্য নালিশ করিয়া আদালতে ডিক্রী পাইয়াছেন এবং যে-কোন সময়ে টাকা আদায়ের নিমিত্ত স্মৃতিমন্দিরটি নিলাম করাইতে পারেন। উহা নিলাম হইয়া গেলে বাঙালীর ঘোরতর কলঙ্ক হইবে। বাঙালী জাতির পক্ষে ৫,০০০ টাকা বেশী কিছু নয়। ধনী মধ্যবিত্ত সকলে কিছু কিছু দিলে উহা অনায়াসে উঠিয়া যায়। অতএব, অনুরোধ এই, যে, সকলে অবিলম্বে যথাসাধ্য টাকা কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুকে, টেম্পল চেম্বার্স, ৬ ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায়, কিংবা সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ৯, লোয়ার রডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায়, পাঠাইয়া বাঙালী জাতিকে কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিবেন।

—

প্রতিযোগিতা বনাম মনোনয়ন

বহুপূর্ব্বে ভারতীয় সিবিল সার্বিসে মনোনয়ন দ্বারা কর্ম্মচারীদের নিয়োগ হইত। তাহার কুফল দেখিয়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন ও নিয়োগের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। আগে কেবল লণ্ডনে এই পরীক্ষা হইত। কয়েক বৎসর হইল ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশেও হইতেছে।

যে-কারণেই হউক, কিছু দিন হইতে দেখা যাইতেছে, যে, প্রতিযোগিতায় যত ভারতীয় সফলকাম হইতেছে, তত ইংরেজ হইতেছে না। ইংরেজ যথেষ্ট সংখ্যায় ঐ চাকরিগুলিতে ঢুকাইবার নিমিত্ত ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন

ইর আমেরিকা ও ইংলণ্ডে প্রকাশক পাওয়া যায় কিনা, ়ই বিষয়ে সাণ্ডার্ল্যাণ্ড সাহেবকে চিঠি লিখি। সেগুলি বর্মেণ্টের দ্বারা নিষিদ্ধ নহে। তাহার উত্তরে তিনি ১৯৩৪ ালের ৩০শে জুলাই লেখেন :—

"You write concerning a publisher for he...... books in England or America or ›oth countries...... I wish such a publisher ›ould be found. But I regret to say, I see ittle hope; certainly little hope in America ınd not much in England. My publisher, Mr. Copeland, has gone out of business. I ried fourteen publishers, before I found one hat would touch my book, with one excep- ion: the Putnams would issue it and handle t for 6,000 dollars, but would guarantee nothing and would not advertise it. All were afraid of Britain. Copeland was sym- pathetic with India, but I had to pay him 2,000 dollars down and 1,000 dollars more later on, for advertising. In all, my book cost me over 4,000 dollars, and but for what you sent me from India my total expense would have been over 5,000 dollars. I have sent copies of the new revised edition (American) to 450 of the leading libraries of all the countries of the world, at my own expense. So it is pretty well distributed and pretty easily obtainable in all lands.

"I think I wrote you that.... got.... in London to promise to publish it there in a somewhat abridged edition. I prepared the abridgement..... accepted it, marked the manuscript all through for his printers and advertised that it would be issued soon. Then some influence (of course the.....) stopped it; and without a word of explana- tion the manuscript was returned to me.

"I do not think it possible that you can get an American publisher. And I am sorry to say, I cannot help you; because I am known as the author of 'India in Bondage', a book banned by Great Britain in India."

তাৎপর্য্য। "আপনি ইংলণ্ড বা আমেরিকায় কিংবা উভয় দেশে বহি দুটির কোন প্রকাশক পাওয়া সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। ওরূপ প্রকাশক পাইবার অভিলাষ হয় বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার কোন আশা দেখিতেছি না—আমেরিকায় নিশ্চয়ই সামান্য আশা এবং ইংলণ্ডেও বেশী নয়। আমার ইণ্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজের প্রকাশক মিঃ কোপল্যাণ্ড এখন পুস্তক-প্রকাশ ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়াছেন। যিনি আমার বহি স্পর্শ করিবেন এরূপ এক জন প্রকাশকও পাইবার আগে আমি চৌদ্দ জন প্রকাশকের কাছে গিয়াছিলাম। এক জন ছাড়া কেহই তাহা ছুঁইতেও চায় নাই—সেই প্রকাশক পটন্যামরা (Putnams)। তাহারা বলিয়াছিল, '৬০০০ ডলার (১৮০০০ টাকা) দিলে আমরা ইহা প্রকাশ করিব, দোকানে রাখিব, কিন্তু ইহার বিজ্ঞাপন দিব না, এবং কোন লাভ আপনাকে দিবার গ্যারাণ্টি দিব না।' সব প্রকাশকই ব্রিটেনের ভয়ে ভীত। কোপল্যাণ্ডের ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতি ছিল। কিন্তু আমাকে ২০০০ ডলার (৬০০০ টাকা) অগ্রিম তাঁহাকে দিতে হইয়াছিল, এবং পরে বিজ্ঞাপন দিবার নিমিত্ত আরও এক হাজার ডলার। সর্ব্বসমেত আমাকে বহিটির জন্য ৪০০০ ডলারের উপর খরচ করিতে হইয়াছিল; এবং আপনি (ঐ বহির লভ্যাংশ হিসাবে) আমাকে যাহা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা না পাইলে আমার মোট খরচ ৫০০০ ডলারের উপর হইত। নূতন আমেরিকান সংস্করণের ৪৫০ খানি বহি আমি পৃথিবীর সব দেশের প্রধান প্রধান লাইব্রেরীতে নিজ ব্যয়ে পাঠাইয়াছি। সেই জন্য ইহা ভালই বিতরিত হইয়াছে এবং সব দেশেই অনেকটা সহজে পড়িতে পাওয়া যায়।

"আমার বোধ হয় আপনাকে লিখিয়াছিলাম, যে,—[ভারতবর্ষে সুপরিচিত এক জন ইংরেজ বন্ধু] লণ্ডনের—কে [কোনও প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশককে] আমার বহিখানি কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ করিয়াছিলেন। আমি সংক্ষিপ্ত পাণ্ডুলিপিটি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলাম।—[ঐ প্রকাশক] উহা গ্রহণ করিয়া ছিলেন ও সমস্ত পাণ্ডুলিপি তাঁহার মুদ্রাকরের জন্য, কোন্ অংশ কিরূপ অক্ষরে ছাপা হইবে, তাহা দাগ দিয়া দিয়াছিলেন, এবং বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, যে, উহা শীঘ্র বাহির হইবে। তাহার পর কোন প্রভাব (অবশ্য,—) উহার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিল, এবং আমাকে কৈফিয়ৎ বা মাফ চাওয়া হিসাবে একটা কথাও না লিখিয়া ঐ ইংরেজ প্রকাশক পাণ্ডুলিপিটি ফেরত পাঠাইয়া দিলেন।

"আপনার কোন আমেরিকান্ প্রকাশক পাইবার কোন সম্ভাবনা আছে মনে হইতেছে না। এবং আমি অত্যন্ত

দুঃখিত, যে, আপনার কোন সাহায্য করিতে পারিতেছি না; কেন না, গ্রেট ব্রিটেন দ্বারা ভারতবর্ষে যে ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজ বহির প্রকাশ ও প্রচার নিষিদ্ধ হইয়াছে আমি তাহার লেখক বলিয়া বিদিত।"

সাণ্ডার্ল্যাণ্ড সাহেবের চিঠি হইতে উদ্ধৃত ইংরেজী বাক্যগুলিতে ও তাহার অনুবাদে কয়েকটি নাম অপ্রকাশিত রাখিয়াছি।

তিনি তাঁহার ইণ্ডিয়া ইন বণ্ডেজের একটি সংক্ষিপ্তসার পুস্তিকা নিজ ব্যয়ে ছাপাইয়া পৃথিবীর নানা সভ্য দেশে সাত হাজার খানা বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্ত গ্রন্থখানি সর্ব্বত্র ভারতের স্বশাসন-অধিকারের সমর্থক সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক বহি বলিয়া স্বীকৃত।

তিনি ১৮৯৫ সালে প্রথম ভারতবর্ষে আসেন। তখন তাঁহার সহিত আমার এলাহাবাদে পরিচয় হয়। সে-বার তিনি পুনায় কংগ্রেসে, সমাজসংস্কার কন্‌ফারেন্সে, ও একেশ্বরবাদীদের কন্‌ফারেন্সে বিশেষভাবে যোগ দিয়াছিলেন। তাহার অনেক বৎসর পরে ১৯১০ সালে আর একবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তখন কলিকাতায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের অতিথি ছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিজ জ্ঞান সর্ব্বদা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত ও ভ্রান্তিহীন রাখিবার নিমিত্ত তিনি ভারতবর্ষের সাতটি খবরের কাগজের গ্রাহক ছিলেন এবং প্রধান প্রধান সমুদয় সাময়িক পত্র লইতেন। আমেরিকায় এবং আরও অনেক দেশে, ভারতবর্ষ ও ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে বিস্তর ভ্রান্ত মত ও মিথ্যা কথা প্রচারিত হয়। এরূপ কিছু আচার্য্য সাণ্ডার্ল্যাণ্ডের চোখে পড়িলেই তিনি অবিলম্বে তাহার প্রতিবাদ করিয়া সত্য প্রকাশ করিতেন। ইহা অনেক বার দেখিয়াছি।

আমাদের দেশে তিনি বিশেষতঃ রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ের পর্য্যালোচক ও লেখক বলিয়া পরিচিত থাকিলেও, তাঁহার প্রধান কাজ ছিল ধর্ম্ম ও তত্ত্ববিদ্যাবিষয়ে উপদেশ দেওয়া এবং পুস্তিকা ও পুস্তক লেখা। তিনি সাতিশয় জ্ঞানী ও উদার-মতাবলম্বী ছিলেন। মডার্ণ রিভিয়ুতে ইংরেজী সাহিত্যের লেখকদের সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার প্রবন্ধগুলি তাঁহার সাহিত্যরসগ্রাহিতার পরিচায়ক।

তিনি পৃথিবীর সকল দেশের স্বাধীনতার সমর্থন করিতেন এবং যুদ্ধের উচ্ছেদ ও সর্ব্বত্র শান্তির প্রতিষ্ঠার জন্য বরাবর চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বিদেশে তাঁহা অপেক্ষা ভারত-প্রেমিক ও অক্লান্তকর্ম্মা ভারতহিতৈষী কেহ ছিলেন বলিয়া আমরা অবগত নহি।

আচার্য্য সাণ্ডার্ল্যাণ্ড

—

ইন্দুভূষণ দত্ত

কুমিল্লা য়ুনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইন্দুভূষণ দত্ত মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে বাংলা দেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। এই ব্যাঙ্কের অন্যান্য কর্ম্মীদের ন্যায্য প্রাপ্য প্রশংসা করিয়াও ইহা বলা যাইতে পারে, যে, এই ব্যাঙ্ক যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহার যে অনেকগুলি শাখা খোলা হইয়াছে ও তৎসমুদয়ের কাজ উত্তমরূপে চলিতেছে এবং ইহা

ইন্দুভূষণ দত্ত

ধ্যানচন্দ
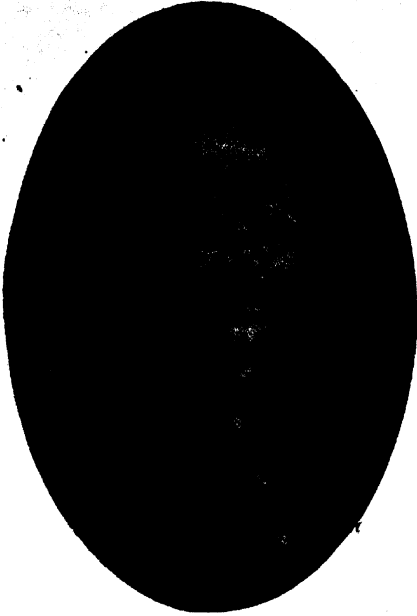
যে এক্ষণে বঙ্গের ও বাঙালীদের একটি প্রধান ব্যাঙ্ক, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ তাঁহার ব্যবসাজ্ঞান, দক্ষতা, শ্রমশীলতা ও সততা।

তিনি কয়েক বৎসর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন এবং তখন তথায় স্বাধীনচিত্ততা, দেশহিতৈষণা ও নৈপুণ্যের সহিত কাজ করিয়াছিলেন।

তিনি অল্পভাষী, মিষ্টভাষী, নম্র, নিরহঙ্কার ও অনাড়ম্বর বলিয় জনপ্রিয় ছিলেন।

তিনি দেশে ও ইংলণ্ডে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, এবং চিরকৌমার্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।

তাঁহার মত এক জন মানুষের মৃত্যু অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে হইলেও তাহা শোকের কারণ হইত। কিন্তু তিনি যে তাঁহার বর্ষীয়সী জননীর জীবিত কালে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু আরও বেদনাদায়ক হইয়াছে।

—

বার্লিনে ওলিম্পিক খেলাধুলা

প্রাচীন কালে গ্রীস দেশে ওলিম্পিয়ায় প্রতি চতুর্থ বৎসরে দৈহিক শক্তি ও দক্ষতার পরিচায়ক নানাবিধ ক্রীড়া ও দৌড়ের প্রতিযোগিতা, সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা এবং সংগীতের প্রতিযোগিতা হইত। ইহাই সেকালের ওলিম্পিক গেম্‌স্। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে ইহার পুনরুজ্জীবন হয় এবং তাহার পর পৃথিবীর নানা দেশে পর্য্যায়-ক্রমে ইহা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আধুনিক ওলিম্পিক গেম্‌সে সাহিত্যের ও সংগীতের প্রতিযোগিতা হয় না।

নানা দেশের ব্যায়ামবীর ও খেলোয়াড়রা এবার এই উপলক্ষ্যে বার্লিনে সমবেত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতেও কয়েক জন গিয়াছিলেন। হকী খেলার প্রতিযোগিতায় ভারতীয়েরা পৃথিবীর অন্য সব দেশের হকীর দলকে পরাজিত করিয়াছে। আগেকার দুই বারের ওলিম্পিক গেম্‌সেও হকীতে ভারতীয়েরা জিতিয়াছিল। অন্য কোন প্রতিযোগিতায় ভারতীয়েরা কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। ভারতবর্ষের হকী খেলোয়াড়দের মধ্যে ধ্যানচন্দ সমধিক বিখ্যাত।

—

ব্রিটেনের যুদ্ধে ভারতের যোগ না-দিবার প্রস্তাব

ব্রিটেন তাহার সাম্রাজ্যিক নীতির অনুসরণ করিয়া নানা যুদ্ধ করিয়াছে এবং পরেও করিতে পারে। যে-সব দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে এই সকল যুদ্ধ করা হয়, তাহাদের সহিত ভারতবর্ষের কোন শত্রুতা নাই। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের সহিত কোন দেশের "গবর্মেণ্টেরই" মিত্রতা বা শত্রুতা হইতে পারে

না; কারণ, ভারতবর্ষ পরাধীন বলিয়া সাক্ষাৎ ভাবে কোন দেশের গবর্মেণ্টের সহিত কোন প্রকার কথাবার্ত্তা চালাইতে বা সন্ধিবিগ্রহ করিতে পারে না। সব দেশের বহুসংখ্যক লোকের সহিত কিন্তু ভারতবর্ষের লোকদের বন্ধুত্ব হইতে পারে।

গত লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে সভাপতিরূপে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু তাঁহার অভিভাষণে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যিক যুদ্ধসমূহে ভারতবর্ষের যোগ না-দেওয়ার সমর্থন করেন। এরূপ যুদ্ধে ভারতবর্ষের যোগ না-দেওয়ার পোষকতা করিয়া কংগ্রেসের এই লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। কংগ্রেসের এই নীতির অনুসরণ করিয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম মান্দ্রাজী সভ্য মিঃ সত্যমূর্ত্তি তাহাতে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, যে, ব্রিটেন যদি কাহারও সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে কোন প্রকার সাহায্য করিবে না। কিন্তু গবর্ণর-জেনারেল ঐ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে অনুমতি দেন নাই।

আমাদের বিবেচনায় উহা উপস্থিত করিবার অনুমতি দিলে গবর্মেণ্টের কার্য্যতঃ কোন ক্ষতি হইত না। কারণ, ভোটের আধিক্যে উহা গৃহীত হইলেও, ব্রিটেনের যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদলকে নিযুক্ত করিতে গবর্মেণ্টের ক্ষমতা লুপ্ত হইত না; দেশী রাজ্যের রাজারা ও ব্রিটিশ-ভারতের ধনী লোকেরাও যে কারণেই হউক, গবর্মেণ্টকে অর্থ, সামগ্রী ও মানুষ দিয়া সাহায্যও করিত। অন্য দিকে, ইহাও নিশ্চিত, যে, ব্যবস্থাপক সভার অনেক সভ্য প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে ভোট দিত এবং সরকার-পক্ষের যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিবার সুযোগ হইত।

কিন্তু গবর্মেণ্ট বলিতে পারেন, এই প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হইলে ইহা সুস্পষ্ট হইত, যে, ব্রিটেনকে যুদ্ধে সাহায্য করার বিরুদ্ধে ভারতে কতকটা প্রবল জনমত আছে। কিন্তু এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতে না-দেওয়াতেও কি তাহাই পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হইতেছে না? গবর্ণর-জেনারেল যে অনুমতি দেন নাই, লোকে পরাজয়ের ভয়ই তাহার কারণ বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছে। ব্রিটেনের যুদ্ধে যে ভারতবর্ষের যোগ দেওয়া উচিত, গবর্মেণ্ট তাহা ভারতীয়দিগকে বুঝাইয়া দিবার সুযোগ কেন গ্রহণ করিলেন না?

যুদ্ধ জিনিষটাকেই আমরা পছন্দ করি না। তা ছাড়া, ব্রিটেনের শত্রু মাত্রেই যে ভারতবর্ষের শত্রু, ইহা ত মোটেই সত্য নহে। সুতরাং ব্রিটেন কাহারও সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, ভারতবর্ষকেও ব্রিটেনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ নহে। আর, ব্রিটেন কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সব অংশকেই ব্রিটিশ পক্ষে তাহাতে যোগ দিতে হইবে, সাম্রাজ্যিক কন্‌ফারেন্স (Imperial Conference) এরূপ নীতির সমর্থন করেন নাই। সাম্রাজ্যিক কন্‌ফারেন্স বরং ইহাই স্থির করিয়াছেন, যে, ব্রিটেন কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্বশাসক ডোমীনিয়নগুলি তাহাতে যোগ দেওয়া না-দেওয়া সম্বন্ধে স্বাধীন থাকিবে। তাহারা যোগ দিতে পারে, নিরপেক্ষও থাকিতে পারে;—কেবল ব্রিটেনের শত্রুপক্ষের সহিত তাহারা যোগ দিতে পারে না। স্বশাসক ডোমীনিয়নগুলির বেলায় যে নীতি অনুমোদিত হইয়াছে, ভারতবর্ষের বেলায় কেন তাহা স্বীকৃত হইবে না? সত্য বটে, ভারতবর্ষ এখনও স্বশাসক ডোমীনিয়ন হয় নাই। কিন্তু ডোমীনিয়নগুলির প্রতিনিধিদের সহিত ভারত-গবর্মেণ্টের প্রতিনিধিও সাম্রাজ্যিক কন্‌ফারেন্সে যোগ দিয়া আসিতেছে, এবং এক জন ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ অনুসারে ডোমীনিয়ন না হইলেও, এই দেশ কার্য্যতঃ ডোমীনিয়নত্ব ("Dominion status in action") পাইয়াছে! ডোমীনিয়নগুলিকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে টানিয়া আনা যদি অন্যায় হয়—এবং তাহা অন্যায় বলিয়া স্বীকৃতও হইয়াছে, তাহা হইলে ভারতবর্ষকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে টানিয়া আনা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না।

অবশ্য, ডোমীনিয়নগুলি স্বশাসক বলিয়া তাহাদের ব্যবস্থাপক সভার মত অধিবাসীদিগের মত বলিয়া গৃহীত হয়। ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভাগুলির মত ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মত বলিয়া ধরা যায় না, কারণ সদস্যেরা সকলে দেশের লোকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত নহেন। কিন্তু সেটা ভারতবর্ষের দোষ নয়। অপিচ, নির্ব্বাচিত সমুদয় বা অধিকাংশ সদস্যের মতকে ত দেশের লোকদের মত বলিয়া মানা উচিত?

ভারতবর্ষ যত দিন পরাধীন থাকিবে, তত দিন তাহার সৈন্যদলকে ব্রিটেন যে-ভাবে ইচ্ছা কাজে লাগাইবেই। অবশ্য, কেহ এ কথা বলিতে পারেন, তাহা হইলে কোন ভারতীয় যাহাতে সৈনিক হইতে না-পারে, তদ্রূপ আন্দোলন করা হউক। কিন্তু এমন কথা কংগ্রেসও বলেন নাই। মহাত্মা গান্ধীও একাধিক বার বলিয়াছেন, যে, পৃথিবীর "সভ্যতা"র বর্ত্তমান অবস্থায় সৈন্যদলের অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ কতকগুলি লোকের যুদ্ধবিদ্যা জানা চাই—অবশ্য দেশরক্ষার জন্য। এখন অনেক দেশে এক দল লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে যাঁহারা মনে করেন, শত্রু দেশ আক্রমণ করিলেও আত্মরক্ষার জন্যও যুদ্ধ করা উচিত নয়। মহাত্মা গান্ধীর মত ঠিক্ এই দলের মতের ন্যায় কি না জানি না। কিন্তু সাধারণতঃ লোকে মনে করে, যে, দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ অবশ্যই করা উচিত। তাহা হইলে, অন্ততঃ কতকগুলি ভারতীয়ের যুদ্ধবিদ্যা জানা চাই। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদলে প্রবেশ না-করিলে বহুসংখ্যক ভারতীয় লোকের ভাল করি

যুদ্ধবিদ্যা শিখিবার অন্য উপায় নাই। যদি কেহ বলেন, ভারতীয় সৈন্যদল ইংরেজের অধীন, অতএব তাহাতে ঢুকিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখিব না, দেশ স্বাধীন হইবার পর যুদ্ধবিদ্যা শিখিব ও দেশরক্ষায় সমর্থ হইব, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, "স্বাধীন ভারতে আপনারা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইবার পূর্ব্বেই—কারণ শিখিতে সময় লাগিবে—যদি কোন বিদেশী জাতি ভারত আক্রমণ করে, তাহা হইলে দেশরক্ষার কি ব্যবস্থা করিবেন ?"

আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি, ভারতবর্ষকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্রিটেনের কোন যুদ্ধে টানিয়া লইয়া যাওয়া উচিত নহে। কিন্তু, যুদ্ধবিদ্যা ভারতীয়দের শিক্ষা করা আবশ্যক ও উচিত, না, অনাবশ্যক ও অনুচিত ? আবশ্যক ও উচিত হইলে, ভারতীয় সৈন্যদলে না গিয়া তাহা শিখিবার কি উপায় আছে ? ভারতীয় সৈন্যদলে যাইব অথচ গবর্মেণ্টের হুকুমে ব্রিটেনের যুদ্ধে যোগ দিব না, বর্ত্তমানআইনবিরুদ্ধ এরূপ আচরণ চলিতে পারে কি না ?—ইত্যাদি নানা প্রশ্ন উঠে। তদ্বিষয়ে চিন্তা করা আবশ্যক।

—

বাঙালী মুসলমানদের একতা

অমুসলমানদের এইরূপ একটা ধারণা থাকিতে পারে, যে, মুসলমানদের মধ্যে খুব ঐক্য আছে। হয়ত হিন্দুদের চেয়ে তাঁহাদের মধ্যে ঐক্য বেশী, এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে কিছু করিতে হইলে তাঁহাদের প্রায় সবাই একমত ইহাও সত্য হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দলাদলি আছে দেখিতেছি, এবং মুসলমানদের মুখেই তাহা শুনিয়াছি। আমরা তাঁহাদের একতা চাই। যদি তাঁহারা একমত হইয়া দেশহিতকল্পে হিন্দুদের সহিত যোগ দেন, তাহা হইলে ত খুবই ভাল। কিন্তু যদি তাহা না-করেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের ঐক্য বাঞ্ছনীয়। কারণ একতা শক্তির জননী, এবং মানুষকে হিতসাধনে সমর্থ করে। তা ছাড়া, যদি হিন্দুদের মুসলমানদের সহিত কোন কারণে কোন কথাবার্ত্তা চালাইতে হয়, তাহা হইলে একদলভুক্ত মুসলমানদের সহিত আলোচনা নানা মুসলমান দলের সহিত আলোচনার চেয়ে সুবিধাজনক। বহু দল থাকার অসুবিধা এই, যে, এক দল যদি বা একটা প্রস্তাবে রাজী হন, ত অন্য কোন-কোন দল বাকিয়া বসিতে পারেন।

আমরা জানি, অধিকাংশ লেখাপড়া-জানা রাজনৈতিক-মতিবিশিষ্ট ('politically-minded') মুসলমান হিন্দুদিগকে অবিশ্বাস করেন ও সন্দেহের চক্ষে দেখেন। তাহা জানিয়াও কর্ত্তব্যবোধে তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি।

ধর্ম্মবিষয়ে সমগ্র ভারতের ও সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানদের স্বার্থ এক কিনা—এক হইতেও পারে—তাহার আলোচনা করিব না। ইহা করিবার প্রয়োজন আমাদের নাই, যোগ্যতাও নাই। আমরা কেবল রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক আলোচনাই কিঞ্চিৎ করিব। কিন্তু তাহা বিশেষ করিয়া হিন্দুদের স্বার্থের দিক্ দিয়া করিব না।

সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ যাহা, বঙ্গেরও তাহা—বঙ্গের হিন্দুদেরও তাহা এবং বঙ্গের মুসলমানদেরও তাহা। কিন্তু এগুলি ছাড়া প্রদেশগুলির কিছু আলাদা আলাদা রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ আছে। লেখাপড়া-জানা বাঙালীরা জানেন, অবাঙালীদের মিলের কাপড়, চিনির কারখানার চিনি, ইত্যাদির কাটতি বঙ্গেই বেশী। সেই জন্য অবাঙালীরা বঙ্গে বাঙালীর কাপড়ের কল, চিনির কল, লবণপ্রস্তুতির কারখানা ইত্যাদি সুনজরে দেখে না। এই সব পণ্যশিল্পের ক্ষেত্রে অবাঙালী মুসলমান নেতারা কেহ কি বাঙালী মুসলমানদিগকে উৎসাহ দিয়া বলিয়াছেন, "ভাই, তোমরা এই সব কারখানা কর।" কেহই বলেন নাই। বঙ্গের পাট উৎপন্ন করে যে-সব চাষী, তাহাদের অধিকাংশ মুসলমান। পাটশুল্কের সব টাকাটা বাংলা দেশ পাইলে, মুসলমানদেরই সুবিধা সব চেয়ে বেশী হইত ; কারণ বঙ্গে মুসলমানদেরই সংখ্যা বেশী। কিন্তু কোন অবাঙালী মুসলমান সদস্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পাটের সব টাকাটা বঙ্গের পাওয়া উচিত বলিয়াছিলেন কি ? কেহই বলেন নাই। ভারতীয় সৈন্যদলে মুসলমান সিপাহীদের মধ্যে পাঞ্জাবীর সংখ্যাই বেশী। বাঙালীরা সৈন্যদলে অবাধ প্রবেশাধিকার পাইলে বাঙালী মুসলমানরাই অধিকাংশ স্থলে সেই অধিকার ভোগ করিবে। কিন্তু বাঙালী মুসলমানরাও মুসলমান বলিয়া কি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন পাঞ্জাবী মুসলমান সদস্য বাঙালী মুসলমানের সিপাহী হওয়ার সমর্থন করিয়াছেন ? কেহই করেন নাই। বঙ্গের অধিকাংশ কৃষক মুসলমান এবং অধিকাংশ বাঙালী মুসলমান কৃষিজীবী। বঙ্গে জলসেচনের ব্যবস্থার খুব দরকার। জলের অভাবে খাদ্যশস্যের চাষ কমিয়াছে। কিন্তু বঙ্গের বাহিরে এক-একটা প্রদেশে ২০।২৫।৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে জলসেচনের খাল আদি প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার তুলনায় বঙ্গে জল-সেচনের ব্যবস্থা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এই সকল প্রদেশের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার মুসলমান সদস্যেরা বঙ্গের মুসলমান কৃষকদের সুবিধার নিমিত্ত জলসেচনের কৃত্রিম খাল যথেষ্টসংখ্যক হওয়া উচিত কখনও বলিয়াছেন কি ? বলেন নাই।

অবশ্য, ইহাও সত্য, যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অবাঙালী হিন্দু সদস্যেরাও বঙ্গের আর্থিক উন্নতিবিধায়ক কোন প্রস্তাব উক্ত সভায় আনেন নাই কিংবা অন্যের আনীত সেরূপ প্রস্তাবের সমর্থন করেন নাই। প্রকৃত কথাটাই এই, যে, অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু মুসলমান সবাই বাংলাকে শোষণ

করিতে খুব রাজী আছেন ও করেন, কিন্তু বাংলার আর্থিক উন্নতির জন্য তাঁহারা সাধারণতঃ কোন চেষ্টাই করেন না। বস্তুতঃ বঙ্গের কংগ্রেসওয়ালারাও মুখ ফুটিয়া বলুন আর নাই বলুন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন অন্যান্য প্রদেশের অবাঙালী কংগ্রেস-নেতারাও বঙ্গের উপর প্রভুত্ব ও মুরুব্বিয়ানা করিতে যত উৎসাহী, বঙ্গের সমস্যা ও দুঃখ বুঝিতে ও তাহার সমাধান ও দূরীকরণকল্পে কিছু করিতে সেরূপ উৎসাহী নহেন। সেই জন্য, যেমন বঙ্গের হিন্দুকে তেমনি বঙ্গের মুসলমানকেও অন্য প্রদেশের ঔদাসীন্য ও বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও, বঙ্গের জন্য খাটিতে হইবে। অন্য প্রদেশের সাহায্য এ-বিষয়ে বাঙালী হিন্দু বা মুসলমান পাইবেন না।

একটা কথা আমরা মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসীতে বার বার বলিয়াছি। এই প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। বঙ্গের লোকসংখ্যা অন্য প্রত্যেক প্রদেশের চেয়ে বেশী। সুতরাং ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গের প্রতিনিধির সংখ্যা অন্য প্রত্যেক প্রদেশের চেয়ে বেশী হওয়া উচিত। কত হওয়া উচিত, তাহাও আমরা অঙ্ক কষিয়া দেখাইয়াছি। কিন্তু ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইন বাংলাকে তাহার প্রাপ্য অপেক্ষা কম প্রতিনিধি দিয়াছিল, ১৯৩৫এর আইনও কম দিয়াছে। আমাদের এই বিষয়ে বক্তব্যের সমর্থন কোন অবাঙালী বা বাঙালী সংবাদপত্র বা নেতা করেন নাই। হিন্দু করেন নাই, মুসলমানও করেন নাই—যদিও বঙ্গদেশ ন্যায্যসংখ্যক প্রতিনিধি পাইলে তাহার অধিক অংশ হইত মুসলমান। বঙ্গের অধিকাংশ প্রতিনিধি ধর্ম্মে মুসলমান হইবে বলিয়া বঙ্গের বাহিরের (কিংবা বঙ্গের) কোন মুসলমান নেতা বা সংবাদপত্র ত বঙ্গের জন্য ন্যায্যসংখ্যক প্রতিনিধির দাবি সমর্থন করেন নাই?

সুতরাং, যেহেতু বাঙালী মুসলমানেরা এবং অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানেরাও মুসলমান, অতএব এই শেষোক্ত মুসলমানেরা বাঙালী মুসলমানদের সুখসচ্ছলতার ও সুবিধার জন্য মাথা ঘামাইবেন, এরূপ আশা কেহ করিতে পারেন না। বস্তুতঃ বঙ্গে—বিশেষ করিয়া মুসলমানবহুল পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে—যখনই ভূমিকম্পে, জলপ্লাবনে, ঝড়ে, দুর্ভিক্ষে মুসলমানেরাই অধিক সংখ্যায় বিপন্ন হইয়াছে, তখনও বঙ্গের বাহিরের মুসলমানেরা তাঁহাদের ধর্ম্মভাইদের জন্য বিশেষ কিছু করেন নাই, নিরক্ষর বাঙালী মুসলমানদের শিক্ষার জন্যও তাঁহারা কিছু করেন নাই। বাংলাভাষী মুসলমানদের প্রতি উর্দ্দুভাষী মুসলমানদের মনের ভাব কিরূপ তাহা কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজে বাংলাভাষী ছাত্রদের ও উর্দ্দুভাষী ছাত্রদের মধ্যে অল্পদিন আগে যে বিরোধ হইয়াছিল, তাহা হইতে বুঝা যায়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রবন্ধে ও পুস্তিকায় এই মত ব্যক্ত করেন, যে, বাঙালীকে কাপড় কিনিতে হইলে বঙ্গে বাঙালীর কারখানায় বা তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ই কেনা উচিত, তাহা না পাইলে তবে অন্য জায়গার কাপড়; এবং আমরাও যখন এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, তখন মহাত্মা গান্ধীর গুজরাটী দলের শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার, শ্রীযুক্ত জীবনলাল প্রভৃতি আমার সহিত তর্ক করিতে আসিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, মহাত্মাজীই ত বলিয়াছেন, "আমার স্বদেশী দ্রব্য সর্ব্বাগ্রে তাহা যাহা আমার বাসগ্রামে প্রস্তুত হয়।"

এই সকল তথ্য বিবেচনা করিয়া আমাদের এই ধারণা জন্মিয়াছে, যে, সমগ্রভারতীয় ব্যাপারসমূহে বাঙালীরা যোগ্য অবাঙালী নেতার নেতৃত্ব মানিতে পারেন, কিন্তু বঙ্গীয় ব্যাপারসমূহে বাঙালীদিগকে দলবদ্ধ হইয়া বাঙালী নেতারই পরিচালনায় কাজ করিতে হইবে। ইহা যেমন হিন্দু বাঙালীর পক্ষে সত্য, তেমনি মুসলমান বাঙালীর পক্ষেও সত্য। মিঃ জিন্না কিংবা আর কোন অবাঙালী মুসলমান নেতার নেতৃত্ব সমগ্রভারতীয় বিষয়সমূহে মুসলমান বাঙালীরা মানিতে পারেন, কিন্তু বঙ্গীয় ব্যাপারসমূহে মুসলমান বাঙালীদিগকে নিজেদের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে হইবে, এবং নিজেদের মধ্য হইতেই মুসলমান বাঙালী নেতা বাছিয়া লইতে হইবে।

মুসলমান বাঙালীদের ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত, যে, তাঁহাদের মধ্যে সমগ্রভারতীয় মুসলমান নেতা কেহ নাই কেন। এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সভাপতি যে কয় জন মুসলমান হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জনও বাঙালী নহেন। অথচ বঙ্গে যত মুসলমানের বাস অন্য কোন প্রদেশে তত নহে। এই কারণে ভারতীয় মুসলমানদের নেতৃত্ব মুসলমান বাঙালীরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় করিবেন, ইহা আশা করা স্বাভাবিক।

ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশে ও ব্রহ্মদেশে কত মুসলমানের বাস, তাহার তালিকা নীচে দিতেছি।

আজমীর-মেড়োয়ারা	৯৭,১৩৩
আণ্ডামান ও নিকোবর	৬,৭১৯
আসাম	২৭,৫৫,৯১৪
বালুচিস্তান	৪,০৫,৩০৯
বঙ্গদেশ	২,৭৪,৯৭,৬২৪
বিহার-উড়িষ্যা	৪২,৬৪,৭৯০
বোম্বাই প্রেসিডেন্সী	৪৪,৫৬,৮৯৭
ব্রহ্মদেশ	৫,৮৪,৮৩৯
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৬,৮২,৮৫৪
কূর্গ	১৩,৭৭৭
দিল্লী	২,০৬,৯৬০
মান্দ্রাজ	৩৩,০৫,৯৩৭
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২২,২৭,৩০৩

পঞ্জাব	১,৩৩,৩২,৪৬০
আগ্রা-অযোধ্যা	৭১,৮১,৯২৭
মোট ব্রিটিশ ভারত	৬,৭০,২০,৪৪৩
দেশীয় রাজ্যসমূহ	১,০৬,৫৭,১০২
সমগ্র ভারতবর্ষ	৭,৭৬,৭৭,৫৪৫

এই তালিকায় দেখা যাইতেছে, সমগ্র ভারতবর্ষে যত মুসলমানের বাস, তাহার এক-তৃতীয়াংশেরও অধিকের বাসস্থান বঙ্গে। বঙ্গের নীচেই পঞ্জাবে অধিকসংখ্যক মুসলমানের বাস। কিন্তু পাঞ্জাবী মুসলমানদের সংখ্যা বাঙালী মুসলমানদের সংখ্যার অর্দ্ধেকেরও কম।

বাঙালী মুসলমানদের কোন কোন নেতা বাঙালী হিন্দুদের চেয়ে প্রভাবশালী হইতে পারিবেন, এই চিন্তায় উৎফুল্ল হউন তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু এই সকল ও অন্যান্য মুসলমান বাঙালী নেতা যাহাই ভাবুন করুন, শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের সমষ্টি সমগ্রভারতীয় মুসলমান সমাজে, এবং বিশেষ করিয়া বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে, আপনাদের স্বাভাবিক ন্যায্য স্থান সম্বন্ধে উদাসীন না থাকিয়া অধিকতর মনোযোগী হইলে মুসলমান বাঙালীদের, এবং মুসলমান ভারতীয়দেরও, কল্যাণ হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা।

—

অবিনাশচন্দ্র দাস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডক্টর অবিনাশচন্দ্র দাসের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্র হইতে ও বঙ্গীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্য হইতে এক জন গণনীয় ব্যক্তির তিরোভাব হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স সত্তর বৎসরের চেয়ে কয়েক মাস কম হইয়াছিল। সাহিত্যিক কৃতিত্বে ও পাণ্ডিত্যে তিনি বাঁকুড়া জেলার গৌরবস্থল ছিলেন। তিনি 'পলাশবন', অরণ্যবাস', 'কুমারী,' 'সীতা' প্রভৃতি বাংলা গ্রন্থের লেখক বলিয়া সুবিদিত। পদ্যও তিনি বেশ লিখিতে পারিতেন। তিনি 'গন্ধবণিক' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ঋগ্‌বৈদিক সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁহার যে বিস্তৃত ইংরেজী নিবন্ধ পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, তাহা লিখিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ্‌-ডি উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক নিয়োগের কারণও ঐ গ্রন্থখানি। তিনি তাহা না-লিখিলেও অন্য অনেক এম্‌-এ, বি-এল উপাধিধারীর মত অধ্যাপক হইবার যোগ্য ছিলেন। তিনি বেশ বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ইংরেজী লিখিতে পারিতেন এবং ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার জ্ঞানও যথেষ্ট ছিল। তাঁহার বাংলা গ্রন্থগুলি অনাবিল ও সেগুলির ভাষা প্রসাদগুণবিশিষ্ট।

তাঁহার ও আমার উভয়েরই জন্ম বাঁকুড়ায়। বাল্যকাল ও যৌবন হইতেই, বিশেষতঃ যৌবনে, আমাদের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। আমরা একই সময়ে, যদিও ভিন্ন ভিন্ন কলেজে, কলিকাতায় পড়িতাম। অবিনাশের বাড়ী যে নূতনচটি গ্রামটিতে, তাহা আমাদের বাল্যকালে বাঁকুড়া শহরের শেষ সীমা হইতে আনুমানিক আধ ক্রোশ দূরে ছিল। এখন নূতনচটি গ্রামের ও বাঁকুড়া শহরের মধ্যে সীমারেখা টানা কঠিন।

অবিনাশ বর্দ্ধিষ্ণু, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা হরিনাথ দাস স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর, বিদ্বান ও শিক্ষাদানদক্ষ ছিলেন। অবিনাশের স্বভাবচরিত্র তাঁহার দ্বারা সবিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিল। শানবাঁদা গ্রামের মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, নূতনচটির হরিনাথ দাস প্রভৃতি বোধ হয় সেকালে বাঁকুড়ায় প্রথম ইংরেজী শিখিয়াছিলেন।

বাঁকুড়া জেলার যে শুশুনিয়া পাহাড়ের একটি গুহার গাত্রে প্রাচীন সংস্কৃত একটি লিপি খোদিত আছে, সেই পাহাড় দেখিতে যাইতে হইলে আমাদিগকে অবিনাশদের বাড়ীর সম্মুখস্থ রাঙা রাজপথ দিয়া যাইতে হইত। বাল্যকালে আমরা যখন সরস্বতীপূজায় ব্যবহারের নিমিত্ত চণ্ডীদাসের চরিতকথার সহিত জড়িত ছাতনা গ্রামের সন্নিহিত শালবনে শ্বেত আরণ্য পুষ্প সংগ্রহ করিতে যাইতাম, তখনও অবিনাশদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতে হইত।

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় যখন নূতনচটির নিকটস্থিত পাচবাঘা গ্রামের বড় বাঁধের (পুষ্করিণীর) পাড়ের রাশি রাশি রক্ত করবী তুলিয়া আনিতাম এবং বাল্যে কখন কখ নূতনচটি ও পাচবাঘায় ভোজ খাইতে যাইতাম, তখন অবিনাশদের বাড়ী অতিক্রম করিয়া যাইতাম।

যৌবনে যখন আমরা উভয়েই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্ এ হইয়াছি, তাহার পরও, মনে পড়ে, পাচবাঘা গ্রামে হিতলাল মিশ্রের সহধর্ম্মিণীর নিকট হইতে কিঞ্চিৎ লব ভিক্ষা করিয়া লইয়া গিয়া উভয়ে নিকটবর্ত্তী বনে বন্য ব তুলিয়া খাইয়াছিলাম। আরও কত কথা মনে পড়িতেছে।

অবিনাশ আমার চেয়ে কিছু ছোট ছিলেন। সেই ম মনে করিয়াছিলাম, আমার সন্তানদিগকে বলিয়া যা আমার মৃত্যুর পর আমার যৌবনকাল সম্বন্ধে তাহাদে কোন কৌতূহল হইলে অবিনাশকে যেন জিজ্ঞাসা কর তাহা আর হইলনা। সুখের বিষয়, আমার চেয়ে কিছু ছো আমাদের বন্ধু বাঁকুড়ার প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় সুস্থ জীবিত আছে ন। তিনি দীর্ঘজীবী হউন।

—

প্যালেষ্টাইনে অশান্তি

প্যালেষ্টাইনে আরবদের বিদ্রোহ থামে নাই। জন্য ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কঠোরতর উপায় অবল

করিতেছেন। আরও ব্রিটিশ সৈন্য সেখানে প্রেরিত হইতেছে।

—

স্পেনে বিদ্রোহ

স্পেনের গবর্মেণ্ট সমাজতান্ত্রিক, বিদ্রোহীরা ফাসিষ্ট। সুতরাং ফাসিষ্ট ইটালীর ও ফাসিষ্ট জার্মেনীর সহানুভূতি স্পেনের বিদ্রোহীদের দিকে। শুনা যায়, ইটালী বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য দিতেছে; হয়ত জার্মেনীও দিতেছে। ফ্রান্সের গবর্মেণ্ট সমাজতান্ত্রিক। তাহার সহানুভূতি স্পেনের গবর্মেণ্টের দিকে। কিন্তু, বোধ হয় সারা ইউরোপে সমরানল প্রজ্বলিত হইবার ভয়ে, কোন পক্ষকেই কেহ প্রকাশ্য ভাবে সাহায্য করিতেছে না।

উভয় পক্ষই নিষ্করুণ ভাবে সংগ্রাম চালাইতেছে। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট উভয় পক্ষকে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্ক করিতেছেন। কিন্তু ইহাও উক্ত হইয়াছে, যে, এ-পর্য্যন্ত কোন পক্ষ বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কোন প্রমাণ পান নাই।

—

ভারতবর্ষীয় জাহাজের ব্যবসায়

বোম্বাইয়ের সিন্দিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশ্যন কোম্পানীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বলচাঁদ হীরাচাঁদ এই কোম্পানীর বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতি রূপে বলিয়াছেন, শীঘ্রই ভারতবর্ষ ও ইউরোপের মধ্যে ভারতীয়দের দ্রুতগামী যাত্রীবাহী জাহাজ চালাইবার বন্দোবস্ত হইবে। তিনি বলেন, যে, বর্ত্তমানে ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে বাণিজ্য আছে, তাহার মাল ও যাত্রী বহনের কাজের কোন অংশ ভারতীয় জাহাজ করে না। ভারতীয় জাহাজ দ্বারা এই কাজ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। সিন্দিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশ্যন কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা তাহাতে মত দিয়াছেন।

তিনি আরও বলেন, যেমন ব্রিটিশ জাহাজওয়ালারা দাবি করিয়াছেন, যে, ব্রিটেনে বিক্রীত রাশিয়ার কাঠের বড় একটা অংশ ব্রিটিশ জাহাজে আনীত হওয়া উচিত, তেমনি ভারতের বাজারে বিক্রীত ব্রিটিশ মালও কতক পরিমাণে ভারতীয় জাহাজে ব্রিটেন হইতে আনীত হওয়া উচিত। লী কমিশনের যে-সব সুপারিশ ভারত-গবর্মেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে এই গবর্মেণ্টের ইংরেজ কর্ম্মচারীদের অনেক সুবিধা হইয়াছে। তাহারা তাহাদের চাকরির কয়েক বৎসরের মধ্যে কয়েক বার গবর্মেণ্টের ব্যয়ে বিলাত যাতায়াত করিতে পারে। গবর্মেণ্ট তাহাদিগকে যে জাহাজ-ভাড়া দেন, তাহা আসে ভারতবর্ষের লোকদের প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে। অতএব ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা আশা করা যুক্তিসঙ্গত, যে, এই সরকারী ইংরেজ কর্ম্মচারীরা সেই সব জাহাজে যাতায়াত করিবে যেগুলি ভারতীয়দের সম্পত্তি এবং যেগুলির নিয়ন্ত্রণ ও কার্য্যনির্ব্বাহ ভারতীয়েরা করে।

এই সমস্তই সঙ্গত কথা। আমরা সিন্দিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশ্যন কোম্পানীর উদ্যমের সাফল্য কামনা করি।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অনেক অংশ যেমন সমুদ্রতটে অবস্থিত এবং তাহার বন্দর আছে, বঙ্গদেশেরও অনেক অংশ তেমনি সমুদ্রতটে অবস্থিত এবং তাহার বন্দর আছে। বাঙালী অতীত কালে জাহাজ নির্ম্মাণ করিত ও চালাইত। (এখনও চট্টগ্রামে ছোট ছোট জলযান নির্ম্মিত হয়)। বর্ত্তমান সময়ে কিন্তু বাঙালীর সমুদ্রগামী জলযানের ব্যবসায়ে উদ্যম দেখা যাইতেছে না। বোম্বাই অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণীয়।

—

মহাত্মা গান্ধী আরোগ্যের পথে

মহাত্মা গান্ধী সেগাঁও নামক যে-গ্রামে অধুনা বাস করিতেছিলেন, তথায় ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাকে বার্দ্ধার (Wardhar) হাসপাতালে যাইতে রাজী করা হয়। ৮ই সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ে প্রাপ্ত সংবাদ হইতে জানা গিয়াছে, তাঁহার তিন-চার দিন জ্বর হয় নাই এবং তিনি প্রফুল্ল আছেন—যদিও এখনও হাসপাতালে আছেন।

—

সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ইউরোপ হইতে আসিয়া বোম্বাই বন্দরে পৌঁছিবামাত্র গবর্মেণ্ট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন ও পুনার য়েরাবদা জেলে বন্ধ রাখেন। সেখানকার গ্রীষ্ম, তথাকার জলবায়ু ও বন্দীদশা তাঁহার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিতে থাকে। গবর্মেণ্ট তাঁহাকে সেখান হইতে আনিয়া কার্সিয়াঙে তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর বাটীতে নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। এখানেও তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল থাকিতেছে না—তিনি পীড়িত হইয়াছেন। ডাঃ সর্ নীলরতন সরকার ও অন্য কোন বেসরকারী ডাক্তার তাঁহার দেহ পরীক্ষা করিবেন এই প্রস্তাবে গবর্মেণ্ট রাজী হওয়ায় ডাঃ সরকার ও ডাঃ বি এস্ রায় তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছেন।

তাঁহাকে মুক্তি দিয়া তাঁহার ভ্রাতাদিগকে তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে দিলেই সর্ব্বোত্তম ব্যবস্থা হয়।

—

বন্যা

আসাম, বঙ্গদেশ, বিহার, আগ্রা-অযোধ্যা ও পঞ্জাবে বন্যায় অগণিত লোক বিপন্ন হইয়াছে, মাঠের শস্য, গবাদি ও অন্য নানাবিধ সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, ঘরবাড়ীও অনে

ভাঙিয়া বা ভাসিয়া গিয়াছে, এবং যাহাদের প্রাণ গিয়াছে তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়।

যাঁহারা বিপন্ন লোকদের কোন-না-কোন প্রকার সাহায্য করিতেছেন, তাঁহারা ধন্য।

—

দুর্ভিক্ষ

বঙ্গের ১১।১২টি জেলায়, এবং অন্য কোন কোন প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলেও, এখনও দুর্ভিক্ষ চলিতেছে। বিপন্ন লোকদিগের অন্ন, বস্ত্র, ঔষধপথ্য এবং গৃহনির্ম্মাণ ও জীর্ণসংস্কারের প্রয়োজন এখনও আছে।

—

বঙ্গে জননীর অল্পতা ও জাতির ক্ষয়

বঙ্গে পুরুষজাতীয় হিন্দু বাঙালীর সংখ্যা মোটামুটি ১,১৬,২৯,০০০ এবং নারীজাতীয় হিন্দু বাঙালীর সংখ্যা ১,০৫,৭২,০০০। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, যাঁহারা জননী, বা জননী হইতে পারেন, তাঁহাদের সংখ্যা বঙ্গে যথেষ্ট নহে। বঙ্গে নারী যথেষ্ট নাই, অথচ "বুদ্ধিমান" বাঙালী বরপণ-প্রথা (এবং কতকটা কন্যাপণ-প্রথা) প্রচলিত রাখিয়া বিবাহের প্রতিবন্ধক ও জননীত্বের বাধা ঘটাইয়া রাখিয়াছেন।

বঙ্গে যত নারী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে রক্ষিতা ও পতিতা ৭৮ হাজারের অধিক। এই পাপাচার জননীর সংখ্যা আরও কমাইয়াছে।

বঙ্গে হিন্দুনারীদের মধ্যে ২৩,৮৬,০০০ বিধবা। বিধবাদের বিবাহ এখন কিছু কিছু চলিতেছে বটে, কিন্তু যথেষ্ট চলিতেছে না। সুতরাং হিন্দুদের মধ্যে এই কারণে জননীর সংখ্যা আরও কম হইতেছে।

এরূপ অবস্থায় বাঙালী হিন্দুর আপেক্ষিক সংখ্যা যে যথেষ্ট থাকিতেছে না, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

—

নিম্নপদে ইউরোপীয় নিয়োগের প্রস্তাব।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতে চাহিয়াছিলেন, যে, ইউরোপীয়দিগকে এদেশের সব নিম্নপদে নিযুক্ত করা হউক; তাহাতে সরকারী কাজের উন্নতি হইবে ও ভারতীয়দের আত্মসম্মান রক্ষিত হইবে। ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি সর্ আবদুর রহিম প্রস্তাবটি বিদ্রূপাত্মক মনে করিয়া উহা সভায় উপস্থিত করিতে দেন নাই। এরূপ প্রস্তাব না করাই ভাল।

সহজেই অনুমান হয়, যে, প্রস্তাবকর্ত্তা উহা গম্ভীর ভাবে উপস্থিত করিতে চান নাই। তাহা হইলেও, এই প্রসঙ্গে এই ঐতিহাসিক কথাটা মনে পড়িবে, যে, কোম্পানীর আমলে গোড়ার দিকে যখন কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীরা বেতন কম পাইত, তখন তাহারা খুব ঘুষ লইত ও অন্য 'উপরি' রোজগার অনেক করিত বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের বেতন বাড়াইয়া দেন।

—

আর একটি পরিহাসাত্মক প্রস্তাব

শ্রীযুক্ত শ্যামলাল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতে চাহিয়াছিলেন, যে, যেহেতু (সরকারী মতে) আণ্ডামান দ্বীপ "বন্দীদের স্বর্গধাম" অতএব ভরতবর্ষের রাজধানী সেখানে স্থানান্তরিত হউক! সর্ আবদুর রহিম ইহাও বিদ্রূপাত্মক বলিয়া সভায় পেশ করিতে দেন নাই।

আণ্ডামান স্বর্গধাম বটে কিনা, সে-বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত গবর্ন্মেণ্ট ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন কোন বেসরকারী সভ্যকে সেখানে যাইবার অনুমতি দিয়াছেন। উক্ত হইয়াছে, যে, তাঁহাদের উপর সরকার বাহাদুরের সুনজর আছে।

—

ব্রিটেনে ও মিশরে সন্ধি

ব্রিটেনে ও মিশরে সম্প্রতি যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহা ২০ বৎসর কাল স্থায়ী হইবে। তাহার পরে উভয় পক্ষের সম্মতি অনুসারে ঐ সন্ধির সংশোধন বা পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। উভয় পক্ষ ইচ্ছা করিলে ১০ বৎসর পরেও সন্ধির সর্ত্ত পরিবর্ত্তনের আলোচনা করিতে পারিবেন। সন্ধির সংশোধন বা পরিবর্ত্তন যাহাই হউক না কেন, এই মূল নীতির উপর এই দুই দেশের মধ্যে স্থায়ী ভাবে মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, যে, সন্ধির বিরোধী মনোভাব কোনও পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিবেন না। কোনও তৃতীয় পক্ষের সহিত উভয় পক্ষের কাহারও বিরোধের আশঙ্কা হইলে, সেই পক্ষ অপর পক্ষের নিকট শান্তিপূর্ণ মীমাংসা সম্বন্ধে পরামর্শ লইবেন। এক পক্ষ কাহারও সহিত যুদ্ধ করিলে অপর পক্ষ তাহার সাহায্য করিবেন। কিন্তু মিশর আপনা হইতে কোন শক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন না। যুদ্ধ বা অন্তর্জ্জাতিক বিশেষ অবস্থায় মিশর ব্রিটেনকে বন্দর ও বিমান কেন্দ্রসকল ব্যবহার করিতে দিবেন ও যানবাহন চলাচল ও সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণে সুযোগ দিবেন। প্রয়োজনানুসারে ব্রিটিশ সৈন্য মিশরে প্রেরিত হইবে ও তথায় ব্রিটেন সামরিক আইন জারি করিতে পারিবেন। যত দিন পর্য্যন্ত এ-বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত না হন, যে, সুয়েজ খাল নিরাপদ রাখার সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিতে মিশরীয় সৈন্য শক্তিলাভ করিয়াছে, তত দিন ১০ হাজার ব্রিটিশ সেনা ও ৪ শত বিমান-সৈন্য মিশরে থাকিবে। তাহাদের আবাসস্থান-নির্ম্মাণের ব্যয় মিশর দিবেন। অন্তর্জ্জাতিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হইলে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট সৈন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, মিশর স্বাধীনতা লাভ করে নাই। তবে তাহার অবস্থা এইরূপ হইল বটে, যে, ইটালী তাহাকে গ্রাস করিতে চাহিলে ব্রিটেন নিশ্চয়ই তাহার সাহায্য করিবে।

—

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে হিন্দু সম্মেলন

'বঙ্গবাসী' বলেন :—

"গত ১৫ই আগষ্ট শনিবার অপরাহ্নে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ঙ্গীয় হিন্দু সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে বহু প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্মেলন উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বাঙ্গালার হিন্দু সম্প্রদায় আজ সর্ব্বতোভাবে বিপন্ন। কিন্তু বিপদ মানুষের মনুষ্যত্ব পরীক্ষার জন্যই আসিয়া থাকে; কাজেই এই বিপদে হিন্দু সম্প্রদায়কে হতাশ বা ভগ্নোদ্যম হইলে চলিবে না। যে-সমস্ত সমস্যা হিন্দুজাতির সমক্ষে আজ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের সমাধানের পথ খুঁজিয়া না পাইলেও তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস এই যে, হিন্দু জাতি বাঁচিয়া থাকিবে, উহার সুদিন পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। তিনি আরও বলেন যে, সার্ব্বজনীন কল্যাণসাধন বাই হিন্দু জাতির চিরকালের বৈশিষ্ট্য, হিন্দু জাতি আবহমানকাল এই গুরুতর দায়িত্ব বহন করিয়া আসিয়াছে এবং এই দুর্দ্দিনেও এই কর্ত্তব্যবোধ উদ্বুদ্ধ হইয়াই তাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে, তিনি তাহা বিশ্বাস করেন। তাঁহার মতে বর্ত্তমানে বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক সমস্যা হইতে প্রধানতঃ দুইটি; (ক) নারীর অবস্থা ও অধিকার ইত্যাদি এবং খ) তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়সমূহ। নারীদের সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য এই, বাঙ্গালার নারীর আপেক্ষিক সংখ্যা দিন দিনই কমিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালা দেশে পুরুষ অপেক্ষা নারী কম জন্মিয়া থাকে। অন্যান্য দেশে না অপেক্ষা পুরুষেরাই বেশী আত্মহত্যা করিয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালায় নারীরাই বেশী আত্মহত্যা করে। প্রসূতি-মৃত্যু-সংখ্যাও বাংলায় অত্যন্ত বেশী। যে জাতির নারীর এই অবস্থা সেই জাতি বর্দ্ধিষ্ণু হইবে কি করিয়া? এই সমস্যা রাষ্ট্রিক সমস্যা অপেক্ষাও গুরুতর। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়সমূহ সম্বন্ধে রামানন্দ বাবুর মত এই। মানুষকে মানুষের মর্য্যাদা ও সম্মান দিতেই হইবে। মানুষকে মানুষ বলিয়া গণনা করাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এবং এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের প্রতি বর্ণহিন্দুদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ১৯ সালের ভারতশাসন আইনে সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাচার গচ্ছিলা প্রকাশ করা হইয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালার হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ভারত-সচিবের নিকট যে আবেদন প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাও ভারত-সচিব 'পত্রপাঠ বিদায়' দিবার মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এঅবস্থায় বর্ত্তমানে হিন্দু সম্প্রদায়ের কি কর্ত্তব্য, তাহা এই সম্মেলনই নির্দ্ধারণ করিবেন। তবে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, হিন্দুজাতি টিকিয়া থাকিবে, হিন্দু মরিবে না।"

—

জগদ্ব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টা ও ব্রিটেন

পাশ্চাত্য বহু দেশে জগদ্ব্যাপী শান্তিস্থাপনের জন্য নানাবিধ চেষ্টা হইতেছে। আমেরিকা ইউনাইটেড ষ্টেটসের বাহিরে সমগ্র পৃথিবীতে ৬৯৭টি সমিতি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি এই প্রকার চেষ্টা করিতেছেন। তাহার মধ্যে ২১টি ভারতবর্ষে স্থিত। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটসের "শান্তি ও স্বাধীনতার নিমিত্ত নারীদের আন্তর্জাতিক সংঘ" ("Women's International League for Peace and Freedom") পৃথিবীর সকল গবর্মেণ্টকে যুদ্ধ উঠাইয়া দিবার দাবি জানাইয়া একটি অনুরোধ-পত্রে পাঁচ কোটি স্বাক্ষর সংগ্রহ করিতেছেন। বর্ত্তমান সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বেলজিয়মের ব্রসেলস্ শহরে জগদ্ব্যাপী শান্তি-প্রয়াসীদের কংগ্রেস হইয়া গিয়াছে। সেই সম্পর্কে ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে ৬ই সেপ্টেম্বর যুদ্ধের উচ্ছেদ ও শান্তির প্রতিষ্ঠার সমর্থক জনসভার অধিবেশন হইয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েক জন জনপ্রতিনিধি নিজ নিজ বাণী প্রকাশ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাণীর শেষে বলিয়াছেন, শান্তি পাইতে হইলে তাহার পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে; সে মূল্য হইতেছে এই, যে, শক্তিশালীদিগকে গৃধ্নুতা ত্যাগ করিতে হইবে, এবং দুর্ব্বলদিগকে সাহসী হইতে শিখিতে হইবে।

ইংলণ্ডে এই জগদ্ব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা খুব জোরে চালান হইতেছে। ইহার এক জন প্রধান কর্ম্মী লণ্ডনের সেণ্ট পল ক্যাথিড্রেলের (প্রধান গীর্জ্জার) ক্যানন শেপার্ড। তিনি হাজার হাজার যুবককে এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাইতেছেন :—

"I renounce war, and never again, directly or indirectly, will I support or sanction another."

তাৎপর্য্য। আমি যুদ্ধ ত্যাগ করিলাম, এবং আর কখনও, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে, আর কোন যুদ্ধের সমর্থন বা অনুমোদন করিব না।

পাশ্চাত্য সভ্য দেশসমূহে ১৯৩৫ সালে যুদ্ধ ও শান্তি-বিষয়ক ১৬২ খানা বহি প্রকাশিত হইয়াছিল—অধিকাংশ ইংলণ্ডে। যুদ্ধবিরোধী ক্ষুদ্রপত্রী ও পুস্তিকা আরও অনেক বেশী সংখ্যায় প্রচারিত হইয়াছে, এবং শান্তিসমর্থক চিত্তাকর্ষক বড় বড় প্ল্যাকার্ড সমস্ত ইংলণ্ডে ননকনফর্মিষ্ট খ্রীষ্টিয়ানদের অনেক অনেক গীর্জ্জার—কখন কখন সরকারী এংগ্লিকান গীর্জ্জারও—সম্মুখে দৃষ্ট হয়।

এই প্রকার নানা যুদ্ধবিরোধী ও শান্তিসমর্থক চেষ্টার প্রভাবে ইংলণ্ডে এখন বহুসংখ্যক যুবক আর সৈন্যদলে ঢুকিতে চায় না। আমেরিকার "লিভিং এজ" কাগজের আগষ্ট সংখ্যায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে এ-বিষয়ে ইংলণ্ডের অবস্থাটা কিছু অনুমান করা যায়। "লিভিং এজ" লিখিয়াছেন, ইংলণ্ডের সৈন্যদলের সংখ্যা নিয়ম-অনুসারে যত হওয়া উচিত, তাহা অপেক্ষা ৯,০০০ কম দাঁড়াইয়াছে। আগামী মার্চ মাসে এই সৈন্যদলের ২৬,০০০ সৈনিক পেন্স্যন লইবে। টেরিটোরিয়ালদের সংখ্যা নিয়মানুসারে যাহা হওয়া উচিত, তাহা অপেক্ষা ৪৫,০০০ কম আছে; শুধু লণ্ডনেই

বর্ত্তমান ১৫০০০। আকাশযুদ্ধের জন্য আবশ্যক সৈন্যদলের এক বিভাগে ১০,০০০ লোক কম আছে। আক্রান্ত হইলে শুধু লণ্ডনের রক্ষার্থই যে এরোপ্লেন-সৈনিকদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাদের সংখ্যার শতকরা ৫০ জন কম আছে।

—

শান্তিপ্রতিষ্ঠায় ইংলণ্ডে ভারতীয় শিক্ষার প্রভাব

পূর্ব্বে উল্লিখিত ক্যানন শেপার্ড প্রমুখ লোকেরা যে শান্তি-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে মহাত্মা গান্ধীর ভারতবর্ষীয় অহিংসাবাদের প্রভাব তাঁহার নাম করিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। গান্ধীজীর এক জন আমেরিকার 'চেলা' মিঃ গ্রেগ "দি পাওআর অব্ নন-ভায়োলেন্স" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তিনি শান্তিনিকেতনে কিছু কাল ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী দলের মধ্যে থাকিয়া কাজ করিতেছেন। ইংরেজরা বলেন, ব্রিটেন তরবারি দ্বারা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন। তাহা ঐতিহাসিক সত্য হউক বা না-হউক, সমসাময়িক ঐতিহাসিককে হয়ত বলিতে হইবে, যে, ভারতবর্ষ অহিংসা ও শান্তির বাণীর দ্বারা ব্রিটেনকে জয় করিতেছে।

বিরোধী পক্ষকেও প্রকারান্তরে ভারতবর্ষের প্রভাব স্বীকার করিতে হইতেছে। কলিকাতার ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজ বিলাতে ক্যানন শেপার্ড প্রমুখ শান্তিসমর্থকদের মত ও কর্ম্মের বিরুদ্ধে এক গণ্ডা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিয়াছেন। তাহাতে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ক্লৈব্য ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই মর্ম্মের বচন ষ্টেট্‌স্‌ম্যান আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী ইংরেজী "হরিজন" পত্রিকায় ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের জবাব দিয়াছেন। তাহাতে গান্ধীজী লিখিয়াছেন, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান গীতার যুদ্ধপ্ররোচক যে-সব কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন, টেরারিষ্ট অর্থাৎ বিভীষিকাপন্থী সন্ত্রাসকেরাও তাহাই ব্যবহার করে। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান গান্ধীজীর প্রবন্ধের উত্তরে দীর্ঘ একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে এই মর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, যে, গীতায় যেরূপ যুদ্ধে প্ররোচনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা যুদ্ধঘোষণার পর উভয় পক্ষের সশস্ত্র যুদ্ধ; তাহা, যুদ্ধঘোষণা না-করিয়া সশস্ত্র লোকের বা লোকদের দ্বারা অতর্কিতে অস্ত্রহীন নিরপরাধ অসৈনিক লোকদিগকে বা লোককে আক্রমণ নহে। কোনও টেরারিষ্টের সহিত তাহাদের পন্থা সম্বন্ধে আমাদের কখনও আলোচনা হয় নাই। সুতরাং ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের ঐ তর্কের উত্তর টেরারিষ্টদের কিছু আছে কি না এবং থাকিলে তাহা কি, বলিতে পারি না। কিন্তু ষ্টেট্‌স্‌ম্যানকে সাধারণ ভাবে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, যে, যদি কোন দেশের কতকগুলি লোক সেই দেশের গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রকাশ্য বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে চৌরঙ্গীর দৈনিক সেই বিদ্রোহকে তৎকর্ত্তৃক উদ্ধৃত গীতার উপদেশের অনুযায়ী এবং বৈধ মনে করিবেন কি?

যাহা হউক, ইহা অবান্তর কথা। আমাদের এ মন্তব্য ও টিপ্পনীতে মূল বক্তব্য এই, যে, আধুনিক ও প্রাচীন ভারতবর্ষের উপদেশকে শান্তিকামী ও যুদ্ধকামী উভয় পক্ষে ইংরেজকেই কাজে লাগাইতে হইতেছে।

অতএব চৌরঙ্গীর দৈনিক কি এখন বলিবেন, "জয়, গীতা কি জয়!" এবং বিলাতী শান্তিকামীরা কি বলিবেন, "জয়, মহাত্মা গান্ধী কি জয়?"

মহাত্মা গান্ধী অবশ্য "হরিজন" পত্রিকায় বলিয়াছেন তিনি শ্রীমৎ ভগবদ্গীতা হইতে শান্তির অনুকূল উপদেশ পাইয়াছেন।

—

সংস্কৃতির উপর জগৎজোড়া আক্রমণ

আধুনিক সময়ে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বাধীনতার উপর প্রায় সর্ব্বত্র আক্রমণ চলিতেছে। তাহার ফলে, এবং একনায়কত্ব, যুদ্ধের আয়োজন ও যুদ্ধের প্রভাবে সংস্কৃতির হানি এবং তাহার উচ্ছেদের আশঙ্কা অনুভূত হইতেছে। এই বিষয়ে নিখিল-ভারতীয় প্রগতিশীল লেখকদের সমিতি রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ বহু মননশীল ভারতীয়ের নিম্নমুদ্রিত মন্তব্য ব্রসেলসের জগদ্ব্যাপী শান্তি-কংগ্রেসে পাঠাইয়াছেন। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের নেতাদের ইহাতে স্বাক্ষর আছে।

"Recent events at home and abroad have been so dismal and disconcerting that we, as representatives of the writers and artists of India and of all who care for the life of the mind, feel it incumbent upon us to register our protest against the insane reaction and chauvinism that plays to-day with the fate of civilization and threatens to destroy the culture that we hold so dear. Our silence at this juncture would be unpardonable complacency; it would be betrayal of the duty which we owe to society.

"The tremendous deprivation of civil liberties in India is by no means a merely political disaster; it implies, we feel, a scarcely disguised attack on culture and on efforts at its propagation among our people. To our minds, the often indiscriminate proscription of books, those on the theory and practice of socialism being particularly suspected, is nothing short of a scandal. We frequently hear with chagrin of stoppages of books and pamphlets and periodicals from abroad under the notorious section 19 of the Sea Customs Act, which has been used on occasion to prevent the entry even of such books as Sidney and Beatrice Webb's "Soviet Communism" in spite of the great reputation of the authors as sociological investigators of the highest rank. Nearer home we may mention the ban which only the obscurantism of the Government can explain, on the English translation of Rabindra Nath Tagore's "Letters from Russia". The rec